



বৃহৎ বঙ্গ

[অপ্রাচীন কাল হইতে পলাশির যুদ্ধ পর্য্যন্ত]



757.6
.051/3

দ্বায় বাহাদুর

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি. লিট. (অন

কবিগোবিন্দ



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৩৪১



TBCU 2959

PRINTED AND PUBLISHED BY SHUPHENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA.

Reg. No. 715H.—February, 1936.—Aa.

Q 157 59

উৎসর্গ

মহামহাশয় শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য

১৯১২ বঙ্গ

সংস্কৃত

পাতি

বাহাদুরের শ্রীকরকমলে

একদা 'বঙ্গ' যৌবনে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র পাণ্ডুলিপি হাতে লইয়া
মহারাজ বীরচন্দ্র কার নামে পুস্তকখানি উপস্থাপন করিবার অনুমতি ও
কর প্রকটন করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিল।
১৯১১ সনের মে মাসে 'বঙ্গ' দর্শন-মানসে আগরতলায় গিয়াছিল।
এখনও ভুলিয়া গিয়াছে যে সেই পার্বত্য প্রদেশ ভ্রমণের কথা
নীলা পল্লীগুলি ভাঙে আর্থিক আহত হইয়াছিল।

'বঙ্গ' নামটি আমার স্বকপোল-কল্পিত
আরকিওলজিকাল রিপোর্টে উদ্ধৃত (১৯১৭-১৯১৮)
"বঙ্গ"।
গোয়ালিয়র-প্রশস্তিতে
বাস্তব্যের রাজধানী
"পঞ্চ সৌভ" "সৌভাগ্য বীতি," "সৌভাগ্য"
প্রদান করিয়া দাতব্য।
তখন আমার বয়স পঞ্চাশতি মাত্র ;
সংকীর্ণ সাহিত্যিক জীবনে প্রতিষ্ঠা-প্রভাব
বনে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত আছে,—আর মনে আছে,

ইতিহাসের সঙ্গে উল্লিখিত
গৌড়বংশ উপাধি
মুশকিতের
একটি মাণিক্য ও মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য আমাকে তৎসময়ে
যে আনুকূল্য করিয়াছেন, তাহা আর কি লিখিব ? আমার প্রিয়বন্ধু
কর্নেল মহিমচন্দ্র তাহা জানিতেন।

সেই প্রথম সময় হইতে আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে আমি শ্রীশ্রী
করকমলে আমার বক্তৃত্তম-সমাহিত "বৃহৎ বঙ্গ" উৎসর্গ করিতে উপস্থিত
হইয়াছি। তৎকাল বয়সেই শ্রীশ্রীযুত মহারাজের প্রতিভা ও মহানুভবতার যৎ
সর্বত্র বিদিত হইয়াছে। মহারাজ এই দানের কুটিরে পদার্পণ করিয়া তাহাকে
হৃদয়ঙ্গম আপ্যায়ন ও আনুকূল্য করিয়াছেন এবং এই পুস্তক উৎসর্গ করিবার
অনুমতি দিয়াছেন। আমার প্রথম গ্রন্থ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" এবং (সম্ভবতঃ
এই শেষ গ্রন্থ "বৃহৎ বঙ্গ" ত্রিপুরেশ্বরদেবের নামের সঙ্গে সংযুক্ত করি
পারিয়া আমি বৃত্ত হইয়াছি। আমার সাহিত্যিক জীবনে এই সিংহাসনের উৎসাহ ও আনুকূল্যের রশ্মিপাতে বিবর্ত-সং
করিয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি শ্রীশ্রীযুতের দান
করিয়া ভারতবর্ষের এই মহা-অর্থসঙ্কটের দিনে প্রজাহিত-সঙ্কল্পে নিয়োজিত করুন

গুণময় এবং পবিত্র
বিনোদচন্দ্র সেন

বঙ্গ
গোষ্ঠী
১৫৭ ৫৭

হইয়াছিল। এ দেশের অধিকাংশ ইতিহাসই মুসলমানগণের রচিত রাষ্ট্রীয় ইতিহাস; তাহাতে জয়-পরাজয়ের কথা, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং বিজয় মুসলমানদিগের কীর্তিই সমধিক পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছে। সামাজিক, নৈতিক, শিল্প ও ধর্ম-সংক্রান্ত—ক্রম-বিকশিত সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সেই সম্বন্ধ সকল সময়েই খুব গুরুতর হয় না। বহু শতাব্দী হইতে বাঙ্গালী জাতি যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে—এদেশে তাহার কোন উল্লেখ-যোগ্য ইতিবৃত্ত নাই। কিন্তু দশজন কৃতবিদ্বৎ ঐতিহাসিকের সমবেত চেষ্টায় যাহা সম্পাদিত হইবার পরিকল্পনা হইয়াছিল, আমার স্থায় অকৃতী ব্যক্তির দ্বারা একক তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? তথাপি আমি এতদর্থে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছি। এজন্য আমি ১০১২ বৎসরের চেষ্টায় এবং ৬৭ হাজার টাকা ব্যয়ে বঙ্গের প্রাচীন শিল্পের অনেক নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছি। অনেক চেষ্টা করিয়াও আমি এই শিল্প-সংগ্রহটি যথাযথভাবে রক্ষা করিতে পারিতেছি না। এত যত্ন ও কষ্টলব্ধ ভালবাসার জিনিষগুলি বিক্রয় করিবার কথা আমার মনে উদরই হইতে পারে নাই। এই মূল্যবান সংগ্রহটি আমি ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীমন্নহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের করকমলে উপহৃত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। তাহার নিকট হইতে আমি এই সদয় আশ্বাস পাইয়াছি যে তিনি এই জিনিষগুলি আগরতলার রাজ-প্রাসাদে যত্নপূর্বক রক্ষা করিবেন। বলা বাহুল্য, এই পুস্তকে যে সকল চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহার অধিকাংশই আমার স্বীয় চিত্র-শালা হইতে গৃহীত। এই পুস্তকখানি ত্রিপুরেশ্বরের নামে উৎসর্গ করিবার অনুমতি দিয়া এবং এই পুস্তকের হৃদয় ব্রহ্ম প্রভৃতির জন্য তিনি আংশিক ভাবে আর্থিক আনুকূল্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

‘বৃহৎ বঙ্গ’ নামটি আমার স্বকপোল-কল্পিত বা আধুনিক নহে। ১৯০৩-০৪ সনের আর্থিকওলজিকাল রিপোর্টে উদ্ধৃত (২৭৭-২৮৫ পৃঃ) হীরানন্দ শাস্ত্রীর গৃহীত পাঠে আমরা

গোয়ালিয়র-প্রশস্তিতে “বৃহদ্বঙ্গান্” কথাটি পাইয়াছি। একসময়ে
 “বৃহৎ বঙ্গ”।
 বাঙ্গলার রাজধানী গোড় বলিতে সমস্ত পূর্ব-ভারতকে বুঝাইত।

“পঞ্চ গোড়” “গোড়ীয় রীতি,” “গোড় ব্রাহ্মণ”—এই সকল শব্দ প্রাচীন কালের গোড়দেশের প্রসার ও মহিমা-স্ফোটক। ছাংখের বিষয় পঞ্চ গোড়মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত—এদেশের অত্যন্ত প্রধান

কেন্দ্র—উড়িষ্যাসম্বন্ধে আমরা এই পুস্তকে কিছু লিখিতে পারিলাম
 উড়িষ্যা।

না। বাঙ্গলার স্থাপত্য, বাঙ্গলার কলা-শিল্প ও বাঙ্গলার রাষ্ট্র-ইতিহাসের সঙ্গে উড়িষ্যার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। গঙ্গাবংশীয় রাজাদের কেহ কেহ “পঞ্চ-গোড়েশ্বর” উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। সেদিন পর্য্যন্তও রাঢ় অঞ্চলের অনেকটা কলিঙ্গ-নৃপতিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। গঙ্গাবংশীয় রাজারা বাঙ্গালী ছিলেন, এই মত এখন অনেক ঐতিহাসিকই গ্রহণ করিয়াছেন। চতুর্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গলা অক্ষর ও উড়িষ্যার অক্ষরে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না (এই পুস্তকের ১৭ ও ১৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। বঙ্গভাষা ও উড়িয়া ভাষার যে পার্থক্য, তাহা একই ভাষার প্রাদেশিক রূপান্তর ভিন্ন কিছুই নহে। সিংহল-বিজয়ী বিজয়-সিংহের সময় হইতে উড়িয়াবাসীরা বাঙ্গালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। সিংহ-

প্রত্যেক ভাষারই একটা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বা genius আছে। ইংরেজেরা গঙ্গাকে 'Ganges,' বঙ্গদেশকে 'Bengal,' ব্রাহ্মণকে 'Brahmin,' কলিকাতাকে 'Calcutta' প্রভৃতি ভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা তো এই সকল উচ্চারণ শুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন না,—এমন কি বোড়াসাঁকোর বাবুরা যে পবিত্র 'ঠাকুর' শব্দটার অদ্বিতীয় বাক্যের বিকৃতি ঘটাইয়া "Talore" শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইংরেজীতে নাম লিখিতে গেলে তাঁহারা কোনই কথা শুনবেন না, সেই 'ট্যাগোর' শব্দটি ব্যবহার করিবেনই। গ্রীক ও রোমানেরা চন্দ্রগুপ্তকে "ভাণ্ডোকেটাস," সিন্ধুকে "Indus" প্রভৃতি ভাবের বিকৃত উচ্চারণ দ্বারা পরিচিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রাচীন ইতিহাসগুলিতে তাহাই চলিয়া আসিতেছে। চীনদেশীয় লোকেরা খনাদিকাল হইতে ভারতীয় নামগুলির যে বিকৃতি-সাধন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের ভাষায় তাহা সেই ভাবেই চলিতেছে। জাতীয় ভাষার ছন্দ রক্ষা করিয়া প্রাচীনেরা বেক্রপ উচ্চারণ করিতেন, তাহার ঘন ঘন পরিবর্তন করিলে সাধারণের পক্ষে তাহা আয়ত্ত করা কঠিন হয়, বিশেষ, কোন ভাষার স্বভাবানুগ ছন্দ হারাইয়া ফেলিলে নাম-শব্দগুলি সেই দেশবাসীর স্বতির অমূল্য হয় না। কিন্তু সুদী-সমাজ যদি আমার অবলম্বিত রীতি দোষাবহ মনে করেন, তবে আমি ভবিষ্যতে সাবধান হইব।

বাঙ্গলায় আৰ্য্য-সভ্যতার ধারা

এই পুস্তকে মগদের সঙ্গে—তথা সমস্ত আৰ্য্যাবর্তের সঙ্গে—বাঙ্গলার ঘনিষ্ঠ সংঘর্ষ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। আৰ্য্যাবর্তে—বিশেষ করিয়া মগধে—যে সকল রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল, এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় তাহার অনেকগুলি চিহ্নই আসিতেছে। আৰ্য্য-সভ্যতা এবং দেশীয় আচার ও রীতির ধারা-বাহিকায় বাঙ্গালীরা যে পরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা অস্বল্প।

কুমারীদিগকে বাজারে বিক্রয়। প্রচলিত ছিল, এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় তাহার অনেকগুলি চিহ্নই আসিতেছে। আৰ্য্য-সভ্যতা এবং দেশীয় আচার ও রীতির ধারা-বাহিকায় বাঙ্গালীরা যে পরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা অস্বল্প।

জর্জ। খৃষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষে যে সকল কুমারীর পিতামাতা দারিদ্র্য-নিবন্ধন তাহাদিগকে যোগ্যবয়সের সঙ্গে বিবাহ দিতে অসমর্থ, তাঁহারা সন্তোষোবন-প্রাপ্ত কন্তাদিগকে বিবাহার্থে বাজারে আনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন।" ("Strabo tells us that those who are unable from poverty to bestow their daughters in marriage, expose them for sale in market-places in the flower of their age" Robertson's India, p. 65)। সেদিন পর্য্যন্তও বৈষ্ণবেরা রামকেলী, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ভিক্ষুণীদিগকে বাজারে বিক্রয় করিত,—সাধারণতঃ এইরূপ মেয়েদের এক এক জনের মূল্য ছিল ১।০ (পাঁচ সিকে)। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা বৈষ্ণব-সমাজের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া যাওয়ার পর এই প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া বাইতেছে, কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ অবশেষ বোধ হয় এখনও আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কবি দাশরথি এই প্রথাকে বিজ্ঞপ করিয়া লিখিয়াছেন :—"গোসাক্রীকে পাঁচ সিকে দিয়ে, ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে, জাত্যংশে কুলীন বড় নেড়া।"

খৃঃ-পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে অশোক পুরুষজাতীয় ধর্ম-মহামাত্রদিগের সঙ্গে জীর্ধর্ম-মহামাত্রও নিযুক্ত করিয়া ঘরে ঘরে ‘সঙ্ঘ’ প্রচার করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে সেদিন

পর্য্যন্তও “মা-গোসাকী”গণ ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীতে আনাগোনা করিয়া ধর্মের তত্ত্ব প্রচার করিতেন। মহাবি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার

আত্মজীবন-চরিতে লিখিয়াছেন, তাঁহার ‘দিদিমা’ এই “মা-গোসাকী”-গণের বাতায়ত পছন্দ করিতেন না। এই “মা-গোসাকী”গণ খুব সম্ভব সেই অশোকের সময়ের “জীর্ধর্ম-মহামাত্র”গণের ধারাটি বজায় রাখিয়াছিলেন। এই সকল প্রাচীন রীতি, ব্যবহার ও প্রতিষ্ঠানগুলি অদ্বন্দ্বন বৈষ্ণব সমাজই এই দেশে বেশী রক্ষা করিয়াছেন, বেহেতু প্রাচীন ধর্ম-সম্প্রদায়গুলি অধুনা বৈষ্ণব-সমাজের সঙ্গেই বেশী মিশিয়া গিয়াছে। জন-সাধারণের মধ্যেই প্রাচীন ধর্ম ও রীতি-নীতি অধিকতর পরিমাণে পাওয়া যায়, বৈষ্ণব-ধর্ম সেই জন-সাধারণকে আত্মসাৎ করিয়াই এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পালি সামন্ত-ফল-স্বত্তে পুরণ কঙ্গপ, মক্খলিপুত্র গোশাল, অজিত কেশকম্বল, ককুদ কচ্চয়ন, নিগ্রহ জ্ঞাতি-পুত্র, সঞ্জয় বোলেট্ট প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতের যে সকল মত আমরা উল্লিখিত দেখিতে পাই, সেই সকল মত, কোথায়ও পরিবর্তিত বা

প্রাচীন একাভিয়ারী বিকৃত হইয়া, কোথায় বা অকৃতর আদর্শে নীত হইয়া, বঙ্গীয় সহজিয়া ও বাড়িলদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে।

কুমার দত্ত প্রণীত “বঙ্গ-সাহিত্য-উৎসাহ-সম্প্রদায়,” বাড়িলদের সম্বন্ধে নিবন্ধ প্রকাশ্য এবং বর্তমানের গ্রন্থের ৭৬৯-৭৮২ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে পাঠক এই কথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের মধ্যে যে নৈশ মিলন-সমিতি হইত, তাহার উল্লেখ আমরা খৃঃ-পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত পালি “কথাবথু”নামক পুস্তকে পাই, তাহাই বঙ্গদেশে সহজিয়াদের নৈশ-সভায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই বৌদ্ধভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা “একাভিয়ারী” নামে পরিচিত ছিল এবং একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিব্বত রাজা চ্যাংচুং তদীয় দূত ‘নাগচো’র মুখে দেশের যে অবস্থা দীপঙ্করকে জানাইয়াছিলেন তাহাতে সম্ভবতঃ এই দলেরই উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহারা নীল আলখালা পরিতেন এবং দেশময় ব্যভিচারের স্রোত বহাইয়া দিয়াছিলেন; রাজা স্বয়ং ইহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, প্রথম ভাগের ভূমিকা এবং ঐ পুস্তকের ৩১৯-৩২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। “চাক দর্শন” নামক পুস্তকে এদেশের সহজিয়াদের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, আমি তৎপ্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি (এই পুস্তকের ৭৭৩ পৃঃ)।

শুধু মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা নহে,—প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবের চিত্রাঙ্কন-প্রচেষ্টা, বাহা সিদ্ধানপুরে প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যাইতেছে, তাহার সঙ্গেও বাঙ্গলার কুটির-শিল্পের আশ্চর্য্য ঐক্য দৃষ্ট হয়। পাহাড়পুরে দেশীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-শিল্পের যে সকল নিদর্শন আছে,—তাহাতে মনে হয় বাঙ্গলার

কলালক্ষী যেন অতল জলধিতল হইতে তাহার প্রথম নিজামনের পদ-চিহ্ন সেখানে রাখিয়া গিয়াছেন। অজস্র চিত্রগুলি যে বাঙ্গালী চিত্রকরের করম্পর্শে উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ গ্রন্থভাগে (৪১৬-৪২ পৃঃ) প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভারতীয় জগৎ-প্রসিদ্ধ শিল্প-কেন্দ্রগুলির আদর্শ এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। বঙ্গপর্য্যন্তে আখ্যাসভ্যতার শেষ রেণু-কণা আমরা যে পরিমাণে কুড়াইয়া পাইয়াছি, আখ্যাবর্তের অন্তর্গত তাহা স্থলভ নহে। এদেশের কুটির-শিল্পে আমরা মহেশ্বোদারো, অজস্রা, অমরাবতী প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রের তীর্থ-রেণু প্রচুররূপে পাইতেছি। পাবাগের গায়ে, কাঠে, বস্ত্রে, তুলট কাগজে, তিরুট ও তালপত্রের পুঁথির মলাটে, উপাখ্যানের আচ্ছাদনে, কাঁধা— শিকা— আলপনা— মেঠাই— দেয়াল-চিত্রে, ঘটিতে, বাটিতে, পালকে, পানের ডিবেতে, দেব-বিগ্রহে, কাঠের রথে, সিংহাসনে, মন্দিরের পোড়া ইটে, মাজুর ও পাটীতে, হস্তিদন্তের ও ধাতব তৈজস-পত্রে, এমন কি বিছানা বাধিবার দড়ি, পুঁতির লাঠি, নারিকেলের মালায় রচিত নর-মুণ্ড, অস্ত্রের বাট, ধলে, আসন প্রভৃতি শত শত নিত্য-ব্যবহৃত দ্রব্যাদিতে চারুকলার যে সকল নিদর্শন পাইতেছি, তাহা সূচিরাগত বৌদ্ধ শিল্পের ধারাটি উজ্জল করিয়া দেখাইতেছে। গত এক শত বৎসরের মধ্যে এই স্রোত মন্দীভূত হইয়া বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা জন্মাইতেছে। বাঙ্গলার শিল্প-কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমরা পাঠকের দৃষ্টি এই পুস্তকের ২৩৫-৪৮, ৪০৬-৪২ পৃষ্ঠায় প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি; নানা কারণে আমরা অহমান করিয়াছি, বাঙ্গলাদেশই বঙ্গধর্মের প্রধান চিত্র-শালা ছিল।

শিল্পের আর একটি শাখাও একে আখ্যানে উল্লেখ করিয়া। আখ্যানের দেশে পটুয়ারা নানানুপ পৌরাণিক উপাখ্যানের চিত্র আঁকিয়া এখন পর্য্যন্ত দূর পরাগামে অদর্শন করিয়া

মঞ্চরী।

ধাকে। এক একটি উপাখ্যানের চিত্র কাগজে বা পত্রে অঙ্কিত হইয়া সুদীর্ঘ মানচিত্রের মত জড়ান থাকে এবং তাহাতে সেই বিষয়ের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি একত্রে সুসম্বন্ধভাবে পর পর প্রদর্শিত হয় যে, পটুয়ারা যখন এক একটি দৃষ্ট দেখাইয়া তৎসম্পর্কিত পরার আবৃত্তি করিয়া যায়, তখন দর্শক ও শ্রোতার সমস্ত গল্পটি কবিত্বের ভাষায় ও মনোরম চিত্র-সাহায্যে উপভোগ করিবার সুবিধা পান। এই চিত্রপট-প্রদর্শনের রীতিটা বিক্রমপুরে “পট নাচানো” নামে পরিচিত। বঙ্গের কোন কোন স্থানে এই শ্রেণীর পটুয়াদিগকে ‘পটদার’ বলে। এই রীতিটি খৃষ্ট-জন্মের বহুপূর্ব হইতে এদেশে প্রচলিত। বৌদ্ধগণ এইরূপ চিত্র দ্বারা জাতকের গল্পগুলি সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতেন—ইহাদিগকে প্রাচীন কালে ‘মঞ্চরী’ বলিত এবং চিত্রগুলিকে কখনও কখনও ‘মঞ্চপট’ বলা হইত, যেহেতু চিত্রের উপসংহারে ধর্মরাজের সভা ও পাপের দণ্ড প্রদর্শিত হইত। শেষোক্ত প্রথাটা এখন পর্য্যন্তও বিস্তারিত। মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি নাটকে এইরূপ চিত্র-প্রদর্শনের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধদিগের অনুরোধে খৃষ্টানেরাও এইরূপ চিত্র দেখাইয়া তাহাদের ধর্ম প্রচার করিতেন, রোমে ভ্যাটিকানে খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে ‘পেপিরাস’ (Papyrus) পত্রে অঙ্কিত এইরূপ কয়েকখানি ছবি আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই প্রাচীন ধারাটি সেদিন পর্য্যন্তও বাঙ্গালী চিত্রকরেরা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এই শ্রেণীর বহুসংখ্যক পট উদ্ধার করিয়াছেন এবং পটদ্বারেরা যে সকল গীতি গাঁথিয়া তাহাদের ছবির ব্যাখ্যা করে, তাহার অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই শ্রেণীর চিত্রকরদের মধ্যে পুস্তকের ৪৩৯-৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কি ধর্মে, বাঙ্গালী যে পথে চলিয়াছে, সেই পথেই তাহার লক্ষ্য 'ভূমা'। এই আদর্শের মধ্যে কোন সীমা-রেখা, সঙ্কোচ বা স্বিধার ভাব দেখা যায় না;

বাঙ্গলাদেশ আদর্শের
কোন বিভাগেই আছে
সমস্ত নহে,—বাঙ্গালীর লক্ষ্য
'ভূমা'।

বাৎসল্য, দাম্পত্য, বা লৌকিক ধর্মসংস্কার দ্বারা এমন কি স্বকৃতির অনুরোধেও এই আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। দাতাকর্ণের গল্পটি খুব প্রাচীন; এক বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালাতেই বঙ্গের নানা ছেলা হইতে সংগৃহীত দাতাকর্ণের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত প্রায় অর্ধশত পুঁথি রক্ষিত আছে। মেদিনীপুর হইতে রংপুর, এবং শ্রীহট্ট

হইতে ত্রিবেণী—এই বৃহৎ প্রদেশের সর্বত্রই দাতাকর্ণের পুঁথি পাওয়া বাইতেছে। একসময়ে ঘরে ঘরে প্রত্যেক বাঙ্গালী ছেলেকেই এই পুস্তক পড়িতে হইত, ইহা বাঙ্গালী ছেলের নিত্যপাঠ্য "শিশুবোধক" বইখানির অন্তর্গত ছিল।

অতিথি যাহা চাহিবেন, তাহাই দিবেন এই সত্য-রক্ষার ব্যপদেশে কর্ণ ও তাঁহার সীমস্তিনী তাহাদের একমাত্র পুত্র বৃষকেতুর মন্তক করাত দিয়া দাতাকর্ণ।

কাটিতেছেন এবং রাণী সেই পুত্রের মাংস অতিথির জন্য রন্ধন

করিতেছেন। এই গল্পটির কথা গ্রন্থভাগে একবার উল্লেখ করা হইয়াছে।

উপাখ্যানটি আট হিসাবে একবারে অসম্পূর্ণ ও নিশ্চয়—এমন কি বীভৎস। আটের প্রচেষ্টা—ধর্মনীতি, সমাজনীতি এমন কি সাহিত্য-রীতিকেও কতকটা নিয়ম ও শৃঙ্খলার গত্তীর মধ্যে আনয়ন করা। সে হিসাবে গল্পটি ব্যর্থ,—ইহার লক্ষ্য দান ও আতিথ্যের আদর্শ-প্রদর্শন, এই আদর্শ একেবারে ভোলানাথ দিগধরের ছায়—সম্পূর্ণ নিরাভরণ, এমন কি ছাই-ভস্ম-মাখা। ইহার বিশেষত্ব এই,—সেই আদর্শ অপর সকল কথা জুফেপে ডিঙ্গাইয়া গিয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যী শৈব্যা অশ্রুজলে শ্রমণের চিত্তা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গের এই আদর্শটি মাতৃকঙ্কণার জন্ত পর্যন্তও একটু মাত্র অবকাশ রাখে নাই। একটি নিঃশ্বাস বা একফোঁটা অশ্রু পড়িলে সমস্ত বিফল হইবে। পল্লী-গীতিকার (পূর্ববঙ্গ-গীতিকা ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ৭৯-১১৮

কাঞ্চনমালা।

পৃঃ) কাঞ্চনমালার গল্পও এই একই সুরে বাধা। কাঞ্চন তাঁহার

প্রাণাধিক প্রিয় স্বামীকে স্বীয় চিরশত্রু রত্নমালার হস্তে চিরতরে সমর্পণ করিয়া বাইতেছেন; যে মুখ একবার মাত্র দেখিবার জন্ত তিনি শত শত জীবনের কষ্ট তুচ্ছ করিতে পারেন, সেই স্বামীকে আর দেখিতে পাইবেন না,—এই মহা-ত্যাগের সময়ে তাঁহারও একবিন্দু অশ্রু বা একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িতে পারিবে না,—ইহাই সর্ব, তবেই স্বামী অক্ষচক্ষে দৃষ্টি ফিরিয়া পাইবেন। তাঁহার এই পরীক্ষা সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও রজাবতীর শূলের উপর প্রাণ দেওয়ার উৎকট পরীক্ষাকেও ছাপাইয়া গিয়াছে। বিশেষত্ব এই, দাতাকর্ণের গল্পে যাহা

নাই, সেই সাহিত্যিক শিল্পজ্ঞান পরীকবি-রচিত “কাঞ্চন-মালা”র আছে। এই গল্প ত্যাগের সর্বোচ্চ শেখরে দাঁড়াইয়াও কাব্যোচিত শিল্প ও সংযম রক্ষা করিয়াছে, এরূপ মহান্ দৃষ্ট সাহিত্যে বিরল। ধর্ম-মঙ্গলের কালু ডোম ভ্রাতৃ-স্নেহের

কালু ডোম।

আতিশয্যে তাঁহার ঘোর শত্রু ছোট ভাই ধৃষ্ট-শিরোমণি ইন্দার কাছে প্রতিশ্রুত হইল, সে বাহা চাহিবে—তাহা দিবে। ইন্দা শত্রু-পক্ষের চর—সে কালুর মাথাটা চাহিয়া বসিল। সিংহবিজ্ঞাত বীরবর সত্যরক্ষার জন্ত কি অদ্বুত সংযমের সহিত প্রাণ দিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম-মঙ্গল কাব্যগুলিতে লিখিত আছে। অনেক ইতিহাসে বর্ণিত আছে,

প্রতাপাদিত্য।

প্রতাপাদিত্য কল্লতরু সাজিয়া সিংহাসনে বসিলে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার মহারাজ্যকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই কার্যের স্থায়পরতা-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিবে, অনেকে ইহাকে নিছক বর্করতা মনে করিবেন। কিন্তু ত্যাগের মহান্ আদর্শ ভিন্ন অল্প কোন দিক্ দিয়া বিচার করিলে এই সকল গল্পের গুণাগুণ বুঝিতে পারা যাইবে না। বঙ্গের লক্ষ্য—ভূমা। বাঙ্গালী অল্পে সন্তুষ্ট নহে। মিউজিয়ামের চিত্রশালায় তিব্বত, বেঙ্গুন প্রভৃতি দেশের অন্নদরের ভাস্কর-নির্মিত বৌদ্ধমূর্তির চেপ্টা মুখ, খর্ষ নাসিকা ও কোটরগত চক্ষু অনেকেই দেখিয়া বিন্দা, কিন্তু সেই ভাস্কর্যের নিদর্শনই হউক, অথবা হীন কারিগরের গড়া মুর্তিই হউক, সমস্ত বৌদ্ধমূর্তির একটা পরিচিত দাঁপ আছে—তাহা বৌদ্ধমূর্তি-ব্যূহের সাধারণ লক্ষণ—তাহা নিক্রান্তের ভাব, তাহা সকল মূর্তিতেই আছে। সেইজন্য এই সকল গল্প—সু-রচিত বা কুৎসিতই হউক—ভূমার প্রতি লক্ষ্যই ইহাদের বিশেষত্ব। বাঙ্গালী কোন ক্রিয়াকর্ম বাদ দিয়া গ্রহণ করিবে না; সে দিবে, সর্বস্ব দিবে;—ত্যাগ করিবে, কপর্দকও রাখিবে না; সে সত্যরক্ষা করিবে,—বাৎসল্য, দাম্পত্য বা সাংসারিক কোন বাধার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না। তাহার ভাব-প্রবণতার শ্রোতে ঐরাবতের স্থায় বাধা ভূণের মত ভাসিয়া যায়। জড়বাদীরা বলিবেন, এ সকল গল্পে কতকটা অসংবত আতিশয্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু বাহারা ‘ভূমা’কে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা দিগম্বর জৈন তীর্থঙ্করদের মতই সমস্ত সংস্কার ত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহাদের অবাধ রাজ্যে তিল-প্রমাণ বাধার অবকাশ নাই। তাঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট হইবার নহেন। সংস্কারাধীন ক্ষুদ্রদের সমালোচকের টিট্কারীতে তাঁহাদের কি হইবে?

এই ভূমার প্রতি যে বাঙ্গালীর লক্ষ্য—তাহা সামাজিক জীবনের মধ্যেও স্বীয় বিদ্রোহী সত্তা বুঝাইতেছে। সহজিয়ারা দাম্পত্য-প্রেমকে অগ্রাহ করিয়াছে এবং প্রশ্ন তুলিয়াছে,—“সীতা-সাবিত্রীর প্রেম যৌন-সম্বন্ধের আদর্শ বলিয়া গণ্য হইবার দাবী রাখে কিনা?” উত্তরে তাহারা উহা অস্বীকার করিয়া বলিয়াছে, ইহাদের তথাকথিত স্বামি-প্রেমের মধ্যে কতটা সামাজিক প্রশংসালভের ইচ্ছা, কতটা ইহকালে সুখে থাকা এবং পরকালে স্বর্গ-সুখের লোভ অলক্ষ্যভাবে বিদ্যমান, তাহা অবধারণ করা সহজ নহে; কিন্তু ‘পরকীয়া’ প্রথম হইতেই কলঙ্কের তিলক মাথায় করিয়া সর্বপ্রকার কষ্টের জন্ত প্রস্তুত হইয়া একমাত্র প্রেমকেই বরণ করিয়া লইয়াছে। নিন্দা, দণ্ড, সর্বস্বত্যাগ—ইহাই এই প্রেমের পুরস্কার। এই

প্রেম যদি একনিষ্ঠ ও ইন্দ্রিয়জস্রী হয়—তবে তাহাই আদর্শ প্রেম। চণ্ডীদাস এইরূপ প্রেমের প্রসঙ্গেই লিখিয়াছিলেন,—“ব্রজাও ব্যাপিয়া আছে যে জন, কেহ না চিনয়ে তারে। প্রেমের আরতি, যে জন জানয়ে সেই সে চিনিতে পারে।” চৈতন্য-চরিতামৃতকার এই প্রেমের অজস্র প্রশংসা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—“পরকীয়া-ভাবে সর্ব রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অস্ত্র নহে বাস।” পৃথিবীতে ইহা দুর্লভ—চণ্ডীদাসও ইহাই বলিয়াছেন, ইহা মানব-সমাজে কচিং দৃষ্ট হয়—“কোটিকে গোটিক হয়।” তৎপরে, সমাজে সাধারণ নরনারীর পক্ষে ইহা অপকারী হইবে এই আশঙ্কা করিয়াই যেন বলিয়াছেন, যিনি মাকড়সার জালের হতা দিয়া স্বমেক-শেখর আকাশে ঝুলাইয়া রাখিতে পারেন, এবং ভেককে কাল-সাপের মুখের মধ্যে নৃত্য করাইয়া অক্ষতদেহে ফিরাইয়া আনিতে পারেন, তিনিই যেন এই পদের পথিক হন। এই অসম্ভব পদের পথিক বাঙ্গালী সাধক হইয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্তও চারু-দর্শন নামক পুস্তক-পাঠে জানা গিয়াছে (৭৭৩ পৃঃ)। আশ্চর্যের বিষয় ১৭১৭ সনে বৈষ্ণব-সমাজের তাত্‌কালিক নেতারা আলিবর্দী খাঁর প্রধান কর্মচারীদের মধ্যবর্তিতায় প্রকাশ সভায় বিচার করিয়া স্বকীয়া হইতে যে পরকীয়া শ্রেষ্ঠ—এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দলিলখানি পাওয়া গিয়াছে (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড ১৬৩৮-৩৯ পৃঃ)। পূর্ববঙ্গের গীতিকার “আধাবধু” নামক গাথাটি (৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৮৫-২০৭ পৃঃ) এই প্রেমের অসামান্য ত্যাগ ও অনাবিল আদর্শ অতিশয় নিষ্ঠা ও নির্ভীকতার সহিত প্রমাণ করিয়াছে; সমাজে এত বড় বিজোহীর স্বর আর কোন জাতি দেখাইতে পারিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

বাঙ্গালীর ভাব-প্রবণতাসম্বন্ধে বেশী লেখা বাহ্য। এখনও হয়ত একরূপ দুই একটি বৈষ্ণব পাওয়া যাইতে পারে, যিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া গঙ্গামৃত্তিকা-দর্শনে কাঁদিয়া অধীর হন, যেহেতু সেই মৃত্তিকায় যে খোল তৈয়ার হয়,—সেই খোল সংকীর্ণনের সময়ে বাজিয়া কুকনামের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করে। “ক

ভাব-প্রবণতা।

দেখি কাদছে বাপু কিসের কারণ?” ধাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি বাঙ্গালী প্রহ্লাদ। চৈতন্য-ভাগবতে উল্লিখিত আছে যে এক বাঙ্গালী অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে দশরথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সত্যসত্যই পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন (আদি খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়)। এই ঘটনা পঞ্চদশ শতাব্দী বা তৎপূর্বে ঘটিয়াছিল, অভিনেতা রাম-বনবাসের সময়ে এতটা অভিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, লুপ্ত-চৈতন্য আর ফিরিয়া পান নাই।* বিজ্ঞাপতি-রচিত পুরুষ-পরীক্ষা নামক সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষণ সেনের সভায় উমাপতি ধর প্রভৃতি মজীর সাক্ষাতে এক অভিনেতা উত্তর-চরিত অভিনয় করিতে যাইয়া এইভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ধর্ম-জগতে এই ভাব-প্রবণতা যে কিরূপ অপূর্বভাবে

* “পুরুষ দশরথ ভাবে এক নটবর।

রাম-বনবাসে এড়িলেন কলেবর।”

প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা চৈতন্য-লীলায় প্রকাশ পাইয়াছে—সে লীলার আশ্রয় স্বপ্ন ও স্বপ্নের স্বপ্নমায়। এখনও খোল বাজিয়া উঠিলে ইহসংসার ও অধ্যাত্মলোকের মধ্যে যে ব্যবচ্ছেদ-রেখা বাঙ্গালী তাহা ভুলিয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই ভাব-প্রবণতা—বাহা বাঙ্গালী জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-সম্পদের অধিকারী করিয়াছে—তাহা নীরস ও শুষ্ক জড়বাদীরা নিন্দা করিয়া থাকেন। যুগে যুগে আদর্শ ভিন্ন হয়; এক যুগে বাহা সর্বজন-প্রশংসিত, অন্য যুগে তাহার গুণাগুণ-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে, এমন কি তাহা নিন্দিত হয়। সুতরাং আদর্শের বিচার নিশ্চয়োজ্ঞান। কিন্তু যে যুগেই বাঙ্গালী যে আদর্শের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছে, সে তাহার পিছনে এতদূর চলিতে পারিয়াছে যে তাহা অপর জাতির বিশ্বাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রত্যেক ক্ষুদ্র বিষয়ে বাঙ্গালী অসীমকে লক্ষ্য করিয়াছে। সেই অসীম মহান হইতেও মহান এবং অণু হইতেও অণু—“মহতোহপি মহীয়ান্ অনোরপি অণীয়ান্।” বাঙ্গালীর গল্প-সাহিত্যের পুনরায় উল্লেখ করিব। গল্পগুলি নিছক করনা ও মিথ্যা হইলেও ইহারা জাতীয় চরিত্রের দিগ্‌দর্শন। রাজগৃহে “রমণী-বিলাসী”র পরীক্ষা,—সে পরমসুন্দরী বোড়শী রমণীর সঙ্গে

শয়ন করিয়া পরদিন জানাইল, ছাগের গন্ধে সে রাত্রিতে ঘুমাইতে পারেন নাই; অল্পসন্ধ্যানে জানা গেল, অপোগণ্ড অবস্থায় সেই রমণী কয়েক মাস ছাগ-হৃৎ খাইয়াছিল। উৎকৃষ্ট ছদ্মকেননিভ

বহুমূল্য শয্যায় শুইয়া “শয্যা-বিলাসী” অভিযোগ করিল, চুলের অল্প রাত্রি তাহার ঘুমে বিষ ঢটিয়াছে—জানা গেল, সপ্ততল গদীর শেষটির নীচে একগাছি চুল ছিল। রাজার অতিথি-শালায় অলসদের পরীক্ষা। তিনি অলসদিগকে ভরণ-পোষণ করিবেন—এই বোঝা করিয়াছিলেন। শত শত অলস ব্যক্তি আসিয়া অতিথিশালা ভর্তি করিয়া ফেলিল। পরীক্ষার দিনে মধ্যরাত্রে রাজা গৃহে আগুন ধরাইয়া দিলেন, অতিথিরা যে যে পথ পাইল—পলাইয়া গেল, মাত্র রহিল তিন জন। এই তিন জন প্রকৃত অলস ব্যক্তি প্রজলিত অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতে উত্তম হইল, তবু নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা মাত্র করিল না। একজন আগুন দেখিয়া বলিয়া উঠিল ‘কত রবি অলে?’ দ্বিতীয় ব্যক্তি আরও অলস, সে বলিল ‘কে বা আঁখি মেলে?’ চোখ চাওয়াও তাহার নিকট শ্রম-সাধ্য; তৃতীয় ব্যক্তি বাক্যব্যয় করিতেও প্রস্তুত নহে—সে অতি সংক্ষেপে বলিল ‘ফি শো’ (ফিরিয়া শোও)। এই সকল তুচ্ছ গল্পের দ্বারা বুঝা যায়, বুদ্ধি ও অহুত্বতিকে স্বজ্ঞাতিহীন ও অতি প্রথর করিবার যে তপস্বী, তাহাতে বাঙ্গালী সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই সকল আজগুবি গল্পের বহুল প্রচার দ্বারা মনে হয়, বাঙ্গালী সর্বদা একটা অসম্ভব আদর্শ চোখের সামনে রাখিয়াছে। বাঙ্গালী বাহা করিবে, তাহার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িবে। সাহিত্যরথ স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বহু মহাশয় জাতীয় চরিত্র বুঝাইবার জন্য তাহার একখানি পুস্তকে এইরূপ ছই একটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছিলেন। ‘রূপণ’ নামক প্রাচীন যুগের একটি গল্পে শুধু ছইটি পদ্যমা বাঁচাইবার জন্য একজন রূপণ ধনী কি অসাধ্য সাধন করিয়াছিল, তাহা লিখিত আছে। অবশেষে সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সে চিতায় বাঁইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। যখন চিতায়

অগ্নি-সংযোগ করা হয়, তখনও সে নিজেকে বাঁচাইবার কোন উদ্বেগই করে নাই। এই অবস্থায় ভগবান্ সদয় হইয়া ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া তাহাকে চিতা হইতে উঠাইয়া বলিলেন—
“আমি তোমার অনন্তব্রত একনিষ্ঠ কার্পণ্যে বিস্মিত হইয়াছি, তুমি যাহা চাও আমি তাহাই তোমাকে দিব, তুমি বল কি বর চাও।” কৃপণ বলিল, “এই বর দাও, যেন আমাকে সেই ছইটি পয়সা না দিতে হয়।” হীরেন্দ্রনাথ বসু নামক এক নবীন লেখক তাঁহার “মুন্সিল-আসান” নামক একখানি পুস্তকে এই সুপ্রাচীন গল্পটি বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙ্গালী কি চায়, তাহার কি সাধনা, তাহা এই সকল ক্ষুদ্র অলীক গল্পগুলির মধ্যেও পাওয়া যায়।—সে স্বপ্ন কাজ করিবে,—তাহা একেবারে মসলিন; সে স্বপ্ন চিন্তা করিবে—তাহা একেবারে নব্যন্তায়। বিলাতের তাঁতি বাঙ্গালী তাঁতির নিকট মসলিন তৈরী করিবার কৌশল শিখিতে চাহিয়াছিল। বাঙ্গালী সে বিজ্ঞা গোপন করিল না, তাহাকে শিখাইয়া দিল। কিন্তু নানারূপ কসরত করিয়া বিলাতী তাঁতি হতাশ হইয়া বলিল, “আমরা ওরূপ স্বপ্ন স্বপ্নে তৈরী করিতে পারিব না,—আমাদের আঙ্গুল মোটা।” মোট কথা বাঙ্গালী যাহা করে তাহা শুধু দৈহিক শ্রম নহে, তাহা আধ্যাত্মিক তপস্তা। তপোবল-হীন ব্যক্তি তাহা পারিবে না। এই একশত বৎসরের মধ্যে আমাদের সেই তপস্তা টুটিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীর প্রেম-তপস্তা যে কিরূপ, তাহা গোবিন্দদাসের একটি পদে দেখা যায়। *

এক শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালীর দেহত্মী সম্বন্ধে বড়লাট মিণ্টো বলিয়াছিলেন,—এরূপ লাবণ্যপূর্ণ সুগঠিত মুখত্মী ও দেহ-সৌষ্টব্য তিনি জগতের অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখেন নাই। “I never saw so handsome a race; these
বাঙ্গালীর দেহত্মী।

(the Bengalis) are tall masculine athletic figures, perfectly shaped and with the finest possible cast of countenance and features. The features are of the most classical European models with great variety at the same time.”—Lord Minto’s letter to the Hon’ble A. M. Elliot, Sep. 20, 1807. ওয়ালটার হ্যামিল্টন লিখিয়াছেন, “ইহাদের দেহত্মী কি আমাদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন? আমি আপনাদিগকে ছইটি বাঙ্গালীর সহিত পরিচিত করিয়া দিব,—ইহারা আমার সঙ্গে বিলাতে আসিয়াছেন, ইহারা মন্দিরের চূড়ার মত আমার মাথা ডিঙ্গাইয়া উঠিয়াছেন, ইহাদের মুক্তি যেমনই দীর্ঘ তেমনই সুগঠিত। ইহারা আমার

- * “কটক গাড়ি, কমল সম পবতল মস্তীর চীরহি ঝাপি।
গাগরি বারি চারি করি পিছল পথ, চলতহি অঙ্গুলি ঢাপি।
মাধব তুয়া অভিসারকি লাগি—দূরতর পন্থ, গমন ধনি সাথয়ে, মন্দিরে বামিনী জাগি।
কর-বুগ নরন মুদি চলু ভামিনী, তিমিরে পয়ানক আশে।
মণি-কঙ্কণ-পণ কণিমুখ-বজ্রন শিখই ভূজগ-গুরু পাশে।
গুরুজন-বচনে বদির সম মানই, আন শুনই কহ আন।
পরিজন-বচনে বদির সম হাসই, গোবিন্দ দাস পরমাণ।”

খর্ব মূর্তি দেখিয়া আমোদের সহিত একটু হাসিয়া থাকেন। (“Is their physique so inferior? I will introduce to you two Bengalis who have come with me to England. They tower above me and they are as well-proportioned as tall, they smile on my small stature.”) একশত বৎসর পূর্বেও যে বাঙ্গালীর চেহারা লোকের শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিত, তাহা মিস বেলনস্ অঙ্কিত ছবিগুলি ও ৮৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত মল্ল-বীরের চিত্রটি দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে। বেলনসের আঁকা ছবিগুলির মধ্যে বিশেষ করিয়া চরকের দৃশ্যটির প্রতি লক্ষ্য করুন, সেই সকল মূর্তির কবাট-বক্ষ ও গুগুটিত দেহ-লাবণ্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখন কলেজের ছাত্রদের মূর্তি একেবারে হতশ্রী হইয়া গেলেও পাড়া গায়ে কুবক ও অপরাপর নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বাঙ্গালীর সেই অতীত-যুগের পুরুষোচিত দেহ-সৌষ্ঠব মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বাঙ্গালীর বীরত্ব যে এক কালে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা বাহিরের ইতিহাসে মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়, আমরা আত্ম-বিস্মৃত জাতি—
বাঙ্গালীর বীরত্ব।

আমাদের অতীত গৌরবের কথা আমরা কিছুই লিখিয়া বাই নাই, কিন্তু তথাপি পরকীয় ইতিহাসে মাঝে মাঝে সে গৌরবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একদা এই প্রাচ্য ও গঙ্গা-রাড় দেশের বিক্রান্ত বোদ্ধাদের ভয়ে জগজ্জয়ী আলেক্জেন্ডারের সৈন্তেরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গিয়াছিল,—আলেক্জেন্ডার মাত্রেনেত্রে মিনতি করিয়াও তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই।

খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে মহাকবি ভার্জিল তাঁহার Georgics (III, 27) কাব্যে বাঙ্গালীদের বীরত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছিলেন, “স্বতি-মন্দিরের দ্বার-দেশে হস্তিদন্ত ও স্বর্ণের অঙ্করে আমরা এই গঙ্গারিডদের * যুদ্ধের কথা ও বিজয়ী কুইরিনিয়াসের সৈন্তের সমর-কৌশল চিত্রিত করিয়া রাখিব।” (On the doors will I represent in gold and ivory the battle of the Gangaride and the arms of our victorious Quirinius.) দ্বাদশ শতাব্দীতে কলহণকবি কাশ্মীরের ইতিহাসে কতিপয় বাঙ্গালী সৈন্তের রাজভক্তির অতুলনীয়

* ভার্জিল প্রভৃতির উল্লিখিত ‘গঙ্গারিডি’ শব্দদ্বারা বাহুবল অর্থাৎ গঙ্গার এই সীমান্ত প্রদেশকেই বুঝাইতেছে। কেহ কেহ ‘গঙ্গারিডি’ শব্দ গঙ্গা-রাড়ী শব্দের রূপান্তর মনে করেন। এই শব্দের সঙ্গে একটি নদী ও তৎসম্পর্কিত স্থানের নামের বিশেষ ঐক্য দেখা যায়। উহা ‘গাঙ্গুড়’ বা ‘গাঙ্গুড়ী’। গাঙ্গুড় নদী মনসা নদীর ভাঙ্গানের সহিত অবিস্মরণ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। এই নদী দিয়া বেহলা খামীর শবের সহিত ভাসিয়া গিয়াছিলেন। “পরম হৃদয় লগাই দীর্ঘ মাথার চুল। জাতিগণ লগ্যা গেল গাঙ্গুড়ির কুল” (বিজয় গুপ্ত)। এই নদীর তীরে উপনিবিষ্ট কনোজিয়া ঠাকুরেরা গাঙ্গুলী নামে পরিচিত। এখন বাঙ্গলার স্থানবিশেষের নামে (যথা—চাঁটুতি, বাড়ুরী, মুখটি) সংস্কৃত উপাধায় শব্দের যোগে ‘চট্টোপাধ্যায়’ ‘বন্দ্যোপাধ্যায়’ ‘মুখোপাধ্যায়’ প্রভৃতি রূপ ধারণ করিয়াছে। এগুলি যে গ্রামের নাম তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনও ‘গাঁই’ শব্দ দ্বারা তাহার স্পষ্ট উল্লেখ সূচিত হইতেছে। কৃত্তিবাসের সময়েও (চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী) নামের এই সংস্কৃতায়ক পরিবর্তন হয় নাই, কবি তাঁহার পুরুষপুরুষদিগকে ‘মুখুটি’ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কি ভাবে তাহারা পরিহাস-কেশবের মন্দিরের পার্শ্বে প্রাণ দিয়াছিল, তাহা উচ্ছ্বসিত কবিতার ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন (২২৬ পৃঃ)। কল্‌হণ লিখিয়াছেন, “এই মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী সৈন্ত সেদিন যে অকৃত বীরত্ব দেখাইয়াছিল, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও বুঝি তাহা পারিতেন না।” অথচ কবি এই বাঙ্গালী বীরদের ঘোর শত্রু ছিলেন। রঘুবংশে লিখিত আছে, “বঙ্গীয় নৃপতিগণ রণতরীতে আরোহণপূর্বক” রঘুর দিগ্বিজয়ে বাধা দিয়াছিলেন, এবং সেই যুদ্ধে একপ ঘোরতর হইয়াছিল যে, বুদ্ধ জয় করিয়া রঘু “গঙ্গামধ্যস্থিত দ্বীপপুঞ্জে জয়ন্তস্ত প্রোথিত করিয়াছিলেন।” (রঘুবংশ, ৪র্থ সর্গ।) যে সমুদ্র-গুপ্ত আসমুদ্র হিমাচল জয় করিয়াছিলেন, তাহাকেও বঙ্গদেশ জয় করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল, তিনিও এই হুরুহ কার্য্য সমাধা করিয়া সাগর-সঙ্গমে একটি স্মারক জয়ন্তস্ত স্থাপিত করিয়াছিলেন। কাব্যে, তাম্র-শাসনে এবং অপরাপর বহুস্থলে আমরা বঙ্গের বিজয়ী রণতরীর উল্লেখ পাই। ধর্ম্মপাল বঙ্গীয় দিগ্বিজয়ী সৈন্ত লইয়াই তাহার অপ্রতিহত সমরাভিযান সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

একশত বৎসর পূর্বেও বাঙ্গালী রণক্ষেত্রে হৃদ্যস্ত ছিল। ইণ্ডিয়ান আরম্মালের চতুর্থ অধ্যায়ে বিশপ হিবার লিখিয়াছিলেন, “যে মুষ্টিমেয় সৈন্ত লইয়া লর্ড ক্লাইভ একপ আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশই বাঙ্গালী ছিল।—“That little army with which Clive did such wonders was raised chiefly from Bengal.” ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ঐতিহাসিক বলটন লিখিয়াছেন, “বাঙ্গালীরা বহু রণক্ষেত্রে দেখাইয়াছে, তাহারা সাহসিকতায় যুরোপীয় সৈন্তদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।”—“The Bengalis have on many occasions shewn themselves in no way inferior to European troops in personal courage.” ওয়ালটার হ্যামিল্টন লিখিয়াছেন, “আমাদের ভারতীয় যুদ্ধগুলির ইতিহাসের আদিপর্কে বাঙ্গালীরাই প্রধানতঃ আমাদের সৈন্তশ্রেণীর বহু দল সংগঠন করিয়াছিল এবং যুদ্ধে সাহস ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল।” “At an early period of our military history in India they (the Bengalis) almost entirely formed several of our battalions and distinguished themselves as brave and active soldiers.” ইহার পরে বোধ হয় বলা অস্তায় হইবে না যে, প্রধানতঃ বাঙ্গালীর বাহুবল ও জগৎ শেঠ-প্রমুখ বাঙ্গালীদের অকুণ্ঠ অর্থ-সাহায্য ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের ভিত্তি গড়িয়া দিয়াছিল। এখনও পুলিশ ডিপার্টমেন্টে শত শত বাঙ্গালী কোন কোন সময়ে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের ঘোর হুঁচিস্তার সৃষ্টি করিয়া—এমন কি বহু সময়ে প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহকারিতা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে ভারতের ছোটলাট ও বড়লাটগণ বারংবার উচ্চ প্রশংসার সহিত তাহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেদিনও (২৬ শে নভেম্বর, ১৯৩৪) বড়লাট নয়া-দিল্লীতে ইনস্পেক্টর জেনারেলদের সম্মেলনে বলিয়াছেন,—“আমি এই সুযোগে বাঙ্গলা ও কলিকাতা পুলিশের বিশেষ সুখ্যাতি করিতেছি। আশা করি এ সম্বন্ধে আপনারা সকলেই আমার সহিত একমত হইবেন। যদিও আপনাদের সকলকেই বিপজ্জনক অবস্থা নিবারণ করিতে হইয়াছে, তথাপি বাঙ্গলার দ্বায় অপর কোনও

প্রদেশে পুলিশ-বাহিনীকে হৃদ্যস্ত ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ শক্তির সহিত এত দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিতে হয় নাই। আমি এবং আমার গবর্নমেন্ট উপলব্ধি করিয়াছি যে, সম্প্রতি অবস্থার যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা বাঙ্গলা পুলিশের অবিচলিত রাজভক্তি, কর্তব্যপরায়ণতা এবং বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ক্রমাগত চাপ প্রদান...করিবার ফল।”—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ নভেম্বর, ১৯৩৪।

বাঙ্গালীরা যুদ্ধকালে হৃদ্যস্ত হইলেও প্রভুভক্তিতেও তাহারা অসামান্য। বাঙ্গলার রাজরাজডাগণই বিদ্রোহী হইয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণের প্রভুভক্তির তুলনা নাই।

শ্রীহট্টে নবাব হরেকৃষ্ণ বড়বঙ্গকারীর হাতে নিহত হইলে সেই বাঙ্গলার রাজভক্তি।

শোকে (১৭০৯-১১ খৃঃ) তাঁহার প্রভুভক্ত সেনাপতি রাধানাথ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। যখন বাঙ্গালীরা নিজেদের কথা নিজেরা লিখিয়া যান নাই, তখন বিদেশীদিগের প্রদত্ত অতি সামান্য বিবরণ এবং কাব্য-কথার প্রমাণই আমাদের আশ্রয় করিতে হইবে। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে লক্ষ্য-ভূমুনী রাজার জন্ত বাহা করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা রাজভক্তির উচ্চতর নিদর্শন জগতের ইতিহাসে হস্তপ্রাপ্য। পুত্রদের আসন্ন মৃত্যু জানিয়াও তিনি তাহাদিগকে ঘুম হইতে উঠাইয়া দিয়া রাজার জন্ত রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং সেই অভিযানে শাকা-সুখার মৃত্যু হইলে এক বিন্দু অশ্রু তাগ না করিয়া স্বামীকে তাঁহার নিশ্চেষ্টতার জন্ত গল্পনা করিয়া তাঁহাকেও সেই অসম সময়ে প্রেরণ করিয়াছেন। বহু ধর্মমঙ্গল-কাব্যে এই একই কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং এই ইতিহাস-মূলক কাব্যে এই ঘটনাগুলি নিছক গল্প বলিয়া মনে হয় না। আর এগুলি যদি শুধু গল্পই হয়, তথাপি রাজভক্তির আদর্শটা যে বাঙ্গালীর কত বড় ছিল তাহা গল্পগুলি পাঠে সহজেই অনুধাবন করা যায়।

বাঙ্গালীর সামুদ্রিক অভিযানসম্বন্ধে দেশময় শত শত রূপ-কথা ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এক সময়ে ব্রাহ্মণ-শূদ্র প্রভৃতি জাতির বিচার দ্বারা লৌকিক মতে আভিজাত্য নির্ণীত হইত না। রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্র ছুইই পদ-প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালীর বিদেশে অভিযান।

প্রায় সমকক্ষ ছিলেন; গুপ্ত ও পাল-রাজত্ব বৈশ্ব-প্রাধান্তের যুগ, তখন বণিকেরাই প্রধান ছিলেন। চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর কাব্যের নায়ক ছিলেন। ইহাদের সময়ে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব খুব বেশী ছিল না,—বণিকেরা ব্রাহ্মণের টোলে কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, জ্ঞান প্রভৃতি সর্কশাস্ত্র পাঠ করিতেন। ধনপতি সদাগর এক ব্রাহ্মণকে শুভদিন ধার্য্য করিতে আদেশ করেন, কিন্তু পুরোহিত-কথিত শুভদিনটি তাঁহার মনের মত হয় নাই, এজন্য জুড় সদাগর “নফরে আদেশ করি মারে তাকে ধাক্কা।” অবশ্য পাল-রাজত্বের শেষদিকে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব বৃদ্ধি পায়;—উহা দণ্ডপানি, বৈষ্ণবদেব প্রভৃতির যুগ। এই বণিকৃদের সমুদ্রযাত্রা কেন নিষিদ্ধ হইল এবং সমাজে তাঁহারা কেন হীনতা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা ৪৭১-৭২ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। নৈতিক অবনতি না হইলে কোন ব্যক্তি বা জাতির অধঃপতন হয় না।

এই অবনতির সূচনা আমরা কাব্য ও রূপকথায় পাইতেছি, তাহা ইতিহাসগ্রাহ্য না হইলেও খাটি সামাজিক চিত্র। ধনপতির স্ত্রী খুলনাকে লইয়া বণিক-সমাজে যে ঘোঁট হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায়—সেই সমাজের আদর্শ অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছিল। মুরারি শীলের যে চিত্র কবিকঙ্কণ দিয়াছেন—তাহা প্রতারক ধূর্তের। রূপকথায় বণিকদের প্রতারণাসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি আছে—

“কোনহ বেনে দারচিনি দিতে দরমুজ বাহির করে।

কোনহ বেনে কাহণের বস্ত্র বেচে সিকার দরে ॥

কোনহ বেনে ‘খাণ্ডারা’ পাথর ঝাঁপিতে ভরিয়া ধোর।

ওরে মহামাণিক্য, সাহামাণিক্য কয়ে লোকেতে বিকোর ॥”

(ঠাকুরদাসের কুলি, প্রথম সংস্করণ, ২৯০ পৃঃ)

বাঙ্গালীর বাভা, বালী, স্মিত্রা প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অভিধানসম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা গবেষণা দ্বারা সুসংবদ্ধ হয় নাই। বাঙ্গলা অক্ষর, বাঙ্গলা শিল্পাদর্শ, বাঙ্গালীর মত নাম এবং জাতীয় উপাধি ঐ সকল দ্বীপে পাওয়া বাইতেছে। শ্রীযুক্ত রমানাথ বিদ্যাস বালী দ্বীপে বাঙ্গলা গৃহ-নির্মাণ-পদ্ধতি—অবিকল এদেশের তায়—দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। জাপানী কাকাস ওকাকুরা তাঁহার সুবিখ্যাত “Ideals of the East” পুস্তকে লিখিয়াছেন, “Down to the days of the Mahamuden conquest went by the ancient highways of the sea the intrepid mariners of the Bengal-coast founding their colonies in Ceylon, Java and Sumatra binding Cathay (China) and India in mutual intercourse.” [মুসলমান-বিজয়ের পূর্বে পর্যন্ত সাহসী বঙ্গীয় নাবিকগণ বিশাল সমুদ্র-পথে যাত্রা করিয়া সিংহল, বাভা, স্মিত্রা প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন-পূর্বক চীন দেশের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।] যে সকল কারণে এদেশে সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল তাহা এই পুস্তকের ৪৭১-৭২ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। যে মর্মান্তিক অত্যাচারের ফলে কুর্ষ স্বাভাবিক নিয়মামুসারে তাহার পৃষ্ঠে দৃঢ় আচ্ছাদনের সৃষ্টি করে, হিন্দুরাও সেইরূপ অত্যাচারে বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী সেই বুদ্ধদেবের সময় হইতে নিবৃত্তিমূলক ত্যাগের পরা কাষ্ঠ দেখাইয়া আসিয়াছে।

২৪ জন জৈন তীর্থঙ্করের মধ্যে ২২ জনই বৃহৎ বঙ্গের (সমেংশেখরে) পার্শ্বনাথ পাহাড়ে

সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ও তাঁহাদের সমাধি সেইখানেই এখনও

বাঙ্গালীর ত্যাগ।

বিদ্যমান (১৩৪ পৃঃ)। ইহারা সকলেই রাজপুত্র ছিলেন এবং

ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। আমরা ইতিহাসের অনেক পৃষ্ঠা হারাইয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও বাঙ্গালীরা যে অপূর্ণ ত্যাগ-মহিমা দেখাইয়াছেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। সাতারের হরিশ্চন্দ্র রাজা বুদ্ধ বয়সে রাজত্বের ভার

যুবরাজ মহেন্দ্রের উপর সমর্পণ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন (২৭২ পৃঃ)। রাজা গোপীচন্দ্রের সম্রাসের কথা সর্বত্র বিদিত (২৭৪ পৃঃ)। বৈষ্ণব অধ্যায় বঙ্গের ত্যাগী মহাজনদের কাহিনীতে পূর্ণ। সপ্তগ্রামের ধনকুবের ও রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী রঘুনাথ দাস রাজভিখারীদের অগ্রণী (৭২১ পৃঃ)। তিনি শুধু সম্রাসী ছিলেন না, অতি অল্প বয়সে রাজৈশ্বর্য ও “দ্বী অঙ্গরা সম” ত্যাগ করিয়া বে কঠোর ব্রত পালন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অতি উচ্চ আদর্শ। সনাতন ও রূপ—হই অতুল বৈভবশালী ভ্রাতা এবং তাঁহাদের ভ্রাতৃপুত্র জীব—রাজ-বৈভব পরিত্যাগপূর্বক কঠোর ব্রহ্মচর্যের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহারা তিত্ত-কবায় বনফল খাইতেন এবং চৈতন্তচরিতামৃতে লিখিত আছে—তাঁহারা জঙ্গলের কোন একটি বৃক্ষের নীচে শুইলে পাছে সেই স্থানটির প্রতি আসক্তি জন্মে, এই জন্ত নিত্য নূতন বনবৃক্ষের নীচে শুইতেন (“একৈক বৃক্ষের নীচে একৈক রাজি শয়ন”—৭১৭ পৃঃ)। আর একজন রাজ-সম্রাসী নরোত্তম দাস—তিনি রাজসাহীর অন্তর্গত খেতুরির রাজা কৃষ্ণানন্দের একমাত্র পুত্র ছিলেন। অতি অল্পবয়সে কৃষ্ণানন্দের ভ্রাতৃপুত্র সম্ভব দত্তকে রাজত্ব দিয়া তিনিও রঘুনাথ দাসেরই মত কঠোর সংযম ও ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছিলেন (৭৪৮-৫০ পৃষ্ঠা)। বন-বিষ্ণুপুরের দস্যুরাজ বীর-হাঙ্গির তাঁহার গুরু শ্রীনিবাস আচার্যের পদে সমস্ত রাজ্যভার ফেলিয়া দিয়া তাঁহার রাজ্যী সুদক্ষিণাদেবীর সহিত ব্রহ্মচর্য ও কঠোর সংযমব্রত পালন করিয়াছিলেন (৭৫৩ পৃঃ)। গড়ছারের রাজা চাঁদ রায়ও প্রথমতঃ দস্যুবৃত্তি করিতেন, তৎপরে গৃহস্থ-সম্রাসীর ব্রত গ্রহণ করেন (৭৬০ পৃঃ)। বৈষ্ণব-অধ্যায়ে এইরূপ ধনকুবের ও রাজরাজড়াদের ত্যাগের কথা পথে-ঘাটে—সর্বত্র। চৈতন্তের সহচর, নিত্যানন্দগতপ্রাণ স্বর্ণবিশিষ্ট-কুলগোরব জোরপতি উদ্ধরণ দত্ত এই দলের অন্ততম (৭১১ পৃঃ)। একশত বৎসর পূর্বে পাইক-পাড়ার লালাবাবু এইরূপ ত্যাগ দেখাইয়া বনাবনবাসী হইয়াছিলেন। অতি ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বঙ্গদেশ এত জন রাজ-সম্রাসীর পুণ্যজীবন প্রকটিত করিয়া দেখাইয়াছে যে, তাহাতে স্বতঃই মনে হইবে,—এদেশ ত্যাগের দেশ—তপস্তার দেশ।

পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গালী লেখকেরাও সংস্কৃত হইতে মালমসলা কুড়াইয়া তাঁহাদের নিজের ছাঁচে ঢালিয়া পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি রচনা করিয়াছিলেন।

কথা-সাহিত্যে মৌলিকত্ব ও গুণগুণের ধারা।
তাঁহারা পূর্বকাল হইতে বহু শাস্ত্রগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু কোনটিই আক্ষরিক অনুবাদ নহে। তাঁহারা নিজেদের ছন্দে ঢালাই করিয়া তাহা স্বদেশের উপযোগী করিয়া লইয়াছেন।

সর্বত্রই তাঁহাদের এই মৌলিকত্বের প্রমাণ দৃষ্ট হয়। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডটার যুদ্ধাঙ্গুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তদ্বারা ভক্তির ফুল-হার নির্মিত করা হইয়াছে, বর্ণক্ষেত্রকে কীর্তনভূমিতে পরিণত করা হইয়াছে। পরবর্তী সময়ে উড়িষ্যার কবিরা বাঙ্গালী কবি কবিচন্দ্রের এই নূতন ছাঁচে-ঢালা লঙ্কাকাণ্ডের অনুকরণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর বৈষ্ণব কবিতার মৌলিকতাসম্বন্ধে গ্রন্থভাগে (২৮৮-২৫ পৃঃ) অনেক কথাই লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু বাঙ্গালীরা যে গুপ্তযুগের ধারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার অজস্র নিদর্শন আমরা বাঙ্গলার কথা-সাহিত্যে পাইয়াছি। বাঙ্গালীর প্রেমের আদর্শ যে গুপ্ত-যুগের কবি-দিগকেও স্থানে স্থানে ছাপাইয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গুপ্তযুগের কবিরা অভূত-পূর্ব প্রতিভা সত্ত্বেও কতকটা অলঙ্কার-শাস্ত্রের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন, রাজ-প্রাসাদ বা ঋষির আশ্রম ছাড়া তাঁহারা কদাচিৎ নিজে নামিয়া আসিয়াছেন—নিয়ন্ত্রণী তাঁহাদের কাব্য ও নাট্যে অগ্রাহ্য। কিন্তু বাঙ্গলা কথা-সাহিত্যে শ্রেণী-ভেদ, পদ-বৈষম্য এরূপ কোন গভী আদৌ নাই। এই কবিদের সাম্রাজ্য নর-রুদ্র,—সেই হৃদয়ের স্বকুমার বৃত্তি, সংসাহস, সংযম, ত্যাগ প্রভৃতি গুণের ভিত্তির উপর তাঁহাদের কবিত্ব-সৌধ প্রতিষ্ঠিত। কবিরা সমস্ত সামাজিক নিয়ম ও আইন কাহ্নন অগ্রাহ্য করিয়া হৃর্জয় সাহসের সহিত স্বভাবের পথে চলিয়াছেন, চণ্ডালের বাড়ী অথবা বেদের নৌকা তাঁহারা অন্তর্চিস্তান বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন নাই; বিবাহিত জীবন—তাঁহাদের প্রেমের বেড়া দিয়া আকাশ-বাতাস রোধ করিয়া দাঁড়ায় নাই। কিন্তু তাঁহাদের রচনা অদ্বুতরূপে মৌলিক হইলেও কবিরা কোন দস্ত প্রকাশ করেন নাই; সেই লেখা অনাড়ম্বর, স্বাভাবিক ও অবাধ-গতি—তন্মধ্যে আদৌ প্রচার নাই। এই সকল গুণে আকৃষ্ট হইয়া ডা° টেলা ক্র্যামরিস মহায়া পড়িয়া বলিয়াছিলেন,—সমস্ত ভারতীয় সাহিত্যে এই গল্পের জোড়া নাই; ডা° সিলভ্যান লেভি লিখিয়াছেন, ফরাসী দেশের শীত-প্রধান আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিয়া তিনি এই সকল গল্প পড়িবার সময়ে মনে করিয়াছেন, তিনি চির-বসন্তের রাজ্যে বিহার করিতেছেন, এবং সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী রোদনষ্টাইন বলিয়াছেন,—অজস্র ও অমরাবতীর যে সকল অপূর্ণ রমণীমূর্তি তিনি দেখিয়াছেন, এই সকল গল্পের নায়িকারা যেন সেই রমণীদেরই জীবন্ত লেখমালা। শ্রীমতী হেগ এই সকল গল্পের যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা মন্দিরে উচ্চারিত স্তব-স্ততির মতই শোনার। তিনি ফরাসী দেশের সর্বপ্রধান লেখক মাদাম দি লাফেয়েতি (Madam de Lafeitye) এবং মেটারলিঙ্কের রচনার খুঁৎ বাহির করিয়া বলিয়াছেন, বাঙ্গলা কথা-সাহিত্যের নায়িকারা একেবারে নিখুঁৎ এবং এই গল্পগুলির নায়িকারা সেজপীয়র ও রেসাইন-এর (Jean Racine) নারীচরিত্রের মত, যুরোপের ঘরে ঘরে পঠিত হওয়ার যোগ্য। “ইহারা জগতের চিরস্থায়ী গ্রন্থগুলির সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে আসনের দাবী করে। যুগে যুগে পাঠকগণ এই গল্পগুলির নব নব সৌন্দর্য আবিষ্কার করিবেন” (৩৪৮-৪০৬ পৃঃ)।

বাঙ্গলার স্থাপত্য ও শিল্পসম্বন্ধে বেশী কিছু লিখিবার নাই; এক মসলিনই বস্ত্রের শিল্প-কৃতিত্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়বার্তা বহন করিতেছে। বাঙ্গলা ও নিকটবর্তী প্রদেশগুলির মন্দিরগুলিতে যে সকল শিল্প-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এক শত বৎসর পূর্বে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হটন লিখিয়াছিলেন:—

শিল্প ও স্থাপত্য।

ইহাদের একটি যদি যুরোপে থাকিত, তবে তাহা দেখিবার জন্ত দেশ-বিদেশ হইতে কত যাত্রী ভিড় করিত, কত লেখক বড় বড় পুস্তক লিখিয়া, ইহাদের রচকের নাম, ধাম, আকৃতি, প্রকৃতি, ব্যয় ও কর্মীদের প্রতিভা সম্বন্ধে বর্ণ ঘোষণা করিতেন; কিন্তু এই অসাধারণ

প্রতিভাশালী শিল্পিগণ নাম-গোত্র হারাইয়া জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অমাহুদী কীর্তি অরণ্যে বসিয়া অশ্রমোচন করিতেছে (৯২০-২১ পৃ:) ।

বাঙ্গালীর মনস্বিতা সর্বজন-সম্মত । আমরা ইংরেজদের সংস্পর্শে আসিবার পর তাঁহারা আমাদের যে গুণের পরিচয় পাইয়াছেন, তাহা উদ্ধৃতিত প্রশংসার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন ।

মেদিনীপুরের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের জায় বঙ্গদেশে তখন মনস্বিতা ।

অনেক বিদ্বান্ ছিলেন । কেরি সাহেব লিখিয়াছেন, “ইনি বিজ্ঞা-গৌরবে আমাদের ডা° জনসনের তুল্য ।” মার্সমান লিখিয়াছেন—“ইনি আধুনিক যুগের সর্ব-প্রধান পণ্ডিতদের অগ্রতম ।” প্রতাপাদিত্য-চরিত-লেখক রাম বহু সম্বন্ধে কেরি লিখিয়াছেন, “ইহার অপেক্ষা বিজ্ঞানুরাগী লোক আমার চোখে পড়ে নাই ।” রাজা রামমোহন-সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ অ্যাডামন্ সাহেব লিখিয়াছেন, “জগতে ইহার তুল্য ব্যক্তি এ পর্যন্ত জন্মেন নাই, কখনও জন্মিবেন না ।” বিলাতের ইউনিটেরিয়ান সভার সভাপতি রামমোহনকে অভিনন্দন দিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, “ভূপর্ঘাটক নাবিকগণ দক্ষিণ-মেরুর ‘স্বর্ণজুস’-আখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ সর্ব-প্রথম দেখিয়া বেক্রপ আশ্চর্য হইয়াছিলেন, আপনাকে দেখিয়া আমাদের সেইরূপ বিশ্বাস হইয়াছে । আজ যদি প্রেটো, সফ্রেতিস, মিণ্টন কিংবা নিউটন সশরীরে এখানে আবির্ভূত হইতেন, তাঁহাদিগকে আমরা বেক্রপ ভক্তির অর্ঘ্য ডালি দিতাম, আপনাকে তাহাই দিয়া এই অভিনন্দন করিতেছি ।” সেদিনও গোথলে ভারত-ব্যবস্থাপক সভার বলিয়াছিলেন,—“ভারতবর্ষে জে. সি. বোস এবং পি. সি. রায়ের জায় বৈজ্ঞানিক, রাসবিহারী ঘোষের জায় আইনজ্ঞ ও রবীন্দ্রনাথের জায় কবি আর কোথায় পাইব ?”—কিন্তু এই মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রতিভাশালী লোক বঙ্গের ইতিহাস-সিদ্ধির সিকতাভূমির কয়েকটি বালুকা-কণা মাত্র । দীপঙ্করসম্বন্ধে তিব্বতের লোকগণ বলিয়াছিল, “স্বয়ং বুদ্ধদেবও এতটা সম্মান পান নাই, যতটা ইনি পাইলেন” (৩৩৩ পৃ:) । বাঙ্গালীর নব্যজায় যুগ্ম চিন্তাশীলতার সর্বোচ্চ নিদর্শন । মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পার্শ্বভী তর্কতীর্থ আমাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে একজন জার্মান ও একজন ইংরেজ প্রায় ছুইবৎসর কাল এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া—ইহা অতীব জটিল ও তাঁহাদের বুদ্ধির হ্রস্বগম্য মনে করিয়া পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দিয়াছিলেন ।

বাঙ্গালী বেক্রপ জ্ঞানে বড়—হৃদয়ের স্বকুমার বৃত্তিতে সে তদধিক বড় । তাহার হৃদয়ের কোমলতামিশ্র দার্ঢ্য বুঝাইতে যাইয়া একখানি চিত্রের প্রতি অঙ্গুলী-নির্দেশপূর্বক আমরা নিরন্ত হইব,—তাহার সম্বন্ধে প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করিয়া আমরা অর্জাচীনতার পরিচয় দিব না । সমস্ত প্রশংসা ও উদ্ধ্বাস চৈতন্তদেবের পাদ-পীঠের নীচে পড়িয়া থাকিবে ।

বাঙ্গালী রমণীর অদম্য সাহস ও একনিষ্ঠ প্রেমের কথা বলিতে যাইয়া শত বৎসর পূর্বে হটন সাহেব লিখিয়াছিলেন, “তাঁহাদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও প্রাণ-সমর্পণ জলন্ত চিতার শিখাকেও অতিক্রম করিয়া স্বর্গের নিকটতর হইয়াছে” (৯১৪ পৃ:) ।

“তোমাকে কি ভাঙ্গ, সিদ্ধি বা অন্ত কোন নেশা খাওয়াইয়াছে ? একটুখানি অগ্নি-কণা

গায় লাগিলে ফোঁস্কা পড়ে এবং অসহ্য বজ্রণা হয়, আর সমস্ত দেহটা পুড়িয়া ছাই হইবে, তখন তোমার আর্ন্তনাদ ও 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' চীৎকার ঢাকা-নিনাদে চাপা পড়িবে—কেহ শুনিতে পাইবে না, তোমার শরীর দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাধা থাকিবে—তোমার পলাইবার পথ থাকিবে না—অবস্থাটা কি তুমি বুঝিতে পারিয়াছ ?” বঙ্গের লাট হ্যালিডে সাহেবের সঙ্গী এক পাত্রী এদেশের একটি অষ্টাদশবর্ষীয়া রূপবতী যুবতীকে সহমরণের সঙ্কল্প হইতে বিরত করিবার জন্ত এইভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রমণী প্রস্তর-মূর্তির স্থায় বসিয়াছিলেন, তাঁহার কাণে এসকল কথা পৌছিল কি না পৌছিল, তাহা যেন প্রথমতঃ বুঝাই গেল না। তার পর যখন রমণীর কাণ আলাপালা হইতে লাগিল, কিছুতেই পাত্রীর বক্তৃতা ধামে না, তখন তিনি একটা বাতি আনাইলেন ও নীরবে সেই বাতিটার মধ্যে অঙ্গুলী স্থাপন করিলেন। বেক্রপ ভাবে মোম গলিয়া যায়, অঙ্গুলীটি সেই ভাবে পুড়িয়া গলিয়া গেল, অগ্নি কজ্জি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। ভীত ও বিস্মিত ভাবে লাট হ্যালিডে লিখিয়াছেন, একটা রাজ-হাঁসের পালকের কলম বেক্রপ পুড়িয়া ছাই হয়, সেই ভাবে সমস্ত আঙ্গুলটি পুড়িয়া গেল। রমণী নিবাতনিঃস্প দীপ-শিখার স্থায় বসিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার মুখের ভাবে কোন সামান্য পরিবর্তনও লক্ষ্য করিলাম না। পাত্রী ভয় পাইয়া রমণীর হাতের আগুন নিবাইয়া দিলেন।

বাঙ্গালী রমণীর একনিষ্ঠ সতীত্বের যে সকল নিদর্শন এক শত বৎসর পূর্বে দেখা বাইত, অনেক উচ্চমনা সাহেব অকুণ্ঠিত ভাবে তাহার প্রশংসা করিয়াছেন।

সহমরণ।

সহমরণোচ্ছতা এক রমণী স্বামীর চিতায় প্রবেশ করিবার পূর্বে রাজা রামমোহন বলিয়াছিলেন, “আপনাকে কেহ বাধিতে পারিবে না, আপনি চিতা হইতে উঠিতে চাহিলে আপনার কোন বিয় জন্মান হইবে না, এইভাবে আপনি প্রাণ দিতে পারেন ?” রমণী তাহাই করিলেন,—বাসর-শয্যায় বেক্রপ তিনি স্বামীর সঙ্গিনী হইয়াছিলেন, সেইভাবেই তিনি তাঁহার চিতা-সঙ্গিনী হইলেন। এই সকল দৃশ্য হটনের চোখের সামনে ছিল, এইজন্ত তিনি লিখিয়াছিলেন—ইহাদের প্রেম ও ত্যাগ জলন্ত চিতার শিখাকে অতিক্রম করিয়া স্বর্গের দ্বারে পৌছিয়াছে (১৯১৩-১৪ পৃঃ)।

সেদিন পর্য্যন্তও জগৎ শেঠেরা জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন, ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করিয়াছেন। জড়-জগতের ঐশ্বর্য্য বাঙ্গালী প্রমত্ত হইয়া ভোগ করে, এবং যখন

চিত্তরঞ্জন।

সময় উপস্থিত হয় তখন অপ্রমত্ত হইয়া তৃণের স্থায় তাহা ত্যাগ করিতে পারে ; বাঙ্গালী ঘটিকা-বস্ত্রের দোলন-দণ্ডের স্থায় দুই বিরুদ্ধ সীমার মধ্যে অতি সহজে আনাগোনা করে। বাঙ্গালী চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব। আজ চিত্তরঞ্জন বিলাসী বাবু, ভোগে আকর্ষিত, কাল চিত্তরঞ্জন বিরাগী ফকির। নিজের বাস-গৃহস্থানি পর্য্যন্ত দান করিয়া ফেলিয়াছেন।

আমার কার্য্যের ক্ষেত্র বিরাট। এই বইখানি লিখিতে বাইয়া আমার বারংবার মনে হইয়াছে—এই কার্য্য সূসম্পন্ন করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। এখনও ভারতীয়

প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য-সমূহের তর তর অল্পসন্ধান হয় নাই; এখনও এদেশের এবং নিকটবর্তী প্রদেশ-সমূহের শিলালেখ ও তাম্রশাসন প্রচুর পরিমাণে উদ্ধার পায় নাই; এখনও গ্রাম, কাঞ্চোড়িয়া, বাভা, বালী, সুমিত্রা এবং অপর্যাপ্ত ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাসে যথায় যথায় বাঙ্গলার উল্লেখ আছে, এবং সেই সেই দেশের ভাস্কর্য্যে এতদেশীয় শিল্পদর্শন কি পরিমাণে বিদ্যমান, ভাল করিয়া তাহার খোঁজ হয় নাই; বাঙ্গলা অক্ষর কোন্ কোন্ দেশে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত হইয়াছিল, এখনও তাহা আমরা সুস্বভাবে সন্ধান করিয়া দেখি নাই; চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ইতিহাস সন্ধান করিতে এখনও বিলম্ব আছে,—এমন কি এদেশের অতি সান্নিধ্যে নেপাল, তিব্বত, ভূটান, রেব্বুন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাঙ্গালীরা যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা আভাসে মাত্র জানিতে পারা গিয়াছে; এখনও খাস বাঙ্গলা ও উড়িষ্যাদেশে বহু টিপি, ভগ্ন প্রস্তর, ইষ্টকগৃহের অবশেষ ও প্রাচীন বহুসংখ্যক সুবৃহৎ দীঘি ঐতিহাসিকের দৃষ্টির বাহিরে পড়িয়া আছে। এখনকার ঘোর অর্থনৈতিক সমস্যা উত্তীর্ণ হইয়া যদি বাঙ্গালী জাতি জগতে টিকিয়া থাকিতে পারে, তবেই ভবিষ্যকালে এদেশের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার সম্ভাবনা হইবে, আমি দিন-মজুরের খাটুনি খাটিয়া মাত্র কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বিদায় লইতেছি। কাঞ্চোড়িয়াতে বাঙ্গলার রূপকথা অনেকগুলি প্রচলিত আছে; এবং তান্ত্রিক ‘হেবজ’ যে বাঙ্গলা দেশ হইতে কাঞ্চোড়িয়া ও বাভা গ্রহণ করিয়াছে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ডা° বিজ্ঞানরাজ চট্টোপাধ্যায়ের কাঞ্চোড়িয়া সম্বন্ধীয় পুস্তক দ্রষ্টব্য। *

সম্প্রতি বাভা, সুমিত্রা, রেব্বুন এবং ব্রহ্মদেশের স্থাপত্যে যে বাঙ্গলাদেশের বিশেষ প্রভাব ছিল, এমন কি বাঙ্গালী স্থপতিরাই ঐ দেশগুলির মন্দিরাদির গঠন-প্রণালী তত্ত্ব-দেশের লোকদিগকে শিখাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক প্রাদেশিক ইতিহাস।

ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে। বাভার প্রাধন্যের নিকটবর্তী চণ্ডীলোন, জংরাস এবং চণ্ডীসিউ মন্দিরের গঠন ঠিক পাহাড়পুরের সম্প্রতি-আবিষ্কৃত মন্দিরের স্থায়। ভারতবর্ষের অন্ত কোথাও একরূপ স্থাপত্য-রীতি দেখা যায় না। এদিকে বাভার ঐ সকল মন্দির ৮ম-৯ম শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু পাহাড়পুরের স্থাপত্য ৫ম কি ৬র্থ শতাব্দীর, অর্থাৎ ৩০০ বৎসর পূর্বের। কে. এন. দীক্ষিত বলেন যে, এতদ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রাধন্যের মন্দিরগুলির পূর্বদর্শন—বাঙ্গালী স্থপতির এই নির্মাণ-পদ্ধতি। (দীক্ষিত মহাশয় লিখিত গবর্নমেন্ট আরকিওলাজিকাল রিপোর্ট,

* Images of Hebajra have been quite recently discovered from Angkor Hom (as the writer heard from Mr. Finot). This is a Tantrik divinity of the Buddhists (which is Saiva in its attributes) introduced into Tibet and Nepal from Bengal during the Pal-period." —Indian Influence on Cambodia, p. 261.

১৯২৬-২৭ খৃঃ)। শ্রীযুক্ত এ. কে. কুমারস্বামী তাঁহার 'India and Indonesia' নামক পুস্তকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মদেশের পেগান-মন্দির-সমূহের কারুকার্য (ত্রয়োদশ শতাব্দী) এবং দেওয়ালের গায়ে আঁকা চিত্রগুলি বাঙ্গলা এবং নেপালের অনুরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল। গৌড়েশ্বর পাল-রাজদের আশ্রয়ে নালন্দা ও বিক্রমশিলা-বিহারের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। নালন্দা-বিহার সমস্ত প্রাচ্য এসিয়ার কেন্দ্র-ভূমি-স্বরূপ ছিল। এই কেন্দ্র হইতে বাঙ্গলার শিল্প ও স্থাপত্য দেশে দেশে অভিবানপূর্বক দিগ্বিজয়ী হইয়াছিল।

এই ভূমিকার প্রথমে যে কয়েকখানি বঙ্গের ইতিহাস লিখিত হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রাদেশিক ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, ইহাদের অনেকগুলি আমার নিকট আছে। তন্মধ্যে সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিত 'বংশোর-খুলনার ইতিহাস,' অচ্যুতচরণ তর্কনিধি লিখিত 'শ্রীহট্টের ইতিহাস,' বতীন্দ্রমোহন রায় কৃত 'ঢাকার ইতিহাস,' যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস,' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'বাঙ্গলার ইতিহাস,' কেশরনাথ মজুমদার প্রণীত 'ময়মনসিংহের ইতিহাস,' শুক্রেস্বর, বাণেশ্বর এবং অপরূপ বহু লেখক প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ 'রাজমালা,' (কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত), শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত 'ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস,' কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত 'রাজমালা,' আশুতোষ চৌধুরী প্রণীত 'ত্রিপুরার কথা,' রাধারমণ সাহা প্রণীত 'পাবনার ইতিহাস,' এচ. ডব্লিউ. বি. মরেনো প্রণীত 'পাইকপাড়া রাজ্য এবং কান্দিরাজ' (ইংরেজী), রায় বাহাদুর কালিকাদাস দত্ত প্রণীত 'কুচবিহারের ইতিহাস' (ইংরেজী), আনন্দচন্দ্র রায় প্রণীত 'বারভূঞা' এবং 'ফরিদপুরের ইতিহাস,' নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত পঞ্চ-খণ্ডে প্রকাশিত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস,' ময়ূরভঞ্জের ইতিহাস ও 'কামরূপের ইতিহাস' (শেখোক্ত দুই ইতিহাস ইংরেজীতে লিখিত), মুকুন্দ পালচৌধুরী প্রণীত 'মণিপুরের ইতিহাস,' বরেন্দ্র অম্বুসকান সোসাইটি প্রকাশিত 'গোড়ীয় লেখমালা,' রজনীকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত 'গোড়ের ইতিহাস,' স্বজননাথ রায় প্রণীত 'উলা বা বীরনগর,' আশুতোষ চৌধুরী প্রণীত 'চট্টল ভূমি,' নিখিলনাথ রায় প্রণীত 'মুর্শিদাবাদের কাহিনী,' তমোনাথ দাস সম্পাদিত ও অনূদিত 'মহারাত্রি পুরাণ,' অভয়পদ মল্লিক প্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস,' মৃত্যুঞ্জয় শর্মা প্রণীত 'রাজাবলী' (পঞ্চম সংস্করণ, ১৮১০ খৃঃ), প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'মহানাদ,' নগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত 'নদীয়া কাহিনী,' কালিদাস দত্ত রচিত স্মরনবন সম্বন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ, রাজনারায়ণ বসু প্রণীত 'সেকাল আর একাল,' হীরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত 'লৌহাগড়ের কাহিনী,' যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'মহেশ্বরপাশা,' বিজয়চন্দ্র নাগ প্রণীত 'নাগবংশের ইতিহাস,' হেমলতা সরকার প্রণীত 'স্বর্গীয় ব্রহ্মসুন্দর মিত্র' (ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ববঙ্গের ইতিহাস), অরুণচন্দ্র সেন এবং বিমানচন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'সোনার বাংলা,' কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের 'বঙ্গের রত্নমালা,' মহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত 'চাষী পোদদের ইতিহাস,' বিনয়চন্দ্র সেন প্রণীত 'বৌদ্ধজাতক' (ইংরেজী), বেভারিজ সাহেব কৃত 'বাখরগঞ্জ জেলার

ইতিহাস,' প্রভাসচন্দ্র সেন প্রণীত 'বগুড়ার ইতিহাস,' হরগোপাল দাসকুণ্ড প্রণীত 'সেরপুরের ইতিহাস ও মহাস্থানের ইতিহাস,' অধ্যাপক জে. এন. দাসগুপ্ত প্রণীত '১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর বাঙ্গলা' (ইংরেজী), রাজকুমার মহিমানিরঞ্জন প্রণীত 'বীরভূম-বিবরণ,' মন্থনাধ বোস প্রণীত বহু বঙ্গীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের জীবন-চরিত, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালিক বঙ্গীয় সমাজ,' চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত 'বাঙ্গলার বীর,' অমূল্যধন রায় ভট্ট প্রণীত 'দ্বাদশ গোপাল,' স্বরূপচন্দ্র রায় প্রণীত 'স্বর্ণগ্রামের (সোনার গাঁয়ের) ইতিহাস,' নবীনচন্দ্র ভট্ট প্রণীত 'ভাওয়ালের ইতিহাস,' রাজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য প্রণীত 'বাঙ্গালীর বল,' উপেন্দ্রচন্দ্র কর প্রণীত 'বিশ্বজননী ভারতমাতা,' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত 'বঙ্গদেশে লুপ্ত বৌদ্ধ-ধর্মের চিহ্ন' (ইংরেজী), হলায়ুধ মিশ্র কৃত 'সেক শুভোদয়া,' সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত 'রামচরিত,' রোহিণীকুমার সেন প্রণীত 'বাকলার ইতিহাস,' খোসালচন্দ্র রায় প্রণীত 'বাখরগঞ্জের ইতিহাস,' গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্ট প্রণীত 'বল্লালচরিত,' পীরমহম্মদ কৃত 'সমসের গাজীর গান,' অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত 'সিরাজুদ্দৌলা,' দুর্গাচরণ সাত্তালের 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস,' ইসা খাঁ, 'ফিরোজসাহ,' 'সুজা বাদসাহ' প্রভৃতি বহু পল্লীগীতি, উমেশচন্দ্র গুপ্তের 'জাতিতত্ত্ব-বারিধি,' সতীশচন্দ্র ঘোষের 'চাক্কা জাতি,' ডাক্তার রাধাগোবিন্দ বসাক প্রণীত 'উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাস,' ডাক্তার রমেশচন্দ্র মহম্মদার প্রণীত 'প্রাচীন বাঙ্গলার ইতিহাস' (ইংরেজী), কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নবাবী আমল,' ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও রমাপ্রসাদচন্দ্রের বঙ্গের ইতিহাস সম্বন্ধে নানা সারগর্ভ ও মৌলিক প্রবন্ধ, ডাক্তার হেমচন্দ্র রায় প্রণীত 'উত্তর-ভারতের রাজাদের বংশাবলী' (ইংরেজী) এবং ডাক্তার হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত 'প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস' (ইংরেজী), মণীন্দ্রমোহন বসু প্রণীত 'সহজিয়া-সংক্রান্ত পুস্তক' (ইংরেজী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু যিনি বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার ইতিহাস সম্পর্কে এই যুগে অনেক কিছু করিয়াছেন, তাঁহার কথা আমি অপূর্ণ্যস্ত উল্লেখ করি নাই। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেজোদারোর

আবিষ্কারের জন্ত চিরদিন অরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাঁহার

রাখালদাস।

বাঙ্গলার ইতিহাস এদেশের ঐতিহাসিকগণের অপরিহার্য্য সঙ্গী হইবার দাবী রাখে; তাহাতে বিজ্ঞানসঙ্গত এত মালমস্লা সংগৃহীত হইয়াছে যে বইখানি পড়িলেই বুঝা যায়, অপূর্ণ্যাপ্ত ঐতিহাসিক উপকরণ তাহার লেখনী-মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—শৃঙ্খলার অভাবে সেগুলি সুসংবদ্ধ হইয়া প্রকাশ পাইবার অবকাশ পায় নাই। পুস্তক দুই খণ্ড পড়িলেই অসমিত হইবে, গ্রন্থকার বাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে অনেক বেশী জানিতেন এবং তিনি বাহা জানিতেন, তাহাও সুবিস্তৃত করিয়া লিখিবার তিনি সময়-সুবিধা পান নাই। তাঁহার অল্পস্থায়ী জীবন মহেজোদারো, হরপ্পা, বাঙ্গলা ও কলিঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় নির্দিষ্ট স্থানের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা বিভ্রাৎ-চমকের দীপ্তি দিয়া অস্তর্হিত হইয়াছে,— তাহা আমাদের একটা অপূর্ণ্যাপ্ত ঐতিহাসিক ভাণ্ডারের ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছে, স্থির ও নিশ্চিত আলোকে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার সুবিধা দেয় নাই। বিজ্ঞাপতির কথায়

তাহার উদঘাটিত দৃষ্টাবলী—“ভাল করি পেখন না ভেল, মেঘ-মালা সঙ্গে তড়িৎ লতা জলু”—
স্বল্পালোকে বহু সম্ভাবনার আশা দিয়া গিয়াছে। তাহার ইতিহাসগুলি জন-সাধারণের পাঠ্য
হয় নাই, উহা শুধু ঐতিহাসিকদিগেরই পাঠ্য।

আর একখানি ইতিহাসের কথা এখানে লিখিব,—ইহা জয়চন্দ্র মুন্সী রচিত কুচবিহারের
ইতিহাস। এই পুস্তকখানি ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহা ফুলফুপ কাগজের

জয়চন্দ্র মুন্সী।

কোয়ার্টো আকারে ৪৬২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রথম ভাগটা কতকগুলি

গল্পের সমষ্টি হইলেও ৩৩ পৃঃ হইতে ৪৬২ পৃঃ পর্যন্ত ইহার প্রদত্ত

বিবরণী বিশ্বাসযোগ্য ও বিচারসহ। ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। ইহার একমাত্র
হস্তলিখিত পুঁথি আমার নিকট আছে।

উপসংহারে বাঙ্গলার ইতিহাসসম্বন্ধে প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ষি নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নাম
অতীব শ্রদ্ধা সহকারে উল্লেখ করিব। রিক্ত-হস্তে কোনরূপ স্কুল-কলেজের শিক্ষা না পাইয়া

প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ষি।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ দেশের ইতিহাসের জ্ঞান যাহা করিয়াছেন,

তাহাতে মানুষ একনিষ্ঠ তপস্তা-দ্বারা কিরূপ অসাধ্য সাধন করিতে

পারে, তাহা উজ্জলভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। কতকগুলি সন্দেহজনক কুলজি-লেখকের উপরে
অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করিয়া, তিনি তাহার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলি যদি মাঝে মাঝে বিকৃত
না করিতেন, তবে তিনি ঐতিহাসিক জগতে চক্রবর্তীর আসন দাবী করিতে পারিতেন।
প্রসিদ্ধ লেখক অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন;
বৈষ্ণব কবির ভাষায় বলিব, “আমরা সই, যে জয়ী তার সঙ্গী হই।” আমাদের ইহাই
অমোঘ রাজনীতি।

ইতিহাস বিভাগে বঙ্গের সুসন্তান রাজকুমার শরৎকুমার রায়ের নাম সসম্মানে
উল্লেখযোগ্য। ইনি কোন আড়ম্বর ও প্রতিষ্ঠার লোভী না হইয়া বাঙ্গলার ঐতিহাসিক

শরৎকুমার।

প্রাচ্যের অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন—এবং বহু অর্থ

ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়া জাতীয় ইষ্টের প্রতি দ্বিরলক্ষ্য হইয়া

অপর লোকের আড়ালে কাণ্ডার চালাইয়াছেন এবং অকুণ্ঠিত ভাবে নিজের প্রাপ্য যশের
ভাগ অপরকে দিয়া মহাপ্রাণতা দেখাইয়াছেন।

বর্তমান কালে কে. এন. দীক্ষিত, দেবদত্ত ভাণ্ডারকার, হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, হেমচন্দ্র রায়,
রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাধাকমল ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ সেন, ননীগোপাল
মজুমদার, বিনয়চন্দ্র সেন, রাধাগোবিন্দ বসাক, নলিনীকান্ত ভট্টশালী,
আধুনিক ঐতিহাসিকগণ।

বিজ্ঞানরাজ চ্যাটার্জি, বিমানচন্দ্র মজুমদার, কালিদাস নাগ, প্রবোধ-
চন্দ্র বাগচী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু মনীষী ঐতিহাসিক উচ্চস্তরের গবেষণার
দ্বারা এদেশের ভাবী ইতিহাসের পথ সুগম করিতেছেন। শিল্পের ইতিহাসে স্টেলা ক্র্যামরিশের
প্রচেষ্টা তাহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রতিপন্ন করিয়াছে, তাহা স্বর্ণমূল্যে বিকাইবে।

আমি বঙ্গভাষা ও সাহিত্য লইয়া জীবন কাটাইয়াছি, ইতিহাস-ক্ষেত্রে আমি অপরিচিত।

পূর্বোক্ত কৃতী অধ্যাপকের দল পদে পদে আমার জুটি পাইবেন। তাঁহারা দোষগ্রাহী হইলে আমার অনিচ্ছাকৃত ও অজ্ঞানতা-প্রসূত অপরাধ সহজেই আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

এই পুস্তকের বিষয় ও
আমার অক্ষমতা।

এই পুস্তকে সিংহলী ও বঙ্গভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা
করিয়াছি (৬৫-৬৭ পৃঃ); জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনা

করিয়াছি (১২৮-৫২ পৃঃ); নব্য-জ্যোতিষ ও স্থিতির মত জটিল ও একান্ত

হ্রস্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজের অসামর্থ্য বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছি (৩৫৩-
৭২ পৃঃ)। বৌদ্ধ বিহার (৩০০-০৪ পৃঃ), নবদ্বীপের টোল (৩৪৬-৫২ পৃঃ), বাঙ্গলার গণিত,
মসলিন, রেশমের ব্যবসায়, কবিত্ত্ব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও বৈষ্ণব ধর্ম (৫৬৮-৮৯ পৃঃ), তত্ত্বশাস্ত্র
(৫৭৯ পৃঃ), সহজিয়া, মকরীদেব চিত্র, শঙ্ক-ব্যবসায় (৯২৮ পৃঃ), কোলীজ (৫৯৬ পৃঃ) ও
শিল্পসম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা (৪৩০, ৬৬৬, ৮৮৮-৯২ পৃঃ) দীপঙ্কর, জয়দেব, মহাপ্রভু
চৈতন্য ও তাঁহার বহুসংখ্যক পার্শ্বদগণের জীবনী, এবং নানা প্রাদেশিক ইতিবৃত্ত (পরিশিষ্টাংশ)
লইয়া আমি চর্চা করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। এমন দেবতার নৈবেদ্য নাই, বাহাতে চক্ষুর
আঘাত না করিয়াছি। এজন্ত আমাকে অনেক পুস্তক পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু সাক্ষাৎ
সম্বন্ধে কাহারও উপদেশ বা সাহায্য আমি খুব কমই পাইয়াছি। আমি যে সকল বিষয়
লইয়া আজীবন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে কিছু নূতন তথ্য পাঠকগণ সম্ভবতঃ
পাইবেন। এক্ষেত্রেও আমার মনস্তিত্তা বা প্রতিভার দাবী নাই, দিন-মজুরের পারিশ্রমিকের
দাবী। পুস্তকখানি আমি নানারূপ গুরুতর সমস্যা-দ্বারা জটিল করি নাই; নানারূপ
বিভিন্ন মতের ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের কোন চেষ্টা করি নাই, আমার সেরূপ
পাণ্ডিত্যও নাই। ঐতিহাসিক কিংবদন্তী বা উপগল্প, তাহার যে মূল্যই থাকুক না কেন, তাহা
আমি বাদ দিই নাই। তাহা যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকের বিচারাধীন করিয়াছি;
কারণ জাতীয় ইতিহাস-গঠনের প্রাক্কালে সামান্য খড়কুটোরও কিছু মূল্য আছে,—কিছুই
উপেক্ষার বিষয় নহে;—বাহা আজ উপেক্ষিত হইতেছে, হয়ত ভাবী আবিষ্কারের আলোকপাতে
কালে তাহার একটা মূল্য দাঁড়াইতে পারে।

এই পুস্তকের ভাষা হয়ত ঠিক বিজ্ঞান-সঙ্গত, ওজন করা, নির্লিপ্ত ঐতিহাসিকের ভাষা
হয় নাই। আজ বঙ্গের শ্রমশানের উপর দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী লেখক যদি মাঝে মাঝে অতীত

বিজ্ঞান-সঙ্গত উজ্জ্বল-
হীন যুক্তিমূলক ভাষা।

গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া থাকেন, কিংবা
কিছু বিচলিত হইয়া উজ্জ্বল প্রকাশ করিয়া থাকেন—তবে আশা

করি তিনি ঐতিহাসিকগণের ক্ষমা হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

বিশেষ এই পুস্তক শুধু ঐতিহাসিকগণের জন্ত লিখিত হয় নাই, বঙ্গের জনসাধারণের মনে
স্বদেশ-প্ৰীতি জাগ্রৎ করা আমার অশ্রুতম লক্ষ্য। নীরস ও শুষ্ক গবেষণায় তাহারা আকৃষ্ট
হইবে না—এজন্ত যদি রস-সন্ধারের অভিপ্রায়ে ভাষায় মাঝে মাঝে কিছু রং ফলাইতে চেষ্টা
করিয়া থাকি, তাহাতে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যুরোপের লেখকগণ
ক্রাইষ্টের জন্ম ও তৎকৃত অলৌকিক লীলা সম্বন্ধে সাধারণতঃ নীরব, নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাসের

শুচিতা তাঁহারা রক্ষা করেন,—আমাদের ঐতিহাসিক বিষয়গুলির অধিকাংশ ধর্ম-বিশ্বাসের সহিত জড়িত, সেই বিশ্বাসে হানা দিতে তাঁহাদিগের একটুও বাধে না,—এই জন্য আমাদের ইতিহাসের আলোচনা-কালে তাঁহারা অতিরিক্ত মাত্রায় বৈজ্ঞানিক হইয়া বসেন। হাইলার সাহেব যখন লিখিলেন, কোশল্যা নিশ্চয়ই দশরথকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ছিলেন, তখন তৎকৃত ইতিহাসখানি বাঙ্গলার স্কুলে স্কুলে পাঠ্য করিতে কাহারও আপত্তি হইল না—ইহাই বিজ্ঞান-সঙ্গত আলোচনা। আমাদের মুক জনসাধারণের একটা প্রথর অনুভূতি আছে—এই ভাবের গবেষণা তাহাদের মর্মান্তিক হয়; কিন্তু তুলসীতলা হইতে হাতের নোয়া পর্য্যন্ত হিন্দুজাতি যে চক্ষে দেখিয়া থাকেন, গবেষণার সময়ে হিন্দু লেখকের তাহা একটু মনে রাখিলে ভাল হয়—তাহা না হইলে জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যোগ-স্বত্র ছিন্ন হইবে। আমাদের জনসাধারণ একান্ত অবজ্ঞার যোগ্য নহে, তাহাদের গোঁড়ামি সত্ত্বেও তাহারা বঙ্গের নিজস্ব ভাব, ধর্ম ও শিল্প কতটা বজায় রাখিয়াছে, তাহা এই পুস্তকের পাঠক অনেক স্থলেই দেখিতে পাইবেন। ইহাদের সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ লেখক পাদ্রী লিফ্রয় তাঁহার ভারতীয় অগাধ অভিজ্ঞতার বলে জানাইয়াছেন, “হিন্দুচাৰ্য্য অত্যশ্চর্য্য ক্ষমতার সহিত স্বজ্ঞাতিস্বপ্ন দার্শনিক ও নীতিবচনিত আলোচনা করিতে পারে। এই চাৰ্য্য একেবারে নিরঙ্কর ও দরিদ্র।” (“A very competent and independent witness Dr. Lefroy has testified from his long personal experience to the extraordinary aptitude with which the poorest and the most illiterate Hindu peasant will engage in discussion in the deepest philosophical and ethical questions.” হাভেল সাহেব লিখিয়াছেন, “The Indian painters though illiterate in the western sense are the most cultured of their class in the world.” (Introduction, xix, Ideals of the Indian Art, E. B. Havell.) ভারতবর্ষের পটুয়ারা পাশ্চাত্য-মতে মূর্খ, কিন্তু জগতের চিত্রকরদের মধ্যে তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা সকলের উপরে। এ সম্বন্ধে আমার এই বক্তব্য যে বাঙ্গলার লেখকবর্গ এদেশের ইতিহাস লিখিতে গিয়া একটু শ্রদ্ধার সহিত লিখিলে ভাল হয়, এই পুস্তকের ১৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় সাহেবদের রামায়ণ ও মহাভারতাদি সম্বন্ধে যে মতামত উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অসার ও অতিরিক্ত মাত্রায় বৈজ্ঞানিক মতগুলির তাঁহারা যেন প্রশ্রয় না দেন। মুসলমানদের জাতীয়তা অনেক বেশী, তাঁহাদের বিশ্বাসসম্বন্ধে কেহ কিছু লিখিতে সাহসী হন না। ইংরেজ রাজার জাতি—তাঁহাদের ইতিহাস লইয়া কেহ যথেষ্টাচার করিতে পারে না। একমাত্র হিন্দু সমাজই এই সকল বিষয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় গবেষণাশীল লেখকদের যথেষ্টাচারের প্রশ্রয় দিতেছেন।

আমার এই পুস্তক ভাবী ঐতিহাসিকগণের পক্ষে একখানি পাদপীঠরূপে গণ্য হইলে ধন্য হইব। তাঁহারা ইহার উপর দাঁড়াইয়া বঙ্গ-জননীর যে মহিমাযিত্ত প্রতিমা গড়িবেন, সেই শুভ-স্বপ্ন আমার সমস্ত শ্রমকে সার্থক করিয়াছে, এই পরিকল্পনা আমার লেখনীকে বলদৃপ্ত

ও আশাবিত্ত করিয়াছে। আমি বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষা পুণ্যতীর্থ জানি না, বাঙ্গলা ভাষা বাহা আমি মাতার নিকট শিখিয়াছি, বাহাতে আমার দ্বীপুত্রকণ্ঠা কথা বলিয়া আমার শ্রবণে অমৃত ঢালিয়া দিতেছেন, সেই ভাবের মত এমন স্মৃতি ও স্মৃতি-আর কোন ভাষা আমি জানি না; আমার কর্ণে কোকিল-পাখি-কণ্ঠে এরূপ কল-তান নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যের মত এমন ভাব ও কবিত্বের খনি আমি কোথাও পাই নাই। আমি বিশ্ব-প্রেমিক নহি, আমি একান্ত ভাবে প্রাদেশিক; তাহাতে কেহ যদি মনে করেন, আমি যুগোপযোগী নহি,— আমি ক্রম-বর্দ্ধি-অগ্রগতিশীল সভ্যতার পশ্চাৎ-ভাগে কুপমগ্ন হইয়া পড়িয়া আছি,—তবে সেই অভিযোগের আমি প্রতিবাদ করিব না, আমি তাহাই। আমার এক মাত্র গর্ব আমি মায়ের ছেলে—তাহার হাতের ধান-দুর্কা ও আশিসের অপেক্ষা আমার কাছে বড় কিছুই নাই।

এই পুস্তকে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত লিখিয়া ইহা শেষ করিলাম, পরিশিষ্ট-খণ্ডে প্রাদেশিক রাজ্যগুলির ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের পরের ঘটনাগুলি দোষভঞ্জে নানা অটলতা-যুক্ত হইয়া আছে। এই সময়ে তাহার যথাযথ বিবরণ দিতে পারিলাম না। এখন এই দেশ একটা উত্তেজনার মধ্য দিয়া চলিতেছে। সরকার সন্নিহিত, এবং দেশের লোক ব্যতিব্যস্ত।

কেন ব্রিটিশ-অধিকারের ইতিহাস লিখিত হইল না।

এ দেশের লোকের পক্ষে অল্পই জীবনের প্রধান সম্বল, কিন্তু জর হইলে চিকিৎসক অল্প বন্ধ করিয়া দেন, সেইরূপ যদিও ঐতিহাসিকের পক্ষে সত্যই সর্বদা অবলম্বনীয়, এই বিকৃত ও উত্তেজিত যুগে সত্য কথা এখন নিরাপদ নহে। আশা করি, অচিরে এই রাজনৈতিক ঘনঘটা কাটিয়া যাইবে, তখন ব্রিটিশ-অধিকারে আমাদের কত দিক দিয়া কত উপকার হইয়াছে, এবং জাতীয় সম্পদ কোন্ দিকে বাড়িয়াছে, এবং কোন্ দিকে কমিয়াছে—তাহার একটা হিসাব-নিকাশ করার সময় হইবে। তখন যদি আমার সামর্থ্য থাকে ও আয়ুতে কুলায়, তবে “ব্রিটিশ-অধিকারে বাঙ্গলা” শীর্ষক এই পুস্তকের পরবর্তী খণ্ড প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। ইংরেজেরা আমাদের একটা জিনিষ দিয়াছেন, বাহা অমূল্য— তাহা চোখের দৃষ্টি। কে ছিল অশোক, কে ছিল দীপঙ্কর, এমন কি কে ছিল শিবাজী ও রণজিৎ সিং—কে ছিল প্রতাপাদিত্য ও কে ছিল সীতারাম, কোথায় ছিল নালন্দা ও বিক্রমশিলা,—এক কথায় এই বিরাট ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের কাছে বঙ্গদেশও অন্ধকারময় ছিল। ইংরেজের কাছে চক্ষুদান পাইয়া আমরা আজ জাগিয়া উঠিয়াছি। এই চক্ষুদান অপেক্ষা বড় দান কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। তাহারাই আমাদের চক্ষু উন্মোচন করিয়া গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছেন—এ বিষয়ে কোন মতান্তর হইতে পারে না।

বাঙ্গালী মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ এদেশের বৈষ্ণব-ধর্মের উপর সূক্ষ্ম-

সম্প্রদায়ের চিন্তা-ধারার প্রভাবসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন।

আমার ছাত্র ডা° এনামুল হক, এম. এ., পি. এচ. ডি. মহাশয়কে এ বিষয়ে তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া এই পুস্তকের অন্ত একটা সংক্ষিপ্ত সন্দর্ভ লিখিতে

অমরোষ করিয়াছিলাম। তিনি তদনুসারে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়া আমায় দিয়াছেন। তিনি মনে করেন, গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মুসলমান সূফী সম্প্রদায়ের নিকট অনেক বিষয়ে স্বর্গী।

অবশ্য তুর্কী-বিজয়ের বহু পূর্বে হইতে আরব-দেশীয় লোকেরা বাণিজ্য-অভিপ্রায়ে বঙ্গদেশে আনাগোনা করিতেন, কিন্তু সেই আদিকালে তাঁহারা এদেশে ধর্ম-প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। ডা° হক্ আদি-যুগের বঙ্গপর্যটক কয়েকজন মুসলমান সাধুর উল্লেখ করিয়াছেন—

১। সুলতান বায়িদী বিস্ফাসী—ইনি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের পাঁচ মাইল উত্তরে নসীরাবাদ গ্রামের একটি টিলার উপর তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন আছে— ইনি ৮৭৪ খৃঃ অব্দে পরলোকগমন করেন।

২। সাহ সুলতান রুমি—ইনি কনষ্টান্টিনোপলের লোক (১০৫০ খৃঃ)। কথিত আছে, ইনি ময়মনসিংহের অন্তর্গত মদনপুর গ্রামে এক কোচ-রাজাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন। নেত্রকোনার অন্তর্গত মদনপুরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে, এবং তথায় তাঁহার সমাধি আছে।

৩। সাহ সুলতান বলখী—ইনি মধ্য-এসিয়ার বলখের রাজা ছিলেন, শেষে সাধু হন। বগুড়া জেলায় মহাস্থানের পরশুরাম রাজা ও তদীয় কন্যা শিলাদেবীকে ইনি যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং তথায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। তিনি খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজয়মান ছিলেন।

৪। সাহ জালালুদ্দিন তব্রিজি—ইহার সম্বন্ধে এই পুস্তকের ৫১০-১৬ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পাণ্ডুয়ায় ইহার মসজিদ আছে।

ইহাদের দ্বারা মুসলমান ধর্ম বঙ্গে বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। হক্ সাহেব লিখিয়াছেন, “নানা কারণে তাঁহারা সূফী-মতকে বঙ্গে প্রতিষ্ঠা দান করিতে পারেন নাই।”

ইহাদের পরে যাহারা আসেন,—(তখন বঙ্গ-বিজয় শেষ হইয়াছে)—তাঁহারাি ধর্ম-প্রচারে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে (১) সিরাজুদ্দীন বদায়ুনী (১৩৫৭ খৃঃ) গোড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। (২) হুসুদ্দিন কুতুব-ই-আলাম (১৪১৫ খৃঃ) গণেশের পুত্র বহুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা প্রদান করেন। (৩) সফীউদ্দীন শহীদ পাণ্ডুয়ার পাণ্ডুরাজাকে পরাস্ত করিয়া সেই দেশে ধর্মপ্রচার করেন (১২৯৫ খৃঃ)। (৪) শাহ ইসমাইল ঘায়ী উত্তর বঙ্গে মুসলমান-ধর্মের প্রচারক ছিলেন (১৪৭৪ খৃঃ)। (৫) সাহজাদালাল মুজর রদ ইয়মনী খ্রীষ্টো ১৩৪৬ খৃঃ অব্দে দেহ-রক্ষা করেন, এবং তাঁহার শিষ্য মুজসিন ওয়ালিয়া চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন।

কিন্তু এই বিদেশী প্রচারকেরা দেশের হৃদয় ছুঁইতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী যুগে বঙ্গ-দেশী মুসলমান সাধুরাই—স্থানীয় হিন্দুধর্মের কোমল দিক্টার উপর জোর দিয়া তাঁহাদের

মত জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত করিয়াছিলেন। ইহারা প্রেমের ক্ষেত্রে সুফী-সাহিত্য হইতে বাঙ্গালী হৃদয়ের অমুকুল স্বাধীনতার বাণী শুনাইয়া ছিলেন। হক সাহেবের মতে বাঙ্গলার রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-সাহিত্যে সুফী-সাহিত্যের রস-ধারা প্রবাহিত হওয়ায় ইহাতে চিন্তাশীলতার এতটা উদ্যম অবাধ গতি দিয়াছে। সহজিয়া নেতাদের মধ্যে অনেক

সদা-সোহাগ-সুফী ও
বৈষ্ণবদের সমীচারা।

ব্যক্তি মুসলমান ছিলেন, তাহা আমরা ৮৯২-৯৪ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছি। এই শ্রেণীর মধ্যে যে স্বাধীন চিন্তা দেখা যায় তাহা

ইসলামিক শিক্ষার ফল বলিয়া লেখক দাবী করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে সুফীদের মধ্যে এক শ্রেণীর সাধক আছেন, তাহারা পুরুষ হইয়াও রমণী-জনোচিত অলঙ্কার পরেন এবং স্ত্রীভাবে ভগবানকে ভজন করেন। ইহাদের অমুকরণে গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে সমীচারার সাধনা প্রবেশ করিয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের নাম “সদা-সোহাগ”-সুফী। প্রবন্ধ-লেখক এই ভাবে অত্যাশ্চর্য্য বিষয়েও সুফী-সাহিত্যের সহিত বৈষ্ণব-সাহিত্যের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন এবং তদ্বারা সুফী-প্রভাবের পরিকল্পনা করিয়াছেন।

সমীচাবে সাধনা এখনও বাঙ্গলাদেশের অনেক বৈষ্ণবই করিয়া থাকেন। বৃন্দাবনের নোলক-বাবাজী এবং নবদ্বীপের ললিতা সমী এখনও স্ত্রীজনোচিত শাড়ী ও অলঙ্কার পরিয়া সাধনা করেন। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে এই সমীচাবে ভজনা, হজরত মহম্মদের দৃঢ় পুরুষোচিত বিশ্বাসের অনুকুল নহে। এখনকার পণ্ডিতমণ্ডলী প্রমাণ করিয়াছেন ও একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে সুফীরা মুসলমান হইলেও তাহাদের ধর্মমতের অস্থি-পঞ্জর সমস্তই বৌদ্ধ-ধর্ম দ্বারা গঠিত। গ্রন্থভাগে আমরা পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি যে সহজিয়ার ধর্মমত,—তাহাদের বিচিত্র স্বাধীন চিন্তাধারা—বহু পূর্বে হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল। তিব্বত-রাজ লাঃ লামা ছডের সময়ে নীল আলখাল্লা-পরিহিত এক শ্রেণীর বৌদ্ধভিক্ষু-নেতা নর-নারীর অবাধ মিলন এবং ব্যভিচারী চিন্তা অতি উগ্রভাবে প্রচার করিতেছিলেন। হজরত মহম্মদের বহু পূর্বে হইতে তামিল ভাষী শৈবগণ ধর্ম-মন্দিরের অমুষ্ঠানের ব্যর্থতা প্রচার করিয়া গীতি রচনা করিয়াছিলেন (৫৭৮ পৃঃ)। এই শৈব ও বৌদ্ধগণই মুসলমান দীক্ষা গ্রহণ করিয়াও প্রাচীন মতগুলি ছাড়িতে পারেন নাই। বাঙ্গলার এই নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এবং হিন্দুগণ উভয় সম্প্রদায়ই তাহাদের প্রাচীন দীক্ষায় প্রভাবান্বিত ছিল। এই সকল সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার দার্শনিক স্বাধীনতা তাহারা ইসলাম হইতে পায় নাই, শেষ দিক্কার বৌদ্ধধর্ম হইতেই তাহা পাইয়াছিল। ইসলামের সামাজিক সাম্য ও উদারতা নিম্নশ্রেণীর সহজিয়া ও বাউলদের ধর্মভাবকে যে কতকটা প্রভাবান্বিত না করিয়াছিল, তাহা নহে, কারণ নূতন ধর্ম অবশ্য কতক পরিমাণে তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু এদেশের জনসাধারণ কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলেই দেশজ সূচিরাগত বৌদ্ধ-সংস্কার ও বিশ্বাসই বিশেষ ভাবে সমাশ্রয় করিয়াছিল।

যাভার ‘বরোবদর’ শব্দটি লইয়া অনেক পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু

এটি যে একটি খাঁটি পূর্ববঙ্গের শব্দ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। বুদ্ধের এক নাম 'বজ্র'। 'বজ্রাসন', 'বজ্র-যোগ', 'বজ্রতন্ত্র' প্রভৃতি শব্দ সুপরিচিত। এই বজ্র শব্দ হইতে বাজ, বজ্র ("বজ্র পড়িয়া গেল" চণ্ডীদাসের পদ), এবং বদর শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। গয়ার "বজ্রাসন", ঢাকার সূর্যাপুর গ্রামের "বজ্রাসন" প্রভৃতি স্থানে বৃহৎ বৌদ্ধ বিহার ছিল।

পূর্ববঙ্গের মাঝিরা সর্বত্র নৌকা বাহিবার সময়ে "বদর" শব্দ
বজ্র, বজ্র, বদর।

উচ্চারণ করিয়া থাকে, ঝড়-তুফানের সময় উহারা 'বদর' 'বদর'

বলিয়া সেই বজ্রের শরণ লয়। মুসলমান হওয়ার পর সেই মাঝিরা বুদ্ধকে ভুলিয়া গেল, কিন্তু 'বদর' যে আকাশের দেবতা তাহা ভুলিল না; নামটির সঙ্গে পীর লাগাইয়া তাহারা মুসলমান-গ্রন্থ একটা ব্যাখ্যা দিল। হয়ত 'পীর বদর' বলিয়া কেহ ছিলেন, কিন্তু এমনও হইতে পারে যে মুসলমানগণ বুদ্ধকেই "পীর" নাম দিয়া তাহাদের একটা পূর্বাগত অস্পষ্ট ধারণার সূচনা করিতেছে; কিন্তু এই বদর যে 'বজ্র' শব্দের স্বর্ণণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিক্রমপুরের বিখ্যাত গ্রাম এখন "বজ্রযোগিনী" নাম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু চিরকাল ইহার নাম ছিল "বদর যোগিনী"—এখনও বুদ্ধগণ ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ইহাকে "বদর যোগিনী" বলিয়াই জানে। 'বদর বদর' অর্থ 'ঝড় বজ্র'। ঐ শব্দে 'বৃহৎ বুদ্ধ-মন্দির' বুঝায়।

২৭৭-৮৪ পৃষ্ঠায় সাভারের রাজা মহেন্দ্রের যে অনুশাসনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হয় উক্ত রাজা তাহার রাজ্যে বহু চন্দনতরু রোপণ করিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ী
রাজা মহেন্দ্রের চন্দনতরু।

সাভারের নিকট, কিন্তু সাভারের অতি নিকটবর্তী তেঁতুল-ঝোড়া গ্রামনিবাসী সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সম্প্রতি আমাকে জানাইয়াছেন যে, সেই অঞ্চলে এখনও অনেক চন্দন-বৃক্ষ জঙ্গলে জঙ্গলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কথা শিলা-লিপিকে সমর্থন করিয়া মহেন্দ্রের সেই কীর্তির স্মৃতি-গৌরব এখনও বহন করিয়া আনিতেছে।

এদেশে রাজাদের যে প্রত্যেকের সভাতেই রূপকথা ও গীতিকথা শুনাইবার জন্ত লোক নিযুক্ত থাকিত, ৫২৯ পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এই রীতি রামায়ণের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে; প্রত্যেক রাজারই কীর্তিকথা ইহারা গান করিত। যোগী পাল, মহী পাল প্রভৃতি রাজস্ববর্গের গীতি হইতে ঊনবিংশতাব্দী পূর্বের বাথরগঞ্জের কীর্তিপাশা গ্রামের জমিদার রাজা রাজকুমারের সম্বন্ধে পালা-গান গীত হইয়া আসিতেছে। সুতক্ষরীনে পাওয়া যায়—আলিবর্দি খাঁ দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়—রূপকথা শুনিতে। মীরন যে রাজ্যে কোন জঙ্গলের এক শিবিরে বজ্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত

হন, সে রাজ্যেও তাহার সঙ্গে রূপকথা শুনাইবার লোক ছিল।

রূপকথা।

তাহাদেরও এক সঙ্গে মৃত্যু হইয়াছিল। সেদিনও ভাওয়ালের মোকদ্দমার কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য জানা গিয়াছে যে "টোনা" নামক নমঃশূদ্র, একটা মহিম ও ক্ষেত্রমোহন নামক এক ব্যক্তি কুমার রমেন্দ্রনারায়ণকে রূপকথা শুনাইত।

(আনন্দবাজার, ১৭ই আশ্বিন, ১৩৪১ ।) অনেক সময়ে রমণীরাই এই রূপকথার ভাল গল্প বলিতে পারিতেন, কোন কোন স্থানে তাহাদের নাম ছিল “আলাপিনী”। এই রাজত্ববর্গ ও সম্রাট লোকেদের উৎসাহে তাহাদের অন্তঃপুরে আলাপিনীরা যে রূপকথা শুনাইত, তাহার শীলতা, কথার গাঁথুনী, এবং আদর্শ অতি উচ্চদরের হইত, মালঞ্চমালা প্রভৃতি গল্প এই অপূর্ণ কথা-শিল্পীদের রচনা। আমরা এই শ্রেণীর লোকদিগকে হারাইয়াছি।

আমি প্রাক দেখিতে পাই নহি, এজন্ত এই পুস্তকে অনেক ভুল রহিয়া গিয়াছে। ৪৬৪ পৃষ্ঠার ৩২ ছত্রে ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়কে আমি কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি; তিনি ব্রাহ্মণ। আশা করি ব্রাহ্মণোচিত ঐদার্য্য-গুণে তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। ৫৬৪ পৃষ্ঠার ১৮ ছত্রে শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়কে আমি শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছি, তজ্জন্তও আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ৫১৭ পৃষ্ঠার ২৮ এবং ৩০ ছত্রে ছইবার হাতী ভ্রমবশতঃ।

ঘোম স্থলে হাড়ী-ঘোম ছাপা হইয়াছে, ইহাও প্রাক দেখার ত্রুটি। ৪৮৮ পৃষ্ঠার ২৮ ছত্রে “মাতা” স্থলে “স্ত্রী” হইবে। ৫৪২ পৃষ্ঠার ২৬ ছত্রে tunnel শব্দ স্থলে canal ছাপা হইয়াছে এবং ৭৮৮ পৃষ্ঠার ৮ ছত্রে “মছলান্দি” স্থলে “মসনদ আলি” লেখা হইয়াছে, ইহার কামানের উপর ও রাজমালায় “মছলান্দি” শব্দই পাওয়া যাইতেছে। ৩০৬ পৃষ্ঠার ৩১ ছত্রে “নয়পাল” স্থলে “নরপাল” এবং ৪১৮ পৃষ্ঠার ১৫ ছত্রে “নলিয়া” শব্দ “নালিয়া” রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। ১০০২ পৃঃ ৪ ছত্রে “মজলিস কুতুব” স্থলে ভুলক্রমে “সমসের কুতুব” ছাপা হইয়া গিয়াছে। ২৮৩ পৃষ্ঠার ২৩শ ছত্রে “বল্লালের পুত্র” স্থলে “বল্লালের প্রপৌত্র” হইবে।

৪৫৩-৫৪ পৃষ্ঠায় আমি “রায়বেশে” নৃত্য সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছি তাহাতে কিছু ভুল হইয়াছে। আমি শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের মুখে বাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা প্রায় ছয় মাস পরে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম, অথচ তাহাতে উদ্ধৃত করার চিহ্ন ব্যবহার করাতে মনে হইবে যেন উহা দত্ত মহাশয়েরই উক্তি, কিন্তু তাহা নহে, স্বতির ভ্রমবশতঃ তাহা যথার্থ হয় নাই। প্রথমতঃ যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহা সিউড়ীর বাৎসরিক মেলার উপলক্ষে নহে, সিউড়ী হইতে ১২ মাইল দূরে রাজ-নগরের দাতব্য-চিকিৎসালয়ের দ্বার-উদঘাটন উপলক্ষে প্রদর্শনীটি হইয়াছিল। ৪৫৩ পৃষ্ঠার ৫ম ছত্রে “মুসলমান” শব্দ স্থলে “বাউরি” হইবে। এইরূপ আরও কিছু কিছু ভুল আছে, মোট কথা উহা ঠিক দত্ত মহাশয়ের মুখের কথা নহে, স্বতির উপর নির্ভর করিয়া কয়েকমাস পরে লিখিত। এই প্রসঙ্গে এই কথাটি বলা দরকার, বৃহৎ বঙ্গের সঙ্গে বাঙ্গালীর পরিচয় ঘটাইবার জন্ত বাহারা চেষ্টা করিতেছেন, তন্মধ্যে দত্ত মহাশয়ের স্বার্থতাগ ও প্রচেষ্টা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গলাদেশের অপূর্ণ ‘রায়বেশে’ নৃত্য আজ ভারতের সর্বত্র এমন কি যুরোপীয় অনেক মহামনা ব্যক্তির মধ্যেও আদর ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে। পুঁথিপত্রে কেহ কেহ এই রায়বেশে

নৃত্যের উল্লেখ পূর্বেই জানিতেন, কিন্তু এই নৃত্য যে এদেশে এখনও বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে বিজ্ঞান তাহা দত্ত মহাশয়ই আবিষ্কার করিয়াছেন ; কাঠিন্ত্য ও জারিন্ত্য, বঙ্গের জেলার

রায়বেশে ও অপরায়ন নৃত্য। মুক্তনৃত্য, ঢালি সম্বন্ধেও তাহারই চেষ্টার ফলে লোকে জানিতে পারিয়াছে ও শিক্ষিত লোকেরা গ্রহণ করিতেছেন। জারি গানের

কথা অনেকে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু সুঠাম সুন্দর জারিন্ত্য দত্ত মহাশয়েরই আবিষ্কার। রুমরনৃত্য অপাঙ্ক্তের ছিল। কিন্তু আজ উহা শিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন। দত্ত মহাশয় নানা প্রবন্ধে কীর্তন ও বাউল-নৃত্য বিশ্লেষণ করিয়া উহার সহজ সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

ইহাছাড়া তিনি বঙ্গের নিজস্ব চিত্র-শিল্প পট, পুঁথির পাটার ছবি, চালচিত্র, সরার সন্ধান, পীড়চিত্র, কাঠের মধ্যে নানারূপ কারুকার্য, ইট ও পাটির কাজ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ও তৎসংক্রান্ত প্রদর্শনী খুলিয়া দেশের লোকের অমুরাগমূলক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, বামিনী রায় প্রভৃতি শিল্প-গুরুগণ এবিষয়ের অগ্রদূত, কিন্তু তাহারা তুলি লইয়া ব্যস্ত। গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এই সকল বিষয়ে গবেষণার দ্বারা এবং নানাস্থানে বাঙ্গলার খাটি শিল্পসম্বন্ধে বক্তৃতা দ্বারা বাঙ্গলার নিরুদ্ধ চিরাগত শিল্প-রীতির উৎসমুখ বিমুক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

এখনও বঙ্গদেশ সেই স্থপ্রাচীন যুগের ধারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। খৃষ্ট জন্মবার ৬৭ শত বৎসর পূর্বের মন্দিরদের কাজ সামান্য ভাবে এখনও চলিয়া

আসিয়াছে, তাহা আমরা ইতিপূর্বেই লিখিয়াছি (৪১১ পৃঃ)।
নিম্নশ্রেণীর প্রাচীন শিল্প রক্ষা করিয়াছে।

এখনও বীরভূমে জহরী পটুয়ার এ বিষয়ে কৃতিত্ব অসাধারণ, তাহার সহযোগী মটর, বাদব, গণেশ ও কার্তিক সেই শিবের

শল্তা জালাইয়া রাখিয়াছে, এই আহিতাঘিদের হোমাঘি এখনও নির্দোষিত হয় নাই। ফরিদপুরে বটীচরণ আচার্য্য ও বামাচরণ আচার্য্য—প্রাচীন চিত্রকরদের ধারা

বজায় রাখিয়াছেন। বটীচরণের বয়স ৮৫ বৎসর। কালীঘাটের কোন কোন পটুয়ার কৃতিত্বও সামান্য নহে। কুমারটুলীর নিতাই (এন. সি.) পালের নাম এখন ভারতের সর্বত্র বিদিত।

কুমারগরের বজ্জাল শিল্পীর গড়া মৃত্তিকার মূর্তির সৌন্দর্যে ফ্রান্সদেশের রাজা মুফ হইয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ফরিদপুরের নলিয়া-বাসী

খেপাচরণ পাল প্রাচীন মডেল অমুরায়ী যে সিংহমূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা অশোকস্তম্ভের সিংহকে স্মরণ করাইয়া দেয়। “রায়বেশে” নর্তকদের মধ্যে বীরভূমের

বোগেশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। “চড়ক গম্ভীরা” বা দশ-অবতার নৃত্যে, বিশ্বেশ্বর দাস (উপাধি ‘বাল্য’—বা নৃত্যে শ্রেষ্ঠ) ফরিদপুর জেলায় প্রথম স্থান অধিকার

করিয়া আছেন, তাহার নৃত্যের এক একটি ভঙ্গী দশ অবতারের নিঃশব্দ অভিনয় দ্বারা প্রত্যেকটির এমন রূপ বিজ্ঞপ্তি করে যে, তাহাতে বেদ-উদ্ধরণ হইতে সমস্ত ভাগবত লীলা

উৎকৃষ্ট ভাবে প্রদর্শিত হয়। আমাদের আলিপনা-লগ্নীদের কত নাম করিব। সে দিন

পর্যন্তও ঘরে ঘরে এই লক্ষ্মীরা বিরাজ করিতেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রমুখ চিত্রশিল্পীগণ এই আলপনা হইতে চিত্র-শিল্পের প্রেরণা পাইয়াছেন। একটি ছইটি নাম দিয়া কি করিব? লক্ষ নামের তালিকা দিলেও উহা সম্পূর্ণ হইবার নহে। ফরিদপুরের বগলা দেবী, নগেন্দ্রবালা দেবী প্রভৃতি অশীতিপর বৃদ্ধারা এখনও যদি পিঠালী বা চালের গুঁড়া লইয়া বসেন, তবে তাঁহাদের অবলীলাক্রমে অঙ্কিত আলপনার কাছে শিল্পাচার্য্যগণও হার মানিয়া যান। খুলনা জেলার সেনহাটি-বাসিনী 'কমলার মার' খ্যাতিও আমরা শুনিয়াছি। ব্রত-নৃত্যে ফরিদপুরের মায়া দেবী, কালী ও নির্মলা দেবী, সুবাসিনী, মোক্ষদা দেবী প্রভৃতি তরুণীরা প্রাচীন ধারাটি প্রশংসনীয় সাফল্যের সহিত অভ্যাস করিতেছেন। সামান্য চেষ্টা করিলে আমরা ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ জ্বরী, সুমুর, যশোহরের ঢালি ও ব্রত-নৃত্যকারীদের নাম সংগ্রহ করিতে পারি। এখনও খুলনা, শ্রীহট্ট ও যশোরে ছই একজন এমন রমণী আছেন, কাঁথা শেলাই কার্যে তাহাদের কৃতিত্ব অসাধারণ। এই সকল শিল্প বাঙ্গলা দেশে অজস্তা, বরোবদর, খেজুরাহ, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানের শিল্প-কলা হইতেও প্রাচীনতর। কোন্ অতীত যুগের হরিদ্বারে, ইহাদের উৎস-মুখ, তাহা কোন্ প্রত্নতত্ত্ববিদ নির্ণয় করিবেন? হয়ত তাঁহাকে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার যুগে গতিবিধি করিতে হইবে, হয়ত মহাভারতের সময়েরও বহু পূর্বেই বঙ্গদেশের শিল্পের অপোগণ্ডত্ব ঘুচিয়া গিয়াছিল—এইগুলিই আমাদের বঙ্গদেশের নিজস্ব সম্পত্তি। দুঃখের বিষয় স্বদেশী নেতাদের বিচিত্র কর্ম-বিভাগের মধ্যে ইহাদের কথা কেহই একবার স্মরণ করেন না। এই শিল্পীরা নিঃস্বার্থভাবে—বিষম দারিদ্র্য ও নিরুৎসাহের মধ্যে শত সহস্র বৎসর যাবৎ তাঁহাদের নিজস্ব জিনিষ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ঝিনুকের জীব বেক্ষপ শুক্তির মধ্যে মুক্তা রক্ষা করে এবং তজ্জন্ত প্রাণ দেয়—এদেশের শিল্পীরা চিরকাল সেইভাবে তাহাদের নিজস্ব বিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু আর বৃদ্ধি তাহারা পারে না, দেশের লোকের দ্বারা অবজ্ঞাত হইয়া এইবার দেশী শিল্প মরিতে বসিয়াছে।

বাঙ্গলার চিত্রশিল্প-সম্বন্ধে আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি (২২৮-৪০, ৪০৬-৫২, ৫৫৭-৫৮, ৮৮৭-৯২ পৃঃ)। হিন্দু রাজত্বকালে শিল্পী যে প্রভূত পুরস্কার ও উৎসাহ পাইত, গত সাত শত বৎসর যাবৎ সে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। মোগল ও রাজপুত শিল্পের মার্জিত ও পরিণত রূপ সে কোথায় পাইবে? কালীঘাটের চিত্রের মূল্য ছিল ছই পয়সা। আরাঞ্জের নিষেধাত্মক বিধিতে শিল্পীরা দিল্লী-দরবার হইতে প্রস্থান করিয়া রাজপুতনায় আশ্রয় লইয়াছিল, সেখানে ঐ শিল্প পরিচ্ছন্নতা ও কায়দা-কানুনের দিকটা কতকটা হারাইয়া হিন্দুর আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু ছই দিকের প্রভাবে পড়িয়া উহা একটা মিশ্র রকমের সামগ্রীতে দাঁড়াইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মানসিংহ

এই জয়পুরী আদর্শ বাঙ্গলায় চালাইয়াছিলেন; তদবধি বাঙ্গালী শিল্পী বাঙ্গলার বড় মাস্তুলদের ফরমাইস মত জয়পুর-শিল্পের অনুকরণ করিয়াছে, তাহাতে সোণারূপার প্রাচুর্য্য, দরবারী কায়দা-কানুন ও পোষাকের আড়ম্বর বেশী।

কিন্তু নিম্নস্তরের শিল্পী সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক ছিল, ব্যাসের শাপে তাহার পেটে ভাত ছিল না (বিশ্বকর্মার প্রতি অভিশাপ—“তোমার গুণধর, যত কারিগর, হইবে হুংখী বেগার।”—অন্নদা-মঙ্গল)। রং, বাটালী, এমন কি হুচিট পর্যন্ত সে অতিকণ্ঠে সংগ্রহ করিত। সে কলা-লজ্জার নৈবেদ্য ক্ষুদ্র দিয়া সাজাইয়াছিল, কিন্তু তাহা বিহ্বলের ক্ষুদ্র, এবং নিশ্চয়ই দেবীর তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল। প্রাচীন বাঙ্গলার (মুসলমান-যুগের) ছুতার, পটুয়া, মসুরী, সীবনরতা কথা-কারিণী প্রভৃতির কাজে বাঙ্গলার নিজস্ব রূপটি বজায় আছে। সেখানে বাঙ্গালী শিল্পী বরোবদর, কাঞ্চোড়িয়া, খেজুরাহ, অজন্তা, অমরাবতী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি দেশের প্রাচীন শিল্পীদের সহোদর, তাহাদের পরম্পরের সংস্কার-সূত্র ছিন্ন হয় নাই। এই শিল্পীদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যাইতে পারে। সেখানে রমণীদের দেহের উত্তরার্দ্ধ অনাচ্ছাদিত—পূত মাতৃস্তন অনাবৃত। পুরুষের দেহেও পোষাক অতি অল্প, যখন কোন বিদেশীকে আকিতে হইবে, তখন চিত্রকর তাহাকে পোষাক-পরিচ্ছদে আড়ম্বর-পূর্ণ করিয়া প্রদর্শন করেন। অজন্তার প্রসিদ্ধ চিত্র ‘পুলকেশীর দরবারে বিদেশী রাজদূত’এর প্রতি দৃষ্টি করুন, পুলকেশী ও বিদেশী রাজদূতের পরিচ্ছদের বৈষম্য সহজেই ধরা পড়ে। ময়ূরভঞ্জের একটি প্রস্তর-ফলকে বহু রমণী নানা ভঙ্গীতে উৎকীর্ণ হইয়াছে ; প্রত্যেকের দেহের উত্তরার্দ্ধ অনাবৃত। ২০০ বৎসর পূর্বে নির্মিত ফরিদপুরের একখানি কাঠে-গড়া মাতৃমূর্তির ছবি দেওয়া হইয়াছে, ফটোগ্রাফে ছবিখানি একেবারেই ভাল উৎরাই নাই, আদত মূর্তি অতি সুন্দর,—জননীর একটি স্তন শিশু আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, অঙ্কটি অপর হস্তে খুঁটিতেছে। এখনও বাঙ্গলার কুমারেরা কোন কোন স্থানে এইরূপ মাতৃমূর্তি নির্মাণ করে, কিন্তু নব-কচির আয়ুগত্যা করিয়া বস্ত্রের ষটাটা একটু বেশী করে; আমার নিকট বহু রমণীমূর্তি আছে, তাহাদের বক্ষ অনাবৃত, কিন্তু তাহাতে আদৌ শীলতার অভাবের কোনও ইঙ্গিত নাই।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, চিত্রের জীবন্ত ভাব ও গতির দ্রুততা। এখানে বাঙ্গালী চিত্রকর ও ভাস্কর শ্রেষ্ঠতম সাফল্য দেখাইতেন। ২৫০ বৎসর পূর্বের একখানি কাঠ-সিংহাসনের কতকগুলি মূর্তি আমার নিকট আছে, তাহা প্রায় ধ্বংসের মুখে, তাহাতে গাভীগুলির গতির দ্রুততা যে ভাবে দেখান হইয়াছে তাহা অতি আশ্চর্য্য। শ্রীযুক্ত পার্সি ব্রাউন এবং ফ্রেন্স সাহেব এই কাঠ-ফলকের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। ফ্রেন্স সাহেব এই ফলকখানি লইয়া প্রায় একমাস রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এখানকার কোন ফটোগ্রাফার সেই নষ্ট-প্রায় কাঠ-ফলকের যথাযথ প্রতিলিপি তুলিতে পারেন নাই, এজন্য শেষে উহা ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। অখারোহীর একখানি চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা ৭০০ বৎসর পূর্বে পোড়া ইটের উপর উৎকীর্ণ মূর্তি হইতে গৃহীত। অখারোহীর চিত্রটি অনেকাংশে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু কি অদ্ভুত গতিশীলতা অথের প্রতি আছে খেলিতেছে! হরিণের কি শঙ্কটাপন্ন অবস্থা—একদিকে ঘোড়ার বজ্র-কামড়, অপর দিকে তাহার হুই পাখের মধ্যে পড়িয়া হরিণের উৎকট যুগ্ম-রূপ। কুকুরটির দেহের প্রায় সবটুকু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তথাপি শুধু অবশিষ্ট কয়েকটি রেখায়

তাহার নৃশংস ধাবন-ক্রান্ততা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু মূলের এই অংশ ছবিতে যথাযথভাবে উঠে নাই।

বাস্তালী চিত্রকরের মনোভাব-জ্ঞাপনের শক্তি অসামান্য, পটুয়ার তুলি এই বিষয়ে এত পটু যে তাহার গড়া মূর্তি ও ছবি যেন কথা কহে। কালীঘাট-চিত্রাবলীতে স্বামিন্দ্রীর ছবিটি লক্ষ্য করুন। (এ সম্বন্ধে ৪৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) যতগুলি ভঙ্গীতে পটুয়া রমণীমূর্তি আঁকিয়াছে, তাহার সবগুলিই সুস্পষ্ট, কোন জটিল রেখাপাতে ছবিগুলি ত্রুটো হইয়া নাই।

জয়পুরী চিত্রের সঙ্গে বাস্তালী পটুয়ার পার্থক্য সহজেই ধরা পড়িবে। বাস্তালী পটুয়া অনেক সময়ে বড়-মাহুঘদের মন জোগাইয়া দেব-দেবীর ছবি আঁকিয়াছে। ১০০ বৎসর পূর্বে লিখিত একখানি জয়দেবের গীত-গোবিন্দ চুঁচুড়ার শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ মণ্ডলের বাড়ীতে আছে, উহার প্রত্যেক পত্রে বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত আছে। চিত্রগুলি গ্রাম্য এক আচার্য্য-চিত্রকরের অঙ্কিত এবং অনেকাংশে খাঁটি বাস্তালী ছবি। কোথাও কৃষ্ণ রাধার পা ধরিয়া সাধিতেছেন; কোথাও কৃষ্ণ রাধার পদতলে পতিত, রাধা হাতে ধরিয়া আদরে কৃষ্ণকে তুলিতেছেন; কোথাও রাধাকৃষ্ণ আলিঙ্গনবদ্ধ, কিংবা গাঢ় অহুরাগে পরস্পরের বিদ্যাবধ চুম্বন করিতেছেন। বঙ্গের বাহিরে এই ঘনিষ্ঠতা বিরল। জয়দেবের সময় হইতে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের এই গূঢ় মিলন-রহস্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। চৈতন্তের সময় হইতে সমস্ত বাঁধ একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে,—আরাধ্য ও আরাধকের মধ্যে কে বড় কে ছোট তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে, এবং প্রেমের বস্তায় জগদীশ্বর ও ক্ষুদ্র জীব এক পঙ্ক্তিতে স্থান লইয়াছেন—কূপ ও সমুদ্র এক হইয়া গিয়াছে। ভক্তিভগবতে ভক্তি ও প্রেমের এই উদ্দাম-লীলা-চঞ্চল চিত্র আর কোন প্রদেশের তুলিতে উঠিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। জয়পুরী রাধা আঁচল ও পোবাকের গোরবে ডগমগ হইয়া কৃষ্ণের বাম দিকে যেন অকুচিকর অকায়দা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া কতকটা সরিয়া দাড়াইয়াছেন; কৃষ্ণ নানা বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া মকর-মুখ স্বর্ণমণ্ডিত বাণী বাজাইতেছেন—কাহাকে ডাকিতেছেন, তিনিই জানেন।

কবি রামপ্রসাদ সেন ও তাঁহার পত্নীর যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমি হালিসহর-বাসী শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম. এ. মহাশয়ের নিকট পাইয়াছি। একখানি স্বর্ণ-খচিত সমুজ্জ্বল চণ্ডীমূর্তির দুই পার্শ্বে ভক্তিমান ও ভক্তিমতীর ছবি দুইটি দেওয়া হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, এই ছবি যখন অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পূর্বে রামপ্রসাদ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তখন হালিসহর অঞ্চলটা রামপ্রসাদের স্মৃতিময়, যে পটুয়া ছবি আঁকিয়াছিল, তাহার বাড়ী হালিসহর কুমার-পাড়া, এই স্থানটি রাম-প্রসাদের গৃহ ও ‘পঞ্চমুণ্ডা’ হইতে অর্ধ মাইল দূরে, এক পাড়া বলিলেই হয়। গোপেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীও এক মাইলের মধ্যে এবং তাহারই পূর্বপুরুষ ছবি আঁকাইয়াছিলেন। সেখানকার লোকের মুখে শুনিয়াছি উক্ত পার্শ্চর ভক্তদ্বয়ের ছবি রামপ্রসাদ ও তাঁহার স্ত্রীর অনুরূপ। এখন যেমন কালীমূর্তি আঁকিতে যাইয়া অনেক সময়ে পরমহংস দেবের ছবিও তৎপার্শ্বে আঁকা হয়, রামপ্রসাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাহার প্রতিবেশী

পটুয়া যে ভক্ত আঁকিতে যাইয়া রামপ্রসাদ ও তাঁহার পত্নীর ছবি আঁকিবে, তাহাও তেমনই স্বাভাবিক। রামপ্রসাদের পত্নী কালিকা-দেবীর দর্শন পাইয়াছিলেন, একথা কবি স্বয়ং বলিয়াছেন। রামপ্রসাদকে বাহারা চক্ষে দেখিয়াছিলেন, জীবনী-লেখক অতুলবাবু তাহাদের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন—“রামপ্রসাদের বাবরি চুল ছিল, উজ্জল গৌরবর্ণ ছিলেন, গলায় ফটিক মিশানো রক্তাক-মালা ছিল, অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন।” (অতুল মুখোপাধ্যায়-কৃত রাম-প্রসাদের জীবন, ২৫৪ পৃঃ।) দাড়ী ছিল না বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু লোকের দাড়ী কখনও থাকে, কখনও থাকে না, অত্যাশ্চর্য্য বিবরে এই বর্ণনার সঙ্গে চিত্রের খুব সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

এইখানে গ্রাম্য-শিল্প পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা সন্দেহ হই একটা কথা বলিব। বঙ্গের পল্লীতে ১২ মাসে ১৩ পার্বণ হইত, ঠাকুরের সিংহাসন ও শ্রীবিগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া রথ পর্য্যন্ত নানা শিল্পখচিত দ্রব্য নির্মাণের জন্ত শত শত হস্তধর, দাতু ও প্রস্তর-শিল্পী ও চিত্রকরেরা বৎসর ভরিয়া বঙ্গদেশে খাটিত; প্রধান প্রধান নগরে উহা সমারোহ ব্যাপার ছিল। প্রায় প্রত্যেক বিশিষ্ট গ্রামেই রথ টানা হইত, ঢাকার তাঁতি-বাজার ও শাঁখারী-বাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জন্মাষ্টমীর যে মিছিল বাহির করিত, তাহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইত। মোড়শ শতাব্দীতে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ দুর্গোৎসব উপলক্ষে সেই সময়ের সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। বঙ্গের প্রত্যেক নগরীতে বড় বড় রথ তৈরী হইত। বাউলি, আন্দুল, ধামরাই, মহিষাদল, বাশবেড়িয়া, মহেশ প্রভৃতি শত শত গ্রামে যে সকল অপূর্ব কারুকার্য্যময় অঙ্ক-ভঙ্গ কিংবা কথকিৎ পরিচালনা-যোগ্য রথ পড়িয়া আছে, তাহাদের প্রত্যেকটির জন্ত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ধনাঢ্যদের মধ্যে এই পূজা-পার্বণোপলক্ষে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। শত বৎসর পূর্বেও সংবাদ-ভাস্কর, প্রভাকর প্রভৃতি পত্রিকা কোন্ বাড়ীর পূজা ও সমারোহ কিরূপ হইল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত করিয়া এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইন্ধন যোগাইত। বড় বড় নগরে কতদিক দিয়া যে উৎসবের সাড়া পড়িয়া যাইত, তাহার অবধি নাই; ছোট ছোট গ্রামেও এই সময়ে সাধ্যানুসারে ব্যয় করিতেন। এই সকল উপলক্ষে বার মাস কামার, কুমার, ছুতার, ‘বিদ্যা-বাজীকর’, মুলওয়ালী, মালী, ঢাকী, সানাইবাদক, ঢুলী, জেলেডিল্লি ও বড় ডিল্লির মাঝি, তাঁতী প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীর লোকই আনন্দের সঙ্গে গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জন করিত। আমরা উৎসবগুলির মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছি। ধর্ম্মই এদেশে শিল্পীকে জীবিত রাখিয়াছিল, এখন পূজার মন্দির ও দালান ধ্বসিয়া পড়িয়াছে; শিল্পীদের দাড়াইবার জায়গা কোথায়? প্রত্যেক ধর্ম্মেরই উৎসব আছে, পুরাতন উৎসবগুলি যুগোপযোগী বিবেচিত না হইলে তৎসঙ্গে নূতন উৎসব প্রবর্তিত হউক। বাঙ্গলা দেশে সার্বজনীন দুর্গোৎসবে শিল্পীদের কিছু কিছু অঙ্গসংস্থান হইতেছে। ধর্ম্মভিন্ন অল্প কোন প্রেরণা এ দেশকে জাগাইতে পারিবে না। যন্ত্রজাত শিল্পের সঙ্গে নিতান্ত অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফেলিয়া দিলে গ্রাম্যশিল্প ভাসিয়া যাইবে। শিল্প—

ভক্তি ও প্রেম—এই দুই দেবতার সঙ্গী। ভক্তি গিয়াছে, পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে এখন প্রেমের স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াই চলিতেছে, এদেশে স্বর্ণকারের আর দরকার নাই, রমণীরা অলঙ্কার চান না। ভারতবর্ষের এই দুই দেবতার আসন উলিয়াছে, কাহার বাহু আশ্রয় করিয়া শির দাঁড়াইবে? গান্ধীজীকে (আমি তাঁহার ক্ষুদ্র ভক্ত) শ্রবণ করাইয়া দিতেছি যে ধর্ম বাদ দিয়া শিল্পকে তিনি বাচাইতে পারিবেন না। ধর্ম শুধু আত্মায় নহে, মন্দিরে তাহার বেদী নির্মাণ করিতে হইবে, তবেই শিল্প রক্ষা পাইবে। জাপানী-বস্ত্রের, স্বর্ণ-মুলা সোনার গিটী সেপ্টপিন বা ক্রচ পরিলে দেশী শিল্প কেমন করিয়া মাথা তুলিবে? ৫৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণগণের পৈতা প্রাচীন কালে সর্বদা অপরিহার্য ছিল না। বজ্রোপবীত বজ্রের সময়েই ধারণ করার বিধি ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, বালীদীপে যখন হিন্দুর উপনিবেশ হয়, তখন সেই প্রাচীন রীতিই প্রচলিত ছিল, এবং এখন পর্যন্ত সেই প্রাচীন রীতি সে দেশে পণ্ডিত-সমাজে বিদ্যমান। ভূপর্গাটক শ্রীযুক্ত রমানাথ বিশ্বাসের প্রবন্ধে লিখিত আছে “পণ্ডিতকে (বালীদীপের) দ্বিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার পৈতা কোথায়? তিনি উত্তর করিলেন—‘আমরা শুধু পূজা অর্চনার সময়ে উহা ব্যবহার করিয়া থাকি, অন্য সময়ে নহে’” (প্রবর্তক, কাস্তিক, ১৩৪১, বাং সন, ৪০ পৃঃ)।

ভূপর্গাটক মহাশয় বালীদীপের অধিবাসীদের গৃহ-নির্মাণ-পদ্ধতি-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “বলিদের (বালীদীপ-বাসীদের) গৃহ-নির্মাণ-পদ্ধতি ঠিক বাঙ্গালীর মত। সাত-সমুদ্র পার হইয়া কিরূপে আমাদের গৃহ-নির্মাণপ্রথা ওরা অবলম্বন করিয়াছে, তাহার ঠিক সিদ্ধান্তে এখনও আসিতে পারি নাই।” দূরদূরান্তরে বাঙ্গালীরা যে তাহাদের ধর্ম, শিকা-দীক্ষা ও রীতিনীতি লইয়া গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, সে কথা বিশ্বাস মহাশয় জানেন না, অন্ততঃ পালরাজত্বের ইতিহাস ভাল করিয়া পড়িলে তিনি এবিষয়টা কতক জানিতে পারিতেন, কিন্তু এখনও সে ইতিহাস-লেখার সময় আসে নাই। এখন ইতিহাস-লক্ষী ঈষৎ হারোল্ডাটন-পূর্বক বাঙ্গালীর সেই কীর্তি-কাহিনীর আভাস দেখাইতেছেন। ডক্টর ষ্টেলা ক্র্যামরিশ আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন : “The great importance of East Indian Art and Architecture within India itself is but one of its aspects. The other, equally important, shows the art and architecture of this province as the prime source of Indian influence in further India and Indonesia. The indigenous and original character of Bengal art has become known mainly in its paintings (*pata* and book-covers) and but recently also in its sculpture (Paharpur. Seventh Century). Its connection and leading rôle in image-making with the rest of Aryabarta is amply illustrated by the sculptures of the Pal and Sen age at that place. It influenced the further East, and Paharpur must be considered as the most convincing monument preserved; unmistakably it proves that the temples of Khmer-

greatness are unthinkable without this prototype.” [ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের মহৎ স্থাপত্য ও শিল্পপ্রভাব ভারতের চতুঃসীমার মধ্যে অতীব গুরুতর ; কিন্তু এই প্রভাব স্থানান্তরেও বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে । পূর্ব-ভারতের এই প্রভাব স্বদূর পূর্বে— ভারতীয় দ্বীপসমূহেও সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হইয়াছে । বাঙ্গলার শিল্প চিত্র-বিস্তার (পট ও পুঁথির মলাটের ছবি প্রভৃতিতে) মধ্যেই স্বীয় মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য বেশী দেখাইয়াছে ; ইদানীং স্থাপত্য-শিল্পেও (পাহাড়পুর, সপ্তম শতাব্দী) তাহা প্রচুর পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । পাল ও সেন-রাজত্বের মূর্তি-নিৰ্ম্মাণের আদর্শের সঙ্গে সমস্ত আধ্যাত্মিকের সম্বন্ধ ও বাঙ্গলার শিল্পের প্রাধান্ত বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে ; পাহাড়পুরের শিল্প ও স্থাপত্যের আদর্শ পূর্বভারতের দ্বীপ-পুঞ্জ অকাটাভাবে প্রমাণিত । খ্মের (Khmer) মন্দির সমূহের মহৎ স্থাপত্য শিল্পের আদি খুঁজিতে গেলে আমাদের পাহাড়পুরের আদর্শ স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই ।]

পরিশিষ্টাংশের প্রাদেশিক রাজ্যগুলির ইতিহাসের প্রতি আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । এইসকল ইতিহাসে দৃষ্ট হইবে, প্রজারা মেববৎ নিরীহ এবং রাজভক্ত ছিল না ।

অনেক সময়ে ইহারা রাজাদের হননকারী ও ভাগ্য-বিধাতা ছিল ।

প্রজাপতি ।

প্রজাদের অসন্তোষে ত্রিপুর-রাজ প্রতাপমণিক্য (১৪৩৩ খৃঃ), জয়মণিক্য (১৪৯৬ খৃঃ), অহংরাজ সুহেন কা (১৪৯৩ খৃঃ), সুজিন কা (১৬২৭ খৃঃ), ভগ্যরাজা (হুরান কা) ১৬৪৪ খৃঃ অব্দে এবং লক্ষণসিংহ ১৭৮০ খৃঃ অব্দে নিহত হন । পাঠক মনে করিবেন না, প্রাদেশিক রাজগণের মধ্যে পূর্বোক্ত রাজগণই মাত্র স্বীয় বিদ্রোহী প্রজা ও সৈন্তের হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন, আমরা বাহ্যভাবে এই তালিকা বাড়াইলাম না । পাঠক ইতিহাস খুঁজিলে এই হতভাগ্যদের দলে আরও অনেক রাজা পাইবেন ।

প্রজারা কিছুতেই অত্যাচার সহ করে নাই । রাজার বংশধর না থাকিলে রাজোচিত গুণের পরিচয় পাইয়া ইহারা রাজা নির্বাচিত করিয়াছে ।

প্রজা-কর্তৃক রাজ-

নির্বাচন ।

যে যে স্থানে তাহারা রাজাকে হত্যা করিয়াছে, পরবর্তী রাজাকেও তাহারাই মনোনয়ন করিয়াছে । ত্রিপুর-রাজ যশোমণিক্যের পরে রাজবংশের কেহ উত্তরাধিকারী ছিল না ;—“রাজ পুত্র পৌত্র নাহি, নাহি রাজ-ভ্রাতা । কাহাকে করিব রাজা জানিয়া সর্বথা ॥ সেনাপতি মন্ত্রিগণ চিন্তিয়া তখন । কাহাকে করিব রাজা না দেখে লক্ষণ ॥ মহামণিক্য-বংশে কল্যাণ নাম খ্যাতি । যশোধর-কালে কৈলাগড়ে সেনাপতি ॥ করেছে অনেক যুদ্ধ সেই মতিমান । সেই রাজযোগ্য হয় দেখে বিজ্ঞান ॥ এসব চিন্তিয়া সেনা-পাত্র-মন্ত্রগণ । কল্যাণ নাম সেনাপতি বসে সিংহাসন ॥” এই ব্যক্তিও পালবংশীয় গোপালের ছায়াই নানা যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাইয়া স্বীয় রাজযোগ্য গুণাবলীর পরিচয়-প্রদানান্তর প্রজাদের কর্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন । কিন্তু ইনিই একমাত্র প্রজানির্বাচিত রাজা ছিলেন না । দ্বিতীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে প্রাগজ্যোতিষপুরের মহারাজ ধর্মপালও এইভাবে প্রজাদের মনোনয়নে রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । আসামের বৈষ্ণবদের দ্বারা

লক্ষীসিংহ মহারাজ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে নিহত হইলে, বৈষ্ণবেরা মোয়ামারির বড় গোস্থানীর পুত্র বনাগণকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বনাগণের পিতা পুত্রকে সাংসারিক প্রতিষ্ঠার লোভী হইতে দেন নাই। এই সকল প্রাদেশিক ইতিহাস হইতে জানা বাইতেছে, আমাদের জনসাধারণের রাজনৈতিক জ্ঞান যথেষ্ট ছিল এবং তাহারা তাহাদের ইষ্টানিষ্ট বুঝিয়া রাষ্ট্রব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত ছিল। এদেশের জনসাধারণ অবজ্ঞার বোগ্য নহে। ইহারা অজগরের মত এক ঋতুতে ঘুমায় এবং এক ঋতুতে জাগে।

শাক্ত ও বৈষ্ণবের ঘৃণা যে কি ভীষণ, তাহা আসামে দেখুপ দৃষ্ট হয়, বৃহৎ বাঙ্গালার অল্প কোন প্রদেশে সেদৃশ দেখা যায় নাই। চৈতন্য-চরিতামৃত দেখা যায়, নবদ্বীপে শ্রীবাসের বাড়ীতে কোন লোক চন্দন ও সিন্দুরলিপ্ত বিধপত্র ও শাক্ত ও বৈষ্ণবের ঘৃণা।

চণ্ডীপূজার ফুল রাখিয়া গিয়াছিল, এজন্য বৈষ্ণবদের সে কি ক্রোধ! এই অপরাধে সেই ব্যক্তি নাকি কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়াছিল! নরোত্তম-বিলাসে দৃষ্ট হয়, শাক্তেরা বৈষ্ণব-গুরু নরোত্তমের মৃত্যু হইলে, তাহার শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাততালি দিয়া ঠাট্টা করিতে করিতে গিয়াছিল (নরোত্তম-বিলাস দ্রষ্টব্য)। বৈষ্ণবেরা কালীর নাম করিত না, এজন্য দোষাতের কালিকে ‘সেহাই’ বলিত। শক্তিপূজার উপকরণের নাম করিতে নাই, এজন্য জবা পুষ্পকে “ওড় ফুল” বলিত, “কাটা” কথা তাহাদের অভিধানে নিষিদ্ধ, এজন্য তরকারী কোটাকে “বানান” বলিত।

কিন্তু আসামের শাক্ত-বৈষ্ণবের ঘৃণার কাছে উহা কিছুই নহে। হুর্গাপ্রতিমাকে প্রণাম না করাতে শঙ্কর-শিষ্য নারায়ণের দক্ষিণ হস্ত রাজা নরনারায়ণের আদেশে ভূতোরা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, এবং এই নারায়ণ দাস ও অপর শিষ্য গোকুল দাসের উপর রাজার আদেশ হইল, ইহাতেও যদি তাহারা দেবীকে প্রণাম না করেন, তবে তাহারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। এইরূপ ভীষণ অত্যাচারের ফলে নিরীহ বৈষ্ণবেরা শেষে মরিয়া হইয়া শিখদের মত বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহারা জপমালা ফেলিয়া দিয়া খজা-হস্ত হইয়া রাজা লক্ষীসিংহকে হত্যা করিয়াছিলেন (১৭৮০ খৃঃ), আসামে বৈষ্ণববাহিনী হুর্দ্ব হইয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন।

এই সকল প্রাদেশিক ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পূর্বোক্ত পার্শ্ব-অঞ্চলে হিন্দুধর্ম বিরূপ দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হইয়া দেশগুলি আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল। যদিও ত্রিপুরার

পার্শ্ব প্রদেশে হিন্দুধর্ম-বিস্তার। রাজারা স্বলোচনের (যুদ্ধিরের সমসাময়িক বলিয়া কথিত) সময় হইতে চতুর্দশ দেবতার উপাসক, তথাপি ক্রমশঃ হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি

রাজা ও প্রজাদের অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় চতুর্দশ দেবতার পুরোহিত চম্ভাইদের প্রভাব হইতেও তাহাদের দেশে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের প্রতি অন্ধা বেশী হইয়াছিল। বিজয়মণিক্য প্রভৃতি ত্রিপুরেশ্বরগণ নিম্নবঙ্গে অবতরণ-পূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য স্বর্ণ ও ভূমি দান করিয়াছিলেন,—“সহস্র স্বর্ণধ্বজ আরোপিতা ভূপে। উৎসর্গিয়া দিল ধ্বজ ব্রাহ্মণ-সমীপে ॥ উৎসর্গ স্বর্ণবত ব্রাহ্মণেরা লুটে। বিজয়মণিক্য-কীর্তি হৈল ধ্বজ-ঘাটে ॥

• • • সেই পঞ্চদ্রোণ ভূমি ব্রাহ্মণকে দিল। সেই হনে পঞ্চদ্রোণ গ্রাম-নাম হৈল।” (রাজমালা।) ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরেশ্বর কলাগমাণিকা তাঁহার প্রাসাদে তুলান উপলক্ষে বৃন্দাবন, মথুরা ও সেতুবন্ধ হইতে ৫০,০০০ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। অমরমাণিক্যের রাজ-সভার সর্বদা ২০০ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত উপস্থিত থাকিয়া সেই সভা শাস্ত্রালোচনা দ্বারা মুখরিত করিতেন (রাজমালা।) কোচরাজ প্রাণনারায়ণ (১৬২৫-৬৫ খৃঃ) “ব্যাকরণ, স্মৃতি ও সাহিত্যে অদ্বিতীয় কৃত-কবি ও প্রতিদ্বন্দ্বিত ছিলেন।” কথিত আছে, তাঁহার প্রাসাদে দ্বারী ও ভূতারা পর্য্যন্ত সংস্কৃত কথ্য বলিত। অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধরমাণিকা (১৬১১-২৩ খৃঃ) সর্বপ্রথম গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করেন, তদবধি খোল ও করতালের কল-বনে ত্রিপুরার পার্শ্বত্যাগ রাজ্য মুখরিত হইয়া আসিতেছে। ঊর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে মহারাজ বীর-চন্দ্রমাণিকা যে সকল বৈষ্ণব-পদ রচনা করিয়াছিলেন সেগুলি লালিত্য ও ভাব-গৌরবে বৈষ্ণব মহাজনগণের বোধ্য। রাজধরমাণিক্যের সময়ে আটজন কীর্তনোদ্যোগ দিনরাত্রি অবিরাম রাজ-প্রাসাদে কীর্তন গাহিত (রাজমালা)।

এই সকল রাজাদের বংশলতায় দেখা যায়, ইহারা ক্রমশঃ অনার্য উপাধি ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ সংস্কৃতায়ক নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আসামের রাজা রুদ্রসিংহ এক্ষণে গৌড়া হিন্দু হইয়াছিলেন যে, তিনি গঙ্গার খানিকটা অংশ পাইবার লোভে প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল-বাদসাহের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। এই রুদ্রসিংহকে (রাজত্বকাল ১৬৮৬-১৭১৪ খৃঃ) অহম্ম-রাজাদের চিরাগত সমাধি-রীতির পরিবর্তে শ্মশানে দাহ করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে রাজা এই আদেশ করিয়াছিলেন।

খাস বাঙ্গলা দেশে সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বৈষ্ণব বাঙ্গলা-ভাষার প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং শাস্ত্র-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদকারীদিগকে অভিসম্পাত করিতেন—উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজাদের আশ্রিত ব্রাহ্মণেরা ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ করিতেন। বাঙ্গলার ব্রাহ্মণেরা এতকাল জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতের প্রচারের দ্বার আগলাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব-পাহাড়-বেষ্টিত রাজ্যগুলিতে এই প্রতিকূল সাম্য-বিরোধী হাওয়া বহিবার অবকাশ পায় নাই। কোচবেহারের রাজা নরনারায়ণ (১৫৫৪-৮৭ খৃঃ) অনন্ত কন্দলী নামক প্রসিদ্ধ কবিদ্বারা রামায়ণ ও ভাগবতের অনুবাদ প্রণয়ন করাইয়াছিলেন। নোয়াখালি অঞ্চলের রাজা জয়চন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্বিজ ভবানী কর্তৃক রামায়ণের ভাব-অনুবাদ সংকলিত করাইয়াছিলেন। কবি জানাইয়াছেন, এই কার্যের জন্ত তিনি রাজার নিকট (সেই সময়ে যখন টাকার মূল্য অনেক বেশী ছিল) প্রতিদিন দশ টাকা হিসাবে দক্ষিণা পাইতেন।

ত্রিপুরার রাজাদের অনেকেই মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়া বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগ।

ছিলেন, রাজমালায় তাহার উল্লেখ আছে। ধর্মমাণিকা (১৪৬৩-১৫১৫ খৃঃ) অনেক সংস্কৃত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ সংকলন করাইয়াছিলেন, তৎপত্নী বিহবী কমলাদেবীরও এ বিষয়ে গুরু উৎসাহ ছিল। “শ্রীধর্মমাণিকা রাজা কমলার পতি। উৎকলখণ্ড পাঁচালী রচাইল মহামতি॥ জ্যোতিষের বাজী-রত্নাকর-নিধি আর। পাঁচালী

রচাইল রাজা লোকে বুদ্ধিবার।” ধর্মমাণিক্য রামকবি দ্বারা প্রেত-চতুর্দশীর বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এই পুস্তকখানি তাহার বিশেষ প্রিয় ছিল (১০২৯ পৃঃ)। প্রাচীন কালের কোন ত্রিপুরেশ্বরের আদেশে রচিত বৃহন্নারদীয় পুরাণের বঙ্গানুবাদ আমার নিকট ছিল। বোধ হয় এই পুস্তক এক সময়ে আগরতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, বেহেতু মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য এই পুস্তকে স্বহস্তে আমার নাম লিখিয়া একখানি উপহার দিয়াছিলেন। অষ্টশতাব্দী পূর্বে মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য ভাগবতাদি বৈষ্ণবশাস্ত্র-প্রকাশের জন্ত বহরম-পুরের রামনারায়ণ বিজ্ঞানত্নকে এক লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। অহম-রাজ সুদর্পনারায়ণ ১৭০৮ খৃঃ অব্দে রাজ-মাতা চন্দ্রপ্রভার আদেশে নারদীয় পুরাণের আর একখানি অনুবাদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই তালিকা বাড়াইবার দরকার নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক বুদ্ধিতে পারিবেন, বিগত ৪৫ শত বৎসর বাবৎ প্রাদেশিক রাজাদের প্রায় প্রত্যেকে বলিলেও অত্যাতি হইবে না, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দ্বারা সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ সঞ্চলন করাইয়াছিলেন। সাধারণ গৃহস্থেরা পর্যন্ত বঙ্গভাষা ও শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদে মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেন।*

দেখা যাইতেছে, শুধু ত্রিপুরা, ত্রিহট্ট, আসাম, কাছাড়, কোচবেহার নহে—গৌড়ীয় ভাষার শ্রীসাধন-কল্পে আরাকান প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্য সীমান্তেও বাঙ্গলা ভাষা আদৃত হইয়াছিল। লোর চন্দ্রানীর লেখক দৌলত কাজী এবং পদ্মাবতীর লেখক সৈয়দ আলোয়াল প্রভৃতি কবিরা আরাকান-রাজকর্মচারীদের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া বঙ্গভাষায় কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটি খাঁ—হিন্দু কবিদ্বয়ের দ্বারা মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ইহার হসেন সাহা ও তৎপুত্র নসরত সাহার প্রতিনিধিস্বরূপ চট্টগ্রামে থাকিয়া ত্রিপুরেশ্বরের বিকক্ষে বুদ্ধিবিগ্রহাদি চালাইতেন। স্বয়ং নসরত সাহা পূর্বোক্ত কবিদ্বয়ের পূর্বে অপর কোন পণ্ডিতের দ্বারা একখানি অনুবাদ রচনা করাইয়াছিলেন। (“শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান। রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিদান।” বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১১৬ পৃঃ।) মুসলমান সম্রাটের আদেশে গুণরাজ খাঁ ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্দের অনুবাদ শেষ করেন (১৪৭০-৮০ খৃঃ)। মাতৃভাষার প্রতি অমুরাগে হিন্দু মুসলমানে প্রভেদ ছিল না, ধর্ম ভিন্ন হউক, কিন্তু মাতৃভাষা এক ছিল; একদিকে লোহিত্য নদী, আরাকান ও নিতাই লগতাক্ হ্রদের পার্শ্ববর্তী মণিপুর—অপরদিকে ঢাকা ও পদ্মাবতীর পূর্ববঙ্গের পল্লীসমূহ অবধি সমস্ত পূর্ববঙ্গ বঙ্গভাষার আদর করিয়াছে। আমরা পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি

* নিম্নলিখিত বিবরণ-পাঠে জানা যায় জনৈক ব্রাহ্মণ (অনন্তরাম শর্মা) বাঙ্গলা মহাভারতের একখানি নকল প্রস্তুত করিয়া আজীবন সংসার-নির্ভরতার বায় ও তাহা ছাড়া বিস্তর দক্ষিণা গোবিন্দরাম রায় নামক গৃহস্থের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন (১৭১৪ খৃঃ)। “এই অষ্টাদশ ভারত পুস্তক শ্রীগোবিন্দরাম রায়ের, একোন পত্র অঙ্ক সাত শত ঊননব্বই সমাপ্ত হইয়াছে। স্ব অক্ষরমিৎ শ্রীঅনন্তরাম শর্মাঃ ইহার দক্ষিণা জ্ঞাবধি সামান্ততা ক্রমে অল্প-বস্ত্রে প্রতিপাল্য হইয়া সন্তোষ হইয়া পুস্তক লিখিয়া দিলাম। নগর দক্ষিণাহ পাইলাম তারপর রোগাক্রম বৎসর ব্যাপিয়া পাইবার আজ্ঞা হইল। শুভমঙ্গল শকাব্দ ১৬৩৬।” বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৩৯ পৃঃ।

পূর্ববঙ্গই বঙ্গভাষার গৌরবের আদি-লীলাভূমি; মহাপ্রভু নিজে পূর্ববঙ্গবাসী হইয়াও পশ্চিম-বঙ্গে যে ভগবদ্ভক্তির তরঙ্গ তুলিয়াছিলেন, তাহাতে শেষে সমস্ত বঙ্গ, বিশেষ করিয়া পশ্চিম-বঙ্গ, ভাসিয়া গিয়াছিল, তদবধি বঙ্গভাষা-চর্চার কেন্দ্র পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছে। আমার মনে হয়, বৌদ্ধাধিকারের শেষের দিকে রাজ-দ্বারে বঙ্গভাষা সম্মানিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেন-রাজাদের সময়ে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে জনসাধারণকে সম্পূর্ণরূপে অপাণ্ডিত্যে করিয়া বঙ্গভাষা দ্বারা শিক্ষা-বিস্তারের পথ নিরোধ করা হইয়াছিল! কিন্তু সেন-রাজাদের অধিকার-বহির্ভূত পূর্বোক্ত দেশগুলিতে বঙ্গভাষা রাজদ্বারেও আদৃত ছিল—এই ভাষা ঐ সকল দেশের কোন কোন স্থানে গৌরব-জনক “সুভাষা” নামে পরিচিত ছিল (১০১৬ পৃঃ)।

আমরা গ্রন্থভাগে ডোম-সৈন্তের উল্লেখ করিয়াছি। ত্রিপুরাদিপ দত্তমানিক্যের সময়ে (সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে) তাহার সেনাদলের মধ্যে হাড়ি-সৈন্ত অতি চর্ছা ছিল।

হাড়ি ও ডোম সৈন্ত।

খাসিয়াদের সঙ্গে যুদ্ধকালে হাড়ি-সেনাপতিদের ভয়ে খাসিয়া-রাজ রণক্ষেত্রে না বাইয়া ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রয় স্বীকার করিয়া সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। “দ্বাদশ হাজার হাড়ি হাতে কোদাল লৈয়া। হাড়িয়া ডগর বাগ্গ চলে বাজাইয়া।.....উত্তরের হাড়ি চলে আগে লৈয়া বানা। বঙ্গদেশী হাড়ি সব মধ্যে থাকে থানা। দক্ষিণ দিগের হাড়ি চট্টগ্রাম আদি। তার সেনা মাঝে চলে মহাশঙ্ক বাদি। ডেমস ডগর বাজে নাচে উর্দ্ধ হাতে। শূকর-খেদান লাঠি পাকাইয়া মাথে।” ডোম-সেনাপতি কালুর যে বিদ্রোহের বীরত্বের বর্ণনা ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়, তাহার অনেকখানি করুণা-মূলক। কিন্তু রাজমালায় উল্লিখিত হাড়ি-সৈন্তের কথা নিছক ঐতিহাসিক সত্য। আজ আমরা হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতিকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়া তাহাদিগকে ‘ছি! ছি!’ করিয়া গৃহ-প্রদ্রাব হইতে তাড়াইয়া দিতেছি—আমাদের সমাজের ইহাৱাই এককালে ভিত্তি রক্ষা করিতে বাইয়া অকাতরে প্রাণ দিয়াছে। এই অকৃতজ্ঞ সমাজের প্রতি বিরূপ হইয়া যদি তাহারা এখন প্রতিশোধ লয়, তবে আমরা কি বলিতে পারি? ক্ষুদ্রতম কীটও জন্মে জন্মে পদ-দলিত হইয়া শেষে সর্পে পরিণত হয়। ক্ষুদ্রের মধ্যেও অনন্ত শক্তির বীজ লুকাইয়া আছে, আমরা আপনার লোকদিগকে পর করিয়া দিয়া জাতীয় শক্তির কতটা হানি করিতেছি, তাহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

উত্তরবঙ্গের উপাত্ত-ভাগে পার্শ্বত্যা পল্লীতে হেবজের যে মূর্তি পাওয়া গিয়াছে এবং যাহার ক্ষুদ্র প্রতিলিপি ত্রীমুক্ত পুরণচাঁদ নাহারের অন্তর্গত আমরা এই পুস্তকে দিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে যুগলের বড় আদর্শ ভারতীয় শিল্পে আমরা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। হেবজের কাষ্ঠ ও শস্তর-নির্মিত অনেকগুলি মূর্তি আমরা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে দেখিয়াছি,

হেবজ।

কিন্তু নাহার মহাশয়ের সংগৃহীত মূর্তিটিই সর্বোত্তম। বাহিরের আত্যন্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে পুংচিহ্নের মুখে যে অনবচ্ছিন্ন আনন্দ কুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কামগন্ধ নাই, তাহা অনাবিল ধ্যান-লোকের আধ্যাত্মিক আনন্দ। বৈষ্ণবদের চিত্রশালায় যে আনন্দ এখনও অনাগত, চিত্রকরকে

তাহা আঁকিতে হইলে এই চিত্রের জড় অংশ বাদ দিয়া বিস্তৃত প্রেমের অংশটুকু আদর্শ করিলে ভাল হয়।

বৌদ্ধ-ধর্মকে আনন্দ-হীনের ধর্ম বলিয়া প্রচার করাতে এক শ্রেণীর বৌদ্ধ আপত্তি করিয়াছেন। মাধ্যমিক মহাযান-বাদীরা কয়েক শত বৎসর পূর্বে হইতে বৌদ্ধ-ধর্মকে উপনিষদের গা বেঁধিয়া দাড় করাইতে চেষ্টিত; “নির্দ্বন্দ্ব”কে তাহারা যে ভাবে ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে উহা কতকটা “ভাব-সমাধি”রই মত হইয়া দাড়ায়। নিরীশ্বর বৌদ্ধ-ধর্মে বুদ্ধই কালক্রমে ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করিলেন; জাপানের হরিউজি মন্দিরে রক্ষিত “সঙ্কর্ম-পুওরীক” গ্রন্থে বুদ্ধকে স্বয়ম্ সৃষ্টিকর্তা বলিয়া পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই

আনন্দ-হীনের ধর্ম।

ভাবে বৌদ্ধ-ধর্মে উপাত্ত ও উপাসকের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে ভক্তি-ধর্মের প্রথমোক্তম সূচিত হইয়াছে। বৌদ্ধ-তত্ত্বে আদি-বুদ্ধ-আদি-প্রজ্ঞার সঙ্গে এবং বজ্রসম্ব শক্তির সঙ্গে যুক্ত হইয়া তন্মোক্ত হরগৌরীর যুগলমূর্তি সংবলিত শৈবধর্মের,—তথা তান্ত্রিক শাক্ত ধর্মের গোড়া পত্তন করিয়াছিল। শুধু ইহাই নহে, ধর্মপালের সময়ে (অষ্টম-নবম শতাব্দী) “মহাস্থববাদ মাথা তুলিয়া দাড়ায়, বুদ্ধ যে আনন্দ-স্বরূপ এই মতবাদ তাহা প্রকাশ করে। বাঙ্গালী টঙ্কদাস হেবজতন্ত্রের টীকা লিখেন। এই ‘মহাস্থববাদ’ হইতেই বজ্রযান ও কালচক্রযানের মতাদি উদ্ভূত হয়।” (বামিনীকান্ত সেন—‘দেশ’, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৪১ সন, ৮৬ পৃঃ।)

বুদ্ধদেবের স্থঃখবাদে ক্লান্ত হইয়া, ভারতীয় বৌদ্ধ-ধর্ম এই ভাবে ক্রমে ক্রমে উপনিষদের দিকে অগ্রসর হইতে ছিল। কালচক্রযান ও বজ্রযানে যে ভক্তিবাদ সূচিত, শৈবধর্মে ও বৈষ্ণবধর্মে তাহার পরিণতি, এতদ্ব্যতীত ডাঃ কার্ন (Dr. Kern) লিখিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম হইতে এদেশে ভক্তিবাদের উৎপত্তি।

এইভাবে ভারতীয় বৌদ্ধগণ এক যুগে উপনিষদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এতৎ-সঙ্গেও বলিতে হইবে, এই আনন্দ ও স্থঃখবাদ বুদ্ধদেবের আদর্শ হইতে অনেকটা উল্টা পথ ধরিয়াছিল।

বৌদ্ধ-ধর্মে তপস্তার জন্ত অতিরিক্ত শারীরিক কষ্ট-সাধনের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে (১১৬ পৃঃ)। এ সম্বন্ধে মহাভারতের নির্দেশ বহুপূর্বেই প্রচারিত হইয়াছিল, “অহিংসা, সত্য, অনৃশংসতা ও দয়াই যথার্থ তপস্তা, কেবল শরীর-শাসন করিলেই তপস্তা হয় না” (মহাভারত, শাস্তি, ৭২ অঃ)।

আমরা এই পুস্তকের ৭১, ৮৮ এবং ৮৯ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি, বঙ্গদেশ হইতে এক সময় লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ স্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক আধ্যাবর্তের নানা স্থানে ও দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ পাল-রাজগণ তাহাদের রাজত্বের আদি কালটায় বড়ই গোঁড়া ছিলেন, ইহাদের উৎপীড়নেই গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা দেশ-ত্যাগী হইয়া সমস্ত পূর্বভারতকে হিন্দু-গণ্ডীর বহির্ভূত বলিয়া শাসন প্রচার্য করিয়াছিলেন। সম্ভ্রতি যে সকল তাম্র-পট আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্বারা নবম-দশম শতাব্দীতে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের বিদেশে বিদ্যুত অভিযানের প্রমাণ

দৃষ্টান্ত হইয়াছে। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা (Vol. XXI, p. 260) প্রকাশিত কোলাগালুর [মাদ্রাজ এবং দক্ষিণ রেলওয়ের গুণ্টাখালির হুগলি (Hugli)-অঞ্চলের] অনুশাসনে দৃষ্ট হয়, রাষ্ট্রকুটরাজ খোজিগু ৮৮৯ শকে (৯৫৭ খৃঃ অব্দে) গদাধর নামক গোড়াগত ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিতেছেন। এই ব্রাহ্মণকে “বারেন্দ্র ঞ্জোতকারিণা” বিশেষণ দ্বারা বারেন্দ্র শ্রেণীভুক্ত বলিয়া জানা যাইতেছে। ইনি “বিদ্বান্-গোড়চূড়ামণিগুণী” এবং ইহার জন্মস্থান ‘তাড়া’ (Tada) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এক্ষণ আরও তাম্র-পট পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে এদেশের ব্রাহ্মণগণের ভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থচিত হইয়াছে। এই ভাবে বঙ্গের ব্রাহ্মণগণ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, শূরবংশীয় রাজার যজ্ঞের জন্য ভিন্ন দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করার দরকার হইয়াছিল। তাগা ও গোড় ব্রাহ্মণদের বিদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপনের সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত প্রবাদ আছে (Indian Antiquary, Vol. LX, PIT)। এই পত্রিকার (Vol. XII, pp. 248-51) রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের, সাঙ্গলী প্লেটে দৃষ্ট হয়, উক্ত রাজা কেশব দীক্ষিত নামক এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে লোহাগ্রাম নামক পল্লী দান করিয়াছিলেন। এই দানপত্রের কাল ৮৫৫ শকাব্দ (৯৩৩ খৃঃ)। কেশব দীক্ষিতের পিতার বাড়ী ছিল পৌণ্ড্রবর্ধনে। তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণে অকাটা ভাবে এই কথা সমর্থিত হইয়াছে যে গোড়ীয় ব্রাহ্মণেরা পালরাজাদের সময়ে দেশ-ত্যাগী হইয়া অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধাদি দেশের প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছিলেন।

গুজরাটে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত অল্প একটা দিক্ দিয়াও আমরা নির্দেশ করিতে পারি। আমাদের অনুমান হয় যে গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণেরা আদিকালে বাঙ্গালী ছিলেন। রমাপ্রসাদ চন্দ, ডি. আর. ভাণ্ডারকার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বাঙ্গালার বহুসংখ্যক লোক গুজরাট ব্রাহ্মণদের স্বগণ। ইণ্ডিয়ান হিষ্টোরিক্যাল কোয়ার্টারলির (১৯৩০ খৃঃ) এক সংখ্যায় ভাস্করবর্ধনের তাম্রশাসন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত নাগর ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশে ছিলেন। প্রবন্ধ-লেখক বলিতেছেন, “We made an attempt to prove by means of epigraphic and other evidences that Nagar Brahmins existed in Bengal so far back as the 5th century”. অধ্যাপক ভাণ্ডারকার ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়ারীতে (১৯১১, ৪১-৭২ পৃষ্ঠা) প্রমাণ করিয়াছেন যে, নাগর ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালার নানা জাতির সঙ্গে খিচুড়ী পাকাইয়া গিয়াছেন। ভারতীয় সেন্সাস রিপোর্টেও (1931, Vol. Pt. I, Chap. XII, Para. 543, ৪৭১-৭২ পৃষ্ঠা) এই উক্তি মানিয়া লওয়া হইয়াছে। মালদহে নাগর শ্রেণীর চাষারা ‘কৃষ্ণ উরা’ ও ‘প্রিষ্ণ উরা’ এই দুই নামে প্রসিদ্ধ (ইহার সাধারণতঃ কানাই এবং পলসা এই দুই নামে অভিহিত হইয়া থাকে)। আশ্চর্যের বিষয়, গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণের মধ্যেও কৃষ্ণ উরা ও প্রিষ্ণ উরা এই দুই শ্রেণী আছে। এই ভাবের নানা প্রমাণ Indian Culture, Vol. I, No. 3 সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে।

ইতিপূর্বে প্রবন্ধ-লেখকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নাগর ব্রাহ্মণেরা গুজরাট হইতে

বাঙ্গলা দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক বিপরীত, বাঙ্গলা হইতেই নাগর ব্রাহ্মণেরা গুজরাটে গিয়াছিলেন।

আমরা ৭১ পৃষ্ঠায় প্রমাণ করিয়াছি, বাঙ্গলা দেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ গুজরাটে গিয়াছিলেন। এই নাগর ব্রাহ্মণেরাও সম্ভবতঃ সেই দলের। সূর ও গুপ্ত রাজগণের সময় নাগর ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গলায় ছিলেন—খৃষ্টীয় পঞ্চ শতাব্দী পর্য্যন্ত। তারপর তাঁহারা বৌদ্ধ পালরাজগণের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ দেশত্যাগী হইয়া গুজরাট এবং অন্যান্য প্রদেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হন। তখন বঙ্গদেশ অভিশপ্ত দেশে পরিণত হয়। তখন যে সকল নাগর ব্রাহ্মণ স্বদেশে ছিলেন, তাঁহারা বৌদ্ধাচারী হইয়া পতিত হন। এজন্য তাঁহারা নানা শ্রেণীতে মিশিয়া গিয়া কোথাও কায়স্থ কোথাও সংচাৰী প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হন। বিগত সেন্দ্বাসে দৃষ্ট হয়, একমাত্র মালদহে ১৪,৩৪৬ জন নাগর শ্রেণীর লোক আছে, বৃহৎ বঙ্গে এই নাগরদের সংখ্যা অনেক বেশী। আশ্চর্যের বিষয় তাঁহাদের এক শ্রেণীর নাম “ভাটনাগর”। গুজরাটেও “ভট্টনাগর” নামক এক শ্রেণীর নাগর ব্রাহ্মণ আছেন, হিন্দু-রাজত্বকালে খৃঃ পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহারা বাঙ্গলা দেশে সংব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা পরে এত অধোগতি পাইলেন কিরূপে? এই সকল কারণে মনে হয় বাঙ্গলা হইতে গুজরাটে যাইয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা গোঁড়ামীর একটা বড় কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন, এদিকে পাল অধিকারে তাঁহারা অনাচারী ও পতিত হইয়া বাঙ্গলা দেশে নিম্নতর জাতির সঙ্গে মিশিয়া গেলেন।

নাগর ব্রাহ্মণগণের আদি বাস বাঙ্গলা বলিয়াই মনে হয়। এই অনুমান যদি সর্ব্ববাদি-সম্মত নাও হয়, তথাপি পালদের সময় যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার বিবিধ অকাটা প্রমাণ নানা প্রদেশ হইতে পাওয়া যাইতেছে।

Indian Museumএর আরকিওলজিকাল শাখার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কে. এন. দীক্ষিত মহাশয় তাঁহার অধুনাতন রিপোর্ট হইতে নিম্নলিখিত স্থানটি এই পুস্তকে উদ্ধৃত করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। বাক্পতি মুঞ্জের নবওয়াল তাম্রপত্র বিষয়ক প্রবন্ধ হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল, ইহা নবম-দশম শতাব্দীর।

“এই তাম্রশাসনগুলির প্রধান গুরুত্ব এই যে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সেই কালে ব্রাহ্মণগণ মালবে আসিয়া পরমার রাজকুমার হইতে ভূমি দান পাইয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত ইহাতে পাওয়া যাইতেছে। কতকগুলি স্থলে দেখা যায়, দূর বাঙ্গলা প্রদেশের অনেক ব্রাহ্মণ মালবে উপনিবিষ্ট হইয়া এইভাবে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। এতদ্বারা মনে হয়, এই যুগে বাঙ্গলা দেশ বেদ-বিজ্ঞার একটা কেন্দ্র ছিল। দেখা যায়, দক্ষিণ-রাঢ়াস্তর্গত বিষ্ণুগঙ্গা নামক গ্রামবাসী দোনক নামক এক ব্রাহ্মণ ৭৮টি অংশের মধ্যে একাই ৫টি অংশ দান পাইয়াছিলেন। আর একজন ব্রাহ্মণ কোলকবাসী ছিলেন, এই কোলক এবং গোলক,—দান-প্রাপক কয়েক জন ব্রাহ্মণের আদি-ভূমি; ইহারা আসাম, উত্তর-বিহার এবং উড়িষ্যা অঞ্চলে ভূমি লাভ করিয়াছিলেন। আমি অনুমান করি, কোলক—উত্তর-বঙ্গের বগুড়া জেলার তন্নামে অভিহিত গ্রাম। সাবধিদেশ নামে আর একটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস,

এই সাবধি অথবা সাবধিকা কতক পরিমাণে বগুড়াকেই বুঝায়। ইন্দ্রপাল নামক আসামের এক রাজার এক প্রশস্তিতে এই 'সাবধি'র উল্লেখ আছে—এই স্থানটি প্রাবস্তিরই অপভ্রংশ। ইন্দ্রপালের প্রশস্তিতে এই স্থানের মধ্যে বাইগ্রামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। একটি তাম্রশাসন সম্প্রতি বাইগ্রাম হইতে আবিষ্কৃত হওয়াতে এই স্থান-নির্দেশ সম্বন্ধে আর কোন দ্বিধাই নাই, বগুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিমে বাইগ্রাম এখনও অবস্থিত। বগুড়ার উত্তরাংশের অনেকটা স্থান যে সাবধি বা সাবধিকা দেশ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই তাম্রপটের 'দারদুরিকা' এবং 'মিতলি-পাডকা'—বর্তমান 'দাদ্রা' (পঞ্চবিধি ধানার অন্তর্গত) এবং 'মিতাই' বা 'মিতাল-পাড়া' বলিয়া মনে হয়। উভয় গ্রামই বগুড়া জেলায়। মালব-রাজ হইতে ভূমি-দান-প্রাপ্ত বাদ্বালী ব্রাহ্মণদের অধিকাংশই সামবেদী, ছানোগ্য-শাখাভুক্ত। বাদ্বালী দেশেই সামবেদী সম্প্রদায় বেনী, হুতরাং উপরি উক্ত সম্প্রদায়-নির্দেশে বাসস্থানের ইঙ্গিত বিশেষ করিয়া পাওয়া বাইতেছে।” *

এই পুস্তকখানি প্রথমতঃ ম্যাকমিলান কোম্পানী প্রকাশ করিবেন বলিয়া স্থির ছিল,—বিলাত হইতে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে সে চুক্তি ভাঙ্গিয়া গেল। বর্তমান ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্রীমতীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পুস্তকখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়া আমার ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। এই ব্যাপারে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বর্তমান রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত

* “The most important information contained in these plates is regarding the migration of Brahmins from various parts of the country to Malwa where they were recipients of donations at the hands of Paramara prince. In several instances the donees seem to have migrated all the way from Bengal which thus appears as a country where Brahmins studying different Vedas were flourishing. Thus we find a Brahmin named Donaka hailing from village Vilvagabasa falling within the Southern Radha country who recieved so many as five shares. Another person is said to have migrated from Kulancha which in the form of Golancha and Kroḍancha occurs as the original place of Brahmins who recieved grants in Assam, North Bihar and Orissa. I propose to identify this with Kulancha in Bogra District of North Bengal; another locality mentioned in these plates is Sāvathikā which is surely a tract more or less corresponding to Bogra District in Bengal. An inscription of Indra Pāla, a king of Assam, refers to this Sāvathi which is apparently the same as Sravasti and mentions the presence of a place called Vaigram in it. The identity of the latter has now been completely established by the find of a copper plate of the Gupta period at Vaigram which is at the North-west corner of the Bogra District in which a place is mentioned as Vāyigrām. There can be no doubt that the Sāvathi or the Sāvathi desa included the northern part of Bogra District. In the present case the two villages in the tract are Dardurika and Mitilapāthaka which it is possible to identify with Dādrā in Panchbibi Thana of the Bogra District and Mitail or Matialpara, both of which are in the Bogra District. A large majority of the Brahmins mentioned in these places from Bengal just referred to are stated to have belonged to the Chhandogo Sakha of the Sama Veda which is significant in view of the preponderance of the adherents of this Veda among the Brahmins of Bengal.”

যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও প্রেস-কমিটির সদস্য শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। পুস্তকখানির কাগজ ও ছাপার বন্দোবস্ত বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে হইয়াছে। কিন্তু ছবি-সংগ্রহ এবং ব্রক-প্রস্তুত করিবার বিপুল ব্যয়ের অধিকাংশ আমাকে বহন করিতে হইয়াছে। পুস্তক সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আমি নিম্নলিখিত মহোদয়গণের সহায়তা পাইয়াছি :—সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, প্রেস-সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক, শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, বঙ্গবর শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, খজাপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ স্বতীতীর্থ প্রভৃতি। শ্রীশ্রীযুক্ত ত্রিপুরেশ্বরের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রেসের কর্মচারী শ্রীযুক্ত রাইচরণ দাস অনুগ্রহ করিয়া সূচিপত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। আরকিওলজিকাল ডিপার্টমেন্ট আমাকে তাহাদের কতকগুলি ছবি ছাপাইবার অনুমতি দিয়া বাধিত করিয়াছেন। সেই সকল ছবি আমি • চিত্রিত করিয়া দিলাম। ইহাদের সর্বস্বত্বের মালিক ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের আরকিওলজিকাল শাখা। অর্থাভাবে আমার বিদ্যুত চিত্রশালায় রক্ষিত চিত্রগুলির প্রতিলিপি আমি প্রচুর পরিমাণে দিতে পারি নাই। ব্রকগুলি সস্তাদরে করিতে বাধা হওয়ায় সেগুলি অনেক সময় মনের মত হয় নাই। ফরিদপুর হইতে ছই শত বৎসরের প্রাচীন মাতৃমূর্তিটি অতীব সুন্দর, কিন্তু ব্রকটি একেবারেই তেমন হয় নাই। মেদিনীপুর হইতে শ্রুতিনাথবাবু আমায় যে মাহুরখানি দিয়াছেন, তাহা বি. এন. আর. পাঁশকুড়া স্টেশনের চার মাইল পূর্বে অবস্থিত রঘুনাথবাড়ীর জনৈক কারিগর কর্তৃক নির্মিত। দুঃখের বিষয়, এই মাহুরের কাঠগুলি যেরূপ ভাবে সুন্দর ফাঁপ হুজুরের মত তৈরী করিয়া নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে, তাহা ব্রকটিতে আদৌ উঠে নাই। আমার সংগৃহীত কাণ্ডগুলির মধ্যে মাত্র ১২খানির কিছু কিছু নমুনা দিয়াছি। বাহারী শিল্প-সংগ্রহে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদের নিকট আমি ঋণী, তন্মধ্যে শ্রীহট্ট জেলা-স্কুলের সুরযোগ্য হেড পণ্ডিত মহাশয়ের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও আমি মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছি, তথাপি কবি জসীমুদ্দিন কাণ্ড-সংগ্রহে আমাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। বঙ্গবাসী স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরীর নিকট আমি নানা বিষয়ে ঋণী। আমার শিল্প-সংগ্রহে শ্রীশ্রীযুক্ত ত্রিপুরেশ্বর মাণিক্য বাহাছরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে এই ভূমিকার প্রথমমাংশে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিদ্যুত ইতিহাস ও তৎসংক্রান্ত চিত্রাদি সম্বন্ধে আমি বাহাদের সহায়তা লাভ করিয়াছি, তাহাদের অনেকেরই নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না—তজ্জন্ত আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ত্রিপুরা স্টেট ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে এই পুস্তক মুদ্রিত করিবার জন্য কয়েকখানি ব্রক পাওয়া গিয়াছে। তজ্জন্ত ইহাদের কর্তৃপক্ষের নিকটে আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অনুক্রমণিকা

প্রথম অধ্যায় ১-৮৯ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—আম্বুগঙ্গপ্রদেশ—১-৫ পৃঃ।

গঙ্গার মহিমা ও তাহার কারণ—২ পৃঃ, আম্বুগঙ্গ প্রদেশে আৰ্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠা—৪ পৃঃ, দূরে অবস্থিত হিন্দুদিগকে ঘন ঘন গঙ্গাতীরে আহ্বান—৪ পৃঃ, অপরাপর নদ-নদীর সঙ্গে গঙ্গার পার্থক্য—৪-৫ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—বৃহৎ বঙ্গে বৌদ্ধ ইতিহাসের বিলোপ—৫-১১ পৃঃ।

প্রাচ্য ভারতে আৰ্য্য-নিবাস—৫ পৃঃ, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিঘ্বে পূর্বভারত নিগৃহীত—৬ পৃঃ, প্রাচীন ইতিহাস-বিলোপের কারণ—৭ পৃঃ, বুদ্ধমূর্তিকে হিন্দু দেবতারূপে পূজা—৯ পৃঃ, বৌদ্ধ ও জৈনদিগের প্রতি অত্যাচার—৯ পৃঃ, সঙ্কর্মীর দলন—১০-১১ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,—প্রাচ্যভারতের গৌরব—১১-২২ পৃঃ।

বঙ্গদেশের রাষ্ট্রীয় সীমার অনিশ্চয়তা—১২ পৃঃ, প্রাগৈতিহাসিক যুগে দ্বাদশ বঙ্গ—১২-১৫ পৃঃ, বৃহৎ বঙ্গের সীমা—১৫-১৬ পৃঃ, বাঙ্গলা ভাষার প্রসার—১৭-১৯ পৃঃ, শিক্ষা-দীক্ষার সীমা—১৯ পৃঃ, একটি ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে কতগুলি মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—১৯ পৃঃ, জগতের ইতিহাসে বাঙ্গলার স্থান—২০-২২ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,—ঐতিহাসিক যুগের পূর্বব্যাখ্যায়—২২-৩০ পৃঃ।

অঙ্গ-গৌরব কর্ণ—২৩-২৪ পৃঃ, মগধ-গৌরব জরাসন্ধ—২৪-২৫ পৃঃ, জরাসন্ধের পরাক্রম—২৫-২৬ পৃঃ, অস্তি ও প্রাপ্তি—২৬ পৃঃ, বঙ্গগৌরব পৌণ্ড্র বাহুদেব—২৮ পৃঃ, কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ ও মৃত্যু—২৯ পৃঃ, প্রাগজ্যোতিষপুরের (আসামের) অধিপতি নরক—২৯ পৃঃ, বৃহৎ বঙ্গের অপরাপর রাজগণ—৩০ পৃঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ,—মণিপুর, চেদি ও ত্রিপুরা সম্বন্ধে এদেশের দাবী—৩১-৩৯ পৃঃ।

“নিতাইলেক্ পাক্”—৩১ পৃঃ, প্রবাদের মূল্য—৩২ পৃঃ, চেদি কোথায় ?—৩২-৩৪ পৃঃ, চাষা-নাগরী—৩৪ পৃঃ, ভীমের পূর্বমুখী যাত্রা—৩৫ পৃঃ, গওক ও পুলিন্দ—৩৫ পৃঃ, নিম্নস্তরে প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ রক্ষা—৩৫ পৃঃ, ত্রিপুর দেশে ক্রম—৩৬-৩৭ পৃঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ,—কৃষ্ণ-বিদ্যে—৪০-৪৬ পৃঃ ।

শৈব প্রভাব—৪০-৪১ পৃঃ, জরাসন্ধের ক্ষাত্রনীতি—৪১-৪২ পৃঃ, তাহার অপূর্ণ সংযম—৪২ পৃঃ, সর্পপ্রধান অভিযোগ ও তাহার উত্তর—৪৩ পৃঃ, ক্ষাত্র শক্তির বিলোপ—৪৩-৪৪ পৃঃ, জৈন প্রভাব—৪৪-৪৬ পৃঃ, উপগরগুলি নিছক গর নহে—৪৬ পৃঃ, বারংবার ধর্ম-মতের পরিবর্তন—৪৬ পৃঃ ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ,—নবব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম—৪৭-৫৪ পৃঃ ।

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, মহাভারতের প্রমাণ—৪৭ পৃঃ, ব্রাহ্মণ 'অগ্নিশিখা' ও 'একমাত্র উপাত্ত'—৪৭ পৃঃ, ব্রাহ্মণেরা দেবতাকে উপদেবতা ও উপদেবতাকে দেবতা করিতে পারেন—৪৮ পৃঃ, খাড়াখাণ্ডের বিচার—৪৯ পৃঃ, দ্বীলোকের পক্ষে বৃক্ষ, চন্দ্র, সূর্য্য দেখা নিষিদ্ধ ; তাহাদের সম্বন্ধে অপবাদ—৪৯-৫২ পৃঃ, সর্পপ্রধান বিদ্রোহী চৈতন্য—৫২ পৃঃ, তাহার প্রতি আক্রোশ—৫২-৫৩ পৃঃ ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ,—বিজয় কর্তৃক লঙ্কা-অধিকার—৫৪-৮৯ পৃঃ ।

সিংহবাহুর রাজধানী সিংহপুরের ভৌগোলিক সংস্থান—৫৫-৫৮ পৃঃ, নগ্নগদীপ ও মহিলাদ্বীপ—৫৯-৬২ পৃঃ, নিশঙ্ক মল্লের শিলালিপি ৬৩ পৃঃ, শঙ্ক-সাদৃশ্য—৬৫-৬৮ পৃঃ, অজন্তাগুহার সিংহল-বিজয়ের চিত্রাবলী, গোড় ব্রাহ্মণ—৭১-৭২ পৃঃ, (মহাবংশের ষষ্ঠাধ্যায়ে বিজয়ের সিংহলে আগমন—৭২-৭৫ পৃঃ), রাজকুমারীর পিত্রালয়ত্যাগ—সিংহের সহিত মিলন—মাতা ও ভগিনী-সহ সিংহবাহুর পলায়ন—বঙ্গের উপকণ্ঠে সিংহবাহু কর্তৃক পিতৃবধ—বঙ্গ ছাড়িয়া রাঢ়ে রাজধানী-স্থাপন—বিজয়-চরিত্র—লঙ্কায় আগমন—৭২-৭৫ পৃঃ, (মহাবংশের সপ্তমাধ্যায়ে বিজয়ের সিংহল-বিজয়—৭৬-৮২ পৃঃ), বিজয়ের যক্ষ-রাজ্য অধিকার—যক্ষী শয্যা-সঙ্গিনী—যক্ষ-বিজয়—নূতন নূতন নগর-স্থাপন—যক্ষীর মৃত্যু ও পুত্রকন্ডার কথা—৭৬-৮২ পৃঃ, (মহাবংশের অষ্টমাধ্যায়ে পাণ্ডুবাসুদেবের রাজ্যাভিষেক—৮২ পৃঃ), বিজয় কর্তৃক স্বীয় ভ্রাতাকে আমন্ত্রণ—পাণ্ডুবাসুদেব—৮২ পৃঃ, (সিংহলী কথার উপসংহার—৮৩-৮৯ পৃঃ), সিংহল-বিজয় বাঙ্গলার অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা—৮৩-৮৯ পৃঃ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ৯০-১১৮ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—ঐতিহাসিক যুগ, বুদ্ধদেব—৯০-১১৮ পৃঃ ।

জাতকের গল্পকথা—তপস্বীর মহৎ আত্মোৎসর্গ—"এই তিনটি মৃতকর জীবের কি কোনই উপকার করিতে পারি না"—মহেন্দ্র সেন ও জীব শর্ম্মা—প্রাণ-হত্যাকারী ও প্রাণ-দাতা কাহার দাবী বেশী ?—প্রথমবার পুরী দর্শন—দ্বিতীয়বার দর্শন—তৃতীয়বারে সাধু-দর্শন—মার-বিজয়—বুদ্ধ-প্রাপ্তি—সজ্জ—সারিপুত্রের অভিমান—বুদ্ধের উপদেশ—সামান্যফলস্বত্ত—৯০-১০৫ পৃঃ—"ডিভাইনা কমেডিয়া"তে বুদ্ধের উল্লেখ—১১৭ পৃঃ—মার্কো পোলো (১১৭-১৮ পৃঃ) ।

তৃতীয় অধ্যায় ১১৯-৫২ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—আর্য্য ও অনার্য্য সংমিশ্রণ—১১৯-২৫ পৃঃ।

যবন, স্কেচ্ছ, শক প্রভৃতি জাতির আর্য্য-সমাজে প্রবেশ—পণিজাতি—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও জন-মত—রক্তশুদ্ধি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—রামায়ণ, সন্ন্যাসধর্মের প্রতিবাদ—১২৫-২৮ পৃঃ।

ভিক্ষুধর্মের প্রতি পিতামাতার আতঙ্ক—ভিক্ষুধর্মের বিরুদ্ধবাদ গার্হস্থ্য আদর্শ—রামায়ণী নীতি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,—জৈনধর্ম—১২৮-৩৬ পৃঃ।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের পার্থক্য—২৪ জন তীর্থঙ্করের বিবরণ—১৩৩-৩৪ পৃঃ, জৈন শাস্ত্র ও সাহিত্য—১৩৫ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,—ভারতেতিহাসের ধারাবাহিকত্ব—১৩৬-৪০ পৃঃ।

মহাভারতের সময়-নির্ণয় এবং যুগের আদিকথা—পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অদ্বুত অদ্বুত মত—বংশলতা—মহাভারতের সময়—১৪০ পৃঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ,—নন্দবংশ, আলেকজান্ডারের অভিযান—১৪১-৪৭ পৃঃ।

মহাপদ্ম-নন্দ দ্বিতীয় ভার্গব—মন্ত্রী সকাতলের প্রতিহিংসা—চাণক্যের অপমান ও প্রতিহিংসা—বংশাবলী ও সময়-নির্দেশ—১৪৩ পৃঃ, চন্দ্রগুপ্তের সৈন্তবল—মেগাস্থিনিসের বিজ্ঞান-সম্বন্ধ বর্ণনা—আলেকজান্ডার ও চণ্ডী-কথিত উপাখ্যান—১৪৭ পৃঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ,—চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য—১৪৮-৫২ পৃঃ।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র—১৪৮ পৃঃ, মুদ্রারাক্ষসের চাণক্য—১৪৮-৫০ পৃঃ, বাঙ্গলাদেশের সঙ্গে চাণক্যের সম্বন্ধ—১৫০ পৃঃ, চন্দ্রগুপ্তের জীবনী (৩২২-২৯৮ খৃঃ পূঃ)—১৫১ পৃঃ, প্রারোপবেশনে মৃত্যু—১৫১ পৃঃ।

চতুর্থ অধ্যায় ১৫৩-৭৩ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—বিন্দুসার ও অশোক—১৫৩-৫৫ পৃঃ।

বিন্দুসার (২৯৮-২৭৩ খৃঃ পূঃ)—অশোক (২৭৩-২৩২ খৃঃ পূঃ)—১৫৩ পৃঃ, দিব্যাবদানের ও মহাবংশের বংশলতায় অনৈক্য—১৫৪ পৃঃ, অনৈক্যের কারণ—১৫৫ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—অশোক সম্বন্ধে অপবাদ—১৫৫-৫৮ পৃঃ।

ভ্রাতৃহত্যা—১৫৫ পৃঃ, পাঁচশত অমাত্যের শিরশ্ছেদ—১৫৬ পৃঃ, পুরমহিলাদিগকে দাহ—১৫৬ পৃঃ, নরক—চণ্ডাশোক-ধর্ম্মাশোক—১৫৬ পৃঃ, উপগুপ্ত—১৫৭ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,—অশোক-নীতি—১৫৮-৬৪ পৃঃ।

মহাভারত-প্রসঙ্গ—১৫৮ পৃঃ, প্রামাণিকতা—১৫৮-৬০ পৃঃ, মহাভারতাদির নীতি এবং অশোক-নীতি—১৬০ পৃঃ, রাজনীতি ধর্মনীতি নহে—১৬১ পৃঃ, রামায়ণী নীতি ও কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র—১৬১ পৃঃ, হিন্দু রাষ্ট্র-নীতি—১৬২ পৃঃ, গ্রীক-নীতি—১৬২-৬৩ পৃঃ। হিন্দু রাষ্ট্র-নীতি উদার হইলেও দোষযুক্ত—১৬৩ পৃঃ, চাণক্য-নীতি—বাণভট্টের নিন্দা—১৬৩-৬৪ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,—অশোক-অনুশাসন—১৬৫-৭৩ পৃঃ।

“সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশু-ঘাতং”—১৬৫-৬৬ পৃঃ, পরধর্মনিন্দা নিষিদ্ধ—১৬৭ পৃঃ, মৃগয়ার পরিবর্তে লোকহিতার্থে অভিযান—১৬৮ পৃঃ, দণ্ডিতের প্রতি দয়া—১৬৯ পৃঃ, রাজ-গৃহ বিচারের জন্ত সর্বদা মুক্ত—১৬৯ পৃঃ, শিলালেখ ও স্তম্ভগুলির স্থান-নির্দেশ—১৭০-৭১ পৃঃ, মহেন্দ্র—১৭১ পৃঃ, অশোকের দান—১৭২ পৃঃ, বিখ্যাত ত্রয়োদশ অনুশাসনে অশোকের অনুতাপ—১৭৩ পৃঃ।

পঞ্চম অধ্যায় ১৭৪-৯২ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—মৌর্য, স্থল ও কাণ বংশ—১৭৪-৭৬ পৃঃ।

মগধের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বাঙ্গালী—মগধের সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ—১৭৫-৭৬ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—গ্রীস এবং হিন্দুস্থানের পরস্পরের প্রভাব—১৭৬-৮৩ পৃঃ।

গ্রীক-প্রভাব—১৭৮ পৃঃ, অশোক ও রাজী তিস্যরক্ষিতা—১৮০ পৃঃ, অশোকের বংশ-ধরগণ—১৮১ পৃঃ, মৌর্য রাজত্ব (৩২৫-১৮৫ খৃঃ পূঃ)—১৮২-৮৩ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,—মৌর্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ—১৮৩-৮৫ পৃঃ।

ব্রাহ্মণের একাধিপত্যের বিলোপ—পশুবধযুক্ত হোম নিষেধ, ব্যবহার ও দণ্ডের সাম্য—১৮৪ পৃঃ, অশোকের বংশধরগণের অক্ষমতা—১৮৫ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,—ক্ষাত্র-শক্তির পুনরুদ্যম—১৮৫-৮৭ পৃঃ।

ক্ষাত্র শক্তির বিলয়—১৮৬ পৃঃ, অম্বিকুল—১৮৬-৮৭ পৃঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ,—স্থল বংশ—১৮৭-৯২ পৃঃ।

স্থলবংশ (১৮৫-৬৩ খৃঃ পূঃ)—১৮৮ পৃঃ, পুষ্যমিত্রের বৌদ্ধদলন—১৮৮ পৃঃ, স্থল বংশীয় শেষ রাজার অপমৃত্যু—১৯০ পৃঃ, কাষ ও অকুবংশ—১৯০ পৃঃ, ইক্ষাকুবংশ—১৯১ পৃঃ, শিশুনাগবংশ—১৯১ পৃঃ, মৌর্যবংশ—১৯১ পৃঃ, স্থলবংশ—১৯১ পৃঃ, অকুবংশ—১৯১ পৃঃ, রঘুবংশ—১৯১ পৃঃ, পৌরবংশ—১৯২ পৃঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ১৯৩-২০১ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—শৈব ধর্মের বিবর্তন, শিব বনাম বুদ্ধ—১৯৩-৯৮ পৃঃ।

ধ্বংসের আনন্দ—১৯৩ পৃঃ, রক্ত তাণ্ডব—১৯৩-৯৪ পৃঃ, ঢাকার পাগল—১৯৪ পৃঃ, অনাসক্ত-শ্রুতি—১৯৪ পৃঃ, শিব ও বুদ্ধ—১৯৫ পৃঃ, বুদ্ধ এখন শিবের মতই, অনেকাংশে কল্পনাজড়িত—১৯৫-৯৬ পৃঃ, সাদৃশ্য—১৯৬ পৃঃ, বুদ্ধ ও শিবের আদর্শ-সাম্য,—১৯৭-৯৮ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—শৈব ধর্মের অভিনব দান—১৯৮-২০১ পৃঃ।

তিনটি গুণ—১৯৮ পৃঃ, আনন্দ—১৯৮ পৃঃ, শৈবধর্ম বঙ্গীয় বৈষ্ণব-মুগের অগ্রদূত—১৯৯-২০১ পৃঃ।

সপ্তম অধ্যায় ২০২-২৬ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—অক্র ও শক-নৃপতিগণ এবং ধর্ম-প্রতিযোগিতা—২০২-০৬ পৃঃ।

পূর্ববর্তী বঙ্গীয় রাজগণ—২০২-০৬ পৃঃ, অক্রপ্রাধান্য (৬৩ খৃঃ পূঃ-২২৫ খৃঃ)—২০২ পৃঃ, শকগণের অভ্যুদয়—২০৩ পৃঃ, কণিক, হবিক প্রভৃতি—২০৩ পৃঃ, ভারতীয় ধর্ম ও উপাধি-গ্রহণ—২০৪ পৃঃ, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয়—২০৫ পৃঃ, ব্রাহ্মণ কে? তিন যুগে তিন রূপ ব্যাখ্যা—২০৫ পৃঃ, পূর্ব ভারতে শৈব ধর্মের প্রাধান্য—২০৬ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—গুপ্তগণের অভ্যুদয়—২০৬-১৭ পৃঃ।

চন্দ্র বর্মা (৪র্থ শতাব্দী)—২০৬ পৃঃ, লিচ্ছবি ও গুপ্তবংশ—২০৭ পৃঃ, শ্রীগুপ্ত ও ঘটোৎকচগুপ্ত—২০৭ পৃঃ, 'মহারাজাধিরাজ' 'পরমভট্টারক' চন্দ্রগুপ্ত—২০৮ পৃঃ, তৎপুত্র রাজর্ষি দ্বিতীয়চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য—২০৮ পৃঃ, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাকবি কিনা?—২০৯ পৃঃ, বজ্রিশ সিংহাসনে ত্যাগ ও দানের মাহাত্ম্য—২০৯ পৃঃ, ব্রাহ্মণকে দানের পুণ্য—২১০ পৃঃ, বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তের পরাক্রম—২১১ পৃঃ, এদেশে গুপ্তবংশের স্মৃতি বিলুপ্ত—২১১ পৃঃ, সমুদ্রগুপ্তের বিজয়-কথা—২১১ পৃঃ, হত-বন্দী—পরাজিত—২১২ পৃঃ, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের আয়তন—২১৩ পৃঃ, বীণাবাদক সমুদ্রগুপ্ত—২১৪ পৃঃ, স্বন্দগুপ্তের বিপদ—২১৫ পৃঃ, ছন্দগুপ্তের আক্রমণ—২১৬ পৃঃ, গুপ্তরাজবংশের তালিকা—২১৬-১৭ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,—পরবর্তী গুপ্ত ও অপরাপর স্বাধীন রাজগণ—২১৭-২৩ পৃঃ।

লিচ্ছবিগণের উত্তরাধিকারী—২১৭ পৃঃ, 'আদিত্য' উপাধি—২১৮ পৃঃ, গুপ্তদিগের প্রদত্ত উপাধি—২১৮ পৃঃ, শশাঙ্কগুপ্ত—২১৯ পৃঃ, রাজ্যবর্ধনের হত্যা—২১৯ পৃঃ, শশাঙ্ককৃত বুদ্ধদলন ও অমৃত্যুপ—২২০ পৃঃ, ছোট ছোট গুপ্ত-রাজা—২২১ পৃঃ, বশোবর্মা—২২১ পৃঃ, আদিত্যসেন—২২১ পৃঃ, খজ্ঞাবংশ—২২১ পৃঃ, বড়কামতা—২২৩ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,—রাজতরঙ্গিনী-কথিত দুইটি আখ্যান—২২৩-২৬ পৃঃ।

জয়্যাপীড়ের সঙ্কল ও গোড়ে আগমন—২২৪ পৃঃ, জয়্যাপীড় ও কমলা—২২৪ পৃঃ, সিংহবধ—২২৪ পৃঃ, মণিবলয়ে 'জয়্যাপীড়' নাম ফোঁদিত—২২৫ পৃঃ, কল্যাণীদেবীর সহিত বিবাহ—২২৫ পৃঃ, কান্দীরের ললিতাদিত্য ও গোড়েখর—২২৫ পৃঃ, দেহরক্ষী ক্ষুদ্র দলের অভিযান—২২৬ পৃঃ, 'পরিহাস-কেশব'এর 'রামস্বামী'বিগ্রহের ধ্বংস—২২৬ পৃঃ।

অষ্টম অধ্যায় ২২৭-৪৭ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—মৌর্য ও গুপ্ত-রাজত্ব শিল্পসাহিত্য—২২৭-৪০ পৃঃ।

যুগে যুগে বৃহত্তর বাঙ্গলার গৌরব—২২৭ পৃঃ, আদিম-মানবের চিত্রালেখ্য—২২৮ পৃঃ, শিল্পানপুরের গুহা-চিত্র—২২৮-২৯ পৃঃ, শিল্পানপুর মহেঞ্জোদারো, বিক্রমখোলা ও মহাভারতাদির বর্ণিত চিত্র, মৌর্য চিত্র—২২৯ পৃঃ, আর্ঘ্য সমাজে শিল্পীর স্থান—২৩০ পৃঃ, আদিম শিল্পীরা কোথায় গেল ?—২৩০ পৃঃ, অশোক-রেলিংএর মূর্তি—২৩১ পৃঃ, গ্রীকশিল্পের প্রভাব—২৩২ পৃঃ, ভারতীয় বুদ্ধ-মূর্তির বৈশিষ্ট্য—২৩২ পৃঃ, বাঙ্গলা দেশ মগধের শিল্প-শালা—২৩৩ পৃঃ, রামায়ণ ও মহাভারতের প্রমাণ—২৩৪ পৃঃ, গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে নিয়ম—২৩৫ পৃঃ, স্তূপনীতি—২৩৬ পৃঃ, ভারতীয় শিল্পের স্বাধীনতা ও বৈশিষ্ট্য—২৩৭ পৃঃ, মহাদেব-মূর্তি গড়িতে হইবে না, দেব-মূর্তি গড়িতে হইবে—২৩৮ পৃঃ, বাঙ্গলায় বর-কঙ্কার চিত্র—২৩৮ পৃঃ, মৌর্যযুগের পূর্ববর্তী শিল্প—২৪০ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—মহেঞ্জোদারো—চীনপর্ঘাটকগণের মত—২৪০-৪৩ পৃঃ।

৫০০০ খৃঃ পূঃ ভারতীয় শিল্প—২৪০ পৃঃ, ফাহায়েন—২৪২ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,—বাহিরের সঙ্গে আদান-প্রদান, অজস্তা গুহা—২৪৩-৪৭ পৃঃ।

বিদেশের সহিত সম্বন্ধ—২৪৩ পৃঃ, গ্রীকদিগের নিকট ঋণ—২৪৪ পৃঃ, গ্রীকদিগের উপরে প্রভাব—২৪৪ পৃঃ, অজস্তার চিত্র-সম্পদ—২৪৫ পৃঃ।

নবম অধ্যায় ২৪৮-৭২ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—পাল-সাম্রাজ্য, মৎস্য-ন্যায়—২৪৮-৪৯ পৃঃ।

লামা তারানাথের বর্ণনা—২৪৮ পৃঃ, রাজলক্ষীর রাজকুল-ত্যাগ—২৪৯ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—গোপাল ও তাঁহার পুত্রপুরুষগণ—২৪৯-৫২ পৃঃ।

দয়িতবিক্র—২৪৯ পৃঃ, বপাট—২৪৯ পৃঃ, গোপাল—(৭৪০-৮৫ খৃঃ) পালগণের আদি সম্বন্ধে উপগল্প—২৫১-৫২ পৃঃ, সমাজ-সংস্কার—২৫১ পৃঃ, দেবদেবী—২৫২ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,—ধর্মপাল—২৫৩-৫৫ পৃঃ।

ধর্মপাল (৭৮৫-৮২০ খৃঃ, ভি. স্মিথের মতে ৭৪০-৮১০ খৃঃ)—২৫৩ পৃঃ, ধর্মপালের

সামন্ত রাজগণ—২৫৩ পৃঃ, ধর্মপালের দিগ্বিজয়—২৫৩ পৃঃ, রাজপুরুষদের উপাধি—
২৫৪ পৃঃ, দানশীলতা—২৫৫ পৃঃ, রাজ্যের সীমা—২৫৫ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,—দেবপাল—২৫৬-৫৮ পৃঃ।

দেবপাল (৮২০-৫৮ খৃঃ, ভি. খ্রিঃ ৮০০-৪৮ খৃঃ)—২৫৬ পৃঃ, বীর অথচ শান্তিপ্ৰিয়—
২৫৬ পৃঃ, দর্ভপানি—২৫৭ পৃঃ, জাভার দূত—২৫৮ পৃঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ,—বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও
দ্বিতীয় বিগ্রহপাল—২৫৮-৬১ পৃঃ।

বিগ্রহপাল (৮৫৮-৬০ খৃঃ)—২৫৮ পৃঃ, নারায়ণপাল (৮৬০-৯১৫ খৃঃ)—২৫৯ পৃঃ,
অধিকার-সংকোচ—২৫৯ পৃঃ, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (৯১৫-৭৮ খৃঃ)
—২৫৯-৬১ পৃঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ,—পরবর্তী পালরাজগণ—২৬১-৭২ পৃঃ।

মহীপাল (৯৭৮-১০৩০ খৃঃ)—২৬১ পৃঃ, মহীপাল ও লীলা—২৬২ পৃঃ, নরপাল
(১০৩০-১০৪৫)—২৬৩ পৃঃ, কর্ণদেবের পরাজয়—২৬৩ পৃঃ, বৈষ্ণবজাতির উন্নতি—২৬৩ পৃঃ,
বিগ্রহপাল (তৃতীয়) (১০৪৫ খৃঃ)—২৬৪ পৃঃ, দ্বিতীয় মহীপাল ও সুরপাল—২৬৪ পৃঃ,
কৈবর্তপতি দিবোবাক—২৬৪ পৃঃ, রামপাল—২৬৪ পৃঃ, পিতৃরাজ্যোদ্ধার-ব্রত—২৬৫ পৃঃ,
সামন্তচক্র—২৬৬-৬৮ পৃঃ, রামপালের চরিত্র—২৬৮ পৃঃ, ভীমের গুণাবলী—২৬৮-৬৯ পৃঃ,
রামপালের দিগ্বিজয়—২৬৯ পৃঃ, যক্ষপালের মৃত্যুদণ্ড—২৬৯-৭০ পৃঃ, রমোতি—২৭০ পৃঃ,
পরবর্তী পালরাজগণ—২৭০ পৃঃ, তাম্রপটে কুমারপালের প্রশংসা—২৭০ পৃঃ, বৈষ্ণবদেবকৃত
আসামজয়—২৭০ পৃঃ, মদনপাল—২৭১ পৃঃ, তৃতীয় গোপাল ও ইন্দ্রদায়পাল—২৭১ পৃঃ,
তারানাতের তালিকা—২৭১ পৃঃ।

দশম অধ্যায় ২৭৩-৩০৪ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—পাল রাজত্বের নানা কথা, অপরাপর রাজবংশ—২৭৩-৮৭ পৃঃ।

বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশ—২৭৩ পৃঃ, গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস—২৭৪ পৃঃ,
রাজেন্দ্র চোল (১০২৫ খৃঃ)—২৭৫ পৃঃ, ত্রিপুরা নাথ-যোগীদের অগ্রতম প্রধান কেন্দ্র—
২৭৬ পৃঃ, চন্দ্ররাজগণ—২৭৭ পৃঃ, মহেন্দ্রের শিলালেখ—২৭৭-৮৪ পৃঃ, জয়সেন বিখ্যাসের
সদ্বৈষ্ণব কুলচক্রিকা, মানবংশ—২৮৫ পৃঃ, বর্ষবংশ—২৮৫ পৃঃ, মিহিরগুপ্ত—২৮৬ পৃঃ,
লাউসেন—২৮৬ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—এদেশে ইতিহাসের উপকরণ—২৮৭-৯১ পৃঃ।

ইতিহাস কেন লুপ্ত হইল?—২৮৮ পৃঃ, ফেমেন্দ্র, ইন্দ্রদত্ত, ভট্টাচার্য, রাজমালা—
২৮৮-৮৯ পৃঃ, জয়নাথ মুন্সী—২৮৯ পৃঃ, পল্লীগাথা প্রভৃতি—২৮৯-৯১ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,—বিজ্ঞা ও বিদ্যানের গৌরব—২৯১-৩০০ পৃঃ।

কোটলা, দর্ভপাণি ও কেদার মিশ্রের প্রতিপত্তি—২৯২-৯৩ পৃঃ, ব্রাহ্মণদের প্রভাব—২৯২ পৃঃ, বিজ্ঞা-যুগ—২৯২ পৃঃ, গোড়ীয় রীতি—২৯৪ পৃঃ, বৈষ্ণবদের প্রশস্তিক উপমা—২৯৫ পৃঃ, জয়দেব—২৯৬ পৃঃ, পণ্ডিতী বাঙ্গলা—২৯৭ পৃঃ, গুরুতর সামাজিক পরিবর্তন—২৯৮ পৃঃ, বৌদ্ধ কুল-প্রদীপ—২৯৯ পৃঃ, ব্রাহ্মণগণের বাঙ্গলা দেশ-ত্যাগ—২৯৯-৩০০ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,—বৌদ্ধ-বিহার—৩০০-৩০৪ পৃঃ।

নালন্দা—১০ কোটি স্বর্ণ-মুদ্রায় ক্রীত আম্রকানন—৩০০ পৃঃ, ক্রমিক ইতিহাস—৩০১ পৃঃ, শ্রীবিষ্ণু-কৃত ১০৮টি মন্দির—৩০১ পৃঃ, হিউনসাংয়ের সময়কার নালন্দার অধ্যাপক-গণ—৩০১ পৃঃ, ইংচিং—৩০২ পৃঃ, স্থাপত্য ও চাক্ষুশ—৩০২ পৃঃ, ধর্মগজ—৩০৩ পৃঃ, বিক্রমশিলা—৩০৪ পৃঃ, 'রাজকীয়' বিশ্ববিদ্যালয়, দীপঙ্করের সময়ে আচার্য্যগণ—৩০৪ পৃঃ।

একাদশ অধ্যায় ৩০৫-৩৩৪ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—বৌদ্ধধর্ম ও তাহার প্রভাব—৩০৫ পৃঃ।

দীপঙ্কর—৩০৫ পৃঃ, বিদেশ-ভ্রমণ—৩০৬ পৃঃ, তিব্বতরাজ লাঃ লামা ইয়েসি—৩০৭ পৃঃ, "আমি স্বর্ণ বা প্রতিষ্ঠার কান্দাল নহি"—৩০৭ পৃঃ, লাঃ লামা ইয়েসি ও গারোয়ালের রাজা—৩০৮ পৃঃ, তিব্বতরাজার মৃত্যু—৩০৯ পৃঃ, চ্যাংচুয়ের প্রচেষ্টা—৩০৯ পৃঃ, গ্যাম্‌সনর পরামর্শ—৩১০ পৃঃ, দীপঙ্করের মূর্তি—৩১০-১১ পৃঃ, তিব্বত যাওয়ায় সম্মতি—৩১১ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—তিব্বত-যাত্রা ও তথায় মহৎ কর্মপ্রতিষ্ঠা—৩১১-১৭ পৃঃ।

আচার্য্য রত্নাকরের অমুমতি—৩১২-১৩ পৃঃ, দীপঙ্করের অভাবে ভারতবর্ষ—৩১৩ পৃঃ, নেপালরাজ-কৃত সম্বর্ধনা—৩১৩ পৃঃ, যুবরাজ পরপ্রভ—৩১৩ পৃঃ, দীপঙ্করের অভিনন্দন—৩১৪ পৃঃ, 'ভারতবর্ষ দেবস্থান'—৩১৪ পৃঃ, 'এদেশটি নীলকান্তমণির খনি'—৩১৪ পৃঃ, ১০৪০ খৃষ্টাব্দে—৩১৫ পৃঃ, সংবর্ধনার জন্ত নির্মিত নূতন বাস্ত-যন্ত্র—৩১৫ পৃঃ, শেষ—৩১৬-১৭ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,—বাঙ্গালী কর্তৃক সুদূর উত্তর-পূর্বের ধর্মপ্রচার—৩১৭-১৯ পৃঃ।

যক্ষ—৩১৭ পৃঃ, শাস্তরক্ষিত—৩১৭ পৃঃ, পদ্মনাভ—৩১৮ পৃঃ, কমলশীল—৩১৮ পৃঃ, তিব্বতে বাঙ্গালী প্রচারক—৩১৮-১৯ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,—বৌদ্ধধর্মের অবশেষ—৩১৯-৩২৯ পৃঃ।

সংজ্ঞা স্ত্রীলোকদের প্রবেশাধিকার—৩১৯-২১ পৃঃ, একাভিগ্নায়ী—৩২১ পৃঃ, বাঙ্গলার সহজপন্থী—৩২২ পৃঃ, তান্ত্রিক ভৈরবীচক্র—৩২২ পৃঃ, বোধিদর্ম—৩২২ পৃঃ, বোধিদর্ম ও লোহর মত—৩২২ পৃঃ, নেড়ানেড়ী—৩২৪ পৃঃ, বিবাহপ্রথা-প্রবর্তন—৩২৫ পৃঃ,

নেজানেডার কলক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নহে—৩২৫ পৃঃ, বাউল ও সহজিয়া মতে স্পষ্ট বোধিদর্শনের প্রভাব—৩২৬ পৃঃ, চৈতন্য 'শূন্য মূর্তি'—৩২৭ পৃঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ,—বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও ব্রাহ্মণের টোল—৩২৯-৩৪ পৃঃ।

স্বারপণ্ডিত—৩৩০ পৃঃ, বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগুলির পরিণতি—৩৩৩-৩৪ পৃঃ।

দ্বাদশ অধ্যায় ৩৩৫-৪৫৭ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—পালরাজ্যে ধর্মশাস্ত্র, পাণ্ডিত্য, শিল্প ও কথাসাহিত্য—

৩৩৫-৪০ পৃঃ।

নাগসেন ও মিনাওয়ার—৩৩৬-৩৭ পৃঃ, চন্দ্রগোমিন, শাস্ত্ররক্ষিত (৭০৫-৭৬৫ খৃঃ)—
৩৩৮ পৃঃ, জ্ঞানকী—৩৩৯ পৃঃ, রত্নাকর শাস্ত্রি—৩৩৯ পৃঃ, ইতিহাস উদ্ধারে উদাসীনতা—
৩৩৯ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—বঙ্গলাদেশে জ্ঞানের গৌরব—৩৪০-৪৪ পৃঃ।

বিদ্বানদিগকে দান ও উৎসাহ—৩৪২-৪৩ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,—নবদ্বীপের টোল—৩৪৪-৫৩ পৃঃ।

নবদ্বীপে টোলের উৎপত্তি ও বিকাশ—৩৪৬ পৃঃ, টোলের শিক্ষাপদ্ধতি—৩৪৬ পৃঃ, রাজ-
হস্তের দানের মর্যাদা—৩৪৭ পৃঃ, নবদ্বীপে ভারতবর্ষের সর্বস্থানের ছাত্রসমাগম—৩৪৭ পৃঃ,
জীবন-যাত্রার সারল্য—৩৪৮ পৃঃ, নবদ্বীপ-টোলের গ্রন্থকারগণ—৩৪৯ পৃঃ, অধ্যাপকগণ—
৩৫০ পৃঃ, জাগদীশী—৩৫০ পৃঃ, যুরোপের জ্ঞানশাস্ত্র, বৌদ্ধজ্ঞান ও নব্যজ্ঞান—৩৫১-৫৩ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,—সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য—৩৫৩-৭৬ পৃঃ।

নব্যজ্ঞান—পূর্ববর্ত্তিগণ—৩৫৩ পৃঃ, নব্যজ্ঞানের উদ্দেশ্য—৩৫৪ পৃঃ, দৃষ্টান্ত—৩৫৫ পৃঃ,
নব্যজ্ঞান পড়িবার যোগ্যতা—৩৫৬ পৃঃ, 'পূর্বতো বহিমান্'—৩৫৭ পৃঃ, গঙ্গেশ শিরোমণি—
৩৫৯ পৃঃ, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি সর্ব-সম্মত কথা—৩৫৯ পৃঃ, প্রবাদ—৩৫৯ পৃঃ, রঘুনাথ
শিরোমণি—৩৬০ পৃঃ, গুরু বাহুদেব কে ?—৩৬০ পৃঃ, বাহুদেব সার্কভৌম চৈতন্যের
শিক্ষক নহেন—৩৬১ পৃঃ, রঘুনাথের বাল্যজীবন, 'খ' আগে না হইয়া 'ক' আগে হইল
কেন ?—৩৬১ পৃঃ, চৈতন্যের সঙ্গে বহুদেবের গল্প—৩৬২ পৃঃ, কাণা শিরোমণি—৩৬৩ পৃঃ,
পূর্বপক্ষ ও রঘুনাথের জবাব—৩৬৪ পৃঃ, "হ"রের গোয়াল—৩৬৪ পৃঃ, শরণের হৃৎকৃত্তি—
৩৬৭ পৃঃ, স্থতিশাস্ত্র—৩৬৭ পৃঃ, স্থতিধর—৩৬৮ পৃঃ, জুমুর নন্দী—৩৬৯ পৃঃ, আর্ঘ্যাসপ্তশতী—
৩৬৯ পৃঃ, হরিভক্তিবিলাস—৩৭১ পৃঃ, কুল্লুক ভট্ট—৩৭১ পৃঃ, জ্যোতিষ—৩৭১ পৃঃ,
চিকিৎসা-শাস্ত্র, মাধবকর ও চক্রপাণি দত্ত—৩৭২ পৃঃ, জ্ঞানশাস্ত্র—৩৭২ পৃঃ, অভিধান—
৩৭২ পৃঃ, তাম্রলিপির কবিত্ব—৩৭৩ পৃঃ, দিগ্বিজয়ী—৩৭৩ পৃঃ, রূপনারায়ণ—৩৭৩ পৃঃ,
আচার্য ও সরস্বতী উপাধি-লাভ—৩৭৪ পৃঃ, জীবগোস্বামীর নিকট পরাজয়—৩৭৫ পৃঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ,—ব্রাহ্মণ্য তেজস্বিতা ও চরিত্রবল—৩৭৬-৮১ পৃঃ।

কুমার দত্ত ও মাধবী—৩৭৬ পৃঃ, গোবর্দ্ধনাচাৰ্য্য—৩৭৬-৭৭ পৃঃ, কবি কৃত্তিবাস—
৩৭৭ পৃঃ, গৰ্গ—৩৭৮ পৃঃ, বুনো রামনাথ—৩৮০-৮১ পৃঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ,—গুপ্ত-পাল যুগের জের—কথা-সাহিত্য—৩৮১-৪০৬ পৃঃ।

নব-ব্রাহ্মণ্য—৩৮১ পৃঃ, সেনরাজগণ নব-ব্রাহ্মণ্যের পৃষ্ঠপোষক—৩৮২ পৃঃ, পূৰ্ব্ব-ময়মন-
সিংহ সেনরাজগণের অধিকার-বহির্ভূত—৩৮২ পৃঃ, স্মরণ্যগীত—৩৮৩ পৃঃ, দশকাহিনীয়া—
৩৮৩ পৃঃ, জঙ্গলবাড়ী—৩৮৪ পৃঃ, কন্দুরগৌরবের যুগ—৩৮৪ পৃঃ, গল্পগুলির উচ্চাঙ্গের শিক্ষা—
৩৮৪ পৃঃ, ব্রাহ্মণ্যগণ গল্প-সাহিত্যের প্রতিবাদী—৩৮৫ পৃঃ, তাঁহারা কি নিবেদন করিলেন ও
কি দিলেন?—৩৮৬ পৃঃ, আলাপিনী—৩৮৬ পৃঃ, ভারতচন্দ্র রায়—৩৮৭ পৃঃ, গীতিকথা,
মালকমালা—৩৮৭ পৃঃ, তাত্ত্বিকতা—৩৮৮ পৃঃ, তপসিসিদ্ধি—৩৮৮ পৃঃ, বিপদে ক্রফেপহীন—
৩৮৯ পৃঃ, সপত্নী-স্নেহ—৩৮৯ পৃঃ, ভাবের কাঙ্গাল, ঐশ্বৰ্য্যের কাঙ্গাল নহে—৩৯০ পৃঃ,
'পাটরাণী' ও 'ঠাকুরাণী'—৩৯১ পৃঃ, গল্পের বাধুণী—৩৯১ পৃঃ, গল্পে বৌদ্ধযুগের প্রমাণ—
৩৯২ পৃঃ, কাঞ্চনমালা—৩৯২ পৃঃ, অপূৰ্ব্ণ ত্যাগ—৩৯৪ পৃঃ, পল্লী-গীতিকায় শৈবযুগের
প্রভাব—৩৯৫ পৃঃ, এই নাট্যকারা কালিদাসাদি কবি-বর্ণিত নাট্যকারদের পর্যায়ে—৩৯৬ পৃঃ,
মল্লিকা—৩৯৬ পৃঃ, চন্দ্রাবতী—৩৯৬ পৃঃ, পূৰ্ব্বরাগ—৩৯৭ পৃঃ, হিন্দুরা এসকল গান গায় না
—৩৯৭ পৃঃ, বাঙ্গালীর সৃষ্টি এক ধাপ উপরে—৩৯৭ পৃঃ, 'সতীত্ব' ধর্ম উপেক্ষিত—৩৯৮ পৃঃ,
মহা—৩৯৯ পৃঃ, বিদেশী সমালোচকদের মত—৪০০ পৃঃ, গীতি-কথা ও পল্লী-গীতিকা—
৪০২ পৃঃ, ভাষার কথা—৪০৩ পৃঃ, গীতি-কথা, পল্লী-গীতিকা ও রূপকথা—৪০৪ পৃঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ,—গুপ্ত ও পালযুগের স্থাপত্যের জের—৪০৬-৫২ পৃঃ।

জাভা দ্বীপের শিল্পের উপর বাঙ্গলার শিল্প-প্রভাব, উড়িষ্যার শিল্প বাঙ্গলার শাখা—
৪০৬-০৯ পৃঃ, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাঙ্গালীর উপনিবেশ—৪১০ পৃঃ, বঙ্গের পল্লী ও সহর
সিদ্ধানুগ—৪১১ পৃঃ, মহেন্দ্রোদ্যোগ—৪১১-১৬ পৃঃ, অজন্তা—বাঙ্গালীর পটু—৪১৬ পৃঃ,
দ্বীলোকদের শিল্প-সাধনা—৪২১ পৃঃ, জয়পুরী কলম, বাঙ্গলাদেশে তৎপ্রভাব—৪২১ পৃঃ,
কালীঘাটের পটু—৪২২ পৃঃ, কাজলরেখার চিত্র-পটুতা—৪২৫ পৃঃ, মেঠাই—৪২৬ পৃঃ,
বিবাহ-বাসর—৪২৬ পৃঃ, দ্বীলোকের উচ্চশিক্ষা ও নৃত্য পটু—৪২৭ পৃঃ, পুরুষ ও স্ত্রী
সংসার-বধের গ্রহখানি চাকা—৪২৮ পৃঃ, চট্টগ্রামের মুসলমানগণ—৪২৯ পৃঃ, বাঙ্গালী
মেয়েদের হাতের কাঁথা—৪৩০ পৃঃ, স্থাপত্য—৪৩২ পৃঃ, ৭০০ বৎসরের প্রাচীন মন্দিরের
কয়েকখানি ইট—৪৩৩ পৃঃ, শিকারের ছবি—৪৩৩ পৃঃ, অপরাধের ছবি—৪৩৪ পৃঃ, শিল্পের
সাধনা—৪৩৫ পৃঃ, একটি উমামহেশ্বরের মূর্তি—৪৩৫ পৃঃ, প্রশান্ত বুদ্ধ—৪৩৬ পৃঃ, প্রসন্ন
শিব—৪৩৬ পৃঃ, এদেশের শিল্প অনাথ্য-সমূহ—৪৩৭ পৃঃ, উত্তরদেশের প্রভাব—৪৩৭ পৃঃ,
বুদ্ধ, শিব ও বাজ্রদেব মূর্তি—৪৩৮ পৃঃ, পটীদার শ্রেণী—৪৩৮-৪০ পৃঃ, খেজুরাহ ও রাজগড়

—৪৪১ পৃঃ, মঙ্গরীদের কার্যপটুতা—৪৪১ পৃঃ, গোপীসজ্জা, যত্ননন্দন দাস—৪৪২ পৃঃ, প্রাচীন অলঙ্কারের নমুনা—৪৪৩ পৃঃ, চিত্রশিল্প—৪৪৪-৪৫ পৃঃ, চৈতন্য-সঙ্কীর্ণনের ছবি—৪৪৬ পৃঃ, কালীঘাটের ছবি—৪৪৭ পৃঃ, মেয়েদের বিচিত্র ভঙ্গী—৪৪৯ পৃঃ, আখ্যাবর্তের চিত্রকরদের কৃতিত্ব—৪৫২ পৃঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ,—বাঙ্গলার নৃত্যকলা—৪৫২-৫৭ পৃঃ।

রায়বেশে—৪৫২-৫৭ পৃঃ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ৪৫৮—৫৫৩পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—সেন-রাজত্ব—৪৫৮-৭২ পৃঃ।

দুর্গাচরণ সাত্ত্বালের সামাজিক ইতিহাস—৪৬০ পৃঃ, আদিশূর—৪৬২ পৃঃ, কোন জাতির স্বীয় দাবী সর্বদা বিশ্বাসযোগ্য নহে—৪৬৩ পৃঃ, নির্দিষ্টারে বিবাহ—৪৬৫ পৃঃ, সামন্ত সেন—৪৬৫-৬৬ পৃঃ, হেমন্ত সেন—৪৬৬-৬৭ পৃঃ, পঞ্চগৌড়েশ্বর ও নবলক্ষ সৈন্ত—৪৬৭ পৃঃ, মনসামঙ্গল—৪৬৭ পৃঃ, বাঙ্গলার রাগ ও ভাটিয়াল সুর—৪৬৮ পৃঃ, গোপীচাঁদের গান—৪৬৮ পৃঃ, বহৎ বাঙ্গলা ক্ষুদ্র হইয়া গেল—৪৬৯ পৃঃ, সমুদ্রযাত্রা—৪৭০ পৃঃ, সমুদ্রযাত্রা-নিষেধ-বিধির কারণ—৪৭১-৭২ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—গৌরীদান ও বাল্যবিবাহ—৪৭২-৭৬ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,—বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের সময়নিরূপণ—৪৭৬-৭৮ পৃঃ।

মুসলমান ইতিহাসের প্রমাণ—৪৭৬ পৃঃ, রাখালবাবুর মত—৪৭৭ পৃঃ, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া বঙ্গে আর কোন জাতি নাই—৪৭৮ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,—কৌলীন্ত—৪৭৯-৫০৪ পৃঃ।

তাম্রশাসনে কৌলীন্তের উল্লেখ নাই কেন?—৪৭৯ পৃঃ, আচার—৪৮১ পৃঃ, বৈষ্ণব-শক্তির বিলোপ—৪৮৩ পৃঃ, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া বঙ্গে আর জাতি নাই—৪৮৪ পৃঃ, বল্লাল সেনের সঙ্গে স্বর্ণবণিকদের বিরোধ—৪৮৫ পৃঃ, পিতৃপিণ্ড-যজ্ঞ ও তাহার উপসংহার—৪৮৫ পৃঃ, কুন্দন আচার্য্য ও মণিদত্ত—৪৮৭ পৃঃ, স্বর্ণবণিকদের দণ্ড—৪৮৭-৮৮ পৃঃ, কৈবর্ত প্রভৃতি জাতির প্রতি অহুগ্রহ—৪৮৮ পৃঃ, বল্লাল-চরিত্র—৪৮৯ পৃঃ, ধোয়ী কবি—৪৯১ পৃঃ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য—৪৯৩ পৃঃ, শরণ—৪৯৩ পৃঃ, জয়দেব ও পদ্মাবতী কর্তৃক বুঢ়ণ মিশ্রের পরাজয়—৪৯৪ পৃঃ, উপগল্পগুলির সারাংশ—৪৯৫ পৃঃ, জয়দেবের পদে সংকৃত প্রাকৃতের অহুবায়া—৪৯৬ পৃঃ, কচির কথা—৪৯৮ পৃঃ, ভক্তি ও ভোগ—৪৯৯ পৃঃ, গীতগোবিন্দের টীকা—৫০০-০১ পৃঃ, 'দেহি পদপল্লবমুদারং'—৫০২ পৃঃ, গীতগোবিন্দের অহুবাদ—৫০৩ পৃঃ, লক্ষণ সেনের সভার পণ্ডিতগণ—৫০৩ পৃঃ, হলায়ুধ, পুরুষোত্তম প্রভৃতি—৫০৪ পৃঃ, বিজ্ঞাপ্রভা ও শশিকলা—৫০৪ পৃঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ,—বৌদ্ধধর্মের প্রতিক্রিয়া—নৈতিক অধঃপতন—৫০৪-১২ পৃঃ।

বীভৎস ছবি—৫০৫ পৃঃ, মন্ত্রী পারদারিক—৫০৫ পৃঃ, মাধবীর কাহিনী—৫০৬ পৃঃ,
গোবর্দ্ধন আচার্যের তেজস্বিতা—৫০৭-০৮ পৃঃ, রাজ্ঞী বলভার নীচতা—৫০৯-১২ পৃঃ।

ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদ,—সাহ জালালুদ্দিন তব্রেক ও সেক শুভোদয়া—
৫১৩-২৩ পৃঃ।

শুভোদয়া—৫১৩-২০ পৃঃ, লক্ষণ সেনের সঙ্গে দেখা—৫১৩ পৃঃ, বিব-ভঙ্কণ—৫১৪ পৃঃ,
নানারূপ কেরামৎ—৫১৪ পৃঃ, প্রতিমা-সৃষ্টির বাড়াবাড়ি—৫১৯ পৃঃ, পৌত্তলিকতার
মূলোচ্ছেদ হয় নাই—৫১৯ পৃঃ, সোমনাথের মন্দির—৫২০ পৃঃ, জাতি-ভেদের অবিচার—
৫২২ পৃঃ, বঙ্গদেশের বিলাস-কলা—৫২৩ পৃঃ, বাঙ্গালীর শিল্পকলার বিনাশ—৫২৩ পৃঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ,—মুসলমান-বিজয়—৫২৪-৫৩ পৃঃ।

অনঙ্গপালের পরাজয়—৫২৫ পৃঃ, ইবন বক্তিয়ার কর্তৃক বঙ্গবিজয়—৫২৬ পৃঃ,
বিহারের “হুর্গ”বিজয়—৫২৭ পৃঃ, বাঙ্গালী যুদ্ধে যোগ দেয় নাই কেন?—৫২৮ পৃঃ, জন-
সাধারণের সঙ্গে সেন-রাজাদের বিচ্ছেদ—৫৩০ পৃঃ, পল্লী-কবির নীরব—৫৩০-৩১ পৃঃ,
বঙ্গালী কুলে দেশময় অশান্তি—৫৩২ পৃঃ, ব্রাহ্মণ্য অহুশাসনের কঠোরতা—৫৩২ পৃঃ,
বঙ্গালের শেষ জীবন—৫৩৩ পৃঃ, লক্ষণ সেন তুর্কিদের আগমনের আভাস পাইয়া কি
করিলেন?—৫৩৫ পৃঃ, কুলীনদিগকে নিজের দলে টানিয়া আনা—৫৩৬ পৃঃ, চিরস্থায়ী
বন্দোবস্ত—৫৩৬ পৃঃ, কুল-শাস্ত্রের প্রামাণিকতা, স্বীয় সিংহাসন হৃদয় করা—৫৩৮ পৃঃ,
আমির মামুদের সুরাপান—৫৩৮-৩৯ পৃঃ, ‘তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়’—৫৪০ পৃঃ, প্রধান
নাগরিকগণ ও ধন-সম্পত্তি স্থানান্তরিত করা—৫৪০ পৃঃ, যঃ ইঃ বক্তিয়ার লক্ষণাবতী ছাড়িয়া
নবদ্বীপ আক্রমণ করিলেন কেন?—৫৪১ পৃঃ, বৃষ্টিবার ভুল—৫৪১ পৃঃ, অভিযান ব্যর্থ—
৫৪২ পৃঃ, লক্ষণ সেন গেলেন কোথায়?—৫৪৩ পৃঃ, সম্ভবতঃ বশোরে—৫৪৩ পৃঃ, এ সম্বন্ধে
প্রমাণ—৫৪৩ পৃঃ, খেয়াভোগ, পিঠেভোগ, দেবভোগ, মোভোগ প্রভৃতি নাম—৫৪৪ পৃঃ,
জয়সেন বিশ্বাসকৃত কুলজি—৫৪৭-৪৮ পৃঃ, বৈষ্ণব বঙ্গালের সৃষ্টি—৫৫১ পৃঃ, হুই বঙ্গাল
কখনই নহে—৫৫১ পৃঃ, গ্রন্থোক্ত বিবরণ বিশ্বাস-যোগ্য কিনা? প্রশ্ন হইতে পারে,
কিন্তু লেখকের উদ্দিষ্ট এক বঙ্গাল—৫৫৩ পৃঃ।

চতুর্দশ অধ্যায় ৫৫৪-৬০৯ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—হিন্দু রাজত্বের নানা কথা—৫৫৪-৫৬ পৃঃ।

শিলাদি অত্যাচারে ধ্বংস-প্রাপ্ত—৫৫৪ পৃঃ, হিন্দুর কঠোর পরীক্ষা—৫৫৬ পৃঃ, হিন্দু
বাহু সম্পদের প্রত্যাশী নহে—৫৫৬ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—পরবর্তী শিল্প ও স্থাপত্য—৫৫৭-৬৮ পৃঃ।

মাতৃমূর্তি—৫৫৭ পৃঃ, বাঙ্গলা সহর—৫৫৮ পৃঃ, খড়োঘর—৫৫৮ পৃঃ, বাঙ্গলাঘর,
ছরওয়ার জ্ঞান মিঞার ঘর—৫৫৯-৬৪ পৃঃ, ঘরের দেওয়ালে চিত্র—৫৬৪ পৃঃ, টঙ্গিবাড়ী—
জলটুঙ্গী—৫৬৫ পৃঃ, সাতৈরের শীতল পাটী—৫৬৫ পৃঃ, অস্ত্রাঙ্গ শিল্প জব্য—৫৬৭ পৃঃ,
আমিষ ও নিরামিষ রান্না—৫৬৭ পৃঃ, ভাস্কর্য—৫৬৭ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,—বৌদ্ধ ও শৈব ভাবের বিভিন্নতা—৩৬৮-৭৬ পৃঃ।

বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ভাবের মধ্যবর্তী শৈব ভাব—৫৬৯ পৃঃ, গুপ্তচরগণ—৫৭০ পৃঃ,
চাষার হাতে শিব ঠাকুর—৫৭২ পৃঃ, কৃষকবেশী শিব—৫৭৩ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,—মৌর্য ধর্ম—বাঙ্গলার ধর্মের উপর তামিল প্রভাব—
৫৭৬-৭৯ পৃঃ।

শৈব ও শাক্ত ধর্মের উপর তামিল প্রভাব—৫৭৮ পৃঃ, অগ্নির স্বামী ও মানিক
ভাসহরা—৫৭৮ পৃঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ,—বাঙ্গলার তন্ত্রশাস্ত্র—৫৭৯-৮৯ পৃঃ।

তান্ত্রিক সিদ্ধি সম্বন্ধে উপগম—৫৮০ পৃঃ, বৈষ্ণব ও শাক্ত তন্ত্র—৫৮২ পৃঃ, কুলার্ণবতন্ত্র
—৫৮২ পৃঃ, গোরক্ষ-বিজয়—৫৮৪ পৃঃ, আচার—৫৮৬ পৃঃ, বৈদিক ও বীরাচার—৫৮৬ পৃঃ,
অলৌকিক ক্ষমতা—৫৮৬ পৃঃ, দৈবশক্তি ও জড়শক্তি—৫৮৭ পৃঃ, সুরাপান—৫৮৭ পৃঃ,
দিব্যচারী—৫৮৮ পৃঃ, বীরাচারী—৫৮৮ পৃঃ, অধোগতি—৫৮৮ পৃঃ, মংস্ত-হৃত্র—৫৮৮ পৃঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ,—আচার-ব্যবহারের কথা, জাতিতত্ত্ব—৫৮৯-৬০৯ পৃঃ।

পৈতা—৫৮৯ পৃঃ, বর-মনোনয়ন—৫৯০ পৃঃ, কুকুর—৫৯০ পৃঃ, কাপড়পরা রীতি ও
পাগড়ী—৫৯০ পৃঃ, খোঁপা বীধা—৫৯২ পৃঃ, বৈষ্ণবশাস্ত্র ও বৈষ্ণবগণ—৫৯২ পৃঃ, 'রোমধা'—
৫৯২ পৃঃ, বাঙ্গলার কোলোন্ত ও বিদেশীয়দের মতামত—৫৯৬ পৃঃ, কোলোন্তের উজ্জল দিক—
৫৯৭ পৃঃ, বহু-বিবাহ—৫৯৯ পৃঃ, সার জর্জ বার্ডউডের মত—৫৯৯ পৃঃ, বার্গাড শ-র মত—
৬০০ পৃঃ, সোপেন হেয়ারের মত—৬০১ পৃঃ, প্রকৃত গুণীরাই কুলীন হইয়াছিলেন—৬০৩ পৃঃ,
এ দেশের প্রকৃতি হৃদাস্ত ও স্বাধীন—৬০৪ পৃঃ, কুলীন ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণী-বিভাগ ও
উদারতা—৬০৫ পৃঃ, শূর, সেন ও চন্দ্রবংশের সম্বন্ধ-বিচার—৬০৯ পৃঃ।

সপ্তদশ অধ্যায় ৬১০-৭৮২ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—পাঠান রাজত্ব—৬১০-৬১৭ পৃঃ।

মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার খিলিজির শেষ জীবন—৬১০-১১ পৃঃ, মহম্মদ শিরান (১২০৫-
১২০৮ খৃঃ)—৬১১ পৃঃ, আলিমদ্দিন, হুলতান আলাউদ্দিন (১২০৮-১২১১ খৃঃ)—৬১২ পৃঃ,

গিয়াসউদ্দিন ইউয়ুজ (১২১১-১২২৬ খৃ:)—৬১২ পৃ:, নসিরুদ্দিন মহম্মদ (১২২৬-২৮ খৃ:)—৬১৩ পৃ:, হাসামুদ্দিন, ইখতিয়ারুদ্দিন, আলাউদ্দিন জ্বানি, সৈফউদ্দিন (১২২৮-৩৩ খৃ:)—৬১৩ পৃ:, তোগান খাঁ (১২৩৩-৪৪ খৃ:)—৬১৩ পৃ:, তোগান খাঁ ও তমুর খাঁ (১২৪৪-৪৬ খৃ:)—৬১৪ পৃ:, মুলুক যুজবেক (১২৪৬-৫৮ খৃ:)—৬১৪ পৃ:, জালালুদ্দিন (১২৫৮—একবৎসর), আর্সলান খাঁ (১২৫৮, ১২৬০-৬১ খৃ:)—৬১৫ পৃ:, তাতার খাঁ (১২৬১ ৬৬ খৃ:)—৬১৫ পৃ:, তোগ্রেল খাঁ (১২৭৮-৮২ খৃ:)—৬১৬ পৃ:, নসিরুদ্দিন বগড়া খাঁ (১২৮২-৯১ খৃ:)—৬১৬ পৃ:।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান রাজগণ—৬১৭-৪৮ পৃ:।

নসিরুদ্দিন ও কায়কোবাদ—৬১৭-১৮ পৃ:, পিতাপুত্রের মিলন (১২৮৮ খৃ:)—৬১৮ পৃ:, ফিরোজ সাহ ও তাঁহার পুত্রগণ (১২৮৯-১৩৩০ খৃ:)—৬১৯ পৃ:, বহরম খাঁ ও কুদর খাঁ (১৩৩০-৩৮ খৃ:)—৬১৯ পৃ:, আলাউদ্দিন ও ফকরুদ্দিন (১৩৩৮-৪৩ খৃ:)—৬১৯ পৃ:, ইখতিয়ারউদ্দিন গাজিসাহ (১৩৪৯-৫২ খৃ:)—৬২০ পৃ:, সামসুদ্দিন ইলিয়াস সাহ (১৩৫৩-৫৮ খৃ:)—১ম সেকেন্দর সাহ (১৩৫৮-৮৯ খৃ:)—৬২০ পৃ:, গয়েসুদ্দিন আজিম সাহ (১৩৮৯-৯৩ খৃ:)—৬২১ পৃ:, গয়েসুদ্দিনের জায়গরভা—৬২১ পৃ:, সাইপ্রাস, গোলাপ ও তুলিপ—৬২২ পৃ:, প্রসিদ্ধ কবি হাফেজ—৬২২ পৃ:, সৈফউদ্দিন হাম্জা (১৩৯৬-১৪০৬ খৃ:)—৬২২ পৃ:, ২য় সামসুদ্দিন (১৪০৬-০৯ খৃ:)—৬২২ পৃ:, রাজা গণেশ (১৪০৯-১৪ খৃ:)—গণেশ কোন্ জাতি?—৬২৩ পৃ:, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ-সমতা—৬২৪ পৃ:, ভাড়াড়িয়ার জমিদার বংশ—ভাড়াড়ী বংশ—৬২৪ পৃ:, নবকিশোরী ও আসমানতারা—৬২৫ পৃ:, বহু কেন মুসলমান হইলেন?—৬২৬ পৃ:, বহু কর্তৃক অত্যাচার—৬২৭ পৃ:, আহম্মদ সাহ—৬২৭ পৃ:, সাহরকের পত্র—৬২৭ পৃ:, দাস নাসিরের ৮ দিনের রাজত্ব, নসিরুদ্দিন মহম্মদ সাহ (১৪৪২-৫৯ খৃ:)—৬২৮ পৃ:, বরবক সাহ (১৪৫৯-৭৪ খৃ:)—৬২৯ পৃ:, ইউসুফ সাহ (১৪৭৪-৮২ খৃ:), জালালুদ্দিন ফতে সাহ (১৪৮২-৮৬ খৃ:), সুলতান সাহাজাদার আটমাস রাজত্ব—৬২৯ পৃ:, ফিরোজ সাহ (১৪৮৬-৮৯ খৃ:)—৬৩০ পৃ:, মহম্মদ সাহ (১৪৮৯-৯০ খৃ:)—৬৩১ পৃ:, মুজাফর সাহ (১৪৯০-৯৩ খৃ:)—৬৩১ পৃ:, হসেন সাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খৃ:)—৬৩১-৩৩ পৃ:, নাসির উদ্দিন নসরত সাহ (১৫১৯-৩২ খৃ:)—৬৩৩ পৃ:, আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহ (৩ মাস মাত্র), গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ সাহ (১৫৩২-৩৮ খৃ:)—৬৩৪ পৃ:, শেরসাহ কর্তৃক হুমায়ূনের পরাভব, শের সাহ (১৫৩২-৫৩ খৃ:)—৬৩৫ পৃ:, বাল্য ও কৈশোর—৬৩৫ পৃ:, দিল্লীর বহুদর্শিতা—৬৩৬ পৃ:, খজাঘারা কাটিয়া মাংসভক্ষণ—৬৩৬ পৃ:, বেহার অধিকার—৬৩৭ পৃ:, লোদি মেজিকি—৬৩৭ পৃ:, রোটাস দুর্গ অধিকার—৬৩৭ পৃ:, সম্রাট হইবার পূর্বে ও পরে—৬৩৮ পৃ:, খিজির খাঁ—৬৩৮ পৃ:, মহম্মদ সাহ (১৫৫২-৫৪ খৃ:)—৬৩৯ পৃ:, বাহাদুর সাহ (১৫৫৪-৬০ খৃ:)—৬৩৯ পৃ:, জালাল সাহ (১৫৬০-৬৩ খৃ:)—৬৪০ পৃ:, গিয়াসুদ্দিন (১৫৬৩ খৃ:),

কালাপাহাড়—৬৪০ পৃঃ, ছলারী বিবির প্রেম—৬৪০ পৃঃ, বিবাহ ও হিন্দু বিধেব—৬৪১ পৃঃ, প্রতিশোধ—৬৪১ পৃঃ, কালী ধ্বংস, অহুশোচনা, নিরুদ্দেশ—৬৪২ পৃঃ, জালালের পুত্র এবং তাঁহার হস্তা গিয়াসুদ্দিন (১৫৬৩ খৃঃ)—৬৪৫ পৃঃ, তাজ খাঁ কররাণী (১৫৬৩-৬৪ খৃঃ)—৬৪৫ পৃঃ, সোলেমান কররাণী (১৫৬৪-৭২ খৃঃ)—৬৪৫ পৃঃ, দাউদ সাহ (১৫৭২-৭৬ খৃঃ)—৬৪৫-৪৬ পৃঃ, প্রথমসন্ধি—৬৪৬ পৃঃ, অরীকার,—তেরিয়া গড়িতে পলায়ন—৬৪৬ পৃঃ, মনিয়াম খাঁর দরবারে দাউদ—৬৪৭ পৃঃ, পুনরায় সন্ধি-লঙ্ঘন—৬৪৮ পৃঃ, দাউদের মৃত্যু—৬৪৮ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,—পাঠান রাজত্ব সম্বন্ধে নানা কথা—৬৪৯-৭৪ পৃঃ।

পাঠান সম্রাটগণের অপমৃত্যু—৬৪৯-৫০ পৃঃ, প্রতিশ্রুতির মূল্য—৬৫০-৫১ পৃঃ, দিল্লী-বিদ্রোহী হুদাঙ্গ “বঙ্গ-ব্যাত্র”—৬৫১ পৃঃ, হিন্দুর সহিত রক্ত সন্ধ—৬৫২ পৃঃ, ফুলমতী বেগম—৬৫৩ পৃঃ, হিন্দু-মুসলমানে প্রীতি—৬৫৫ পৃঃ, বঙ্গ ভাবার আদর—৬৫৬ পৃঃ, পাঠান রাজত্ব কালে হিন্দুদের বাণিজ্য ও অর্থগম—৬৫৭ পৃঃ, শিল্পীরা অনার্য—৬৫৯ পৃঃ, পাঠান রাজারা শিল্প-চর্চার তাদৃশ সুযোগ পান নাই—৬৫৯ পৃঃ, মসজিদ রচনায় হিন্দু শিল্পী—৬৬০ পৃঃ, খামখেয়ালী সম্রাটগণের অত্যাচার—৬৬২ পৃঃ, রাজদরবারে ও বিলাসের কক্ষে বিদেশী ভাবার প্রভাব—৬৬৫ পৃঃ, পল্লী স্বীয় ভাব বজায় রাখিয়াছে—৬৬৬ পৃঃ, মন্দির-গাত্রে চাকু শিল্প—৬৬৬-৬৭ পৃঃ, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব—৬৬৭ পৃঃ, মেয়েদের নৃত্যগীত—৬৬৮ পৃঃ, মেয়েদের হাতের কাজ—৬৬৯ পৃঃ, হুঃখান্ত দৃষ্ট উদ্ভাটন করিতে নাই—৬৭০ পৃঃ, কাজীদের অত্যাচার—৬৭১ পৃঃ, চণ্ডীদাসের মৃত্যু—৬৭২ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,—হিন্দু সমাজ ও বৈষ্ণব ধর্ম—৬৭৪-৯৬ পৃঃ।

শুভপুরাণ ও ধর্মপূজা পদ্ধতি—৬৭৫ পৃঃ, মুসলমানগণের সঙ্গে মিলনের কলে প্রায়—৬৭৬ পৃঃ, সেনরাজত্বে ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিজ্ঞাকে স্বীয় শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ করা—৬৭৭ পৃঃ, জনসাধারণের আগরণের হুইটি কারণ—৬৭৭ পৃঃ, মাধবেন্দ্র পুরী—৬৭৭ পৃঃ, রামানুজ (১০৭০ খৃঃ)—৬৭৭ পৃঃ, সনক-সম্প্রদায়—নিম্বাচার্য—৬৭৮ পৃঃ, রুদ্র-সম্প্রদায়—বিকুস্বামী, বল্লাভাচার্য ও চৈতন্য—৬৭৮ পৃঃ, বল্লাভী-সম্প্রদায়ের গুরুভক্তি—মাধ্বাচার্য (১১৯১ খৃঃ)—৬৭৯ পৃঃ, চৈতন্য ভাগবতাদি পুস্তকে চৈতন্যকে কৃষ্ণ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা—৬৮১ পৃঃ, চৈতন্যের বিনয়—৬৮২ পৃঃ, “মহাভাব”—৬৮২ পৃঃ, রূপদর্শন—৬৮৩ পৃঃ, গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম—৬৮৫ পৃঃ, ভাবপঞ্চক—৬৮৬ পৃঃ, শাস্ত্র, দান্ত, সখা ভাব—৬৮৬ পৃঃ, বাৎসল্য ও মাধুর্য—৬৮৭-৮৯ পৃঃ, হুঃখ-বাদ ও আনন্দ—৬৮৯ পৃঃ, পারিবারিক সন্ধ—৬৯০ পৃঃ, নীতিশাস্ত্র—৬৯০ পৃঃ, গানে গানে চৈতন্যের ইতিহাস রচনা—৬৯০ পৃঃ, কীর্তনের সঙ্গে চৈতন্যের সন্ধ—৬৯১ পৃঃ, মহাভজন গান—৬৯১ পৃঃ, পার্থিব মোড়কে আটা স্বর্গের চিঠি—গৌর চন্দ্রিকা—৬৯২-৯৪ পৃঃ, সন্ন্যাসের জন্ত প্রস্তুত হওয়া—৬৯৪ পৃঃ, প্রেমের সাগর-সঙ্গম—৬৯৫-৯৬ পৃঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ,—গৌরাঙ্গ ও তাঁহার পরিকরবর্গ—৬৯৭-৭৩৯ পৃঃ ।

চৈতন্যের পূর্বে দেশের অবস্থা—৬৯৭ পৃঃ, বংশাবলী—৬৯৭ পৃঃ, জগন্নাথ মিশ্র—৬৯৮ পৃঃ, বিশ্বরূপ ও নিমাই—৬৯৯ পৃঃ, ছরস্ত-পনা—৬৯৯ পৃঃ, অধ্যয়ন, বিবাহ ও পত্নী-বিয়োগ—৭০০-০১ পৃঃ, নিমাই ও ঈশ্বর পুরী—৭০২ পৃঃ, পাদপদ্ম, পূর্বরাগ—৭০৩ পৃঃ, ঈশ্বর পুরী সম্বন্ধে শচীদেবীর ভয়—৭০৫ পৃঃ, টোল-ত্যাগ—৭০৬ পৃঃ, ভট্টাচার্য্যের দল ও গৌরাই কাজির আদেশ—৭০৬ পৃঃ, মহাসঙ্কীর্তন—৭০৭ পৃঃ, কাজীর প্রীতি—৭০৭ পৃঃ, নিতাইয়ের আবির্ভাব—৭০৭ পৃঃ, মাধবেন্দ্র পুরী—৭০৮-০৯ পৃঃ, 'যার জন্ত গোপীনাথ ফীর করিলেন চুরি'—৭০৯ পৃঃ, অষ্টৈতাচার্য্য—৭১০ পৃঃ, নরহরি সরকার—৭১১ পৃঃ, শ্রীবাস—৭১২ পৃঃ, "হরিদাস"—৭১৪ পৃঃ, লোকনাথ গোস্বামী—৭১৬ পৃঃ, সনাতন ও রূপ—৭১৭-২১ পৃঃ, রঘুনাথ দাস—৭২১-২৪ পৃঃ, রামানন্দ রায়—৭২৫-২৬ পৃঃ, শিবানন্দ সেন, পরমানন্দ সেন, মুরারি গুপ্ত, পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধি, বাসুদেব সার্কভোম, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, রঘুনন্দন—৭২৬ পৃঃ, আগমবাগীশ—৭২৭ পৃঃ, পাণ্ডিত্যের যুগে ভাবের লীলা—৭২৭-২৮ পৃঃ, জগাই ও মাধাই—৭২৯ পৃঃ, চৈতন্যের সম্মাস—৭৩১ পৃঃ, 'আপনিই সেই ঝাড় দার'—৭৩৪ পৃঃ, পুরী-ত্যাগের সম্বন্ধ—৭৩৪ পৃঃ, চৈতন্যের প্রভাব—৭৩৬-৩৯ পৃঃ, কালোর উপরে দরদ—৭৩৯ পৃঃ ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ,—চৈতন্যের তিরোধান ও বৈষ্ণব সমাজ—৭৩৯-৪৭ পৃঃ ।

তিরোধান সম্বন্ধে নানা মত—৭৩৯ পৃঃ, চৈতন্যের তিরোধানের পর বৈষ্ণব সমাজের অবস্থা—৭৪১ পৃঃ, অর্ধ-শতাব্দী পরে—৭৪২ পৃঃ, তিনটি কেন্দ্র—৭৪২-৪৪ পৃঃ, রূপনারায়ণ—৭৪৫ পৃঃ, রূপ-সনাতনের দৈন্ত—৭৪৬ পৃঃ ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ,—শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ—৭৪৭-৬৯ পৃঃ ।

শ্রীনিবাস—৭৪৭ পৃঃ, নরোত্তম দত্ত—৭৪৮-৫০ পৃঃ, শ্যামানন্দ—৭৫০ পৃঃ, রাজ-দস্যুর খপ্পরে—৭৫২-৫৪ পৃঃ, হাথিরের অমৃত্যু—৭৫৫ পৃঃ, ধর্মের বিরুদ্ধে দ্বার-উদ্ঘাটন—৭৫৭-৫৯ পৃঃ, কায়স্থ গুরুর ব্রাহ্মণ শিষ্য—৭৫৯ পৃঃ, চাঁদরায়ের পীড়া—৭৬০ পৃঃ, তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান ও পরাজয়—৭৬৪ পৃঃ, মহাপ্রভুর ধর্মের ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা—৭৬৮ পৃঃ ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ,—গুরুবাদ ও পরকীয়া—৭৬৯-৮২ পৃঃ ।

গুরুবাদ—৭৬৯ পৃঃ, দেহতত্ত্ব—৭৭১ পৃঃ, পরকীয়া—৭৭২ পৃঃ, কিশোরী-ভজনের মেলা—৭৭৩ পৃঃ, সহজিয়াদের আদর্শ-প্রেম—৭৭৫-৭৬ পৃঃ, রস-সার—৭৭৬ পৃঃ, সহজিয়া আদর্শ—৭৭৭ পৃঃ, সাধু হুর্গাপ্রসাদ—৭৭৭-৭৮ পৃঃ, প্রাচ্য তপস্বী—৭৭৮-৮২ পৃঃ, সহজিয়া সাহিত্য—৭৮২ পৃঃ ।

ষোড়শ অধ্যায় ৭৮৩-৯৫৮ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—পাঠান বিদ্রোহ—৭৮৩-৮৫ পৃঃ।

কতলু খাঁ ও ওসমান—৭৮৪ পৃঃ, আবহুল রজ্জকের মুক্তি—৭৮৪ পৃঃ, ওসমানের অপূর্ণ সাহস ও মৃত্যু (১৬১২ খৃঃ)—৭৮৫ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—বাঙ্গলার বিদ্রোহিগণ—৭৮৬-৮০৮ পৃঃ।

পাঠান ও মোগল রাজত্ব—৭৮৬ পৃঃ, ১৫৮২ খৃঃ—৭৮৮ পৃঃ, জঙ্গলবাড়ী (১৫৮৫ খৃঃ)—৭৮৮ পৃঃ, প্রতাপাদিত্য—৭৮৯-৯০ পৃঃ, বসন্ত রায়ের হত্যা—৭৯১ পৃঃ, প্রতাপ সঙ্ঘের নানা কথা—৭৮৯-৯০ পৃঃ, ঘটক-কারিকা—৭৯৫ পৃঃ, কৈদার রায় ও চাঁদ রায়—৭৯৭ পৃঃ, কৈদার রায়ের মৃত্যু সঙ্ঘের নানাকথ প্রবাদ—৭৯৯ পৃঃ, করিমুল্লা—৮০০ পৃঃ, ভূষণার মুকুন্দরাম রায় ও ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্য—৮০১ পৃঃ, বঙ্গদেশে মোগলদের বিরুদ্ধে কেন হইল?—৮০১-০৩ পৃঃ, ফিরোজ খাঁর প্রতিজ্ঞা—৮০৩-০৮ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,—পর্তুগীজ দস্যু, কুচবিহার-যুদ্ধ প্রভৃতি—৮০৮-২০ পৃঃ।

আকবরের নীতি—৮০৮-১০ পৃঃ, আকবর ও অশোক—৮১০ পৃঃ, পর্তুগীজ জলদস্যু “হান্সাদ”—৮১১-১৬ পৃঃ, কুচবিহার রাজ্য—৮১৬-১৮ পৃঃ, মুওমালা ও তুরক কাটা—৮১৮ পৃঃ, ত্রিপুরা ও আসাম—৮২০ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,—মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্তৃগণ—৮২০-৪২ পৃঃ।

আকবরের নীতি—৮২১ পৃঃ, হুজুর্জাহানের জন্মকথা—৮২৩ পৃঃ, সের আফগানের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র—৮২৪-২৬ পৃঃ, জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ কাবুলী (১৬০৭ খৃঃ)—৮২৬ পৃঃ, পরবর্তী শাসনকর্তৃগণ—৮২৭ পৃঃ, সুজা বাদসাহ—৮২৮-৩৫ পৃঃ, মীরজুমলা—৮৩৫ পৃঃ, সায়েস্তা খাঁ—৮৩৬ পৃঃ, ফিদাই খাঁ আজিম খাঁ—৮৩৬ পৃঃ, সায়েস্তা খাঁ (দ্বিতীয় বার)—৮৩৬ পৃঃ, নওয়াব ইব্রাহিম খাঁ—৮৩৭-৩৮ পৃঃ, সুলতান আজিম ওয়ান—৮৩৮-৪১ পৃঃ, মুরসিদকুলি খাঁ—৮৪১-৪২ পৃঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ,—রাজা সীতারাম রায়—৮৪২-৫০ পৃঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ,—পরবর্তী বাদসাহগণ—৮৫০-৮০ পৃঃ।

পরবর্তী বাদসাহগণ—৮৫০-৫২ পৃঃ, সুজাউদ্দিন খাঁ—৮৫২-৫৩ পৃঃ, সরফরাজ খাঁ—৮৫৩-৫৪ পৃঃ, আলিবর্দি খাঁ—৮৫৪-৬১ পৃঃ, মুস্তাফা খাঁর দাবী—৮৫৮-৫৯ পৃঃ, বর্গীদের সঙ্গে শেষ সন্ধি—৮৫৯ পৃঃ, সিরাজউদ্দৌলা—৮৬১ পৃঃ, তারাসুন্দরী—৮৬৩ পৃঃ, ইংরেজ সংঘর্ষ—৮৬৮ পৃঃ, যড়যন্ত্র—৮৭০ পৃঃ, সিরাজের দৌর—৮৭৩ পৃঃ, মুস্তাফা খাঁ ও আলিবর্দি—৮৭৩ পৃঃ, সময় ব্যবহার—৮৭৪ পৃঃ, সবৎজ—৮৭৫ পৃঃ, পলাশীর যুদ্ধ—৮৭৬ পৃঃ, পরিজন-বর্জিত নবাব—৮৭৬ পৃঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ,—শিক্ষা-দোকান কথা—৮৮১-৯৫৮ পৃঃ।

পাঠানাদিকারে বাঙ্গালী—৮৮১-৮২ পৃঃ, বাঙ্গালীর স্বাভাব্য ও দিল্লীর বিদ্রোহ—৮৮২ পৃঃ, হিন্দু-শিল্প—৮৮২-৮৩ পৃঃ, বারহুয়ারী মসজিদ—৮৮৩-৮৪ পৃঃ, শের সাহের সমাধি—৮৮৪ পৃঃ, পৃথিবীময় হিন্দু কারিগর উপনিবিষ্ট হইয়াছিল—৮৮৬ পৃঃ, আরাজের কৃত শিল্প ও সঙ্গীতের নিরুৎসাহ—৮৮৭ পৃঃ, বাঙ্গালী মোগল কলমের পক্ষপাতী কেন হয় নাই?—৮৮৭-৮৯ পৃঃ, রাজপুত-শিল্প—৮৮৯ পৃঃ, কাজরা কলম—৮৯০-৯২ পৃঃ, সর্বধর্মের সমন্বয় চেষ্টা ও সহজিয়া—৮৯২-৯৬ পৃঃ, বলরাম হাড়ী—৮৯৩ পৃঃ, বাবা আউল—৮৯৩-৯৫ পৃঃ, সন্ধ্যাভাবা—৮৯৫ পৃঃ, বাঙ্গলার তথ্য-কথিত নিয়ন্ত্রণী—৮৯৫-৯৬ পৃঃ, গণিত—৮৯৬-৯০৫ পৃঃ, সহজিয়াদের তত্ত্বাদি জ্ঞান—৯০৫ পৃঃ, উচ্চ-শিক্ষা—৯০৬ পৃঃ, সঙ্গীতচর্চা—ভাটিয়াল—৯০৮ পৃঃ, মনোহর সাই—৯০৮-০৯ পৃঃ, স্ত্রীশিক্ষা—৯০৯-১০ পৃঃ, চন্দ্রাবতী, আনন্দময়ী ও ভ্রমরী দেবী—৯১০-১১ পৃঃ, হটী বিজ্ঞানকার—৯১১ পৃঃ, জামাশুন্দরী, গঙ্গামণি ও পার্শ্বতি দাসী—৯১২ পৃঃ, সতী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও ইংরেজ লেখকদের অভিমত—৯১৩-১৪ পৃঃ, প্রাচীন কালের দেবতা—৯১৪-১৫ পৃঃ, ডাক ও খনার বচন—৯১৫-১৮ পৃঃ, নিম্ন-শ্রেণীর লোকেদের সম্বন্ধে বিদেশীর অভিমত—৯১৮-২০ পৃঃ, বণিকগণের কথা—৯২৩-২৪ পৃঃ, জাহাজ-নির্মাণ—৯২৪-২৭ পৃঃ, শস্যের কারবার—৯২৮-৩১ পৃঃ, বস্ত্র-বয়ন শিল্প—মসলিন—৯৩১ পৃঃ, একটি বড় এলাচের খোলে ৪৫টি পৈতা—৯৩২ পৃঃ, বিদেশী মত, ৬০ হাত কাপড় হাতে রাখিলে টের পাওয়া যায় না, ৩০০০ বৎসর পূর্বে হিন্দু অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ১৭৫ হাত মসলিনের ওজন ৪ তোলা—৯৩৩ পৃঃ, মসলিন নামের উৎপত্তি ও প্রকার-ভেদ—৯৩৬ পৃঃ, ঢাকা মসলিনের চাহিদা—৯৩৭ পৃঃ, কারবারীদের কষ্ট, মসলিনের উৎকর্ষ ও স্থায়িত্ব, বিলাতের শিল্পীদের অনধিগম্য—৯৩৯ পৃঃ, চরকা ও ডলন কাটি—৯৪০ পৃঃ, রেশম—৯৪৩-৪৬ পৃঃ, বাঙ্গালীর পাণ্ডিত্য—৯৪৬ পৃঃ, বেদ-বিজ্ঞা—৯৪৬ পৃঃ, মৃত্যুঞ্জয়, রামরাম বহু, রামমোহন রায়, গঙ্গাধর কবিরাজ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রভৃতি—৯৪৭-৫৪ পৃঃ, মোগলাদিকারে বাঙ্গালী—৯৫৪-৫৮ পৃঃ।

সপ্তদশ অধ্যায় ৯৫৯-১০১২ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ—আদিযুগ—৯৫৯-৭৫ পৃঃ।

বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ—৯৫৯ পৃঃ, ভাষার তিন যুগ, ব্রজবুলি এ দেশ-প্রচলিত প্রাকৃতের নিদর্শন কিনা?—৯৬০ পৃঃ, ব্রজবুলি—৯৬১ পৃঃ, বৌদ্ধ দোহা ও গান—৯৬২ পৃঃ, বাঙ্গলার নাম প্রাকৃত—৯৬৩ পৃঃ, দেশী ধারা—৯৬৪ পৃঃ, প্রাকৃতসংস্কৃত যুগের বঙ্গ-সাহিত্য—গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র—৯৬৬ পৃঃ, ধর্মপূজার পুথি, গীতিকথা, রূপকথা ও পল্লীগাথা—৯৬৭-৬৯ পৃঃ, প্রবচন—৯৬৯ পৃঃ, মঙ্গলকাব্য—৯৭০ পৃঃ, শিবায়ন—৯৭১ পৃঃ, কৃষ্ণ-ধামালী, চণ্ডীমঙ্গল—৯৭২ পৃঃ, বৈষ্ণবদিগের শাক্ত বিষয়—৯৭৩ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—সংস্কৃত প্রভাবান্বিত বাঙ্গলা-সাহিত্য—১৭৫-৮৮ পৃঃ।

সংস্কৃত-প্রভাবান্বিত বাঙ্গলা-সাহিত্য—১৭৫ পৃঃ, ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে আদর্শের রূপান্তর—১৭৬ পৃঃ, তুর্কী নবাবদের দ্বারা বঙ্গভাষার উৎসাহ প্রদান—১৭৭ পৃঃ, সজয়, কাশীদাস এবং মহাভারতের অপরাপর অনুবাদকগণ—১৭৮-৭৯ পৃঃ, রামায়ণ, কৃত্তিবাস—১৭৯ পৃঃ, বুদ্ধের অবতার রামানন্দ ঘোষ ও অপরাপর রামায়ণের অনুবাদকগণ—১৮১ পৃঃ, ভাগবত ও অপরাপর পুরাণ—১৮১ পৃঃ, গীতগোবিন্দ—১৮২ পৃঃ, অনুবাদ সাহিত্যের স্থায়ী ফল—১৮২ পৃঃ, মনসাদেবীর গান—১৮৩ পৃঃ, মনসামঙ্গলের কবিগণ—১৮৩ পৃঃ, চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ—১৮৪ পৃঃ, ধর্মমঙ্গল—১৮৬-৮৮ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,—চৈতন্য যুগ—১৮৮-১০০২ পৃঃ।

চণ্ডীদাসের কবিতা—১৮৮-৯১ পৃঃ, বিষ্ণুপতি—১৯২-৯৩ পৃঃ, অপরাপর বৈষ্ণব পদ-কর্তা—১৯৩-৯৭ পৃঃ, মাথুর-গান—১৯৭-৯৯ পৃঃ, প্রাচীন যুগের শেষ অধ্যায়—১৯৯-১০০২ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,—কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎপরবর্তী যুগে বাঙ্গলা সাহিত্যের অবস্থা—১০০২-১২ পৃঃ।

ভারতচন্দ্র—১০০৩ পৃঃ, রামপ্রসাদ—১০০৪ পৃঃ, কৃষ্ণকমল গোস্বামী—১০০৬ পৃঃ, কবিওয়ালী—১০০৬ পৃঃ, দৈবর গুপ্ত—১০০৭ পৃঃ, আগমনী গান—১০০৮ পৃঃ, গোপাল উড়ে—১০০৯ পৃঃ, দাশরথি রায়, রামনিধি গুপ্ত—১০১০-১২ পৃঃ।

অষ্টাদশ অধ্যায় (পরিশিষ্ট) ১০১৩-১১৪০ পৃঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ,—বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস—ত্রিপুরা রাজ্য—১০১৩-২৩ পৃঃ।

পার্বি ইতিহাসের প্রতি উপেক্ষা—১০১৫ পৃঃ, রাজ-মালা—১০১৫ পৃঃ, ত্রিপুর—১০১৭ পৃঃ, ধ্বজ, চন্দ্র ও ত্রিশূল চিহ্ন—১০১৮ পৃঃ, হেরামধিপতির কন্যার সহিত বিবাহ—১০১৮ পৃঃ, হিমতি রাজা, বিশাল গড়, বৈকুণ্ঠপুর—১০১৯ পৃঃ, কীর্তিধর বা ছেংখোম্পা, মহারাজা ত্রিপুরা-সুন্দরী—১০১৯-২০ পৃঃ, রত্নকার মাতার পুত্র-বিরহ, পল্লীগাথা, গোড়েশ্বর এবং রত্নকা, গণিকাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, জমির বাঁর গড়ে যুদ্ধ—১০২২-২৩ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,—ধর্মমাণিক্য—১০২৩-৩০ পৃঃ।

প্রতাপ মাণিক্য, ধন্য মাণিক্য, সেনাপতিদিগকে হত্যা—১০২৪ পৃঃ, বরদাখাত দখল—১০২৫ পৃঃ, সেনাপতি চয়চাগ—১০২৫ পৃঃ, সৈন্তগণের মধ্যে জাতিভেদ বিলোপ, “কাঠি ছোঁয়া”—১০২৫ পৃঃ, ধানাহি হুর্গ অধিকার, দিগধর কুকীদের বঙ্গতা স্বীকার—১০২৬ পৃঃ, হুসেন সাহের সঙ্গে বিরোধ—১০২৭ পৃঃ, গোড়-মল্লিকের অপমান—১০২৭ পৃঃ,

চট্টগ্রাম ও আরাকান বিজয়, ত্রিপুর সৈন্তের উপর্যুপরি পরাজয়—১০২৭ পৃঃ, অদ্বুত উপায়ে গোমতির জল বাধা, হৈতেন খাঁ ও করাবীর পরাজয়, মল্লম্বলি নিবেধ, দুই মণ সোণার ভুবনেশ্বরী মূর্তি—১০২৮ পৃঃ, উৎকল খণ্ড পাঁচালী, প্রেত চতুর্দশী, পল্লীগাথা, স্থপতির মুণ্ডচ্ছেদ, দেব মাণিক্য—১০২৯ পৃঃ, হুঁরাচার তাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ—১০৩০ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,—১০৩০-৩৯ পৃঃ।

বিজয় মাণিক্য—খাসিয়া, শ্রীহট্ট ও জয়ন্তীর আত্মগতা স্বীকার, মবারক খাঁকে বলিদান—১০৩০ পৃঃ, বিজয় মাণিক্যের দিগ্বিজয়—১০৩১ পৃঃ, অনন্ত মাণিক্য ও উদয় মাণিক্য, চট্টগ্রাম হইতে বেদখল—১০৩২ পৃঃ, উদয়মাণিক্য ও জয়মাণিক্য—১০৩৩ পৃঃ, অমরমাণিক্য, অমর দীঘি, ভুলুয়া জয়, শ্রীহট্টের রাজা ফতে খাঁ বন্দী, ইসা খাঁ মহলন্দী, বাকলা-জয়—১০৩৩ পৃঃ, ভূতই বড় না রাজাই বড়, মগদেশ-বিজয়—১০৩৪ পৃঃ, মগদেশাধিপতি সেকন্দরের বিজয়, অমরমাণিক্যের অদ্বুত সাহস ও আত্মহত্যা, রাজধর-মাণিক্য—১০৩৫ পৃঃ, যশোধরমাণিক্য, কল্যাণমাণিক্য, গোবিন্দমাণিক্য, মধো ছত্রমাণিক্য—১০৩৬ পৃঃ, পুনরায় গোবিন্দমাণিক্য, রামমাণিক্য—বিচারে দয়া, রত্নমাণিক্য, নরেন্দ্রমাণিক্য, পুনরায় রত্নমাণিক্য, মহেন্দ্রমাণিক্য—১০৩৭ পৃঃ, ধর্মমাণিক্য (দ্বিতীয়), মুকুন্দমাণিক্য, মহাভারতের বঙ্গাভাবাদ—১০৩৮ পৃঃ, পুনরায় জয়মাণিক্য—১০৩৮ পৃঃ, বিজয়মাণিক্য ও লক্ষণমাণিক্য—১০৩৯ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,—লক্ষণমাণিক্য—কৃষ্ণমাণিক্য—১০৪০-৫০ পৃঃ।

“ আমি যুদ্ধ-জয় করি, তুমি অধিকারী,” লক্ষণমাণিক্য—১০৪১ পৃঃ, কৃষ্ণমাণিক্য, কৃষ্ণমালা—১০৪২ পৃঃ, বঙ্গভাবার উৎসাহদান, গণতন্ত্র, প্রজাদের ক্ষমতা—১০৪৪ পৃঃ, সীমানা, বংশাবলী—১০৪৫ পৃঃ, হালামদের উপাধি, ত্রিপুরার শিল্প—১০৪৭ পৃঃ, হিন্দু ও মুসলমান ইতিহাস-লেখক—১০৪৮ পৃঃ, বসন্ত রোগ—১০৪৯ পৃঃ, দ্বাদশমণ্ডল—১০৫০ পৃঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ,—প্রাগজ্যোতিষপুর—১০৫০-৫২ পৃঃ।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ—১০৫০ পৃঃ, বাণলিঙ্গ—১০৫১ পৃঃ, কামাখ্যা তীর্থ চিত্র-বিজ্ঞা—১০৫২ পৃঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ,—ঐতিহাসিক যুগের আদিকাল—১০৫৩-৫৫ পৃঃ।

ভাস্কর বর্ম্মা—১০৫৩ পৃঃ, হর্জর বর্ম্মা, বনমাল, রত্নপাল—১০৫৪ পৃঃ, ইন্দ্রপাল, ধর্ম্মপাল, সীমা—১০৫৫ পৃঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ,—পাঠান-আক্রমণ ও ক্রমশঃ অধিকার-সঙ্কোচ—১০৫৫-৬৮ পৃঃ।

কামতা দখল—১০৫৬ পৃঃ, অহম্মরাজগণ—স্বকাকা, স্বতিকা, স্বদিনকা, স্বখাংকা—১০৫৭ পৃঃ, স্বপ্রাংভা, স্বতুকা, টায়াওখামটি, স্বদাংকা, স্বজাংকা হইতে স্বহেনকা, স্বপিংকা,

সুহৃৎমং—পাঠানদের পরাভব—১০৫৮ পৃঃ, সুরেন্দ্রনাথ, সুখান্দা—১০৫৯ পৃঃ, প্রতাপসিংহ, নরিয়া রাজা, জয়ধ্বজ—১০৬০ পৃঃ, চক্রধ্বজ, উদয়াদিত্য হইতে পাঁচ জন নৃপতি, লরারাজা—১০৬১ পৃঃ, গদাধর সিংহ, রুদ্র সিংহ—১০৬২ পৃঃ, শিব সিংহ, লক্ষ্মী সিংহ, বৈষ্ণব বিদ্রোহ—১০৬৩ পৃঃ, গৌরীনাথ হইতে পুরন্দর সিংহ ৪ জন নৃপতি—১০৬৪ পৃঃ, শিয় ও স্থাপত্য— ১০৬৮ পৃঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ,—কোচবিহার—১০৬১-৭৬ পৃঃ।

ব্রহ্মপাল হইতে ভবচন্দ্র—১০৬৯ পৃঃ, শিববংশ, চন্দন সিংহ, বিশ্বসিংহ —১০৭০ পৃঃ, চিলারায়, নরনারায়ণ—১০৭১ পৃঃ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও বীরনারায়ণ—১০৭২ পৃঃ, রাজার অদ্ভুত কার্য্য ও মৃত্যু, প্রাণনারায়ণ—১০৭৩ পৃঃ, মোদনারায়ণ, বাসুদেব নারায়ণ ও মহেন্দ্রনারায়ণ—১০৭৪ পৃঃ, রূপনারায়ণ, উপেন্দ্র ও দেবেন্দ্রনারায়ণ—১০৭৫ পৃঃ।

নবম পরিচ্ছেদ,—কাছাড় (হেরম্ব)—১০৭৬-৮০ পৃঃ।

মহাভারতের বীরগণের সহিত সম্বন্ধ—১০৭৭ পৃঃ, বংশাবলী—১০৭৮ পৃঃ।

দশম পরিচ্ছেদ—শ্রীহট্ট—১০৮০-৯৬ পৃঃ।

শ্রীহট্টের শাসন—১০৮১ পৃঃ, শ্রীহট্টের প্রাচীন তীর্থ—১০৮২ পৃঃ, প্রাচীন ইতিহাস—১০৮৪ পৃঃ, কেশবের তাম্রশাসন—১০৮৫ পৃঃ, গোড়গোবিন্দ কে ?—১০৮৬ পৃঃ, মুসলমান-বিজয়—১০৮৮ পৃঃ, শ্রীহট্টের স্বাধীনতালোপ—১০৯০ পৃঃ, সাহজালালের দরগা, শ্রীহট্টের নবাবগণ—১০৯০ পৃঃ, আমিল, নবাব হরেকৃষ্ণ—১০৯১ পৃঃ, ইটা, প্রতাপগড় ও লাউড়—১০৯২ পৃঃ, নবাব রাধারাম—১০৯৩ পৃঃ, লাউড়—১০৯৪ পৃঃ, শিল্প—১০৯৫ পৃঃ, কামান—১০৯৬ পৃঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ,—মণিপুর—১০৯৬-৯৯ পৃঃ।

মিতাই রাজবংশ—১০৯৬ পৃঃ, নরসিংহ, নবীন সিংহ—১০৯৭-৯৮ পৃঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ,—মেদিনীপুর—১০৯৯-১১০৭ পৃঃ।

রাজা গুরুর্ক-শ্রীচন্দন পাল—১১০৪ পৃঃ, নারায়ণবল্লভ-শ্রীচন্দন পাল, দেবীবল্লভ-শ্রীচন্দন পাল, গ্রামবল্লভ-শ্রীচন্দন পাল মাড়ি স্থলতান, রাজা মধুসূদনবল্লভ-শ্রীচন্দন পাল মাড়ি স্থলতান ও রাজা পরীক্ষিৎ-শ্রীচন্দন পাল মাড়ি স্থলতান—১১০৫ পৃঃ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ,—বন-বিষ্ণুপুর,—১১০৮-১৮ পৃঃ।

আদিমল্ল—১১০৯ পৃঃ, আদিমল্লের অভিষেক—১১১০ পৃঃ, মল্লেশ্বর, গ্রামরায়, জোড় বাজলা, লালজী, মুরলীমোহন—১১১১ পৃঃ, মদনগোপাল, মদনমোহন, রাধাশ্যাম, রাধামাধব—১১১৮ পৃঃ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ,—ভুলুয়া বা নোয়াখালী—১১১৯-২৩ পৃঃ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ,—সুন্দরবন—১১২৩-৩২ পৃঃ।

পুরাতত্ত্ব—১১২৩ পৃঃ, কালিদাস দত্ত লিখিত সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—১১২৬ পৃঃ,
পৌরাণিক গ্রন্থে সুন্দরবন, ঐতিহাসিক যুগে সুন্দরবন—১১২৭ পৃঃ, পাল রাজত্বকাল—
১১২৮ পৃঃ, সেন রাজত্বকাল—১১২৯ পৃঃ, মুসলমান রাজত্বকাল—১১৩০ পৃঃ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ,—অন্যান্য রাজ্য ও জমিদারগণ—১১৩২-৪০ পৃঃ।

মুরসিদাবাদ—১১৩২ পৃঃ, কৃষ্ণনগর, ভাওয়াল—১১৩৩ পৃঃ, ময়নাগড়, পুঁটিয়া—
১১৩৪ পৃঃ, নাটোর, কাশীমবাজার—১১৩৫ পৃঃ, দীঘাপাতিয়া, দিনাজপুর, ঢাকা—১১৩৬
পৃঃ, অপরাপর কথা—১১৩৭-৪০ পৃঃ।

বৃহৎ বঙ্গ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

আনুগঙ্গ প্রদেশ

“বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কুশঃ স্তনীনয়ো নহি দূরতরস্থঃ ।

অযুতশতবরনারীভিঃ পরিবৃতঃ করিবরকোটাশ্বরো নৈব হি নৃপতিঃ ॥”

সিদ্ধনদের গভী ত্যাগ করিয়া আর্ধ্যগণ আর্ধ্যাবর্ষের সর্বত্র স্মরণাতীত কালে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বপ্নে মূলতঃ সিদ্ধনদেরই মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। উত্তরকালে সম্ভবতঃ সমুদ্র দেখিয়া তাঁহারা উহা সিদ্ধনদের মতনই বিশাল কোন নদ মনে করিয়াছিলেন—তাই সমুদ্রের অপর নাম সিদ্ধ। এই সিদ্ধ নদ হইতেই হিন্দু, হিন্দু, হিন্দুহান প্রভৃতি নাম হইয়াছে।



মকরের উপর গঙ্গাদেবী। গুলনা
জেলায় ঈশ্বরীপুরে প্রাপ্ত প্রত্নদর্শিত্ব হইতে
গৃহীত। দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

রামায়ণে আমরা গঙ্গার যে প্রথম বর্ণনা পাই, তাহা যেন একটা নূতন বিশ্বয় ও আনন্দের ভাব প্রকাশ করিতেছে। গঙ্গার জলরাশি কোথাও বায়ুবেগে চূর্ণ হইয়া সুন্দরীর বেণীর ছায় ছলিয়া উঠিয়াছে; কোথাও জল আবর্ত-শোভিত, কোথাও বেণু-বীণার ছায় তরঙ্গের সুর-লহরী; কখনও জলের গভীর নিঃস্বনে দিব্ প্রতীশব্দিত; কোথাও নির্মলবালুকাময় তটভূমি শারদীয় জ্যোৎস্নার ছায় প্রিয়দর্শন; কোথাও তটভঙ্গ-শব্দে চতুর্দিক্ কম্পিত; কখনও জলের অটুহাস্ত-শব্দে সিকতাভূমি কলধনা,— কোথাও বা মালার ছায় তীরকূহ বৃক্ষদ্বারা সমলঙ্ঘিত; কখনও স্তম্ভকেনরাশি যেন স্থিতবদনার হাসির ছায় মনোহর (রামায়ণ, অযোধ্যা, ৪০ অঃ, ১৩-২৫ শ্লোক)। রামায়ণে গঙ্গার এবং বিধ বর্ণনা নব-সাক্ষাৎ ও নব-আবিষ্কারের আনন্দ সূচনা করিতেছে।

যতই আর্ধ্যগণ আর্ধ্যবর্ষের নানাস্থানে যাইয়া বসবাস করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভারতীয় নিবিড়

গঙ্গার মহিমা ও তাহার কারণ।
অরণ্যের মধ্যে দিশে-হারা আর্ধ্য-পথিক কোথায় যাইয়া পড়িবেন, এই আশঙ্কায় তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইলেন। মূল আর্ধ্যসমাজের সঙ্গে

যোগ বাহাতে ছিন্ন না হয়,—প্রত্যেক আর্ধ্যের বাসস্থান বাহাতে এক্রপ ভাবে নির্দিষ্ট থাকে, বাহাতে প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সমাজের আস্থানে সকলেই সাড়া দিতে পারেন,—সীতাকে অবেষণ করিতে যাইয়া স্ত্রীকে যেরূপ সমস্ত পৃথিবীর মানচিত্র ঘাঁটিতে হইয়াছিল,—আর্ধ্যসমাজের কোন পথ-দ্রষ্টা পরিবারকে বাহাতে তেমনই উৎকট ভাবে সন্ধান করিতে না হয়, তজ্জন্ত কেন্দ্রীয় সমাজ ব্যস্ত ও চেষ্টিত হইলেন।

রামায়ণে গাঙ্গেয় প্রদেশের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে স্পষ্টই ধারণা হয়, আর্ধ্যগণ সেই স্থানটিই উপনিবেশের পক্ষে প্রকৃষ্ট মনে করিয়াছিলেন। রামায়ণের বর্ণনায় গঙ্গা শিব-জটা-জুট-জুটা, কিন্তু শিবপত্নী নহেন, তিনি সাগর-মহিষী; “শঙ্করস্ত জটা-জুটা গঙ্গা সাগরমহিষী।” (অযোধ্যাকাণ্ড)

রামায়ণেরও পূর্বে হইতে আর্ধ্যগণ গাঙ্গেয় তটভূমিকে বসবাসের জন্ত মনোনীত করিয়া লইয়াছিলেন। ক্রমে এই গঙ্গার মাহাত্ম্য নানা পুরাণে কীর্ণিত হইল। সিদ্ধ, যমুনা, গোদাবরী প্রভৃতি শত শত নদ-নদী এই প্রদেশ অলঙ্কৃত করিতেছে। কিন্তু স্বয়ং শিব যে গঙ্গাকে শিরে ধারণ করিয়াছেন, সেই গঙ্গার পাবনী শক্তি বর্ণনা করিতে যাইয়া পুরাণকারেরা কতই না উপকথার সৃষ্টি করিয়াছেন! বাহারা গঙ্গাতীরবাসী তাঁহাদের জন্ত অক্ষয়-বর্গ পরিকল্পিত হইয়াছে; শত শত ক্রোশ দূর হইতে গঙ্গার জল অমূল্য সম্পদের স্থায় ভারে ভারে বাহিত হইয়া লইয়া যাওয়া হইত। সোমনাথ বিগ্রহ প্রতিদিন সেই সত্ত্ব: সংগৃহীত গঙ্গানীরে অভিষিক্ত হইতেন। একজন্ত শত সহস্র লোক গুজরাট হইতে সারি দিয়া গঙ্গার উপকূল পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিত; এক এক কলসী জল শত শত ক্রোশ অতিক্রম করিয়া হাতে হাতে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে মন্দিরে আনীত হইত। ভারতের দূরদূরান্তরে কেহ কেহ দীর্ঘ খনন করাইয়া গঙ্গাজলে উহা পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিতেন। তখনকার দিনে, যখন বাতাসাত বহু বিয়-সঙ্কুল ও বিপজ্জনক ছিল, তখন এইরূপ কার্য যে কত কষ্টসাধ্য ও ব্যয়জনক ছিল, তাহা অস্বপ্নান করা যাইতে পারে। গঙ্গাতীরে মরিবার ইচ্ছা হিন্দুর স্বাভাবিক, উহা অপরিহার্য্য সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। কত আসন্ন-মৃত্যু ধনবান্ হিন্দু বহুদূর হইতে গঙ্গাতীরে আনীত হইতেন। রোজ, বৃষ্টি, হিম, শীতের প্রকোপ ও প্রচণ্ড ঝড় সহ্য করিয়া চিরদিন আরামে পালিত ধনী ব্যক্তি মৃদুস্বাকালে অগ্নানচিত্তে দিনের পর দিন গঙ্গাতীরে অতি অস্ববিধাজনক স্থানে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। *

* এই সংস্কার হিন্দুর ধর্মের কতটা বহুল হইয়াছিল তাহার একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত দিতেছি। যোর ইংরাজী সভ্যতার পঞ্চাশতী ব্রাহ্ম-মতাবলম্বী ঢাকা-নবগ্রাম নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পার্শ্বতীচরণ রায় বৃদ্ধবয়সে

হিন্দু গঙ্গাভক্তির উদাহরণ সকলেই জানেন। ইহার বহু উদাহরণ সকলেই দিতে পারেন। কিন্তু বাহার এই সংস্কারটি সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি মূলতঃ ধর্মমূলক ছিল? আমার মনে হয়, এই গঙ্গাজলকে পানী, তাপী, আর্দ্র ও মুমূর্ষুর অনন্তশরণ পরিকল্পনা পূর্বক স্মৃতিকার আর্ঘ্যসমাজের উপনিবেশ একটা নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ করিয়া জাতীয় ঐক্য দৃঢ়বদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই সংস্কারের জন্ত গঙ্গার দুই তীর আধ্যানিবাসে সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিয়াছিল। গঙ্গাতীরে বাস পরম প্রাচ্যার বিদ্য, এই বিশ্বাসে ধর্ম্মাহুগী হিন্দু পুণ্য অর্জন করিবার আশায় গঙ্গাতীরে বাসের জন্ত এতটা লোলুপ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক টুকরা অস্থি যে গঙ্গার জল স্পর্শ করিলে মৃতের আর নরক-ভোগ অসম্ভব হয়, এমন নদীকে কে উপেক্ষা করিবে? এমন কি পাঠান দরাক্ খাঁ পর্যন্ত সংস্কৃতে গঙ্গাস্তব লিখিয়া গিয়াছেন।* পাদটাকায় উল্লিখিত বিধর্ম্মী পার্শ্বতী রায় লগুনে বাস করিয়া এক ফোঁটা গঙ্গার জলের জন্ত মৃত্যুকালে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। স্বয়ং আলিবর্দি খাঁ মৃত্যুকালে কিরীটেধরীর পাদস্পৃষ্ট গঙ্গাজল পান করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

এই বহু-ব্যাপক সংস্কারের ফলে আর্ঘ্যসমাজের বাসস্থান একটি গঙীতে বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল। গঙ্গার দুই তীর ঘুরিলে মূল আর্ঘ্যসমাজের একটা প্রধান

পেঙ্গন লগুয়ার পরে জীবনের শেষ ভাগ বিলাতে বাপন করেন; সেই বয়সে তিনি বিপত্নীক হইয়া বিলাতে এক মেম বিবাহ করেন। কিন্তু এই সময় স্বদেশ ও স্বসমাজ হইতে দূরে বাইয়া তাঁহার হিন্দুধর্মে স্নেহিত সঙ্গা হইয়া উঠে। তিনি ইংরাজীতে "From Hinduism back to Hinduism" (হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া এ ধর্ম্ম পুনর্গ্রহণ) নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। যে সময়ে তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল, তখন তিনি তাঁহার বিদেশিনী পত্নীকে অশ্রুপূর্ণ করিয়া বলেন যে, মৃত্যুর পূর্বে তিনি বাহাতে একবিন্দু গঙ্গাজল পান করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা না করিলে তাঁহার মৃত্যু স্বথকর হইবে না। এই রমণী বিলাত হইতে রায় মহাশয়ের আত্মীয়গণের নিকট এক শিশি গঙ্গাজল পাঠাইবার জন্ত কাকুতি মিনতি করিয়া যে সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহার আত্মীয় স্নেহলব্ধ শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেনের নিকট ছিল। আমি সেগুলি পড়িয়াছি, তাহাতে "Poor dear cries for a drop of Ganges water"—"আমার প্রণয়সঙ্গী স্বামী এক ফোঁটা গঙ্গার জলের জন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন" প্রকৃতি ভাষের কথা ছিল। একপ সাহেবী ভাবাপন্ন স্বদেশত্যাগী ব্যক্তির মনের এইরূপ সংস্কার কি আশ্চর্যের বিষয় নহে? আমি বেহালায় থাকি; কোন কোন সময় বেথিয়াছি, ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দে ক্রমশঃ করিয়া লোকেরা দক্ষিণদিক্ হইতে শব কাণে করিয়া লইয়া যাইতেছে—গঙ্গাতীরে দাহকাণ্ড করিবার জন্ত।

* দরাক্ খাঁ-কৃত গঙ্গাস্তব হইতে নিম্নে চারিটি ছত্র উদ্ধৃত করিলাম :—

"স্বধূনিমুনিকন্তে তারয়ে: পুণ্যবস্তম্।

স তরতি নিজপুণ্যস্তজ কিণ্ডে মহবম্।

যদি চ গতি-বিহীনং তারয়ে: পাগিনং মাম্।

তদপি তব মহবং তদমহবং মহবম্।"

শাখার সন্ধান পাইতে কোনও কষ্টই হয় না। নতুবা এক সময়ে যে ঝারিখণ্ড বন সিংহ,

আমুগঙ্গ প্রদেশে আবা-
সমাজের প্রতিষ্ঠা।

বায়্র ও অপরাপর হিংস্র পশুসমূহ ছিল, যে প্রাগজ্যোতিষপুর
অতি দুর্গম অরণ্য ভেদ করিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইত, পুরাণের
উপগল্প কথঞ্চিৎ মানিয়া লইলে, সগরের অসংখ্য বংশধর যে রাজ্য

স্থাপন করিতে বাইরা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন—সেই কিরাত, মেচ, কুকি,
হাজাং, চাকমা প্রভৃতি জাতি-অধ্যুষিত অরণ্য প্রদেশে কে ভরসা করিয়া আসিত ?
গঙ্গা শুধু তাঁহার স্বীয় উপকূল নহে, চতুর্দিক সমস্ত জন-বিরল স্থানে আর্ধ্যসমাজকে
আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন। এই জন্ত কালীঘাটের মরাগঙ্গার কর্দম-জলে অবগাহন
করিবার জন্ত নিত্য শত শত লোকের ভিড় হয়,—অথচ এককালে যে সকল নদী গঙ্গার প্রধান
শাখা ছিল, ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধাধিকারে দূষিত মনে করিয়া বাহাদেবের মহিমা লুপ্ত করিয়া
দিয়াছেন—পূর্ববঙ্গের সেইরূপ বড় বড় নদীর এখন আর আদর নাই।

বাহাদেবের পক্ষে নানা কারণে গঙ্গাতীরে বাস করা অসম্ভব হইয়াছিল, সামাজিকগণ

তাঁহাদিগকেও ঘন ঘন গঙ্গাতীরে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

দূরে অবস্থিত হিন্দু-
লিগকে ঘন ঘন গঙ্গাতীরে
আহ্বান।

পঞ্জিকা হাতে লইলেই দেখিবেন, কোন্ কোন্ যোগে গঙ্গাস্নান
গৃহস্থের পক্ষে অবশ্যপালনীয় ; সেই সেই যোগে এবং গ্রহণাদি
উপলক্ষে গঙ্গাতীরে যে ভিড় হয় উহা সামলাইয়া লইতে অসংখ্য

স্বৈচ্ছাসেবক গলদুর্ঘট হইয়া পড়েন।

গঙ্গাভক্তি আর্ধ্যসমাজকে ঐক্যের অচ্ছেদ্য হস্তে আবদ্ধ করিয়াছিল। গঙ্গা শতমুখে
সমুদ্রে পড়িয়াছেন ; আমাদের বঙ্গদেশ—শুধু বঙ্গদেশ নহে, সমস্ত পূর্বভারত গঙ্গার
আবির্ভাবে ধন্ত হইয়াছে। এই গঙ্গার উপকূলে শত শত মঠ উখিত হইয়া এককালে
ভারতীয় সভ্যতার দিক্‌প্রদর্শন করিয়াছিল। গঙ্গার উপকূলবর্তী ও তৎপার্শ্ববর্তী বিশাল
জনপদ—মঠ, মন্দির, অট্টালিকা ও রাজপ্রাসাদে সমলঙ্কৃত হইয়া এবং কৃষকের হলচালনের পক্ষে
উৎকৃষ্ট উর্বর ভূমি বহন করিয়া লক্ষীর পদাঙ্ক-লাঞ্চিত হইয়াছে। যেখানে গঙ্গা স্রবৎ পৌছিতে
পারেন নাই, প্রাচীন কালের এক রাজর্ষি দীর্ঘজীবনের তপস্তার দ্বারা প্রশস্ত খাদ খনন
করিয়া বহু-বোজন-ব্যাপক সেই মহাদেশে তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছিলেন ; সেই পুণ্যলোক
মহাজনের কার্য সম্বন্ধে আমাদের প্রবচন-সম্রাট ডাক বলিয়াছেন, “মরুবি যদি মরুগে ভগার
খাদে” (যদি মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় হয়, তবে ভগীরথের খাদে মরাই শ্রেয়ঃ)।

সিদ্ধ ও সরস্বতীর যে উজ্জ্বলিত বর্ণনা ঋগ্বেদে পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে পুরাণে লিখিত
গঙ্গা-স্তোত্রের একটা ভেদ দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩য় সূক্ত, ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬১ ও

অপরাপর নদ-নদীর
সঙ্গে গঙ্গার পার্থক্য।

৬৪ সূক্ত, সপ্তম মণ্ডলের ৩৬ ও ২৫ সূক্ত পাঠ করিলে দেখিতে
পাইবেন, ঋগ্বেদের ঋষিরা সিদ্ধ ও সরস্বতী সম্বন্ধে যে সকল স্তোত্র
লিখিয়াছেন, তাহা উজ্জ্বলিত কবিতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বিশালতোয় জলরাশির অপরূপ রূপ, মধুপুষ্পপ্রসূ তরলতাসমলঙ্কৃত তটভূমি ও নানা

শাখাসেবিত তরঙ্গভঙ্গ দর্শনে বৈদিক কবি বিশ্ব ও আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া স্তোত্র পাঠ করিয়াছেন। বায়ীকৃত গজাবর্ণনা (রামায়ণ, অযোধ্যা) কতকটা সেইরূপ বটে, কিন্তু পুরাণের প্রশংসা অত্যাধিক, তাহাতে গজাতীরে বাস হিন্দু দ্বিতীয় অমুশাসনের অন্তর্গত হইয়াছে। সেই সকল শ্লোক কবিত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া সামাজিক বিধিতে পরিণত হইয়াছে,—তাহাদের উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট।

আমাদের বাঙ্গলাদেশ যে মহাপ্রাকৃতিক শক্তির পূণ্য-প্রভাবে ধনধান্যশালী, শ্রামশ্রী-মণ্ডিত ও সভ্যতার শেখরাসীন হইয়াছিল—সেই স্মরণীয়দ্বীপকে ভগীরথের পূর্তকৌশল যেদিন শাখা-প্রশাখা-সমৃদ্ধ করিয়া এ দেশে বহমান করিয়াছিল, সেইদিন একসঙ্গে এদেশে আৰ্য্যসভ্যতা এবং ভাগ্যলক্ষীর প্রবেশপথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। গঙ্গার এক স্তোত্রে ভক্তিমান কবি লিখিয়াছেন যে, হে মাতঃ গঙ্গে ! তোমা হইতে দূরে অবস্থিত কোন রাজ্যের অধীশ্বর হওয়া অপেক্ষা তোমার জলের ক্ষুদ্রতম মংগল বা কচ্ছপ হওয়াও আমি অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বুহৎ বঙ্গে বৌদ্ধ ইতিহাসের বিলোপ

“অশোক বাহার কীর্তি ছাইল

গাঙ্গার হ’তে জলদি শেষ

তুই কিনা মাগো তাদের জননী,

তুই কিনা মাগো তাদের দেশ।” —দ্বিজেন্দ্রলাল।

বৈদিক ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, পূর্নভারত অতি প্রাচীন কাল হইতেই আৰ্য্যনিবাসে পরিণত হইয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রগণকে বিখ্যামিত্রের সন্তান বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। রামায়ণে দেখিতে পাই, চন্দ্রবংশীয় অমর্ত্য নামক এক নৃপতি ধর্ম্মারণ্যের নিকট প্রাগ্জ্যোতিষপুর স্থাপন করেন।

প্রাচ্য ভারতে আৰ্য্য-নিবাস।

শতপথ ব্রাহ্মণের প্রমাণে দৃষ্ট হয়, বিদেঘমাধব নামক কোন রাজা মিথিলায় আৰ্য্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। মহাভারতের কর্ণপর্বে লিখিত হইয়াছে, “পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও চৈদি দেশীয় মহাশূর্য্য শাখত পুরাতন ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত আছেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন।” হরিবংশে লিখিত আছে, পুরুষ পঞ্চপুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, সূর্য্য, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ—ইহারা ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। সাগর-সঙ্গমের নিকট ‘কপিলান্দ্রম’ অতি প্রাচীন আৰ্য্যতীর্থ। সাগর-সঙ্গমের এই কপিলান্দ্রমে এখনও বৎসর বৎসর সাগরে স্নান উপলক্ষে অসংখ্য জনতা হইয়া থাকে। ভগীরথ এইখানে

গঙ্গার নবশাখা খনন করিয়া সমুদ্রের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছিলেন; কপিল, ভগীরথ ও গঙ্গার বিগ্রহ এখনও তথায় পূজিত হইয়া থাকে। ত্রিপুরার চতুর্দশ দেবতা-পূজক চত্বাইগণ সেই হইতে তথায় বাইয়া বঙ্গের দূরতর সীমায় আর্ঘ্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ তীর্থও অতি প্রাচীন। শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে বহু প্রাচীন তীর্থ আছে, সেগুলি স্বর্ণযুগের কাল হইতে বিদ্যমান। আমরা পরে তাহা আলোচনা করিব (পরিশিষ্টে শ্রীহট্টের ইতিহাসাংশ দ্রষ্টব্য)।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, পূর্বভারতে আর্ঘ্যসভ্যতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের বিষয় নহে। তৎপরে কৃষ্ণের জাতি ২২শ তীর্থঙ্কর নেমিনাথ অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশে আসিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি বিদ্রোহের ভাব শিক্ষা দেন; তিনি এই সকল দেশে জৈনধর্ম বিশেষ করিয়া প্রচার করেন। মগধাধিপতি জরাসন্ধ, প্রাগজ্যোতিষপুরের নরক, ভগদত্ত, পৌণ্ড্র বাহুদেব প্রভৃতি পূর্বভারতের রাজারা কৃষ্ণদেবী ছিলেন; ত্রিপুরাধিপতি ত্রিপুর নিজেই স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম-বস্তায় পূর্বভারত ভাসিয়া গিয়াছিল, সুতরাং ব্রাহ্মণেরা এই দেশকে তাঁহাদের গভীর বহির্ভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্রে অনেক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়া সমস্ত পূর্বভারতকে কলঙ্কলাঙ্কিত করিয়াছিলেন; অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ এমন কি সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত বৃহৎ জনপদকে তাঁহারা আর্ঘ্যগভীর বহির্ভূত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন—“বাহারা তীর্থ-যাত্রার উপলক্ষ ভিন্ন এই সকল দেশে গমন করিবেন তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্বদেশে ফিরিবার অধিকার লাভ করিতে হইবে।”

“অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে সৌরাষ্ট্রে মগধেপি চ।

তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥”

কিন্তু শ্লোকটির দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, এই বৃহৎ নিষিদ্ধ জনপদে আর্ঘ্যগণ-পূজিত অনেক তীর্থ বহুপূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। এক কালে যে সকল স্থানে ঈশ্বরী তীর্থস্থান করিয়াছিলেন, পরবর্তী যুগে উহারা নিষিদ্ধ রাজ্যে পরিগণিত হইল কেন? আদি-যুগে এ রাজ্য আর্ঘ্যগণের অধুষিত হইয়া পরে তাঁহাদের এক বৃহৎ শাখা দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল কেন? ইহার উত্তর এই,—বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের হাওয়া বহিয়া হিন্দুর চক্ষে এ দেশকে দূষিত করিয়াছিল। তীর্থঙ্করচূড়ামণি পার্শ্বনাথ পুণ্ড্র, রাত ও তাম্রলিপ্তি প্রদেশে চাতুর্গাম ধর্ম প্রচার-পূর্বক কলহস্তের শিক্ষা দিয়া বঙ্গ ও কন্দকাণ্ডময় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই জন্ত হিন্দুদিগের দ্বারা এই দেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এই

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিষয়ে
পূর্বভারত নিগূহীত।

নিষেধবিধি পূর্বভারতে আর্ঘ্য-উপনিবেশের আধুনিকত্ব প্রমাণিত করে না,—আর্ঘ্যগণের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় হিন্দু-বিষেধের পরিচয় প্রদান করে মাত্র। যে মগধ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ ভারতের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব, তাহাদিগকে অনাধ্য বুলিয়া ঘোষণা করা ঘোর অসহ্যার ফল।

গৌড় সভ্যতা অতি প্রাচীন। পরবর্তী গৌড়েশ্বরগণ “পঞ্চগৌড়েশ্বর” অথবা বিজয়পুত্রের উত্তরবর্তী সমস্ত আধ্যাত্মিক অধিকার এই গৌরবান্বিত উপাধি ধারণ করিতেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটা প্রাচীন রীতির প্রবর্তনা করিয়াছিলেন গৌড়ীয় আলঙ্কারিকগণ।

রামায়ণ ও মহাভারতকে আমরা বর্তমান যুগের নির্দেশ অনুসারে ঠিক ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। পুরাণগুলি সম্বন্ধেও সেই একই কথা। তথাপি এই সকল কাব্য-পুরাণে যে যথেষ্ট ঐতিহাসিক উপাদান আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহাদের কাব্যংশ ও ধর্মতত্ত্ব, ভক্তি-ব্যাখ্যা ও উপকথা ছাড়িয়া দিলেও ইহারা যে ঐতিহাসিক তত্ত্বের এক একটি দৃশ্যদর্শনরূপ, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। উপকথা-বহুল ঐতিহাসিক উপকরণ পাশ্চাত্য দেশে অগ্রাহ্য হয় নাই। সে দেশে ভারতবর্ষের ত্রায় এত তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপিও পাওয়া যায় নাই। মূলকথা এই উপকরণগুলি হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব বাহির করিতে হইলে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির আশ্রয় লইতে হইবে। তাম্রশাসন যে বিশ্বস্ততার প্রতীক, তাহাও আমরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিতে পারি না। তাহাতেও তোমামোদ-জীবগণের অতিরঞ্জন ও সত্যের অপলাপ আছে। সর্বত্রই বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করিয়া সত্য নির্ণয় করিতে হয়।

যখন আমরা মহাভারত ও হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণে নরক, ডিম্বক, মুর, ভগদত্ত, জরাসন্ধ, পৌণ্ড্র বাহুবল প্রভৃতি বহুবিধ আধ্যাত্মিক কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে দেখিতে পাই, তখন আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতযুদ্ধের প্রাকালে পূর্বভারত অনেক পরিমাণে নব-প্রবর্তিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছিল। এই

প্রাচীন ইতিহাস বিলোপের কারণ।

বিক্রমতা উত্তরকালে বৌদ্ধ ও জৈন প্রাধাত্মের যুগে পূর্বভারতকে কয়েক শতাব্দী কাল নবযুগের হিন্দুদিগের নিকট বর্জনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। হিন্দুবিধেবের জন্তই আমরা এই দেশের প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে এত অজ্ঞ ছিলাম। কৃষ্ণের প্রবল সহায়তার যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান হইয়াছিল, সেই পুনরুত্থিত হিন্দুধর্ম জৈন-বৌদ্ধদিগের উজ্জ্বল অধার এদেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছিল। বৌদ্ধবিহারের নাম শুনিলে হিন্দুগণ কাণে আঙুল দিতেন, এই পাপ নাম উচ্চারণ করিতে নাই—শিশুরা এই শিক্ষা পাইয়াছিল। হিউনসাঙ্গ-বর্ণিত সমতটের রাজধানী কাম্বোজ নগরে (কম্বোজ, আধুনিক সময়ে কুমিল্লার নিকটবর্তী কাম্বোজ) যেখানে সম্রাট ছিল বর্তমানে উহার নাম “বিহারমণ্ডল”—উহা বড় কাম্বোজ গ্রামের কিছু উত্তরে। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় লিখিয়াছেন, “পার্বত্য গ্রামবাসিগণ কখনও ভোরের বেলায় সেই গ্রামের নাম লয় না, পূর্বের গ্রাম কি পশ্চিমের গ্রাম ইত্যাদি বলিয়া দরকার হইলে ইহার উল্লেখ করিয়া থাকে” (প্রতিভা, তৃতীয়বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১২৫ পৃষ্ঠা)। সম্ভ্রান্তি প্রকল্প হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, এম্. এ., পি-এচ্. ডি, মহাশয় “ছদ্মবেশে দেবদেবী” নামক তাঁহার একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমাদের

সর্বত্র আরাধ্য হিন্দুদেবতার অনেকগুলিই বৌদ্ধতত্ত্ব হইতে গৃহীত। বৌদ্ধ দেবদেবীগণ হিন্দুর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং হিন্দুরা তাঁহাদিগকে বেমান্য নিজস্ব করিয়া বৌদ্ধগণ অস্বীকার করিয়াছেন; এমন কি তারা, কালী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতাদিগকে আমরা যেভাবে পূজা করিয়া থাকি, তাহা বৌদ্ধ তত্ত্বের অমুগত। তিনি দেখাইয়াছেন, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা প্রভৃতি সাতটি দেবতা তারার রূপান্তর, এবং তারা দেবীর উৎপত্তি বৌদ্ধ ধর্ম হইতে; ইহার মাধ্যম “অফোভা,” পাঁচটি মুদ্রা ও ‘একজটা’ নাম সমস্তই বৌদ্ধতারা হইতে গৃহীত। পরবর্তী হিন্দু তাত্ত্বিকগণ “অফোভা” অর্থে শিব এবং ‘একজটা’ও হিন্দু দেবতার বিভূতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু অফোভা প্রকৃতপক্ষে ধ্যানী বুদ্ধ; একজটা বৌদ্ধ দেবতা, এবং মুদ্রাগুলিও বৌদ্ধ তত্ত্বামুগ। হিন্দু তত্ত্বের যেগুলিতে অন্তরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোনটিই সপ্তম শতাব্দী হইতে অধিক প্রাচীন নহে; এবং বৌদ্ধ তত্ত্ব এই সকল লক্ষণও বৈকল্প দৃষ্ট হয়—হিন্দু তত্ত্ব ব্যাখ্যার তাহা নাই; তাহা কোনরূপ গোঁজামিল মাত্র। সরস্বতী অবশ্য বৈদিক দেবতা, কিন্তু বঙ্গদেশে ইহাকে ভদ্রকালী বলিয়া পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। বিনয়বাবু বলেন, “সরস্বতী বৈদিক দেবতা, পুরাণেও তাঁহার পূজা আছে এবং পুরাণগুলি প্রায়ই তাত্ত্বিক যুগের পূর্বে লিখিত হইয়াছে, সে সকল কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই.....কিন্তু যখন ভদ্রকালীর সঙ্গে সরস্বতীর সংযোগ হইয়াছে তখনই বুঝিতে হইবে আমরা যে সরস্বতীর পূজা করিতেছি তিনি (বৌদ্ধ) তারার একটি রূপভেদ” (হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধনা-লেখমালা, ১৮-২৮ পৃঃ)। কালিদাস শিবের বিবাহকালে বরযাত্রীদের সঙ্গে কালীদেবীর যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় তখনও তিনি হিন্দু দেবমন্দিরে বিদ্যমানরূপে প্রতিষ্ঠিত হন নাই।

এই ভাবে দৃষ্ট হয়, হিন্দুরা বৌদ্ধধর্ম শুধু নষ্ট করিয়া ছাড়েন নাই, তাঁহারা হাতে বৌদ্ধ-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যের উপর নিজ নিজ নামাঙ্কের ছাপ দিয়া উহা সর্বতোভাবে নিজস্ব করিয়াছেন। হিন্দুর পরবর্তী জ্ঞান-দর্শন, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই এই লুণ্ঠনের পরিচয় আছে—কোথাও গণ-স্বীকার নাই। এইভাবে হিন্দুরা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের বিলোপ সাধন করিয়াছেন। বঙ্গের পশ্চিমোত্তর উপান্তে প্রিয়দর্শী অশোক প্রভৃতি যত বড় বড় রাজা জন্মিয়াছিলেন, কিছুদিন পূর্বে আমাদের নিকট তাঁহারা নামে মাত্রও পরিচিত ছিলেন না। বঙ্গগৌরবের মধ্যমণি বিক্রমপুরবাসী দীপঙ্করের নাম পর্যন্ত বিক্রমপুরবাসীরা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর ও স্বর্ণ বিহারের নামই বা কে শুনিয়াছিল? কেবল আমরা যুধিষ্ঠির, ভীম প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডবের নাম লইয়া গর্ক করিতে শিখিয়াছিলাম; কেবল ঋষ, প্রহ্লাদ প্রভৃতির স্বপ্নে বিভোর ছিলাম। বাড়ীর কাছে কলিঙ্গের যে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ সৈন্য হত্যা করিয়া রাজা অশোক অমৃতপ্ত হইয়াছিলেন, সেই রূপ মহাযুদ্ধের কথাও আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু কবে কোন যুগে কুন্তকর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বাইরা স্ত্রীষ প্রভৃতি বানরেরা তাঁহার উদরস্থ হইয়া কর্ণরক্ত দিয়া বহির্গত হইয়াছিল এবং লঙ্গণের শক্তিশেল উপলক্ষে মারুতি কবে কোন

বুহৎ বঙ্গে বৌদ্ধ ইতিহাসের বিলোপ

৯

দিক্ দিয়া গন্ধমাদন শৈল কাঁধে করিয়া লঙ্কাক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিল, স্বরণাতীত কালের সেইরূপ উপকথা আমরা পরার ছন্দে পাঠ করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম। বগুড়া জেলায় ভীম কৈবর্তের জাদ্বালকে আমরা দ্বিতীয় পাণ্ডবের কীর্তি পরিকল্পনা করিয়া ভক্তিতে গলগদ হইয়াছি এবং ঢাকা জেলার সাভারের বৌদ্ধ রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষকে পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রের বাড়ী মনে করিয়া সশ্রদ্ধ হইয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ত্রিপুরা জেলার ময়নামতী পাহাড়ে স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড লোকে শুভ-

বুদ্ধমূর্তিকে হিন্দুদেবতা-
রূপে পূজা।

নিশ্চয়রূপে অস্থি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। জৈন ও বৌদ্ধ দেবতার
বিগ্রহ বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে পাওয়া যাইতেছে কিন্তু তাঁহারা যে বৌদ্ধ
বা জৈন ধর্মের অন্তর্গত তাহা কে কবে মনে করিয়াছিল? কোন

কোন স্থানে দিগম্বর তীর্থঙ্কর শিবরূপে পূজিত হইতেছেন। এক স্থানে দেখিয়াছি বোধিতকর
নিম্নে উপবিষ্ট বুদ্ধ বিগ্রহের নাম পাওয়া দিয়াছে ‘জটাশঙ্কর,’—বুদ্ধের শিরের উর্দ্ধে বোধিতকর
পত্রপুঞ্জ জটাস্বরূপ প্রতিভাত হইয়াছে। বুদ্ধমূর্তিকে সিন্দুর-মণ্ডিত করিয়া গ্রাম্য পুরোহিতেরা
তারা মূর্তিজ্ঞানে অর্চনা করিয়া মাতৃপূজার বাহা চরিতার্থ করিয়াছেন, একরূপ সংবাদও আমরা
জানি। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছেন, “ত্রিপুরায় বড় কাম্তা গ্রামে
বিহার মণ্ডলে বৌদ্ধ জম্বলমূর্তি কুম্ভমূর্তি বলিয়া পূজিত হইয়া থাকে” (প্রতিভা, তৃতীয় বর্ষ,
দ্বিতীয় সংখ্যা, ১২৫ পৃঃ)। অনেক স্থলে অশোক-স্তম্ভ ‘ভীমের গদা’ নামে অভিহিত।

হিন্দুদের ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা নাই, তাহারা এই সকল প্রমাণ দ্বারা
ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, আমি তাহাদিগকে সমর্থন করিতে পারি না। বৌদ্ধধর্মের
প্রতি ব্রাহ্মণেরা এতই বিদ্বেষিত হইয়াছিলেন যে, সেই সকল পাপ-কথা যেন কেহ না শুনে
এই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছা করিয়া তাহাদের কীর্তি লোপ করিয়া
বৌদ্ধ ও জৈনদিগের প্রতি
দিয়াছিলেন। সত্যবটে বুদ্ধ-নির্ক্ষাণের প্রায় দেড় হাজার বৎসর
অত্যাচার।

পরে জয়দেব কয়েকটি ছত্রে বুদ্ধের বন্দনা করিয়াছেন। আরও
দুই এক স্থলে হিন্দুরা এইরূপ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। অগাধ অপ্রমেয় হিন্দুশাস্ত্রের
মধ্যে পরবর্তী কালের সেই সকল পঙ্ক্তি ধর্ষব্যোর মধ্যেই নহে। কি ভীষণ অত্যাচারের
সহিত ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম ভারত হইতে নির্মূল করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন,
তাহা শঙ্কর-বিজয় নামক পুস্তকের নিম্নলিখিত কথাগুলি পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা যায় :—

“দৃষ্টমতাবলম্বিনঃ বৌদ্ধান্ জৈনান্ অসংখ্যাতান্ রাজমুখ্যাননেকবিজ্ঞা-প্রসঙ্গভেদৈ-
নির্জিত্য তেষাং শিরাংসি পরশুভিক্ষিণ্য বহু উত্থলেবু নিক্ষিপ্য কঠম্রমণৈশ্চূর্ণীকৃত্য চৈবং
দৃষ্টমতধ্বংসমাচরন্ নির্ভয়ো বর্ততে।” জৈনদের প্রতি আরও যে সকল অমানুষী অত্যাচার
হইয়াছিল তাহা পরে লিখিব (জৈন শব্দপুটি দ্রষ্টব্য)।

বৌদ্ধধর্মের নেতারাও শুধু এই ভাবে নিপীড়িত হন নাই, শূত্রপুরাণে দেখা যায় অতি
নিম্নস্তরের বিকৃত বৌদ্ধধর্মমতাবলম্বীরা পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়াছিল। “বেদ-
পরায়ণ ব্রাহ্মণগণের মুখ হইতে অগ্নি বাহির হইতে লাগিল এবং তাহারা সঙ্কম্পীদের বধাসর্বস্ব

কাড়িয়া লইয়া তাহাদের বিনাশ সাধন করিতে লাগিল। তাহাদের কাতর প্রার্থনার ধর্মের (বুদ্ধের) আসন টলিল, তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। ধর্ম যখন রূপী হইয়া মাথায় টুপি পরিয়া কামান হাতে লইলেন। দেবতাগণ ইজার পরিয়া ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। ব্রহ্মা মহামুগ্ধ হইলেন; বিষ্ণু পদ্মগন্ধর এবং আদম শিব হইলেন।” এই অবতারের তালিকা খুব দীর্ঘ, তাহাতে গণেশকে গাজি, কার্তিককে কাজি, শ্ববিদিগকে ফকির এবং ইন্দ্রকে আমরা মোলানা-রূপে দেখিতে পাই। চন্দ্রহর্ষ প্রভৃতি দেবতারা পদাতিক হইয়া সামরিক বাজনা বাজাইতে লাগিলেন। শূন্তপুরাণে “নিরঞ্জনের ক্রমা” নামক পরিচ্ছেদে এই বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

মালদহ জেলার কোন স্থানে হয়ত মুসলমানগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণগণের উৎপীড়নে উল্লসিত হইয়া উৎপীড়িত সঙ্কীর্ণশ্রমিগণ এই ব্যাপারে দৈব প্রতিশোধের পরিকল্পনা করিয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ‘বুদ্ধদেবের অবতার’ বলিয়া নিজকে প্রচার করিয়া
সঙ্কীর্ণের দলন।

বর্দ্ধমানবাসী রামানন্দ ঘোষ নামক একব্যক্তি একখানি রামায়ণ রচনা করেন, তাহাতে তাঁহার বৈষ্ণবধর্মের প্রতি বিদ্বেষ অতি ক্রুদ্ধ ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দুরা বৌদ্ধ ও ভোম পণ্ডিতদিগের বৃত্তি লোপ করাইয়া তাহাদের হস্ত হইতে দেবমন্দিরের পূজার অধিকার কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ভোমাচার্য্যদিগের নাম বৌদ্ধ-সাহিত্যে পরিচিত। যে সকল বৌদ্ধ পুরোহিত তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করিয়া অতি হেয় জিনিষ ভক্ষণ করিতেন তাঁহারাষ্ট সন্তবতঃ ‘মেধর’ শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিলেন। শব্দটি ‘মহম্বর’ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। হিন্দু স্থতির বিধানে চণ্ডালেরা মেধরদের বর্তমান কার্যে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু কালে যখন চণ্ডালেরা হিন্দুর নিতান্ত অন্তর্গত ও সমাজের নিম্নশ্রেণীর গণ্ডীভুক্ত হইয়া পড়িল, তখন বিজিত শত্রুগণের মধ্যে তাঁহারা তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদির দরুন নিতান্ত হেয় জিনিষ ঘাঁটাঘাঁটি করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না, তাঁহারাষ্ট চণ্ডালের কাজের ভার লইতে বাধ্য হইলেন। ইহারাষ্ট ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। এদেশে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের পুনরুদ্ধারে বিজিত বৌদ্ধদিগের প্রতি যেরূপ কঠোর নিপীড়ন চলিয়াছিল, তাহাতে বৈষ্ণবেরা যদি সেই সকল হতভাগ্যের জন্ত স্বেচ্ছা সমাজের দ্বার উদঘাটন না করিতেন, তবে সেই শ্রেণীর সকলেই মুসলমান হইয়া যাইত। কেবল বৌদ্ধধর্মের প্রতি নহে, জৈনদিগের প্রতিও ব্রাহ্মণ্য বিদ্বেষ প্রজ্বলিত ছিল, ‘হস্তিনা পীড়্যমানোহপি ন গচ্ছন্তৈজেনমন্দিরন’ এই একটি কথায় সেই বিদ্বেষ বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে শৈবেরা বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মস্তক ছেদন করিয়া কিরূপ নির্দয়ভাবে তাহাদের মতের ধ্বংস করিয়াছিল, তাহা স্থানান্তরে লিখিত হইবে।

বাহা হউক বিদ্বেষ ও উৎপীড়নাদি সত্ত্বেও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনের সারাংশ ব্রাহ্মণেরা নিজেদের শাস্ত্রের অন্তর্গত করিয়া শেষে এই দুই ধর্মকে বর্জন করিয়াছিলেন। এ দেশের বর্তমান হিন্দুধর্ম জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের স্বর্ণ তাহার ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় বহন করে।

বৌদ্ধ-ইতিহাস ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছায় ও ঘোর শত্রুতা করিয়া লুপ্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের

রাজ্যে যে কোন কালে পূর্বোক্ত দুই প্রধান ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের এরূপ আশ্চর্য্য লীলা হইয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্নমাত্র বাহাতে না থাকে তাহারা উঠিয়া পড়িয়া তাহাই করিয়াছেন, এজ্ঞা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের পথে এত আধার।

শুধু হিন্দুরা নহেন, মুসলমানেরাও বৌদ্ধ ধর্ম ও শাস্ত্রের বিলোপসাধনে সচেষ্ট ছিলেন। মগধের রাজধানী ওদন্তপুরে তুরঙ্গগণ বহুবিজয়ের কিছু পূর্বে বহু বৌদ্ধভিক্ষু ও শ্রমণের প্রাণ নাশ করিয়াছিলেন এবং তথাকার সুবিভূত পাঠাগার জালাইয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ নেপাল, চট্টগ্রাম, আরাকান প্রভৃতি সীমান্ত প্রদেশে পলায়ন করিয়া তাহাদের জীবন ও জীবনাধিক প্রিয় ধর্মগ্রন্থগুলি কতক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিলেন; তৎপরে ব্রাহ্মণ্য ক্রোধে তাহারা যৎপরোনাস্তি নিপীড়িত হইয়াছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, “বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলি জনসাধারণের ভাষা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে,—যে জনপদে এক কোটির অধিক বৌদ্ধ এবং ১১,৫০০ ভিক্ষু বাস করিত, সেখানে একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ ৩০ বৎসরের চেষ্টায় পাওয়া যায় নাই। বুদ্ধ—বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ কচিং উল্লিখিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার ধর্মাবলম্বীদের নাম ও ধর্মমত বিস্তৃতির অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে; শুধু নৈয়ায়িকেরা বৌদ্ধমত-খণ্ডনোদ্দেশ্যে তাহাদের গ্রন্থাদির কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন—কিন্তু সে সকল জ্ঞানের গ্রন্থ এখন অল্পই পঠিত হয়। যে পূর্বভারত বৌদ্ধধর্মের প্রধান লীলাক্ষেত্র ছিল, তথায় বৌদ্ধধর্মের যে অস্তিত্ব ছিল, তাহাও যুরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিক-গণের চেষ্টায় অধুনা আবিষ্কার করিতে হইয়াছে” (Discovery of Living Buddhism in Bengal, ১ পৃ:)।

বৌদ্ধ-বিজয়ের পর বাঙ্গলা যখন নব ব্রাহ্মণ্যে দীক্ষিত হইল, তখন ভুলিয়া গেল যে এককালে এই দেশের সীমান্তে নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিহার ছিল, দীপঙ্করের প্রতিভা দেশ-বিদেশে উজ্জ্বল করিয়াছিল, এদেশ হইতে বাঙ্গালী বীরেরা যাইয়া সিংহল বিজয় করিয়াছিলেন এবং এদেশের ধীমান ও বিতপাল অর্ক এশিয়ার চিত্রগুরু হইয়া শিল্পজগতে এক অতৃপ্তপূর্ব যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচ্য ভারতের গৌরব

“প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে
জ্ঞান ধর্ম কত কাব্য কাহিনী।” —রবীন্দ্রনাথ।

“বসিত রাজেন্দ্র যথা স্বর্ণ-সিংহাসনে,
হুকারে শৃগাল তথা বিকট নিঃস্বনে।

লুপ্ত গোড়, সমতট, কক্ষান্তের চিহ্ন,
কোথা হরিকেল কোথা করণ-সুবর্ণ।
পথে পথে রাজধানী—ফুলের বাগান,
এতো নহে বঙ্গ—এয়ে বঙ্গের শ্মশান।”

বাঙ্গলাদেশের সীমা-নির্দেশ করা কঠিন। প্রাচীনকালে কতবার যে এ দেশের রাষ্ট্রীয় সীমার পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। পুরাকালে চীন, ব্রহ্ম, কলিঙ্গ, প্রাগজ্যোতিষপুর, আরাকান, ত্রিপুরা প্রভৃতি নানাদেশ এই ভূভাগের ভিন্ন ভিন্ন অংশের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া এ দেশের রাষ্ট্রীয় কলেবরকে যুগে যুগে বহুধা-বিভক্ত ও বিচিত্র বর্ণে লালিত করিয়াছে।

এক সময়ে যেমন গোড়-সাম্রাজ্য বৃদ্ধাইতে বিক্ষোভরসীমায় কনোজ, সারস্বত গোড়, মিথিলা ও উৎকল—এক কথায় গোটা আর্য্যাবর্তটাকে বৃদ্ধাইত, বঙ্গদেশের রাষ্ট্রীয় সীমার অনিশ্চয়তা। সেইরূপ আবার বঙ্গদেশ বলিতে “দ্বাদশ বঙ্গ” অর্থাৎ বার খণ্ডে বিভক্ত বাঙ্গলা,—পূর্বের রেঙ্গুনের পশ্চিম সীমা হইতে ছোটনাগপুরের সীমা, উত্তরে প্রাগজ্যোতিষপুর ও দক্ষিণে তমলুক ও সুন্দরবন,—এই সমস্ত অঞ্চলটাই এক রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইত। পালদের প্রাধান্তের সময়ই “পঞ্চগোড়” কথাটার সৃষ্টি। তখন সমস্ত আর্য্যাবর্ত মাঝে মাঝে গোড়েশ্বরের পদানত থাকিত, এবং এদেশের রাজারা “পঞ্চগোড়েশ্বর” উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজচক্রবর্ত্তির দাবী করিতেন,—এই সময়েরও বহুপূর্বে এদেশের সংস্কৃত ভাষায় “গোড়ীয় রীতি” প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

ইতিহাস-পূর্ব যুগে জরাসন্ধ আর্য্যাবর্তের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি বা রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। ঐতিহাসিক যুগে। পৌণ্ড্র বাহুদেব, প্রাগজ্যোতিষপুরের নরক ও চেদির শিশুপাল ইহার সামন্ত-রাজা ছিলেন। এক সময়ে পৌণ্ড্র বাহুদেব অনেকটা জরাসন্ধের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। নরক, মুর ও ভগদত্তের সময় এই দেশটা প্রাগজ্যোতিষপুরের অন্তর্গত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে বাঙ্গলাদেশের অনেকটা তমলুকের অন্তর্গত ছিল; সম্ভবতঃ অশোক যে মহাসমরে দ্রক্ষয় কলিঙ্গদিগকে জয় করিয়াছিলেন, সেই যুদ্ধে মেদিনীপুর জেলার তমলুকবাসী বাঙ্গালীরাই কলিঙ্গ সৈন্তের অগ্রণী হইয়াছিল (“মেদিনীপুর” দ্রষ্টব্য—পরিশিষ্ট)।

বাঙ্গলা ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে অনেকস্থলে ‘দ্বাদশবঙ্গ’ বা বার-ভূঞার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজচক্রবর্ত্তীদের অভিষেককালে দ্বাদশ মাণ্ডলিকগণের উপস্থিতি অপরিহার্য্য ছিল; অভিষেকসংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ইহাদের কতকগুলি রূতা ছিল। ইহারা রাজার সিংহাসনারোহণের সময়ে তাঁহার মাথায় জলধারা বর্ষণ করিয়া অভিষেক করিতেন। ইহারা প্রায়ই রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতেন, রাজার নিকটেই ইহাদের আসন থাকিত। উত্তরকালে এই দ্বাদশ-মাণ্ডল-স্বামী, ‘বারভূঞা’

নামে এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যসমূহে রাজ-দরবারের বর্ণনায় প্রায়ই “বারভূঞা বসি আছে বৃকে দিয়া ঢাল” এইভাবে রাজার পরাক্রান্ত পার্শ্বচরদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামপাল একাদশ শতাব্দীতে কৈবর্ত-বিদ্রোহ দমন করিবার জন্ত যে সামন্তচক্র গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এই ‘দ্বাদশ মাণ্ডলিক’ অবশ্যই সেই বীরদিগের অগ্রণী ছিলেন।

পাঠানশক্তির বিলোপকালে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বারভূঞার প্রতাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বারটি ভূঞা রাজা বাঙ্গলার বারটি শার্দুলের মত হৃদ্যন্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভুলুয়ার ভূঞা রাজা ছর্নভনারায়ণ সুর নিখিল পূর্ব-দেশাধিপতি ত্রিপুরেশ উদয়মাণিক্যকে রাজস্ব দিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, ‘ত্রিপুরারাজ্য আমার, পূর্ববর্তী রাজা বিজয়মাণিক্য আমার প্রজা ছিলেন’ (রাজমালা—অমরমাণিক্য খণ্ড)। অমরমাণিক্য ইহার বিরুদ্ধে স্বয়ং এক বিপুল বাহিনীর সহিত যাত্রা করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই, এই যুদ্ধজয়ের ফলে পরবর্তী ভুলুয়ার ভূঞা রাজা বলরাম সুর ত্রিপুরেশকে অমর দীঘি খনন কালে ১,০০০ কুলি পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সুবিখ্যাত দীঘি তিন বৎসরের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় খাত হইয়াছিল (১৫৭৮-৮১ খৃঃ); এবং বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত ভূঞা রাজারাই এতদুপলক্ষে ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রয়তা করিয়াছিলেন। জঙ্গলবাড়ীর দ্রেশা খাঁ ও বিক্রমপুরের কৈদার রায়ের নামও আমরা এই সামন্তরাজগণের তালিকাভুক্ত দেখিতে পাই। শুধু শ্রীহট্টের ফতে সিং কোন সাহায্য করেন নাই। কুমার রাজ্যধর ও দ্রেশা খাঁ ত্রিপুরার এক বিপুল বাহিনীর নেতা হইয়া শ্রীহট্টে গমনপূর্বক তথাকার নবাব ফতে সিংএর গর্জ খর্ব করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া আসেন। রাজমালায় দৃষ্ট হয় ত্রিপুররাজ বিজয়মাণিক্য ষোড়শ শতাব্দীতে দিগ্বিজয়ে অভিযান করিয়া সমস্ত পূর্ববঙ্গে স্বীয় রাজচক্রবর্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজমালায় পুনঃ পুনঃ এই “দ্বাদশ বঙ্গের” উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

মোগলেরা সামন্তরাজার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; তাঁহারা সমস্ত ক্ষমতা স্বীয় মুষ্টির ভিতর রাখিয়া তাঁহাদের অধীন রাজাদিগকে মাত্র একটা ফাঁকা সম্মান দিতেন। কিন্তু বঙ্গের দ্বাদশ শার্দুল এই অবস্থা হৃঃসহ মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে মোগলদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং অনেকেই প্রাণ দিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের কৈদার রায়, বশোহরের প্রতাপাদিত্য, জঙ্গলবাড়ীর দ্রেশা খাঁ, ভুলুয়ার মুকুন্দ রায় ও তৎপুত্র শত্রাজিৎ—মোগলদের বিদ্রোহী ছিলেন। ইহারা জানিতেন পাঠান ও মোগলে অনেক তফাৎ—পাঠানেরা অবনতি স্বীকার করিলে শত্রুকে স্বীয় রাজ্যের অথবা আধিপত্য দিতেন—মোগলেরা ফাঁকা সম্মান দিয়া আসল ক্ষমতা কাড়িয়া লইতেন। মোগল সম্রাটের ফৌজদারদের সম্বন্ধে সিরার মতফরিণে লিখিত আছে, “ফৌজদারদের প্রধান কর্তব্য ছিল, জমিদারদের শক্তি খর্ব করা, তাঁহারা যেন যুদ্ধাদি সংগ্রহ না করেন, বন্দুক ও বারুদ প্রভৃতি যেন তাঁহারা বেশী না রাখেন, তাঁহারা যেন তাঁহাদের পুরাতন হুর্গগুলি সংস্কার না করেন, কিংবা নূতন কোন হুর্গ নিৰ্ম্মাণ না করেন। কিন্তু যদি কোন ফৌজদারের মনোবোগের জটিল সুবিধা পাইয়া জমিদার এই ভাবের উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া ক্ষমতাপন্ন হইতে চেষ্টা করেন,

তবে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমস্ত সৈন্ত বিদায় করিয়া, যুদ্ধোপকরণসমূহ সম্রাট-সরকারে সমর্পণ করিতে হইবে; ইহাতে কিছুমাত্র অবাধ্যতা করিলে তাঁহাকে তাঁহার বাসস্থান হইতে দূরে নির্বাসিত করিতে হইবে। ইহাতে যদি তিনি ষড়যন্ত্রের কোন লক্ষণ প্রদর্শন করেন, তবে তাঁহার হুগাঁদি ভূমিসাৎ করিয়া, তাঁহাকে এমন কঠোর শাস্তি দিতে হইবে যে জমিদার যেন একটা নগণ্য প্রজার অবস্থা প্রাপ্ত হন।” কিন্তু মোগলদিগের কঠোর শাসনসত্ত্বেও বাঙ্গলার খণ্ডরাজ্যগুলির ক্ষমতা কোন কালেই একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। আকবরের সময়ে ভুরহটের রাণী পাঠানদিগের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন, ইনি “রাঘবাধিনী” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন (বঙ্গবীরাদনা, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, ১৫০-৫১ পৃঃ)। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম সময়েও মেদিনীপুরের চকলিয়ার জমিদার জীবন রায় তাঁহার পাইক সৈন্ত দ্বারা সারজেন্ট বাসকোষ প্রভৃতি ইংরেজ সেনাপতির অসংখ্য সিপাই হঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের শিবির লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ডবলিউ. কে. ফারমিয়ার লিখিয়াছেন, ‘বাঙ্গালী পাইকেরা পশ্চিমা সিপাই হইতে সৈন্ত হিসাবে উৎকৃষ্ট’ (E. G. Galzier's Bengal District Records, Vol. I, p. 9)। নলডাঙ্গার রাজাদের পূর্ব-পুরুষ রণবীর চর্ক্বে পাঠানদিগের হাত হইতে এই রাজ্যটি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। রাজসাহীর জমিদারের রাজ্য ভাগলপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, চাকলা রাজসাহী এই অধিকারের অন্তর্গত ছিল এবং ইহার রাজস্ব ছিল ২৭ লক্ষ টাকা। বর্ধমানের রাজাও খুব প্রতাপশালী ছিলেন, ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে ইহারা জন কোম্পানীর অনেক উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নোয়াখালির চৌধুরীরা কিরূপ দুর্দান্ত ছিলেন, এবং একটি বেগম স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া কিরূপ অসম্ভব বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা “চৌধুরীর লড়াই” নামক পল্লীগীতিকায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে (পূর্ববঙ্গগীতিকা, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। পাঠানেরা সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না, তাঁহারা সমস্ত দেশটার খুঁটিনাটি খবর রাখিয়া প্রত্যেক দেশের উপর বিজয়চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া পদানত করিতে চাহিতেন না। তাঁহারা এদেশে বাস করিয়া কতকটা এদেশের লোকের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিলেন। হিন্দু জমিদারেরা এবার বুঝিয়াছিলেন যে, মোগলেরা দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা হরণ করিতে আসিয়াছেন—এজন্য তাঁহারা জীবনপণে বাধা দিয়াছিলেন। এই ভূঞা রাজাদের অনেকেরই সমস্ত বঙ্গদেশের অধিকারের উপর লোলুপ দৃষ্টি ছিল। ঈশা খাঁ, কেমার রায় প্রভৃতি অনেকেই সেই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতাপাদিত্যই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অবিকতর অগ্রসর হইয়াছিলেন—প্রতাপে কেহ তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই, এবং “ভয়ে যত ভূপতি দ্বারহ” হইতেন। এদিকে উত্তরে ত্রিপুরার দত্তমাণিক্য এবং পশ্চিমে বনবিষ্ণুপুরের বীর হাধীর মুসলমানদের সঙ্গে আড়াআড়ি করিয়া বঙ্গদেশে অধিকার বাড়াইতে চেষ্টিত ছিলেন। ঈশা খাঁর বংশধর দেওয়ান ফিরোজ খাঁ যে মোগল সম্রাটের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সর্বস্ব পণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা বঙ্গীয় একটি পল্লীগীতিকায় বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত আছে (পূর্ববঙ্গগীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ৪৩৫-৭৮ পৃঃ)।

এই পুরুষসিংহদের অনেকেই আকবরের সেনাপতিদিগকে যেরূপ বিশ্বস্ত করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। কিন্তু ইহারা শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ঈশা খাঁ দিল্লীখরের সঙ্গে সন্ধি করিয়া স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন, অপরাপর ভূঞাগণ মোগলবাহিনীকর্তৃক নানারূপে লাঞ্চিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এই দ্বাদশ মওলাধিপতি যদি একত্র হইয়া মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন, তবে মনে হয় বঙ্গদেশ কখনই মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইতে পারিত না। কোন্ কলহের উপগ্রহ বঙ্গের রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময়ে ভেদনীতির বীজ বপন করিয়া অথও বঙ্গদেশকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়াছিল তাহা জানি না,—দেখা যাইতেছে বাঙ্গালী তখনও একজাতি হইয়া গড়িয়া উঠে নাই,—এখনও বোধ হয় তাহা হয় নাই। আমাদের কবিরা সাতকোটি লোককে বৃথাই “একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্” বলিয়া আহ্বান করিতেছেন, উহা শুধু একটা কবিত্বের উচ্ছ্বাস মাত্র।

এই দ্বাদশ মাওলিক বা বারভূঞা-নিয়োগ শুধু বাঙ্গলার রীতি নহে, সমস্ত আর্য্যজগতে রাজচক্রবর্তীদের দ্বাদশটি সামন্ত-রাজ্য নিয়োগের রীতি পরিদৃষ্ট হয়। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যেও এইরূপ প্রথার উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। রাজপুতানার রাজাদের মধ্যে দ্বাদশ সামন্ত-নায়ক নিযুক্ত করিবার প্রথা আছে। সেদিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরার রাজারা দ্বাদশ মওলাধিপ নিযুক্ত করিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত হইতেন। বঙ্গের এই দ্বাদশ মওলাধিপের অনেকেই হিন্দু ছিলেন। ঈশা খাঁ মুসলমান হইলেও তিনি হিন্দুর পুত্র ছিলেন।

এই গঙ্গার সিকতাভূমির উপর প্রভুর লইয়া যুগে যুগে হিন্দুর সহিত বৌদ্ধের, হিন্দুর সহিত হিন্দুর, পাঠানের সহিত পাঠানের, মোগলের সহিত মোগলের এবং হিন্দু, পাঠান ও মোগলের কতই না যুদ্ধ হইয়াছে! এইজন্য এদেশের রাষ্ট্রীয় সীমা নিরন্তর পরিবর্তিত হইয়াছে। সেদিনও উড়িষ্যা ও বিহার বাঙ্গলা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।

স্বতরাং প্রকৃতি ইহার যে সীমা আঁকিয়া দিয়াছেন, মূলতঃ আমরা তাহাই অবলম্বন করিব। ইহার উত্তরে আকাশম্পর্শী হিমাদ্রি-শৃঙ্গ, দক্ষিণে তমলুক-

বৃহৎ বঙ্গের সীমা।

প্রান্তসমাপ্রিত বিশাল বারিধিবক্ষ, পূর্বে আরাকানের নিবিড় অরণ্য, পশ্চিমে মগধের সীমান্তে ছোটনাগপুরের কান্তারভূমি—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী বিপুল সমতলক্ষেত্র—চিরসবুজ, নিত্য-নূতন-শ্রী, শতের অকুরন্ত ডাঙার,—কুন্দ, অপরাজিতা, সন্ধ্যা-মালতী, নবমল্লিকা ও পদ্মের রাজ্য—“পদ্মোৎপলবাকুলা” শত দীর্ঘিকার পূণ্য তীর্থ—বুদ্ধ, চৈতন্য, পার্শ্বনাথ, দীপঙ্কর, রামকৃষ্ণ, শঙ্করদেব প্রভৃতি নরদেবতার পদরত্নঃপুত এবং বিজয়, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, ধর্মপাল, রামপাল, মহীপাল প্রভৃতি সিংহবিজ্ঞান নৃপতিদের কীর্ত্তিভূমি—ধনপতি, চাঁদ সদাগর, শ্রীমন্ত প্রভৃতি বিশ্ববিন্দু-সম্প্রদায়ের বাণিজ্যকেন্দ্র—তুষান্দ, দীমান, বিতপাল, বসন্তপাল, হিরপাল প্রভৃতি কীর্ত্তিমান্ শিল্পীদের নিকেতন—চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা, কালীঘাট প্রভৃতি ভারত-বিশ্বত তীর্থভূমি—জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নব্যতায় ও মসলিনের জন্মভূমি,—এই মহাদেশই আমাদের বৃহৎ বঙ্গ। আমরা কলিঙ্গ ও মিথিলার

ইতিহাস এই মহাদেশের অন্তর্গত করিতে পারিলাম না ; ইহা আমাদের অক্ষমতা ও স্থানাভাবের জন্ত। বস্তুতঃ পূর্বভারতে শিক্ষাদীক্ষার আদর্শ ও ভাষা প্রায় একইরূপ। এই সমগ্র দেশটার ইতিহাস এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং ইহা এতই একভাষাপন্ন যে ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীর রেখা টানিলে তাহা কতকটা কৃত্রিম হইবে।

পদ্মার ভাঙ্গুনি পাড়ের মত, এ দেশের রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের কোনই নিশ্চয়তা নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে মগধ, রাজগৃহ, ওদন্তপুর, তমলুক (তাম্রলিপ্তি), দন্তভুক্তি, মহাস্থান, করণসুর্ষণ (রাঙামাটি), সোনারগাঁ, সাতগাঁ, বিক্রমপুর, গোড়, ঢাকা (দবাক্, বাঙ্গলা), পাটিকারা, কন্দাম্ভ, বিজয়নগর, সিংহপুর, সাতার, মহানাদ প্রভৃতি নানাস্থান এই দেশের রাষ্ট্রীয় কেন্দ্ররূপে যুগে যুগে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছে। মুসলমানদের সময়েও কতবার এই কেন্দ্রের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। গোড়, লক্ষণাবতী, রমতী, তাণ্ডী, পাণ্ডুরা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, রাজমহল প্রভৃতি কতই না স্থানে খামখেয়ালী রাজারা রাজধানী পরিবর্তিত করিয়াছেন। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে পূর্বভারতের ভাষা অনেকটা এক রকমের ছিল। মণিপুর, প্রাগজ্যোতিষপুর, কাছাড়, ত্রিপুরা প্রভৃতি দেশের রাজসভায় বাঙ্গলা ভাষা সমাদৃত ছিল ; তৎকাল রাজকীয় দলিলপত্র ও তাম্রপটে বাঙ্গলা ভাষাই ব্যবহৃত হইত। রাজাদের যশোগান প্রজারা বাঙ্গলা ভাষাতেই গাহিত। সেনরাজাদের সময়ে সংস্কৃতের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইরাছিল, কিন্তু বঙ্গদেশের যে সকল স্থান সেনদের সীমা-বহির্ভূত ছিল, সেই সকল অঞ্চলে সংস্কৃতের প্রভাব স্বীকৃত হইলেও বাঙ্গলা ভাষা অনাদৃত ছিল না। বাঙ্গলা ভাষাকে রাজমালায় “সুভাষা” বলা হইয়াছে ; এই উপাধি দ্বারা কথিত ভাষার সহিত লিখিত ভাষার পার্থক্য স্থচিত হইয়াছে। নলিনী ভট্টশালী মহাশয়ের মতে ত্রিপুরা জেলার কাম্তা গ্রাম এক সময়ে খড়্গবংশের রাজধানী ছিল। উক্ত বংশের রাজারা সমতটে রাজত্ব করিতেন। খড়্গবংশীয় রাজাদের সঙ্গে আরাকান রাজাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হইয়াছিল, সমতটের রাজপুত্র এক সময়ে আরাকান শাসন করিতেন, তাহাও নলিনী ভট্টশালী মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বৌদ্ধ-প্রাধান্ত-যুগে পূর্বভারতের রাজাদের সঙ্গে বৃহত্তর ভারতের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল। আরাকানের রাজসভায় সেদিন পর্য্যন্তও “বঙ্গভাষা আদৃত ছিল এবং আরাকানবাসীরা বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করিতেন।” এ সম্বন্ধে চট্টগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় আমাকে (১৯৩৩, ৪ঠা জানুয়ারীর) চিঠিতে জানাইয়াছেন :—

“অল্প কয়েকদিন পূর্বে আমি দৌলত কাজির একখানা ছেঁড়া পুঁথি পাইয়াছি। তিনশত বৎসর পূর্বে আরাকানের রাজসভায় বঙ্গ ভাষার চর্চা হইত। আরাকানের যে চন্দ্রসুন্দর রাজা সুলতান সুজাকে আশ্রয় দিয়া সমুদ্রে ডুবাইয়াছিলেন, আলওয়াল তাঁহার রাজসভায় তখন উপস্থিত ছিলেন। আলওয়ালের সেকেন্দরনামায় উল্লেখ আছে :—

এই মতে সুখে গোয়াইলু বহুকাল।

বৃদ্ধ বয়সে অবশেষে ঘটিল জঞ্জাল ॥

শাহ সুজা সঙ্গে যদি আইহু দৈবগতি ।
হতবুদ্ধি পাত্র সব দিল হতমতি ॥
আপনার দোষ হস্তে পাই অবসাদ ।
এক পাপী আমারেও দিল মিথ্যাবাদ ॥
কারাগারে গৈহু আমি না পাই বিচার ।
যত ইতি বসতি হইল ছারখার ॥

এই চন্দ্রসুন্দর্য নরপতির বহুপূর্বেও আরাকানের রাজসভার বঙ্গভাষার চর্চা হইত ।

চন্দ্রসুন্দর্যের পিতার নাম—ধেডো
ধেডোর পিতা—নরপতিজি
নরপতিজির পিতা—মাংছানি
মাংছানির পিতা—শ্রীসুন্দর্য ।

এই শ্রীসুন্দর্য আরাকানের একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন । তিনি ১৬২২-১৬৩৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত আরাকানে রাজত্ব করিয়াছেন বলিয়া ফারারের ইতিহাসে উল্লেখ দেখা যায় । শ্রীসুন্দর্য অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় নরপতি ছিলেন । তিনি “খেত-তুবার-বরণী” রমণী পরিবৃত্ত হইয়া রাজসভায় আসিতেন । পূর্ববর্ণিত কবি দৌলতকাজি শ্রীসুন্দর্যের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন ।” যে রাজসভায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আলওয়াল তাঁহার “পদ্মাবৎ” কাব্য ও দৌলতকাজি “লোর চন্দ্রানি”র মত বিস্তৃত সংস্কৃতায়ক বাঙ্গলায় কাব্য লিখিয়াছেন, তাহা পরবর্তী সময়ের কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় মতই বাঙ্গলা ভাষার উৎসাহ ও আশ্রয়দাতা ছিল বলিয়া মনে হয় । বৌদ্ধযুগে বাঙ্গলা ভাষা বর্তমান বঙ্গদেশের গণ্ডী ছাপাইয়া পূর্বদিকে গিরিকান্তার-সমাকীর্ণ আরাকানের সীমা অবধি প্রসার লাভ করিয়াছিল, এই সিদ্ধান্ত সহজেই গ্রহণ করিতে পারা যায় ।

এই দেশে শুধু ঘন ঘন রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন হয় নাই, ইহার ভাষাও মূলতঃ অর্দ্ধমাগধী এবং একলক্ষণাক্রান্ত—তথাপি সেই ভাষার উপর প্রাদেশিকত্বের ছাপ মারিয়া ভিন্ন ভিন্ন বাঙ্গলাভাষার প্রসার । অংশকে তফাৎ করা হইয়াছে । ত্রিপুরা, মণিপুর, প্রাগজ্যোতিষপুর প্রভৃতি প্রদেশে বহুকাল বাঙ্গলায় দলিলপত্র, এমন কি তাম্রশাসন পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে ।* ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর উড়িষা-সাহিত্যের ভাষার সহিত

* In the north-east the Bengali alphabet was adopted in Assam, where not only in the Kamauuli grant of Vaidyadeva, but also in other inscriptions, Bengali characters have been exclusively used. In the Assam plates of Vallabhadeva of the Saka year 1107 (1188 A.D.), we find archaisms which lurked in the backwoods of civilization. In the East, the Bengali script was also being used in Sylhet where similar archaisms are to be met with

বর্তমান বাঙ্গলা ভাষার যে সারিধা, তাহা ত্রিপুরা, ময়মনসিং, চট্টগ্রাম প্রভৃতি দেশের কথিত ভাষার সহিত আধুনিক কালের লিখিত বাঙ্গলার অপেক্ষা ন্যূন নহে। গঙ্গা-বংশের রাজত্বকালে বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে উড়িয়া ভাষার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। সম্প্রতি, —একশত বৎসরও হয় নাই, আসামী ভাষাকে বাঙ্গলা হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে, তৎপূর্বে বাঙ্গলাই আসামের রাজ-দরবারে ও বিজালয়গুলিতে প্রচলিত ছিল। কয়েকজন মিশনারী আসামের নিম্নশ্রেণীর কথিত ভাষায় কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, ও তত্পূর্বোক্তি অক্ষর (যথা পেট কাটা ‘র’—ব) তৈরী করিয়াছিলেন—তারপর বখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, আসামের ভদ্রসাহিত্য অন্তরূপ—তাহা বাঙ্গলা, তাহাতে ওরূপ নিম্নশ্রেণীর ভাষা চলিবে না, তখন তাঁহারা সেই নিম্নশ্রেণীর কথিত ভাষা তদ্দেশে চালাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন—তাঁহাদের সামান্য ক্ষতিপূরণের ব্যপদেশে আসামের কথিত ভাষার পরিবর্তন হইয়া গেল। প্রাদেশিক অভিমান সৃষ্টি করা সহজ,—পৃথিবীতে যত জাতি-বিরোধ এই ভাবেই উপস্থিত হইয়াছে। বখন ভাষার এই পরিবর্তন হয়,—তখন তৎকালকার সদাশয় ইংরেজ স্কুল-ইনস্পেকটর ইহার বোরস্তর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন—স্কটলও, আয়ারলও, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার কথিত ভাষায় নানারূপ পার্থক্য ও বৈষম্য বিদ্যমান, তথাপি বিশাল ইংরেজী সাহিত্য সেই প্রাদেশিকত্বগুলি উপেক্ষা করিয়া একভাষাপন্ন হইয়াছে; এমন কি ওয়েল্‌সের ভাষার সঙ্গে ইংরেজী ভাষার মজাগত কোন সাদৃশ্য নাই, তথাপি সে দেশেও ইংরেজী প্রচলিত হইয়াছে। এখনও যদি রাষ্ট্রদেশের কথিত ভাষা ও ঢাকার কথিত ভাষার উপর প্রাদেশিকত্বের জোর দেওয়া যায়, তবে সাহিত্যে ছুইটি ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হইতে পারে; একটা অথও দেশের পাঁচ মাইল দূরে দূরে যদি ভাষার স্বল্প বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, তবে প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন ভাষায় চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়, এবং একই দেশের লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে কথা কহিবার সুযোগ হারাইয়া ভাষাক্ষেত্রে অনায়াসে একটা ব্যাবেলের মঠ প্রস্তুত করিতে পারে।

এই ভারতবর্ষে এক সময়ে গান্ধার হইতে ব্রহ্মদেশ এবং হিমালয় হইতে রামেশ্বর—এমন কি সিংহল, জাভা, বালি ও সুমাত্রা পর্য্যন্ত বৃহৎ জনপদে—একই সংস্কৃত ভাষার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল, এজন্য সংস্কৃত ভাষা একরূপ অপূর্ণ বৈভবশালিনী হইয়াছে। এখন যদি উড়িয়া, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে পুনরায় এক ভাষা স্বীকৃত হয় তবে তাহা—‘বাঙ্গলা ভাষা,’

in the Sylhet grants of Kesavadeva and Ishanadeva. In the south the Bengali script was used throughout Orissa. We find the proto-Bengali script in the Ananta-Vasudeva temple-inscriptions of Bhutta Bhabhadeva at Bhuvaneswara and the modern Bengali alphabet in the grants of the Ganga Kings, Nrisingha Deva II, and Nrisingha Deva IV. The modern cursive Odya script was developed out of the Bengali after the 14th century A.D., like the modern Assamese." R. D. Banerjee's "Origin of the Bengali Script," pp. 5-6.

হুতরাং দেখা যাইতেছে, এক সময়ে এই বিশাল প্রদেশে শুধু বাঙ্গলা ভাষা নহে, বাঙ্গলা অক্ষরও প্রচলিত ছিল। প্রাদেশিক বিভাগের ফলে বাঙ্গলা ভাষার অধিকার সঙ্কুচিত করা হইয়াছে।

‘উৎকল ভাষা’ অথবা ‘আসামী ভাষা’ যে কোন নামেই পরিচিত হউক—জাতীয় জীবনে উহা একটা অবিসংবাদিত লাভের বিষয় হইবে ; কিন্তু এককালে বাহা সহজ ছিল, এখন আর তাহা তেমন সহজ নহে। কাটা জিনিষকে জোড়া দেওয়া সহজ ও সম্ভবপর নহে।

বাহা হউক আমরা প্রাচীন কালের কথা বলিতে বাইরা সমস্ত পূর্বভারতকেই লক্ষ্য করিব। বিজ্ঞেন্দ্রলাল রায় তাঁহার বঙ্গ-বন্দনার অশোকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ; তিনি

শিকারীক্ষার সীমা।

অজ্ঞায় করেন নাই। এক সময়ে মগধই সমস্ত পূর্বভারতের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। * বঙ্গদেশের শিকারীক্ষার মূল প্রশ্রবণ—

এই গঙ্গার আদি-উৎস হরিদ্বার-স্বরূপ—মগধ-কেন্দ্রস্থলে বিরাজিত ছিল ; মগধের উচ্চশিক্ষা, মগধের শিল্পকলা সমস্তই উত্তরকালে পূর্বদিক্ আশ্রয় করিয়া গোড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, মগধকে বাদ দিয়া বাঙ্গলার ইতিহাস রচনা করা চলে না। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসে মগধকে বাদ দেন নাই।

যদি ভারতীয় মানচিত্রের পূর্ব-সীমানায় কতকটা অংশের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি, তবে উত্তর সীমান্তে দার্জিলিং, কালিঙ্গ প্রভৃতির নিকটে নেপাল উপত্যকার

একটি ক্ষুদ্র নগরাজ্যে
কতগুলি মহাপুংগব জনগ্রহণ
করিয়াছেন।

গোরক্ষপুরের অতি সান্নিধ্যে কপিলাবস্ত্র ও লুধিনীবনের সাক্ষাৎ পাই, তারপর সমেৎ-শেখরে (বর্তমান মানভূমজেলায়) অবতরণ করুন, আরও দক্ষিণে নবদ্বীপ এবং তৎ পূর্বোত্তরে রঙ্গপুর, বিক্রমপুর ও প্রাগজ্যোতিষপুর চিহ্নিত করুন ; একটু পশ্চিমে

ভাগলপুর এবং মগধ। এই যে ক্ষুদ্র একটা সীমানা দেওয়া হইল, সমস্ত পৃথিবীর মানচিত্রে তাহা অতি নগণ্যস্থান অধিকার করিয়া আছে। বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় সীমানা ইহা নহে। কিন্তু বঙ্গীয় শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রভূমির সীমা টানিলে এই বিভাগ মানিয়া লইতে হইবে। এই সকল স্থান পরস্পরের অদ্রবর্তী, আকৃতিতে এবং পরিমাণে পৃথিবীর মানচিত্রে এই বিভাগ নগণ্য হইলেও ইহা অল্প হিসাবে নগণ্য নহে। এই বিভাগে আমরা বুদ্ধকে পাইয়াছি, তাহার অর্থ মানবজাতির একতৃতীয়াংশের আধ্যাত্মিক রাজ্যের সম্রাট এই বিভাগের লোক। যিনি জগতের রাজস্বকুলের শিরোভূষণ—সেই অশোক এই বিভাগের নিবাসী। এই বিভাগে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর, জগদল, সুবর্ণবিহার প্রভৃতি জগতের আদর্শ শিক্ষা-কেন্দ্রগুলিকে পাইয়াছি। এই বিভাগে দীমান ও বিতপাল চিত্রকলার সম্রাট, তাঁহারা যে রীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা নেপাল ও তিব্বত অতিক্রম করিয়া চীন-জাপানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই বিভাগে শ্রীজ্ঞান দীপকর সমস্ত মাধ্যমিক

* বিজ্ঞেন্দ্রলাল তাঁহার হুপ্রসিদ্ধ “ বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্তা আমার, আমার দেশ ” গানটিতে বুদ্ধ, অশোক, বিজয় প্রভৃতি সকলকে বঙ্গবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। সে সময় বিহার জেলাটা বঙ্গের একাংশ ছিল। কবি কালিদাস রায় লিখিয়াছেন, “এই গানে ডি. এল. রায় ‘বঙ্গ আমার’ লিখিয়াছিলেন,— মিলিপবারু পুনর্মুদ্রণ-কালে ‘বঙ্গ’ উঠাইয়া দিয়া ‘ভারত’ করিয়াছেন।”

মহান-বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উপাত্তদেবতা, বুদ্ধের নীচেই তাঁহার স্থান। বিক্রমপুরের শাস্ত্ররক্ষিত ও শীলভদ্র একসময়ে সমস্ত বৌদ্ধ জগতের শিক্ষাকেন্দ্রের গুরু ছিলেন। সুবিখ্যাত জৈন গুরু ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ দীর্ঘকাল রাত, পুণ্ড্র ও তাম্রলিপ্ত দেশে তাঁহার চাতুর্ধর্ম ধর্ম প্রচার করিয়া ৭৭৭ খৃঃ পূঃ অব্দে মানভূমে সমাধিলাভ করেন; এই মানভূম জেলায় আরও অনেক তীর্থঙ্করের সমাধিস্থান রহিয়াছে। রঙ্গপুর অঞ্চলে এবং ত্রিপুর দেশে বঙ্গাদিপ রাজা গোবিন্দচন্দ্র মাতৃ-মাজা শিরোধার্য করিয়া দ্বিতীয় রামচন্দ্রের ছায় ছাদশ বংশরের জন্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্তিকথা আসাম হইতে পাঞ্জাব এবং কলিঙ্গ হইতে বোম্বে প্রেসিডেন্সী পর্যন্ত সর্বত্র এখনও গীত হইয়া থাকে। বোম্বাই প্রদেশে এখনও গোপীচাঁদের সন্ন্যাস রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় এবং সেদিনও সুবিখ্যাত রাজ-চিত্রকর রবিরথী বঙ্গের রাজা গোপীচাঁদের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, তাহা এখনও ভারতবর্ষের নানা স্থানে ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে।

মগধের সুবিখ্যাত সম্রাটগণের কথা ছাড়িয়া দিলাম। গুপ্ত, পাল ও সেন সম্রাটগণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার অবকাশ এখানে নাই। কিন্তু উত্তরকালে সাদ্ধোপাঙ্গ-সহকারে মুক্তিমান্ হরি-নাম-স্বরূপ যিনি সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিতে আসিয়াছিলেন—তিনি এই দেশের ইতিহাসে একা। তিনি প্রেম-ভক্তি-গগনের পূর্ণচন্দ্র। এদেশকে গঙ্গা যে উর্বরতা ও শ্রামলতী দান করিয়াছেন মহাপ্রভু ও বঙ্গের আধ্যাত্মিক রাজ্যে তরুণ সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য দিয়া গিয়াছেন। আমি হৃদয় স্থায়-শাস্ত্রের বঙ্গীয় গুরুদের নাম এখানে করিলাম না। তাঁহারাও প্রত্যেকে এক একটি দিক্‌পাল-সদৃশ। আসামের শঙ্কর, বঙ্গদেশের রূপ, সনাতন, নরোত্তম, ত্রিনিবাস, অম্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রামানন্দ বৈষ্ণব-জগতের গুরুকুলের প্রথম পঙ্ক্তিতে আসীন।

এখানে আমরা ভারত-মানচিত্রের পূর্বাংশের যে সীমা প্রদান করিলাম, তাহাতে যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন জগতের আর কোথাও কি এইরূপ একটি ক্ষুদ্র গভীর মধ্যে এত বেশী মহাজনগণের আবির্ভাব হইয়াছে? বঙ্গের বঙ্গোপসাগর গোলাপের জন্মভূমি, এই সীমা-নির্দিষ্টগভী তেমনিই ধর্মবীর ও সাধকগণের লীলাক্ষেত্র। এই পূর্বভারত পবিত্র হইতেও পবিত্র। বাঙ্গলাদেশ বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, শাস্ত্র—হিন্দুধর্মের এই কয়েকটি শাখা-প্রশাখার প্রধান কেন্দ্রভূমি। উত্তরকালে ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্ম এইদেশে প্রবেশ করিয়াছে। এই শক্তিশালী দেশকে গ্রাস করিবার উপযোগী প্রতিভা কোন বিদেশীর নাই। কিন্তু যে কেহ এই দেশে আসিয়াছেন, তিনি বাহা কিছু ভাল আনিয়াছেন, এ দেশ-লক্ষী তাহা রাজেশ্বরীর ছায় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন। বিদেশীরা ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রধান নৈতিক ও অধ্যাত্ম-সম্পদ বাঙ্গালীরা গ্রাস করিয়াছেন। যে মহাক্ষেত্রে এতগুলি শক্তির সংঘর্ষ হইয়াছে, সে দেশ,—সে সমাজ এঁধো পুকুরের মত আবর্জনা-পূর্ণ হইয়া থাকিতে পারে নাই, স্বাধীন চিন্তা সে দেশের পক্ষে স্বাভাবিক। এ দেশের লোক নানা জাতি ও নানা ধর্মের সমন্বয় করিতে শিখিয়াছে। বিভিন্নশক্তির

সংঘর্ষে আসিয়া ইহারা সংস্কার-জয়ী হইয়াছেন। ইহাদের উদারতা ও শিক্ষার প্রসার যে কত বড়, তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া বাইব। যখনই বিদেশীয়গণ তাঁহাদের দুর্দ্বৈ শক্তির বলে রাষ্ট্র-প্রাধাত্য স্থাপন করিয়া বস্ত্রার মত এদেশে আসিয়াছেন, তখনই হয়ত কিছুকালের জন্ত আত্মরক্ষার্থে আমাদের সমাজ তাঁহাদের প্রধান সম্পদকে অতিরিক্ত যাত্রায় আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। কচ্ছপ বেক্রপ মাংস-লুক হিংস্রজন্তু হইতে নিজের কোমল দেহ রক্ষা করিবার জন্ত বাহিরে একটা কঠিন আচ্ছাদনের সৃষ্টি করে, হিন্দুসমাজ সেই ভাবে সময়ে সময়ে একটা অতিরিক্ত গোড়ামির গত্তী স্থাপন করিয়া পররাজ্যাধিকার-লোলূপ জাতিগুলি হইতে নিজকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রভাব সাময়িক। বর্তমান হিন্দুধর্ম সেইরূপ একটা আত্মরক্ষার আবরণে বেষ্টিত, কিন্তু ইহার ভিতরে ভিতরে এখনও যে চিন্তার প্রসারতা ও মানসিক স্বাধীনতা আছে, অল্প দেশের সহিত তাহার তুলনা হয় না। আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তাহা দেখাইব। এখন পুনরায় দুর্জয় রাষ্ট্রশক্তি ও নব্যসভ্যতার সংস্পর্শে সেই কঠিন আবরণ ধসিয়া পড়িতেছে; আশা করি অচিরে আমরা বাঙ্গালী জাতির স্বরূপ আবিষ্কার করিবার সুবিধা পাইব।

পুরাকালে আর্য্যাবর্তের পূর্ব্বখণ্ড নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল; এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের গৌরব, নাম ও সীমার কিছুই ঠিক ছিল না। বহুধা-বিভক্ত এই দেশের যে রাজা যখন প্রবল হইয়া উঠিতেন, তাঁহার রাজ্যের গত্তী কিছুকালের জন্ত তখন বাড়িয়া যাইত। আমরা এই অধ্যায়েই দেখিয়াছি এক কালে গোড় দেশের নামে সারস্বত কান্তকূজ, গোড়, মিথিলা ও উৎকল, অর্থাৎ প্রায় সমস্ত বিক্ষোভের প্রদেশ পরিচিত হইত, গোড়ের নামে প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত নামাঙ্কিত ছিল। গোড়ের শ্রেষ্ঠ রাজারা 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' এই গৌরবান্বিত উপাধি ধারণ করিয়া সার্বভৌম সম্রাটের সম্মানের দাবী করিতেন। এককালে সপ্তধা-বিভক্ত ব্রিটনের প্রধান রাজা বেক্রপ "ব্রিটওয়াল্ডা" উপাধি গ্রহণ করিতেন, 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধিও সেইরূপ গোড়দেশের মহিমাব্যঞ্জক ছিল। এই পঞ্চগৌড়েশ্বর উপাধি কালে গোড়ের রাজস্ববর্গের কোলিক উপাধিতে পরিণত হইয়াছিল; এমন কি যখন গোড়রাজ্যের সীমা একান্ত সঙ্কুচিত হইয়াছিল, তখনও প্রাচীন সংস্কারবশতঃ গোড়রাজকে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি দ্বারাই সম্মান করা হইত। রাজা গণেশকে কুন্তিবাস 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' নামে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বিজয়াদিত্য ও বিজয়গুপ্ত গোড়াধিপ হুসেন সাহারও ঐ নামেই পরিচয় দিয়াছেন। ইহা ছাড়া গোড়ের আরও ছোট ছোট নৃপতিকে জোয়ামদ-জীবগণ ঐ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। এমন কি এখনও পুরীর রাজার এক উপাধি 'পঞ্চগৌড়েশ্বর।' সিংহপুরের রাজারা উড়িয়া বিজয় করিয়া "পঞ্চগৌড়েশ্বর" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। কোচবেহারের প্রাচীন ইতিহাসে তথাকার রাজাদিগেরও এই উপাধি দৃষ্ট হয়। (জয়চন্দ্র মুন্সীর 'রাজাবলী' দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু এই গৌরবময় উপাধিটি সর্ব্বদাই কবি বা রাজ-সেবিগণের অতিরঞ্জন ছিল না। 'পাক্কার হ'তে জলদি শেষ' পর্য্যন্ত রাজ্য—আমাদের এই গোড়দেশ—বহুকাল আর্য্যাবর্তে

৫ 15759

প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। যুগ-যুগ-ব্যাপী মর্যাদা পরবর্তী লোকেদের মধ্যে উত্তরাধিকার-
হুত্রে পৌছায়। এক সময়ে এই গৌরব নামে মাত্র পর্যাবসিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু উহা
যে এ দেশের প্রাচীন গৌরব-কাহিনীর স্মারক তাহাতে সন্দেহ নাই।

যে দেশের সীমানা যুগে যুগে অসংখ্যবার পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহার ভৌগলিক
সীমা লইয়া একটা অধ্যায় লিখিতে আমরা স্বতঃই দ্বিধাবোধ করিতেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক যুগের পূর্বাধ্যায়

“অনারতং বিনিয়ন্তো মহাত্মৈঃ শত্রুঘাতিভিঃ।

ন হন্তামো বরং তস্ত ত্রিভিবর্ষশতৈবলম্ ॥”

—মহাভারত, সভা—১৪ ; ৩৫।

এক সময়ে আর্য্যবর্তের পূর্বভাগ—মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, প্রাগজ্যোতিষপুর প্রভৃতি
নানা ভাগে বিভক্ত ছিল। এই বৃহৎ ভূভাগ পরস্পরের অতিসামান্য হেতু এবং যুগে
যুগে একজ্ঞাত সম্রাটের শাসনাধীন থাকার দরুন শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতায় ঐক্যলাভ
করিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় বিভাগ—প্রবল-স্রোতা নদীর চরের মত ক্রমাগত পরিবর্তনশীল—
তাহার উপর আমরা জোর দিব না; এই রাজ্যের সভ্যতা ও শিক্ষার কেন্দ্রভূমিগুলির
প্রতিই বিশেষ মনোযোগী হইব। লোকেতিহাসের কাহিনী বর্ণনা করিতে গেলে বোধ
হয় এই পন্থাই সনীচীন।

বৈদিক সাহিত্যে এই দেশের নাম অনেক স্থলে পাওয়া গিয়াছে। সেই সকল
নামোল্লেখ এবং ভৌগলিকগণের ভূতত্ত্ব আলোচনা দ্বারা এদেশের অস্তিত্ব কোন্ যুগে
হইয়াছিল তাহা লইয়া গবেষণা করিব না। সে বিজ্ঞা আমার নাই এবং আমি
প্রত্নতাত্ত্বিক নহি।

মহাভারতের সময় হইতেই আমরা আর্য্যবর্তের পূর্বাংশের বিশেষরূপ উল্লেখ পাই।
সেই উল্লেখই আমাদের আলোচনার ভিত্তিভূমি।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছু পূর্বে আমরা এই ভূভাগের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির কীর্তি
অবগত হই। যগধরাজ জরাসন্ধ, পৌণ্ড্র বাহুদেব, অঙ্গরাজ কর্ণ, প্রাগজ্যোতিষপুরাধিপতি
নরক ও ভগদত্ত এবং বঙ্গাধিপ চিত্রসেন ও সমুদ্রসেন।

কর্ণ অঙ্গদেশে* রাজত্বলাভ করিয়া পূর্বাভারতের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা ও শৌর্য্য-বীৰ্য্যের লীলাক্ষেত্র ছিল হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ ও কুরুক্ষেত্র।

মহাভারতের এক বৃহৎ অংশ তাঁহার গুণগরিমায় পূর্ণ, সেই কীর্ত্তিকথা লইয়া পূর্বাঞ্চলের লোকেদের গৌরব করিবার কিছুই

নাই ; কিন্তু আমাদের দেশে তাঁহার পরিচয় অতীবিশিষ্ট। তিনি পরশুরামের শিষ্য, অবিভীষ বীর, দুর্ঘ্যোধনের প্রিয়সখ ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁহার প্রধান অবলম্বন, এ সকল কথা লইয়া আমরা গৌরব করিব না। মহাভারতে অতি সংক্ষেপে তাঁহার আর একটি গুণের উল্লেখ আছে—

“তিনি প্রার্থীগণের কল্লবৃক্ষ স্বরূপ ছিলেন, তিনি বাচকদিগকে কখনই প্রত্যাখ্যান করিতেন না। সাধু ব্যক্তির তাহাকে সংপূরক বলিয়া গণনা করিতেন, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণসমূহ হইয়াছিল, তিনি ব্রাহ্মণের অল্প জীবন দানেও উত্তম হইতেন।”—
কর্ণপর্ক, ২৫ অঃ, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

কৌরবকুলের বর্ষ-স্বরূপ মহারথ কর্ণ, বীহার মৃত্যু উপলক্ষে ব্যাস লিখিয়াছেন, “নদীসমুদয়ের গতি রুদ্ধ হইল, দিক্‌বিদিক্‌সকল ধূমাকীর্ণ ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল..... মহার্ণবসকল সংজ্ঞাহীন ও শব্দায়মান হইল, বৃষ্টিও তির্য্যাক্ ভাবে অত্যাধিক হইলেন। অনল সদৃশ উজ্জ্বল হইতে লাগিল এবং বহুকরা আত্মনাশ করিয়া কম্পিত হইল” (কর্ণপর্ক, ২৫ অঃ)। আমাদের এই অঞ্চলে কর্ণ এতাদৃশ পুরুষ-সিংহরূপে বিশেষভাবে পরিচিত নহেন। আমরা তাহাকে উপাধি দিয়াছি ‘দাতাকর্ণ’। এই উপাধি যে তাঁহার যোগ্য, তাহা মহাভারতের পূর্বাঙ্কিত করেকটি পঙ্ক্তি দ্বারা প্রমাণ হইবে। ‘দাতাকর্ণ’ নামক পুস্তকে যে একটা উপগল্প বর্ণিত হইয়াছে সেই অলৌকিক কাহিনীতে কর্ণের হৃদয় যে কত উচ্চ, তাঁহার দানশক্তি যে অপরিমিত সেই কথা অতিরঞ্জনের ভাষায় কথিত হইয়াছে ; যেমন আমরা অসীম শক্তি দেখিয়া কোন মহাবীরের বহু হস্ত, বহু চক্ষু কল্লনা করিয়া তাঁহার কর্ম্ম-শীলতা ও অন্তর্দৃষ্টি সাধারণকে রূপক দিয়া বুঝাইয়া আসিয়াছি—রাবণ, কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন, শিশুপাল প্রভৃতি রাজাদের সম্বন্ধে ঐভাবে রূপ বর্ণনা করিয়াছি—কর্ণ সম্বন্ধে উপগল্পটিও তদ্রূপ একটি রূপকমাত্র। কিন্তু এদেশে তাঁহার দানশীলতার কথা এখন পর্য্যন্তও প্রবাদবাক্যের দ্বারা সুপরিচিত হইয়া আছে। বোধ হয় ইন্দ্রপ্রস্থ বা কুরুক্ষেত্রের পার্শ্ববর্তী স্থানে তাঁহার ‘দাতাকর্ণ’ নাম কেহ জানেন না।

* প্রাচীন অঙ্গ—মুন্দের সহ ভাগলপুর প্রদেশ। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ যে ১৬টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল, অঙ্গ তাহার অন্ততম (অঙ্গুত্তর, বিনয়নুত্তর, দীঘনিকায়, গোবিন্দনুত্তর)। অঙ্গের রাজধানী ছিল চম্পা,—এই রাজ্যের মূল, মূল বঙ্গের স্থপরিচিত। এখনও চাঁপা মূল, চাঁপা কলা প্রভৃতি শব্দ অঙ্গ দেশের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। লোমপাতি রাজা এবং পরবর্তী কালে কর্ণ এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। বাড়উড় সাহেবের মতে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলা প্রাচীন অঙ্গ দেশের অন্তর্গত ছিল এবং কাহারও কাহারও মতে সাঁওতাল পরগনাও অঙ্গের অংশ। সর্ব প্রথম অঙ্গ-সংহিতায় অঙ্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (পঞ্চম কাণ্ড, ১৪ অনুবাক্)। মঙ্গলাল বের ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অভিধান দ্রষ্টব্য (৭-৮ পৃঃ)।

কিন্তু এদেশে এই নাম চিরপরিচিত। দ্বীলোকেরাও কথায় কথায় উপমা দেওয়ার সময় ঐ পরিচয়ের প্রবাদবাক্য ব্যবহার করে। ‘দাতাকর্ণ’ পুস্তকখানি লইয়া এদেশের বহু কবি কবিতা লিখিয়াছেন। বোধ হয়, এই বিষয় লইয়া বাঙ্গলার প্রাচীন কবিরা যত কবিতা লিখিয়াছেন, অল্প কোন বিষয়ে এত অধিক কবিতা লিখিত হয় নাই। আমাদের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায়ই ভিন্ন ভিন্ন কবি-রচিত ৩০১৩৫ খানি ‘দাতাকর্ণের’ পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। একশত বৎসর পূর্বে বাঙ্গলায় বালকগণের নিত্যপাঠ্য শিশু-বোধক এবং অপরাপর পুস্তকে দাতাকর্ণের উপাখ্যান একটি অপরিহার্য্য বিষয় ছিল। কর্ণ যে বাঙ্গালীর কত প্রিয়, তাঁহার শৌর্য্য-বীৰ্য্য ও অপরাপর অসাধারণ গুণের জন্ত নহে, শুধু দানশীলতার জন্ত, তাহা এই প্রসঙ্গে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। তিনি সমস্ত সম্পত্তি বিলাইয়া দিয়া—এমন কি স্বীয় প্রণামিক পুত্রকেও নিহঁরভাবে হত্যা করিয়াও দানের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। এই কথাটি বাঙ্গালী কবি পুনঃ পুনঃ তাঁহার পাঠক-গণকে গম্ভীরে বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ছর্য্যোধনকে বাক্যদান করিয়া তিনি সহোদর-দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়া বাগ্‌দানের মহিমা দেখাইয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের কর্ণকে তদেশবাসীরা এক ভাবে দেখিয়াছেন, অঙ্গ-বঙ্গের লোকরা তাঁহাকে আর এক ভাবে বুঝিয়াছেন। পাল-রাজগণের কাহারও কাহারও তাম্রশাসনে কর্ণের দান-শীলতার কথা উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। শৌর্য্য, বীৰ্য্য ও ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাও এদেশের লোকেরা হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য, মহানুভবতা ও ত্যাগধর্ম্মকে বড় করিয়া দেখিয়াছে। কর্ণের প্রসঙ্গে এদেশের সেই বৈশিষ্ট্যের কথাই মনে পড়া স্বাভাবিক। বাঙ্গলার তাম্রশাসনগুলিতে আমরা পুনঃ পুনঃ কর্ণের এই দানশীলতার উল্লেখ দেখিতে পাই। মহাভারতে কর্ণের এই গুণটির অতি সংক্ষেপে মাত্র উল্লেখ আছে। ভার্গবের প্রিয় শিষ্য, অজ্ঞেয় বোদ্ধা এবং বীরদের অগ্রণী কর্ণ অঙ্গ-বঙ্গে ‘দাতাকর্ণ’ তাম্রশাসনে ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল কর্ণের মত দাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কুমারপালের মন্ত্রী বৈষ্ণবেশকে “স্বভাবসিদ্ধ দানশীলতা-গুণে ‘চম্পকেশ কর্ণের’ সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। কর্ণ সম্বন্ধে এই ভাবের উল্লেখ বাঙ্গলার আরও দুই একখানি তাম্রশাসনে আমরা পাইয়াছি। বাঙ্গলার কোন তাম্রশাসনেই কর্ণের বীরত্বের উল্লেখ নাই। সমস্ত আধ্যাত্ত্ব কর্ণকে যে ভাবে দেখিয়াছে বাঙ্গলাদেশ সেভাবে দেখে নাই। এদেশ ক্ষমতার পূজক নহে,—হৃদয়ের মহান গুণের পূজক; এই জন্তই এদেশের কৃষ্ণ শঙ্খচক্রগদাধারী নহেন—তাঁহার একমাত্র অমোঘ অস্ত্র একটা বাঁশের বাঁশী।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের বৃহৎ বঙ্গের প্রধান পুরুষ জরাসন্ধ। মহাভারত, হরিবংশ
মগধ-গৌরব জরাসন্ধ।
প্রভৃতি পুরাণে এই অদ্বিতীয় বীরের কাহিনী বিশেষভাবে
লিপিবদ্ধ আছে।

একদা নারদ আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, “পাণ্ডু স্বর্গবাসী, তিনি আমাকে বলিয়াছেন, যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যহুয় যজ্ঞ করিতে বলিবেন। এই যজ্ঞ পূর্ণ করিতে পারিলে আমার স্বর্গবাস স্থায়ী হইবে।”

সমস্ত বজ্ঞের শ্রেষ্ঠ রাজস্বয়। সর্কপ্রধান সম্রাট না হইলে এই যজ্ঞ সম্পাদন করা সম্ভবপর নহে। নারদ বলিলেন, 'তুমি রাজাধিরাজ, ভ্রাতৃগণের সহায়তায় তুমি কৃতকার্য হইবে।' যুধিষ্ঠির ভাবিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভ্রাতৃগণকে ডাকাইলেন; তাঁহারা কেহ গাণ্ডীব, কেহ গদা, কেহ অপরাপর অস্ত্রের গৌরব করিয়া এই কার্যে তখনই হস্তক্ষেপ করিতে পরামর্শ দিলেন। মন্ত্রী ও সভাসদেরা একবাক্যে বলিলেন, 'যুধিষ্ঠিরের পক্ষে এই যজ্ঞ একান্ত সহজ ব্যাপার।' তাঁহারা অনতিবিলম্বে যজ্ঞস্থলস্থান আরম্ভ করিতে রাজাকে ধরিয়া বসিলেন। রাজা ধৈর্য্যান ব্যাস ও ধোম্য প্রভৃতি ঋষিবর্গের মত লইলেন, তাঁহারা বলিলেন, 'মহারাজ, তুমি এ কার্যের যোগ্যপাত্র।'।

এই সকল অমূল্য মত পাইয়াও দীর্ঘ-বুদ্ধি যুধিষ্ঠিরের সমস্ত বিধা ঘুচিল না; তিনি যতপতি কৃষ্ণকে আনিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন, 'যদিও আমার ভ্রাতৃবৃন্দ-প্রমুখ সমস্ত আত্মীয়, মন্ত্রিগণ এবং শ্রেষ্ঠ ঋষিরা এই কার্যে অনুমোদন করিয়াছেন, তথাপি আমি কৃষ্ণের মতামতসারেই পরিচালিত হইব।' সারথি ইন্দ্রসেনকে সঙ্গে করিয়া দ্বারকা হইতে দ্বারকানাথ যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত হইলেন।

কৃষ্ণ সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "এত শীঘ্র এই কথার মীমাংসা চলে না।" তৎসময়ের ক্ষত্রিয়গণের একটা ইতিহাস তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বলিলেন, কংসবধের পর এখন বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধই ভারতবর্ষের অধিতীয় সম্রাট; জরাসন্ধের পরাক্রম।

সে তোমাদের এই কার্যে প্রতিবাদী হইয়া তোমাদের সমস্ত উদ্ভয় পণ্ড করিয়া দিবে। তাহাকে নিরস্ত করিতে না পারিলে তোমাদের এ কার্যে ত্রুটি হওয়া উচিত নহে। তাহারা তোমাদের ও বৃদ্ধকুলের আত্মীয়, তাঁহারাও ভয়ে জরাসন্ধের অনুগত হইয়াছেন। শুধু তোমাদের পূজা ও মেহভাজন মাতুল পুরজিৎ জরাসন্ধের অনুগামী হন নাই, কিন্তু তোমাদের পিতৃসখা যবনাদিপতি বৃদ্ধ ভগদত্ত, বৃদ্ধকুলের পরম আত্মীয় ভীষ্মক ইহারা সকলেই তাঁহার বাধ্য। আমরা বহু চেষ্টা করিয়াছি, তথাপি ভীষ্মক জরাসন্ধের ভয়ে আত্মীয়তা সবেও আমাদের সহায়তা করিতে স্বীকৃত হন নাই। হংস ও ডিম্বক এই দুই মহাপরাক্রান্ত রাজা জরাসন্ধের অনুচর। চেন্দ্রি-অধিপতি শিশুপাল যুদ্ধকালে জরাসন্ধের সেনাপতি হন। মহাপরাক্রান্ত, বিশ্ববিশ্রুতকীর্তি পৌণ্ড্র বাহুদেব ইহার অন্তরঙ্গ সখা। যে সকল রাজা জরাসন্ধের প্রতিকূলতা করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীয় দেশ পরিত্যাগ করিয়া বনাচারী হইয়াছেন, নতুবা অন্তত বাস করিতেছেন। উত্তরদেশবাসী রাজগণ ও অষ্টাদশ ভোজকুল পশ্চিমদিকে পলায়ন করিয়াছেন। ইহার ভয়ে শূরসেন, ভদ্রকার, বোধ, শাব, পটচ্চর, স্তম্বল, মকুট, কুলন্দ, কুন্তি, শালয়নবংশীয় রাজগণ, দক্ষিণ-পাঞ্চালের রাজারা, এবং কোশলবাসী নৃপতিগণ পশ্চিমদিকে পলায়ন করিয়াছেন, মৎস্ত প্রভৃতি দেশীয় রাজগণ অতিশয় ভীত হইয়া উত্তরদিক্ হইতে দক্ষিণদিকে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছেন। শিবের মন্দিরে বলি দেওয়ার জন্ত এই দুই সম্রাট ৮৬জন

রাজাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। আর ১৪জন নৃপতি হইলেই একশত সংখ্যা পূর্ণ হইবে, তখন ইনি যজ্ঞ করিয়া ইহাদিগকে বলি দিবেন।

দুর্দান্ত জরাসন্ধ বহুবার মথুরা অবরোধ করিয়াছিলেন; ইহার অমিত পরাক্রম এবং অসংখ্য সৈন্যবলের নিকট যত্নকুল দাঁড়াইতে পারে নাই; অবশেষে ভীত ও আতঙ্কিত হইয়া আমরা প্রিয় জন্মভূমি মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম গিরিরাশি-সংরক্ষিত রৈবতকের নিকট রাজধানী পরিবর্তিত করিয়া কথকিং নির্ভয়ে বাস করিতেছি। এই দুর্জয় শত্রু কিছুতেই তোমাদের রাজত্ব যজ্ঞ অস্থগ্ন করিতে দিবেন না।

“যদি আমরা শত্রুনাশক মহাজ্ঞানীরা তিনশত বৎসর অবিশ্রামে জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। (মহাভারত, সভা, ১৪ অঃ) সুতরাং জরাসন্ধ থাকিতে কিছুতেই তুমি রাজত্ব যজ্ঞ করিতে পারিবে না। রাজত্ব যজ্ঞ একেবারে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।” (সভা, ১৫ অঃ)।

কৃষ্ণের এই কথার জরাসন্ধের প্রতাপের কতকটা আভাস পাওয়া গেল। হরিবংশে জরাসন্ধ কর্তৃক মথুরা আক্রমণের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—তাহা আরও বিস্তৃত। পুরাণকার যেন ভারতের সমস্ত রাজত্ববর্গের ছবি-সংযুক্ত একখানি বিশাল পটে জরাসন্ধকে রাজরাজেশ্বর মহাসম্রাট্শ্বরূপ আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, এই একখানি চিত্র দিয়া হরিবংশ-পুরাণের অনেকাংশ পূর্ণ করা হইয়াছে।

জরাসন্ধের দুই হুহিতা অস্তি ও প্রাপ্তিকে কংস বিবাহ করিয়াছিলেন। কংসের মৃত্যুর পর ইহারা জরাসন্ধকে তাঁহাদের স্বামি-হত্যার প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করেন।

অস্তি ও প্রাপ্তি। জন্মাতৃবধের শোকে প্রতিহিংসাবৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া জরাসন্ধ

মথুরাপুরী আক্রমণ করিয়াছিলেন, একবার হুইবার নহে—সপ্তদশবার। প্রথমবারের আক্রমণকালে ভারতবিশ্বত প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের রাজা সম্রাট জরাসন্ধের অস্থবর্তী হইয়াছিলেন। হরিবংশ ৩৫জন রাজার নাম বলিয়া “অন্তান্ত” শব্দদ্বারা অধিকতর সংখ্যার ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই ৩৫জনের মধ্যে আমরা যত্নকুলের বিরুদ্ধে অভিযান।

গান্ধার ও কাশ্মীর হইতে প্রাগ্জ্যোতিষপুর পর্যন্ত এবং হিমাচলের উপত্যকা হইতে দাক্ষিণাত্যের কোন কোন দেশের নাম পাইয়াছি। এই মহতী চম্র মধ্যে পৌণ্ড্রাজ বাহুবল, অঙ্গ-বঙ্গ হুই দেশের অধিপতি, চেদিরাজ শিশুপাল, কাশী, মদ্র, গান্ধার প্রভৃতি দেশের রাজার উল্লেখ আছে। আশ্চর্যের বিষয় যাহারা মথুরা অবরোধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ঋষদ রাজা ও সভাতৃবর্গ দুর্যোধনের নামও পাইতেছি। যত্নবংশের দ্বারা সুরক্ষিত মথুরার চারিটি দ্বার জরাসন্ধ অবরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীন রাজগণের মধ্যে পশ্চিমদ্বার রোধ করিয়া ১০জন রাজচক্রবর্তী, উত্তরদ্বারে ১২জন এবং পূর্বদ্বারে ১৩জন পরাক্রান্ত রাজা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, স্বয়ং জরাসন্ধ, শিশুপাল ও তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ কয়েকজন মহাবোদ্ধার সঙ্গে দক্ষিণদ্বার অবরোধ করিয়াছিলেন।

এই মহাসৈন্ত ও রাজাধিরাজগণ-পরিবৃত সম্রাট জরাসন্ধ যে তখন ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান রাজা ছিলেন, তাহা মহাভারতাদি পুরাণে পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যায়। যে রাজধানীতে উত্তরকালে অশোক প্রভৃতি মৌর্যবংশীয় রাজগণ আসীন ছিলেন, তৎপূর্বে নন্দবংশ, এবং মৌর্যবংশের রাজত্বের অবসানে, অন্ধ্রবংশ ও গুপ্তসম্রাটেরা অবস্থিত ছিলেন, সেই রাজধানীর সর্বপ্রথম গৌরব জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথ পত্তন করিয়াছিলেন এবং সেই গৌরব-শিখা জরাসন্ধের সময় সমস্ত ভারতবর্ষ আলোকিত করিয়াছিল। জরাসন্ধের পতাকা-নিম্নে শত শত খেত রাজহুত্র একত্র দেখিয়া কৃষ্ণ বলরামকে বলিয়াছিলেন, ‘মনে হইতেছে মথুরার আকাশে শত শত বলাকাপঙ্ক্তি উড়িতেছে।’ এই মহাসৈন্ত হইতে কৃষ্ণ সাগরের জায় একটা গভীর কলরব উথিত হইয়াছিল; হরিবংশকার বলিতেছেন, এই সময় তর্জনী হেলনপূর্বক এক সমুদ্র মঞ্চ হইতে জরাসন্ধ বলিলেন “চূপ”। তখন হিমাদ্রিতুলা হির কোন যোগিবরের জায় জরাসন্ধকে দেখা বাইতেছিল। তাঁহার সেই আদেশবাণী ইন্দ্রিতে প্রচারিত হওয়ামাত্র মহাসৈন্তসমুদ্র অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া তুক্ষীভাব অবলম্বন করিল, উত্তাল মহাসাগর যেন প্রশান্ত মহাসাগরে পরিণত হইল; রাজাদিগকে সন্মোহন করিয়া তিনি সম্রাটের বোম্ব গভীর কথায় আলাময়ী এক বক্তৃতা করিলেন।

এক সময়ে কৃষ্ণ ও বলরামের প্রত্যাপে জরাসন্ধের এই বিপুল সৈন্ত প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ত্বরিতগতিতে তিনি তাহাদের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, “হে ক্ষত্রিয়গণ, তোমরা পলায়নোত্তম হইয়াছ কেন? তোমাদিগকে ধিক্। বেশ, তোমরা যুদ্ধ করিও না, এইখানে দাঁড়াইয়া থাক, আমি স্বয়ং এই দুইটি রাখালকে (কৃষ্ণ-বলরাম) একাই বধ করিব। তোমরা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখ।”

এই কথায় লজ্জিত হইয়া পলায়নপর সৈন্ত ফিরিয়া আসিয়া আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

প্রবল দীর্ঘকাল স্থায়ী যুদ্ধের পরও যত্নকুল পরাস্ত হইল না, বহু সৈন্ত ক্ষয় হইল; কিন্তু জরাসন্ধকে ফিরিয়া আসিতে হইল। এদিকে তাঁহার প্রিয় কন্যা অস্তি এবং প্রাপ্তির বিলাপ ও উত্তেজনায় তিনি হির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার যত্নকুল ধ্বংস করিবার মন্ত্র অটল হইয়া রহিল, তিনি পুনঃ পুনঃ মথুরা আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

যত্নকুল বিশেষরূপে বুঝিলেন, পরিণামে তাঁহারা জরাসন্ধের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না। তাঁহার জনবল এবং অধীন নৃপতিবর্গ অনেক বেশী; বালির বাধ দিয়া এই মহাস্রোত তাঁহারা কতদিন ঠেকাইয়া রাখিবেন? তাঁহারা পরামর্শ করিয়া প্রিয়তম জন্মভূমি পরিত্যাগ-পূর্বক দূরদূরান্তরে বাস করিয়া নিরাপদে থাকাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। যদিও সমস্ত ধন-সম্পত্তি লইয়া বাওয়া সম্ভবপর হইল না, তথাপি কতক কতক মূল্যবান সামগ্রী লইয়া তাঁহারা পশ্চিমদিকে পলায়নপর হইলেন, এবং তথায় রৈবতক পর্বত-বেষ্টিত রমণীয় কুশস্থলীতে বাস করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, “তথায় একপ দুর্গসংস্থার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণের কথা দূরে থাকুক, দ্রৌলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারিবে।”

অবশ্য ভীমার্জুনের সাহায্যে ছলনা করিয়া কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বধ করিয়াছিলেন ; তাঁহার কপট দ্রাক্ষকবেশে বাইয়া জরাসন্ধকে আক্রমণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে মগধের দীপ্তি কতকদিনের জন্য নিবিয়া গিয়াছিল। বক্রিমবাবু কৃষ্ণচরিতে লিখিয়াছেন—“হিন্দুরাজত্বকালে অধিকাংশ সময়েই আধিপত্য মগধাধিপতির ছিল। আমরা যে সময়ের বর্ণনায় উপস্থিত, সে সময়েও মগধাধিপতি উত্তরভারতের সম্রাট।.....কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও উভয়পক্ষের মোট অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা উপস্থিত ছিল, লেখা আছে। একা জরাসন্ধের বিংশতি অক্ষৌহিনী সেনা ছিল বলিয়া উল্লিখিত।”

এই সকল সৈন্ত-সংখ্যা ও প্রতাপের বর্ণনায় কতকটা অতিরঞ্জন নিশ্চয়ই আছে, তথাপি মহাভারত ও অপর্যাপ্ত পুরাণ পাঠ করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, কুরুক্ষেত্রের কিছু পূর্বে জরাসন্ধ পূর্ব-গগনের মধ্যাহ্ন-মার্গেও ছিলেন। তাঁহার মত বলশালী ও প্রবল নৃপতি তখন ভারতবর্ষে অল্প কেহ ছিলেন না।

কিন্তু এই পূর্বভারতে শুধু জরাসন্ধ নহেন, তখন আরও অনেকগুলি প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, যাহারা তাঁহাদের অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা সমস্ত আধ্যাত্মিক স্থাপিত করিবার স্পষ্ট করিতেন। ইহাদের মধ্যে জরাসন্ধের পরেই পৌণ্ড্র বাহুদেবের নাম করিতে পারি। সেই সময়ের পৌণ্ড্রদেশ বঙ্গদেশের অনেকাংশ জুড়িয়াছিল ; চৈনিক পরিব্রাজকগণ ও প্রাচীন ইতিবৃত্তকারেরা অনেকেই এই পৌণ্ড্রদেশের গৌরব কীর্তন করিয়াছেন।

হয়ত পুরাকালে ইহার দক্ষিণে পদ্মা, পশ্চিমে মহানন্দা, উত্তরে কোচবিহার ও করতোয়া নদী ছিল ; উত্তর-বঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও পাবনা জেলার পূর্বাংশ ব্যতীত এক সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ এই পৌণ্ড্র বা পৌণ্ড্রবর্ধন ভূক্তির অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন পৌণ্ড্রের অনেকাংশ এখন পাবনা ও বরেন্দ্রভূমির মধ্যে পড়িয়াছে। সম্প্রতি দীক্ষিত সাহেব মহাস্থান হইতে যে মোহা-লিপি-সংযুক্ত প্রস্তরখণ্ড পাইয়াছেন, তাহাতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে অশোকের সময় মহাস্থানই পৌণ্ড্রদেশের রাজধানী ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনতিপূর্বে এই ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন বাহুদেব। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্র বাহুদেবের সন্ধানে বলিয়াছেন, “এই হরাস্বা মহাবল ও পরাক্রান্ত, আপনাকে পুরুষোত্তম বলিয়া পরিচয় দেয় এবং মোহবশতঃ আমার শত্রু-চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করে, এই রাজা জগতে

(“পৌণ্ড্রকো বাহুদেবেতি মোহমো লোকে ইতি বিপ্র-
তঃ।” মহা, সভা, ১৪অ ২০)।

* পৌণ্ড্রদেশ—পাণ্ডুরা। মহাভারতের পৌণ্ড্র বাহুদেবের সময় হইতে এই দেশ বঙ্গদেশের একটা বিখ্যাত এবং সুবিস্তৃত অংশ ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী পৌড় হইতে কুড়ি মাইল উত্তরপূর্বে ও মালদহ হইতে ছয় মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। অধ্যাপক উইলসনের মতে রাজসাহী, দিনাজপুর, বঙ্গপুর, মালদহ, বগুড়া এবং দিহত এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পুরাকালে মহানন্দা এবং করতোয়ার প্রান্ত পাণ্ডুরা পাবদেশ যৌত করিয়া বহিয়া যাইত। ফাউসন সাহেব বলেন, দিনাজপুর, বগুড়া ও বঙ্গপুর এই রাজ্যের প্রধান অংশ ছিল। এককালে পৌণ্ড্রদেশ বলিতে সমস্ত উত্তরবঙ্গ বুঝাইত।

বাসুদেব নামে বিখ্যাত এবং বঙ্গ, পৌণ্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি" (মভা, ১৩ অ:)।
হরিবংশের ভবিষ্যৎপর্কের ২৩ অধ্যায়ে পৌণ্ড্র বাসুদেবের দ্বারকা আক্রমণ সম্বন্ধে বিস্তৃত এক
বর্ণনা আছে। নরকে কৃষ্ণ হত্যা করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া বাসুদেবের প্রতিহিংসা বৃদ্ধি
লাগিয়া উঠে। তিনি তাঁহার অধীন রাজগণকে আহ্বান করিয়া
কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ ও যত্ন।

বলেন, "এই গোপনন্দন কৃষ্ণ কোন্ সাহসে আমার নাম গ্রহণ
করিয়াছে? জগতে একমাত্র আমিই 'পুরুষোত্তম বাসুদেব'; এই উপাধি এবং চিহ্ন সে কেন
গ্রহণ করিয়াছে? হে রাজগণ, আমার সুদর্শন অতি তীক্ষ্ণ, আমার সহস্রার মহাঘোর চক্র,
আমারই শাস্ত্র নামক মহারথ ধনু ও কৌমুদিকী নামক বৃহৎ গদা—আমিই গদাধর—এই
উপাধি গ্রহণের আর কাহারও অধিকার নাই। হে রাজগণ! যদি তোমরা আমাকে 'শতচক্র-
গদাধর' না বল, তবে তোমাদের প্রত্যেকের শতভার স্বর্ণ ও বহু ধাতু দণ্ড করিব।"

এই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী পৌণ্ড্র বাসুদেব অষ্টসহস্র রথ এবং বহু সহস্র গজারোহী এবং
অসংখ্য পদাতিক সৈন্য লইয়া বঙ্গদেশ হইতে দ্বারকা অবরোধ করিবার জন্য একলব্য প্রভৃতি
পরাক্রান্ত সামন্ত রাজাদিগকে সঙ্গে করিয়া অভিযান করিলেন; অবরোধকারীদের শত শত
দীপশলাকার আলোকে সমস্ত দ্বারকাপুরী উজ্জ্বল হইয়াছিল; এই ভীষণ যুদ্ধে বহুসংখ্যক
যুবীর নিহত হইয়াছিলেন। সাত্যকির সঙ্গে অবিশ্রান্ত যুদ্ধে যখন পৌণ্ড্র রাজ একান্ত পরিশ্রান্ত
হইয়া পড়িলেন, তখন কৃষ্ণ আসিয়া ক্রুর যুদ্ধে তাঁহাকে নিহত করিলেন, কিন্তু তিনি পৌণ্ড্রকের
অসাধারণ বীরত্বে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"ইহার কি আশ্চর্য্য বীৰ্য্য, কি
হুঃসহ ধৈর্য্য!"

ইহার পর আমরা নরকবধের উল্লেখ করিব। হরিবংশে প্রাগ্জ্যোতিষপুরাধিপতি *
নরকের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। ইনি ভূমিপুত্র,—কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন
না। নানারূপ উপগল্প হইতে নিছক সত্যটুকু গ্রহণ করা বড়ই
কঠিন, তবে একথা কতকটা নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে
যে, দেব-মাতা অদিতির দুইটি বহুমূল্য কুণ্ডল ইনি বলপূর্ব্বক লইয়া
আসেন। প্রধানতঃ এই কারণেই ইন্দ্রাদি দেবতার প্রার্থনায়
কৃষ্ণ প্রাগ্জ্যোতিষপুরে নরক রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া-
ছিলেন।

নরক রাজচক্রবর্তী ছিলেন। নিশ্চন্দ, পঞ্চনদ, মুর ও হরগ্রীব নামক সেনাপতিরা
ইহার অসংখ্য সৈন্যের পরিচালনা করিতেন। এই প্রতাপশালী মিত্র-বৃাহের দ্বারা সংরক্ষিত
হইয়া নরক সমস্ত আর্থ্যাবর্ত্তে অপরায়ে এবং শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিমান পুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।
ইনি যখন কৃষ্ণের আহ্বানে সমরাস্রমে উপস্থিত হইলেন,—তখন হরিবংশকার লিখিয়াছেন,
স্বর্ণদণ্ড-সংলগ্ন শত শত মণিখচিত পতাকা-বেষ্টিত ইহার স্বর্গীয় রথ লোক-চক্ষু ঝলসাইয়া
দিয়াছিল,—এই রথ অষ্ট লৌহচক্রসংযুক্ত এবং বহুমূল্য হীরকখচিত যুগে আবদ্ধ বহু অশ্বদ্বারা

প্রাগ্জ্যোতিষপুরের
(আদাম) অধিপতি নরক।
"মধুমূরনরকবিনাশন" কৃষ্ণ-
স্তোত্র—জয়দেব।

বাহিত হইত। রথটি লোহজালে রক্ষিত ছিল; পুরাণকার লিখিয়াছেন, এই উজ্জল রথে সমাসীন রাজচক্রবর্তী নরককে সাক্ষাগগণের সূর্যের মত দেখা যাইতেছিল। কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁহার গৌরব অন্তমিত হইবে, এইজন্ত তাঁহাকে সাক্ষাগগণের সূর্যের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে। কৃষ্ণ অতি কঠোর যুদ্ধের পর তীক্ষ্ণ ভ্রমক্ষেপে নিপুণের মস্তক ছিন্ন করিলেন—ক্রমে মহাযুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তিনি বাণদ্বারা হয়গ্রীবের বক্ষ ভেদ করিলেন—শক্তিশেলে মুরকে সংহার করিয়া এবং কঠোর যুদ্ধে পক্ষজনের নিধন সাধনপূর্বক পাক্‌জন্ত শব্দ নিনাদ করিয়া তাঁহার বৈজয়ন্তী আকাশে উড়াইয়া দিলেন। ইহার পর স্বয়ং নরকের সঙ্গে তাঁহার সজর্ষ। হরিবংশে এই যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ একটি বর্ণনা আছে। কৌতূহলী পাঠক নিজে তাহা পাঠ করিবেন। আমাদের এই পূর্বদেশের রাজারা যে কিরূপ পরাক্রান্ত ছিলেন, এই সকল বর্ণনাতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। নরকের মৃত্যুর পর তাঁহার শোকার্তা জননী ভূমি বিলাপ করিতে করিতে অদিতির সেই কুণ্ডল দুইটি লইয়া কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘হে কৃষ্ণ! তোমার লীলা কে বুঝিবে? বালক যেমন পুতুল লইয়া খেলা করে, তোমার খেলাও সেইরূপ। তুমি যাহাকে দিয়াছিলে, তাহাকে তুমি আজ নিজহস্তে হত্যা করিলে! বাহা হউক এই কুণ্ডল দুইটির জন্ত তুমি নরককে হত্যা করিয়াছ, এই দুইটি কুণ্ডল গ্রহণ কর এবং নরকের সন্তানদিগকে রক্ষা করিও।’ জয়দেবের বন্দনায় ‘মধু-মুর-নরক-বিনাশন’ পঙ্ক্তিতে মুর ও নরকের উল্লেখ আছে।

মহাভারতে দৃষ্ট হয়—আমাদের এই বৃহৎ বঙ্গ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছু পূর্ব হইতে পরাক্রান্ত রাজগণ-অধ্যুষিত ছিল। বাসুদেব, নরক, মুর প্রভৃতি খাস বাঙ্গলার রাজা।

চিত্রসেন ও সমুদ্রসেন বঙ্গের অতি প্রবল রাজা ছিলেন, ইহারা ভীমের দ্বিধিকয়ে বাত্রায় বাধা জন্মাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া বৃহৎ বঙ্গের অপরাপর রাজগণ।

বর্তমান হুগলী জেলার রাজা (কোশকী কচ্ছপতি), তাম্রলিপ্তির রাজা, মালদহের (মোদা গিরির) রাজা, সূক্ষ বা রাঢ়দেশের রাজা প্রভৃতি বঙ্গের বিভিন্ন অংশের রাজগণও ভীমকে সহজে পথ ছাড়িয়া দেন নাই। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্তের উল্লেখ মহাভারতের অনেকাংশেই পাওয়া যায়। এই সমস্ত রাজার প্রায় সকলেই যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব বক্ষে নিমগ্নিত হইয়া সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্তির রাজা ময়ূরধ্বজ ও নীলধ্বজ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় আমাদের বৃহৎ বঙ্গ পরাক্রান্ত রাজগণের নিবাসস্থল এবং শ্রেষ্ঠ আর্থ্যভূমিরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবশ্য বঙ্গদেশের পূর্ব-সীমান্তের রাজগণের প্রসঙ্গে বন্ধিও কিরাত, চীন ও যবন সৈন্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তথাপি তাঁহাদের সঙ্গে সমস্ত আর্থ্যাবস্তময় বৈবাহিক আত্মীয়তা ছিল তাহা প্রমাণিত হইতে পারে। আমরা দেখাইয়াছি, এই বৃহৎ বঙ্গের কেহ কেহ সার্কসৌম সন্ন্যাসী ছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মণিপুর, চেদি ও ত্রিপুরা সম্বন্ধে এদেশের দাবী

“নাসৌ মুনির্নৃত মতং নাভিন্নং ।”

“বেদাঃ প্রমাণং স্বতয়ঃ প্রমাণং

ধর্মার্থ যুক্তং বচনং প্রমাণং ।

যন্ত প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং

কন্তুত কুর্ঘ্যাৎ বচনং প্রমাণং ॥”

মগধ, প্রাগ্জ্যোতিষপুর, অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র প্রভৃতি স্থান বৃহৎ বহু অস্তর্গত, তাহাদের ভৌগলিক সংস্থান সর্বজনসম্মত ; কিন্তু এই রাজ্যগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি স্থান আছে—যাহাদের ভৌগলিক সীমানা সম্বন্ধে মতভেদ আছে ।

মণিপুর—বঙ্গদেশের পূর্বসীমান্তে যে মণিপুরের রাজারা বক্রবাহনের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেছেন,—তাহার সঠিক সংস্থান এখনও কেহ নির্দেশ করিতে পারেন নাই ।

মহাভারতের প্রমাণ দ্বারা বর্তমান কালের বঙ্গবিশ্রুত মণিপুর অর্জুনের মণিপুর কিনা— তাহা বিচার করা ঝাউক । মহাভারতের আদি পর্বে ২১৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে— “অর্জুন কলিঙ্গতীর্থ ও তত্রত্য পুণ্যতীর্থ সকল অতিক্রম করিয়া সুরমা হর্ম্যাবলী অতিক্রম করিয়া চলিলেন । মহাবাহু অর্জুন তাপসগণ-পরিশোধিত মহেন্দ্র পর্বত অতিক্রম করিয়া মহাসাগর-উপকূল-মার্গে মণিপুর গমন করিলেন ।” সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ নন্দলাল দে মহাশয় তাঁহার Geographical Dictionary of Ancient India নামক পুস্তকে ভারতবর্ষের যে মানচিত্র দিয়াছেন তাহাতে মহেন্দ্র পর্বত তাম্রলিপ্তির ১০০ শত মাইল দক্ষিণে দেখান হইয়াছে । তিনি লিখিয়াছেন উড়িষ্যার উত্তরে মাত্র পাঁচশত সমস্ত পর্বত-শ্রেণীকেই মহেন্দ্র পর্বত বলা হইত ; মহেন্দ্র পর্বত অপরদিকে প্রায় বঙ্গদেশের এক প্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়াছিল । তৎকালীন উড়িষ্যা রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ করা সুকঠিন, তবে একথা নিশ্চিত যে অর্জুন ক্রমশঃ পূর্বদিকে যাইতেছিলেন, “মহেন্দ্র পর্বত অতিক্রম করিয়া” অর্জুন ক্রমে পূর্বদিকে আসিয়া সাগরে পৌঁছিলেন ; এই সাগর বাঙ্গলার সুপ্রাচীন সাগর-তীর্থ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে । পূর্বকালে সমুদ্র অনেকটা উত্তরে ছিল—সুতরাং বাঙ্গলার পূর্বে “মণিপুর”—মহাভারতের মণিপুর হওয়া বিচিত্র নহে । ত্রিপুরার “রাজমালার”

“মিতাইলেক পাক ।”

সারাংশ সকলন করিয়া কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন ত্রিপুরার পূর্বদিকে যে মণিপুর দৃষ্ট হয়, তাহার প্রাচীন নাম “মিতাইলেক পাক,” গত দুই শতাব্দীর মধ্যে গ্রীষ্মের বৈক্য

অধিকারীরা এই দেশকে ‘মণিপুর’ আখ্যা দিয়াছেন। এই মত বিচারসহ কিনা, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে। আমরা মণিপুরের ঐতিহাসিক পরিশিষ্টে তাহা দেখাইরাছি।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা উড়িয়া, এমন কি দ্রাবিড় রাজ্যের ‘ম’ অক্ষরযুক্ত নগরগুলির তালিকা হাত্‌ড়াইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানকে সেই প্রাচীন ‘মণিপুর’ নাম দিয়াছেন। ল্যাসেন (Lassen) চিকাকোলের দক্ষিণে “মনদুর বন্দরকে” মণিপুর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। “প্রাচীন হিন্দুদিগের যুদ্ধাঙ্গ সঞ্চরীয় গ্রন্থের” লেখক (Weapons of Ancient Hindus, pp. 145-148) ল্যাসেনের মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং মাহুরার সন্নিহিত “মনলুরা” নামক স্থানকে বক্রবাহনের রাজধানী মনে করিয়াছেন। মিঃ রাইস্ (Rice) ইহাকে মধ্যভারতের “রত্নপুর” বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং অপর একজন লেখক চিত্তা হুদের তীরস্থ “মানিকপত্তনই” মণিপুর বলিয়া অনুমান করিতেছেন। সুতরাং “মণিপুর” নগরটি ভারতবর্ষের “ম” যুক্ত নগরের নামের তালিকা প্রায় নিঃশেষ করিয়াছে, অথচ কোন মতই সত্যের বিশেষ সন্নিহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

এতগুলি মতের মধ্যে বঙ্গদেশীয় চিরাগত প্রবাদটি আমরা ছাড়িয়া দিতে পারিতেছি না। যখন মণিপুর নামক একটা প্রসিদ্ধ নগর এখনও বিজ্ঞমান এবং উহা পূর্বদেশের অন্তর্গত, তথাকার রাজারা বক্রবাহনের বংশধর বলিয়া এখনও দাবী করিতেছেন—তখন বৃহৎ বঙ্গের ইতিহাসে সে কথাটা আমরা ছাড়িয়া দিব কিরূপে? অন্ততঃ প্রবাদটার উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে করি।

চেদি—চেদি সম্বন্ধেও বঙ্গের একটা কীৰ্ত্তি দাবী আছে। সে দাবী বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। তথাপি যখন এখনও কোন মতই সন্দেহভাবে স্থাপিত হয় নাই এবং একই নামে অনেক দেশ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পরিচিত, তখন প্রবাদগুলির উল্লেখ করিতে দোষ নাই। “নহমুলা জনশ্রুতিঃ” প্রবাদ মতই অবিদ্বান্ হউক না, তাহার মূলে কিছু সত্য থাকিবে অসম্ভব নহে, অন্ততঃ সেই জনশ্রুতি অপর কোন বিষয়ের উপর প্রাসঙ্গিক ভাবে আলোক পাত করিতে পারে। মহাভারতের সময় চেদি এক অতি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল; চেদিরাজ শিশুপালের সঙ্গে কৃষ্ণের শত্রুতা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। শিশুপাল অরাসকের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন। বহুদেবের ভগিনী শিশুপালের মাতা ছিলেন। কৃষ্ণ পিতৃস্মার অমুরোধে শিশুর বহু অপরাধ মার্জনা করিয়াছিলেন; ইন্দ্রপ্রস্থে এই অপরাধের মাত্রা চরমে পৌছিয়াছিল; তখন কৃষ্ণ সূদর্শনচক্র দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, “আমি যখন প্রাগজ্যোতিষপুরে চলিয়া গিয়াছিলাম তখন শিশুপাল আমার মথুরাপুরী অরক্ষিত পাইয়া উহা দগ্ধ করে। আমার পিতা যখন অধর্মের যজ্ঞ অহুষ্ঠান করেন, তখন সে আমাদের যজ্ঞাশ্রম অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, স্বীয় মাতুল বিশালাদিপতির কন্যা ভদ্রাকে অপহরণ করে; সৌবীর দেশে একান্ত পতিপরায়ণা বক্র পত্নীকে তাঁহার ঘোর প্রতিকূলতা সবেও বলপূর্ব্বক লইয়া যায়।” রাজহর্য যজ্ঞসভায় শিশুপাল কৃষ্ণের বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধিষ্ঠিরের যজ্ঞ

পণ্ড করিবার মানসে যেরূপভাবে সমবেত রাজস্ববর্গকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, তাহা মহাভারতের পাঠক সকলেই অবগত আছেন; ইনি সেকালে যে একজন রাজচক্রবর্তী ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই।

এখন এই রাজচক্রবর্তী শিশুপালের চেদি কোথায়? কোন কোন পণ্ডিতের মতে, বৃন্দেলখণ্ড ও মধ্যভারতের অপর কয়েকটি দেশ (পূর্বে টোলি ও পশ্চিমে কলিসিক এই দুয়ের মধ্যবর্তী) প্রাচীন চেদির অন্তর্গত ছিল। এই স্থানটিই বৌদ্ধসাহিত্যে চেদি বলিয়া উল্লিখিত। রাজস্থানের লেখক টড্ অমুমান করেন, বৃন্দেলখণ্ডের অন্তঃপাতি চাঁদেরি প্রাচীন চেদি। কাহারও কাহারও মতে গ্রীকগণ যে চন্দ্রাবতী (সন্দ্রাবতিস্) নগরের নাম করিয়াছেন, তাহাই এই চাঁদেরি এবং এই স্থানটি মহাভারতের শিশুপালের রাজধানী ছিল। ইহা ললিতপুরের ১৮ মাইল পশ্চিমে স্থিত এবং বর্তমান চাঁদেরির ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। এই স্থানে অনেক প্রাচীন কীর্তি ও প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। আইন আঁকবরীর মতে এই নগরী সুপ্রাচীন এবং এক সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত রাজাদের রাজধানী ছিল। ডাঃ ফুরার, জেনারেল কানিংহাম এবং বুলারের মতে বৃন্দেলখণ্ডটাই প্রাচীন চেদিরাজ্য। স্বন্দপুরাণ ও রেবাথণ্ডে 'দাহলমণ্ডল'কে (বৃন্দেলখণ্ডের প্রাচীন নাম) প্রাচীন চেদি বলা হইয়াছে। খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে টোলেমি যে মণ্ডল রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই এই 'দাহলমণ্ডল'—শোন ও নন্দদার উৎপত্তি স্থান-সংলগ্ন ভূভাগ ইহার অন্তর্গত। মহাভারতের সময় এই প্রদেশের রাজধানীর নাম ছিল সুক্তিমতি, গুপ্তদের সময় চেদি রাজ্যের রাজধানী কালাঞ্জোর এবং কলচুরিদের সময় উহা মহিবমতি নগরী নামে পরিচিত ছিল (নন্দলাল দেব ভৌগলিক ইতিহাস, ৪৮ পৃঃ)।

পূর্বোক্ত মতগুলি যদিও ঠিক একটা জায়গাকে নির্দেশ করে না, তথাপি মনে হয় মোটের উপর মধ্যভারতের বৃন্দেলখণ্ডটাই প্রাচীন চেদিরাজ্য বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, দেশ-প্রচলিত প্রবাদগুলি আমরা একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহি না। ভারতবর্ষের প্রাচীন ভৌগলিক ইতিহাস এখনও সুদৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। এসময়ে প্রবাদগুলির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, হয়ত বাহার মূল্য নাই বলিয়া এখন মনে হইতেছে, কালে তাহার কোনরূপ মূল্য দাঁড়াইতে পারে।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে (১৮৭৫ খৃঃ, ২৮শে মার্চ) "ভাওয়ালের ইতিহাস" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার লেখক ভাওয়াল-জয়দেবপুর স্কুলের পণ্ডিত নবীনচন্দ্র ভদ্র তাঁহার পুস্তকের ২০২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "ভাওয়ালের উত্তর-পশ্চিমাংশে 'দিব্লীর ছিট' নামক বহুদূর স্থান ব্যাপিয়া কতকগুলি প্রাচীন অট্টালিকা ও প্রাচীরের চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং তাহার চতুর্পার্শ্বে এক গড়খাই দৃষ্ট হয়; অধুনা তাহা ঘোর অরণ্যে পরিপূর্ণ হওয়াতে ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও সর্পাদি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান হইয়াছে। সুতরাং তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক তথ্যানুসন্ধান করা দুঃসাধ্য। জনশ্রুতিতে জানা যায় ইহাই

রাজ্য শিশুপালের রাজধানী ছিল। উক্ত স্থানের শৈলাট গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বৃহদায়তন প্রাচীন পুষ্পোদ্ভানের চিহ্ন বর্তমান আছে। তাহাতে মুচুকুন্দ, নাগকেশর ও গুলাচি এবং বৃহৎ বৃহৎ চাষল প্রভৃতি অতি প্রাচীন বৃক্ষসকল দৃষ্ট হয়। জনরব আছে যে উহাই উল্লিখিত রাজ্যের পুষ্পবাটিকা ছিল; লোকে উহাকে “ফুল সাঙ্গনের গড়” বলিয়া থাকে। উক্ত গ্রামের উত্তরাংশে শিশুপালের রাজধানী ছিল। চেদি যে কামাখ্যার অন্তর্নিবিষ্ট প্রদেশ তাহারও বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারত প্রভৃতি পুরাণে শিশুপাল রাজ্যের বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, অতএব বাহ্যিক বিবেচনায় তদ্বিবরণ বর্ণনার বিরত রহিলাম।”

“বহুদিন গত হইল, ভাওয়ালের মখীর মাঠের সম্মুখে কতকগুলি অক্ষরযুক্ত একখণ্ড তামার পাত পাওয়া গিয়াছিল, * তত্রত্য ভূতপূর্ব জমিদার স্বর্গীয় মহাশয় গোলোকনাথায়ণ রায়চৌধুরী তাহা আনাইয়া ঐ অক্ষরগুলি পড়াইবার জন্য অনেক যত্ন করাইয়াছিলেন; কিন্তু কেহই তাহা চিনিতে না পারিয়া ঢাকার কোন বিজ্ঞ ইংরেজের নিকট পাঠান, তদ্বারও কোন ব্যক্তি তাহা পাঠ করিতে পারেন না। তৎপর তাহা কলিকাতায় প্রেরিত হয়। কিন্তু সেখানেও কেহ তাহা পাঠ করিতে না পারায় তাহা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। বোধকরি ঐ অক্ষরগুলি চাষা-নাগরী হইবে। এখানে যাহারা চাষা-নাগরী অবগত আছে, তাহাদিগকে ঐ তাম্রশাসন প্রদর্শন করা হইয়াছিল না.....ভাওয়ালে

চাষা-নাগরী।

এখনও চাষা-নাগরী চণ্ডাল জাতির মধ্যে কেহ কেহ অবগত আছে, তদ্বারা বিলক্ষণ অঙ্গগণনা ও হিসাবাদি করিয়া থাকে, চাষা-নাগরীতে লিখিত কতিপয় পুস্তক তাহাদের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়” (২৫-২৬ পৃঃ)।

পুস্তকখানির প্রারম্ভেই লিখিত আছে—“জনরব আছে যে ভাওয়াল রাজ্য শিশুপালের রাজধানী ছিল। মহাভারতে চেদি রাজ্য শিশুপালের রাজধানী—তদনুসারে ভাওয়াল চেদি-রাজ্যের অংশ বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন তত্ত্বের লিখনভাসে কামাখ্যা দেশের দক্ষিণ সীমা বৃদ্ধগঙ্গা (বুড়ীগঙ্গা) ও চেদি দেশ কামাখ্যার অংশ বলিয়া অনুমিত হইতেছে” (উপক্রমপিকা)। লেখক প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এককালে ভাওয়ালের আয়তন খুব বড় ছিল। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ফতুল্লা প্রভৃতি স্থান ভাওয়ালের মধ্যে “এবং লাক্ষা নদীর পূর্বে তুরাক নদীর পশ্চিমে বহুপরিমিত ভূমি ইহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল।”

এই শিশুপাল খুব সম্ভব পালবংশীয় কেহ হইবেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ভীমসেনের পুত্র দীমন্তসেনের পৌত্র এবং রণদীরসেনের পুত্র হরিশ্চন্দ্রকেও কিংবদন্তী পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্র

* এই তাম্রশাসনখানি এখন পাওয়া যায় না; তবে সম্ভবতঃ মলিনী ভট্টশালী মহাশয় ইহারই উল্লেখ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহার পাঠোদ্ধার হয় নাই, তবে ভট্টশালী মহাশয় ইহার একটা আনুমানিক সারাংশ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন, উহা লক্ষ্য সেনের রাজত্ব কালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

হির করিয়া সাভারের নিকটবর্তী জনপদে অনেক উপগয়ের সৃষ্টি করিয়াছিল; ভীম কৈবর্তের জাদ্বালকেও মধ্যম পাণ্ডবের কীর্তি বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত, এই শিশুপালকেও তরুণ মহাভারতোক্ত শিশুপালের সঙ্গে এক করিবার কিংবদন্তী প্রচলিত হইতে পারে। মহাভারতের সময়ে রাজপ্রাসাদের স্বংসাংশে ও নাগকেশর এবং গুলাচি পুষ্প তরুর বংশ যে এখনও বর্তমান আছে—তাহা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু মহাভারতের সেই অংশ আলোচনা করিলে

ভীমের পূর্বমুখী যাত্রা।

দেখা যায় ভীম দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া পূর্বদিকে প্রথমতঃ পাকাল,

তৎপরে ক্রমান্বয়ে বিদেহ (মিথিলা) ও গণ্ডক দেশবাসীদিগকে জয়

করিয়া দর্শান দেশে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে রাজার সঙ্গে ধোরতর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজয়পূর্বক পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৎপরে প্রবল পরাক্রান্ত রোচমানকে জয় করিয়া পূর্ব দেশ অধিকার করিলেন। তৎপরে দক্ষিণে বাইয়া পুলিন্দদিগকে পরাভূত করিয়া শিশুপালের রাজ্য চেদি দেশে উপস্থিত হইলেন।

তারা তত্তে লিখিত আছে, পুলিন্দদেশ শ্রীহট্টের পূর্বে এবং কামরূপের উত্তরে,—

(নন্দলাল দেব প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক অভিধান, ১৬১ পৃঃ)

গণ্ডক ও পুলিন্দ।

এবং গণ্ডকী নদী দেবলগিরি হইতে উৎপন্ন (তিব্বত দেশের

দক্ষিণ সীমান্তে) এবং ত্রিবেণীঘাটের সম্মিহিত কোন স্থান হইতে সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে (৬০ পৃঃ)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভীম ক্রমশঃ পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া চেদিমণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই মত একেবারে উপেক্ষণীয় নহে।

বরঞ্চ মহাভারতের একটি উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় চেদি দেশ বঙ্গের সম্মিহিত ছিল। পৌণ্ড্র বাসুদেবের প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, “এই পৌণ্ড্র বাসুদেব বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি ও সমস্ত চেদিদেশে সুবিখ্যাত” (মভা, ১৩ অঃ)। এক নামে ভিন্ন ভিন্ন যুগে নানা প্রদেশ বুঝাইত—তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সুতরাং চেদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নাম হওয়াও বিচিত্র নহে।

এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানের ভার ভাবী প্রাচীনভারতের ইতিহাস লেখকের উপর। আমাদের পক্ষে এই প্রচেষ্টা আধারে ঢিল ছোড়াছুড়ির মত।

নবীনচন্দ্র ভদ্র মহাশয়ের “ভাওয়ালের ইতিহাসে” প্রসঙ্গক্রমে যে কথটা লিখিত

হইয়াছে, তাহা আমরা এত প্রয়োজনীয় মনে করি যে তৎসম্বন্ধে

নিম্নস্তরে প্রাচীন ইতি-
হাসের উপকরণ রাখা।

কিছু আলোচনা করিব। এই যে চাষা-নাগরীর কথার এখানে

উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এ কথটা আমার কাছে একেবারে নূতন। তবে

কি ব্রাহ্মী লিপি কিংবা গুপ্ত লিপির অমূল্যলন দেশ হইতে এখনও পর্যন্ত লুপ্ত হয় নাই? সমাজের উপরকার স্তরে বহু পরিবর্তন হইয়াছে। তাঁহারা নানা দেশের সংস্পর্শে আসিয়া যুগে যুগে রীতি, নীতি, ভাব ও ভাষার অনেকরূপ পরিবর্তন করিয়া থাকেন, এমন কি অনেক সময়ে ভিন্নদেশাগত বিজয়ী বীরদের অত্যাচারে কখনও কখনও সমাজের

উচ্চশ্রেণীর লোকেরা একেবারে বিলুপ্ত হন, নতুবা দেশান্তরী হইয়া আশ্রয়লাভ করেন। কিন্তু সমাজের নিম্নশ্রেণী সেই ঝড়ের উৎপাতে একেবারে নষ্ট হয় না। শাল, তমাল ভাঙ্গিয়া প্রভঞ্জন লীলা করেন, কিন্তু তিনি শ্রামদুর্জাদলের একটিও শিখা ভাঙ্গেন না। দেশের প্রাচীনতম আচার, নীতি এমন কি শিক্ষা, দীক্ষা, কলাবিজ্ঞা—এ সমস্তই দেশের নিম্নতম শ্রেণীর কুটিরে লুকাইয়া আশ্রয়লাভ করিয়া থাকে, এদেশে যে তাহা হইয়াছে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা পরে দিব। এই নিম্নশ্রেণীর লোকেরা জাতীয় প্রাচীন সম্পদের অস্তঃপুরের দুর্গবরূপ। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা এই অস্তঃপুরে যতটা রক্ষিত আছে—উচ্চশ্রেণীর সমাজে তাহা নাই। এই জন্তই কি ভাওয়ালের জঙ্গলে চণ্ডালেরা সেই প্রাচীন লিপি এখনও বজায় রাখিয়াছে? এবং প্রাজ্ঞমানী ভদ্রলোকেরা নাসিকা কুণ্ঠন করিয়া সেই লিপির নাম দিয়াছেন “চাষা-নাগরী?” এই নাগরীতে লেখা পুঁথিও কিছু ছিল। বৌদ্ধদিগের অবলম্বিত লিপিকেই কি ব্রাহ্মণেরা “চাষা-নাগরী” নাম দিয়া তাহাদের ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন? ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, এই চাষা-নাগরীতে জ্ঞান-সম্পন্ন লোক ও চাষা-নাগরীতে লিখিত পুঁথি ভাওয়ালে চণ্ডালদের মধ্যে ছিল। এই ৫৭ বৎসরে কি তাহা লোপ পাইয়াছে? বিচিত্র নহে, কিন্তু ইহার খোঁজ করা একান্ত প্রয়োজন; অপিচ, এই “চাষা-নাগরী”র অর্থ কি “হিন্দুস্থানী লিপি”?—তাহা বলিয়া ত মনে হয় না। হিন্দুস্থানীরা বহুকাল যাবৎ বাঙ্গলার নানা স্থানে বাস করিতেছে। তাহাদের নাগরীর সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। তাহাদের নাগরীর এইরূপ অদ্বীত নাম কেনই বা হইবে? ব্রাহ্মীলিপির জ্ঞান যদি এদেশে নষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা বৌদ্ধ-বিষেবের ফলে হইয়াছে। দেব নাগরীর প্রাধান্তের যুগে বৌদ্ধ যুগের লিপি হতাদৃত হইয়াছিল এবং তজ্জন্তই তাহা সমাজের নিম্নস্তরে প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। সেই লিপির “চাষা-নাগরী” নাম হওয়াও অসম্ভব নহে।

ত্রিপুরদেশ—যযাতিপুত্র দ্রহ্মুর ত্রিপুররাজ্যে আগমন সম্বন্ধেও বহু প্রবাদ এদেশে চলিয়া আসিয়াছে। পিতা কর্তৃক অভিষিক্ত দ্রহ্মু এক বর্ষের রাজ্যে চলিয়া গেলেন। মহাভারতের আদি পর্বে ৮৩ অধ্যায়ে এই অভিষাপের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। দ্রহ্মুকে যযাতি বলিলেন—“তুমি সেই দেশে যাও, যেখানে অশ্ব, গজ, রথ, গর্দভ, ছাগ বা গো-বাহিত কোন যানবাহনের সন্ধান নাই। যেখানে একান্ত নিকটবর্তী স্থানে বাইতে হইলেও ভেলার আশ্রয় করিতে হয় (বড় নৌকার যাতায়াতের উপায় নাই) অথবা সীতার কাটিয়া বাইতে হয়।” কিন্তু সেই দেশ কোন দেশ, তাহা মহাভারতকার উল্লেখ করেন নাই। খিলহরিবংশে (৩০ অঃ, ১৬-২০ শ্লোক) উল্লিখিত হইয়াছে—যযাতি সমাগরা সপ্তরীপা পৃথিবী পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। এই বিভাগানুসারে তাহার বিশাল সাম্রাজ্যের পশ্চিম ও উত্তর ভাগ দ্রহ্মু পাইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণানুসারে (৪র্থ অংশ, ১০ম অঃ, ১৭/১৮ শ্লোক) দ্রহ্মু পশ্চিম দিক পাইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে (২ম স্কন্ধ, ১২ অঃ ১৬/১৭ শ্লোক) তিনি দক্ষিণ-পূর্বদিকের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

পুরাণগুলির মধ্যে অনৈক্যের সামঞ্জস্য করিবার জন্য শব্দকল্পদ্রুম-সংকলয়িতা রাধাকান্তদেব বাহাদুর বহু পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন—তাহা শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত হইয়াছে। “যযাতি মরণ সময়ে কনিষ্ঠ পুত্রঃ পুংঃ রাজচক্রবর্তিনঃ কৃতবান্। যদবে দক্ষিণ পূর্বস্তাং কিকিঁদ্রাজ্যখণ্ড দত্তবান্। তথা দ্রহবে পূর্বস্তাং দিশি পশ্চিমায় তুর্কসবে উত্তরাত্মানবে সর্বান্ পুরোরাধিনাং চক্রে।”

সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অমুসারে দ্রহু পূর্বদিক্ পাইয়াছিলেন। বাহাদুর দ্রহু হইতে ত্রিপুররাজবংশাবলীর বংশলতা অঙ্কিত করেন তাঁহারা বলেন—“কোন কোন পুরাণে যে দ্রহুকে পশ্চিমদিকে প্রেরণের কথা পাওয়া যায়, কল্পভেদে মূলবস্তা বা শ্রোতার বাসস্থান-ভেদে, বা দিক্‌নির্ণয়ের কল্পভেদে তাহা ঘটয়াছিল ইহাই বুঝা যায়।”

খাম্ ত্রিপুরার যে সকল সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ইতিহাস আছে তাহার কতকগুলি ৪৫শত বৎসরের প্রাচীন; ইহাদের লেখকগণ সকলেই একবাক্যে ত্রিপুররাজগণের পূর্বপুরুষ যযাতি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রাজরত্নাকরের ষষ্ঠ সর্গে (৪-১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ও রাজমালার প্রথম অধ্যায়েও এই কথা আছে। রাজমালা পুস্তকখানি প্রাচীন, ইহাতে লিখিত আছে যে চণ্ডেশ্বর ও বাণেশ্বর নামক শ্রীধর্মমাণিক্য রাজার শ্রীহট্টনিবাসী দুই সভাপণ্ডিত ত্রিপুরা ইতিহাস সঙ্কলন করিতে নিযুক্ত হন। চতুর্দশ দেবতার প্রধান পাণ্ডা ছর্গভেদ্র (চস্তাই) ইহাদিগকে সহায়তা করেন। তাঁহারা রাজমালিকা, যোগিনীমালিকা, বারণ্যকায়নির্ঘর, হরগৌরীসংবাদ ও লক্ষ্মণমালিকা নামক সুপ্রাচীন সংস্কৃত ঐতিহ্যগ্রন্থ আলোচনা করিয়া বিশেষ চস্তাইগণ-কথিত ত্রিপ্রাভাষার প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণপূর্বক রাজমালা সঙ্কলন করেন। রাজমালা পুস্তকখানি সেই যুগের বাঙ্গলা ভাষার একটা কীর্তিস্তম্ভ। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী হইতেও ইহার বর্ণিত বৃত্তান্ত অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য; কিন্তু প্রথম কয়েক অধ্যায়ে অলৌকিক কাণ্ডকারখানা ও কল্পনার লীলাখেলা আছে। এই কয়েকটি অধ্যায় সম্বন্ধে অবশ্যই বিধা আছে। ত্রিপুরার রাজবংশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাস-লেখক কৈলাসচন্দ্র সিংহ তথাকার রাজত্ববর্ণের যযাতি হইতে উদ্ভবের দাবী অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে কামরূপের স্থানরাজাদের বংশধর বলিয়া মনে করেন এবং ‘বিথকোষ’কার হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের মত গ্রহণ করিয়া দ্রহুর পশ্চিম দেশে উপনিবেশ-স্থাপনের মতটাই পক্ষপাতী।

এই জটিল সমস্তার সমাধান করার চেষ্টা এখানে না করাই শ্রেয়ঃ। যেহেতু প্রত্নতত্ত্বের দিক্ দিয়া এই গ্রন্থ লিখিতে আমি সক্ষম করি নাই। কিন্তু রাজরত্নাকরে ত্রিপুর হইতে বর্তমান পঞ্চত্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য পর্য্যন্ত যে ১৮৪ জন নৃপতির বংশলতা পাওয়া যায়—তাহার অনেকাংশই ঐতিহাসিক বিচারসহ ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়। ত্রিপুর-রাজত্ববর্ণের মত এরূপ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে ভারতবর্ষের বর্তমান অল্প কোন বংশকে দেখা যায় না। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। ভারতের ক্ষত্রিয়-কুলতিলক চন্দ্র-স্বর্ধাবংশীয় ক্ষত্রিয়দের অভিমানী আর্ঘ্যাবর্তের প্রধান প্রধান রাজগোষ্ঠীর প্রায় সকলেই দেশান্তর আগত এবং উত্তরকালে ব্রাহ্মণ্যগ্রহে হিন্দু-ধর্ম ও সমাজের উচ্চ

শ্রেণীতে ভুক্ত হইয়াছেন; সুতরাং কোন রাজবংশে যদি আর্য্যসমাজের বহির্ভূত কোন সম্প্রদায়ের শোণিত প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা সার্বজনীন রীতির জ্যোতক,—নিন্দ্যাহ নহে।

এই অব্যায়টা একটু বড় হইল। যে কয়েকটি রাজবংশের কথা লিখিত হইল, তাহা ছাড়া আরও অনেক রাজবংশ বাঙ্গলাদেশে ষাণ্ময়ুগের ঐতিহাসিক যুগের অভিনেতৃস্বরূপ দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। নানারূপ পৌরাণিক উপগল্পের মিশ্রণসত্ত্বেও একথাটা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যুগধাশ্রিত মহাভারতীয় যুগের বাঙ্গলাদেশ, বিজ্ঞা-গৌরবে, যশঃ-প্রতিষ্ঠায় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় একটি অতি শ্রেষ্ঠ দেশ ছিল। যুগে যুগে সমস্ত আর্য্যাবর্তের এমন কি তৎকালপরিচিত ভারতবর্ষের সার্বভৌম রাজশক্তি দিল্লী ও মগধ ইহাদের একতমের রাজধানীর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে। আমরা বাঙ্গলা দেশের প্রাচীন দলিলের কোন কোনটিতে দেখিয়াছি—‘সরকার ইন্দ্রপ্রস্থে’র দোহাই দেওয়া হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও বাঙ্গলা চিরদিন দিল্লীর সহিত বিদ্রোহিতা করিয়া আসিয়াছে। ঐরূপ দোহাই ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের পরিচায়ক।

শ্রীহট্টের বিস্তৃত ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় দাবী করিতেছেন, শ্রীহট্টের লাউড় নামক স্থান এককালে মহাভারতের ভগদত্তের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বগুড়ার ইতিহাস-লেখক প্রভাসচন্দ্র সেন বলেন যে উক্ত জেলার মহাস্থানগড় নামক স্থানটি সুপ্রসিদ্ধ পৌণ্ড্র বাহুদেবের রাজধানী ছিল। দিনাজপুরের ইতিহাসে ঐ দেশের কোন কোন অংশকে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে বাণকন্ঠা উবার প্রণয়ঘটিত ব্যাপারের লীলাভূমি বলিয়া বর্ণিত আছে। মেদিনীপুরের বগড়ি অঞ্চলটা ভীমকৃত বক-রাক্ষসবধের লীলাস্থল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। এইভাবে বঙ্গদেশের কোন কোন অংশ বিরাটের গোপূহ এবং কীচক-বধভূমি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। সত্য সত্যই মহাভারতের সময়ে হুগলীর নিকট মহোজা নামক এক বিক্রান্ত রাজা বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু যতগুলি কিংবদন্তী স্থানীয় লেখকগণ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বিশ্বাসভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, প্রমাণাভাবে তাহার অনেকগুলিই অশ্রদ্ধেয়। ১৮৯১ খৃঃ প্রকাশিত স্বরূপচন্দ্র রায়-কৃত সুবর্ণগ্রামের ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে যে, সুবর্ণগ্রামের (জেলা ঢাকা) সন্নিহিত লাঙ্গলবন্ধে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব আগমন করিয়াছিলেন (২৩ পৃঃ)। সুবর্ণগ্রাম নাম সম্বন্ধে এই লেখক বলেন—“জনশ্রুতি যে অতি প্রাচীন কালে আকাশ হইতে এই বিস্তৃত ভূভাগের উপর সুবর্ণ বর্ষিত হইয়াছিল, তদবধি ইহা সুবর্ণগ্রাম নামে আখ্যাত হয়। সুবর্ণ বা সুবর্ণবৎ কোনও পদার্থের বর্ণন অসম্ভব কথা নহে। ১৮১০ খৃঃ অব্দে ইউরোপের অন্তর্গত হাঙ্গেরী দেশে রক্ত ও অস্তান্ত সময়ে পশুভক্ষণীয় বস্ত্র এবং ১৭৭৪ শকের ১৪ চৈত্রে চীনদেশে বালুকাবৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮৮৭ খৃঃ ১১ই আগষ্টে বোম্বাই সহরে প্রাটিনাম্ বৃষ্টি হইয়াছিল” (২ পৃঃ)।

জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু দিদিমার গল্পগুলিকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবার এইরূপ পাণ্ডিত্যের প্রচেষ্টা দেখিলে মনে হয় আমাদের লেখকেরা

অনেক সময়ে বৃথা শাস্ত্রজ্ঞান দেখাইতে বাইরা ইতিহাসকে হস্তরসের এলাকার পর্য্যন্ত লইয়া আসেন, তখন তাঁহাদের অবলম্বিত প্রবীণ অধ্যাপকোচিত গাঙ্গীর্ঘ্য কোতুক ও কৃপার উদ্বেক করে।

আমার নিকট বঙ্গদেশের ইতিহাস সম্বন্ধীয় রাশি রাশি প্রাদেশিক ইতিহাস ছড়ান রহিয়াছে। এই সকল ইতিহাসের কতকটা মূল্য স্বীকার করিতেই হইবে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগ সম্বন্ধে তাঁহাদের উল্লিখিত অনেক তথ্যই মূল্যবান; জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ করা অজ্ঞায় নহে, কিন্তু এই সকল প্রাদেশিক বিবরণীর আদিভাগে ইহারা বখন পৌরাণিক যুগের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন অধিকাংশ স্থলেই ইহারা পাণ্ডুপুত্রদের লইয়া যুক্তি-তর্কের আড়ম্বর করিয়া বৃথা ধস্তাধস্তি করিয়াছেন। তাম্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতির প্রমাণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী না জানার ফলে অনেক সময়ে তাঁহাদের ভ্রমগুলি উপহাস্যাপদ হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে একটি কথা এই যে নবব্রাহ্মণ্যের প্রচারকগণ সমস্ত দেশটা মহাভারতের জাল দিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন। হিন্দুর পুরাণ ছাড়া এ দেশে আর কোন বিষয়ক ঘটনার অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। এইভাবে বিগত সহস্র বৎসর পূর্বের সমস্ত ইতিহাস লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ইদানীন্তনকালে ব্রাহ্মণগণ যেখানে যেখানে বৌদ্ধ-যুগের নিদর্শন ছিল—তাহা রামায়ণ ও মহাভারতের যুগের ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। চন্দ্র-সূর্য্যবংশের গৌরব লোকচক্ষে তাঁহারা খুব অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেখানে যে কোন রাজা আছেন, তাঁহাদের আদি পুরুষকে মহাভারতের কোন দেশ-বিশ্রুত বীরের সঙ্গে গোঁজামিল দিয়া, বংশলতা টানিয়া আনিয়াছেন। বঙ্গদেশের সকল রাজার সম্বন্ধেই ঐরূপ ঘটিয়াছে। শুধু এদেশে নহে, রাজপুতনা প্রভৃতি দেশেও সূর্য্যবংশের গোঁজামিল একইভাবে হইয়াছে। ভারতের পশ্চিম দিক্‌টা সূর্য্যবংশের ও পূর্ব দিক্‌টা চন্দ্রবংশের লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্মৃতরাং রাজাদিগের আদিপুরুষের কথাটা একেবারে ইতিহাস হইতে বাদ দিলেও মন্দ হয় না। যতই কেন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হউক না কেন, ঐতিহাসিকগণ এই সকল বংশ-লতার মুখপাতটা খুব সূচক্ষে দেখিবেন না। বালি দ্বীপের হিন্দুগণ তাঁহাদের দেশে অযোধ্যা, সরযু, ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি সমস্ত স্থানই দেখাইয়া থাকেন। এ দেশের ইতিহাসকেও ব্রাহ্মণগণ মহাভারতোক্ত তীর্থে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধেতিহাস মুছিয়া ফেলিয়া ছিলেন। যাহা হউক এই অধ্যায়ে যে সকল কথা লিখিত হইল তাহা হইতে একথা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, মহাভারতের যুগে আমাদের এই বৃহৎ বঙ্গ মার্কণ্ডেয় নৃপতিদের নিবাসভূমি ছিল। শিশুপালকে বাদ দিলেও জরাসন্ধ, পৌণ্ড্রবাসুদেব, নরক, ভগদত্ত প্রভৃতি রাজারা আর্ঘ্যাবর্তের যে কোন নৃপতি হইতে শৌর্য্য, বীর্ঘ্য ও ক্ষমতায় নান ছিলেন না; ইহারা এই দেশের প্রাচীন যুগের গৌরব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কুম্ভবিদ্যে

নানাদেশের প্রভাবে মতের স্বাধীনতা

কেশবেন কৃতং কন্ম জরাসন্ধবধে তদা ।

ভীমসেনার্জুনভাঞ্চ কন্তং সাক্ষিতিমন্ততে ।

অদ্বায়েণ প্রবিষ্টেন ছদ্মনা ব্রহ্মবাদিনা ॥

দৃষ্টঃ প্রভাবঃ কৃষ্ণেন জরাসন্ধস্ত তূপতেঃ ॥

—মহাভারত, সভা, ৪১ অঃ, ২৩।

পুরাকালে পূর্বভারতের রাজারা অধিকাংশই শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞ-বিদ্যেবী এবং কিরাত, মেচ, কুকি, চাকমা, হাজাং, খম্ প্রভৃতি জাতিদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন; শিব অমুচরগণের বিকৃত দেহ ও অদ্ভুত মুখ করনা করিবার কারণ ইহাও হইতে পারে। প্রাচীন শৈব ধর্ম এ দেশে বহুমূল ছিল। শিবের সঙ্গে এ দেশের রাজারা নানাভাবে আত্মীয়তা করনা করিয়া গৌরব অমুভব করিয়াছেন। এই দেশে এককালে স্বয়ম্ভূই সম্রাট ছিলেন। ত্রিপুররাজ্যের ত্রিলোচন এবং কোচবিহারের রাজা বিখসিংহ শিবের ঔরসজাত পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন। হরিবংশে লিখিত আছে মহারাজ বাণকে শিব এত ভালবাসিতেন যে স্বীয় পুত্র কার্তিকেয় হইতে তাঁহার আবদার বেশী রাখিতেন; বাণ-প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ—সর্বপ্রকার শিবলিঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং বাণলিঙ্গ নামে অভিহিত। কোচদের সঙ্গে নানারূপ শিবলীলা উপকথার বিষয়ীভূত হইয়া আছে। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে এ সম্বন্ধে নানা কাহিনী বর্ণিত আছে। পার্শ্বাত্য জাতিদের সঙ্গে অতিরিক্ত মেশামেশি, যজ্ঞ-বিদ্যে ও কৃষ্ণের সহিত শত্রুতা ইত্যাদি কারণে পূর্বদেশের রাজারা ক্ষত্রিয় হইয়াও ‘দানব’ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জরাসন্ধ, বাণ, ভগদত্ত, নরক ও মুর প্রভৃতি রাজারা ক্ষত্রিয় হওয়া সবেও দানব নামে পরিচিত। ইহারা যে আর্ঘ্য-সমাজভুক্ত ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৈদিক সাহিত্যে লিখিত আছে যে, পূর্বদেশীয় রাজারা অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্ঘ্যনীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পশ্চিম-ভারতীয়, চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় ও বত্তকুলের রাজাদের সঙ্গে ইহাদের কুটুম্বিতা ছিল। জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তিকে যথুরারাজ কংস এবং বাণের কন্যা উবাকে ত্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বিবাহ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের প্রতি বিদ্যেবের জন্ত ক্ষত্রিয়পুঙ্গব কংস ‘দানব’

আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জয়দেবকৃত কৃষ্ণশ্লোকে তাঁহাকে “কংসদানবধাতন” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

শৈব রাজাদের অনেকেই যজ্ঞে পশুবলির প্রতিবাদী ছিলেন। নরকের বিরুদ্ধে ইহাই প্রধান অভিযোগ ছিল। স্বয়ং শিব দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিলেন। সমস্ত বাঙ্গলাদেশ এক সময়ে কৃষ্ণ এবং যজ্ঞাহুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধবাদী ছিল। দেশ ব্যাপিয়া সেই সময়ে ভোলানাথের ধ্বজা উড়িতেছিল; কৃষ্ণ-সমাপ্তিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম এদেশে সে যুগে সমাদৃত হয় নাই। পরবর্তী কালে যজ্ঞ-নিবেদকারী, সামা-প্রচারক, করুণাখনি বুদ্ধদেবকে শিব তাঁহার সাম্রাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বহুযুগ পরে যখন এ দেশ কৃষ্ণকে স্বীকার করিল, তখন তাঁহাকে শঙ্খচক্রগদা ছাড়িয়া এ দেশের মাটিতে পদার্পণ করিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালী তাঁহার হাতে একটি বাণী দিয়া তাঁহার আত্মগত্য স্বীকার করিল। এ দেশ কখনই ঐশ্বর্য্যকে গণ্য করে নাই; বল দিয়া এ দেশ কখনই জয় করা যায় নাই; বাণীর শূরে— প্রেমের আচ্ছাদনে বাঙ্গালী চিরকাল সাড়া দিয়াছে।

জরাসন্ধের চরিত্রে বৃহৎ বঙ্গের ক্ষাত্রনীতি অতি উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। কৃষ্ণের নীতি ও জরাসন্ধের নীতি দুই ভিন্ন সামগ্রী। ইন্দ্রপ্রস্থের নীতি “নারি অরি, পারি যে কোশলে।” কৃষ্ণ ধর্ম্মাবতার সাধুচরিত্র যুধিষ্ঠিরের মুখে মিথ্যাকথা কহাইয়া গুরুবধ করাইয়াছিলেন; ক্ষাত্র-নীতি উল্লঙ্ঘন করিবার ইঙ্গিত দিয়া অস্ত্রায় ভাবে ভীম কর্তৃক হৃষ্যোধনের হত্যা ঘটাইয়াছিলেন; ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধে স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলেন; ছদ্মবেশে গিরিব্রজপুরে প্রবেশপূর্ব্বক উপবাসী জরাসন্ধের এবং কোশলে দিবাবসানের চাতুরী খেলিয়া জয়দ্রথের হত্যার কারণ হইয়াছিলেন।

এগুলি মহাভারতের উপকথা মাত্র। কিন্তু পূর্ব্বভারতের বাহা কিছু কাব্যকথা ও গল্প তাহাদের সকলের মূলে সনাতনধর্ম্মাশ্রিত মহানীতির পরিচয় জাজ্বল্যমান। মহাভারতেও জরাসন্ধের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে আমরা তাহাই দেখিতে পাইব।

যুগে যুগে রাজনৈতিক আদর্শ ও ক্ষাত্রধর্ম্মের মূলভাবের পরিবর্তন হইয়াছে সত্য, কিন্তু জরাসন্ধের ক্ষাত্রনীতি। সমুদ্র যেমন তাহার সিকতাতৃমি লঙ্ঘন করে না,—মহারাজ জরাসন্ধ

তরুণ সেই যুগে আচরিত ক্ষাত্রনীতি উল্লঙ্ঘন করেন নাই। প্রথমতঃ জরাসন্ধ বহুবংশীয়দের প্রবল প্রতাপ সত্ত্বে সমস্ত বিদিত হইয়াও স্বয়ং যুদ্ধকামী বা সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির ইচ্ছুক হইয়া বিনাকারণে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন নাই। এমন কি যখন কৃষ্ণ জরাসন্ধ-জামাতা কংসকে নিধন করেন—তখনও মগধ-সম্রাট বন্দ করিতে উদ্বৃত্ত হন নাই। কিন্তু যখন তাঁহার প্রিয় কন্যা অস্তি তাঁহাকে স্বীয় স্বামি-হত্যার প্রতিশোধ লইতে ক্রমাগত উত্তেজিত করিয়া করুণ আর্তনাদে রাজপ্রাসাদ মুখরিত করিয়া তুলিলেন, তখন তিনি যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। প্রথম অভিযানে যজ্ঞবীরেরা তাঁহার অসামান্য শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন, তথাপি তাহা ব্যর্থ হইয়াছিল; কিন্তু অস্তি তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেন নাই, ক্রমাগত উদ্ভাইয়া পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়া জরাসন্ধের সামরিক অভিযানগুলির ইচ্ছন যোগাইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমার্জুন যে ভাবে যাইয়া তাঁহাকে হত্যা করেন, তাহা নীতিবিগর্হিত। তাঁহারা স্নাতক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে গুপ্তদ্বার দিয়া মগধ রাজধানীতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা গুপ্তভাবে জরাসন্ধের বিশ্ববিশ্রুত ভেরীত্রয় এবং সুপ্রতিষ্ঠিত চৈত্যানুগ্ধ ভগ্ন করিয়া ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। জরাসন্ধ অতি বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগের আতিথ্যসংকার করিতে উত্তত হইলেন। কৃষ্ণ তাহা গ্রহণ করিলেন না। তাই বলিয়া জরাসন্ধ যে তাঁহাদের কার্যাবলীর খবর রাখিতেন না, তাহা নহে। গুপ্ত চরের মুখে তাঁহাদের প্রবেশ অবধি চৈত্যা ও ভেরী-ভণ্ডের সমস্ত খবরই তিনি জানিতেন; কিন্তু আতিথ্য-ধর্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার জন্ত তিনি গৃহাগত স্নাতক ব্রাহ্মণবেশীদিগের প্রতি কিছুমাত্র প্রতিকূলাচরণ করেন নাই। কৃষ্ণ যখন বলিলেন, “আমরা তোমার শত্রু,” তখন ইচ্ছা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে নিজের করায়ত্তে পাইয়া বধেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন। সেই অদ্বিতীয় বীরসম্রাট বিনীত ও শাস্তভাবে বলিলেন, “কই, আমি ত আপনাদের কোন অনিষ্ট করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।” একপ সংযতেন্দ্রিয় বিনয়ান্বিত পুরুষকে শুধু ফাত্রবীর বলিয়া নহে—একজন ধর্মনিষ্ঠ নীতিমান পুরুষ বলিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কৃষ্ণ যখন পাণ্ডবগণের সহিত মগধে বাত্মা করেন তখন তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল,—এইভাবে গোপনে জরাসন্ধকে হত্যা করিতে পারিলেও “তাঁহার অস্তিত্ব স্বপক্ষগণ কর্তৃক তাঁহারা নিহত হইতে পারেন।”

কিন্তু যখন কৃষ্ণার্জুন ও ভীম তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন—তখন জরাসন্ধ স্বীয় সৈন্তগণ দ্বারা বা তাঁহার বিশ্বজয়ী সেনাপতিদিগের দ্বারা তাঁহাদের বধ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন না।

কৃষ্ণকে তিনি ‘দাস’ বলিয়া ঘৃণা করিতেন—(মহা, সভা, ৪১ অঃ জরাসন্ধের অপূর্ণ সংযম।

১ম শ্লোক), তাই তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না।

অর্জুনাপেক্ষা ভীমকেই সমধিক দৈহিক বলসম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাকেই তাঁহার কথঞ্চিৎ যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনোনীত করিলেন। তখন মহারাজ জরাসন্ধ কোন ব্রত পালন করিয়া উপবাসী ও পরিশ্রান্ত ছিলেন, এই অবস্থায় তিনি ভীমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধের পূর্বে তিনি তৎপুত্র সহদেবকে যোবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন; যুদ্ধক্ষেত্রে বহু বৈজ্ঞানিক নানারূপ প্রলেপ ও ঔষধ লইয়া উপস্থিত রহিলেন, ইহাই তাৎকালিক বৈজ্ঞানিক যুদ্ধের নীতি ছিল। জরাসন্ধের আত্মীয়-স্বজন ও অসংখ্য সৈন্ত তামাসগীরের মত কুতূহলী হইয়া সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত রহিলেন। জরাসন্ধ অক্ষরে অক্ষরে ফাত্রনীতি পালন করিয়াছিলেন। কত বড় সংযম তাঁহার ছিল যে উপবাসক্রিষ্ট শরীরে—বিধের সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক ও সামন্ত-রাজগণ-পরিবৃত থাকিয়াও—সমস্ত সুবিধা ভূষণ উপেক্ষাপূর্বক স্বীয় প্রাসাদে, স্বগণের মধ্যে, নিরাশ্রয় অবস্থায় কুটচক্রী শত্রুগণের যুদ্ধের আহ্বান এইভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তিনজন যোদ্ধার মধ্যে তাঁহাকে দৈহিক বলে ও পদমর্যাদায় যোগ্যতম মনে করিয়াছিলেন তাঁহাকেই স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন। এহেন অকুতোভয় ফাত্রনীতির সাক্ষাৎ আদর্শস্বরূপ। বীরবরের উপবাস ও ব্রতধারণের কথা জানিয়াও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা তদন্ত সমস্ত সুবিধা দ্বিধাশূন্যভাবে অমানচিত্তে গ্রহণ করিলেন, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। জরাসন্ধের

চরিত্রে সম্রাটের যোগ্য শৌর্যবীর্যের সঙ্গে সংঘের অপূর্ণ মহিমা মিশিয়া গিয়াছিল ; তিনি তাঁহার কপটাচারী শত্রুদিগের সঙ্গে কথাবার্তায় শিশুপালের মত অসংযত ক্রোধ বা অপভাষা ব্যবহার করেন নাই। ইহারই সিংহাসন উত্তরকালে মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোক অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ মগধরাজের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, জরাসন্ধ তাহাদের সকলগুলিরই নিরাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান অভিযোগ—যাহা আমরাও প্রতিবাদ করিতে দ্বিধা বোধ করি—তাহা তাঁহার মহাদেব মন্দিরে একশত রাজাকে বলি দেওয়ার সংকল্প।

এই নিষ্ঠুর ও বর্বরজনোচিত ব্যবহার সমর্থন করা যায় না। কিন্তু জরাসন্ধ এই অভিযোগের উত্তরে কি বলিয়াছিলেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য :—“হে কৃষ্ণ ! আমি কোন রাজাকেই জয় না করিয়া আনয়ন করি নাই। বিক্রমপ্রকাশপূর্বক লোককে আপনার বশে আনিয়া তাহার প্রতি স্বেচ্ছামুসারে ব্যবহার করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম।” সুতরাং দেখা যাইতেছে এই ৮৪জন রাজা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন নাই ; তিনি বিদ্রোহীদিগকে পরাজয় করিয়া বলপূর্বক ধরিয়া আনিয়াছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে জরাসন্ধ সাফাৎ ক্ষত্রধর্মের প্রতীক ছিলেন। এই ক্ষত্রনীতিরক্ষাকল্পে তিনি শত্রুদিগকে করায়ত্তে পাইয়াও তাঁহাদের প্রতি অলৌকিক মর্যাদা দেখাইয়াছিলেন এবং ত্রয়োদশ দিবস দিনরাত্রি অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর ভীমহস্তে নিহত হইয়াছিলেন। সেই যুগের রাজনীতির আদর্শ ভিন্নরূপ ছিল ; কিন্তু তাহা যাহাই থাকুক না কেন, তিনি তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। বন্দী রাজগণ-সম্পর্কে তিনি কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, “আমি ক্ষত্রধর্মাবলম্বী, দেবপূজার জন্য রাজগণকে আনিয়াছি, এখন কি নিমিত্ত ভয় পাইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিব ?” (মহাভারত, সভা, ২২ অঃ।)

আর্য্যাবর্তের পূর্বাংশের এই সকল রাজগণের প্রায় সকলেই কৃষ্ণের বিরোধী ছিলেন, এই জন্যই কৃষ্ণ-সমাপ্তিত নব ব্রাহ্মণসমাজ ইহাদিগকে রাক্ষস ও দানব বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন না, কাজশক্তির বিলোপ। নিজেরাই ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিতেন ; পৌণ্ড্র বাসুদেব “শঙ্খচক্রগদাধর” বলিয়া নিজেকে অভিহিত করিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার শাস্ত্র ধর্ম, পাক্‌জন্তু শঙ্খ ও কৌমোদকী গদার অনুশাসন মানিত না, তাহাদিগকে তিনি শাস্তি দিতেন। নরক, মূর, ভগদত্ত, বাণ প্রভৃতি রাজারা চিরকাল কৃষ্ণের সহিত শত্রুতা করিয়া আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণকে কেন্দ্রস্থানীয় করিয়া উত্তরপশ্চিমে যে নূতন হিন্দুসমাজ গঠন করিতেছিলেন—পূর্বদেশের মার্কণ্ডেয় রাজারা তাহার ঘোরতর বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। মহাভারত, রামায়ণ এই দুই হিন্দুসমাজের সর্বজনাদৃত গ্রন্থে ধর্মসমবয়ের একটা চেষ্টা আছে ; কিন্তু যে আকারে আমরা এই দুই পুস্তক পাইতেছি—তাহা সমধিক পরিমাণে কৃষ্ণের মহিমাজ্যোতক।

আর্য্যাবর্তের এই অংশে পরবর্তী কালে ক্ষত্রিয়শক্তি একেবারে হ্রাস পাইয়াছিল। পুরাণে নন্দবংশ শূদ্রকুলজাত বলিয়া বর্ণিত আছে। এই বংশের স্থাপয়িতার সহিত পুরাণকার পরশুরামের উপমা দিয়া তাঁহাকে ক্ষত্রকুলান্তক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মৌর্যদের শূদ্রত্বও সর্বজনস্বীকৃত। পরশুরামের পর কুরুক্ষেত্রে এবং তৎপরে নন্দদের দ্বারা ক্ষত্রশক্তি বিশেষরূপে ক্ষয় হইয়া পড়ে। এই যুগে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ে যজ্ঞাদি বিলুপ্ত হয়। যাহারা যজ্ঞের বিষয় ঘটাইত, তাহারা দানব, রাক্ষস প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখা যায় মৌর্যদিগকে দানবদের পঙ্ক্তিবদ্ধ করা হইয়াছে।*

জৈন ও বৌদ্ধদিগের অধিকারকালে প্রাণিহিংসামূলক যজ্ঞাদি বহুপরিমাণে লুপ্ত হয়। আমাদের এই বৃহৎ বঙ্গ পূর্ক হইতে নব ব্রাহ্মণ্য-নেতা কৃষ্ণের বিদ্রোহী ছিল। এখানে কৃষ্ণবিরোধী দলের চেষ্টায় যজ্ঞাদি বহুকালের জন্য একরূপে নির্মূলাপিত হইয়াছিল। এখানে নানাদেশীয় লোকের যতটা সমাগম ও মিশ্রণ হইয়াছিল—বোধ হয় ভারতের আর কোন দেশে ততটা হয় নাই। বাঙ্গালী বহুপূর্ক হইতে সমুদ্রে যাতায়াত ভালবাসিতেন; সমুদ্র-তীরবর্তী তমলুক এবং পূর্কবঙ্গে অধুনা-বিলুপ্ত কপিলারাম প্রভৃতি স্থান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। চাম্পা, কম্বোজ, টংকিং, আনাম, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের নানা মন্দির-গাত্রে ফোঁদিত লিপি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আর্য্যাবর্তের পূর্কংশের লোক সমুদ্রে যাতায়াতে অতীব দক্ষ ছিলেন। বাঙ্গালীরা খৃষ্ট জন্মবার বহুপূর্কে সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সমুদ্রপথে চীনদেশে গমনাগমন করিতেন। কথিত আছে, চীনদেশে উপনিবিষ্ট হিন্দুগণ চীনপতির সাহায্যে একদা ২,৮০০ নৌসেনা ও কতকগুলি রণতরী দিয়াছিলেন—ইহা খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর ঘটনা। (বাঙ্গালীর বল, ২ পৃঃ, এবং J. R. A. S., 1896; Article by G. Phillip.) খৃষ্ট জন্মবার কিছু পরে বাঙ্গালীরা মাটাবান-তীরে উপনিবেশ-স্থাপনপূর্কক তথায় ‘সঙ্ঘর্ষ’ নামক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাভারতে এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের অনেক স্থলে পূর্কদেশীয় রাজাদের নৌবলের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়।

সুতরাং শুধু নিকটবর্তী পাহাড়িয়া জাতিদের সঙ্গে নহে, বাঙ্গালী সনাতনকাল হইতে বিভিন্ন জাতিদের সংস্পর্শে বিশেষভাবে আসিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, তাম্রলিপির লোকেরাই আরও দক্ষিণ দেশে বাইয়া তামিলরূপে গণ্য হইয়াছে। তামিল ও তেলেগু জাতির সঙ্গে যে এককালে এদেশের ঘনিষ্ঠ সংঘর্ষ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আসামের শ্রানজাতি, ব্রহ্মদেশের কিরাত ও চীনদেশবাসিগণ এদেশের উত্তরপূর্ককালে বহুদিন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে অধুনা মস্ত বড় একটা বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর তোলা হইয়াছে। পার্শ্ববর্তী প্রতিবাসীদের সঙ্গে আহারাদি চলে না, অথচ কোন কোন জাতি—যথা, স্বতন্ত্র প্রভৃতি,—তাঁহাদের ব্যবসারে অপরিচ্ছিন্নতার কিছুই নাই তথাপি সমাজ তাঁহাদিগকে ঠেকাইয়া

* “কালকা বৌদ্ধতা বৌদ্ধাঃ কালকেশ্যসুখাঃ।” চণ্ডী, অষ্টম মাহাত্ম্য।

রাখিয়াছে, - একজাতীয় লোক হইলে এতটা বিচ্ছিন্নতা কিছুতেই ঘটিতে পারিত না। কোন কোন সময়ে রাজ-নির্ধ্যাতনে অথবা রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের কালে শ্রেণী-বিশেষ অপদস্থ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু সাধারণতঃ বিদেশাগত ভিন্নজাতির বংশধরগণকে হিন্দুসমাজে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে একটু জায়গা দিয়া তাঁহাদিগকে কতকটা ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারাি অধিকাংশ হলে অনাচরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, এদেশে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব হইতে অনেকাংশে বিমুক্ত হইয়া দূরদেশসমূহের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদানের ফলে চিন্তাজগতে কতকটা স্বাধীনতা পাইয়াছিল। এ দেশে কোন দিনই পরের অত্যাচার এবং সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের কঠোরতা সহ্য করিতে পারে নাই। গঙ্গা যেদ্রুপ চিরচকল, পদ্মানদীর তীর যেদ্রুপ সত্যত ভঙ্গশীল—এদেশের চিন্তা ও সামাজিক গঠন তেমনই অবিরাম-গতিশীল। কৃষ্ণ-বিদ্যেয়ীদের ধ্বজার নিয়ে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম বিশেষ পুষ্টলাভ করিয়াছিল—কিন্তু সেই ধর্ম দুইটিও বৈশীদিন এখানে স্থায়ী হয় নাই, তারপর পুনরায় নব ব্রাহ্মণ্যের ছটা এদেশকে প্রদীপ্ত করিয়াছিল। এদেশের লোকেরা যখন যে ভাবটি ধরিয়াছে, তাহার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছে। পৌণ্ড্র বাহুদেব যে অঞ্চলে কৃষ্ণ-বিদ্যেয়ের চূড়ান্ত অভিনয় করিয়াছিলেন—তাহার বহুদূর পরে কে জানিত সেই দেশের মৃত্তিকায়, সেই গঙ্গার উপকূলে, কৃষ্ণ নামের মহিমায় লোকে এমনভাবে মাতিয়া উঠিবে! আমিই ‘একমাত্র শঙ্খচক্রগদাধর’ বলিয়া পৌণ্ড্রক গর্ব করিয়াছিলেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের জন্ত কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কে জানিত সেই দেশে কৃষ্ণের কীর্তিকথা একরূপ ভাবে প্রচারিত হইবে?

জৈনেরা জীবে দয়ার অভিনয়ের চূড়ান্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একদল মাথায় ময়ূরপুচ্ছ লইয়া চলাফেরা করিতেন। পাছে তাঁহাদের পদতলে নিষ্পেষিত হইয়া কোন ক্ষুদ্র কীট নিহত হয়, এই ভয়ে তাঁহারা সেই ময়ূরপুচ্ছ দিয়া পথ ঝাড়িতে ঝাড়িতে অগ্রসর হইতেন। তাঁহাদের একশ্রেণী প্রতিদিন

জৈন প্রভাব।

পিপীলিকাকে নিয়মিত ভাবে শর্করা প্রদান করেন এবং অল্প একদল বাড়াবাড়ি করিয়া এখনও নয় গাত্রে ছারপোকা ছাড়িয়া দিয়া নিজের দেহের রক্তদ্বারা তাহাদের ক্ষুধা নিবারণ করিয়া থাকেন। এক সময়ে স্বয়ং পার্শ্বনাথ এই দেশে বহুবৎসর জৈনধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং এদেশে—বিশেষ সুল্লবন বিক্রমপুর এবং মানভূম অঞ্চলে—বহু লোক এই ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। বহু বঙ্গ-শলী হইতে তীর্থঙ্করদের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে—এই ধর্ম তৎকালে কতটা ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল—ইহা দ্বারা তাহাই বুঝা যায়। জয়নগর-মজিলপুর-নিবাসী স্বদেশের ইতিহাস-উদ্ধারকল্পে নিবেদিতজীবন শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয় আমাকে জানাইয়াছেন, তাঁহার নিবাসপল্লী হইতে ৬৭ কোশ দূরবর্তী করঞ্জলী গ্রামে সম্প্রতি একটা পুষ্করিণী-খননকালে প্রায় ৬ফিট উচ্চ এক বিশাল কাল-পাথরের জৈনদিগদ্বয়-সম্প্রদায়ভূক্ত পার্শ্বনাথমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। কালিদাসবাবু লিখিয়াছেন, “এরূপ সুল্লব মূর্তি আমি ইতিপূর্বে অল্প কোথায়ও দেখি নাই।” যথাস্থানে ইহার ছবি দেওয়া

গেল। শিবি যে মহাত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা অবশ্যই একটা উপগল্প মাত্র, বৌদ্ধজাতকে বুদ্ধ একজন্মে একটা বুদ্ধকু ব্যাঘ্র ও তাহার শাবকদ্বয়ের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া নিজের দেহ দান করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্রিত্তি করিয়াছিলেন—একপ একটা উপাখ্যান আছে; ইহাও অবশ্য একটা উপগল্পমাত্র। কিন্তু আমাদের দেশে ত্যাগ ও দয়াধর্মের যে কি অপূর্ণ অভিনয় হইয়াছে তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। শিবি উপাখ্যান, দাতাকর্ণ উপাখ্যান প্রভৃতি কাহিনীর মধ্যে যে অতিরঞ্জন আছে, তাহা

একটু মুছিয়া ফেলিলেই ধরা পড়িবে যে, ঐ সকল কবি-কল্পনার অভ্যস্তরে সত্যের অস্থিকঙ্কাল রহিয়া গিয়াছে। ইহারা আরব্য উপজ্ঞাসের গল্পের জায় নিছক কর্তব্যপ্রসূত নহে। এখনও

বাঙ্গালী বৈষ্ণবের ঘরে রক্তের নাম করিতে নাই—‘কাটা’ কথা তাঁহাদের অভিধানে নাই, তরকারী কোটা বা কাটাকে তাঁহারা ‘বানান’ বলেন। জীবে দয়ার নীতিকথা সেই আদি কাল হইতে এদেশে এমনই ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। দয়া, প্রীতি, ত্যাগ—এই সকল গুণের আদর সম্ভব-অসম্ভব গল্পছলে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। পুরাণকারগণ, কথক ও কীর্তনীয়ারা বাঙ্গলার ঘরে ঘরে নানা উপাখ্যান দ্বারা ত্যাগ-ধর্মের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। বাঙ্গালীরা এক সময়ে বণিক-শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বণিকেরা বেদোক্ত পণিজাতি, ইহারা গরু হইতে দধি, দুগ্ধ, দ্বত প্রভৃতি পাইতেন, কৃষিকার্যে দক্ষ ছিলেন। ইহারাই পশুবলির বিরোধী ছিলেন। বেদের সময় হইতেই আখ্যদের সঙ্গে ইহাদের শত্রুতা চলিয়াছিল। এই নিরীহ পণিজাতি সংখ্যায় প্রবল ছিলেন এবং উত্তরকালে ইহারাই বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্র সুপ্রসারিত করিয়া বজ্র-বিরোধী হইয়াছিলেন।

নানা দেশের সভ্যতা, নানা ভাব ও নানা ধর্মের প্রবাহ এ দেশে আসিয়া শতশ্রোতা গঙ্গার জায় জাতীয় সভ্যতার সাগরসঙ্গমে মিশিয়া গিয়াছে। এজন্ত বাঙ্গালী বাহা আজ ভাবিবে, তাহা ভারতবর্ষের অতীত কাল কি পরম ভাবিবে। বাঙ্গালী জাতি সর্বদাই চিন্তার নেতা। তাঁহারা একস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার মাহুষ নহেন। বর্তমান যুগের ব্রাহ্মণ্য ও জাতিভেদ

মাত্র কয়েক শতাব্দীর জন্ত তাঁহাদিগকে অচলায়তনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। বৌদ্ধযুগের অবসানে যে বিশৃঙ্খলতা, যে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মমূলক অত্যাচার এদেশে প্রবল রূপের মত

প্রবাহিত হইতেছিল—বাহাতে বাঙ্গলার কুণ্ডেধরগুলি হয়ত বা উড়িয়া যাইত—তাহা হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সমাজ-গুরুগণ অত কড়া ও শক্ত নিয়মের দড়ি দিয়া কুটিরগুলি বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলা সে বাঁধন বেশীদিন মানিয়া চলিবার দেশ নহে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্যের আন্দোলনে সেই কুটিরের ভিত্তি খুব জোরে নাড়া পড়িয়াছিল। অধুনা আর একটা বিপ্লবের যুগ আসিয়াছে। বাঙ্গালী যুগে যুগে কিরূপ চিন্তাশীলতা ও গঠনমূলক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে, তাহাই আমরা ঐতিহাসিক অধ্যায়ে ক্রমে ক্রমে দেখাইব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নব ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম

"গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ"

পৌরাণিক যুগের কল্পনার কুছাটিকা ভেদ করিয়া যে সত্যের আলোটুকু আসিয়াছে তাহাতে বৃহৎ বঙ্গের মানচিত্রকে খুব উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছে। অপিচ আমরা দেখিতে পাই, কৃষ্ণ-সমাপ্রিত যে আধ্যাত্মিকের অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহাতে ব্রাহ্মণকে দেবতা হইতেও উচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছিল। এই গৌরব ও পূজার প্রধান পতাকাবাহী ও পুরোহিত ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ। পূর্বকালের অর্থাৎ বৈদিকযুগের ব্রাহ্মণ ছিলেন অন্তরূপ। তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য-রক্তের উপর ততটা জোর দেন নাই। অহুলাম ও প্রতিলোম বিবাহ সর্বদাই অনুষ্ঠিত হইত এবং প্রধানতঃ বৃত্তিই জাতি-নির্দেশক ছিল। যে কোন জাতির লোক ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এমন কি কোন কোন মহর্ষি গণিকাজাত ছিলেন। সত্যকাম ও নারদের মাতার স্থান এই পর্যায়ে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু মহাভারতের যুগের পর হইতে ব্রাহ্মণগণ যে ক্ষমতা পাইলেন, তাহা তাঁহাদিগের অপ্রতিদ্বন্দ্বি শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়ভাবে প্রতিপন্ন করিল। বঙ্গদেশের রাজারা, এমন কি সমস্ত

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, মহা-
ভারতের প্রমাণ।

ভারতবর্ষের রাজগণ ব্রাহ্মণদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন; অশোক প্রভৃতি বৌদ্ধ সম্রাটগণও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়াছেন। কিন্তু

মহাভারতে ব্রাহ্মণকে স্বর্গমর্ত্যের সর্বোচ্চস্থানে যে ভাবে আসীন করা হইয়াছে, পূর্ব-ভারতবাসিগণ প্রথমতঃ তাহা স্বীকার করেন নাই। মহাভারতে যজ্ঞাদির যে উচ্ছৃঙ্খিত প্রশংসা ও ফলশ্রুতি আছে এবং বিশেষ করিয়া অহুশাসন-পর্বে ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপের যে সকল উপগল্প লিখিত হইয়াছে, তাহাদের প্রভাব প্রথমতঃ এদেশ স্বীকার করে নাই। মহাভারতকার লিখিয়াছেন—ব্রাহ্মণের সেবা করিলে ইহলোকে ও পরলোকে এমন কোন অভ্যাপ্ত সামগ্রী নাই, বাহা মাহুবে না পাইতে পারে। এখানে

বৌদ্ধধর্ম জোর দিয়া বলিল 'কাহাকেও কিছু দিবার ক্ষমতা অপরের ব্রাহ্মণ "অগ্নিশিখা" ও "একমাত্র উপাঙ্গ।" নাই। কর্মই লোকের অদৃষ্ট নির্মাণ করে এবং কর্মই সর্বফলপ্রসূ।'

মহাভারতের অহুশাসন পর্বে ব্রাহ্মণসম্বন্ধে যে সকল প্রশংসাবাদ আছে তাহার কিছু নমুনা আমরা নিরে দিতেছি। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, 'ফলতঃ ব্রাহ্মণপ্রীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, আমি ব্রাহ্মণগণের দাস। এই জীবলোকে ব্রীজাতির যেমন পতিই পরমধর্ম, পতিই দেবতা ও পতিই পরমগতি, সেইরূপ কত্রিয়কুলের ব্রাহ্মণসেবাই পরম ধর্ম, ব্রাহ্মণই পরম দেবতা ও পরমগতি (অষ্টম অধ্যায়)। অরণ্যমধ্যে

অগ্নিশিখা বেরূপ সমস্ত বন দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারা কোথাবিষ্ট হইলে সমুদায় ভগ্নসাৎ করিয়া থাকেন। উহাদিগের গুণের ইয়ত্তা নাই।

ব্রাহ্মণেরা দেবতাকে উপ-
দেবতা ও উপদেবতাকে
দেবতা করিতে পারেন।

ব্রাহ্মণেরা পিতৃ, দেবতা, মনুষ্য ও উরগগণের পূজা। উঁহারা
দেবতাকে অপদেবতা ও অপদেবতাকে
দেবতা করিয়া থাকেন। মুষ্টিদ্বারা বায়ুগ্রহণ ও হস্তদ্বারা

চন্দ্রস্পর্শ ও পৃথিবীধারণ করা বেরূপ, ব্রাহ্মণকে পরাজয় করাও তদ্রূপ স্বকঠিন" (৩৩
অধ্যায়)। সাতাইশ নক্ষত্রের কোন্ কোন্টিতে ব্রাহ্মণকে কি কি খাওয়াইলে বা দিলে
স্বর্গলাভ হয়, ৬৪ অধ্যায়ে তাহার একটা দীর্ঘ তালিকা আছে,—যথা কৃত্তিকায় ঘৃত,
পায়স; রোহিণী নক্ষত্রে মৃগমাংস, ঘৃত, ছদ্ম ইত্যাদি; মৃগশিরা নক্ষত্রে সবৎস দেহদান;
আর্দ্রায় তিল-মিশ্রিত কেশর; পুনর্ভুতে পিষ্টক ও অন্ন; পুষ্যায় সুবর্ণদান; অশ্লেষায়
রজত ও বুধদান; মধ্যায় তিলসংযুক্ত সরাব ইত্যাদি। ফলশ্রুতিতে দাতাদিগকে নানারূপ
লোভ দেখান হইয়াছে, যথা—“চিত্রা নক্ষত্রে বৃষ ও গন্ধদ্রব্য দান করিলে অশ্বারোহের
সঙ্গে নন্দনকাননে বিহার করিতে পারা যায়।” এই অগণিত দানদ্রব্যের মধ্যে রাজকীয়
বিলাস-সামগ্রীর অভাব নাই, যথা—হাতী, রথ, কঞ্চল, খেতবর্ণমাল, মেঘমাংস এবং অগুরু-
চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য। যে যে বিখ্যাত পুরুষেরা ব্রাহ্মণদিগের এবং বিধ দান করিয়া
স্বর্গের সমস্ত সুখের অধিকারী হইয়াছেন, ৭৭ অধ্যায়ে তাঁহাদের নামের এক দীর্ঘ তালিকা
আছে; আমরা সহিষ্ণু পাঠকবর্গের ঘাড়ের সেই মূষল চাপাইব না; এমন কি স্বীয় পরিণীতা
ভার্য্যাকেও ব্রাহ্মণকে দান করিয়া কোন রাজা প্রশংসিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্য-প্রতাপের
আর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া আমরা নিরন্তর হইব—“ব্রাহ্মণদিগের শাপ-প্রভাবেই
সাগরের জল নিতান্ত অশেষ হইয়াছে, উহাদের কোপানল দণ্ডকারণ্যে এখনও প্রশমিত
হয় নাই। উহারা দেবগণের দেবতা, কারণের কারণ, প্রমাণের প্রমাণ। উহাদিগের
মধ্যে কি বৃদ্ধ কি বালক সকলেই পূজার যোগ্য। যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশূন্য,
তিনিও অন্যকে পবিত্র করিতে পারেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণ
বিদ্বান্ হউন বা মুখ হউন—তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ
জ্ঞান করা বিধেয়। অগ্নি সংস্কৃতই হউন বা অসংস্কৃতই
হউন, তাঁহার দেবত্ব কিছুতেই লুপ্ত হয় না। যেমন তেজস্বী
অগ্নি শ্মশানে অবস্থান করিলেও দূষিত হন না, প্রত্যুত
ষড়্ভগ্নহে বিধিবৎ ব্যবহৃত হইতে পারেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ
যদিও সতত অনিষ্টকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তথাপি
তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ জ্ঞানিয়া সমাদর করিবে”
(১৪১ অধ্যায়)। “ব্রাহ্মণই সর্গপ্রদান, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। চন্দ্র, সূর্য্য,
জল বায়ু, ভূমি, আকাশ ও দিক্-সমূহ ব্রাহ্মণ-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্ন গ্রহণ করিয়া
থাকেন” (৩৪ অধ্যায়)।

পরশুরামের পূর্বে ব্রাহ্মণ বড় কি ক্ষত্রিয় বড় সমাজে একবার এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। পালি “অথথৈত্তত্ত” নামক পুস্তকে দেখা যায়, বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয়দিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহার বহু পূর্বেই একবিংশবার যুদ্ধ করিয়া পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিয়াছিলেন; কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনও পরশুরাম কর্তৃক নিহত হওয়ার পর মহানন্দ প্রভৃতি দ্বারা ক্রমান্বয়ে নিরস্ত হইয়া অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে অনেকে কিরূপ দীনভাবে ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যাইতেছে।

ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব ও ব্রাহ্মণ্য-জাতিভেদের কড়াকড়ি ভারতে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। এই ব্রাহ্মণ-শিক্ষাদীক্ষার ভিত্তিভূমি মহাভারতে অম্বুশাসন পর্বের দশম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে: “হীন জাতিকে উপদেশ দেওয়া কখনই কর্তব্য নহে।” “ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য ইহারা পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারেন, কিন্তু কুকর্মান্বিত শূদ্রের অন্ন কখনই ভোজন করিবেন না” (১৩৪ অধ্যায়)। বৈশ্যের অন্ন-সম্বন্ধেও কতকগুলি নিষেধ-বিধি আছে। এ দিকে যে সকল ব্রাহ্মণ চিকিৎসক, অস্ত্রজীবী, পুরোহিত, দেবল ও দৈবজ্ঞ তাঁহাদিগকেও শূদ্রের পর্ধ্যায়ে ফেলা হইয়াছে। তাহারা বেতন লইয়া অধ্যাপনা করেন—সেইরূপ ব্রাহ্মণেরও অন্ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে মনুস্মৃতি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ-রাজ পৃথ্যামিত্রের সময়ে ফিরিয়া লেখা হইয়াছিল, তখন তাহাতে উহার বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল; পৃথ্যামিত্র মৌর্যরাজের সেনাপতি ছিলেন, শেষে স্বপ্রভুকে হত্যা করিয়া তাহার সিংহাসন অধিকার করেন। আশ্চর্য্যের কথা—

বিষয়-বিরাগের স্থলে ব্রাহ্মণ যে পার্থিব ভোগ-বিলাসের যোগ্য পাত্র, তাহা এই মানব-স্মৃতির নব সংস্করণে প্রচুর পরিমাণে সমর্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সেনাপতি হইতে পারেন, রাজা হইতে পারেন, ইত্যাদি ব্যবস্থা স্পষ্টরূপে সংশোধিত মনু-স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ-রাজার কার্য্য সমর্থন করিতেছে, “সৈন্যপত্যং চ রাজ্যং চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ। সর্বলোকাধিপত্যং চ বেদশাস্ত্র বিদর্হতি।” (মনু, ১০০)। সমস্ত পৃথিবীর অধিকার ভ্রাতৃত্ব: ব্রাহ্মণের প্রাপ্য, এ ভাবের কথাও মানব-ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়। সুদ্রবংশের পূর্বে ব্রাহ্মণের অপরাধের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু পরবর্তী স্মৃতিকারগণ ব্রাহ্মণের দণ্ড অতিক্রম করিয়া দেন। শূদ্রদের উপর শাস্তির ব্যবস্থা এই সময়ে কঠোরতম হইয়া দাঁড়ায়, এতদ্বারা সুদ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ রাজাদের স্বজাতিকে বাড়াইবার প্রবল চেষ্টা ও মৌর্যাদিগের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ সূচিত হইতেছে।

ঐলোকদিগের সম্বন্ধে পরবর্তী কালে যে সকল অম্বুশাসন শাস্ত্রীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারও সূত্র মহাভারতেই পাই—“পতিই ঐলোকের পরম দেবতা, পরম বদ্ধ ও পরমা গতি। অস্ত্র পুরুষের কথা দূরে থাকুক, যিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও বৃক্ষকেও অবলোকন করেন না—তিনি পাত্তিব্রত্যা ধর্মের ফল লাভ করিয়া থাকেন” (১৩৬ অধ্যায়)। এই উক্তির সঙ্গে নারদপঞ্চচূড়া-সংবাদের নানারূপ জঘন্না কথা মিলাইয়া পড়িলে ঐলোকদিগের উপর শাস্ত্রীয় কঠোর বিধির কারণ উপলব্ধ হইতে পারে। সম্ভবতঃ সন্ন্যাসের প্রতি

ঐলোকের বৃক্ষ, চন্দ্র, সূর্য্য
কথা নিষিদ্ধ। তাহাদের
সম্বন্ধে অপবাদ।

অনুরাগ আকর্ষণ করিবার জন্য বৌদ্ধগণ গার্হস্থ্যের প্রধান আকর্ষণ—স্বীজাতির উপর ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মাইবার জন্য এই সকল দৃশ্য অপবাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ছই একখানি বৌদ্ধজাতকে যে সকল চিত্তাকরজনক উপকথা পাওয়া যায়—তাহা নিশ্চয়ই স্বীজাতির প্রতি পুরুষের হৃদয়ে স্বাভাবিক বন্ধন ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হইয়াছিল। “ছনিয়া সব বাউরা হোকর ঘর ঘর বাঘিনী পোষে” প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক উক্তিও সেই প্রাচীন উদ্দেশ্যমূলক। গৃহীকে গৃহছাড়া করিবার উদ্দেশ্যে গৃহস্থের প্রধান অবলম্বন গৃহিনীকে এইভাবে নিন্দিত করা হইয়াছে।

মহাভারতে এই যে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের কথা আছে, তাহা প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর হিন্দু জনসাধারণের কর্ণে ধ্বনিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে একপ অদ্বিত ও অচলা ব্রাহ্মণভক্তির লীলাভূমিতে পরিণত করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম সমস্ত জাতির জন্য দীক্ষার দ্বার খুলিয়া দিলেন—যজ্ঞধর্মের ঘোর প্রতিবাদ করিলেন, তাহারও দ্বিসহস্র বৎসর পরে চৈতন্য “চণ্ডালোহপি বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ” সাম্যের এই মহাবাণী প্রচার করিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ যুগ হইতে এই সকল ধর্মগুরুগণের সময় পর্যন্ত ব্রাহ্মণের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বের দাবী কথঞ্চিৎ অস্বীকৃত হইলেও তাহাদের জন্য একটা শ্রদ্ধার আসন সর্বত্রই নির্দিষ্ট ছিল। অধুনা ব্রাহ্মধর্ম সেটুকুও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রতি কি অমোঘ বিশ্বাস—কি অচলা ভক্তি হিন্দুসমাজের অস্থিপঞ্জরে প্রবেশ করিয়া আছে! এখনও জনসাধারণের মধ্যে সে বিশ্বাস কতক পরিমাণে অনড় হইয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোক কাহারও মুখ দেখিতে পারিবে না, মহাভারতীয় এই নীতির খুব বাড়াবাড়ি অভিনয় হইয়াছে। স্বর্গীয়া রাসমণির জীবনচরিতে দেখিতে পাই যে, তিনি স্বামীর ঘোড়াটা দেখিয়া লজ্জায় একহাত ঘোমটা টানিয়া দিয়া তথা হইতে পলাইয়া গিয়াছিলেন। ইহা গল্প-গুজব নহে, সত্যকার ঘটনা, রাসমণি স্বয়ং লিখিয়াছেন। (রাসমণির জীবনী দ্রষ্টব্য।) অবশ্য গাছ দেখিয়া লজ্জা পাওয়ার উদাহরণ এখনও আমরা পাই নাই। প্রচলিত “অস্থ্যাম্পশ্চা” কথাটাতে সূর্য্যের দৃষ্টি হইতেও মেয়েদের আত্মরক্ষার ইঙ্গিত আমরা পাইতেছি। জাতিভেদ এবং অন্নভোজনের যে কড়াকড়ি এদেশে হইয়াছে তাহাতে মনে হয়,—সমস্ত ধর্মতত্ত্ব হাড়ীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নৈতিক হিন্দু বন্ধনশালায় সতর্ক পাহারা দেওয়াই পরম ধর্ম মনে করিয়া থাকেন। মহাভারতকার বলিয়াছেন, “শূদ্রাঃ, শিল্পী ও নিন্দিত ব্যক্তির অন্ন শোণিতসদৃশ” (অনুশাসন, ১৩৫ অধ্যায়)।

উত্তরকালে বৌদ্ধ ধর্মকে নিরস্ত করিয়া যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম শির উত্তোলন করিয়াছিল, তাহা এই সকল উপদেশ মূলধনের দ্বায় বিশেষ ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। সেই নবগঠিত সমাজের এই সূত্রগুলি ছিল ভিত্তিস্বরূপ।

বৌদ্ধ ধর্মের মূল সূত্রগুলি হিন্দুধর্মে পূর্বেই প্রচারিত হইয়াছিল, ব্যক্তিক অনুষ্ঠান অনেক স্থলেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। মহাভারত ব্রাহ্মণদিগের মাহাত্ম্যের অতিশয়োক্তি ও যজ্ঞের সমর্থন করিয়াও ‘জীবে দয়া’ নীতির কথা ভুলিয়া যান নাই। মহাভারতের অনুশাসন-পর্কে দেখিতে পাই, “মহাত্ম্যমাত্রেই আত্মপ্রাণের দ্বায় অস্ত্রান্ত্র প্রাণীর প্রাণকে প্রিয়বস্ত্র বলিয়া

জ্ঞান করা উচিত। যখন সিদ্ধিকাম জ্ঞানোন্নিগেরও মৃত্যুভয় বিহীন, তখন মাংসানী হরণগণ কর্তৃক নিপীড়িত অস্ত্র জন্তুগণ যে মৃত্যু হইতে ভীত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বাহারা রসনাকে তৃপ্ত করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে, তাহাদিগকে ব্রাহ্মস বলা যাইতে পারে। বাহারা মাংসাহারে বিরত, তাহাদের দুর্গম অরণ্যে, দুর্গ বা চত্বরে বা উন্মত্ত-শত্রু ব্যক্তি বা সর্প প্রভৃতি হিংস্রজন্তু হইতে কোন ভয়ের কারণ থাকে না। এবংবিধ ব্যক্তি সর্বদাই সর্বভূত-শরণ্য, বিশ্বাসজনক হইয়া নিরুদ্বেগে কাল হরণ করিতে সমর্থ হন। যদি কেহই মাংসভোজী না হয়, তবে পশুহত্যা এককালে তিরোহিত হইতে পারে। দাতকেরা কেবল মাংসভোজীর জন্তু জীবহত্যা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বয়ং মৃত বা অপার কর্তৃক নিপাতিত প্রাণিগণের মাংস ভোজন করে, তাহাকে হত্যাকারীর তুল্যফল ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কোন জন্তুকে সংহার করিবার জন্তু ক্রয় করে, যে ব্যক্তি উহাকে সংহার করে এবং যে ব্যক্তি উহার মাংস ভোজন করে, তাহাদের তিন জনকেই হত্যাভাজিত মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়.....যে ব্যক্তি মাংস ভোজনে স্বয়ং বিরত হইয়াও অন্তকে তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা করে, তাহাকেও বধভাগী হইতে হয় সন্দেহ নাই” (অনুশাসন পর্ব, ১১৫ অধ্যায়)। শেখোক্ত বিধান পাঠ করিয়া আমাদের দেশের বিধবাদিগের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। তাহারা নিজেদের স্বজনবর্গকে উৎকৃষ্ট মাছের মুড়া বা পেট খাওয়াইবার জন্তু কত অনুন্নয়-বিনয় করেন, তাহা সকলেই জানেন। নিজেরা যে সুখে বঞ্চিত, আপনার জনকে সেই সুখভোগ করিতে দেখিলেও তাহাদের পরোক্ষভাবে কতকটা তৃপ্তি ঘটিতে পারে। কিন্তু মহাভারতের বিধিতে এই মাংসাহার-বিরতা মহিলাদিগের জন্তুও নরকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে, মহাভারতে জীবের প্রতি দয়ার যে সূত্র প্রচারিত হইয়াছে—তীর্থঙ্করগণ, স্বয়ং বুদ্ধদেব এবং মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোক তদপেক্ষা নূতন কথা কিছু বলেন নাই। আর্ঘ্যদের অধিকার-বিস্তৃতির সঙ্গে আর্ঘ্যাবর্তের ভীষণ অরণ্যানী কর্তনপূর্বক তাহা বাসযোগ্য জনপদে পরিণত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, হিংস্র জন্তুদিগকে নিঃশেষ করিবার দরকার ঘটিয়াছিল। মূলতঃ এই অভিপ্রায়ে আর্ঘ্যগণ যজ্ঞবিধি পালন করিতেন, তাহাতে অসংখ্য পশুবলি দেওয়া হইত। অবশ্য দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন বিশাল স্থানে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিলে কাষ্ঠের জলীয় নির্ঘাস-জাত বাষ্পরাশি আকাশে পরিব্যাপ্ত হইলে পর্জন্তুদেবের কৃপালাভ করা সম্ভবপর হয়, এজন্য অনাবৃষ্টি দূর করিবার উদ্দেশ্যেও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু পশুভয়-নিবারণ ও হর্ভেজ জঙ্গল পরিষ্কারপূর্বক তাহা লোকাবাসে পরিণত করাই অনেক যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই পশুহিংসার নিশ্চয়তা অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগে এতদেশ অরণ্যবহুল ছিল; এজন্য যজ্ঞাগ্নি এ দেশে ঘন ঘন প্রজ্জ্বলিত হইত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর শৌর্য্য, বীর্ঘ্য ও শোণিত-পাতের একটা শ্রাদ্ধ হইয়া যায়। যে সকল দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোক অধিকাংশ অনাৰ্ঘ্য ছিলেন, তাহারা এই যজ্ঞগুলি খুব সূচক্ষে দেখিতেন না। অনাৰ্ঘ্যগণ প্রায়ই যজ্ঞ বিয় ঘটাইতেন। তাহাদিগকে

রাফস, দানব প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইত। ইহারা ই উত্তরকালে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

স্ববৃহৎ জনসাধারণের মনের ভাবের অভিব্যক্তি স্বরূপ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম এদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। সাধারণ জনমত পূর্বেই এই দয়াদর্শ শিখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সেইজন্তই অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই দুই ধর্ম আখ্যাবর্তে এতটা প্রসার লাভ করিয়াছিল। জীবে দয়ার সূত্র আমরা মহাভারতাদি পুরাণে প্রচুর পরিমাণে পাইতেছি, উত্তরকালে এই সূত্রগুলির বিশেষ পুষ্টি ও ত্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। কপিলবস্ত্র—শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি হইতে মাত্র দেড় শত ক্রোশ পশ্চিমে। ঢাকা হইতে কলিকাতা যতদূর প্রায় ততটুকু ব্যবধান। স্মৃতরাং কপিলবস্ত্রকে বৃহৎ বস্ত্রের অন্তর্গত বলিলে বিশেষ দোষ হয় না। গয়া, মানভূমি, বুদ্ধদেবের মহাতীর্থ, ও তীর্থঙ্করদের প্রচারক্ষেত্র আমাদের বৃহৎ বস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত; বহুযুগ ধরিয়া এই সমস্ত দেশ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সর্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ ছিল। এই জন্তই এ অঞ্চলটা ব্রাহ্মণগণ পরিত্যাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈদিক যুগ হইতে এ পর্যন্ত কোন কালেই ব্রাহ্মণের যজ্ঞাগ্নি এ দেশে একেবারে নির্দীপিত হয় নাই। যখন উহা নির্দীপ্যমান হইয়াছিল, তখন সেন রাজাদের মাতৃকুলের কোন আদি পুরুষ—তিনি সুরবংশীয়ই হউন বা অপর কোন বংশীয়ই হউন—স্বদূর পশ্চিম হইতে নব ব্রাহ্মণদীক্ষিত সাম্বিক যজ্ঞাহুষ্ঠানে পারগ ব্রাহ্মণদিগকে এখানে আনিয়া তাঁহাদিগকে ধর্মীয় সপ্তম শতাব্দীতে এ দেশের ধর্মগুরু ও সমাজগুরুরূপে অধিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। সেই কনোজাগত ব্রাহ্মণগণের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের অধীন হইয়া আমরা এখন পর্যন্ত তাঁহাদের বিধান

শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছি। কিন্তু তাঁহাদের অধিকারে যুগে যুগে অনেক বিদ্রোহ ঘটিয়াছে। এই বিদ্রোহীদের সর্বজনস্বীকৃত অধিনায়ক ছিলেন সপার্থক চৈতন্যদেব। তত্ত্বরত্নাকরে লিখিত আছে, ত্রিপুরাসুর হত হইলে বটুকভৈরব গণদেবকে জিজ্ঞাসা করেন—ত্রিপুর নিহত হওয়ার পর তাহার সত্তা জগৎ হইতে একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছিল,—না কোন না, কোন প্রকারে বিদ্যমান ছিল। গণদেব উত্তর করিলেন,—ত্রিপুরাসুর হত হইলে তাঁহার রূপ তিনভাবে জগতে দেখা দিয়াছিল—সেই মহাতেজা অশুরের প্রধান অংশ শচীগর্ভে চৈতন্যরূপে প্রকট হইল, দ্বিতীয় ও তৃতীয়াংশ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। ইহারা সমুখযুদ্ধে শিব-শক্তির বিরুদ্ধতা করিতে অসমর্থ হইয়া মাহুযকে হীনবল করিবার জন্ত নারীভাবের উপাসনা শিক্ষা দান করিল। “শিবদর্শ্যবিনাশায় লোকানাং মোহহেতবে। হিংসার্থং শিবভক্তানাং মুপায়ণ-সুজ্ঞদ্বহন। অংশেনাঞ্জন গৌরাখ্য শচীগর্ভে বভূব সঃ।ততো হুবায়া ত্রিপুরঃ শরীরৈস্তিভিরাশুরৈঃ। উপপ্লবায় লোকানাং নারীভাবমুপাদিশৎ॥” নব-ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম যাহা আপৎকালের ধর্ম্মের জায় সময়ের প্রয়োজন বুঝিয়া সমুদ্রযাত্রা নিষেধ, ত্রীলোকের প্রতি অবিচার এবং প্রবহমান স্বাভাবিক ধর্ম্মের গতিরোধ করিয়া জাতিভেদ ও আহার-সংঘের জন্ত শত শত নিষেধবিধি দ্বারা সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনে কৃত্রিমতা আনয়ন করিয়াছিল—তদ্বিরুদ্ধে

বাহ্মণী জাতি পুনঃ পুনঃ সতর্কবাণী উচ্চারণপূর্বক সনাতন ধর্মের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়াছে। চৈতন্যদেব প্রাচীন সমাজের প্রধান এবং প্রথম বিদ্রোহী। এই বিদ্রোহ আধুনিক সময়ে রামমোহন রায় ঘোষণা করিয়াছেন এবং সম্প্রতি গান্ধী-প্রবর্তিত নীতিতে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ভিত্তি বোধ হয় একেবারে ধসিয়া পড়িতেছে। বাহ্মণী কোন কালেই স্বাধীনতার ডাক অগ্রাহ্য করে নাই। চিত্তার সঙ্কীর্ণতা, কোন ধর্মমতের অস্বাভাবিক অনুজ্ঞা তাঁহারা বেশী দিন সহ্য করেন নাই। জরাসন্ধ, নরক, মুর প্রভৃতির সময় হইতে বৃহৎ বঙ্গ চির দিন স্বাধীনতার যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। ঐতিহাসিক যুগে এই যুদ্ধলীলা বিশেষ ভাবে সংঘটিত হইয়াছে।

এই অধ্যায়ের শেষে একটি কথা আমাদের বক্তব্য। মহাভারতেই আমরা নব-ব্রাহ্মণ্যের সূচনার লক্ষণ সকল দিকে দেখিতেছি,—রক্ষনশালাকে দর্শন-স্পর্শনের অতীত অতি পবিত্র মন্দিরে পরিণত করা, জাতিভেদের অচ্ছেদ্য প্রাচীর উত্তোলন করা, দ্বীলোককে কোটায় পুরিয়া রাখা, সর্কোপরি ব্রাহ্মণদিগকে তেত্রিশ কোটি দেবতার উর্দ্ধে স্থান দিয়া তাঁহাদিগকে দ্ব্যলোক-ভুলোকের একাধিপত্য প্রদান করা—এ সমস্তই যত্রাকারে মহাভারতে দেখিতে পাই।

কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানে পশুহননবৃত্তি ত দয়ার সঙ্গে খাপ খায় না! যে মহাভারতে পশু-হত্যার বিরুদ্ধে এরূপ স্পষ্ট ও দ্বিধাশূন্য ভাষায় অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে—তাহা এ সম্বন্ধে যজ্ঞানুষ্ঠান-প্রচারক নব ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা কি ভাবে করিবে? তবে কি মহাভারত যজ্ঞার্থে পশুবলি নিষেধ করিয়াছেন? তাহা ত কখনই নহে। মহাভারতের মূলনীতি জীবহত্যার বিরোধী এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে রাজ্যে পশুবলি দিনরাত অনুষ্ঠিত হইত, নরবলিও যথায় বাদ পড়িত না, এমন কি একশত নরেন্দ্র বলি দিয়া যেখানে জরাসন্ধ শিবের তুষ্টিসাধনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, পরমদয়াবান্ আদর্শ নৃপতি অশোকও যেখানে পশুহত্যা নিষেধ করিয়াও প্রথমতঃ নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি পশুবধের অনুজ্ঞা দিয়া মাংসাশিগণের জন্ত স্বীয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা রাখিতে সম্মত হইয়াছিলেন—সেই রাজ্যে মহাভারতকার একেবারে জীবহত্যা নিষেধের হুকুমজারি করিতে কিছু দ্বিধাবোধ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? মাংসাশীদিগের জন্ত মহাভারত কয়েকটি রক্ষাকবচের অনুকল্পনা করিয়াছিলেন। “বৃথা-মাংস” কথাটা আমরা মহাভারতেই পাইতেছি। দেবতাদিগকে নিবেদন করিয়া মাংস প্রসাদস্বরূপ খাইলে দোষ নাই। এই যে রক্ষাকবচ ধরিয়া দিয়া গেলেন, সেই রক্ষে মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা দেবস্থানগুলিকে পশুরক্তে রঞ্জিত করিয়া তুলিল। এই রক্ষাকবচের ফলে এখনও কালীঘাটা দি তীর্থস্থান অষ্টমৌরদিনে একটা বিরাট কসাইখানাতে পরিণত হইয়া থাকে। ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাসে দেখিতে পাই, রাজারা শত্রুগণকে ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে অবাধে বলি দিতেছেন। এইভাবে দায়ুদ খাঁর নিকট-আত্মীয় মমারক খাঁ চতুর্দশ দেবতার নিকট ত্রিপুরার পুরোহিত চন্ডাই বিতুষ্ট কর্তৃক বলিগ্রন্থ হত হইয়াছিলেন এবং সেদিনও মনিপুরের ধান্সল জেনারেলের

আদেশে সাগরেন্দ্রনাথ ধনসিংহ নামক জরাদ টেঙাংটা নামক খজা দ্বারা কুইন্টন, দ্বীমে, সিমসন এবং কলিঙ্গ এই চারি জন শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষকে দেবমন্দিরের প্রাঙ্গণে বলি দিয়াছিল; নব ব্রাহ্মণ্য ঐ রক্ষাকবচগুলি হাতে পাইয়া একপ হিংস্র ও নির্দম হইয়া পড়িয়াছিল। রক্ষাকবচগুলি নিরীহভাবে প্রথম দেখা দিলেও উহা পরিণামে বীভৎস অত্যাচারের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। মহাভারতে বৃথা-মাংস সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—“যে মাংস মদ্যপূত ও প্রোক্ষিত করিয়া পিতৃমজাদিতে দান করা যায়, তাহাই পবিত্র ও ভক্ষ্য এবং তদ্ব্যতীত সমুদায় মাংসই বৃথা-মাংস ও অভক্ষ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। রাক্ষসের দ্বার বৃথামাংস ভক্ষণ করিলে কখনই স্বর্গ বা যশোলাভ হয় না। অতএব অমৃতানবিহীন অপ্রোক্ষিত বৃথা-মাংস ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে” (অমৃতশাসন, ১১৫ অধ্যায়)। বলা বাহুল্য যে এইরূপ বিধানের পর হিন্দুধর্মে উপলক্ষ বা অজুহাতের কোন অভাব কেহ বোধ করেন নাই এবং কাহারও মাংস-ভোজনের বির ঘটে নাই। মহাভারতে জীবে দরা সম্বন্ধে যে প্রকাণ্ড বক্তৃতা দেখা যায়, রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করাতে তাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল—কিন্তু মহাভারতীয় নীতি লোকমতের দৃষ্টদর্শন স্বতন্ত্র; উহা যে পরবর্তী কালের জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অমূল্যত্ব হুচনা করে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিজয় কর্তৃক লঙ্কা অধিকার

“একল্য বাহার বিজয়-সেনানী

হেলায় লঙ্কা করিল জয়।”

—বিজয়কৃত্তিক।

এইবার আমরা ঐতিহাসিক যুগের নিকটে আসিয়া পড়িলাম। পৌরাণিক যুগের স্বপ্ন-কুহেলিকার উপরে পটক্ষেপ হইলে আমরা যে সকল দৃশ্যের সাক্ষাৎকার লাভ করি, তাহার প্রচ্ছদপটে ইতিহাসের অরুণালোক আসিয়া পড়িয়াছে।

যে সময়ে বুদ্ধদেবের নির্কাল লাভ হয় (খৃঃ পূঃ ৪৮০), তাহারই সন্নিহিত কোন সময়ে বঙ্গাদিপ সিংহবাহুর পুত্র বিজয় লঙ্কা দ্বীপে বাইয়া তাঁহার বহু স্তম্ভ ও অন্তরঙ্গ-সহ সেই দেশ জয় করিয়া উপনিবিষ্ট হন। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি এই দেশ বিদ্রোহের দেশ,

ইহা শাস্তিশিষ্টদের আবাসভূমি নহে। কালিদাস রঘুর দ্বিবিজয় উপলক্ষে লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশ জয় করিতে রঘুকে যেরূপ বাধা পাইতে হইয়াছিল, অল্প কোথাও তিনি এরূপ তুর্দান্ত শত্রুর সম্মুখীন হন নাই। বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বাহাকে আমরা পুরুষোত্তমের সিংহাসনে বসাইয়াছি, সেই চৈতন্যদেবও বাঙ্গলার শিষ্টশাস্ত সন্তান ছিলেন না, তিনি বাল্যকালে অতি ছরস্তুই ছিলেন।

এই বিদ্রোহের দেশে ঐতিহাসিক যুগের প্রথমাদে আমরা এক বিদ্রোহী রাজকুমারের দেখা পাই। রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, হে মাতঃ বঙ্গভূমি! তুমি তোমার সন্তানদের আর শাস্তিশিষ্ট করিয়া রাখিও না—তাহাদের গৃহহীন ছরছাড়া করিয়া দাও। রাজকুমার বিজয় বঙ্গমাতার সেইরূপ এক গৃহতাড়িত ছরছাড়া সন্তান ছিলেন। তিনি প্রজামণ্ডলীর নিকট অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং রাজবিদ্রোহী হইয়া নির্কাসিত হইয়াছিলেন। বিজয়ের অনতিপরে বৌদ্ধধর্ম লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছিল। পিতৃনাম স্মরণীয় করিবার জন্য সিংহবাহু-তনয় লঙ্কার নাম সিংহল রাখিয়াছিলেন, তদবধি সেই নাম চলিয়া আসিতেছে।

এই বিজয় কর্তৃক সিংহল-বিজয় বাঙ্গালীর ইতিহাসে একটা স্বরলীল ঘটনা। সমস্ত প্রাচীন পালিপুস্তকে বাঙ্গলার সিংহবাহু-তনয় বিজয়ের বিজয়গাথা কীর্তিত আছে।

আমরা মহানাম-কৃত মহাবংশ হইতে বিজয়-কৃত লঙ্কাজয়ের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই লঙ্কা-বিজয় বাঙ্গলার ইতিহাসের একটি অতীব গুরুতর ও গৌরবান্বিত ঘটনা। মহামহীকহেও যুগ ধরে, আমাদের এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠাতেও একটু যুগ ধরিয়াছে। সুতরাং বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।

দ্বীপবংশ, মহাবংশ, কুলবংশ প্রভৃতি সিংহলের বাবতীয় প্রাচীন ইতিহাসের মত এবং সিংহলের চিরন্তন সংস্কার—লঙ্কাজয়ী বিজয় বাঙ্গালী ছিলেন; এসম্বন্ধে যিনি সমস্ত ঘটনাটি অবগত, তাঁহার মনে কোন দ্বিধার ভাব থাকিতেই পারে না। এইজন্য সেই ঘটনাটির সম্পূর্ণ বিবৃতি আবশ্যক।

বঙ্গের রাজার সুসিমা নামী এক কন্যা ছিলেন (দ্বীপবংশ)। এই কন্যা যেমন সুন্দরী তেমনই স্বাধীন ও উজ্জ্বলপ্রবৃত্তি ছিলেন; রাজপ্রাসাদে তাঁহাকে তাঁহার চরিত্রের জন্য গল্পনা সহিতে হইত। সুসিমা তাহা সহ করিতে না পারিয়া একদা গোপনে প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

ইহা খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর ঘটনা; সুতরাং সেই সুদূরকালের সমস্ত ইতিহাসের জায় সিংহলের রাজধানী সিংহ-ইহাতেও কতকটা উপগম্ন মিশ্রিত আছে। এইরূপ উপগম্ন পুরের ভৌগোলিক সংস্থান। কেন হইল, তাহাও আমি পরে লিখিব।

যখন রাজকন্যা রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন, তখন একদল বণিক বঙ্গ হইতে মগধে যাইতেছিলেন, কুমারী তাঁহাদের সঙ্গে ধরিলেন। পথে রাঢ়দেশে এক সিংহ তাঁহাদিগকে তাড়া করিল। (সম্ভবতঃ সিংহউপাদিধারী কোন বর্বর দস্যবলপতি অর্থলুব্ধ হইয়া বণিকদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল।) বণিকেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিলেন, কিন্তু

রাজকুমারী কামাতুরা হইয়া তাহাকে ভজন করিলেন। সিংহের ঔরসে স্রসিমার দুইটি সন্তান জন্মিল। দ্বীপবংশ লিখিয়াছেন, ইহারা উভয়েই পরমসুন্দর ছিলেন। পুত্রের নাম সিংহবাহু এবং কন্যার নাম সিবলী। দ্বাদশবর্ষ সিংহের সঙ্গে বাস করিয়া (দ্বীপবংশ অনুসারে;—মহাবংশ অনুসারে দ্বাদশবর্ষ) রাজকুমারীর স্বামীর প্রতি অকুচি হইল, তিনি তাঁহার পুত্রকন্যা লইয়া উরুখাসে তাঁহার পিতৃরাজ্য বঙ্গের উপান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। এদিকে সিংহ সেইদিনই পলায়নপর দ্বীপপুত্রকন্যার সন্ধানে দ্রুত রওনা হইয়া বঙ্গের উপান্তে আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিল।

এখানে সিংহবাহু তাঁহার পিতাকে বধ করিয়া উত্তরাধিকার-স্বত্রে বঙ্গের রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন; (বেহেতু তাঁহার অপুত্রক মাতামহ বঙ্গেশ্বরের অল্প দিন পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল)। কিন্তু তাঁহার মাতা স্রসিমা বঙ্গেশ্বরের ভ্রাতৃপুত্রকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সুতরাং সিংহবাহু তাঁহার মাতামহের রাজ্য মাতার স্বামীকে ছাড়িয়া দিয়া যেখানে (অর্থাৎ বঙ্গ হইতে মগধের পথে রাত্ৰ দেশে) তিনি আশৈশব পালিত হইয়াছিলেন, সেইখানে “সিংহপুর” নামক রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।*

এই রাত্ৰ দেশের নামান্তর লাট, লাট, রাল প্রভৃতি। একাদশ শতাব্দীতে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয়ের শিলালিপিতে এই দেশকে “লাট” বলা হইয়াছে। মীনহাজ ইহাকে “রাল” এবং মহাবংশকার “লাট” নামে অভিহিত করিয়াছেন।

“সিংহপুর” রাঢ়ের অতি প্রাচীন রাজধানী। জৈন হরিবংশে পূর্ব-ভারতের দুইটি প্রধান নগর উল্লিখিত আছে, একটি গোড়, অপরটি সিংহপুর। বঙ্গীয় কুলজীওয়ের অনেক-গুলিতেই এই সিংহপুরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বল্লালসেন-কৃত বঙ্গীয় ২৭টি কুলস্থানের মধ্যে সিংহপুর অন্ততম। “সিংহপুরো মন্তপুরো মেঘনাদস্তথাপিচ। বাসার্থং প্রদত্তেন্দ্রোবল্লালেন মহীভুজা ॥”—বাচস্পতির কুলকারিকা। এই স্থানটি কাঁধি মহকুমা হইতে ৬ মাইল দক্ষিণপূর্বে এবং কাটোয়া হইতে ১৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে, অক্ষরেখার ২৩°৫৩' উত্তরে এবং দ্রাঘিমা রেখার ৮৮°৭' পূর্বে অবস্থিত।

ঐতিহাসিকগণ জানেন রাঢ় দেশের যে স্থানে সিংহপুর অবস্থিত, পুরাকালে উক্ত দেশের সেই অংশ (দক্ষিণাংশ) কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল। মহাবংশে উক্ত আছে সিংহবাহুর মাতামহ বঙ্গের রাজা কলিঙ্গের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ কলিঙ্গের সীমা তখন বঙ্গদেশের একপ্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়াছিল এবং উভয়রাজ্য পাশাপাশি ছিল। এককালে তমলুক কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল এবং কলিঙ্গরাজ এত পরাক্রান্ত ছিলেন যে অশোক এক লক্ষ সৈন্য ধ্বংস এবং বহু লক্ষ সৈন্য আহত করিয়া বহু কষ্টে কলিঙ্গ জয় করিতে পারিয়াছিলেন।

* “Sinhapur—Sinhapur in the district of Hugly in Bengal; it was founded by Sinhabahu, the father of Vijay who conquered and colonised Lanka. ...It is situated in Radha, the Lata of the Buddhists and Lade of the Jains.”—The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India by Nandalal De, M.A., B.L. Published by Luzac & Co., London, p. 186.

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কলিঙ্গ-যুদ্ধের মত একরূপ গুরুতর ঘটনা সেই পুরাতন যুগে বিরল। যতটা জানা যায়, তাহাতে মনে হয় তাম্রলিপ্তিই (তমলুক) কলিঙ্গের মুখপাত্র-স্বরূপ ছিল, এবং অশোকের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তাম্রলিপ্তির লোকেরাই সেই যুদ্ধের প্রধান নায়ক ছিলেন (পরিশিষ্টে 'মেদিনীপুর' দ্রষ্টব্য)। মেদিনীপুর জেলাটা তমলুকের অন্তর্গত ছিল; সেদিন পর্য্যন্তও (১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে) বর্তমানের অন্তর্গত বগড়ি পরগনা, হুগলীর অন্তর্গত কতকগুলি পরগনা এবং হিজলি জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছিল (যোগেশচন্দ্র বসুর মেদিনীপুরের ইতিহাস, ২৫ পৃঃ)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় জগমোহনের 'দেশাবলী-বিবৃতি' নামক যে সংস্কৃত ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে দৃষ্ট হয়, এক সময়ে বেহালা, বড়িষা, মঙ্গলচাঁট প্রভৃতি পল্লী পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছিল। রামপাল একাদশ শতাব্দীতে যে সামন্তচক্র রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অন্ততঃ তিনজন রাজা কলিঙ্গবাসী ছিলেন—দন্তভুক্তি, অপারমন্দার ও কোটাটবী। এই সকল ও অপরাপর প্রমাণ-দ্বারা নির্ণীত হয় যে, বর্তমানে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা রাজ্যের মধ্যে যে রাষ্ট্রীয় ব্যবচ্ছেদ-রেখা দৃষ্ট হয়, তাহা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে,—বিশেষ রাত্ দেশের অধিকাংশ এক সময়ে কলিঙ্গ-রাজ্যের কুক্ষিগত ছিল। সিংহবাহু যখন সিংহপুর স্থাপন করেন, তখন তিনি মাতামহের রাজ্য ত্যাগ করিয়া সিংহপুরে একটা স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার অনতিপরে সিংহপুর কলিঙ্গের অন্তর্গত হইয়াছিল এবং এককালে এই সিংহপুরের রাজারাই সমস্ত কলিঙ্গের অধীশ্বর বলিয়া শিলালিপিতে ঘোষণা করিতেন।* এক সময়ে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা একটা যুক্তরাজ্য ছিল, তাহা সেদিনকার কথা, কিন্তু তাই বলিয়া উড়িষ্যার লোককে বাঙ্গালী বলা যায় না, যদিও লাট সাহেবকে বঙ্গেশ্বরই বলা হইত। সেইরূপ প্রাচীনকালে সিংহপুর—কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত থাকিলেও অধিবাসিগণ বাঙ্গালী ছিলেন এবং তাহাদিগকে কখনই উড়িষ্যা বলা যাইতে পারে না। ১১৪২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরবাসী বাঙ্গালী সুপ্রসিদ্ধ অনন্তবর্ম্মা সমস্ত উড়িষ্যা জয় করিয়া গঙ্গাবংশের স্থাপন করেন; প্রায় ৫০০ বৎসর কাল অনন্তবর্ম্মার বংশধরগণ কলিঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া এদেশের সঙ্গে কলিঙ্গের রাজনৈতিক সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। রাত্দেশের এক প্রধান অংশ যে এককালে কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল, তাহার অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে; এমন কি “রাত্” নামেই ইহা কতকটা প্রমাণিত। “ট” অক্ষরটি উড়িষ্যার নিজস্ব, এই অক্ষরটি বাঙ্গলা শব্দে খুব অল্পই দৃষ্ট হয়। বিজয়ের সিংহপুর এখন সিঙ্গুর বা সিঙ্গুরগড় (সিংহপুরগড়) নামে পরিচিত।

প্রাচ্যবিজ্ঞানমহর্ষি নগেন্দ্রনাথ বসু, নন্দলাল দে এবং অধ্যাপক ডাঃ সহিহ্রা সাহেব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই সিঙ্গুরই যে প্রাচীন সিংহপুর তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। বঙ্গ হইতে মগধে

* “Kalinganagar, however, appears to have been the general name of the capitals of Kalinga which were different at different periods, as Nanipur, Rajāpara, Bhūbaneswar, Pistapur, Jaintapur, Simhapur and Mukhalinga.” G. Dictionary, N. De,—p. 85.

যাইতে হইলে রাঢ়দেশ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয় এবং মহাবংশের বর্ণনা পাঠ করিলে স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে যে, রাঢ়দেশের যে অংশে রাজকুমারী সিংহের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং যেখানে উত্তরকালে সিংহবাহু তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন, তাহা বঙ্গদেশের প্রান্তসীমায় ছিল। বনিকদের সঙ্গে কুমারী সুসিমা মগধে যাইবার পথে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া রাঢ়ে পৌছিলেন এবং সিংহ ও তাহার রাঢ়দেশের নিবাসস্থানে স্বীয় পুত্র, কন্যা এবং পত্নীকে না পাইয়া অমনই ছুটিয়া আসিয়া বঙ্গদেশে অত্যাচার করিতে লাগিল,—এই সকল বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, রাঢ়দেশের সেই স্থানটি এবং বঙ্গদেশের প্রান্তসীমা অতি নিকটবর্তী ছিল। বঙ্গ ও মগধ এই দুই রাজ্যের মধ্যে রাঢ় দেশ—এবং দক্ষিণ-রাঢ়েই সিংহপুর। আমরা পরে বিব্রঙ্কমতাবলম্বীদের মতের সমালোচনা করিব, এইজন্ত সিংহপুরের ভৌগোলিক সংস্থান-সম্বন্ধে এতগুলি কথা লিখিলাম।

বিজয় পিতা কর্তৃক দত্তিত হইয়া একটা জাহাজের বহর লইয়া নির্ধাসিত হইলেন। দ্বীপ-বংশে লিখিত আছে, রাজা সিংহবাহু বিজয়কে এই ভাবের দণ্ড দিয়াছিলেন,—“এই বালককে (বিজয়কে) এ রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দাও—ইহার সমস্ত দাস, দাসী, মজুর, সহচর ও তাহাদের স্ত্রীপুত্র কেহ যেন আর এ দেশে না থাকে। জাহাজে ভাসিতে ভাসিতে ইহারা যেখানে ইচ্ছা বাউক, আর যেন ইহারা স্বদেশে মুখ দেখাইতে বা বাস করিতে না আসে।” মহাবংশের বিবরণের সমস্তটার অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে, রাজা সিংহবাহু বিজয় ও তাঁহার সাতশত সহচরের অর্ধ-মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বীপবংশে এই মস্তক-মুণ্ডনের উল্লেখ নাই। মহাবংশ পরবর্তী গ্রন্থ, মনে হয় ইহার লেখক একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, পরিকর-পরিবৃত হইয়া শিশুমণ্ডলী যে জাহাজে উঠিয়াছিলেন, তাহা ঝটিকা-তাড়িত হইয়া নিবন্ধেশ হইয়া গেল। সেই জাহাজের আরোহিণী “নগদ্বীপে” উপনিবিষ্ট হইল। (“The ship in which the children had embarked was hopelessly driven to an island named Naggadwip.”—Dwipavamsa.) ক্রমশঃ ঝটিকা-তাড়িত হইয়া স্ত্রীলোকের জাহাজও বিজয়ের জাহাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বদূর এক দ্বীপে আশ্রয় লইল,—তাহার নাম মহিলা-রাষ্ট্র, মহাবংশ-অনুসারে ‘মহিলা-দ্বীপ’।

দ্বীপবংশে লিখিত হইয়াছে—ঝটিকা-তাড়িত হইয়া সপরিকর বিজয়ের জাহাজ অতি দুর্দশাগ্রস্ত হইল—তাহার বহাদি বিকল হইল, এবং পথ হারাইয়া কোনক্রমে তাঁহারা সুপুরা বন্দরে উপস্থিত হইলেন। মহাবংশ ও দ্বীপবংশের বর্ণনা এ বিষয়ে একরূপ। এখন আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব নগদ্বীপ এবং মহিলারাষ্ট্র বা মহিলাদ্বীপ কোথায়। সুপুরা বন্দর হইতে ইহারা ভরকক্ষে যাইয়া তিনমাস বাস করিয়াছিলেন (দ্বীপবংশ), এখানে অধিবাসিগণ ইহাদিগকে বিস্তর ভয়তাপ ও সৌজন্ত-দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা মদ খাইয়া তথাকার স্ত্রীলোকদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার ও হঠকারিতা করিয়া সর্বসাধারণের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। তথাকার লোকেরা একত্র হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, “এই ছরাদ্বীপ-দিগকে (rascals) হত্যা করা হউক” (দ্বীপবংশ); মহাবংশ লিখিয়াছেন—বিজয়ের নিজ

সহচরেরাও অবাধ্য হইয়া নানারূপ অত্যাচার করাতে বিজয় সেই স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মনে হয়, এই কথায় একটা ইঙ্গিত আছে যে, বিজয়ের সঙ্গে তাঁহার বিদ্রোহী অমুচরবর্গের মনোমালিখ ঘটাতে একদল সেইখানে রহিয়া গিয়াছিল; এতৎসম্বন্ধে কতকগুলি কথা পরে লিখিব।

বিজয় এখানেও আবার ভয়ানক ঝটিকার মুখে পড়িলেন, সেই ঝড়ে জাহাজ বিপর্যস্ত হইয়া দক্ষিণমুখে বাইতে বাইতে লঙ্কায় উপস্থিত হইল।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন বঙ্গোপসাগরের পূর্ব উপকূলে ‘জাকু’ নামক যে দ্বীপ দৃষ্ট হয় (সিংহলের উত্তরে) উহাই নগদ্বীপ। এইরূপ অনুমান করিবার হেতু এই যে, সিংহলের উত্তরে ভারতসমুদ্রের পূর্ব উপকূলে সেই সময়ে নগদ্বীপ নামে একটি দ্বীপ ছিল, তথায় বুদ্ধদেব একবার গিয়াছিলেন বলিয়া মহাবংশে উল্লিখিত আছে। সুতরাং যখন নগদ্বীপ পাওয়া যায় না, অথচ সিংহলের উত্তরে ‘জাকু’ নামক দ্বীপ পাওয়া বাইতেছে—বুদ্ধদেব-সংশ্লিষ্ট ঐ দ্বীপেরই পূর্ব নাম নগদ্বীপ বা নগদ্বীপ থাকা সম্ভব।

কিন্তু আমার মনে হয় মহাবংশ ও দ্বীপবংশোক্ত নগদ্বীপ খুবসম্ভব পূর্ব উপকূলের ‘নেগাপত্তম’। এই বন্দর তাঞ্জোরের নিকটবর্তী। ইহা অতি প্রাচীন স্থান; খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এই স্থান বৌদ্ধদিগের একটি প্রাচীন তীর্থস্থান ছিল। তাহারও বহুপূর্বে এই বন্দর বিখ্যাত ছিল। ঐতিহাসিক James Burgess সাহেব তাঁহার History of Indian Architecture (১ম খণ্ড, ২০৬ পৃ., ১৯১০) পুস্তকে লিখিয়াছেন,—“কাবেরীর তটভাগে নেগাপত্তম তাঞ্জোরের সর্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এই বন্দর মাত্রাম হইতে ১৭৩ মাইল

দূরে অবস্থিত এবং বৌদ্ধগণের একটি প্রধান তীর্থ। ১০০৬ খৃষ্টাব্দে নগদ্বীপ ও মহিলাদ্বীপ।

প্রথম রাজেন্দ্র চোলের প্রদত্ত ভূমিতে কিন্দারাম অথবা কথ্য-প্রদেশের (সম্ভবতঃ দক্ষিণ-ব্রহ্মদেশ অথবা শ্রামের অন্তর্গত) রাজা চড়ামণ বর্ম্মা (চুলামন) কর্তৃক এখানে একটি বৌদ্ধতূপ নির্মিত হইয়াছিল। ইহার পরে কুলতুঙ্গ চোল ১০২০ খৃষ্টাব্দে এখানে অন্ততঃ দুইটি মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মদেশীয় একটি অনুশাসন হইতে জানা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতেও পেগুদেশ হইতে বৌদ্ধ যাত্রীরা নেগাপত্তমে যাত্রারাত করিতেন।” বারজেস সাহেব তথাকার আর একটি সুপ্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার উচ্চতা ছিল ৭০ ফিট। এই মন্দির নেগাপত্তম হইতে মাত্র এক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে যেস্ট পাদ্রীরা উহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। বৌদ্ধ রাজগণ যেখানে মঠ-মন্দির নির্মাণ করাইতেন, তাহা প্রায়ই বুদ্ধের অমুচর কিংবা সুপ্রাচীন জগন্নাথ কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুর সমাধির উপর স্থাপিত হইত। এই ভাবে নালন্দা বিহার ও তথাকার মঠ-মন্দিরাদি বুদ্ধদেবের প্রসিদ্ধ জনৈক শিষ্যের সমাধি উপলক্ষ করিয়া নির্মিত হইয়াছিল। দশম-একাদশ শতাব্দীতে নেগাপত্তমে যে সকল কীর্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সম্ভবতঃ আদিযুগের কোন শ্রমণের সমাধির স্মারক, নতুবা রাজারা সেখানে এতগুলি মন্দির ও তূপ রচনা করিবে কেন, এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতেও পেগু প্রভৃতি দূরতর দেশ হইতে এখানে

যাত্রীর সমাগম হইবে কেন? এই সকল কারণে নেগাপত্তম্ যে অতি প্রাচীন স্থান, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

কোন কোন পণ্ডিত মনে করিয়াছেন, পশ্চিম উপকূলের মালদ্বীপই বৌদ্ধ গ্রন্থোক্ত "মহিলা-দ্বীপ।" এখানেও আমার মনে হয়, পশ্চিম উপকূলের মহি বন্দরই এই মহিলা-দ্বীপ,— ইহা মহিদ্বীপ বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল (ওয়েবস্টার অভিধানের ভৌগোলিক পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)। এই মহিদ্বীপ খুব প্রসিদ্ধ স্থান,—ইহা এককালে ফরাসীদিগের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল।

কিন্তু এই উভয়মতের যেটাই গৃহীত হউক না কেন, মূল সিদ্ধান্তের কোন ব্যতিক্রম হইবে না। যেহেতু জাফা ও নেগাপত্তম্ উভয়ই ভারতের পূর্ব উপকূলে এবং মালদ্বীপ ও মহিদ্বীপ সেইরূপ পশ্চিম উপকূলে। বিজয় সিংহপুর ছাড়িয়া খুব সম্ভব তমলুক হইয়া দক্ষিণ মুখে বাত্মা করিলেন। পূর্ব উপকূলে একদল রহিয়া গেলেন, পশ্চিম উপকূলেও বিপদে পড়িয়া আর একদল পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন, কিন্তু মহাপরাক্রান্ত বীর বিজয় ও তাঁহার হৃদ্যন্ত সহচরেরা সুপ্রসিক (আধুনিক সোপরা, থানা জেলার অন্তর্গত বোম্বাইএর উত্তরে) হইয়া ভরকচ্ছ নগরে (আধুনিক ব্রোয়াচ্) উপস্থিত হইলেন; তথা হইতে মানবিক এবং দৈব উভয় শক্তি-দ্বারা বিপর্যস্ত হইয়া অনাহার ও নানা লাঞ্ছনা সহ করিয়া সিংহলে পৌঁছিলেন।

এই সহজ সরল সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিবার কোনই কারণ নাই। বস্তুতঃ অট্টো ফ্রাঙ্কি (Otto Franke), বার্নাউফ (Burnouf) প্রভৃতি বহুবিধ জগন্মাত্র পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত এই সহজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রায় সমস্ত ভারতীয় পণ্ডিতগণ ও সিংহলবাসীরা ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সিংহলের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপাল, সিদ্ধার্থ, ভিক্টু পি. বজরাননন্ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহলীভাষার অধ্যাপক শীলানন্দ আমাকে জানাইয়াছেন যে, * সিংহলী বৌদ্ধগণের চিরাগত বিশ্বাস যে, তাঁহারা বাঙ্গালী; কত শত শতাব্দী পরেও সিংহলীদের সঙ্গে বাঙ্গালীদের চেহারার যে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহা অতি আশ্চর্য্য, মিথিলা, আসাম ও বিহার-বাসীদের সঙ্গেও আমাদের ততটা সাদৃশ্য নাই। সিংহলী ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালী ভাষার অতি

* "We have the long-standing tradition that Vijay came to Ceylon from Bengal and founded an empire here in the 6th century B. C. This tradition is of hoary antiquity and has come down to us from remote generations. This belief is confirmed by the evidence of Mahavamsa, Dipavamsa, and other works and is supported by the striking resemblance between the features and appearance of the Bengalis and the Buddhist population of Ceylon, no less by the great similarity between the Bengali and Ceylonese dialects. The Ceylonese women wear *sari* just like Bengali ladies. Last year when some Sinhalese women came to Calcutta, I had at first mistaken them for Bengali women. Similarly if Sinhalese women would pass by the streets of a Bengali town, the Bengalis would mistake them for their own people. I have heard the Bengalis say that the Sinhalese people speak Bengali exactly like Bengalis, whereas their immediate neighbours—the Biharis and other people who sometimes spend their whole life in Bengal, cannot speak Bengali except with a peculiarly non-Bengali accent." P. Shilananda, Buddhist Priest and Professor of Sinhalese, Calcutta University.

নিকট সম্বন্ধ, তাহা পরে লিখিব। বস্তুতঃ ধর্মপাল, রেভারেণ্ড সিদ্ধার্থ, রেভারেণ্ড শীলানন্দ প্রভৃতি বস্তুজন বুদ্ধ ভিক্ষুকে আমরা দেখিয়াছি, প্রত্যেকের চেহারা অবিকল বাঙ্গালীর মত। আমরা কয়েক স্থলে দেখিয়াছি, বাঙ্গালীরা কোন কোন সিংহলীর সহিত বাঙ্গালায় কথা কহিতে আরম্ভ করিয়া শেষে বিজয়ের সহিত আধিকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা ভিন্ন দেশবাসী,—বাঙ্গালা বুঝেন না। গত ১৫ই এপ্রিল তারিখে (১৯৩৩) নয়া দিল্লীতে সিংহল গভর্নমেন্টের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত পেরিসুন্দরম এক বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালী বিজয় যে সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া গর্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৯৩৩, ১৭ই এপ্রিলের 'লিবার্টি' দ্রষ্টব্য)।

সুপারিক ও ভরকচ্ছ—এই দুইটি স্থান দক্ষিণ-গুজরাটের সন্নিহিত। গুজরাটের দক্ষিণাংশকে গ্রীকগণ লাট বা লারিকা নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই স্থানে কয়েকজন পণ্ডিত সম্প্রতি এই মত প্রচার করিতেছেন যে, সিংহবাহু বাঙ্গালী মায়ের পুত্র বটেন, কিন্তু তিনি গুজরাটের দক্ষিণে প্রাচীন লাট নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

নানাকারণে বাঙ্গালাদেশের প্রতি বাহিরের মনোভাবের পরিবর্তন হইয়াছে। বাহারা বিজ্ঞানসম্মত নিয়মে ইতিহাসের চর্চা করিয়া থাকেন, আশ্চর্যের বিষয় তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন অবৌদ্ধিক ও অদ্ভুত একটা মত প্রচার করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের সেক্সপীয়রের এই কয়েকটি কথা মনে পড়া স্বাভাবিক—“যিনি আমার ধনরত্ন হরণ করেন, তিনি কিছুই হরণ করেন না। তিনি যাহা লইয়া যান, তাহা আজ আমার, কাল অপরের। কিন্তু যিনি আমার সুনাম হরণ করেন, তিনি এমন একটি জিনিষ হরণ করেন, যাহাতে তাঁহার কোনই লাভ হয় না, অথচ আমি প্রকৃতই দরিদ্র হইয়া পড়ি” (ওথেলো)। বঙ্গের ইতিহাসে বিজয়ের সিংহল-জয় তেমনিই বাঙ্গালীর একটি বড় সুনামের বিষয়।

বঙ্গের রাজকুমারী চলিয়াছেন, বঙ্গ হইতে মগধে—মগধেই রাঢ় দেশ, সেই দেশেই তৎপুত্র সিংহবাহু রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। এই বঙ্গদেশ (সমতট) এখনও আছে, তন্নিকটবর্তী রাঢ় দেশ এবং তাহা উত্তীর্ণ হইয়া মগধে এখনও বাইতে হয়। ইহা ছাড়া ভারতবিশ্বত সুপ্রাচীন সিংহপুর বঙ্গের উপকণ্ঠে রাঢ় দেশে এখনও বিদ্যমান।* সুতরাং এই বিবরণে ভৌগোলিক জটিলতা কিছুমাত্র নাই। যদি মানিয়াও লওয়া হয় যে, গুজরাটের দক্ষিণাংশ এককালে লাট বা লারিকা নামে উক্ত হইত—তবেও কি বলিতে হইবে বঙ্গ হইতে মগধে বাইতে গুজরাটের সেই লাট দেশ পথে পড়ে? বঙ্গের সীমান্ত ছাড়িয়াই

* Radha—that part of Bengal which lies to the west of Bengal including Tamruk, Midnapur and the districts of Hugli and Burdwan. A portion of the district of Murahidabad was included in its northern boundary. It was the native country of Vijay who conquered Ceylon with seven hundred followers (Uphams 'Rajabali,' Pt. I, Raj-Tarangini, Chap. II, Mahavamsa, Chaps. 6, 47). It is the Lāla of the Buddhists and Lāḍa of the Jains It should be stated here that Radha is a corruption of Rashtra and an abbreviation of Gangarashtra or Gangarada—the Gangaride of Megasthenes.—“Geographical Dictionary,” pp. 64-65.

রাঢ় দেশ—মগধের পথে রাজকুমারী সেই স্থানে উপনীত হইলেন। এ অবস্থায় গুজরাটের কথা উদয় হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? সিংহ রাঢ়ের সীমা ছাড়িয়াই বঙ্গে আসিয়া অচিরে উপস্থিত হইল—এখানে গুজরাটের কথা কি করিয়া উঠিতে পারে? তারপরে বিজয় সিংহপুর ছাড়িয়া দক্ষিণ মুখে চলিলেন, প্রথম নগরীপ—পূর্ব উপকূলে, দ্বিতীয় মহিলাদীপ—পশ্চিম উপকূলে সর্বশেষ সুপ্ররিকা বন্দরে। সমুদ্রযাত্রার পর পর ভৌগোলিক নির্দেশ এই ভাবে পাওয়া গেল, অর্থাৎ ইহারা পূর্ব উপকূল হইতে রওনা হইয়া পশ্চিম উপকূলের দিকে চলিয়াছিলেন। কিন্তু যদি গুজরাট হইতে বিজয় রওনা হইতেন তবে উন্টা রাজার রাজ্য দিয়া তাঁহাকে গমন করিতে হইত,—প্রথমই সুপ্ররিকা বন্দরের নাম থাকিত। কিন্তু বুদ্ধগ্ধে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে, বহু পর্যটন এবং দুই বিভিন্ন স্থানে তাঁহার সঙ্গীদিগকে ফেলিয়া আসিয়া সর্বশেষে তিনি সুপ্ররিকে পৌছিয়াছিলেন।

এদিকে সে সময়ে দক্ষিণ-গুজরাটের নাম লাট থাকিলেও সেখানে সিংহপুর কোথায়? সেই দেশে সিংহপুর রাজধানী বা তৎসংক্রান্ত কোন সংস্কারের চিহ্নমাত্র নাই। পশ্চিমোত্তরে এক সিংহপুর আছে—এই সিংহপুর (Salt Range) বঙ্গ হইতে ১৩০০ মাইল দূরে—তক্ষশীলার নিকট ও বিতস্তা নদীর তীরবর্তী। এখানে বঙ্গের রাজকুমারী অবশ্য হাটিয়া আসিতে পারেন নাই; এই সুপ্ররিকা বন্দরও পূর্বোক্ত সিংহপুর হইতে ২০০ মাইল দূরে অবস্থিত, সেখান হইতেও সিংহবাহু সুপ্ররিকে আসেন নাই। প্রতিবাদীরাও এই সিংহপুর বিজয়ের জন্মভূমি বলিতে সাহসী হন নাই। তাঁহারা গুজরাটের মানচিত্র হাতড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, কাথিওয়ারে যে সিংহর নামক স্থান আছে, তাহাই হয়ত সিংহপুর। কিন্তু বঙ্গ দেশ হইতে বিজয়কে এতটা দূরে লইয়া যাইবার হেতু কি? বঙ্গ দেশের উপান্তে রাঢ় দেশ, তথায় বহু প্রাচীন সিংহপুর—এবং ভারতের পূর্ব উপকূলে নগরীপ, পশ্চিম উপকূলে মহিলাদীপ, তৎপরে সুপ্ররিকা—পর পর সমস্তই আছে, এই সাজানো বাগান ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নিতান্ত অসতর্ক এবং অযৌক্তিক মত প্রচারের কারণ কি? কবির গানটি মনে পড়ে,—“আঁচলে মানিক বেঁধে, কেঁদে কেঁদে, আঁধার-পথে খুঁজতে গেলি।”

প্রতিবাদীদের অগ্রণী বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ই. জে. র্যাপসন তাঁহার সম্পাদিত অক্সফোর্ড *Early History of India* পুস্তকে এরূপ অসম্ভব কথা লিখিলেন কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তিনি মনের কথা সরল সহজ ভাবে না লিখিয়া অতিশয় দ্বিধার সহিত যাহা লিখিয়াছেন তাহা অসংবদ্ধ ও পরস্পর-বিরোধী। তিনি লিখিয়াছেন, “The Mahavamsa seems to locate Lala in Magadh.”* “মহাবংশের লেখা পড়িলে মনে হয় যেন লাল দেশ মগধের অন্তর্গত।” তাই যদি হবে, তবে তিনি বিজয়কে গুজরাটের লাট দেশবাসী মনে করেন কেন? মহাবংশে যাহা বলা হইয়াছে, দ্বীপবংশ এবং কুলবংশেও তাহাই আছে, সিংহলের

* মহাবংশে অতি পরিষ্কার ভাবে লিখিত আছে যে, বঙ্গ হইতে মগধে যাইতে পথে রাঢ় দেশ। কিন্তু র্যাপসন কেন লিখিলেন, মহাবংশ পড়িলে মনে হয় রাঢ় দেশ মগধের অন্তর্গত? বাঙ্গলা দেশে যে অতি প্রাচীন ভূখণ্ড রাঢ় নামে চিরবিদ্যমান, তাহা কি তিনি জানেন না? বাঙ্গলার নাম করিতে তাঁহার কৃত্যের কারণ কি?

সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থের ঐ একই স্বর। তবে তিনি কোন্ প্রমাণ-বলে বিজয়কে গুজরাটবাসী বলিতে চান? এই সকল প্রাচীন পুস্তকের সরল অর্থ তিনি বুঝিয়াও লিখিয়াছেন, “লাট দেশের সিংহপুর সম্ভবতঃ কাথিওয়ারের সিহোর।” বিজয়ই সর্ববাদিসম্মতরূপে সিংহলে সর্বপ্রথম আর্যোপনিবেশ স্থাপন করেন। যদি তিনি সত্যি কাথিওয়ারের অধিবাসী হইবেন, তবে কি করিয়া রূপসন আবার লিখিলেন—“The first stream of emigration to Ceylon came from Orissa and perhaps from South Bengal.” তাঁহার মতে কাথিওয়ার হইতে প্রথম অভিযান গেল, অথচ পুনরায় দক্ষিণ-বঙ্গ দেশ হইতে বিজয় গিয়াছিলেন—এরূপ পরস্পর-বিরোধী একটা ইঙ্গিত তিনি কি করিয়া দিলেন? ইহার মত একান্ত দ্বিধা-যুক্ত, এবং “শ্রাম রাখি, কি কুল রাখি”—গোছের।

বিজয় যে বাঙ্গালী তাহার আর একটা অকাটা প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণের পর আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না।

সিংহলের রাজা নিঃশঙ্ক মল্লের শিলালিপিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ইনি বিজয়ের বংশে উদ্ভূত। Epigraphica Zeylanica-র দ্বিতীয় খণ্ডে এই লিপি প্রকাশিত হইয়াছে। এই রাজা সিংহপুরে জন্মগ্রহণ করেন। যে বংশের বিজয় সিংহলে পদার্পণ করেন—সেই সময় হইতে ১৭০০ বৎসর পরে নিঃশঙ্ক মল্ল ভূমিষ্ঠ হন, তাহা হইলে ইহার জন্ম-তারিখ হইল ১২১৭ খৃঃ। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি হগলী জেলার অধিকাংশ এক সময়ে কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল এবং রাঢ় দেশের কতকাংশ পর্য্যন্ত কলিঙ্গ-রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আমরা আরও জানিতে পারিয়াছি যে, এক সময়ে সিংহপুর অতি প্রধান ও প্রবল-পরাক্রান্ত নগর ছিল। গৌড় দেশের ছোট ছোট রাজারা বেরূপ “পঞ্চগৌড়েশ্বর” উপাধি গ্রহণ করিতেন, মেদিনীপুর ও সিংহপুরের রাজারাও সেইরূপ “কলিঙ্গেশ্বর” উপাধি গ্রহণ করিতেন, সিংহপুরের অভ্যুজ্জল সময়ে ইহারা কলিঙ্গের রাজগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। তমলুকের রাজা ১১৪২ খৃষ্টাব্দে সমস্ত উড়িষ্যা জয় করিয়া গঙ্গাবংশকে তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন—ইহার নাম অনন্তবর্মা, ইনি বাঙ্গালী ও ক্ষত্রিয়, সম্ভবতঃ ইহারা সিংহপুরের রাজাদের জ্ঞাতী ছিলেন। প্রায় ৫০০ বৎসর কাল কলিঙ্গদেশ বাঙ্গালীর শাসনাধীন ছিল। পরবর্তী সময়ে সিংহপুর-রাজ্য হীনশ্রী হইয়াও “উত্তরে হারকানদী, পূর্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে অজয়নদ এবং পশ্চিমে ময়ূরাক্ষিনদ এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন প্রায় ২৮০ বর্গমাইল ব্যাপক কুদ্ররাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। সিংহপুরের তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে জয়বান বা জবান গ্রাম। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতেই এই দুই গ্রামের মধ্যে অল্পতম জয়বানের ১,৫৭০ স্বর্ণমুদ্রা বৎসর বৎসর রাজস্ব দিতে হইত, সুতরাং ইহাদের রাজ্যের আয়তন সেই সময়ের মাপকাঠিতে বিচার করিলেও একটা প্রকাণ্ড ভূভাগ ছিল। (নগেন্দ্রনাথ বসুর জাতীয় ইতিহাস—রাজত্ব কাণ্ড, ১৩৭ পৃঃ।)

সিংহলের রাজারা চিরকালই সিংহপুরের বলিয়া গর্ব করিতেন, এবং তাঁহারা একদা কলিঙ্গেশ্বর “উপাধি” ধারণ করিয়া সমস্ত সিংহল দেশটা কলিঙ্গেশ্বর সিংহপুর-পতির অধীন বলিয়া ঘোষণা করিতেন। এখন আমরা নিঃশঙ্ক মল্লের লিপি হইতে কতকটা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"When one thousand seven hundred years had elapsed since this King (Vijoy), protected by the Gods in accordance with the behest of the Buddha, arrived in the island of Lanka, and destroying the *yakṣas* made in an abode for mankind, there was born the great king Siri Saṅgaba Kalinga Parakrama Bahu Viraraj Nissanka Malla Aprati Malla in *Simhapur in the country of Kalinga* in role Jambudiva, the birthplace of the Buddhas, Bodhisattas and Universal monarchs, (he was born) of the womb of the great queen Parvati unto King Joygopa who was like unto a *tilak* ornament to this royal line (of the Okkaka * dynasty). He grew up in the midst of royal splendour and being invited by the great king of the island Lanka, his senior kinsman, to rule over the island of Lanka which was his by the right of lineal succession of kings, he landed in great state in Lanka. Enjoying (thereafter) the royal dignities of governor and subking and being proficient in all arts of sciences, he in due order of regal succession received the sacred unction and wearing the crown assumed supreme sovereignty.—"Epigraphica Zeylanica," Vol. II.

এই লিপির সারমর্ম এই যে রাজা নিঃশঙ্ক মল্ল সিংহপুরের বিজয়ের বংশোদ্ভব। এই স্থানের রাজারা "কলিঙ্গেশ্বর" উপাধি ধারণ করিতেন এবং ইহা কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল। ইনি বিজয়ের সিংহলে পৌঁছিবাব ১৭০০ বৎসর পরে সিংহপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সেই বংশোদ্ভব কোন সিংহলরাজ তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী না পাইয়া তাঁহাদের মূলস্থান সিংহপুরের এক জাতিকে আনাইয়া রাজ্যটি তাঁহাকে প্রদান করেন। উত্তরাধিকারহস্ত্রে সিংহপুরের রাজবংশের দাবী সিংহলের সিংহাসনে অগ্রগণ্য ছিল।

দক্ষিণ-রাঢ় যে কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল, তাহা সর্বসন্দেহহীন; সিংহপুর অতি প্রাচীন ও প্রধান নগর এবং কলিঙ্গভুক্ত ছিল, তাহাতে কোন দ্বিধা নাই। এমন অবস্থায় এই লিপির প্রমাণ অকাট্য।†

এখন বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে সিংহলী ভাষার যে নিকট-সম্বন্ধ তাহা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। এ সম্বন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ মহম্মদ সহিহুল্লা সাহেব এম্. এ., ডি. লিট্. আমাদের লিখিয়া জানাইয়াছেন, "I have tried to show in an article that the Singhalese language has the greatest affinity with the language of the Eastern inscriptions of Asoka and must have been derived from the ancient language of Raḍha. According to the description of

* Ikṣaku.

† ভৌদ্রবর্মার তাম্রশাসনে দুই বার—এই বংশ "নগেন্দ্রবর্মার জহাভুল্য" সিংহপুর রাজধানী হইতে আগত হইয়াছিলেন; সিংহপুর তখন কলিঙ্গের অন্তর্গত। পূর্ববঙ্গ অধিকার করিয়া এই বংশ-বংশ কলিঙ্গ, অঙ্গদেশ, বিকোলের রাজধানী গোপেশ্বর প্রভৃতি নিকটবর্তী প্রদেশগুলি জয় করিয়াছিলেন (ভৌদ্রবর্মার বেলাভা তাম্রশাসন স্তম্ভা)।

the Mahavamsa Lāta the motherland of Bijay was situated between Vanga and Magadha. So it cannot but be the Raḍha which has been called Laḍha in the Jain books and in the Tirumalai inscriptions of Rajendra Chola."

["আমি একটি প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সিংহলী ভাষার সঙ্গে অশোকের পূর্বভারতের লিপি-ব্যবহৃত ভাষার ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। ঐ ভাষা নিশ্চয়ই রাঢ় দেশের প্রাচীন ভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মহাবংশের বর্ণনানুসারে বিজয়ের মাতৃভূমি মগধ ও বঙ্গের মধ্যবর্তী কোন স্থানে অবস্থিত ছিল, সুতরাং ইহা জৈনপুস্তকে এবং রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয়ের শিলালিপিতে যে দেশকে 'লাট্' বলা হইয়া থাকে সেই দেশ, অর্থাৎ 'রাঢ়' ভিন্ন আর কিছু হইতেই পারে না।"] সহিষ্ণু সাহেব যে প্রবন্ধের কথা বলিয়াছেন, আমি তাহা দেখি নাই।

শব্দ-সাদৃশ্য

বাঙ্গলা	সিংহলী	বাঙ্গলা	সিংহলী
বাতাস, বাত	বাতায়	পিঠ, পিট	পিট
শীত (পূর্ববঙ্গে হিত)	সিত, হিত	স্তন	তন
বর্ষা	বার	উরু	উর
ফেনা, ফেন	পেন	হাড়, হাড়ি	এ্যাটে
মাটি	ম্যাটি	দাত	দাত
লোম	লোম	জিভ, জিব	দিব
মাকড়সা	মাকুলুবা	পুস্তক, পৌধা, পোত	পোত
ভিটা বা ভিটি, ভিত	* বিত্ত	জল	দল
আম্র, আম	আম্ব	সুপ্	সুপ
আতা	আতা	গুয়া (গুবাক)	পুয়া, পুয়াক
সাদা	সুহ	পেপে	পেপল
রাতা, রাতু (রক্তবর্ণ)	রাহু	কেশ	কেশ

* দৃষ্ট হইবে যে, পূর্ববঙ্গের অনুরূপ সিংহলী ভাষায় "ভ"-স্থানে অনেক সময় "ব" ব্যবহৃত হয়, যথা—বাঙ্গলা "ভাত" শব্দ সিংহলীতে "বাত"; পূর্ববঙ্গেও ঐ "বাত" প্রচলিত। সিংহলীর "অ"-কার ঠিক বাঙ্গলা অকারের মত নহে; উহা বরাং বাঙ্গলার "আ"-কারেরই বেশী সন্নিহিত। সিংহলী "অ"-এর উচ্চারণ অর্ধবীর্ণ, কতকটা ইংরেজী ah-এর মত। এ দৃষ্ট আমি তাঁহাদের "অ"-কারের স্থলে বাঙ্গলায় "আ"-কার ব্যবহার করিলাম।

বাঙ্গলা	সিংহলী	বাঙ্গলা	সিংহলী
কাণ	কাণ	দেব	দেউ, দেব
ছিদ্র	সিহুর	ধর্ম	ধাহ্ম
মুখ	মুহল	হাওয়া	ওয়া
হাত	আত	লোহা	লোহ
বাহ	বাহ	উত্তর	উত্তুর
গাছ	গাস	দক্ষিণ, দখিণ	দকুন
বিবাদ	বাদ	সাত	হাত
প্রহার	পহার	আট	আট
নদী, গাঙ্গ	গাঙ্গ	মাছুর	প্যাছুরা
সাগর, সাগুর	সাগুর	স্থখ	স্থক
বিল	বিল	ছাখ	ছক
গ্রাম	গাম	জাল	জাল
তৈল, তেল	তেল	চাল	চাল, হাল
উকুন	উকুনা	তিন	তুন
স্নান করা, নাওয়া	নানওয়া	ভাত	ভাত, বাত
নিদ্রা যাওয়া, নিদ যাওয়া	নিদনওয়া	সর	সর
বাধ	বাণ	কাঁস	পাস
উত্তম	উত্তুম	সোত বা হোত	হোয়া
চোর, চোরা	চোর, হরা	সমুদ্র	সমুদ্র
লাঙ্গল (নাঙ্গল)	নাঙল	পোষ	পোবন
বাগ	বগ	চৈত্য	চৈত
বিড়াল	বলালা	মাছুর	মিনিহা
ইন্দুর	উন্দুর	(পূর্ববঙ্গে “মাছুর” ও পশ্চিমবঙ্গে “মিন্‌সে”)	
মাছি, মশা	ম্যাম্মা	পুত্র, পুত	পুতা
কুকুর	কুকুর	মামা	মামা
হাস	হানসয়া	লো (রক্ত)	লে
ময়না	ময়িনা	কোথায়	কোহান, কোহেন
আঁক (ইকু)	উক	গৃহ	গে
কাল	কালু	চন্দ্র, চাঁদ	ছান্দ, হান্দ
নীল	নীল	মা	মাও
চিনি	সিনি (উচ্চারণ ‘ছিনি’)	হাড়ি	হাট্টি

বাঙ্গলা	সিংহলী	বাঙ্গলা	সিংহলী
ব্রাহ্মণ	বামুনা, বাবুনা	কাসি	কাস, কাস
নাদা	লাডা	পিঠা	পিট
চাতাল	ছান্দাল	লবণ, লুন	লুন
আমি	আম্মা	বদনা	বদিনা
মটকি	মুটি	শালিধান বা চাউল	হাল
পাতিল (Cooking pot)	এ্যাতিলি	বদনা	উহুনা
নাও (নৌকা)	ভাও	কঞ্চল	কঞ্চলিয়

সিংহলী শব্দের মধ্যে কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত ও পর্তুগীজ হইতে গৃহীত, কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলা শব্দ, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের কথিত শব্দের সঙ্গে সিংহলী শব্দের খুব মিল দেখা যায়। এক্ষণ তালিকা খুব দীর্ঘ করা যায়। অবশ্য ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলির সঙ্গে পরস্পরের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সুতরাং অপর কোন প্রাদেশিক ভাষায় এইরূপ শব্দ-সাদৃশ্য খুঁজিয়া কতক পরিমাণে বাহির করা যাইতে পারে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের ভাষার সঙ্গে সিংহলীর সম্বন্ধ অত্যধিক; অপর কোন ভাষার সঙ্গেই সিংহলের ভাষার এতটা সাদৃশ্য নাই। বহু শব্দ আরও আছে, যদ্বারা এই সাদৃশ্য প্রমাণিত হইতে পারে। কিন্তু শুধু শব্দ-সাদৃশ্য-দ্বারা এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার নিবিড় সম্বন্ধ নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হয় না। বিভক্তি-চিহ্ন এবং বাক্য-বিজ্ঞাসের রীতিই এই সম্বন্ধ নিশ্চয়তার সহিত সূচনা করে। এক্ষেত্রে ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ একটু সন্ধান করিলে সিংহলীর সঙ্গে বাঙ্গলার পরম ঐক্য প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন। আমি স্বয়ং সিংহলী জানি না, হুই-এক জন প্রথিতযশা সিংহলীর মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

সিংহলী “সে” শব্দ “উহু” এবং “ও”-দ্বারা বুঝায়—আমাদের বাঙ্গলার “ও জানে” এবং সিংহলীতে “উ জানে না” প্রায় একরূপ। “তাহার” শব্দের সিংহলী প্রতিশব্দ=“উহাগে”। পূর্ববঙ্গে এই শব্দ=“ওহাগো” এবং “উহাগো”। তাহার=সিংহলীতে “ওণ”, “ওয়ান”, “ওহন”—পূর্ববঙ্গে সাধারণ লোকেরা এই স্থলে “উনি”, “ওনারা”, “ওয়ান” বলিয়া থাকে। “আপনার” শব্দ সিংহলীতে “আপ্পগে”—পূর্ববঙ্গে “আমাগো”; “আপনাকে” সিংহলীতে “আপেন”। দ্রাবিড় সিংহলী she শব্দ=“এ্যা”; আশ্চর্যের বিষয়, ফরিদপুরে এখনও ছোট ছোট মেয়েদের “এ্যা” বলিয়া সম্বোধন করা হয়। “তোমার”—সিংহলীতে “তোগে”, পূর্ববঙ্গে “তোগো” (যথা—“তোগোর” সাথে কথা বলিব না, ইত্যাদি)।

ক্রিয়াবিশেষণেও এই সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। “কোথায়” সিংহলীতে “কোহে”—পূর্ববঙ্গে “কোহানে”; সেখানে=সিংহলী “এহে”—পূর্ববঙ্গে “ওহানে”; “আমি” শব্দটি সিংহলীতে “মাম্মা”—পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পুথিতে “আম্মি” এবং “আম্মা”।

প্রাচীন বাঙ্গলা পুথিতে অনেক শব্দের বৈকল্পিক পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে সিংহলীর নৈকট্য অধিকতর দৃষ্ট হয়। পুরাতন পুথিতে পুস্তক শব্দে “পোখা” ও “পোত” এই দুই রূপই পাওয়া যায়। সিংহলীতে পুস্তক = “পোখ” ও “পোত”।

পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পুথি মাঝেই “মা” শব্দের স্থলে “মাও” পাওয়া যায়। সিংহলে “মাও” শব্দই এখনও প্রচলিত। ব্রাহ্মণ শব্দ এখনও পাড়াগায়ে “বামুন” ও “বাবুন”-রূপে প্রচলিত। সিংহলীতে ঐ শব্দ “বাবুনা”। সিংহলী “পুতা” বাঙ্গলায়ও প্রচলিত ছিল, যথা—“অবু তব গিরিশ্রুতা মার বলে পড়ে পুতা।” বাঙ্গলায় প্রাচীনকালে দুর্গকে “কোট” বলিত। আমাদের ঢাকা জেলাতে স্মৃগাপুর গ্রামে একটা প্রাচীন দুর্গ যেখানে ছিল, সেখানটাকে লোকে “কোটবাড়ী” বলে। পূর্ববঙ্গের বহু প্রাচীনস্থানে এই অর্থে “কোট” বা “কোটবাড়ী” ব্যবহৃত হইত। সিংহলে দুর্গকে “কোট” বলে। মানার্থে “নাহা” শব্দ সুপরিচিত; ঐ শব্দ ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া এখনও সিংহলে ব্যবহৃত হয়। পূর্ববঙ্গে নদীমাত্রকে “গাঙ্গ” বলে, সিংহলেও তাহাই। বাঙ্গলায় ঘোড়া, গরু প্রভৃতির পুরীষ বুঝাইতে “নাদা” শব্দ ব্যবহৃত হয়, পূর্ববঙ্গে এই শব্দ “লাদা”—সিংহলীতে উহা “লাডা”। “গৃহ” শব্দ প্রাচীন বাঙ্গলায় “গেহ”, “গে” এই দুই রূপেই পাওয়া যায়,—সিংহলীতে উহা “গে”। “শ্রোত” শব্দ সিংহলীতে “হোয়া”—পূর্ববঙ্গে “হোত”। “রক্ত” শব্দ সিংহলীতে “লে”, প্রাচীন বাঙ্গলাতে “লো”। “শালিধান” সিংহলীতে “হালি”। পূর্ববঙ্গ-গীতিকায় এই শব্দ “হালি”-রূপেই পাওয়া যায়। তথায় “স”কার অনেক সময়ই “হ”কারে পরিণত হইয়া থাকে। “ছিত্র” শব্দ সিংহলীতে “সিতুর”; সম্ভবতঃ এই শব্দ-দ্বারাই বাঙ্গলায় “সিদকাটা”, “সিন্দেল চোর” প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যা হইতে পারে। “তন” শব্দ পূর্ববঙ্গের পুথিতে “তন”-রূপে কখন কখনও দেখিয়াছি। সিংহলীতে “তন” শব্দ “তন”-রূপেই প্রচলিত আছে। সিংহলীতে “মুখ” শব্দে “মুহল”, প্রাচীন বাঙ্গলাতে “মুহে”, “মুঞে” সপ্তমীতে ব্যবহৃত হইত। “ইন্দুর” শব্দ সিংহলীতে “উন্দুর”; প্রাচীন বাঙ্গলা পুথিতেও ঠিক ঐরূপ পাওয়া গিয়াছে। “উত্তর” শব্দ সিংহলীতে “উতুর”, এখনও বাঙ্গলাতে “উতুরে হাওয়া”র ঐ রূপটি বজায় আছে। “রাত্তু”, “রাতা” (রক্তবর্ণ) প্রাচীন বাঙ্গলায় অনেক পাওয়া যায়, যথা—কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে “কার সঙ্গে ঋগড়া করি চক্ষু কৈলি রাতা।” সিংহলী “সমুদুর”,—বাঙ্গলা প্রাচীন পুথিতে ঠিক এই রূপই পাওয়া যায়।

“ধম্ম” শব্দ সিংহলীতে “ধহাম”; প্রাচীন বাঙ্গলা পল্লীর “ধামরাই”, “ধামারণ” (ঢাকা জেলা) প্রভৃতি নামে ঐ ধহাম শব্দের সহিত নৈকট্য স্থচিত হইতেছে। বাঙ্গলার পারিবারিক উপাধিগুলির কোন কোনটি সিংহলে দৃষ্ট হয়; যথা—সেন, দাস, সিংহ, বর্দন ইত্যাদি। ছত্বে প্রকৃতিগত রূপ সিংহলী ও বাঙ্গলায় প্রায় একরূপ। আমি এ সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধান করি নাই; যেটুকু জানিয়াছি, তাহাতে এই সাদৃশ্য অতি আশ্চর্য। “আমি সিংহলী জানি না” এ কথাটি সিংহলীতে “মম সিংহলী দানে না।” (বাং) আমি জানি না = (সিং) মম না দানিমি। (বাং) সে যায়, ও যায় = (সিং) ওহ যাইই। (বাং) সে দেখে, ও দেখে = (সিং)

ওহ দাখি। (বাং) সে বা ও দান করে বা নার=(সিং) ওহ নানওয়া। (বাং) সে বা ও আদর করে=(সিং) ওহ আদরে করনওয়া। (বাং) সে যার বা ও যার=(সিং) ওহ বাইই। (বাং) সে গেল=(সিং) ওহ গলা। (বাং) উহার পুত্রক আমি নেই নাই (পূর্ববঙ্গের বাঙ্গলায়—ওগোর পুত্রি আমি নেই নাই)=(সিং) ওহগে পোতা মন ন গান্তেমি। (বাং) (Imperative) বাও=(সিং) বাও (উচ্চারণের একটু সামান্য তফাৎ আছে)। (বাং) খাও=(সিং) খাও (khawa)। (বাং) ভাত খাও=(সিং) বাত খাও (khawa)। (বাং) উহাকে বা ওকে মার=(সিং) ওহ মার (marwa)। পূর্ববঙ্গের পল্লীর ভাবার সঙ্গেই সিংহলীর বেশী মিল।

সহিষ্ণু সাহেব বিজয়কৃত সিংহলজয়-সম্বন্ধে আমাকে যে একটি ক্ষুদ্র নোট দিয়াছেন, (বিদেশী এবং বাঙ্গালী বহু পণ্ডিতই এই নোটের অনেকাংশই স্বীকার করিয়া থাকেন) তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল :—

“The voyage of Vijay was in this order—Vanga country—Nagga Dwip, Mahila Dwip, Supparakka, Bharukaccha, corresponding to Bengal—Jaffna, Māldwip, Sopara, Broach. This order of the places shows that the voyage must have been started from the eastern coast, not the *western coast*. Vijay must have left some of his followers at Bharukaccha. These become settled there and gave the name of the older country to their new home which was afterwards corrupted to *Latā*, evidently the same word as *Lāla*.”

Sinhapur is said to have been situated between Vanga and Magadha in *Lāla-rattha* (*SKT. Lāḍa Rāshṭra*). In the Jain Prakrit books it is called *Lāḍha*. In the *Prabodha-Chandrodaya* it is called *Raḍha*. Minhaj calls it *Rāl*. Sinhapura or Singapura has been mentioned in some inscriptions. There it is said to be in Kalinga. The Varma kings of Bengal claimed to have come from Singapura. King *Niśāṅkamalla* (about 1200 A.D.) of Ceylon came from a dynasty of Kalinga kings who were reigning at Singapura, being of the same family from which descended Vijay—the first King of Ceylon. So Sinhapur must have been in South *Raḍha* which afterwards became merged in the Kalinga kingdom. Mr. Nandalal Dey identifies this Sinhapur with Singur in the district of Hugly.”

“বিজয়ের সমুদ্র-অভিযান এইভাবে হইয়াছিল, বঙ্গদেশ—নগদ্বীপ, মহিলাদ্বীপ, সুপারক, ভারুকচ্ছ (বর্তমান বাঙ্গলা—জাফনা, মালদ্বীপ, সোপরা, ব্রুচ)। এই অভিযান হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বিজয় পূর্ব-উপকূল হইতে রওনা হইয়াছিলেন। পশ্চিম-উপকূল হইতে তাহার যাত্রারস্ত হইতেই পারে না। বিজয় সম্ভবতঃ তাঁহার কতকগুলি অশ্বচরকে ভারুকচ্ছ রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং ইহারা যে স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেইস্থানটি তাঁহাদের

জন্মভূমির নামানুসারে অভিহিত করিয়াছিলেন ; সেই নাম কালে কালে পরিবর্তিত হইয়া “লাড়” নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই লাড় এবং আমাদের “রাড়” বা “লাড়” নিশ্চয়ই একশব্দ।

সিংহপুর বঙ্গ-মগধের মধ্যবর্তী লাল-রাট্ট (সংস্কৃত লাটরাষ্ট্র) নামক স্থানে অবস্থিত। জৈনদিগের প্রাকৃত গ্রন্থসমূহে এই দেশ “লাড়,” প্রবোধচন্দ্রোদয়ে “রাড়” এবং মীনহাজ কর্তৃক “রাল” নামে উক্ত হইয়াছে। কতকগুলি প্রাচীন লিপিতে সিংহপুর বা সিংহপুরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঐ সকল লিপিতে এই স্থান কলিঙ্গের অন্তর্বর্তী বলিয়া উল্লিখিত আছে। বঙ্গ-দেশের বর্ষাবংশীয় রাজারা এই সিংহলের অধিবাসী বলিয়া দাবী করিয়াছেন। সিংহলরাজ-রাজে নিম্নলিখিত (অধুমান ১২০০ খৃঃ) সিংহপুরের রাজাদের বংশে উদ্ভূত এবং তিনি সিংহলরাজ্য-স্থাপনবিজয়ের বংশধর বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। সিংহপুর দক্ষিণ-রাটে অবস্থিত। ঐ নগর বিজয়ের পরে কলিঙ্গ-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াগিয়াছিল। মিঃ নন্দলাল দে এই সিংহপুরকে হুগলী জেলার বর্তমান সিংহুর বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন।”

নগেন্দ্রনাথ বহু, অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙ্গালার পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তুই একটি কথা এখনও সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয় নাই। বাঙ্গালী গুজরাটে উপনিবেশ-স্থাপনপূর্বক উক্ত দেশের একাংশকে “রাড়” নাম দিয়াছিলেন, সহিষ্ণু সাহেবের এই সিদ্ধান্ত সম্ভবপর হইতে পারে ; যতদূর জানি তিনিই এই মতের প্রথম প্রচারক। বাঙ্গালী কর্তৃক গুজরাটে উপনিবেশ-স্থাপনের একটা প্রাচীন সংস্কার এ দেশে ছিল, তাহা আমরা অবগত আছি। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে কালকেতুর গুজরাটে রাজ্য-স্থাপনের একটা গল্প আছে। এই গল্পটি অন্নদামঙ্গলের বিজ্ঞানন্দরে গুণবদ্ধ রাজার পুত্র স্তন্যদেবের এবং বর্তমানরাজ বীরসিংহের কল্পা বিজ্ঞার গল্পের স্থায় নহে। পূর্ববর্তী বিজ্ঞানন্দর-লেখকগণ—যথা, কবিকঙ্কণ ও রামপ্রসাদ—এই গল্পের স্থান-নির্দেশ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করিয়াছেন। কিন্তু কবিকঙ্কণ যেমন গুজরাটে উপনিবেশের কথা লিখিয়াছেন, মাধবাচার্য্য এবং তৎপূর্ববর্তী অপরাপর চণ্ডীকাব্য-লেখকগণও সেই গুজরাটেরই উল্লেখ করিয়াছেন। স্মরণ্য প্রাচীন কাল হইতে এই সংস্কার এ দেশে চলিয়া আসিয়াছে। গুজরাট বঙ্গদেশের কাছে নহে, অথচ প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালীর গুজরাটে উপনিবেশ-সম্বন্ধে একটা গল্পকথা প্রচলিত আছে, তাহার অনেকাংশ মিথ্যা ও অবিখ্যাত হইলেও মূলে কোন একটা ঐতিহাসিক ঘটনার অঙ্কুর ছিল বলিয়াই মনে হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক স্বর্গীয় মিঃ জে. এন. দাসগুপ্ত “মিরাত আহমদি” নামক একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শুধু কবিকঙ্কণ নহেন, উক্ত পুস্তকের মুসলমান লেখকও একটা অল্পরূপ গল্প বলিয়াছেন। দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন, “The coincidence between the Hindu poet (Kavikankan) and the Mohammedan historian (author of Mirat Ahmadi) would suggest that a traditional account of the foundation

of Gujrat was long prevalent in Hindustan." (Bengal in the Sixteenth Century, p. 176.) এই দুইটাই উপগল্প এবং ইহাদের মধ্যে হয়ত এইটুকু সত্য যে হিন্দুস্থানের সর্বত্র একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, বিদেশীরা গুজরাটের কতকাংশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া অল্পকালের জন্ত তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর গুজরাট-অঞ্চলে উপনিবেশ-সম্বন্ধে আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিহুতি-ভূষণ দত্ত, এম. এ., পি. আর. এস., ডি. এস. সি. মহাশয় সম্প্রতি আমাকে লিখিয়া জানাইয়াছেন:—

"১৯১৯ সালে আমি গুজরাটের অন্তর্গত কাথিয়ারে ভ্রমণ করিতেছিলাম এবং ১৯২১ সালে আমি মধ্যপ্রদেশ ও মিরাতে কিছু কালের জন্ত অবস্থান করিয়াছিলাম। কাথিয়ারে ওয়ার্কান নামক স্থানে আমি "উদীচা যুবক মণ্ডলীর" সঙ্গে ছিলাম। ইহারা ব্রাহ্মণ এবং "উদীচা গোড় ব্রাহ্মণ" বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহারা বলেন যে, বহু কাল পূর্বে এলাহাবাদের নিকটবর্তী কোন স্থান হইতে ইহারা তথায় আসিয়াছেন। এই গুজরাটবাসী ব্রাহ্মণেরা "গোড় ব্রাহ্মণ" এবং যখন এলাহাবাদের নিকট কোন স্থান ইহাদের আদিম দেশ, তখন আমি ইহাদিগকে আমাদের বাঙ্গলার গোড়ের অধিবাসী বলিয়াই অনুমান করিলাম। মিরাত সহর হইতে ৯ মাইল দূরবর্তী খারখোদা নামক স্থানে আমি স্বামী সোমতীর্থ মহোদয়ের আশ্রমে বাস করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা "তাগা-ব্রাহ্মণ" এবং তাঁহাদের প্রাচীন কুলজীগ্রন্থ-অনুসারে তাঁহারা "গোড় বাঙ্গলা" হইতে আসিয়া তদ্দেশে বাস করিতেছেন। এইরূপ "গোড় ব্রাহ্মণ" আখ্যাবর্তের উত্তর-পশ্চিমে আরও অনেক স্থানে আছেন। আমার মনে হয়, প্রাচীনকালে বাঙ্গলা দেশ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ ঐ সকল অঞ্চলে গিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। মিরাত ও তাহার নিকটবর্তী বুলন্দসহরাদি জেলাতে প্রায় চার লক্ষ "গোড় ব্রাহ্মণ" বাস করেন; ইহারা নিজেই যখন গোড় বাঙ্গলা হইতে আসিয়াছেন বলেন, তখন তাঁহারা যে বাঙ্গালী সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।"

বাঙ্গালীর সঙ্গে সিংহলের সংস্রব বহু পূর্ব হইতে এ দেশে চলিয়া আসিয়াছে। শুধু ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর নহে, বাঙ্গলার যে কোন বণিক বাণিজ্যে যাইবেন—তাঁহাকে সফর করিতে সিংহলে যাইতেই হইবে। বঙ্গীয় বহু প্রাচীন কাব্যে এ দেশের বণিকদের সিংহলে যাতায়াতের কথা উল্লিখিত আছে। এতদ্বারা বাঙ্গলার সঙ্গে সিংহলের একটা ব্যাপক সম্পর্ক প্রতিপন্ন হয় এবং সিংহলে বাঙ্গালীর যে একটা স্থায়ী রকমের আড্ডা ছিল—এই সকল কাহিনী তাহার অপরোক্ষ ইঙ্গিত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। বস্তুতঃ বাঙ্গালী জাভা, বালী, সুমাত্রা, কম্বোডিয়া, শ্রাম, জাপান ও চীন প্রভৃতি বহু স্থানে সেই ইতিহাস-পূর্বযুগে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজয়ের এই কীর্তি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অজন্তার বিশ্ববিখ্যাত চিত্রাবলির মধ্যে সিংহল দেশে বিজয়ের অভিযান-

শীর্ষক চিত্রটি সর্কচিত্রের মধ্যে অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব পাইয়াছে। এই চিত্রাবলির বহুমূল্য মুক্তামালার মধ্যে বিজয়কৃত সিংহলবিজয় মধ্যমণিস্বরূপ। অজন্তার চিত্রাবলির ভূমিকায়

অজন্তা গুহার সিংহল-
বিজয়ের চিত্রাবলি।

এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার অনুবাদ আমি নিয়ে
দ্বিতোছি; ইহা লেডি হারিসহামের “অজন্তা-দৃষ্টাবলি” পুস্তকে
উদ্ধৃত কুমারী কোরাথ এম্. লারচারের মন্তব্য হইতে সংকলিত

হইল:—“এই চিত্রাবলির মধ্যে সিংহল-যুদ্ধ-শীর্ষক অত্যাশ্চর্য্য চিত্রটি দেওয়া হইয়াছে। যদিও
এই ছবিটি চিত্রকারিণী লেডি হারিসহামের ঠিক মনের মত প্রতিলিপি হয় নাই, তথাপি
এই পর্যায়ের চিত্রগুলির মধ্যে ইহাই বৃহত্তম এবং সর্বোৎকৃষ্ট। মূল চিত্রের উপরিভাগ
মাঝে মাঝে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; (হয়ত ইচ্ছা করিয়াই কেহ এইভাবে কীর্তিহানি
করিয়া থাকিবে, অথবা অজ্ঞ কারণেও ইহা হইতে পারে) কিন্তু ইহার বর্ণের উজ্জলতা
অনেক পরিমাণে এখনও বিদ্যমান। ছবিগুলি ভিন্ন ভিন্ন পঙ্ক্তিতে অঙ্কিত হইয়াছে,
কিন্তু তাহাদের মহান সমাবেশ অতি চমৎকার। পৃথক্ করিয়া দেখিলে এক এক
পর্যায়ের ছবি এক একটি মণির জায় বোধ হয়। অপূর্ণাঙ্গুতি হস্তীগুলির বৃহৎ তোরণের
মধ্য দিয়া যুদ্ধার্থে অভিযান, সৈন্যসমূহের বর্ণাফেপ-সহ যুদ্ধোত্তম, আকাশে উড্ডীন তীররাজি,
সমরক্ষেত্রে ভীতিদায়ক দৈত্যদানবের আবির্ভাব, পটোক্ষে নর্তকীদের চারু নর্তন, গায়ক-
বাদকদের সঙ্গ, রাজার অভিষেক—এই সমস্ত ছোট ছোট সুন্দর চিত্র-সংবলিত যে মহৎ
দৃশ্য অবতারণিত হইয়াছে, তাহা অতীব বিস্ময়কর। অজন্তা গুহার চিত্রাবলির দ্বিধাশূন্য
নিখুঁত কলানৈপুণ্য বিশ্ববিশ্রুত, কিন্তু এই চিত্রখানি অপরাপর সমস্ত চিত্রকে হার
মানাইয়াছে।”

মহাবংশের ষষ্ঠাধ্যায়ে বিজয়ের সিংহলে আগমন *

বঙ্গদেশের রাজধানীতে বহুকাল এক রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি কলিঙ্গরাজার
দুহিতাকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাহার একটি কন্যা হয়। দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া
বলিলেন, “এই কন্যার সঙ্গে পশুপতির মিলন হইবে।” কন্যাটি অতি সুন্দর ও খেচ্ছাতপ
ছিলেন—রাজা ও রাণী ইহার বাবহারে লজ্জিত থাকিতেন। (বীপবংশে ইহার নাম
“সুসিমা” বলিয়া লিখিত আছে।)

* উইলহেল্ম গ্রাগার, পি-এচ্. ডি. এবং ম্যাবেল হেইনেস্ বোড, পি-এচ্. ডি.-কৃত ইংরাজী অনুবাদ
অবলম্বনে এই বিবরণ সংকলিত হইল।

কুমারী একাকী রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া গেলেন ; তিনি স্বাধীন জীবনের স্বখ-
 ভোগের জন্য লোলুপ হইয়াছিলেন। একদল পথিক মগধের পথে
 যাইতেছিল, কুমারী তাহাদের সঙ্গে লইলেন। ‘লাল’ দেশের জঙ্গল-
 পথে তাহারা এক সিংহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। যে যে-দিকে
 পারে পলাইয়া গেল, কিন্তু রাজকুমারী যে পথ দিয়া সিংহ যাইতেছিল, সেই পথে
 চলিলেন।

সিংহ যখন স্বীয় আহাৰ্য্য ভোজনাশ্বে স্বস্থানে যাইতেছিল, তখন দূর হইতে তাহাকে
 দেখিতে পাইল। সিংহ সেই রমণীর মোহে পড়িয়া গেল। সে লেজ নাড়িয়া কুমারীর
 নিকটবর্তী হইল এবং তাহার দুইকর্ণ তখন খুলিয়া পড়িল।
 সিংহের সহিত মিলন। সিংহকে দেখিয়া কুমারীর দৈবজ্ঞের কথা মনে উদ্ভিত হইল
 এবং তিনি নির্ভয়ে তাহার গাত্রে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাহার
 কোমল স্পর্শে সিংহ গাঢ়তরুণে আকৃষ্ট হইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া
 স্বীয় গিরিগহ্বরে প্রবিষ্ট হইল ; সেখানে রাজকুমারীর সঙ্গে পশুরাজের মিলন ঘটিল।
 এই মিলনের ফলে রাজকুমারীর গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা—এই দুইটি বমজ
 সন্তান জন্মলাভ করিল।

ছেলেটির হাত ও পা কতকটা সিংহের মত হইয়াছিল, এই জন্য তাহার মাতা তাহার
 নাম সিংহবাহু রাখিলেন। কুমারীর নাম হইল সিংহসিবলী। ছেলের বয়স যখন বোল
 হইল, তখন সে নিজের মনের একটা সন্দেহ-সম্বন্ধে তাহার মাতাকে
 জিজ্ঞাসা করিল,—“তোমার সঙ্গে আমাদের পিতার চেহারার এতটা
 মাতা ও ভগিনী-সহ সিংহবাহুর পলায়ন। বৈষম্য কেন ?” তখন রাজকুমারী সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন।
 তাহা শুনিয়া পুত্র বলিল,—“চল, আমরা এ স্থান হইতে দেশে ফিরিয়া যাই।” মাতা
 বলিলেন, “তোমার পিতা একটা পাখর দিয়া এই গহ্বরের মুখ বন্ধ করিয়া চলিয়া যান।” তখন
 পুত্র সেই মন্ত পাখরটা কাঁধে করিয়া লইয়া ৪০০ মাইল পথ এক দিনে যাতায়াত করিয়া
 ফিরিয়া আসিল।

ইহার পরে একদিন সিংহ শিকারের জন্য চলিয়া গেল। সিংহবাহু এক স্বন্ধে তাহার
 মাতা ও অপর স্বন্ধে তাহার ভগিনীকে লইয়া খুব হাঁটিয়া চলিলেন। তাহারা কাপড়ের
 অভাবে গাছের পাতা ও লতা পরিয়াছিলেন। এই ভাবে তাহারা একটি পল্লীর নিকটে
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে সেই স্থানে বঙ্গাধিপের এক ভাগিনেয় তাহার
 অধীনে সৈন্তাধ্যক্ষের কাজ করিতেছিলেন। এই সেনাপতির নাম অহুর। তিনি বঙ্গের
 প্রান্তভাগের শাসন-কর্তৃত্ব করিতেন। যে সময় রাজকন্যা তদীয় পুত্র ও ছহিতার সহিত
 তথায় উপস্থিত হইলেন, ঠিক সেই সময়ে তথাকার শাসনকর্তা দৈবক্রমে তথায় একটি
 বটবৃক্ষের নীচে বসিয়া কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,
 “তোমরা কে ?” রাজকন্যা বলিলেন, “আমরা বনবাসী।” শাসনকর্তা তাহার লোকদিগকে

বলিয়া তাঁহাদিগকে বঙ্গদান করিলেন। তাঁহারা সেই বঙ্গ পরিধানমাত্র তাহা বহুমূল্য পরিচ্ছদে পরিণত হইল।

শাসনকর্তা অমর তাঁহাদিগকে বৃক্ষপত্র আহার্যাদান করিলেন, কিন্তু সেই বৃক্ষপত্র তাঁহাদের প্রভাবে স্বর্ণনির্মিত ভোজনপাত্রে পরিণত হইয়া গেল।
বঙ্গের উপকণ্ঠে।

বিস্মিত হইয়া শাসনকর্তা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, “তোমরা কে?”
তখন রাজকন্যা তাঁহাকে স্বীয় বংশ ও কুলের কথা বলিলেন। তখন শাসনকর্তা তাঁহার মাতুলকন্যাকে বিবাহ করিলেন।

এ দিকে শিকার হইতে ফিরিয়া সিংহ তাহার পরিবারবর্গকে না-দেখিতে পাইয়া—
বিশেষতঃ পুত্রহারা হইয়া—অত্যন্ত শোকার্ত হইয়া পড়িল। সে আহার ও পানীয় ত্যাগ করিল এবং তাহাদিগের উদ্দেশে বঙ্গদেশের উপাস্তবর্তী পল্লীসমূহ
সিংহের অত্যাচার।

ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তৎপল্লীর অধিবাসীরা তাহার ভয়ে বাড়ীঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। সেই প্রান্তভাগের লোকেরা রাজার নিকট আসিয়া নালিশ করিল, “মহারাজ! একটা সিংহের দৌরাণ্ডো আপনার রাজ্যে লোক বাস করিতে পারিতেছে না। আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।”

রাজা এমন কোন লোক পাইলেন না যে, এই বিপদ হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। তখন রাজা হাতীর পিঠে সহস্র স্বর্ণমুদ্রার একটি তোড়া রাখিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন—“যে কোনও ব্যক্তি সিংহকে ধরিয়া আনিবে, এই তোড়া তাহারই হইবে।” তারপরে রাজা সেই তোড়ার মুদ্রাসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে ত্রিসহস্র ও শেষে ত্রিসহস্র স্বর্ণমুদ্রার পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। সিংহবাহ ছই বার এই কার্যে ব্রতী হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতা ছই বারই তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন; কিন্তু তিন বারের বার সিংহবাহ নিজের পিতাকে নিধন করিয়া ত্রিসহস্র স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিবার জন্ত প্রয়াণ করিলেন।

সিংহবাহকে রাজপুত্রবেরা রাজসভায় উপস্থিত করাইল। রাজা তাঁহাকে বলিলেন—
“তুমি যদি এই সিংহকে বধ করিতে পার তবে রাজসিংহাসন তোমারই হইবে।”

সিংহবাহ সিংহের গর্ভের মুখে উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে পুত্রকে পুনরাগত দেখিয়া
সিংহবাহ কর্তৃক পিতৃবধ।
অতি স্নেহবশতঃ সিংহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সিংহবাহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটি তীর ছুড়িলেন। তীর সিংহের ঠিক মস্তকের উপরে পতিত হইল, কিন্তু বাৎসল্যের একপই প্রভাব যে সেই তীর সিংহের কোন ক্ষতি করিল না। সিংহের কপালে ঠেকিয়া উহা ফিরিয়া আসিয়া সিংহবাহর পাদমূলে পড়িল। তিন বার এইভাবে সিংহবাহর বাণ ব্যর্থ হইয়া গেল, কিন্তু চতুর্থ বারে সিংহের ক্রোধ হইল। ক্রোধ হওয়া মাত্র চতুর্থ বারের নিষ্কিপ্ত শর তাহার শরীর ভেদ করিয়া চলিয়া গেল।

সিংহবাহ কেশরযুক্ত সিংহ-মস্তকটি লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেই সময়ের সাত দিন পূর্বে বঙ্গাধিপের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। রাজার কোন পুত্র ছিল না। মন্ত্রীরা

সিংহবাহুর বিক্রমের নিদর্শন পাইয়াছিলেন; তাঁহারা জানিয়াছিলেন, সিংহবাহু মৃতরাজার দৌহিত্র এবং তাঁহার মাতাকেও চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া সিংহবাহুকে অভিনন্দনপূর্বক বলিলেন, “আপনিই আমাদের রাজা হউন।” সিংহবাহু রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু উহা তাঁহার ধর্মপিতাকে (মাতার স্বামী) অর্পণ করিয়া সিংহসিবলীকে

সিংহবাহুর বঙ্গ ছাড়িয়া সঙ্গে করিয়া স্বীয় জন্মস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই নগরীর নাম হইল “সিংহ পুর।” এই নগরীর চতুর্পার্শ্ব ৪০০ ক্রোশ

ব্যাপিয়া তিনি বহু পল্লী স্থাপন করিলেন। “লা’লদেশে”—সেই রাজধানীতে সিংহবাহু রাজত্ব করিতে লাগিলেন এবং তিনি সিংহসিবলীকে রাজ্ঞীরূপে গ্রহণ করিলেন। বিবাহের পরে রাজ্ঞী ১৬ বার প্রসব করিলেন। প্রত্যেক বারেই যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম বিজয় এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম সুমিত্র (সুমিত্র) রাখা হইল। যথাসময়ে রাজা বিজয়কে যুবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সর্বসময়ে রাজার ৩২টি পুত্র হইয়াছিল।

বিজয় অতি দুষ্চরিত্র হইয়া উঠিলেন, তাঁহার সঙ্গীরাও তাঁহারই মত ছিলেন। ইহারা রাজ্যে অসহনীয় অত্যাচার করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে তাঁহাদের সমস্ত ব্যবহারের কথা জানাইল। রাজা মন্ত্রীদিগকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিলেন এবং পুত্রের তীব্র নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু যুবরাজ রাজার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। এইরূপে এক বার, দুই বার এবং তিন বারেও রাজার কথায় যুবরাজের চরিত্রের কোন উন্নতি হইল না। তখন প্রজাগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে বলিল,—“মহারাজ! আপনি পুত্রকে বধ করুন।” বিজয় ও তাঁহার শত শত সঙ্গীর মস্তকের অর্দ্ধভাগ মুণ্ডন করাইয়া রাজা তাঁহাদিগকে নির্কাসন দিলেন। তাঁহাদিগের স্ত্রী ও পুত্রকন্যা-সহ জাহাজে উঠাইয়া দিয়া তিনি তাঁহাদিগকে সমুদ্রপথের যাত্রী করাইলেন। স্ত্রী, পুরুষ এবং শিশুগণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রেরিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে আগমন-পূর্বক তথায় বসবাস করিতে লাগিল। যেখানে বালকগণ উপনিবিষ্ট হইল, তাহার

নাম হইল নগরদ্বীপ; মহিলাগণ যেখানে রহিলেন, তাহার নাম হইল মহিলাদ্বীপ; কিন্তু বিজয় যে বন্দরে গেলেন, তাহার

নাম স্থপারক। কিন্তু সেখানে তাঁহার সঙ্গীদের দৌরাণ্যে বিপর্যয় হইয়া পুনর্বার তিনি সমুদ্রপথে যাত্রা করিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ বিজয় অবশেষে লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হইলেন। তথায় ভাস্কর্য্য নামক স্থানে তিনি জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যে দিন ভগবান্ তথাগত যমজ সন্তানের জন্ম পরিদৃশ্যমান হইলি শালতরুর অবকাশস্থলে নির্কাসপ্রাপ্তির প্রতীক্য করিতেছিলেন, সেই দিনই বিজয় লঙ্কায় উপনীত হইয়াছিলেন। এইখানে মহাবংশ নামক গ্রন্থের বিজয়ের আগমন-বর্ণনাক মষ্ট অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইল। এই মহাবংশ ধার্মিক ব্যক্তিগণের চিত্তপ্রশমন, হৈর্যা ও আনন্দের জন্য সঞ্চলিত হইল।

মহাবংশের সপ্তমাধ্যায়ে বিজয়ের সিংহল-বিজয়

যখন জগতের অনন্তশরণ তথাগত ভুলোকের উদ্ধার সাধন করিয়া চিরমঙ্গলময় শান্তির শেখরদেশে আরোহণপূর্বক নির্ঝাণ-শয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন সেই মহাজ্ঞানী বাক্যকোবিদগণের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেব সমস্ত দেবতাগণের সমক্ষে সন্নিহিত দণ্ডায়মান দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন,—“সিংহবাহ-তনয় বিজয় সাত শত সঙ্গিসহ ‘লাল-দেশ’ হইতে লঙ্কায় আসিতেছে। হে দেবরাজ! লঙ্কায় আমার ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত হইবে, অতএব আপনি সাবধানতার সহিত বিজয় ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে লঙ্কায় রক্ষা করিবেন।” যখন দেবরাজ তথাগতের এই কথা শ্রবণ করিলেন, তখনই তিনি তাঁহার সম্মানার্থ নীলোৎপল বর্ণদেবের (বিষ্ণুর) উপর লঙ্কারক্ষার ভার ও অভিভাবকত্ব প্রদান করিলেন। শত্রু হইতে এই ভার প্রাপ্তি মাত্র সেই দেবতা লঙ্কায় উপনীত হইয়া কোন ভ্রমণশীল সাধুর ছদ্মবেশে তথায় এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। বিজয়ের সঙ্গিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মহাশয়! এই দ্বীপের নাম কি?” তিনি উত্তরে বলিলেন, “এখানে কোন মানুষ নাই, কিন্তু তোমাদের কোন বিপদ ঘটবে না।” এই বলিয়া তিনি তাঁহার কমণ্ডলু হইতে তাহাদের গাজে জল ছিটাইয়া দিলেন, তৎপরে তাহাদের হস্তে রক্ষি-বন্ধনপূর্বক আকাশপথে অন্তর্ধান হইয়া গেলেন।

তখন তথায় কুকুরীর বেশে এক যক্ষী উপস্থিত হইল। এই যক্ষী ছিল ‘কুবরা’ নামী যক্ষীর সহচরী। বিজয়ের এক অমুচর কুকুরীর পশ্চাতে ধাবিত হইল, কিন্তু বিজয় তাহাকে মানা করিয়াছিলেন। সে ভাবিল, নিশ্চয়ই এখানে কোন পক্ষী আছে, নতুবা কুকুর ধাক্কিত না। সেই কুকুরী-বেশিনী যক্ষীর অধিকারিণী কুবরা নামী যক্ষী অনতিদূরে এক বৃক্ষের নীচে বসিয়া সন্ন্যাসিনীর স্থায় চরকা-দ্বারা সূতা কাটিতেছিল। বিজয়ের অমুচর সন্ন্যাসিনীকে একটা বাপীতীরে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া সেই পুকুরের জলে যান করিয়া জলপান করিল, তৎপরে কতকগুলি পয়নালা ভাঙ্গিয়া লইল এবং পয়নাপত্রে কিছু জল সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিল। যক্ষী তখন তাহাকে বলিল “যেখানে আছ, ঠিক সেইখানেই থাক; এখন তুমি আমার করতলগত হইয়াছ।” এই কথা উচ্চারণ করামাত্র সেই লোকটি সেখানে বন্দীর মত হইয়া রহিল, তাহার নড়িবার শক্তি লুপ্ত হইল। কিন্তু তাহার হাতে যে রাখী বাঁধা ছিল তাহার গুণে সেই যক্ষী তাহাকে খাইয়া ফেলিতে পারিল না। যদিও যক্ষী তাহার রাখীটা খুলিয়া ফেলিবার জন্য অনেক অমুরোধ করিল, লোকটি কিছুতেই তাহাতে সন্মত হইল না। তখন যক্ষী তাহাকে আক্রমণ করিল এবং জোর করিয়া একটা গুহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে যক্ষী বিজয়ের সাত শত অমুচরের সকলকেই সেই গুহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

সাত শত অমুচরের একটিকেও ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া বিজয় ভীত হইলেন। তিনি পঞ্চাঙ্গে (খড়া, ধনু, যুদ্ধকুঠার, বর্শা এবং বর্ধ) সজ্জিত হইয়া সেই পুকুরের তীরে উপনীত

হইলেন; তথায় তিনি কোন অমুচরের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন না, শুধু সেই অতি সুন্দর বাপীতটে সন্ন্যাসিনীবেশী সেই দ্বীলোককে দেখিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, “নিশ্চয়ই আমার

অমুচরেরা এই রমণীর প্রভাবে বশীভূত হইয়াছে।” তখন তিনি অগ্রসর হইয়া তাহাকে বলিলেন, “মহাশয়া! আপনি কি আমার লোকগুলিকে দেখিয়াছেন?” যক্ষী বলিল, “যুবরাজ! আপনি সেই সকল লোকজন দিয়া কি করিবেন? আপনি পুকুরে দান করিয়া জলপান-পূর্ব্বক শাস্ত হউন।”

এই কথায় বিজয়ের মনে সকল কথা পরিষ্কার হইয়া গেল,—“এই রমণী নিশ্চয়ই যক্ষী, সে আমার পদমর্যাদা-সম্বন্ধে সবই জানে।” তখন তাড়াতাড়ি তিনি ধনুতে বাণ বোজনা করিয়া স্বীয় নাম ঘোষণাপূর্ব্বক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহার ধনু-গুণ-দ্বারা যক্ষীর কণ্ঠ বাধিয়া বামহস্তে তাহার কেশরাশি আকর্ষণপূর্ব্বক অস্থহস্তে নিষ্কাষিত রূপাণ উদ্ধিত করিলেন। তিনি উঠেঃস্বরে বলিলেন, “দাসি! তুমি আমার সাত শত লোক ফিরাইয়া দাও, নতুবা আমি তোমাকে বধ করিব।” তখন ভীতা হইয়া যক্ষী অমুনয়পূর্ব্বক রাজকুমারের নিকট প্রাণ ভিক্ষা করিল এবং বলিল, “আমার জীবন দান করুন, প্রতিদানে আমি আপনাকে একটি সাম্রাজ্য দান করিব এবং স্ত্রীজনোচিত যে ব্যবহার আপনি ইচ্ছা করিবেন এবং যে সেবা আপনি চাহিবেন, তাহা সমস্তই দিব।”

যক্ষী পাছে বিশ্বাসঘাতকতা করে, এই জন্ত বিজয় তাহাকে দিয়া শপথ করাইয়া লইলেন এবং যে মুহূর্ত্তে তিনি আদেশ করিলেন, “আমার অমুচরদিগকে এখনই লইয়া আইস” তখনই যক্ষী তাহাদিগকে তথায় লইয়া আসিল। ইহার পর রাজকুমার বলিলেন, “আমার লোকজন ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে।” তখনই যক্ষী প্রচুর চাউল, নানারূপ খাদ্যদ্রব্য এবং অপরাপর বহু সামগ্রী তাহাকে আনিয়া দিল। যে সকল বণিকেরা জাহাজে তথায় আসিয়াছিল এবং যাহাদিগকে যক্ষগণ খাইয়া ফেলিয়াছিল, এ সকল জিনিষপত্র ও খাদ্যদ্রব্য তাহাদেরই ছিল। সেই সমস্ত দ্রব্য-দ্বারা বিজয়ের লোকজনেরা অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া প্রথমতঃ তাহার সম্মুখে আনয়ন করিল, তৎপরে তাহারা একত্র বসিয়া আহার করিল।

বিজয় স্বয়ং সেই খাদ্যদ্রব্যের কিছু অংশ যক্ষীকে দিয়াছিলেন, সে তাহা আহার করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিল। যক্ষী ষোড়শ-বর্ষীয়া পরমা সুন্দরী রমণীর বেশে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বিজয়ের নিকট উপস্থিত হইল।

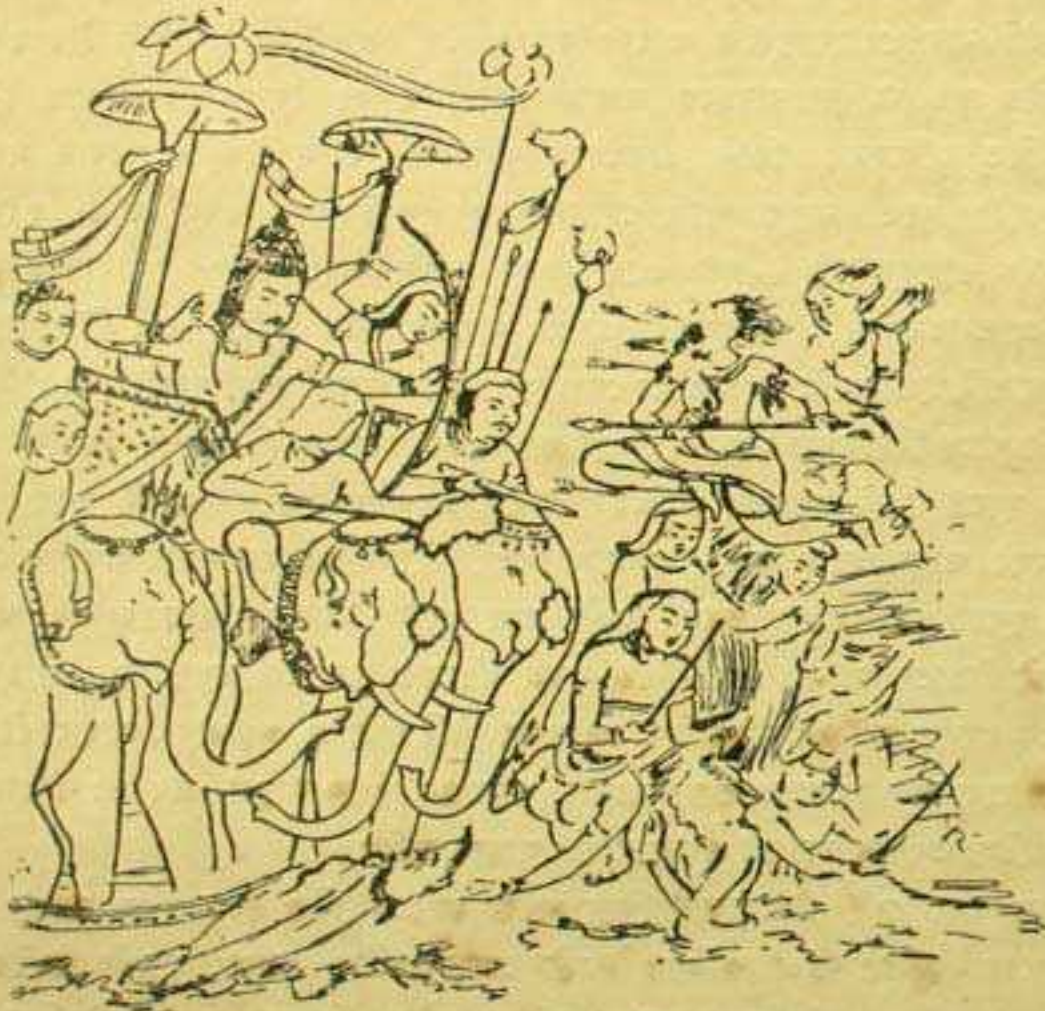
যক্ষীকে শয্যা-সজ্জা করা। একটি বৃহৎ তরুচ্ছায়ায় যক্ষী অতি চমৎকার শয্যা রচনা করিল। একটি শিবিরের দ্বারা সেই স্থানটি উৎকৃষ্টরূপে আচ্ছাদিত করা

হইয়াছিল এবং তাহার উর্দ্ধে একটি তন্ত্রাতপ বিরাজিত ছিল। এই সকল আয়োজন দেখিয়া দ্বিষ্টচিত্তে রাজকুমার সেই শিবিরে প্রবেশ করিলেন এবং যক্ষীকে সেই শয্যায়

স্বীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে বহু সুখলাভের আশায় তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহচরেরা-শিবির সংস্থাপনপূর্বক তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া রহিল।

রাত্রে রাজকুমার নানারূপ বাস্তবধনি শুনিতে পাইলেন, এবং তাঁহার পার্শ্বে শায়িতা যক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই সমস্ত গোলমাল কিসের?” যক্ষী মনে মনে চিন্তা করিল, “এখন ইনিই আমার প্রভু, আমি ইহাকেই এই রাজ্য দান করিব। যক্ষগুলিকে সমূলে বধ করিতে হইবে। যদি তাহা না করিতে পারি, তবে আমাকর্তৃক ইহার এইখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন জানিয়া তাহারা আমাকে হত্যা করিবে।”

যক্ষী বিজয়কে বলিল, “এইখানে যক্ষদের একটি রাজধানী আছে, তাহার নাম সিরিসাবস্ত্র। যক্ষ-রাজার নাম কালসেন। লঙ্কাধিপ যক্ষপতির কন্যাকে এখানে আনা



কুবজা যক্ষীর সাহায্যে বিজয় কর্তৃক কালসেন নামক যক্ষরাজের পরাজয়।

(অজস্র-চিত্র হইতে গৃহীত)

হইয়াছে, তাহার সঙ্গে তাহার মাতাও আসিয়াছেন। এই কন্যার বিবাহোপলক্ষে সমস্ত দিনব্যাপী মহোৎসব চলিতেছে। বহু যক্ষ এখানে সমাগত হইয়াছে, এই কলরব তাহাদের।

যদি তুমি আজই ইহাদিগকে বধ কর, তবে পারিবে; কিন্তু ইহার পরে আর তাহা সম্ভবপর হইবে না।”

বিজয় বলিলেন, “আমি ইহাদিগের সঙ্গে কিরূপে পারিব? ইহারা তো অদৃশ্য হইয়া থাকে?” যক্ষী বলিল, “সে যাহাই হউক, তুমি ভীত হইও না; আমি যেখানে যেখানে চীৎকার করিব, তুমি সেইখানে সেইখানে লক্ষ্য-সন্ধান করিবে।

যক্ষ-বিজয়।

আমার বাহুবিস্তার শুধু তোমার অস্ত্র তাহাদের শরীরে পতিত হইবে।” এই কথা শ্রবণমাত্র বিজয় যক্ষীর উপদেশানুসারে যক্ষদিগকে সংহার করিলেন। এইভাবে জয়লাভ করিয়া তিনি যক্ষরাজের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে অপর একজনকেও সেইরূপ পরিচ্ছদ দিলেন।

কতকদিন সেইখানে বাস করিয়া বিজয় তাম্রপানি নগরে গমন করিলেন, এইখানে এক রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সেই যক্ষীকে লইয়া স্বীয় মন্ত্রিবর্গসহ তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

যখন বিজয়ের সঙ্গীরা লক্ষাবীপে আসিয়া শাস্ত্রকাস্ত-দেহে মাটির উপর হাত রাখিয়া বসিয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই দেশের লাল মাটির গুণে তাঁহাদের করতল তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। এইজন্য তাঁহারা সেই স্থানের নাম “তাম্রপানি” রাখিয়াছিলেন। এদিকে বিজয়ের পিতা সিংহবাহু সিংহবধ করার জন্য “সিংহল” নাম পাইয়াছিলেন; তদবধি তাঁহার সহচর ও আত্মীয়গণ ঐ নামে পরিচিত হইতেন; এই সংস্রবহেতু বিজয়ের লোকজনেরাও “সিংহল” নামে অভিহিত হইতেন।

বিজয়ের মন্ত্রীদিগের মধ্যে সেখানে কেহ কেহ নূতন নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন। কদম্ব নদীর তীরে অমুরুদ্ধ নামক নূতন নূতন নগর-স্থাপন।

বিজয়ের এক অমাত্য “অমুরুদ্ধ” গাম (অমুরুদ্ধ গ্রাম) স্থাপন করেন। ঐ গ্রামের উত্তরে গান্ধীরা নদীর তীরে পুরোহিত উপতিয় “উপতিয়” গাম (উপতিয় গাম) সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বিজয়ের আর তিন জন অমাত্য উজ্জনি, উরুবিব এবং বিজিত নামক তিন পল্লী স্থাপন করেন।



বুদ্ধ-জয়ান্তে বিজয়ের প্রমোদোৎসব।

(অজস্র-চিত্র হইতে গৃহীত)

এই দেশে অধিকার স্থাপিত হইলে সকলে বিজয়ের নিকট প্রার্থনা করিল, “আপনি আমাদের রাজপদে অভিষিক্ত হউন।” কিন্তু তাহাদের বারংবার প্রার্থনাসত্ত্বেও বিজয়



বিজয়ের অভিষেক।
(অজস্তা-চিত্র হইতে গৃহীত)

বলিলেন, “যদি উচ্চকুলের কোন রমণী রাজ্যী হইয়া আমার সঙ্গে একত্র অভিষিক্ত না হন, তবে সহধর্মিণী-হীন অবস্থায় কিছুতেই আমার অভিষেক হইতে পারে না।” কিন্তু তাঁহার অমাত্যবর্গের দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল, যে করিয়া হউক বিজয়কে রাজ্যাভিষিক্ত করিতেই হইবে। অবশ্য কাজটা খুব সহজ ছিল না। কিন্তু তাঁহারা দমিবার পাত্র নহেন, সুতরাং নিরাশ হইলেন না। তাঁহারা বহুসংখ্যক বহুমূল্য মণিমুক্তা ও অপরূপ সামগ্রীসহ দক্ষিণ-ভারতের

পাণ্ডু রাজার নিকট
দক্ষিণ-ভারতের
পাণ্ডু রাজা।
তাঁহার কছার সহিত
বিজয়ের সম্বন্ধের

প্রস্তাব করিয়া লোক পাঠাইলেন; তাঁহারা নিজেদের এবং অপরূপ ব্যক্তিগণের জন্তও সেইরূপ যোগ্য কছার সন্ধান দৃঢ়দিগকে অবহিত

করিয়া দিলেন। যখন দূতেরা জাহাজে চড়িয়া মাছুরায় উপস্থিত হইল, তখন তাহারা মাছুরার রাজাকে সেই সকল উপহার ও পত্র প্রদান করিল।

মাছুরার রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্বীয় কছাকে লঙ্কায় প্রেরণ করা স্থির করিলেন। বিজয়ের মন্ত্রীদের জন্তও তিনি আরও এক শত কছা প্রেরণ করা সংকল্প করিয়া নগরে ঢোল দিয়া ঘোষণা করিলেন, “যাঁহারা তাঁহাদের কুমারী কছাদিগকে লঙ্কায় পাঠাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা কছাদিগকে দুই প্রস্ত পরিচ্ছদসহ রাজদ্বারে উপস্থিত করাইবেন; তাহা হইলেই আমি তাহাদিগকে গ্রহণ করিব।”

এইভাবে তিনি বহুসংখ্যক কুমারী সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের অভিভাবকদিগকে ক্ষতিপূরণার্থে পণ দান করিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় কুমারীকে নানারূপ অলঙ্কার ও ব্যবহার্য সামগ্রী এবং পথের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান করিলেন। তিনি পদমর্যাদা-অনুসারে অস্ত্রাস্ত্র কুমারীদিগকে উপযুক্ত বেশভূষা দিয়া সজ্জিত করাইলেন। বহু অশ্ব, গজ এবং শকট-সমাবেশে রাজযোগ্য মিছিল চলিল; তৎসঙ্গে অষ্টাদশ শিল্পীর এক সহস্র

পরিবারবর্গ লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিল। রাজদূত রাজার পত্রসহ মহারাজ বিজয়ের জন্ত এই সকল উপঢৌকন ও কুমারীদিগকে লইয়া যাত্রা করিল। এই বিপুল জনতা লঙ্কার মহাতীর্থ (মহাতিথ) নামক স্থানে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইল। তাহাদের উপস্থিতির স্মারক-স্বরূপ উত্তরকালে এই স্থানটির নাম 'মহাতীর্থ' হইয়াছিল।

সেই যক্ষীর গর্ভে বিজয়ের একটি পুত্র ও একটি কন্যা হইয়াছিল। যখন বিজয় শুনিলেন, রাজকুমারী সিংহলে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন যক্ষীকে বলিলেন, "প্রিয়তমে, এই বেলা তুমি এখান হইতে প্রস্থান কর; তুমি তোমার পুত্রকন্যাকে আমার নিকট রাখিয়া যাইতে পার। মানুষেরা তোমাদের মত যক্ষীদিগকে ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে।" এই কথা শুনিয়া যক্ষী তাহার স্বগণ যক্ষদিগের ভয়ে অত্যন্ত আতঙ্কিত হইল। বিজয় বলিলেন, "বিলম্ব করিও না, আমি তোমাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়া নৈবেদ্য দান করিব।" যখন পুনঃ পুনঃ সকাতর-ভাবে প্রার্থনা করিয়াও যক্ষী নিষ্ফল হইল, তখন সে তাহার দুইটি সন্তান লইয়া তথা হইতে লঙ্কার চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার মনে সর্বদা আশঙ্কা হইতেছিল যে তাহার কোন বিপদ ঘটবে।

লঙ্কা নগরীতে পৌছিয়া সে তাহার সন্তান দুইটিকে পুরীর দ্বারে রাখিয়া স্বয়ং একাকী নগরীতে প্রবেশ করিল। লঙ্কাবাসী যক্ষেরা তাহাকে চিনিতে পারিল এবং আশঙ্কা করিল যে সে বিজয়ের গুপ্তচর; তাহারা এই বিখ্যাসে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে এক দুর্দান্ত যক্ষ একটি মুষ্টির আঘাতে তাহার প্রাণবধ করিল। কিন্তু যক্ষীর এক মাতুল যক্ষপুরী হইতে নির্গত হইয়া পথে সেই বালক-বালিকাকে দেখিতে পাইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে? কাহার সন্তান?" এবং যখন শুনিল যে তাহারা কুবজার পুত্রকন্যা, তখন বলিল "তোমাদের মাতাকে যক্ষগণ হত্যা করিয়াছে, তোমাদিগকে দেখিতে পাইলেও তাহারা মারিয়া ফেলিবে, সুতরাং অগোণে অতি দ্রুত পলাইয়া যাও।" তাহারা যথাসাধ্য দ্রুত গমন করিয়া শ্রমণকুটে উপস্থিত হইল। বালকটি বড় ও কন্যাটি ছোট ছিল। বালক বয়স্ক হইয়া নিজ ভগিনীকে বিবাহ করিল। তাহাদের বংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া যখন বৃহৎ পরিবারে পরিণত হইল, তখন তাহারা রাজার আদেশ লইয়া মলয় পর্বতে বাস করিল। ইহাদিগেরই বংশধরেরা "পুলিন্দ" নামে খ্যাত হইয়াছে।

পাণ্ডু রাজার দূতেরা বিজয়কে রাজকন্যাসহ সেই সকল বহুমূল্য রত্নাদি ও কুমারীগণ অর্পণ করিল। বিজয় এই সকল দূতদের যথাযোগ্য সংবর্দ্ধনা করিয়া সম্মানিত করিলেন এবং কুমারীদের সহিত পদমর্যাদানুসারে স্বীয় মন্ত্রী এবং সেনাপতিদের বিবাহ দিলেন। মন্ত্রীরা এইবার তাঁহাকে রীতি-অনুসারে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া একটি মহৎ উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। বিজয় রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পাণ্ডুরাজ-কন্যাকে সমারোহের সহিত বিবাহ করিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্যীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি এই উপলক্ষে তাহার মন্ত্রীদিগকে অনেক ধন দান করিয়াছিলেন এবং তদবধি বৎসর বৎসর তিনি তাহার খত্তর পাণ্ডুরাজকে এক একটি মুক্তা উপহার পাঠাইতেন, এই মুক্তার মূল্য ছিল দুই লক্ষ মুদ্রা।

অতীতের দুর্ভাগ্য জীবন পরিহারপূর্বক এই নৃপতি সমস্ত লঙ্কার অধিপতি হইয়া অতিশয় জ্ঞানপরতার সহিত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন ; তাঁহার রাজত্ব শান্তিপূর্ণ ও সুখময় হইয়াছিল। ‘তাঁধপানি’ নগরে তিনি এইভাবে আটত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বিজয়ের রাজ্যাভিষেক নামক মহাবংশের সপ্তম অধ্যায় এইখানে পরিসমাপ্ত হইল। এই পুস্তক সুদীর্ঘের চিত্তপ্রশমন, হৈর্যা ও অবিচ্ছিন্ন আনন্দদানের জন্ত সঙ্কলিত হইল।

মহাবংশের অষ্টমাধ্যায়ে পাণ্ডুবাহুদেবের রাজ্যাভিষেক

রাজাধিরাজ বিজয় জীবনের শেষ বৎসর চিন্তা করিলেন, “আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু আমার কোন পুত্র নাই। এই মহারাজ্য বহুকষ্টে আমি গঠন করিয়াছি এবং ইহা বহুলোকাবাসে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই সুগঠিত বিশাল রাজ্য আমার মৃত্যুর পর নষ্ট হইয়া যাইতে পারে ; সুতরাং আমার ভ্রাতা সুমিত্রকে আনাইয়া তাঁহাকে এই রাজ্যে অধিষ্ঠিত করিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি।” তিনি মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের সম্মতিক্রমে ভ্রাতার নিকট একখানি চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু এই পত্র-প্রেরণের কয়েকদিন পরেই বিজয় রাজার মৃত্যু হইল।

তাঁহার মৃত্যুর পর উপতির গ্রামে থাকিয়া মন্ত্রীরা রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রাজার আগমনের জন্ত প্রতীক্ষা করিয়া এই সময়ে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিজয়ের মৃত্যুর এবং নূতন রাজার আগমন পর্যন্ত প্রায় এক বৎসর কাল লঙ্কাদ্বীপ রাজশূন্য অবস্থায় ছিল।

সিংহবাহুর মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুমিত্র রাজা হইয়াছিলেন ; মজদেশের রাজকন্ডার গর্ভে তাঁহার তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। লঙ্কা হইতে দূতগণ আসিয়া রাজাকে বিজয়ের পত্রখানি দান করিল। সেই পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া রাজা তাঁহার তিন পুত্রকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, “বৎসগণ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তোমাদের মধ্যে একজনকে সুন্দর লঙ্কা-নগরে যাইতে হইবে। ইহা আমার ভ্রাতার রাজ্য, তিনি লোকান্তরিত হইলে এখন যে যাইবে, সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবে।”

রাজার সর্ব্বকনিষ্ঠ কুমার পাণ্ডুবাহুদেব যাইতে সম্মত হইলেন। তাঁহার পথে কোন বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা নাই—এ সম্বন্ধে আশঙ্ক হইয়া, পিতার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক ৩২ জন মন্ত্রিপুত্র-সহ ধর্ম্মযাজকের ছদ্মবেশে

তিনি জাহাজে রওনা হইলেন।

সিংহলী কথার উপসংহার

আমরা মহাবংশের আর অধিক অনুবাদ দিব না। বিজয়ের লঙ্কার অভিযান এবং তথায় নব রাজ্যস্থাপন বাঙ্গলার ইতিহাসের অতি শ্রবণীয় ঘটনা এবং বাঙ্গালী জাতির মস্ত বড় গৌরবের বিষয়। প্রত্যেক বাঙ্গালীরই এই বিষয়টি স্মৃতিতে গাঁথিয়া রাখিবার বিষয়, এইজন্য ইহা মূল পালি হইতে সমগ্রভাবে অনূদিত হইল। অধুনা বাঙ্গালীরা বিজয়ের গৌরবের কাহিনী কিছুই জানে না, আমরা আশ্চর্যবিস্মৃত জাতি। বাঙ্গালীর অসামান্য গৌরবের কথা আমরা বিদেশীয়দের বিবরণ ও ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি হইতে কথঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছি। তাহারা যে এসিয়ার দূর দূরান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে বসবাস করিয়া অপূর্ণ কন্মশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত অপরেরা প্রসঙ্গক্রমে দিয়া গিয়াছেন—আমরা আমাদের কথা কিছুই বলি নাই। দ্বীপবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের রূপায় আমরা সিংহল-বিজয়ের বৃত্তান্তটি পাইয়াছি। বাঙ্গলার প্রাচীন সভ্যতা ও জয়শ্রীর এই মুষ্টিমের রত্নালঙ্কার আমাদের নিকট বহুমূল্য।

এই কাহিনীটি নানারূপ উপকথায় বিজড়িত। মহারাজ ধাতুসেনের আদেশে দ্বীপবংশ বিস্তারিত করিয়া লেখা হয়। রিচ্ ডেভিড্‌স্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অহুমান করেন যে বিস্তারিতভাবে পুনর্লিখিত দ্বীপবংশই মহাবংশ নামে পরিচিত। ধাতুসেন বৃত্তীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন—মহাবংশ ঐ সময়ে রচিত হইয়াছিল। বিজয়ের মৃত্যু ৪৪৬ খৃঃ পূর্বে ঘটিয়াছিল এবং পাণ্ডুবাসুদেব ৪৪৬ খৃঃ পূর্বে রাজা হইয়াছিলেন।

অধ্যাপক রিচ্ ডেভিড্‌স্ লিখিয়াছেন, “যে সময়ে মহাবংশ ও দ্বীপবংশ লিখিত হইয়াছে, তাহার বছরে রচিত ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ উপগল্পগুলির সঙ্গে মহাবংশ ও দ্বীপবংশের কাহিনী তুলনা করিলে শেযোক্ত আখ্যায়িকাগুলি অধিকতর বিশ্বসনীয় মনে হইবে।” তিনি আরো বলিয়াছেন, “এই সমস্ত কাহিনী ঠিক ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারা গেলেও ইহারা তাহাদের সময়ের লৌকিক সংস্কারের বখাযখ চিত্র দিয়াছে; সেই চিত্র হইতে আমরা প্রাচীনতর কালের ঘটনার অনেকগুলি ইঙ্গিত পাইতে পারি।” আমরা এই আখ্যায়িকার ভৌগোলিক বিবরণ-সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

দ্বীপবংশ, মহাবংশ, কুলবংশ প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন সিংহলী গ্রন্থে এই ভৌগোলিক বিবরণ-সম্বন্ধে কোন মতান্তর নাই।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বিজয় কর্তৃক সিংহল-বিজয় বঙ্গদেশের তদানীন্তন কালের একটি অতি শ্রেষ্ঠ ও শ্রবণীয় ঘটনা। বিজয়ের বংশধর রাজারা

সিংহল-বিজয় বাঙ্গলার
অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা।

তাহাদের মাতৃভূমি পূর্বভারত কখনই বিস্মৃত হন নাই। ভারতের
পূর্বাঞ্চল হইতে, এমন কি বঙ্গদেশ হইতে, সেই প্রাগৈতিহাসিক

যুগে বহু উজ্জমশীল ব্যক্তি যবদ্বীপ, মাটাবান, কাছোড়িয়া, শ্রাম, সুমিত্রা, জাপান,

চীন প্রভৃতি দেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা সেই সকল অঞ্চলে যে কীর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় গরিমায় উজ্জল। প্রাচ্যবঙ্গ, শ্রামদেশ ও কাছোড়িয়া প্রভৃতি স্থানে বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশীয় বহু কীর্তি বিস্তারিত। স্মৃতি ও বালীদ্বীপে খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর যে সকল প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের হ্রাচ অনেকটা পাল রাজাদের সময়ের স্বাক্ষরের মত। বালী ও যবদ্বীপের শুধু লিপি নহে, অনেক প্রস্তর ও ধাতু-মূর্তিতে বাঙ্গালী-ভাস্করের হস্ত-চিহ্ন অতি স্পষ্ট। অধুনা চট্টগ্রামের দেয়াং পাহাড়ের নিকটে ভূনির হইতে অষ্টম ও নবম শতাব্দীর বহু ধাতব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই স্থানে আমরা সেই মূর্তিগুলির একখানির এবং বালী-জাবা দ্বীপের কয়েকখানি বুদ্ধ বিগ্রহের ছবি দিলাম। আমার নিকট আরও দুইখানি ছিল, একখানি আমি মজিলপুরের কালিদাস দত্ত মহাশয়কে দিয়াছি। পাঠক দেখিবেন, বাঙ্গালী কৃত বিগ্রহ ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মূর্তিগুলি শুধু যে এক আদর্শে নির্মিত তাহা নহে, তাহাদের সাদৃশ্য এত অধিক যে, মনে হয় তাহারা একই ভাস্করের দ্বারা নির্মিত। পাল রাজাদের সঙ্গে যে ভারতীয় ঐ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি সিংহল-বিজয়কেই আমরা বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বলিয়া মনে করি।

এককালে ‘বাহ’ শব্দযুক্ত নাম প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের বৈশিষ্ট্য ছিল। চন্দ্রগুপ্তের গুপ্ত ভদ্রবাহুর বাড়ী পৌণ্ড্রবর্ধনে (বঙ্গে) ; ধর্মপালের সমসাময়িক আসামের রাজা ছিলেন বীরবাহ। এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ‘কুর্তিবাসী’ রামায়ণে বীরবাহুর উল্লেখ আছে, সংস্কৃত রামায়ণে নাই—উহা বাঙ্গালী করনার সৃষ্টি বলিয়াই মনে হয়।

সিংহবাহুর জন্মকথা একটা গল্প মাত্র। গল্পটা রোম-নগর-স্থাপয়িতা রমুলাসের গল্পের মত। সমুদ্রতীরে রমুলাস ও তাঁহার ভ্রাতা রিমাসকে এক ব্যাঘ্রী স্বীয় স্তন্য পান করাইয়া পালন করিয়াছিল। সিংহবাহুর সম্বন্ধে উপকথাটার দোড় আরও অনেক বেশী। ইহাতে দৃষ্ট হয় সিংহবাহুকে একটা সিংহ জন্মদান করিয়াছিল। বঙ্গদেশে পশুরাজের সঙ্গে সেদিনও মণিপুরের রাজমুর্তি অঙ্কিত পাওয়া যাইত। সিংহ এদেশে চিরকালই পরাক্রমের লাক্ষণ। গোড়েশ্বর রামপালের দ্বিতীয় পুত্র কুমারপালের সেনাপতি বৈষ্ণবদেব একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পরাজিত রাজাদের মুকুটের সোনা দিয়া এক বৃহৎ সিংহ গড়াইয়াছিলেন এবং তাহা তাঁহার প্রাসাদের তোরণের উর্দ্ধে স্থাপন করাইয়াছিলেন। ত্রিপুরা প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের কোন কোন প্রাচীন রাজ-সিংহাসন ষোড়শ সিংহ-দ্বারা দ্রুত। সিংহলাধিপ একটি মোমনির্মিত সিংহ মগধেশ্বরকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা দেখিতে ঠিক জীবন্ত সিংহের মত হইয়াছিল; ঐ সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ ছিল। পিঞ্জরের দ্বার না খুলিয়া কেহ পশুরাজকে বাহির করিতে পারেন কিনা পরীক্ষা করিবার জন্ত সিংহবাহুর বংশধর সিংহটা মগধে মহানন্দের সভায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। একটা উত্তপ্ত লৌহশলাকা পিঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করাইলে সিংহ গলিয়া বাহির হইয়া আসিল। মগধবাসীর বুদ্ধির জয়জয়কার পড়িল। সিংহ-সম্বন্ধে এইরূপ নানা

ঐতিহাসিক কথা ও উপকথা বাঙ্গলা দেশের প্রচলিত আছে। এদেশে যে দরজায় কোন সিংহমূর্তি নাই—সে দরজা যদি গৃহের পুরোভাগে প্রবেশ-পথে থাকে, তবে তাহাকেও ‘সিংদরজা’ বলে এবং রাজা সিংহশূন্য আসনে বসিলেও তাহা ‘সিংহাসন’ নামে অভিহিত হয়। সেদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী মল্লবীরের শেষ পরীক্ষা ছিল সিংহের সহিত লড়াই করা। উদাহরণ-স্বরূপ একশত বৎসরের প্রাচীন একখানি চিত্রপটের প্রতিলিপি এখানে দেওয়া যাইতেছে। ইহা কালীঘাটের এক পটুয়া আঁকিয়াছিল। একশত



সিংহের সহিত মল্লবীরের যুদ্ধ।

(১০০ বৎসরের প্রাচীন কালীঘাটের চিত্র)

বৎসরের প্রাচীন হইলেও চিত্রের আদর্শটি বহু প্রাচীন। পটুয়ারা পুরুষায়ক্রমে একই

আদর্শে চিত্র অঙ্কন করিয়া থাকে। বাঙ্গালী মল্লবীর সিংহকে আলিঙ্গন-বদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে মল্লের অল্পমাত্রও আয়াস দৃষ্টি হয় না, অথচ আলিঙ্গনটি এত নিবিড় যে সিংহের মুখের হাঁ অতি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন, চক্ৰিশ পরগনার অন্তর্গত বাওয়ালীর মোড়লদের একটা বিরাট রথে সিংহের সঙ্গে এক মল্লবীরের লড়াইয়ের ছবি কাঠে নিশ্চিত হইয়াছিল। সিংহটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু মল্লবীরের মূর্তিটা এখনও ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে, সে মূর্তি বীরের মূর্তি বটে। আমাদের শিল্প, সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র ও দেবমন্দির ‘সিংহময়’ বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। ‘সিংহবাহিনী’-মূর্তি বিশেষ-ভাবে বাঙ্গালীর পূজিত দেবতা।

সিংহের প্রবাদ নানাকারণে এদেশে সম্ভবপর হইয়াছে। এই সিংহ-সংক্রান্ত উপকথার মধ্যে সত্যকথা এই যে পূর্ববঙ্গের সীমান্তে রাঢ়দেশে কোন অনাথ্য দস্থ্য-দলপতি বঙ্গদেশাগত বণিকৃদিগের সম্পত্তি লুণ্ঠনপূর্বক বঙ্গেশ-তনয়াকে বহুকাল আটকাইয়া রাখিয়াছিল, এবং পরিশেষে অনৈক্য হওয়াতে রাজকুমারী সন্তানদ্বয়সহ পিতৃগৃহে আসিয়াছিলেন। এই দলপতির ‘সিংহ’ উপাধি থাকাও কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। সম্ভবতঃ এইরূপ কোন ব্যাপারকে পরিশেষে একটা গল্পের আকার দিয়া সিংহবাহুর বিবরণ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু উপকথাটি যে রূপ হউক না কেন, তাহার ভিতরকার যে ভৌগোলিক বৃত্তান্তটি আছে, তাহা অতি স্পষ্ট, সত্য-সন্ধান করিবার সময় আমরা তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। এই আখ্যানটি পড়িলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে বঙ্গ ও মগদের মধ্যে রাঢ় নামক প্রদেশের একাংশে সিংহপুর রাজধানী সিংহবাহু কর্তৃক খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে স্থাপিত হইয়াছিল।

কলিকাতায় আমার পরিচিত যে সকল সিংহলী বদ্ধ আছেন বা এককালে ছিলেন, তাঁহাদের কয়েকখানি আলোক-চিত্র এইখানে প্রদত্ত হইল। সিংহলী বৌদ্ধদের সকলেরই বাঙ্গালীর চেহারা, ইহা দৃষ্টি-মাত্রই প্রতীয়মান হইবে। বিজয় ও তৎসহগামীদের বহু পরবর্তী বংশধরদের চেহারার সঙ্গে প্রায় তিন হাজার বৎসর পরেও যে বাঙ্গালীদের এরূপ অবিকল সাদৃশ্য পাওয়া বাইতেছে ইহা একটু আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। তাহার এক কারণ এই যে, বঙ্গদেশের লোকেরা সকলেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া কতকটা স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে দাক্ষিণাত্যের তামিলভাষী বহু লোক সিংহলে বাস করিয়া সিংহলী হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হিন্দু। বৌদ্ধগণ তাঁহাদের সহিত ততটা মিশেন নাই। দ্বিতীয়তঃ শুধু বিজয় ও তাঁহার অল্পবর্জিগণ নহেন, সেই সময় হইতে বাঙ্গালীর এই উপনিবেশে পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন যুগের শত শত বাঙ্গালী বাইরা তথায় বসবাস করিয়াছিলেন। সেন রাজাদেরও অনেক পরে এই অভিবাসন ধামিয়াছে। সিংহলে এরূপ পরিবার আছেন যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ৭৮ পুরুষ পূর্বে বঙ্গদেশ হইতে তথায় গিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের অনেক স্থলে এখনও যে ‘পালওয়ার’ নৌকা দৃষ্ট হয়, সিংহলেও সেইরূপ নৌকা প্রচলিত আছে (ছবি দেখুন)। বাঙ্গালীর বহু প্রাচীন পুস্তকে সিংহলে যাতায়াতের বিবরণ আছে। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, সত্যপীরের কথা,



সিংহলী ধর্মপাল—৮৬ পৃঃ, ২০শ ছত্র।



বিমলানন্দ—৮৬ পৃঃ, ২০শ ছত্র।



ধর্মপাল, বৃদ্ধ বয়সে—৮৬ পৃঃ, ২০শ ছত্র।



দেবপ্রিয় বলী সিংহ—৮৬ পৃঃ, ২০শ ছত্র।



শেভারেও শীলানন্দ—৮৬ পৃঃ, ২০শ ছত্র।



শেভারেও শিকার ও তাঁহার সিংহলী বন্ধু—৮৬ পৃঃ, ২০শ ছত্র।



পালোয়ার নৌকা—৮৬ পৃঃ, ৩১ ছত্র।

এমন কি শনির পাঁচালী প্রভৃতি বহু সংখ্যক কুজ-বৃহৎ কাব্যে যেখানেই কোন বণিকের সফরে যাওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেইখানেই সিংহলে যাওয়াটা তাঁহার অপরিহার্য্য কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্বারা সিংহলের সঙ্গে বঙ্গের ব্যাপক সম্বন্ধ অস্বীকৃত হইতেছে। *

আর্য্যবর্ষ এখন বৌদ্ধযুগের শত শত কীর্তির শ্মশান। সেই নালন্দা-বিহার, অশোকের রাজপ্রাসাদ, রেলিং ও বিজয়স্তম্ভ—এ সমস্তের ভাঙ্গা নিদর্শন কিছু কিছু ভূনিম্নে পাওয়া যাইতেছে। কথিত ৮৪ হাজার অশ্বশাসনের অতি সামান্য কয়েকখানি মাত্র পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু বৌদ্ধযুগের আদি ইতিহাস সিংহলে অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে।

সমুদ্রের অতলতলে হতসর্কস বণিক বৈরূপ স্বীয় অগাধ সম্পত্তির একটি সামান্য অংশ উদ্ধার করিতে পারিলেও তাহা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরে—সিংহলের মহাবংশ, দ্বীপবংশ ও কুলবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের নিকট তেমনই মূল্যবান ও বহুপূর্ব্বক রক্ষা করিবার সামগ্রী। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস এই সকল গ্রন্থে বাহা আছে, ভারতের আর কোথায়ও তাহা নাই। এইজন্যই সিংহল-বিজয় ভারতের ঐতিহাসিক একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই সিংহলের সঙ্গে বাঙ্গালীর সম্বন্ধের সংস্কারমূলক কাহিনী বঙ্গসাহিত্যের অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে, একথা আমরা এই মাত্র উল্লেখ করিয়াছি। উপসংহারে আমরা সিংহল-কলোম্বো-নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদীশ্বরমের স্থলিখিত একটি প্রবন্ধ হইতে নিম্নের কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি; এই প্রবন্ধ গত জুন মাসের (১৯৩৩) “কলিকাতা রিভিউ” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে :—

“The Singalese who form the vast majority of the Ceylonese are descendants of Vijay the Bengali Prince, and hence in language specially the Singalese has close affinity with the Bengali. Fifty per cent. of words

* বাঁহারা বঙ্গের দাবীর প্রতিকূলতা করেন, তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন দ্বীপবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি প্রাচীনতম পুস্তকে যে বঙ্গ ও মগধের কথা আছে, তাহা সর্বেস্ব কল্পনা। এই যুক্তিটা শারীরিক জবরদস্তি মাত্র, ইহা উত্তর দেওয়ার যোগ্য নহে।

আবার কেহ কেহ বলেন, সিংহবাহুর মাতার নাম হর্পাসেবী,—জজরাটের হুপারিক বন্দরের নাম হইতে ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। যদি কোন লোকের নাম দিয়াই তাহার বাড়ীর খবর পাওয়া যায়, তবে বঙ্গদেশে গয়ারাম, অযোধ্যাপ্রসাদ, বনুনা, সিদ্ধু, বৃন্দাবন, মথুরা, ষারকা, নবদ্বীপ প্রভৃতি শত শত দেশ-বাচক নামধারী লোককে তত্ত্ব দেশবাসী বলিতে হয়। “হর্পাসেবী”র নাম হরুপা কি “হুপ্রিয়াস” রূপান্তর হইতে পারে।

কিন্তু আরও কথা, সিংহবাহুর মাতার নাম হর্পাসেবী, তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই নামটি দ্বীপবংশে পাওয়া যায়। দ্বীপবংশই সিংহলের সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রাচীন ইতিহাস,—উহাই গ্রন্থ। আমরা মহানাম-কৃত মহাবংশের অনুবাদ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, তাহাতে শুধু “বঙ্গরাজকন্ত” এই ভাবের উল্লেখ আছে, তাঁহার নাম নাই। এই অনুবাদ একান্ত ভাবে মূলানুগত বলিয়া গ্রন্থকার দাবী করিয়াছেন।

যদি দ্বীপবংশ ও মহাবংশের বহু পরবর্ত্তী কোন টীকায় সিংহবাহুর মাতার অঙ্গরূপ নাম থাকে, তবে দ্বীপবংশকে অগ্রাহ্য করিয়া সে নাম কেনই বা গ্রন্থ হইবে? বিজয়ের সিংহল অধিকার-সম্বন্ধে দ্বীপবংশই সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। পূর্বেই বলিয়াছি দ্বীপবংশ ও মহাবংশই সিংহলের আদিগ্রন্থদ্বয়।

of classical Singalese are identical with those of Bengali. So though Ceylonese as a whole is a "Crown Colony" of greater India, Singalese Ceylon is an important part of greater Bengal. Both the Singalese and the Bengali belong to the same stock of North Indian Aryans and so have many things in common with them. Comparative Philology of Bengali and Singalese will reveal great treasures of linguistic wealth of greater Bengal. In my paper "Bengal and Ceylon" read before the greater Bengal Section of Prabashi Banga Sahitya Sammilani, held last December in Allahabad under the esteemed presidentship of Dr. Kali Das Nag, I emphasised the urgent need of founding a Greater Bengal Society or *Brihattara Banga Samity* in Calcutta early to carry an organised activity and research on this neglected but vitally important subject of Bengal's national history ;.....that modern Bengal will be richer in every way by the services of such a society is open to no doubt. In South Kanara there are people called Gonda Brahmins who claim that they are immigrants from Bengal. Their language called Kankani, only a colloquial tongue with no written script, is a South Indian edition of Bengali and nothing else. From this, Gujrat, Java and especially from Singalese Ceylon many things of Greater Bengal can be unearthed" (pp. 294-95).

ইহার মর্মার্থ এই,—বর্তমান সিংহলীগণ বঙ্গের রাজকুমার বিজয় ও তাঁহার সহচরদের বংশধর, এই জন্তই সিংহলী ও বাঙ্গলার এতটা সাদৃশ্য। প্রাচীন সিংহলীর অর্ধেক শব্দ বঙ্গভাষার শব্দ। সুতরাং যদিও সিংহলদ্বীপকে বৃহৎ ভারতের উপনিবেশগুলির "মুকুট" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তথাপি সিংহলবাসিগণ বিশেষভাবে বৃহত্তর বঙ্গদেশবাসীদেরই স্বগণ। সিংহলী ও বাঙ্গালী—এই দুই জাতিই উত্তরাপথের আর্য্যবংশ-সম্মত এবং ইহাদের মধ্যে এই জন্তই নানাবিধে সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। সিংহলীভাষা এবং বঙ্গভাষার তুলনামূলক তথ্য সন্ধান করিলে বৃহত্তর বাঙ্গলাভাষার এক অপূর্ণ ভাণ্ডারের পরিচয় পাওয়া যাইবে। গত ডিসেম্বর মাসে, বৃহৎ বঙ্গের প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যিকগণের সম্মিলনে আমি "বাঙ্গলা দেশ ও সিংহল" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। মনীষী ডাঃ কালিদাস নাগ সভাপতি ছিলেন। আমি সেই প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া ইহাই বলিয়াছিলাম যে অগোণে "বৃহত্তর বঙ্গ সমিতি" নামক একটি প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় স্থাপিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। বৃহৎবঙ্গের উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এইরূপ একটা প্রতিষ্ঠান বঙ্গদেশের পক্ষে অতি মূল্যবান সন্ধান প্রদান করিয়া বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করিবে। আধুনিক বঙ্গদেশ যে এবংবিধ অমুঠান-দ্বারা প্রচুররূপে উপকৃত হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। দক্ষিণ কানারায় গোণ্ডা নামক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহারা দাবী করেন যে তাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের কথিত ভাষার নাম "কঙ্কণী," এই ভাষায় কোন লিখিত পুস্তক নাই, কিন্তু অমুঠান সন্দেহও নাই যে, এই ভাষা বাঙ্গলা ভাষারই একটি দক্ষিণাত্য সংস্করণ

ছাড়া আর কিছুই নহে। এই সমস্ত হইতে এবং গুজরাট, জাভা, বিশেষ করিয়া সিংহলী ইতিহাস হইতে, বৃহৎ বঙ্গের অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

আমরা গুজরাট ও মধ্যভারতে বঙ্গীয় উপনিবেশের কথা বলিয়াছি। এইবার শ্রীবৃক্ষ জগদীশ্বরমের প্রবন্ধ হইতে বাঙ্গালীর প্রাচীন বিস্তৃত উপনিবেশ-চেষ্টার আরও কিছু সমর্থন পাওয়া গেল। পূর্বভারতীয় দ্বীপমালা, চীন, শ্রাম, জাপান প্রভৃতি বহুস্থানে স্বরণাতীত কালের চিহ্নগুলি এখন বঙ্গের ইতিহাস-লক্ষীর ভাণ্ডারে লুক্কায়িত আছে।

আশ্চর্যের বিষয়, ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের ইতিহাস শিখিবার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বহুব্যয় স্বীকার করিয়া দলে দলে ছাত্রগণ ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন, সেখানে তাঁহারা এ দেশের পুরাতন শিক্ষার পর কখনও কখনও জার্মেনী ও প্যারীতে যাইয়া পাঠ সাজ করিয়া উপাধি লইয়া আসেন। ভারতের পুরাতনের খনি বাড়ীর কাছে, তাহার সন্ধান লওয়াও অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়-সাধ্য। কিন্তু তাহাই খোঁজ করিতে আমরা দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াই এবং আমাদের বিলাতের গুরুগণ যতটুকু দিয়াছেন—তাহার বেশী অগ্রসর হইতে ভয় পাই, বেহেতু পাছে তাঁহাদের সঙ্গে মতান্তর হয় এবং ডিগ্রিলাভ না ঘটে। পরাধীন ভারতবর্ষের অধিবাসীদের লইয়া নিয়তি কতরূপই বিক্রম ও রহস্তের খেলা খেলিতেছেন, তাহার জন্ত দ্রব্য করিলে কি হইবে?

বিজয়ের মৃত্যুর পর পাণ্ডুবান্ধব সিংহলের রাজা হন। ইহার পর তৎপুত্র অভয় এবং অভয়ের মৃত্যুর পর তাহার ভাগিনেয় পাণ্ডুকান্ড ৭০ বৎসর সিংহলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পাণ্ডুকান্ডের পুত্র মুতাশিব ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন, মুতাশিবের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র তিন্ন সিংহলের রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালে খৃঃ পূঃ ৩০৯ অব্দে অশোকের পুত্র, বিদিশার (বর্তমান ভিল্‌সার নিকটবর্তী বৈশ নগরীর) দেবী নামিকা মহাবীর গর্ভজাত মহেন্দ্র এবং তাঁহার কন্যা সজ্জামিত্র ধর্মের সুসমাচার প্রচারার্থ সিংহলে আগমন করেন। হিউনসাঙ ইহাদিগকে অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সিংহলীদের ইতিবৃত্ত-সম্মুখারে ইহারা অশোকের পুত্র-কন্যা।

মহারাজ তিন্ন যুবরাজ মহেন্দ্রের কাব্য-বস্ত্র-পরিহিত প্রতিভাপূর্ণ দীপ্ত মূর্তি দেখিয়া বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে স্বতঃই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—“ভারতবর্ষে এক্ষণ বৈশাখী কতজন আছেন?” মহেন্দ্র বলিলেন, “গৈরিক বসনে ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন ও সমুজ্জল, তথায় বুদ্ধশিষ্যের সংখ্যা অগণিত।”

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক যুগ, বুদ্ধদেব

[বুদ্ধদেব—৫৬৩-৪৮৩ খৃঃ পূঃ]

“উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার।”

—বিজ্ঞেন্দ্রলাল।

“নিদ্রাসি বজ্রবিধেরহহ শ্রুতিজাতঃ

সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতঃ

কেশব ধৃত-বুদ্ধ-শরীর—জয় জগদীশ হরে।”

—জয়দেব।

এই যুগে (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে) ব্রাহ্মণশাসিত ভারতবর্ষে বৃহৎ বাগলা এক নূতন আদর্শ লইয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল। বুদ্ধদেব খৃঃ পূঃ ৫৬৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। হিউনসাঙ এবং তাঁহার সময়কার চীনা লেখকগণের মতে বুদ্ধদেবের জন্মকাল ৮৫০ খৃঃ পূঃ। কপিলাবস্তুর * অনতিদূরে লুধিনী বনে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি রাজা শুদ্ধোদন ও রাণী মায়াদেবীর পুত্র।† কথিত আছে, তাঁহার পূর্ণগর্ভা জননী স্বীয় পিতালয়ে ঘাইতেছিলেন, পথিমধ্যে লুধিনী বনে ‡ তাঁহার প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইল। সেই বনে হয়ত তাঁহার উদরে

* কপিলাবস্তুর শাক্যরাজাদের রাজধানী ছিল; শাক্যরাজ্য বর্তমান বগি ও গোরক্ষপুর জেলার উত্তরে কোশল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

† রাজা শুদ্ধোদন কলি নামক স্থানের অধিপতি অজ্ঞানের মহামায়া ও গৌতমী নামী দুই কন্যা বিবাহ করেন। মহামায়া বা মায়াদেবী বুদ্ধের জননী, কিন্তু গৌতমীই মাতৃহারী বালক বুদ্ধের গালগিড়ী; বৌদ্ধশাস্ত্রে ইনি “মহাপ্রজ্ঞাবতী” নামে উল্লিখিত।

‡ লুধিনী বৌদ্ধধর্মের বেথেলহাম। রাজা অশোক এই স্থানে উপস্থিত হইলে তাঁহার গুরু উপগুপ্ত বলিয়া উঠিয়াছিলেন, “মহারাজ, এই স্থানে সেই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।” উপগুপ্ত-উচ্চারিত ঠিক এই কথাগুলি অশোক তৎপ্রতিষ্ঠিত স্মারকস্তম্ভে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। অক্ষরগুলি একটুও স্নান হয় নাই, এখনও উজ্জ্বল ও স্পষ্ট আছে।

অস্ত্রোপচার করিয়া পুত্রকে বহির্গত করা হইয়াছিল। লৌকিক সংস্কার—গৌতমবুদ্ধ জননীর কুক্ষি ভেদ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহাপুরুষেরা প্রায়ই অযোনিসম্ভব; প্রবাদটি এই প্রাচীন সংস্কারের প্রতিপোষক হইতে পারে,—নতুবা ইহা অস্ত্রোপচারের ইঙ্গিত-সূচক। জন্মের কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি মাতৃহারা হইলেন। তাঁহার জন্ম হইতে তরুণ যৌবনাবধি জীবনকাহিনী অনেক উপগল্পজড়িত। শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি শাক্যসিংহ বলিয়া খ্যাত, তাঁহার অপর নাম গৌতম।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহাকবি অথবোধ বুদ্ধের চরিতকথা কবিত্বচ্ছটায় উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন, তৎপূর্বে ললিতবিস্তরে সেই আখ্যায়িকা বিবৃত হইয়াছিল। অথবোধের

জাতকের গল্পকথা।

বুদ্ধচরিত অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত কবি এডুইন আরনল্ড 'এশিয়ার আলোক' নামক কাব্য লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া বুদ্ধদেবের পূর্বকার জন্মকাহিনী-সংবলিত বৌদ্ধজাতকগুলি নানারূপ অতিরঞ্জন ও গল্পের সাজসজ্জা লইয়া ভক্ত পাঠকমণ্ডলীর শ্রদ্ধা পাইয়া আসিয়াছে। যদিও এই সকল জন্মকথার অধিকাংশেরই কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, তথাপি বুদ্ধজন্মের পূর্ববর্তী তৎকাল-প্রচলিত ভারতীয় নানা প্রবাদ এই জাতক-কাহিনীগুলিতে স্থান লাভ করিয়াছে। এই নিমিত্ত জাতকগুলির একটা বিশেষ মূল্য আছে।

"পঞ ঞ্জ এসত পঞ ঞ্জাস" (৫৫০) জাতকে বুদ্ধদেবের ঐ সংখ্যক জন্মের বৃত্তান্ত আছে; ইহা ছাড়া আরও অনেক জন্মের কথা নানা উপাখ্যানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। * বুদ্ধ মনুষ্যরূপে, অথবা পক্ষী, কুর্কুর, মৃগ, মৎস্য, মর্কট, ইন্দুর প্রভৃতি যেভাবেই বেখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন—সেইরূপেই কোন না কোন মহৎ গুণের আদর্শ দেখাইয়াছেন। বৌদ্ধগণ যে সকল গুণ সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন, জাতকের উপগল্পে মনুষ্য ও জীবজন্তুরূপে বুদ্ধ সেই সকল গুণের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। যদিও অনেকগুলি উপাখ্যানেই ত্যাগধর্মকে খুব বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে, তথাপি সাহস, তেজ, বীৰ্য্য প্রভৃতি গুণও কোমলতর গুণরাশির আড়ালে পড়ে নাই। গৌতম কাঠবিড়াল-জন্মে বিন্দু বিন্দু জল তুলিয়া সমস্ত সমুদ্র শোষণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন,—এই জন্মে তিনি "বীৰ্য্যপারমিতা" সম্পন্ন করেন। এইভাবে সিংহ-জন্মে "সত্যপারমিতা" এবং বেখাস্তরজাতকে "শীলপারমিতা" এবং মর্কট-জন্মে "প্রজ্ঞাপারমিতা" সম্পাদন করেন। কিন্তু ত্যাগমূলক কাহিনীগুলিই সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমরা এখানে একটি জাতকের বৃত্তান্তের উল্লেখ করিব, আরনল্ড এই গল্পটি তাঁহার কাব্যে মনোরম ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

* কথিত আছে, যুগে যুগে জগতে অসংখ্য বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্বশেষ বুদ্ধ চতুর্থের নাম—জকুচ্ছন (খৃঃ পূঃ ৩১০১), কনকমুনি (খৃঃ পূঃ ২০০০), কান্তপ (খৃঃ পূঃ ১০১৪) এবং শাক্যসিংহ ৫৬০ খৃঃ পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই বুদ্ধ-প্রাণ চারিটি মহাপুরুষ যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা "মহাভদ্রকল্প" নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

কোন এক জন্মে বুদ্ধদেব একজন তপস্বী ছিলেন। সেই সময়ে একদা ভীষণ অনারুটি ও রৌদ্রের তেজে সমস্ত দেশ শুকাইয়া গিয়াছিল। অগ্নি-সদৃশ রৌদ্রের উত্তাপে ও আহাৰ্য্যের

তপস্বীর মহৎ
আত্মোৎসর্গ।

অভাবে সমস্ত জীবজন্তু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তপস্বী তাঁহার গম্ভীৰ্য্য আশ্রমে যাইবার পথে এক বৃহৎ ভূভাগ জীবকঙ্কালে ও শব-দেহে পূর্ণ দেখিতে পাইলেন। একটি খালের ধারে এক করুণ দৃশ্য

বিশেষভাবে তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। বহুদিবসের উপবাসক্লিষ্টা একটা ব্যাত্তী অনাহারে অন্তিম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল,—তাঁহার হুইট শাবক তাঁহার স্তনে মুখ সংলগ্ন করিয়াছিল, কিন্তু স্তনে বিন্দুমাত্র স্তন্য ছিল না; তাঁহার বৃদ্ধা সেই মৃনু মাতৃবক্ষ হইতে স্নান আহরণ করিতে চেষ্টা পাইতেছিল। খড়ের ঘরের বাঁশের বেড়ার উপর জোরে হাওয়া বাহলে উহা বেক্ষণ কাঁপিয়া উঠে, ব্যাত্তীর প্রবল অন্তিম নিঃশ্বাসে তাঁহার মাংস-শূন্য, স্বক্ৰমাত্রে-আবৃত অস্থিপঞ্জর তেমনই কাঁপিতেছিল। আর কিছুকালের মধ্যে এই তিনটি প্রাণীর জীবনান্ত ঘটিবে। তপস্বীর হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল। তিনি ভাবিলেন, “আমি কি এই তিনটি জীবের কোনই উপকার করিতে পারি না?” তিনি সম্মুখে ও দূরে চাহিয়া দেখিলেন—মাটি রৌদ্রের তাপে তাম্রবর্ণ, তাঁহাতে তৃণ কি ঘাসের চিহ্ন নাই। খালে একবিন্দু জল নাই, উহা একেবারে শুষ্ক। তখন তপস্বী স্বীয় সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিলেন।

আমি কি এই তিনটি তিন মাথার পাগড়ী, গায়ে অঙ্গরক্ষা ও পায়ের উপান ও দূরে ফেলিয়া মৃতকর জীবের কোনই দিলেন এবং একটুকরা নেংটি মাত্র রাখিয়া নগ্নদেহে ব্যাত্তীর সম্মুখে উপকার করিতে পারি না? উপস্থিত হইলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন—“মাতঃ, এই দেখ, তোমার খাদ্য সম্মুখে।” সেই আত্মানে মৃনু ব্যাত্তীর অর্ধনিম্নলিত চক্ষু উন্মুক্ত হইল, হিংস্র বুদ্ধ মাংসাত্মীর নয়নতারকা অগ্নিদুগ্ধের স্তায় জ্বলিয়া উঠিল। ব্যাত্তী এক লক্ষ্যে সম্মানসীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহার শোণিত পান করিতে লাগিল। সেই হিংস্র উল্লাস-লীলার সঙ্গে যখন তপস্বীর প্রাণবায়ু শেষ হইল, তখন দেখা গেল—তাঁহার চক্ষে ত্যাগ-জনিত এককোঁটা পুলকান্দ।

মহেন্দ্রসেনাবদানে বুদ্ধের আর একটি জন্মবৃত্তান্ত আছে। কানীরাঙ্গ মহেন্দ্রসেন খুব উদারচিত্ত ও দানশীল ছিলেন। তাঁহার শত্রু—সামন্ত রাজারা—

মহেন্দ্রসেন ও জীবশর্মা।

রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছে। বনবাসী রাজা নির্বিকারচিত্তে সমস্ত দুঃখ বরণ করিয়া লইলেন। একদা জীবশর্মা নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “মহাশয়! রাজা মহেন্দ্রসেনের নিকট আমি যাইব, কোন্ দিকে তাঁহার রাজধানী?” মহেন্দ্রসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাঁহার নিকট আপনার কি দরকার?” ব্রাহ্মণ বলিলেন, “তিনিই হইল তাঁহার মত দাতা জগতে নাই—আমি অর্থকামী, অর্থের আশায় তাঁহার নিকট যাইতেছি।” রাজা তাঁহার নিজের পরিচয় দিয়া বর্তমান অবস্থা জানাইলেন। জীবশর্মা অত্যন্ত দুঃখিতভাবে বলিলেন, “আমার অদৃষ্ট এইরূপই, নতুবা আপনার স্তায় মহাত্মার এই অবস্থা কেন হইবে?” তিনি বিমনা হইয়া অনেক বিলাপ করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্রসেন

সেই সকল বিলাপ শুনিয়া বড়ই দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন ; কিছুকাল চিন্তা করিয়া তিনি জীবশর্মাকে বলিলেন, “আপনি এক কাজ করুন, এই তরুলতাগুলি দিয়া আমার হাত বাধুন, তারপর এখন যিনি আমার স্থলে রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহার নিকট আমাকে লইয়া গিয়া বলুন, ‘মহারাজ ! আমি আপনার শত্রুকে ধরিয়া আনিয়াছি। আমাকে পুরস্কৃত করুন।’ এই কথা শুনিয়া তিনি প্রীত হইয়া আপনাকে প্রচুর অর্থ দিবেন এবং আমাকে বধ করিবেন।” ব্রাহ্মণ একজন মহামনা রাজার হত্যার ব্যবস্থা করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে স্বভাবতঃই দ্বিধাবোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অত্যন্ত অর্থ-লালসার অবশেষে তাহাই করিতে সম্মত হইলেন।

পূর্বে এক জন্মে বুদ্ধদেব ছিলেন কাশীরাজ মহেন্দ্রসেন। পূর্বে পূর্বে কত জন্মের স্মৃতি ও ত্যাগস্বীকারের ফলে যে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন—এই সকল জাতক-কাহিনীতে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বুদ্ধ বিশ্বের দাবতীয় জীবজন্তুর জীবন অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং সর্বজীবের প্রতি সহানুভূতি ও দয়া তিনি অর্জন করিয়া বুদ্ধত্বের যোগ্য হইয়াছিলেন,—জাতক-পরিকল্পনা সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্যে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা-প্রসূত। ইতর জীব ও মানবের মধ্যে যে বিভিন্নতার রেখা যুরোপীয়েরা টানিয়াছেন, ভারতবর্ষ তাহা কোন কালেই স্বীকার করেন নাই।

আর্য্যাবর্তে অতি প্রাচীন কাল হইতে নানা বুদ্ধবীর, ধর্মবীর ও কর্মবীরগণের সম্মুখে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত ছিল,—হিন্দু ও জৈনেরা তাঁহাদের পুরাণে এবং বৌদ্ধগণ তাঁহাদের জাতকে নিজ নিজ উপাস্তদেবতা ও দেবকর ব্যক্তিকে কেন্দ্র-স্থানে স্থাপনপূর্বক সেই সকল তাঁহাদের স্বকীয় মুদ্রালাঙ্কিত করিয়া নিজ নিজ শাস্ত্রে চালাইয়াছেন।

মহাভারত ও হিন্দু পুরাণাদিতে যে সকল কথা আছে, বৌদ্ধজাতক ও জৈনপুরাণে অনেক স্থলেই তাহা রূপান্তরিত হইয়া স্থানলাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ প্রত্যেক শ্রেণীই তাঁহাদের উপাস্তদেবতাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন উপকথাগুলিকে স্বীয় শাস্ত্রের অন্তর্গত করিয়াছেন। সুপ্রাচীন ইতিহাস ও উপকথার ভাণ্ডার সেই সকল দেবতার জন্ম-জন্মান্তরীণ লীলার যোগান দিয়াছে। এইভাবে শিবপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বরাহপুরাণ, দেবীপুরাণ প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধজাতকগুলি বৌদ্ধদিগের সেইরূপ পুরাণ ভিন্ন আর কি ?

গৌতমের জন্মের পর মহর্ষি কালদেবল (অসিত) রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “এই শিশুর শরীরে রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ দৃষ্ট হয় ; যদি ইনি সংসারে থাকেন, তবে জগজ্জয়ী সম্রাট হইবেন, যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বনবাসী হন, তবে এমন ধর্মপ্রচার করিবেন বাহা সমস্ত জগদ্বাসী গ্রহণ করিবে। কালদেবল শিশু-গৌতমের শরীরে ২২টি মহাপুরুষের লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে হনুমান্ অশোকবনস্থিতা সীতাদেবীর নিকট রামচন্দ্রের শরীরের যে সকল লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছিলেন, উহাদের সঙ্গে ললিতবিস্তরের এই সকল লক্ষণের অনেকটা ঐক্য দৃষ্ট হয়।

পুল সন্ন্যাসী হইয়া যশস্বী হইবেন, ইহা সচরাচর কেহ চান না ; জনকজননী ইচ্ছা করেন, যেন পুল রাজচক্রবর্তী হন। কিন্তু অন্নবয়স হইতেই দেখা গেল, গৌতম ভাবুকের মত বসিয়া চিন্তা করেন এবং তিনি কতকটা উদাসীন। এক সময়ে তাঁহার খুল্লতাত-পুল দেবদত্ত একটি কপোতের প্রতি শরঞ্জেপ করেন, প্রাণের ভয়ে পক্ষীটা শিশুগৌতমের ক্রোড়ে আশ্রয় লয়। গৌতম তাহার বক্ষ হইতে শর তুলিয়া ফেলিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহার ক্ষতস্থানে ঔষধের প্রলেপ দিয়া প্রাণরক্ষা করেন। তাঁহার ভাতা সেই কপোতটি স্বয়ং শিকার করিয়াছেন বলিয়া তাহা লইয়া যাইতে চান, গৌতম তাহা দেন না। শুদ্ধোদনের কাছে বিচারার্থ এই শিশুদের মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন “গৌতম, তুমি ইহাকে কপোতটি দাও না কেন? উহা ইহারই প্রাণ্য, বেহেতু উহা সে শিকার করিয়াছে।” পঞ্চম বর্ষীয় গৌতম বলিলেন—“যে প্রাণ হরণ করিতে চাহে সে ইহা পাইবার যোগ্য কিংবা যে জীবন দান করিয়াছে, তাহারই এই জীবের উপর অধিকার, আপনি বিচার করুন।”

এই ভাবের কার্যকলাপ ও উক্তি-দ্বারা সংসারের প্রতি উপেক্ষা ও সর্বজীবের প্রাণ-হত্যাকারী এবং প্রাণ-প্রতি করুণার ভাব লক্ষ্য করিয়া গৌতম যে রাজ্য ত্যাগ পাতা, ইহাবের মধ্যে কাহার করিয়া উত্তরকালে বনবাসী হইবেন, শুদ্ধোদনের মনে এই আশঙ্কা বদ্ধমূল হইল।

অথচোষ লিখিয়াছেন, রাজা লোকের অগোচরে এক রাজকীয় প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া বুদ্ধদেবকে তথায় রাখিলেন। সেখানে অতি সুকুমার-বয়স্ক, সুদর্শন বালকবালিকা ও কিশোরকিশোরীরা তাঁহার সম্মুখে থাকিত। কেহ পীড়িত হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে লইয়া যাওয়া হইত। সেখানে প্রাসাদসংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে নানা বর্ণের ফুল ফুটিত, কিন্তু ঋষিয়া পড়িবার পূর্বেই তাহা স্থানান্তরিত করা হইত।

সমস্ত জগৎ একটি নন্দনকানন। একটি শুকুনা ফুল বা পাতা তথায় থাকিতে পাইত না। প্রাসাদের কোন স্থানে আর্জুন বা বিসদৃশ দ্রব্য রাখিবার হুকুম ছিল না। স্তূতরাং নিরবধি গান, বাজ, ফুলের শয্যা, ফুলমালা, রত্নময় দীপাবলী, দুগ্ধফেননিভশয্যা এবং প্রিয়দর্শন তরুণতরুণী ছাড়া বালক গৌতমের চক্ষে আর কিছুই পড়িত না। পৃথিবীতে যে, রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য এবং নানাবিধ কষ্ট আছে, রাজকুমার তাহা কিছুতেই জানিতে পাইতেন না। মাঝে মাঝে রাজা স্বয়ং নানা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পুলকে দর্শন দিতেন। এদিকে ধূপধূনা, অঙ্কুর ও চন্দনাদির গন্ধে প্রাসাদ আমোদিত থাকিত এবং যুহু সমীর সত্ত্বঃপ্রস্ফুটিত ফুলগন্ধে মাতোয়ারা হইয়া যখন কুমারের অঙ্গ স্পর্শ করিত, তখন তিনি ভাবিতেন, আমার পিতার রাজ্য কি সুন্দর! পৃথিবী কি সুখের! এই সংসারের কোলাহল হইতে সুদূরে অবস্থিত প্রাসাদে প্রবেশ করিবার পূর্বে যে পৃথিবী তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সেই শৈশব-স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া গেল এবং তাঁহার চক্ষে সমস্ত জগৎটা একটা নন্দনকাননে পরিণত হইল।

একদিন বালক রাজপুত্র তাঁহার পিতার নিকট কপিলাবস্ত রাজধানীটা দেখিবার জন্ত অমুমতি চাহিলেন। শুদ্ধোদন আদেশ করিলেন, যেন সেদিন রাজধানীতে অশোভন কিছু না থাকে; বৃদ্ধ, জরাতুর, রুগ্ন, মৃত, শুষ্ক ও মলিন কিছু যেন কুমারের চক্ষে না পড়ে। সমস্ত রাস্তা-ঘাট চন্দন-জলে ধোত হইয়া কুশ্মাকীর্ণ করা হইল। কুমার গৌতমকে লইয়া সারথি ছন্দক * রাজপথে রথারোহণে চলিলেন। তাঁহার পিতৃরাজ্যের শোভাসম্পদ দেখিয়া গৌতম মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু কোথা হইতে হঠাৎ এক বৃদ্ধ রক্ষীদের দৃষ্টি এড়াইয়া রাজপথে আসিয়া পড়িল। সেই পরকেশ, অলিতদন্ত, লোলচর্ম্ম, কুজদেহ বৃদ্ধকে দেখিয়া গৌতম শিহরিয়া উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, “সারথি! একি? একি যামুখ?” সারথির উত্তরে তিনি বুঝিলেন,—বাঁচিয়া থাকিলে সকলকেই এক সময় এইরূপ বৃদ্ধ হইতে হইবে; তাঁহার পিতা শুদ্ধোদনেরও এইরূপ অবস্থা হইবে এবং স্বয়ং তিনিও এই দশা প্রাপ্ত হইবেন। আর এক দণ্ডে তিনি রাজপথে থাকিতে চাহিলেন না,—“তবে কি আমাদের সকলের দশাই এইরূপ হইবে?” এই ভাবনার শেষ নাই; রাজকুমার বিমর্ষ ও চিন্তাবিত্ত হইলেন। এতদিন যে সত্য তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ঢাকা ছিল—সেই সত্য উলঙ্গ ও বীভৎসরূপে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

একদিন যাহা ব্যর্থ হইয়াছে, দ্বিতীয় দিন তাহা শোধরাইতে পারে, এই ভাবিয়া শুদ্ধোদন গৌতমকে আবার স্বীয় রাজধানী দেখাইলেন। এবার অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বিত হইল,—
 দ্বিতীয় বার দর্শন।
 অপ্রিয়-দর্শন কিছু যেন কুমারের চক্ষে না পড়ে। কিন্তু মৃত্যুর আশ্বান অলজ্য। কখন কে কি অবস্থায় মরিবে তাহা কে বলিতে পারে? সেদিন রাজপথে একটি লোক মৃত হইল এবং তাহাকে দাহ করিবার জন্ত শোকার্ভ আত্মীয়েরা লইয়া চলিল। পুনরায় প্রশ্ন হইল—“একি আর উঠিবে না, কণা কহিবে না, ইহার পিতামাতারা কি চিরদিনের জন্ত ইহাকে হারাইলেন? এরূপ হওয়া কি শুধু ইহারই অদৃষ্টলিপি, না আরও কেহ কেহ এইভাবে চলিয়া যাইয়া থাকে?” উত্তরে শুনিলেন, “সকল জীবেরই এই নিয়তি স্থনিশ্চিত,—কুমার স্বয়ং, তাঁহার পিতা এবং আত্মীয়গণ এবং জীব যাত্রেরই এই শেষ পরিণতি। বেশীদিন নয়, ১০০ জোর ১২০ বৎসর যামুখের পরমায়ু, ইহার পূর্বেই অধিকাংশ লোককে পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে হইবে। আত্মীয়গণের মেহ-জনিত আর্ন্তনাদ প্রভৃতি কিছুতেই এই অনিবার্য নিয়তির গতি রোধ করা যায় না।” চিন্তাকুল গৌতম

* সংস্কৃত বা পালী প্রাচীন সাহিত্যে যে সারথি শব্দ দৃষ্ট হয়—তদ্বারা কোন প্রধান ব্যক্তিকে বুঝাইত; কেহ যেন সারথিকে ‘কোচওয়ান’ মনে না করেন। পূর্বাংশের সারথি হুমন্ত দশরথ রাজার একজন প্রধান অমাতা ছিলেন। রাম-বনবাসোপলক্ষে রাজগৃহে যে বাগ্‌বিত্তা হয়, অযোধ্যা কাণ্ডের সেই বর্ণনা পড়িলে দৃষ্ট হইবে হুমন্ত রাজাকে শুধু পরামর্শ দিতেন না, রাজনীতির আদেশ অমান্ত করা, এমন কি ভৎসনা করার সাহসও তাঁহার ছিল। মহাভারতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হইয়াছিলেন।

সেদিনও বিষয়মুখে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পিতা যে সত্য তাঁহার চক্ষু হইতে লুকাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, সেই ঐক্য সত্য আবার তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হইল।

কি জানি, প্রথম ও দ্বিতীয় বার যে সকল উপায় ব্যর্থ হইয়াছে, তৃতীয় বারে তাহা সফল হইতে পারে। কুমারের মনোভাব হয়ত এবার ভাল হইবে, এই আশায় বধাবিহিত সতর্কতা

অবলম্বন করিয়া শুদ্ধোদন আবার তাঁহার পুরী ও রাজপথ সাজাইতে তৃতীয় বারে সাধুদর্শন।

আদেশ করিলেন। এবার কুমার গৈরিকমণ্ডিত কমণ্ডলুহস্তে এক সাধুর দর্শন পাইলেন। যুবরাজের প্রশ্নের উত্তরে সারথি বলিলেন, “সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া ইনি গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন।” গৌতম বুঝিলেন, ইহাই মানুষের প্রকৃত পথ; জরা, রোগ, শোক ও মৃত্যুর অধীন মানুষ কেন এই সংসারে আসক্ত হইয়া থাকিবে? এই পথই সর্ক্যাপেক্ষা প্রশস্ত।

শুদ্ধোদনের চেষ্টা ধামিল না। কুমার অল্পকালের মধ্যে সর্ক্যবিজ্ঞায় পারদর্শী হইলেন। ললিতবিস্তরে লিখিত হইয়াছে, তিনি বিখ্যামিত্র নামক অধ্যাপকের নিকট অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, ব্রাহ্মী, সৌরাষ্ট্রী, মাগধ প্রভৃতি চতুঃষষ্টি ভারতীয় লিপি শিখিয়াছিলেন এবং ধর্মবিজ্ঞায় প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাজয় করিয়া দণ্ডপাণি রাজার কন্যা অম্বুপমা স্তন্যরী গোপাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বধাসময়ে তাঁহার একটি পুত্র জন্মিল। ইনিই



বৃহৎপুত্র রাহুল। (তিলক দেশীর প্রাচীন চিত্র হইতে)

শেষে পিতার প্রকৃত সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়া প্রজ্ঞা অবলম্বনপূর্বক “রাহুল” নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

জীবের ছঃখ গৌতমের মনে শেলসম বিদ্ধ হইয়া রহিল। এই কষ্ট কি নিবারণ করা যায় না? সংসারের এই মানি কি করিয়া তিরোহিত করা যায়? ইহাই তাহার ভাবনার মুখ্য বিষয় হইল। তিনি একদিন রাজপ্রাসাদ ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া ২৯ বর্ষ বয়সে ছন্দককে লইয়া কপিলাবস্ত ত্যাগ করিলেন। কপিলাবস্ত ছাড়িয়া গৌতম ছন্দক-সহ দক্ষিণপূর্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছুপথ অতিক্রম করিয়া ইহারা “অভমি” বা ‘আনোমা’ নামক নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। যেখানে তিনি অশ্বের গতি বন্ধ করিলেন, সেই স্থানটির নাম “মনিয়া” * (অনুবৈষ্ণব জেলার অন্তর্গত); এইস্থান হইতে তিনি ঘোড়ার পিঠেই নদী অতিক্রম করিয়া ছন্দককে ঘোড়ার সহিত বিদায় দিলেন। ছন্দক কাঁদিয়া তাহাকে কাকুতিমিনতিপূর্ব্বক রাজপ্রাসাদে ফিরিতে অনুরোধ করিলেন; গৌতম উত্তরে বলিলেন,—

“বজ্জাশনি-পরন্ত-শক্তি-শরাশ্ববর্ষে।

বিহ্যংপ্রভাপ্রোজ্জলিতং কুপিতক লোহম্ ॥

আদীপ্তশৈলশিখরাঃ প্রপতেষুন্মুগ্ধি।

নো বা অহং পুনর্জনয়ে গৃহাভিলাষম্ ॥”

অর্থাৎ বজ্র, কুঠার, শর, প্রস্তর, বিহ্যংপ্রভার জ্বায় প্রজ্জলিত লোহ, আগ্নেয়গিরি-শেখর ইত্যাদি আমার মস্তকে পতিত হউক, তাহাতেও আমার গৃহাশ্রমে অভিলাষ জন্মাইতে পারিবে না। তীব্র বিরাগের বশবর্তী হইয়া ক্রকপে জীবের ছঃখ নিবারণ করা যাইতে পারে—ইহাই একমাত্র চিন্তার বিষয় করিয়া রাজপুত্র মনিয়া নগর অতিক্রম করিলেন। প্রাচীন মনিয়া উক্ত নামের বর্তমান নগর হইতে এক মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত ছিল। পরিত্যক্ত নগর এখন এক বিরাট ভগ্নাবশেষবিশিষ্ট স্থানে পরিণত। এখন লোকে উহাকে “তমেখ্বর দিল” বলে। এইস্থানে “তমেখ্বর” নামক এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। গৌতমের যাত্রা-পথের যে সকল প্রাচীন বৃত্তান্ত আছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলির স্থান-নির্দেশ এখনও খুব ঠিক বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

১। ছন্দক-নিবৃত্তন স্থান—আনোমা নদীর পূর্ব্বতীরে গৌতম পৌছিয়া যেখানে ঘোড়াসহ ছন্দককে বিদায় দিয়াছিলেন, সেখানে এই স্থান বিজ্ঞমান ছিল। কেহ কেহ বলেন, “চন্দভরি” (বর্তমান চন্দবর) নামক পল্লীতে এই স্থান ছিল। অপরেরা বলেন, সে স্থানটি বর্তমানে “ছন্দবাড়ী” গ্রাম, হিউনসাঙ ও ফাহায়েন তথায় একটি চৈতোর উল্লেখ করিয়াছেন, এখনও উহা তথায় আছে।

* মনিয়ার বর্তমান নাম মোনিয়া (Whence); ইহা কপিলাবস্ত হইতে ৩৪ মাইল এবং রামগ্রাম হইতে ৬ মাইল দূরে। আনোমা নদী হইতে রামগ্রাম (হিউনসাঙের লেখানুসারে) ১০০ মিলি, অর্থাৎ ১০২ মাইল।

২। ছন্দক নিবন্ধন তৃপের কিছু পূর্বদিকে আর একটি ক্ষুদ্র তৃপের উল্লেখ পাওয়া যায়; এইখানে গৌতম তাহার বহুমূল্য কানীনিষিত বস্তাদি এক ব্যাধকে দিয়াছিলেন। এই তৃপের নাম “কাষায় গ্রহণ”—লোকে এখন “ভিটা” নামক একটা পল্লী দেখাইয়া সেই তৃপের স্থান-নির্দেশ করিয়া থাকে।

৩। কাষায় গ্রহণ তৃপের অনতিদূরে আর একটি তৃপের উল্লেখ পাওয়া যায়। উহার নাম “চূড়াপতি গ্রহণ।” এইখানে বুদ্ধদেব কেশছেদপূর্বক সন্ন্যাসীদের মত চূড়াধারণ করিয়াছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে চূড়াস নামক একটি গ্রামে উক্ত তৃপ অবস্থিত ছিল। চূড়াস গ্রাম “ভিটা” হইতে উত্তর-পূর্বে চার মাইল দূরে অবস্থিত।

নানাহান অতিক্রম করিয়া রাজকুমার বৈশালী নগরে উপস্থিত হইলেন (কাশী হইতে ১৪১ মাইল পূর্বোক্ত কোণে)। জেনারেল কানিংহামের মতে বৈশালী (বিশার) পাটনার উত্তরে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে কোন সন্ন্যাসীর নিকট তিনি কিছুকাল ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তথা হইতে মগধে উপস্থিত হইয়া পাণ্ডব-শৈলে তিনি ধ্যানধারণা প্রভৃতি অভ্যাস করেন। তখন বিহিসার মগধের রাজা। মগধ হইতে নানাহান ঘুরিয়া তিনি নিরঞ্জন- (বর্তমান ফুল) ভীরে উপস্থিত হইলেন এবং দৃষ্টির তপস্তা আরম্ভ করিলেন; তাহার সঙ্গর বজ্র-কঠিন, “মস্তকের সাধন কিম্বা শরীর পতন।” “ইহাসনে শুষ্কত্ব যে শরীরং। অগ্নিহিংসং প্রলয়ক যাতু। অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পজরভাং। নৈবাসনাং কায়মত-শলিষ্ঠতে।”—“শরীর এই আসনে শুকাইয়া যাক্; অস্থি, মাংস, ত্বক্ লীন হইয়া যাক্,—তথাপি যে জানে জীবের হৃৎকের প্রশমন হয় তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত এই আসন হইতে বিচ্যুত হইব না।’ পরের হৃৎক দূর করিবার জন্ত একি অসাধ্য-সাধন পণ। এই দয়ার অবতার শ্ববির তুলনা জগতে কোথায়?

গৌতমের এই সময়ের কঙ্কালসার দেহের প্রতিমূর্তি কতখানে প্রস্তরে গঠিত হইয়াছে; দেহে মাংসের আবরণ নাই—কেবল কয়েকখানি অস্থি। জীবের হৃৎক কিসে দূর করিবেন তজ্জন্ত ধ্যানধারণা, অনাহার, শীতবাত-উপেক্ষা এবং অস্থিসার দেহ। বহুবৎসর এইভাবে চলিয়া গেল, একদিন তিনি অনাহারে ক্লিষ্ট দেহে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। হিন্দুশাস্ত্রে ষষ্টি-ধর্মের কঠোরতার ষষ্ঠ নিয়ম আছে, সংযমী হইয়া তিনি তাহার সমস্ত প্রতিপালন করিলেন, কিন্তু কোন ফললাভ হইল না।

একদিন বটবৃক্ষের নীচে উপবাস-তপ মুখে রাজপুত্র তপস্তা করিতেছেন, রাত্রি বনাইয়া আসিল। তখন বহু ক্লান্ত সাধনের পর তাহার মন সন্দেহে বিচলিত হইল; অমনই দেখিলেন, ভীষণ ব্যাঘ্র ও সর্প, দৈত্য ও দানব বদন ব্যাদান করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে,

ভীষণ ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছে, ভয়ে অস্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা মুহূর্তমাত্র। এ জীবনের কোন প্রয়োজন নাই, যখন লক্ষ্য

মিলিল না, তখন বাঁচিয়া ফল কি? এই নির্বেদ উপস্থিত হওয়া মাত্র মন হইতে ভয়ের ভাব তিরোহিত হইল। প্রশান্ত নির্ভীক চক্ষে সেই সকল বিভীষিকাকে তিনি উপেক্ষা

করিলেন। রজনীর দ্বিতীয় ঘামে দেখিতে পাইলেন, পরমহুন্দরী বোড়শী যুবতীরা নখদেহের নিকশম সৌন্দর্য্য মদিরা-পাত্রের জ্বায় তাঁহার সম্মুখে ধারণ করিয়া তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিতেছে। মুহূর্ত্তের জন্ত গৌতমের চক্ষু মুগ্ধ হইল, পরক্ষণেই দীর্ঘ তপস্তাজাত বিবেকবাণী তিনি শুনিতে পাইলেন এবং বলিলেন “আমি স্থূথের জন্ত জন্মি নাই, তোমরা অল্পত্র বাও, হৃৎখীরের বোঝা আমি মাথায় লইব, ইহাই আমার ব্রত।” রজনীর তৃতীয় ঘামে তিনি দেখিলেন, দেবাদিদেব ইন্দ্র স্বয়ং যেন তাঁহাকে জগতের আধিপত্য দিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার এক হস্তে রাজদণ্ড এবং অপর হস্তে অভিব্যেক-তিলকের জন্ত চন্দন ও মালা; গৌতম সেই রাজদণ্ড, মালা বা রাজটীকা গ্রহণ করিলেন না—আমি হৃৎখীর ঝুলি গ্রহণ করিয়াছি, এ সকল ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠার আমি প্রয়াসী নহি। এক সময়ে নচিকেতাকে যম বিশাল সাম্রাজ্যের আধিপত্য দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু নচিকেতা বলিয়াছিলেন, “যোনহং নামৃতা স্মাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।”—বাহা নথর, ভঙ্গশীল তাহা আমি চাই না। অবিনশ্বর নিত্য-পদার্থের সন্ধান আমাকে দিন।

কথিত আছে, যার তাহার পুত্রকন্যা ও অসংখ্য সৈন্তসামন্ত লইয়া নানারূপ কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক বুদ্ধকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু প্রতিবারই পরাভূত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নপর হইয়াছিল। যারের তিন পুত্র ও তিন কন্যা ছিল; পুত্রদের নাম বিলাপ, হর্ষ ও দর্প; এবং কন্যারা রতি, প্রীতি ও তৃষ্ণা। ইহারা প্রত্যেকেই বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। যারের সেনাপতিদের মধ্যে উগ্রতেজা, সুনেন্দ্র, দীর্ঘবাহু, প্রসাদ, প্রতিলক প্রভৃতি প্রবান ছিল। প্রলোভন এখানেই ধামিল না। তারপর আর এক দৃশ্য। গৌতম দেখিলেন, শুদ্ধোদন বুদ্ধ হইয়াছেন, পুত্রশোকে তিনি মুহুমান, গোপা স্বামিশোকে যৌবনে যোগিনী, তাহার হৃই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত, অনাহারে অনিদ্রায় ক্লশদেহে সে লাভণ্য নাই। এই অপূর্ব্ব পারিজাত-মালা তো দেবতার দান,—তিনি দেবতার এই অমূল্য প্রসাদ পুনরলিত করিয়া আসিয়াছেন। জননীর পার্শ্বে শিশু রাহুল বিমনা হইয়া বসিয়া আছে, “তুমি কি পাষণ? আমাদিগের এত কষ্টে কি তোমার মমতা হব না? ফিরে এস, জীব-হৃৎখের নিয়তি তুমি খণ্ডাইবে কিরূপে?” এই দৃশ্য গৌতমকে মুহূর্ত্তকাল অভিভূত করিল, কিন্তু উহা মুহূর্ত্তমাত্র, “আমি বড় পথ ধরিয়াছি, আমাকে অলিগলি দেখাইওনা—আমার ক্ষেত্র অতি প্রশস্ত, স্থখ ও মেহের ডুরি দিয়া আমাকে সঙ্গীর্ণ স্থানে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইও না।”

এই সকল দৃশ্য গৌতম বাহা দেখিলেন তাহা কাল্পনিক বা স্বপ্নদৃষ্ট নহে। উহাদের কথাবার্ত্তা, হাবভাব, রূপ ও ভঙ্গী জীবন্ত; একরূপ মনে হইল, যেন তাহাদের নিঃশ্বাস তাঁহার গায়ে লাগিতেছে। তাঁহার চরিতাখ্যানগুলিতে কথিত আছে যে যার বা কামনার দেবতা তাঁহাকে ভীত, আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ করিয়া যারার কূপে ফেলিবার জন্ত এই সকল প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সকল ভয়ে নির্ভয় ও সকল প্রলোভনে অটল ছিলেন।

এই উপাখ্যানটি “মার-বিজয়” নামে পরিচিত। প্রকৃত বিরাগ জন্মবার পূর্বে মনুষ্যহৃদয়ের বল পরীক্ষার জন্ত এক সময়ে সমস্ত সাংসারিক প্রলোভন ঘেন একত্র হইয়া সাধককে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে। এই প্রলোভন দমন করিতে না পারিলে সাধক সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। কথিত আছে তান্ত্রিকগণ অহরহঃ এইভাবে সাংসারিক ভয়, লোভ ও আকর্ষণের সম্মুখীন হইয়া শ্মশানে মৃত দেহের উপর বসিয়া তপস্বী করেন। মার-বিজয়ের পর বুদ্ধের উপাধি হইয়াছিল “অর্হন” (অর্হৎ)—অরি হনন্ করিতে সমর্থ—শব্দটি এই অর্থ সূচনা করে। অজস্রা-গুহার গৌতম-জীবনের এই অধ্যায়ের একটি উৎকৃষ্ট চিত্র আছে। আর একটি চিত্রে গৌতম যে রাজপথে বৃদ্ধ, মৃত ও সন্ন্যাসীকে দেখিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা অতি সূচাকরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে।

অপদেবতা প্রলোভনের শেষশর নিক্ষেপ করিয়া নিরস্ত হইল। বিত্ত সম্বন্ধেও এইরূপ প্রবাদ আছে এবং আমাদের শিবের কামভঙ্গ্যও এই জাতীয় সংস্কারজাত। আমার মনে হয়, বিত্তর শয়তানরূপ প্রলোভন-দমন এবং শিবের কামজয় বৌদ্ধকাহিনীর নিকট দৃশ্য। কামদেব বখন শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখন শিবের চক্ষু অকস্মাৎ গৌরীর বিধাদরের প্রতি পড়িয়া এক মুহূর্তের জন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল—“শিবস্ত কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তদৈর্ঘ্যঃ।”

যাহা হউক রাজ্যের শেষ যামে গৌতমের তপঃসিদ্ধি হইল। কামজয়ী পুরুষের মনের দৃঢ়তা অটল অচল হইলে রাত্রি-শেষে গৌতম দেখিলেন অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে—সত্যের আলোক পূর্ণভাবে তাহার চক্ষে প্রকাশ পাইয়াছে; সেই তপোনির্মল চক্ষে জগতের চারিদিকে তিনি সত্যের স্বর্ণাঙ্কর উজ্জলভাবে দেখিতে পাইলেন এবং বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন।

তাঁহার নিকট এই কয়েকটি কথা জিজ্ঞাস্যমান হইল। প্রত্যেক জীব নিজের কর্মফলে সুখ-দুঃখ পায়—জীবন দুঃখময়, জন্মে জন্মে কামনা পরিহার করিতে পারিলে জন্মান্তরের বাহে চিরভ্রাম্যমাণ জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে।

উৎকট ক্লম্ম সাধন করিয়া নিজেই দেহ ক্ষয় করা উচিত নহে। কামনার বশবর্তী হইয়া কাজ করিবে না, নিকাম হইয়া মধ্যপথ অবলম্বনপূর্বক সুকর্ম করিয়া বাইবে।

বুদ্ধ শব্দের অর্থ লজ্জ-জ্ঞান; তিনি যে তত্ত্বের অধিগম-দ্বারা এই উপাধি গ্রহণ করেন, সেই তত্ত্বের পারিভাষিক “প্রতীত্যসমুৎপাদ।” অবিজ্ঞার ধ্বংসই দুঃখমোচনের একমাত্র উপায়—এই মহাতত্ত্ব তিনি উপলব্ধি করিলেন। পৃথিবীর যত দুঃখ তাহা এই অবিজ্ঞার ভালপালা হইতে জাত; অবিজ্ঞা-তত্ত্বের ক্রমবিকাশ এইরূপ:—অবিজ্ঞা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে বড়ায়তন, বড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে জরামৃত্যু, শোক, পরিদেব, দৌমনস্ত, উপায়নের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আত্যন্তিক দুঃখের মূল কারণ অবিজ্ঞা। এই কথাগুলি কতকটা গীতার “মোহাৎ সজ্জায়তে ক্রোধঃ” প্রভৃতির মত শোনায়। অবিজ্ঞা ধ্বংসের আটটি উপায় ভগবান্ বুদ্ধ নির্দেশ করিয়াছেন—

সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ শ্রুতি ও সম্যক্ সমাদি—এই আটটি উপায়ের নাম আৰ্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। সৌভাগ্য অবিজ্ঞার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “এই হুঃখের গৃহ কে নির্মাণ করিয়াছে তাহাকে আমি ধরিয়া ফেলিয়াছি। এখন সেই নির্মাতা আর গৃহ রচনা করিতে পারিবে না।” “অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিসম্ অনির্ক্সিং। গহকারকং গবেসন্তো হুঃখা জাতি পুনশ্চুনং ॥ গহকারক দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি। সন্ধাতে ফাসুকা ভগ্গা গহকুটং বিসংকিতং। বিসংখার গতং চিত্তং ত্হানং থয়মজ্জগা।”

ভাবার্থ :—এই গৃহ কে নির্মাণ করিয়াছে, জন্মজন্মান্তরের পথ পর্য্যটন করিয়া পুনঃ পুনঃ হুঃখ পাইয়াও তো এতদিন তাহার সন্ধান পাই নাই। হে গৃহ-নির্মাতা! এতদিন পরে আজ তোমার নাগাল পাইয়াছি, আর তুমি গৃহ নির্মাণ করিতে পারিবে না। গৃহের ধাম ও ভিত চিরতরে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। আমার চিত্ত আজ বিকারশূন্য—সংস্কার ও কামনা লয় পাইয়াছে।

অবিজ্ঞাজাত কামনাই এই হুঃখের ঘর বারংবার রচনা করিয়াছে। চিত্ত কামনা ও সংস্কার-শূন্য হইলে কে আর এই হুঃখের ঘর রচনা করিবে?

বৌদ্ধধর্ম্মের একটি প্রধান শিক্ষা অহিংসা। শুধু মহাযুগ-জগতে এই অহিংসনীতি পালনীয় নহে, জীবমাত্রের প্রতিই ইহা আচরণীয়। এজন্ত বুদ্ধদেব-সম্বন্ধে জয়দেব লিখিয়াছেন, “নিন্দসি বজ্জবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্। সদয়হুদয়দর্শিতপত্ত্বাতম্” পশুবলি-সংবলিত বজ্জাহুষ্ঠান নিন্দা করিয়া তিনি করুণ হৃদয়ে পশুহত্যার প্রতি লোক-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার এই দয়ামূলক নীতির ফলে অশোক রাজা কর্তৃক দেশ-বিদেশে শত শত পশুচিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ নিজে জীবনের সমস্ত কষ্ট বরণ করিয়া লইবেন এবং জগৎকে হুঃখমুক্ত করিবেন, এই মহানীতি পালন করিতেন :—

“বৎ কিঞ্চিদ্ জগতো হুঃখং তৎ সর্বং ময়ি পচ্যতাম্।

বোধিসত্ত্ব শুভৈঃ সর্বৈঃ জগৎ সুখিতমন্ত চ ॥”

(জগতে যত কিছু হুঃখ-কষ্ট, তাহা সমস্তই আমাতে আসুক। বোধিসত্ত্বদের পুণ্যফলে জগৎ হুঃখমুক্ত হইয়া সুখী হউক।) বুদ্ধদেব-সম্বন্ধে নানা উপদেশ-সংবলিত কত বে গল্প আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। একটি এইরূপ :—একদা ভরদ্বাজ নামক এক বণিকের গৃহে বুদ্ধ ভিক্ষুবেশে মুষ্টিভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। বণিক তাহাকে ভৎসনা করিয়া বলিল—“তুমি সুহৃদেহ, অন্তের শ্রমলব্ধ শস্য লইতে আসিয়াছ কেন? আমি তোমাকে কিছু জমি দিতেছি, তুমি উহা হইতে শস্য উৎপন্ন করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে শিখ।”

বুদ্ধদেব বলিলেন, “আমি কৃষিকার্য্যই করি, তবে আপনাদের কৃষির সহিত আমার কৃষির একটু তফাৎ আছে। মানুষের মনই আমার জমি, বদ্ধ ও উৎসাহ দুটি বলদ, লাঙ্গলের ফাল

বিনয়, জ্ঞান হল এবং বিশ্বাসই আমার বীজ। এই বীজ হইতে নির্মাণ-ফল উৎপন্ন হয়।” প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পরেও এক সাধুর মুখে বুদ্ধমুখোক্তারিত উপদেশের প্রতিধ্বনি বজ্রের পল্লীতে পল্লীতে শোনা গিয়াছিল, “মনরে কৃষিকাজ জ্ঞান না—এমন মানব-জন্ম রৈল পতিত, আবাদ কোর্লে ফলত সোনা।”

বুদ্ধদেবের নির্মাণ কি, তৎসম্বন্ধে সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন : “যে অবস্থায় সুখও নাই, দুঃখও নাই, বাহার কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে না; বাহাতে উৎপত্তি ও নিরোধ তুল্যভাবে নিষ্পন্ন হয়, এবং যদ্বারা একত্ব ও বহুত্বের ভেদ নিরস্ত হয়—সেই ভাবাভাব-বিনির্মুক্ত অবস্থাকে নির্মাণ বলে।” এই ব্যাখ্যা যদি গ্রহণ করা যায়, তবে নির্মাণ আধ্যাত্মিক জগতের “নেতি” আখ্যা পাইতে পারে। ইহ জগতের সত্যত অমুচ্যের নীতিহীন বৌদ্ধদের কর্মকাণ্ডে পালনীয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পদ “আনন্দ” যাহা উপনিষদ্ দিয়াছিলেন এবং শৈব ও বৈষ্ণবেরা বিশেষ করিয়া তাঁহাদের ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ গড়িয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্মে সেই আনন্দ বা অপর কোন আধ্যাত্মিক বাস্তব দানের স্থান কোথায়? প্রতিবাদীরা কহিয়া থাকেন, আত্মাত্মিক দুঃখনিবৃত্তিই বৌদ্ধধর্মের মূল উদ্দেশ্য, উহাতে আর কিছু দেওয়ার নাই। কেহ কেহ এই ধর্মকে “দুঃখবাদ” নাম দিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। কেন বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইল, তৎপ্রসঙ্গে আমরা আবার আলোচনা করিব।

যাহা হউক সমাগবুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির পর গৌতম চক্ৰ ভিক্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন। স্নানান্তে শুচি হইয়া শুদ্ধভাবে স্নাজাতা * তাঁহাকে যে উৎকৃষ্ট চক্ৰ খাইতে দিয়াছিলেন, গৌতম তাঁহার উপবাস-সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সেই চক্ৰ আহার করিয়াছিলেন। এই চক্ৰ-সম্বন্ধে স্নাজাতা ভগবান্ বুদ্ধকে বলিয়াছিলেন, “সম্মঃপ্রসূত একশত কৃষ্ণবর্ণ গাভীর হৃদে আমি পঞ্চাশটি গাভী পোষণ করিয়াছি। তাহাদের হৃদে পঁচিশটি গাভী, এবং সেই পঁচিশটির হৃদে আবার বারটি গাভী—তৎপরে সেই বারটি গাভীর হৃদে ছয়টি গাভী পোষণ করিয়া তাহাদের হৃদ্বদ্বারা এই চক্ৰ উৎকৃষ্ট চাউল ও মশলা সহকারে প্রস্তুত করিয়াছি। দেব, আপনি ইহা আহার করিয়া তৃপ্ত হউন।”

বটবৃক্ষমূলে নির্মাণতত্ত্ব তাঁহার লাভ হইয়াছিল, এবং এইভাবে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তিনি সেইদিন হইতে বুদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই বটবৃক্ষটি “বোধিবৃক্ষ” নামে জগতে পরিচিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে মৌর্যবংশের ধ্বংসকারী পৃথ্যামিত্র নামক রাজা এই বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অক্ষয়বটের বীজ ধ্বংস হইবার নহে—পুনঃ পুনঃ অত্যাচারীর হাতে লাহিত হইয়াও অক্ষয়বটের বংশধর এখনও গরায় বিরাজ করিতেছে।

* উৎস্নাজাতা কবিব্রহ্মার এক ধনাঢ্য গোপের পত্নী ছিলেন। উৎস্নাব্রহ্মার সেনপত্নীতে ইহাদের বাড়ী ছিল।

গৌতম গয়া হইতে রওনা হইয়া কোণালা ও আর চারিটি সঙ্গী লাভ করেন। তাঁহারা তাঁহার ধর্মমত গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্মের যে বিরাট শক্তি উত্তরকালে জগতের ৬ অংশ গ্রাস করিয়া অপর ৬ অংশের নিকটও আত্মপ্রকাশ-পূর্ব্বক তাহাও স্বকীয় প্রভাব প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল সজ্জশক্তি। এই পাঁচটি শিষ্যের দ্বারা সেই সজ্জের পত্তন হইয়াছিল।

বুদ্ধের ধর্ম আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিকাশ পায় নাই, উহা প্রধানতঃ নীতিমূলক। হিন্দু-ধর্মের জটিল আধ্যাত্মিক-বাদ হইতে মুক্তলাভ করিয়া এই নীতিমূলক ধর্ম সহজেই ভারতবর্ষের বাহিরে অস্ত্রান্ত দেশের গ্রহণীয় হইয়াছিল। কেন যে তিনি আধ্যাত্মিক উপদেশ দেন নাই তৎসম্বন্ধে পালি “অবহুতসুত্ত” নামক পুস্তকে একটি গল্প আছে, তাহা এইখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

একদা সারিপুত্র গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেবের সঙ্গে সঙ্গে পর্যটন করিতে-
ছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—গৃহত্যাগ করিয়া আমি কি লাভ করিলাম? যে

সারিপুত্রের অভিমান। সকল জটিল সমস্তা আমার

মনে সর্ব্বদা একটা দ্বিধার সৃষ্টি করিয়াছে, গৌতম তো তাহার কোনটিরই সমাধান করিলেন না, আমার বনবাস বৃথা হইল। আমি আজই তাঁহাকে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, সমস্তোষজনক উত্তর না পাইলে পুনরায় গৃহে ফিরিয়া যাইব। বুদ্ধদেব যখন আসিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন সারিপুত্রের মুখে যেন বর্ষাগমের সমস্ত মেঘের ছায়া পড়িয়াছে, তিনি শিষ্যের এরূপ বিমর্ষতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সারিপুত্র বলিলেন, “আচার্য্য, আপনি আমাকে গৃহ হইতে আনিয়া কি শিক্ষা দিয়াছেন? আপনার উপদেশ শুধু অষ্টমার্গ অনুসরণ করা। সেগুলি তো কয়েকটি নীতিসূত্র মাত্র, অধ্যাত্ম জগতের কোন তত্ত্ব তো বিন্দুমাত্রও আপনি আমার নিকট পরিষ্কার করিয়া বলিলেন না। আমার প্রশ্নগুলি এই:—

“আত্মা কি? ইহা কোথায় থাকে, ইহার অস্তিত্ব আছে কি নাই? যদি আত্মা থাকে, তবে

দেহের সঙ্গে ইহার কি সম্বন্ধ? এবং দেহ বিনষ্ট হইলে আত্মা কোথায় যায়? ঈশ্বর আছেন কি নাই? যদি থাকেন তবে জীবের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ? দেহ নষ্ট হইলে তাহার অণুপরমাণু কোথায় যায় এবং বিদেহী আত্মা কোথায় কি ভাবে থাকে?”



সারিপুত্র।

“যদি আপনি এই সকল প্রশ্ন-সম্বন্ধে আমাকে সম্যক্ রূপে অবহিত করিতে পারেন, তবে আমি আপনার কাছে থাকিব, নতুবা এখানে কবায় ফলমূল খাইয়া বন-ভ্রমণের কোন স্বার্থকতাই তো আমি দেখিতে পাই না।”

বুদ্ধদেব বলিলেন, “আমি তোমাকে ডাকিয়া গৃহ হইতে এখানে আনি নাই। তুমি সংসারজালায় জলিয়া পুড়িয়া শাস্তি খুঁজিতেছিলে এবং সেই শাস্তির জন্ত আমার নিকট আসিয়াছিলে। আমি তোমাকে সেই মহাশাস্তি লাভের একমাত্র উপায় অষ্টমার্গ নির্দেশ করিয়া দিয়াছি। তুমি ব্যস্ত হইলে চলিবে

বুদ্ধের উপদেশ।

না, যদি তুমি আমার উপদেশের বশবর্তী না হও, তবে অনায়াসে চলিয়া যাইতে পার।

“দেখ, যেন একজনকে কেহ বাণ মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়াছে,—অপর এক ব্যক্তি তাহার ক্ষয় হইতে বাণটি তুলিবার জন্ত অগ্রসর হইয়াছে, তখন যদি সে বলে ‘আগে বল, এই বাণটি উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম বা দক্ষিণ—কোন দিক হইতে আসিয়াছে, তবে আমি তোমাকে উহা তুলিতে দিব; আগে বল, উহা কি কোন ব্যাধ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের হাত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তবে তোমাকে উহা তুলিতে দিব।’ তোমার প্রশ্ন কি সেই শরাস্ত্র অবাধ ব্যক্তির মত নহে?”

“তোমার চিত্ত একান্ত অশান্ত হইয়া শাস্তি খুঁজিতেছিল, আমি তোমাকে শান্তিলাভের উপায়স্বরূপ এই অষ্টমার্গ দেখাইয়া দিয়াছি। এই সকল পন্থা অনুসরণ করিলে তুমি স্বয়ং সত্য দর্শন করিবে, তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ—তাহাদের উত্তর তুমি হাতে হাতে পাইবে। সত্যের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে তুমি বিধাশূন্য হইয়া সকলই চাক্ষুষ দেখিতে পাইবে। কিন্তু এখন আমি যদি ঐ সকল প্রশ্নের এক একটি উত্তর বলিয়া দিই এবং তুমি অন্তর গমন করিয়া তোমা অপেক্ষা বিজ্ঞ বা প্রবীণ লোকের সঙ্গ লাভ কর, তখন তোমার মতগুলি বলিলে তিনি হয়ত অধিকতর যুক্তি ও পাণ্ডিত্যবলে সেগুলি খণ্ডন করিয়া অল্প মত স্থাপন করিবেন, তুমি তখন তাহার উত্তর দিতে পারিবে না এবং ভাবিবে যে আচার্য্য তোমাকে ভুল শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু যদি তুমি অষ্টমার্গ অবলম্বন করিয়া সাধনার পথে স্বয়ং অগ্রসর হও এবং তোমার কামনা নিরন্তর হইয়া যায়, তখন তুমি তোমার তপোনির্মল চক্ষে সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর নিজেই পাইবে। তখন তোমাকে সহস্রবার অন্তরূপ বুঝাইলেও কেহ তোমার বিশ্বাস টলাইতে পারিবে না। তুমি যদি একটা ঘোড়া তোমার সম্মুখে দেখ, তবে যদি খুব পণ্ডিত ব্যক্তিও তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে সেই জীবটা উট, তথাপি তুমি তাহার মত কিছুতেই গ্রহণ করিবে না।”

বুদ্ধ সমস্ত জগৎকে নীতিমার্গের সহজপথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন, অধ্যাত্মরাজ্যের জটিল পথ পরিহার করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন সূনীর পথ অবলম্বন করিয়া লোক সত্য লাভ করিতে পারে। নতুবা অধ্যাত্মরাজ্যের কথা কেবল কূটতর্ক ও হৃদয়বুদ্ধির লীলাক্ষেত্র হইয়া পড়ে। ঋষির মত দ্রষ্টা হইতে পারিলে অধ্যাত্মরাজ্যের সমস্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়, নতুবা

বাহার তাহার কাছে সেগুলি বলিলে তাহা শুধু পরস্পর বিরোধী মতবাদের জটিল ও সংশয়পূর্ণ সমস্তার পরিণত হয়। অধ্যাত্মরাজ্য-সম্বন্ধে তিনি কোন কথা বলেন নাই। তাঁহার অষ্টমার্গ কুলুপের জায়, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিলে অধ্যাত্মরাজ্যের দ্বার প্রত্যেকে স্বয়ং উন্মোচন করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে।

বুদ্ধ গৃহাশ্রমকে নিন্দা করেন নাই, কিন্তু ভিক্ষুকে গৃহস্থ হইতে উচ্চতর সম্মান দিয়াছেন। ‘সাম্যফলসূত্র’ পুস্তকখানি পাঠ করিলে এবিষয়ে তাঁহার মতামত অতি স্পষ্টভাবে জানা বাইতে পারে। বুদ্ধের তিরোধানের পর তাঁহার এবং তদীয় ধর্মমত-সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লেখা হইয়াছে। শুধু জাতক গ্রন্থগুলি নহে, বহু পুস্তকে তাঁহারই মুখে শোনা-কথার দোহাই দিয়া নানা জনে নানা মত প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু এই সকল গ্রন্থের উক্তি কতটা ঠাট তাহা বলা যায় না।

পালি “সাম্যফলসূত্রে” (শ্রম্যফলসূত্রে) লিখিত আছে, মগধ-রাজকুমারগণের চিকিৎসক জীবকের রাজগৃহস্থ মনোহর আত্মবাটিকায় ভগবান্ বুদ্ধদেব বিশত-পঞ্চাশদধিক এক সহস্র সংখ্যক শিষ্যপরিবৃত হইয়া বাস করিতেছিলেন।

একদা মগধাধিপ মহারাজ অজাতশত্রু (অজাতশত্রু) স্বীয় রাজপ্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিয়া মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে নৈশগগনের শোভা উপভোগ করিতেছিলেন; তখন শরৎ কালের প্রসন্ন অন্ধরে পূর্ণচন্দ্র শীত সুন্দর রশ্মি বিতরণ করিতেছিল। বিমুগ্ধনেত্রে সেই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রাজা অনাহৃত কাব্যকথায় তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন:—

“বন্ধুগণ! এই জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী কি সুন্দর! কি প্রিয়দর্শন! কি সাধনাদায়িনী! পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের কি মহৎ চিহ্ন!

“আজ এই জ্যোৎস্না-শীতল যামিনীতে এমন কোন সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহার নিকট গেলে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে পারিব?”

এই প্রশ্নের উত্তরে একজন সচিব বলিলেন, “মহারাজ সর্বশাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত লোকপূজ্য প্রবীণ পূরণ কসমপ (পূরণ কাশ্যপ) মুনির নিকট চলুন, তাঁহার উপদেশে অভীষিত শান্তিলাভ করিতে পারিবেন।” এই কথা শুনিয়া রাজা নীরব হইয়া রহিলেন। তৎপরে আর পাঁচজন সচিব পূর্বোক্ত ভাবের প্রশংসাবাদ করিয়া মক্খলিপুত্র গোসাল (মক্খরিপুত্র গোসাল) অজিত-কেশকম্বল, ককুদ-কচ্ছায়ণ (ককুদ-কাত্যায়ন), সঞ্জয়বেলট্টি-পুত্র (সঞ্জয়বেলাস্থি-পুত্র), নিগঠঞাত-পুত্র (নিগঠজ্জাত-পুত্র) এই পঞ্চ পণ্ডিতের উল্লেখ করিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহাদের কথা শুনিয়া পূর্ববৎ নীরব হইয়া রহিলেন।

এই সময়ে ভিক্ষুপ্রবর জীবক মহারাজ অজাতশত্রুর অনতিদূরে বসিয়াছিলেন, অজাতশত্রু তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “সুহৃৎশ্রেষ্ঠ জীবক, তুমি কিছু বলিলে না যে?”

জীবক বলিলেন, “সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বুদ্ধদেব আমাদের আশ্রোজ্ঞানে বাস করিতেছেন, তিনি জ্ঞান এবং পবিত্রতার আধারস্বরূপ, তিনি মুহূর্ব্বনের একমাত্র পথপ্রদর্শক। মহারাজ, তাঁহার নিকট চলুন, শান্তি পাইবেন।”

“প্রিয় জীবক, তুমি আমার হস্তীগুলি সুসজ্জিত করিতে বল।” তখন রাজার আদেশে পাঁচশত হস্তিনী সুসজ্জিত হইল, সেই ৫০০ হস্তিনীর উপর সুবেশপরিহিতা পাঁচশত সুন্দরী আলোকবর্জিকা ধারণ করিয়া নানাতৃণশোভিত বিশালকায় ঘিরদে সমারুঢ় মহারাজ অজ্ঞাতশত্রুকে বেঁটন করিয়া চলিল। রাজা সেই রাত্রিকালে মহাসমারোহের সহিত রাজগৃহ হইতে জীবকের আম্রবাটিকাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বিশাল আম্রোষ্ঠানের নিকটবর্তী হইয়া রাজা সহসা ভয়াভিভূত হইয়া পড়িলেন, আশঙ্কায় তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি ভীত ও উত্তেজিতকণ্ঠে জীবককে জিজ্ঞাসা করিলেন— “জীবক! তুমি কি আমাকে ছলনা করিয়া আনিয়া শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতেছ? বিশত-পঞ্চাশদধিক একসহস্র ব্যক্তি যে স্থানে সমবেত, সেস্থান এমন নীরব কিরূপে হইতে পারে? একটি কানী কিংবা হাঁচির শব্দ পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে না।”

“মহারাজ, আমি আপনাকে ছলনা করিয়া শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতে আনি নাই, আমি তরুণ পাবও নই। ঐ পটমণ্ডপে দীপ জলিতেছে, ঐ দিকে চলুন।”

রাজা হস্তীগুষ্ঠে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া যেস্থানে হস্তী আর চলে না, সেই স্থানে অবতরণ করিলেন এবং বস্ত্রমণ্ডপের সমীপবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “জীবক, ভগবান্ বুদ্ধদেব কোথায়?”

“ঐ মধ্যস্থ স্তম্ভের সম্মুখে পূর্বমুখ হইয়া শিষ্য-পরিবেষ্টিত বুদ্ধদেব উপবিষ্ট আছেন।”

তখন রাজা অগ্রসর হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে একপাশে দাঁড়াইলেন। রাজা দাঁড়াইয়া একবার সেই নিঃশব্দ বিশাল জনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; উর্ম্মহীন, নির্ম্মল হৃদয়ের জায় শিষ্যমণ্ডলী নীরব ও প্রশান্ত। রাজা উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, “কি সুন্দর! কি প্রশান্ত! আমার প্রাণাধিক কুমার উদায়িভদ্রের (উদায়িভদ্রের) জীবন যেন এইরূপ শান্তিপূর্ণ হয়।”

অনন্তর রাজা কৃতাজলিপুটে ভগবান্ বুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি বলিলেন, “ভগবান্ বুদ্ধদেবের আদেশ হইলে আমি কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি।”

“মহারাজ, আপনার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।”

“হে দেব! সংসারে নানা শ্রেণীর লোক কাজ করিয়া থাকে। সারথি, অশ্বরক্ষক, তীরন্দাজ, নিশানবাহক, সেনাপতি, সৈনিক, পাচক, নাশিত, মালাকর, মোদক, তত্ত্ববায়, কুস্তকার, জ্যোতির্বিদ, সচিব প্রভৃতি শত শত শ্রেণীর লোক জীবিকা অর্জন করিতেছে। ইহারা স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইহজীবনেই স্বকৃত কর্ম্মের পুরস্কার লাভ করিতেছে। তাহারা স্বীয় পরিশ্রমজাত অর্থ পরিবার পালন করিয়া বন্ধুবান্ধবসহ নানারূপ সুখভোগ করিয়া জীবনযাপন করিতেছে। শ্রমলব্ধ অর্থ দানদানাদি ব্যাপারে ব্যয় করিয়া পরকাল-সম্বন্ধেও তাহারা সুখের পথ হির করিয়া রাখিতেছে। গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ম্মের পুরস্কার ইহজীবনেই লক্ষিত হইতেছে কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রমের কোন পুরস্কার কিংবা লাভ আপনি এরূপ দেখাইতে

পারেন কি, বাহার ফল এই জীবনেই ভোগ করা যায় ?” বুদ্ধদেব বলিলেন, “মহারাজ, আপনি কি এই প্রশ্ন আর কোন সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণের নিকট উত্থাপন করিয়াছিলেন ?”

“হাঁ, করিয়াছিলাম।”

“আপনার আপত্তি না থাকিলে, তাঁহাদের নিকট আপনি কি উত্তর পাইরাছেন, আমাকে বলিতে পারেন ?”

“আমি একবার পূরণ কস্মপ (পূরণ কাশ্যপ) মুনির নিকট গিয়াছিলাম, নানারূপ ভদ্রতা এবং সৌজন্যহৃৎক আলাপের পর আমি তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে উত্তরে বলিয়াছিলেন, ‘যে ব্যক্তি লোক-পীড়ন করে, দগ্ধ্যতা কিংবা চৌর্য্যবৃত্তি করে, তাহার কোন পাপই হয় না। যে অসত্য কথা বলে, পরদার-গমন প্রভৃতি সমাজ-গর্হিত কাজ করে, তাহার প্রকৃতপক্ষে কোন পাপ হয় বলিয়া আমার মনে হয় না। যদি কেহ তীক্ষ্ণদার অসিদ্ধারা সমস্ত মানবমণ্ডলীর দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া এক স্তূপাকার মাংসপিণ্ডে পরিণত করে তথাপি সে কোন পাপকার্য্য করিল বলিয়া আমি মনে করি না। যদি কোন ব্যক্তি গঙ্গার দক্ষিণোপকূলস্থ সমস্ত জনপদ নির্মহুষ্ট করিয়া ফেলে, তথাপি সে কোন হৃদয় করিল বলিয়া আমার প্রতীতি হইবে না। যদি কেহ গঙ্গার উত্তরোপকূলের সমস্ত জনপদ ব্যাপিয়া মুক্তহস্তে দান করিতে করিতে অগ্রসর হয় এবং প্রতিস্থানে পূজা ও যজ্ঞাদির অহুষ্ঠান করিয়া স্বীয় মনে কৃতার্থ হয়, তথাপি সে কোন পুণ্যকর্ম্ম করিল বলিয়া আমি মনে করিব না। পরোপকার, আত্মসংযম, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতির দ্বারা কোনরূপ পুণ্যসঞ্চয় হয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।’ হে দেব, কাশ্যপ এইভাবে ‘সন্ন্যাসাশ্রমের ইহকালের পুরস্কার কি ?’ এই প্রশ্নের উত্তরে কর্ম্মের অসারতা সধকে আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কেহ আত্মফল-সধকে কিছু জানিতে চাহিলে তদন্তরে নিষফলের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিলে বেরূপ হয়, এই উত্তর তেমনই হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালে আমি তাঁহার এই কথাগুলির নিন্দা বা প্রশংসা কিছুই করি নাই, এবং যদিও এ উত্তরে আমার কিঞ্চিদাত্ত তৃপ্তি হয় নাই, তথাপি আমি অসন্তোষহৃৎক কোন কথা বলি নাই, এবং তাঁহার কথা গ্রাহ কিংবা অগ্রাহ কিছুই না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া নীরবে প্রস্থান করিয়াছিলাম।

“অন্তঃপর মক্খলিপুত্ত (মক্খিপুত্ত) গোসালের নিকট গিয়াছিলাম, তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, ‘জীবগণের পাপপুণ্যের কারণ নাই। ব্যক্তিবিশেষের জীবন যে ভাবে গঠিত হইতেছে, তার উপর তাহার কিছুমাত্র হাত নাই। পুরুষকার বলিয়া কোন বস্তু নাই। সমস্ত জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থ একই অলক্ষ্য নিয়মের বশবর্তী, তাহাদের কিছুমাত্র স্বশক্তি নাই, তাহারা অন্ধভাবে ভাগ্যের অধীন হইয়া বিচরণ করিতেছে। তাহারা যে শ্রেণীতে, যে অবস্থায়, বেরূপ প্রকৃতি লইয়া উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই অপরিবর্তনীয় নিয়মানুসারে কাজ করে এবং সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। প্রত্যেক জীবই ৮৪ লক্ষ বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং অসংখ্য উপায় এবং অসংখ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইহজগতে বারংবার গমনাগমন করে। জানী ব্যক্তি ভাবিতে পারেন,—আমি এই সকল

পুণ্যস্থান-দ্বারা কর্মক্ষয় করিব, মৃত্যুও জ্ঞানানুসারে সেইরূপ চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি স্বীয় মানদণ্ডে জীবের সুখদুঃখ পরিমাণ করিয়াছেন, তাহার তিলমাত্রও ব্যতিক্রম হইবার নহে। জন্মজন্মান্তর গ্রহণ করিয়া তাহা অসম্ভাবিকরূপে জীবের ভোগ করিতে হইবে। তীর হইতে গুলি নিক্ষেপ করিলে তাহা একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত গমন করে, সেই সীমা হইতে অধিকতর নিকটে কিংবা দূরে পড়ে না; সেইরূপ জ্ঞানী হউন কিংবা অজ্ঞানীই হউন, কর্মের নির্দিষ্ট গতি অতিক্রম করিবার কাহারও সাধ্য নাই। জন্মজন্মান্তরক্রমে স্বভাবাধীনভাবে কর্মক্ষয় হইলে জীব চরমশান্তি পাইয়া থাকেন।’ হে দেব! মক্খলিপুত্র গোশাল ‘সন্ন্যাসাশ্রমের পুরস্কার কি?’ এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে জন্মজন্মান্তর-দ্বারা কিরূপ পাপক্ষয় হয় তাবিষয়ক উপদেশ দিয়াছিলেন।

“অজিত-কেশকণ্ঠকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, ‘বাগবজ্জের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এই পরিদৃষ্টমান জগৎ কিছুই নহে, পরকাল বলিয়াও কিছু নাই। কোন সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণই প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না, প্রাকৃত মানবের পক্ষে তাহা সুদূরপরাহত। মৃত্যুর পর পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, কিছুই থাকে না। মৃত্যুর পর পিণ্ডাদি প্রদান বিড়ম্বনামাত্র। তাহার মৃত্যুর পর পিণ্ডাদি প্রদান বা সংকারাদির দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপকারের কথা বলেন, তাহার হইয় অজ্ঞ, না হইয় মিথ্যাবাদী। মৃত্যুর পর মৃত্যুও পণ্ডিত সকলেরই অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহাদের কিছুই থাকে না।’ দেব! এই ভাবে অজিত-কেশকণ্ঠ ‘সন্ন্যাসাশ্রমের পুরস্কার কি?’ এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে দেহ এবং আত্মার ধ্বংস-সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

“তৎপর আমি ককুদ-কচ্ছায়নকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, ‘সপ্তপ্রকার দ্রব্যে জগৎ নির্মিত, ইহাদিগকে কেহ সৃষ্টি করে নাই, ইহারা নির্লিপ্ত এবং অবিনশ্বর, এগুলি হইতে আর কিছু উৎপন্ন হয় নাই, গিরিশৃঙ্গের দ্বারা ইহারা অটল। জল, মৃত্তিকা, অগ্নি, বায়ু, সুখ, দুঃখ এবং আত্মা এই সপ্তদ্রব্য, ইহাদিগকে কেহ নিধন করিতে পারে না, ইহারা চিরস্থায়ী। যদি কেহ তীক্ষ্ণ অসিদ্বারা কাহারও জীবন নষ্ট করে, তবে বুদ্ধিতে হইবে যে, পূর্বোক্ত সপ্তদ্রব্যের অভ্যন্তর দিয়া অসি চলিয়া গিয়াছে মাত্র।’ এইভাবে ককুদ-কচ্ছায়ন ‘সন্ন্যাসদর্শনের প্রত্যক্ষ পুরস্কার কি?’ এই প্রশ্নের উত্তরে ভিন্ন এক বিষয়ের ব্যাখ্যা শুনাইয়াছিলেন।

“তৎপরে আমি নিগ্রহ জ্ঞাতি-পুত্রকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, ‘নিগ্রহগণ চারি প্রকার সংঘম অভ্যাস করেন, তাহার সাধারণভাবে জল পান করেন না (জীবহননা-শঙ্কায়) এবং সর্বদা পাপ হইতে বিরত থাকেন।’ ‘সন্ন্যাসাশ্রমের ফল কি?’ ইহার উত্তরে নিগ্রহ জ্ঞাতি-পুত্র আমাকে চারি প্রকার সংঘম-সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দিয়াছিলেন।

“তৎপরে আমি সঞ্জয়বেলট্টিকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, ‘যদি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর পরকাল আছে কিনা, আমি কি উত্তর দিব মনে ভাবিতেছ? পরকাল আছে কিংবা পরকাল নাই, এ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিব না। এই ভাবে “পাপপুণ্যের ফলাফল এবং সত্যরক্ষণশীল ব্যক্তির পরকালের পুরস্কার কি?” প্রভৃতি প্রশ্ন-সম্বন্ধেও আমি সেই

একই উত্তর দিব।' সঞ্জয়বেলটি 'সন্ন্যাসাশ্রমের পুরস্কার কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতি কিংবা পূর্বোক্ত অপরাপর পণ্ডিতগণের প্রতি আমি কোনরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করি নাই। তাঁহাদের বাক্য গ্রাহ্য কিংবা অগ্রাহ্য না করিয়া আমি নিঃশব্দে প্রস্থান করিয়াছি।

"এইরূপ ভগবন্! আমি আপনাকে সেই প্রশ্নই করিতেছি। এই সংসারে সন্ন্যাস অবলম্বন-দ্বারা কি পুরস্কার লাভ হইতে পারে, সংসারাত্মকে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অনুসরণ করিয়া বেক্রপ ফল লাভ হইয়া থাকে, সন্ন্যাসলব্ধ তরুণ কোন প্রত্যক্ষ ফলের বিষয় আমাকে বলিতে পারেন কি?"

"মহারাজ, আমি তাহা বলিতে পারিব, কিন্তু তৎপূর্বে আপনাকে একটি প্রশ্ন করিব। মহারাজ, আপনার দাসগণ প্রত্যয়ে শয্যা হইতে উত্থান করিয়া প্রাণান্ত-পরিশ্রমে আপনার সেবা করিয়া থাকে। তাহারা পরিশ্রম স্বীকার করে কিন্তু আপনি সমস্ত সুখ-সন্তোষ করেন। ইহাদের মধ্যে যদি একজন মনে করে, অপরের জন্ত এত কষ্ট স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? সে যদি গৈরিক বসন পরিধান করিয়া ভিক্ষুর বৃত্তি অবলম্বন করে, ক্রমে যদি তাহার সন্ন্যাসের খ্যাতি প্রচারিত হয় এবং আপনি শুনিতে পান যে, আপনার ভৃত্যগণের মধ্যে একজন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নির্জনে সামান্ত আহারে সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করিতেছে তখন আপনি কি তাহাকে পুনশ্চ দাসবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য করিবেন?"

"কখনই না, বরং তাহার সহিত দেখা হইলে আমি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সম্মান দেখাইব, তাহার সেবাসুশ্রদ্ধার জন্ত লোক নিযুক্ত করিয়া দিব।"

"এরূপ হইলে, মহারাজ, আপনাকে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, সন্ন্যাসদর্শনের কিছু ফল ইহজীবনেই লাভ করা যাইতে পারে।"

"হা, ভগবন্, তাহা স্বীকার্য, কিন্তু ইহা ছাড়া আর কোন ফলের বিষয়ে আপনি আমাকে বলিতে পারেন কি?"

তখন বুদ্ধদেব স্বাধীনজীবী গৃহস্থ যদি সম্পত্তি ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সেও নির্জনে ইন্দ্রিয়সংযমাদি যতিদ্বারা আচরণের জন্ত লোকপূজিত হয়, প্রমাণ করিলেন। রাজা এবারও সন্ন্যাসাশ্রমের কতক ফল ইহলোকেই লব্ধ হইতে পারে, তাহা স্বীকার করিয়া বলিলেন,—“অন্ত কোন উৎকৃষ্টতর ফলের বিষয়ে আমাকে বলুন।"

"সেক্রপ ফল অনেক আছে, বলিতেছি, মনোযোগপূর্বক শুধুন। যদি পৃথিবীতে এরূপ কোন প্রবুদ্ধ সন্ন্যাসীর দর্শন-লাভ হয়, যিনি বিগতস্পৃহ, কামনাশূন্য এবং সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্রিয়জরী, লোভমোহাদি বাহাকে ক্রীড়নকের স্থায় করিয়া রাখে নাই, যিনি নিজ বৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিয়াছেন, বাহার চিত্ত উদ্বেগশূন্য, যিনি পরমরম্য পরমপ্রিয় সত্যের অনুসন্ধান করিয়া তন্মাত্রে চিরপ্রসন্ন হইয়াছেন,—এইরূপ সন্ন্যাসীর দর্শনমাত্র অক্ল গৃহস্থগণের মায়াপাশ কাটিয়া যাইবে। এই বিপদ ও বিষ-সঙ্কল

সাংসারিক জীবন তখন তাহার ভাল লাগিবে না। শৃঙ্খলিত পক্ষী যেরূপ উড়ীড়মান পক্ষিদর্শনে তাহার স্বীয় স্বাবীন শক্তির কথা স্মরণ করে, মুক্ত পুরুষের দর্শন লাভ করিয়া বিড়ম্বিত গৃহস্থ সেইরূপ মুমুক্ষু হইবে। এক উন্নততর উৎকৃষ্ট জীবনের চিত্র তাহার চক্ষে পড়িবে। সে তখন ভিক্ষু হইয়া শান্তিলাভ করিবে। ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করিলে নির্জনে তাহার আত্মানুসন্ধানের প্রবৃত্তি জন্মিবে, সে প্রতিপদে সতর্ক হইবে; যে কামনা বিপদসঙ্কুল, যাহা স্বচনায় লোভের উদ্রেক করিয়া পরিণামে কষ্টের প্রান্তসীমায় উপস্থিত করে, সেইরূপ বাসনার অনুসরণে তাহার স্বাভাবিক ভীতি উৎপন্ন হইবে। সে শয়নে, উপবেশনে, ভোজনে প্রতিকার্যে মহান আত্মসংযমের উদ্দেশ্য স্মরণ করিবে। এইভাবে ভিক্ষু মুক্ত বিহঙ্গের জায় বেছায় বিচরণ করিতে শিক্ষা করে, শেষে কামনা আর তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, ভোগের ইচ্ছা তাহার ক্রমে নিবৃত্ত হইয়া যায়। সংসারাস্রমে তাহার এই নিবৃত্তি-শিক্ষার পক্ষে বহু অন্তরায় আছে।

“মহারাজ, যেমন কোন রোগক্লিষ্ট ব্যক্তি অতি কষ্ট পাইতেছিল, তাহার অগ্নিমান্য হইয়াছিল এবং চক্ষু নিম্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, সে যদি পুনরায় স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়, তবে পূর্বাবস্থা ও পরের অবস্থা স্মরণ করিয়া সে কত সুখী হয়।

“মহারাজ, যেরূপ কোন কারারুদ্ধ ব্যক্তি শৃঙ্খলিত অবস্থায় এক প্রকোষ্ঠে পড়িয়া থাকে, কিন্তু মুক্তি পাইলে সে পূর্বাবস্থা ও পরের অবস্থা স্মরণ করিয়া প্রফুল্ল হয়।

“মহারাজ, যেমন কোন ক্রীতদাস পরের আদেশ-পালনে নিযুক্ত থাকে, তাহার স্বচ্ছন্দ গতিবিধির শক্তি থাকে না, সহসা যদি সে মুক্তি পায় তবে সে কত সুখী হয়।

“মহারাজ, যেনে করুন কোন সম্পন্নব্যক্তি মরুভূমির পথে পড়িয়া অনাহারে ও তৃষ্ণায় বিপদ আশঙ্কা করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি যদি সহসা এক ধনদাত্তশালিনী পল্লীর উপাস্তে উপস্থিত হন, তাহা হইলে কত সুখী হন।

“সেইরূপ ভিক্ষু ক্রমে আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া যখন কামনা হইতে মুক্তিলাভ করেন, তখন সেই রোগমুক্ত, কারামুক্ত, মরুভূমি-উত্তীর্ণ ব্যক্তির জায় তাঁহার আনন্দ লাভ হয়। তাঁহার প্রফুল্লতা হৃদয়ের অন্তঃপুর হইতে উৎপন্ন হয়, বাহিরের অবস্থাচক্রে তাহার হ্রাস বা উপচয়ের সম্ভাবনা থাকে না। যেরূপ কোন নদী, স্বর্ণ হইতে বৃষ্টিধারা পড়ুক বা না পড়ুক, ছইকূল স্পর্শ করিয়া পরিপূর্ণ প্রবাহে চলিয়া যায়, তরুণ তিনিও সমভাবে চলিয়া যান।

“হে মহারাজ, সন্ন্যাসাশ্রমে এই সকল ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে কিন্তু ইহা ছাড়া আরও ফল আছে।

“আত্মসংযমের ফলে তাঁহার সমস্ত হৃদয় পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। যেরূপ এক পদ্মপুকুরে অনেকগুলি পদ্ম বিকাশ পাইয়াছে, জলধারা তাহাদের প্রত্যেকটি পুষ্ট হইয়াছে, শীতলজলস্পর্শে তাহারা নির্মল এবং নবীনভাবে ধারণ করিয়াছে, রক্তবর্ণ, ধূতবর্ণ অথবা নীলবর্ণ পদ্মের কোনটির একটি অংশ নাই যাহা সৌরভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে;—যেরূপ আপাদমস্তক ধূতবর্ণ পরিষ্কৃত বস্ত্রে পরিবৃত্ত হইয়া কেহ উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার শরীরের

এমন কোন স্থান নাই, যাহাতে সেই খেত পরিধেয়ের সংস্পর্শ নাই, সন্ন্যাসাশ্রমে নিকলন্ত জীবন লাভ করিয়াও সেইরূপ সর্লঙ্গীন পবিত্রতা লব্ধ হইয়া থাকে।

“যখন চিত্ত এইরূপে প্রশান্তভাব ধারণ করে, তখন পাপ উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তখন দেহসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। এ দেহ কণিক তৃষ্ণা ও ক্ষুধার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। ধাত্তের সঙ্গে তুষের যে সম্পর্ক, তরবারির সঙ্গে কোষের যে সম্পর্ক, দেহের সঙ্গে আত্মারও সেইরূপ সম্পর্ক। তখন দেহ হইতে আত্মাকে ইচ্ছানুসারে বিচ্যুত করিতে পারা যায়; ইন্দ্রিয়াদি-সংযমশীল মুক্ত সন্ন্যাসীর এই লাভ হয়, যে কোন মূর্ত্তি করনা করিয়া তিনি তাহা পরিগ্রহ করিতে পারেন, তিনি কঠিন ভূমি ভেদ করিয়া তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন, জলের উপর ছুটিয়া বাইতে পারেন, এক হইয়া বহু রূপ গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি ইচ্ছানুসারে দৃশ্য বা অদৃশ্য হইতে পারেন, বিহঙ্গের দ্বায় শূন্যমার্গে উড্ডীন হইতে পারেন। কুস্তকার যেমন ইচ্ছানুসারে যে কোন রূপ ঘট নির্মাণ করিতে পারে, স্বর্ণকার কিংবা হস্তিদন্ত-ব্যবসায়ী বেক্রপ যে কোন মূর্ত্তি গঠন করিতে পারে, সেইরূপ সন্ন্যাসী যে কোন আকার ধারণ করিতে পারেন।

“ইহা ছাড়াও সন্ন্যাসের আরও ফল আছে। চিত্তবৃত্তি প্রশান্ত হইলে তাহার জন্ম-জন্মান্তরের অবস্থা স্মৃতিতে উদ্ভিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বহুজীবনের বিবরণ তাহার মনে জাগরিত হয়; অমুক স্থানে আমি অমুক নামে পরিচিত ছিলাম, অমুক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতাম, আমি অমুক পরিবারভুক্ত ছিলাম, আমার আয়ুর পরিমাণ এইরূপ ছিল; সেই স্থান হইতে আমি অমুক স্থানে পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করিলাম, তথায় আমি এই কাজ করিয়াছিলাম, তারপর আবার আমার অমুক স্থানে জন্ম হয়, ইত্যাদি। এইভাবে পূর্ব্বজন্মের সংস্কার, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল তাহার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয়।

“মহারাজ, বেক্রপ কোন ব্যক্তি এক গ্রাম হইতে অল্প গ্রামে, সে গ্রাম হইতে পুনরায় গ্রামান্তরে বাইয়া শেষে নিজগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন অধ্ব-ক্লান্তি দূর হইলে, প্রশান্ত অন্তঃকরণে বেক্রপ তাহার মনে হয়, আমি অমুক স্থানে গিয়াছিলাম, তথা হইতে অমুক স্থানে বাইয়া এই কার্য্য করিয়াছি, অমুক স্থানে উপবেশন করিয়াছি, অমুক স্থানে দাঁড়াইয়া কথা বলিয়াছি, এবং শেষে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছি; সন্ন্যাসাশ্রমের এই প্রত্যক্ষফল পাওয়া বাইতে পারে, কিন্তু ইহা ছাড়াও উৎকৃষ্ট এবং উন্নততর আরও ফল লব্ধ হইয়া থাকে।

“মুক্ত সন্ন্যাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ হয়, তিনি বস্তু ও জীবের স্বরূপ দর্শন করেন। কোন্ ব্যক্তি কি কর্ম্ম করিতেছে এবং তাহার কি প্রকার অবশ্রুন্তাবী ফল ভোগ করিতে হইবে, তিনি তাহা প্রত্যক্ষবৎ বুদ্ধিতে পারেন। বেক্রপ, মহারাজ! প্রাসাদশিখরে দাঁড়াইয়া কেহ নিম্নে জনশ্রোতের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পায় লোকগণ কে কি ভাবে কাজ করিতেছে, কে আসিতেছে, কে কোন্ পথে বাইতেছে ইত্যাদি, মুক্ত সন্ন্যাসী কামনার পরিণতি সেইরূপ সূচনায়ই দেখিতে পান, কোন্ কামনার পরিণাম বিষময়, কোন্ পথ কষ্টকময়, কোন্ কার্য্যদ্বারা উৎসেগ ও অনর্থ সৃষ্ট হয়, কোন্ কার্য্যদ্বারা উহা নিবারিত হয়,

তিনি উহা জানিয়া কামাসব, ভবাসব এবং অবিজ্ঞাসব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হন। তাঁহার বর্তমান কামনা, ভবিষ্যৎ করনা এবং অজ্ঞানজনিত মোহ এই ত্রিবিধ কষ্টের কারণ একেবারে দূর হইয়া যায়, ঈদৃশ ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া চির প্রশান্তিতে স্থিত হন। যেক্ষণ, মহারাজ, কেহ পরিতপিত্বের দাঁড়াইয়া নির্মল জলস্রোতের প্রতি লক্ষ্য করিলে, সেই নির্মল জলের ভিতর যে সকল শঙ্খ, কঁকর, প্রস্তর এবং হাড়র রহিয়াছে, তিনি তাহা পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইবেন, বাসনাতাড়িত জীবনের কষ্টগুলিও মুক্ত সম্যাসী সেইরূপ দেখিতে পান। এই জ্ঞানই সম্যাস-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ, এই জ্ঞানের তুলা উৎকৃষ্ট ফল মনুষ্য-জীবনে আর কিছু লব্ধ হইতে পারে না।*

ভগবান্ বুদ্ধ এই ভাবে উপদেশ প্রদান করিলে অজাতশত্রু বলিলেন, “হে পরমারাধ্য দেব, পতিত দ্রব্যকে পুনঃ উজ্জ্বল করিয়া দিলে, অথবা যাহা লুক্কায়িত ছিল তাহা সমুখে ধরিলে, অথবা ঘোর তিমিরাবৃত স্থানে আলোক ধরিলে, অথবা পথহারা বিপন্ন পথিককে পথ দেখাইয়া দিলে যেক্ষণ হয়, সেইরূপ ভগবন্, আপনি নানা উজ্জল এবং বিচিত্র উপমা দ্বারা আমাকে সত্যের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। এখন হে দেব, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে আশ্রয়দানে যেন ক্রটি না হয়। ভগবন্, আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করুন, আমি যাবজ্জীবন আপনাতে অনুরক্ত থাকিব। আমি মহাপাপী, মলিনতাপূর্ণ, দুর্বল এবং ঘোর অজ্ঞানাত্মক। আমি রাজ্যলাভের জন্ত আমার পরম পূজনীয় সাক্ষাৎ ধর্মের অবতারস্বরূপ পিতৃদেবকে হত্যা করিয়াছি। তিনি পরম ধর্মনিষ্ঠ, ত্রায়পরায়ণ নৃপতি এবং অতি উদার-চরিত্র দেবসদৃশ ব্যক্তি ছিলেন। আমার তায় নরাদমকে আশ্রয়দান করুন, যেন ভবিষ্যতে আর আমি পাপ না করিতে পারি।”

“মহারাজ, তুমি পাপাসক্ত হইয়া একরূপ কাণ্ডা করিয়াছিলে, কিন্তু তুমি যখন ইহা পাপ বলিয়া মনে করিতেছ এবং সর্বসমক্ষে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ না, তখন আমরা তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি। কারণ যে ব্যক্তি পাপকে পাপ বলিয়া জানিয়াছে, সে ভবিষ্যতে আর পাপ করিতে পারে না।”

সেই রমণীয় জ্যোৎস্নাশীতল নিশীথে রাজা হৃদয়ের ব্যথা জুড়াইবার জন্ত ভগবান্ বুদ্ধদেবের নিকট গিয়াছিলেন। অজাতশত্রু বৌদ্ধধর্ম-গ্রহণের পর ক্রুর ত্রায়নিষ্ঠ-ধর্মপরায়ণ নৃপতি হইয়াছিলেন তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। শারদ নিশীথের পূর্ণচন্দ্র অনন্তপ্রাণে পিপাসা জাগাইয়া তাহা এইভাবে পূণ্যপথে প্রবর্তিত করিয়াছিল।*

এই ‘সাম্যফলসুত্তে’ বুদ্ধদেবের সময়কার নানা দার্শনিক মতের অতি সংক্ষেপে একটা বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে মনে হয়, সেই সময়ে উপনিষদের ব্রহ্মানন্দ অতি জটিল

* মল্লিখিত এই প্রবন্ধটি মন ১০০২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানেশ্বর মহাশয় ইহা তাঁহার “বুদ্ধদেব” নামক পুস্তকে ২০৪-২১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

চিন্তার আবর্তে পড়িয়া কতকটা বিলম্ব পাইবার মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। বুদ্ধদেব কামনা, তাহার প্রগতি ও তাহার শেষ পরিণতি, ঠিক একটা অন্ধুরের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও ধ্বংসের মত স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া তাঁহার ধর্মমত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের উপর স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই যুক্তিতর্কের প্রাবল্যের দিনে তিনি অনির্দিষ্টের সন্ধানে লোককে প্রবর্তিত করিতে চাহেন নাই, কিন্তু প্রায় প্রত্যক্ষ ফলের মত নির্দোষত্বকে স্বেচ্ছাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে পূরণ-কাস্ত্রপ ধর্ম, অধর্ম, পাপ, পুণ্য অস্বীকার করিয়াছিলেন। মক্খলিপুত্র গোশাল অদৃষ্টের অখণ্ডনীয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন এবং ককুদ-কাত্যায়ন কতকগুলি নিত্য বস্তুর তালিকা দিয়া মানুষের কিছু করণীয় আছে ইহা স্বীকার করেন নাই। এই সকল মতের কোনটিতেই সমাজ-রক্ষার ব্যবস্থা নাই। ইহারা অবাধ-চিন্তাশীলতার ফল মাত্র; সাম্প্রদায়িক, সামাজিক, নৈতিক এবং পৌরোহিত্যের সমস্ত কর্মকাণ্ড এই মতবাদীরা ভুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, অথচ কোন একটা নির্দিষ্ট দিকে জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা ইহাদের কোনটিরই মধ্যে ছিল না।

বুদ্ধ আধ্যাত্মিক কোন নূতন চিন্তার বাহাজুরি দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি হুঃখবাদের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আত্মাত্মিক হুঃখ নিবৃত্তির পথ দেখাইয়া সমস্ত বিশ্বকে আহ্বান করিয়াছিলেন। জগতের সকলেই হুঃখী, সকলেই ত্রিতাপ-দগ্ধ সুতরাং জগতের সর্বস্থান হইতেই তাঁহার আহ্বানের সাড়া পাওয়া গিয়াছিল। এইভাবে বৌদ্ধধর্ম সার্বজনীন ধর্মে পরিণত হইয়াছিল। যে সকল সমস্তার উপর সমস্ত জগতের শান্তি নির্ভর করে, তিনি সেই সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া যে রাজপথ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা অচিরকাল মধ্যে সর্বজন-গ্রাহ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

বুদ্ধের সময় উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল মত প্রচলিত ছিল তাহার সকলগুলিই কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। বিদ্বন্মোদ-তরঙ্গিণীতে বৌদ্ধমত বলিয়া বাহা লিখিত হইয়াছে। তাহাতে দৃষ্ট হয় অজাতশত্রু-কথিত ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতের সমস্তগুলিই শেষযুগে বৌদ্ধগণের কোন না কোন সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকে বৌদ্ধমত এই ভাবে বলিয়া লিখিত হইয়াছে :—

“অভিলষিত ভ্রব্যভোজনই স্বর্গ। নিজ পত্নীতে ও পরদারে যথেষ্ট বিহার করিবে।” (স্বদার-পরদারে যথেষ্ট বিহারে সঙ্গ)। “প্রত্যক্ষান্তর মানং ন সকলফলভুং দেহভিন্নোহস্তি কশ্চিদ্ভিধ্যাতুতে সমন্তোহপ্যনুভবতি জনঃ সর্বমেতন্নিমোহাং।” “কা সৃষ্টৌ পরিবেদনা যদি পুনঃ পিত্রোরপত্যাদবঃ। কুস্তাজ্জাঃ প্রভবন্তি সন্ততমমী তন্তংকুলাদিতঃ।” অর্থাৎ দেহ ভিন্ন পাপ পুণ্যাদি সমস্ত কর্মের ফলভোগী কোন আত্মা নাই। এই মিথ্যা-ভূত অখিল সংসারে জীবগণ মোহবশতঃ এই সকল অনুভব করিয়া আসিতেছে। যখন মাতা-পিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হইতেছে, আর সেই সেই কুস্তকারাদি কর্তৃক যখন নিরন্তর ঘটাদি উৎপাদিত হইতেছে, তখন সৃষ্টির জন্ত ভাবনা কি আছে? অর্থাৎ সৃষ্টি কিরূপে হয়, তাহাতো চক্ষুর সম্মুখেই দেখিতেছি, এজন্ত পৃথক সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি?

স্মৃতরাং দেখা যাইতেছে যে শুধু পুরণ-কাণ্ডের মত নহে, মধুরিপুত্র গোশাল, অজিত কেশকম্বল, নিগ্রহ জ্ঞাপিতপুত্র এবং সঞ্জয় বেলটেষ্ঠর মত—ইহাদের কোন মতই ভারতবর্ষে হারাইয়া যায় নাই; বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের পর বাউল ও সহজিয়া গুরুদের মধ্যে যে সকল মত প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাও বিকৃত বৌদ্ধমত। আমরা তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইব, বুদ্ধের সময়ের প্রচলিত যে ছয়টি চিন্তাধারা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলি বৌদ্ধদিগের সমাজে অল্পপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। স্মৃতরাং তৎকালের কোন মতই এদেশে হইতে চলিয়া যায় নাই। সমাজের অধঃপতনের সেই সকল মত সহজিয়াদিগের মধ্যে এখনও বিদ্যমান। অধুনাতন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের নিয়ন্তরে বৈষ্ণব বৌদ্ধমত প্রচ্ছন্নভাবে পরিদৃষ্ট হয়, বুদ্ধের সময়কার ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতও তদ্রূপ কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত হইয়াছিল। সহজিয়াদের বিকৃত সাহিত্য পাঠ করিলে এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে। বঙ্গদেশের এই সকল মত এখনও বৈষ্ণব প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, ভারতের অন্ত কোন প্রদেশে তদ্রূপ উহা আছে কি না তাহা আমরা জানি না। বুদ্ধের নীতিমূলক ধর্মের সঙ্গে এই সকল মতের গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান। বুদ্ধ জটিল আধ্যাত্মিক চিন্তার দিকে একেবারেই যান নাই, কিন্তু এই সকল মতে ব্যাপকভাবে স্বাধীন চিন্তার খেলা দৃষ্ট হইয়া থাকে (পরিশিষ্টে সহজিয়া প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

অজাতশত্রু যে তাঁহার পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে বহুপ্রবাদ ও উপাখ্যান বৌদ্ধজগতে প্রচলিত আছে। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত, যথা ভিন্সেন্ট স্মিথ, —এই সকল প্রবাদ বিশ্বাস করেন নাই। আমরা এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিব না। কিন্তু সন্ন্যাসধর্ম যে গৃহস্থের আশ্রম অপেক্ষা ভাল, তৎসম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মত অপ্রত্যয় করিবার কোন কারণ নাই। সেই মতবাদটি বহুকাল হইতে আমাদের দেশে চলিয়া আসিয়াছে। এখনও এদেশের লোকের বিশ্বাস যে মুক্তিকামী কোন লোক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাঁহার সাত পুরুষ পর্যন্ত উদ্ধার পায়। সেদিনও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘সন্ন্যাসাশ্রম ভাল না গৃহস্থাশ্রম ভাল?’ পরমহংসদেব স্বীয় অভ্যন্তরভাবে একটা প্রবচন দিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন:—‘খোলার মধ্যে থৈ যখন তৈরী হয়, তখন কতকগুলি থৈ আগুনের উত্তাপে বাহিরে আসিয়া পড়ে। কতকগুলি খোলার ভিতরেই থাকিয়া যায়। যেগুলি বাহিরে আসিয়া পড়ে সেগুলি যেরূপ ধ্বংসে সাদা হয়, কড়ার ভিতরের থৈ তেমনটি থাকে না, সেগুলি একটু লালচে হয়।’

বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষমূলে তপঃসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ধর্মার্থ অতিরিক্ত কঠোরতা এবং দৈহিক স্বচ্ছন্দতা—এই উভয় পন্থা পরিহারপূর্বক ‘মধ্যপথ’ অবলম্বন করিয়াছিলেন। বোধদয় জগতে নৈতিক জীবনের প্রতি সর্বপ্রথম তিনিই এতটা জোর দিয়াছিলেন। এই নৈতিক তত্ত্ব অমৃতফল অশোক রাজার সময় ফলিয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইব।

প্রথম পঞ্চ শিষ্যের পর ৬০ জন নূতন শিষ্যকে বুদ্ধদেব দীক্ষা প্রদান করিলেন। বর্ষাকালটি তিনি কয়েক বৎসর ‘মৃগ-দাব’ নামক স্থানে বাস করিয়া উপদেশ প্রদান করিতেন। এই

যুগদাবের বর্তমান নাম সারনাথ। এখানে অশোকরাজা (খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী) ১২৮ ফিট উচ্চ একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। যুগদাব-সংলগ্ন জনপদের পূর্ণনাম ছিল, “ইষিপত্তনমিগদায়” (ঋষিপত্তনযুগদাব)। পরবর্তীকালে এই স্থানে হিন্দুরা সারঙ্গ-নাথের মন্দির স্থাপন করেন এবং তদবধি ইহার নাম সারঙ্গনাথ বা সারনাথ হইয়াছে। বুদ্ধদেবের শিষ্যসংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া চলিল। অনামা নদীর তীরে আনন্দ, দেবদত্ত, অনিরুদ্ধ, শুভোদন, অমৃতোদন প্রভৃতি বহু ব্যক্তি তাঁহার মতে দীক্ষিত হন, ইহাদের অধিকাংশই কপিলবস্তুর রাজবংশজাত। কপিলবস্তুরে ফিরিয়া আসিয়া বুদ্ধ কতক দিন তথায় ছিলেন। এখানে রাজা শুভোদন তাঁহার বাসের জন্ত নগ্ৰোধ মঠ স্থাপন করেন, এই মঠ রোহিণী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এই মঠের ভগ্নাবশেষ শিওপুরের উত্তরে বরগজিয়া নামক স্থানে দৃষ্ট হয়। বোধ হয় বর (বট) গজিয়া ও নগ্ৰোধ একই সংস্কৃত শব্দ হইতে উৎপন্ন। এখানে বুদ্ধপুত্র রাহুল তাঁহার পিতার সঙ্গে দেখা করিয়া নির্ঝাণ ধর্মের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ঋষিপত্তনে তিনি শ্রেষ্ঠপুত্র যশ ও কোণ্ডিষ্ঠকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব বহুস্থানে নানারূপ উপদেশ দিয়া ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে নরলীলা শেষ করিয়া অনন্তধামে প্রয়াণ করেন (৪৮৩ খৃঃ পূঃ)। বৈশালীর নিকট বেলুর নামক স্থানে আসিয়া তিনি বৃথিয়াছিলেন, মৃহা সন্নিহিত। এই স্থানে তিনি প্রিয় শিষ্য কাশ্যপের সঙ্গে বেশ পরিবর্তন করিয়া তাঁহাকেই তাঁহার প্রতিনিধিত্বে বরণ করেন। রাজগৃহ হইতে গওকী নদীতীরে কুশীনগরে পৌছিয়া ‘পাবা’ নামক স্থানে তিনি শিষ্য সহ চূড়্র নামক এক কন্দকারের আতিথ্য স্বীকার করেন। তৎপ্রদত্ত শূকর মাংস ভক্ষণ করিয়া বুদ্ধ নিদারুণ আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। তথায় একটা যমজ শালবৃক্ষ তলে তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হয়।

বুদ্ধের সখা এবং প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে রাজা বিধিসার বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, বিধিসার হইতে বুদ্ধ পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন।

যখন বুদ্ধ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বুদ্ধদ্বাভপূরক রাজগৃহে ফিরিয়া আসেন—তখন বিধিসার তাঁহাকে আদরে অভিনন্দিত করিয়া এই সকল কথা বলিয়াছিলেন :—

“আদিত্যপূর্কং বিপুলং কুলং তে।

নবং বয়ো দীপ্তমিদং বপুষ্য।

গাত্রং হি তে লোহিত-চন্দনহাং

কষায়-সংল্লেশমনহমেতৎ ॥

কন্দাদিয়ং তে মত্তিরক্রমেণ

ভৈক্ষ্যক এবাভিরতা ন রাজ্যে।

হস্তঃ প্রজা-পালন-যোগ্য এবং

ভোক্তুং ন চার্হং পরদত্তময়ম্ ॥”

আপনার স্বর্ঘ্যবংশের বিপুল কুল, নূতন বয়স, দীপ্তমান দেহ, আপনার বুদ্ধিবিকৃতি খটল কেন? রক্তচন্দনে শোভা পাওয়ার যোগ্য অল্প কি কষায় বস্ত্রের উপযুক্ত? আপনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন কেন? আপনার বিশাল ভূজ প্রজাগণের আশ্রয়-স্বরূপ হইবে, ইহা কি পরদত্ত অন্ন গ্রহণের যোগ্য?

এই প্রশ্নগুলি পড়িয়া রামায়ণের কিক্কিয়া কাণ্ডের তৃতীয় সর্গে লঙ্কণের প্রতি হনুমানের উক্তি মনে পড়ে :—

আয়তান্ধ স্তব্ধতাং বাহবঃ পরিঘোপমাঃ ।

সর্বভূষণভূবাহাঃ কিমর্থং ন বিভূষিতাঃ ॥ ইত্যাদি ।

[আপনার পরিঘতুল] হইবাহ আয়ত ও বৃত্তাকৃতি (স্বগোল), এই বাহ সমস্ত ভূষণ-ধারণের যোগ্য, অথচ আপনি ভূষণহীন কেন?]

কথিত আছে বুদ্ধদেব ত্রিশজন রাজাকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। কাশ্যপ, সারিপুত্র, মৌগল্যায়ন, অনিরুদ্ধ, পূর্ণ, কাত্যায়ন, উপানি ও রাহুল—ইহারা ই তাঁহার সর্বপ্রথমকার শিষ্য। বুদ্ধের মাতামহের নাম অঞ্জন ছিল। এইজন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ৩য় অধ্যায়ে বুদ্ধমাতা মারাদেবীকে ‘অঞ্জন’ বলা হইয়াছে।

বুদ্ধ ২৯। বৎসর বয়সে (৫৯৪ খৃঃ পূঃ) সম্যাস গ্রহণ করেন, ছয় বৎসর তপস্তা সাধনের পর (৫৮৮ খৃঃ পূঃ) গয়াতে তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তিনি গয়ায় এক মাস একুশ দিন অবস্থান করেন; তৎপরে কাশীতে আগমনপূর্বক ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত হন।

বুদ্ধ যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা নূতন বলা যায় না। হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্র খুঁজিলে তাঁহার সকল মতের আদির সন্ধান মিলিবে। কামনা জয়, ইন্দ্রিয়ের প্রশমন, জন্মান্তর বাদ, অহিংসা, হুঃখনিবৃত্তি প্রভৃতি সমস্ত কথাই আমরা হিন্দু দর্শন ও মহাভারতাদি পুরাণে প্রাপ্ত হই। অতিশয় দুঃস্বপ্ন তপস্তা এবং বিলাস উভয়ই পরিত্যাগপূর্বক মধ্যপথ অবলম্বনীয়,—এই নীতি বুদ্ধদেব প্রচার করিয়াছিলেন—এই মধ্যপথ মহাভারতও নির্দেশ করিয়াছেন। এ্যারিস্টটল গ্রীকদিগের মধ্যে এই



মৌগল্যায়ন।

মাধ্যমিক পন্থার উপদেশ দিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব যে সজ্জের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাই বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্ব। শ্রবীদের যে আশ্রয় ছিল—তাহা পারিবারিক জীবনেরই অঙ্গীয়। শিষ্য কয়েক বৎসর মাত্র গুরুর আশ্রমে থাকিতে পারিতেন। বুদ্ধের নির্দিষ্ট অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনার সহজ উপায়,—উহাতে সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্,—প্রজ্ঞাসঙ্কল্প, সম্যক্ ব্যাঘাম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাদি—সমাধিসঙ্কল্প এবং সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্মান্ত ও সম্যক্ আজীব—শীলব্রহ্মের অন্তর্গত। এই অষ্ট মার্গ ছাড়া দশটি নিষেধ-বিধির উল্লেখ করা বাইতে পারে :—

- ১। পানাতিপাত—প্রাণীহত্যা হইতে বিরতি।
- ২। অদিম্মাদান—অদত্তা দান বা চুরি।
- ৩। কামেসুমিচ্ছাহার—মিথ্যা কামাচার।
- ৪। মুসাবাদ—মিথ্যা কথা বলা।
- ৫। পিস্থনবাদ—ভেদ বাক্য।
- ৬। করুদবাদ—কর্কশ কথা বলা।
- ৭। সম্বল্লাপ—নিরর্থক কথা বলা।
- ৮। অভিজ্জা—পরদ্রব্যে লোভ।
- ৯। ব্যাপাদ—মানসিক হিংসা।
- ১০। মিচ্ছাদিট্ঠি—বিপরীত জ্ঞান।

একথা সকলেই অবগত আছেন, বৌদ্ধধর্মের বিজয়ধ্বজা যুরোপে প্রবেশ করিয়া খৃষ্ট-ধর্মকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল; আদিযুগের খৃষ্টীয় 'চার্লস' বৌদ্ধ সভ্যতারামের ছাঁচে গঠিত হইয়াছিল। জন নামক এক ধর্মবাজক (John the Monk) খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বুদ্ধের কাহিনী "বারলাম এবং যোসেপের" কথা বলিয়া যুরোপে প্রচলিত করেন। এই পরিবর্তিত নামে খৃষ্টানেরা বুদ্ধকে তাঁহাদের একজন ধর্মগুরু বলিয়া স্বীকার করেন। মহাকবি ডাণ্টে তাঁহার প্রসিদ্ধ "ডিভাইনা কমেডিয়া"তে বুদ্ধদেবের সম্পর্কে এইরূপভাবে সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন :—*"un uom nasce alla riva dell' Inds, e quive éebi ragiom de christo, néchi, legga, nechi scriva e tuth suoi Voleried attribuoni Sono, quanto ragione umana vede Senza peccato in Vita o in Sermoni"* (Paradiso, XIX 70-75). ইহার মর্মার্থ এই—*"তিনি সিদ্ধুর উপকূলে জন্মিয়াছিলেন, যে দেশে কেহ কখনও খৃষ্টের কথা বলে না, তাহারা লিখিতে পড়িতে জানে না—তাঁহার সমস্ত উদ্দেশ্য এবং কাজ—মানবীয় যুক্তি অনুসারে শুদ্ধ। কাহাকেও তিনি বাক্যে ও কার্যে বাধা দেন নাই।"*

ডাঃ কে. ই নিউম্যান বুদ্ধের উল্লেখ-সূচক ডাণ্টের এই উক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মারকো পোলো (Marco Polo) বুদ্ধ সম্বন্ধে এয়োদশ শতাব্দীতে (১২৯৮-১২৯৯ খৃঃ) লিখিয়াছেন "এই সাগোমনি (শাক্যমুনি) ভারতীয় লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, এবং প্রথম সাধু। ইনি একজন ধনশালী এবং পরাক্রান্ত রাজার পুত্র ছিলেন, কিন্তু হৃদয়ের মহত্বগুণে সমস্ত ভোগ-বিলাস ত্যাগ করেন। তারপর বৃদ্ধদেব কিরূপে তাঁহার পিতা কর্তৃক এক মনোরম নিভৃত গৃহে জগতের দৃষ্টির অন্তরালে স্তরক্ষিত হইয়াছিলেন এবং সহসা রাজপথে বাহির হইয়া এক খলিত দস্ত, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে ও একটি মৃত ব্যক্তির শব দেখিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, মার্কো পোলো তাহার সবিস্তার বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি উপসংহারে লিখিয়াছেন, “যদি ইনি শুধু ধৃষ্টদর্শের দীক্ষাটি পাইতেন, তবে ইনি জগতের একজন সর্বপ্রধান সাধু হইতে পারিতেন।” মার্কো পোলো ব্রাহ্মণদিগের নিরামিষ ভোজন ও বৈরাগ্যের নানা দৃষ্টান্ত দিয়া উলঙ্গ জৈন-সন্ন্যাসীদের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “ইহারা উলঙ্গ থাকেন কেন জিজ্ঞাসা করাতে উত্তরে বলিয়া থাকেন,—“আমরা জগতে কিছুই লইয়া আসি নাই—জগতের কোন জিনিষের উপর আমাদের দাবী নাই।”

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

“হেথায় আৰ্য্য, হেথা অনাৰ্য্য, হেথায় জাবিড় চীন—
শক ছন দল, পাঠান ও যোগল, এক দেহে হ’ল লীন।”

—রবীন্দ্রনাথ।

আৰ্য্য ও অনাৰ্য্য সংমিশ্রণ

বেদের সময় হইতে আমরা দেখিতে পাই, এই দেশে আৰ্য্য ও অনাৰ্য্যের অবাধভাবে মিলন হইয়াছে। সেই সময় হইতেই একদল যজ্ঞের পক্ষে, অপর দল যজ্ঞের বিপক্ষে। আৰ্য্যগণের মধ্যেও যজ্ঞ-বিরোধী ও ইন্দ্রের বিদ্রোহী লোকের অপ্রতুল ছিল না। তাহারা ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেন ও সর্বপ্রকার যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন, তাহাদের মধ্যেও অনেক অনাৰ্য্য রাজা ছিলেন, তাহারা আৰ্য্যদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। এদিকে

আৰ্য্যগণের একদল ইন্দ্রের বিপক্ষ হইয়া অনাৰ্য্য কোন কোন ইন্দ্রের পক্ষ বিপক্ষ।

সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। বেদের সময় হইতে আৰ্য্য-অনাৰ্য্য মিশ্রণ আরম্ভ হইয়াছিল; সেই খিচুড়ীর মধ্যে ডাল-চাল বাছিয়া লওয়া সম্ভবপর নহে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ—ভট্টাচার্য্য, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় চক্রবর্তী, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, দেবশর্মা প্রভৃতি উপাধির মুখোপাধ্যায় পরিবার তাহাদের স্বরূপ বদলাইতে পারিবে না। তাহাদের রক্তের রাসায়নিক পরীক্ষা হইলে কতরকম উপাদানই যে তাহাতে পাওয়া যাইবে তাহার অবধি করা যায় না।

মহারাষ্ট্রে ভাষায় একটি প্রবাদ আছে (নদী চৈ পাহ নয়ে মুক্ত অপি ঋষিট পুস্ং নয়ে কুচ্চ) “নদী এবং ঋষির আদি খুঁজিতে নাই।” ব্যাস দীঘর কচ্ছার সন্তান, পরাশরের মাতা ছিলেন চণ্ডাল কচ্ছা,—(মহাভারত বনপর্ক)। বশিষ্ঠ বেণ্ডাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (ভাগবতকার—ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্টিকোয়েরী, জানুয়ারী ১৯১১) এবং ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ৪০ এবং ৪৪ সূক্তের রচকস্বরূপ কল্পিত ছিলেন। নাভাগরিষ্ট নামক বৈজ্ঞানিক হই পুত্র ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিলেন, (হরিবংশ)। ভারতবাসীদের মধ্যে শুধু আৰ্য্য ও অনাৰ্য্য এবং আৰ্য্যদের নানা-শ্রেণীর মধ্যে প্রতিলোম এবং অহলোম বিবাহ দ্বারা যে মিশ্রণ হইয়াছিল,—ইহাই শেষ নহে, যখন, দ্রোণ প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক যে আৰ্য্য সামাজ্যে প্রচুর সংখ্যায় মিশিয়া গিয়াছিল

তাহা ডি. আর. ভাণ্ডারকার ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারির এক প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন (১৯১১, জাহুয়ারী সংখ্যা)। বৌদ্ধধর্মের আমন্ত্রণে নানাজাতীয় লোক এতদেশে আসিয়া নাম পরিবর্তনপূর্বক বৌদ্ধসমাজে মিশিয়া গিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ যবনবীর মিনেণ্ডার নাগসেন কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইবার পর ভারতবর্ষে এতটা জন-প্রিয় হইয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের সাতটি সমৃদ্ধ নগরী তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় চিত্তাভ্যন্তের জন্ত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া ছিল; এই প্রবাদটি খুটাক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। * শকরাজরা বিদেশাগত; তাঁহাদের কেহ কেহ বৌদ্ধধর্ম এবং কেহ কেহ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া বিপুল ভারতীয় জনসমাজে মিশিয়া গিয়াছেন। বহু যবন (গ্রীক) বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বৌদ্ধ সমাজে দানের কথা নানা স্থানের প্রস্তর-লিপিতে পাওয়া যাইতেছে—গ্রীক দেশীয়েরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া কেহ কেহ বিষ্ণু-মন্দির অথবা গুরু-দ্বন্দ্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। শকরাজ স্বভদ্রদত্ত ব্রাহ্মণদিগকে তিন হাজার গাভী দিয়াছিলেন এবং প্রভাসে আটজন ব্রাহ্মণের বিবাহ দেওয়াইয়া সে কথা তাম্রলিপিতে উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রতি বৎসর এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পুণ্য অর্জন করিতেন। রুদ্রদমন নামক এক শক-ক্ষত্রপ আয়ুর্বেদ ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। এই শক রাজগণের আদিপুরুষেরা বিজাতীয় ছিলেন, তাঁহাদের নামেই তাহার পরিচয়; যথা ‘স্পেলি-রিসেস’ ‘আজস্,’ ‘মোয়াস্’। তাঁহারা পশ্চিম হইতে শাসনকর্তা পাঠাইয়া এক কালে তক্ষশীলা, কাপিণ্ডয়ার, মালব এবং দাক্ষিণাত্য পার্শ্বান্ত শাসন করিতেন। তাঁহাদের রাজারা হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ‘স্পেলোহোরস্,’ ‘স্পেলোগডামাস্’ প্রভৃতি রাজারা “দার্মিকা” উপাধি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মৃত্যুর ধর্মচক্র চিহ্নিত করিয়াছিলেন। এই সকল রাজাদের কেহ কেহ হিন্দু হইয়া স্বকীয় মৃত্যু বৃষভ-লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। আভীরগণ এক সময় আর্য্য-সমাজ-বহির্ভূত ও হিন্দুগণের শত্রু ছিলেন, তাঁহারা শেষে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু নামে পরিচিত হইয়া বিশাল হিন্দু সমাজে মিশিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এখন সিন্ধুনদীর তীর হইতে বঙ্গদেশ এবং দাক্ষিণাত্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন। আভীর-লেখমালায় (১৮০ খৃঃ) এই বিষয় উল্লিখিত আছে।

অনার্য্য দাসগণ সম্বন্ধে ঋগ্বেদের এক স্তোত্রে লিখিত আছে—“আমাদিগের চতুর্দিকে দস্যুজাতি আছে,—তাহারা বস্ত্র করে না, তাহারা কিছু মানে না,—তাহারা মানুষের মধ্যেই নয়, তাহাদের ক্রিয়াকলাপ ভিন্ন রকমের। হে ইন্দ্র! তুমি ইহাদিগকে বিনাশ কর।” কথিত আছে ইন্দ্র দাসরাজ সম্বন্ধে এক শত সংখ্যক প্রস্তর-নির্মিত নগরী ধ্বংস করেন। ত্রস নামক

* এইরূপ সপ্ত নগরীর দাবী সম্বন্ধে হোমারের একটি প্রবাদ আছে :—

“Seven wealthy cities claim for Homer dead,
Through which the living Homer begged his bread.”

এক অনার্য্যরাজা ইন্দ্রের অন্তরঙ্গ স্ত্রী ছিলেন। অপর এক দাস-রাজা—নমুচি—ইন্দ্রের সঙ্গে বহু বিরোধ করিয়াছিলেন। আর্য্যবংশীয় অর্ণ এবং চিত্ররথ যজ্ঞ করিতেন না, তাঁহারা ইন্দ্রকে মানিতেন না, ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বধ করেন। বস্তুতঃ সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পাঠ করিলে দেখা যাইবে, পুরাকালে যুদ্ধ-বিগ্রহগুলি আর্য্য ও অনার্য্যের যুদ্ধ নহে,—ইন্দ্রপক্ষীয় যজ্ঞানুষ্ঠানকারীদের সঙ্গে ইন্দ্রের বিপক্ষ যজ্ঞ-বিরোধীদের যুদ্ধ—উভয় দলেই আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই শ্রেণীর লোকই ছিলেন।

বেদোক্ত পণিজাতি ফিনিশিয়ান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহারা ইন্দ্রের বিরোধী ও যজ্ঞের অনিষ্টকারী ছিলেন। ইন্দ্র সরমাকে পাঠাইয়া তাঁহার বলবীর্য্যের বর্ণনা ও ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক পণিদিগকে হাত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন; পণিজাতি। তাঁহারা বলিয়াছিলেন—“আমরা ইন্দ্রের বশ্যতা স্বীকার করিব না, আমরাও যুদ্ধ করিতে জানি।”

এই পণিরা অতি বিপুল ভাবে ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ তাঁহারা মাংসাশী ছিলেন না; গরু-সেবা এবং গোজাতির রক্ষা করিয়া গোছড় হইতে মাখন, ছানা, ঘৃত প্রভৃতি উৎপন্ন করিতেন। সিভিলিয়ান স্বর্গীয় এ. সি. সেন মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ইন্দ্র পণিদিগের নিকট পাঁচ প্রকার গব্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিলেন—ছানা, মাখন, ঘি, দধি ও ক্ষীর। তথাপি ইন্দ্র কতবার যে ইহাদের নিকট হইতে গরু অপহরণ করিয়া হত্যা করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। যজ্ঞে অসংখ্য জীবহত্যা হইত এবং যজ্ঞকারিগণ প্রচুর পরিমাণে মত্ত (সোমরস) পানপূর্ব্বক উদ্বলিত হইয়া থাকিতেন,—পণিরা এই সন্তোষ আচারের বিরোধী ছিলেন। যজ্ঞক্রিয়ায় ঋষিদিগের প্রাপ্যের মাত্রা বেশ ছিল। তাঁহারা ২২ উপলক্ষে ইন্দ্রের স্তোত্র রচনা করিয়া বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হইতেন। বক্রশ্বি কোন এক যজ্ঞ উপলক্ষে ইন্দ্রের স্তোত্র রচনা করিয়া রুমগণ হইতে চারি হাজার গাভী, একখানি সুন্দর বাড়ী এবং একটি উজ্জল স্বর্ণকলসী পাইয়াছিলেন; স্তুরাং ঋষি ও তদংশীয়েরা বে যজ্ঞের বিশেষরূপ পক্ষপাতী হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই সকল যজ্ঞ ও উৎসবে সর্বদা পশুহত্যা হইত। ঋগ্বেদে লিখিত আছে, বৃত্রবধ করিয়া ইন্দ্র বে বিপুল উৎসবের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তিন শত মহিষ মারিয়াছিলেন। সেকালে ভারতবর্ষ সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি ঋষদ-সংকুল ভীষণ জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। স্তুরাং এই জঙ্গল পরিষ্কার করা ও পশুহত্যাপূর্ব্বক জন-নিবাসের প্রসার বৃদ্ধি করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বহুদিন ধরিয়া যদি কোন স্থানে স্তব্ধ বৃক্ষসমূহ দাহ করা হয়, তবে তজ্জাত জলীয় ধূমে আকাশে মেঘোৎপত্তি হইতে পারে,—এজন্ত অনাবৃষ্টি নিবন্ধনও রাজারা মেঘ-কামনায় সময়ে সময়ে যজ্ঞ করিতেন।

আর্য্যগণের নির্মম পশুহত্যা ও যজ্ঞের বীভৎসতা তৎবিরোধী পশুপালক পণি ও অপরায়ণ জাতীয় লোকেরা লক্ষ্য করিয়া হঃখিত ও বিমর্ষ হইতেন। এই পশুহত্যার

বিরোধী দল জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশঃ সংখ্যায় প্রবল হইয়া ক্ষুদ্র নিখাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন। মহাভারতের সময় জনমত অনেকটা পশুহত্যার বিরোধী হইয়াছিল।

মহাভারতকার পশুহত্যার বিরুদ্ধে অনেক কথা কহিয়াছেন, আমরা তাহা পূর্বের এক অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি (১ম অ°, ৭ম প°, ৫১ পৃঃ)। কিন্তু মহাভারত মূলতঃ ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবান্বিত। জীবহত্যার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার যত প্রকাশ করিয়া ব্যাস জনমতের প্রবাল্য স্বীকার করিয়াছেন মাত্র, অপিচ জীবহত্যার পক্ষে এতগুলি রক্ষা-কবচের বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছেন যে তাহাতে পশুহিংসার নিবৃত্তি হয় নাই। বঙ্গদেশের সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস একরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, টিকিটি টানিলে যেকোন মাথাটা চলিয়া আসিতে বাধ্য, সেইরূপ বাঙ্গলার কথা-প্রসঙ্গে সমস্ত ভারতীয় ইতিবৃত্তের উল্লেখ মাঝে মাঝে অপরিহার্য।

আমরা দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছি যে, আদিকাল হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও জনমতের মধ্যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। কোনও সময় গোড়া ব্রাহ্মণগণ বৈদিক আচার ও যাগযজ্ঞ চালাইয়াছেন,—কখনও বা বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মের

ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও জনমত।

আচারে অহিংসা-মূলক জনমত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আনুষ্ঠানিক ধর্মের বহু আচার বিচার এবং কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের করতলগত ক্ষমতার লীলা একদিকে, অপর দিকে প্রাচীন যাগযজ্ঞের হুর্গের লোহ প্রাচীর ভেদ করিয়া মুক্ত আকাশের আলো ও বায়ু আনিবার প্রচেষ্টা—এই দুই প্রবাহ ভারতীয় সভ্যতাকে যুগে যুগে রূপান্তরিত করিয়াছে।

আমরা আরও দেখাইয়াছি, বর্ণাশ্রমের ভিত্তি—রক্তের বিশুদ্ধি—কতটা অসার। সেই পুরাকাল হইতে নানাজাতীয় লোক—আর্য ও অনার্য—ভারতীয় সমাজ গঠন করিয়াছে।

বিস্তৃতি।

স্বল্পভাবে বিচার করিলে বৃত্তি-হিসাবে শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করা

বাইতে পারে—কিন্তু রক্তের বিশুদ্ধতা একটা অলীক স্বপ্ন। বংশ-

মর্যাদা বাহাদের মধ্যে যত বেশী, তাঁহাদের মধ্যে গলদ তত বেশী। শ্রীকৃষ্ণ প্রাচ্যবিজ্ঞা-মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার জাতীয় ইতিহাসের পিরালী ব্রাহ্মণ-খণ্ডে বঙ্গীয় কুলীন সমাজের যে বীভৎস দৃষ্ট উদ্যোচিত করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিতেও কুষ্ঠা হয়। মুসলমান সম্রাটগণ বহুসংখ্যক বেগমকে অবরোধে আটকাইয়া—নিষ্ঠুরভাবে ছোট ছোট শিশুর অঙ্গ-বিকৃতি ঘটাইয়া—খোজাবাহিনী সৃষ্টিপূর্বক এবং সঙ্গিন পাহারার ব্যবস্থা করিয়া, স্বভাবের গতি রোধ করিতে পারেন নাই; আর দূরদূরান্তর পরীতে স্বামী হইতে সম্যক বিচ্ছিন্ন শতশত ধর্মপত্নী শুধু শাস্ত্রের বচন শুনিয়া নিরন্ত থাকিবেন, এ প্রত্যাশাই বা কে করিতে পারে? বাঙ্গলার এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন মেলের পঙ্ক্তিবৃত্ত কুলীনদিগের কুল কলঙ্ক-লাহিত, সে কথা বলা নিম্প্রয়োজন। বাঙ্গলা দেশে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব সম্প্রতি যত বেশীই হউক না কেন, একদিন এমন ছিল যে, উত্তর-পশ্চিমের ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ-দিগকে বিদ্ধার করিতেন, এখনও তাঁহারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে পঙ্ক্তি রক্ষা করিতে নারাজ। অথচ উত্তর-পশ্চিমের ব্রাহ্মণদিগের নিজেদের গলদের সীমা নাই। অধ্যায়ভাগে

ভাণ্ডারকরের যে প্রবন্ধের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যায় তৎকালকার ব্রাহ্মণেরাও মিশ্রজাতি। এই মিশ্রজাতি আবার এদেশের ব্রাহ্মণগণকে যেরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাহাতে বুঝা যাইবে, এদেশের ব্রাহ্মণ অজ্ঞাত শ্রেণীর হিন্দুর সঙ্গে এক সময়ে একরূপভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে চিনিয়া বাহির করা শক্ত হইয়াছিল, এজন্য কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এখন যে ১২১৩ লক্ষ ব্রাহ্মণ বঙ্গে দর্প-সহকারে শিখা উত্তোলন করিয়া আছেন, তাঁহারা কি পাঁচটি মাত্র ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন? ইহা অসম্ভব। এই বাঙ্গলা দেশেরই প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁহারা অবাধে মিশিয়া গিয়াছেন। মাধার খুলি পরীক্ষা করিয়া টিবেটো-বর্মণ, জাবিড়, তামিলী প্রভৃতি কত শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যে এই দেশের নানা শ্রেণীরই সম্পর্ক অবধারিত হইবে, তাহা বলা যায় না। অম্বষ্ঠহৃত্তে (পালি অম্বষ্ঠহৃত্ত) বুদ্ধদেবের মুখে যে সকল কথা বলা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, এক সময়ে ক্ষত্রিয় জাতিই সমাজে প্রধান ছিলেন, ব্রাহ্মণের পদ-মর্যাদা সমাজে হীনতর ছিল। পরশুরামের সময় ক্ষত্রিয়েরা অতিদর্পী হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা করিতেন; এইজন্য “নবলং ক্ষত্রিয়স্ত, ব্রাহ্মণস্ত বলং” এই বুদ্ধবাণী ঘোষণা করিয়া পরশুরাম রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উচ্চবর্ণগুলির কুলগ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যাইবে তাহাদের সঙ্গে নিম্নবর্ণের নানারূপ মিশ্রণ ঘটিয়াছে। সূতরাং শুধু বেদ, উপনিষদ, শিখা, উপবীত ও উপাধি দেখাইয়া আপনাদিগকে “ভূদেব” বলিয়া প্রচার করা ও বর্ণাশ্রম ধর্মের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা তাহাদিগকে নিম্নশ্রেণীভুক্ত করিয়া অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছি, পবিত্র দেব-মন্দিরে—যেখানে ভগবান্ সর্বজগতের পিতা, সর্বজগতের মাতা, সর্বজগতের পিতামহ (পিতাহং সর্বজগতো মাতা বাতা পিতামহঃ) একমাত্র আরাধ্য,—সেই পিতৃমাতৃ ও পিতামহদেবের অঙ্কে যাইবার প্রবেশদ্বারে খাড়া পাহারা রাখিয়া—বিদ্वाধিপের সন্তানগণকে তাঁহার উদার মন্দিরের দ্বারে ঠেকাইয়া রাখিয়াছি—তাহাদিগের প্রতি এই আচরণ ইতিহাস সমর্থন করে না। এই আচারের অঙ্গদ্বারা আমরা অথও দেশকে শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া সমস্ত জাতিকে নিবীৰ্য্য ও বলহীন করিয়া ফেলিতেছি। বাঙ্গলা দেশে প্রত্যেক নিম্ন জাতির মধ্যে সুস্পষ্ট আর্য্যলক্ষণযুক্ত নরনারীর অভাব নাই, অথচ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকদিগের মধ্যে অতি দুর্বল অনার্য্য-মূর্তিও আমরা দেখিতে পাই—উপবীত, তিলক, কপ্তী বা অস্ত্র কোন ছাপে সেই অনার্য্যতা ঢাকা পড়ে না।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার “নেপালের সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য” নামক সন্দর্ভে একটি সুপ্রাচীন গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে, আদিকালে ত্রিশদুর নামক এক চণ্ডাল উত্তর-ভারতে শার্দূলকর্ণ নামক তাহার পুত্র-সহ বাস করিত। জন্মজন্মান্তরের স্মৃতিফলে ইহারা বেদবেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিল। ত্রিশদুর একটি ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত তাহার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করে। ব্রাহ্মণ চণ্ডালের স্পর্শায় ক্রোধান্বিত হইলে চণ্ডাল তাঁহাকে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছিল :—

“সোণাতে আর ছাইতে খুব একটা পার্থক্য আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণে আর অপর জাতির লোকের মধ্যে তেমন কিছু পার্থক্য ত নাই। কাঠে কাঠে ঘষিলে আগুন জ্বলে, ব্রাহ্মণ তেমন কোনও কাণ্ড হইতে ত জ্বলে না, আকাশ হইতে পড়ে না, ভূঁই ফুঁড়িয়া উঠে না। ঠিক চণ্ডালের মতই ব্রাহ্মণও মায়ে পেরে হইতে পড়ে। যখন মরে তখন অল্প জাতির মত তাহার শবও অশুচি হয়; এ বিষয়ে কোন ভেদ দেখা যায় না। ব্রাহ্মণেরা মাংস খাওয়ার লোভে ভয়ানক নিষ্ঠুর বস্তু করে। তাহারা বলে—ছাগল ইত্যাদি পশুকে মস্তদ্বারা পবিত্র করিয়া যজ্ঞে বধ করিলে স্বর্গে যায়। যদি স্বর্গে যাওয়ার পথ ইহাই হয়, তবে তাহাদের বাপ মা ভগিনীদিগকে কেন সেই উত্তম পথেই স্বর্গে পাঠাইয়া দেয় না? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এ সকল নামে মাত্র, এগুলিতে কোনও বিশেষ ভেদ বুঝায় না; সমস্ত মানুষেরই পা, উরু, নখ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গগুলি ঠিকই এক রকম, কোনও কিছুতে এতটুকুও ভেদ নাই। সেজন্ত চারিটা আলাদা আলাদা শ্রেণী থাকিতে পারে না। ছেলেরা পথে খেলিতে খেলিতে খানিকটা ধূলা জড় করিয়া উহাকে ভাগ ভাগ করিয়া রাখিয়া বলে এই রহিল জল, এই দুধ, এই দই, এই মাংস, এই ঘি ইত্যাদি। কিন্তু তাই বলিয়া ধূলিরাশি এই সকল জিনিষের কোনও একটাও হয় না। তেমনি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি কতকগুলি নাম মাত্র, উহারা বিভিন্ন জিনিষ নয়। জন্তুদের মধ্যে—গরু, ঘোড়া ইত্যাদির মধ্যে আকৃতির ভেদ আছে। সেই জন্তু গরু একটা জাতি, ঘোড়া আর একটা জাতি এবং আর আর জন্তু আর এক এক জাতি। তেমনি আম, জাম, খেজুর ইত্যাদিও বিভিন্ন জাতের। কিন্তু ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণে কোনও আকারের পার্থক্য না থাকায় উহারা ভিন্ন জাতের হইতে পারে না। বলা হয় যে, ব্রাহ্মণেরা দেবতা হয়, ক্ষত্রিয়েরা হয় বক্ষ, বৈশ্যেরা হয় নাগ ও শূদ্রেরা হয় অশ্বর। যদি তাই হইত, যদি শ্রুতির এই কথা সত্য হইত যে ব্রাহ্মণ হইতেই ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য হইতেই বৈশ্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের জন্ত বিশেষ কোনও চিহ্ন থাকিত। চারিটা বর্ণের সকলেই নিজ নিজ কৰ্ম-ফলে স্বর্গলাভ করিতে পারে, জাতি-বিশেষের কোনই বাধা সে বিষয়ে নাই। সেই জন্ত জাতিগত কোনও বিশেষ ভেদও নিশ্চয়ই নাই। মানুষের মধ্যে বাহারা জমি চাষে, বীজ বোনে, শস্ত জন্মায় তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলে। বাহারা বিবাহ না করিয়া বনে গিয়া ঘাস-পাতার ঘর বানাইয়া ধ্যানে দিন কাটায় তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে বাহারা গ্রামে থাকে ও মন্ত্র শিক্ষা দেয়, তাহাদিগকে অধ্যাপক বলে। বাহারা লাভের আশায় এটা-সেটা কাজ করে তাহাদিগকে শূদ্র বলে। বাহারা রথ বা হাতী চালনার কাজ লয় তাহাদিগকে মাতঙ্গী বলে। বাহারা চাষ করে তাহাদের নাম চাষা। বাহারা বাণিজ্য করে তাহাদের নাম বণিক। বাহারা গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লয় তাহাদিগকে প্রব্রাজক বলে। বাহারা সং আচরণ-দ্বারা প্রজা রঞ্জন করে তাহাদিগকে বলে রাজা। ইহাদের কোনটাতেই জন্মগত বিশেষত্ব নাই।” ইং হরিজন, ৩০ সখ্যা।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লিখিত এই বিষয়টি সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হরিজন পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং বাং ১৩৪০ সনের ২৯শে ডিসেম্বর

বঙ্গবাণী তাহা বাদলায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। আমি সেই অনুবাদ অবলম্বনে ইহা এখানে দিলাম।

বৌদ্ধধর্মের আদি সময়ে এবং তৎপূর্বের হিন্দু সমাজে জাতি-ভেদ অনেক পরিমাণে শিথিল ছিল, নতুবা চণ্ডালের পক্ষে ব্রাহ্মণের নিকট এবংবিধ প্রস্তাব করা কখনই সম্ভবপর হইত না। জাতি-ভেদের একুপ কড়াকড়ি ও শক্ত আইন-কাহ্নন বঙ্গদেশে বিগত ৫১৬ শতাব্দীর মধ্যে হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু সমাজের সেই সকল গোড়ামি সবেও তান্ত্রিকগণ ও সহজিয়ারা জাতি-ভেদের বন্ধন শিথিল করিয়া সেই সমাজের খিড়কির দরজা অনেকটা মুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহাতে সর্বজাতির মিলন ঘটিতে পারিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রামায়ণ, সন্ন্যাসধর্মের প্রতিবাদ

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন অহিংসনীতির জয় ঘোষণা করিয়াছে। জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া পণি বা বণিক-সম্প্রদায়, এই অহিংসনীতিকে সংবর্দ্ধনা করিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। বুদ্ধ গার্হস্থ্য আশ্রমকে অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু ভিক্ষুধর্মের প্রতি পিতামাতার আতঙ্ক। সন্ন্যাসাশ্রমকে শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। এই স্থানে আধ্য-

সমাজ বিশেষ ঘা পাইয়াছিলেন। ঋষির আশ্রম অন্তরূপ ছিল, সেখানে বেদবেদান্তের চর্চা হইত, কিন্তু দারাপুত্র ও শিষ্টমণ্ডলী-পরিবৃত ঋষির ধর্ম—সংসারের ধর্ম ছিল, তাহাতে গো-সেবা হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহস্থের সমস্ত কর্তব্যের ব্যবস্থা ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবে ভারতবর্ষে নানাভাবে সন্ন্যাসধর্ম প্রচারিত হইতে লাগিল। পালি সামণ্য ফলস্কৃত-পুস্তকে তাহাদের কথা আছে। বড়দর্শনকারেরা এইরূপ সম্প্রদায়গুলির কোন-কোনটির মতের পরিচালনা করিয়াছিলেন।

রাজপুত্র মহাবীর ও রাজপুত্র বুদ্ধ ভিক্ষু হইয়া ছুই মহৎ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। দলে দলে উচ্চকুলের বংশধরেরা গার্হস্থ্যশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ভিক্ষু-ধর্মের উপর জনসাধারণের একটা ভীতির ভাব সঞ্চারিত হইল। কন্দর্প-সমান রূপ, অটুট নবযৌবন, উজ্জ্বল প্রতিভাশালী রাজকুল-সম্বৃত তরুণেরা এমন কি তরুণীগণও রাজপ্রাসাদ ও রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধসঙ্গে নাম লিখাইতে লাগিলেন। আসমুদ্র-হিমাচলবাসী ভারতীয় পিতামাতারা প্রমাদ গণিলেন। এই সার্কজনীন আতঙ্ক ও ত্রাসের ভাব আমরা

আমাদের শিশুকালেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাদের মা ও দিদিমারা আমাদের পাড়হীন কাপড় পরিতে ও কুশাসনে বসিতে দিতেন না। ইহা সেই বহুগু পূর্বের সার্বজনীন সন্ন্যাসভীতি হইতে উৎপন্ন আতঙ্ক।

হিন্দু সমাজ ভিক্ষুধর্মের ঘা সহিয়া ঝাঁড়াইল—একখানি গ্রন্থের বলে। সেই গ্রন্থের তুল্য প্রিয় গ্রন্থ হিন্দুর আর একখানিও নাই—উহা রামায়ণ। গ্রন্থখানি এই সত্য প্রচার

ভিক্ষুধর্মের বিরুদ্ধে।

করিল যে, ধর্ম, মোক্ষ, ইহকাল, পরকাল এই সমস্ত লক্ষ্যের সন্ধানই নিজ পরিবারের গণ্ডিতেই পাইবে। পারিবারিক জীবনই সর্বার্থসিদ্ধির শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র। এই পারিবারিক জীবন তুমি নিজে গঠন কর নাই, উহা ভগবানের দান, তুমি উহা কিছুতেই এড়াইতে পারিবে না। তোমার পারিবারিক দায়িত্ব অপরিহার্য।

তুমি যদি পিতৃমাতৃ-সেবা কর—তাহাদের আনুগত্য কর, তবে তোমার মোক্ষলাভ হইবে। স্ত্রতরাং সাক্ষাৎ ভগবানের প্রতীক পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া বনে বাইয়া কে কি শিখিবে?

গার্হস্থ্য আদর্শ।

তুলসীতরু-সমাপ্রিত মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া সেওড়া-গাছের সেবা করিতে বনে বাইব কেন? একমাত্র পিতৃসত্য পালন করার জন্ত রাম ভগবানের অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অনুসরণ এবং তাঁহার ছন্দানুবর্তী হইলেও মোক্ষলাভ হইতে পারে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে যদি কনিষ্ঠের অনৈক্য হয়, তথাপি কনিষ্ঠ তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হইলেই তদীয় জীবন চরিতার্থ হইবে। লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে নানাবিষয়েই মতবৈধ দেখাইয়াছেন—কিন্তু তাঁহার ক্ষুরধার যুক্তিতর্ক তিনি সরযুর জলে ভাসাইয়া দিয়া ছায়ার ছায় রামের ছন্দানুবর্তী হইয়াছিলেন। ভরত স্বগৃহে থাকিয়াও ভ্রাতৃসেবের আদর্শ দেখাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। সীতা স্বামিভক্তির মূর্তিমতী প্রতিমা। কৌশল্যা বাৎসল্যের প্রতীক। পরিবার বলিতে শুধু ইহারাই নহেন, দাসদাসীরাও পরিবারের জন। হনুমান্ প্রভুভক্তিকে অতি উদ্ভল করিয়া দেখাইয়াছেন, এবং সুগ্রীব ও বিভীষণ সখ্যভাবে আদর্শ কিরূপ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

রামায়ণ বলিতেছেন—পরিবারের গণ্ডিই ধর্মের সুপ্রশস্ত আড়িনা। এই পারিবারিক ধর্মের পথ কুসুমাকীর্ণ নহে। ভিক্ষুধর্মের কঠোর পথ পরিহার করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন

রামায়ণী নীতি।

উপভোগ করিবার জন্ত পারিবারিক ধর্ম পরিকল্পিত হয় নাই। মুণ্ডিতশির হইয়া উপবাস ও ব্রতাদি পালনপূর্বক ছায়ার পশ্চাতে ধাবিত হওয়া অপেক্ষা গৃহের জীবন্ত দেবতাদের সেবা উৎকৃষ্ট, ইহাই রামায়ণের প্রতিপাদ্য। এই পারিবারিক ক্ষেত্র হৃদয় তপস্তারই ক্ষেত্র, ইহা অবিচ্ছিন্ন শান্তি ও অবিদ্রিত সুখভোগের পন্থা নহে। কোন্ জটিল সন্ন্যাসী পিতৃভক্তিতে ভরপুর রামসন্ন্যাসীর মত হৃদয় ব্রত পালন করিয়াছে? জটাজুটধারী, মলিন, পাংশু-দিগ্ধাঙ্গ, পাহকার উপর ছত্রধারী, রাজর্ষি ভরত ভ্রাতৃভক্তির যে আদর্শ দেখাইয়াছেন—সেই অতুল ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্তার সমতুল তপস্তা কোন্ ভিক্ষু কবে দেখাইয়াছে? কে লক্ষ্মণের মত ভ্রাতৃসেবার আহার-নিজ্ঞা বিদ্যত হইয়া সংঘমের

পর কাঠা দেখাইয়াছে বা সীতার ছায় আজীবন পাতিত্বের ব্রত পালন করিয়া অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছে? কে কবে বিভীষণের মত সাশ্রনেত্রে স্বকুলের সংহার প্রত্যক্ষ করিয়াও সখ্যচ্যুত হয় নাই? এই সকল চরিত্রের প্রত্যেকটি একটি বিশাল পটের ছায়। ইহারা বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুর জীবন্ত প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদ তীক্ষ্ণ বৈরাগ্যের লৌহ-শলাকা-দ্বারা লিখিত হয় নাই, হৃৎচর তপস্তা-ক্ষেত্রে অহুরাগের স্বর্ণ-অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। এই পথ বিচার, তর্ক, নীতি-জ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রভৃতি উৎকট উপায়জাত নহে—ইহা গঙ্গাতরঙ্গের মত পরম স্নেহমমতার সুবিলম্বিত বিদ্যকর উৎস। ইহা স্বভাবসঞ্জাত প্রীতি, ভক্তি ও অহুরাগের স্বর্নার বিন্দু চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিয়া লীলা-চঞ্চল গতিতে ছুটিয়াছে। জীবন-মরুভূমিতে ইহা অমৃতের সন্ধান দিয়াছে এবং দেখাইয়াছে যে রূপ নেংড়া আমার বীজটি যেখানে পুঁতিবে, সেইখান হইতেই ইহা তাহার অপূর্ণ সুরভি ও অতুল রসান্বাদের ভাঙার খুলিয়া বসিবে—সেইরূপ ভগবান্ যেখানে তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন—তোমার সর্কার্থসিদ্ধির পথও সেইখানে গড়িয়া দিয়াছেন—তুমি বাহিরের আকাবাকা অনিশ্চিত পথ খুঁজিতে বনে যাইবে কেন?

বৌদ্ধধর্মের পর এই রামায়ণী নীতি ভারতের সর্বত্র বিজয়পতাকা প্রোথিত করিয়া ভারতীয় সমাজকে এক অপূর্ণ শান্তির আদর্শ দিয়াছিল। এখনও বে এক পরিবারে বহুসংখ্যক লোক আদরে, সোহাগে, শ্রদ্ধায় ও ত্যাগের মহিমার গৌরবজনক স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা এই একখানি মহাগ্রন্থের শিক্ষার প্রভাবে। কিন্তু বাংলাদেশে ইহার শক্তি হ্রাস হইতেছে, রামায়ণী শিক্ষা বৃষ্টি এদেশ হইতে তিরোহিত হয়! কিন্তু এক সময়ে ইহা অত্যুজ্জ্বল ছিল, তাহা আমরা শৈশবে দেখিয়াছি। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আজমীড়ের রাজপুত্র সারঙ্গদেবকে—বৌদ্ধধর্মের অহুরাগী আশঙ্কা কবিয়া তৎপিতা রাজা বিশালদেব নানা উপদেশ দিয়া কুমারকে শেষে বলিয়াছিলেন :—

“ইহ নষ্টজ্ঞান জ্ঞান স্তনিয়োগ কাণ।

পুরুষোত্তম ভজ্ঞে কিত্তীহান ॥

পরমোধ ভজ্ঞ বোধক পুরাণ।

রামায়ণ স্তনহ ভারত নিদান ॥”—চাঁদ-গাথা।

মহাভারত ভারতীয় নানাদর্শ, নানামত, যুগধর্ম, সনাতনধর্ম এক বিশাল চিত্রপটে আঁকিয়া দেখাইতেছে। ইহাতে বহু রূপ পারিবারিক জীবনের সংযোগ ও সামঞ্জস্য আছে, তেমনই উহার বিরোধ ও বিয়োগ দৃষ্ট হয়। ইহাতে দান, ধ্যান, তপ, সামাজিক কর্মকাণ্ড সকলই একস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি চরিত্রে সতীধর্মের আদর্শ অঙ্কিত হইয়াছে, অপরদিকে দ্রৌলোকের হর্ষলতাগুলি জঘন্য অতিরঞ্জন সহিত নারদ-পঞ্চকূড়া-সংবাদে প্রদর্শিত হইয়াছে। একদিকে সৌভ্রাজ্য, অপরদিকে জ্ঞাতিবিরোধ,—একদিকে

হ্যাঁচা ভূমির জন্তু জীবনপণ যুদ্ধ, অপরদিকে স্বীয় দেহের মাংস কাটিয়া পক্ষীকে প্রদান—
এই ভাবের বিরুদ্ধ আদর্শ মহাভারতের নানা অঙ্ক জটিল ও বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে।
দ্রৌলোকের চরিত্র দুর্বলতার চিত্র এত অধিক অতিরঞ্জিত করিয়া দেখান হইয়াছে—বাহাতে
মনে হয় কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী ভিক্রুর ধর্ম্মে যাহুবকে আকৃষ্ট করিবার জন্তই রমণীচরিত্রে
ঐরূপ বীভৎসতা দেখান হইয়াছে, একথা আমরা একবার উল্লেখ করিয়াছি।

মহাভারতে সংসার ও সন্ন্যাস এই দুই আশ্রমের প্রতিপোষক কথাই পাওয়া যায়।
কিন্তু রামায়ণের লক্ষ্য এক, উহাতে কোন জটিলতা নাই, উহা পারিবারিক জীবনের
আদর্শমূলক কাব্য। একটিমাত্র আদর্শ উহাতে দৃষ্ট হয়—তাহা যত্ন বা অশুশাসনরূপে
উপস্থিত করা হয় নাই, কাব্যকথায় পারিবারিক জীবনকে লোভনীয় ও উজ্জল করিয়া
দেখান হইয়াছে।

মহাভারত যুগে যুগে ভৃগুপদলাঙ্ঘিত বিক্রুর বক্ষের স্তায় নানারূপ ধর্ম্মমত দ্বারা চিহ্নিত
হইয়াছে। উহাকে একখানি আদত গ্রন্থ বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায় না। পৃথিবী খনন
করিলে যেসকল ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিচিত্র মৃত্তিকার উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই বিপুল
গ্রন্থে সেইরূপ নানা যুগের স্মৃতি ও ধর্ম্মমতের নিদর্শন পাওয়া যায়।

রামায়ণী নীতির প্রভাব ভারতীয় সভ্যতার চক্রবালে অন্তর্নিহিত প্রভাব দীপ্তি
দেখাইয়া বিলীন হইতেছে, ইহা সত্য সত্যই পরিতাপের বিষয় অথবা ইহা সভ্যতার অপর কোন
উন্নততর পহার রহস্য—কোন নব আদর্শের দিকে আমাদের আকর্ষণ করিতেছে—তাহা
কে জানিবে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জৈন ধর্ম্ম

বুদ্ধদেবের পূর্বে পার্শ্বনাথ-শিষ্য শেষ তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন।
বুদ্ধদেব ও মহাবীর উভয়েরই কর্ম্মক্ষেত্র ছিল বৃহৎ বঙ্গে—মগধ ও পাটনায়। জৈন
ইতিহাস-অনুসারে মহাবীর বহুকাল রাঢ়দেশে স্বকীয় ধর্ম্মমত
প্রচার করিয়াছিলেন। বৈশালীর লিচ্ছবি-রাজবংশে তাঁহার জন্ম
হইয়াছিল। যৌবন কালেই তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন
এবং ৪০ বৎসর বয়সে বিদেহ, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ
করেন। মিথিলার রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁহার মাতৃকুলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল এবং

মহাবীর (৪৪৭ খৃঃ পূঃ

—৪৭৭ খৃঃ পূঃ)।

এই সূত্রে তিনি বিধিসার ও অজাতশত্রুর রাজসভায় স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। ৫২৭ খৃঃ পূর্বে তাঁহার নির্বাণ ঘটয়াছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস, কিন্তু ঐ সময় স্বীকার করিয়া লইলে অজাতশত্রুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার ও খারবেলের প্রস্তর-লিপির কথিত বৃত্তান্তের সহিত তাঁহার জীবনের সামঞ্জস্য কতকটা কষ্ট-করনা করিয়া করিতে হয়। এজন্ত অধ্যাপক জেকবি ৪৭৭ খৃঃ পূঃ বীর-নির্বাণের সময় ধরিয়া লইয়াছেন, তাহা হইলে ৫৪৭ খৃঃ পূঃ তাঁহার জন্মকাল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধ ৫৬৩ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ৪৮৩ খৃঃ পূঃ অব্দে অশীতি বৎসর বয়সে তাঁহার নির্বাণ লাভ হয়। জৈন ধর্ম-প্রবর্তক মহাবীর তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন ; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত স্থির হইলে জেকবি, ভিসেন্ট স্থিখ প্রভৃতি পণ্ডিতদের কথিত জন্মতারিখ অগ্রাহ্য করিতে হয়।

বুদ্ধের মত ও মহাবীর প্রচারিত মতের অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। উভয়েই জীবহত্যার বিরোধী ও বজ্রাঘুষ্ঠানের প্রতিবাদী ছিলেন। উভয়েই হিন্দুর বর্ণাশ্রম কতকাংশে মানিয়া লইয়াছিলেন এবং হিন্দু দেবতা স্বীকার করিতেন। এইজন্য কেহ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পার্থক্য। কেহ জৈন ধর্মকে বৌদ্ধধর্মের শাখা-স্বরূপ অনুমান করিতেন। কিন্তু এখনকার গবেষণায় উভয় ধর্মের পার্থক্য বিশেষভাবে ধরা পড়িয়াছে এবং জৈন ধর্ম যে বুদ্ধের পূর্বে প্রচারিত ও হইয়াছিল তাহারও অকাটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম একই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া একই সূত্র প্রচার করিয়াছে। মহাবীরও বুদ্ধের দ্বায় নিজে রাজকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া যতি-ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, জৈন ধর্ম সংঘন ও কঠোরতায় বৌদ্ধধর্মকে বরাং ছাপাইয়া গিয়াছে। তথাপি বৌদ্ধ ধর্মের এত প্রচার হইল কেন? কি কারণে উহা জগতের এক-তৃতীয়াংশ গ্রাস করিয়া এখনও প্রচারকার্যে সচেষ্ট এবং জৈন ধর্ম ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যে গভীবদ্ধ থাকিয়া শুধু নিজের আচার-ব্যবহার-নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত রহিয়াছে?

ঐতিহাসিকেরা বলেন জৈন ধর্ম, হিন্দু ধর্মোক্ত দেব-দেবতার উপর বেশী শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া ভারতের সঙ্গে অধিকতর অন্তরঙ্গ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ও বিদেশীর প্রবেশ-পথ কতকটা অন্তরায়পূর্ণ করিয়াছে। জৈনেরা বিশ্বাস করেন, প্রত্যেক তরুণতারও আত্মা আছে। তাঁহারা জীবের দুঃখ-কষ্টের প্রতি এত মমতান্বিত ও সদয়, যে একটি গাছের পত্রপল্লব ছিঁড়িতেও কষ্টবোধ করেন, পাছে তাহাদের আত্মা কষ্ট পায়। তাঁহাদের একদল শিরে ময়ূরপুচ্ছ লইয়া রাজপথের কুড় কুড় জীব সরাইয়া পথ পর্যাটন করেন, পাছে কোন জীব পদপীড়নে বিনষ্ট হয়। তাঁহারা নিজের শরীরের রক্তদ্বারা মশক ও ছারপোকার ক্ষুরিবৃদ্ধি করা ধর্মের অঙ্গীয় মনে করেন এবং পিপীলিকাকেও কোন কোন জৈনধর্মাবলম্বী নিত্য শর্করা প্রদান করিয়া “জীবে দয়া” সূত্রের পরা কাঠা প্রদর্শন করেন। সাধারণতঃ কাব্য-নাটকে ইহারা ‘নিগ্রাধু’ নামে পরিচিত।

এইভাবে দয়ার অঘুষ্ঠানের মধ্যে একটা আতিশয্য আছে, যাহাতে হিন্দুধর্মের গভী পার হইয়া এই ধর্ম দেশান্তরে গৃহীত হইতে পারে নাই। তাহা ছাড়া বৌদ্ধদের সজ্ব

একটা মস্ত বড় অস্ত্র, এই অস্ত্র-দ্বারা বৌদ্ধগণ জগজ্জয় করিয়াছিলেন; এই সজ্জের উদ্ভূত তোরণে দেশান্তর হইতে সমাগত লোকেরা আসিয়া ভগবান্ বুদ্ধের চরণে আশ্রয় লইতে পারিয়াছিলেন, বিশ্বের সঙ্গে এই ভাবের ঘনিষ্ঠ যোগ রাখার দরুন বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ-দ্বার অব্যাহত হইয়াছিল। জৈন ধর্ম নানারূপ কঠোরতা ও বিধি-ব্যবহার জালে আবদ্ধ হইয়া হিন্দুস্থানে প্রসার লাভ করিয়াছিল, কিন্তু বাহিরের আগন্তুকগণকে তাঁহাদের পঙ্ক্তিতে আনিতে পারে নাই। এইজন্ত বৌদ্ধধর্ম যখন হিন্দুস্থান হইতে ক্রমশঃ দূরে যাইয়া দেশ-দেশান্তরে অভিব্যক্তি করিতেছিল, তখন জৈন ধর্ম স্বীয় জন্মস্থানকে অধিকতর জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের কক্ষীগত হইয়াছিল।

সামান্য ফল সূত্রে (শ্রমণা-ফল-সূত্রে) দেখা যায় যে বুদ্ধদেবের সময়েই উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক নানারূপ মতবাদের দরুন ধর্মনীতি অতি জটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল। অজাতশত্রু তৎকালের সুপ্রসিদ্ধ অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট গিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহাদের সুস্থ বিচার ও গবেষণামূলক চিন্তার আড়ম্বর তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই; বুদ্ধদেবের উপদেশে তিনি শান্তি পাইয়াছিলেন—সেই সকল কথা পূর্বের এক অধ্যায়ে আমরা লিখিয়াছি। অজাতশত্রুর সময়েই নির্গ্রহ জ্ঞাত-পুত্রের কথা আমরা পাইয়াছি, ইনি একজন জৈন তীর্থঙ্কর। বস্তুতঃ বুদ্ধের পূর্বেই জৈন ধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। জৈনগণ কহিয়া থাকেন, ঋষভদেবই তাঁহাদের প্রথম তীর্থঙ্কর। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, ইনি রাজবৈভব ত্যাগ করিয়া নগ্ন সন্ন্যাসিরূপে বনে যাইয়া তপস্তা করিয়াছিলেন। ঋষভদেব কোশলরাজ নান্দী ও রাজ্ঞী মরুদেবীর পুত্র। তৎকালে প্রচলিত রীতি-অনুসারে তিনি স্বীয় যমজ ভগিনী সুমঙ্গলাকে বিবাহ করেন। ঋষভদেবকে কেহ কেহ ‘আদিনাথ’ নামে অভিহিত করেন।

প্রথম তীর্থঙ্কর হইতে পার্শ্বনাথ ২৩শ স্থানীয় এবং মহাবীর ২৪শ তীর্থঙ্কর। জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুশাস্ত্রে এই সম্প্রদায় নানা নামে পরিচিত। ইহারা সংসারের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত এজন্ত “নির্গ্রহ”, ইহারা ইন্দ্রিয়বিজয়ী এজন্ত “অরিহন্তা” (অর্হৎ)। ইহারা পৃথিবীর সমস্ত লোভ ও আকর্ষণ তপোবলে জয় করিয়াছেন, এজন্ত ইহারা “জিন” (জয়ী)। ইহাদের সন্ন্যাসীরা ‘শ্রাবক’ ও সন্ন্যাসিনীরা “শ্রাবিকা” নামে অভিহিত। জৈনগণ দাবী করেন বৌদ্ধধর্ম জৈন ধর্মের শাখা-মাত্র (“It is very likely that future researches will throw a flood of light on the theory that Buddhism is rather a branch of Jainism”—An Epitome of Jainism by Puran Chand Nahar & S. Ghosh—Introduction, p. 3)। বস্তুতঃ জৈন ধর্মের ধর্মমতের সহিত বৌদ্ধমতের একটি স্থানে বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়, উভয় ধর্মই নিরীশ্বরবাদী। জৈনদিগের ধর্ম-শাস্ত্র ও জ্ঞান একরূপ বিপুল ও সুস্বাভিমান তত্ত্বপূর্ণ যে সারাজীবনের আলোচনায়ও তাহার কিনারা করা যাইতে পারে না। জৈনেরা অর্থশালী ও প্রভাবান্বিত সম্প্রদায়, তাঁহারা এককালে মঠ-মন্দিরাদির অল্প যেরূপ মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন, সেই কাহিনী ভারতীয়

প্রাচীন কীর্তিশালার একটি বিশেষ অধ্যায় অধিকার করিয়া আছে। অথচ দুঃখের বিষয় তাঁহাদের প্রাচীন শাস্ত্র ও ইতিহাসের উদ্ধার-করে তাঁহারা বিশেষ কিছুই করেন নাই।

মথুরার স্তূপ জৈনকীর্তির প্রায় দুই সহস্র বৎসরের সাক্ষ্য দিতেছে; কেহ কেহ বলেন, বেদে জৈনদের যে উল্লেখ দৃষ্ট হয়—তদ্বারা অনুমিত হয় যে জৈনমত বেদের সমকালিক কিংবা তদপেক্ষাও প্রাচীন।

যাহা হউক ২৩শ সংখ্যক তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ও তৎপরবর্ত্তী মহাবীরের সময় হইতেই জৈন ধর্ম এদেশে বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষ ভিন্ন জৈন ধর্মাবলম্বী অল্প কোন দেশে আছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। কিন্তু এদেশে—রাজপুতানা, গুজরাট, পঞ্জাব এবং দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে—ইহারা সংখ্যায় প্রবল। ইহাদের অর্থসম্পদ ও বাণিজ্যে কৃতিত্ব ভারতবর্ষে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত।

এই বাঙ্গলা দেশে ইহাদের প্রভাব খুবই বেশী ছিল। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে বৌদ্ধ ধর্মের ত্যায়, জৈন ধর্মও বিলুপ্ত হইয়াছিল; তথাপি সেদিন পর্য্যন্তও জগৎ শেঠ ভ্রাতারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনশালী ছিলেন। খাস বাঙ্গালীদের মধ্যে জৈন ধর্ম অল্পই আছে। যখন ভক্তির বজ্রায় দেশ ভাসিয়া গেল, সেই সঙ্গে এদেশবাসীরা নিরীশ্বরবাদের কলঙ্ক এস্থান হইতে একবারে মুছিয়া ফেলিলেন। আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি, হাতীর পায়ে নীচে নিষ্পেষিত হইলেও জৈন মন্দিরে প্রবেশ করিবে না—এরূপ নিষেধ-বিধি জনসাধারণের মধ্যে এক সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু মৃত্তিকা-নিরে এ দেশের নানা স্থানে এত অধিক পরিমাণে তীর্থঙ্করদের মূর্তি আবিষ্কৃত হইতেছে যে এক সময়ে এই ধর্মের প্রভাব যে খুব বেশী ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যে সকল মন্দিরে ভগবানের স্থলে মানুষকে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছে—এবং তাঁহান্না জন্ত আরতি জলে না, ভোগ প্রস্তুত হয় না, প্রেম-ভক্তির আতিশয্যের দিনে হিন্দুগণ সেই সকল মন্দির অস্পৃশ্য মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু যেরূপ জৈন তীর্থঙ্করদিগের বহু প্রাচীন মূর্তি-দ্বারা এককালে এই ধর্মের প্রভাব প্রমাণিত হয়, তেমনি অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণবর্তিত কূট তর্কে আমাদের নব্যতায় যে এক সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন ত্যায়ের চিন্তাশীলতা-দ্বারা বিশেষ প্রভাবাবিত হইয়াছিল তাহাও সহজেই অনুমেয়। অনুমানকে হিন্দুগণ বিশেষরূপে আশ্রয় করিয়া একমাত্র প্রত্যক্ষবাদের শ্রেষ্ঠত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। এদেশের মহাস্থানে এক সময়ে জৈন ধর্ম-নেতা ভদ্রবাহু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি অশোকের পিতামহ সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু ছিলেন। এক সময় মগধ, অঙ্গ ও কোশল রাজ্যে জৈন ধর্ম প্রবল হইয়া তাহা রাষ্ট্র-কেন্দ্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। আমাদের দেশে ধারাবাহিক ইতিহাস ছাপ্রাপ্য হওয়াতে, আমরা যাহা এখন দেখিতে পাই না, তাহা কোন কালেই ছিল না, বলিয়া মনে করিয়া থাকি এবং যাহা আছে—তাহা স্মৃতিকাল হইতেই বিত্তমান, এরূপ সংস্কার পোষণ করি।

এদেশে এককালে জৈনধর্মের প্রাধান্যের প্রধান প্রমাণ এই যে নেমিনাথ ও পার্শ্বনাথ প্রভৃতি তীর্থঙ্করদের এই অঞ্চলটি এক সময়ে প্রধান ধর্ম-ক্ষেত্র ছিল। পার্শ্বনাথ পাহাড় (সমেৎ শেখর) এখনও জৈনদের অত্যন্ত প্রধান কেন্দ্র।

পার্বনাথ খৃঃ পূঃ ৮৭৭ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া খৃঃ পূঃ ৭৭৭ অব্দে বঙ্গদেশের তদান্যে অভিহিত পাহাড়ে মোক্ষ প্রাপ্ত হন। পরবর্তী তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান মহাবীর-সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। বৈশালী নগরের নিকট কুণ্ড গ্রামে ইহার জন্ম হয়। বৈশালীর রাজা চেতকের ভগিনী ত্রিশূলাদেবী ইহার মাতা। চেতক রাজার কন্যা চেলেনা বিধিসার রাজার রাজ্ঞী ; সুতরাং ঐ সকল রাজাদের দরবারে এক সময় তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। পিতা ও মাতার মৃত্যুর পর মহাবীর ৩১ বৎসর বয়সে সম্রাস গ্রহণ করেন। সম্রাসের ১২ বৎসর পর্য্যন্ত ইনি জৈন ধর্ম প্রচার করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ৪১ বৎসর বয়সে জীবমুক্ত হইয়া ৭২ বৎসরে তিরোহিত হন ; পোদ্দাপুরী পাহাড়ে তাঁহার লীলাবসান হয়। ঐ স্থান বর্তমান বেহারের অতি নিকটবর্তী, তাঁহার তিরোধান খৃঃ পূঃ ৫২৭ অব্দে ঘটিয়াছিল।

রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। এই সময়ে মগধের জৈন সজ্জের অধ্যক্ষ, রাজ-গুরু ভদ্রবাহু তাঁহার শিষ্যদিগকে লইয়া কর্ণাটে গমন করেন। তথায় তিনি দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, বিদেশে অবস্থানকালে তৎস্থলে অভিব্যক্ত মগধের জৈন ধর্ম্যাধ্যক্ষ স্থলভদ্র পূর্বাচরিত জৈন ধর্মের অনেক পরিবর্তন সাধন করেন। জৈন ভিক্ষুমাত্রই সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ থাকিবেন এই ছিল নিয়ম, কিন্তু স্থলভদ্রের দল খেতাব্বর পরিধানের পক্ষপাতী হইলেন। ভদ্রবাহু দ্বাদশবৎসর পর ফিরিয়া আসিয়া নব-প্রবর্তিত নিয়ম অমুমোদন করেন নাই। তাঁহার মত ছিল, নিগ্রহগণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কার-বর্জিত হইবেন। বাহারা পার্শ্বিক সংস্কারের বশবর্তী হইয়া জৈনদের সনাতন উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে তিনি ও তাঁহার দল পণ্ডিত্বরক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। দুই দলের মধ্যে অনেক দিন ধরিয়া তর্কযুদ্ধ চলিল, অবশেষে ৭৮ খৃঃ অব্দে ইহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। দিগধরেরা বলেন—দেহ এবং দেহের সংস্কার যে রক্ষা করিবে সে আবার নিগ্রহ হইবে কেমন করিয়া ? খেতাব্বরীরা লোকসমাজে চলাফেরার সময়ে খেতবস্ত্র পরিয়া বাহির হইবার পক্ষপাতী হইলেন।

কিন্তু কি বৈষ্ণবধর্ম, কি সহজিয়াধর্ম, কি ত্যাগধর্ম বাঙ্গালীরা বাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আদর্শের ঈষদ্রাজ্য স্মৃতি তাঁহারা অমুমোদন করেন নাই। পার্শ্বিকতার অমুরোধ বা সমাজবিধি তাঁহাকে ভূমি হইতে একটুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সুতরাং কপটাচারী ভ্রাতার হস্তে খজা দিয়া কালু ভোম নিজ গ্রীবা বাড়াইয়া দিলেন ; কল্লতরু সাজিয়া রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁহার রাজ্ঞীকে পর্য্যন্ত দান করিয়া ফেলিলেন ; কর্ণ একফোটা চোখের জল না ফেলিয়া স্বীয় পুত্র বুধকেতুর মস্তক নিজে ছেদন করিলেন,, এই সকল প্রবাদ ঐতিহাসিক ভিত্তিহীন হইলেও বঙ্গের চিন্তাদারার যে উচ্চাঙ্গ প্রদর্শন করে—তদ্বারা বাঙ্গালীর এই বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন হয় যে এ জাতি তাঁহাদের চিন্তা বা কর্মে কিছুতেই অল্পে সন্তুষ্ট হইবার নহে, বাহা কিছু বাঙ্গালী করিবে—তাঁহার চূড়ান্ত অভিনয় না করিয়া ছাড়িবে না। দৈহিক সংস্কার ত্যাগ করিয়া যিনি নিগ্রহ হইবেন—তাঁহার আবার

বস্ত্রের উপর লোভ অথবা নগ্ন হওয়ার ভীতি কেন? বাঙ্গালী ভদ্রবাহু দিগম্বরদের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। এইরূপ দিগম্বর সন্ন্যাসীর মূর্তি বাঙ্গালী চিত্রকরেরা অনেক আঁকিয়াছেন। সহজিয়ারা প্রচার করিলেন, স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলেও তাহার প্রতি ভালবাসা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, “প্রণয় করিয়া ভাঙ্গয়ে যে, সাধন অঙ্গ পায় না সে” (চণ্ডীদাস); পরের স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা—স্বকীয় হইতে শ্রেষ্ঠ—এই সীতা-সাবিত্রীর আদর্শমূলক সত্যত্বের রাজ্যে নিষ্ঠাকভাবে বৈষ্ণব-কবি গাহিলেন—

“ননদিনী বল গিয়া নগরে,
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী
রক্তপ্রেম-কলঙ্কসাগরে।”

এইরূপ সমাজবিধি, শাস্ত্রবিধির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সাধারণের অনধিগম্য ভাবের রাজ্যে শেষ পর্য্যন্ত ডঙ্কা বাজাইয়া স্বীয় মত প্রচার করার হুঃসাহস বোধ হয় বাঙ্গালীর মত অন্ত কোন জাতি খুব কমই দেখাইয়াছে।

সুতরাং লোকসমাজে চলিতেও নিগ্রহদিগকে উলঙ্গ হইয়া চলিতে হইবে,—আদর্শকে একটুকুমাত্র খর্ব্ব করিতে দেওয়া হইবে না, এই মতে বাঙ্গালী ভদ্রবাহু ও তাঁহার দল দৃঢ় হইয়া রহিলেন। এদিকে পার্শ্বনাথ প্রভৃতি তীর্থঙ্করগণের সঙ্গে বাঙ্গালার দীর্ঘকাল-ব্যাপী অবিচ্ছিন্ন সংঘর্ষের ফলে জৈন ধর্ম যে এই দেশে কতকটা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। বঙ্গদেশের সঙ্গে জৈন ধর্মের যে ঘনিষ্ঠ সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল—সে ইতিহাস উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা আমাদের উচিত।

ভদ্রবাহুপ্রমুখ দিগম্বরের দল মেয়েদিগের জন্ত তাঁহাদের আশ্রমে একটুকুমাত্র স্থান রাখিলেন না। সকলেই অবগত আছেন ১৯শ তীর্থঙ্কর (তীর্থঙ্করী (৭)) মল্লীকুমারী চিরকুমারী ছিলেন, কিন্তু দিগম্বর জৈনেরা তাঁহার স্ত্রীত্ব স্বীকার করিলেন না, তাঁহারা তাঁহাকে পুরুষরূপে পরিকল্পনা করিয়া তীর্থঙ্কর-তালিকার অন্তর্গত করিয়া লইলেন এবং তিনি “মল্লীনাথ” হইলেন।

নিম্নে আমরা ২৪জন তীর্থঙ্করের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিতেছি।

১। আদিনাথ (ঋষভ দেব)। ২। অজিতনাথ—রাজা জিতশত্রু ও রাজ্ঞী বিজয়ার পুত্র। ইনি বঙ্গদেশের পার্শ্বনাথ পাহাড়ে (সমেৎ শেখর) তিরোধান করেন ইহার বর্ণ ছিল স্বর্ণের জায় এবং ইহার চিহ্ন (লাজন) ছিল হস্তী। ৩। সম্ভবনাথ—রাজা জিতারি এবং রাজ্ঞী সেনার পুত্র। স্বর্ণবর্ণ, অখলাজন। ৪। অভিনন্দন—রাজা সম্বর ও রাজ্ঞী সিদ্ধার্থীর পুত্র। বঙ্গদেশের সমেৎ শেখরে তিরোধান,—স্বর্ণবর্ণ, কপিলাজন। ৫। স্মৃতিনাথ—রাজা মেঘ এবং রাজ্ঞী মঙ্গলার পুত্র। স্বর্ণবর্ণ, (ক্রৌঞ্চ-লাজন)। ৬। পদ্মপ্রভ—রাজা শ্রীধর ও রাজ্ঞী সুষিয়ার পুত্র। বঙ্গদেশের সমেৎ শেখরে তিরোধান। রক্তবর্ণ,

পদ্ম-লাঞ্জন। ৭। সুপার্বনাথ—রাজা প্রতিষ্ঠ ও রাজ্ঞী পৃথ্বীর পুত্র, সমেৎ শেখরে তিরোধান। সবুজবর্ণ, স্বস্তিকলাঞ্জন। ৮। চন্দ্রপ্রভ—পিতা রাজা মহাসেন, মাতা রাজ্ঞী লক্ষণা। এই দেশের সমেৎ শেখরে তিরোধান। ধ্বজবর্ণ, চন্দ্রলাঞ্জন। ৯। স্ববুদ্ধিনাথ—রাজা সুগ্রীব এবং রাজ্ঞী রমার পুত্র। এই দেশের সমেৎ শেখরে তিরোধান। ধ্বজবর্ণ, মকরলাঞ্জন। ১০। শীতলনাথ—রাজা দৃঢ়রথ ও সুসনন্দার পুত্র। এই দেশের সমেৎ শেখরে তিরোধান। স্বর্ণবর্ণ, শ্রীবৎসলাঞ্জন। ১১। শ্রেয়াংশনাথ—রাজা বিষ্ণু এবং রাজ্ঞী বিষ্ণার পুত্র। বাঙ্গলার সমেৎ শেখরে তিরোধান। ইহার বর্ণ স্বর্ণের জায় এবং গরুড়-লাঞ্জন। ১২। বসুপুজা—বাসুপুজা রাজা এবং রাজ্ঞী জয়ার পুত্র—ভাগলপুরে জন্ম ও নির্কীর্ণ। রক্তবর্ণ ও মহিষলাঞ্জন। ১৩। বিমলনাথ—রাজা কৃতবর্মা ও রাজ্ঞী শ্রামার পুত্র—বাঙ্গলার সমেৎ শেখরে নির্কীর্ণ। স্বর্ণবর্ণ, বরাহলাঞ্জন। ১৪। অনাথনাথ—রাজা সিংহসেন ও রাজ্ঞী সুবশার পুত্র। বাঙ্গলার সমেৎ শেখরে তিরোধান। স্বর্ণবর্ণ, শ্যোনলাঞ্জন। ১৫। ধর্ম্যনাথ—রাজা ভানু এবং রাজ্ঞী সুহৃতার পুত্র। বাঙ্গলার সমেৎ শেখরে তিরোধান। স্বর্ণবর্ণ, বজ্রলাঞ্জন। ১৬। শান্তিনাথ—রাজা বিখসেন এবং রাজ্ঞী অচিরার পুত্র। সমেৎ শেখরে নির্কীর্ণ। পিঙ্গলবর্ণ, মৃগলাঞ্জন। ১৭। কুহনাথ—রাজা সুর ও রাজ্ঞী ত্রীর পুত্র—সমেৎ শেখরে তিরোধান, ছাগলাঞ্জন। ১৮। অরনাথ—পিতা রাজা সুদর্শন ও মাতা রাজ্ঞী দেবী। সমেৎ শেখরে মহাপ্রয়াণ—স্বর্ণবর্ণ, নন্দ্যাবর্ত। ১৯। মল্লীনাথ—রাজা কুস্ত ও রাজ্ঞী প্রভাবতীর কন্যা—সমেৎ শেখরে তিরোধান। নীলবর্ণ, কুস্তলাঞ্জন। ২০। মুনি সুরত—রাজা সুমিত্র এবং রাজ্ঞী পদ্মাবতীর পুত্র—সমেৎ শেখরে মহাপ্রয়াণ। কৃষ্ণবর্ণ, কুর্মলাঞ্জন। ২১। নেমিনাথ—রাজা বিজয় এবং রাজ্ঞী বিপ্রার পুত্র। পিঙ্গলবর্ণ, নীলোৎপল লাঞ্জন। সমেৎ শেখরে মহাপ্রয়াণ। ২২। নেমিনাথ (২য়)—হরিবংশোদ্ভূত রাজা সমুদ্র-বিজয় এবং রাজ্ঞী শিবার পুত্র। কৃষ্ণবর্ণ, শঙ্খলাঞ্জন। ইহার পিতা সমুদ্র-বিজয়, কৃষ্ণের পিতা বহুদেবের ভ্রাতা ছিলেন। ২৩। পার্বনাথ—রাজা অশ্বসেন ও রাজ্ঞী বামাদেবীর পুত্র—জন্ম ৮৭৭ খৃঃ পূঃ। ৭৭০ খৃঃ পূর্বে সমেৎ শেখরে মহাপ্রয়াণ। ইনি ২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবীরের প্রায় ২৫০ বৎসরের পূর্ববর্তী। সমেৎ শেখরে তিরোধান। নীলবর্ণ, সর্পলাঞ্জন। ২৪। মহাবীর (বর্জমান)—রাজা সিদ্ধার্থ ও রাজ্ঞী ত্রিশলার পুত্র, পবাপুরীতে নির্কীর্ণ (৪২৭ খৃঃ পূঃ)। পিঙ্গলবর্ণ, সিংহলাঞ্জন।

এই তালিকা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—২১ জন তীর্থঙ্কর ব্যতীত ইহাদের সকলেই বৃহৎ বঙ্গের সমেৎ শেখরে মহাপ্রয়াণ করেন, সুতরাং বাঙ্গলাদেশ যে জৈন ধর্মের একটি প্রধান লীলাক্ষেত্র ও তীর্থস্থান ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই তীর্থঙ্করেরা সকলেই রাজকুলোদ্ভূত; এবং দুইজন ব্যতীত সকলেই ইক্ষাকু-বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মিঃ পূরণ চাঁদ নাহার তাঁহার Epitome of Jainism পুস্তকে (৬৮৫ পৃঃ) লিখিয়াছেন:—“পার্বনাথ পাহাড় বঙ্গদেশের হাজারীবাগ জেলার অবস্থিত, ইহা জৈনদিগের সর্বপ্রধান তীর্থ। ২৪জন তীর্থঙ্করের মধ্যে ২০ জনই এই স্থানে নির্কীর্ণ লাভ করিয়াছিলেন।

এখানে দিগম্বর ও শ্বেতাশ্বর জৈনদিগের অসংখ্য মঠ-মন্দির আছে। তীর্থঙ্করদিগের পদাঙ্কের পূজা হইয়া থাকে, কিন্তু পার্শ্বনাথের মন্দিরে পার্শ্বনাথের একটি প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত।”

আদিনাথের একটি মূর্তি ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত কুলপী ধানার অধীন ঘণ্টেশ্বরী গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটি একটু অল্প নীল রঙের বালি পাথরের উপর ক্ষোদিত (পঞ্চপুষ্প, সুন্দরবনে আবিষ্কৃত জৈন মূর্তি প্রবন্ধ, ১৩৩৯ আঘাট, ১৩৪ পৃঃ)। মহাবীর (বর্তমান স্বামী) ৫২৭ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জৈন দিগের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ আয়ারঙ্গ সূত্রে লিখিত আছে তিনি ১২ বৎসর কাল বঙ্গদেশের অন্তর্গত রাঢ় দেশে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

পার্শ্বনাথের এই প্রস্তর-মূর্তিটি সুন্দরবনের অন্তর্গত কাঁটাবেনিয়া গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। সুন্দরবনের ২৪ নং লাটে এইরূপ আর একখানি মূর্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে উদীরমান ঐতিহাসিক ডায়মণ্ড হারবারের অধীন জয়নগর মজিলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের গবেষণা-মূলক ইংরেজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



পার্শ্বনাথের মূর্তি।

জৈন শাস্ত্র ও সাহিত্য অতি বিরাট, এ পর্য্যন্ত তাহাদের বিশেষ সন্ধান হয় নাই। ইহাদের বহুগ্রন্থ সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছে—বহু সংখ্যক প্রাকৃত্তে এবং অবশিষ্টগুলি প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত। ইহাদের ব্যবহৃত প্রাকৃত্ত অঙ্গ-মাগধী, সূতরাং এক সময়ে এ দেশে যে প্রাকৃত্ত প্রচলিত ছিল, ইহারা তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন। বাঙ্গালী ভদ্রবাহু—ইহাদের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও মুখ্য লেখকগণের অগ্রতম। ইহার রচিত করসূত্র (দশাশ্রুতি স্বন্দ নামক বিরাট পুস্তকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে ৮ম অধ্যায়) জৈনদিগের প্রধান গ্রন্থ। চাতুর্মাস্য উৎসবের সময় ইহা জৈনমন্দিরে ভক্তির সহিত পঠিত হইয়া থাকে। ভদ্রবাহু চন্দ্রগুপ্তের সময় নিখিল জৈন সজ্জের অধ্যক্ষ ছিলেন। জৈন (প্রাকৃত্তে লিখিত) পদ্মচরিত (পউম চরিতাম) একখানি প্রাচীনতম প্রাকৃত্ত কাব্য। জৈনদিগের আধ্যাত্মিক গ্রন্থও বিস্তর; জ্ঞান, দর্শন সম্বন্ধে ইহারা এক সময়ে ভারতীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর অগ্রণী ছিলেন। তীর্থঙ্কর ও প্রধান জৈন সাধুদের জীবনচরিতও বহু বিদ্যমান। প্রফেসর হারতাল (Hertal) বলেন, ইহাদের বর্ণনাত্মক

রচনা—শুধু ভারতীয় সাহিত্য নহে—সমগ্র মনুষ্য-জাতির সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠার দাবী রাখে। ("With respect to its narrative part, it holds a prominent position not only in Indian Literature but in the Literature of mankind.")

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারতেতিহাসের ধারাবাহিকত্ব

কুরুপাণ্ডব, পরবর্ত্তী শিশুনাগ ও নন্দবংশ

কুরুপাণ্ডবেরই হউক বা কুরুপাকালেরই হউক, কিংবা ভিসেন্ট খ্রিঃ, হফকিংস সাহেবের মতামতসারে পাণ্ডবর্ণ কোন ভূটিয়া জাতির সহিত আর্য্যসমাজের এক মুখ্য শাখারই হউক, কুরুক্ষেত্রনামক স্থানে যে একটা মস্তবড় যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে কোন মতাস্বর নাই। প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থেরও কিছু কিছু চিহ্ন এখনও বর্তমান। সাজাহানের দিল্লী ও হুমায়ুনের সমাধিমন্দিরের মধ্যবর্ত্তী যমুনা-তীরের কতকটা স্থান প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের একাংশ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। নিগমবোধবাট এবং তাহার উত্তরস্থিত সলিমগড়ের সমিহিত নীলছত্রী-মন্দির ইন্দ্রপ্রস্থের সীমানার মধ্যে ছিল, অনেকের ইহাই ধারণা। বুদ্ধদেব, অর্জুন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি হিমাদ্রির পার্শ্বত্যা জাতীয় লোক ছিলেন বলিয়া ভিসেন্ট খ্রিঃ অনুমান করিয়াছেন। এরূপ মত আমরা আরও অনেক শুনিয়াছি,—শিবঠাকুর অনাখ্য দেবতা, সীতা অর্থে লাক্ষ্মীর ফাল, রামের লঙ্কা-জয় অর্থ দাক্ষিণাত্যে আর্য্যগণের কৃষিবিজ্ঞার চর্চা—প্রভৃতি মত আমরা ওয়েবার সাহেবের কল্যাণে শুনিয়াছি। মানুষের কঙ্কাল ও রক্তের উপাদান কি, সেই শব্দের বিজ্ঞার অনুশীলন করা আমাদের কার্য্য নহে। বহুগু হইতে সন্ধ্যাকালে শিব-মন্দিরে ভোগ ও আরতির ঘণ্টা বাজিতেছে—তাহা আরও বহুগু বাজিবে। বহুগু যাবৎ মুমূর্ষু ব্যক্তি পিপাসার্ত্তের জ্বায় রাম নামামৃত শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়া আসিয়াছে ও আরও বহুগু সেইরূপ উৎসুক থাকিবে এবং যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা আমাদের আদর্শ আছেন ও থাকিবেন। আমরা ইতিহাসের কঙ্কাল লইয়া টানাহেঁচড়া করিব না এবং এই সকল জীবন্ত দেবতা ভাঙ্গিয়া মাটির পুতুল গড়িব না।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়-সম্বন্ধে প্রচলিত মত, উহা ৩১০২ খৃঃ পূঃ অব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। ভিসেন্ট খ্রিঃ লিখিয়াছেন—পাণ্ডবদের নাম পাণ্ডু শব্দ হইতে হইয়াছে—এই শব্দের অর্থ

pale বা yellow (পীত)। স্মৃতরাং পাণ্ডবেরা নেপালী বা ভূটিয়া দেশের লোক।
 দ্বিতীয়তঃ, পাণ্ডবদের মধ্যে অনার্য আচার প্রচলিত ছিল—যথা, এক স্ত্রীর বহু স্বামী গ্রহণের
 প্রথা, স্মৃতরাং তাঁহারা পাহাড়িয়া কোন অসভ্য সম্প্রদায়-ভুক্ত।

এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে আৰ্য্যদিগের আচার-ব্যবহার চিরদিনই একরূপ ছিল
 না। আৰ্য্যদিগের ক্রমবিকশিত সামাজিক ভিন্ন ভিন্ন স্তরে যুগে যুগে নানা প্রকার অস্তিত্ব
 প্রমাণিত হয়। উদালক মুনির স্ত্রীকে যখন অপর এক ঋষি ধরিয়া লইয়া যান, তখন
 সেই স্ত্রীর প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র রোষপূর্ণ চক্ষে সেই দৃশ্য দেখিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ;—
 তখন তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন :—“বৎস! ইহাই প্রথা, যে যাহাকে ইচ্ছা করিবে, সে
 তাহাকে পাইবে, ইহাতে বাধা দেওয়ার শক্তি সমাজ আমাকে দেন নাই।” দুর্গাচরণ
 সান্যাল মহাশয় তাঁহার ‘সামাজিক ইতিহাসে’ লিখিয়াছেন, পুরাকালে আৰ্য্যসমাজে যে
 কোন পুরুষ যে কোন স্ত্রীকে ইচ্ছা করিত, তাহাকে সেই পুরুষের অমুগামিনী হইতে হইত।
 নতুবা সেই স্ত্রীর সমাজে নিন্দা হইত এবং লোকে তাহাকে “কর্কশা” বলিয়া ঘৃণা করিত।
 দশরথ-জাতকে দৃষ্ট হয়, সীতা রামের সহোদরা ছিলেন এবং শেষে তাঁহার পত্নী হন।
 এককালে আৰ্য্যসমাজের কোন কোন শাখার সহোদর-সহোদরার বিবাহের প্রথা বিস্তারিত
 ছিল। দ্রৌপদীর বিবাহের সময় যুধিষ্ঠির ক্রপদ রাজার নিকটে এক রমণীর বহুপতি হইবার
 কতকগুলি প্রাচীন নজীর উপস্থিত করিয়াছিলেন, যথা :—“ধর্ম্মশীলা জটীলা নাম্নী গৌতম
 বংশীয়া এককন্তা সাতজন ঋষিকে বিবাহ করেন, এবং বাক্ষী নাম্নী মুনিকন্তা প্রচেতাঃ নামক
 দশভ্রাতার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন।” (মহাভারত, আদিপর্ব ১৯৬ অঃ।) শুধু পাণ্ডবদের
 জন্মবৃত্তান্তটিই আধুনিক আদর্শ-অনুসারে বিসদৃশ নহে, স্মৃতরাষ্ট্র ও বিহুরের জন্মকথাটাও
 খুব স্ক্রুচিসঙ্গত নহে। ইহাছাড়া নারদঋষি ও সত্যকামের জন্ম-কথা, ব্যাসঋষির উৎপত্তি
 ইত্যাদি বিচার করিলে দৃষ্ট হইবে, ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি সর্বজনপূজ্য ঋষিরা
 বাভিচারোৎপন্ন হইয়াও সমাজের শীর্ষস্থানে আসীন হইয়াছিলেন। মণিপুরের বৃদ্ধরাজা এই
 সত্তে তাঁহার কন্তা চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুনের হস্তে দিয়াছিলেন যে, দৌহিত্র তাঁহাদের সিংহাসনের
 অধিকারী, স্মৃতরাং অর্জুনের পুত্র হইলে সে মণিপুরেই থাকিবে, তাহার উপর অর্জুনের
 কোন দাবী থাকিবে না।

বিরাট আৰ্য্যসমাজে যৌনসম্পর্ক ও আহাৰাদি-সম্বন্ধে অসম্ভব রকমের শিথিলতা বিস্তারিত
 ছিল। যুগে যুগে আৰ্য্যসমাজ নানারূপ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া বর্তমান আকারে দাঁড়াইয়াছে।
 এক সময়ে আৰ্য্যগণ এত বেশী গরু খাইতেন যে, অতিথি আসিলেই একটি গরু মারিতে
 হইত। এইজন্ত অতিথির এক নাম “গোর।” রাম বনবাস-কালে স্তম্ভাছ বলিয়া শূকরের
 মাংস সীতাকে খাইতে দিয়াছিলেন। প্রাচীন যুগ হইতে আৰ্য্যগণ কোন একটা বিশেষ
 আচারের খুঁটি ধরিয়া বসিয়া থাকেন নাই। এখন যে সকল আচার ও রীতিনীতি লুপ্ত
 হইয়াছে, তাহা চীনাম্যান বা ভূটিয়াদের মধ্যে পাইলে আমাদের আৰ্য্যবংশীয় পূজ্য ব্যক্তিদিগকে
 তাহাদের দলের মধ্যে লইয়া ফেলিব, ইহা কি খুব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে?

শ্রীধ সাহেব আরও লিখিয়াছেন—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা একটা জাতি-বিরোধ লইয়া হইতেই পারে না। একটা সামান্য পারিবারিক কলহ কি ভারতীয় সমবেত রাজশক্তির উপস্থিতি ও

যুদ্ধবিগ্রহাদির কারণ হইতে পারে? কথিত আছে পূর্বদেশের পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অস্বতঃ প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা পর্য্যন্ত এতটা পথ পর্য্যটন করিয়া কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। ঘরোয়া লড়াই হইলে এরূপ হওয়া

অসম্ভব ছিল। এই পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে পারিবারিক ব্যাপারগুলি কিছুই নহে, যুদ্ধাদি হইতে হইলে একটা জাতীয়তা-সম্পর্কিত কারণ থাকা চাই। তাঁহারা জাতীয়তা বলিতে যাহা বুঝেন, ভারতবর্ষে তাহা কোন কালেই ছিল না। ভারতীয় সভ্যতার মূল কেন্দ্র পারিবারিক জীবন ও জাতিত্বের বন্ধন। তাহারা সার্বভৌম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত দেশে অথও প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই রাজপরিবারের যুদ্ধবিগ্রহে যে সমস্ত মিত্র ও সামন্তরাজ যোগ দিবেন, উহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। এখন হইতে দুই তিন হাজার বৎসর পরে, যখন বর্তমান ইতিহাসের অনেক কথাই লোকে ভুলিয়া বাইবে, তখন যদি কেহ বলে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ ও মীরজাফর প্রভৃতি কয়েকজন সভাসদ মুরশিদাবাদের নবাবের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত করিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে শত শত যোজন দূরে—বহু সাগর, শৈল, ও ভূধর অতিক্রম করিয়া কেন ইংরেজ জাতি যোগ দিবেন, বিশেষ তাঁহারা বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন? তবে সেই প্রশ্নটির অনুরূপ প্রশ্নই ইহা হইবে। 'পাণ্ডু' শব্দ দেখিয়া জাতি নির্ণয় করিতে হইলে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী ফক্স সাহেবকে তদর্থ-ব্যঙ্গক জীব-বিশেষের শ্রেণীভুক্ত করিতে হয়। ভিলেন্ট শ্রীধ লিখিয়াছেন, পূর্বভারতে ব্রাহ্মণবিরোধী যে সকল জাতি রাজত্ব করিতে ছিলেন—যথা, লিঙ্গবি, শিশুনাগ বংশীয় এবং মগধ ও তাহার নিকটবর্তী দেশের রাজগণ, তাঁহারা কখনই আর্য্য ছিলেন না, তাঁহারা ভূটিয়া, গুর্খা এবং তিব্বত-বাসীদেরই জাতি ও অনার্য্য ছিলেন,—এই জন্তই তাঁহারা ব্রাহ্মণদের বেদবিধি গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য বুদ্ধদেবের নাক চেপ্টা ছিল কিনা তৎসম্বন্ধে গবেষণা প্রয়োজনীয়। এই সকল মতের সঙ্গে ওয়েবারের রামায়ণের টীকা, অর্থাৎ সীতা অর্থ লাললের ফাল এবং লঙ্কাকাণ্ডটা দাক্ষিণাত্যে কুশিখিকা দেওয়ার চেষ্টা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক মত জুড়িয়া দেওয়া উচিত। হইলার দশরথের মৃত্যুর যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাও কি আমরা বিজ্ঞান-সম্মত বলিব? একাকী রাত্রে এক ঘরে দশরথ রাজাকে পাইয়া শোকসন্তপ্তা কৌশল্যা পুত্র-নির্কাসনের প্রতিশোধার্থ স্বামীকে গলা টিপিয়া মারিয়াছিলেন; নতুবা এত বড় রাজ্যটা মরিলেন, তাঁহার কোন ব্যাঘ্রাম-পীড়া হইল না ও তাঁহার জন্ত কোন চিকিৎসক ডাকা হইল না, ইহাও কি হইতে পারে?

আমরা এসকল বৈজ্ঞানিক মতের আলোচনা করিব না। পাণ্ডবেরা চীনদেশের লোক হউন বা বুদ্ধদেব নাক চেপ্টা ভূটিয়া হউন, তাহাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। রামায়ণ-মহাভারতোক্ত নায়ক ও নায়িকাগণের সঙ্গে আমাদের শুধু একটা বাহ্য ইতিহাসের সম্পর্ক বিদ্যমান নহে, তাঁহারা এ দেশে শুধু নরককাল অথবা ঐতিহাসিক কৌতুহলের তৃপ্তিদায়ক

পুরাকালের কৰ্মবীর নহেন। বুদ্ধদেব যদি ভূটিয়া-কূলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাতেই কি তাঁহার প্রতি জগতের শ্রদ্ধা লুপ্ত হইবে? চণ্ডাল মাতার সন্তান পরাশর ও গণিকার সন্তান সত্যকাম, তাহাতে কি হইয়াছে? আর যদি বল ইহারা কবি-করনা মাত্র, ইহাদের অস্তিত্বই ছিল না, তথাপি আমরা হুঃখিত হইব না। যে মন্ত্রবলে সৃষ্টিকর্তা আমাদের মায়িক দেহ দিয়াছেন, তেমনি কোন দৈবশক্তির ইচ্ছাজালে পৃথিৱী এই সকল কাব্যনাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতবাসীর হৃদয়ের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া তাঁহারা অধিষ্ঠিত আছেন—তাঁহাদিগকে লোক-শ্রদ্ধা হইতে কে অপসারিত করিবে? খৃষ্ট অবোনি-সম্ভব, কুমারী মেরীর পুত্র, এই সকল করনাও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক অবাধে সহ্য করিয়া আসিতেছেন। খৃষ্টের প্রতি তজ্জন্ত তাঁহাদের শ্রদ্ধার হ্রাস হয় নাই।

কিন্তু যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাজগণ হইতে যে বংশলতা পুরাণাদিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহা পারজিটার সাহেব মূলতঃ গ্রাহ্য করিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

বংশলতা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাঁহাকে একঘরে করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, পুরাণোক্ত রাজবংশাবলীর সঙ্গে শিলালিপি ও প্রাচীন মুদ্রায় প্রাপ্ত রাজগণের নামের আশ্চর্যরূপ মিল রহিয়াছে, তখন স্বয়ং ভিসেন্ট স্মিথ অনেকটা ঘাড় চুলকাইয়া বলিতেছেন, এই পুরাণের বংশাবলী একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। “The Pauranic genealogies of kings in prehistoric times seems to be of doubtful value but those of the historical period of Kaliyuga from about 600 B C., are records of high importance and extremely helpful in reconstructing the early political history of India.” (Oxford History of India, 1921, p. 34.) ইহার সারার্থ এই যে কলিযুগের ইতিহাস-পূর্ব অধ্যায়ের, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৬০০ বৎসর পূর্বের যে বংশলতা পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, তাহা কতকটা সন্দেহজনক—কিন্তু ৬০০ খৃঃ পূঃ হইতে যে বংশলতা দেওয়া হইয়াছে তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং ভারতের প্রাচীন কালের ইতিহাস গঠনের পক্ষে অপরিহার্য। এই ঐতিহাসিক যুগটা তাঁহারা বুদ্ধদেবের জন্ম ও আলেকজান্ডারের অভিযানের সময় হইতে গণনা করেন। তৎপূর্ববর্তী সময়ের ইতিহাসের কোন আলোরেখা বিদেশ হইতে পাওয়া যায় নাই, সুতরাং ভারতবর্ষের স্থানীয় ইতিহাস-লেখকগণের উক্তি তাঁহারা সম্যক্রূপে বিশ্বাস করিতে বিধা বোধ করিতেছেন। কিন্তু ইহারা খৃঃ পূঃ ৬০০ বৎসরের কথা লিখিয়াছেন, তাঁহারাই তৎপূর্ববর্তী বংশলতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং আলেকজান্ডার আসিবার পর হইতে যে ভারতীয় ইতিহাসের প্রত্যয়-যোগ্য যুগ আরম্ভ হইবে—ইহা তাঁহারা আভাসেও জানিতেন না। আমরা পারজিটারের সহিত একমত হইয়া বলিতে পারি যে, পুরাণোক্ত রাজবংশলতা মূলতঃ গ্রাহ্য, কিন্তু নানা কারণে কতকটা বিকৃত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় রাজাদের প্রত্যেকেই তাঁহাদের বংশাবলী ও ইতিহাস রক্ষা করিতেন। তাঁহারা শুধু ইতিহাস স্বতন্ত্র ভাবে লিখাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না, শিলালিপি, তাম্রলিপি, এবং ধাতব পত্রে স্বীয়

কীর্তি ও পূর্বপুরুষদের কীর্তি উৎকীর্ণ করিয়া—ইতিহাস রক্ষা করিবার সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতেন। কিন্তু পরবর্তী ব্রাহ্মণাধর্ম ইতিহাস-বিরোধী হইয়াছিল, শুধু স্তাবক ব্রাহ্মণেরা অর্থলোভে রাজকীয় অহুশাসনের শ্লোক রচনা করিতেন সত্য,—কিন্তু মূলতঃ পৌরাণিক যুগের ব্রাহ্মণগণ জড়শক্তির বিরোধী ও নিবৃত্তি-ধর্ম্যাশ্রয়ী ছিলেন। পার্থিব ঐশ্বর্য—গৌরব ও রাষ্ট্র-ক্ষমতা তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করে নাই। বৌদ্ধ-যুগে প্রতাপাধিত রাজাদের অনেক ইতিহাস ছিল এবং পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সমুখানে তাহাদের অধিকাংশ ধ্বংস পাইয়াছে। অনেক যুরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন, পুরাকালে আদিত পুরাণগুলি প্রাকৃত ভাষায় লিখিত ছিল। নব ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের দিনে তাহারা সংস্কৃতে অনূদিত হইয়াছিল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিন্দাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় সম্প্রতি মহাভারতের একখানি সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি মনে করেন যে কলি ও দ্বাপর যুগের সন্ধিস্থলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এখন (১৯৩১) কল্যাণ ৫০৩২ এবং এই সময়ই মহাযুদ্ধের সময়। এ সম্বন্ধে তিনি অনেক প্রমাণ দিয়াছেন। এখন ১৯৩৩ খৃঃ অব্দ, স্মৃতরাং তাঁহার মতে ১৪৩০ + ১৯৩৩ = ৩৩৬৩ বৎসর পূর্বে মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল। বঙ্কিমবাবু বিষ্ণুপুরাণের মত গ্রহণ করিয়া খৃঃ পূঃ ১৪৩০ অব্দ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময় বলিয়া স্বীকার করেন।* বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে “যাবৎ পরিক্রিতো জন্ম যাবদনন্ডাভিষেচনম্। এতদ্ বর্ষসহস্রস্ত জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্।” বঙ্কিমবাবু এই মত গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন “নন্দের পুরানাম নন্দ-মহাপদ্ম। বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েই আছে—মহাপদ্মঃ তৎপুত্রাশ্চ একবর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নৈবৈব তান নন্দান্ কোটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ররিস্রুতি। তেষামভাবে মৌর্য্যাস্চ পৃথিবীং ভোজ্যন্তি, কোটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেভিষেক্যতি।” ইহার অর্থ, মহাপদ্ম এবং তাঁহার পুত্রগণ একশত বর্ষ পৃথিবীপতি হইবেন। কোটিল্য-নামক ব্রাহ্মণ নন্দবংশীয়দিগকে উদ্ধূলিত করিবেন। তাঁহাদের অভাবে মৌর্য্যগণ পৃথিবী ভোগ করিবেন। কোটিল্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্য্যভিষিক্ত করিবেন।

* উইলসন ও কোলব্রুক সাহেবের অনুমান-অনুসারে খৃঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে, উইল কোর্ড সাহেবের মতে ১৩৭০ খৃঃ পূঃ, বুকাননের মতে খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, এটি সাহেবের মতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন “ইউরোপীয়দের সঙ্গে আমাদের কোন মারাত্মক মতভেদ নাই।” (কৃষ্ণচরিত্র, ২পৃঃ।) সম্প্রতি ভারত-যুদ্ধের কাল লইয়া অধ্যাপক হেমচন্দ্র চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র রায় এবং প্রবোধচন্দ্র সেন অনেক গবেষণা করিয়াছেন। শেখোক্ত পণ্ডিতদ্বয় তাঁহাদের যুক্তি দ্যোতিবিক গণনার ভিত্তির উপর দাঁড় করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। এই সকল মতের রেখায় রেখায় ঐক্য না থাকিলেও বঙ্কিমবাবুর কথায় বলা যাইতে পারে মহাভারতের কাল-সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে “কোন মারাত্মক প্রভেদ নাই।” এই সকল ভ্রুটি প্রায় লইয়া আলোচনা করা এখানে আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নন্দবংশ, আলেকজান্ডারের অভিযান

যুধিষ্ঠির এবং মহাপদ্ম-নন্দের মধ্যে মোটামুটি হিসাব করিলে প্রায় ১০১৫ বৎসরের ব্যবধান। এই সময়ের কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিবৃত্ত নাই, কিন্তু এই সময় যে ভারতে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে একটা বিধম সংঘর্ষ চলিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাপদ্ম-নন্দকে ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরামের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভারতীয় রাজকুল বা ক্ষত্রকুল প্রায় নির্মূল হইয়াও একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। পুনরায় সেই শক্তি হুনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল, এবং হীন কুলজাত নন্দবংশ ক্ষত্রিয়-দিগকে পুনরায় নিরস্ত করিয়াছিলেন। ভারতীয় সভ্যতার ধারাবাহিকত্ব কোন কালেই নষ্ট হয় নাই।

হফকিন্স সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, মহাভারতে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বেদের স্বক্তের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। মহাভারতেই অহিংসনীতির সৃষ্টি এবং নানা আধ্যাত্মিক মতের বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়। পরবর্তী কালে বহুধর্ম মত ও আধ্যাত্মিক সূত্র প্রচার করিয়া জননেতৃগণ আধ্যাত্মিক কৰ্ম্মশীলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতের আভাস মহাভারতেই পাওয়া যাইবে এবং পরবর্তী বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে তাঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়।

বেদে যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, মহাভারত ও বৌদ্ধ জৈন-শাস্ত্রে এবং পুরাণাদিতে সেই সূত্রাকার তত্ত্বগুলি পল্লবিত ও শাখা-প্রশাখা-যুক্ত বৃহৎ বিটপীর ছায় ভারতে ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল। এই সভ্যতার কোন কালেই ক্রম-ভঙ্গ হয় নাই, কতকগুলি রাজার নাম ও কৰ্ম্মের তালিকা আমরা নিশ্চয়ই হারাইয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু ভারতীয় নিবৃত্তি-মূলক সভ্যতা কোন কালেই নষ্ট হয় নাই। দেশলক্ষ্মীর কনক-কিরীটের একটি অংশেরও জ্যোতি ম্লান হয় নাই।

পরবর্তী ধর্মমতগুলিকে গ্রাস করিয়া যষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে দুই মহাশক্তি—জৈন ও বৌদ্ধধর্ম এদেশে বিরাজিত হইয়াছিল। আমাদের এই বঙ্গদেশে উক্ত দুই কলতরুজাত অমৃত ফল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইব।

কিন্তু বঙ্গদেশের চিন্তা ও আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস পর্যালোচনা করিতে গেলে রাজ-নৈতিক ইতিবৃত্তের কতকটা আভাস দেওয়া প্রয়োজনীয়।

মহাপদ্ম-নন্দ-সম্বন্ধে ভাগবতে লিখিত হইয়াছে (১০ম স্কন্ধ) “মহানন্দীর পুত্র মহাপদ্ম অতি প্রবল রাজা হইবেন, তিনি শূদ্র মাতার গর্ভজাত। তাহা হইতে উৎপন্ন রাজারা শূদ্র এবং দয়াশূন্য। মহাপদ্ম সমস্ত দেশ নিঃক্ষত্রিয় করিয়া দ্বিতীয় ভার্গবের ছায় রাজ্য শাসন করিবেন।

সুমলয় এবং তাঁহার অপরাপর পুত্রগণ একশত বৎসর রাজত্ব করিবেন। কিন্তু একজন

ব্রাহ্মণ নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মোর্ধ্যবংশের প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই বংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্তকে সেই ব্রাহ্মণ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবেন।”

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে, “শিশুনাগ বংশীয় রাজগণের শেষ রাজা মহানন্দী। ইহার সর্বসমেত ৩৬২ বৎসর রাজত্ব করিবেন। মহানন্দীর পুত্র মহাপদ্ম শূদ্র মাতার গর্ভজাত। তিনি দ্বিতীয় পরশুরামের মত ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করিবেন এবং তৎকুলজাত রাজগণ শূদ্র-বংশীয় বলিয়া গণ্য হইবেন।” মহাপদ্ম সমস্ত পৃথিবী একদেশের অধীন করিবেন। স্তম্ভলয় নামে তাঁহার পুত্র এবং অপরাপর পুত্রগণ একশত বৎসর রাজত্ব করিবেন। কোটিল্য নামক এক ব্রাহ্মণ নয়জন নন্দের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মোর্ধ্য বংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।”

এ সম্বন্ধে সোমদত্ত-প্রণীত ‘বৃহৎকথা’র অনেক উপগল্প আছে। তন্মধ্যে নন্দ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তিনি কোন কারণে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী সকাতলের উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। তাঁহাকে তাঁহার পুত্রগণ সমেত একটা কূপে নিক্ষেপ করা হয়। সেইখানে অন্ন একটু ডাল ও জলের ব্যবস্থা তাঁহাদের জন্য ছিল, কিন্তু সেই খাণ্ড ও পানীয়-দ্বারা এক

মন্ত্রী সকাতলের
প্রতিহিংসা।

জনের প্রাণ রক্ষা হইতে পারিত। মন্ত্রী কহিলেন, “যে প্রতিহিংসা লইতে পারিবে সেই বাঁচুক।” পুত্রেরা একবাক্যে বলিল “আপনিই এ বিষয় যোগ্যতম, স্ততরাং আপনিই এই অনাহারে কোনমতে জীবনরক্ষা করুন।” সকাতলের চোখের সম্মুখে একে একে সব করটি পুত্র অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ইহার পরে মন্ত্রী কোন ক্রমে উদ্ধার পাইয়া কূপ হইতে উঠিয়া আসিলেন। তিনি প্রতিহিংসার বিবে জর্জরিত হইয়া একদা কোন প্রান্তর-ভূমিতে ঘুরিতেছিলেন তখন দেখিতে পাইলেন, একটি হীন পরিচ্ছদ-

চাণক্যের অপমান ও
প্রতিহিংসা।

পরিহিত ব্রাহ্মণ প্রান্তরটা খুঁড়িতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কি করিতেছেন?” ব্রাহ্মণ বলিলেন, “তাঁহার পাদ কুশ-

বিদ্ধ হওয়াতে ক্ষত হইয়াছে—এইজন্য তিনি প্রান্তরের সমস্ত কুশচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কর হইয়াছেন। মন্ত্রী বুঝিলেন, প্রতিহিংসা কিরূপে লইতে হয় তাহা এ ব্যক্তি জানেন। স্ততরাং তাঁহার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। এই ব্রাহ্মণ ছিলেন ইতিহাসবিদ্রোহিত চাণক্য। সকাতল ইহাকে পরামর্শ দিলেন যে শীঘ্রই নন্দের রাজত্ববনে প্রচুর সমারোহের সহিত এক শ্রাদ্ধ হইবে; তিনি যদি পুরোহিতের কাজ করেন, তবে অনেক অর্থলাভ হইতে পারিবে; তিনি স্বয়ং তাঁহাকে পুরোহিত-বস্ত্র নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। তাঁহার উপদেশমত নির্দিষ্ট দিনে চাণক্য শ্রাদ্ধসভার পুরোহিতের আসনে বসিলেন। মহাপদ্ম-নন্দ এই অপরিচিত ব্রাহ্মণের বৃষ্টভাষণে তাঁহার টিকি ধরাইয়া সেই আসন হইতে উঠাইয়া দিলেন এবং তৎস্থলে রাজপুরোহিত স্রবন্ধকে নিযুক্ত করিলেন। মুক্তশিখ চাণক্য আর শিখা বন্ধন করিলেন না, সেইখানেই প্রতিশ্রুত হইলেন যে সাত দিনের মধ্যে যদি তিনি নন্দের বধ সাধন করিতে না পারেন, তবে তিনি আর জীবনে

শিখা বন্ধন করিবেন না। ইহার পর অভিচার-প্রক্রিয়া-দ্বারা তিনি নন্দের হত্যা সাধন করেন এবং তাঁহার পুত্র হিরণ্যগুপ্তকেও বধ করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন।

প্রাচীন পুরাণগুলির মত অহুসরণ করিলে নিম্নলিখিতরূপ বংশাবলীও তাহাদের সময় নির্দ্ধারিত হইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণেরও মতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ ১৪৩০ খৃঃ পূঃ। শিশুনাগবংশীয় ১০ জন রাজার সময় ৩৬২ বৎসর। ইহাদের মধ্যে শেষ দুইজন নন্দিবর্দ্ধন ও মহানন্দ ৮৩ বৎসর, মহানন্দ ও তাঁহার ৮ পুত্র, এই ৯ জনের রাজত্বকাল ১০০ বৎসর। কোন কোন যুরোপীয় ঐতিহাসিক নিম্নলিখিত ভাবে বংশাবলী ও সময় নির্দেশ করিয়াছেন,—

শিশুনাগ ইনি প্রথমতঃ কানীর রাজা ছিলেন ৬৪২ খৃঃ পূঃ

কাকবর্ণ
ফেমধর্ম
ফেমজিত } ইহারা রাজগৃহে রাজধানী স্থাপন করেন ৫৮২ খৃঃ পূঃ

বিধিসার ... ৫৫৫ খৃঃ পূঃ

অজাতশত্রু ... ৫৫৪ খৃঃ পূঃ

দর্শক ... ৫২৭ খৃঃ পূঃ

উদাসীন ... ৫০০ খৃঃ পূঃ

নন্দিবর্দ্ধন ... ৪৭০ খৃঃ পূঃ

নয়জন নন্দবংশীয় রাজা (মহাপদ্ম এবং তাঁহার ৮ পুত্র) ৩২২ খৃঃ পূঃ

চন্দ্রগুপ্ত ... ৩২২-২৯৮ খৃঃ পূঃ

৬৪২ খৃঃ পূঃ শিশুনাগের সময় ধরিলে দেখা যায় যুধিষ্ঠিরাব্দ অর্থাৎ ১৪৩০ খৃঃ পূঃ হইতে

উহার ব্যবধান মাত্র (১৪৩০—৬৪২) ৭৮৮ বৎসর। *

* ষীপবংশ ও মহাবংশের মতে বুদ্ধের সমকালীন বিধিসার হইতে বংশাবলী এইরূপ :—

			রাজত্ব-কাল
১।	বিধিসার	...	খৃঃ পূঃ ৫৪৩—৪৯১
২।	অজাতশত্রু	...	খৃঃ পূঃ ৪৯১—৪৫৯
৩।	উদয়িত্ত	...	খৃঃ পূঃ ৪৫৯—৪৪৩
৪।	অনিকঙ্ক	...	খৃঃ পূঃ ৪৪৩—৪৩৫
৫।	মুতা	...	খৃঃ পূঃ ৪৩৫—৪১১
৬।	নাগ দাসক	...	খৃঃ পূঃ ৪১১—৩৯৩
৭।	হুহুনাগ	...	খৃঃ পূঃ ৩৯৩—৩৬৫
৮।	কাল্যাপেক	...	খৃঃ পূঃ ৩৬৫—৩২৩
৯।	কাল্যাপেকের দশ পুত্র	...	খৃঃ পূঃ ৩২৩—৩২১
১০।	নয় জন নন্দ...	...	খৃঃ পূঃ ৩২১—৩২১

খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে আলেকজান্ডার ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পোরস (পুরু) নামক রাজার সহিত যুদ্ধ করেন। ইহার পরাক্রম দেখিয়া মাসিডনীয় বীর বিস্মিত হইয়াছিলেন।



আলেকজান্ডার, প্রাচীন মুদ্রা হইতে।

যদিও কোন অচিন্তিতপূর্ব আলেকজান্ডার।

দুর্ঘটনায় পঞ্জাবাধিপতি পরাজিত হন, তথাপি “গ্রীকগণ স্বীকার করিয়াছেন যুদ্ধ-বিজ্ঞায় আর কোন এসিয়াটিক জাতি হিন্দুদের সমকক্ষ ছিলেন না।” পুরু দৈর্ঘ্যে ৬½ ফিট ছিলেন।

বাহা হউক পুরুর সম্বন্ধে আমাদের আর কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। আলেকজান্ডার পাঞ্জাব বিজয়ের পরে পূর্বাঞ্চলে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাঁহার সৈন্তেরা অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং পাটলীপুত্রের (কুম্ভমপুর) রাজার সৈন্তসংখ্যা ও পরাক্রমের যে কাহিনী তিনি পুরু ও ফিগিয়ুস হইতে শুনিয়াছিলেন, তাহাতে যদিও আরও পূর্বে অভিযান করিবার তাঁহার দুর্দমনীয় বাসনা নিরস্ত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার সৈন্তেরা একেবারে নিরুৎসাহ হইয়া গিয়াছিল। মাসিডনিয়ার

মহাবীর, বাহার ইঙ্গিতে বিপুল গ্রীক সৈন্ত উঠিত বসিত, তাহারা একেবারে ফিরিয়া বসিল, এমন কি তিনি সাশ্রনেত্রে তাঁহাদের নিকট কাকুতি-মিনতি করিয়াও তাহাদিগের মনের গতি ফিরাইতে পারিলেন না। গ্রীকগণ শুনিলেন যে প্রাচ্যের রাজা গঙ্গাতীরে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত সাজসজ্জা করিয়া আছেন। তাঁহার ২০০০০ অশ্বারোহী

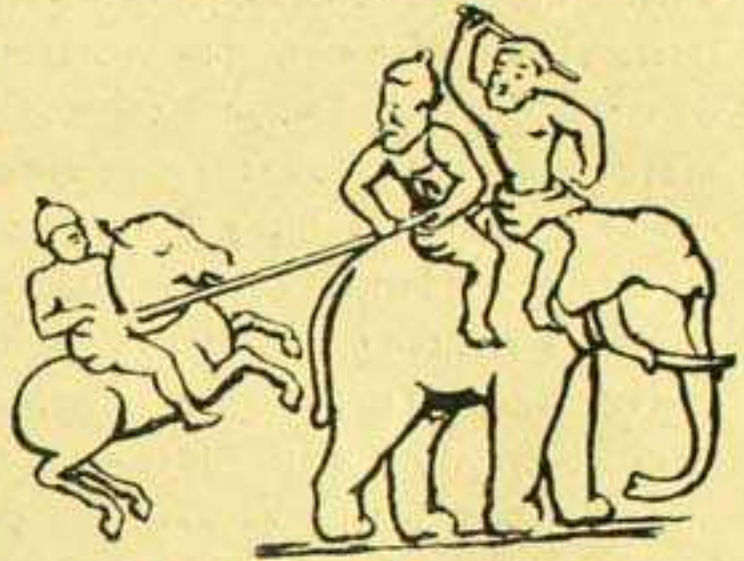
চন্দ্রগুপ্তের সৈন্তবল।

সৈন্ত, চাই লক্ষ পদাতিক, তিন হাজার হস্তী ও দুই হাজার যুদ্ধরথ সেই স্থানে প্রস্তুত হইয়া আছে। মেগাস্থিনিস আলেকজান্ডারকে

বলিলেন যে তিনি চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন; সেখানে তাঁহার শিবিরে চার লক্ষ সশস্ত্র সৈনিক দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। গ্রীক দূত পাটলীপুত্র নগর-সম্বন্ধে বলিয়া ছিলেন—“এই নগর দৈর্ঘ্যে ১০ মাইল এবং ইহা দুই মাইল প্রশস্ত। সমস্ত নগরটি প্রাকার-বেষ্টিত। এই প্রাকারে ৫৭২টি গম্বুজ আছে এবং ইহার তোরণের সংখ্যা ৬৪টি।

১১। চন্দ্রগুপ্ত	খৃঃ পূঃ ৩২১—২৯৭
১২। বিন্দুসার	খৃঃ পূঃ ২৯৭—২৬২
১৩। অশোক	খৃঃ পূঃ ২৬২—২২৭

আলেকজান্ডারের জীবনীলেখক প্লুটাক বলেন—“গদ্যারিডির রাজাদের ৮০ হাজার অধারোহী সৈন্ত, দুইলক্ষ পদাতিক, আট হাজার যুদ্ধরথ এবং ৬০০০ হস্তী ছিল। চন্দ্রগুপ্ত দুইলক্ষ সৈন্ত লইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে সামরিক অভিযান করিয়া এই বিশাল দেশ জয় করিয়াছিলেন।” এরিয়ান লিখিয়াছেন—“এই সকল বিজয়ের কথা শুনিয়া আলেকজান্ডারের সৈন্তদের মধ্যে এরূপ ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল যে তাহারা একবাক্যে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে অসম্মতি জানাইল; তাহারা এবিষয়ে এরূপ দৃঢ়তার সহিত আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিল যে আলেকজান্ডারের স্বীয় সৈন্তগণের উপর সম্যক্ আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও এইবার তাহাকে তাহাদের মতানুসারে পারশ্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।”



পুরু ও আলেকজান্ডার (প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)।

পুরু হস্তী পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দিয়াছে। আলেকজান্ডার অধারোহণে যুদ্ধ করিতেছেন; হস্তি-পৃষ্ঠে দুই ব্যক্তি, তন্মধ্যে যাহার মাথায় মুকুট তিনিই পুরু।

আলেকজান্ডারের অভিযান-সম্বন্ধে এ্যারিয়ান, জটিন, মেগাস্থিনিস্ প্রভৃতি লেখকগণের বর্ণিতকাহিনীর সামঞ্জস্য নাই; উদ্ধৃত অংশগুলি হইতেই পাঠক তাহার কিছু কিছু নমুনা পাইবেন। কিন্তু হইলে কি হয়? পশ্চিম হইতে যে আলো আসে তাহাই বৈজ্ঞানিক।

ভারতবর্ষের নাকি কোন ইতিহাসই ছিল না, আলেকজান্ডারের আগমন হইতেই সেই ইতিহাস ধরা পড়িয়াছে। ঐ সকল ঐতিহাসিকের মধ্যে মেগাস্থিনিসই প্রধান। আমরা কথায় কথায় তাহার দোহাই দিয়া অতি দুর্ভেদ্য ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাই। মেগাস্থিনিস্ ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে নানা কথাই বলিয়াছেন তাহাদের মধ্যে দুই একটির নিদর্শন দিতেছি: “ভারতবর্ষে এরূপ একশ্রেণীর লোক আছে যাহাদের কান এত লম্বা যে দুটি কান দিয়া তাহারা সর্কশরীর জড়াইতে পারে।” “আর এক শ্রেণীর লোক আছে তাহাদের মুখ নাই, নাক নাই,—কেবল একটি করিয়া চক্ষু আছে। তাহাদের পদতল বিষম লম্বা এবং পদাঙ্গুলী সকল উন্টাদিকে ফিরান। আর এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারা দৈর্ঘ্যে ৯ ইঞ্চি মাত্র। সেখানে কতকগুলি অরণ্যবাসী লোক আছে যাহাদের মাথার নীচের দিকটা শক্ত ও পুরু এবং উপর দিকে খুব সূক্ষ্ম ও পাতলা।* ভারতবর্ষের পিপীলিকাগুলি

মেগাস্থিনিসের বিজ্ঞান-সম্ভব বর্ণনা।

* মাথার উপরের শিখটাকে হয়ত গ্রীকদূত মাথার একটা অংশ মনে করিয়া থাকিবেন, কি জানি?

ষষ্ঠে পরিচ্ছেদ

চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য

আমরা পূর্বে যাহা কিছু লিখিয়া থাকি না কেন, এ কথা কখনই অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, গ্রীকদিগের আগমন এবং অশোক প্রভৃতি রাজত্ববর্গের শিলালেখ-আবিষ্কার আমাদের ইতিহাসে এক নবযুগ প্রবর্তিত করিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন যুগের যে কাহিনী দেশময় নানাশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার মূল্যও উপেক্ষণীয় নহে।

চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করেন। চন্দ্রগুপ্ত মূরা নামক এক শূদ্রবংশীয় কোন রমণী হইতে উদ্ভূত, এজন্য এই বংশকে মৌর্যবংশ বলা হইয়া থাকে। ডিডোরাস্ সিকুলাস্ নামক আলেকজান্ডার-অভিযানের কাহিনীর জনৈক লেখক বলেন— নন্দের মূরা নামী এক মহিষী ছিলেন। একটি সুদর্শন নাপিতের প্রেমে তিনি মুগ্ধ হন এবং চন্দ্রগুপ্ত সেই নরহৃন্দরের ঔরসজাত পুত্র। আলেকজান্ডারের অভিযান প্রসঙ্গে জড়িত্ বুলেন, “চন্দ্রগুপ্ত অতি নীচবংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি একদা আলেকজান্ডারের শিবিরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্পর্ধাপূর্ণ বাক্যে আলেকজান্ডার ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার আদেশ দেন। চন্দ্রগুপ্ত কোনরূপে পলাইয়া এই দণ্ড হইতে অব্যাহতি পান।”

চাণক্যের অপর নাম বিষ্ণুগুপ্ত, কিন্তু তাঁহার পিতার নাম ছিল চণক, এজন্য তিনি চাণক্য নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ তাহার রাষ্ট্রনীতি অতি কুটিল ছিল, এজন্য তিনি কোটিল্য নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। মহাবংশের বর্ণনা-অনুসারে তিনি খর্ষাকৃতি ও কদাকার ছিলেন। তৎপ্রণীত কোটিল্য শাস্ত্র সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পুস্তক তদানীন্তন

কালের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ের

একখানি দর্শন-স্বরূপ। চাণক্যের এই অসাধারণ কীর্তিস্তম্ভ তৎকালীন ভারতের উপর যে উজ্জ্বল আলো প্রক্ষেপ করিতেছে, তাহা একরূপ অমূল্য। ভারতীয় শিক্ষার্থীর পক্ষে উহা অন্ধের পক্ষে চক্ষুর মত। এই কোটিল্য শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া বিলাতে ও এতদেশে বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাময় পুস্তক বৎসর বৎসর লিখিত হইতেছে। গ্রামশাস্ত্রী মহাশয় এই মহাগ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন।

পৃষ্ঠীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বিশাখদত্ত লিখিত মুদ্রারাক্ষস নামক নাটকে চাণক্যের চরিত্র পরিদ্রুট করিয়া দেখান হইয়াছে। যদিও চাণক্যের বহু শতাব্দী পরে এই নাটকখানি রচিত

হইয়াছে, তথাপি ইহা পড়িলে স্পষ্টই মনে হইবে যে গ্রন্থখানি দ্রাগত

দেশীয় সংস্কারের একখানি বিশ্বস্ত অমূল্যলিপি। চাণক্য একসময়ে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির গুরু পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—তাঁহার সম্বন্ধে নানা কাহিনী, প্রবাদ,

গয় ও উপগয় আধ্যাবর্তের সর্বত্র প্রচারিত ছিল, তাহার অনেক কথাই হয়ত কাল্পনিক, কিন্তু চাণক্যের চরিত্র-সম্বন্ধে লোকের মনে যে ধারণা বদ্ধমূল ছিল, মুদ্রারাক্ষস তাহার একটি অমূল্য ছবি ; বহুদিন পরেও সেই চরিত্রের মুখ্যভাব ও বৈশিষ্ট্যটুকু লোকস্মৃতিতে হারাইয়া যায় নাই। এই হিসাবে মুদ্রারাক্ষসের একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সেন্সপীয়ার ও স্কট বের্প কল্পনার মধ্য দিয়া ঐতিহাসিক সত্যের কিরণরেখা আনিয়াছেন, বিশাখদত্তও মুদ্রারাক্ষসে চাণক্যের ছবির উপর তেমনই আলোপাত করিয়াছেন। কি অদ্বিত সে ছবি ! কত অপূর্ণ উপায়ে চাণক্য রাক্ষসের জ্ঞান প্রবীণ কুরবার স্বী-সম্পন্ন মন্ত্রীর সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল করিয়া দিতেছেন ! চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে রাক্ষস-মন্ত্রী বতগুলি শাণিত ছুরিকা প্রক্ষেপ করিয়াছেন, চাণক্যের অসাধারণ রাষ্ট্রনীতি-জ্ঞান সেই অস্ত্রগুলির গতিপথে মুখ ফিরাইয়া দিয়া তদ্বারা রাক্ষসকেই দা দিয়াছেন। বতগুলি অস্ত্ররঙ্গ স্তম্ভ ও বন্ধুদের দ্বারা রাক্ষস পরিবেষ্টিত ছিলেন, ও বাহাদিগকে নিঃসন্দেহ চিন্তে তিনি গুপ্তচরস্বরূপ নিযুক্ত করিয়া তাঁহার মর্মেণ দ্বার তাঁহাদের নিকট অকপটে উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছিলেন, শেষকালে দেখা গেল—তাঁহার রাক্ষসের কেহ নহেন, চাণক্যেরই গুপ্তচর। শেষ মুহূর্ত্তে তিনি চাণক্যের বড়বস্ত্রের বেড়াঝালে এমনইভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন যে, হতাশাপূর্ণ বিষয় সহকারে বলিয়া উঠিলেন, “অহো ! শত্রু আমার হৃদয়ের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে।” তাহার বুদ্ধির বলে একটি বিশাল সাম্রাজ্যের সমুখান হইয়াছিল, তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী। তাঁহার মত গুপ্তীর গুণ বৃত্তিতে সমর্থ দ্বিতীয় লোক ছিল না—অথচ গুপ্তী হউন, নিগুপ্ত হউন, তাঁহার আশ্রিত নৃপতির উন্নতির পক্ষে যে ব্যক্তি বাধা দিয়াছে, তাঁহার হস্তে তাহার উদ্ধার বা নিকৃতি ছিল না। কি ঘোর অভিসন্ধি বিফল করিয়া তিনি অভয়দত্তকে হত্যা করিলেন ! চন্দ্রগুপ্তের একটি কেশেরও হানি হইল না। পুষ্পপুরের উৎসব উপলক্ষে তিনি চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে কি অদ্বিত মিথ্যা দ্বন্দ্বের অভিনয় করিলেন ! এই নাটকে চাণক্যের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, কোন ঐতিহাসিক রাষ্ট্রগুরুর এরূপ জীবন্ত চিত্র জগতের সাহিত্যে আর একখানিও নাই। উইলসন্ সাহেব মুদ্রারাক্ষসের ইংরেজী অম্বাদের উপসংহারে বলিয়াছেন, “The plot of the drama singularly conforms to one of the unities, and the occurrences are all subservient to one action—the conciliation of Raksha. This is never lost sight of from first to last, without being made unduly prominent. It may be difficult in the whole range of dramatic literature to find a more successful illustration of the rule. * * * The succession of incidents is active and interesting, although women form no part of the Dramatis Personæ, except in the episodic introduction of Chandan Das's wife, a peculiarity that would be scarcely possible in the dramatic literature of Europe (p. 254).—ইহার মর্ম্মার্থ এই যে “মুদ্রারাক্ষসে নাটকের মূল ঘটনার প্রতি সর্বত্র লক্ষ্য আছে, অথচ সেই লক্ষ্যের উপর নাটককার কখনই অসঙ্গতভাবে জোর দেন নাই,

ঘটনার মূল কেন্দ্র গ্রাফস মন্ত্রীকে চন্দ্রগুপ্তের দিকে টানিয়া আনা। গ্রহকার সেই লক্ষ্য কখনই বিস্মৃত হন নাই, এই লক্ষ্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। নাটকের সমস্ত ঘটনার এতাদৃশ কেন্দ্রগ-গতি, জগতের নাটকীয় সাহিত্যে বিরল। নাটকে একবারমাত্র কার্যোপলক্ষে চন্দনদাসের স্ত্রী উকি মারিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহা ছাড়া আর কোন স্ত্রী-চরিত্র নাই। অথচ পরপর ঘটনার সন্নিবেশ হেতু নাটকখানি সর্বদা সক্রিয় ও কোতূহল-উদ্দীপক। এই বৈশিষ্ট্য ইউরোপের কোন নাটকে সম্ভবপর নহে।” (২৫৪ পৃঃ)

বঙ্গদেশের সঙ্গে চাণক্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। কিছুদিন পূর্বেও চাণক্য-শ্লোক মুখস্থ করিয়া পাঠশালার ছেলেরা লেখাপড়া শুরু করিত। পণ্ডিতদের কথা ছাড়িয়া দিলেও বাঙ্গলার পাড়াগায়ে এরূপ সাধারণ গৃহস্থ, এমন কি একটু উচ্চ শ্রেণীর চাষা নাই যে চাণক্যের ছই একটি শ্লোক আবৃত্তি না করিতে পারে। গিরিব্রজ ও পাটনার সভ্যতার খুব বড় ঢেউ আমাদের দেশে আসিয়াছিল—পাটলিপুত্রের মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৈভবের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী বাঙ্গালীরা। চাণক্য শুধু চন্দ্রগুপ্তের নহেন, তৎপুত্র বিন্দুসারের রাজসভায়ও প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। যে সকল শ্লোক বাঙ্গলাদেশে চাণক্যের রচিত বলিয়া গৃহীত হইরাছে, তাহা মূলতঃ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই মনে হয়।

বাঙ্গলা দেশের সঙ্গে
চাণক্যের সম্বন্ধ।

জরাসন্ধ বেখানে একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন এবং সমস্ত আর্য্যাবর্ত, এমন কি দাক্ষিণাত্যের কতকাংশ বিজয় করিয়াছিলেন—সেইখানে উত্তরকালে মহানন্দ-পুত্র এরূপ এক সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহার বৈভব ও সমৃদ্ধি দেখিয়া তৎকালে পাশ্চাত্য জগতের সর্বপ্রধান জাতি গ্রীকেরা বিস্ময়ে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে নন্দকে পুরাণকারেরা ভার্গবের সঙ্গে উপমা দিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (২৯৮ পৃঃ পৃঃ পর্য্যন্ত); আলেকজান্ডারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার সেনাপতিত্বয় এ্যান্টিগোনাস ও সেলিউকস তাঁহার এসিয়া মহাদেশস্থ সাম্রাজ্যের অবিকার লাভের জন্য পরস্পর শত্রুতাসাধনে নিযুক্ত হন। সেলিউকস প্রতিদ্বন্দীকে পরাভূত করিয়া ৩১৩ খৃঃ অব্দে ব্যাবিলন অধিকার করেন এবং অল্পকালের মধ্যে অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। এসিয়ার পশ্চিম ও মধ্যাংশ তাঁহার অধীনস্থ স্বীকার করিয়াছিল এবং ভারতের সীমান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। সেলিউকস নিকেটর অতঃপর ভারত-বিজয়ের উদ্দেশ্যে সিদ্ধনন্দ অতিক্রম করিয়া চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালন করিলেন। এই যুদ্ধে তিনি সম্ভবতঃ পরাজিত হইয়াই চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেলিউকস মোর্য্যসম্রাটের হস্তে ভারতের বহির্ভূত পারোপনিসদই (কাবুল), এরিয়া (হেরাট) ও এ্যারাকোসিয়া (কান্দাহার) প্রভৃতি রাজ্য অর্পণ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। এরূপ উক্ত আছে, সেলিউকস নাকি তাঁহার এক কন্যা চন্দ্রগুপ্তকে উপঢৌকনস্বরূপ দান করিয়াছিলেন। গ্রীক সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভার মেগাস্থিনিস নামক

এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইনি কিছুকাল পাটলীপুত্রে অবস্থান করিয়াছেন এবং সমসাময়িক ভারত-সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের ৩০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ৯,০০০, হস্তী, ৬০০,০০০ পদাতিক ও বহু যুদ্ধবল ছিল। গ্রীকদূত পাটলীপুত্র নগর-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“এই নগর দৈর্ঘ্যে ১০ মাইল এবং ইহা দুই মাইল প্রশস্ত। সমস্ত নগরটি প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই প্রাকারে ৫৭২টি গদ্যুজ আছে এবং ইহার তোরণের সংখ্যা ৬৪টি।” ভিন্সেন্ট গ্রিথের মতে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের সীমা এইভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে :—

আফগানিস্থানের শেবসীমা হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত ভারতের যুক্ত-প্রদেশ (আগ্রা, অযোধ্যা, বিহার, কাশ্মির, পাঞ্জাব, বঙ্গদেশ)। ভিন্সেন্ট গ্রিথ বলেন, আফগানিস্থান এই সময়ে

চন্দ্রগুপ্তের জীবনী ৩২২ খৃঃ

পূঃ-২৯৮ খৃঃ পূঃ।

ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল এবং চন্দ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যের কোন কোন

অংশ জয় করিয়াছিলেন। তিনি মহীশূরের প্রচলিত বিশ্বাস ও

সংস্কারের উল্লেখ করিয়া বলেন—যে হরত মহীশূর পর্য্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের

বিজয়-পতাকা উড়ীন হইয়াছিল। নন্দদার উত্তরবর্তী সমস্ত ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থান যে তাহার অধীনস্থ হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। চন্দ্রগুপ্ত ৩২২ খৃঃ পূঃ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ২৯৮ খৃঃ পূঃ স্বর্গারোহণ করেন। তিনি ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত উত্তরকালে জৈনধর্মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার জৈন-গুরু ছিলেন, ভদ্রবাহু। ভদ্রবাহুর বাড়ী ছিল বঙ্গদেশের অন্তর্গত পৌণ্ডবর্ধনে। একসময়ে দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, উত্তর-ভারতে দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইবে। এই গণনার অচিরকাল-মধ্যেই উক্ত প্রদেশে দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা দেয়। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার প্রজাদের বাসের জন্ত উর্ধ্বের স্থান খুঁজিয়া বহু জৈন শ্রমণসহ মহীশূর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, তাঁহার গুরু ভদ্রবাহু এইসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হন। তাঁহার প্রজাদের হুঃখ দূর করিবার জন্ত তিনি মহীশূরে এক উপনিবেশ স্থাপন করেন। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার দয়ার্জ হৃদয় জীবহুঃখে বেশী মর্ম্মাহত হইতে লাগিল, এবং ২৯৮ খৃঃ পূঃ অর্ধে

প্রায়োপবেশনে মৃত্যু।

তিনি নন্দদার উপকূলে প্রায়োপবেশন দ্বারা প্রাণত্যাগ করেন, তখন

তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০ বৎসরের নীচে ছিল। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর সেলিউকসের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল এবং তিনি গ্রীকদের স্থাপিত ব্যাক্ট্রিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রবাদ, সেলিউকস তাঁহার কন্যাকে চন্দ্রগুপ্তের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। মুদ্রারাক্ষসে প্রায়ই যবন সৈন্যদের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের সংগ্রামের কথা উল্লিখিত আছে। ভারতের এই যুগে গ্রীক ও হিন্দু—জগতের দুই শ্রেষ্ঠ সভ্যজাতির বিশেষরূপ মিলন হইয়াছিল। কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্ত সর্বদা শত্রুবেষ্টিত হইয়া একটি দিনের বেশী রাজ-প্রাসাদের কোন এক প্রকোষ্ঠে রজনী বাপন করেন নাই।

ভারতীয় রাজগণের এই ভাবের অপূর্ণ জীবনের দৃষ্টান্ত অন্তত কোণার পাইব ? আজ যিনি বিশ্ববিজয়ী সম্রাট, কাল তিনি বেচ্ছায় ভিক্ষু ও সন্ন্যাসী। চন্দ্রগুপ্ত জীবের

ছাথে প্রায়োপবেশন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার জগৎবিশ্রান্ত বংশধর অশোক শুধু তদীয় বিশাল সাম্রাজ্য উত্তরাধিকার-স্বত্রে লাভ করিয়াছিলেন, এমন নহে, তাঁহার অসামান্য-লোকহিতৈষণা, প্রজাবাৎসল্য ও অহিংসাবৃত্তির বীজ তাঁহার শোণিতেই ছিল। সেই গুণগ্রামের জীবন্ত নিদর্শন, প্রস্তর-স্তম্ভে ও শিলা-গাত্রে এখনও অমর হইয়া রহিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিন্দুসার ও অশোক

“অশোক যাহার কীর্তি ছাইল গান্ধার অবধি জলধি-শেষ,
তুই কিনা মাগো তাদের জননী, তুই কিনা মাগো তাদের দেশ।”

— দ্বিজেন্দ্রলাল।

চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের উপাধি ছিল “অমিত্রঘাত।” তিনি দাক্ষিণাত্যের অনেকাংশ বিজয় করিয়াছিলেন। লামা তারানাথ বলেন, তাঁহার সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত ব্যাপক ছিল। ভিন্সেন্ট স্মিথ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রীকরাজ এ্যাটিওকাসের সোটারের সঙ্গে বিন্দুসারের আত্মীয়তাসূচক পত্র ব্যবহার চলিয়াছিল, গ্রীকদূত ডেমিওকাস তাঁহার সভায় আসিয়াছিলেন। ইজিপ্টরাজ টোলেমির দূত এই সময়ে পার্টলীপুত্র রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিন্দুসার ২৯৮ খৃঃ পূঃ অব্দে রাজা হইয়া ২৭৩ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বিন্দুসার ২৯৮-২৭৩

খৃঃ পূঃ।

মৌর্যবংশতিলক দেবতাদিগের প্রিয় মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোকবর্দ্ধন ২৭৩ হইতে ২৩২ পর্য্যন্ত ৪১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের কীর্তিকথা বাঙ্গালীকি তাঁহার অমর কাব্যে লিখিয়াছেন, পাণ্ডবদের গাথা ব্যাস মহাভারতে কীর্তন করিয়াছেন, মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থে সাক্ষাৎ নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের জীবন-আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে।

অশোক ২৭৩-২৩২

খৃঃ পূঃ।

কিন্তু বিবিধ অবদানে অশোকবর্দ্ধনের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইলেও তাহার তাঁহাকে অমর করিতে পারে নাই। তিনি নিজের মর্ম্মকথা পাথরে উৎকীর্ণ করিয়া যে দেবদেবতাইয়াছেন, তাহাতেই তিনি নিজেকে নিজে অমর করিয়া গিয়াছেন। দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী কোন দৈববরে অমর হন নাই, তিনি স্বকীয় কর্ম্ম-প্রভার দিগ্দিগন্ত আলোকিত করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

দ্বীপবংশ ও মহাবংশে যগধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রাজগণের বংশলতা এই পুস্তকের ১৪৩।৪৪ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। অশোক সমেত এই বংশের ২০ জন ভিন্ন ভিন্ন বংশতালিকা। রাজার নাম পাওয়া যাইতেছে। দিব্যাবদানের তালিকার সঙ্গে এই তালিকার গরমিল আছে। দিব্যাবদানের তালিকা এইরূপ—১। বিধিসার ২। অজাতশত্রু ৩। উদয়িভদ্র ৪। যুগ ৫। কাকবর্ণী



অশোক।

৬। মহলী ৭। তুলকুচি ৮। মহামণ্ডল ৯। প্রসেনজিৎ ১০। নন্দ ১১। বিন্দুসার ১২। অশোক ১৩। কুনাল ১৪। সম্পদ ১৫। বৃহস্পতি ১৬। বৃষসেন ১৭। পুষ্যমিত্র ১৮। পুষ্যমিত্র।

বিষ্ণুপুরাণের তালিকা এইরূপ—শিশুনাগ বংশ ১। শিশুনাগ ২। কাকবর্ণ ৩। ক্ষেমধর্ম ৪। ক্ষেত্রসেন ৫। বিধিসার ৬। অজাতশত্রু ৭। দর্শক (হর্ষক) ৮। নন্দীবর্দ্ধন ৯। মহানন্দী ১০-১৮। তাঁহার ভ্রাতা মহাপন্ন নন্দ ও তাঁহার আট পুত্র ১৯। (মৌর্য) চন্দ্রগুপ্ত ২০। বিন্দুসার ২১। অশোক ২২। সুবংশ ২৩। দশরথ।

জৈন স্থবিরাবলী চরিত্রে ইহা ছাড়া শ্রোণিক, তুনিক, উদায়ী এই তিন রাজার নাম উল্লিখিত আছে।

এই কয়েকটি বংশাবলী পর্যালোচনা করিলে ইহাদের মধ্যে যে অনৈক্য দৃষ্ট হয় তাহা নিম্নলিখিত কারণগুলির দরুন হইতে পারে। এক রাজা কখনও ভিন্ন ভিন্ন নামে

অভিহিত হইতেন, কেহ বা তাঁহার প্রচলিত নাম আর কেহ বা তাঁহার উপাধির উল্লেখ করিয়াছেন (যে রূপ—সেলিম ও জাহাঙ্গীর)। দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ বা রাজার ভাতার নাম ও বংশাবলী দিয়াছেন। রাজকুমারেরা প্রায় সকলেই প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন এবং রাজবংশের মর্যাদাবশতঃ রাজা বলিয়াই গণ্য হইতেন। তৃতীয়তঃ, পুরাণকারদের হস্তলিখিত পুঁথিগুলিতে নাম সম্বন্ধে ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অপরাপর কথা পাঠক না বুঝিতে পারিলেও অনুমান করিয়া একটা সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তি ও স্থানের নাম সম্বন্ধে লেখা না পড়িতে পারিলে পাঠকগণের ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং পুঁথিলেখকদের এই সম্বন্ধে প্রায়ই ভুল হইয়া থাকে। চতুর্থতঃ, গাঁহার যে রাজবংশের সঙ্গে বিশিষ্টরূপে ঘনিষ্ঠতা হইবে আবদ্ধ তাঁহার সেই বংশের তালিকা অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারেন। বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশ এবং দিব্যাবদানের বংশাবলী অনেকটা একরূপ,—কিন্তু গাঁহার সেই বংশের সঙ্গে সেরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন না, তাঁহার অনেক সময় জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া ভ্রম করিয়াছেন।

কিন্তু তথাপি এই সকল বংশাবলী সুদূর অতীত কাল হইতে এতটা যে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাই আশ্চর্যের বিষয়। যুদ্ধবিগ্রহের সময়ের সঙ্গে এই বংশাবলী-কবিত সময়ের খুব বেশী ব্যবধান নাই। সুতরাং ভারতবর্ষের রাজগণের একটা ধারাবাহিক বংশলতা আমরা পাইতেছি। কতকটা ভুল থাকা অনিবার্য, জগতে কোন্ জাতিরই বা অতিদূরতর সময়ের এরূপ ইতিহাস আছে? যে সময় হইতে পুরাণ লেখা বন্ধ হইয়া গেল, ভাগ্যক্রমে সেই সময় হইতে আমরা মুদ্রা, তাম্রশাসন ও শিলালেখ প্রচুর পরিমাণে পাইতেছি। এখনও ভারতীয় ইতিহাস লিখিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। বিদেশীয়দের সাহিত্যে আমরা আরও অনেক উপাদান পাইব বলিয়া আশা করি। এদেশেরও উপাদানও যথেষ্টরূপে সংগৃহীত হইতে আরও দীর্ঘকালের প্রচেষ্টার দরকার হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অশোক সম্বন্ধে অপবাদ

অশোক মগধরাজ বিন্দুসারের পুত্র, তিনি সুভদ্রাদেবী নামী পরমা সুন্দরী এক ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অশোক দেখিতে কুংসিত ছিলেন, জড়হতা।
এজন্য রাজা তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। রাজার প্রিয় পুত্র ছিলেন সুসীম। অশোক তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমন করিয়া পথে সংগৃহীত সৈন্য

সামন্ত লইয়া রাজধানীতে প্রবেশ করেন। বিন্দুসারের ঐ সময় মৃত্যু হইয়াছিল—অশোক রাজধানীর তোরণ বন্ধ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে কোশলক্রমে স্তম্ভসমূহকে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার হত্যাসাধন করেন। রাধাগুপ্ত নামক এক মন্ত্রী অশোককে বিশেষ সহায়তা করেন। ভারতবর্ষে প্রচলিত আখ্যানিকাগুলি হইতে এই কথাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। সিংহলের মহাবংশে বিস্তারিতভাবে অশোকের জীবনচরিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থানুসারে চন্দ্রগুপ্ত ৩৪ বৎসর রাজত্ব করেন, তৎপুত্র বিন্দুসার ২৮ বৎসর কাল মগধ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অশোক তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে নানা কোশলে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুবরাজ “সুম্নন” ও তাঁহার ৯৯ জন ভ্রাতাকে হত্যা করেন। কেবলমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিস্যকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন বলিয়া তাঁহাকে মৃত্যু হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন।

সুম্ননের পত্নী পলাইয়া আশ্রয়লাভ করেন—স্বামীর মৃত্যুকালে তিনি গর্ভবতী ছিলেন, নিগ্রোধ নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। চণ্ডালেরা তাঁহাকে পালন করে। কিন্তু অল্পবয়সেই রাজকুমার বৌদ্ধশ্রমণগণের ক্রুপা প্রাপ্ত হন। কথিত আছে গৈরিক-পরিহিত অজ্ঞাতকুলশীল এই বালকই অশোকের চিত্তে সর্বপ্রথম ধর্ম্মভাব জাগাইয়া দেয়। অশোক-অবদানে তাঁহার ভ্রাতৃহত্যার কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু তাঁহার অন্তর্বিধ নৃশংসতার অনেক উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে ; কথিত আছে—একদা মন্ত্রিসভা তাঁহার কোন মতের প্রতিবাদ করিয়াছিল, এজন্ত তিনি বহুশস্ত্রে পাঁচ শত অমাত্যের শিরশ্ছেদ করেন। তাঁহার অন্তঃপুরের মহিলারা একদা তদীয় কদাচারের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ব্বক একটা পত্রশুল্ক অশোক বৃদ্ধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে দেখাইয়া

পুত্রমহিলাদিগকে বাহ।

তাঁহার প্রতি প্লেবোক্তি করিয়াছিলেন। সম্রাট তাহা জানিতে পারিয়া পুত্রমহিলাদিগকে জীবন্ত দগ্ধ করেন। তাঁহার এই ভীষণ কার্য্য দর্শন করিয়া অনৈক মন্ত্রী তাঁহাকে বহুশস্ত্রে এই সকল নৃশংস কার্য্য করিতে নিবেদন পূর্ব্বক একটা জ্বলাদ রাখিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে তিনি ‘চণ্ডগিরিক’ নামক তত্ত্ববায়কুলে জাত এক জ্বলাদ নিযুক্ত করেন। বাহিরে কারুকার্য্যময় একটা অতি সুদর্শন গৃহ নির্মাণ করিয়া তথায় তিনি চণ্ডগিরিকের দ্বারা লোকহত্যা করিতেন। সেই গৃহ দর্শনার্থিগণ লুপ্ত হইয়া তথায় প্রবেশ করিলে তখনই চণ্ডগিরিকের হস্তে তাহাদের নিধন সম্পাদিত হইত। এই বধ্যগৃহের নাম ছিল ‘নরক’।

এইরূপ শত কলঙ্ক অশোক চরিত্রে আরোপ করা হইয়াছে। ভারতীয় আখ্যান-গুলিতেই এইরূপ কাহিনীর প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। তিনি এই অতি নৃশংস চণ্ডনীতি অনুসরণ করার জন্ত তাঁহার উপাধি হইয়াছিল “চণ্ডাশোক।” চণ্ডাশোক শেষ সময়ে “ধর্ম্মাশোক” নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

উপরি উক্ত যে সকল কলঙ্কের কথা তাঁহার নামে আছে, তাহার মূলে কিছু সত্য থাকিতে পারে। এতগুলি বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত আখ্যান একেবারে মিথ্যা হইতে পারে না। আমরা পরে দেখাইব, তাঁহার প্রতি ব্রাহ্মণগণের ক্রোধের কারণ ছিল, তাঁহারা কতকগুলির সৃষ্টি করিয়া

ধাকিবেন। বৌদ্ধগণও তাঁহাদের ধর্মের মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্ত কতকগুলি আখ্যান রচনা করিতে পারেন। তাঁহাদের ধর্মবলে কত বড় পাপও যে কত বড় সাধুতে পরিণত হইতে পারে, তাহাই হয়ত প্রদর্শন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও তাঁহার প্রিয় মন্ত্রীদিগকে প্রথমতঃ হত্যা করিয়াছিলেন, সেই কাহিনীগুলি যজ্ঞরিত ও পরবিত হইয়া এইরূপ আখ্যায়িকার আকার ধারণ করিয়া থাকিবে। কিন্তু যেরূপ রাশি রাশি হৃদয় তাঁহার প্রতি আরোপ করা হইয়াছে, তাহার সিকিভাগও যদি সত্য হইত, তবে দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী কি তজ্জন্ত অমৃতপ্ত হইতেন না? কলিঙ্গক্ষেত্রের সামরিক অভিযানে রাজন্ত-ধর্ম আশ্রয় করিয়া তিনি যুদ্ধে কতকগুলি লোক হত্যা করিয়াছিলেন—তজ্জন্ত তাঁহার মর্মস্পর্শী অমৃতাপ পাথর গাত্রে উপরে অক্ষয় অক্ষরে ব্যক্ত রহিয়াছে, আর নিজের আত্মীয় স্ত্রীস্বামীদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া কি তিনি কিঞ্চিদাত্তও অমৃতপ্ত হইলেন না? এদিকে এইরূপ পরস্পরবিরোধী যুক্তি তর্ক সত্ত্বেও আমরা একথা বলিতে পারি না যে তিনি নিরলস। যুদ্ধিষ্ঠিরও মিথ্যাচার করিয়াছিলেন, ধর্মশোকও প্রথম-জীবনে হয়ত রাজ্যলোলুপ হইয়া কতকগুলি হত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ববর্তী মগধের রাজা অজাতশত্রুর নামেও পিতৃবধের কলঙ্ক আছে। ধর্ম যে মানুষজীবনে কি অতুতপূর্ণ পরিবর্তন আনিতে পারে, তাহার উদাহরণ এদেশের ইতিহাসে অনেক আছে। দস্যু রত্নাকর প্রথমে চণ্ডাশোকের মতই নরহস্তা ছিলেন। তিনিই না শেষে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটির মৃত্যু দেখিয়া করুণাবিগলিতহৃদয়ে অমৃতভূত্বে কাব্যকথার জন্ম দিয়াছিলেন? প্রাচীন উপাখ্যান বাদ দিলেও আমাদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বনবিহুপুত্রের বীর হাধীর, গোড়দ্বারাধিপ চান্দরায়, নববীপের রাজকুমারদয়, জগাই-মাধাই, দস্যু নারোজি, ভীলপহু বেঙ্গা বারমুখী, দস্যু কেনারাম প্রভৃতি বহুলোকের জীবন এই মহাসত্য প্রমাণ করে। অন্ধকার রজনীর অবসানে যেরূপ তপনের উজ্জল আলো ফুটিয়া উঠিয়া জাগতিক দৃষ্ট উজ্জল করে, দৈবকৃপায় প্রাক্তনের শুভ ফলে হঠাৎ কোন কোন ব্যক্তির জীবনে এমন মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়—যখন কলঙ্কিত জীবন নিরলস হইয়া অমল-ধবল রূপ গ্রহণ পূর্বক আনাদিগের চক্ষে স্বর্গীয় সূর্য্য প্রকাশ করে।

অশোকের বহু ধর্মগুরু ছিলেন। তন্মধ্যে উপগুপ্তের নামই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইনি চম্পা (অঙ্গের রাজধানী) নগরের প্রধান বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন, কিন্তু দূরদূরান্তরে ধর্ম

উপগুপ্ত।

প্রচার করিয়া বেড়াইতেন, তৎসম্বন্ধে বহু প্রবাদ ও উপাখ্যান মথুরা, কাশ্মীর, এমন কি মঙ্গলিয়ারও প্রচলিত আছে। বৌদ্ধগ্রন্থে নানাবিধ আখ্যায়িকা দ্বারা তাঁহার জীবনের ত্যাগ ও ধর্মবিশ্বাস দেখান হইয়াছে। তন্মধ্যে একটিকে কতকটা রূপান্তরিত করিয়া রবিবাবু তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ‘সন্ন্যাসী উপগুপ্ত’ কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। কথিত আছে অশোকের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভগবান্ বুদ্ধদেবের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, অশোকের মত দাতা কেহ ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার সর্বপ্রধান দান অর্থ নহে—তিনি স্বীয় প্রিয়তম স্ত্রীদর্শন তরুণ পুত্র মহেন্দ্র (মতাস্তরে কনিষ্ঠ

ভ্রাতা) ও অষ্টাদশবর্ষীয়া রূপসী কস্তা (মতান্তরে কনিষ্ঠা ভগিনী) সজ্জমিত্রাকে বৌদ্ধসংঘে ভিক্ষুসম্প্রদায়কে দান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভিক্ষুধর্ম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহলে বাইয়া ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সজ্জমিত্রা আদিত্য নাম নহে, সংঘে প্রবেশ করার পর তিনি এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অশোক-নীতি

এখন আমরা অশোকের অশ্বশাসনগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কথিত আছে, অশোক ৮৫০০০ অশ্বশাসন বা ধর্মরাজিকা স্থাপন করেন।

উপনিষদের পরের যুগে ভারতবর্ষে যে নানা প্রকার মত প্রচলিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম যে সকল মতের সমন্বয় করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, তাহা বৈদিক সাহিত্যের পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ পশুহননের বিরুদ্ধবাদীরা সাধারণ জনসমাজের মধ্যে যে ঘোর আন্দোলন করিয়া বৈদিকধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ছিল—

মহাভারত-প্রসঙ্গ,
প্রাথমিকতা।

তাহার প্রমাণ রামায়ণে পর্য্যাপ্ত দেখিতে পাই। অবোধ্যাকাণ্ডে শততম স্বর্গে ৩৮-৩৯ শ্লোকে বেদবিরোধী শুদ্ধ তর্কাস্থিত অবিধ্বাসী ব্রাহ্মণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাভারতে দৃষ্ট হয় নানারূপ অপগণক ও উলঙ্গ সন্ন্যাসীর দল তখন খুবই পুষ্টলাভ করিয়াছিল। মহাভারতখানি ভাল করিয়া পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে সঙ্কলয়িতা যথাসাধ্য সতর্কতার সহিত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে তিনি গ্রহণের গতির কথা উল্লেখ করিয়া কালনির্ণয়ের একটা একটা দৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া গিয়াছেন যে মহাভারতের আধুনিক টীকাকার সেই স্বত্রে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, ভীষ্ম, দ্রুপদ প্রভৃতির কাহার কি বয়স ছিল—তাহার একটা ঠিকজি করিয়া ফেলিয়াছেন। যে সকল প্রমাণ বলে মহাভারতের ভারতকৌমুদী নামক টীকা-প্রণেতা মহা-মহো^১ শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা উপেক্ষণীয় বলিয়া মনে হয় না। জ্যোতিষিক গণনা বলে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যুধিষ্ঠিরের ৭২, ভীমের ৭১, অর্জুনের ৭০ এবং নকুল ও সহদেবের ৬৯ বৎসর এবং কয়েক মাস বয়স ছিল। *

* ষোড়শ নির্ণয়সাপেক্ষে মুদ্রিত মহাভারতের ১৩৪ অধ্যায়ে যে কয়েকটি শ্লোক দৃষ্ট হয়, তদনুসারে যুধিষ্ঠির ২৬ বৎসর, ভীম ১৫ বৎসর, অর্জুন ১৪ বৎসর এবং নকুল ও সহদেব ১৩ বৎসর বয়সে হস্তিনাপুরে আসেন, সেখানে দ্রুপদাদির সহিত ১৩ বৎসর থাকেন। ঋতুগুহে বাইয়া ৬ মাস থাকার পর একচন্দ্র

মহাভারতের প্রতিপর্কশেষে কতটি অধ্যায় এবং শ্লোকে তাহা শেষ হইয়াছে, তাহা পরিষ্কার ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

১। আদিপর্ক—	২২৭ অধ্যায় এবং ৮৮৮৪ শ্লোকে সম্পূর্ণ।
২। সভাপর্ক—	৭৮ টি অধ্যায় এবং ২৫১১ টি শ্লোক
৩। বনপর্ক—	২৬৯ " " " ১১৬৬৪ " "
৪। বিরাটপর্ক—	৬৭ " " " ২০৫০ " "
৫। উদ্যোগপর্ক—	১৮৭ " " " ৬২৮ " "
৬। ভীষ্মপর্ক—	১১৭ " " " ৫৮৮৪ " "
৭। দ্রোণপর্ক—	১৭০ " " " ৮২০২ " "
৮। কর্ণপর্ক—	৬৯ " " " ৪২৬৪ " "
৯। শৈল্যপর্ক—	৫৯ " " " ৩২২০ " "
১০। সৌপ্তিকপর্ক—	১৮ " " " ৮৭০ " "
১১। দ্বীপর্ক—	১৭ " " " ৭৭৫ " "
১২। শান্তিপর্ক—	৩৩৯ " " " ১৪৭০৭ " "
১৩। অমুশাসনপর্ক—	১৪৬ " " " ৮০০০ " "
১৪। অশ্বমেধপর্ক—	১৩০ " " " ৩৩২০ " "
১৫। আশ্রমিকপর্ক—	৪২ " " " ১১১১ " "
১৬। মৌসলপর্ক—	৮ " " " ৩২০ " "
১৭। মহাপ্রস্থানিকপর্ক—	৩ " " " ১২৩ " "
১৮। স্বর্গারোহণপর্ক—	৫ " " " ৩২৩

শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই সুবৃহৎ পুস্তকে সমস্ত বিষয় এত পরিষ্কারভাবে দেওয়া হইয়াছে যে, সম্বলয়িতা পাঠকচিত্ত হইতে যথাসম্ভব বিধার ভাব দূর করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। যুদ্ধিগিরের পক্ষে সাত অক্ষৌহিনী সৈন্ত ছিল এবং দ্রুপ্যোদনের সৈন্ত সংখ্যা ছিল একাদশ অক্ষৌহিনী। গ্রহকার লিখিয়াছেন—একটি হাতী, একখানি রথ, পাঁচটি পদাতিক এবং তিনটি ঘোড়া—ইহাতে একটি পংক্তি হয়। তিন পংক্তিতে এক সেনামুখ, এবং তিন সেনামুখে এক গুণ্ড হয়। তিন গুণ্ডে এক গণ, তিন গণে এক বাহিনী এবং তিন বাহিনীতে এক পুতনা হয়, তিন পুতনায় এক চমু, তিন চমুতে এক অনীকিনী এবং দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিনী হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা অক্ষৌহিনীতে রথের সংখ্যা করিয়াছেন ২১৮৭০, হস্তীর সংখ্যাও তাহাই। “হে পণ্ডিতগণ এক অক্ষৌহিনীতে পদাতিক সংখ্যা এক লক্ষ

আমে এক বৎসর বাস করেন, হস্তিনাপুরে ফিরিয়া দ্রুপ্যোদনাদিগ্ন সঙ্গে মিলিত হইয়া পাঁচ বৎসর বাস করেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থে ২৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তার পর পাণ্ডা খেলায় হারিয়া ১৩ বৎসর নির্বাদিত হইয়া থাকেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া যুদ্ধিগির ১০৮ বৎসর ৬ মাস বয়সে স্বর্গারোহণ করেন।

নয় হাজার তিন শত পঞ্চাশ জানিবেন" (আদিপর্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৯-২৭ শ্লোক)। এই হিসাব অনুসারে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৫৬০৯০০, কৌরব পক্ষে ২৪০৫৭০০। প্রধান অস্ত্রবেত্তা ভায় দশ দিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, দ্রোণাচার্য পাঁচ দিন, কর্ণ দুই দিন, শল্য অর্ধ দিবস, ইহার পরে গদাযুদ্ধ হয় (আদি, ২য় অধ্যায়, ৩০-৩১ শ্লোক)। হফকিন্স সাহেব দেখাইয়াছেন, মহাভারতের মধ্যে অসংখ্য লেখা বেদের অনুবৃত্তি মাত্র। যদিও মহাভারতে বিস্তার স্থানে কল্পনার লীলাখেলা দৃষ্ট হয়, আদি ইতিহাস-পূর্বযুগের চিরাগত কাহিনীগুলি বাদ দেওয়াও মহাভারতকারের পক্ষে সমীচীন হইত না। বহুযুগাগত সংস্কারের অন্তর্বিধ— এমন কি একটা ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। কিন্তু যিনি পূর্ববর্তী বৈদিক সাহিত্যের এতটা পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক ঘটনা বর্ণনাকালে কোন্ ঋষির মুখে সেই তথ্য প্রচারিত হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন, কাল ও সৈন্যসংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে যিনি অতি যত্নভাবে গণনা ও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে ভুলেন নাই, তিনি যে গ্রন্থোক্ত প্রধান নায়ক-নায়িকাদের সম্বন্ধে অবাধ কল্পনা চালাইবেন, তাহাত মনে হয় না। কুরুক্ষেত্রে একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহার কথা আসমুদ্র হিমাচল পর্যন্ত কোটা কোটা লোকের মধ্য হইতে একেবারে উড়িয়া যাইবে এবং মহাভারতোক্ত কতকগুলি কল্পনামাত্র এত বড় দেশের আপামর সাধারণ সম্রাজ্ঞ হইয়া শুনিবে, এ কথা ত বিশ্বাস করা যায় না। ওয়েবার ও ভিল্লেম্ট শ্বিথের পাণ্ডুগণের ব্যাখ্যার কোন প্রমাণ কি

এ দেশে আছে? বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী মতের ত অসংখ্য শাস্ত্র আছে, কোন শাস্ত্রে কি ভীমার্জুন ও বুদ্ধদেব কখনও ভুটিয়া বা মোস্তলিয়ান বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন? সাতসমুদ্রের ওপার হইতে পণ্ডিতেরা ব্যাসদেবের টিকি এমন কড়াভাবে ধরিলে আমরা সহ্য করিতে পারিব না। যদি প্রাচীনতম শাস্ত্রের কোন কোনটিতে পাণ্ডবদের নাম না থাকে তবে সেই অনুজ্ঞেই কি পাণ্ডবদের যুদ্ধের বিষয়ে সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ?

মহাভারতে বৈদিক কাল হইতে আগত সমস্ত ধর্মমতের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আছে। অশোকের অনুশাসন আলোচনা করিতে হইলে কোন্ কোন্ কথায় তিনি পূর্ববর্তী যুগের রাজাদের আদর্শ রক্ষা করিয়াছেন, এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তিনি ভারতবর্ষে নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই বিচার্য। আমরা এক যুগকে 'আধার যুগ' বলিয়া এবং অপরকে 'আলোকের যুগ' নাম না দিয়া আদি অধ্যায়টা চোখ বুজিয়া পথে চলিব না। ভারতের চিন্তাশীলতার যে ধারাবাহিকতা আছে তাহা আমাদের কাছে দেখাইতে হইবে, এই ধারাবাহিকতা একটা সত্যকার বড় কথা, এ প্রচেষ্টা আমরা ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা জোড়া দেওয়ার মত মনে করি না।

রামায়ণের অবোধ্যাকাণ্ডে শততম অধ্যায়ে ভরতকে রাজনীতি-সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার উপলক্ষে রামচন্দ্র তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেই প্রশ্ন আবার মহাভারতের সভাপর্বে নারদ যুধিষ্ঠিরকে করিয়াছিলেন। এই দুই প্রশ্ন প্রায় এক, এমন কি কোন কোন

স্থানে রামকথিত রাজনীতি নারদের উপদেশের সঙ্গে প্রায় ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যাইতেছে। ইহা ছাড়া রাজনীতি সম্বন্ধে বিস্তর গ্রন্থ সংকলিত সাহিত্যে আছে। শুক্রনীতিসার, কামন্দকীয় নীতিসার, গৌতমসংহিতা, বশিষ্ঠসংহিতা, হারীতসংহিতা, অত্রিসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতি বহু গ্রন্থে রাজনীতির আলোচনা দৃষ্ট হয়—মহু ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা তাহাদের মধ্যে বেশী প্রচারিত। এই সকল সংহিতাগ্রন্থ ছাড়া কানীখণ্ড, দেবীভাগবত, অগ্নিপূরণ, ত্রীমভাগবত, গীতা প্রভৃতি পুস্তকে নীতিশাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে। কয়েকবৎসর হইল কোটিল্যের আবিষ্কৃত হওয়াতে এই গ্রন্থ রাজনীতি-সম্বন্ধে সর্বোচ্চ শ্রেণীর পর্য্যায় স্থান লাভ করিয়াছে।

এইসকল রাজনৈতিক নিবন্ধ প্রায় একপ্রকার। রাজনীতি সর্বদেশেই ধর্ম্মনীতির পঞ্জিকিতে স্থান পাইবার দাবী করিতে পারে না। রাজার শাসন-রাজনীতি ধর্ম্মনীতি নহে। প্রণালীর মূলেই রহিয়াছে সাম দান, ভেদ, দণ্ড। শত্রুদের ছিদ্রান্বেষণ, স্বীয় প্রবল প্রজাদের ক্রমবর্দ্ধি প্রতাপ লক্ষ্য করিলে রাজার ভেদ জনাইবার চেষ্টা অবলম্বন, গুপ্তচরগণের দ্বারা সংবাদ-সংগ্রহ—এসমস্তই রাজনীতির অঙ্গীয়। রামায়ণে লিখিত আছে, শুধু যুবরাজ, প্রধান মন্ত্রী ও রাজপুরোহিত ব্যতীত অপর সকল রাজকর্ম্মচারীর

প্রত্যেকের পাছে তিন তিনটি করিয়া গুপ্তচর থাকিবে। তাহারা রামায়ণী নীতি ও সর্বদা তাহাদের গতিবিধি ও কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবে। এই কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র।

গুপ্তচরেরা প্রধান সেনাপতি, অস্ত্রপূরাধ্যক্ষ কর্ম্মচারী, বেতনাধ্যক্ষ, বেতনপ্রদানকারী, প্রধান বিচারপতি, নগরাধ্যক্ষ, রাজ্যসীমা-পালক, দুর্গাধ্যক্ষ, ব্যবহারদর্শী প্রভৃতি সকলেরই পাছে পাছে থাকিয়া অজ্ঞাতসারে সংবাদ সংগ্রহ করিবে। প্রজাদের গতি-বিধি ও কথাবার্তার সংবাদ দেওয়ার জন্ত গুপ্তচরেরা গণিকাদের বাড়ীতে পর্য্যন্ত আনাগোনা করিত—ইহাও কোন কোন নীতিসংহিতায় দৃষ্ট হয়। কোটিল্য এই শাস্ত্রের অন্ততম গুরু, ইনি গুপ্তচরদের যে কার্যতালিকা দিয়াছেন তাহাতে মনে হয় রাজ্যের কেহই এই শ্রেণীর লোকের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। কোটিল্যের শাস্ত্রে যে উচ্চাঙ্গের সভ্যতা ও রাষ্ট্রনীতির অস্তুদৃষ্টি পাওয়া যায় জগতে ঐ শ্রেণীর সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। তথাপি তিনি যখন লিখিয়াছেন “যিনিই ক্ষমতাপন্ন, যুদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য।” “যিনি উত্তরোত্তর স্বীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে অভিলাষী, তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বকার সন্ধির নিয়ম পালন করা চলে না।” “যে রাজা শাস্ত্রের নিয়ম পালন করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহার প্রতিপক্ষকেও সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। কারণ উভয়পক্ষ যদি তুল্যরূপ ক্ষমতামণ্ডলী হন, তবেই প্রকৃত শান্তি হইতে পারে। দুইটি লোহদণ্ড তুল্যরূপ উত্তম না হইলে তাহাদের প্রকৃত মিলন ঘটিতে পারে না।” ইহাই রাজনীতি। রাজ্যরক্ষা করিতে হইলে ব্যাবহারিক জীবনে এই নীতি পালনীয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই সকল চাণক্যনীতি পাঠ করিয়া অশোকের অমুশাসন পড়িলে মনে হইবে যেন আবদ্ধ গৃহ হইতে ছুটিয়া আসিয়া মুক্তাকাশের নীচে দাঁড়াইয়াছি। রাজ্যপালন ও রক্ষার জন্ত কঠোরতা অপরিহার্য্য, তাহা হিন্দু রাষ্ট্রনীতিতে আছে।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হিন্দুদের রাজনীতির আদর্শের মত উচ্চনীতি জগতের আর কোন জাতির ছিল না। এই সকল নীতি ক্ষত্রিয়গণ যথাসাধ্য পালন করিয়া চলিতেন।

“যে ব্যক্তি ‘তোমারই আমি’ এই কথা বলে, প্রাণভয়ে কৃতান্ত্রলি, মুক্তকেশে পলায়মান, স্তম্ভ, মদমত্ত, লুকায়িত, নিরস্ত্র, বর্ধহীন, রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থলাবৃত্ত—এরূপ লোক অবধ্য”

(মহু ৭ম অধ্যায়)। ঐদৃশ ব্যক্তিকে যে হত্যা করে সে ভ্রূণ হত্যাকারী বলিয়া কথিত হয়। মহাভারতে লিখিত আছে “দুর্জয় লোক ভয়বশতঃ উপহিত হইলে, শত্রু আসিয়া শরণাগত হইলে কিংবা কোন লোক যুদ্ধে বিজিত হইলে তাঁহাদিগকে পুত্রের জায় রক্ষা করিতে হইবে। (সভা ৫ম অঃ, ৫৬ শ্লোক)। ইলিয়ড কাব্যে লিখিত আছে শত্রুপক্ষের কোন বিজিত রাজকুমার ইউলিসিসের পাদমূলে নিপতিত হইয়া প্রাণের জন্ত ভিক্ষা করিয়াছিলেন। মহাজ্ঞানী ইউলিসিস তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণবধ করিলেন। উক্ত কাব্যসম্বন্ধে সে দেশের সুধী-সমাজ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জ্ঞানী শিরোমণি ইউলিসিস সে পর্য্যন্ত যতগুলি কার্য করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার এই কার্যটিই তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

গ্রীক নীতি।

সমাজ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জ্ঞানী শিরোমণি ইউলিসিস সে পর্য্যন্ত যতগুলি কার্য করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার এই

কার্যটিই তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যখন বিদেশীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তখনই হিন্দুদিগের বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। যেহেতু যে ক্ষত্রনীতি ভারতীয় রাজাদের মধ্যে অলঙ্ঘ্য ছিল, সেই নীতির দ্বা-দাক্ষিণ্য শত্রুরা দেখান নাই। ভারতবর্ষের পরাজয়ের ইহাও অন্ততম কারণ। তাহাদের যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যশাসন এ সমস্তের মধ্যেই একটা মনুষ্যত্ব ছিল। একটা উদাহরণের উল্লেখ করিব। তাইমুরলেন ভারতের পশ্চিমাংশের কোন কোন স্থান স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার পৌত্র মিরচা সেই সকল দেশের অধিকার রাখিতে পারেন নাই। কঙ্কর নামে এক হিন্দু রাজা স্বাধীন হইলেন এবং মিরচা তাঁহাকে সাতবার আক্রমণ করিয়াও পরাজয় করিতে পারেন নাই; প্রত্যেক বারই মিরচা পরাস্ত হইয়াছিলেন। শেষবার কঙ্করের হাতে পরাজিত হইয়া তিনি বন্দী হন। হিন্দু রাজা শরণাগত শত্রুকে মুক্তিদান করিলেন, কেবল একটি মাত্র সর্ভ রহিল, যেন তাতার-রাজ আর তাঁহার রাজ্য আক্রমণ না করেন এবং রাজত্বের দাবী উত্থাপন না করেন।

মিরচা নিকৃতি পাইয়া পুনরায় তাঁহার উদারহৃদয় শত্রুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এবার ভাগ্যচক্র বিপরীত দিকে ফিরিল, কঙ্কর বন্দী হইলেন। মিরচা বন্দীর চক্ষু দুটি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিলেন। ক্ষত্রনীতি অমুসারে কঙ্কর শরণাগত শত্রুকে পুত্রবৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ধর শত্রু তাহার হৃদয়হীনতা ও পশুভাব দেখাইতে ছাড়িল না। কিন্তু কঙ্কর এই দুর্জীবহারের প্রতিশোধ দিলেন। মিরচার বিশ্বাস ছিল তাঁহার মত লক্ষ্যভেদ করিতে পারে এরূপ লোক জগতে নাই; একদা তিনি শুনিলেন, অন্ধ হইলেও কঙ্কররাজ কোন স্থানে শব্দ মাত্র শুনিলে তাহা না দেখিয়া শব্দভেদী বাণ দ্বারা লক্ষ্যভেদ করিতে পারেন। মিরচা বন্দীকে সন্মুখে আনিয়া এই গুণের পরীক্ষা

দিতে বলিলেন। কঙ্কর বলিলেন, “আমি আপনার দ্বারা পরাস্ত হইয়াছি—আপনি আমার বিজয়ী, অস্ত্র কাহারও মুখোচ্চারিত বাণী আমি শুনিব না, আপনারই আমাকে আদেশ করিতে হইবে।” মিত্রা লক্ষ্যহান স্থির করিয়া কঙ্করকে আদেশপূর্বক যাই সরিয়া পড়িবেন, তৎপূর্বেই কঙ্কর-হস্তনিষ্কিপ্ত বাণ তাঁহার বক্ষ ভেদ করিল। এই ভাবে ১৪৫১ খৃঃ অব্দে মিত্রা মৃত্যুমুখে পতিত হন (মোগল ইতিহাস, এফ্. এফ্. কারটনপ্রণীত, প্রথম সংস্করণ, লণ্ডন ১৭০৯, বঙ্গবাসী সংস্করণ ২৯—৩১ পৃঃ)। এই পুস্তকের ১২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হিন্দুরা আক্রান্ত হইলে যুদ্ধ করিয়া থাকে, কিন্তু স্বেচ্ছায় অপর কাহারও রাজ্য আক্রমণ করিতে যায় না।

এই ক্ষাত্রনীতি যে কিরূপ দৃঢ়ভাবে রাজগণ পালন করিতেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহারাজ জরাসন্ধের বধ-সাধনার্থে শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমার্জুন ছদ্মবেশে গিরিব্রজপুরের রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। জরাসন্ধ গুপ্তচরের মুখে জানিয়াছিলেন যে ইহারা গুপ্তদ্বার দিয়া তাঁহার চৈত্য ও ভেরী ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। যে জরাসন্ধের পরাক্রম একরূপ ছিল যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সৈন্তের সঙ্গে যদি আমাদের বহুকুল অবিশ্রান্ত তিন শত বৎসর যুদ্ধ করে, তথাপি তাহার কিছু মাত্র ক্ষয় করিতে পারিবে না,—ভারতের তৎকালীন সেই অদ্বিতীয় সন্ন্যাসী তাঁহার শত্রুদের পরিচয় পাইয়াও ক্ষাত্রনীতি লঙ্ঘন করিলেন না; তিনি এই তিন অতিথি যুদ্ধকামী হইলে তন্মধ্যে ভীমকেই বিশেষ বলবান্ মনে করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, যেহেতু মল্লযুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাতে শারীরিক বলেরই অধিক দরকার। কৃষ্ণকে তিনি মনে মনে ‘দাস’ বলিয়া ঘৃণা করিতেন, এজন্য উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি ধর্ম্মকার্য্যে ব্রতী হইয়া উপবাসী হইয়াছিলেন, সেই উপবাসক্রান্ত দেহেই রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তথায় তাঁহার আত্মীয় স্ত্রীস্বং ও বৃহৎ চন্দ্ৰ উপস্থিত ছিল, কিন্তু ক্ষাত্রনীতি পালন করিয়া সংবতভাবে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রলয়পয়োদি যেরূপ বেলা অতিক্রম করেন না, ক্ষাত্রধর্ম্মনীতি সেইরূপ সীমা উল্লঙ্ঘন করেন নাই, আমরা এই কথা ৪২-৪৩ পৃষ্ঠায় একবার লিখিয়াছি। এই ক্ষাত্র নীতি পালন করিয়া যুধিষ্ঠির দ্যুতক্রীড়ায় সর্বস্বান্ত হইলেন। যেহেতু দ্যুত-কার্য্য মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অনুমোদন করিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠির তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে পারিলেন না।

হিন্দু রাষ্ট্রনীতি উদার
হইলেও তাহা সৌম্যবৃত্ত।

যাহারা যনের মত ভীষণ, ইন্দ্র ও প্রভঞ্নের মত হৃদ্বর্ধ—সেই ভীমার্জুন মেঘশাবকের মত যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনবাসী হইলেন, রাজনীতি ও রাজ-পরিবারে পালিত চিরাগত নীতির সংস্কার তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

হিন্দু রাজধানীতে উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মনীতি আছে, কিন্তু তথাপি রাজনীতি কোনকালেই একেবারে শুভ্র চন্দ্রকিরণবৎ হইতে পারে না। যেখানে সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহাদি করিতে হইবে, শত্রুর পরাজয় ইচ্ছা করিতে হইবে ও প্রজাদিগকে দমন করিয়া রাখিতে হইবে, সেখানে যোগি-ঋষির ধর্ম্ম চলে না।

চাণক্য-শাস্ত্রে ধূর্ততাকে সমুখযুদ্ধ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। বাহুবল হইতে ছল-কৌশল ভাল, কারণ যিনি কৌশল ও কূটনীতিতে অভিজ্ঞ, তিনি আপনার হইতে শ্রেষ্ঠ বিক্রমশালী হৃদয় প্রতিপক্ষকেও অনায়াসে জয় করিতে পারেন। (অর্থশাস্ত্র, ৯ম অধ্যায়, ১ পৃঃ)। এখানে চাণক্য তাঁহার নিজ জীবনের একাত্তরের সফলতার ইঙ্গিত করিয়াছেন মাত্র। তিনি বন্দীর মুখ হইতে স্বীকারোক্তি আদায় করিবার জন্য অষ্টাদশ প্রকার অতি নিষ্ঠুরভাবে পীড়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং অনায়াসে লিখিয়া গিয়াছেন—“প্রত্যহ একটি একটি করিয়া নূতন যন্ত্রণা দেওয়া যাইতে পারে এবং দরকার হইলে এক সময়ে এক বন্দীর উপর সর্বপ্রকার পীড়ন প্রয়োগ করা প্রয়োজনীয় হইতে পারে।” আমাদের সমস্ত ইতিহাসই তাহাদের পূর্ববর্তী অশুশাসনগুলি অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়া থাকে। কোটিল্যের পূর্ববর্তী সময়েও বন্দীর স্বীকারোক্তির জন্য তাহার উপর পীড়ন চলিত। অর্থশাস্ত্রের নীতিগুলির কত অংশ পূর্ববর্তী ইতির পুনরাবৃত্তি, এবং কতগুলি মৌলিক, তাহা বলা যায় না।

এই অর্থশাস্ত্র যে সকলেরই অনুমোদিত ছিল, তাহা নহে। বিখ্যাত সন্ন্যাসীর পক্ষে কতকগুলি অপরিহার্য আইন প্রচলিত করিতে হয়, কিন্তু তাহা সকলের মনঃপূত বা অনুমোদিত হইবার কথা নহে। শ্রীহর্ষের বদ্ধ বাণভট্ট অর্থশাস্ত্রের

বাণভট্টের নিন্দা।

নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন—“কোটিল্যের নির্ধর্ম ও নিদারুণ রাষ্ট্র-বিজ্ঞান কে অনুমোদন করিবে? তাহাতে রাজাদের এরূপ মজা রাখিতে হইবে যাহারা প্রতারণা-শাস্ত্র ও বাহুবলীয় পারদর্শী। যাহাতে তুচ্ছ অর্থসংগ্রহের জন্য অর্থলব্ধীর পদে প্রাণের অর্ঘ্য ঢালিয়া দিতে হইবে, যাহাতে উন্নতিকর সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের ধ্বংস নিশ্চিত এবং যাহাতে সহোদরগণ এবং যাহারা স্বাভাবিক দ্বেষ-প্রেমে যাহুবের সঙ্গে আবদ্ধ, তাহারা ই বধ্যভূমির উপযুক্ত বলি-স্বরূপ।”

কোটিল্য তৎপূর্ববর্তী বহু ইতিকারের মতামত আলোচনা করিয়া তাঁহার গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন। “পূর্ববর্তী শাস্ত্রকারেরা প্রাচীন নরপতিগণের রাজ্যশাসনে সহায়তা করিবার জন্য যে বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহাদের পন্থা অনুসরণ করিয়া পরিশিষ্ট-স্বরূপ এই অর্থশাস্ত্র লিখিত হইল” (১৫শ খণ্ড, ১ম অধ্যায়)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অশোক-অনুশাসন

কিন্তু অশোকের নীতি এক অভিনব সামগ্রী। সমস্ত জগতে, এমন কি হিন্দুশাস্ত্রেও, তাহার তুলনা নাই। তিনি সমস্ত নীতিশাস্ত্রের উর্কে উঠিয়া খুব একটা উচ্চ স্থান হইতে জগৎ দর্শন করিয়াছিলেন। কি ভাবে রাজ্য শাসন করিতে হইবে, রাজনীতিবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাই আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে রাজ্য পালন করিতে হয়, অশোক তাহাই বলিয়াছেন। জগৎ তাঁহার চক্ষে একটা সাম্রাজ্য ছিল না—উহা ছিল একটি বৃহৎ পরিবার—তিনি উহা রক্ষা করিয়া কিরূপে নিরুপদ্রবে রাজত্ব করিতে পারিবেন, তৎসম্বন্ধে একবারও ভাবেন নাই। কোন বৃহৎ পরিবারের পিতৃহানীর ব্যক্তি কিরূপে সেই পরিবারভুক্ত সকলের মঙ্গল হইবে সর্বদা তাহাই চিন্তা করেন, অশোকও স্বীয়-রাজ্য-সম্বন্ধে সেইরূপই করিতেন। এই পরিবার কেবল মনুষ্য-সম্প্রদায় লইয়া নহে, সমস্ত জীবই যেন সেই পরিবারভুক্ত ছিল। একটিমাত্র শিলালেখ দণ্ডের কথা উল্লিখিত আছে। কৌশাঘী অনুশাসনে বলা হইয়াছে “ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীদের দলে যে কেহ সজ্জ্ব ভেদ জন্মাইবার চেষ্টা করিবেন, তিনি খেত বঙ্গ পরিধান করিতে বাধ্য হইবেন, এবং ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীদের দলে মিশিতে পারিবেন না।” এই দণ্ডের অভিপ্রায় যে ব্যক্তি ভিক্ষুধর্মের অযোগ্য, তাহার গৈরিক বাস পরা বিড়ম্বনামাত্র। ইহাকে ‘দণ্ড’ বলা ঠিক নহে, সজ্জ্বর মধ্যে ঐক্যরক্ষার জন্য উহা একটি উপায়মাত্র। কিন্তু তাঁহার এত বড় রাজ্যে কি লোক দণ্ড পাইত না? অবশ্যই পাইত; কিন্তু তিনি তাঁহার কর্মচারীদেরকে পুনঃ পুনঃ সেই দণ্ডের কঠোরতা হাস করাইবার উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা প্রজাপালক দেবমূর্তিতেই দেখিতে পাই—শাসন-কর্ত্তরূপে নহে।

নির্মমভাবে পশুবলির কাজ চলিতেছিল। বৈদিক যাগযজ্ঞে দেশ পরিপ্লাবিত ছিল। রাজা সমস্ত দেশ হইতে এই প্রথা উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেকালে তাহা

অসাধ্যসাধন ছিল; একালেও কি তাহা নহে? তথাপি
 “সদয় হৃদয় দর্শিত পশু-
 যাতন।”
 অপরিহার্য কিছু কিছু রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা রাখিয়া অশোক

পশুহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন। জগতের এক ভগবৎকর ব্যক্তি এই পশু বধ দেখিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে তাহা নিবারণ করিয়াছিলেন, সদয় হৃদয়ে জীবহত্যার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই পুরাণুগে একমাত্র অশোকের চক্ষে তেমনই জীবকণ্ঠে সহানুভূতিজাত এক ফোঁটা করুণার অশ্রু পড়িয়াছিল; তাঁহার প্রায় সমস্ত শিলালিপিতে পশুহত্যা-নিবারণের প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়। “পূর্বে রাজ-রন্ধনশালায় রাজার ব্যঞ্জনের জন্য শতসহস্র প্রাণিহত্যা করা হইত—এখন তিনটি

মাত্র প্রাণী হত্যা করা হয়—পশ্চাৎ আর তিনটি প্রাণীও হত্যা করিতে দেওয়া হইবে না।” (চতুর্দশ গিরিলিপি।) অষ্টম শিলালিপিতে মৃগয়া-নিবারণের ইঙ্গিত আছে। পঞ্চম স্তম্ভ-লিপিতে কয়েকটি রক্ষাকবচের উল্লেখ আছে—কিন্তু সকলগুলিতে দৃষ্ট হইবে, অশোকের জীবনের অন্ততম মহাব্রত ছিল—মৌন পশুজাতির কষ্টমোচন। এদেশে মৎস্তের প্রাচুর্য্য সর্বজনবিদিত, মৎস্তপ্রিয় জনসাধারণকে মৎস্তাহার হইতে সেকালে নিবৃত্ত করা একান্ত অসম্ভব ছিল; তথাপি তিনি ধীরে ধীরে তাহাদিগকে নিবৃত্তির পথে আসিতে কতই না চেষ্টা করিয়াছেন। “আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা হইতে, কার্তিক মাসের পূর্ণিমার পূর্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক পূর্ণিমা, চতুর্দশী, অমাবস্তা ও প্রতিপদ এবং বৎসরের উপোসধ দিবসে মৎস্ত বধ বা বিক্রয় করিতে পারিবে না।” (পঞ্চম স্তম্ভলিপি।)

বৃষদিগকে যে উত্তম লৌহ-স্বারা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হয়, তৎসম্বন্ধেও তিনি ধীরে ধীরে নিষেধবিধি প্রচার করিয়াছিলেন। উক্ত শিলালিপিতে বলা হইয়াছে—“পুষ্যা ও পুনর্বসু নক্ষত্রযুক্ত দিবসে প্রত্যেক চাতুর্মাসিক পূর্ণিমা ও অমাবস্তার দিবসে এবং চাতুর্মাস্তের শুরুপক্ষে বৃষকে লৌহশলাকা-স্বারা কোনরূপ চিহ্নিত করিতে পারিবে না।” চতুর্দশ গিরিলিপিতে অশোক ‘সমাজ’ সম্বন্ধে নিষেধবিধি প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ ‘সমাজ’ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক লিখিয়াছেন—পশুদিগের মধ্যে নির্দম প্রতিদ্বন্দিতার সৃষ্টি করিয়া পুরাকালে কোন বৃহৎ আঙ্গিনায় তাহাদের মারাত্মক ক্রৌড়া দেখান হইত, এইরূপ উৎসবই ‘সমাজ’ শব্দের অভিপ্রেত। স্ত্রীলোকের আচার ও মঙ্গলাহুতানের যে যে অংশে পশুহত্যার প্রথা ছিল, তিনি তাহা নিবারণ করিয়াছিলেন। (নবম গিরিলিপি।) তৎকৃত পশুচিকিৎসালয়ের উল্লেখ এই শিলালিপিগুলিতেই আছে।

তিনি পথে পথে যে সকল বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, এবং কূপ খনন করিয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্য তিনি সপ্তম স্তম্ভলিপিতে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। “দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন—পথে পথে বটবৃক্ষ সকল রোপণ করাইয়াছি। উহারা পশু ও মনুষ্যগণকে ছায়া দান করুক। আম্রবাটিকা প্রস্তুত করাইয়াছি এবং অর্ধক্রোশ ব্যবধানে কূপ খনন করাইয়াছি এবং সেই সেই স্থানে জলদানের ব্যবস্থা করাইয়াছি। মনুষ্য ও পশুগণের উপকারের জন্ত অনেক আশ্রয়স্থান নির্মাণ করাইয়াছি।” (সপ্তম স্তম্ভলিপি।)

তিনি শুধু তাহার নিজের প্রজাদিগকে অপত্যনির্বিশেষে লালনপালনের ভার গ্রহণ করেন নাই,—হৃদয়ের শুদ্ধ বাৎসল্যভাব ও দয়াবৃত্তি সীমাতে সন্তুষ্ট হয় না, কলিঙ্গ অহুশাসনে তিনি বলিয়াছেন “সকল মনুষ্যই আমার পুত্রতুল্য। আমার পুত্রেরা ঐহিক ও পারলৌকিক সকল মঙ্গল ও সুখের অধিকারী হউক, ইহা আমি যে রূপ ইচ্ছা করি তেমনই প্রার্থনা করি সকল মনুষ্যই সেইরূপ হউক।”

মনুষ্য ও পশু-চিকিৎসালয় তিনি শুধু স্বীয় রাজ্যের নানাস্থানে স্থাপন করেন নাই, ম্যাসিডোনিয়া এবং এ্যাটিগোনেসের রাজ্য পর্য্যন্ত হৃদয় পশ্চিম এবং দক্ষিণে সিংহল পর্য্যন্ত এই ভাবের দাতব্য চিকিৎসালয় তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। “যে যে স্থানে

মহুয়া ও পশুগণের উপকারক ঔষধ এবং ফলমূল নাই, সেই সেই স্থানে ঐ সকল সংগৃহীত ও রোপিত হইয়াছে।” (দ্বিতীয় গিরিলিপি।)

তাহার ধর্মপ্রচারকগণকে তিনি তৎকালপরিজ্ঞাত জগতের সর্বত্র পাঠাইয়াছিলেন, টলেমি, মিশর (২৬১—২৪৬ খৃঃ পূঃ) ম্যাসিডনিয়ারাজ্য অণ্টিগোনাস (২৭৭—২৩৯ খৃঃ পূঃ),

সাইবিনীর মগাস (২৫৮—খৃঃ পূঃ মৃত্যু), এপিরসের রাজা

পরধর্মনিষ্ঠা নিবদ্ধ।

আলেক্সান্দ্রাস (২৭২—২৫৮ খৃঃ পূঃ)—ইহাদের রাজ্যে তিনি মহুয়া

ও পশুচিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার ধর্ম কি তাহা তিনি পুনঃ পুনঃ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন—প্রধান ধর্ম অহিংসা ও জীবে দয়া, পিতামাতার প্রতি ভক্তি, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে বধ্যাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও দান-দ্বারা সন্তুষ্ট করা, উপকার বৃদ্ধি ইত্যাদি। তাহার ধর্মে আধ্যাত্মিকত্ব কিছুই ছিল না—তাহার প্রধান ভিত্তি স্থনীতি, তিনি অতিরিক্তমাত্রায় স্বীয় ধর্ম-ধ্বজাধারী ও কোন হেতুতেই পরধর্মের বিরোধী ছিলেন না। এ সম্বন্ধে তিনি প্রচার করিয়াছিলেন “অভিষেকের দ্বাদশ বর্ষ হইতেই আমি সর্বলোকের হিত ও সুখের জন্ত এইরূপ ধর্মলিপি শিখাইতেছি। তাহারা বাহাতে পূর্বপাপ-আচরণ ত্যাগ করিয়া ধর্মে উন্নতি লাভ করে, তাহাই আমার উদ্দেশ্য। এইরূপে আমি প্রজাগণের হিত ও সুখ দেখিয়া থাকি। আরও জ্ঞাতিদিগকে, প্রত্যাসন্নদিগকে এবং দূরবর্তীদিগকে কি কি উপায়ে সুখী করিতে পারা যায়, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়া থাকি এবং সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকি। এইরূপ সর্বজীবের ও সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি আমার লক্ষ্য থাকে। সর্ব-ধর্মাবলম্বীকেই আমি বিবিধ প্রকারে পূজা ও সম্মান করিয়া থাকি, তথাপি আমার মতে স্বধর্মের প্রতি অমুরাগই শ্রেয়।” (ষষ্ঠ স্তম্ভলিপি।) “আমার ধর্মমহামাত্রগণ কি গৃহস্থ, কি উদাসীন সকলের জন্ত এবং সকল ধর্মাবলম্বীর জন্ত ব্যাপৃত আছেন। তাহারা সজ্জের কার্য্যেও নিযুক্ত আছেন। ব্রাহ্মণ ও আজীবকগণের জন্তও আমি এইরূপ করিয়াছি। নিগ্রহদিগের (জৈন সম্প্রদায়) জন্তও এইরূপ করিয়াছি। ইহারা তাহাদিগের জন্তও ব্যাপৃত আছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্তও এইরূপ করিয়াছি, তাহারা তাহাদের কার্য্যেও ব্যাপৃত আছেন।”

একদিকে পারস্তের উপাস্তভাগ, অপরদিকে বঙ্গ, বিহার ও আসাম। একদিকে গান্ধার ও হিমালয়ের উত্তর হইতে প্রায় সমস্ত দাক্ষিণাত্য, এই বিশাল রাজ্যের তিনি একচ্ছত্র অধীশ্বর, তাহার এতগুলি অনুশাসনের কোনটিতে এত বড় সাম্রাজ্য কি করিয়া রাখিতে হইবে কিংবা দণ্ডমুণ্ডের বিধিব্যবস্থা কি প্রকারে হইবে এসম্বন্ধে একটি কথাও নাই। তাহার শিলালিপি পাঠ করিলে মনে হয় যে সুবিশাল এক পরিবারের পিতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি দিনরাত্র সমস্ত সম্মান পালনের চিন্তায় বিভোর হইয়াছেন—স্নেহ, প্রীতি ও দয়াদ্বারা কি ভাবে তাহাদের জীবনের উন্নতি করিবেন, তিনি এই চিন্তায় ব্যস্ত। মনে হয় যেন তাহার বিশাল সাম্রাজ্য একটি বিরাট চিকিৎসাশালা—তাহার ভারপ্রাপ্ত মহাভিষক সকলের আধিবাধি দূর করিতে ওষধি তৃণ ওষুধ খুঁজিতেছেন,—মনে হয় যেন কোন বিশাল মরুভূমির পথের অধ্যক্ষ-স্বরূপ, তিনি প্রতি মাইল ব্যবধানে কূপ ও শীতল বিটপী ছায়ায়

কিরূপে ব্যবস্থা করিবেন—তজ্জন্ত চিন্তায় নিবিষ্ট; আত্মরক্ষা, দুর্গসংহার, অধারোহী, গজারোহী ও পদাতিক সৈন্তের কথা নাই। যেন ভারতবর্ষে দয়ার এক বিরাট উৎসবক্ষেত্র, মহাদাতা—কর্মকর্তৃরূপে পুণ্যপুণ্যরূপে কাহার কি দরকার তাহার সন্ধান নিতেছেন—যেন সমস্ত ভারতবাসী দয়ার এক মহোৎসব চলিতেছে। পশুবলি নাই, নৈবেদ্যের ঘটা নাই, অমুষ্ঠানাদির বাহ্য বা আড়ম্বর নাই; হুঃখীর হুঃখ বৃদ্ধিতে, আর্ন্তের মর্মে সাহসনা দিতে, পৃথিবীর সমস্ত জীবের আতঙ্ক নিবারণ করিতে, দানসত্র খুলিয়া সর্বলোকের অভাব মোচন করিতে, গুহজনের প্রতি কর্তব্য শিখাইতে, মহাপুরোহিত সেই মন্দির হইতে অবিরত ব্যবস্থা করিতেছেন, তাঁহার শাস্তি নাই, বিরাম নাই। যমু, বাস্তবতা, অত্রি, কোটিল্য, শুক্র-কথিত রাজনীতি কোথায় আর অশোক রাজার রাজনীতি কোথায়? উভয় নীতির মধ্যে স্বর্ণ-মর্ত্যের ব্যবধান। জগতের আর কোন্ দেশে একরূপ রাজা জন্মিয়াছেন তাহাত জানি না।

অশোক দিনরাত্র জগতের হিতার্থ উন্মোগী ছিলেন; “সর্ব লোক হিতের জন্ত সতত জাগ্রত ও উন্মোগী থাকা চাই। তাহাদের ইষ্টচিন্তা ছাড়া আমার কর্মান্তর নাই। আমি জগতের কাছে যেন অণুগী হইতে পারি।” (বঠ অমুশাসন।) পূর্বে রাজগণ যুগ্মাদির জন্ত অভিযান করিতেন, তৎস্থলে অশোক অস্তরূপ অভিযানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

যুগ্মার পরিবর্তে লোক-
হিতার্থে অভিযান।

তিনি তাঁহার ভ্রমণ পবিত্র উদ্দেশ্যে পরিচালিত করিলেন। “ব্রাহ্মণ,

সাধু ও সন্ন্যাসিগণের সঙ্গলাভ, তাঁহাদিগকে দান করা,

বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুণজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে স্বর্ণদান, পল্লীর লোকদিগের

সঙ্গে মেলামেশা ও তাহাদিগকে ধর্ম সধক্ষে অবহিত করা, গ্রামে গ্রামে ধর্ম আচরিত হইতেছে কি না, তাহার সন্ধান লওয়া—আমার ভ্রমণের এইগুলি মুখ্য উদ্দেশ্য। পূর্বে যে যুগ্মার প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা হইতে এইরূপ ভ্রমণ আনন্দদায়ক ও উৎকৃষ্ট।” (অষ্টম অমুশাসন।) তিনি প্রতিষ্ঠা চাহিতেন না—তাঁহার লক্ষ্য ছিল বহু উর্দ্ধে স্বর্গের দিকে, সুতরাং লৌকিক বশের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন। “দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা বশ বা কীর্তির বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার করেন না।” (দশম অমুশাসন।) তিনি যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে পূর্বেই লিখিয়াছি তাহা জটিল অধ্যাত্ম বাদ নহে, সরল ও অবিসম্বাদিত সার্কজনীন সত্য। “ক্রীতদাস ও সাধারণ ভৃত্যদিগের প্রতি সদাশয়তা, গুরুজনের পূজা, প্রার্থীদিগের প্রতি অহিংসা, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান প্রভৃতি কার্য্যকে সাধুকার্য্য এবং এইরূপ অন্তান্ত কার্য্যকে ধর্ম-মঙ্গল কহে।” (নবম গিরিলিপি।) বাক্য-সংঘের উপর অশোক খুব জোর দিয়া বলিয়াছেন—“সকল ধর্ম সম্প্রদায়েরই সারবুদ্ধি বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু তাহার মূলে বাক্য-সংঘম। কিরূপে? সধর্ম্মীর সম্মান ও পরধর্ম্মীর নিন্দা সামান্য বিষয়েও যেন আদৌ না হয়। কোন কোন কারণে পরধর্ম্মীদিগের পূজা কর্তব্য। উহা-দ্বারা সধর্ম্মীদিগের উন্নতি ও পরধর্ম্মীদিগের উপকার হয়। একরূপ না করিলে সধর্ম্মীদিগের ক্ষতি হয়। যদি কেহ সম্প্রদায়ের প্রতি অহরুক্তিবশতঃ বা সধর্ম্মীদিগের

গৌরব বর্জন্য সধর্ম্মদিগের পূজা ও পরধর্ম্মদিগের নিন্দা করে, সে বিশেষরূপে স-সম্প্রদায়ের হানি করে। সুতরাং সমবায় (সামঞ্জস্য) ভাল। কিরূপে? সকলে পরস্পরের ধর্ম্ম শ্রবণ করুক, এবং উত্তরোত্তর শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করুক।” (ষাদশ অনুশাসন।)

আমরা যে আধুনিক কালে সর্কধর্ম্মসময়দের আলোচন করিতে চেষ্টিত, কত শত শতাব্দী পূর্বে অশোক তাহার বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন।

যাহারা অপরাধ করিয়া কারাগারে যায়, তাহাদের জন্য এই রাজবির কত দয়া! নিজের সম্ভান যদি ঐরূপ শাস্তি পায়, তবে মানুষের মনে বেকরূপ কষ্ট হয়, ইহা সেইরূপ ব্যথা। ধর্ম্ম-মহামাত্রদিগের কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি যে গিরিলিপিতে বলিয়াছেন—“দণ্ডিত ব্যক্তির অনেকগুলি সম্ভান আছে কি না, হুঃখে তাহারা আত্মহারা হইয়াছে কি না, দণ্ডিতের প্রতি দয়া। অথবা সে বুদ্ধ কি না, এই সকল বিবেচনাপূর্ব্বক ধর্ম্মমহামাত্রগণ অস্ত্রায় অবরোধ ও অস্ত্রায় দৈহিক দণ্ডের প্রতিবিধান ও বন্ধনমুক্তির জন্য ব্যাপৃত আছেন।” “দণ্ডিত ব্যক্তির স্বর্ণেরা কষ্ট পাইতেছে কি না এবং দণ্ডিত ব্যক্তির বহুসম্ভান আছে কি না এবং সে বুদ্ধ কি না”—এসকল কি বিচারকগণ কোথাও দেখিয়া থাকেন? অশোক আদৌ শুধু বিচারক ছিলেন না। পিতামাতা সম্ভানকে দণ্ড দিয়া গোপনে আর এক চক্ষে চাহিয়া দেখেন, তাহার ব্যথা হইতেছে কি না—ইহা সেই মাতাপিতার দণ্ড। “নগরের শাসনকর্ত্তারা সর্কদা দেখিবেন যেন নগরবাসীগণের অকারণ অবরোধ ও দৈহিক দণ্ডভোগ না ঘটে।” (খোলীর অতিরিক্ত অনুশাসন।) মোটকথা তাহার অনুশাসনগুলি পড়িলে মনে হয় তিনি সাম্রাজ্যের সম্রাট নহেন, শাসনকর্ত্তা নহেন,—পালনকর্ত্তা। তাহার উক্তিগুলি সিংহাসন হইতে উচ্চারিত বলিয়া মনে হয় না, বেদী হইতেই উচ্চারিত বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ এগুলি শাসন বা অনুশাসন নহে—পালন-নীতি। উহাদের মধ্যে শাসনের নামগন্ধ নাই।

যাহার যে প্রয়োজনে রাজদরবারে আসার দরকার, তাহার জন্য প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত রাত্রি অব্যাহত দ্বার। “সুতরাং আমি নিয়ম করিয়াছি—সকল সময়ে—আমি ভোজনেই ব্যাপৃত থাকি বা অস্ত্রঃপুরে, নিভৃতকক্ষে, শৌচগৃহে, বানে বা প্রমোদ-রাজগৃহে বিচারার্থ সর্কদা উজ্জানেই থাকি, সর্কত্রই আমার বার্তাবহগণ আছে, তাহারা আমাকে প্রজাগণের প্রয়োজন জ্ঞাপন করিবে।” (ষষ্ঠ গিরিলিপি।)

যদি কোন জরুরী কার্য্য সম্বন্ধে মোখিক আদেশ লইয়া মন্ত্রীদের মধ্যে মতবৈধ হয় “বা কোন বিশেষ জনসমাজে কোন বিবাদ বা প্রবন্ধনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যেখানেই হউক বা যে সময়েই হউক, আমাকে তৎক্ষণাৎ জানাইবে; আমি এইরূপ আদেশ করিতেছি। কারণ রাজকার্য্য বা পরিশ্রম করিয়া কর্ত্তব্য পর্যাাপ্ত হইয়াছে, ইহা মনে করিয়া কখনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না।” (ষষ্ঠ গিরিলিপি।) তিনি যে সকল আদেশ প্রচার করিয়াছেন তাহা রাজকীয় আইনের ধারার মতন নহে। মন্ত্রীদের লইয়া খসড়া তৈয়ার করাইয়া শেষে উহা তিনি প্রচার করেন নাই। উহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। উহা পরকে বলিয়া দিয়া লেখান বাইতে

পারে না। তিনি আদেশ প্রচার করিয়া ভাবিয়াছেন হয়ত রাজকর্মচারীরা তাঁহার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না—সতত দয়ার্জচক্ষে তিনি প্রজাহিতের উদ্যোগী ছিলেন। বহু কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া তিনি সর্বদা চিন্তিত থাকিতেন—তাঁহার উপদেশগুলি বখাযধরূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে কি না, তাঁহার তাহা বুঝাইয়া দিবার ভার প্রাপ্ত, তাঁহার তাহা বুঝাইতে পারিতেছেন কি না? প্রজারা তাহা বুঝিতেছে কি না? কলিঙ্গ জৌগড় অমুশাসনে তিনি বলিতেছেন “আপনারা হয়ত সম্যকরূপে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই। হয়ত কেহ কেহ আংশিক বুঝিয়াছেন—কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বুঝেন নাই—প্রতি-তিথ্য দিবসে এই লিপি শ্রবণ করাইবেন, অন্ততঃ এক ব্যক্তিকেও শ্রবণ করাইবেন।” এইরূপ কথা অপরকে দিয়া লিখান বাইতে পারে না। অশোকলিপির প্রত্যেকটি আদেশ, প্রত্যেকটি উপদেশ তাঁহার নিজের। উহা একরূপ সৌহার্দ্যের ভাবমাথা, একরূপ প্রবল স্নেহ, দয়া ও মমতার ছাপমারা—উহার মধ্যে রাজার ব্যক্তিগত শুভেচ্ছার এত প্রবল প্রেরণা দৃষ্ট হয় যে উহার একটি শব্দ, একটি বর্ণও পরের সাহায্যে লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তৎসাময়িক পাশাপাশি নৃপতিদের শিলালেখ দৃষ্টি করুন, সেগুলিতে উৎকট রাজকীয় গৌরবের বোঝা, আদেশের প্রভু পাঠকচক্ষুকে ঝলসিয়া দিবে। তাহাদের সঙ্গে অশোক-শিলালেখমালার কোন তুলনাই হইতে পারে না। অশোকলিপিতে আমরা রাজার রাজবেশ দেখিতে পাই না; বিশ্বের মঙ্গলকামী সচেষ্ট সাধুর দেখা পাই। প্রস্তরলিপিগুলির মধ্য হইতে রক্তনাংসের সাধু যেন জীব জগতের ব্যাধায় দয়ার্জ হইয়া তাঁহার অমুশাসন প্রচার করিতেছেন। সেই অমুশাসনগুলি এত জীবন্ত, তাহাতে জগতের হিতকরে এত দয়া, এত বাৎসল্য, এত হৃদয়তা যে তাহাতে এখনও প্রাণে সাড়া দিয়া উঠে; আমরা বর্তমান কালের সমস্ত কোলাহল বিস্মৃত হইয়া সেই সর্বকালোপযোগী বাণী শুনিয়া চরিতার্থ হই—উহা যে ২০০০ বৎসরের উজ্জ্বল হইতে ইতিহাসের অতি প্রাচীন এক নিবিড় যুগ হইতে আসিয়াছে, তাহা ভুলিয়া বাই, মনে হয় যেন কোন সাধুর পার্শ্বে এখানে এখনই বসিয়া সেই জগৎ-মঙ্গল সর্বজন-হিতকর পরমার্থ জীবনের উপদেশ শুনিতেছি।

শিলালেখ ও স্তম্ভগুলির অশোকের শিলা-লেখগুলি নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা স্থান-নির্দেশ।

বাইতে পারে—

১৪টি প্রধান গিরিলেখ, তন্মধ্যে ১০টি এই ছয়স্থানে পাওয়া গিয়াছে—

- ১। সাহাবাজ গড়ী (কপরিদিগিরি) পেশোয়ারে।
- ২। সাহারাপুরের দেড়াছন সবডিভিসনে কলসী গ্রামে।
- ৩। হাজরা জেলায় মঙ্গরায়।
- ৪। কাথিওয়ারে গ্রিগার পাহাড়ে।
- ৫। ছুবনেখরের নিকট ধৌলিতে।
- ৬। গঞ্জাম জেলায় (মাল্লাজ) জৌগড়ে।

বোধাই প্রেসিডেন্সীতে সোপ্রানামক স্থানের অনুশাসনে ষষ্ট শিলালেখের কতকাংশ পাওয়া যায়।

সাতটি প্রধান স্তম্ভলেখ নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে পাওয়া গিয়াছে :—

- ১। সোপ্রানামক স্থান হইতে ফিরোজসাহ কর্তৃক আনীত স্তম্ভ—দিল্লীতে স্থাপিত।
- ২। ফিরোজসাহ কর্তৃক মীরাট হইতে আনীত, দিল্লীতে স্থাপিত।
- ৩। কৌশাম্বী স্তম্ভ—অধুনা এলাহাবাদ-ছর্গের নিকটে স্থিত।
- ৪। চম্পারণ জেলায় অররাজ শিবের মন্দির পার্শ্বে লউড়িয়া গ্রামের স্তম্ভ।
- ৫। চম্পারণ জেলায় মথিয়া গ্রামে নন্দনগড় স্তম্ভ।
- ৬। ঐ জেলায় বি. এন্. আর—গৌণহা স্টেশনে রামপুর পিলার।
- ৭। সপ্তম স্তম্ভ দিল্লীতে।

ছোট ছোট শিলালেখ মহীশূরে তিনটি, নিজামের অধিকারে একটি, বিহারে একটি, জব্বলপুরে একটি, রাজপুতনায় একটি।

অশোকের গুরু উপগুপ্ত সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান বৌদ্ধ সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কোন কোন লেখকের মতে মহেন্দ্র অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ভারতীয় সমস্ত গ্রন্থে এবং হিউনসাঙ্গের ভ্রমণ কাহিনীতে মহেন্দ্রকে এইরূপ

মহেন্দ্র।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সিংহলের মহাবংশে তিনি অশোকের পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। মহেন্দ্র সমস্ত সিংহল বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন, এই হিসাবে তিনি বিজয়ের মতই সিংহল জয় করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। সমস্ত সিংহল দেশ মহেন্দ্রের স্মৃতিচিহ্নে পূর্ণ। অশোকাবদানে মহেন্দ্রের অসামান্য ধৈর্য, ত্যাগ-বীকার এবং সর্বসহ চরিত্র-দৃঢ়তা সম্বন্ধে অনেক গল্প উল্লিখিত আছে। অশোকের বহু নির্যাতন ও কঠোরতম দণ্ড তিনি অমানবদনে সহ করিয়াছেন। এ দেশে মহেন্দ্রের চলিত নাম ছিল বিগতশোক। বঙ্গদেশের পৌণ্ড্রবর্জনে তিনি কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। বাকীপুরে ভিকুন পাহাড়ীতে ছোটলোকেরা এখনও মহেন্দ্রের ভিক্ষু-মূর্তি মাটিতে গড়িয়া বৎসর বৎসর পূজা করিয়া থাকে। তদ্দেশে মহেন্দ্র ‘ভিকুনা-কুয়ার’ (ভিক্ষু-কুমার) নামে পরিচিত।*

অশোকের পুত্র কুনাল সম্বন্ধেও অনেক উপাখ্যান পাওয়া যায়। বিমাতা তিম্বরকিতা কুনালের রূপে মুদ্রা হন—কিন্তু যখন এই গর্হিত প্রস্তাব কুনাল দুগার সহিত উপেক্ষা করেন তখন তিনি জুহু হইয়া ষড়বয়স করিয়া অশোকের প্রিয় পুত্রটিকে তক্ষশীলায়

* Even now at Bhiknapahari in Bankipur, a crude earthen image of the Bhikna Kuar (the monk-prince Mohendra) is annually erected and worshipped by low class people. Such things indicate that the traditions are not altogether baseless.

Piyadasi Inscriptions by Ramavatar Sarma, Patna, Introduction, pp. vi & vii.

প্রেরণ করেন। রাজার শিলমোহরটি রাণী কোশলে হস্তগত করিয়া কুনালকে রাজ্যদেশ জাল করিয়া একটা চিঠি লিখেন, তাহাতে আদেশ ছিল, যেন তিনি চিঠি প্রাপ্তি যাত্র তাহার ছইটি চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলেন। কুনাল এই অদ্ভুত আদেশ কোন ষড়যন্ত্রের ফল বলিয়া অনুমান করিলেন। কিন্তু মন্ত্রীরা উপদেশ দিলেন যে তিনি রাজাকে একবার চিঠি লিখিয়া আদেশের সত্যতা নিরূপণ করুন। কুনাল সে উপদেশ না লইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় চক্ষু উৎপাটন করিয়া অন্ধ হইলেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি তাঁহার পত্নী কাকুনমালার হস্তধারণ করিয়া ধীরে ধীরে পাটলীপুত্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন, বহুকষ্টে রাজপ্রাসাদের নিকট উপস্থিত হইয়া কুনাল বাণী বাজাইতে লাগিলেন। চিত্রাভ্যাস কর্ণের পরম তৃপ্তিদায়ক সেই অমৃততুল্য বংশীধ্বনিতে অশোক বংশীবাদককে নিজের সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। পুত্রের মুখে তাঁহার দুর্দশার কথা শুনিয়া অশোকের চিত্ত করুণা ও দুঃখে ভরিয়া গেল। তিনি ষড়যন্ত্রীদের সমুচিত দণ্ডের বিধান করিলেন। জৈন-সাহিত্যে এই গল্পটি পাওয়া যায়। অশোক তাঁহার য়েহনীলা কস্তা চাকরমতির সঙ্গে লুধনি বনে তীর্থ-ভ্রমণে গিয়াছিলেন। লুধনি বনের নাম ছিল কুম্বিনি বন। তথায় তিনি বুদ্ধের জন্মের স্মারক স্তম্ভে একটি লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন।

এইরূপ বহু উপাখ্যান বৌদ্ধ সাহিত্যে লিপিবদ্ধ আছে,—সেগুলি লিখিবার এখানে স্থানাভাব। সিংহলের মহাবংশে লিখিত আছে বৌদ্ধধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার পূর্বক তাহা শুদ্ধভাবে প্রচারিত করিবার জন্য অশোক প্রথমবারের ‘মন্ত্রণা সভা’ আহ্বান করিয়াছিলেন।

অশোকের দান।

কথিত আছে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য অশোক ১০ কোটি স্বর্ণ দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৯ কোটি ৬০ লক্ষ স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন। অশোক তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। মন্ত্রীরা কুনালপুত্র সম্পাদিকে বলিলেন একরূপ অজস্র দান করিলে রাজকোষে আর কপর্দকও থাকিবে না। সম্পাদি আর অর্থ বিতরণ নিষেধ করিয়া দিলেন। তখন অশোক কোবাগারে কিছু না পাইয়া তাঁহার নিজের বহুমূল্য সমস্ত আসবাব বিতরণ করিয়া ফেলিয়া নিজে মৃন্ময় পাত্রের আহার করিতে লাগিলেন। একদিন অশোক কুড়ুটরামের ভিক্ষু সঙ্ঘকে একটি মাত্র আমলকী দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—ইহাই তাঁহার শেষ দান! তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী ছিলেন রাধাগুপ্ত। একদিন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই সাম্রাজ্যের অধিপতি কে?” রাধাগুপ্ত বলিলেন “আপনিই এই বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট।” অশোক তখন বলিলেন—“এই সাগর-মেখলা হীরামুক্তামণি-পূর্ণা বহু প্রজা ও জীব সঙ্খুলা বহুমতী আমি সঙ্ঘকে দান করিলাম। আমি ইচ্ছা চাই না, ব্রহ্মার পদ চাই না। আমি সহস্র পৃথিবীর সম্রাট হইতে চাই না; কারণ এই সকল বাহ্য ঐশ্বর্য্য সলিলস্রোতের তায় চঞ্চল ও অনিত্য। সাধুদিগের একমাত্র কাম্য আত্মসংযমই আমি একমাত্র প্রার্থনা করি।” তখনই এক দান-পত্র লিখাইয়া অশোক তাহা মোহরাক্ষিত করিয়া দিলেন। কথিত আছে অশোকের মৃত্যুর পর তৎপৌত্র সম্পাদি শূন্তসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

অশোকের অনুশাসনগুলির মধ্যে কলিঙ্গলিপিই (ত্রয়োদশ অনুশাসন) নানা কারণে সমধিক ঐতিহাসিক মূল্য বহন করে। কলিঙ্গ যুদ্ধে একলক্ষ পঞ্চাশ সহস্র লোক বনৌ হয়, একলক্ষ লোক নিহত হয়, এবং তদপেক্ষা অনেকগুণ লোক আহত হয়।

এই নিদাক্ষণ হত্যা কাণ্ড প্রিয়দর্শীর মনে যে কষ্ট, অনুতাপ ও দয়ার ভাব উদ্বেক করিয়াছিল, তাহা যেন শৈল কঠিন পাহাড়ের আবরণ হইতে চীংকার করিয়া আর্জনাৎ করিতেছে। এই মর্শ্বস্তদ স্মরণটি দ্বিসহস্র বৎসরের উচ্চকালের পরেও যেন একটি শিশুর ককণ কান্নার জায় আমাদের কাণে আসিয়া বাজিতেছে। এই শৈললেখের মর্শ্বাত্তিক ভাব-প্রবণতা দেখিয়া অনেকে অনেক রকম অনুমান করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন কলিঙ্গ যুদ্ধের ঘোর নিষ্ঠুরতায় তাঁহার চিত্ত একপ ধ্রুবীভূত হইয়াছিল যে তিনি তৎপরেই বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন; কেহ কেহ বলিয়াছেন, কলিঙ্গ যুদ্ধের পর আর তিনি কোন যুদ্ধই করেন নাই; আবার কেহ অনুমান করিয়াছেন চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারের পর এক কলিঙ্গ ছাড়া তিনি তাঁহার সাম্রাজ্য আর বাড়ান নাই—যেহেতু তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বিশাল মৌর্যসাম্রাজ্য চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারই এত বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এই সকল মতের সমস্তই সম্পূর্ণ ঠিক না হইলেও ইহাদের অনেকগুলিই যে আংশিক ভাবে সত্য তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। বস্তুতঃ কলিঙ্গ যুদ্ধ জয় করিয়া তিনি প্রাণে বড় দাগা পাইয়াছিলেন। কলিঙ্গ অনুশাসনের শিলালিপিতে স্থ'চ ফুটাইলে তাহা হইতে যেন রক্ত বাহির হয়, তাহা এত জীবন্ত। “কলিঙ্গ বিজয়ে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শীর অনুশোচনা হইয়াছে” কেন হইয়াছে? তাহা তিনি বিস্তৃত ভাবে বলিয়াছেন। “সেই দেশে কত মহামনা সাধু আছেন যাহারা ধর্ম মানিয়া চলেন, যাহাদের জীবন নিকলঙ্ক, তাঁহাদের আত্মীয়গণ এই যুদ্ধে মারা পড়িয়াছেন। আমি সাধুজনকে ব্যথা দিয়াছি, যত লোক হতাহত হইয়াছে—তাঁহাদের শত সহস্রের একাংশও দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শীর অনুতাপের কারণ।” “আমরা পুত্র পৌত্রগণ যেন দেশবিজয় বাঞ্ছনীয় মনে না করেন। তাঁহারা যেন ধর্ম বিজয়কেই স্বার্থ বিজয় মনে করেন।” অনেক কারণে মনে হয়—কলিঙ্গের অন্তর্গত মেদিনীপুরের লোকেরাই অশোকের সঙ্গে এই প্রাণান্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরিশিষ্টে ‘মেদিনীপুর’ শব্দ দৃষ্টব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মোর্ঘা, স্তম্ভ ও কাম্ববংশ

“দেখিলে কি তুমি বৌদ্ধপতাকা—

উড়িতে দেশ বিদেশে ও

তিব্বত, চীনে, ব্রহ্ম তাতারে—

ভারত স্বাধীন যেদিন ও।”

আমার পুনঃ পুনঃ একটা কথা মনে হইতেছে। বাঙ্গলার কথা লিখিতে গিয়া, তাহা “বৃহৎবঙ্গ” অথবা যে নামেই অভিহিত করি না কেন, অশোক এমন কি বুদ্ধদেবের কথাগুলি আমি এত বেশী করিয়া লিখিতে বাইতেছি কেন? এজন্ত হয়ত কেহ কেহ আমার কৈফিয়ৎ চাহিতে পারেন।

সুতরাং এই কথাটা আমাকে একটু বিশদ করিয়াই বলিতে হইবে। আমার সরল আন্তরিক বিশ্বাস যে এই পূর্বভারতের সভ্যতার—বিশেষ করিয়া মগধের শিক্ষা দীক্ষার—

মগধের প্রকৃত উত্তরাধিকারী
বাঙ্গালী।

আমরা বাঙ্গালীরাই উত্তরাধিকারী হইয়াছি, অন্ততঃ আমরা তাহা
যতটা পাইয়াছি, আমাদের প্রতিবেশিগণের মধ্যে কেহই, এমন কি
খাস্ বিহারবাসীরাও, ততটা পান নাই। মগধের দীপ নিবু নিবু

হইলে তাহা গোড়ে জলিয়া উঠিয়াছিল। এই দীপ—একই দেশলাই কাঠির। গোড়ের দীপ
বখন নির্ঝালোযুথ, তখন তাহার পরবর্তী শিখা জলিয়া উঠিয়াছিল নবদ্বীপে। সেই দীপই
এখন কলিকাতা ও তরিকটবর্তী স্থানে জলিতেছে। ইহা প্রমাণযোগ্য যে মাগধী ত্যাগধর্ম,
মাগধী উচ্চশিক্ষা, মগধের শৌর্য বীর্য—এ সমস্তই বাঙ্গালীরা যেমন করিয়া পাইয়াছে,
অন্ত কেহ তেমন করিয়া পায় নাই। মগধ মুসলমান কর্তৃক ধ্বংস হইলে তাহার ধর্ম
আরও পূর্বে চলিয়া আসিয়াছিল।

এককালে মগধেশ্বরগণ সমস্ত ভারতবর্ষের অধিতীয় সম্রাট ছিলেন, তখন সমস্ত ভারতবর্ষ

মগধের সহিত বাঙ্গলার
সম্বন্ধ।

তাঁহাদের পদানত ছিল। মগধের রাজত্ব ভগ্ন হইলে গুপ্তদের
অবনতির পর গোড় সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। গোড়রাজধানী বহু
প্রাচীন, এবং মগধের অবনতির পর গোড়ই সেই দেশের স্মিন্ধ

গৌরবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। সমস্ত আর্য্যাবর্ত গোড়ের মহিমায় মহিমাযিত ছিল।

সারস্বত, কাশ্যকুজ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল এই পঞ্চরাজ্য লইয়া বে বিশাল সাম্রাজ্য পালগণ অধিকার করিয়াছিলেন—তাহার নাম ছিল পঞ্চগৌড়। এ সম্বন্ধে সকল কথা আমরা ১৯ পৃষ্ঠায় বিশেষ ভাবে একবার উল্লেখ করিয়াছি।

এককালে গৌড়ের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রীতি "গৌড়ীয় রীতি" নামে পরিচিত হইয়াছিল। দণ্ডাচার্য্য প্রভৃতি লেখকগণ তাহা বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ময়ূরভট্ট, রূপরাম, ঘনরাম, যানিক গাঙ্গুলী প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মমঙ্গল লেখকগণই যেখানে সেখানে গৌড়েশ্বর-গণের 'নবলক্ষ সৈন্তে'র উল্লেখ করিয়াছেন। মগধের প্রতাপের শেষ শিখা যে কতকটা ক্ষুদ্র হইয়াও গৌড় প্রাসাদকে দীপ্ত করিয়াছিল—তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। জরাসন্ধের পর মহানন্দ, তৎপর চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি রাজত্ববর্গ—তৎপর স্তম্ভরাজগণ এবং সর্ব্বশেষ পাল ও সেন রাজারা সেই একই দেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া—পরবর্ত্তী রাজাদের প্রভাব ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হওয়া সত্ত্বেও—পূর্ব্বভারতের গৌরবের ধারাবাহিকত্ব বজায় রাখিয়াছেন।

নালন্দা, বিক্রমশীলা, উদয়পুর, জগদল, স্থবর্ণ, বাজাসন প্রভৃতি বিহারের শিক্ষাদীক্ষার বাঙ্গালীদের যথেষ্ট সাহচর্য্য, দান এবং প্রভাব ছিল এবং যখন এই সকল বিদ্যালয় নির্মাণ প্রাপ্ত হইল—তখন পূর্ব্বভারতে ভারতী কণেকের জন্ত মিথিলা কেন্দ্র পরিক্রম করিয়া নবরীপে সিংহাসন স্থাপন করিলেন। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব বেহারের বিহার-সমূহের সংস্কার বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের মহাশিক্ষা ত্যাগ, বৌদ্ধ রাজগণের ভিক্ষুবেশ এবং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত মহৎ দৃষ্টান্ত বাঙ্গলাদেশেই বিশেষ করিয়া পরিপুষ্ট লাভ করিয়াছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের শিক্ষা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের অস্থি-মজ্জাগত হইয়াছিল এবং সজ্জের আত্মষ্ঠানিক পদ্ধতিগুলি সহজিয়া তান্ত্রিকদের মধ্যে কখনও উন্নত, কখনও পরিবর্ত্তিত, কখনও বা বিকৃত হইয়া বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বুদ্ধের পর চৈতন্য ;—অশোক, মহেন্দ্র, উপগুপ্ত প্রভৃতির পর বাঙ্গলার গোপীচন্দ্র রাজা, রূপসনাতন, নরোত্তম, রঘুনাথ এমন কি সেদিনকার লালাবাবু পর্য্যন্ত বাঙ্গলার রাজবর্গগণ ভিক্ষাভাও হাতে করিয়া আদি ভিক্ষুকের অনুসরণ করিয়াছেন। দীপঙ্কর, শীলভদ্র, শান্ত রক্ষিত, বাহুদেব সার্কভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি ভারতবন্দিত পণ্ডিতগণ—সেই মগধের শিক্ষাকেন্দ্রগুলির প্রভা ও সংস্কার যুগোপযোগী ভাবে বিকীর্ণ করিয়াছেন। একালেও পরমহংসদেব, রামমোহন রায়, বিবেকানন্দ, কেশব সেন, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, পূর্ব্বভারতের জ্ঞান-প্রাধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা ক্রমশঃ এই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া দেখাইব যে বাঙ্গালীরাই মাগধী গৌরবের উত্তরাধিকারী এবং সেই মগধের শিক্ষা ও ধর্ম্মনীতির সংস্কার বঙ্গদেশ যতটা রক্ষা করিয়াছে ও করিতেছে, আর কেহ তাহা পারে নাই। আমাদের এই পুস্তক রাজনৈতিক ইতিহাস নহে। রাজনৈতিক একটা চারচিত্র না থাকিলে বিষয়গুলির বধ্যস্থানে সমাবেশ করিয়া প্রদর্শন করা কঠিন

হয়, একজ্ঞ আমরা রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ বাদ দিতে পারি না। কিন্তু বৃহৎ বঙ্গের শিক্ষাদীক্ষার ইতিহাস এখনও দুর্ভেদ্য তিমিরাবৃত—ঘন সন্নিবিষ্ট অন্ধকারের নিবিড়তা ভেদ করিয়া সুস্পষ্ট আলোকে সেই ঐতিহাসিক পট উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আমাদের চিন্তাশীলতা, শিক্ষাদীক্ষা, কলাবিজ্ঞ ইত্যাদির ধারাবাহিক ইতিকথার একটা ভিত্তি স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইব। রাজনৈতিক ইতিহাসে যথেষ্টাচার শাসনকর্তারা রাষ্ট্রীয় সুবিধাব্যবস্থাসারে রাজ্য-বিভাগ করিয়া থাকেন; কতবার বঙ্গদেশের এক প্রধান অংশ—কলিঙ্গের কুক্ষিগত হইয়াছে। কাশী, গয়া, ভাগলপুর জেলা প্রাক্‌জ্যোতিষপুর প্রভৃতি প্রদেশ কণে বঙ্গাদিকারান্তর্গত কণে বঙ্গমুক্ত হইয়া স্বতন্ত্র হইয়াছে। সেই ভাঙ্গাগড়ার বিরাম নাই। এখন পর্য্যন্তও সেই রাষ্ট্রবিভাগের সীমার রেখা নূতন নূতন করিয়া টানা হইতেছে। এই নিত্যচঞ্চল, পল্লদলগত বারিবিন্দুর মত অস্থায়ী রাষ্ট্রীয় সীমানা লইয়া আমার এই ইতিবৃত্ত নহে। আমরা বাহা—তাহা কিরূপে হইয়াছি, আমাদের চিন্তা, শিক্ষা, বিশেষতঃ মনের সংস্কার এ সকল কোথায় কি ভাবে পাইয়াছি—সেই ভাবধারার পৌরুষাপর্য্য ও ক্রমপুষ্টি প্রদর্শন করিতে হইলে আমরা মগধকে বাদ দিতে পারি না। তাহা করিলে আমাদের আত্মপরিচয়ে বিশেষ বিয় ঘটিবে। এই জন্তই মগধকে লইয়া আমরা এতটা নাড়াচাড়া করিয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রীস এবং হিন্দুস্থানের পরস্পরের প্রভাব

মৌর্য্য অধিকার কালে দেশের অবস্থা বেরূপ উন্নত ছিল তাহা বিদেশী পর্য্যটকগণ বিশ্বয়ের সহিত লিখিয়া গিয়াছেন। মহাভারতে ময়দানব-কৃত যুদ্ধটির রাজসভা এবং রামায়ণে লঙ্কাপুরীর বর্ণনায় যে সুস্পষ্ট চিত্রপট আছে, তাহা হইতে অনুমান করা সহজ যে মৌর্য্যাদিকারের বহু পূর্বে হইতে ভারতের বাহ্য সমৃদ্ধি উন্নতির চরম শেখরে পৌছাইয়াছিল। গ্রীক দূত বলিয়াছেন “চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ সুস্বাদু এবং একবটনের রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা সমৃদ্ধ।” ডা'হায়েন লিখিয়াছেন, অশোকের কীর্তি দেখিলে সেগুলি মনুষ্যকৃত বলিয়া মনে হয় না। কোন অশরীরী শিল্পী এই সকল বিরাট কীর্তি নির্মাণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইবে।

অশোক-স্থাপিত পশু-চিকিৎসালয়ের অমূরূপ প্রতিষ্ঠান সেদিন পর্য্যন্তও ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হইত। হ্যামিল্টন সাহেব লিখিয়াছেন “আহমদাবাদ, সুরাট এবং ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের বহুস্থানে যে সকল পশু-চিকিৎসালয় আছে, তাহা সম্রাট অশোকের প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয়গুলির আদর্শ এখনও রক্ষা করিয়া আসিতেছে। সুরাটের প্রতিষ্ঠানটির নিম্নলিখিত বর্ণনা (অষ্টাদশ শতাব্দীর) অনেকটা পার্চলিপুত্রের পশুশালায় রীতির পরিচয় দিতেছে। “সুরাটের বণিকদের চিকিৎসালয়টিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী কোন রিপোর্ট আমাদের কাছে নাই। পশুশালাটি প্রায় এক বিঘা জমি জুড়িয়া। ইহা চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত। পশুদিগের জন্ত এই বৃহৎ স্থানটিতে ছোট ছোট বহু প্রকোষ্ঠ আছে। কোনও জীবজন্তু পীড়িত হইলে এখানে অত্যন্ত সতর্ক ও মিত্র যত্ন পাইয়া থাকে। মৃত্যুর পূর্বে এই চিকিৎসাগারটি বৃদ্ধ ও জরাতুর পশুদের শান্তির আগার স্বরূপ হয়।

“যখন কোন জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ভাঙ্গিয়া যায়, তখন তৎস্থানী তাহাকে এই চিকিৎসালয়ে লইয়া আসে। সেই পশুর অধিকারীর কি জাতি, সে কি শ্রেণীর লোক ইত্যাদি কোন বিষয়েই প্রশ্ন করা হয় না। দেওয়া মাত্র পশুটি তথায় গৃহীত হয়। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে এই চিকিৎসালয়ে অনেকগুলি ঘোড়া, গাধা, বাঁড়, ছাগ, মেঘ, বানর, হংস, কুকুট, পায়রা এবং অন্যান্য নানা প্রকারের পাখী ছিল। সেখানে একটা কচ্ছপ ছিল, সেটা নাকি সেখানে ৭৫ বৎসর যাবৎ বসবাস করিতেছিল। ইহার মধ্যে রক্তলোভী জীবদিগের সম্পর্কিত বিষয়টিই সর্বাধিক আশ্চর্য-জনক ছিল। সেখানে ছারপোকা, ইন্দুর, ছুঁচো এবং অপরাপর অনেক হিংস্র ক্ষুদ্র জীব যথাযোগ্য খাদ্য প্রাপ্ত হইত।” (হ্যামিল্টনের হিন্দুস্থান-কাহিনী, ১৮২০ খৃঃ, ৭১৮ পৃঃ।)

এই ভারতবর্ষের সমস্ত দেশ ঘুরিলে দেখা যাইবে যাহা কিছু অতি আদিম প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঘটিয়াছে তাহারও কিছু না কিছু নিদর্শন কোন না কোন স্থলে আছে।

হিন্দুরা গ্রীকদিগের সংসর্গে আসাতে গ্রীকদিগের কিছু না কিছু প্রভাব তাহাদের শিল্পের উপর অবশ্যই আসিয়া পড়িয়াছিল। ব্যাকট্রিয়ার দিকেই সেই প্রভাব একটু বেশী দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভিলেন্ট স্মিথ প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন ভারতীয় শিল্পের উপর হেলেনার প্রভাব অতি সামান্য,—যাহা আছে তাহাও বাহ্য মাত্র। গ্রীক সভ্যতা কখনই হিন্দুর হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। অবশ্য একদল উগ্রপন্থী পাশ্চাত্য পণ্ডিত আছেন, যাহারা কেবলই গ্রীক ও রোমের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। একদল ধর্ম্মবাজক সেদিনও বলিতেন যে ভগবান্ হিব্রুভাষায় কথা বলিতেন, যেহেতু বাইবেল হিব্রুভাষায় লিখিত এবং তজ্জন্তই অগতের যত ভাষা তাহা হিব্রু হইতে উৎপন্ন। সেইরূপ, ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার প্রায় সমস্তই হেলেনার দান—এরূপ মতবাদী পণ্ডিতও এখন আছেন। কিন্তু ভারতীয় পুরাতত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ উগ্রপন্থীদের দল ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। গাঙ্কার অঞ্চলের বুদ্ধমূর্তিগুলি দেখিলে হিন্দু শিল্পের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব কতটা হইয়াছিল

তাহা বুঝা যাইবে। কিন্তু এই প্রভাব সিদ্ধনদের পশ্চিমে কিছু অবশিষ্ট থাকিলেও ঐ নদের পূর্বে তাহা কণিকা প্রমাণ, এবং যদি কিছু থাকিয়া থাকে তাহা একান্ত বাহ্য। অপর দিকে, ব্যাক্টিয়ার গ্রীক কারিকরগণ যে হিন্দু শিল্পকলার আদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা সেই দেশের কতকগুলি বুদ্ধমূর্তিতে স্পষ্ট প্রতিভাত। যে আধ্যাত্মিকতা গ্রীক কলায় নাই, ব্যাক্টিয়ার বুদ্ধমূর্তিতে কোথায়ও কোথায়ও তাহার স্পষ্ট পরিচয় আছে।

ভারতীয় সভ্যতার উপর হেলেনার প্রভাব কতকগুলি সাহেব নানাদিক্ হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কেহ বলেন রামায়ণ ইলিয়াডের নকল; ভারতে স্থপতিবিদ্যা ছিল না, ব্যাক্টিয়া হইতে গ্রীকেরা হিন্দুদিগকে তাহা শিখাইয়াছেন। মূর্তি অঙ্কন বা গঠন ভারতে গ্রীকেরাই আমাদের হাতে ধরিয়া শিখাইয়াছেন, ইত্যাদি।

গ্রীকদিগের সঙ্গে আলেকজান্ডারের পরে কিছু কিছু সম্পর্ক আমাদের দেশে হইয়াছিল। আমাদের পুরাণকারেরা রূপকহলে যে সকল গল্প সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে

মৌর্যযুগের গ্রীকদিগের সঙ্গে ভারতীয় সংঘর্ষের একটু আভাস গ্রীক প্রভাব।

আছে বলিয়াই মনে হয়। পুষ্টমিত্র মৌর্যদিগকে অধিকারচ্যুত করেন এবং তিনি ঘোর বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন, তাহার সময়ে হিন্দুধর্মের একটা সমুখান হইয়াছিল—তখন অশোক প্রভৃতি নৃপতিবৃন্দকে ব্রাহ্মণেরা হীন প্রতিপন্ন করিতে স্বতঃই চেষ্টিত হইয়াছিলেন। চণ্ডীতে দেবীযুদ্ধে দেখা যায় যে অশুরদের দলে যে সকল সৈন্ত ছিল, তাহাদের মধ্যে “মৌর্যেরা” প্রবল ছিল। এই মৌর্যগণকে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী দৈত্য-দলভুক্ত করিয়াছেন। ভারতীয় হিন্দুশক্তি কোন বৈদেশিক আক্রমণে আত্মরক্ষার্থ সম্মুখ হইয়া একত্র দাঁড়াইয়াছিল—চণ্ডী-কথিত অলৌকিক গল্পটির মধ্যে এইরূপ কোন সত্য নিহিত থাকা আশ্চর্যের বিষয় নহে, এ কথা পূর্বেই (১৪৭ পৃষ্ঠায়) লিখিত হইয়াছে। কালিদাস প্রভৃতি কবির লেখায় গ্রীক রমণীরা যে রাজাকে বেষ্টিত করিয়া ধনুর্ধারণ হস্তে বীরবেশে শরীর-রক্ষার কাজ করিতেন, তাহার উল্লেখ আছে। মুদ্রারাক্ষসেও সেইরূপ বর্ণনা আছে। আলেকজান্ডারের সময়ে বিদেশী গণিকারা হিন্দু রাজার সঙ্গে সঙ্গে রণক্ষেত্রে থাকিতেন। কিন্তু এই সকল উপাখ্যান ও বর্ণনার মধ্যে যদি কিছু ঐতিহাসিক তথ্য থাকে, তবে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, হিন্দুরাজগণ গ্রীকদিগের বাহ্য সাহচর্য্য পাইয়াছিলেন ও বোগ্যতা অনুসারে স্বীয় স্বীয় বিচিত্র কর্মবিভাগে তাহাদিগকে কিছু স্থান দান করিয়াছিলেন। গ্রীকদিগকে তাহারা সৈন্তস্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ মুদ্রারাক্ষসাদি নাটকে পাওয়া যায়।

কিন্তু অশোক যে বহু স্থবির ও স্থবির-পুত্র গ্রীস, পারস্ত ও অন্যান্য প্রদেশে পাঠাইয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বহু মনুষ্য-ও পশু-চিকিৎসালয় স্থাপন ও তৎসঙ্গে ঔষধার্থ প্রয়োজনীয় তরু-গুল্য বপন করাইয়া চিকিৎসা-জগতে ও ধর্মরাজ্যে একটা মহাহিতকর পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছিলেন, হিন্দুধর্মের অন্ততম প্রধান শাখা—বৌদ্ধধর্মকে

ভারতের গভী অতিক্রম করাইয়া পূর্ব ও পাশ্চাত্য জগতে বহুলোককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সাহেবরা নীরব। গ্রীকদের কেহ কেহ গরুড়ধ্বজ স্তম্ভ নির্মাণ পূর্বক বিষ্ণুকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বনন ধর্মরক্ষিত, যবন হরিদাসের মত তাঁহার পূর্ব সম্প্রদায়ের নাম-গোত্র হারাইয়া, নব দীক্ষার প্রচার কার্যে নিযুক্ত হইয়া আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং গুজরাটের ধর্ম্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন,—মহারক্ষিতকে অশোক ধর্মপ্রচারার্থ গ্রীসদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি অবশ্য বহু গ্রীককে নব ধর্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। এই সকল বহু প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা গ্রীকদিগের উপর হিন্দুপ্রভাব সম্বন্ধে তো কোন আলোচনা করিতেই স্বীকৃত নহেন। বৌদ্ধ-আচার ও নীতি, প্রথম দিক্কার খৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধিকার ব্যাপ্ত করিয়াছিল। জারমানগণের মধ্যে কিছুকাল পূর্বেও প্রাতঃকালে উঠিয়া পিতৃ-তর্পণ করার রীতি ছিল। এ সকল অনেক কথা তাঁহারা ইতিহাসিক ভাবে লিখিয়াছেন। তথাপি ভারতের নিকট যে গ্রীক বা রোমানগণ কোনরূপ দায়ী একথা তাঁহারা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সহজে স্বীকার করিতে বেন কুণ্ঠিত।

চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রচারের জন্ত অশোক রাজা পাশ্চাত্য দেশসমূহে ভারতবর্ষ হইতে প্রবীণ বৈজ্ঞানিককে পাঠাইয়াছিলেন, এই সকল লোকদিগকে ‘হবির’ বা ‘হবিরপুত্র’ বলিত। চলিত কথায় ইহাদিগকে ‘ধেরা’ বা ‘ধেরা-পুত্র’ বলিয়া থাকে। সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ধেরা বা ধেরা-পুত্র নামে অভিহিত। এখন পাশ্চাত্য দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞান নাম “ধেরাপিউটিক্স”। এত বড় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কি জানেন না যে এই শব্দ “ধেরাপুত্র” হইতে উদ্ভূত? কিন্তু সে কথা জানিয়াও তাঁহারা স্বীকার করিবেন না, যেহেতু স্বীকার করিলে যে সমস্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানটাকে হিন্দু-বিজ্ঞান-চিহ্ন-লাঙ্কিত করিতে হয়। ওয়েবেষ্টারের অভিধানে “ধেরাপিউটিক্স” অর্থে লিখিত হইয়াছে “‘ধেরাপিউটি’ শব্দ হইতে ঐ নাম উদ্ভূত। এই নামের কতকগুলি সম্যাসী পুরাকালে আলেকজান্দ্রিয়ার নিকটে বাস করিতেন, পণ্ডিতপ্রবর ফিলো এই বিবরণ লিখিয়াছেন—একথা এখন অনেকে বিশ্বাস করিতে দ্বিধা বোধ করেন।” * তাঁহারা কেন বিশ্বাস করিতে চাহেন না? আমাদের নিকট এই অভিপ্রায় অতি স্পষ্ট। অশোকের দ্বিতীয় অনুশাসনে “দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী” রাজা তাঁহার রাজ্যে এবং তদুপান্তে চোড়, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র, তাম্রপর্নী, আন্তিয়োক নামক যবন রাজার রাজ্যে দুই প্রকার চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন, “পশু-চিকিৎসালয় এবং মনুষ্য-চিকিৎসালয়।” ত্রয়োদশ অনুশাসনে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে অশোক পাশ্চাত্য জগতের সমস্ত পরিচিত স্থানে ধর্মশাস্ত্র অবহিত করাইবার জন্ত এবং ধর্মচক্র প্রবর্তিত করাইতে যাইয়া যবনরাজ এ্যাণ্টিয়োকাস, এবং এ্যাণ্টিয়োকাসের রাজ্য ছাড়াইয়া টোলেমি, এ্যাণ্টিগোনাস, মগস এবং

* “A name given to certain ascetics said to have anciently dwelt near Alexandria. They are described in a work attributed to Philo, the genuineness and creditability of which are now much discredited.” Webster’s Dictionary.

আলেকজান্ডারের রাজ্যেও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ পাঠাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের কোন স্থানই অবশ্য বাদ ছিল না, চোড়, পাণ্ডু এবং সিংহল পর্যন্ত সর্বত্র ধর্মচক্রের মহিমা বিবোমিত হইয়াছিল। * এই পণ্ডিতগণের নাম যে 'ধেরা' এবং 'ধেরাপুত্র' ছিল তাহা বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রবিৎ সকলেই জানেন। এবং এখনও ব্রহ্মদেশ ঘুরিয়া আসিলে কোতূহলাক্রান্ত পাঠক ধেরাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিয়া আসিতে পারেন।

যুরোপে আজকাল পালিভাষাবিৎ পণ্ডিতের অভাব নাই। তাঁহারা অশোকলিপি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং ধেরা ও ধেরাপুত্র বলিতে কাহাদিগকে বুঝায় তাহাও ভাল করিয়া জানেন। 'ধেরাপিউটিক্স' অর্থ যে ধেরাপুত্রদের-সম্বন্ধীয়' তাঁহাও তাঁহারা অবগত আছেন ও অভিধানে লিখিয়াছেন, ইহারা পূর্বদেশীয় সন্ন্যাসী; আলেকজান্দ্রিয়ার বাজার পর্যন্ত যে এই সকল ধেরা ও ধেরাপুত্রদের কর্মক্ষেত্র ছিল, ভিন্সেন্ট-প্রমুখ পণ্ডিতগণ এ সমস্ত লিখিয়া এবং ওয়েবেষ্টার তাঁহার অভিধানে এ কথা স্বীকার করিয়াও লিখিয়াছেন, 'যে সেকথা এখন অনেকে বিশ্বাস করিতে চান না।' এরূপ স্পষ্ট প্রমাণ থাকিতে তাঁহারা বিশ্বাস করিতে কেন চান না? ইহা কি প্রতীচ্যের স্পর্ধিত অভিমানের ফল নহে? এদিকে তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভারতীয় যুদ্ধবিগ্রহ ও সামাজিক ঘটনার ছবি তিল তিল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া হেলেনার শ্রেষ্ঠত্বের কল্পিত প্রভাব-চিহ্ন আবিষ্কার করিতে কত না ব্যস্ত!

অশোকের বহু পত্নী ছিলেন, তন্মধ্যে সম্ভবতঃ কুরুবকী ও অসন্ধিমিত্রা প্রধানা ছিলেন। অসন্ধিমিত্রার মৃত্যুর পর তিনি তিষ্ণরক্ষিতা নামী এক পরমা স্নন্দরী ললনাকে বিবাহ করেন।

অশোক ও রাজী
তিষ্ণরক্ষিতা।

এই মহিষী ও কুনাল-ঘটিত ককণ আধ্যাত্মিকার প্রতি আমি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করিয়াছি। কথিত আছে একদা অশোকের উদরে দুঃসহ যন্ত্রণা হয়। সেই সময়ে কোন রাখাল বালকেরও ঐরূপ রোগ

হইয়াছিল। রাজী গোপনে রাখাল বালককে হত্যা করিয়া তাহার উদর পরীক্ষা করেন, তাহাতে দৃষ্ট হয় উহাতে বহু কীটাপু জন্মিয়াছে। রাজী তাহাদের উপর অনেক প্রকার রস প্রয়োগ করেন, তাহাতে সেগুলি বিনষ্ট হয় নাই, কিন্তু পিয়ারের রস দেওয়া মাত্র কীটাপুগুলি নির্মূল হইয়া যায়। চিকিৎসকের অসাধ্য অশোকের রোগের যখন কিছুতেই উপশম হইল না, তখন রাজী তাঁহাকে পিয়ারের রস খাওয়াইয়া সুস্থ করেন। তদবধি এই স্নন্দরী মহিষী রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কুনালের সঙ্গে রামচন্দ্রের ও তিষ্ণরক্ষিতার সঙ্গে কৈকেয়ীর তুলনা চলিতে পারে।

অশোকের কুরুবকীগর্ভজাত তাইবর নামক প্রিয়পুত্র হইয়াছিল। সম্ভবতঃ রাজ-কুমার অরায় হইয়াছিলেন। অশোকের আর এক পুত্র জলুক কাশ্মীরের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

* The Missionaries of the Imperial Teacher (Asoka) and their successors carried the doctrines of Gautama from the banks of the Ganges to the snows of the Himalayas, the deserts of Central Asia and the bazars of Alexandria. Oxford History of India by V. Smith, p. 133 (1922).

অশোকের পৌত্র দশরথ সম্ভবতঃ জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি ২৩১ খৃঃ পূঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। হইখানি পুরাণের মতে তিনি আটবৎসর কাল রাজত্ব করেন। কুনালের পুত্র সম্প্রতি (সম্প্রতি) কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন ; কথিত আছে ইনি অশোকের জীবিতাবস্থায়ই তাঁহার হাত হইতে রাজ-শক্তি কাড়িয়া লইয়া অশোকের অবাধ দানশীলতা সম্বন্ধিত করিয়াছিলেন।

অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলিউকাশের (নিকিতার বিজয়ী নামে প্রসিদ্ধ) হাত হইতে সিন্ধুদেশ উদ্ধার করেন। এইভাবে পোরস (Porus), অস্তি ও অভিসার রাজাদের রাজ্য তিনি পুনরায় হিন্দু-সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং সেলিউকাশকে পরাজয় করার দরুন তিনি তাঁহার আরও কতকগুলি স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। এই প্রকারে বেলুচিস্থান, খিলাট, মকেরন প্রভৃতি দেশ চন্দ্রগুপ্তের হস্তগত হয়। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় সেলিউকাশের দূত অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য সুরহং হইয়াছিল, এবং গ্রীকগণ নিরস্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সন্ধাব রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সেলিউকাশ, ইজিপ্টের রাজা টোলেমির ভ্রাতার হাতে ৭৮ বৎসর বয়সে নিহত হন। ইজিপ্ট-রাজদূত দাইওসিসিয়াস চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের রাজসভায় কতকদিন বাস করিয়াছিলেন।

বিন্দুসার তাঁহার পিতার রাজ্য হ্রত বা কতকটা বাড়াইয়া ছিলেন, কিন্তু এবিষয়ে খাটি প্রমাণ নাই। অশোক তাঁহার রাজত্বের নবমাঙ্গে কলিঙ্গ জয় করেন। এই জয়ের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কলিঙ্গ-বিজয়ের ফলে মহানদী ও কাবেরীর মধ্যবর্তী এবং সমুদ্রপর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল জনপদ অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। দক্ষিণে মহীশূর-সুবর্ণগিরি পর্যন্ত তাঁহার আধিকৃত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং অশোকের রাজ্য পশ্চিমে হিন্দুকুশ এবং মধ্যভাগে (পশ্চিমোত্তরে) কাশ্মীর ও পূর্বে নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে মহীশূর, দক্ষিণপশ্চিমে কাথিওয়ার এবং পূর্বে অনুগাঙ্গ প্রদেশ এ সমস্তই তাঁহার অধিকারের অন্তর্গত ছিল। কাশ্মীরের প্রধান নগর ছিল প্রবরপুর (ত্রীনগর) এবং নেপালের রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল মুণ্ডপত্তন ও ললিত-পত্তন।*

মেগেস্থিনিদ্ চন্দ্রগুপ্তের শাসনপ্রণালীর যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা অশোকের সময়েও কতকাংশে সেইরূপই ছিল বলিয়া মনে হয়। এই সুরহং রাজ্য কতকগুলি প্রাদেশিক খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, তোমলী, সুবর্ণগিরি এবং আরো কয়েকটি স্থান প্রাদেশিক প্রধান নগর ছিল ; স্বয়ং যুবরাজ অশোক এক সময়ে তক্ষশীলা ও উজ্জয়িনীর শাসনকর্তা ছিলেন।

মেগেস্থিনিসের সময়ে মগধের সৈন্যবল, ৬ লক্ষ পদাতিক, ৩০ হাজার অধারোহী, ৯ হাজার হস্তী এবং বহুসংখ্য রথবিশিষ্ট ছিল। কোন স্থানে রাজকীয় শিবির থাকিলে তথায়

রাজার সঙ্গে ৪,০০,০০০ সৈন্য থাকিত। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে সুবিখ্যাত সুদর্শন হ্রদ খনন করা হইয়াছিল। বৈষ্ণব পুষ্পগুপ্ত এই কার্য্য-সম্পাদনের ভার পাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে (অশোকের রাজত্বকালে) যবনরাজ তুসম্প এই হ্রদের মোর্যবংশের ঘনিষ্ঠতা দৃষ্ট হয়, মুদ্রারাক্ষস নাটকের যদি কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকে, তবে স্বীকার করিতে হইবে গ্রীক সৈন্তেরা বহু পরিমাণে চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যদল-ভুক্ত ছিল। উত্তরকালে যবন ধর্ম্মরক্ষিতকে অশোক গুজরাটে বৌদ্ধমত প্রচার করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যবন ধর্ম্মরক্ষিতের মূল নাম কি ছিল তাহা জানা যায় নাই। বৈষ্ণব হরিদাসের মুসলমানী নাম যেহুপ অজ্ঞাত, ধর্ম্মরক্ষিতের পূর্বনামও সেইরূপ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। কিন্তু তিনি ভারতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নবধর্ম্মে একরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে অশোক তাঁহাকে প্রাদেশিক আচার্য্যের পদ দিয়াছিলেন। সাচির স্তূপে দেখা যায় অশোক ধর্ম্মপ্রচারার্থ গ্রীস দেশে আচার্য্য মহারক্ষিতকে পাঠাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি মহারাষ্ট্র, ব্রহ্মদেশ, নেপাল প্রভৃতি প্রদেশে যে সকল আচার্য্য পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকের নামও পাওয়া গিয়াছে। অশোক-অনুশাসনে তিনি কোন্ কোন্ দিনে কোন্ কোন্ পণ্ড-বিনাশ নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন। যে দেশের সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে যজ্ঞধূমে আকাশ সমাচ্ছন্ন ছিল এবং চক্কা প্রভৃতি নানারূপ বাস্তব-বস্তুর উচ্চ শব্দে পণ্ডর মৃত্যুকালের মর্মান্তিক চীৎকার শ্রুতির অনায়ত্ত্ব হইয়া বাইত, সেই দেশে একদিনে অশোক পণ্ডহনন ধামাইয়া দিতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি কত দিক্ হইতে কতরূপ ওজুহাতে সে পণ্ডহত্যা-নিবৃত্তির নীতি অতি ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হইবে যে তিনি একরূপ অসাধ্যসাধন করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, জৈন (আজীবক) দিগের প্রতিও তাঁহার সৌজন্ত ও মহাত্মভবতা সেইরূপ স্বরণীয়। তাঁহার রাজ্যের ত্রয়োদশাংশে তিনি খালতিশ পাহাড়ের গুহা ও ছাগ্রোধ গুহা জৈনদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন, এই দুইটি গুহা বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বের বিশ বৎসর পরে সেইরূপ আবার “হুপ্রিয় গুহাটি”ও আজীবকদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই ভাবে তিনি সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাঁহার অনুশাসনে তিনি লিখিয়াছেন, “যে ব্যক্তি পরের ধর্ম্ম নিন্দা করে—সে নিজের ধর্ম্মের উপর অশ্রদ্ধা আনয়ন করে।”

অশোকের পরে মোর্যবংশীয় নিম্নলিখিত রাজগণের নাম শোনা যায় :—

১। দশরথ—(২৩২ খৃঃ পূঃ) নাগার্জুনী গিরিগুহা আজীবকদিগকে দান করেন, ইহার পরেই মোর্যবংশের অবনতি আরম্ভ হয়। (বায়ুপুরাণ)

মোর্য-রাজত্ব ৩২৫—

১৮৫ খৃঃ পূঃ, মোটি ১৪০

বৎসর।

২। সংগত মোর্য (উপাধি ‘বন্ধুপালিত’)। (বায়ুপুরাণ)

৩। সালিস্থক (সারিস্থক) মোর্য (‘দাস-বর্ষণ’ এবং ‘দেব-বর্ষণ’ এই দুই উপাধিতে পরিচিত); ইনি উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ

রাজা খারবেল-কর্তৃক পরাস্ত হন।

৪। সোমশরমণ মোর্ধ্য (দাস শরমণ বা দেবশর্মণ)। (বায়ুপুরাণ)

৫। সত্যধনবান মোর্ধ্য। (বায়ুপুরাণ)

৬। বৃহদ্রথ মোর্ধ্য (মন্ত্রী পৃথ্বিমিত্র কর্তৃক নিহত)।

অশোক খৃঃ পূঃ ২৩২ অব্দে পরলোকগমন করেন এবং খৃঃ পূঃ ১৮৫ অব্দে অশোকের ৪৭ বৎসর পরে মোর্ধ্য-সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়। তাঁহার পরে ছয়জন নৃপতি মগধের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন—তাঁহাদের সমগ্র রাজত্ব কাল ৪৭ বৎসর। ইহাদের মধ্যে দশরথ ৮ বৎসর। অপরাপর রাজার সময় সমভাবে বিভক্ত করিলে তাঁহারাও প্রত্যেকে প্রায় ৮ বৎসর করিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। বলা হইয়াছে, এই রাজত্বকাল মোটে ৪৭ বৎসর। কোন রাজা সাম্রাজ্যের কতটা শাসন করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। ইহাদের মোট রাজত্বকাল চন্দ্রগুপ্ত মোর্ধ্য হইতে অশোক পর্য্যন্ত—৩২৫ খৃঃ পূঃ অব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৫ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ১৪০ বৎসর কাল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোর্ধ্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ

মোর্ধ্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ কি? বাহা হঠাৎ এত বিস্তৃতি লাভ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে বিশালতা লাভ করিয়াছিল—তাহার ধ্বংসের বীজ নিজের মধ্যে লইয়াই উহা উৎপন্ন হইয়াছিল। অশোকের শাসনতন্ত্র সমস্ত জগতের প্রতি সার্বজনীন উদারতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদিগকে সমভাবে শ্রদ্ধা করিয়াছিলেন। বাহারা চরিত্রবলে শ্রদ্ধার দাবী উপস্থিত করিতেন তিনি হঠাৎ তাঁহাদের চিরাগত অর্জিত শ্রদ্ধা অগ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহার সার্বজনীন ধর্ম্মে, বাহা কিছু সনাতন কাল হইতে অধ্যাত্ম ও ধর্ম্মনীতির গুণে পূজা পাইয়া আসিয়াছিল, তাহা হঠকারিতা করিয়া তিনি উড়াইয়া দেন নাই। কাহারও প্রাণে পীড়া দান করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি যতটা সতর্কতাই অবলম্বন করুন না কেন, বাহারা বহুযুগের ক্ষমতা ও প্রতাপ ভোগ করিয়া বংশমর্যাদা ও রক্তের গৌরবে স্মৃতিরাগত আভিজাত্যে দৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহাদের সকল দাবী তিনি রক্ষা করিবেন কিরূপে? ধর্ম্ম সম্বন্ধে অধিকার ব্রাহ্মণের একচেটিয়া ছিল, সেই অধিকারের ভাগ অপর কাহাকেও ছাড়িয়া দিতে ব্রাহ্মণেরা স্বতঃই কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বধন দেখিলেন,

ধর্মের বিচার, ধর্মসম্বন্ধে আলোচনা ও সত্যধর্ম রক্ষিত হয় কিনা তাহার বিচারার্থ “ধর্ম মহামাত্র” নামক একশ্রেণীর ধর্মাদ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন, তখন
ব্রাহ্মণের একাধিপত্যের
বিলোপ। সাধারণের উপর তাঁহাদের যে অমোঘ আধিপত্য ছিল, তাহা
হইতে তাঁহারা সহজেই বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন। এই কার্যের
উপকারিতা ও প্রজাবর্গের হিতৈষণা কেহ অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

গির্গার পরর্ত্তের অহুশাসনে অশোক পশুবলিযুক্ত হোমাদি নিবেদন করিয়াছেন।
ধর্মমহামাত্রের পদ এক সময়ে হিন্দুরাজ্যেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে তাহা
উঠিয়া যায়, বহু শতাব্দী পরে তিনি এই পদের পুনরায় সৃষ্টি
পশুবলিযুক্ত হোম নিবেদন। করিলেন; যেখানে যেখানে তখন ব্রাহ্মণগণের অথও আধিপত্য
ছিল, ধর্মমহামাত্রগণ ধর্মগুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণ দেবতাস্থানীয়
ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে অপরাপর মনুষ্যের সমান করিয়া ঘোষণা করিলেন। (সিদ্ধপুর
শিলালিপি।)

চতুর্থ স্তম্ভলিপিতে তিনি বলিয়াছেন, ব্যবহার ও দণ্ডদানে যেন পক্ষপাত না করা হয়।
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে স্থলে সামাজিক ও নৈতিক ধর্মের দণ্ডমুণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত-
বিধানের কর্ত্তা ছিলেন ব্রাহ্মণেরা, তাঁহাদিগের সেই স্থান আর একচেটিয়া রহিল না,
ধর্মমহামাত্রগণ ও রাজকগণ সেই সেই বিভাগে কর্ত্তা হইলেন। পূর্বে ব্রাহ্মণ যতই গর্হিত
ব্যবহার ও ধর্মের সাম্য। কার্য করিতেন না কেন, তাঁহার প্রতি শারীরিক দণ্ড নিষিদ্ধ
ছিল, সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তাঁহাদিগকে ধর্মাদিকরণে উপস্থিত
করাইবার কোন উপায় ছিল না। যদিই বা তাঁহারা খেচ্ছায় উপস্থিত হইতেন তাঁহাদিগের
উক্তি মাত্র লিখিয়া লওয়া হইত। তাঁহাদিগকে কিছুতেই জেরা করা যাইত না। “দণ্ডের
মধ্যে তাঁহাদের প্রধান দণ্ড ছিল শিখা-কর্ত্তন।” “ব্যবহার-সমতা বা দণ্ড-সমতা” এই
ছই কথার দ্বারা অশোক ব্রাহ্মণ-শূদ্রে কোন পার্থক্য রাখিলেন না। এই সকল কারণে
বিশেষ বজ্রাদি অহুষ্ঠানে গুরুতর বাধা পাইয়া ব্রাহ্মণেরা যে তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া
উঠিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু পূর্বেই আমরা বলিয়াছি, অশোক কখনই ব্রাহ্মণ-
বিদ্বেষী ছিলেন না। চতুর্থ, ত্রয়োদশ এবং সপ্তম স্তম্ভলিপিতে তিনি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি
যথাযোগ্য সম্মানের বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন। জৈনদিগের আজীবকগণের স্তুতিও বহু
শিলালিপিতে জ্ঞাপিত হইয়াছে।

কিন্তু বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত স্থান ও গৌরব মানুষ সহজে হারাইতে চায় না। মহাভারতে
লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করিলেই তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ কতকগুলি গৌরব
ধাকে, বাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা এখন সেই ব্যাস-বাক্যের
বিরুদ্ধতা সহ করিতে পারিলেন না। সুতরাং অশোকের উদারতা এবং সর্কজীবের প্রতি
সমভাব অবলম্বনে ব্রাহ্মণগণ ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়াছিলেন। পুষ্টমিত্র কর্ত্তক মৌর্য্যসাম্রাজ্য-
ধ্বংসের মূল কারণ ব্রাহ্মণদের চিরসঞ্চিত ক্রোধ এবং প্রতিশোধেচ্ছা।

কেহ কেহ বলেন যে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষে এই পতন ততটা হয় নাই,—অপরাধের কারণও যথেষ্ট ছিল। অশোক ছাড়া ও ধর্মের ভিত্তির উপর যে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, পরবর্তী মৌর্যরাজগণ তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। আরাজীবের পর দ্বিতীয় আরাজীব জন্মগ্রহণ করেন নাই; সেইজন্যই মৌর্য সাম্রাজ্য হস্তান্তরিত হইয়া গেল। অশোকের বংশধরগণ সকলেই হীনবীৰ্য্য ও দুর্বল ছিলেন। অর্জুনের গাওঁর অর্জুনই ব্যবহার করিতে পারিতেন। অশোকের পরে, এই বিশাল সাম্রাজ্য যে সকল মহাশূন্যে দৃঢ়ীভূত হইয়া একত্র সম্বন্ধ হইয়াছিল, সেই গুণরাশির অভাবে ইহার ভিত্তি শিথিল হইয়া গিয়াছিল। এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য। তথাপি আমরা বলিব, বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণ থাকি সত্ত্বেও আরাজীবের প্রতি হিন্দু জনসাধারণের অমুরাগের অভাবই মৌর্যরাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া ফেলিয়াছিল; মৌর্যসাম্রাজ্যও সেইরূপ প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ-চক্রান্তেই যে হতবল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ক্ষাত্রশক্তির পুনরুদয়

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব অনেক দিন হইতেই ছিল। মূরের সংস্কৃত টেক্সট পুস্তকে এই দ্বন্দ্বহচক বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এক সময়ে ক্ষত্রিয়েরাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পালি অধট্টহত্ত নামক পুস্তকে বিশেষভাবে দেখিতে পাইতেছি। কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনের সময়ে কলহটা খুব ঘনাইয়া আসিয়াছিল। পরশুরাম ক্ষত্রিয়-কুলকে নির্মূল করিয়াছিলেন।

দীর্ঘযুগের পর ক্ষত্রিয় শক্তি পুনরায় বল সঞ্চার করিয়া আখ্যাবর্তে খুব শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। ক্ষত্রিয় নরনারায়ণ কৃষ্ণ এই যুগে ব্রাহ্মণ্য শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইয়া হিন্দুধর্মকে নূতন এক আকারে গঠিত করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। তাঁহার এই চেষ্টার ক্ষত্রিয়-সমাজের সর্বসম্মত সমর্থন তিনি পান নাই—যেহেতু তাঁহার প্রভুত্ব মানিয়া লইতে কেহ কেহ প্রস্তুত ছিলেন না। ভারতের পূর্বাঞ্চলটা—মগধ, প্রাগজ্যোতিষপুর ও চন্দী প্রভৃতি রাজ্য—কৃষ্ণাধিপতির প্রদান কেন্দ্র ছিল। মগধের অরাসক, পৌণ্ড্রবর্জনের বাহুদেব, প্রাগজ্যোতিষপুরের নরক, মুর ও চেন্দ্রির শিশুপালকে হত্যা করিয়া কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও তদীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্তের ভিত্তি দৃঢ় করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ যুগও বেশীদিন টিকিল না। কুরুক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষত্রিয়শক্তি ধ্বংস পাইল।
হর্ষ্যোদন এবং যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যে সকল ক্ষত্রিয় বীর জীবিত রহিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা

নখাগ্রে গণনা করা যায়। মুষ্টিমেয় ক্ষত্রিয় পুনরায় হীনবল
ক্ষত্রিশক্তির বিলয়। হইলেন। তখন হিন্দু সমাজের নিয়ন্তর শির উত্তোলন করিতে

লাগিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর আর কোন বড় ক্ষত্রিয় রাজার কথা অনেকদিন পাওয়া
যায় নাই। তথাপি নিয়ন্তরের লোকদের ক্ষত্রিয়দিগকে ডিঙ্গাইয়া শ্রেষ্ঠপদ লাভ করা
বড় সহজ কাজ হয় নাই। বিনষ্টপ্রায় ক্ষত্র শক্তিরও একটা শৃঙ্খলা ও শাসনপ্রণালী অটুট
ছিল—নিয়ন্ত্রেশ্বরী লোকেরা তাঁহাদের হাত হইতে ক্ষমতা সহজে কাড়িয়া নিতে পারে নাই।
আর্য্যাবর্ত্তে ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে পুনরায় একটি সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। এই দ্বন্দ্ব ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণে
নহে, ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়ে নহে, ক্ষত্রিয়-শূদ্রে।

মহানন্দকে সকলে একবাক্যে দ্বিতীয় ভৃগুরাম উপাধি দিয়াছেন। কথিত আছে, তিনি
হীনবংশজাত ছিলেন, এবং পরশুরামের দ্বারাই ক্ষত্রিয়-কুল নির্মূল করিয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ
বিপুল আহবে ক্ষত্রিয়শক্তি হীনবীৰ্য্য হইয়া ধ্বংস পাইল। নবোদিত নন্দদিগকে চাণক্য সংহার
করিলেন। মৌর্য্যবংশীয় অশোক সমাজের উপর ব্রাহ্মণগণের অসম্ভব প্রভুত্ব মানিলেন না।

ব্রাহ্মণগণ পুনঃ পুনঃ বিপদের মুহূর্ত্তে স্বীয় উদ্ধাবনী শক্তি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত
হইয়াছেন। তাঁহারা দেখিলেন, অশোক সম্রাটের স্মৃতি করিয়া গ্রীস, ইজিপ্ট, ম্যাসিডনিয়া

অধিকূল।

প্রভৃতি নানাদিকে শ্রমণ ও ভিক্ষু প্রেরণপূর্ব্বক বিদেশীয়দিগকে সম্রাটের
পক্ষপাতী করিয়া তুলিতেছেন, দলে দলে গ্রীক সৈন্য আসিয়া
মৌর্য্যদিগের আশ্রয় লইতেছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মোক্ত সত্য জনসাধারণের মনের কথা, তাহা
ব্রাহ্মণদিগের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পক্ষপাতী নহে—বর্ণভেদ ব্রাহ্মণের অটুট ক্ষমতা বোদ্ধেরা স্বীকার
করেন না। ক্ষত্রিয়-শক্তি যাহা ব্রাহ্মণদের অক্ষুণ্ণ হইয়া আসিয়াছিল—তাহা শূদ্রনরপতিদের
দ্বারা একেবারে পর্য্যুদস্ত। শাসনে, ধর্ম্ম ও সমাজে মত্ত হস্তীর বেগে নবগঠিত মহাযান-মত সমস্ত
ভারতবাসীকে গ্রাস করিতে উত্তত। ব্রাহ্মণেরা এই বিপদের সময়ে ক্ষত্রিয়-শক্তি গঠন করিতে
সক্ষম করিলেন। চারিদিকে অনার্য্য-সমাজ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া নিঃক্ষত্রিয় আর্য্যাবর্ত্তের দিকে
লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। অশোকের মধ্যাহ্ন-ভারততুল্য অগ্রমের তেজ ও জগদ্ব্যাপক
অন্তরঙ্গের প্রভাবে সেই সকল বিদেশীয় শত্রুরা নিরস্ত ছিল। কিন্তু এবার দলে দলে আসিয়া
কেহ বা শত্রুভাবে কেহ বা বন্ধুভাবে দেখা দিল। শকদিগের এক প্রধান দল বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ
করিয়া ভারতে অথও আধিপত্য স্থাপন করিলেন। তাঁহারা পর হইয়াও পর থাকিলেন না।
কনিষ্ঠের প্রবর্ত্তিত অঙ্গ এখনও আমাদের পঞ্জিকার শিরোভূষণ।

ভারতের চতুঃসীমার উপাস্থভাগে যে সকল বিদেশীয়েরা আনাগোনা করিতেছিলেন,
তাঁহারা ভারতের চক্রবর্ত্ত্যবংশের খ্যাতির সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। ভারত তখন
সমস্ত এশিয়ার মধ্যমাণ, এমন কি যুরোপের চক্ষুও তাহার দীপ্তিতে ঝলসিয়া গিয়াছিল।
জগতের রাজত্ববর্গের কীর্ত্তিস্বরূপ চক্রবর্ত্ত্যবংশীয়দের কীর্ত্তিকথা ছন প্রভৃতি জাতিরা বিলক্ষণ

জানিতেন। ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগের কোন কোন শ্রেণীকে লোভ দেখাইয়া আহ্বান করিলেন—
আমরা তোমাদিগকে ক্ষত্রিয়পদে স্থাপন করিব, তোমরা চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় বলিয়া মানিয়া লইব
এবং সমস্ত ভারতের অধিকার তোমাদিগকে দিব, তোমরা আমাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া
লও। আবু পর্ব্বতের কোন নিবিড় গুহায় এই গুপ্ত মন্ত্রণা চলিতেছিল। বর্কর জাতিদের জন্ত
প্রায়শ্চিত্তের বিধান পূর্ব্বক তথায় একটা যজ্ঞের ব্যবস্থা হইল—প্রমর, প্রতিহার, চোহান এবং
সোলাঙ্কী (চোলুক্য) এই চারিশ্রেণীর নাম হইল অগ্নিকুল—ইহারা নবমুঠ ক্ষত্রিয়, অগ্নি হইতে
উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইহাই প্রবাদ। আবু পর্ব্বত রাজপুতনার দক্ষিণ দেশে। এই নবপ্রতিষ্ঠিত
ক্ষত্রিয়কুলের অমিত বিক্রম, দেশান্তরগত তপস্তার দৃঢ়তা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অতি উজ্জল অক্ষরে
অঙ্কিত রহিয়াছে। মাত্র এই চারিটি বংশ নহে, ভারতবর্ষের গিরিসঙ্ঘল উপত্যকা-ভূমিতে বহু
রাজবংশ এই ভাবে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিয়া ব্রাহ্মণদের ক্রুপায় ক্ষত্রিয়-খাতায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন।
বঙ্গলা দেশেও এইরূপ ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের উদাহরণ অনেক দৃষ্ট হয়, ক্ষত্রিয়ত্ব দীক্ষিত জাতিরা
ক্রমে ক্রমে সমস্ত আর্য্যাবর্তের ক্ষত্রিয়কুলের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া পুনরায় নবপ্রবুদ্ধ
ক্ষাত্র-শক্তিকে ভারতবাসী করিয়া তুলিতেছিলেন। চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের গৌরবের দীপ্তি এখনও
লুপ্ত হয় নাই, এই বংশে প্রবেশের দাবী দৃঢ় করিবার জন্ত কত রাজা-মহারাজা কুবেরের ঐশ্বর্য্য
ব্যয় করিয়াছেন। সেই যে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী এবং ব্রাত্যের প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা, যাহা রাজপুতনার
দক্ষিণাংশে শিলাতলে হোমায়ি হইয়া প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহার জের এখনও চলিতেছে।
একদিকে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রচণ্ডবেগে প্রাচীন বর্ণাশ্রমের স্মরিত তীরদেশ ভগ্ন করিয়া
ডাঙ্গা ও পানী এক করিয়া ফেলিতেছে, অপর দিকে এই বঙ্গলা দেশই সেই আবু পর্ব্বতের
ব্রাত্যশুদ্ধি কত অমূল্যত জাতিকে ক্ষত্রিয়পদ দিয়া ব্রাহ্মণের তৈলবটের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছে।
বঙ্গলার প্রায় এমন কোন হিন্দু পল্লী নাই, যাহা আবু পর্ব্বতের সেই অভিনয় করিয়া ঘরে ঘরে
নব নব অগ্নিকুল উৎপাদন না করিতেছে।

পরবর্ত্তন পরিচ্ছেদ

সুন্দরবংশ

মৌর্য্যবংশের মোট রাজত্বকাল ১৪০ (মতান্তরে ১৩৭) বৎসর। এই সময়ের
মধ্যে অশোকের পর মৌর্য্যবংশের রাজাদের বিশেষ কোন কীর্ত্তিকথা শোনা যায় না।
অশোকের পৌত্র দশরথ বৌদ্ধদিগের অপেক্ষা জৈনদিগের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি
নাগার্জ্জুন গিরিগুহা এবং তৎসংলগ্ন উপত্যকা-ভূমি আজীবকগণকে দান করিয়াছিলেন।
সালিস্থথ (সারিস্থক) মৌর্য্য (বায়ুপুরাণ অনুসারে ইহাদের নাম ইন্দ্রপালিত) উড়িষ্যার
সুবিখ্যাত রাজা খারবেল কর্তৃক পরাস্ত হইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বোক্ত লিখিত হইয়াছে।

শেষ মোঘা রাজা বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্টিমিত্র অতি সুদক্ষ যোদ্ধা ও সমর-নীতি-
বিশারদ ছিলেন। তিনি স্বল্পবংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। কথিত আছে ইহারা পুরুষপরম্পরা

মোঘ্যরাজগণের পুরোহিতের কার্য্য করিতেন। বৌদ্ধধর্মের বিস্তার
ও ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের ক্রম-অবনতি ইহারা খুব সূচকে দেখেন নাই।
খৃঃ পূঃ।

রাজপ্রাসাদের বাহিরে দীর্ঘ দীর্ঘে অন্তঃসলিলা নদীর তীর ব্রাহ্মণ্য
অভিসন্ধি ও বড়দর মোঘ্যকুললক্ষীর সিংহাসনের ভিত্তি শিথিল করিয়া ফেলিয়াছিল।
এদিকে গ্রীক বীর—মিনাওর পশ্চিম ভারত জয় করিয়া বিপুলবাহিনী সঙ্গে মোঘ্যরাজ্যের
সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। এই বিদেশী শত্রুর দুর্নিবার গতি পুষ্টিমিত্র নিবারণ
করিয়াছিলেন। নানা কারণে পুষ্টিমিত্রের প্রভাব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, ব্রাহ্মণগণ শূদ্ৰ-
শাসনে অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছিলেন। হিন্দুগণ বৌদ্ধ-প্রভাবে ম্রিয়মাণ ছিলেন—এরূপ অবস্থায়
বৃহদ্রথের শিথিল হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লওয়া পুষ্টিমিত্রের পক্ষে কোনই কঠিন কার্য্য
হইত না। কিন্তু চিরদিন বাহাদুরের আশ্রয়ে পালিত, তাঁহাদের এরূপভাবে সর্ব্বনাশ করিলে
লোকচক্ষে তাহা নিন্দনীয় হইত। রাজাকে সমস্ত সৈন্ত পরিদর্শন করিবার ছলনায় লইয়া
আসিয়া কোনও সৈন্তের শরে তাঁহাকে নিহত করিয়া সিংহাসনে চাপিয়া বসা তিনি তদপেক্ষা
সমীচীন নীতি মনে করিয়াছিলেন। এই দুর্ঘটনা খৃঃ পূঃ ১৮৫ অব্দে সংঘটিত হইয়াছিল।

কথিত আছে পুষ্টিমিত্র অশোকের ৮৪ হাজার ধর্ম্মরাজিকা ধ্বংস করেন এবং অক্ষয়
বটের মূলচ্ছেদ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে নানা ভাবে উৎপীড়ন করিয়া নির্মূল করিতে চেষ্টা
পাইয়াছিলেন। ইহা ব্রাহ্মণ রাজা যে ঠিক বিবেচনের বশীভূত হইয়া
করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। অশোকের বহুসংখ্যক (৮৪

হাজার [৭]) শিলালিপি হিমালয় হইতে কুমারিকা, বেলুচিস্থান ও আফগানিস্থান হইতে বাঙ্গলা
ও আসাম পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেগুলি শুধু পল্লীতে পল্লীতে শৈলগাত্রে অঙ্কিত ছিল এমন
নহে; তাহার অর্থ লোক বুঝে কি না, তাহা লোকে সর্ব্বদা পড়িয়া শ্রবণ রাখে কি না—
ইহা পরিদর্শন করিবার ভার ধর্ম্মমহামাত্র ও রাজকদের উপর ভৃত্য ছিল। সেই অনুশাসনগুলি
সংস্কৃত কিংবা শুধু রাজধানীর ভাষায়—শুধু ব্রাহ্মী বা কুটিল লিপিতে লিখিত হয় নাই।
তাহা খোরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রাদেশিকলিপিতে এবং ভারতের নানা প্রাদেশিক অক্ষরে ও ভাষায়
লিখিত হইয়াছিল। সেই বিশাল অনুশাসন-সাহিত্য সমস্ত জনপদের লোকেরই অধিগম্য
ছিল। এই অনুশাসন এরূপই সরল সহজ ও সুখপাঠ্য ছিল যে তাহা সর্ব্বসাধারণের
মুখস্থ হইয়া থাকিবার কথা। সুবমালার তায় ইহারা নিত্যপাঠ্য ছিল।

এই উপদেশগুলি ব্রাহ্মণগণ কখনই সূচকে দেখিতে পারিতেন না। সমস্ত মানুষের
সমান অধিকার, বিচারসাম্য, ব্যবহারসাম্য এসকল কথা বাহিরের লোকের কর্ণে কিছুই অদ্ভুত
শোনায় না। কিন্তু এই ভারতবর্ষে বসিয়া কে তখন বলিতে পারিত যে চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণের
বিচারশালায় স্থান এক? এই পশু-হনন-নিষেধ অর্থাৎ যজ্ঞলোপ—যে যজ্ঞ ব্রাহ্মণ্য-
প্রতিপত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান, বাহা ব্রাহ্মণকে নানা দান-দক্ষিণায় পুরস্কৃত করিত—সেই

যজ্ঞবিধি ও পশু-হনন-নিষেধ, এই সকল উপদেশ প্রাপ্তরগাত্র হইতে সরল পল্লীলোকের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত ও অঙ্কিত হইয়া বাইতেছিল। ব্রাহ্মণ্য-শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি ভারতবর্ষে এই শিলামালার সান্নিধ্যে কিরূপে অটুট থাকিবে? পৃথুমিত্র এই শাস্ত্র জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ব্রাহ্মণের মনের জ্বালা নির্বাপন করিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহেবদের মত মৌলিকতা দেখাইতে বাইয়া বলিয়াছেন, যখন পৃথুমিত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট অনেকেই মিত্র উপাধি দৃষ্ট হয় এবং “মিত্র” শব্দের অর্থ “স্বর্গ্য”, তদ্বারা মনে হয় এই বংশ মূলে স্বর্গ্য-উপাসক পারসিক ছিলেন। একপ অকিঞ্চিংকর ভিত্তির উপর এতাদৃশ বিরাট ঐতিহাসিক মত স্থাপন করিতে ভিন্সেন্ট স্মিথও সাহসী হন নাই। তিনি বিষয়টাকে একেবারে উড়াইয়া না দিয়া বলিয়াছেন, “আমি এ কথা মানিতে চাই না।” পৃথুমিত্র সামবেদীয় গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মকে ছ’হাতে আছড়াইয়া মারিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি জালন্ধর পর্য্যন্ত তাঁহার নির্ধ্বংস বৌদ্ধ-পীড়ন-নীতি চালাইয়াছিলেন। পৃথুমিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা কালিদাসের “মালবিকাগ্নিমিত্র” নাটকে দৃষ্ট হয়। ইহারই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ পাণিনি তাঁহার অদ্বিতীয় ব্যাকরণ রচনা করেন। পৃথুমিত্র অতি আড়ম্বরের সহিত অশ্বমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। পশুহননশীল বজ্রাগ্নি আর্য্যাবর্ত্তে একেবারে নিবিয়া গিয়াছিল, অশোকের পর পৃথুমিত্র পুনরায় সেই বজ্রকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। রাজকুমার অগ্নিমিত্র বিদর্ভ-রাজকে জয় করিয়া সেই জয়োল্লাসে সার্কসডোম নৃপতির গৌরবমালা তাঁহার পিতাকে পরাইবার জন্ত এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই মগধ হইতে আশ্ব-রক্ষার্থ বৌদ্ধগণের নানাস্থানে পলায়নের আরম্ভ হয়। “Many Monks who escaped his sword are said to have fled into the territories of other rulers” (Smith’s History of India, p. 213).

পৃথুমিত্র	রাজত্বকাল	১৮৫ খৃঃ পূঃ
অগ্নিমিত্র	”	১৪৯ ” ”
বাসুজ্যোষ্ঠ	”	১৪১ ” ”
বসুমিত্র	”	১৩৪ ” ”
অদ্রক	”	১২৪ ” ”
পুলিওক	”	১২২ ” ”
বজ্রমিত্র	”	১১৯ ” ”
ভাগবত	”	১১০ ” ”
দেবভূমি	”	৭৮—৬৩ খৃঃ পূঃ

(পার্জিটার—কলিযুগের রাজবংশ ; পৃঃ ৩০—৭০ ।)

একুনে যোগ করিলে মিত্রবংশের রাজত্বকাল ঠিক ১১২ বৎসর হয় না, যদিও ১১২ বৎসরই এই বংশের রাজত্বকাল নির্দিষ্ট আছে; সামান্য ৩৪ বৎসরের তফাৎ দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। সাধারণতঃ এক রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীর অভিষেক ঠিক তার পরের দিনই হয় না, শুভদিন ও অপরাপর কারণের প্রতীক্ষায় বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। অভিষেক হইতে অনেক সময়ে ৩৪ মাস দেবী হইয়া যায়। সুতরাং ঠিক অভিষেক হইতে রাজার মৃত্যু পর্য্যন্ত সময় ধরিলে ঐ ১১২ বৎসরই ঠিক হইতে পারে।

নানা কারণে মনে হয় সুদ্র বংশের রাজত্ব খুব শান্তিপূর্ণ ছিল না, ঘরাও কারণে ও গৃহবিচ্ছেদে সর্বদা ঘন্ড ও রেবারেবি চলিতেছিল। অগ্নিমিত্রের পুত্র সুমিত্র নাট্যামোদী ছিলেন, তিনি যখন তাঁহার অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ-পরিবৃত হইয়া আনন্দ করিতেছিলেন তখন মিত্রদেব নামক একব্যক্তি তাঁহার মন্তক ছেদন করেন। “পদ্মনাল হইতে পদ্ম যেমন খসিয়া পড়ে, সেইরূপ মিত্রদেবের তরবারির আঘাতে সুমিত্রের মন্তক কণ্ঠচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল।” (বাণ—হর্ষচরিত, ৪র্থ অধ্যায়।) সুদ্রবংশের শেষ রাজা দেবভূতি বা দেবভূমি লম্পট ছিলেন, এই লম্পটের ফলে তিনি গুপ্তভাবে নিহত হন।

খৃঃ পূঃ ১৮৫ অব্দে পুষ্যমিত্র তাঁহার প্রভু বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া তদীয় সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। অহুমান ৬০ খৃঃ পূঃ অব্দে দেবভূতিকে হত্যা করিয়া সেইরূপে তাঁহার ব্রাহ্মণমন্ত্রী বাহুদেব (কাথবংশীয়) মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। বাহুদেব ও তাঁহার বংশধরগণ মোট ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। সুদ্রবংশ ১১২ বৎসর ও কাথবংশ ৪৫ বৎসর, মোট ১৫৭ বৎসর বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার ছিল। খৃঃ পূঃ ১৮ অব্দে মগধে ব্রাহ্মণ-রাজত্বের অবসান হয়। কিন্তু কালের এই হিসাব ঠিক রাখিয়াও ভিন্সেন্ট স্মিথ ব্রাহ্মণরাজত্বের অবসানের তারিখ ২৭ কি ২৮ খৃঃ অব্দ বলিয়া অহুমান করিয়াছেন, তাহা কি করিয়া হইল অহুমান করিতে পারিলাম না। কথিত আছে, কাথবংশের শেষ রাজাকে দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রবংশের রাজা সিম্বুক (সিপ্রক) হত্যা করেন। অন্ধ্রবংশের রাজারা মগধ বিজয় করিলেও পূর্বভারতের সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক কমই ছিল।

সম্ভবতঃ আশোকের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল রাজত্বের মধ্যে ক্রমে ক্রমে যে শাসন-শিথিলতা দৃষ্ট হইতেছিল—তাঁহার ফলে দাক্ষিণাত্যের কোন কোন সামন্তরাজ ঠিক স্বাধীন না হইলেও আপনাদিগের অধীনতার পাশ অনেকটা

কাথ ও অন্ধ্রবংশ।

ছেদন করিয়াছিলেন। অন্ধ্রনরপতিরা সেইরূপ কোন সামন্ত-

রাজবংশীয় ছিলেন বলিয়া অহুমিত হয়। পূর্ব ভারতের সঙ্গে অন্ধ্রদিগের সম্বন্ধ অতি অল্পই ছিল বলিয়া আমরা তাঁহাদের কথা এখানে বলা নিম্নয়োজন মনে করিলাম। কিন্তু বঙ্গদেশে বৈষ্ণব-ধর্ম যে আকারে আমরা দেখিতে পাই, তাহা দাক্ষিণাত্য-প্রচলিত শৈব-ধর্মের রূপান্তর। খৃষ্টপূর্ব যুগের তামিল কবিদের শিবস্তোত্রের সঙ্গে বাঙ্গলার অনেক বৈষ্ণব এমন কি শাক্ত কবিদের স্তোত্রেরও আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। আমরা

পরে তাহা কতকটা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিব। বাসুদেবের পূজাও অন্ধ রাজগণই উত্তরপূর্ব ভারতে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, এবং বাঙ্গলার নানাজাতির সঙ্গে তামিল-সংমিশ্রণ অন্ধরাজগণের সময়েই বেশী হইয়া থাকিবে।

পুরাণকারেরা শিশুনাগ, ইক্ষাকু, অন্ধ্র, পৌরব এবং পাণ্ডুবংশের যে তালিকা দিয়াছেন, আমরা তাহা নিরে দিলাম। বায়ুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও অগ্নিপু্রাণ হইতেই আমাদের তালিকা মূলতঃ সংকলিত হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণ হইতে অপরাপর পুরাণোক্ত রাজগণের বিবরণ সংকলিত হইয়াছিল—পার্জিটার সাহেব এই মতাবলম্বী।

ইক্ষাকু বংশ :—১। বৃহৎ ২। বৃহৎকর ৩। উরুক্র ৪। বৎসবাহু ৫। প্রতিবোম ৬। বিধাকর ৭। সহস্রব ৮। বৃহৎ ৯। ভানুরথ ১০। প্রতীতাপ ১১। সুপ্রতীক ১২। মরুদেব ১৩। হনকর ১৪। কিসরাথ ১৫। অশ্বরীক ১৬। স্থলপ ১৭। অন্তর্জিৎ ১৮। বৃহদ্রাজ ১৯। ধর্মিন ২০। কৃতজ্ঞ ২১। রণজ্ঞ ২২। সজ্ঞ ২৩। শাক্য ২৪। উজ্জ্বল ২৫। সিদ্ধার্থ ২৬। রাহুল ২৭। প্রসেনজিৎ ২৮। কুলক ২৯। কুলক ৩০। হরপ।

শিশুনাগবংশ :—১। শিশুনাগ ২। কাকবর্ণ ৩। কেমধর্ম ৪। কজাধ্বজ ৫। বিধিসার ৬। অজাতশত্রু ৭। বর্শক ৮। উদয়িন ৯। নন্দীবর্জ ১০। মহানন্দিন ১১। মহাপদ্ম-নন্দী ১২। হুঙ্কর বা হুমলয়।

মহাপদ্মনন্দী কজিগবংশ-ধ্বংসকারী, তাঁহার ৮ পুত্র ক্রমান্বয়ে ১২ বৎসর রাজত্ব করেন, এবং কোটিল্যের চক্রান্তে নিহত হন।

মৌর্য্যবংশ :—১। চন্দ্রগুপ্ত ২। বিন্দুসার ৩। অশোক ৪। কুনাল ৫। বহুপালিত ৬। দর্শন ৭। দর্শন ৮। সম্রাতি ৯। সালিহক ১০। দেবধর্ম ১১। শতধনবান্ ১২। বৃহৎ (পুত্রমিত্ত কর্তৃক নিহত)।

সুন্দরবংশ :—১। পুত্রমিত্ত ২। অগ্নিমিত্ত ৩। বহুদৈর্ঘ্য ৪। বহুমিত্ত ৫। অন্ধ্রক ৬। পুলম্বিক ৭। যোষ ৮। বহুমিত্ত ৯। ভাগবত ১০। দেবভূমি (১০ জন হুঙ্ক)।

অন্ধ্রবংশ :—১। সিমুক ২। কুক (জাতা) ৩। জীমাতকর্ণী ৪। পূর্ণোদর ৫। স্বকৃষ্ণ ৬। সাতকর্ণী ৭। লম্বোদর ৮। মেঘপাতি ৯। অপীলক ১০। স্বাতি ১১। স্বকৃষ্ণাতি ১২। মুগেন্দ্রপাতি ১৩। পুলম্বি ১৪। অগ্নিকর্ণ ১৫। হাল ১৬। হনুর সাতকর্ণী ১৭। চকোর সাতকর্ণী ১৮। শিবপাতি ১৯। গৌতমপুত্র ২০। পুলোমা ২১। সাতকর্ণী ২২। শিবশীলোল ২৩। শিবস্বক ২৪। জ্ঞানশ্রী সাতকর্ণী ২৫। বিজয় ২৬। চান্দ্রী সাতকর্ণী ২৭। পুলোমারি।

রঘুবংশ :—১। রামচন্দ্রের ছোট পুত্র কুশ ২। অতিথি ৩। নিবধ ৪। মল ৫। নভঃ ৬। পুণ্ডরীক ৭। কেমধর্ম ৮। দেবানীক ৯। অহীন ১০। নীল ১১। উগ্রাভ ১২। বজ্রনাভ ১৩। শমন ১৪। বাহিতাথ ১৫। বিশ্বন ১৬। হিরণ্যভ ১৭। কৌশল্য ১৮। ব্রাহ্মাভ ১৯। পুত্র ২০। পুত্র ২১। ক্রবসক্তি ২২। হুর্ধ্বন ২৩। অগ্নিবর্ণ,—ইনি অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ালব্ধ ও রমণীগণপ্রিয় ছিলেন এবং আঙ্গিক, সাত্বিক ও বাচিক এই বিবিধ নৃত্য দ্বারা রমণীগণকে মুগ্ধ করিতেন; ইনি অল্প বয়সে রাজ্যদ্বারোপে প্রাণত্যাগ করেন। (কালিদাসের রঘুবংশ হইতে গৃহীত)।

পৌরবংশ :—১। অর্জুনপৌত্র (এবং অভিমত্যা-পুত্র) পরীক্ষিত ২। জাম্ববত ৩। শতানিক ৪। অখমেধবত ৫। নিচকু (ইহার সময়ে হস্তিনাপুর গঙ্গাগর্ভস্থ হইয়া, ইনি কোণাখি নগরে রাজধানী স্থাপন করেন)। ৬। উক ৭। চিত্ররথ ৮। হুচিরথ ৯। বৃক্শিমৎ ১০। অসেন ১১। সুনীথ ১২। স্কচ ১৩। নৃচকু ১৪। অখিবল ১৫। পরিসব ১৬। হুস্তার ১৭। মেধাবীন ১৮। নৃপত্তম ১৯। জব ২০। তিগমাতমান ২১। বৃহত্তম ২২। বাহুবন ২৩। শতানিক ২৪। উবয়ন ২৫। বহিনারা ২৬। মণ্ডপানি ২৭। নিরামিত্র ২৮। কেমক।

পার্জিটার সাহেব অহুমান করেন, পুরাণগুলি পূর্বে পালি ও প্রাকৃত ভাষায় বংশাবলী-গাথাক্রমে লিখিত ছিল, গুপ্তদের রাজত্বের পূর্ণভাগে এই শাস্ত্র সংস্কৃতে ফিরিয়া লেখা হয়। ইহার পক্ষে তিনি ভাষাগত যে সকল প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা অখণ্ডনীয় বলিয়াই মনে হয়। গুপ্তরাজত্বের প্রথম ভাগ পর্যন্ত পুরাণগুলিতে কতকটা ইঙ্গিত আছে—তখন তাঁহাদের রাজ্য আনুগঙ্গ প্রদেশে—প্রাগ, সকেত এবং মগধ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পুরাণসঙ্কলনের আদিপর্ব শেষ হয়, গুপ্তগণ তখন অপর কয়েক জন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্বের অধীন ছিলেন এবং পুরাণে ইহারা সকলে ব্যয়কুণ্ঠ, দয়াহীন, অনৃত্যচারী ও খামখেয়ালী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই মন্তব্য পাঠ করিয়া আমাদের আলবিক্রনীর কথা স্মৃতিতে উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শৈব ধর্মের বিবর্তন, শিব বনাম বুদ্ধ ।

“অবৃষ্টিসংরন্তমিবাধুবাহ-

মপামিবাধারমহুত্তরঙ্গম্ ।

অন্তঃচরাণাং মরুতাং নিরোধা-

গ্নিবাতনিকম্পমিব প্রদীপম্ ॥”—কালিদাস ।

বোধ হয় বেদ পুরাণ ও কাব্যে মহাদেব যে ভাবে পরিকল্পিত হইয়াছেন, অল্প কোনও দেবতা সে প্রকার রূপমহিমমণ্ডিত হইয়া দেখা দেন নাই ।

বেদে তিনি বিনাশের দেবতা । তাঁহার উপর পুরাণ, উপপুরাণ ও কাব্য ক্রমে রং ফলাইয়া তাঁহাকে অতি উজ্জ্বল ও মহিমাদিত করিয়া তুলিয়াছে । তাঁহার নর্ত্তন—আনন্দের

ধ্বংসের আনন্দ,
কৃত্ততাওব ।

আতিশয়া ;—সেই আনন্দ তাঁহার বিদ্যাপ-বাদনে, ইত্যন্ততঃ বিক্ষিপ্ত ত্রিশূলাঘাতে ও জগদন্তকর তাণ্ডবে পরিব্যক্ত । দিগ্বলয়ে গ্রহ ও জ্যোতিক সেই আনন্দে নির্দীপিত হয় । দিগ্‌হস্তিগণ স্বক হইতে

ধরিত্রীর বোঝা ফেলিয়া দিয়া মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সেই তাণ্ডব-নর্ত্তনে যোগ দেয় । নর্ত্তন কালে শিবের ক্রোধে জগতের বিলয় হয় । তথাপি জগৎ তাঁহাকে বিরিয়া বিরিয়া নর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা হয় ।

প্রদীপের চারিদিকে পতঙ্গের মত জগতের এই প্রগতি । মৃত্যু ও ধ্বংস নিশ্চয়, তথাপি জগতের এই প্রগতি । আনন্দ-স্বরূপের এই প্রলয়কর তাণ্ডবের চিরাহুচর বিশ্বমণ্ডলী, —মৃত্যুই ইহার নিয়তি । তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই নর্ত্তনে যোগ দিয়া শুধু মৃত্যুর জন্তই অগ্রসর হয় । এই মৃত্যুর অগ্নিকুণ্ডে জালামুগ্ধ রূপকামী পতঙ্গের মৃত্যু অনিবার্য, উহা তাহার ভালবাসার সহ-মরণ ।

এই তাণ্ডব—এই বিশ্বধ্বংস এবং কৃষ্ণের রাসলীলা উভয়ই এক সামগ্রী । রাসে জীবের সমস্ত কামনা, লজ্জা, ভয়, ঐশ্বর্য, স্বাভাবিকজ্ঞান নষ্ট হইয়া এক আনন্দময়ের খেলার সাহচর্য প্রতীক্ষা করে । তাণ্ডব পুরাতন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দূর করিয়া নূতন বিশ্বরচনার সূচনা করে ।

প্রজলিত দীপশিখায় পতঙ্গগুলি মরে কেন?—বেচ্ছায় ও অনিবার্য আকর্ষণে। মরে কেন?—জীবকে জিজ্ঞাসা কর। শিবতাণ্ডবে জগৎ নষ্ট হয় কেন?—জগৎকে জিজ্ঞাসা কর। যে এই আলা বুকে লইয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে সেই ইহার মর্ম্ম জানে। এই জহর-ব্রতের আকর্ষণ অস্ত্রের অবোধগম্য।

শিবের তাণ্ডবনৃত্য ও জগতের ধ্বংস—পুরাণকারের কল্পনার এক অদ্ভুত সৃষ্টি।

নিত্যই সায়ংকালে জগৎ ধ্বংস পাইতেছে, নিত্যই বিঘোর তন্দ্রায় জীবের অস্তিত্ব ভুবিয়া যাইতেছে,—আবার অরণ্যলোকে কুসুম কুড়ির বিকাশের সঙ্গে জীবনের জাগ্রত স্পন্দন উপলব্ধ হইতেছে। বিশ্বদেবতার অঙ্কে চোখ মেলিয়া জাগরণ, এবং তাঁহারই তাণ্ডব বা আনন্দলীলার ঘুম-পাড়ানিয়া গানের সঙ্গে চক্ষু বুজিয়া স্থনিদ্রা—বিশ্ব এই ভাবে নিত্য জাগিতেছে, নিত্য মরিতেছে। নিত্য না মরিলে নিত্যকার জগৎ পুরাতন হইয়া যাইত। মৃত্যুই জীবনকে নিত্য স্মৃতি দিতেছে।

যিনি বিনাশের দেবতা তাঁহাকে লইয়া পুরাণকারেরা কত রূপেরই না পরিকল্পনা করিয়াছেন! ঢাকার একটি পাগল ছিল—সে একটা খড়ি লইয়া অতি ব্যস্ততার সহিত বাড়ীর

প্রাচীরে মনুষ্যের মূর্তি, বৃক্ষ, পল্লব, ফুল ও ঘর-দরজা আঁকিয়া যাইত।

ঢাকার পাগল।

একটানে যে ছবি সে আঁকিত তাহা অতি নিখুঁত সুন্দর ও সুশ্রী হইত। সেই ছবি আঁকিয়া সে মুহূর্তকাল ছবিটা মুদ্রনেত্রে চাহিয়া দেখিত, তারপরে বলিত “বাঃ”, সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা মুছিয়া ফেলিয়া অপর একটা প্রাচীরে সেইরূপ আঁকিতে মনোযোগ দিত। সারাদিন সেই আঁকার বিরাম ছিল না—সারাদিন এই মুছিয়া ফেলারও বিরাম ছিল না।

ধ্বংসের দেবতাটি কি তেমনই পাগল নন? এই পাগলামির একটা আকর্ষণ আছে;—উহা আকর্ষণ-হীনের আকর্ষণ। কিছুতেই বাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, সকলেই উর্দ্ধ্বাসে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে চায়। মানুষের অপর কাহারও উপর না থাকিলেও নিজের সৃষ্টির উপর এবং নিজের জনের উপর দরদ থাকা স্বাভাবিক।

অনাসক্ত শ্রী।

যে বিববৃক্ষ বপন করে সে বিববৃক্ষটিকে কর্তন করে না।

কিন্তু একি দেবতা? এত সুন্দর তাঁহার এই বিশ্ব। শোভার ভাণ্ডারের হুঁহাতে মুক্ত-পরিবেশন করিয়া ইচ্ছানুযায়ী হাত গুটাইয়া ফেলা এবং সমস্ত ধ্বংস করাই ইহার নিত্য-লীলা। এই সজ্জা-প্রস্তুত পদ্ম, উদ্ভাস গিরিনদী, ধনধান্যময়ী পল্লবিনী প্রকৃতি দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়; মনে হয় আবার দেখি। কিন্তু শিল্পী নিজে তাহার শিল্প একবারটি না দেখিয়া অমনি তাহা ধ্বংস করেন। এই যে প্রকৃতির শত শত বন্ধনের মধ্যে পরম দেবতা একটি মুক্তির স্বরূপ দেখাইয়াছেন, তাহা অন্ত কোন জাতি এমন ভাবে কল্পনা করিতে পারেন নাই। এরূপ পাগল দেবতা, উন্মত্ত ভোলানাথ, আর কোন ধর্ম্মের শাস্ত্রে নাই। বাঁহার কুবেল ভাণ্ডারী, তাঁহার শশানে শব্দা,—হীরা, মণি পারিজাত-পুষ্পের বিজয়মালা পরিয়া দেবতার বাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়েন, তিনি নিজে হাঁড়মালা পরিয়া, ভস্ম ভূষণ করিয়া জটাভূট মুক্ত করিয়া চিতায় বসিয়া আছেন। দেবতাদের অঙ্গের

স্বাসে অর্ধযোজন আমোদিত হইতেছে, আর শিবের জটাবদ্ধ কেশদাম হইতে “ফণী ফণ” গর্জন করিতেছে। কে চায় পারিজাত? কে চায় উচ্চৈঃশ্রবা? কে চায় ঐরাবত? কে চায় অমৃত? বুড়ো ঘাঁড়ের উপর চাপিয়া ভিক্ষুরাজ চলিতেছেন—‘ডুমু’ ‘ডুমু’ ডমরু বাজিতেছে। বস্তুতঃ এই হিমাদ্রিসীমান্ত আয়ুগঙ্গাপ্রদেশ শিবেরই প্রকৃত রাজ্য বলিয়া মনে হয়। সোম্য, শান্ত, তুষারাবৃত রজতশেখর হিমাদ্রি শিবেরই লীলাভূমি। সেই চাকচক্যনিভ মুখের উর্দ্ধে অর্ধচন্দ্রের সূচাক দীপ্তি—তীহার তৃতীয় চক্ষু।

ভারতের ধর্মলক্ষ্মী বড় গুহানো মেয়ে। এখানে যিনি যাহা কিছু ভাল লইয়া আসেন, তিনি তীহার একটা ভাগ নৈবেদ্যস্বরূপ তুলিয়া রাখেন। বুদ্ধরাজপুত্র, তরুণ বয়সে জীবকষ্ট দেখিয়া সন্ন্যাসী, জীবের দয়া দেখিয়া জগতের দুঃখের ভার তিনি নিজের উপর লইয়াছিলেন। আর শিব রাজপুত্র নহেন, রাজ-রাজেশ্বর,—কৈলাসের স্বর্ণময়পুরী তীহার রাজধানী, তীহার কোবাগারের অধ্যক্ষ স্বয়ং বক্ষাধিপতি কুবের। বুদ্ধ—সন্ন্যাসী, শিব ভিখারী—চিতা শয্যা। জীবের ব্যাধায় ব্যাধিত বুদ্ধ পরম দয়ার বশবর্তী হইয়া জগৎ হইতে দুঃখ দূর করিবার জন্ত সঙ্কল্পিত। এদিকে যখন দেবগণ নিদারুণ মহনজাত সামুদ্রিক হলাহলে বিশ্ববিলুপ্ত হয় দেখিয়া শিবের শরণাপন্ন হইলেন, তখন তিনি সহানুভবনে সমস্ত বিষ স্বীয় কণ্ঠস্থ করিয়া জগৎ উদ্ধার করিলেন। তিনি সমুদ্র-মহনজাত কলতরু, অমৃত, কোম্বুড এই সকল বহুমূল্য দ্রব্যের কিছুই চান নাই,—তিনি ব্যাধিত জগতের বৃকের শৈল্য উদ্ধার করিয়া আসিলেন, পুরস্কার কণ্ঠের বিষ। এই বিষই তীহার অমৃত! পারিজাত দিয়া কি করিবেন! বিষের ফুল কাণে পরিলেন, সেই বিষাক্ত ধূসর পুষ্প, তীহার হৃদয়ের বিষহর, সমাহিত, শান্তির হাওয়া পাইয়া শুভ্র-জ্যোৎস্নার মত নিশ্চল হইয়া কাণে ফুটিল। তীহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারে, এমন কে আছে! বিষধর সর্পেরা, তীহার জটাজুট আশ্রয় করিয়া লইল, গর্জনশীলা গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গের ক্রীড়া অবিরাম সেই জটাজুটে চলিতে লাগিল। এই ভীষণ পরিবেষ্টনীর মধ্যে নিবাস্ত-নিরুপ্প্রদীপের মত শিব সমাধিমগ্ন। এই সমাধির সঙ্গে কাহার সমাধির তুলনা? শিব-সমাধি ভাঙিতে যাইয়া কামদেব ভগ্নাবশেষ হইয়া গেলেন।

তরুণ বুদ্ধ, বুড়ো শিবের কাছে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেহ কেহ বলিবেন, শিব একটা কল্পনামাত্র, বুদ্ধ জীবন্ত ঐতিহাসিক মূর্তি। ভারতবর্ষের মধ্যে শিব ও

বুদ্ধের মধ্যে কে যে কতটা কল্পনার সামগ্রী ইহার বিচার আরম্ভ করিলে তাহা সহজে শেষ হইবে না। কার্ন (Kern) প্রভৃতি অনেকাংশে কল্পনাজড়িত।

পণ্ডিতেরা বলেন—বুদ্ধ রাজপুত্র ছিলেন না, নেপাল-উপত্যকার কোন জননারকের পুত্র ছিলেন। তীহার মাতার গর্ভসময়ে সমস্ত দেবতারা অদৃশ্যভাবে উপস্থিত ছিলেন, তিনি অযোনিসম্ভব, মাতার কুক্ষি ভেদ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। ললিতবিস্তারে এ সম্বন্ধে বহুবিধ গল্প আছে। জাতকগুলিতো সমস্তই উপগল্প। অষ্টাষ্টমুত্ত, সামান্ত্র-ফলমুত্ত প্রভৃতি পুস্তকে বুদ্ধের স্বীয় উক্তি বলিয়া যে সকল কথা প্রচলিত আছে—

তাহা ঐতিহাসিকগণ তাঁহার উক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। কোন জন্মে বুদ্ধ হংস ছিলেন, কোন জন্মে তিনি বানর ছিলেন, কোন জন্মে সারস পক্ষী ছিলেন, ইত্যাদি জাতক-কথিত বহুবিধ উপাখ্যান সহস্র সহস্র মাধ্যমিক মহাযান সম্প্রদায়ের বোদ্ধেরা বিশ্বাস করেন। বস্তুতঃ বুদ্ধজীবনী-সাহিত্য এক অদ্ভুত ও বিরাট কল্পনারাজ্য। শিবের মধ্যেও কি কিছু সত্য নাই? হয়ত কোন আদিযুগের এক বুড়ো সাপুড়ে শিলা বাজাইয়া বাঁড়ের উপর চাপিয়া হিমাচলের কোন প্রদেশ হইতে আসিয়া আদিগল্পের ভিত্তি গড়িয়া গিয়াছিলেন, সেই ভিত্তির উপর কি অপরূপ এক পারমার্থিক মন্দির নির্মিত হইয়াছে। বুদ্ধসম্বন্ধে এত উপকথা প্রচলিত হইয়াছে এবং হিউনসাঙ্গের মত পণ্ডিত বৌদ্ধগণও এই উপকথার এত বাহুলা সৃষ্টি করিয়াছেন যে হিন্দু দেবদেবীগণের সঙ্গে তাঁহার এখন আর কোন বিশেষ ব্যবধান রাখেন নাই। ঐতিহাসিক বুদ্ধ ও কালনিক শিব এখন প্রায় এক পঙ্ক্তিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

কিন্তু বুদ্ধ সে বিশাল চাল-চিত্র কোথায় পাইবেন, বাহা বুড়ো শিবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। স্বর্গমর্ত্যপাতাল শিবের লীলাভূমি, কোন স্থানে সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া অনাদি লিঙ্গ উঠিয়াছে, কোথাও দুর্জটের জটায় গঙ্গার তরঙ্গ-ভঙ্গ-কম্পিত বিশাল জলপ্রপাত পড়িয়াছে; সে স্রোত ঐরাবতকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, গিরিকন্দর শৈলশৃঙ্গ বিদলিত করিয়া ছর্নিবার গতিতে ছুটিয়াছে। শিবের জটায় একটি কেশও সেই ভীষণ জলাঘাত নাড়াইতে পারিতেছে না। শিব তাওব, বাহাতে বিশ্ববিলয় হয়, তাহার উদাস্তকল্পনা মানুষকে যতটা উদ্বোধিত ও কবিত্বের প্রেরণাব্যুক্ত করিতে পারে, বুদ্ধ তাহা কোথায় পাইবেন? শিবের সমাধিতে যুগ যুগ অতীত হইয়া যায়, দেবতারা সেই সমাধিস্তম্ভের অনতিদূরে কৃতাজ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। বুদ্ধের নির্দোষ কি ইহার কাছে লাগে? শিব বিশ্বের বিষ দূর করিবার জন্ত স্বয়ং বিষভক্ষণ করিয়া নীলকণ্ঠ। মার বুদ্ধকে ছলনা করিতে আসিয়া পরাস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কৈলাস-শিখরে কাম ভস্মীভূত। বাহা কিছু বুদ্ধের গরিমা তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া শিবে আরোপিত। কিন্তু শিবের আনন্দ বুদ্ধ কোথায় পাইবেন? শিবের আনন্দের পর-পার নাই, তাঁহার কণ্ঠের বিবাক্ত ধ্বস্তর পুষ্প আনন্দ-নির্মল শুভ্র হাথে সতত উদ্বদ্ধ; তাঁহার কণ্ঠে হাড়মালা, অঙ্গে চিতার বিভূতি, দেহবেষ্টী ভীষণ উরগ ও ব্যাঘ্রচর্ম, এ সমস্তের মধ্যে ভীষণত্ব বা ঘৃণার কিছুই নাই। মন্তুকোঙ্কের অর্কচন্দ্রের প্রসন্ন জ্যোতিতে, আনন্দময়ের দ্বৈত-কুক্ষিতাধরের মুহূর্ত্তে তাহার নূতন গৌরব লাভ করিয়া আনন্দহচক হইয়াছে। এই জগতের ব্যাধার পরমব্যাপী নীলকণ্ঠ শিব—এই মহাভিক্ষু, রত্নকাঞ্চনবিলাসত্যাগী মহাবোগী—সমস্ত ঘৃণোর শোধক মহানির্ঘণ,—আভিজাত্য ও দেবগৌরব-বিসর্জনকারী মহা অপাণ্ডিত্য,—এই দ্বিগুন, বিবাণ-ডমরু-গণ্ড-বাদক, মহাভয়ের মধ্যে চির অভয়—মৃত্যুর মধ্যে অমর—এই শিব,—হিন্দুর অধ্যাত্মরাজ্যের কর্তা—ঠাকুরের ঠাকুর।

বুদ্ধ ভিক্ষু—শিব ভিক্ষু, বুদ্ধ উপদেষ্টা—কৈলাসশিখরে সমাসীন শিবও উপদেষ্টা। বুদ্ধ

যারজয়ী—শিব কামভঙ্গকারী, বুদ্ধ নির্দোষালোক প্রাপ্ত বোগী—শিব নির্দোষকর সমাধিময়, বুদ্ধ জগতের দুঃখে দুঃখী—শিব জগৎ-উদ্ধারের জন্ত কঠে কালকূট ধারণ করিয়াছেন। তরুণ বুদ্ধ—বনাম যুগযুগান্তের বুদ্ধ শিব। পুরাণকারেরা শিবকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গঠন করিলেন। আর তাঁহার সংহারমূর্তি নাই, বেদের রক্তদেব আনন্দস্বরূপ যোগিরাজ হইলেন—তাঁহার তাণ্ডব হইল আনন্দনর্তন—প্রেম-পাগলের প্রমত্ত আনন্দোৎসব।

বুদ্ধ ঐতিহাসিক চিত্র, আর শিব পুরাণের কল্পনা। পুরাণকারেরা চিরদিনই অধ্যাত্ম জীবনের উপর বেশী জোর দিয়াছেন, বাস্তব জীবনের ইতিহাসকে তাঁহারা ততটা গ্রাহ্য করেন নাই। শিবের গোড়ায় যে কোন বাস্তব সত্য নাই, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। এখনও হিমালয়ের কোন

বৌদ্ধ ও শিবের আদর্শ-
নামা।

উপত্যকায় ডমরু বাজাইয়া সাপ গায়ে জড়াইয়া বুঝভাসনে তুবার-কুন্দ-কাস্তি কোন কোন জাতি চলাফেরা করিয়া থাকে, তাহাদের কোন স্তম্ভ আদি পুরুষ বিযাগ-বাদনে দিক্ প্রকম্পিত করিয়া আখ্যাদের মণ্ডলীর মধ্যে হস্ত কোন কালে একটা বিশিষ্ট আসন লইয়াছিলেন,—সুতরাং মূলে কিছু বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক সত্য ছিল,—তাঁহার উপর যুগ যুগ ধরিয়া পুরাণকারেরা রং ফলাইয়া একরূপ এক রক্ত-গিরিনিভ চারুচন্দ্রাবতঃশ ব্যাঘ্রচন্দ্র-পরিহিত নিখিল ভয়-হরণ, প্রসন্ন পদ্মাসীন মহাযোগীর মূর্তি আঁকিয়া ফেলিলেন যে, বুদ্ধ তাঁহার কাছে নিম্নত হইয়া গেলেন। বস্তুতঃ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বুদ্ধ শেষকালটায় জাতকের গল্পে নানাজন্মে নানারূপ জীবজন্তুর অবয়বে পরিকল্পিত হইয়া অবশেষে যে আকার গ্রহণ করিলেন, তাহাতে বুদ্ধদেবের বাস্তবতা ও শিবের কাল্পনিক কাহিনীর মধ্যে বেশী তারতম্য রহিল না; ললিতবিস্তরে বুদ্ধাবির্ভাব অবহিত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতারা গর্ভবতী যাদ্যাদেবীর চতুঃপার্শ্বে আনাগোনা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ অযোনিসম্ভব, তিনি মাতৃকুক্ষি ভেদ করিয়া অবতীর্ণ হন, এমন কি পালি অথর্ঠসূত্রে ও সামান্তফলসূত্রে বুদ্ধের মুখে যে সকল কথা আরোপ করা হইয়াছে, হিউনসাঙ্গ তাঁহার অগ্নিমা-লখিমা শক্তির যে সকল গল্প লিখিয়া গিয়াছেন—লঙ্কাবতারসূত্রে বুদ্ধের লঙ্কায় গমনসম্বন্ধে যে সকল অলৌকিক আখ্যান কীর্তিত হইয়াছে—তাহা প্রায় সকল বৌদ্ধ বিশ্বাস করেন। এই সকল গল্পে আত্মবান্ লোকদের সঙ্গে শিবোপাসকদের পার্থক্য কোথায়? জাতকগল্প ও পুরাণ-আখ্যানগুলিতে প্রভেদ কি? বুদ্ধ যে সকল নিয়ম ও উপদেশ দিয়াছেন, নানা পুরাণে নানা তরঙ্গ শিবোপদেশ তদপেক্ষা গুরুত্ব নূন কিমে? সুতরাং জাতক প্রভৃতি বৌদ্ধ-সাহিত্য ও হিন্দুর তন্ত্র-পুরাণ প্রায় এক পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইল। ঐতিহাসিক বুদ্ধের উপর ক্রমাগত রং ফেরান হইতে লাগিল এবং বৈদিক শিবও ঠিক একস্থানে তুচ্ছীকৃত হইয়া থাকিলেন না।

ভারতবাসীর চক্ষে বুদ্ধ ও শিব প্রায় এক শ্রেণীর দেবতা হইয়া পড়িলেন। হীনযানীরা সরিয়া পড়িলেন, কিন্তু মহাযানীরা ভারতবর্ষের ধর্ম স্বীকার করিয়া বুদ্ধকে তাঁহার স্বদেশে আরও কতকদিন টিকিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে যেরূপ পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতি আকাশের দিগ্বলয়ে মিশিয়া যায় এবং পূর্ষাকাল সিন্দুরে রঞ্জাইয়া দিনদেবতা শত

রশ্মির শর-নিকরে সমস্ত কুহেলিকা দূর করিয়া জগতে আবির্ভূত হন, বুদ্ধ সেই ভাবেই অস্ত গেলেন এবং শিব সেই ভাবেই বুদ্ধের সমস্ত শক্তি ও প্রভাব নিঃশেষে আহরণ করিয়া তাঁহাকে হঠাইয়া দিলেন। রামচন্দ্র যেরূপ পরশুরামের ভাগবত তেজ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ যেরূপ শিশুপালের বৈষ্ণবীশক্তি লুপ্ত করিয়া সুদর্শন-চক্র-দ্বারা তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিলেন, শৈবধর্ম সেই ভাবে বুদ্ধের সমস্ত শক্তি নিঃশেষে আয়ত্ত করিয়া বৌদ্ধধর্মকে ভারতবর্ষে একেবারে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলিল।

পুরাণকারেরা বুদ্ধের সমস্ত বিভূতি শিবে প্রয়োগ করিয়া দেবাদিদেবের মূর্তি উজ্জ্বল করিলেন, সুতরাং এই নবগঠিত শিবমূর্তির নিকট বুদ্ধদেবের মূর্তি নিপ্রভ হইয়া পড়িল।

কিন্তু বুদ্ধ ভারতবর্ষকে যে দান দিয়াছিলেন, শিব কি শুধুই তাহা দিয়া ক্ষান্ত হইলেন? বুদ্ধ দিয়াছিলেন—ভিক্ষুর ত্যাগ, ইন্দ্রিয়-সংযম, কামনার বিলোপ এবং নির্ক্ষাণ—জীবমঙ্গলের জন্ত। আমরা দেখিতে পাইলাম, শিব এ সমস্ত গুণই আত্মসাৎ করিয়া বুদ্ধমূর্তি দান করিয়া ফেলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শৈব ধর্মের অভিনব দান

কিন্তু শিব এই সকল গুণ ছাড়া আরও তিনটি বিষয়ে বুদ্ধকে ডিঙ্গাইয়া গেলেন। তাঁহার নূতন তিন গুণের—প্রথমটি আনন্দ, দ্বিতীয়টি গার্হস্থ্যশ্রম ও তৃতীয়টি ব্রহ্মজ্ঞান।

বৌদ্ধধর্ম আনন্দ-হীনের ধর্ম—জগতের অত্যন্ত দুঃখাভিঘাতে অভিভূত মানবের পরিত্রাহি তিনটি গুণ।

আর্তনাদ; কামনার বিলোপে যে নির্ক্ষাণ, তাহাতে প্রশান্তি আছে

—কিন্তু তাহাতে আনন্দ নাই। এই আনন্দ-হীনতার জন্ত উত্তর-

কালে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অপর নাম নাস্তিকতা হইয়াছিল।

শৈব-সমাধি আনন্দ-সাগরে ডুব দেওয়া, ইহাতে দুঃখের হাত হইতে পলায়নের ইচ্ছা নাই, কলানিধির পূর্ণত্ব যেরূপ সমুদ্রকে আকৃষ্ট ও ক্ষীত করে, ব্রহ্মানন্দ সেইরূপ আত্মাকে আকর্ষণ করিয়া তাহাতে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে। ইহা আত্মহারার আনন্দ,

আনন্দ।

ইহা সংসারকে জালাবজ্রণার কারাগার মনে করিয়া সংসার-কারাগার

ভাঙ্গিবার ইচ্ছা-প্রসূত নহে; ইহা আধ্যাত্মিক জগতের অনাগত বংশীরবের আহ্বান।

বুদ্ধদেব পুনঃ পুনঃ সংসারাপ্রমকে হীন মনে করিয়াছেন। “সাম্যফলমুত্তে” বুদ্ধদেবের এ সম্বন্ধে অজাতশত্রুর প্রতি উপদেশ অতি সুস্পষ্ট, সন্ন্যাসীর স্থান গৃহাশ্রম হইতে উচ্চ। ঋষি গৃহী হইতে বড়,—গৃহী বত বড় অনাসক্তই হউন না কেন। বুদ্ধ তাঁহার সজ্ঞে দ্রৌলোকের

স্থান প্রথমতঃ রাখেন নাই ; শেষে বহু অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহাকে অশীতিপর্য্যবৃত্তা মহাপ্রজাবতীর জন্ত দ্বার খুলিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। শৈবধর্ম গৃহকে পুণ্যানিকেতন করিয়া দেখাইল— গৃহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। অন্নপূর্ণা গৃহিণী ও গৃহস্থ শিব আদর্শ দাম্পত্যী। সে দাম্পত্য কত বড় তাহা পুরাণকারেরা নানাভাবে দেখাইয়াছেন। শিবের স্তায় স্বামী পাইবার জন্ত গৌরীকে বহু তপস্তা করিতে হইয়াছিল ; তপঃশীর্ণা, সূচির-সাধনাক্রান্তা, তবী গৌরী দাম্পত্যের আদর্শ স্ত্রীমূর্ত্তি। গৌরী স্বামিনিন্দায় প্রাণত্যাগ করিয়া একনিষ্ঠ দাম্পত্যের চূড়ান্ত দৃশ্য দেখাইয়াছিলেন। শিব মৃত গৌরীদেহ যুগযুগ স্বন্ধে করিয়া মহাপ্রেমে নৃত্য করিয়াছিলেন। এদিকে কৈলাসে শিবভূগার সংসারে—আদর্শ পারিবারিক জীবন প্রতিবিম্বিত। ভিক্ষুকের অন্নখালার অন্নপূর্ণা,—শিবের ঘাঁড়, স্বীয় বুড়ো সিংহ, কার্তিকের ময়ূর, গণদেবের ইন্দুর ও লক্ষ্মীর পেচক এবং ভৃত্য নন্দী-ভৃঙ্গী ও পুত্রকল্যাণগণকে পরিবেশন করেন। সিদ্ধি ও ভান্ন বাটিতে বাটিতে হিমরাজের কলার হাতে কড়া পড়িয়াছে, তথাপি তাঁহার প্রসন্ন প্রেম-গন্ধিত ধর্ম-পত্নীর ছবি ও মাতৃমূর্ত্তি নিরুপম আনন্দের আধার। এখনও হিন্দুর ঘরে ঘরে গৃহিণীমুখে সেই অন্নপূর্ণার ত্র্যম্বকসহনক্ষমা অপূর্ব্ব সেবা ও ত্যাগের প্রভা খেলিয়া যাইতেছে। এদিকে শিবের শত প্রেম সত্ত্বেও তিনি ত্যাগী-উদাসীন—যে মুহূর্ত্তে গৃহাশ্রম তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে, সেই মুহূর্ত্তে আবার চিত্তাগ্নির বিরাগ তাঁহাকে সমভাবেই আকর্ষণ করিতেছে। একদিকে গৌরীর কোমল-বল্লরীসমা ভুজলতা তাঁহার কণ্ঠ বেড়িয়া ধরিয়াছে, অপরদিকে বিষধর সর্প তাঁহার অপর স্বন্ধে ফৌঁস ফৌঁস করিতেছে। এই অনাসক্তির মধ্যে আসক্তি, বিরাগের মধ্যে রাগ—ভাব-সমাধির পার্শ্বে অগাধ দাম্পত্য-প্রেম—এই ত্যাগের মহিমামণ্ডিত গৃহীর চিত্র—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর শুদ্ধ আনন্দহীন নীরস কঠোরতর করিয়া লোকচক্ষে উপস্থিত করিল এবং এই ধর্মের প্রতি সকলকে বিতুষ্ট করিল। বুদ্ধদেব যাহা দেন নাই, পুরাণকারের নবমুঠ শিব এখানে তাহা মুক্ত হস্তে পরিবেশন করিলেন।

বৌদ্ধধর্মে আস্তিকতা নাই। বুদ্ধদেবকে ছাপাইয়া ভক্তের পূজার ধূপ ঘোঁয়া আর উপরে উঠিল না। সেই বুদ্ধদেবও বলিলেন, কেহ কিছু করিতে পারিবে না, তোমার নিজের উপকার নিজেকেই করিতে হইবে। কর্ম্মফল অহুস্তীর্ঘ্য, অখণ্ডনীয় ও অমোঘ। পূজা কর কর্ম্মের—মন্দিরে ঘণ্টা বাজাইলে তোমার পাপতাপ ঘুচিবে না।

শিব-সমাধি আনন্দলোকের পূর্ণ ইঙ্গিত, তাহা শুধু কামনা-জয় নহে ; কামনা-জয়ের পরে কোন অনাস্বাদিত স্বপ্নের স্পষ্ট আভাস তাহাতে আছে। আত্মার মধ্যে যে পরমাত্মা তাহার স্বরূপদর্শন, “মনো নবদ্বারনিবিকল্পিত আত্মানমাত্মজ্ঞবলোকয়ন্তম্” এই শিবকে আমরা পাইলাম। স্মৃতরাং দেখা যাইতেছে শৈবধর্ম বুদ্ধের এক একখানি করিয়া সমস্ত ভূষণ হরণ করিয়াই ফান্ত হইয়া নাই, ইহা বৌদ্ধধর্মের দত্ত ঐশ্বর্য্য হইতে আরও কিছু বেশী অধ্যাত্মসম্পদ এদেশকে দিয়াছিল—বাহাতে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্জের পরিবর্ত্তে “হর হর” রবে ভারতের দিগ্দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

এদিকে অতিশয় সূক্ষ্ম-চিন্তা ও বিচারবৃত্তির ফলে বৌদ্ধধর্ম লোকের নিকট ক্রমশঃ

নাস্তিকের ধর্মরূপে পরিচিত হইতে লাগিল। বিদ্বন্মোদ-তরঙ্গিণীতে ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন মত বধায়ক রূপেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, “বদভাষা ও সাহিত্য” পুস্তকে (ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ১০২) আমরা তাহা দেখাইয়াছি। শেষদিকে বৌদ্ধধর্মে ভাবজগতে যে উন্নয়ন মক্কাভূমির সৃষ্টি করিয়াছিল, পুরাণকারেরা তাহাতে রসের অমৃত ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষকে সেই যুগে কেহ জোর করিয়া এক ধর্ম হইতে অন্য ধর্মে প্রবর্তিত করে নাই; দ্বীয় আকর্ষণী বলে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম নিরুক্তি-মূলক। আত্মাত্মিক দুঃখ-নিবারণ ইহার মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য লইয়াই কপিলবস্তুর রাজকুমার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া অরণ্যচারী হইয়াছিলেন। লালসার মূল যতদিন থাকিবে, ততদিন মানুষের দুঃখ অপরিহার্য। কাম-ক্রোধাদি রিপূর শিকড় পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলিয়া মানুষকে অনড়, অটল ও নিদ্রম্প একটি পামাণ-প্রতিমার মত করিয়া গড়িতে হইবে। যাহা কিছু জীবনের উপভোগ্য তাহা সমস্ত কাড়িয়া লওয়া হইল। বৌদ্ধধর্ম কঠোর চিকিৎসকের মত ভবরোগীর ঘরে হানা দিয়া তাহাকে সর্ববিষয়ে নিবৃত্ত করিয়াছিল, কিন্তু এই ধর্ম দিয়া গেল কি? নির্ঝণরূপ মহাশূন্ত, বাহাতে মানুষের বধাসর্বস্ব লুপ্ত হইয়া একটা শূন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে। একটি মাত্র নৈতিক দান এই ধর্মের অঙ্গীয় ছিল, তাহা দয়া, দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি। একটি অশ্রম মত, একটি অপার্থিব কুণ্ডলের মত এই দয়াবৃত্তি সঙ্কল্পের শ্রী উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু নির্ঝণ-প্রাপ্তির পর সে দয়াও বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং লৌকিক বিশ্বাসে বৌদ্ধধর্ম যে নাস্তিক-বাদের অপর নাম হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

উন্নত নৈতিক জীবন, আত্মাত্মিক দুঃখনিবৃত্তিই কি মানুষের সম্যক্ পরিভূষণ দিতে পারে? প্রকৃতিতে চারিদিকেও ‘নেতি-নেতি’র ব। এত সুন্দর হইয়া গাছের ডগায় ফুলটি ফুটিল, কিন্তু দু’দিনের দেখা-শোনার পরই সম্বন্ধ চুকিয়া গেল, প্রকৃতি ‘নেতি-নেতি’ বলিয়া তাহা বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন; আকাশে উজ্জ্বল তারাটি ফুটিল, রাত্রি অবসানে প্রকৃতি আকাশ হইতে তাহা মুছিয়া ফেলিলেন, অপোগণ্ড শিশুর মুখের স্বর্গের হাসি চিতায় ডালি দিলেন। প্রকৃতি কত বীণা, কত প্রতিভা, কত ক্ষমতা, কত হেলেন, কত নারদ, কত অফিয়াস, কত তিলোত্তমা, কত অর্জুন ও আলেকজান্ডার মানব জগতে অপূর্ণ রং দিয়া আঁকিয়া ‘নেতি-নেতি’ বলিয়া তিষ্ঠিতে দিলেন না। মহাশূন্তের ক্রোড়ে এই ‘নেতি-নেতি’র চিরকাল ধ্বনিত হইতেছে। বৌদ্ধধর্মের মূল নীতি কি এই শূন্যবাদ—বাহা আছে তাহা অনিত্য—সুতরাং ধ্বংসই শ্রেয়?

কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যে আর একটি সামগ্রী আছে তাহাও তো উপেক্ষণীয় নহে। আনন্দ বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে, এই আনন্দ নশ্বরকে অবিনশ্বর করিয়াছে, শূন্যকে অবিশ্রান্ত অন্ধপাত-দ্বারা নিরর্থক করিতেছে। নিত্য রাত্রে চোখ বুজিলেই জগৎ লয় হইয়া যায়—অন্ধকারের গর্ভে—মহা শূন্যে। কিন্তু আবার প্রত্যয়ে জাগিলেই দেখি, কিছুই তো যায় নাই। যাহা গিয়াছে তাবিয়াছিলাম, তাহা স্মৃতির সঙ্গে দ্বিগুণ সাজসজ্জায় চমুর কাছে নিজের সজ্জা

প্রমাণ করিয়া ঝলমল করিতেছে। আনন্দ এই নিত্যচঞ্চল ধ্বংসশীল জগতের চিরস্থায়ী মেরুদণ্ড, চঞ্চলের সঙ্গে—অনিত্যের সঙ্গে নিত্যবস্তুর সেতুবন্ধন। বৌদ্ধধর্মে এই আনন্দ নাই, কারা ও হাহাকার আছে—হয়ত নির্ঝাঁপ-বারিপ্রক্ষেপে তাহা ধামান যায়; কিন্তু কুংপিপাসার জ্ঞাত্তা যেরূপ অন্নজলের দরকার—তুধু হরীতকী চিবাইয়া উহা নিবারণ করা যাইতে পারে—কিন্তু মানব-মন যে পরম-পরিতৃপ্তি চায়—চঞ্চল ছোট ছোট তৃপ্তি যে স্থায়ী মহাতৃপ্তিকে ইঙ্গিত করে, সেকথা বৌদ্ধধর্মে বলে না। নির্ঝাঁপ ও সমাধিতে এই প্রভেদ। যদি নির্ঝাঁপ শূন্যবাদ হয়, তবে পূর্বেই বলিয়াছি শিব-সমাধি আনন্দসাগরে ডুব দেওয়া।

শৈবদিকের শৈবধর্ম—বঙ্গীয় বৈষ্ণব-যুগের অগ্রদূত। গৌরীর সঙ্গে শিবের যে সকল প্রেমলীলা আমরা রাজাদের তাম্রফলকের স্তোত্রে বর্ণিত দেখিতে পাই এবং সেই যুগের শিব ও গৌরীর পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ প্রস্তর-নির্মিত যুগলরূপ দেখিতে পাইতেছি, তাহা রাধাকৃষ্ণের লীলার আদি যুগের সূচনা করে। বুদ্ধদেব যেরূপ বেদের ব্রহ্মদেবকে সোম্য, শান্ত সমাধির গড়ন দিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে হরগৌরীর প্রেম সেইরূপ রাইকান্থুর বিচিত্র লীলার প্রথম অধ্যায় অবধারিত করিয়াছিল। বুদ্ধদেব শিবকে তাঁহার উত্তরাধিকারী করিয়া স্বীয় সিংহাসনে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া বিদায় লইলেন। শিবও তজ্জপ কৃষ্ণকে স্বীয় প্রেমের বিভূতি প্রদান করিয়া এদেশ হইতে বিদায় লইলেন। শিবের গার্হস্থ্যধর্ম, স্বপত্নীকে ধর্ম-উপদেশ—ইত্যাদি বাহ্য উপাদানগুলি পরিহার করিয়া—তদীয় প্রেমের পরিপূর্ণভাব কৃষ্ণ উত্তরাধিকারসূত্রে গ্রহণ-পূর্বক প্রেমের বস্তার এ দেশকে ভাসাইরাছিলেন। এই বস্তার আদি সূচনা শৈবধর্মে।

এই ভাবে বৈদিক ব্রহ্মদেবতা পরবর্তী বৌদ্ধযুগে বুদ্ধের গুণগুলি গ্রহণপূর্বক জ্ঞানীর আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন;—শিব ক্রমশঃ জ্ঞানের এলাকা ছাড়িয়া প্রেমের পথে অগ্রসর হইলেন—এবং যখন হরগৌরীর যুগলমূর্তিতে এই প্রেম কতকটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, তখন রাধাকৃষ্ণ বঙ্গের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই প্রেমের পরিপূর্ণ পরিণতি প্রদর্শন করিলেন। দুঃখের বিষয় হরগৌরীর যে অপূর্ণ প্রস্তর নির্মিত যুগলমূর্তি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় পাওয়া যায়, প্রতিমা-বিদ্যেবীদের দ্বারা প্রস্তরশিল্প ধ্বংস হওয়ার দরুন বঙ্গদেশের সেই নিকষিত হেমতুল্য সম্যক পরিণত প্রেমের স্বর্গীয় প্রতিচ্ছবি প্রস্তরে অঙ্কিত বা গঠিত দেখিতে পাই না। শিল্পে সেই প্রেম-পরিণতি না পাইলেও আমরা অতুলনীয় বৈষ্ণব-পদে তাহা পাইয়াছি।

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

গুপ্ত সাম্রাজ্য

“সোহম্যাজন্যশুকানামাকলোদয়কর্মণাম্ ।
 আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরধবস্বনাম্ ॥
 বধাবিধিতাগ্নীনাং বধাকামাচ্ছিতাধিনাম্ ।
 বধাপরাধদণ্ডানাং বধাকালপ্রবোধিনাম্ ॥
 ত্যাগায় সমুত্তার্থানাং সত্যায় মিতভাধিনাম্ ।
 বশসে বিজিগীষুণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্ ॥
 শৈশবেহভ্যাস্তবিজ্ঞানাং যৌবনে বিষয়েধিনাম্ ।
 বার্কিকে মুনিবৃন্দীনাং যোগেনাস্তে তনুতাজাম্ ॥
 —অযয়ং বক্ষ্যে তনুবাগিভবোহপি সন্ ।
 তদুগ্ধৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ ॥”

—রঘুবংশ ।

অন্ধ্র ও শক নৃপতিগণ এবং ধর্ম-প্রতিযোগিতা

অন্ধ্র নৃপতির বহুকাল আর্ঘ্যাবর্তে প্রবল ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা মগধ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন কিনা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ইহারা গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী তেলিঙ্গনা প্রদেশের লোক ছিলেন এবং তেলেগু ভাষায় কথা বলিতেন। গৌতমপুত্র জ্ঞানত্ৰী ইহাদের সর্বপ্রধান রাজা ছিলেন, তাঁহার রাজত্বকাল ১৬৬ খৃঃ—১৯৬ খৃঃ। ২২৫ খৃঃ অব্দের পর ইহাদের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অনেক স্থানে “তেলেঙ্গা” সৈন্তের উল্লেখ আছে। মুতাকরিণে দৃষ্ট হয় সৈন্তমাত্রই বঙ্গদেশে “তেলেঙ্গা” নামে অভিহিত হইত, তেলিঙ্গনা সৈন্তের এক কালে ব্যাপক-প্রভাবের ইহা প্রমাণ। আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, অন্ধ্র-প্রদেশের শৈবধর্মের দ্বারা বাঙ্গলার বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, সুতরাং বাঙ্গলার শিকাদীক্ষায় এই তেলেগু ভাষীদের একটা অবদান ও অন্তরঙ্গতা আছে—তাহা পরে আমরা দেখাইব।

অন্ধ্রপ্রাধিক, ৩৩ খৃঃ পূঃ—
 ২২৫ খৃঃ।

মুদ্রবংশের ক্ষমতা-বিলোপের এবং গুপ্ত-অভ্যুদয়ের পূর্বে আমাদের পূর্বাকালের ইতিহাস কতকটা তমসাচ্ছন্ন। এই সময়টার মধ্যে পশ্চিমদিকে বক্ত্রিয়ার গ্রীক শাসনকর্তারা খুব শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন; মৌর্যবংশের শেষ দিক্টায় ইহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং আরও ক্ষমতাশালী হইয়া পাক্কা পথ দখল করেন। গ্রীকবীর এ্যাটিওকাসের হস্তে পাজাব ও কাবুলের অধিপতি সুভাগসেনা পরাজিত হইয়া বহু উপঢৌকন ও রাজস্ব প্রদান করিয়া সন্ধিসন্ধি আবদ্ধ হন। বক্ত্রিয়ার চতুর্থ রাজা ডেমিট্রিয়াস এত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন যে তিনি “ভারতবর্ষের অধিপতি” নামেও পরিচিত ছিলেন। ক্রমে চীনদেশের পশ্চিম প্রান্ত হইতে ‘যুই-চি’ নামক এক বৃহৎ সম্প্রদায় দক্ষিণদিকে অবতরণ করিয়া বক্ত্রিয়া দখল করেন। তাঁহাদের রাজা কাডফিসেস ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ অধিকার করিয়া অগ্রসর হন। দ্বিতীয় কাডফিসেস এত প্রবল হন যে তিনি চীনদেশ অধিকার করিবার ছরাকাজ্জা পর্যন্ত পোষণ করিয়াছিলেন। তিনি চীন সম্রাটের কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব পর্যন্ত করিয়া পাঠাইয়া শেষে বিশেষ লাঞ্চিত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় কাডফিসেসের পর শকরাজ কণিক প্রায় সমস্ত আর্যাবর্ত অধিকার করেন (৭৮ খৃঃ)। কণিকের পর তৎপুত্র হবিদ,—তাঁহার পর বাসুদেব কণিক, হবিদ প্রভৃতি সম্পূর্ণ হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়া স্বীয় শকবংশীয় উপাধি পরিত্যাগ করেন।



কণিক
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)



হবিদ
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

শারীরিক শক্তিবলে যাহারা বাহির হইতে এদেশ দখল করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার সনাতনী-শক্তি-প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া এ দেশের ধর্ম ও আচার

গ্রহণ করিলেন। হিন্দুর এই বিজয়কথা স্পষ্টাক্ষরে ইতিহাসে লিখিত আছে। এই রাজাদের কোন কোনটির মুদ্রায় বৃষভ ও ত্রিশূল লাঞ্জন শিবমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রীকরাজ মিনাওর পূর্বাঞ্চলটা অধিকার করিতে যাইয়া পুষ্যমিত্রের হস্তে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এ্যান্টিয়াকিডাসের দূত গ্রীক তক্ষশীলাবাসী হেলিওডোরাস বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করিয়া গুরুভক্ত প্রতীতি করেন। দ্বিতীয় কাডফিসেস শৈবধর্মে আস্তা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার মুদ্রার একদিকে তাঁহার মূর্তি অপরদিকে বৃষভারূঢ় মহাদেবের চিত্র অঙ্কিত আছে। (অক্সফোর্ড ইতিহাস—ভিনসেন্ট স্মিথ, ১২৮ পৃঃ।) পার্শিয় রাজা গণ্ডফারনেসের মুদ্রায়ও শিবমূর্তি অঙ্কিত দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় কাডফিসেস এবং কণিক উভয়ের মুদ্রায় শিবের চতুর্ভুজ, দ্বিভুজ এই দুই মূর্তিই পাওয়া যাইতেছে। কণিকের কোন কোন মুদ্রার একপার্শ্বে বুদ্ধমূর্তিও দৃষ্ট হয়।

কিন্তু কণিক শিবভক্ত হইলেও বৌদ্ধধর্মেরই গোড়া ছিলেন। ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে ইহাদের ভারতীয় ধর্ম ও উপাধিগ্রহণ।
বৌদ্ধধর্ম—বিশেষ মাধ্যমিক মহাবান কোন কালেই শিবকে বাদ দেয় নাই। কণিকের পৌত্র বাহুদেব নিজের শক উপাধি পর্যাঙ্ক ত্যাগ করিয়া ভারতীয় নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইভাবে দৃষ্ট হইবে বহু বিদেশী গ্রীক, পার্শিয়, যুইচি, কুশাণ ও শক ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে বৌদ্ধধর্মের দেশ-বিদেশে বহুল প্রচারের দরুন ইহা ভারতীয় স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে নাই। এদিকে “হীনযানীরা” বুদ্ধের মতগুলি বিশেষভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে তাঁহাদের মতের বিস্তৃতি-লাভপক্ষে অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল। অশোকের পর কণিক বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করিয়া তাহা আরও উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই জন্ত তিনি পুনরায় বৌদ্ধসভা আহ্বান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃত হইয়া ইহা যে আকার ধারণ করিল, তাহাতে ইহা অনেক পরিমাণে হিন্দুমত গ্রহণ করিল। এই নবগঠিত উদারপন্থী বৌদ্ধধর্মের নাম হইল মহাবান। এখন চীন, জাপান, ভারতবর্ষ, নেপাল, ভূটান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ সকলেই মহাবান-পন্থী। যাহাকে হীনযান নামক নিম্নিত উপাধি দেওয়া হইয়াছে, তাহা সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্রাম প্রভৃতি দেশে প্রচলিত। কিন্তু এই দুই নাম সম্প্রতি পরিকল্পিত হইয়াছে এবং একদেশদর্শীরা হীনয ও মহাবুদ্ধের যে স্মৃতি করিয়া নাম-সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহা সর্বসম্মত নহে।

বৌদ্ধধর্মের নবসংস্কার হইলেও উত্তরোত্তর ইহার শক্তি ভারতবর্ষে কমিয়া আসিতে লাগিল। রামায়ণের আকর্ষণ ভারতবাসীর পক্ষে অনিবার্য হইয়া উঠিল। অশ্বমেধের বৃদ্ধ-চরিত্র অপেক্ষা রামায়ণ-কাব্য ভারতবাসীর মন বেশী আকর্ষণ করিল। মহাভারত ক্রমশঃ কেন্দ্রবর্তী করিয়া নব ব্রাহ্মণ্যের ব্যাখ্যা প্রদান করিল। এই মহাপ্রবন্ধের বিরাট আদর্শ, আখ্যান-গৌরব, আধ্যাত্মিক বৈজয়ন্তী নূতন ভাবে উত্তোলন করিল। বহুদিন যাগযজ্ঞের ধুমধাম ও যুগকাণ্ডে পশুহননজনিত উল্লাস—অশ্বমেধাদি যজ্ঞের দিগ্বিজয়ী উৎসাহ এদেশে নিরস্ত হইয়াছিল। পুষ্যমিত্র এই যজ্ঞাধি নূতন করিয়া প্রজ্জ্বলিত করিলেন। বৌদ্ধ-

দিগের ত্যাগ অপেক্ষা ক্ষত্রবীৰ্য্য পুনরায় অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। বৌদ্ধ সাম্যপ্রচারে ব্রাহ্মণগণ বর্ণগুরু বলিয়া স্বীকৃত হন নাই, এমন কি ধর্মগুরুর ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যাস। আসনও তাঁহাদের টলিয়া পড়িয়াছিল। অশোকের সময়েই কিংবা তাহারও পূর্বে হইতে শূদ্রাধিকারে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি লোকের আস্থা কমিয়া গিয়াছিল, তাঁহার অনুশাসনেই তিনি তাহা জানাইয়াছেন। “লোকগণ এখন ব্রাহ্মণ, প্রবীণ ও মাতৃপিতৃগণের প্রতি বীতস্পৃহ।” সজ্জের গুরুই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে পারিবারিক বন্ধন এই শিক্ষায় নিতান্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। সজ্জকে উচ্চতর স্থান দেওয়াতে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব কমিয়া গেল। অশোক একদিকে সজ্জের মাহাত্ম্য ও পদগৌরব ঘোষণা করিয়াছেন, অপরদিকে ব্রাহ্মণ ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। যে সকল ব্রাহ্মণ উচ্চতর ধর্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন, অশোক তাঁহাদের কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের এই গৌরব স্বীকার করিয়াও তিনি তাঁহাদিগকে কোন বিশিষ্ট পদ দেন নাই। চরিত্রভূষিত লোকেরই তিনি আদর করিয়াছেন ও জাতি-নির্কিংশেবে তাঁহাদিগকেই রাজসভার উচ্চতম পদ প্রদান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ কে? মহাভারতকার অনেকবার এই প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। (১) নহস যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, “যদি শূদ্রে সত্যাদি ব্রাহ্মণোচিত গুণ লক্ষিত হয়, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।” (২) যুধিষ্ঠির বংশগত-প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন যৌন-প্রবৃত্তি, জন্ম ও মরণ মানবজাতির সাধারণ ধর্ম, এই নিমিত্ত সর্বদা পুরুষেরা জাতিবিচারে বিমূঢ় হইয়া নারীতে অপত্যোৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব মনুষ্যজাতির মধ্যে সমুদয় বর্ণের এইরূপ শব্দরহবশতঃ ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি নিতান্ত দুর্জের। কিন্তু তত্বদর্শীরা তাহার মধ্যে “ঋত্বাক্ষরীয়া তাহারাই ব্রাহ্মণ”—এই আখ্য প্রমাণানুসারে বৈদিক ব্যবহারেরই প্রাধান্য অস্বীকার করেন। (বনপর্ব—১৭২ অঃ) (৩) কিন্তু অনুশাসনপর্বে

ব্রাহ্মণ কে? তিন যুগে
তিনরূপ ব্যাখ্যা।

দেখা যায়, “ব্রাহ্মণবংশে জন্মিলেই গুণনির্কিংশে তিনি পূজা পাইবেন” এই বিধান আছে। সমগ্র মহাভারত পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে, এই গ্রন্থে ভারতীয় অতি পুরাকালের সমাজ-নীতির আভাস থাকিলেও ইহা সঙ্কলিত হওয়ার সময়ে ব্রাহ্মণকেই সর্বপ্রধান স্থানে, এমন কি সর্বদেবতার উর্দ্ধে স্থাপন করিবার চেষ্টা আছে। এই ব্রাহ্মণ্য-গৌরবের ধ্বজা ধারণ করিয়া আছেন স্বয়ং ভৃগুপদ-লাহিত-বক্ষ ত্রীকৃষ্ণ। কিন্তু ঠিক মহাভারতের সময়ে ব্রাহ্মণ তখনও যে সমাজে পরবর্তী যুগের মত প্রতিষ্ঠিত হন নাই, তাহার একটি প্রমাণ এই যে, সভাপর্বে রাজস্বয়ংক্রের ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যাপারটার উপর কোন জোরই দেওয়া হয় নাই। যতিদের ভোজনের প্রচুর ব্যবস্থা এবং বায়ন, অন্ধ, খঞ্জদিগকে পরিতোষপূর্বক আহাৰ্য্যদানের কথা আছে, সেখানে ব্রাহ্মণ-ভোজনের উল্লেখ নাই। পরবর্তী যুগে ব্রাহ্মণ-ভোজনই সকল ধর্ম ও সামাজিক কার্যের সর্বাপেক্ষা পুণ্যকার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ব্রাহ্মণকে পুরোভাগে করিয়া যে হিন্দুধর্ম নূতন ভাবে দাঁড়াইল তাহার অগ্রদূত ত্রীকৃষ্ণ।

কিন্তু ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল মহাভারতের ধর্ম গ্রহণ করে নাই; মগধে সুদ্রবংশের সঙ্গে কৃষ্ণাশ্রিত ব্রাহ্মণ্য কতকটা নির্ধাপিত হইয়া গেল। এ দিকে হর্ষবর্দ্ধন কনোজে পুনরায় বৌদ্ধ ধর্মকে উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মগধ ও গোড়ে প্রাচীন শৈব ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল। জরাসন্ধ, নরক, মূর, শিশুপাল প্রভৃতির রাজ্যে কৃষ্ণ বহুকাল নিগূহীত রহিলেন।

আমরা দেখাইয়াছি, বৌদ্ধ ধর্মকে ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করিয়া শৈব প্রতিভা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম যে আকারে দেশে প্রচলিত ছিল, তাহাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী গরুড়ে আসীন বিষ্ণু, তাহার একদিকে লক্ষ্মী, অপর দিকে সরস্বতী, পূজিত হইতেন। গত্যাভামা, রুক্মিণী, প্রভৃতি বহুপত্নীক দৈবকীনন্দন,—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কেন্দ্রবর্তী নবব্রাহ্মণ্যের পুরোহিত-কর রাজচক্রবর্তী কৃষ্ণ এই পূজার উদ্দিষ্ট ছিলেন না, ব্রাহ্মণই পরমপূজ্য ছিলেন। হিন্দু ধর্মের নব জাগরণে এক দিকে বৈষ্ণব ধর্ম অপরদিকে শৈব ধর্ম উভয়েই নবশ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের পার্শ্বে শৈব ধর্ম বহুকাল একত্র প্রচলিত ছিল। গোড়ের প্রাচীন সমস্ত তীর্থই শৈব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুপ্তগণের অভ্যুদয়

কুষাণ ও সুদ্র বংশের পর চতুর্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস কুহেলিকাময় ও হ্রস্বীক্য। গুপ্তরাজত্বের কিছু পূর্বে (মক্কাবাসী) পুষ্করগাদেশাধিপ চন্দ্রবর্মার কথা চন্দ্রবর্মী, চতুর্দশ শতাব্দী। বাঁকুড়া জেলার শুন্তুনিয়া-পার্বত্যগাত্রে কোদিত লিপি হইতে জানা যায়। ইনি যদি মেহেরোলি শুন্তুলিপির চন্দ্র হইতে অভিন্ন না হন, তাহা হইলে চন্দ্রবর্মী বঙ্গে এক মহাযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, সুদূর পশ্চিম হইতে তিনি বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। *

* শ্রীযুক্ত কে. পি. জয়সোমাল বিহার ও উড়িষ্যা-রিসার্চ সোসাইটির মার্চ-জুন সংখ্যক পত্রিকায় (১৯৩৩) প্রমাণ করিয়াছেন যে ভিল্পেট শিখ্ প্রমুখ পণ্ডিতেরা কুশান ও অন্ধ্রবংশের অবসান ও গুপ্তগণের আরম্ভ—এই সময়টাকে ভারতীয় ইতিহাসের “অন্ধকার-যুগ” আখ্যা দিয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে। জয়সোমাল সাহেব বলেন, গুপ্তদিগের অতির পূর্বে আখ্যাবর্ত্তে বাক্যাতক ও ভারশিখ এই দুই প্রবল বংশের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহারা যে শুধু আখ্যাবর্ত্তের প্রধান রাজস্ব-শক্তি ছিলেন, তাহা নহে;—গুপ্তদিগের পূর্বে ইহারা ভারতবর্ষের

এই অন্ধকারযুগে ক্ষীণ আলোকরশ্মির মত কোন এক সময়ে চন্দ্রগুপ্ত নামক এক রাজা সুবিখ্যাত লিচ্ছবি বংশের সহিত বৈবাহিক আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া সমস্ত গোড়রাজ্য লিচ্ছবি ও গুপ্তবংশ। দখল করিয়া লইলেন। চন্দ্রগুপ্তের পিতার নাম ঘটোৎকচ এবং পিতামহের নাম শ্রীগুপ্ত। ইহারা সম্ভবতঃ সামান্য সামন্তরাজ্যরূপে

মগধাধিপের অধীনে থাকিয়া ক্রমে বলস্কয় করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের সময়ে লিচ্ছবিদের কথা পাওয়া যায়, তারপরে ৭০০ বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের শৌর্যবীর্যের বিশেষ কোন পরিচয় ছিল না। কিন্তু গুপ্তদের মূর্তায় যে ভাবে লিচ্ছবিদের নাম পাওয়া বাইতেছে, তাহাতে আমাদের মনে হয় গুপ্তযুগের অব্যবহিতপূর্বে লিচ্ছবিরাই মগধ অধিকার করিয়াছিলেন।

শ্রীগুপ্ত ও ঘটোৎকচগুপ্ত সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় নাই। শিলালিপিতে তাঁহাদের উপাধি 'মহারাজ' দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহাদের রাজত্ব মগধের কোন অল্পপরিমাণ ভূভাগে সীমাবদ্ধ থাকারই সম্ভাবনা। ঘটোৎকচগুপ্তের পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্তই গুপ্তবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ সময় হইতেই গুপ্তরাজ্য আরম্ভ হইয়াছিল। বৈশালীর লিচ্ছবিবংশ এই সময়ে খুব পরাক্রান্ত



প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও রাজী কুমার দেবী
(প্রাচীন মূর্তা হইতে গৃহীত)



প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
(প্রাচীন মূর্তা হইতে গৃহীত)

হইয়া উঠিয়াছিল, ৭০০ বৎসরের পূর্বে বুদ্ধদেবের সময়েও লিচ্ছবিদের কথা পাওয়া যায়। সেই বংশের কুমারদেবীকে বিবাহ পূর্বক চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবতঃ তাঁহাদের সাহায্যে মগধ দখল

অধিতীয় সম্রাট রূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাকাতক বংশাবতঃ প্রথম প্রবর সেন ব্রাহ্মণ-কুল-সম্ভূত ছিলেন এবং তিনি সমস্ত আর্ধ্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের বহুদূরবর্তী স্থান পর্যন্ত অধিকার করিয়া সম্রাট উপাধি গ্রহণ ও চারিটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রবর সেনের পৌত্র রুদ্র দেবের (প্রথম রুদ্র সেন) হস্ত হইতে সমুদ্রগুপ্ত

করিয়া তাঁহার অধিকার প্রয়াগ ও অযোধ্যাপর্য্যন্ত বিস্তৃত করেন। ত্রীশুপ্ত ও ঘটোৎকচগুপ্ত “মহারাজ” উপাধিতে পরিচিত, কিন্তু প্রথম চন্দ্রগুপ্ত শিলালিপিতে “মহারাজাধিরাজ”

“পরমভট্টারক” প্রভৃতি রাজচক্রবর্তীর উপাধি ব্যবহার করিয়াছিলেন।

‘মহারাজাধিরাজ’ ‘পরম-ভট্টারক’ চন্দ্রগুপ্ত।

মুদ্রায় পদ্মীকুলের উল্লেখ বড় দেখা যায় না, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের

মুদ্রায় লিচ্ছবিবংশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং তদীয় বংশের

অপর্যাপ্ত সকল রাজার শিলালিপিতেই তাঁহার পদ্মী কুমারদেবী ও লিচ্ছবিবংশের কথা উল্লিখিত আছে। ইহাতে মনে হয়, এই লিচ্ছবিবংশের সঙ্গে আত্মীয়তাই ইহাদের ভাগ্যলক্ষীর মন্দিরে প্রবেশ করিবার পক্ষে প্রধান সহায় হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের অধিকার খুব বিস্তৃত ছিল না, এজন্য শিলালেখে সমুদ্রগুপ্তের বিজয়কাহিনী কীৰ্ত্তনোপলক্ষে “তিনি নির্দাক্ষব, একমাত্র স্বীয় ভূজবলে অসংখ্য এবং প্রবল শত্রুপক্ষসমূহ পরাজয় করিয়াছিলেন,” এরূপ ভাবের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গুপ্তবংশের অধিতীয় প্রতিভা—সাহা-সাহানসাহা-বিজয়ী, অমিতপরাক্রম, খড়্গা ও বীণাপুস্তকরঞ্জিত-হস্ত, কবিশ্রেষ্ঠ, দাতা-শিরোমণি, ভাগ্যলক্ষীর ললাম-বিজয়মালা, অশ্বমেধ

তৎপুত্র রাজর্ষি দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য।

বক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত বীরকীৰ্ত্তি, মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক সমুদ্রগুপ্তের

রাজত্ব প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপক ছিল। কঠোর যুদ্ধবিগ্রহের

পর তাঁহার বিশাল রাজ্যের প্রতি শান্তি দেবীর কৃপামধুর হাস্ত

বিতরিত হইয়াছিল। সেই হাস্তচ্ছটায় তাঁহার শাসিত প্রদেশগুলি শিল্পকলা ও কবিত্বমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। তৎপুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শান্তিপূর্ণ বিজয়রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া প্রজা-হিতকর বহু কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। শিলালিপিতে তাঁহাকে পরমভাগবত ‘রাজর্ষি’ এবং আশ্রিতবংশসল প্রজারঞ্জক বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। সমুদ্রগুপ্ত হর্ব্যের রশ্মির দ্বারা প্রখর ছিলেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন জনপ্রিয়, নয়নানন্দবর্ধন চন্দ্রলেখার মত, শিলালেখের বিশেষণে একের প্রখর তেজ ও অপরের মধুর চরিত্রেরই যেন আভাস দিতেছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি ছিল “বিক্রমাদিত্য”। উজ্জয়িনীর কোন বিক্রমাদিত্য কোনকালে ছিলেন কিনা জানা নাই। গুপ্তরাজগণও মালবদেশ বিজয় করিয়া উজ্জয়িনীতে অত্র এক রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যসম্বন্ধে যে শত শত উপগল্প প্রচলিত আছে, অন্ততঃ তাহার উপকরণের অনেকাংশ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলি হইতে সংগৃহীত।

অনেকে মনে করেন কালিদাস এই বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি ছিলেন। এ সম্বন্ধে খাটি ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটন করিবে কে? কালিদাস যদি কোন রাজসভার

আদ্যাবস্দের অধিকার কাড়িয়া লইয়াছিলেন—সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ শৃঙ্গের শিলা-লিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। বাক্যাতক রাজ-পরিবারের সঙ্গে পরিণয় হজে ভারশিব (মহারাজ ভবনাগ) উত্তর বংশের রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ভারশিব বংশীয়েরা গঙ্গাतीरे দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। জয়সোমাল সাহেব অনুমান করেন, সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের স্থল এখনও কান্ধীর “দশাশ্বমেধ” ঘাট নামে পরিচিত।

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকেন, তবে মগধরাজের সঙ্গেই তাঁহার ঐ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। লৌকিক সংস্কার, তিনি বিক্রমাদিত্যের রাজসভা উজ্জল করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি বিক্রমাদিত্য ছিল। মগধের রাজা হইলেও চন্দ্রগুপ্তের অত্যন্তম রাজধানী উজ্জয়িনীতে ছিল। লৌকিক সংস্কার, কালিদাস উজ্জয়িনীবাসী ছিলেন। কালিদাস যে শুপ্তগুণের কবি, তাহা তাঁহার ভাষাও রচনাভঙ্গী আলোচনা করিলে স্বীকার করা যায় না। ইন্দুমতীর স্বয়ংবরে যদিও নায়িকা উত্তর-কোশলাধিপতি অজকেই বরমাল্য দান করিয়াছেন, তথাপি মগধের প্রাধান্য সেই রাজমণ্ডলীর মধ্যে স্বীকৃত হইয়াছিল। মগধপতিই রাজন্তবর্গের পুরোভাগে ছিলেন। কালিদাসের “আসমুদ্রক্ষিতীশানাং” প্রভৃতি পদ পড়িয়া কেহ কেহ মনে করেন কবি রূপকপ্রয়োগে শুপ্ত বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি সমুদ্রগুপ্তের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তের জন্য উপলক্ষে কবি ‘কুমারসম্ভব’ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল যুক্তি বৈজ্ঞানিক হিসাবে দোষশূন্য না হইলেও একটা অনুমানকে স্মৃতি করিতেছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, চন্দ্রগুপ্তের (দ্বিতীয়) আদেশক্রমে কালিদাস রাজকন্যা প্রভাবতীর বিবাহ উপলক্ষে ‘সেতুবন্ধ’ কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের টীকাকার রামদাস এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন, বাকাতক মহারাজ প্রবরসেনের বংশে জাত কদ্রসেনের সঙ্গে প্রভাবতীর বিবাহ হয় এবং এই বংশের গৌরব ‘সেতুবন্ধ’ কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে।

কালিদাসের সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য হ্রাস পাইলেও বৌদ্ধ ভাবগুলির ছাপ জাতীয় জীবনে তখনও খুব স্পষ্ট ছিল। বৌদ্ধধর্মের সর্বপ্রধান গুণ ত্যাগ। কবি রবীন্দ্র অনাধিপিত্তদের মুখে বলিতেছেন “সর্ব ধর্ম হ’তে ত্যাগ ধর্ম সার”,—মেঘ—
 কালিদাসকৃত বজ্রিশ-সিংহা-
 মনে ত্যাগ ও মনের মাহাত্ম্য।
 “নিজেকে নাশিয়া দেয় জলধার।” এই গুণ বৌদ্ধ যুগের আদর্শ গুণ ছিল। বৌদ্ধ রাজন্তবর্গ কয়েকটি নির্দিষ্ট বৎসর পরে সর্বত্যাগী কলত্ররূপ হইতেন, তখন ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বুদ্ধের রাজ্যত্যাগের মহিমার অনুসরণ করিয়া তাঁহারা সমস্ত ঐশ্বর্য বিলাইয়া দিতেন। উত্তরকালে হিউনসাং হর্ষবর্দ্ধনকে এই ভিক্ষুর ধর্ম পালন করিতে দেখিয়া গিয়াছিলেন। কালিদাস মহারাজ দিলীপকে দিয়া এই অনুষ্ঠান করাইতেছেন—বলা বাহুল্য বাস্তবিকর রামায়ণে, অথবা অত্র কোন পূর্ববর্তী কাব্য বা পুরাণে, দিলীপের সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা নাই। বজ্রিশ-সিংহাসনে বিক্রমাদিত্যসম্বন্ধে যতগুলি কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার সমস্তই ত্যাগমূলক।* তাঁহার প্রথম পুত্রলিকা বিক্রমাদিত্যের

* বেতাল-পঞ্চবিংশতি ও বজ্রিশ-সিংহাসনে উজ্জয়িনী ও বিক্রমাদিত্যের কথা পূর্ণ। লৌকিক-সংস্কার কালিদাস ইহাদের রচয়িতা; এই সকল গল্প বৌদ্ধ জাতকের স্তায়, অথচ ইহাতে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবও আছে। কালিদাস এই গল্পগুলি রচনা না করিয়া থাকিলেও কতকগুলি প্রাচীন কাহিনী নূতন করিয়া সংকলন করিয়া থাকিবেন।

অসীম ত্যাগমূলক দান-শক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপে দিতেছেন, যে কেহ উপযাচক হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইবে তিনি সর্বস্ব দিয়াও তাহা পূরণ করিতে ইচ্ছুক হইতেন। দ্বিতীয় পুস্তলিকা রাজার সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান বলিলেন, বাহাতে বিক্রমাদিত্য কোন হোম সম্পাদন করিতে বাইয়া নিজেকে বলি দিতে উত্তত হইয়াছিলেন। তৃতীয় পুস্তলিকা রাজার অমূল্য চারিটি ফল,— বন্ধারা চতুর্গ লাভ হয়—কোন এক ব্রাহ্মণকে অকাতরে দেওয়ার কথা বলিয়াছেন। চতুর্থ পুস্তলিকা বলিতেছেন, রাজা একবার কোন ব্রাহ্মণের নিকট কিছু উপকার পাইয়াছিলেন, কি করিয়া তাঁহার প্রত্যুপকার করিবেন তাহাই ইহার সত্য চিন্তার বিষয় ছিল। ব্রাহ্মণ ছলনা করিয়া জানাইল যে, সে যুবরাজকে হত্যা করিয়া তাঁহার অঙ্গের আভরণ চুরি করিয়াছে। মন্ত্রীরা সেই ব্রাহ্মণকে তখনই বধাভূমিতে লইয়া বাইবার পরামর্শ দিলেন। রাজা তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া আরও নানা উপহার দান করিলেন। পঞ্চম পুস্তলিকার উপাখ্যান এই যে, রাজা এক বণিকের প্রার্থনায় তাঁহার ভাণ্ডার হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ দশটি মাণিক্য তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। ৩২টি উপাখ্যানের প্রত্যেকটিতে এইরূপ দান ও ত্যাগের কথা আছে এই বিষয়ে বৌদ্ধ জাতকগুলির সঙ্গে বত্রিশ-সিংহাসনের উদ্দিষ্ট আদর্শের খুব ঘনিষ্ঠ ঐক্য আছে। নাগার্জুন নাটকেও এইরূপ আদর্শদানের কাহিনী আছে—উহা খাস বৌদ্ধ গ্রন্থ।



সিংহে শিকারী চন্দ্রগুপ্ত (২য়), বিক্রমাদিত্য
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

কালিদাসের সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, এইখানে জাতক গ্রন্থগুলির সঙ্গে বত্রিশ-সিংহাসনের ব্রাহ্মণকে দানের পুণ্য। একটু প্রভেদ আছে। বুদ্ধদেবের জন্মকথায় যে দান ও ত্যাগের মহিমা দৃষ্ট হয় তাহার কোন গাণ্ডী নাই। সেই ত্যাগ চন্দ্রের জ্যোৎস্নার স্থায় সমস্ত জীবজগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বত্রিশ-সিংহাসনের কাহিনীগুলিতে যদিও অপরাপর লোকের জন্ত ত্যাগ-স্বীকারের কথা আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণকে দান করিলে যে অসীম পুণ্যসঞ্চয় হয়, মাঝে মাঝে কবি তাহা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে জটিল করেন

নাই। ১১শ পুস্তলিকার কাহিনীটিতে আশ্চর্য ব্রাহ্মণের জন্ত ত্যাগ-স্বীকারের অশেষ পুণ্য বর্ণিত আছে।

বিক্রমাদিত্যসম্বন্ধে এই সমস্ত উপাখ্যানের মধ্যে শৌর্য্য, বীৰ্য্য, বীরত্ব প্রভৃতি কথা একরূপ নাই বলিলেই হয়। উহার সকলগুলি ত্যাগ ও দানের মহিমায় উজ্জ্বল। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিবার আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য এই যে, বঙ্গদেশে কালিদাসের বর্ণিত গুণ ও কাব্যের

আদর্শ এক সময়ে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা পরবর্তী এক যুগে আমাদিগকে দেখাইতে হইবে।



শিকারোক্ত চন্দ্রগুপ্ত (২য়), বিক্রমাদিত্য
(প্রাচীন মূর্ত্তা হইতে গৃহীত)



অথারোহী চন্দ্রগুপ্ত (২য়), বিক্রমাদিত্য
(প্রাচীন মূর্ত্তা হইতে গৃহীত)

কালিদাসের বর্ণনা বাহাই থাকুক না কেন, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শৌর্য্য, বীর্য্য ও ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। কা-হায়েনের বিবরণে জানা যায়, তাঁহার শাসনে রাজ্যে শান্তি বিরাজ করিতেছিল ও শত্রুগণ মাথা তুলিতে সাহস করে নাই। তাঁহার মৃত্যুয় তিনি সিংহের সহিত লড়াই করিতেছেন, এইরূপ মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয়।

বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তের
পরাক্রম।

বঙ্গদেশে গুপ্তরাজত্বসম্বন্ধে কোন প্রবাদ বা সংস্কার নাই, তবে যদি কালিদাসের বিক্রমাদিত্য সত্যই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত হন, তবে শুধু বজ্রিশ-সিংহাসনের কাহিনী নহে—বেতাল-পঞ্চবিংশতি-কথিত উপাখ্যানমালায় তাঁহার কৃতিত্ব এবং তান্ত্রিক অহুষ্ঠানে

সিদ্ধিলাভসম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প আমরা বঙ্গীয় পল্লীসমূহে শুনিয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এক সময়ে এই দেশ গুপ্তসম্রাটদের বিশাল রাজ্যের অন্তর্গত হইলেও এবং মগধ বঙ্গদেশের এত নিকটে

হওয়া সত্ত্বেও গুপ্তদের স্মৃতি এদেশ হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছিল, এমন কি সমুদ্রগুপ্তের নামও আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

আলবেক্লী লিখিয়াছেন, সাধারণ লোকের বিশ্বাস গুপ্তরাজগণ যেমনই প্রবল ও শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন, তেমনই দুষ্ট ছিলেন। একচ্ছত্র রাজা হইতে হইলে

সমুদ্রগুপ্তের বিজয়-কথা। কতকটা কঠোরতা অবলম্বন না করিলে চলে না। বহু রাজার সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া বৈজয়ন্তী পতাকা উড়াইতে হয়। বহু স্বাধীন বীরবিক্রম রাজাকে হত্যা

করিয়া তাঁহাদের রাজ্য কাড়িয়া লইতে হয়। রাজচক্রবর্তীদের পথ কুসুমাকীর্ণ নহে।

হত।

গুপ্তরাজগণের রণহস্তী ও রণ-অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে বিরাম পাইত না,

তাঁহাদের সৈন্তগণের বর্ষ কচিং বকোমুক্ত হইত। “প্রবল ও দুষ্ট”

(powerful and wicked) উপাধি নিরীহ লোকেরা তাঁহাদিগকে যদি দিয়া থাকে তবে ইহাই তাহার কারণ। কদ্রদেব, মতিল্য, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্মা, গঙ্গাপতি নাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দি, বলবর্মা প্রভৃতি বহু আর্য্যাবর্তবাসী রাজাকে সমুদ্রগুপ্ত অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছিলেন (violently extirpated). তাম্রশাসনে আমরা তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই।

সমুদ্রগুপ্ত কোশল দেশের মহেন্দ্ররাজ, মহাকান্তারাজিণ ব্যাস্ররাজ, কেরলাধিপ মন্তরাজ, পিত্তপুরের মহেন্দ্ররাজ, পার্শ্বত্যা কোণ্ডার স্বামিদত্ত, এরণ্ডপল্লাধিপ দমন, কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপ, অবমুক্ত দেশের নীলরাজ, বেঙ্গীদেশাধিপ হুতিবর্মা, পালঙ্ক দেশের উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের

বন্দী।

কুবের, কুস্থালপুরার বনজয় এবং দক্ষিণাপথের অপর অপর রাজগণকে

মহাসমরে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন, তৎপর

বশ্তাস্বীকারের পর নিজগুণে মুক্তি দিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত ইহা ছাড়া সামতট, দবাক (ঢাকা), কামরূপ, নেপাল, কার্ণাটপুর প্রভৃতি প্রত্যন্ত (আর্য্যাবর্তের সীমান্ত) প্রদেশের নৃপতিগণের বশ্ততা লাভ করিয়াছিলেন। মালবীয়-গণ, অর্জুনাক্ষয়গণ, যুদ্ধয়গণ, মজ্জকগণ, আভীর, প্রচাজ্জনা, সনকানিকা, কাকা, খরপারিকা

পরাস্ত।

ও অপর্যাপ্ত শ্রেণীর লোকের এবং তাহা ছাড়া দৈবপুত্র, সাহা,

সাহানসা, শক, মুরগা এবং সিংহল ও অন্তান্ত দ্বীপবাসীরা তাঁহাকে

রাজচক্রবর্তী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাদের অনেকে তাঁহাকে বাৎসরিক রাজস্ব দান করিতেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্ত কুসুমপুরের দরবারে উপস্থিত হইতেন। অপররা তাঁহাকে তাঁহাদের ধন ও ঐশ্বর্য্য সমস্ত প্রদানপূর্ব্বক বিচিত্র গরুড়ধ্বজ ও তত্তদেশীয় সুন্দর রমণী প্রভৃতি উপঢৌকন দিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্ভট করিতে চেষ্টা করিতেন। অন্তান্ত উপাধির সহিত তাঁহাকে শিলালিপিতে বারংবার ‘কৃতান্তের পরস্ত’ এবং ‘অন্তক’ বলা হইয়াছে। ইরানের শিলালিপিতে লিখিত হইয়াছে “তিনি পৃথিবীর যাবতীয় রাজত্ববর্গকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার শাসনাধীন করিয়াছিলেন। তাঁহার শত্রু-রাজগণ নিদ্রাবশে স্বপ্নের অবকাশে তাঁহাকে স্মরণ করিলে কম্পিত কলেবর হইতেন। তিনি সর্ব্বরাজোচ্ছেদকারী ছিলেন।” ইহার মধ্যে কতকটা বেনীমাত্রায় রংফলান হইলেও তাঁহার দুর্দান্ত প্রতাপে দেশময় যে ভয়ের ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল তাহার আভাস পাওয়া যায় এবং আলবেকনীর কথার কতকটা প্রতিপোষকতা দৃষ্ট হয়। এতগুলি রাজত্বকে যিনি দিবারাত্র যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার সৈন্তসংখ্যা প্রথম দিকে যে খুব বেশী ছিল, এমন নহে; কারণ তিনি একাকী নিজ ভূজবলমাত্র আশ্রয় করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন,—শিলালিপিতে এ কথার বারংবার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাঁহার স্বভূজবল

তাহার একমাত্র বান্ধব ছিল (whose only ally was the strength of his arms). তাহার অঙ্গ শত যুদ্ধের শত কুঠার, শূল, শেল, বাণ ও পরশুর চিহ্ন বহন করিত। শিলালিপির কবি লিখিয়াছিলেন—“এই চিহ্নগুলিই তাহার পুরুষদেহের শোভা-সৌন্দর্য ছিল। তিনি এক জনের রাজ্য কাড়িয়া লইয়া অপরকে প্রদান করিয়া নিত্য নব রাজবংশ স্থাপন করিয়াছিলেন। বশুতা স্বীকার করিলে তাহার রাগ থাকিত না। “ভক্তি অবনতি মাত্র গ্রাহ্য মৃদু হৃদয়ত্ব।” সুতরাং তিনি ভারতের প্রাচীন আভিজাত্য ধ্বংস এবং নব আভিজাত্যের পত্তন করিয়াছিলেন। এই ভাবে দেশময় শত্রুর সৃষ্টি করিয়া তিনি সমস্ত শত্রুজয় করিয়া অরিন্দম হইয়াছিলেন।

গুপ্তযুগের পূর্বে এই বিশাল ভারতবর্ষ যে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল তাহা পূর্বের বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ দৈব লীলার মহৎ ক্ষেত্র। কোন বড় রাজবংশ একযুগে খণ্ড ভারতকে অখণ্ড শ্রী প্রদান করেন এবং সেই বংশের প্রতাপবিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই অখণ্ড রাজশ্রী

চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের
আগমন।

শতধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ ভাঙ্গাগড়া এদেশে বহুবার হইয়াছে। কত বড় শক্তি থাকিলে একজন বীর এই অসাধ্যসাধন করিতে পারেন তাহা অস্বপ্নময়। তৈমুরলঙ্গ, আলেকজেন্ডার প্রভৃতি বীরেরা দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, তাহাদের আশ্চর্য্য বীর-প্রতিভা ধূমকেতুর মত উদ্ভিত হইয়া হঠাৎ জগৎকে চমক লাগাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু কোন মহাদেশের শক্তিপুঞ্জ জয় করিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্ত বশুতার নিগড়ে আবদ্ধ করা কঠিনতর কাজ। সমুদ্রগুপ্ত এই কঠিনতর কাজ সম্পাদন করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত সমস্ত ভারতবর্ষের অধিপতি হইয়াছিলেন—তাহার রাজত্ব পূর্বে বঙ্গদেশ ও কামরূপ, উত্তরে নেপাল, পশ্চিমে পাজাব ও মালব এমন কি পেশোয়ার এবং দক্ষিণে সিংহল প্রভৃতি দ্বীপমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেহ কেহ বলেন সিংহল ও দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি ও পূর্বদেশ তাহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু পূর্বকালে উগ্র শাসনের চাপ দিয়া বিজিত রাজ্যগুলিকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিবার রীতি ছিল না, “ভক্তি-অবনতি পাইলেই দিগ্বিজয়ী সম্রাট তাহা গ্রাহ্য করিতেন এবং বিজিত রাজ্য তাহার আশ্রয় লাভ করিতেন।” শিলালিপিতে যে সকল প্রদেশের নাম পাওয়া বাইতেছে—ইহাদের সকলেই তাহার একচ্ছত্র রাজ-গৌরব স্বীকার করিয়াছিলেন। অশ্বমেধ-যজ্ঞ দ্বারা তিনি তাহার অখণ্ড প্রভাব সমস্ত ভারতবর্ষে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। এই অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দেওয়ার জন্ত বে শ্রমমুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার একদিকে অশ্বমেধের ঘোড়ার প্রতিরূতি দেওয়া হইয়াছে। আমরা মনে করিতে পারি এই যজ্ঞে সিংহলের মেঘবাহন, শক নৃপতিরা (দৈবপুত্রাঃ) এবং পেশোয়ারের সাহা ও সাহানসা (কুমাণরাজগণ) করদানার্থ কুসুমপুর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। চীনদেশীয় ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, সিংহলের রাজা মেঘবাহন সমুদ্রগুপ্তকে বহু উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং শিলালিপিতে যে সকল কথা উক্ত হইয়াছে তাহা অবিখ্যাস করিবার কারণ

নাই। পাটলিপুত্রের রাজগণ যুগ যুগ ধরিয়া এই মহাদেশে রাজচক্রবর্তীর পদে আসীন ছিলেন। জরাসন্ধের সময় হইতে গিরিজ্ঞের নিকটবর্তী ভিন্ন ভিন্ন রাজধানী সর্বদেশের সেরা দেশ ছিল। অল্প সময়ের জন্য এই দেশের প্রভা পরিদ্রাণ হইলেও কোন নব রাজবংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাচীন রাজগৌরব ফিরিয়া আসিত।

সমুদ্রগুপ্ত শুধু বিজয়ী সম্রাটরূপে আমাদের শ্রদ্ধা দাবী করেন নাই, তাঁহার মুক্ত-হস্ত দান, পণ্ডিতগণের সাহায্য, কবিত্ব ও সঙ্গীতশাস্ত্রে কৃতিত্বের বহু উল্লেখ শিলালিপিতে পাওয়া যায়। তাঁহার দানশক্তি পৃথু এবং বাণের অপেক্ষাও

বেশী ছিল। শিলালিপির কবি লিখিয়াছেন, তিনি তাঁহার মনস্বী প্রতিভায় স্বরগুরু কাশ্যপকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গীতশাস্ত্রে অধিকার নারদ, তম্বুর এবং অপরাপর কলাবিৎকে ছাপাইয়া গিয়াছিল, তিনি বিদ্বৎগণের অবলম্বনস্বরূপ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া “কবিরাজ” রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত শত যুদ্ধ-নায়ক সম্রাট ছিলেন। বহু নরপতি তাঁহার খজ্ঞাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন, অপর অনেক নৃপতির গর্ভে তিনি নষ্ট করিয়াছিলেন এবং বহু নব রাজবংশ তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সকল নৃপতির ছিন্ন, গর্ভিত ও কৃতজ্ঞ শির নিত্য তাঁহার পদতলে লুপ্তিত হইত। এখন তাঁহারা কোথায়? সেই ক্ষমতাশালী লিচ্ছবিবংশ কোথায়—ঐহারা গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তিগঠনের



বীণাবাদক—সমুদ্রগুপ্ত

(প্রাচীন মূর্ত্তা হইতে গৃহীত)

প্রথম ইষ্টক যোগান দিয়াছিলেন? সেই অতুলবীৰ্য্য নাগসেন ও অচ্যুতই বা কোথায়—ঐহারা শেষ পর্য্যন্ত সমুদ্রগুপ্তের সহিত লড়িয়া সবংশে নিহত হইয়াছিলেন, তথাপি গুপ্ত সম্রাটের নিকট “ভক্তি অবনতি” দেখান নাই? সমুদ্রগুপ্তের পুরুষকারের গৌরব সাময়িক জগৎ স্বীকার করিয়াছিল, এখন আমাদের কাছে তাহার মূল্য কি? কিন্তু তিনি যে বীণাবাদনে অদ্বিতীয় ছিলেন, তিনি যে স্বরের মোহিনীতে মুগ্ধ হইতেন, তাঁহার সেই বীণাবাদনশীল মূর্ত্তিটি আমাদের চক্ষে বড় মধুর লাগিয়াছে, তাহা তাঁহার

মূর্ত্তায় অঙ্কিত হইয়া আছে। অশ্বমেধ-যজ্ঞকারী ও খজ্ঞাহস্ত সমুদ্রগুপ্ত হইতে বীণা-হস্ত সমুদ্রগুপ্তই আমাদের প্রাণ বেশী স্পর্শ করে। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজত্বের প্রথম দুই বৎসর তিনি বহু যুদ্ধ করিয়া এই মহাদেশে শান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন।

তাঁহার পতাকা গরুড়চিহ্নলাভন হইলেও তিনি বৌদ্ধদিগের উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন; সুবিখ্যাত বৌদ্ধ লেখক বসুবন্ধু তাঁহার অন্তরঙ্গ সহৃৎ ছিলেন। গুপ্তবংশ হিন্দুধর্মের

পুনরুত্থানের নেতা হইলেও তাঁহাদের রাজত্বকালে বৌদ্ধবিদ্বেষের কোন পরিচয় নাই। তাঁহার বংশধরদের অনেকের অমাত্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ মন্দিরে আলোর ব্যবস্থা ও ভিক্ষুদের আতিথ্যের সংস্থান করিয়া যে সকল শিলালেখ উৎকীর্ণ করিয়াছেন, তাহাতে গুপ্তরাজগণের কীর্তি ও যশ ঘোষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ স্তম্ভবংশের পতনের পর আধ্যাত্মিক বৌদ্ধদিগের প্রতি প্রথর দুলার ভাব হ্রাস পাইয়াছিল।



কুমারগুপ্ত (১ম)
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)



কুমারগুপ্ত (২য়)
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

কিন্তু কুমারগুপ্তের পুত্র স্বন্দগুপ্তের সময়ে গুপ্ত রাজত্বে নানারূপ বিপদ দেখা দিয়াছিল। পশ্চিম হইতে ইরানবাসী খ্যামিত্রগণ ও মধ্য এশিয়া হইতে হুনেরা তাঁহার বিশাল রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। মহাবীর স্বন্দগুপ্ত এইসকল বিপদ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু শত্রুরা প্রথমতঃ তাঁহার রাজ্য কতকটা দখল করিয়া লইয়াছিল। পৈতৃক রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তির জন্ত তাঁহাকে কত অনিদ্ররাত্রি কাটাতে হইয়াছিল—তাঁহার ইয়ত্তা নাই। শিলালেখের বর্ণিত আছে, তিনি পৈতৃক রাজ্য হারাইয়া একদা সমস্তরাত্রি শুধু মৃত্তিকাকে পালক করিয়া তত্পরি শয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু অসীম ধৈর্য, বীরত্ব ও সাহস-বলে স্বীয় রাজ্য পুনরায়



স্বন্দগুপ্ত ও তাঁহার রাজী, মধ্যে গরুড়ধ্বজ
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

অধিকার করিয়া যেদিন তিনি ইরানদেশীয় নৃপতির মস্তক তাঁহার পাদপীঠে পরিণত করিয়াছিলেন সেইদিন শত্রুজয়ী সম্রাট তাঁহার মাতার ক্রোড় আশ্রয় করিয়া সেই বিজয়বার্তা তাঁহাকে স্বয়ং জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শিলালেখে কথিত আছে, “কুম্ভ যেরূপ কংসকে বধ করিয়া মাতা দৈবকীর নিকট সেই বার্তা বহন করিয়াছিলেন, স্বন্দগুপ্ত সেইভাবে জননীকে বিজয়-সংবাদ জ্ঞাপন করিলে মাতার আনন্দাশ্রু তাঁহার মস্তক আর্দ্র করিয়াছিল।”

স্বন্দগুপ্ত শত্রুদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগকে দয়া প্রদর্শন করিতেন, এজন্য তিনি সর্বজন-প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি জয়গর্বে অহঙ্কৃত হন নাই। সর্বদা ক্ষমাশীল মধুর চরিত্রগুণে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। স্বন্দগুপ্তের পর আরও কয়েকজন, গুপ্ত রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বন্দগুপ্তই অখণ্ডভারতের শেষ রাজ-চক্রবর্তী। তাঁহার পরে এই বংশের পতনের ইতিহাস। দ্বিধ সাহেব লিখিয়াছেন, “আরজেবকে যেরূপ মোগলবংশের শেষ রাজা বলা যাইতে পারে, স্বন্দগুপ্তও সেইরূপ গুপ্তবংশের শেষ রাজা।” তৎপরে কয়েক পুরুষ পর্যন্ত গুপ্তরাজবংশধরগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকার ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু লৌকিক সৌজন্তে তাঁহারা ‘মহারাজাধিরাজ’ ও ‘পরমভট্টারক’ উপাধি শেষ পর্যন্ত বহন করিয়াছিলেন।

স্বন্দগুপ্তের স্মৃদুত বাহু অপসারিত হইলে হনেরা পুনরায় প্রবল পরাক্রমে গুপ্ত-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া ইহার ধ্বংস সাধন করিলেন। হনরাজ তোরমান্ এই আক্রমণের নেতা হইলেও তৎপুত্র মিহিরগুপ্তই পরিশেষে এই ধ্বংসকার্যে শেষ আছতি প্রদান করেন। ইহার পরও অনেকদিন পর্যন্ত গুপ্ত-বংশধরগণ রাজবিভূতি অঙ্গে ধারণ করিয়া স্তাবকগণ হইতে মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি রাজ-চক্রবর্তীর উপাধিদারণপূর্বক সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের তেজ সম্পূর্ণ অন্তমিত।

আমরা নিম্নে গুপ্ত সম্রাটদের একটা তালিকা দিতেছি :—

গুপ্তরাজবংশের তালিকা

- ১। শ্রীগুপ্ত।
- ২। যটোৎকচগুপ্ত।
- ৩। চন্দ্রগুপ্ত (১ম)—রাণী কুমার দেবী। ইহার অভিব্যেক কাল হইতে গুপ্তাব্দ প্রচলিত হয় (৩১৯—২০ খৃঃ)।
- ৪। সমুদ্রগুপ্ত—রাণী মল্লী দেবী; মৃত্যু ৩৭৬ খৃঃ।
- ৫। চন্দ্রগুপ্ত (২য়), উপাধি—বিক্রমাদিত্য—রাণী ঐশ্বৰ্য্য বা ঐশ্বৰ্য্যামিনী দেবী। ইহার রাজ্যাব্দ চিহ্নিত যে সকল উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের তারিখ যথাক্রমে ৪০১ খৃঃ (৮২ গুপ্ত), ৪০৭ খৃঃ (৮৮ গুপ্ত), ৪১২ খৃঃ (৯৩ গুপ্ত)। মেহাবলান ৪১২ খৃঃ—৪১৫ খৃঃ মধ্যে কোন সময়ে; প্রধান কর্মচারী পৃথিবী সেন।
- ৬। কুমারগুপ্ত (১ম)—রাণী অনন্ত দেবী; উপাধি—মহেন্দ্রাদিত্য, গ্রাণ্ড রাজ্যাব্দ চিহ্নিত লিপি, ৪১৫ খৃঃ (৯৬ গুপ্ত), ৪১৭ (৯৮ গুপ্ত), ৪২৮ খৃঃ, ৪৩২ খৃঃ।

পরবর্তী গুপ্ত ও অপরাপর স্বাধীন রাজগণ

২১৭

৭। পুরগুপ্ত—রানী শ্রীবৎস দেবী—উ—প্রকাশিত। (প্রথম কুমারগুপ্তের দুই পুত্র, তদাধো জ্যেষ্ঠ কন্দগুপ্ত ও কনিষ্ঠ পুরগুপ্ত।)

৮। সন্দগুপ্ত—৪৫৫ খৃঃ (১৩৬ গুপ্ত), ৪৫৬ খৃঃ, উ—বিক্রমাব্দিত্য (১৩৭ গুপ্ত), ৪৫৭ খৃঃ (১৩৮ গুপ্ত)

৯। নরসিংগুপ্ত—রানী মহালক্ষ্মী দেবী। উ—বালাবিত্য।

১০। কুমারগুপ্ত (দ্বিতীয়)—৪৭০ খৃঃ।

১১। তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

১২। চন্দ্রগুপ্ত (৩য়) ; উ—বাদশাবিত্য।

১৩। বিকুগুপ্ত, উ—চন্দ্রাবিত্য

১৪। জয়গুপ্ত, উ—প্রকাণ্ডবংশ।

এই তালিকার শেষের দিকে আর একজন প্রবল পরাক্রান্ত গুপ্ত বংশীয় রাজার নাম পাওয়া যায়। ইনি গুপ্তবংশীয় হইলেও ইঁহার অন্ত কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইনি বৃধগুপ্ত। বিবিধ তাম্রলিপি ও শিলালিপি হইতে জানা যায়, ইনি ৪৭৬ খৃঃ অব্দে (১৫৭ গুপ্ত) মালবদেশ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ৪৮৫ খৃঃ অব্দে (১৬৫ গুপ্ত) ইঁহার রাজ্য গৌড়দেশ হইতে মালব ও মধ্যদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মালবদেশে তাঁহার অধিকার ৪৮৫ খৃঃ হইতে ৪৯৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত হুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বৃধগুপ্তের পর আর একজন গুপ্ত রাজার নাম পাওয়া যাইতেছে, ইনি ভানুগুপ্ত। ইঁহার অধিকার ৫০২ খৃঃ হইতে ৫৩৩ খৃঃ পর্য্যন্ত পৌণ্ডবর্ডন হইতে মালব দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময়ের অব্যবহিত পরেই মালব রাজ বশোধর্যদেব বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা অধিকার করিয়াছিলেন।

এই তালিকাটি রাখালবাবুর ইতিহাস হইতে গৃহীত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরবর্তী গুপ্ত ও অপরাপর স্বাধীন রাজগণ

ফ্লিট সাহেব অনুমান করেন লিচ্ছবিরাজগণ গুপ্তসাম্রাজ্য-স্থাপনের পূর্বে সার্কসভৌম সম্রাট ছিলেন। শ্রীগুপ্ত, ঘটোৎকচগুপ্ত, এমন কি প্রথম চন্দ্রগুপ্তও তাঁহার রাজত্বের প্রথমার্ধে পর্য্যন্ত লিচ্ছবি-সম্রাটগণের সামন্ত নৃপতি ছিলেন। যে অব্দ “গুপ্তাব্দ” লিচ্ছবিগণের উত্তরাধিকারী।

নামে পরিচিত, তাহা মূলতঃ লিচ্ছবি-সংবৎ, স্বাধীন গুপ্তগণ সেই অব্দ গ্রহণ করেন এবং পরে উহাই গুপ্তাব্দ নামে চলিয়া যায়। লিচ্ছবি-রাজকুমারীর পাণি-

গ্রহণের পর চন্দ্রগুপ্তের ভাগ্যলক্ষী ফিরিয়া যায়, এদিকে যেমনি গুপ্তসাম্রাজ্যের বিস্তার হইতে লাগিল—লিচ্ছবিগণও তদবধি নেপাল-উপত্যকায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় বসবাস করিতে লাগিলেন। গুপ্তরাজগণের সঙ্গে সেই কৃতজ্ঞতা ও বৈবাহিক আত্মীয়তা-বৃত্তে বিদ্যমান থাকায় এত বড় একচ্ছত্র সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত নেপাল তাঁহার অধিকারভুক্ত করেন নাই।

৪৮০ খৃষ্টাব্দে কন্দগুপ্তের মৃত্যু হওয়ার পর মালবদেশ গুপ্তসাম্রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বাধীন হয়; পরপর ক্রমাগত শত্রুর আক্রমণে গুপ্তরাজগণ বিধ্বস্ত হইয়া পড়েন। শেষদিকে তাঁহাদের এক শাখা কতক সময়ের জন্য গৌড়দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই ক্ষীরমাণ রাজগণের তালিকায় আমরা পুরগুপ্ত, নরসিংগুপ্ত, দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত, তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত, জয়গুপ্ত (উপাধি প্রকাণ্ডবশাঃ) প্রভৃতি অনেক নৃপতির নাম করিতে পারি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে এই বংশের রাজগণের অনেকেরই “আদিত্য” উপাধি দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি বিক্রমাদিত্য ছিল, ইহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। কুমারগুপ্তের উপাধি ছিল “মহেন্দ্রাদিত্য;” নরসিংগুপ্ত “বালাদিত্য” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত “দ্বাদশাদিত্য” নামে পরিচিত ছিলেন। ইহা ছাড়া কন্দগুপ্ত বোধ হয় শত্রু বিজয় করিয়া পিতামহের অমুকরণে “বিক্রমাদিত্য” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।



দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

কুমারগুপ্তের দ্বিতীয় পুত্রের বংশধরেরা এক সময়ে পাটলিপুত্রের রাজা হইয়াছিলেন। এই শাখার কুমারগুপ্ত (তৃতীয়) ঈশানবর্দ্ধী নামক কোন রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া গৌড়ের অধিকার হইতে বিচ্যুত হন।

সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে ভারতের ইতিহাসের অন্ধকার-যুগ বলা বাইতে পারে। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পর তাঁহাদের প্রদত্ত উপাধির সম্মান রক্ষা করিয়া অমাত্যগণ কোন কোন প্রদেশে স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও আপনাদিগকে “মণ্ডলাধিকরণ” বা “কুমারামাত্যাদিকরণ” ইত্যাদি নামে পরিচিত করিতেন। ঈশা ঝাঁর পূর্বপুরুষেরা “দেওয়ান” উপাধিবৃত্ত ছিলেন, সুতরাং তিনি রাজা হইয়াও দেওয়ান উপাধি ত্যাগ করেন নাই। শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গের রাজারা স্বাধীন নবাব ছিলেন, অথচ তাঁহারা পূর্বপুরুষের “দেওয়ান” উপাধি চিরকাল বজায় রাখিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় পেশওয়ার, গুজরানের প্রমত্ত উপাধি।

হায়দ্রাবাদের নিজাম—এই সকল উপাধি পূর্ববর্তী সম্রাটের দান। উপাধিদারীর বংশধরেরা স্বাধীন হইয়াও তাহা ছাড়েন নাই। গুপ্তরাজগণের প্রদত্ত উপাধি তাঁহাদের অমাত্যগণের বংশধরেরা সেইরূপ অনেকদিন বজায় রাখিয়াছিলেন। গুপ্তদের নানা শাখা সমস্ত আত্মাবর্তে ছড়াইয়া পড়ে, এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশের অধিপতি হইয়া কথঞ্চিৎ বংশগৌরব বজায় রাখিয়াছিলেন।

এই নানা শাখায় বিভক্ত গুপ্তরাজগণের বংশধরগণের কে কাহার সন্তান তাহা অনেক সময়ে নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু গোড়েশ্বর শশাঙ্ক এই শশাঙ্কগুপ্ত।

সকল বংশধরের মধ্যে যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষ্কাররূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে শশাঙ্ক গুপ্তরাজগণের বংশধর। ইনি প্রথমতঃ

(কর্ণশ্রবণের) রাঙ্গামাটির শাসনকর্তা ছিলেন, তখন ইহার প্রচারিত মুদ্রায় ইনি “রাজা” উপাধি গ্রহণ করেন নাই। শ্রীমহাসামন্ত “শশাঙ্কদেবগুপ্ত” এই নামে নিজ পরিচয় দিতেন কালে মগধ, গোড়, রাঢ় ও সমস্ত বঙ্গদেশ ইহার অধিকৃত হয়। ইহার উপাধি ছিল, “নরেন্দ্রাদিত্য”। সম্ভবতঃ ইহার পিতা বা পিতৃব্যের নাম মহাসেনগুপ্ত। শেষোক্ত ব্যক্তি চন্দ্রগুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দগুপ্তের বংশধর বলিয়া মনে হয়। মালবরাজ দেবগুপ্তও গুপ্তবংশ হইতে উৎপন্ন। সূতরাং দেবগুপ্তের শত্রু কান্তকুজাধিপতির বিরুদ্ধে শশাঙ্ক (নরেন্দ্রাদিত্য) স্বীয় জাতির সাহায্যের জন্ত কান্তকুজাভিমুখে অভিযান করিয়াছিলেন।



“গোড়-হুজু” শশাঙ্কগুপ্ত
(প্রাচীন মুদ্রা হইতে গৃহীত)

এই সময়ে স্থানীধরে রাজ্যবর্দ্ধন রাজত্ব করিতেছিলেন, জাতির শত্রুতা মাধ্যম করিয়া শশাঙ্ক এইভাবে তাহার সহিতও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন। কালক্রমে এই বিবাদ শেষ হইয়া

রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যা—৬০৬

খৃঃ অঃ।

যায়, শশাঙ্ক তথায় পৌছিবার পূর্বেই দেবগুপ্ত পলায়ন করেন। সম্ভবতঃ যুদ্ধের অবসান হইলেও শশাঙ্কের মনে রাজ্যবর্দ্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের শেষশিখা নির্ক্ষাপিত হয় নাই। রাজ্যবর্দ্ধন অতি সাধুচরিত্র ছিলেন। দেশময় তাহার গুণ ও কীর্তির কথা প্রচারিত ছিল। কথিত আছে শশাঙ্ক তাহার অমাত্যবর্গকে প্রায়ই বলিতেন, “স্বীয় রাজ্যের প্রান্তদেশে কোন সাধুচরিত্র রাজা বিদ্যমান থাকা অকল্যাণকর,” এ কথাটির অর্থ ইহাই মনে হয় যে, কোন কারণে যদি প্রজারা রাজার কার্যে অসন্তুষ্ট হয়, তবে তাহারা স্বভাবতঃই সেই সাধু রাজার সাহায্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বিদ্রোহী হইতে পারে। দেবগুপ্তের পরাজয়ে ক্ষুব্ধ হইয়া হউক, বা পূর্বোক্ত বিদ্বেষবশতঃই হউক, শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে বড় ব্রহ্মপুর্বক হত্যা করিবার অভিসন্ধি মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন। তিনি রাজ্যবর্দ্ধনকে গোড়দেশে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন এবং অতিশয় আপ্যায়ন ও স্নেহমধুর ব্যবহারে তাহার মনের সমস্ত সন্দেহ অপনোদন করিয়া (৬০৬ খৃঃ অঃ) স্বীয় রাজধানীতে আনিয়া নিরস্ত্র অবস্থায় গোপনে হত্যা করিলেন। এই ঘটনা হর্ষচরিত্র এবং হিউনসাঙ্গের বিবরণে লিখিত

আছে, বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণ শশাঙ্কের সমস্ত দোষ যথাসাধ্য খালন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধনকে তাঁহার সিংহনাদ নামক এক সেনাপতি এই নিষ্ঠুর সংবাদ দেওয়ার সময়ে শশাঙ্ককে “গৌড়ভুজঙ্গ” নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই কৃত্রিম ব্যবহারের সংবাদ শুনিয়া হর্ষবর্দ্ধন প্রতিজ্ঞা করিলেন—“যে পর্য্যন্ত এই গৌড়াধিপ শশাঙ্ককে আমি হত্যা না করিতে পারিব, সে পর্য্যন্ত আহা-বিষয়ে দক্ষিণ হস্তের ব্যবহার করিব না।” কথিত আছে শশাঙ্ক শূড়লাবদ্ধ কান্তকুজের রাজ্যী রাজ্যশ্রীর বন্ধন মোচন করিয়াছিলেন।

শশাঙ্ক গোড়া শৈব এবং বৌদ্ধবিষেবী ছিলেন। হিউনসাঙ্গ লিখিয়াছেন—তিনি বোধিতকুর মূল উচ্ছেদ করিয়া পাটলীপুত্র ও কুশীনগরে বহু বৌদ্ধকীর্তি ধ্বংস করেন।

পাটলীপুত্রে তিনি বুদ্ধ-চরণ-চিহ্ন-লাঙ্ঘিত প্রস্তরখণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা না পারিয়া উহা গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কুশীনগর হইতে তিনি বৌদ্ধ শ্রমণ-দিগকে দূর করিয়া দিয়া গয়ার বোধিবৃক্ষের উচ্ছেদ এবং আশ্রমসমূহ ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং বোধিবৃক্ষের নিকটবর্তী আশ্রমের বুদ্ধমূর্তি ভাঙ্গিয়া তৎস্থানে শিবমূর্তি স্থাপন করিতে আদেশ দেন, কিন্তু ঐ কার্যের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মূর্তি ভাঙিতে সাহসী না হইয়া একটা প্রাচীর তুলিয়া উহা চকুর আড়াল করিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত হইয়াছে যে শশাঙ্ক এইসকল তীর্থস্থান ধ্বংস করিয়া পরিণামে আতঙ্কিত হইয়াছিলেন; তাঁহার শরীরময় ঘা হইয়াছিল এবং মাংস পচিয়া গিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করার পর কিছুকালের জন্ত শশাঙ্ক কান্তকুজ অধিকার করিয়াছিলেন। ৬০৬ খৃঃ অব্দে শুধু কামরূপ ছাড়া প্রায় সমস্ত উত্তর-পূর্ব ভারত তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি অতি প্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন।

হর্ষবর্দ্ধন জ্যেষ্ঠভ্রাতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্ত নিগোড় করিবার মানসে গোড়ে অভিযান করেন। কামরূপের ভাস্করবর্মা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এই অভিযানের সহায়তা করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ কতকটা সহায়তা পাইয়াছিলেন। এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

শশাঙ্কের যে সকল স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহাদের কতগুলি খাটি এবং কতকগুলিতে অল্প ধাতুর বেশী পরিমাণে খাদ আছে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয়, দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করিতে বাইয়া গোড়ের রাজকোষ শূন্য হইয়াছিল, তজ্জন্ত শশাঙ্ক এরূপ অপকৃষ্ট মুদ্রা চালাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এইরূপ ব্যয়বাহুল্যে নিঃস্বতাপন্ন ভাণ্ডার পূরণ করিবার জন্ত খাদযুক্ত স্বর্ণমুদ্রার প্রচলনের রীতি কয়েক রাজ্যে ঘটিয়াছিল। স্বন্দশ্বপ্তের মুদ্রায়ও এইরূপ খাদ দৃষ্ট হয়, তাহাও একই কারণে ঘটিয়াছিল।

নানারূপ অশান্তি ও রোগের প্রকোপ সহ করিয়া শশাঙ্ক ছয়বৎসরব্যাপী যুদ্ধের

শেষভাগে মৃত্যুস্থলে পতিত হন। * সম্ভবতঃ গোড়েশ্বরের পরাজয় এবং মৃত্যুঘটিত ক্রোধবশতঃ পুলকেশী হর্ববর্দ্ধনের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইয়া তাঁহাকে শেষে পরাস্ত করিয়াছিলেন। হর্ববর্দ্ধন ব্রাহ্মণগণের চক্রান্তে তাঁহার জনৈক অমাত্যকর্তৃক নিহত হন।

এই অন্ধকার-যুগে মাঝে মাঝে গোড়ের যে কাহিনী পাওয়া যায় তদ্ব্যতীত শশাঙ্কের কীর্তি স্মরণীয়। তিনি হঠাৎ কোন গ্রহ-উপগ্রহের মত উদ্ভিত হইয়া কয়েক বৎসরের জন্ত তাঁহার চমকপ্রদ বীরত্ব, রাষ্ট্রীয় কূটনীতি ও প্রতিভার আলো ছোট ছোট গুপ্তরাজ্য।

দেখাইয়া গোড়াকাশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস ও পালরাজত্বের অভ্যুদয়ের মধ্যে গোড়সম্বন্ধে আরও দু'একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। শশাঙ্কের পূর্বে ৫৩৩ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত গুপ্তবংশের ভানুগুপ্ত গোড়দেশ শাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে কতক সময়ের জন্ত মালবরাজ যশোবর্দ্ধা।

যশোবর্দ্ধা এই দেশ স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। গোড়দেশের ভাগ্যলক্ষ্মীর এইভাবে পুনঃ পুনঃ বিপর্যয় ঘটিতেছিল। হর্ববর্দ্ধনের মৃত্যুর পর গুপ্তবংশোদ্ভূত মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক আদিত্যসেন ৬৭১ খৃঃ অব্দে মগধে পুনরায় স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ গোড়দেশপর্যন্ত তিনি স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। আদিত্যসেনের রাজ্যের নাম ছিল “কোণাদেশী”।

পৌণ্ড্রদেশ কতকদিনের জন্ত শৈলবংশীয় কোন রাজার অধীন ছিল।

এই সময়ে বঙ্গের আর একটি পরাক্রান্ত রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। হিউনসান্স এবং ইৎসিং উভয়েই লিখিয়াছেন—তাঁহাদের অবস্থিতকালে সমতটে খড়্গাবংশীয় নৃপতিগণ দৃঢ় ভাবে শাসনব্যয় চালাইতেছিলেন। খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গা এবং তৎপুত্র দেবখড়্গা এই কয়েকটি নাম আমরা পাইতেছি। সার্কভোম

* সম্প্রতি “বোধিসত্ত্ব পিটকাবতঃশক” (অন্ত নাম “মঞ্জুশ্রী মূলকল্প”) নামক একখানি গ্রন্থ শ্রীযুক্ত কে. পি. জয়মোহন সম্পাদন করিতেছেন। এই পুস্তকে রাজাদের নাম ইন্দ্রিতে দেওয়া আছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন, ইহাতে যে ‘হকারাভ’ নাম দেওয়া আছে, তাহাতে হর্ববর্দ্ধন বুঝা যাইবে। ‘রকারাভ’ রাজা রাজ্যবর্দ্ধনকে এবং ‘সোমাথা’ শশাঙ্ককে বুঝাইতেছে। এই অনুমান ঠিক হইলে শশাঙ্ক নব্বয়ে পুস্তকখানি হইতে জানা যায় :—তিনি দুইকর্ণা ছিলেন এবং কানী পদ্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অব্যবহিত পরে, উদয়র নগরের জয়নাগ নামক এক রাজা অল্প সময়ের জন্ত গোড় রাজত্ব করেন।

‘হকারাভ’ রাজা অর্থাৎ হর্ববর্দ্ধন—

“পরাজয়ানাস সোমাথাঃ দুইকর্ণাঘুচাশিণম্।

ততো নিবন্ধঃ সোমাথোঃ স্ববেশেনাবতিষ্ঠতঃ।

নিবর্ত্তয়মাগ হকারাথাঃ রেচ্ছ রাজ্যেনমপুজিতঃ।

তুইকর্ণা হকারাথো নৃপঃ শ্রেয়সা চার্ঘ্য বশ্মিনঃ।

স্ববেশেনৈব প্রয়াতঃ যশেইগতিনাপি স।”

মঞ্জুশ্রী মূলকল্প কাহার কাহারো মতে দ্বাদশ শতাব্দীতে কাহারও মতে অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হয়।

রাজাদের সম্বন্ধে বেক্রপ স্তোকবাণী লিখিত হয়, তাম্রলিপির কবি ইহাদের সম্বন্ধেও সেইরূপ স্তোকবাণী বলিয়াছেন, যথা “নিখিলকৃতিপতিজয়ী”—“অশেষ-কৃতিপাল-মৌলিমালা-মণি-খচিত-পাদপীঠ” ইত্যাদি। সমতট প্রদেশ সম্ভবতঃ পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রাচীন খাদ, উত্তর গারো ও অজ্ঞাত পাহাড়, পূর্বে ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট, দক্ষিণে সমুদ্র—এই সীমানার মধ্যে অবস্থিত ছিল। বস্তুতঃ এখন পূর্ববঙ্গ বলিতে যে দেশটি বুঝায় তাহার প্রায় সমস্তটাই এই সমতটের অন্তর্গত ছিল। খজ্জাবংশীয় রাজারা বিদ্যাচর্চা ভালবাসিতেন এবং বিদ্বান্দিগকে সমাদর করিতেন; ইহারা প্রসিদ্ধ নালন্দা বিহারের উৎসাহবর্দ্ধক ও সাহায্যকারী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় নানা প্রমাণ দ্বারা দৃঢ়রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই রাজাদের রাজধানী ছিল কর্মান্তনগর (আধুনিক কামতা বা বড়কামতা, কুমিল্লার ১২ মাইল পশ্চিমে)। শ্রীযুক্ত দীক্ষিত সাহেব এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নহেন। খজ্জোদ্যামের পৌত্র দেবখজ্জা শ্রীহর্ষের সমসাময়িক। এই কর্মান্ত বা কামতানগরে যে স্থানে বিহার ছিল—তাহা এখনও ‘বিহারমণ্ডল’ নামে পরিচিত, উহা বড়কামতা গ্রামের কিছু উত্তরে। ভট্টশালী মহাশয় বলেন, খজ্জাবংশীয় রাজাদের রাজ্য ত্রিপুরা, নোয়াখালী, বরিশাল, ফরিদপুর এমন কি ঢাকা জেলার কোন কোন অংশ জুড়িয়া ছিল, ইহাই প্রাচীন সমতট। এই রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন, দেবখজ্জের পুত্র রাজভট্ট, একজন গৌড়া বৌদ্ধ ছিলেন। হিউনসাঙ্গের সময়ে কর্মান্ত নগরের পরিধি ৫ মাইল ব্যাপক ছিল। রাজধানীর অভ্যন্তরে ত্রিশটি সজ্জারাম ও শতাব্দিক দেবমন্দির ছিল। হিউনসাঙ্গের সময়ে এই নগরে ২০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন, কিন্তু ৫০ বৎসর পরে ইংসিংএর সময়ে (৬৭৩ খৃঃ—৬৮৮ খৃঃ) এই সংখ্যা বাড়িয়া ৪০০০ এ পরিণত হইয়াছিল।

রাজভট্ট সমস্ত বৌদ্ধমঠ ও মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করিতেন। এই নগরে বহু জৈন (নিগ্রহ) বাস করিতেন, এবং ইহাতে একটি অশোকস্তম্ভ ছিল বলিয়া হিউনসাঙ্গ লিখিয়াছেন। ভট্টশালী মহাশয় তথায় একটি স্তম্ভ দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহার বর্ণনা বেক্রপ পাওয়া যায়, তাহাতে উহা চীন পর্যটককথিত সেই প্রাচীন অশোকস্তম্ভ বলিয়াই মনে হয়।

যে কারণেই হউক এই খজ্জাবংশীয় রাজাদের সঙ্গে আরাকানের রাজাদের সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল। সম্ভবতঃ রাজভট্টের পরে কোন সময়ে কর্মান্ত রাজ্য লহদেবের অধীন হইয়াছিল। লহচন্দ্র বা লহয়চন্দ্র নাম সম্ভবতঃ আরাকানরাজ চুলটেংচন্দ্রেরই বাঙ্গলা রূপান্তর। তাম্রশাসনে শ্রীমৎস্যলহচন্দ্রবিজয়রাজ্যের অষ্টাদশ বৎসরে শ্রীকৃষ্ণমদেবস্বত ভারদেবের উল্লেখ আছে। ইহার উপাধি ‘কর্মান্তপাল’ দৃষ্ট হয়। ইহাতে মনে হয় তখন আর কর্মান্তের রাজারা রাজচক্রবর্তী ছিলেন না—তাহারা “শাসনকর্তা” হইয়া গিয়াছিলেন। লহয়চন্দ্র (চুলটেংচন্দ্র) ৯৫১ খৃষ্টাব্দে আরাকানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আরাকানরাজাদের সঙ্গে কর্মান্তরাজগণের, জয়ী ও জিত, কিংবা বৈবাহিক

আত্মীয়তা-সূত্রে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আভাস পাওয়া যায়। আরাকানরাজদের মুদ্রালাঞ্জন শায়িত বৃষ, খজ্রাবংশেরও তাহাই। বড়কামতার চতুর্দিকস্থ ভূভাগ ‘পাটিকারা’ নামে পরিচিত। ব্রহ্মদেশের ইতিহাস ‘মহারাজোয়াং’ গ্রন্থে এই ‘পাটিকারা’র কথা উল্লিখিত আছে। ময়নামতীর গানে দৃষ্ট হয় যে, মাণিকচন্দ্র রাজা এই পাটিকারার রাজধানীতে রাজত্ব করিতেন।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর পাটিকারার কোন রাজকুমার পেগুর রাজা কিংমিথার কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহজাত পুত্র অলংশিশু পাটিকারার এক কন্যাকে বিবাহ করেন। কথিত আছে অলংশিশু পিতৃভূমি দেখিবার জন্য প্রায়ই পাটিকারায় আসিতেন। অলংশিশু ১০৮৫ খৃঃ—১১৬০ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন (নলিনী ভট্টশালী মহাশয়ের প্রবন্ধ, প্রতিভা ২য় সংখ্যা, ১২৫ পৃঃ)।

এই বড়কামতা গ্রাম ও তাহার নিকটবর্তী প্রদেশগুলি জুড়িয়া প্রাচীন বহু কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। ভট্টশালী মহাশয় তাহার একটি কৌতূহলোদ্বেগকরী করুণ বর্ণনা দিয়াছেন। তথাকার অষ্টাদশ-হস্তবিশিষ্ট নটেস্বরের মন্দির, ত্রিশটি সজ্জারামের ভিকুদের বিপুল কোলাহল, নিগ্রহৃদিগের কঠোর যতিধর্মপালন—পুরাকালের বাঙ্গলার সেই স্বাধীন রাজ্যের প্রতাপ ও সমৃদ্ধি এখন একটি স্বপ্নে পরিণত। কবির সেই উক্তি মনে পড়ে,—
“এই যদি শেষ, সব হয় শেষ, জীবন স্বপন প্রভাতে ও।
তুম্বন ফয়রে, ছঃখ শত সহিয়ে,
ভ্রমিছে লোকে কি আশে ও।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজতরঙ্গিনী-কথিত দুইটি আখ্যান

গৌড়ের এই অন্ধকার-যুগে যে কয়েকটি ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক রশ্মি পাওয়া গিয়াছে, তাহার কিছু কিছু আভাস দেওয়া হইল। এখানে আমরা কলহগুরুত রাজতরঙ্গিনীর (কাশ্মীরের ইতিহাস) দুই একটি উপাখ্যানের উল্লেখ করিব। এই সকল বিবরণের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ নহি, কিন্তু বর্ণিত ঘটনাগুলি যে কতকাংশে সত্য, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

আবুল ফজল লিখিয়াছেন, পালদিগের অব্যবহিত পূর্বে জয়ধর নামক এক রাজা গোড়াধিপতি ছিলেন,—অধ্যাপক ল্যাসন মনে করেন ইনিই রাজতরঙ্গিনীর “গৌড়েশ্বর জয়ন্ত”, এই কথাটুকুর অবতারণা করিয়া আমরা রাজতরঙ্গিনীর কাহিনীটি নিয়ে দিতেছি।

তখন কাশ্মীরাবিপতি ছিলেন জয়াপীড়, ইনি মহারাজ ললিতাদিত্যের পৌত্র। তরুণ জয়াপীড় মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, তিনি একাকী কোন শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী

হইবেন, তৎপূর্বে তিনি কোন ভোগবিলাসে প্রমত্ত হইবেন না।
জয়াপীড়ের সঙ্কল্প ও গৌড়ে আগমন। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া তিনি একক ছদ্মবেশে দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। সেই সুদূর কাশ্মীরের লবঙ্গ ও আম্ররসতা-পরিশীলন-মধুর আবহাওয়ার সীমা ছাড়িয়া একেবারে খজুর-তাল-তমাল নিষেবিত, গঙ্গানীর সম্পৃক্ত-সমীরচূষিত বঙ্গদেশের নাতিশীতোষ্ণ বায়ুর সংস্পর্শে আসিলেন। প্রথমতঃ পৌণ্ড বর্জন হইয়া তৎপরে তিনি গৌড়ে উপস্থিত হইলেন। গৌড়ের রাজা তখন জয়ন্ত। গৌড়ে এক বিশাল চাক্ষুশিযথচিত কার্তিকেয়ের মন্দির ছিল। সেখানে প্রতি নিশীথে অপূর্ণ সুন্দরী নর্তকীরা অঙ্গের নানারূপ লীলায়িত ভঙ্গী দেখাইয়া নৃত্যদ্বারা দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিত। নর্তকীর শ্রেষ্ঠ ছিলেন কমলা। সরসীর কুমুদদলের মধ্যে বেক্রপ চন্দ্ররশ্মি—সেই কার্তিকেয়ের মন্দিরে সঙ্গীতের আসরে কমলার গীতি ও নর্তন ছিল তেমনই।

জয়াপীড় ও কমলা। এদিকে ছদ্মবেশী হইলেও কাশ্মীরের তরুণ রাজার রূপ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কাশ্মীর ধরাতে নন্দনবন, সেখানকার দ্বীপুরুষ স্বভাবতঃই সৌন্দর্যের জন্ত বিখ্যাত। জয়াপীড় ছিলেন কাশ্মীরবাসীদের মধ্যেও পরম সুন্দর, সুতরাং নবাগত যুবকের প্রতি সকলেরই মুগ্ধ দৃষ্টি পতিত হইল। কিন্তু বিশেষ করিয়া রূপের জালে পড়িলেন কমলা। শুধু কুমারের স্ত্রী রূপ নহে, তাহার কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া কমলা বুঝিলেন, ইনি কোন দেশের রাজা হইবেন। কতকগুলি লক্ষণের একটি এই যে সেকালে রাজাদের সঙ্গে সর্বদা তাবলধারিণী থাকিত, মণিযথিত সুবর্ণপাত্র-হস্তে তাহারা রাজার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া থাকিত। রাজা ইচ্ছানুসারে পৃষ্ঠের দিকে হাত বাড়াইয়া তাবল গ্রহণ করিতেন। রাজনটী লক্ষ্য করিল, তরুণ যুবক অভ্যাসবশতঃ পুনঃ পুনঃ স্বীয় পৃষ্ঠের দিকে হস্ত প্রসারিত করিতেছেন। মেঘ ফুরাইয়া গেলেও ময়ূর বেক্রপ অভ্যাসবশতঃ কেকারব করে, রাজ্য হইতে প্রবাসে একাকী আসিয়াও জয়াপীড় সেইরূপ এই হাত বাড়াইবার অভ্যাস ছাড়িতে পারেন নাই। নটী বুঝিলেন, ইনি রাজা না হইয়া বান না।

রমণীরা নানারূপ ছলাকলায় পারদর্শিনী, সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নর্তকীর পক্ষে জয়াপীড়কে কোশলে ভুলাইয়া স্বগৃহে লইয়া আসা বিশেষ শক্ত কাজ হয় নাই। কিন্তু যখন নর্তকী নানা অমুনয় বিনয় করিয়া তরুণ নৃপতিকে প্রেম নিবেদন করিলেন, তখন তিনি সঙ্কল্পের বিষয় তাহাকে বলিয়া নিরস্ত করিলেন। এই সময়ে একটা বড় বকমের সিংহ গৌড়ের এক জঙ্গলে ঢুকিয়া বড়ই উৎপাত করিতেছিল। রাজা সেই সিংহের মস্তকের জন্ত উচ্চ পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। কিন্তু কোন শিকারী সিংহকে বধ করিতে সমর্থ হইল না। এই কথা শুনিয়া বহু লোকের নিবেদন মাত্র না করিয়া একাকী খড়্গাহস্তে জয়াপীড় সিংহ খুঁজিতে নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন, খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি সিংহের

সিংহবধ।

গুনিয়া বহু লোকের নিবেদন মাত্র না করিয়া একাকী খড়্গাহস্তে জয়াপীড় সিংহ খুঁজিতে নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন, খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি সিংহের

দর্শন পাইলেন এবং খড়্গের এক আঘাতে তাহাকে বধ করিলেন। কিন্তু মুন্সু সিংহ জয়্যাপীড়ের দক্ষিণ বাহু কামড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

গৌড়েশ্বরের আদেশে সেই সিংহের মস্তক তাঁহার নিকট অনীত হইল, কিন্তু শিকারীর দর্শন নাই। সঙ্কল্প পূর্ণ হওয়ার আনন্দে তিনি রাজধানীর এক প্রান্তে একাকী বিশ্রাম ভোগ করিতেছিলেন। তখন শিকারীর বাহু কামড়াইবার সময়ে তাঁহার মনিময় বলয় সিংহের দংষ্ট্রাবদ্ধ হইয়াছিল। সেই বলয় খোলা হইলে রাজা দেখিলেন, তাহাতে “জয়্যাপীড়” নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

ছদ্মবেশী যুবক ললিতাদিত্যের পোজ, তরুণ বয়সে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, একথা কোথাও অবিস্মৃত ছিল না। গৌড়েশ্বর জয়ন্ত শিকারীকে আনিবার জন্ত বহু লোক নিযুক্ত করিলেন। জয়্যাপীড়কে রাজসকাশে উপস্থিত করা হইল। তিনি সাদরে তাঁহার গুণবতী ও রূপবতী কন্যা কল্যাণীদেবীকে জয়্যাপীড়ের কল্যাণীদেবীর সহিত বিবাহ।

সঙ্গে বিবাহ দিয়া তাঁহাকে নানা উপঢৌকন প্রদান করেন। কলহ লিখিয়াছেন, জয়ন্তের পাঁচটি প্রবল শত্রুকে পরাজয় করিয়া জয়্যাপীড় তাঁহার খণ্ডের রাজ্য নিকট করিয়াছিলেন।

জয়ন্তকে কায়স্থ ও প্রখ্যাতনামা আদিশুরের সহিত অভিন্ন প্রমাণ করিবার জন্ত যে কয়েকখানি জাল কুলজী সম্প্রতি প্রণীত হইয়াছে তাহার অসারতা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষভাবে তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসে (১৫২-১৬১ পৃঃ ১৩০০) প্রতিপন্ন করিয়াছেন। (জয়্যাপীড়ের বিবরণ রাজতরঙ্গিণী ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

গৌড়েশ্বর জয়ন্তের গুণবতী কন্যা কল্যাণীদেবীকে যে কাশ্মীরের রাজা জয়্যাপীড় বিবাহ করেন, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই; কিন্তু বাকী গল্পটা বেন রূপকথার রাজকুমারের কাহিনীর মত শোনায। তাহার কতটা সত্য, কতটা মিথ্যা এবং অতিরঞ্জন তাহা প্রমাণ করিবার উপায় নাই।

কলহণের দ্বিতীয় উপাখ্যানটি জয়্যাপীড়ের পিতামহ ললিতাদিত্য (মুক্তপীড়) সম্বন্ধীয়। তাহাতে বাঙ্গালীর শৌর্যবীর্যের অনেক পরিচয় আছে।

ললিতাদিত্যের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের বহুদিন কলহ চলিতেছিল। তিনি সন্ধি করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া তাঁহাকে কাশ্মীরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। গৌড়েশ্বর স্বভাবতঃই শত্রুরাজ্যে প্রবেশ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছিলেন। কিন্তু ললিতাদিত্য কাশ্মীরের ললিতাদিত্য ও গৌড়েশ্বর।

তাঁহার গৃহদেবতা ‘পরিহাস-কেশব’কে স্পর্শ করিয়া তাঁহার সম্মানিত অতিথিকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি তাঁহার কোন বিষ ঘটে তবে তৎক্ষণাৎ ‘পরিহাস-কেশব’ দায়ী হইবেন। গৃহদেবতাকে লইয়া এরূপ স্পষ্ট প্রতিশ্রুতির পর গৌড়েশ্বর অবশ্য নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন; কিন্তু কাশ্মীর-রাজ এই পবিত্র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া ত্রিগামী নামক স্থানে গুপ্তহস্তারক নিযুক্ত করিয়া রাজ-অতিথিকে নিধন করেন।

এই সংবাদ পাইয়া রাজার দেহরক্ষীর একটি ক্ষুদ্র দল গোড়দেশ হইতে প্রতিশোধ লইবার জন্ত কাশ্মীরভিমুখে রওনা হইল। কলহ লিখিয়াছেন (৪র্থ অধ্যায়) ;—

দেহরক্ষী ক্ষুদ্রবলের
অভিযান।

“গোড়রাজ্যের পরিচারকেরা তাঁহার প্রতি প্রেম ও ভক্তির অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্বীয় প্রাণ স্বীয় প্রভুর জন্ত বিসর্জন দিয়াছিল। (৩২৪ শ্লোক)

“তাঁহারা কাশ্মীরের তীর্থ সারদা দেবীর মন্দির দেখিবার ছলনা করিয়া এক জোট করিয়া পরিহাস-কেশবের মন্দিরে প্রবেশ করিল, এই পরিহাস-কেশবই তো তাঁহাদের প্রভুর জীবনের জন্ত জামিন হইয়াছিলেন। (৩২৫ শ্লোক)

“পুরোহিতেরা দেখিলেন, গোড়ীয় সৈন্তগণ পরিহাস-কেশবের মন্দিরে ঢুকিতেছে ; রাজা তখন কাশ্মীরে ছিলেন না, তাঁহারা মন্দিরের সদর দরজা বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। (৩২৬ শ্লোক)

“গোড়ীয়গণ সেখানে মহামারী উপস্থিত করিয়া পরিহাস-কেশব ভ্রমে ‘রামস্বামী’ নামক বিষ্ণুর অপর এক রজতময় বিগ্রহ আক্রমণ করিল। তাঁহারা সেই মূর্তি পীঠ হইতে উৎপাটিত করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। (৩২৭ শ্লোক)

‘পরিহাস-কেশব’ ভ্রমে
‘রামস্বামী’ বিগ্রহের ধ্বংস।

“এদিকে ত্রীনগরের সৈন্তগণ আসিয়া যখন সেই মূর্তিময় গোড়ীয়গণকে বধ করিতেছিল, তখনও তাহারা স্বীয় মৃত্যু অগ্রাহ্য করিয়া সেই দেবমূর্তি ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাঁহার বেণু চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিতেছিল। (৩২৮ শ্লোক)

“গোড়ীয়গণের ক্রুদ্ধদেহ রক্ত-রঞ্জিত হইয়া যখন ভূমিতে পড়িতেছিল তখন তাহারা পরস্পরগাত্রে স্থলিত রক্তিম গৈরিকাবৃত প্রস্তরখণ্ডের মত দেখাইতেছিল। (৩২৯ শ্লোক)

“তাঁহাদের রক্তধারা যেন তাঁহাদের অসাধারণ প্রভুভক্তিকে সমুজ্জ্বল করিয়া দেখাইল এবং ধরিত্রীকে অসামান্য সম্পৎশালী করিল। (৩৩০ শ্লোক)

“তড়িপাত বজ্রদ্বারা নিবারিত হয়, অতি মূল্যবান মরকত মণি (Emerald) দ্বারা বহুবিধ দোষ নষ্ট হয়। প্রত্যেক মণির কোন না কোন আশ্চর্য্য ব্যবহারিক মূল্য আছে, কিন্তু এই বীরগণের বীরত্বের তুলনায় অপর সমস্ত মণি নিস্পত্ত। (৩৩১ শ্লোক)

“তাঁহারা তাঁহাদের প্রভুর জন্ত কত দূরদেশ পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছিল। সেই মৃত প্রভুর জন্ত তাঁহারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া কি অসাধ্য-সাধনই না করিয়াছিল। (৩৩২ শ্লোক)

“সেই দিন গোড়ীয়গণ বাহ্য করিয়াছিল, তাহা সৃষ্টিকর্ত্তাও বুঝি করিতে পারিতেন না। (৩৩৩ শ্লোক)

“রামস্বামীর বিগ্রহ এই গোড়ীয় সয়তানগণ ভগ্ন করাতে রাজার অতি সাধের বিখ্যাত ‘পরিহাস-কেশব’ বিগ্রহ রক্ষা পাইয়াছিল। (৩৩৪ শ্লোক)

“এখন পর্য্যন্ত রামস্বামীর মন্দির বিগ্রহশূন্য থাকিয়া গোড়ীয়গণের জগদ্ব্যাপী বীরত্ব-যশের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।” (৩৩৫ শ্লোক)।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৌর্য ও গুপ্ত-রাজত্ব শিল্পসাহিত্য

“ন প্রভা তরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাং”—কালিদাস।

আমরা যুধিষ্ঠিরের যুগ, মৌর্যযুগ এবং গুপ্তদের যুগ—ভারতের এই তিন প্রধান যুগের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি—এই তিন যুগই গোড়দেশের উজ্জ্বল কীর্তিচিহ্নিত। রঘুবংশে দিলীপের দ্বিধিজয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে বাঙ্গালীরা তাঁহাকে তাঁহাদের রণতরীর সাহায্যে বাধা দিয়াছিল, এবং সে যুদ্ধে এত ভীষণ হইয়াছিল যে বিজয়ী রঘু জয়ন্তস্ত প্রোথিত করিয়া স্বীয় গৌরব ঘোষণা করিয়াছিলেন। কালিদাসের রঘুবংশ অবশ্য ইতিহাস নহে, কিন্তু গুপ্ত-যুগে যে বঙ্গবীরগণ যুদ্ধবিজ্ঞায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এই সংস্কার কালিদাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—তাহাতে সন্দেহ নাই। যুধিষ্ঠিরের যুগে ভগদত্ত, জরাসন্ধ, পৌণ্ড্র বাসুদেব, মুর, নরক, সমুদ্রসেন—ইহারা কৃষ্ণদেবী এবং কৃষ্ণের প্রতিবন্দী ছিলেন। ইহাদের রাজ্যের সীমা যুগে যুগে রাষ্ট্রীয় বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ইহারা সকলেই বৃহত্তর বাঙ্গালার অধিবাসী ছিলেন। মৌর্যযুগের পূর্বে বঙ্গের এক ছন্দান্ত রাজকুমার সিংহল বিজয় করিয়াছিলেন। সেই বিজয়কাহিনী সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয়ে একরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, সেই ঘটনার বহু শতাব্দী পরেও অজস্তার চিত্রকরের তুলি সিংহলবিজয় তাঁহার সমস্ত প্রতিভা দিয়া আঁকিয়াছিল। অজস্তার অতুলনীয় চিত্রগুলির শীর্ষস্থানে বিজয়ের অভিযান। গুপ্তযুগের শেষার্ধ্বে ‘গৌড়-ভূজঙ্গ’ শব্দ প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করিয়াছিলেন।

মৌর্যযুগ হইতে বঙ্গের অতি নিকটবর্ত্তী মগধই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল। বাহারা মগধ-জয়ী, তাঁহারা ভারতজয়ী। আমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের উল্লেখ এখানে করিব না। যিনি যখন মগধ জয় করিয়াছেন, তিনিই সর্বত্র জয়ী হইয়াছেন, তিনিই একচ্ছত্র রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া সমগ্র ভারতের উপর রাজদণ্ডের প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। তদানীন্তন ভারতবর্ষের আয়তন অতি বৃহৎ ছিল—একদিকে পারস্য, অপর-দিকে রাজ্যমাটা, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সিংহল। এই বিরাট ভূভাগ সাক্ষাৎসম্মুখে বা পরোক্ষে মগধের শাসন মানিয়া চলিত। জরাসন্ধ হইতে স্বনামগুপ্ত পর্য্যন্ত মগধের রাজগণ ভারতীয় রাজচক্রবর্ত্তীগণের পুরোভাগে বিরাজ করিতেছিলেন। ইন্দুমতীর স্বয়ংবর উপলক্ষে কালিদাস সমস্ত নৃপতির পুরোভাগে মগধেশ্বরের স্থান দিয়া লিখিয়াছেন, ভূমণ্ডলে

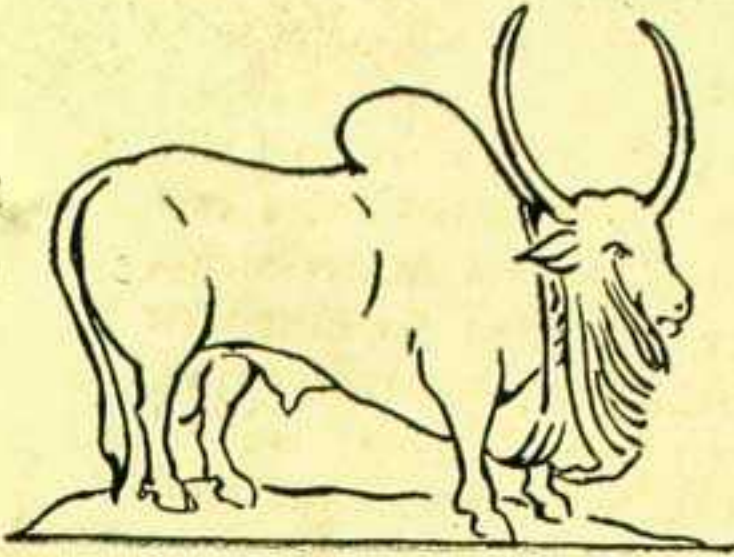
সহস্র সহস্র নরপতি থাকিলেও বসুমতী কেবল এই মহীপতি দ্বারাই রাজবতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, যেহেতু রাজনী নক্ষত্র ও গ্রহগণে সমাকীর্ণ হইলেও কেবল চন্দ্রমা দ্বারাই দীপ্তিমতী হইয়া থাকে। (“কামং নৃপাঃ সন্ত সহস্রশোহন্তে, রাজবতীমাহরনেন ভূমি। নক্ষত্রতারা-গ্রহ-সঙ্কলাপি, জ্যোতিষতী চন্দ্রমসৈবরাত্রিঃ” ॥) কিন্তু এইবার মগধের ভাগ্যলক্ষ্মী আর একটু পূর্বদিকে মুখ ফিরাইয়া বহু প্রাচীন গোড়রাজধানীর প্রতি প্রসন্নদৃষ্টিতে চাহিলেন। গোড়দেশ মগধ-সিংহাসনের শ্রী হরণ করিয়া লইল। কিন্তু আমরা সেই অধ্যায় আরম্ভ করিবার পূর্বে গুপ্তযুগের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

দীহারী বলিতেন, ভারতীয় শিল্প বিদেশ হইতে এদেশে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের জন্ত নিত্য নূতন বিষয়ের সামগ্রী সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়া অধুনা তাহাদের সিদ্ধান্তগুলি অসার প্রতিপন্ন করিতেছে। কোন কোন লেখক “যোগীমারা” গিরিগুহা এবং বিজয়গড়ের প্রাচীন চিত্রাঙ্কন দেখিয়া তাহা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (*Indian Antiquary*, Vol. xxxiv, Sept., 1905)। কেহ কেহ রায়গড়ের অন্তঃপাতী সিদ্ধানপুর-গিরিগুহার চিত্রিত শৈলমালাকেও ঐ পর্ধ্যায়ে ফেলিয়াছেন (বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির বিবরণী, ১৯১৫, দ্রষ্টব্য)।

শেষোক্ত চিত্রগুলি বি. এন. আর রেলওয়ের মিঃ এডারসন সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। এই চিত্রগুলির সঙ্গে অধুনাতন কালের আবিষ্কৃত ফরাসী, স্পেন ও ইটালী দেশের প্রাচীন শৈলচিত্রগুলির খুব সাদৃশ্য আছে এবং এ সমস্তই এক যুগের বলিয়া আধুনিক মানবের চিত্রালেখ্য, মনে হয়। সিদ্ধানপুর বি. এন. রেলওয়ের নাহারপলী স্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে। এই স্থানের পাহাড়ের গাত্রে অঙ্কিত চিত্র-গুলি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অমর নাথ দত্ত, এল. এল. বি. মহাশয় ইংরেজীতে

‘Pre-Historic Relics of Singanpur’ নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহাতে সেই চিত্রগুলির কতকটির ছবি দেওয়া হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটি অতিকায় বানরাকৃতি মনুষ্যের ছবিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার হাত-পায়ের গড়ন, স্থবিশ্রুত বক্ষ, দীর্ঘবাহু,—খাট অগচ স্থল স্বক এবং ঈষৎ মুক্ত দেহ বে যুগের মনুষ্যের আভাস দেয় তাহাকে পণ্ডিতদের কেহ কেহ প্রত্ন-যুগ বলিয়া মনে করেন। মিঃ পারসি ব্রাউন তাহার *Indian Painting* নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—“The rock paintings at Singanpur may be of very remote antiquity.”* (সিদ্ধানপুরের এই গিরিচিত্রগুলি

* “These drawings depict human beings and animals and are accompanied by what appear to be hieroglyphics. Although many of these drawings are not unintelligible, enough of them have been identified to show that this primitive artist had a natural gift for artistic expression as proved by the facile manners in which he interpreted his ideas by means of these effective hematite brush forms.



* মহেশ্বরীদেবীর বৃষ, ৩৭ হাজার বৎসর পূর্বের, (২৪০-৪৩ পৃঃ)।



* পাহাড়পুরের একটি পুরুষের ছবি (পাহাড়পুর-সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত #১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)



* পাহাড়পুরে তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে রাখাক্ষ ও গোপদেবী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই চিত্র 'বঙ্গলাজুন-কল্পন'।



মহেশ্বরীদেবীর বৃষ
মাহেশ্বরের মূর্তি। ২০০
বৎসর পূর্বে নিখিত
বীরভূম জেলার একটি
কাঠের মূর্তি আমরা
এইরূপ বেশিয়াছি,
এবং পরবর্তী মূর্তিটির
সঙ্গে ইহার ভঙ্গীর
সাদৃশ্য আছে।



* কলিকাতা মিউ-
জিয়ামের একতলার
পূর্বদিকের বারান্দার
নবম-দশম শতাব্দীতে
নিখিত একটি বৃষবর্ণ
প্রস্তরস্তম্ভের নিম্নভাগের
মূর্তি হইতে গ্রহীত।



মহাপালসেবের বড় রাজ্যকে (২৮৪ খঃ) লিখিত অষ্টদশতিকা। প্রজাপতির মতো পুথির প্রথম পাতা অঙ্কিত ছবি, মূল চিত্র রচিত।



নরপতি কবিচন্দ্রের প্রজাপতি পুথির (১৭৬৩ খঃ) রচিত ছবি হইতে এই ছবিগুলি গৃহীত।



ব্রহ্মদামল, (১৭৩৯ খৃঃ)



ব্রহ্মদামল, (১৭৩৯ খৃঃ)



সিংহ—পটুয়ার আঁকা, ২৪শ পরগণা, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ।



সংকীর্ভন—পটুয়ার কর্জুক শুধু সাধারণ আঁকা, (করিবপুর) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ।

সুদূর প্রাচীন যুগের বলিয়া মনে হয়)। এই চিত্রগুলির মধ্যে মংস্তনারী (mermaid) এবং নানাবিধ পশুর প্রতিমূর্তি আছে। তখনও হয়ত মনুষ্যেরা জীবজন্তুকে পোষ মানাইতে শিখে নাই। শিকার দ্বারাই সম্ভবতঃ তাহারা জীবিকা নির্বাহ করিত। এই শিকারের ছবিগুলি দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত ইহাদিগকে 'শিকার-যুগের' মনুষ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন।

এই ছবিগুলি পাহাড়ের সিন্দুর ও গৈরিক প্রস্তরের গুড়া-দ্বারা অঙ্কিত। ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রাচীন চিত্রাবলীর সঙ্গে ইহাদের নিকট-সাদৃশ্য লইয়া অমরবাবু খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা করিয়া বলিয়াছেন—এই ছবিগুলির সঙ্গে যুরোপের নানাস্থানে প্রাপ্ত এবং জাভা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের প্রাচীন গিরিগুহায় অঙ্কিত মূর্তি তুলনা করিয়া বিশেষজ্ঞগণ ইহাদিগকে বিশ হাজার বৎসর পূর্বের বলিয়া অনুমান করেন।

সিঙ্গানপুরের ছবিগুলি বিশ হাজার বা পনের হাজার বৎসর পূর্বের কিনা পণ্ডিতগণ তাহার বিচার করিবেন। এই সকল তারিখ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করা আমার পুস্তকের বিষয়ভূত নহে; তথাপি নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে এগুলি হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর ছবি ও প্রতিমূর্তির যুগের বহু পূর্ববর্তী। এই যুগের নিকট ঋগ্বেদের যুগকেও মানবজাতির শিশুকাল বলা যাইতে পারে। এইখানে সিঙ্গানপুরের কয়েকখানি ছবির প্রতিলিপি দেওয়া হইল।

সম্প্রতি মধলপুর জেলায় বিক্রমখোলায় কতকগুলি চিত্রাঙ্কর আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাও পর্বত-গাত্রে উৎকীর্ণ। বিক্রমখোলার অনতিদূরে উবাকুটি নামক স্থানে ঐরূপ কতকগুলি জ্যামেতিক চিত্র ও প্রাণীর ছবি দুর্গম পাহাড়-গাত্রে পাওয়া গিয়াছে। বিক্রমখোলা বি. এন. আর. পথে বেলপাহাড় স্টেশন হইতে ৪।৫ মাইল দূরে অবস্থিত। লিপিগুলি ৩১ × ৬ ফিট স্থান ব্যাপিয়া আছে। অক্ষরসংখ্যা প্রায় ৩৫০। উবাকুটির অক্ষর বা চিত্রসংখ্যা ২০।২৫টি হইবে। মহেঞ্জোদারোর চিত্রাঙ্করের সঙ্গে এই সকল অক্ষরের সাদৃশ্য আছে এবং ইহাদের কোন কোন অক্ষর ব্রাহ্মী লিপির ছায়। কিন্তু এখনও ইহাদের পাঠোদ্ধার হয় নাই। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন, ইহাদের সময় আনুমানিক ৪০০০ বৎসর পূর্বের, মহেঞ্জোদারো ও অশোক-লিপির মধ্যবর্তী কোন সময়ে এই অক্ষরগুলি লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে।

এই সিঙ্গানপুরের চিত্রগুলি কুড়ি হাজার বৎসর পূর্বের অনুমান করিয়া লইলে ভারতীয় চিত্র-ইতিহাসের সময়-নির্দেশপূর্বক আমরা নিম্নলিখিত ভাবে একটা ধারাবাহিকত্ব দেখাইতে পারি।

- (১) সিঙ্গানপুরের চিত্র ২০,০০০ বৎসর পূর্বের।
- (২) মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার চিত্র—৬,০০০। ৭,০০০ বৎসর পূর্বের।
- (৩) বিক্রমখোলার চিত্রাঙ্কর—৪,০০০ বৎসর পূর্বের।
- (৪) মহাভারতাদি পুরাণ-বর্ণিত চিত্র—৩,৫০০ বৎসর পূর্বের।
- (৫) মৌর্যচিত্র—২,৫০০ বৎসর পূর্বের।

এই সকল চিত্রে এমন কতকগুলি বিষয় দৃষ্ট হয় যাহাতে অকাট্যরূপে প্রমাণ হয় যে বঙ্গদেশের চিত্রবিজ্ঞা কোন কোন স্থলে ইহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। এতৎ-সংলগ্ন চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করুন। বাঙ্গালা পল্লীতে লক্ষী-পূজায় ঠিক এইরূপ ছবি আঁকিয়া মেয়েরা পূজা করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভারতীয় চিত্র তাহার ধারাবাহিকত্ব হারায় নাই। কিন্তু এই সকল চিত্র বা মূর্তি নির্মাণ করিয়াছিল কাহারো? সে সকল চিত্রকরের বংশ কি লোপ পাইয়াছে?

আমরা মনে করি—আর্য্যগণ কোন চিত্র-সংস্কার লইয়া এতদেশে আসেন নাই, ভারতীয় আদিম অধিবাসীদিগের নিকটেই এই সংস্কার তাঁহারা পাইয়াছিলেন। ব্যাবিলন, ঈজিপ্ট, ক্রীট্ এবং অমেরিয়ান শিল্পের সঙ্গে এই ভারতীয় আদিযুগের শিল্পের নানারূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার যে লেখা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সহিত ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির কতকটা মিল দেখা যায়, কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন; এবং অমরবাবুর পুস্তকের সিদ্ধান্তপূর্ব্বক ৩নং চিত্রকে কেহ কেহ ঈজিপ্টের মত “চিত্রাকর” বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো ও বিক্রমখোলার চিত্র ব্রাহ্মী লিপির আদিপুরুষ হওয়া অসম্ভব নহে।

আর্য্যগণ সঙ্গীতকে যেরূপ উচ্চস্থান দিয়াছেন, চিত্রকলাকে সেরূপ দেন নাই। সাময়িক আখ্যায়িকায় শিল্পীর স্থান। ঋষিরা প্রমত্ত হইতেন। নারদ, তদ্বৃক প্রভৃতি সঙ্গীতের গুরুগণ আর্য্যগণপূজিত। দেবী ভারতীর হস্ত বীণা-রঞ্জিত।

চিত্র এবং স্থপতিশিল্পের দেবতা বিশ্বকর্মা কে আর্য্যগণ যদিও তাঁহাদের দেবপঞ্জিক্তিতে কতকটা স্থান দিয়াছেন, তথাপি কোন উচ্চবর্ণের লোকেরা ঐ দেবতার পূজা করেন না। স্বর্গবাসী দেবতার কোন শিল্পকার্য্য করাইতে হইলেই বিশ্বকর্মা কে ডাকাইয়া পাঠাইতেন, তিনি তাঁহাদের কর্ম্মচারীর মত। “বিশ্বকর্মা” ঠাকুর প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর শিল্পীদেরই দেবতা এবং তাহারাই এই দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা মনে হয় অনার্য্য জাতিদের নিকট হইতেই আর্য্যগণ এই শিল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লঙ্কার প্রধান শিল্পী ‘বিদ্যাদৃজিহ্ব’ রাক্ষসজাতীয় ছিলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থের রাজস্থল যজ্ঞের সভা নির্মাণ করিয়াছিলেন ময়দানব। এই ময়দানব প্রাচীন ব্যাবিলনের ময় (Maya) জাতীয় কিনা তাহা বিবেচ্য। মৌর্য্যযুগের শিল্পী “তুষাক্ষ”, যিনি সুদর্শন হ্রদের প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিলেন তিনিও সম্ভবতঃ অনার্য্য-বংশোদ্ভূত, তাঁহার নাম আর্য্যজাতীয় বলিয়া মনে হয় না।

আদিম শিল্পীরা কোথায়
গেল?

ঐতিহাসিক-যুগে চণ্ডালজাতীয় সূর্য্য স্থপতি কান্মীরে যে সকল অদ্ভুত স্থাপত্যের দ্বারা বিত্তস্তা নদীর গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, রাজতরঙ্গিণীকার কলহণ তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন; এখনও এ দেশে স্থাপত্য ও চিত্রের কারুকার্য্য সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই করিয়া থাকে। যাহারা তাম্রপটে অক্ষর উৎকীর্ণ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, সেই শিল্পীরাও হীনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়—ভোগট, তাতট প্রভৃতি পাল রাজাদের নিযুক্ত শিল্পী নিশ্চয়ই উচ্চকুলজাত ছিল না। এমন কি

মৌর্যগণের সময়েও আইন-আকবরিতে আবুল ফজেল যে কয়েকজন হি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই নিম্নশ্রেণীর; বিখ্যাত দম্বন্ত এবং কেশু কাহারাজাতীয়। যুরোপে চিত্রকরেরা যে সম্মান ও অর্থ প্রাপ্ত হন, ভারতীয় শিল্পকারগণ অনেক বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা শতগুণে উৎকৃষ্ট কারুকার্য করিয়াও তদপেক্ষা অতি অকিঞ্চিৎকর প্রতিষ্ঠা ও অর্থ পাইয়া থাকে। ভুবনবিজয়ী “মসলীন” যাহারা প্রস্তুত করিত, তাহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠাই বা কি ছিল? অর্থ সম্পদই বা কি ছিল?

হাতীর দাঁতের উপর যে সকল চিত্রকর মৌর্য বাদসাহদের স্বায়তন সর্কাদ-সুন্দর প্রতিকৃতি অঙ্কন করে, তাহারা এবং জয়পুরের অপূর্ণ প্রস্তর-শিল্পীরা অতিসামান্য উপার্জনে তুষ্ট।

ভারতচন্দ্র তাঁহার অয়দা-মঙ্গলে লিখিয়াছেন—ব্যাস বিশ্বকর্মাণকে অভিষাপ দিয়াছিলেন যে, তাঁহার পূজকগণ অর্থাভাবে না থাইয়া মরিবে।

এই সকল প্রমাণবলে আমার মনে হয়—ভারতীয় শিল্প অনার্যদের দান। অথচ বাৎস্তায়ন লিখিয়াছেন (৩য় শতাব্দী)—কলাবিজ্ঞার মধ্যে চিত্রবিজ্ঞাই সর্বশ্রেষ্ঠ। আদিম শিল্পিগণ কোথায় গেলেন? তাঁহারা কি জাতীয় ছিলেন?—এই অশোক-রেলিংএর মূর্তি।

জটিল প্রশ্নের সহজে সমাধান হয় না। ভারতবর্ষে যাহারা একবার আসিয়াছেন, কি হন, কি শক, কি পার্থান, কি মৌর্য, কি কালজ্বর, কি ম্যালেরিয়া কাহাকেও ত এ স্থান হইতে চলিয়া যাইতে দেখি নাই। যুরোপবাসীরা যেখানে যান তাঁহারা তদেশবাসী অধ্বসভাদিগকে একেবারে নির্মূল করিয়া ছাড়েন, যথা—আমেরিকার রেডইণ্ডিয়ান। কিন্তু সকল শ্রেণীর লোকই, কি জেতা বা কি জিত, ভারতের ক্রোড়ে ভিন্ন ভিন্ন যুগে আশ্রয় পাইয়াছেন। আমার মনে হয়—ভারতের আদিম শিল্পিগণ আর্যসমাজের নিম্নস্তরে স্থান লাভ করিয়াছিল এবং এখনও তাহাদের বংশধরগণ ‘কারিগর’ শ্রেণী নাম ধরিয়া নিম্নজাতিদের অন্তর্গত হইয়া আছে। দীর্ঘকাল আর্যসমাজের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে তাহারা তাহাদের চেহারার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়াছে, তথাপি আমার মনে হয় অশোক-রেলিংএ যে বহুসংখ্যক চ্যাপটা নাক, এদেশবাসী হইতে কতকটা ভিন্ন-লক্ষণাক্রান্ত ও মুখবিশিষ্ট লোক দৃষ্ট হয়, উহাই সেই আদিম শিল্পীদের মূর্তি। শিল্পীরা মনুষ্যমূর্তি আঁকিতে যাইয়া সহজেই তাহাদের নিজেদের প্রতিমূর্তি আঁকিয়াছে। এতৎসংলগ্ন চিত্র দেখুন।

মৌর্য রাজগণের কীর্তি দেখিয়া গ্রীস রাজদূত বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পারস্ত রাজধানীর ঐশ্বর্যকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন মৌর্য-যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের উপর গ্রীক প্রভাবের ছাপ স্পষ্ট। গান্ধারের দিকে যেখানে গ্রীক ক্ষত্রপেরা (Satraps) আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছিলেন, সেখানে অবশ্য গ্রীক-প্রভাবের অনেক নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহার পশ্চিমে যদি গ্রীক-প্রভাব কিছু থাকিয়াও থাকে—তাহা শুধু চালচিত্রে। ভারতীয় শিল্প কখনই গ্রীক-শিল্পের দ্বারা অভিভূত হয় নাই। রাজচক্রবর্তী বেক্রপ তাঁহার সাম্রাজ্যের দূর প্রান্তের প্রজা হইতেও রাজস্ব আদায় করিয়া

রাজসভাঘরে আদ্যসাৎ করিয়া থাকেন, ভারতীয় শিল্প সেইভাবে বিদেশী শিল্প হইতে কিছু গ্রহণ করিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল। তাহাতে ভারতীয় আদর্শ, ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, ভঙ্গী, শ্রী কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ভারতীয় শিল্প অধ্যাত্মবাদী হইয়াও জড়জগৎকে তুচ্ছ করে নাই; উহাতে অধ্যাত্ম সৌন্দর্যের সঙ্গে

গ্রীকশিল্পের প্রভাব।

জড়জগতের শোভা মিশিয়া গিয়াছে, গ্রীক-শিল্প বাহিরের অবয়বের প্রতি বদ্ধ-লক্ষ্য। নরনারীর অবয়বে সম্পূর্ণতা দান করাই তাহাদের তুলির চরম সার্থকতা, কিন্তু ভারতীয় শিল্প ভূতলে দাঁড়াইয়া স্বর্গ ছুঁইতে চাহিতেছে। তাহাদের শিল্পপ্রতিভা বিদ্যুতের মত পৃথিবীতল হইতে অরিত হয় নাই, তাহা অধ্যাত্মরাজ্যের দান। গ্রীক-প্রভাবাবিহীন বুদ্ধ এবং মগধের রীতি নির্মিত বুদ্ধ—এতদ্বয়ের পার্থক্য দেখাইবার জন্য আমরা কয়েকখানি ছবি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দিলাম।

এ সম্বন্ধে একটি কথা বক্তব্য। ভারতীয় বুদ্ধ ধ্যানের মূর্তি। বৌদ্ধগণ এখন জগতের দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। চীন, জাপান, সিংহল, রেঙ্গুন, জাভা, কাম্বোডিয়া, শ্রাম, বালি প্রভৃতি সকল স্থানেই বুদ্ধমূর্তি আছে। মগধশিল্পীর কয়েকখানি ভারতীয় বুদ্ধ-মূর্তির বৈশিষ্ট্য।

বুদ্ধমূর্তি ধ্যানী বুদ্ধের আদর্শ প্রতিকৃতি। তাহাদের নির্মাণপ্রণালী ও বৈশিষ্ট্য অন্তর্দেশের অনায়ত্ত। কিন্তু এখানে আমি তাহাদের শিল্পশ্রেষ্ঠত্বের প্রসঙ্গ তুলিব না। যাহারা তাহাদিগকে অহুসরণ করিয়া প্রাচ্যভাবে ভাবিত হইয়া এই দেশে মূর্তি গড়িয়াছেন, তাহাদের কাজের মধ্যেও সেই বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়। রেঙ্গুনের বুদ্ধের ক্ষুদ্র চক্ষু ও ক্ষীণ গণ্ড, চীনে বুদ্ধের মোঙ্গলিয়ান মুখভাব, চাপটা ওষ্ঠাধর, স্থূল হস্ত ও জয়গের উর্দ্ধগ তির্ঘ্যগগতি, নানাদেশের অশিক্ষিত বর্ষর শিল্পিকৃত বুদ্ধের বিকৃত মূর্তি—কুদর্শন, শোভাসৌষ্টব-বিরহিত প্রস্তরাকৃতি—কলিকাতার মিউজিয়ামের বিশাল বৌদ্ধ গ্যালারিতে এইরূপ শত শত বিচিত্র বকমের বুদ্ধমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। খেজুরাহ, জাভা ও সিংহলের মগধ-শিল্পাঙ্গ কয়েকখানি বুদ্ধ ও অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি অতীব সুন্দর, মাগধী পর্য্যায়ের চূড়ান্ত শোভা-সৌন্দর্য্য তাহাতে আছে।

কিন্তু ভাল হউক, মন্দ হউক, এই যে বিরাট বুদ্ধ মূর্তির ব্যূহ আমরা চিত্রশালায় দেখিতে পাই, তাহাদের প্রত্যেকটিতে সেই বৈশিষ্ট্যের ছাপটি আছে। সুন্দর অসুন্দর, সুশ্রী বিশ্রী, মগধ—রেঙ্গুন—আরাকান, প্রভৃতি সমস্ত প্রাচ্য জগতের বুদ্ধমূর্তিই ভাব-প্রধান। ইহাদের সকলের উপরই অল্পবিস্তর একটা ধ্যানের ছাপ আছে, প্রত্যেক বুদ্ধকে দেখিয়াই যেন প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়। প্রত্যেকের দেহ যেন চিন্ময় এবং শরীরের প্রতীক হইয়াও অশরীরী। ইহাদের মুখে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, আনন্দ—নিরানন্দ, প্রভৃতি সাংসারিক ভাবের লবলেশ নাই। অর্ধনির্মীলিত চক্ষের স্থির নিষ্পন্দ ভাব, প্রশান্ত ওষ্ঠপুট, তাহাতে হৃদয়োচ্ছ্বাস-বিজ্ঞপ্তির সম্পূর্ণ অভাব;—এক কথায় ‘নির্কাম’ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, বুদ্ধবিগ্রহের প্রত্যেকটিতে তাহা আছে। এমন কি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনে স্বায়ুর নিষ্পন্দতা এবং একটা অপার্থিব নিশ্চেষ্টতা—মুখে সম্পূর্ণ বিকারচাক্ষুণ্য বিরহিত, যেন সর্কাদ দিয়া সেই নির্কাম-তত্ত্ব বুঝাইতেছে।

ভূমিস্পর্শমুদ্রা, বজ্রাসন প্রভৃতি সমস্তই যেন সেই নির্মাণের ইঙ্গিত করিতেছে। যেদ্রপ কোন অক্ষম চিত্রকর যোড়া আঁকিতে যাইয়া ব্যর্থ হইলেও যেমন তেমন করিয়া তাহার উদ্দিষ্ট বিষয়টি বুঝাইয়া দিতে পারে, বুদ্ধবিগ্রহনির্মাতাও সেইরূপ হাজার অক্ষমতাসত্ত্বেও সে যে নির্মাণতত্ত্বটি বুঝাইতে চায়, তাহা তাহার সম্পাদিত কার্য্য দেখিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না।

এইবার গান্ধার-প্রভাবান্বিত বুদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তাহাতে মানুষের প্রতিকৃতি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ, বাহ্য অবয়বের প্রতি লক্ষ্য অধিকতর, মানুষের লক্ষণ তাহাতে বেশী। শিল্পী যে মানুষ আঁকিতেছে, অপরূপ কিছু আঁকিতে বসিয়া যায় নাই, তাহা তাহার বাটালী বা তুলির প্রত্যেক রেখাপাতে ধরা পড়িতেছে। গ্রীক প্রভাবান্বিত কতকগুলি বুদ্ধমূর্তিতে নির্মাণের গৌরব রক্ষা করিয়াও বাহিরে গ্রীক ধারার অঙ্গসৌষ্ঠব বজায় রাখিয়াছে।

বাহিরের সমালোচক ইহসংসারের ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তুলনায় হয়ত এই গ্রীক-আদর্শকেই বেশী প্রশংসা করিবেন, কারণ উহা ঠিক মানুষেরই প্রতিকৃতি, কিন্তু মগধশিল্পী ঠিক এই মানুষিক তত্ত্বটি বুঝাইতে চান নাই। তিনি নরলোককে উপেক্ষা করিয়া বাসনার অতীত কোন রাজ্য খুঁজিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একান্ত অক্ষম প্রাচ্যশিল্পীর যে সফলতা হইয়াছে, অতি দক্ষ গ্রীক-শিল্পীর তাহা হয় নাই। পক্ষান্তরে অত্যাশ্রুষ্ট প্রাচ্যশিল্পীর কাজে বাহ্য সম্পূর্ণতার যে অভাব পরিলক্ষিত হইবে, নিরুপষ্ট গ্রীক-শিল্পীর কাজে হয়ত তাহা নাই। একটি সংসারের সামগ্রী, অপরটি ধ্যান-লোকের, এখন দুইটি চিত্র লক্ষ্য করুন। মগধের বুদ্ধ ধীর, স্থির, নির্বিকল্প, প্রশান্ত—নিবাতনিকম্প দীপশিখার স্থায়। তাঁহার ওষ্ঠাধরে, অবনমিত অক্ষিপটে, এমন কি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে একটা নিবিড় শান্তির ছায়া—নির্মাণতত্ত্বের জীবন্ত ব্যাখ্যাস্বরূপ। অপরদিকে গ্রীক-প্রভাবান্বিত বুদ্ধের করাস্থুলিতে কোন কোন চিত্রে ধ্যানের উপযোগী মুদ্রালক্ষণ বিরাজমান, কিন্তু তাহা একান্তই বাহ্য। তাঁহার সমস্ত শরীরে জীবনের স্পন্দন স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হইতেছে,—তাঁহার মুখের ভাবে কোন কথা বুঝাইবার চেষ্টা ও বাক্‌চাতুরী যেন সাংসারিক ভাবের ব্যঞ্জনা করিতেছে।

এই যে মগধাশ্রিত শিল্প, এখনও তাহা এ দেশ হইতে তিরোহিত হয় নাই। বাঙ্গলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে এখনও যেদ্রপ শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়

এই দেশই একসময়ে মগধের শিল্পশালা ছিল। হয়ত মগধের শিল্পকার্য্যের জন্ত বঙ্গদেশই শিল্পী সরবরাহ করিয়াছে। শুধু বাঙ্গলাদেশে মগধের শিল্প-শালা।

ঢাকার মসলিন নহে, সোনাকপার কাজ, বিলুপ্ত প্রস্তরশিল্প, কাষ্ঠফলকে, ইষ্টকে, কার্পাসে সর্বত্র বাঙ্গলাদেশ হইতে যে অজস্র চারুশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় পূর্বভারতের মধ্যে বঙ্গদেশই সর্বপ্রধান শিল্প-কেন্দ্র ছিল। এখনও বঙ্গদেশের কুস্তকারগণ যে সকল দেবদেবী নির্মাণ করে, তাঁহাদের মুখ ও চক্ষুর ভঙ্গীতে সেই প্রাচীন ধারা সহজেই ধরা পড়িবে। মগধ যে দীপ জ্বালাইয়া জগৎ আলো করিয়াছিল—এখনও সেই দীপ ক্ষীরমাণ হইয়া এদেশের পল্লীতে পল্লীতে জ্বলিতেছে।

ভারতীয় শিল্পকলাদি সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এত উল্লেখ ও ইঙ্গিত আছে যে তাহা অগাধ করা বাতুলতা। এই শিল্পসম্বন্ধে বেদে যে আভাস আছে, তাহা ছাড়িয়া দিলেও

রামায়ণ ও মহাভারতের
প্রমাণ।

রামায়ণ, মহাভারতাদি পুরাণ হইতেও নানা কাব্য ও নাটিকায় স্থম্পষ্ট-ভাবে বহু উল্লেখ আছে। কালিদাসের বহু পূর্বে ভাস-কবি তাঁহার

প্রতিমা নাটকে ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় ফিরিয়াই মৃতের চিত্রশালায় দশরথের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া শোকসন্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন—এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সেই গৃহে ইক্ষাকুবংশের মৃত রাজাদের প্রতিমূর্ত্তি ছিল—সেই মৃত রাজগণের পঙ্ক্তিতে নবনির্ম্মিত দশরথের মূর্ত্তি দেখিয়া ভরত ঘটনাটি বুঝিলেন এবং শোকবিধ্বল হইয়া পড়িলেন। রামায়ণে রাবণের আদেশে বিদ্যাজ্জিহ্ব নামক রাক্ষস রামের কর্তৃত্ব মন্তক ও ধনু নির্মাণ করিয়াছিলেন; “নয়নে মুখবর্ণঞ্চ ভর্ত্ত্বন্তংসদৃশং মুখম্। কেশান্ কেশান্তদেশঞ্চ তঞ্চ চূড়ামণিং শুভম্। এতৈঃ সর্কৈরভিজ্ঞানৈরভিজ্ঞায় স্থত্ৰংখিতা।” (লঙ্কা, ৩২শ অঃ।) বৈদেহী সেই মায়ামুণ্ডের মুখবর্ণ, চক্ষু, কেশ, মাধার চূড়ামণি এবং সমস্ত লক্ষণ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া শোকসন্তপ্ত হইলেন। বিদ্যাজ্জিহ্ব এরূপ পারদর্শিতার সহিত তাহা নির্মাণ করিয়াছিলেন যে, সীতার ছায় রামগতপ্রাণা স্ত্রীও তদ্বারা প্রতারিত হইয়া শোকার্ত হইয়াছিলেন। রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে বেরূপ শিল্পসম্ভারের বর্ণনা আছে এবং রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন চিত্রশালার উল্লেখ (সুন্দর, ৩৬ শ্লোক) দৃষ্ট হয়, তাহাতে, প্রাচীন কালে এদেশের মাহুষের মূর্ত্তি কেহ গঠন বা চিত্রণ করিতে পারিত না—এরূপ মত গ্রাহ্য প্রচার করেন, তাঁহারা আমাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলি নিতান্ত একটা আবর্জনার স্তুপ মনে করেন, আমরাও কি তাহাই করিব? মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয়যজ্ঞের ময়দানবন্ধুত যে রাজসভার বর্ণনা আছে তাহা ফা হায়েন কথিত চন্দ্রগুপ্তের রাজসভার সঙ্গে তুলিত হইয়া শ্রেষ্ঠতর আসন পাইবার যোগ্য, কিন্তু কোন গ্রীক দূত তাহা দেখেন নাই—সুতরাং তাহা অবজ্ঞেয়। ইংরাজীতে যাহাকে ইতিহাস বলে, আমাদের কাব্যপুরাণাদি তাহা না হইতে পারে,—কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে যে সকল বর্ণনা আছে, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, শিল্প প্রভৃতির যে যথাবধি চিত্র দেওয়া আছে তাহা মনগড়া কথা নহে। কবি বা লেখকেরা যাহা দেখিতেন, তাহাই বর্ণনা করিতেন। ইন্দ্রপ্রস্থের সভায় ফটিক-পরিশোভিত একটা স্থানকে জলাশয় মনে করিয়া দ্রুঘোদন জলক্রমে হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া উপহসিত হইয়াছিলেন (“স কদাচিৎ সভামধ্যে ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহীপতিঃ। ফটিকং স্থলমাসাশ্রয় জলমিত্যাভিশঙ্কয়া। স্ববস্ত্রোৎকর্ষণং রাজা কৃতবান্ বুদ্ধিমোহিতঃ।”) একটা জায়গায় একটা ফটিকের স্তম্ভ বা ভিত্তি ছিল, তাহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে মনে হইত যেন ছইটি কাচের দরজা খোলা আছে, দ্রুঘোদন ঢুকিতে যাইয়া কঠিন ফটিকের ধাক্কা খাইয়া মাথা গুরিয়া বসিয়া পড়িলেন। (“দ্বারস্ত পিহিতাকারং ফটিকং প্রেক্ষ্য ভূমিপঃ। প্রবিশন্নাহতো মুচ্ছি, ব্যাঘূর্ণিত ইব স্থিতঃ।”) আবার একটা স্থানে ছইটি ফটিকময় বিশাল কবাট মুক্ত ছিল, কিন্তু উদ্ধৃতিত মণিজ্যোতিতে এরূপ বোধ হইতে লাগিল যেন ছইটি দরজাই বন্ধ, তখন ছই হাত বাড়াইয়া দ্রুঘোদন তাহা খুলিবার

অভিপ্রায়ে তাহাতে বেগে ধাক্কা দিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া গেলেন। (“তাদৃশক্কাপরং দ্বারং
ক্ষটিকোককপাটকম্। বিদ্যটয়ন্ করাত্যাস্ত নিজমাগ্রে পপাত হ।”) অল্প একজায়গায় একটি
মুক্ত দ্বার ছিল, তাহাও পূর্বে দ্বারের স্থায় আবদ্ধ মনে করিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া চলিলেন।
(“দ্বারস্ত বিততাকারং সমাপেদে পুনশ্চ সঃ। তদ্ বৃত্তক্ষেতি মদানো দ্বারস্থানাত্তপারমং”—সভা,
৩৫ অঃ, ১০-১২ শ্লোক।) অভিমানী হর্ষোদন অহকারবশতঃ দ্বারদর্শক কাহারও সাহায্য
না লইয়া এইরূপ নানা ভাবে বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন।

ভারতীয় স্থপতিরা যে প্রাচীনকালে নানারূপ মণি, ক্ষটিক ও কাচসংযোগে গৃহনির্মাণের
বিচিত্র কৌশল দেখাইতেন, এই সকল পাঠ করিয়া এতৎসম্বন্ধে কোন দ্বিধা থাকিতে পারে না।
রাজহুয়যজ্ঞে উপলক্ষে কাঞ্চোজের রাজা যুধিষ্ঠিরকে বোলখানি পট্টবস্ত্র ভেট দিয়াছিলেন,
মহাভারতে লিখিত আছে তাহা কদলীপত্রের স্থায় মন্থন—তাহাদের কোন কোনটি কৃষ্ণবর্ণ,
কোনটি শ্রামবর্ণ এবং কোনটি অরুণবর্ণ। কৃষ্ণ নানামণিরত্নখচিত শিকোর (‘শিকার’) মধ্যস্থিত
সুবর্ণময় জলপাত্র যুধিষ্ঠিরকে এই উপলক্ষে উপহার দিয়াছিলেন। এই সকল দ্রব্যের কারুকার্য
এত সুন্দর ও সুন্দর ছিল যে হর্ষোদন শকুনীকে বলিয়াছিলেন, “মাতুল, এই দ্রব্যগুলি দেখিয়া
যুধিষ্ঠিরের সৌভাগ্যদর্শনে আমার যেন জ্বর হইয়াছিল। (“দৃষ্টো চ মম তং সর্বং অরুণমিবা-
ভবং ॥”)

চন্দ্রগুপ্তের রাজসভাকে গ্রীকদূত সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। পারস্তের
রাজসভা তৎকালে প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সভা তাহাকে পরাজিত করিয়াছে, এসকল
মানুষের হাতের কাজ নহে; কোন দৈব শিল্পী কৃত। গ্রীকদূতের এইরূপ উচ্ছ্বসিত বর্ণনা
পড়িয়া যুরোপীয় পণ্ডিতেরা তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই; ব্যাস, বাস্মীকির কথা
অগ্রাহ্য, কিন্তু ফা হায়েন, মেগাস্থিনিস্ ও ইংসিং বত অদ্বুত কথাই তাঁহারা বলুন না কেন,
তাঁহাদের কথা কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে।

চন্দ্রগুপ্তের সময়ে যে ভারতীয় স্থাপত্য ও কলাশিল্প খুব উচ্চ দরের ছিল এবং গ্রীক ও
পারস্তের শিল্পীদিগকে ছাপাইয়া গিয়াছিল—একথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করিতে বাধ্য
হইলেন, কিন্তু তথাপি গ্রীকদিগের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি চিরবিবাসীরা এক কথায় সিংহাসন ছাড়িয়া
দিতে প্রস্তুত হইলেন না।

ভারতবর্ষে দেবদেবী, বহু হস্ত, বহু মুখ, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি সহকারে নির্মিত হইয়া
ধাকেন। বাহারা বাহু দৃষ্টিতে দেখিয়া ভাসাভাসা সমালোচনা করেন, তাঁহারা হয়ত মনে

গঠনশালী সম্বন্ধে শিল্পী-
দের নিয়ম, গুণনীতি।

করিতে পারেন, এই শিল্প বিশৃঙ্খল,—ইহার কোন স্বত্র বা নিয়ম
নাই, শিল্পী তাঁহার খেয়ালে কার্য্য করিয়া যান। কিন্তু গুণনীতি
ও শিল্পসম্বন্ধীয় সমস্ত পুস্তকে কলাশিল্পের নিয়ন্ত্রণের যে সকল স্বত্র

ও কর্তার নিয়ম আছে, তাহাতে শিল্পীর যথেষ্টাচারের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। এমন কি
মহামূর্ত্তি ও গজমূর্ত্তির সংযোগে যে গণেশ দেবতা নির্মিত হইয়া থাকেন, তাঁহার সম্বন্ধেও
অনেক খুঁটিনাটির আইন আছে। যথা—গণেশের মস্তক হাতীর, মহামূর্ত্তি, কর্ণ লম্বা,—

লম্বোদর, ক্ষুদ্র কিন্তু মাংসল স্বক, মাংসল পদদ্বয়, দীর্ঘ শুঁড়, বামদন্ত দেখাইতে হইবে না, শুঁড়টি বামদিকে হেলান থাকিবে। মূর্তির শিরা, অস্থিসংযোগ দেখাইতে হইবে না। ইহার পরিমাণ এইরূপ—শুঁড়=৪২ তাল; মস্তক=১০ আঙ্গুল, শুঁড়ের শেষদিকে পুঙ্কর থাকিবে। কর্ণ= (দৈর্ঘ্যে) ১০ আঙ্গুল এবং (বিস্তৃতিতে) ৮ আঙ্গুল। হুই কাণের অবকাশ স্থানের মাপ= ১ তাল এবং এক আঙ্গুল। চক্ষুর উপর দিয়া মস্তকের পরিধি=৩২ আঙ্গুল। চক্ষুর নিম্নভাগে শুঁড়ের উৎপত্তিস্থান হইতে মস্তকের পরিধি ২৬ আঙ্গুল। পুঙ্কর এবং শুঁড়ের শেষদিকের পরিধি=১০ আঙ্গুল। কর্ণের দৈর্ঘ্য=৩ আঙ্গুল, উহার পরিধি ৩০ আঙ্গুল। উদরের পরিধি= ৪ তাল। উদরের দৈর্ঘ্য=৬ অথবা ৮ আঙ্গুল। দাঁত=দৈর্ঘ্যে ৬ আঙ্গুল; উৎপত্তি স্থানের পরিধি এইরূপ। নিম্নাধর=৬ আঙ্গুল, পুঙ্করের মধ্যে পদ্ম থাকিবে। উরুর উৎপত্তিস্থানের পরিধি=৩৬ আঙ্গুল। উরুর শেষদিকের পরিধি=২৩ আঙ্গুল। হাতের উৎপত্তিস্থানের পরিধি শেষদিক্‌টার পরিধি অপেক্ষা এক কিংবা দুই আঙ্গুল বড়। চক্ষু এবং কর্ণে অবকাশ-স্থান=৪ আঙ্গুল। চক্ষুর হুই প্রান্তের ব্যবধান, হুই চক্ষের তারার ব্যবধান এবং চক্ষুদ্বয়ের উৎপত্তিস্থানের ব্যবধান=(ক্রমাগত) ১০, ৭ এবং ৬ আঙ্গুল।

এই ভাবে বহুমুখ, বহুহস্ত, বহুপাদ দেবতাদিগের সমস্ত দেহের খুঁটিনাটির পরিমাণ দেওয়া আছে।

পরিমাণহচক যে সকল শব্দ (পারিভাষিক) ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এইরূপ:—
একটি মূর্তির $\frac{1}{2}$ অংশ=এক আঙ্গুল, (মূর্তি=হাতবদ্ধ করিলে যে 'মূঠ' হয় তাহাই)। তালের দৈর্ঘ্য ১২ আঙ্গুল। ৫ তালে=এক বাল, ৬ তালে=এক কুমার।

মূর্তিগুলির যেরূপ পরিমাণ হইবে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল:—

(সাধারণতঃ) বামন	= ৭ তাল	(অসাধারণ) নরনারায়ণ	= ১০ তাল
মামুষ	= ৮ তাল	চণ্ডী	= ১২ তাল
দেবতা	= ৯ তাল		
রাক্ষস	= ১০ তাল	ভৈরব, হিরণ্যকশিপু, বৃজ	= ১৬ তাল
স্ত্রী	= ৭ তাল		
কুমার	= ৬ তাল		
বাল	= ৫ তাল		

৭ তাল-পরিমিত মূর্তির মাপ:—

(১) মুখ=১২ আঙ্গুল, (২) গ্রীবা=৩, (৩) হৃদয়=২, (৪) উদর=২,
(৫) সর্বিধ=১৮, (৬) জাহ্নু=৩, (৮) জজ্বা=১৮, (৯) গুল্ফাধঃ=৩।

৮ তাল-পরিমিত মূর্তির মাপ:—

(১) মুখ=১২ আঙ্গুল, (২) গ্রীবা=৪, (৩) হৃদয়=১০, (৪) উদর=১০,
(৫) বস্তি=১০, (৬) সর্বিধ=২১, (৭) জাহ্নু=৪, (৮) জজ্বা=২১, (৯)
গুল্ফ=৪।

১০ তালের মাপ ;—

- (১) মুখ = ১৩ আঙ্গুল, (২) গ্রীবা = ৫, (৩) হৃদয় = ১৩, (৪) উদর = ১১,
(৫) সবিধ = ১৩, (৬) জজ্ঞা = ২৬, (৭) জাম্বু = ৫, (৮) গুল্ফ = ৫,
(৯) মণি = ১ ।

“শিশুদের (বাল) দৈর্ঘ্যের বিচিত্রতা ঘটে ; কঠোর নিয়ম হইতে সমস্ত শরীর বেভাবে বৃদ্ধি পায়, তাহাদের মুখ সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় না । কঠোর নিয়ম হইতে সমস্ত শরীরের যে দৈর্ঘ্য, তাহা মুখের ৪½ গুণ । কঠোর নিয়ম হইতে শিল্প পর্য্যন্ত মাপ মুখের দ্বিগুণ ; উক হইতে শেষ পর্য্যন্ত = মুখের দ্বিগুণ । হস্ত মুখের আড়াই গুণ ।”

“শিশুরা পাঁচ বৎসরের পর হইতে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া যায় । মেয়েদের বোড়শবর্ষে সর্বাঙ্গ পুষ্ট হয় ।” (শুক্রনীতি—৪র্থ অঃ, ৪র্থ পঃ, ১৬৯-৪১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।)

মেয়েদের সঙ্গে পুরুষদের যে সকল স্থানে মাপের বিভিন্নতা আছে, তাহা অতি সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । আলঙ্কারিকদের ক্ষীণ কটি, বিপুল নিতম্ব, পদ্মাক্ষ প্রভৃতির অতিরঞ্জিত রূপবর্ণনার সঙ্গে শুক্রনীতির পরিমাণের ঐক্য অল্প । শুক্রাচার্য্য স্বভাবকে অনুসরণ করিয়াছেন ।

এই সকল শিল্পসম্বন্ধীয় নিয়ম পড়িলে দৃষ্ট হইবে যে এদেশের শিল্পাচার্য্যগণ অতি স্বক্সভাবে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাণ স্থির করিয়া দিয়াছেন । মূর্তি স্বাভাবিকই হউক বা উদ্ভট রকমেরই হউক—প্রত্যেকটি স্বক্সবিষয়ের হিসাব আছে, শিল্পীকে কোনরূপে ব্যভিচারী হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় নাই । আমরা সামান্য কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ করিলাম মাত্র ।

কিন্তু শুক্রনীতির কয়েকটি কথা প্রাণধানযোগ্য—তাহা ভারতীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক এবং সেই কয়েকটি স্বত্বের উপরই এদেশের শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত । যদিও আচার্য্যগণ শিল্পীর

ভারতীয় শিল্পের স্বাধীনতা
ও বৈশিষ্ট্য ।

হাত পা আইনকাহুন দ্বারা একরূপ বাধিয়া দিয়াছেন, সেই কয়েকটি স্বত্ব পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, এই সকল আঁটা আঁটি বাধন সম্বন্ধে তাঁহারা শিল্পীর স্বাধীনতা হরণ করেন নাই । শিল্পীকে তাঁহারা কখনই ক্রীতদাসে পরিণত করেন নাই । যেখানে ভারতের প্রকৃত মহিমা—তাহার অর্জ্জনকারীকে তাঁহারা তপস্তা করিতে বলিয়াছেন ; পরের নির্দেশে কতকদূর যাওয়া বাদ—কিন্তু গৌরবের শীর্ষস্থানে উঠিতে হইলে সাধককে একা যাইতে হইবে,—সমস্ত বন্ধনের অতীত রাজ্যে একা একা প্রাণের দেবতার সঙ্গে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে । শুক্রাচার্য্য লিখিয়াছেন, “সকল মূর্তির চরম উদ্দেশ্য ধ্যানযোগের সহায়তা করা ; সুতরাং শিল্পীকে ধ্যান-নিরত হইতে হইবে ।” মূর্তির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইলে শিল্পীকে ধ্যানধারণা করিতেই হইবে—ইহা ছাড়া উপায়ান্তর নাই । এমন কি সাক্ষাৎভাবে রূপদর্শন ও তাহা পরীক্ষা করিয়া চলিলেও শিল্পী কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না । (মকল বিজ্ঞায় কুলাইবে না ।) শুক্রনীতি—৪র্থ অঃ, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ১৪৭-১৫১ শ্লোক ।

সুজনীতি স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন মনুষ্যের মূর্তি গড়িতে হইবে না। দেবমূর্তিই গড়িতে হইবে। মনুষ্যমূর্তি যদি স্ত্রী এবং স্ত্রী হই—তাহাকে ছাড়িয়া বিদ্রোহ ও কুরুপ দেবমূর্তিগঠনও শ্রেয় (৪র্থ অঃ, ৪র্থ পঃ, ১৫৪-১৫৭ শ্লোক)।

এই শ্লোক কয়টিতেও ভারতীয় শিল্পের চরম কথা বলা হইয়াছে। একপ কথা অল্প কোন দেশে কেহ বলিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। ইহা ভারতীয় নিজস্ব কথা।

যদি শিল্পী মনুষ্যের মূর্তি গড়িতে লাগিয়া যান, তবে কোটীপতিদেরই মূর্তি লইয়া ব্যস্ত হইবেন। অর্থের প্রলোভনে স্বরূপ, কুরুপ ধনী ব্যক্তিদের খেয়াল পূর্ণ করিতেই তাঁহার জীবন চলিয়া যাইবে, তিনি লক্ষ্যহীন হইবেন। কিন্তু যদি তিনি তাঁহার মনুষ্যমূর্তি গড়িতে হইবে না, দেবমূর্তি গড়িতে হইবে।

প্রাণের দেবতাকে অঙ্কন বা গঠন করিতে বসিয়া যান, সে মূর্তি, গণেশ, কার্তিক, চণ্ডী বা বিষ্ণু বে দেবতারই হউন না কেন—তাঁহার ধ্যানে তিনি ডুবিয়া পড়িবেন। আরাধ্যদেবতার অমুপ্রাণনায় তাঁহার সমস্ত কলাশিল্প-শক্তি উদ্বেলিত হইবে, তিনি ধ্যানালোকে পৌছিয়া তাঁহার কার্যের চরম সফলতা লাভ করিবেন।

স্থাপত্যসম্বন্ধে স্ত্রীচাৰ্য্যের নিয়মগুলি এমনই পরিপূর্ণ এবং খুঁটিনাটি-তত্ত্বপূর্ণ। বঙ্গদেশে প্রাচীন প্রাসাদাদি খুব বেশী নাই। তদ্বর্ণিত মেরু, মন্দির, ঋক্ষমালি, ছাদমণি, চন্দ্রশেখর, মাল্যবান্, পারিষাদ, রত্নসার, ধাতুমাল, পদ্মকোষ, পুষ্পহাস, শীকর, স্বাস্থিক, মহাপদ্ম, পদ্মকূট, বিজয় প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর মন্দিরের গঠনপ্রণালী, ডোম (dome) বা রত্নের সংখ্যা, উচ্চতা, কত তল প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ কথা নীতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলার খড়ো ঘরের রীতি বহু প্রাচীন এবং দেশজ। এসম্বন্ধে স্থানান্তরে লেখা হইবে। আমরা অবগত আছি বাঙ্গলার মন্দির ও গৃহনিৰ্ম্মাণ সম্বন্ধে প্রাচীন একখানি পুঁথি মেদিনীপুর জারগ্রামে ছিল। যিনি আমাকে এই পুস্তকের সংবাদ দিয়াছিলেন, তিনি এখনও উহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ডাকের বচনের “পূর্বে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তরে ঘের, দক্ষিণে ছেড়ে, বাড়ী করগে ভেড়ের ভেড়ে”—পূর্বে হাঁস অর্থ পূর্ব-দিকে জলাশয়। পল্লীর কুটারস্থাপত্যের এই নিয়ম পল্লীবাসী সকলেরই মুখে মুখে শোনা যায়।

বাঙ্গলার চিত্রশিল্প বহু প্রাচীন। হরিবংশের চিত্রলেখা বাঙ্গলার আদি যুগের চিত্রকরী। প্রাগজ্যোতিষপুরের বাণ রাজার কন্যা উবা স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, কামদেবের পুত্র অনিরুদ্ধকে দেখিয়া—প্রেমে পতিত হন। এই স্বপ্ন-দৃষ্ট তরুণ সুদর্শন রাজকুমার

কে তাহা তিনি কিছুতেই জানিতে না পারিয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেন। তাঁহার সখী চিত্রলেখা তখন ভারতীয় তৎকাল-প্রসিদ্ধ বাবতীয় তরুণ রাজকুমারের চিত্র অঙ্কন করিয়া কুমারী উবার নিকটে উপস্থিত করেন, তন্মধ্য হইতে উবা সহজেই অনিরুদ্ধকে চিনিয়া লইয়াছিলেন। হরিবংশের পূর্বে মনুষ্যমূর্তির অবিকল প্রতিকৃতি অঙ্কনের কথা বোধ হয় আর কেহ বলেন নাই। চিত্রলেখার সময়ে এবং তাহার পূর্ব



২৩০. বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে গৃহীত নারীক-চিত্র



ব্রজসামল (১৭৬৩ খৃঃ)



গোপীশের জন্ম, ১০৪৭ সালে অঙ্কিত (বীকুন্না জোনা) চিত্র হইতে।



গোপীশের জন্ম, ১০৪৭ সালে অঙ্কিত (বীকুন্না জোনা) চিত্র হইতে।

হইতে যে এদেশে চিত্রবিজ্ঞান বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল—এই বিবরণ হইতে তাহা অস্বীকৃত হয়।*

এইরূপ বরকনের চিত্র আকিয়া দেশে-বিদেশে ঘটকরমণীরা দেখাইয়া বিবাহ স্থির করিতেন। এতৎসম্বন্ধে বাঙ্গলায় বহুদিনের কিংবদন্তী আছে। প্রাচীন পল্লী-গীতিকায় দৃষ্ট হয় বহু পল্লী-সুন্দরীর চিত্র লইয়া ঘটকীরা দেশবিদেশে আনাগোনা করিত। কথিত আছে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমও এই চিত্রদর্শন হইতেই প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল। রাধার পূর্বরাগ বর্ণনায় এই কথা পাওয়া যায়। পূর্বরাগের প্রথমাংশের নামই “চিত্রদর্শন”।

“কি চিত্র বিচিত্র মরি দেখাইল চিত্রকরী, প্রাণ মম নিল বে হরি।”

“বিশাখা যখন দেখায় চিত্রপট, মোরা বলেছিলাম সে বড় লম্পট।”—

প্রভৃতি বহুবিধ গান বৈষ্ণব কবিগণ রচনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক যুগেও এইরূপ চিত্রাঙ্কনের দ্বারা পাত্রপাত্রীর মন আকর্ষণ করার রীতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। জঙ্গল-বাড়ীর দেওয়ান ফিরোজ খাঁ বানিয়াচন্দ্রের দেওয়ান-কুমারী সখিনার চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া কুমার-ব্রত অবলম্বনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিলেন—“ফিরোজ খাঁ” নামক পল্লী-গীতিতে তাহা দৃষ্ট হয়। “মুকুট রায়” নামক রাজপুত্রের কথা উক্ত নামে অভিহিত পল্লীগীতিকায় দৃষ্ট হয়; রাজা তাঁহার জন্ত পাত্রী খুঁজিতে নানাদিক্ হইতে রাজকন্তাদের চিত্রপট সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মুকুট রায় সেই ছবির কোনটিই পছন্দ করেন নাই।

চণ্ডীদাসের—

“হাম সে অবলা, সরলা অথলা—ভালমন্দ নাহি জানি।

বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি।”—

প্রভৃতি পদ সকলেই অবগত আছেন।

রাজা ও রাজতুল্য ব্যক্তিদের ছবি যে একসময়ে সর্বত্র পাওয়া যাইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কালিদাসের শকুন্তলায় রাজা দ্রুপদেবের ছবি অঙ্কন করিবার যে কথা আছে তাহাতে দেখা যায়, এ বিষয়ে তাঁহার পটুতা কত বেশী ছিল। চিত্রোপযোগী ঘটনানির্দেশ, দূরত্বের পরিষ্কার ধারণা এ সমস্তই তাঁহার আয়ত্ত ছিল। উত্তরচরিতে রামের সঙ্গে সীতার বিবাহ ও পরবর্তী ঘটনাগুলির চিত্রিত দৃশ্যপট লক্ষণ সীতাকে দেখাইতেছিলেন—সেই অঙ্কটি ভবভূতির পাঠকদের সুপরিচিত। গুপ্ত সম্রাটগণ এমন কি কণিক প্রভৃতি শক রাজাদের মূর্তি তাঁহাদের মূর্তায় অঙ্কিত পাওয়া যাইতেছে। মহেঞ্জোদারোর মূর্তিগুলির আবিষ্কারের পর উগ্রপন্থী গ্রীকভক্তগণ এখন আর বলিবেন না যে হিন্দুরা গ্রীস হইতে মূর্তি আকিবার

* It is a notable fact that the first Indian painter mentioned by name was a woman. Chitralekha was the heroine of an incident in the *Dwaraka-Lila*, a work of the Epic age and probably dating from many centuries before the Christian era.

—P. Brown's *Indian Paintings*, p. 11.

বা গঠন করিবার কৌশলটি শিখিয়াছিলেন। যদিও ভারতীয় শিল্প বিদেশাগত, কোন কোন পণ্ডিত এই যত প্রতিপন্ন করিতে প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সকল মতের বিরুদ্ধে বর্তমান কালে পুঞ্জীভূত আবিষ্কার সাক্ষ্য দিতেছে—যাহাতে সেগুলি আর মাথা তুলিতে পারিবে না। আমরা এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া যাইব।

মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীর যে বর্ণনা গ্রীক দূত দিয়াছেন তাহাতে তাহাদের সৌধরচনা ও সাধারণতঃ সমস্ত স্থাপত্যের উৎকর্ষের আলোচনা করিয়া কোন কোন পণ্ডিত অতুমান করিয়াছেন যে অতটা উৎকর্ষ হঠাৎ একদিনে হইতে পারে না। ইহাদের পূর্বে বহু সাধনা হইয়া গেলে তৎপরে ঐরূপ সিদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু সেই সাধনা, সেই আদি প্রচেষ্টার কোন চিহ্ন ভারতবর্ষে নাই, স্মরণ্য এই উৎকৃষ্ট স্থাপত্যের জন্ম ভারতবাসী হেলেনার শিল্পের নিকট স্বামী। কিন্তু স্মিথ সাহেব বলেন উত্তর-ভারতে উপর্যুপরি মুসলিম আক্রমণে ভারতীয় আদি যুগের শিল্পের নমুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যাহা কিছু আছে তাহাতে ভারতীয় রীতির বৈশিষ্ট্যের ছাপ এই দেশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উপর এমন স্পষ্ট যে উহা বিদেশাগত বলিয়া মনে হয় না। আদিযুগের শিল্পের কোনই নিদর্শন ভারতবর্ষে নাই বলিয়া ভারতীয় শিল্পী গ্রীক-মহাজনের খাতক প্রতিপন্ন করিতে বাহারা চেষ্টিত হইয়াছিলেন,—মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা তাহাদের যুক্তির ভিত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহেঞ্জোদারো, চীন-পর্যটকগণের মত

সম্প্রতি মহেঞ্জোদারোর (শব্দটির অর্থ, মৃতের তৃপ) ৭২০ বিঘা জমির নিম্নে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, এবং যাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে গ্রীকেরা হিন্দুদিগকে চিত্র ও ভাস্কর্য শিখাইয়াছেন, এই পরিকল্পনা

এখন উড়িয়া যাইবে। এই সকল নিদর্শন বহু যুগ ব্যাপক, স্তরে স্তরে ভিন্ন ভিন্ন যুগের চিহ্ন উহাতে আছে। খৃষ্ট জন্মবার

৫৬০০০ বৎসর পূর্বের যে সকল বাড়ী ঘর ও মূর্তি পাওয়া

গিয়াছে বা যাইতেছে—তাহা শুধু সময় হিসাবে পূর্ববর্তী নহে, উহা ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের আদিরূপ দেখাইতেছে। এইগুলি ভারতীয় শিল্পের জনক, এক পরিবার ভূত। ইহাতে যে সকল অক্ষর দৃষ্ট হয় তাহার সঙ্গে ব্রাহ্মীলিপির সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়, ইহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এখন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজপুত্র যজ্ঞের ময়দানব কৃত গোটা সভাটা আর শুধু কবি কল্পনা বলিয়া মনে হইবে না,—ইজিপ্ট ও ব্যাবিলনের সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার পূর্ববর্তী বলা চলিবে না। কিন্তু আর্যগণ যদিও এই শিল্পের অনেক উন্নতি করিয়াছেন, আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা

করিয়াছি—এই শিল্প আৰ্যদের নহে—ইহা ভারতীয় আদিম অধিবাসীদের। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার শিল্প অপেক্ষাও সিদ্ধানপুরের শিল্প বহু প্রাচীন, তাহা আদিম মানবের শিল্প হাতে খড়ি। মহেঞ্জোদারো সিদ্ধ দেশের লারকণা প্রদেশে অবস্থিত এবং হরপ্পা পাঞ্জাবের মনগোমরি জেলার অন্তঃপাতী।

খেরাহ, ভুবনেশ্বর, মগধ এবং বঙ্গদেশের নানাস্থানে রমণীদের যে নানারূপ লীলায়িত ভঙ্গী আমরা দেখিতে পাইতেছি তাহার আদি খুঁজিতে আমাদের আর হেলেনায় যাইতে হইবে না। তার জন মার্সেল তিনখানি মস্ত বড় পুস্তকে মহেঞ্জোদারোর প্রসঙ্গ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় বাঙ্গলা দেশের আলিপনা ও কাঁথার পণ্ডের সঙ্গে মহেঞ্জোদারোর পদ্মগুলির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এই স্থানের একটি লোকের আকৃতি পর পৃষ্ঠায় দিতেছি, আমরা বীরভূমির কাণ্ডে ফোদিত প্রাচীন একটি মূর্তি দেখিয়াছি, তাহা অনেকটা এই রকমের।

মার্সেল লিখিয়াছেন, গ্রীকদিগের পূর্বেই মহেঞ্জোদারোর শিল্পীরা জীবজন্তু অঙ্কনে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। এখানে ঐ দেশে প্রাপ্ত বৃষের মূর্তির একটি নমুনা দিতেছি।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই অনাৰ্যলোকেরা ৭,০০০ বৎসর পূর্বে শিবপূজা করিত এবং শুধু লিঙ্গ নহে, ধ্যানস্থ শিব মূর্তিও মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া যাইতেছে। শিব কোথা হইতে আসিলেন, কেহ তাহা জানে না। দক্ষ তাঁহাকে অপাণ্ডিত্য করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি দেবগণের গভীর বাহিরে ছিলেন, অনাৰ্য নন্দী-ভূদ্বী তাঁহার সহচর ছিল, এই ভাবের পৌরাণিক বর্ণনা আমরা জানিতাম, তাঁহার আদি খুঁজিতে হইত আমাদেরকে অনাৰ্য নিবেদিত কোন পার্শ্বত্যা দেশে যাইতে হইবে। এবার তাঁহার গোড়াকার খবরটা কতকটা পাওয়া গেল।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে, মৌর্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে বাঙ্গালীর কতকটা হাত ছিল। মগধ বাঙ্গলার প্রতিবেশী। গুপ্তদের সময়কার যে সকল বুদ্ধমূর্তি আছে—সেগুলি খাস মগধ শিল্পশালার। তাঁহাদের উন্নত নাসিকা, কবাট বক্ষ এবং ধ্যানস্থ, স্থগঠিত ত্রিবিধিষ্ট আৰ্যমূর্তি ভাস্কর্য-মহিমার চরম আদর্শ। আশ্চর্যের বিষয় সেই মগধ বুদ্ধের অল্পম মুখশ্রী বাঙ্গালীরা এখনও পর্যন্ত তাহাদের আদর্শ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের দেবমূর্তি হইতে ক্রমশঃ সেই দেব-মানব, নরনারায়ণের সন্ধি-সূচক আধ্যাত্ম্যাব অধুনা তিরোহিত হইতেছে; কিন্তু কিছুকাল পূর্বেও আমাদের দেশের কুস্তকার ও হস্তধরগণ বিগ্রহ নির্মাণ করিতে যাইয়া গুপ্তযুগের বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের মুখ অঙ্কন করিত। আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। ফরিদপুরের নালিয়া গ্রামের কুমরের হাতের বুদ্ধমূর্তির মুখ ও বোধিসত্ত্বদের মুখ তুলনা বোধ্য।

এই ভাবের আধ্যাত্মিকত্বের চূড়ান্ত গরিমা দেখাইতেছে, কানীর তিলভাণ্ডারের মন্দির সংলগ্ন একখানি বুদ্ধমূর্তি, উহা আদি গুপ্তযুগের, উহাকে পাণ্ডারা “জটাশঙ্কর” নামে অভিহিত করে। এই জটাশঙ্করের মত স্থগঠিত, বুয়স্ক, সিংহকটি, ভাগবত মুখ-মহিমা

বিশিষ্ট ধ্যানগোরবের অত্যাচ্ছল ত্রীমূর্তি আমার চক্ষে আর পড়ে নাই। ইহা গুপ্তযুগের বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ফাহায়েন গুপ্তযুগের আখ্যাবর্ত্ত সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। বিনয় পিটকের বিস্তৃত পাঠ সংগ্রহের জন্ত তিনি ৩৯৯ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ৪১৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নানাস্থান পর্য্যটন করেন। তিনি তিন ফাহায়েন।

বৎসর পাটলীপুত্রে ও ছই বৎসর তমলুকে ছিলেন। তাঁহার আখ্যাবর্ত্ত-ভ্রমণ (৪০১—৪১০ খৃঃ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই সম্পাদিত হইয়াছিল। ফাহায়েন যগধের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমাদের মহাভারতের গিরিব্রজপুরের কথা স্মরণ হয়। প্রজারা নিশ্চিন্ত ও সুখী, অপরাধের দণ্ড প্রায়ই জরিমানার দ্বারা হইত। শুধু যেখানে কোন লোক দৃঢ়ভাবে বিদ্রোহী হইয়া থাকিত কিংবা দস্যুতাকে তাহার নিতানৈমিত্তিক বৃত্তিতে পরিণত করিত, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুদণ্ড বা অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা হইত, কিন্তু এরূপ শাস্তির ব্যবস্থা অতি অল্পই হইত। নগরে বড় বড় মন্দির ও পশু চিকিৎসালয় ছিল। তখনও অশোকের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইত, ফাহায়েন উহা দেখিয়া বিস্ময়ে বলিয়াছেন, “এগুলি কোন স্বর্গীয় স্থপতির কাজ—এরূপ নির্মাণশক্তি মানুষের হইতে পারে না।” বিচিত্র শোভা-মণ্ডিত হর্ম্য ও প্রাসাদ দেখিয়া চীন পর্য্যটক বিস্মিত হইয়াছিলেন। অধিসাহেব, লিখিয়াছেন, “সে সময়ের কোন বড় হর্ম্য বা এমারত এখন নাই, এই স্থান বহু পূর্বে হইতে মুসলমানেরা অধিকার করিয়া ক্রমাগত হিন্দুর প্রাচীন কীর্তি ধ্বংস করিয়া নিঃশেষ করিয়াছেন। (অক্সফোর্ড প্রকাশিত হিন্দুভারত, ১৬০ পৃঃ, ১৯২১।) ফাহায়েন লিখিয়াছেন সমস্ত দেশে কেহ যজ্ঞ মাংস পিষাজ বা রক্তন খায় না, তাহারা কোন জীবিত প্রাণী হত্যা করে না।” অশোক জীবহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন, অথচ দেশের অবস্থা বিবেচনায় জীবহত্যার জন্ত দরজা খুলিয়া না রাখিয়া পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার অসামান্য জীবপ্রীতির ফল বৌদ্ধাধিকার-বিলোপের পর ফলিয়াছিল। ফাহায়েন সাধারণতঃ যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাই লিখিয়াছিলেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অশ্ববধ করিয়াছিলেন।

অশোকের সেই বিশাল রাজপ্রাসাদ যেখানে বিদেশী পর্য্যটকের বিস্ময় জন্মাইয়া আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, উহা বর্ত্তমান সহরের দক্ষিণে কুমরাহার গ্রামে অবস্থিত ছিল। এখনও তাহা কেহ খুঁজিয়া দেখে নাই।

ফাহায়েনের বর্ণিত গুপ্তরাজ্যের সুশাসন আদর্শ স্থানীয়। উহা স্পষ্ট দেখাইতেছে মৌর্য-যুগের কোটীলা-প্রবর্ত্তিত গুপ্তচর-প্রথার দৌরাণ্ড্য তখন আর ছিল না। তথাপি আলবিরুনী লিখিয়াছেন—গুপ্তগণ খুব ক্ষমতাপন্ন ও চুপ্ত ছিলেন। জনমত কখনই একরূপ হয় না।

এই গুপ্তযুগে কালিদাসের অতুলনীয় শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্য বিরচিত হয়। স্বতঃসংহার, সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহার তরুণ বয়সের রচনা। মুদ্রারাক্ষস, মৃচ্ছকটিক কিছু পূর্বের রচনা। ৪৭৬ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ আখ্যাভট জন্মগ্রহণ করেন।

বরাহমিহির (৫০৫ খৃঃ—৫৩৭) ও ব্রহ্মগুপ্ত (জন্ম ৫৯৮ খৃঃ) প্রভৃতি এই গুপ্তযুগে বিজ্ঞমান
সাহিত্য। ছিলেন। সুতরাং গুপ্তযুগকে সংস্কৃত সাহিত্য-বিজ্ঞান ইত্যাদির
সুবর্ণযুগ বলা বাইতে পারে। গুপ্ত সম্রাটেরা হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী
হইলেও বৌদ্ধবিশ্বাসী ছিলেন না। স্বয়ং সমুদ্রগুপ্ত বৌদ্ধ লেখক বহুবল্লভ বুদ্ধভাষিমাত্রী ছিলেন,
একথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাহিরের সঙ্গে আদান-প্রদান, অজস্তাণ্ডহা

গুপ্তযুগে মগধের সঙ্গে ভারতের বাহিরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিজ্ঞমান থাকার প্রমাণ পাওয়া
যায়। তখন ভারতীয় বর্হিবাহিজ্যের শুরুর যুগ। ৩৫৭ হইতে ৩৭১ খৃঃ অব্দের মধ্যে বাহিজ্যাদি
বিষয় লইয়া অন্ততঃ দশ বার চীন রাজদূতেরা ভারতবর্ষে গমনাগমন
করিয়াছিলেন। ফাহায়েন হইতে আরম্ভ করিয়া বহু চীন পরিব্রাজক
তীর্থ দর্শন ও বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার জন্ত এদেশে আসিয়াছিলেন এবং আর্ঘ্যাবর্তবাসী বহু বৌদ্ধ
পণ্ডিত চীনে গমন করিয়াছিলেন। ৩৮৩ খৃঃ অব্দে কুমারজীবের চীনগমন এ সম্বন্ধে
হিন্দুস্থানের বৌদ্ধগণের প্রথম প্রচেষ্টা। ৪৩১ খৃঃ অব্দে কাশ্মীরের যুবরাজ গুণবর্ম্ম জাবা দ্বীপে
যাইয়া তৎকালবাসীদিগকে বৌদ্ধধর্মে প্রবর্তিত করেন। তৎপূর্বে তথায় হিন্দু পরিব্রাজকগণ
উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। অজস্তা চিত্রে আমরা দেখিতে পাই পারশ্ব রাজদূত সম্রাট পুলকেশীর
নিকট দূত পাঠাইতেছেন। রোমের রাজার নিকট ৩৩৬, ৩৬১, ৫৬১ খৃষ্টাব্দে অন্ততঃ তিনবার
মগধের রাজদরবার হইতে দূত প্রেরিত হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ আছে।

ডিনসেট স্মিথ বলেন, হিন্দু মুদ্রায় দিনারের উল্লেখ দৃষ্টে এই কথা প্রমাণিত হইতেছে
যে, এই দিনার শব্দ হিন্দুরা রোমানগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শব্দটি
ল্যাটিন “দিনাবিদ্মন” শব্দের রূপান্তর। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিনীতে দিনার শব্দের উল্লেখ
বহুস্থানে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু আমাদের বলিবার উপায় নাই যে রোমানেরা বা গ্রীকগণ
হিন্দুদের কোন ঋণ বহন করে, সেই দাগ তাঁহারা সংগোপন করিতে চেষ্টা করেন। অবশ্য
যুরোপীয়েরা হেলেনার প্রভাব আমাদের দেবমন্দিরের নৈবেদ্যের মধ্যেও আবিষ্কার করিতে
সচেষ্ট। আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি তাঁহাদের “থেরোপুটিক” শব্দ নিশ্চিতরূপে আমাদের
থেরাপুত শব্দ হইতে আসিয়াছে। কিন্তু একথা তাহারা মানিবেন কেন? দিনার শব্দ
আমরা মহাভারতে পাইতেছি, ইহার উদ্ভব হইত তাঁহারা বলিবেন, মহাভারতে ঐ শব্দ

নিশ্চয়ই প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই “প্রক্ষিপ্ত” শব্দ-দ্বারা যত কিছু অযৌক্তিক, অসত্য ও অলৌকিক তাহা শোষণ করিয়া লওয়া যায়, প্রত্নতাত্ত্বিক সন্ধান ব্যাপারে এই শব্দটি পক্ষগব্য স্থানীয়।

এই যুগে গ্রীকগণ হইতে যে হিন্দুরা জ্যোতির্বিজ্ঞান কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষ ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কতকগুলি বিষয়—“সামুদ্রিকী”, সমুদ্র পাড়ি দিয়া এই বিজ্ঞা আসিয়াছে এই জন্ত ইহা সামুদ্রিকী।

গ্রীকবিদের নিকট ঋণ।

লৌকিক প্রবাদে বাহা শোনা যায় তাহাতেও ফলিত জ্যোতিষ যে এদেশের নয় তাহার প্রমাণ আছে। বরাহমিহির অনেকগুলি গ্রীক শব্দ তাহার গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন এবং আর্ঘ্যভট্টও গ্রীক প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। ‘পনক্ষর,’ ‘আপোল্লিম,’ ‘স্বেকান,’ ‘মুহা,’ ‘ইন্দিহা’ প্রভৃতি হিন্দু-জ্যোতিষের কয়েকটি শব্দ যাবনিক। কিন্তু তাহারাও

হিন্দুদের নিকট গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান অনেক কথা লইয়াছেন, গ্রীকবিদের উপরে প্রভাব।

তাহার অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। আর্ঘ্যভট্টের ছাত্রগণের মধ্যে স্নেহ ছাত্র কতকটি ছিলেন, তাহার ‘দশগীতিকা পরিশিষ্ট’ নামক জ্যামিতির গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন :—“সংপ্রত্যারম্ভে স্নেহাস্ত্রবাসিনামববোধায় গোলমেবাণুস্বতি।” বীজগণিতের অনেক কথা গ্রীকেরা আর্ঘ্যভট্টের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেকালে হিন্দু পণ্ডিতেরা কত উদার ছিলেন, তাহা গর্গাচার্যের এই উক্তি হইতে বুঝা যায় :—

“স্নেহা হি ববনাস্তেবু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।

ঋষিবক্তেহপি পূজ্যস্তে কিং পুনর্বেদবিদ্বিজঃ ॥”

কোথা গণিত শাস্ত্র হিন্দুদিগেরই উদ্ভাবিত। যজ্ঞকুণ্ডের আকার লইয়াই এই বিজ্ঞান প্রথম অনুশীলন হয়। হয়ত কোন রাজার খেদাল হইল যে যজ্ঞকুণ্ডের আয়তন ঠিক থাকিবে কিন্তু উহা বৃত্তাকার বা অষ্টকোণ হইবে, সুতরাং যজ্ঞকর্তা ঋষিকে চতুর্কোণ কুণ্ডের সমান করিয়া বৃত্তাকার, অষ্টকোণ বা অন্ত কোন প্রকার কুণ্ড নির্মাণ করিবার সমস্তা পূরণ করিতে হইল, এইভাবে বৃত্ত=চতুর্কোণ, বা চতুর্কোণ=অষ্টকোণ, জ্যামিতির এই সকল সূত্র লইয়া ভাবিত হইতে হইয়াছিল। রেখা গণিতের জন্মকথা এই প্রকারের। যে সকল দেশের যজ্ঞের বালাই নাই সে সকল দেশে এই সব সমস্তার উদয় হয় নাই। আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। সাতটি ঋষির নামে সাতটি গ্রন্থ আছে। ঋষি শব্দ হিন্দুস্থানীরা “ঋষি” এইভাবে উচ্চারণ করে (য=থ)। এখন আরব গ্রন্থকারেরা হিন্দু জ্যোতিষ অনুবাদ করার সময় “ঋষি” শব্দ লইয়া ভাবিত হইয়া পড়িলেন, তাহারা অভিধান খুলিয়া দেখিলেন ঋষ শব্দের অর্থ ভয়ুক। সুতরাং তাহাদের তর্জমায় সপ্তর্ষি সপ্তভয়ুকে পরিণত হইল। এই সপ্ত ভয়ুক হইতে যুরোপীয় পণ্ডিতগণ Seven bears আমদানী করিলেন। আমাদের বক্তব্য এই, ভারতবর্ষ তখন নিজ সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া প্রবাহ-হীন হইয়া পড়ে নাই, তখন তাহার গতিশীলতা অবাধ ছিল; সমস্ত জগতের

সঙ্গে তাহার সধক ছিল এবং হিন্দুরা জীবন্ত মহামানবের ছায় চারিদিক্ হইতে বাহা কিছু ভাল তাহা আশ্রসাৎ করিয়া বড় হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরের উৎকৃষ্ট গুণ গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু নিজকে পরাস্থকরণে হারাইয়া ফেলেন নাই। তাঁহাদের অপূর্ণ নাটকগুলি সর্বদা অভিনীত হইত। কিন্তু অনেক সময় প্রশস্ত প্রাঙ্গনে পট-পরিবর্তন পূর্বক দৃশ্যাবলী দেখাইবার অবকাশে যে খানিকটা সময়ের জন্য দর্শকদিগকে অবসর দেওয়া হইত, সেই সময়ে কোন অংশ-বিশেষ অভিনীত হওয়ার পর আড়াল দেওয়ার উপযোগী ভাল কোন উপায় ছিল না, হয়ত বা সেই অবকাশে গুপ্ত প্রকোষ্ঠে যাইয়া অভিনেতার। বেশাদি বদলাইতেন। উক্ত রূপ কোন কারণ বশতঃ গ্রীকদিগের নিকট তাহারা “দবনিকা” পাইয়া থাকিবেন। কথাটির মধ্যেই ঋণ স্বীকার আছে। প্রাচীন নাটকের আধুনিক সংস্করণ যাত্রায়ও “দবনিকার” কোন স্থান নাই, সুতরাং ইহা দেশজ নয় বলিয়াই অনুমিত হয়।

এই গুপ্ত যুগে নানাদিকেই ভারতের অপূর্ণ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কলাশিল্পের সমস্ত চিত্র লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আধ্যাত্ম ছিল সকল দেশের সেরা, এখানে কতই না চরম

চারুশিল্পের নিদর্শন ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। তবে দক্ষিণের অজস্তার চিত্র-সম্পদ।
 ছুর্গম গিরিগুহায় অজস্তার যে চিত্রগুলি বিদ্যমান, কোন ভাগে

তাহার বিলোপ হয় নাই। এই গুহা চিত্রগুলির মধ্যে ১৬ নং এবং ১৭ নং চিত্র অতুলনীয়,—বিজয়ের সিংহল অভিযান—চিত্রগুলির মধ্যমণি। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি পঞ্চম শতাব্দীর। ভারতীয় চিত্রকলার এইগুলি শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। খুব সম্ভব ইহা হইতে যদি শ্রেষ্ঠ কিছু কল্পনা করা যায়, তাহা নিশ্চয়ই আধ্যাত্মে ধ্বংস পাইয়াছে এবং নালন্দা বিহারের শিল্প তাহাদের অত্যন্ত ছিল। বড় বড় বুদ্ধমূর্তি, নরনারী অঙ্গের নানারূপ লাগু ও মনমোহন ভঙ্গিমা, ফুলতার বিচিত্র সৌষ্ঠব এ সমস্ত অজস্তা চিত্রগুলির উপর এক স্বপ্নকুহক বিস্তার করিতেছে। চিত্রকরদের সংবম অসাধারণ ছিল, তাহারা এক একটি রেখার যে ইচ্ছিত দিয়াছেন, বহু রেখার জটিলতা উপস্থিত করিয়াও এখনকার চিত্রকর সেই সাধনার পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারিবেন না। গৃহস্থ রমণী বাহির হইয়াছেন বুদ্ধকে ভিক্ষা দিতে—তাঁহারা ভিক্ষা দিতে ভুলিয়া গেলেন, সেই মানসসরোবরের শ্রেষ্ঠ কমলের মত প্রশান্ত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া রমণী ও বালক নিশ্চল ভাবে চাহিয়া রহিলেন, কি জন্য আসিয়াছেন ভুলিয়া গিয়াছেন, শিশুর হাত হইতে ভিক্ষার দ্রব্য পড়িয়া গিয়াছে। মা ও ছেলের দৃষ্টির ইচ্ছিতে পটে অধ্যাত্ম রাজ্যের এক অপূর্ণ সম্পদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন কোন চিত্রসমালোচক বলিয়া থাকেন রেখা-দ্বারা দূরত্বের ভাব বুঝান অতি অল্প দিনের আবিষ্কার। অজস্তার চিত্রে পালকে সমাসীন রাজার পার্শ্ববর্তী পরিচারকদের একরূপ ভাবে আঁকা হইয়াছে, বাহাতে চিত্রকর যে রেখা সম্পাতে দূরত্বের ভাব বিশেষভাবে বুঝাইতে পারিতেন, তাহার প্রমাণ সুস্পষ্ট রহিয়াছে। *

* কোন কোন চিত্র-সমালোচক বলেন, অজস্তা এবং নালন্দা প্রভৃতি বিহারের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি পূর্ত ও স্থাপত্য-বিভাগের অন্তর্গত; তাহা প্রাচীন ভারতের চিত্রাঙ্কনের অনুগায়া নহে। প্রাচীনকালে অনেক গৃহেই প্রাচীর ও স্তম্ভাদি সাধাইবার রীতি প্রচলিত ছিল। এখনও বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে এই রীতি বিদ্যমান আছে।

প্রত্যেক রেখা অঙ্কনে শক্তিমত্তার পরিচয় আছে, কোথায় বিধা বা ক্ষীণশক্তির প্রমাণ নাই। রংএর খেলার লাবণ্যে চক্ষু মুগ্ধ হইয়া যায়, অথচ কোন স্থানে অতিরাগ বা বাহুল্য নাই।

ঝান্সী জেলায় দেওঘরে পাথরের উপর গুপ্তযুগের যে শিল্প পরিচয় আছে, তাহাই বোধ হয় প্রস্তর কারুকার্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ধাতবমূর্তি এই সময়ে খুব উৎকৃষ্ট হইত। দিল্লীতে সমুদ্রগুপ্তের ঢালা লৌহের যে স্তম্ভ আছে তাহা এযুগের শিল্পকারদের বিশ্বয়। তামার উপর ঢালাই করা কাজ ঐ যুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। নালন্দাতে ৮০ ফিট উচ্চ বুদ্ধের এক তাম্রমূর্তি ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল এবং সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত ৭২ ফিট উচ্চ একটি অতি সুন্দর বুদ্ধমূর্তি গুপ্তযুগে নির্মিত হইয়াছিল—তাহা এখন বারমিংহাম চিত্রশালায় রক্ষিত। গুপ্তযুগের একটি প্রস্তরস্তম্ভের প্রতিলিপি ভিসেন্ট গ্রিথ তাহার প্রাচীন হিন্দুযুগের

বেহারে মেঘেরা এখনও গৃহের বেয়ালে নানাজগৎ চিত্রাঙ্কন করিয়া থাকেন; বৌদ্ধ-বিহারে ভিক্ষুদের হাতের কাজ এই শ্রেণীর। যদিও অল্পসংখ্য চিত্রাঙ্কন চমৎকার রূপ উৎরাইয়া গিয়াছে, তথাপি প্রাচীন চিত্রের রীতি হিসাবে ঐ সকল চিত্র আদর্শ চিত্র নহে। বৌদ্ধ ভিক্ষুর কঠোর সংযম ও ঋষিজনোচিত সরলতা ঐ সকল চিত্রকে নম্র করিয়াছে, কিন্তু চিত্র বলিতে প্রাচীনেরা যাহা বুঝিতেন তাহার অনেকটাই নায়ক ও নায়িকা লইয়া। তাহাদের জীলায়িত মাধুরী, প্রেমোৎসব, লাল ও সোনালী বৌদ্ধ-ভিক্ষুর হস্তে আশা করা যায় না। বৌদ্ধ-ভিক্ষু অনাসক্ত ভোগবিরত কামিনী-কাকন ত্যাগী। নরনারীর প্রেমলীলাই অগতে চিত্রকরকে শ্রেষ্ঠ প্রেরণা দিয়া থাকে, ভিক্ষু সেই প্রেরণা কোথায় পাইবেন? নরনারীর মিলনের মধ্যে যে রূপের সন্ধান মেলে, চিরকৌমাৰ্য্যে দীক্ষিত ভিক্ষু তাহা জানেন না। হুতরাং তাহার চিত্র-সম্পদের অভাবনীয় চমৎকারিত্ব-সম্বন্ধে তাহাতে যৌন প্রেমের ব্যঞ্জনা নাই।

বাংলায়ন বলেন—“প্রকৃত-চিত্রবিৎ তিনি, যিনি বাতাসোলিত তরঙ্গের জীলা-চাকলা, প্রমলিত অগ্নির সহসা উদ্ভিত লীলা ও বিমল সৈন্তের বৈজয়ন্তীর বিকৃত আকর্ষণ হইতে পতিশীলতা শিখিয়াছেন” (“তরঙ্গায়িনিখাধুমং বৈজয়ন্ত্যখরাধিকম্। বায়ুগত্যা লিপেদ্ যন্ত বিজেরঃ স তু চিত্রবিৎ।”) “তিনি শরীরের নানাস্থানের মাংসপেশী, ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নতোন্নত ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহা আভাসে বুঝাইবেন কিন্তু অস্থি ও শিরা দেখাইবেন না, কারণ একটু দূরে শিরা ও অস্থি দৃশ্য হয় না এবং চিত্র একটু দূর হইতেই দেখিতে হয়। শরীরাবয়বের তরঙ্গায়িত ভাবের দ্বারা তিনি আভাসে সেই সকল বুঝাইবেন।” বাহুদের জোখ আঁকিবার কোন সাধারণ নিয়ম নাই; একই চক্ষু অবস্থান্তরে নানাভাব পরিগ্রহ করে; যোগ সাধনের সময়ে চক্ষু দুটি ধনুর মত হয়, পুরুষ ও নারীর লালসাজনিত দৃষ্টির সময়ে চক্ষু, মন্তোদরের মত দেখায়, নির্জিকার পুরুষের চক্ষু নীলোৎপল-পত্রের স্তায় হয়, রোক্তমান চক্ষু দীর্ঘ রক্তমা নিবন্ধন পদ্মপত্রের মত এবং ক্রুদ্ধ ব্যক্তির চক্ষু শশকের চক্ষুর মত দেখায়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান্তরে চক্ষু নানা ভাব গ্রহণ করে। রূপগোপনীর “নান কেলি-কৌমুদী”র প্রস্তাবনায় “কিল-কিঞ্চিৎ ভাবে”র নিদর্শন স্বরূপ চক্ষুর এই রূপান্তর অতি কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত আছে।

নরনারীর পূর্ণরূপে উভয়ের চক্ষু উভয়ের মধ্যে নিত্য যে অত্যাশ্চর্য্য রূপ আবিষ্কার করে তাহা বৌদ্ধ-বিহারের চিত্রে বিরল। ভূষণহীনা হইলেও প্রেমিক প্রেমিকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অপাধিব ভূষণ আবিষ্কার করেন (“অঙ্গাঙ্গ-ভূষিতান্তেব কেনচিছুপাধিনা। যেন ভূষিতবস্ত্রাতি তদ্ রূপমিতি কথ্যতে।”)। নিরাভরণ-দেহে যিনি আভরণের জ্যোতি দিতে পারেন সেই চিত্রকরের তুলি সার্থক। যে রেখা-পাতে অরূপ বেহে রূপের-বেলা খেলিতে থাকে, তাহা চিত্রকরের কার্যের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। মাতা তাঁহার হেলের মধ্যে অস্তের অনুষ্ট রূপ আবিষ্কার করেন, চিত্রকরকে বাৎসল্য অঙ্কন করিতে হইলে সেই রূপ-রেখা-পাত আয়ত্ত করিতে হইবে। এক কথায় জোখে প্রেমের অঙ্গন পরিলে যে রূপছটা আবিষ্কৃত হয়, চিত্রকর তাঁহার চিত্রে সেই রেখাপাত করিবেন।

ইতিহাসে দিয়াছেন—তাহাতে ফুললতা ও মহম্মদমূর্তির নানা বিচিত্র ভঙ্গী কল্পিত হইয়াছে। এই গুপ্তযুগের বাহা কিছু সাহিত্য বিজ্ঞান ও চিত্র সম্পদ তাহা বাঙ্গলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। আমরা আধ্যাবর্তের প্রাচীন সভ্যতার যতটা উত্তরাধিকারী, অল্প কোন প্রদেশবাসী ততটা হয় নাই। মৌর্য ও গুপ্তযুগের সভ্যতা ও উচ্চচিন্তার ধারা সমস্তই বাঙ্গলায় কি পরিমাণে আসিয়াছে তাহা আমরা বধ্যস্থানে দেখাইব। বাহা কিছু মগধে ছিল তাহা গোড়ে আসিয়াছে, গোড়ের ধ্বংসের পর তাহা বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—যেমন করিয়া কোন বিজয়ন্তস্ত ভাদ্রিয়া পড়িলে তাহা হইতে রত্ন ও মুক্তা নিকটবর্তী স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। গুপ্তদের সময় হইতেই মগধ গোড়রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের পূর্বোন্নিখিত “আধ্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প” নামক প্রাচীন পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। এই গুপ্তরাজাদের মগধ সর্বদা “গোড় মগধ” নামে উল্লিখিত হইয়াছে। গোড়তন্ত্রের একটি অঙ্গ ছিল মগধ। পরবর্তী গুপ্ত রাজারা বঙ্গদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া গোড়রাষ্ট্র স্বাধীন ভাবে পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন।

মৃত ও নিখিত মনুষ্য দেখিতে একরূপ; কিন্তু চিত্রবিৎ এই দুয়ের প্রভেদ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া নিখিতকে নিখিত এবং মৃতকে মৃত বলিয়া বুঝাইবেন। একটি শবের পার্শ্বে নিখিতের যেন স্থান প্রকাশ পণ্যস্ত বুঝাইয়া বিভিন্নতা বুঝাইবেন (“মৃগক চেতনাবুজং মৃতং চেতনাবর্জিতম্। নিয়ন্ত্রিতবিভাগক যঃ কয়োতি স চিত্রবিৎ।”)। নিখিতের চিত্র “স্বাস ইব” প্রতীয়মান হইবে। নাটক-নাটিকার চিত্রকেই অনেকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। এই রূপাদর্শবৃত্ত চিত্র আধ্যাবর্ত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গপরে দশম ও একাদশ শতাব্দীতে খেজুরাহ ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরে যে-সকল নাটক-নাটিকার চিত্র দৃষ্ট হয় তাহা আদিযুগের রূপরেখাঙ্কিত বিলুপ্ত চিত্ররীতির কথা মনে জাগাইয়া দেয়। এই রীতি ষাটশ শতাব্দীতে ত্রিগুণধর্মের যোর প্রতিবার স্বরূপ যৌন মিলনকে মন্দির-গাত্রে বীজৎস করিয়া দেখাইয়াছিল। তখন বাৎসায়ন যুগের (খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী) সেই রূপ-রেখা একান্ত স্থল ও হুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল। বাৎসায়ন চিত্রশিল্পকে কলাশিল্পগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছিলেন (“যথা হুমেকঃ প্রবরো নগানাং যথাওজানাং গরুড়ঃ প্রধানঃ। যথা নরাণাং প্রবরঃ ক্রীতীশস্তথা কলানামিহ চিত্রকল্পঃ।”)।

যখন ত্রিগুণধর্ম এদেশ হইতে দূরীভূত হইল এবং হিন্দুর প্রাচীন আদর্শ কতক পরিমাণে পুনরায় গ্রহণ করা হইল, তখন প্রণয়ী যুগলের চিত্রপট আর তেমন রূপ ও লাবণ্য-রেখা-সংযুক্ত হইতে পারিল না। কতকগুলি উমা-মহেশ্বরের মূর্তিতে সে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু যবিও বৈকল্য রূপাভিসারের পক্ষে এই ভাবটি সম্যক শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল, বিদেশীদের আক্রমণে এদেশের ভাস্কর্য ও চিত্রবিজ্ঞা বিনষ্ট হওয়াতে সেই নাটক নাটিকার প্রেমলীলা আর কলাবিজ্ঞার বিদগ্ধীভূত হইতে পারিল না (১৩৩৯ বাং চৈত্র মাসের ভারতবর্ষে ওজরাস রায় মহাশয়ের ভারতীয় চিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। চিত্রকলা সম্বন্ধে বাৎসায়নের নিম্নলিখিত শ্লোক স্মরণীয় :—

“রেখাং প্রশংসন্ত্যার্চ্যা বর্তনাক বিচক্ষণাঃ।

শ্রিয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি বর্ণাচামিতরে জনাঃ।”

[“আর্চ্যাগণ রেখার প্রশংসা করেন, রমণীগণ অলঙ্কারের পক্ষপাতিনী, ইতর ব্যক্তিরা বর্ণের চাকচাকা দেখিবার মুগ্ধ হয়।” বাৎসায়নের মতে চিত্রবিজ্ঞার ছয়টি অংশ—রূপভেদ, প্রমাণ (গঠন ও আকৃতির পরিমাণ ও ভঙ্গি), ভাব, লাবণ্য, যোজন্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাতত্ত্ব।]

নবম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পালসাম্রাজ্য, মৎস্যন্যায়

“যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপাল গীত ।

ইহা শুনিতে বে লোক আনন্দিত ॥”

— চৈতন্য-ভাগবত, অষ্টা ।

বৃহত্তর বাঙ্গলা ছাড়িয়া এবার আমরা খাস বাঙ্গলা মূলকে আসিয়া পড়িব । পাল ও সেন-যুগ খাস বাঙ্গলার । মোঘা ও গুপ্তযুগের বাহা কিছু নিজস্ব তাহা শেষের দুইযুগে বাঙ্গলার নিজস্ব হইল ।

অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে আর্য্যাবর্ত কোন প্রধান সম্রাট বা একচ্ছত্র মহীপতির রাজত্বের আয়ত্ত হয় নাই । আরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর বিপুল মোগল সাম্রাজ্যের স্থায় আর্য্যাবর্ত তখন শতধা বিভক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রখণ্ডে পরিণত হইয়াছিল ।

বঙ্গদেশের অবস্থা কবি সন্ধ্যাকর তখন মৎস্যন্যায়ের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন । বড় মৎস্য বৈষ্ণব ছোট মৎস্যকে ধরিয়া খায়, বঙ্গদেশে সেইরূপ ছোট ছোট ভূমিদারগণ ছোট ছোট রাজার

গ্রাসে ধাইয়া পড়িতে লাগিলেন । সর্বত্র অরাজকতা, নিপীড়িত লামা তারানাথের বর্ণনা ।

প্রজাতিগকে রক্ষা করিতে কোন বলবান্ ভূজ প্রসারিত হয় নাই, তাহারা চক্ষে “কাঞ্চনবৃক্ষ” দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া পড়িল । [সংস্কৃত কবিদের কাঞ্চনবৃক্ষ বঙ্গের প্রাদেশিক নাম “সরসেফুল”] বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তারানাথ এই সময়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “উড়িষ্যা, বঙ্গ এবং প্রাচ্যদেশের আর পাঁচটি প্রদেশের বিভিন্ন অংশে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ এবং প্রত্যেক বৈষ্ণব পার্শ্ববর্তী ভূভাগে আপন আপন প্রাধান্য স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সমগ্র দেশের কোন রাজা ছিল না ।”

তারানাথ আরও লিখিয়াছেন “গৌড়দেশে এক নৃপতি ছিলেন, তাঁহার বিধবা পত্নী পরবর্তী নির্ধাচিত রাজাকে গোপনে নিধন করিতেন । এইভাবে তিনি বহু রাজার প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন ।” কথাটা উপগল্পের মত শোনায় । তবে ইহা আশ্চর্য্য নহে যে, বিধবা রাণীর সহিত মন্ত্রিবর্গের বড়বড় ছিল । তাঁহারা কোন স্থায়ী রাজাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া

স্বীয় স্বীয় প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যিনিই সিংহাসনের দাবী করিতেন, তাঁহাকে তাঁহারা বাধা দিতেন না। কিন্তু গোপনে রাণী তাঁহাকে রাত্ৰিকালে বধ করিতেন। সুতরাং রাজা হওয়া একটা বিভীষিকায় দাঁড়াইয়াছিল। যাহারা রাজবংশে জন্মিয়াছিলেন, উপর্যুপরি তাঁহাদের কয়েকজন এইভাবে নিহত হওয়ার পর অনেকদিন রাজা হইবার জন্ত কেহ আর অগ্রসর হন নাই। এই সময় “বাদ” নামক এক জননায়ক কতকদিনের জন্ত রাজা হইয়াছিলেন, আখ্যায়িকামূলকল্পে—ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

রাজলক্ষ্মী কাহার ভুজ্জ অবলম্বন করিবেন? রাজকুলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এবার তিনি বিশিষ্ট এবং যোগ্য ভূজ্জাশ্রয় করিতে উদ্যত হইলেন; সম্মিলিত প্রজারা অরাজকতা নিবারণের উপায় উদ্ভব করিলেন। যিনি সর্কোপেক্ষা যোগ্য প্রজারা রাজলক্ষ্মীর রাজকুলত্যাগ। তাঁহারই ললাটে রাজচিহ্নলাহন লিখিয়া দিল এবং কণ্ঠে বিজয়মালা দোলাইয়া দিল। এই ভাগ্যবান ব্যক্তি গোপাল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গোপাল ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণ

গোপালের পিতামহ দয়িতবিষ্ণুকে “অবনীপাল কুলের সর্কোৎকৃষ্ট বংশধরের বীজপুরুষ” বলা হইয়াছে। পাল-বংশীয় নৃপতিগণের তিনি বীজপুরুষ ছিলেন, তিনি “সর্কবিজ্ঞা-বিগুহ” ছিলেন। বেদ, বেদান্ত, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, মীমাংসা, তায়, আয়ুর্কেদ, দয়িতবিষ্ণু। ধর্মকেদ, গান্ধর্ষ শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি বিজ্ঞায় যিনি কৃতি হইতেন, তাঁহাকেই “সর্কবিজ্ঞা-বিগুহ” বলা হইত। দয়িতবিষ্ণু সুদী সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের আদি নিবাস ছিল—উত্তরবঙ্গ, বরেন্দ্রভূমি।

এই পণ্ডিত-বরের পুত্র “বপাট” ছিলেন যোদ্ধা। সেই ঘোর অরাজকতাপূর্ণ চৌরদস্য-অধ্যুষিত বঙ্গদেশে তখন পণ্ডিতের পুত্রকেও শাস্ত্র ছাড়িয়া অস্ত্র ধরিতে হইয়াছিল। তাম্রলেখের ভাষায় বপাট অরাতিনিধনকারী ও কর্মকুশল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন—“তাঁহার বিপুল কীর্তিকলাপ সমাগরা বহুধরাকে বিহ্বলিত করিয়াছিল।” এতদ্বারা অস্বাভাবিক হইয়া ‘বপাট’ পৈত্রিক শাস্ত্রচর্চার ব্যবসায় ছাড়িয়া

বীরত্ব দ্বারা কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি নানাস্থানে “জয়ন্ত” ও “দুর্গ” প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া ধরাতলে সেই কীর্তি ও বীরত্বের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিলেন।” সুতরাং বণ্যাট হইতেই এই বংশ বিস্তারশালী ও প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

গোপাল বণ্যাটের পুত্র। অমুমান ৭৪০ খৃষ্টাব্দে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। লামা তারানাত্হের মতে গোপাল ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহা হইলে তাঁহার রাজত্ব ৭৮৫ খৃঃ

অব্দে শেষ হয়। ডিসেন্ট স্মিথ এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

গোপাল ৭৪০-৮৫ খৃঃ।

রাখালদাসবাবুর মতে গোপাল ৭৫০-৭৯০ অব্দের কোন সময়ে রাজা হইয়া ৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। রাজা হইবার পূর্বেই শাসনভার অনেকটা তাঁহার হাতে ছিল, এইজন্য তারানাত্হ তাঁহার ৪৫ বৎসর রাজত্বের কথা বলিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই বঙ্গদেশের ঘোর অরাজকতার সময় বহু দস্যু ও অত্যাচারীর গর্স খর্ব করিয়াছিলেন, প্রজাদের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন, এবং যেখানে প্রবলের অত্যাচার ও দুর্ব্বলের দলন হইত, সেই স্থানেই অভয় শব্দ উচ্চারণ করিয়া দাঁড়াইতেন। গোড়মুণ্ডে তাঁহার সমকক্ষ বীর আর কেহ ছিল না; নতুবা যিনি একজন সামান্য ভূস্বামীর পুত্র, এবং এক পণ্ডিতের পৌত্র ছিলেন, সেই মধ্যবিত্তকুলজাত (চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি বংশের কেহ নহেন) একজনকে গোড়বাসী সকলে মিলিয়া রাজপদে বরণ করিবেন কেন? তাম্রলিপিতে লিখিত হইয়াছে, “প্রকৃতিপুঞ্জ ইহাকে রাজলক্ষ্মীর প্রসারিত কর গ্রহণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং ইনি এরূপ বশবী হইয়াছিলেন যে, দ্বিমুণ্ড-প্রসারিত পূর্ণিমা রজনীর জ্যোৎস্নাই তাঁহার যশের স্থায়ী ধবলতার সঙ্গে তুলিত হইতে পারিত।” উত্তরকালে যখন ইহার বংশ গোড়ে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন স্তাবক পণ্ডিতেরা এই বংশের সঙ্গে সূর্য্যবংশের একটা সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

বৈষ্ণবদেবের সম-সাময়িক সঙ্ঘ্যাকরনন্দী যখন রামপালকে রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিতে বাইয়া এক বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তখন বৈষ্ণবদেব যেটুকু বাকী ছিল তাহাই

পালগণের আদি সম্বন্ধে উপগম।

বা পূরণ না করিবেন কেন? তাঁহার প্রশস্তিতে রামচন্দ্রের স্থায় পালরাজকেও সূর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ববর্তী জনশ্রুতি এই যে ধর্ম্মপাল সমুদ্রকুলজাত। একথা ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য-গুলিতে পাওয়া যায় এবং সঙ্ঘ্যাকর নন্দীও ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। রাখালদাস-বাবু বলেন যে যখন এই দুই ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত বিভিন্ন যুগের প্রমাণ মিলিয়া বাইতেছে, তখন ধর্ম্মপাল সমুদ্রকুলজাত একথা অবিখ্যাস করিবার কোন কারণ নাই;— ইহাই তাঁহার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। পালগণের আদিপুরুষ যে বঙ্গোপসাগর বা ভারত-মহাসাগরের ওরসজাত পুত্র, তাহা তাম্রপট, শৈল-লেখ কিংবা যে কোন “বিশ্বাসযোগ্য” স্থানে লিখিত থাকিলেও উন্নত ভিন্ন কেহ তাহা বিশ্বাস করিবে না। হয়ত এই অজ্ঞাতকুলশীল পালবংশ প্রাচীন কোন যুগে সমুদ্র পাড়ি দিয়া বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এই জনশ্রুতিটি সেই ইতিহাসের একটা দুরাগত বিকৃত প্রতিধ্বনি। রাখালদাসবাবু সমুদ্রের

ঔরসে পালবংশের আদিপুরুষ জন্মিয়াছেন, এই মত গ্রহণ করিয়া তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণাটি উপহাসাস্পদ করিয়া ফেলিয়াছেন। (বাঙ্গলার ইতিহাস, ১ম ভাগ ১৩৩০, ১৬৭-১৬৮ পৃঃ।)

বাঙ্গলা দেশকে অত্যাচার হইতে বিমুক্ত করিতে গোপালকে যে বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহাদি করিতে হইয়াছিল, তিব্বতবাসী তারানাথ তাহা লিখিয়াছেন। “After seven years Gopal who had been elected king managed to free himself and obtained the kingdom” (Cunningham's Survey Report, Vol. XV, p. 148)। নারায়ণদেবের তাম্রশাসনেও গোপাল কর্তৃক কামাচারগণের দৌরাশ্রয় নিবারণের কথা উল্লিখিত আছে। মনে হয় গোড়দেশে শাসন-শৃঙ্খলা আনয়ন করাই গোপালের প্রধান প্রচেষ্টার বিষয় হইয়াছিল, তিনি গোড়দেশে সম্যক্ অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন; দীর্ঘকাল নানা যুদ্ধ বিগ্রহে পারদর্শিতা দেখাইয়া তিনি রাজ্যরূপে নির্ধাচিত হইয়াছিলেন। গোড়রাজ্য নিকটক করিবার পর তাঁহার আর বেশী কিছু করিবার ছিল না। কথিত আছে, তিনি রাজ্য হইবার পূর্বেও ধর্মপথে থাকিয়া প্রজাদের অনুরাগ ও মৈত্রী লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে তিনি জনসাধারণের মধ্যে বাহাতে জ্ঞান প্রচারিত হয়, তজ্জন্ত চেষ্টিত ছিলেন। পূর্বের উল্লিখিত তাম্রলিপিতে উল্লিখিত আছে তিনি অচিরে রাজ্য মধ্যে চিরশান্তি সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—“শান্তীং প্রাপ শান্তিঃ।”

দেবপালের তাম্রলিপিতে গোপালকে বিনয়ীদের দৃষ্টান্ত-স্থানীয় বলা হইয়াছে। সমুদ্রান্ত গোড়দেশ জয়ের পর “আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই” ইহা মনে করিয়া তিনি তাঁহার মদমস্ত হাতীগুলিকে রথ-যুগ হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। উক্ত লিপিতে বলা হইয়াছে যে তিনি রণ-হস্তীগুলিকে পুনরায় বনে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; তাহারা আনন্দাশ্রুপূর্ণ চক্ষে বনে যাইয়া তাহাদের স্বগণদের সঙ্গে পুনরায় মিশিতে পারিয়াছিল। দেবপালের তাম্রশাসন হইতে আমরা জানিতে পারি, গোপালদেব সমাজ সংস্কার করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে স্ব স্ব কর্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে ইহারা স্বধর্ম বিচ্যুত হইয়াছিলেন। গোড়মণ্ডলের রাজারা যুগে যুগে যে সমাজ-সংস্কার করিয়াছেন, গোপালই তাহারই অন্যতম আদি পথ-প্রদর্শক।

এই সকল বর্ণনা দ্বারা মনে হয় যে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা “গোপাল” যদিও মহাবীর এবং যুদ্ধনীতি-বিশারদ ছিলেন, তাঁহার সেই অসামান্ত বীরবিক্রম তিনি সংযত করিতে পারিতেন। তিনি ছুরাকাজ্জী ছুঁদান্ত বীর ছিলেন না, তাঁহার জয়েচ্ছা অবাধ ছিল না। যেখানে দরকার, সেইখানেই তাঁহার অসি কোষমুক্ত হইত এবং প্রয়োজন-শেষে তিনি তাহা কোষবদ্ধ করিতে জানিতেন। তিনি বিনয়ীদের আদর্শ ছিলেন এবং জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া তাঁহার প্রধান কর্তব্য মনে করিতেন। এই সকল গুণ পিতামহ দয়িতবিস্মুর পৌত্রের যোগ্য। প্রকৃত পক্ষে ধর্ম-মণ্ডিত চরিত্র মহাত্ম্যেই তিনি প্রজারঞ্জন এবং প্রজাদের নির্দোষতার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ ক্ষমতার অধীন থাকিতে চায়,

কিন্তু তাহারা মধ্যাহ্ন ভাস্করের তেজকে ভয় করে। গোপালের চরিত্রে এই বিনয়-মাধুরী ছিল বলিয়াই তিনি সর্বজন প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি রণ-হস্তীগুলিকে পর্য্যস্ত যুদ্ধান্তে তাহাদের অরণ্য-জীবনের অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সর্বজীবে তাঁহার দয়া ছিল,—এই সামান্য কথায় তাঁহার মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধ ধর্ম্মে যে জীবে দয়ার নীতি শিক্ষা দেয়, এই ব্যাপারে আমরা তাহারই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই।

বপাট বা দয়িতবিকুর পত্নীদের উল্লেখ নাই। গোপালের মহিষী যদিও ইন্দ্রের শচী, অগ্নির স্বাহা, শিবের সর্দানী, কুবেরের ভদ্রা ও বিকুর লক্ষ্মীর সঙ্গে উপমিত হইয়াছেন, তথাপি তিনি কোন্ বংশের মেয়ে তাহার উল্লেখ নাই। পরবর্ত্তী দেবদেবী।

প্রায় সকল পাল রাজারই মাতৃকুল কোন না কোন রাজবংশ-জাত,—তাম্র-শাসনে তাহা সগোরবে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু গোপাল-পত্নী দেবদেবী বহুগুণে গুণবতী হইয়াও বোধ হয় মধ্যবিস্ত লোকের মেয়ে ছিলেন, এ জন্য তাঁহার বংশকথা অমূল্লিখিত রহিয়াছে। গোপাল স্বয়ং মধ্যবিস্ত গৃহস্থকুল হইতে প্রকৃতিপুঞ্জ কর্তৃক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তৎপূর্বেই সমান ঘরে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বিজয়ী বীর ছিলেন কিন্তু দিগ্বিজয়ীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল না। তিনি পররাজ্য বিজয় করিয়া একচ্ছত্র মহাপাল হওয়ার বাসনা করিতেন না। গৌড়মণ্ডলের শান্তি আনয়ন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—সেই শান্তির আবর্ত্তাবের পর তিনি তাঁহার অসি কোষ মুক্ত করেন নাই। এমন কি তাঁহার শত যুদ্ধের সহচর রণ-হস্তীগুলিকে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন। গোপাল ৭৪০ খৃঃ অব্দে ওদন্তপুরের বিহার স্থাপন করেন।

৮ অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, এখনও বরেন্দ্র ভূমির এক নগণ্য পল্লীতে শ্রীশ্রীগোপালদেবের সমাধি বিদ্যমান আছে। এক জীর্ণ কুটারে দরিদ্র কৃষক কামিনীরা সেই সমাধির স্মৃতিতে সন্ধ্যাকালে তৈলের ক্ষুদ্র আলো দেখায়। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে, বাঙ্গালীরা তাঁহাদের দেশের প্রধান গৌরব বিস্মৃতির জলে ডুবাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গের দরিদ্রেরা সেই রাজাকে ভুলে নাই,—যিনি মহাবিপদের দিনে বাঙ্গালী জাতিকে মৎস্যভ্রাতার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্মপাল

গোপাল ছিলেন পূর্ণচন্দ্র—গৌড়মণ্ডল আলোকিত করিয়া বিরাজ করিয়াছিলেন—
 তাঁহার উদয়াস্ত মহিমাযিত, উজ্জল অথচ শান্ত। কিন্তু তাঁহার পুত্র ধর্মপাল ছিলেন মধ্যাহ্ন-
 মার্জিত—তেজ, বিক্রম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তিনি গৌড়মণ্ডলে
 একচ্ছত্র রাজত্ব লইয়া সমৃদ্ধ থাকিবার লোক ছিলেন না। তাঁহার
 সিংহাসন ছিল বজ্রতুল্য দৃঢ়—তাঁহার বিজয়লক্ষ্মী ছিলেন বজ্রাসনে
 স্থিত, অবিচলিত।

ধর্মপাল ৭৮৪ খৃঃ-৮২০ খৃঃ
 অব্দ। ভিক্টোরিয়ার মতে
 ৭৪০-৮১০ খৃঃ।

তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন গৌড়ের চতুর্দিক স্থাপদসমূহ অরণ্যের
 জায়—কে কাহার রাজ্য কাড়িয়া লইবে, তাহারই চেষ্টা চলিতেছিল। দশদিক্ হৃদ্যন্ত শত্রু-
 ধর্মপালের সামন্ত রাজগণ। সৈন্ত-পরিব্যাপ্ত ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর অমাত্যগণ

স্বাধীন হইয়া সকলেই একচ্ছত্র সিংহাসনের দাবী করিতেছিলেন।
 নন্দ্রদ্বার উত্তরকূলে মালবরাজ, (ভোজদেশাধিপ), উজ্জয়িনীরাজ (অবন্তীর রাজা), মধ্যভারত
 ও পাঞ্জাববাসী কুরু ও বহুকুল, ভারতের পশ্চিম সীমানার যবন গ্রীকগণের শেষবংশধরেরা,
 কান্দাহার (গান্ধার) ও ভারতের উত্তরপূর্ববাসী কীর ও যংস্তরাজা (বর্তমান কাঙ্গরা বা
 জালামুখী) এবং দক্ষিণে মাদ্রাজ (মদ্র) প্রভৃতি প্রদেশের নৃপতিবৃন্দকে ধর্মপালের নিকট
 মাথা নোয়াইতে হইয়াছিল। তাম্রশাসনের অতিরঞ্জিত ভাষায়—“এই সকল নৃপতিরা ‘মাধু’
 ‘মাধু’ উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম-পূর্বক রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মঙ্গলাচরণ
 করিয়াছিলেন।” তিনি কান্তকূলের ইন্দ্ররাজকে পরাভূত ও
 চক্রাযুধ।

বিতাড়িত করিয়া তাঁহার আশ্রিত চক্রাযুধকে এই রাজ্য প্রদান
 করেন। চক্রাযুধের অভিষেক কালে ধর্মপালের সমস্ত সামন্ত রাজা উপস্থিত ছিলেন এবং
 বৃদ্ধ পাঞ্চালগণ চক্রাযুধের মস্তকে স্বর্ণকলস হইতে অভিষেকের জলধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন।

ধর্মপালের দিগ্বিজয় অভিযানের কথা তাম্রলেখের কবি অতিশয় আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায়
 লিখিয়া গিয়াছেন। দণ্ডাচার্য্য গৌড়ীয় রীতি নামক অলঙ্কার শাস্ত্রের যে রীতির উল্লেখ
 করিয়াছেন, এই সকল প্রশস্তি হইতে তাহা পরিকারভাবে বুঝা
 যায়। ধর্মপালের দিগ্বিজয়।

যায়। উদ্যাপতিধর-কৃত বিজয় সেনের প্রশস্তি সেইরূপ রচনার
 আর একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ধর্মপালের দিগ্বিজয় কাহিনী অলঙ্কারের বাহুল্যে ঘনঘটাচ্ছন্ন
 হইয়া আছে—তাঁহার অসংখ্য সৈন্তের পদভরে পর্বতশিখর নোয়াইয়া পড়িয়াছিল; তদীয়
 বৃহৎ চমুর অগ্রগামী “নাসীর” নামক সৈন্তদের বিক্রান্ত গতিতে মাকাতার অভিধান স্মরণ
 করিয়া স্বয়ং ইন্দ্রদেব স্বীয় চক্ষু ভয়ে নিমিলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রণ-হস্তীগুলির নাম
 ছিল “ঘণাঘণ”; সংস্কৃত অভিধানে এ শব্দের অর্থ দেওয়া আছে “হস্তীর বিরাট্ বৃহৎ”।

ধর্মপালের এই রণ-হস্তীর বিরাট বাহু যখন কোন বৃহৎ নদী পার হইত, তখন মনে হইত সেই নদীর সিকতাকূমি বহুদূর পর্য্যন্ত সরিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ হস্তীগুলি নদীর প্রসারিত তটভূমির মত মনে হইত এবং তাহাদের ঘন সন্নিবেশে চতুর্দিক্ শ্রামায়মান হইয়া লোকের মনে অকাল বর্ষাগমের বিভ্রম জন্মাইত। তাহার অসংখ্য রণতরী সেতুবন্ধস্থিত সমুদ্র-নিমজ্জিত পর্ব্বতমালার সমুদ্রত-শেখর বলিয়া মনে হইত এবং ধর্মপাল যখন জুদ্ধ হইতেন, তখন মনে হইত চতুঃসাগর বেষ্টিত ভূমণ্ডলে বাড়বানল অলিয়া উঠিয়াছে। তাহার রাজধানীতে উত্তর দেশের রাজারা, তাহার সখ্যাকামনা করিয়া আহুগতা স্বীকারপূর্ব্বক অসংখ্য অর্থ পাঠাইতেন। তাহাদের খুরোখিত ধূলিতে রাজধানী ধূসরিত হইয়া থাকিত।

এই সকল বর্ণনায় আমরা প্রবল প্রতাপাবিত একচ্ছত্র সম্রাটের একটি উজ্জ্বল ছবি দেখিতে পাই। ধর্মপাল গুপ্তরাজাদের সাম্রাজ্যের অনেকটা যে অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার গুণগাথা সর্ব্বত্র গীত হইত, আমরা রাজপুত্রবদের উপাধি।

তৎসম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। গোপালের সঙ্গে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (বিক্রমাদিত্য) তুলনা চলে, উভয়েরই সংঘত বীরত্ব, শান্তিপ্রিয়তা ও ত্যাগ প্রায় কিন্তু ধর্মপাল ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের স্থায়, তাহার ক্রোধ ছিল বাড়বাগ্নির মত; একবার একরূপ। অলিয়া উঠিলে তাহা সহজে নিবিত্তে চাহিত না। ইহার দরবারে যে সকল প্রধান ব্যক্তি ও রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, খালিমপুরের তান্ত্রশাসনে তাহাদের একটা তালিকা দেখা যায়—সে সকল উপাধির অনেকগুলি আমাদের কাছে এখন দুর্কোধ্য হইয়া গিয়াছে—যথা রাজ-রাজনক (অধীন রাজা?), রাজপুত্র, রাজামতা, সেনাপতি, বিষয়পতি, ভোগপতি, বটাদিকৃত, দণ্ডশক্তি, দণ্ডপালিক, চৌরাক্ষরিক, দোঃসাধসাধনিক, দূতখোলগমাগমিক, অভিব্রমাণ, হস্তাধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ, গবাধ্যক্ষ, মহিষাধ্যক্ষ, ছাগাধ্যক্ষ, মেঘাধ্যক্ষ, নাকাধ্যক্ষ, * তরিক, শৌকিক, গৌলিক, তদাযুক্তক, বিনিযুক্তক, চাট, ভাট—প্রভৃতি, জ্যেষ্ঠকায়স্থ, মহামহন্তর, দর্শগ্রামিক, করণ, ক্ষেত্রকর, বলাধ্যক্ষ, বলাক ইত্যাদি।

এই দরবার যে প্রবল একচ্ছত্র সম্রাটের, তাহা এই তালিকা হইতেই বুঝা যায়। আমাদের বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান; গরু, ছাগ, বুঝ প্রভৃতি জন্তু কৃষির সহায়। গোধন রাজাদের একটা প্রধান সম্পত্তি ছিল। সেই জন্তুদের সময় হইতে গরু চুরি করা রাজাদের একটা নিত্য কার্য্য ছিল। স্বয়ং ইন্দ্র পণিদের গরু হরণ করিতেন। বিরাট রাজার গো-গৃহ লইয়া মত্ত বড় যুদ্ধ বাধিয়াছিল, সুতরাং গবধ্যক্ষ-ছাগাধ্যক্ষের পদ বহু প্রাচীন যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে। তান্ত্রশাসনটি ভূমিদান সম্পর্কীয়, সুতরাং ইহাতে রাজ্যের ভূমিসংক্রান্ত কর্ম্মচারীদেরই মাত্র উল্লেখ করা

* 'নাকাধ্যক্ষ' অর্থ আকাশ-বিভাগের অধ্যক্ষ। এই পদটির অর্থ কি তাহা বোঝা যায় না। কালিদাসের রঘুবংশে শ্রবাবংশীয় নৃপতিরা সকলেই স্বচ্ছন্দে আকাশপথে বিচরণ করিতেন বলিয়া উল্লিখিত আছে (প্রথম অধ্যায়)। অবশ্য অপরাপর কাব্যসমূহেও আকাশগামী রথের উল্লেখ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। শিল্প শাস্ত্রেও আকাশগামী রথের বর্ণনা আছে। আকাশে যাতায়াতের সত্যই কোন ব্যবস্থা ছিল কিংবা এ সমস্তই উপগম?

হইয়াছে। রাজাদের বিপুল নৌ-বাহিনীর এবং বাণিজ্যতরণীর অধ্যক্ষ বা রাজকর্মচারীদের উল্লেখ এখানে নাই। ভারতবর্ষে যুগে যুগে গ্রীক, কুশাণ, হুণ প্রভৃতি যে সকল জাতি বিজয়ী হইয়া আসিয়াছেন—তাহাদের ভাষার কতকগুলি পদের উপাধি দরবারে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল, এই জন্ত এই সকল উপাধির ভাষা কতকটা জটিল ও ছক্কোদ।

খালিমপুরের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে মহারাজ ধর্মপালের ত্রিভুবনপাল নামক এক পুত্র ছিলেন। তিনিই জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন এবং যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, বোধ হয় তাঁহার অকালে পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় কনিষ্ঠ দেবপাল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। ত্রিভুবনপাল নাম যখন রাজকীয় দলিলপত্রে ব্যবহৃত দেখা যায়, তখন ঐ নাম পরিবর্তন করিয়া একই ব্যক্তির দেবপাল নাম গ্রহণ করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন, ধর্মপাল ৬১ বৎসর রাজত্ব করেন। রাখালদাস-বাবুর মতে তাঁহার রাজত্বকাল ৩৫ বৎসর।

ধর্মপাল তাঁহার অমুগত বিপুলবাহিনীকে নানা তীর্থে দর্শন করাইয়া তাহাদের পরলোকের জন্ত পুণ্যসকলের সহায় হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে উত্তর দিকে কৈদার-তীর্থে তর্পণাদি করিবার সুযোগ দিয়া প্রয়াগে এবং তৎপর বোধাই প্রেসিডেন্সীর গোকর্ণ তীর্থে ধর্মকার্য সম্পাদন করাইয়াছিলেন।

কথিত আছে রাবণ রাজা এই গোকর্ণ তীর্থে তপস্তা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

তাম্রশাসনের কবি লিখিয়াছেন, মহারাজ পুথু, মহারাজ রামচন্দ্র এবং পুণ্যলোক নল রাজা এখন স্বর্গগত, তাঁহারা আর দর্শনীয় নহেন। কিন্তু ইহাদের সমস্ত গুণ লইয়া মহারাজ ধর্মপাল দেব বিজ্ঞমান। তাঁহাকে দেখিলেই সেই সকল মহাপুরুষদের দেখিবার ফল হইত।

ধর্মপালের রাজত্ব যে সর্বদাই বিজয়ের ইতিহাস তাহা নহে। এতাদৃশ পরাক্রান্ত নৃপতিকেও ছই একস্থলে অবনতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি খজুররাজ দ্বিতীয় নাগভট্টের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। এই শত্রুকর্তৃক বারংবার বিপর্যস্ত হইয়া ধর্মপাল তাঁহার আশ্রিত কনোজাধিপতি চক্রাযুধকে লইয়া রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের নিকট বিনীত ভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

জয়পরাজয় বীরদিগের জীবনে উভয়ই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ধর্মপাল যে উত্তর ভারতের অধিপতি হইয়াছিলেন এবং দক্ষিণাপথের কোন কোন স্থানে যে তাঁহার প্রতাপ স্বীকৃত হইত, তাহার প্রমাণ আছে।

তারানাথ লিখিয়াছেন, ধর্মপালের রাজ্য বঙ্গোপসাগর হইতে উত্তরে দিল্লী এবং জলন্ধর (পঞ্জাব) পর্যন্ত এবং দক্ষিণে বিক্র্যপর্কতের উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ধর্মপাল প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রকূটরাজবংশীয় জেজের পৌত্র এবং ককরাজের পুত্র পরবলের কন্যা রমদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। পরবলের অপর নাম গোবিন্দ। প্রসিদ্ধ বিক্রমশীলা বিহার ধর্মপালকর্তৃক তদীয় রাজত্বের প্রথম ভাগে স্থাপিত হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেবপাল

ধর্মপালের জ্যেষ্ঠপুত্র ত্রিভুবনপাল সম্ভবতঃ অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে কনিষ্ঠ দেবপাল সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। দেবপালের মাতা রজাদেবী “মুর্তিমতী কীর্তি” বলিয়া বর্ণিত

দেবপাল—৮২—৫৮ গুঃ হইয়াছেন। ইনি সম্ভবতঃ অনেক মঠমন্দিরাদির প্রতিষ্ঠাত্রী (ডিসেন্ট গ্রিধ, ৮২—৫৮ ছিলেন। ডিসেন্ট গ্রিধ বলেন, দেবপালের সেনাপতি লবসেন বা গুঃ)।

লাউসেন কলিঙ্গ ও আসাম জয় করেন। কাহারও কাহারও মতে লাউসেন ধর্মপালের শ্রালিকা রজাবতীর পুত্র এবং উক্ত রাজার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি শুধু কলিঙ্গ ও আসাম নহে, “অজের ঢেকুরের” অধিপতি ইছাই ঘোষকে বধ করিয়া উক্ত দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে “ঈশ্বর ঘোষের” যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, সেই ঈশ্বর ঘোষ এবং ধর্মমল্ললোক ইছাই ঘোষ অভিন্ন—এই মতও কেহ কেহ প্রচার করিতেছেন।

তাম্রলিপিতে লিখিত হইয়াছে, দেবপালের মুখে সর্বদা হাসির শ্রী বিরাজ করিত; ইহার চিত্ত নির্মল ছিল, তাহাতে কুটিলতার লেশ ছিল না এবং ইনি সংযত-বাক্, সংযত-

ব্যবহার ও মধুর চরিত্র-দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখ চরিত্রের জন্ত ইহার দেহ পবিত্র ছিল এবং পিতামহের জায় ইনি

শান্তিকামী ছিলেন। পিতামহ বেক্রপ যুদ্ধান্তে বহু হস্তীগুলিকে অরণ্যজীবনে ছাড়িয়া দিতেন, ইনিও সেইরূপ দিগ্বিজয়াস্তে হস্তীগুলিকে তাহাদের নিবাসভূমি বিদ্যাপর্কতে মুক্তি দিতেন। দেবপাল রণশ্রান্ত অশ্বগুলিকে তাহাদের জন্মভূমি কাষোজের অরণ্যে বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; সেখানে তাহারা তাহাদের আরণ্যসহচর স্বর্গণের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দাশ্র বর্ষণ করিত।

তাম্রশাসনের অতিরঞ্জিত ভাষায় স্তাবক কবি লিখিয়াছেন, সত্যযুগে বলি, ত্রেতাযুগে ভার্গব, দ্বাপরে কর্ণ এবং কলিতে বিক্রমাদিত্য দাতা বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন; কিন্তু তারপর লোকে দানের মহিমা ভুলিয়া গিয়াছিল, দেবপাল সেই দানশীলতা গুণ পুনরায় মর্ত্যে প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছিলেন।

তাম্রলিপির কবির অনেক অতিশয়োক্তি করিয়াছেন, কোন কোন স্থানে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, কিন্তু বেশী স্থানেই সত্যগোপন করিয়াছেন। নিজের আশ্রয়দাতা নৃপতির দোষগুলি ঢাকিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহাদের পরাজয়-কথা প্রায়ই উল্লেখ করেন নাই। তথাপি এই তাম্রলেখমালা ভাল করিয়া পাঠ করিলে এক এক নৃপতির চরিত্রের বিশেষ বিশেষ গুণগুলি বুঝিতে পারা যায়; সে সখকে কবিগণ যথেষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। ধর্মপাল ছিলেন পরাক্রমশালী বোদ্ধা, কিন্তু দেবপালের বীরত্ব অপেক্ষা সাধুতাই চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল,

উপরের লেখাগুলি পাঠ করিলে তাহাই বোঝা যাইবে। পরবর্তী তাম্রশাসনগুলি পড়িলে আমরা দেবপাল-সম্বন্ধে আরও কতকগুলি তথ্য জানিতে পারি। ধর্মপাল এত বড় বোকা হইয়া যে সকল কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন, দেবপাল তাহা সমাপ্ত করেন, তিনি দ্রাবিড়েশ্বর ও পিতৃশত্রু গুর্জরনাথকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। দেবপালের মাতা রাষ্ট্রকূটাদিপতি অমোঘবর্ষের ভগিনী ছিলেন। দেবপাল মাতুলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। এই সময়ে কাঞ্চোজগণ হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া গোড়দেশ আক্রমণের জন্ত চেষ্টিত ছিলেন, কিন্তু দেবপাল কর্তৃক পরাজিত হন। তিনি গুর্জরের রামভদ্রদেবকে জয় করিয়া সেই দেশের গব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন এবং উৎকলের রাজাকে রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনে দেবপালকর্তৃক প্রাগ্জ্যোতিষপুর অধিকার এবং হণবিজয়ের কথাও উল্লিখিত আছে।

এই সকল বৃত্তান্তের দ্বারা মনে হয় ধর্মপাল যদিও তাঁহার বিশাল রাজ্য একরূপ নিকটক করিয়াই স্বর্গীয় হইয়াছিলেন, তথাপি চারিদিকে বিজয়োদ্ধ স্বাধীন নৃপতিরা গোড়মণ্ডলের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। দেবপালকে দীর, স্থির ও সৌম্য প্রকৃতির লোক বুঝিয়া ইহার মাথা জাগাইয়াছিলেন—কিন্তু পুণাশীলা রাজ্ঞী রণামহাদেবীর আশীর্ব্বাদে তাঁহার প্রিয়পুত্র দেবপাল সর্বত্র বিজয়ী হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধগুলি তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা অদ্বিতীয় বীর জয়পাল কর্তৃকই বেনীর ভাগ নির্ব্বাহিত হইত। নারায়ণপালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে “জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার (দেবপালের) অনুজ্ঞাক্রমে বলবান্ জয়পাল দিগ্বিজয়ার্থ চতুর্দিকে প্রধাবিত হইলে, দূর হইতে তাঁহার নাম শ্রবণ করিয়াই উৎকলের রাজা অবসন্ন হইয়া পড়িয়া স্বীয় রাজধানী ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা (সম্ভবতঃ ভগদত্তবংশীয় প্রলম্বের প্রপৌত্র জয়মাল বীরবাহু) জয়পালের বশীভূত হইয়া অধীনত্বস্বীকাররূপ মালা মস্তকে পরিয়া চিরকাল শান্তিতে অবস্থান করিয়াছিলেন।” “জয়পাল ইন্দ্রের কনিষ্ঠ উপেন্দ্রের দ্বায় অগ্রজ দেবপাল দেবকে ধরিত্রীর শাসনস্থলের অধিকারী করিয়াছিলেন।” সুতরাং দেখা যাইতেছে অর্জুনতুল্য সহোদরের বীরত্বেই দেবপাল তাঁহার রাজ্যের শত্রুদলন করিয়া রাজশ্রীকে মহিমান্বিত করিয়াছিলেন। দেবপালের এই সৌভাগ্যের ফল আরও দুইজনের সাহায্যে অর্জিত হইয়াছিল। ইহার তাঁহার মন্ত্রিষয়; প্রথমতঃ দর্ভপানি। তাম্রলেখে বর্ণিত হইয়াছে—“ইহার নীতিকোশলে দেবপাল বিদ্যা হইতে হিমাদ্রি পর্য্যন্ত, পূর্ব্ব সমুদ্র ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্তী সমগ্র ভূভাগ, করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।” দর্ভপানির পৌত্র কেশর মিশ্রও দেবপালের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তাম্রশাসন ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—“এই মন্ত্রিবরের বুদ্ধির বলের উপাসনা করিয়া গোড়েশ্বর (দেবপাল দেব) উৎকল কুল উৎকলিত করিয়া হণগব্ব খর্ব্ব করিয়া এবং দ্রাবিড়-গুর্জরনাথের দর্প চূর্ণাকৃত করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রমেখলা বহুকরা উপভোগ করিতে পারিয়াছিলেন।”

শান্তস্বভাব, স্থির, দীর, ধর্ম্মাহুরাগী দেবপাল দৈবাহুগ্রহে অর্জুনতুল্য ভ্রাতা জয়পাল এবং

বৃহৎপতিতুল্য মন্ত্রী দর্ভপাণি ও কেশর মিশ্রকে লাভ করিয়া সর্বত্র বিজয়যুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্যটির পরিসর বড় কম ছিল না। অনুশাসনে লিখিত আছে—“একদিকে হিমালয়, অপরদিকে সেতুবন্ধ; একদিকে লক্ষীর নিকেতন ক্ষীরসমুদ্র, অপরদিকে বঙ্গপালয়—এই চতুঃসীমাবদ্ধির সমগ্র ভূমণ্ডল দেবপাল নিঃসন্দেহভাবে উপভোগ করিয়াছেন।” দেবপাল সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র নৃপতি না হইলেও তিনি যে তৎকালীন ভারতীয় রাজত্বগণের পুরোভাগে ছিলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে একজন শ্রেষ্ঠ নৃপাল ছিলেন, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়।

ইহার রাজত্বকালে যবদ্বীপের রাজা শ্রীবালপুত্রদেব পাটলিপুত্রে দূত পাঠাইয়া ইহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যেন মহারাজ দেবপাল যবদ্বীপাধিপতির নামে রাজগিরের অন্তঃপাতী নন্দীবনাক ও মণিবারকগ্রাম, নারিকাগ্রাম, হস্তিগ্রাম এবং গয়া জেলার পালামর-গ্রাম—এই পাঁচখানি গ্রাম নালন্দা বিহারে দান করেন। এই গ্রামগুলির উপস্থত্ব দ্বারা (১) নালন্দা বিহারের বুদ্ধসেবা, (২) ভিক্ষুসঙ্ঘের বলি, চক্র, চীবর, পিণ্ড, শয়ন, আসন, ঔষধ, সজ্জা, (৩) ধর্মগ্রন্থ-লিখন, (৪) বিহার ভগ্ন হইলে তাহার সংস্কার—এই চতুর্বিধ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছিল। যবদ্বীপের বালপুত্রদেব শ্রীবীরনামক রাজার বংশসম্মত। বলা বাহুল্য এই পঞ্চগ্রাম বালপুত্রদেব সেই সেই গ্রামের মালিকদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া দান করিয়াছিলেন। দেবপালের রাজত্বের আটত্রিশ বৎসরের কার্তিক মাসের একবিংশ দিনে, অনুমান ৮৫৮ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে, এই দানপত্র সম্পাদিত হইয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও

দ্বিতীয় বিগ্রহপাল

বিগ্রহপাল ধর্মপালের পৌত্র এবং দেবপালের ভারতবিশ্রুতকীর্তি শক্তিমান কনিষ্ঠ সহোদর অয়পালের পুত্র। কাহারও কাহারও মতে বিগ্রহপাল ধর্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাকুপালের পৌত্র।

বিগ্রহপাল হৈ-হৈ রাজবংশভূষণরূপা লজ্জা নারী কল্যার পাণিগ্রহণ করেন।

সম্ভবতঃ ইহার অল্প নাম ছিল হরপাল। ইহার সময়ে গুজরাদিপতি ভোজরাজ অতি

প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা বিগ্রহপাল পরাজিত

হইয়াছিলেন। কিন্তু তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়াছে, প্রগত সমস্ত

সামন্ত নৃপতির মুকুটমণি তাঁহার পাদপীঠ উজ্জল করিয়াছিল এবং তিনি উত্তরাধিকারহুজে

বিগ্রহপাল ৮৫৮-৮৬০ খৃঃ।

বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ২৫৯

প্রাপ্ত সিংহাসন নিজের যোগ্যতা দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাম্রলিপির “জ্যাজ্জিত” শব্দের অর্থ সকলেই “উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত” করিয়াছেন, কিন্তু আমার মনে হয় তাঁহার সিংহাসনের দাবীর প্রতিদ্বন্দী অপর কেহ ছিলেন, জ্যাজ্জিত কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিতটাই আছে। গুর্জরপতির আক্রমণে শুধু তিনি নহেন, তাঁহার পুত্র নারায়ণপালও কতকটা বিপর হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিগ্রহপাল ৮৫৮ খৃঃ অব্দে সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি অল্পকাল পরেই পুত্র নারায়ণপালের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। ভাগলপুরের তাম্রশাসনের সপ্তদশ শ্লোকে এই বানপ্রস্থ অবলম্বনের আভাস আছে।

নারায়ণদেব—বিগ্রহপাল ও লজ্জাদেবীর পুত্র। তিনি সম্ভবতঃ ৮৬০ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব খুব নিরাপদে নির্বাহিত হয় নাই; রাজত্বের প্রথম

দিক্টায় গোড়ের পরম শত্রু গুর্জররাজ ভোজদেব মগধ আক্রমণ করেন। ভোজদেবের এই অভিযান দৃঢ়সঙ্কল্পিত এবং সুসজ্জ ও

সামন্ত-নৃপতিগণের সমবেত চেষ্টায় সফল হইয়াছিল। নারায়ণপালের পিতা বিগ্রহপাল এই সমবেত শত্রুগণকর্তৃক লাহিত হইয়াছিলেন; ভোজরাজের প্রধান সহায়স্বরূপ যোধপুরের (প্রাচীন মাণ্ড্যাপুর) রাজা কঙ্ক ও কলচুরি বংশের রাজা গুণাস্তোদাদিদেব সামন্ত নৃপতিস্বরূপ এই অভিযানে মিলিত হইয়াছিলেন এবং

মুদ্রের নারায়ণপালের সঙ্গে গুর্জরাদিপ ও তাঁহার সামন্ত নৃপতিগণের যে সংঘর্ষ হইয়াছিল, তাহাতে নারায়ণদেব পরাজিত হইয়াছিলেন। নারায়ণপালের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষপরে গুর্জরের দৌরাত্ম্যে পালসাম্রাজ্য

ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে মুদ্রের, ত্রিহুত ও মগধ, গুর্জর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া গেল এবং পালরাজা গোড়বদ্রের আবেষ্টনীর মধ্যে পরিণত মহিমায় রাজত্ব চালাইতে লাগিলেন।

কিন্তু নারায়ণপাল দেব উত্তর-পূর্ব ভারতের অধিকার হইতে অনেকটা বঞ্চিত হইলেও ইহার দীর্ঘ রাজত্ব মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ছিল। ইহার সময়ে উচ্চশিক্ষা, শিল্পকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ে দেশের খুব উন্নতি হইয়াছিল। আমরা এই অধ্যায়ের শেষে পালরাজত্বকালে দেশের অবস্থার কতকটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। শান্তিপ্রিয়, দানবীর, প্রিয়ভাবী, আদর্শচরিত্র, নারায়ণপাল উচ্চশিক্ষা ও চারুশিল্পের উৎসাহদাতা ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে প্রজারা সুখে বাস করিত, কবি তাঁহার শুভ বংশোদ্ভাষি শিবের হাসির সঙ্গে তুলিত করিয়াছেন।

নারায়ণপালের একমাত্র পুত্র রাজ্যপাল। আনুমানিক ৯১৫ খৃঃ অব্দে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার রাজত্বের কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। তাম্রলেখে এই রাজার কৃত কুলাচল-সদৃশ উচ্চ দেবালয় এবং অগাধ-সমুদ্রতুল্য বিশাল দীর্ঘিকার উল্লেখ আছে। বরেন্দ্রভূমিতে বহু উচ্চ দেবালয়ের ভগ্নস্থাপ এবং অধুনা-ক্ষুদ্রত্বপ্রাপ্ত দীর্ঘিকা নানাস্থানে

দৃষ্ট হয়। ইহার কোনটি কোন রাজার কীর্তি, তাহা এখনও ভাল করিয়া জানা যায় নাই।
 পালরাজগণের সময়ে সাধারণতঃ দেশে শান্তি ছিল এবং তাঁহারা
 সকলেই শিক্ষা, শিল্প ও সাধারণের হিতকর নানা অহুষ্ঠানে নিরত
 ছিলেন। রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূটপতি জলভূদেবের (কাহারও
 কাহারও মতে ভূদেব ধর্মাবলোকের) কন্যা ভাগ্যদেবীর পাণিগ্রহণ
 করেন। ইহাদের পুত্র দ্বিতীয় গোপালদেব।

উত্তর ভারতে তখন কান্নকুজ এবং রাষ্ট্রকূট এই দুই পরাক্রান্ত রাজার মধ্যে যুদ্ধ-
 বিগ্রহ চলিতেছিল। কান্নকুজের অধিকার মগধ ও ত্রিহত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।
 সম্ভবতঃ দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র কনোজাধিপতি মহীপালকে
 বধন বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিলেন, তখন গোড়াধিপ দ্বিতীয় গোপালদেব এই সুবিধায়
 মগধ পুনরায় দখল করিলেন। কিন্তু গোপালদেবের অদৃষ্টে অব্যাহত শান্তি ছিল না।
 তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে বৃন্দেলখণ্ডের রাজা চন্দেলবংশীয় যশোবর্ম্মা গোড়দেশ আক্রমণ
 করিয়াছিলেন। মধ্যভারত ছত্রপুরে এই চন্দেলবংশীয় রাজাদেরও বে সকল কীর্তি বিদ্যমান—
 তাহা এখনও অটুট অবস্থায় আছে; এই কীর্তিগুলি অতীব বিস্ময়কর। প্রকৃতির
 স্বপ্নকুহক-জড়িত এরূপ অপূর্ণ স্থাপত্যমহিমা ভারতের আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া
 মনে হয় না। পাহাড়ের উচ্চস্থিত রাজগড় আরব্য উপজ্ঞাসের দৈত্যপুরী বা অতিমানুষ্যগণের
 রাজধানী বলিয়া ভ্রম হয়। খজুরাহো গ্রামে আবিষ্কৃত যশোবর্ম্মার তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয়
 ৯৫৪ খৃঃ অব্দে উক্ত রাজা গোড়, কাশ্মীর, কোশল, মিথিলা, মালব, চেরী, কুরু ও গুজ্জর-
 রাজগণকে পরাস্ত করিয়া সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত স্বাধিকারে আনিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় গোপালদেব দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে।
 গোপালদেবের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। তাঁহার সময়ে গোড়, বঙ্গ ও বরেন্দ্রে বিদেশীয়গণের
 বড়ই উৎপাত চলিতেছিল। তাম্রশাসনের কবি বিগ্রহপালের প্রশংসা
 করিতে যাইয়া তাঁহার কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা ভিন্ন আর কিছুই
 বলিতে পারেন নাই। বে সময়ে সমস্ত দেশ অসির স্বনংকারে
 মুখরিত, তখন হয়ত দ্বিতীয় বিগ্রহপাল কোন নিরাপদ পল্লী খুজিয়া
 তথায় তুলিহস্তে চিত্রপট আঁকিতেছিলেন, তাঁহার অভ্যুত্থান বিশালকায়
 হস্তিগণ রণমন্ডে মাতিয়া কোন দূর্লভ্য নদীর প্রসারিত সিকতা ভূমির জায়
 দৃষ্ট হয় নাই—তাহারা হিমালয়ের হিমশীতল কোন উপত্যকার চন্দনবনে
 বধেচ্ছ বিহার করিতেছিল। এই সময়ে যশোবর্ম্মার পুত্র ধর্ম্মদেব কনোজ হইতে বিপুল বাহিনী
 লইয়া গোড়েশ্বরের পত্নীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই জন্ত কি তাম্রশাসনকার
 মহীপালের মাতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্ঞীর নাম বা বংশসম্বন্ধে একটি কথাও লিখেন
 নাই? অপরদিকে কাথোজিয়ারা আসিয়া অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গের সিংহাসন দখল করিয়া
 বসিয়াছিল। এই জন্তই কি মনঃফোড়ে দ্বিতীয় বিগ্রহপাল চিত্র করিবার জন্ত রং ও তুলি



দ্বিতীয় বিগ্রহপাল।
 (প্রাচীন মুদ্রা হইতে)

লইয়া ব্যস্ত থাকিয়া সংসার-জালা ভুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন? বশোবর্মার পুত্র ধর্মদেবের দ্বিধিভয়-প্রবৃত্তিটা যেমন খুবই প্রবল ছিল, তেমনই তাঁহার পরাজিত রাজাদের অন্তরমহলের প্রতি একটা লিপ্সাও বলবতী ছিল। তাম্রশাসনের কবি তাঁহার এই রোগটারও বেশ প্রশংসার সহিত উল্লেখ করিয়া তদীয় অবরোধিকার এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন :—“সমরজয়ী রাজা ধর্মের কারাগারে বন্দিনী রমণীরা সজলনেত্রে এই ভাবে কথাবার্তা বলিতেছিলেন—“আপনি কে? অকুদেশের রাজ্ঞী; আপনি কে? রাঢ়রাজপত্নী; আপনি কে? অঙ্গরাজ-পত্নী।” এই ঘটনা ১০০২ খৃঃ অব্দে ঘটিয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরবর্তী পালরাজগণ

কাঞ্চোজিয়াগণ ছিলেন বিদেশী; কুলজীগ্রহে নলুপকানন ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন—“এই অস্পৃশ্যজাতি নিজদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে চায়। এই এক বিবম রোগ বে জাতি রাজা হইবে, সেই নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রচার করে।” নলুপকানন জানিতেন না যে আবুপর্কতে ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিবার জন্ত যে সময়ে বজ্র হইয়াছিল তদবধি ব্রাহ্মণের সর্কজাতির মধ্যে এই প্রচেষ্টা চলিতেছিল।

কাঞ্চোজিয়ারা কে? ফরাসী পণ্ডিত ফুঁসের মতে তিব্বত দেশের নামান্তর কাঞ্চোজ দেশ—নেপালে এই প্রবাদ প্রচলিত। রমাপ্রসাদ চন্দ্র মনে করেন “কাঞ্চোজরাজ গৌড়পতি”

মহীপাল—২৭৮-১০৩০ খৃঃ তিব্বত বা অন্ত কোন পাহাড়িয়া দেশ হইতে আসিয়া বরেন্দ্র জ
(ভিগেট শ্বিথের মতে)। করিয়া “গৌড়পতি” উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ২৬৬ খৃঃ অব্দে
ইহাদের এক বংশধর কর্তৃক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। বাণনগরে
ইহাদের কীর্তিচিহ্ন পাওয়া যায়। কোচ, পলিয়ার, রাজবংশী প্রভৃতি জাতিরা এই কাঞ্চোজরাজ-
গণের স্বশ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল যে “অনধিকারী” জাতি কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া-
ছিলেন—ইহারা সেই জাতি।

মহীপালের রাজত্বকালে উত্তর-পূর্ব ভারত নানা নৃপতির প্রতিদ্বন্দিতামূলক যুদ্ধবিগ্রহে ছিন্নভিন্ন হইতেছিল। কনোজাধিপতি রাজ্যপাল চন্দেলরাজগণের শরণাপন্ন হইয়াও আশ্রয়লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি যামুন গজনীর সহায়তা-প্রার্থির জন্ত লোলুপ হইয়াছিলেন। মহীপালের পরে নরপালের সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত ঘোর সমরানলে দগ্ধ হইতেছিল। একদিকে চেদীরাজ কর্ণ অপূর্ণ বীরত্ববলে সমস্ত উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ বিজয় করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনের ভাষায় “কর্ণদেবের বিক্রমদর্শনে পাণ্ডুরাজ চণ্ডতা ত্যাগ করিয়াছিলেন,

কেরলরাজের গর্ভ খর্ব হইয়াছিল, কুঙ্গরাজ সংপথে আসিয়াছিলেন, বঙ্গরাজ ও কলিঙ্গরাজ ভয়কম্পিতকলেবরে লুকাইয়া ছিলেন, কীররাজ পিঙ্গরাবদ্ধ পাখীর ভায়ে অবস্থান করিতে-
ছিলেন, হণরাজের হর্ব অস্ত্রহিত হইয়াছিল।” এই ভারতবিজয়ী বীর চন্দ্রেন্দ্রবংশের রাজা কীর্ত্তিবর্ষাকর্তৃক পরাভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমানগণ এই সময়ে অমিতবিক্রমে বস্ত্রার
ভায়ে আঘাতবর্তের উপর আসিয়া পড়িলেন। আঘাতবর্তের হিন্দুরাজাদের অনেকে একত্র
হইয়া মুসলমানের অভিযানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু কথোজরাজগণের হস্ত হইতে
বরেন্দ্রভূমি উদ্ধার করিয়া মহীপাল স্বদেশে নানা লোকহিতকর ব্যাপারে আত্মশক্তি প্রয়োগ
করিয়াছিলেন। যে প্রচণ্ডশক্তি হিন্দুসাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইতেছিল, তাহা বাধা
দিবার জন্ত মহীপাল কোন চেষ্টাই করেন নাই। বঙ্গদেশের সুবিখ্যাত মহীপাল দীঘি
এখনও সেই নিশ্চিত জনপ্রিয় রাজার প্রধান কীর্ত্তিস্বরূপ বিজ্ঞমান আছে। এত বড় দীঘি
আর বাঙ্গলার নাই। এই দীঘি রঙ্গপুরের অতি সমিহিত। তিনি প্রজাদিগকে স্বীয় চরিত্রের
নানাগুণে মুগ্ধ করিয়াছিলেন; তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে পল্লীগাথা এখনও উত্তরবঙ্গে
গীত হইয়া থাকে। “ধান ভানতে মহীপালের গীত” এই প্রবাদবাক্য বাঙ্গলার ঘরে ঘরে
প্রচলিত। ষোড়শ শতাব্দীতে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের পূর্বে বঙ্গদেশের অবস্থা কি ছিল তাহা
বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

“বোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত।”

মহীপালের মৃত্যুর ৪৫ শত বৎসরেও যে গীত বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পূর্ণোচ্চমে গীত হইত
এবং এখন কিষ্কিন্ধ্যান সহস্রবৎসর পরেও বাহা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, সেই গানের
বিষয়ীভূত রাজচরিত্র যে কতটা জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহা সহজেই
মহীপাল ও লীলা।

অগ্রহমান করা যায়। একটি ক্ষুদ্র মহীপালের গানে আমরা জানিতে
পারিয়াছি, লীলা নামী এক ধনাঢ্য বণিকৃৎসাকে মহীপাল ভালবাসিতেন। তাহাকে
পাওয়ার জন্ত তিনি কত হিমপূর্ণ রাজ্য খুজিয়াছেন, গ্রীষ্মকালে উষ্ণ প্রদেশে গমনাগমন
করিয়াছেন। একদিন তিনি শুনিলেন, তাঁহার নবনির্মিত দীঘিতে স্নান করিবার জন্ত সেই
সুন্দরী কন্তা আপনা হইতে আসিয়া জলে স্নাতার কাটিতেছে। মহীপাল নিজে জলে
নামিয়া লীলার জটিল ও দীর্ঘ শৈবালের মত ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত চুলের মুঠা ধরিয়া টানিয়া
আনিলেন এবং তাহাকে বলপূর্বক লইয়া গেলেন। ইতঃপূর্বেই মহীপালের সংস্রবে
লীলার একটা কলঙ্ককথা প্রচলিত ছিল, এই জন্ত লীলার পিতামাতা তাহাকে মহীপালদীঘিতে
যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। লীলা সে কথা না মানিয়া দীঘির জলে নামিয়াছিল, ইহা দ্বারা
মনে হয় রাজশিকারী যে পাখিটাকে শিকার করিয়াছিলেন, সে পাখী ধরা দিতেই তাঁহার
কাছে আসিয়াছিল। এই সকল গল্পকথার ঐতিহাসিক মূল্য কি তাহা জানি না। তবে
পল্লীগাথা অনেক সময়েই সত্যের একটু ইঙ্গিতকে ভিত্তি করিয়া তাহার উপর কল্পনার সৌধ

নির্মাণ করে। এই প্রাচীন গাথাটিতে যে সত্যের সেরূপ একটু ইঙ্গিত না আছে তাহাই বা কে বলিবে ?

মহীপাল দেব সম্ভবতঃ ১০৩০ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কেহ কেহ বলেন তিনি ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তারানাথের মতে মহীপাল ৫২ বৎসর রাজত্ব করেন। সুলতান মহম্মদ যখন উত্তরাপথের প্রসিদ্ধ নগরসমূহ ধ্বংস করিতেছিলেন, যখন স্থানীধর, মথুরা, কান্ধকুজ, গোপাল, কলঙ্কর, সোমনাথ প্রভৃতি নগর ও দুর্গ একের পর একটি করিয়া বিজয়ী বিদেশীর করতলগত হইতেছিল, তখন মহীপাল নিশ্চিতমনে বারানসী নগরীকে নানা কীর্তিতে সজ্জিত করিতেছিলেন।

মহীপালের পুত্র নরপালের সময়েই বঙ্গদেশের নানাস্থানে শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল; উত্তর-ভারতে যে ঋড় বহিতেছিল, গোড়ে তাহার গতি উপলব্ধ হয় নাই। নরপাল নিকষেগে সিংহাসনে বসিতে পারেন নাই। যে কর্ণদেব অর্দ্ধ আর্ধ্যাবর্ত্ত কবলিত করিয়া চেন্দীরাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন, তিনি প্রথমবার চন্দেলরাজ কীর্ত্তিবর্ধার হস্তে পরাজিত হন। চন্দেলরাজের ব্রাহ্মণ সেনাপতি গোপালের শৌর্য্য ও বীরত্বগুণে এই জয় সংসাধিত হইয়াছিল। কিন্তু কর্ণদেবের দ্বিতীয় বারের পরাজয় ঘটয়াছিল মগধে।

নরপাল—১০৩০-১০৪৫ খৃঃ।

নরপাল তাহাকে পরাভূত করেন। কর্ণদেব গয়ায় তীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন। সেইখানে মগধাধিপতি নরপালের সঙ্গে তাঁহার যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, তাহার ফলে কর্ণ মগধ অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় জয়ের আশা না দেখিয়া স্বীয় যুযুৎসাবৃত্তি কতকগুলি বৌদ্ধ বিহার ও মঠ ধ্বংস করিয়া কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত করেন। নরপালের মৈত্রদল বিজয়ী হইয়া কর্ণদেবের সৈন্তসামন্তদিগকে অবাধে হত্যা করিতেছিল। এই সময়ে বঙ্গের মুকুটমণি শ্রীমান্ অতীশ দীপঙ্কর গয়ায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মধ্যবর্ত্তিতায় কর্ণদেব ও নরপালের মধ্যে উভয় পক্ষের একটি সম্মানজনক সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। শত্রুতা এইভাবে সৌহার্দ্যে পরিণত হইলে নরপালের পুত্র কুমারপালের সঙ্গে চেন্দীরাজ যৌবনশ্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন।

৬ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন “নরপাল দেবের রাজত্বকালে বৈষ্ণব-জাতির প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল, বৈষ্ণবগ্রন্থকর্তা চক্রপাণি দত্তের পিতা নারায়ণ নরপাল দেবের বৈষ্ণবজাতির উন্নতি। রত্নশালায় অধ্যক্ষ ছিলেন। জনার্দন মন্দিরের প্রশস্তি রাজবৈষ্ণব সহদেব কর্তৃক এবং গদাধর মন্দিরের প্রশস্তি বৈষ্ণব ব্রজপাণি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই কোদিত লিপিবন্ধে শিল্পীর অনবধানতাপ্রযুক্ত বহু ভ্রম-সম্বন্ধে রচয়িতৃগণের বিভ্রা ও রচনাকোশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।”

১০৪৫ খৃঃ অব্দে নরপালদেবের পুত্র বিগ্রহপাল (তৃতীয়) সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার ঋগুর ভারতবর্ষের তৎকালীন নৃপতিগণের প্রধান—চেন্দীধর কর্ণদেব, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বিগ্রহপাল বহু রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। পাটনা

জেলায় কোষরাজগ্রামে বীরদেব-নির্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে এই সকল মূর্তির অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। বিগ্রহপালের সময়ে বর্ষবংশীয় রাজগণের অভ্যুদয় হয়। তাঁহারা বাংলাদেশের অনেকটা আত্মসাৎ করেন। এই রাজগণের মধ্যে বিগ্রহপালের সমসাময়িক বজ্রবর্মা ও জাতবর্মা। জাতবর্মা বিগ্রহপালের স্থালীপতি, তিনি কর্ণদেবের দ্বিতীয় কন্যা বীরশ্রীর পাণিগ্রহণ করেন। জাতবর্মা হরিকেল (চন্দ্রদ্বীপ) অধিকার করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন ও পরে দিবা নামক কৈবর্ত সেনাপতিকে পরাভূত করিয়া অঙ্গদেশ (পাটনা) অধিকার করেন।

কিন্তু বিগ্রহপালের রাজত্বের শেষদিকে আর এক দুর্ভাগ্য শত্রু ক্ষীয়মাণ পালশক্তির বিক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিত্বরূপ বঙ্গদেশে রাজ্যস্থাপন করেন। ইহারা কৈবর্তকুলসম্ভূত। সেনাপতি দিব্যের নাম এই মাত্র করা হইল—ইনি অঙ্গ ছাড়িয়া বরেন্দ্রে উপস্থিত হন এবং তথাকার অধিবাসিগণকে পালরাজাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। দিবা অনেক স্থলে দিবেবাক্ নামে পরিচিত। তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বের শেষের দিকে কৈবর্তগণ উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহী হইয়া দিবেবাকের শাসন স্বীকার করিয়া লয়।

বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর রাজ্যের অধিকার লইয়া তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে কলহ ধনাইয়া আসে। দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দুর্নীতিপরায়ণ হইয়াছিলেন। বিগ্রহপালের তৃতীয় পুত্র রামপাল কৃতী ও জনপ্রিয় ছিলেন, সুতরাং যদি তিনি রাজ্যের প্রতি লোভ করেন এই আশঙ্কায় মহীপাল শুধু রামপালকে নহে, অপর ভ্রাতা সুরপালকেও শূলভিত্ত করিয়া কারাগারে প্রেরণ করেন। এমন কি তিনি রামপালকে বধ করিবারও প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহীপাল বিদ্রোহী কৈবর্তদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাভূত হইয়া নিহত হন। ইহার পরে কতক সময়ের জন্য সুরপাল রাজা হইয়াছিলেন। কেহ কেহ অহুমান করেন সুরপালকে হত্যা করিয়া রামপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ইহা একটি অহুমান মাত্র। সুরপালের রাজত্ব বেশীদিন স্থায়ী ছিল না, এবং তাঁহার রাজত্ব সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না—সুতরাং তিনি হয়ত রামপালকর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, এই “হয়ত” দ্বারা পুণ্যলোক রাজা রামপালের ঘাড়ে এত বড় একটা অভিযোগ চাপাইয়া দেওয়া ঠিক নহে।

বাহা হউক রামপাল যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন পাল-সাম্রাজ্য নামমাত্রে পর্যাবসিত হইয়াছিল। বিদ্রোহী কৈবর্তেরা উত্তরবঙ্গের সমস্তটা দখল করিয়া লইয়াছিল। দিবেবাকের পরে তদীয় ভ্রাতা রুদোক গৌড় অধিকার করিয়াছিলেন। রামপালের সময়ে রুদোকের পুত্র ভীম কৈবর্তদের অধিনায়ক হইয়া দেশ শাসন করিতে লাগিলেন; রামপাল তখন পদ্মা ও গঙ্গার মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র গভীর মধ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন।

কিন্তু কিরূপে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবেন, ইহাই ছিল রামপালের দিবসের চিন্তা ও

রাজের স্বপ্ন। রামপালের মাতুল “বিদ্যা-মাণিক্য” নামক হুজুয় হস্তিপুষ্ঠে সমারূঢ় মণনদেব
পিতৃরাজ্যোদ্ধারবৃত্ত।
তাহার সহায় হইলেন। রামপাল জনপ্রিয় ছিলেন,—পূর্বগগনের
সমুজ্জ্বল সূর্য্য, পালবংশাবতংস রাজ্যহারা রামপালের জন্ত সমস্ত
গৌড়মণ্ডল মর্যাদাস্থিক কষ্ট বোধ করিতেছিল।

এই দেশে এখনও কৈবর্তের সংখ্যা ২০ লক্ষের উপর, তাহারাই সম্ভবতঃ একসময়ে
দেশের মুখপাত্র ছিলেন। বিশেষ পূর্ববঙ্গে সমুদ্র ও বড় নদীতে ইহারা হুজুয় ছিলেন।
ইহাদের শরীরে অমাত্যবী বল ছিল,—কিন্তু “বুদ্ধিযন্ত বলং তন্ত”। রামপাল সংগঠনের
শক্তি ও রাষ্ট্রনীতির উজ্জ্বল প্রতিভা লইয়া জয়গ্ৰহণ করিয়াছিলেন। সামান্য একটি
ভূস্বামীর অবস্থায় পরিণত একটি মেটে প্রদীপের সলতের মত গৌরবান্বিত পালবংশের
এই হুঃস্থ হতভাগ্য বংশধর কিরূপে কৈবর্তগণের হাত হইতে দেশ উদ্ধার করিয়াছিলেন,—
শতধা-বিভক্ত এই গৌড়মণ্ডলকে কিরূপে ঐক্যের সূত্রে গাঁথিয়াছিলেন, তাহা সন্ধ্যাকর
নন্দী বিস্তারিত ভাবে লিখিয়াছেন।

সন্ধ্যাকর নন্দী লিখিয়াছেন, প্রথমতঃ ভীম কৈবর্তের পরাক্রম ও তাহার নিজ শোচনীয়
অবস্থা স্মরণ করিয়া রামপাল নিরাশ হইয়াছিলেন। তিনি ছদ্মবেশে সমস্ত সামন্ত নৃপতিদের
গৃহে গৃহে বাইয়া দেখা করিতে লাগিলেন; পার্শ্বত্যা দেশের দলপতিদিগের সাহায্য পাইবার
জন্তও চেষ্টিত হইলেন এবং দিবারাত্র স্বীয় তরুণপুত্র রাজ্যপাল ও অমাত্যগণের সঙ্গে পরামর্শ
করিতে লাগিলেন। ক্রমে যেন ঘনঘটাচ্ছন্ন নিরাশা ভেদ করিয়া একটু একটু করিয়া
আলোর সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন, দেশের লোকের হৃদয়ের অমুরাগ তাহার
প্রতি স্থির রহিয়াছে।

যখন দেশবাসিগণের ভালবাসা সম্বন্ধে তিনি বিদ্যাস্ত হইলেন, তখন তাহার হৃদয়ে অদম্য
উৎসাহ ও বাহতে বল আসিল। তিনি অঝারোহী, গজারোহী ও পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ
করিতে প্রাণপণে লাগিয়া গেলেন। তখনও পালরাজগণের ভাগ্যের নিঃশেষ হয় নাই।
সেই পূর্বপুরুষোপার্জিত অর্থ তিনি জলের মত বিলাইয়া দিতে লাগিলেন।

কৈবর্তবিদ্রোহের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রথম সেনাপতি হইলেন রামপালের মাতুলপুত্র
রাষ্ট্রকূটবংশীয় শিবরাজদেব। তিনি প্রচণ্ডবেগে ভীমাধিকৃত দেশগুলি আক্রমণ করিলেন—
এই আক্রমণের ফলে দেশ জুড়িয়া আতঙ্ক হইবার কথা ছিল,—কিন্তু রাজার অহুজাক্রমে
শিবরাজদেব যথাসম্ভব সংযম ও সাধুতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই অভিযান চালাইতে
লাগিলেন। তিনি হস্তী, অশ্ব ও পদাতিকের বিপুলবাহিনী লইয়া গঙ্গা উত্তীর্ণ হইলেন এবং
সর্বত্র দেবত্র ও ব্রহ্মত্র জমি এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। বরেন্দ্রভূমি শিবরাজের বিক্রম ও
সংযম এই উভয় গুণেই তাহার বশীভূত হইয়া গেল। ভীমের নিযুক্ত সেনাপতিগণ ক্রমশঃ হটিয়া
যাইতে লাগিল। যেখানে প্রজামণ্ডলী অহুকুল, সেখানে অভিযান অনেক পরিমাণে নিরাপদ।
অল্পসময়ের মধ্যেই শিবরাজ রাজদরবারে সংবাদ দিলেন—“বরেন্দ্রভূমি অধিকৃত হইয়াছে।”

কিন্তু সহসা এই বিরাট অভিযানের বেগ সামলাইতে না পারিয়া কৈবর্তরাজ একটু

বিত্রস্ত হইয়া পড়িলেও পুনরায় তাঁহার বিপুল বলসঙ্কর করা কষ্টসাধ্য হইল না। এবার উভয় পক্ষের জীবনমরণ পণ। কৈবর্তনেতা তাঁহার অধিকৃত সমস্ত প্রদেশ হইতে অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। হিমাদ্রিভূমি এই বিরাট ব্যুহ ভেদ করিতে পারিলে তবে জয়ের আশা,— যে বরেন্দ্র-দেশ তাঁহার পূর্বপুরুষদের পুণ্য জন্মভূমি ও তাঁহাদের শত শত কীর্তিদীপ্তিতে সমুজ্জল, বাহা স্বপ্রলব্ধনের জায় রামপাল শিবরাজের কল্যাণে কিছুকালের জন্ত পাইলেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু বাহা দেখিতে দেখিতে শত্রুকর্তৃক পুনরধিকৃত হইয়া গিয়াছিল—তবেই তাহা সত্য সত্য অধিকার করিতে পারিবে, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন। এই সমস্তার কণ্টকাকীর্ণ মুহূর্ত্তে তিনি সমস্ত সামন্ত-নৃপতি লইয়া এক গোড়চক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন—সেই চক্রে নিম্নলিখিত দলপতিগণ যোগদান করিয়াছিলেন:—

১। মগধ ও পীঠাধিপতি ভীমযশা। ইনি কাঞ্চকুজাধিপতি দেবরক্ষিতকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ ইনি রামপালের বিরুদ্ধে ছিলেন, একসময়ে মথনদেব (রামপালের মাতুল) ভীমযশাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার মিত্রতা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন এবং স্বীয় কন্যা শঙ্করদেবীকে ইহার সঙ্গে বিবাহ দিয়া সেই সখ্য সূদৃঢ় করিয়াছিলেন। কৈবর্ত-বিরুদ্ধে অভিযানার্থ একত্র সামন্তমণ্ডলীর মধ্যে ইনিই সম্ভবতঃ প্রধান ছিলেন, যেহেতু ইহারই নাম সন্ধ্যাকর নন্দী সর্বপ্রায়ে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাকে “বন্দ্য” উপাধি দিয়াছেন। (পীঠ—বর্তমান গয়া-জেলার প্রাচীন নাম)।

২। কোটাটবীপতি বীরগুণ। কোটাটবী উড়িষ্যার বিশাল অরণ্যানীবেষ্টিত গড়জাত প্রদেশ। আইন আকবরীতে এই দেশকে কটক সরকারের অন্তর্গত “কোট দেশ” বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সন্ধ্যাকর নন্দী বীরগুণকে “নানারত্ন-কুটুম-কোটাটবী-কণ্ঠী-দক্ষিণ-সিংহাসন-চক্রবর্তী” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৩। দণ্ডভুক্তির রাজা জয়সিংহ। ইনি উড়িষ্যার রাজা কর্ণকেশরীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দণ্ডভুক্তি বর্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণভাগে অবস্থিত ছিল। রামচরিতে কর্ণকেশরীকে পরাজয় করার জন্ত যে বহুপল্লবিত বৃন্দসমাসযুক্ত উপাধি দ্বারা ইহার প্রশংসা করা হইয়াছে সেই প্তব্যুক্ত বিশেষণটি দেড় ছত্র পরিমিত দীর্ঘ।

৪। বালবলভীর অধীশ্বর বিক্রমরাজ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বালবলভী বর্তমান বাগড়ীর প্রাচীন নাম। সন্ধ্যাকর নন্দী এই দেশের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে এই দেশ নদীবহুল ছিল বলিয়া মনে হয়।

৫। শূরবংশীয় অপার মান্দারের অধিপতি লক্ষ্মীশূর। রামচরিতে ইহাকে “অপার-মান্দার-মধুন্দন-সমস্তাটবিক-সামন্তচূড়ামণি” উপাধি দেওয়া হইয়াছে।
নামস্তচক্র।
নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে অপার-মান্দার হর্গেশনন্দিনীর “গড়মান্দারগ”।

৬। কুজবটীর অধীশ্বর শূলপাল। ইনি পালবংশের কোন বংশধর হইবেন। কুজবটীর এখনও স্থাননির্ণয় হয় নাই।

৭। তৈলকম্পের অধিপতি কদ্রশিখর। এই স্থানটির বর্তমান নাম 'তৈলকুপি', উহা মানভূম জেলায় অবস্থিত।

৮। উচ্ছালের অধিপতি ময়গাল সিংহ।

৯। ঢেকুরী রাজা প্রতাপসিংহ। ঢেকুরী উত্তর-রাঢ়ে অবস্থিত। ইহাই ইছাই-ঘোষের "অজ্জের ঢেকুরী", এখানে এখনও ইছাই-ঘোষের শ্রামরূপার মন্দির অতি জীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান।

১০। কয়দ-মণ্ডলের নরসিংহার্জুন।

১১। শম্ভুটগ্রামের চণ্ডার্জুন।

১২। নিত্রাবলের বিজয়রাজ। নগেন্দ্রনাথ বহুর মতে এই বিজয়রাজই বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেন। নামের সাদৃশ্যজনিত অসুমান ভিন্ন এই মতের সমর্থক অস্ত কোন প্রমাণ নাই।

১৩। কৌশাধীর ঘোরপর্দন। কুশাধী রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। এখানে নসরত সাহের একটি মসজিদ আছে। ঘোরপর্দন সম্ভবতঃ লিপি-প্রমাদ; নামটি গোবর্দন। কেহ কেহ মনে করেন ইনি ভোজবর্মার তাম্রশাসনে উল্লিখিত গোবর্দন।

১৪। পদ্মবদার সোম।

গৌড়াভিযানার্থ এই চতুর্দশ নৃপতিমণ্ডল-নির্মিত চক্রবাক্সলার ইতিহাসে জাতীয় ঐক্যের একটি বিরল নিদর্শন। কৈবর্তপতি ভীম এই দেশেরই লোক, তাঁহার বিরুদ্ধে এত বড় একটা চক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহারা,—তাঁহাদের বংশধরেরা লক্ষণসেনের বিপদের সময়ে, জাতীয় মহাবিপদের দিনে কোথায় ছিলেন? এই চতুর্দশ মহারথ একত্র হইয়া সমস্ত গৌড়মণ্ডল যেন এক ব্যক্তি এইরূপ ভাবে ভীমের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। এরূপ ঐক্য গৌড়দেশে বড় দেখা যায় নাই। এই অপূর্ণ ঐক্যের একটি কারণ আমার মনে হইতেছে, কৈবর্ত-রাজা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমস্ত জাতির উপর শাসনদণ্ড চালাইবেন—ইহা জাত্যাভিমানের দুর্গবরূপ গৌড়দেশে দ্রুতঃসহ ও অসহ্য হইয়াছিল। এই সামন্ত-চক্র বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার প্রায় অধিকাংশ স্থান লইয়া সংগঠিত হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতেই নব ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের হাওয়া পূর্ব-ভারতে পৌছিয়া কৈবর্তাদিকারটা জাতীয় সম্মানজ্ঞানকে অভিঘাত করিয়াছিল। পালেরা যে জাতীয়ই হউন, তাহারা সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া লোকের শ্রদ্ধা ও স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, পালেরা বৌদ্ধ হইলেও ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ ভক্তি করিতেন।

যাহা হউক, তথাপি রামপাল যে এত বড় একটা কাণ্ড করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্যের বিষয়। এই সামন্ত-চক্র লইয়া রামপালদেব প্রবল নৌবাহিনীর সহিত অগ্রসর হইয়া নৌ-সেতু নির্মাণ পূর্বক ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণপশ্চিমে কোন স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। কৈবর্তরাজ "মরি কিংবা মারি" সঙ্কল্প করিয়া রণক্ষেত্রে 'মরিয়া' হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হস্তিপৃষ্ঠে আরুঢ় কৈবর্তরাজ ভীম—রামপালের সেনাপতি বিত্তপালের হস্তে বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজার এই বিপদের সংবাদ শুনিয়াও কৈবর্তসেনা একেবারে আশা ত্যাগ করে নাই। তাহারা

আবার একত্র হইয়া হরি নামক সেনা-নায়েকের নেতৃত্বে রামপালের গতিরোধ করিতে দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু এবার চান্দা কৈবর্ত (মাহিষ) জাতির গৌরব পশ্চিমে বিলম্বিত হইয়া যুদ্ধের জায় স্থায়ী হইয়াছিল। হরিও রামপালের পুত্র রাজ্যপালের হস্তে বন্দী হইলেন। কৈবর্তপতি ভীম তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতির সহিত একই শানিত রণকুঠার-দ্বারা নিহত হইলেন। কৈবর্তেরা তিন পুরুষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকার গোড়মণ্ডলের বহুদূরব্যাপক হইয়াছিল। ভাগ্যদোষে তাঁহাদের রাজত্ব “কৈবর্তবিদ্রোহ” নামের কলঙ্ক ললাটে ধারণ করিয়া লাহিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মহীপালের নিষ্ঠুরতা ও উগ্রশাসনেই যে এই বিদ্রোহীদের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাতে কোন সংশয় নাই। ভীমরাজকে নিহত করিয়া রামপাল তাঁহার রাজধানী ডমর-নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ লেখক সঙ্ঘাকর নন্দী কৈবর্তরাজত্বের প্রতি এতটা বিধিষ্ট ছিলেন যে তাঁহাদের রাজধানীকে তিনি ‘উপপুর’ নামে অভিহিত করিয়াছেন। যদি ভীম জয়ী হইতেন, তবে রামপালের কার্যটাই “বিদ্রোহ” নামে অভিহিত হইত; জয়ের গৌরব ও পরাজয়ের কলঙ্ক রাষ্ট্র-ইতিহাসে চিরপরিচিত। কৈবর্ত-গণের ক্ষোভের কারণ নাই। কৈবর্তরাজ ভীমের খুল্ল-পিতামহ দিব্বোক দ্বিতীয় মহীপালকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া বিজয়োল্লাসে যে স্তম্ভ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা এখনও রাজসাহী জেলায় এক দীঘির উপরে মস্তক উত্তোলন করিয়া বিগ্ৰহমান। উত্তরবঙ্গের বহুস্থানে যে বিশাল মৃৎপ্রাকারের অবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়, এবং যাহা “ভীমের জাদাল” নামে প্রসিদ্ধ তাহা ভীম-কৈবর্ত রামপালের সামন্ত-চক্রের গতিরোধ করিতে নির্মাণ করিয়াছিলেন।

রামপাল দয়ালু ও মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। ভীমকে বন্দী করিয়া তিনি প্রথমতঃ তাঁহাকে পদোচিত মর্যাদা ও আতিথ্য দেখাইতে ক্রটি করেন নাই। কিন্তু যুদ্ধান্তে কৈবর্ত-সেনা পরাজয় স্বীকার করিয়াও সেনাপতি হরির নেতৃত্বে পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহ করাতে তিনি ভীম ও তদীয় সেনাপতির বধাজ্ঞা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সামন্ত রাজারা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, ইহাদের জীবিত থাকি তাঁহার সাম্রাজ্য-রক্ষার পক্ষে নিরাপদ নহে।

কৈবর্তযুদ্ধে ভীমরাজা কলিঙ্গ অধিপতির সাহায্য পাইয়াছিলেন। এই রাজার নাম কর্ণ,—“উৎকলেশ-কর্ণকেশরী”। ইনি সুপ্রসিদ্ধ কেশরীবংশের রাজা ছিলেন। রামপালের সামন্ত-চক্রের অত্যন্ত প্রধান বীর দণ্ডভুক্তির অধিপতি জয়সিংহ উৎকলে অভিযান করিয়া এই রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

শত্রুপক্ষের কবি সঙ্ঘাকর, যিনি কৈবর্তদিগের প্রতি অতি-বিধিষ্ট ছিলেন এবং ভীমকে রাবণের সঙ্গে উপমা দিয়া তাঁহার রাজধানীকে উপপুর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তিনিও ভীমের চরিত্রের কতকগুলি গুণের উল্লেখ না করিয়া পারেন নাই। ভীম স্বয়ং পণ্ডিত ছিলেন এবং পণ্ডিতগণের আদর জানিতেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্যশালী ছিলেন এবং যুক্তহস্তে দান করিতেন। এই সকল

ভীমের গুণাবলী।

গুণ বুঝাইতে তিনি নিম্নলিখিত বিশেষণগুলি ব্যবহার করিয়াছেন—“ভীম লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ের আবাস” তাঁহাকে পাইয়া “বিশ্ব অতিশয় সম্পৎ লাভ করিয়াছিলেন। সজ্জনগণ অযাচিত দান লাভ করিয়াছিলেন”, ইত্যাদি। এই কৈবর্ত রাজারা শুধু শারীরিক বলে দেশ অধিকার করেন নাই, ইহারা লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন।

ভীমকে জয় করিয়া রামপাল তাঁহার পূর্বপুরুষদের বাসভূমি বরেন্দ্ররাজ্যের অধিকার ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। ক্রমে সমস্ত গৌড়মণ্ডল তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল এবং পালবংশের ভাগ্যলক্ষ্মী পুনরায় এই বংশের প্রতি কতকটা স্মৃতিস্বরূপ হইয়াছিলেন।

রামপালের বিধিভঙ্গ।

রামপাল সমস্ত মিথিলাদেশ ও বর্তমান বেহার জেলার উত্তরাংশ চম্পারন এবং ষারবঙ্গ জেলাদ্বয় অধিকার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি কামরূপও জয় করিয়াছিলেন। যেহেতু আমরা দেখিতে পাই তাঁহার পুত্র কুমারপাল কামরূপের সিংহাসনে তাঁহার এক অমাত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

শেক-শুভোদয়া পুস্তকে তাঁহার সম্বন্ধে একটি গল্প আছে; এই গল্পটি আমাদের কাছে একেবারে অলৌক বলিয়া মনে হয় না, তবে “হলায়ুধ-কৃত” শেক শুভোদয়ার অনেক গল্প ও উপগল্প আছে, এজন্ত খুব জোর করিয়া এই গল্পটির সত্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু এইরূপ একটি গল্প সৃষ্টি করিবার কোন কারণ নাই। রামপাল যে নিজে পারিবারিক শোকে নদীর জলে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। মাতুল মধনদেবের মৃত্যুতে তিনি এতটা শোক পাইয়াছিলেন যে, তজ্জন্তই তিনি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন—সন্ধ্যাকর নন্দী এইরূপ কথা লিখিয়াছেন।

শেক-শুভোদয়ায় লিখিত আছে যে রামপালের পুত্র কোন বণিক-বধূকে ধর্ষণ করেন। সেই রমণী রাজ-দরবারে অভিযোগ করে। রামপাল স্বীয় তরুণ বয়স্ক পুত্রকে শূলে দেওয়ার দণ্ড প্রদান করেন। এই ঘটনাটি শ্রীযুক্ত হর্গাচরণ সান্যাল মহাশয়

যক্ষপালের মৃত্যুদণ্ড।

আরও একটু বিস্তারিত করিয়া তৎসম্বন্ধে রাজসাহী অঞ্চলে প্রচলিত জনপ্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, রামপালদেবের যে পুত্র এইরূপ দুষ্টব্যবহার করেন, তাঁহার নাম যক্ষপাল। ধর্মিতা-রমণী আলুলারিত-কুন্তলে রাজ-দরবারে উপস্থিত হইয়া রামপালের সম্মুখে সমস্ত ঘটনা বলিয়া তাঁহার কলঙ্কিত জীবনের আর কোন মূল্য নাই—এইরূপ জানাইয়া বিষ পান করিয়া সেইখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই ঘটনার রামপাল ভুলিয়া গেলেন যে তিনি যক্ষপালের পিতা, ভুলিয়া গেলেন যে কুমারের বিবাহিতা স্ত্রী ও যেহা-তুরা জননীর পক্ষে রাজকুমারের প্রতি উচিত দণ্ড দিলে তাহা অসহ্য হইবে। তিনি তাঁহাকে শূলে দেওয়ার দণ্ড দান করিলেন। তাঁহার মাতা সাক্ষ্যদেয় পুত্রের জীবনভিক্ষা করিলেন, কিন্তু জাঘের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা কিছুতেই তাঁহার কর্তব্যবিচ্যুত হইলেন না। কুমার যক্ষপালকে শূলে দেওয়া হইল এবং সেই শোকে রাজমহিষী ও রাজবধূ আত্মহত্যা করিলেন। রামপাল স্বয়ং এই শোক সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনিও নদীগর্ভে তাঁহার জীবন বিসর্জন করিলেন। শেক-শুভোদয়া-কার লিখিয়াছেন, রামপালের এই কাণ্ডের জ্ঞাননিষ্ঠায়

সমস্ত প্রজা এরূপ কৃতজ্ঞ ও ভক্তিমান হইয়াছিল, যে অজ্ঞাবধি রাজ্যের লোকেরা পুণ্যলোক নৃপতির এই বিশ্বয়কর ত্যাগের কথা গান করিয়া থাকে। (“অজ্ঞাপি তেবাং বশো গীয়তে লোকৈঃ, রামপালো রাজা একমেব পুত্রং অপরাধিনমনপরাধিনং বা শূলেন যোজয়ামাস”—শেক-ভূভোদয়া। তিব্বতের ঐতিহাসিক লামা তারানাথও লিখিয়াছেন যে, রামপালের যক্ষপাল নামে এক পুত্র ছিল। এই গল্পের বিশ্লেষণ করিতে গেলে হয়ত অনেক ঐতিহাসিক খুঁত বাহির হইতে পারে, কিন্তু মোটামুটি অসত্য বলিয়া মনে হয় না। এত বড় একটা ঘটনা লইয়া যে পল্লীগীতি রচনা হইয়াছিল, তাহা ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব মনে করি না।

রামপাল গৌড়রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রমাবতী নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। রমাবতী আবুলফজলের আইন আকবরীতে রমোতি নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ‘রমোতি’ বা “রমতি” নগরের নাম প্রাচীন বাঙ্গলা ধর্মমঙ্গলগুলিতে অনেক রমোতি।

স্থলে পাওয়া যায়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রমাবতী-নগরী গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যে অবস্থিত ছিল। রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের তাম্রশাসনেও রমাবতী নগরী রাজধানীরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। রামপাল এই নগরে “জগদল মহাবিহারের” প্রতিষ্ঠা করেন।

রামপালের মৃত্যুর পূর্বেই জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যপালের মৃত্যু হইয়াছিল, সুতরাং দ্বিতীয় পুত্র কুমারপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। বৈষ্ণবদেবের তাম্রশাসনে ইহার যে সকল গুণের উল্লেখ আছে তাহা পড়িলে মনে হয় কোন দুর্ভাগ্য মহাকাব্য পাঠ করিতেছি। ইনি সমুদ্রের সঙ্গে সর্স্ববিষয়ে উপমিত হইয়াছেন, কি কি বিষয়ে উপমিত হইয়াছেন,—তাহার তালিকা দিলে এই পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা পূর্ণ হইবে। প্রশস্তিকার এইভাবে উপমার বাহু সাজাইয়া শেষ ছত্রে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, “না, হইল না,”—একটি বিষয়ের অভাবে সমুদ্রের সহিত কুমারপালের তুলনা চলে না—সুতরাং তাঁহাকে সমুদ্রের সহিত উপমা দেওয়া উচিত নহে। সমুদ্র রামের সেতুর দ্বারা লজ্জিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কুমারপালকে কেহ লজ্বন করিতে পারে নাই, অর্থাৎ তিনি কোন শত্রুকর্তৃক পরাজিত হন নাই। একথা ঠিক কিনা তাহা বিচার্য। রামপালের পর পালরাজগণের খর পড়ন্ত, তখন কি তিনি নিরবচ্ছিন্ন জয়লাভ করিয়া খুব শান্তিতে ছিলেন? এই সকল তাম্রপটের পাণ্ডিত্য আমাদিগকে “গৌড়ীয়-রীতি” কি পদার্থ তাহা বারংবার স্মরণ করাইয়া দেয়।

একথা ঠিক যে যখন কামরূপের রাজা বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, কুমারপাল তাঁহার অন্তরঙ্গ বৃহৎ ও অমাত্য বৈষ্ণবদেবকে বিদ্রোহ-নিবারণের জন্ত প্রেরণ করেন। বৈষ্ণবদেব

আমত বিক্রমে কামরূপের রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবদেবকৃত আদাম-স্তম্ভ।

কুমারপাল এই সংবাদে অত্যন্ত হুট হইয়া বৈষ্ণবদেবকে কামরূপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। কৈবর্ত-বিদ্রোহের সময়েও কুমারপাল সেনানায়ক হইয়া স্বীয় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

কুমারপালের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মদনপাল সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। মদনপাল রামপালের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র, ইনি রাজ্ঞী মদনদেবীর গর্ভজাত। মদনপালের বাড়ীর নাম ছিল “চিত্রমতিকা”। ইনি ব্যাসদেবের সমগ্র মহাভারতের পাঠ শুনিয়া-

মদনপাল।

ছিলেন এবং পাঠক বটেখর স্বামী শর্দ্বাকে একটি গ্রাম পুরস্কার-স্বরূপ প্রদান করেন। মদনপাল রাজা হইবার আটবৎসর পরে এই দান সম্পাদিত হইয়াছিল। মদনপাল সম্ভবতঃ এই সময়েই সেনবংশের আদিরাজগণের কাহারও দ্বারা মগধ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। তিনি কান্তকূজের রাজার সাহায্য পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরে

তৃতীয় গোপাল ও ইন্দ্রহাম-
পাল।

তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র তৃতীয় গোপাল, নামে মাত্র রাজা হইয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই পালবংশের রাজত্বের উপর শেষ যবনিকাপাত হয়। যে বংশ প্রায় পাঁচ শত বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন এবং ঐহাদের রাজত্বকালে বাঙ্গলা দেশ শৌর্য, বীর্য, শিল্প-কলা, স্থাপত্য, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই অমরকীর্তি ও সম্পদ-ভূষিত হইয়াছিল, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেই বংশের শেষ দীপ নিবিয়া গেল। তৃতীয় গোপালের পর পালবংশের বংশধর আর ছই এক জনের নাম জনশ্রুতিতে পাওয়া যায়। ভিন্সেন্ট গ্রিথ লিখিয়াছেন—“এই বংশের গোবিন্দপাল নামক এক রাজা ১১৭৫ খৃঃ অব্দে বিজয়মান ছিলেন। পালেরা বঙ্গের গৌরব অশেষরূপে বাড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাদের একজন কানোজাদিপত্যকে পরাভূত করিয়া স্বীয় সামন্তকে সেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, অপর এক জন প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজবংশ উচ্ছেদ করিয়া স্বীয় আশ্রিত বন্ধুকে তথাকার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ঐহারা ইঙ্গিতে এই ভাবে নূতন রাজবংশ সৃষ্টি করিতে পারিতেন, তাঁহাদের প্রতাপ যে ভারতবর্ষে সর্বত্র স্বীকৃত ছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ইহারাই বিক্রমশিলা, ওদন্তপুর (উদুপু) এবং জগদল বিহারের স্থাপয়িতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

মুসলমানবিজয়ের সময়ে ইন্দ্রহাম পাল নামক এই বংশের এক রাজা মগধের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। মুঙ্গের জেলায় ইন্দ্রহামের কতকগুলি ভয় ভূর্গের অবশেষ এখনও লোকে দেখাইয়া থাকে। লামা তারানাথ পাল রাজগণের তারানাথের তালিকা।

যে তালিকা দিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তাম্রশাসন ও শিলালিপি-লিখিত রাজগণের মিল নাই। কিন্তু তারানাথ এবং বৃন্দাবন দাস যে সকল পালরাজার উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন তাম্র বা তন্তুলিপি না পাওয়া গেলেও তাঁহাদের অস্তিত্বে সন্দেহ নাই হইবার কোন কারণ নাই। হয়ত কোন রাজা তাম্রশাসন প্রচার করেন নাই। বহুসংখ্যক শিলালিপি যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। অনেকই লুপ্ত হইয়াছে, অল্পমাত্র আছে। এই বিশাল পালবংশের শাখাপ্রশাখায় ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু নৃপতি ছিলেন; একথা সত্য যে জনপ্রবাদের প্রমাণ সাবধানতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু তাহা সরাসরি অগ্রাহ্য করা যায় না। তারানাথের তালিকা পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

১। গোপাল—৬৬০—৭০৫ খৃঃ	১০। শ্রেষ্ঠপাল—৯৫২—৯৫৫ খৃঃ
২। দেবপাল—৭০৫—৭৫৩ খৃঃ	১১। শমক—৯৫৫—৯৮৩ খৃঃ
৩। বসুপাল—৭৫৩—৭৬৫ খৃঃ	১২। ভায়াপাল—৯৮৩—১০১৫ খৃঃ
৪। ধর্মপাল—৭৬৫—৮২৯ খৃঃ	১৩। জায়পাল—১০১৫—১০৫০ খৃঃ
৫। মধুরক্ষিত—৮২৯—৮৩৭ খৃঃ	১৪। তাম্রপাল—১০৫০—১০৬৩ খৃঃ
৬। বাণপাল—৮৩৭—৮৪৭ খৃঃ	১৫। হস্তিপাল—১০৬৩—১০৭৮ খৃঃ
৭। মহীপাল—৮৪৭—৮৯৯ খৃঃ	১৬। শান্তিপাল—১০৭৮—১০৯২ খৃঃ
৮। মহাপাল—৮৯৯—৯৪০ খৃঃ	১৭। রামপাল—১০৯২—১১৩৮ খৃঃ
৯। সাহুপাল—৯৪০—৯৫২ খৃঃ	১৮। দক্ষপাল—১১৩৮—১১৩৯ খৃঃ

কোন কোন স্থানে রাজগণের একাধিক নাম ছিল। জনসাধারণ তাঁহাদিগকে একরূপ নামে চিনিত, কিন্তু তাম্রশাসন ও রাজকীয় দলিলে তাঁহাদের নাম অত্বিধ হইত। আবার কোথাও রাজার নানা পুত্রেরা ভিন্ন ভিন্ন অংশে রাজ্য শাসন করিতেন, তাম্রশাসনে শুধু এক শাখার বংশাবলী উল্লিখিত হইত, অন্যান্য ধারার কোন উল্লেখ দেখা যাইত না। এই সকল নানা কারণে বংশাবলীর এই রূপ অনৈক্য ঘটিয়া থাকিবে। পালবংশের মূলশাখার বহু উপশাখাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীও পূর্বাগত সংস্কার ও লোক-সৌজন্তবশতঃ রাজা নামে পরিচিত ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকেও তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকিবে। বৌদ্ধ শতাব্দীতে বৃন্দাবন দাসোক্ত ভোগীপাল ও বোগীপাল সম্বন্ধে পল্লীগীত প্রচলিত ছিল, লেখক মহীপালের সঙ্গে ইহাদের নামোক্ত করিয়াছেন, তারিখসম্বন্ধে তারানাতের ভুলগুলি স্পষ্ট। ইহা ছাড়া ঢাকা জেলার ভাওয়ালের জঙ্গলে যে প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ "শিশুপালের বাড়ী" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে এবং জনসাধারণ বাহাকে মহাভারতোক্ত চেদিরাজের প্রাসাদ বলিয়া নির্দেশ করিয়া আসিতেছে, তিনিও খুব সম্ভব পালবংশের কেহ হইবেন। অনেক স্থলেই সামান্ত সামান্ত ভূখণ্ডের অধিপতি রাজপুত্রেরাও রাজতালিকায় হয়ত স্থান পাইয়াছেন। কথিত আছে, পালবংশে ৫২জন রাজা ছিলেন।

দশম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পালরাজত্বের নানাকথা, বাঙ্গলার অপরাপর রাজবংশ

“এ পয়ঃ-পারে, কত কত জাতীয় ভাঙিল কত শত রাজ্য ও ।
আসিল স্থাপিল, শাসিল রাজ্য, রচি ঘর কত পরিপাটী ও ॥
কত শত দুর্জয় দুর্গম দুর্গে, বেড়িল তব তটদেশ ও ।
নগরে প্রাচীরে, ঘেরিল শেবে চির-যুগ-সন্তোষ আশে ও ॥
উপহসি সর্কে মানব-গর্কে, কাল প্রবল চিরকালে ও ।
গৃহ গড় পুঞ্জ, কতিপয় তুঞ্জ রাখিল করি বিকলাকৃতি ও ॥
ঐ পুরোভাগে, ভগ্ন বিভাগে, গৃহবর শেষ শরীরে ও ।
দেখিছি যে সব উজ্জল লেখা, সে গত-বৌবন-রেখা ও ॥”

—গোবিন্দচন্দ্র রায়

পাল রাজাদের অধিকারকালে বঙ্গদেশ যে সকল প্রাদেশিক ও বিদেশী ক্ষুদ্র ও বড় রাজাদের সংগ্রবে আসিয়াছিল, আমরা সংক্ষেপে তাঁহাদের সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিব ।

১। বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশ । ইহাদের পূর্বপুরুষ পূর্ণচন্দ্র আধুনিক রোটার্শ-নগরের রাজা ছিলেন । তৎপরেবর্তী রাজা স্বর্ণচন্দ্র বিক্রমপুর অঞ্চলের রাজা হন । স্বর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র পূর্ববঙ্গের অনেকস্থলের অধিপতি হইয়াছিলেন । ইহার পুত্র শ্রীচন্দ্র তৎপরে সিংহাসন অধিকার করেন । সম্ভবতঃ মাণিকচন্দ্র শ্রীচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন ।

শ্রীচন্দ্র সিংহাসন অধিকার করিলে ইনি পৈত্রিক অধিকারস্থজে বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশ ।

বিক্রমপুরের কতকাংশের মালিক হইয়া গোড়ের এক বিস্তৃত জমিদারী মিরান স্বরূপ গ্রহণ করেন । এই সময়ে তিনি মিহিরকুলের (ত্রিপুরা) রাজা তিলকচন্দ্রের কস্তা ময়নামতীর পাণিগ্রহণ করিয়া ত্রিপুরদেশের এক বিস্তৃত অংশের অধিকারী হন । তাঁহার রাজধানী ছিল পাটিকায়,—আধুনিক পাটিকারাতে । এখনও তথায় মাণিকচন্দ্রের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় । তন্মধ্যে ৪ ইঞ্চি পরিমিত একখানি উমামহেশ্বরের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, উহা এখন আমার নিকট আছে । মাণিকচন্দ্রের পত্নী ময়নামতী পরমসুন্দরী ও গুণবতী ছিলেন । কথিত আছে রাজা প্রৌঢ় বয়সে অপর কয়েকজন রাজকুমারীকে বিবাহ করেন, তন্মধ্যে একজন সুন্দরী ও তরুণী ছিলেন । সেই নব বিবাহিতা বোড়শীর রূপে মুগ্ধ হইয়া

তিনি ময়নামতীকে তাড়াইয়া দেন, যেহেতু পাটরাণীর সঙ্গে এই নূতন জীর সর্কদা ঝগড়া হইত। ময়নামতী অতি অল্প বয়সে ভারতবিখ্যাতকীর্তি মহাযোগী গোরক্ষনাথের শিষ্য হন। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে ১৯ বৎসর বয়সে রাজকুমারের রিষ্ট ছিল এবং যদি দ্বাদশ বর্ষ তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া দেশত্যাগী হন, তবেই এই রিষ্ট কাটিয়া যাইতে পারে—দৈবজ্ঞগণ গণিয়া এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। রাজার মৃত্যুর পর রাজ্যই ছিলেন দেশের শাসনকর্তা, কিন্তু যখন কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখনই রাজ্যের আদেশে তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিতে হয়, এই উপলক্ষে একদল লোক ময়নামতীর বিরুদ্ধে অনেক কুৎসা প্রচার করেন। তিনি এবং হাড়িসিদ্ধা উভয়েই গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন। হাড়িসিদ্ধার সঙ্গে সমস্ত রাজ্য উপভোগ করিবার ইচ্ছায় নাকি রাণী তাঁহার প্রাপ্তবয়স্ক একমাত্র পুত্রকে দ্বাদশবৎসরের জন্ত বনে পাঠাইয়াছিলেন। গোপীচন্দ্রের জী অতুনা তারত্বরে রাণীর এই অপবাদ ঘোষণা করিয়া শাস্ত্রীকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—পল্লীগীতিকায় এই সকল কথা দেশময় প্রচারিত হইয়াছিল।

এখন ঐতিহাসিকগণের অনেকে এই গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রকে রাজেন্দ্রচোলের শিলা-লিপির বঙ্গাধিপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার অল্পবয়সে সন্ন্যাসগ্রহণে দেশময় যে শোকের উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, তাহা লইয়া অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও বোম্বাই পর্য্যন্ত সমস্ত দেশগুলিই পল্লীগীতি রচনা করিয়াছিল। ত্রিপুর জেলা ও উড়িষ্যায় এখনও “বঙ্গের রাজা গোপীচন্দ্র” গানের ছড়া প্রাচীন লোকদের মুখে শোনা যায়। গোপীচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র নামের

গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দ-
চন্দ্রের সন্ন্যাস।

রূপান্তর, দুর্ভাগ্য মল্লিক কৃত পল্লীগাথায় তাহা উল্লিখিত আছে। তিনি পূর্ববঙ্গের অনেকটা জুড়িয়া রাজ্যশাসন করিতেন, ত্রিপুরমণ্ডলের পার্শ্বভ্যপ্রদেশের এক বিস্তৃত অংশ তিনি তাঁহার মাতামহ হইতে

প্রাপ্ত হন। গোড়ের কতকাংশ তিনি মিরাস লইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি নিতান্ত নগণ্য রাজা ছিলেন না। গোরক্ষনাথের শিষ্য হওয়ার দরুন তাঁহার এই ত্যাগ পিতৃসত্যপালনকারী নামের নির্দাসনের মতই দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল, যেহেতু গোরক্ষশিষ্য নাথ-সম্প্রদায় ভারতের নানাস্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই পল্লীগাথা সর্কত্বে গান করিয়া বেড়াইতেন। সেদিন পর্য্যন্তও বোম্বাই সহরে “বঙ্গাধিপ গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস” তত্ত্বত্ব রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত, এবং রাজা রবিবর্মা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের একটি চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন; ভারতবর্ষের সর্কত্বে ঘরে ঘরে বঙ্গাধিপের এই ত্যাগের মূর্ত্তি আদৃত হইয়াছে।

গোবিন্দচন্দ্র সাভারের হরিশ্চন্দ্রের দুই কন্যা অতুনা-পতুনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিদায়কালে অতুনার বিলাপ করণরসের নির্বরস্বরূপ। তদপেক্ষাও করণরসায়ক দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ অন্তে স্বামি-স্ত্রীর মিলনের দৃশ্য। দ্বাদশ বৎসর পর গোবিন্দচন্দ্র গৃহে ফিরিতেছেন; ১৯ বৎসরে সন্ন্যাস অবলম্বন, ৩১ বৎসরে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন। তাঁহার অপূর্ণ সুন্দর মূর্ত্তি ধূলিধূসর, শিরোময় দীর্ঘ জটাভূট, অনশনে অস্থিচর্শ্মসার;

তিনি প্রিয়দর্শন ও অপরূপশ্রীসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার সেই রূপ—সেই সৌন্দর্য আর নাই। তিনি রাজাস্ত্রপুরে প্রবেশ করিতে উদ্ভূত হইলে প্রহরীরা বাধা দিল, কিন্তু সন্ন্যাসীর উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইল না। রাজা অহুনা রাজহস্তিদ্বারা উহাকে হত্যা করিতে আদেশ করিলেন,—রাজহস্তী স্বীয় প্রভুকে চিনিতে পারিয়া হাঁটু গাড়িয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া পড়িল, তাহার দুইচক্ষু হইতে অজস্র অশ্রু ঝরিতে লাগিল। রাজা ভীমদর্শন রাজকীয় শিকারী কুকুর লেলিয়া দিলেন, ঘোর চীৎকার ও আত্মকানন করিয়া কুকুর যাইয়া সন্ন্যাসীর মুখ দেখা মাত্র তাঁহার পদলেহন করিতে লাগিল। তখন অশ্রুসিক্ত মুখে রাজা বলিলেন, “বনের পশুরাও তোমাকে চিনিতে পারিয়াছে, আমি তোমার সহধর্মিণী হইয়াও তোমাকে চিনিতে পারি নাই।” এই সকল কাব্যকথা পল্লীকথাকে সরস করিয়াছে, ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য কি জানি না।

এগুলি হয়ত সত্যই কাব্য-কথা ; কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস-গ্রহণ ঐতিহাসিক সত্য, ইহা নিঃসন্দেহে বলা বাইতে পারে।

রাজেন্দ্রচোলের সঙ্গে ইহার যুক্ত ঘটয়াছিল, পল্লীগাথায় তাহার ইঙ্গিত আছে। রঙ্গপুর অঞ্চল হইতে নীলফামারি সবডিভিসনের ম্যাজিষ্ট্রেট বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে গীতিকা সংগ্রহ

রাজেন্দ্রচোল—১০২৫ খৃঃ।

করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে—উড়িষ্যার দক্ষিণ দিক্ হইতে

এক রাজা বঙ্গে আসিয়া ইহার সঙ্গে যুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি

পরাজিত হইয়া তাঁহার কন্যা গোবিন্দচন্দ্রকে সম্প্রদান করিয়া সন্ধি করেন। এই দক্ষিণ-উড়িষ্যা হইতে আগত রাজাই সম্ভবতঃ রাজেন্দ্রচোল। তিব্বতমলয় শিলালিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে—গোবিন্দচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হাতীর পীঠে চড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিলেন, এই রাজা যে পরাস্ত হইয়াছিলেন কিংবা আদৌ কোন যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা পরিষ্কার করিয়া উল্লিখিত হয় নাই। যাহা হউক অতি অল্প দূর অগ্রসর হওয়ার পরেই রাজেন্দ্রচোলকে সন্ধি করিতে হইয়াছিল। সুতরাং দুই দিক্ হইতেই এই ঘটনাটি দুইভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রাজাদের স্তাবক কবিদের কথার কতকটা বাদ দিয়া গ্রহণ করিতে হয়। রাখালদাসবাবু লিখিয়াছেন, “শ্রীচন্দ্রের বংশধরগণ পরে পালরাজগণের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং গোবিন্দচন্দ্র নামক একজন পরবর্তী রাজা রাজেন্দ্রচোল কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এই গোবিন্দচন্দ্র প্রথম মহীপালদেবের সমসাময়িক।” রাখালদাসবাবু তাম্রশাসন ও শিলালিপির কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করিতেন, তদ্বিরুদ্ধে যদি সুদীর্ঘকালের কোন জন-প্রবাদ বা গাথা থাকে, তাহার উল্লেখ করাটাও ঐতিহাসিক অঙ্গহানি বলিয়া মনে করিতেন। ইহাও এক প্রকার দৃষ্টিকোণ ব্যাধি। চোলরাজ রাজেন্দ্রের তিব্বতমলয়ের শিলালিপিতে লিখিত আছে—“তিনি কর্ণভূষণ, চন্দ্রপাছকা এবং বলয়বিভূষিত মহীপালকে ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া তাঁহার অদ্বুত বলসম্পন্ন হস্তিসমূহ এবং রত্নোপম রমণীগণকে হস্তগত করিয়াছিলেন, এবং বাঙ্গলাদেশে যেখানে ঋতুভ্রষ্টের কখনও বিরাম নাই সেখানে গজপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন।”

ত্রিপুরার ইতিহাসে আমরা কোন কোন স্থানে ছই পক্ষের স্তাবক-কবিকৃত ঘটনার ছইরূপ বিবরণ পাইয়াছি। শ্রীকরণ নন্দী-কৃত ছুটি খাঁর বিজয়-কাহিনী ও রাজমালার ধন্ত মাণিক্যের রাজত্বের বিবরণ দ্রষ্টব্য। রাজেন্দ্রচোলের অপর নাম ছিল “পরকেশরী বন্দী” এবং পূর্বোক্ত শিলালিপি তাঁহার রাজত্বের ত্রয়োদশ অব্দে (১০২৫ খৃঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

ময়নামতীর গানে ও গোরক্ষবিজয়ে যে সকল প্রসিদ্ধ নাথ-যোগীদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাঁহাদের অনেকেই ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে ১৩২৮ বাং সনের পৌষমাসের ‘ইতিহাস ও আলোচনা’ পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী, এম. এ. মহাশয় যে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন :—

(১) শালবান্ রাজার পুত্র “গাভুর সিদ্ধাই” ত্রিপুরার লালমাই পাহাড়বাসী ছিলেন। কুমিল্লা হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে ‘শালবানপু’ গ্রাম ও তথায় “শালবানের দীঘি” এখনও বিদ্যমান। ঐ গ্রামে শালবানের প্রাচীর-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই বাসভবন শালবান্ ও হাড়িপা সিদ্ধার বাড়ী বলিয়া জনশ্রুতি আছে। যে চৌরঙ্গী এখন জগদ্বিখ্যাত, তাহা বাহার নাম বহন করিতেছে, সেই নাথ-যোগী চৌরঙ্গীও এই শালবানপুরে বাস করিতেন, তাহা একখানি প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায়। “ব্রহ্ম-যোগী” নামক পুঁথিতে ৮৪ সিদ্ধার অন্ততম প্রধান সিদ্ধা চৌরঙ্গীনাথ যে শালবান্ নগরে যাতায়াত করিতেন, তাহা লিখিত আছে, “জেন মতে চৌরঙ্গী গেল শালবান নগরে।” গাভুর সিদ্ধা যে শালবানের পুত্র তাহা গোরক্ষবিজয়েই পাওয়া যায়, “তথাপিহ হই আমি শালবানের বেটা” (২১ পৃষ্ঠা)।

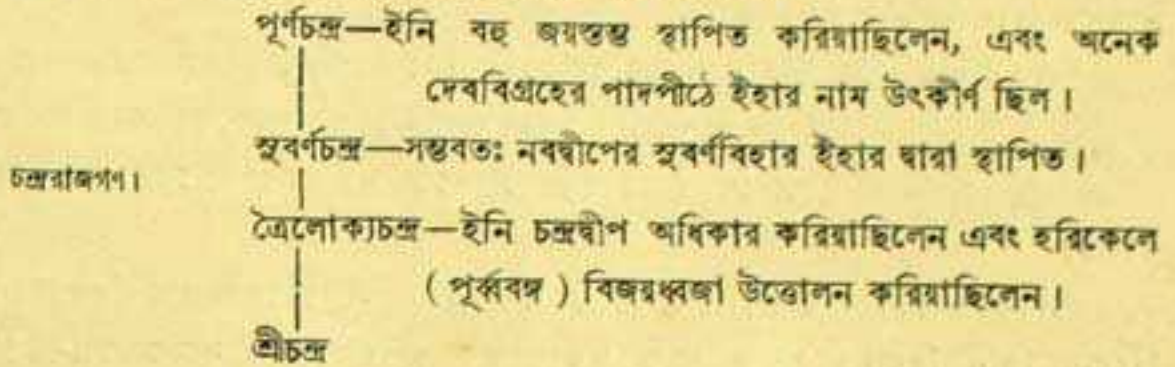
(২) ময়নামতীর সম্বন্ধে ত্রিপুরার পর্কতে নানা প্রবাদ আছে—একটি পাহাড়ের নামই “ময়নামতীর পাহাড়”। ময়নামতীর শৃঙ্গে একটি শ্রুঙ্গ আছে, জনশ্রুতি ঐ শ্রুঙ্গ দিয়া ময়নামতী ও হাড়িসিদ্ধা অদৃশ্য হইয়া যান, ঐ শ্রুঙ্গের পার্শ্বে ত্রিপুরেশ্বরের একটি সুরমা “বান্ধালা” আছে। সম্প্রতি শ্রুঙ্গটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৩) মীননাথ যে “কদলীর দেশে” (“উত্তরে মিনাই”) উত্তর দিকে গিয়াছিলেন, মীনচেতনে ও গোরক্ষবিজয়ে সেই স্থান সম্বন্ধে ‘সিদ্ধাই’ শব্দটি দৃষ্ট হয়। ত্রিপুরার উত্তরে শ্রীহট্টের নিকট ‘সিদ্ধাই’ গ্রাম এখনও আছে এবং তথায় যোগিশুদ্ধির সম্বন্ধে প্রবাদ আছে; গোরক্ষবিজয়ে এই প্রসঙ্গে যে ‘মেখলী কাঁধার’ উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা মনিপুরীরা এখনও প্রস্তুত করিয়া থাকে।

আমি মাণিকচন্দ্র রাজার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত একটি ক্ষুদ্র উমা-মহেশ্বরের প্রস্তরমূর্তির কথা লিখিয়াছি। এই মূর্তি শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয় আমাকে দিয়াছেন, আমার মনে হয় বাংলাদেশের সর্বত্র যে উমা-মহেশ্বরের মূর্তি পাওয়া বাইতেছে, তাহার আদি-ইতিহাস নাথযোগীদের সঙ্গে জড়িত।

শীতলবাবুর সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হইলে আমাদের কাছে স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতবর্ষের একটা প্রধান ধর্ম-সম্প্রদায় নাথ-ধর্মাবলম্বিগণের অন্ততম প্রধান কেন্দ্র ছিল—ত্রিপুরা জেলা ও ত্রিহট্টের উপাত্ত দেশ।

চন্দ্র রাজাদের যে বংশলতা পাওয়া বাইতেছে, তাহা এইরূপ :—



শ্রীচন্দ্রের দুইখানি তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একখানি অসম্পূর্ণ। কেহ কেহ অনুমান করেন—বংশাবলী উৎকীর্ণ হওয়ার পর কোন দুর্ঘটনাবশতঃ হয়ত তাম্রশাসন তদবস্থায় রহিয়া গিয়াছে, বাকীটুকু পূর্ণ করিবার সুবিধা হয় নাই। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় অনুমান করেন, রাজভাণ্ডারে বংশাবলীর অংশ অনেক তাম্রপটেই উৎকীর্ণ হইয়া প্রস্তুত থাকিত, কাহাকেও দানপত্র দেওয়ার সময়ে বাকী অংশ উৎকীর্ণ হইত, এই তাম্রলেখটি ঐরূপ একখানি। তাম্রলিপির অক্ষর দশম শতাব্দীর শেষ ও একাদশ শতাব্দীর প্রথমের বলিয়া অনুমিত হয়।

ঢাকা জেলার সাভার হইতে যে শিলালিপির প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে এবং বাহার পাঠ ‘ঢাকা রিভিউ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে আমরা অপর এক রাজবংশের নাম ও বিবরণ পাইতেছি। ঢাকার আট মাইল উত্তরে সাভার গ্রামে একটা বড় জঙ্গলে ধলেশ্বরী নদীর তীরে রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জঙ্গল হইতে বহু বুদ্ধমूर्তি এবং নানারূপ কারুকার্যসম্বলিত ইষ্টক ও প্রস্তরাদি পাওয়া গিয়াছে। সাভারের একটা মঠের নিম্নে যে শিলালিপি ফোঁদিত ছিল তাহার মূল সংস্কৃত, ঢাকা রিভিউ, ১৯২০-২১ সনের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং তাহার প্রতিলিপি পাদটীকায় দেওয়া হইল। পরপৃষ্ঠায় অনুবাদটি মুদ্রিত হইল। *

নমঃ স্মরণায়

যে আতো বীরবর মহিতাদিনু বংশৌবদেশাৎ
বীমস্তো বীরবরঃসুকুটাং ভীমসেনানুপেন্দ্রাৎ।
সোদধো বৈদিশবল গেষতাদিহিরাঙ্কঃ সগেহাৎ
আগতিয়াত্রিবন মলিতে ভাবলীনে প্রবেশে। (১)।
বংশাবলী ব্রহ্মাবৃত্ত অষ্টিঃ
দক্ষেপ গাঙ্গং স চ ভাবলীনং।

“নমঃ স্তুতায়

(১) গ্রহরাজ চন্দ্রবংশজাত, বীরশ্রেষ্ঠ রাজা ভীমসেন, যিনি অটুট ধৈর্য্য ও সংযমের প্রতীক ছিলেন, তাঁহার পুত্র ধীমন্ত সেন দশবল (বুদ্ধ) দেবের উপাসক ছিলেন, এজন্য ভ্রাতৃবর্গের সহিত ইহার মনোমালিঙ্গ হওয়াতে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া পর্বত ও অরণ্যপূর্ণ ভাবলীন দেশে উপনীত হন।

“এই ধীমন্ত সেন তাঁহার অধীন যোদ্ধাবর্গ ও সেনাপতিদের সাহায্যে গঙ্গার দক্ষিণ দিকে বংশবাটী (অধুনা বংশাই) ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী ভাবলীন প্রদেশে দুর্জয় কিরাতদিগকে জয় করিয়া সেই দেশ অধিকার করেন।

“ধীমন্ত সেনের পুত্র রণধীর সেন দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের ছায় বিজয়ী মহাবীর ছিলেন, তিনি হিমালয় পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ জয় করিয়া সম্ভার নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।

ধীমন্তসেনঃ সহসৈন্তযোধৈ-

রাজ্যমতি শ্রা প্রবলাং কিরাতাং । (২) ।

ধীমন্তপুত্রো রণধীরসেনঃ

সংগ্রামজ্ঞেতা ইব কার্তিকেয়ঃ ।

হিমালয়ব্যাগ্ধ বেশান্বিজিত্য

সংরপুর্য়ামবসং প্রবীরঃ । (৩) ।

হরিশ্চলো মহারাজঃ রণধীরস্ত পুত্রকঃ

ধর্ম্মেশ ইব ধর্ম্মায়া ধনাঢ্যঃ কুবেরাধিকঃ । (৪) ।

নৃপেন্দ্রবংশমার্ত্ত্ত্ত হরিশ্চল ইবাতবং ।

প্রশান্তিলোকান সর্কান্ সঃ অধবা ইব প্রাঘবঃ । (৫) ।

যমলাত্রাসিনী তীরে বৌদ্ধাকমঠমন্দিরে

বিজনে চ স রাজধি ধর্ম্মার্থং শ্রাবতিষ্ঠতে । (৬)

ভিক্ষককুলে চেতনিনঃ শশাঙ্কঃ

সমুচ্ছলঃ কিঞ্চিৎ পূর্ণচন্দ্রঃ ।

রাজধিগা কণ্টক-শাখিশৈলা

হৃদাসিতা বৈ মলয়াদ্রি জেন । (৭) ।

হরিশ্চলস্ত পুত্রো মহেন্দ্রো মীনাক্সারিষিতো দত্তঃ কর্ণাং বৈ মহেশ্বরঃ

প্রণমা স্তুতং দেব রচিতা শাসনী মজ্জ কবীন্দ্র শিবদেবেন ভিষগুন্মাবধনুনা ।

শকাব্দঃ—(অস্পষ্ট) *

* মিঃ স্টোপলটন ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় দ্বয় আমাদের এই প্রশস্তির যে প্রতিলিপি পাঠাইয়াছেন আমি তাহাই প্রকাশ করিলাম। ইহাতে অনেক ভুল ও পাঠোচ্ছাদের গোলমাল আছে।

“রণধীর সেনের পুত্র মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সাক্ষাৎ ধর্মরাজের ভ্রাতৃহই ধর্মদ্বা ও কুবেরের ভ্রাতৃ ঐশ্বর্যশালী ছিলেন।

“তিনি ভারপধাবলম্বী হইয়া প্রজাদিগকে শাসন করিতেন এবং স্বর্ঘ্যবংশ-প্রদীপ হরিশ্চন্দ্রের মতই প্রতাপশালী ছিলেন।

“স্বভাবতঃ চন্দ্র কলঙ্ক বহন করে কিন্তু ইনি ভিবক্কুলের নিকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র। এই রাজর্ষি যমুনার (যমলত্রাসিনী ?) তীরে নির্জন বৌদ্ধমূর্তিশোভিত মঠ-মন্দিরে বাস করিতেন।

“হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রাজর্ষি মহেন্দ্র,—যিনি এই কণ্টকাকীর্ণ পার্শ্বত্যা জঙ্গল চন্দনতরু নিবেদিত করিয়াছিলেন,—তিনি এই মঠ মীনাঙ্কাদ্রিস্থিত শাকে শিবের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

“ভিবক্কু মাধবের পুত্র কবীন্দ্র শিবদাস স্বগতকে প্রণামপূর্বক এই শ্লোকমালা রচনা করিলেন। শকাব্দা (অম্পষ্ট)।”

এখন “মীনাঙ্কাদ্রি”র অর্থ :—মীন=১২, অঙ্ক=২, অত্রি=৭, =১২২৭ শক (“সপ্ত-কুলাচল”)=১৩৭৫ খৃঃ অব্দ। সর্বদাই যে অঙ্ক বাম দিক্ হইতে পড়িতে হইবে, এমন নয়। অঙ্কের সোজাসুজি পাঠ আমরা অনেক স্থানে পাইয়াছি, যথা ভারতচন্দ্রের সত্যনারায়ণের পাচালীতে “সনে রুদ্র চৌতিশা” (রুদ্র ১১+৩৪=১১৩৪ বাং সন), খেলারামের ধর্মমঞ্জলে —“ভুবনশকে বায়ুমাসে শরের বাহন, খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন” (১৪ ভুবন ৪২ বায়ু=১৪৪২ শক, শরের বাহন মাস ধনু অর্থাৎ পৌষ মাস), জয়নারায়ণকৃত কালীখণ্ডে “মিত্র শতচৌদ্দ শক”=১৪১৪ শক, গোপালভট্ট-প্রণীত বল্লাল-চরিতে “অন্ধরাজজ্ঞ মানে বহুভির্বাহণরধিকশাকেযু”=১০১৩ শক, আনন্দভট্টের বল্লাল-জীবনীতে “শাকে চতুর্দশশতে মহুশ্যরদনযুতে” (মহুশ্যরদন=৩২)=১৪৩২ শক, ঐ পুস্তকের অন্তর্গত “সহস্রেষ্ট বিংশযুতে শকান্দে পৃথিবীপতিঃ স্ত্রীভিঃ সাক্ষং মহাভাগং উৎপপাতঃ দিবং প্রতি”=১০২৮ শক। বিষ্ণুর অবতার বলিয়াই যে মীন অর্থ সর্বদা এক হইবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। জ্যোতিষিক গণনায় মীন অর্থ ১২। আমরা সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিষ্তীর্থ মহাশয়কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, “মীন অর্থ কখনই ‘এক’ বলিয়া ধরা হয় না, সর্বদাই উহার অর্থ ১২।” যাহারা মীন অর্থ এক ধরিয়া এবং অঙ্কের বামা গতি স্বীকার করিয়া এই শ্লোকের অর্থ ৭২১ অর্থাৎ ৮৬২ খৃঃ অব্দ নির্ধারণ করিয়াছেন, * তাঁহাদের এ কথটা মনে রাখিতে হইবে যে ঐ প্রশস্তি নবম শতাব্দীর হইলে উহার আবিষ্কারক বৃদ্ধ পণ্ডিত ৮ অমৃতানন্দ গুপ্ত কখনই উহার পাঠ উদ্ধার করিতে পারিতেন না।

ইহা নিশ্চিত যে বৌদ্ধপ্রভাব তখনও দেশে যথেষ্ট ছিল। এদিকে বল্লাল সেন উদীয়মান ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন; ভীমসেনের পুত্রগণের মধ্যে ধর্ম লইয়া কলহ হওয়া কিছুই আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। প্রশস্তিতে হরিশ্চন্দ্র ও মহেন্দ্র উভয়েই রাজর্ষিপদবাচ্য

হইয়াছেন। এমন অবস্থায় ইহাদের ৫ পুরুষ বিশ্বরূপ সেনের পুত্র ভীমসেনের সময় হইতে গণনা করিলে যে কোনরূপ ব্যতিক্রম লক্ষিত হইবে না, তাহা পরে লিখিব।

শোনা যায় সাভারের নিকটবর্তী মাহিষ ও কৈবর্তজাতীয় লোকেরা কেহ কেহ হরিশ্চন্দ্রের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্যের কথা নাই, ইহা হইলেও হইতে পারে। বেহেতু সমাজ-বহির্ভূত উচ্চকুলসম্মত এই বংশ অবশেষে নিম্নতর জাতিদের সঙ্গে মিশিয়া বাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

বাহারা বলেন, একটি প্রাচীন প্রস্তরলেখ বহুপূর্বে কতকাংশে রূপান্তরিত করিয়া এই অমূল্য প্রস্তর হইয়াছিল, তাহাদের কোন যুক্তিই বিচারসহ নহে। ভিবক্ শিবদাস দেবকে কেনই বা গৌরবান্বিত করিবার চেষ্টা হইবে? আতিচ্যুত বৌদ্ধরাজাকে দাবী করিতে কোন উচ্চশ্রেণীস্থ হিন্দুর সেকালে প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। বাহাদের কাছে এই শিলালিপির প্রতিলিপি ছিল, তাহারা ইহা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। র্যান্ডিন ও টেপলটন সাহেব দৈবক্রমে ইহার সন্ধান পাইয়া বহুকালের চেষ্টার ফলে ইহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। অমৃতানন্দ কবিরাজ প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে এই প্রতিলিপি লিখিয়াছিলেন, চতুর্দশ শতাব্দীর উৎকীর্ণ লেখাও স্পষ্টতাই তিনি সহজে পড়িতে পারেন নাই। এতদ্বারা তিনি স্বয়ং সংস্কৃত সুপণ্ডিত হইলেও শিলালিপিতে এরূপ অসাধু সংস্কৃত দেখা যায়। ভারতের নানাস্থানের শিলালিপিতে ভুল সংস্কৃতের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। হরিশ্চন্দ্র রাজার বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন, তিনি শেষ বয়সে নদীতীরে বৌদ্ধ মঠ-মন্দিরে বাস করিতেন। বিজয় সেনের সম্বন্ধেও এরূপ বৃদ্ধবয়সে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনের কথা তাম্রশাসনে পাওয়া যাইতেছে। পার্থক্য এই যে বিজয় সেন হোম-ধুম-পবিত্র গঙ্গার উপকূলে ধর্মির আশ্রমে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, হরিশ্চন্দ্র বৌদ্ধ রাজা, তাহার ধর্মে বজ্রাঘির প্রীতি নাই—তিনি ভিক্ষুর আশ্রমে ও মঠে বিচরণ করিতেন।

হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট এবং ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনের খুল্লতাত পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন, বি. এল., গীতাচার্য্য মহাশয় সম্প্রতি দুর্জয়দাস কৃত বৈষ্ণবকুল-পঞ্জী প্রকাশ করিতেছেন; এই পঞ্জীর কথা ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতমল্লিক তাঁহার চন্দ্রপ্রভা ও রত্নপ্রভা নামক দুই প্রসিদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন উহার একখানি অতি জীর্ণ কাপি পাইয়াছিলেন, সেই কীটদষ্ট বহু প্রাচীন পুঁথিখানি বর্তমান কো-গ্রামের কোন একটি মল্লিক পরিবারের জনৈক বিধবার নিকট ছিল, উহা এখনও আছে কি না জানি না। বিধবা যক্ষীর ছায় সতর্ক ভাবে পুঁথিখানি রক্ষা করিতেন, কাহাকেও ছাড়িয়া দিতেন না। দুর্জয় দাস বিশ্বরূপ সেনের পৌত্র কার্তিক সেনের সমসাময়িক ছিলেন।

কার্তিক সেনের পিতা ভীম সেন। দুর্জয় দাসের অব্যবহিত পরেই মল্লদেশবাসী শক্তি গোত্রীয় জয়সেন বিশ্বাস তাঁহার “সদ্বৈষ্ণব-কুল-চন্দ্রিকা” রচনা করেন। দুর্জয় দাস তাঁহার পূর্ববর্তী বহু বৈষ্ণব-পঞ্জিকার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের কোনটিই পাওয়া যায় নাই। তাঁহার ক্ষুদ্র ৩২ পৃষ্ঠা ব্যাপক কুল-গ্রন্থখানি এবং জয়সেন বিশ্বাসের “সদ্বৈষ্ণব-

কুল-চন্দ্রিকা” এই দুই পুস্তকই এখন বৈষ্ণব-গণের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কুল-গ্রন্থ। শেখোক্ত পুস্তক ১২২৭ শকে (১৩০৫ খৃঃ) রচিত হয়। সর্বৈশ্ব-কুল-চন্দ্রিকা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি, মহারাজ ভীম সেন ১১৫৮ হইতে ১১৯৬ শক পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন (১২৩৬-১২৭৪ খৃঃ)। ইনি বল্লালের প্রপৌত্র। গ্রন্থকর্তা জয়সেনের কন্যা কমলা দেবীকে ভীম সেনের পুত্র কার্তিক সেন বিবাহ করেন। স্মৃতরাং সেনরাজত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বনিষ্ট অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থাকিবার কথা।

আমরা হানান্তরে “সর্বৈশ্ব-কুল-চন্দ্রিকা” হইতে আর অনেক কথা উদ্ধৃত করিব। কুলশাস্ত্র নানা প্রতারকের হাতে পড়িয়া বিড়ম্বিত হইয়াছে। দুর্জয় দাস ও জয় সেন বিশ্বাস যে দুইখানি কুল-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, খুব প্রাচীন পুঁথি না পাওয়া পর্যন্ত,—উক্ত পুস্তক দুয়ের সকল অংশ আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। এই দুইখানি পুস্তকই গীতাচাৰ্য্য মহাশয় শীঘ্র প্রকাশ করিবেন, তখন স্মরণীয় ইহাদের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে বিচার করিবেন; আমি তজ্জন্ত প্রস্তুত হই নাই।

কুলজী অনুসারে, মহারাজ ভীম সেন ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। এদিকে আমরা সাভারের শিলালিপিতে হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র মহেন্দ্রের মন্দির নির্মাণের তারিখ ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দ পাইলাম। মহেন্দ্র বৃদ্ধ বয়সে মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এদিকে ভীমসেনের জন্মতারিখ পাওয়া যায় নাই,—তাহা দ্বাদশ শতাব্দীর কোন সময়ে হইতে পারে। ভীম হইতে মহেন্দ্র পঞ্চম পুরুষ, স্মৃতরাং বল্লাল প্রপৌত্র ভীমসেন এবং সাভারের লিপি-কথিত ভীমসেন একব্যক্তি হইতে পারেন। বল্লালের তারিখ সম্বন্ধে অনেক মতান্তর আছে। গোপাল ভট্ট রচিত বল্লালচরিতে “রাজবল্লভ” বলিয়া যে ভীমসেন উল্লিখিত হইয়াছেন, তিনিও এই ব্যক্তি কি না বলা যায় না। তাহাতে দ্বিধার কারণ এই উহা বিশ্বাস করিতে হইলে ভীমসেনের বয়ঃক্রম অপরিমিতরূপ বেশী হইয়া পড়ে।

এই সকল তারিখ সম্বন্ধে হস্তলিখিত পুঁথির পাঠ অনেক সময়েই অবিদ্বান্ত। যখন তারিখটি গ্রন্থকার অঙ্কের অঙ্করে প্রদান করেন, তখন অনেক সময়েই নকলকারীর ভ্রমে তাহা অশুদ্ধরূপ হইয়া হয়। সাক্ষেতিক শব্দ প্রয়োগ করিলেও সেই সকল শব্দের প্রায়ই নানারূপ অর্থ করা হয়। স্মৃতরাং এ বিষয়ে বাগবিতণ্ডা ত্যাগ করিয়া মোটামুটি আমরা জয়সেন বিশ্বাসোক্ত ভীমসেন এবং সাভারের লিপির ভীমসেন এক ব্যক্তি কি না সেই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি।

ষ্টেপলটন সাহেব ও নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় সেন রাজগণের সঙ্গে সাভারের রাজ-পরিবারের সংস্রব অহুমান করিয়া প্রথমতঃ লিপিট কতকটা দ্বিধার সহিত খাটি বলিয়া গ্রহণ করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছিলেন,—তারপর সে মতের পরিবর্তন করিলেন। শিলালিপির প্রামাণ্য তাঁহারা স্বীকার করিতে এখন কুণ্ঠিত। এতৎ সম্বন্ধে আমার স্মরণীয় পত্রের জবাব দিতে না পারিয়া সেই চিঠির মাত্র কিয়দংশ ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন, অপরাংশ কেন প্রকাশ করিলেন না, তাঁহারাই জানেন। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে ষ্টেপলটন সাহেব

নলিনীবাবুর দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হইয়াছিলেন, সুতরাং ইহাদের ছই মত না ধরিয়া তাহা এক জনের মত বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য হইবে না। টেপলটন সাহেব কিঞ্চিৎ বিধার সহিত আমাকে প্রথমে লিখিয়াছিলেন—“It has all the characteristics of a genuine inscription”—[এই শিলালিপি সর্ব্ব বিষয়ে খাটি বলিয়াই মনে হয়।] এই শিলালিপি সম্বন্ধে নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় টেপলটন সাহেবের মারফৎ আরও কতকগুলি কথা লিখিয়াছেন, তাহার কতকাংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি,—

“When we were coming away from Savar last June (1920), Babu Harendra Nath Ghosh handed over to me the *khātā* full of litigation notes in which S. J. Ambikacharan Chaudhuri had taken down in pencil the *slokas* dictated by the late Amritananda Kaviraj. I found that the whole composition was the copy of an inscription on a Math dedicated by Mahendra, son of Harish. Harendra Babu had only utilised a part of the composition, the rest of which was also of unusual interest.

Mr. Rankin thereupon undertook to find the original of these *slokas* and through the aid of Mr. J. N. Roy, I.C.S., and Mr. A. C. Sen, I.C.S., at last succeeded in getting into touch with Babu Pratap Ch. Gupta, the grandson of Amritananda Kaviraj. Pratap Babu ransacked the papers of his grandfather and after much search succeeded in finding the required *slokas* written in violet ink in the Kaviraj's own hand on a piece of paper only 4" x 8" in size and handed it over to Mr. Rankin. On one side of the paper is seen a transcript in which many slips had occurred and on the reverse the transcript is copied correctly.

I shall give below an exact copy of the *slokas* and a translation; these *slokas* as already noted appear on a close reading to be the transcript of an inscription attached to an ancient Math, dedicated by Mahendra..... the inscription however is extremely interesting. It takes note of the fact that Harishchandra was a Buddhist. It gives the correct boundary of Bhowal or Bhabalina and furnishes us with the important information that it was reclaimed by Dhimanta from the occupation of the powerful Kirats. This supports the statement of the Yoginitantra that Pragjyotish at one time extended up to the confluence of the Lakshya and the Brahmaputra. The Ganges is said to be flowing below Bhowal and thus this statement furnishes proof of the current tradition that the Ganges used to flow in olden times through the Dhaleswari channel or even further north along the course of the present Buriganga.”

ইহার ভাবার্থ—“আমরা গত জুন (১৯২০) মাসে সাভার হইতে ফিরিবার পথে বাবু হরেন্দ্রনাথ ঘোষ আমার হাতে একখানি খাতা দিলেন। এই খাতায় মোকদ্দমা সম্বন্ধে অনেক কথা ছিল। সেই খাতাখানির মধ্যে অধিকাংশ চৌধুরীর হাতে পেন্সিলে লেখা এই শ্লোকগুলি

ছিল, স্বর্গীয় কবিরাজ অমৃতানন্দ তাহা আবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং চৌধুরী মহাশয় তাহা টুকিয়া লইয়াছিলেন। আমি বুঝিলাম ইহা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র মহেন্দ্র কর্তৃক নিশ্চিত একটি মন্দিরের গাত্র-সংলগ্ন শিলালিপির নকল। হরেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধে ইহার কতকাংশ মাত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি দেখিলাম ইহার বাকী অংশও খুব দরকারী।

শ্রীযুক্ত র্যাঙ্কিন সাহেব কবিরাজের স্বহস্ত-লিখিত আদত লিপিটি উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টার পর শ্রীযুক্ত জে. এন. রায় এবং এ. সি. সেন সিভিলিয়ান ঘরের সাহায্যে স্বর্গীয় অমৃতানন্দ কবিরাজ মহাশয়ের পৌত্র প্রতাপচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরিচিত হইয়া সন্ধান লইলেন। প্রতাপবাবু তাঁহার পিতামহের সমস্ত কাগজপত্রের বিশেষরূপে খোজ করিয়া শেষে সেই শ্লোকযুক্ত আদত কাগজটি পাইয়া র্যাঙ্কিন সাহেবকে প্রদান করেন। ছোট ৪"×৮" ইঞ্চি কাগজে স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের নিজ হাতে বেগুনী কালীতে উহা লিখিত। কাগজখানির এক দিকে নকলটি অনেক ভ্রমপূর্ণ, কিন্তু অপর দিকে উহা নিতুল করিয়া লিখিত হইয়াছে। আমি নিয়ে সেই শ্লোকগুলি অনুবাদসহ প্রদান করিতেছি।

এই শিলালিপি অতীব প্রয়োজনীয় তত্ত্বপূর্ণ। ইহা হইতে জানা যাইতেছে, হরিশ্চন্দ্র বৌদ্ধ রাজা ছিলেন। ইহাতে ভাওয়াল অথবা ভাবলীনের একটা ঠিক সীমানা দেওয়া হইয়াছে। এই লিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে ঐ স্থান কীরাতদের হাত হইতে ধীমন্ত সেন দখলে আনিয়াছিলেন। এই লিপি দৃঢ়ভাবে বোগিনীতলে উল্লিখিত প্রাগ্জ্যোতিষপুরের সীমা সমর্থন করিতেছে। প্রাগ্জ্যোতিষপুর রাজ্য এক সময়ে লক্ষ্য ও ব্রহ্মপুত্রের সংগমস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহাতে দেখা যায় এক সময় গঙ্গা ভাওয়ালের প্রান্তভাগ দিয়া বহিয়া যাইত। লৌকিক সংস্কার, এক সময়ে ধলেশ্বরী এমন কি আরও উত্তরে বুড়িগঙ্গার খাদ দিয়া গঙ্গা বহত। ইহা ছিল; সুতরাং সেই সংস্কার এই লিপি সপ্রমাণ করিতেছে।

যদি কুলজীটিকে বিশ্বাস্ত বলিয়া ধরা যায়, তবে আমরা শিলালিপির মহারাজ ভীম সেন এবং জয় সেন বিশ্বাসোক্ত মহারাজ বজ্রালের পুত্র ভীম সেনকে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে পারি। বিশ্বাস মহাশয়ের ঐতিহাসিক নানা কথা সম্বন্ধে প্রচুর তর্ক ও আন্দোলন হইবে; কিন্তু তিনি সেন বংশের যে তালিকাটি দিয়াছেন তাহা অবিশ্বাস্ত কিনা বিবেচ্য। আমরা লক্ষ্য সেনের রাজত্বের ইতিহাস দেওয়ার সময় সেই তালিকাটির কথা পুনরায় আলোচনা করিব। এই বহু ঐতিহাসিক তত্ত্বপূর্ণ কুলজীখানিতে যে প্রক্ষেপকারীর হস্ত স্পর্শ করে নাই—তাহা বলিতে পারি না। এদেশে যাহারা জাতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাঁহারা খুব পণ্ডিত হইলেও নিজের সামাজিক গৌরবের কথা একবারে ভুলিতে পারেন না। এমন কি নিতান্ত অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও মধ্যে মধ্যে এইরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া থাকেন।

হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অছনা ও পছনাকে গোপীচন্দ্র বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া ময়নামতীর গানে উল্লেখ আছে। ইহা কতদূর ঠিক বলা যায় না।

আমরা এই শিলালিপির প্রতিলিপিখানি নিম্নলিখিত কারণে প্রামাণ্য মনে করি।

১। ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রের বৃদ্ধাবস্থা—তখন তিনি রাজর্ষি। ১২৭৪ খৃষ্টাব্দ (মহারাজ ভীম সেনের মৃত্যুর সময়) হইতে ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমরা চারিজন রাজার নাম পাইতেছি—ধীমন্ত, রণবীর, হরিশ্চন্দ্র ও মহেন্দ্র। এক শতাব্দীতে ৪ জন রাজার গণনা প্রচলিত নিয়মানুসারে সম্ভব।

২। সাজারের লিপি ও জয় সেন বিশ্বাসের কুলুজী হইে বিভিন্ন এবং পরস্পরের অজ্ঞাত স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে এবং উভয় স্থানেই ভীম সেন “মহারাজ” বলিয়া উল্লিখিত। কুলুজী হইতে আমরা জানিতে পারিলাম, ইনি বল্লাল পৌত্র মহারাজ বিশ্বরূপ সেনের পুত্র।

৩। জয় সেন বিশ্বাস কার্তিক সেনকে স্বীয় কস্তা দান করিয়াছিলেন, সুতরাং তদ্বিলিখিত বংশলতা নির্ভুল বলা যাইতে পারে—বিশেষতঃ পূর্বোক্ত নানা প্রমাণ দ্বারা তাহা সমর্থিত হইতেছে। তবে প্রক্ষেপকারী কেহ কিছু করিয়াছেন কি না—বলিতে পারি না।

আদত লিপি হইতে অমৃতানন্দ কবিরাজ মহাশয় স্বহস্তে প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অমৃতানন্দ কবিরাজ সে সময় পূর্ববঙ্গের সর্বাধিপতি বড় কবিরাজ ছিলেন, রাজা ও রাজকর ব্যক্তিগণ—দাঁহারা তাঁহার দ্বারা চিকিৎসিত হইতেন—তাঁহাদের নৌকা অনেক সময় কবিরাজ মহাশয়ের ঘাটে বাধা থাকিত। ইনি সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং ইহার সত্যতা ও বিবিধ সদৃশ জনসমাজে বিশেষ পরিচিত ছিল। অমৃতানন্দের পুত্র বাদবানন্দ আমা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি পুরাতন “ভারতী” পত্রিকার এক জন নিয়মিত লেখক ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় পিতাপুত্র উভয়েই পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও এবং বাদবানন্দ প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনায় পটু হইয়াও তাঁহারা এই দলিলটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। প্রতিলিপি সম্বন্ধে ইহার কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। উহা হারাইয়া গিয়াছিল। ব্যাধিন সাহেব চেষ্টা না করিলে উহা পাওয়া যাইত না।

মূল শ্লোকের কবিত্ব উচ্চদরের নহে, এবং কবিরাজ মহাশয় চতুর্দশ শতাব্দীর লিপির ভাল করিয়া পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে শ্লোকগুলি অনায়াসে নব শ্রীমণ্ডিত করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, সেই ভাবেই নকল করিয়াছিলেন, এজন্য ইহাদের অনেক ভ্রুটি দৃষ্ট হয়।

ভট্টশালী মহাশয় সময়-সূচক পদটির বিকৃত অর্থ করিয়া উহা অষ্টম কি নবম শতাব্দীর বলিয়া লিখিয়াছেন। আমরা প্রমাণ করিয়াছি—লিপিটি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগের। প্রায় এই সময়ে রচিত আনন্দভট্টের বল্লালচরিতেও কালবাচক সংস্কৃত পদ “বামাগতি” নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে এবং আরও বহুস্থলে যে সেই নিয়মের ব্যত্যয় হইয়াছে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ আমরা দিয়াছি। বিশেষ “বামাগতি” দ্বারা ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গেলে উহার কোন অর্থই হয় না। আর একটি কথা এই যে এই লিপি যদি অষ্টম কি নবম শতাব্দীর

হইত, তবে কবিরাজ মহাশয় তাঁহার সেকেলে পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তাহাতে দস্তখুট করিয়া পাঠোদ্ধার করিতে পারিতেন না, ইহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে।

চতুর্দশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধ প্রভাব যথেষ্ট ছিল। বঙ্গদেশে সপ্তদশ শতাব্দীতেও বৌদ্ধগণের একটা নবজাগরণ হইয়াছিল। বর্তমান জেলায় রামানন্দ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ঐ শতাব্দীতে আপনাকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়া বৈষ্ণব ও মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে একটি অভিবান সংগঠিত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা এই পুস্তকের ১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে হাজারিবাগ অঞ্চলে মানবংশীয় রাজাদের উল্লেখ পাই। ১। উদয়মান, ২। শ্রীধোতমান, ৩। অজিতমান (রাজা উদয়মানের ভ্রাতা) পরে

উদয়মানের বংশোদ্ভব, ৪। রুদ্রমান ১১৩৭ খৃঃ অব্দে মগধে রাজত্ব করিতেছিলেন। তৎপূর্ববর্তী বর্মান নামক আর এক রাজার

উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা সেনদিগের পূর্বে মগধে স্বাধীন রাজা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের অপর এক রাজবংশের তাম্রফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহারা বর্ষবংশীয়। এই বর্ষবংশের তাম্রলিপি একদিকে চন্দ্রবংশীয় ও অপরদিকে সেন রাজাদের তাম্রফলকের অক্ষরের মত দৃষ্ট হয়, বরঞ্চ উহা সেনদের তাম্রলিপির বেশী সরিহিত

বর্ষবংশ। বর্ষবংশীয়েরা ‘পরম ভট্টারক’ ‘মহারাজাধিরাজ’ এবং ‘পরমেশ্বর’

প্রভৃতি রাজচক্রবর্তীদের উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং ইহারা প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। ভোজবর্ষার তাম্রলিপিতে দৃষ্ট হয়, ইহারা কলিঙ্গের অন্তর্গত সিংহপুরের আদিমবাসী। এই সিংহপুর খুব সম্ভব দক্ষিণরাঢ়স্থ বিজয়ের সিংহপুর। এই বংশের বর্ষবর্ষণ অঙ্গদেশে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। ইহার পুত্র জাতবর্ষা কর্ণরাজ-কর্তা বীরশ্রীকে বিবাহ করেন এবং কামরূপ অধিকার করিয়া কৈবর্ত রাজা দিব্বোককে পরাস্ত করেন। জাতবর্ষার পুত্র শ্রামলবর্ষা। শ্রামলবর্ষার পুত্র ভোজবর্ষার তাম্রশাসন ঢাকা নারায়ণগঞ্জের অন্তঃপাতী বেলাবা নামক গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শ্রামলবর্ষার কর্তা ত্রৈলোক্যসুন্দরী মহারাজ্ঞী মালব্যদেবীর গর্ভসম্ভূতা। এই সময়ে সিংহল-রাজ বিজয়বাহুর (১ম) এক রাজ্যের নাম ত্রৈলোক্যসুন্দরী, ইনি কলিঙ্গের (দক্ষিণ রাঢ়) সিংহপুরের রাজকর্তা। সুতরাং দেখা যাইতেছে ত্রৈলোক্যসুন্দরী নামটি এক সময়ে সিংহপুরের রাজপুরে প্রচলিত ছিল। কর্ণ, দিব্য (দিব্বোক) প্রভৃতি নামের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে এই রাজবংশ বিখ্যাত রামপালের প্রায় সমসাময়িক,—অর্থাৎ দশম-একাদশ শতাব্দীর।

বর্ষবংশ সম্ভবতঃ এককালে পাল নৃপতিদের সামন্ত রাজা ছিলেন। ইহারা যজুবংশীয় বলিয়া দাবী করেন এবং বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। আমাদের মনে হয়, ইহারা বিজয়ের বংশীয়, কিন্তু হিন্দু প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় প্রবল হইয়া উঠিলে ইহারা আপনাদিগকে যজুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। পূর্বদেশের রাজারা যে হিন্দুপুরাণের এবং রামায়ণ মহাভারতাদির

উল্লিখিত রাজবংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বহু প্রমাণ পূর্বভারতে বিদ্যমান। বিজয়ের বংশধরেরা বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে জাতিত্বের কথা লোপ করিয়া মহাভারতের সর্বপ্রধান নায়ক সাফাৎ ভগবান্ কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ইহারা গৌরবযুক্ত হইয়া থাকিবেন। সম্ভবতঃ এই রাজবংশে আরও দুইটা নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম জ্যোতিবর্মা ও হরিবর্মা। সম্ভ্রতি শ্রামলবর্মাকে বল্লালসেনের পুত্র বলিয়া প্রমাণ করিতে যাইয়া কুলুজীকারকেরা যে সকল জাল বংশতালিকা তৈয়ার করিয়াছেন এবং বাহাদের দ্বারা নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মত প্রবীণ ব্যক্তিও প্রভাবিত হইয়াছেন তাহার একটি কৌতুকাবহ বিবরণী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে পাল রাজত্বের শেষ সময়ে বিহার অঞ্চলের বর্মবংশীয় রাজারা সম্ভবতঃ পূর্ববঙ্গের চন্দ্র রাজাদের অধিকার বিলুপ্ত করিয়া রাঢ়, বঙ্গ ও বিহার অঞ্চলে পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে শূরবংশ হয়ত বর্ম বংশকে পরাভূত করিয়া সেনাদের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হন। এই জটিল এবং যুদ্ধবিগ্রহপূর্ণ বিপদসঙ্কুল অরাজকতার যুগে সেনরাজগণ স্বীয় শক্তি সমস্ত বঙ্গ ও বিহারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তথাকার একচ্ছত্র রাজত্ব লাভপূর্বক দেশে শান্তি স্থাপন করেন।

শকরাজ মিহিরগুলের সঙ্গে কোন সময়ে বঙ্গ দেশের হয়ত বা একটা সংশ্রব হইয়াছিল। তাহা অবশ্য পাল রাজত্বের পূর্ববর্তী ঘটনা। আমাদের ইহা একটি অনুমান মাত্র। অনুমানের হেতু এই যে ত্রিপুরার একটা বৃহৎপরগনার নাম মেহেরকুল। ঐ পরগনা ভারতবিশ্বত মহাবীর মেহের-
গুলের নামাঙ্কিত কি না, ইহা একটা জটিল সমস্যা।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত ময়নাগড়ের অধিপতি কর্ণসেনের লাউসেন বা লবসেন নামক বে পুত্র ছিল, তাঁহার সাহায্যে গৌড়েশ্বর, কলিঙ্গ, বর্ধমান, তারপাশা, কামরূপ প্রভৃতি দেশ জয় করেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি মূলতঃ এই লবসেনের বীরত্ব গাথা লইয়া। ইনি ঢেকুরের ইছাই দ্বায়েকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং হরিপালের কন্যা কাণেড়ার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভপূর্বক উক্ত রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। বাঙ্গলা পঞ্জিকায় কয়েক বৎসর পূর্বেও কলিকালের রাজচক্রবর্তীদের মধ্যে লাউসেনের নাম উল্লিখিত হইত। লাউসেন বা লবসেন গৌড়েশ্বরের শ্রালীপুত্র ছিলেন। ভিন্সেন্ট প্রিথের মতে এই গৌড়েশ্বর পাল বংশীয় দেবপালদেব।

আমি কতকগুলি কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু আমার মনে এখনও সে সম্বন্ধে কতকগুলি সমস্যার ভালরূপ সমাধান হয় নাই।

- ১। গোরক্ষনাথ ও গোবিন্দচন্দ্রের সময়।
- ২। ভর্তৃহরি ও গোপীচন্দ্রের (গোবিন্দচন্দ্রের) সম্বন্ধ এবং তাঁহাদের কাল।
- ৩। এই গোবিন্দচন্দ্র এবং রাজেন্দ্র চোলের সময়ের গোবিন্দচন্দ্র এক ব্যক্তি কি না ?

৪। সাভারের হরিশ্চন্দ্রের কথা অতুনা ও পুতুনার সহিত গোবিন্দচন্দ্রের বিবাহ হইয়া থাকিলে উভয় রাজার কালের সম্বন্ধ প্রমাণ করা যায় কি না ?

৫। জাতিগত প্রশ্ন দ্বারা বিচলিত না হইয়া প্রশান্তভাবে বিচার করিলে সাভারের শিলালিপি খাটি বলিয়াই বোধ হয়, তবে বঙ্গালচরিতোক্ত অথবা “সম্বৈজ্ঞ-কুল-চন্দ্রিকা”র ভীমসেন এবং শিলালিপির ভীমসেন এক ব্যক্তি কি না তৎসম্বন্ধে আমার কতকটা সন্দেহ আছে।

এই সকল জটিল প্রশ্নের কেহ চূড়ান্ত উত্তর দিতে পারিবেন না। তবে কালে হয়ত দৃঢ়তর প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়া সমস্তার সমাধান-পথ সুগম করিয়া দিতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এদেশে ইতিহাসের উপকরণ

ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই; ভারতের লোকেরা ইতিহাস লিখিতে জানিতেন না, ইত্যাদি কথা সকলের মুখেই শোনা যায়। মহাভারত ও অপর্যাপ্ত পুরাণ-তত্ত্ব পাঠ করিলে আমরা অতি পূর্বকাল হইতে কতকগুলি রাজ বংশের ধারাবাহিক বংশাবলী জানিতে পারি। এই সকল বংশাবলী যে সমস্তই ভ্রমপূর্ণ তাহা বলা যায় না, ইদানীং তাম্রশাসন ও শিলালিপির প্রমাণে অবধারিত হইয়াছে যে এত পূর্বকালের লেখার মাঝে মাঝে সত্যের অপলাপ হইয়া থাকিলেও সেগুলি মোটের উপর নির্ভরযোগ্য। পার্জিটার সাহেব পুরাণোক্ত বংশাবলীর আংশিক বিশ্বস্ততার পক্ষপাতী।

প্রত্যেক রাজাদেরই বংশাবলী ও পূর্বপুরুষদের গুণকীর্তন করিবার জন্ত অভিজ্ঞ লোক থাকিত। বিবাহ-সভায় ও যজ্ঞস্থলে ইহারা উৎসবকারী রাজার পূর্ববর্তীদিগের গুণগ্রাম বর্ণনা করিতেন। কালিদাসকৃত রঘুবংশে ইহার উল্লেখ আছে। তাম্রশাসন ও প্রস্তরলেখ সহজে মষ্ট হয় না এবং এগুলি দানগ্রহীতাদের স্বার্থের সঙ্গে বিশেষরূপ জড়িত, এজন্ত এ সকল নানারূপ বিপ্লব সত্ত্বেও কতক কতক রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু কাগজ বা ভূর্জপত্রাদিতে লেখা ইতিহাস কচিৎ রক্ষিত হইয়াছে। যদি একবংশই ক্রমাগতঃ রাজত্ব করিতেন, তবে সেই বংশের ইতিহাস রক্ষিত হইত। কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসে রাজনৈতিক বিপ্লব এত ঘন ঘন হইয়াছে যে এক বংশের কথা অপর বংশীয় লোকদের রক্ষা করিবার কোনই স্বার্থ থাকিত না। ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপার হইলে সকলেই এদেশে তাহা যত্নপূর্বক রক্ষা করিয়া থাকে, কারণ ধর্ম সকল সম্প্রদায়েরই সামগ্রী। কিন্তু নূতন বংশের রাজারা তাহাদের পূর্ববর্তী রাজগণের (অনেক সময়েই যাহারা শত্রুপক্ষীয়) ইতিহাস রক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ উদাসীন—এমন কি বিবেচনা হইতেন। এদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণ

কখনই একত্র হইয়া একটা রাজনৈতিক ঐক্য অনুভব করেন নাই—সুতরাং তাঁহারা রাজত্ব-সম্বন্ধীয় ঘটনাগুলি প্রথম হইতে ধারাবাহিকভাবে রাখিতে বড় ইতিহাস কেন লুপ্ত হইল? করেন নাই। বিশেষ গত সাত আট শত বৎসরের মধ্যে ধর্ম ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে গ্রন্থ লেখার প্রচেষ্টা বেশী হয় নাই। লোক বা জাতি-বিশেষের ইতিহাস লইয়া লোকেরা কখনই মাথা ঘামাইতে চায় নাই। দেবতাদের কীর্তি পুরাণকারেরা লিখিয়াছেন এবং জনসাধারণ তাহাই পাঠ করিয়া পুণ্য অর্জন করিয়াছে। মানুষের কীর্তি ক্ষণবিক্ষংসী, উহা লইয়া আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই—এই ছিল লোকদের বিশ্বাস। সুতরাং যে সকল প্রাচীন প্রাদেশিক ইতিহাস ছিল তাহা এই কয়েক শতাব্দীর অবহেলায় প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

তথাপি প্রাদেশিক এবং বিশেষ বিশেষ রাজত্বসম্বন্ধীয় ইতিহাস যে ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। রামপাল সম্বন্ধে আমরা সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত পাইয়াছি। ধর্মচর্চায় আকর্ষণ নিমজ্জিত বঙ্গদেশ হইতে এই ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থকারের বাড়ী ছিল পৌণ্ড্রদেশে, কিন্তু তাঁহার পুস্তকখানি নেপালে পাওয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামপালের ঘটনাগুলির প্রায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল, কারণ তাঁহার পিতা প্রজাপতি নন্দী রামপালের মহাসাক্ষিবিশিষ্ট ছিলেন। পুস্তকখানি কাব্যের রূপ দিয়া লিখিত হইয়াছিল। রামপাল ও রঘুকুলচন্দ্র রাম এই উভয়ের সম্পর্কেই প্রতিটি শ্লোকের অর্থ করা যাইতে পারে। কবির উপাধি ছিল “কলিকাল-বান্দ্যকি”। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত নেপাল হইতে ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে আবিষ্কৃত হয়; যে পুস্তকখানি পাওয়া গিয়াছে এবং বাহা ৬৭৭৭৭৭ শা ১ মহাশয় বাঙ্গলার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোক পর্যন্ত টীকা আছে। যে রূপক দ্বারা রামায়ণ ও রামপালচরিতকে একত্র জড়ান হইয়াছে, তাহাতে রামপালের ভাগ এত দুর্বোধ্য যে যিনি সেই সময়ের পুণ্যপুণ্য ঘটনা না জানেন তাঁহার পক্ষে এরূপ টীকা লেখা অসম্ভব। এই জন্য অনেকে মনে করেন—সন্ধ্যাকর নন্দী স্বীয় গ্রন্থের টীকা স্বয়ংই লিখিয়াছেন। যে অংশের টীকা লিখিত হয় নাই, তাহা দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। রামচরিত খৃষ্টীয় একাদশ শতকের শেষভাগে লিখিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ দশরথ-পুত্র রামচন্দ্রের রূপকের সম্বন্ধ থাকার দরুনই পালবংশীয় রাজার কীর্তি-সম্বলিত রামচরিতের জীবনরক্ষা হইয়াছে। নতুবা রামচরিত কে পড়িত? আমরা এই রামচরিত হইতেই জানিতে পারি যে, পাল ও সেন রাজাদের অনেকের সম্বন্ধেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। তিব্বতদেশীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ এরূপ কতকগুলি পুস্তকের নাম করিয়াছেন, যথা—

(১) কেমেন্দ্রভদ্র প্রণীত ইতিহাস। কেমেন্দ্র মগধবাসী ছিলেন এবং তিনি পুরাকাল হইতে রামপাল পর্যন্ত সমস্ত রাজার বিবরণ দিয়াছেন।

(২) ইন্দ্র দত্ত নামক এক ক্ষত্রিয় সেন-রাজাদের প্রথম চার জনের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পুস্তকের নাম “বুদ্ধপুরাণ।”

(৩) গুরুপরম্পরা ইতিহাস। গ্রন্থকার ব্রাহ্মণবংশজাত “ভট্টঘটা” পদবী। তারানাম লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সুবিখ্যাত ইতিহাসের উপকরণ তিনি এই পুস্তক হইতেই বেশী সংগ্রহ করিয়াছেন।

ত্রিপুররাজ্যের একখানি ইতিহাস আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্ত্রীকেশর ও বাণেশ্বর নামক দুই পণ্ডিত উহা বাদলায় লিখিতে আরম্ভ করেন, তৎপূর্বে উহা ত্রিপুরভাষায় ছিল।

ত্রিপুরার ‘রাজমালা’। গ্রন্থকারদ্বয় যে সকল পুস্তকের সাহায্যে রাজমালা লিখিয়াছিলেন,

তন্মধ্যে ‘রাজমালিকা’, ‘যোগিনীমালিকা’, ‘বারণ্যকায়-নির্ণয়াদি’ এবং ‘লক্ষণমালিকা’ প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। শেষোক্ত পুস্তকখানি খুব সম্ভব লক্ষণ সেনের জীবন ও রাজত্বসম্বন্ধীয় পুস্তক।

আমার নিকট একখানি হস্তলিখিত কোচবিহারের ইতিহাস আছে। ইহা মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের প্রধান মন্ত্রী কালীচন্দ্র লাহিড়ীর আদেশে মুন্সী জয়নাথ ঘোষ ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন। এই পুস্তকের পত্রসংখ্যা ৪৬৯। এ পর্য্যন্ত বহিখানি ছাপা হয় নাই; ইহাতে কোচবিহারের ১৫ জন ভূপতির রাজত্বের বিবরণ আছে।

মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বের কতকাংশের পরে আর লিখিত হয় নাই। পুস্তক লিখিবার আদেশ দেওয়ার সময়ে মন্ত্রী কালীচন্দ্র লেখক জয়নাথ ঘোষকে প্রাচীন কতকগুলি ইতিহাসের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে জানা যায়, পূর্বকালের রাজাদের এইরূপ রাজত্ববিবরণ লিখাইবার রীতি বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল।

আসামের ‘অহম’ রাজাদের যে ইতিহাস আছে, তাহা এত পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিশ্বাসযোগ্য যে, আসামের ইতিহাস-লেখক গোইট সাহেব বলেন—অহমজাতির ইতিহাস লিখিবার শক্তি মুসলমান ঐতিহাসিকগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই সকল ঐতিহাসিক বিবরণে কাল্পনিক কাহিনী বা উপকথা নাই, উহা একান্তরূপে বাহ্য-বর্জিত ও খাটি তথ্যপূর্ণ। সুতরাং আমাদের দেশে ইতিহাসের উপকরণ যথেষ্ট ছিল। অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি এখনও বাহা আছে তাহা নিতান্ত সামান্য নহে।

উপকরণগুলির নিম্নোক্ত ভাবে শ্রেণী-বিভাগ করা যাইতে পারে।—

প্রথমতঃ—মুদ্রা। বহুসংখ্যক মুদ্রা অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশের নানাস্থানে পাওয়া যায়। সেগুলি নানাস্থানে সংগৃহীত আছে এবং তৎসম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ। পুস্তক লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—রাজাদের ইতিহাস। তৎসম্বন্ধে এখনই আলোচনা করিয়াছি।

তৃতীয়তঃ—শিলালিপি ও তাম্রশাসন।

চতুর্থতঃ—সাময়িক নানা গ্রন্থে রাজরাজভাদের এবং বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ এবং বিদেশীয় পর্য্যটকগণের ভ্রমণবৃত্তান্তে এবং অপরাপর বিদেশী লেখকগণকর্তৃক কোন কোন ঘটনার বিবরণ। প্রাচীন মন্দিরাদি।

পঞ্চমতঃ—পল্লীগাথা।

এই শোষোক্ত উপকরণ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

১। কোন কোন গুপ্তরাজার সম্বন্ধে পল্লীগাথার উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিদাস রঘুরাজার সম্বন্ধে বৃহৎ জনপদব্যাপী পল্লীগাথার উল্লেখ করিয়াছেন, পল্লীগাথা।

তদ্বারা প্রমাণিত হয়, রাজাদের সম্বন্ধে পল্লীগাথা রচনার সংস্কার বহুকাল হইতে এদেশে বিদ্যমান ছিল। (রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ২০ শ্লোক।)

২। ধর্মপালের সম্বন্ধে তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে যে তাঁহার সম্বন্ধে প্রজারা গান বাধিয়া সর্বত্র গাহিয়া বেড়াইত; সেই সকল গান পল্লীর রাখাল-বালকেরা গাহিয়া প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিত; দিবসের কর্ম্যাবসানে বণিকেরা তাহাদের বিপণীতে সেই গান গাহিতে ভালবাসিত, এমন কি অন্তঃপুরচারিণীগণ সেই সকল গান গাহিতেন এবং তাঁহাদের পোষা পাখীকে তাহা আবৃত্তি করিতে শিখাইতেন। (৮ম শতাব্দী—খালিমপুর তাম্রশাসন।)

মহীপালের বাণগড় তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, মহারাজ রাজ্যপালের কীর্তিকথা জনসাধারণ মুখে মুখে গাহিয়া বেড়াইত (১০ম শতাব্দী)। বৃন্দাবন দাস তাঁহার চৈতন্য-ভাগবতে (১৫৭৩ খৃঃ) লিখিয়াছেন যে বোগীপাল, ভোগীপাল ও মহীপাল (১০ম শতাব্দী) সম্বন্ধে পল্লীগাথা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পূর্বে বঙ্গের সর্বত্র গীত হইত, এবং তাহাই বঙ্গবাসীর একটা প্রধান আনন্দোৎসবের বিষয় ছিল। সেক শুভোদয়া নামক পুস্তকে দৃষ্ট হয়—রামপাল (১১শ শতাব্দী) তাঁহার পুত্রকে কোন বণিক-সীমন্তিনীকে ধর্ষণের অপরাধে শুলে দিয়াছিলেন, তাঁহার এই অপূর্ণ ত্রায়পরতা-সম্বন্ধে পল্লীগাথা বাঙ্গলার সর্বত্র লক্ষণসেনের সময়েও (১২শ শতাব্দী) গীত হইত। ত্রিপুরার মহারাজ ধর্মমাণিক্য (১৬শ শতাব্দী) সম্বন্ধে এইরূপ পল্লীগীতিকার উল্লেখ রাজমালায় পাওয়া যায়। তাঁহার রাজ্ঞী কমলাদেবী ও পরবর্তী রাজা অমরমাণিক্য সম্বন্ধেও এইরূপ গীতি প্রচলিত ছিল। রাজারা ত্রিহং হইতে উৎকৃষ্ট গায়ক ও নর্তক আনাইয়া সেই সকল গান কি ভাবে নাচিয়া গাহিতে হয়, তাহা ত্রিপুরবাসীদিগকে শিখাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বোড়শ শতাব্দীর জঙ্গলবাড়ীর ঈশা খাঁ ও তৎপরবর্তী কয়েকজন পরাক্রান্ত দেওয়ানের সম্বন্ধে পল্লীগাথা পূর্ববঙ্গ-গীতিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এরূপ অনেক উদাহরণের উল্লেখ করিতে পারি। আমাদের এই সকল মন্তব্য পাঠ করিলে পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক রাজার সম্বন্ধেই নিরঙ্কর প্রজা-মণ্ডলীরাও গাথা রচনা করিয়া গান করিত। যাহারা অত্যাচারী ও হৃদ্যন্ত শাসনকর্তা ছিল, তাহারা প্রজাদের রচিত পল্লীগীতির কশাঘাত খাইত। মাণিকচাঁদের গানে “লম্বা-লম্বা-দাড়ী” বাঙ্গাল মন্ত্রী অত্যাচারের কথা সবিস্তারে বর্ণিত আছে। তিনি যে সকল অত্যাচার করিয়া-ছিলেন, তাহা কবির কৃপায় অনেকেই অবগত আছেন। কবি দয়া করিয়া তাঁহার কলঙ্কিত নামটি প্রকাশ করিয়া তাহা অমর করিয়া রাখেন নাই। কিন্তু কবিকঙ্কণ সেলিমাবাদ পরগনার শাসনকর্তা মাসুদ সরিফের শত কুকীর্তির উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে চিরকালের জন্ত ঘৃণার পাত্র করিয়া রাখিয়াছেন। ফেমানন্দ উক্ত পরগনার পরবর্তী শাসনকর্তা বারা খাঁ সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রজারা তাঁহাকে কত ভালবাসিত তাহার আভাস

পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ গাজি নামক এক দস্যুদলপতি প্রবল হইয়া কিছুকালের অল্প ত্রিপুর-রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। পল্লীগীতি পীর মহাম্মদ তৎসম্বন্ধে একটি বিস্তারিত গীতি লিখিয়াছেন। উহা সমসাময়িক রচনা ও মূল্যবান ঐতিহাসিক উপকরণপূর্ণ। স্থানান্তরে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

সেকালের কোন লেখাই বৈজ্ঞানিকের মানদণ্ডে নিখুঁত বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। তত্ত্বশাসন ও শিলালিপিতেও স্তাবকতার অতিরঞ্জন আছে; আমরা বলিতে চাই না যে, পল্লীগীতিগুলি নির্দোষ এবং খাঁটি সত্য; উহাদের মধ্যে নানারূপ ত্রুটি, সত্যের অপলাপ, অবিজ্ঞতা ও কাল্পনিক জনশ্রুতি, অজ্ঞতার বাগাড়ম্বর এ সমস্তই আছে, কিন্তু তথাপি এই পল্লীগীতিগুলি রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের নিতান্ত নগণ্য উপকরণ নহে। বড়ই দুঃখের বিষয়, এই নানাতত্ত্ববহুল, কবিদ্রব্য, জাতীয় গৌরবস্বরূপ পল্লীগীতির সন্ধানার্থ সরকার বাহাদুর ও বিশ্ববিদ্যালয় যে সামান্য কিছু টাকা দিতেন তাহা সম্প্রতি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই রত্নগুলি বৎসর বৎসর ধ্বংস পাইতেছে, শীঘ্রই লুপ্ত হইয়া যাইবে। জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তার তরঙ্গ উঠিয়াছে, কত দিক্ দিয়া কত ত্যাগের সংবাদ পাইতেছি। কিন্তু দেশের ইতিহাসসম্বন্ধে তাঁহাদের নিশ্চেষ্টতা বিষময়কর! ঘরে আগুন লাগিলে এক বালতি জল আনিবার মতনও লোক কি দেশে নাই?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞা ও বিদ্বানের গৌরব

মৌর্য-সম্রাট অশোকের অশ্বশাসনে দেখা যায়, তাঁহার সময়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের প্রতি দেশে শ্রদ্ধা কমিয়া গিয়াছিল—দেশবাসীরা প্রকৃত জ্ঞানী ও চরিত্রবান্ ত্যাগী পুরুষদিগকে সম্মান দেখাইতে বিস্মত হইয়াছিলেন। তরুণের দল বাহাতে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদিগকে শ্রদ্ধা করেন, তজ্জন্তু রাজা উপদেশ দিয়াছেন। একদিকে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া অন্যদিকে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে ধর্মের একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করিতে দেন নাই। ব্রাহ্মণ বলিতে তিনি শুধু ব্রাহ্মণবংশজাত ব্যক্তিদিগকে বুঝিতেন না, তিনি সর্বজাতিনির্ভেদে ‘সমাজসাম্য’ প্রচার করিয়াছিলেন। এজন্ত কুল ও শ্রেণী গণ্য না করিয়া, সর্বজাতি হইতে নির্বাচন-পূর্বক ‘ধর্মমহামাত্র’গণ নিযুক্ত করিতেন। সম্রাটের প্রতি তাঁহার অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল। কথিত আছে, কোটিল্য লিখিয়াছিলেন—বিদ্বানের সঙ্গে রাজার তুলনাই হইতে পারে না। রাজা যে দেশে রাজত্ব করেন সেই দেশের ক্ষুদ্রগণ্ডীতে তাঁহার নাম ও প্রতিষ্ঠা। কিন্তু

বিদ্বানের পূজা পৃথিবীব্যাপী। কোটিল্য বিদ্বানের প্রাপ্য সম্মানের কথা অনেকস্থলে বলিয়াছেন, কিন্তু নিজে ব্রাহ্মণ হইয়াও বঙ্গদেশে প্রচলিত তদীয় নীতিমালায় ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধার কথা নাই।

এই বিচার প্রতি যে শ্রদ্ধা জানাইয়া দেওয়া হইল, তাহার ফলে হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণের মধ্যে শ্রমণদের প্রতিপত্তি অসীম হইল। গুপ্তবংশের তাম্রশাসনে দেখা যায়, পণ্ডিত-মণ্ডলী-পরিবৃত হওয়াতে রাজা বিশেষরূপ গৌরবান্বিত বলিয়া বর্ণিত হয়।

শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের প্রভাব। হইয়াছেন। গুপ্ত রাজাদের কবিতা লেখা একটি বিশেষ গুণের মধ্যে পরিণত হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত সিংহ শিকার করিয়া যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, বীণা বাজাইবার দক্ষতা দেখাইয়া তাহা হইতে কম বশ উপার্জন করেন নাই। অশোকের সময়ে প্রাদেশিক অক্ষরে ও প্রাদেশিক ভাষায় অনুশাসন লিখিত হইয়াছে, গুপ্তদের সমস্ত অনুশাসনই দেবনাগরী অক্ষর ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তখন পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের দিকে সর্বসাধারণের লক্ষ্য হইয়াছে—কালিদাসের মত কবি জন্মিয়াছেন, বরাহমিহিরের মত জ্যোতির্বিদদের অভ্যুদয় হইয়াছে, দেশবিদেশের জ্ঞানীদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক ও চায়দর্শনের মীমাংসা লইয়া আলোচনা চলিয়াছে। বড় বড় গ্রীক রাজা ও শকবংশীয় দ্বিধিজয়ী বীরেরা হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ম্যানিগ্রার, কণিক প্রভৃতি বিদেশীয়েরা এই দেশে বাস করিয়া এই দেশের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিদেশীয়েরা নাম বদলাইয়া হিন্দু বা বৌদ্ধ হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ বা সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পুণ্য অর্জন করিয়াছেন, কেহ বা গরুড়স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়া তাহা দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন।

পালরাজগণের সময়ে এই দেশ জ্ঞান ও ধর্মকাজে একেবারে জাঁকিয়া উঠিয়াছিল। তখন বিক্রমশিলা, ওদন্তপুর ও নালন্দার বিহারগুলি জগতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। খজুরাবংশের রাজপুত্র বঙ্গের শীলভদ্র নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ হইয়াছেন। বিক্রমপুরের রাজকুমার দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান পূর্বাকাশের উজ্জল পূর্ণচন্দ্রের জ্যায় উদ্ভিত হইয়া সমস্ত ভূমণ্ডল আলোকিত করিয়া অর্দ্ধজগতের পূজা লাভ করিয়াছেন।

পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ বিশেষ করিয়া পালরাজগণের সময়ে যেরূপ সম্মান ও আদর পাইয়াছেন, তাহাতে তাহাদের রাজ্যকাল আমরা ‘বিজ্ঞানবুগ’ নামে অভিহিত করিতে পারি। চরিত্রবান্ পণ্ডিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে রাজা খুবই সম্মান করিতেন। ব্যাস-বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ কোন রাজার অধীন ছিলেন না, রাজারা যদি তাহাদের চরণগুলির প্রয়াসী হইতেন—তাহা আশ্চর্যের বিষয় হইত না। এমন কি যৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত চানক্যের নিকট যেরূপ গরুড় পক্ষীর মত করজোড়ে থাকিতেন, মুদ্রারাক্ষসে

সে দৃষ্ট অতি পরিষ্কার ভাবে চিত্রিত হইয়াছে; তাহাতেও আশ্চর্য্য হইবার মত কিছু নাই। একমাত্র বীহার মন্ত্রণাবলে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া নিজের সিংহাসন ভারতবর্ষে অদ্বিতীয় প্রতাপশালী করিতে পারিয়াছিলেন সে-হেন চানক্যের অবজ্ঞাসূচক “বৃবল” সম্বোধনেও

কোটিল্য, বর্তমান ও
কেন্দ্রার নিজের প্রতিপত্তি।

তিনি চরিতার্থ হইতেন। এ ব্যাপারেও আশ্চর্য্য হইবার বিষয় নাই—দরিদ্রের পক্ষে স্বপ্নে পাওয়া রাজ্যের মতনই তাঁহার সাম্রাজ্যলাভ আশাতীত সৌভাগ্যহুচনা করিয়াছিল। কিন্তু পালরাজগণ মন্ত্রীদিগকে যে সম্মান দিয়াছেন তাহাতে মনে হয় তৎকালে সর্বসাধারণের ধারণা হইয়াছিল যে, রাজা অপেক্ষা বিদ্বানই শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং নৃপতিরাও অকুণ্ঠিত চিন্তে এই প্রণতি ও শ্রদ্ধা পণ্ডিতদিগকে দিতেন। গরুড় স্তম্ভলিপিতে দেবপাল সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, সামন্ত নৃপতিগণের বিশালকায় হস্তিসমূহের পদদ্বলিতে সমস্ত দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া দেবপালকে লোকলোচনের দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়া রাখিত এবং পরাজিত ও মিত্র রাজাদের অসংখ্য সৈন্তগণের যাতায়াতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎকার সহজ ছিল না, এইরূপ প্রবল পরাক্রান্ত একচ্ছত্র সম্রাট দেবপাল তদীয় মন্ত্রী দর্ভপানির উপদেশ প্রাপ্তির জন্ত অবসর খুঁজিয়া তদীয় গৃহদ্বারে প্রতীক্ষা করিতেন। মন্ত্রী দর্ভপানি রাজসভায় উপস্থিত হইলে রাজা সর্বোপায়ে জ্যোৎস্নাধবল মহার্ষি সিংহাসনে তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করিয়া শেষে বেন সজ্জ্বিত ভাবে তদীয় সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। দর্ভপানি মন্ত্রী হইলেও তাঁহার কর্মচারী ছিলেন। কর্মচারীকে এতটা সম্মান কোন্ রাজা দিয়াছেন? ধর্ম্মপাল রাজার মন্ত্রী গর্গ স্পর্ধার সহিত বলিতেন, “বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দশদিকের একটি মাত্র দিকের অধিপতি করাইয়াছিলেন, সেই একটি দিকেও অশুরগণ তাঁহাকে প্রায়ই পরাজিত করিতেন—বৃহস্পতি তাহা ঠেকাইতে পারিতেন না, কিন্তু আমি ধর্ম্মপাল রাজাকে অখিল দিকের স্বামী করিয়া দিয়াছি।” এই ভাবের অহঙ্কারদীপ্ত কথা সেই মন্ত্রীর বংশধরেরা ধর্ম্মপাল ও তাঁহার বংশধরদের কর্মচারী হইয়াও তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ করিতেন। সুরপালের মন্ত্রী কেমার মিশ্র গোড়া হিন্দু ছিলেন। পালরাজাদের অনেকেই বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁহাদের যজ্ঞাদি মন্ত্ৰ না করারই কথা; কিন্তু গরুড়স্তম্ভলিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে কেমার মিশ্র যখন স্বীয় গৃহে যজ্ঞ করিতেন, তখন সুরপাল স্বয়ং মন্ত্রীর উৎসবে তৎগৃহে উপস্থিত হইয়া অবনতমস্তকে যজ্ঞের বারি মস্তকে লইতেন।

বিক্রমশিলা-বিহারের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে বিক্রমশীল রাজার উপরই ছিল। নালন্দা বিহার পণ্ডিতগণের দ্বারা পরিচালিত হইত, বিক্রমশিলা-বিহারের ভার শুধু রাজার উপর হস্ত ছিল। রাজা স্বয়ং তথায় উপাধি ও পুরস্কার বিতরণ করিতেন। কিন্তু চীনদেশের পর্যটক বিশ্বয়ের সহিত লিখিয়াছেন যে, যখন রাজা স্বয়ং সেই বিহারে প্রবেশ করিতেন তখন কোন ছাত্র বা অধ্যাপক তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়াইতেন না, কিংবা অপর কোন ভাবে সম্মান দেখাইতেন না। বিক্রমশিলা বৌদ্ধবিহার ছিল, এখানেও বিদ্বান ও বিজ্ঞার্থীর সম্মান এতটা বেশী ছিল। এই উপলক্ষে আমাদের সর্বদাই মনে পড়িবার কথা :—

“বিদ্বদ্বক্ষ নৃপদ্বক্ষ নৈব তুল্যাং কদাচন।

স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে ॥”

এই বিজ্ঞার যুগে বিদ্বান্দিগের প্রতি লোকের যে কতটা অগ্ন্যবগ ছিল এবং রাজবাজড়ারা পর্য্যন্ত বিদ্বানের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন তাহার একটা প্রধান দৃষ্টান্ত এই যে, তিব্বতের

এক রাজা বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ দীপঙ্করকে তিব্বতে আনিবার জন্ত কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া শেষে সেই চেষ্টায় নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। আমরা দীপঙ্করের প্রসঙ্গে সেই ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ করিব।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে এই দেশবাসীরা সংস্কৃত যে রীতিতে রচনা করিতেন তাহা 'গৌড়ীয় রীতি' নামে প্রসিদ্ধি পাইয়াছিল। বৈদর্ভী রীতি ও গৌড়ীয় রীতির তুলনা করিয়া দণ্ডাচার্য্য বলিয়াছেন যে গৌড়ীয় রীতি কঠোর ও জটিল এবং বৈদর্ভী রীতি প্রাঞ্জল ও সরল। সেই গৌড়-রীতির উদাহরণস্বরূপ তিনি একটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—“যধানতার্জুনাজগমসদৃক্ষাঙ্কো বলক্ষণ্ডঃ।” তিনি বৈদর্ভী রীতির উদাহরণস্বরূপ আর একটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। যথা—“মালতীমালা লোলালিকলিলা যথা।”

নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর পাশাপাশি এই তিনটা বিশ্ববিদ্যুত বিহার বিজ্ঞান ধাকার ফলে তৎকালের জগতের ঐশ্ব্যনটা বিজ্ঞার সর্বপ্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

গৌড়ীয় রীতি, ভাষার ক্রম-চীন, জাপান, তিব্বত ও এশিয়ার অপরাপর প্রদেশ হইতে ছাত্রগণ বর্জনশীল জটিলতা। উচ্চশিক্ষার জন্ত এই কেন্দ্রে অবিচ্ছিন্ন ধারায় ছুটিয়া আসিত।

এতগুলি পণ্ডিতের সমাগমে এবং নানাবিধ জটিল বিষয়ের আলোচনার দরুন পূর্বাঞ্চলের ভাষাটা কতকটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা সহজ ভাষায় কথা কহিবেন কেন? তাঁহারা কোন কালেই তাহা করেন নাই। এখনও পণ্ডিত-কবিরা ভাষার মারপ্যাচ মারিয়া কথাগুলি হুর্গোধ করিয়া বাহাজুরী লইয়া থাকেন। স্বভাবের মিষ্টকণ্ঠ সঙ্গীত বিজ্ঞার গুরুগণের সভায় বিচার না, তাঁহাদের কালোয়াতি সাধারণের রসবোধের পক্ষে একটু কঠিন হয়। গৌড়ীয় সংস্কৃত যদি এই সময়ে একটু জটিল হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ এই। দণ্ডাচার্য্যের অভিযোগ যে মিথ্যা নহে, তাহা তাম্রশাসনের ও শিলা-লিপির ভাষা আলোচনা করিলেই বুঝা যায়।

“চন্দ্রভোক্তবভূমহীপ্রসরণং সঙ্গপ্রধানাশয়ঃ পাত্রশ্রীমহিতঃ ক্ষুরঙ্গসময়ঃ সোয়ং গভীরঃ পরঃ। রত্নানাং নিলয়ঃ শ্রিয়ঃ কুলগ্রহং স্বাস্থস্থিত-শ্রীপতিঃ হ্রাদেবং সদৃশোহম্মুদেখ্যাদি জলধারোহধবা লজ্জিতঃ।”—এই অংশটি বৈষ্ণবদেবের তাম্রশাসনের ১৮ সংখ্যক শ্লোক। ইহা শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত। ইহার একদিক্ সমুদ্রার্থক, অপরদিক্ বৈষ্ণবদেবের অর্থজ্ঞাপক। এই তাম্রশাসনের একস্থলে রামপালকে রামচন্দ্রের সঙ্গে এবং ভীম কৈবর্তকে রাবণের সঙ্গে উপমা দেওয়া হইয়াছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর দ্বার্থ কাব্যের কথা তাম্রশাসনের লেখক অবগত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ ছন্দের জটিলতা, অর্থের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য, এবং বিচিত্র আলাপ্যারিক গুণসমবিত কবিতা দ্বারা লেখার চেষ্টায় পাল রাজত্বের সময় সংস্কৃত ভাষা প্রাঞ্জলতা হারাইয়া কতকটা হুর্গোধ হইয়া পড়িয়াছিল। দণ্ডাচার্য্য বহুপূর্বে গৌড়ীয় রীতির এই কালোয়াতির কথাই লিখিয়াছিলেন। পালরাজগণের তাম্রশাসনের প্রায় সর্বত্রই এইরূপ ভাষা লইয়া নানারূপ পরবিত্ত ভঙ্গীতে খেলা করিবার দৃষ্টান্ত পাওয়া

যায়। একস্থানে বৈষ্ণবদেবের সৈন্ত সহকারে অভিযান ও যুদ্ধ একটা যজ্ঞের সঙ্গে উপমিত হইয়াছে। তদীয় রণবাতায় অশ্ব-ধুরোথিত ধূলিপটল বালুকাপূর্ণ যজ্ঞভূমির মত দেখাইত; সেই আকাশব্যাপ্ত ধূলিপটলে সূর্য্যদেবের অশ্বগণের গতিরোধ হইত; দেবরাজ ইন্দ্র দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিয়া সেই অবিচ্ছিন্ন ধূলিরাশি হইতে স্বীয় দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করিতেন; এদিকে আবার দুইটি হস্তই চক্ষু রক্ষায় ব্যাপৃত থাকায় ইন্দ্র আর কোন কার্য্যই করিতে পারিতেন না, তাঁহার গুরুতর কর্তব্যগুলি অসম্পাদিত থাকিয়া যাইত। দেবচক্ষু মুদিত হয় না, তাহা অপলক। সুতরাং দেবরাজ দেবতাগণের কর্ম্মফলের নিন্দা করিতে থাকিতেন, কেন তাঁহারা চক্ষু বুজিতে পারেন না? ইহা তাঁহাদের কর্ম্মফল, যদি চক্ষু বুজিতে পারিতেন তবে দুইটি হস্তকে একপভাবে নিযুক্ত রাখিতে হইত না। ইহার পরের শ্লোকে উপমা আরও অনেকদূর গড়াইয়াছে। শত্রুসেনার শরীর এই যজ্ঞের ইন্ধন, রিপুশির হোমাগ্নির শ্রীফল, শত্রু নরপালগণের নিধন এই যজ্ঞের পূর্ণাছতি। (কর্মোলিলিপি ১৫ ও ১৬ শ্লোক।) এইরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। রামায়ণাদির বে প্রাঞ্জলতা ছিল, পুরাণ ও মহাভারতেও তাহা কতক পরিমাণে বজায় ছিল। মুচ্ছকটিক, মুদ্ভারাক্ষস প্রভৃতি নাটকও কতক পরিমাণে প্রাঞ্জল ছিল। কালিদাসের সময় হইতে অলঙ্কারের দিকে কবিদের ঝোঁক পড়ে। কালিদাসের উপমা ও ভাবা চমৎকার—কিন্তু মাঝে মাঝে উপমাগুলি একটু কষ্টকল্পিত ও ভাবা একটু জটিল। ভবভূতির সময় পাণ্ডিত্যের প্রভাব সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচণ্ড বেগে আসিয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিতগণ ভাবাকে গুরুগম্ভীর, কখনও বা বীণা নিঃস্বনের স্থায় মধুর করিয়া ভাবার উপর অসামান্য অধিকার দেখাইয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও কালিদাসের ভাষায় যতটা প্রাঞ্জলতা ছিল, ভবভূতির ভাষায় তাহা পাওয়া যায় না। তবে ভবভূতি নিজের ভাবপ্রবণতায় আবিষ্ট হইয়া লিখিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছলিত স্নেহ ভাগীরথীর স্থায় শতধারায় ছুটিয়া পাণ্ডিত্যের ঐরাবতকে যেন শ্রোতে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার পরে সংস্কৃতের পুনরুত্থানে পণ্ডিতগণ আসর জমকালো করিয়া বসিয়াছেন। ভাবার প্রাঞ্জলতা তাঁহাদের উদ্দিষ্ট নহে, ভাবার বাহ্যিক দেখানই তাঁহাদের লক্ষ্য হইয়াছিল। মগধের রাজসভায় বঙ্গের পণ্ডিতগণ বৈদর্ভী রীতিকে কতকটা অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকিবেন। শ্রীহর্ষচরিত, দশকুমারচরিত, কাদম্বরী প্রভৃতি রচনায় পাণ্ডিত্যের চূড়ান্ত ও অলঙ্কার-নিপুণতার একশেষ দেখানো হইয়াছে। কাদম্বরী ও শ্রীহর্ষচরিতে সংস্কৃত গল্পলেখার একরূপ পূর্ণতমপুষ্টি দৃষ্ট হয়, বাহাতে লেখকগণ শব্দ দ্বারা যে কিরূপ অসাধারণ চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু সেই সকল শব্দ একত্র করিয়া যে শব্দবাহ বা সন্ধির দুর্গ সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা ভেদ করা সকলের সাধ্য নহে। এদিকে নালন্দা প্রভৃতি বিহারে যে বৌদ্ধ জায়দর্শনের স্মৃদুত ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল, তাহার ছাঁচ বদলাইয়া হিন্দু দার্শনিক ও নৈয়ায়িকগণ যে স্বপ্ন বিপ্লবাত্মক কূট তর্কের মঠ গড়িয়াছিলেন—তাহা জগতের বিশ্বয় অথবা মূর্ত চিন্তাশীলতার স্বরূপ ধারণ করিয়া পরাধীন বাঙ্গলার অপূর্ণ কীর্তি হইয়া রহিয়াছে।

ইহার পরবর্তী অধ্যায়ে বাঙ্গালীরা সংস্কৃত ভাষাকে পাণ্ডিত্যের জটিল প্রকোষ্ঠ হইতে ধীরে ধীরে প্রমোদ-ভবনে ফিরাইয়া আনিলেন। উমাপতি ধরের প্রশস্তি ভাষার সন্ধিস্থলের রূপ প্রকটিত করিতেছে। কতকগুলি জটিল ও কূট-সন্ধির বন্ধনীর মধ্যে থাকিয়াও ভাষা অনেকটা জীবনের স্বচ্ছন্দ গতি ফিরাইয়া পাইয়াছে; অলঙ্কারের গুরুভার লঘু হইয়াছে। কিন্তু জয়দেবের কাছে সেই জটিলতাও ভাল লাগে নাই। কি সমাজ, কি রাষ্ট্রনীতি, কি সাহিত্য—কোন স্থানেই বাঙ্গালীর প্রতিভা দীর্ঘকাল দাসত্বশ্রমে বদ্ধ থাকিতে চায় নাই। যাহা জীবন্ত, গতিশীল ও প্রাণম্পর্শী তাহার দিকেই বাঙ্গালীর ঝোঁক। রাখাল-বালক বৈরূপ সারাদিন রাজ্য সাজিয়া মৃৎস্তম্ভকে সিংহাসনে পরিণত করিয়া অভিনয় করে, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা উর্দ্ধ্বাসে মাতার অঞ্চলতল খোঁজে, বাঙ্গালীর প্রতিভাও সেইরূপ দর্শন, বিজ্ঞান, অলঙ্কার শাস্ত্র লইয়া দিনভোর নাড়াচাড়া করিয়া শেষে গৃহের আঙ্গিনায় আসে—

জয়দেবের আবির্ভাবে
ভাষার প্রাচলতা।

স্বপ্নের সহিত কথা কহিয়া প্রাণ জুড়াইতে। জয়দেব সেইরূপ সংস্কৃত আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া কদিত প্রাকৃতের অনুরাগী হইয়াছিলেন,

তাহার রচনায়ও সন্ধি-সমাসের বাহুল্য আছে কিন্তু তন্মধ্যে ভারি গহনা একখানিও নাই। যাহা কিছু আছে তাহার ব্যবহার কষ্টকর বা গুরুত্ব হয় নাই, অপিচ তিনি সংস্কৃতের লৌহহার খুলিয়া দিয়া তাহাতে পাড়াগাঁয়ের চলিত কথার বহর ঢালাইয়াছেন, তাহার “চল সখি কুঞ্জঃ” “অলিকুল-সহুল কুসুম-সমূহ” “বধুজন-জনিত-বিলাপে” “কোকিল-কুজিত-কুঞ্জকুটীরে” “ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিণীলন-কোমল-মলয়-সমীপে” প্রভৃতি পদ সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গলার সন্ধি হুচক—তিনি সংস্কৃতে রীতিকাব্য লিখিয়াছেন কিন্তু মনে হয় এই উপলক্ষে বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের দ্বারে অপাণ্ডিত্যের না হইয়া থাকে,—এই জন্ত তাহার একটা চেষ্টা রচনার সর্বত্র দৃষ্ট হয়। তিনি বহু বাগাড়ম্বর ভাল বাসিতেন না, তজ্জন্তই উমাপতি ধরকে নিন্দা করিয়াছেন এবং বাঙ্গলার কোমল প্রাণের ভাষায় একমাত্র কোমল কান্ত পলাবলী রচনা করিতে তিনিই দক্ষ—এই শ্রাব্য করিয়াছেন। কপিলবস্তুর রাজকুমার ঐশ্বর্য ছাড়িয়া ভিখারী সাজিয়া ছিলেন, হর্ষবর্জনা দি কত রাজ্য সেইভাবে কলতরু সাজিয়া সর্বত্র বিলাইয়া দিয়া নিঃস্ব হইতেন। বাঙ্গলাদেশেও এইরূপ বাহু সম্পদ ছাড়িবার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বাহুল্য ছাড়িয়া স্বভাবে ফিরিয়া আসার শক্তি বাঙ্গালীর যতটা আছে জগতে আর কোন জাতির তাহা আছে কিনা জানি না। জয়দেব সংস্কৃতের জটিল বাধ ভাঙ্গিয়া দিয়া ভাষাকে গতিশীল করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার গীত-গোবিন্দ এখনও বাঙ্গলার দ্বারে দ্বারে কলনিঃস্থনে বহিয়া চলিতেছে।

এই বিজ্ঞান যুগের যে প্রবল পাণ্ডিত্য তাহা এখনও বাঙ্গলার পাড়াগাঁয়ের বাসুন

বাঙ্গলার পাড়াগাঁয়ে
বিজ্ঞানযুগের প্রভাব।

পণ্ডিতদের কদিত ভাষার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে।

মৌর্য, গুপ্ত এবং পালদিগের রাজত্বের কোন শিক্ষা বা কথাই বাঙ্গলায় ব্যর্থ হয় নাই। আমরা দেখাইব, এই সকল যুগের

প্রকৃত উত্তরাধিকারী আমরাই হইয়াছি, আধ্যাত্মিকের আর কোন জাতিই সেই যুগের

গুণরাশির ততটা দাবী করিতে পারেন না, যতটা আমরা পারি—যেহেতু মগধবাসীরা ধীরে ধীরে পাটলীপুত্রের আওতা ছাড়িয়া ক্রমে পূর্বদিকে হটিয়া গৌড়ে আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

“Indian Pandits in the Land of Snow” নামক পুস্তকে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—
“The close resemblance which the modern Bengali bears to the Magadhi, and the comparison of the customs of the ancient Magadhi people with those of the modern Bengalis show that the latter have descended from the former.....It may be inferred that we are the descendants of the very people who constituted the central empire of Magadha though we have thus far, in the course of two thousand years and a half, moved to Bengal, replacing the original Bengalis who moved further East and South to Burmah and Siam” (p. 21).

[“বাঙ্গালা ভাষা ও মাগধীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ,—প্রাচীন মগধবাসীদের রীতি নীতির সহিত বর্তমান বাঙ্গালীদের রীতিনীতির ঐক্য প্রভৃতির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বর্তমান বাঙ্গালী জাতি—মাগধীদের বংশধর।.....ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরাই আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে মগধ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমির অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহারা এই দীর্ঘ কালের মধ্যে বঙ্গ দেশের আদিম অধিবাসীদিগকে, ব্রহ্মদেশে ও শ্রামে বিতাড়িত করিয়া এই দেশে উপনিবিষ্ট হইয়া ছিলেন। ”]

অর্দ্ধমাগধী এমন কি পৈশাচি প্রাকৃতের সমস্ত অপপ্রয়োগ লাহিত-পূর্ব সীমান্তের গ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আজও তাঁহাদের অন্তঃপুরে কথিত ভাষার মধ্যে সংস্কৃতের অতি পণ্ডিতী বাঙ্গালা।

গুরুগম্ভীর শব্দ সর্বদা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের চলিত কথা অপভ্রংশ প্রাকৃত। সেই কথায় কেধায়ও “ও” স্থলে “উ” (যথা “চোর” চুর, সোল স্থলে হল, সাত স্থলে সূত), কোধায়ও বা উ স্থলে ও (যথা তুফান স্থলে তোফান), ট স্থলে ঠ (যথা ছোট স্থলে ছোঁট), ও স্থলে উ (যথা ঢোলের স্থলে ডুল), ন স্থলে ল (যথা নাড়া স্থলে লাড়া), শ স্থলে হ (যথা শালা স্থলে হালা) ইত্যাদি নানারূপ প্রয়োগ দ্বারা দেখা যায় যে প্রাকৃত ভাষার গতির স্বাভাবিক নিয়মে তাঁহাদের কথিত ভাষার একটা স্থায়ী রকমের বিভিন্নতা দাঁড়াইয়া গিয়াছে; কিন্তু তথাপি তাঁহারা সেই সকল প্রাকৃত ভাষার আনুগত্য স্বীকার করিয়াও এবং তাঁহাদের ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের বিচিত্রমুখী গতি সত্ত্বেও সেই পণ্ডিতী যুগের জয়পতাকা উড়াইয়া রাখিয়াছেন। কথিত ভাষায় শব্দের প্রাকৃতরূপ তাঁহারা শতবার স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি দেবভাষার কতকগুলি চিহ্ন ভাষা হইতে মুছিয়া ফেলিতে স্বীকৃত হন নাই। কোন কোন স্থানে উচ্চারণদোষে তাঁহাদের সংস্কৃত দোষাবহ এমন কি উপহাস্যাম্পদ হয়—তথাপি সেই সকল শব্দ তাঁহারা ছাড়িবেন না। ‘ভাত’কে ‘অন্ন’ বলিবেন, ‘জুতো’কে ‘পাছকা’, ‘কাঠ’কে ‘কাঁঠ’, ‘কাটাল’কে ‘কণ্টকী’, ‘ঘাম’কে ‘ঘর্ষ’, ‘চামড়া’কে ‘চর্ষ’, ‘ঘি’কে ‘ঘৃত’ ‘খাওয়া’কে ‘ভক্ষণ’, ‘দেখা’কে ‘দর্শন’ ‘বাসুন’কে ‘ব্রাহ্মণ’ প্রভৃতি সামুভাষা তাঁহারা নিরন্তর কথোপকথনের ভাষায়ও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কোন কোন স্থলে রাঢ়ের লোকেরা পূর্বাঞ্চলের লোককে এজ্ঞা ঠাট্টা করিয়া থাকেন। বিজ্ঞপকারীরা একটা শ্লোক লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে “পূর্বাঞ্চলের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে কখনই আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে না, কারণ তাঁহারা ‘শতায়ু হও’ এই বলিতে যাইয়া ‘হতায়ু হও’ এই আশীর্বাদ করিয়া ফেলেন।” আপনারা যদি মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের “প্রবোধচক্রিকা” এবং শত বৎসর পূর্বের আর কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন সেই পালরাজত্বের ‘পণ্ডিতী যুগ’ যাহা গোড়ীয় রীতি-অনুগ বলিয়া দণ্ড্যাচার্য লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কি ভীষণ প্রভাব একসময়ে আমাদের বাঙ্গালাভাষার উপর পড়িয়াছিল। ইহার বহু উদাহরণ আপনারা আমার “Bengali Prose Style” নামক পুস্তকে পাইবেন। প্রবোধচক্রিকা হইতে একটি মাত্র উদাহরণ দেখাইতেছি—“অনভিব্যক্ত বর্ণাশ্রমনি মাত্র রাজা পরানামী ভাষা যেমন অভিনব কুমারদেব ভাষা তদনন্তর অভিব্যক্ত বর্ণমাত্রা পশুপ্তি নামক ভাষা দ্বিতীয়া যেমন প্রাপ্তমৎকিঞ্চিদয়স্ক বালকবাণী।”

আর্য্যাবর্তের আর কোন প্রাদেশিক ভাষার উপর গোড়ীয় রীতির এতটা প্রভাব দেখা যায় না। তাহারা তাম্রলিপি ও শিলালেখ লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ গোড়দেশেরই পণ্ডিত এবং তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের কীর্তিরক্ষার্থে যে তাঁহারা অমনোবোগী ছিলেন না, তাহা এই সকল উদাহরণের দ্বারা সহজেই বুঝা যাইবে।

সেদিন আমাদের নটরাজ গিরিশচন্দ্র প্রক্লেশ নামক নাটকে একটি স্ত্রী-চরিত্রের মুখে যে ভাষার আড়ম্বর দেখাইয়াছেন, তাহা ঠিক করনাপ্রসূত নহে। অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও যে গোড়ীয় রীতির প্রভাব পড়িয়াছিল তাহার প্রমাণও অশিক্ষিত লোকের সাধুভাষা-ব্যবহারের চেষ্টায় মাঝে মাঝে ধরা পড়ে। সেগুলি আর ভাষার অলঙ্কার বলিয়া গণ্য হইবার মতন নহে, তাহা বরঞ্চ ভাষার রোগ বলিয়া ধরা যায়। সেদিনও এক চাষা আমাকে বলিতেছিল, “বাবু, এবার আমাদের ক্ষেতে অসহ ধান হইয়াছে।” আর একজন তাহার জামাতার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়া বাহু প্রসারণপূর্বক বলিয়াছিল, “দেখুন, আমার উপর সে চটিতে পারে, কিন্তু আমার কতাকে সে মারিবে কেন? তাহার উপর এতটা অমুরাগ কি ভাল?”

পালাধিকারে বঙ্গীয় সমাজে এক গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছিল। যদিও অশোকের সময় হইতে প্রকৃত গুণবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রাজদরবারে বিশেষরূপ সমাদৃত হইয়া আসিয়াছিলেন, তথাপি গোঁড়া হিন্দুর দল এই সম্মানে প্রীত ছিলেন না। বুদ্ধ বংশের সময় হইতে ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্য অতিমাত্রায় প্রশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। অশোক ধর্মমহামাত্রদের পদের সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণগণের কোপের ভাজন হইয়াছিলেন, বজ্জে পশুহননবিধি রহিত করিয়াও বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণদিগের বিদ্বেষপাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন, এ সকল কথা ১৮৩-৮৪ পৃষ্ঠায় আমরা কতকটা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিয়াছি। পুষ্টমিত্র ব্রাহ্মণ্য-ধ্বজা উত্থাপিত করিয়া বৌদ্ধদিগের প্রতি ভীষণ

গুরুতর সামাজিক
পরিবর্তন।

প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ব্রাহ্মণদের বলবৃদ্ধি হইতেছিল, অন্ধ্ররাজগণও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃসমুখানের পরিপোষক হইয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এদিকে বৃহৎবঙ্গে পালরাজাদের সময়ে বৌদ্ধ-হাওয়া পুনরায় সবেগে প্রবাহিত হইতেছিল। তিব্বতের রাজা লাঃ লামা ইয়েসি, ব্রাহ্মণ্যধর্মের নেতা গারোয়ালের রাজার হস্তে উৎপীড়িত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

এদিকে পালরাজাদের সময়ে নালন্দা, ওদন্তপুর, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বহু বৌদ্ধবিহার—জ্ঞান ও বিজ্ঞার প্রথর রশ্মি বিতরণ করিয়া বৌদ্ধধর্মকে জয়যুক্ত করিয়াছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিব।

পালরাজগণ, বিশেষ করিয়া শেষের দিকের পালবংশের কতিপয় রাজা, প্রকৃত বোণ্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রতি সশ্রদ্ধ থাকিলেও তাঁহারা বৌদ্ধধর্মেরই পরিপোষক ছিলেন। আর্য্যাবর্তের ও দক্ষিণাপথের গোঁড়া ব্রাহ্মণের দল এদেশকে অভিশপ্ত মনে করিয়া ত্যাগ করিলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে—এখানে জনসাধারণ অতি পূর্বকাল হইতেই ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী ছিল এবং এদেশ বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল, সুতরাং যদিও কপিল মুনির আশ্রম এবং প্রাচীন শৈবধর্মসংক্রান্ত অনেক তীর্থ এখানে বিরাজ করিত—তথাপি পালাধিকারে নবোখিত ব্রাহ্মণগণ এই দেশকে ব্রাহ্মণদিগের বাসের অযোগ্য মনে করিয়া এদেশের সঙ্গে সমস্ত হিন্দু-সমাজের সম্বন্ধ ত্যাগ করাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে রাঢ় অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণব পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে বৌদ্ধপ্রাধান্ত দেখিয়া পদ্মা ও বুড়িগঙ্গাকে গঙ্গার শাখা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত এবং ভগীরথ-খাত খালের গৌরব বাড়াইয়া ঐ দুইটি বৃহৎ নদীর জাতি মারিয়াছেন, তেমনই করিয়া পালাধিকারে ভারতের নবমুঠ ব্রাহ্মণ্য-শাসিত হিন্দুসমাজ বঙ্গ ও অপরায়ণ বৌদ্ধাধিকৃত স্থানসমূহ তাঁহাদের গণ্ডী হইতে বর্জন করিলেন। ফলে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধ বর্জিত হইল। তীর্থযাত্রা ছাড়া অল্প কোন উদ্দেশ্যে এই সকল দেশে আসিলে হিন্দুর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে—এই বিধি প্রচারিত হইল। সমুদ্রযাত্রা নিষেধ এবং ভারতের বড় বড় বাণিজ্য-কেন্দ্রের বর্জন দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে বাণিজ্যলক্ষ্মী একরূপ বিতাড়িত হইলেন।

সামাজিক এই গুরুতর পরিবর্তনের ফলে এই দেশ ব্রাহ্মণ-বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। আমরা এই পুস্তকের ৭১ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি যে এদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশের হিন্দু কেন্দ্রে আশ্রয় লইয়া জাতিরক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত, এম. এ., পি. আর. এস. মহাশয় তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন।

৮৮ পৃষ্ঠায় সিংহল-প্রবাসী শ্রীযুক্ত জগদীশ্বরমের একটি প্রবন্ধের কতকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে—ঐ প্রবন্ধটি কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে অতি স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত আছে—দক্ষিণাপথের কানেড়ার লক্ষ লক্ষ কঙ্কণ ভাবাত্মী ব্রাহ্মণ বাংলাদেশ হইতে তথায় গিয়াছেন বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের

ব্রাহ্মণগণের বাংলাদেশ
ত্যাগ।

ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিত নৈকট্য। এক্ষেত্রে এখনও ভালরূপ অনুসন্ধান চলে নাই; কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—পালাধিকারে গৌড়দেশের ব্রাহ্মণগণ ভারতবর্ষের নানা-স্থানে গমন পূর্বক তত্তৎ স্থানে অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং এই জন্ত—

“অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র-মগধেষু চ।

তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃসংস্কারমহতি।”

—প্রভৃতি শ্লোকের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এই জন্ত শূরভাজগণের পূর্বপুরুষকে কনোজ হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া নব ব্রাহ্মণ্যধর্মকে এদেশে প্রোচ্ছল করিতে হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধ-বিহার

পাল-রাজত্ববর্ণের সময়ে জাতীয় উচ্চ শিক্ষা গৌরবের তুঙ্গশিখরে উঠিয়াছিল। কোথায় গেল সেই নালন্দা,* ওদন্তপুর (সং উদয়পুর), বিক্রমশিলা, জগদল ও স্তবর্ণ বিহার? এই যুগ বাঙ্গালা ইতিহাসের স্বর্ণযুগ;—ইহা স্থপতি ও কলাশিল্পের স্বর্ণযুগ—ইহা বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষার স্বর্ণযুগ—এই যুগের গৌরবস্বত্তি বাঙ্গলাদেশকে চিরকাল উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া নালন্দা-বিহার গৌড়মণ্ডলের—তথা এশিয়ার—সর্বপ্রধান বিজ্ঞানকেন্দ্র-রূপে বিরাজ করিতেছিল। বিহারে রাজগিরির ৭ মাইল উত্তরে বড়গাঁও বলিয়া যে পল্লী

নালন্দা—১০ কোটি স্তবর্ণ-
মুদ্রার ক্রীত আশ্রয়কানন।

বিজ্ঞান, তাহাই এক সময়ে নালন্দা-বিহারের গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল। কথিত আছে পাঁচশত বর্ষিক ১০ কোটি স্তবর্ণমুদ্রা-মূল্যে বুদ্ধদেবের জন্ত এক বিশাল আশ্রয়কানন ক্রয় করেন। সেই আশ্রয়-কাননে উত্তরকালে নালন্দা বিহারের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। পালি সাহিত্যে মাঝে মাঝে ‘নালো’ গ্রামের উল্লেখ থাকিলেও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে ইহা একটি অখ্যাত পল্লীমাত্র ছিল। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সিংহলাদিপ যবরাজ এইখানে একটি বড়রকমের বিহার-নির্মাণের অহুমতি পাইয়াছিলেন, ৩৩০-৩৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আশ্রয়ণে এই বিহার নির্মিত হইয়াছিল। জৈন ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, ৫০০ খৃঃ পূর্বে এইস্থানে রাজা বিশ্বিসারের

* নালন্দা-বিহারের সমকালবর্তী আরও কয়েকটি বৌদ্ধবিহার বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ভাগলপুরের পাথরখাটার অবস্থিত বিক্রমপুর-বিহার, ওড়িশাতে বলভি বিশ্ববিজয়লয়। এই বিজয়লয়ে ১০০ শত বিহারে ছয় হাজার ভিক্ষু থাকিত, এতদ্ভিন্ন স্থবিখ্যাত তক্ষশিলা শিক্ষাকেন্দ্রের কথা সর্বত্র সুবিদিত।

রাজত্বকালে কোন জৈন সন্ন্যাসী একটি আশ্রম স্থাপন করেন—নালন্দা-বিহার
ক্রমিক ইতিহাস। তাহারই বিকাশ। লামা তারানাথের মতে অশোকই এই

বিহারের প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য সারিপুত্র
নালন্দায় জন্মগ্রহণ করিতে এইস্থান বৌদ্ধতীর্থস্বরূপ গণ্য হইয়াছিল। খৃঃ দ্বিতীয় এবং
তৃতীয় শতাব্দীতে নাগার্জুন এবং আর্যদেব এই পল্লীতে স্থাপিত বিহারের অনুরাগী
হইয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণু নামক এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ মহাযান-প্রবর্তিত
শ্রীবিষ্ণুকৃত ১০৮টি মন্দির।

অভিধর্মের সম্যক শ্রীবুদ্ধির জন্তু এখানে ১০৮টি মন্দির নির্মাণ
করিয়াছিলেন। ৪০০ খৃঃ অব্দের সম্মিলিত কোন সময়ে বিখ্যাত চীন পর্যটক ফা-হায়েন
এই বিহার পরিদর্শন করেন—তিনি পল্লীটিকে “নালো” নামে অভিহিত করিয়াছেন। বুদ্ধের
প্রধান শিষ্য সারিপুত্রের সমাধিমঠ তিনি এইখানে দেখিয়া গিয়াছিলেন। বঙ্গের উজ্জলরত্ন
খজ্রাবংশীয় রাজকুমার শীলভদ্র যখন নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন, সেই সময়ে সপ্তম শতাব্দীর
প্রারম্ভে হিউনসান্স এই বিহারে ১৫ মাস অবস্থান করিয়া সেই বিশ্ববিদ্যুত প্রণীতবরের নিকট
সংস্কৃত শিক্ষার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধনির্করণের পর পাঁচজন নরপতি এইস্থানে
পাঁচটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই পাঁচজন রাজা ছিলেন—শক্রাদিত্য, বুদ্ধগুপ্ত,
তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্য এবং বজ্র। উত্তরকালে ক্রমান্বয়ে বহু রাজত্বের মুক্তহস্ত দানশীলতা,
আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা, এবং স্থপতি ও চাক্ষুশবিদগণের প্রচেষ্টায় নালন্দা-বিহার একরূপ
একটা কীর্তি হইয়া দাঁড়াইল যে, ৬৬৭ খৃঃ অব্দে হিউনসান্স যখন ইহা প্রথম দর্শন করেন
তখন ইহার সমৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এই বিহারে বহু সহস্র
সর্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত বাস করিতেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম বৌদ্ধজগতে সুপরিচিত
ছিল। তাঁহারা শুধু পাণ্ডিত্যের জন্ত বিখ্যাত ছিলেন না, তাঁহারা বিনয়ের সূত্রগুলি অঙ্গীকারে
অতি কঠোরভাবে পালন করিয়া নরসমাজে আদর্শস্থানীয় হইয়াছিলেন। তাঁহারা
শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতে একরূপ তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, কিরূপে রাতদিন চলিয়া
যাইত অনেক সময়ে তাঁহাদের তাহা খেয়াল থাকিত না। নালন্দা-বিহারের নাম একরূপ
সম্মানের ছিল যে, কোনস্থানে প্রতিষ্ঠা পাইবার আশায় পণ্ডিতগণ নালন্দা-বিহারে পাঠ
করিয়াছেন, মাঝে মাঝে স্বার্থের জন্ত একরূপ মিথ্যা পরিচয়ও দিতেন। তাঁহারা এই বিহারে
পাঠ করিতে আসিতেন তাঁহারা অধিকাংশই দ্বারপণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তর ভাল করিয়া না
দিতে পারিয়া প্রবেশলাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহারা আধুনিক ও প্রাচীন শাস্ত্রে উত্তমরূপে
ব্যুৎপন্ন না থাকিতেন, নালন্দা-বিহার তাঁহাদিগকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করিতেন না। প্রত্যেক

১০ জন আবেদনকারীর মধ্যে দুই তিনজন মাত্র গৃহীত হইতেন,
বাকী প্রার্থীরা ফিরিয়া যাইতেন। হিউনসান্স যখন নালন্দায় ছিলেন
তখন যে সকল পণ্ডিতচূড়ামণি সেই বিহার অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন,
তাঁহাদের মধ্যে এই কয়েকটি নাম বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য—শীলভদ্র, জ্ঞানচন্দ্র, জিনমিত্র,
স্থিরমতি, গুণমতি, চন্দ্রপাল এবং ধর্মপাল।

অপর একজন চীনপণ্যটক দীর্ঘকাল এই বিহারে অবস্থান করিয়াছিলেন (৬৭৩-৬৮৪ খৃঃ)। তাঁহার নাম ইংচিং। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন (৬৭৩ খৃঃ) নালন্দা-বিহারে আটটি বৃহৎ পাঠাগার এবং তাহা ছাড়া ৩০০ প্রকোষ্ঠ ছিল। এই সকল ইংচিং।

প্রকোষ্ঠে ৩০০০এর অধিক শ্রমণ বাস করিতেন। রাজগণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহার্থ ২০০ সমৃদ্ধ গ্রাম দিয়াছিলেন। ৪৫০ খৃঃ হইতে নালন্দা-বিহারের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। সুপ্রসিদ্ধ হন রাজা মিহিরকুলের সমকালবর্তী (৫১৫ খৃঃ রাজত্ব আরম্ভ) বালাদিত্য এইখানে একটি বিহার নির্মাণ করেন। কিন্তু তাহার পূর্বেই আরও তিনজন রাজা তথায় বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে শত্রুদিত্য ৪৫০ খৃঃ অব্দে 'আদি বিহার' স্থাপন করিয়াছিলেন। বহু মন্দিরগাত্রে যে সকল শিলালিপি ছিল তাহা হইতে জানা যায়, পাল রাজারাই ইহার সর্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন, এই রাজাদের অনেকগুলি রাজধানী ছিল, যথা—মগধ, বিলাসপুর, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতি। গোপাল, মহীপাল, বালাদিত্য, নরপাল, রামপাল এবং গোবিন্দপাল এই বিশাল বিহারকে অকুণ্ঠ ও মুক্তহস্ত ব্যয়ের দ্বারা পৃথিবীর অত্যন্তম শ্রেষ্ঠ কীর্তি করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

নালন্দা বিহার ৩০০০ ফুট প্রসারিত উচ্চভূমিখণ্ডের উপর অবস্থিত ছিল। ইহার সম্মুখে বড়গাঁয়ের সুদর্শন হ্রদগুলির নীলজলে কুমুদ-কল্লার সুরভি বিতরণ করিত। নালন্দার প্রধান বিহারটির আয়তন ছিল ১৬০০×৪০০ ফুট। চতুর্দিকে

স্থাপত্য ও কারুশিল্প।

আর ৬টি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর বিহার, সহচরীরা বেরূপ রাজকুমারীকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তরূপ সেই প্রধান বিহারকে মণ্ডিত করিয়াছিল। বালাদিত্য রাজার মঠ নালন্দার সর্বোচ্চ দর্শনীয় বস্তু ছিল। ইহার চূড়া ৩০০ ফুট উচ্চে আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছিল। এই সুবিশাল এবং উচ্চ মঠের চতুর্দিকে শ্রীবিষ্ণুর ১০৮টি মঠ পদের ১০৮টি দলের মত দেখাইত। ইহার বহুতানকগুলির উর্দ্ধে প্রসারিত অদ্বুত রাক্ষস-মুখ কারুকাণ্ড, বিচিত্রবর্ণে অমুরঞ্জিত অলিন্দ, আরক্ত চুনীর জমকাল স্তম্ভ এবং নানারূপ কারুখচিত উজ্জল রেলিংগুলির প্রশংসা হিউনসাঙ্গের মুখে যেন ধরে না। আজ অজস্রা, ইলোরা ও হস্তিনাপুর যে বিচিত্র ছবি দেখিয়া জগতের কারুশিল্পিগণ আশ্চর্য্যাবিত হইয়া গিয়াছেন, এবং বাহা বিধাতার ক্রোধ ও ভিন্নধর্মীদের অত্যাচার হইতে বনজঙ্গলের একান্ত নিভৃতে থাকিয়া কথকিং ভাবে আশ্রয়লা করিয়াছে, আর্ঘ্যাবর্ত তথা সমস্ত এসিয়ার সর্বপ্রধান বৌদ্ধকেন্দ্র, বিশ্ববিজয়ী সম্রাটদের মুক্তহস্ত দানশীলতায় পুষ্ট নালন্দা-বিহারের চিত্র ও স্থাপত্যের নিদর্শন যে সেগুলি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ছিল তাহা কি আমাদের ভাবা স্বাভাবিক নহে? আর্ঘ্যাবর্ত হইতে ভগবান্ নরলীলার সমস্ত চিত্র মুছিয়া ফেলিয়াছেন। প্রকৃতি তাঁহার নিরুপম শিল্পকলার সহস্র সহস্র কুহুম ও কোরকচিহ্ন বনেজঙ্গলে সৃষ্টি করিয়া দিবসান্তে নির্দম হস্তে ধ্বংস করিয়া ফেলেন, এই ভাবেই আর্ঘ্যাবর্তে শিল্পীর শিল্প, স্থপতির স্থাপত্য ধ্বংস পাইয়াছে, তাহার জন্ত দোষী করিব কাহাকে?

শ্রমণ এবং অধ্যাপকদের গৃহ সাধারণতঃ চৌতল ছিল। নবতল গৃহও ছই একটি ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটের সংযোগে এরূপ নৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে যে, ভাস্কর স্থানার বলিয়াছেন—

ধর্মগঞ্জ।

“আধুনিক জগতের কোন ইষ্টক-নির্মিত গৃহই এই নালন্দার নির্মাণ-কৌশলের গা যেঁষিয়া দাঁড়াইতে পারে না। ইটের সঙ্গে ইট এমনই সূচাক্রমে গ্রথিত হইয়াছে যে, তাহাতে জোড়ার কোন চিহ্নই নাই। কানিংহাম এবং ব্রাডলি এই নালন্দার স্থপতি ও শিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলিয়াছেন—“জগতের কোন এক স্থানে এরূপ আশ্চর্য্য কলা ও স্থপতিশিল্পের এতগুলি নিদর্শন আমি দেখি নাই।” কানিংহামের মত পণ্ডিতের এই উক্তি মূল্য খুবই বেশী। অথচ তাঁহারা ভাঙ্গাচুরা কিছু উপকরণ দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। হায় নালন্দা! বহুপূর্বে হিউনসাঙ্গ বলিয়াছিলেন, “The monasteries of India are counted by myriads, but this is the most remarkable for grandeur and height.” “ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র বিহার আছে, কিন্তু শোভা-সমৃদ্ধি ও উচ্চতায় নালন্দা-বিহারের তুলনা নাই।” নালন্দা-বিহার যেখানটায় ছিল, সে যারগার নাম ছিল ধর্মগঞ্জ। এই ধর্মগঞ্জের তিনটি বিখ্যাত মন্দির ছিল—রত্নসাগর, রত্নবোধী এবং রত্নরঞ্জক। রত্নবোধী নবতল গৃহ ছিল। এই পুস্তকাগারে প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র, সমাজ ও বহুবিধ হ্রলভ তাত্ত্বিক গ্রন্থ সংগৃহীত ছিল। তুরস্ক অভিযানে এই রত্নবোধী ধ্বংস পায়—ও ইহার বাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহার এক প্রান্ত অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়। ৭৪০ খৃঃ অব্দে আমরা নালন্দার শেষ খ্যাতি শুনিতে পাই—তখন কমলশীল এই বিহারের তত্ত্বের উপাসক ছিলেন। বালাদিত্য-নির্মিত তিনশত ফুট উচ্চ অপূর্ণ কারুকার্য্যমণ্ডিত বিহারের উত্তরদিকে বুদ্ধের আশী ফুট উচ্চ একটি তাম্রমূর্তি ছিল। মহারাজ অশোকের বংশধর রাজা পূর্ণবর্মা ৬০৪ খৃষ্টাব্দে মূর্তিটি নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। ইংচিঙ্গের পর চেং (Tche-hong) নামক আর একজন চীন ভিক্ষু নালন্দায় আসিয়াছিলেন। ৬৪০ খৃঃ অব্দে আলিয়ে-পো-মোনো (আর্য্যবর্মা) ও ওই-য়ে (Hoei-ye) নামক দুইজন কোরিয়াবাসী ভিক্ষু নালন্দায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ স্থানেই প্রাণত্যাগ করেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বত হইতে ধর্ম্ম ও অপর ছয়জন প্রধান ব্যক্তি নালন্দায় আসিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দশম শতাব্দীতে কি-ঐ (Ke-ye) নামক চীন ভিক্ষু নালন্দায় আসিয়াছিলেন। ইহাদের কথা ভারতবর্ষের কোন ইতিহাসে স্থান পায় নাই। পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য্য বিজ্ঞা, ধর্ম্ম ও শিল্পের আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্রের সম্বন্ধেও দেশের ইতিহাসলব্ধী অতল বিশ্বাস-সমুদ্রের তলে বসিয়া কোন ভাবী সুদক্ষ ভূবরীর প্রতীক্ষা করিতেছেন। হিউনসাঙ্গ নালন্দাবাসী ভিক্ষুদের আহার্য্যসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কোতুকাবহ তালিকা দিয়াছেন :—

প্রচুর পরিমাণে জম্বীরফল, সুপারি, কপূর, মগধের সুগন্ধ তণ্ডুল ও অস্ত্রান্ত্র দ্রব্য ইহারা পাইতেন। হিউনসাঙ্গের জন্ত ব্যবস্থা ছিল—প্রত্যহ ২২০টি জম্বীরফল, ২০টি জাম, ২০টি খেজুর, আড়াইতোলা কপূর, কিছু মাখন, এক পোয়া তণ্ডুল, মাসে তিন ‘রাশি’

তৈল। নালন্দার ভিক্ষুগণ ঘোড়ায় চড়িতে পাইতেন না। কাঠের যানে বসিয়া বাহকদ্বারা নীত হইতেন।

যদি জঘীরফল অর্থ বাতাপিলেবু হইয়া থাকে, হিউনসাঙ্গ রোজ ২২০টি বাতাপিলেবু দিয়া কি করিতেন, তাহা ভাবিবার বিষয়—বোধ হয় সবৎ প্রস্তুত করিয়া পান করিতেন। কিন্তু জঘীর অর্থে বোধ হয় ‘কালোজাম’।

নালন্দা-বিহার তখনও শ্রীহীন হয় নাই। শেষের দিকে (খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর গোড়ায়) ছই বিহারেরই প্রতিষ্ঠা জোরে চলিতেছিল। বিক্রমশিলা-বিহার ৮১০ খৃঃ অব্দে

বঙ্গাধিপ মহারাজ ধর্মপাল কর্তৃক স্থাপিত হয়। যদিও
বিক্রমশিলা—৮১০ খৃঃ।

রাজচক্রবর্তীগণের দানে নালন্দা-বিহার পুষ্ট হইয়াছিল—তথাপি নালন্দা সর্বতোভাবে গণতান্ত্রিক ছিল। এখানে ছোট বড় কেহ ছিল না। যিনি পণ্ডিত ও চরিত্রবান্ হইতেন, তিনিই ইহার পরিচালনার ভার লইতেন। রাজাদের কোন ইচ্ছা বা

অহুমতি এফেত্রে চলিত না। কিন্তু বিক্রমশিলা ছিল ঠিক রাজকীয়
“রাজকীয়” বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিষ্ঠান। রাজাই ইহার কর্তা ছিলেন, এবং বিহারের সমস্ত পরিচালনার ভার তাঁহারই উপর ছিল এবং তাঁহারই ইচ্ছিতে ইহার কার্য্য নির্বাহ হইত। ইহাকে লোকে “রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়” বলিয়া জানিত। রাজা স্বয়ং পণ্ডিতদিগকে উপাধি ও পুরস্কার বিতরণ করিতেন, তথাপি তিব্বতীয় রাজদূত বিনয়দর বিশ্বম্ভের সহিত বলিয়াছেন—রাজা সভাগৃহে উপস্থিত হইলে ছোট বড় কোন শ্রমণই তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার জন্ত দাঁড়াইতেন না। শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য-ভেদের ইহারা প্রতীকস্বরূপ ছিলেন। “বিহঙ্ক নৃপত্বক” শ্লোক শুধু কথার কথা ছিল না—জীবনেও তাহা প্রতিফলিত হইত। জ্ঞানের

এরূপ আদর বিশ্বের অন্ত কোথাও হইয়াছে কিনা জানি না।
দীপঙ্করের সময়ে আচার্যগণ।

দীপঙ্করের সময়ে বিক্রমশিলার নিয়লিখিত অধ্যাপকগণ শীর্ষস্থানীয় ছিলেন,—দীপঙ্করের গুরু আচার্য্য জিতারি, আচার্য্য রত্নবজ্র, আচার্য্য জ্ঞানশ্রীমিত্র ও আচার্য্য রত্নকীর্ত্তি।

বিক্রমশিলা যে পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ও সাধুর নামে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, যিনি বৌদ্ধজগতে বুদ্ধদেবের পরেই সম্মানিত, যিনি বাঙ্গালাদেশের নবম শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক জয়ন্তস্বরূপ, যাহাকে আমরা অবিমুখতা ও মুখতার জন্ত এককাল ভুলিয়াছিলাম—সেই আমাদের হৃল্লভ দীপঙ্করকে আজ আমরা আমাদের বলিয়া জানিতে পারিয়াছি—পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের দ্বারা আমাদের জ্ঞাননেত্র প্রবুদ্ধ হওয়ার ফলে। এজন্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিব। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে দীপঙ্করের জীবনী সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

একাদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধধর্ম ও তাহার প্রভাব, দীপঙ্করের প্রাথমিক জীবন

“সুসাপান অত্যাচার, ক্রণহত্যা ব্যভিচার তত্ত্ব ধর্ম্যে ভারত ব্যাপিল ।
যক্ষ রক্ষ বিষহরি, নানা উপহার করি, জীব সব পূজিতে লাগিল ॥”
“রাম আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, অসুরেরে করিলা সংহার ।
এবে অস্ত্র না ধরিলা, কারু প্রাণ না মারিলা, মন শুদ্ধি করিলা সভার ॥”
“আজানুলম্বিত বাহু যুগল, কনক পুতলী দেহা ।
অরুণ অধর শোভিত কলেবর, উপমা দেয়ব কাই ॥”

—গৌরপদতরঙ্গিনী, ১৪, ৪২, ১১৬ পৃঃ ।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ২৮০ খৃঃ অব্দে ঢাকাজেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগনায় বজ্র-
যোগিনী গ্রামে কোন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি তাঁহার বাড়ীর পশ্চিমে



দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ।

‘বজ্রাসন’ বিহারে
পাতিতা-অর্জুন । অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ।
বজ্রযোগিনীর পশ্চিমে—ঐ জেলায় নারা ও
সুয়াপুর নামে দুইটি গ্রাম আছে, এই দুই
পল্লীর সন্ধিস্থলে একটি বড় রকমের বিহার
ছিল—তাহা এখন উচ্চ ঢিপিতে
পরিণত । এই ঢিপিগুলির নাম ‘বজ্র-
সনের ভিটা ।’ কয়েক বৎসর অতীত
হইল একজন সেটেলমেন্ট অফিসার উদ্দেশ্যে
হইয়া এই ভিটাগুলির একটিকে খনন
করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে
অনেকগুলি বুদ্ধমূর্তি এবং বিস্তৃত বিহারের

চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল । এই বজ্রাসন বিহার দীপঙ্করের স্বীয় পল্লীর অতি সম্মিহিত ।
সম্ভবতঃ এখানে তিনি কতক দিনের জন্ত পাঠ করিয়া ছিলেন । গয়ার বিখ্যাত
বজ্রাসন বিহারেও যে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষার কতকটা নির্বাহিত হইয়াছিল, তাহাও
অস্বাভাবিক বলা যাইতে পারে । দীপঙ্কর কল্যাণশ্রী নামক কোন রাজার ছেলে ছিলেন এবং

তাহার মাতার নাম ছিল প্রভাবতী। বাল্যকালে তাহার মাতা তাহার 'চন্দ্রগর্ভ' নাম দিয়াছিলেন। এই সময়ে অধ্যাপক আচার্য জিতারির বিজ্ঞান যশ সর্বত্র প্রচারিত ছিল—দীপঙ্করের প্রথম উচ্চশিক্ষার ভার ইহার উপর স্থাপ্ত হইয়াছিল। জিতারির সাহায্যে ইনি বিজ্ঞানের পাঁচটি শাখায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দীপঙ্কর ত্রিপিটক, হীনায়নশ্রাবকের চারিশাখা, মাধ্যমিক এবং বোগাচার্য দর্শন ও তন্ত্রের চারিটি শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তীর্থকদের শাস্ত্র এবং অপরাপর বিজ্ঞান পারদর্শী হইয়া দীপঙ্কর তৎকাল প্রসিদ্ধ এক মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণকে তর্কশাস্ত্রে পরাভূত করেন। এই সময় সংসারিক সুখ উপভোগের প্রতি তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল এবং তিনি জ্ঞান ও ধর্মের পথেই রহিয়া যাইবেন এই সঙ্কল্প করিয়া ধর্ম শাস্ত্র চর্চা, ধ্যান, ধারণা এই ত্রিবিধা ও সর্বশাস্ত্রের মর্মোদ্ধার প্রভৃতি বিষয় লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময় তিনি কৃষ্ণগিরি বিহারে রাহুলগুপ্তের নিকট যাইয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রাহুলগুপ্ত তাহার শিষ্যকে বৌদ্ধশাস্ত্রের গুপ্ত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান দীক্ষিত করেন এবং তাঁহাকে "গুহ্যজ্ঞানবজ্র" উপাধি প্রদান করেন। ১৯ বৎসর বয়সে ওদন্তপুর বিহারের মহাসাঙ্ঘিক আচার্য শীলরক্ষিত তাঁহাকে "দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান" উপাধি প্রদান করেন। তাহার বয়স যখন ৩১, তখন আচার্য ধর্মরক্ষিত কর্তৃক তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ভিক্ষুদের শ্রেণীতে উন্নীত হন এবং বোধিসত্ত্বগণের যে সকল প্রতিশ্রুতি লইতে হয়—তাহা গ্রহণ করেন। ইহার পরে মগধের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্যগণের নিকট তিনি কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন এবং শূন্য হইতে জগতের উদ্ভব স্বীকার করিয়া এই সূত্র (শূন্যবাদ) বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রচার করেন। এই সময়ে তিনি অবগত হইলেন যে সুবর্ণবিহারের অধ্যক্ষ চন্দ্রকীর্তি বৌদ্ধ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তিনি তাহার শিষ্য হইবার মানসে সুবর্ণদ্বীপ যাত্রা করেন। কেহ কেহ বলেন পেগুর নাম সুবর্ণদ্বীপ। কিন্তু অপর অনেকের মত বাবাবীপেরই অপর নাম সুবর্ণদ্বীপ। আমাদের মতে দীপঙ্কর বাবাবীপেই গিয়াছিলেন, নতুবা পেগু হইতে আসিতে হইলে সিংহলে যাইবেন কিরূপে? তাহার সুবর্ণদ্বীপে যাত্রা বহুমাসে সম্পাদিত হইয়াছিল এবং এজন্ত তাঁহাকে বহুবৃত্ত সহিতে হইয়াছিল। বাবাবীপে তিনি দ্বাদশ বৎসর থাকিয়া সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্র

বিবেশ-ক্রমণ।

করায়ত্ত করিয়াছিলেন। মগধে ফিরিয়া আসার পর তাহার অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা সর্বজনস্বীকৃত হইয়াছিল এবং তৎকালিক মগধের প্রধান পণ্ডিত শাস্ত্রি, নরপাণ্ড, কুশলী, অবদ্বী, ডোম্বি প্রভৃতি বহুলোক তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া ধস্ত হইয়াছিলেন।

এই সময় তিনি তীর্থকদিগের মত খণ্ডন করিয়া তাঁহাদিগকে তিনবার পরাভূত করেন। অপরাপর প্রতিদ্বন্দী ধর্মনেতাদেরও তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তাহার তুল্য পণ্ডিত তখন ছিল না এই বিশ্বাস সর্বসাধারণের মনে দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। পালবংশের প্রসিদ্ধ রাজা নরপাল তাঁহাকে অহ্বান করিয়া আনাইয়াছিলেন। এই সময় বিক্রমশীলা কর্ণরাজ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। নরপালের সঙ্গে কর্ণের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে উভয় পক্ষেরই সাময়িক ভাবে জয়পরাজয় ঘটিয়াছিল। দীপঙ্কর মধ্যে পড়িয়া

দুই রাজার মধ্যে সন্ধি স্থাপনপূর্বক তাঁহাদিগকে সৌহার্দ্য হস্তে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। (২৬৩ পৃঃ।)

এই সময়ে তিব্বতের রাজা ছিলেন লাঃ লামা ইয়েসি হোড্। ইনি অতিশয় ধার্মিক ছিলেন। তিব্বতের প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের উন্নতি সাধনার্থ ইনি সাতজন বালককে মনোনীত করেন। ইহাদের কাহারও বয়স দশের উর্দ্ধে ছিল না। বাহাতে ছোটকাল হইতে ইহারা সংসারে আবদ্ধ না হইয়া নির্মল চরিত্র ও ধর্মরক্ষা করিতে পারেন, এই জন্ত রাজা এই সকল বালককে তাঁহাদের পিতামাতার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই

সাত বালক যখন বৌদ্ধশাস্ত্রের চর্চায় অনেকটা অগ্রসর হইয়া বয়স্ক হইয়াছিলেন, তখন রাজা আবার ইহাদের প্রত্যেকটির অধীনে দুইজন করিয়া বালক সেই দলভুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রমণদিগের এই তরুণ ক্ষুদ্রদল ক্রমে সর্বসমেত ২১টি হইয়াছিল। রাজা সঙ্কল্প করিলেন শুধু ইহাতে হইবে না; ভারতবর্ষ হইতে প্রধান কোন বৌদ্ধপণ্ডিত আনাইয়া তিনি নানারূপ তত্ত্বদ্বিত তিব্বতের বৌদ্ধধর্মকে সংশোধিত করিবেন। এতদ্বর্থে ইনি এই ২১টি শ্রমণকে কাশ্মীর ও মগধ প্রভৃতি রাজ্যে পাঠাইয়াছিলেন। ১০জন বিখ্যাত পণ্ডিত তিব্বতে বাইতে স্বীকৃত হন, কিন্তু রাস্তাঘাট এতই দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল ছিল যে পথেই ২১জন তিব্বতীয় শ্রমণের মধ্যে পীড়া ও সর্পদংশনে ১৯জন মৃত্যুমুখে পতিত হন। উক্ত ভারতীয় পণ্ডিতগণ সহ দুইজন অবশিষ্ট শ্রমণ তিব্বতে ফিরিয়া আসেন। এই দুইজনের নাম “রিগছেন্ জান পো” এবং “লেগন্ পহি সিরাব।” রাজার আদেশমত ইহারা মগধাদি দেশেও আসিয়াছিলেন। ইহারা গৃহে ফিরিয়া রাজাকে বলিলেন—“ভারতবর্ষে বিক্রমশিলার প্রধান অধ্যক্ষ দীপঙ্করের মত পণ্ডিত আর নাই, কিন্তু আমরা তাঁহাকে তিব্বতে আসিতে বলিতে সাহস পাইলাম না।” যে সকল ভারতীয় পণ্ডিত আসিয়াছিলেন তিব্বতীয় শ্রমণেরা তাঁহাদের কাছে পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু দীপঙ্করের গুণগ্রামের কথা রাজা যতই শুনিতে লাগিলেন ততই তাঁহাকে তিব্বতে আনিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রবল হইল। অবশেষে তিনি একজন সুদক্ষ শ্রমণ “গ্যাতসন-গ্রুসেনগি” (Gyatason-Gru-senge) কে একশত অশ্বচর ও অনেক স্বর্ণসহ বিক্রমশীলায় পাঠাইয়া দিলেন। সেনগি দীপঙ্করের সঙ্গে দেখা করিয়া গুরুভার একখণ্ড স্বর্ণ ও তিব্বত-রাজার পত্র তাঁহার হাতে দিলেন এবং সেখানে গেলে তিনি সর্বোচ্চ সম্মান পাইবেন, এই সকল কথা বলিয়া অতি বিনীত ভাবে উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কিছু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া দীপঙ্কর বলিলেন “আমার যাওয়ার দুইটি কারণ দর্শাইলেন, আমাকে এই স্বর্ণ আরও প্রচুর স্বর্ণ দিবেন এবং দ্বিতীয়তঃ সেখানে গেলে আমি পূজা প্রতিষ্ঠা পাইব। মহাশয়, আপনার রাজাকে বলিলেন আমি স্বর্ণ বা তিব্বতের প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল নহি। এই স্বর্ণ আপনি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিচ্ছেন।” এই বলিয়া দীপঙ্কর তিব্বত দূতকে সেই স্বর্ণখণ্ড ফিরাইয়া দিলেন। সেনগি এই সকল কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার কোষের বস্ত্রের এক প্রান্ত দিয়া চক্ষু

আমি স্বর্ণ ও প্রতিষ্ঠার
কাঙ্গাল নহি।

করিয়া থাকিয়া দীপঙ্কর বলিলেন “আমার যাওয়ার দুইটি কারণ
দর্শাইলেন, আমাকে এই স্বর্ণ আরও প্রচুর স্বর্ণ দিবেন এবং দ্বিতীয়তঃ
সেখানে গেলে আমি পূজা প্রতিষ্ঠা পাইব। মহাশয়, আপনার

রাজাকে বলিলেন আমি স্বর্ণ বা তিব্বতের প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল নহি। এই স্বর্ণ আপনি তাঁহাকে
ফিরাইয়া দিচ্ছেন।” এই বলিয়া দীপঙ্কর তিব্বত দূতকে সেই স্বর্ণখণ্ড ফিরাইয়া দিলেন। সেনগি
এই সকল কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার কোষের বস্ত্রের এক প্রান্ত দিয়া চক্ষু

মুহুর্তে লাগিলেন। তিনি গদগদ কণ্ঠে তাঁহার সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিলেন। আচার্য্যদেবের জন্ত সেনগি হিয়ালয়ের স্বদূর উপত্যকা হইতে কত ক্লান্ত, কত বিপদ, কত ব্যয়বাহুলা বহন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে কেহবা দারুণ তাপাতিসহে, কেহবা অরোগে, কেহবা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এখন যদি ফিরিয়া যান তবে তাঁহাদের রাজার ক্ষোভ ও দুঃখের সীমা-পরিসীমা থাকিবে না। এই সকল কথা শুনিয়া দীপঙ্করের মন আর্জ হইল, তিনি অনেক মধুর বাক্যে তাঁহাকে সাশ্বনা দিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প হইতে তিনি বিচলিত হইলেন না। তিব্বতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

রাজা লাঃ লামা তথাপি আশা ছাড়িলেন না। তিনি তিব্বতের লোকদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের সার কথা প্রচার করিবেন। যে করিয়া হউক, দীপঙ্করকে আনিতে হইবে—

লাঃ লামা ইয়েসি ও গারো-
রালের রাজা।

নতুবা অন্ততঃ বিক্রমশিলার যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া
আছেন—তাঁহাকে আনিতে হইবে। এই ধর্মপ্রচার ও লোক-

হিতকর কার্যের জন্ত অর্থের দরকার, সুতরাং স্বর্ণ সংগ্রহ করিবার

জন্ত রাজা নেপালের উপত্যকার স্বয়ং যাত্রা ১০০ পরিকর সহ উপস্থিত হইলেন। সেখানে গারোলোগের (গারোরালের) রাজার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। উক্ত রাজা বৌদ্ধবিষেবী ছিলেন এবং বখন শুনিলেন যে তিব্বতরাজ বৌদ্ধধর্মের একজন প্রধান পাণ্ডা—তিনি ধর্ম-বিস্তার করা তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার বহু সৈন্যদ্বারা সহজেই তাঁহাকে বন্দী করিলেন। প্রথমতঃ প্রস্তাব করা হইল, রাজা তাঁহার অধীনস্থ স্বীকার করিয়া বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করিবেন, যদি তাহা না করেন তবে রাজার চেহারা যত বড় তত বড় একটা মূর্তি গঠন করিতে যতটা খাঁটি সোনার দরকার তাহাই তাঁহাকে দিতে হইবে। তিব্বতের যুবরাজ ‘চ্যাংচুব’ প্রথমতঃ পিতৃব্যশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উদ্বেগী হইয়াছিলেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন ঐরূপ অভিযানের ফলে গারোলোগের নির্দুর রাজা তাঁহার বৃদ্ধ পিতৃব্যের উপর অত্যাচার করিতে পারেন। সুতরাং সোনা সংগ্রহ করিয়া রাজার মূর্তির জন্ত চেষ্টা করিলেন। কিন্তু একটা মাসের মতন মূর্তি গড়িতে যে সোনার দরকার তাহা মাসেরটির ওজন হইতে ঢের বেশী। শত্রুপক্ষের লোকেরা তাঁহার প্রদত্ত স্বর্ণ দেখিয়া বলিল এই সোনা দিয়া মাসেরের যাত্রা মুখখানি গড়া বাইতে পারে। সমস্ত মূর্তি গড়িতে আরও সোনার দরকার হইবে। রাজকুমার তাঁহার পিতৃব্য বন্দী রাজার সঙ্গে দেখা করিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন “আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমায় মূর্তি দিলেও আমি বেশী দিন বাঁচিব না, সুতরাং এতগুলি সোনা এই নির্দুর বিধর্মীকে দেওয়ার কোন দরকারই নাই। এই টাকা দিয়া তোমরা প্রজাদের মধ্যে ধর্মপ্রচার কর এবং দীপঙ্কর ত্রিজ্ঞানকে আমাদের দেশে আনিতে বধাসাধ্য চেষ্টা কর। সোনা সংগ্রহের আর চেষ্টা করিও না। তোমরা উক্ত মহাপুরুষের নিকট এই মর্মে চিঠি পাঠাও—তিব্বতরাজ স্বীয় রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং আপনাকে আনিবার চেষ্টার জন্ত বিধর্মী শত্রু রাজ্য কর্তৃক বন্দী হইয়া কারাগারে আছেন, তাঁহার এই প্রার্থনা, যেন তিনি (দীপঙ্কর) রাজাকে দুঃখের দিনে আশীর্বাদ করেন। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস তাঁহার

আশীর্বাদে তাহার জন্মজন্মান্তরে তিনি ধর্মপথে দৃঢ় থাকিবেন এবং সেই পথ বিয়বিহীন-
কুসুমাকীর্ণ হইবে। তিনি পণ্ডিতবরের শ্রীমুখ-দর্শনের আশায় এখনও জীবিত আছেন।”
সাম্রাজ্যে যুবরাজ পিতৃব্যের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তথাপি তাহার মুক্তির
আশা ছাড়িলেন না; সোনা সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শত্রু রাজা জুহু
হইয়া তিব্বতের রাজার উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে একটা ভীষণ
কষ্টদায়ক কারাগারে প্রেরণ করিলেন। এত কষ্ট বৃদ্ধ রাজা সহ
করিতে পারিলেন না। শেবমুহুর্ত পর্যন্ত দীপঙ্করের নাম স্মরণ

করিয়া তিনি কারাগারে প্রাণত্যাগ করিলেন।

বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতৃপুত্র ‘চ্যাংচুব’ রাজা হইলেন। কিন্তু তিনি শাসন
পরিচালনা করিলেও ধর্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া রহিলেন। পিতৃব্যের মৃত্যুতে গভীর
শোকে তিনি এক সভা আহ্বান করিয়া বিনয়ধর (শূলগুম
গিয়ালওয়া) নামক পণ্ডিতকে পুনরায় দীপঙ্করকে আনিতে প্রেরণ
করিলেন। ইহার বয়স ২৭ বৎসর মাত্র হইলেও ইনি কয়েক বৎসর ভারতবর্ষে থাকিয়া
সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। রাজা বলিলেন, “আমাদের দেশে ধর্মের ঘোর অবনতি হইয়াছে।
ভিক্ষুরা বিসংবাদ করিয়া তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে একদল নীলরঙ্গের
আলখালা পরিয়া তাত্ত্বিক ব্যভিচার শিক্ষা দিতেছে। স্বর্গীয় মহারাজ ভারতবর্ষ হইতে
যে তের জন পণ্ডিত আনাইয়াছিলেন, তাহারা কার্যতঃ কিছুই করেন নাই, বরঞ্চ দিন দিন
ধর্মের অধোগতি হইতেছে। তুমি দীপঙ্করকে যে করিয়া হউক লইয়া আইস; তুমি ভারতবর্ষে
ছিলে, সংস্কৃত জ্ঞান এবং সে দেশের গরম হাওয়ায় অভ্যস্ত হইয়াছ। যদি দীপঙ্কর নিতান্তই না
আসেন, তবে তাহার পরেই যিনি প্রধান তাহাকে আনিতে চেষ্টা করিবে।” বিনয়ধর
প্রথমতঃ যাইতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, তিনি নির্জনে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও বিনয়ধর্ম আচরণ
করিবেন—ইহাই তাহার লক্ষ্য হইয়াছিল, সুতরাং তাহার পক্ষে দীপঙ্করকে আনিবার বৃথা
চেষ্টা করিয়া জীবনের কাম্যবস্ত-লাভের পক্ষে বিয় উপস্থিত করা উচিত হইবে না,
ইহাই স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা প্রথমতঃ বাহা অনুরোধের মত বিনয়ের সহিত
বলিয়াছিলেন, এবার তাহা রাজ্যদেশ বলিয়া জিদ ধরিলেন। অগত্যা বিনয়ধরকে সেই
আদেশ পালন করিতেই হইল। রাজা তাহার সঙ্গে ১০০ অশ্বচর দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন,
কিন্তু বিনয়ধর মাত্র পাঁচটি সঙ্গী লইলেন। রাজা তাহাকে মোট ৩৫ আউন্স স্বর্ণ দান
করিলেন। ইহার মধ্যে ১৬ আউন্সের একখণ্ড স্বর্ণ দীপঙ্করকে উপঢৌকনস্বরূপ দেওয়া
হইবে, ৭ আউন্স বিনয়ধরের পারিশ্রমিক, ৭ আউন্স তাহার যাতায়াতের ব্যয় এবং
৫ আউন্স একটি দোভাবীর ভাড়া (যিনি দেশী ভাষা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন)।

একবার ডাকাতির হাতে পড়িয়া আর একবার সর্পবহুল নদীর সিকতাভূমিতে সশঙ্ক-
ভাবে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া নানা ক্লম ও বিপদ অতিক্রমপূর্বক বিনয়ধর বিক্রমশিলায়
উপস্থিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে তখন সেই বিহারে বিনয়ধরের শিক্ষক তিব্বতদেশীয় গ্যাম্-

মন অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহারা যে অতীশ দীপঙ্করকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন, একথা যেন প্রকাশ না করেন। অতীশ বিক্রমশিলা বিহারের সর্বোচ্চ চূড়ান্তরূপ, তাঁহাকে ছিনাইয়া এখান হইতে আপনারা লইয়া যাইবেন, এই উদ্দেশ্যের কথা শুনিলে এখানকার লোকেরা আপনাদের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করিবে। আপনারা উদ্দেশ্য গোপন করিয়া আধ আউল সোনা দক্ষিণা দিয়া মহাস্থবির রত্নাকরের নিকট উপস্থিত হউন এবং এখানকার ছাত্রশ্রেণীতে ভর্তি হউন। তারপর লেখাপড়ার আগ্রহ, ব্যবহারের সৌজন্য এবং অনুরাগ দ্বারা যদি মহাস্থবিরকে খুসী করিতে পারেন তবে অতীশ পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করিয়া স্বীয় অভিলাষ-জ্ঞাপনের সুবিধা পাইতে পারেন।

শূলশ্রুম নাগচো-বাসী ছিলেন বলিয়া অনেক সময়ে নাগ-চো উপাধিতেই অভিহিত হইয়াছেন। নাগ-চো স্বদেশের পণ্ডিতের উপদেশ গ্রহণ করিয়া সেই ভাবে বিহারে ভর্তি হইলেন। পূর্বে হইতেই তাঁহার বৌদ্ধশাস্ত্র অনেকটা জানাশুনা ছিল, সুতরাং তথায় প্রবেশ লাভ করিতে বেশী বেগ পাইতে হয় নাই।

তারপর দিন বিক্রমশিলা বিহারে ৮০০০ ভিক্ষুর এক বিরাট সঙ্ঘ আমন্ত্রিত হইয়াছিল। নাগ-চো গয়ৎসেনর সঙ্গে সেই সঙ্ঘের এক কোণে উপবেশন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—অতীশ কোনটি। গয়ৎসেন বলিলেন, “তাঁহার দেবদুর্লভ প্রিয়দর্শন ঋষিমুণ্ডি দেখিলে আপনা-আপনিই চিনিতে পারিবে।” সেই সঙ্ঘে প্রথমে আসিলেন ‘আচার্য্য স্থবির বিজ্ঞাকোকিল’, ইহার কাছে অতীশ কতকদিন পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর আর একজন আচার্য্য আসিলেন তাঁহার মূর্তি সোম্য ও গম্ভীর; বৌদ্ধসাহিত্যে ইহার মত পণ্ডিত দ্বিতীয় ছিল না, ইহার নাম নরপাণ্ডু; ইনিও একসময়ে অতীশের গুরু ছিলেন। নরপাণ্ডুর পর এক সুবেশ-পরিহিত প্রধান ব্যক্তি আসিয়া একটি উচ্চমঞ্চে উপবেশন করিলেন। ইনি বিক্রমশিলার রাজা, কিন্তু ইহাকে দেখিয়া ছোটবড় কোন পড়ুয়া বা অধ্যাপক উঠিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। সেই সময়ে আর একজন অতি গম্ভীরপ্রকৃতি, স্থিরদী পণ্ডিত আসিলেন, তাঁহার নাম বীরবজ্র। ইনি কোন্ দেশের লোক, কেহ বলিতে পারিল না—লোকে বলিত, ইহার জ্ঞানের অবধি নাই।

সভামঞ্চের সমস্ত আসন পূর্ণ হইয়া গেল। কেবল একজনের স্থান তখনও পূর্ণ হইতে বাকী। তখন এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলেন, তাঁহার আগমনে সমস্ত সভাস্থলে

রীপঙ্করের মূর্তি। একটা শ্রদ্ধামিশ্র আনন্দের গুঞ্জন শোনা যাইতে লাগিল। বিনি

আসিলেন, তিনি সেই সমাগত বরেণ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বরেণ্য, তাঁহার আনন্দময় মুখ দর্শন করিয়া কাহারও দৃষ্টি ক্লান্ত হয় না। তাঁহার মূর্তির উজ্জল-দীপ্তি এবং মুখভরা বিনয়লাবণ্যে দর্শকগণের চক্ষু মুগ্ধ হইয়া গেল। তাঁহার কোমরে কতকগুলি চাবি ঝুলিতেছিল, কারণ তথাকার সমস্ত বিহারের প্রবেশ তাঁহারই অনুমতি-সাপেক্ষ ছিল। এমনই তাঁহার স্নিগ্ধ রূপ এবং আকর্ষণী শক্তি যে ভারতবাসী, নেপালী, তিব্বতবাসীগণ সকলেই মনে করিতে লাগিল যে, তিনি তাঁহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের

একজন। বোধ হয় বর্গ হইতে দেবগণও তাঁহাকে আশ্রয় বলিতে পারিলে দত্ত হইতেন। তাঁহার মুখে প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে এমন একটা স্নেহের মাধুর্য্য খেলিতেছিল যে তদ্বারা দর্শকমণ্ডলীর প্রত্যেকেই বেন বাহুপ্রভাবে অভিভূত হইল। ইনিই তৎকালিক জগতের পণ্ডিতদের শীর্ষস্থানীয় শ্রীমান্ আচার্য্য মহাপ্রভু অতীশ দীপঙ্কর, বাহার দর্শনকামনার তিব্বতরাজ বন্দী হইয়াও ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুকে স্মৃতির মৃত্যু মনে করিয়াছিলেন।

ইহার পর বিনয়ধর দীপঙ্করকে ছই একবার দেখিয়াছিলেন, প্রত্যেকবারই তাঁহার হৃদয় ভক্তিবিনয় হইয়া তাঁহার পদে লুটাইয়া পড়িতে চাহিয়াছে। কিন্তু মগধের বহু বিহার বাহার তত্ত্বাবধানে চলিতেছিল,—পাণ্ডিত্যে, চরিত্রগুণে এবং ব্যক্তিগত-প্রভাবে যিনি সমস্ত ভারতবর্ষের দৃষ্টির কেন্দ্রীভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে তিব্বতে লইয়া যাইবার প্রার্থনা করিতে তাঁহার সাহসে কুলাইতেছিল না। বহুদিনান্তে একদা বিনয়ধর গ্যায়ংসনের সহিত দীপঙ্করকে নির্জনে পাইলেন। তিনি বিনীতভাবে পণ্ডিতবরকে বলিলেন :—তিব্বতের উপর রাষ্ট্রবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লব চলিয়া যাইতেছিল। মৃত রাজা লাঃ লামা এবং তাঁহার পিতা বৌদ্ধধর্ম্মকে সমুন্নত করিতে কতই

না চেষ্টা করিয়াছেন। ভ্রষ্ট তান্ত্রিকেরা দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। প্রভু তিব্বত যাওয়ার সময়।

অতীশের জন্ত সমস্ত দেশবাসী বারিবিন্দুপ্রার্থী চাতকের দ্বায় তৃষ্ণার্ত হইয়া আছেন—তাঁহারা তাঁহার জন্ত কতই না সহিয়াছেন! দীপঙ্করের মন এবার কৰুণাপূর্ণ হইল, তিনি বলিলেন, “জানি হে জানি, তোমার দেশের লোকেরা আমার জন্ত বহু অর্থব্যয় করিয়াছে। আমার জন্ত তোমাদের অনেক লোকক্ষয় হইয়াছে এবং আমারই যাওয়ার প্রতীক্ষা করিতে করিতে তোমাদের দেবপ্রতিম স্বর্গীয় রাজা বিধর্ম্মীর কারাগারে প্রাণ দিয়াছেন! আমার মন কি পামাণে নির্ম্মিত? তোমাদের দুঃখ আমার বুকে শেলের মত বিঁদিয়া আছে। কিন্তু আমার হাতে এখন বিস্তর কাজ আছে তাহা সমাপ্ত করিতে একটি বৎসর সময় লাগিবে। এই সময়টি যদি তোমরা অপেক্ষা করিতে পার, তবে চেষ্টা করিয়া দেখিব যাইতে পারি কিনা।” তিব্বতবাসীরা বলিল, “এক বৎসর কেন বত কাল বলিবেন, আপনার শ্রীমুখের অমুকুল আদেশের আশা করিয়া আমরা প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিব্বত-যাত্রা ও তথায় মহৎ কৰ্ম্মপ্রতিষ্ঠা

নানারূপ বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইল। দীপঙ্কর তাঁহার গুরুস্ববির রক্ষাকরের নিকট বিদায় চাহিতে গেলেন। তিনি বলিলেন, “এই তিব্বতীয় আয়ুঃস্বয়ংয়ের সঙ্গে আমি তীর্থ-দর্শনে যাইব, আপনি আমাকে অমুমতি দিন। আমি প্রার্থনা করি যে আমার প্রত্যাবর্তন

পর্যন্ত আপনার স্বাস্থ্য যেন ভাল থাকে।” রত্নাকর বলিলেন, “দীপঙ্কর, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।” বিক্রমশিলার এক ভিক্ষু বলিলেন, “এই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের চক্ষুঃস্বরূপ, ইহার অভাবে এই দেশ ধর্মহীন হইবে।” মহাস্থবির রত্নাকর বলিলেন, “তোমার উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারিয়াছি, নাগ-চো এবং গ্যরৎসন তোমাকে তিব্বতে লইয়া যাইবেন। তিব্বতের রাজার আদেশে নাগ-চো এখানে আসিয়াছেন। আর একবার

আচার্য্য রত্নাকরের
অনুমতি।

তিব্বতের রাজা তোমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, আমি তাহা দেই নাই। এখনও আমি তোমার পথে সমূহ বিপদ উপস্থিত করিতে পারি। রাজাকে জানাইলে তোমার তো যাওয়া হইবেই না, বরঞ্চ এই তিব্বতের আয়ুশ্চন্দ্রের জীবন সংশয় হইবে। কিন্তু আমি তাহা করিব না—যেহেতু অতীশ স্বয়ং তিব্বতবাসীদের হিতার্থে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, আমি তাঁহার শুভ উদ্দেশ্যে বাধা দিব না। বিশেষ এই আয়ুশ্চন্দ্রকে আমি শিষ্যদ্বয়ে গ্রহণ করিয়াছি, গুরু হইয়া ইহাদের বিরুদ্ধাচরণ করা আমার কর্তব্য নহে, কিন্তু আমি মাত্র তিনটি বৎসরের জ্ঞান ইহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি।”

তিব্বতরাজের প্রেরিত ১৬ আউল সোনা দীপঙ্কর চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। ইহার একাংশ তিনি বিক্রমশিলার অধ্যাপকদিগকে দিলেন, দ্বিতীয় অংশ স্থবির রত্নাকরের হাতে দিলেন, বিক্রমশিলা বিহারের স্থবিরদিগের ব্যবহারের জন্ত; তৃতীয় অংশ তিনি বজ্রাসন বিহারের সাহায্যার্থ পাঠাইলেন, চতুর্থ অংশ রাজভাণ্ডারে দেওয়ার জন্ত উপদেশ দিলেন, রাজা যেন তাহা তথাকার বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের হিতার্থে ব্যয় করেন।

ইহার পর অতীশ নানা মঠ ও মন্দিরের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গুরুদের নিকট এই যাত্রার শুভাশুভ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলে যদি জানিতে পারে তিব্বতরাজ তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন, তাহা হইলে দেশময় একটা উত্তেজনা উপস্থিত হইবে—এই আশঙ্কায় নাগ-চো সমস্ত জিনিষপত্র ৩০টি দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে রাতারাতি পূর্বেই পাঠাইয়া দিলেন। বজ্রাসন প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া দীপঙ্কর বাওয়ার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। রত্নাকর স্থবির বলিলেন, “নির্দিষ্ট সময়ান্ত্রে আপনারা ফিরিয়া আসিবেন।” নাগ-চো এই স্তুতি পাঠাইয়া বলিলেন, “আমি এখন শ্রীজ্ঞানের অধীন, তাঁহার আদেশ পালন করিব। তিনি আসিতে চাহিলে আসিব।” মহাস্থবির দুঃখের সহিত বলিলেন, “আমিই বা কি করিয়া তোমাদিগকে অতীশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে বলিব? বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের নিকট কি হিত তাহা প্রার্থনা করিয়া লও। যদি অতীশ আসিতে চান ভাল, নতুবা সেখানে থাকিয়া যেন জীবনমাত্র সকলের উপকার করিয়া জীবন যাপন করেন—আমি এই ইচ্ছা বহন করিব।” নাগ-চোর দিকে চাহিয়া অতিবুদ্ধ রত্নাকরাচার্য্য বলিলেন, “আয়ুশ্চন্দ্র, অতীশ-বিহনে ভারতবর্ষ কাণা হইবে। বহু বিহার ও প্রতিষ্ঠানের চাবি ইহার হস্তে, ইহাকে ছাড়া অনেক বৌদ্ধবিহারের কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। ভারতে বিপদের দিন আসিতেছে—চারিদিক হইতে সেই বিপদের ছায়া দেশকে আচ্ছন্ন করিতেছে। তুরস্কীয়েরা ভারতবিজয়ের জন্ত অভিযান করিতেছে।

আমার মন নানা আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। তোমরা আমার আশীর্বাদ লইয়া যাও, অতীশ যেন জগতের মঙ্গলের জন্ত তথায় কাজ করেন।”

বুদ্ধ রত্নাকরের কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হইয়া গেল। অতীশ তাঁহার অসমাপ্ত কার্যগুলি বৎসর ভরিয়া সম্পাদন করিলেন। তাঁহার গুরুতর কার্যের ভার তিনি সুবিখ্যাত হাবির-দিগের উপর হস্ত করিলেন। প্রত্যেক স্থানেই তাঁহাকে নানারূপ বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। নাগচো, গায়েংসেন, ভুমিগর্ভ, ভুমিশাখ ও বীর্ঘ্যচন্দ্র প্রভৃতি ভিক্ষু-সম্প্রদায়ের অনেকের সঙ্গে তিনি উত্তরে মিত্র-বিহারের পথে রওনা হইলেন। মিত্র-বিহারের অধ্যক্ষ

দীপঙ্করের অভাবে

ভারতবর্ষ।

ও অধ্যাপকগণ এই দলকে বিশেষভাবে অভিনন্দন করিলেন।

তাঁহারা নিজেদের মধ্যে এই ভাবে বলাবলি করিতে লাগিলেন,—

কেহ বলিলেন, “অতীশ চলিয়া গেলে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অর্থ্য অন্তর্মিত হইবে, ইহাকে কিছুতেই বাইতে দেওয়া হইবে না, আশ্বন, সেই চেষ্টা করি।” আবার কেহ বলিলেন, “বিক্রমশিলার সজ্ঞ যখন ইহার গমন রোধ করিতে পারে নাই, তখন আমরা কি করিব?” সকলেই একবাক্যে বলিলেন, “অতীশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন অনিবার্য হইবে।”

পথে কোন বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করিয়া অতীশ তিব্বতের দিকে রওনা হইলেন, তাঁহার সঙ্গে এই সমস্ত লোক ছিলেন—গায়েংসেন ও তাঁহার দুই ভৃত্য, নাগচো ও তাঁহার চারিটি ভৃত্য, ইহা ছাড়া অতীশের সঙ্গে ২০ জন অনুচর।

অতীশ তান্ত্রিক আচার ও ক্ষমতা-লাভের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার তান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক বহু শক্তি আয়ত্ত ছিল। সেই শক্তির বলে তিনি পথে অনেক দুষ্ট ও শত্রুর হাত হইতে আশ্রয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি পথে অনেক বিহার হইতে সংবর্দ্ধনা পাইয়াছিলেন। নেপালের রাজা অনন্ত কীর্তি তাঁহাকে বিশেষরূপে সংবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। শ্রীজ্ঞান নেপালের মহারাজকে একটি হস্তী উপহার দিয়া বলিয়াছিলেন, “মহারাজ, এই হস্তিটি যুদ্ধের সহিত

নেপালের রাজার সংবর্দ্ধনা।

পালন করিবেন, ইহাকে যুদ্ধের কিংবা অন্ত্রশস্ত্র বহন করিবার জন্ত

যেন ব্যবহার করা না হয়। দেববিগ্রহ, দেবমন্দিরের সামগ্রী, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি বহন করিবার জন্ত ইহাকে নিযুক্ত করিতে পারেন। এই হস্তীর নাম দৃষ্টোবদী।” নেপালের রাজা এই উপহার গ্রহণ করিয়া শ্রীজ্ঞানের প্রতি সম্মান দেখাইয়া সেই স্থানে “ধান-বিহার”

নামক একটি বিশাল বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার

স্বীয়পুত্র যুবরাজ পদ্মপ্রভকে শ্রীজ্ঞানের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

পদ্মপ্রভ শ্রীজ্ঞান কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া কতকদূর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। দীক্ষাগ্রহণের পর যুবরাজের নাম হইয়াছিল ‘দেবেজ’।

এবার শ্রীজ্ঞান তিব্বতের সীমানায় পদার্পণ করা মাত্র রাজার প্রেরিত ৪ জন সেনাপতি (ল’হই ওয়াংপো, ল’হই লোডই, ল’হই সেরাব এবং ল’হই শ্রীজিন) আসিয়া তাঁহাকে

প্রণাম করিলেন। ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ১৬ জন বর্ষাধারী সৈন্ত ছিল। তাহা ছাড়া

কয়েক জন লোক পতাকা বহন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল—
দীপকরের অভিনন্দন।

তাহাদের প্রত্যেকের হাতে এক একটি সাটিন বস্ত্রনির্মিত রাজ-
চ্ছত্র ছিল। এই দলের সঙ্গে বীণা, ঢাক, ঢোল ও সানাই প্রভৃতি বস্ত্র-বাদকের দল ছিল। চারি
জন সেনাপতি এই দলের সঙ্গে “ও মণিগদ্যহু” গান করিতে করিতে মগধের পূজনীয় অতিথিকে
সংবর্দ্ধনা করিল। সম্রাটের প্রতিনিধি নরিসোম্পা এই স্থানে আসিয়া শ্রীজ্ঞানকে পাঁচ
আউল সোনা এবং রাক্ষসমুখাঙ্কিত বিচিত্র কারুকার্যখচিত চায়ের পাত্র উপহার দিলেন।
পথে নাগচোর পল্লীতে শ্রীজ্ঞান কিছু দিন অবস্থান করিয়া পুনরায় রওনা হইলেন। চারিজন
সেনাপতি সহ ৩০০ লোক-সমাবৃত হইয়া শ্রীজ্ঞান চলিলেন। সেনাপতিরা যে অভিনন্দন
শ্রীজ্ঞানকে দিয়াছিলেন, তাহা তাহারা গান করিয়া তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। সেনাপতিদের

প্রধান শ্রীজ্ঞানকে নিম্নলিখিত ভাবে সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন—“হে
‘ভারতবর্ষ দেবস্থান’।

মহাভাগ! আপনি ভারতবর্ষ হইতে আমাদের এই দেশে আসিতে
আমরা ধন্ত হইয়াছি। আপনাকে আমরা কোন মূর্ত্তিমান্ দেবতার ছায় মনে করিতেছি।
আপনি আমাদের চক্ষে চিত্তামণি ও কল্পতরুর ছায়। ভারতবর্ষ আমাদের চক্ষে দেবস্থান,
ধর্ম্মের স্বীয় নিকেতন। কিন্তু আমাদের এ দেশেও কতকগুলি সুবিধা আছে, যাহা ভারতে
নাই। এদেশে গ্রীষ্মের অত্যধিক প্রকোপ নাই। তিব্বতের উপত্যকায় সুনির্মল-জলবাহী
নির্ভর ও নৈসর্গিক উৎসের অভাব নাই। শীতকালে এদেশে শৈত্যাধিক্যের দরুন কোন কষ্ট
হয় না। হিমালয়ের শিলারক্ষিত উপত্যকাপ্রদেশে এমন অনেক স্থান আছে যাহা স্বভাবতঃই

উষ্ণ—শীতকালে ঐ সকল স্থান অত্যন্ত আরামপ্রদ। বসন্তকালে
এদেশের লোকের খাণ্ডের অসম্ভাব হয় না। এখানে পাঁচবার ফসল
“বেশটি নীলকান্ত মণির
খনি।”

হয়। শরৎকালে দেশ জুড়িয়া তৃণলতাশৃঙ্গ ও নবপল্লবের এমনই শোভা
হয় যে মনে হয় বেন সমস্ত দেশটি একটি নীলকান্ত মণির খনি। এখানে রাজা লাঃ লুসন পা
সর্গজনপ্রিয় ধর্ম্মামুরক্ত, তাহার প্রতি গভীর অমুরাগযুক্ত মন্ত্রীরা প্রজাদের হিতসঙ্কল্পিত
হইয়া রাজ্যে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছেন। এখানে কোন ঋগড়া বিবাদ নাই। এখন
মহাভাগের আগমনে এদেশ পুণ্যময় হইয়া উঠিল।” এই স্থানে দীপকর রাজপ্রতিনিধির উপহৃত
“চা” পান করিলেন (১০৪০ খৃঃ)। ইহাই বোধ হয় বাঙ্গালীর প্রথম “চা” খাওয়া।

সেনাপতিরা এখন মিছিল করিয়া তাঁহাকে ধোলিন-বিহারে লইয়া চলিল। পথে তাহারা
“লোখা, লোমা, লোলা, লোলা” ইত্যাদি গান গাহিতে গাহিতে আকাশে বাতাসে তাহাদের
আনন্দোচ্ছ্বাস ছড়াইয়া চলিল। শ্রীজ্ঞানের সঙ্গে রাজা ভূমিসজ্জ, পণ্ডিত পরহিতভদ্র,
পণ্ডিত বীর্ষ্যচন্দ্র, লোচাভা শৃগধং প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিরা চলিলেন। ইহাদের মধ্যে
মহারাজ ভূমিসজ্জ—সমস্ত পশ্চিম ভারতের রাজা ছিলেন—তিনি পৃথিবী জয় করিবার
উপযুক্ত বলশালী ছিলেন এবং তাহার পাণ্ডিত্যও অসাধারণ ছিল। কিন্তু ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ
করিয়া অবলোলাক্রমে তাহার রাজ্যসম্পদ ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ মঠের অধিবাসী হইয়াছিলেন।

এই বিশিষ্ট পুরুষদের সঙ্গে মহাপুরুষ শ্রীজ্ঞান রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বহু পণ্ডিত, বহু গণ্যমান্য প্রিয়দর্শন পুরুষমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীজ্ঞানের মূর্তিই বিশেষ দর্শনীয় হইয়াছিল, রাজহংসের মত উন্নতগ্রীব একটি সুদৃশ্য ঘোটকের উপর তিনি আরুঢ় ছিলেন। তাঁহার বয়স তখন ৬০ বৎসর হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাঁহার মুখের স্বাভাবিক লাবণ্য, দেহকান্তি, ব্যবহারের ভদ্রতা ও সৌজন্ম তাঁহাকে দেবযোগ্য সম্মানের পাত্র করিয়াছিল।

১০৪০ খৃষ্টাব্দে।

তাঁহার মধুর ওষ্ঠাধরে নিরবধি মিষ্ট হাস্তের তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছিল এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সর্বদা সংস্কৃত মধুর শ্লোকাবলী উচ্চারিত হইতেছিল। তাঁহার কথাগুলি সুস্পষ্ট, চিত্তাকর্ষক এবং শ্রুতিসুখাবহ ছিল; তিনি প্রায়ই বলিতেন “অতি ভাল” “অতি মঙ্গল,” অতীশের মুখে এই অতি ও ভাল শব্দ তিব্বতের লেখক লিখিয়া তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন তাহা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। তাঁহাকে এই সময় কি চমৎকারই না দেখাইতেছিল! তাঁহার কথা ও কণ্ঠস্বর কতই না মিষ্ট বোধ হইতেছিল।

রাজধানীর নিকটে আসিলে প্রধান মন্ত্রী ল’হই ওয়ানচান্দ্র যুক্তকরে “হে প্রভু আমরা ধন্য হইলাম” বলিতে বলিতে তাঁহাকে আসিয়া প্রণামপূর্বক ৪০ হস্তবিশিষ্ট এক বিশাল অবলোকিতেশ্বরের ছবি উপহার দিলেন, ইহা বৃহৎ বস্ত্রখণ্ডে স্বর্ণস্থিত অতি আশ্চর্য্য কারুশিল্পের সহিত গ্রন্থিত হইয়াছিল।

নেপালরাজ ৪২৫ জন লোক সঙ্গে দিয়াছিলেন, তথাকার যুবরাজ দেবেন্দ্র ভিক্রুও গুরুর সাহচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই ভাবে শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর তিব্বতে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। তথাকার লোকেরা বলিতে লাগিলেন, “ইনি কিরূপ লোক! এরূপ সম্মান এপর্য্যন্ত কাহাকেও দেখান হয় নাই। স্বয়ং মহারাজ ইহাকে আনিবার চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিলেন। কত অর্থ ও কত লোকক্ষয়ই না ইহার জন্ত হইয়াছে। ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবতা।” ধলিন বিহারের লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, “ইনি নেপাল যাওয়ামাত্র তথাকার রাজা, রাজ্ঞী, যুবরাজ এবং সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি নানারূপ গীতবাস্তব মিছিল করিয়া ইহাকে অভিনন্দিত করিয়া রাজধানীতে লইয়া আসিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই ইহার তুল্য সংবর্দ্ধনা স্বয়ং বুদ্ধদেবও কোথাও পান নাই।”

এইবার তিব্বতের রাজার সঙ্গে মিলন। ইহার সংবর্দ্ধনার জন্ত রাজাদেশে একটি বিশেষ-রকম বাস্তবস্ত্র নির্মিত হইয়াছিল, তাহার নাম হইয়াছিল “রাগজুন,” ইহা নানারূপ কারুখচিত পিত্তলনির্মিত এক অপূর্ব বস্ত্র, ইহার আকৃতি ও সুর উভয়ই অদ্বুত ছিল। রাজা প্রজাদিগকে আদেশ করিলেন—“**শ্রীজ্ঞানই** **রাজ্যের কর্তা ও প্রভু, তাঁহার আদেশ ও** **উপদেশ যেন কেহ লঙ্ঘন না করে।**” এই ঘটনার বহু শতাব্দী পরে বিজুপুরের রাজা বীর হাধীর তাঁহার গুরু শ্রীনিবাস আচার্য্যকে এইভাবে তাঁহার রাজ্যের সর্বময় কর্তা করিয়া দিয়াছিলেন।

সংবর্দ্ধনার জন্ত নির্মিত
নূতন বাস্তবস্ত্র।

শ্রীজ্ঞানের বিশেষ চেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম হইতে তান্ত্রিক ব্যভিচার দূর হইয়া উহা নির্মল হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি সমস্ত এসিয়ার লোকের শ্রদ্ধা একুপ হইয়াছিল যে, তাঁহার নাম শুনিলে রাজচক্রবর্তীদের মস্তক অবনত হইত। বুদ্ধদেবের পর বৌদ্ধজগতে দীপঙ্করের দ্বায় আর কোন লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি বহু পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং সেই সকল পুস্তকই তিব্বতে সত্যধর্ম প্রচার করিয়াছিল। তাহার কয়েকখানির নাম এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) বোধিপথ-প্রদীপ। (২) চর্যাসংগ্রহ-প্রদীপ। (৩) সত্যদ্বয়াবতার। (৪) মধ্যমোপদেশ। (৫) সংগ্রহগর্ভ। (৬) হৃদয়নিশ্চিত। (৭) বোধিসত্ত্ব-মাত্তাবলি। (৮) বোধিসত্ত্ব কর্মাদিমার্গাবতার। (৯) সরস্বতায়দশ। (১০) মহাবান পথসাধন-বর্ণসংগ্রহ। (১১) মহাবান-পথসাধনাসংগ্রহ। (১২) স্ত্রীস্বার্থ সমুচ্চয়োপদেশ। (১৩) দশকুশল-কর্মোপদেশ। (১৪) সপ্তকবিধি। (১৫) গুরু কর্ম বিভঙ্গ। (১৬) চিত্তোপদসম্ভব। (১৭) বিধিক্রম। (১৮) সমাধিসম্ভব-পরিবর্ত। (১৯) লোকোত্তর-সপ্তকবিধি। (২০) গুরুক্রিয়া-ক্রম। (২১) শিক্ষা-সমুচ্চয়-অভিসাম্য। (২২) বিমলরত্নলেখন, শেবোক্ত পুস্তিকাখানি যগধরাজ নয়পালের নিকট দীপঙ্করের একখানি চিঠি।

নিরবচ্ছিন্ন পরোপকার ও জগতের ইষ্টসাধনে তৎপর মহাভাগ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান স্বীয় অক্লান্ত কর্মশীলতায় সমস্ত বৌদ্ধজগৎ উজ্জল করিয়া ৭৩ বর্ষ বয়সে লাসা নগরের সন্নিহিত লেধান পল্লীতে ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ইহার সান্নিধ্যত

শেষ।

বৎসর পরে গৌড়দেশ তুরস্কের অধীন হইয়াছিল। দীপঙ্কর হিন্দুযুগের শেষ অধ্যায়ের সর্কোপেক্ষা শ্রেষ্ঠপুরুষ এবং বাঙ্গালী জাতির চিরগৌরব। শ্রীজ্ঞানের নাম বৌদ্ধজগতের পুরোভাগে। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত বিবরণ দিলাম। আমি স্বর্গীয় রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের পুস্তক হইতে এই জীবনীর অধিকাংশ উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

তিব্বতে দীপঙ্করের জীবনচরিত অনেক আছে। আমরা কেহই তাঁহার সন্ধান করি নাই। শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় এই বাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তৎপরেও আমাদের এ সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধান করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক লামা দাউসন ছপ কাজি মহাশয়ের নিকট প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী দীপঙ্করের জীবনীর একখানি তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত পুঁথি আমি দেখিয়াছিলাম, তাঁহার সাহায্যে সেই পুস্তকের খানিকটা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আশা ছিল অবসর হইলে তাঁহারই সাহায্যে পুস্তকখানির অম্ববাদ করিব। কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে সে আশা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। বহিখানি যে কোথায় গেল, তাহাও জানি না। তিব্বতে সন্ধান করিলে একুপ আরও পুঁথি পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। ত্রমটন লিখিত (১০৫৫ খৃঃ) দীপঙ্করের জীবনচরিতে অনেক কথা পাওয়া যায়। আমরা অতিসংক্ষেপে তাঁহার জীবনী বর্ণনা করিলাম। এই একজন পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালী ছিলেন যিনি তাৎকালিক জগতে অদ্বিতীয় বশ অর্জন করিয়াছিলেন। নেপালের রাজা তাঁহার

রাজার সহিত অমুগত পরিকরের মত তাঁহার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেন। নেপালের যুবরাজ তৎকর্তৃক ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন। তিব্বতরাজ তাঁহাকে স্বদেশে আনিবার চেষ্টায় জলের মত অর্থ ব্যয় করিলেন। সেই চেষ্টায় তাঁহার বহু অর্থ ও লোক ক্ষয় হইল এবং এই জন্ত তিনি শত্রুকর্তৃক কারাগারে নিষ্কিন্ত হইয়া কারাগারেই প্রাণত্যাগ করিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি দীপঙ্করের নিকট আশীর্বাদ-প্রার্থনার বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। যবদ্বীপের (সুবর্ণদ্বীপ) রাজা ধর্মপাল দীপঙ্করও কমলের নিকট জিজ্ঞাস্তা হইয়া ধর্মবিষয়ক নানা জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া হুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। গোড়েশ্বর নয়-পালের সঙ্গে তাঁহার সর্বদা পত্রব্যবহার চলিত। শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় বিস্তারিত ভাবে তৎসম্বন্ধে অনেক প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। এক কথায় তাঁহার জীবনকালে দীপঙ্কর সমস্ত এসিয়ার সম্রাটগণের পূজনীয়, অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, এবং এখনও বিশাল বৌদ্ধ রাজ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অপ্রমেয়। কথিত আছে, চীন দেশের অমিতবিজ্রম সম্রাটগণ দীপঙ্করের নাম শুনিলেই সিংহাসন হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালী কর্তৃক হুদূর উত্তর-পূর্বে ধর্মপ্রচার

এমন একজন বাঙ্গালী-সম্বন্ধে বাঙ্গলার ইতিহাস নীরব। আন্টামাস ও বাবরের চৌক পুরুষের নাম না জানিলে আমরা পণ্ডিত-সমাজের হয়ে হইয়া পড়ি, অথচ আমাদের গৌরবকিরীটের মধ্যমণি সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ। শুধু দীপঙ্কর

যক্ষ।

নহেন, বহু বাঙ্গালী খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী এবং তৎপূর্ব হইতে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের জন্ত এসিয়ার সর্বত্র জ্ঞানের দীপশিখাহস্তে বাতায়িত করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা একরূপ কিছুই জানি না। অশোকের এক বিদ্রোহী মন্ত্রী নির্বাসিত হইয়া চীন দেশে গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম যক্ষ। সাত শত অহুচর সঙ্গে তিনি চীনের এক প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহার পূর্বেই বৌদ্ধ ধর্ম চীনে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু যক্ষের দ্বারা এই প্রচেষ্টার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। তদবধি ভারতের নানা স্থান হইতে, বিশেষ আমাদের মগধ হইতে, শত শত পণ্ডিত চীন, জাপান প্রভৃতি স্থলে অভিবান করেন এবং তথাকার দশ ভাগের নয় ভাগ লোককে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন।

শাস্তরক্ষিত।

বলা বাহুল্য ইহাদের মধ্যে বহু লোক বাঙ্গালী ছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে গোড়বাসী শাস্তরক্ষিত তিব্বতরাজ খিসরঙ্গ দিউস্থান কর্তৃক বহু মানের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া মগধ হইতে তিব্বতে গমন করেন।

এই শাস্ত্ররক্ষিত নালন্দা বিহারের প্রধান আচার্য্য ছিলেন, স্মৃতরাং ইনিও নগণ্য ছিলেন না। ইনি তিব্বতের বনধর্মকে পরাজিত করিয়া বৌদ্ধধর্মকে রাজকীয় ধর্মে পরিণত করেন।

পদ্মনাভ।

তৎকালকার লামা-সম্প্রদায় ইহারই প্রবর্তিত। তিব্বতবাসীরা ইহাকে আচার্য্য বোদিসত্ত্ব উপাধি দ্বারা ইহার প্রতি সম্মান দেখাইয়া থাকেন। ইহার সঙ্গে পণ্ডিত পদ্মনাভ নামক একজন প্রধান আচার্য্য তিব্বতে গিয়াছিলেন।

ইহারা তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের বীজ বপন করিয়া তাহা অঙ্কুরিত করিয়াছিলেন। তখন বৌদ্ধ ধর্মের অনেক শাখা-প্রশাখা হইয়াছিল। চীনদেশীয় কয়েকজন পণ্ডিত ইহাদের মত

কমলশীল।

খণ্ডন করিবার জন্ত তিব্বতে আগমন করেন। বহু তর্ক-বিতর্ক হয় এবং ইহাদের আলোচনা দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। অবশেষে গোড়ীয় প্রধান আচার্য্য কমলশীল—যাহার নাম ইতঃপূর্বেই মগধ হইতে সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল—তিব্বতে আসিয়া চৈনিক বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া ভারতীয় ধর্মের প্রাধান্য স্থাপন করেন।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তিব্বতরাজ রমচান বাঙ্গলা হইতে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার রাজধানীতে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহারা অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় প্রায় ৭০ জন পণ্ডিতের তিব্বতে বাঙ্গালী প্রচারক।

নাম দিয়াছেন। আমরা তন্মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী বৌদ্ধাচার্য্যের নাম দিতেছি; শাস্ত্ররক্ষিত, পদ্মসম্ভব (উদয়নবাসী), দীপঙ্কর, তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র দানশ্রী, বিমলমিত্র, জিনমিত্র, মুক্তিমিত্র, সুগতশ্রী, দানশীল, সম্ভোগবজ্র, বিরোচন, মঞ্জুঘোষ প্রভৃতি।

ভারত ইতিহাসের এই যুগটি আমাদের নিকট একেবারে আঁধার হইয়া আছে; অথচ এই যুগই আমাদের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ যাবাদ্বীপে যাইয়া তথায় শ্রাবক-সম্প্রদায়ের বে উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। বাঙ্গালী চীন ও জাপানে যাইয়া ধর্ম, স্থপতি, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাপানের হুরিউজি মন্দিরের বৌদ্ধ পুরোহিতগণ শাস্ত্র-গ্রন্থ লিখিবার সময় যে অক্ষর ব্যবহার করেন তাহা জাপানী চিত্রাক্ষর নহে, তাহা পাল ও সেন-রাজগণের সময়কার প্রাচীন বঙ্গাক্ষর। স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ ভারতীয় বহু চীন ভাষায় অদ্বিতীয় সংস্কৃত পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ তন্ত্র ও বৌদ্ধ জ্ঞানদর্শন-সম্পর্কীয়। ইহাদের অধিকাংশই বাঙ্গালী পণ্ডিতদের লেখা। চীন, জাপান, তিব্বত ও নেপালে এই সকল কীর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে, আর কতকদিন পরে এই সকল পুস্তক হাতড়াইয়া পাওয়া যাইবে না। এই পালরাজগণের রাজত্ব বাঙ্গালীর পক্ষে অত্যাশ্চর্য্য যুগ। বিশ্ববিজ্ঞানযুগের কতিপয় শিক্ষার্থী চীন, তিব্বত, যবদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ও সিংহলে তদ্বৈদেশী ভাষা শিক্ষা করিয়া যদি কয়েক বৎসর চেষ্টা করেন, তবে বঙ্গের এই যুগের ইতিহাসের উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু গোড়া ব্রাহ্মণদের হোয়াচে-রোগ তো আমাদের দেশে এক হাজার বা বারশত বৎসর পূর্বে বৌদ্ধ

ও জৈন ধর্মের দস্তরমত আড়ং ছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা একেবারে অজ্ঞ ও উদাসীন। বিলাতে না বাইয়া যদি এগিয়ার নানাস্থান হইতে আমরা পুরাতত্ত্ব সন্ধান করি তবে বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের অনেক কথা আবিষ্কৃত হইতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধ ধর্মের অবশেষ

তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের অনেকগুলি শাখা-প্রশাখার উল্লেখ আমরা পাইয়াছি। নবম শতাব্দীর শেষভাগে তিব্বতরাজ চ্যাংচুব নাগচোকে ডাকাইয়া মগধে পাঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন তিনি তাঁহার কাছে কয়েক শ্রেণীর বৌদ্ধগণের উল্লেখ করেন, তাঁহাদের মধ্যে নীল আলখাল্লাপরা একদলের কথা বলিয়া তাঁহাদের সম্পর্কে জানান যে, ইহারা ধর্মের নামে ছনীতি প্রচার করিতেছে, ইহাদের একজন যে সকল মত সমর্থন করিতেন, তাহা শুনিলে কাণে আসুল দিতে হয়।

প্রথমতঃ বুদ্ধদেব সজ্জ্ব ভিক্ষুগণকে কোন স্থান দিবেন না, এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার বিমাতা ও মানী পরমা সাক্ষা ও অতিবৃদ্ধা মহাপ্রজাবতী, যিনি বুদ্ধকে মাতার অভাবে নিজে লালনপালন করিয়াছিলেন, তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া সজ্জ্ব প্রবেশের অমুমতি চাহিলেন। কিন্তু বুদ্ধের অটল সঙ্কল্প টলিল না, তিনি কোন স্ত্রীলোকের জন্ত সজ্জ্বের দ্বার উন্মুক্ত করিবেন না। বিষয়টিতে মহাপ্রজাবতী ফিরিয়া গেলেন, বুদ্ধ মনে ব্যথা পাইলেন, কিন্তু তিনি বিমাতার জন্ত তাঁহার নীতির আদর্শ শিথিল করিলেন না। তারপর তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দ মহাপ্রজাবতীর পক্ষ লইয়া তাঁহাকে হইবার অমুরোধ করিলেন—কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না। কিন্তু যখন তৃতীয়বার আনন্দ সেই প্রার্থনা উপস্থিত করিলেন, তখন বুদ্ধদেব বিষয়টিতে স্বীকৃত হইলেন, যেহেতু উপর্যুপরি বিফলকামা হইয়া অতিবৃদ্ধা মহাপ্রজাবতী নিদারুণ মনস্তাপ পাইতেছিলেন, বুদ্ধ তাঁহার অমুরোধ আর এড়াইতে পারিলেন না। কিন্তু আনন্দকে বলিলেন, “দেখ আনন্দ, যদি

সজ্জ্ব স্ত্রীলোকদের
প্রবেশাধিকার।

আমাদের সঙ্কল্প ১০০০ বৎসর টিকিয়া থাকিত, সজ্জ্ব স্ত্রীলোক
প্রবেশ করাইবার অমুমতি দেওয়াতে উহা মাত্র ৫০০ বৎসর টিকিবে;

খেতাবিকা (একরূপ খেতবর্ণ কাট) বেকরূপ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে শত নষ্ট হইয়া যায়, সজ্জ্ব স্ত্রীলোক প্রবেশ করাত্তে সঙ্কল্পের পক্ষে তেমনই অনিষ্ট হইবে।” সজ্জ্ব স্ত্রীলোক-প্রবেশ

এখনও এদেশে আতঙ্কের কারণ হইয়া আছে। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এতৎসম্বন্ধে আমাদের নিকট একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একদা তিনি পরমহংসদেবকে তাঁহাদের ব্রাহ্মমন্দির ও উপাসনাপদ্ধতি দেখাইতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রাটের সমাজগৃহে লইয়া আসেন। বেদী হইতে আচার্য্য বক্তৃতা করিতেছিলেন এবং উচ্চমঞ্চে মহিলারা উপবিষ্ট ছিলেন। পরমহংসদেব উচ্চদিকে চাহিয়া উহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এঁরা কে?” শিবনাথ শাস্ত্রী বলিলেন—“ইহারা ব্রাহ্মিকা, উপাসনার যোগ দিতে আসিয়াছেন।” পরমহংসদেব তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “করেছেন কি? গাছ পুঁতিয়াই ছাগল লাগাইয়াছেন, —এ ধর্ম টিকিবে না।”—এই কথা বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে হো হো করিয়া খুব হাসিয়াছিলেন। ভারতীয় সম্যাসীরা চিরকালই স্ত্রীজাতির প্রতি প্রতিকূল—ইহা আমাদের কাছে চাখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে। বুদ্ধদেব অনিচ্ছাসবে স্ত্রীলোকদিগকে সম্ভে প্রবেশাধিকার দিয়া ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী-সম্বন্ধে যতটা পারেন ততটা কঠিন নিয়ম প্রণয়ন করিলেন। যথা:—

(১) যো এন ভিক্ষু অসম্মতো ভিক্ষুনিয়ো ঔবদেব্য পাচিত্তিয়ং। (সম্ভেবর অনুমতি না লইয়া যদি কোন ভিক্ষু ভিক্ষুণীদিগকে উপদেশ দেন, তবে তিনি প্রায়শ্চিত্তযোগ্য হইবেন) (ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষ—ভিক্ষুণী উপদেশবর্গ ২১)।

(২) সম্মতোংপি চে ভিক্ষু অথংগতে সুরিয়ে ভিক্ষুনিয়ো ঔবদেব্য পাচিত্তিয়ং। (সম্ভেবর অনুমতি পাইলেও যে ভিক্ষু সূর্য্যাস্তের পর ভিক্ষুণীদিগকে উপদেশ দিবেন তিনি প্রায়শ্চিত্তযোগ্য) (ঐ, উপদেশবর্গ ২২)।

(৩) যো এন ভিক্ষু ভিক্ষুনিয়া সত্তিং সংবিধায় একস্তানমগ্রং পটিপজেব্য অস্তমসো গামাস্তরস্পি অন্নত্রসময়া, পাচিত্তিয়ং। (যদি উপযুক্ত সময়ে ছাড়া অল্প সময়ে কোন ভিক্ষু ভিক্ষুণীর সহিত দীর্ঘপথ বা গ্রামান্তরে গমন করেন, তবে প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য হইবেন) (উপদেশবর্গ ২৭)।

(৪) যো এন ভিক্ষু ভিক্ষুণিয়া সত্তিং সংবিধায় একং নাবং অভিরূহেব্য উদগামিনিং বা অধাগামিনিং বা অথত্র তিরিয়স্তরণায়, পাচিত্তিয়ং। (যদি কোন ভিক্ষু সঙ্কেত করিয়া কোন ভিক্ষুণীসহ খেয়া নৌকায় আড়াআড়িভাবে পার না হইয়া ভাটি বা উজানগামী কোন নৌকায় আরোহণ করেন তবে তিনি প্রায়শ্চিত্তযোগ্য হইবেন) (উপদেশবর্গ ২৮)।

(৫) যো এন ভিক্ষু ভিক্ষুনিয়া সত্তিং একো একায় রহো নিসজ্জং কম্পেব্য পাচিত্তিয়ং। (যদি কোন ভিক্ষু একাকী কোন একক ভিক্ষুণীর সহিত জনহীন স্থলে উপবেশন করেন, তবে তিনি প্রায়শ্চিত্তযোগ্য হইবেন) (উপদেশবর্গ ৩০)।

এইরূপ বহু উপদেশ আছে। কোন ভিক্ষু বিজ্ঞ ব্যক্তির অবিজ্ঞমানে ভিক্ষুণীকে ৫/৬টি বাক্যের অধিক ধর্ম ও উপদেশ দিতে পারিবেন না (মুদাবাদবর্গ ৭)। কোন ভিক্ষু ভিক্ষুণীর জন্ত বস্ত্র সেলাই, কিংবা ভিক্ষুণী কোন ভিক্ষুর জন্ত উত্তরপ কাজ করিতে পারিবেন না (উপদেশবর্গ ২৬)। এইরূপ অনেক উপদেশ সম্ভ্রান্তির ভিত্তি গঠন করিয়াছে

বসন্ত: বুদ্ধদেব যৌনসম্বন্ধের দুর্বলতা অবগত হইয়া সজ্জের বিগুহতা রক্ষার জন্ত কঠোর অনুশাসন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

যদিও সজ্জের প্রথম যুগে আদর্শচরিত্রা, পূজনীয়া ভিক্ষুণীগণ বৌদ্ধ সমাজকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তথাপি সেই লোকান্তর মহামুভবের দূরদৃষ্টি ও আশঙ্কা যে অমূলক নহে, তাহা অচিরেই বুঝা যাইতে লাগিল। কতক বৎসর অতিবাহিত না হইতে হইতেই সজ্জের জীবনে কলুষের রেখাপাত হইল। দেখা গেল, ভিক্ষুণীরা কমণ্ডলুর মধ্যে জল লইয়া নদীজলে নিক্ষেপ করিতেছেন। আমরা দেখিতে পাই ভিক্ষুণী গর্ভিণী হইতেছেন (ভিক্ষুণী প্রা, স্তব্ধ বিভঙ্গ, পারা ১-২); বচ্চকুটা(বচ:কুটা)তে গিয়া গর্ভপাত করিতেছেন (চুল্ল ১০, ২৭, ৩); ভিক্ষুণী প্রোষিতভর্তৃকা বধুর গর্ভপাতে সাহায্য করিয়া স্বকীয় ভিক্ষাপাত্রে ঐ জল বহন করিতেছেন (ঐ ১০, ১৩)। কোন গর্ভিণী প্রব্রজ্যা লইয়া সজ্জ চুকিয়া প্রসব করিতেছেন; যেখানে সেখানে ধূর্তেরা অরণ্যে ও অতীর্থে (যে ঘাটে সাধারণতঃ কেহ স্নান করে না) ভিক্ষুণীগণকে দূষিত করিতেছে (ভিক্ষুণী প্রা, পাচি ২-৫, ২১ ঐ স্তব্ধবি)।.....কোথাও বা নানারূপ অলঙ্কার ধারণ করিতেছেন, গন্ধবর্ণক ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিতেছেন (ঐ, পাচি, ৮৮-৮৯)।.....আবার কোনও স্থানে ভিক্ষু খাইতে বসিলে নিজে পাখার বাতাস দিয়া পরিচর্যা করিতেছেন, অথবা গৃহস্থের বাড়ীতে পাকের সময়ে বাইয়া “অমুক ভিক্ষুর জন্ত অমুক জিনিষ পাক কর”—এইরূপ বিশেষ কোন ভিক্ষুর জন্ত পাক করাইতেছেন। (ঐ পাচি, ৬ ও ২০); কোথাও তাহারা অভ্যাঙ্গ করিতেছেন, তিলক রচনা করিতেছেন, দর্পণে মুখ দেখিতেছেন, পান-গৃহ ও পশুবধ্যস্থান স্থাপন করিতেছেন, দোকান বসাইতেছেন, মহাজনী কারবার করিতেছেন (চুল্ল ১০, ১০-৪)। (ভিক্ষুপাতি মোক্ষ, মূল ও অনুবাদ, পণ্ডিত বিশ্বশেখর শাস্ত্রী সংকলিত, ৬০-৬১ পৃ:।) ভবভূতি প্রণীত মালতীমাধবে প্রব্রাজিকা কামনিকা, অবলোকিতা ও বুদ্ধরক্ষিতার চরিত্রে এই ভিক্ষুণীদের যে চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহা পূর্বোক্ত চিত্রশালার এক পঙ্ক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য।

খৃষ্ট জন্মবার তিন শত বৎসর পূর্বে এরূপ একদল ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী দেখা দিল যাহারা নিজদিগকে একাভিপ্রায়ী (একাভিপ্রায়ী) বলিয়া পরিচয় দিল। তাহারা বুদ্ধদেবের আইন-

কানুনের বিরুদ্ধে তাহাদের একটা ক্ষীণস্বর অতি ধীরে তুলিল এবং একাভিপ্রায়ী।

বলিল যদি ধর্মের লক্ষ্য (অভিপ্রায়) এক হয় তবে নরনারীর মিলনে কোন দোষ হইতে পারে না। বরঞ্চ দ্বীলোক ও পুরুষ একত্র হইয়া আলোচনা করিলে তাহা পূর্ণাঙ্গ ও হিতকর হয়; তথায় যৌনবিজ্ঞানও আলোচিত হইবে, স্তব্রাং অজ্ঞ সাধারণ এই সকল সভায় উপস্থিত হইতে পারিবে না। তাহারা (ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী) গোপনে রাত্রিকালে একত্র হইয়া আলোচনা করিত এবং এই শ্রেণীর বৌদ্ধগণের নাম হইয়াছিল “একাভিপ্রায়ীর দল”। বলা বাহুল্য প্রথমতঃ এই দল অতি ক্ষুদ্র ছিল এবং সজ্জের অধিকাংশ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত ও উপহাস করিত।

এখনও যে শত শত সহজিয়ার দলভুক্ত স্ত্রী-পুরুষ একত্র হইয়া বঙ্গের বহু পল্লীতে গোপনে ভজনসাধন করিয়া থাকে, তাহারা কি সেই “একাভিপ্রায়ী” দলের প্রবর্তিত ধর্মের শিখা জ্বালাইয়া রাখে নাই! অবশ্য সেই একাভিপ্রায়ীর দলও এখন বাঙ্গলার সহজগণহী।

শতধারায় বিভক্ত। সহজিয়াগণের আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্য ঠিক একরূপ নহে, দুই হাজার বৎসরে অনেক ভাব ও পদ্ধতির পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু এই ঘোষণাড়া প্রমুখ বঙ্গীয় পল্লীর গোপন নিষীধ-সভা সেই প্রাচীন বীজ হইতে উৎপন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই ত্রতের এই কথা।

তিব্বতরাজ চ্যাংচুব নাগচোকে যে নীল পোষাকপরা দলের কথা বলিয়াছিলেন, বাহারা ঘোর দুর্নীতি ও ব্যভিচার প্রচার করিয়া দেশকে অধঃপাতে দিতেছে বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা কি ইঞ্জিয়ার পথে ইঞ্জিয়ার চরম সংঘম প্রচারক বর্তমান সহজিয়াদের পূর্ববর্তিগণের মতের প্রতিধ্বনি নহে?

তিব্বতে তান্ত্রিকতার ব্যভিচার চলিতেছিল, রাজা তজ্জন্ত আক্ষেপ করিয়াছিলেন। এদিকে ভিক্ষুগীর দল ক্রমাগত সিংহল ও ভারতবর্ষ হইতে হিমালয়ের এই মনোরম উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া তিব্বতের সম্ভারামগুলিতে স্থায়ী ভাবে বাস করিতেছিলেন।

তান্ত্রিক ভৈরবীচক্র।

এই তন্ত্রসিদ্ধা রমণীদের মধ্যে কাহারও কাহারও অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। দীপঙ্কর তিব্বত-বাত্রার পূর্বে মঞ্জুশ্রীর রূপাভিনা ও আদেশ প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে কোন তন্ত্রসিদ্ধা রমণী মঞ্জুশ্রীর আদেশ তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। এখনও কাশী প্রভৃতি স্থানে যে সকল তান্ত্রিক অমুঠাননিরতা ভৈরবী দৃষ্ট হয়, এই সকল রমণী তাহাদের পূর্ববর্তী। তিব্বতের ইতিহাস পাঠ করিলে ইহাদের তাৎকালিক কার্যকলাপ অনেকটা জানা যায়। চৈতন্যদেব ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে দাক্ষিণাত্যে এইরূপ এক ভৈরবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিব্বতরাজ চ্যাংচুব যে সকল তান্ত্রিক ব্যভিচারের কথা বলিয়াছিলেন তাহা বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের “ভৈরবীচক্র” সম্পর্কিত। এক শতাব্দী পূর্বেও বৌদ্ধতন্ত্রের অনুকরণে হিন্দুরা এইরূপ চক্র করিতেন। বাঙ্গলার অনেক পাড়ারগায়ে পুরুষ ও স্ত্রীলোক একত্র হইয়া চক্রে বসিতেন। ইহার সামাজিক নিয়ম ও শৃঙ্খলা তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। পুরুষ ও নারীগণ চক্রে বসিয়া নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র অতলে ডুবাইয়া যথেষ্টাচার করিতেন। বৌদ্ধতন্ত্রের সমস্ত কথা হিন্দুতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে—কিন্তু হিন্দুরা ক্রমেও বৌদ্ধগণের উল্লেখ করেন নাই; সেকথা পরে লিখিব। এসমস্ত বিষয় বিস্তারিত ভাবে লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে বর্তমান হিন্দুসমাজের সহিত বাহারা পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, বৌদ্ধ ও জৈন সমাজ ও সাহিত্য তাঁহাদের ভাল করিয়া জানা দরকার। বৌদ্ধধর্মের বাহিরের খোলসটা আমরা পোড়াইয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু তাহার প্রাণটা আমাদের সমাজ ও সাহিত্যকে এমন জড়াইয়া ধরিয়া আছে যে, তাহা এখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখান অসম্ভব। বৌদ্ধ সমাজের প্রত্যেকটি অঙ্গ হিন্দুসমাজের উপর তাহার ছায়াপাত করিয়া রহিয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে বোধিদর্শ নামক জনৈক পণ্ডিত তিব্বতে যাইয়া এক নব মত স্থাপন করেন। বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির নানারূপ বিগ্রহ ও দেবমূর্তিতে পূর্ণ। কিন্তু বোধিদর্শ ঐ সকল মূর্তিতে বিশ্বাস করিতেন না। ইহার মঠে একখানি মাত্র বুদ্ধের মূর্তি ছিল—কোন দেবতাবিগ্রহ তিনি রাখিতে দিতেন না।

তঁাহার শিষ্যগণের মধ্যে লোহু নামক এক ভিক্ষু এই মত প্রচার করিয়াছিলেন, “ধর্ম মানুষের স্বভাব, উহা শূন্যতার অপর নাম। ধর্মগ্রন্থ কোন শাস্ত্রে লিখিত হয় নাই। সেই অলিখিত গ্রন্থ মানুষের পরিবর্তনশীল স্বভাবের অমুবর্তী হইয়া নিরন্তর ক্রমবিবর্তনের পথে চলিতেছে। প্রকৃত ধর্ম মানুষের ভিতরকার জিনিষ, উহা বাহিরের কিছু নহে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা তত্ত্ব না বুঝিয়া যে সে পুস্তক হাতে লইয়া শ্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকে। যে আইন ও নিয়ম বিশেষ কার্য্যকরী, তাহা পুস্তকের সাহায্য ব্যতীত প্রত্যেক কর্মের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। জলের অবিরাম প্রবাহ, বাতাসের স্রব,—সেই মহাশাস্ত্রের বাণী; তাহা শুনিলেই ধর্মের স্বরূপ বুঝিবে, মিছামিছি কতকগুলি বহি হইতে শ্লোক ও প্রার্থনা আবৃত্তি কর কেন?” তঁাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি দেববিগ্রহ পূজা করেন না কেন? তঁাহার উত্তর—“পিত্তল বা কাঁসার বুদ্ধ আগুনে গলিয়া যায়, কাঠের বুদ্ধ আগুনে দগ্ধ হয়, মাটির বুদ্ধ জলে পড়িলে মিলিয়া যায়, যাহা নিজেকে পরিভ্রাণ করিতে পারে না, তাহা আমাকে পরিভ্রাণ করিবে কিরূপে? মূর্তিকার প্রত্যেক রেণুই বুদ্ধক্ষেত্র, বুদ্ধের অমোঘ নিয়মে শাসিত। চারিদিকে বিশ্ব সেই মহা স্মৃতিকারের বিধান বোষণা করিতেছে। তবে আর বুদ্ধ-বিগ্রহের কথা কেন? ঐ যে আকাশচুম্বী পর্বত, ঐ দূরগামিনী নদী—এই অদ্বুত জগৎ, এসমস্ত কি তঁাহার বিগ্রহ নয়? কেন তুলি, ছাঁচ ও রং লইয়া বৃথা প্রয়াস পাইতেছ?” তিনি ধূপ-ধুনা জালান না কেন?—এই প্রশ্ন করা হইলে উত্তরে বলিতেন, “অজ্ঞ লোকেরা জানেন না যে ধূপ-ধুনা নিজের ভিতরেই আছে। প্রকৃত ধূপ-ধুনা কি?—আত্মসংযম, জ্ঞান, ধৈর্য্য, দয়া, দ্বিধাশূন্যতা, ভক্তি এবং অভিজ্ঞতা। শূন্যবাদরূপ পবিত্র সামগ্রীই খাঁটি স্নগন্ধ, তাহা সমস্ত আকাশ ছাইয়া আছে, সেই শূন্যবাদের পরম স্নগন্ধ ক্রমেই উর্দ্ধে উঠিতেছে। কিন্তু মানুষের হাতের প্রস্তুত স্নগন্ধ, কাঠের দোয়া—কখনই স্বর্গে পৌঁছিতে পারে না। বাতাস, মেঘ এবং শিশিরকণাই প্রকৃত ধূপ-ধুনা, উহারা স্বর্গ হইতে বৎসরের সমস্ত ঋতু ভরিয়া বর্ষিত হইতেছে।” তিনি পঞ্চ প্রদীপাদি জালাইয়া আরতি করেন না কেন, এই প্রশ্ন করায় বলিতেন, “এই জগৎ একটা বিরাট প্রদীপশলাকা, জলরাশি ইহার তৈল, আকাশ ইহার ছায়ায় আবর্ত, চন্দ্রসূর্য্যরূপ দীপ হইতে আলো জলিয়া সমস্ত জগৎকে উজ্জ্বল করে। যদি মানুষের প্রকৃতি উজ্জ্বল হয়, তবে তাহার কাছে স্বর্গ আধার থাকিবে না, নিজের মধ্যে আলো থাকিলে স্বর্গ ও পৃথিবী আপনা আপনি সাধকের কাছে আলোকিত হইবে। এই আলো লাভ করিলে মানুষ দেখিবে বিধাতার বিধান অনন্ত, তাহার প্রত্যেকটি স্পষ্টভাবে তখন চক্ষে পড়িবে।”

বোধিদর্শ ও লোহুর মত।

(শরচ্চন্দ্র দাসের Indian Pundits in the Land of Snow, ৪৪ পৃঃ।)

বোধিসত্ত্বের এই শাখাই চীনদেশের পূর্বভাগে প্রবল। কথিত আছে লোহুর সমস্ত উপদেশ সম্রাট মিংচাংটী শিলায় উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন (১৫১৮ খৃঃ)।

এই মতবাদীরা বাঙ্গলায় 'বাউল' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সহজিয়া ও বাউলের দল বোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র কর্তৃক বৈষ্ণবধর্মের পতাকার নীচে আশ্রয় পাইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম এই দেশ হইতে তাড়িত হওয়ার পর দলপতিরা চীন, তিব্বত, নেপাল ও চট্টগ্রামের পূর্বে আশ্রয় লইলেন। বঙ্গদেশের দ্বার ইহাদের বিরুদ্ধে একেবারে অর্গলবদ্ধ হইয়া রহিল। তান্ত্রিক ব্যভিচারদৃষ্টে নিম্ন শ্রেণীর সহজিয়া, বাউল, আউল প্রভৃতি শ্রেণীকে নব ব্রাহ্মণ্যধর্মে দীক্ষিত সমাজের লোকেরা ঘৃণার চক্ষে দেখিত; সে ঘৃণার সীমা-পরিসীমা ছিল না। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী হিন্দুর পক্ষীরা আশপাশ দিয়া চলিয়া গেলে তাহাদের ছায়া-সংস্পর্শ অসহ্য হইত। এই ঘৃণার দরুন পূর্ববঙ্গের শত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া জাণ পাইয়াছিল—এই ঘৃণার জন্ত বৌদ্ধ-সাহিত্য লুকাইয়া ফেলিয়া ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা অপর কোন ধর্মে মিশিয়া বাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে মাহারা রাজ্যে জৈন ও বৌদ্ধদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার চলিয়াছিল। নবদ্বীপের নূতন ছায় ও দর্শন বৌদ্ধ-জ্ঞান ও দর্শনের ভাব ও পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তাহাদের স্বর্ণ স্বীকার করা দূরে থাকুক তাহাদের অস্তিত্বের চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত করিল। "বাজাসন" নেড়ানেড়ী।

নাম পর্যন্ত একান্ত ঘৃণ্য হইল। বৌদ্ধ সম্ভারামণ্ডলি শেষাঙ্গে তান্ত্রিক বীভৎসতার আড্ডা হইল। ঢাকা জেলার সূর্যাপুর গ্রামের কাছে যে বিশাল বৌদ্ধতৃপ দৃষ্ট হয় এবং যেখানে বাজাসন-বিহার সংস্থাপিত ছিল, সেই স্থানে পূর্বে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব বাস করিতেন, তাহারা সেস্থান হইতে উঠিয়া গিয়া এখন সূর্যাপুরে বাস করিতেছেন। তাহাদিগকে পূর্বে 'বাজাসনের চক্রবর্তী' ও 'বাজাসনের দাশ' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইত। কিন্তু তাহাদের বংশধরগণ এই বাজাসনের নামের সঙ্গে তাহাদের সংশ্লিষ্ট ভাববাসিতেন না। কেহ তাহাদিগকে ঐ নামে অভিহিত করিলে তাহারা চটিয়া লাল হইতেন। এদেশে তাহারা এক সময়ে বৌদ্ধ-সংশ্রবে আসিয়াছিলেন—তাঁহারা সে প্রাচীন কলঙ্কের দাগ একেবারে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেন। বৌদ্ধধর্ম এদেশে এতই ঘৃণিত হইয়াছিল যে বুদ্ধমূর্তিগুলি পর্যন্ত হিন্দু দেবদেবীর নাম দিয়া পরিচিত করা হইত। এই ছয় শতাব্দীর মধ্যে বোধিসত্ত্ব, অবলোকিতেশ্বর, বজ্রতারা, প্রজ্ঞাপারমিতা, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি যে সকল বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পূজিত হইত সেই সকলের নাম পর্যন্ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাদের নাম করা মহাপাপ, এজন্য এখন ১৬ শতাব্দী পূর্বে যে সকল বিগ্রহ এত সমারোহে পূজা পাইতেন, তাহাদের কোনটি আবিষ্কৃত হইলে কেহ তাহাদের নামগোত্র বলিতে পারে না, তজ্জন্ত আমাদের বৌদ্ধশাস্ত্র খুঁজিতে হয়। এমন দিনে বোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাউল ও নেড়ানেড়ীরা ভীষণ ব্রাহ্মণ্যদলন সহ করিতে না পারিয়া রামকেলীতে রূপসনাতনের নিকট এবং খড়দহে বীরভদ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। খড়দহে ১,২০০ নেড়া এবং ১,৩০০ নেড়ী বীরভদ্রের রূপালাভ করিয়া যে

আনন্দোৎসব করিয়াছিল, তাহার স্মৃতি সেদিন পর্য্যন্তও জাগ্রৎ ছিল। খড়দহে বৎসর বৎসর নেড়ানেড়ীদের মেলা বসিত। ২০২৫ বৎসর পূর্বে অর্থাভাবে এই ঐতিহাসিক মেলাটি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই মেলার স্থানটি দেখিয়া ভগিনী নিবেদিতা উহাকে “বৌদ্ধধর্মের সমাধিক্ষেত্র” নাম দিয়াছিলেন। বীরভদ্র নেড়ানেড়ীদিগকে বৈষ্ণব ধর্মের গণ্ডিতে আশ্রয় দিয়া পরম অহুকম্পা দেখাইলেন, তিনি তাহাদের উৎকট ব্যভিচারের স্রোত বধাসাধ্য বন্ধ করিতে চেষ্টিত হইলেন। নেড়ানেড়ীরা বিবাহ করিতে পারিত না— কারণ সম্ভব বিবাহ প্রথা ছিল না, সুতরাং তাহাদের জারজ সম্ভানেরা সমাজে অত্যন্ত হেয় হইয়া থাকিত। বৈষ্ণবদের গণ্ডীভুক্ত হইয়া তাহারা বিবাহবন্ধনে ধরা দিল ও গৃহস্থ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী সাক্ষিয়া সমাজের চক্ষে অনেকটা উন্নত হইল। সেই আদিম ব্যভিচারের স্রোত এখনও একেবারে শেষ হয় নাই, কিন্তু ইহারা বিবাহপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া অনেক উন্নত হইয়াছে।

বিবাহপ্রথা-প্রবর্তন।

ভিক্ষুদলপতি কোন আগন্তুক প্রার্থীর নিকট আর আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত ভিক্ষুণীকে তাহার হাতখানি মাত্র দেখাইয়া তাহাতে ১।০ মূল্যে বিক্রয় করে না। নবদ্বীপ হইতে এ নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে—রামকেলীতে কিছু কিছু আছে শুনিয়াছি। এই সকল রীতির উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বৈষ্ণবদিগকে নিন্দা করেন; কিন্তু নেড়ানেড়ী প্রাচীন পতনোন্মুখ ও পতিত বৌদ্ধগণের লোক, বৈষ্ণবেরা ইহাদিগকে অনেক উন্নত করিয়াছেন, নেড়ানেড়ীর কলঙ্কের ছাপসারা বৈষ্ণব-সমাজকে লাক্ষিত করা উচিত নহে।

নেড়ানেড়ীর কলঙ্ক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নহে।

বৌদ্ধধর্মের যে শাখা পূর্বচীনে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা চরিত্রনীতি, পাপপুণ্য প্রভৃতির উপর ততটা জোর দিত না। তাহারা বৌদ্ধধর্মকে আধ্যাত্মিক পন্থায় লইয়া গিয়াছিলেন। তাহারা বাহ্যভঙ্গের বিরোধী ছিলেন এবং নিজের দেহই মহাশূন্য ও সাধনার ক্ষেত্র বলিয়া মনে করিতেন। তাহারা শূন্যবাদ স্বীকার করিতেন এবং দেহকেই সর্বসাধনার মূল মনে করিয়া বাহ্য অস্থান পরিহার করিয়াছিলেন। এই নরদেহই তাহাদের ধর্ম মন্দির ছিল, এবং দেহতত্ত্ব অবধারণ করাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। লোম্ব চীনদেশে এই মত খুব জোরের সহিত চালাইয়াছিলেন। বোধিধর্মের এই দেহতত্ত্বমূলক শূন্যবাদ সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নানক রচিত “গগন ময় রবিচন্দ্র দীপক জলে”—“ধূপ মলয়ানিল—সকল বনরাই ফুলস্ত জ্যোতি। ক্যারসে আরতি হোয় ভব খণ্ডন তেরি, আরতি অনাহত শব্দ বাজস্ত ভেরী।” এবং রবীন্দ্রনাথের “গগনের ধালে, রবিচন্দ্র দীপক জলে, তারকা মণ্ডল চমকে মোতিরে। ধূপ মলয়ানিল পবন চামর করে ফুলস্ত জ্যোতিরে। কেমন আরতি করে ভব খণ্ডন তব আরতি, অনাহত শব্দ বাজস্ত ভেরীরে।” প্রভৃতি গান লোম্বর পূর্বোক্ত কথার পন্থাম্বাদের মত শোনায। বঙ্গদেশের বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই মতের বিশেষ প্রচলন দেখা যায়, ইহারা নরদেহ ছাড়া আর কোন বস্তুকে সাধনার অবলম্বন বলিয়া স্বীকার করেন না। এমন কি নাথ-ধর্মসম্প্রদায়ের লেখক গোরক্ষ-বিজয় নামক গ্রন্থে বাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাও এই মতের অমুখ্যায়ী বলিয়া মনে হয়। গোরক্ষ মুখদ

বাজাইয়া গুরু মীননাথকে উদ্বোধন করিয়াছিলেন। সেই মৃদঙ্গের বোল ছিল “কায়াসাধ”

“কায়াসাধ”। বাঙ্গালী সহজিয়াদের একদলের নেতা ছিলেন বলরাম,

বাউল ও সহজিয়া মতে

শ্রী বোধিবর্ষের প্রভাব।

ইনি হাড়ী জাতীয় ছিলেন। একদা ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের কয়েকজন

লোক গঙ্গায় অঞ্জলি অঞ্জলি জল লইয়া তর্পণ করিতেছিলেন।

বলরাম সেই নদীর আর একস্থানে দাঁড়াইয়া অঞ্জলি অঞ্জলি জল নদীতটের দিকে নিক্ষেপ

করিতেছিলেন। ইহার অর্থ কি, জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, ব্রাহ্মণেরা অঞ্জলিতে জল

লইয়া সেই জল পুনরায় নদীতে নিক্ষেপ করিলে যদি তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ পাইতে পারেন,

তবে আমি এই জল নদীতীরে ফেলিয়া দিলে আমার শত্রুকেত্রে তাহা নিশ্চয়ই পৌছিবে;

যেহেতু সেই সকল ক্ষেত্র নিশ্চয়ই তত দূরে অবস্থিত নহে—ব্রাহ্মণদের পিতৃপুরুষগণ এখান

হইতে যতদূরে অবস্থান করিতেছেন। বোধিবর্ষ কৃত বাহু আচার ও অমুষ্ঠানের প্রতিবাদ

এই বাঙ্গালী সহজিয়া ও বাউলগণের মধ্যেও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। ঢাকার ৬পার্কীতীচরণ

কবিরাজ মহাশয় প্রণীত “চাক-দর্শন” নামক উপন্যাসে এই বৈষ্ণব, আউল, বাউল ও সহজিয়া-

দের যে চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহা নিখুঁত ও খাটি ঐতিহাসিক ছবি। তিনি ইহাদের সম্বন্ধে

লিখিয়াছেন, “ইহারা পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান অগ্রাহ করে এবং মনে করে তদ্বারা লোক

কুপথে পরিচালিত হয় মাত্র। তাহাদের বিশ্বাস বেদ ও ধর্মশাস্ত্র সাংসারিক লোকেরা

নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত রচনা করিয়াছে। তাহারা ব্রাহ্মণ এবং জাতিভেদ মাত্র করে না

এবং স্ত্রীলোকেরা তাহাদের স্বামীর প্রতি কোন শ্রদ্ধা পোষণ করে না, তাহারা বিগ্রহ-পূজা,

আরতি, শঙ্খ ও ঘণ্টারব, পাপপুণ্য সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা—এ সমস্তই বৃথা মনে করে। তাহারা

শুধু নিজের ভিতরে যে আত্মজ্ঞান আছে তাহাই চরম সাধনা দ্বারা পূর্ণ করিয়া এমন এক স্থানে

পৌছাইতে চায় যাহাতে কামনা লুপ্ত হইয়া জীব স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিতে পারে।

তাহাদের নৈশ সভাসমিতি এবং স্ত্রীপুরুষের মিলনের উদ্দেশ্য ইহাই।” (“In the

contemplative school of Bodhi Dharma, the distinction between vice and

virtue is lost. According to this school worship of gods and goddesses, etc.,

is intended for the ignorant. The Dharma being only a matter of the heart,

offerings and salutations are really unnecessary. The true Dharma is not

outside of man's self. But the deluded are ignorant of this and they there-

fore chant books of prayers. A brazen Buddha melts, a wooden Buddha

burns when exposed to the fire, an earthen Buddha cannot save itself from

water. It cannot save itself, how can it save me? Why then carve or

mould an image of him? What is the true incense?—The true doctrine of

Sunnyata is the true incense, etc.”—S. C. Das's Indian Pundits in the

Land of Snow.) এই সহজিয়া ও বাউলের মত বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিধ্বনির ছায়া শোনা যায়।

একদিন এক বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। এই ব্যক্তি চৈতন্য-নিত্যানন্দের নাম

করিয়া আমাদের দরজায় ভিক্ষার জন্ত দাঁড়াইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

‘বাবাজি, তোমার আখড়া কোথায়?’ সে একটা জায়গার নাম

চৈতন্তশূন্তমূর্ত্তি।

করিল। আমি তখন প্রাচীন চৈতন্ত-বিগ্রহ বাঙ্গলার কোথায়

কোথায় আছে, তাহার সন্ধান লইতেছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘বাবাজি, তোমাদের আখড়ায় চৈতন্ত-বিগ্রহ আছেন?’ বাবাজি দাঁতে জীব কাটিয়া বলিল, “সেকি কথা, চৈতন্তের কি বিগ্রহ আছে? তিনি যে শূন্তমূর্ত্তি!” তখন বুঝিলাম এই শ্রেণীর বাউলেরা বিগ্রহের নিকট মাথা নোয়ায় না, “তিনি যে শূন্তমূর্ত্তি” এই উক্তিটি মহাবানী বৌদ্ধদের “ধ্যায়েৎ শূন্তমূর্ত্তিং”-এর ঠিক অনুবাদের মত শুনাইল।

যখন কোন নূতন ধর্মের রথ জাতি বা সমাজের রাজপথ দিয়া চলিয়া যায়, তখন প্রাচীন ধর্মাবলম্বীরা তাহার পথ ছাড়িয়া দেয় এবং অনেক সময় আগন্তকের নিকট আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু নূতন প্রবল ধর্ম তাহাদিগকে দীক্ষা দান করিলেও তাহাদের সাধনার খুঁটিনাটি তত্ত্বগুলি নব-দীক্ষিতকে শিখাইবার অবসর পায় না। রাজস্ব আদায় করিয়া রাজপথ চলিয়া যায়। বাহিরের হুই একটি স্বত্র স্বীকার করিলেই তাহারা নব দীক্ষিতকে আপনাত করিয়া লয়। জাভার মুসলমানেরা এখনও ঘটা করিয়া লক্ষ্মীপূজা করে, পারস্যের সুফি-সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা বৌদ্ধধর্মের অনেক জিনিষ ছাড়ে নাই, বরঞ্চ সেইগুলিই তাহাদের মর্ম্ম অধিকার করিয়া আছে। বাঙ্গলার অধঃপতিত ঘৃণিত বৌদ্ধগণ বৈষ্ণবের ধর্মগ্রহণ করিয়া রক্ষা পাইল, কিন্তু তাহারা বৈষ্ণবধর্মের কতটুকু লইল? চৈতন্ত-নিত্যানন্দের নাম মাত্র সখল দিয়া বীরভদ্রী দল তাহাদিগের তিলকে বৈষ্ণবের ছাপ দিয়া ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু তাহারা যে সাধনা এ পর্য্যন্ত করিতেছিল, সেই দেহতত্ত্ব ও শূন্ত-ধ্যান এখন পর্য্যন্ত করিতে লাগিল। বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে শত শত দল আছে তাহাদের কাহারও নাম বলরামী, কাহারও নাম বাবা আউলী, ধুসী বিশ্বাসী, পাগলা কানাইয়া, হজরতী, গোবরাই, পাগলনাথি, পাণ্ডুফকিরী, এরূপ কত নাম করিব? শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহাদের কোন খবর রাখেন না। কিন্তু এই সকল দলের ধর্মবিশ্বাস খোঁজ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, বহু আরাধনা ও তপস্তা করিয়া শেবদিকের মহাবানী বৌদ্ধগণ যে সকল তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহারা তাহা রক্ষা করিয়াছে। আপনারা পাগলা কানাইর গান, লালশশীর গান, মুরসদী গান প্রভৃতি পড়িয়া দেখিবেন, কত উচ্চাদের কথা তাহাতে আছে। অনেক সময়ে তাহা সন্ধ্যাভাষায় লিখিত। সকল কথা ভাল করিয়া বুঝা যায় না, কিন্তু নিবিড় জঙ্গলের পথে জটিল শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়া যেরূপ অজ্ঞাত পুষ্পের সুরভি আসে ও অভিনব নব-পুষ্পের অরুণ রাগরঞ্জিত মুখশ্রী দেখা যায়, এই সকল বাউল ও ফকিরদের গানে সেইরূপ বিগত ভারতীয় তপস্তা-মহিমার কিছু কিছু আভাস আছে। আমরা তাহা ভুলিয়াছি, কিন্তু নিম্ন স্তরের লোকেরা এই সম্পদ ছাড়ে নাই। রবীন্দ্রবাবু বাউলের গান হইতে তাহার কবিত্বের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। এই বাউলদের দেহতত্ত্ব বিষয়ক শত শত গান এখন লুপ্ত হইবার পথে। তাহারা বৈষ্ণবদিগের দান নহে, তাহারা সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী ভারতীয়

নিবিড় দর্শনাত্মক ও মনোবিজ্ঞান-সম্মত সাধনার দান। কবে আমরা হারানো ছইটি চক্ষু ফিরিয়া পাইব, বাহার দ্বারা নিজেদের জিনিষ দেখিবার সামর্থ্য হইবে ?

বাঙ্গলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে—বিশেষ করিয়া মুসলমানের মধ্যে—যে সকল অপূর্ণ গান এখনও পল্লীপুষ্পের ছায় অনাদরে ফুটিতেছে ও অনাদরে শুকাইতেছে, তাহা পালরাজত্ব-কালের ধর্মসাধনার বিপুল হর্ষের ভগ্ন রেণু। ইহা বাঙ্গলাদেশে যত আছে, ভারতের অল্প কোথায়ও তত নাই—বেহেতু সেগুলির স্বরূপ বাঙ্গালীরাই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। তাহাদের স্বাধীন ক্ষুর্ভি, অনবস্ত সৌন্দর্য্য এবং সর্বসংস্কারের উর্দ্ধে স্থিত অজ্ঞাত রাজ্যের তত্ত্বসাধনার প্রচেষ্টা বাঙ্গালী প্রতিভার অমুকুল—বেহেতু বাঙ্গলাদেশ প্রকৃতপক্ষে মাগধ-মহিমার উত্তরাধিকারী। এ সম্বন্ধে আমরা শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের মন্তব্য পাদটীকায় উদ্ধৃত করিতেছি।*

বাঙ্গালী সহজিয়া দলের শত শত পুঁথি আছে, তাহা বৌদ্ধ-দর্শনের পথাবলম্বী। অমৃত-রসাবলী, রত্নসার, রসসার প্রভৃতি পুঁথিতে জীবনরহস্যের অভিনব ব্যাখ্যা আছে। কেহ বলেন এগুলি যদি বৌদ্ধগ্রন্থ হইতেই গৃহীত হইয়াছে, তবে বৌদ্ধগ্রন্থের নামোন্মেষ ইহাতে নাই কেন ? বৌদ্ধগ্রন্থের নামোন্মেষ করিলে যে সেগুলি অপুণ্ড্র হইত। বর্তমান কালের হিন্দুদর্শন ও ছায়েব অনেক স্থলে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধগণের অবলম্বিত পথে সঙ্কলিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে বৌদ্ধাচার্য্যগণের উন্মেষ নাই। বৌদ্ধ-শব্দটিই নবদীক্ষিত হিন্দুর নিকট হিন্দুকুলবধূর পক্ষে ভাস্করের নামের মত অস্বাক্ষরীয় হইয়াছিল। বিশেষ বাহাদের সর্বশরীর বৌদ্ধকলঙ্কে চিহ্নিত, সেই নেড়ানেড়ীর দল যদি বৌদ্ধ গ্রন্থকারের নাম করিত তবে তাহাদিগকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইত। তাহারা সত্যমিথ্যা নানারূপ গল্প প্রস্তুত করিয়া, তাহাদের সমস্ত সূত্রের স্থাপনকর্তা বৈষ্ণব মহাজনেরা,—এই কথা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এজন্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রূপ, সনাতন, মীরাবাই প্রভৃতি দেবতুল্য ব্যক্তিকেও তাহাদের মতের গঞ্জীতে ফেলিয়া নিজেদের সাধনা বৈষ্ণব-সমাজে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছে। তাত্ত্বিকভাবে বৌদ্ধ সাধনা বহুপূর্ণ হইতে চলিয়া আসিতেছিল। আমি একাভিপ্রায়ীদের কথা বলিয়াছি। কদাবন্ত (কদাবথু) নামক পালি পুস্তকের ২৩ অধ্যায়ে ইহাদের উন্মেষ আছে। এই পুস্তক খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে লিখিত হইয়াছিল। স্মৃতরাং একাভিপ্রায়ী দল তাহার পূর্ণ হইতে বিচ্যমান ছিল। 'একাভিপ্রায়ী' অর্থ 'সমভাবাপন্ন'। কদাবথুতে লিখিত আছে—কোন কোন সম্ভারামে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন, শুধু বৌদ্ধ অনুরাগ

* "The close resemblance which the modern Bengali bears to the Magadhi and a comparison of the customs of the ancient Magadhi people with those of the modern Bengalis shows that the latter have descended from the former..... Evidence is not wanting for satisfactorily proving that our ancestors were the people who carried on diplomatic and commercial transactions with the Greeks and about whom Megasthenes, Arrian and Strabo have left records." P 21.

বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও ব্রাহ্মণের টোল

৩২৯

বশতঃ নহে—পরস্পরের মত ও অভিপ্রায়ের ও আদর্শের একত্বহেতু—এবং তাঁহারা সেই সঙ্ঘারামে মিলিত হইয়া ধর্মচর্চা করিতে ইচ্ছুক হইতেন, এমন কি জন্মজন্মান্তরেও তাঁহারা এই মিলন আকাঙ্ক্ষা করিতেন। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের মধ্যে অক্লগণ, বৈতালিক ও উত্তর-পাঠকগণই এই মতের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। অক্লগণ এই দ্বীপুত্রবের পরস্পর-সাহচর্য্য ধর্মজীবনের এতটা প্রয়োজনীয় মনে করিতেন যে তাঁহারা প্রচার করিতেন, দেবপ্রতিম ও অত্যাশ্চর্য্য-কমতাসম্পন্ন ধর্মিরাও অর্হতের রূপ ধারণ করিয়া বৌদ্ধ আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করেন।

কেন যে সহজিয়াগণ রূপ, সনাতন, মীরাবাই, এমন কি স্বয়ং মহাপ্রভুকেও এইভাবে বৌদ্ধ প্রেমের বশবর্তী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—তাঁহাদের অর্থ এখানে পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন অর্হৎ, বৌদ্ধভিক্ষু ও মহাপুরুষদের নাম তাঁহারা বৈষ্ণব হওয়ার পরে আর করিতে পারেন নাই, এজন্ত বৈষ্ণব মহাজনের টিকি ধরিয়া টানিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে একটা কথা বলা প্রয়োজনীয়। এই সহজ প্রেম তাঁহাদের বাখ্যা অনুসারে এত নির্মল, ত্যাগপূর্ণ ও সংযমাত্মক যে তাঁহারা তাঁহাদের মতের সহিত পুজামুপুজাভাবে পরিচিত, তাঁহারা এই বৌদ্ধ মিলন পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক গৌরবে মগ্নিত বলিয়া বুদ্ধিতে পারিবেন। কিন্তু এই আদর্শ ব্যক্তিচারীদের হাতে এরূপ দুর্গতি পাইয়াছিল এবং লৌকিক সংস্কারে ইহা এত ঘৃণ্য মনে হইয়াছে যে সহজিয়ারা তাঁহাদের মত অতি গোপনে প্রচার করিয়া আসিতেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও ব্রাহ্মণের টোল

নালন্দা-বিহারের অবনতি এবং গৃহদাহে ধ্বংস পাইবার পরেও বিক্রমশিলা-বিহার অনেকদিন পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ মহিমায় বিরাজ করিতেছিল। আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি—নালন্দায় একজন দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। শিক্ষার্থীকে এই দ্বারপণ্ডিতের নিকট পরীক্ষা দিয়া তথায় প্রবেশাধিকার পাইতে হইত। প্রতি দশটির মধ্যে আটটিকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইত। এই পরীক্ষা কঠিন ছিল। উচ্চশিক্ষার অনেকটা অগ্রসর না হইলে কেহ নালন্দা-বিহারের ছাত্র হইবার দাবী করিতে পারিতেন না। বিক্রমশিলা-বিহারে ছয়টি দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। গৌড়ের সনক রাজার

সময়ে (১৫৫-১৮৩ খৃঃ) নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণ এই বিহারের দ্বারপণ্ডিতের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন:—

পূর্বদ্বারে—আচার্য্য রত্নাকর শাস্তি

পশ্চিমদ্বারে—বাগেশ্বর কীর্ত্তি

উত্তরদ্বারে—নরপাণ্ড

দক্ষিণদ্বারে—প্রজ্ঞাকরমতি

প্রথম কেন্দ্রীয় দ্বারে—রত্নবজ্র

দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় দ্বারে—জ্ঞানশ্রীমিত্র

এই ছয়জনের মধ্যে অন্ততঃ তিনজন বাঙ্গালী ছিলেন। আমি এই অধ্যায়ে দেখাইতে চেষ্টা পাইতেছি যে, আখ্যায়িকার অতীতস্থানবাসী অপেক্ষা বাঙ্গালীর মধ্যেই ভারতীয় পরবর্তী সভ্যতা ও উচ্চশিক্ষার প্রভাব সর্বাধিক বেশী পাওয়া যাইতেছে। মগধ স্বদীর্ঘকাল সমস্ত ভারতবর্ষের প্রধান শিক্ষা ও কর্মতার কেন্দ্র ছিল—সুতরাং তাহার প্রভাব যে এদেশে বেশী ছড়াইয়া পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ পালরাজ্যের প্রায় সমস্ত গৌরবই বিশেষভাবে বাঙ্গালীর নিজস্ব। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বরেন্দ্র দেশের অধিপতি সনাতনের পুত্র জিতারি বিক্রমশিলা বিহারে একটি সত্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিক্রমশিলা, ওদন্তপুর, স্বর্ণবিহারের অধঃপতন হইল,—বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগুলির দীপ নিবিয়া গেল; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সেই সঙ্ঘারামগুলির গৌরবের স্থিতি বহু পরেও রক্ষিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ মঠ-মন্দিরের চূড়া খসিয়া পড়িল, তাহাদের বিরাট গৃহগুলির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত রহিল না। কিন্তু এখনও বাঙ্গলার বহুস্থানে মাটি খুঁড়িলে তাহাদের ভিত বাহির হইবে। রামাই পণ্ডিত কৃত শূত্‌পুরাণ একখানি প্রাচীন বাঙ্গলা পুস্তক। উহা কত প্রাচীন তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। বর্তমান কালে উহা যে আকারে পাওয়া যাইতেছে তাহাতে উহা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ শতকের লেখা বলিয়া অনুমান হয়। কিন্তু ইহার মাঝে মাঝে প্রাচীনতর যুগের লেখার নমুনাও আছে, বিশেষতঃ ইহার গঙ্গাংশগুলিতে। এই শূত্‌পুরাণ সঙ্ঘর্ষদেবের পুস্তক। বৌদ্ধধর্ম পুরাকালে ‘সঙ্ঘর্ষ নামে’ পরিচিত ছিল। শূত্‌পুরাণকে অধঃপতিত বৌদ্ধদিগেরই একখানি পুস্তক বলিয়া গ্রহণ করা যায়। ইহাতে লেখা আছে, “সিংহলে শ্রীধর্মদেবের বহুত সম্মান,” “কনক দেউল প্রভুর কনক বিহার,” “ধর্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে”—এই সকল উক্তিভেদে ধর্মঠাকুর যে স্বয়ং বুদ্ধদেব তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ থাকে না। সিংহলে বৌদ্ধগণের প্রধান আড্ডা, নদীয়ার নিকট স্বর্ণবিহারই বোধ হয় দ্বিতীয় অংশের লক্ষ্য এবং তৃতীয় কথাটি জয়দেবের সুবিখ্যাত “নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতি-জাতম্” ছত্রের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। “বিহার” শব্দটিও বৌদ্ধবিহার অর্থে বহুদিন বাঙ্গলায় প্রচলিত হয় নাই। দামোদরের নিকটবর্তী বলুকা নদীর ধারে ও বর্তমানে চম্পাই নগরীর নিকটস্থ হাকন্দ নামক স্থানে কোন বৌদ্ধবিহার বিদ্যমান থাকা সম্বন্ধে এই পুস্তকে কতকগুলি কথা লিপিবদ্ধ আছে। সেগুলি ঠিক নাহা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত

বিহারসম্বন্ধে লৌকিক স্থতির শেষ চিহ্ন কিনা বলা যায় না, কিন্তু বৌদ্ধবিহারগুলির স্থতির দীপ যে তখনও বঙ্গদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা একেবারে নিবাইয়া ফেলে নাই, তাহা সেই সকল উল্লেখ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। প্রাচীন প্রাসাদের দুই একখানি পাথর বা কারুখচিত ধামের ভগ্নাংশ দেখিলে যেরূপ আমরা পূর্ববর্তী কোন রাজচক্রবর্তীর আবাসস্থানের কথা স্বরণ করি, এই সকল উল্লেখ দ্বারাও সেইরূপ আমাদের স্মৃতিখ্যাত নালন্দা ও বিক্রমশিলার কথাই মনে পড়ে। হাকন্দ-বিহারের উত্তরদ্বারের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন নীলাই। তাঁহার ৮০০ গতি বা শিষ্য ছিল। দক্ষিণদ্বারের দ্বারপণ্ডিত স্বয়ং গ্রন্থকর্তা রামাই পণ্ডিত। তাঁহার গতিসংখ্যা ১,৬০০। পশ্চিমদ্বারের দ্বারপণ্ডিত পণ্ডিত খেতাই, গতিসংখ্যা ৪০০ এবং পূর্বদ্বারের দ্বারপণ্ডিত কংশাই, গতিসংখ্যা ১,২০০ (৮৪-৮৮ পৃঃ, শৃঙ্গপুরাণ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্করণ)। বস্তুতঃ এই শৃঙ্গপুরাণোক্ত ধর্ম-ঠাকুরের কাহিনীর মধ্যে যে বিকৃত বৌদ্ধধর্মের অনেক কথা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় লুক্কায়িত আছে, তাহা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বহু পণ্ডিত বিস্তারিতভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান কীর্তি ইহাদের সজ্জারাম। এই সজ্জারামগুলিতে বহুযুগের গ্রন্থাবলী সংগৃহীত থাকিত। ইহাদের ব্যয় নির্বাহিত হইবার জন্ত রাজারাজড়ারা প্রতিবন্দিতা করিয়া বহু সম্পত্তি দান করিতেন। ইহাদের বাহাড়ম্বরের অবধি ছিল না। কারুখচিত বিশাল মঠমন্দিরের শোভায় ইহারা সম্রাটগণের বিশাল প্রাসাদগুলিকে ছাড়াইয়া বাইত। বৌদ্ধধর্মের অবনতির সময়ে ব্রাহ্মণগণ ইহাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও জ্ঞানের সারাংশ আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। নালন্দা ও বিক্রমশিলা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পরে আর্য্যাবর্তের বৌদ্ধ ধর্মের ঘোর অনিষ্ট হইলেও জ্ঞান ও শাস্ত্রালোচনার পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায় নাই। হিন্দুধর্ম ইহাদের বল ও সমস্ত শক্তি নিজস্ব করিয়া লইয়া জাগিয়া উঠিল। মহম্মদ-ইবন বক্তিয়ার খিলজি গুনিতে পাইলেন, পাটনা একটা বড় রাজার রাজধানী ও তাহাদের একটা অজেয় মহাপ্রতাপশালী দুর্গ আছে। বিক্রমশিলার বিহারকে মুসলমানেরা দুর্গ বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। চারিদিকে নিরীহ হিন্দু ও বৌদ্ধগণকে হত্যা করিতে করিতে বিজয়ী দল যখন বিক্রমশিলার উচ্চ-চূড় অট্টালিকা ও শত সহস্র শিকারী ও অধ্যাপকের কণ্ঠধ্বনি-গুঞ্জরিত বিহার দেখিলেন, তখন ইহাদের ধারণা হইল, এই দুর্গ জয় করিতে পারিলেই হিন্দুধানে মুসলমান-অভিধানের প্রধান বিয় দূর হইবে। মুণ্ডিতমস্তক, কাষায়বস্ত্রপরিহিত ভিক্ষুগণকে ইহারা সেনাপতি মনে করিয়া অসি চালাইতে লাগিলেন। নিঃশেষে বিনাধার্য্য মুণ্ডের পর মুণ্ড কর্তিত হইয়া এই দুর্গ সেনাপতিশূন্য হইয়া পড়িল। যে বিপুল সম্পত্তি বহুযুগ ধরিয়া সজ্জারামে সঞ্চিত হইয়া আসিয়াছিল তাহা লুণ্ঠন করিয়া বক্তিয়ার মনে করিলেন, মগধের দুর্গ হইতে তিনি রাজভাণ্ডার লাভ করিয়াছেন। মানুষ্য থুনী হইলে যে তাহার হিসাবে কতটা ভুল হইতে পারে তাহা এই হত্যাকাণ্ড হইতে অনায়াসে বুঝা যায়। অস্ত্রশস্ত্র নাই, জগদগুরুগণ এ পর্য্যন্ত সর্বলোকের পূজা পাইয়া আসিয়াছিলেন,

তাহাদের পবিত্র আশ্রম যে কেহ হানা দিবে, ইহার বিন্দুমাত্র আশঙ্কাও তাহাদের ছিল না। একজন রক্ষী বা সশস্ত্র পাহারাওয়াদাও এতবড় অট্টালিকার মধ্যে ছিল না। বক্তব্যের মাধ্যম তখন খুন চড়িয়া গিয়াছে। শত শত ভিক্ষুর মধ্যে যখন একজনও বাকী নাই, বিপুল ভাণ্ডার যখন সমস্তই লুণ্ঠিত হইয়াছে, তখন হঠাৎ শত শত সহস্র সহস্র পুঁথি তাহার চক্ষে পড়িল। “এগুলি কি?” কে বলিবে? সেগুলি তাহাদের প্রাণের বস্তু ছিল, তাহারা ত মৃত্যুর রক্তশয্যায় চিরনিদ্রিত। বক্তব্যের বলিলেন, “বাহির হইতে হিন্দুলোক কাহাকেও ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা কর ‘এগুলি কি?’” তাহার অধীন সেনারা এত বড় একটা যুদ্ধ জয় করিয়া বিজয়োল্লাসে বলিল, “হজুর, সহরে আর একটি হিন্দুও বাকী রাখি নাই—কাহাকে ডাকিয়া আনিব?” তখন তিনি সেই যুগ-যুগ-সঞ্চিত ধর্ম, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের খনি বিশাল পুস্তকশালা পোড়াইয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন। দেখিতে দেখিতে কত কবি, কত দার্শনিক, কত নৈয়ায়িক, কত স্থপতি ও চিত্রকরের জীবনব্যাপী আরাধনার ফল হইতে মানবজাতি বঞ্চিত হইল। বিক্রমশিলার মঠে মঠে, মন্দিরের গাত্রে বড় বড় ভিক্ষু ও আচার্য্যগণের মূর্তি অঙ্কিত ছিল, সেগুলি মুহূর্তের মধ্যে ধূমে পর্যাবসিত হইল। এই ঘটনা ১১৯৮ খৃঃ অব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। বক্তব্যের খিলজি পাটনার কেলা ফতে করিয়া গোঁফে চাড়া দিয়া আমাদিগের বাদলার দিকে অগ্রসর হইলেন।

হিন্দুসমাজে বৌদ্ধগণের সম্ভ্রম মত কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। হিন্দুশক্তি কোনকালেই কেন্দ্রীভূত হইয়া জাতীয় ঐক্য উজ্জ্বল করিয়া দেখায় নাই। বৌদ্ধগণ শুধু কয়েকজন ভিক্ষুর হস্তে সম্ভারামের চাবি দিয়া জনসাধারণকে উচ্চশিক্ষা হইতে কতকটা দূরে রাখিয়াছিলেন। এই মুসলমান-কৃত বিপ্লবের সময়ে যখন প্রধান ভিক্ষু ও আচার্য্যগণ দুর্গম তিব্বতের গিরিগুহার অথবা নেপাল উপত্যকায় পলায়ন করিলেন, কিংবা মুসলমান আততায়ীর হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিলেন, যখন সম্ভারামের বিপুল পাঠাগার দগ্ধ হইয়া গেল, তখন বৌদ্ধ জন-সাধারণের আশ্রয়-স্বরূপ যোগ্য ব্যক্তি কেহ রহিল না। তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন লোক ছিল না, এবং তাহাদের কাছে ধর্মশাস্ত্র বা কোন পুস্তক রহিল না। এইজন্য কর্ণধারহীন নৌকার ভায় তাহারা অতলে ডুবিয়া গেল। তাহারা হয় ব্রাহ্মণদের পদধূলি লইয়া হিন্দুসমাজের কোন একটা নীচ স্থানে অস্পৃশ্য হইয়া রহিয়া কৃতার্থ হইল, নতুবা মুসলমান সমাজে মিশিয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা এই হৃদ্যে তাহাদের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহার আভাস শূন্তপুরাণের “নিরঞ্জনের উদ্ভা” শীর্ষক অধ্যায়ে পাওয়া যায়। হুগলী জেলার জাজপুর গ্রামে এই অত্যাচারের চূড়ান্ত হইয়াছিল—“দক্ষিণা মাগিতে যায় (বাএ), যার (জার) ঘরে নাই পায়, সাপ (শাপ) দিয়া পোড়ায় ভুবন।” ব্রাহ্মণেরা বৈদিক বলিয়া পরিচয় দিল, কিন্তু তাহারা বড়ই দুর্জন। তাহাদের শক্তি খুব বেশী। দশ বিশ জন একত্র হইয়া তাহারা সঙ্কল্পকে বিনাশ করিতে লাগিল।

এই হৃদ্যে যে মুসলমানেরা তাহাদের স্থবির, ভিক্ষু ও আচার্য্যদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিল—তাহাদের প্রধান তীর্থস্বরূপ সম্ভারামগুলিকে ধ্বংস করিয়াছিল, তাহাদিগকেই

তাহারা মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিল; কারণ মুসলমানেরা এইবার ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের প্রধান শত্রু ব্রাহ্মণগণ এবার জন্ম হইল—এই আনন্দে হজরত মহম্মদকে তাহারা ধর্মরাজের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিল,—

“যতেকে দেবতাগণ, সভে হৈয়া একমন, আনন্দেতে পরিল ইজার।
ব্রহ্মা হৈল মহম্মদ, বিষ্ণু হৈল পরগধর, আদম্ব (আদম) হৈল শূলপাণি।
গণেশ হৈল গাজি, কার্তিক হৈল কাজি, ফকির হৈল যত মুনি।
তেজিয়া আপন ভেক (বেশ), নারদ হৈলা শেক, পুরন্দর হৈল মলানা।
চন্দ্রসূর্য্য আদিদেব, পলাতক হৈয়ে সব, সভে মিলি বাজায় বাজনা।
আপনি চণ্ডিকাদেবী, তেই হৈলা হায়া (Eve—হাবা=হায়া) দেবী,
পদ্মাবতী হৈল বিবি নূর।

যতেক দেবতাগণে, হায়া সভে একমনে, প্রবেশ করিল জাজপুর।
দেউল দেহার্য ভাঙ্গে, কাড়্যা কিড়্যা খায় রঙ্গে, পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্মের পায়, রামাক্রি পণ্ডিত গায়—এ বড় বিষম গণ্ডগোল।
.....এইরূপে দ্বিজগণ, করে সৃষ্টি-সংহরণ, ই বড় হৈল অবিচার।”

এই অবিচার সহ্য করিতে না পারিয়া বঙ্গদেশের বৌদ্ধগণ অনেক স্থানে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া সামাজিক-সাম্য ও অগ্রবিধ সুবিচার পাইয়া—ব্রাহ্মণের সৃষ্টিসংহারী অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইল। পূর্ববঙ্গই বৌদ্ধদিগের প্রধান আড্ডা ছিল—সেখানে মুসলমানের সংখ্যা অসম্ভব রূপে বাড়িয়া গেল। আজ যে ভারতবর্ষে শতসহস্র লোক মুসলমান, তাহা কি পশ্চিমাগত মুসলমান-দৌরাণ্যের ফল, না ব্রাহ্মণের হিতাহিত-কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য অত্যাচারের ফল? হে হিন্দু, তুমি যে ছিন্নমস্তার ছায়া নিজের মস্তক নিজে কাটিয়া এখন রক্তদর্শনে ভীত ও ক্ষতস্থানের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছ—তুমি তো “স্বখাত সলিলে” ডুবিয়া মরিতেছ। একটু দয়া ও কৃপার দৃষ্টিতে যেখানে স্বর্ণফল ফলিত, সেখানে নির্মমতার দ্বারা দগ্ধিয়া তুমি উর্কির দেশকে উত্তর করিয়া তুলিয়াছ। আর কত দিন দেবতার দ্বার স্বজাতির বিরুদ্ধে বন্ধ রাখিবে?

১১৫০ সালে লিখিত বর্দ্ধমান জেলার রাতুল গ্রামের ৭০ বৎসর বয়স্ক শশিভূষণ পণ্ডিতের গৃহে রক্ষিত, রামাই পণ্ডিতের ভনীতায়ুক্ত একখানি পুঁথিতে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়—বলুকার যে ধর্মঠাকুরের বিহার নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা পাটনার বিহারগুলির মতই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ছিল। সিংহল-রাজের বিহারের সঙ্গে বলুকার এই “দেহার্য” তুলিত হইয়াছে—তাহার ‘ফটকের স্তম্ভ’, ‘প্রস্তরের প্রাচীর’, ‘রত্ন-কবাট’ এবং ‘বিশ্বকর্মার নিজের হাতের কারুকার্য’ ভারতবর্ষের বড় বড় সজ্জারামকে অরণ্য করাইয়া দেয়, ইহাতেও দ্বারপণ্ডিত এবং তাঁহাদের গতিদের কথা আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, অর্দ্ধ-বৌদ্ধভাবাপন্ন ধর্মঠাকুরের চেলারা মুসলমানদিগের সঙ্গে যে তখনই মিশিয়া বাইবার উপক্রম

করিতেছিল, তাহা এই সকল বর্ণনায় স্পষ্ট দেখা যায়। ধর্মঠাকুরের নিকট প্রার্থনা এইরূপ “তোম বি সাহেব গোঁসাই, তোম বি জগন্নাথ। তোম বি ধরম গোঁসাই, তোমবি চারিবেদ, তোম বি পীর পরগম্বর তোম বি ছৈয়দ”, “ত্রিশ রোজার বাত কহে—মিলে ফরমান, অত্যা-হিন্দোলজি পশ্চাতে মুসলমান।” “জমিনা পর লোভে তেলাই উড়মান বিরজী। উঠে বৈঠে নমাজ করে তরু কাজী” যেখানে আমরা “শ” বা “স” দিলাম সেখানে মূলে ‘ছ’ আছে; বধা—‘সাহেব’ স্থানে ‘ছাহেব,’ “শোভে” স্থানে “ছোবে”। এগুলি ঠিক রামাই পণ্ডিতের লেখা হইতে পারে না, কিন্তু বাঙ্গলা রচনার মাঝে মাঝে এইরূপ হিন্দী ও উর্দু মিশ্রণ এই গ্রন্থের একটা কৌতুকবহ ব্যাপার। এই অংশটিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের এত কথা আছে এবং ধর্মঠাকুরের পূজার সঙ্গে সেগুলি মিলাইয়া লইবার এরূপ প্রচেষ্টা দেখা যায়—যে আমার মনে হয় যে নাথ-সম্প্রদায় এক সময়ে মুসলমানদিগের সঙ্গে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং খুব সম্ভব ইহাদের অনেকে মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। আমরা বঙ্গে পালরাজাদের সময় হইতে বৌদ্ধধর্মের ক্রম-পরিণতির একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে দিতে চেষ্টা করিলাম।

সজ্জারামগুলি বিলোপের পর হিন্দু সমাজে জ্ঞানের চর্চা ধামে নাই। পূর্বেই বলিয়াছি হিন্দুরা বৌদ্ধধর্মের জ্ঞান কোন মঠ বা মন্দিরে তাঁহাদের উচ্চশিক্ষা আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। ব্রাহ্মণদের উচ্চশিক্ষা কতকটা কুলতান্ত্রিক। প্রত্যেক পণ্ডিতের বাড়ীই ছোটখাট সজ্জারামের মত। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে সমস্ত অদীত বিজ্ঞা নিজ নিজ হাতের নকল করা পুঁথিতে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়া থাকেন। একটি বড় সজ্জারাম নষ্ট হইলে বেরূপ বৌদ্ধ জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়, হিন্দুদের শাস্ত্রের তেমন কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থশালা নাই। এক এক গ্রামে প্রত্যেক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে বহু পুস্তক রক্ষিত থাকে। হয়ত ৭৮ পুরুষ বাবৎ সেই সকল গ্রন্থ ও টিপ্পনী একই বাড়ীতে একই পরিবারের লোক কর্তৃক লিখিত হইত। পরবর্তী বংশধর পিতা পিতামহের গ্রন্থগুলি নিজ বাড়ীতে পান, তাহা ছাড়া বর্তমান সময়ের ভাল বহি তিনি নিজে নকল করিয়া রাখেন। বড় বড় টোলের পণ্ডিতেরা নিজেই পুস্তক বা টিপ্পনী প্রণয়ন করেন এবং ছাত্রদের দ্বারা তাহাই নকল করাইয়া লন। প্রত্যেক টোলই একটি ছোটখাট বিহার। নালন্দা ও বিক্রমশিলার অভাবে সমস্ত বৌদ্ধ জ্ঞানের চক্ষু আঁধার হইয়া গেল। কিন্তু মুসলমানদের অত্যাচার, জলপ্লাবন, অগ্নিদাহ, বজ্রা, কীটের ও শিশুর দৌরাণ্ডা কিছুতেই বাসুন পণ্ডিতদের পুস্তকাগার ধ্বংস করিতে পারে নাই, এখনও শত শত, সহস্র সহস্র গ্রন্থরাজি ব্রাহ্মণদের গৃহে গৃহে বিরাজমান। ব্রাহ্মণের টোলের মত জ্ঞানলাভ ও প্রচারের এরূপ গণতান্ত্রিক পন্থা অল্প কোন দেশে এত বহুল পরিমাণে আছে কি না জানি না। পাশ্চাত্য সভ্যতা এই দরিদ্র দেশের উপযোগী উচ্চশিক্ষার সহজ পন্থা ছাড়িয়া দিয়া বড় বড় রাজপ্রাসাদে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে—ফলে উচ্চশিক্ষা এদেশে আর নাই, আছে বাহ্যিক ও ব্যয়বাহুল্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পালরাজত্বে ধর্মশাস্ত্র, পাণ্ডিত্য, শিল্প ও কথাসাহিত্য

জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্র

“বহুপতে: ক গতা মথুরাপুরী।”—রূপগোস্বামী।

পালরাজত্বে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দর্শন ও জ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। জৈনগণও অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকজন গ্রন্থকারের নাম করা বাইতেছে। ইহাদের প্রভাব বঙ্গদেশে বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়াছে।

মগধের সরিহিত গোরবরা নামক পল্লীতে বহুভূতি নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল পৃথ্বী দেবী। ইহাদের পুত্র ইন্দ্রভূতি (উপাধি গৌতম) জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের শিষ্য ছিলেন, ইনিই জৈনশাস্ত্রসংগ্রহের প্রথম ও সর্বমাত্ত পরিচালক ছিলেন। ইনি ৬০৭ খৃঃ পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রায় ৯২ বৎসর বয়সে ৫১৫ খৃঃ পূর্বে পরলোকগমন করেন। সুতরাং এই মগধবাসী জৈন পণ্ডিত পালরাজত্বের বহুপূর্বে জৈনশাস্ত্রগুলির ভিত্তি গড়িয়া যান। এই সময়ে জ্ঞানশাস্ত্র অর্দ্ধমাগধী ভাষায় লিখিত হইত। ইন্দ্রভূতির পরে বহু জৈন নৈয়ায়িক জ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিক্রমাদিত্যের গুরু সিদ্ধসেন দিবাকর সর্বপ্রথম জ্ঞানশাস্ত্রকে প্রাধান্ত প্রদান করেন। বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্ততম ক্ষপণক ও জৈন সিদ্ধসেন একই ব্যক্তি বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কথিত আছে এই জৈন সন্ন্যাসীর একটা ক্ষমতা জন্মিয়াছিল যে, ইহার দৃষ্টিমাত্র শিবলিঙ্গ ফাটিয়া যাইত। বাঙ্গালার অভিরাম স্বামীরও ঐরূপ একটা ক্ষমতা হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। ইহাদের বহুপরে মগধবাসী দিগদ্বয়সম্প্রদায়কুল বিজ্ঞানন্দ “আপ্তমীমাংসালঙ্কার” অথবা অষ্টসাহস্রী নামক জ্ঞানের গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। ইহার অপর নাম পাত্রকেশরী স্বামী। ইনি সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, অদ্বৈত, মীমাংসক, স্মৃগত, তদাগত, ভিজ্ঞান, ধর্মকীর্তি, প্রজ্ঞাকর, শবর স্বামী, ভর্কুহরি প্রভৃতি বহু হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থকারদের মতামত লইয়া বিচার করিয়াছিলেন। তাঁহার অষ্টসাহস্রীতে সর্বমত

খণ্ডন করিয়া তিনি নিজের মত স্থাপন করিয়াছিলেন। জিনসেন তাঁহার আদি পুরাণে (৮৩৮ খৃঃ) বিজ্ঞানন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। গুজরাট, কাশ্মীর ও উজ্জয়িনীতেই বহু জৈন নৈরায়িক জন্মগ্রহণ করেন, অপর অনেকের নাম পাওয়া যাইতেছে, তাঁহাদের বাসস্থানের নির্ণয় হয় নাই। পুরাকাল হইতে খৃষ্টীয় বোড়শশতাব্দী পর্য্যন্ত অনেক জৈনজ্ঞানের গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে। নদীয়ায় ও তৎপূর্বে মিথিলায় হিন্দুদের বর্তমান জায়শাস্ত্রের আবির্ভাবে তাহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশে জৈনপ্রভাবের এত নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে যে তাহাতে মনে হয় এক সময়ে জৈনশাস্ত্র এতদেশে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে অদীত হইত। বৌদ্ধপ্রভাবের মত জৈনপ্রভাবও কিরূপে ‘গজভুক্ত কপিথবৎ’ এদেশ হইতে তিরোহিত হইল, তাহার কারণ হাতড়াইয়া পাওয়া যায় না।

কেন যে হিন্দুরা ঘোর জৈনবিষেদী হইয়া এদেশে “হস্তিনা পিড্যমানোহপি ন গচ্ছেৎ জৈনমন্দিরম্” প্রভৃতি প্রবাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের একটা জটিল সমস্যা। অথচ বঙ্গদেশের যেখানে সেখানে তীর্থঙ্করদের বিশাল প্রস্তরমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়া এদেশে যে পূর্বে জৈনধর্ম প্রবল ছিল তাহা অকাট্যভাবে প্রমাণ করিতেছে।

পালিতে বৌদ্ধদিগের যে সকল গ্রন্থের গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে “মিলিন্দপঞ্জো” বিশেষ বিখ্যাত। ইহা ১০০ খৃঃ অব্দের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল। এই পুস্তক-



নাগসেন (প্রাচীন তিব্বতীয় চিত্রে হইতে)

খানি চীনদেশে “নাগসেন-সূত্র” নামে অভিহিত। ইহাতে গ্রীক রাজা মিনাণ্ডারের সহিত ভিক্ষু নাগসেনের তর্ক-বিতর্ক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তকে ব্যাক্তিয়ার গ্রীক নৃপতি সম্বন্ধে লিখিত আছে—ইনি সাহিত্য ও বিজ্ঞান শ্রুতির বহু বিভাগে পারদর্শী ছিলেন। সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক দর্শন, গণিত, সঙ্গীতশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, চতুর্বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, জ্যোতিষ, বাহুবল ও তত্ত্ব—

এই সমস্ত বিজ্ঞান তাঁহার কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকৃত ছিল। তাঁহার সঙ্গে তর্কে কেহ সমকক্ষতা করিতে পারিতেন না। তিনি সর্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দৈহিক বলও অসাধারণ ছিল। তাঁহার মত সাহসী ও কার্যতৎপর ব্যক্তি

পালরাজ্যে ধর্মশাস্ত্র, পাণ্ডিত্য, শিল্প ও কথাসাহিত্য, জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্র ৩৩৭

সমস্ত ভারতবর্ষে তখন কেহ ছিল না। তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও সৈন্তসংখ্যার অবধি ছিল না। তিনি নাস্তিক, দ্বিধাসম্পন্ন, তর্কপরায়ণ ও অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণের সঙ্গে আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। নাগসেনের সহিত তাহার তর্কের প্রথমটা এইরূপে আরম্ভ হইয়াছিল :—

“রাজা—মহোদয়! আপনি কি আমার সঙ্গে পুনর্বার আলোচনা করিবেন ?

নাগসেন—যদি মহারাজ পণ্ডিতের মত আলোচনা করেন, তবে করিব। কিন্তু যদি রাজকীয়ভাবে আলোচনা করিতে চান, তবে আমি সম্মত নহি।

রাজা—পণ্ডিতেরা কি ভাবে আলোচনা করেন ?

নাগসেন—যখন পণ্ডিতেরা তর্ক করেন, তখন তাঁহারা কোন কোন বিষয় ছাড়িয়া দিয়া নূতন বিষয় আরম্ভ করেন। যদি কোন বিষয় ভুল প্রমাণিত হয় তখনই তাহা সংশোধন করেন এবং সে বিষয়ে আর তর্ক চালান না। তাঁহারা পরস্পর ভুল স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতগুলির গুণাগুণের তারতম্য লইয়া বিচার হয়, কিন্তু তাহাতে কেহ ক্রোধ প্রকাশ করেন না। মহারাজ, পণ্ডিতদিগের আলোচনা এই ভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

রাজা—রাজকীয়ভাবে আলোচনার কথা যে বলিলেন, তাহা কিরূপে হইয়া থাকে ?

নাগসেন—মহারাজ, যদি কোন রাজা তর্কে প্রবৃত্ত হন, তবে তিনি বাহা বলেন তাহার প্রতিবাদ হইলে তিনি চটিয়া যান এবং প্রতিবাদীকে দণ্ড দিতে হুকুম করেন। মহারাজ, আলোচনার রাজকীয় ভাব এইরূপ।

রাজা—ভাল, আপনি পণ্ডিতের মতই তর্ক করিতে আরম্ভ করুন, ভুলিয়া যান যে আমি রাজা। পূজনীয় মহাশয়! আপনি তর্কের সময়ে কোন বিধা বোধ করিবেন না। মনে করিবেন, যেন ভ্রাতার সঙ্গে অথবা কোন অজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে কিংবা শিষ্যের সঙ্গে আলোচনা করিতেছেন; এমন কি, মনে করিবেন যেন আপনার ভৃত্যের সঙ্গে আলোচনা করিতেছেন।”

ভারতীয় শাস্ত্র ভারতের বাহিরেও যে কিরূপ আগ্রহ ও কিরূপ ভক্তির সহিত অধীত হইতেছিল, এতদ্বারা ইহাই বুঝা যায়।

রাজা কনিকের সময় হইতে বৌদ্ধগণের মধ্যে দুই দল দেখা দিল :—

মহাযান ভারত হইতে মঙ্গোলিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত হইল এবং হীনযান সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্রামে বিস্তৃতি লাভ করিল। হীনযান ঠিক বুদ্ধদেবের কথা ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করিবেন না, ইহাই তাঁহাদের মত। ধর্মপদ গ্রন্থ—বাহাতে বুদ্ধদেবের স্বীয় শ্রীমুখের বাণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং অপরাপর বহু পালিগ্রন্থ বাহাতে বুদ্ধের শিষ্যগণ তাঁহার উক্তি লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই মাত্র তাঁহাদের গ্রন্থ। মহাযান সম্প্রদায়ের



মিনাভার
(প্রাচীন মূর্তা হইতে)

লোকেরা বলেন, সত্য কখনও বুজের মতের বিরোধী হইতে পারে না, আমরা যেখানে যে সত্য পাইব তাহাই গ্রহণ করিব।

বঙ্গদেশের বৌদ্ধ-নৈয়ায়িকদের মধ্যে চন্দ্রগোমিনই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইনি রাজসাহী জেলার ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অল্প বয়সেই সাহিত্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও কলাশাস্ত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত "সামান্তদূষণ চন্দ্রগোমিন।

দিক্-প্রকাশিকা" নামক পুস্তক-রচয়িতা অশোক-আচার্য্য কর্তৃক তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। বরেন্দ্র-রাজকন্যা তারার সঙ্গে ইহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু ঐ কন্যার নাম ও তাঁহার উপাস্ত দেবতার নাম এক হওয়াতে তিনি বিবাহে সম্মত হন নাই; এই জন্ত বরেন্দ্রাধিপতি তাঁহাকে শাস্তি দিয়াছিলেন। ইনি নির্কাসিত হইয়া বরিশালের একটি দ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। এই দ্বীপ এখন তাঁহার নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপ নামে খ্যাত হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপ হইতে ইনি সিংহলে গমন করেন। ইনি পাণিনির পাতঞ্জলভাষ্য অগ্রাহ্য করিয়া ব্যাকরণের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। এই সময়ে ইনি নালন্দা বিহারে আসিয়া আচার্য্য চন্দ্রকীর্তির সৌহার্দ্য লাভ করেন। ইনি আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীর পূর্বভাগে বিজয়মান ছিলেন। ইহার জ্ঞানসম্বন্ধে সর্বপ্রধান পুস্তকের নাম "জ্ঞানালোকসিদ্ধি।"

শাস্তরক্ষিতের কথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। ইনিও বাঙ্গালী ছিলেন। ৭০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৬৫ খৃঃ পর্যন্ত ইনি বর্তমান ছিলেন। নালন্দার অধ্যাপকগণের মধ্যে ইহার মান ও প্রতিষ্ঠা খুব বেশী ছিল। তিব্বতরাজ খ্রীশ্চোন দিউস্তানের আহ্বানে ইনি তিব্বতে

যাইয়া তের বৎসর ছিলেন। ওদন্তপুর বিহারের আদর্শে রাজা শাস্তরক্ষিত, ৭০৫-৭৬৫ খৃঃ।

ইহার পরামর্শানুসারে মগধে সমাইএ-বিহার ৭৪৯ খৃঃ অব্দে নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন এবং তিব্বতে ইহার কীর্তি অক্ষয় হইয়া আছে। ইহার প্রধান গ্রন্থ 'তত্ত্বসংগ্রহকারিকা' একত্রিশ অধ্যায়ে বিভক্ত। বর্ণনা—(১) স্বভাবপরীক্ষা, (২) ইন্দ্রিয়পরীক্ষা, (৩) উভয়পরীক্ষা, (৪) জগৎস্বভাববাদপরীক্ষা, (৫) শব্দব্রহ্মপরীক্ষা, (৬) পুরুষপরীক্ষা, (৭) মৌমাংসাকল্পিত আত্মপরীক্ষা, (৮) কপিলপরিকল্পিত আত্মপরীক্ষা, (৯) দিগধরপরিকল্পিত আত্মপরীক্ষা, (১০) উপনিষদপরিকল্পিত আত্মপরীক্ষা, (১১) বাৎসীপুত্র-কল্পিত আত্মপরীক্ষা, (১২) কর্মফলসম্বন্ধপরীক্ষা, (১৩) সমবারশদার্থপরীক্ষা, (১৪) গুণ-শদার্থপরীক্ষা, (১৫) কর্মশদার্থপরীক্ষা, (১৬) সামান্তশদার্থপরীক্ষা, (১৭) প্রমাণান্তরপরীক্ষা, (১৮) আহাধ্যপরীক্ষা, (১৯) প্রতিপরীক্ষা, (২০) অনেন্দ্রিয়াতীতার্থসর্প পুরুষপরীক্ষা ইত্যাদি। এই তালিকা হইতে দেখা যাইবে তিনি হিন্দু ও জৈনশাস্ত্র এবং উপনিষদ প্রভৃতি সমস্ত ধর্মগ্রন্থের মত আলোচনা ও খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধ মত (আত্মা নাই) প্রমাণ করিয়াছিলেন।

কমলশীলও একজন বাঙ্গালী ছিলেন, ইনি শাস্তরক্ষিতের শিষ্য। কতক সময়ের জন্ত ইনি নালন্দায় তত্ত্বশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ইনিও তিব্বতরাজের আহ্বানে তথায় গিয়াছিলেন। সেই সময়ে চীন পণ্ডিত মহাবানী হোসাং পদ্মসম্ভব ও শাস্তরক্ষিতের মত খণ্ডন

পালরাজদে ধর্মশাস্ত্র, পাণ্ডিত্য, শিল্প ও কথাসাহিত্য, জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্র ৩৩৯

করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু কমলশীল তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বীয় গুরুর গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রভাকরগুপ্তও সম্ভবতঃ বাঙ্গালী ছিলেন। ইনি বঙ্গদেশের সনক রাজার সময়ে (৯৮৩ খৃঃ) বিক্রমশিলার পূর্বদ্বারের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। ইহার জ্ঞানসম্বন্ধে বহু গ্রন্থ বিদ্যমান, তন্মধ্যে “প্রমাণ-বার্তিকালকার” ও “মহাবলন্তনিশ্চয়” প্রসিদ্ধ।

প্রসিদ্ধ জিতারি (দীপঙ্করের গুরু) পাল-রাজার অধীন সামন্ত-রাজ সনাতনের সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইনি বাঙ্গালী ও বরেন্দ্রবাসী ছিলেন। জ্ঞানসম্বন্ধে ইহার অনেক গ্রন্থ সুপরিচিত, তন্মধ্যে “হেতুবাদোপদেশ,” “ধর্ম্যধর্ম-বিনিশ্চয়” প্রভৃতি প্রধান।

জ্ঞানশ্রী (৯৮৩ খৃঃ) গৌড়বাসী হইলেও দীর্ঘকাল কান্মীরে বাস করেন। ইনি প্রথমতঃ শ্রাবক-সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন; স্বদেশে ফিরিয়া জ্ঞানশ্রী বিক্রমশিলার দ্বারপণ্ডিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে—দীপঙ্কর তাঁহার প্রথম জীবনে ইহার নিকট অনেক বিষয়ে শ্রবণী ছিলেন। অপরাপর নানা গ্রন্থের মধ্যে ইহার “প্রমাণ-বিনিশ্চয়-টীকা” বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি শ্রাবকের দল ছাড়িয়া শেবে মহাবান-সম্প্রদায় আশ্রয় করিয়াছিলেন। ইহার “কার্য্যাকারণ-ভাবসিদ্ধি” গ্রন্থখানিও বিশেষ প্রশংসিত।

রত্নাকর শাস্ত্রি (৯৮৩ খৃঃ) ওদন্তপুরের শ্রাবক-সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন। ৯৮৩ খৃঃ অব্দে বিক্রমশিলার দ্বারপণ্ডিতগণের তালিকায় ইহার নাম আছে; ইনি জিতারি ও রত্নকীর্ত্তি প্রভৃতি আচার্য্যগণের শিষ্য ছিলেন। ইনি তীর্থকদলের প্রতিবাদ নিরাশ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। অনেকদিন ইনি সিংহলে বাস করিয়াছিলেন। ইহার প্রধান পুস্তকের নাম “বিজ্ঞানমাত্রসিদ্ধি”।

যে সকল নৈয়ায়িকের নাম দেওয়া হইল, তাঁহাদের অধিকাংশই বাঙ্গালী ছিলেন। শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের গ্রন্থগুলিতে বাঙ্গালী পণ্ডিত তাহার চীন-জাপানে গিয়াছিলেন তাঁহাদের উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের শত শত নৈয়ায়িক পণ্ডিতের নাম ও গ্রন্থাবলী পাওয়া যাইতেছে। বৌদ্ধ পণ্ডিতের অনেক পুস্তকই ভারতবর্ষে নাই। চীন, জাপান, তিব্বত, শ্রাম ও নেপাল হইতে তাহার আবিষ্কৃত হইতেছে। প্রায়শঃ মূল সংস্কৃতে লিখিত গ্রন্থ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। চীন বা তিব্বতীয় ভাষার অনুবাদ হইতে আমরা তাহাদের বিষয় জানিতে পারি। এই সমস্ত বৌদ্ধ জ্ঞান পাঠ করিলে আমরা আমাদের দেশের অদ্বিতীয় অন্ততম গৌরব নব্যজ্ঞানের অঙ্গুর ও বিকাশের হর্গম পন্থা আবিষ্কার করিতে পারি। হায়! ভারতীয় পণ্ডিতগণ! তোমাদের ধর্ম-কলহ কি নিদারুণ। তোমাদের অতুলনীয় কীর্ত্তিগুলি স্বদেশবাসীরা উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, কিন্তু অপর জাতিরা তাহাই অতি যত্নে কুড়াইয়া রাখিয়া

ইতিহাস উদ্ধারে উদা-
গীনতা।

ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে। তোমরা নিজেরা এখন নিঃশব্দ। এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্ত একদল দৃঢ়সঙ্কল্প যুবকের চীন, জাপান, শ্রাম, সিংহল, তিব্বত, নেপাল, বালী ও জাভায়

যাওয়া দরকার। সেগুলির বাহা অবশিষ্ট আছে, হয়ত এখনও তাহার কতক কতক বহু তপস্তার দ্বারা কুড়াইয়া আনিতে পারা যায়। কিন্তু এই দুর্গম পন্থায় পথিক কে হইবেন? এখানে উপাধি, স্বর্ণপদক ও উচ্চপদের আশা নাই। পুরাকালে কোম্বোয়াস বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বেক্রপভাবে ধর্মপ্রচার করিতে দেশ-বিদেশে গিয়াছিলেন, বিলাতে এক প্রাচীন যুগে এরেস্‌মাস প্রভৃতি জ্ঞানিবৃন্দ বেক্রপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ স্বদেশের কল্যাণকামী, পার্থিব বশ, অর্থ প্রভৃতির প্রতি উদাসীন কতিপয় দেশ-সেবকের প্রয়োজন। বিলাতে যাইয়া নরমান-বিজয় ও ক্রমওয়েলের শাসন, এমন কি ক্রুসেডের বৃত্তান্ত পড়িয়া গবেষণার জন্ত ছাত্রগণ উন্মুখ হইয়া ছুটিতেছেন, সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও পদগৌরব আছে। এখানে কিছুই নাই। কিছু না লইয়া, ভিক্ষার তুলি কাঁধে করিয়া জীবন বিনাপণে সমর্পণপূর্বক বাহারা খাটিবেন, সেইরূপ খাটিবার কয়েকটি লোক চাই। ইলোরা, অজন্তা, হস্তিগুফ, খেজুরাহ, শ্রাম, বরোবদর, প্রম্বনম্ হইতে নিরবধি আমাদের দেশলক্ষীর নিমন্ত্রণ আসিতেছে, আমরা বধির হইয়া আছি—তাই মাতৃ-আজ্ঞা শুনিতে পাইতেছি না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গলাদেশে জ্ঞানের গৌরব

মৌর্যদিগের সময় হইতে বিজ্ঞা ও জ্ঞানের আদর আমরা বৃহৎ বাঙ্গলার সর্বত্র দেখিতে পাই। সেই সময় হইতে সুদীর্ঘ রাজ্যের কাণ্ডারী ও রাজার পূজ্য হইয়াছিলেন। সে সম্মান কত বড়, বাহা প্রদর্শনের জন্ত “বৃন্দ” উপাধিতে যেন কৃতার্থ হইয়া চন্দ্রগুপ্ত কোটিল্যের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ছায় তাঁহার সেবা করিতেন। এই বিজ্ঞা ও জ্ঞানের আদর করিয়া কোটিল্য তাঁহার সমস্ত বড়বড়, গুপ্তহত্যা, বিবপ্রয়োগ প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক নির্মম উপায় অবলম্বন সবেও মূলতঃ রাক্ষস মন্ত্রীর সৌহার্দ্য ও সহকারিতা-প্রার্থী ছিলেন। গুণীর আদর দেখাইবার জন্ত পালরাজগণের মধ্যে একজন মহিমাযিত সম্রাট অমলধবল মহার্ষ আসনে স্বীয় মন্ত্রীকে বসাইয়া সশঙ্কচিত্তে সন্মেলের সহিত স্বয়ং সিংহাসনে উপবেশন করিতেন, এবং অপর এক রাজা, বাহার দুর্জব শক্তিবলে চারিদিকের নৃপতিরা গরুড় পক্ষীর ছায় তাঁহার রাজসভার উপস্থিত থাকিতেন, তিনি স্বয়ং তাঁহার মন্ত্রিবরের কুটিরের এক কোণে পরামর্শের জন্ত অবকাশ প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহাকে একটা সংবাদ দিতেও সাহসী হইতেন না। প্রকৃত একজন গুণীর আদর দেখাইবার জন্ত তিব্বতরাজ অসংখ্য স্বর্ণ ব্যয় করিয়া স্বীয় রাজসভার প্রধান ব্যক্তিদিগকে কত কত হস্তসাদনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং সেই বাঙ্গালী পণ্ডিতের

দর্শনকামী হইয়া শেষে নিজ প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার প্রিয় সভাসদেরও অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, এবং নেপালের রাজা ও তাঁহার রাজী মহাসমারোহে সেই পণ্ডিতকে বরণ করিয়া লইয়া—তাঁহাদের একমাত্র পুত্র যুবরাজকে তাঁহার পায়ে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার শিষ্যত্বে দীক্ষিত করাইয়াছিলেন। প্রকৃত গুণীর প্রতি শ্রদ্ধা, বিজ্ঞা ও জ্ঞানের আদর এই দেশে বৌদ্ধযুগের পরেও বহুদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। শুধু ইতিহাসে নহে, এই সুধীগণের যে চিত্র আমরা কাব্য-নাটকাদিতে পাই—তাহা সর্বোত্তোভাবে সেই অপূর্ণ সমাদরের যোগ্য। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা দেখিয়া গ্রীকদূত বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। পারস্তের রাজার রাজপ্রাসাদ কারুকার্য ও ঐশ্ব্যের জন্ত বিখ্যাত ছিল, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ এবং তাঁহার সভার সৌন্দর্য ও শোভা পারস্তরাজের রাজধানীর গৌরবকে হার মানাইয়াছিল। সেই রাজাধিরাজ প্রসিদ্ধ নন্দবংশের উচ্ছেদকারী মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত যে মন্ত্রী আজ্ঞাবহ ভূতাস্বরূপ ছিলেন সেই মন্ত্রীর গৃহের বর্ণনা আপনারা মূর্ত্তারাক্ষস নাটকে পাঠ করেন। গোময়লিপ্ত ক্ষুদ্র খড়োঘরে, অতি সামান্য আসবাবযুক্ত পর্ণকুটীরে বাস করিয়া চাপক্য আর্ঘ্যাবর্ত্তের সমস্ত রাষ্ট্রনীতির কাণ্ডারী হইয়াছিলেন, তাঁহার তিলমাত্র ভোগের ইচ্ছা ছিল না। বড় বড় যুদ্ধবিগ্রহ, বড়বড় ও রাজনৈতিক ব্যাপার যাহার ইঙ্গিতমাত্রে সম্পাদিত হইত, তিনি অন্নাহারী, কুটিরবাসী বিস্ময়প্রকৃতি ব্রাহ্মণের আদর্শ; যখন রাক্ষস মন্ত্রীর পরাভব হইল, তখন তিনি তাঁহাকে স্বীয় পদে অভিষিক্ত করিয়া নিজে ব্রাহ্মণোচিত প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন। আমরা একখানি নাটক মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক এই সকল ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই নাই। ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণের এই যে আদর্শ তাহা তো পরবর্ত্তী কালের সমস্ত তাম্রশাসন ও শৈললেখ্যই প্রমাণিত হইতেছে। ঐতিহাসিক ঘটনার খুঁটিনাটির প্রতি অতিরিক্ত পরিমাণে মনোযোগ দেওয়ার কারণ নাই। কিন্তু কি কাব্য, কি নাটক, কি তাম্রশাসন ও শিলালেখ এ সমস্তের মধ্যে যদি আমরা একটা আদর্শই দেখিতে পাই, তবে তাহাই জাতীয় ইতিহাসের মূল কথা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইব।

পরবর্ত্তী সেন-রাজত্ব-কালে এমন কি মুসলমানাধিকারেও আমাদের এই আদর্শ উজ্জল ছিল, জ্ঞানের পথে আমাদের মাথা কাহারও নিকট হেঁট করিতে হয় নাই। আমরা ‘জগদগুরু’ উপাধি লইয়া সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষক বলিয়া আপনাদিগকে ঘোষণা করিতাম। আমাদের সেই মহিমান্বিত পদের বিচ্যুতি যেদিন ঘটিয়াছে সেই দিন হিমালয় বিদ্যাপর্ব্বতের মত নতশির এবং ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা একটা খাদে পরিণত হইয়াছে।

মগধের লোকেরা ক্রমাগত পূর্ব্বমুখী হইয়া বাংলায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, খাস বিহারে মগধের যতটা চিহ্ন আছে বাংলাদেশে তাহা তদপেক্ষা অনেক বেশী। বিহার খুঁড়িয়া নালন্দা, ওদন্তপুর ও বিক্রমশিলার প্রস্তরখণ্ড, দেববিগ্রহ ও শিলালেখ বাহির হইতে পারে, কিন্তু বাংলার ব্রাহ্মণের কুটিরই মূল মাগধী প্রতিভার আশ্রয়স্থান হইয়াছিল। নানাভাবে বিভক্ত চূর্ণবিচূর্ণ মাগধী সভ্যতা, বিস্ময়জনক সত্যদেহের স্থায় বহুদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বাংলাদেশ হইল সেই তীর্থ, যে তীর্থে মাগধী মহাদেবীর মন্তিকটি

পড়িয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীতে বেহার হইতে বহু সৈন্ত-সামন্ত ও আত্মীয়-সহচরপরিবৃত হইয়া রাজা শশাঙ্ক বাঙ্গলাদেশে আসিয়া মুর্শিদাবাদের নিকট কাণসোনার উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিকায়ত মাগধদেব আসিয়া তদীয় বিপুল সৈন্ত ও বহু আত্মীয়-স্বগণসহ রাঢ়ে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। মগধের লোকেরা উপর্যুপরি শত্রুর আক্রমণে, অবশেষে মুসলমানের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়া বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কতক তিব্বত ও নেপাল প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন; কতক চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হইয়া রহিলেন। ইহা ছাড়া রাঢ়ে ও বঙ্গে (চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত তথায় হিন্দু-রাজত্ব ছিল) বহুসংখ্যক মগধবাসী আশ্রয় লইয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতেও বর্তমানে বৌদ্ধগণের বিপুল প্রভাব ছিল। ঐ শতাব্দীতে সহস্র সহস্র শিষ্যের সহিত রামানন্দ ঘোষ ভারতবর্ষে পুনরায় বৌদ্ধ-সাম্রাজ্য-স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তখন পুরীর মন্দির মুসলমানগণকর্তৃক বহুভাবে লাহিত হইয়াছিল এবং বৈষ্ণবেরা তাহা দখল করিয়াছিলেন। রামানন্দ নিজেকে বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া পুরীর মন্দির উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হন। তিনি পরিকারভাবে প্রচার করেন যে, পুরীর মন্দির বৌদ্ধগণের নিজস্ব, ইহাতে আর কাহারও অধিকার নাই। তিনি একখানি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে তিনি এই রাজ্য হইতে মুসলমান-দিগকে দূর করিয়া—বৈষ্ণবগণের হস্ত হইতে পুরী কাড়িয়া লইয়া পুরীর মন্দিরাধিপতি বুদ্ধ-বিগ্রহকে একচ্ছত্র রাজা করিবেন। এই সংকল্প করিয়া তিনি পুস্তক লিখিয়াছিলেন যে, যখন এদেশে পুনরায় বৌদ্ধরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন তিনি পুরীর মন্দিরের পাদপীঠে বসিয়া তৎকৃত রামায়ণখানি পাঠ করিবেন। বুদ্ধদেবের সপ্তদশ শতাব্দীর এই অদ্বিতীয় অবতারের বিষয় যে রামায়ণে লিখিত আছে সেই পুস্তকখানির নাম রামলীলা। ইহার সম্বন্ধে অপরাপর কথা পরে লিখিব। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বভাগে নারায়ণদেব মগধ হইতে আসিয়া ঐশ্বর্যসিংহে উপনিবিষ্ট হন। সম্ভবতঃ মনসামঙ্গলের উপাখ্যান-ভাগ তিনি বেহার অঞ্চল হইতে আনিয়াছিলেন। চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সনকা বেহারী রাজকন্যা ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, নারায়ণদেব যে মগধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা শ্রীহট্টের অন্তর্গত মগধ গ্রাম, কিন্তু এই অসম্ভব সত্য নহে। এই ভাবে পতনোন্মুখ মাগধী-মহিমা বাঙ্গলার আসিয়া আশ্রয় লইল, তাহার ফলাফল পরে লিপিবদ্ধ হইবে।

এই দেশে বিজ্ঞান যে সম্মান হইয়াছিল,—তাহা মগধের ইতিহাসকেই স্বরণ করাইয়া দেয়। হিন্দু ও বৌদ্ধরাজগণ পণ্ডিতদিগকে যেরূপ অজস্র দান করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। পালরাজগণের পরেও এই দানের স্রোত নিরুদ্ধ হয় নাই। শত শত তান্ত্রশাসন এবং অভ্যন্তরীণ দলিলপত্র নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সেই মহানুভব রাজাদের দানশীলতার পুণ্যে যে কয়েকখানি আমরা পাইয়াছি, তাহা হইতেই এই দানের পরিমাণ কতকটা বুঝা যাইবে। দৃষ্টান্তস্বলে তান্ত্রশাসনের বাৎসাগোত্রীয় উদয়কর দেবকে বিজয় সেনের দান, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় পীতবাস গুপ্তশর্ম্মাকে শ্রীচন্দ্রদেবের দান, বিক্রমপুরবাসী রামদাস দেবশর্ম্মাকে

ভোজবর্ষদেবের দান, বাৎসরগোত্রীয় হলায়ুধ দেববর্ষাকে বিধিরূপ সেনের দান, উপাধ্যায় ব্যাসদেব শর্ম্মাকে লক্ষ্মণ সেনের দান প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র দানের উল্লেখ করিলাম। এই দানের পরিমাণ যে কত বেশী ছিল, তাহা দেখাইতে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। তৎকালে যে কোন উপলক্ষ হইলেই রাজারা পণ্ডিত-বিদায় করিয়া উৎসাহ দিতেন। এখনকার রাজারা যেমন বিলাত যাইয়া খেয়ালে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন, গৃহে আসিয়া দেখেন রাজপ্রাসাদের আঙ্গিনায় বড় বড় ঘাস জন্মিয়াছে, মালীর অভাবে তাহা কাটা হয় নাই—রাজপ্রাসাদে তাঁহার শুইবার ঘরের ছাদে ফুটা হইয়াছে, মিস্ত্রীর অভাবে তাহা মেরামত হয় নাই—কারণ রাজ্যের চৌদ্দ আনি আর মহারাজ বাহাদুরের বিলাত যাওয়ার ব্যয়ে খরচ হইয়া গিয়াছে,—তখনকার দিনে তেমনি চারিদিকে যোগ্য সুপণ্ডিত ও চরিত্রবান্ পণ্ডিতদিগকে মুক্তহস্তে দান করা রাজাদের একটা খেয়াল ছিল। একটা উপলক্ষ বা অসুখাত পাইলেই হয়। আমরা তাম্রশাসনে বালরাম নামক একজন রাজার উল্লেখ পাই। তাঁহার ঠোঁটের উপরে নূতন গোঁফের রেখা দেখা দিয়াছে মাত্র। এই নব শুশ্ফোলমের উপলক্ষে উৎসব করিয়া তিনি ২১ খানি গ্রামের স্বত্ব ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং ইহা ছাড়া বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগকে আরও ৪১ লক্ষ টাকা বিদায় দিয়াছিলেন। আসামের অনেক রাজাও মুক্ত হস্তে বিদ্বান্গণকে এইভাবে পুরস্কৃত করিয়াছেন, তাহা তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয়।

বস্তুতঃ বিজ্ঞান অমুশীলন ও উৎসাহ দেওয়া তখন একটা সমারোহ-ব্যাপার ছিল। ধনাঢ্য লোকেরা মাতাপিতৃ-শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রধান কেন্দ্রের পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন। কান্দী, কান্দী, কান্দীর, ডাবিড়, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, অযোধ্যা ও মিথিলা প্রভৃতি দেশ হইতে প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ আসিতেন। নৈয়ায়িকে নৈয়ায়িকে, দার্শনিকে দার্শনিকে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত বিচার চলিত। তেমন এক বিচারসভা আমি শৈশবে দেখিয়াছি। যাবতীয় শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতগণ একত্র হইয়া বিচার করিতেন। তাহাতে প্রত্যেক বিজ্ঞান অমুশীলনপুষ্ট হইত এবং নূতন তথ্য, নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইত। এইরূপভাবে মিলন বৎসরে একবার, দুইবার নহে, বহুবার হইত। বিজ্ঞানী পণ্ডিতদিগের বিদায় সর্বোচ্চ হইত। ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ একত্র হইয়া সর্বসমক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে অদ্বীত বিজ্ঞান অমুশীলনপূর্বক বে মৌলিকতা দেখাইয়াই উৎসাহ পাইতেন, তাহাতে জ্ঞানের পরিধি উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইত। এখনকার দিনেও এইরূপ Conference হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে শুধু বিজ্ঞানমুরাগী, পার্থিব সমস্ত গৌরবের প্রতি উদাসীন, জ্ঞানসম্বল পণ্ডিতগণ একত্র হন না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের সময়ে লার্ড ওয়েলেসলি সিভিলিয়ানদের মধ্যে প্রাদেশিক ভাবার কৃতিত্ব পরীক্ষার জন্ত এইরূপ বিচারপদ্ধতি চালাইতে চাহিয়াছিলেন, ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে রামমোহন রায় ও মেকলে প্রমুখ ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তিরা প্রাদেশিক ভাবাগুলিকে হতাস করিয়া দারুণ বাধা উপস্থিত করাতে সেইরূপ বিচারপদ্ধতির মূলে

কুঠারঘাত করা হইয়াছে। বাঙ্গালীর নব্যজ্ঞানের স্বত্র ধারণা করা পাশ্চাত্য জগতের কতকটা অসম্ভব, কারণ শুধু বিজ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞানচর্চার তাঁহারা এখন আর একটা মূল্য দিতে প্রস্তুত হন না।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক গ্রাম অপরাপর গ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন। প্রত্যেক গ্রামেই তাঁতী, কাঁসারী, জোলা, ধোপা, নাপিত, গায়ক, গোয়াল, কামার, কুমার, পুরোহিত বিজ্ঞান, তাহা ছাড়া তথায় দেবমন্দির আছে, হাট বাজার বসে, স্ততরাং প্রতিগ্রামের লোকেরা জগৎ হইতে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকিত। কিন্তু বৎসরে কয়েকবার ‘শুভ বোগ’ হইয়া থাকে, তীর্থ-মাহাত্মা আছে—সেই সকল উপলক্ষে ভারতীয় পল্লীবাসীদের একটা সার্বজনীন মিলন হইত। এই মিলন উপলক্ষে পল্লীবাসীরা আর কুপমণ্ডুক হইয়া থাকিতে পারিত না। চিন্তাধারার একটা প্রেরণা সর্বদা প্রবাহিত হইয়া আসিয়া পল্লী-সভ্যতার ত্রিবৃদ্ধি করিত। বাহিরের বায়ু আসিয়া পল্লীর নিরুদ্ধ বায়ুকে নূতন গতিশীলতা প্রদান করিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবদ্বীপের টোল

এইভাবে আমাদের সোণার বাজলা ভারতী দেবীর সাধনা করিত। বৌদ্ধ সজ্জারামগুলি নষ্ট হওয়ার পরে বাজলা দেশ ছাইয়া টোল বসিয়া গেল, বাহা এক ছিল তাহা বহু হইল। এখন আর ওদন্তপুর, বিক্রমশিলা, সুবর্ণবিহার, সমস্ত বিজ্ঞান ভাণ্ডারী হইয়া অধ্যাক্ষতা করিতে দাঁড়াইল না। সমস্ত বিজ্ঞানমন্দিরের চাবি একজনের কাছে রহিল না। লিখিত আছে দীপঙ্করের কোমরে অনেকগুলি চাবি সর্বদাই ঝুলান থাকিত। তিনি বহু সজ্জারামের অধ্যাক্ষ হওয়ার দরুন সেই সমস্ত বিজ্ঞানালয়ের চাবি তাহার কাছে থাকিত। কিন্তু সজ্জারামগুলি নষ্ট হওয়ার পর কে আর তিন শত ছুট উচ্চ মঠ নির্মাণ করিবে, কে বিশালায়তন বিহার নির্মাণ করিবে, কে আর রাজচক্রবর্তীদের শ্রায় তাঁহাদের মুক্তহস্ত দানে বিজ্ঞানশালায় রাজভাণ্ডার স্থাপিত করিবে? আমাদের সেই গৌরবের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু ভারতী দেবী নিজ শ্রীহস্তে ধাঁহার করে সাঁঝের দীপ জ্বালাইয়া দিতেন, কপালে স্বীয় কৃপাচিহ্নের তিলক আঁকিয়া দিতেন, তাঁহাদিগের গৌরব নষ্ট করিবে কে? সেই রাজপ্রাসাদগুলির জারগার সামান্য কুটির হইল—কতি কি? হয়ত কুটিরে বসিয়াই এক সময়ে বায়ীকি রামায়ণ ও বাস মহাভারত লিখিয়াছিলেন—তদপেক্ষা কত বৃহৎ বিজ্ঞানতানে বাস করিয়া আমরা বি. এ. পরীক্ষার জ্ঞান মাথা খুড়িয়া মরিতেছি। নবদ্বীপে রঘুনাথ শিরোমণি,

জগদীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নব্যজ্ঞানকে যে চূড়ান্ত গরিমা প্রদান করিলেন, তাহাতে ইন্দ্রজিতি, সিদ্ধসেন-দিবাকর ও চন্দ্রগোমিন প্রভৃতি জৈন ও বৌদ্ধ পণ্ডিতের কীর্তি নিশ্চয় হইয়া গেল। সুতরাং বিজ্ঞান গতি মুসলমানাধিকারেও বিন্দুমাত্র ধামে নাই। ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্তও বঙ্গদেশের এই গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। উহার কিছু পূর্বে হইতেই বঙ্গে নদীয়ার টোল ভারতবিজয়ী হইল। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন ঐ সকল টোল জগদ্বিখ্যাত বিহারের সম্ভারামগুলির সঙ্গে তুলনা করা বাতুলতা। অবশ্য পরাধীন ভারতবর্ষে তখন রাজচক্রবর্তীদের দান ও সমারোহ আমরা কি করিয়া আশা করিতে পারি? সে ধর্মপাল, বালাদিত্য প্রভৃতি রাজস্ববর্গের মুক্তহস্তের দানে নির্মিত শত শত মঠ-মন্দির নবদ্বীপে আশা করা বৃথা। কিন্তু বাহিরের আসবাবপত্র সামান্য হইলেও ভিতরের তো কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ও জ্ঞানের পর শাস্ত্রচর্চা ধামিয়া যায় নাই। ইহাদের পরিণতি বাঙ্গালার নবজ্ঞানে দৃষ্ট হয়। শুধু তাহাই নহে, প্রাচীন শাস্ত্র সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া বাঙ্গালীর প্রতিভা জ্ঞানের এমন একটা শ্রী ফুটাইয়া তুলিয়াছে, বাহা বিশ্বব্যাপক। যদিও নবদ্বীপের টোলগুলির উত্থানপতন-প্রসঙ্গ পরবর্তী ইতিহাসের অন্তর্গত, তথাপি পাল-যুগের বিজ্ঞান কথা কহিতে যাইয়া ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞানচর্চার সূত্র টানিয়া আনিলে নবদ্বীপের কথা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বিহারের সম্ভারামগুলির পরে মিথিলা ও নবদ্বীপ। তখন বাঙ্গালী স্বাধীনতা হারাইয়া বসিয়াছে। নালন্দায় ১০,০০০ ছাত্র পড়িত, বিক্রমশিলায় কোন একটা সভা হইলে ৮,০০০ ভিক্ষু দার্শনিক মতের আলোচনা করিতেন। নালন্দায় ৮০,০০০ ভিক্ষু নির্কীর্ণ পাইয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপে “লক্ষ লক্ষ পঢ়ুয়া পড়িত”—ইহা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন। এই লক্ষ লক্ষ মানে কি? সেকালের ভাষায় এই সকল ব্যাবহারিক অতিরঞ্জন ছিল, অবশ্য বৃন্দাবন দাস “বহুসংখ্যক” কথাটা ঐ ভাবে বুঝাইয়াছিলেন। তখন হয়ত রঘুনাথ শিরোমণি জীবিত ছিলেন, অপরাপর বিখ্যাত নৈয়ায়িকেরাও আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তখনকার দিনের সকল কথা জানি না, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের কিছু বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। এই নবদ্বীপে পূর্বে হরিহোড় নামক এক ব্যক্তি খুব ঐশ্বর্যশালী ছিলেন, তাহার হাত হইতে সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া মানসিংহ ভবানন্দ মজুমদারকে, নবদ্বীপের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া করমান্ দিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ রাজার সময়ে নবদ্বীপের টোল খুব জাকিয়া উঠিয়াছিল। বিজ্ঞান গৌরব তথায় বহুপূর্বে হইতেই ছিল। নবদ্বীপের সুবর্ণ-বিহার তাহার প্রমাণ। ভবানন্দের পর গোপাল রায় রাজা হন, তাহার পুত্রের নাম রাঘব রায়। ইহাদের সময়েও নবদ্বীপে টোলের সম্মান ও শ্রী অব্যাহত ছিল। কিন্তু পরবর্তী কাল হইতে তথাকার টোলগুলির দীপ্তি ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে। রাঘব রায়ের পুত্র কদ্র রায় অহুমান ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে বিজয়মান ছিলেন। ১৭২১ খৃষ্টাব্দের জাহ্নবীরী সংখ্যায় “কলিকাতা মাসিক” (Calcutta Monthly) নামক একখানি ইংরেজ-সম্পাদিত পত্রিকায় নবদ্বীপ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল, “নবদ্বীপের টোলগুলির গৌরব সর্ব্ববাদিসম্মত। এই টোলগুলির মধ্যে তিনটি ছিল

সর্বপ্রধান, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ও গোপালপাড়ার টোল। ইহাদের ব্যয়নির্বাহার্থ যথাযোগ্য

সম্পত্তির ব্যবস্থা আছে। যখন এই নিজস্ব সম্পত্তির আয় হইতে
নবদ্বীপে টোলের উৎপত্তি
ও বিকাশ।

পণ্ডিত ও ছাত্রদের ব্যয়নির্বাহ করা কঠিন হয়, তখন কৃষ্ণনগরের
মহারাজ মুক্তহস্তে দান করিয়া সমস্ত অভাব পূর্ণ করিয়া থাকেন।
প্রত্যেক পণ্ডিতের জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তির ব্যবস্থা আছে এবং তাহার দ্বারা তাঁহারা যতগুলি ছাত্র
রাখেন তাহাদের প্রত্যেকের জন্য একটা অতিরিক্ত অর্থসাহায্য পাইয়া থাকেন। এই বৃত্তি
ও অর্থসাহায্যে সমস্ত ব্যয় স্থানিকভাবে হয়। এখন (১৭৯১ খৃঃ) এক নবদ্বীপের টোলেই প্রায়
১,১০০ ছাত্র এবং ১৫০ জন অধ্যাপক আছেন। কিন্তু এই টোলগুলির অবস্থা পড়ন্ত দশায়।
রাজা ক্রুদ্ধের সময়ে অবস্থা ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল।”

এই লেখক জানাইয়াছেন যে রাজা ক্রুদ্ধের সময়ে (১৬৮০ খৃঃ) ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪,০০০
এবং অধ্যাপক ছিলেন ছয় শত। অধ্যাপকের সংখ্যা এত বেশী থাকিতে মনে হয়,
শাস্ত্রের বহু বিভাগ এই সকল টোলের অন্তর্গত ছিল।

“কলিকাতা মাসিক” হইতে এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—“বহু
দূরদেশ হইতে নদীয়াতে ছাত্র-সমাগম হয়, এই আগন্তুক ছাত্রমণ্ডলী অধিকাংশই প্রৌঢ়বয়স্ক।

কারণ তাঁহারা বহুকাল অজ্ঞান দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়া নবদ্বীপে
জ্ঞানদর্শন পাঠ করিবার যোগ্যতা অর্জন করেন। এতদূর পড়িয়া
টোলের শিক্ষাপদ্ধতি।

শুনিয়া আসিয়া নবদ্বীপে শিক্ষা সমাপ্ত করিতে তাঁহাদের বিশটি বৎসরের দরকার হয়।
তাঁহারা সাহিত্যচর্চার জন্য এখানে আসেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই টোলের নির্দিষ্ট বৃত্তি ও
রাজার দান হইতে ব্যয় চালাইবার মত খরচ পাইয়া থাকেন।

“ইহারা যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করেন তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন। এইজন্য
সংস্কৃত ভাষায় অভিধানাদিও কবিতায় রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা যেন এটি মনে
না করা হয় যে, তাঁহাদের বিজ্ঞা কেবল মুখস্থ কথার আবৃত্তিতেই শেষ হয়। তাঁহারা
সর্বদা মৌলিক গ্রন্থ এবং টিপ্পনী লিখিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহাদের বিশেষ বৃত্তি ও পুরস্কারের
ব্যবস্থা আছে।”

কি কি পুস্তক পড়ান হয় তাহা এবং শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অপরাপর জ্ঞাতব্য
বিষয় আলোচনা করিয়া সন্দর্ভকার লিখিয়াছেন—“বেলা ১০টা হইতে ১২টা পর্যন্ত
সাধারণতঃ অধ্যয়ন-কার্য করা হয়। শিক্ষার প্রণালী এইরূপ—ছইজন অধ্যাপক দর্শন
প্রভৃতি শাস্ত্রের কোন একটা মত লইয়া তর্ক করিয়া থাকেন। ছাত্রগণ তাহা শুনিবার
অধিকার পাইয়া থাকে। যদি অধ্যাপকদের আলোচনা ও তর্ক দুরূহ বা জটিল বোধ হয়,
তবে তাহারা তাঁহাদিগকে সর্বদা প্রশ্ন করিয়া বিষয়টি বুঝিবার অধিকার পায়, অধ্যাপকেরা
ছাত্রদিগকে এইভাবে প্রশ্ন করিয়া বুঝিবার চেষ্টায় সর্বদা উৎসাহ দিয়া থাকেন। তাঁহারা
ছাত্রদিগের সম্বন্ধে অতিশয় সহিষ্ণুতা ও দৈর্ঘ্য রক্ষা করিয়া অধ্যাপনা করেন। যদি কোন
অধ্যাপক চটিয়া যান তবে তাঁহার খুব নিন্দা হয়। এমন কি ছাত্র যতবড় বেদুই ও বুদ্ধিশূন্য

হউক না কেন, যদি কচিং কোন অধ্যাপকের দৈর্ঘ্যচ্যুতি ঘটে কিংবা তিনি কোন অপভাষা ব্যবহার করেন, তবে দেশময় তাঁহার নিন্দা প্রচারিত হয় এবং তিনি অসম্মানিত হন।" (যখন ছাত্রের বয়স ৪০ বা তদূর্ধ্ব, তখন তাঁহার সহিত অভদ্রোচিত ব্যবহার অধ্যাপকগণের পক্ষে যে দৃশ্যীয় হইত, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?) "নবদ্বীপের রাজারা পণ্ডিতগণের এই ভাবের বাদ-প্রতিবাদ ও তর্ক শুনিবার জন্য প্রায়ই টোলে উপস্থিত হইয়া থাকেন। ইহারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখান কিংবা আলোচনায় বিজয়ী হইয়া স্বীয় গুণপনার পরিচয় দেন, তাঁহাদিগকে রাজারা যোগ্যভাবে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন। কোন বিশেষ উপলক্ষে সর্বসাধারণের সমক্ষে এইরূপ তর্ক ও আলোচনায় বিজয়ী পণ্ডিতেরা রাজার নিকট বিশেষ উৎসাহ ও পুরস্কার পাইয়া থাকেন। এককালে এই পুরস্কার প্রকৃতই মূল্যবান ছিল। রাজা রুদ্রের সময়ে প্রধান পণ্ডিতগণ ঘটিভরা স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা পাইতেন। এখনকার রাজাদের তরুণ দান করা সাধ্য নহে; হয়ত একটা পিতলের ঘড়া, গরদের জোড় প্রভৃতি সামান্য পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু রাজার নিজহস্তের এই দান পাইয়া অধ্যাপকেরা যে আনন্দ ও

গৌরব অনুভব করেন, তাহার মূল্য খুব বেশী। কোন রাজচক্রবর্তী যদি বহুমূল্য খিলাৎ দান করেন, তাহাও এই সামান্য দানের কাছে একান্ত অকিঞ্চিৎকর। ভারতীয় পণ্ডিতগণের চিরাভ্যস্ত অর্থের প্রতি উপেক্ষা ও ত্যাগের ইহা একটি প্রধান নিদর্শন। পণ্ডিত্যের জন্য যে সামান্য মূল্য তাহারা পান তাহা তাঁহাদের কাছে অসামান্য মনে হয়।"

কিন্তু নবদ্বীপের টোলগুলি ক্রমশঃ শ্রীহীন হইল। রাজা রুদ্রের পূর্বে ইহাদের যে অসামান্য শ্রীবুদ্ধি হইয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে অধঃপতিত হইল। রাজা রুদ্রের সময়ে (১৬৮০ খৃঃ) ৪,০০০ (চার হাজার) ছাত্র ও ৬০০ (ছয় শত) অধ্যাপক ছিল। ১৭২১ খৃঃ অব্দে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়াইল ১,১০০ এবং অধ্যাপকের সংখ্যা হইল ৪০০। ১৮২৯ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক উইলসন নবদ্বীপের টোলের ছাত্রসংখ্যা পাঁচ শত হইতে ছয় শতের মত দেখিয়াছিলেন এবং অধ্যাপক সংখ্যাও অল্পপাতে হ্রাস পাইয়াছিল। ১৮৬৭ সালে ই. বি. কাউএল ছাত্রসংখ্যা ১৫০ ও অধ্যাপক সংখ্যা খুব কম দেখিয়াছিলেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কাউএল সাহেব নবদ্বীপের টোলগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার ১৮৬৭ সনের ১২শে জানুয়ারীর রিপোর্টের সারাংশ সঙ্কলন করিতেছি—“পূর্বকালে গ্রীস দেশে

নবদ্বীপে ভারতবর্ষের
সর্বস্থানের ছাত্রসমাগম।

যে রূপ লেখাপড়ার উচ্চাঙ্গ অনুশীলন হইত এবং বাহার বিবরণ
আমরা মাঝে মাঝে প্লেটোর ‘বাদানুবাদে’ (Controversies) পাই,
আশ্চর্যের বিষয় নবদ্বীপে আমরা সেই প্রাচীন সময়ের একটা ধারা

যেন সাক্ষাৎ সন্মুখে দেখিতে পাইলাম। বিজ্ঞাদান করিয়া অর্থগ্রহণ করা ইহারা পাপ মনে করেন; পণ্ডিতেরা শুধু বিনাবেতনে ছাত্রদিগকে পড়াইয়া ফাস্ত থাকেন না, পরন্তু তাহাদের খাওয়ান ও বাসস্থান যোগাইয়া থাকেন। ইহারা বড়লোকদের সামাজিক ধর্মকাণ্ডে বিদায় এবং নানারূপ ব্যাপারে দক্ষিণা লাভ করিয়া এই সমস্ত খরচ নির্বাহ করেন।

নবদ্বীপে প্রধানতঃ স্থিতি ও জ্ঞান পড়ানো হইয়া থাকে। এই বিষয়ে নবদ্বীপের খ্যাতি ভারত-বাসী। বিশেষতঃ জ্ঞান পড়িবার জন্ত এখানে ভারতবর্ষের সর্বস্থান হইতে ছাত্র আসিয়া থাকে। আমি আমার অবস্থিতিকালে প্রৌঢ়বয়স্ক, এমন কি বাহাদের চুল প্রচুর পরিমাণে পাকিয়া গিয়াছে, এমন সকল পড়ুয়াকে লাহোর, পুনা, তামিল দেশ, এমন কি মিথিলা ও নেপাল প্রভৃতি স্থান হইতেও আসিতে দেখিয়াছি। স্থিতির টোলে সাধারণতঃ ৮ বৎসর পড়িতে হয়। জ্ঞানের টোলে ১০ বৎসরের নীচে কিছুতেই হয় না। টোলগুলি মাসে ১০ দিন করিয়া বন্ধ থাকে। এইভাবে প্রতিপদ, অষ্টমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, পৌর্ণমাসী, শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের দুই তিথিতেই টোল বন্ধ থাকে। ইহা ছাড়া সরস্বতী পূজার দুই সপ্তাহ এবং অস্তান্ত পূর্ণ উপলক্ষেও ছাত্রগণ ছুটি পায়। জ্ঞানের টোলে ছেলেরা আষাঢ় হইতে কার্তিক পর্যন্ত ছুটি ভোগ করে। স্থিতির টোলে ভাদ্র হইতে কার্তিক পর্যন্ত। লাহোর হইতে ত্রিবাঙ্গুর পর্যন্ত বহুদেশ হইতে ছাত্রগণ নবদ্বীপে আসিয়া থাকে। নবদ্বীপের উপাধি পাইলে ভারতীয় সমস্ত বিজ্ঞানেক্ষে সেই পণ্ডিত সম্মানিত হন। যদিও বৎসরের কয়েকমাস টোলগুলি বন্ধ থাকে, বাকী কয়েক মাস ছাত্রগণ প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া এই ক্ষতি পূরণ করিয়া থাকেন।”

“পণ্ডিত ও ছাত্রগণ যেরূপ সরলভাবে জীবনযাপন করেন তাহা স্পার্টানদের কষ্টসহিষ্ণুতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।” কাউএল সাহেব আরও লিখিয়াছেন, “বংশপরম্পরা পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানজ্ঞানের যে কষ্ট ও তপস্বী স্বীকার করিয়া এই জীবনযাত্রার সারল্য।

নবদ্বীপে অধ্যয়ন করেন, তাহা আমাদের বিশ্বাস ও সম্মানের উদ্বোধন করে। প্রত্যেক ছাত্র একটি খড়ো ঘরের সামান্য অংশে বাস করে। তাহার সম্বল একটি লোটা ও মাছর; অধিকাংশ ছাত্রেরই ইহা ছাড়া অন্য কোন আসবাবই নাই। তাহারা নিজদের পাঠ্য পুস্তক নিজেরা নকল করিয়া লয়। টোলগুলি চতুর্কোণ একটা জায়গার উপর অবস্থিত। অধ্যাপকের ছাত্রদের সঙ্গে থাকেন না; তিনি আসিয়া নির্দিষ্ট সময়ে পড়াইয়া যান। এই চতুর্কোণ জায়গার একদিকে বহুতাশালা আছে। ইহা অনেকস্থলেই একটা খড়ো ঘর, তিন ফুট উচ্চ ইহার মেজে। একটা দিকে ঝড়ুটি হইতে রক্ষিত হওয়ার কতকটা ব্যবস্থা আছে, অপর দিকগুলি খোলা।”

কাউএল সাহেব লিখিয়াছেন, একটিমাত্র টোল কতকটা সভ্যরকমের; “পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র তর্কালঙ্কারের এই টোলটি লক্ষ্মী-নিবাসী এক ব্যক্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩০ গজ চতুর্কোণ জমির উপর স্থাপিত, ইহাতে ৩০টি পাকা ঘর আছে, ঘরগুলি সাধারণতঃ ২ ফুট দীর্ঘ এবং ৮ ফুট প্রশস্ত—ইহা ছাত্রদের বাসের জন্য। প্রত্যেকটি ঘরের একটি জানালা ও একটি দরজা আছে। কোণের দিকের ঘরগুলি একটু লম্বা। বহুতাশালা মাটি হইতে পাঁচ ফুট উচ্চ মেজের উপর নির্মিত, এই গৃহটি দুইভাগে বিভক্ত, প্রত্যেকটি ১০ ফুট দীর্ঘ, ভিতরে ১০ ফুট প্রশস্ত।”

বাহু শোভা হিসাবে নবদ্বীপের এই টোলগুলিকে যে কোন সম্ভারামের সঙ্গে তুলনা

করিলে বাতুলতা হইবে। পুরাকালে ঋষিরা আশ্রমবাসী ছিলেন, বৌদ্ধযুগে জ্ঞানী ও ভিক্ষু রাজ-প্রাসাদবাসী এবং একালে জ্ঞানী টুলো পণ্ডিত কুটিরবাসী ব্রাহ্মণ। কিন্তু বেখানে বেভাবে থাকুন না কেন, এই জ্ঞানিগণ ভারতীয় বিজ্ঞা-ক্রমোন্নতির পথে চালাইয়া লইয়াছেন।

হুনির্দিষ্ট প্রস্তরের রাজপথ, যে দিক্ দিয়া ভারতী দেবীর রথ চলিয়াছে, তাহার অগ্রগতি ধামে নাই, লক্ষ্যচ্যুতি ঘটে নাই। নদীয়ার স্থিতিকার বিপুল সংস্কৃতশাস্ত্র আলোচনা করিয়া যে মহাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাই এখন পর্য্যন্ত আমাদের সামাজিক জীবনের কাণ্ডারী। রঘুনন্দনের নথ্যগ্রন্থ সমস্ত স্থতিশাস্ত্র ছিল। তিনি সমরোপযোগী যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, হয়ত তাহা এখন আর চলিবে না। সময়ের প্রয়োজন সাধিয়া সেই বিপুলগ্রন্থ অচলায়তনে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এক যুগে তাহার প্রয়োজন ছিল, এবং সেই সময়ের উহা যুগনির্দেশক স্তম্ভস্বরূপ। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি জ্ঞানশাস্ত্রে ঢাকার মসলিনের মত যে স্বপ্ন বুনট তুলিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী মস্তিষ্কের চিরকালের বিজয়কীর্তি। এখন লোকে মনে করিতে পারেন এত স্বপ্ন চিন্তাশীলতার প্রয়োজন কি? সে স্বতন্ত্র কথা। মানুষের চিন্তাশীলতা শাণিত করিবার প্রয়োজন নাই যাহারা বলেন, এরূপ লোকদিগকে আমরা বলিতে পারি—মানুষ মারিবার অস্ত্রশস্ত্রই বা এতটা শাণিত করিবার কি প্রয়োজন? কেবল জড় অধিকার বাড়াইবার যাহাদের প্রচেষ্টা এবং তদর্থে যাহারা বিজ্ঞানের তিন ভাগকে নিয়োজিত করিয়াছেন—তাহাদের মতের সঙ্গে আমাদের মত মিলিবে না।

এই নবদ্বীপে বসিয়া যাহারা জ্ঞানশাস্ত্রের তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কয়েকখানির আমরা নাম নিয়ে দিতেছি :—

গ্রন্থকার	গ্রন্থ
১। রঘুনাথ শিরোমণি	তত্ত্বদীপ্তি
২। মথুরানাথ	তত্ত্বালোক রহস্য
৩। কৃষ্ণকান্ত	তত্ত্বদীপালী
৪। কণাদ তর্কবাগীশ	তত্ত্বটীকা
৫। ভবানন্দ	তত্ত্বালোকসারমঞ্জরী
৬। মহেশ ঠাকুর	তত্ত্বালোকদর্পণ
৭। মধুসূদন ঠাকুর	তত্ত্বালোক-কণ্টকোদ্ধার
৮। রুদ্র জায়বাচস্পতি	তত্ত্বদীপ্তিবিখ্যাতা
৯। জগদীশ	তত্ত্বদীপ্তিটিপ্পনী
১১। গদাধর	তত্ত্বদীপ্তিটীকা
১০। ভবানন্দ	তত্ত্বদীপ্তিমঞ্জরী
১২। মহাদেব পণ্ডিত	তত্ত্বভবানন্দী ব্যাখ্যা

গ্রন্থকার	গ্রন্থ
১৩। কালীশঙ্কর ...	তত্ত্বকালীশঙ্করীপত্রিকা
১৪। চন্দ্রনারায়ণ ...	তত্ত্বশান্ত্রিপত্রিকা
১৫। কন্দ্রনারায়ণ ...	তত্ত্বরৌদ্রীপত্রিকা

ইহা ছাড়া আরও বহু নৈয়ায়িক এদেশে জন্মিয়াছিলেন। নব্যজ্ঞানকে অনেকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, যেহেতু অতি স্থূল জিনিষকে আয়ত্ত করা সুকঠিন। “আত্মবুদ্ধির আত্মদ তত্ত্ব”, এই প্রবাদ প্রতিবাদীরা প্রতিপন্ন করিতে চান। স্বয়ং সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ নব্যজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—“ইউরোপীয় জ্ঞানশাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করিলে ভারতীয় জ্ঞানশাস্ত্র দাঁড়াইতে পারে না, যেহেতু জিনিষটা বড় স্থূল এবং ইহার প্রণালী এত জটিল এবং ভারগন্ত, ইহার ভাষা এত দুর্বোধ্য যে তাহা বুঝিয়া উঠা শক্ত এবং জড়জগতে ইহার উপকারিতা কিছুই নাই।” তাহার জিনিষটা স্থূল ও জটিল বলেন, তাহার প্রকারান্তরে স্বীকার করেন যে উহা তাহাদের বুদ্ধির পক্ষে অনধিগম্য।

কিন্তু যে বিজ্ঞান জন্ত ৪৫ শত বৎসর বাঙ্গালী ভারতবর্ষের নেতা হইয়াছিলেন, নবদ্বীপ ভারতীয় সমস্ত প্রদেশবাসীর তীর্থে পরিণত হইয়াছিল, যে ক্ষেত্রে বাঙ্গালী গ্রহণ করিয়াছিলেন গুরু পদ এবং অজ্ঞাত দেশবাসীরা শিক্ষার্থী হইয়া তাহার পাদপীঠে বসিয়াছিলেন এবং যে বিজ্ঞান কৃতিত্বের জন্ত বাঙ্গালাদেশের ঘরে ঘরে পণ্ডিতগণ জ্ঞানপঞ্চানন, তর্করত্ন, তর্কবাগীশ, জ্ঞানবাগীশ, তর্কচক্ৰ, তর্কতীর্থ, জ্ঞানতীর্থ প্রভৃতি উপাধি লাভ করিয়া চিন্তাশীলতার এক অতীব হর্গম ও জটিলপথে অদ্বুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন—সেই বিজ্ঞানকে বাঙ্গালীর একরূপ ভূমি মারিয়া এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দে নদীয়ার টোলে যে সকল অধ্যাপক পড়াইতেন, তাহাদের সম্বন্ধে কাউএল সাহেব সুবিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। আমি তাহা হইতে এখানে কিছু সংকলিত করিতেছি :—

“জ্ঞানই নবদ্বীপের টোলগুলির শ্রেষ্ঠ বিষয় ছিল। মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের চিন্তামণি অবলম্বনে অধিকাংশ জ্ঞানের গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু চিন্তামণিকে আশ্রয়মাত্র করিয়া

অধ্যাপকমণ্ডল।

নবদ্বীপের কাণা শিরোমণি একরূপ স্থূল বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে, চিন্তামণি কোথায় পড়িয়া রহিল ঠিকানা নাই। কাণা শিরোমণি মিথিলার গৌরবকে কাণা করিয়াছিলেন। তাহার দীপ্তি নব্যজ্ঞানের পত্তন করিয়াছে। চিন্তামণি চারিটি ভাগে বিভক্ত। কিন্তু দীপ্তিকার ছইটি মাত্র অধ্যায় লইয়া টীকা লিখিয়াছেন। যথুরানাথ চিন্তামণির নূতন টীকা করিয়াছিলেন, এবং দীপ্তিকে তিনি নূতন

আগবীণী।

ব্যাখ্যা দিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু রঘুনাথের পরে জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হইয়াছিলেন জগদীশ তর্কালঙ্কার। তিনি একরূপ অদ্বুত প্রতিভা দেখাইয়াছেন যে অনেক সময়ে লোকে জ্ঞানশাস্ত্রের অজ্ঞ নাম দিয়াছিল—

‘জাগদীশী’ বেনাস পড়াইবার অধ্যাপক ছিলেন তখন শঙ্কর বাগীশ এবং গদাধর ভট্টাচার্য। স্বতিশাস্ত্রের সর্গপ্রধান শিক্ষক ছিলেন ব্রজনাথ বিজ্ঞানরত্ন। ইহার প্রত্যেকেই দ্বিধিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন এবং ইহাদের নাম শুনিলে সমস্ত ভারতবর্ষের পণ্ডিতসমাজ মাথা হেঁট করিতেন।” আমরা নব্যজ্ঞায় সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার আগুতোষ কোন সুপণ্ডিত লোক স্থির করিয়া তাঁহারই হাতে একএকটি বিভাগের ভার ছাড়িয়া দিতেন। স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের নব্যজ্ঞায়ের তাদৃশ অধিকার না থাকাতো এবং যুরোপীয় পণ্ডিতগণ নব্যজ্ঞায়ের হস্ত বিলম্ব এবং চিন্তার অদ্বিত জাল ভেদ করিতে না পারায় বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার স্থান দিতে সাহসী হন নাই। এজন্য বাঙ্গালার সংস্কৃত বিভাগে বাঙ্গালীর অপূর্ণ কীর্তি অস্বীকৃত হইয়াছে। এই বিসদৃশ ঘটনা এক বাঙ্গলায়ই হইতে পারে। অত্ৰ কোন দেশ এভাবে নিজস্ব নিলাম করিয়া দেয় নাই।

বৌদ্ধতত্ত্ব হইতে যে কালী, তারা এমন কি সরস্বতীর পূজা বঙ্গদেশে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা আমরা এই পুস্তকের ৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি। যদিও সরস্বতী বৈদিক-দেবতা, তথাপি বাঙ্গালায় এই দেবীর পূজায় ইহাকে ভদ্রকালী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সুতরাং ইহাকে বঙ্গদেশে বৌদ্ধতত্ত্বোক্ত শক্তি-ব্যূহের অন্তর্গত করা হইয়াছে।

শুধু দেবপূজায় নহে বঙ্গদেশে শিক্ষাদীক্ষা-সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়েই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তারিত আছে। বাঙ্গালার নব্যজ্ঞায়ে বৌদ্ধ জ্ঞানদর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। গৌতমপ্রমুখ জ্ঞানদর্শনের প্রবর্তকগণ প্রমাণের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, ইহাই স্বীকার করেন। উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞা আলোচনার জন্য যুক্তির কতকটা স্থান আছে সত্য, কিন্তু তাহা তত্ত্ব-নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট নহে ইহাই ঋষিরা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কঠোপনিষৎ বলিতেছেন—“নৈবা তর্কেণ মতিরাপনেনা।” বৃহদারণ্যকোপনিষৎ কেবল তর্কবুদ্ধির নিষেধ করিয়াছেন। তর্ক বেদমূলক না হইলে হিন্দুদর্শন সেরূপ তর্কের নিন্দা করিয়াছেন। মহাভারতে কোন তार्কিক শৃংগলযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এরূপ লিখিত আছে। (শান্তিপর্ক, ১৮০ অধ্যায়।) মহুর প্রমাণও তর্ক অবলম্বন করিয়া যে ব্রাহ্মণ শ্রুতি-স্বতি অগ্রাহ করেন, তিনি ব্রাহ্মণসমাজে অপাণ্ডিত্য। (মহু ২/১১।)

বৌদ্ধেরা শ্রুতি-স্বতি স্বীকার করেন না, সুতরাং তর্কবুদ্ধিই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন। ত্রিপিটকে অনেক স্থলেই “তং কিস্স হেতু”—ইহার কারণ কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা দৃষ্ট হয়। স্বয়ং বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগকে উপদেশ দিয়াছেন,—“পণ্ডিতেরা বেক্ষণ সোণাকে আগুনে পোড়াইয়া নিকব পাথরে পরীক্ষা করিয়া থাকেন, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আমার কথাগুলিকেও সেইরূপ পরীক্ষা করিয়া লইও, কেবল আমার গৌরবরক্ষার জন্য গ্রহণ করিও না।” (তত্ত্ব-সংগ্রহ, ৩৫৮।) বৌদ্ধদিগের মতে আত্মা বলিয়া কোন পৃথক্ পদার্থ নাই। এইখানে হিন্দুদর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধ জ্ঞানের বিশেষ পার্থক্য, তাঁহাদের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ ও স্বয়ংবেত্তা, অপর জ্ঞাতার অপেক্ষা করে না। শূন্যবাদী মাধ্যমিকগণের কেহ কেহ বলেন, ‘প্রমাণ

নাই, প্রমেয় নাই, প্রতিষ্ঠা নাই,' কেহ বলেন "অনাদিবাসনা বশতঃ জ্ঞান নানা আকারের হইয়া থাকে।" গৌতম তাঁহার জ্ঞানদর্শনের প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি যোলটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু বৌদ্ধগণ তাঁহাদের জ্ঞানশাস্ত্রে কেবলমাত্র প্রমাণ পদার্থকেই অবলম্বন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য বাঙ্গলা নব্যজ্ঞায় বৌদ্ধ জ্ঞানদর্শনের মত এই প্রমাণকেই প্রধানতঃ আশ্রয় করিয়াছেন। নব্য-নৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্তিবাদের অতি সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু এই ব্যাপ্তিবাদ গৌতমের জ্ঞানদর্শনে নাই, অথচ বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্তিবাদের কথা অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন (জ্ঞানবিব্দু ২:১২। ৩:১২৭-২৮। ১৩৪-১৩৬)। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গলার নব্যজ্ঞায় বৌদ্ধজ্ঞায়কে আশ্রয় করিয়া আরও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। নব্যজ্ঞায়ে কি ভাবে তর্ক করিতে হইবে তাহা অতি সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাঁহারা তর্কের বিগততা লইয়া ক্রমাগত বুদ্ধির ক্রীড়া দেখাইয়াছেন, কোন তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তে পৌছিবার লক্ষ্য তাঁহাদের নাই। এ সম্বন্ধে আমরা পরে পুনরায় লিখিব। মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ বলেন, "আমাদের নিজেদের কোন পক্ষ নাই। বিপক্ষের স্বীকৃত প্রমাণাদির দ্বারা তাহাদের পক্ষের দোষ প্রদর্শন করাই আমাদের অভিপ্রেত।" দিগ্‌নাগ বলেন, "অনুমান—অনুপ্রের—ব্যবহার-ধর্মধর্মি সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে। এই 'ধর্মধর্মি'-সম্বন্ধ কল্পিত। ইহার বস্তুতঃ থাকার কোন আবশ্যকতা নাই।"

তাঁহারা মনে করেন, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধশাস্ত্র এদেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা হিন্দু-ধর্মের প্রকৃতি অবগত নহেন। হিন্দুরা নূতন কোন ধর্মের সংস্পর্শে আসিলে সেই ধর্মের মধ্যে বাহ্য কিছু খাটি ও গ্রাহ্য তাহা গ্রহণ করিয়া আবর্জনাগুলি বিসর্জন করেন। যখন এই ভাবে সেই ধর্মের বল একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন পর-ধর্ম প্রাপ্ত তত্ত্বের দ্বারা স্বীয় ধর্মের উৎকর্ষ সাধন করিয়া উজ্জিষ্টের মত প্রতিবাদীদের ধর্মকে বিদায় করিয়া দেন, এইজন্ত যুগে যুগে হিন্দুধর্ম নব কলেবর ধারণ করিয়া এই দেশে টিকিয়া আছে। বল-প্রয়োগ দ্বারা ইহা হইত না। নাগার্জুনাদি প্রাচীন বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ কতকটা গৌতমের পথেই চলিয়াছিলেন, দিগ্‌নাগই প্রত্যক্ষ-প্রমাণের উপর বেশী জোর দিয়া অনেক স্থলে গৌতমের মত খণ্ডন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ দিগ্‌নাগ জ্ঞানশাস্ত্রের যুগপ্রবর্তক। পরবর্তী ধর্মকীর্তি প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ মূলতঃ দিগ্‌নাগকে অনুসরণ করিয়াছেন। আত্মার পৃথক্‌ সত্ত্বা অস্বীকার করার দরুন বৌদ্ধ জ্ঞায় সাধারণের চক্ষে নাস্তিকবাদ নামে পরিচিত হইয়াছিল। শ্রুতি-স্মৃতির বন্ধনমুক্ত শুধু তর্কমূলক বৌদ্ধ-জ্ঞায়ই বাঙ্গলার নব্য-জ্ঞায়ে কতকটা পথপ্রদর্শক হইয়াছিল। শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত প্রভৃতি কতিপয় শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গাঙ্করে লিখিত অপোহসিদ্ধি, ফণভঙ্গসিদ্ধি, অবগতি-নিরাকরণ, সামান্ত-দূষণদিক-প্রসারিতা, অন্তর্ব্যাপ্তি-সমর্থন, এই ছয়খানি বৌদ্ধ জ্ঞায়-প্রকরণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদন করিয়াছেন। এশিয়াটিক সোসাইটির ১০৭৪৬ সংখ্যক পুঁথি প্রাচীন বঙ্গাঙ্করে লিখিত পাওয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের পর বৌদ্ধজ্ঞায় যে ভিত্তি গড়িয়া গিয়াছিল, হিন্দুর নব্যজ্ঞায় সেই

ভিত্তি কতকটা আশ্রয় করিয়া স্বীয় বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্মাণ করিয়াছিল, তাহা তুলনা করিয়া দেখার বিষয়। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে নব্যজ্ঞায় সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গটি মূলতঃ শ্রীবৃক্ষ হর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ., পি. আর. এস., লিখিত 'বৌদ্ধজ্ঞান' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য

বাঙ্গলার গৌরব নব্যজ্ঞায়। বাঙ্গালীর হৃদয়ের কোমলতা ও উচ্ছ্বাস আমরা বৈষ্ণব
নব্যজ্ঞায়। অধ্যায়ে দেখাইব। যে জাতি ভাবের স্রোতে মেয়েদের মত
আপনহারা হইয়া বসে—সে জাতি স্বপ্ন চিন্তাশীলতায়ও এতটা

কৃতকার্য, যে জগতে তাহারা অপ্রতিদ্বন্দী; একথা কোনরূপ অত্যাঙ্গি নহে।

তর্ক-বিতর্কে হিন্দু চিরকাল অভ্যস্ত। উপনিষদের "বাকোবাক্য" ইহার প্রমাণ। ইতিহাস-পূর্ব সেই দূর যুগে হিন্দু দার্শনিকগণ তর্ক-বিতর্কদ্বারা কোন সত্যের স্বরূপ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিতেন। চরকের (খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) বিমানস্থানে তর্ক-বিতর্ক কিরূপে করিতে হইবে এবং কি প্রণালীতে সভাজয় করিতে হইবে, তাহার ইঙ্গিত আছে। এই প্রণালী নৈতিক হিসাবে খুব বিতর্ক বা দোষশূন্য নহে। সভা-বিজয়ার্থীর যে ভাবে তর্ক-বিতর্ক করিতে হইবে, তাহাকে 'ফাকি' আখ্যায় অভিহিত করা যায়।

পূর্ববর্তিগণ।

চরক বলিয়াছেন, "শ্রুতিহীনং মহতা স্বত্রপাঠেন", ইহার অর্থ যেখানে দেখিবে বিপক্ষীয় পণ্ডিত খুব বিদ্বান্ নহেন, তথায় "মহতা স্বত্রপাঠেন" অর্থাৎ আড়ম্বরময় বড় বড় শব্দ ও স্বত্র আওড়াইয়া তাহাকে ভড়কাইয়া দিতে হইবে। যেখানে প্রতিপক্ষ বড় পণ্ডিত সেখানে পাণ্ডিত্য দেখাইতে চেষ্টা করিও না, অল্প উপায়ে বিবদান্তরে তাহার মন আকৃষ্ট করিয়া সে বাহাতে যুক্তির খেঁই হারাইয়া ফেলে তরুণ ব্যবস্থা করিতে হইবে। চরক এইরূপ বহু উপদেশ দিয়াছেন, এগুলি রণক্ষেত্রে কায়দা করিয়া শত্রুকে পরাজয় করার উপযোগী। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পালি "কথাবথু" গ্রন্থে এইরূপ তর্ক-রীতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে গৌতম (অক্ষপাদ) জ্ঞানদর্শনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পঞ্চম শতাব্দীতে বাৎজায়ন (পঞ্চিলস্বামী) গৌতমের পথে জ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করেন। চার্ল্যাক বহুপূর্বে বলিয়াছিলেন, যখন জগৎ মিথ্যা—তখন অহুমানাদি দ্বারা কোন ফল সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ যাহা একান্ত অনিশ্চিত, ধরিতে চুইতে পারা যায় না—তাহা

অনুমানাদি দ্বারা আয়ত্ত করার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি। পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধ দার্শনিক দিগ্‌নাগ অনুমানাদির বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ উপস্থিত করেন। সপ্তম শতাব্দীতে উদ্যোতকর বাৎস্তায়নকে সমর্থন করিয়া ও দিগ্‌নাগের মত খণ্ডন করিয়া তাঁহার বার্তিক প্রণয়ন করেন। নবম শতাব্দীতে বাচস্পতি মিশ্র সেই বার্তিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া দিগ্‌নাগের কথাবলয়ী ধর্মকীর্ত্তি প্রভৃতি বৌদ্ধ দার্শনিকের মত খণ্ডন করেন। দশম শতাব্দীতে উদয়নাচার্য্য কুস্থমাঞ্জলি ও তাৎপর্য্যটীকাপরিণুক্তি দ্বারা পুনরায় বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন।

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, যখন মুসলমানেরা হিন্দুস্থানের দ্বারদেশে ভিড় করিয়া বিপরীত হুকার করিতেছিল, এবং জয়পাল সাহাবুদ্দিন ঘোরির সহ জীবনমরণ সমস্তার সমাধান করিতেছিলেন, তখন ‘জনকতনয়াপদচারণপুণ্য’ মিথিলায় বসিয়া গঙ্গেশ শিরোমণি নিশ্চিন্তমনে তাঁহার তত্ত্ব-চিন্তামণি রচনা করিতেছিলেন। তিনি গৌতমের জ্ঞানদর্শন হইতে মাত্র চারটি বিষয় লইয়া বিচার করিয়া গিয়াছেন—প্রত্যক্ষ-চিন্তামণি, অনুমান-চিন্তামণি, উপমান-চিন্তামণি ও শব্দ-চিন্তামণি। তাঁহার বিচার আর একখানি পূর্ববর্ত্তী গ্রন্থের অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল, এই পুস্তকের নাম “আকর।” আকর এখন লুপ্ত। বৌদ্ধগণ তখন নিরস্ত হইয়া ভারত ত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং গঙ্গেশ প্রধানতঃ মীমাংসকগণেরই প্রতিপক্ষতা করিয়াছেন। ইহার পূর্বে শ্রীহর্ব নামক এক ব্যক্তি মীমাংসকগণকে সমর্থন করিয়া নৈয়ায়িক-দিগের বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণাদি সঙ্কলন করিয়াছিলেন, ‘আকরে’র লেখক ও গঙ্গেশ শিরোমণি শ্রীহর্বের প্রতিবাদ করেন।

এখন নব্যজ্ঞান বলিতে যাহা বুঝায়—তাঁহার আদিগ্রন্থ চিন্তামণি। এই নব্যজ্ঞান কোন ফল লাভের ভরসা প্রদান করে না। অজ্ঞাত শাস্ত্রের জ্ঞান ইহা ফলপ্রদ নহে। এই

নব্যজ্ঞানকে কোন শাস্ত্র বলা যায় না, ইহা কোন বিশেষ শিক্ষা

নব্যজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

দান বা মত স্থাপন করে না, ইহা কেবল ছুরিকায় ধার দেওয়া।

নব্যজ্ঞান-পাঠের ফল—বদি ইহাকে ফল বলা যায়—অধ্যয়নকারীর বুদ্ধি ক্রমশঃ মার্জিত ও ধারাল করা। এই পুস্তকগুলি পাঠের পর দেখিতে পাইবেন, যে সকল মত বা কথা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া চিরকাল গ্রাহ্য হইয়া আসিয়াছে, যাহাদের সম্বন্ধে কোনকালে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই, তাহা একান্ত জটিল ও ছুরহ। ইহা সূক্ষ্ম করিতে চেষ্টা করিলে নব নব প্রশ্নের উদয় হইয়া পথকে পুনঃ পুনঃ ছুরম করিয়া ফেলা হয়; পথিকের পথ এক্ষেত্রে অকুরন্ত। এই অকুরন্ত পথ পর্যাটন করিয়া পাহ যখন ফিরিয়া আসিবেন, তখন তাঁহার হস্ত রিক্ত, তিনি কিছুই দেওয়ার জন্ত লইয়া আসিয়াছেন একথা তিনি বলিতে পারিবেন না। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিকে তিনি প্রথর করিয়া আনিয়াছেন, শুধু এইটুকু তিনি বলিতে পারিবেন; যেখানটা এতকাল ক্ষটিকের মত বন্ধ মনে হইয়াছিল তাহা একেবারেই বন্ধ নহে বরং তাহা ক্রমশঃ উত্তরোত্তর আরো ময়লা কাটিয়া পরিষ্কার করিবার যোগ্য বলিয়া মনে হইবে। এই নব্যজ্ঞান—কায়দা-শিক্ষা,—সত্য-নিরূপণের জন্ত অবাধ অনন্ত পথে চলা-ফেরা শিক্ষা।

গঙ্গেশ শিরোমণি যে সূত্র একটিমাত্র ছত্রে কহিয়াছেন, তাহার বিবৃতি রঘুনাথ এক সহস্র কি তদধিক ছত্রে করিয়াছেন। হয়ত, তাঁহার সূত্রের মধ্যে যে এত সূক্ষ্ম কথার অবকাশ ছিল, তাহা স্বয়ং গঙ্গেশ শিরোমণিও জানিতেন না। পরিভাষা না জানিলে এই সকল সূত্রের অর্থ করা বা বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব।

চাক্ষরিক অমুমানকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ব্যাবহারিক কারণে অমুমানের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। যাহা অস্বীকার করিবেন, তাহার উপাধি যখন পাওয়া বাইতেছে, তখন তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। রঘুনাথ তাঁহার দীর্ঘত্বিত্তে কি করিয়াছেন, তাহা দুই একটি উদাহরণ দিয়া সংক্ষেপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব, হয়ত এ চেষ্টা একান্তই বাতুলতা বলিয়া গণ্য হইবে। ধরুন “ঘটাভাব” কথার বুঝা গেল, ঘটের অভাব। কিন্তু যে স্থান, ব্যক্তি বা

দৃষ্টান্ত।

অপর কিছু সম্বন্ধে এই কথাটা বলা হইল, তাহার হয়ত আরও দশ রকমের অভাব ছিল; সে স্থান বা সেই লোকের অর্থ্যভাব, খাড়াভাব, বস্ত্রাভাব—এইরূপ শত রকমের অভাব ছিল—সে সকল না বুঝাইয়া শুধু নিরবচ্ছিন্ন ঘটের অভাবটি কি কথা বলিয়া বুঝান যায়? “ঘটাভাব” বলিতে সহজ বুদ্ধিতে বুঝা বাইতে পারে যে তাহার আর কোন অভাবই নাই, কেবলই ঘট নামক জিনিষটার অভাব। কিন্তু তাহাতো নহে, কি কথা বলিলে বুঝা যাইবে যে অল্প সমস্ত অভাবের কথা না বুঝাইয়া ঘটটার অভাবকে শুধু বুঝাইবে। প্রথমতঃ ঘটভাব কথাটা স্মৃট হইল না, স্মৃতরাং আরও স্মৃট করিবার জন্ত দ্বিতীয় সূত্রের স্থাপনা হইল, তাহা—ঘট-নিরূপিত অভাব। তাহাতেও সন্দেহ রহিয়া গেল, তখন তৃতীয় ব্যাখ্যায় কথাটি দাঁড়াইল ‘ঘটনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাকঃ অভাবঃ।’

চতুর্থ ব্যাখ্যায় কথাটা আরও পরিষ্কার করিবার চেষ্টা হইল, “ঘটদ্বৈতর-নিষ্ঠ-প্রতিযোগিতা-নিরূপিতঃ, যোহভাবঃ।” এইভাবে ক্রমশঃ টানিয়া সূত্রটিকে দীর্ঘ করা হইতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি, পারিভাষিক শব্দ উদ্ভবরূপে না জানা থাকিলে এই সূত্রগুলি বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা। ধরুন ঘটের যদি গোলাকৃতি থাকে কিংবা যদি উহা চৌকোণ কি অষ্টকোণ হয়, উহার বর্ণ যদি রক্ত বা পীত হয়, উহার মধ্যে যদি কোন বস্তু বা আচ্ছাদন থাকে—তবে এই সমস্ত উপাদান ব্যতিরেকে শুধু ঘটের অভাব বুঝাইতে হইলে সংজ্ঞাটি কি হইবে? রঘুনাথের টীকায়—যে জিনিষটা জলের মত সহজ বলিয়া প্রথম মনে হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ জলের মত জটিল হইয়া পড়ে। কি করিয়া অতি বিস্তৃত বিজ্ঞানসম্মত বাক্য-দ্বারা যে কথাটি বলা অভিপ্রেত, শুধু তাহাই বুঝাইতে পারা যায়—নব্যজ্ঞানে সেই প্রণালীটি শিখিতে পারা যায়। অমুসীক্ষণ দিয়া জল দেখিলে যে রূপ আপাততঃ স্বচ্ছবৎ প্রতীয়মান জলে শত শত কীট দৃষ্ট হয় এবং তাহা অপেক্ষা বলিয়া মনে হয়, সেই অমুসীক্ষণ যদি ক্রমশঃ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম হইয়া থাকে, তবে প্রথম যন্ত্রটি দ্বারা যে সকল কীট আবিষ্কৃত হইয়াছিল, উত্তরোত্তর তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলে,—দীর্ঘত্বিত্তি সেইরূপ সংজ্ঞা বা শব্দের ওক্তি ও উপযোগিতা পরীক্ষার যন্ত্রবিশেষ। ইহা বিষয়ের জ্ঞান বাড়াইয়া দেয় না, ইহা

কেবল কথাগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত বিতর্কিতা দিতে শিক্ষা দেয়। কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে স্বজাতা ভগবান্ বুদ্ধের জন্ম বে চক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার নিম্নাংশ-প্রণালী এইরূপ :—একশত কালো গাভীর দুধ খাইয়া পঞ্চাশটি গাভী পুষ্ট হয়—এই পঞ্চাশটির দুধ খাইয়া পচিশটি গাভী এবং তাহাদের দুধে বারটি গাভী, এবং তাহাদের দুধে বে ছয়টি গাভী পুষ্ট হয়, সেই ছয়টির দুধে চক প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই চক বহু গাভীর বংশানুক্রমিক ক্রমমার্জিত দুধের সারাংশ দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। শয্যাবিলাসী সপ্তস্তর পুরু গদির নীচে একটা চুল ধাকাতো রাত্রে তাঁহার ঘুম হয় নাই; রমণীবিলাসীর শয্যাসঙ্গিনী অপোগণ্ড শৈশবাবস্থায় কয়েক মাস ছাগদুগ্ধ খাইয়াছিলেন, এই হেতু তিনি পূর্ণ বোড়শী হইলেও রমণীবিলাসী তাঁহার অঙ্গে ছাগদুগ্ধ পাইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছিলেন। এই সকল গল্প খাস বাঙ্গলা দেশের। টেলর সাহেব ঢাকা মসলিনের সূতা তৈয়ারি করিবার বে সকল স্বক্মাতিস্বক্স উপায় বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাও এই সকল উপকথার মত শোনায়। বাঙ্গলার নব্যজ্ঞায়ও এইরূপ স্বক্স সামগ্রী। বুদ্ধির কর্তৃপ ইহাতে যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে—তাহাতে একথা জগৎকে অনায়াসে বলা চলে বাঙ্গালী বুদ্ধিমান্ বটে, সেরূপ স্বক্সবুদ্ধি অল্প কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পার্শ্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম, দুই একজন জার্মান ও একটি ইংরেজ তাঁহার নিকট নব্যজ্ঞায় শিখিতে আসিয়া কেহ কয়েক মাস কেহ বা এক বৎসর পড়িয়া উজ্জ্বল্যাসে পলায়নপর হইয়াছেন। নবদীপেও এইরূপ পৃষ্ঠভঙ্গ-দেওয়া ছাত্রের কথা আমরা শুনিয়াছি। এখন ঈশফের “আত্মবুদ্ধির স্বাদ অন্ন” এই নীতি প্রচার করিয়া কেহ কেহ বলিতেছেন, ব্যবহারিক জীবনে এত স্বক্স তর্ক ও বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। বিতর্কবৃষ্টির একগালে চড় খাইয়া অপর গাল ফিরাইয়া দেওয়ার নীতিরই বা ব্যবহারিক জীবনে কি প্রয়োজন আছে? মাধ্যাকর্ষণ, কেন্দ্রমুখ ও কেন্দ্র-ব্যভিচারী গতির তত্ত্ব জানিয়াই বা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়?

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গলায় বে জ্ঞানশাস্ত্র নবযুগে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা বুদ্ধিকে শাপিত করিবার পন্থা। কিন্তু জ্ঞানের উদ্দেশ্য পূর্বে অন্তরূপ ছিল। চিন্তামণিতে লিখিত

নব্যজ্ঞায় পড়িবার
যোগ্যতা।

আছে “অথ জগদেব হুঃখপঙ্কনিমগ্নমুদ্দিবীর্ষুঃ”—যে ব্যক্তি হুঃখের আত্যন্তিক ভাবে নিবারণ করিতে চায়—সেই ব্যক্তি এই জ্ঞানশাস্ত্র পড়িবার যোগ্য। যিনি বেদান্ত-শ্রবণকারী এবং সাধন চতুষ্টয়সম্পন্ন

তিনিই জ্ঞানশাস্ত্রপাঠের মুখ্য অধিকারী। আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন “বন্ধনধিকার্যেব প্রবর্ততে কর্মকাণ্ড ইব ব্রহ্মকাণ্ডে স ন ফলভাগু ভবতি।” সূত্ররাং রঘুনাথের কিছু পূর্বেও জ্ঞানশাস্ত্রের পথাবলম্বীরা মোক্ষ কামনা করিতেন। কিন্তু বাঙ্গলার নব্যজ্ঞায় গোপাধিকারীর অদ্যোতব্য—এসম্বন্ধে ‘নব্যজ্ঞায়’ প্রণেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, “এই শাস্ত্রের যিনি গোপাধিকারী হইবেন, তাঁহাকে আর বেদান্তোক্ত পথে মোক্ষকামী হইয়া তত্ত্ববুদ্ধি হইতে হইবে না। পরন্তু তিনি পুরাণাদিপ্রদর্শিত পথে “মোক্ষার্থী” হইয়া তত্ত্বজ্ঞানান্তিলাষী,

অথবা তত্ত্বজিজ্ঞাসুত্ব হইয়া, অথবা কেবল বুদ্ধিপরিমার্জনা কামনা করিয়া এই শাস্ত্রানুশীলনে বন্ধপরিকর হইলেই তাঁহার এই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ সম্ভব হইতে পারিবে। তাঁহার পক্ষে যে সব গুণগ্রাম একান্ত আবশ্যক তাহা—মেধা, বুদ্ধি, বিনয়, সত্যানুরাগ, সংযম, দৃঢ়চেষ্ঠা ও ধৈর্য্য ইত্যাদি। যে সব গুণগ্রাম তাঁহার এ শাস্ত্রানুশীলনে অন্তরায়, তাহা—ভাবুকতা, নানা-বিদ্ভানু-রাস, এবং বিজ্ঞাদান-ভিন্ন পরোপকারজাতীয় সঙ্কর্ষ—অথবা কোন মতবিশেষে—আসক্তি (৮৭ পৃঃ)।” সুতরাং “মোক্ষার্থী” হওয়ার কথাটা যদিও অন্ততম উদ্দেশ্যের মধ্যে দয়া করিয়া রাখা হইয়াছে—তাহা পূর্বসংস্কারের প্রতি সৌজ্ঞেয় দেখাইবার জন্ত মাত্র, বস্তুতঃ কোন ধর্ম, পরোপকারবৃত্তি কিংবা লাভের আশা ত্যাগ করিয়া, এই নব্যতায় অধ্যয়ন করিতে হইবে রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় মধুরানাথ ও রত্ননাথ শিরোমণির “ব্যাপ্তিপঞ্চকের” সামান্য কয়েক ছত্রের ব্যাখ্যা করিতে বাইরা ডিমাই রয়েল সাইজের ৪৮০ পৃষ্ঠাব্যাপক বৃহৎ পুস্তক লিখিয়াছেন, অথচ “ব্যাপ্তিপঞ্চক” বাহিরের লোকের পক্ষে বেক্রপ ছর্কোথ প্রায় তাহাই রহিয়া গিয়াছে।

“পর্যতো বহিমান্” এই কথাটা লইয়া নৈয়ায়িকেরা আলোচনা করিয়া “ব্যাপ্তি” বুঝাইয়াছেন। ধূমের সহিত বহির একটা সাহচর্য্য সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়; রন্ধনশালা, চন্দর বা

গোষ্ঠে ধূম ও অগ্নি দেখিয়া যেখানে ধূম সেইখানেই বহি আছে, একপ একটা অহুমান হয়। অগ্নির সহিত ধূমের এই যে সম্বন্ধ

তরুপ সম্বন্ধের নাম “ব্যাপ্তি”।

সুতরাং যেখানে কোন ব্যক্তি ধূম ও বহি দেখিয়াছে তাহা ছাড়া যদি অল্প কোন স্থানেও—ধরুন পর্যতোও—সে ধূম দেখে, তবে সে মনে মনে চিন্তা করিবে যে বহির ব্যাপ্য যে ধূম তাহাতো এই পর্যতোও আছে; এই ভাবে বহির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূম দেখিয়া তাহার মনে যে আলোচনা হইবে—তাহার নাম “পরামর্শ”।

“পরামর্শের” পর ‘পর্যতো বহি আছে’ “পর্যতো বহিমান্”—তাহার এই ধারণা হইবে, ইহার নাম “অনুমিতি”।

সুতরাং যখন কোন “অনুমিতি” হয় তখন এই কয়েকটি প্রক্রিয়া মনোমধ্যে হইয়া থাকে :—

“কেন পর্যতটি বহিমান্?” এই প্রশ্নের উত্তরে সহজেই পূর্বদৃষ্ট কারণসম্বন্ধে চিন্তা উপস্থিত হইবে, যেহেতু ধূম আছে, বহিও সেখানে থাকিবে—ইহাই “হেতুবাক্য”।

প্রথমতঃ পর্যতটি বহিমান্, এই যে একটি বাক্য হইল—ইহার নাম “প্রতিজ্ঞাবাক্য”।

দ্বিতীয় স্তরে কেন পর্যতটি বহিমান্, এই প্রশ্ন হইলেই ধূমের সহিত ইহার সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি স্মরণ করা হয়—এই অনুমিতির লিঙ্গ অর্থাৎ হেতুদর্শনকে “হেতুবাক্য” বলা হয়।

তৎপরে প্রশ্ন, ধূম আছে বলিয়াই বহি থাকিবে কেন? তখন যেখানে যেখানে ধূম, সেইখানে সেইখানেই বহি, এই ভাবের দৃষ্টান্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয়,—যেমন রান্নাঘর, “বো বো ধূমবান্, স স বহিমান্, যথা মহানসম্।” এই হইল “উদাহরণবাক্য”। জায়া-ঘরবের ইহাই তৃতীয়তঃ। চতুর্থ প্রশ্ন,—বুঝিলাম, যেখানে ধূম থাকে সেইখানেই বহি

ধাকে, কিন্তু এখানে কি? এই প্রশ্নটি কিছুই নহে, তবে কথাটা খুব পরিষ্কার করিবার জন্য বলিতে হয় “অয়মপি তথা,” রত্নশালার ধূম দেখিয়া যেমন বহির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়—পর্কতটিও সেইরূপ বহিসাহচর্য্যযুক্ত ধূমবিশিষ্ট। ইহার নাম “উপনয়বাক্য।” কথাটা একেবারে দোবশূন্য করিবার জন্য একটা ‘সুতরাং’ বাক্য ব্যবহার করা প্রয়োজন। ধূম পর্কতে আছে ‘সুতরাং’ পর্কত বহিমান্। ইহা “নিগমনবাক্য।” তাহা হইলে জ্ঞানাবয়বের এই পঞ্চাঙ্গ :—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন। রাজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—“এখন এই পরার্থানুমিতি-প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যাপ্তির স্থান নির্দেশ করিতে হইলে আমাদের উক্ত ‘জ্ঞানের’ মধ্যে তৃতীয় জ্ঞানাবয়ব ‘উদাহরণ’বাক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই উদাহরণবাক্যের মধ্যে ‘যাহা ধূমযুক্ত তাহা বহিযুক্ত,’ ইহাই হইল ‘ব্যাপ্তি’। এই ‘ব্যাপ্তির’ স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য উদাহরণবাক্যের মধ্যে রত্নশালারূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দৃষ্টান্ত-লব্ধ বহি-ধূমের সহচার-দর্শনটি বক্তা ও শ্রোতা উভয়বাদিসম্মত হয়; সুতরাং তজ্জনিত ব্যাপ্তিটিও উভয়বাদিসম্মত হয়। এই ‘ব্যাপ্তির’ সাহায্যেই ‘এই পর্কতটিও তরুণ’—এই উপনয়রূপ চতুর্থ জ্ঞানাবয়বটি রচিত হইয়া থাকে এবং এই অবয়বটি স্বার্থানুমানের কথিত ‘পরামর্শের’ আকার-বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অবশ্য এখানে ব্যাপ্তি-ঘটিত উদাহরণটি উভয়বাদিসম্মত হওয়ার পরামর্শ-ঘটিত ঐ উপনয় বাক্যটিও উভয়বাদি-সম্মত হয়, এবং উপনয় বাক্যটি উভয়বাদি-সম্মত হওয়ার নিগমনটিও সুতরাং উভয়বাদি-সম্মত হয়, আর তজ্জন্য বক্তার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রোতা পর্কতে বহির অনুমিতি করিতে বাধ্য হয়।” (২১ পৃঃ।)

কিন্তু জ্ঞানাবয়বের সম্বন্ধে ইহাই একমাত্র মত নহে। বৌদ্ধমতে জ্ঞানাবয়ব মাত্র দুইটি—‘উদাহরণ’ ও ‘উপনয়’; মীমাংসকমতে তিনটি—‘প্রতিজ্ঞা,’ ‘হেতু’ ও ‘উদাহরণ’। বেদান্তমতে ‘প্রতিজ্ঞা,’ ‘হেতু’ ও ‘উদাহরণ’। মহর্ষি ব্যাংজায়নের মতে দশটি—জিজ্ঞাসা, সংশয়, শক্য-প্রাপ্তি, প্রয়োজন, সংশয়বৃদ্ধাস, প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন।

এই ইতিহাসে জ্ঞানের তত্ত্বব্যাখ্যা করিবার অবকাশ নাই। নব্যজ্ঞানে মাকড়শার বাগুড়ার মত একটির পর একটি করিয়া এরূপ জাল প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, বাহিরের লোকের পক্ষে তাহা একেবারেই অনবিগম্য। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীবৃদ্ধ স্বরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় নব্যজ্ঞান সম্বন্ধে ইংরেজীতে যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে এই শাস্ত্রের মর্ম্মকথা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। রাজেন্দ্রবাবুর পুস্তকের মত তাহাও বাহিরের লোকের পক্ষে দুর্ব্বোধ। আমরা এ সম্বন্ধে অনধিকারী, সুতরাং তাহার পুস্তকখানি হইতে একটা উদাহরণ দিয়া ইহার জটিলতা প্রমাণপূর্ব্বক নব্যজ্ঞানের ইতিহাসাংশের পুনশ্চ অবতারণা করিব।

“পুস্তকের স্থান” (The place with a book) বাক্যে নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করিতে হয়। প্রথমতঃ পুস্তকদ্বসম্বন্ধে “প্রকারতাবচ্ছেদক।” দ্বিতীয় “সমবায়,” তৃতীয় “সাংসর্গিক,” চতুর্থ “অবচ্ছেদক,” পঞ্চম “প্রকারতাবচ্ছেদকস্বাধ্যবিধয়তা”—ইহার প্রত্যেকটি বুঝাইতে অনেক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে।

যে ‘চিন্তামণি’ গ্রন্থশা্রে চিন্তাশীলতার একটা নূতন দ্বার খুলিয়া দিয়াছে সেই অসামান্য গ্রন্থের লেখকের নাম গঙ্গেশ শিরোমণি। কেহ কেহ তাঁহাকে গঙ্গেশ্বর শিরোমণি নামেও অভিহিত করিয়াছেন। ইহার জন্মস্থান বাঙ্গলাদেশ বলিয়া

গঙ্গেশ শিরোমণি।
কেহ কেহ দাবী করিয়াছেন। বিশ্বকোষে গঙ্গেশের বাড়ী বাঙ্গলাদেশ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে—এরূপ মতাবলম্বী এদেশে আরও অনেকে আছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় মিথিলাই তাঁহার জন্মস্থান। মিথিলাবাসীরা দ্বারভাদ্রার নিকটবর্তী “রোবড়া” পোষ্ট আফিসের অধীন “কারিধান” নামক গ্রাম গঙ্গেশের জন্মস্থান বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু এ বিষয়টি লইয়া এখনও কোন অলুসন্ধান হয় নাই।

গঙ্গেশ যেখানেই জন্মিয়া থাকুন না কেন, তাঁহার সম্বন্ধে এই কয়েকটি বিষয় নিশ্চিতরূপে বলা বাইতে পারে।

১ম—তিনি অল্পবয়সে পিতৃহারা হইয়া মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

৫৭সংস্কৃতে কয়েকটি সর্ক-

সম্বৃত কথা।

২য়—তাঁহার মাতুল একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন।

৩য়—গঙ্গেশের কর্মজীবন মিথিলায়ই অতিবাহিত হয়, তথায়

তাঁহার টোল ছিল।

৪র্থ—‘জায়-লীলাবতী’র “প্রকাশ” নামক টীকাকার মহামহোপাধ্যায় বর্দ্ধমান গঙ্গেশের পুত্র ছিলেন। ইনি উক্ত টীকার প্রারম্ভ-বাক্যে লিখিয়াছেন :—

“জায়ান্তোজপতঙ্গায় মীমাংসাপারদৃশনে।

গঙ্গেশরায় গুরবে পিত্রেহত্রভবতে নমঃ ॥”

ইনি “গঙ্গেশ” নাম না লিখিয়া সর্কদাই “গঙ্গেশ্বর” নাম লিখিয়াছেন, “ইতি মহামহো-
পাধ্যায়-শ্রীগঙ্গেশ্বরায়-মহোপাধ্যায়-শ্রীবর্দ্ধমান-বিরচিত্তে জায়নিবন্ধপ্রকাশে চতুর্থোহধ্যায়ঃ
সমাপ্তঃ, শুভমঙ্গল সং ৩৫৫ আশ্বিন।”

৫ম—গঙ্গেশের পৌত্র, বর্দ্ধমানের পুত্র, যজ্ঞপতি ‘চিন্তামণির’ “প্রভা” নামক টীকা
প্রণয়ন করেন।

৬ষ্ঠ—গঙ্গেশ হইতে পঞ্চমস্থানীয় পক্ষধর ১৩২৮ খৃঃ অব্দে একখানি পুস্তক নকল করেন
এবং ষষ্ঠস্থানীয় কচিদত্ত ১৩৭০ খৃঃ অব্দে জীবিত ছিলেন। দশমস্থানীয় শঙ্কর মিশ্র ১৪৬২
খৃঃ অব্দে তদীয় কোন কোন গ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রবাবু অনেক প্রমাণ-দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, গঙ্গেশ ১১৫০ খৃঃ অব্দের পরবর্তী ;
সেই সকল প্রমাণ আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হইয়াছে তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে

৩২সংস্কৃতীয় প্রবাদ।

বিস্তারিত ছিলেন। কথিত আছে, তিনি প্রথম বৌবনে অকাট মূর্খ
ছিলেন, কিন্তু অলৌকিক উপায়ে দৈবরূপা লাভ করিয়া শেষে শ্রেষ্ঠ
পণ্ডিত হইয়াছিলেন। এসম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। “চিন্তাদিব্যবিলো-
চনেন.....সিদ্ধান্ত-দীক্ষাশ্রুতঃ গঙ্গেশস্তমুতে মিতেন বচসা শ্রীতম্-চিন্তামণিম্”, এই
“দিব্যবিলোচনেন” কথাটির দ্বারা দৈবানুকম্পা স্মৃতিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে

করিয়াছেন। চিন্তামণির মত প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ সেই যুগে আর রচিত হয় নাই। ইহার বহু টীকা হইয়াছে। এই গ্রন্থ অধ্যয়নের জন্ত এককালে ভারতের নানাস্থান হইতে ছাত্রগণ মিথিলায় সমাগত হইত। চিন্তামণি পাণ্ডিত্যের খনিস্বরূপ। উহাতে প্রাচীন জ্ঞানের কত যে পুস্তকের সারোচ্চার ও আলোচনা করা হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বৈশেষিক, বৈদান্তিক, তান্ত্রিক, ত্রিদণ্ডী, জৈন-নৈয়ায়িক সিংহব্যাঘ্র (আনন্দ স্বরী ও অমরচন্দ্র স্বরী)-জয়ন্তী, বাচস্পতি মিশ্র, প্রভাকর, মণ্ডন, রত্নকোষকার প্রভৃতি নৈয়ায়িকদের মতের আলোচনা এই পুস্তকখানিতে আছে। গবেশসম্বন্ধে

“কিং গবি গোত্বং? কিমগবি গোত্বম্? যদি গবি গোত্বং ময়ি নহি তত্ত্বম্।

অগবি চ গোত্বং যদি ভবদিষ্টম্, ভবতি ভবতাপি সম্প্রতি গোত্বম্॥”

এই শ্লোকযুক্ত যে আখ্যানটি শোনা যায়, তাহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই, যেহেতু জন-প্রবাদে এই শ্লোকটি উদয়নের উপরও আরোপ কর হইয়াছে।

রঘুনাথ শিরোমণি

রঘুনাথ শিরোমণির বাড়ী শ্রীহট্ট পঞ্চখণ্ডে। কাত্যায়ন গোত্রীয় গোবিন্দ চক্রবর্তী ইহার পিতা এবং ইহার মাতার নাম সীতাদেবী। রঘুনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর রঘুপতি রাজা সুবিদনারায়ণের একটি খজা কন্যাকে বিবাহ করিয়া প্রচুর ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন, এই বিবাহ তাহার মাতা সীতাদেবীর অহুমোদিত ছিল না; তেজস্বিনী রমণী ক্রুদ্ধা হইয়া শ্রীহট্ট ত্যাগ পূর্বক নিঃস্ব অবস্থায় দ্বিতীয় পুত্র রঘুনাথকে লইয়া গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে আসিয়া বাসুদেব নামক বিখ্যাত নৈয়ায়িকের গৃহে আশ্রয়লাভ করেন। অনেকে বলেন এই বাসুদেবই সুবিখ্যাত বাসুদেব সার্কভোম। নানা কারণে আমরা এই মতে সম্মতি দিতে প্রস্তুত নহি। সুবিস্তৃত বৈষ্ণব সাহিত্যে, চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-মঙ্গল প্রভৃতি চরিতাখ্যানে—কোণার্ডও রঘুনাথ শিরোমণির নামের উল্লেখপর্যন্ত নাই। বাসুদেব সার্কভোম-সংক্রান্ত নানা কাহিনী বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিতে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার কোনটিতে প্রাসঙ্গিক ভাবে রঘুনাথের সঙ্গে সার্কভোমের কোন সংশ্লিষ্টতা সূচিত হয় নাই। রঘুনাথ শিরোমণি তাৎকালিক নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের মধ্যে দিক্‌পালস্বরূপ ছিলেন—বৈষ্ণব-সাহিত্য তৎসম্বন্ধে একেবারে নীরব। এতদ্বারা সহজেই মনে হয়, তিনি বৈষ্ণবদিগের কিংবা বাসুদেব সার্কভোমের কেহ ছিলেন না।

যে বাসুদেব মিথিলা হইতে ‘চিন্তামণি’গ্রন্থ কর্তৃত্ব করিয়া আসিয়া মিথিলার ভারতী-মন্দিরের দীপ অর্চনানিৰ্ব্বাহিত করিয়াছিলেন, সে বাসুদেব বৈষ্ণব ইতিহাসের বাসুদেব সার্কভোম নহেন। কথিত আছে বাসুদেব সার্কভোম চৈতন্যদেবের শিক্ষাগুরু ছিলেন, এ

কথাটিও সর্বৈব মিথ্যা। বৈষ্ণবদিগের নিখিল-বিশ্রুত তিন চারিখানি চৈতন্তচরিতাখ্যানের মধ্যে কোথাও একথা নাই যে চৈতন্তদেব শৈশবে বাসুদেব সার্কভোমের নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে চৈতন্তচরিতানুতই প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ, তাহাতে বাসুদেব-চৈতন্তমিলনের যে আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বরঞ্চ এইরূপ জনশ্রুতির প্রতিবাদ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। বাসুদেব সার্কভোম প্রথম চৈতন্তদেবকে চিনিতে পারেন নাই; তারপর যখন শুনিলেন, ইনি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র ও নীলাধর চক্রবর্তীর দৌহিত্র,—তখন পরিচয় পাইয়া তিনি চিনিতে পারিলেন। কিন্তু এই উপলক্ষে দুইজনের কোন একজন, অথবা উপস্থিত ব্যক্তির মধ্যে কেহ একবারও উল্লেখ করিলেন না যে, চৈতন্ত বাসুদেবের ভূতপূর্ব ছাত্র। এদিকে জয়ানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন লেখক চৈতন্তদেবের শিক্ষক কে কে ছিলেন, তাহা পরিষ্কার করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নবদ্বীপে তিনি তিনজন শিক্ষকের নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিষ্ণুদাস শর্ম্মা, সুদর্শন চক্রবর্তী ও গঙ্গাদাস পণ্ডিত। ইহাদের মধ্যে বাসুদেব সার্কভোমের নাম নাই।

সুতরাং চৈতন্তদেব ও রঘুনাথ শিরোমণি উভয়েই বাসুদেব সার্কভোমের নিকট পড়িয়াছিলেন, একথা আমরা বিশ্বাসযোগ্য মনে করি না। রঘুনাথ অবশ্য বাসুদেবের ছাত্র, কিন্তু সে বাসুদেব বৈষ্ণবদের বাসুদেব সার্কভোম নহেন।

কথিত আছে বাসুদেব পণ্ডিতের টোলে রঘুনাথ নবদ্বীপের পাঠ সমাপন করেন। তাঁহারই বাড়ীতে রঘুনাথ-জননী খাইতে পরিতে পাইতেন; কিন্তু বাসুদেব বালক

রঘুনাথের অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত তাহাকে পড়াইতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে যে দিন পণ্ডিত মহাশয় শিশুকে ক, খ, গ, ঘ পড়াইতে স্তম্ভ করেন, সেই দিনই বালক তাঁহাকে প্রশ্ন করে, ‘খ’

আগে না হইয়া ‘ক’ আগে হইল কেন? পঞ্চমবর্ষীয় বালক এইভাবে ক্রমাগত তাঁহাকে এরূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল যে বাসুদেব বুঝিলেন এই বালক কালে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবেন। একদা তাহাকে এক বিজ্ঞাণী তামাকের জন্ত আগুন আনিতে বলিল। তাহার মাতা রাগা করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন “আগুন কিসে নিবি?” বালক হাতের তেলোতে কতকটা ধূলি রাখিয়া বলিল, “এইবার হাতের মাটির উপর আগুন রাখ।” একদিন বাসুদেব বালক রঘুনাথকে পূজার জন্ত কিছু ফুল চয়ন করিয়া আনিতে বলিলেন। রঘুনাথ হাতে করিয়া ফুল আনিла। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, “হাতে করিয়া কি ফুল আনিতে হয়? তাহাতে কি পূজা হয়?” রঘুনাথ উপরকার ফুলগুলি পণ্ডিত মহাশয়কে তাঁহার সাজিতে তুলিয়া লইতে বলিল, বেহেতু নীচের ফুলগুলি তাহার স্পর্শদোষহুই কিন্তু উপরকার ফুলগুলি তো ফুলের উপরই ছিল—সেগুলির পবিত্রতা নষ্ট হয় নাই। পণ্ডিত মহাশয় উপরকার ফুলগুলি গ্রহণ করিলে রঘুনাথ নীচের ফুলগুলি

হাত হইতে ফেলিয়া দিল। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার পণ্ডিত মহাশয় রঘুনাথের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতেন।

কথিত আছে নবদ্বীপে রঘুনাথ চৈতন্তদেবের সতীর্থ ছিলেন এবং চৈতন্তদেবের লিখিত একখানি জ্ঞানের পুঁথি দেখিয়া একান্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি জ্ঞানশাস্ত্রে অদ্বিতীয় হইব এই উচ্চাশা মনে মনে পোষণ করিতেছিলাম, কিন্তু তোমার লিপিকুশলতা ও জ্ঞানে অধিকার দেখিয়া আমার সে আশা নিশ্চল হইল।” “এরূপ অসার বিচার চর্চায় আমার কোন ফলোদয় হইবে না”, এই বলিয়া চৈতন্তদেব সেই পুঁথি গদাগর্ভে বিসর্জন দিয়া রঘুনাথকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, “তুমি অনায়াসে জ্ঞানের চর্চা কর, আমি তোমার পথে দাঁড়াইব না।” আর একদিন রঘুনাথ কোন দ্রুত জ্ঞানের প্রণের সমাধান করিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধিত করিয়া ভাবিতেছিলেন, চৈতন্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এত নিবিষ্টভাবে কি চিন্তা করিতেছ?” রঘুনাথ সেই প্রশ্নটি বলিলে চৈতন্ত তৎক্ষণাৎ তাহার ঠিক উত্তরটি বলিয়া দিলেন। যাহার উত্তর তিনি সারাদিন চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, তাহা সমাধান করিতে চৈতন্ত মুহূর্তমাত্র সময় লইলেন না। রঘুনাথ এবারও বিস্মিত হইলেন।

এই গল্পগুলির কোনটিরই কোন ভিত্তি আছে বলিয়া আমার মনে হয় না, রঘুনাথ নবদ্বীপের পরিচিত অতি প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে চৈতন্তের সখ্য থাকিলে বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ, বাসুদেব ঘোষ, লোচন দাস, গোবিন্দ কর্মকার প্রভৃতি লেখকদের কেহ না কেহ এই বক্তৃত্ত্বের অবশ্যই উল্লেখ করিতেন। এমন কি মুরারি গুপ্তের মত তাত্‌কালিক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কিংবা কবিকর্ণপুরের মত ইতিবৃত্তকার অবশ্য সে কথা অন্ততঃ দুই একটা ইঙ্গিতেও জানাইতেন—কিন্তু কেহই এ বিষয়ে কিছু লিখেন নাই। একমাত্র ঈশান নাগর তাঁহার অদ্বৈতপ্রকাশে চৈতন্তের জ্ঞানের পুঁথি ও তাঁহার এক নৈয়ায়িক সতীর্থের ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই সতীর্থ কে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত তিনি করেন নাই। রঘুনাথ শিরোমণি এই সতীর্থ হইলে ঈশান নাগর নিশ্চয়ই তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেন। ঈশানের জীবন প্রায় শতাব্দীকাল ব্যাপক ছিল, এবং এই সুদীর্ঘকালের অধিকাংশটা তিনি নবদ্বীপে অতিবাহিত করেন। তাঁহার সহিত একই পল্লীতে যে বিশ্ববিদ্রুত পণ্ডিত বাস করিতেন, চৈতন্তের সতীর্থ সেই রঘুনাথ হইলে ঈশান অবশ্যই তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেন।

সুতরাং গল্পগুচ্ছগুলি আমাদের কাছে একান্তই অসার বলিয়া বোধ হয়। শিশির ঘোষ মহাশয় ঈশান নাগরের গ্রন্থে “জনৈক জ্ঞানের পটুয়া” এই পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রঘুনাথ সাব্যস্ত করিয়া তদীয় ‘অমিয় নিমাই চরিতে’ কথাটি লিখিয়াছিলেন,—তদবধি জন-কৃতিটি প্রবল হইয়াছে।

কিন্তু রঘুনাথ যে কাণা অর্থাৎ একচকুহীন ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই।
কাণা শিরোমণি। ‘কাণা শিরোমণি’ বলিতে রঘুনাথকেই বুঝায় এবং এই কাণার নামে
কতকগুলি পয়ার আমরা শৈশবে শুনিয়াছি, সেই কবিতাগুলি
রঘুনাথকেই উদ্দিষ্ট করিয়া লেখা হইয়াছে।

নবদ্বীপে পাঠ সমাপ্ত করিয়া রঘুনাথ পক্ষধর মিশ্রের কাছে পড়িতে ইচ্ছুক হইয়া মিথিলায়
গমন করেন। সেখানে নাকি পক্ষধরের এক ছাত্র তাঁহাকে উপহাস করিয়া জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলেন:—

“কো ভবানেকলোচনঃ ?” “আথওলঃ সহস্রাকো বিরূপাক্সিলোচনঃ।
অস্ত্রে দিলোচনাঃ সর্কো কো ভবানেকলোচনঃ ॥”

রঘুনাথের উত্তর,—

“আথওলঃ সহস্রাকো বিরূপাক্সিলোচনঃ।
যুগং বিলোচনাঃ শাপ্তে চ্যায়ৈহমেকলোচনঃ ॥”

কথিত আছে, পক্ষধর মিশ্রের টোলে গুণানুক্রমিক মঞ্চ সাজান ছিল। সর্বনিম্নশ্রেণীর
ছাত্রগণ মঞ্চের সর্বনিম্ন স্থানে পাঠ করিতেন, ক্রমে উর্দ্ধ শ্রেণীর ছাত্রদের উচ্চতর আসন
নিয়োজিত ছিল। সর্বোচ্চ মঞ্চে পক্ষধর স্বয়ং বিশিষ্ট ছাত্রগণকে পাঠ দিতেন এবং গ্রন্থাদি
রচনা করিতেন। নূতন কোন ছাত্র আসিলে তাঁহাকে মঞ্চের সর্বনিম্ন স্থানে প্রবেশ করিয়া
বিজ্ঞার পরীক্ষা দিতে হইত।

রঘুনাথ রীতি অনুসারে সর্বনিম্ন স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি ইহার পূর্বেই নবদ্বীপে
পাঠ সমাপন করিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং নিম্নশ্রেণীর প্রধান ছাত্র বেশী বাক্য
ব্যয় না করিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাত স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপভাবে ক্রমে উচ্চ
সোপান অতিক্রম করিয়া তিনি একেবারে পক্ষধরের মঞ্চে সমারূঢ় হইলেন। অনতিবিলম্বে
একবারে প্রধিতবশা অধ্যাপকের নিকটে পড়িবার বোগ্যতার পরিচয় পাইয়া ছাত্রমণ্ডলী
বিম্বিত এবং দীর্ঘাতুর হইল। তাহারা স্ববোগ পাইলেই নানারূপ বিরুদ্ধতা ও শ্লেষোক্তি
করিত।

রঘুনাথের সঙ্গে আর দুইজন ছাত্র এক সময়েই মিথিলায় পাঠ সমাপনার্থ উপস্থিত
হইয়াছিলেন, রঘুনাথ তিনজনেরই পরিচয় এক শ্লোক দিয়াছিলেন :—

“কুশদ্বীপ-নলদ্বীপ-নবদ্বীপ-নিবাসিনঃ।
তর্কসিদ্ধান্ত-সিদ্ধান্ত-শিরোমণিমনীষিণঃ ॥

পক্ষধরের সঙ্গে শিরোমণির শ্লোক-যুক্ত সম্বন্ধে অনেক উদ্ভট কবিতা আছে। উদ্ভট-গুরু
পূর্ণচন্দ্র দে তাহার অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের ঐতিহাসিক মূল্য কি,
বলা শক্ত।

কথিত আছে পক্ষধর মিশ্র একবার স্বীয় মত খণ্ডন করাতে জুঁক হইয়া নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন :—

“বক্ষোজ-পানকং কাণ ! সংশয়ে জাগ্রতি স্মৃটম্ ।
সামান্তলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপাতে ॥”

কাণাও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি উত্তরে বলিলেন :—

রঘুনাথের জবাব ।
“যোহকং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ ।
তমেবাধ্যাপকং মন্তে তদন্তে নাম-ধারিণঃ ॥”

তিন বৎসর কাল রঘুনাথ শিরোমণি পক্ষধরের টোলে পড়িয়াছিলেন । গুরু-শিষ্যের পরিচায়ক (পূর্ণবাবুর কবিতাম্ভাব সহ) অনেক শ্লোক রাজেন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার নব্য-ভ্রায় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার একটিও যদি সত্য হয় তবে বলিতে হইবে ভগবান্ রঘুনাথকে শুধু গুরুধার বুদ্ধি দিয়াছিলেন, এমন নহে, স্বজ্জলভ কবিত্বশক্তিও দিয়াছিলেন ।

প্রবাদ এই যে, পক্ষধর মিশ্র রঘুনাথের অমৃত প্রতিভা এবং পাণ্ডিত্যের যতই পরিচয় পাইতে লাগিলেন ততই তিনি ছাত্রের প্রতিষ্ঠায় ঈর্ষাতুর হইলেন । এ সম্বন্ধে নানা উপগল্প আছে ; এমন কি উত্তেজিত হইয়া রঘুনাথ নাকি এক সময়ে গুরু-হত্যার ইচ্ছাও পোষণ করিয়াছিলেন ।

মিথিলায় তিনি তাঁহার গুরু বাসুদেবের ভ্রায়সদ্বক্ষীয় অনেক পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়া-ছিলেন । বেহেতু মিথিলার টোলের নিয়ম ছিল না যে তথাকার পুঁথি কোন বিদেশী ছাত্র নকল

করিয়া স্বদেশে লইয়া যায় । যে করিয়াই হউক রঘুনাথ যেদিন নবদ্বীপে হরি ঘোষের বাড়ীতে টোল খুলিলেন, সেই দিন হইতে

মিথিলার স্বর্গ্য অন্তমিত হইল ; নবদ্বীপের টোলে পাঞ্জাব, কনোজ, মদ্র ও তামিল দেশের ছাত্রেরা পড়িতে আসিতে লাগিল । হরি ঘোষ গয়লা ছিলেন—সেই টোলগৃহ অল্পদিনের মধ্যে শত শত ছাত্রের গুঞ্জরণে এরূপ কোলাহলময় হইয়া উঠিল এবং ছাত্রের পরিভাষা-ছক্কোষ তর্কবুদ্ধি এবংবিধ মুখরিত হইতে লাগিল যে লোকে সেই টোলের নাম দিল “হ’রের গোয়াল ।”

রঘুনাথের জীবনের অনেক কথাই উদ্ভট কবিতায় আছে, তাহার কতটা লেখকদের কল্পনাগ্রসৃত এবং কতটা ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য তাহা নির্ণয় করা দুরূহ । কথিত আছে, নবদ্বীপে ফিরিয়া আসার পরে, তাঁহার পূর্ব গুরু বাসুদেব তাঁহাকে একটি কবিতাম্ভাব প্রদান করিলেন :—

“অগ্নি দিবসমনৈবীঃ পদ্মিনীসন্ধানি ত্বম্
রজনিস্থ নিরতোহভূঃ কৈরবিপ্যাং রমণ্যাম্ ।
কথয় কথয় ভূঙ্গ ! স্বচ্ছভাবেন তাবৎ
কিমধিকসুখমৈবীরজ বা তত্র বেতি ॥”

সারাদিন পদ্মিনীর ঘরে কাটাইয়া, সারারাত্রি কুমুদিনী মন্দিরে অতিবাহিত করিয়া আসিলে, হে অলি! তুমি ঠিক বল দেখি কোথায় বেশী সুখী হইয়াছিলে? এখানে বাহুদেব নিজেকে দিন এবং পক্ষধরকে রাত্রি পরিকল্পনা করিয়া শিখা কোথায় বেশী সুখী হইয়াছেন, এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘুনাথের উত্তর :—

“স্বং পীযুষ দিবোহপি ভূষণমসি ভ্রাত্রে পরীক্ষিত কো,
মাধুর্য্যং তব বিশ্বতোহপি বিদিতং সাক্ষী চ মাক্ষরীকতা।
কিঞ্চেক্ষপরম্বক্ষস্তুদমপি ক্রমো ন চেৎ কুপ্যসি,
যঃ কাস্তাধরপন্নবে মধুরিমা নাস্তত্র কুত্রাপি সঃ ॥”

এতদ্বারা রঘুনাথের পক্ষধরের প্রতিই পক্ষপাত সূচিত হইতেছে। ত্রয়োদশ, চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে ব্যাপক এই যৌনভাব পূর্ব্ণভারতের সাহিত্য, শিল্প, এমন কি ছায়শাস্ত্রের মধ্যেও কোথায়ও রূপকচ্ছলে কোথাও উপমার জন্ত সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এই যৌনভাব জয়দেবের কবিতায় ও উড়িষ্যা এবং বঙ্গের সেই সময়কার শিল্পে মাঝে মাঝে বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছে। ইতিহাস হিসাবে এই সকল কবিতার বিশেষ কিছু গুরুত্ব বা মূল্য আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

রঘুনাথ নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন—তত্ত্বচিন্তামণি-দীপ্তি, পদার্থ-খণ্ডন, আত্মতত্ত্ব-বিবেকটীকা, প্রামাণ্যবাদ, নানার্থবাদ, আখ্যাতবাদ, ব্যাপ্তিবাদ, লীলাবতী-টীকা, খণ্ডনখণ্ডাঙ্ক-টীকা, গুণকিরণাবলী-প্রকাশ-দীপ্তি, ছায়কুসুমাজলিটীকা, ছায়লীলাবতী-প্রকাশ-দীপ্তি, ছায়লীলাবতী-বিভূতি, ব্রহ্মসূত্র-বিভূতি, মলিনুচ-বিবেক। এ সকল পুস্তকের অনেকগুলিই এখন পাওয়া যায় না। রঘুনাথের রামভদ্দ নামক এক পুত্রের উল্লেখ আমরা পাইয়াছি।

বৈদিক-সংবাদিনীর মত গ্রহণ করিয়া অচ্যুতবানু বলেন, রঘুনাথ ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইহাকে চৈতন্যদেবের সতীর্থ প্রমাণ করিবার চেষ্টা এই সময়-নির্দ্ধারণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে কি না বলা যায় না। * রঘুনাথের ছাত্র সুবিখ্যাত

* এই পর্য্যন্ত লেখার পর দেখা গেল যে রঘুনাথের বাসস্থান নবদ্বীপ এই মত সমর্থন করিয়া কয়েকজন লেখক প্রতিবাদ-প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত করিতেছেন। দৃষ্টান্তস্বলে আমরা ‘শ্রীহট্টের রঘুনাথ’ নির্দক ‘প্রতিভা’ পত্রিকায় প্রকাশিত (৩য় বর্ষ, দশম ও একাদশ সংখ্যা), শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ডাহের প্রবন্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এদ্বারা আমাদের বক্তব্য এই যে, মহাপ্রভু রঘুনাথের সমসাময়িক বা সতীর্থ এই মত প্রমাণাত্মকভাবে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। পরন্তু মহাপ্রভু যে বাহুদেবের নিকট পাঠ গ্রহণ করেন নাই, বৈষ্ণব প্রামাণিক সাহিত্যের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়। মহাপ্রভুর সঙ্গে নৈমিত্তিক রঘুনাথের কোন সংস্রব কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। নবদ্বীপে কয়েকজন বাহুদেব ছিলেন, রঘুনাথ শিরোমণি ইহাদের কাহার ছাত্র, তাহাও প্রমাণিত হয় নাই। এই অবস্থায় প্রতিবাদ-প্রবন্ধগুলির বুদ্ধিও খুব দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারিতেছে না, হতরাং আমাদের লেখা পরিবর্তনের মুহূর্ত্ত এখনও উপস্থিত হয় নাই।

মথুরানাথের (নবদ্বীপবাসী শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের পুত্র) যতগুলি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে— তাহাদের কোনটির লিখন-কালই ১৫৫৬ খৃঃ অব্দের পূর্ববর্তী নহে। মথুরানাথ রঘুনাথের বৃদ্ধ বয়সের ছাত্র, এবং এই ১৫৫৬ খৃঃ অব্দও তাহার সহস্রলিখিত পুঁথির সময় নহে। সুতরাং অচ্যুতবাবু রঘুনাথের যে কাল নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রায় ঠিক বলিয়া ধরা যায়—অপর কোন নিশ্চয় প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা অহুমান করি রঘুনাথ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে জন্মগ্রহণ করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। নবদ্বীপের অপরাপর নৈয়ায়িকের নামও আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

গভীর অরণ্যে ঘেরাপ ফল-ফুল জন্মিয়া লোকচক্ষুর অগোচরে বিলীন হয়, বাঙ্গলাদেশে কত যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জন্মিয়া সেইরূপ ভাবে ইতিহাসের অজ্ঞাতসারে ধরাধাম হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কে তাহাদের খোঁজ করে? এখনও বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে শত শত সংস্কৃত পুঁথি স্তূপীকৃত হইয়া কীট, অগ্নি, জলপ্লাবন দ্বারা ধ্বংস পাইতেছে। কোন কোন স্থলে সেই সকল পণ্ডিতের অকুতিবংশধরগণ তাহা নিকটবর্তী নদীগর্ভে বিসর্জন দিয়া পিতৃকণ হইতে বিমুক্ত হইতেছেন, কোথাও বা অভাবের দায়ে কোন ব্রাহ্মণবিধবা পুরাতন পুঁথির বিনিময়ে ফেরিওয়ালার নিকট কিছু লবণ সংগ্রহ করিতেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি এই সমস্ত পুঁথির সহস্রাংশের একাংশও পান নাই। তাহাদের পূর্বে কার্য্যে কতকটা আন্তরিকতা ছিল,—এখন অর্থাভাবে ও পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের মত দূঢ় সহনের অভাবে কাজটা কতকটা ঠাট বজায় রাখার মত হইয়াছে। কত পুঁথি যে ধ্বংস পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, তথাপি তাহা নিশ্চুল হয় নাই, এখনও কত যে আছে তাহারও ইয়ত্তা নাই। এই সকল পুঁথির মধ্যে অপ্রকাশিত পুস্তক যথেষ্ট আছে; উর্দু, আরবী ও পার্শী পুঁথিগুলির ছুঁদশা ততোধিক। কত লক্ষ টাকা বৎসর বৎসর আমাদের বড় মানুষেরা বাজে খরচ করিতেছেন, একটি লক্ষ টাকা এতদর্থে ব্যয়িত হইলে এখনও বঙ্গদেশের অনেক গৌরবের জিনিষ, অনেক হারানো রত্নের উদ্ধার হইতে পারে।

গুপ্ত ও পাল রাজাদের সময়কার অনেক তাম্রপট্টই বাঙ্গালী পণ্ডিতের লেখা। সেন-রাজবংশ কালের ভাবা বহু আড়ম্বরপূর্ণ—গৌড়ীয় রীতিতে রচিত। জিনেন্দ্রবুদ্ধি বামন-জয়াদিত্য রচিত কাশিকাবৃত্তির “ভাস” নামক টীকা প্রণয়ন করেন। বাঙ্গালী পণ্ডিতদের মধ্যে জিনেন্দ্রবুদ্ধি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই টীকার হস্তলিখিত পুঁথির অধিকাংশই বঙ্গদেশে—বিশেষতঃ রাজসাহী জেলাতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ‘ভাসের’ টীকাকারগণের প্রায় সমস্তই বঙ্গদেশবাসী। জিনেন্দ্রবুদ্ধিকে বাঙ্গলার বৈদ্যাকরণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া বাইতে পারে।

একাদশ শতাব্দীতে রক্ষিত মৈত্রেয় “ধাতুপ্রদীপ” নামক পাণিনির ধাতুপাঠের টীকা প্রণয়ন করেন। ‘মৈত্রেয়’ উপাধি বাঙ্গালী ভিন্ন অল্প কাহারও দেখা যায় না রাজসাহী বরেন্দ্র অহুসকান সমিতি ‘ধাতু-প্রদীপ’ প্রকাশ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষণ সেনের প্রসিদ্ধ সভাকবি শরণদেব পাণিনির ব্যাকরণ অবলম্বন পূর্বক “দ্ব্যটবৃত্তি” নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন এবং এই সময়েই বাঙ্গলার শরণের দ্ব্যটবৃত্তি।

অন্ততম প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পুরুষোত্তম ভাবাবৃত্তি নামক টীকা রচনা করেন; এই পুস্তকে বৈদিক ভাষার আলোচনা নাই, ইহা পাঠ করিলে কাশিকা ও ভাগবৃত্তির সিদ্ধান্তগুলি অতি পরিষ্কার রূপে বুদ্ধিতে পারা যায়। পুরুষোত্তম স্বয়ং বলিয়াছেন “কাশিকা-ভাগবৃত্ত্যোশ্চৈ৷ চৈ৷ সিদ্ধান্তং বোদ্ধুমস্তি ধীঃ। তদা বিচিন্ত্যতাং ভ্রাতর্ভাবাবৃত্তিরিয়ং মম।” পুরুষোত্তম বোদ্ধ ছিলেন এবং লক্ষণ সেনের আদেশে, ‘ভাবাবৃত্তি’ রচনা করেন। তদ্রচিত “ললিতপরিভাষা”, “জ্ঞাপকসমুচ্চয়” ও ‘উণাদিবৃত্তি’ নামে আরও কয়েকখানি পুস্তক আছে। বল্লাল সেনের সমকালিক (দ্বাদশ শতাব্দী) বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলজাত অনিরুদ্ধ ভট্ট বাঙ্গলার বগুড়া জেলায় বিলিয়ারা পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন, ইনি বল্লালের সভা-পণ্ডিত ছিলেন।

তঁহার রচিত “হারলতা” (অশৌচসংক্রান্ত) নামক স্থতিগ্রন্থ “বিব্রিধিকা ইণ্ডিকা”র ১২০২ খৃঃ অব্দে কমলকৃষ্ণ স্থতিতীর্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। রঘুনন্দন ইহার শ্লোক প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণাচার্য্য রঘুনন্দনের সমকালিক ছিলেন, মেদিনীপুর বগড়ি কৃষ্ণগড়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ইনি পাশ্চাত্য বৈদিক ছিলেন। ইহার রচিত “বর্ষক্রিয়া-কৌমুদী”, “দানক্রিয়া-কৌমুদী” “শ্রাদ্ধক্রিয়া-কৌমুদী” প্রভৃতি চারিখানি স্থতিগ্রন্থ ক্রমান্বয়ে ১২০২, ১২০৩, ১২০৪ এবং ১২০৫ সনে বিব্রিধিকা ইণ্ডিকায় কমলকৃষ্ণ স্থতিতীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। রঘুনন্দন এবং ইনি প্রতিবন্ধিতা করিতেন, সম্ভবতঃ এজন্য ইহার পুস্তক হইতে কোন শ্লোক তিনি নজির স্বরূপ উদ্ধৃত করেন নাই। এই চারিখানা পুস্তকের প্রথমটিতে বাৎসরিক ধর্ম-ক্রিয়ার কথা আছে, দ্বিতীয়টি দান সম্পর্কিত, তৃতীয়টিতে শ্রাদ্ধের কথা এবং চতুর্থটিতে অশৌচ ও মলমাস সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থা আছে। গোবিন্দানন্দের পিতার নাম ছিল গণপতি ভট্ট। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন। ইনি জ্যোতিষে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং ইহার রচিত প্রায়শ্চিত্ত বিবেকের টীকা (শূলপাণির রচিত) চণ্ডীচরণ স্থতিভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু বঙ্গদেশের স্থতিকারদের রাজা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য। ইনি হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র এবং নবদ্বীপবাসী। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ইনি গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। তদ্রচিত জ্যোতিষতত্ত্ব ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। ইহার প্রসিদ্ধ “অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব”র মধ্যে “উদ্বাহতত্ত্ব”, “দায়ভাগতত্ত্ব”, “প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব” এবং “একাদশীতত্ত্ব”ই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত দুইখানি পুস্তক ব্যবহার-শাস্ত্রের অন্তর্গত এবং বাঙ্গলা ও আসামে ব্রিটিশ আদালতে গ্রাহ্য হইয়াছে। উদ্বাহতত্ত্ব বিবাহসংক্রান্ত স্থতিগ্রন্থ—ইহাতে বঙ্গদেশে বর্তমান কালে প্রচলিত বিবাহে খুব আটখাটী নিয়ম বিদ্যমান হইয়াছে। বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরার অপেক্ষা রঘুনন্দনের এই নিগড় অত্যধিক কঠোর এবং তাহাতেই এদেশে বিবাহ-

সমস্তা এত জটিল হইয়াছে। জীমূতবাহনের দায়ভাগোক্ত “প্রাদেশিক স্বত্ব” অপেক্ষা রঘুনন্দনের “সামুদায়িক স্বত্ব” জটিল, তাহা বঙ্গদেশ গ্রহণ করে নাই। শ্রাদ্ধ এবং প্রায়শ্চিত্ত-সম্বন্ধে রঘুনন্দন শূলপাণি ও অনিরুদ্ধ ভট্টকে মূলতঃ অবলম্বন করিয়াছেন। “একাদশীতত্ত্বে” রঘুনন্দন বিধবার নির্জলা উপবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহা পশ্চিমবঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে প্রচলিত হইয়াছে।

সেন রাজাদের তাম্রশাসনগুলিতে সংস্কৃতের পাণ্ডিত্য চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়াছিল, তৎপূর্বে বাণভট্ট তাঁহার কাদম্বরী ও হর্ষচরিতে যে সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ কবিত্বপূর্ণ গল্প লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অলঙ্কার-শাস্ত্রের শিরোভূষণস্বরূপ। সেন রাজাদের তাম্রশাসনে শাব্দিক-বিকীর্ণিত, শ্রুগুণ, মালিনী, আর্ঘ্যা, অহুভুত, বসন্ততিলক, শিখরিনী, মন্দাকিনী, পৃথ্বী, পুষ্পিতাঙ্গী,—প্রভৃতি নানা ছন্দের খেলা দৃষ্ট হয়।

সুপ্রসিদ্ধ বোপদেব গোস্বামীর মুক্তবোধ সর্বজন-সমাদৃত গ্রন্থ। ইনি বাঙ্গালী ছিলেন তাহা মনেহ করিবার কারণ নাই, কেহ কেহ বলেন ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু তাঁহার এই মতের পক্ষে কোন প্রমাণই দিতে পারেন নাই। তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন,—তৎসম্বন্ধে স্বর্গীয় বাদবেশ্বর তর্করত্ন ও মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন অনেক প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। যুক্তিগুলি বিচারসহ বলিয়াই মনে হয়। প্রথমতঃ ‘গোস্বামী’ উপাধি বাঙ্গলার বাহিরে বড় দেখা যায় না। কোন মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণের এক্ষণ উপাধির কথা আমরা শুনি নাই। বোপদেব নিজের পরিচয়-উপলক্ষে লিখিয়াছেন, “দেশানাং বরদাতটং বরমতঃ স্বার্থাভিধানং মহাস্থানম্”। স্বন্দপুরাণ হইতে জানা যায় করতোয়া নদীর নাম “বরপ্রদা” (বরদা), বগুড়া জেলার সুপ্রাচীন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাস্থান দিয়াই এই বরপ্রদা বা বরদা নদী প্রবাহিত। এই মহাস্থান প্রাচীন কালে নানাকীর্তিমণ্ডিত বিদ্বজ্জনাপ্রসূত, এবং শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক-গণের নিবাসভূমি ছিল। বোপদেবের পিতা চিকিৎসক ছিলেন, তাহা তিনি নিজেই জানাইয়াছেন। মহারাষ্ট্র দেশে মহাস্থান বলিয়া কোন স্থানের অস্তিত্ব জানা নাই। এমন কি তদ্রূপে বোপদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি মুক্তবোধ প্রভৃতি গ্রন্থের নামও শুনা যায় না। সেদেশে “বোপদেব-কারিকা” নামে একখানি স্থতির কারিকা পাওয়া যায় মাত্র।

বোপদেব বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এদেশে তৎসম্বন্ধে একটি শ্লোক প্রচলিত আছে:—

“বহু ব্যাকরণে বরেণ্যঘটনাঃ ক্ষীতাঃ প্রবন্ধা দশ, প্রখ্যাতা নব বৈজ্ঞকেষু তিথিনির্দ্ধারার্থ-
মেকোহঙ্কৃতঃ। সাহিত্যে ত্রয় এব, ভাগবতদ্ব্যেকৌ ত্রয়
... ..” বোপদেব একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজয়মান ছিলেন। তদ্রচিত
‘কাব্যকামধেনু’ একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

খঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় বৈয়াকরণ সৃষ্টিধর “ভাবাবৃত্তীয়ার্থবিবৃতি” রচনা করেন। চর্চাদাস ও রাম তর্কবাগীশ নামক বাঙ্গালী পণ্ডিতদ্বয় মুক্তবোধের যে টীকা প্রণয়ন করেন, তাহা এদেশে বিশেষরূপে

প্রচলিত।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদবাসী জুমুর নন্দী 'সংক্ষিপ্তসারে'র টীকা রচনা করেন ;
জুমুর নন্দী। এই টীকার নাম 'রসবতী', ইহা বাঙ্গালার সর্বত্র এককালে
প্রচলিত ছিল। "স্থপন্ন" নামক ব্যাকরণ-প্রণেতা পদ্মনাভ দত্ত

পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে রূপগোস্থানী "হরিনামামৃত" নামক ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন।
এই গ্রন্থে রাধা ও কৃষ্ণ নামে সংজ্ঞা নির্দেশ হইয়াছে। বৈষ্ণবসমাজে এই ব্যাকরণখানি
বিশেষ আদৃত। তদ্রচিত "উজ্জ্বল নীলমণি" অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধীয় সর্গজনপ্রিয় গ্রন্থ।
সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ এবং উহার টীকাকার রামচরণ তর্কবাগীশ উভয়েই
বাঙ্গালী ছিলেন।

কবিবর সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" সম্বন্ধে আমরা ২৮৮ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছি।
গৌড়ের রাজসভার কবি (নবম শতাব্দী) কবিরাজ পণ্ডিতের "রাঘব-পাণ্ডবীয় কাব্য"

আখ্যানগুণশতী।

একখানি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন কাব্য। ইহার প্রত্যেক শ্লোকের
রামপক্ষে ও পাণ্ডবপক্ষে অর্থ করা যায়। রামচরিতের ছায় ইহার

শ্লোকগুলি দ্ব্যর্থবোধক। গোবর্দ্ধনাচার্যের "আখ্যানগুণশতী"—লক্ষণসেনের সময়কার একখানি
অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। গোবর্দ্ধনাচার্য সম্বন্ধে আমরা এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত আলোচনা করিয়াছি।
(শব্দসূচী দ্রষ্টব্য)। কবি লক্ষণসেন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"সকলকলাঃ করয়িতুং প্রভুঃ প্রবন্ধস্ত কুমুদবকোশ্চ।

সেনকুলতিলকভূপতিরেকো রাক্ষসপ্রদোষশ্চ ॥"

ধোয়ীকবির "পবনদূত"র কবিত্ব প্রশংসার্থ। লক্ষণসেনের প্রেমে পড়িয়া কুবলয়া নাম্নী বক্ষী
যে বিরহ ব্যথা সহিয়াছিলেন, তাহাই এই কাব্যের বর্ণনীয়। প্রসঙ্গক্রমে বিজয়নগর
প্রভৃতি স্থানের যে সকল ভৌগোলিক বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও অতীব উপাদেয়। জয়দেব
ইহাকে "কবি-স্বাপতি" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, ইহার সম্বন্ধেও আমরা গ্রন্থভাগে অনেক
আলোচনা করিয়াছি (শব্দসূচী দ্রষ্টব্য)।

কেন্দুবিব নিবাসী জগৎপ্রসিদ্ধ কবিকুলশিরোমণি জয়দেবের বিস্তারিত প্রসঙ্গ এই
পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত দেওয়া হইয়াছে (শব্দসূচী দ্রষ্টব্য)।

"প্রসন্নরাঘব"-রচয়িতা জয়দেবও বাঙ্গালী কবি। কিন্তু ইনি 'গীতগোবিন্দ' প্রণেতা
জয়দেব নহেন। রচনার প্রণালী দেখিয়া উভয়কেই এক যুগের কবি বলিয়া মনে হয়।
কেহ কেহ দুইজনকে অভিন্ন মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। 'প্রসন্নরাঘব' প্রণেতা
স্বয়ং লিখিয়াছেন, তাঁহার পিতার নাম মহাদেব এবং মাতার নাম সুমিত্রা। কিন্তু 'গীত-
গোবিন্দ'কার তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামাদেবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।
'প্রসন্নরাঘব'কারের "চন্দ্রালোক" নামে একখানি অলঙ্কারের গ্রন্থও আছে।

ধোয়ী কবির সম-সময়ে কিংবা তাঁহার কিছু পরে বঙ্গদেশের কয়েকজন বৈষ্ণব কবি
"পদাবদূত," "উজ্জ্বলদূত," "বাতদূত" প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়াছেন। চৈতন্যের অন্তরঙ্গ

পরিকর মুরারিকৃত “চৈতন্যচরিত কাব্য” এবং কবি কর্ণপুর রচিত “চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য”, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত “গোবিন্দ লীলামৃত”,—ভট্টনারায়ণের “বেণীসংহার” প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ। ভট্টনারায়ণ কনোজ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার নাটক গোড়ীয় রীতিতে লিখিত স্তবরাং মনে হয় তিনি গোড়দেশে আসিয়া উহা রচনা করিয়াছিলেন। ঘটককারিকা বিশ্বাস করিলে ভট্টনারায়ণ “বেদবাণাদ শকে” (৭৩২ খৃঃ) বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে কাঁচড়াপাড়া-নিবাসী পরমানন্দ সেন (কবি কর্ণপুর) একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তদ্রচিত “চৈতন্যচরিতামৃত” কাব্যের নাম আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইহার সর্বপ্রধান গ্রন্থ “চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক।” এই নাটকখানির অজস্র প্রশংসা ডাঃ সিলভান-লেভি মহাশয় করিয়াছেন, (মৎপ্রণীত “Caitanya and His Age” নামক পুস্তকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের আদেশে ‘চৈতন্য-চন্দ্রোদয়’ রচিত হয়—ইহার সম্বন্ধে অপর একখানি পুস্তকে বিস্তারিতভাবে আমরা আলোচনা করিয়াছি। লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস রচিত “বাল্যলীলা সূত্র” এবং “বিকৃতভক্তি রত্নাবলী” প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ সম্মানিত। (শব্দসূচী দ্রষ্টব্য।)

রূপ গোস্বামীর “বিদগ্ধমাধব” ও “ললিতমাধব” ষোড়শ শতাব্দীর দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক। প্রথমতঃ রূপ গোস্বামী এই দুইখানি নাটকের ভাব একখানি নাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়া যে খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল, কিন্তু চৈতন্যদেব কবিকে বিষয়টা দুইভাগে বিভক্ত করিয়া স্বতন্ত্রভাবে দুইখানি নাটক লিখিতে উপদেশ দেন, তাহার একখানিতে বৃন্দাবন-লীলা (মাধুর্য) ও অপরখানিতে ঐশ্বর্যের (মাধুরলীলা) ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে।*

ষোড়শ শতাব্দীতে ষড়্ গোঁস্বামীর অল্পতম রঘুনাথ দাস বৃন্দাবনে বাসকালে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন—তন্মধ্যে কয়েকখানির নাম এখানে করিতেছি :—

১। বিলাপকুসুমাজলি, ২। প্রেমাপরবিধ স্তোত্র, ৩। রাধাষ্টক, ৪। প্রেমাসুজ-মঙ্গলার্থা স্তোত্র ও শ্রবণকল্পপ্রকাশক স্তব, ৫। গোবর্দ্ধনদশক প্রার্থনাদশক, ৬। নামশিখা, ৭। প্রার্থনা ৮।, উৎকর্ষাদশক, ৯। অভীষ্টসূচনা, ১০। শচীনন্দনশতক, ১১। নামাষ্টক। এইরূপ ২৯খানি পুস্তক বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত। ইহাদের কতকগুলি আকারে খুব ছোট। ভক্তিরত্নাকরে ষড়্ গোঁস্বামী প্রণীত বহু পুস্তকের নাম উল্লিখিত আছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে বহু বাঙ্গালী পণ্ডিত সংস্কৃতে নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। “সাহাড়িয়ান্ গাঁই,” বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ শূলপাণি সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে তাঁহার বঙ্গবিশ্রুত

* রূপ গোস্বামী “রানকেলী-কৌমুদী”, “পদ্মাবলী”, “সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত”, “হংসদূত”, “উদ্ধবসংবাদ”, “স্তবমালা”, “পদোদেশবীপিকা”, “জানক-মহোবসি”, “মথুরা-মাহাত্ম্য”, “গোবিন্দ-বিরহাবলী”—প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীক-বিবেক, প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক প্রভৃতি স্মৃতিসংগ্রহ সংকলন করেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, নব ব্রাহ্মণ্যের অভ্যুদয়ের ফলে ব্রহ্মাচারী বৌদ্ধগণের প্রভাবান্বিত সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিশেষ চেষ্টা চলিয়াছিল। আচারকে মঙ্গুগণরাশির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া সামাজিক জীবনে আচার শুদ্ধিনুলক অনেক অনুশাসন প্রচারিত হইয়াছিল। শূলপাণি এইভাবে নিবন্ধকারদের মধ্যে বর্তমান যুগে অগ্রণী। ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দন তাঁহার অসামান্য শ্রম ও অধ্যবসায়ের কীর্তিস্তম্বরূপ “অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব” প্রচারিত করেন। এই স্মৃতিগ্রন্থ বর্তমান যুগে বাঙ্গালীর হিন্দুসমাজের পথ প্রদর্শক এবং ইহারই অনুশাসনে আমাদের ধর্ম্মাযুষ্ঠান পরিচালিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব সমাজে হরি-ভক্তি-বিলাসের অনুশাসন প্রচলিত। এই গ্রন্থ রচনা করেন রূপ গোস্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সনাতন,—তিনি চৈতন্য দেবের উপদেশ পাইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহার অধ্যায় ভাগ হইতে বিষয় সৃষ্টি ও সমস্ত খুঁটিনাটি কথা চৈতন্যদেব সনাতনকে কহিয়া দিয়াছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতের ‘সনাতন শিক্ষা’ নামক অধ্যায়ে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে এবং চৈতন্যের উপদেশাদি বিষয়ে সমস্ত কথা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সনাতন ব্রাহ্মণ হইলেও হুসেন সাহের মতী স্বরূপ তিনি কত কালের জ্ঞাত মুসলমানদের আচার ব্যবহার ও মুসলমানী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এজ্ঞাত হই ভ্রাতাই সমাজে নিগূহীত ছিলেন; এমন কি কয়েক বৎসর পূর্বেও রামকেলী গ্রামে রূপগোস্বামী কৃত “রূপসাগর” নামক প্রকাণ্ড দীঘির জল হিন্দুদের অপেক্ষে ছিল। সনাতন অতি বিনয়ী ছিলেন। তাঁহার মহাগ্রন্থ ‘হরিভক্তি বিলাস’ রচনার পর তিনি

হরিভক্তিবিলাস।

চৈতন্যদেবকে বলিলেন “এখনওগোঁড়া হিন্দুসমাজ আমাদের এতটা বিরুদ্ধ যে আমার নাম থাকিলে—এই স্মৃতি-পুস্তকের অনুশাসন কেহ মানিবে না।” তদনুসারে তিনি গোপাল ভট্টের নামে পুস্তক খানি প্রচারিত করেন। পরবর্তী সময়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং সনাতনের ভ্রাতৃপুত্র জীব গোস্বামী এ কথা প্রচারিত করেন। জীব গোস্বামী সম্বন্ধে সমস্ত কথা এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত লিখিত হইয়াছে (শব্দসূচী ভ্রষ্টব্য)। তদ্রচিত ‘বট সন্দর্ভ’ চিন্তাশীলতা, পাণ্ডিত্য ও ভক্তির প্রস্রবণ বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য হয় না। জীব গোস্বামী

কুম্ভক ভট্ট।

প্রণীত ক্রমসন্দর্ভ, সর্বসংবাদিনী, ‘গোপালচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজসাহীবাসী কুম্ভক ভট্ট মনুসংহিতার টীকা প্রণয়ন করেন। এই টীকা পণ্ডিত সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

জ্যোতিষের সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত বহু প্রাচীন পুঁথি আমরা বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে দেখিয়াছি। এখনও তাহাদের সন্ধান লওয়া হয় নাই। ‘জ্যোতির্বিজ্ঞানকল্ললতিকা’ প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তকের সঙ্গে জ্যোতিষ আলোচনাকারী পণ্ডিতগণ সুপরিচিত।

এদেশে আয়ুর্বেদের এত পুস্তক রচিত হইয়াছে যে তাহাদের সংখ্যা নাই। প্রত্যেক পল্লীতেই পুঁথি খুঁজিতে গেলে সংস্কৃত ও বাঙ্গলায় লিখিত চিকিৎসা

জ্যোতিষ।

শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের অনেকগুলিই ‘পান্ডার’ আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কতকগুলিতে বহু মুষ্টিযোগের উল্লেখ আছে।

বঙ্গদেশে মাধবকরের নিদান ও চক্রপাণি দত্তের (লোপ্রবংশীয় কুলীন) “চক্রদত্ত” গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। ইহার সম্বন্ধে শ্রীহট্টের ইতিহাসের গৌর গোবিন্দ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। মাধব করের নিদানের টীকাকার বিজয় বক্ষিত বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালী বাগ্‌ভট স্বীয় নামানুসারে আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ রচনা করেন। বহরমপুরের সর্কশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত শিরোমণি গদাধর কবিরাজের সুবিখ্যাত ‘জল্ল কল্লতরু’ টীকা এবং অপরাপর বিষয় স্বতন্ত্রভাবে এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

জায়শান্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথাই একবার উল্লিখিত হইয়াছে। রঘুনাথ ও মথুরানাথের কথা সবিত্তার আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপের সর্কপ্রধান নৈয়ায়িক জগদীশ ছায়ের বে টীকা করেন, তাহা ‘জাগদীশী’ নামে প্রসিদ্ধ।

জায়শান্ত্র। জগদীশ কৃত “শব্দশক্তিপ্রকাশিকা”ও একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন তাহার সুপ্রসিদ্ধ ছায়ের গ্রন্থ “ভাষা-পরিচ্ছেদ” প্রণয়ন করেন। বিশ্বনাথ নবদ্বীপবাসী ছিলেন। অপরাপর ছায়-গ্রন্থ লেখকগণের মধ্যে বাসুদেবের নাম অগ্রগণ্য। ইনি বৈষ্ণব ইতিহাসে সুপরিচিত। এই বাসুদেব সার্কভোম বৈষ্ণবদের অথবা অপর কোন বাসুদেব সার্কভোম তাহা লইয়া এখনও মাঝে মাঝে তর্ক হইয়া থাকে। ইহার রচিত পুস্তকের নাম ‘সার্কভোম-নিবৃত্তি’।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বগুড়াবাসী গদাধর ভট্টাচার্য্য ছায় শাস্ত্রে কৃতিত্ব দ্বারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। ইনি নবদ্বীপে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ইহার ছায়ের টীকার নাম ‘গদাধরী’।

এই নিবন্ধের শেষদিকের অনেক কথা আমি ১৩৩৬ সনের পৌষ মাসে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু সংস্কৃতের গ্রন্থাগার এখনও সুগভীর তিমিরাজ্জল, বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিরাজ করিতেছে। কোন্ অধ্যবসায়শীল বাঙ্গালী শিক্ষার্থী এই বিরাট সাহিত্যশালায় দীপশলাকা হস্তে প্রবেশ করিয়া বাঙ্গলার এই রত্নভাণ্ডার লোক সম্মুখে আনিয়া দেখাইবেন! বহু গ্রন্থ ধ্বংস হইয়াছে। যাহা কিছু কালের উচ্ছিষ্টের মত এখনও পড়িয়া আছে তাহা কে উদ্ধার করিবে?

আধুনিক কালে রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম ও তারানাথের বাচস্পত্যভিধান এবং বাঙ্গলা ভাষায় বিশ্বকোষ বিরাট কলেবর ও বিপুল উপকরণ দ্বারা প্রমাণ করিতেছে যে বাঙ্গালী পণ্ডিতের এখনও ধৈর্য্যচ্যুতি বা শিক্ষার প্রতি বিমুখতা জন্মে নাই। কিন্তু উৎসাহ ও আশ্রয় পাইলে পুনরায় কল্লতরুর উদ্ভব হইতে পারে, কিন্তু “অনাশ্রয়া না জীবন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতাঃ।”

গুপ্ত ও পাল রাজাদের যে সকল তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশ বাঙ্গালী পণ্ডিত লিখিত। এই সকল তাম্রপটের কতকগুলি এক্ষণে কবিত্বপূর্ণ স্থললিত

ভাষায় লিখিত যে রচকগণ শ্রেষ্ঠ কবিদের এক পর্যায়ে স্থান পাইবার যোগ্য। আমরা ত্রিপুরা, আসাম ও শ্রীহট্টের ইতিহাস আলোচনা কালে কয়েকখানি এদেশীয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছি।

ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা দ্বিধিজয় করিতে বাহির হইতেন। জয়ী পণ্ডিতের খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে কেশব কাশ্মীরী সমস্ত ভারতবর্ষ বিজয় করিয়া ১৫০৩ কিংবা ১৫০৪ খৃঃ অব্দে নবদ্বীপে আসিয়া চৈতন্তের সহিত বিচারে পরাভূত হইয়াছিলেন। সঙ্কট-উদ্গত-দ্বিধিজয়ী।

গুপ্ত চৈতন্ত এই মহা পণ্ডিতকে হারাওয়া দিয়া ‘বাদীসিংহ’ উপাধি লাভ করেন। সে কালে এই সকল দ্বিধিজয়ী পণ্ডিতগণ হস্তীর পৃষ্ঠে সমারোহ করিয়া দেশ বিদেশে বিদ্রোহলীকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিয়া বেড়াইতেন। বহুপূর্বে পুন্ডবী নিবাসী মণ্ডন মিশ্র এই ভাবে পণ্ডিত রাজচক্রবর্তী হইয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গ দেশে আর একজন পণ্ডিতের কথা এখানে উল্লেখ করিব। তিনি দ্বিধিজয়ী হইয়া অশেষ বশ অর্জন করিয়াছিলেন।

সেই সময়ে (ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে) কামরূপের রাজধানী ছিল ‘এগারসিন্দুর’। এই নগর ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত ছিল। এগারসিন্দুর, মিরজাফরপুর, দগদগা, কুটীন্দুর ও হোসেনপুর পাশাপাশি পল্লী ছিল। এই স্থান বাণিজ্য ও বিজ্ঞা আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এগারসিন্দুরের অতি নিকটে ভিটাদিয়া নামক পল্লী কুলীনদিগের একটা কেন্দ্র ছিল। তথায় লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী নামক সর্কশাস্ত্রবিৎ এক পণ্ডিত বাস করিতেন। তাহার পত্নীর নাম ছিল কমলাদেবী।

রূপচন্দ্র নামক ইহাদের এক পুত্র জন্মে। এই বালক বাল্যকালে একপ ছষ্ট ছিল যে তাহার অত্যাচারে পল্লীবাসীরা বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। লক্ষ্মীনাথ নানারূপ চেষ্টা করিয়াও ইহাকে জ্ঞানের পথে আনিতে পারিলেন না। ছষ্ট বালক রূপনারায়ণ।

লেখাপড়া জিনিষটাকে একেবারে পছন্দ করিত না। একদিন পণ্ডিত জুহু হইয়া কমলাদেবীকে আদেশ করিলেন “আজ যখন ছরাসা ভাত খাইতে আসিবে, তখন তাহাকে ছাই দিবে।” পতিব্রতা ব্রাহ্মণী পতির আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি অন্নব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিবার সময় ধালার এক কোণে এক টুকরা ছোট কয়লা রাখিয়া দিলেন। কিন্তু ছষ্ট হইলেও বালক খুব মেধাবী ছিল, তাহার দৃষ্টি সেই পোড়া কাঠ টুকরার উপর পড়িল, সে আভাসে উহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া সেই পদার্থটা কি এবং কোন্ উদ্দেশ্যে রাখা হইয়াছে তাহা তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল। কমলাদেবী “ওটা কিছু নয়, ভুলে ধালায় পড়িয়া গিয়াছে” প্রভৃতি যে সকল ব্যাখ্যা দিলেন তাহা বালক বিশ্বাস করিল না। সে একটা খারাপ শপথ দিয়া তাহার মাতাকে সত্য বলিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অবশেষে মাতা সান্ত্বনেন্দ্রে সত্য কথা বলিয়া, কেন সে পিতার উপদেশ

গ্রাহ না করিয়া এত দৃষ্ট হইতেছে, তজ্জন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং ভবিষ্যতে বাহাতে সে চরিত্র সংশোধন করে তজ্জন্ত সিদ্ধ-মধুর উপদেশ দিলেন।

রূপচন্দ্র সে সকল উপদেশ শুনিলেন কি না শুনিলেন বোঝা গেল না। তিনি অতিরিক্ত গাভীরা অবলম্বন করিয়া সেই বে খালা ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তাহার পর বহু বৎসর পর্যন্ত তাঁহার সন্ধান ছিল না। তিনি ভিটাদিয়া হইতে বাঙ্গলার অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানকেন্দ্র “পণ্ডিতবাড়ী” নামক পল্লীতে উপস্থিত হইলেন।

আচার্য ও সরস্বতী
উপাধিলাভ।

তথায় অসামান্য মনস্বিতাশ্রুতি তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাকরণ আয়ত্ত করিয়া “চক্রবর্তী” উপাধি লাভ করিলেন। পণ্ডিতবাড়ী হইতে নবদ্বীপে আসিয়া তিনি কয়েক বৎসর ছাত্র, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া “আচার্য” উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। নবদ্বীপ হইতে তিনি উড়িষ্যায় আসিয়া পুরীধামে উপস্থিত হন, তখন নীলাচল চৈতন্তপ্রভুর গানে ও নর্তনে ভাসিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু রূপচন্দ্র মহাপ্রভুর সহিত দেখা করেন নাই, দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মহারাষ্ট্র দেশে চলিয়া আসিলেন। নদীয়ার ঠাকুরের ফাঁদে পা দিলে তাঁহার ভাবপ্রবণ প্রাণ আর খুদী পুঁথি লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারিত না। পুনর টোলে রূপচন্দ্র দীর্ঘকাল বেদ, বেদান্ত ও বেদান্ত পাঠ করেন। তথাকার অধ্যাপক হইতে সরস্বতী উপাধি লাভ করিয়া তিনি মস্ত বড় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার মনে দিগ্বিজয়ী হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। অথমে যজ্ঞের ঘোড়ার ছায় তিনি নানা প্রদেশ ঘুরিয়া সেই সেই স্থানের পণ্ডিতদিগকে যে কোন শাস্ত্রে আলোচনা করিতে আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। তখন কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থান হইতে জয়পত্র কুড়াইয়া অবশেষে শুনিলেন বৃন্দাবনে দুই মহাপণ্ডিত আছেন, তাঁহারা অজ্ঞেয়। সুতরাং রূপ ও সনাতনকে বিজয় করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার বলবতী হইল। ইহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া রূপচন্দ্র তর্ক করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন “তর্ক করিয়া কি লাভ হইবে?” রূপচন্দ্র উত্তরে বলিলেন “শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বিজয়ী হওয়া, আমি আপনাদিগকে জয় করিতে পারিলে, শিক্ষা সফল হইল, মনে করিব। শুনিয়াছি নাকি আপনাদের ছাত্র পণ্ডিত এখন আর ভারতবর্ষে নাই।” সনাতন হাসিয়া বলিলেন “আমাদের কোন পাণ্ডিত্য নাই, আপনার ছাত্র বিশ্ববিশ্রুতকীর্তি পণ্ডিতের সহিত তর্ক করিবার কি সাধ্য আমাদের আছে?” রূপচন্দ্র বুঝিলেন “পণ্ডিতেরা ভয় পাইয়াছেন, আমার সঙ্গে তর্কে পরাভূত হইলে পাছে ইহাদের এতবড় প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়, এজন্ত তর্ক করিতে অনিচ্ছুক।” তখন তিনি বলিলেন “আপনারা আমার সঙ্গে তর্কে পারিলেন না, একথা স্বীকার করুন।” রূপ ও সনাতন অগ্নানবদনে স্বীকৃত হইলেন। সেই স্বীকারোক্তি হস্তে লইয়া রূপচন্দ্র প্রত্যাগমন করিলেন, এমন সময় শুনিলেন যে বৃন্দাবনে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে আর একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত আছেন, তাঁহার নাম জীবগোস্বামী, তিনি সনাতন ও রূপের ভ্রাতুষ্পুত্র। শোনা মাত্র উক্ত যুবক জীবের নিকট উপস্থিত হইলেন। জীব তৎকালে ভারতীয় সর্বশা স্রবোত্তম ছিলেন, তথাপি তখনও তিনি সাংসারিক ভাবের উর্দ্ধে

আধ্যাত্মিক বিনয়ের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। রূপচন্দ্রের হস্তে তাঁহার জীবগোস্বামীর নিকট খুল্লতাতগণের পরাজয়ের কথা শুনিয়া তাঁহার চিত্তে অতীব ক্রোধের উদ্রেক হইল। তিনি ইহার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঁচদিন পরাজয়।

ক্রমাগত তর্কের পর রূপচন্দ্রের অধৈর্যবাদ ভাসিয়া গেল। জীবগোস্বামী দ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিলেন। সপ্তমদিনে জীবগোস্বামী জ্ঞান ও কর্মযোগের উপর ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলেন। রূপচন্দ্র এবার সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া জীবের শিষ্য স্বীকারপূর্বক ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তোষিণী টীকার সাহায্যে ভাগবত পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি লঘু ও বৃহৎ ভাগবতামৃত পাঠ করিলেন। তৎপর বিদগ্ধ-মাধব, ললিত-মাধব, উজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি পুস্তক তিনি ভক্তির আলোকে পাঠ করিয়া কৃতবিশ্ত হইলেন। এবার স্পর্ধিত পণ্ডিতের সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হইল। তিনি এই সমস্ত বিচার ও তর্কযুদ্ধ অসার মনে করিতে লাগিলেন। রূপচন্দ্রের উপাধি এবার হইল “রূপ-নারায়ণ,” আমরা স্থানান্তরে ইহার কথা পুনরায় উত্থাপন করিব। * এই যে দ্বিধিজয়ী মহাবীরদের মত দ্বিধিজয়ী পণ্ডিতগণ দেশ বিদেশে গিয়া জয়পত্র সংগ্রহ করিতেন ইহা মধ্যযুগের বিশেষত্ব; সম্ভবতঃ ইহা পালযুগের জের, এমন কি বোধ হয় এই রীতি পুরাকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিয়াছিল। সভাস্থলে কূটতর্ক দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে কিরূপে জয়-করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে চরক নানা উপদেশ দিয়াছেন—এইরূপ বিতর্ক হইতেই বোধ হয় ছাত্রশাস্ত্র উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। এই সূচিরাগত রীতি এতদিন পর্য্যন্ত এদেশে প্রচলিত ছিল, সম্ভবতঃ পালদের সময়েই উহা প্রসার লাভ করিয়াছিল। রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই জয়াকাজ্জ্বল ও যুগ্মস্ববৃত্তির অসারতা প্রমাণ করিবার পরে পণ্ডিতগণের ‘যুদ্ধং দেহি’ রব ধামিয়া গেল। মহাপ্রভু নানাস্থানে “আমি মূর্খ ব্রাহ্মণ, তর্ক করিতে জানি না” ইত্যাদি বলিয়া অশেষভাবে যে বিনয় দেখাইতেন, সেই বিনয় শেষে পণ্ডিতগণের চরিত্রের ভূষণ হইল। তারপর শ্রদ্ধা ও অজ্ঞাত ক্রিয়া উপলক্ষে সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে তর্ক ও আলোচনা হইত, তাহা বিজ্ঞার গৌরব ও উন্নতি-সাধনের জন্ত,—তাঁহার মূলে মধ্যযুগের প্রতিষ্ঠার লোভ ছিল না। এই যশোলিপ্সার হ্রাস পাইলেও পাণ্ডিত্য অর্জনের চেষ্টা বঙ্গদেশে কখনও শিথিল হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও মেদিনীপুরবাসী মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মার অসীম শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া কেরী, মার্সম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতি সংস্কৃতবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিস্মিত হইয়া কেহ তাঁহাকে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের অগ্রতম, কেহবা তাঁহাকে জনসনের ছায় অগাধ বিজ্ঞার অর্ণব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপরে আধুনিক সময়েও রামমোহন, বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালীগণ দেশবিদেশে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালী এখনও জগতের সুখী সমাজে প্রথম শ্রেণীতেই আসন স্থাপন করিয়া আছেন। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ জগতের সর্বত্র পূজা পাইতেছেন এবং

রামকৃষ্ণ বে সিংহাসনে আরুঢ় তাহার কাছ বৈসিয়া বসিতে পারে এমন লোক জগতে ছিল না। যে সকল গুণী ও পণ্ডিতের নাম করিলাম তাহা প্রকৃত বিদ্বানদিগের তুলনার মুষ্টিমেয়। প্রকৃত পক্ষে কত যে অসাধারণ গুণী ও জ্ঞানী এদেশে উর্দ্ধতম চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন বঙ্গলক্ষী তাঁহাদের নাম স্মরণীয় করিয়া রাখেন নাই। কোনও অজ্ঞাত মহামণির ছায় তাঁহারা বিশ্বস্তির খনিতে লুক্কায়িত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মণ্য তেজস্বিতা ও চরিত্রবল

এই সকল জ্ঞানীর সংসারের প্রতি উপেক্ষা ও তেজস্বিতা আমাদের বিশ্বয় উৎপাদন করে। অর্জুজগদধিপ বাহার ক্রভঙ্গিতে কাঁপিতেন, সেই চাণক্য গোময়লিপ্ত একটা খড়োঘরে বাস করিতেন। তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্যের গৃহের চূড় অত্রংলেহী দর্পে উর্দ্ধে উঠিয়া স্থপতি শিল্পের মহিমা প্রচার করিত, কিন্তু সেই বিশ্বপূজ্য পণ্ডিতের খড়ের চালের উপর সঞ্চারশীল অলাবুলতা কুটারের নগ্নতা কথঞ্চিৎ নিবারণ করিত। এই বিষয় নিঃস্পৃহতা ভারতীয় শ্রেষ্ঠ মনোবিগলের বিশেষত্ব। লক্ষণসেনের রাজসভায় মাধবী নামী বণিক-বধু আসিয়া নালিশ করিলেন “রাজশালক কুমার দত্ত তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে।” উমাপতি ধর প্রভৃতি

বিচারকগণের নিকট এই অভিযোগ। স্বয়ং লক্ষণসেন সেই

কুমার দত্ত ও মাধবী।

অভিযোগ শুনিলেন। এই সময় আলুলারিতকুন্তলে রাজমহিষী

স্বয়ং সভায় উপস্থিত হইলেন এবং তীব্রস্বরে বলিলেন—“এখানে এমন কোন্ মহারাজ আছেন যিনি এই অভিযোগের বিচার করিবেন? একটা নির্জজ্ঞা দুষ্টা স্ত্রীলোকের অভিযোগে আমার লাতাকে দণ্ড দিবে এমন কাহার সাধ্য?” রাজার ক্ষুব্ধ অধর ও রক্তচক্ষু দর্শনে মহারাজা নির্জাক, ভয়ে সভাসদগণের মুখ শুকাইয়া গেল। স্বয়ং লক্ষণসেনও ভয়ে মৌনাবলম্বন করিলেন। খটিকার পূর্বকণে নিরুপ্প প্রকৃতির ছায় ভয়-বিসৃতা অত্যাচারিতা মাধবীর কণ্ঠে অভিযোগের বাণী শুক হইয়া গেল।

সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন আচার্য্য গোবর্দ্ধন। ইনিও চাণক্যের মতই বিষয়-নিঃস্পৃহ, অধচ লক্ষণ-সাম্রাজ্যের পরিচালক, অশ্রুতম কাণ্ডারী। পরিধানে কোপীন, হস্তে

গোবর্দ্ধনাচার্য্য।

কমণ্ডলু। তিনি রাজার (বল্লভা) স্পর্ধা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন,

খস্তাহস্তে করিয়া রাজাকে মারিতে অগ্রসর হইলেন এবং রাজাকে

বলিলেন “কি আশ্চর্য্য! এই স্ত্রীলোকের, বিচারগৃহের অবমাননা করিতে আসিয়াছে। আমি

দেখিতেছি লক্ষণসেন, তোমার রাজত্ব শেষ হইয়া আসিতেছে। তুমি সেই সিংহাসনে বসিয়াছ যে সিংহাসনে বসিয়া রাজা রামপাল একদা পরদ্রো-ধৰ্ম্মপাশে তাঁহার পুত্রকে শুলে দিয়াছিলেন। এখনও লোকে তাঁহার স্মৃতিবিচারের প্রশংসা করিয়া থাকে। তুমি এই সিংহাসনের অযোগ্য।”

বৃদ্ধের চক্ষু সজল হইল, তিনি দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া সেই সভা হইতে নিজ্জাস্ত হইতে উদ্ধত হইলেন, লক্ষণসেন সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক গোবর্দ্ধনাচাৰ্য্যের পা ধরিয়া ফিরাইয়া আনিলেন এবং স্বয়ং খড়া হস্তে কুমারদত্তকে কাটিতে উদ্ধত হইলেন।

এই উপাখ্যানটি “শেক শুভোদয়া” নামক পুস্তকে লিখিত আছে। ভিন্ন সূত্রে হুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় এই কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উপরন্তু লিখিয়াছেন “রামপালের এই পুত্রের নাম যক্ষপাল।” লামা তারানাথ রামপালের যক্ষপাল নামক এক পুত্রের কথা লিখিয়াছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে রামপাল তাঁহার মাতুল মধন (মহন) দেবের মৃত্যুতে শোকার্ত হইয়া নদীজলে প্রাণত্যাগ করেন। সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন পুত্রকে শুলে দিয়া সেই শোকে রামপাল নদীতে ডুবিয়া মরেন। কোন্ কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য কতটা তাহা ভবিষ্যতে নির্ণীত হইবে, কিন্তু গোবর্দ্ধনের মত তেজস্বী ব্রাহ্মণের যে বঙ্গদেশে কোন কালেই অভাব হয় নাই, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা বাইতে পারে।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে কৃষ্ণিবাস কবি গোড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হইয়া স্বরচিত পঞ্চশ্লোক আবৃত্তি করিয়া রাজাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া-

কবি কৃষ্ণিবাস।
ছিলেন। কৃষ্ণিবাসের মুখে বিচিত্র ছন্দোময়ী কবিতাগুলি রস ও

ভাবপ্রাচুর্য্যে শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছিল। পাত্রমিত্রগণ কৃষ্ণিবাসকে ইঙ্গিতে জানাইলেন “তুমি যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে—কারণ স্বয়ং গোড়েশ্বর তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন।”

কৃষ্ণিবাস সগর্বে বলিলেন—“আমার গুণপনা রাজসভায় দেখাইতে আসিয়াছি। আমি কাহারও কাছে কিছুমাত্র বাজ্ঞা করি না।” “কারো কিছু নাহি লই গৌরব মাত্র সার।” গোড়েশ্বর চমৎকৃত হইয়া গেলেন। কাহার এতটা স্পর্ধা যে মুখের উপরে তাঁহার দান গ্রহণ করিতে এভাবে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ্য গৌরবের মর্যাদা রক্ষা করিলেন এবং কেদারখাঁএর দ্বারা কবির মন্তকে চন্দনের ছড়া দিয়া তাঁহাকে বাস্মীকির রামায়ণের বঙ্গানুবাদ করিতে আদেশ দিলেন। কৃষ্ণিবাস স্বয়ং তাঁহার আত্মবিবরণে এই কথাগুলি লিখিয়াছেন।

সভায় ধস্তা ধস্ত রব পড়িয়া গেল। যখন তিনি রাজ-পথে বাহির হইলেন, তখন তাঁহার সর্দার চন্দনচর্চিত ও কষ্টদেশে রাজপ্রসাদের চিহ্নরূপ পুষ্পমালা। তিনি বিপুল রাজ-উপচৌকন ও অর্থাদি অগ্রাহ করিয়া জ্ঞানের মর্যাদা রাখিয়াছেন, এজন্ত নগরবাসীরা সম্মুখে “হুলিয়া পড়িতকে” ধস্তা ধস্ত করিতে লাগিলেন।

আমরা ক্রমাগত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের নিষ্ঠা ও তেজস্বিতার পরিচয় পাইয়া

আসিয়াছি। পঞ্চদশ শতাব্দীর আর একজন ব্রাহ্মণের কথা বলিব। ময়মনসিংহ জেলার বিপ্রপুর (আধুনিক বিপ্রবর্গ) গ্রামে গর্গনামে এক পণ্ডিত ছিলেন, ইনি ত্রীচৈতন্তের সমকালবর্তী। সেই গ্রামের গুণরাজ নামক এক ব্রাহ্মণের একটি পুত্র হয়, যখন শিশুটি অতি অপোগণ্ড তখন তাহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। তখন লোকের নানারূপ কুসংস্কার ছিল। পিতৃমাতৃহীন শিশু বাড়ীর আদিনায় পড়িয়া কাদিতে লাগিল। ‘অপয়া’ ভাবিয়া তাহাকে কেহ গ্রহণ করে নাই। অর্দ্ধদিবস সেই জ্ঞানহীন শিশু হাত পা আছড়াইয়া কাদিতেছিল—না খাইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল—কেহ তাহাকে কোলে তুলিয়া লয় নাই। যে জন্মিয়া মা বাপ খাইয়াছে, তাহাকে কে বাড়ীতে স্থান দিবে? মুরারি নামক চণ্ডাল এই সকল মেয়েলি শাস্ত্র জানিত না। সে ছিল সকলের ঘৃণ্য, স্তূতরাং হুঃখার্তের জন্ত তাহার মমতা হারায় নাই—সে আসিয়া শিশুটিকে কোলে তুলিয়া লইল। তাহার সম্মান ছিল না, স্তূতরাং তৎপত্নী কোশল্যা সম্মান পাইল এবং পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশুও সেই গৃহে পিতামাতার যত্ন পাইল। পাঁচ বৎসর সেই শিশু চণ্ডাল পিতা ও চণ্ডাল মাতার যত্নে বর্দ্ধিত হইল। শিশুর নাম—কোশল্যা কঙ্ক রাখিয়াছিল। এই পাঁচ বৎসর পরে আবার বিপদ হইল। বসন্তরোগে মুরারি প্রাণত্যাগ করিল এবং তাহার পত্নীও শোকে ছয়ছাড়া হইয়া কয়েক মাসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। পঞ্চবর্ষ-বয়স্ক কঙ্ক পালক পিতামাতার শ্রমানে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাদিতে লাগিল। এবার তাহার ‘অপয়া’ নাম আরও জাহির হইয়া গিয়াছে, কোন চণ্ডালও আর তাহাকে রূপা করিল না। চণ্ডালাগ্রে পুষ্ট বালকের ব্রাহ্মণত্ব কেহ স্বীকার করিল না। একূলে ও ওকূলে তাহার কেহই ছিল না, স্তূতরাং জাত্যভিমান ও কুসংস্কার বালকটিকে একেবারে নিরাশ্রয় ও নিরালম্ব করিয়া ফেলিল। বালক কাদিতে কাদিতে শ্রমানের উপর ঘুমাইয়া পড়িল এবং পুনরায় জাগিয়া কাদিতে লাগিল। চিতা-ভস্ম ও চোথের জল একত্র হওয়াতে সেই সুন্দর শিশুটির মুখখানি ভয়লিপ্ত বালক-শিবের মুখের মত দেখা যাইতেছিল।

গর্গ ছিলেন সর্কশাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত; সমস্ত ময়মনসিংহ অঞ্চলে তখন তাহার মত চরিত্রবান্ ও বিদ্বান্ কেহ ছিলেন না; তিনি ব্রাহ্মণ-সমাজের অবিসংবাদিত

নেতা ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বৃদ্ধ ঋষিকর ব্রাহ্মণ নদীতে স্নান করিয়া সেই শ্রমানের নিকট দিয়া নামাবলী গায়ে যাইতেছিলেন।

হঠাৎ তাহার কর্ণে বালকের ক্রন্দনধ্বনি প্রবেশ করিল এবং তিনি ধূলিলুপ্তিত বালককে দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি তাহার নামাবলী দিয়া তাহার সর্কাদের ধূলিবাণি মুছিয়া পরমগ্রেহে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন, তাহার সাক্ষী পত্নী সাবিত্রীদেবীর পুত্র ছিল না, লীলা নামক একটি মাত্র কন্তা ছিল। সাবিত্রীদেবীর মেহে কঙ্ক ব্রাহ্মণগৃহে লালিত পালিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ-সমাজ ব্যাপারটা বড় প্রীতির চক্ষে দেখিতেছিলেন না। কিন্তু জ্ঞানের পূর্ণাবতার তেজস্বী গর্গের বিরুদ্ধে কিছু করা তাহাদের সাহসে কুলাইল না।

গর্গের স্বরভী নারী একটা গাভী ছিল, কঙ্ক দুপুরবেলা নিকটবর্তী গোচারণের মাঠে সেই গাভী চরাইত, প্রাতে ও বৈকালে লীলার সঙ্গে খেলা করিত এবং বাঁশী বাজাইত। তাহার বাঁশী যখন বাজিত, তখন সমস্ত পল্লীর লোক তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইত। ক্রমে তাহার বয়স ১০ হইল, গর্গ দেখিলেন কঙ্ক অত্যন্ত মেধাবী। তিনি যত্নপূর্ব্বক তাহাকে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত শিখাইলেন, মুখে মুখে কঙ্ক প্রচলিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলির সমস্ত শ্লোক শিখিয়া ফেলিল, কঙ্কের প্রতিভা সকলেই স্বীকার করিল। সে ইহার মধ্যে “মলয়ার বারমাসী” নামক যে বাঙ্গলা কাব্য রচনা করিল, তাহাতে তাহার নিজের জীবন ও মর্শ্বের দুঃখের স্মৃতি এমনই করুণভাবে বাজিয়া উঠিল যে সমস্ত মহম্মদসিংহ জেলার লোক বোড়শবর্ষীয় বালকের গীতিকাব্যটি মুখস্ত করিয়া ফেলিল। আরও দুই এক বৎসর গেল, কঙ্ক “সত্যপীরের গান” নামক আর একখানি কাব্য রচনা করিল, ইহাই বাঙ্গলা ভাষায় সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রাচীন বিজ্ঞানন্দর। কিন্তু বিজ্ঞানন্দর বলিতে বাঙ্গালীর মনে যে ভাবটির উদয় হয় ইহাতে তাহার কিছুই নাই। ইহাতে কবিত্বের পরিচয় যথেষ্ট আছে, কিন্তু কুত্ৰাপি শীলতার ব্যতায় হয় নাই। সমস্ত জেলায় “কবিকঙ্ক” এখন প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। এই সময়ে গর্গ তাহার গৃহে এক মহতী সভা আহ্বান করিলেন। সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তথায় উপনীত হইলেন। গর্গ প্রস্তাব করিলেন “কঙ্ককে সমাজে নেওয়া হউক,”—একটা বজ্র হঠাৎ পড়িলে লোক বেক্রপ বিষয়-বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে, এই প্রস্তাবে সভাগৃহে সেইরূপ একটা ভীতি ও বিষয়ের ভাব দেখা গেল।

‘নন্দু’ প্রভৃতি গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা বলিলেন—“যে ছেলে পাঁচবৎসর চণ্ডালের ভাত খাইয়া চণ্ডালের সংসর্গে যাহুষ হইয়াছে, সেই দুর্ভাগ্য বালকের কি ব্রাহ্মণত্বের কোন দাবী আছে? তাহা হইলে যে মুসলমান হইয়া গোমাংস ভক্ষণপূর্ব্বক অস্পৃশ্য হইয়া গিয়াছে তাহাকেও তো আপনারা জাতে তুলিতে পারেন।” সমস্ত সভায় একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। অধিকাংশ লোকের বিরুদ্ধ মত। গর্গ সেখানে দাঁড়াইয়া বালকের ইতিহাস বর্ণনা করিলেন। সে যখন অবোধ শিশু তখন সে চণ্ডালার খাইয়াছে, সে ইচ্ছাকৃত কোন পাপ করে নাই। তিনি তাহাদিগের মমতা ও সহানুভূতির দাবী করিলেন, তাহাদের করুণা প্রার্থনা করিতে বাইয়া তাহার কণ্ঠ অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। কিন্তু সেই নির্মম কুসংস্কারের অভেদ বাহু ভাঙিতে অসমর্থ হইয়া তিনি স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া ক্রমাগত ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করিতে লাগিলেন, তখন ব্রাহ্মণেরা কেহই তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাহাদের শিখার বন্ধনী খুলিয়া গেল, তাহারা মুক্তকণ্ঠ হইলেন, সারাদিন বাদপ্রতিবাদ চলিতে লাগিল, কিন্তু পিতামহ ভীষ্মের জায় এই বুদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহাদের তর্কের শরজাল ভেদ করিয়া নিজে যে মত সূচু করিলেন প্রতিপক্ষের মত তাহার সেই অগাধ পাণ্ডিত্যের মুখে তুণের জায় ভাসিয়া গেল।

কেহ কেহ তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তদীয় যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া তাহার পক্ষে মত দিলেন কিন্তু অসাক্ষাতে পুনরায় জটলা চলিল। যড়যন্ত্রের ফলে সরলহৃদয় ব্রাহ্মণ কিন্তুবৎ হইয়া পড়িলেন। তিনি এই সময় পাগলের মত যে সকল ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং

সত্যাপন কি স্বয়ং নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া বাকুলভাবে তিন রাত্র তিন দিন মন্দিরস্থার অর্গলবদ্ধ করিয়া যে ভাবে দেবতার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া ধরা দিয়া পড়িয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত কাহিনী পড়িলে মনে হয়, ইনি সেই সত্যযুগের ঋষি ; এদিকে কল্প নানা ভাবে বিপদগ্রস্ত হইয়া অনাহারে শুষ্কমুখে একটা বাহিরের ঘরের মেজেতে পড়িয়াছিলেন। তন্ত্রার আবেশে তিনি দেখিলেন—তিনি নরকাগ্নির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, যমদূতেরা তাঁহাকে নিশ্চয়মভাবে প্রহার করিতেছে তখন এক রক্তগোর পুরুষের তাঁহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন “চল আমার সঙ্গে।” সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ গৌরাজ। কল্প প্রভাত হইবার পূর্বেই সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া নবদীপে চৈতন্তদেবকে দেখিতে ছুটিয়া চলিলেন। পথে নৌকাডুবি হওয়াতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। ইহা একটি গল্পের কথা নহে, কালের জীবনী চারিজন কবি লিখিয়াছেন এবং স্বয়ং কল্পে তাঁহার বিজ্ঞানসন্দের পূর্বভাগে অতি করুণভাবে স্বীয় জীবনের ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গর্গের মত ব্রাহ্মণ সেকালে অনেক ছিলেন, নতুবা মুসলমানসংস্পর্শযুক্ত ব্রাহ্মণগণ সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়া কুলীন হইতে পারিতেন না।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র মহারাজ শিবচন্দ্র তাঁহার রাজ্যের সঙ্গে কোন স্থানে বাইতেছিলেন। যানের সময় বহুসমারোহসহকারে রাজকীয় শিবির হইতে রাজ্যী নিকটবর্তী এক পুষ্করিণীতে অবতরণ করেন,—সেই পুষ্করের অপর ঘাটে জনৈক অতি সামান্তবেশ পরিহিতা সন্ন্যাস ব্রাহ্মণ মহিলা দান করিতেছিলেন, তাঁহার হাতে লাল হুতা ছাড়া অঙ্গে কোন আভরণ ছিল না। এই রমণীর অঙ্গ সঞ্চালনে কয়েক বিন্দু জল বিক্ষিপ্ত হইয়া রাজ্যীর দেহ স্পর্শ করাত্তে রাজ্যী ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কে ?” উত্তরে সেই মহিলা বলিলেন, “নবদীপ অঞ্চলের যিনি সর্বপ্রধান ব্যক্তি আমি তাঁহার ধর্মপত্নী।” রাজ্যী মনে করিলেন—রমণীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে এবং নিজেকে কতকটা অপমানিতা মনে করিয়া রাজ্যীর নিকট অভিযোগ করিলেন। এই রাজ্যে মহারাজ শিবচন্দ্রের উপরে কে প্রধান ব্যক্তি থাকিতে পারেন ? রাজা অহুসঙ্কান করিয়া জানিতে পারিলেন—ইনি রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের পত্নী। তিনি রাজ্যীকে বলিলেন—“এক হিসাবে রমণীর কথা সত্যই বটে, কারণ রামনাথের জায় বঙ্গদেশে এতবড় নৈয়ায়িক আর দ্বিতীয় নাই।” রাজ্যীর অভিমান আরও অলিয়া উঠিল তিনি রাজ্যীকে বলিলেন—“এই পণ্ডিতকে তোমার বেতন-ভোগী সভাপণ্ডিত নিযুক্ত কর, তবেই ঐ প্রাণলোকটার দেমাক কমিয়া আসিবে।” রাজা বলিলেন, রামনাথ কিছুতেই প্রতিগ্রহ করিবেন না। তথাপি রাজ্যীর একান্ত অহুরোধে তাঁহাকে রামনাথের কুটিরে বাইতে হইল, একথা-সেকথা পরে, রাজা বলিলেন, “আপনার কোন অহুপপত্তি আছে ?” অভাব কথাটা শোভন নহে, এই জন্ত অহুপপত্তি কথা দ্বারা তিনি প্রশ্নটির অবতারণা করিলেন। তর্কসিদ্ধান্ত মনে করিলেন রাজা জায়ের অহুপপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন—এবং সেই ভাবে উত্তর দিতে লাগিলেন। বাধ্য হইয়া রাজ্যীকে বলিতে হইল, তিনি জায়-বাটত প্রশ্ন করেন নাই, তাঁহার সাংসারিক কোন অভাব আছে কি না—তাহাই জানিতে চাহিয়াছেন। রামনাথ বলিলেন, “এই দেখুন তিস্তিডী বৃক্ষ, ইহার পাতার ঝোল

এবং যে সামান্য জমি আছে, তাহার উৎপন্ন যাচ্ছেই আমাদের অভাব সম্পূর্ণরূপে পূরণ হইয়া যায়—এই সংসারের আর কি অভাব থাকিতে পারে ?” সভাপতিত্ব হওয়ার কথাটাও রাজা ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করিয়া যে ভাবে ভৎসিত হইয়াছিলেন, তাহাতে রাজাধিরাজ শিবচন্দ্রের উচ্চ শির এই বিষয়-বিতৃষ্ণ বিলাসলেশশূন্য ব্রাহ্মণ তপস্বীর নিকট একেবারে হেট হইয়া গিয়াছিল।

বাছল্য ভয়ে আর এসকল দৃষ্টান্ত বাড়াইব না। সজ্জারামগুলি পড়িয়া ভাদ্রিয়া বাউক, ভিক্ষু ও শ্রমণগণ এদেশ হইতে বিতাড়িত হউন। কিন্তু যে উচ্চ চিন্তা ও স্বাধীন তেজ মৌর্যাদিকার হইতে পাল, সেন এবং মুসলমান রাজত্বে এমন কি নিতান্ত আধুনিক সময় পর্য্যন্ত শ্রেণী-নির্বিশেষে বাঙ্গালীজাতি দেখাইয়া আসিয়াছেন, তাহা একই কল্পতরু হইতে উৎপন্ন। সে নেংড়া আমের বীজ নষ্ট হয় নাই। বৈষ্ণব দমাজের একটা ইতিহাস আছে তাহাতে দয়া, ক্ষেম, ত্যাগ, জ্ঞান, প্রভৃতি গুণের আদর্শ অনেক পাওয়া যায় তাহা শুধু ব্রাহ্মণ সমাজে আবদ্ধ নহে, সমস্ত বাঙ্গালী জাতি সেই গুণগরিমার উত্তরাধিকারী। বাহিরের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে, সিংহাসন পত্রাসনে পরিণত, সিংহদ্বার কুটিরের কাঁপে দাঁড়াইয়াছে কিন্তু এখনও সেই আধ্যাত্মিক হোমাগ্নি অলিতেছে। আমরা যাগধ শৌর্য-বীর্ঘ্য-জ্ঞান যতটা আয়ত্ত করিয়াছি অল্প কোন দেশ তাহা পারে নাই। পূর্বযুগের সঙ্গে আধুনিক কালের সেই সম্বন্ধ আবিষ্কার করাই এখন বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের সর্বপ্রধান কার্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গুপ্তপাল যুগের জের—কথাসাহিত্য

এইবার আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যের এক বিভাগে গুপ্ত ও পাল-যুগের সুস্পষ্ট ছাপ দেখাইতে চেষ্টা করিব। সেনাদের সঙ্গে নব ব্রাহ্মণ্য বাঙ্গলায় প্রবেশ করিয়াছে—ইহার

নব-ব্রাহ্মণ্য।

সঙ্গে মূলতঃ আমাদের সম্বন্ধ খুব বেশী নহে। ইহাতে শুধু ব্রাহ্মণকে বাড়াইবার চেষ্টা। ব্রাহ্মণসেবা সেবাবৃত্তির চরম, ভৃগুর লাধি খাইয়া বিষ্ণু ভৃগুর পদ প্রক্ষালন করিয়াছিলেন—ইহাই সকল সেবার সেরা সেবা। ব্রাহ্মণকে ভোজ্য দিলে তাহার ফল অনন্তপুরুষ পর্য্যন্ত ভোগ করিবে। ব্রাহ্মণকে সম্বলিত করিতে পারিলে অক্ষয়পুণ্য। ব্রাহ্মণকে রাগাইলে সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁহার শাপের বোঁড়ায় উড়িয়া বিলীন হইয়া যাইবে,—ইত্যাদি। এসকল কথা বাসের মহাভারতেও আছে। অষ্টমবর্ষে গৌরীদান, স্বয়ংবরপ্রণা ঘণার্হ, সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ, কোন্ তিথিতে কলা, মূলা, বার্তাকু, অলাবু

থাইতে হইবে, মাধে মূল্য থাইলে ব্রাহ্মবধের পাপ—ইত্যাদি বিধি বিধান লইয়া নব ব্রাহ্মণ্য কনোজ হইতে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইল। সেনরাজ্যের অধ্যায়ে আমরা এই সকল বিধি-ব্যবহার কারণ ও দেশের উপর তাহার ফল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে নব-ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব খুব বেশী, এখানে তাহার উল্লেখের স্থান নাই। সেন রাজগণের প্রভাব যেখানে যেখানে গিয়াছে, সেখানে সেখানে নব-ব্রাহ্মণ্য তাহার ইম্পাত-কঠোর নিয়মাবলী লইয়া এক একটা অচলায়তনের সৃষ্টি করিয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়ের সমস্ত ইতিহাস মুছিয়া ফেলিয়া এই নব-ব্রাহ্মণ্য ব্রাহ্মণকে নূতন ভাবে গড়িয়াছে। তাহার হস্তে শিবের ত্রিশূল, বিষ্ণুর চক্র, বিষ্ণুকর্ম্মার পরশু, ব্রহ্মার অক্ষমালা—এ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দিয়া তাহাকে ভূদেবরূপে সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এই দাসত্বের নিগড় বাঙ্গালী জাতি বেশী দিন সহ্য করে নাই। বাঙ্গালীর বিধাতা চির-বিদ্রোহীর শোণিতের ত্রিলক তাহার কপালে লিখিয়া দিয়াছেন। তাহার ললাটের লিপি বিদ্রোহ, পরাধীনতা তাহার প্রকৃতিগত নহে। এই ব্রাহ্মণ্য তাহার এক বিদ্রোহী সন্তানের হাতে শীঘ্রই লাক্ষিত হইয়াছিল। চৈতন্যদেব এবং তদীয় পরিকরেরা দেখাইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণগণের নিগড় যত শক্ত তাহা ভাঙ্গিতে তাঁহাদিগের শক্তি তদপেক্ষা অনেক বড়। কিন্তু সে সকল কথা পরে লিখিব।

বাঙ্গলাদেশে যেখানে যেখানে সেন রাজগণ গিয়াছেন, সেখানে সেখানে নব-ব্রাহ্মণ্যের স্বতীকার বাইয়া সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা এবং অবস্থার উলটু পালট করিয়াছেন। যেখানে

সেনরাজগণ নব-ব্রাহ্মণ্যের
পৃষ্ঠপোষক।

দেখিব বালাবিবাহ প্রশংসিত নহে, স্বয়ংবর বা 'ইচ্ছাবর' প্রতিষ্ঠিত, সমুদ্রবাতায় নিষেধ নাই, বঙ্গালের কোলীজ অবীকৃত, জাতিভেদ খুব কঠোর ভাবে সমাজকে বাঁধিয়া ফেলে নাই—যেখানে বন্ধ্যো-পাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়-উপাধি ব্রাহ্মণ্যে নাই, চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ সমাজের শ্রেষ্ঠ এবং ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্রের প্রভাব নাই, কায়স্থের মধ্যে দত্তই প্রধান কুলীন, যেখানে দেখিব অমূল্য ও প্রতিলোম বিবাহ-প্রথা সর্বজাতির মধ্যে বিদ্যমান, সেই সেই স্থানে বুঝিব নব-ব্রাহ্মণ্য প্রবেশপথ পায় নাই। বঙ্গের সীমান্তে কতকগুলি স্থান আছে যেখানে সেনরাজগণ অধিকার বিস্তারের সুবিধা করিতে পারেন নাই। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্টের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা বিশেষ ভাবে এখানে ময়মনসিংহ জেলার কথাই বলিব। এই জেলার মধ্যে ইহার পূর্বাংশের প্রতিই আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখিব।

এককালে সমস্ত প্রাগজ্যোতিষপুর এবং ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান গুপ্তাধিকারের অন্তর্গত ছিল। সেই সময়ে গুপ্তপ্রভাব এই স্থানে খুব বেশী হইয়াছিল। তাহার ফলে পার্শ্বত্যা জাতিগণের মধ্যে অনেকে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং রাজবংশীয়, কোচ, হাজাং, চাকমা প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা আর্ঘ্য সমাজের অন্তর্গত হইয়াছিল। গুপ্তবংশের পতনের পর পাল-রাজত্বের সময় ময়মনসিংহ জেলা প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ্যের অধীন হয়, উক্ত রাজ্য পালগণের চক্রবর্ত্তি স্বীকার করিত। কিন্তু পাল-রাজত্বের শেষভাগে ঐ স্বীকার শুধু নামে মাত্র পর্য্যবসিত হয় এবং সেনরাজগণের সময় প্রাগজ্যোতিষপুর

একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। উত্তরকালে প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজারা অত্যন্ত হীনবল ও শ্রীহীন হইয়া পড়েন এবং ময়মনসিংহ তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়। বিশেষ পূর্বময়মনসিংহে

পূর্ব-ময়মনসিংহ কোন উক্ত পার্কতাদলের নেতাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে স্বীয় শক্তি অব্যাহত রাখিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেন রাজগণ এই সকল নেতাদের বশতা পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা ছিলেন;

শুধু যদি বঙ্গের এক দূর সীমান্তে ক্ষুদ্র একটা রাজ্য তাঁহাদের গণ্ডীর বহির্ভূত থাকিত, তবে বিশেষ ক্ষতির কারণ ছিল না। কিন্তু অশুবিধা এই দাঁড়াইল যে বাহারা সেনদের বিদ্রোহী ছিলেন, সেইরূপ আঢ্য ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা ময়মনসিংহের পার্কতাপ্রদেশে আসিয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় বড়বড় করিবার সুবিধা পাইতেন। সেনরাজগণ কয়েকবার এই রাজ্য অধিকার করিবার প্রচেষ্টা পাইয়াছিলেন। শরৎকালে সম্রাট-সৈন্য অনায়াসে এই ক্ষুদ্র দলপতিদের সৈন্য জয় করিয়া সেনরাজ্যস্থিত পতাকা উড়াইয়া ধ্বজা-দণ্ড প্রোথিত করিত। বর্ষাগমে সেই দণ্ডকে উত্তোলন করিয়া কে কোথায় ফেলিয়া দিত, তাহার ঠিকানা নাই। তখন কংশ, ধনু, ভৈরব প্রভৃতি বিশাল-তোয়া নদ-নদী প্রলয় বিবাল বাজাইয়া সেই পার্কতাপ্রদেশে বিচরণ করিত। পথ-ঘাট ছরদিগম্বা হইত। সেই দুর্গমপথ বিচরণে অভ্যস্ত কাণ্ট-মার্জারের মত পার্কত্যা অধিবাসিগণ গুপ্ত পথ দিয়া আসিয়া সম্রাট-সৈন্য ধ্বংস করিয়া ফেলিত এবং জন্মভূমির এমন নিগূঢ় অঙ্গে লুকাইয়া নিরাপদ হইত যে কাহার সাধ্য তাহাদিগকে সেখানে অনুসরণ করিতে পারে? কয়েকবার এইভাবে বহু অর্থ ও লোকক্ষয় সহ করিয়া সেনরাজগণ ময়মনসিংহের পূর্বাংশ জয়ের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কেন্দারনাথ মজুমদার প্রণীত ময়মনসিংহের ইতিহাসে এই সকল কথা বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। সেনরাজগণ এতদেশ অধিকারভুক্ত করিতে পারেন নাই। তাহার ফল এই হইল যে বহুকাল পর্য্যন্ত নব-ব্রাহ্মণ্য এদেশে প্রচলিত হইতে পারে নাই। সেই সকল পার্কত্যা ও অপরাপর স্বাধীন শাসকগণের হাত হইতে এই স্থানগুলি সোজাশুজি মুসলমানগণের হস্তগত হয়। এই প্রদেশ মধ্যবর্তী সেনরাজগণ এবং ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের দ্বারা

চিহ্নিত হয় নাই। পূর্বে দুর্গাপুর অঞ্চলটা কোচবংশীয় 'গারো' নামক রাজার অধীন ছিল। ইহার রাজ্য এক সময়ে বহু বিস্তৃত ছিল।

১২৮০ খৃষ্টাব্দে সোমেশ্বর সিংহ নামক এক ব্রাহ্মণ-সেনাপতি পশ্চিম হইতে আসিয়া এই পাহাড়-বেষ্টিত দুর্গাপুরটি অধিকার করেন। সুতরাং সেনরাজগণের সঙ্গে এই রাজ্যের কোন সংশ্রব হয় নাই। সেরপুর বা দশকাহনীয়া অঞ্চলের শেষ রাজা ছিলেন রাজবংশী দিলীপ

সামন্ত। ইহার বাড়ীর চতুর্দিকের প্রশস্ত গড়ের এখনও কিছু কিছু চিহ্ন আছে—উহা এখন 'গড়জরিপা' নামে পরিচিত। 'জরিপা'

শব্দ 'দিলীপ' শব্দের অপভ্রংশ। ১৪২১ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ সাহার সেনাপতি মজলিস হুমায়ুন দিলীপ-সামন্তকে নিহত করিয়া এই রাজ্য আবিষ্কার করেন। সুতরাং এখানেও নব-ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব কিছুমাত্র হইতে পারে নাই। এইভাবে জঙ্গলবাড়ী রাজ্যটিও কোচ রাজা

হইতে মুসলমানগণের অধিকৃত হয়। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে দুই ভাই রাম ও লক্ষণ হাজরা রাজত্ব করিতেছিলেন। লক্ষণ হাজরা ছিলেন বড়, তিনিই রাজা ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ইশাখা মসনদ আলি ঐ মনে দ্বিপ্রহর রাত্রে

অত্যন্তভাবে লক্ষণ হাজরার রাজধানী আক্রমণ করেন। লক্ষণ হাজরা পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তদবধি জঙ্গলবাড়ীতে ইশাখার বংশধর 'দেওয়ানগণ' সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইভাবে মদনপুর, বোকাইনগর প্রভৃতি স্থান রাজবংশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণের হস্ত হইতে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর মুসলমানগণ অধিকার করেন। বৌদ্ধাধিকার হইতে এদেশে বহু কাহিনী ও উপকথা প্রচলিত ছিল, তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল 'ত্যাগ'। গুপ্ত ও পাল অধিকারেও এই আদর্শ শিথিল হয় নাই। জীবে দয়া ও ত্যাগের মহিমা এই সকল গল্প সাহিত্যের মূলমন্ত্র ছিল। জাতক উপাখ্যানের আশ্রয়ে এই ত্যাগের মহিমায় উজ্জল। নাগানন্দ নাটকে (খৃঃ প্রথম শতাব্দী) এই ত্যাগে অদ্বিতীয় কল্পনা সংমিশ্রিত হওয়াতে রাজপুত্র নাগানন্দের চরিত্র উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য যুগের সর্বপ্রধান কথা

কর্মগৌরবের যুগ।

ভক্তি ও প্রেম। কিন্তু বৌদ্ধযুগে ত্যাগ ও দয়া প্রধান ধর্ম ছিল। কর্মই তখন শ্রেষ্ঠ ছিল—ভক্তির বিশেষ কোন আভাস তৎকালের সাহিত্যে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধগণ কর্মফল মানিতেন, সুতরাং ত্যাগমিশ্রিত কর্মই তখন ধর্মের প্রধান অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। সে ছিল এদেশের এক অতুজ্জল যুগ তখন লোকের হৃদয় সাহস ও বিক্রম ছিল, কোন সুন্দরীকে পাইতে হইলে মহৎ ত্যাগ ও পুরুষকার দিয়া তাহার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইত। "None but the brave deserves the fair" কথাটার সে যুগে পূর্ণমাত্রায় সার্থকতা ছিল। রমণীদিগকে অশেষ সহিষ্ণুতা ও একনিষ্ঠ তপস্বী-দ্বারা মনোনীত পতির উপযুক্ত হইতে হইত। তখন বিখ্যাতী পুরুষেরা জাভা, হুমিত্রা, চীন, জাপান প্রভৃতি এসিয়ার সর্বদেশে যাতায়াত করিতেন। পুরুষগণের বীর্যবস্তুর ক্ষেত্র অবাধ ছিল।

এই সময়কার উপকথাগুলিতে সেই বিক্রম, পুরুষকার, নিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতার অপূর্ণ দৃষ্টান্ত আমরা বঙ্গসাহিত্যে আশাতীতরূপে পাইরাছি। আমাদের আশ্চর্যের বিষয় এই যে পূর্বযুগের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, যাহা কিছু চিত্তহারী ও অপূর্ণ তাহার অনেক সামগ্রী আমরা নিম্নশ্রেণীর নিকট হইতে পাইতেছি। যে সকল অদ্বিতীয় শিল্পী গল্পগুলির উদ্ভাবকের শিকার।

অজস্র চিত্র আঁকিয়াছিলেন এবং ইলোরা ও খজুরাহের অপূর্ণ স্থাপত্য ও কলাশিল্পের পরিচয় দিয়াছিলেন, যাহা এখন জগতের বিশ্বয় ও হিন্দুগৌরবের মুকুটমণি, সেই সকল শিল্পী কাহারো ছিলেন? তাহারো খুব সম্ভব নিম্নশ্রেণীর লোক, কারণ তাহাদের এই ব্যবসায়—সমাজের দুই ধাপ নিম্নে অবস্থিত ব্যক্তিদের বৃত্তি—বৈশ্রবৃত্তি। সেইরূপ এই সকল উপকথার মধ্যে যে ত্যাগ ও অপরাপর গুণের আদর্শ আছে তাহা বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু শাস্ত্রের সার কথা হইলেও এদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের নিকট হইতেই আমরা পাইতেছি। কিভাবে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এই সকল অদ্বিতীয় তত্ত্ব শিখিয়াছিল এবং যাহা

কিছু আধ্যাত্মিক জগতের অতি দ্রুত ও উচ্চাঙ্গের সমগ্রতা, তাহা ঋষিজনোচিত সারল্যের সহিত এমন সহজ করিয়া কি কৌশলে কে তাহাদিগকে বুঝাইতে শিখাইল, এই কূট প্রশ্নের উত্তর কোথায় পাইব? কিন্তু এই সকল উপাখ্যান রাজকন্তারা শুনিতেন, সর্বসাধারণে শুনিত, রাজারা রাজসভায় বসিয়া শুনিতেন, অন্তঃপুরচারিণীরা অবরোধে বসিয়া শুনিতেন। সুতরাং কথা-আবৃত্তিকারিণী নাপিতানী বা অল্প কোন নিয়ন্ত্রণের লোক হইলেও সেই কথার মূল্য তো আমরা কমানিতে পারি না। সাধারণ লোকেরা এই যে উচ্চাঙ্গের কথা-কৌশল, চরিত্র-বর্ণন ও শীলতামূলক অনবত্ত প্রেমকাহিনী বলিতে শিখিয়াছিল, তাহাতে দৃষ্ট হইবে উন্নত আধ্যাত্ম্যতা এদেশের আপামর সাধারণের মধ্যে কতটা প্রসার লাভ করিয়াছিল। *

নব ব্রাহ্মণ্য এই সকল গল্পের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। ইহাতে প্রেমের যে স্বাধীন হাওয়া আছে, তাহা ব্রাহ্মণেরা সহ্য করিতে পারিলেন না। ইহাতে বিবাহের পূর্বেই পূর্বরাগ আছে, তাহা তো একেবারে গোড়া সমাজের অসহ্য। কোন কোন ব্রাহ্মণগণ গল্প-সাহিত্যের প্রতিবাদী। সময়ে অভিভাবকের মত লজ্জন করিয়া নারিকা নিজের মনোনিয়নের প্রতি নির্ভর করিয়াছেন এবং প্রেমের একনিষ্ঠ তপস্বী বজায় রাখিয়াছেন, ব্রাহ্মণের ইহা চক্ষুঃশূল হইল। প্রত্যেক নারিকাই বয়স। গৌরীদানের ফল ইহার একটি গল্পও স্বীকার করে নাই। এইরূপ নানা কারণে ব্রাহ্মণেরা গল্পগুলির প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। কিন্তু গল্পগুলি যে বিমলানন্দ দান করিয়া সমাজকে নিত্য-শুভ ও পুলকিত রাখিয়াছিল, তাহার স্থান পূরণ করিবে কে? ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের অধিকৃত সমস্ত দেশ হইতে কথা-সাহিত্যের উচ্ছেদ সাধন করিলেন। কথা যে সকল লোকের উপজীবিকা ছিল, তাহারা ইহা ছাড়িয়া অল্প বৃত্তি অবলম্বন করিল। কেবল দূরদেশে, যেখানে নবব্রাহ্মণ্য ভাল করিয়া প্রবেশ করিবার পথ পায় নাই, সেইখানে সেইসকল গুলী ব্যক্তিত্ব এখনও পর্য্যন্তও তাহাদের ব্যবসায় কোন রকমে বজায় রাখিয়াছে। ব্রাহ্মণের নিষেধবাক্যে বঙ্গে শত শত কুঞ্জে কোকিল ও পাণ্ডিত্য কণ্ঠ হঠাৎ রোধ হইয়া গেল। কেবল কোন দূর পল্লীর নিভৃত কোণে বসিয়া সাঁঝের প্রদীপ

* এই সকল পল্লীগাথার অল্পশ্রু প্রশংসা যুরোপ হইতে আসিতেছে। সুবিখ্যাত ফরাসী চিত্রকরী শ্রীমতী হেগ লিখিয়াছেন, "In reading these ballads one is reminded of other eternal classical master-pieces. They deserve to be on the same shelf as these,—among the books that never grow old and in which each generation discovers new reasons to love them. How much I wish that circumstances might allow me to translate them and publish them in France. শ্রীমতী হেগ "আধা-বঁদুর" কবিকে তাঁহাদের finest and oldest ফরাসী উপজ্ঞানের (La Princesse de Cleines) লেখিকা Madame de La Fayette হইতে বড় মনে করিয়াছেন। তিনি "রাজা রঘুর" গীতিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—কবি অল্প কয়েক ছন্দে মৃত্যুর পরের যে ছবি আঁকিয়াছেন, মেটেরলিক তাঁহার অনেক নাট্যকার সেইরূপ ছবি আঁকিতে যাইয়া বিফল হইয়াছেন—"This ballad has in a few lines expressed much more and what a picture!" এই ভাবের প্রশংসা বিলাতের আরও অনেক গুলী সমালোচক করিয়াছেন।

আলাইয়া এখনও হই একজন শুদ্ধকেশী বৃদ্ধা নিশ্চিত মনে নিজের স্নেহের ছালাদিগের কৌতূহল পূরণ করিবার জন্য দূরগত বংশীরবের মত সেই রাজকন্যা ও রাজপুত্রের প্রেমকাহিনী—জীবনক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রাণান্ত পরীক্ষা ও চরম তপস্তার কথা—শুনাইয়া থাকেন। কিন্তু আর বেশীদিন চলিবে না। তাঁহাদের সংখ্যা যে হারে হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে আর দশবৎসর-মধ্যে তাঁহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া অন্তর্হিত হইবেন।

ব্রাহ্মণেরা এই অবিবাহিত নরনারীর প্রেমকাহিনী সমর্থন করিলেন না। কিন্তু তাঁহারা একহাতে গ্রহণ আর একহাতে দান করিলেন। তাঁহারা নদীর এপার ভাস্কিয়া ওপার গড়িলেন। তাঁহারা এই সকল লৌকিক প্রেমমূলক উপকথা ও বাদীন নাটক-নাটিকার কাহিনী অগ্রাহ্য করিয়া দেবলীলার কথা করিলেন ও কি দিলেন।

বলিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টিত হইলেন। লোকশিক্ষা সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ই তাঁহারা নিজেদের হাতে রাখিলেন। যাহারা গল্প শুনাইয়া সাধারণকে মুগ্ধ করিত, তাহাদের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক ছিল, কিন্তু এবার কথক ঠাকুর গলায় খেত শুভ্র শৈত্য দোলাইয়া মাথা ও কণ্ঠে পুষ্পমালা পরিয়া বেদীর উপর চাপিয়া বসিলেন। তাঁহারা মহাভারতের কথা, রামায়ণের কথা, ভাগবতের কথা, ঋষ প্রহ্লাদের উপাখ্যান, কুরুজয় রাজার একাদশী প্রভৃতি পৌরাণিক গল্প শুনাইতে লাগিলেন। সেই যে রাজপুত্র, সদাগরের পুত্র ও নাটিকার কথা তাহা কোথায় ভাসিয়া গেল; কিন্তু স্মৃতির বিষয় আমরা প্রাচীন যুগের, সেই লুপ্তপ্রায় উপাখ্যানের অনেকগুলি উদ্ধার করিয়াছি। হিন্দুযুগের সঙ্গে এই গুপ্ত ও বৌদ্ধ যুগের আদর্শের তুলনা-মূলক সমালোচনার উপকরণ বখেপ্ত পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে—বৌদ্ধ-যুগের সেই সকল রূপমালা, শব্দমালা, কাঞ্চল রেখা, কাঞ্চনমালার উপাখ্যানই ভাল কিংবা পৌরাণিক যুগের ঋষ প্রহ্লাদের গল্পই ভাল তাহা লইয়া বিতর্ক করা অনাবশ্যক। তবে হিন্দু নবব্রাহ্মণ্য গ্রহণ করিবার পূর্বে কিরূপ গল্প রচনা করিত, এই অধ্যায়ে তাহার আভাস দিয়া পরবর্তী এক অধ্যায়ে ভক্তিমূলক দেবলীলা ও দেবমাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাহিনীগুলি সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিব।

পূর্বেই লিখিয়াছি গল্প করার প্রথা বর্ষের জাতির মধ্যেও আছে—ইহা কোন যুগ-বিশেষের নিজস্ব নহে। প্রায় পাঁচহাজার বৎসর পূর্বে বাগ্মীকি লিখিয়াছিলেন যখন

‘আলাপিনী’।

হুঃস্বপ্ন দেখিয়া মাতুলালয়ে ভরত বিব্রত হইয়া বসিয়াছিলেন, তখন রাজসভায় নিযুক্ত কথাব্যবসায়ীরা কথা শুনাইয়া তাঁহার প্রসন্নতা উৎপাদনের চেষ্টা পাইয়াছিল। বৌদ্ধযুগে মালিনী ও নাপিতরমণীগণই প্রধানতঃ অন্দরমহলে কথা বলিত। তাঁহাদের নাম ছিল “আলাপিনী”। মহিলা-কবি চন্দ্রাবতীর (১৫৭৫ খৃঃ) পুস্তকে আমরা কথাব্যবসায়ীদের এই উপাধি পাইয়াছি। তিনি সীতার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, “উপকথা সীতারে শুনায় ‘আলাপিনী’।” এই আলাপিনীগণ রাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অন্দরে মহিলাদিগের গায়ে বসনভূষণ পরাইবার সর্ববিধ কৌশল অবগত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবি যখনন্দন দাসের গোবিন্দলীলামৃতে সেই কৌশলের যে বর্ণনা আছে,

তাহাতে বুঝা যায় বেশভূষাকারিণীদের কলা-শাস্ত্রে কতটা অধিকার ছিল। আতুড়ঘরে—বিশেষতঃ বঙ্গীর দিন—ইহারা বড় ঘরের মেয়েদিগকে গল্প শুনাইয়া নির্জনতার শান্তি ও অবসাদ দূর করিত। বাহিরে গল্প বলিতে সুদক্ষ ব্যক্তির গানের সঙ্গে মিশাইয়া নানারূপ গল্প বলিত। ইহা তাহাদের পেশা ছিল। রাজসভায় কথা বলিবার জন্ত লোক নিযুক্ত থাকিত। সেদিনও আলিবর্দীরা রোজ গল্পকারকের সঙ্গে দিবসের কতকটা সময় কাটাইতেন এবং মীরন মরিবার রাত্রিতেও এক আলাপিনীর সঙ্গে বসিয়া গল্প শুনিতেছিলেন, মৃত্যুকরিনে একথা লিখিত আছে। এরূপ জনৈক কথাব্যবসায়ী আমার জানা ছিল, তাঁহার নাম ছিল ভারতচন্দ্র রায়, ইনি ঢাকা জেলায় সাভার গ্রামবাসী ছিলেন। ত্রিপুরার রাজসভায় তিনি গল্প শুনাইতেন, রাজা, রাজপুত্র প্রভৃতি রাজপরিবারগণ রাজসভায় নিযুক্ত গল্পকারকের কাছে সেই সকল উপাখ্যান শুনিতেন। এই কাজে ভারতচন্দ্র রায় মহাশয়ের মাসিক বেতন ছিল ৩০ টাকা।

গল্পগুলি বলিবার এই ধারা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছিল—বাহার শেষ রাজসভার কথাব্যবসায়ী ভারত রায় ছিলেন—তাহার পর হইতে বঙ্গদেশের এই ধারা লোপ পাইয়া গিয়াছে, ভারত রায়ের মুখে আমি গল্প শুনিয়াছি, তাহা করুণ, অদ্ভুত, হাস্য প্রভৃতি রসের উৎসস্বরূপ ছিল।

এই যে কথা বলিবার ধারা এককাল ধরিয়া এদেশে চলিয়াছিল, তাহাতে গল্প বলিবার কৌশল এতদ্দেশে পূর্ণ পরিণতি পাইয়াছিল। এইভাবে গল্পগুলি কিরূপ উচ্চাঙ্গের তাহা দেখাইবার জন্ত বৌদ্ধযুগের একটি গল্পের কথা আমি এখানে বলিব।

ইহা মালকমালার কাহিনী। খুব সম্ভব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ইহা বিরচিত হইয়াছিল। বহুকাল হইতে উহা কথিত হইয়া আসাতে উহার ভাষার অবস্থা পরিবর্তন হইয়াছে।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মহাশয় উহা এক ৮০ বৎসরের বৃদ্ধার মুখে শুনিয়া তাহা লিখিয়া লইয়াছিলেন, পাছে তাঁহার নিজের কোন পরিবর্তন অলঙ্কিতে আসিয়া পড়ে, এই জন্ত তিনি দ্রুত লিপিতে সাবধানতার সহিত গল্পটি টুকিয়া লইয়াছিলেন। এই বৃদ্ধা তাঁহার পিতামহীর নিকট গল্পটি শিখিয়াছিলেন, তাঁহার বয়স ছিল ২০। এই ভাবে যুগে যুগে গল্পটি মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয়, আলাপিনী পূর্বপ্রস্ত-কাহিনী অতি অদ্ভুতভাবে অম্লকরণ করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়াছিলেন। গল্প বলিবার সময়ে পূর্ববর্তিনী রমণী যেখানে হাসিতেন, কাসিতেন, জ্ব কুঞ্চিত করিতেন, হাতের যে ভঙ্গী করিতেন, তিনি তাহার সমস্ত মুদ্রাই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এই আলাপিনী বলিয়াছেন, তিনি ঐহার নিকট শুনিয়াছিলেন, তিনিও সেইভাবেই তাঁহার নিকট এই বর্ণনা-কৌশল শিখিয়াছিলেন। সুতরাং ইহার ভাষার খুব বেশী পরিবর্তন হয় নাই। বাণিজ্যকেন্দ্রের ভাষাগুলিই সাধারণতঃ বেশী পরিবর্তিত হইয়া থাকে। বাহিরের সর্বপ্রকারের প্রভাব হইতে দূরে থাকিয়া বঙ্গের অঙ্গ পাড়াগাঁওগুলির ভাষা বিশেষরূপ পরিবর্তিত হয় নাই। দক্ষিণাবাবুর ঠাকুরদাদার কুলি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন

১। গীতিকথা, মালক-
মালার গল্প।

মালকমালার গল্পের ভাষা ছর্সোঁধ বলিয়া অক্ষয় সরকার প্রমুখ সমালোচকবর্গ এই গল্প এখনকার দিনে অচল, এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাধ্য হইয়া পরবর্তী সংস্করণগুলির ভাষা দক্ষিণাবাবু অনেকটা পরিবর্তিত করিয়াছেন।

এই গল্পে প্রাচীনযুগের যে সকল নিদর্শন আছে, তাহাই ইহার নব ব্রাহ্মণ্যযুগের পূর্ববর্তিতার অকাটা প্রমাণ। ইহার প্রতি অধ্যায়ে তাত্ত্বিকতার প্রভাব স্পষ্ট; মালকমালা তাত্ত্বিকতা।

মৃত স্বামীর সহিত শ্মশানে পুড়িতেছেন; তাঁহার ছিন্ন হস্ত ও নাসিকা হইতে অজস্র রক্ত ছুটিতেছে—পিশাচগণ লেলিহান জিহ্বা বাহির করিয়া সেই রক্তধারা চাটিয়া খাইতেছে। ঘিয়ামা রাত্রি, ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টি, পিশাচেরা তাঁহার স্বামীর শবট চাহিয়া উদ্দাম নৃত্য করিতেছে কিন্তু সাম্রীর অটল সংকল্প দেখিয়া তাহারা নিরস্ত হইয়া গেল। তার পর আসিল জলকুন্তীর ও ব্যাঘ্র, তাহাদিগকেও তিনি স্বামীর শব দিলেন না, বক্ষে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিলেন। প্রলোভনের দেবতা পরম সুন্দরী রমণীমূর্তি ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে সখীয় স্থাপন করিয়া ঘৃণিত শবট ফেলিয়া দিতে পরামর্শ দিল। রজনীর অন্ধকারের শেষ হয় না, তাহাও যেন মালকের বিরুদ্ধে। কিন্তু মালক রাত্রিকে বলিলেন, ‘আমি তোমার নক্ষত্রগুলিকে আঙনে পরিণত করিব।’ ভয়ে নিশীথিনী প্রভাত হইল। তাঁহার অলৌকিক তপস্তায় অপোগণ্ড শিশুস্বামী জাগ পাইল। তিনি তাঁহার সমস্ত প্রাণের ব্যগ্রতা দিয়া তাঁহাকে দেখিতে চাহিলেন, এই আকাঙ্ক্ষার বলে তাঁহার অন্ধ চক্ষে দৃষ্টি ফিরিয়া পাইলেন। স্বামীকে সেবা করিবার জন্ত তাঁহার উৎকট তপস্তাজনিত যে আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, তাহার ফলে তিনি হাত ফিরিয়া পাইলেন। শুধু এই কয়েকটি স্থানে নহে, সমস্ত গল্পটী জুড়িয়া তাত্ত্বিক তপস্তা ও তাহাতে কিরূপ সিদ্ধিলাভ করা যায় তাহার বর্ণনা আছে। এই গল্পটি পড়িবার সময়ে

তপঃসিদ্ধি।

বিক্রমাদিত্যের তাল-বেতাল-সিদ্ধির কথা মনে পড়ে। কিন্তু ইহা আরব্য উপন্যাসের অথবা বজ্রিশিংহাসনের অলৌকিক গল্পের মত আদৌ নহে। ইহার তাত্ত্বিকতা ও অলৌকিকত্বের মধ্যে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক শক্তি উদ্বোধনের কথা অন্তর্নিহিত, এইজন্য এই অলৌকিক কাহিনী কোন বোগীর তপস্তার কথা মনে করাইয়া দেয়। মালক অপোগণ্ড শিশুর পত্নী, সেই অপোগণ্ড শিশুকে তিনি মাতৃস্নেহে পালন করিলেন। বাৎস্যল্যের এরূপ একখানি নিখুঁত ছবি বোধ হয় যশোদা-মায়ের আঙ্গিনা ছাড়া অন্তত্র দ্রুত। মালক যখন বাহা করিয়াছে, তাহা সমস্তই হৃদয়ের পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক শক্তি সম্যকভাবে প্রয়োগ করিয়া। এই অদ্ভুত অলৌকিক গল্পের মধ্যে সর্বদা কর্মের মাহাত্ম্য ও তপস্তার গৌরব পরিদৃষ্ট হয়; এজন্য রাজপ্রাসাদে, শ্মশানে, ব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যে, মালিনীর গৃহে মালক কর্ম ও তপস্তা-গৌরবে সর্বত্র দেবীর পর্যায়ে আসীন, কোথায়ও মাহুদী নহেন। যখন রাজা তাঁহার তিন দিনের শিশু পুত্রের সহিত মালকের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, তখন কোটালের কন্যা মালক বুঝিল, তাহার পিতার সামাজিক হীনত্বের দরুন রাজবধুর উচিত মর্যাদা সে সেই রাজপুত্রে পাইবে না। এজন্য সে রাজার কাছে তিনটি সর্থী চাহিল। এক একটির

পর রাজা তাহাকে উৎকট শাস্তি দিতে লাগিলেন। তাহার কণ, নাসিকা, এবং বাহু ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এক এক শাস্তি সহ করিয়া সে পরবর্তী সৰ্ত্তগুলি বলিতে সাহস হারাইল না। পূৰ্ব্বাপেক্ষা উৎকটতর শাস্তি বরণ করিয়া লইয়া সে তাহার সৰ্ত্ত বলিতে থাকিল। মোট কথা দেহটা মালঞ্চ অকিঞ্চিৎকর মনে করিত। মালঞ্চমালার গল্প শেষ করিলে মনে হইবে, সে বিদেহী, ইন্দ্রিয়মুক্ত, কর্তব্যের জীবন্ত প্রতীক,—একটি বহিতুল্য অলস আধ্যাত্মিক শক্তি। যখন ব্যাঘ্রের গুহায় সে স্নেহ ও যত্ন পাইয়া সুখী, তখন তাহার স্বামী পাঁচ বৎসরে পা দিয়াছে। এ সময়ে তো লেখা পড়া শিখাইতে হয়। সে যে রাজ্যের রাজা হইবে, মালঞ্চের উপর উহার ভার স্থাপ্ত। সম্মুখে যে বিপদই থাকুক না কেন, যে দিন স্বামী পাঁচবৎসরে পা দিল সেইদিন সমস্ত স্নেহের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বিপদে ভ্রক্ষেপহীন।

নিরাপদে শাস্তির আশ্রম ছাড়িয়া সে তাহার জীবনতরী অকূলে ভাসাইল। মূলকথা তাহার নিকট বিপদ অকিঞ্চিৎকর, দৈহিক সুখ অকিঞ্চিৎকর। তাহার জীবন একটা তপস্তার প্রদীপ। যেদিন রাজকুমার চন্দ্রমাণিক লোহশৃঙ্খলাবদ্ধ কারাগারে নিক্ষিপ্ত, সে ঘোর রাত্রে ব্যাঘ্রদের সাহায্যে কারাগৃহে প্রবেশ করিল। লোহশৃঙ্খল ভাঙ্গিবার উৎকট চেষ্টায় শিকলের প্রতিগ্রহের দরুন তাহার আটটি করিয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। নিশাশেষে শৃঙ্খলভঙ্গের সঙ্গে সমস্ত দন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, রক্তস্রোতে মুখ ভাসিতেছে, মালঞ্চ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিল। রাজকুমার তাহাকে দেখিতে না পাইয়া নিজে মুক্তি পাইলেন। এই অশরীরী দৈবশক্তি কৰ্ম্ম ও তপস্তাজাত কলতরুতুল্য। রাজা তাহার স্বপুত্র, মালঞ্চকে ডাকিনী মনে করিতেন; এজন্য যে পথে সে বাইত, তাহা কাঁটায় ঘিরিয়া রাখিতেন। পুকুরে পাহারা রাখিতেন যে মালঞ্চ জল না খাইতে পারে। প্রতি পদক্ষেপে স্বপুত্রের নিৰ্ম্মম অত্যাচার ও দানবলীলা দেখিয়া মালঞ্চ বলিতেন “তবু আমার স্বপুত্র আছেন, আমাকে কষ্ট দিবে এমনও ত আর কেহ নাই।” চন্দ্রমাণিকের জন্ত মালঞ্চ না করিয়াছিল এমন কৃচ্ছ্র নাই। তাহার যত্ন, স্নেহ, অধ্যায়জগতের, তাহা জগতের কোন কিছুই সঙ্গে তুলনা হয় না। সেই স্বামী রাজকন্তাকে বিবাহ করিলেন। অশ্বরাজ ঘোড়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন আরোহীকে তৎপৃষ্ঠে না দেখিয়া মালঞ্চের প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল। স্বামীর অন্তঃ আশঙ্কা করিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু সে যখন শুনিল, কুমার এক রাজকন্তাকে বিবাহ করিয়াছে—তখন বলিল “আমার স্বামী এখন সুখী হইয়াছেন, আমার মত সৌভাগ্যবতী কে? এখনতো আমার জীবনের আর দরকার নাই, যে পুকুরের জলে আমি বিবাহের প্রথম প্রস্তাব শুনিয়াছিলাম, কলহংস তখন সেই সরোবরের নীলজলে বিচরণ করিতেছিল; প্রভাতের সূর্য্য পুকুরের পদ্মকুড়িগুলি ফুটাইয়া দিয়াছিল, সেই আমার পিতামাতার বাড়ীর পুকুর—তাহার স্নানতল জলই এখন আমার প্রকৃত ঔষধ-নিবৃত্তির স্থান, তাহাতে কাঁপ দিয়া ডুবিয়া আমি জুড়াইব।”

সপত্নীস্নেহ।

সরোবরের নীলজলে বিচরণ করিতেছিল; প্রভাতের সূর্য্য পুকুরের পদ্মকুড়িগুলি ফুটাইয়া দিয়াছিল, সেই আমার পিতামাতার বাড়ীর পুকুর—তাহার স্নানতল জলই এখন আমার প্রকৃত ঔষধ-নিবৃত্তির স্থান, তাহাতে কাঁপ দিয়া ডুবিয়া আমি জুড়াইব।”

স্বামীর সঙ্গে রাজকন্তা শুইয়া আছেন, মালঞ্চ একবার স্বামীকে দেখিবে, পা টিপিয়া

গভীর রাত্রে বাসর-গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল দম্পতী নিদ্রিত, তখন পুলকাক্রম বর্ষণ করিতে করিতে সে যে গানটি গাহিয়াছিল—তাহা ত্যাগশীলতার চরম। মানুষের মুখে তেমন কথা ফোটে না, তাহা স্বর্গের দেবীর বাণী, নন্দনের দেব-পুষ্প—

“সুখে ধাইকো—সুখে ধাইকো রে রাজপুত্র, সুখে ধাইকো রে রাজকন্তা
—যদি সতীর মুখের কথা সুপ্রভাতে ফলে—রে।
বাসরের প্রদীপ যেন সাত পুরুষে নেহালে। রাজছত্র যেন চৌদপুরুষের
মাথায় থাকে—রে।
জল, থল, বন, বৃক্ষ, যেন সজাগ হয়্যা ধাইকো রে—রাজমন্দিরের চূড়া
যেন অজয় হয়্যা ধাইকো রে। চন্দ্র সূর্য্য যেন রে স্তম্ভলে হাসে।
আমার স্বত্তরের ঘর, আমার সোয়ামীর পীড়ি, অক্ষয় কর্যা রাইখো বিধাতা।
রাজকন্তার আগ্রহ যেন হাতে গায়ে ক্ষয়ে—রে। হে ধাতা,
তুমি আমারে দেও এই বর। চৌদভরা পূর্ণ কর আমার স্বত্তরের সংসার।
ওরে আমি জল মাটি হয়্যা থাকিমো রে, আমি ভুজিমো কত সুখ।
ওরে আমি পশু পক্ষী হয়্যা থাকিমো রে। আমি ভুজিমো রে কতই সুখ!”

তাহার স্বত্তর যেখানে প্রথম দিন তাহাকে আদর করিয়া রাজপ্রাসাদে আসিতে অনুরোধ
করিলেন, সেখানকার ধূলি মাথায় লইয়া মালঞ্চ বলিল “আজ
ভাবের কান্ডাল, ঈশ্বরের
কান্ডাল নহে।
এইখানে সর্বপ্রথম তোমার মুখের আদর পাইলাম। এইস্থান
আমার নিকট পুণ্য তীর্থ। এ স্থানের কাছে আমি রাজপ্রাসাদ
নগণ্য মনে করি।”

মালঞ্চচরিত্রে আত্মার স্বরূপ দৃষ্ট হয়। তিনি দেহকে যেমন অকিঞ্চিৎকর মনে
করিয়াছেন, রাজপ্রাসাদও তাঁহার কাছে তেমনি অকিঞ্চিৎকর। ইনি ছিলেন ভাবজগতের
মানুষ, মণিমাণিক্য অপেক্ষা মুখের কথাতে বেশী মূল্য দিতেন। এই জন্ত স্বত্তরের পদরজঃ-
পুত তাঁহার আদরের বাণীর প্রথম ক্ষেত্রকে তিনি তীর্থ মনে করিয়াছিলেন।

তিনি আমন্ত্রণমাত্র রাজপ্রাসাদে আসিলেন না। বাহার তাঁহার পরম শত্রু ছিল,
তিনি অপূর্ণ তপস্তাধারা তাঁহাদের জীবন দান করিলেন, বাহার তাঁহাকে কোনও দিন
ছুটি স্নেহের কথা বলিয়াছিল বা কোনরূপ উপকার করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে লইয়া
রাজপ্রাসাদে আসিলেন। তিনি এমন সুখ চান নাই, বাহার অংশ তিনি অপরকে দিতে
পারিবেন না। কাহাকেও হুঃখী রাখিয়া তিনি নিজে সুখী হইতে চান না। ইহা নিছক
বৌদ্ধ আদর্শ।

তখন রাজপ্রাসাদে বিপুল পুষ্পতোরণ উঠিয়া গিয়াছে, নহবৎ প্রভাতী রাগিণীতে

গৃহলক্ষ্মী দেবী-প্রতিমা মালকমালার আগমনী গাহিতেছে, শত্রুমিত্র সকলের বিশালদল লইয়া বিপুল সমারোহপূর্বক মালকমালার স্বামিগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সপত্নী আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইল, তিনি তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন; তিনি নিজের ভোগের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া রাজকন্যা কাকীকে পাটমহিবীররূপ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন, তাহাকে স্বামীর পার্শ্বে 'পাটরাণী' ও 'ঠাকুরাণী' বসাইলেন, নিজে ভোগনিঃস্পৃহ আনন্দময়ীর স্থায় সেই রাজসংসারে কত্রী হইলেন। প্রজারা কাকীকে 'পাটরাণী' বলিয়া জানিল, কিন্তু মালকমালার নাম দিল "ঠাকুরাণী"। তাহারা বুঝিয়াছিল একজন মাহুদী, আর একজন দেবী।

যাহারা বহু শতাব্দী ধরিয়া কথা শিখিয়াছে, বিশেষতঃ যাহাদের শ্রোতা ছিল শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত গৃহের মহিলারা, তাহারা গল্পকে নানা শিল্প-কলায় সাজাইতে পারিত। তাহারা অলঙ্কারশাস্ত্র না পড়িয়াও এমনই সকল কায়দা-কাহুন জানিত, যাহাতে বর্ণনা নিখুঁত হইত।

এই মালকমালার গল্পের বাধুনিটি চমৎকার। প্রথমতঃ আতুড়ঘরে রাজকুমারের মৃত্যু, এইখানেই গল্পটি শেষ হইতে পারিত, কিন্তু মালকের মত দেবীর হাতে তাহার জীবন, তাহাকে বাঁচাইতে হইবে; সুতরাং গল্প ধামিল না। এইভাবে স্বাভাবিক-ক্রমে গল্প আবার চলিল। কাকীর সঙ্গে বিবাহের পর গল্পের আখ্যান ফুরাইয়া গেল, এইখানে গল্প পুনরায় শেষ করা বাইতে পারিত, কিন্তু বিবাহ করা মাত্র সেই রাজ্যের নিয়মানুসারে রাজকুমার বন্দী হইলেন, তখন তাহার মুক্তি দেওয়ার দরকার হইল, গল্পের গতি ধামিল না। মুক্তি পাওয়ার পরে চন্দ্রমাণিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও মালককে রাজপ্রাসাদ হইতে দূর করিয়া দিলেন। এইখানে গল্পের স্বাভাবিক ভাবে ইতি হইতে পারিত, কিন্তু মালকের মত তপস্বিনীর তপঃসিদ্ধি না দেখাইলে গল্প পশু হইয়া পড়িত, সুতরাং নৈতিক প্রয়োজনে আরও খানিক দূরে বাইতে হইল। এই নায়িকাকে যদি প্রথম খণ্ডের গ্রহণ করিতেন, তবে তাহা যোগ্য হইত না। গল্পকার এমন এক শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন যখন রাজা প্রজা একত্র হইয়া মালককে সংবর্দ্ধনা করিয়া লইবেন। আকাশ হইতে দেবতারা যে মালকের কর্মগুলি দেখিতেছিলেন, কর্মফল হাতে করিয়া তাহাকে দেওয়ার জন্ত, তাহারা শুধু একটা যোগ্য মুহূর্তের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। বন্দীর মুক্তি হইল, মৃতেরা জীবন পাইল, বহুদিন যাহারা কষ্ট দিয়াছিলেন এমন সকল বদ্ধ শত্রুমিত্র হইয়া দাড়াইল—যখন এই ভাবে সুবাতাস বহিল, তখন গৃহলক্ষ্মী পরিপূর্ণ মহিমায় গৃহে ফিরিলেন। কোটালের কন্যা রাজ-অমুগ্রহে প্রাসাদে একটুখানি জায়গা পাইয়া কৃতার্থ হইল না, তাহার কর্ম দ্বারা, মহাতপশ্রী দ্বারা অর্জিত বিপুল সংবর্দ্ধনা পাইয়া গৃহে ফিরিল।

এই গল্প যে বৌদ্ধযুগের তাহার প্রমাণ কি? প্রথম প্রমাণ ইহার মূলমন্ত্র ত্যাগ, নিষ্ঠা ও কর্ম। পরবর্তী সময়ে সাহিত্যের যে অধ্যায় শুরু হইবে তাহাতে কর্ম কিছুই নহে,

একমাত্র প্রেমই লক্ষ্য হইল, কৰ্ম্ম-গৌরব একেবারে লুপ্ত হইল। ব্রাহ্মণ্য যুগে বিপদে পড়িলে লোকে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা পাইত না; কেবল মা, মা বলিয়া চণ্ডী, মনসা দেবী বা অপর কোন দেবতার নাম জপ করিত। সেই যুগের স্বতিকায়েরা বলিলেন, একবার হরি নাম করিলে যত পাপ নষ্ট হয়, তত পাপ মানুষ সারাজীবনে করিতে পারে না। একবার মাত্র গঙ্গায় অবগাহন, একবার মাত্র তুলসীতলায় দীপ জালা, আরতির সময়ে

শাখে হুঁদেওয়া, কিংবা একটিমাত্র বিঘদল শিবের পায়ে দেওয়া—
গল্পে বৌদ্ধযুগের প্রমাণ। তাহা হইলেই যতই বিপদ ঘনীভূত হউক না কেন—সমস্ত দূর হইবে।

যাহারা বন্দী হইতেন বা মশানে নীত হইতেন, তাহারা বসিয়া বসিয়া চণ্ডীর ‘চৌতিশা’ জপ করিতেন, মালঙ্কের মত সারারাত্রি লোহের শিকল ভাঙ্গিতে যাইয়া দাঁতগুলি হারাইতেন না। মালঙ্কের আত্মনির্ভর-পূর্ণ কৰ্ম্মশীলতা বৌদ্ধযুগের। বৌদ্ধেরা বলিয়া থাকেন, যেমন কাজ করিবে তেমন ফল পাইবে। কৰ্ম্মফল নষ্ট করিতে পারেন, এমন কোন দেবতা নাই। মালঙ্ক নানা বিপদে পড়িয়া একটিবার কোন দেবতার নাম করেন নাই।

দ্বিতীয় প্রমাণ—এই গল্পে ব্রাহ্মণের কোন উচ্চস্থান নাই, তাহাকে দান করা, ভক্তি করা ইত্যাদির ফল বর্ণিত হয় নাই।

তৃতীয় প্রমাণ—ইহার পরিপূর্ণ তাত্ত্বিকতা, এই তাত্ত্বিকতা ব্রাহ্মণ-শাসিত নব হিন্দুধর্মে বিশেষ আদৃত হয় নাই। বিশেষ ব্রাহ্মণ্য প্রভাবযুক্ত প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে তাত্ত্বিকতার কোন আমল দেখিতে পাওয়া যায় না।

চতুর্থ প্রমাণ—কথক ঠাকুর বেদীতে বসিয়া, কীৰ্ত্তনীয়ারা ঘরের আঙ্গিনায় নাচিয়া গাহিয়া, পুরাণব্যাখ্যাকারীরা ফুলমালা গলায় দোলাইয়া, পুরোহিতেরা শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইয়া যে সকল উপদেশ দিয়া থাকেন তাহার মধ্যে মালঙ্কমালার চরিত্রে যে সকল গুণ-গৌরব দৃষ্ট হয়,—তাহার কোনটি প্রশংসিত নহে। উপবাস কল্পিয়া থাকিবার পুণ্য, ভক্তিতে রোমাঞ্চ হইয়া আঙ্গিনায় লুটাইয়া পড়া, হরি বলিতে চক্ষে অশ্রু বহা, ইত্যাদি ব্রাহ্মণ-কথিত কোন পুণ্যই মালঙ্ক অর্জন করেন নাই। বরঞ্চ তিনি এতকাল জঙ্গলে কাটাইলেন, কতকাল অজ্ঞাতকুলশীল মালীর বাড়ী ছিলেন—এজন্ত তাহার কোনই কৈফিয়ৎ দিতে হইল না। কোন কঠোর পরীক্ষা দিতে হইল না, ইহা হইতে অনেক পরিমাণে কম অপরাধী বেহুলা মৃত স্বামীকে লইয়া জলে ভাসিয়া ছয়মাস কোথায় ছিল—কেহ জানিত না, তজ্জন্ত জ্ঞাতিগণ চাঁদ মদাগরের সভায় ঘোরতর আপত্তি উত্থাপনপূৰ্ব্বক বেহুলার হাতে ভাত খাইবে না—সঙ্কল্প করিয়া বণিক্রাজকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল, এবং খুলনা কয়েকদিন সপত্নী কর্তৃক দিনের বেলায় ছাগ রাখিতে নিযুক্ত হওয়ার দরুন ধনপতিকে তাহার জ্ঞাতিরা যেরূপ আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের পাঠক মাঝেই অবগত আছেন। সামাজিক দোরাঙ্কের এইরূপ দৃষ্টান্ত হিন্দু-সাহিত্যে আরও ঢের পাওয়া যায়।

পঞ্চম প্রমাণ—ভাষা। মালঙ্কমালা একটি গীতিকথা—ইহার অধিকাংশ গল্প, এবং মাঝে মাঝে পদ্য। বহু শতাব্দীর আবৃত্তির ফলে গজাংশের ভাষা অবশ্যই পরিবর্তিত

হইয়াছে, কিন্তু পঞ্চাংশের ভাষা তত শীঘ্র পরিবর্তিত হয় নাই। প্রথম সংস্করণের পঞ্চাংশের ভাষা অতীব ছরোঁধ। তাহা বোধ হয় মূল রচনার অনেকটা অনুবর্তী, সেই ভাষা বহু প্রাচীন।

মালঞ্চমালা একটি উৎকৃষ্ট গীতিকথা। বৌদ্ধদিগের কথাসাহিত্য বেক্রপ ছিল তাহার আদর্শ এই মালঞ্চমালা। এই প্রসঙ্গে আমরা মন্তব্যগুলি সমস্ত খুলিয়া বলিব তজ্জন্ত এত বিস্তারিত ভাবে ইহার আলোচনা করিলাম। এই শ্রেণীর গীতিকথা আরও কতগুলি আমরা পাইয়াছি,—সেগুলি ভারি সুন্দর এবং বৌদ্ধযুগের চিহ্ন বহন করে। তাহাদের মধ্যে সমুদ্রযাত্রা, স্বামিনোদয়ন প্রভৃতি আধুনিক স্মৃতি-নিবিদ্ধ অনেক বিষয় আছে। কাঞ্চনমালার গল্পের সঙ্গে মালঞ্চমালার গল্পের কিছু কিছু ঐক্য আছে এবং তাহাতেও ত্যাগের আদর্শ উচ্চ। আমি যখন আমার “Folk Tales of Bengal” পুস্তকের ভূমিকায় বাঙ্গলার গীতিকথাগুলি এই জাতীয় কথাসাহিত্যের মধ্যে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহা আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় লিখিয়াছিলাম, তখন লর্ড রোনাডসের প্রাইভেট সেক্রেটারী পণ্ডিতপ্রবর গুরুলে সাহেব ঐ পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে যাইয়া লিখিয়াছিলেন “প্রথম যখন দীনেশবাবুর উচ্ছাসপূর্ণ প্রশংসা পাঠ করি, তখন মনে করিয়াছিলাম, অতিরিক্ত স্বদেশ প্রীতির দরুন তাহার বিচার শক্তি নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু নিজে মালঞ্চমালার সুন্দর কাহিনীর অনুবাদ পড়ার পর দেখিলাম দীনেশবাবুর কথা সবই সত্য।” মালঞ্চমালার চরিত্র সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—“হিন্দু পত্নীর আদর্শ যে কত মহান ও উচ্চ হইতে পারে, তাহা মালঞ্চমালায় বেক্রপ পাইয়াছি, আর কোথায়ও তেমন পাই নাই।” *

কাঞ্চনমালাও মালঞ্চমালার ছায় শিশু স্বামী লইয়া বনজঙ্গলে কত কষ্ট পাইয়াছেন, কত কষ্টে—কতপ্রাণান্ত চেষ্টায় তাহাকে মাহুব করিয়াছেন। কিন্তু সহসা এক রাজা দস্যুর মত কুটিরে আসিয়া তাহার ছোট কৌস্তভ মণির মত অমূল্য স্বামি-কাঞ্চনমালা। শিশুটিকে চুরি করিয়া লইয়া গেল। কালে সেই রাজার কন্যার সঙ্গে তরুণ বয়সে তাহার বিবাহ হইল। কাঞ্চন স্বামী হারাইয়া মণিহারী ফণী হইল। তারপর সেই রাজকন্যার দাসী হইয়া সেই গৃহে আশ্রয় লইল। কিন্তু রাজকন্যা রত্নমালা স্বামীকে কাঞ্চনের অনুরাগী দেখিয়া ষড়যন্ত্রপূর্বক কাঞ্চনকে নির্বাসিত করিলেন। কিন্তু স্বামীর মন ফিরিয়া পাইলেন না। তরুণ যুবরাজ কাঞ্চনের বিরহে রাজ্য ত্যাগ করিল—তাহাকে খুঁজিয়া বনে জঙ্গলে বেড়াইল, কাদিতে কাদিতে তাহার চক্ষুদুইটি অন্ধ হইল। কাঞ্চনের

* “When I read the author's enthusiastic appreciation of Bengal Folk Tales, the thought crossed my mind that possibly his patriotism has affected his judgment. But after I had read the translation of the beautiful story of Malancha-mala, I went back to the first lecture and I knew that what he said was true.

I have never read anything which led me to such an understanding of the sublimity of the conception of the ideal Hindu wife as I have obtained from the story of Malancha-mala.”

সঙ্গে এই অবস্থায় তাহার দেখা হইল। এক সন্ন্যাসী কাকনের সহায় ছিলেন—তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাকন প্রার্থনা করিল, “আপনি আমার স্বামীর চক্ষু দান করুন।” সন্ন্যাসী বলিলেন, “আমি যাহা বলিব, তাহা করিতে পারিবে?” কাকন বলিল, “স্বামীর চক্ষুর জন্ত যাহা বলিবেন তাহাই করিব। আমার সমস্ত ঐর্ষ্যা, যাহা আপনি আমাকে দিয়াছেন, তাহা ফিরাইয়া দিয়া আমি আবার বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইব, এই রাজধানীতে আমার কাজ নাই, পাতার কুটিরে থাকিব।” সন্ন্যাসী মাথা নাড়িলেন, কাকন বলিল, “তবে কি দিব? আমার চক্ষু দুইটি নিন্, এখনই তাহা উপড়াইয়া আপনার পদতলে দিতেছি, আপনি আমার স্বামীর দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিন।” এবারও সন্ন্যাসী ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইলেন। “তবে কি করিব? যাহা বলিবেন,—উহার চক্ষু লাভের জন্ত আমাকে যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।” সন্ন্যাসী তাহার হাতে একটি ফল দিয়া বলিলেন, “এই পর্ত্তগহ্বরে রত্নমালা আছেন, তুমি এই ফলটি তাঁহার হাতে দাও, এবং সেই সঙ্গে তোমার স্বামীকে সৰ্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে দিয়া এস। ইহার পর—জীবনে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না, এই শেষ দেখা। কিন্তু যদি স্বামীকে সপত্নীর হাতে দিতে যাইয়া তোমার একবিন্দু অশ্রু বা একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ে, তবে সমস্ত পণ্ড হইবে, তোমার স্বামী আর চক্ষু ফিরিয়া পাইবেন না।”

অপূর্ণ ত্যাগ।

যে সপত্নী চূড়ান্ত কষ্ট দিয়া তাঁহার বিকল্পে নানা মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া নিশ্চয়ভাবে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, সেই সপত্নী পাইবে তাঁহার প্রাণাধিক স্বামীকে, যাহাকে তিনি একবার চক্ষু দিয়াছিলেন, কত কষ্টে, দিন-রাত্তির কত কষ্ট করিয়া বাঁচাইয়াছিলেন, যাহার হাসি দেখিলে তিনি স্বর্গ চান না, যাহার সঙ্গ পাইলে তিনি আহরনিদ্রা ভুলিয়া যান, যে স্বামী তাঁহার জীবনের একমাত্র তপস্বী, একমাত্র কাম্য—সেই স্বামীকে সপত্নীকে দিতে হইবে? এই দেখুন কাকনমালা ফল হাতে চলিতেছেন—স্বামীর ইষ্টমাত্র কামনা করিয়া তাঁহার নিজ সৰ্ব্ব জলাঞ্জলি দিতে কাকন চলিতেছেন, তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস উঠিতে চাহিতেছে তাহা তিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত ত্যাগের রাজ্যে ঢুকিয়া সংযত করিতেছেন, যে অশ্রুবিন্দু চোখের কোণে পড়ন্ত, তাহা স্বামীর শুভ কামনায় তপস্বীর হোমানলে শুক হইয়া গিয়াছে।

তিনি সেই ত্রেতাযুগের রামচন্দ্রের মতই সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া বাইতেছেন, তাঁহার সাম্রাজ্য স্বামিসঙ্গ, অবোধার সাম্রাজ্য অপেক্ষা অনেক বড়, এবং তাঁহার পরীক্ষা সীতার অগ্নিপরীক্ষা হইতে অনেক কঠোর। স্বামীকে দান করিয়া সৰ্ব্বহারা রমণী বনপথে চলিতেছেন, সেই মুখখানি ফিরিয়া দেখিবার তাঁহার অধিকার নাই। এই দৃষ্টের উপর পটফেপ করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যের অধিবাসী এক দেবতার ছবি কবি দর্শকের চক্ষে অমর তুলিকায় আঁকিয়া রাখিলেন।

এই গাথাটির মধ্যেও তাত্ত্বিকশক্তির অনেক নিদর্শন আছে। গীতিকথাগুলি সমস্তই ত্যাগের ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং তদ্বারা বৌদ্ধ-যুগের শূণ ও কর্মগুলি

খুব বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। গীতিকথাগুলিই পল্লীগীতার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রচনা। পল্লীগীতার অনেক রূপভেদ আছে, যথা—গীতিকথা, রূপকথা, পল্লীগীতিকা। পল্লীগীতিকার যে সকল গল্প প্রচলিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তান্ত্রিকতা দেখিতে পাই না, কঠোর কৰ্ম ও উৎকট পরীক্ষা সকলই আছে, কিন্তু ত্যাগ অপেক্ষা তাহাতে প্রেমের মহিমাই বেশী উজ্জ্বল হইয়াছে। ক্রমশঃ এই কথা-সাহিত্য হইতে ত্যাগ চলিয়া গেল এবং প্রেমই সর্বাপেক্ষা বড় আদর্শে পরিণত হইল।

পল্লীগীতিতে প্রেমের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। আদর্শের এই রূপান্তর হওয়ার কারণ কি? বৌদ্ধ-যুগান্তে গুপ্ত-যুগে শিবই উপাস্ত দেবতা হইলেন। ভিক্রুর আদর্শ ও ত্যাগ ধীরে ধীরে ম্লথ হইল। মহাভিক্রু বুদ্ধ গৃহস্থালীকে সন্ন্যাস অপেক্ষা নিম্নে স্থান দিয়াছেন। বৌদ্ধ ভিক্রুগণ স্ত্রীলোকের সাহচর্য-ত্যাগটাকেই

বড় ধর্ম মনে করিতেন, কিন্তু শৈব ধর্ম গৃহস্থালীর উপর জোর দিল, যৌন প্রেম তাহাদিগকে ভুলাইল। ক্রমশঃ ক্রমশঃ গোড়ার বৈষ্ণবেরা যে প্রেমকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন—সেই দিকে লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কালিদাসের শিব এদিকে “মহাবোগী” নিবাতনিকম্প প্রদীপের মত; এই শিবের কটাক্ষে মদন ভয়ীভূত হইল; কিন্তু তাহার কুলশরট স্বর্গ হইতে পাওয়া অমোঘ অস্ত্র;—যে দেবতপস্তায় ইন্দ্রের বজ্র, তেমনই এক দেবতপস্তায় কুলশরের সৃষ্টি। সেই কুলশর শিবের বক্ষে পড়িয়াছিল। অমোঘ লক্ষ্যকারীর শর ব্যর্থ হয় নাই। শিব বিদ্বোষ্ঠা গৌরীকে বিবাহ করিলেন। এমন কি এই কুলশর বখন শিবের বৃকে পড়িয়াছিল, তখনও “শিবস্ত কিঞ্চিৎপরিলুপ্তদৈর্ঘ্যঃ”—মুহূর্তের জন্য তাঁহার দৈর্ঘ্য বিচলিত হইয়াছিল। এই শৈব ধর্মের সঙ্গে বহু দিনের শুদ্ধতাপ্রাপ্ত বুদ্ধজিত সমাজ-জীবনে যৌন-প্রেম প্রবেশ করিল। ভিক্রুর যুগব্যাপী কঠোর সংবমে দেশ অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

পল্লীগীতিকাগুলি এই শৈব ধর্মের চিহ্নাক্ত যুগের বার্তা বহন করিতেছে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখাইব যে প্রাচীন মাগধ চিত্র-শিল্পের দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গলায় চলিয়া আসিয়াছিল। অজন্তার চিত্রের সঙ্গে লঙ্কো আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মুকুলবাবু কালীঘাটের পট-অঙ্কনের ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছেন। সেইরূপ গুপ্তযুগের কাব্যের সঙ্গেও এই বঙ্গীয় পল্লীগীতিকার ঐক্য আমরা দেখিতে পাইতেছি। চিত্রের মত কাব্যেরও একটা দ্বারা চলিয়া আসিয়াছে; কোন স্থানে বিশাল স্রোত সামান্য খাদে পরিণত হইয়া অতি মুছ ও ম্লথগতিতে চলিতেছে, কোথাও বা সেই দ্বারা মূল প্রস্রবণের বেগ অতিক্রম করিয়া বিরাটুতর শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমার বিশ্বাস এই পল্লীগীতিকাগুলি অনেক বিষয়ে গুপ্তরাজ্যের আদর্শকে ছাপাইয়া অধিকতর শক্তির পরিচয় দিতেছে।

পল্লীগীতিকায় নায়িকারা শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, মালবিকা প্রভৃতি নাটকের নায়িকার সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে এক পরিবারের লক্ষণ বহন করে। ইহাদের ছাঁচ নব-ব্রাহ্মণ্যের ছাঁচে আদৌ ঢালা নহে। তাহাদের ছাঁচ স্বতন্ত্র,—শকুন্তলা,

মালবিকা, রত্নাবলী প্রভৃতি নাটকের নাট্যকার সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে এক পরিবারের লক্ষণাক্রান্ত। শকুন্তলা, মালবিকা ও উর্জ্জ্বলীর সঙ্গে মহয়া, মলুয়া প্রভৃতি নাট্যকার পূর্বরূপে তুলিত হইতে পারে। চন্দ্রাবতী গৌরীর মত স্বীয় মনোনীত স্বামী পাইবার জন্য শিবের আরাধনা করিতেছেন। তিনি জয়চন্দ্রকে ভালবাসেন, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মেয়ে প্রেমের কথা কাহাকে জানাইবেন? নির্জনে ফুল তুলিতে বাইয়া প্রাণের কথা যেন নিজেরই কাণে কাণে বলিতেছেন :—

“তোমারে দেখিব আমি নয়ন ভরিয়া।
তোমারে লইব আমি হৃদয়ে তুলিয়া ॥
বাড়ীর আগে ফুটিয়াছে মালতী বকুল।
অকল ভরিয়া তুলব তোমার মালার ফুল ॥
বাড়ীর আগে ফুটিয়াছে রক্তজবা সারি।
তোমারে করিব পূজা প্রাণে আশা করি ॥
বাড়ীর আগে ফুটিয়াছে মল্লিকা মালতী।
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমা হেন পতি ॥”

এই নিরাবিল প্রেমমুগ্ধা কুমারীর চিত্র কালিদাসের তপোনিরতা গৌরীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সর্বত্র শকুন্তলার মত নাট্যকারা নবযৌবনে কোন নায়ক-দর্শনে প্রেমের প্রথম উন্মেষ অনুভব করিতেছেন। মলুয়া আড়ালিয়া গ্রামে মান্দার গাছের বেড়া-মলুয়া।

যুক্ত কদলী তরুর আড়ালে ঝাড়-জঙ্গলে ঘেরা এঁধোপুকুর-পাড়ে কদম গাছের নীচে সুসুপ্ত স্থানর এক যুবককে দেখিতে পাইলেন। এই যুবকের নাম চাঁদ-বিনোদ, ইহাকে দেখা মাত্র “ভিনদেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন। লাজরক্ত হৈল কন্ঠার প্রথম যৌবন।” শকুন্তলা স্বকীয় বকলবাস কাঁটায় আটকাইয়াছে ভান করিয়া একটু অবকাশ পাইয়া ছদ্মস্তকে ফিরিয়া দেখিয়া লইলেন, মলুয়াও কলসী ভরিবার ছলে কুস্তুর জল-প্রবেশের শব্দধারা চাঁদবিনোদকে জাগাইয়া তুলিলেন। উভয়ের সসঙ্কোচে কথাবার্তা চলিল—তারপর সেই একনিষ্ঠ প্রেমব্রত কত দুঃখ ও বিপদের মধ্যেই না উদ্ঘাপিত হইল! চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র দুইজনে তরুণ বয়সে বাগানে ফুল কুড়াইতে বাইয়া পরস্পরকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। জয়চন্দ্র ফুলগাছের ডাল নোয়াইয়া ধরিতেন, চন্দ্রাবতী সেই ডাল হইতে তাহার মাজি ভর্তি করিতেন, ইহার মধ্যে না কোন এক সময়ে প্রেমের দেবতা পরস্পরের কটাক্ষ উপলক্ষ করিয়া ফুলশর ছুঁড়িলেন। কমলা তৃষিত রাজপুত্রকে পাতার আধারে জল দিতে বাইয়া ঠাহার মুখের দিকে চাহিয়া চোখ ফিরাইতে পারিল না, তথাপি সে যে সংঘম অবলম্বন করিয়াছিল, রাজপুত্রের অনুনয়-বিনয়ে তাহা ভাঙে নাই। কবি লিখিয়াছেন, ফুলটি

চন্দ্রাবতী।

ছুটিবার পূর্বে ফুলকলির কাছে ভ্রমর বারবার আসিয়া গুন্ গুন্ করে কিন্তু কলি সহজে ফুটে না, ফুলের সমস্ত মধু লইয়া সে মুখ বুজিয়া থাকে, কমলার কাছে রোজ রোজ কুমার সেই ভাবে আসিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া বাইতে লাগিলেন। মদিনা ফুলকে দিয়া উড়ন্ত বুলবুলী ধরাইত, ছইজনে আমের চারা পুঁতিয়া তাহার চারিদিকে বেড়া দিত, শৈশবে ছইজনে একদণ্ড ছাড়াছাড়ি থাকিতে পারিত না, এইভাবে কোন মুহূর্তে অন্য তাঁহার শরাসনে তুলিয়া ছইজনের প্রাণ লইয়া খেলিতে লাগিলেন। সমস্ত গীতিকাগুলিতে গুপ্ত-

পূর্বরাগ।

যুগের নায়িকাদের মত প্রেমের লুকোচুরি খেলা—পূর্বরাগের অভিনয়। নব ব্রাহ্মণ্য কাঁটা দিয়া এই ভালবাসার পথরোধ করিল,

মৈমনসিংহ প্রভৃতি কয়েকটি জেলা সেনরাজগণের গতিরোধ করাতে সেই ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব তথায় ঢুকিতে পারে নাই, কিন্তু এখন ঢুকিয়াছে; হিন্দুরা আর প্রায় এ গীতিগুলি গায় না। মুসলমান

হিন্দুরা এসকল গান গায় না।

সমাজে সেরূপ কঠোর বিধিব্যবস্থার বালাই নাই, তাহারাই এগুলি গাহিয়া থাকে। ইদানীং মোল্লারা আদেশ জারি করিয়াছেন, এসকল গান আর গাওয়া হইবে না।

তথাপি সৌভাগ্যের বিষয় এই যে কাব্যের সেই প্রাচীন ধারাটি আমরা বঙ্গের সীমান্তের কতকগুলি স্থান হইতে কুড়াইয়া পাইয়াছি।

কিন্তু এই নায়িকারা যদি কালিদাস প্রভৃতি কবির নায়িকাদের সহিত এক পঙ্ক্তিতে স্থান পান তবুও আমাদের খুব প্রীতি বা গর্ববোধ করিবার বখেষ্ঠ কারণ নাই। বাঙ্গালী নকল

শুধু ধারা এক নহে, বাঙ্গালীর সৃষ্টি এক ধাপ উপরে।

করিয়া ক্ষান্ত হয় না, বিধে তাহার কিছু দেওয়ার আছে, সে যেখান হইতেই তাহা দিক না কেন, তাহার মধ্যে নিজের একটা স্পষ্ট ছাপ দিয়া জগতে ছাড়িয়া দেয়। এ ছাপ বাঙ্গালীর রাজকীয় মুদ্রার ছাপ। আমরা গুপ্ত-যুগের সংস্কৃত কাব্য ও নাটকে যে সকল নায়ক-

নায়িকা পাইতেছি, তাঁহাদের সকলেরই ভদ্রবেশ। কালিদাসই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, তাঁহার সমস্ত কাব্যে রাজসভার সৌজন্য ও পরিচ্ছন্নতা আছে। তাঁহার নায়িকা মালবিকার অন্তঃপুরে দাসীর ছদ্মবেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও রাজকুমারী, তাঁহার প্রতি বাক্যে প্রতি কথায় রাজাস্তঃ-পুরচারিণীর সম্মান প্রকট করে। তাঁহার শকুন্তলা বনবাসসত্ত্বেও রাজ্যের ছায়। তাঁহার মধ্যে যে পরিচ্ছন্নতা, বাক্যসংযম দৃষ্ট হয়—তাহাতে রাজা বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, এই বনলতা উজ্জ্বলতা হইতে শ্রেষ্ঠ! কালিদাসাদি কবির সৃষ্টি স্ববির আশ্রম ও রাজসভা লইয়া। সমাজের নিম্নস্তরে তাঁহারা বাইতে চাহেন নাই।

কালিদাসের কাব্য ও নাটকে প্রচুর সৌন্দর্য আছে, প্রচুর করুণা আছে—সেগুলি বেন মালীর হাতের পুষ্পবন, প্রত্যেক কথায় সংযম আছে, কোথাও বাহুল্য নাই। কবি শিল্পীর মতন কাটিয়া ছাঁটিয়া তাঁহার চিত্রগুলি উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক কাব্যেই রাজসভার মর্যাদা আছে, ছদ্মস্ত, অগ্নিমিত্র, পুত্ররবা তাঁহার নায়ক। তিনি রসের যে পসরা সাজাইয়া উপস্থিত করেন—তাহা রাজভোগ।

কালিদাস সৌন্দর্যের উপাসক, সংযতবাক্ ও শব্দচিত্র অঙ্কনপটু। কিন্তু এরূপ ভ্রমবেশ, এরূপ সংযম আমাদের পল্লীগীতিকার কচিং দৃষ্ট হয়। গীতিকাগুলিতে যে উদ্যম লীলা আছে, যে অবাধ স্বাধীনতা, চরম স্থান পাইবার যোগ্য দ্রুত-গতি আছে—তাহা কালিদাসে নাই। বাঙ্গালী কবিকে আপাততঃ মনে হইবে অসমসাহসী। কোথায় সমাজ, কোথায় স্বাধীনতা, কোথায় শাস্ত্র? পল্লীকবি সে সকল কিছুই মানে না। সে প্রকৃত জহরী, সে কেবল সত্য ও শিবকে দেখিয়াছে—তাহা আস্তাকুড়ে পাইলেও সে তাহা শিরোধার্য করিয়া লইয়াছে। সে কাহারও দান নহে—মহু, বাজবন্ধ্য, পুরাণ, স্বাধীনতা এসকল কিছুই সে জানে না, সে অলঙ্কার শাস্ত্র পড়ে নাই, সে কাহারও আইন মানিয়া চলে না। কিন্তু প্রকৃত স্বন্দর কি সে তাহা চিনিয়াছে, সত্যকে সে শিশুর মত নির্মল চক্ষে দেখিয়াছে। আমরা বাহাকে অসতী বলি, সে তাহার পুঁথির পাতায় পাতায় তাহার ছবি আঁকিয়াছে, কিন্তু সে নির্ভীকভাবে অসতীকে সতীশিরোমণি করিয়া দেখাইয়াছে। ডোম রমণী তাহার স্বামীকে ছাড়িয়া শ্রাম রায়ের সঙ্গে অনায়াসে চলিয়া গেল, রাজকুমারী তাহার স্বামীকে বলিয়া কহিয়া অনুমতি লইয়া আধা বধুর সঙ্গে চলিয়া গেল। বাতাসী নিজের স্বামীকে ত্যাগ করিয়া নদীর তীরে তাহার বধু বিনাথের প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিল। এমন সকল কথা কবি লিখিয়া গিয়াছেন যে তিনি সমাজের সজ্জনের কাণমলা—নাকমলা খাইবার যোগ্য। সেরূপ ছবি আঁকিতে মেটারলিংও ভয় পাইয়াছেন, সাধারণের হিত-কামনা সতীত্বের একটা মামুলী অর্থহীন খেয়াল হইতে শ্রেষ্ঠ, করাসী কবি ইহা নানাবক্তৃতায় বুঝাইলেন, কিন্তু যাহা বলিলেন সত্যই তাহা আঁকিতে যাইয়া ভয় পাইলেন, মনাভেনাকে অক্ষতদেহে রণক্ষেত্র হইতে ফিরাইয়া আনিলেন। রবীন্দ্রবাবু বিনোদিনীকেও এইভাবে বাঁচাইয়া আনিলেন। সতীত্বকে পদাঘাত করিতে পা উঠাইয়াও সাহসে কুলাইল না। কিন্তু পল্লীকবির সাহস দেখুন, তাহার বক্তৃতা করিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি নাই। সে আদৌ প্রচারক নহে, সে বুঝিয়াছে প্রেম জিনিষটা খাটি সোণা, তাহার কাছে পুরোহিতের মত, সামাজিক আদর্শ এবং লোকনিন্দা অতি অকিঞ্চিৎকর। সে সেই প্রেমের প্রকৃত মূল্য বুঝিয়াছে ও দিয়াছে। এজন্য তাহার অসতী পরপুরুষকে ভালবাসিয়া এমন সকল কার্য করিয়াছে, এমন নির্ভীক ভাবে তাহাদের নায়কদিগের অনুগমন করিয়াছে, যে তাহারা সীতা-সাবিত্রী হইতেও চিত্র হিসাবে উজ্জ্বল হইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। আধাবধুর পালা, শ্রামরায়ের পালা, এবং ধোপার পাঠ

এই তিনটি গীতিকা পড়িয়া দেখুন, পল্লীকবির সৃষ্ট নায়িকারা, পর-
সতীর ধর্ম উপেক্ষিত।

উপগত নায়িকারা, ভ্রষ্টা নায়িকারা—স্বর্ণের পবিত্রতা গারে মাখিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গোড়া সমাজের অতিবড় পাণ্ডারা ইহাদিগকে দোষ দিবার সুবিধা ও অবসর পাইবেন না। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, কবি সমাজের পক্ষ বা সংস্কারকের পক্ষ—এই দুই পক্ষের কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নাই। তিনি স্বয়ং পদ্যটি দেখিয়াছেন ও তাহাই আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। তাহার নীচে যে পক্ষ আছে, তাহা তিনি খাঁটিতে বসিয়া দান নাই, তিনি দীপশিখাটি দেখিয়াছেন ও তাহাই দেখাইয়াছেন, তাহার নীচে যে ছায়া আছে সে

দিকে তিনি দৃষ্টি করেন নাই। তিনি সামাজিক জটিল সমস্যা, দ্বীপুরুষের অধিকার, নরপ্রকৃতির স্বাভাবিক গতি, ভাবপ্রবণতা অপেক্ষা লোকহিত শ্রেয়, এই সকল বড় বড় প্রশ্ন লইয়া তাহাদের মতের পোষকতার জন্য দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কাব্যের নায়ক-নায়িকা সৃষ্টি করেন নাই। সেই প্রচেষ্টা করিতে যাইয়া বড় বড় লেখকেরা গলদঘর্ষ হইয়া যান, মূর্খ পল্লীকবি সে সকল জটিল বস্তু পরিহার-পূর্বক অকুতোভয়ে সত্যের সহজ পথে চলিয়া গিয়াছেন। যখন ডোমের দ্বী শ্রাম-রায়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল তখন সে বুঝিল তাহার জীবনমরণ শ্রামরায়ের হাতে, যখন রাজকুমারী আধাবধূর বাণী শুনিল তখন সমস্ত জগতের কোলাহল তাহার কাণে পৌছিল না; জগতে সে আর সেই বাণীর স্বর শুধু রহিল। এই ভাবে সত্য ও হৃন্দরকে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করিয়া কব্যক কবি যে ছবি আঁকিয়াছেন—তাহা অতুলনীয় হইয়াছে। এই সকল পল্লীগীতিকা পড়িলে পাঠক একটা অজানিত রাজ্যের হাওয়া পাইবেন, ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দুসমাজের রুদ্ধতার অবরোধের দ্বিভিত বায়ু হইতে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সেই হাওয়া নির্মল ও স্বতঃস্ফূর্ত এবং যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকে নূতন জীবন দান করে। পাঠক স্বতঃই শকুন্তলাদি নাটকের মত একটা স্বাভাবিক স্ফুর্তি ও আনন্দ রস এই গীতিকার পাইবেন। স্বতরাং গুপ্ত ও পাল-যুগের বার্তা এগুলি বে বহিয়া আনিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নব ব্রাহ্মণ্য যুগের ভাবা ও ভাব হইতে ইহা এত পৃথক যে তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। কিন্তু সেই গুপ্ত ও পাল-যুগের কাব্যকথা যেখানে ছিল, এ গীতিকাগুলি আর সেখানে দাঁড়াইয়া নাই। এই গতিশীল ধারা পূর্ববর্তী যুগের খাদে নিজেকে আবদ্ধ রাখে নাই। ইহা সেই যুগের পর আরও অনেক কঠোর মুক্তিকা ভাঙিয়া পূর্ববর্তী যুগকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে। এই সকল গীতিকার প্রেম—সাধারণ কাব্যের উপাদানে নিশ্চিত নহে। এই গীতিকার প্রেমের স্বরূপ,—তপস্তা; ইহার পশ্চাতে হৃৎথকে বরণ করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দান করিবার সঙ্কল্প, এগুলিকে প্রেমের গীতি বলিলে ঠিক হয় না—এগুলি প্রেমতীর্থের তর্পণ। অধিকাংশ নায়িকাই প্রেমবজ্রের হোতা। পৃথিবী ইহাদের নিকট বজ্রবেদী, স্বীয় জীবন বলি দিয়া ইহারা সেই বজ্রবেদীতে হোমাগ্নি জ্বলাইয়া রাখিয়াছে। ইহারা সহস্র ঝঙ্কা, বিপদ, টিটকারী, কলঙ্ক কিছুতেই সেই হোমাগ্নি নিবিত্তে দেয় নাই। ইহারা প্রাচীন কালের আহিতাগ্নি।

অধিকাংশ নায়িকাই প্রেমের তপস্তা করিতে গিয়া শুধু একনিষ্ঠ জীবনপণ ভালবাসা মাত্র দেখায় নাই, প্রতিপদে ইহারা অদ্ভুত উদ্ভাবিনী শক্তি দেখাইয়াছে। মহয়া স্বীয় মৃতপ্রায় প্রণয়ীকে কাঁধে করিয়া পার্শ্বত্যাগে ক্ষতপদে ছুটিতেছে যেন সতীদেহ কাঁধে করিয়া স্বয়ম্ চলিয়াছেন। মহয়াকে যখন তাহার ধর্মপিতা তাহার নায়কের রাজধানী হইতে পলাইয়া

যাইতে বলিলেন, তখন সে অস্বীকার করিল না—যেহেতু সে

মহয়া।

ভাবিয়াছিল, তাহার নায়কের প্রেম বড় মানুষের প্রেম, চোখের

খেয়াল মাত্র, দুই দিনে এ প্রেম জুড়াইয়া যাইবে, তখন প্রণয়ী জাত্ খোয়াইয়া সর্বস্ব হারাইয়া বিপদে পড়িবে, স্বয়ং প্রেমে আকর্ষিত হইয়া আত্মজীবন বিরহ-সম্ভাপ অস্বীকার করিয়াও

সে ধর্মপিতার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অধিশিখা বেক্রপ নিজেকে দগ্ধ করিতে করিতে উচ্চৈ উঠিতে থাকে, সেইরূপ প্রেমে আত্মহারা মহয়া হ্রলজ্য বিপদের উর্দ্ধপথবাত্মা বরণ করিয়া চলিল। কিন্তু সে যে দিন বুঝিল তাহার প্রণয়ীর প্রেম প্রকৃত ও বাঁটা, শুধু একটা চোখের নেশা বা খেয়াল নহে, সেদিন তাহার মুখে যে হাসি ফুটিয়া উঠিল তাহা স্বর্গীয় সুসমা-মাথা। তখন সহস্র বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া সে ঘোড়ায় চড়িয়া পিতৃমেহ তুচ্ছ করিয়া প্রণয়ীর সঙ্গে পর্বতের পথে চলিল। বখন বণিক তাহাকে লুপ্ত করিবার জন্ত শত শত প্রলোভন দেখাইল, তখন সে কপট প্রেমের অভিনয় করিয়া তৎককের বিষ দিয়া সেই স্বামী-হস্তাদিগকে বধ করিল এবং কুঠার দিয়া তাহাদের জাহাজ বিদীর্ণ করিয়া জলে ডুবাইল। কয়েকটি মাত্র মুহূর্তের মধ্যে যেন এক প্রবল ঘূর্ণীবায়ু চলিয়া গেল। সে মুখে প্রেমের কথা বলে নাই, কিন্তু শেষের দিনে পিতাকে বলিল, “তুমি যে সৃজনকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিবে ঠিক করিয়া রাখিয়াছ, তাহা হইবে না। কোথায় সৃজন এবং কোথায় আমার স্বামী! তুমি আমার চক্ষু লইয়া দেখ।”

“সোণার তরুয়া বঁধু একবার দেখ”, “সৃজনের সঙ্গে আমার স্বামীর যে প্রভেদ, জোনাকীর সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রের সেই প্রভেদ।” এই বলিয়া সে ছুরিকা নিজের বুকে বিধাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। পূর্বযুগের নায়িকার কথা আমরা পাইয়াছি, তাঁহারা স্বভাবের পথে চলিয়াছেন, স্বভাবের বশীভূত হইয়া ভালবাসিয়াছেন, মিলনে হাসিয়াছেন, বিরহে কাঁদিয়াছেন। কিন্তু এই সকল পল্লীগীতিকার নায়িকাদের অধিকাংশই জটিল অবস্থার মধ্যে স্বীয় অলৌকিক উদ্ভাবনী শক্তি দেখাইয়া স্বীয় অপূর্ণ ব্যক্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। ইহাদের প্রায় কেহই “স্রোতের শেওলা” নন। ইহাদের সম্বলিত শক্তি, সমস্ত জটিলতাকে প্রতিভাবে দূর করিয়া নিজের তপস্তা উজ্জ্বল করিবার শক্তি অত্যন্ত। ইহাদের মধ্যে প্রেমের নানা লীলা, বসন্ত, শরৎ, হেমন্ত, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুভেদে বিরহ ও মিলনের বিচিত্র চিত্র প্রকৃত যাত্র-মোহিনী-মাথা। ইহারা নদীর মত স্বচ্ছতোয়া নির্মল ও সুন্দর, কিন্তু তাহা বিদেশী সমালোচকদের মত।

ছাড়া আরও কিছু—গঙ্গার মত পবিত্র এবং ঐরাবতদলন-যোগ্য শক্তিশালিনী। এই যে প্রশংসা আমি করিলাম তাহার প্রতিধ্বনি সূদূর সমুদ্রের পার হইতে আসিয়াছে। শ্রীযুক্তা হগম্যান বলিয়াছেন, “নায়িকাগুলি সেরপীয়র ও রেইনীর দ্বীচরিত্রের মত যুরোপের ঘরে ঘরে পঠিত হওয়া উচিত। আমি এবং ম্যাতামসিলা এভিলাইন রোঁলা (রোঁমা রোঁলার ভগিনী) পল্লীগীতিকাগুলি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিতে চাই। প্রায় বিশ্ববৎসর যাবৎ আমি ভারতবর্ষের সাহিত্য পড়িয়া আসিতেছি, কিন্তু হঠাৎ যে এমন অপূর্ণ জিনিষ পাইব, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না।” তিনি প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন, মেটারলিঙ্ক ও ফরাসীর সর্বপ্রধান লেখক বা নায়ক-নায়িকা অপেক্ষা বাঙ্গলা পল্লীগীতির নায়ক-নায়িকারা শ্রেষ্ঠ, ইহাদের সৌন্দর্য্য সর্বকালস্থায়ী, বরং যুগে যুগে সমালোচকগণ ইহাদের নূতন নূতন সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিবেন; একথা একবার উল্লেখ করিয়াছি। ডাঃ স্টেলা ক্রামরিশ ‘মহয়া’ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “আজ তিনদিন যাবৎ মহয়া হোমরা ও নদের চাদের চিত্র আমার মাথায় ঘুরিতেছে। সমস্ত ভারতীয় সাহিত্যে আমি

একপ স্তম্ভর একটি গল্প পড়ি নাই।” ডাঃ সিলভান লেভি লিখিয়াছেন, “মহা পড়িয়া মনে হইল, এই শীতের দেশে থাকিয়াও যেন আমি ভারতবর্ষের বসন্তঋতু উপভোগ করিতেছি। এই কাহিনীর নদের চাঁদ ও মহার প্রেম চিরনবীন আলেখ্যের মত আমাকে আকৃষ্ট করিতেছে।” সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী রোদেনষ্টাইন বলিয়াছেন, “এই নায়িকাগুলি অজন্তাওহার অপূর্ণ নারীচিত্রগুলির যেন জীবন্ত সংকরণ। ইহাদের লীলায়িত ভঙ্গী ও লাস্তের মনোহারিত্ব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।” এ্যামেরিকার লেখক-প্রবর এ্যালেন বলিয়াছেন—“গীতিকাগুলি পড়িয়া মনে হইল বঙ্গদেশ এখনও তাহার বোবন হারায় নাই।” শিক্ষা বিভাগের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর ওটেন সাহেব বলিয়াছেন, “যদি বাদ্যলী এই গীতিকাগুলির আদর করে, তবেই বৃষ্টিব তাহারা উন্নতির পথে যাইবার শক্তি হারায় নাই। সহরের ধোয়ার মধ্যে বাস করিয়া এবং নিরবচ্ছিন্ন শকটের ঘর্ষের রব শুনিয়া কান ঝালাপালা হওয়ার পর হঠাৎ যদি কেহ পদ্মা নদীর অবাধ সৌন্দর্য্য দেখে, তাহাতে যেমন তাহার একটা মুক্তির আনন্দ হয়—এক রাশ কৃত্রিম সাহিত্য পাঠ করার পর এই পল্লীগীতিকাগুলি পড়িলে তেমনই একটা নবজীবনের স্তুতি পাওয়া যায়।”

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা শুধু অহুবাদ পড়িয়া এইরূপ শত শত উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপত্র পাঠাইয়াছেন, তন্মধ্যে সামান্য কয়েকটি ছত্র মাত্র উদ্ধৃত হইল। কাদম্বরী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, সাগরিকা, মালবিকা প্রভৃতি সমস্ত নায়িকাই বোবনে বিবাহ করিয়াছেন। ইহারা নিজে স্বামী মনোনয়ন করিয়াছেন, এমন কি গৌরীদান কথাটাই মিথ্যা। এসম্বন্ধে পল্লীকবিরা কালিদাস, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিদেরই অহুবর্তী। পৌরাণিক নায়ক-নায়িকাদের কোথায়ও গৌরীদান নাই। সাবিত্রীকে দ্রুমৎসেন বরদা দেখিয়া নিজের রথ দিয়া বলিলেন, “তুমি স্বামী মনোনয়ন করিয়া আন।” সত্যবানকে তিনি মনোনীত করিলেন। কিন্তু দ্রুমৎসেন সত্যবানকে অন্নায়ু জানিয়া দ্বিধা বোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সাবিত্রী বলিলেন, “আমি ইহাকে মনোনীত করিয়াছি। ইনি অন্নায়ু হউন, দীর্ঘায়ু হউন, এখন আর সে প্রশ্ন উঠিতেই পারে না, আমি মনে মনেও দ্বিচারিণী হইতে পারিব না।” গৌরীকে কালিদাস প্রাপ্তবয়স্ক্য করাইয়া বিবাহ দিয়াছেন; সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ছায় স্তনভিন্নবকলা গৌরীর অঙ্গ তখন বোবনলাবণ্যে ঢলঢল করিতেছিল। পল্লীগীতিকার নায়িকারাও এই পৌরাণিক চরিত্রদের পঙ্ক্তিতেই বিরাজ করিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় পল্লী-রমণীরা স্বামী মনোনয়ন করায় একটা বিশেষ গৌরব মনে করিতেন। এক পল্লীকবি লিখিয়াছেন—নারীর জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখ ও সৌভাগ্য,—সে বাহাকে মনোনয়ন করিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিতে পারা।

স্বয়ংবর কথাটা এক সময়ে এদেশে খুবই প্রচলিত ছিল, লৌকিক ভাষায় পল্লীবাসীরা তাহা ‘ইচ্ছাবর’ শব্দ দিয়া বুঝাইত। ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবান্বিত নায়িকাদের সঙ্গে এই পল্লীগাধার নায়িকাদের কোন সাদৃশ্য নাই।

এই কাব্যকথাগুলি সেন-রাজগণের পূর্ববর্তী সাহিত্যের ধারা, যদিও অপেক্ষাকৃত

আধুনিক সময় পর্য্যন্ত সেই ধারা চলিয়া আসিয়াছে। মাগধী শিক্ষার উত্তরাধিকারী যে আমরা হইয়াছি তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আমাদের অন্তঃপুরচারিণীদের রূপে আমাদের গৃহদেবতারারূপসী হইয়াছেন। আমরা যে মাঘমাসে সরস্বতীর পূজা করি, তাহা শুভচরিত্রা চন্দ্রাবতীর মত মহিলাদের পদে আমাদের ভক্তির অর্থ্য। দশভুজার মত মহা নানাভাবে কৰ্ম্মশীলা—সেই মহারার মত মহিলারা আমাদের শক্তি ও প্রেরণা দিয়া থাকেন। এজন্ত দুর্গাপূজা আমাদের সার্থক। মল্লার মত গৃহলক্ষ্মী বাহারি দেখিয়াছেন, তাঁহারা কি জিজ্ঞাসা করিবেন, কেন আমরা এত ঘটা করিয়া লক্ষ্মীপূজা করি। এই নাগিকারা এখনও আমাদের ঘরে ঘরে বিরাজিতা। ইহারাই আমাদের মাতা, ভগিনী, সখী ও পত্নী, এই জন্ত বাঙ্গলা দেশ পুরাতন হইয়াও পুরাতন হয় নাই; আমাদের গৃহে দেবনির্ম্মালা এখনও শুক হয় নাই, আশীর্বাদের দুর্কা এখনও সবুজ আছে, ভারতীর কণ্ঠের বিজয়মালা এখনও বাসি হয় নাই।

ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের গৌরীদান এই পল্লীগীতিকা অগ্রাহ্য করিয়াছে। গীতিকথায় সিদ্ধ তান্ত্রিকগণের অদ্বুত কার্য্য, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, দয়া, নিষ্ঠা, ক্রমা প্রভৃতি গুণের দৃষ্টান্তই বেশী। কিন্তু পরবর্ত্তী পল্লীসাহিত্যে প্রেম ক্রমশঃ স্থায় রাজ্য বিস্তার করিয়াছে। জ্ঞান ও ত্যাগমূলক কৰ্ম্ম যে পরিমাণে বেশী সেই পরিমাণে এই পল্লীসাহিত্যে বৌদ্ধ যুগের বেশী সন্নিহিত এবং প্রাচীন। গীতিকথাগুলিই এই সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন, খাটি পল্লীগীতিকাগুলিতে কোন অলৌকিক ঘটনা নাই। তাহা প্রায় সমস্তই পঞ্চ রচিত, তাহাতে কৰ্ম্মমহিমা প্রচুররূপে দেখিতে পাই। কিন্তু এই সাহিত্যে এক পা এক পা গীতিকথা ও পল্লীগীতিকা।

করিয়া প্রেমই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং শেষে মনের অপরাপর সমস্ত গুণ প্রেমের আড়ালে পড়িয়াছে। গীতিকথায়ও প্রেম আছে কিন্তু তাহার সঙ্গে মনের অপরাপর মহাগুণও প্রদর্শিত হইয়াছে। কৰ্ম্মগৌরব এবং ত্যাগে উজ্জ্বল হইয়া দেহী বিদেহী হইয়াছেন এবং সুখদুঃখের অতীত অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। কাজলরেখা ও মালকুমালি হৃদয়ের উচ্চভাবে সম্যক প্রবুদ্ধ হইয়া দেহের সুখদুঃখকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। কিন্তু পল্লীগীতিকায় মীনকেতনের শুভ্র এবং নির্ম্মল পতাকা সকলের উর্দ্ধে উঠিয়া গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপনের ইঙ্গিত করিতেছে।

‘গীতিকথা’গুলি সুপ্রাচীন কিন্তু পল্লীগীতিগুলি তাদৃশ প্রাচীন নহে। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বের গীতিকথা একেবারে নাই বলিলেও অত্যাক্তি হয় না এবং বোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত গীতিকথাই অধিক। ইহাদের রচনা যে যুগেরই হউক না কেন, ইহাদের পূর্ণ মহিমাই এই সাহিত্যিক ধারার প্রাচীনত্ব স্থচনা করিতেছে। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভার স্থাপত্য ও কারুকার্যের বর্ণনা পড়িয়া অস্থম্যান হয় যে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন নিদর্শন না পাওয়া গেলেও তাহা একটা পরিণতি, আরম্ভ নহে, ইঠাৎ একদিনে কেহ সেরূপ শিল্পমহিমার চরমে পৌছিতে পারে না, তাহা যুগযুগের শিল্পচর্চার প্রমাণ। এই গীতিকথাগুলিও সেইরূপ ইহাদের নিজের অন্তর্কর্ত্তী প্রমাণ দ্বারা এই ধারার

প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতেছে। এই পল্লীসাহিত্য ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবযুক্ত সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ভিন্ন-লক্ষণাক্রান্ত ও প্রাচীন, এবং কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, রত্নাবলী, এমন কি মুচ্ছকটিক যুগের আদর্শের অনেকটা অনুরূপ।

ইহাদের রচনার ভাষা পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু অজ পাড়াগাঁয়ের ভাষার শত শত বৎসরেও খুব বেশী পরিবর্তন হয় না। যেখানে বাণিজ্য বা রাষ্ট্রীয় কারণে ভিন্নদেশীয় জনসমাগম হয় না, সেখানে সংস্কৃত, আরবী, ফার্সি, পর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষার প্রভাব প্রাদেশিক ভাষার উপর পড়ে নাই,—বঙ্গের উপাত্তস্থিত সেই সকল দুর্গম অরণ্য-প্রদেশের পল্লীগুলিতে ভাষা অনেকটা অপরিবর্তিত অবস্থায়ই আছে। সেখানে নব নব কচির আক্রমণে

বেশভূষার বেশী পরিবর্তন হয় নাই, সেখানে প্রপিতামহী বেক্রপ
ভাষার কথা।

সাজী পরিতেন, যে কায়দায় চুল বাঁধিতেন, নাতিনী,—কত্কাও সেইভাবে বেশভূষা করিয়া থাকেন। ভাষা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। আজ যদি পাল-রাজত্বের কোন লোক উপস্থিত হয়, তবে কি আমরা তাহার কথা কিছুই বুঝিব না? আমার মনে হয় একটু আয়াস করিলেই পল্লীবাসীরা সেক্ষণের অনেকটা বুঝিতে পারিবে। কেতাবী ভাষার দ্বারা ভাষার স্বরূপ নির্ণয় হয় না। যে যুগে মধুসূদন ‘দন্তোলি-নিষ্কেপি’ ‘ইরশ্বদ-গতি’ প্রভৃতি সংস্কৃত অভিধানানুগ এমন সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা কোন কালে কথিত বাঙ্গলায় কেহ শোনে নাই, সেই যুগে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার ‘ছতুম পোঁচার নক্সা’ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়ের ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’র প্রথমার্ধের ভাষা ও পরবর্ত্তী অংশের ভাষা দুই ভিন্ন যুগের ভাষা। সুতরাং ভাষার প্রাচীনত্ব এবং যুগনির্ণয় করা একটু কঠিন কাজ। আমি মালঞ্চমালার গল্প হইতে একটি উদাহরণ দিব। “পতি হাসে, মালঞ্চ হাসেন, পতি কাদে, মালঞ্চ কাদেন, পতি কথা কয়, মালঞ্চ কথা কন, পতি হাত পা নাড়ে, মালঞ্চ আদরে থেলা দেন। চোখের জল ঢালিয়া মালঞ্চ পতিকে নাওয়ান, মাথার চুল দিয়া পতিকে মুছান, মুখের বাতাস দিয়া পতিকে শুকান, আঁচল খানা দিয়া বেড়িয়া পতিকে বুকের মধ্যে করিয়া বসিয়া থাকেন.....চলিতে চলিতে সেই নিলক্ষের চড়ায় শিশু-স্বামীর মুখে রোদ্দ লাগে, আঁচল দিয়া ঢাকিয়া নেন, বুষ্টি মাথায় পড়ে, বুক দিয়া আবরিয়া নেন, ধূলাবাঁলি উড়িয়া আসে, চুল ছড়াইয়া পাখা ধরেন।” এই কথাগুলি এত সরল ও গ্রাম্য যে বহু শতাব্দীতেও এরূপ ভাষার খুব বেশী পরিবর্তন হয় না।

প্রথম সংস্করণের ভাষা অনেকটা দক্ষিণাবাবু পরিবর্তিত করিয়া এই সংস্করণ করিয়াছেন, ইহা আধুনিক ভাষা, কিন্তু কথাগুলি এত সহজ ও সংক্ষিপ্ত যে পুরাকালের পল্লীর ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালীর গৃহের কথাগুলির একটা তফাত দাঁড়াইয়াছে সন্দেহ নাই, তাহা সত্ত্বেও ইহাতে বঙ্গপল্লীর সুপ্রাচীন সুরটি আছে, অপোগণ্ড শিশুর গায়ে ছবের গন্ধের মত তাহাতে ছল হইবার অবকাশ নাই। এই সুর ব্রাহ্মণ্যযুগের বাঙ্গলা ভাষার কথা বলিবার ভঙ্গী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই সকল গল্প বলিবার বেদী ব্রাহ্মণঠাকুর দখল করিয়া বসিলেন, বর্ণনা করিতে লাগিলেন, “খোরা রজনী, নিবিড় গাঢ় তমস্বিনী—শাস্তা নলিনী” ইত্যাদি।

পল্লীমায়ের স্মৃতি ব্রাহ্মণগণ বদলাইয়া দিয়াছেন সত্য, তথাপি উহা মায়ের ডাকের মত বেথানে শুনি সেই থানেই উহার মিষ্টত্ব আমাদের কানে লাগে—আমরা মুগ্ধ হইয়া পড়াই; উহার মোহ পল্লীমায়ের ডাকের মত আমাদের কাছে ভুলাইয়া রাখিয়াছে।

উপাখ্যানগুলির কতকটি পালরাজত্বের সময়ে প্রথম রচিত হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগে সেই ভাষা রূপান্তরিত হইয়াছে। তথাপি প্রাচীন যুগের সঙ্গে এই ক্ষেত্রে নূতন যুগের একটা পরম ঐক্য আছে, তাহাই বুঝাইতে চাহিয়া এখানে এ সম্বন্ধে এতটা বিস্তারিত আলোচনা করিলাম। প্রাচীন ধারার পরিবর্তন হইয়াছে, তথাপি তাহার গতি ধামে নাই, কিংবা নূতন পথে চলিবার শক্তি হারায় নাই, বরং স্থানে স্থানে দ্রুততর বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ইহাই দেখাইতে যাইয়া আমি পল্লীসাহিত্য-সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিলাম।

আমরা প্রাচীন-কথা-সাহিত্যে তিনটি প্রকারভেদ দেখিয়াছি, ১ম গীতিকথা, উহাতে অধিকাংশই গল্প, মাঝে মাঝে ইহাতে কবিতা আছে, কবিতাগুলির ভাষা প্রায়ই কতকটা প্রাচীন যুগের অনুরূপ। এই গীতিকথাগুলিতে তান্ত্রিক বৌদ্ধযুগের প্রভাব খুব বেশী।

গীতিকথাসম্বন্ধে অলৌকিক গাথা, এবং সিদ্ধ তান্ত্রিকগণের অন্তত কার্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; ইহাদের সঙ্গে গ্যালিক উপগল্পে কথিত ১০ম, ১১শ শতাব্দীর ডুইড্ পুরোহিত সম্বন্ধীয় অলৌকিক বর্ণনার অনেক সাদৃশ্য আছে। আমরা “Folk Literature of Bengal” নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। মালকমালা, কাঞ্চনমালা, পুষ্পমালা, মধুমালা, কাজলরেখা প্রভৃতি উপাখ্যান এই শ্রেণীর।

দ্বিতীয় শ্রেণী পল্লীগীতিকথা। পূর্ববঙ্গগীতিকার অধিকাংশ কথাকাব্য এই শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর আদর্শ খুব প্রাচীন (গুপ্তযুগের) হইলেও যে সমস্ত কাব্য আমরা পাইয়াছি, তাহার কোনটাই ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয় না। প্রেমের জন্ত তপস্বী হইয়া পল্লীগীতিকার প্রাণস্বরূপ—ইহাতে তান্ত্রিকতার দৃষ্টান্ত বিরল—তাই একটিতে আভাস মাত্র পাওয়া যায়, বৌদ্ধ যুগের ত্যাগ এই সকল কাব্যের বড় কথা নহে। ইহাদের মূল স্বর প্রেমের বীণায় বাজিয়াছে। পল্লীগীতিগুলির অধিকাংশই শুধু পদ্মে লেখা। ইহাতে অবটন-বটন-পটীয়সী কল্পনার লীলা নাই, শ্রেষ্ঠগীতিগুলির মধ্যে অলৌকিক কিছু নাই বলিলেই চলে, পার্থিব নিত্য-দৃষ্ট পথে চলিয়া ইহারা আমাদের কাছে স্বর্গের কথা শুনাইতেছে; মলয়া, মহয়া, দেওয়ান মদিনা, কঙ্ক ও লীলা প্রভৃতি বহুকথা এই পল্লীগীতিকার অন্তর্গত।

তৃতীয় শ্রেণীর কথার নাম রূপকথা। ইহা কথাসরিংসাগরোক্ত গল্পগুলির মত। ইহাতে ছেলেদের কোতুলক পূরণ করিবার মত উপাদান যথেষ্ট আছে। ইহা যে কতকাল হইতে এদেশে প্রচলিত তাহা নির্ণয় করা কঠিন। রাজা ও রাজকন্তার কথা, রাজপুত্রের সঙ্গে সদাগর পুত্রের সখ্য, রাজকন্তাকে দস্যু বা রাক্ষসগণ কর্তৃক পাবাণ-গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা এবং বহু অলৌকিক বীরত্ব দেখাইয়া রাজপুত্রের তাহাকে উদ্ধার করা, রূপার কাঠি ও সোনার কাঠি, নৃত্য কলা, বিহঙ্গম-বিহঙ্গমা ইত্যাদি নানা বিষয় এই রূপকথাগুলির আখ্যানবস্তু। এই সকল গল্পের অধিকাংশের মাতৃভূমি বাংলাদেশ। ইহারা সম্ভবতঃ বাংলাদেশ হইতে দ্বাদশ

বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যুরোপে প্রবেশ করিয়াছিল। গ্রীম্-ভ্রাতৃদ্বয় যুরোপীয় প্রাচীন কথাসাহিত্যের উদ্ধার করিয়াছেন, তন্মধ্যে “বিখ্যস্ত জনের গল্পটি” “ককিরচাঁদ ও রূপমালা” নামক অতি প্রাচীন বাঙ্গলা গল্পের ঠিক অনুবর্তী; গোদা, যম ও ময়নামতীর সম্বন্ধে অনুরূপ ও অনুরণকারীর যে ব্যাপার মণিকচাঁদের গানে বর্ণিত আছে, তাহা কার্ডিওয়েন ওইনবাচের গল্পের সঙ্গে মিলিয়া যায়। গলদিগের বেলরের গল্প ঠিক বাঙ্গলা রামায়ণের ভঙ্গলোচনের গল্পের মত। বাঙ্গলার প্রাচীন অলিখিত গল্পভাণ্ডার হইতেই কৃত্তিবাস উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্মমঙ্গলে ইন্দা চোবের কথা এবং বঙ্গীয় রামায়ণের মহীরাবণের নিন্দকাটি প্রয়োগের ব্যাপার এবং “রোজ বাডের” গল্প একরূপ, এইরূপ একটি ছইটি নয়; গ্রীম্ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাচীন বহু গল্পের অতি নিকট সম্বন্ধ। হয়ত আখ্যাত্তে অন্ধ রাজত্বের সময় এই সকল গল্প আখ্যাবর্ত্ত হইতে দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিল। এম. এন. বেঙ্কট স্বামী মহাশয় তামিল দেশের যে সকল গল্প প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ এখনও বাঙ্গলার পল্লীতে প্রচলিত। আমরা যে কয়েকটি রূপকথা সংগ্রহ করিয়াছি তন্মধ্যে ছই তিনটি বেঙ্কট স্বামী মহাশয়ের প্রকাশিত উপাখ্যানের সঙ্গে মূলতঃ একরূপ। বাঙ্গলার রূপকথার একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহাদের অনেকগুলির মধ্যে পাখীকে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। বিহঙ্গম বিহঙ্গমা দিদিমাদের কথিত উপাখ্যানগুলির প্রধান চরিত্র। ইহারা ভবিষ্যদ্বক্তা এবং নায়কনায়িকার বিপদের পূর্বাভাস দিয়া তাহা উদ্ভীর্ণ হইবার উপদেশ দিয়া থাকে। বাঙ্গলার শত শত রূপকথায় ইহাদের বিজ্ঞতার পরিচয় আছে। আমাদের প্রকাশিত কাজলরেখার কাহিনীতেও সর্বজ্ঞ শুকপাখীর ভবিষ্যৎ বলিবার ক্ষমতা দেখান হইয়াছে। বিলাতের “কেইথফুল” জনের গল্প—বাহা লালবিহারীবাবু ও দক্ষিণাবাবু ছই ভিন্ন নামে প্রকাশ করিয়াছেন এবং বাহা পূর্বাঞ্চল হইতে গৃহীত হইয়াছে,—তাহাতে এই বিহঙ্গম-বিহঙ্গমার কথা এমন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যাহাতে উহা যে বাঙ্গলাদেশ হইতেই প্রবাস যাত্রা করিয়া বিলাতী শিশুসম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। আমরা Folk Literature of Bengal পুস্তকে বঙ্গদেশের অনেকগুলি উপাখ্যান ও গ্রীম্ সংগৃহীত বিলাতী কথাসাহিত্যের আশ্চর্য্যরূপ ঐক্য পরিহার ভাবে দেখাইয়াছি; তাহা পড়িয়া The Story of the Sluggards, Rampel Stiles Kin প্রভৃতি গল্প যে বাঁটি বাঙ্গলাদেশের তাহা সহজেই পাঠকের মনে হইবে। যুরোপীয় গ্রাম্য সাহিত্যের বিচারকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, গ্রীম্ ভ্রাতৃদ্বয়-সংগৃহীত গল্পের অনেকগুলিই ভারতবর্ষ হইতে নেওয়া, কিন্তু গল্পগুলির সঙ্গে তুলনা করিয়া বঙ্গদেশে প্রচলিত প্রাচীনতম কথাসাহিত্যের যে আশ্চর্য্য সাহচর্য্য দৃষ্ট হয়—তাহাতে এই দেশকেই সেই সাহিত্যের গুরু আসনে বসাইতে হয়। ‘Folk Literature of Bengal’ পুস্তকে আমি সেই সকল গল্পের সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। স্বর্গীয় লালবিহারী দে এই সকল উপকথার কতকগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দক্ষিণাবাবুপ্রমুখ অনেকে বাঙ্গলার রূপকথা প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলাদেশই রূপকথারই দেশ, এদেশের পল্লীতে পল্লীতে এখনও খুঁজিলে শত শত প্রাচীন রূপকথা আবিষ্কার করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশের

এইসকল মূল্যবান উপকরণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে বা নাইতেছে, সেদিকে দৃকপাত না করিয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গভাষায় ডাক্তার উপাধি লাভের জন্ত ছাত্রগুলিকে বিলাত পাঠাইতেছেন, তাহাদের অধিকাংশই দেশের প্রতি অমুরাগ দূরের কথা, একটা বিরাগ ও বিতৃষ্ণার ভাব লইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। এই ছাত্রদিগকে যদি বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে পাঠাইতেন, তবে তাঁহারা অনেকটা শিখিতে পারিতেন, অন্ততঃ তাঁহাদের পাছে যে খরচ হয় তাহার অনেকটা কমিয়া যাইত, এবং তাঁহারা অখড়িষ বা আকাশকুসুম না আনিয়া সত্যকার কিছু হাতে লইয়া ফিরিতে পারিতেন।

এই উপাখ্যানগুলি সমুদ্র-যাত্রা-নিষেধ সত্ত্বেও কেমন করিয়া কোন্ সময়ে এদেশ হইতে সমুদ্র পাড়ি দিয়া বিলাতে গেল, তৎসম্বন্ধেও আমি আলোচনা করিয়াছি। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইহা ঘটিয়াছিল এরূপ অনুমান হয়। মোঘলগণেরও বহুপূর্বে ভারতবাসীরা গ্রীকদের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। অশোকের সময়ে এই পরিচয় নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হয়—কিন্তু গুপ্তদের সময়েই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ভাবের বিনিময় ও চিন্তাধারার আদান-প্রদান বেশী হইয়াছিল। ইসফের গল্পের অনেকগুলি যে ভারতবর্ষের দান এবং আরব্য উপজাতির মূল ভিত্তি যে ভারতীয় কথাবিদগণ গড়িয়া দিয়াছিলেন তাহা অনেক যুরোপীয় পণ্ডিত প্রমাণ করিয়াছেন; তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন যে পরবর্তী কালে ক্রুসেডের সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাসীরা লড়াই করার উপলক্ষে এক জায়গায় কয়েকদিনের জন্ত জড় হইয়াছিলেন—তখন হয়ত ভাবের আদান প্রদান অনেক পরিমাণে ঘটিয়া থাকিবে। গুজরাট হইতে ১০ সহস্র বংশীবাদক পারস্ত দেশে গিয়াছিল, তাহারা সমস্ত যুরোপ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং তাহাদের বংশধরেরা এখন যুরোপে ‘জিপ্সি’ নামে পরিচিত। ইহারা যে ভারতবাসী, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ইহারা এদেশের কতকগুলি গল্প যে তথ্য চালাইয়াছিল তাহা গুবই সম্ভবপর। মমলিন বাঙ্গলাদেশ হইতে এককালে পৃথিবীর সর্বত্র প্রেরিত হইত। সেই সকল জাহাজের মাঝিরা হয়ত বঙ্গের গল্পগুলি সঙ্গে সঙ্গে বহন করিয়া লইয়াছিল। এইরূপ নানাস্থানে আমাদের গল্পসাহিত্য ভূপর্ধ্যটন সমাধা করিয়া থাকিবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গুপ্ত ও পালযুগের স্থাপত্যের জের

হিন্দুর স্বাধীন যুগের কথা অতীত। এই পুস্তকে আমরা বাঙ্গলাদেশের শিল্পসম্বন্ধে নানা কথার অবতারণা করিয়াছি। সেই ইত্যন্ততঃ বিক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলির মধ্যে আমাদের কয়েকটি অনুমান আমরা এখানে সংক্ষেপে পুনরায় লিপিবদ্ধ করিব। আমরা লিখিয়াছি, গুপ্ত ও



হরগোরা—ষোলশ শতাব্দী, ২৩শ পরগণা।

কাটিকের—এই মূর্তিখানি অতি অগুরু। ইতিহাস নিউজিয়ামের আরকিওলজিকাল শাখার ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় ডাঃ বিমলাচরণ লাহা মহাশয়ের আবেদনক্রমে ইহাতে কয়েকখানি অগুরু দেবমূর্তি সংগ্রহ করিয়াছেন, এই মূর্তি তাহাদের অঙ্কিতম। ডাঃ লাহা মহাশয় এই মূর্তির রক্ষণানি আনার পুস্তকে ব্যবহার করিতে বিয়াছেন। মূর্তির নির্মাণ-কাল দশম-একাদশ শতাব্দী। ইহা পাল-রাজত্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্প-গৌরব ঘোষণা করিতেছে।



হরগোরা—বারিপুর ময়ূরভূজ—দশম শতাব্দী।



স্বামি, ঢাকা টাউন-প্রতাপ, ১০ম শতাব্দী।



বিষ্ণুমূর্তি—২৪শ পুরুষ, একাদশ শতাব্দী।



বিষ্ণুমূর্তি—২৪শ পুরুষ, ১২শ শতাব্দী।



নবগ্রহ—দিল্লীর, দশম শতাব্দী, শিবুজ কালিদাস মন্দির গৃহে স্থাপিত।

পালদের সময়ে হয়ত বাঙ্গলা দেশই মগধের চিত্রকর ও ভাস্কর জোগাইত, এবং এই দেশই বিস্তৃত মাগধ-সাম্রাজ্যের চিত্রশালাস্বরূপ ছিল।

খেজুরাহ, উড়িষ্যা, বিহার, সিংহল, জাভা, কাষোডিয়া, শ্রাম ও বালী প্রভৃতি শিল্প-কেন্দ্রের জগদ্বিখ্যাত প্রস্তর ও ধাতব শিল্পের সঙ্গে বঙ্গীয় শিল্পের যে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহারা অনেক পরিমাণে যে একলক্ষ্যাক্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদের আদর্শ অনেকাংশে এক, এবং পরিভাষা দিয়া বুঝাইতে গেলে বলিতে হয়—ইহারা ‘এক কলমের’ ;—এই কলম বাঙ্গলার ‘কলম’ বলিয়াই মনে হয়।

প্রথমতঃ শিল্পীদের মধ্যে বঙ্গীয় ধীমান ও বীতপাল (পিতাপুত্র) উত্তরবঙ্গের লোক,—তাহাদের প্রতিভা চীন, জাপান, নেপাল ও তিব্বত প্রভৃতি রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া হিমালয়ের উপত্যকায় ও তদন্তরে—এক বিশাল রাজ্যে শিল্পশাস্ত্রের এক নব যুগ আনয়ন করিয়াছিল (অষ্টম-নবম শতাব্দী)। প্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক ডাঃ ষ্টেলা ক্র্যামরিশ্ রূপম্ পত্রিকায় (নং ৪০, ১০৯ পৃঃ) লিখিয়াছেন:—*The art of Bihar and Bengal exercised a lasting influence on that of Nepal, Burma, Ceylon and Java—* (বাঙ্গলা ও বিহারের শিল্প নেপাল, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও জাভার শিল্পের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল)।

বালী-দ্বীপের মূর্তিগুলি ঠিক বাঙ্গলাদেশের মূর্তির ছায়। তথাকার কতকগুলি ধাতব বুদ্ধমূর্তি অবিকল চট্টগ্রামের দেয়াং পাহাড়ের নিকটে প্রাপ্ত ধাতব বুদ্ধমূর্তির ছায়। (নবম ও দশম শতাব্দী, পরবর্তী চিত্র দ্রষ্টব্য)। বালী-দ্বীপের শিলালিপির অক্ষর অনেকাংশে সেই যুগের বাঙ্গলা অক্ষরের ছায়। পাল-রাজাদের সঙ্গে স্বদূর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের রাজত্ববর্গের ঘনিষ্ঠতা ছিল, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। সম্ভবতঃ পাল রাজাদের শিল্পীরা সেই সকল স্থানে সাদরে আমন্ত্রিত হইয়া শিল্পের প্রেরণা দিয়াছিলেন। নালন্দার তাম্রপটে দেখা যায়, সম্রাট দেবপালের সভায় সুমিত্রার রাজার নিকট হইতে রাজদূত আসিয়াছিল। বুদ্ধচরণরেণু-পুত্র প্রাচ্য ভারতে যাবতীয় দেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা আনাগোনা করিতেন, স্মরণ্য প্রবল-প্রভাবান্বিত, ঐশ্বর্যের ভূষণে আসীন পাল-রাজাদের শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য যে সেই সকল দেশকে প্রভাবান্বিত করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীযুক্ত জে. সি. ফ্রেঞ্চ, সি. আই. ই. তাহার “*Art of the Pal Empire*” নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, “*It seems extremely probable, though the point has not yet been definitely established, that the Hindu Art of Java is to be derived from Bengal*” (p. 23)—“খুবই সম্ভব, যদিও এখন পর্য্যন্ত বিষয়টি নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় নাই যে, জাভার হিন্দু-শিল্প বাঙ্গলাদেশ হইতে উদ্ভূত।”

উড়িষ্যা—উড়িষ্যায় গঙ্গাবংশের অধিকারকালে (ষষ্ঠ হইতে বোড়শ শতাব্দী *), বাঙ্গলার

প্রভাব নানাদিকে লক্ষিত হইয়াছিল। বলিতে গেলে চারুকলাক্ষেত্রে ময়ূরভঞ্জ—বাঙ্গলা ও কলিঙ্গের সন্ধিস্থলে, ইহা কলিঙ্গের সর্বোত্তরে এবং বাঙ্গলাদেশের উপাস্তভাগে,—বাঙ্গলাদেশের শিল্পকলার মধ্যে যে অধিকতর বিত্ত্বকতা এবং প্রস্তুতগাত্রে ধাতব শিল্পের স্থায় স্থায় কারুকার্য, বিশেষ অলঙ্কারাদিতে এবং মূর্তিগুলিতে কোমল ভাবের ব্যঞ্জনা, তাহা ময়ূরভঞ্জের শিল্পীরা বাঙ্গলাদেশ হইতে পাইয়াছে, এরূপ অনুমান সহজেই হয়।—

“Artistically Mayurbhanja lies between Bengal and Kalinga (as understood here). It is the northernmost of the Orissan States and borders on Bengal. A greater precision and almost metallic sharpness in details such as jewellery and more emotional physiognomical expression bring it near to the former.”—Stella Kramrisch, Indian Sculpture, p. 112.

ময়ূরভঞ্জে খিচিং নামক স্থানে যে সকল স্বর্গীয় লাভণ্যচ্ছটা ও দেবহাস্তমণ্ডিত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাল-রাজত্বের বাঙ্গালীর বাটালীর প্রভাব স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছে।

ডাঃ ক্র্যামরিস্, বাঙ্গালী শিল্পসম্বন্ধে বলিয়াছেন—“পশ্চিমা শিল্পের সঙ্গে তুলনা করিলে বাঙ্গলা ও বিহারের কাল পাথরের মূর্তিগুলির শাস্ত সমাহিত সুকোমল ভাব-প্রবণতা এবং গাম্ভীৰ্য্য সকলের চক্ষে খুব বেশী করিয়া বাজিবে”—“Executed in black stone the dignified yet sensuous serenity of these eastern images stands in telling contrast to the work of the west.” (p. 112) এবং উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন—

“So it comes about that traces of the Pala and Sena School of Art of Behar and Bengal are noticeable in the subsequent images of Utkala” (p. 113).

সুতরাং দেখা যাইতেছে পাল ও সেনদের বাঙ্গলা-বিহারের শিল্পকলা-দ্বারা উৎকলের শিল্প উত্তরকালে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল।

মিষ্টার জে. সি. ফ্রেক The Art of the Pal Empire of Bengal, (বাঙ্গলার পাল সাম্রাজ্যের কলা-শিল্প) পুস্তকে ৩২ খানি ছবি দিয়াছেন, ইহার সামান্য কয়েকখানি বিহারের—তাহাও সেদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলারই একটি প্রদেশ ছিল। কিন্তু মূর্তিগুলির অধিকাংশই খাস বাঙ্গলাদেশের। মিঃ ফ্রেক বাঙ্গলার মহাস্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—“মহাস্থানের একটা সমুচ্চ ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়া পাল-সাম্রাজ্যের স্বায়ী শিল্পকলার নিদর্শন আছে, চারিদিকে বিলপূর্ণ-সমভূমি—তন্মধ্যে বহু মাইল ব্যাপী উচ্চভূমি পালদিগের কীর্তিচিহ্ন বহন করিতেছে। ইজিপ্টের জন্ত বৎসর বৎসর যে ব্যয় হয়, তাহার শতাংশের একাংশও যদি এই স্থানে খননের জন্ত ব্যয় হইত, তবে কতই না আশ্চর্য্য ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইত!” (৪ পৃঃ)

ফ্রেক সাহেবের পুস্তকে ৩২ খানি ছবি বঙ্গদেশের শিল্পশ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করিতেছে। বগধ ও গোড়ের প্রাধান্ত-যুগে বৃহৎ বঙ্গই শিল্পের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। সেই যুগের মূর্তিগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মুখমণ্ডলের অপার্বিহ কোমলতা ও ওষ্ঠসম্পূটের হাসিরেখা—এবং ভক্তিপ্রেমের প্রেরণা—অপোগও শিল্পের স্বর্গীয় ভাব স্মরণ করাইয়া দেয়।

উহা খেজুরাহ, ভুবনেশ্বর, খিচিং, বালী ও সিংহলের মূর্তিতে একই ভাবে বিদ্যমান। কিন্তু খাস বাঙ্গলায় ঐ সকল কোমল অথচ সংযত,—ভাবপ্রবণ অথচ ধ্যানস্থ,—লীলায়িত অথচ দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ মূর্তির উৎকর্ষ লক্ষ্য করিবার সামগ্রী। আমরা স্থানান্তরে দেখাইব—কাঙ্গড়ার চাকশিল্পের সঙ্গে খাস বাঙ্গলা শিল্পের সখ্য নিকটতম,—ইহার কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণ আমরা নির্দেশ করিয়াছি। ফ্রেন্স সাহেব লিখিয়াছেন:—“When the writer (Mr. French) was in the Punjab Hill-States recently he came across a curious and unexpected echo of the Pal dynasty. There is a strong and continuous tradition that the ruling families in certain States are descended from the ‘Rajas of Gour in Bengal.’ These States are Suket, Keonthal, Kashtwar and Mandi. In the ancient Rajput States tradition has immense force and accuracy. Of Kashtwar it is related that ‘Kahan Pal’—the founder of the State—with a small band of followers arrived in the hills in order to conquer a kingdom for himself. He is said to have come from Gour, the ancient capital of Bengal and to have been a cadet of the ruling family of that place.” (The Art of Pál Empire, p. 19.)

মর্ম্মার্থ:—[ফ্রেন্স সাহেব সম্প্রতি পঞ্জাব পাহাড়িয়া রাজ্যগুলিতে পর্যটনকালে পালবংশসম্বন্ধে একটা আশাতীত অদ্ভুত কথা শুনিতে পান। সেখানে একটা বহুমূল ও দীর্ঘব্যাপী সংস্কার এই যে পঞ্জাবের কয়েকটি রাজ্যের রাজবংশ বাঙ্গলার গোড় রাজবংশের শাখা। সূকেত, কেয়োথল, কাষ্টওয়ার এবং মণ্ডি—এই কয়েকটি স্থানের রাজারা গোড়-রাজবংশীয় বলিয়া লোকের চিরাগত বিশ্বাস। প্রাচীন রাজপুত-রাজ্যগুলিতে এইরূপ কিংবদন্তী ও সংস্কারের মূল্য সমধিক, এবং তাহা বিশ্বাসযোগ্য। তদ্রূপ প্রচলিত প্রবাদ এই যে, কাষ্টওয়ারের রাজগণের আদিপুরুষ “কাহনপাল” একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল লইয়া গোড়দেশ হইতে আসিয়া উক্ত দেশ জয় করেন এবং বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।]

এ সম্বন্ধে আরও অনেকগুলি প্রমাণ আছে, এই পুস্তকে সেনরাজ-প্রসঙ্গে আমরা তাহারও উল্লেখ করিব। এবিষয়ে এখন নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে বাঙ্গালীরাই পঞ্জাবে যাইয়া বহু খণ্ডরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে গভর্নমেন্ট গেজেটিয়ারের উক্তি, মরলা দেবী চৌধুরাণীর প্রবন্ধ, রাখালদাসবাবুর মত এবং ফ্রেন্স সাহেবের উক্তি মিলিয়া যাইতেছে। কাঙ্গড়া উপত্যকায় যে বাঙ্গলার শিল্প প্রবেশ লাভ করিবে, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। এখনও বাঙ্গালীর কীৰ্ত্তি অনাবিস্কৃত,—মধ্যভারতে গোড়-ব্রাহ্মণদের ও দক্ষিণ-ভারতে কঙ্কণ-ভাষাভাষী বাঙ্গালীদের বিশাল উপনিবেশ, গুজরাটে তাঁহাদের কীৰ্ত্তিকাহিনী—মাটাবান ও সিংহল-বিজয় প্রভৃতি প্রসঙ্গ ইতঃপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এখন কুপমজুকে পরিণত বাঙ্গালী জাতি যে এক সময়ে দূরদুরান্তরে যাইয়া রাজ্য জয় করিত তাহা কালে

দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইবে। বাঙ্গালী বৌদ্ধ শিক্ষাদীক্ষা ও কলাশাস্ত্রের নৈপুণ্য ও কৃতিত্ব লইয়া এক সময়ে এশিয়ার সর্বত্র যাতায়াত করিত—তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে।

এখনও বাঙ্গলার কুটিরশিল্পের অজস্র নিদর্শন ও মৌলিকতার প্রমাণ দেশময় ছড়াইয়া রহিয়াছে। একপ অধিক পরিমাণে শিল্পনিদর্শন আখ্যাবস্তের আর কোথাও আছে বলিয়া আমরা জানি না। একজাই আমরা এদেশকে মাগধ ও গৌড়-সাম্রাজ্যের চিত্রশালা আখ্যা দান করিয়াছি। শ্রীযুক্ত মুকুল দে মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—অজস্র অনেক চিত্রকরই বাঙ্গালী ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও অপরাপর লেখকেরা অনুমান করিয়াছেন—‘জাভার বরোবদর মন্দিরে যে সকল অপূর্ণ শিল্পনিদর্শন আছে, তাহা বাঙ্গালী ও কলিঙ্গবাসীদের কীর্তি। কলিঙ্গদেশের শিল্পকলা যে বাঙ্গালীর আদর্শ-দ্বারা বহু পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, তাহা আমরা লিখিয়াছি।

নানা কারণে আমরা সমুদ্রযাত্রা নিষেধ বিধিবদ্ধ করিয়া গত ৫৬ শত বৎসর যাবৎ বীর প্রদেশের ক্ষুদ্র গভীর মধ্যে কুণমণ্ডুক সাজিয়াছি। কিন্তু প্রাচীনকালে সমুদ্রোপকূলবর্তী তমলুক ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান বন্দর ছিল। এই স্থান হইতে বাঙ্গালী জগতের নানাস্থানে বাইরা উপনিবেশ করিত। খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দী বঙ্গীয় সভ্যতা ও জগজ্জয়ের সুবর্ণযুগ। কিছু পরে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, জৈনতীর্থঙ্করেরা কিছুকাল পূর্বে হইতেই বঙ্গের পার্শ্বনাথ পাহাড় (সমেতশেখর) তাঁহাদের প্রধান কর্মক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে বঙ্গের দুর্দান্ত—হুলাল ছেলে বিজয়ের সিংহলে অভিযান। অমূল্য বিত্তাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—একজন বাঙ্গালী বীর খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে আনাম রাজ্যে গমন করেন। তাঁহার নাম লাকলঙ (Laklong)। ইহার মাতৃকুল নাগবংশীয় ছিলেন। আনাম দেশের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, ইনি তদেশীয় রাজাকে বিতাড়িত করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তথায় ‘উকি’ নামক এক রমণীকে বিবাহ করিয়া তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। আনাম দেশের নাম তিনি বনলঙ্গ রাখেন। তথাকার রাজবংশীরেরা বন বা বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। ইহারা খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক পর্য্যন্ত আনামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুপণ্ডিত জেরিনি ও অপরাপর পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনি বঙ্গদেশ হইতে আনামে গিয়াছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, নাগপূজক কয়েকটি জাতি বাঙ্গলা হইতে এবং ভারতের উত্তরাঞ্চল হইতে তামিলকম্ দেশে যায়। ইহাদের মধ্যে মরগ, চের, ও পাঙ্গলা উল্লেখযোগ্য। চেরগণ উত্তর-পশ্চিম পাঙ্গলা হইতে দক্ষিণ ভারতে যায়। সেখানে বাইরা তাহারা চেররাজ্য স্থাপন করে। পাঙ্গলা যে বাঙ্গলা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে (রাখালদাস বাঙ্গলার ইতিহাস দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)। “বাঙ্গলার বর্তমান অধিবাসিগণের সহিত দ্রাবিড় ভাষাভাষী আদি অধিবাসিগণের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ইহার প্রমাণ প্রাচীন দ্রাবিড় সাহিত্যে পাওয়া যায়” (বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় পঃ, ২৬ পৃষ্ঠা)।

বাঙ্গালীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে
উপনিবেশ।

“সিংহলের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিজয়সিংহ নামক বঙ্গদেশীয় কোন রাজপুত্র সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।বিজয়সিংহ নাম অনাথা নহে, স্মতরাং তাঁহার জন্মের পূর্বেই বঙ্গ-মগধের অধিবাসিগণ আৰ্য্যজাতীয় আচার-ব্যবহার ও ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন” (ঐ, ২৪ পৃষ্ঠা)।

ইহা ছাড়া মাটাবানে বাঙ্গালীর উপনিবেশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। আমরা এই পুস্তকে গুজরাটে বাঙ্গালী “তাগা ব্রাহ্মণ”দের বিস্তৃত উপনিবেশ এবং বাঙ্গলার অপর্যাপ্ত জাতির তথ্য বসবাস-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি (৭০-৭১ পৃঃ)। সিংহল কলম্বো-প্রবাসী শ্রীযুক্ত জগদীশ্বরম্ প্রমাণ করিয়াছেন, দক্ষিণ কাণাডায় গোণ্ডা ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালী এবং তাঁহাদের ভাষা (কঙ্কণীভাষা) বাঙ্গলা ভাষারই কথিত রূপ ভিন্ন কিছুই নহে, (৮৮ পৃঃ)।

জাভা, বালী, কাষোডিয়া, শ্রাম প্রভৃতি দেশের ইতিহাস খুঁজিলে বাঙ্গালীর অসংখ্য কীর্তিচিহ্ন আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা। আমরা নিজেদের কথা নিজেরা লিখিয়া রাখি নাই। এদেশে এমন একটা যুগ আসিয়াছিল যে, পার্শ্ববর্গ গৌরবকে আমাদের ব্রাহ্মণগণ অতীব উপেক্ষার সহিত দেখিতেন। ইহাদের চেষ্টায় এদেশের ইতিহাস লোপ পাইয়াছে। গত পাঁচশত বৎসর দেবলীলা ও ধর্মকথা বর্ণনা করাই আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য মনে করিয়াছি। রোমানদিগের দেখাদেখি গুপ্তগণ তাঁহাদের মুদ্রায় নিজেদের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করিতেন, কিন্তু তৎপরে পুনরায় দেবমূর্তি অথবা ধর্ম-চিহ্নই মুদ্রায় অঙ্কিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত কারণে এশিয়ার নানা দেশে যে সকল ঐতিহাসিক উপকরণ উপেক্ষিত হইয়া আছে, তাহার আবিষ্কার হইলে বঙ্গের ইতিহাসে নূতন আলোকপাত হইবে।

গুপ্ত ও পালরাজ্যগণের সময়ে বাঙ্গালী জগতের সমস্ত দেশে যাতায়াত করিত। বাঙ্গালীর যে রণতরীর কথা মহাভারতে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়, তাহা এক সময়ে জগজ্জয়ী হইয়াছিল। বঙ্গের পল্লীবাসীরা সেই যুগের বাঙ্গালীর অদম্য সাহস, জীবনোৎসর্গ, তপস্তা, নানা দেশে পর্যটন, অসম-সাহসিকতা, বীর্য্য ও “মঙ্গের সাধন কিংবা শরীরপতন”—তপঃসিদ্ধির এই সাধনার সঙ্কল্প নানা উপকথা, রূপকথায় কল্পনার অতিরঞ্জন দিয়া বহুবিধ প্রবাদ ও গল্প রচনা করিয়াছিল, তাহারই ছিটাকোঁটা আমরা পূর্বকথিত পল্লীগীতিকায় পাইয়াছি।

হিন্দুর স্বাধীন যুগের কথা অক্ষুরন্ত। বাঙ্গলাদেশে সে রাজত্বের শেষ হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গের পল্লীর হৃদয়কে কেহ পরাজয় করিতে পারে নাই। যে শিক্ষাদীক্ষা এককালে এদেশকে “সকল দেশের সেবা” করিয়াছিল, এখনও বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সেই শিক্ষার হৈমন্তিক ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই গুপ্ত ও পালবংশের কথার সঙ্গে আমাদের দেশের এখনকার কথা অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে। আমরা সেই যুগকে বাদ দিলে নিজের স্বরূপ আবিষ্কার করিতে পারিব না। বঙ্গের নগর যুগে যুগে বিকটভাবে পরিবর্তিতরূপে দেখাইয়াছে,—ধূতি ছাড়িয়া একযুগে বাঙ্গালী পায়জামা ও আলখাল্লা পরিয়াছে,

মাতৃভাষা ছাড়িয়া পারসী, পর্তুগীজ, ইংরেজী পড়িয়াছে; হাত ছাড়িয়া কাঁটা চামচের সাহায্যে ভাত-তরকারী খাইয়াছে, চন্দন ও অগুরু ফেলিয়া আতর এবং শেষে এসেন্সের শিশি লইয়া ব্যস্ত হইয়াছে, কাজল ছাড়িয়া সূর্য্য, অলঙ্কার ছাড়িয়া মেন্দী ধরিয়াছে, টাকি কাটিয়া মোরছা পরিয়াছে এবং খড়ম ছাড়িয়া লাটুদার জুতা পরিয়াছে, আবার ইংরেজীর আমলে সে পাগড়ী আর নগরবাসীর মাথায় নাই, তৎস্থানে সোলার টুপি শোভা পাইতেছে; গলার শৈতা ও কঙ্কীর জায়গায় নেকটাই, উপানহ ও জুতার জায়গায় বুট, প্রণাম ও কুর্নিশের জায়গায় টুপিখোলা, করজোড়ের জায়গায় করমর্দন—পারসীর জায়গায় ইংরেজী বুলী—যুগে যুগে বহুপীর জায় এদেশের নাগরিকগণ এই ভাবে বেশ পরিবর্তন করিতেছে।

কিন্তু সহর ও নগরে যেসকল গানের উজান ও ভাঁটি, উলট-পালট ও পরিবর্তন, বঙ্গের পল্লীতে তাহা নাই। বঙ্গের পল্লী সেদিনও ছিল আম, জাম, কাঁঠাল-তরুর ছায়াশীতল, সেখানকার কুঁড়ে ঘর গোময়লিপ্ত, অতি পরিচ্ছন্ন আঙ্গিনা, সেদিন পর্য্যন্তও তাহাতে একটা ছুঁচ পড়িলে রাত্রে কুড়াইয়া তুলিতে পারা বাইত; কারণ সেখানে বাঙ্গলার ঋতুভেদে সোনার ফসল আনিয়া মজুত করা হইত। * সেদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলার মন্দির কারুকাব্য-মণ্ডিত ছিল, সেখানে দেবতার নিত্যভোগ পাইতেন, প্রসাদ পাইবার জন্ত ছেলে-বুড়ো জড় হইত, সেখানে অতিথি ফিরিত না। মেয়েরা চরকা ছাড়িত না, তাহাদের সমস্ত শিল্পনৈপুণ্য দিয়া যে সন্দেশ তৈরী করিত, তাহাতে ফুল ও ফলের সমস্ত শোভা প্রদর্শিত হইত, তাহাদের সেলাই এক একখানি কাঁথা পারস্তের কার্পেটের মত হইত। তাহাদের আলপনা ও পিঁড়ী-চিত্র দেখিলে লোকে মুগ্ধ হইয়া তাকাইয়া থাকিত। তাহাদের শিকা, পানের বাটা, পুঁথির লাঠি দেখিয়া সকলে বিমোহিত হইত। পল্লীর স্বত্বধর কাঠের মধ্যে যে সকল সূক্ষ্ম কার্য্য করিত, তাহাতে কারুশিল্পের পরা কাঁঠা প্রদর্শিত হইত। পল্লীর চিত্রকর যে সকল ছবি আঁকিত এবং পল্লীর মিস্ত্রি পোড়া ইটের উপর যে সকল ফুল লতা ও নরনারীর মূর্তি উৎকীর্ণ করিত এবং পুঁথির মলাটে যে ছবি আঁকিত তাহার বিস্ময়কর সৌন্দর্য্য দেখিয়া এখনও লোকে মুগ্ধ হইয়া থাকে; পল্লীর হালুইকরের হাতে মিছুরির খেলনা, নারিকেলের সন্দেশের মঠ, গৃহ, জীবজন্তু নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া ছবির মত সাজানো থাকিত, সেই নারিকেলের শাঁস দিয়া এরূপ ময়ূর গঠিত হইত, যাহার ডানা পাখা ও লেজে ইন্দ্রধনুর বিচিত্রবর্ণ খেলা করিত। মোর্যা, গুপ্ত ও পাল-রাজত্বকে স্মরণ করাইয়া দিবার মত শিল্প-সম্ভার গ্রামবাসীরা আয়ত্ত করিয়াছিল, তাহা হিন্দুর সভ্যতার বিচিত্র আসবাব ও ধারা বজায় রাখিয়াছিল। তাঁহারা ই জগজ্জয়া কীর্ত্তনগানের স্রষ্টা, গ্রামের টোলের পণ্ডিতগণ সর্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া জগদগুরু উপাধি লাভ করিতেন এবং নটগণ নর্ত্তনে এরূপ চিরাগত পটুতা প্রদর্শন করিত যে গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের মত পণ্ডিত ও সমালোচক সেই নর্ত্তনের ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছেন। তিনি সমস্ত যুরোপীয় নৃত্য ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন এবং বলিয়া থাকেন যে বঙ্গের পল্লীর রাইবেশে, বাউল, জারি, দশাবতার নৃত্যের যেরূপ বিজ্ঞানামুগ্ধ অঙ্গভঙ্গী ও সৌষ্টব্য—তাহাতে ইহাদের এই নৃত্য জগতে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য,

এবং ইহা সেই প্রাচীন শিবতাম্র ও মহাভারতীয় যুগের বৃহৎলার নাট্য-দ্বারা বজায় রাখিয়াছে।

বড় বড় স্থাপত্য ও অপরাপর কলাশিল্পে ভারতের স্থান পূর্ববর্তী ছিল। এ সকল শিল্প রাজ্যভূগোলে শ্রীসম্পন্ন হয়। যুধিষ্ঠিরের যে রাজসভা ময়দানব নির্মাণ করিয়াছিল, চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীর যে ঐশ্বর্য, কারুকার্য ও স্থপতিবিজ্ঞার পরা কাণ্ডা দেখিয়া গ্রীকদূত মেগাস্থেনিস উহা পারস্তের বিশ্ববিশ্রুত রাজধানীর গৌরবকেও হীন মনে করিয়াছিলেন, অশোকের যে বিশাল রাজপুরীর ভগ্ননিদর্শন দেখিয়া স্থপতিবিজ্ঞাবিশারদেরা সেই পুরাকালে একপ শিল্পদক্ষতা কিরূপে হইল সেই সমস্তা পুরণ করিতে অক্ষম হইয়াছেন, নালন্দার ভগ্ন মন্দিরাদির যে কারুকার্য দেখিয়া কানিংহামের মত শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলিয়াছেন, জগতে তিনি সেরূপ স্থাপত্য ও চারুশিল্পের একরূপ বিরাট নিদর্শন কোথায়ও দেখেন নাই, মথুরার সমৃদ্ধি ও স্বর্ণ-রৌপ্যের অসংখ্য দেবমূর্তির যে আশ্চর্যগঠনপ্রণালী ও শিল্প-কৃতিত্ব দেখিয়া মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা ছাড়া ইলোরা-অজন্তার অপূর্ণ স্থাপত্য ও চিত্রশালা—দূর যবদ্বীপে বিরাট বরোবদর মন্দির—বহু দৌরাভ্যা, ধ্বংস ও ক্ষয়ের পরও এই যে ভারতীয় কলাশিল্পের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নাবশেষ ও নমুনা (ও তৎসম্বন্ধে বিদেশীয়দের মতামত) পাওয়া বাইতেছে—সেই অদ্বুত শিল্প ও স্থাপত্য পরাদীন ভারতবর্ষে অসম্ভব। গুপ্তীর পুরস্কার, স্থাপত্যের অসামান্য ব্যয় ও মুক্তহস্ত উৎসাহ, যে সকল না হইলে এক্ষেত্রে তরূপ অপূর্ণ সফলতা অসম্ভব হয়—রাজচক্রবর্তী ভিন্ন তাহা শিল্পী কোথায় পাইবে? রাজরাজ্যেশ্বরগণ শিল্পীকে বলিতেন যতটা ভাল হয় তাহা কর—যেখান হইতে যে উপকরণের দরকার সংগ্রহ কর—রাজভাণ্ডার তোমার জন্য মুক্ত হইল। সেই অকাতর ও অকুণ্ঠ দানশীলতার শিল্পীর বাহতে বিশ্বকর্মার ক্ষমতা আবির্ভূত হইত। ইতিহাসে পাইতেছি, এদেশের কোন শিল্পী শক্তি থাকিতেও মন্দির-নির্মাণকালে তাহা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করে নাই এই অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। রাজকোষ, রাজ-পারিতোষিকের মতই অবাধ ছিল। কোথায় গেল কুমারপালের মন্ত্রী বৈষ্ণবদেবের সেই প্রাসাদ, যে প্রাসাদের উর্দ্ধে জীবন্ত সিংহের ছায়া এক স্বর্ণসিংহমূর্তি এমনই ভাবে দাঁড়াইয়াছিল বাহা দেখিয়া মনে হইত দেবীর বাহন সত্যসত্যই স্বর্গ হইতে ভূতলে নামিতেছে, যে বিরাট সিংহ পালরাজাদের বহু-শতরাজার মাথার স্বর্ণমুকুট ভাঙ্গিয়া গড়া হইয়াছিল। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি—সিঙ্গানপুর প্রভৃতি গুহাচিত্র ও হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কারের পর এই সিদ্ধান্ত স্থির নির্ণীত হইয়া গিয়াছে যে ভারতের আদিম অধিবাসীরা স্থাপত্য ও চারুশিল্পে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। পাঁচ-সাত হাজার বৎসর পূর্বে যে সকল হস্তা, পশুপক্ষী এবং নরমূর্তি নির্মিত হইয়াছিল, তাহাতে একথাটা প্রমাণিত হয় যে আর্যগণ কোন শিল্পসংস্কার ভারতে আনেন নাই। তাঁহারা এদেশের আদিম সভ্যতা হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অজন্তা গুহা, খেজুরাহ প্রভৃতি স্থানে আমরা রমণী-মূর্তির যে সকল লীলায়িত ভঙ্গী পাই, জীবজন্তুর প্রতিকৃতি দেখিতে পাই, তাহা সেই আদিম

শিল্পকলার বিকাশ। আৰ্য্যগণ এইজন্ত বোধ হয় বাহ্য ঐশ্বৰ্য্যের যে সকল বর্ণনা দিয়াছেন তাহা দানব রাক্ষস প্রভৃতির বিজ্ঞা—এই ভাবের একটা ইঙ্গিত দিয়াছেন। অযোধ্যাপুরীর যে বর্ণনা, তদপেক্ষা লঙ্কার বর্ণনা শতগুণ সমৃদ্ধিসূচক।

যুধিষ্ঠিরের রাজসভা ময়দানব রচনা করিয়াছিলেন। আদিম অধিবাসীদের নিকট হইতে আৰ্য্যগণ যে স্থাপত্য ও চাক্ষুশিল্পের অনেকটা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আৰ্য্যগণ এই শিল্পচর্চায় আধ্যাত্মিকত্ব দিয়াছেন, এরূপ কথাও আর বলা চলে না। মহেঞ্জোদারোতে শিবমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। এই শিব যে প্রথমতঃ আৰ্য্যগণের দেবতা ছিলেন না, তাহার প্রমাণ অনেক শাস্ত্রেই আছে। দক্ষ তাঁহাকে কন্যা দান করিলেও তিনি দেবতার পঙ্ক্তিতে স্থান পান নাই। কেহ কেহ বলিতেন যখন আৰ্য্যগণ শিবকে স্বীকার করিয়া লইলেন তখন তাঁহাকে আধ্যাত্মিক গৌরব প্রদান করিয়া সৰ্ব্বনমস্ত্র দেবাদিদেব করিয়া তুলিলেন। ভারতীয় আৰ্য্যগণ এই আধ্যাত্মিকতার ছাঁচে তাঁহাদের সমস্ত সভ্যতাকে মণ্ডিত করিয়াছেন। বাহিরের অবয়ব-গঠনাদিতে তাঁহারা আদিম অধিবাসীদের সহায়তা পাইয়াছেন, কিন্তু যে ভাবচ্ছন্দে তাঁহারা সমস্ত মূর্তি গড়িয়াছেন, বুদ্ধদেবের মুখে অশেষ শাস্তি ফুটাইয়াছেন, শিবের মুখে প্রসন্নতা আঁকিয়াছেন, কৃষ্ণের মুখে প্রেমের লাবণ্য দিয়াছেন, ভগবতীর সাক্ষাৎ মাতৃমূর্তি অমূর্তব করিয়াছেন, এমন কি পশুপক্ষী, ফুলপল্লব এ সমস্তই একটা মহৎ ভাবানুগ করিয়াছেন, তাহা যেমন সাহিত্যে, যেমন দর্শনে, তেমনই চাক্ষুশিল্পে আৰ্য্যগণের বিশেষত্ব। কিন্তু এ সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠিয়াছে। মহেঞ্জোদারো ও পাহাড়পুরেও আধ্যাত্মিক গৌরবমণ্ডিত মূর্তি পাওয়া যাইতেছে। আৰ্য্য ও অনাৰ্য্য সভ্যতা-সম্বন্ধে এখন নানা দিক্ দিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভক্তি ও প্রেম তামিলদিগের দান বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন। আৰ্য্যগণ শিল্প ও স্থাপত্য কতটা শ্রীসম্পন্ন করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা অনাগত যুগে হইবে। মহেঞ্জোদারোর ধ্যানস্থ দেবমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি; কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, তামিল-সভ্যতা হইতে হিন্দুরা আধ্যাত্মিক গুণবিজ্ঞা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গলা দেশে যে সকল স্থাপত্য ও শিল্পের চিহ্ন ছিল, তাহার অনেকগুলিই মুসলমানের দৌরাত্ম্যে ধ্বংস পাইয়াছে। সম্প্রতি পাহাড়পুর হইতে যে সকল ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহাতে গুপ্তযুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, এমন কি মৌর্য্যযুগের একখানি তাম্রপটও নাকি অধ্যাপক ভাণ্ডারকার মহাশয় তথায় দেখিয়াছেন। পাহাড়পুর রাজসাহী জেলার, শিয়ালদহ হইতে রওনা হইলে সান্তাহারের পর দুইটি স্টেশন ছাড়িয়া জামালগঞ্জ স্টেশনে নামিলে পশ্চিমদিকে তিন মাইল দূরে পাহাড়পুর পাওয়া যাইবে। Report of Archaeological Survey in 1925-26 পুস্তকে পাহাড়পুরের ভূপ-খননের বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই ভূপে গুপ্তযুগের ১৬খানি প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি বালগোপালের যমলাজ্জুন ভাস্কর্য্যের চিত্র। ঐ ছবি বৃহৎবৃক্ষ শিশুকৃষ্ণ বলীলাক্রমে ভাস্করিতেছেন—এখানে তিনি লীলাময়—কোন দ্রুত কার্য্য-সম্পাদনের ভাব

মুখেচোখে ফোটে নাই, সমুদায় পদ্মদল ভাঙ্গিবার মত কৃষ্ণের সহজ, সুন্দর মোহন ভাব,—
বাল্মীকী চিত্রকরের বৈশিষ্ট্য এখানে; দেবতার কাছে পাহাড়-পর্বত ভাঙ্গাও বাহা, লীলা-
কমল লইয়া খেলা করাও তাহাই; বালগোপালের লাভণ্য ঢল ঢল চিত্রখানি বাল্মীকীর ভাবী
মাধুর্য্যসের পরিণতির পূর্বসন্ধান দিতেছে। পাহাড়পুরের রাধাকৃষ্ণের ছবি গুপ্তরাজত্বের
প্রথমভাগের, তাহার মধ্যেও অপূর্ণ কমনীয়তা আছে। এই লাভণ্যপূর্ণ কমনীয়তা বাল্মী-
কলমে বাল্মীকীর নিজস্ব; যেখানে যেখানে বাল্মীকী গিয়াছে—সিংহল, আসাম, কাশ্মিড়িয়া,
জাভা, বালী, শ্রাম—সর্বত্রই এই কমনীয়তা তাঁহার লইয়া গিয়াছে। মেয়েদের ও
নায়েকের নানারূপ নর্ত্তনশীল ভঙ্গী পাহাড়পুরের মূর্তিতে ফুটিয়াছে—উত্তরকালে
খেজুরাহ ও ভুবনেশ্বরের অপূর্ণ নরনারী-মূর্তির স্মৃতি ইহাতে দৃষ্ট হয়। মৃন্ময় অদ্বুত
সন্ন্যাসিমূর্তি এবং বানর, সিংহ প্রভৃতি—বেশ দক্ষতার সহিত গঠিত হইয়াছে। চতুর্দশ
পোড়া ইটের (terracotta) উপর শ্রেণীবদ্ধ মূর্তি—বাল্মীকীর এই মন্দির-গাত্রে চাক্ষুশিল্পের
বিশেষত্ব, পরবর্ত্তীকালে উহা খুব শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন যুগের চিত্রপদ্ধতি
এই বিশ্বকর বিহারের গাত্রে দৃষ্ট হয়। নানারূপ পুষ্পের মধ্যে ‘পদ্মেরই প্রতিপত্তি
অধিক’ উহা বৌদ্ধদের পদ্ম-প্ৰীতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—অজস্ররও পদ্মই ফুলগুলির
মধ্যে সর্কাপেক্ষা বেশী। এই বিহারের নিয়ন্ত্রণে অনেক হিন্দুদেবদেবীর মূর্তি আছে।
উত্তরের মন্দিরটি সর্কাপেক্ষা বড়, ২৭ ফুট লম্বা, ২৩ ফুট ৫ ইঞ্চি চওড়া। এই
স্তূপ-খননে দীঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় (স্বয়ং রাজপুত্র) রাজপুত্রের মতই মুক্ত-
হস্তে ব্যয় করিয়াছেন, বঙ্গদেশে এরূপ আরও বহু স্তূপ আছে—কে তাহা খনন করিবে?
সুন্দরবন প্রভৃতি স্থানে বহু প্রাচীন স্তূপ দৃষ্ট হয়, অভিযাপ্রস্তু বঙ্গের ইতিহাস-লক্ষী সেই
সকল স্তূপের অতলতলে বসিয়া অশ্রবর্ষণ করিতেছেন। কে তাঁহাকে উদ্ধার করিবে?
পাহাড়পুরে প্রাপ্তমূর্তিগুলির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের লীলা ও গোচারণরত রাখালদের দৃশ্য প্রমাণ
করিতেছে যে, রাইকাহ্ন এদেশে বহু প্রাচীন কালের আরাধ্য। দীক্ষিত মহাশয় মহাস্থান-
গড় হইতে আর একখানি লিপিস্কৃত প্রস্তর পাইয়াছেন। তাহা মৌর্য্যযুগের ব্রাহ্মীলিপিতে
লিখিত।

এই সমুদ্র-সিকতা-ভূমি গাঙ্গেয় উপত্যকার পাথরের গৃহ ও বিগ্রহ প্রস্তুত করা
সহজ নহে। বহুদূর হইতে বহু ব্যয়ে প্রস্তর আনিতে হয়। সুতরাং যখন বহু কষ্ট ও ব্যয়-

নির্ম্মিত বিগ্রহ ও মন্দির অত্যাচারীরা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল,
বঙ্গদেশে প্রস্তরশিল্পধ্বংস।

তখন প্রস্তরের ব্যবসায়টি একেবারে ধ্বংস পাইল। প্রস্তর-দ্বারা
গৃহ কি মন্দির গঠন করিতে এদেশে অনেক সময় লাগিত, রাতারাতি কিছু হইবার উপায়
ছিল না। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সংবাদটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িত এবং কালাপাহাড়ের দল
তাহা ভাঙ্গিবার উদ্দেশে অভিযান করিত। বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে, বধা বাঁকুড়া
জেলায় হাঁড়মাসরা গ্রামে (৬ ধর্ম্মদাস রায়ের বাড়ীতে) এরূপ দেখা যায় যে মন্দির
সম্পূর্ণ না করিয়াই মুসলমান-অভিযান হেতু শিল্পীরা অর্দ্ধসমাপ্ত কাজ ফেলিয়া পলাইয়া

গিরাছে। প্রস্তরশিল্প এইভাবে উঠিয়া গেল। যোগলদের সময়ে কোন হিন্দু প্রজা সম্রাটের বিনা অনুমতিতে এমারত তুলিতে পারিত না। পূর্বে সোনা, রূপা ও মণিমালিকা দিয়া বিগ্রহ গঠিত হইত, কিন্তু তাহা কিছুমাত্র নিরাপদ ছিল না। এজন্ত বাবতীয় মূর্তি গঠন করিয়া যেনতেন প্রকারে কোনরূপে পূজা সমাধা পূর্বক তাহা বিসর্জন করা হইতে লাগিল। সুতরাং শুধু উৎসাহের অভাব নহে, অমানুষিক অত্যাচারে এদেশের শিল্প ধ্বংস পাইতে বসিল।

কিন্তু এই ভাবপ্রবণ শিল্প ও অপরাপর সুকুমার কলাবিজ্ঞার প্রতি অহুঃস্বাস এদেশবাসীর মজাগত। বাজারে যে শিল্পের চাহিদা কমিয়া গেল, তাহা কুটিরে স্বীয় মহিমা বিস্তার করিল। লক্ষ্যে আট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অসিত হালদার অজস্তা-সবন্ধে লিখিয়াছেন, “আশ্চর্যের বিষয় অজস্তার ছবির মধ্যে আমরা বাঙ্গলা দেশের প্রচুর আভাস পাই। প্রথমতঃ আমরা গুহার নিকটবর্তী দ্রবস্তী গ্রামে বেড়াতে গিয়ে যত কুটির দেখেছি, সবগুলিই মাটির ছাদ, অজস্তার ছবিতে অবিকল বাংলার খড়ে ছাওয়া আটচালা। সে দেশের লোক নারকেল গাছ চোখে দেখেনি, কিন্তু ছবিতে নারকেল গাছ

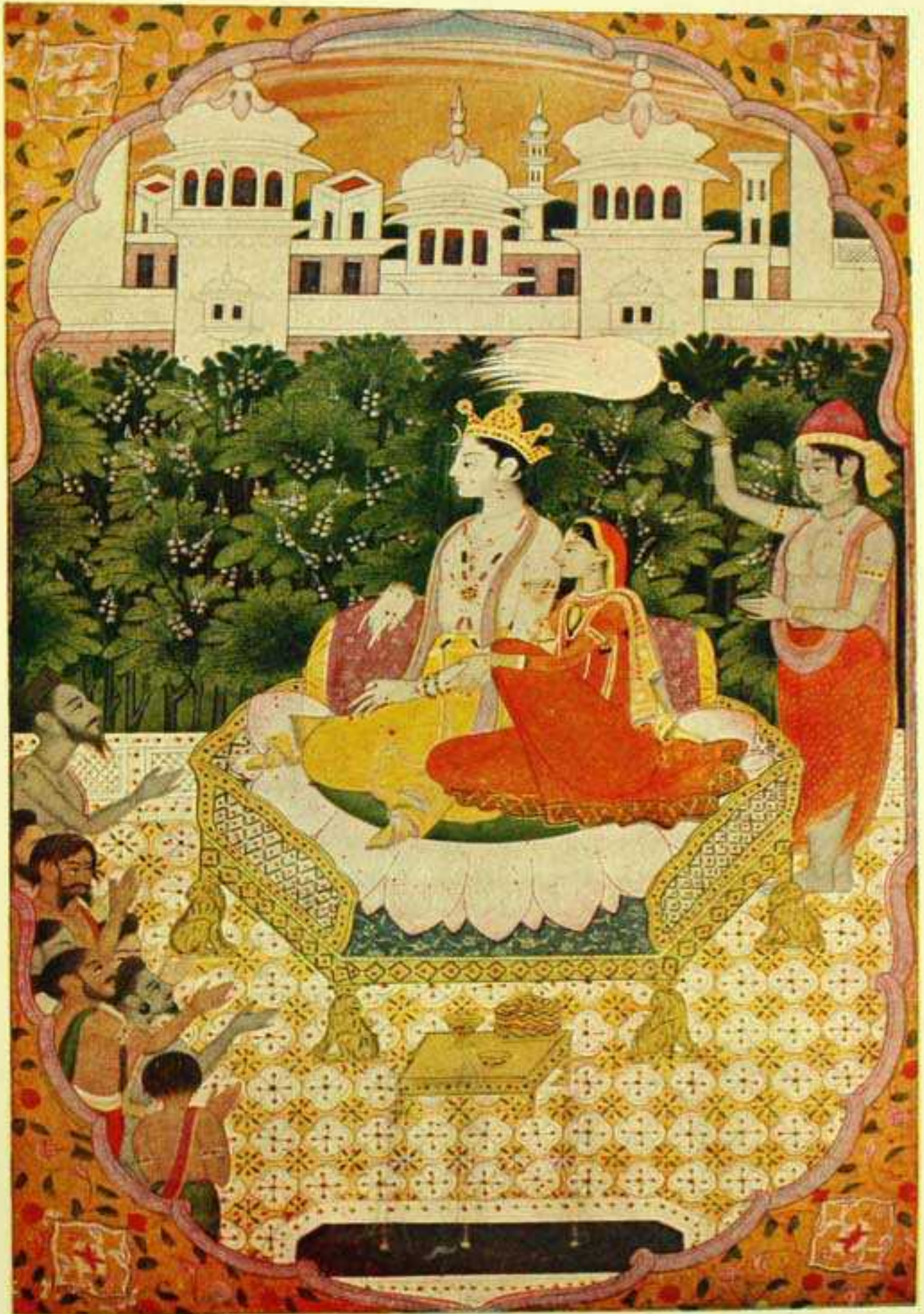
বাঙ্গালীর পটুৎ।

যথেষ্ট। বঙ্গদেশে বাঁড়ের দেহের তুলনায় তাহার স্বকৃষ্ণা যতটা বেশী উঁচু দেখা যায় অজ্ঞ কোন দেশে সে রকম দেখা যায় না। অজস্তার ১নং গুহার বাঁড়ের লড়াইয়ের ছবিতে ঠিক আমাদের দেশের বাঁড়ই অঙ্কিত। যশোহর, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের শত শত বংশের প্রাচীন কাঠের পাটার উপর আঁকা যে সকল চিত্র দেখা যায়, অজস্তার ছবির সঙ্গে তার অঙ্কনপদ্ধতি, এমন কি বর্ণ ও রেখাগুলির (অজস্তার মত অত উৎকৃষ্ট না হ'লেও) একটা অদ্ভুত মিল সহজেই অনুভূত হয়। আমাদের হুর্গা প্রতিমা প্রভৃতির চালচিত্রগুলি এখনও ঠিক অজস্তার নিয়মেই গোবর মাটির জমির উপর সাদা রং দিয়ে তার উপর আঁকা হয়। কালীঘাটের পটের ও অজস্তার রেখা-কৌশলের মধ্যে খুবই সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। কালীঘাটের এই প্রচলিত পটগুলির রেখার টান দেখলেই অজস্তার শিল্পীদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এই সমস্ত দেখে কবির কথায় বলতে ইচ্ছে হয়—

আমাদেরই কোনো সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়।

আমাদের পট অক্ষর ক'রে রেখেছে অজস্তায় ॥”

অজস্তা গুহার কতকগুলি চিত্রে মেয়েদের শাড়ী ও পুরুষদের ধুতি ঠিক বাঙ্গালীর মত (গ্রিফিথ্ অজস্তা, ১ম খণ্ড, ১৮-১৯ পৃষ্ঠা)। অজস্তাচিত্রাবলীর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য—তুললতার মধ্যে মহাশয় ও অপরাধী জীবজন্তুদিগকে মানাইয়া লওয়া। কোন একটা তুল বা ‘পল্লবিনী লতা’র মধ্যে হাতীর স্থায় একটা বড় জানোয়ার কিংবা চকুবিশিষ্ট একটা বিরাট মরালকে এমনভাবে শায়িত করিয়া রাখা হইয়াছে যাহাতে সেই সপুষ্প লতার মধ্যে তাহারা যেমালুম মিশিয়া গিরাছে। উদ্ভিদ ও জীবচিত্রের এই মিলনে কোন বৈষম্য



রাম-সীতা—খাস জয়পুরী কলম, সপ্তদশ শতাব্দীর ডবি, উত্তর-পশ্চিমের চিত্রকরের অঙ্কিত। শিশুভারতী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্ট এবং ইণ্ডিয়ান প্রেসের প্রজ্ঞাবিকারী মহাশয়দের আশুকুলো গ্রাণ্ড।

ঘটে নাই ; একটা কল্কার ফুলগুলির মধ্যে বামনরূপে কোন পুরুষ, অর্ধশায়িত রমণীরূপে কিংবা ক্ষুদ্রপদ বৃহৎমস্তক উদ্ভট মনুষ্যরূপে—চিত্রগুলি এমনই ভাবে সাজানো আছে যে সেগুলি যেন শিল্পবাগানের অঙ্গীয় হইয়া গিয়াছে। অধুনা যুরোপে এই সকল কল্কার নানারূপ অঙ্কন হইতেছে। বাঙ্গালী চিত্রকরেরাও যে পরীগ্রামে এইভাবে জীব-উদ্ভিদের মিলন ঘটাইয়া তাহাদের কল্কার কারুকাৰ্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেন, তাহার নিদর্শন আমরা অনেকগুলি পাইয়াছি, যদিও চিত্রহিসাবে সেগুলি অজস্তার সমকক্ষ নহে। বাঙ্গলাদেশে যাঁদের লড়াইয়ের চিত্র অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। অজস্তায় তাহা দুর্বল নহে। তুলনায় বাঙ্গলার চিত্র নিকৃষ্ট নহে। হাতীর লড়াই, অজস্তা ও বাঙ্গলা চিত্রে, উভয়েই পাওয়া গিয়াছে।

অজস্তায় বিজয়ের অভিযানে কি অথারোহী কি পদাতিক কি ধ্বজবাহক কাহারও মস্তকে উফ্যীয় অথবা পাগড়ীর বালাই নাই। উহারা ঠিক বাঙ্গালী। অজস্তাওহার ছাদের চিত্রগুলি সাধারণভাবে অনেকটা বাঙ্গলাদেশের দুর্গা-প্রতিমার চালচিত্রের মত। মধ্যভারতে ছতরপুরের নিকট রাজগড়ে আমরা ঐরূপ দেখিতে পাই। অজস্তার ১৮ নং চিত্রে, পুরুষের ধূতি ও জ্বীলোকের শাড়ী ঠিক বাঙ্গালীর মত।

আমাদের দেশী শিল্প ও সাহিত্যে মাতৃস্তন পবিত্রতার প্রতীক। উহাতে আবরণ দেওয়া হইত না। এমন কি দেবতাদেরও স্তন-বর্ণনা অনেক সময়ে কাব্য ও সাহিত্যে পাওয়া যায়। কালিদাসের ‘স্তনভিগ্নবকলা’ সুপরিচিত। তাত্ত্বশাসনে গৌরীর ও লক্ষ্মীর স্তন-বর্ণনা স্থলভ। সরস্বতীবন্দনায় ‘জয় জয় দেবি চরাচরসারে, কুচযুগশোভিত-মুকুতাহারে’ প্রভৃতি কথা উক্ত দেবী-পূজা উপলক্ষে শিশুদিগকেও আবৃত্তি করিতে হয়। বাঙ্গলার প্রাচীন শিল্পে জ্বীলোকদিগের স্তন আবৃত করা হইত না ; এই আক্র বিদেশীদিগের—বিশেষভাবে যোগলদের আমদানি। বাদশাজাদী ও বেগমদের সম্পূর্ণ অবয়ব বহুমূল্য গেলাপ্ দিয়া ঢাকা হইত। এমন কি আয়তজীবের কত্তার দেহ সাতপ্রস্থ মসলিনে আবৃত থাকা সত্ত্বেও যোগল বাদশাহ স্ত্রীলতাহীনা বলিয়া তাহার কত্তাকে ভৎসনা করিয়াছিলেন। রাজপুত-কলাশিল্প যোগল কায়দা অবলম্বন করিয়াছিল, যেহেতু সেখানকার রাজারা সর্বদাই যোগল দরবারের সংস্পর্শে আসিতেন। অজস্তা-ওহার রানীদের পর্য্যস্ত গাত্রে অঙ্গরক্ষা নাই, অথচ বহুমূল্য মণিমুক্তায় তাহা উজ্জল। মাতৃদেহের সর্কাপেক্ষা পুণ্যস্থান,—বাৎসল্যের মহাতীর্থের উপর কোন যবনিকার উৎপাত নাই। বাঙ্গলার পরীশিল্পে স্তন সর্বদাই নগ্ন থাকিত। সিংহল, বালীদীপেও রমণীমূর্তির এই বৈশিষ্ট্য।

অদ্ভুত ও উদ্ভট ভঙ্গিমার ছবি—অজস্তায় অসংখ্য। এইরূপ ছবি আমাদের দেশেও প্রাচীন চিত্রপটে দেখিতে পাওয়া যায়। মহিষ-জাতকের ছবিটি অজস্তাওহার পরিহাস-রসিকতার একটি কোতূহলোদ্দীপক দৃষ্টান্ত। একটি বানর কোন মহিষের পিঠে চাপিয়া বসিয়া ঐ জন্তুর চক্ষু দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তামাসা করিতেছে, বানর ও মহিষের ভাবভঙ্গী অদ্ভুত। এইরূপ আর একটা ছবিতে একটি ভল্লুক একটা মানুষকে আলিঙ্গন করিতেছে,—

সে যে কল্পিত আলিঙ্গন তাহাতে পরিহাসরসই বেশী, না বিভীষিকাই বেশী, তাহা ঠিক করা শক্ত। আর একটি চিত্রে এক রূপসী রমণী দোলায় ঢুলিতেছেন, মেয়েটির গা হইতে যেন রূপ ঝরিয়া পড়িতেছে, অঞ্চ ভঙ্গিটা উদ্ভট। গ্রীকদিগের Pan দেবতার জায় অদ্ভুত কিম্বদের ছবি অজন্তার উদ্ভট চিত্রাবলীর মধ্যে প্রথম পঙ্ক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য (দেওয়ালে ছবি, দ্বিতীয় গুহা)। বাঙ্গলার প্রাচীন চিত্রশালায় অদ্ভুত ছবির অভাব নাই (চিত্র জটব্য)।

অজন্তার সিংহগুলি ঠিক বাঙ্গলার চিত্রিত সিংহের মত। বাঙ্গালী চিত্রকর ও কুমারেরা এখনও ঠিক সেই আদর্শ বজায় রাখিয়াছে। উহাতে সিংহের কেশর সুস্পষ্ট নহে। মুখের আকৃতি ছাড়া অপরাপর স্থান কতকটা ঘোড়ার মত। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বাগবাজারের সার্কজর্নীর দুর্গোৎসবে প্রতিমার নিম্নে ঐরূপ সিংহ নির্মিত হইয়াছিল। মৎসকলিত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগে প্রাচীন মহিষমর্দিনীর যে ছবি দেওয়া হইয়াছে তাহার সিংহও ঠিক এইরূপ। কালীঘাটের অনেক পুরাতন পটে আমরা ঐরূপ সিংহ দেখিয়াছি। সুতরাং অজন্তাগুহার চিত্রকরদের এই পশুরাজের মূর্তিসংস্কার অধুনা পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় চলিয়া আসিয়াছে। অশোকস্তম্ভের উপর যে সিংহমুখ দেওয়া হইয়াছে তাহা বাঙ্গলাদেশে চিত্রকর ও কুমারদের মধ্যে বহুকাল প্রচলিত ছিল। প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন ছাঁচে ঢালা নূতন একটি মূর্তিকার সিংহ প্রদত্ত হইল, উহা ফরিদপুর জেলার নালিয়া গ্রামের কুমারেরা প্রস্তুত করিয়াছিল। পাশাপাশি অশোকস্তম্ভের বিখ্যাত সিংহমূর্তি দেখানো হইতেছে। সিংহগুলির সাদৃশ্য স্পষ্ট বুঝা যায়। পোড়া ইটের উপর নির্মিত দুই শত বৎসরের প্রাচীন ২৪ পরগনার কোন পল্লী-মন্দিরে প্রাপ্ত দুইটি হরিণের প্রতিচ্ছবি ও অজন্তার দুইটি ধাবমান হরিণের ছবিও পাশাপাশি দেওয়া গেল, পাঠক পরস্পরের সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন। সুতরাং দেখা বাইতেছে দূর অজন্তাগুহা এবং মাগধী শিল্পের দ্বারা বঙ্গদেশে এখনও চলিয়া আসিতেছে। সেই সকল প্রাচীন শিল্পকলার এত বেশী নিদর্শন পাওয়া বাইতেছে যে বাঙ্গলাই আর্য্যাবর্ত্তে প্রাচীন শিল্পের জন্মভূমি বলিয়া মনে করিতে আমাদের মনে কোন কুণ্ঠা বা দ্বিধাভাব হয় না। ৪০১২০ বৎসর পূর্বেও বাঙ্গালী রমণীরাই বিশেষভাবে চিত্রকলার অধিকারিণী ছিলেন। অল্পমূল্যে চক্চকে যুরোপের শিল্পের উচ্ছিষ্ট বস্ত্রের মত এদেশে প্লাবন উপস্থিত করিয়া আমাদের দেবভোগ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। উড়িষ্যার খিচিং হইতে যে সকল প্রাচীন ভগ্ন প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা বাঙ্গলার শিল্পের চরম আদর্শ। পূর্বোক্ত চিত্রগুলির কয়েকটি তুলনায় সমালোচনার জন্ত এখানে দেওয়া বাইতেছে।

মধ্যযুগে এমন কি মুসলমানদের সময়েও চিত্রবিগ্ণা বাঙ্গালীর নিজস্ব ছিল। পল্লীবাসিনীরা লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন। লক্ষ্মীর কোটা খুলিয়া ইহার ঘরবাড়ী সাজাইতে বসিতেন, ইহার রন্ধন-শালায় শিল্পকে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিলেন। কতটা পবিত্রতা ও স্নেহের সহিত বাঙ্গালীর মেয়েরা এইসকল শিল্পকার্য্য ও রান্না প্রস্তুত করিতেন তাহা কাজলরেখা নামক পল্লীগীতিকা পাঠ করিলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। বরণডালা হইতে আরম্ভ করিয়া নানারূপ আলপনা, দেওয়ালের চিত্র, কাঁথা, বইটে, বালিসের গেলাপ, নূতন আত্মীয়দের বাড়ীতে



অশোক স্তম্ভের নিঃসার মত সিংহ। হুয়ান্সান ৬৭৮ হইতে
ফরিদপুরের নলিয়া গ্রামের কুমার কর্তৃক নিৰ্মিত।



• অশোক স্তম্ভের নিঃসার।



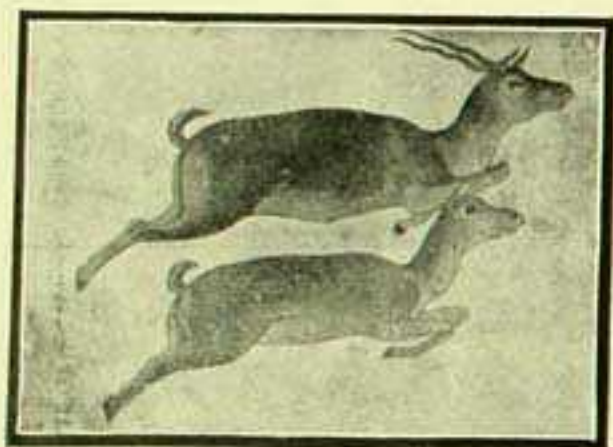
প্রাগৈতিহাসিক যুগে (কেহ কেহ অনুমান করেন—২০,০০০ বৎসর
পূর্বের, ২২৮-২২ পূর্বা দ্রষ্টব্য) সিঙ্গানপুর পাহাড়-পাড়ে সিন্দুর-চূর্ণে
অঙ্কিত চিত্র।



এই ছবির অনুরূপ "লগ্নীর দ্বারা" বা "চামর"
এখনও এদেশের মেয়েরা দেয়ালে সিন্দুর দিয়া
আঁকিয়া থাকেন, এই ছবিখানি ১৩৩০ সনের
আবদ সংখ্যায় প্রকাশিত হুয়ান্সান বাবুর প্রবন্ধ
হইতে গৃহীত।



গোড়া মটির উপর মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ
ছবি। অজন্তার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে—সপ্তম
শতাব্দী, ২৪শ পৃষ্ঠা।



অজন্তার হরিণ-মূর্তি, অনিত হালবার মহাশয়ের
'অজন্তা' নামক পুস্তক হইতে গৃহীত।
ভূমিকা ২৮০ পৃঃ।



সিঙ্গানপুরের ইন্ডিয়ান চিত্র, এগনও বাঙ্গলাবেশের কুমারের
এইরূপ ইন্ডিয়ান তৈরী করিয়া থাকে।



সিঙ্গানপুরের গিরগিটি, ২২০-২২১ পৃঃ।



সিঙ্গানপুরের মানুষের চিত্র, তখনকার দিনের
মানুষ না কি কতকটা এইরূপ ছিল, ২২২ পৃঃ।



ত্রিপুরা, মেহের, দাস বাজার রথ, ষাটশ শতাব্দীর শেষ।
গ্নেয় স্বামী, অস্ত্রাঙ্ক পাখী হাতে দৌখিন স্ত্রী।
মাতার বেশ পুত্রের নৃপতিংক।



ত্রিপুরা মেহের, দাস
অংশ, গ্নেয় সম্রাসী। ষাটশ
শতাব্দীর শেষ।



গুলনা, চতুর্দশ শতাব্দীর কাঠের
খামের অংশ।



গুলনা, চতুর্দশ শতাব্দীর কাঠের
খামের অংশ।



গুলনা, চতুর্দশ শতাব্দীর কাঠের
খামের অংশ।



২৪ পরগণা বাউলী, কাঠের রথের বিবিধ অংশ
—কাঁটাল বিহ্রতা, ২৫০ বৎসরের আঁচীন।



২৪ পরগণা বাউলী, কাঠের রথের বিবিধ অংশ,—২৫০
বৎসরের আঁচীন। কলসী-ককে রুমলী।



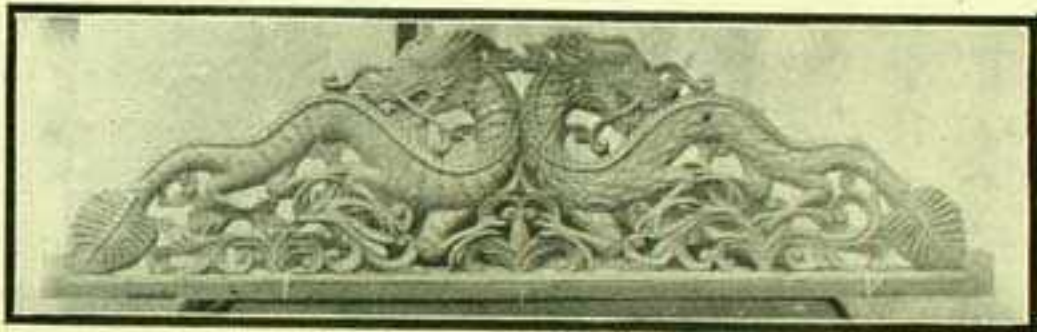
২৪ পরগণা বাউলী, কাঠের
রথের বিবিধ অংশ,—২৫০
বৎসরের আঁচীন। বিবিধ মনু-
নুতি।



বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী (ফরিদপুর, নালিয়া গ্রামের) কাঠের
সিংহাসনের অংশ, সপ্তদশ শতাব্দী।
অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত।



সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ, আন্দুল কুতুবাবুদের
কাঠের রথের বিভিন্ন অংশ।



শ্রীহট্টের নবাব হুসেইনশাহর কাঠ-সিংহাসনের অংশ (১৭৯৯ খ্রঃ)।



সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ, আন্দুল কুতুবাবুদের কাঠের রথের
বিভিন্ন অংশ।



সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ, আন্দুল কুতুবাবুদের কাঠের রথের
বিভিন্ন অংশ।



পুলনা, মিত্র তেতুলিয়া গ্রাম, কাঠের ঘরের
অংশ—ঘর ঘনি সমস্তই কারুকায়িত
কাঠ নির্মিত ছিল, স্বাভাবিক মূর্তি, সপ্তদশ
শতাব্দী।

খুলনা-ওয়ালী কাঠের সিংহাসনের অংশ, সপ্তদশ
শতাব্দী—নালিয়াগ্রাম, ফরিদপুর। আমার
জ্ঞান অজিতকুমার কর্তৃক সংগৃহীত।



পুলনা, মিত্র তেতুলিয়া গ্রাম, কাঠের
ঘরের অংশ—পুলনা মূর্তি, সপ্তদশ
শতাব্দী।



ঢাকা, কাঠ-সিংহাসনে দেবী-বুদ্ধ, সপ্তদশ শতাব্দী।



ঢাকা কাঠ-সিংহাসনে দেবী-বুদ্ধ, সপ্তদশ শতাব্দী।



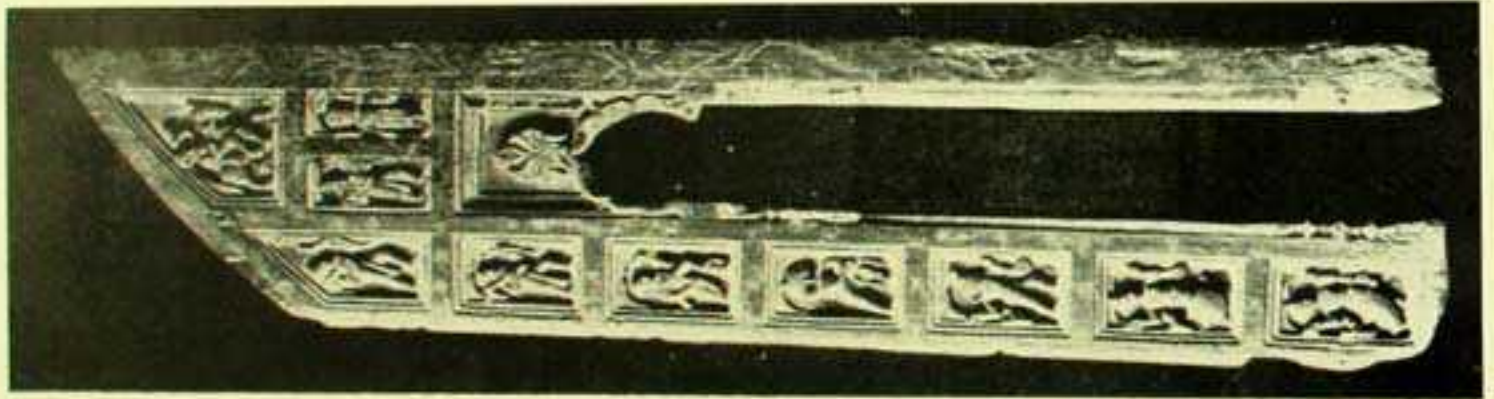
ঢাকা, কাঠ-সিংহাসনে কৃষ্ণলীলা, সপ্তদশ শতাব্দী।



ঢাকা, কাঠ-সিংহাসনে বসে থাকা মূর্তি, সপ্তদশ শতাব্দী।



ফরিদপুর, নালিয়া কাঠের মাতৃমূর্তি, সপ্তদশ শতাব্দী।
আমার হস্ত-অজিতকুমার কর্তৃক সংগৃহীত।



ঢাকা, সপ্তদশ শতাব্দী, কাঠ-সিংহাসনে দশ-অবতার।



রাজা দীনারাম দায় নির্মিত কাঠের
লক্ষী মূর্তি, অষ্টাদশ শতাব্দী। কবিচন্দ্র আদে
ইহার অস্ত্রে লক্ষ টাকার গহনা ছিল ও
ইহার অঙ্গুষ্ঠে মন্দির ছিল। এখন এই মন্দির
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম। আমার হস্ত
অজিতকুমারের সংগৃহীত।

পাঠাইবার জন্য পানরক্ষার উপযোগী নবীন কদলীপত্রের আধার (নির্দিষ্ট কালের জন্য নতুন কলাপাতা জলে রাখিয়া শক্ত করা হইত, তন্মধ্যে নানারূপ বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত হইত), নানারূপ কারুশিল্প শিকার ও লেপ-তোষক বাধিবার দড়ি, বিয়ের কনের কপালে স্থাপ্য চন্দনরেখার কারুকাৰ্য্য, বাসরের প্রায় সমস্ত আসবাব, চিত্রিত পিণ্ডে ও কাগজের আসন, পাশা খেলার উপযোগী চিত্রিত কাগজ, ছেলেদের পুতুল—একশত শত প্রকারে মেয়েরা তাঁহাদের কারুকাৰ্য্য দেখাইতেন। সেই লক্ষ্যের সাজসজ্জার জায়গায় এখন পিয়র্স সোপ, হাজলিন স্নো এবং নানারূপ নকল বা আসল বিলাতী এসেন্স উগ্র মূর্তিতে চুকিয়া প্রাচীন মৌলিকতা ও বাঙ্গলার নিজস্ব শিল্পসম্ভার উলটু-পালটু করিয়া দিয়াছে। যুরোপের এই বিজয়ই প্রকৃত বঙ্গবিজয়। প্রাচীন কোন বাঙ্গলা পুস্তকে আমরা পড়িয়াছিলাম ‘হীরার বদলে জিন্না’, ইহা অবশ্যই অনুপ্রাসের বাহাজুরী, কিন্তু সময়ে সময়ে সত্য ঘটনাও উপভাসের মত বিশ্বাসকর হয়। শাখের উপর কত রূপই না চিত্র চিত্রিত হইত। একটি শাখের উপর দশ অবতারের ছবি দেওয়া হইল (চিত্র দেখুন)। এখানে চতুর্দশ শতাব্দীর একটি কাঠশিল্পের উল্লেখ করিব, উহা প্রস্তর-শিল্পের অনুরূপ; সম্ভবতঃ তখনও বাঙ্গলার প্রস্তরশিল্প ধ্বংস পায় নাই। এই কাঠফলক খুলনা জেলার সাতক্ষীরার কোন মন্দিরে লয় ছিল। মানসিংহের সময়ে এক দস্থ্যপতি তাহার প্রাচীন দেবমূর্তি ও সম্পত্তি এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া যায়। এই কাঠফলক মানসিংহের সময় হইতে প্রায় দুইশত বৎসরের অধিক পুরাতন মনে করি। কাঠের উপরে বেরূপ স্থাপ্য কারুকাৰ্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা ঠিক প্রস্তরায়িত কারুকাৰ্য্যের জায়। সেই প্রাচীন মন্দিরটির কাঠের কারুকাৰ্য্যের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হইল। প্রথমটি চতুর্দশ শতাব্দীর। কাঠমন্দিরটির একটি স্তম্ভ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার প্রায় শতাব্দীকাল পরে (পঞ্চদশ শতাব্দীতে) আর একটি কারুকাৰ্য্যময় স্তম্ভ তথায় বসানো হয়, তাহার কাজ প্রাচীনতরটির মত তত স্থাপ্য নহে। অনেক সময়ে শুধু কাঠের সাহায্যে এদেশের মন্দির প্রস্তুত হইত। মন্দিরের সমস্ত কাঠই কারুকাৰ্য্যময় ছিল। প্রতাপাদিত্যের সময়কার একখানি কারুকাৰ্য্যময় কাঠগৃহের অনেক উপাদান আমার নিকট সংগৃহীত আছে, উহা খুলনা জেলার আসানদি গ্রামের কাছে স্থাপিত ছিল। সেই সব কাঠ-নির্মিত শিল্পের কয়েকটির নমুনা দিতেছি। আর একটি কথা এই যে এইসকল শিল্প বত প্রাচীন ততই উৎকৃষ্ট। মুসলমান রাজত্বের শেষের দিকে কাঠশিল্পের অবনতি ঘটিয়াছিল। ক্ষুদ্রস্থানে কারুকাৰ্য্য করিতে হইলে অল্পত মূর্তির উদ্ভব হইয়া পড়িত। কোন কোন স্থান অতি সঙ্কীর্ণ, সেখানে মানুষের পা তটি পাখীর পায়ের মত করিয়া কিংবা শেবার্জ সর্পাকৃতি করিয়া স্থান সংকুলান করিতে হইত। এই প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য নানারূপ অদ্ভুতাকৃতি পরিকল্পিত হইয়াছে। কাঠগৃহের চূড়ান্ত শোভা বাঙ্গলার রথগুলিতে প্রদর্শিত হইত। বাঙ্গলার নানা স্থানে, যথা ২৪ পরগনা, বাগালী, মাহেশ, আব্দুলমোড়ী, ঢাকা জেলার বেনিয়ারুড়ি ও ধামরাই প্রভৃতি গ্রামে প্রাচীন রথ এখনও আছে, তাহাদের শিল্প ও কারুকাৰ্য্য বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের অধিকাংশই দ্বিতল, ত্রিতল বাড়ীর জায় বিরাট। ক্ষুদ্র, বৃহৎ কাঠের

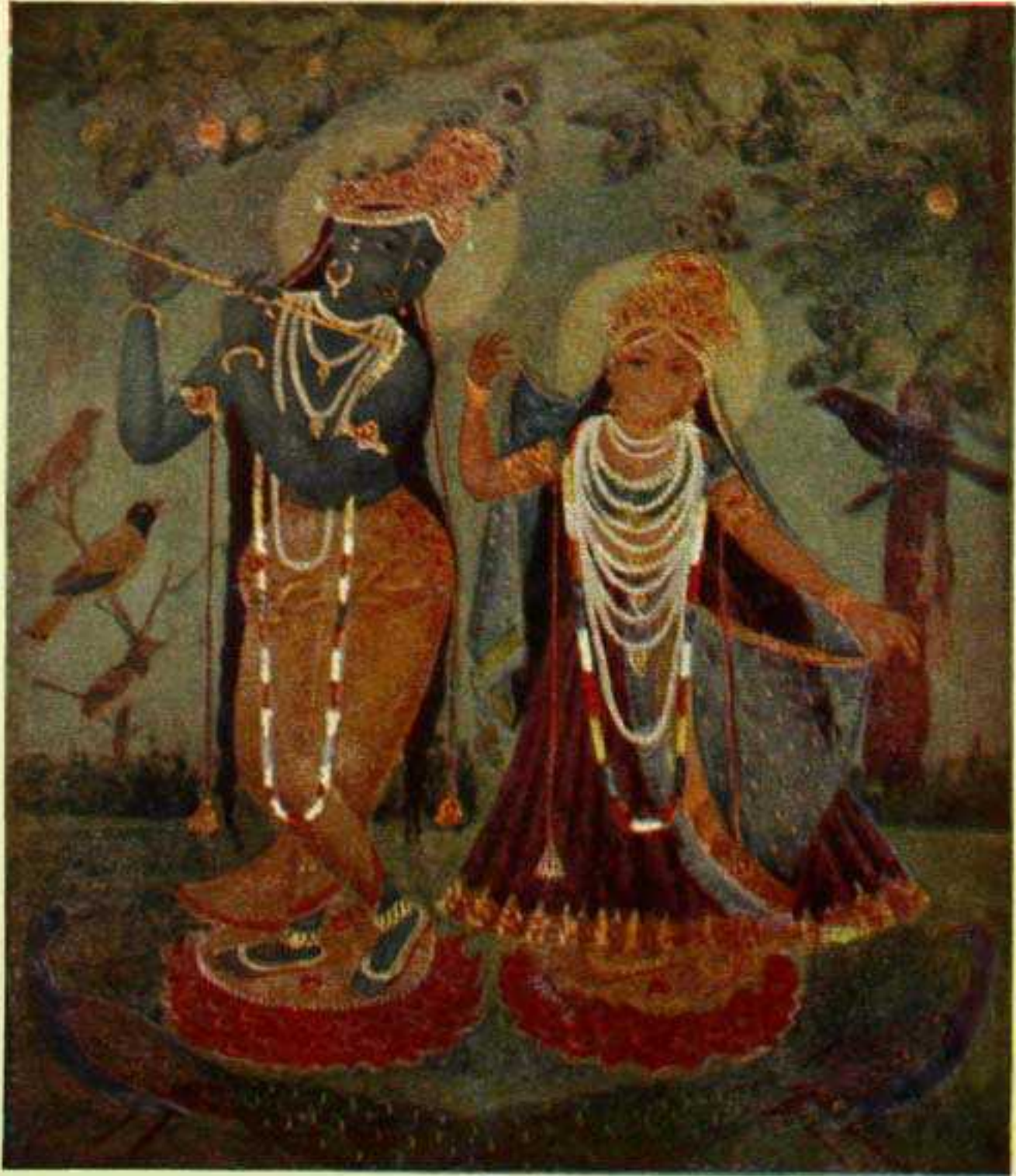
রথ বাঙ্গলার বহু প্রাচীন পল্লীতে দৃষ্ট হয়। বেহালার একখানি কারুকার্যমণ্ডিত ৭০।৮০ বৎসরের প্রাচীন পিতলের রথ আছে।

বৌদ্ধ সাহিত্যে পদ্ম একটি পবিত্র সামগ্রী,—বৌদ্ধ-শিল্পেও পদ্মের প্রধান স্থান। বৌদ্ধমত 'ঐ মণিপদ্মহ'—বৌদ্ধ শাস্ত্রে 'পদ্ম' একটি আসনের নাম। 'পদ্ম' 'মহাপদ্ম' প্রভৃতি উপাধির সহিত সকলেই পরিচিত। অজন্তাগুহার বিচিত্র ফুলপল্লবের মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার যোগ্য; যদিও নানারূপ ফুলের ছবি অজন্তা-চিত্রে পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে পদ্মই সর্বাধিক বহুল। পদ্মের বিচিত্র অবস্থার ছবিতে অজন্তা পরিপূর্ণ; কোনটি একেবারে কুঁড়ি, কোনটি আধফোটা, কোনটি সম্পূর্ণ বিকশিত,—এই পদ্ম কখনও পত্রহীন পূর্ণ শতদল, কখনও পত্রে আধঢাকা কুঁড়ি। এইভাবে নানা অবস্থায় এক পদ্মই—অজন্তা-চিত্রের প্রধান সম্বল। বোধ হয় অপরাপর ফুল শতকরা কুড়িটি, পদ্ম শতকরা ৮০টি। বাঙ্গলার চিত্রেও পদ্মের স্থান আছে, কিন্তু অজন্তার সঙ্গে তাহার একটা প্রভেদ আছে। অজন্তার মত পদ্ম বাঙ্গলার কাঁধা ও চিত্রিত পীড়িতে আমরা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু অনেকস্থলেই বাঙ্গলা ছবির পদ্ম ভিন্ন প্রকারের, তাহা ঠিক পদ্মের নকল নহে, তাহা 'মানসপদ্ম' নামে অভিহিত করা যায়। পদ্মটির ভাব গ্রহণ করিয়া তাহা চিত্রকর অবলীলাক্রমে ইচ্ছামুসারে রূপান্তরিত করিয়াছেন, যে পদ্মটি সরসীতে জন্মে—সেই পদ্মটি চিত্রকরের মনে নবভাবে জন্মলাভ করিয়াছে। স্বাভাবিক পদ্ম একরূপ বই দুইরূপ হয় না, কিন্তু এই 'মানসপদ্ম' সংখ্যাতীত। পদ্মের শুধু ভাবটি লইয়া চিত্রকর করনার মুক্তহস্ত তুলির খেলা দেখাইয়াছেন। অজন্তার ফুলপল্লবের মূলধন অল্প, কারণ তাহা মূলের অধিকতর অহুগ। কিন্তু বাঙ্গালী চিত্রকরের অহুরন্ত করনায় একই জিনিষ অসংখ্য আকারে দেখা দিয়াছে; কি আলপনার, কি মন্দিরের ইষ্টকে, কি প্রস্তরে, কাষ্ঠফলকে, পুঁথির মলাটে, পিত্তল বা তাম্রপটে, কি কাঁধায়—চিত্র-সস্তারের অবধি নাই। তুলির লীলায়িত রেখাপাতে কতপ্রকারের নক্সা ও কঙ্কা যে অঙ্কিত হইয়াছে তাহার সীমা-সংখ্যা নাই; প্রকৃতিকে অহুসরণ করিলে চিত্রকর অল্প সময়েই নিঃস্ব হইয়া পড়িতেন। কারণ প্রকৃতির সৃষ্টি বিশেষ বিশেষ স্থানে নির্দিষ্টসংখ্যক, এবং সেই নির্দিষ্ট-সংখ্যক দ্রব্যের সকলগুলিই তুলির যোগ্য নহে; কিন্তু যেখানে মানস হরিদ্বারের উৎস, সেখানে বিষয়বস্তুর অবধি থাকিতে পারে না, নিত্য নবজাত শিশুর স্তায় করনাস্থষ্ট কুশলতার সংখ্যা অগণিত, ভঙ্গী অগণিত এবং রূপ অগণিত। বাঙ্গলার এই ছবিগুলির যে ভাঙার আছে তাহা অজন্তাকে এই স্থানে হার মানাইয়াছে। অস্তান্ত দেশে এক একটি বিশেষ শিল্প-শ্রেণী আছে। কিন্তু এক শতাব্দী পূর্বেও বাঙ্গলার শ্রেণী-নির্কীর্ণেবে সকল জাতির রমণীই কাঁধা শেলাই, আল্পনা দেওয়া, পীড়ি-চিত্র, দেওয়ালে ছবি আঁকা প্রভৃতি বহু শিল্পকার্য জানিতেন। এখনও আসামের রেশমের উপর যে সকল সুন্দর ফুললতার কাজ দেখা যায় তথাকার রমণীরা তাহা প্রস্তুত করেন। প্রত্যেক কুমারীকেই বিবাহের পূর্বে তাঁহার হাতের কাজ দেখাইয়া বধূরূপে নির্মাণিত হইতে হয়। বাঙ্গালী রমণীরা শিল্পশাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান লইয়াই যেন ভূমিষ্ঠ হইতেন। তাঁহাদের কাজের যে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাতে



৩২ নং নারিকুন্ডলা, প্রথম নাটকটি নিম্নের মণ্ডীর ছবি সহিত আনকর্তৃক সংগৃহীত। দলছবি ৮১ x ৩১ ফিট, ১২৫ বৎসরের আঁচনি। এই ছবির ভাব খাজী বাঙ্গলা।
চিত্রকরের নাম শ্রী কয়াল (জা) যোগেশ্বরী, কলিকাতা।

মনিসিংহের সঙ্গে জয়পুরী কলম বঙ্গের উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত হয়। জয়পুরের প্রভাবের কথা এই পুস্তকের ৪২১ পৃষ্ঠার আলোচিত হইয়াছে। মনিসিংহের রাজত্বকালে বাঙ্গালী চিত্রকরেরা এই সো-আঁসলা শিল্পের পক্ষপাতী হয়। বনৌষের গৃহে গত ২৩ শত বৎসরের মধ্যে এই জয়পুরী (যাহাকে কেহ কেহ "রামপুত শিল্প" আখ্যা দিতা থাকেন) শিল্প-প্রভাব অব্যাহত থাকে। কিন্তু খাটী বাঙ্গালী চিত্রকরেরা এই অঙ্গন-শিল্পিত গ্রহণ করে নাই। পূর্বি-বঙ্গের বহুস্থানের ও কালীবাটের পটুয়া বাঙ্গলার 'নতুন শিল্প'এর অনেকটা রক্ষা করিয়া আনিয়াছিল। জয়পুরের প্রভাববিত শিল্পে পোষাকের আঁড়খর, খাণ্ডা, পাখাওয়া, শুভ্রা ও সরসারী কাঁচকা বেশী, উহাতে ঐখ্যের ভাগ অধিক, মাথো অর। বাঙ্গলার খাটী চিত্রকরার মত ইহা ততটা প্রাপবন্ত নহে। খাটী দেশী পটুয়ার হাতের রাখাকের সে মাখামাখি ভাব, তাহা উহাতে নাই।



রাখাক (মূলতঃ ৪৩ x ২১ ফিট) ১৭^শ বৎসরের পুরাতন রচিত ছবি হইতে গৃহীত। শ্রামবাজার কলকল বস্ত্র বাটীর ছবি, মৎসাপুত্রীত। জয়পুরী প্রভাব স্পষ্ট। ভূমিকা, ২১/০৭: ৪৪৮।

এখনকার দিনে যে কোন জাতির মহিলা গৌরবান্বিত হইতে পারেন। বস্তুতঃ এই শিল্প-কার্য্য এদেশে এরূপ ব্যাপকরূপে সমাজে প্রচলিত ছিল যে আমাদের বাংলাদেশকে যে “মগধের চিত্রশালা” বলা হইয়াছে, তাহা অত্যাধিক নহে। বাঙ্গলার খাঁটি শিল্প বাহার সঙ্গে মহেঞ্জোদারো এমন কি সিঙ্গানপুর-শিল্প হইতে গুপ্ত যুগের শিল্প,—অজন্তা, অমরাবতী, বালৌদীপ ও সিংহলের শিল্পের সাদৃশ্য স্পষ্ট, তাহাই আমাদের দেশের অব্যাহত প্রাচীন শিল্পধারা—বাঙ্গলার চিত্রশিল্পের সঙ্গে কাঙ্গড়া চিত্রশিল্পের এতটা মিল দেখা যায় যে আমরা দুই শিল্পকেই অভিন্ন মনে করি। আমরা এই পুস্তকের স্থানান্তরে একখানি

স্থানান্তরের শিল্পসাধনা।

কাঙ্গড়ার চিত্রশিল্পে নলিনী সান্যাল মহাশয়ের মত উদ্ধৃত করিয়াছি ; বস্তুতঃ বাঙ্গলার প্রাচীন চিত্রের সঙ্গে উক্ত দেশের চিত্রের সৌন্দর্য্য স্পষ্ট, তাহা নিতান্ত নিরপেক্ষ সমালোচকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। কালীঘাটের পটুয়া ও কাঙ্গড়ার চিত্রকর-দিগের একটা জায়গায় অদ্ভুত ঐক্য দেখা যায়। উভয় স্থানের চিত্রকরেরাই তাঁহাদের চিত্রে নানরূপ স্ক্র ও ঘোটা, সহজ, বক্রাস্ত ও কৌকড়ান রেখা আঁকিয়া চিত্রগুলিকে একটা বৈশিষ্ট্য দিয়াছেন। অনেক সময়েই ঐ রেখাগুলি বাহ্যতঃ নিরর্থক বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু ঐ সকল রেখাপাতে চিত্রগৌরব যেন শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা কালীঘাটের শিব ও পরীর চিত্রের উল্লেখ করিতে পারি। আমাদের ধারণা কাঙ্গড়া ও কালীঘাটের কলম এক।

১৫৯২ খৃঃ অব্দে মানসিংহ বাঙ্গলার শাসনকর্তা হইয়া এদেশে আসেন, তিনি কয়েক বৎসর বঙ্গেশ্বররূপে এদেশে ছিলেন। এই সময়ে রাজপুত—বিশেষতঃ জয়পুরী শিল্প এতদেশে প্রবেশ করে। কিন্তু এই শিল্প একান্তপক্ষে উড়ো শিল্প—উহা এদেশের মাটিতে শিকড় বসাইয়া বাঙ্গলার জিনিষ হইয়া দাঁড়ায় নাই। পুঁথির মলাটে এবং বাঙ্গলার বড়মানুষদের ঘরে অনেক সময়েই এই শিল্প অলুপ্ত হইয়াছে। ঘাগরা-পরা গোপী, নিরেট নিশ্চেষ্ট স্থানুবৎ বংশীধর কৃষ্ণ, সমস্ত শরীর পোষাক-পরিচ্ছদে আবৃত নরনারী ইত্যাদি রূপ রাজপুত চিত্রে বাঙ্গালী পটুয়ার লীলাময় তুলির রেখা পড়ে নাই, বাঙ্গালীর তুলি জীবন দান করে, তাহার মত হুঃসাহস ও প্রাণের আতিশয্য ভারতের অন্ত কোন দেশ দেখাইতে পারে নাই। কৃষ্ণ রাধার পায়ে ধরিয়া সজলচোখে সাধিতেছেন—বাক্যমনের অগোচর ব্রহ্ম এখানে প্রেমের ছলাল, তিনি এত সহজভাবে, এত দৈন্তের সহিত বাঙ্গালী প্রেমিককে ধরা দিয়াছেন। বাঙ্গালী শিব অরপূর্ণার কাছে ভিখারীর ভাবে অর্দ্ধ উলঙ্গ বেশে ঋণ ভিক্ষা করিতেছেন ; আর জয়পুরী কৃষ্ণের বাণী স্বর্ণমণ্ডিত, তাঁহার বেশভূষা রাজকীয় ; রাধিকা রাজ্যীর বেশে শ্রীকৃষ্ণের বামদিকে ঘাগরা ও অলঙ্কারের আসবাব লইয়া জমকালরূপে দেখা দিতেছেন ; শিব পঞ্চমুখে ঐশ্বর্য্য দেখাইতেছেন। এ সকল জাকজমক সত্ত্বেও বাঙ্গালী ছবির কাছে রাজপুত-চিত্র প্রাণহীন। দিল্লীর দরবারী কারদা জয়পুরী চিত্রগুলিকে পাইয়া বসিয়াছে। মানসিংহ তাঁহাদের দেশ হইতে বড়মানুষী চালের চিত্রাদর্শ আনিয়াছিলেন, মৎসঙ্গলিত বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে প্রদত্ত চিত্রে এই আদর্শ দৃষ্ট হইবে

জয়পুরী কলম ও বাঙ্গলা
বেশে তাহার প্রভাব।

বীরভূম, বিষ্ণুপুর এবং ২৪ পরগনার কোন কোন স্থানে বাঙ্গলার প্রাদেশিক পল্লীশিল্প একেবারে খাঁটি দেশজ। বাঙ্গালী পটুয়ার তুলিতে যে বৌদ্ধযুগের পর কত শত ছত্ৰপত্র ছুটিয়াছে, বাঙ্গালী মেয়েরা যে কত লীলায়িত ভদ্রী দেখাইয়াছে, বাঙ্গালীর প্রাণ যে কত আবেগে ভরা, তাহা ঐ সকল চিত্রে দৃষ্ট হইবে। কোথাও তাহার ছবি, কলালাবণ্য বিস্তার করিতেছে, কোথাও আশ্চর্য্য বেগশীলতা, ভাবপ্রবণতা দেখাইয়াছে, কোথাও বা অতুলনীয় ধৈর্য্য স্থচী ও তুলিতে অব্যক্ত সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে; এইরূপে বিচিত্র গুণে গুণশালিনী বঙ্গীয়

কলালক্ষ্মীরা ছেঁড়া কাপড়ে ছেঁড়া সূতার, জীর্ণ কাগজে তাঁহাদের

লক্ষ টাকা মূল্যের প্রতিভাজাত সম্পদ কড়ার মূল্যে স্বজাতিকে বিলাইয়া দিয়াছেন। এখানে শিল্পী রাজপুত্রবের প্রসাদভিখারী নহে; সে দিনান্তে ছুটি পয়সা রোজগার করিয়া কথঞ্চিৎ জীবন নির্বাহ করে, কিন্তু তাহার মাথা বিকাইয়াছে সে কলালক্ষ্মীর পায়ে। তাহার অমূল্য শক্তির যে কোন মূল্য আছে তাহা সে জানে না বা কেহ তাহাকে বলিয়া দেয় নাই।

বাঙ্গলার চিত্রশিল্পের রাণী বাঙ্গালী কুলবধূরা। মাতা যে কাঁথাখানি রচনা করিতে শুরু করিয়াছেন, স্বজীবনে তাহা শেষ করিতে পারেন নাই, সেই অসমাপ্ত কাঁথা লইয়া তাঁহার কন্যা বসিয়া গিয়াছেন, তিনিও উহা শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাঁহার কন্যা হস্ত উহা শেষ করিয়াছেন, এরূপ উদাহরণ বিরল নহে। তিন জীবনের চেষ্টায় কাঁথাখানি শেষ হইয়াছে। ইহার ঘন ঘোড়গুলি দেখিলে মনে হয় না যে জীবন অস্থায়ী, পদ্মপত্রে জলবিন্দুর স্তায় টলমল, ইহার নির্মাণে অসীম বৈর্য ও সহিষ্ণুতা দেখিলে মনে হইবে—জীবন অমর; শিল্পের স্বস্বতার যেরূপ অবধি নাই, শিল্পীর জীবনেরও যেন তরুণ অবধি নাই, কারণ শিল্পী যদি ক্ষণতরেও ভাবিতেন, তিনি মরিবেন, তবে এরূপ কার্য্য হাত দিতেন না। এই সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য বাহা এখনকার দিনের শিল্পীর পক্ষে একেবারে অসম্ভব, তাহার অস্ত্র একটা মহত্তর প্রেরণা ছিল, তাহা ভুবনবিজয়ী অরামৃত্যুর অতীত অমর স্বর্গীয় প্রেমের। পুত্র, কন্যা বা স্বামীর জন্ত এই সকল কাঁথা তৈরী হইত। বাহার প্রেমের জন্ত চিত্তানলে প্রবেশ করিতেন, তাঁহারা এবং তাঁহাদের জননীরাই এই কাঁথা শেলাই করিতে পারিতেন।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি—বঙ্গকুটিরের শিল্পের উপকরণ অতি সামান্য। তাঁহারা কড়ি কোথায় পাইবেন? ছেঁড়া পুরাতন কাপড় ও শাড়ীর পাড় যাহা জন্মাবধি ব্যবহারের পরে লোকে ফেলিয়া দেয়—তাঁহাই দিয়া তাঁহারা প্রেমের তপত্তা করিতে বসিতেন, তাঁহারা যে কারুকাৰ্য্য করিয়াছেন, রং ফলাইবার যে ক্ষমতা দেখাইয়াছেন তাহা উৎকৃষ্ট হইলেও শিল্প ইহা হইতে ভাল হইতে পারে কিন্তু তাঁহাদের তপত্তা অস্ত্র জাতির অনাধস্ত। রক্তনগ্নে ঘাইয়া মেয়েরা শুদ্ধ দাত দেহে লাল পেড়ে খাঁটি শাড়ী পরিয়া উহুনের ধারে বসিয়া প্রথমে অগ্নিদেবকে পূজা করিতেন, (কাজল রেখা)—বাহার খাইবেন, তাঁহারা যেন পরিতৃপ্ত হন এই ছিল সেই তপত্তার লক্ষ্য। প্রিয়জনেরা ও আদরের ছালাদেরা খাইবেন, হস্তগাং তাঁহার শক্তিতে যতটা সম্ভবপর তাহা তিনি করিতেন। পক্ষাশ



খাঁটি বাজলা, মহিষ-মর্দিনী কৃষ্ণরাম বশর বাড়ীর ছবি ৪ × ২১ ফিট (১৭০ বৎসরের) মৎসগৃহীত।

ব্যঞ্জন রাধিতেন, তাহা পঞ্চাশ রূপ অমৃত। উপকরণ অতি সামান্ত, কারণ বাঙ্গলার কুললক্ষী অতি গরীব। সামান্ত শাকসবজী ও ডাল যে কিরূপ অমৃতের মতন হইত এবং কতরূপ বিচিত্র হইত, শৈশব কালে আমরা তাহা স্বাদ পাইয়াছি, জীবনে তাহা ভুলিব না। এই রান্নায় গোমেধ, অশ্বমেধ, ছাগমেধ এমন কি কুকুট বা মেঘবজ্রও হইত না এবং তজ্জন্ত একটা কসাইখানার ব্যাপার ও সমারোহ হইবার প্রয়োজন ছিল না। এই রান্না প্রেম-তপস্বিনীর প্রেম-বজ্র, ইহার অতি সামান্ত উপকরণ বাঙ্গালীর দেহের স্বাস্থ্যের পক্ষে সহজ ও অমূল্য। ঘেঠাইয়ের যে কত ছাঁচ ঘরে ঘরে ছিল তাহা বাহুকের মস্তুর দ্বারা কে কি বলিয়া উড়াইয়া দিল। সন্দেশের কয়েকখানি প্রাচীন ছাঁচের নমুনা আমরা এখানে দিতেছি ;—এগুলি খুব ভাল নমুনা নহে, প্রাচীন পল্লীতে ঘুরিলে ইহা হইতে অনেক উৎকৃষ্ট ছাঁচ পাওয়া যাইতে পারে।

বিবাহবাসরে মেয়েদেরই রাজ্য, এখানে মেয়েরা কর্তা ; বর-কনের কড়ি বা পাশাখেলার জন্ত শিল্পমণ্ডিত কাগজ কি বস্ত্র, বরকনের বিবাহের আসন, পীড়িচিত্র, প্রভৃতি সকলই মেয়েরা করিতেন। কনের চুল বাধিতে বাইয়া তাঁহার নিন্ত্য নূতন কায়দা আবিষ্কার করিতেন। কনের কপালে অঙ্কুর চন্দন দিয়া অতি স্থল্ল খড়্‌কের দ্বারা কত চাক্ষুশিরে অবতারণা করিতেন—কনের মুখখানির উর্দ্ধে সেই শিল্পের বর্ণ ঝলমল করিয়া তাহার লাবণ্য অশেষরূপে বাড়াইয়া দিত। কনের বাড়ীতে পানের খিলি দেওয়ার জন্ত নবীন কদলীপত্রের মোড়ক একরূপ শিল্পমণ্ডিত করিতেন যে, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া বাইত। শিকা, লেপতোষক বাধিবার দড়ি প্রভৃতি গৃহস্থালীর সর্ববিষয়ে, এমন কি হাড়ীর গায়ে কতরূপ চিত্রাঙ্কন হইত তাহা বর্ণনা করা যায় না। বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি দেশে গৃহের দেওয়াল নানারূপ চিত্র-বিচিত্র রঙ্গের ছবিতে মণ্ডিত করা হয়, বেহারেও এই প্রথা আছে। ইহা অজন্তার দেওয়াল সাজাইবার কথা স্বতঃই স্মরণ করাইয়া দেয় ; গৃহের দেওয়াল তাঁহার দেবীপ্রতিমার চালীর মত নানা চিত্রে সাজাইয়া প্রত্যেকটি গৃহ বেন এক একখানি চিত্রশালার পরিণত করিতেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই শিল্পচর্চা কোন শ্রেণীবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না। সে কালের প্রত্যেক কুলবধু শিল্পী ছিলেন। বাড়ীর প্রত্যেক উৎসবে এই শিল্পীরা অধিনায়কত্ব করিতেন। এই শিল্পীদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য বিশেষ উৎকর্ষ দেখাইয়া যশস্বিনী হইতেন।

বাঙ্গলার পল্লী—দরিদ্র পল্লী, এইভাবে ভরপুর প্রেমের তপস্যায় শিল্প-সমৃদ্ধ ছিল ; এই জন্ত বাঙ্গলার প্রত্যেক গৃহস্থের মন এত সরস ও প্রেমপূর্ণ ছিল।—এখন যদি আমরা আমাদের মাতৃজাতির এই অতুলনীয় তপস্যাকে দাসীহুত্তি বলিয়া ঘণা করি, তবে এই বলিতে হয় যে আমরা আমাদের মাতাদের অকৃতি অযোগ্য সন্তান।

“কাঠুরিয়া এক মাণিক পেল, পাখর বলি ফেলে দিল ;
অভিমানে কঁাদছে মাণিক, মহাজনে টের না পেল।”

কালীঘাটের পটুয়াদের যে সকল ছবি এখানে দেওয়া হইল তাহার এক এক খানি এক বা দুই পরসায় বাজারে পাওয়া যাইত, তুলির একটিমাত্র টানে মূর্তিগুলি রেখা-সম্পদযুক্ত হইয়া জীবন্ত হইয়া উঠিত। কোন মডেলের দরকার হইত না; অথচ চিত্রকর তাঁহার চিত্রে যে কথা বুঝাইতে চাহিতেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ চিত্র-ভাষার জ্ঞান ছিল; যে ভঙ্গী, যে ভাব তাঁহারা আঁকিয়া দেখাইবেন, তাহার সন্ধান তাঁহাদের অব্যর্থ তুলির রেখাপাতে স্থাপ্ত হইত। হয়ত বা কোথাও কোথাও টেকনিক্ অথবা শিল্পের স্বল্পনীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান হইত, সে কালে অন্ততঃ সেরূপ ভুল বিরল ছিল না। কালীঘাটের পটুয়ার চিত্র কবিত্তে সরস;—মেয়েদের কত ভঙ্গী যে তাহারা আঁকিতে পারিত তাহার ইয়ত্তা নাই, প্রত্যেকটি ভঙ্গী লালিত্য ও কবিত্তময়। এই সকল চিত্র বাজারে এক পরসায় দুই পরসায় বিক্রীত হইত, খরচ একরূপ কিছুই ছিল না। গৃহস্থ-ঘরের ছবিতে দামী সোণার রং ঝলমল করিত না, কিন্তু সরু ও মোটা তুলির রেখায় শাড়ীগুলি এমন সুন্দর ও স্বাভাবিক হইত যে আজকাল মডেল সামনে রাখিয়া খুব অল্পসংখ্যক চিত্রকরই এরূপ শাড়ী আঁকিতে পারেন। কোন কোন চিত্রকর শাড়ী আঁকিতে বাইরা একটা কাপড়ের তুপ আঁকিয়া বসেন। ছবির মূল্য এত অল্প ছিল যে বাঙ্গলায় এমন দরিদ্র ছিল না, তাহার বাড়ীতে এই সকল ছবি বিরাজ না করিত। সে সময়ের লোকেদের দেশসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও সম্যক্ জ্ঞান ছিল। এখনকার চিত্রকর ছবিখানি আঁকিয়া ৫০০ হইতে ৫০ টাকা পর্যন্ত তাহার দাম দিবেন, এদেশে কয়জন এরূপ চিত্রবিলাসের অধিকারী? সাবেকো চিত্রকরদের হিসাব ছিল, তাহারা রাতারাতি বড় মানুষ হইতে চাহিত না, নিজেরা অতি সামান্য অর্থে তৃপ্ত থাকিয়া কলারাজীর দান সমস্ত জাতিকে বিতরণ করিত। এখনকার শিক্ষাদীক্ষা সমস্তই অগ্নিমূল্য, অথচ দেশের লোকের অল্পসংগ্রহের কড়ি নাই। যেখানে খড়ো ঘরের টোলে গুরু গরুর রাখালী করিয়া ছাত্র যত্নদর্শন পড়িত, সেইখানে বিমানস্পর্শী তুঙ্গ প্রাসাদ উঠিয়াছে, ছাত্রদের অভিভাবকগণ পুস্তকতালিকা ও তত্ত্বাল্য দেখিয়া মুর্ছা বাইতেছেন। এরূপ বিসদৃশতা বেশী দিন থাকিবার নহে। আমরা খেজুরাহ মন্দিরে যে সকল অপূর্ণ বুদ্ধমূর্তি দেখিয়াছি তাহার সঙ্গে চট্টগ্রামে সম্প্রতি আবিষ্কৃত ছোট ছোট দাতব বুদ্ধমূর্তির এমন একটা সাদৃশ্য আছে যাহা সকলেরই চক্ষে পড়িবে। এই গোবরমাটির উপর ছবির কথা যাহা অসিতবাবু অজন্তার উপলক্ষে লিখিয়াছেন, তাহা শুধু চূর্ণাপ্রতিমার চালচিত্রে নহে, অন্ততঃ বীরভূম জেলার বহু পল্লীতে ঘরের দেওয়ালে গোবরমাটির উপর মেয়েরা এখনও সেইরূপ বহু ছবি আঁকিয়া থাকেন। একটি পল্লীর কথা তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন যে, তাহাতে প্রায় সমস্ত ঘরগুলির দেওয়ালেই এরূপ চিত্র অঙ্কিত আছে। সেই পল্লীমধ্যে প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন চিত্রশালায় প্রবেশ করা হইল। রঙ দেওয়ার এমনই বাহাদুরী সেই প্রসিদ্ধ চিত্রকরীদের আছে যাহা দেখিলে হরিবংশে উল্লিখিত বাণরাজ-পুরীর চিত্রলেখাকেই মনে পড়ে। চিত্রলেখাও আসামের লোক ছিলেন।

প্রাচীন যুগে বাঙ্গালীর তুলি ও বাটালী যে জয়যুক্ত ছিল তাহা এই সকল প্রমাণে

বুঝিতে পারা যায়। তাহারা কাগজে, আয়নার, কাঠে, ধাতব সামগ্রীতে, পুঁথির মলাটে, কাপড়ে, পাথরে, হাতীর দাঁতে ও মাটিতে সর্বত্র কিছুদিন পূর্বে যে সকল চিত্র অঙ্কিত বা উৎকীর্ণ করিত তাহা দেখিলে বোঝা যায় যে এদেশ চারু শিল্পেরই স্বরাজ্য।

আমরা বহু প্রাচীন পল্লীগাথার বাদালী ঘেরেদের চিত্রশিল্পে দক্ষতার কথা পাইতেছি। কাজল রেখা একটি অতি প্রাচীন গীতিকথা, ইহাতে নারিকা যে চিত্রশিল্পবিশারদ ছিলেন, তাহা দেখানো হইয়াছে। তিনি শুধু ফুলপল্লব ও তরুরাজি তুলিতে কাজল রেখার চিত্রপটুতা।

ফুটাইতে দক্ষ ছিলেন না, মাহুঘের প্রতিকৃতি ঠিক স্বভাবের অমুখ্যায়ী করিয়া আঁকিতে পারিতেন। রাজাদের নিযুক্ত চিত্রকরী ছিল, তাহারা বড় বরে বিবাহের ঘটকালী করিত এবং তাহারা বিবাহের যোগ্য পাত্রপাত্রীর ছবি লইয়া দেশ বিদেশে যাতায়াত করিত। চিত্র যদি মনোনীত হইত, তবেই বিবাহের প্রস্তাব অনেকটা অগ্রসর হইত।

জঙ্গল বাড়ীর তরুণ দেওয়ান ফিরোজ খাঁ এইরূপ এক চিত্রকরীর কাছে সখিনার ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা প্রাগজ্যোতিষপুরের বাণ রাজার অন্তঃপুরচারিণী চিত্রলেখার নাম পাইতেছি। ইহার পূর্বে সংস্কৃত সাহিত্যে আর কোন চিত্রকর বা চিত্রকরীর উল্লেখ নাই। সুতরাং (পুরাণের কথা বিশ্বাস করিতে হইলে) আমাদের দেশেই এই চিত্রবিদ্যার একরূপ আদি-ভূমি বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে পুনঃ পুনঃ আমরা রাধিকার সখীদের চিত্রবিদ্যার কৃতিত্বের কথা উল্লিখিত দেখিতেছি।

এগুলি কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নহে, কিন্তু এখনও যে বাদলার পল্লীর ঘেরেরা নানারূপ চিত্রাঙ্কনপটুতা দেখাইয়া থাকেন, তাহাতে আমরা চোখের উপরই দেখিতেছি। এদিকে বখন প্রাচীন সাহিত্যেও ইহার প্রচুর উল্লেখ দেখিতে পাই, তখন দেশে যে চিত্রকর ও চিত্রকরীর বাহুল্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

মাগধী স্বকুমার-শিল্প যেখানে যেখানে খুব শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে সেই সেইখানেই বাদলা দেশে প্রচলিত শিল্পকলার সঙ্গে যে তাহার যোগ আছে—তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। উৎসাহ, অর্থ, বড়লোকের পৃষ্ঠপোষকতা এ সকলের অভাব হইলেও বাদলার শিল্প একেবারে মরিয়া যায় নাই। তাহা প্রাসাদ ছাড়িয়া কুটীরবাসী হইয়াছে। কিন্তু কৈলাসের স্বর্ণপুরী ছাড়িয়া চিতাভস্মের উপর আসীন শিব যেরূপ তাহার মহিমা হারান না, সেইরূপ এই অভাব ও রাজনৈতিক বিপ্লবে উৎপীড়িত দেশেও শিল্প নিজের গৌরব সেদিন পর্যন্তও বজায় রাখিয়াছিল। আমরা প্রবাসী রামচন্দ্রের মত ঐর্ষ্যহীন, অরণ্যচারী এবং অধঃপতিত হইয়াছি। কিন্তু রাম সীতার সঙ্গে থাকিতেন, ও প্রায়ই বলিতেন, “তোমার সঙ্গে থাকিয়া অযোধ্যার অভাব আর আমাকে কষ্ট দেয় না।” আমাদের অন্তঃপুরিকাদের ভালবাসা নিঃস্ব অবস্থায়ও আমাদের পরম শান্তি ও গৌরবের বিষয় ছিল। তাহারাই আমাদের শিল্পের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, বাহা কিছু অভাব অভিযোগ তাহা সেহ দিয়া অতিমাত্রায় পূরণ করিতেন। সামান্য শাক, তরকারী ও ব্যঞ্জনকে নানা কৌশলে প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অমৃত আশ্বাদ দিতেন। সন্দেহ প্রভৃতি তৈরী করিতে বাইয়া এরূপ শিল্পনৈপুণ্য

দেখাইয়াছিলেন যে তাহা শুভ্র ও সুরভি ফুলফলের শোভা ধারণ করিত। বাঙ্গালী মেয়েদের হাতের শত শত হাঁচ আছে তাহা মাটি দিয়া গড়া, তাহার কারুকার্য দেখিবার যোগ্য, তাহা মেহার্জী আবুলের স্পর্শে অপূর্ণ শ্রীসম্পন্ন। একটি নারিকেলের শাঁস লইয়া কত শিল্পনৈপুণ্য যে তাহারা দেখাইয়া থাকেন, তাহা পূর্ববঙ্গের মহিলাদের নিশ্চিত নারিকেলের মেঠাই না দেখিলে কেহ বুঝিতে পারিবেন না। স্বামী, পুত্র, কন্যা বাহা
মেঠাই।

থাইবেন তাহা গড়িতে বাইরা প্রাণ-ঢালা মমতার রসান দিয়া রাত্রিদিন ভুলিয়া তাহারা কন্দনৈপুণ্য দেখাইতেন। বঙ্গের পকাশ ব্যঞ্জন এখন কবার কথা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু উহাতে তাহাদের মেহমধুর মনের সমস্ত স্নকুমার বৃত্তির লীলা প্রদর্শিত হইত। রাসাধর ছিল তাহাদের শিল্পশালা, আগপনা-শোভিত আঙ্গিনা ছিল তাহাদের চিত্রশালা, নানারূপ কারুখচিত সামান্য দড়ির শিকা, মাটির হাড়ীর রঞ্জিত চিত্রিত শোভা—এ সকলের সহিত ভাঁড়ার ছিল তাহাদের চিত্রশালা। সামান্য শাড়ী ও ছেঁড়া কাপড়ের উপর কত চিত্র-বিচিত্র কারু-কার্য দেখাইয়া তাহারা যে কাঁধা ও বালিশের খোল, পানের বটুয়া তৈরী করিতেন তাহাতে তাহাদের শয্যাগৃহ ছিল চিত্রশালা। এই আঁকা ও সেলাই করার কতকগুলি নিয়ম ছিল, ভিন্ন ভিন্ন রূপ আঁকিবার প্রণালীর ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল।

যে আসনে প্রিয়তম পুত্রের বিবাহ হইবে, কত মেহে সে আসন চিত্রিত হইত তাহা তাহাদের সহিষ্ণুতা ও কৃতিত্বের বড় রকমের নিদর্শন ছিল। পীঁড়ি-চিত্র বাঙ্গালী মেয়ের আর একটা মস্ত বড় বিজ্ঞ। আমরা এরূপ পীঁড়ি-চিত্র দেখিয়াছি
বিবাহ-বাসর।

বাহার অঙ্কন বিষয়কর। এই সকল পীঁড়িতে, মেঠাইয়ের ছাঁচে, কাঁধায় ও বহির মলাটে, বটুয়ায় ও শিকায়, ঠাকুরের সিংহাসনের কাঠে, সর্বত্র অজস্তার চিত্রশিল্প ও ইলোরা ও ভুবনেশ্বরের কারুকার্য বারংবার উকি মারিয়া যায়, মনে হয় একটা বড় জিনিষ ছোট হইয়া গেলেও তাহার মূল প্রাণ হারায় না। মাহুস সর্বাস্তঃকরণ দিয়া তপস্তার সমস্ত প্রচেষ্টা দিয়া বাহা করে—তাহার মধ্যে আর বাহাই হউক না কেন প্রাণের অভাব হয় না। মেয়েদের শিল্পে এই যে প্রাণের চূড়ান্ত আকাজকা ও সাধনা দেখিতে পাই—তাহাই বাঙ্গালার কুটার-শিল্পের বিশেষত্ব। একখানি ভাল স্থপ্রাচীন কাঁধা পরীক্ষা করিয়া দেখুন, উহাতে যে দৈর্ঘ্য অবলম্বিত হইয়াছে তাহা অমাহুসিক। এখনকার দিনে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া তেমন পরিশ্রম করিলেও কেহ ওরূপ জিনিষ তৈরী করিতে পারিবে না। ভালবাসা-প্রসূত সে শিল্পতপস্তা এদেশ হইতে কি চিরতরে বিদায় লইয়াছে? আমাদের এখন খাওয়ার আনন্দ চলিয়া গিয়াছে, সে অবিলম্বিতগতবামা রাত্রির আনন্দ চলিয়া গিয়াছে। রন্ধনশালা, শয্যাগৃহ, বিশ্রামকক্ষ যেন শ্মশানের মত খাঁ খাঁ করিতেছে। তথাপি কপালে একটি সিন্দুরের টিপ ও বিবাহের একখানি চিত্রিত পীঁড়ি দেখিলে এক অতীত যুগের স্মৃতি কথা মনে পড়ে।

পূর্বে পুরুষ ও স্ত্রীলোক প্রায় তুল্যরূপ শিক্ষিত ছিল। যেখানে পুরুষের শিক্ষা ও বিজ্ঞার

চর্চার উপর এত জোর দেওয়া হইয়াছিল, সেখানে যে দ্বীলোকের শিক্ষা উপেক্ষিত ছিল, ইহা বলা ভুল। বৈদিক আত্মেয়ী, অরক্ষতী, গাঙ্গা প্রভৃতি উচ্চ-শিক্ষিত দ্বীলোকের নাম সর্জনজনবিদিত। রামায়ণে গৌতমী প্রভৃতি কঠোরব্রতা যোগিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মনে মনে অনেক বিতর্কের পর হনুমান সীতার সহিত সংস্কৃত ভাষার কথা বলিয়াছিলেন। মহাভারতে এইরূপ উচ্চশিক্ষিত ও সাধনানিরত অনেক দ্বীলোকের কথা পাইতেছি। রাজাস্তম্ভপু্রে দ্বীলোকেরা নানারূপ শিক্ষা পাইতেন। অর্জুন বৃহন্নলা সাজিয়া বিরাটরাজপ্রাসাদে রাজকুমারীদিগকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিয়াছিলেন। ‘পদ্মিনী’ রমণীর লক্ষণমধ্যে “নৃত্যগীতে অনুরক্তি” একটা অপরিহার্য গুণ ছিল। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে রমণীদের নৃত্যগীতি, চিত্রকলা ও উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞাশিক্ষার অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। বেহলা এমন সুন্দর নাচিতে গাহিতে জানিতেন যে তাহার নামই হইয়াছিল “বেহলা নাচুনী,” প্রাচীন অনেক গীতিকথায় আমাদের রাজকুমারীরা স্বর্গে যাইয়া নৃত্যগীতে কৃতিত্বপ্রদর্শনপূর্বক দেবতাদিগের নিকট বরলাভ করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সংস্কৃত মুচ্ছকটিকের বসন্তসেনা নানা বিজ্ঞায় সুপণ্ডিতা ছিলেন—তিনি সংস্কৃতে কথাবার্তা বলিতে পারিতেন। অপর নাটকগুলির নায়িকাদের অনেককেই প্রাকৃত ভাষার কথা বলিতে দেখা যায়। হিন্দু রাজত্বকালে পুরুষ ও প্রাপ্তবয়স্ক রমণীরা এক গুরুতর পাঠশালায় একত্র পড়িতেন। গীতিকথাগুলির অনেকটিতেই এইরূপ অধ্যয়ন উপলক্ষে প্রেমের অভিনয়ের সূত্রপাত বর্ণিত আছে। ‘সখীসোনা’ প্রভৃতি গীতিকার এইরূপ নায়ক-নায়িকার কথা দৃষ্ট হয়। এগুলি গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। বহু কাহিনীতে এইরূপ ব্যাপারের উল্লেখ ইহা একটা ব্যাপক রীতির অস্তিত্ব প্রমাণ করে। গল্পসাহিত্যের ঐতিহাসিকত্ব আমরা অগ্রাহ করিতে পারি, কবির কল্পনায় অনেক নায়ক-নায়িকা ও ঘটনার সৃষ্টি হইয়া কথাসাহিত্যে বিরচিত হইয়া থাকে, কিন্তু উহাতে আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অনেক সময়েই সমাজের দর্পণস্বরূপ। আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যে অগণিত মহিলা-কবির নাম পাইতেছি, অনেক ঐতিহাসিক মহিলার বিজ্ঞাবুদ্ধির কথা জানিয়াছি। যখনামতী শিশুকালে পাঠশালায় পড়িতেন এবং গোরক্ষনাথের শিষ্যা হইয়া যোগশাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ, চাঁদবিনোদের পালা ও কেনারাম বিশ্ববিজয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাসের প্রেমিকা রামীর অনেক পদ পাওয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আনন্দময়ী দেবী একজন সুপণ্ডিতা মহিলা ছিলেন। তিনি বেদ হইতে অঘিষ্টোম যজ্ঞের অনেক ব্রহ্মস্তু ও যজ্ঞকুণ্ডের আকার প্রভৃতি তাঁহার পিতাকে জানাইয়াছিলেন। হরিলীলা কাব্যে তাঁহার যে পদগুলি আছে তাহা তাঁহার সংস্কৃতে অসামান্য ব্যুৎপত্তি প্রমাণ করে।

এইরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে—বৌদ্ধ ভিক্ষুণীরা এককালে এদেশে জ্ঞান ও সাধনার শীর্ষদেশে পৌছিরাছিলেন। ধেরী গাথা পুস্তকে তাঁহাদের বিজ্ঞাবুদ্ধির কিছু কিছু নমুনা আছে। বিজ্ঞানুন্দরে বিজ্ঞা যে পাণ্ডিত্যের বলে প্রতিদ্বন্দ্বীকে তর্কে আহ্বান করিয়াছিলেন,

তাহা করনামূলক হইলেও পূর্বকালের একটা ঐতিহাসিক সংস্কারের অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। এই সংস্কার বহু প্রাচীন কালের, মণ্ডনমিশ্রের ও শঙ্করের ঘোরতর শাস্ত্রালোচনার ফেদ্রে মণ্ডনশাস্ত্রী উভয়ভারতী মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে পণ্ডিতা রমণীর অভাব ছিল না—জাহ্নবী দেবী, শিখি মাইতীর ভগিনী মাদবী প্রভৃতি অনেকের নাম করা যাইতে পারে। এক কালে ব্রাহ্মণের শ্রেণীর মেয়েরাও লিখিতে পড়িতে জানিতেন। ধনপতি সদাগরের দ্বিতীয় ভাৰ্য্যা খুলনা চিঠিপত্র লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন। কবি এ সমস্ত বিষয় এমন অবলীলাক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন যে সত্য সত্যই খুলনা নামক কোন জীলোক বণিক্কুলে না থাকিলেও উহা সেই কুলে বহু অজ্ঞাতনামা শিক্ষিতা রমণীর বিস্তৃমানতার প্রমাণ। আমরা জীলিকা-সম্বন্ধে আলোচনা উপলক্ষে আবার এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিব।

পরবর্তী সময়ে লেখাপড়া না শিখিলেও কথকতা ও কীর্তন প্রভৃতির দ্বারা দেশে শিক্ষার এতটা প্রচার হইয়াছিল যে এ দেশের নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা পর্যন্ত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতাদি পৌরাণিক সমস্ত উপাখ্যান অবগত ছিল। ব্যাধ-রমণী কুলরা চণ্ডীকে যে সমস্ত শাস্ত্রের কথা শুনাইয়া দিয়াছিল তাহার ঐতিহাসিকত্ব কিছুই নাই কিন্তু নিম্নতম শ্রেণীর জীলোকের আক্ষরিক জ্ঞান না থাকিলেও তাহারা যে সেই সকল শাস্ত্রোক্ত ব্যাপার বিদিত ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এখনও হস্ত নিম্নতম শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে সেইরূপ জ্ঞান আছে। কবিওয়ারীদের মধ্যে অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর সঙ্গীত-রচয়িতা যজ্ঞেশ্বরী প্রভৃতির কথা বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসজ্ঞমাত্রই অবগত আছেন। আমরা জীলোকের উচ্চশিক্ষার উদাহরণ পরবর্তী এক অধ্যায়ে দিব।

পূর্বকালে জীলোক ও পুরুষের বিজ্ঞাবুদ্ধি সাধারণতঃ একরূপ ছিল। পণ্ডিতের ঘরে পণ্ডিতা গৃহলক্ষ্মীর অভাব ছিল না। সাধারণ গৃহস্থ রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, মূল সংস্কৃতে না পড়িতে পারিলেও কথক ঠাকুরের কৃপায় তাহাদের উপাখ্যান-ভাগ জানিতেন। তাহাদের রমণীদেরও সে বিজ্ঞা ছিল। পুরুষেরা জমিজমার হিসাব রাখিতেন, শস্তক্ষেত্র পরিদর্শন করিতেন, রমণীরা সেই শস্ত গোলায় তুলিয়া রাখিয়া ভাঁড়ারের হিসাব রাখিতেন। পুরুষেরা বাহিরের সকল কৰ্ম করিতেন, মেয়েরা গৃহের মধ্যে সকল কাজ করিতেন, পরস্তু অসাধারণরূপ শিল্পবিজ্ঞার চর্চা করিতেন। এক চাকার রথ চলে না। ঘরে বাহিরে পুরুষ ও জী এই দ্বিচক্রবাহিত সংসার-রথ বিনা আড়ম্বরে চলিয়া যাইত। এখন যদি পুরুষেরা বিখের সমস্ত সংবাদ রাখেন এবং জীলোক কৃপমণ্ডকের জায় স্বীয় অন্তঃপুরের বাহিরের কিছু না দেখেন, তবে অশান্তি হইবেই। জীলোক এখন ঘরের কাজ কিছুই করিবেন না পণ করিয়া উপভাস-হস্তে শুইয়া পড়িয়া আছেন, অথচ বৎসর বৎসর মানবকের আবির্ভাব হওয়াতে অর্থসমগ্রতা ক্রমেই জটিল ও কঠিনভাবে পরিগ্রহ করিতেছে। এদিকে সংসারের ভার কাঁধে করিয়া পুরুষ গলদগর্ভ হইয়া চোখে সরিষার ফুল দেখিতেছেন, আবার চারিদিকের হাওয়া বাঙ্গলার কুটিরেও আসিয়া ঢুকিয়াছে। জীলোক আর অবগুষ্ঠনবতী

হইয়া অবরোধের পাখী হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিতে চাহেন না। অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও বঙ্গ-পল্লীতে অবরোধ বলিয়া কিছু ছিল না। সহরে একান্ত অনাস্থীয় ও অপরিচিত পাড়াপড়সীর মধ্যে বাস করিয়া যে অবরোধ একরূপ অপরিহার্য হইয়াছে, তাহাতে নগরবাসিনীরা স্বর্গহের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরকার ঘরে বাওয়া ও কার্যোপলক্ষে নীচে নামা ভিন্ন অঙ্গচালনা বা স্বাধীনতার কোনই সুযোগ পান না। এই সকল অসামঞ্জস্যের দরুন বৌনসমস্তা আমাদের দেশে বড়ই অটল হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীলোক এখন আর পুরুষের অবিচার অত্যাচার সহ্য করিবেন না, তাঁহারা এখন অসহিষ্ণু ও মরিয়া হইয়া উঠিতেছেন। ঘরে ঘরে কেরোসিনের বিভীষিকা দেখা দিতেছে। তাহার উপর অপবদর্শ্যাবলম্বীর হাত গায়ে লাগিলে তাঁহারা এক-ঘরে অস্পৃশ্য হইয়া পড়িতেছেন—হিন্দুগৃহে আর তাঁহাদের স্থান নাই। কিছুদিন পূর্বেও গোঁড়া ব্রাহ্মণ সমাজ ধর্মিতা রমণীর প্রতি যে উদারতা দেখাইতেন, এখন আর তাহা নাই। ঘরে ঘরে স্ত্রীবিদ্বেষ, তাহার ধোয়া বঙ্গে ঘনাইয়া উঠিয়াছে। পুরুষ বিবাহ করিতে চাহেন না, রমণীরাও নানারূপে এই গৃহের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে মনে মনে সঙ্কল্প করিতেছেন। ইহার ফল কি দাঁড়াইবে জানি না, কিন্তু পুরুষ হইয়া যদি স্ত্রীলোকের ভালবাসা না পায় এবং স্ত্রীলোক হইয়া যদি পুরুষের ভালবাসা না পায় তবে তাঁহাদের মত দুর্ভাগ্য আমি কল্পনা করিতে পারি না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত আলোয়াল কবির পদ্যাবৎ পড়িলে দেখা যায়, মুসলমানগণের মধ্যে কেহ কেহ কিরূপ সংস্কৃত অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। তদপেক্ষা

চট্টগ্রামের মুসলমানগণ।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সংস্কৃত শ্লোক সহ অদ্ভুত সমাস ও সন্ধি-সম্বলিত অতি কঠিন সংস্কৃত শব্দ দ্বারা তিনি যে পুস্তক লিখিয়া

গিয়াছেন, তাহা প্রায় তিন শত বৎসর বাবৎ মুসলমানেরা এখনও দল বাঁদিয়া শত শত মুসলমান শ্রোতার সম্মুখে গান করিয়া থাকেন। ইহা হইতেও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এরূপ উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতশব্দবহুল একখানি কাব্য প্রায়ই ফারসী অক্ষরে লিখিত হয়। বৌদ্ধ নেতারা মগধধ্বংসের পর তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে পালাইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের একদল চট্টগ্রাম অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হন। এই স্থলে পরিশেষে যখন তাঁহারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন তখন যে উচ্চাঙ্গের সাধনা ও পাণ্ডিত্য তাঁহাদের ছিল তাহার অসুশীলনের আর কোন সুবিধা রহিল না। কিন্তু যুগ-যুগ অর্জিত সেই বিজ্ঞার প্রভাব তাঁহাদের শোণিতে ছিল। পূর্ব সংস্কার লুপ্ত হইতে বহুকালের দরকার হয়। চট্টগ্রামের মুসলমানগণের সংস্কৃত-কৃতিত্ব এত বেশী ছিল যে তাহা নিম্নশ্রেণীর কুটীর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এইজন্য পদ্যাবতের এত শ্রোতা সেখানকার মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যায়। পদ্যাবতের রচনার নমুনা এইরূপ :—

“বসন্তে নাগর-বর নাগরী বিলাসে,
বরবালা ছই ইন্দু, শ্রবে বেন সুধা বিন্দু
মৃদুমন্দ অধরে ললিত মধু হাসে,

প্রফুল্লিত বনস্পতি, কুটিল তমাল ক্রম
 ঝড়ত মধু রত কুঞ্জে রত রাসে,
 মলয় সমীর, স্নানীতল সুরভিত,
 বিলোলিত পতি অতি রসভাবে ।”

ছত্রহ প্রাকৃত ও সংস্কৃতবিজ্ঞার জাহাজস্বরূপ কাব্যখানি বাঙ্গালী মুসলমান কবকেরা
 এই তিন শত বৎসর যাবৎ দল বাঁধিয়া গাহিয়া আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে সংস্কৃতচর্চা
 যে কিরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও ব্যাপক ছিল, তাহা ইহা দ্বারা বেশ উপলব্ধি করা যায়।

কাঁধার যেসকল অপূর্ণ নমুনা আমরা দেখিয়াছি তাহা ফটোগ্রাফ করিয়া রাখিবার
 সুবিধা হয় নাই। এখানে অতি সাধারণ কয়েকখানি কাঁধার অংশগুলির কয়েকটি প্রতিলিপি
 দিতেছি, এই কাঁধাগুলি ৩৪ শত বৎসর যাবৎ অতি দরিদ্র মেয়েদের দ্বারাই সাধারণতঃ
 প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। যে সকল শাড়ী পুরাতন হইয়া ছিঁড়িয়া যাইত, তাহা ফেলিয়া
 না দিয়া নিয়ন্ত্রণী এবং সময়ে সময়ে বিপর্যয় মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহলক্ষ্মীরা তাহা দ্বারা এই
 কাঁধাগুলি সেলাই করিতেন। ইহা বিক্রয় করিয়া ঠাহারা কায়কষ্টে জীবিকা চালাইতেন।
 কখনও কখনও দ্বৈহ ও ভালবাসাই ইহার একমাত্র প্রেরণা দিয়াছে, স্বামী ও পুত্রকে দিবার
 জন্ত রমণীরা দিনরাত পরিশ্রম করিয়া কাঁধা সেলাই করিতেন। সেই পুরাতন শাড়ী ও
 ছেঁড়া শাড়ীর পাড়ের নানা রঙ্গের সূতা এবং ছুঁচ ইহাই যাত্র ছিল উপাদান।

ইহাতে একটি পয়সাও ব্যয় হইত না, অথচ যে শিল্পকৌশল ও সহিষ্ণু পরিশ্রমে

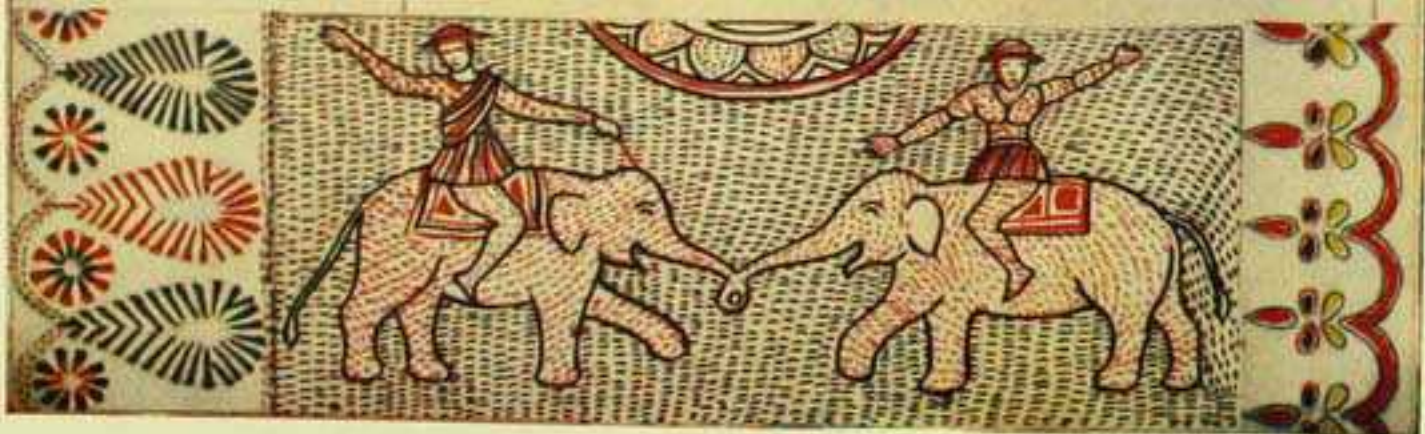
বাঙ্গালী মেয়েদের হাতের
 কাঁধা।

এক একখানি তৈরী হইত, তাহা এদেশে ছাড়া অন্য কোন দেশে
 কোন রমণী কোন কালে এরূপ তুচ্ছ উপকরণ দিয়া সম্পাদন
 করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

প্রথমতঃ সমস্ত কাঁধাখানির উপর ঘন ফোঁড়ের শেলাই দেওয়া হইত, ইহা সাদা সূতায়
 হইত। ইহাতে জমির উপর কোমল একটা সাদা রঙ্গের যেন ঢেউ খেলিয়া যাইত।
 একখানি তিন হাত লম্বা দুই হাত প্রশস্ত জমির উপর ঐরূপ সরল সোজা রেখার বুননি
 দেওয়ায় যে কত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার দরকার তাহা অনুমান করা যাইতে পারে; হৃৎথের
 বিষয় সাদা জমির উপর সেই সকল সাদা সূতের বুননি ফটোগ্রাফে বা ছবিতে ধরা পড়ে না।
 সূতরাং আমাদের প্রদত্ত চিত্রগুলিতে তাহা টের পাওয়া যাইবে না। এই বুননি দ্বারা জমির
 যে শুধু শোভা বৃদ্ধি হয় তাহা নহে, এত ঘন বুননি দেওয়াতে পুরাতন শাড়ীতে প্রস্তুত জমি
 খুব শক্ত হইত, তাহা ছিঁড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিত না। এইভাবে জমি প্রস্তুত হইলে
 তাহার উপর কত যে পত্র, কত যে ধানের শীষ, কত যে রং-বেরং ফুল ও সূতার পল্লব
 রচিত হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। আশ্চর্যের বিষয় আমি ন্যূনপক্ষে দুইশত কাঁধা দেখিয়াছি,
 ইহার একখানি ঠিক অপরাধখানির মত নহে। এই বিচিত্র লতাপল্লব ও ফুলসজ্জা অসামান্য
 উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় প্রদান করে, কারণ ইহাদের আদর্শ প্রায় সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন; প্রত্যেক



এই ছবি এবং ইহার পর-পৃষ্ঠার ছবি ১৯ খানি কাঁথার অংশ-বিশেষ চরিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। বহু-প্রাচীন কাঁথা একবারে চুলত, যেহেতু সূতা দ্বারা প্রস্তুত এবং এই কাঁথাসকলি সর্বদা ব্যবহৃত হইত; ইহাদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনখানি ১৪০ বৎসরের। সেখানি রাধা-কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। অপরগুলি ১০০ হইতে ৫০০ বৎসর পুরকের। আর সমস্ত কাঁথাই পুরন-বস্ত্রের। একখানিতে ১১টি কাঁথা হইতে, অপরখানিতে ৮টি হইতে অংশ বিশেষ চিত্রিত হইয়াছে।



রমণী যেন সংকল্প করিয়া বসিতেন যে অপরের কায়দা তিনি নকল করিবেন না এবং তাঁহার কাঁথাখানি অপরের কাজ হইতে ভাল করিতে হইবে। এই সকল চারু শিল্পকলাজাত কাজ প্রত্যেকটি মৌলিক হইলেও, কাঁথা শেলাইএর কতকগুলি নিয়ম ছিল, আমাদের পিতামহীরা তাহা জানিতেন। স্বামী ও পুত্রকন্টার প্রতি ভালবাসায় সেই শিল্প-নৈপুণ্য কোমলতর ও হৃদয়তর হইয়া ফুটিয়া উঠে; হয় ত দূরগত প্রবাসী পুত্রের মুখখানি স্মরণ করিয়া তাহার ব্যবহারার্থ যে জিনিষটা তৈরী করিতেছেন তাহার উপর সমস্ত মাতৃহৃদয়ের প্রাণঢালা বস্তু শিল্পীর হস্তে মেহজনিত-নিপুণতা প্রদান করে। মেহের দ্বারা যে কাজটি হয় তাহার মধুরতা ও লাভন্য এই কাঁথাগুলি স্পর্শমাত্র অনুভব করা যায়। উহা যন্ত্রের তৈরী নহে, যন্ত্রের তৈরী; ছাঁচে ঢালা কোশলের একদেবে বাধুনির মধ্যে উহার জন্ম হয় নাই, শত সহস্রের মধ্যে একসঙ্গে পরিবেশনের জন্য সিদ্ধারের কলে উহা তৈরী হয় নাই, কাঁথাগুলি হাতে করিলেই মনে হইবে উহা বাৎসল্য বা দাম্পত্য-স্মৃতিমাথা। কেবল ফুললতা নহে, রাজা, প্রজা, রথ, হস্তী, অশ্ব, পৌরাণিক উপাখ্যান—এ সকলই কোন কোন কাঁথায় সত্যায় বিরচিত হইয়াছে। ইহার সর্বাপেক্ষা বড় মনোহারিত্ব ইহার বিচিত্র বর্ণসম্পদ, ছবিগুলি বিলাতী চিত্রাদর্শ-হিসাবে যেখানে ফুল করিয়াছে বলিয়া মনে হইবে, ভারতীয় চিত্রাদর্শে হয় ত তাহাই উহার গুণ। কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দিয়া একখানি কাঁথা খুলিয়া ধরিলে মনে হইবে বাঙ্গলার মনোরম কোন পল্লী-দৃশ্যের একখানি ছবি চোখের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। রংগুলি একপভাবে সুবিস্তৃত হইয়াছে বাহাতে শিল্পকোশলের চূড়ান্ত কথা বলা হইয়াছে। কাশ্মীরের শাল, বেনারসের শাড়ী ও পারস্তের গালিচা যেন ছাপাইয়া গিয়াছে এই পল্লীবাসিনীদের বিচিত্র বর্ণস্বপ্না। বাঙ্গলার কাঁথা, ক্ষোদিত ইষ্টক প্রভৃতি যাবতীয় শিল্পসৃষ্টির একটা বৈশিষ্ট্যই এই যে বাহাকে আমরা লতা, ফুল ও তরু প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়া থাকি—সেই ককার কাজের মধ্যে তরুপ নকলবাজি আদৌ নাই—পদ্ম ঠিক পুকুরের পদ্ম নহে, ফুল ও লতা স্বভাবের ফুল ও লতা নহে—বাঙ্গালী শিল্পী নকলনবীস্ আদৌ নহে—সে স্বক হইতে ওস্তাদ।

এখানে প্রদত্ত ছইখানি রঙীন ছবি ১২খানি কাঁথা হইতে গৃহীত। প্রথমটিতে এগার খানি ও দ্বিতীয়টিতে আটখানি কাঁথার নিদর্শন আছে। এই সকল কাঁথার কোন কোন খানি দৈর্ঘ্যে আট ফুট ও প্রস্থে চার ফুট, স্তম্ভরাং অতি বৃহৎ। আমার চিত্রশালায় প্রায় ৫০ খানি কাঁথা সংগৃহীত আছে, ইহার সকল গুলিই উৎকৃষ্ট নহে, এবং আমার কাছে যে সকল উৎকৃষ্ট কাঁথা আছে, তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট কাঁথা এখনও বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার বিত্তমান আছে। আমি একখানি কাঁথার “শিব-তাণ্ডবে”র ছবি দেখিয়াছি, অপর একখানিতে নানারূপ নায়ক-নায়িকার সমাগমসহ ফুললতার নিপুণ কার্য আছে, তাহাদের নিদর্শন দেওয়ার সুবিধা পাইলাম না—কিন্তু অন্ততঃ এই ছইখানি কাঁথা যে বাঙ্গালী রমণীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী সীবন-কার্য-দক্ষতা প্রমাণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ১২খানি কাঁথার নিদর্শন দেওয়া হইয়াছে—তাহাদের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ত্রিগুপ্ত বিশ্বপতি চৌধুরী, এম. এ.

আমাকে আঁকিয়া দিয়াছেন। তিনি নিঃস্বার্থভাবে কতদিন পরিশ্রম করিয়া যথাসম্ভব নিখুঁৎ প্রতিলিপি গ্রহণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তথাপি মূল কাঁথাগুলির যে “ঢল ঢল অঙ্গের লাবণী” এবং অত্যাস্ত্য বর্ণসম্পদ তাহা তুলির রেখায় সেরূপ স্পষ্ট হয় নাই। এই কাঁথাগুলি ফরিদপুর, শ্রীহট্ট, খুলনা, যশোহর, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সংগৃহীত। ইহাদের মধ্যে একখানি ১৫০ বৎসরের প্রাচীন, বাকীগুলি ৮০ হইতে ৫০ বৎসর পূর্বের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। কাপড়ের জিনিষ বেশী দিন টিকে না, সুতরাং কাঁথা সেলাই যে কত কালের রীতি তাহা বলিবার উপায় নাই। এই কার্য যে অতি দীর্ঘতার সহিত করিতে হইত, তাহা প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক “শনৈঃ কহা শনৈঃ পহাঃ” হইতেই প্রমাণিত হয়।

জন্ত ছিল বাঙ্গালী যখন সে বাজারের মেঠাই খাইত না, যখন সে শিল্পনৈপুণ্যের পরা কাঁঠা দেখিবার জন্ত দোকানে দোকানে ঘুরিত না। একখানি কাঁথা সেলাই করিতে সাধারণতঃ ছয় মাস লাগিত, কিন্তু আমরা এমন সকল অপূর্ণ কাঁথার কথা শুনিয়াছি বাহা পিতামহী আশ্রয় করিয়া গিয়াছিলেন, মাতা তাহার সমস্ত জীবনে শেষ করিতে পারেন নাই, কঙ্কার মুখে তাহার সমাপ্তি-বাক্য উচ্চারিত হইয়াছে। সেই অমূল্য কারিগরী বাহা এখন আর হইবার নহে, তাহার মূল্য এক টাকা বা দুই টাকা ছিল, এখন আর পাওয়া যায় না। জাপানী ও জাপানী চক্চকে শিল্পের, আদর্শ হিসাবে, অতি খেলো জিনিষের প্রত্যেকটির জন্ত আমরা যে দর দিতেছি তাহাতে দশখানি কাঁথা পাওয়া যাইত। আমরা পরাজিত জাতি, কিন্তু রাত্রীর পরাজয়কে আমি তত হুঁত্যা মনে করি না, বিলাতী সভ্যতার গোলোকধামায় পড়িয়া আমরা যে আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলি হারাইয়া ফেলিয়া কাচমূল্যে কাঞ্চন প্রদান করিতেছি ও কাঞ্চনমূল্যে কাচ ঘরে আনিতেছি,—এই যে আশ্রয় পরাজয় ইহাই আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় পরাজয়। আমাদের চোখে কে মুষ্টি মুষ্টি বালি নিক্ষেপ করিয়াছে যে, আমাদের প্রকৃত সম্পদকে আর আমরা সম্পদ বলিয়া চিনিতে পারি না। পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলি বাহা ভুলিয়া গিয়াছে আমরা তাহা ভুলি নাই। যগন্দের শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান, স্থাপত্য এ সমস্তেরই আমরা এখনও প্রকৃত উত্তরাধিকারী এ কথায় অবিশ্বাসের কোন হেতু থাকিবে না। এই স্থানে কাঁথার সঙ্গে আলপনারও কিছু কিছু নমুনা দিতেছি।

গৌড় এক সময়ে স্থাপত্যশিল্পের ভূমিস্থানে অবস্থিত ছিল। দোচালা ঘরের মত যে সকল ইষ্টকালয় এখনও মাঝে মাঝে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহার আদি স্থান গৌড়। বার্জেস সাহেব

বলিয়াছেন বাঙ্গলা দেশ হইতে এই ভাবের মন্দিরাদি নির্মাণ পৃথিবীর

স্থাপত্য।

সর্বত্র অহুকৃত হইয়াছে। বাঙ্গালী কারুকার্যের পরা কাঁঠা পোড়া

ইটের উপর দেখাইত। এখনও যখন অত্যাচার ও প্রকৃতির নানারূপ বিপ্লবে দেশের কারুকার্য-খচিত অট্টালিকাগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে ও খরনদীর স্রোত ও বস্তার সেই সৌন্দর্য্যের অনেকগুলিরই অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখনও দূর পল্লীর দৈবক্রমে রক্ষিত দুই একটি মন্দিরের ইষ্টকের কারুকার্য চক্ষু মোহিত করে। বোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত সংগ্রামসিংহের ফরিদপুর মথুরাপুরে (খানা চেলগাদি) একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরটি কোন দৈব দুর্ঘটনার দরুন



মটির গহনা, ১২শ শতাব্দী ফরিদপুর।



মূর্তিকা-নির্মিত মাতৃমূর্তি, বিষ্ণুমূর্তি প্রভৃতি, ১২শ শতাব্দী ফরিদপুর।



প্রাচীন স্বামগণের হাঁচ



মোঁচ/বাতা,



কলিহাড়,



কলমৌলতা,



শিবলতা।



(ক) শিবলতা,



(খ) কলমৌলতা,



(গ) কলমৌ

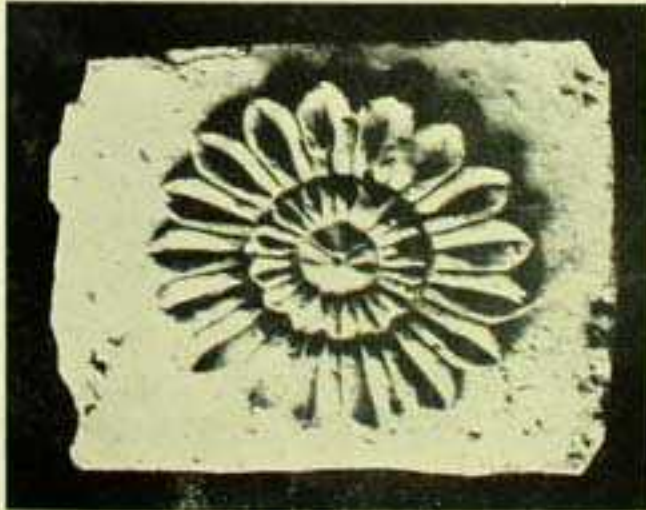


মৃৎ-শিল্প । পোড়া ইটের (Terra-cotta) কাজ ।

মুসলমানাদিকারে আধাবর্ত্তে গ্রন্থর-শিল্প এরূপাধ্বংস প্রাপ্ত হয় কিন্তু মানসিক মোগল সম্রাট হইতে মন্দির নির্মাণের অধিকার পান ; ফলে বৃন্দাবনে ১৪৮০ খৃঃ অব্দে গোবিন্দ-জীর মন্দির তৎকর্তৃক নিশ্চিত হয় । যজ্ঞবেশের শাসনকর্তৃক কালে তাঁহার আশ্রয়ে বহু পন্নীতে মন্দির নিশ্চিত হয় এবং তাহারের গায়ে পোড়া ইটের নানা মূর্তি ও শিল্পকাৰ্য্য রচিত হইয়াছিল- ২৩ শত বৎসর পূর্বে যজ্ঞবেশে এই প্রকার বহু মন্দির রচিত হয়, কলিকাতার চারিদিকে কোতালপুর, বরিশা, বেহালা, বৈচিত্র নিকট বৈজ্ঞাপুর, ঢাকা, বাগেরা মেদিনীপুরের বহু স্থান হইতে আমরা পোড়া ইটের উপর উৎকর্ষ শিল্প কাৰ্য্যের নমুনা সংগ্রহ করিয়াছি । দ্বিতীয় যুগের প্রকালেও বাঙ্গলা দেশে পোড়া ইটের উপর কাৰ্য্যকাৰ্য্য হইত, পাটাতনপুরে তাহার নিদর্শন বিজ্ঞমান



বনবিহুপুর, জোড়ী মন্দিরের গায়ে নৌ-সৈন্য, সপ্তদশ শতাব্দী



২৪শ পরগণা, বরিশা, সপ্তদশ শতাব্দী ।



ফরিদপুর, রথের অংশ, চতুর্দশ শতাব্দী ।



২৪শ পরগণা, বরিশা, সপ্তদশ শতাব্দী ।



২৪শ পরগণা, বরিশা, সপ্তদশ শতাব্দী ।



বানর-গুচ, মেদিনীপুর, সপ্তদশ শতাব্দী।



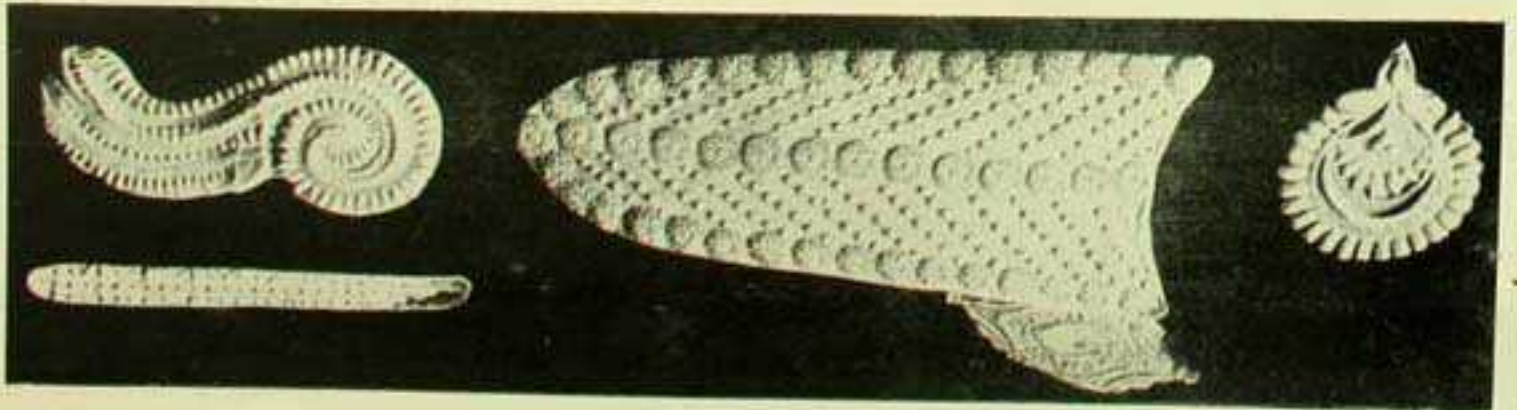
বড়ার ও গোপীন্দ্র বর্ম বিজয়ার্থ মণ্ডল যাত্রা,
চৌদ্দশ শতাব্দী, কান্দৈপুর।



বর্ষা পরগণা, মেদিনীপুর—
সপ্তদশ শতাব্দী।



শিকার-চিত্র, ছবিতে ভাল-উৎসাহ নাই। অথও কুকুরের উদ্দাম গতি এবং
হরিণের দুর্দৃশ্য কালের অত্যন্ত মূলের মত হয় নাই। কান্দৈপুর, চতুর্দশ শতাব্দী
৪৩০ পৃঃ।



মন্দির গহনা, ১২শ শতাব্দী, কান্দৈপুর। ৪৩০ পৃঃ।



ঢাকাই মসলীন, মহানাব, আমের কোন পরিবার হতে গৃহীত, নব্বদশ শতাব্দী।



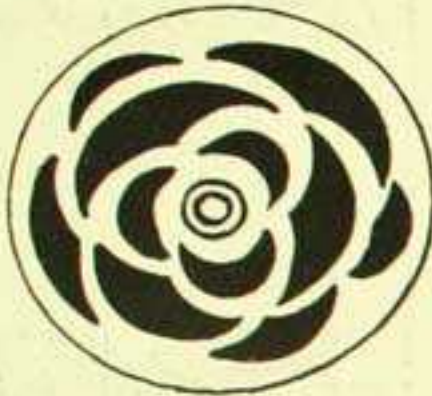
— ইতিহাস মিউজিয়ামে একটি এককর্ণ-ছাদশ
শতাব্দীর প্রস্তর মূর্তি হতে গৃহীত।
(ঢাকা মসলীন)।



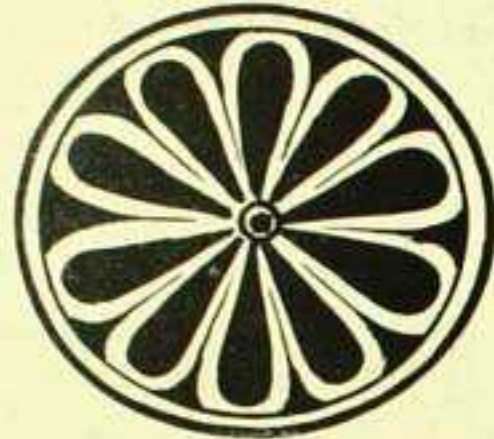
মেদিনীপুরের মাদুর, তুয়িকার ৩/০ পৃ: ১০—২০ ছত্র স্তম্ভ।



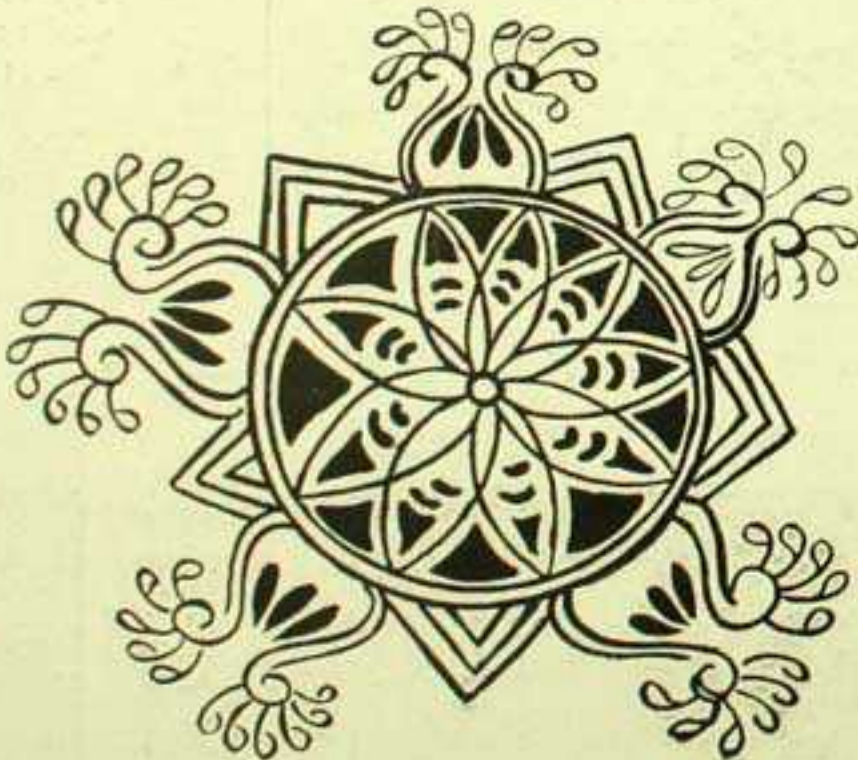
একটি, শাখের উপর উৎকর্ণ বর্ণ, অবতারের
মূর্তি, শিহট, নব্বদশ শতাব্দী।



পদ্ম



পান-পদ্ম,—এই পদ্ম প্রাচীন কাল হইতে
চলিয়া আসিয়াছে। তাপান হইতে বাঁধা-
কোনিয়া পদ্ম ইহার অধুন পদ্ম দৃষ্ট হয়।



পদ্ম ১



মটির গহনা, ১২শ শতাব্দী ফরিদপুর।



মৃৎকলা-নির্মিত মাতৃমূর্তি, বিষ্ণুমূর্তি প্রভৃতি, ১২শ শতাব্দী ফরিদপুর।



প্রাচীন আমলদেবের মুদ্রা



মোচনতা,



কলহি ডু,



কলমৌলতা,



শিখলতা।



(ক) শিখলতা,

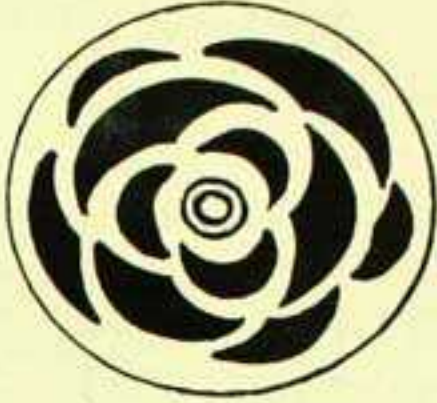


(খ) কলমৌলতা,

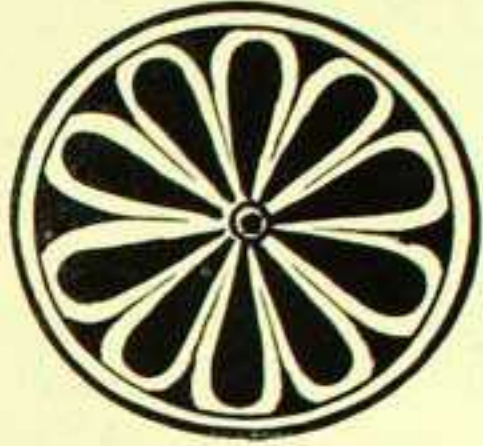


(গ) কলমৌ

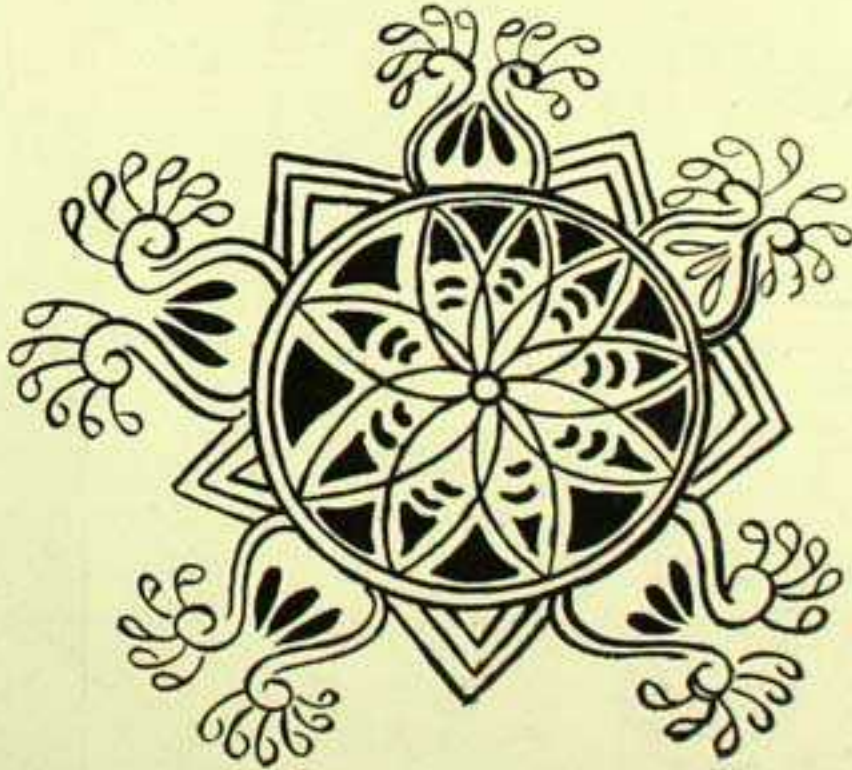




পদ্ম ।



পান-পদ্ম,—এই পদ্ম প্রাচীন কাল হইতে
চাওয়া আসিয়াছে । জাপান হইতে ব্যাবি-
কোনিয়া পর্যন্ত ইহার অনুরূপ পদ্ম দৃষ্ট হয় ।



পদ্ম ।



সাঁকড়ি, মধ্যমীয়া, মধ্যমীয়া জাতের, সাদা পাখার হাটের পুরাতন, এককাল, পাখারী।



১. ইতিহাসে মিউজিয়ামে একটি এককাল-সাদা
পাখারী পাখার দৃষ্টি হাটের পুরাতন।
(সাঁকড়ি মধ্য মন)।



মধ্যমীয়া জাতের, মধ্যমীয়া, মধ্যমীয়া জাতের, সাদা পাখার হাটের পুরাতন, এককাল, পাখারী।



একটি, পাখার উপর উচ্চতরী মন, মধ্যমীয়া
দৃষ্টি, মধ্যমীয়া, মধ্যমীয়া পাখারী।



বানর যুদ্ধ, মেদিনীপুর, সপ্তদশ শতাব্দী।



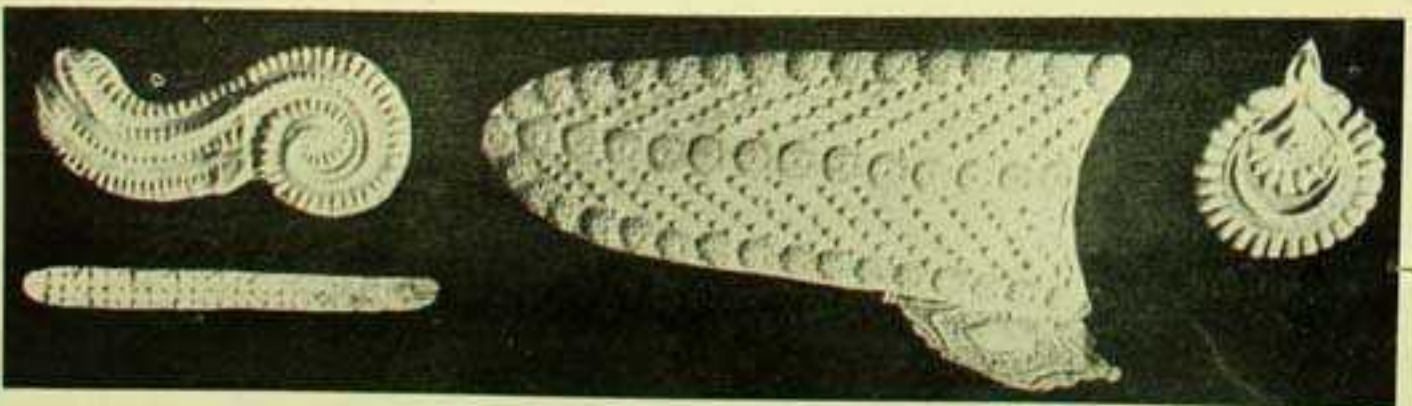
বড়ার ও গোপীদের দ্বি বিজয়ার্ঘ্য মথুরা যাত্রা,
ষোড়শ শতাব্দী, ফরিদপুর।



২০শ পুরুষ, মেঘালয়—
সপ্তদশ শতাব্দী



শিকার-চিত্র, ছবিতে ভাল উৎসাহ নাই। অথ ও কুকুরের উদ্ভাবন গতি এবং
হরিণের যুগ্ম কালের আতঙ্ক মূলের মত হয় নাই। ফরিদপুর, চতুর্দশ শতাব্দী—
৪৩৩ পৃঃ।



বাতির পাহনা, ১২শ শতাব্দী, ফরিদপুর। ৪৩৩ পৃঃ।

গুপ্ত ও পালযুগের শিল্প ও স্থাপত্যের জের

দেববিগ্রহ স্থাপনের অযোগ্য মনে হইয়া পরিত্যক্ত হয়—গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত Ancient Monuments in Bengal এর ১৮৯৬ খৃঃ অব্দের সংস্করণে (২২৪ পৃঃ) লিখিত আছে—উহা বৈষ্ণবশৈলীর সংগ্রামসিংহ কর্তৃক আত্মমানিক হইশত বৎসর পূর্বে নির্মিত হয়। কিন্তু এ কথাটা ভুল। সংগ্রামসিংহ ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া বৈষ্ণব-সমাজের সঙ্গে মিশিয়া বাইতে চেষ্টা করেন। বহু বৈষ্ণব পরিবারের পুত্রকন্যা তিনি জোর করিয়া আপনার পরিবারে বিবাহ দেওয়াইয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সমাজে এজন্ম এতাদৃশ একটা ঘৃণা ও আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাঁহার সঙ্গে বাহাদুরের এই ভাবে আত্মীয়তা তাঁহার সমাজ-বহির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাদের বংশধরেরা “হাম বৈষ্ণব” নামে পরিচিত। সংগ্রামসিংহের কন্যা বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়া উচলিসেন বংশীয় হরিনাথ সেই লজ্জায় দেশান্তরিত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, “সংগ্রামসাহতনয়া-পাণিগ্রহণপীড়িতঃ”—কবিকর্ত্তহার তাঁহার বৈষ্ণবকুলপঞ্জীতে (১৬৩৫ খৃঃ অব্দে) লিখিয়াছিলেন।

সংগ্রামসাহ-জামাতা হরিনাথ কবিকর্ত্তহারের সমসাময়িক। সুতরাং সংগ্রাম-সাহ (বা সিংহ) তিন শত বৎসর পূর্বের লোক। তাঁহার নির্মিত পূর্বোক্ত মন্দিরের পার্শ্বে একটি ভগ্ন মন্দিরের অবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহা বহু প্রাচীন, স্বাভাবিক ক্রমে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া লুপ্ত হইবার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। এই ভগ্নাবশেষ হইতে কয়েকখানি ইট আমি সংগ্রহ করিয়াছি। সংগ্রামসাহের মন্দির তিনশত বৎসর পূর্বের, তাহা একরূপ আশুই

আছে, যদিও তাহাতে ভাঙ্গন লাগিয়াছে, কিন্তু তৎপার্বর্তী মন্দির সংগ্রামসাহের সময় হইতে অন্যান্য ৩৪ শত বৎসর পূর্বের। সুতরাং তাহা এখন হইতে প্রায় সাতশত বৎসর পূর্বের, অর্থাৎ দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীর। তখন পূর্ববঙ্গে হিন্দুরাজত্ব ছিল। হিন্দুরাজত্ব ধ্বংস পাওয়ার ফলে আমাদের দেশের শিল্পের মূলে কুঠারাঘাত হয়। যেখানে কোন স্থলর বিগ্রহ বা অপর কোন মূর্তি রচিত হওয়ার কথা রাষ্ট্র হইত, সেইখানেই কালাপাহাড়ের দণ্ডহস্তে উপস্থিত হইত। সুতরাং কে আর অক্লান্ত অধ্যবসায় ও তপস্বী করিয়া শিল্পদেবীর জন্ত অর্ঘ্য সাজাইবে। ভাস্করগণের হাত বন্ধ হইয়া গেল। পাথরের মূর্তি গড়ার বে বিরাট কারবার বঙ্গদেশে ছিল তাহা বিলুপ্ত হইল।

এতৎসংলগ্ন চিত্রগুলির মধ্যে প্রথম ছবি একটি অশ্বারোহী শিকারীর। শিকারীর মুখ চোখ নাই—কেবল দেহের ও মুখের অস্পষ্ট রেখাঙ্কণ আছে, ঘোড়াটা অনেকটা অটুট অবস্থায় আছে। এই ঘোড়া যে কোন বিখ্যাত মন্দিরের অঙ্কিত বা ফোঁদিত শিকারের ছবি।

ঘোড়ার সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। কনারক, অজন্তা, ভুবনেশ্বর বা অন্য কোন স্থানে এই ঘোড়া হইতে উৎকৃষ্ট ঘোড়া দৃষ্ট হয় না; ইহার গতি, সমস্ত অঙ্গের লীলায়িত ভঙ্গী এবং ছন্দময়ী বেগ—ভাস্কর কি অদ্বিতীয় শিল্প-কৌশলে প্রদর্শন করিয়াছেন। অশ্বারোহীর সমস্ত শরীর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবল রেখার ইঙ্গিত আছে, সেই ইঙ্গিতই যথেষ্ট। সেই ইঙ্গিতে তাহার অসামান্য ক্ষিপ্ৰকারিতা ও তেজোগর্ভ বর্শাক্ষেপ বেন রেখাটির

মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বর্ষাটি যেভাবে দেখান হইয়াছে তাহাতে যেন ভাস্কর মূর্তিতে সম্পূর্ণরূপে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঘোড়াটি কি বেগে হরিণের উপর আসিয়া পড়িয়াছে! হরিণের মুখ ঘোড়াটা কামড়াইয়া ধরিয়াছে; নীচে শিকারী কুকুর, তাহার প্রায় সমস্ত দেহটাই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কেবল একটা আবছায়ার রেখাঙ্কণ আছে, সেই রেখাঙ্কণে ব্লাড-হাউণ্ড জাতীয় ক্ষিপ্ৰগতি কুকুরের ভাব অতি স্পষ্ট হইয়াছে। শিল্পীর কি অদ্বিতীয় ক্ষমতা। সে শুধু রেখা দিয়া সমস্ত চিত্র নানারূপ ভঙ্গী সহকারে অতি অনাদ্রাসে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। সমস্ত চিত্রটির মধ্যে একটি অদ্বিতীয় গতিশীলতা ও শিকারের উত্তেজনা দৃষ্ট হয়। ঘোড়াটা হরিণটার মাথা কি ভাবে আঘাত করিয়া লইয়াছে। অম্বারোহী, তাহার হাতের অমোঘ-লক্ষ্য বর্ষা, অতি দ্রুত অহুসরণকারী কুকুর, হৃদয়ঙ্গম চরম অবস্থায় নীত হরিণ এবং সর্বোপরি ঘোড়াটার হৃদয়ঙ্গম তেজস্বিতা, একখানি ইটকে একটা জীবন্ত মৃগয়াভূমিতে পরিণত করিয়াছে। হুঃখের বিষয় মূল ইষ্টকটি না দেখিলে শুধু ছবি দেখিয়া ইহার গুণগুলি বুঝা যাইবে না।

পোড়া-ইটে মেঘপালকের ছবি, হরিণের ছবি প্রভৃতি কতকগুলি ছবির রেখা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি ইহাতে রেখাঙ্কণের আশ্চর্য্য দক্ষতার ভাস্কর্য্য প্রমাণ দৃষ্ট হয়। পোড়া-ইটের ২০০ বৎসরের প্রাচীন রথবাহী ঘোড়া অস্পষ্ট হইলেও রেখাঙ্কণে অদ্বিতীয়। রথটি অতি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাইতেছি, উহা হিন্দু আমলের রথ। আমি এই খোদাই ইটের (Terracotta) পরবর্ত্তী সময়ের কতকগুলি ছবি এই সঙ্গে দিতেছি।

অপরায়ণের ছবি।

পাঠক দেখিতে পাইবেন কালে শিল্পের এই ত্রী ক্রমশঃ অবনতি-প্রাপ্ত হইয়াছে। একটি ছবি শিল্পাবানকের, তাহার হাতে পাচনবাড়ি, খুবসম্ভব এটিও একটি মেঘপালক। একটি ছবিতে, রাজা ও রানী আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া রথে বাইতেছেন। রথটির অনেকাংশই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রথবাহক ঘোড়ার একখানি পায়ের অর্ধেকটা মাত্র আছে; রথটি প্রাচীন হিন্দু আমলের। অপর ছবি, অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সংগ্রামশাহের মন্দিরের, ৩০০ বৎসর পূর্ব্বের। গোপীরা পশরা মাথার মথুরার হাটে বাইতেছেন। পশ্চাতে লাঠি হাতে বড়াই। বৃদ্ধার হাতের লাঠি, তাহার কুসৃত্য ও বামহাতখানি রাখিবার ভঙ্গী লক্ষ্য করুন। আর একখানে ছবিও ঐরূপ গোপীদের পশরা মাথার মথুরা বাজার ছবি। শেষের দুইখানি ছবির প্রথমটিতে কদমগাছের নীচে দুইটা গাভী এবং অপরখানিতে গুরু বজ্রমানদের কপালে তিলক আঁকিয়া দিতেছে।

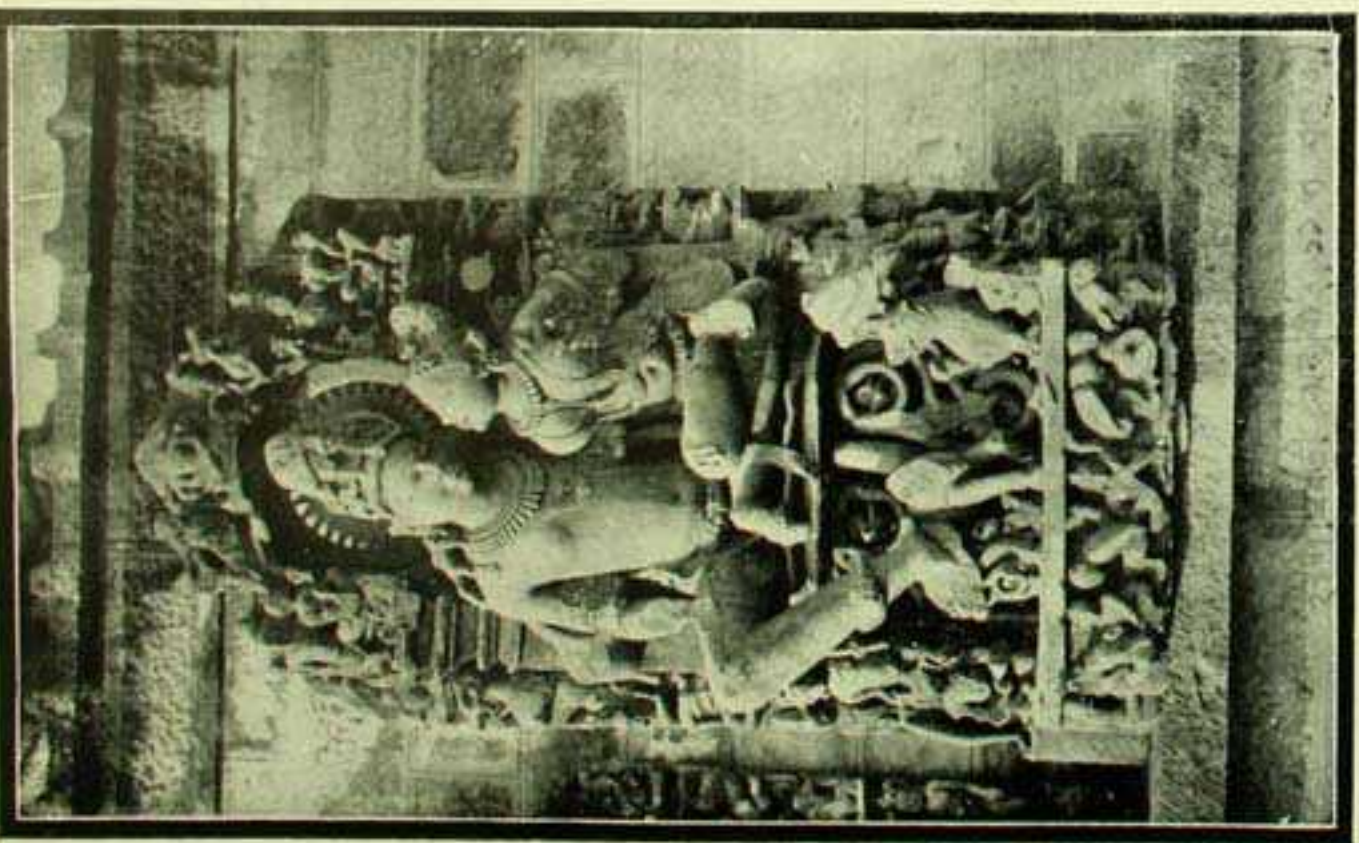
আমার কাছে যে নমুনাগুলি আছে, তাহা হইতে আমি এই কয়েকটি ছবি দিলাম। পাঠক প্রথম চারিখানি ছবিতে ভুবনবিজয়ী মাগধ শিল্পীর হস্তচিহ্ন দেখিবেন। প্রধানতঃ বঙ্গের এই শিল্পীরাই ভারতবর্ষ, জাভা, প্রধনুম, শ্রাম প্রভৃতি স্থানের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্য-গরিমার অংশীদার ছিলেন। এখনও বাঙ্গলার শত শত মন্দিরে এই ইষ্টক কারুর নিদর্শন আছে, অনেক স্থলে ইহা অপেক্ষাও বহুগুণে উৎকৃষ্ট নিদর্শন আছে, বাঙ্গালী যে মাগধ রাজধানীর নিদর্শন বজায় রাখিয়াছে ইহাই আমাদের বিশেষ করিয়া বলিবার বিষয়। শিকারের ছবি, দুটি হরিণের ছবি এবং মেঘপালকের ছবি দেখিয়া সহজেই মনে হইবে যে যাহারা



* অশুরাংশন দাম্পত্য, প্রচক্ষণ ও সাধনা—৯ম-১০ম শতাব্দী, মদুরাজের অন্তর মূর্তি ৪৩৬ পৃ: ২৭ ছত্র।



সমার্পিত, হরগোবিন্দপুর—১২শ শতাব্দী, ৩৩৪ পৃ, ২৮ ছবি।



সমার্পিত, হরগোবিন্দপুর (মেজরাহ) ১১শ শতাব্দী।



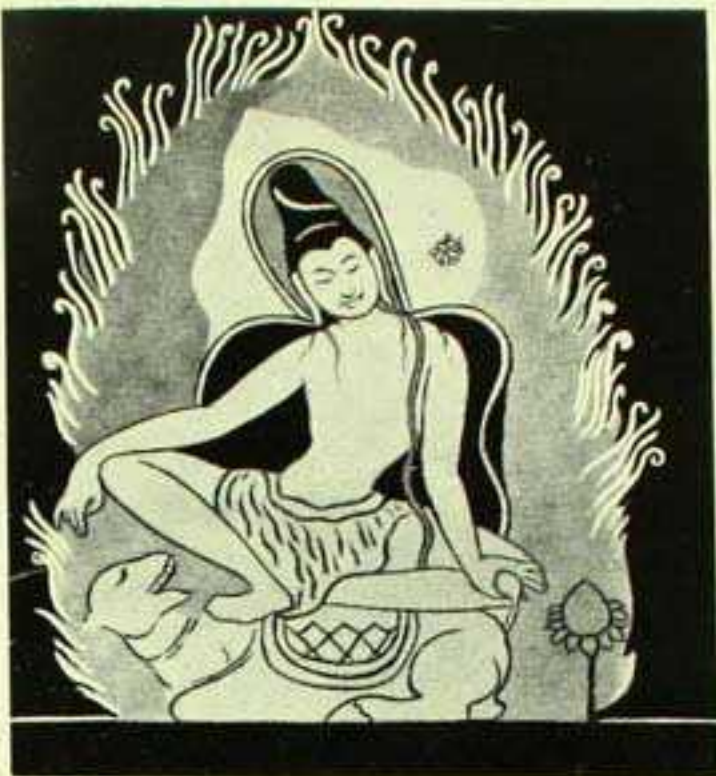
হরগোত্রী (খাতব মূর্তি) দাম্পত্য, অন্ধরবনে প্রাপ্ত।
(১২-১৩শ শতাব্দী)।



হরগোত্রী—কালীঘাটের পটুয়া অঙ্কিত। (১২শ শতাব্দী) ক্রমশঃ
দাম্পত্যভাবের মাহুদে পরিণতি, শিবের ভাব শিশুর ভায়।

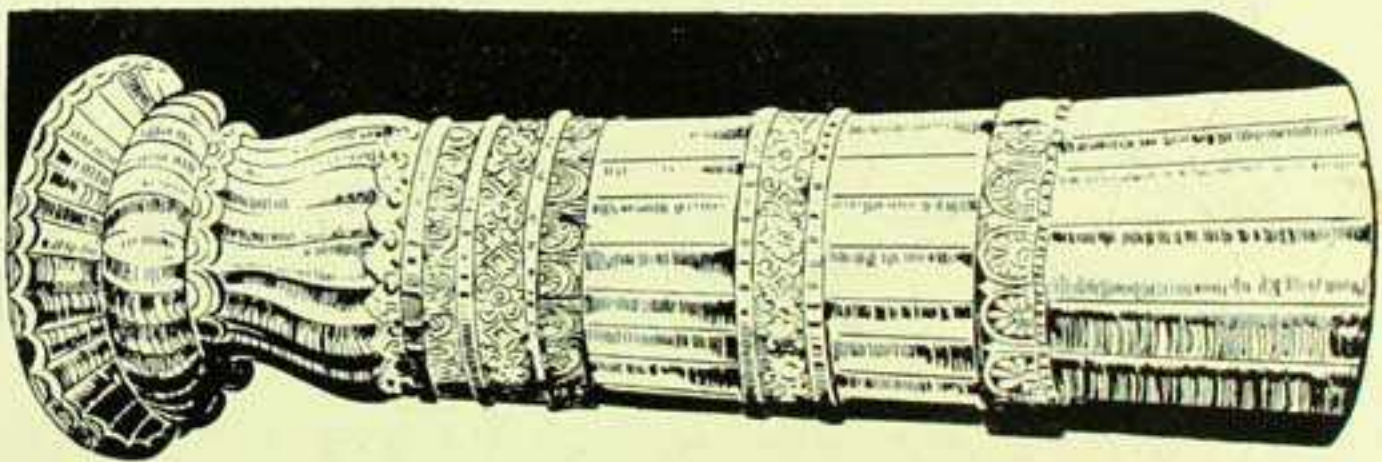


হরগৌরী—কালীঘাটের পটুগা অঙ্কিত ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

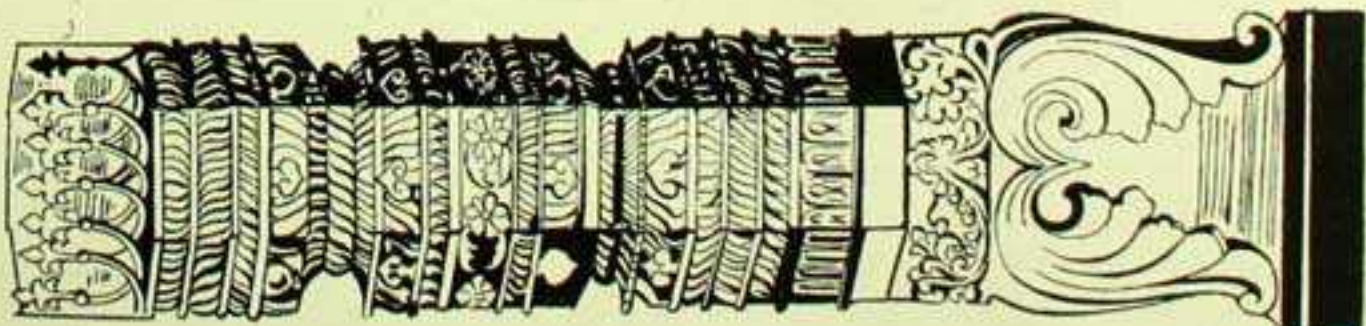


এই শিল্প ৩০ বছরের পুরানো মাদ্রাসার কোন কলমে বহুতক
অঙ্কিত। দশম শতাব্দীতে অঙ্কিত মূর্তির সঙ্গে এই আধুনিক
মূর্তির তুলনার কতকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

(দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালে দশম শতাব্দীর দেবতামণ্ডপ)
রচিত পুঁথি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম।



অজ্ঞাতের খাম।



কাটনিমিত্ত খাম, খুলনা—১৪শ
শতাব্দী।



মহাশিব—কালীঘাটের পটুয়া অঙ্কিত, ১৯শ শতাব্দীর প্রথম।

অজস্রা শুধা চিত্রিত করিয়াছিলেন এই ছবি তাঁহাদেরই অথবা সেই শ্রেণীর শিল্পীদের বংশধরগণের হাতের।

প্রস্তরমূর্তি অধিকাংশই কালাপাহাড়েরা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। পুকুরের তলার এইরূপ অনেক ভগ্ন বিগ্রহ পাওয়া যায়, মাটি খুঁড়িলেই মূর্তি বাহির হইয়া পড়ে। গুপ্তযুগের মূর্তিগুলির পরিকল্পনার মধ্যে উজ্জ্বলের ভাব পাওয়া যায়; তাহাদের মুখের প্রসন্ন গাঙ্গীর্বা, অবয়বের নিরাত্তরণ শৌর্য বা রমণীজনোচিত কোমলত্ব দেখামাত্রই ভাবের তপস্তার কথা মনে করাইয়া দেয়। এই দেশের এক জায়গার কথা শুনিয়াছি, যেখানে দাক্ষিণী শুভ দিনক্ষণ দেখিয়া নিমগাছ রোপণ করে। ব্রাহ্মণ ভাকিয়া সেই চারাটির অভিষেকার্থ জলধারা দিবার জন্ত উহা পূজা করিয়া তত্পরি ভাঙ রাখিবার ব্যবস্থা করে। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যার পরিবারের সমস্ত লোক ভূমিষ্ঠ গলবস্ত্র হইয়া সেই চারাকে প্রণাম করে। এইরূপে অভিষেকের জল, বস্ত্র ও পূজা পাইতে পাইতে চারা বড় হইয়া উঠে। তারপর বহু বৎসর পরে যখন নিমগাছটি মূর্তি-নির্মাণের যোগ্য হয়, তখন তাহাকে আবার হোমায়ি আলিয়া ব্রাহ্মণকে দিয়া পূজা করাইয়া লয়, ইহার পর সেই কাঠ দ্বারা কত শ্রদ্ধা ও বিনয় সহকারে দাক্ষিণী দেবমূর্তি নির্মাণ করিয়া থাকে। সে নিজেই মূর্তি গড়ে সত্য, কিন্তু প্রতিমূর্ত্ত সে স্বরূপে রাখে যে সে বাহাকে গড়িতেছে, বাহার আকার দিতে চাহিতেছে, তিনি অবাঞ্ছনসগোচর। এই পূজার ভাবের প্রেরণা পাইয়া শিল্পী বাহা গড়ে তাহার তুলনা কোথায় মিলিবে? দেবযুগের যে ধ্যানের ভাব, সে শাস্ত্র গরিমা কোন্ শিল্পী কোথায় দিতে পারিয়াছে? ইহাই ভারতীয় বিশেষতঃ বঙ্গদেশের শিল্পের বৈশিষ্ট্য। দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা আমরা যে ভাবে করিতে জানি তাহা অল্পত্ন স্বল্পভ নহে। নিজের চৈতন্য দিয়া আমরা অচেতন জড় কাঠ-পাথরকে চৈতন্য দান করি। অপোগণ্ড শিশু স্বপ্ন দেখিয়া বেরূপ হাসিয়া উঠে, কেন হাসে তাহা কেহ জানে না, সে নিজে তো দিগম্বর, তাহার জ্ঞান নাই, ভাষা নাই, সে সেই নিরর্থক হাসির অর্থ বুঝিবে কিরূপে? সেই নির্মল যুধিকান্ত্র হাসি সাংসারিক ভোগজনিত হাসি নহে—তাহা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের আনন্দব্যঞ্জক আধ্যাত্মিক জগতের হাসি। আমি কোন কোন মূর্তিতে সেইরূপ হাসি দেখিয়াছি—যে শিল্পী সেই হাসি পাথরের উপর ফুটাইতে পারিয়াছেন—

তিনি শত শত বৎসরের জাতীয় তপস্তার সংস্কারবশতঃ শক্তি লাভ করিয়া উহা পাথরে প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছেন। ষাটশ শতাব্দীর একখানি ভাঙ্গা উমামহেশ্বরের মূর্তির ছবি দেওয়া হইল, উহা কালাপাহাড়ী দৌরাঘাটে একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উমার মুখখানি তো শাবল বা খড়্গের আঘাতে উড়িয়া গিয়াছে। কটিদেশ হইতে অবশিষ্ট অংশ নাই। ভাঙ্গণের এই মহিমা নির্মম বর্ষরের হাতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উমার চিবুক যেখানে ছিল সেইখানে শিবের হাত রহিয়াছে, সেই আবুল কয়েকটি দিয়া যেন বিশ্বের সমস্ত কোমলতা, সমস্ত মেহ করিয়া পড়িতেছে, যদি মূর্তিঘরের আর কিছু না থাকিত শুধু শিবের এই কয়েকটি মমতার গড়া, দেহপ্রতীক

একটি উমামহেশ্বরের মূর্তি।

আত্মল ধাক্কিত, তবেই বোধ হয় ভাবের কার্যের অনেকটা সফলতা হইত। সেই আত্মল কয়েকটি আছে, আর আছে অর্ধবিনষ্ট শিব-মুখের একটু হাসি ও মেহমাখা দৃষ্টি—সেই হাসিটুকু ও সেই দৃষ্টি স্বগায়—তাহা একেবারেই এই জগতের নহে। ফটোগ্রাফ দিয়া এই একান্তরূপে ভাঙ্গাচুরা জিনিষের অপূর্ণত্ব কিরূপে বুঝাইব—তথাপি এইখানে তাহা দিলাম। এই ভাঙ্গা মূর্তিটি আমার কপেশ্বর মন্দিরের দেয়ালে আঁটা আছে।

অজ্ঞাতর প্যানেলে বহু মনুষ্যের যে সমাবেশ দৃষ্ট হয়, বাঙ্গালার চৈতন্যসংকীর্ণনের তরুণ অনেক ছবি আছে। তাহার মধ্যে একখানি উৎকৃষ্ট ছবি এই পুস্তকের মুখপত্রে দেওয়া হইয়াছে। এই ছবিতে ১২-টি মূর্তি আছে, ইহাদের একজনের সঙ্গে অন্তের মিল নাই, প্রত্যেকের মুখ চোখ ও ভঙ্গী স্বতন্ত্র ভাবের। আমার মনে হয় এই সকল ছবি সেই সকল মনুষ্যের অনেকটা খাঁটি প্রতিচ্ছিত্র, তাঁহাদের পূর্নকার যে সকল চিত্র ছিল, চিত্রকর সেগুলি সামনে রাখিয়া কিংবা তাঁহাদের মূর্তির সংস্কার আয়ত্ত করিয়া এই বিরাট ছবির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। আমার নিজের চিত্রশালায় যে সকল ছবি ও মূর্তি আছে। তাহা হইতেই অধিকাংশ প্রতিলিপি প্রস্তুত হইল। বলা বাহুল্য যে বাঙ্গলায় ইহাদের অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট মূর্তি ও ছবি এখনও আছে।

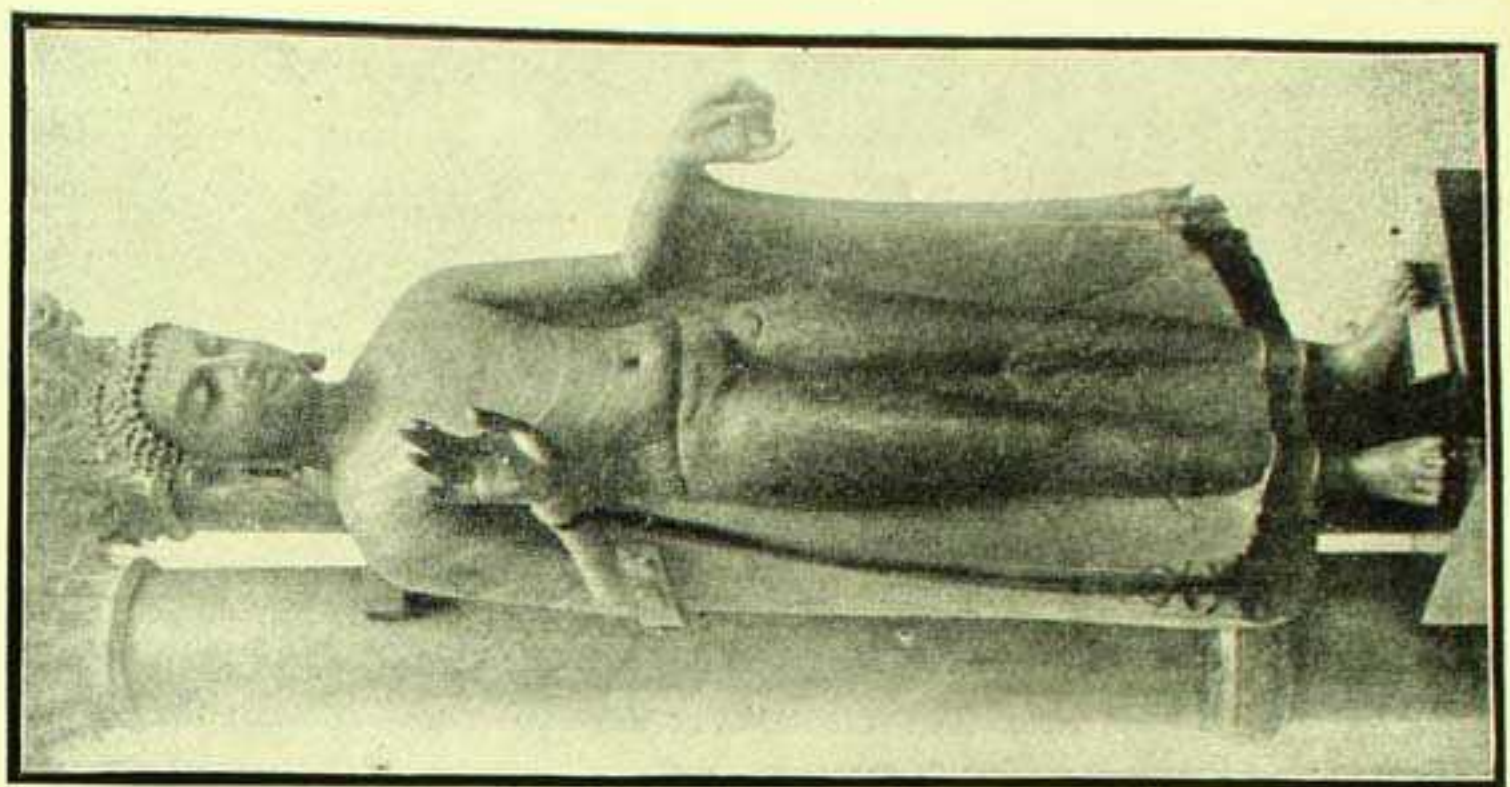
উৎকৃষ্ট বুদ্ধমূর্তির প্রশান্ত স্থলর মুখের ভাব এবং সুস্পষ্ট নাসা, চক্ষু, শ্রিতোষ্ঠ ও আর্ধ্যমহিমা মাগধ শিল্পের লক্ষণাক্রান্ত। জাভা, শ্রাম, সিংহল, খেজুরাহ, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানের অনেক মূর্তিতে এই ছাঁচ দেখা যায়। বৌদ্ধাধিকারকালে এইরূপ মূর্তিতে হাসি ফুটে নাই, তাহাতে ধ্যানমহিমা খেলিয়া যাইতেছে।

প্রশান্ত বুদ্ধ।

কালিদাসের কুমারসম্ভবের শিব ও চিত্রের বুদ্ধমূর্তিতে তফাৎ খুব কম। সমুদ্র নিগুরঙ্গ, বিরাট কোন সামগ্রী যদি স্তব্ধ হয়, তবে তাহার যে ভাব তাহাই কালিদাসের শিবে এবং সমস্ত বুদ্ধমূর্তিতে। একটিমাত্র দীপশিখা স্থির হইয়া দাঁড়াইলে যে রূপ দেখায় ইহা সেইরূপ; বায়ুর মুহূ হিল্লোলও দেখানে নাই সেইখানে অনড় চিত্রার্পিতের জায় দীপশিখাটি; তাহা সমুদ্রের মত বিরাট নহে, বারিবিদ্যুর মত ক্ষুদ্র, তথাপি তাহার স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্যের যে মহিমা তাহা নিগুরঙ্গ সমুদ্রেরই জায়। আকারের প্রভেদে কিছু আসে যায় না—উভয়েই একনিষ্ঠ তপতার প্রতীক। কালিদাস আর একটি উপমা দিয়াছেন—মেঘ আকাশে দাঁড়াইয়া আছে বর্ষণের পূর্বে, তখনও উহা সেইরূপই গাম্ভীর্য্যের একখানি চিত্র। কালিদাসের শিব বুদ্ধের ভাব উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তপস্বী শিব ও তপস্বিনী গৌরীর একখানি ছবি দেওয়া হইল। ইহাদের মধ্যে দাম্পত্য-লীলার লেশমাত্র নাই। মুখেচোখে অটুট তপতার ভাব, নবম শতাব্দীর পর কঠোর সংযমীর অমর প্রশান্ত ভাব ধীরে ধীরে ছুটিয়া যাইতেছে। ষাদশ শতাব্দীর শিবের মুখের ভাব পরিবর্তিত হইয়াছে। শিব এবার জ্ঞানের

প্রসন্ন শিব।

সীমানা ছাড়িয়া প্রেমে পা দিয়াছেন, তাহার চক্ষে ধ্যানের ভাব হইতে প্রসন্নতা বেশী। অধরে ধীরে ধীরে হাসি ফুটিতেছে, তাহার চিন্ময় ধ্যানস্থ দেহে যেন প্রেমের রোমাঞ্চ আস্তে আস্তে দেখা যাইতেছে। গৌরীর মুখের



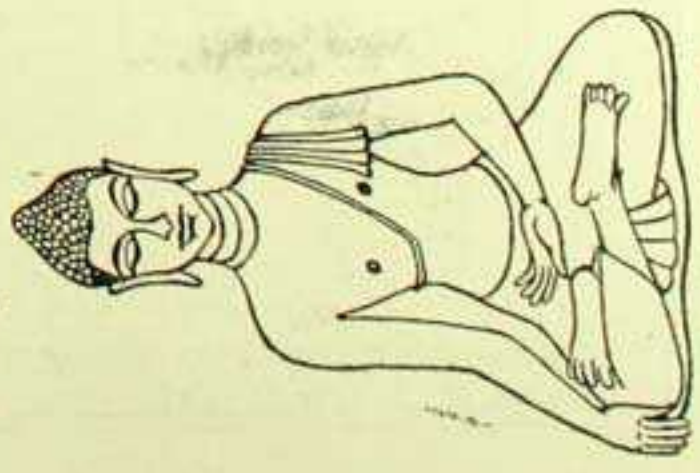
সুলতানগরীর (বাংলাদেশ) বুদ্ধ, এখন বাস্মিংহান মিউজিয়মে—৫ম শতাব্দী।



সারনাথ বুদ্ধ—৫ম শতাব্দী।
(শ্রীযুক্ত দেবপ্রিয় বগী সিংহের আঁকানুসারে)



চট্টগ্রাম মিউজিয়ামে পাওয়া গেল—৫ম শতাব্দী
খাতের মূর্তি



বুদ্ধ—৫ম শতাব্দী। (চট্টগ্রাম মিউজিয়ামে পাওয়া গেল—৫ম শতাব্দী)

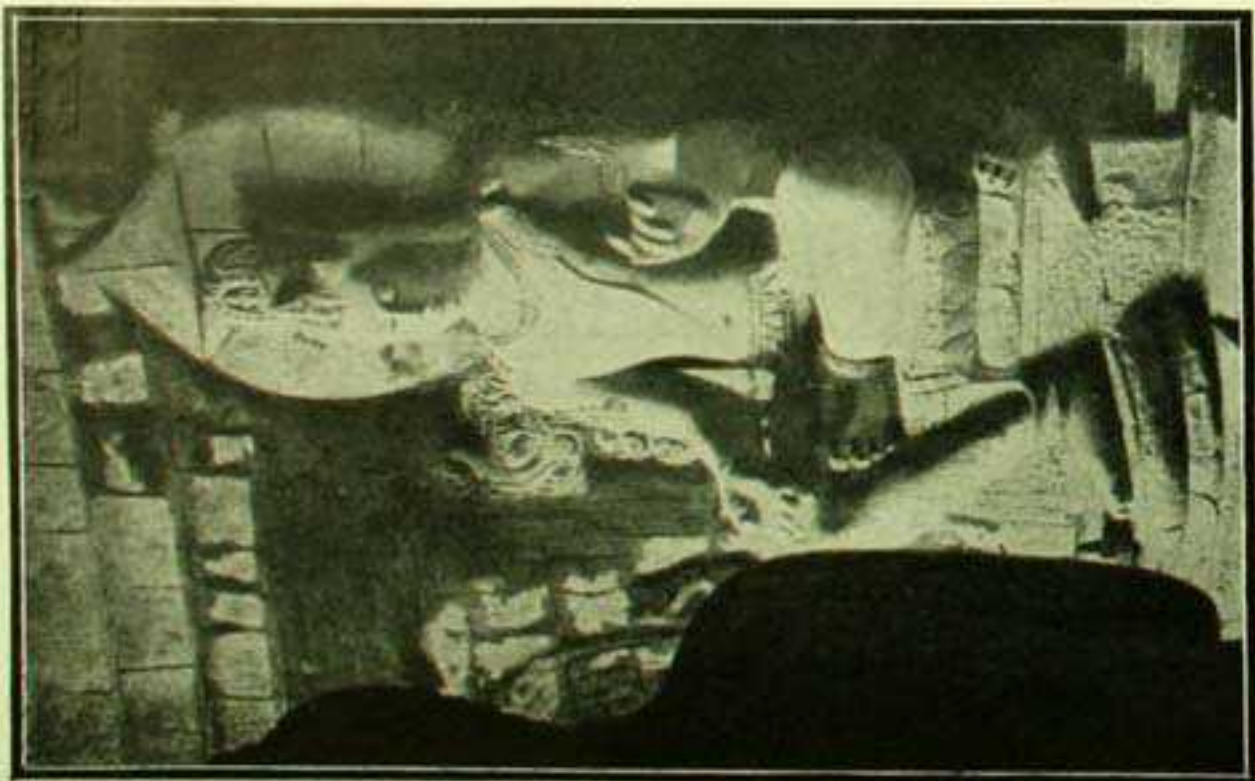


বরোবধর, ভারত।
(২ম-১০ম শতাব্দী।)

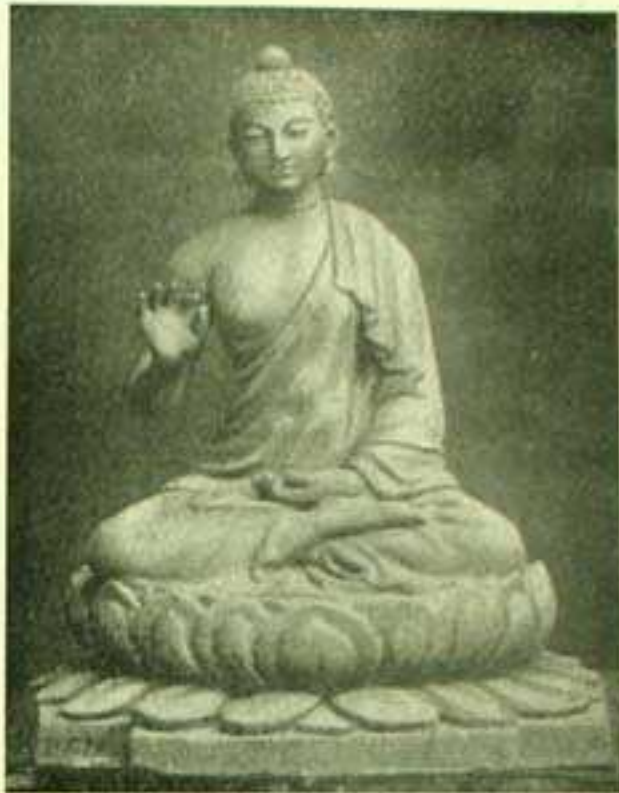
ঢাকা মিউজিয়ামে রক্ষিত বৌদ্ধ স্থাপত্য নিম্নলিখিতগুলির ছাড়াও নবীনকায় অষ্টশালীর পুস্তকের ভূমিকা-
লেখক ষোল্লগাট্টন সাহেব একাধিক শতাব্দীর তির্যকীয় "গণ-সাম-জান" পুস্তকের একটি কথার উল্লেখ করিয়াছেন—
"স্থাপত্য ও চাক্ষুশিমে বাঙ্গালীর স্থান সর্বত্রোক্ত, তৎপরে নেত্রদ্বার ও তিলতবাসীতর, সর্বদেশে চীনাগের।"



বরোবধর, ভারত—কিউজিয়ারান।



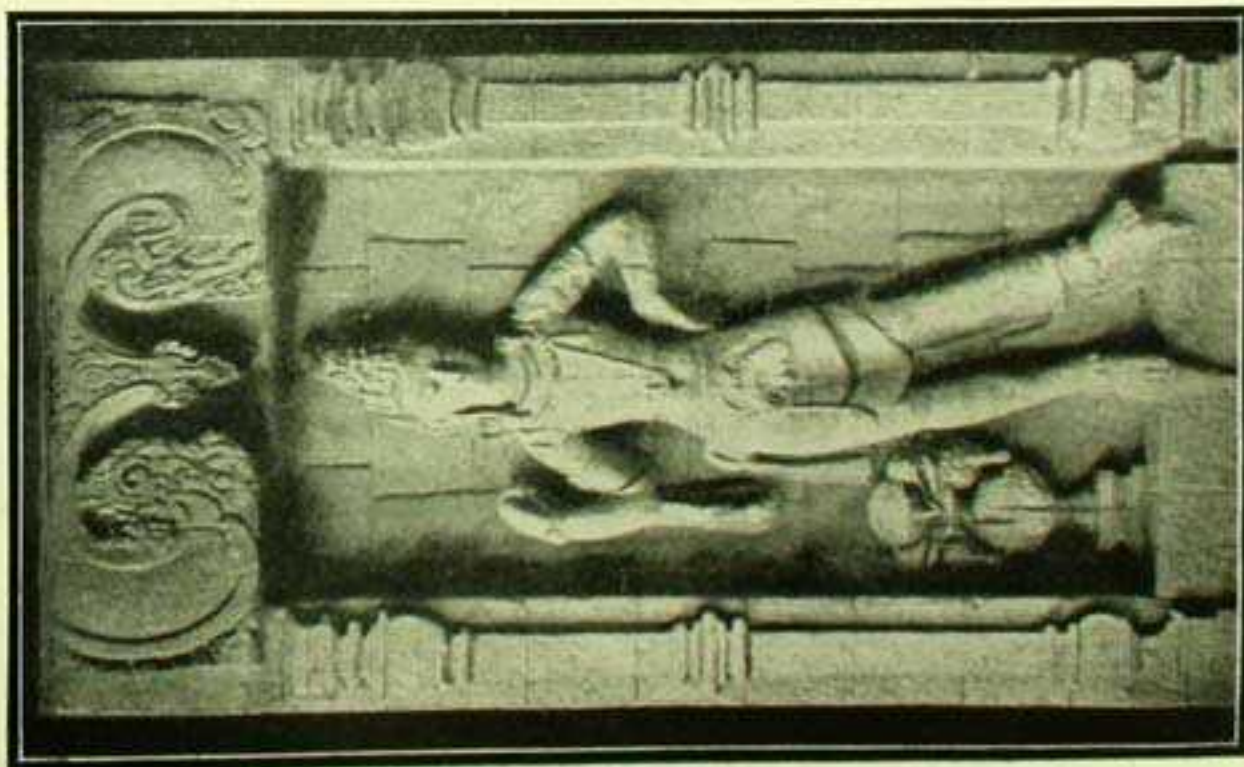
বুদ্ধনৃসিং—বরো বধর, ভারত।
(ই. বি. হাভেল সাহেবের চিত্র হইতে—১ম শতাব্দী।)



এন. সি. পালের কৃত মূর্তিকার অনুলব্ধকরণ।



বগো বদর, বুদ্ধ — ৯ম-১০ম শতাব্দী।
(এন. সি. পালের কৃতোগ্রাহক হইতে।)



আমুন, ১১শ শতাব্দী—বৈষ্ণব। (ই. বি. জাভেল সাহেবের
চিত্র হইতে প্রাপ্ত।)



খেজুরাং, বুদ্ধমূর্তি—১০ম-১১শ শতাব্দী, ক্রমশঃ ধ্যান-ভাবের পরিবর্তন,
মুখে করুণা ও প্রকৃমতা। ৪৩৬ পৃঃ।



বৌদ্ধ মণ্ডপ, চট্টগ্রামে
প্রাপ্ত, ১০ম শতাব্দী, খাতব
মূর্তি



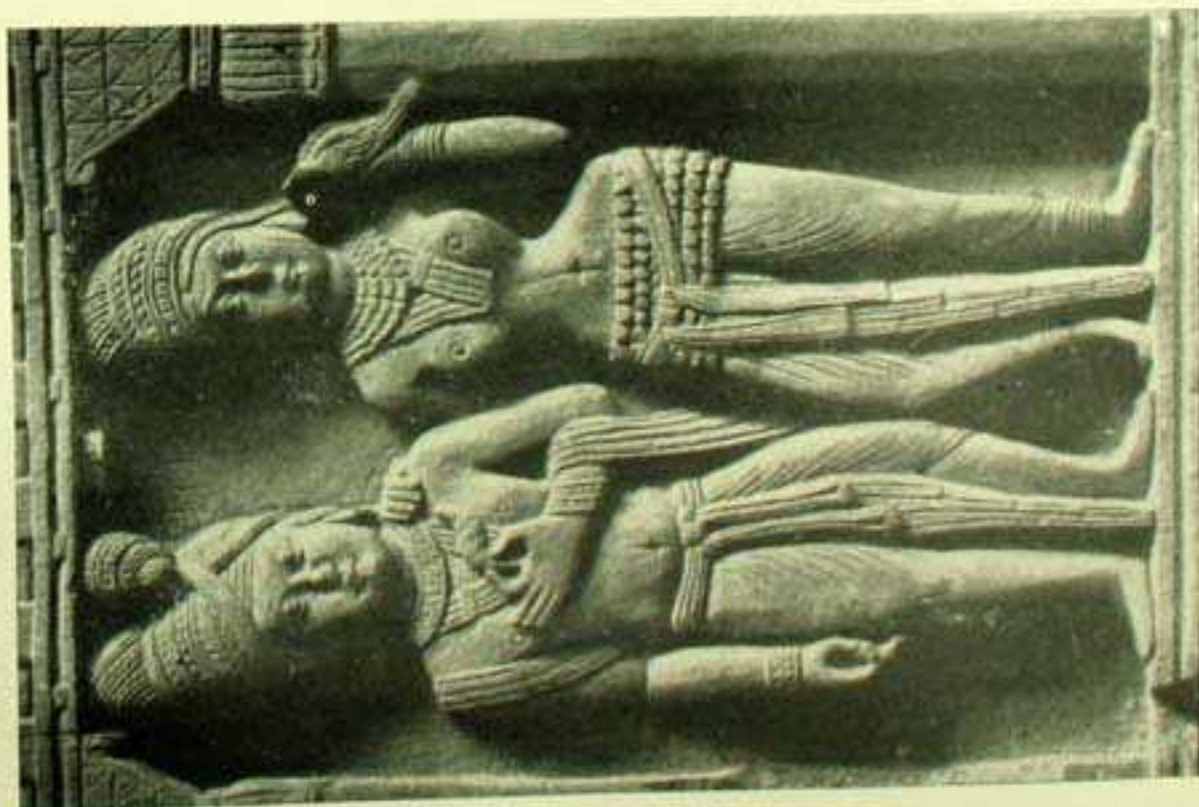
বৌদ্ধ-স্মারক—কাঠের প্যানেল, বঙ্গ ও তিব্বতের সঙ্গিহলে প্রাপ্ত—১৩শ শতাব্দী।



বৌদ্ধ জম্বল দেবতা—১১শ শতাব্দী, (গোকা
মিউজিয়াম, জপান পত্রিকা হইতে)



• অশোক বেলিংএর মূর্তি।
(২৩১ পৃ., ২০-২৩ ছত্র প্রস্তাব্য।)



অশোক বেলিংএর মূর্তি ২৩১ পৃ., ২০-২৩ ছত্র।



• "গান্ধার বুদ্ধ", ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম,
১১শ শতাব্দী।



ভূটিয়া বুদ্ধ—১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে কাথমান্দিয়ায় আলি
কলিকাতা এমিগ্রাটিক সোসাইটিকে দান করেন, তখন
এই মূর্তি একশত বৎসরের প্রাচীন ছিল। ডাঃ জন ভ্যান
মানিনের আনুক্রমিক ফটোগ্রাফ গৃহীত। ২২৩ পৃঃ
এবং ভূমিকা ১৬৮, পৃঃ ১৩—১৭ ছত্র; দ্রষ্টব্য।



বেহলিয়ার রূপেধর শিব—১২০-২০১ পৃঃ।
(বৌদ্ধমূর্তির সঙ্গে সাদৃশ্য।)



চন্দক



অনিম

(নবমবর্ষ বয়সে চিত্রকর) পুষ্পেন্দু সেন কর্তৃক প্রাচীন চিত্রের
আনুক্রমিক অঙ্কিত)।

দিকে চাহিয়া তিনি সমাধির আনন্দ ভুলিয়া বাইতেছেন। এতৎসংলগ্ন কয়েকখানি ছবিতে পর পর জ্ঞানের সীমা পাড়ি দিয়া হরগোরী-প্রেমলীলার ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছেন। তরুণ ছবি বা মূর্তির বিকাশ খাস বাঙ্গলার। গ্রীক শিল্পী হয়ত পঞ্জাবের পূর্ব-পশ্চিমের শিল্পকে কতকটা প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের প্রভাব ভারত-শিল্প-লক্ষ্মীর হৃদয় ছুঁইতে পারে নাই। ভারতীয় কলালক্ষ্মী সম্রাজ্ঞীর সিংহাসনে থাকিয়া পাশ্চাত্য শিল্পীর নিকট হইতে কিছু রাজস্ব আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এদেশের শিল্প অনাথ্য-সমূহ।

আর্য্যাগমনের পূর্বে এদেশে যে শিল্প প্রচলিত ছিল, পরবর্তী কালে তাহারই ক্রমবিকাশ হইয়াছিল; বাঙ্গালীরা সেই শিল্পে স্বীয় প্রেমের মহিমা প্রবেশ করাইয়া দিয়া প্রস্তরীভূত অহল্যাস্বরূপ আদিম ভারতীয় শিল্পের নবভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অশোকের বরাহত রেলিংএর মূর্তির মুখ সেই আদিম শিল্পীদের মুখের ছবি বলিয়া মনে হয়। চিত্রের মুখগুলির নাক একটু খাঁদা। সমস্ত মুখত্রীতে আর্য্য আদর্শের নামগন্ধ নাই। মুখের ভাব একটু চেপ্টা। অশোকের সময় তুষান্দ নামক স্থপতির দ্বারা স্বদর্শন হ্রদের বিশাল পয়ঃপ্রণালী গঠিত হইয়াছিল, তুষান্দ নামটি অনাথ্য নামের মত শোনায। কাশ্মীরে সূর্য্য নামক স্থপতি অদ্বুত উপায়ে বিস্তৃত নদীর গতি উল্টাইয়া দিয়াছিলেন, রাজতরঙ্গিনীতে সেই বৃত্তাস্ত কল্হণ লিখিয়াছেন; সূর্য্য চণ্ডালবংশীয় ছিলেন।

অশোক রেলিংএর মূর্তিগুলির বরাহতের ধরণের মুখের সংস্কার এদেশের আর কোন স্থানে দেখা যায় না। এই আদিম অধিবাসীদের মুখের ভাব ছাড়া আর এক প্রকার ছাঁচ আমরা পাইতেছি। তাহা স্পষ্টই উত্তরদেশসমূহ। নেপাল, চীন ও ব্রহ্মের

উত্তরদেশের প্রভাব।

ছাঁচ আমরা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখে দেখিতে পাইতেছি। আমাদের দেশের চিত্রকর ও স্থপতি-বিশারদেরা তিব্বত, নেপাল, চীন ও জাপানে যে বঙ্গদেশের শিল্পের যে রীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহাই তত্তদদেশের শিল্পরাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল—একথা ইতিহাসজ্ঞ লোকেদের সকলেই অবগত আছেন। তথাপি উত্তর দেশের শিল্পীদের কার্য্যক্ষেত্রে অদ্বুত দক্ষতা ছিল। তাহারা ভারতীয় আদর্শ গ্রহণ করিলেও মুখের ভাব ও ছন্দে নিজেদের রীতি বজায় রাখিয়াছিল। আমাদের দেবদেবীর মূর্তিতে তাহাদের এই প্রভাবের চিহ্ন পরিকারভাবে পাওয়া যায়। কোন স্থানে আমাদের দেবদেবীর মুখ মঙ্গোলিয়ানদের মত, তাহাদের গণ্ডের অস্থি মঙ্গোলিয়ানদের স্থায় সমুন্নত, কিন্তু প্রভাবটা চক্ষুর উপরই বেশী দৃষ্ট হয়, অথবা ধমুক বা অর্দ্ধচন্দ্রের মত নহে, তাহা ঈষৎ ত্রিভুজভাবে স্থাপিত ছইটি শব্দের মত। আমাদের দেশের কুমারেরা কোন কোন স্থানে চূর্ণাপ্রতিমার মত এই মঙ্গোলিয়ানদের মত অঙ্কিত করিয়া উহা দেবচক্ষুর বৈশিষ্ট্য বলিয়া বর্ণনা করে। চীন ও তিব্বত প্রভৃতি দেশের তাত্ত্বিক শক্তিপূজা আমরা ঐ সকল উত্তরের দেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, এবং তজ্জগতই দেবচক্ষুর এই বৈশিষ্ট্য এখন পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। উড়িষ্যার “খিচিং” নামক স্থানে (ময়ূরভঞ্জের নিকট) বহু প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। সেই প্রস্তরমূর্তিগুলির ভাবব্যক্তি অতি সুন্দর, কিন্তু তথায়ও দেবীমূর্তির চক্ষু মঙ্গোলিয়ানগণের চক্ষুর



মত। খিচিং নামটিও উত্তর দেশের কোন নামের মত শোনায়—সম্ভবতঃ তথ্য মঙ্গোলিয়ান কোন জাতির এককালে বেশী প্রভাব ছিল।

আমরা বঙ্গদেশের ভাষা ও চিত্রকলার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া তাহাতে প্রমাণিত হইবে যে মগধ আদর্শই আমাদের নিজস্ব, এবং পারিপার্শ্বিক প্রভাবের দ্বারা স্থলবিশেষে কিছু কিছু রূপান্তরিত হইলেও সেই আদর্শকেই আমরা বঙ্গায় রাখিয়াছি। মগধ বৃহত্তর বাঙ্গলার রাজধানী ছিল, এই জন্ত এই শিল্পকলাকে আমরা “মগধী” আখ্যা দিতেছি। কিন্তু আমার মনে হয় বাঙ্গলা দেশ হইতে শিল্পীরা মগধে যাইয়া কাজ করিত। দীমান ও বিতপাল খাস রাজসাহীর লোক, বাঙ্গলা দেশে প্রস্তুত প্রস্তুতমূর্তিগুলির আদর্শ বিহারীদের মত হইলেও খাস বাঙ্গলাদেশের মূর্তি বিহারের মূর্তি হইতে সুন্দর হইত। খাস বাঙ্গলার প্রথম শ্রেণীর একখানি ও উৎকৃষ্ট বিহারী একখানি মূর্তি পাশাপাশি রাখিলে, এই কথা প্রমাণিত হইবে। বাগেরহাটের বুদ্ধমূর্তির মুখ বেরূপ প্রসন্ন দেবভাব-জ্যোতিতে পূর্ণ—বিহারী মূর্তি সর্ববিষয়ে একরূপ হইলেও তাহার কোনটিতেই দেবত্ৰী ততটা ফোটে নাই, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বিহারে প্রাপ্ত বহু মূর্তি খাস বাঙ্গলার ভাস্করগণকর্তৃক নির্মিত, একরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নহে।

আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি যে এদেশে শিব জ্ঞানরাজ্যের সীমানা হইতে পা বাড়াইয়া ধীরে ধীরে প্রেমের কুঞ্জবনের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। বুদ্ধ ও শিব এই দুই মূর্তিই অষ্টম-নবম শতাব্দীর জনসাধারণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য দেবতা ছিলেন।
বুদ্ধ, শিব ও বিষ্ণু (বাহুদেব)-
মূর্তি।
তাম্রশাসনের শিববন্দনায় তাঁহার যে মূর্তির বর্ণনা পাই, সময়ে সময়ে তাহা বৈষ্ণব সাহিত্যকে শ্রবণ করাইয়া দেয়। গৌরীর সঙ্গে শিবের নানারূপ লীলার ইঙ্গিত সেই সকল স্তোত্রে পর্যাপ্তরূপে পাওয়া যায়।

এদিকে উমা-মহেশ্বরের যুগল প্রস্তুতমূর্তিতেও সেই লীলার ভাব ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়। বাহুদেবের পূজা খুব প্রাচীন হইলেও বঙ্গদেশে শেব-পালরাজগণ, বিশেষ সেনবংশীয় রাজগণের রাজত্বকালেই এই দেবতার পূজা খুব বেশী পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল। বাহুদেব মূর্তিতে সেই জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ প্রশান্তভাব একেবারে চলিয়া গিয়াছে—তাহাতে প্রেমের উন্মাদনা নাই,—“ঢল ঢল অঙ্গের লাবণী” নাই, যাহা পরবর্তী যুগে বৈষ্ণবেরা প্রেমময়ের পরিকল্পনায় দেখাইয়াছেন, কিন্তু স্বকোমল ভাবের সূত্রপাত আছে। বিদ্বাদ্বরের হাসি এবার সুস্পষ্ট, পদ্মপলাশনেত্রের চাহনীতে চন্দ্রোদয়ে বারিধিবন্ধের মত ভাবের ঢেউ উছলিত হয়। দেহে লাবণ্য—অপার্থিব ইন্দ্রিয়াতীত লাবণ্য দেখা দিয়াছে। কোন কোন বুদ্ধ ও বাহুদেবমূর্তি আমরা এক জায়গায় রাখিয়া তাহাদের পার্থক্য ও সাদৃশ্য বিশেষ করিয়া অনুভব করিতে পারি।

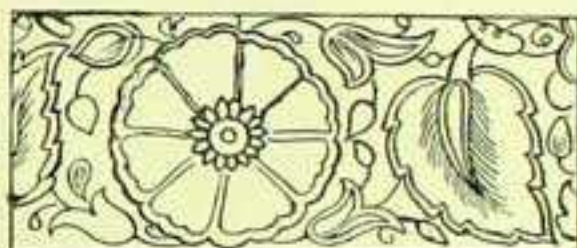
বুদ্ধ নিশ্চেষ্ট, তাঁহার নেত্র ধ্যানরাজ্যে, ওষ্ঠাধর প্রশান্ত, দেহ নির্বিকার, মুখচোখ অবয়ব কামনা-রাজ্যের উর্দ্ধে। বাহুদেবের অঙ্গ কামনা-মাথা—কিন্তু সে কামনা রক্তমাংসের নহে, তাহা আধ্যাত্মিক, দেহ চিন্ময় স্বমাময়, চকু, ওষ্ঠ, চাঁউনি ও হাসি দ্বারা মন হরণ করে। এই



কৃষ্ণের নগর-যাত্রা, বীরভূম, দশদশ শতাব্দী।



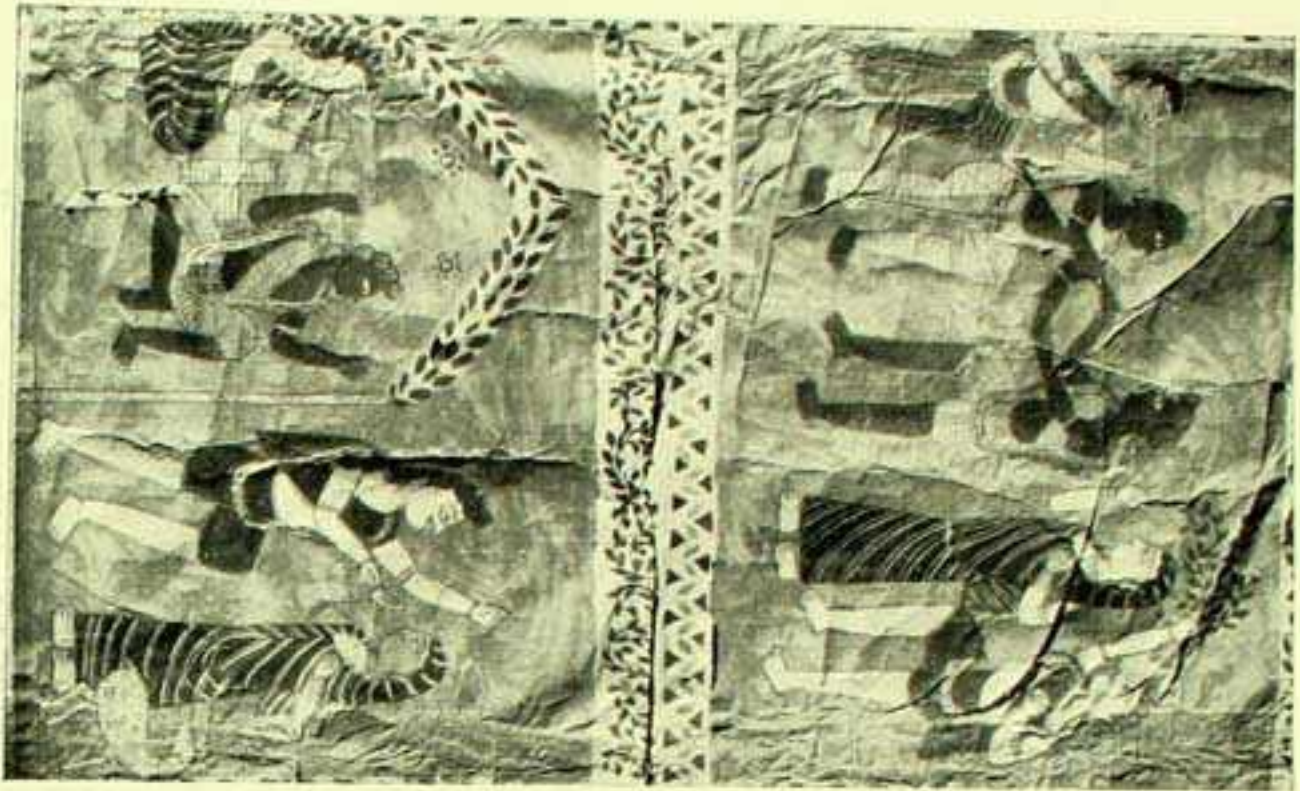
মহারাণী কৃষ্ণ, ষড়দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, বিজয়পুর বীরভূম।



২০০ হইতে ৩০০ শত বৎসর পূর্বের বিভিন্ন মলাট হইতে গৃহীত।



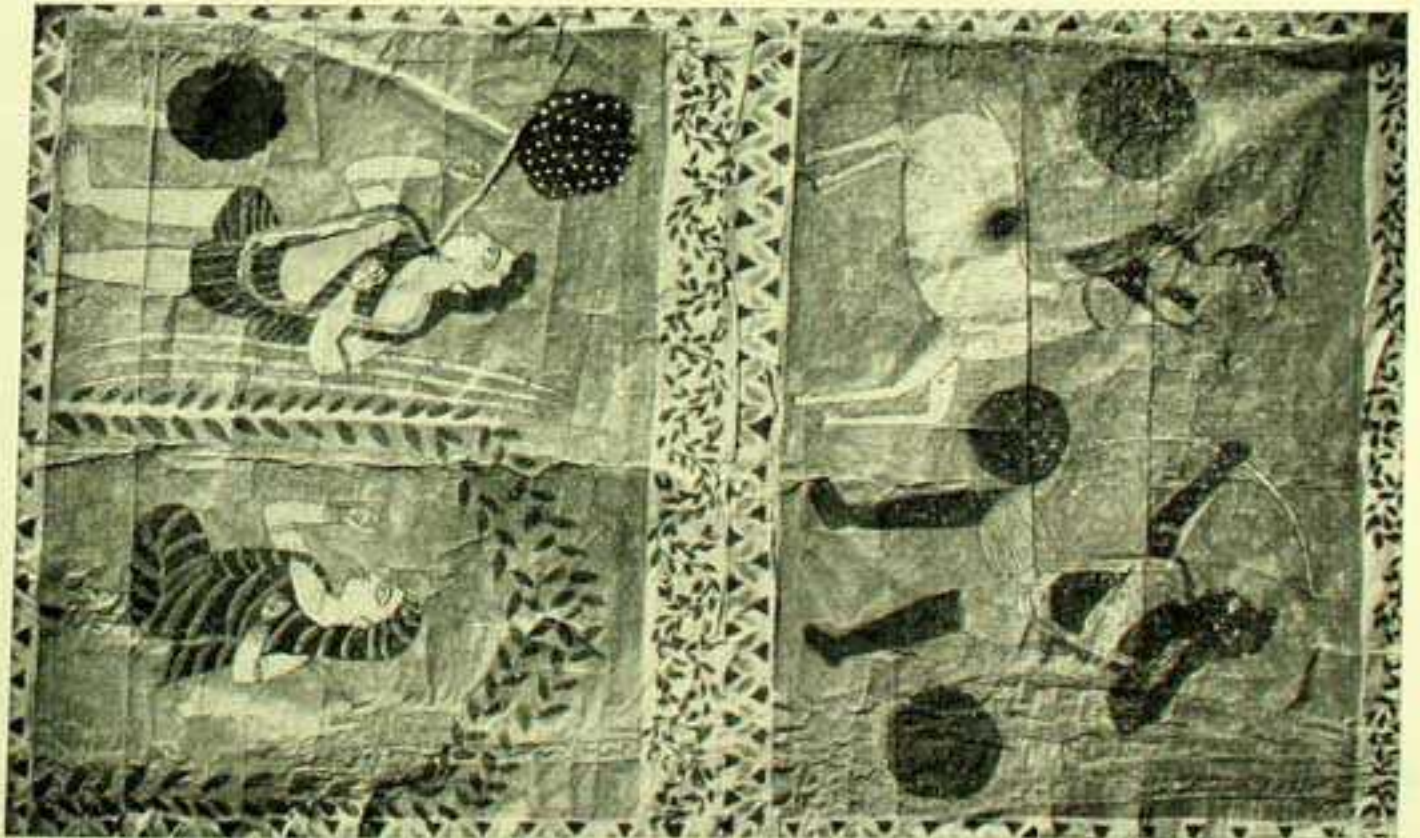
শুভ-নিবৃত্তির যুদ্ধ, যশোহর ঊনবিংশ শতাব্দী।



সূৰ্পনখা ও লক্ষ্মণ ।

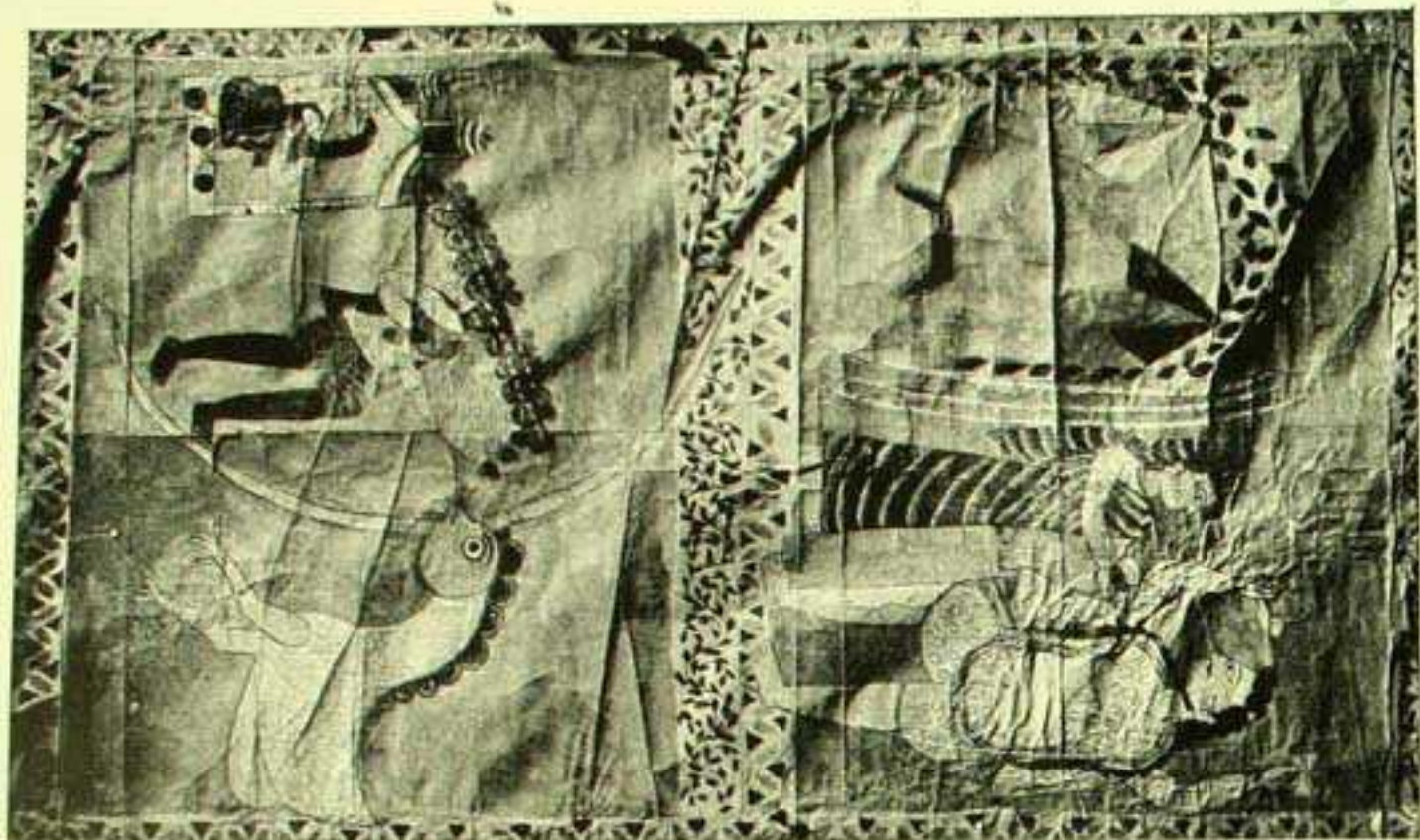
ভরত মিলন ।

পটিদারদের এই ছবি গুলি হুগলী-জেলায় ৫০১৩০ বৎসর পূর্বের অঙ্কিত ।



সীতা কর্তৃক লক্ষ্মণকে বিদায় ।

রাম কর্তৃক হরিণরূপী মারীচ বধ ।



অটল ও বর্ষানন।

মহাশীর বেশে রাবণ সীতার কুটিরে।



রানি ও লক্ষ্মণের শূন্য-কুটিরে প্রত্যাগমন।

ছই মূর্তি নদীর এপার ও ওপারে। একদিকে জ্ঞান, অপরদিকে প্রেম। মাগদী শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞানের সহিত শেষ, হয়ত বা ভক্তি ও প্রেমের ছায়াবের দিকে কচিং উকি মারিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশ এখন হইতে নুতন পথ খুঁজিয়া বাহির করিল—সে পথ প্রেমের। এ বিষয়টি পরে আলোচ্য। খুব প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তিতে বৌদ্ধ প্রশান্তির ভাব স্থম্পষ্ট। নবম শতাব্দীর একখানি ভাস্কর্য বিষ্ণুমূর্তি আমার নিকট আছে, তাহার বৃষভাক, কপাটবন্ধ ও সোম্য অবয়ব এবং অচঞ্চল স্থির মুখভঙ্গী বুদ্ধমূর্তিরই মত, পরবর্তী সময়ে এই প্রশান্ত মাগরে বে ভাবের ঢেউ খেলিয়াছে ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ অভাব।

বুদ্ধ ও বাহুদেবের মধ্যবর্তী মূর্তি শিবের। তিনি অর্দ্ধমুক্ত—অর্দ্ধবৃক্ষ, অর্দ্ধবিরাগ অর্দ্ধরাগ, শিলাদর্শ ছই যুগের মধ্যবর্তী। তারপর বাহুদেব জ্ঞানের দিকটা ছাড়িয়া প্রমে পৌছিয়াছেন মাত্র, তাঁহার শঙ্খ, চক্র, গদা প্রভৃতি ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু তাঁহার একটি হস্তে অনুরাগ-পন্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধের অঙ্গশ্রী নানা মুদ্রায় বিচিত্র ভঙ্গীতে ফুলের কুঁড়ির মত সুন্দর দেখায়। তাঁহার বসিবার ভঙ্গী, বজ্রাসন, পদ্মাসন প্রভৃতি জ্ঞানের পহাবলম্বী। বাহুদেবের ও সকল আসনের বাংলাই কিছুই নাই। বাহুদেবের পূজা পরিশেষে বেভাবে কৃষ্ণ-পূজায় পরিণত হইল—তাহা বাঙ্গালীর জাতীয় প্রচেষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা—জগতে তাহার উদাহরণ বিরল। তাহা পরে আলোচনা করিব।

আমরা বুদ্ধের সময় হইতে একদল লোকের সাক্ষাৎ পাই বাহাদেব ব্যবসা ছিল ছবি দেখাইয়া লোকের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করা। ইহাদিগের উপাধি ছিল “মহরী”। দণ্ডের সহিত সংযুক্ত চিত্রাঙ্কিত কোন বস্ত্র অথবা “ধ্বজ-দণ্ড” অর্থে কবিকঙ্কণ ‘মহরী’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, (চণ্ডীকাব্যের প্রথমমাংশ)।

সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় বাজকগণ প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধগণের এই রীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা Papyrus তরুর পাতে এইরূপ ছবি আঁকিয়া জড়াইয়া রাখিতেন। ভেটিকানে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর এইরূপ ছবি রক্ষিত আছে। জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্ত যে সকল চিত্র অঙ্কিত হইত, তাহাতে কখনও কখনও শ্রোতৃবর্গকে আমোদ দেওয়ার জন্ত প্রচুর ব্যঙ্গরসের ব্যবস্থা থাকিত। সুতরাং মহরীরা যে সকল কথা বলিয়া শ্রোতৃবর্গ ও দর্শকদিগকে হাসাইত তাহা তাহাদের নামে পরিচিত হইয়াছিল। এখনও লোকে “ঠাট্টা-মহরী” কথা ব্যবহার করিয়া থাকে। খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দী হইতে আমরা মহরীদের পরিচয় পাই। মক্কালীপুত্র গোসালীর পিতার জীবিকা অর্জনের এই বৃত্তি ছিল। মুদ্রারাক্ষস নাটকে এইরূপ পট দেখাইয়া সাধারণের নিকট হইতে অর্থগ্রহণের ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে। এই চিত্র-ব্যবসায়ীরা পাপীদিগের শাস্তি আঁকিয়া যমরাজের দূতগণের মূর্তি দেখাইতেন। আশ্চর্যের বিষয় এখন পর্যন্তও বাঙ্গলার পটব্যবসায়ীরা ধর্মবিষয়ক নানা উপাখ্যানের চিত্র দেখাইয়া উপসংহারে যমরাজের সেই পাপীদের শাস্তি দেওয়ার দৃশ্যটা প্রদর্শন করেন। যে কোন পৌরাণিক চিত্রের শেষভাগে যমের দণ্ড-গৃহ দেখান হয়। ইহা সেই স্মৃতিগত প্রাচীন রীতি। মুদ্রারাক্ষসে দৃষ্ট হয় এইরূপ চিত্রগুলির সাধারণ নাম

“ধম-পট”। বুদ্ধদেবের সময়ের পূর্বে হইতে এই “পটীদার”গণ পটে অঙ্কিত ছবি দেখাইয়া ধর্ম প্রচার করিতেন (“সংযুক্ত-নিকায়, খন্ধ সংযুক্ত” প্রভৃতিতে “করণ চিত্তং—চরণং চিত্তং চিত্তেনেব চিত্তিতং” ইত্যাদি দৃষ্টব্য)। বুদ্ধদেবের অপসালিনী ৮৪ পৃষ্ঠা দেখুন। ইহাতে এই ভাবের চলন্ত চিত্রের বিবরণ দেওয়া আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে “সারথপ্পকাসিনী” নামক সংযুক্ত-নিকায়ের ভাষ্যে, শ্রীমদেশের সংস্করণে) লিখিত আছে—“নথা ব্রাহ্মণা পাসণ্ডিকা হোস্তি, পটকোট্টকং কত্তা তথ নানপ্পকারা সুগতি-হুগ্গতিবদেন সম্পত্তি-বিপত্তয়ো লেখাপেত্তা ‘ইদং কথং কত্তা ইদং পটিলভত্তি, ইদং কত্তা ইদত্তি দত্তেত্তা তং চিত্তং গহেত্তা বিচরত্তি।” এই ‘নথা’ শব্দ কখনও ‘সংথা’ রূপ ধারণ করিয়াছে। জৈন শাস্ত্রে ইহাদের নাম “সংথা”। কোন্ পাপে নরকে কি শাস্তি তাহা ছবিদ্বারা ইহারা দেখাইতেন। সেই ইতিহাস-পূর্ক যুগ হইতে বর্তমান পটীদারেরা পর্য্যন্ত “ধম-পট” দেখাইয়া থাকে। তাহাতে যে কোন বিষয়েরই ছবি থাকুক না কেন, শেষের দিকে পাপীর শাস্তির ছবি থাকে। ক্রমে বৌদ্ধধর্মের প্রচারবুদ্ধির সঙ্গে এই পট দেখাইয়া ধর্মসংক্রান্ত উপাখ্যানগুলির প্রচলন অত্যধিক হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ দূরদূরান্তর ধর্মপ্রচারের জন্য যাতায়াত করিতেন। যেখানে পরস্পরের মধ্যে ভাষাবার কোন কথা বুঝাইবার সুবিধা বেশী নাই, সেখানে ছবি এই প্রচার-কার্যের প্রধান সহায়। ছবি যে ভাষায় কথা কহে তাহা সার্বজনীন। বুদ্ধদেবের জন্মকথা (জাতক) লইয়া ছবি অঙ্কিত হইত, অনেক সময়ে সেইগুলি দেখাইয়া হস্তাদির ইঙ্গিতেই বিদেশী শ্রোতার মনে কাহিনীগুলির একটা মোটামুটি ভাব বুঝাইয়া দেওয়া হইত। কাগজ কিংবা বস্ত্রের উপর এই সকল চিত্র লিখিত হইত। সম্ভবতঃ কাপড়ের উপর ছবি আঁকার পদ্ধতিই গোড়ার খুব বেশী ছিল, ‘পট’ শব্দ (পট) দ্বারাই ইহা অস্বীকৃত হয়। জাতকের উপাখ্যানগুলি পাহাড়ের গা খুঁড়িয়া উৎকীর্ণ করা হইত, দেওয়ালে আঁকা হইত এবং ‘মন্তরীরা’ কাগজে বা কাপড়ের উপর তাহা আঁকিয়া সঙ্গে লইয়া ধর্মপ্রচারার্থ সর্বত্র যাতায়াত করিত। অজন্তার গোবরমাটির উপর সাদা রং মাখিয়া তাহার উপর যে সকল অপূর্ক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল কোন কোন স্থানে তাহা এখনও পূর্ববৎ উজ্জল আছে। শত শত বৎসরের প্রাকৃতিক দৌরাণ্ড্য তাহাদিগকে শ্রীহীন করিতে পারে নাই, কত বর্ষার জলঝড়, গ্রীষ্মের অগ্নিসম তাপ, হেমন্তের শিশির সেই পর্বতগুলির উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই গিরিগুহাগুলি যক্ষের ছায় কলালক্ষীর এই বিচিত্র দান বক্ষে আগলাইয়া রাখিয়াছে। ইহা একবার বলা হইয়াছে। বীরভূম জেলায় এখনও মেয়েরা গোবরের মাটির উপর প্রথমতঃ সাদা রং ফলাইয়া প্রতি গৃহের দেওয়ালে দেওয়ালে নানারূপ পল্লব, দেবলীলা ও নরলীলা, লক্ষীর পদাঙ্ক, ধাতুশীর্ষ প্রভৃতি কত কি আঁকিয়া থাকেন। এই সকল কথা পূর্বে একবার বলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় সেই সকল ছবির যে প্রতিলিপি তুলিয়াছেন, তাহা দেখিলে প্রতিপদে অজন্তাকে মনে পড়ে। অজন্তার বিখ-বিজয়ী চিত্রশিল্পের সমকক্ষতা করিবে এই দরিদ্র কুটীরবাসিনীরা সেরূপ শিক্ষাদীক্ষা কিরূপে পাইবেন? তথাপি এই ছবিগুলি যে অজন্তার অক্ষয় ভাণ্ডারেরই ক্ষুদ্রশাখা, সেই প্রাচীন সংস্কারজাত একই খনির উৎপন্ন রত্ন, তাহাতে

কোন সন্দেহ নাই। অজন্তার শিল্প বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত বজায় রাখিয়াছে, সেই শিল্পীদের অনেকেই খুব সম্ভব বাঙ্গালী ছিলেন তাহার প্রমাণও খেজুরাহ ও রাজগড়।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। যে করিয়াই ইউক খেজুরাহের ভাস্কর্যের সঙ্গে মগধের তথা বাঙ্গলার ভাস্কর্যের আশ্চর্যরূপ ঐক্য দৃষ্ট হয়। মাগধ শিল্পীরা কি সেই দেশে গিয়াছিলেন? খেজুরাহের সন্নিকটবর্তী রাজগড়ের পর্বতান্তরালে লুকায়িত বিশাল রাজপ্রাসাদ দেখিয়াছিলাম, তাহা কি বিরাট কল্পনাপ্রসূত! মনে হইয়াছিল, আলাদীনের প্রদীপ-ঘসার ফলে কোন দৈত্য আসিয়া অদ্বিত রাজগড়-প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া গিয়াছে; এখনও তাহা অটুট শোভা-সৌন্দর্য্যে বিস্তমান। সেই রাজগড়ের প্রাসাদে ঢুকিতেই আশাতীতরূপে প্রকাণ্ড দুর্গাপ্রতিমার একটা চালচিত্রের স্থায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি নানাবর্ণে চিত্রিত খিলান দৃষ্ট হয়। হঠাৎ পাহাড়িয়া দৃশ্য চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং নরশিল্পীর অদ্বিত কারুকার্য চক্ষে পড়িয়া বিশ্বয়ের উদ্বেক করে। এই রাজগড়ের তোরণের চালচিত্র দেখিয়া আমার বীরভূমের দেওয়ালে আঁকা মেয়েদের হাতের নানা চিত্র মনে পড়িয়াছিল। এই চিত্রশিল্প যে এক পরিবারের লক্ষণাক্রান্ত তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

মন্তরীদের সম্বন্ধে আর দুই একটি কথা বলিয়া এই বিষয় শেষ করিব। বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে এই মন্তরীরা এখনও আছে। এখনও পট দেখাইয়া তাহারা উপজীবিকা অর্জন করে। তাহাদের ছবিগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর, বাঙ্গলার পল্লীকলাবিষ্ঠা-বৈশিষ্ট্য এই সকল পটে যথেষ্ট আছে। এই সকল পটের বিশেষ গুণ এই যে, একটা মন্তবড় বিষয়কে ইহারা এমনভাবে সংক্ষিপ্ত করিতে পারে বাহাতে মূলগল্পের কোন হানি হয় না এবং

যে সকল দৃশ্য করণ বা অপর কোন বিশেষ রসব্যাঞ্জক, সেই সকল মন্তরীদের কাণ্ডপটুতা।

বিষয়ে জোর দিয়া কাহিনীর কবিত্ব ও কোতূহল চিত্রকর বেশী করিয়া জাগাইয়া তোলে। বেগুলি নিত্যন্ত গুচ্ছাংশ, বাহা ছাটিয়া না ফেলিলে কোন বড় কাব্যকথার সম্বলান এতটুকু সংকীর্ণস্থলে হওয়া অসম্ভব, চিত্রকর তাহার স্বতঃসিদ্ধ কলাপ্রতিভার বলে তাহা আবিষ্কার করিয়া তদীয় চিত্রে মৌলিকতা ও সৌন্দর্য্য উভয়ই যথেষ্ট পরিমাণে রাখিয়া থাকে। আমরা পল্লীগাথা-সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছি, এই পল্লীচিত্রগুলির সম্বন্ধেও তাহাই প্রযুক্ত। গল্পটি কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করিয়া পর পর চিত্রাবলী দিয়া সমস্ত আখ্যানবস্তুটি তাহারা জীবন্ত করিয়া তোলে। এই চিত্রগুলি দেখাইবার সময়ে প্রত্যেকটা চিত্রসম্বন্ধে চিত্রকর পাঁচ ছয়টি ছত্রের কবিতা গান করিয়া থাকে। এই গানে বিষয়টি উজ্জ্বল ও দর্শকের কোতূহল বিশেষভাবে উদ্ভিক্ত হয়। বাংলাদেশে এই মন্তরীদের নাম 'পটুয়া' কোথায়ও বা 'পটীদার'। বিক্রমপুর অঞ্চলে এইরূপ পট দেখানো ব্যাপারটাকে "পট নাচানো" বলে। পূর্ববঙ্গ, রাঁচি, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও সেই মন্তরীদের ব্যবসা চলিতেছে। ইহারা নিশ্চয়ই বৌদ্ধ ছিল, এজন্য অনেক স্থলেই ইহারা মুসলমান হইয়া অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইয়াছে। কিন্তু তাহারা এই সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক বৃত্তি আর রক্ষা করিতে পারিতেছে না। বঙ্গের অধিতীয় কলা এখন ডুবন্ত। পটীদারগণ অনেকটা

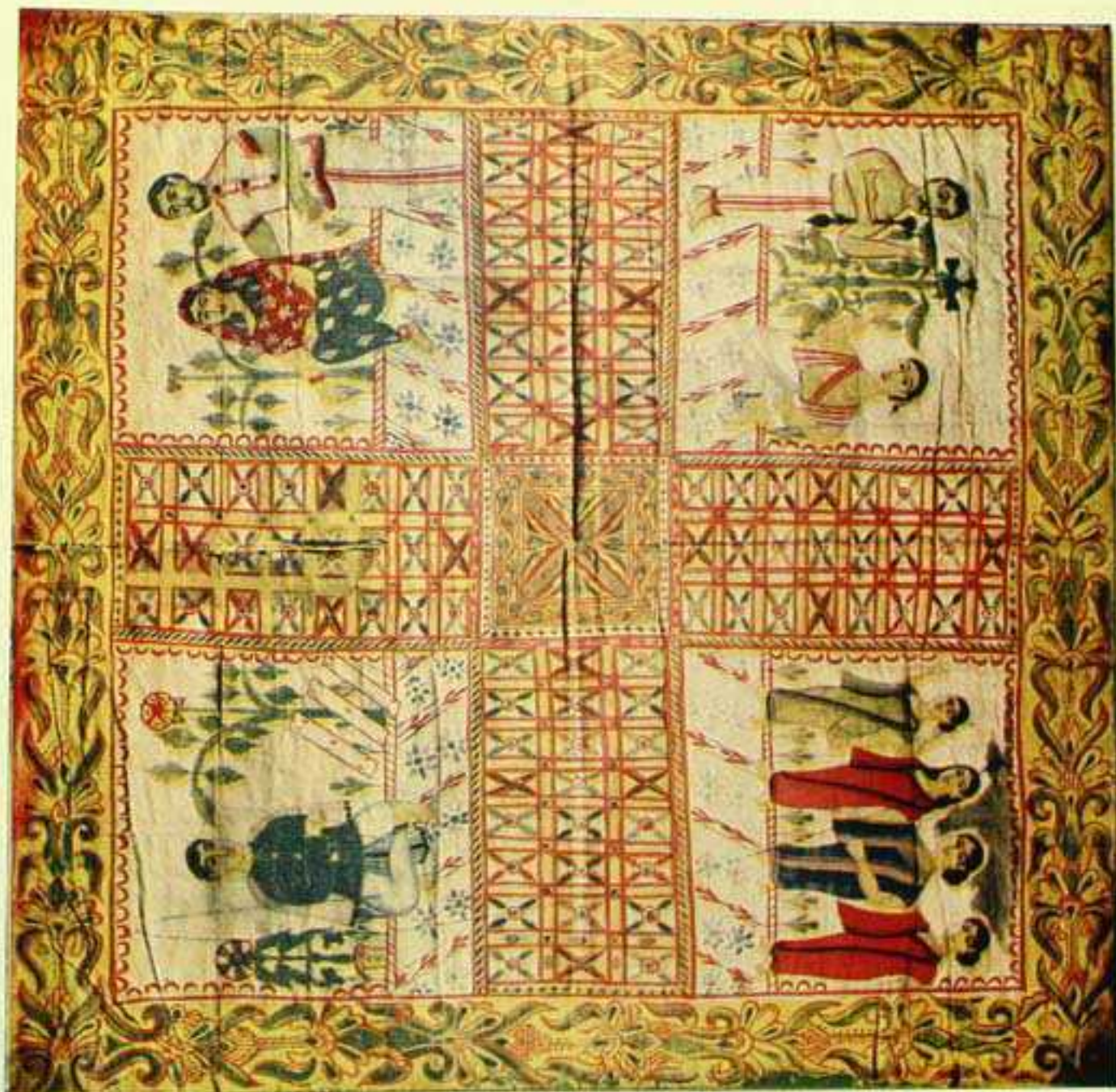
হিন্দুভাবাপন্ন, তাহাদের অধিকাংশের হিন্দু নাম। তাহাদের ছবির বিষয় অধিকাংশই পৌরাণিক। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এই পটুয়া বা পটীদারদিগের কৃতিত্ব ও গুণগণা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বদেশপ্ৰীতির উচ্ছ্বাসে রঞ্জিত। তিনি সাশ্রুনেত্রে গদগদ কণ্ঠে চিত্রকরদের বর্তমান হৃদশার কথা বলিয়া শ্রোতৃবর্গকে করুণরসে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। এখন ইহাদের সংখ্যা এত দ্রুতভাবে হ্রাস পাইতেছে যে, খৃষ্টপূর্ব প্রায় সহস্রবৎসর বাবৎ বঙ্গদেশে যে ধারাটা বজায় রাখিয়া আসিয়াছে তাহা সহানুভূতিহীন উত্তরক্ষেত্রে আজ বৃষ্টি শুকাইয়া যাইতে চলিল। আমরা সর্ববিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইয়া আছি, দেশের কাকন কাচমূল্যে বিকাইতেছে। চিত্রে কয়েকখানি পটের অংশের প্রতিলিপি দেওয়া গেল।

বাঙ্গলাদেশ নদীমাতৃক। এখানে মানুষের কীর্তি বেশী দিন থাকে না; বিশেষ পূর্ববঙ্গের নদীর ভাঙ্গুনিতে বহুগুণের অপূর্ণ রাজভাণ্ডারের মুক্তব্যয়-জাত শিল্পচিত্র, বিজয়ীর দর্প,—পদ্মা, ধলেশ্বরী, ভৈরবের দাপটে টুটিয়া গিয়াছে। কিন্তু এদেশের প্রধান গুণ এই যে, শিক্ষাদীক্ষা, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য এ সমস্ত বিজ্ঞাই এখানে জনসাধারণ আয়ত্ত করিয়া লইয়া থাকে। অশোকের সঙ্গে মৌর্য্য হর্ম্ম্যাদির বিলোপ পাইয়াছে, সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তিগণের কীর্ত্তি এখন কোথায়? কিন্তু সেগুলি নষ্ট হইলেও এই দেশে শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম্মের বীজ ছড়ান আছে। এই দেশ একাত্তকাননের মত একটি পাদপের অহঙ্কার করে না, জাপানের হজিইয়ামার মত এদেশ একটিমাত্র সমুদ্রত শৈলশৃঙ্গের দর্পে দর্পিত নহে। এক কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তিলোপে এদেশ সর্বস্বহারা হয় না। নালন্দা ও বিক্রমশিলার পতনে এদেশের বিস্তার গৌরব যায় নাই। বাহা কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া বিজয়মান ছিল, তাহা কেন্দ্রহীন হইয়া সর্বত্র প্রসার লাভ করিল। প্রত্যেক পরীত্রাঙ্গণের ঘরে ঘরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালন্দার উদ্ভব হইয়া বিস্তার গৌরব রক্ষা করিল। সাম্রাজ্যপতির আকাশচুম্বী কীর্ত্তি ভূতলশায়ী হইল, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত শত ধীমান্ ও বিতপাল কলালক্ষীর গৃহে সাঁঝের দীপ জালাইয়া রাখিল।

সেই কক্ষের পৌত্রবধু বাণরাজার কন্যা উবার সখী চিত্রলেখার সময় হইতে চিত্রে কৃতিত্ব বাঙ্গালী রমণীর একটি বিশেষ গুণ। যখনন্দন দাস (খৃষ্টীয় সপ্তদশশতাব্দী)

গোপী-সজ্জা, যখনন্দন দাস।
 তাঁহার গোবিন্দলীলামৃত পুস্তকে রাধিকার সখীরা তাঁহার যে অঙ্গ-
 সজ্জা করিতেছেন তাহার একটি বিস্তারিত বিবরণী দিয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণের কথা উপগল্প বল, আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রতীক বল, প্রেমের রূপক বল—ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু এই কাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিক কি কিছুই নাই? গোপীরা রাধিকাকে বেভাবে অভিসারের জন্ত সাজাইতে বসিয়াছেন, সেইভাবে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতেও কোন ধনীর ছহিতা বা রাজকুমারীকে তাঁহার সহচরীরা বাসরের জন্ত সাজাইতে বসিত। তখন এদেশের স্বাধীনতা চলিয়া গিয়াছে। মন্দিরের অপূর্ণ কারু-
 কার্য্য ও বিগ্রহের অলঙ্কার-সৌষ্ঠব নির্মাণের এখন আর উৎসাহ কোথায়? নির্মম অত্যাচারীর অসির ভয়ে ভাস্করের লৌহ-লেখে মরিচা ধরিয়া গিয়াছে। তথাপি সেই সময়েও



উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অঙ্কিত (শিহট্টের মেয়েদের হাতে আঁকা)।

রাধিকার অভিসার-সজ্জার যে বর্ণনা কবি দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় বাঙ্গালী রমণীর চাক্ষুশে স্বতঃসিদ্ধ দক্ষতা তখনও পূর্ণবৎ বজায় ছিল।

“ললিতা সোনার চিকনী দিয়া রাধার কেশ বিনাইয়া সেই আর্দ্রকেশরাশি ধূপধূনার ধোয়া দিয়া শুকাইয়া লইল। তৎপর কেশরাজি শুকুক্ষিত করিয়া তাহাতে উৎকৃষ্ট স্নগন্ধ তৈল মাখাইল। শ্রীমতীর কুন্তল স্বভাবতঃই মৃদুস্নগন্ধপূর্ণ, অগুরুর গন্ধে তাহার সুরভি বাড়িয়া গেল। ছটি বেণী সূচাক্রমে গাঁথিয়া ক্ষুদ্র একটি বকুলকুলের মালা যেন আর একটি বেণীতে পরিণত করা হইল। এই তিন বেণীর সমাহারে সৌন্দর্যের তীর্থস্বরূপ ত্রিবেণী রচিত হইল। এই তিন বেণী একত্র করিয়া প্রথমতঃ পটুজাদ (রেশমী ফিতা) দিয়া বাঁধিয়া তাহা পুনরায় সোনার সূত্র তার দিয়া ঘিরিয়া ফেলিল।”

“প্রথমতঃ ভিতরকার রক্তবর্ণ বস্ত্র (সায়ার মতন কোন কাপড়) পরিয়া তাহার উপর রাধা ভ্রমরের মত নীলাভ মেঘডুমুর শাড়ী পরিলেন।” রাধা বৃন্দাবনবাসিনী; তাই কবি এখানে মুক্তা ও মণিখচিত স্বর্ণহস্ত দিয়া একটা কোঁচা তৈরীর কথা লিখিয়াছেন। “চন্দন, কর্পূর এবং কাশ্মীরের অগুরু দিয়া সখীরা একটা স্নগন্ধ তৈরী করিল” (ইহা হিমালী যো জাতীয় হইবে), “এই স্নগন্ধ সখীরা রাধার অঙ্গে মাখাইয়া দিল।”

ইহার পর কবি যে সকল অলঙ্কারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে অজস্র বা অমরাবতীর উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের অঙ্গ-ভূষণ মিলাইয়া দেখুন। বুঝিবেন, সপ্তদশ শতাব্দীর কবির সঙ্গে বৰ্ত্ত ও সপ্তম শতাব্দীর প্রাচীন মহিলাদের বেশভূষার সত্যিকার পরিচয় ছিল; অলঙ্কারগুলি অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও কলাশিল্পের পরিচায়ক, তাহা কতকগুলি মণিমাণিক্যের শ্রীহীন কাণ্ডজ্ঞানশূন্য সমাহার নহে। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত গহনার উল্লেখ আছে, কিন্তু কবি শিল্পদ্রব্য বোঝাই একটা কাঁকা মাথা হইতে নামান নাই, গহনাগুলি হালকা ও মূল্যবান, সুন্দরকে নবশ্রী প্রদান করে কোথাও শ্রীহীন করে না। বাঙ্গালী যে প্রাচীন শিল্পজ্ঞান বহু শতাব্দীর দৌরাশ্রয় ও বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও অটুট রাখিয়াছিল, ইহা তাহাই প্রমাণ করিতেছে। যত্নবান দাসের কাব্য কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত সংস্কৃত “গোবিন্দ-লীলামৃত” কাব্যের একখানি সুললিত পটভূমি।

অতি প্রাচীন খৃষ্টীয় বৰ্ত্ত ও সপ্তম শতাব্দীর প্রায় সমস্ত গহনাই এখনও বঙ্গের পল্লী-মহিলারা পরিয়া থাকেন। মুসলমান মেয়েদের মধ্যেই সেই প্রাচীন প্রাচীন অলঙ্কারের নমুনা। গহনার প্রচলন খুব বেশী। বৈষ্ণবগণের উৎকৃষ্টতর কলাজ্ঞান ও ক্রটির প্রভাবে হিন্দুরা প্রাচীন গহনাগুলির কোনটি পরিহার কোনটি বা পরিবর্তন করিয়া তাঁহাদের অন্তরে চালাইয়াছেন। কিন্তু হিন্দুর নিম্নশ্রেণী হইতেই এদেশে অধিকাংশ মুসলমান হইয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীন গহনা ও বেশভূষা এখন পর্য্যন্ত বজায় রাখিয়াছেন। প্রাচীন বাহুদেবের গলায় যে হার দেখা যায় উহার নাম হাঁপুলি, উহা বঙ্গের মুসলমান পাড়ায়ই সর্বত্র দৃষ্ট হয়। গৌরীর কাণের ঢেড়িও পূর্ববঙ্গের মুসলমান মেয়েদের অনেকেই পরিয়া থাকেন। দেবীর হাতের অলঙ্কার মুসলমান মেয়েদের কাঁকন এখনও পল্লীতে পাওয়া যায়। আমরা

বাপ্পদেবের ও গৌরীর গহনাগুলি কতক কতক এবং বঙ্গপন্নীর মুসলমান মেয়েদের পরিচিত রূপার ভূষণের কয়েকটি চিত্র এখানে দিতেছি।

বাপ্পদেবের কটিবন্ধ ও গৌরীর নীবিবন্ধ বঙ্গদেশ হইতে এখনও উঠিয়া যায় নাই। এখনও নিত্যন্ত মফঃস্বলে বণিকসম্প্রদায়ের মধ্যে রূপার "গোটের" প্রচলন আছে, উহাই কটিবন্ধ। উহা পুরুঘেরাও কোমরে পরিয়া থাকে। বঙ্করাজ বা বাঁকমল পঞ্চাশবৎসর পূর্বে এদেশে হিন্দু মেয়েদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল, এখনও মুসলমান পাড়ায় তাহা আছে। সে আমলের বেশর, হিন্দুদেবীর বিগ্রহে যাহা নাসিকার সৌষ্ঠব সম্পাদন করিত, তাহা এখনও হিন্দু মেয়েরা (বিশেষ নিয়ন্ত্রেণীর) ব্যবহার করিয়া থাকেন। বেশর এখন সভ্য হইয়া নোলকে পাড়াইয়াছে।

কিন্তু চিত্রকলার কথা বলা হয় নাই। অজস্তার চিত্র ও বাঙ্গালীর অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের চিত্র যে এক পরিবারের লক্ষণাক্রান্ত তাহা উল্লেখ করিয়াছি। এই চিত্রবিজ্ঞা এদেশে যে কতভাবে কতদিক্ দিয়া প্রচলিত ছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গালী যে কাজ করিতে বসিয়াছে তাহাই একটা কলাবিজ্ঞার সাহায্যে সুন্দর করিয়া লইয়াছে। ইহার অধিকাংশ নিদর্শনই স্ত্রীজাতির হাতের কাজ। শিকা, কাঁধা, আসন, আলপনা, হাঁড়ি, দেয়াল, রুমাল, লাঠি, নারিকেল মেঠাই, আমসব প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই বাঙ্গালী মেয়েদের এই স্বতঃসিদ্ধ পটুহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা ৪৫ হাত উঁচু নারিকেলের মেঠাইএর রথ ও ফুলের গাছ দেখিয়াছি, প্রায় ততটা উঁচু চিনির মেঠাই দেখিয়াছি। উহা এখনও বঙ্গের কোন কোন পন্নীতে উৎসববিশেষে পাওয়া যায়। করিমপুর জেলার নালিয়া গ্রামে এখনও ছই একজন কারিগর ঐরূপ বৃহদাকৃতি মেঠাই প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সকল মেঠাইএর কারুকার্য অতি চমৎকার। ঠিক এসময়ে উহাদের ফটোগ্রাফ দিতে পারিলাম না। লগ্নীর সর ও পিড়ি-চিত্রণে মেয়েরা স্বীয় প্রতিভা দেখাইতেন, শাঁখের পুতুল ও শাঁখের উপর নানারূপ কারুকার্যও এখানে উল্লেখযোগ্য।

পুঁতি দিয়া থলিয়া ও লাঠি কতরূপ চিত্র-বিচিত্র করা হইত। এবার পশ্চিম দেশের নীতের হাওয়া বহিয়া আমাদের এই পন্নীর প্রাণস্বরূপ কলাবিজ্ঞাকে নিমূল করিয়া একান্ত ত্রীহীন ও উলঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছে। যে হাত এককালে নব নব উদ্ভাবনী শক্তির বলে শত শত সুন্দর ছাঁচ তৈরী করিয়া আত্মীয়স্বজন, বিদেশী ও অতিথিসকলকে সন্দেশাদি নানারূপ মিষ্টান্নের বিচিত্ররূপে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করিয়াছে, আমাদের দেশের সেই কোমল করকিশলয় প্রাচীন কারুকার্যগুলির প্রতি এখন অতীব উপেক্ষাশীল ও উদাসীন।

ইংরেজ আসিবার পূর্বপর্ধ্যন্ত আমাদের চিত্রবিজ্ঞার ধারা নির্মিলিত চলিয়া আসিয়াছিল।

চিত্রশিল্প। বাঙ্গলাদেশের চিত্রনৈপুণ্য অজস্তার পথেই চলিয়াছিল। বরেন্দ্র-

ভূমির বীমান ও বিতপালের জায় বহু চিত্রকর ও স্থপতি ছিলেন যাহাদের নাম আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাহাদের হাতের কাজের সহস্র সহস্র ধ্বংস পাইলেও সেই ধ্বংসভূষণের মধ্যে অনেক নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে।

আমাদের প্রস্তরভাস্কর্যের নমুনা এখনও বধেই আছে। পরাধীনতার যুগেও আমাদের শিল্পরাশী তাঁহার নিজেকে হারাওয়া ফেলেন নাই।

একখানি আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন ছবি হইতে নমুনা দেওয়া হইল, ইহার তারিখ পাওয়া গিয়াছে, এই রাধার দুই সহচরীর ছবির সঙ্গে যে কাগজ ছিল তাহার তারিখ ১০৯৫ বাং সন। খুব সম্ভব ঐ কাগজগুলি ও ছবিখানি এক সময়ের। ছবিখানি বড় ছিল— তাহার প্রায় সব অংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যেটুকু আছে তাহা দেখিয়া মনে হয় উহা রাজপুত কলমের ততটা অনুবর্তী নয়—বতটা অজস্কার। ইহারও তারিখটা যাহা মালিকের বংশাবলীর হিসাব ধরিয়া পাওয়া যায়, তাহাও প্রায় তিনশত বৎসরের কাছাকাছি। আশ্চর্যের বিষয় ছবিটা দীর্ঘকাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রংএর উজ্জলতা ও সোণার চাকচিক্য কমে নাই।

তারপর আমরা পুঁথির মলাটের উপর গালা ঢালাই করিয়া যে সকল ছবি ৩০০ হইতে ১০০ বৎসর পূর্বে অঙ্কিত হইয়াছিল—তাহার কিছু কিছু নমুনা দিতেছি। এই সকল নানাবর্ণের বিচিত্রভাবে চিত্রিত কাঠের মলাট আমার নিকট অনেকগুলি আছে, উহার কয়েকখানির প্রতিলিপি সংস্কলিত “বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়” গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। এই ছবিগুলিতে রাজপুত চিত্রকলার কতকটা প্রভাব আছে, কিন্তু বিষয়গুলি ও চালচিত্র হইতে স্বরূপ করিয়া নরনারীর প্রতিকৃতি অতনু প্রভৃতি অনেকটাই খাঁটি বাঙ্গলার। বর্ণবিভাস ও মেয়েদের হাবভাবে রাজপুত চিত্রাদর্শ কতকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পশুচিত্র-অঙ্কনে রাজপুত কলা-শিল্পের স্থান খুব উচ্চ, কিন্তু বাঙ্গলার পশু-জগতের কতকটা নিজস্বতাব আছে। বাঙ্গালীর সিংহ—কলনারাজ্যের সিংহ, তাহা কতকটা Unicornএর মত। ইহার মুখ ও গ্রীবা-ভদ্রী কতকটা ঘোটকের স্থায়।

বাঙ্গলার চিত্রকর পশুগুলির যে ভঙ্গী দেখান, তাহাতে অসামান্য গতিশীলতা দৃষ্ট হয়। পোড়াইটের (Terracotta) উপর প্রাচীন ঘোড়াটির মূর্তি দেওয়া হইয়াছে এবং হরিণ-গুলির গতিভঙ্গী দেখান হইয়াছে, তাহাতে ঐ সকল চিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমার History of Bengali Language and Literature এর ২২০ পৃষ্ঠায় হরিণদের আর একটা ছবি দেওয়া হইয়াছে, এইগুলি দেখিলে মনে হয় বেন ইহার চিত্র-হিসাবে সম্পূর্ণ নিখুঁৎ হউক না হউক, তাহাতে কি আসে যায়, কিন্তু তাহাদের চলিকূতাটাকে যে চিত্রকর মূর্ত করিয়া দেখাইতে পারেন এই কৃতিত্ব বাঙ্গালী চিত্রকরের অসাধারণ। দুই শত তের বৎসর পূর্বের একটি কাঠফলকে উৎকীর্ণ গাভীদিগের চিত্রসংযুক্ত একখানি কাঠফলক আমার নিকট আছে, কাঠ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে কিন্তু তথাপি বেন তাহা গাভীদিগের গতি সামলাইতে পারিতেছে না। ফ্রেঙ্ক সাহেব এই ছবিখানির খুব প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও ছবিখানির ফটোগ্রাফ তুলিতে পারেন নাই।

কাগজের উপর চিত্রের অনেক নমুনা আমি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা ৩৪০ বৎসর পূর্বে হইতে ১০০ বৎসর পূর্বে পর্য্যন্ত। এই সমস্তই মাগব চিত্রশিল্পের দ্বারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

চৈতন্য-সংকীর্ণনের মূর্তিগুলির চোখে-মুখে যে ভাব-প্রবণতা (emotion) দেখান

হইয়াছে—তাহা বাঙ্গালীই পারেন, অস্ত্রের পক্ষে উহা অনধিগম্য। নৌকার বাজীর হকা হইতে কয়েক খসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সে জ্ঞান নাই, তিনি চৈতন্ত-সংকীৰ্ত্তনের ছবি।

চৈতন্তের দিকে চাহিয়া আছেন। মাঝি হাতে ফেপণী ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহারা যে বাজী লইয়া নির্দিষ্ট স্থানে বাইবে তাহা ভুলিয়াছে। একটি স্ত্রীলোক স্বর্ধ্যকে প্রণাম করিবার জন্ত সম্ভবতঃ হাত ভুলিয়াছিল, কিন্তু সে চৈতন্তের দিকে চাহিয়া তাঁহাকেই প্রণাম করিতেছে। কলসী জলে ছাড়িয়া কুলবধু একি অপূৰ্ণ দৃশ্য দেখিতেছে। গাভীগুলি উৰ্দ্ধমুখ হইয়া চৈতন্তের রূপসুখা পান করিতেছে। এটি হইতেছে ছবিগুলির সাধারণ ভাব। কিন্তু এই ভাবটিকে প্রাণাচ্ছ দেওয়ার জন্ত চিত্রকর আদৌ মাথা ঘামান নাই। গাভীগুলির দুই একটি আবার এদিক ওদিক চাহিয়া আছে—রমণীগণের দুই একজন গল করিতেছেন—তাঁহাদের দৃষ্টি চৈতন্তের প্রতি নাই, হয়ত তাঁহার সম্বন্ধেই গল হইতেছে। ইহাতে কোন বাড়াবাড়ি নাই;—শিল্পীর এই সংঘম ইহার অন্ততম বৈশিষ্ট্য। চিত্রকর ছবিটিকে তাঁহার চূড়ান্ত কলাকৌশল দ্বারা একঘেয়েম্বের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সৰ্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয় শত শত লোকের একমাত্র লক্ষ্য চৈতন্তের মূর্তি। তিনি চিত্রপটের বামদিকে অবস্থিত। নিত্যানন্দের আজ্ঞামূল্যবিত দুই বাহু স্প্রসারিত, তিনি দীৰ্ঘমূর্তি, পদ্মপলাশ-নেত্র, কতকটা দীর্ঘ-স্থির; তাঁহার বামের মূর্তি শ্রীবাসের, তাঁহার এক বাহু নিম্নের দিকে ছস্ত, অপর বাহু অর্জোখিত—ইনিও কতকটা দীর্ঘ-স্থির। চিত্রকর এই দুইটি চিত্রে যেন পূৰ্ণসংস্কারের পথ অবলম্বন করিয়া দেবমূর্তি গড়িয়াছেন। দুইটি মূর্তিই কতকটা অনড়, কাঠ-কঠিন, এই লীলারিত জনসমুদ্রের মধ্যে থাকিয়াও যেন উহার একটু বাহিরে। ইহাদের মধ্যে পূৰ্ণাগত দেব-সংস্কারের ভাব বেশী, স্বাভাবিকত্ব অল্প।

কিন্তু চৈতন্তের সমস্ত মূর্তিটি যেন একটি লীলাময় সম্মীত। তাঁহার দুই হস্তের ভঙ্গী লক্ষ্য করুন। তাঁহার বুকের উপর দিয়া যেন একটা গানের ঝড় বহিয়া যাইতেছে—তিনি যেন একটা মূর্তি রাগিণী। এই চিত্রপটখানিতে প্রায় ১২০টি ছবি আছে—উহার কোন এক মূর্তির সঙ্গে অপর কোন একটির সাদৃশ্য নাই, প্রত্যেকটির চেহারা ও ভঙ্গী স্বতন্ত্র রকমের। বৈষ্ণব নর্তনের আশার কাছে অনেক ছবি আছে, তাহা আলোচনা করিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, মূর্তিগুলি তাৎকালিক বিশিষ্ট ভক্তগণের মূর্তির অনেকটা অমুরূপ। ইহাদের প্রত্যেকের পরিচয়ের জন্ত আমি চেষ্টিত আছি। চৈতন্তের সময় হইতে তাঁহার ও তাঁহার ভক্তগণের ছবি অঙ্কিত হইয়া আসিতেছে, তাঁহার উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণের ছবি আঁকিতে যাইয়া এই চিত্রকর সেই প্রাচীন সংস্কারের পথ অবলম্বন করিতে সাদৃশ্য সংরক্ষিত হইয়াছে। পরবর্তী কালের চিত্রকরগণ সেই প্রাচীন সংস্কার হারাইয়া ভক্তের মূর্তি গড়িতে যাইয়া অনেক সময়ে দ্বন্দ্ব-দ্বন্দ্বপুট গৌসাই গড়িয়াছেন।

এই চিত্রখানি সেই ঐতিহাসিক কীর্তন অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, যে কীর্তনে গঙ্গার পথে চৈতন্ত কাজির নিবেদন অগ্রাহ করিয়া সাংসকালে সমস্ত নদীয়াবাসীর বুকে অপূৰ্ণ উদ্ভাসনার ডেউ ভুলিয়া রাজপথে রওয়ানা হইয়াছিলেন।



অধিকাংশ ছবির আদর্শ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের। এই স্থানে তিন শ্রেণীর ছবির নমুনা দেওয়া হইল। প্রথম নয় খানি ছবি গত শতাব্দীতেও বাজারে দুই এক পরসায় বিক্রীত হইত। পৌরাণিক বিবরণ ও সাময়িক ঘটনা উভয় লইয়াই পটুয়ারা ছবি আঁকিত। অষ্ট শতাব্দী পূর্বের অনেক ছবি বাজারে প্রচলিত ছিল। এলোেকেশী ও মহাস্তের লইয়া একসময়ে বেশে যে উৎসবের পট্ট হইয়াছিল, তাহাতে নবীন কর্তৃক এলোেকেশীকে হত্যা, মহাস্তের খানি টানা, মহাস্তের গৃহে মূর্ত্যাপত্তা এলোেকেশীকে লইয়া যাওয়া ইত্যাদি নানা ছবি আমরা দেখিয়াছি। নূতন রেলগাড়ীর আবির্ভাব ও পটুয়াদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। বহু পূর্বে যুগের সংস্কার লইয়া পটুয়ারা কোন কোন ছবি আঁকিত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবির আদর্শগুলি বড় বড় পটুয়ারা শুধু কালি দিয়া আঁকিত। এই সকল ছবির রেখা-বিস্তারন সরল ও নবল,—অনায়াসে কোন মডেল বা আদর্শ সম্মুখে না রাখিয়া—পটুয়ারা স্বচ্ছন্দে তুলি চালাইয়া আঁকিত, উহাতে মনের ভাব যেমন অব্যক্ত হইত, তেমনই রেখাঙ্কনের প্রচুর ক্ষমতা প্রদর্শিত হইত। ৪৩০(৫) পুটার শিব, ৮৪ পুটার মনমোর এবং ৪৪৭ (জ-এ) পুটার ছবিগুলি এই শ্রেণীর। এই অঙ্কন-পদ্ধতি অতি প্রাচীন কালের সংস্কার বহন করিয়া আনিয়াছে। এই আদর্শ-ছবিগুলি পটুয়ারা কখনও অপরকে দিত না। ইহাদের নকল করিয়া মেয়েগা যে চিত্র আঁকিত, তাহাতে রং কলাইয়া সেগুলি বাজারে বিক্রয় করা হইত। এখন এই ব্যবসায় নষ্ট হওয়াতে সেই আদর্শগুলি আমরা খুব উজ্জ্বলো কিনিতে পারিয়াছি। এখন আর এই সকল ছবি অলভ্য নহে। ইহাদের অধিকাংশই নাহেবেয়া, গভর্মেন্ট আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মুকুল দে, শ্রীযুক্ত গুরুদাস দত্ত এবং আমি কিনিয়া কালীঘাটের পটুয়া-পল্লীর ভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছি। শিল্প-সমালোচকেরা এই সকল ছবির সঙ্গে অস্বাস্থ্যের রেখা সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। আমি ইহাদের আর ২৫০ শত সংগ্রহ করিয়া ত্রিপুরার রাজ-ভাণ্ডারে উপহার দিয়াছি।

তৃতীয় শ্রেণীর ছবিগুলি প্রাচীন কিন্তু বিদেশী প্রভাবে ও জার্মান প্রেসের অনুকরণে রমণী মূর্তি তুলির পশ্চাত্ত-ক্ষেত্রে কার্পেট প্রভৃতি অঙ্কিত করিয়া চিত্রগুলির সরল রেখা-সম্পদ নষ্ট করা হইয়াছে।

৪৪৭ (এ-৬) পর্যন্ত পুটার ছবিগুলির পশ্চাত্ত-ক্ষেত্রে একান্ত আড়ম্বর হইল—তাহাতে মূল ছবির মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথচ ৪৪৮ (এ) পুটার দ্বিতীয় ছবি খানি হইতে ছবির পশ্চাত্ত-ক্ষেত্রে জটিল ও হৃদয় কারকাকাবা কলাইতে বাইয়া আধুনিক চিত্র-প্রকাশকেরা বাজে লোকমিগকে লুপ্ত করিতে বাইয়া ছবিগুলির সরল সৌন্দর্য হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়াছেন ও তাহাদের গৌরব হানি করিয়াছেন। এই পরিবর্তিত আকারে ইহাদের কোন কোন খানি এখনও কলিকাতার বাজারে পাওয়া যায়।





হিন্দু কল্যাণ



প্রার্থনা

এইরূপ চিত্র বঙ্গদেশে আরও দুই একখানি আছে। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বাহিরেও বাঙ্গলায় অনেক ছবি আছে, তাহাতে প্রাচীন মাগধী ধারার প্রবাহ যে অব্যাহত-ভাবে চলিয়া আসিয়াছে তাহা টের পাওয়া যায়। মহেন্দ্রগিরিতে খ্রীলোকদের নানা ভঙ্গী দৃষ্ট হয়, এত প্রাচীনকালেও ভারতীয় শিল্পকারের রমণী-অবয়বের লাভণ্যময় গতিশীলতা লক্ষ্য করিবার যে চক্ষু ফুটিয়াছিল ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। আমরা খেজুরাহ মন্দিরে একরূপ বহু রমণীমূর্তি পাইয়াছি, মন্দিরের এক একটা অপ্রশস্ত অবকাশ শিল্পীর নব নব উদ্ভাবিত চারুকলার সৌন্দর্য্য দিয়া পূরণ করিবার জন্ত এই সকল অপূর্ণ নরনারী-চিত্রের পরিকল্পনা হইয়াছিল। আঙ্গুলের ভঙ্গী, পাড়াইবার, বসিবার, কথা কহিবার, চামর চুলাইবার, মন্দিরা বাজাইবার, কুল ও ফাগ ছড়াইবার, নৈবেদ্য লইয়া পথে চলিবার, ব্যজনসম্বলনের ও বিরহের কষ্ট প্রকাশ করিবার, বৃক্ষের আড়ালে বাইরা—জলে নিমজ্জিত হইয়া নিজে লুকাইবার, বৃক্ষে আরোহণের ছলে নিজের দেহের নগ্নতা ঢাকিবার, মান করিয়া বসিয়া থাকিবার—এইরূপ শত শত ভঙ্গীতে সুন্দরী রমণীরা যে কত বেশী সুন্দরী হইয়া উঠেন তাহা খেজুরাহ, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি নানা স্থানের মন্দিরে দেখা যায়। অজস্রাও অমরাবতীর চিত্রও অকুরন্ত।

বাঙ্গলায় এইভাবে চিত্র অনেক আছে, লোপ পাইতে বসিয়াও এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, এমন ধারা বহু চিত্র আমাদের প্রাচীন কলা-লক্ষীর শিল্পশালায় পাওয়া যাইতে পারে। এই ছবিগুলি যে খুব সুন্দর তাহা বলিব না, যেহেতু ইহাদের অপেক্ষা অনেকগুলি সুন্দর ছবি কাঠের উপরে আঁকা আমি নিজেই দেখিয়াছি। এগুলি সমস্তই আমার বাড়ীর চিত্রশালায় রক্ষিত, এজন্ত ফটোগ্রাফ দেওয়ার সুবিধা পাইয়াছি। তিনশত বৎসরের প্রাচীন সংগ্রামসিংহের সময়ের একটি কাঠের পুতুলের ছবি আমরা এখানে দিলাম।

শাক্ত ছবি এদেশে অনেক ছিল, এখনও খোঁজ করিলে কতকটা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রতিদিন অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইতেছে। আমি অনেকগুলি দেবীযুদ্ধের ছবি কাঠে উৎকীর্ণ অবস্থায় পাইয়াছি—সেগুলি হইশত বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিককালের প্রাচীন। তাহা হইতে দুই একটি চিত্রের প্রতিলিপি এখানে দিতেছি। এইসকল ছবিতে দেবীর শক্তিমত্তা চিত্রকারক কিরূপ সাহসিকতার সহিত উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার আভাস পাওয়া যায়।

বাঙ্গলার চিত্রকর সব জিনিষ নিজের অতি সরিকটে আনিয়া দর্শন করেন, তিনি একেবারে দৃষ্টগুলির মধ্যে দ্বয়ং ঢুকিয়া পড়েন। এইজন্য তিনি কালীবাটের ছবি। হাসিকানায় বেক্রপ তাহার সৃষ্ট ব্যক্তিগুলির সঙ্গে যোগ দিতে পারেন তেমনই তিনি পরিহাস-রসিকতার ওস্তাদ। ১০০-১৫০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী চিত্রকর সামাজিক বিষয়ের ছবি আঁকিতেন, তাহাতে এই পরিহাস-রস থাকিত। কিন্তু চিত্রকরেরা প্রায়ই নিরশ্রেনীর লোক; এই কারণে ছবিগুলি খুব দরের হইত না, তথাপি এগুলি বাঙ্গলার পল্লীর অশিক্ষিত শতশত নরনারীর উপভোগ্য ছিল এবং এই চিত্রগুলি সমাজের



চাবুকস্বরূপ নৈতিক নেত্রোন্মীলনের সহায়তা করিত। একখানি পত্র বেরূপ কথা কহে, একখানি ছবিও সেরূপ কথা বলিতে পারে। লেখকের সঙ্গে বেরূপ অক্ষরের পরিচয়, চিত্রকরের সঙ্গে যদি রেখার পরিচয় তেমনই হয়, তবে রেখার সঙ্গে তে তিনি অনায়াসে একটা ভাব জীবন্ত অক্ষরের মত ছুটাইয়া তুলিতে পারেন। কালীঘাটের একটি ছবিতে দৃষ্ট হয়—স্ত্রীর হাতে বালা-চুড়ি নাই, কাণে মাকড়ি নাই, গলায় হার নাই, পায়ে মল নাই—সেগুলি কোথায় গিয়াছে? বাবুটির নিজ বেশভূষার বাহার ও কৌচার বলনী দেখিলেই স্পষ্ট বোঝা যাইবে—কোন নিরয়ের জন্ত সে স্ত্রীর সমস্ত গহনাপত্র কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে নিরাভরণা করিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সে ফান্ত হয় নাই, পুনশ্চ সাজগোজ করিয়া সেই অভিশপ্ত পথের দিকে রওয়ানা হইয়াছে। সর্ব্ব্ব-হারী স্ত্রী সমস্ত গহনা নিজহাতে খুলিয়া স্বামীকে দিয়াছেন, কিন্তু সে যে আবার পাপপথের পথিক হইবে, ইহা সহ করিতে পারিতেছেন না। এজন্ত নগ্ন হাত দুটি দিয়া স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়াছেন। এই ছবির প্রধান গুণ—শিল্পের সৌন্দর্য্য নহে, ছবিহিসাবে ইহার দর সামান্য, কিন্তু রেখা দিয়া যে কথা কহা যায় শিল্পের সেই উচ্চাঙ্গের শক্তিটি চিত্রকরের ছিল।

কালীঘাটের আদর্শ বাঁটি বাদলার চিত্রাদর্শ নহে, যুরোপীয় ভাবে প্রাচীন আদর্শ কতকটা রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু চিত্রকরদের মধ্যে কাহারও কাহারও অসামান্য গুণপনা ছিল। ছবিগুলির মডেল কালীঘাটের কারিগরেরা তৈরী করিত। একটা কাগজে সেই খসড়া কালীতে আঁকা হইত। মেয়েরা সেই খসড়া অনুযায়ী ছবি আঁকিত, এবং তিন চারজন একত্র হইয়া রঙ্গের কাজে লাগিয়া যাইত। চার পাঁচটা খুরিতে ভিন্ন ভিন্ন রং গোলা থাকিত, এবং একটি মেয়ে একটি মাত্র রঙ সেই ছবিখানিতে দিয়া যাইত। খসড়ার অনুযায়ী শত শত ছবি আঁকিয়া যেহেঁরা কেহ সাদা, কেহ লাল, কেহ নীল এইভাবে যার যার নির্দিষ্ট রং ছবিখানিতে দিয়া যাইত। এইভাবে চার পাঁচটি মেয়ে একসঙ্গে বসিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে দুই তিন শত ছবির সমস্ত রঙ্গের কাজ শেষ করিয়া ফেলিত। কোন কোন সময়ে মেয়েরাও খসড়া বা আদর্শ আঁকিত। বাজারে যে মাটির পুতুল বিক্রয় হয় তাহাও এইভাবে ৪৫ জন মেয়ে এক এক বাড়ীতে প্রস্তুত করিয়া থাকে, বেরূপ ফিপ্রহণ্ডে এই ছবি এবং পুতুল প্রস্তুত হয় তাহা আশ্চর্য্য। বাগবাজারে কুমারটুলিতে এখনও এই পদ্ধতিতে রংএর কাজ হয়।

১০০ বৎসর পূর্ব্বের কালীঘাটের চিত্রে বিলাতী অঙ্কন স্পষ্ট,—তাহার শিল্পীতি দোষাবহ ও টেকনিক অসম্পূর্ণ। কিন্তু মাঝে মাঝে ভারতীয় চিত্রের ভাষা শিল্পী স্বাভাবিক ও বংশগত প্রতিভায় আয়ত্ত করিয়া ফেলিত।

বাহার ছবির খসড়া তৈরী করিত, তাহাদের ক্ষমতা অল্প। তাহাদের বহু-পুরুষাগত চিত্রবিজ্ঞার সংস্কার মজ্জার মধ্যে নিহিত ছিল। কোন নৈসর্গিক উৎস হইতে অবিরত জলধারার জায় সেই পূর্ব্বসংস্কার হইতে তাহাদের এমন অল্প উদ্ভাবনী শক্তি জন্মিত যে তাহাদিগকে কোন মডেলের সাহায্য লইতে হইত না। কোন কুকুর, বিড়াল, নর, নারী, বৃক্ষ



বালগোপাল, ফরিদপুর, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।



কুশাবন, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ—শান্তিপুর।



মাতৃভাব, এখানে আশ্চর্যভাবে ফুটিয়াছে। গাভী বৎসকে স্তন্য দান করিতেছে, অপর দিকে ঘোহনকারিনীর শিশু তাঁহার স্তনে মুখ দিয়াছে। গাভী ও জননীতে মাতৃভাব একরূপেই ফুটিয়াছে। “যা বেবী সৰ্বভূতেষু মাতৃরূপেন বিজতে।” পশু পক্ষীও মানবে মাতৃভাবের মহিমা একরূপ। পট্টয়ার আঁকা এই ছবি শ্রীযুক্ত অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রবাসীতে ছাপাইয়াছিলেন—তাঁহার অনুমতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।



করিবপুর, মাতৃমূর্তি—শিশু এক হস্তে মাতার স্তন আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, অপর হস্তে আর একটি স্তন খুঁজিতেছে।



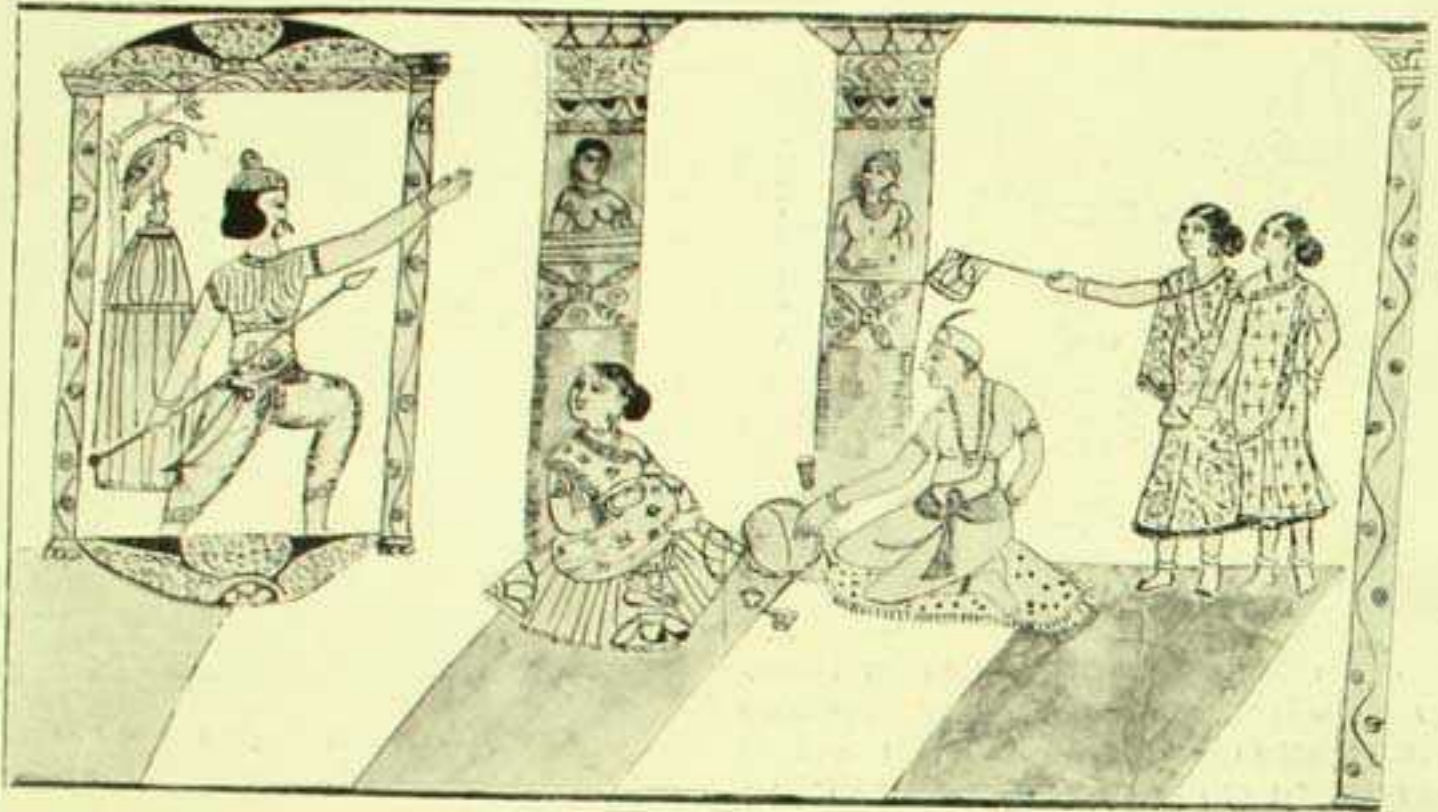
মাতৃমূর্তি আলেকজেন্দ্রিয়ার আইসিস মূর্তি। স্তন্যদান ইহাতে মাতৃভাব বেশ ফুটিয়াছে।



মাতৃমূর্তি, চীনদেশীয় কুয়ান য়িনি (৩৫১ পৃঃ)।



মাতৃমূর্তি—কালীঘাট।



লক্ষণ সেন।

নবমবর্ষ বয়সে চিত্রকর পুষ্পেন্দ্র সেন কর্তৃক পরিকল্পিত ও অঙ্কিত।
মন্দিরচূড়ে শকুনি ভাবী অমঙ্গলের সূচনা করিতেছে। "মহারাজ, ইহারা অধবিক্রোশ নহে—ডাকাত" (৫৪২ পৃঃ)।



বাবর (৩৩৪ পৃঃ)।



আকবর (৮২১ পৃঃ)।



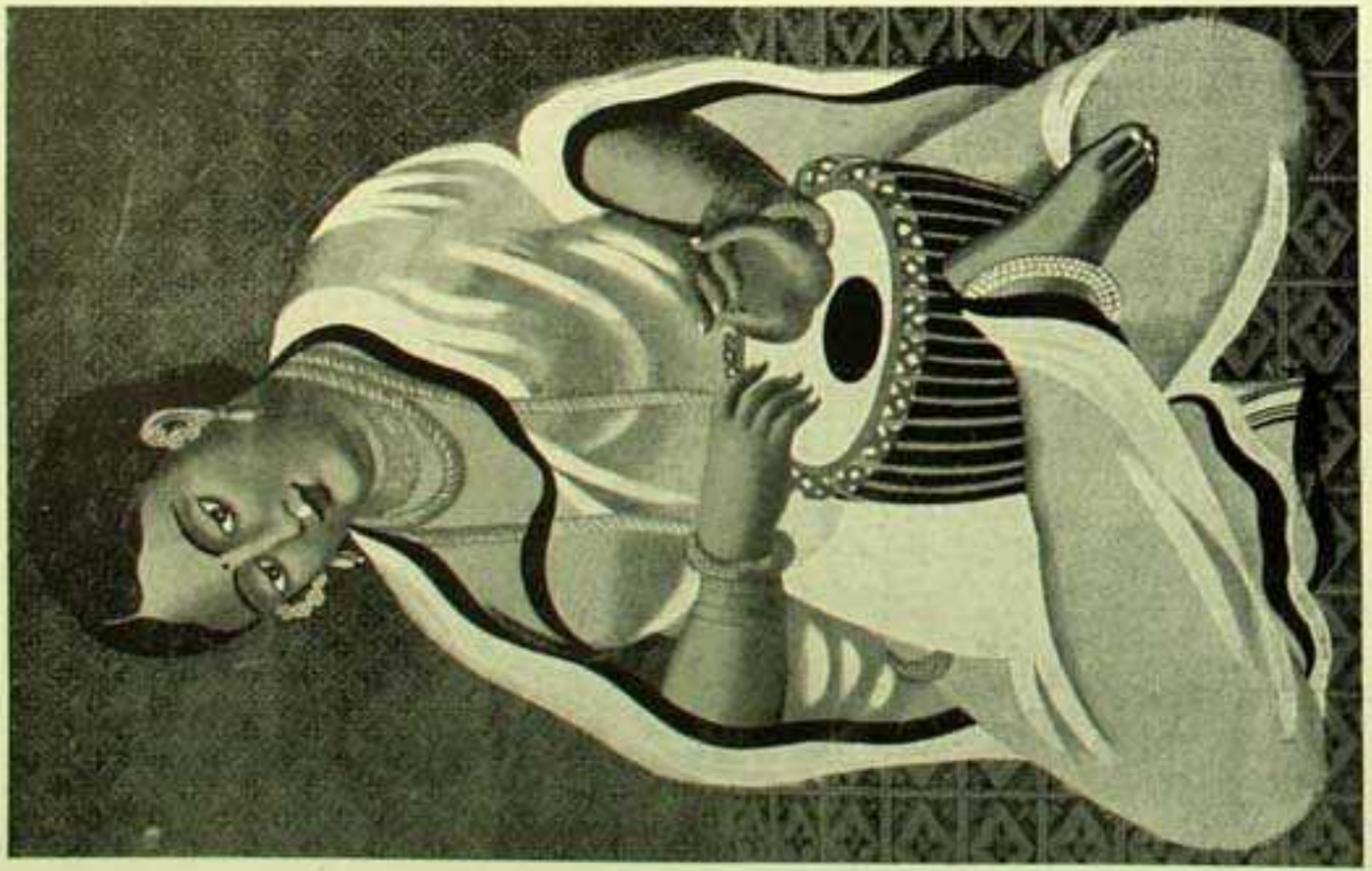
মোহন প্রাচীন কাল



মোহন প্রাচীন কাল



কালিঘ



কালিঘ



বীণা বাদিকা



নারিকী

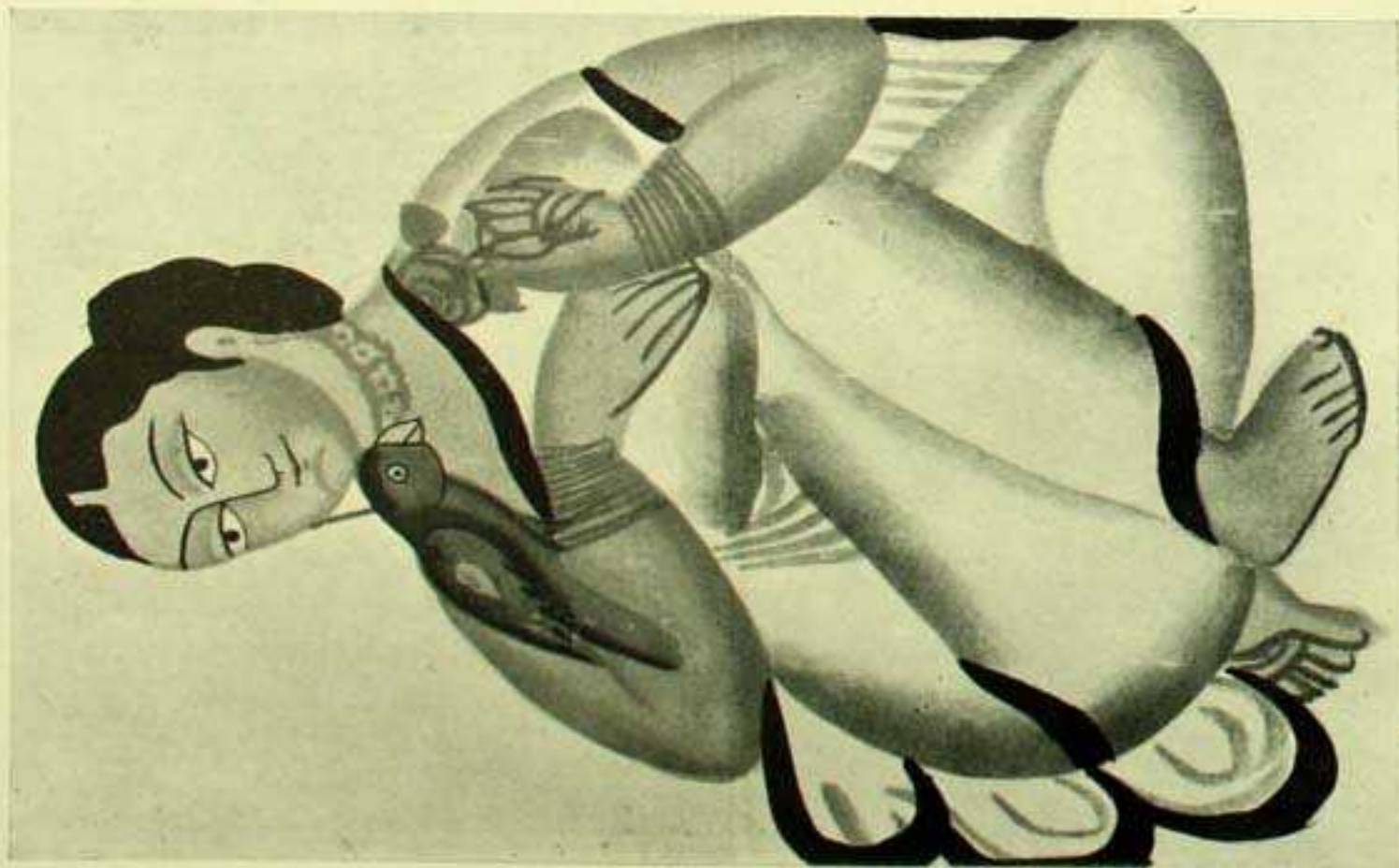


নৃত্য





বৈক্য বাজ-চিত্র ।





নাটিকা



হেড়া-খাননি।

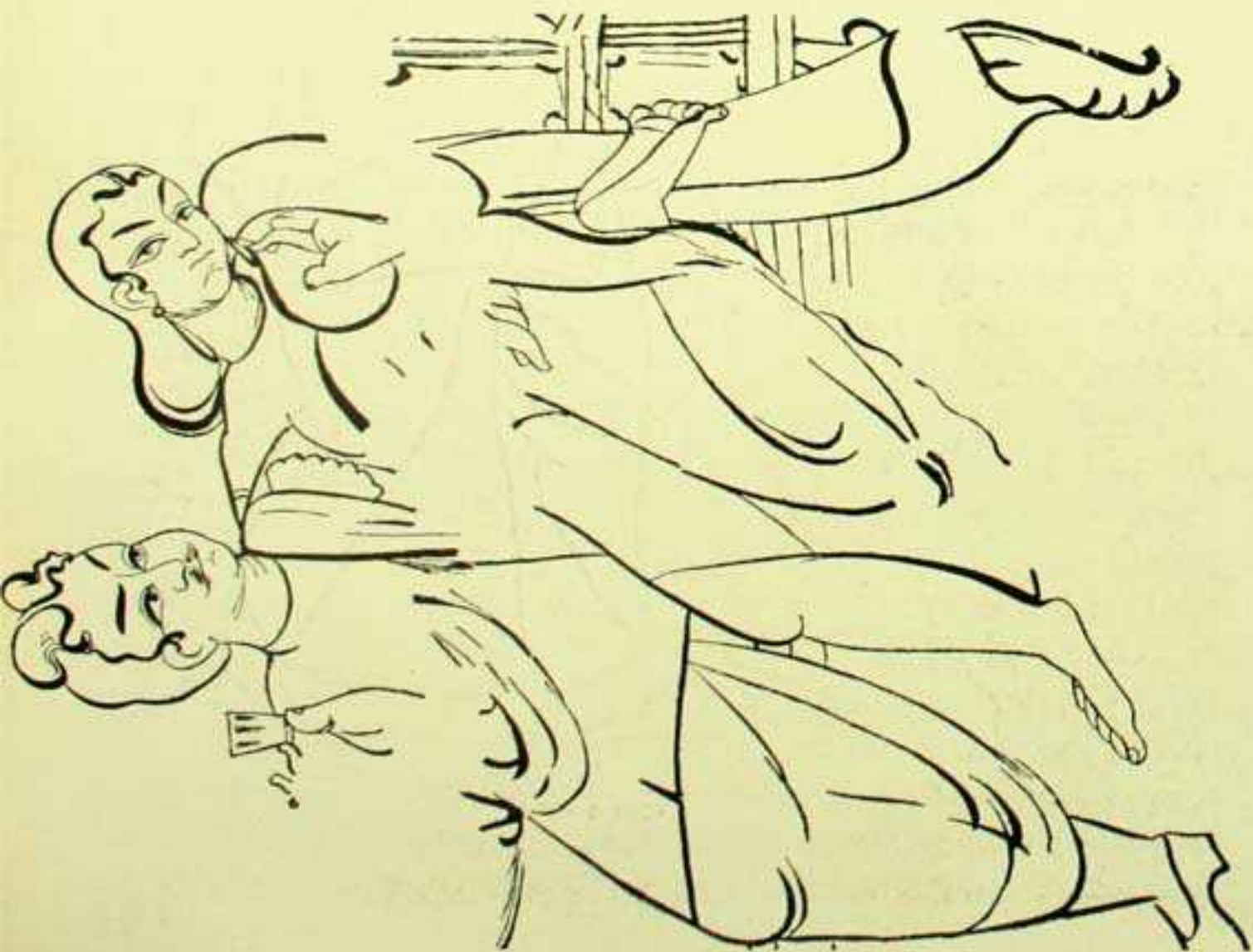
আদর্শ ছবি



নারক ও নারিক।



পদী।



নরিক ও নরিকা।

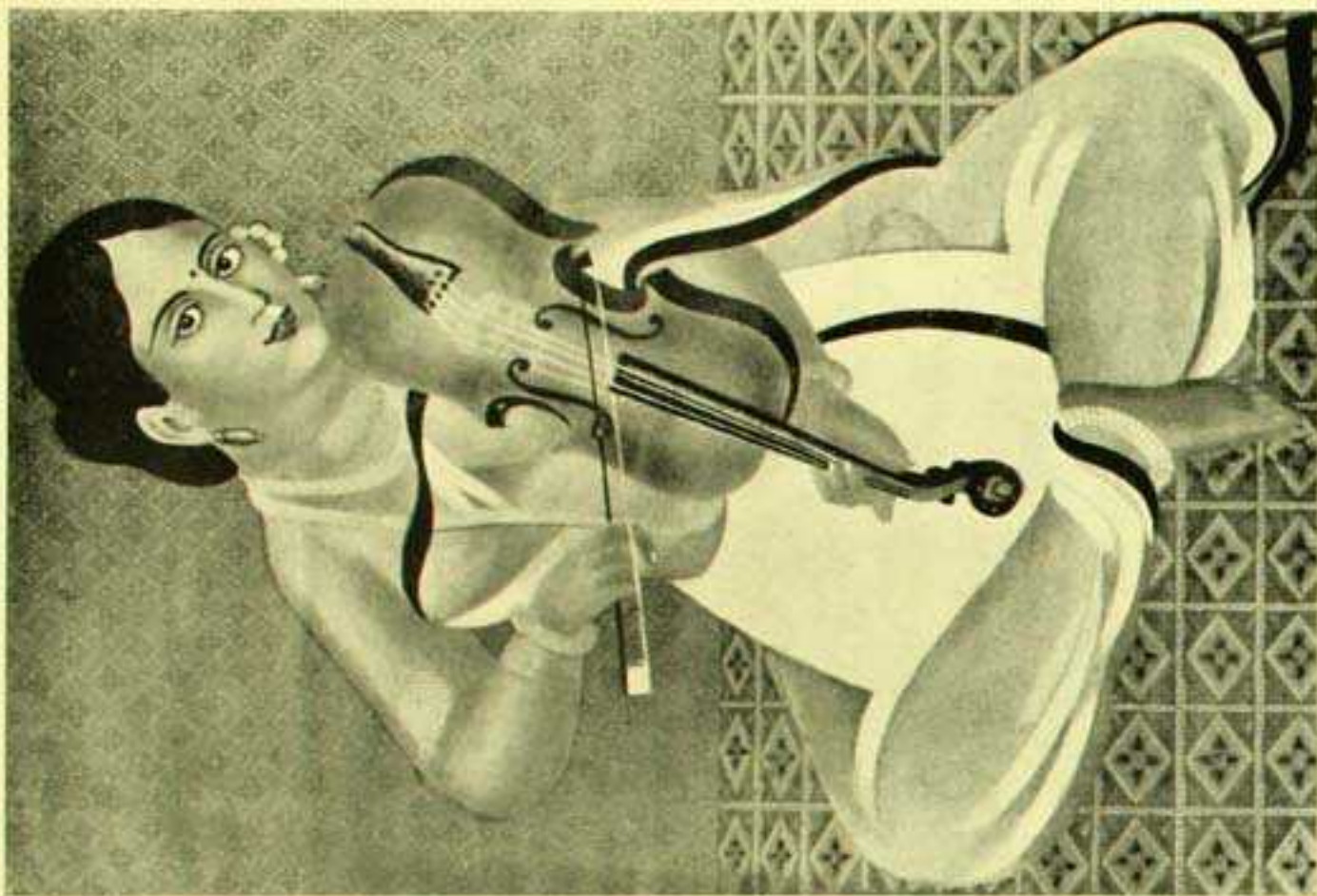


পরী

বিদেশী প্রভাবে প্রাচীন ছবির পশ্চাতে কার্পেট অঙ্কন।



চল ছবিগানে



বেহালা বাদিকা



তানবুঁট সেবিনী

সামনে রাখিয়া তাহারা নকল করে নাই। কেবল একটা কালো রংএর তুলি অবলীলাক্রমে টানিয়া তাহারা জীব ও উদ্ভিদ-জগতের সমস্ত ভঙ্গী, সমস্ত ভাব, এক আঁচড়ে আঁকিয়া ফেলিত। এই ক্ষমতা অতি আশ্চর্য। ছবিগুলি দেখিলে মনে হয়, যে পর্যন্ত তুলিতে কালি থাকে, সেই সময়টুকুর মধ্যে তাহারা এক একখানি ছবি আঁকিয়া ফেলিতে পারিত। তুলিটির একখানি ছবি আঁকিবার জন্য দুইবার কালি গ্রহণ করিতে হইত না। তাহারা সময় ও উপকরণ সঞ্চয়ে এত মিতব্যয়ী যে তাহাদের উপাদান ত একটু কাগজ, একটা তুলি আর একটুখানি কালি, কিন্তু সেই কালিটুকুর একবিন্দুও তাহারা অপব্যয় করে না, মেয়েদের শাড়ী আঁকিতে যাইয়া কালো পাড়টি মাত্র আঁকিয়া দেখায়; বাকী অংশে সামান্য সামান্য আবছায়া গোছের একটু তুলির দাগ ফেলিয়া কাপড়ের ভাজগুলি দেখায়, অনেকস্থলেই মেয়েদের বিচিত্র ভঙ্গী।

কাগজের স্বাভাবিক সাদা রং বজায় রাখিয়া শাড়ীর জমি দেখাইয়া থাকে। মেয়েদের বসিবার, দাঁড়াইবার, চুল আঁচড়াইবার, আয়নার মুখ দেখিবার, বেহালা-সেতার বাজাইবার, নাচিবার প্রভৃতি কত যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভঙ্গী ইহারা মডেলের সাহায্য না লইয়া অবলীলাক্রমে আঁকিয়া যাইত, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ছবিগুলি ঠিক এখনকার বৈজ্ঞানিক আদর্শের অনুযায়ী হয় নাই। টেকনিকের তুল এই ছবিগুলিতে বাহির করা হয় ত শক্ত নহে; তাহারা মাপকাঠি অথবা মডেল সামনে করিয়া বসিত না, কিন্তু চিত্রের যাহা শ্রেষ্ঠ গুণ তাহা কোন কোন ছবিতে থাকিত। টেকনিক শিখিয়া লইতে মানুষের কতদিন লাগে? কালিদাসের কবিতা নকল করিতে যাইয়া যদি তাহাতে দুই একটি বর্ণাশুদ্ধি থাকে তবেই কি কালিদাস মাটি হইয়া বাইবেন? কালিদাসের মতন কবি হওয়াই শক্ত এবং মস্ত বড় ভাঙ্গা, বর্ণাশুদ্ধির জন্য তাঁহা কবিতাকে অগ্রাহ করা বাতুলতা-মাত্র। সে আমলে ভারতবর্ষে টেকনিকের উপর কেহ কোন জোর দিত না। কবিতা ও শিল্পকলার প্রাণ—মহান্ ও সুন্দরকে প্রতিফলিত করা। এখানে শতাব্দিক বংশের পূর্বের একটি মহাদেবের মডেল দিতেছি। এই ছবিখানি ইংরেজী, মুসলমানী, রাজপুত কি কাদুরা—কোন কলমের দ্বারা খসে না। ইহা বাঙ্গলার চিত্র-প্রাসাদবাসী রাজচক্রবর্তীর ছবি; শুধু কালির টানে মুহূর্তমাত্রে হস্ত চিত্রকর ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু ইহার প্রত্যেক কালির রেখায় হিন্দুর চিত্তস্থান আদর্শমূর্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। বুধটি ঠিক বুধের মতন হয় নাই ইত্যাদি রকমের অসার ও অকিঞ্চিৎকর মন্তব্য তাহারা প্রকাশ করিবেন, তাহাদের সেই সমালোচনার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া ততক্ষণ মহান্ ও সুন্দরকে দেখিয়া আমরা চক্ষু জুড়াইয়া লইব। শুধু কালির টানে একি অদ্ভুত মহেশ্বর—একি অদ্ভুত বুধ অঙ্কিত হইয়াছে। কতকগুলি রেখা চিত্রকর আপন মনে আঁকিয়া গিয়াছেন; তাহার কতকগুলি একেবারে অর্ধশূন্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সমস্ত চিত্রপটটির তাহারা কি পূর্ণতাই না দিয়াছে। মানুষ ও দেবতার কোথায় তফাত তাহা এই ছবিখানি দেখিলেই বুঝা যাইবে। এই দেবতা যে মানুষ নহেন, কোন উচ্চলোকবাসী, তাহা শিশুও বুঝিতে পারিবে। এই ভাবের অনেকগুলি প্রাচীন ছবি আমি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহারা প্রায়ই একশত সোয়ানত বংশের প্রাচীন, কিন্তু ছবি আঁকার

তারিখ দিয়া ছবির বয়ঃক্রম নির্ণয় করা উচিত নহে, ইহা শত শত বৎসর পূর্বেরকার হিন্দুর ধারণা, পটুয়ারা পুরুষানুক্রমে এ ধারণা উত্তরাধিকারস্বত্রে পাইয়াছে। শিবমূর্তিটি “রজতগিরি-সঙ্কশং” “নিবাস্ত-নিহস্পামিব প্রদীপং” “চাক্ৰচন্দ্রাবতংশং” প্রভৃতি ধ্যানের মার নিংড়াইয়া লইয়া যেন সেই দেক-উপাদানে রচিত হইয়াছে।

এই চিত্রগুলির মধ্যে পরীটির প্রতি লক্ষ্য করুন, উর্কে উঠিবার ভঙ্গী, সেই চেষ্টায় শাড়ীর এলোমেলো ভাব, সমস্ত অবয়বের লীলাচকল মহিমা ও তরঙ্গারিত অঞ্চল কেমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, ইহাদিগের সমস্ত গুণবৈশিষ্ট্য আলোচনা করিবার স্থান নাই। নমুনা যাহা দিলাম তাহা ঠিক ছবিগুলির অমুরূপ হইল না এই আশঙ্কা।

আমরা পল্লীগীতি ও গীতিকথা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি এখানে তাহাই ফিরিয়া উল্লেখ করিব—এই নিরশ্রেষ্ট কবি ও চিত্রকরদের আশ্চর্য্য সংঘম ও ধৈর্য্য। গুপ্ত-যুগের কবিদেরও এসম্বন্ধে একটু খলন আছে, কালিদাসও তাহা হইতে বাদ বাইবেন না, প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যগুলির তো কথাই নাই, সর্বত্র শীলতার অভাব। কবিগণ তাঁহাদের মীনকেতনের রথ নির্ঝিঁচারে বেখানে সেখানে চলাইয়াছেন। ভারতজন্মে এই কুরুচি উৎকট হইয়া উঠিয়াছে, রামপ্রসাদের কায় সাধকও সেই অভিযোগ হইতে নিরুত্তি পাইবেন না। কবিকল্প আদিরসে ডুবিয়া বান নাই, তথাপি বহু জায়গায় শীলতা অতিক্রম করিয়াছেন। বৈষ্ণব-পদরূপ পঞ্চজ আদিরসের পাঁকেই জন্মিয়াছে। পল্লীগীতিকাগুলির প্রায় সবগুলিই প্রেমসম্পর্কিত, নায়ক-নায়িকার বহু অবস্থা কবিরা বর্ণনা করিয়াছেন, এক একস্থানে তাঁহাদের বর্ণনা অম্লীলের সমীপবর্তী হইয়াছে, মনে হইয়াছে “এই বে। ছেলেদের কাছে আর পড়া চলিবে না;” কিন্তু পরক্ষণেই দেখা বাইবে কবি আশ্চর্য্য সংঘমের সঙ্গে লেখনীর গতি ফিরাইয়া লইয়াছেন। এই উজানের সর্বত্র একটা স্বতঃসিদ্ধ স্মৃতির হাওয়া বহিয়া বাইতেছে। ছবিগুলি সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা বাইতে পারে।

এখানে দুইটি চিত্র দেওয়া বাইতেছে। প্রথমটি শিব-অরুণার। এখানে শিবের কটি হইতে বাঘছাল খসিয়া পড়িতেছে। এই শিব ত্রৈলোক্যস্বামী, দিগদ্বর জৈন তীর্থঙ্কর প্রভৃতি ভারতীয় সাধুগণের ভাব লইয়া গড়া। বোগিগণের শ্রেষ্ঠ দেবাদিদেবের এই ছবি। লৌকিক সংসারে শিব ভোলানাথ। তিনি ভাবের রাজ্যে থাকেন, ভাবের উজ্জ্বাস একটু হইলে তাঁহার কটি হইতে বাঘছাল খসিয়া পড়ে, ভোলানাথের এইরূপ ভুল পদে পদে। বিবাহের আসরে পিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া একবার তিনি এইভাবে নম্র হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন মেনকারাণী লজ্জায় পলাইয়া গিয়াছিলেন এবং এযোগণ প্রদীপ নিবাইয়া বাঁচিয়াছিলেন। এই প্রাচীন চিত্রপটের শিবের মূর্তি সেই ভোলানাথের। ইহাতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের কিছুই নাই। বাঙ্গালীরা ঠাকুর-দেবতাদিগকে নিজ অন্তরঙ্গের মত করিয়া লইয়া থাকেন। তাঁহারা কখনই দৈব ঐশ্বর্য্যের পক্ষপাতী নহেন, মাধুর্য্যসই তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করে। তাঁহারা এখানে বুড়ো শিবকে লইয়া একটু ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ঠাকুরদাদাকে লইয়া নাতি বেক্ষণ ঠাট্টাবিজ্ঞপের একটু অবকাশ পাইলে ছাড়ে না, এই ব্যঙ্গরসও সেইরূপ। এখানে শীলতার কথা

একেবারে উঠিতেই পারে না। এই ছবির সঙ্গে গ্রীকদিগের কোন কোন উলঙ্গ বীরপুরুষের ছবি তুলনা করা যাইতে পারে। তথ্যও উলঙ্গতা আদৌ কুরুচির পরিচায়ক নহে; কিন্তু গ্রীকশিল্পীর পূর্ণগঠিত মাতৃস্বের দেহসৌষ্ঠব দেখানই উদ্দেশ্য, এই হিসাবে সেই মূর্তির বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে। ইহার মাথু ও মাংসপেশীর এবং গঠনের টেকনিক অনেকটা নিখুঁত। কিন্তু শিবের নগ্নতা আদৌ দৈহিক কোন ভাব নির্দেশ করে না, উহা বাহ্য জগতের প্রতি পরম উপেক্ষাত্বক—এই নগ্নতা বোগিজনোচিত ভাবপ্রবণতা ও সম্পূর্ণ উদাসীনতার পরিচায়ক। গ্রীক ও ভারতীয় রীতির পার্থক্য এইখানে—এক জাতির লক্ষ্য বাহ্য জগতের প্রতি, অপরের লক্ষ্য অন্তর্জগতে।

দ্বিতীয় চিত্রখানি মাতৃমূর্তি। ইহা হিন্দু ধর্মের ভক্তি ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ, মাতা শিশুকে স্তন্য দিতেছেন। এখনকার চিত্রকরেরা অতি সরু শাড়ীর আড়াল হইতে নানারূপ বিস্ত্রী ইন্দ্রিত সুস্পষ্ট করিয়া স্তনযুগল বেক্ষণ অস্পষ্টভাবে দেখাইয়া থাকেন, তাহা অশ্লাল। সেই সকল ‘স্কচিপূর্ণ’ সমালোচক হইতে এই মাতৃমূর্তিসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিবেন তাহা করনা করিতেও আমাদের ঘৃণা হয়। অজ্ঞাত দেশেও মাতৃমূর্তি কতকটা এই ভাবের আছে, ছইখানি বিদেশী চিত্র পাশাপাশি রাখিয়া দেখাইতেছি। বাঙ্গালীর চিত্রে মাতা ও শিশুর প্রকৃতিতে যে অন্তর্ভুক্তি আছে, অপর ছই ছবিতে তাহা নাই। সেই ছই মূর্তিতে মাতা শিশুকে যে ভাবে ধরিয়াছেন সে ভাবে একখানি বই বা অস্ত্র কোন সামগ্রীকেও ধরিতে পারিতেন। আলেকজেন্দ্রিয়ার আইশিস্ এবং হোরাস্ মূর্তিতে মাতার মুখে সম্পূর্ণ ভাবের অভাব এবং ছেলের সম্পূর্ণ নিদ্রার ভাব; ইহাদের কাহারও মুখে-চোখে কোন ভাবই ফুটিয়া উঠে নাই। চীনদেশীয় কুয়ান ইসির (Kuan Yisi) মূর্তি বৌদ্ধ শাস্তি প্রকট করিতেছে—উহাতে মাতৃস্বের কিছুই নাই। (এইচ. জি. ওয়েলসের The Outline of Historyর ৩৮২ এবং ৩৯৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহাদের সান্নিধ্যে বাঙ্গালীর চিত্র কত বেশী মূল্যের তাহা সহজেই অহুমের; শিশুর ও মাতার ভাব—একেবারে মূর্তিকে দেবমন্দিরে স্থাপনের যোগ্য করিয়াছে। মাতার মুকুটের সহিত মুখাবয়ব এবং বালকের নিবিড়ভাবে মাতৃস্তন্যধারণের মধ্যে বাৎসল্যের গূঢ় সৌন্দর্য্য প্রকটিত। জুংখের বিষয় কাষ্ঠনির্মিত এই অল্পমাত্র মাতৃপ্রতিমার ছবিটি ভাল হয় নাই।

দুরাগত বংশীরব বেক্ষণ মধুর, অজস্রতা, অমরাবতী প্রকৃতির সময় হইতে সমস্ত মগধ শিল্পের এই যে প্রতিধ্বনি বাঙ্গলার কুটিরে আমরা পাইতেছি তাহাও তেমনি মধুর। বাঙ্গালী মগধ দেশের সংস্কার বজায় রাখিয়াছে, ইহাই তাহার বাহাজুরী। তাহাদের শিকাদীক্ষা কলা-শিল্পে সর্বত্রই সেই প্রতিধ্বনিটি পাওয়া যায়। প্রাচীন চিত্রবিজ্ঞান ভগ্নাবশেষ হঠাৎ বাঙ্গলার পল্লীর নানাহানে এখনও কুড়াইয়া পাওয়া যায়, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

কালীবাটের পটুয়াদের চিত্রের বিলাতী গিল্টি কিরূপ বেখাপ্পা হইয়াছে তাহা কতকগুলি চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে। এই চিত্রবৃহৎ মধ্যে একটি রমনী সেতার বাজাইতেছেন, দ্বিতীয় চিত্রে একটি মেয়ে চুল আঁচড়াইতেছেন। আশ্মান প্রেস হইতে এই বাঙ্গালীর ছবিগুলি ছাপাইয়া লইবার সময় আধুনিক শিল্পবিশারদেরা তাহার কি উন্নতি করিয়াছেন

তাহা কয়েকটি চিত্রে ধরা পড়িবে। কি সরল, অকুতোভয়, নিশ্চিত, বলদৃপ্ত তুলিতে মূল ছবিখানি আঁকা হইয়াছে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু জাখান প্রেস হইতে ইহার যে চালচিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে শিশু ডুলাইবার কতকগুলি ফুল-আঁকা কারুকার্য ও সত্তরকির মত পরিবেষ্টনী দিয়া আদত ছবিখানির গর্ভিত ভঙ্গীর অবমাননা করা হইয়াছে। এই বর্তমান যুগের চালচিত্র আদৌ মূল চিত্রের সহিত মানানসই হয় নাই।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আখ্যাবর্তের নানাত্বানে এমন সকল চিত্রকর ছিলেন, যাহাদের অঙ্কনশক্তি বিদেশীয়গণেরও প্রজ্ঞা এবং বিশ্বয় উৎপাদন করিত। আরাজীবের প্রাসাদের শ্রেষ্ঠ ভিষক্ ভিনিস্গাসী এম. ম্যানোচি লিখিয়াছেন, “জাহাঙ্গীরের সময়ে ভারতবাসীদের মধ্যে ও ছোট ছোট রাজ্যগুলিতে একরূপ সকল চিত্রকর ছিলেন যাহারা যুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি এমন সর্বাঙ্গসুন্দর নকল করিতে পারিতেন যাহাতে কোন্টি আসল কোন্টি নকল তাহা নির্ণয় করা সাধারণ বিচারকের সাধ্য হইত না।” ভারতীয় বিষয় লইয়া যে সকল মৌলিক চিত্র অঙ্কিত হইত তাহা তাহাদের অনধিগম্য ছিল, একজ্ঞ সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই লেখেন নাই।

“There were painters in his time amongst the Indians and in the Native States of the country who copied from our finest pieces of Europe so exactly that one must be a nice judge to distinguish their hand from the original.” (p. 291.)

—General History of the Mugal Empire by F. F. Catron.

এই অধ্যায় বড় হইয়া গেল সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য অনেক থাকিলেও সেগুলি লইয়া আর আলোচনা করিবার অবকাশ হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালার নৃত্যকলা

বাঙ্গালীর নৃত্য : ভারত ঋষি নানারূপ হিন্দু নৃত্যের উল্লেখ করিয়াছেন। শিবতাণ্ডবই তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই শিবতাণ্ডবের অনেকগুলি নৃতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে পাওয়া যাইতেছে। তাহাতে শিবের এক পা উঁচু ও হাতগুলির দ্বারা তাল রক্ষার ভঙ্গী যে ভাবে দেখান হইয়াছে, দক্ষিণাত্য হইতে উদয়শঙ্কর তাহা শিখিয়া আসিয়া বিলাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। এই সকল নৃত্যের অনেকগুলিই বাঙ্গালার পরীতে কথঞ্চিৎ রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত ইহার উৎসাহ দিয়া দেশের মহা উপকার

করিয়াছেন। তাঁহার মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট না হইলে অন্ধকারের মধ্যেই এই প্রাচীন নৃত্যধারা বিলুপ্ত হইয়া বাইত। এ সম্বন্ধে তিনি আমাকে বাহা বলিয়াছেন তাহা এই :—

“বীরভূমে বাৎসরিক মেলা উপলক্ষে আমি দেশীয় ভদ্রলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ‘এখানে স্থানীয় আমোদপ্রমোদ কিছু আছে কি না।’ তাঁহারা বলিলেন, ‘আমোদপ্রমোদের আর কি ছাই থাকিবে, তবে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা (বেনীর ভাগ মুসলমান) ‘রাইবেশে’ নাচিয়া থাকে, তাহা ভদ্রলোকের দেখিবার যোগ্য নহে।’

“আমি তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে বলিলাম, মেলার কর্তৃপক্ষীয়েরা বেন কতকটা অবজ্ঞার সহিত আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। উৎসব আরম্ভ হইল। দর্শকগণের মধ্যে
রায়বেশে।

কয়েকজন উচ্চ রাজকর্মচারী সাহেব ছিলেন। তাহা ছাড়া সবজঙ্গ, ডেপুটি, মুন্সেফ, শিক্ষক, জমিদার ও সাধারণ বহুলোকের একটা জনতা হইয়াছিল। উৎসব-তালিকায় অনেক রকম আমোদপ্রমোদের বিষয় ছিল; তন্মধ্যে ‘রাইবেশে’ নৃত্য অত্যন্ত। আমি হঠাৎ দেখিলাম দূর হইতে ২৫০ জন লোক অপরূপ ভঙ্গীতে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া আসিতেছে। তাহাদের হাতে বর্শা নাই, কিন্তু তাহারা হস্তের ভঙ্গীতে বর্শাক্ষেপের অভিনয় করিতেছে। কোন স্থানে শত্রুপক্ষের সঙ্গে বাহযুদ্ধ, খজোর যুদ্ধ, বর্শ-চর্মদ্বারা প্রহার-নিবারণের চেষ্টা—এ সমস্তই শূন্য হস্তের ভাবভঙ্গীতে বেন জীবন্ত করিয়া দেখাইতেছে। শুধু হস্তপদের ভঙ্গী নহে, তাহাদের মুখভঙ্গী অদ্ভুত, কোথায়ও মৃত্যুকালীন যন্ত্রণার বিকৃতরূপ, কোথায়ও বা সিংহবিক্রমে আক্রমণকালে নৃশংস মুখবিকৃতি। এ সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রোচিত নৃত্যের অঙ্গীয়। দূর হইতে দেখিলাম বেন বৈশাখী ঝড় বা আবাড়িয়া মেঘের মত তাহারা বোছুবেশে আসিতেছে। আমি বেন প্রত্যক্ষ করিলাম সেই বাঙ্গালী বীরগণকে, বাহারা কাশ্মীরে গিয়াছিল ললিতাদিত্যের অধিষ্ঠিত পরিহাস-কেশবের মন্দির ভাঙ্গিতে, বাহারা পৌণ্ড্র-বাসুদেবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে পরাভূত করিতে ঝারকাপুরে গিয়াছিল, বাহারা বালি, প্রথমম ও জাভা বীরবিক্রমে অধিকার করিবার জন্ত পুরাকালে বঙ্গদেশ হইতে রওনা হইয়াছিল, বাহারা রাজকুমার বিজয়ের অমুঘর্ষী হইয়া খটিকাতাড়িত জাহাজ হইতে বুদ্ধ-নির্কীর্ণের সময়ে সিংহলে অবতীর্ণ হইয়া সেই দেশ বলপূর্বক অধিকার করিয়াছিল; এই রাইবেশের দল যে সেই বাঙ্গালী সৈন্তের পুরোগামী নৃত্যশীল বোছুদের বংশধর, তৎসম্বন্ধে বিধামাত্র রহিল না। কি বিরাট তাহাদের লক্ষ্যবস্তু, বাহুবলোচ্চল, খজাচর্ম ব্যবহারের অদ্ভুত ভঙ্গী, কি অসাধারণ হৃদমণীয় বীরবিক্রম, এ সকল এতগুলির কথা নহে। আমার চক্ষে বাঙ্গালার গৌরবের, বীরত্বের শেষশিখা অতীত যুগের যবনিকা উত্তোলিত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

“আমার সর্বশরীর রোমাক্ষিত ও চক্ষু বিফারিত হইল। কিছুকাল আমি আড়ষ্ট-আবিষ্ট হইয়া সেই বিক্রান্ত নর্তকদের দ্রুতগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার পার্শ্ববর্তী এক বদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মিঃ ডাট্ট, আপনার কি হইয়াছে? কোন অসুখ হইয়াছে নাকি?’ আমি বেন জাগ্রত হইলাম, বলিলাম, ‘দেখছেন না কি প্রলয় ঝড় বহিয়া বাইতেছে?’

“আমি চিরকালই নৃত্যপ্রিয়। শৈশবে কীৰ্ত্তনীদ্বাদের দলে ঢুকিয়া নাচিয়াছি, তারপর যুরোপের বহুস্থানে নৃত্য দর্শন করিয়াছি, স্বয়ং সেই সকল নৃত্যোৎসবে যোগদান করিয়া নাচিয়াছি। কিন্তু এই ‘রাইবেশে’দের নর্ত্তনের যে ছন্দ, অঙ্গভঙ্গীর যে বিজ্ঞানশুদ্ধ তালমান-জ্ঞান, যে অপূৰ্ণ গতিশীলতা, এক কথায় নৃত্যের চরম সফলতা, তাহা আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। আমি ডাবিলাম ইহাই প্রকৃত ‘শিবতাণ্ডব’, বীরভূম জেলার লোকেরা এই নৃত্যসংস্কার কোথায় পাইল তাই ভাবিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলাম।

“মনে হইল, পঞ্চপাণ্ডব বীরভূমের মত কোন রাজ্যে আসিয়াছিলেন, হয়ত বা এইখানেই বিরাতের রাজপুরী ছিল, এবং ইঙ্গসভা হইতে নৃত্য শিখিয়া এইখানেই অর্জুন বৃহন্নলাবেশে রাজকুমারীদিগকে নৃত্য শিখাইয়াছিলেন, সেই দেবনৃত্য তদবধি এদেশে চলিয়া আসিয়াছে, বীরভূমের বীরেরা এই বীর-নর্ত্তন করিতে করিতে বঙ্গের বিজয়ী সৈন্তের পুরোগামী হইত। আমার মন দেশপ্ৰীতিতে ডুবিয়া গেল।

“‘রাইবেশে’ পূৰ্ণসংস্কার হারাইয়া বসিয়াছে। তাহারা জানে না কত বড় বীরত্বের সংস্কারের তাহারা উত্তরাধিকারী। তাহারা নিজকে ‘রাইবেশে’ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। বৈষ্ণবদিগের প্রভাবকালে যখন মেয়েলী-নর্ত্তনে দেশ মজিয়া গেল, তখন ‘রাইবেশে’ হইল ‘রাইবেশে’,—তখন রাধিকা ছিলেন নটের গুরু। এমন কি গোপ্বামিগণের শিকার প্রভাবে এই বীরবিক্রম বোদ্ধগণের বংশধরেরা নর্ত্তনকালে মাঝে মাঝে ঘোমটা দিয়া মেয়েদের অভিনয় করিত। অথচ তাহাদের সমস্ত নর্ত্তনটি যুদ্ধক্ষেত্রে মরণ-পণ বীরত্বের অভিনয়।”

ধর্মমঙ্গল, চণ্ডিকাব্য প্রভৃতি নানা প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থে “রাইবেশে”গণের উল্লেখ আছে। বাঙ্গলার বাঁশের লাঠির কথা কে না জানে? বাঙ্গলার লাঠিয়াল এই বাঁশের লাঠির দ্বারা শত্রুর শির বিচূর্ণ করিত, এমন কি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে তাহা বন্দুকের গুলি ঠেকাইত বলিয়াও শুনিয়াছি। রাইবাঁশ খুব বড় গোছের বাঁশের লাঠি ছিল। এই শব্দ হইতে নৃত্য-পদ্ধতির নাম হইয়াছে মনে হয়।

রাইবাঁশের দল ছাড়া বাঙ্গলার পল্লীতে আরও অনেক রূপ নর্ত্তন প্রচলিত ছিল, বধা, দশ-অবতার নৃত্য, বাউলের নৃত্য, জারি নৃত্য ইত্যাদি। এগুলি অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে; গুরুসদয় দত্ত বলেন—“এই সকল নৃত্যে অমার্জিত বা অশিক্ষিত ভাবের কোনই পরিচয় নাই। দরিদ্র, কটিবাস-সার এই দীনহীন দলের অধিকাংশই মুসলমান। কিন্তু তাই বলিয়া ইহারা যে শিকার সংস্কারের উত্তরাধিকারী তাহা অতি উচ্চ দরের।” আমাদের দেশে আর্থিক অবস্থা গুলপণ্যের মাপকাটা নহে। হয়ত বহুনার তীরে বসিয়া যে সকল ভাস্কর তাজমহল ও মতিমহল রচনা করিয়াছিল—তাহাদের পরণে নেংটি ও মাথায় একটা অতি নিকট কাপড় পাগড়ীর মত করিয়া জড়ান ছিল।

বৈষ্ণব-নর্ত্তনে নৃত্যকলা এদেশে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এদেশে নাচিবার কৌশল যে অদ্ভুতরূপে আয়ত্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাঁচা শরীর উপরিভাগে অসুষ্ঠ্যমাত্র

স্পর্শ করিয়া নর্তকীরা নাচিতে পারিতেন, মনে হইত যেন তাঁহারা শূন্যের উপর নাচিতেছেন।
কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন:—

“না হবে ভূষণের ধ্বনি, না নড়িবে চীর, ক্রান্তগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর।
বিষম সংকট তালে বাজাইব বাঁশী,—ধনু অঙ্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রেমসী ॥
হারিলে তোমার লব বেশর কাঁচুলী, জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী।”

রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন, তুমি এমন করিয়া নাচিবে যেন :—

“না নড়িবে গণ্ড, মুণ্ড, নুপুরের কড়াই, না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই।
না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘটি শ্রবণের কুণ্ডল, না নড়িবে নাগার মতি নয়নের পল।”

এগুলি নিছক কল্পনা বলিয়া মনে হয় না। অতি ক্রান্ত গতিতে হৈরণ্যের ভাব আনয়ন করে, ইহা তাহারই ইঙ্গিত। কাঁচা সরার উপর নৃত্যের কথা আমরা অনেক বাঙ্গলা রূপকথায় শুনিয়াছি। সরা ভাঙ্গিলে নর্তকীরা দণ্ড পাইত। এই কৌশল এখনও ভারতবর্ষে বিলুপ্ত হয় নাই। কয়েক বৎসর হইল ভারতের একজন মহারাজা দেশীয় নৃত্যকৌশল বড়লাটকে দেখাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে ষ্টেটসম্যানের সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন, নর্তকীরা “danced on sword-edges, on sharp spikes and saws and finally on frail hollow sugar wafers without breaking them in order to show the lightness of foot.” এই সকল লুপ্ত বিজ্ঞা উদ্ধার করিবার চেষ্টা না করিয়া আমরা নৃত্য শিখিতে বিলাতে বাইয়া থাকি—আমরা যে আলোচনা করিলাম, তাহাতে এই কথাটা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। শত শত শতাব্দী যাবৎ আর্ব্যাবর্ত যে উচ্চ সভ্যতা অর্জন করিয়াছে তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিলেও আমাদের পরীগ্রামগুলি তাহা হারায় নাই। বিলাতী সভ্যতা ভদ্রলোকদিগকে নিঃস্ব করিয়া ফেলিয়াছে, স্বর্গীয় অতুল চম্পটি বলিতেন “আমরা নিলাম হইয়া গিয়াছি।” কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ছিল তাহা বাঙ্গলার পরীগ্রামী কুড়াইয়া আঁচলে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। কবে আমরা মানুষ্য হইব, আমাদের উত্তরাধিকারের উচিত মূল্য বুঝিতে পারিব, তখন তিনি আমাদের সম্পত্তি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন, সাক্ষ্যনেত্রে তিনি তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। বাঙ্গলাদেশের শিফাভমনি বিলাতী ছনে স্বদেশীয় বক্তৃতা দিতে পারেন, “বঙ্গ! আমার, জননী আমার” এমন কি ‘বন্দে মাতরম্’ প্রভৃতি গান উদ্ভাত হুরে গাহিতে পারেন, কিন্তু বঙ্গদেশ যে প্রকৃতই ‘সকল দেশের সেরা’ এই কথাটা না বুঝিলে বিলাতী স্বদেশ-প্রেমের গানের নকল আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত সাড়া পাইবে না। বাঙ্গলাদেশ বুঝিতে হইলে আমাদের পরীগ্রামি খুঁজিয়া রত্নোদ্ধার করিতে হইবে। কারণ এদেশের সভ্যতার কেন্দ্র নগর নহে, পরী। আমরা অনেকবার বলিয়া আসিয়াছি—বাঙ্গলাদেশই ছিল যগধের কলা-শিল্প ও চিত্রশালা।

বাঙ্গলা দেশের ঢাকাই মসলিন শিল্পজগতের অদ্বিতীয় কীর্তি। বাঙ্গলা দেশের ও উড়িষ্যার সুস্ন সোনাকুপার কাঁজ অতি অপূর্ণ। যদিও প্রস্তুতশিল্প এদেশে একরূপ লুপ্ত হইয়াছে,

তথাপি বাঙ্গলার কুস্তকারগণ এখনও মূর্তি-নিৰ্মাণে ভারতে অধিতীৰ্ণ। যদিও নালন্দা বিহারের মত কারুকাৰ্য্যমণ্ডিত স্থাপত্যের নিদৰ্শন বাঙ্গলা হইতে লোপ পাইয়াছে—তথাপি সেদিন পর্য্যন্তও বাঙ্গলার স্থাপত্যশিল্পের সংস্কার বাঙ্গালী অপূৰ্ণভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, ছরওয়ার জানি মিঞার ঘরের বিস্তৃত বিবরণ আমরা পরে দিব। পাঠক বুঝিবেন, এই শিল্প বাঙ্গলার প্রাচীন আদৰ্শ কিরূপ উৎকৃষ্টভাবে প্রদৰ্শন করিতেছে। বাঙ্গালীর নৃত্যকলা, বাঙ্গালীর অপূৰ্ণ কহার চাক শিল্প—শিকা, দড়ি, নারিকেলের শাঁস ও খোল দ্বারা আশ্চর্য্য শিল্পকলার নানা সামগ্রী প্রস্তুত করার পদ্ধতি,—অজস্তা-গুহার আদৰ্শে দেখালে চিত্রাঙ্কণ, সন্দেশ, কীরের ও নারিকেলের মেঠাই, আমসব প্রভৃতির মধ্যে বিচিত্র চাককলা-প্রকটন, কাঠের রথে ও সিংহাসনের মধ্যে স্থপ্ততম রেখার বিচিত্র ফুল, লতা ও মূর্তি অঙ্কন,—এইরূপ শত শত কারুকাৰ্য্যে ১০০ বৎসর পূৰ্বেও বাঙ্গালী সিদ্ধহস্ত ছিল, তৎসম্বন্ধে আমরা ইহার পূৰ্বে উল্লেখ করিয়াছি। যগন্দের নিকটবর্তী কোন কোন স্থানে এইরূপ শিল্প-নিদৰ্শন কিছু কিছু পাওয়া যাইবে, কিন্তু বাঙ্গলা দেশে যে কত উৎসে ও কত প্রবাহে কলা-লক্ষী তাঁহার অজস্র দান অরণ্যের জলের মত ছড়াইয়া দিয়াছেন—তাহা অনুধাবন করিলে স্বতঃই মনে হইবে, মাগধ গৌরবের অঙ্গলেহী চূড়া এই শস্ত-শ্রামলা আহুগঙ্গভূমির উপরই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং এখনও যে সে দেবখাদ শুকাই নাই শত শত ভগ্ন নিদৰ্শন দ্বারা তাহার প্রমাণ করিতেছে। রাগরাগিণী, কলাশাস্ত্র ও বিজ্ঞার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর স্বীয় নিকেতন এই বঙ্গভূমি। তিনি তাঁহার আশ্চর্য্য উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা তাঁহার সপত্নী লক্ষ্মীর অভিষাণ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। তিনি রিক্ত হস্তে যে তপস্তা করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্মীর অক্লপা দ্বারা পরাস্ত হয় নাই। পারস্তের কারপেটকে হার মানাইয়াছে বাঙ্গলার কাঁথা; তাহাতে এক পরমাণু ব্যয় করিতে হয় নাই, বড় বড় শিল্পী এখানে রাজাহুগ্ৰহে পুষ্ট হয় নাই; পটুয়ারা এক কড়িমুলোর কাগজে যে রেখাঙ্কণ করিয়াছেন, তাহাতে প্রতি কুটিরে বাঙ্গলার চিত্রসম্পদ অধিগম্য হইয়াছে। সেই সকল ধ্যানী বুদ্ধ, তপোমহিমামণ্ডিত উমা-মহেশ্বর, অবলোকিতেশ্বর ও বাসুদেবের মূর্তি গড়িবার পাথর এখন সুহৃৎভ, বহিঃশত্রুর আঘাতে ভাঙরের বাটালী হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে—কিন্তু শিল্পী একটি পরমাণু ব্যয় না করিয়া নদীর তীরের মৃত্তিকা লইয়া আসিয়া এখনও শত শত দেবমূর্তি গঠন করিয়াছেন এবং সেই দেবমূর্তি খড়ের ঘরে জাগ্রত রাখিয়াছেন। বড় বড় ওস্তাদ রাজকীয় অৰ্ণে উৎসাহিত হইয়া এখানে আর কালোয়াতী করিতে আসির জমাইয়া বসেন না, কিন্তু অতি গরীব নিরশ্রেণীর লোকেরা যে প্রতি গৃহ-প্রাঙ্গণে অপূৰ্ণ মনোহরসাহী কীৰ্ত্তন করে, তাহাতে সমস্ত রাগ-রাগিণী, গদ্যার শত ধারার মত এদেশের সুরসাগরের পুণ্য তীরে আসিয়া মিশিয়াছে,—এখন আর শীলভদ্রের জায় বাঙ্গালী পণ্ডিত বিশাল নালন্দা-বিহারের অটালিকায় বসিয়া শিক্ষাদান করেন না অথবা দীপঙ্করের ছায় অদ্বৃত্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তি বিক্রমশিলার রাজকীয় বিশ্ববিজ্ঞালয় হইতে সমস্ত এসিয়াকে জ্যোতির্দানপূৰ্ণক আলোকিত করেন না, কিন্তু সেদিন পর্য্যন্তও জীর্ণ খড়ো ঘরে বসিয়া বাঙ্গালী জ্ঞানের পণ্ডিত ও স্বতিকাৰ শাস্ত্রের যে সকল টিপনী রচনা

“Oṣedhi”, thus the Sen Kings are evidently compared to successful physicians who by administering medicinal creepers can cure a patient attacked by poisonous beasts. Here the poison is power.” (Inscriptions of Bengal, p. 85). [‘ওষধি’ শব্দ লইয়া কবি দ্ব্যর্থবাচক একটু খেলা খেলিয়াছেন। স্পষ্টতঃই সেনরাজগণ উৎকৃষ্ট কবিরাজদের সঙ্গে তুলিত হইয়াছেন, ইহারা অসরোগ্যকর গুল্মলতা-দ্বারা রোগীদিগের বিষদোষ খণ্ডাইতে পারিতেন—এস্থলে শত্রুর তেজ্জই বিষস্বরূপ কল্পিত হইয়াছে।] পুনরায় আমরা কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনেও এই বিষবৃন্তির ইঙ্গিত পাই—বজ্রাল সেন তাঁহার শত্রুদিগের দর্পজ্বর তাঁহার (ভেবজ) লতাস্বরূপ খঞ্জোর স্পর্শে আরোগ্য করিতেন।” খঞ্জাকে লতার সঙ্গে উপমা দিয়া শত্রুর দর্পকে জ্বরস্বরূপ বর্ণনা করা কতকটা অদ্ভুত। আমাদের মনে হয়, ইহা সেন-রাজাদের জাতিসূচক একটা ইঙ্গিত বাক্য।

জাতিসম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত নিরপেক্ষতার সহিত পূর্বোক্ত কথামূলি লিখিলাম। কিন্তু এই কথাটা যখন একটা ঐতিহাসিক সমস্তার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে তখন আমি বাহা নিশ্চিতরূপে জানি তাহা না বলিয়া প্রমত্তির পাশ কাটিয়া যাওয়া কাপুরুষতা মনে করি।

সেকালে বিবাহের এত আঁটা-আঁটি ছিল না। সমাজে অনুলোম প্রতিলোম উভয়-বিধ বিবাহই প্রচলিত ছিল। বাণভট্টের কাদম্বরীতে দৃষ্ট হয় তাঁহার বৈশাখ-বিমাতৃগর্ভজাত পুত্র এবং তিনি উভয়েই সহোদরের মত এক বাড়ীতেই ছিলেন। “দ্বীরহং ছন্দুলাদপি”—রাজারা যেখানে সেখানে বিবাহ করিতেন এবং জাতিগুলি এখনকার মত লোহের চাঁচে ঢালাইকরা হইত না। রূপকথামূলিতে রাজপুত্র, রাজকন্যা, সওদাগরের পুত্র, মস্কার পুত্র, কোটালের পুত্র—এই ভাবের পদসূচক পরিচয়েই দৃষ্ট হয়,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতির উপর জোর দেওয়া হয় নাই। বিবাহেতে প্রেমই নির্দিষ্টারে বিবাহ।

প্রধান পুরোহিত, রূপকথায় এইরূপ দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণের ছেলে, ক্ষত্রিয়ের ছেলে কি বৈশ্যের ছেলে এরূপ কথা পল্লীগীতিকা ও রূপকথায় আদৌ নাই। তখনও অবশ্য গোড়া ব্রাহ্মণগণ হয় ত এক কোণে দাঁড়াইয়া এই সকল নির্দিষ্টার বিবাহ ও খাজাখাজের অনিয়ন্ত্রিত রীতি উকি মারিয়া দেখিয়া জুকুটী করিতেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে তাঁহারা দিন পাইয়া বসিলেন। মহাভারতের নানা স্তরে নানারূপ সামাজিক ব্যবস্থার কথা আছে। এক যুগ ছিল যখন বৈবাহিক আত্মীয়তায়, জাতির কথা আদৌ উখিত হইত না। ক্ষত্রিয় ভীম ব্রাহ্মসকল হিড়িম্বাকে ও ক্ষত্রিয় অর্জুন নাগকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পুত্র যটৌৎকচ ও বক্রবাহনের সঙ্গে অভিমন্ত্যর সামাজিক কোন পার্থক্য ছিল বলিয়া অনুমিত হয় না।

সামন্ত সেন রাজ দেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এ দিকে শূরবংশের রাজারা দক্ষিণ হইতে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সামন্ত সেন বহু যুদ্ধে স্বীয় শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করিয়া জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। কবির ভাষায় “তিনি কণাটি দেশের অন্তর্মুখী লক্ষ্মীকে

পুনরায় উদযাচলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি কণাটলক্ষীর লুণ্ঠনকারী দস্যোগণকে একাকী নিহত করিয়াছিলেন,” শুধু যে তিনি প্রবলপ্রতাপাবিত ছিলেন এমন নহে। “তিনি সত্যনিষ্ঠ, অকপট এবং করুণার আধার ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষদের ধবলকীর্তিতরঙ্গে আকাশতল বিদ্যোত হইয়াছিল। এই সকল পুণ্যে সেনবংশ নিম্নোক্ত মগধের রাজার শক্তি বিলোপ করিয়া সমগ্র রাঢ় দেশের রাজচক্রবর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাদের সময়েই বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম শির উত্তোলন করিয়াছিল। সামন্ত সেন বৃদ্ধ বয়সে পুত্র হেমন্ত সেনের উপর রাজ্যভার দিয়া স্বয়ং সুপ্রসার গঙ্গাপুলিনে আরণ্য আশ্রমগুলি দেখিয়া বেড়াইতেন। হোমধুম-সুগন্ধ ঔষিদের সেই সকল পুণ্যাশ্রম তাঁহার শেষ বয়সে আশ্রয়স্থল হইয়াছিল।”

সেনবংশ বিদেশাগত। তাঁহাদের অল্পকালের মধ্যে এতটা প্রভাব-প্রতিপত্তি হওয়ার কারণ ব্রাহ্মণদের সহায়তালভ। সামন্ত সেনের বংশধর বল্লাল সেন যে সামাজিক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে ব্রাহ্মণগণ এদেশের সর্বোচ্চ, ইহকাল ও পরকালের কাণ্ডারী এবং সমাজের একমাত্র গুরু ও নেতৃত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শূরবংশ ইহার পূর্বেই পূর্ববঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই শূরবংশের সহিত বৈবাহিক আত্মীয়তার দ্বন্ধনও বঙ্গদেশে সেন-রাজাদের ক্ষমতা তথা ব্রাহ্মণ-প্রভাব দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। এই দুই বংশের মিলন

সোণায় সোহাগা-মিলনের ছায় শুভ ফল প্রসব করিয়াছিল।
হেমন্ত সেন।

উভয় বংশই ব্রাহ্মণদিগের পক্ষপাতী। হেমন্ত সেনের সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, যে তিনি বহু যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ী হইয়াছিলেন, হেমন্তের সময়ে বঙ্গাধিপের রাজশয্যা নিরুপক কুলশয্যায় পরিণত হয় নাই। এই বংশের সকল রাজাই বিজ্ঞা ও বিদ্যানের সম্মান করিতেন। ইহারা ছায়পর ও শান্তিপ্রিয় ছিলেন। পরাক্রমের সহিত এই সমস্ত মহাশয়ের সমাহারবশতঃ শেষ সময়ের মগধ পালবংশীয়গণের অরাজকতার সময়ে তাঁহারা বাঙ্গালীর অল্পরাগ ও সহায়তা অর্জন করিয়াছিলেন।

হেমন্ত সেনের পত্নীর নাম বশোদেবী। ইহাদের পুত্র বিজয় সেনই সেনবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা—কুলপ্রদীপ। বিজয় সেন—অপুত্রক শূরবংশীয় রাজার হ্রিহিতা বিলাসদেবীর পানি-গ্রহণ করিয়া প্রায় সমগ্র পূর্ববঙ্গ স্বাধিকারে আনয়ন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পালবংশীয় শেষ রাজাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার অধিকারের সীমানা খুব হ্রাস করিয়াছিলেন। তিনি কামরূপের রাজা ইন্দ্রপালকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তৎপর ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে মিথিলার ছানদেবকে পরাস্ত করেন। পশ্চিম প্রদেশগুলি জয় করিবার জন্ত তিনি বিরাট নৌবিতান প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া বীর, রাঘব ও বর্দ্ধন নামক নৃপতিরা ইহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন।* আর্য্যাবর্তের পশ্চিমাংশেও তিনি কতকটা কৃতকার্য হইয়া থাকিবেন, নতুবা তাম্রশাসনে এই অভিযানের উল্লেখ থাকিত না। সেন-রাজগণ অবশ্য ভারতের

*ভিনসেন্ট স্মিথের মতে এই বীরের পূর্ণ নাম বীরবাহু। ইনি কামরূপাধিপতি নরকের বংশধর। বীরবাহুর পুত্রের নাম বলবর্দ্ধ। মনোমোহন চক্রবর্তীর মতে রাঘব, অনন্ত বর্দ্ধা চৌদ্রগঙ্গের পৌত্র।

সার্কভৌম রাজা হইতে পারেন নাই। মৌর্যবংশীয় অশোক একচ্ছত্র রাজচক্রবর্তী ছিলেন। তারপর শুগুপবংশের সমুদ্রগুপ্তও সেই গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন। পালরাজার আর্য্যাবর্ত-বিজয়ী হইয়াছিলেন, দক্ষিণাপথের কোন কোন অংশে সাময়িকভাবে প্রভাব বিস্তার করিলেও তাঁহার “পঞ্চগৌড়েশ্বর” (Lord of the five Indies) উপাধি দ্বারাই পরিচিত হইতেন। সারস্বত (পাঞ্জাব), কান্তকূজ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল—এই পঞ্চদেশ পঞ্চগৌড় নামে প্রসিদ্ধ। এই নাম গৌড়দেশেরই মাহাত্ম্যজ্ঞাপক। এই গৌড়দেশ হইতে “গৌড়ীয় রীতি” নামক রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ গৌড়দেশ তখন “সকল দেশের সেরা” ছিল। প্রাচীন ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে অনেক স্থলেই গৌড়েশ্বরগণের “নবলক্ষ সৈন্তের” উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যে সকল রাজাদের সম্বন্ধে এই সৈন্তসংখ্যার আরোপ করা হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে একথা অবিস্মৃত হইলেও প্রাচীন কালে সম্ভবতঃ পালবংশের গৌরবের সময়ে যে কোন এক বা একাধিক রাজা তাঁহাদের রণ-অভিযানের নবলক্ষ সৈন্ত লইয়া যাত্রা করিতেন, তাহা অনুমান করিতে বাধা নাই। “নবলক্ষ” কথাটা বাঙ্গলাদেশে প্রবাদবাক্যের স্থায়

হইয়া পড়িয়াছিল; বাঙ্গলা বৈষ্ণবপদে সর্বদা বৃন্দাবনে “নবলক্ষ ধেমুর” উল্লেখ পাই। এককালে গৌড়াধিপের এই বিরাটসংখ্যক সৈন্ত ছিল।

এজন্তই এই প্রবাদবাক্যের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। সেই-রূপ আবার এই “পঞ্চগৌড়েশ্বর” উপাধিটা। এককালে পালরাজগণ সিংহাসনে বসিয়া এই গৌরবান্বিত উপাধি গ্রহণ করিতেন, কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে কবিগণ যে কোন আশ্রয়দাতা জমিদার বা রাজাকে এই উপাধি দিয়াছেন। এই প্রাচীন সংস্কার বাঙ্গলার জলমাটিতে ছিল। এজন্তই ইহা এত প্রসার লাভ করিয়া তোষামোদজীবী কবিগণের স্তাবকতার অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইত।

বাঙ্গলাদেশের এই বিরাট প্রভাব প্রতিপত্তির আরও কিছু প্রমাণ আছে। গৌড় যখন ভারতবর্ষের রাজকীয় মহাশক্তির অগ্রতম কেন্দ্র ছিল, তখন গৌড়ের আমোদপ্রমোদ ভারতের সর্বত্র অনুকৃত হইত। মনসাদেবী সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যে সকল কাব্য পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে হরিদত্তই সর্বাধিক প্রাচীন কবি। ইহার একটি চোখ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এজন্ত ইহাকে সাধারণতঃ “কানা হরিদত্ত” বলিয়া ডাকা হইত। অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত

হইয়াছে “কানা হরিদত্ত” খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে বঙ্গীয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাহারও পূর্বে হইতে মনসাদেবীর গান

বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। এই বাঙ্গলাদেশের নায়ক-নায়িকার কাহিনী শুধু বঙ্গদেশে নহে, এককালে প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্তে প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মনসাদেবী সম্বন্ধীয় কাব্যের একটি প্রাচীন সংস্করণ “পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত” হইয়া পণ্ডিত বিন্দুপ্রসাদ মিশ্র সারস্বত কর্তৃক কাশীর কল্লতরু প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আর একটি সংস্করণ এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব সদস্য বাবু ভগবতীসহায়, এম. এ., বি. এল. এবং বাবু বৈষ্ণৱায়ণ সিংহ, এম. এ. মহাশয়দ্বয়ের

নিকট শুনিয়াছি যে পশ্চিমাঞ্চলের গীতি-ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের এই বেহলার কাহিনী গান করিয়া আর্থ্যাবহের স্বল্প পশ্চিমপ্রান্তেও জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। আমি যে হিন্দী সংস্করণটি দেখিয়াছি তাহাতেও চম্পানগরের বণিকরাজ চাঁদ সদাগর, তাহার রাজ্ঞী ও সাহ সদাগরের কাহিনী ঠিক বাঙ্গলা কাব্যগুলির ছায় বর্ণিত আছে। এই কাব্যকথা

বাঙ্গলার রাগ ও ভাটিয়াল হয়। যে বাংলাদেশ হইতে গিয়াছে তাহার প্রমাণও ঐ পুস্তকে আছে। অনেক গানের পূর্বে “বাঙ্গাল রাগে” অথবা “ভাটিয়াল রাগে”

গান করিতে হইবে, এইরূপ নির্দেশ আছে। এই “ভাটিয়াল রাগ” পূর্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণী লোকের একমাত্র অবলম্বন। বিশাল নদনদী বাহিয়া যখন বাঙ্গালী মাঝি প্রশান্ত সায়াহ্নে রূপরূপ শব্দে বৈঠা ফেপন করে, তখন তাহার কণ্ঠে ভাটিয়াল সুর দিগদিগন্তে একটা উদ্দাম হাওয়ার ছায় ঘুরিয়া বেড়ায়। মনে হয় বেন সেই সুরটি প্রশান্ত জলরাশির, অনন্ত আকাশের ও নিখর বায়ুমণ্ডলেরই নিজের সুর।

এই মনসাদেবী সম্বন্ধে বাংলাদেশে বহু কাব্য রচিত হইয়াছে। আমি অন্যান্য এক শত কবির কাব্যও স্বয়ং দেখিয়াছি। তাহা ছাড়াও যে আরও কত ‘মনসামঙ্গল’ বঙ্গের নিভৃত নিকেতনে দৃষ্টির অগোচর রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পরবর্তী কালে নারায়ণদেব, বিজয় গুপ্ত, বংশীদাস ও তাহার গুণবতী কন্তা চন্দ্রাবতী, ‘কেতকদাস ফেমানন্দ’ প্রভৃতি কবিরা ‘মনসামঙ্গলে’ যে অপূর্ণ করণরস বহাইয়া দিয়াছেন, হিন্দী সংস্করণে তাহার কিছুই নাই, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হিন্দী সংস্করণগুলির সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাচীনতম মনসামঙ্গলের কবি হরিদত্তের লেখার সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে। মনসাদেবীর ‘সর্পসজ্জা’ নামক অধ্যায়টি হিন্দী পুস্তক ও কানা হরিদত্তের রচনার সঙ্গে মিলিয়া যায়।

ইহার ব্যাখ্যা শুধু এই হইতে পারে যে, পালরাজগণের সময়ে যখন বাঙ্গলার মনসামঙ্গল কাব্য মগধে ও গৌড়ে প্রচারিত হয়, তখন আমাদের গৌড়দেশ ছিল সমস্ত ভারতবর্ষের আমোদপ্রমোদের প্রধান কেন্দ্র। তখন সেই গান সমস্ত আর্থ্যাবর্ত প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। কিন্তু সেনদের সময়ে বাংলাদেশের গভীর মধ্যে গৌড়ীয় প্রভাব সঞ্চিত হইয়া পড়িল, তখন আর কোন বোগাবোগ রহিল না; তারপর বাঙ্গালীরা এই কাব্যকে যে উজ্জল ত্রি দান করিয়াছে তৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্য জনসাধারণ আর অবহিত হয় নাই। সেই কানা হরিদত্তের ও তৎপূর্ববর্তী মনসামঙ্গল-লেখক বাংলাদেশে বাহারা ছিলেন তাহাদের সেই ক্ষীণ সুরটির প্রতিধ্বনি এখনও কাশী, এলাহাবাদ, ভাগলপুর এবং তাহা হইতেও স্বল্প পশ্চিম হইতে আমরা আবিষ্কার করিতেছি, পরবর্তী বাঙ্গলা কবিদের করণ কবিরময় স্বরলহরী আর তথায় পৌছিতে পারে নাই।

শুধু মনসামঙ্গল নহে; রাজা গোপীচন্দ্রের গান গৌড় কেন্দ্র হইতে এক সময়ে ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল। লক্ষণদাস প্রণীত হিন্দী “গোপীচন্দ্র কা গানে” বাঙ্গলার রাজা গোপীচন্দ্র, তাহার মাতা ময়নামতী (হিন্দীতে ময়নাবতী হইয়া গিয়াছে) জলেকরী, গোরক্ষনাথ প্রভৃতির প্রসঙ্গ বাঙ্গলা গীতিকার মতই বর্ণিত

গোপীচন্দ্রের গান।

হইয়াছে। উড়িয়া ভাষায় বিরচিত গোপীচন্দ্রের গানের ছইশত বৎসরের একখানি প্রাচীন পুঁথি প্রাচ্যবিজ্ঞানবিদ নগেন্দ্রনাথ উদ্ধার করিয়াছেন এবং তাহার কতকাংশ আমার প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে (প্রথম খণ্ডে ৮৪-৯৪ পৃষ্ঠা) উদ্ধৃত হইয়াছে। গোপীচন্দ্রের গানের প্রসার সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী। স্বর্গীয় কবিরাজ হুর্গানারায়ণ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্ত পাক্কাব হইতে এই গোপীচন্দ্রের গানের কতকগুলি হিন্দী ও উর্দু ভাষায় লিখিত কবিতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রদেশে এই বঙ্গের রাজা গোপীচন্দ্রের গানের প্রভাব খুব বেশী। কয়েক বৎসর পূর্বেও তথায় বাঙ্গলা দেশের রাজা গোপীচন্দ্র ও মাতৃ-স্বাক্ষর তাহার অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসগ্রন্থের প্রসঙ্গ লইয়া নাটক রচিত ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে রাজা রবিরঞ্জন সন্ন্যাসের প্রাক্কালে গোপীচন্দ্রের একখানি ছবি আঁকিয়াছিলেন। তাহার নাম 'গোপীচন্দ্র কা সন্ন্যাস'। এই ছবিতে গোপীচন্দ্রের পত্নী অহুনা ও পছনার মূর্তি তিনি অঙ্কন করিয়াছেন। এখনও বোধ হয় কলিকাতার বাজারে এই ছবি পাওয়া যায়। এই সকল প্রমাণ-দ্বারা বুঝা যায় বাঙ্গলাদেশের এই করুণ কাব্যকথা দক্ষিণাত্যে কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

এই ছইটি গান ছাড়া বাঙ্গলার মায়েরা আম, জাম, কাঁটালতরুর ছায়ায় বসিয়া কত রূপকথার সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের ছুলালদের কারা ধামাইতেন, তাহা ভারতের গভী পার হইয়া সমস্ত যুরোপে গৃহীত হইয়াছিল। লালবিহারী দে ও দক্ষিণাবাবু বাঙ্গলার সেই অপূর্ণ রূপকথাগুলির সামান্য কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহা পাঠকেরা গ্রীষ্ম ভ্রাতাদের সংগ্রহের সহিত মিলাইয়া ও তৎসম্পর্কে স্থলী ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মন্তব্য পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে বাঙ্গলার মাটি প্রধানতঃ এই রূপকথার জননী; এই খনি হইতেই জগতের সমস্ত উপকথা-সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে। মৌর্য, গুপ্ত ও পালবংশের রাজত্বকালে মগধ ও গৌড় হইতে ঢাকার মসলিনের মত কাব্যকল্পনাভাণ্ডার বিদেশে রপ্তানী হইত, এখন আমরা পাট, মসলা, ভুগি, চাউল ও গম পাঠাইতেছি।

সেন-রাজাদের সময় হইতে বৃহৎ বাঙ্গলা ক্ষুদ্র বাঙ্গলায় পরিণত হইল। বিদেশের সঙ্গে আদান-প্রদান একরূপ তিরোহিত হইল। সমুদ্রবাত্তা নিবন্ধ হইয়া আমরা কুপমাণ্ডুকে পরিণত হইলাম। ইহার জন্ত আমরা সেন-রাজাদিগকে অভিমুক্ত বৃহৎ বাঙ্গলা ক্ষুদ্র হইয়া গেল।

করিতে পারি না, বেহেতু বাধ্য হইয়া তাঁহারা সময়োপযোগী ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের ঘরোয়া বিবাদ, বাঙ্গলার সীমা পার হওয়ার কথায় আতঙ্ক, এবং জগৎটাকে বাদ দিয়া অঞ্চলী অপ্রবাসী হইয়া গৃহস্থ আশ্বাদনের হেয় লিপ্সা জাতীয় হুর্গতির কারণ হইয়াছিল। যে মুহম্মদ গার্হস্থ্য সমীর উপভোগের আশায় আমরা জড়তা অবলম্বন করিয়াছিলাম সেই আপাততঃ শান্তিস্থখের বায়ু পরিণামে হুর্গতির ঝটিকায় পরিণত হইয়া নিজের দেশে আমাদেরকে কাঙ্গাল ও পরমুখাপেক্ষী করিবে তাহা কে জানিত ?

সেনদের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব ব্যাপ্ত হইল, তাহাতে এই দেশবাসীরা এক নববর্ষে

দীক্ষিত হইল। উত্তরকালে রঘুনন্দন যে স্মৃতিসঙ্কলন করিয়াছিলেন, সেনেরা তাহা দেশে গৃহীত হইবার পথ সুগম করিয়াছিলেন।

সমুদ্রযাত্রা নিবিদ্ধ হইল। দেশে জাহাজ এত বিরাট হইত যে সাধারণতঃ একখানি জাহাজে ৭০০ যাত্রী যাতায়াত করিত, এ ধারণা বহুমূল সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। বঙ্গের বিজয়সিংহ ৭০০ লোক লইয়া সমুদ্রপথে লঙ্কায় গিয়াছিলেন। জনক-জাতকে বুদ্ধ ভরোচ নগর হইতে ৭০০ বণিকের সঙ্গে এক জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। নবলঙ্ক মৈত্রেয় জায় সমুদ্রপথে জাহাজে ৭০০ যাত্রী-বহনের কথাটাও প্রবাদবাক্যে দাঁড়াইয়াছিল। সমুদ্রবণিজ-জাতকে বর্ণিত আছে একটি গ্রামের সমস্ত লোক স্বতন্ত্ররাজ্যীয় ছিল। তাহারা জাহাজ-নির্মাণের জন্ত অগ্রিম টাকা গ্রহণ করিয়া বধাসময়ে জাহাজখানি দিতে পারিয়াছিল না, সুতরাং একখানি জাহাজে সেই বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র পলাইয়া গিয়াছিল। স্বল্পরক-জাতকে পুরন্দ্রাত্মজের সমুদ্রযাত্রা-প্রসঙ্গে লিখিত আছে, তাহারা যে জাহাজে তাঁহাদের বিপুল কাঠসম্ভার লইয়া বাণিজ্য করিবার জন্ত বিদেশে গিয়াছিলেন, সেই জাহাজে তাঁহাদের তিনশত সহযাত্রী ছিল। ব্রহ্মদেশীয় তপুস এবং পালকৎ বঙ্গোপসাগরের একখানি জাহাজে পাঁচশত গাড়ী মাল লইয়া গিয়াছিলেন, একথা বিশপ বিগাওয়েটের বুদ্ধ-চরিতে উল্লিখিত আছে। লঙ্কাবিজয়ী বঙ্গের বীর বিজয় যে জাহাজে সিংহলে গিয়াছিলেন তাহাতে বহুসংখ্যক অশ্ব ও হস্তী ছিল, অজস্রাচিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের Indian Shipping পুস্তকে পাঠক এইরূপ বৃহদাকার জাহাজে ভারতীয় লোকের সমুদ্রযাত্রাসম্বন্ধে পূর্বোক্তরূপ নানাবিধ তথ্য অবগত হইবেন। মহাভারতে বঙ্গীয় রাজাদের নৌবলের উল্লেখ আছে। হড়াহা গ্রামে আবিষ্কৃত একটি শিলালিপিতে গোড়বাসীদিগকে ‘সমুদ্রা-শ্রয়ান্’ বলা হইয়াছে। এদেশে বহু কৈবর্তের বাস, ইহারা জলযুদ্ধে অদ্বিতীয় পৌরুষ দেখাইত। শম্ব-জাতকে একখানি জাহাজের উল্লেখ আছে, তাহা দৈর্ঘ্যে ৮০০ হাত, প্রস্থে ১০০ হাত এবং ২০ fathom জল ডাঙ্গিয়া যাইত বলিয়া লিখিত আছে। বাঙ্গলার

অনেক প্রাচীন পুঁথিতে বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রার প্রসঙ্গ আছে।

কিন্তু সমুদ্রযাত্রা-নিষেধের বহু পরে সেগুলি লিখিত হওয়া বশতঃ সেই সকল বর্ণনা অনেকটা অতিরঞ্জিত ও বিকৃত হইয়াছে। চাঁদ সদাগরের জাহাজগুলির যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে সেগুলি অসীম সিদ্ধবক্ষে ভাসমান হিমালয়ের মতন ছিল বলিয়া মনে হয়। এক জাহাজে রোজ হাট বসিত, তাহাতে বিকিকিনি সবই হইত, এসকলের অতিরঞ্জিত বর্ণনা বিজয় গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বহু কবি দিয়াছেন। বংশীদাসের বর্ণনাগুলি অনেকটা যথাযথ। তাহার সময়ে (ষোড়শ শতাব্দীতে) তখনও সমুদ্রযাত্রা-নিষেধবিধি পূর্ণাঙ্গুলে তাদৃশ কার্যকরী হয় নাই। জাহাজ-নির্মাণের তিনি যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যসম্পন্ন। গীতিকথাগুলিতে সমুদ্রযাত্রাসম্বন্ধে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। তাহাতে এক বণিক বলিতেছে, “সমুদ্রই

আমার বাড়ীঘর।” অপর এক বণিকবধু বলিতেছেন, “আমাদের পারিবারিক রীতি এই যে বিবাহাদি আমাদের সমুদ্রে জাহাজের উপরই নির্বাহিত হয়।” সমুদ্রযাত্রা লক্ষণসেনের সময়েও যথারীতি চলিতেছিল। শেক শুভোদয়া পুস্তকে বর্ণিত আছে—প্রভাকর নামক এক বণিক তাহার বিপুল বণিজ্যদ্রব্য লইয়া বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল। এই দেশে তমলুক ও চট্টগ্রামের বন্দর অতি প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও চট্টগ্রামের হালিসহর, পতেঙ্গ, ডাবল, মুড়িং প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন কালের জাহাজের অল্পরূপ জাহাজ নির্মিত হইয়া থাকে।

যে দেশের বণিকেরা সমুদ্রকেই তাঁহাদের গৃহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, যে দেশবাসীর তুল্য জগতে নৌযুদ্ধবিশারদ আর কোন জাতি ছিল না,—যে দেশের বণিকেরা সমুদ্রেই তাঁহাদের বিবাহ এবং অপরাপর আমোদকর শুভ ঘটনা সম্পাদন করিতেন, যে দেশে বণিক্রাই রাজার তুল্য সম্মান পাইতেন, বিদেশে গেলে বাহাদের ডঙ্কা রাজ-ডঙ্কার মত বাজিয়া উঠিলে কোন রাজা সেই দেশে আসিয়াছেন এই আশঙ্কা জন্মাইত, যে দেশের শ্রেষ্ঠ

বণিক্গণ রাজার ছায় ছত্র, দণ্ড, সিংহাসন ব্যবহার করিতেন, সমুদ্রযাত্রা-নিষেধবিধির (মনসামঙ্গল কাব্যগুলি দ্রষ্টব্য) সে দেশে সমুদ্রযাত্রা কেন কারণ। নিষিদ্ধ হইল! একথা একবার আলোচিত হইয়াছে। আমরা পুনরায় সংক্ষেপে সেই কারণগুলির উল্লেখ করিয়া যাইতেছি—

১ম, এই দেশ বিজিত হওয়ার পর বণিক্রা অপর দেশে তেমন সম্মান পাইতেন না, প্রবাসে তাঁহাদের উপর অত্যাচার অবিচার হইলে তাহার প্রতিকার হইত না।

২য়, ভিন্ন দেশের সমাজের অমুকরণে প্রবাসী হিন্দু এরূপ সমস্ত আচার-ব্যবহার শিখিয়া আসিতেন, বাহাতে আমাদের শাস্ত হিন্দু সমাজ উৎপীড়িত হইত, স্বদেশীয় রাজা না থাকিতে সমাজের উপর সেই সকল উৎপাত কেহ নিবারণ করিতে পারিত না।

৩য়, এই পরাধীন দেশ হইতে একবার লোক চলিয়া গেলে এখানে তাহারা অনেক সময়ে ফিরিয়া আসিতে চাহিত না, কোন স্বাধীন দেশে উপনিবিষ্ট হইত, এইভাবে আমাদের লোকসংখ্যা ক্ষয় পাইত।

৪র্থ, অনেক স্থলে হিন্দুর ছেলে প্রবাসে গেলে ভিন্ন ধর্মীদের মেয়ে বিবাহ করিয়া ফেলিত। ইহা আমাদের সমাজের পক্ষে একটা বিভীষিকার দাঁড়াইয়াছিল।

৫ম, প্রবাসে হিন্দুশক্তির কোন কেন্দ্র না থাকিতে তথায় তাঁহাদের খোঁজখবর লওয়ার কোন সুযোগই ছিল না।

আমরা মহাভারতেও সমুদ্রযাত্রার সম্বন্ধে নিষেধবিধির ইঙ্গিত পাই, তাহা হয়ত কোন একটা বিশেষ প্রদেশের সাময়িক কোন অস্থবিধার দরুন বটিয়াছিল, কিন্তু ইহা কোন দেশব্যাপী নীতি বা ব্যবস্থার সূচক নহে—ইহা সহজেই অমুমান করা যায়।

সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য ব্যাপিয়া হিন্দুর সমুদ্রযাত্রার কথা আছে, বৌদ্ধ জাতকগুলি সেই উপাখ্যানময়। এই বাঙ্গলাদেশে যে এক সময়ে সমুদ্রযাত্রার জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা রূপকথা, গীতিকথা এবং প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্য-সমূহের সর্বত্র দৃষ্ট হয়। হিন্দুরাজত্ব পণ্ডিত এই

নিবেদনবিধি কোন শাস্ত্রের কোন এক গূঢ় প্রান্তে পড়িয়া থাকিলেও তাহার প্রচার ছিল না। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে মাহুঘের ঘোর বিপদের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ আছে, এবং সেই বিপৎকালে সহায়তা করিবার জন্য চণ্ডীর নিকট প্রার্থনা আছে। সেই দুই চারিটি প্রধান বিপদের মধ্যে “বিঘূর্ণিতা চ বাতেন হিতা পোতে মহার্ঘবে”—এই ছত্রটি আছে, হুতরাং সমুদ্রের বিপদ যে প্রায়শঃ ঘটত তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাংলাদেশের মেয়েলী ব্রত কথায়ও মেয়েদের একটি প্রধান প্রার্থনার কথা প্রায়শঃ দেখা যায়, তাহা ভাই ও পিতাকে সমুদ্রের ঝটিকা হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপাস্ত দেবতার নিকট স্তোত্র পাঠ করা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গৌরীদান ও বালাবিবাহ

গৌরীদান ও বালাবিবাহ নবাবত কনোজিয়া ব্রাহ্মণদের প্রবর্তিত। অবশ্য ব্রাহ্মণেরা অনায়াসে শ্লোক রচনা করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে পারিতেন ও দিতেন, হুতরাং মনু, বাজবল্য প্রভৃতি ঋষিগণকে তাঁহাদের মতের সমর্থকরূপে দাঁড় করাইতে বিশেষ কোন কষ্ট করিতে হইত না। এ দিকে সংস্কৃত সাহিত্য এত বিরাট ও এই মহাদেশের অন্তর্গত ছোট ছোট দেশে সাময়িক কারণবশতঃ এত বিভিন্ন রীতির প্রচলন হইয়াছিল যে যুগে যুগে স্বতিশাস্ত্রে নানা হস্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যরূপ বিরাট রত্নাকর হইতে যে কোন হস্ত সাহিত্যিক ডুবারীগণ হাতড়াইয়া বাহির করিতে পারেন, এমতাবস্থায় সর্ববিষয়ে শাস্ত্রের সমর্থনের বিশেষ মূল্য দিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

গৌরীদান প্রথাটা স্বাভাবিক নিয়মের বিরোধী। প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে বিবাহের ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম, তবে কেন আমাদের ৭৮ বৎসরের খুঁকীদের বিবাহের জন্য পণ্ডিতদের এতটা জেদ? আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি—পৌরানিক

গৌরীদান।

যত রাজকুমারী তাঁহারা সকলেই বর স্বয়ং মনোনীত করিতেন, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি হিন্দুর আদর্শ ললনারা স্বীয় স্বীয় বর নিজেরাই মনোনয়ন করিয়াছিলেন। এমন কি গৌরী স্বয়ং প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া শিবকে বরস্বরূপ লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কালিদাস গৌরীর যে চিত্র দিয়াছেন, তাহার পর গৌরীদানের কোন অর্থ থাকে না।

যখন হিন্দুগণ জগতের দূর দূরান্তরে বাইতে অসমর্থ হইয়া পরাধীনভাবে স্বীয় পরিবার-রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইলেন, তখন অতি অল্প বয়সেই স্বামীর হস্তে তাহাকে সমর্পণ না করিয়া নিশ্চিত হইতে পারেন নাই। ঘরের কাছে কুমারী-অপহারক দস্যুরা ঘুরিতেছিল— তাহারা প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী পাইলেই বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া বাইত। জলদস্যু, মগ ও হাশ্মাদগণ কত রমণীর বে সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পল্লীগীতিকার কত গানে পাওয়া যায়, অপহৃত রমণী কাদিয়া কাদিয়া স্বামীকে করুণ নিবেদন জানাইয়া পাশবিক শারীরিক বলের অধীন হইয়া চিরতবে গৃহ হইতে লুপ্তিত হইতেছে। খুব অল্প বয়সে কোন স্বামীর বাহর আশ্রয়ে কন্যাকে দিয়া পিতামাতা নিশ্চিত হইতেন। হিন্দুর বাহিরে বাইয়া বাণিজ্যাদি করার সুবিধা চলিয়া গেল, তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। গৃহে বাস করিয়া জীবন কাটানই মূল উদ্দেশ্য হইল, তখন গৃহে শান্তিরক্ষা করাই হইল তাঁহাদের প্রধান চিন্তার বিষয়। এই গার্হস্থ্য জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র এদেশে একান্নভুক্ত পরিবার। বৌদ্ধজগতে মনুষ্য ও জীবজন্তুর জন্য বিশাল চিকিৎসালয় ছিল, তাহাতে সর্ব্বজীব সহায়তা ও আশ্রয় পাইত—পীড়িতের ও আর্ন্তের তখন কোন ভয়ের কারণ ছিল না। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম তখন মানুষকে পায়ে শিকল দিয়া গৃহে আবদ্ধ রাখিত না। হিন্দু স্বাধীনতার যুগে হিন্দু সম্ভানেরা অবাধে জগতের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিত। কিন্তু এদেশ হইতে যখন সেই সকল প্রতিষ্ঠান উঠিয়া গেল, তখন সেই অভাব পূরণ করিতে গৃহ তাহার দৃষ্টি হস্ত বিস্তার করিল। বিশাল সংদারামগুলির অভাব বেকরূপ গ্রামে গ্রামে টোল স্থাপিত হইয়া ব্যাপকভাবে পূর্ণ করিল, বিশাল চিকিৎসালয় সমূহের অভাব প্রত্যেক গৃহ সেইরূপ পূর্ণ করিল। গৃহ, সেবাশ্রম, চিকিৎসালয় প্রভৃতি সমস্তেরই ভার গ্রহণ করিল। এইরূপ গৃহের প্রধান অবলম্বন হইল একান্নভুক্ত পরিবার। হিন্দু সভ্যতা গৃহকে কেন্দ্র করিয়া এক নবস্ত্রী ছুটাইয়া তুলিল। ভিক্ষুর ধর্ম্মের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম যুদ্ধ ঘোষণা করিল। রামায়ণী নীতি গৃহে গৃহে গার্হস্থ্য ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। তদনুসারে ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, পিতামাতা ইহাদের মেহসম্বন্ধ শুধু সুধাপূর্ণ ও আনন্দময় হইল না,—উহা আধ্যাত্মিক মোক্ষ ও শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তুর সন্ধান দিল। ইহাতে শিখাইল—পিতামাতার কথা পালন করিলে, ভ্রাতার হৃন্দানুবর্ত্তী হইলে, পাতিব্রত্য সাধনা করিলে যে স্বর্গে পৌছান যায়—ভিক্ষুর আশ্রমে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন স্বর্গের সন্ধান নাই। এমন কি দাস্ত্র এবং মৈত্রীও এই গার্হস্থ্যশ্রমের একটি প্রধান অঙ্গীয় হইল, প্রাপ্তবয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিলে এই একান্নভুক্ত পরিবারে বিয় হওয়ার সম্ভব ছিল। ভিন্ন পরিবারের ঋচি ও শিক্ষা লইয়া প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রী তাঁহার স্বস্ত্রালয়ে উপস্থিত হইয়া তথাকার নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে তেমন সোয়াস্তি বোধ করিতে পারেন না। প্রত্যেক বাড়ীই দর্শজনের ঘর, তাঁহাদের সকলেই এক প্রকৃতির লোক নহেন, প্রাপ্তবয়স্কা রমণী স্বাভাবিক নিয়মে স্বামীর সঙ্গে মিশিয়া বাইতে পারেন, কিন্তু স্বামীর গৃহের অপরাপর লোকের সঙ্গে তাঁহার অনেক সময়ে বনিবনাও না হওয়ারই বেশী সম্ভব। এজন্য গৌরীদানের ব্যবস্থা হইল। ছোট মেয়েটা স্বস্ত্রালয়ে আসিয়া অন্নদিনের মধ্যে তাঁহাদের মেহবন্ধনে

ধরা দিতেন। শিল্পর চিত্তে যে সকল ভাব অঙ্কিত হয়, তাহা কোন কালেই মুছিয়া যায় না, এবং মেহের দ্বারা শক্তিশালী বন্ধন আর কিছুই নাই। ছোট বউটি যখন এইভাবে বড় হইতেন, তখন নূতন পরিবারে তিনি অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেন। তিনি দেবরদিগকে নিজের ভ্রাতার মত, স্বস্তর শান্তডীকে পিতামাতার মত দেখিতেন। দাসদাসীরা তাঁহার একান্ত স্বজন হইয়া বাইত। একাদভুক্ত গৃহের সর্বপ্রধান অবলম্বন বধু। এই বধুর সঙ্গে যদি পারিবারিক সামঞ্জস্য না হয়, তবে একাদভুক্ত পরিবারকে আর কোন শক্তি বাধিয়া রাখিতে পারে না। তাহা তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া যায়। শতাব্দিক লোক এক পরিবারে পরম সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কোন বৃহৎ যন্ত্রের শত শত অংশের মত দৃঢ় সন্নিবদ্ধ হইয়া ক্রীড়িতে পারে, তাহা আমাদের পূর্বকালের গার্হস্থ্য প্রদর্শন করিয়াছে। এখনকার পরস্পর-বিরোধী স্বর্ণের বিজ্ঞোহানলের শিখায় প্রদূষিত গৃহ দেখিয়া সে গার্হস্থ্য—যাহা আমরা দেখিয়াছি—তাঁহার মাধুর্য্য অমুভব করা অসম্ভব। মেহগুণে এই অঘটন সংঘটিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য লোকের মনে বিবাহের সঙ্গেই একটা যৌন সম্বন্ধের কুৎসিত ইঙ্গিত আসিয়া থাকে। কিন্তু প্রাচীনকালে, এমন কি আমাদের সময়েও, প্রাপ্ত-বয়স্কা না হইয়া কোন রমণী তাঁহার স্বামিসঙ্গ পাইতেন না। অকালদাম্পত্যের বিরুদ্ধে এত বিদ্‌য, নিষেধ ও টিটকারি,—বিশেষ গুরুজনভীতি থাকিত যে ছোট বউটির সঙ্গে তাহার স্বামী কথা বলিলে তাহাও একটা মস্ত বড় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। শুধু স্বামীর সঙ্গে সদ্ভাব থাকিলেই এদেশের রমণীরা আদর্শ-গৃহিণী বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন না; মেহগুণে তাঁহার দেবরকে লঙ্গনের মত, শান্তডীকে কোশল্যার মত, দাসকে হুমুমানের মত করিতে পারিলে তবে তিনি গৃহলক্ষ্মীর স্থান অধিকার করিবার যোগ্যতা লাভ করিতেন। এখন সেই যৌথ পরিবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—সঙ্গে সঙ্গে রোগীর পথ্য, আত্মুরে সেবা, বিপদের সহায়তা ভাসিয়া গিয়াছে। বড় বড় হাসপাতাল হইয়াছে সত্য, কিন্তু গ্রাম্য চাষাও তাহার দ্রুপুত্রকে সেই সকল চিকিৎসালয়ে রাখিতে সক্ষম হইবে না। একাদভুক্ত পরিবারের আদর্শভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গার্হস্থ্যের প্রধান স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গোবীন্দান এককালে সামাজিক জীবনের জন্ত পরিকল্পিত হইয়াছিল।

পদ্মিনী দ্রৌপদী অপরাপর গুণের মধ্যে নৃত্যগীতে অমুভাগ একটি প্রধান ছিল,—“নৃত্যগীতাত্মক পদ্মিনী পদ্ম-গন্ধা”। আমাদের দেশে শত শত রূপকথায় নায়িকাদের স্বর্গে বাইয়া ইন্দ্রসভায় নৃত্যগীত ও অভিনয় করার কাহিনী আছে। বেহলা নৃত্যে এতটা দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন যে তাহার নাম ছিল “বেহলা নাচুনী”। বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধিকার নানারূপ নৃত্যের উল্লেখ আছে। রাজকুমারীরা এক সময়ে নৃত্যগীত ও চিত্রবিজ্ঞায় পারদর্শিনী ছিলেন, বৃহন্নলার সময় হইতে বহুগুণ পর্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রতকথায় মেয়েদের নৃত্যগীতের বহুস্থানে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং প্রত্যেক ব্রতেই মেয়েরা হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতেন। এখনও পূর্ববঙ্গের সীমান্ত প্রদেশে বিবাহে মেয়েদের নৃত্যপ্রথা প্রচলিত

আছে ; ব্রতকথার “এক কলসী গঙ্গাজল, এক কলসী দি। বছরান্তে একবার ভাঁজো নাচবো না তো কি ?” এবং

“বোল বোল বর্তির হাতে বোল সরা দিয়া।

মোরা বাই ইন্দ্রপুরীর নাটুয়া হইয়া।”

(অবনীন্দ্রনাথ—বাঙ্গলার ব্রত, ৫১ পৃঃ)

ঐতিহ্য মেয়েলী ছড়া ঘরে ঘরে পরিচিত। মুসলমানদের সময় হইতে এই রীতি উঠিয়া যায়, বঙ্গদেশের শত শত কোকিলকণ্ঠ ও খজন-গতি ধামিয়া যায়। যদি একথা কেহ শুনিতে পাইত, যে কোন রমণী ভাল নাচিতে গাহিতে পারেন তবে কি রক্ষা ছিল ? ময়মনসিংহ জেলায় মুসলমান নবাবদের নিযুক্ত এক শ্রেণীর লোক ছিলেন, তাঁহাদের উপাধি ছিল “সিন্দুকী।” হিন্দুর ঘরের রূপবতী ও গুণবতী রমণীদের তিকানা নবাব সরকারে জানাইয়া দেওয়াই তাঁহাদের কাজ ছিল। এই সংবাদ দেওয়ার জন্ত তাঁহারা বিস্তর জায়গীর পাইতেন। পূর্ববঙ্গ-গীতিকার ভূমিকায় এই সিন্দুকীদের সন্ধানে অনেক কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

মোট কথা কনোজের ব্রাহ্মণেরা যে সকল বন্ধনী দিয়া সমাজকে বাধিয়া ফেলিলেন, তাহা আপৎকালের জন্ত বিধান,—তাহা সর্বকালের জন্ত নহে। অর হইলে রোগীর ভাত বন্ধ হয়, পায়ে ঘা হইলে পক্ষিরাজ ঘোড়াকেও দোড়াইতে দেওয়া হয় না, এইরূপ আপৎকালে সমাজকে যে সকল বিধানে রক্ষা করা হইয়াছিল তাহা এখন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। সেই সময়ে আমরা উপস্থিত থাকিলে হয়ত আমরাও এই বিধানই করিতাম। হিন্দুধর্মের নেতৃগণ প্রবীণ ছিলেন, তাঁহারা যে আমাদের গৃহকে আকাশ-বাতাসের স্বাধীন গতিবিধি হইতে বঞ্চিত করিয়া অচলায়তন করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা বাধ্য হইয়াই তাঁহাদিগকে করিতে হইয়াছিল। সমস্ত প্রথা, রীতিনীতি ও যুগ-বিশেষের আইন-কানূনের পশ্চাতে থাকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী। ইতিহাস বাদ দিয়া বিচার করিলে অবিচার করা হয়। দোষের মধ্যে যে ফুলটি এককালে এত সুন্দর থাকে, তাহাও পচিয়া গেলে ঝাঁটিয়া ফেলিতে হয়। রোগ সারিলে ভাত বন্ধ করিয়া রাখা বাতুলতা। এদেশে যখন প্রয়োজনানুসারে যে নিয়ম হইয়াছে তাহাই মেয়েলী শাপ ও স্ববিবাক্যের দোহাই দিয়া সনাতন কালের সামগ্রী করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহারা এ সকল বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করিবার কোনই কারণ নাই। তাহারা প্রয়োজনাতীতরূপে প্রশ্রয় দিয়া বাসী বা পচা জিনিষ ঘরে রাখিতেছেন, তাঁহাদিগকেই আমরা দোষী বলিব। সমস্ত জাতি যখন যে অভাব উপলব্ধি করে, শাপকারেরা তাহাই বিচার করিয়া বিধিবদ্ধ করেন, নতুবা লোকে তাহা মানিবে কেন ?

সেনবংশের শক্তিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ মুসলমানাধিকারে নব হিন্দুধর্মে এই বিধানগুলি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেনেরা ব্রাহ্মণগণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন তাঁহারা স্বাধীন ছিলেন তখন সকল বিষয়ে কড়াকড়ি করার ততটা প্রয়োজন

হয় নাই—সকল সামাজিক ঘটনার পশ্চাতে রাজবল ছিল। কিন্তু যখন পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মণেরাই সমাজের সর্বোচ্চ নেতা হইলেন, তখন নিষেধ-বিধিগুলি প্রবল হইল। বহিঃশত্রুভীত, অত্যাচারে আতঙ্কিত ব্রাহ্মণ অভিনাবকগণ গৃহস্থের দোর আগলাইয়া ‘এটা করিতে নাই,’ ‘ওটা করিতে নাই’ এইভাবে সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দম্ভা গৃহে পড়িলে যেমন উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা যায় না, ঘোর অরাজকতার দিনে তেমন মেয়েরা যদি একটু উচ্চকণ্ঠে কথা কহিতেন, তাহাও দোষাবহ হইত। ব্রাহ্মণের নববিধি-ব্যবস্থার অনেকটাই আপংকালের ধর্ম। এই সকল বিধিব্যবস্থার ফলাফল আমরা বৈষ্ণব অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের সময়-নিরূপণ

বিজয়সেনের রাজধানী ছিল তৎস্থাপিত বিজয়-নগরে। রাজসাহী জেলায় দেব-পাড়াগ্রামে তৎপ্রতিষ্ঠিত বিশাল প্রহ্মেশ্বর-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ মন্দিরের সম্মুখেই বিজয়সেনকৃত প্রকাণ্ড হ্রদ। মন্দিরগাত্রে যে শিলালেখ সংলগ্ন ছিল তাহা একখানি বৃহৎ প্রস্তরে উৎকীর্ণ। তাহা গীত-গোবিন্দোক্ত উমাপতিধর নামক কবির রচনা। বরেন্দ্রের শিল্লগোষ্ঠী-চূড়ামণি রাণক শূলপাণি কর্তৃক এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই প্রশস্তিতে বিজয়সেন-কর্তৃক গোড়েশ্বরের পরাজয়ের উল্লেখ আছে।

এখন পর্য্যন্তও সেন-রাজগণের সিংহাসনে আরোহণ ও রাজত্বকাল সম্বন্ধে ঠিক সময় নির্দ্ধারিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে নানা মূনির নানা মত। আমরা এই সকল তারিখের সূত্র মর্ম্মানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকগণের সঙ্গে কলরব করা নিম্নপ্রয়োজন মনে করি। ইহাদের মোটামুটি রাজত্বকাল সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা সকল ঐতিহাসিকেরই আছে। ২৪৮১০ বৎসরের এ দিক্ সে দিক্ হইলে যে কি ঐতিহাসিক ভ্রটি বা বিভ্রাট ঘটতে পারে তাহা আমরা বুঝি না। এইরূপ সূত্র কালনির্ণয় করিতে বাইয়া লেখকগণ বুদ্ধিবৃত্তির একটা ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। বল্লাল সেন রচিত দান-সাগরের নানা স্থানে প্রাপ্ত অন্ততঃ তিনখানি পুস্তকে উহার রচনা-কাল নির্দিষ্ট আছে। তাহা ১০২০ শক (১১৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দ) চই এক

মুসলমান ইতিহাসের
প্রমাণ।

খানি পুঁথিতে তারিখ দেওয়া হয় নাই। এজ্ঞা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন “সমস্ত পুঁথিগুলিতে যখন ঐ শ্লোকগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন ঐগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।” ইহা বড়ই আশ্চর্য্য অহুমান। “অদ্বুত-সাগর” এক বৎসর পরে

রচিত হইয়াছিল। ১১৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে বঙ্গালসেন পরলোকগমন করিয়া থাকিবেন। রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে লক্ষ্মণসেনের জন্ম ১১১৯ খৃঃ ও মৃত্যু ১১৭৩ খৃষ্টাব্দে। যাহারা হাতের লেখার পুঁথি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন বহুসংখ্যক পুঁথির মধ্যে দুই একখানিতে মাত্র সন তারিখ থাকে। তিনটি ভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত তিনখানি পুঁথিতে যখন একই তারিখ পাওয়া যায়, তাহাই এই তারিখের প্রমাণিকতার বশেষ্ট কারণ। গোড়-বিজয়ের মাত্র ৩৪ বৎসর পরে ইতিহাস-প্রণেতা মিনহাজ এই বিজয়কাহিনী শুনিয়া তদীয় তবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন, তিনি মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজির অধীন সমসামউদ্দীন নামক এক বোদ্ধা, যিনি এই অভিযানের সঙ্গী ছিলেন, তাহার এবং সেই সময়কার অপর একজন সৈনিকের মুখে কাহিনী শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই বুদ্ধ সৈনিক ৩৪ বৎসর পূর্বের কথা যে সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাস করা যায় না। যে রাজাকে তাঁহারা জয় করিয়াছিলেন, তিনি এত বড় লোক ছিলেন যে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রাজগণের মধ্যে তিনি অগ্ৰতম ছিলেন, তাঁহার নাম সন্দেহে সমসামউদ্দীনের ভুল হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর নহে। ‘লক্ষণ’ নামটাকে হিন্দুস্থানীরা ‘লছমনিয়া’রূপে উচ্চারণ করিতে পারে, সুতরাং এই লছমনিয়া যে আমাদের লক্ষ্মণসেন তাহা বলা অযৌক্তিক নহে। দ্বিতীয়তঃ তারিখটা সন্দেহেও মোটামুটি ভাবে সমসামউদ্দীন নিশ্চয়ই কোন ভুল করেন নাই। বঙ্গ-বিজয়ের তারিখ সন্দেহে ঐতিহাসিকগণ যে গগনভেদী কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার প্রভেদ মাত্র দুই কি তিন বৎসর। সমসামউদ্দীন বলিয়াছিলেন ৫৯৬ হিজরায় (১২০০ খৃষ্টাব্দে) মুসলমানগণ নদীয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন। ‘নোদিয়া’ রাজধানী থাকা সন্দেহেও একটা ভুল হওয়া অসম্ভব। অবশ্য অপরাপর বিষয় সন্দেহে অতিরঞ্জন, মিথ্যাপবাদ, স্বপ্নের দৃষ্ট, জনশ্রুতিজাত ভুল ধারণা—এগুলি মিনহাজের প্রদত্ত কাহিনীতে থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু সাফাংক্ষেত্রে যিনি উপস্থিত ছিলেন, তিনি তিনটি বিষয় কখনই ভুল করেন নাই,—স্থানের নাম, রাজার নাম ও ঘটনার সময়। রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে যদি ১১৭০ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মণসেন পরলোক-গমন করিয়া থাকেন, তবে ১২০০ খৃষ্টাব্দে তিনি মুসলমানগণকর্তৃক পরাজিত হইবেন কিরূপে! দান সাগর ও অদ্বুত সাগরের তারিখ দেওয়া আছে, কিন্তু তাহা পাথরে উৎকীর্ণ হয় নাই বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ ঐ তারিখ মানিয়া লইলেই সময়

সন্দেহে সমস্ত অসামঞ্জস্য ও দুরূহ প্রশ্নের সহজে সমাধান হয়।

রাখালবাবুর মত।

বঙ্গাল যদি ১১৬৮-৬৯ খৃঃ অব্দে পরলোকগমন করেন তখন লক্ষ্মণসেনের ৪৯ বৎসর হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে, বরং তাহাই বেশী সম্ভব, যেহেতু বঙ্গালের বিরুদ্ধে লক্ষ্মণসেন যে একটা দল পাকাইয়া তাহার নেতা হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে প্রবল জনশ্রুতি আছে। পিতাপুত্রের মধ্যে বহু শ্লোকের বিনিময় হইয়াছিল। তাহাও বুদ্ধ লোকেরা কহিয়া থাকেন ও সহজিকর্ণামৃত প্রভৃতি পুস্তকে সেই শ্লোকগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। এ দিকে কোলিঙ্গ লইয়া বিবাদের কথাও এদেশে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও গার্হস্থ্য জীবনে উভয়ের মধ্যে যে মনোমালিঙ্গ হইয়াছিল তাহা বঙ্গাল-

গুরু গোপালভট্ট-প্রণীত বঙ্গাল-চরিতে এবং লালমোহন বিজ্ঞানিধির সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থে স্চিত্ত হইতেছে। লক্ষণসেন বঙ্গালের জীবদ্দশাতেই প্রোচুত্রে পৌছিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা অসম্ভব হয় না। সুতরাং সিংহাসনে আরোহণকালে যদি তাঁহার বয়স ৪২ হয় তবে ১২০০ খৃষ্টাব্দে বয়ঃক্রম প্রায় ৮০ বৎসর হয়। এদিকে বঙ্গালসেনের রাজত্বে ৩২ বৎসর পাওয়া গিয়াছে, রাজ্যপ্রাপ্তির সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৩০ ধরিয়া লইলে তাঁহার জীবনও ৬২।৬৩ বৎসর হয়। এই ভাবে নীচের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আমরা পূর্ববর্তী সেন-রাজাদের রাজত্বকালের একটা মোটামুটি হিসাবে উপনীত হইতে পারি। রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন “নবদ্বীপ যে সেন-বংশের রাজধানী ছিল, ইহার কোনও প্রমাণই অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই।” শিলালিপির বা তাম্রশাসনের প্রমাণ ছাড়া অস্তিত্ব প্রমাণ যদি ‘বিজ্ঞানসম্মত’ না হয়—তবে অবশ্যই একথার একটা মূল্য দেওয়া যায়। কিন্তু সকলেই জানেন নবদ্বীপে এখনও একটা প্রকাণ্ড দীঘির অবশেষ রহিয়াছে, ইহার নাম বঙ্গালদীঘি ও তৎপার্শ্বে বিশাল স্তূপ বিস্তারিত, তাহা এখনও বঙ্গাল রাজার বাড়ী বলিয়া লোকে দেখাইয়া থাকে। ১৫১০ খৃঃ অব্দে চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অষ্টমত এই বঙ্গালদীঘিতে স্নান করিতেন, ইহা গোবিন্দ দাস চাক্ষুস দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন এবং তাহার এক ভীরের স্তূপটি যে বঙ্গাল রাজার বাড়ী তিনিও তাহা কহিয়া গিয়াছেন।* আমাদের এই পুস্তক তারিখের খুঁটিনাটি বিচার করিবার স্থান নহে, সুতরাং এ সম্বন্ধে বোগ্যতর ব্যক্তিদের উপর তথ্যনির্ণয়ের ভার দিয়া আমি নিশ্চিত হইতে পারি।

বঙ্গালসেনের রাজত্বকালের একখানিমাত্র তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার মাতা বিলাসদেবী সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে হেমাংক মহাদান সম্পাদন করেন, তাহার দক্ষিণাঙ্করূপ রাজমাতা বাগুদেব নামক সামবেদী এক ব্রাহ্মণকে রাঢ়মণ্ডলের বাগুহিট (ঢাকা জিলার বালিয়াটি কি না?) গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। রাঢ়মণ্ডলের বাগুহিট ঢাকা জেলায় বালিয়াটি বলিতে হইলে উক্ত মণ্ডলের পরিধি অত্যধিক বাড়াইতে হয়। ইহাই তাম্রশাসনের বিষয় এবং ইহা বঙ্গাল-রাজত্বের একাদশাব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল।

বঙ্গাল সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্য মহাশয়ের মতে তিনি ১০৬৩ শকে (১১১১ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গালসেন-সম্বন্ধে অনেক কথা ঘটক-কারিকা এবং বঙ্গাল-চরিত নামক সংস্কৃত কাব্যে লিখিত আছে। সন তারিখ সম্বন্ধে পরবর্তী লোকেরা অনেক গোলযোগ করিয়াছেন কিন্তু এই ঘটককারিকাগুলি সেই সময়ের ঘটনাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণ-পরিবারে প্রচলিত বিশ্বাস ও জনশ্রুতির উপর স্থিত। তাহার অধিকাংশেরই মূলে কিছু সত্য আছে বলিয়া বিশ্বাস হয়।

* “প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় তাহার নিয়ড়।

কেহ কেহ বলে যারে বঙ্গাল সাগর।

বঙ্গাল রাজার বাড়ী তাহার নিকটে।

তাম্রাচর্য্য প্রমাণ আছে তার বটে।” গোবিন্দবাসের কড়চা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৌলিঙ্গ

প্রথমতঃ বল্লালসেন কর্তৃক স্থাপিত কৌলিঙ্গ-সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব। রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কৌলিঙ্গ যে বল্লালকৃত তাহাতে সন্দেহ করেন। কিন্তু আমাদের মতে এই বিষয়টিতে সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ নাই। তিনি বলেন, তাঁহার তাম্রশাসনে উহার উল্লেখ নাই। তাঁহার হই একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাম্রশাসনে কোন রাজার সম্বন্ধে যাবতীয় কথা উল্লেখ থাকিবার কথা নয়। দীপঙ্করের কথা পাল-রাজগণের তাম্রশাসন বা

তাম্রশাসনে কৌলিঙ্গের
উল্লেখ নাই কেন ?

শিলালিপিতে নাই, তজ্জন্ত কি সেই বিখ্যাত ব্যক্তির অস্তিত্ব অবিখ্যাস
করিতে হইবে ? মুসলমানগণের ইতিহাসে হুসেন সাহার সময়ে যে
চৈতন্যদেবের অভ্যুদয় এবং উক্ত সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী 'সনাতন' ও

প্রধান কর্মচারী 'রূপ' যে সেই সময়ে মুসলমান রাজসভা হইতে পলায়ন করিয়া গিয়া বৈষ্ণব
সনাজের অস্ত্রতম নেতা হইয়াছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই। এজন্ত কি চৈতন্য প্রভু,
রূপ ও সনাতনের অস্তিত্ব অবিখ্যাস করিতে হইবে ? তাম্রশাসন ও শিলালেখগুলি মূলতঃ
রাষ্ট্রীয় ইতিহাস। উহাতে প্রধানতঃ রাজাদের যুদ্ধজয়ের কথাই বর্ণিত হইত, সামাজিক কোন
কথা, ধর্মের উত্থান-পতন প্রভৃতি বিষয় তাম্রশাসনে পাওয়া যাইবার কথা নহে। বিশেষ বল্লাল-
প্রবর্তিত কৌলিঙ্গ বল্লালের বহু পরবর্তী কালে স্মৃতিপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। বল্লালের সময়ে এই
কৌলিঙ্গের বহু শত্রু ছিলেন, তাঁহারা উহা মানিতেন না,—এবংবিধ বিষয় তাম্রশাসনে লিপি-
বদ্ধ হওয়ার যোগ্য নহে। সুতরাং একটি ক্ষীণ জলধারার মত এই কৌলিঙ্গ অবশেষে বিপুলতোয়া
নদীর মত সমাজব্যাপী হইয়াছিল—ইহার উল্লেখ এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত একখানি মাত্র তাম্রশাসনে
নাই দেখিয়া তাহার সত্যতায় সন্দেহান হওয়া উচিত নহে। সামাজিক বিষয়ের কোন উল্লেখই
তো আমরা বঙ্গদেশের তাম্রশাসনগুলিতে পাইতেছি না। কনোজ হইতে যে ব্রাহ্মণগণ আনীত
হইয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ বল্লালসেন, লক্ষণসেন, বিশ্বরূপসেন প্রভৃতি কাহারও তাম্র-
শাসনে নাই, কৌলিঙ্গপ্রথা-সম্বন্ধেও কোন কথা সেই সকল তাম্রশাসনে নাই। কিন্তু বিদেশাগত
ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ এখনও আছেন এবং কৌলিঙ্গপ্রথাও বিলম্বিতকালে অবস্থায় বঙ্গীয় পল্লী-
সমূহে এখনও বিদ্যমান। যদি বল্লালসেন এই প্রথা প্রবর্তিত না করিয়া থাকেন, তবে এই অদ্বিত
কৌলিঙ্গপ্রথার উদ্ভাবক অথ কেহ অবশ্যই থাকিত, অন্ততঃ জনশ্রুতিতেও তাহার নাম পাওয়া
যাইত। কিন্তু সমস্ত বঙ্গদেশে, সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে প্রাচীন শত শত কুলীন গ্রন্থে এই কথাটি
পাওয়া যায়—কৌলিঙ্গপ্রথা বল্লালসেন-প্রবর্তিত। তাহারা এই কৌলিঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন
তাঁহাদেরই বংশধরগণ এই কথা পুরুষাভূক্তমে জানিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের কুলজী-
পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন। দানসম্বন্ধীয় পুস্তকে কিংবা জ্যোতিষের গ্রন্থে বল্লালসেন কেনই-বা

সমাজসংস্কারের মত অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিবেন? সুতরাং দান-সাগর ও অদ্বুত-সাগরে কোলিত্তের অস্থল্লখে উহা অগ্রাহ্য হইতে পারে না।

শ্রোত্রিয়দিগের মধ্যে যাহারা নবগুণ (‘‘আচারো বিনয়ো বিজ্ঞা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্, নিষ্ঠা শান্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম’’)-বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা কুলীন এবং যাহারা অস্তুতঃ ছয়টি গুণযুক্ত, তাঁহারা সিদ্ধ শ্রোত্রিয় এবং অবশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা কষ্টে শ্রোত্রিয়ের পর্যায়ে পড়িয়া গেলেন।

বৌদ্ধধর্মের অবনতির সময়ে দেশ আচারভ্রষ্ট হইয়াছিল। এই ধর্ম সমস্ত জগতের নিকট নিমন্ত্রণ-চিঠি দিয়া সর্বদেশীয় লোককে ভারতীয় তোরণের সমীপবর্তী করিয়াছিল। ‘‘তাতার হইতে জলধি-সীমা’’ব্যাপী সর্বস্থানের অধিবাসীরা—চীন, হন, আফগান, পাঠান, মোগল প্রভৃতি সকলেই ধর্মজ্ঞার জন্ত এবং নালন্দা প্রভৃতি বিহারে শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্ত ভারতের অতিথি হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম জগদব্যাপী প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। এই মহাজন-সঙ্গমে হিন্দুর আচার-ব্যবহার ভাসিয়া গেল—আর্য্য-অনার্য্যের রক্ত মিশিয়া গেল। নূতন হিন্দুধর্ম এই আগন্তুকদিগের সমাগম পছন্দ করিলেন না। ব্রাহ্মণেরা জাতিভেদ সমাজে কঠোর করিলেন। বৌদ্ধ জন-সাধারণের মধ্যে যাহারা কৃতাজলি হইয়া ব্রাহ্মণের শরণ লইলেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সঙ্গে নিজেদের ব্যবধানটা সুস্পষ্ট রেখার গণ্ডী দিয়া বুঝাইয়া দিলেন,—ব্রাহ্মণেরাই একমাত্র বিশুদ্ধ জাতি, অপর সমস্ত শূদ্র। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ স্বকঠোর গণ্ডীর মধ্যে আপনাদিগকে সুরক্ষিত করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণের জাতির দাবী অস্বীকার করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, কলিতে শুধু দুই বর্ণ, তৃতীয় বর্ণ নাই, প্রথম ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় শূদ্র। বস্তুতঃ ব্যভিচারের স্রোত বৌদ্ধদিগের শেষ সময়ে এদেশে অবাধে বহিয়া যাইতেছিল। কেহ চীনদিগের মত নানারূপ জীবজন্তুর মাংস ভক্ষণ করিত এবং দ্বৈন্যসম্পর্কে বৌদ্ধতত্ত্বসকল ও সহজিয়া-সম্প্রদায় নানারূপ বীভৎস আচারের প্রদর্শন দিতেন। ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধদিগকে নিরস্ত করিয়া সেনরাজগণের সাহায্যে যে আদর্শের স্থাপন করিলেন তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য পাইল ‘আচার’। ইহাই কোলিত্তের নবগুণের সর্বাপেক্ষা স্থান লাভ করিয়াছে। এই স্বত্রে আচারের প্রাধান্য হওয়ার পর সমাজে ইহার এতটা বাড়াবাড়ি হইয়াছে যে, বর্তমান সময়ে ইহা একটা অদ্বুত উপহাস্যাম্পদ আকারে দাঁড়াইয়াছে। খাজাখাজের বিচার লইয়া ইহার শাসন অত্যাচারীর শাসনের মত হইয়া উঠিয়াছে। ‘আচরণীয়’ কথাটা বঙ্গীয় নিম্নসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিশেষ অর্থজ্ঞাপক হইয়াছে। ঘরে ঘরে যেদিন তান্ত্রিকগণের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া চক্র-গঠনপূর্ব্বক শ্রমশানের শবের মাংস ও মস্তাদি খাইত, সেই সময়ে আচার সত্যসত্যই একটা ধর্ম পরিণত হইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। নব হিন্দু-স্বতীকারেরা ইহার এতটা প্রাধান্য দিয়াছিলেন যে, বর্তমান কালে ইহা হিন্দুসমাজের প্রধান ভিত্তিতে পরিণত হইয়াছে। আমি যদি খুষ্টানের ভজনাগারে যাইয়া তাহাদের মত উপাসনা করি, যদি মুসলমানের সহিত একত্র বসিয়া নমাজ পড়ি, তবুও হিন্দুসমাজ আমার টিকিতে হাত দিবে না, কিন্তু যদি আমি বিছানার উপর ধালা রাখিয়া

অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণ করি কিংবা নিবিদ্ধ পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করি তবে সেই মুহূর্তে আমি সমাজচ্যুত হইব। অবশ্য আজকাল হিন্দুধর্মের এই সকল রীতিনীতি একটু বেশী শিথিল হইয়াছে, কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্বেও এই আচার স্বেচ্ছাচারী রাজার মত হিন্দুসমাজকে শাসন করিয়া আসিয়াছিল। যদি কাপড়ে একটা ভাত লাগিয়া থাকিত, তবে বাড়ীর মেয়েরা সমস্ত ধর্ম নষ্ট হইয়া গেল ইহাই মনে করিতেন। এখনও পাড়াগাঁয়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যে এমন দুইএকজন আছেন, যাহারা দিনরাত্র আচারের অদ্বুত অভিনয় করিয়াও সোয়াস্তি পাইতেছেন না। ক্রমাগত কথায় কথায় শ্রান করিতেছেন, তথাপি দেহের শুদ্ধতা সম্পূর্ণ হইল না ভাবিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছেন। একটি স্ত্রীলোককে জানি তিনি কোন ডোম বা চাঁড়ালের পা বে সকল স্থানে পড়িয়াছে, পাছে তাহা মাড়াইতে হয় এই ভয়ে গঙ্গাপ্রাণের পর বকের মত অদ্বুত ভঙ্গিতে পা বাড়াইয়া কত আশঙ্কার সহিত পথে হাঁটিয়া বান। অপর একজনকে জানি তিনি অল্প কোন গৃহ হইতে কোন পিপীলিকা তাহার রন্ধনশালায় আসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি স্পর্শ করিয়া ধর্ম নষ্ট করে কিনা, ঘরের দ্বারে বসিয়া তাহাই পাহারা দিতে থাকেন, তাহাদের গুরুতর কোন দোষেও তাহারা ততটা ক্ষুব্ধ বা আতঙ্কিত হন না, বতটা অন্নব্যঞ্জনাদি স্পর্শ করিলে উত্তেজিত হইয়া থাকেন। চরিত্রে নহে, আধ্যাত্মিক শক্তি বা নীতিতে নহে, কলিতে ধর্ম অন্নগত হইল। সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবীর মধ্যে সর্বদো আচারের স্থান দিয়া ব্রাহ্মণেরা কতকগুলি উপস্থিত অন্তর্ভুক্ত হইতে সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু এই আচারই এখন হিন্দুর গৃহে নির্মম দস্যুর মত উৎপীড়ন করিতেছে।

কিন্তু নব-ব্রাহ্মণ্য এই ‘আচার’ নামক বিষয়টির সৃষ্টি করে নাই, ইহা পুরাকাল হইতে আর্য্যসমাজে নানা আকারে বিद्यমান ছিল। প্রত্যেক ধর্ম এদেশে আচারকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। যুগে যুগে আচারের রূপের পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু ইহার মূলে যুক্তি থাকুক আর না থাকুক, ইহা আর্য্যধর্ম ও তাহার বিভিন্ন শাখার ভিত্তি গড়িয়া দিয়াছে।

প্রাচীন ঋষিদের আশ্রমে আচারের দৌরাত্ম্য না থাকিলেও উহার শাসন প্রবল ছিল। বেদ-শিক্ষার্থীকে আচার পালন করিতে হইত। গুরু স্বয়ং আচার-পূত হইয়া আচরণ করিয়া শিক্ষার্থীকে আচার শিখাইতেন এবং আচার হইতেই ‘আচার্য্য’ শব্দ উদ্ভূত। যিনি আচার রক্ষা করিতেন না, তিনি ব্যভিচারী।

কতকগুলি আচার সনাতন নীতির অঙ্গীয়,—যথা “সত্যং জয়াং প্রিয়ং জয়াং ন জয়াং সত্যমপ্রিয়ম্। নানৃতং চ প্রিয়ং জয়াং এব ধর্মঃ সনাতনঃ।” কতকগুলি

আচার।

স্বাস্থ্যসম্বন্ধে, যথা “নেক্ষেতোত্তমাদিত্যমস্তং বাস্তং কদাচন।

নোপসৃষ্টং ন বারিস্থং ন মধ্যং নভসো গতম্।” (মহু) কোন

সময়েই সূর্য্য দেখিবে না, একধাটা সোজাসুজি বলিলে লোকে মানিবে না, অধচ কোশলে তাহাই বলা হইয়াছে। সূর্য্যের দিকে চাহিলে চোখ খারাপ হয়, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু কতকগুলি আচার মেয়েলী ব্যবহারজাত—নবব্রাহ্মণ্য সেইগুলির উপরই বেশী জোর দিল। কতকগুলি স্ত্র প্রাচীন স্ত্রকারেরা লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের

উদ্দেশ্য কিছুতেই বুঝা যায় না। প্রসাধন পূর্বাঙ্কে করিতে হইবে। কাংস্তপাত্রে পা ধুইবে না, কাহাকেও ইঙ্গদন দেখাইতে হইলে ইঙ্গদন নাম করিতে হইবে না—‘মণিদন’ বলিবে (বোধায়ন ২—৩—৩২)। কনিষ্ঠকে শ্রীমান্ বলিতে হইবে, প্রজ্ঞেয়দিগকে শ্রীযুত বলিতে হইবে। ক্রিয়াকে কুশল, বৈশ্বকে অনাময় ও শূদ্রকে আরোগ্য জিজ্ঞাসা করিবে (আপস্তম্ব, ১—১৪—২২)। এই আচারগুলি একেবারে নিরর্থক। নবব্রাহ্মণ্য সংহতুক বা অহেতুক আচারগুলি সম্বন্ধে শুধু অনুশাসন প্রচার করিল না, বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। “উদ্ভিতে জগতীনাথে যঃ কুর্য়াদনুশাসনম্। স পাপিষ্ঠঃ কথং ক্রতে পূজয়ামি জনার্দনম্।” ইহার গোণ উদ্দেশ্য একটা পাওয়া যায়—খুব ভোরে উঠিবে—যেন ব্রাহ্মমূর্ত্তে শয্যাভ্যাগ করিয়া শুচি হইতে পারা যায়—কিন্তু এরূপ ‘পাপিষ্ঠ’ বলিয়া গালাগালি কেন? “বিষং বা তুলসীং দৃষ্টা ন নমোদ্ যো নরাদমঃ। স বাতি নরকং ঘোরং মহারোগেণ পীড়্যতে।” যে ব্যক্তি মাঘ মাসে মূলা খায় সে ব্রহ্মবধের তুল্য পাপ করে। বেদপন্থী ঋষি এবং বৌদ্ধগণের আচারসম্বন্ধে নানারূপ অনুশাসন আছে, কিন্তু সত্য কিংবা প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের দোহাই দিয়া রঘুনন্দন বৈষ্ণব হিন্দুসমাজকে দৃঢ়ভাবে “অষ্টপুষ্ঠে” বাঁধিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই।

আর্য্যধর্ম্মের দুই প্রধান শাখা জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মেও অহেতুক আচারের অস্তিত্ব বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধদের বিনয়পিটক এই আচারের একটি পেটিকা বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য হয় না। দস্তকাষ্ঠ কতটা লম্বা হইবে, উপবেশনের পিড়ি কত বড় হইবে, গ্রামে কোন্ ভাবে বাইবে, তথায় কি করিয়া বসিতে হইবে, খাওয়ার রীতি কি, ছুঁচ রাখিবার জায়গাটা কিরূপ হইবে—তাহা চূরবর্গ, ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ প্রভৃতি গ্রন্থভাগে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। জিজ্ঞাসা বাহির করিয়া ভোজন করিতে নাই, চপ্ চপ্ বা শূক শূক শব্দ করিয়া ভোজন করিবে না, (প্রাতিমোক্ষ ৪২—৫৫), এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুশাসন বৌদ্ধগ্রন্থে অনেক আছে—ঋষিদের স্বত্বিতেও অনুরূপ বিধি আছে—বৌদ্ধদের অনুশাসনের একটা সার্বকতা এই মনে হয় যে সমস্ত বাহারা বাস করিতেন, তাঁহাদের রীতিনীতির একটা ঐক্য থাকার দরকার। কিন্তু নবব্রাহ্মণ্যের আচার কত যে উদ্ভট আকারে পল্লীজীবনে দেখা দিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া হাসিব কি কাঁদিব তাহা বলা যায় না। এটা করিতে নাই, ওটা করিতে নাই এরূপ শত শত নিষেধ-বিধি লইয়া পল্লীবাসিনীরা তাঁহাদের আত্মীয় ও সম্ভ্রান্তিবর্গকে বিভীষিকা দেখাইয়া থাকেন। এখন হিন্দুদের ধর্ম্ম যতটুকু থাকুক আর না থাকুক, অন্ধ ও বধির আচার উগ্র হইয়া এই সমাজে বেজদণ্ড পরিচালনা করিতেছে। সর্কদশী মহারাজ দেবতাদের প্রিয় অশোক একবার মেয়েলী আচারের বিরুদ্ধে মুহূর্ত্তে একটু কটাক্ষ করিয়াছিলেন (শিলালেখ ৯)। “শিশুর জননীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক নিরর্থক মঙ্গলাচরণ করেন……………ইহার ফল অন্ন।” তিনি যদি বঙ্গদেশে নবব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে কত যে নিষেধ-বিধি প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা জানিতেন, তবে নিশ্চয়ই তাহা রাজবিধি দ্বারা বারণ করিয়া দিতেন। কোনখানে যাত্রার পূর্বে কাকের নানা ভঙ্গীতে ডাকের

শুভাশুভ ফলের কতকটা তালিকা আমি “বদ্বভাবা ও সাহিত্যে” (ষষ্ঠ সংস্করণ পৃ: ৮৫) দিয়াছি।

আচারের পরই বিনয়—যখন জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত হইয়াছিল তখন বিনয় চরিত্রের ভূষণস্বরূপ হইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দের বিলোপ বা পলায়নের পর অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে তাঁহাদের ধর্ম পূর্ব-গৌরবের স্পর্কার একটা ছায়ামাত্র রাখিয়া গেল। বৃথা প্রজ্ঞাভিমানী লোকেরা এই স্পর্কা-সম্বল হইয়া উঠিল। বাহারা নব-ব্রাহ্মণ্যের শাসন না মানিয়া বিদ্রোহ করিত, সেই সকল ছক্কিনীত লোকদিগের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজ দ্বার রুদ্ধ করিল। কথিত আছে—নবাগত কার্য়ত্বের মধ্যে ‘দত্ত’ এবং বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর ‘গুপ্ত’ ছক্কিনীত ব্যবহারের জন্য অপর সমস্ত গুণের অধিকারী হইয়াও কোলিন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। শেষোক্ত শ্রেণীর নাম এখন “অশুগুপ্ত” হইয়াছে। মহাকুলীন দত্তপাণি বৈষ্ণবগণের মধ্যে পিতার অবাদ্য হওয়ার দরুন কুল হারাইয়াছিলেন (“দত্তপাণি: পিতু: শাপাং সাধ্যভাবমুপাগত:”)। বস্তুত: কোলিন্য সেই সকল লোককে দেওয়া হইয়াছিল, বাহারা ব্রাহ্মণশাসন শিরোগ্রাস্য করিয়া লইয়াছিলেন। এই নূতন সমাজে মৌলিক প্রতিভাশালী ব্যক্তি অপেক্ষা বাহারা শাস্তশিষ্ট হইয়া সমাজের বশীভূত হইয়া থাকিতে সক্ষম ছিলেন, তাঁহারা হই আদৃত হইয়াছিলেন। সেন-গোষ্ঠী নব ব্রাহ্মণসমাজকে পূজা করিয়া লইলেন এবং হিন্দুরাজত্বের অবসানে ব্রাহ্মণেরাই সর্ববিষয়ে কর্তা হইয়া পড়িলেন।

এই নব-ব্রাহ্মণ্য ধনকে উপেক্ষা করিতে শিখাইলেন, প্রতিষ্ঠা ও প্রতাপকে ভুজ্জ বলিয়া অনাদর করিলেন, সমুদ্রযাত্রা নিবেদ্য করিয়া ধনাগমের বৈষ্ণবশক্তি বিলোপ।

পথ রুদ্ধ করিলেন। যে বৈষ্ণবশক্তি গুপ্ত ও পালদের সময়ে ভারতে একাধিপত্য করিতেছিল—নব-ব্রাহ্মণ্য তাহাদিগের অধিকাংশকে অনাচরণীয় করিয়া রাখিলেন। তাহাদের পৃথিবীব্যাপী গতিবিধি থামিয়া গেল। কুবেরের ভাণ্ডার ক্রমশ: হ্রাস পাইতে লাগিল। বণিক্ ‘বেণে’ নামে সমাজের দুগার পাত্র হইল। এক সময়ে বাহাদের আসন রাজাসনের তুল্য ছিল, রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্রের পদবী একরূপ ছিল, সেই ধনকুবের বণিক্দের বংশধরগণ ‘বেণে’ হইয়া সমাজের এক কোণে কথঞ্চিৎ স্থান করিয়া লইয়া কোনরূপে জীবিত রহিলেন। নব-ব্রাহ্মণ্য বৈষ্ণবশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিল। বল্লালচরিতে বর্ণিত হইয়াছে, বল্লালসেন যখন বল্লাভানন্দ শেঠের উপর ক্রোধবশত: সমস্ত স্বর্ণবণিক্ জাতিকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন ব্রাহ্মণেরা একবাক্যে রাজাকে উপদেশ দিলেন, স্বর্ণবণিক্দিগের উপবীত কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে অনাচরণীয় জাতির পঙ্ক্তিতে স্থাননির্দেশপূর্বক একেবারে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে। ধনের শক্তি বড় প্রবল শক্তি, এককাল বৈষ্ণবরা এই শক্তির বলে রাজ্যে অতি প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; এইবার নিঃস্ব কটিবসন দিগম্বর ব্রাহ্মণের হস্তে ধনকুবেরগণ পরাস্ত হইলেন।

বঙ্গে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র ছাড়া কোন জাতি নাই,—এই ঘোষণা করিয়া ব্রাহ্মণেরা কত্রিয়-

দিগেরও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লুপ্ত করিলেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠার উপর একটা কুংসিত গালি বর্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ পার্থিব প্রতিপত্তিকে হতাদর করিলেন। এই ভাবে ক্ষত্রিয়শক্তি ও বৈষ্ণবপ্রভাবের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া নব-ব্রাহ্মণ্য তাঁহার অপ্রতিহত বৈজয়ন্তী সমস্ত বঙ্গদেশের উপর দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিলেন। নব-ব্রাহ্মণ্য এই সকল

ব্রাহ্মণ এবং শূত্র—এই দুই জাতি ছাড়া বঙ্গ আর কোন জাতি নাই।

শিক্ষা নানারূপ অলৌকিক উপাখ্যান ও পৌরাণিক গল্পের মধ্য দিয়া দেশে প্রচার করিলেন। তাঁহাদের এই প্রচারকাণ্ড কত বে উপায়ে সম্পাদিত হইয়া অমোঘ ও বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল, ব্রাহ্মণকে তিথিভেদে দানের

ফল, ব্রাহ্মণের বরদানের ফল, তাঁহাদের অভিষাণের অগ্নিময় ধ্বংসকারী ফল—কথক ঠাকুর, কীর্ত্তনীয়া, পটুয়ারা, পল্লীর চিত্রকরেরা, বক্তৃতায়, গানে, গল্পে, চিত্রে ঘোষণা করিয়া এই ধারণা দেশে এমন বদ্ধমূল করিয়া ফেলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের উপর ভক্তি এদেশের জনসাধারণের মজাগত হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে হয়ত মনে হইতে পারে এই যে ব্রাহ্মণের দীক্ষা এদেশবাসীর পক্ষে শুধুই অহিতকর হইয়াছিল, কিন্তু তাহা নহে, উহা শুধু সমাজের বিশেষ এক সময়ের কতকগুলি অন্তঃস্থ ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য সাময়িকভাবে প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা স্বকীয় প্রভাব সমাজের উপর অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজা ছিলেন না, লোকে তাঁহাদের কথা মানিবে কেন? সুতরাং শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারা একরূপ এক সিংহাসনের সৃষ্টি করিলেন—তাহা কুশাসন হইলেও রাজ-সিংহাসন অপেক্ষা প্রবলতর হইল। এইভাবে হিন্দুজাতিকে ব্রাহ্মণগণ সম্যক বশীভূত করিয়া তাঁহাদের নিরুত্তি-মূলক মহাদ্বন্দ্ব সমাজে চালাইবার সুবিধা করিয়া লইলেন। বিদেশী রাজার রাজত্বকালে এক শ্রেণীর লোক কতকটা কমতামালী হইয়া দেশ শাসন করিতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা যেকোন সমাজব্যাপী প্রভাব দেখাইয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত অন্তঃস্থ সুলভ নহে। এই নব-ব্রাহ্মণ্যের অন্তর্নিহিত একটা মস্ত বড় গুণ ছিল বাহার বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া কলত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহা আমরা পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে বলিব।

বঙ্গালচরিতে বঙ্গালসেনের সহিত সুবর্ণবণিকদের একটা সংঘর্ষ ও মনোমালিণ্ডের বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। সাম্যাল মহাশয় ঘটককারিকা হইতে আর কিছু বিবরণ দিয়াছেন, তিনি কোন্ বহি হইতে কি পাইয়াছেন তাহা লিখেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার পুস্তকে অমূলক বৃত্তান্ত দেওয়া হয় নাই, বরঞ্চ “সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতিপদ্ধতিসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল তাহা সম্পূর্ণ সত্য।” স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—“প্রকৃত সামাজিক ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গ্রন্থকার সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, গ্রন্থকার কেবলমাত্র সংগ্রাহক নহেন, তিনি বহুস্থানে নূতন অঙ্গসকল ও চিন্তার পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।” সাম্যাল মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—“অষ্টাদশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া নানাবিষয়ক বিবরণী সংগ্রহ করিয়া

এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। প্রচলিত ইংরেজী ও পারসী ইতিহাসে পুরাতন জমিদারদিগের সনদ, বংশাহুক্রমিক কিংবদন্তী, শেক ভূভোদয়া, বল্লাল-চরিত, রাঢ়ী ও বায়েজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কুলশাস্ত্র, ভট্টকবিতা এই সমস্ত মিলাইয়া যথাসাধ্য সত্য নির্ণয়পূর্বক এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি।”

যদি তিনি কোন পুস্তক বা কুলশাস্ত্র হইতে কি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পাদটীকায় উল্লেখ করিতেন তবে গ্রন্থখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইত। আধুনিক বড় বড় বাঙ্গলা ঐতিহাসিক গ্রন্থে ঐরূপ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত পুস্তকের নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কতকগুলি যে জাল এবং সম্পূর্ণ অবিখ্যাত তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং ঐ সকল উল্লেখ যে সর্বদাই লেখকের ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করে তাহা নহে, বরঞ্চ সময়ে সময়ে লেখা অশ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে।

সান্ন্যাল মহাশয়ের ইতিহাস লিখিবার শক্তি এরূপ অসাধারণ যে বঙ্গদেশের কোন ইতিহাস এরূপ প্রত্যক্ষদর্শীর কথার তায় কোতূহলপ্রদ ও জীবন্ত হয় নাই। ভ্রমপ্রমাদ সকলেরই আছে; কিন্তু দুর্গাচরণ বাদুর ইতিহাস যে মোটামুটি সামাজিক ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ বহন করে সে সন্দেহে সন্দেহ নাই।

এখন বল্লালসেন এবং সুবর্ণবণিকদের কথা বলিব। বল্লালসেন বৈষ্ণব প্রতাপশালী ছিলেন, তেমনই ছিলেন অমিতব্যয়ী। তাঁহার রাজ্যের আয় ছিল এককোটি বিংশতিলক্ষ। সে সময়ে এ পরিমাণ মুদ্রার প্রকৃত মূল্য অনেক বেশী। এই উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অপরিমিত ব্যয়শীলতার জন্ত তাঁহার কোন সময়েই অভাব মিটিত না। তাঁহার এই অসুচিত অতিরিক্ত ব্যয়জনিত দারিদ্র্য ‘বল্লালী দারিদ্র্য’ আখ্যায় পরিচিত হইয়াছিল। মগধের বল্লভানন্দ শেঠ ছিলেন সেই সময়ের বিখ্যাত ধন-কুবের। বল্লাল তাঁহার নিকট প্রায়ই ঋণ গ্রহণ করিতেন। একবার তিনি দেড়কোটি স্বর্ণমুদ্রা চাহিয়া তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু মগধের পাল-রাজা ছিলেন বল্লভানন্দের জামাতা এবং এই রাজা বল্লালের পরম শত্রু ছিলেন। যে কারণেই হউক বল্লভানন্দ বল্লালের দূতকে

পিতৃপিণ্ড-যজ্ঞ ও তাহার কতকগুলি স্পর্ধিত ও অপ্রিয় উক্তি বলিয়া ঋণদানে প্রকারান্তরে উপসংহার।

অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, “রাজা ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া অর্থক্ষয় করিতেছেন, ইহা রাজার উচিত কাৰ্য্য নহে। এবংবিধ যুদ্ধবিগ্রহে সাহায্য করা আমি অজ্ঞায় মনে করি। প্রজার হিতকর কাৰ্য্যই রাজাদের করা কৰ্ত্তব্য। তবে যদি তিনি বঙ্গভাগে কতকটা ভূমি আবদ্ধ রাখিয়া ঋণ চান তবে আমি দিতে পারি।” এই স্পর্ধিত উক্তিতে রাজা ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন। কিন্তু কি উপায়ে প্রতিশোধ লইবেন, তাহা সহসা নিরূপণ করিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে রাজা এক বিরাট বজ্রের আয়োজন করিতেছিলেন। বলদেব প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্মণের পরামর্শে তিনি পিতৃপিণ্ড যজ্ঞের অস্থানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা তাঁহার পুত্র লক্ষণসেনকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, “তুমি বিক্রমপুর

যাইবা পিতৃব্য স্বথসেন এবং কুমার ঐব প্রভৃতিকে অস্ত্রপুত্রিকাদের সহিত যজ্ঞে উপস্থিত হইবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।" তদনুসারে বিক্রমপুর হইতে বঙ্গালের জাতিগোষ্ঠী—স্বথসেন, বিষ্ণুমল্ল, ধরসেন, বঙ্গসেন, ধর্মসিংহ, কুমার ঐব প্রভৃতি সকলে যজ্ঞোৎসবে যোগদান করিবার জন্ত গৌড়ে উপনীত হইলেন। রাজার প্রিয় (সম্ভবতঃ জাতি) ভীমসেন এই বিশাল দান যজ্ঞের অন্ততম কর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দানার্চ্য দ্বিতীয়-বৃহস্পতিতুলা বলা হইয়াছে। কার্যনির্বাহক ছিলেন লক্ষণসেন এবং ভীমসেন এই দুই ব্যক্তি। রাজ্যের প্রায় সমস্ত লোকই নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। বঙ্গালচরিতকার আনন্দভট্ট লিখিয়াছেন যে, আহুত, অনাহুত ও রবাহুত ব্রাহ্মণগণ শত সহস্র দিগদেশ হইতে রাজধানীতে সমাগত হইলেন, এই সময়ে সমাগত রাজা ও মহামাণ্ডলিকসকল একত্র হইয়া মহারাজ বঙ্গালসেনের পূজা করিয়াছিলেন।

সহসা একটা সামাজিক গোলমাল উপস্থিত হইল। স্বর্ণবর্ণিকদের জন্ত যে পদ্ধতিতে আসন নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা সেইখানেই মত্ততা করিয়া না খাইয়া চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন এবং রাজপ্রাসাদ হইতে কেহ বহির্গত হইয়া গেলেন। কেহ বা আসন ত্যাগ করিতে পা বাড়াইলেন, এমন সময়ে ভীমসেন তথায় উপনীত হইয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে খাইয়া দাইতে অনুরোধ করিয়া অসন্তুষ্টির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—“মহাশয় শুভ্রন, বড়ই ছোঁয়াছুঁয়ি হইতেছে, তজ্জন্ত আমরা ভোজন করিতে অক্ষম। (তচ্ছ দ্বা বণিজঃ প্রাহঃ শ্রয়তাং ভো মহাশয়। স্পৃষ্টাস্পৃষ্টিঃ সমভবৎ তদর্থাং ভোক্তুমক্ষমাঃ)।” তাঁহাদের শূদ্রদের সমিহিত কোন স্থানে আসন দেওয়া হইয়াছিল এজন্ত তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভীমসেনের সঙ্গে ইহাদের বাদানুবাদ হইয়াছিল এবং উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি পরস্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। বণিকেরা কিছুতেই খাইলেন না, অভুক্ত চলিয়া গেলেন।

“নৃপতি-বল্লভ” ভীমসেন এই ব্যাপারটা রাজার কর্ণে একটু উত্তেজিত ভাষায় বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন, “হ্রাশয় বল্লভানন্দের প্ররোচনায় এই বণিকদের স্পর্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার জামাতা মগধাধিপতি। এই অহঙ্কারে তাহার স্পর্ধা বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে। (ধরাং স মত্ততে তেন শরাবমিব গর্কিতঃ) এই কথা শুনিয়া বঙ্গালের সর্বশরীর কোপে কম্পমান হইল এবং দস্ত কিড়িমিড়ি হইতে লাগিল, মাথা ঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং “পপাত মস্তকাং তত্র কিরীটং হীরকোজ্জলম্” এবং হীরকোজ্জল মুকুট মস্তক হইতে পড়িয়া গেল। আনন্দভট্ট এই ব্যাপারের সবিস্তার বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হইতে আমি সংক্ষেপে ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম।

সাম্রাজ্য মহাশয় আর একটি কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে দেখা যাইবে যে, সোনার বেনেদের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্ত বঙ্গাল এই সময়ে এক সুবিধা পাইলেন। তাহা এই—কুন্দনাচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণ গৌড়ে বাস করিতেন; তাঁহার অল্পপস্থিতিকালে অন্ধরূপে একটি ব্রাহ্মণ তাঁহার দ্বারে অতিথি হইলেন। কুন্দন-পত্নীর

হস্তে এক কপর্দকও ছিল না, তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজদত্ত স্বর্ণধেনু, মণিদত্ত নামক এক স্বর্ণবণিকের নিকট বাধা রাখিয়া কিছু সম্বল সংগ্রহপূর্বক আতিথ্য করিলেন। পরদিন কুন্দন গৃহে আসিয়া সমস্ত কথা শুনিলেন এবং সেই ধেনুর পুতুলটি মুক্ত করিবার জন্ত মণিদত্তের দোকানে উপস্থিত হইলেন। মণিদত্ত লোভে পড়িয়া সেই ধেনু বাধা দেওয়ার কথা অস্বীকার করিলেন। কুন্দন নগরপালকে সংবাদ দিলেন,—এদিকে মণিদত্ত স্বর্ণ ধেনুটি গলাইয়া একটা টেপু তৈরী করিয়াছিলেন। স্বর্ণধেনুর ওজন ১০৮ তোলা ছিল, এই টেপুর ওজনও তাহাই,—এজন্ত নগরপালের মনে সন্দেহ হইল। কুন্দন-আচার্য্য জেদ করিয়া বলিলেন, তাঁহারই সোনার ধেনু গলাইয়া মণিদত্ত ঐ টেপু তৈরী করিয়াছেন। মণিদত্ত ছিলেন বল্লভানন্দ শেঠের ভাগিনেয়। বল্লভ নিজে এই নোকদমার বিচারের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি স্বর্ণবণিকদিগকে শাস্তি দিবার এটি একটি মন্ত বড় সুযোগ মনে

করিলেন। তিনি বল্লভানন্দকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কুন্দন আচার্য্য ও মণিদত্ত।

এই টেপুতে অস্ত্র কোনরূপ ধাতু মিশান আছে কি না। ভাগিনেয়কে রক্ষা করিতে বাইয়া বল্লভানন্দ বলিলেন ‘টেপু খাটি সোনার নির্মিত।’ বল্লভ অত্যন্ত স্বর্ণবণিকদিগকে টেপু পরীক্ষা করিতে দিলেন। দলপতি বল্লভানন্দের প্রভাবে তাঁহারা সকলেই মিথ্যাকথা বলিলেন। স্বর্ণ-নির্মিত ধেনুতে অবশ্য কিছু খাদ থাকিবে, কিন্তু স্বর্ণবণিকেরা একবাক্যে বলিলেন—টেপুতে কোন খাদ নাই। বল্লভ শ্রাবণিক ও গন্ধবণিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—“এ বিষয়ে আমরা নির্ভুল মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিব না; যেহেতু বিষয়টিতে আমরা অনধিকারী—আপনি স্বর্ণকারদিগকে জিজ্ঞাসা করুন।” পূর্বেই বলা হইয়াছে, বল্লভানন্দ ছিলেন ধনকুবের; তাঁহার ঘরে বোলকোটা স্বর্ণমুদ্রা মজুত ছিল। তিনি উৎকোচ দিয়া স্বর্ণকারদিগকে আপনার দিকে টানিয়া আনিলেন, তাঁহারা একবাক্যে মিথ্যা কথা বলিয়া তাঁহারই সমর্থন করিলেন, কিন্তু বল্লভের সন্দেহ ঘুচিল না। তাঁহার গুপ্তচরেরা বল্লভানন্দের চক্রান্তের কথা আভ্যাসে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ইঙ্গিত দিল। তিনি কাশী হইতে একদল স্বর্ণকার আনাইলেন। বল্লভানন্দ তাঁহাদিগকে ধরিতে ছুঁইতে না পারে,—এই জন্ত তিনি তাহাদিগকে শাস্ত্র-বেষ্টিত করিয়া বন্দীর মত লইয়া আসিলেন। তাঁহারা বিশেষ করিয়া টেপু পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিলেন যে ঐ টেপুর সোনায়ে কিছু অষ্টধাতু ও অলঙ্ক মিশ্রিত খাদ বিद्यমান। কাশীর স্বর্ণকারদিগের পরীক্ষা করার পর আর কাহারও সন্দেহ রহিল না যে মিশ্রিত ধাতুতে স্বর্ণ-ধেনু প্রস্তুত হইয়াছিল—এই টেপু তাহা ভাঙ্গিয়া গড়ান হইয়াছে। রাজা এইবার বিচারাসনে সিংহবিক্রমে বসিলেন এবং ব্রাহ্মণদের পরামর্শ অনুসারে এই আদেশ দিলেন, “যেহেতু সমস্ত স্বর্ণবণিক ও স্বর্ণকারেরা অর্থলোভে রাজসভায় মিথ্যাশাস্ত্য দিয়াছে—

তাঁহারা অস্ত্র হইতে পতিত হইল।” তিনি কুন্দন আচার্য্যকে

সোনার টেপু ও ক্ষতিপূরণ দিয়া বিদায় করিলেন এবং স্বর্ণবণিকদের উপবীত কাড়িয়া লইয়া শুধু তাহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া ছাড়িলেন না, তাহাদের সমস্ত

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন। এই ধনকুবেরদের সমস্ত সম্পত্তি খাসদখল করিবার পর বঙ্গালের স্বচ্ছলতা হইল। তিনি তাহাদিগকে এইভাবে নিঃস্ব করিয়া বগদির (বকদ্বীপের) দক্ষিণাংশে নির্বাসিত করিলেন।

মগধরাজের শত্রুর বঙ্গভানন্দ এই ব্যাপারটায় একটুও দমিয়া পড়িলেন না। বাঙ্গলার পশ্চিম হইতে কুর্মীরা দলে দলে এদেশে আসিয়া ভূত্যের কাজ করিত। গৌড় দাস-ব্যবসায়ের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল। বঙ্গালচরিতে লিখিত আছে, বঙ্গালের নিপীড়নে সুবর্ণবিণিকেরা সস্ত্রীক দেশেবিদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন। “অযোধ্যাং প্রবয়ঃ কেচিৎ কেচিন্মূলগিরিস্তথা। চন্দ্রমায়ুতং পাটলীক তাম্রলিপ্তীক কেচন। তথোদয়ং পুরং কেচিৎ কেচিন্মানগচং যয়ুঃ।” কিন্তু বঙ্গালের দৌরাণ্ড্যে এবং বঙ্গভানন্দের চক্রান্তে দাস-ব্যবসায়ীরা গৌড়ের পথ বন্ধ করিল, এবং দাসদের মূল্য দ্বিগুণ-ত্রিগুণ বাড়াইয়া দিল। ফলে এদেশে ভূত্যাভাবে উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের মহাকষ্ট উপস্থিত হইল।

ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বঙ্গাল কৈবর্তদের প্রধান মহেশকে মহামাণ্ডলিকের পদ দান করিয়া কৈবর্তজাতিকে সেবার অধিকার দিলেন। দিক্‌বাক ও ভীমের বিদ্রোহিতার

কৈবর্ত প্রভৃতি জাতির প্রতি অশুভ্রম। জন্তু পালরাজগণ তাহাদিগের জল অনাচরণীয় করিয়া সমাজে অপাঙ্কত্ব করিয়া রাখিয়াছিলেন। বঙ্গাল তাহাদিগকে সেবার

অধিকার দেওয়াতে তাহারা কৃতার্থ হইল। বঙ্গাল সেনার বেণেদের প্রতি অত্যাচার করিয়া জনসাধারণের প্রীতिलाভের জন্তু মালাকার, কুস্তকার, কর্মকার প্রভৃতি জাতি লইয়া ‘নবশাখ’ (হিন্দু সমাজের নূতন শাখা) সৃষ্টি করিলেন। আর্য্যসমাজে ইহারা স্থান পাইয়া বঙ্গালের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়াছিল। বঙ্গালচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে এই সকল কথা বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

বঙ্গালচরিত ও সাংখ্যাল-বর্ণিত উপাখ্যানের মধ্যে অতিরঞ্জন, প্রবাদেব মিশ্রণ ও সত্য-সত্যের সংযোগ অবশ্যই আছে। তথাপি মোটামুটি ঘটনাগুলি বিচার-সহ ও প্রামাণিক বলিয়াই মনে হয়।

দ্বিতীয় উপাখ্যান পদ্মিনী-সংক্রান্ত। বঙ্গালচরিত ও বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস এই উভয় পুস্তকেই এই কাহিনীটি দৃষ্ট হয়। পদ্মিনী হাড়ীর কন্যা—পরমাসুন্দরী, বঙ্গাল ইহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করেন। হাড়ীর কন্যাকে রাজপ্রাসাদে আনিয়া বঙ্গাল তাহার আজীবন ভূত্যের ছায় বশীভূত হইয়া পড়েন। লক্ষ্মণসেনের মাতা তান্দ্ৰা (কাহারও কাহারও মতে বঙ্গভা) দেবী পট্টমহিবীর স্বাভাবিক ভাবেই রাজার একরূপ ব্যবহার দ্বঃসহ হইবার কথা। ঘটনাটি লইয়া পিতাপুত্রে বিরোধ জন্মে। বঙ্গাল পট্টমহিবীর বাবতীয় সম্মান পদ্মিনীকে দিতে কৃতসঙ্কল্প হন। পদ্মিনীর রান্না করা ভাত বৈষ্ণবজাতির মধ্যে সম্ভ্রান্তব্যক্তি মাত্রকেই খাইতে আমন্ত্রণ করেন। খুব ভারী সোণার পিড়ি ও সোণার পান-ভোজনের আসবাব পুরস্কার দিয়া তিনি বৈষ্ণবগণকে প্রলুব্ধ করেন। এই কথা পূর্বে (পৃঃ ৪৬৪) একবার উল্লেখ করিয়াছি। বাহারা প্রলুব্ধ হইয়া রাজ-সাঁদে পা দিয়াছিলেন

তাহাদের বংশধরেরা এখনও “স্বর্ণপীঠা” উপাধির ব্যঙ্গ বহন করিয়া সমাজে অবজ্ঞাত হইয়া আছেন।

পদ্মিনীর ব্যাপারটা লইয়া খুব বাড়াবাড়ি চলিয়াছিল, এমন কি রাজগুরু ‘ভীম ওঝা’ স্বগ্রাম কালিয়া ত্যাগ করিয়া দূরে বাস করিতে লাগিলেন। অনেক শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ রাজদরবার হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বল্লালের প্রকৃতি উদার ছিল, তাহারাই তাহাকে বর্জন করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের বৃত্তি বন্ধ করেন নাই। এক সময়ে লক্ষণসেন পিতার বিরুদ্ধে সৈন্ত-সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু বল্লাল তাহাকে মার্জনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, লক্ষণসেনের পুত্র মধুসেন মৃত্যুকালে তাহার সঙ্গে দেখা করিলে তিনি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বুকে রাখিয়াছিলেন; তাহার গলদেশে নেত্র তাহার মনের আনন্দ বুঝাইয়াছিল, মুখে তাহার ভাবা ফোটে নাই। বল্লালসেনের চরিত্র সম্বন্ধে

সাম্রাট মহাশয় ক্ষুদ্র যে কয়েকটি ছত্রে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,

বল্লাল-চরিত্র।

তাহা প্রণিধানযোগ্য,—“তিনি গুরুজনের নিকট আদরের ছেলে,

যজ্ঞস্থলে পরম ধার্মিক ও দাতা, সভামধ্যে পণ্ডিত, যুদ্ধস্থলে মহাবীর, শত্রুদমনে চতুর ও প্রবঞ্চক এবং উপপত্নীর আগারে লম্পট মাতাল ছিলেন, পণ্ডিতেরা তাহাকে ‘নৃপেশু বল্লালঃ শ্রেষ্ঠঃ’ বলিয়া শ্রদ্ধা দেখাইতেন।”

লক্ষণসেনের সহিত তাহার অনেক শ্লোকের বিনিময় হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। আমরা সেই সকল শ্লোকের কতকগুলি দেখিয়াছি। সেগুলি পিতাপুত্রের রচিত অথবা ইহাদের কলহঘটিত প্রবাদ অবলম্বন করিয়া কোন তৃতীয় ব্যক্তি রচনা করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। শেবোক্ত অনুমানই বেশী সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। তবে উভয়েই যে সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। * কেহ কেহ বলেন বল্লাল-রচিত ‘দান-সাগর’

*

শৈত্যং নাম উপস্থাপন সহজঃ স্বাভাবিকো বজ্জতা

কিং ক্রমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যতাপরে।

কিং চাতঃ পরমঃ তব স্ততিপদঃ হং জীবনং জীবিনাং

হং চেরীচপথেন গচ্ছসি পরঃ কথ্যং নিরোদ্ধং ক্ষমঃ। (লক্ষণসেন)

হে জল তুমি স্বভাবতঃই অতি শীতল, তোমার বজ্জতাও স্বাভাবিক, তোমার পবিত্রতার কথাই বা আর কি বলিব? তোমার সংস্পর্শে লোকে শুচি ও পবিত্র হয়, হুতরাং তুমি নিজে কত পবিত্র, তাহা বুঝিতেই পার।

আর তোমার ইহা অপেক্ষা প্রশংসার কথাই বা কি থাকিতে পারে, যে তুমি সমস্ত জীবের জীবনধরপ। অতএব হে পবিত্র পাবনকারি, যদি তুমি নীচ পাণে গমন কর, তবে কার সাধ্য তোমাকে নিরোধ করিবে?

তাপো নাপগতত্বা ন চ কৃশা ধোতা ন ধূলী তনো-

ন বজ্জলমকারি কলকবলঃ কা নাম কেলীকথা?

দুরোধকিপ্তকরেণ হস্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী

আরকো মধুপৈরকারণমহো বজ্জার-কোলাহলঃ। (বল্লালসেন)

ও 'অন্তুত-সাগর' নামক যে ছইটি বৃহৎ গ্রন্থ আছে তাহার অধিকাংশ বঙ্গালের সভাপণ্ডিত অনিরুদ্ধ ভট্ট রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। সায়াল মহাশয় লিখিয়াছেন—পদ্মিনী প্রকৃত পক্ষে হাড়ীর মেয়ে ছিল না। বঙ্গভানন্দকে সমাজ-চ্যুত করায় প্রতিশোধ দেওয়ার নিমিত্ত বঙ্গভক্তা পদ্মিনী হাড়ী বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদানপূর্বক রাজার ও তাঁহার আত্মীয়গণের জাতি নষ্ট করিয়াছিলেন। বঙ্গালসেনের সাক্ষি-বিগ্রহিক ছিলেন হরি ঘোষ এবং নৌ-বিভাগের কর্তা ছিলেন মহেশ, এখনও মহেশপুর গ্রাম তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। বঙ্গালের জয়-স্বাক্ষার বিজয়পুরে ছিল।

বদিও ভিন্সেন্ট স্মিথ এবং রাখাল দাস দান-সাগরের তারিখ অগ্রাহ্য করিয়া বঙ্গালসেনের মৃত্যু ও লক্ষণসেনের সিংহাসনে আরোহণের সময় ১১১৯ খৃঃ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরা নানা কারণে লক্ষণসেনের রাজত্বকাল ১১৬৯ হইতে ১২০০ খৃঃ পর্য্যন্ত ব্যাপক মনে করিয়াছি। লক্ষণসেন যৌবনকালে মহাবীর রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি কলিঙ্গ জয় করেন, মাধাই নগরের তাম্রশাসনে এই বিজয়-গাথা প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার মূর্তি বীরস্বয়ংক ছিল। তাঁহার বাহু বারণ-হস্তসদৃশ ছিল এবং বক্ষঃ শিলাসংহত ছিল। তিনি শৈশবে গঙ্গা-সৈকতে শরসন্ধান শিখিতেন। বদিও কামরূপ তাঁহার পূর্বেই সেন-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার সময়ে বিদ্রোহের ঘোঁরা সেই দেশ হইতে নির্গত হইতে

গ্রাসতাপিত হাতী কেবলমাত্র জলে পা দিয়াছে, এখনও তাহার শরীরের তাপ দূর হয় নাই—তাঁহার লিপাসা এখনও নিবারিত হয় নাই—এমন কি, বেহের খুলিও খোঁওয়া হয় নাই। সে এপ্যাস্ত জলে নামিয়া ছুটি কন্দুলও খায় নাই। জল-কেলীর কথা এখন কোথায়? আর তাঁহার প্রনারিত কব-খারা পদ্মিনীকে স্পর্শও করে নাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে জমরগুলি মহা অকার-কোলাহল করিয়া উঠিয়াছে।

পরীবাদন্তথো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং
অতথাস্তথো বা হরতি মহিমানং জনরবঃ।
তুলোত্তীর্ণতাপি প্রকটিতহতশেষতমসঃ
রবেত্তাদৃক্ তেতো ন হি ভবতি কস্তাং গতবতঃ। (লক্ষণসেন)

লোকপবাসে মহৎ ব্যক্তির মহিমা নষ্ট হয়—তাঁহা সতাই হউক আর মিথ্যাই হউক। তুলা রাশিতে থাকিয়া সূর্য্য বরকিরণদ্বারা অশেষ রূপ অজকার নষ্ট করেন, কিন্তু তথাপি কস্তা রাশিতে সংক্রামিত হইলে সে তেজও মন্দীভূত হয়।

স্থাপাশো ভীতেয়াঃ কথমপি কলঙ্কস্ত কণিক।
বিধাতুর্দৌষোহয়ং ন চ গুণনিষেস্তস্ত কিমপি।
ন কিং নাত্রেঃ পুত্রো ন কিম্ব হরচূড়ার্নমনি-
ন বা হস্তি কাস্তং বগছপরি কিং বা ন বসতি? (বঙ্গালসেন)

গুণনিধি চন্দের যে কলঙ্ককণা তাঁহা কি তাঁহার নিজের দোষ না বিধাতার দোষ? সেই অজ্ঞ কি চন্দের অজির পুত্র এই নাম হারাইয়াছেন, না লিচুড়ার স্থান পান নাই, অথবা পৃথিবীর অজকার দূর করিতে কি অসমর্থ হইয়াছেন, কিংবা বগতের উর্দ্ধ হইতে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছেন?

দেখিয়া তিনি যথাসময়ে সেই অগ্নি নিবারণ করিয়াছিলেন। কামরূপ অভিযানে তাঁহার বীরত্ব বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। তিনি কাশীরেশকে পরাস্ত করিয়া কান্তকূজ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজয়-স্তম্ভ অসি-বরণার সঙ্গমস্থলে এবং পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণীতে বজ্র-মূপের সহিত প্রোধিত হইয়াছিল। এইভাবে বিজয়ী লক্ষ্মণসেন সমস্ত আর্য্যাবর্তে রণকৌশলনিপুণ প্রবীণ রাজা বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন।

তিনি স্বয়ং শ্রুতকবি ছিলেন এবং বিক্রমাদিত্যের দ্বায় তাঁহার রাজসভা কলকণ্ঠ কবিগণের সুরলহরীতে মুখরিত ছিল। এই কবিদের মধ্যে “ধোয়ী” অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাকে রাজ-সভাসদৃ কবি বলা যায় না; কারণ তদীয় কাব্য পবনদূতে দৃষ্ট হয়, তিনি লক্ষ্মণসেনের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন। শ্বেতহস্তী, স্বর্ণচ্ছত্র প্রভৃতি নানা মূল্যবান রাজযোগ্য উপহার দিয়া

লক্ষ্মণসেন ধোয়ী কবিকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। “পবনদূতে”

ধোয়ী কবি।

লক্ষ্মণসেনের বিরহে কোন যক্ষাঙ্গনা পবনকে দৌতো নিযুক্ত করিয়া

যে সকল উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা মেঘদূতকে স্মরণ করাইয়া দেয়। লক্ষ্মণসেনের সমকালবর্তী বৈষ্ণবংশের ধোয়ী নামক এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির উল্লেখ আমরা কুলজী গ্রন্থে পাই। তিনি ঋতধর বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। তাঁহার বংশধরগণ এখন ২১২২ পর্য্যায়ে চলিতেছে। এক শতাব্দী তিন পুরুষ হিসাবে ধরিলে ধোয়ী সাতশত বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন, সুতরাং ধোয়ীকে লক্ষ্মণসেনের সমকালবর্তী বলিয়া মনে হয়। এই ধোয়ী বৈষ্ণবদের অনেক বীজপুরুষ। শক্তি গোত্রে ছয়টি বীজপুরুষ ছিলেন। কিন্তু ধোয়ী বিত্তা, প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্য্যে এত বড় হইয়া উঠেন যে শক্তি গোত্রের ছয় ধারার যে ছয়জন বীজপুরুষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ইনি তাঁহাদিগের সকলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিলেন। শক্তি গোত্রে আর ছয়জন বীজপুরুষ থাকার সঙ্গেও এক ধোয়ীকে শক্তি গোত্রের একমাত্র বীজপুরুষ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। চন্দ্রপ্রভায় লিখিত আছে, “পুণ্ডরীক সেনাত ও হুজোহজনি ধুয়ী সেনঃ বভূব বীজী স চ শক্তি বংশেহনবত্ত বিত্তাকুল সম্পদাত্যঃ”, তিনি শক্তি বংশে অনবত্ত বিত্তা, কুল ও সম্পদশালী হওয়াতে “বীজী শক্তি গোত্রেব সর্বেষেব প্রকীর্তিতঃ,” অর্থাৎ ছয়টি বীজী থাকিলেও সমস্ত শক্তি কুলের তিনি একমাত্র বীজী বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকেন। পবনদূতের অবতরণিকায় কবি নিজের সম্বন্ধে যে সকল শ্লাঘাপূর্ণ উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে এই দুই ধোয়ী একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। কবি জয়দেব ধোয়ীকে “স্বাপতি” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও যেন মনে হয় যে তিনি রাজতুল্য সম্পন্ন ছিলেন এইরূপ ইঙ্গিত আছে। স্বাপতির অর্থ ভুবনপতি, কবিভুবনপতির অর্থ কবিরাজ—তথাপি ঐ ‘স্বাপতি’ শব্দে যেন একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়া জয়দেব ধোয়ীকে ভুবন-পতি বা রাজতুল্য ছিলেন, তাহাও বুঝাইয়াছেন। বৈষ্ণুকুলগ্রন্থে ধোয়ীর পিতার নাম পুণ্ডরীক ও পিতামহের নাম ত্রীবংশ। ছঃখের বিষয় পবনদূতের প্রদত্ত কবির আত্মবিবরণ বা জয়দেবের টীকায় ধোয়ীর পিতা-পিতামহের নাম উল্লিখিত হয় নাই। সেক শুভোদয়াতে আর এক ধোয়ী কবির উল্লেখ আছে। ইনি জাতিতে তাঁতি ছিলেন এবং অতি দরিদ্র ছিলেন; তাঁহার দৈন্ত্যবস্থা

এবং বংশের হীনতার জন্ত তিনি ভদ্রসমাজে অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার কবি হওয়ার স্পর্ধা দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে বাধিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

লক্ষণসেনের আর একজন সভাকবি ছিলেন, উমাপতি ধর। ইনি বিজয়সেনের প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। ইহার ভাষা অতি আড়ম্বরপূর্ণ ছিল। তাঁহার বাক্য-পল্লবের সেই জগৎস্প-নির্নাদের প্রতি জয়দেব যে ক্রূর ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহা সেই প্রশস্তি পাঠ করিলে সহজেই প্রমাণিত হয়। বৈষ্ণবকুলগ্রন্থে ধোয়ীর সমসাময়িক একজন উমাপতি ধরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। “উমাপতি ধরো বীজী ধরবংশে চ বিপ্রতঃ। স এব কাশ্যপগোত্রো জাতো নৃপতি-বল্লভঃ।” বৈষ্ণবগণের যে সকল বীজপুরুষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের সকলেই বল্লালসেন এবং লক্ষণসেনের সমকালিক। সেই সময়েই ইহারা কোলিত্তমর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্বোক্ত সমস্ত শ্লোক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতাগ্রগণ্য ভরত-মল্লিকের চন্দ্রপ্রভা নামক পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে। লক্ষণসেনের সময়ে উমাপতি ধর বল্লালের কুলমর্যাদা পাইয়া ধরবংশে বীজী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি লক্ষণসেনের সময়ে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। ইহা ছাড়া তৎসম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে যাহাতে তাঁহাকে লক্ষণসেনের রাজকবিদের অল্পতম বলিয়া ধারণা হয়। তিনি “রাজবল্লভ” ছিলেন। ইনি কি লক্ষণসেনের প্রিয় কবিপঙ্ককের একজন নন? উমাপতি ধর শুধু কবি ছিলেন না,—তিনি রাজসভার অল্পতম মন্ত্রী ছিলেন। সেক শুভোদয়াতে লিখিত হইয়াছে যে মাধবী নামী কোন বণিক-বধুকে ধর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে রাজশালক কুমারদত্ত তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়াছিল। মাধবী উচ্ছ্বল বেশভূষায় রাজসভায় উপনীত হইয়া কুমারদত্তের নামে অভিযোগ উপস্থিত করে। উমাপতি ধর খুব আগ্রহ দেখাইয়া মাধবীকে অভিযোগ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন ভ্রাতাকে বিপন্ন দেখিয়া রাজী বল্লভা স্বয়ং রাজসভায় উপনীত হইয়া ব্যাতীর দ্বায় ক্রুদ্ধ কটাক্ষে মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমার ভ্রাতার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার কে করিবে, জানিতে চাই। হে সভাসদগণ, এই উমাপতি ধর অতি পাপিষ্ঠ, এই ব্যক্তি মাধবীকে আমার ভ্রাতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে” তখন উমাপতি ধরের মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল—সে মুখে উত্তর জুটিল না, বিজয়সেনের প্রশস্তি-লেখক উমাপতি ধর লক্ষণসেনের সময়ে অবশ্য বয়সে প্রাচীন হইয়াছিলেন। তিনি রাজমন্ত্রীর কার্য করিতেন, সেক শুভোদয়ায় উল্লিখিত আছে। মিথিলাবাসী কৃষ্ণদত্তকৃত গঙ্গানামী গীতগোবিন্দের টীকায় পাইতেছি :—“উমাপতিধর-নামা লক্ষণসেন-গৌড়েন্দ্র-সচিবঃ।” *

কবি গোবর্দ্ধনাচার্য “আর্য্যাসপ্তশতী” নামক পুস্তক রচনা করেন। ইহার পদলালিত্য

* সেক শুভোদয়া ও মিথিলাবাসী কৃষ্ণদত্তের গঙ্গা নামী গীতগোবিন্দের টীকা—উভয় পুস্তকেই উমাপতি ধর লক্ষণসেনের মন্ত্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। চন্দ্রপ্রভার উমাপতি ধরও লক্ষণসেনের সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ‘রাজবল্লভ’ বলিয়া উল্লিখিত, সুতরাং ইহারা অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়।

স্ববিদিত। লক্ষণসেনের সময়ে ইনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। সেক শুভোদয়া গ্রন্থে গোবর্দ্ধনের
 সন্ধর্কে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণ
 গোবর্দ্ধনাচাৰ্য্য।

এবং দেবকর চরিত্রবান্ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। যখন রাজ্ঞী
 বল্লাভা দেবী তাঁহার ভ্রাতা কুমারদত্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার দরুন সকলের সমক্ষে
 মাধবীকে অতি কুৎসিত ভাষায় গালি দিতে লাগিলেন এবং মন্ত্রী উমাপতি দরকে হুঁকাক্য
 বলিয়া নিরস্ত করিয়া দিলেন, তখন রাজ্ঞীর সেই ক্রোধ-প্রদীপ্ত মূর্তি দেখিয়া স্বয়ং পরম-
 ভট্টারক শ্রীশ্রীমল্ললক্ষণসেনদেব মাথা হেঁট করিয়া আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন। সেই সময়ে
 কৌপীনসার ঋষিকর আচার্য্য গোবর্দ্ধন খনিত্রহস্তে রাজ্ঞীকে বধ করিতে উদ্বৃত্ত হইলেন,
 তারপর লক্ষণসেন সিংহাসনের যোগ্য নহেন, এই বলিয়া “শ্রীমতাং রাজ্যাং অচিরাদষ্টং
 ভবিষ্যতি” এই অভিসম্পাত করিতে করিতে দণ্ডকমণ্ডলুহস্তে রাজসভা হইতে বাহির হইয়া
 পড়িলেন। এই ঘটনাটি সেক শুভোদয়াতে বেরূপ আছে, সেইভাবে সংক্ষেপে আমরা পরে
 লিখিব। সেক শুভোদয়ায় গোবর্দ্ধনকে ‘আচার্য্য’ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, জয়দেবও ইহাকে
 আচার্য্য বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু জয়দেব সকল কবিরই কোন না কোন দোষের
 প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু গোবর্দ্ধন আচার্য্য সন্ধর্কে লিখিয়াছেন যে তিনি আদ্যিস-
 বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

শরণ কবি সন্ধর্কে জয়দেব লিখিয়াছেন “ইনি দ্রুত ছন্দে কাব্য লিখিতে ওস্তাদ কিন্তু
 ইহার ভাবা অতি দ্রুত।” এই বিদ্বৎপঞ্চকের মধ্যে জয়দেব
 শরণ।

কালজয়ী হইয়াছেন। ইনি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া
 বিশাল সংস্কৃত-সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসনের দাবী করিতেছেন। ইহার বাড়ী ছিল
 বীরভূম জেলার কেঁহলী (কেন্দুবিধ)। তথায় তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে বৎসর বৎসর
 মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিনে একটি মেলা বসিয়া থাকে। “গীতগোবিন্দ” জয়দেবের
 শ্রেষ্ঠ কাব্য; এই কাব্যের “স্বপ্নীত পীতাম্বর” নামক স্বাদশ বা শেষ অধ্যায়ে কবি
 তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব এবং মাতার নাম বামাদেবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।
 তিনি ঐ স্থানে আরও লিখিয়াছেন যে তিনি তাঁহার পরাশরাদি কয়েকজন প্রিয় বন্ধুর
 কণ্ঠে বনকুসুমমালিকার শ্রায় এই গীতিকাব্যখানি উপস্থিত করিলেন। এই কাব্যে আমরা
 আরও আভাসে জানিতে পারি যে পদ্মাবতী নাম্নী এক রমণী যখন নৃত্য করিতেন তখন
 তাঁহার গতির তাল রাখিতে কবি স্তব্ধ ছিলেন (পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী)। গীত-
 গোবিন্দে জয়দেবের স্বী গোহিণীর নামও উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। বনমালী দাস কৃত জয়দেব-
 চরিত, নাভাজীকৃত ভক্তমালা প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয় পদ্মাবতী জগন্নাথ মন্দিরের সেবাদাসী
 ছিলেন। সেবাদাসীরা নৃত্যগীতে কৃতিত্ব দেখাইয়া থাকেন; গীতগোবিন্দেও পদ্মাবতী-
 চরণচারণচক্রবর্তী পদে এই কথাটির প্রতি ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়। সেক শুভোদয়ায়
 তাত্ত্বিক প্রভাব বড় বেশী, সুতরাং তাহাতে অনেক অলৌকিক বিষয়ের সমাবেশ আছে।
 এই পুস্তকে জয়দেব ও পদ্মাবতী সন্ধর্কে লিখিত আছে—একদা রাজা লক্ষণসেন তাঁহার

সভার বিখ্যাত নর্তকী বিজ্ঞাপ্রভা, শশিকলা এবং বড় বড় পণ্ডিতের সহিত গঙ্গাতীরে আমোদপ্রমোদ করিতেছিলেন, এই সময়ে রাজদরবারে বুঢ়ণ মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন, “আমি একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও সুপণ্ডিত। আমি ওড়িশ্যে বাইরা রাজা কপিলেশ্বরের সভা জয় করিয়া জয়-পত্র পাইয়াছি। এখন আপনার সভায় যদি এমন কেহ থাকেন যে তিনি সঙ্গীতবিজ্ঞায় আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে প্রস্তুত, তাঁহাকে ডাকুন।” রাজার নিকটে তখন সেক জালালুদ্দিন তব্রজ উপবিষ্ট ছিলেন; তিনি বুঢ়ণ মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্রাহ্মণ, আপনি কোন্ রাগিণীতে বিশেষ পারদর্শী?” বুঢ়ণ বলিলেন, “আমি পঠমঞ্জুরী রাগই বিশেষ করিয়া অভ্যাস করিয়াছি।” এই বলিয়া তিনি পঠমঞ্জুরী রাগে গান করিতে লাগিলেন। সেই গানের সুরতরঙ্গে সম্মুখবর্তী পিপ্পলবৃক্ষ কাঁপিয়া উঠিল এবং তাহার নবোদগত পত্র-পল্লব ঝরিয়া পড়িল। সমাগত লোকেরা বলিল, “কি আশ্চর্য! এমন তো কখনই দেখি নাই, কখনও শুনি নাই—ধন্য আপনি ব্রাহ্মণ!” তখন রাজা ঘটচন্দ্রযুক্ত জয়পত্র ব্রাহ্মণকে দিতে উদ্বৃত্ত হইলেন। নানাবিধ বাস্ত বাজিতে লাগিল। এই সময়ে জয়দেব মিশ্রের ব্রাহ্মণী পদ্মাবতী লোকমুখে এই ঘটনা শুনিতে পাইলেন। তিনি গঙ্গাস্নান করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সভার সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আমি আমার স্বামিসহ যেখানে বিজ্ঞমান, সেখানে অস্ত্র কার শক্তি আছে সেই জয়পত্র পাইতে? আপনারা জিজ্ঞাসা করুন, ইনি আমাদের সঙ্গে শাস্ত্রে অথবা সঙ্গীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জয়ী হইতে ইচ্ছা করেন কি না? আমি অথবা আমার স্বামী এই দুইয়ের মধ্যে যাহার সঙ্গে ইহার ইচ্ছা, ইনি সমকক্ষতা করুন।” সেক জালালুদ্দিন বলিলেন “ব্রাহ্মণি! আপনার স্বামী কবীন্দ্র, তাহার সঙ্গে পরে হইবে, এখন আপনি আপনার সঙ্গীতবিজ্ঞার পরিচয় দিন।” পদ্মাবতী গান্ধার রাগ গাহিলেন। সেই গানের সুরলহরী যখন গঙ্গাবক্ষে খেলিতে লাগিল, তখন সমস্ত নৌকা সেই স্থানে আপন আপন ভাসিয়া আসিয়া জড় হইল। শ্রোতৃমণ্ডলী ব্রাহ্মণীকে পূজা প্রদান করিয়া বলিল, “ধন্য ইনি, ইহার সঙ্গীতে জীবনহীন নৌকা সচল হইয়াছে, মরাগাছে পাতা হইয়াছে। ইনিই জয়ী হইয়াছেন, এরূপ কখনও শুনি নাই, দেখিও নাই।” তব্রজ বলিলেন, “হে ব্রাহ্মণ, আপনাদের মধ্যে কে জয়ী হইয়াছেন—আমার সঙ্গে শাস্ত্রের বিচার দ্বারা নিরূপণ করিতে পারেন।” বুঢ়ণ মিশ্র বলিলেন, “আমি দ্বীলোকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহি না, যেহেতু এদেশে রমণীরা বহুগুণশালিনী, পুরুষদের গুণ নাই।” এই কথা শুনিয়া পদ্মাবতী তাহার দাসীকে পাঠাইয়া রাজসভায় জয়দেবকে আনাইলেন। জয়দেব আসিয়া বলিলেন, “আমার ব্রাহ্মণীর জয় হইয়াছে, আমাকে আত্মদান করা হইয়াছে কেন?” জালালুদ্দিন বলিলেন, “উভয়েরই গুণের পরিচয় ইহারা দিয়াছেন, এখন আপনার গুণপনা আমরা দেখিতে চাই।” জয়দেব উত্তরে কহিলেন, “ইহার সঙ্গীতে গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বসন্তকালে গাছের পাতা আপনা আপনিই ঝরিয়া পড়ে, ইহাতে বাহাদুরী কি?” জালালুদ্দিন বলিলেন, “শুনুন মিশ্রমহাশয়, বসন্তকালে

পাতা ঝরিয়া পড়ে সত্য, কিন্তু একদিনে সকল পাতা পড়ে না, প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া পড়িয়া থাকে।”

জয়দেব বলিলেন, “যে গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িয়াছে, আপনি তাহাতে পত্রোদগম করুন।” বুঢ়ণ বলিলেন, “ইহা আমি পারিব না।” জয়দেব কহিলেন, “তবে এইটি স্থির করুন :—যিনি গাছে নূতন পাতা জন্মাইতে পারিবেন, তিনিই জয়ী।” বুঢ়ণ মিশ্র এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। সেক জালালুদ্দিন উভয়ের প্রস্তাব ও সম্মতি শুনিয়া অহুমোদন করিলেন। তখন জয়দেব বসন্তরাগে গান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কমনীয় নবপত্রপল্লবে গাছটি ভরিয়া গেল। ইহাতে চারিদিকে জয় জয় শব্দ উখিত হইলে বুঢ়ণ মিশ্র রাজার নিকট হইতে যে সকল উপঢৌকন পাইয়াছিলেন তাহার সমস্তই জয়দেবকে দিতে উজ্জত হইলেন। রাজা সেক জালালুদ্দিনের কথায় ব্রাহ্মণকে সেই সকল অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে নিষেধ করিলেন এবং আরও কিছু দ্রব্য আনিয়া বুঢ়ণ মিশ্রকে প্রদানপূর্বক তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

অনেকটা বাদ দিয়াও উপকথাটার মধ্যে এই সত্যটুকু পাওয়া যায় যে, জয়দেব ও পদ্মাবতী উভয়েই সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন, এবং বুঢ়ণ মিশ্র নামক সঙ্গীতশাস্ত্রে দিগ্বিজয়ীকে প্রকাশ্য রাজসভায় ইহারা পরাস্ত করিয়াছিলেন। জয়দেব সম্বন্ধে আরও অনেক গল্পকথা পাওয়া যায়। দস্যুরা তাঁহার হস্তপদচ্ছেদনপূর্বক সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছিল এবং দৈববলে সেই ছিন্ন অঙ্গগুলি জোড়া লাগিয়াছিল। তিনি গীতগোবিন্দে “দেহি পদপল্লবমুদারম্” এই কথা কয়েকটি লিখিতে স্বভাবতঃই দ্বিধাবোধ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁহার অগোচরে কৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহারই ছদ্মবেশে গৃহে আসিয়া নিজহস্তে ঐ শ্লোকার্দ্ধ লিখিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। কথিত আছে একদা তাঁহার মৃত্যুর একটা মিথ্যা সংবাদ রাষ্ট্র হয়, তাহা শুনিয়া পদ্মাবতী

আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে কোন প্রতিভাবান্

ব্যক্তি (বিশেষতঃ ধর্মজগতে) জন্মগ্রহণ করিলেই তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প কথিত হইয়া থাকে। এ সকল আজগুবি কথার কুহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহার সত্যিকার জীবনী উদ্ধার করা বড় কঠিন।

জয়দেব সম্বন্ধেও ইহাই হইয়াছে। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে কবি বীরভূমের গিদ্ধ ছায়াশীতল কেঁছলী গ্রামে বাসপূর্বক অজয় নদীর জলম্পৃষ্ট শরীরে পুলকিত হইয়া ‘ললিত-লবঙ্গলতা-পরীশীলনকোমল’ প্রভৃতি প্রতিমুখকর পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়তমা পদ্মাবতী নৃত্যগীতে কৃতবিষ্ঠ ছিলেন এবং ইহারা উভয়ে রাজা লক্ষণসেনের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, কবি লক্ষণসেনের ছায়া এত বড় রাজার আশ্রয় পাইয়াও কাব্যে তাঁহার নামটি পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই; তাঁহার প্রিয় পরাশর প্রভৃতি সম্বাদিগের নামে পুস্তকের উৎসর্গ-পত্র লিখিয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে জয়দেবের খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল। উমাপতি ধর ও শরণ পর্য্যন্তও বঙ্গীয় কবিরা গোড়ীয় রীতি অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যের তাণ্ডব দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু

জয়দেব সেই পদ্য ভাষা করিয়া কাব্যে সুশ্রাব্য সরল রসাল শব্দের মুক্ত পরিবেশন করিয়াছেন। এই কাব্যের ভাষার সঙ্গে প্রাকৃতের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে জয়দেবের সহজ সুন্দর সংস্কৃত যে তুলিল সে বুঝিল। এই জন্ত তাহার গান কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইতে লাগিল। এখন পর্য্যন্ত জয়দেবের গীতগোবিন্দ শুধু বঙ্গদেশে নয়, ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানে গানের আসরে গীত হইয়া থাকে। এই সৌভাগ্য আর কোন সংস্কৃত কবির হয় নাই। বাঙ্গলা দেশের ত কীর্তনের আসরে অশিক্ষিত গায়কেরা পর্য্যন্ত গীতগোবিন্দের গান সর্বত্র গান করে। মহারাষ্ট্র, মাল্জাজ ও উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ রাস্তার লোকেরাও গাইয়া থাকে। গীতগোবিন্দের ছন্দ ঠিক সংস্কৃতের অনুবর্তী নহে, বরঞ্চ প্রাকৃত ছন্দের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পৌরুষার্থের নিয়ম রক্ষা করিয়া ঘটনার বিস্তার-কৌশল গীতগোবিন্দ মহাকাব্যে দৃষ্ট হয় না। হাওয়া হইতে কতকগুলি বিভিন্ন ফুলের সুরভি আসিলে পথিক বেক্রপ উদ্ভাস্ত হইয়া পড়ে, এই কাব্য পড়িতে পড়িতে পাঠকের মনে তেমনই একটা বিদ্ভূত উপস্থিতি হয়। সকলগুলিই সুখদ ও সুন্দর, কিন্তু তাহারা আগাগোড়া কোন নিয়মের অধীন নহে, কবির মনে যখন যে ভাবটি আসিয়াছে, তাহাই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া এই কাব্যে প্রাকৃত শব্দের প্রয়োগ এত বেশী যে অনেকে মনে করেন বঙ্গদেশের আকাশে বাতাসে যে সকল গান প্রাকৃত ভাষায় উড়িয়া বেড়াইতেছিল, যে সকল প্রাকৃত পদাবলীর কাননে কবি বাস করিতেছিলেন, সেই সকল গানের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া তিনি তাহাদের রূপান্তর সাধনপূর্ব্বক গীতগোবিন্দে স্থান দিয়াছেন। এই জন্তই ইহার ছন্দের রীতি ও অভিধান এতটা প্রাকৃত ভাবাপন্ন এবং এ জন্তই ইহার ভাষায় প্রাকৃত শব্দের বাহুল্য এবং বৃদ্ধি বা এই জন্তই এই কাব্য জনসাধারণের মন এতটা ছুঁইতে পারিয়াছিল। ‘গৌড়ীয় রীতি’ উমাপতি ধরের রচনায় চূড়ান্ত সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। জয়দেব প্রতিক্রিয়ার আদি প্রবর্তক।

Pischel প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে কোন প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষায় প্রথমতঃ এই সকল পদ রচিত হইয়াছিল, জয়দেব পরে তাহাদিগকে সংস্কৃতের রূপ দিয়া বিদ্বজ্জন-সেবা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে ডাক্তার শ্রীলকুমার দে মহাশয় বলেন, পদাবলীতে প্রযুক্ত ভাষার রচনার পদ্ধতি সংস্কৃত কাব্যের অনুরূপ নহে; বরং এই স্বচ্ছ ও সহজ গায় পদগুলি দেশীয় গানের পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছে। এমন কি অতি অল্প চেষ্টায় অনেক পদকে সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতে এবং প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে পরিণত করা যাইতে পারে। প্রাকৃতপিঙ্গলে উদাহৃত পাদাকুলক প্রভৃতি যে সকল মাত্রাজ্ঞান ইহাতে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও প্রাকৃত বা অপভ্রংশ কবিতার আত্মীয়, সংস্কৃতের নহে। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে বাঙ্গলার প্রাচীন ছন্দগুলি জয়দেবের ছন্দোভূগ, একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, জয়দেবের ছন্দ গড়াপিটা করিয়া প্রাচীন বাঙ্গলা কবিতার নানা ছন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে। কবি দেশীয় রীতির অনুগামী হইয়াছিলেন বলিয়াই দেশীয় ভাষার উপর তাহার এতটা প্রভাব। শ্রীলবাবু দেখাইয়াছেন, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

তাঁহার অনেক কবিতায় ‘কবিরাজরাজ’ জয়দেবের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহার ‘বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তকুচি-কৌমুদী’র ধ্বনির অমূল্যকরণ আমরা ‘একদা যদি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে’ স্পষ্টই দেখিতে পাই।

জয়দেব যে নূতন রীতি সংস্কৃত-সাহিত্যে আনিলেন তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অনেক কবি জয়দেবের অমূল্যকরণে কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। সকলেই যে বাধাকল্প বিষয় লইয়া লিখিয়াছেন, তাহা নহে, অনেকে শিব ও পার্শ্বতীসম্বন্ধেও এইরূপ কাব্য প্রণয়ন করেন। এইরূপ কয়েকটি কাব্যের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

- ১। মৈথিল কবিহংসমণি-রচিত শৈব কাব্য “গীত-দিগদ্বন্দ্ব”।
- ২। গজপতিরাজ পুরুষোত্তমদেব-কৃত “অভিনব গীতগোবিন্দ”।
- ৩। হরিশঙ্কর-কৃত “গীত-বাসব”।
- ৪। শ্রীহরি আচার্য্য-কৃত “জানকী-গীত”।
- ৫। চতুর্ভূজ-কৃত “গীতগোপাল”। ইনি জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক ছিলেন।
- ৬। ভাস্কর কবিচক্রবর্তী-কৃত “শৈবকাব্য গীত-গৌরীশ”।
- ৭। ভূকৈলাসের জয়নারায়ণ ঘোষাল-কৃত “গীতশঙ্করীয়ম্”।
- ৮। গীত-গৌরীপতি কাব্য (ইহা ১৮৯০ সালে গ্রন্থরত্নমালা নামক সংস্কৃত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়)।
- ৯। কল্যাণ-প্রণীত “গীত-গঙ্গাধর”।
- ১০। রামভট্ট-প্রণীত “গীত-গিরীশ”।
- ১১। ভূধরপুত্র প্রভাকর-প্রণীত “গীত-রাঘব”।
- ১২। তিরুমল-কৃত “গীত-গৌরী”।
- ১৩। জয়দেব (২য়)-কৃত “রামগীত-গোবিন্দ”।

কেবল যে সংস্কৃতেই গীতগোবিন্দের অমূল্যকরণে যশঃপ্রার্থী কবিগণ কাব্য রচনা করিয়া-ছিলেন তাহা নহে, বঙ্গের প্রাদেশিক ভাষার কোন না কোনটিতেও গীতগোবিন্দের প্রভাব লক্ষিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে নন্দদাস নামক একজন কবি “পঞ্চাধ্যায়ী” নামে জয়দেবের অমূল্যকরণে একটি কাব্য লেখেন। [মাসিক পত্রিকা “পঞ্চপুষ্প,” ১৩৩৬ সনের কার্তিক সংখ্যা, পৃঃ ৯৫৬-৯৫৭।]

জয়দেবের কাব্য স্বর্গ হইতে দেবভাষা নামিয়া আসিয়া মৃত্তিকার কুটির ছুঁইয়াছিল। এই কাব্যের ধ্বনি আমরা চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনে বহু স্থলে পাই; চণ্ডীকাব্যে খুল্লনার বনবাসকালীন বিরহে,—বিজ্ঞাপতির পদে ও বহু বৈষ্ণব কবিগণের আমরা জয়দেবের প্রভা।
গানে পাই। সেই ধ্বনি রঘুনন্দন-কৃত রামরসায়নে ও আলোয়ালের পঞ্চাবতে পাই, কিন্তু ভারতজুড়েই যেন উহা সর্বাধিক বেশী পাই। স্তবরাং ঘাদশ

শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত প্রায় ছয়শত বৎসর কাল জয়দেবের অপ্রতিহত রাজত্বকাল। মৌর্য্যবংশ, গুপ্ত, পাল, পাঠান, মোগল ইহাদের কাহারও রাজত্বকাল এত দীর্ঘ নহে। এখনও জয়দেবের রাজত্বই আমরা বাস করিতেছি, তাহার ললিত-লবঙ্গ-লতার পরিশীলনমধুর সমীর-স্পর্শ-পুলকিত “বঙ্গ-কুঞ্জের” প্রজা আমরা। যদিও ভারতচন্দ্রের পর সাফাৎ সম্বন্ধে কোন কবি আর তাহার বড় একটা অমুকরণ করিতেছেন না, তথাপি তিনি যে হাওয়া বহাইয়া দিয়াছেন তাহা এখনও অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আমাদের গলায় পুলকিত করিতেছে। সেদিনও কবিওয়ালা রাম বহু “হর নই আমি যুবতী, কেন আলাতে এলে রতিপতি” গানটিতে জয়দেবের একটি চরণ ভাঙ্গিয়া এমন সুললিত শব্দ-মালিকা গাঁথিয়াছেন যে, কে বলিবে বঙ্গের কবিরা এখনও তাহার পদাঙ্কে চলিতে ভুলিয়াছে?

শ্রীলতা, অশ্রীলতা প্রভৃতি কচিসম্বন্ধীয় কথার অবতারণা আমরা এখানে করিব না। ইহা নিশ্চিত যে চৈতন্যদেব সারারাত্রি জাগিয়া জয়দেবের গান গাহিয়া কাঁদিতেন। এখনও ভারতের সমস্ত স্থানে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে জয়দেবের মধুনিশ্চন্দ্রিনী কচির কথা।

গীতি সমাদৃত হইয়া থাকে, এখনও কীর্ত্তন-ওয়ালারা বৈষ্ণব কবির পদ গান করিবার সময়ে শুদ্ধ, স্বাভাবিক হইয়া ধোত বাস পরিধানপূর্ব্বক কুতাজলি হইয়া গানের গুরু জয়দেবকে বন্দনাপূর্ব্বক কীর্ত্তন আরম্ভ করে। গণিকার মনেও এই সকল গান গাহিবার সময় একটা বিশুদ্ধ ভাবের ও ভক্তির প্রেরণা আসে। “ফলেন পরিচীরতে”—গাছের ফলেই তাহার পরিচয়। তাহার গানে দেবতা স্বয়ং আসরে উপস্থিত হন, তাহার কাব্যে “গোবিন্দ নাই গীত আছে”—এই সকল মন্তব্য বালকোচিত। গীতগোবিন্দের কোন বিদেশীয় সমালোচক শ্রীলতার প্রশংসা ভুলিয়া তাহার সম্মান লঘু করেন নাই। ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্যের জন্ত বাঙ্গলার প্রধান ব্যক্তিত্ব বাঙ্গালীর নিকট বোঙ্গা আদর পান না। বস্তুতঃ গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষাকে বাঙ্গলা ভাষার অতি সান্নিধ্যে আনিয়া যে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহার তুলনা স্থূলভ নহে। ল্যাটিন ভাষা, বাহা সর্ব্বত্র সমাদৃত, তাহার আদর আর যুরোপে নাই। গির্জা ঘরের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে কচিং ছই একটি ল্যাটিন স্তোত্র আবৃত্তি হয় এই মাত্র। কিন্তু জয়দেবের সংস্কৃত এখনও সজীব। লোকের মুখে মুখে, গানের আসরে, মন্দিরে, স্নানসমাগমে, উৎসবোপলক্ষে, সাধুর কণ্ঠে, গণিকার মুখে, নর্ত্তকীর গীতে জয়দেবের রাজত্ব এখনও ভারতের সর্ব্বজনস্বীকৃত।

র, শ প্রভৃতি কতকগুলি বর্ণ শ্রুতিকর্কশ। এই সকল বর্ণ ইংরেজী ভাষায় খুব বেশী। এই বর্ণগুলি-দ্বারা কথার জোর হয় সত্য, কিন্তু ইহাদের স্ফুটায়ক গৌরব কোমলতা নহে—বরঞ্চ কঠোরতা। কিন্তু ল, ন, ম প্রভৃতি বর্ণ বড় কোমল। জয়দেবের অধিকাংশ পদে এই বর্ণত্রয়ের আধিক্য :—যথা—“অমল-কমল-দল-লোচন ভবমোচন,” “ত্রিভুবন-ভুবন-ভবন-নিদান,” “অলিকুল-সঙ্কুল-কুসুম-সমূহ-নিরাকুল-বকুল-কলাপে।” “মধুসূদন-বদন-সরোজং,” “কোকিল-কলরব-কুজিত,” “চরণ-রগিত-মধি-নুপুরয়া পরিপূরিত-স্বর-বিতানং,” “নয়ননলিনমিব বিদলিতনালাং,” “বসন্তি বিপিন-বিতানে ত্যজতি ললিতধাম, লুঠতি ধরণীতলে বহু বিলপতি তব নাম,” “চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলাং,” “মধুর-মধু-যামিনী,” “ত্বমসি

মম ভুবনং, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভবজলধিরঙ্গং," "মধুমুদিত-মধুপকুল-কলিতরবে—"
এইরূপ পদ অসংখ্য। বাঙ্গলাভাষা এখন পর্য্যন্ত এই সকল কোমল কান্ত পদাবলীর মোহিনী
এড়াইতে পারে নাই। জয়দেব সমস্ত পদই সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু এই সন্ধি
বাণভট্টের সন্ধি নহে, ইহা ছুলের গ্রন্থি—এই গ্রন্থি সংস্কৃতের সম্মান রক্ষা করিয়া বঙ্গ
ভাষার অনাগত মহিমার প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিতেছে। কাব্য হিসাবে পড়িতে গেলেও
জয়দেবের মধুরাফরা কবিতা কর্ণের তৃপ্তিসাধন করে, কিন্তু সুগায়কের কণ্ঠে জয়দেবের
ভাবাবিষ্ট স্বর—কোকিলকণ্ঠ, বীণা বা বংশীর নিরর্থক নিঃস্বনের স্থায় স্বপ্নজগতে লইয়া
যায়। জয়দেব স্বয়ং রাধাকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমান হইয়া এই কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন,
ভক্তের নিকট তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে—ইতিহাস তাহা প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু
তিনি ভক্তকে তাঁহার আসরে ঢুকিতে দিয়া জনসাধারণের বিরুদ্ধে দ্বার অর্গলবদ্ধ করেন
নাই। এই জন্ত তিনি লিখিয়াছেন—দীহারী হরিশ্বরণে মন সরস
করিতে চান তাঁহারী আমার কাব্য পড়ুন, এবং দীহারী বিলাস-

ভক্তি ও ভোগ।

কলায় কুতূহলী তাঁহারীও এই কাব্য পড়ুন। জীবনটা মাহুকের একঘেয়ে একরূপ নহে।
তাহাতে স্বর্গের ভাব প্রতিভাত হয় এবং পার্থিব ভোগের ইচ্ছাও তাহাতে যথেষ্ট—উভয়বিধ
ভাবের ক্ষেত্র—এই গীতগোবিন্দ। জয়দেবের কবিত্বসম্বন্ধে সুশীলবাবু লিখিয়াছেন, "জয়দেব
পরবর্তী ভক্তিশাস্ত্র অনুসরণ করেন নাই কিন্তু পরবর্তী ভক্তিশাস্ত্র তাঁহার কাব্যগ্রন্থকে
শাস্ত্ররূপে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা পাইয়াছে।"—"কবি-করনার প্রাচুর্যের সহিত প্রকৃত
শিল্পীর সংঘম, বাগর্থে পরস্পরের সাপেক্ষ সার্থকতা, শব্দময় আলেখ্যলেখনে দক্ষতা,
ধ্বনিবৈচিত্র্য, ছন্দঃস্বচ্ছন্দ্য, পদলালিত্য ও গীতিমাধুর্য্য তাঁহার কাব্যকে একটি অপূর্ণ সৌন্দর্য্য-
মণ্ডিত করিয়াছে। জয়দেবের কার্য্যকলাপে বৈচিত্র্যালীলার সূক্ষ্ম ও চমৎকারিত্ব থাকিলেও
সামর্থ্যের স্বেচ্ছাচারিতা বা প্রাগল্ভ্য নাই। শিল্পনৈপুণ্যের স্থগ্নতা থাকিলেও অনর্থক আড়ম্বর
বা কৃত্রিমতা নাই। ইহার কান্ত কোমলতা ও স্বচ্ছন্দ-গতি পাঠকের মনকে তন্ময়
করিয়া দেয়। শব্দসম্পদে সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী। প্রাচীন কবিগণ যে অদ্বুত শব্দ-
বিত্তাসনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন তাহা কেবল সংস্কৃতের মত ভাষায় সম্ভবপর হইয়াছে।
সংস্কৃতের শব্দমাত্রপরম্পরার যে অন্তরীণ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য, তাহার সহজ ও স্থনির্দিষ্ট
প্রয়োগে এতাদৃশ সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যেও জয়দেবের মত শিল্পী কবি দুর্লভ।" (ভারতবর্ষ,
আশ্বিন, ১৩৩৯—৫৮২-৫৮৩ পৃষ্ঠা।)

আমরা জয়দেবের প্রসঙ্গ একটু বিস্তারিত করিলাম, কারণ আমার এই ইতিহাস
শুধু রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। আমার নিকট মগধের মৌর্য্য অশোক বেমন, তদপেক্ষা বড়
নবদ্বীপের চৈতন্য; সিংহলবিজয়ী বজ্রের বিজয় আমার নিকট বেক্রপ, অর্দ্ধএশিয়া-বিজয়ী
দীপঙ্কর তেমনি বা তদধিক বড়। যে লক্ষণসেনের রাজসভায় জয়দেব একজন সভাকবি
ছিলেন আমার পক্ষে সেই লক্ষণসেনের সিংহাসন অপেক্ষাও বড় সিংহাসনের দাবী—
সেই নিভৃত কেন্দ্রলি পল্লীর জয়দেবের।

জয়দেবের ভারতবাসী দ্রুত প্রতিষ্ঠালাভের প্রমাণ এই যে, গীতগোবিন্দ প্রণীত হইবার অল্পকাল পরে মিথিলাবাসী ভগবতী-ভবেশ-তনয় কৃষ্ণ রাও এই গীতগোবিন্দের টীকা। কাব্যের গঙ্গা নামক টীকা প্রণয়ন করেন। পরবর্তী কালে আরও অনেকে ইহার টীকা রচনা করেন। তন্মধ্যে পূজারী গোস্বামীর টীকাই প্রসিদ্ধ। পৃথিবীরাজ সভাসদ 'চাঁদকবি' 'চৌহান রাসৌ' নামক কাব্যে জয়দেবের উল্লেখ করিয়াছেন। (জয়দেব অর্থঃ কবি, কবিরায়ণ। জিনে কেবল কীর্তি গোবিন্দ গায়ঃ"॥) পৃথিবীরাজ দৃশ্যতী তীরে ১১২৩ খৃঃ অব্দে সাহবুদ্দীন ঘোরী কর্তৃক নিহত হন। সুতরাং জয়দেবের কাব্য তৎপূর্বেই রচিত হইয়াছিল। রাজপুতানার অন্তর্গত মিবারের অধিপতি রাণা কুস্ত (১৪১২ খৃঃ ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন) গীতগোবিন্দের যে "রসিকপ্রিয়া" নামক টীকা প্রণয়ন করেন তাহাই বোধ হয় অস্তিত্ব টীকাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কথিত আছে বর্তমান জেলার মঙ্গলকোট উজানী নগরের অধিপতি মহারাজ বিক্রমকেশরীর সভায় গীতগোবিন্দ নিন্তা গীত হইত। জনশ্রুতি বিশ্বাস করিতে গেলে এই বিক্রমকেশরীর আদেশে ধনপতি সদাগর বিদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। বিক্রমকেশরীর ভগ্নপ্রাসাদ ও অপরাপর চিহ্ন এখনও উজানীতে বিদ্যমান। রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত আছে জৈনরাজ শ্রীহর্ষদেবের ক্রমসরোবরে নৌবিহারের সময়ে গীতগোবিন্দ গীত হইত। উৎকলে এইরূপ প্রবাদ আছে যে তথাকার কোন রাজা বিদ্রোহবশতঃ স্বয়ং একখানি গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা স্থায়ী হয় নাই। কলিঙ্গে বহুকাল পর্য্যন্ত কর্ণাটের গায়কগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে গীতগোবিন্দ গান করিতেন। সেনেরা কর্ণাটরাজবংশসম্বৃত ছিলেন। এইজন্ত বোধ হয় কর্ণাট গায়কগণের প্রতিপত্তি রাজসভায় বেশী হইয়াছিল এবং তাঁহারা গীতগোবিন্দ গানের রীতিতে বিশেষজ্ঞ হইয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত Aufrechtএর Catalogus Catalogumএ "গীতগোবিন্দে"র অনেকগুলি টীকার উল্লেখ আছে। যে সকল টীকাকারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই অ-বাঙ্গালী। ইহাদের মধ্যে নিম্নে কয়েকজন টীকাকার ও তাঁহাদের গ্রন্থের নাম প্রদত্ত হইল :—

টীকাকার	টীকার নাম
১। চৈতন্য দাস	বালবোধিনী
২। "	বচনমালিকা
৩। উদয়নাচাৰ্য্য	ভাববিভাবিনী
৪। কমলদেব	রত্নমালা
৫। রাণাকুস্ত	রসিকপ্রিয়া
৬। মৈথিল কৃষ্ণ দত্ত	গঙ্গা
৭। কৃষ্ণদাস	

টীকাকার	টীকার নাম
৮। গোপাল	অর্থরত্নাবলী
৯। নারায়ণ ভট্ট	পদ্মশোভিনী
১০। নারায়ণদাস	সর্বাঙ্গসুন্দরী
১১। পীতাম্বর	
১২। ভগবদাস	রসকদম্বকল্লোলিনী
১৩।	ভাবাচার্য্য
১৪।	মালক
১৫। রামতারণ	মাধুরী
১৬। বামদত্ত	
১৭। পণ্ডিত রূপদেব	সানন্দ গোবিন্দ
১৮। লক্ষণভট্ট	
১৯। লক্ষণসুরি	শ্রুতি-রঙ্গিনী
২০। বনমালী ভট্ট	
২১। বিট্ঠলদীক্ষিত	
২২। বিশ্বেশ্বর ভট্ট	শ্রুতি-রঙ্গিনী
২৩। শঙ্কর মিশ্র	রসমঞ্জরী
২৪। শালিনাথ	
২৫। শেষ রত্নাকর	সাহিত্যরত্নাকর
২৬। শ্রীকান্ত মিশ্র	পদভাবার্থচন্দ্রিকা
২৭। শ্রীহর্ষ	
২৮। হৃদয়ধারণ	গীতগোবিন্দ-তিলকোত্তম
২৯। অনুপ সিংহ	অনুপোদয়
৩০। চিদানন্দ ভিক্ষু	
৩১। জগদ্ধর	সারদীপিকা
৩২। ধৃতিকর	
৩৩। ভগবদাস	
৩৪। অর্জুনদাসের পুত্র বাসুদেব বাচ্যসুন্দর	পদাভিনয়মঞ্জরী
৩৫। তিরুমলরাজ	শ্রুতিসাররঙ্গিনী
৩৬। রামভট্টের পুত্র রামকান্ত	গীতগোবিন্দ প্রবোধ
৩৭। কুমারখান কৃত	
৩৮। কোস্তভট্টের ভ্রাতা লক্ষণ	লক্ষশ্রুতিরঙ্গিনী

“দেহি পদপল্লবমুদারম্” পদটির কথা একবার উল্লিখিত হইয়াছে। কথাগুলি জয়দেবের লেখনীর মুখে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা লিখিতে জয়দেব ভরসা পান নাই।

দেহি পদপল্লবমুদারম্।

ত্রিলোকপতি ভগবান্ কৃষ্ণ গোপনারীর পদ ধারণ করিবেন, ইহা লিখিতে তিনি দ্বিধা বোধ করিতেছিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তিনি স্থান করিতে গেলেন, ইতোমধ্যে কৃষ্ণ জয়দেবের বেশে উপস্থিত হইয়া পদ্মাবতীর কাছে লেখনী চাহিয়া লইয়া স্বয়ং “দেহি পদপল্লবমুদারম্” লিখিয়া অন্তর্হিত হইলেন। স্থানের পর গৃহে আসিয়া জয়দেব এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন।

এই প্রবাদটি একটি তুচ্ছ কথা নহে। ইহা বঙ্গীয় ধর্ম-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের একটা মস্তবড় ইঙ্গিত। বাঙ্গালী তাহার দেবতাকে নিজের অন্তরের অন্তরপ্রদেশে আনিয়া অমুরাগের অর্ঘ্য প্রদান করেন। দেবতাকে তাঁহার মাতৃষের প্রাণ দিয়া গড়িয়া জীবন্ত করিয়া তোলেন। বঙ্গের বেদীতে এইভাবে দেব-বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। বাঙ্গালী তাঁহার দেবতাকে বড় করিয়া দূর হইতে দেখিয়া ভয়ে ভয়ে পূজার ফুল নিক্ষেপ করিয়া ছুটিয়া পালান না। বঙ্গের মাতার নিকট দেবতা শিশু, তাঁহার পৃষ্ঠে বঙ্গ-জননীর কোমল চড়ের দাগ এবং তাহার হাতে বঙ্গ-জননীর দড়ি-বাঁধার চিহ্ন। বঙ্গের সখা দেবতার কাঁধে চড়েন, ফলটি খাইয়া যখন দেখেন উহা সুস্বাদু, তখন সেই উচ্ছিষ্ট ফলটি দেবতার মুখে তুলিয়া দেন। আর বঙ্গের প্রণয়িনী মান করিয়া বসিলে দেবতা গলায় কাপড় দিয়া তাহার পদতলে পড়িয়া সাধিতে থাকেন। “কি ছার চকোর চাঁদ হুহু সম নহে” চণ্ডীদাস লিখিয়াছিলেন। ইহার অর্থ সমানে সমানে না হইলে প্রেম হয় না। এই জন্ত বাঙ্গালী দেবতাকে হৃদয়ের এত কাছে লইয়া আসেন যেন তাঁহাকে আলিঙ্গন-পাশে বাঁধিয়া রাখা যায়। বাঙ্গালী তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইবে না, কুঞ্জতরুশূলে বসাইয়া বনফুলের মালা গলায় দিয়া নয়নজলে অভিষিক্ত না করিলে সে দেবতা বে পাথর বা মাটির বিগ্রহ হইয়া থাকিবে। বাঙ্গলার ঠাকুর বাঙ্গালীর জোড় হাতের প্রণাম চান না, তাহার হৃদয়ের উপর ঠাকুরের লুপ্ত দৃষ্টি। এমন সকল বাড়ী জানি যেখানে পরম বৈষ্ণব গৃহ-কর্তার মৃত্যু হইলে সেই গৃহের দেবতাকে কাছা পরিয়া সন্তানের মত পিণ্ড দিতে হয়, যেহেতু মৃত গৃহ-স্বামীর উপাস্ত ছিলেন বাল-গোপাল।

কিন্তু জয়দেবের পূর্বে এ দেশে শ্রীকৃষ্ণের ঐখ্যায়ুক্ত মূর্তি ছিল। গোপী তাঁহাকে সহস্ররূপে ভালবাসিয়াও তাঁহাকে পদতলে বসাইতে সাহসী হইত না। জয়দেবই সর্বপ্রথম দেবতাকে ভক্তের পা ধরিয়া সাধিতে নিযুক্ত করিলেন। পাছে এই কথা পড়িয়া কেহ দাঁতে জিভ কাটে, এই ভয়ে ছদ্মবেশী কৃষ্ণকর্তৃক পাদপূরণের প্রবাদটির সৃষ্টি। ইহার পরে চৈতন্যদেব আসিয়া যখন বুঝাইলেন, ঠাকুর প্রতিফল আমার সেবা করিতেছেন, তিনি প্রাণপ্রিয়, তিনি আমাকে দূরে রাখেন নাই; তাঁহার সঙ্গে মান করা চলে, যদি ভালবাসা সেই মানের ভিত্তি হয়; তাঁহার গালে চড় দেওয়া চলে, যদি আমার হস্তাঙ্গুলি তৎসংস্পর্শে অভিষিক্ত হয়, মোটকথা যে শিশুগুলিকে আমরা প্রতিদিন গাল দিতেছি, মারিতেছি, যে প্রণয়িনীর পদ ধরিয়া সাধিতেছি, ইহা সমস্তই সেই প্রেম-লীলাময়ের রাজ্যের

অস্তরঙ্গের মেহলীলা ; এই সংসারের আত্মিনায় প্রত্যেক মাতার পশ্চাতে সেই অনন্ত মেহলীলা যশোদা আছেন, প্রত্যেক শিশুর পশ্চাতে সেই মেহের ছলল বালগোপাল হাসিতেছেন ; এবং যখন চৈতন্তদেব মানুষের মধ্যে দেবতা ও দেবতার মধ্যে মানুষ এই ভাব স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিলেন, তখন কৃষ্ণের পা ধরা ব্যাপারটার রহস্য বৈষ্ণবেরা ভাল করিয়া বুঝিল। পরবর্তী কবি বলরাম দাস যখন গাহিলেন, “নিদ বায় চাঁদবদনী শ্রাম অঙ্গে দিয়া পা” তখন আর কোন প্রবাদবাক্যের সৃষ্টি করিয়া দেবলীলা বুঝাইবার প্রয়োজন হইল না। মানুষ তাহার সমস্ত লীলার মধ্যে দেবলীলা প্রত্যক্ষ করিল এবং তাহার ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। জয়দেব এইভাবে রাধাকৃষ্ণ-লীলার এক নূতন যুগ প্রবর্তন করিলেন,—বাহা ভারতবর্ষের অজ্ঞাত তখনও অনায়ত্ত ছিল।

স্রার উইলিয়ম জোন্স ও এডুইন আরনল্ড ইংরেজী ভাষায় গীতগোবিন্দের অনুবাদ করিয়াছেন। লাসান এই কাব্য ল্যাটিন এবং রুকার্ট জার্মানে অনুবাদ করেন। ইহা ছাড়া পারসী ও আরবী ভাষায় গীতগোবিন্দের অনুবাদ হইয়াছিল। বাঙ্গলাভাষায়

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহা অনেকবার অনূদিত হইয়াছিল।
গীতগোবিন্দের অনুবাদ।

গিরিধরের অনুবাদ অপেক্ষা রসময়ের অনুবাদই বিশেষ উৎকৃষ্ট। রসময় সংস্কৃত ছন্দের মাধুর্য্য বাঙ্গলায় আনিয়াছেন। হিন্দী ভাষাতেও গীতগোবিন্দের অনেকগুলি অনুবাদ হইয়াছে। রসময় ও গিরিধর ছাড়া প্রাচীন কবিদের মধ্যে জয়দেবের অনুবাদক যত্ননন্দন দাস প্রভৃতি আরও অনেক কবি পাইয়াছি। •

শুধু কবি লইয়াই লঙ্গণসেনের রাজসভা উজ্জ্বল হয় নাই। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হলায়ুধ “ব্রাহ্মণসর্কস্ব” নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। হলায়ুধ “সেক শুভোদয়া” নামক গ্রন্থ প্রণেতা। কেহ কেহ এই পুস্তকের ভুল সংস্কৃত এবং কেহ বা উহার অলৌকিক ঘটনা-বিবৃতি দেখিয়া উহা হলায়ুধের লিখিত নহে এরূপ অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু আমরা লিখিয়াছি, লঙ্গণসেনের সভার পণ্ডিত-গণ।

নকলকারীর অত্যাচারে পুস্তকখানির সংস্কৃত বিকৃত হইয়াছে। ফকিরের কেরামতিতে এখনও প্রবীণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তির বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সুতরাং তদ্বারা পুস্তকখানি জাল বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। লঙ্গণসেন সেক জালালুদ্দিন তব্রেকের অত্যন্ত অমুরাগী ও বশীভূত ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী যে ফকিরের জীবনী লিখিবেন, তাহাতেই বা আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে? হলায়ুধ আত্মপরিচয় স্বলে লিখিয়াছেন তিনি যখন কুমারবয়স্ক তখন লঙ্গণসেন তাঁহাকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন, যৌবনে তাঁহাকে মন্ত্রীর পদ প্রদান

• আমরা কবিরিগের স্মৃতিবারিকী লইয়া অনেক হেঁচ করিয়া থাকি। অনেক টাকাও এতদ্রুপলক্ষে ব্যয় হইয়া থাকে। কিন্তু জয়দেবের এই প্রাচীন অনুবাদগুলি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। সাধারণ গীতগোবিন্দের একটি বৃহৎ সংস্করণে এই প্রাচীন কবিদের কীর্তি রক্ষা করিয়া আমরা কবির প্রতি সম্মান দেখাইতে পারি।

করেন এবং বার্ষিক্যে ধর্ম্যাধিকার বা প্রধান বিচারকের পদ প্রদান করিয়াছিলেন। *
সেক শুভোদয়ায় দেখা যায় রাজার কোন কোন মন্ত্রী জালালুদ্দীন ফকিরের বিশেষ বিরুদ্ধ
ছিলেন, কিন্তু হলায়ুধ তাঁহার একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন।
হলায়ুধ পুরুষোত্তম প্রকৃতি।

“ব্রাহ্মণসর্কস্ব,” “সেক শুভোদয়া” ব্যতীত হলায়ুধের “মৎস্তসূক্ত”
নামক অপর একখানি পুস্তক আছে। এই সময়ে পুরুষোত্তমের “ভাষাবৃত্তি” ও “ধিকৃপাদি
কোষ” গ্রন্থ এবং পশুপতি ও ঈশানের পদ্ধতিদ্বয় রচিত হইয়াছিল। এই সকল কবি এবং
পণ্ডিত ছাড়া শূলপাণি, বলভদ্র প্রভৃতি স্বধীমণ্ডলী লক্ষণসেনের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

মহারাজ লক্ষণসেনের সভা বিশ্বনাথলীর অবলম্বনস্বরূপ ছিল, তাঁহার সভায় কলাবিজ্ঞার
উৎসাহ দেওয়া হইত। রাজদরবারের নর্তকীদের মধ্যে বিদ্যাপ্রভা ও শশিকলা ছিলেন
বিদ্যাপ্রভা ও শশিকলা।

এই সুপ্রসিদ্ধা গায়িকাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন। সেক
শুভোদয়াতে কথিত আছে বিদ্যাপ্রভা একদিন “সুহৈ” রাগে গান করিয়াছিল, সেই গান
বে যেখানে থাকিয়া শুনিয়াছিল, সে-ই চিত্রাংগিতের ছায় মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু
গানের মোহিনী শক্তি সর্কাপেক্ষা বিস্তার করিয়াছিল এক বণিক-বধুর উপর। সেই বণিক
বধু কূপ হইতে জল তুলিতেছিল, সম্মুখে তাহার এক শিশুপুত্র দাঁড়াইয়াছিল। সঙ্গীতের
মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া সেই রমণী কলসীর গলায় বজু না বাধিয়া শিশুপুত্রটিকে বজুবদ্ধ
করিয়া জলে ডুবাইয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধধর্মের প্রতিক্রিয়া—নৈতিক অধঃপতন

লক্ষণসেনের সময়ে ভারতবর্ষটা বাসনের নিকেতনে পরিণত হইয়াছিল। নৈতিক
অধঃপতন না হইলে রাষ্ট্রীয় অধোগতি হয় না। বড় বেলীমাত্রায় ব্যভিচার চলিতেছিল,
ধর্মও যৌন ব্যভিচারে কলুষিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব তাঁহার মাসীমাতা মহা-
প্রজ্ঞাবতীকে ভিক্ষুসত্ত্ব প্রবেশের অমুমতি দেওয়ার সময়ে আনন্দের নিকট যে ভবিষ্যদ্বাণী
করিয়াছিলেন তাহা ফলিতে আরম্ভ করিল। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর সম্পর্ক জ্ঞকার-
জনক হইয়া উঠিল। বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা পঞ্চমকারের বীজমন্ত্র অভিনয় করিতে লাগিলেন।

* “বাল্যে ব্যাপিত-রাষ্ট্রপতিপদঃ বেতান্তবিদ্যোজ্জ্বলজ্যোৎস্নিক-মহামহন্তপদঃ দ্বা নবে যৌবনে।
যৌবনশেষযোগ্যমধিকারপালনারায়ণঃ শ্রীমাল্লসেনদেবপুত্রির্ধর্ম্যাধিকারং বদে।

বৈষ্ণবধর্মে রাধাকৃষ্ণের প্রেম লইয়া নানারূপ অসঙ্গত কাহিনী রচিত হইল। জয়দেবের গীতগোবিন্দের কবিত্ব উপাদেয়, কিন্তু রুচি দোষাবহ। দেবমন্দির-গাত্রে যে সকল যৌন-বিষয়ে মূর্তি অঙ্কিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে মনে হয় কামশাস্ত্রের সমস্ত বক্তৃতাগুলির দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহা পরিকল্পিত হইয়াছিল। যে সকল তীর্থে বালবিধবা, শিশু, যুবক, পিতা-মাতার সহিত পুত্র, পুরোহিতের সহিত তরুণী শিষ্যা, শাণ্ডীীর সহিত পুত্রবধূ, দেবর ও ভাগ্নীর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি গৃহস্থ পরিবার-ভুক্ত ব্যক্তিগণ সর্বদা যাতায়াত করিতেন, সেই তীর্থের দ্বারে এই সকল মূর্তি যে সকল শিল্পী উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উপদেশ দিয়াছিলেন কে? অধ্যাত্মবাদী লোকেরা এই প্রশ্নের নানাতাবে উত্তর দিয়া থাকেন। কিন্তু যখন এই সকল দ্রৌপদীর মূর্তির নানারূপ নগ্নভঙ্গী দেখিতে পাই, তখন তীর্থগামিনী তরুণীর লজ্জাকর চক্ষু ও বুদ্ধ গুরুজনের মুখবিকৃতি, তরুণ যুবকের ক্রম পলায়ন-চেষ্টা, এসকলও তো সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই। চাক্ষুষ প্রমাণের কাছে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা কোথায় ভাসিয়া যায়! এবং বিবেক সেই পবিত্র স্থলে এই সকল বীভৎসতার কোনরূপই অনুমোদন করে না। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বঙ্গের বহু মন্দির-গাত্রে এইরূপ বীভৎস চিত্র উৎকীর্ণ হইয়াছিল, এখনও তাহা স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ত্রিপুর জেলার মেহের কালীবাড়ীর নিকট হইতে এক বৃহৎ কাষ্ঠফলকে আমরা নগ্ন নরনারীর এইরূপ চিত্র পাইয়াছি। উহা তৎকালকার দাস-রাজাদের রথে সংলগ্ন ছিল। দাস-রাজা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিজয়মান ছিলেন। কলিকাতার অতি নিকটে আন্দুলমোড়ীর প্রসিদ্ধ কুণ্ড বাবুদের বহু প্রাচীন অধুনা অব্যবহাৰ্য্য একখানি রথে এইরূপ চিত্র ছিল। খেজুরাহ মন্দিরেও এইরূপ মূর্তি দেখিয়াছি, তাহার ফটোগ্রাফ আমার নিকট আছে। মেহেরের এই নীলতাবিগর্হিত নরনারীর বীভৎসমূর্তিযুক্ত কাষ্ঠফলকখানি আমার নিকট আছে। পুরী ও খেজুরাহ মন্দিরের মূর্তিগুলি এই একই পর্ষাদেয়। বৌদ্ধযুগের প্রতিক্রিয়াসূচক এই যৌন-নীলার চিত্র ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর পরে অঙ্কিত হয় নাই।

যে কঠোর আদর্শ ভিক্ষুর সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বুদ্ধদেব রক্তমাংসজাত বাসনাকে নিঃশূল করিয়া মানুষকে নির্জ্ঞানের পথে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, সেই আদর্শ দ্বাদশ শতাব্দীতে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইল। যে কঠোর সংযম জাতীয় জীবনের সাধনার সামগ্রী হইয়াছিল, যুগব্যাপী উৎকট তপস্যা-জনিত অবসাদে পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন মানব আত্মা সে সাধনার বিস্মৃত হইয়া বসিল। যৌন সম্বন্ধ রততা গ্রন্থ হইবার হইল। দেশের সাহিত্যে, দেশের শিল্পে, দেশের সমাজে সর্বত্র যৌন সম্বন্ধের বাধাবিহীন একেবারে দুরীভূত হইল। কামদেবের অপ্রতিহত রাজত্ব আরম্ভ হইল। লক্ষণসেনের সভার মন্ত্রীরা প্রকাশ্যভাবে

মন্ত্রী পারদারিক।

নর্তকীদের সঙ্গে ব্যভিচারের মূল্য লইয়া কলহ করিতে লাগিলেন
(সেক শুভোদয়া, বোড়শ পরিচ্ছেদ) “অগ্নিনু রাজ্যে মন্ত্রী পারদারিকঃ”

ইত্যাদি কথা এই উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে। পঞ্চাবতী রাজসভার মৃত্যুগীতে বোঁগ দিতেন, সম্ভবতঃ জয়দেব বাগ্গবন্ত লইয়া তালরক্ষা করিতেন। গৃহস্থপরিবার রাজদরবারে নর্তকী

জোগাইত। বিদ্যাংপ্রভা ছিল গঙ্গানদের পুত্রবধু। সে ব্যভিচার-প্রাপ্ত অর্থ আনিয়া স্বত্তরের হাতে দিত, উপার্জন অল্প হইলে তাহা লইয়া গোলযোগ ঘটত। কলিঙ্গাঙ্গনাদের সঙ্গে লক্ষ্মণসেনের কুমার-লীলা তাম্রশাসনে সগৌরবে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল প্রসঙ্গ লইয়া “ধোয়ী কবি” পবনদত্ত লিখিয়া রাজকীয় পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের শ্রালককর্তৃক কুমারদত্তের গৃহস্থ বধূকে ধর্ষণের অনেক কথা পূর্বেই (৩৭৬ পৃষ্ঠায়) উল্লিখিত হইয়াছে। সেক শুভোদয়াতে ঘটনাটি এইভাবে বিবৃত হইয়াছে—একদা মাধবী নামী এক বণিক-বধু গঙ্গানান করিয়া তাহার কটিলম্বিত বিপুল কুন্তলগুচ্ছ রোদ্রে শুকাইতেছিল, এই সময়ে রাজ্যী বলভার ভ্রাতা লক্ষ্মণসেনের শ্রালক কুমারদত্ত রাজ্যের প্রধান ঘোড়াটার চাপিয়া গঙ্গাতে জলপানার্থ আসিল এবং সেই রূপবতী বণিক-বধূকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। কুমারদত্ত মাধবীকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া বলিল, “তোমার গায়ে যে সকল অলঙ্কার আছে

তাহা হইতে অনেক বেশী অলঙ্কার আমি দিব, আমার সঙ্গে সাফাতের মাধবীর কাহিনী।

একটা সময় নির্ধারণ কর, তুমি যাহা চাহিবে আমি তাহাই দিব, আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে কি না দিতে পারি।” মাধবী এই সকল কথা শুনিয়া কোন উত্তর করিল না, মোন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন কুমারদত্ত বলিল, “উত্তর দিতেছ না কেন? আমি যদি তোমাকে এখন ধরিয়া লইয়া যাই তোমাকে কে রক্ষা করিতে পারিবে?” মাধবী বলিল, “তুমি কামাক হইয়া মূঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি কে এবং আমি কে তাহা ভাবিয়া দেখ। তুমি রাজপুত্র, তুমি এইরূপ ঘৃণিত কাজ করিলে লোকে তোমাকে নিন্দা করিবে। আর যে সকল ভয় দেখাইতেছ তাহারই বা মূল্য কি? মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজ্যে পরদ্রী ধর্ষণ করে এমন শক্তি কাহার? (“কত শক্তিবিঘ্নেতে বিজয়-রাজ্যে পরদ্রীঃ ধর্ষয়িতুং শক্ৰোতি ?”) কুমারদত্ত পুনরায় নানারূপ প্রলোভন ও ভয় দেখাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটি হইল। এই সময়ে পুরবাসিনীরা অনেকে গঙ্গানানের জন্ত তথায় উপস্থিত হইল। কুমারদত্ত চলিয়া গেল এবং মাধবী তাহার প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে গৃহে গমন করিল।

কুমারদত্ত গৃহে বাইরা হির ধাকিতে পারিল না। একজন নাপিতানীকে মাধবীর নিকট পাঠাইয়া দিল। সেই স্ত্রীলোকটি আসিয়া মাধবীকে অনেক লোভ দেখাইয়া বলিল, “তোমার রূপ-লাবণ্য দেখিয়া কুমারদত্ত মৃতবৎ—আমার গৃহে অপেক্ষা করিয়া আছে, তোমার মুখের অমুকুল কথা পাইলে সে প্রাণ পাইবে।” নাপিতানাকে মাধবী অনেক তর্জন করিতে লাগিল। সেদিন প্রস্থান করিয়া সে বিরত হইল না, পুনরায় যাতায়াত করিতে লাগিল—তখন মাধবী তাহাকে সম্মার্জনী লইয়া তাড়া করিল।

কুমারদত্তের নিকট নাপিতানী এ সকল কথা বলিল না, সমস্ত অপমান হজম করিয়া হাসিমুখে সে রাজ-শ্রালককে মিথ্যা কথা বলিল, “আমি যেখানে বাই, সেখানে কি কোন কাজ বাকী থাকে? হুসংবাদ আছে। মাধবী বলিয়া দিয়াছে, কুমারদত্ত আমার স্বত্তর ও স্বামীকে কিছু বেশী মূল্য দিয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে দিন এবং যখন তাহার অলঙ্কারগুলি প্রস্তুত করিবেন তখন যেন বলেন যে ঐ গহনায় অষ্টপল সোণা কম হইয়াছে। এই অভিযোগের

পর বাদান্তবাদ হইবে, তখন যেন কুমারদত্ত আমার স্বত্তর ও স্বামীকে বাধিয়া রাজদ্বারে লইয়া যান। তাহা হইলে আমাদের মিলনের সুবিধা হইবে।” এই মিথ্যা কথায় প্রীত হইয়া কুমারদত্ত মাধবীর স্বত্তর ও বাধীকে গহনা প্রস্তুত করিতে দিয়া গেল, কিন্তু এই ব্যাপারে মাধবী কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া বোরতর প্রতিবাদ করিল। সে অবশ্য তাহার স্বামী বা শান্তডীকে কুমারদত্তের কথাগুলি জানায় নাই। অতিরিক্ত টাকার লোভে তাহার স্বামী ও স্বত্তর তাহার প্রতিবাদে কর্ণপাত করিল না। অলঙ্কার লইবার সময়ে কুমারদত্ত তাহার প্রদত্ত অষ্টপল সোণা কম হইয়াছে বলিয়া একটা গোলযোগ উপস্থিত করিল, এবং বিচারের জন্ত বণিকৃৎসকে রাজদ্বারে লইয়া বাইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিল। তখন নাপিতানী বলিল, “এখন সকলই ঠিক হইয়াছে, মাধবী বলিয়াছে, তাহার শান্তডী চক্ষে দেখে না, আপনি যে সময়ে ইচ্ছা তাহার গৃহে বাইতে পারেন।” কুমারদত্ত নাপিত-বধুর কথায় প্রতারিত হইয়া মাধবীর গৃহে উপস্থিত হইল। মাধবী পলাইবার উপক্রম করিলে সে তাহার শাড়ীর আঁচল ধরিয়া টানিতে লাগিল এবং সেখানে তখন একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি হইল। মাধবীর চীৎকারে পাড়াপড়শীরা তথায় উপস্থিত হইল এবং কুমারদত্ত পলাইয়া গেল। লোকজন-পরিবৃত হইয়া মাধবী মস্তীর নিকট উপস্থিত হইল। মস্তী উমাপতিধর বলিলেন, “আমি যথোচিত চেষ্টা করিব, কিন্তু এই কুমারদত্ত রাজার শালক, রাজ্যী বসন্তার ভ্রাতা—আমার দ্বারা এই অভিযোগের বিচার হইবে না, রাজা স্বয়ং বিচার করিবেন, তবে কিছু শাস্তি অবশ্যই হইবে। তুমি দরবারে বাও আমি তথায় শীঘ্র বাইতেছি।” মাধবী রাজসভায় উপস্থিত হইয়া অভিযোগ করিল। বখন মাধবী কুমারদত্তের কথা বলিল, তখন সভাসদেরা স্থানুর জায় বসিয়া রহিল, শুধু একে অস্ত্রের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল, কোন কথা বলিল না। গোবর্দ্ধন-আচার্য্য রাজসভার বিচারক। তিনি সন্ন্যাসী, দণ্ডকমণ্ডলুহস্তে বসিয়াছিলেন। তিনি মাধবীকে স্নিহভাবে আহ্বান করিয়া সকল কথা তাহার মুখে শুনিতে লাগিলেন। তখন রাজমহিষী বসন্তা দাসীর সহিত রাজসভার দ্বার আলিঙ্গন করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “এই উমাপতিধর বোর পাণিষ্ঠ, এই ব্যক্তির প্রেরণায় অভিযোগটি হইয়াছে। এ সমস্তই ইহার বড়মস্ত্রের ফল—হে সভাসদগণ! আপনারা বিচার করুন।” রাজ্যী এই কথা বলিলে সমস্ত সভা চূপ হইয়া গেল। রাজা স্বয়ং মাধা হেঁট করিয়া রহিলেন, রাজ্যী মাধবীকে সোধোদন করিয়া বলিলেন, নির্লজ্জে পরপুরুষরতা ঘিচারিণী তুই কোন্ সাহসে আমার ভ্রাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছিস? ইহার জন্ত তাকে অমৃত্যুতাপ করিতে হইবে। আমি তোকে এমন শাস্তি

গোবর্দ্ধন-আচার্য্যের
তেরখিত।

দিব, বাহাতে তুই ভবিষ্যতে কাহারও মঙ্গল্যায় এরূপ কাজ করিতে সাহসী হইতে পারিবি না।” মাধবী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বাইয়া রাজ্যীর পাদমূলে নিপতিত হইল এবং সকাতরে বলিল, “ধর্ম্মশীলে

মা, আমায় ক্ষমা করুন। এই গোড়রাজ্যের সম্রাট সমর-বিজয়ী মহারাজাধিরাজ লক্ষণসেন, আপনি তাহার পত্নী, আমায় ক্ষমা করুন। এই রাজ্যে চিরকাল সুবিচার হইয়া আসিয়াছে, কেহ এখানে বলপ্রয়োগ করিতে পারে নাই। এখন বুঝিতেছি, বল বাহার, এই পৃথিবী

তাহার। আপনার কুলে এবং পিতৃকুলে এরূপ ব্যবহার ছিল না যে, একজনের পত্নীকে অপরে গ্রহণ করে। মা, আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তবে আমি আপনার ভ্রাতাকেই ভজন্য করিব।” (“তদাজ্ঞাপয় আজ্ঞাপয় তবৈব ভ্রাতরং ভজ্যামি।”) মাধবী এই কথা বলিলে রাজ্ঞী তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া লাধি মারিলেন। ভয়ে কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল না। গোবর্দ্ধনাচাৰ্য্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া লক্ষণসেনকে ভৎসনা করিয়া বলিলেন, “মহারাজ, আপনি বৈষ্ণব ধার্মিক তাহা বুঝিলাম। মহারাজার এই রাজ্য অচিরে বিনষ্ট হইবে।” এই বলিয়া একটা খনিজ লইয়া ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজ্ঞীকে হত্যা করিতে উত্তত হইলেন। তিনি বলিলেন, “রাজার পত্নী—এই গোরবে তুমি বর্ষের মাথায় পদাঘাত করিতেছ। তোমার ভাই ইহাকে ধ্বংস করিতে গিয়াছিল, তুমি ইহাকে গ্রহণ করিতেছ। এই রাজ্য শীঘ্রই নষ্ট হইবে। আমি শুনিয়াছি ৫২ পুরুষ পালগণ রাজত্ব করিয়াছেন। পূর্বকালে রামপাল রাজা ছিলেন। তাহার পুত্র এক দ্বীলোককে ধ্বংস করিয়াছিল, এই অভিযোগে রামপাল তাহাকে শূলে দিয়াছিলেন। এখনও রামপালের এই বিচারের প্রশংসা গ্রাম্যগীতে শোনা যায়। সকলে বলে, রাজা রামপাল তাহার পুত্র অপরাধী বা নিরপরাধ হউন, তাহাকে শূলে দিয়াছিলেন।”

এই বলিয়া দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া গলদক্রমে গোবর্দ্ধনাচাৰ্য্য চলিয়া যাইতে উত্তত হইলেন। সভাসদগণ একেবারে নিস্তব্ধ রহিল। তখন রাজা স্বয়ং সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া গোবর্দ্ধনাচাৰ্য্যের পায়ে ধরিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। এই সময়ে সেক জালালুদ্দিন এবং অপর কয়েকজন সভাসদ কুমারদত্তের নিন্দা করিতে লাগিলেন। রাজা খজাহস্তে কুমারদত্তকে বধ করিতে উত্তত হইলেন। তখন মাধবী অগ্রসর হইয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল, “মহারাজ, কমা করুন, ইনি আমার কর ধরিয়া আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার প্রাণ যায় নাই, জাতিও যায় নাই। আমার প্রতি যে ব্যবহারই করিয়া থাকুন, ইহাকে আপনি কমা করুন। আমার হৃদেই অথবা জন্মান্তরে কৃত দোষেই ইনি এই সব করিয়াছেন। এখন এই অসদ্ব্যবহারটার শাস্তি হউক।” মাধবী এই কথা বলাতে সভাস্থ সকলেই তাহার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

এই কাহিনীটি আমি এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহাতে পাল-রাজাদের ৫২ পুরুষের কথা আছে। পালরাজগণের এমন অনেকের নাম আমরা পাইতেছি বা পাইয়াছি, দ্বিহারা তাম্রশাসনে বা শৈললেখে উল্লিখিত হন নাই। কোন রাজার পাঁচটি ছেলে থাকিলে কখনও কখনও তাহাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হন, সর্গজ্যেষ্ঠ সন্তানের পদ পাইয়া অপরার ভ্রাতাকে সামন্তরাজার পদবী দিয়া থাকেন। লোকশ্রুতিতে অপর ভ্রাতারও রাজা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। এই হিসাবে যে কয়েকজন রাজচক্রবর্তী হইয়াছিলেন তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশীসংখ্যক রাজবংশ-সম্বৃত ব্যক্তিরা ‘রাজা’ বলিয়া সাধারণে পরিচিত হইতেন। ৫২ পুরুষের ব্যাখ্যা এইরূপ হইতে পারে। তারানাথ পালরাজাদের অনেকের নাম করিয়াছেন দ্বিহারা তাম্রশাসনে বা শৈললেখে উল্লিখিত

হন নাই। আমরা “৫২ পুরুষটি” ঠিক আক্ষরিকভাবে সমর্থন করি না, কিন্তু উহা যে লোকপ্রবাদমূলক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রামপালের পুত্রকে শূলে দেওয়ার কথা শুধু সেক শুভোদয়াতে নহে, সার্যাল মহাশয়ও বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছেন,—কুলজীগ্রহ এবং বহুদিনের জনশ্রুতি অবলম্বনে তিনি তাঁহার ইতিহাস লিখিয়াছেন। পুত্রকে শূলে দেওয়ার প্রসঙ্গ লইয়া গ্রাম্যগীতি রচিত হইয়াছিল, তাহারও ইঙ্গিত আমরা সেক শুভোদয়াতে পাইতেছি। পুত্ররাং যুদ্ধভাবে বিচার করিলে কথার খুঁটিনাটি লইয়া আপত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু মোটামুটি হিসাবে ঘটনাটি অগ্রাহ্য করা যায় না, ইহা পূর্বেই আমরা লিখিয়াছি।

এই কাহিনীতে গোবর্দ্ধনাচার্যের সম্যক-সংবৃত্ত ব্রাহ্মণ্যভেদ আমাদের চক্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই সংসাহস, এই জড় শক্তির প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা এবং ভ্রাতৃ বিচারের মূর্ত আদর্শ তখন ব্রাহ্মণের সম্মুখে ছিল বলিয়াই আর্ঘ্য-সভ্যতা জগতে পূজা পাইয়া আসিয়াছে। বঙ্গের বর্তমান নানা কোতুক ও আনন্দের তরল যদিরা দর্শকদিগকে উদ্ভাস্ত করিতেছে—আমাদের নাট্যালাপসমূহ কি এই সকল জীবন্ত ঐতিহাসিক আদর্শ রত্নমণ্ডলের পুরোভাগে আনিয়া দেখাইতে পারে না?

লক্ষণসেনের সভার যে চিত্র আমরা সেক শুভোদয়াতে দেখিতে পাই, তাহা জ্ঞানগরিমা, পাণ্ডিত্য ও শিল্প-কলায় শোভাযুক্ত হইলেও বঙ্গের জাতীয় চরিত্রে যে ঘৃণ ধরিয়াছিল, এবং নৈতিক আদর্শের বিচ্যুতিহেতু যে উহা অধঃপাতের সমীপবর্তী হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সময়ের প্রায় সাতশত বৎসর পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে আবার একবার এই দেশে নৈতিক অধোগতি হইয়াছিল, তাহা দ্বিতীয় বারের রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা করিয়াছিল।

লক্ষণসেনের রাজ্যী বলভা যে কিরূপ অত্যাচারিণী ছিলেন তাহার উদাহরণ আর একটি দিব। জালালুদ্দিন কোন স্থানে একটি ভূপ্রাধিত কলসীর মধ্যে বহু হুর্লভ রত্নালঙ্কার প্রাপ্ত হন, তাহার মধ্যে একটি অতি মূল্যবান মণি ছিল, তাহা তিনি লক্ষণসেনকে প্রদান করেন। সেই কলসীতে মণিটি ছাড়া কতকগুলি মহামূল্য কঙ্কণ ছিল। রাজসভার নর্তকীদ্বয়কে গীতি-কৃতিদের জন্ত তিনি তাহার দুইটি করিয়া চারিটি প্রদান করেন। রাজা, হলায়ুধ-

মিশ্র, আচার্য গোবর্দ্ধন, জয়দেব, পদ্মাবতী ইহাদের প্রত্যেককে তিনি রাজ্যী বলভার নীচতা।

কঙ্কণ প্রদান করেন। রাজাকে মণি ছাড়া আরও দুইটি সর্বশ্রেষ্ঠ কঙ্কণ দেওয়া হইয়াছিল। বনিকু-বধু মাধবী তাঁহার অতি মেহপাত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি তাহাকেও কঙ্কণদ্বয় দিয়াছিলেন। সেই কঙ্কণ হাতে দিয়া মাধবী স্বামিসহ দানার্থে যাইতেছিল। বলভার দাসীরা যাইয়া বলিল, “মা রাণী, সেই বনিকু-বধু মাধবী এমন সুন্দর ও মহামূল্যের কঙ্কণ পরিয়াছে, বাহাতে তাহার হাত দুইখানি সূর্য্যকিরণের মত উজ্জ্বল দেখাইতেছে।” রাজ্যী আজ্ঞা করিলেন, “মাধবী ও তাহার স্বামীকে আমার নিকট লইয়া আইস।” দাসীদিগকে মাধবী বলিল, “তোমরা যাইয়া বল, দানান্তে আমরা রাজ্যীর নিকট

বাইব।" তাহারাই বাইয়া বলিল, "বণিক-বধু ও তাহার স্বামী তোমার আজ্ঞা মানিল না, তাহারাই আসিল না।" রাজ্ঞী স্বয়ং তাহাদের নিকট গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "পাপীয়সী বণিক-বধু! আমার আজ্ঞা অমান্য করিলি কেন? এই কঙ্কণ কোথায় পাইয়াছিস?" মাধবী বলিল, "মা, শুধুন, আমি সাধুর গঙ্গা, সাধুর পুত্রবধু এবং সাধুর কন্যা, আমার ঘরে নানা প্রকারের রত্ন আছে।" রাজ্ঞী বলিলেন, "আমাদের ভাণ্ডারে এমন কঙ্কণ নাই।" মাধবী উত্তর করিল, "মহারাজি। এ বিষয়ে তাহা হইলে আমার মত সৌভাগ্য আপনার হয় নাই।" এই কথা শুনিয়া রাজ্ঞী ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "কি পাপীয়সী! এত বড় কথা। আমার ভাগ্য নাই? আমি অপেক্ষা তোর বেশী ভাগ্য।" রাণী স্বয়ং মাধবীর হাত হইতে জোর করিয়া কঙ্কণ দুইটি খুলিয়া লইলেন এবং ভৃত্যদিগকে আদেশ করিয়া বলপূর্বক তাহার স্বামীর কর্ণ হইতে কুণ্ডল দুইটি খুলিয়া লইয়া উহাকে দূর করিয়া দিলেন। তখন মাধবী স্বামীর সহিত সেক জালালের নিকট বাইয়া কাঁদিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে জানাইল। এদিকে মাধবীর কঙ্কণ রাজ্ঞী নিজে পরিলেন এবং তাহার স্বামীর কুণ্ডল নিজ পুত্রকে পরাইলেন। তৎপরে হলায়ুধ মিশ্র ও পদ্মাবতীকে লইয়া সেক জালালের আশ্রমে গেলেন। রাজাও ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় উপনীত হইলেন। সেই স্থানে মাধবীর সঙ্গে তাহার আবার কলহ হইতে লাগিল। রাজা কিছু না বলিয়া অধোমুখ হইয়া রহিলেন। জালালুদ্দিন কোন কথা বলিলেন না। এদিকে মাধবী রাজ্ঞীকে খুব শাসাইতে লাগিল। মাধবী বলিল, "রাজ্ঞি, আপনি নিজেকে খুব মহৎ মনে করেন, সেক জালাল এই কঙ্কণ আমাকে দিয়াছেন, আপনি জোরপূর্বক তাহা লইয়া গিয়া নিজে পরিয়াছেন, ইহাতে আপনার লজ্জা হয় না? যদি নিজের ইষ্ট চান, তবে আমার কঙ্কণ আমাকে দিন, পরের জিনিষ পরিতে আপনার লজ্জা হয় না?" ভয়ে কেহ কিছু বলিলেন না। রাজা রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিবার জন্ত মিষ্ট কথা বলিতে লাগিলেন, "তুমি কেন ছোটলোকের মত ব্যবহার করিতেছ, বল দেখি? বাহারাই সেবক তাহাদের কঙ্কণ ও কুণ্ডল কেন নিয়াছে? ইহাদের কঙ্কণ ও কুণ্ডল কিরাইয়া দাও।" রাণী সক্রোধে বলিলেন, "এই সেক আপনাকে কি দিয়াছেন? ইনি যথুকর বেণের স্ত্রীকে মহানু্য মণি ও কুণ্ডল দিয়াছেন, আপনাকে কি দিয়াছেন? আপনার মুখে ও আমার মুখে ছাই দিয়াছেন।" মাধবী রাজপত্নীকে বলিল, "কলহকারিণি রাজ্ঞি, আপনার মহত্ব আমার খুব জানা আছে, পূর্বে একবার যখন পা ধরিয়াছিলাম, তখন আমাকে লাগি মারিয়াছিলেন, তাহা আমি ভুলি নাই। কাষ্ঠচরনকারীর বংশের আর বেশী কি মহত্ব থাকিবে?"

এই কলহ আর বেশীক্ষণ চলিল না। সেক জালাল মধ্যে পড়িয়া মিটাইয়া দিলেন। বিজয়সেন (লক্ষণের পিতামহ) রাজজামাতা হইয়াও দৈবশ্রুতিপাকে পড়িয়া কিয়ৎকাল কাষ্ঠচরন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। সাম্রাজ্য মহাশয় সেই গর বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, মাধবী রাণিয়া বাইয়া এখানে সেই কথাটার ইঙ্গিত করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় সেক শুভোদয়াতেও সেই কথার আভাস আছে।

এই যে দৃষ্ট রাজ-প্রাসাদের অন্তঃপুরে উদঘাটিত হইয়াছে, তাহা কি বীভৎস! যৎস্র-জীবীদের মহিলারাও হাটবাজারে এক্রপ কলহ করে না। ইহার মধ্যে যদি সত্যের কোন লেশমাত্রও থাকে, তবে অবশ্য বলিতে হইবে নৈগ রাজার বিচারবুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল এবং রাজ্যী সর্বদা প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া হীনতা প্রদর্শন করিতেন। তাম্রশাসনে লক্ষণসেনের দ্বীর নাম তান্দ্রা দেবী পাইতেছি, এখানে কিন্তু রাজ্যীর নাম বলভা। কিন্তু এক ব্যক্তির একাধিক নাম থাকিতে পারে এবং রাজাদের পক্ষে একাধিক ভাৰ্যা থাকাও কিছুমাত্র আশ্চর্যের বিষয় নহে। লক্ষণসেনের সময় হইতেই রাজপ্রাসাদ একদিকে পণ্ডিতগণের কোলাহলে, অপরদিকে নর্তকীদের ও গণিকাদের নৃপুংস্বনি ও গীতিবাঞ্চে মুখরিত হইয়াছিল। কেশব সেন বুদ্ধবিজ্ঞায় পারদর্শী ছিলেন কিন্তু “কুরঙ্গীসদৃশা লজ্জানতা সুন্দরীগণের নীবিবক্ বিসরণে ব্যস্ত থাকিতেন” (বাঙ্গালীর বল, ১৪০ পৃঃ)। বিজ্ঞাপতির পুরুষ-পরীক্ষায় দেখা যায়—লক্ষণসেনের বহু পত্নী ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও তিনি আদর করিয়া ‘উত্তমা’, কাহাকেও ‘স্বাধীনভর্তৃকা’ বা ‘অভিসারিকা,’ কাহাকেও ‘উৎকষ্টিতা’ বা ‘বিপ্রলদ্ধা’ অথবা ‘কলহাস্তরিতা’ কিংবা ‘বাসকসজ্জা’ নাম দিয়া সেই নামোচিত বেশভূষা পরাইয়া আমোদপ্রমোদ করিতেন।* এই সব কাহিনী একদিকে রাজগৃহে সংস্কৃতির প্রভাব কত বেশী হইয়াছিল তাহা প্রমাণ করে, অপরদিকে রাজার বিলাস-বৃত্তির পরিচয় দেয়।

বলভা ও বসুদেবী নামী যে লক্ষণসেনের দুই প্রধানা মহিষী ছিলেন, তাহার উল্লেখ আমরা ষ্টেপলটন-সম্পাদিত গোড়-পাণ্ডুরা নামক পুস্তকে পাইতেছি। এই পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। স্বতরাং এই বিষয়ে সেক শুভোদয়ার কথা যে বিখ্যাত তৎসম্বন্ধে কোন দ্বিধার কারণ নাই।

যে দেশের আদর্শ স্বামী শিব সতীর মৃত্যুর পর তাঁহার শব স্বন্ধে করিয়া কত যুগ কাটাইয়া দিয়াছিলেন, এবং অশ্রুধারায় যে নদী সৃষ্টি করিয়াছিলেন সিদ্ধনদের পশ্চিমে তাহা মহাতীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে এবং যে দেশে এই আদর্শ দেবতার ইঙ্গিতে কাম ভগ্ন হইয়াছিল এবং যেখানকার লোকেরা “দ্বিহং ন পশ্চতি নগ্নাং—নোদীক্ষেত” প্রভৃতি শ্লোকগুলিতে চিরাভ্যস্ত, যে দেশের আদর্শ রাজা রাম সীতা ভিন্ন অপর কোন দ্বীর মুখ দর্শন করিতেন না, “ন রামঃ পরদারান্ স চক্ষুর্ভ্যামপি পশ্চতি।” সেই দেশে মন্দির-গাত্রে নগ্ন ও বীভৎস চিত্র ও দাম্পত্যের এই কাম-বিলাস—জাতীয় জীবনের স্তমহান্ আদর্শের যে বিচ্যুতি ঘটিয়াছিল, তাহা স্পষ্টই ইঙ্গিত করিতেছে। পৌরাণিক কাহিনীতে ঐতিহাসিকত্বের অভাব হইতে পারে, কিন্তু তাহা জাতীয় আদর্শের নির্দেশক। মহম্মদ বক্তব্যের খিলিজি কর্তৃক নবদ্বীপ আক্রমণের পূর্বে বঙ্গদেশ যে নৈতিক অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল—তাহার চিত্র নানাদিক্ দিয়া আমাদের চক্ষে পড়িতেছে। যদ্রী উমাপতিধরের সঙ্গে রাজসভায় গন্ধর্ভ নামক এক নটের রহস্য ও

* বিজ্ঞাপতির পুরুষ-পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত (হরপ্রসাদ রায় কৃত, শ্রীরামপুরের ছাপা, ১৯১৪ পৃঃ)।

পরিহাসের কথা কবি বিভাশক্তি তাঁহার পুরুষ-পরীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন—উহার বিকৃত রুচি সভ্য-সমাজে সঙ্গত বলিয়া কেহ মনে করিবেন না। একদা গন্ধর্ব্ব নামক এক নট লক্ষ্মণসেনের সভায় উপস্থিত হইল, তাহার কণালের চন্দনের বিন্দুটি কতকটা অল্পস্বাদের মত দেখিয়া উমাশক্তি খর ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, “কি হে গন্ধর্ব্ব! তুমি যে মাধব বিন্দু দিয়া ‘নটঃ’ (ক্লীব) সাজিয়াছ?” নট উত্তর করিল, “আপনি তো উমাশক্তির (বৃষ), আমার কণ্ঠে আর একটি (চন্দনের) বিন্দু আছে, সুতরাং আমি নটঃ (মহাদেব)—এবং আপনার পিঠে চড়িতে পারি।” একথা বলা বাহুল্য যে একটি সামান্য নটের এই প্রকার বিক্রমে রাজসচিব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজ-সভায় পরিহাস-রসিকতা এইরূপ বীভৎস হইত, ইহা তাত্‌কালিক বিগর্হিত রুচির পরিচায়ক।

রাজ্ঞীদের প্রভাব রাজার উপর সাময়িক ভাবে কত প্রবল হইত, তাহার আর একটি উদাহরণ আমরা এই পুরুষ-পরীক্ষাতেই পাইতেছি। কথিত আছে এক সময়ে রত্নপ্রভা নামী রাজ্ঞীর প্রভাব রাজার উপর অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেন কাশীরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন, রত্নপ্রভা বলিলেন, “তোমার বিরুদ্ধে আমি দেওয়ালী রাত্রি (শুখ-রাত্রি) কিরূপে বন্ধন করিব?” লক্ষ্মণসেন প্রতিশ্রুত হইলেন, তিনি যে করিয়া হউক দেওয়ালী রাত্রিতে গোড়ে ফিরিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। রাজ্ঞী বলিলেন, “যদি তুমি প্রতিশ্রুতি পালন না কর, তবে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিব।” লক্ষ্মণসেনের বিপুল নৌবাহিনী কাশীরাজের নগরী অবরোধ করিল; যখন তিনি নগরদে মন্ত, এই সময়ে যে দেওয়ালী রাত্রি সমাগত, তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, নগরবাসীরা দীপালীর উদ্বেগ করিতেছে দেখিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়িল। তখন উৎকণ্ঠিত হইয়া রাজা মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন কি করা যায়?” তাঁহারা বলিলেন, “সুপ্রচুর অর্থ দ্বারা সকলই সম্ভব, আপনি নৌবাহকদিগকে বিশেষরূপ পুরস্কারের ভরসা দিয়া অগ্নি রাত্রিতে গোড়ে পৌছিব্য ব্যবস্থা করুন। রাজ-শক্তির অসাধ্য কি?” পুরুষ-পরীক্ষাকার লিখিয়াছেন, তরুণ এক সহস্র নৌবাহককে প্রচুর অর্থের পরিতুষ্ট করিয়া মনোরথ-গতি নৌকার আরোহণপূর্ব্বক সেই রাত্রিতেই লক্ষ্মণসেন গোড়ে পৌছিয়া রাজ্ঞী রত্নপ্রভার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন-সম্বন্ধে এইরূপ আর একটি আখ্যান আমরা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। হিন্দু-রাজত্বের শেষকালে যে অস্তঃপুরিকাদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল, নানা উপাখ্যানে ইহাই প্রমাণিত হয়। অবশ্য কাশীরাজের সঙ্গে লক্ষ্মণসেনের যুদ্ধ ও জয়লাভ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, তাহা তাম্রশাসনে উক্ত আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাহ জালালুদ্দিন তব্রেক ও সেক শুভোদয়া

প্রসিদ্ধ জালালুদ্দিন তব্রেক—খোজা কুতুবুদ্দিন বক্তিয়ার কাকি (মৃত্যু, ১২৩৬ খৃঃ), বাহাউদ্দিন চাকিয়া মুলতানী (মৃত্যু, ১২৬৬ খৃঃ) এবং খোজা মুহাম্মদ আলজমিরী (১১৪২—১২৩৬ খৃঃ) প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত সাধুগণের সমসাময়িক এবং বন্ধ ছিলেন। জালালুদ্দিন ১২২৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন।

জালালুদ্দিন তব্রেকের আত্মবিবরণী সেক শুভোদয়াতে দেওয়া আছে—তাহাও অত্যন্ত অংশের ছায় আজও বিগলপূর্ণ। ইনি বলিয়াছিলেন, “আমার বাড়ী অটাব-রাজ্যে, আমার পিতার নাম কাকুর এবং ভ্রাতার নাম গরীব। আমরা অতি দরিদ্র ছিলাম, দিনান্তে আহাৰ জুটিত না।” রমজান নামক এক সাধুর সঙ্গে জালালুদ্দিনের সাক্ষাৎ হয়, তাঁহার কথায় আসে। তরুণবয়স্ক জালালের প্রেমপ্রার্থী হয়। কিন্তু জালাল তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন, ইহার পরে অনেক উপগল্প বর্ণিত হইয়াছে। বহুদিন জালাল দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান। সমুদ্রের এক দীপে তাঁহার সহিত একটি বড় সাধুর দেখা হয়। তিনি জালালকে বলেন, ‘তোমার এখনও সঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার সময় হয় নাই। তুমি একবার পূর্বদেশ ঘুরিয়া এস। সেখানে লক্ষণ সেন নামক এক মহারাজ আছেন। সেখানে যে মুসলমান যায়, তাহাকেই তিনি হত্যা করেন। তাঁহাকে জয় করিতে পারেন, এমন কেহ নাই। তুমি হিন্দী কথা বলিতে পার, সেই স্থানে এবং অত্যন্ত দেশে বহুকাল পর্য্যটন করিয়া ফিরিয়া আসিলে তোমার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হইবে।’ (সেক শুভোদয়া, নবম পরিচ্ছেদ।)

লক্ষণ সেনের সঙ্গে সেকের সাক্ষাৎকার ও সেই প্রসঙ্গে অনেক অলৌকিক কথা এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। রাজা গঙ্গাভীরে ছিলেন, সহসা ক্লদ্বর্গ বস্ত্র-পরিহিত দীর্ঘ-মূর্তি জালালকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। জালাল রাজাকে উচিত যত সংবর্দ্ধনা না করাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “আপনি কে? আমি পৃথিবীপতি, আমার সমুচিত সম্মান আপনি করেন নাই কেন?” এই সময়ে একটা চিল একটি গঠি মাছ লইয়া লক্ষণ সেনের সঙ্গে দেখা।

গঙ্গার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। সেক বলিলেন, “আপনি পৃথিবীপতি এই অভিমান করিতেছেন, ঐ চিলটিকে বলুন যে গঠি মাছটি সে যেন ছাড়িয়া দেয়। আপনার আদেশ পালিত হইলে আমি বৃষ্টিব আপনি পৃথিবীর অধীশ্বর।” রাজা বলিলেন, “পক্ষিপ্ৰাণী জ্ঞানশূন্য, উহারা আমার কথা মানিবে কেন? যদি আপনার সাধ্য থাকে, তবে আপনিই বলিয়া দেখুন না কেন, আপনার কথা শোনে কি না।” সেক উদ্ধুদ্ধে চাহিয়া আদেশ করা মাত্র চিল মাছটি ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। রাজা ভয় পাইয়া হুর্গা নাম শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং সেকের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। সেক বলিলেন, “আমি কাহারও প্রতি বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হই না। শিশু মাতৃ-অঙ্গে বসিয়া চন্দ্রকে গালি দিতে থাকে, কিন্তু চন্দ্র তাহাকে অভিশাপ দেন না।”

রাজা বলিলেন, “এই স্থানটি বনজঙ্গলাকীর্ণ ব্যাঘ্রমঙ্গল, আপনি আমার প্রাসাদে আসুন, এই স্থান বাস করিবার উপযুক্ত নহে।” সেক বলিলেন, “আমি আপনার নগরীতে প্রবেশ করিব না। আমি আসিবার সময় পথে শূভকৃত্ত দেখিয়াছি। এই পুরী অচিরাৎ নষ্ট হইবে। আমি এই খানেই অল্প রাত্রি বাস করিব।”

রাজমন্ত্রী উদ্যাপতিধর ভাবিলেন, ‘হাতে আশা-লগুড়, কৃষ্ণ পরিচ্ছদ-পরিহিত, এ ব্যক্তি যবন না হইয়া যায় না। ইহাকে সাক্ষাৎ ইন্দ্রের মতন দেখা বাইতেছে। এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই যবন। যাহা হউক বিষ খাওয়াইয়া ইহাকে মারিবার চেষ্টা করিতে হইবে।’

রাজার অমুরোধে সেক সম্মত হইলেন না। তখন মন্ত্রী সেইখানেই সেকের খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন। সেক বলিলেন, “আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইলে এখানে রন্ধন করিতে হইবে।” মন্ত্রী তাহাই করিলেন এবং ব্যঞ্জনাদির সঙ্গে

বিষভক্ষণ।

দারুণ শৃঙ্গবিষ মাখাইয়া রাখিলেন। যবনের পরিবেষণ করিতে কোন হিন্দু রাজী হইল না। অবশেষে এক রজক-পুত্র একটি পুরাণ ও একটি কপর্দক পাইয়া এই কার্যে সম্মত হইল।

সেক ভোজনান্তে কতকগুলি তৈতুল খাইলেন। মন্ত্রী বলিলেন, “মহারাজ, দরিদ্রদের ৩২ বৎসরেও বৃদ্ধির দাঁত গজায় না। এই ভাল ভাল জিনিষ খাইয়া সেক মুখশুদ্ধির জন্য কতকগুলি তৈতুল খাইতেছেন। এদিকে কর্পূরবাসিত নানারূপ

নানারূপ কেরামৎ।

মসলাযুক্ত সুগন্ধি পান লইয়া ভৃত্য অপেক্ষা করিতেছে।” রাজা ফকিরকে বলিলেন, “আপনি তৈতুল খাইলেন কেন?” সেক মস্ত্রি-কর্তৃক বিষ প্রয়োগের কথা বলিলেন। মন্ত্রী জেদ করিয়া বলিলেন, “মিথ্যা কথা, ভোজন-শেষে একটু তিক্ত খাইতে হয়, নতুবা অস্বস্তি হয়। সেই তিক্ত দেওয়াতে সেক বিষ মনে করিয়াছেন।” সেক বলিলেন, “হয়ত বা তাহাই হইবে।” কিন্তু হলায়ুধ মিশ্র বুদ্ধিতে পারিয়া মন্ত্রীকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন, “মন্ত্রী তুমি অতি পাপবুদ্ধি, এমন কখনও শুনি নাই বা দেখি নাই যে, অভ্যাগতকে কেহ খাইবার জন্য ডাকিয়া আনিয়া বিষ দিয়াছে। যদি ইনি ইচ্ছা করেন, তোমার ঘোর অনিষ্ট করিতে পারেন। তখন তোমাকে কে রক্ষা করিবে?”

রাজা আবার বলিলেন, “এখানে, বড় বাঘের ভয়, চলুন রাজপ্রাসাদে যাই।” কিন্তু সেক গেলেন না। রাজা মন্ত্রীদিগের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। সেই রজক-পুত্র ও সেক তথায় রহিলেন। রাত্রিকালে দুইটা বাঘ আসিয়া সেককে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। পর দিন সেই রজক-পুত্রের মাতা আকাশ-ভেদী চীৎকার করিয়া কানিতে লাগিল, কারণ জনশ্রুতিতে শোনা গেল যে, সেই সেক ও রজক-পুত্রকে রাতে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে। মন্ত্রী রাজাকেও এই কথা জানাইলেন। রাজা যাইয়া দেখিলেন, সেই জঙ্গলে উভয়েই বেশ দুঃস্থ দেখে আছেন, রাজা মন্ত্রীকে মিথ্যা জনরব সৃষ্টি করার জন্য ভৎসনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা দেখিলেন—সেকের সমস্ত কাপড় ভেঙা। তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেক বলিলেন—গভীর রাতে তাহার এক শিষ্য—প্রতাপের নামক বণিক—সমুদ্রে বহ

ধনসম্পত্তি সহ জাহাজ লইয়া যাইতেছিলেন। জলের নীচে একটা প্রকাণ্ড ত্রিশূল ও কাঠের সংঘাতে জাহাজের তলদেশে ছিদ্র হইয়া যায়, এবং সর্বস্ব সহ বণিক সাগরজলে ডুবিয়া অতি আশ্চর্যেরে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করে। বহুদূরবর্তী স্থানে সেক তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া সমুদ্রের নিয়মের হইতে জাহাজখানি উদ্ধার করেন। এই জন্ত তাঁহার কাপড় সিন্ধু হইয়াছে। রাজা কাপড়খানি নিংড়াইয়া ফেলিয়া সেই জল অগ্নিতে সিদ্ধ করাইয়া লবণ পাইলেন এবং তখন সেকের কথায় তাঁহার প্রত্যয় হইল। সেক নামাজ পড়িতে বসিলেন— হাহা ধ্বনিতে গগনমণ্ডল পূর্ণ হইল। তাহা দূর হইতে শুনিয়া কেহ বলিল, “মেঘ গর্জন করিতেছে,” কেহ বলিল, “মহারাক্ষ ভাদিয়া পড়িতেছে,” কেহ বলিল, “গঙ্গার তীর ভাদিয়া পড়িল।”

এই সকল অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়া সেক শুভোদয়া আমাদের লক্ষণসেনের রাজসভার এবং তৎসময়ের সামাজিক অবস্থার যে সকল তত্ত্ব জানাইয়াছেন, তাহার অনেকগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। এই সময়ে বিলাতে আর্থারের সম্বন্ধে যে সকল অলৌকিক ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কাট-হাট দিয়া ইংরাজেরা ইতিহাস গড়িয়া তুলিয়াছেন। স্পেনের ঐতিহাসিকগণ তাহাদের দেশের নানা আজগুবি গল্পের মধ্যে সত্যের আলো খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। আমাদের দেশে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতেও ঐতিহাসিকগণ নানা আজগুবি গল্পে তাঁহাদের পুস্তক ভর্তি করিয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে, চৈতন্য বরাহমূর্তি ধারণ করিয়া ভীষণ গর্জন করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই, চৈতন্যের মুখে হরিনাম শুনিয়া ব্যাঘ্রেরা পর্যন্ত হরিনাম করিতেছে। এই ঘটনার সময় যিনি চৈতন্যের নিকট উপস্থিত ছিলেন, সেই বলদেব ভট্টাচার্য্য নিজে ইহা স্বকর্ণে শুনিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মুরারিগুপ্ত চৈতন্যের বড়-ভ্রাতার কথা চাক্ষুষ ঘটনার ভাষা বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ বিলাতের সেই সকল মধ্যযুগের অলৌকিক গল্পকথা, এবং আমাদের দেশের মুরারিগুপ্তের কড়চা, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ ছাড়িয়া দিয়া ইতিহাস লেখা অসম্ভব। ইংলণ্ডের রাজা ক্যাম্ব্রাট সমুদ্রকে আদেশ করিয়াছিলেন তাহার গতি ধামাইতে; এইরূপ অসম্ভব কথাও তাঁহাদের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। বাইবেল তো আজগুবি কথার খনি, তাহা বাদ দিলে খৃষ্টধর্মের ইতিহাস লেখা যায় না। এদিকে তাম্রশাসন এবং শিলালিপিতেও অনেক অতিরঞ্জিত, একপক্ষসমাপ্ত, একদেশদর্শী, শত্রুর সম্বন্ধে অলৌকিক বৃত্তান্ত-বহুল বর্ণনা আছে, তাহার সকল কথা মানিয়া লওয়া চলে না। ইহাদের সকলগুলিই দলিল ও উপকরণ—একান্তভাবে ইহাদের কোন একটির উপর নির্ভর করিয়া অল্পগুলিকে একবারে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দেওয়া ঐতিহাসিকের উচিত হইবে না। এই হিসাবে সেক শুভোদয়াকেও আমরা লক্ষণসেনের সময়ের ইতিহাসের একটি উপকরণ-স্বরূপ ব্যবহার করিব। ইহাতে যে সকল তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বিচারসহ কি না—তাহাও আলোচনা-যোগ্য। ইহাতে “চতুর্বিংশশতাব্দীর শাকে সহস্রেক-শতাব্দিকে” (১১২৪শক=১২৩২ খৃঃ) তুরস্ক সৈন্ত বিহার ও পাটনার প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে এবং “শাকে যুগ্মবেগুরাজে গতে কল্যাণ গতে ভাস্করে” (১০৬৬ খৃঃ) রামপালের

মৃত্যুর কথা লিখিত আছে। সেক শুভোদয়ার যে হস্ত-লিখিত পুঁথি উমেশ বটব্যাল মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা জগন্নাথ রায়ের পাঠের জন্য রামভদ্র শর্মা নামক এক ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে পুঁথিখানি লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু সনটি দেওয়া হয় নাই। শ্রীযুক্ত ডাঃ শুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন হাতের লেখাটা বরং ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী—কোন ক্রমেই পরবর্তী নহে। এই পুস্তকে লিখিত আছে সাহ জালাল তব্রিজ বিক্রম সংবৎ ১১২৪ (১০৭৩ খৃঃ) কাঠিক মাসে এতদ্দেশে আগমন করেন এবং বিক্রম সংবৎ ১১৩৬ (১০৮৫ খৃঃ) চৈত্র মাসে দেশে ফিরিয়া যান। ইহাতে বহু পরবর্তী হুসেন সাহ সম্রাটের নাম পাওয়া যায়, সুতরাং পুস্তকের যে কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পুস্তকে বিক্রমকেশরী রাজার উল্লেখ আছে এবং এক জায়গায় স্পষ্টই ভুল করিয়া বিক্রমকেশরীকে বিক্রমাদিত্য বলিয়া লেখা হইয়াছে। এই রাজা আকাশপত্র পাইয়াছিলেন—এইরূপ দৃষ্ট হয়, পাশী একখানা বহিতে বিক্রমকেশরীর একখানি দুর্কোধ্য পত্র প্রাপ্তির কথা আছে। মনে হয় বিক্রমকেশরী লক্ষণসেনের কিছু পূর্বে বর্জমানের মঙ্গলকোটের অধিপতি ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বও প্রায় এক সময়েই মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। বিক্রমকেশরী জয়দেবের গীতগোবিন্দের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন—এ কথা আমরা স্থানান্তরে লিখিয়াছি। মঙ্গলকোট অঞ্চলের লোকের সংস্কার কালিদাস নামক এক পণ্ডিত সর্কশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন এবং রাজা তালবেতালসিদ্ধ ছিলেন। একখানি ফারসী পুস্তকে লিখিত আছে, দিল্লী হইতে আগত জনৈক পীরের চক্রান্তে বিক্রমকেশরীর রাজ্য ধ্বংস পাইয়াছিল। বিক্রমকেশরী মঙ্গলকোটের রাজা ছিলেন, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও তাহা উল্লিখিত আছে। বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে বিক্রমকেশরীর গোল বাধাইয়া জনশ্রুতি কালিদাস পণ্ডিত সঙ্কল্পে যে সকল গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা মহাকবি কালিদাস-সংক্রান্ত নহে। ভাষার ভুল অজস্র থাকিলেও সেক শুভোদয়া অতি সহজ ও শ্রুতিমধুর সংস্কৃতে রচিত হইয়াছে। ইহার মাঝে মাঝে যে সকল শ্লোক আছে, তাহাদের ছই একটি বেশ কবিত্বপূর্ণ, হলায়ুধের লেখনীর অযোগ্য নহে। যথা—

“নিগুণৈবপি সন্তেবু দয়াং কুর্কন্তি সাধবঃ ।

ন হি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশচণ্ডালবেশানি ॥”

এই শ্লোক শেলির “Yon silver beams, Sleep they less sweetly on cottage thatch, than on domes of kings !” প্রভৃতি পদ মনে করাইয়া দেয়।

সেন রাজাদের সময় নব-ব্রাহ্মণ্য প্রবেশের ফলে বাঙ্গলার কোন কোন বিষয়ে যে মহৎ ক্ষতি হইয়াছিল, সে ক্ষতি শুধু মুসলমান-বিজয়ের পথ সুগম করিয়া দেয় নাই, অধিকন্তু বঙ্গীয় সমস্ত লোককেও হীনবীৰ্য্য ও অধঃপতিত করিয়াছিল—তাহা জাতিভেদকে লোহের গুণ্ডীতে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া। ইহাদের পূর্বেও জাতিভেদ ছিল এবং ব্রাহ্মণ-শূদ্র ছিল, কিন্তু তথা-কথিত হীনবর্ণ সঙ্কল্পে ছোঁয়াচে রোগের সৃষ্টি এই সেন রাজাদের সময় হইতে। গুপ্ত ও পালশাসনে

হোয়াচে রোগ ছিল না বলিলেও অত্যাচার হইবে না। 'দ্বীপদ্বং দুহুলাদপি'-চণ্ডালোহপি দ্বিজ-শ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ' এ সকল শ্লোক সেন রাজাদের বহু পূর্বে রচিত। বিশিষ্ট চণ্ডাল-কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন—এ সকল তো অতি প্রাচীন যুগের কথা। পালরাজারা ও তৎসময়ের পরাক্রান্ত ব্যক্তিরা বিবাহ-বিষয়ে কোন গত্তীরক্ষা করিতেন না। সেই সকল রাজাদের সময়ের তীর্থগুলিতে জাতিভেদ ছিল না, সমাজেও হোয়াচে রোগাক্রান্ত জাতিভেদ ছিল না। নবব্রাহ্মণ্য একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণকে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দ্বার বন্ধ করিল। ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বিপুল বৌদ্ধ-জনসাধারণের উপর যে অকণ্যা অত্যাচার হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ শূত্রপুরাণ ও অপরাপর পুস্তকে আমরা পাইয়াছি। এই অত্যাচার এত অধিক হইয়াছিল যে, যখন মুসলমানগণ আসিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিরস্ত করিলেন, তখন নিপীড়িত জনসাধারণ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণকর্তা ভগবানের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। যখন ব্রাহ্মণগণ গৃহে গৃহে হোমকুণ্ড জালিয়া বৈদিক ধর্মের অভিনয় করিতেছিলেন তখন এই ধর্মের বেশে হোয়াচে রোগ অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। দেব মন্দিরের আরতিশিখা ও যজ্ঞকুণ্ডের ধোয়া যতদূর যায়—তাহার ত্রিসীমানায় নিম্নশ্রেণীর লোক বাইতে পারিত না। তাহাদের ভাষা—আমাদের কথিত ভাষা—অবজ্ঞাত ও ঘৃণিত হইল। নিম্নশ্রেণীর সংস্কৃত পড়িবার অধিকার তিরোহিত হইল এবং শাস্ত্রের কথা যদি কেহ দেশীভাষায় শুনিত, তবে তাহার রোরব নরকে স্থান হইবে—এই ভয় দেখান হইল। ফলে এই দাঁড়াইল, শ্রমণদের কতক কতক মেধর (মহম্মদ) হইল, কতক ডোম হইল, কারণ ইহারা তাত্ত্বিক ছিলেন এবং ঘৃণিত জিনিষ পানাহার করিতেন।

বৌদ্ধ পাল-রাজাদের সময় ডোমাচার্য্যগণের প্রাধান্তের পরিচয় পাওয়া যায়; এখনও শীতলাদেবী, ধর্মঠাকুর ও কালীমন্দিরের ডোমপূজারী বন্দের নানাহানে বিজ্ঞমান আছে। ডোমেরা শুধু তাত্ত্বিক ধর্মে অগ্রণী ছিলেন, এমন নহে, তাঁহারা রাজাদের অধীন থাকিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে নেতৃত্ব করিতেন। বাদলার অনেক প্রাচীন পুঁথিতে ডোম-সৈন্যের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। "আগডোম, বাগডোম, ঘোড়ায় ডোম সাজে" প্রভৃতি ছেলে-ভুলানো ছড়ায়ও তাহার একটু প্রমাণ আছে বলিয়া মনে হয়। হিন্দু সমাজ স্থিতিশীল নহে—জাতীয় উঠাপড়ার দৃষ্টান্ত এই আপাত দৃষ্টিতে অনড়বৎ সমাজেও অনেক আছে।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সামাজিক শ্রেণীগুলিকে ইম্পাতের গত্তিতে বাধিয়া ফেলিল। ক্রমশঃ এই বন্ধন দৃঢ় হইল। বৈষ্ণবকুল-পঞ্জিকায় দৃষ্ট হয়, বল্লালসেনের সময় শ্রীবৎসসেনের পুত্র দণ্ডপাণি হাড়ীঘোষের কন্যাকে বিবাহ করাতে তাঁহার কৌলিষ্ঠ কতকটা গ্রীহীন হইল, কিন্তু তিনি জাতিচ্যুত হন নাই।

এই হাড়ীঘোষ এক হয় কায়স্থ না হয় সলোপ ছিলেন। ধর্মস্তরী গোত্রের সেন-ভূমির রাজা বিমল সেনের বহু পুত্রের মধ্যে কয়েকটি বৈষ্ণব এবং অবশিষ্ট কয়েকজন কায়স্থ পর্যায় ভুক্ত হইয়াছিল, বৈষ্ণব জাতীয় মহাকুলীন কায়স্থ বংশীয় শোভাকর নাগের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এইরূপ বিবাহ তখন অনেক হইত। কিন্তু পরবর্তী কুলগ্রন্থকারের সময়

সামাজিক অনুশাসন আরো একটু কড়া হইয়াছে। কবিকঠহার (১৬৩৫ খৃঃ) দণ্ডপানির কুল নষ্ট হওয়ার সম্বন্ধে তৎপূর্ববর্তী কুলগ্রন্থ-লেখকের হুঁসে হুঁসে মিলাইয়া লিখেন নাই, “দণ্ডপানিঃ হাড়ীঘোষত কল্যাণ পরিণীতবান্” তজ্জন্তে সিদ্ধকুলের স্থলন হইল, কিন্তু লিখিয়াছেন “দণ্ডপানিঃ পিতৃঃ শাপাৎ সাধ্যভাবন্ উপাগতঃ” অর্থাৎ তিনি ঘোষ-কল্যাণ বিবাহের কথা লিখিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করিয়াছেন। চন্দ্রপ্রভায় ভরত মল্লিক বৈজ্ঞ ও ব্রাহ্মণে বৈবাহিক সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। এবংবিধ আঠারটি বিবাহের উল্লেখ আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ক্রমশঃ জাতীয় সীমারেখা দৃঢ় ও কঠিন হইয়া প্রাচীরের মত উখিত হইয়াছে এবং এক এক শ্রেণীকে ‘একঘরে’ করিয়া রাখা হইয়াছে। পূর্বে অমূল্য ও প্রতিলোম বিবাহ বধেই ছিল—ক্রমে স্বশ্রেণীর মধ্যেও গভী সঙ্ঘর্ষ হইতে চলিয়া শেষে এমন একস্থানে দাঁড়াইয়াছে—যেখানে বিবাহ একটা মন্ত বড় সমস্তা ও দায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

জনসাধারণ নিয়ন্ত্রণীতে আবদ্ধ হইয়া ধর্মজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইল। রান্নাঘরে বিড়াল-কুকুর যাতায়াত করিলে কিছুই হয় না, কিন্তু তথা-কথিত অস্পৃশ্য জাতির হাওয়া সেই রন্ধন-মন্দিরের গায়ে লাগিলে তাবৎ হাড়িকুড়ি জলে বিসর্জন দেওয়ার ব্যবস্থা। যাহারা পালরাজগণের প্রশংসা-গীতিবারা তাহাদের মনস্তত্ত্ব সাধন করিত—তাহাদের মুখে অজস্র প্রশংসা শুনিয়া রাজগণের মুখ লজ্জারক্তিম ও অবনত হইত,—সেন-রাজাদের সময়ে সেই জনসাধারণের উৎসব-আসর ভাঙিয়া গেল। এই রাজপ্রজার সম্বন্ধ শুধু পাল রাজাদের সময়কার নহে। প্রাচীন কাব্যাদিতে দৃষ্ট হয় ইতিহাস-পূর্ব যুগেও প্রজারা এই ভাবে রাজাদের প্রশংসাগীতি রচনা করিয়া গান করিত। সেন রাজাদের সম্বন্ধে একটি পালা গানও রচিত হয় নাই। এমন যে মুসলমান-বিজয়রূপ অশ্রুতপূর্ব বিপ্লব হইয়া গেল, তৎসম্বন্ধে একটি গান রচিত হইয়াছিল বলিয়া কোথাও উল্লেখ নাই। কি ভাবে যে মুসলমানেরা এত বড় রাজ্যটা দখল করিলেন, তাহার একটি বিশ্বস্ত বিবরণ নাই; একটিও উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটে নাই। মোটকথা, ক্ষুদ্র জনসাধারণ তখন সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অনেকে ইসলামধর্ম অবলম্বনপূর্বক নূতন শক্তির আশ্রয় লইয়া অপমানকর ব্রাহ্মণ্য-শাসন হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়াছিল; অপরেরা পদদলিত হইয়াও কথঞ্চিৎ স্বীয় ধর্ম বজায় রাখিয়াছিল। কিন্তু বালির বাঁধের জায় সেই ধর্মবন্ধন অতি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল,—অনধিকারীরা নূতন কোন স্থানে কিছু অধিকার পাইলেই সেই আলাগা বাধটি টুটিয়া যাইত। মন্দির হইতে বিতাড়িত জনসাধারণ মসজিদে প্রবেশাধিকার পাইল; হিন্দুসমাজের অতি কঠোর বৈষম্য হইতে মুক্ত হইয়া তাহারা ইসলামের উদার ভ্রাতৃত্বাবে আকৃষ্ট হইল। মোটকথা, নবব্রাহ্মণ্য মহামুগ্ধের অপমান করিয়া মিলনের স্থলে বিচ্ছিন্ন ঘটাইল। এক জাতিকে দুই টুকরা করিয়া নিজেদের বল নষ্ট করিল। বৃহত্তর দল বলবীৰ্য-শক্তি-শিক্ষা হারাইয়া বাতরোগগ্রস্তের জায় নিষ্পন্দ হইল; ক্ষুদ্রদল শিক্ষার অভিমানে ও পবিত্রতার ভান করিয়াও নিজের পদমণ্ডলা বজায় রাখিতে পারিল না। এখন হিন্দুজাতি যে মরণ-সমস্তায় সম্মুখীন—তাহা এই নবব্রাহ্মণ্যের আত্মদ্রোহী, আত্মহত্যাকারী নীতির ফল।

এখনও যে সকল গোড়ার দল এই পর্যাণিত ভেদনৌতির সমর্থন করিতেছেন, তাঁহাদের গৃহ বখন লম্পট কর্তৃক আক্রান্ত হইবে, তখন নমঃশত্রু, বাগ্দী প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা আর লণ্ড লইয়া লম্পটদের পশ্চাৎ দাবিত হইবে না। বৎসর বৎসর হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানদের অল্পপাতে বেরূপ ক্ষয়শীল হইয়া বাইতেছে, তাহাতে তাঁহাদের পুঁথি, টিকি ও রমণীগণের পবিত্রতা কোথায় থাকিবে—তাহা তাঁহাদের একবার চিন্তা করা উচিত।

মুসলমান কর্তৃক ভারতবিজয়ে আমাদের লাভ ও ক্ষতির একটা হিসাব করিলে ফলাফল কি দাঁড়ায় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা মন্দ নয়।

আমাদের কলাশিল্প অনেকটা মুসলমানেরা ধ্বংস করিয়াছেন। ঘাহারা অজ্ঞতা, অমরাবত্তী, কোণারকে তাঁহাদের ভুবনবিজয়ী শিল্প প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন—তাঁহাদের দ্বারা আমরা খুঁজিয়া পাইতে পারি বটে, কিন্তু কলালক্ষীর বৈজয়ন্তী-প্রতিমা প্রতিমা-স্থলির বাড়াবাড়ি।

যে মুসলমানেরা ভাদ্রিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি মনে হয় বৌদ্ধাধিকারের যুগে সমস্ত এসিয়া ব্যাপিয়া প্রতিমা গড়ার বড় বাড়াবাড়ি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিত্য মূর্তন ধ্যানে পাওয়া বিগ্রহ, বহু হস্ত-কর্ণ-পদ, বিকৃতমূর্তি, কূর্শ-বরাহ, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি সর্ব্ব অবয়বে ভগবানের পূজায় এতটা বেশী প্রচলন হইয়াছিল যে মনে হয় যেমন মৎস্ত না মারিলে পুকুরের জলে সাতার কাটার জায়গাটুকু পর্য্যন্ত থাকিত না, সেইরূপ মূর্তিপূজার এই অবাধ প্রচেষ্টা না থামাইলে আমাদের রান্নাঘর, শয্যাগৃহ, এ সমস্তই মন্দিরে পরিণত না করিলে দেবতাদের স্থান সংকুলান করা অসম্ভব হইত। সত্য বটে তখনও প্রকৃত সাধক অনেক ছিলেন, ঘাহারা বাহিরের অবয়বকে অতিক্রম করিয়া নিরবয়বের ধ্যানধারণা করিতেন, সগুণে বিগ্রহ স্থাপন চিহ্নের মত মাত্র থাকিতেন। এমন কি ভারতবর্ষের সাধারণ লোকেরা পর্য্যন্ত প্রতি বিগ্রহের পশ্চাতে পরমাত্মাকে খুঁজিতে শিখিয়াছিল এবং দেবমন্দির যে পরমাত্মার আবাসগৃহ নহে, স্থাপিত বিগ্রহ যে তাঁহাকে ধারণা করিবার একটা চিহ্ন বা রূপক মাত্র ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিল।

তথাপি অনেকস্থলে, বিশেষ করিয়া আরবদেশে, অসংখ্য বিগ্রহের পরিকল্পনা মানুষের মনকে ব্যতিব্যস্ত ও কুসংস্কারযুক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। দেব-পূজা অনেক সময়ই বাহ্যাকাচারে পরিণত হইয়াছিল, এবং পুরোহিতেরা অল্পভানগুলি মিছামিছি এত বেশী বাড়াইয়াছিলেন

যে দেববিগ্রহের মন্দিরে বৈদিক যুগ হইতে আগত নানারূপ জটিল পদ্ধতির বাহু ভেদ করিয়া সাধারণ লোকের দৃষ্টি সত্যের পথে পৌত্তলিকতার মূলোচ্ছেদ হয় নাই।

অগ্রসর হইতে পারিত না। এই ভাবে মানুষের মন ক্রিষ্ট ও ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছিল। দেবগৃহে দেবতারা এত অতিরিক্ত সংখ্যায় জড় হইয়াছিলেন যে তথায় তাঁহাদের জায়গা কুলাইত না। অতিশয় ভিড়ে মানুষ যেমন খাঁস-প্রখাঁসের বায়ুটুকু হারা হইয়া কোন মুক্ত ময়দানের হাওয়া গোঁজে, ভক্ত ও সাধকের হৃদয়ও তেমনই স্বভাবের মুক্তাঙ্গনে দাঁড়াইয়া একবার তাঁহার শ্রষ্টার সঙ্গে মুখোমুখি হইতে চাহিতেছিল।

ভারতে যে আধ্যাত্মিকতা ছিল, অন্তর্দেশে তাহা ছিল না। এজন্য যে যে স্থানে দেবতারা ভাগিয়া গেলেন, কেহ তাঁহাদিগকে আর গড়িতে পারিল না। ভারতবর্ষে দেবমূর্তি ভগ্ন হইল সত্য, কিন্তু ভক্ত ও সাধক পুনরায় দেবতা গড়িলেন। মূর্তিপূজার মধ্যে যে অমূর্ত পূজার উপাদান আছে, সেই তথ্য ভারতবর্ষে জানিত, অথচ কেহ তাহা জানিত না। যেটুকু আবর্জনা চুকিয়াছিল, মুসলমান তাহাই আসিয়া দূর করিয়া দিলেন। শিব পূজা, ব্রহ্মা পূজা, কৃষ্ণ পূজা, কালী পূজা—হিন্দুদের সকলই রহিল। পাথরের যে রূপ চলিয়া গেল, স্তোত্রে সেই রূপ জাগিয়া উঠিল, তুলি ও বাটালীর গতিশীলতা ধামিল, কিন্তু লেখনীর গতি ধামিল না। রং দিয়া রেখা দিয়া বাহা হইতে, শব্দ দিয়া তাহা অধিকতর সফলতার সহিত বেগে হইতে লাগিল। বৈষ্ণবপদে রাধিকার অভিসারের যে মূর্তি দেখিতে পাই, রাধার পূর্ণরূপ বর্ণনায় কৃষ্ণের যে ছবি দেখিতে পাই, রামপ্রসাদের কালী-মূর্তি-বর্ণনায় যে রূপ চোখে জাগিয়া উঠে তাহা আলোচনা করিলে কে বলিবে মুসলমান মূর্তিপূজার শিকড় এদেশে হইতে উঠাইয়া ফেলিয়াছিলেন?

হজরত মহম্মদ আরব দেশের জড়তাগ্রস্ত, কুসংস্কারের কুচ্ছাটিকাবৃত এক দুর্ভেদ্য ধর্ম-গগনপ্রান্তে সত্যের স্বর্গ স্বরূপ উদ্ভিত হইয়াছিলেন। যে চক্ষু মানুষ হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তিনি সেই চক্ষে দৃষ্টি দান করিয়া মানুষকে ভগবানের নিকট মুখোমুখি করিয়া দাঁড় করাইলেন। ভারতবর্ষেও যে তিনি কতক পরিমাণে তাহা করেন নাই, ইহা বলা যায় না। সোমনাথের মন্দির গঙ্গা হইতে ২০০ ফরসঙ্গ (৪০ ক্রোশ) দূরবর্তী ছিল। পিপীলিকার মত সারি বাধিয়া লোক সেই মন্দির হইতে গঙ্গা পর্যন্ত দাঁড়াইতে, কত

সহস্র লোক দাঁড়াইতে এই ব্যবধানটা ধারণা করিয়া একটা

সোমনাথের মন্দির।

অনুমান করা যায়। প্রত্যেক লোকের হাতে হাতে কলসী কলসী জল চলিয়া আসিত, তদ্বারা পাঁচ হাত উচ্চ লিঙ্গরূপী মহাদেবকে প্রত্যহ অভিষিক্ত করা হইত। তাঁহার মন্দিরে ১,০০০ পুরোহিত সর্বদা নিযুক্ত থাকিতেন এবং আগন্তুক বাত্মীদিগকে ধর্মকাণ্ডে সহায়তা করিতেন, বাত্মীদিগের মন্তক মুণ্ডনের জন্ত এবং দাড়ি-গোপ কামাইবার জন্ত ৩০০ নাপিত নিযুক্ত থাকিত। তাহাদের দ্বারা এক মুহূর্ত অবসর পাইত না। মন্দিরের দ্বারে ৩৪০টি নর্তক-নর্তকী গান ও নৃত্য করিত। ইহাদের প্রত্যেকের জন্ত মন্দির হইতে বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল। এই সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কতটা আধ্যাত্মিকতা ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ভক্তির খেলা সোমনাথের আঙ্গিনায় বতটা হইত তাহা অপেক্ষা যে বাহ্যভঙ্গের অনেকটা বেশী হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভ্যাটিকানে রোমান ক্যাথলিকগণের মধ্যে নানারূপ বীভৎস ঘটনা ঘটিত এবং পোপ সেখানে ভগবানের স্থান দখল করিয়া লইয়াছিলেন। এই জগদ্ব্যাপী কুসংস্কার এবং জীব, জন্ত, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ প্রভৃতি বহুরূপী মূর্তির পূজায় মানবাত্মা ক্রিষ্ট হইয়াছিল। তখন উচ্চতরে ঘোষণা করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল যে, এক ব্যতীত ছই নাই, এস আমরা সকলে বলি ভগবান্ একটি মাত্র, তিনি মহান্। একথা মূর্খদের মুখে শুনিয়া

ইরোপের ঘুম ভাঙ্গিল, সেখানে লুণ্ঠারের আবির্ভাব হইল। লুণ্ঠারের ধর্ম বাহা ইংলও প্রভৃতি বহুদেশে এখন সর্কবাদিবীকৃত—তাহা প্রকৃত খৃষ্ট ধর্ম নহে—তাহাতে মহম্মদের প্রেরণা স্থম্পষ্ট।

এদেশে ইসলামের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ একটা ডেউ আসিয়া কবীর, নানক প্রভৃতি সাধু-দিগকে প্রেরণা দিয়াছিল, তাহাতে বুধা অহুষ্ঠানগুলির উপর লোক-বিরোধ উপস্থিত করিল। সাধু বলিলেন, “পাথর পূজনে হরি মিলে ত মুই পূজে পাহাড়।” রামপ্রসাদ বলিলেন, “যিনি সমস্ত জগতকে খাওয়াইতেছেন, তাঁহার অন্ন, হে বাতুল, তুমি বুধা ‘বুট ভিজানা ও আলো চালের নৈবেদ্য’ প্রস্তুত করিতেছে। সমস্ত জগত যে আমার মায়ের প্রকাশ—রে অবোধ, সেই মায়ের মূর্তি মাটা দিয়া গড়িতেছে কেন?” নানক বলিলেন,—“আমার

নমাজ না পড়িয়াও
মহম্মদকে গ্রহণ।

প্রভুর মন্দির দেখ,—অনন্ত আকাশ, চন্দ্রসূর্য্য সেখানে দিবসে ও সন্ধ্যায় আরতির দীপ জালিয়া থাকে, সেখানে মলয়ানিল দুপের গন্ধ বিস্তার করে। এই ক্ষুদ্র মন্দির ভুলিয়া যাও।” মিরাজ বলিলেন, “নিত্য দান করিলেই যদি তাঁহাকে পাওয়া যাইত, তবে জলজন্তুরাই তাঁহার স্বগণ হইত।” মুসলমান যদি মোল্লার মুখ দিয়া এই সকল কথা কহাইতেন, তবে বুদ্ধিতাম ইহা প্রচার মাত্র, কিন্তু হিন্দু সাধুর মুখে যখন এই উপদেশগুলি শুনি, তখন বুদ্ধিতে পারি হিন্দু সাধুরা সমাজ না পড়িয়াও মহম্মদকে আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যদিও মুসলমানধর্মের প্রভাবে এই সকল ভাব এদেশে বদ্ধমূল হইয়াছিল, হিন্দুদের অগাধশাস্ত্রে যে সূত্ররূপে এই সকল সত্য তৎপূর্বেই প্রচারিত হয় নাই, তাহা নহে। জয়সম্বরের পূর্বেও তামিলদেশের অনেক গানে এই সকল কথার আভাস পাওয়া যায়, আনুষ্ঠানিক ধর্মকে তামিল কবি অপর স্বামী খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—“বেদ পাঠ করিয়া কি লাভ? শাস্ত্র বচন শিখাইয়া কি হইবে? যে একমাত্র শিবের শরণ লইবে মুক্তি তাহারই জন্ম। জঙ্গলে ও নগরে তীর্থ খুজিয়া ঘুরিয়া কি পাইবে? কেন নানারূপ প্রায়শ্চিত্ত ও দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া জীবনটাকে হঃসহ করিয়া তুলিতেছ? আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া এবং মাংসাদি ছাড়িয়া দিয়া কোথায় সত্য সন্ধান পাইবে? যিনি একমাত্র অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ প্রভুর শরণ লন, মুক্তি তাঁহারই। কেন উপবাস করিয়া কঠোর নিয়ম পালন করিয়া আত্মাকে কাদাইতেছ, কেনই বা পরিতপস্বীরে যাইয়া বা দূর এবং নিকটবর্তী নদী জলে অবগাহন করিয়া তপস্তা করিতেছ? যিনি একমাত্র ভগবানকে প্রার্থনা করেন, মুক্তি তাঁহারই।” (Hymns of the Tamil Saivite Saints, F. Kingsbury and G. G. Phillips, p. 57.)

হজরত মহম্মদের শিষ্যেরা হিন্দু অধ্যাত্মসম্পদকে খুব জোরে নাড়া দিতে পারেন নাই। যে রামপ্রসাদ মূর্তিপূজার প্রতি তর্জনী প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি সেই মূর্তির পাশে বসিয়া তপস্তা করিতেন এবং সেই মূর্তি কাঁধে করিয়া গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়ার কালে নদীর স্রোতে বীথ প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন। * মুসলমান হিন্দুর মন্দির ও বিগ্রহ ভাঙ্গিলেন, কিন্তু মূর্তিপূজা

* অতুল সুখোপাধ্যায় প্রণীত রামপ্রসাদের জীবনী, ১০০ পৃঃ।

ধামাইতে পারিলেন না। অত্যাচারীর কুঠারঘাতে শিরলক্ষীর দেউল ভাঙ্গিয়া পড়িল, এই পর্য্যন্ত। ভগবান্ মঙ্গলস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ—তিনি পূর্ণ সৌন্দর্য্যস্বরূপ। সেই রূপের আকাঙ্ক্ষা তিনিই মানবচিত্তে জাগাইয়াছেন, তিনিই সেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করেন। স্মৃতরাং ভগবানের রূপকল্পনা স্বাভাবিক। আমরা জ্ঞানস্বরূপ, দয়াস্বরূপ—এই সকল কথার দ্বারা নিঃশব্দের গুণের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া থাকি। ঐ সকল কথা—কর্ণের পক্ষে ইঙ্গিতের কাজ করে। বিগ্রহও সেইরূপ আমাদের চক্ষুকে অরূপের রূপের ইঙ্গিত দেয়। সেই সকল বাক্যে মনের অগোচর ব্রহ্মকে সাধকের কাছে নানা ভাবে নানা ইঙ্গিতে বুঝাইয়া থাকে। যে সময় ইঙ্গিতগুলি উদ্ভিষ্ট দেবতাকে না বুঝাইয়া নিজেরা প্রবল হইয়া দেবতাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেইযুগে হজরত মহম্মদের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সেযুগে ভগবান্কে ভুলিয়া জনসাধারণ খড়কুটো ও ইটপাথর লইয়া ব্যস্ত হইয়াছিল। তিনি আসিয়াছিলেন সেই উপকরণগুলির বখোচিত মূল্য দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিতে।

হিন্দুর যেখানে প্রকৃত দুর্বলতা এবং মুসলমানের যেখানে প্রবল শক্তি, সেইখানে তাহাদের জাতিভেদের অবিচার।

আক্রমণ অনেকটা সফল হইবে। হিন্দুর জাতিভেদ যে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা নির্মম এবং অকৃতজ্ঞতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। হিন্দু রাজাদের জন্ত নিরশ্রেণীর শত সহস্রলোক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছে। তাহাতেই তাহাদের সিংহাসন রক্ষা পাইয়াছে। পরীগ্রামে তাহারাই ভদ্রলোকের ইচ্ছত রক্ষা করিয়াছে, ব্রাহ্মণগণ তাহাদেরই প্রসাদে ব্রাহ্মণীদিগকে লইয়া সুখে শান্তিতে পারিবারিক জীবন কাটাইবার সুবিধা পাইয়াছেন, অনেক সময় নিরশ্রেণীর লোকেরা তাহাদের জন্ত প্রাণ দিয়াছে। ব্রাহ্মণদের মন্দির তাহারাই রক্ষা করিয়াছে—এই প্রাণপণ সেবা-পরিচর্যা ও ভদ্রগৃহস্থের সম্মান রক্ষার পুরস্কার স্বরূপ তাহারা কি পাইয়াছে? সেই দেবমন্দিরে তাহাদের উঁকি মারিবার ক্ষমতা নাই; সেই ব্রাহ্মণের পা ছুঁইয়া ধূলি গ্রহণের অধিকার তাহাদের নাই; সেই ভদ্র-গৃহস্থের পায়ে একটু জল দেওয়ার অধিকার তাহাদের নাই;—এই সকল অজ্ঞায় ভ্রাতৃবিরোধ ও ঘৃণার রাজ্যে মুসলমান নিঃশ্রুণ ও সার্কজনীন ভ্রাতৃত্বাব লইয়া আসিলেন। পতিত বৌদ্ধগণকে তো হিন্দুরা কোণ ঠাসিয়া এমন এক জায়গায় লইয়া আসিয়াছিলেন যেখানে তাহারা পশুর অধম হইয়া জীবন বাপন করিতেছিল—যে স্থানে তাহারা থাকিত, সে স্থান হিন্দুগৃহস্থের অস্পৃশ্য, তাহাদের ছায়া মাড়াইলে দানের ব্যবস্থা। ইহাদিগকে আহ্বান করিয়া মুসলমান বলিলেন, “আমাদের রাজা-প্রজা নাই, বামুন-চণ্ডাল নাই, আমরা এক পঙ্ক্তিতে বসিয়া খাই। হুনিয়ার এক মালিক। আমরা তাহারই সম্পর্কে সকলে ভাই।” এই কথা এদেশের নিরশ্রেণীর কতবিকৃত হৃদয়ে অমৃত প্রলেপের জ্বর কাজ করিল। আজ যদি হিন্দুর প্রাণে বিন্দুমাত্র জ্ঞান-অজ্ঞান বোধ থাকিত, কৃতজ্ঞতার লেশ থাকিত, তবে কি পূর্ববঙ্গে শত সহস্র লোক মুসলমান হইয়া এদেশের সাম্প্রদায়িক প্রগকে এত জটিল করিয়া ফেলিতে পারিত? উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধের সংখ্যা খুব বেশী ছিল, সেইখানেই ইসলাম কৃতকার্য্য হইল। চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন, “আমি এবং বাহারা আমাকে ভালবাসে তাহাদের মধ্যে জাতি

বলিয়া কিছু নাই—আমরা সকলে একজাতি" (চৈ., ভা.)। এই কথার মহৎদের বিজয়ী কণ্ঠস্বরের প্রভাব ও প্রতিধ্বনি আমরা লক্ষ্য করিতে পারি।

এই সকল নৈতিক শক্তি লইয়া বিশ্বাসের খজাহস্তে মুসলমান আসিয়াছিল। সেই খজো আমাদের পরাজয় হইয়াছে। লৌহ বা ইস্পাতের খজা নহে। যখন তাহারা দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া হিন্দুরাজপ্রাসাদের উত্তর চূড়া অতিক্রম করিয়া বজ্রার মত খরবেগে আমাদের চন্দ্র-সূর্য্য-বংশের ধ্বংসরগণকে প্রাণিত করিয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বমুখে আসিতেছিল, তখন লক্ষণসেনের তখনবঙ্গদেশের বিলাসকলা।

রাজসভায় পদ্মাবতী নৃত্য করিতেছিলেন, এবং জয়দেব তাল রাখিয়া গীতগোবিনদের ললিত পদে মদিরা ঢালিতেছিলেন, লক্ষণসেনের যন্ত্রী—বিদ্যাংপ্রভা ও শশিকলা নামী নর্ত্তকীদ্বয়ের সঙ্গে বাত্রি কাটাইয়া তাহাদের প্রাণ্য লইয়া প্রাকৃত ব্যক্তির মত রাজসভায় অগড়া করিতেছিলেন। তাঁহার প্রিয় কবি কলিদাসাদির মুখে তৎবিরহ-বিলাপ শুনাইতেছিলেন, বাঙ্গলার বহু দেবমন্দির গাত্রে শিল্পিগণ নানাছন্দে যৌন বিষয়ক বীভৎস বন্ধ প্রকটিত করিয়া কলা চাতুর্য্য দেখাইতেছিলেন।

মুসলমানগণ না আসিলে হুই ধর্ম্মের সংঘর্ষ-জনিত প্রেরণার ফলস্বরূপ আমরা হযত কবির, নানক প্রভৃতি সাধুদিগকে পাইতাম না, এমন কি হযত বা চৈতন্যদেবকেও পাইতাম না। বঙ্গসাহিত্য চতুর্দশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে অসামান্য পুষ্টলাভ করিয়াছে তাহাও হযত সমধিক পরিমাণে মুসলমান নবাব বাদশাগণের উৎসাহে হইয়াছিল।

মুসলমানগণ আসাতে আমাদের ধন-ভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইতেছে, স্বর্ণ-দেউল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, হযত কৃষকের বন্ধের কৌস্তভমণিও অপহৃত হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের রাজলক্ষীর কুণ্ডলের প্রধান মণিগুলি অপহরণ করিয়াছেন এবং অনেক সময়ে অত্যাচারের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের আগমন যে মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে ঘটয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কেবল কোভ হয় সেই সমস্ত ও কারুকার্ম্মময় বিগ্রহ ও দেবমন্দিরের জন্ত,—বাহাতে চাক্ষুশিল তাহার শেষ কথা কহিয়াছিল,—বাহা কঠোর পাবাণে ফোদিত হইয়াও কোবল

লাবণ্যের লীলাভূমি ছিল,—বাহাতে বাঙ্গালীর অসামান্য সূক্ষ্ম কারু-
 শিল্প ভক্তি ও প্রেমের বন্ধনে ধরা দিয়া দেবমন্দিরে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা
 করিয়াছিল, সেই ভক্তি-প্রেম-মিশ্র কলা-শিল্পের চরম গৌরব কত
 বাঙ্গালীর শিল্পকলার
 বিনাশ।

যে কালাপাহাড়ী দৌরাণ্ডো নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; তাহা আর পাওয়া
 যাইবে না, সেই যুগের সঙ্গে সে শিল্প, সে প্রেম অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই অতুলনীয় নষ্টশিল্প-
 বৈভবের জন্ত এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু আপনা আপনি নয়ন প্রান্তে আসিয়া পীড়ায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মুসলমান-বিজয়

বহু পূর্বে যখন আলেকজেন্ডার ভারতবর্ষ জয়ের ইচ্ছা করিয়াছিলেন তখন মগদের সান্নিধ্য পর্য্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া যান। তাঁহার সৈন্তেরা মগদানগরের সৈন্তসংখ্যা ও বীরত্ব প্রভৃতির যে সংবাদ পাইয়াছিল, তাহাতে তাহার আর এক পাও অগ্রসর হইবে বিশেষর অভ্যয়ান।

না, এরূপ সম্বন্ধ করিয়া বসিল। আলেকজেন্ডারকে খোরস্তর অনিচ্ছার সহিত ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। তিনি সাক্ষরেন্দ্রে তাঁহার সৈন্তদিগকে সাধিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার স্মৃতি হুঃখে ছায়ায় জায় তাঁহার হৃদয়বর্তী ছিল, তাহার এবার তাঁহার আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত করিল না। অশোকের ধর্মরাজিকা বঙ্গদেশেও অনেকগুলি ছিল,— হিউয়েনসাঙ্গ লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। সমুদ্রগুপ্ত বঙ্গদেশ জয় করিয়া সমুদ্রের তীরে তাঁহার জয়স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন। পালনৃপতিগণ বঙ্গদেশেরই লোক ছিলেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষকে বঙ্গদেশের লোকেরা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিপুল সাম্রাজ্যের মধ্যে বঙ্গদেশ সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

কিন্তু সেনেরা আসিয়াছিলেন দাক্ষিণাত্য হইতে, তাহার কর্ণাটের রাজবংশ-সম্বৃত। সামন্তসেন পালরাজ্যের শেষভাগে বঙ্গের অরাজকতার সময় শৌর্য্যবীরা দেখাইয়া অধিপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হেমন্তসেন একটু একটু করিয়া সেই অধিকার বাড়াইয়াছিলেন। কিন্তু বিজয়সেনই এদেশের উপর প্রকৃত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মিথিলার রাজসভা সর্ব বিদ্যে সেন-রাজাদের আয়ুগত্যা স্বীকার করিয়াছিল। সেখানে লক্ষণ-শতাব্দী 'লসং' এখন পর্য্যন্ত চলিতেছে, মিথিলার রাজ-কবিকে "নব জয়দেব" উপাধিতে অভিনন্দিত করা হইত। বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষণসেন—ইহারা খাস বাঙ্গলা দেশটাই দখল করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন; পশ্চিমে মিথিলা ও পূর্বে আসাম, ইহাই ইহাদের রাজ্যের পরিধি ছিল। লক্ষণসেন কান্দি ও প্রয়াগ অবধি বিজয়ী হইয়া অভিযান করিয়াছিলেন। এই রাজ্য লইয়াই ইহারা সার্বভৌম রাজযোগ্য পরমভট্টারক প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সেনরাজাদের গভী পূর্বে বা পশ্চিমে বঙ্গের সীমানা ছাড়িয়া বেশীদূর প্রসারিত হয় নাই। উত্তর-পশ্চিমের সঙ্গে বাঙ্গলার যে যোগ পালরাজাদের সময় পর্য্যন্তও ছিল, সে যোগ সেনাধিকারে একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল। জয়পাল, অনঙ্গপাল, পৃথ্বীরায়—প্রভৃতি পশ্চিমোত্তর দেশের রাজারা যখন মুসলমানদিগকে ঠেকাইবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছিলেন, পশ্চিমের পাঞ্জাব, কান্দি, কানোজ, দিল্লী ও যথুয়া যে দেশাধ্যবোধ জাগিয়া উঠিতেছিল, সে জাগরণ বাঙ্গলায় আসে নাই। সবজগিন একবার জয়পালের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। ইহার রাজত্ব লাহোর হইতে হিন্দুকুশ এবং কান্দি হইতে মুলতান

পর্যন্ত বিদ্রুত ছিল। জয়পাল সুপ্রসিদ্ধ জয়পালের পুত্র ছিলেন এবং দুই লক্ষ সৈন্য সহ সবস্তুগিনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। ইনি হারিয়া বাইয়া অপরমানজনক সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হন। সবস্তুগিনের পুত্র সুলতান মহম্মদ পুনরায় এই জয়পালের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। জয়পালের ১২ হাজার অধারোহী সৈন্য, ৩০ হাজার পদাতিক ও ৩ শত রণহস্তী ছিল। এবারও মুসলমানেরা জয়ী হয়। তখন হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, যদি কোন রাজা একাদিকবার শত্রু কর্তৃক পরাস্ত হইতেন তবে তাঁহার সাংহাসনের উপর দাবী থাকিত না। দ্বিতীয়বার যুদ্ধে হারিয়া জয়পাল প্রজ্ঞালিত অধিকৃণ্ডে প্রাণ সমর্পণ করেন।

ইহার পর সুলতান মহম্মদ সুলতানের রাজ্য “বাজীরাও”কে আক্রমণ করেন (১০০৪-০৫ খৃঃ)। দাউদ খাঁ নামক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এক রাজা বাজীরাওকে সাহায্য করেন কিন্তু এ যুদ্ধে বাজীরাও পরাস্ত হইলেন এবং দাউদ খাঁ মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করার এবং বৎসর বৎসর ২০ হাজার ‘দিনার’ সুলতানকে দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়া অব্যাহতি পাইলেন।

জয়পালের পুত্র অনঙ্গপাল সুলতান মহম্মদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য যথাসাধ্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রায় সমস্ত আর্থ্যাবর্তকে হিন্দুর এই মহাবিপদের সময় একত্র

হইয়া দলবদ্ধ হইতে আমন্ত্রণ করিলেন। তিনি উজ্জয়িনী, অনঙ্গপালের পরাজয়।

গোয়ালিয়র, কালিঙ্গর, কানোজ, দিল্লী এবং আশ্মমীড় প্রভৃতি প্রদেশের রাজাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান করিয়া চিঠি লিখিলেন। অনঙ্গপালের রাজত্বের নীচে সম্মিলিত রাজস্ববৃন্দ ভারতবর্ষের মহাশত্রুকে বাধা দিবার জন্য দৃঢ়বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। কোকাহার নামক হিন্দুসম্প্রদায় তাঁহার সৈন্তের সঙ্গে যোগ দিল। তাহারা একপ চূর্ধ্ব ছিল যে, রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সুলতান মহম্মদের ৩৫ হাজার আফগান সৈন্য নিহত করিল। এই কোকাহারদের পরাক্রম দেখিয়া সুলতানের মনে বিধ্ব ভ্রাস জন্মিল। তিনি সেদিনের মত যুদ্ধ স্থগিত করিয়া পালাইবার পথ খুজিতে লাগিলেন; এমন সময় অনঙ্গপালের হস্তী সন্ন্যস্ত হইয়া রাজাকে লইয়া ছুটিয়া চলিল এবং রাজা কিছুকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। রাজচক্রবর্তীর বিশাল ধবল ছত্র না দেখিয়া হিন্দু সৈন্য মনে করিল, রাজা নিহত হইয়াছেন, তখন তাহারা রণক্ষেত্র হইতে পালাইতে লাগিল; এবং সুলতান মহম্মদ এই অভাবনীয় সুযোগ লাভ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং পলায়নপর ৮,০০০ হিন্দু সৈন্য নিহত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে স্বীয় বৈজয়ন্তী উড়াইলেন। ইহার পরে ১০২৪ খৃঃ অব্দে সুলতান মহম্মদ সোমনাথ ভ্রম করেন। তৎকালে ভারতবর্ষে এত বড় দেবালয় আর ছিল না। এই দেবতার উদ্দেশে নিয়োজিত ভাতার ও বৃষ্টি কালমিক উপাখ্যানের মত মনে হয়। লিঙ্গের চতুর্দিকে যে সকল মণিময় স্বর্ণঝাড় স্থাপিত, সেগুলির দ্বারা দেবগৃহ অন্ধকার রাত্রিতেও আলোকিত হইত। লিঙ্গের সারিধো একটা স্বর্ণ শূখল ছিল, তাহাতে অসংখ্য স্বর্ণখণ্ডা বাধা ছিল, স্পর্শমাত্র তাহারা বাজিয়া উঠিয়া গ্রহেরে গ্রহেরে নিবৃক্ষ পুরোহিতদের ঘুম ভাঙাইত। এই স্বর্ণশূখলটির ওজন ছিল দুই মন। সোমনাথের ভাতার

হইতে সুলতান হুইশত মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা (দীনার) লইয়াছিলেন। কথিত আছে, জয়পাল রাজার কণ্ঠে যে বড় বড় মুক্তা ছিল তাহাদের মূল্য ছিল ২,০০,০০০ দীনার। তাঁহার অন্তঃপুর-বাসিনী রমণীদের কণ্ঠে ইহার দ্বিগুণ পরিমিত মূল্যের মণিমুক্তা ছিল। সুলতান ভারতবর্ষ হইতে যে অর্থ লাভ করিয়াছিলেন তাহা স্বপ্নের কথার স্থায় মনে হয়।

কিন্তু বিজয়-লক্ষী মুসলমানদের প্রতি সর্বদাই প্রসন্ন হন নাই। দিল্লীর পৃথ্বীরায়ের হস্তে প্রথমবার সুলতান মহম্মদ পরাস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন; তাঁহার দ্বিতীয় বারের আক্রমণে (১১২২ খৃঃ) পৃথ্বীরায় নিহত হন।

এই রণভঙ্গা বাজাইয়া মুসলমান ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিলেন। এ সময় বঙ্গের রাজা লক্ষণসেন কি করিতেছিলেন? হয়ত তিনি ভাবিতেছিলেন, মুসলমানেরা আর বেশী পূর্বে অগ্রসর হইবে না। সেনেরা বঙ্গ ও তৎসন্নিহিত প্রদেশগুলি লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁহারা সমস্ত আত্মবর্ন্ত-জয়ের স্বপ্ন কোন কালেই দেখেন নাই, আকস্মিকভাবে

এই দেশ তাঁহাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল, ইহাই তাঁহারা বক্তৃত্যর কর্তৃক বঙ্গবিষয়।

বড় লাভ মনে করিয়াছিলেন। পালদের সঙ্গে আত্মবর্ন্ত ও দাক্ষিণাত্যের যে বোগ ছিল, সেনদের সময় তাহা একেবারে ছিন্ন হইয়াগিয়াছিল। মিথিলায় লক্ষণ-শতাব্দী প্রচলিত হইয়াছিল। সার্কসৌমত্বের এই পরিচয়ই তাঁহারা যথেষ্ট মনে করিয়াছিলেন।

লক্ষণসেনের রাজত্ব-কাল লইয়া যে বিসংবাদ চলিয়াছে, তাহার সমাধান এইভাবে হইতে পারে। ইহাতে আমার মৌলিকত্বের দাবী কিছুমাত্র নাই। আমার পূর্বে অনেকে এই মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ১১৮৮ খৃঃ অব্দে লক্ষণসেনের জন্ম হয়, সেই সময় বঙ্গাল মিথিলা জয় করিয়া নবজাত শিশুর জন্ম চিরস্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে লক্ষণাদ প্রচলন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে তাঁহার ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে মহম্মদ বক্তৃত্যর কর্তৃক বিতাড়িত হওয়া সম্ভবপর হয়। ১২৪১০ বৎসরের সময়ের ব্যবধানের বিচার লইয়া বৃথা পাণ্ডিত্য দেখাইয়া লাভ নাই এবং তরুণ গবেষণার পাণ্ডিত্য আমার আদৌ নাই।

এখন মহম্মদ বক্তৃত্যর কর্তৃক নদীয়া-বিজয় আমাদের আলোচ্য। অনেক দেশভক্ত ঐতিহাসিক এই ব্যাপারটাতে আদৌ বিশ্বাস করেন না। কেহ কেহ বলেন, নদীয়ায় লক্ষণসেনের রাজধানীই ছিল না; কেহ বলেন, মিনহাজ বর্ণিত নদীয়া এই নবদ্বীপ নহে; কেহ বলেন, যে লক্ষণসেন স্বীয় ভূজবলে কলিঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন,—কাশীর রাজাকে পরাজিত করিয়া বারানসী ও প্রয়াগে জয়স্তুতি নির্দ্বাণ করিয়াছিলেন, যিনি কামরূপের রাজার গর্ভ-ধর্ম্মকারী, সেই “অম্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজত্বেয়াধিপতি, বিবিধ বিজ্ঞা-বিচার-বাচস্পতি, সেনকুল-কমল-বিকাশ ভাস্কর, সৌমবংশ-প্রদীপ, প্রতিপন্ন-কর্ণ—সত্যব্রত গাঙ্গেয়, শরণাগত

বঙ্গপঞ্জর, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ লক্ষণসেন” কি

সপ্তদশ অশ্বারোহীর ভয়ে ভোজনার্থ অনীত স্বর্ণহালী পরিত্যাগ-পূর্বক অন্তঃপুরের মহিলাদিগকে মুসলমানদিগের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া গুপ্তদ্বার-বোগে পলায়ন

করিয়াছিলেন, এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? তাঁহারা মিনহাজের কথিত বৃত্তান্তটা একেবারেই অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু একথা নিশ্চিত যে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইয়াছিল এবং এই বিজয়-সংক্রান্ত প্রধান ঘটনা—নবদ্বীপ অধিকার। নদীয়া জয়ের ৩৪ বৎসর পরে মিনহাজ এই বিবরণটি লিখিয়াছিলেন এবং তিনি দুইজন বোদ্ধার মুখে ঘটনাটি আত্মস্বত্বাভিত্তিক শুনিয়াছিলেন। এই দুই বোদ্ধাই মহম্মদ বক্তিরারের অভিযানের সঙ্গী ছিল। মিনহাজের কথিত বিবরণ তৎসাময়িক লোকের মুখে শ্রুত। ইহা দেশপ্ৰীতির অহুপ্রাণনায় একবারে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে কি প্রকারে? বিজয়ী বোদ্ধাদের পক্ষে স্বীয় শৌর্যবীৰ্য্য বাড়াইয়া বলা এবং অপরাধকে হীন করিবার চেষ্টা কতকটা স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত ঘটনাটিই কল্পনার সৃষ্টি, একথা বলা ঠিক নহে।

লক্ষ্মণসেন সেই সময়ে ভারতবর্ষের এক কীর্তিমান রাজা ছিলেন। তাঁহার সভার গীত-গোবিন্দ ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, যৌবনে তিনি বহু-যুদ্ধ-জয়ী পরাক্রান্ত বীর বলিয়া সুবিদিত ছিলেন। তাঁহার সমস্ত জীবনটাই মুসলমান অভিযানের সমকালবর্তী। তিনি নিশ্চয়ই মুসলমানদিগের পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে আগমন স্পষ্টভাবে সাবধানতার সহিত লক্ষ্য করিতেছিলেন। শৈশবে শুনিয়াছিলেন,—দিল্লীখর, কনোজেশ্বর প্রভৃতি মহাবীরগণের প্রচেষ্টার কাহিনী। তাঁহাদের দৃঢ়বদ্ধ সঙ্কল্প এবং শত্রুদলনার্থ ঐক্য সমস্তই দৈবদোষে পণ্ড হইয়া

গেল। সোমনাথের গগনচুম্বী শিব-মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িল। উদয়পুর-বিহার পর্য্যন্ত বিজয়ী মুসলমানেরা আসিলেন, তাঁহাদের পথ রক্তরঞ্জিত

হইল। মহম্মদ বক্তিরার যেমনই কুৎসিতদর্শন ছিলেন, তেমনই জুর ও নির্ধম ছিলেন। বিহারে তিনি একরূপ নির্ধিষ্ঠারে হিন্দুদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন যে, সজ্জারামের সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া বিষয়টি জানিবার চেষ্টা করিয়া শুনিলেন নগরে একটিও হিন্দু নাই। একটা বিরাট সজ্জারামকে তাঁহারা রণভূমি বলিয়া ভ্রম করিয়া আক্রমণ করিলেন। মুণ্ডিত-মস্তক নিরীহ বোদ্ধাচার্যগণকে শত্রু-সেনাপতি মনে করিয়া অসহায় অবস্থায় ও অলক্ষিতে তাঁহাদের জীবন নষ্ট করিলেন, তখন পর্য্যন্তও খিলিজি বৃদ্ধিতে পারেন নাই যে তিনি শত শত একান্ত নিরীহ, অধ্যয়ননিরত শ্রমণগণের প্রাণ নষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার চক্ষু আসিয়া ঠেকিল বিহারের বিরাট পাঠাগারের প্রাচীরের নিকট। হতত বা তিনি প্রথমতঃ সেগুলি অদ্বন্দ্ব মনে করিয়া থাকিবেন। সেই পাঠাগারের অমূল্য বহুযুগ-সঞ্চিত, জ্ঞানিগণের জীবনব্যাপী তপস্তাসম্বৃত সুধীমণ্ডলীর প্রাণাধিক প্রিয় পাঠাগার নষ্ট করিয়া তিনি মহাহর্গ বিজয়ীর গর্ভে অহুভব করিলেন। তখন দশ হাজার সৈন্য গভীর জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিয়া তিনি মাত্র সপ্তদশ অথারোহী সঙ্গে বণিকবেশে নদীয়ায় প্রবেশ করিয়া আপনাকে অর্থ-ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচয় দিলেন।

এই আত্মবর্জিত্যাপী বিরাট যুদ্ধে বাঙ্গালী যোগ দেয় নাই কেন? (১) দাক্ষিণাত্যের কোন রাজা এই সময় আত্মবর্জিত রাজাদিগকে সাহায্য করিতে আসেন নাই, বাঙ্গলা

দেশেও হ্রত সেইরূপ কোন কারণে আপনাদিগকে দূরে রাখিয়াছিলেন। (২) হ্রত বা রাজা মনে করিয়াছিলেন, পূর্ববর্তী বিজয়ী পাশ্চাত্য অভিযানের সময় অনেক শত্রুই বাঙ্গলাদেশ পর্য্যন্ত আসে নাই, তেউ ধামিয়া গিয়াছে, এবারও তাহাই হইবে। (৩) গুপ্ত ও পালযুগের সময়ে আখ্যাবর্তের সর্বপ্রধান রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র ছিল মগধ। কিন্তু সেনাদের সময় গোড় সে হিসাবে আখ্যাবর্তের কেন্দ্র বলিয়া গণ্য হয় নাই। এই কারণে সাময়িকভাবে গোড়কর্তৃক পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি মধ্যে মধ্যে বিজিত হইলেও আখ্যাবর্তের সঙ্গে বাঙ্গলার যোগ বা অন্তরঙ্গতা কোন দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল না। (৪) সেনেরা খাস বাঙ্গলার লোক ছিলেন না, তিন পুরুষে তাহারা বাঙ্গলা দেশকে কতকটা আপনায় করিয়া লইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বাঙ্গলার বাহিরে তাহারা তাদৃশ সহযোগ প্রাপ্ত হন নাই। (৫) কৌলীজ, সামাজিক বিপ্লব, বৌদ্ধবিজয় প্রভৃতি কারণে খাস বাঙ্গলায়ও সেনাদের রাজত্ব সর্বত্র লোক-প্রীতিকর হয় নাই। স্বীয় সভাপণ্ডিতগণের লিখিত তাম্রশাসন স্তাবকতাপূর্ণ হইতে পারে কিন্তু তাহা কি ব্যাপকভাবে লোকপ্রীতির সূচনা করিতেছে? বৌদ্ধগণ এতটা উৎসাহিত হইয়াছিল যে তাহারা মুসলমানদের পূর্বকৃত শত অত্যাচার ভুলিয়া বিজয়িগণকর্তৃক ব্রাহ্মণ-দলন এবং মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয় ভগবানের দানস্বরূপ মনে করিয়াছিল; শূন্যপুরাণের “নিরঞ্জনের উদ্ভা” নামক অধ্যায়ে দেখা যায়— তাহারা মুসলমানদিগকে ভগবানের ও নানা দেবদেবীর অবতার মনে করিয়া তাহাদের কর্তৃক ব্রাহ্মণ-দলনে নিতান্ত আনন্দিত হইয়াছিল। কানোজাগত ব্রাহ্মণদের (পশ্চিমা ঠাকুর) অত্যাচার ও প্রাধান্য, পূর্ববর্তী সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ক্ষমতা লোপ, দেশের আপামর সাধারণের প্রীতিকর হয় নাই। বল্লালসেনের উপরাজ্ঞী হাড়ী জাতীয়া পদ্মিনীকে সমাজে চালাইবার চেষ্টায় বঙ্গসমাজের সর্বত্র একটা রোষাঘি ধুমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে বল্লাল-কৌলীজ স্বীকৃত হয় নাই। এতদ্বারা বুঝা যায় বাঙ্গলায় একটা অন্তর্বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। ইতিহাসে কোথাও একথা নাই যে সেনরাজত্ব ধ্বংসের প্রাকালে মুসলমানদিগের সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির রীতিমত কোন যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে। পরন্তু দেখা যায় যে বঙ্গবিজয়ের পরে বিশেষ করিয়া উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, নব ব্রাহ্মণদিগের ঘোর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণপূর্বক বস্তির নিশ্চাস ফেলিয়াছে।

এই সময়ে সেনরাজগণের দ্বারা একটা দেশব্যাপী সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টি করা খুব সময়-সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। (৬) লক্ষণসেন অতিবৃদ্ধ হইয়াছিলেন। যে বয়সে লোকে জীবন হইতে মরণের দৃষ্টাই বেশী দেখে, যখন শারীরিক শক্তি লোপের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহাদির প্রতি প্রবৃত্তি থাকা কতকটা অস্বাভাবিক,— সেই সময় বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন যদি লক্ষণসেন তাদৃশ উদ্ভমশীলতা না দেখাইয়া থাকেন, তাহা অস্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। (৭) ইতিপূর্বে দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক পালরাজার সমক্ষেই গ্রাম্যগীতি রচনা হইয়াছিল। রাজাদের সমক্ষে কোন কল্প কাহিনী, যুদ্ধ-বিজয়, ইহার কোন ঘটনাই গ্রাম্য

কবির বাদ দেন নাই। রাজ্যপাল, যোগীপাল, ভোগীপাল, রামপাল, মহীপাল, ধর্মপাল প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক পালরাজাদের সম্বন্ধেই গ্রাম্য গীতির কথা তাম্রশাসনে ও গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। * এই সকল গানের কিছু কিছু আমরা এখনও পাইতেছি। কিন্তু সামন্তসেন, হেমন্তসেন, বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষণসেন—ইহাদের সম্বন্ধীয় কোন পল্লীগীতির উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায় না। অথচ ইহাদের অনেকেরই তাম্রশাসন ও গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এখনও লোকে “ধান ভান্তে মহীপালের গীত” প্রবাদ-বাক্যটি বলিয়া থাকে। চৈতন্যপ্রভুর জন্মবার সময়েও লোকে দিবারাত্র পালরাজাদের গান গাহিত। চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন-দাস লিখিয়াছেন, “যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপাল গীত, ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত” (চৈঃ ভাঃ, অস্ত্য)। কিন্তু এত বড় একটা ঘটনা ঘটয়া গেল,—লক্ষণসেন অতি বৃদ্ধ বয়সে মুসলমানকর্তৃক তাড়িত হইলেন, সমস্ত দেশটা হিন্দুরাজার হাত হইতে মুসলমান রাজার হাতে যাইয়া পড়িল—কত মর্মবিদারক ঘটনার সঙ্গে লক্ষণের রাজত্ব বিজড়িত। এ ছাঃ, এ করুণ কাহিনী গাহিবার জন্ত কি একটি পল্লী-গায়কও পাড়াইল না? এখন কথা হইতে পারে যে, সে সকল গীত লুপ্ত হইয়াছে,—কিংবা এখন বাহা পাওয়া যায় নাই, পরে হয়ত তাহা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাহা পাওয়া যায় নাই, তৎসম্বন্ধে অহুমান আমাদের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের বেশী হানি করিতে পারে না। গীত ত পাওয়া যায় নাই, তৎসম্বন্ধে কোন উল্লেখও পাওয়া যায় নাই। এদিকে এখনও মণিকচন্দ্র রাজার গান, গোপীচন্দ্রের গান ইত্যাদি গাহিয়া উত্তর বঙ্গের চাষারা আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করিতেছে, দশম শতাব্দীর মহীপালের গান এখনও প্রচলিত, অথচ লক্ষণসেন কি বল্লালসেন সম্বন্ধে একটি গানও শুনিতে পাই না। বৃন্দাবনদাস বোড়শ শতাব্দীতে

* রাজাদের সম্বন্ধে এইরূপ গ্রাম্য-গীত রচনার প্রথা বহু প্রাচীন। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রাজা রঘু এইরূপ গান দ্বারা অভিনবিত হইতেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন :—“ইক্ষুচ্ছারানিষাদিগুস্তত্ত গোপ্তাঃ পৌরহম্। আকুমার-কধোদধাতং শালিগোপ্যো জগুধশঃ।” খালিমপুর তাম্রশাসনে ধর্মপাল (৮ম শতাব্দী) সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে :—“গোপৈঃ সৌরি বনেচটৈর্বনভুবি আমোপকণ্ঠে জনৈঃ ক্রীড়ন্তিঃ প্রতিচরং শিশুগণৈঃ প্রত্যাগমং মানপৈঃ। লীলা-বেশ্মনি পল্লবোবর-শুকৈরুপলীতমাক্ষত্বং যন্তাকর্ণরতম্পা-বিবলিতানম্রং সপৈবাননম্।” বাণগড় তাম্রশাসনে রাজ্যপাল সম্বন্ধীয় গ্রাম্যগীতের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (১০ম শতাব্দী)। তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল সম্বন্ধেও তাম্রশাসনে এরূপ উল্লেখ আছে (“কীর্ত্তিপ্রস্তানন্দিত-বিধ-গীত”)। চৈতন্য-ভাগবতে তিন জন পাল রাজা সম্বন্ধীয় ঐ ভাবের পল্লীগীতির কথা আছে—তাহা উপরে উক্ত হইয়াছে। লিখিত আছে চৈতন্য-প্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে এই সমস্ত গান সাধারণের অতি প্রিয় ছিল। সেক শুভোদয়াতে রামপালের প্রশংসাত্মক পল্লীগীতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ১১শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ ঈশ্বর বোদের তাম্রলিপিতে তৎপিতা ধল বোব সম্বন্ধে এইরূপ গীতের উল্লেখ আছে। ১৫৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে রচিত রাজ-মালায় জিপুররাজ ধর্মমণিক্য, রাণী কমলা ও পরবর্তী রাজা অমরমণিক্য সম্বন্ধে সাধারণের উপভোগ্য গীতিকার কথা দৃষ্ট হয়। রাজ-মালায় লিখিত আছে, এই সকল গান নৃত্য ও বাজ্যসহ সহকারে গীত হইবার জন্ত ত্রিহত হইতে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ লোক আনা হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে মৌলভি লুৎফুল খবির জিপুররাজদ্রোহী সম্রাটের গাজির গান প্রকাশিত করিয়াছেন। সংকৃত “Folk Literature of Bengal” নামক পুস্তকে এই গীতি সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে (১৩৬-১৪২ পৃঃ)।

বৌদ্ধপালরাজগণের নাম করিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধীয় দেশব্যাপী গানের উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ সেই সকল রাজার বহুপরবর্তী হিন্দুরাজাদের গীতের উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ শেষ হিন্দুরাজগণের স্থিতি অতি করুণ ঘটনা বিজড়িত জাতীয় ঘোর দুর্দশার কথা। তাঁহাদের সম্বন্ধীয় গান থাকিলে অবশ্যই তিনি উল্লেখ করিতেন।

এই সকল কারণে মনে হয়, নব ব্রাহ্মণগণের উৎপীড়নে—বৌদ্ধ সাম্যবাদের অবসানে জনসাধারণ নিতান্ত হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছিল; তাহারা সেই কষ্টে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া ভয়াবহ পরধর্ম পর্যন্ত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহারাই ছিল গায়ক, উত্তর কালে তাহারাই ঈশাখা দেওয়ান, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান, জাহাঙ্গীর দেওয়ান, দেওয়ান সেকেন্দর প্রভৃতি মুসলমান বীরদের সম্বন্ধে বহু গীতিকা রচনা করিয়াছিল। সঙ্কটকর্ণামৃত ও লোক-প্রবাদে লক্ষণসেনের অনেক সংকৃত শ্লোক পাওয়া যায়, রাজা পণ্ডিত-মণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া নব হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা

করিতেন, কোন্ তিথিতে ব্রাহ্মণকে কি দান করিলে কি ফল হয় এই সকল বিচার চলিত, তিনি ছিলেন পণ্ডিতগণের মধ্যে মহা-পণ্ডিত; পণ্ডিতগণ ছিলেন তাঁহার স্বগণ। জনসাধারণের সঙ্গে

পালরাজগণের যে যোগ ছিল সেনদের সঙ্গে তাহাদের আর সে যোগ রহে নাই। জনসাধারণ পালদের সময় নূতন নূতন গ্রাম্যগীত রচনা করিত; রূপকথা, গীতিকথা প্রভৃতি বাঙ্গলা ভাষায় রচিত হইত এবং রাজারা তাহা শুনিতেন। সময় সময় বখন কোন রাজার প্রশংসা সেই সকল গানে অতিমাত্রায় রঞ্জিত হইয়া উঠিত, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল লজ্জায় আরক্তিম হইত এবং তিনি অধোমুখ হইতেন (খালিমপুর তাম্রশাসন)। কিন্তু সেনদের সময় কি সাধ্য যে জনসাধারণ বাঙ্গলা গান লইয়া রাজদ্বারে প্রবেশ করে? বিদ্যাংলেকা, শশিলেকা বড় বড় রাগ-রাগিণীতে গান করিত এবং পরাবতী ও জয়দেব গীতগোবিন্দ গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন। ইহার বহু পরে বখন বাঙ্গলা ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতাদির ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল, তখন ভট্টাচার্য্যের দল রাগিণী গিয়া অভিশাপ দিলেন, ধর্মগ্রন্থ যে বাঙ্গলায় শুনিবে সে ঘোর নরকে বাইবে।

“অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্ত চরিতানি চ।

ভাষায়াং যানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥”

এইভাবে জনসাধারণ ও রাজসিংহাসনের মধ্যে একটা সুদূর ব্রাহ্মণ্য-গর্কের প্রাচীর উঠিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় ঐক্যের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল; জাতিভেদ শৈল-কঠিন গভীতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীকে আবদ্ধ করিয়া এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীকে

পাল্লিকিয়া দীর্ঘ।

দূরে স্থাপিত করিল। এই ক্ষেত্র সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপযোগী নহে, এই ক্ষেত্রে জাতীয় সঙ্গীত জন্মায় না। বঙ্গ-বিজয়ে জনসাধারণের কোন বিশেষ ক্ষোভের উৎপত্তি করে নাই। মুসলমান আগমনে বঙ্গীয় জনসাধারণ বরঞ্চ কতকটা

কষ্টই হইয়াছিল। শুধু নব ব্রাহ্মণমণ্ডলী তাঁহাদের অহুগৃহীত দলবল সঙ্গে এবং কোলীজ-প্রাপ্ত ভদ্র-সমাজের একটা দল রাজকীয় প্রসাদ লাভ করিয়া রাজাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। একজ্ঞ বঙ্গ-বিজয় এত সহজে হইয়াছিল। দৃঢ়-সঙ্কলিত জাতীয় বাধা অতিক্রম করিয়া পরদেশাগত শত্রু কখনই এক রাজ্য দখল করিয়া দীর্ঘকাল স্বীয় শাসন বজায় রাখিতে পারে না। ইংরেজদিগকে আমরা যেরূপ বাঙ্গলা দেশ হাতে তুলিয়া দিয়াছিলাম, মুসলমান-দিগকেও তাহাই করিয়াছিলাম কিনা, এ সম্বন্ধে সেই আধার যুগের সমগ্র ইতিহাস আমরা জানি না। কিন্তু নিম্নশ্রেণী-দলনকারী ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে জনসাধারণ যেরূপ আতঙ্কিত হইয়াছিল, মুসলমানাধিকারে যে তাহা হয় নাই, তাহার আভাস নানা দিক্ হইতে পাওয়া বাইতেছে।

ডোম-কত্মা পদ্মিনীকে ঘরে আনিয়া বল্লালসেন তাহাকে রাজমহিষীর সম্মান প্রদান করিতে চেষ্টা পান। আমরা পুনঃ পুনঃ কুলজীগ্রন্থে “বল্লালস্তায়নদোষেণ” নষ্ট-কুল ব্যক্তিগণের উল্লেখ পাইতেছি। এই ডোম-কত্মার হাতে রাজা বড় বড় কুলীন বৈষ্ণবদিগকে খণ্ডয়াইয়া-ছিলেন, তাহার আরও প্রমাণ আমরা পাইয়াছি এবং পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। স্বর্ণপীঠদের উল্লেখ কুলজী-গ্রন্থের সর্বত্র আছে। ভরত মল্লিকের রত্নপ্রভা, চন্দ্রপ্রভা, কবি-কণ্ঠহার প্রণীত কুলপঞ্জী প্রভৃতি বহু গ্রন্থের নানা স্থানে এই স্বর্ণপীঠদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখনও স্বর্ণপীঠদের বংশধরগণ বাঙ্গলায় বিস্তারিত আছেন, যদিও তাঁহারা তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত, কিন্তু তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের নাম, ধাম, গাঁই, গোত্র এরূপ পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে যিনি ইচ্ছা করিবেন, তিনিই তাহাদিগের সন্ধান অনায়াসে পাইবেন। ইহারা যে গুরুভার এবং সুবৃহৎ সোণার পীড়ির উপর বসিয়া ডোম-মেয়ের রাধা ভাত খাইয়াছিলেন, তাহাই ভোজন-দক্ষিণা-স্বরূপ পাইয়া এই উপাধিটি লাভ করিয়াছিলেন।

রাজবাড়ীর এই গোলযোগে বাঙ্গলার আবহাওয়াটা দূষিত হইয়া পড়িয়াছিল। বল্লাল-চরিতে পদ্মিনীর প্রতি লক্ষণ সেনের যে অত্যাচারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। বঙ্গের বহু উপকণ্ঠায় বিমাতার এরূপ চক্রান্তের কথা পাওয়া যায়, সেইরূপ কোন গর লক্ষণ সেনের উপর প্রয়োগ করা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। প্রাচীন ইতিহাসে কুণাল ও রাণী তিষ্ঠারক্ষিতার সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ উপাখ্যান বর্ণিত আছে। কিন্তু পাটরাণী বল্লালের ব্যাবহারে যে ভয়ানক জুজু হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অহুমিত হয়। বল্লাল সেনের সঙ্গে লক্ষণ সেনের এই উপলক্ষে ঝগড়া এবং সংস্কৃত গোঁকে পিতা-পুত্রের উত্তর-প্রত্যুত্তর সঙ্কল্পিকর্গামুতে উদ্ভূত হইয়াছে। ঘটককারিকাও এ বিষয়ে নীরব নহে। লালমোহন বিজ্ঞানিধির “সম্বন্ধ-নির্ণয়ে” হুলোপকাননের কারিকা হইতে যে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও পদ্মিনীকে লইয়া লক্ষণসেনের সঙ্গে তাঁহার পিতার কলহ বর্ণিত হইয়াছে।

এদিকে বল্লালী কোলীজ দেশময় একটা গুরুতর আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। বাহাদিগকে বল্লাল কুল দিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে সেই কুল গ্রহণ

করিলেন না, “বারেন্দ্র কায়স্থ, বৈষ্ণ, বৈদিক ব্রাহ্মণ। বঙ্গালের কুল না লইল তিন জন।”

বঙ্গালী কুলে দেশময়
অশান্তি।

ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণ, কায়স্থদের মধ্যে ঐহারা সমাজে তাঁহাদের প্রাচীন
প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি হারাইলেন, তাঁহাদের সংখ্যা বড় কম ছিল না।

দত্তগণ বৈষ্ণ ও কায়স্থগণের মধ্যে প্রধান কুলীন ছিলেন। বৈষ্ণরাজ
চক্রবর্ত্ত লোহ বংশীয় দত্ত ও কুলীন বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গালের গণ্ডীর বহির্ভূত
ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলের দত্তই এখনও তথাকার কায়স্থগণের প্রধান। সেই সকল স্থানে
চক্রবর্ত্তগণই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত। বঙ্গালের নব-পর্য্যয়ে বহু প্রাচীন সুপ্রতিষ্ঠিত
বংশীয়েরা কোন স্থান পাইলেন না, তাঁহারা নীরবে ক্রোধে জলিতে পুড়িতে লাগিলেন।
কেহ কেহ বঙ্গালের কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়া সেন-বংশের সীমার বহির্ভূত স্থানে পলায়ন
করিয়া আশ্রয় করিলেন, পূর্ব-ময়মনসিংহে অনন্ত দত্ত, উত্তর রাঢ়ীয় বাস সিংহ ও ভৃগুনন্দী
বঙ্গালের নিকট অপমানিত হইয়া বঙ্গালের সামীপ্য হইতে দূরে প্রস্থান করিলেন। *

ঐহাদিগকে বঙ্গাল কুল দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে নানা কারণে অসন্তুষ্ট
হইয়াছিলেন, ঐহারা কুলভ্রষ্ট হইলেন তাঁহাদের ক্রোধের সীমা-পরিসীমা রহিল না, ঐহারা কুল
পাইলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার শ্রেণী-বিভাগ লইয়া
বিরক্ত হইলেন। ইহা ছাড়া ডোমকন্ডাকে রাজাস্তঃপুরের শীর্ষস্থানে
কঠোরতা।

দাঁড় করাইবার চেষ্টা কাহারও মনঃপূত হইবার কথা নহে। এমন
কি স্বয়ং রাজগুরু ভীমকালই রাজসভা ত্যাগ করিয়া গেলেন। বঙ্গালী কোলীন্ত দেশময়
একটা অসন্তোষের বিস্তার করিয়াছিল, ঐদৃশ ঘটনাটি লইয়া তাম্রশাসনে গৌরব করার মত
তখন কিছুই ছিল না।

উচ্চ তিন শ্রেণীর নিম্নে যে সকল জাতি, তাহারা ব্রাহ্মণ্য উপদ্রবে অশান্ত হইয়া
উঠিয়াছিল। জনসাধারণের একটা প্রধান ভাগ ছিল বৌদ্ধ। বৌদ্ধ নেতৃবর্গ বঙ্গদেশ হইতে
দূর সীমান্ত প্রদেশগুলিতে আশ্রয় লইয়াছিল। সুতরাং কর্ণধারহীন তরুণীর জায় বৌদ্ধ-
জনসাধারণ এই ব্রাহ্মণ্য আন্দোলনের জলধিতে টলমল করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ জাতি-
ভেদের বন্ধনী কসিয়া আঁটিতে লাগিলেন, রক্তনের হাঁড়ি শালগ্রামের মত সিংহাসনে বসাইয়া
তাঁহারা উহাকে ধর্মের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণের হাঁড়ি ছুঁইতে
পারা দরিদ্রের পক্ষে রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করা অপেক্ষাও অসম্ভব ব্যাপার হইয়া
দাঁড়াইল। এদিকের আচার জিনিষটা নব-কোলীন্তে একবারে মাথা ডিঙ্গাইয়া উপরে বসিল।
বিনি “স্বপাক” খান, তিনি পুণ্যাত্মা। এক জাতির মধ্যেও ছোঁয়াচে রোগ এত কঠোরভাবে

* “চন্দ্রশূভ্রাবনিসংখ্যাপাকে। বঙ্গালভীতঃ বলু দত্তরাজঃ। শ্রীকণ্ঠনারা গুরুণা ঘিজেম। শ্রীমাননন্তো
বিজহৌ চ বঙ্গম্।” ১১৩৩ পৃঃ অর্থে লিখিত একটি প্রাচীন দলিলে দেখা যায়, অনন্ত দত্ত বঙ্গালের হয়ে পলাইয়া
যাইয়া কিশোরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) মহকুমার অধীন কাঞ্চল গ্রামে বাস স্থাপন করেন (কেদার মজুমদার দ্বৃত্ত
ময়মনসিংহের ইতিহাস, ২৫ পৃঃ)।

নির্জিচারে সকল লোককে আক্রমণ করিল যে, সময়ে সময়ে এক বাড়ীতেই সারি সারি উত্থন বসিয়া গেল। উত্থনগুলি হোমকুণ্ডের মতই পবিত্র হইল। জনসাধারণের মধ্যে শত সহস্র লোক "অনাচরণীয়" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের পায়ে একটু জল দেওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী 'নেড়ানেড়ী' নাম লইয়া ভদ্রপন্নী হইতে বহু দূরে কোনরূপে একটু স্থান লাভ করিল, কিন্তু বিবাক্ত শবের ভ্রায় তাহাদের স্পর্শ হিন্দুসমাজে প্রত্যাখ্যাত হইল। ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ জনসাধারণের নিকট হইতে অত্যাচার করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগের গৃহাদি অগ্নিতে পোড়াইয়া ফেলিতে লাগিলেন। আমরা পূর্বে এক অধ্যায়ে দেখাইয়াছি এই বুদ্ধদেব বৌদ্ধগণ (সঙ্ঘসমাজ) ক্রমশঃ বিপন্ন হইয়া মুসলমান কর্তৃক দেশাধিকার একটা মন্ত বড় সৌভাগ্য মনে করিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল।

এদিকে বল্লাল সেন যোগী ও সুবর্ণ-বলিকদের জাতি নষ্ট করিলেন এবং স্বকীয় রাজ্যভূমিগ্রহণে বলবৎ করিয়া কৈবর্ত, কুন্তকার, কর্মকার, মাণিকার প্রভৃতি কয়েকটি জাতিকে নিম্নশ্রেণীর মাধার উপর বসাইয়া দিলেন। (বল্লালচরিত, বল্লালের শেষ জীবন। ১০৯ পৃষ্ঠা।)

বল্লাল সেনের শেষ জীবন সুখের হয় নাই। পদ্মিনী সংঘটিত ব্যাপার লইয়া তাঁহার পত্নী মহারাজ্ঞী রামদেবী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; লক্ষণ সেন প্রকাশ্যভাবে রাজদ্রোহিতা করিতে একবার উদ্বৃত্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব পদ্মিনী তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তাঁহার শরীর চিরকাল সুগঠিত ও সুস্থ ছিল, কিন্তু এবার সেই শরীরে মারাত্মক পীড়া দেখা গেল। তিনি গঙ্গাতীরে কান্দাটে আসিয়া মৃত্যুর জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন (সার্যাল)। এই সকল আন্দোলন উপস্থিত করিয়া তিনি গৃহে নিজে অশান্তি টানিয়া আনিয়াছিলেন, নতুবা তিনি মুক্তহস্ত, উদারচরিত্র, তেজস্বী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। বটুক দাসের পুত্র শ্রীধর দাস কৃত সহস্রকর্ণামৃতে তাঁহার ও লক্ষণ সেনের সংস্কৃত শ্লোকে যে কাব্য-প্রতিবন্ধিতা দৃষ্ট হয়, সেই সমস্ত কবিতা যদি পিতা-পুত্রের রচিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে সংস্কৃত শাস্ত্র ইহারা সৌখিন ভাবে অধ্যয়ন করেন নাই, ইহারা উভয়েই সেই শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। দানসাগর ও অদ্বুতসাগরে বল্লালের বিজ্ঞানবত্তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এমনও হইতে পারে যে সেই দুই-খানি পুস্তক তিনি নিজে রচনা করেন নাই; তাঁহার গুরু অমরক হইতে পুস্তক-প্রণয়নে তাঁহাকে অনেকটা সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু মূল বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন এবং গ্রন্থরচনার আদত প্রেরণাটা রাজার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পণ্ডিতমণ্ডলী পরিবৃত্ত হইয়া তিনি শাস্ত্রালোচনার ব্যাপৃত থাকিতেন, এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না, কোন যোগ্য ব্যক্তি তাঁহার নিকট প্রাধা হইয়া আসিলে তিনি তাঁহাকে ফিরাইতেন না, তাঁহার অব্যবহিত দানে রাজকোষ প্রায় সর্বদাই শূন্য হইয়া পড়িত। এদেশে এখনও যে "বল্লালী দারিদ্র্য" বলিয়া একটা প্রবাদ আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে তিনি একরূপ অমিতব্যয়ী ছিলেন এবং মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন যে, তাঁহার অভাব কোন কালেই মিটিত না।

আর্য্যাবর্তে সমুদ্রগুপ্ত ও ধর্ম্মপালের পরে বঙ্গালের মত তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব এবং শক্তিমত্তা অতি অল্প রাজারই ছিল। কনুসাটে যখন উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহার দেহে যমের নিখাস আসিয়া পড়িতেছিল। এই গৃহহারা দারাপুত্র-স্নেহহারা মুন্সু হতভাগ্য রাজা যখন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া গভীর অস্থতাপ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গী ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে দিয়া প্রাশস্তিত্ত করাইলেন। ভয়দেহে এই প্রাশস্তিত্তের কসরৎ তাঁহার পীড়া দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিল।

লক্ষণসেনকে রাজা মৃত্যুকালে একবার দেখিতে চাহিলেন। পরদিন রাজার সঙ্গে নাই তনিয়া, লক্ষণ কিপ্র জলদান-যোগে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যধুসেনকে (মাধব সেন) পাঠাইয়া দিলেন। রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “আজ জুড়াইলাম, এমন বিষবৃক্ষ হইতে যে একরূপ অমৃত ফল হইবে, তাহা কে জানিত ?” বিষবৃক্ষ দ্বারা লক্ষণসেনকে বুকান হইতেছে। এই বিষয়ে তাঁহার স্বকৃত যে কয়েকটি কবিতা আছে, তাহা বড়ই সুন্দর। এই সকল কথা আমরা সার্যাল মহাশয়ের “বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস” হইতে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু বঙ্গি বঙ্গাল-চরিতের কথাই সত্য হয় এবং সত্য সত্যই রাজা অগ্নিতে আত্ম-বিসর্জন করিয়া থাকেন তবে ইতিহাসের অনেক কথাই ফিরিয়া লিখিতে হইবে।

বঙ্গালের সময় সংস্কৃতের অস্থূলন এত অধিক হইয়াছিল যে পুরমহিলারা পর্য্যন্ত সংস্কৃতে কথাবার্তা বলিতে পারিতেন। লক্ষণসেনের দ্বী স্বামিবিরহে কাতর হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে—

“পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা
অথ কান্তঃ কৃতান্তো বা হঃখতান্তং করিস্যতি।”

কথিত আছে নির্কাসিত লক্ষণসেনের দ্বী-লিখিত এই দুইটি পঙ্ক্তি কোন ক্রমে বঙ্গাল দেখিতে পাইয়া পুত্রকে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিবার আদেশপূর্ব্বক নিম্নলিখিত শ্লোক চতুষ্টয় প্রেরণ করিয়াছিলেন—

“সন্তপ্তা দশমধ্বজাগতিনা সস্তাপিতা নির্জনে ।
তুর্ঘ্যদ্বাদশবৎ দ্বিতীয়মতিমদ্রেকাদশেভস্তনী ॥
সা যন্তী নৃপপঞ্চমস্ত ভবিতা ক্রসপ্তমৌবর্জিতা ।
প্রাপ্তোত্যাষ্টমবেদনাং প্রথম হে তুর্ঘ্যং তৃতীয়ো ভব ॥”

[শ্লোকের অর্থ :—হে বৃষ (দ্বিতীয়) বৎ বলী (পুত্র) । মকর (১০ম)-সমাগমে কর্কট ও মীনবৎ (৪র্থ ও ১২শ) মকরকেতন (কন্দর্প)-সমাগমে করিকুস্ত (১১শ)-স্তনী (বধূ) প্রপীড়িতা এবং সেই তুলা-(৭ম) বা তুলনা-রহিত অর্থাৎ অতুলনীয় ক্রসপ্তমী বর্জিতা (যন্তী) সিংহ (৫ম)-তুলা রাজকুমারের শত্রী হইয়া বৃশ্চিক (৮ম)-বৎ যজ্ঞনা ভোগ করিতেছে, হে মেঘবৎ (১ম) বিনীত পুত্র, শীঘ্র আসিয়া উভয়ে মিশ্রন (৩য়) অর্থাৎ মিলিত হও। (যশোর-খুলনার ইতিহাস, সতীশ মিত্র, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১২।)]

যিনি অদ্বৈত-সাগর লিখিয়াছিলেন, জ্যোতিষের ইঙ্গিত দ্বারা পুত্রবধূর অবস্থা বর্ণনা করা তাঁহারই যোগ্য বটে। এইরূপ একটা বিষয় প্রকাশ করিয়া লিখিবার যোগ্য নহে, ইঙ্গিতে ব্যক্ত করাই সমীচীন।

লক্ষ্মণসেনের মত অভিজ্ঞ, বীরত্বদর্পিত, সুপণ্ডিত প্রবীণবয়স্ক রাজা কি জানিতেন না যে দারদেশে আসিয়া মুসলমান উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদের হৃদয়নীয় খর শক্তি কেহ রোধ করিতে পারেন নাই, অচিরে তাঁহার রাজ্যও ধ্বংস পাইবে? ইহাতো তাঁহার রাজসভার জ্যোতিষীরাই গণিয়া বলিয়াছিলেন। জ্যোতিষগণ যঃ ইঃ ব্যক্তির খিলজির বিকটাক্রুতি, তাঁহার জাহ্নু অতিক্রমকারী সুদীর্ঘ অদ্বৈত-দর্শন ভুজয়ুগলের কথা পর্য্যন্ত গণিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী কাশী অতিক্রম করেন। “ইবন-অল-অধির” নামক ইতিহাসে লিখিত আছে যে তৎকালে আর্ঘ্যাবর্তের রাজগণের মধ্যে কাশীরাজের নাম শীর্ষস্থানে ছিল। তিনি ভারতবর্ষের অজ্ঞাত নৃপতির তুলনায় সর্বপেক্ষা বৃহৎ ভূভাগের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার রাজ্য মালবদেশ হইতে চীনের সীমান্ত, এবং সমুদ্র হইতে লাহোরের নিকটবর্তী (১০ দিনের পথ দূরে স্থিত) প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাহাবুদ্দিন ঘোরী কাশীপতিকে আক্রমণ করিয়া তৎকাল প্রজামণ্ডলীকে যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্মরণীয় হইয়া আছে। রাজা যুদ্ধে নিহত হইয়া অসংখ্য শবের মধ্যে পড়িয়াছিলেন, তাঁহার সোণাবীরা দাঁত দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারা গিয়াছিল। ১,৪০০ উটের পীঠে চাপাইয়া ঘোরী কাশীর লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য লইয়া গিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণসেন কি এই ঘটনা ও বিহারের সংঘারাম ধ্বংসের কথা জানিতেন না? তিনি এত বড় পরাক্রান্ত ছিলেন যে পূর্বোক্ত প্রবল পরাক্রান্ত কাশীরাজকেও তিনি পরাস্ত করিয়া সদর্পে গোড়দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। মোট কথা তুর্কিরা যে বজ্রার মত আসিতেছে, কখন আসে, কখন আসে—একজ্ঞ গোড়-বাসীরা প্রস্তুত ছিল এবং লক্ষ্মণসেন সমস্ত জ্যোতিষ গ্রন্থের পাতা ঘাটিয়া কোন্ দিন কখন তাঁহারা আসিবেন, তাহার দিন, কণ পর্য্যন্ত স্থির করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। এমন কি কোন্ ব্যক্তি আসিবে, লোক পাঠাইয়া তাহার আকৃতি প্রকৃতির খোঁজ লইতেছিলেন ও জ্যোতিষের বচনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতেছিলেন।

একজ্ঞ আত্মরক্ষার্থ তিনি কি কি উদ্যোগ করিতে ছিলেন? প্রথমতঃ তিনি যদিও বঙ্গালী কৌলীন্তের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি দেখিলেন যে দেশের মধ্যে বাহারা পাণ্ডিত্য, চরিত্রবলে, অভিজ্ঞতায়, বহুদেশ-পর্যটনজনিত দূর-দর্শিতায় ও মনব্রিত্যবলে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বঙ্গালসেন তাঁহাদিগকেই কুল দিয়াছিলেন এই কুলীনেরা তাঁহার পিতার সিংহাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ ও অহরহ। এদিকে নির্ঘাতিত নিরশ্রেষ্ট এবং দেশের অনেক গুণী মানী লোক তাঁহার শত্রু। নব ব্রাহ্মণ

তখনও দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সুতরাং ব্রাহ্মণেরা দেশের মধ্যে স্বীয় অধিকার অলঙ্ঘ্য-
ভাবে স্থাপিত করিবার জন্ত যে সকল অত্যাচার অবলম্বন করিতেছিলেন, তাহা জনসাধারণ
কখনই ছুটেচিলে গ্রহণ করে নাই। এই অবস্থায় তিনি বুঝিলেন, বাহারা তাঁহার সিংহাসনের
বিস্তৃত বন্ধ ও হিতৈষী, তাঁহাদিগকে এই হুঃসময়ে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা একেবারেই বিজ্ঞের

কাজ হইবে না। বঙ্গালের বিধান অনুসারে প্রত্যেক ৩৬ বৎসরের
কুলীনদিগকে নিবের পর কোলীজ নবভাবে প্রদত্ত হওয়ার কথা ছিল। কুলীনেরা
দলে টানিয়া আনা।

ইতিমধ্যে রাজ্যবলে সমাজে কতকটা জাহগা জুড়িয়া বসিয়াছিলেন,
তাঁহাদিগকে সরাইয়া দিয়া তাঁহাদের স্থলে নূতন লোক বসাইলে নবমুঠে কুলীনদের সেরূপ
প্রতিপত্তি সহজে হইবে না, এবং বাহাদের কুল বাইবে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন। লক্ষণ-
সেনের পঞ্চদশ রাজ্যাস্থে যখন বঙ্গালী কুলের নব সংস্কার হওয়ার কথা, তখন তিনি কুলীন-

দিগের কুলের পরিবর্তন করিলেন না, ব্রাহ্মণের পুত্র বৈরূপ ব্রাহ্মণ
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। হয়, কুলীনের পুত্রও তেমনই কুলীন হইলেন। এই চিরস্থায়ী
বন্দোবস্ত দ্বারা কুলীনগণ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহাদের সমাজিক মর্যাদা পরিরক্ষিত দেখিয়া
একান্ত কৃতজ্ঞ হইলেন। তাঁহারা সেই বিপদের দিনে রাজ্যের সর্বোপেক্ষা অন্তরঙ্গ
বন্ধু হইলেন।

লক্ষণসেন যদি ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার
রাজত্বের পঞ্চদশ অঙ্কে অর্থাৎ ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে কুলীনদের কুল স্থায়ী হইয়াছিল। ইহার
পূর্বে নূতন বাহিনি আরম্ভ হইলে কাহার কুল থাকিবে, কাহার কুল বাইবে, এইরূপ
একটা আতঙ্ক কুলীনসমাজে দেখা গিয়াছিল। দোষ-অনুসন্ধিৎসুগণ খুব মনোবোগের সঙ্গে
কুলীনদিগের অবোধ্যতা প্রমাণ করিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। কুলীনগণ
পদ্মাপারের ইমারতের মালিকদের স্তায় তাঁহাদের কোলীজ-সৌধে কখন ভাঙ্গন লাগিবে,
এই ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের পদ-প্রতিষ্ঠা কোন স্থায়ী ভিত্তির উপর
না থাকিতে তাঁহাদের কুলগৌরব লইয়া বড়াই করিবার বিশেষ কোন কারণ ছিল
না। কিন্তু বাই তাঁহাদের কুল চিরস্থায়ী হইল, অমনই তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানে
আসীন হইলেন। এদেশের ব্রাহ্মণেরা (শান্তশতী নহে, সারস্বত) তাঁহাদের সঙ্গে
আত্মীয়তা করিতে পারিলে ধন্য হইতেন। “পশ্চিমা ঠাকুরেরা” বাহাদের গ্রহণ করিলেন,
তাঁহাদেরই ব্রাত্য দোষ কাটিয়া গেল। সুতরাং তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক আত্মীয়তা
করিবার জন্ত সমস্ত সমাজে একটা বিষয় আগ্রহ দেখা দিল। ক্রমে এরূপ দাঁড়াইল যে
একজন কুলীন যদি ৮০১২০ বৎসর বয়স্ক হইত, তাহার সঙ্গে সাত-আট বৎসরের মেয়ের বিয়ে
দিতে পারিলেও পিতামাতা কৃতার্থ হইতেন। কুলীনের দর ক্রমশঃ বাজারে বাড়িয়া চলিল।
এক এক জন কুলীন ৩৪ শত বিবাহ করিয়াছেন, এই দৃশ্য সাধারণ ঘটনায় দাঁড়াইল।
কুজ, মুজ, বক্ষ, খজ, মুম্বু এরূপ কুলীন পাইলেও পিতামাতা কৃতার্থ হইয়া তাঁহার ত্রিশতম
প্রৌষকপ স্বীয় অপোগণ্ড কন্যাকে দান করিয়া কৃতার্থ হইতেন। সামাজিক প্রতিপত্তি

বড় লোভনীয় জিনিষ, পশ্চিমা ব্রাহ্মণেরা এ দেশের ব্রাহ্মণদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য করিতেন না। তাঁহারা যখন ইহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইলেন, তখন সেই স্বীকার-পত্র তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ মানপত্র হইয়া দাঁড়াইল। এখন যেমন এম. এ. পাশ বর পাইলে কস্তুর পিতার মুখ প্রফুল্ল হয়, সে কালে সেই নব ব্রাহ্মণের অবির্ভাব কালে কুলীন পাত্র পাইলে লোকে ততোধিক গর্ব অশ্রুভব করিত। নবব্রাহ্মণ্য দ্রৌলোভের দৈহিক জীবনের সুখ-দুঃখের প্রতি একটুও জোর দেন নাই। কুমারীরাও একরূপ শিক্ষা পাইয়াছিল যে অনেক সময় কুলীন বর পাইলে তাহার সহস্র ক্রটি সবেও গৌরব ও আনন্দ বোধ করিত। এখনকার শিক্ষা ও তখনকার শিক্ষার বহু প্রভেদ, সুতরাং সে সময়কার মেয়েদের ক্রটি যেভাবে গঠিত হইয়া গিয়াছিল, এখন তাহার ধারণা করা সহজ নহে। ভিক্ষুকের চূড়ামণি দিগধর, অতি বুদ্ধ শিবঠাকুর ও অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী—ইহারা হইলেন দাম্পত্যের আদর্শ। শিব ভান্ডখোর, গাঁজাখোর, শ্মশানে মশানে ফেরেন, ইহাকে পাইবার জন্য কুমারী গৌরীর তপস্তা। কুলীনের মেয়েরা এই তপস্তাই বরণ করিয়া লইয়াছিল “সোণার প্রতিমা গৌরী আমার, ভান্ডেতে ভান্ডড় জামাতা তোমার” ইত্যাদি আগমনী গানের একটি ঐতিহাসিক অর্থ আছে।

কনোজের ব্রাহ্মণেরা সমাজের শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়া এদেশে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ইহাদিগের পাতিত্যা দূর করিয়া গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা ধস্ত হইলেন। কোলীজ স্থায়ী হওয়া অবধি কুলশাস্ত্র লিখিত হইতে আরম্ভ হইল। সুতরাং বলা যাইতে পারে ১১৮৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কুলশাস্ত্র খাটি ঐতিহাসিক সামগ্রী ছিল না, স্বতন্ত্র কুলশাস্ত্রের প্রামাণিকতা।

উপর নির্ভর করিয়া পরে তাহা জোড়া দেওয়া হইয়াছিল। আদিশুরই হউন, বা শূর বংশীয় যে কোন রাজাই হউন, তিনি যদি “বেদবানাদ” শাক (৬৫৪ শক=৭০২ খৃষ্টাব্দ) সর্ব প্রথম কানোজ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া থাকেন, তবে ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে ৭০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৮৪ খৃষ্টাব্দ—এই ৪৮২ বৎসরের কুলশাস্ত্রের প্রধান অবলম্বন ছিল স্মৃতি। সুতরাং ইহাতে সত্যের অনেক অপলাপ থাকা আশ্চর্যের বিষয় নহে। কোলীজ স্থায়ী হওয়ার পরে খাটি কুলীনদের বংশাবলীর মধ্যে কোনই গোল হয় নাই, যেহেতু ধন, মান, প্রতিষ্ঠা, রূপ, বিজা—এ সমস্ত ছাপাইয়া উঠিয়াছিল কুল। প্রতি বিবাহ উপলক্ষেই কুলজী আবৃত্তি করা হইত, এ জন্য শত শত লোক ঘটকের ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিল। কোন ক্ষুদ্রতম বিষয়েও কোন গোল বাধিলে বিবাহ-সভায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইত। কুলজীশাস্ত্রের অনেক গলদ থাকিতে পারে কিন্তু খাটি কুলীনদের বংশাবলীতে কোন দোষ নাই। গঙ্গার পূর্ব ও পশ্চিম পারে, মেদিনীপুর হইতে বিক্রমপুর পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশে পরবর্তী কুলীনদের যে বংশাবলী পাওয়া যায় তাহা নিখুঁত, কারণ বংশের মর্যাদা এদেশে অস্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া গিয়াছিল। এই সত্যের ইতিহাসটুকু তাঁহারা নির্দোষ রাখিয়াছিলেন। কুলীন-সমাজবহির্ভূত বংশাবলীতে অনেক দোষ পাওয়া যাইতে পারে।

এই ভাবে এ দেশের ব্রাহ্মণ দোষ-দৃষ্ট সারস্বত ব্রাহ্মণদিগের উদ্ধারের পর বঙ্গের নব-সৃষ্ট ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কায়স্থ-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ঐক্য স্থাপিত হইল। যদি লক্ষণসেন

কৌলীন্ত স্থায়ী না করিতেন, তবে এই ঐক্যের পরিবর্তে বিষম অনৈক্য উপস্থিত হইত। প্রথমতঃ রাজা কৌলীন্তের নির্বাচন স্বক্ করিয়া দিয়াছিলেন। “এই নির্বাচনে বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভাদর গাঁই কুলীনেরা পতিত হইয়া সিদ্ধশ্রোত্রীয় হইলেন, রাঢ়ীদের মধ্যে কতকগুলি কুলীন পতিত হইয়া বংশজ নামে পরিচিত হইলেন। এই উপলক্ষে ক্রমশঃ তর্কবিতর্ক, রাগারাগি, গালাগালি অবশেষে মারামারি পর্য্যন্ত হইল। বীহার আশা ভঙ্গ হইল তিনি রাজাকে ও নির্বাচক পণ্ডিতগণকে শাপ দিতে দিতে চলিয়া গেলেন” (সামাজিক ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ৩৬ পৃঃ)। লক্ষণসেন কৌলীন্ত বংশানুক্রমিক করিয়া ক্রমশঃ সমস্ত উচ্চশ্রেণীর সমাজকে হস্তগত করিলেন। ইহারাই তাঁহার আপদ কালের সহায় হইয়াছিল।

লক্ষণসেন এইবার কুলীনকুল পরিবৃত্ত হইয়া নিজেকে কতকটা শক্তিমান মনে করিলেন। একশ্রেণীর লোক বীহারী জানে মানে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহারা তাঁহার নিকট একান্ত কৃতজ্ঞ হইলেন। তাঁহার দ্বিতীয় চেষ্টা হইল নিজ সিংহাসনটিকে দৃঢ় করা।

তিনি বুঝিলেন, পশ্চিমবঙ্গ তাঁহার প্রধান স্থান নহে। শূরবংশ পূর্ববঙ্গে বহুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে পূর্ববঙ্গ লাভ করিয়া সেনেরা সেই দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গ ভয়ঙ্কর নদ-নদীর দেশ। সেখানে পদ্মা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, ভৈরব, ব্রহ্মপুত্র, কংস, ধনু, কানাই, বংশাই প্রভৃতি বিশাল-তোয় নদ-নদীর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগুলি খেন বীপের মত ভাসিয়া বেড়ায়। মুসলমানগণ স্থলযুদ্ধে অসাধারণ শক্তিশালী, কিন্তু নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গ তাঁহাদের পক্ষে কতকটা অনধিগম্য ছিল। স্থলযুদ্ধে হিন্দু তুরঙ্গ দেশের অতিমাত্রাবাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে কিরূপে? নৃশংসতায়, অবয়বে ও হত্যাকাণ্ডে তাহাদের শক্তি অতিমাত্রাবিক ছিল। হিন্দুদের অনেকেই মাংস খাইতেন না, তাঁহারা সুরাপানে অভ্যস্ত ছিলেন না। সবস্তগিনের বংশধরেরা দিগ্বিজয়ী। জীবনক্ষেত্র তাঁহাদের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রের অপার নাম ছিল। তাঁহারা কিরূপ সুরাসক্ত ছিলেন, “তারিকী-সবস্তগীন” নামক পুস্তকে তাহার একটা উদাহরণ আছে। ‘আমির মামুদ একটা প্রকাণ্ড জমকালো শিবিরে বহু সহস্র লোক লইয়া আমোদ করিতেছিলেন। বিরাট রকমের একটা ভোজের বন্দোবস্ত হইয়াছিল, আত্মীয়, সুহৃদ ও সন্তানগণ ভোজনান্তে চলিয়া গেলেন। আমির আদার রজ্জককে বলিলেন, “তুমি কি বল, এখন একটু মদ খাইলে হয় না?”

রজ্জক বলিলেন, “এমন দিন আর কোথায় পাওয়া যাইবে। জাঁহাপনা আমির মামুদের সুরাপান।

আজ খোস মেজাজে আছেন, রাজকুমারের অভিষ্ট পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহার ভোজনান্তে চলিয়া গিয়াছেন। বিশেষ আজিকার এতবড় একটা ভোজের পর একটু মদ খাওয়া তো দরকারই।” আমির বলিলেন, “বেশ। বেশ। আমরা দেশে আসিয়াছি, এই ফিরোজা বাগানই খুব উপযুক্ত স্থান, সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া এখনই স্বক্ করা যাক।” শিবির হইতে তৎক্ষণাৎ প্রচুর মত্ত বাগানে আনীত হইল। ৫০ পাত্র মত্ত একটা ছোট শিবিরে সাজাইয়া রাখা হইল। এই পাত্রগুলি হইতে একটি একটি করিয়া সকলের

নিকট মদ লইয়া আসা হইল। আমির বলিলেন, “সকলকেই সমানভাবে দেওয়া হউক, সকলেই যেন সুবিচার পান।” প্রত্যেক পাত্র ২০ আউন্স করিয়া মদ ঢালা হইল। তাঁহাদের একটু নেশার আমেজ হইল, এদিকে গায়ক ও বাদকেরা সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন এবং আসরটা বেশ জমিয়া উঠিল। বুল হাসেন পাঁচ পাত্র নিঃশেষ করিলেন, যখন ষষ্ঠ পাত্র খান, তখন তাঁহার মাথাটা খরাপ হইল এবং সপ্তম পাত্র খাইতে খাইতে একবারে জ্ঞানশূন্য হইলেন এবং অষ্টম পাত্র পৌঁছিয়া বমি করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় চাকরেরা দরদরি করিয়া তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিল। ভিবকপ্রবর বুলআলা পাঁচ পাত্র খাইতে খাইতে মাথা হেঁট করিলেন, তাঁহাকেও স্থানান্তরিত করা হইল। খালিল দাউদ দশ পাত্র নিঃশেষ করিলেন। সিয়াবিরাজ নয় পাত্র খাইলেন। এতদ্ব্যতীত দাইলামন পাহাড়ে লইয়া যাওয়া হইল। বুনা যিম ১২ পাত্র নিঃশেষ করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেলেন, দাউদ ময়মুণ্ড নেশায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন; গায়ক, বাদক ও বিদ্বকের দল নেশায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। কেবল মাত্র ঠিক রহিলেন স্বয়ং সুলতান ও আদার রজ্জক। অষ্টাদশ পাত্র নিঃশেষ করিয়া রজ্জক চলিয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ পূর্বক আমিরকে বলিলেন, “ইহার পরে যদি জাঁহাপনা গোলামকে আরও দেন, তবে সে নিজের বুদ্ধিভ্রম ও হুজুরের প্রতি শ্রদ্ধা সমস্তই হারাইয়া বসিবে।” আমির হাসিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে বিদায়ের অনুমতি দিলেন। রজ্জক অতীব শ্রদ্ধা জানাইয়া বিদায় হইলেন। ইহার পরও আমির মদ খাইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। তিনি সে দিন সর্বসমেত আদমনি পাত্রের ২৭টি পূর্ণপাত্র মদ খাইলেন, তার পর উঠিয়া এক দড়া জল ও উপাসনা করিবার আসন আনিতে আদেশ করিলেন। হাত মুখ ধুইয়া অঙ্কু করিয়া আমির মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন কালীন উভয় নামাজই পাঠ করিলেন, এবং একরূপ ভাবে কথাবার্তা ও ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে তাঁহাকে দেখিয়া কেহ সন্দেহ করিতে পারিল না যে, তিনি এক পাত্র মদও খাইয়াছেন। আমি এই সমস্ত ঘটনাটি সচক্ষে দেখিয়া লিখিলাম।’ (১০৪০ পৃঃ) আবদুল ফজল বৈহাকী তারিকি সবুকজগিন (Mediaeval India from Contemporary Sources, by Stanley Lane Poole, pp. 8-10).

এই চিত্র পাঠান নাথকের ঐতিহাসিক চিত্র, ইহাদের কাছে বুড়ো লহমনিয়া কি করিবেন? যিনি এক বৈঠকে ১৩০০ মন মদ খাইয়া মাথা ঠিক রাখিতে পারেন, তেমন লোকের পক্ষে জগতে অসাধ্য কি আছে? সমুদ্র-লজ্বনের পরেই এই মদিরা-পানের গল্পটি দাঁড়াইতে পারে, অথচ এক ঐতিহাসিক ইহা সচক্ষে দেখিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। বিদেশীদের লিখিত কথা আমরা নির্বিচারে ইতিহাসের কোঠায় স্থান দেই, কেবল আমাদের শাস্ত্রের কথা উঠিলেই স্মৃতিস্তম্ভ বিচার আরম্ভ হয়!

যাহা হউক ১৩০০ মন মদ খাওয়ার গল্পটা বাদসাদ দিয়া বিশ্বাস করিলেও এই তুরকীর মত লোকসকল যাহার শত্রু, তাহার মাথার উপর যে দিনরাত খড়্গা কুলিতেছিল, তিনি কি একদণ্ডও তাহা জুলিতে পারিয়াছিলেন? যে দিন রাজপুত্রেরা একে একে বহু চেষ্টা করিয়া

মুসলিম অভিযানে বাধা দিতে পারিলেন না—জয়পাল প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত রাজা যুদ্ধে নিহত হইলেন, সে দিনই লক্ষণসেন বুদ্ধিয়াছিলেন, হিন্দুর জয়ের আশা নাই। যে দিন হিন্দুর সমবেত শক্তি সোমনাথ-মন্দির রক্ষা করিতে পারিল না,—পাণ্ডাদের রক্তে মন্দির অভিষিক্ত হইল, সে দিনই লক্ষণসেন বুদ্ধিয়াছিলেন যে হিন্দুর জয়ের আশা নাই। একমাত্র আশা ছিল, হয়ত মুসলিম সৈন্য আর পূর্বে অগ্রসর হইবে না। কিন্তু কাশীর অধিপতি তাহার প্রবল সৈন্য সহ নিহত হইলেন, মগধের গোবিন্দপালের রাজ্য নষ্ট হইল, বিক্রমশীলা, উদুপুত্র বিহার ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। শত্রু বাড়ীর পার্শ্বে, জ্যোতিষ-বেত্তাণী বৃদ্ধাইল—যে ব্যক্তির হস্ত শুধু জাম্বু অতিক্রম করে নাই, প্রায় পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে, সেই উদ্ভট-আকৃতি ব্যক্তিই বঙ্গ-বিজয় করিবে। জ্যোতিষচর্চনের সঙ্গে বক্তৃতার খিলজির চেহারা মিলিয়া গেল। তখনও কি লক্ষণসেন নিলিপ্ত ?

এই অদ্ভুত কক্ষী চূর্মি পাঠানদের সঙ্গে বিরোধে ৮০ বৎসরের বুড়ো কি করিবেন ? রাজধানী লক্ষণাবতী মঃ বক্তৃতার অভিযানের সময় কাহার শাসনাধীন ছিল, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু লক্ষণসেন তাহার পুত্র, পরিবার ও রাজ্যের প্রসিদ্ধ ধনী ও পণ্ডিতমণ্ডলীকে তাহাদের অধিকাংশ সম্পত্তি সহ পূর্ববঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেখানে তাহার দুই পুত্র ভাগ করিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। পূর্ববঙ্গ স্বরক্ষিত করিয়া তিনি কতকটা নিশ্চিত হইয়াছিলেন। মিনহাজ লিখিয়াছিলেন, যখন বক্তৃতার অভিযান আসন্ন হইল তখন “অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, ধনী ও বড়লোকেরা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু লক্ষণসেন স্থান ত্যাগ করিলেন না।” টুয়াট লিখিয়াছেন, “লক্ষণসেন আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা পাইলেন না, কিন্তু তাহার নগরের প্রধান প্রধান লোক তাহাদের সমস্ত পরিবার ও ঐশ্বর্য্য জগন্নাথে অথবা গঙ্গার উত্তর-পূর্ব উপকূলে পাঠাইয়া দিলেন।

তিনি গোড়ে রাজ্য-রক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি পূর্ববঙ্গে তাহার সমস্ত সম্পত্তিতে সামন্তগণ এবং ব্রাহ্মণদিগকে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিত মনে নবদ্বীপে রহিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তাহার বৃদ্ধা বীরত্ব দেখাইয়া লোককণ্ঠ করিবার ইচ্ছা হয় নাই। কিন্তু যেখানে তাহার প্রকৃত বল, মুসলমান সৈন্য যে নদ নদী-রক্ষিত রাজ্যে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইবে—তাহাই রক্ষার জন্ত তিনি ভালরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। মিনহাজ লিখিয়াছেন, ‘নদীয়া দখল করিয়া মঃ বক্তৃতার অনেক অর্থ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।’ রাজা যেখানে ছিলেন, রাজকোষ সেখানে অবশ্যই ছিল কিন্তু লুণ্ঠনটা সম্ভবতঃ খুব বড় রকমের কিছু হইতে পারে নাই। অস্থাবর সম্পত্তি পূর্বেই অনেকটা বিলি হইয়াছিল। অস্ত্যাত্ত অভিযান ও ভাণ্ডার-লুটের ধ্বংস উল্লাসযুক্ত উল্লেখ ও তালিকা থাকে, নদীয়া জয়ের ইতিহাসে তাহার কিছুই নাই—মুসলমানেরা নদীয়ায় বেশী কিছু পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

হয়ত একটা বিষয়ে রাজার বুদ্ধিবার একটু ভুল হইয়াছিল। রাজা হয়ত ভাবিয়াছিলেন, নবদ্বীপ রাজধানী মূল-রাজধানী নহে, সেখানে গঙ্গাতীর বলিয়া লোকের গতিবিধি ছিল, সেখানে বল্লালসেন একটা রাজ-প্রাসাদ করিয়া রাখিয়াছিলেন, বুদ্ধিবার ভুল।

সময়ে সময়ে সেখানে থাকার জন্য, কতকটা দার্জিলিং বা সিমলা শৈলের মত; প্রকৃত রাজধানী লক্ষণাবতী ছাড়িয়া যে বৃদ্ধ রাজাকে তীর্থস্থানে যাইয়া মুসলমানেরা তাড়া করিবেন, ইহা হয়ত তিনি ভাবেন নাই। কুল-কারিকা হইতে জানা যায়, নবদ্বীপকে তীর্থ মনে করিয়া বল্লালসেন তথায় বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন। “মুক্তি হেতু বল্লাল আসিল গঙ্গায়ান। জহু নগরোত্তরে করে যে বাসস্থান।” (সতীশ মিত্রের যশোর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৪।)

মঃ বক্তার রাজধানী লক্ষণাবতী ছাড়িয়া নদীয়া আক্রমণ করিলেন কেন? সচরাচর দৃষ্ট হয়, যখন রাজা রাজধানীতে থাকেন না, তখনই শত্রুপক্ষের সেই স্থান আক্রমণ করার সুবিধা হয়। অর্থসম্পদশূন্য গঙ্গায়ানারীদের একটা ফাঁকা সহর—উহা সোমনাথতীর্থ নহে, ঐ স্থানটা মঃ বক্তার আক্রমণ করিলেন কেন? মিনহাজ লিখিয়াছেন—বিজ্ঞা, বুদ্ধি, জাত্যাভিমান ও প্রবীণ বয়স-হেতু লক্ষণসেন ভারতীয় রাজগণের মধ্যে সর্ব প্রাধান ছিলেন।

তিনি ভারতীয় ধর্ম জগতে আচার্য্য (‘খলিফা’) ছিলেন। ভিন্সেন্ট স্মিথ লিখিয়াছেন—“পূর্ব-বঙ্গের অধিপতি সেই সময় ছিলেন রাজা লক্ষণসেন, মুসলমান ঐতিহাসিক ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন, তাঁহার রাজত্ব ৮০ বৎসর ব্যাপক ছিল। [ইহা মুসলমান লেখকের ভুল নহে, আমরা ইতিপূর্বে তাহা দেখাইয়াছি।] তাঁহার জন্ম-সময়ে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী উক্ত হইয়াছিল, তাহা ফলিয়া গিয়াছিল, কারণ তিনি সর্ব বিষয়ে অতুলনীয় গুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার পারিবারিক সম্মান তৎকালে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজাদের অপেক্ষা বেশী ছিল এবং তাঁহার বংশীয় রাজারা পুরুষানুক্রমে “খলিফা” অর্থাৎ সমস্ত দেশের ধর্মগুরু বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, তিনি কাহারও প্রতি কখনও অবিচার করেন নাই, এবং তাঁহার বদান্ততা প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছিল।

বক্তার নিশ্চয়ই শুনিয়াছিলেন যে লক্ষণাবতীর সমস্ত সম্পত্তি পূর্ববঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল। সেই রাজধানী দখল করা বিশেষ লাভের বিষয় নহে, অথচ একটা সঙ্গিন যুদ্ধ-বিগ্রহে তাঁহার অনতিবৃহৎ সৈন্যদের ধ্বংস হইবার কতকটা আশঙ্কা ছিল। এদিকে নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গ একেবারে অনধিগম্য,—পূর্ববঙ্গের ক্ষিপ্ত-হস্ত নৌবাহকগণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া যুদ্ধ করিতে অনেক বেগ পাইতে হইবে। সুতরাং তিনি একটা সহজ পন্থা আবিষ্কার করিলেন। লক্ষণসেনের মত খ্যাতি-সম্পন্ন প্রবীণ রাজাকে যদি তিনি অশরীরে ধরিয়া লইয়া কুতুবউদ্দিনকে উপঢৌকন দিতে পারেন তবে তাঁহার প্রশংসা খুব বেশী রকমের হইবে। এদিকে পূর্ববঙ্গের রাজারা তিন ভাই পিতার বিপদ দেখিলে স্বতঃই মাথা হেঁট করিয়া তাঁহার অধীনত্ব স্বীকার করিয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে আগ্রহান্বিত হইবেন।

নিজের যে দশ হাজার সৈন্ত ছিল, তাহা জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিয়া তিনি অত্যধিক ক্রততার সহিত নবদ্বীপের দিকে অগ্রসর হইলেন, পাছে তাঁহার আগমনের সংবাদ পাইয়া লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ ছাড়িয়া চলিয়া যান, এই ভয়ে তাঁহার এরূপ ক্রত ও গুপ্ত অভিযান। নতুবা কে কবে শুনিয়াছে যে, দশ সহস্র সৈন্ত হাতে থাকিতে কোন সেনানায়ক মুষ্টিমেয় সৈন্ত লইয়া ঘোটক-ব্যবসায়ীর পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক শত্রুতা করিবার জন্ত কোন নগরে প্রবেশ করিয়াছেন? এই অভিযানের উদ্দেশ্য যুদ্ধ করা নহে,—ইহার মতলব চৌর্য্য এবং দস্যুতা। মিনহাজ লিখিয়াছেন, ‘তিনি সমস্ত রাস্তাটা অতি নিরীহভাবে আসিয়াছিলেন, কাহারও উপর কোন অত্যাচার করেন নাই বরং নিজেকে জনৈক ঘোটক-ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন।’ রূপকথার যেরূপ শুনিয়াছি, কোন রাজকন্তাকে অপহরণ করিবার জন্ত দস্যুরা গুপ্ত পথে প্রবেশ করে—লক্ষ্মণসেনকে ধরিয়া লইয়া বাইবার জন্ত এটি সেইরূপ একটা ফন্দি মাত্র। ইহার উদ্দেশ্য লুণ্ঠন নহে, তাহা হইলে প্রথমই তাঁহার দলবল লইয়া আক্রমণ করিতেন। ইহা রায় লছমনিয়াকে শশরীরে ধরিয়া একবারে দিল্লীর সহরে লইবার চেষ্টা। তাহা না হইলে এরূপ একটা অস্বাভাবিক ঘটনার কোন অর্থই হইতে পারে না। অস্বাভাবিক ঘটনা বলিয়াই রাজা নিতান্ত অপ্রস্তুত ভাবে ছিলেন। তিনি তীর্থবাসী,—গঙ্গাযাত্রা করিতেন এবং ধর্ম্মালোচনা করিতেন। স্থানটি একটা দৃঢ় দুর্গ-সংরক্ষিত মহানগরী ছিল না। এখানে যঃ বক্ত্রিয়ার আসিবেন কেন? খিলজি সমস্ত খবরই জানিতেন, মিনহাজ নিজে সামন্তদ্বিন ও তাঁহার সহচরের মুখে সকল কথা শুনিয়া লিখিয়াছিলেন। রাজার অমাত্য, বন্ধু, পরিবার যে সমস্ত সম্পত্তিসহ দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা যঃ বক্ত্রিয়ারের অবিদিত ছিল না। আহাঙ্গাদি করিবার সময় অতর্কিত ভাবে একটা “আল্লাহো আকবর” বা কোন জয়ধ্বনি পর্য্যন্ত উচ্চারণ না-করিয়া একেবারে ভোজনশালার দরজায় আঘাত,—ইহারা কেমন ঘোটক-ব্যবসায়ী। ইহারা চোর, আসিয়াছিলেন শশরীরে রাজাকে চুরি করিতে। এ অবস্থায় পৃথিবীর সমস্ত লোক বাহা করে, লক্ষ্মণসেন তাহাই কল্পিয়াছিলেন, ঘরে আগুন লাগিলে কি দস্যু ঢুকিলে লোকে ঘর ছাড়িয়া আত্মরক্ষা করে; এখানে যুদ্ধের প্রলুপ্ত উঠিতেই পারে না। লক্ষ্মণসেন গুপ্ত ঘর দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পূর্বে প্রত্যেক রাজপ্রাসাদের সঙ্গে সংযুক্ত খাল কাটা

অভিযান ব্যর্থ।

ধাকিত, তাহার সঙ্গে বড় নদীর যোগ থাকিত। নিতান্ত বিপদের সময় সেই খাল (Canal) দিয়া রাজারা পরিবারসহ বাহির হইয়া পড়িতেন। সম্ভবতঃ মহারাজাও সঙ্গে ছিলেন—তিনিও রাজার সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলেন। কেবল অন্তঃপুরচারিণী দাসীরা ছিল—যঃ বক্ত্রিয়ার তাহাদিগকে বন্দী করিলেন।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যঃ বক্ত্রিয়ারের অভিযান একেত্রে বিফল হইল। তিনি লক্ষ্মণসেনকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার পুত্রগণকে দিয়া বঙ্গবিজয়ের একটা খং লিখাইয়া লইতে পারিলেন না। তিনি সম্রাট কুতুবউদ্দিনের দরবারে এমন একটা বর্ণনা দাখিল করিলেন বাহাতে মনে হইল লক্ষ্মণসেন নিতান্ত কাপুরুষ, বীর্য্যবন্তার অবতার পুরুষসিংহ যঃ বক্ত্রিয়ার তাঁহাকে এমন ভাবে পরাজিত করিয়াছেন যে উক্ত রাজা তাঁহার ভয়ে সমর-ক্ষেত্র হইতে



মানসিংহ (১৫৬৮-১৬০০)।



হুমায়ুন (১৫৫৫-১৫৫৬)।



শেরশাহ (১৫৪৫-১৫৪৬)।



শুজাহান (১৫৯০-১৬২৭)।



জাহাঙ্গীর (১৬২৮-১৬২৯)।



মালিকান (১৬২৭-১৬২৮)।



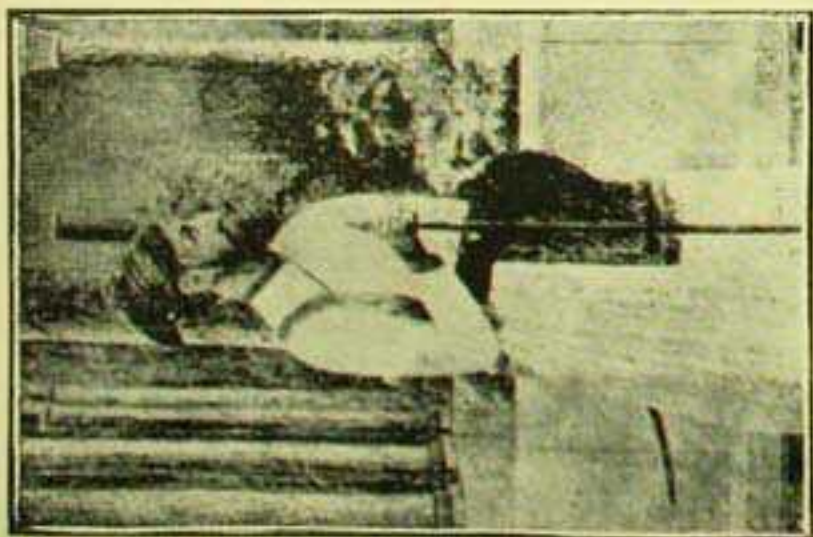
আবদুল্লাহ (৮২৯ পূঃ) ।



মুসলিমুল্লাহ (৮৪১-৪২ পূঃ) ।



সরফরাজ খাঁ (৮৫৩-৫৪ পূঃ) ।



আজিমখান খাঁ (৮৭৩ পূঃ)



হুজাউদ্দিন (৮৫২-৫৩ পূঃ) ।



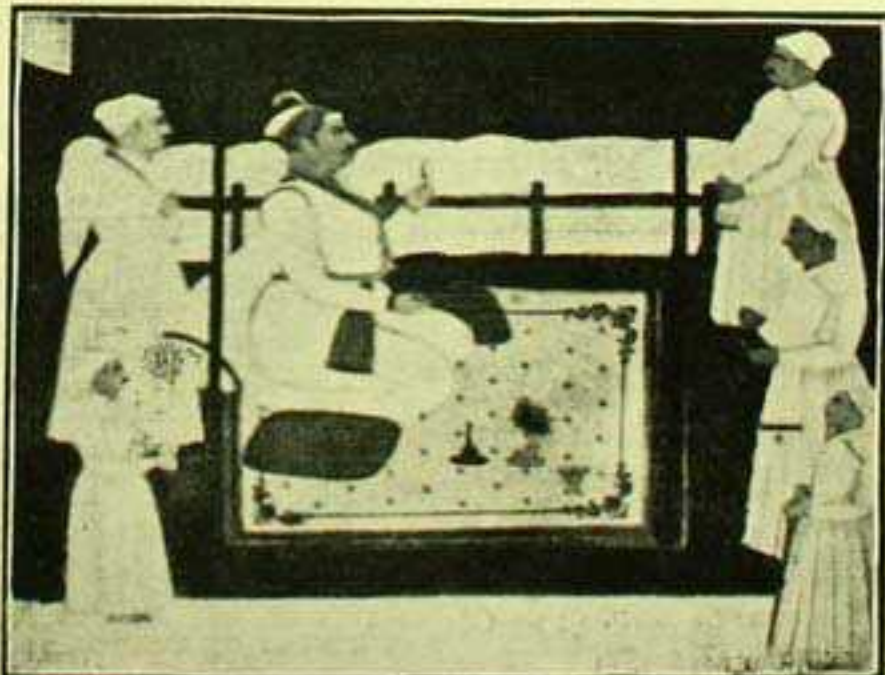
নিরাজুদ্দীন ৮৩১ পৃঃ। পূর্ববর্তী ৪ জন এই নবাবের
ছবি কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ইতিহাস
হইতে গৃহীত হইল।



মৌলানাফর ও মৌলানা (৮৭৬ পৃঃ)।



গোবিন্দনাথ (২৭৪-৭৬ পৃঃ)।



মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র (১০০৪ পৃঃ)।



ক্রাইড (৮২৬ পৃঃ)।



মোহনলাল (১৮৬৬-১৯১১ পূঃ)।

রক্তদমন পশ্চিম
ভারতের শক রাজ,
কনিষ্ঠের অধিনায়—
(১২৮-১৩০ পূঃ)।রাজা নরসিং দেব (বাঁশ বেড়িয়া), কাশী-
খণ্ডের অনুবাদে প্রবর্তক (১৪৭০-১৮০২ পূঃ)।রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল। ভূকৈলাসের রাজা,
কাশীখণ্ডের অনুবাদে প্রবর্তক ও বিবিধ গ্রন্থ-কর্তা।
১৭১৪ শক।রামপ্রসাদ সেন, এই ছবি ও পরবর্তি
চবি সম্বন্ধে (২৪/১-১৮০০ পূঃ) ভূমিকা
সম্প্রদায়। (১৮০৪ পূঃ)।

রামপ্রসাদের পত্নী গণেশদেবী।

কঁধাসেউ মেঘবৎ পলাইয়া গিয়াছেন। দরবারে নদীয়া-বিজয় একটা মন্ত বড় কাণ্ড বলিয়া ঘোষিত হইল। ইতিপূর্বে এই পুরুষসিংহ একটা মকতবকে মহা হুর্গ মনে করিয়া মুণ্ডিত-শীর্ষ নিরীহ বৌদ্ধ আচার্য্যগণকে সেনাপতি ভ্রমে তাঁহাদিগের শির কর্তন করিয়া অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। উদুপুরের কাণ্ডটা নবদ্বীপ-বিজয়ের এক পঙ্ক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য।

নদীয়া ত্যাগ করিয়া লক্ষণসেন কোথায় গেলেন?—নবদ্বীপ ছাড়িয়া বৃদ্ধ রাজা কোথায় যাইবেন, তাহা সম্ভবতঃ পূর্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। নবদ্বীপে মাত্র তিনি ছিলেন,—
লক্ষণসেন গেলেন কোথায়? তাঁহার পরিবারবর্গ, সামন্ত ও প্রধান ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের ধন-সম্পদ সমেত নির্ঝিঁয়ে পূর্ব্বদ্বারে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া মুসলমান-অভিধানের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্ত। সে বয়সে আর তাঁহার রাজত্ব করিতে প্রবৃত্তি থাকিবার কথা নহে। মাধব সেন, কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন—ইহাদের তিন জনেরই কিছু কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। ইহারা পূর্ব্বদ্বারে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সোণার গাঁ ইহাদের প্রধান রাজধানী ছিল। তাম্রশাসনে দেখা যায়, ইহাদের এখানেও মুসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। যঃ বক্তৃত্বারের মৃত্যুর পর মুসলমানেরা পূর্ব্বদ্বারে যাইয়াও ইহাদের সঙ্গে লড়াই বাধাইয়া দিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলাইয়া বাইতে হইয়াছে। বিশ্বরূপের তাম্রশাসনে তাঁহাকে “গর্গববনায় প্রলয়কাল বজ্র” বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

সম্ভবতঃ লক্ষণসেন সেনহাটী নামক যশোর-খুলনার একটা জায়গায় শেষ জীবন কাটাইয়া ছিলেন। কবিরাম নামক জনৈক পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন, লক্ষণসেন সেনহাটী নামক পরী স্থাপন করেন। কবিরাম প্রতাপাদিত্যের সমকালবর্তী (যশোর-খুলনার ইতিহাস ও বিখ্যকোষ ১ম সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। সেখাটী সেনহাটীর নিকটবর্তী, সেখানে বহু শাখারির বাস ছিল—পূর্বে সেখহাটীর নাম সম্ভবতঃ শাখহাট ছিল (যশোর-খুলনার ইতিহাস)। ঐ স্থানের নিকটে জগন্নাথ নামক গ্রাম আছে। মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, লক্ষণসেন পলাইয়া জগন্নাথে গিয়াছেন। একটা নোক্তার গোল হইলে এ শব্দটি সাখনাট পড়িতে হয়। জগন্নাথই হউক বা সাখনাটই হউক, ইহারই কোন স্থানে লক্ষণসেন বাস করিয়া থাকিবেন। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, রাজা ঢাকা নগরীর নিকট কোন স্থানে বাকী জীবন কাটাইয়া ছিলেন। আমরা যে কারণে সেখহাটীর পক্ষপাতী হইয়াছি, তাহা লিখিতেছি।—পূর্বেই বলা হইয়াছে সেনহাটী গ্রাম লক্ষণসেনের স্থাপিত। ঐ গ্রামটি রাজা তাহার জামাতা হরিসেনকে দিয়াছিলেন।
এ সম্বন্ধে প্রশ্ন।

লক্ষণসেন বহু দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। শেব বয়সে তিনি যেখানে গিয়াছিলেন, সেখানে অনেক মন্দির ও বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—তাহাতে সন্দেহ নাই। সেখহাটীতে যে ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে এবং যাহাকে প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি কালী ভূনিম্নে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা ভাস্কর্য্যের চরম। মূর্ত্তিটি পাঁচ ফুট

উক্ত এবং এত সুন্দর যে যশোর-খুলনার ইতিহাস-লেখক সতীশবাবু লিখিয়াছেন এরূপ মনোহারী মূর্তি তিনি দেখেন নাই। এই মূর্তি হইতে অনেক ছোট একটি তারা মূর্তি ঢাকায় পাওয়া গিয়াছে, উহা অবিকল ইহার অনুরূপ। উভয়ের সাদৃশ্য এত বেশী যে মনে হয় উহা এক কারিকরের হাতের কাজ। (“এই সমস্ত দেখিলে কেহ না বলিয়া পারেন না যে এই দুইটি মূর্তি একই সময়ে সম্ভবতঃ একই কারিকর দ্বারা প্রস্তুত।” যশোহর-খুলনার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃ: ২৩১।) ঢাকার মূর্তিটির নীচে ‘লক্ষণসেনের রাজত্বের তৃতীয়াঙ্কে নিশ্চিত’ লেখা আছে। সেখাটীর মূর্তিটিও ঐ সময়েরই, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তাহা এত বড় এবং গঠনাদিতে ভাস্কর এতটা সূক্ষ্ম কার্য্য করিয়াছেন যে, উহা খুব বড় কোন লোক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। ঐ পল্লীর নিকট খুব বড় কুম্ভ পাথরের অতি সুন্দর গণেশ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া নানা কারুকার্য্যখচিত বিশাল তোরণের ভগ্নাংশও সেই স্থান হইতে উদ্ধার হইয়াছে। “এই স্থানে যে সকল দেববিগ্রহ বা দেবালয়ের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও অনেকটা সেন-রাজাদের সময় নির্দেশ করে। দেখহাটা গ্রামের কামারপাড়ায় হৃদকণ্ঠ নামক পুকুরিণীতে একটি বড় গণেশ মূর্তি পাওয়া যায়। উহার নিকটে বাকুইপাড়ার পুকুরে একটি বাসুদেব ও একটি গণেশ মূর্তি পাওয়া যায়।” “হৃদকণ্ঠ পুকুরের নিকট একটি স্থানকে মঠবাড়ী বলে, এখানে অনেক ইষ্টক স্তূপ আছে। গ্রামের মধ্যে কয়েক স্থানে গভীর পরিখার খাত বর্তমান আছে” (পৃ: ২২৭)। ঐ খাত এত বড় যে পরবর্ত্তীকালে সম্ভবতঃ উহার একাংশকে একটা খালে পরিণত করা হইয়াছিল। সেখাটা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে আরও অনেক বিগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য্যের নিদর্শন, বিশাল তোরণ ও গড়খাই কি ঐ স্থানটিকে কোন রাজচক্রবর্ত্তীর ভূতপূর্ব্ব আবাস-স্থান বলিয়া ইঙ্গিত করে না?

পূর্বে বলিয়াছি ঐ স্থান লক্ষণসেন প্রতিষ্ঠিত সেনহাটা গ্রামের অতি নিকটবর্ত্তী, অদূরে লক্ষণসেনের বাজার—সাধারণতঃ উহাই “সেনের বাজার” নামে পরিচিত। কিন্তু বৃদ্ধেরা কহিয়া থাকেন তাঁহারা পূর্বে উহার নাম লক্ষণসেনের বাজার শুনিয়াছেন। সেনহাটা হইতে “পিলজঙ্গ” অর্থাৎ হাতীশাল বেশী দূরে নহে। সমস্ত স্থানটি যে বহু দেবালয়ে পূর্ণ ছিল, তাহা পল্লীগুলির নাম হইতেই বুঝা যায়—‘দেবভোগ’, ‘পিঠাভোগ’, ‘খেয়াভোগ’, ‘মোভোগ’ প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি দেবত্র সম্পত্তি ছিল, তাহাদের নামেই পরিচয়। যশোহরের প্রান্তবর্ত্তী গ্রামগুলি ছাড়িয়া আমরা বরিশাল জেলার সীমান্তে “লক্ষণকাটা” গ্রাম পাই। তথায় এক বিরাট বাসুদেব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। দৌলতপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামখ্যাত হাইকোর্টের উকীল ব্রজবাবু বলিয়াছেন যে যশোর-খুলনার বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্রহ্মজ্ঞা সম্পত্তি লক্ষণসেনের দেওয়া; সেই দলিলের কোন কোনটি তিনি স্বয়ং দেখিয়াছেন। উক্ত প্রমাণাদি দ্বারা এই কথাটা দৃঢ় হইল যে লক্ষণসেনের সঙ্গে এই স্থানটির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, এবং সম্ভবতঃ তথায় তাঁহার একটি রাজধানী ছিল।

খেয়াভোগ, পিঠাভোগ,
দেবভোগ, মোভোগ প্রভৃতি।

সাধনাট বা জগন্নাথ যে নামই নগরটির হউক না কেন, এই স্থানে আসিয়া শেষকালে তিনি বাস করিয়াছিলেন। হিন্দুরা তীর্থবাসী হইবার জন্য বৃন্দাবন বা কাশীতে যাইয়া থাকে। কিন্তু পুরী-তীর্থ বাজীদের আনাগোনার সহর, তথায় কেহ বাস করিতে চায় না। লক্ষ্মণসেন যে এই খানেই গিয়া বাস করিয়াছিলেন তাহার এতদপেক্ষাও প্রবলতর প্রমাণ আছে। আমিই পূর্বে দেখাইয়াছি যে, লক্ষ্মণসেন কুলীনদিগকে একান্ত বশীভূত করিয়াছিলেন। কুলানেরা সেন-রাজগণের সঙ্গে বাস করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহাদের এই রাজদত্ত আভিজাত্য রাজাকে আশ্রয় করিয়াই পুষ্টি লাভ করিত। যশোর ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কায়েতের কুলীন-কেন্দ্র কেন হইল, আমি সত্যোশ মিত্র মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—“প্রতাপাদিত্য ইহাদিগকে আনাইয়াছিলেন।” আমি বলিলাম, “অন্য সাত শত বৎসর পূর্বে অনেক কুলীন এখানে বাস করিয়াছিলেন। আমরা হিন্দু সেন বংশীয়। হিন্দু হইতে আমরা ২২ পুরুষ চলিতেছি।”

হিন্দু খুলনার অন্তর্গত পরগ্রামে বাস করিতেন। এইরূপ ভাবে, শতাব্দীতে তিন পুরুষ গণনা করিলে দেখা যাইবে, বহু কুলীন এদেশে লক্ষ্মণসেনের জীবনের শেষের দিকে আসিয়া বাস করিয়াছেন। রাজা এখানে আসিয়া স্থায়ীরূপে বাস না করিলে কুলীনেরা কখনই রাঢ় ত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়া বাস করিতেন না। বৃদ্ধ বয়সে রাজত্বের ভার যোগ্য পুত্রদিগকে প্রদান পূর্বক তিনি বঙ্গের এক নিভৃত পল্লীতে শুধু দেব-সেবার বিধিব্যবস্থা করিয়া ধর্মজীবন বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি “খলিফা” বা ধর্মগুরু নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল কীর্তি দেখিলে মনে হয় তিনি শেষ জীবনের দিনগুলি আচার্য্যের মতই ধর্মের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। কুলীন সমাজের সকলেই সুপণ্ডিত ও কৃতবিদ্য ছিলেন, ইহাদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করিয়া তিনি শেষের কয়েকটা দিন কাটাইয়া দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ যশোর-খুলনা এবং বরিশালের প্রান্তপর্ধ্যন্ত একটি মস্ত বড় দেশ লক্ষ্মণসেনের এত চিহ্ন বহন করিতেছে যে এখানে তিনি বাস করিয়াছিলেন, তাহাতে বিশেষ কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে হুর্গ, সেনা-নিবাস বা বিজয়-স্তম্ভের কোন নিদর্শন নাই,—আছে কেবল দেবমন্দির, দেববিগ্রহ, দেবতত্ত্বমি ও দেবায়তন। এখানকার লোকেরা বীরত্ব বা শৌর্য্য-বীৰ্য্য দেখাইয়া শত্রু দলন করিয়াছেন, তেমন জনশ্রুতি বা প্রবাদ নাই। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের বংশধরেরা আজও লক্ষ্মণসেনের দেওয়া দলিল দেখাইয়া নিজের জমি ভোগ করিতেছেন। যে সময়ে লক্ষ্মণসেন মিথিলা, কাশী ও প্রয়াগ জয় করিয়াছিলেন এবং কলিঙ্গদেশ-বিজয় অভিযান উপলক্ষে তথাকার রমণীগণের সঙ্গে বিহার করিতেন, এই নিবাসভূমি তাঁহার সেই উদ্যম যৌবনের কোন স্মৃতিই বহন করে না। সেনহাটার অতি নিকটে সুবিখ্যাত বিজয়-চণ্ডীতলা। প্রবাদ যে উহা বিজয় সেনের প্রতিষ্ঠিত চণ্ডী। যশোর-খুলনার ইতিহাসে কথিত হইয়াছে যে বিজয় সেন কোনও সময় তাঁহার সামরিক অভিযানের পথে এই চণ্ডী স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। লক্ষ্মণসেন যখন গৌড় দেশের অধিকার ছাড়িয়া স্বর্গণ ও কুলীনবর্গকে লইয়া এতদেশে আসেন, তখন তাঁহার বিশ্ব-বিশ্রুতকীর্তি পিতামহ বিজয় সেনের প্রতিষ্ঠিত

গৃহদেবতা ফেলিয়া আসিতে পারেন নাই। বিজয়চণ্ডী সেন-বংশের কুলদেবতা, এখন তথায় বিগ্রহ নাই। অতি প্রাচীন বিটপিতলে লোকেরা বহুমান সহকারে তাঁহার পূজা দিয়া থাকে। সেনবংশের কুলদেবতা লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে সঙ্গে যশোরে আসিয়াছিলেন, ইহাও রাজার শেষ জীবনের একটি ঘটনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যদি আমার বক্তব্যগুলি পুনরায় সংক্ষিপ্ত করিয়া বলিতে হয়, তবে বলিব নদীয়া ছাড়িয়া লক্ষ্মণসেনের যশোরে আসিয়া বাস করার অসম্ভবতার পক্ষে এই কয়টি কারণ :—

১। শত্রুর হাতে সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া কোন রাজার রাজত্ব করা রীতি-বিরুদ্ধ। সুতরাং বৃদ্ধ রাজা সোণার গাঁয়ের রাজধানীতে আসেন নাই।

২। সেনহাটী গ্রাম লক্ষ্মণসেনের স্থাপিত। এই গ্রামের অনতিদূরে “সেনের বাজার”কে প্রাচীনেরা ‘লক্ষ্মণসেনের বাজার’ বলিতেন।

৩। ‘শাখনাট ও জাগনাট’ একটা নোক্তার ভুলে ভিন্নরূপ ধারণ করিতে পারে। লোকে শাখনাট নাম জানে না, সুতরাং “জাগনাট” বা “জগন্নাথ”-পাঠ সহজে মনে হয়। শাখহাট, শাখনাট প্রভৃতি নাম সম্বন্ধে সতীশ মিত্র মহাশয়ের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

৪। এই স্থানে বিপুল গড়খাই, ভগ্ন প্রাসাদের চিহ্ন বর্তমান এবং বড় বড় প্রস্তরের দেবমূর্তি পাওয়া গিয়াছে ; তাহাদের কোন কোনটি যে লক্ষ্মণসেনের সময় গঠিত তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ঢাকায় প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে নিশ্চিত তারামূর্তি যশোহরে ভুবনেশ্বরীমূর্তির এতটা সদৃশ যে সতীশবাবু মনে করিয়াছেন উহারা একই হাতের রচনা।

৫। বিনি কুলীদের কোলীজ স্থায়ী করিয়া তাঁহাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছিলেন,—তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই এতগুলি কুলীন যশোরে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, নতুবা তাঁহাদের তথায় যাইয়া বাস করার অল্প কোন কারণই নাই। ৭০০ বৎসর পূর্বে এই সকল কুলীনের অধিকাংশ তথায় গিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের দেওয়া ব্রহ্মত্ব জমির দলিল সেখানে ব্রাহ্মণদের ঘরে ব্রজবাবু দেখিয়াছেন।

৬। লক্ষ্মণসেনের স্থাপিত ‘সেনহাটী’, ‘লক্ষ্মণসেনের বাজার’, প্রকাণ্ড গড়খাই ছাড়া অদূরে পিলজঙ্গ গ্রাম (হাতী শাল), প্রভৃতি দ্বারা সূচিত হয় যে তথায় রাজপাট ছিল এবং তাহা লক্ষ্মণসেনের নামের সহিত জড়িত।

৭। এই রাজপাট, রাষ্ট্রীয় শাসন সংক্রান্ত রাজধানী নহে,—উহা রাজর্ষির তপোবন-কর ‘রাজপাট’। ইহার চারিদিকে যে সকল গ্রাম তাহাদের নামেই বুঝা যায় যে তথায় বহু দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; নামগুলি খেয়াভোগ, নৌভোগ, পিঠাভোগ, দেবভোগ প্রভৃতি। যশোহরের উপাঙ্গে লক্ষ্মণকাটী গ্রামে যে বৃহৎ বাহুদেবমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রায় ছয় ফিট উচ্চ। কোন রাজচক্রবর্তী ভিন্ন এত বড় মূর্তি কেহ প্রতিষ্ঠা করেন নাই, এবং সেই মূর্তি সেন-যুগের ভাস্কর্যের নিদর্শন।

৮। সেনহাটীতে সেন-বংশের কুলদেবতা বিজয়চণ্ডী-তলায় এখনও লোকে পূজা দিয়া থাকে।

(এই মহিলা আপনাকে বঙ্গদেশবাসী (native) বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এদেশেই তাঁহার জন্ম এবং কর্মক্ষেত্র। তিনি বাহা দেখিতেন; তাহারই খসড়া করিয়া লইয়া শেষে ছবিগুলির পূর্ণতা দিতেন। রাজা রামমোহন রায় ১৮৩২ খৃঃ অক্টোবর ২৫ই মার্চ এই ছবিগুলি যথাযথ ও অন্দর হইয়াছে বলিয়া ইহাদের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। ডাঃ জনভান ম্যানিং সাহেবের আনুকূল্যে সেই প্রাচীন চিত্রপুস্তকখানি হইতে প্রতিলিপি গ্রহণ করিবার সুবিধা পাইয়াছি।)



রন্ধনশালায়।



মৃতশিশু গদায় ভাগান।



চরক। ভূমিকা, ১৮০ খৃঃ হইয়া



গঙ্গায় স্নান।



বাস্তালি হিন্দু বাই।



কর্তিত (বলি দেওয়া) পাঠা স্বক্কে গৃহাভিমুখে—পলে গণিকা দর্শন।

সেনরাজারা আরো কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ শতাব্দীকাল পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষণসেনের সঙ্গে সঙ্গে গোড়েশ্বরগণের সার্বভৌমত্বের যে কিছু অবশেষ ছিল, তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। •

• আমরা ইতিপূর্বে জয়সেন বিধান কৃত “সদৈজ-কুল-চন্দ্রিকা” নামক কুলজী গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি। এই পুঁথিতে যে সকল ঐতিহাসিক উপাদান আছে, তাহা সত্য হইলে বঙ্গের ইতিহাসের আঁখার পথটা কতকদূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইবে এবং আমাদের সিদ্ধান্ত অনেকটা উলটু পালটু করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন (হাইকোর্টের এডভোকেট) গীতাচাণ্য মহাশয় শীঘ্র এই পুঁথিখানি প্রকাশ করিবেন, তখন পুস্তক—বর্ণিত ঐতিহাসিক কথাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে বিচার হইবে, এখন তৎসম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলিব না। এই কুলজীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব এত বেশী যে, আমরা গীতাচাণ্য মহাশয়কে এই পুস্তকের কোন হস্তাচীন প্রতিলিপি প্রদর্শনপূর্বক অথবা অন্য কোনও রূপে হৃদয় প্রমাণ উপস্থিত করিয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদেরকে নিঃসন্দেহ করিতে দাবী করিতে পারি। এখানে বলা দরকার যে আমরা পুস্তকখানি সমগ্রভাবে দেখিবার সুযোগ পাই নাই। নিম্নে সদৈজ-কুল-চন্দ্রিকার একটি স্থান উদ্ধৃত হইল :—

“ কর্ণাট-রাজ-মার্জিত-সেনবংশি-রোমনগে ।
সামন্ত্য প্রপৌত্রে। যো নপ্তা হেমন্তভূপতেঃ ।
রাঢ়-বারেন্দ্রগোড়ারীন্ বঙ্গান্ মিহোজ্জিতপ্রিঃ ।
পুত্রো বিজয়সেনস্ত বৈদ্যানরকুলোদ্ভবঃ ।
আদিশূরকুলানন্দগিরিসেনস্ত কস্তকা ।
ধারমানাস যং দেবী বিলাসী গর্ভকৌস্তভম্ ।

(১০৫০ শক, ১১২৮ খৃঃ)

ববাগধেনুমে শাকে বঙ্গালাধাঃ স ভূপতিঃ
বৈজয়ংশাবতংসোহিতুর্জগদ্রপোস্তা নৃপোত্তমঃ ।
দেবীকা শ্রীরাজ-লক্ষ্মীঃ পালভূপালতনয়া ।
চান্তবন্তস্ত মহিবী সমন্তভূবনার্জিতা ।
বঙ্গালতনয়ঃ শ্রীমাদ্রামণ্যো বৈকবোত্তমঃ ।
কামরূপ-গৌড়-মগধান্ জিগায় তরসা বলী ।
নিষ্কটকোকাঁড়োক্তা স ররাজ ধর্মপতিঃ ।
ধার্মিকো ধর্মগোস্তা চ ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মরক্ষকঃ ।
স যোগান্ যোগান্ হুটান্ মানার্হীন মানয়ন্ সপা ।
যাচকাংস্তোষয়ন্ যোগ্যান্ সর্বলোকমরজয়ৎ ।
বিজিত্য শত্রুন্ পতিতান্ পাণ্ডিত্যে সাবরং কঠৈঃ ।
উত্থাপ্য ভূমিবানাতৈঃ স বরক্ষ মহাশয়ঃ ।
সংকুলোচরনিরতান্ চুস্তসম্বদ্ধভাগিনঃ ।
পিতৃবজ্র নরহুটান্ বুধলানকরোন্ বলাৎ ।
পিতৃব পলায়ন্ প্রজাঃ পকবিংশতিবৎসরম্ ।
স লোভে বৈকবং ধাম লক্ষ্মণো লক্ষ্মণোপমঃ ।

আবজ্ঞাপুরে ৮৮৮ হিজরার নির্মিত বল্লালসেনের শত্রু বাবা আদমের সমাধি দৃষ্ট হয়।
তথ্য একটা প্রকাণ্ড পাথর আছে। বল্লালদীঘির নিকট অনেকটা জায়গা জুড়িয়া রাজ-
প্রাসাদের চিহ্ন আছে। তাহার অনেকটা জমি পোড়া মাটি, খুঁড়িলেই পোড়া কয়লা দৃষ্ট
হয়। এ সম্বন্ধে বেশব্যাপী প্রবাদ এই যে কোন এক ফকির বল্লালের রাজধানী হইতে
কতকটা ব্যবধানে গোবধ করিয়াছিল; সেই গোমাংস একটা চিলে ঠোটে করিয়া লইয়া
আসিয়া রাজপ্রাসাদে ফেলিয়া যায়। রাজা বিশেষ অমুসন্ধান করিয়া জানিলেন, তাঁহার

শ্রীমদ্রাঙ্গসেনন্ত জজিরে পুত্রকান্তরঃ ।
ধর্মপালহত্যাক বহুমেধ্যান্তনুত্বাঃ ।
অগ্রজো মাধবন্তেব পূর্বমেব দিবং যমৌ ।
কেশবো বিশ্বরূপন্ত রাজ্যভ্রাত্তো বহুবভুঃ ।
পূর্বরাজ্যং রামপালং বিশ্বরূপোহিহুজ্ঞোহশ্বিনঃ ।
কেশবঃ পশ্চিমে ভাগে গৌড়ান্থোহভূন্নরাধিপঃ ।
স লাম্পেয়নাগাসীং প্রসিদ্ধঃ পিতৃনামতঃ ।
দানেন কর্বঃ শৌর্য্যেণ ভীমঃ পরমধাশ্রিকঃ ।
তত্তামাত্যঃ পুত্রপতিরভূদ্বিধাসত্যাতকুং ।
যো গৌড়রাজ্যং লোভেন যবনার সমার্গরং ।
রামপালং গতং ভূপং মন্ত্রগায়াশুজেন সঃ ।
বিদ্বিয়া পাপভ্রাত্তো হর্গদারমপাবুণোং ।
এবং দশমে তত্তাভিষেকাঘৎসরেহন্ততে ।
যবনাধিপতং গৌড়রাজ্য শৌচ্যাং দশাং গতমঃ ।
(১১২৪ শক, ১২০২ খ্রঃ) বেদপঙ্কেন্দুচক্রাঙ্কে ধিলজীযবনাবভুং ।
উৎপীড়িতপ্রজং গৌড়ে হুষ্টং যাবনাশাসনম্ ।
বিশ্বরূপন্ত বজ্রেণ আধিকারমকুজিতম্ ।
রক্ষন্ বাহবলাধীরঃ প্রজাঃ রাজ্যমপীপলং ।
ত্রিচত্বারিংশবর্ষাণি পালয়ন্নখিলাঃ প্রজাঃ ।
স অগাম দিবং রাজা পুত্রোভ্যাং রাজ্যমর্পয়ন্ ।
হতো তন্ত মহাশূরো ভীমহুল্লরসেনকে ।
কুর্বাতেম পৃথগ্ৰাজ্যং বোর্দিওজিতশত্রুকৌ ।
হর্বর্গগ্রামমবসং কনিষ্ঠঃ হুল্লরন্তয়োঃ ।
তং হুল্লরপুং নাম স্ননান্না যোজয়ন্তু পঃ ।
রামপালেহকরোদ্ রাজ্যং ভীমশ্যষ্টত্রিংশাব্দকম্ ।
তৎহতো বজ্রশান্তা যো রাজতে সেনকার্ত্তিকঃ ।
কার্ত্তিকেয়সমানো নো রূপেণ চ বলেন চ ।
উপযেমে স মহাবীরা কমলাং চ শুভালয়ান্ ।
মন্তুনিহশক্তি জজয়সেনন্ত কন্তকান্ ।
যেনেয়ঃ রচিতা পুস্তী সযৈককুলচন্দ্রিকা ॥

রাজ্যের মধ্যে এক ফকির গোহত্যা করিয়াছে। ক্রোধাক্ত হইয়া রাজা সেই ফকিরের দুর্গতি ও লাঞ্ছনার চরম শাসন করিয়া ছাড়িয়া দেন। ফকির বাবা আদম (বারাহুদ) নামক এক মুসলমান সেনাপতির নিকট বাইয়া সাক্ষনেত্রে বল্লালের অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করে। বাবা আদম বহু সৈন্য লইয়া রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া আসেন। মুসলমানেরা বল্লালের রাজধানীর অনতিদূরে শিবির স্থাপন করেন। বল্লাল-চরিতে মুসলমান সেনাপতির আক্রমণের কারণ অল্পরূপ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে রাজা শঙ্কিত হৃদয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, তখন রাজ-সিমন্তিনীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া কাদিতে লাগিলেন। রাজ্ঞীদের মধ্যে শিলাদেবী, পদ্মাকী, সুভগা, হেমমালিকা, সোমদেবী, এবং চণ্ডেলী তাঁহাকে সাক্ষনেত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ। রাজ্যে মহাশত্রু উপস্থিত, দৈবাৎ যদি পরাজয় ঘটে তবে আমরা কি করিব তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ দিন।” রাজা প্রতি মহিষীকে চুষন ও আলিঙ্গন করিয়া স্বয়ং সাক্ষনেত্রে তাঁহাদের নয়নবারি মুছাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন, “অন্তঃপুরে আগুন জালিয়া রাখ; আমি এই দুইটি পায়রা যুদ্ধক্ষেত্রে

ইহার মর্দার্থ অতি সংক্ষেপে নিম্নে প্রবৃত্ত হইল। কর্ণাট-রাজ-বংশ-জাত সেনবংশ-শিরোমণি নামধর সেনের প্রপৌত্র, হেমন্ত সেনের পৌত্র এবং বিজয় সেনের পুত্র বৈষ্ণবকুলজাত বল্লাল সেন রাঢ়, বরেন্দ্র, এবং গৌড় প্রভৃতি দেশ-বিজয়ী সম্রাট। ইনি আদিশূর বংশজ গিরিসেনের কন্যা বিলাসী দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১০৫০ শকে ১১২৮ খৃঃ অব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন.....(এখানে তদ্বিরচিত দানসাগর এবং অপরাপর বিখ্যাত বর্ণিত আছে তাহা আমরা বাদ দিচ্ছি)। বল্লাল সেন পাল রাজ কন্যা রাজলক্ষ্মীকে বিবাহ করেন। বল্লাল-পুত্র লক্ষণ সেন কামরূপ, গুড়ু এবং মগধাদি জয় করিয়া সার্বভৌম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি ব্রহ্মবিদ, ধার্মিক, ধর্মরক্ষক এবং নানাগুণে বিভূষিত ছিলেন। ইহার রাজত্বকাল ২৫ বৎসর। লক্ষণ সেনের তিনটি পুত্র—ধর্মপাল মূপতি কন্যা বহুদেবীর গর্ভমন্ভূত। অশ্রম মাধব পূর্বেই স্বর্গায় হন। বিখরূপ ও কেশব রাজ্য ভাগ করিয়া অধিকার করেন। বিখরূপ পূর্বে দিক্‌টা (রামপাল প্রভৃতি প্রদেশ) গ্রহণ করেন এবং কেশব পশ্চিম ভাগে গৌড় দেশের রাজা হন। কেশব তাঁহার পিতৃনামানুসারে “লাক্ষণেশ্বর” নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি (কেশব, নামান্তর লাক্ষণেশ্বর) দানে কর্ণের স্তায়, পরাক্রমে ভীমের স্তায় এবং পরম ধার্মিক ছিলেন। ইহার অমাত্য পত্তপতি বিশ্বাসঘাতক হইয়া লোভবশতঃ গৌড়রাজ্য যবনকে সমর্পণ করেন। অমৃত্যুর সহিত পরামর্শ করিবার জন্য কেশব (লাক্ষণেশ্বর) রামপাল গিয়াছিলেন, এই যোগে পাপিষ্ঠ মন্ত্রী রাজ্যিকালে দুর্গদ্বার যবনকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার রাজত্বের দশম বৎসরে গৌড় রাজ্য যবনাধিকৃত হয়। ১১২৪ শকে (১২০২ খৃঃ) ঝিলিজি রাজ্য অধিকার করিলে মুসলমান শাসনে প্রভাৱা নিপীড়িত হয়। বিখরূপ বঙ্গদেশে খাবীন থাকিয়া অকুণ্ঠিত প্রভাবে স্বীয় বাহুবল দ্বারা প্রজা রক্ষা ও পালন করিয়াছিলেন। তিনি ৩৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় দুই পুত্র ভীমসেন ও হুম্মরসেন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইহারা শত্রুদিগকে সোচ্ছিন্ন প্রভাবে পরাজয় করিয়াছিলেন। ভীমসেন রামপালে ও হুম্মর সেন স্ববর্ণগ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। হুম্মর সেন স্বীয় নামানুসারে স্ববর্ণগ্রামের নাম হুম্মরপুর রাখিয়াছিলেন। রামপালে ভীমসেন ৩৯ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপুত্র কার্তিকসেন রূপে ও পরাক্রমে দেব-সেনাপতি কার্তিকেশ্বরের মতই ছিলেন। ইনি মল্লভূমিনিবাসী শক্তি-গোত্রীয় অরসেন বিখাসের কন্যা কমলা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই অরসেন বিখাসই “মহোচ্চ-কুল-চন্দ্রিকা” প্রণয়ন করেন।

ক্ষেত্রে লইয়া যাইতেছি, যুদ্ধে আমার পরাজয় হইলে এই পারাবত ছুটি পাইয়া বিজয়ী সৈন্ত তোমাঙ্গিকে আক্রমণ করিবার পূর্বেই আকাশ-পথে রাজপ্রাসাদে আসিয়া পড়িবে। তখন মুসলমানের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তোমরা অধিকুণ্ডে প্রাণ ত্যাগ করিও।” অতি কঠোর যুদ্ধ হইল। বায়াজুজ (বাবা আদম) বজ্রালের হাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বিজয়োল্লাসে বজ্রাল পাথরা ছুইটিকে সুরক্ষিত করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পাথরা ছাড়া পাইয়া রাজ-প্রাসাদে উড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইলে রাণীরা রাজ-মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সেই অধিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করেন। এ দিকে রাজা যখন দেখিলেন পিঞ্জর শূন্য, পাথরা নাই, তখন ঘোর আশঙ্কায় উন্নতবৎ হইয়া তিনি অঝোরোহণে অতি ক্রুত রাজধানীতে উপস্থিত হন। তখন বহির্দেব তাঁহার রাজোজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ললাম কুশুমগুলিকে গ্রাস করিয়াছেন। সেই অলস অধিকুণ্ডে রাজা নিজে আশ্রয় লইয়া নিদারুণ শোক-জ্বালা নিবারণ করিলেন। বজ্রাল ও তাঁহার মহিষীরা একত্র সেই অধিকুণ্ডে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

এই প্রবাদ এত ব্যাপক ও বহুকালাগত যে ইহা অবিধাস করা যায় না। বিক্রমপুরবাসী সকলেই ইহা জানেন। এখনও তাঁহার “পোড়ারাজার বাড়ী” দেখাইয়া থাকেন। বজ্রাল-চরিতেও আনন্দ ভট্ট এই করুণ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। বাবা আদম বা বায়াজুজের

এই কুলপঞ্জিকা হইতে আমরা জানিতে পাই, (১) বজ্রাল সেন নীচ-কুল-জাতা রমনীর পাণিগ্রহণ করা বশতঃ তৎসম্প্রবৃত্ত বহু লোককে লক্ষণ সেন বংশে পরিণত করেন। (২) কেশব সেনের অপরাধ নাম লাগ্নপের—ইনিই লক্ষণ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। (৩) ইহার মন্ত্রী পতপতি রাজার অনুপস্থিতিকালে লোভবশতঃ দুর্গদ্বার মুক্ত করিয়া দিয়া গোড় রাজ্যে মুসলমানদিগকে আনয়ন করেন। (৪) এই ঘটনা লক্ষণ সেনের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে ১২০২ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল, তখন কেশব (লাগ্নপের) কনিষ্ঠ বিশ্বরূপের সঙ্গে সম্ভবতঃ মুসলমান-আক্রমণ-সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য রামপাল গিয়াছিলেন। বজ্রাল সেন এই কুলজী অনুসারে ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় হন, লক্ষণ সেন তারপর ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে কেশব (লাগ্নপের) গোড়ে রাজা হন, তাঁহার রাজত্বের ১০ম বৎসরে ১২০২ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা গোড় বিজয় করেন। এদিকে বিশ্বরূপ ৩৪ বৎসর রামপালে রাজত্ব করেন, হুতরাং তিনি ১২২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের রাজপদে আসীন ছিলেন। তৎপরে ৩৮ বৎসর ভীম সেনের রাজত্ব কাল, অর্থাৎ ১২৬৫ খৃঃ পর্যন্ত। তৎপরে কার্তিক সেনের রাজত্ব সময়ে “সংক্ষেপ-কুল-চল্লিকা” রচিত হয়।

যে পর্যন্ত এই পুস্তকের ঐতিহাসিক সমগ্রভাবে কিংবা আংশিকভাবে প্রতিপন্ন না হইবে, সে পর্যন্ত শুধু অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা ছাড়া আমরা এতৎ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য মূলতঃই রাখিলাম। বর্তমান কালে কুলজী পুস্তক সম্বন্ধে নানারূপ সম্বোধ মনে উপস্থিত হইবার যথেষ্ট কারণ জন্মিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই কোন পরিচিত কুলজী পুস্তকের মধ্যে ভাল লেখা প্রাক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, আগাগোড়া কাল্পনিক লেখা,—এরূপ পুঁথির সংখ্যা বিরল। অরসেন বিখ্যাত কুলজীগ্রন্থ ছাপা না হইলেও এই পুঁথি অনেক স্থানেই আছে বলিয়া বতীন্দ্রবাবু জানাইয়াছেন।

আর একটা কথা। লক্ষণ সেনের জীবিত দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কেশবের অপরাধ নাম লাগ্নপের ছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে। দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র দ্বারদাস নামে পরিচিত,—সেই সংস্কৃতির আধাঙ্গ যুগে এরূপ ভাবের নামকরণ অসম্ভাবিক নহে।

সমাধি, বল্লালসাগর ও বল্লালের বাড়ী এ সমস্তই পাশাপাশি, এবং রাজার বাড়ীর মাটি খুঁড়িলেই একটা নাতিশূন্য জায়গার সর্বত্র পোড়া কয়লা দৃষ্ট হয়, তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি। ইহা ছাড়া সেন-রাজগণের পরবর্ত্তী রাজাদের বংশাবলী সম্বন্ধে যে একটা ছড়া প্রচলিত আছে, তাহাতে এই পোড়া রাজার উল্লেখ আছে। • এই পোড়া রাজা কে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না—যনে হয় বল্লালের কোন বংশধরের কথা তাঁহার উপর আরোপ করা হইয়া থাকিবে। বল্লাল-চরিতে লিখিত আছে, রাজা যখন এইভাবে অগ্রিকূণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করেন, তখন তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন দূর দেশে ছিলেন, সুতরাং দ্বিতীয় বল্লালের অস্তিত্ব এই কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

কেহ কেহ অস্বাভাবিক করিয়াছেন, এই বল্লাল কৌলীজ-স্থাপয়িতা ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় বংশাবতংস বল্লাল সেন নহেন। ইনি বৈষ্ণব বল্লাল সেন নামক অপর এক রাজা, তিনি ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন এবং গোপাল ভট্ট দ্বারা তাঁহার চরিত্র-কথা লিখাইয়াছেন। আনন্দ ভট্টের বল্লাল-চরিতে পাওয়া যাইতেছে যে তিনি কৌলীজ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্রের নাম লক্ষ্মণসেন। সেন-কুল-কমল-ভাস্কর বল্লালসেন সম্বন্ধে যতগুলি কথা প্রচলিত আছে বল্লাল-চরিত-বর্ণিত বল্লালে তাঁহা অনেক কথাই আরোপ করা হইয়াছে। বৈষ্ণব বল্লালেরও কি তবে লক্ষ্মণসেন নামক পুত্র ছিলেন?

এই সকল লোকেরা বল্লালসেনকে ক্ষত্রিয় (অথবা কায়স্থ) প্রতিপন্ন করিতে যে কতরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা লিখিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। স্বর্গীয় রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এতদর্থে কতকগুলি ফরমাইস মতন তৈয়ী কুলজী গ্রন্থের অসারত্ব ও প্রবঞ্চনা এরূপ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহাতে শুধু এই বিষয়টি নহে, বর্ত্তমান কালের আবিষ্কৃত কুলজীশাস্ত্রের অনেকগুলির উপর কোন

রূপ আস্থা করা যায় না। স্বর্গীয় দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় তাঁহার দুই বল্লাল কখনই নহে। সামাজিক ইতিহাস ও উমেশ বিজ্ঞান মহাশয় তদীয় গ্রন্থ সমূহে

এ বিষয় বিশদ ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। জাতিগত এই সকল ক্ষুদ্রত্ব লইয়া বঙ্গের ইতিহাসের একটি যুগের সমস্তকে মিথ্যার ঘূর্ণিপাকে ফেলিবার আমরা এখানে কোন প্রয়োজন দেখি না।

বল্লাল-রাজ-শিক্ষক গোপাল ভট্টের যে শ্লোকটির বলে ‘বৈষ্ণব বল্লাল’কে দাঁড় করান হইয়াছে তাহা এই :—

• বৈষ্ণববংশাবতংসোহয়ং বল্লালো নৃপপুত্রবঃ ।

তদাঙ্গরা কৃতমিদং বল্লালচরিতং শুভম্ ॥

গোপালভট্টনামা চ তদ্রাজশিক্ষকেণ চ ।

অন্ধরাজজয়ানে বহুভির্বাণৈরধিকশাকেষু ॥”

এখানে স্পষ্টাক্ষরে বল্লালকে 'বৈজ্ঞ' বলা হইয়াছে। যদি দ্বিতীয় বল্লাল দাঁড় করান যায়, তবে প্রথম বল্লালকে বৈজ্ঞশ্রেণীতে ভুক্ত করিতে হয় না। কিন্তু এই শ্লোকটির যে অর্থ বিজয়চন্দ্র নাগ এবং অপরাপর লেখকগণ করিয়াছেন, তাহাতে কোন ক্রমেই উহা সিদ্ধ হয় না। ইহাদের মতে ধৃতরাষ্ট্র পুত্র = ১০০, বঙ্গ ৮ এবং বাণ ৫; সুতরাং $৮+৫=১৩$ । অঙ্কিত বামা গতিঃ, এই নিয়মে ১৩র পিঠে ১০০ চাপাইয়া ১৩০০ শক করা হইয়াছে। ১৩০০ শক = ১৩৭৮ খৃঃ—এই হিসাবে এই বল্লাল-সেনবংশীয় কৌলীক-স্থাপয়িতা বল্লাল হইতে অন্ততঃ ২০০ বৎসরের পরবর্তী। সুতরাং ছই বল্লাল এক ব্যক্তি হইতে পারেন না।

এই গণনাটি ভুল, অঙ্করাজজ (ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র) = ১০০, তৎপরে বঙ্গ আট; সুতরাং $১০০৮+৫$ (বাণ) = ১০১৩ হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্তী মহাশয় ১৯৩২ খৃঃ ৬ই জুন আমাকে লিখিয়া জানাইয়াছেন, "উপরি লিখিত বাক্যটির অর্থ $১০০৮+৫=১০১৩$ হইতে পারে, কিন্তু ১৩০০ করিলে সম্ভব হয় না।" ১০১৩ শক = ১০৯১ খৃষ্টাব্দ। এই সময় সেনবংশীয় প্রসিদ্ধ বল্লালকেই নির্দেশ করিতেছে, সুতরাং ছইটি বল্লাল দাঁড় করাইবার কোন হেতুই দৃষ্ট হয় না। পূর্বোক্ত লেখকেরা $৮+৫=১৩$ যোগ দিয়া উহা ১০০র সঙ্গে পূরণ করিয়াছেন। এক স্থানেই সুবিধা অমুসারে যোগ ও পূরণের কাজ চলিতেছে, ইহা অস্বস্ত গণনা। সম্ভবতঃ রক্ষার জন্ত যদি সকলগুলিকেই যোগ দিতে হয়, তবে $১০০+৮+৫$ দাঁড়ায়, এবং তাঁহাদের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যদি অঙ্কের বামাবর্ত বীকার করিতে হয় তবে সনটা হয় ৫৮০০১। কিন্তু শ্লোকটির অর্থ যে ১০১৩ তাহা অতি সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

গোপাল ভট্টের শ্লোকটি আনন্দ ভট্টের বল্লালচরিতের আর একটি অনুরূপ শ্লোককে সমর্থন করে। সেই শ্লোকটি বিচার করিলে অর্থ-উদ্ধার সহজ হইয়া পড়ে। "সহস্রংষ্ট-বিংশযুতে শকাব্দে পৃথিবীপতিঃ। দ্বীতিঃ সার্বং মহাভাগ উৎপাত্ত দিবং প্রতি ॥" অষ্টবিংশ যুগ্ত সহস্র শাকে পৃথিবী-পতি মহাবীরগের সহিত স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। এখানে যদি অঙ্কের বামাগতি ধরা যায় তাহা হইলে ২৮০২৮ শকে অর্থাৎ ২৮১০৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালের মৃত্যু হয়, ইহাই বলিতে হইবে, উহা উপহাসাপ্পদ। মোট কথা বল্লাল-চরিতে অঙ্কের বামাগতির উল্লেখ নাই। এ সম্বন্ধে তাহা হইলে তিনটি বচন পাওয়া যায় এবং তিনটিই সোজা স্বজ্ঞি ভাবে অর্থ করিতে হইবে। "অঙ্ক রাজজ মানে বঙ্গভিবাণৈরাধিক শাকেবু অর্থ ১০১৩ শক = ১০৯১ খৃষ্টাব্দে; দ্বিতীয় শ্লোক অষ্টবিংশ যুগ্ত সহস্র অর্থ = ১০২৮ শক = ১১০৬ খৃঃ। এবং তৃতীয় একটি সময়-নির্দ্ধারক শ্লোক আছে, তাহা নবদ্বীপাধিপতি শ্রীমৎ বুদ্ধি মন্ত খাঁয়ের জন্মতিথিতে "শাকে চতুর্দশশতে মহম্মদদনযুতে" $১৪০০+মহম্মদদন=৩২=১৪৩২$ শকে (১৫১০ খৃষ্টাব্দে) দাক্ষিণাত্য দ্রাবিড় শ্রীমৎ অনন্ত ভট্টের বংশোদ্ভূত মহামহোপাধ্যায় আনন্দভট্ট কৃত বল্লাল-চরিত উক্ত রাজাকে গ্রন্থকার কর্তৃক উৎসর্গ করা হইয়াছিল। গোপালভট্টের বল্লালচরিত অবলম্বনে ১৪৩১ শকে (১৫১০ খৃষ্টাব্দে)

আনন্দভট্ট কর্তৃক এই বল্লাল-চরিত পুনরায় লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ছইখানি পুস্তকে বল্লাল সম্বন্ধে তিনটি স্থানে সময় নির্দেশ আছে এবং তিনটিই সোজাসুজি ভাবে অর্থ করিতে হইবে। অঙ্কের বামদিকে গণনা—ইহার কোনটিতে সমীচীন হয় না। বল্লালসেন সম্বন্ধে কাল নির্দেশক তিনটি ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। তাহার একটি ১০৯১ খৃষ্টাব্দ এবং অপরটি ১১০৬ খৃষ্টাব্দ। ইহার একটি গোপালভট্টকে আজ্ঞাদানের সময়

গ্রন্থোক্ত বিবরণ বিশ্বাস-
যোগ্য কি না প্রশ্ন হইতে
পারে, কিন্তু লেখকের উদ্দিষ্ট
এক কাল।

এবং অপরটি বল্লালের মৃত্যুর সময়; ইহাতে কোন অসামঞ্জস্য নাই। তবে এই সময় নির্দেশ ঠিক কি না, তাহা বলিতে পারি না। এই পুস্তক বর্ণিত অনেক গল্প আছে তাহা বেরূপ জনশ্রুতি হইতে গোপালভট্ট ও আনন্দভট্ট সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বল্লালের সময় সম্বন্ধে শ্লোকও হয়ত তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা

ঠিক যে অজ্ঞাত বিষয়ে এই ছই পুস্তকেই নানারূপ উপগল্প থাকিতে পারে, কিন্তু ছই বল্লালের কথা কখনই বলা হয় নাই, এক বল্লালের কথাই উভয়েই লিখিয়াছেন।

যে বুদ্ধিমন্ত খানের কথা পুস্তকে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়, তিনি হসেন সাহের পূর্ব-প্রভু। ইহাকে চৈতন্য-চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ “গৌড়-অধিকারী” উপাধি দিয়াছেন। হসেন সাহের পৃষ্ঠে ইনিই বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন। সে ঘটনা বাঙ্গলার অনেক ইতিহাসেই বর্ণিত আছে। বুদ্ধিমন্ত খান তুহানলে প্রাণত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়া বৃন্দাবন গিয়াছিলেন; চৈতন্য প্রভু ইহার জীবন রক্ষা করেন।

অঙ্কের বামগতি প্রচলিত থাকিলেও বহু প্রাচীন পুস্তকে মাঝে মাঝে ইহার ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়। আমরা ২৭৯ পৃষ্ঠায় তাহার অনেকগুলি প্রমাণ দিয়াছি।

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিন্দুরাজত্বের নানা কথা

“বহুপতে কঃ গতা মথুরাপুরী”

মুসলমান-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর বাহ্য সম্পদ দূর হইল। যে সকল কীর্তি স্থাপন করিয়া হিন্দুরাজগণ মনে করিয়াছিলেন, কালের পৃষ্ঠায় তাঁহারা অমর দাগ রাখিয়া গেলেন, অত্যাচারীর কুঠার তাহা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। দাক্ষিণাত্যের অতি নিভৃত কোণে অজস্র আত্মগোপন করিয়া কোন ক্রমে তাহার অতুল শিল্পসম্পদ লুকাইয়া রাখিয়াছিল। দূর বরোবদরে, এবং বালীর প্রধানমে হিন্দু শিল্পের বৈজয়ন্তী এখনও উড়িতেছে। কিন্তু খাস আর্য্যাবর্ত, যে স্থান আর্য্য-সভাভা ও আর্য্যশিল্পের তীর্থভূমি, তাহা হইতে নিশ্চয় পাঠান ও মোগল এরূপ নৃসংশ ভাবে সমস্ত অপূর্ণ কীর্তি ধ্বংস করিয়াছে যে, তাহার কিছু নাই বলিলেই হয়। মুসলমান-বিজয়ের প্রাক্কালে যে মথুরা, মগধ ও আসামের অরণ্য-দেশে বৃহদাকৃতি স্বর্ণ-নির্মিত অমূল্য মণি-মানিক্য-খচিত দেব-বিগ্রহ সন্ধ্যায় পঞ্চ প্রদীপের আলোতে ঝলমল করিত, যাহাদের মন্দিরে শত শত বাগান উজাড় করিয়া পুষ্পরাশি সঞ্চিত হইত, ধূপ-অগুরু-কর্পুরের গন্ধে সুবাসিত আঙ্গিনায় ভক্তের অশ্রুর পবিত্র প্রসবণ ছুটিত, কোথায় সেই গগনস্পর্শী মন্দির ও অপূর্ণ দেব-বিগ্রহ! সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময় গিরিনগরে যে বিপুল পয়ঃপ্রণালী নির্মিত হইয়া “সুদর্শন” নামে পরিচিত হইয়াছিল, অশোক ভূষাফ নামক স্থপতি দ্বারা যাহার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, ১৫০ খৃষ্টাব্দে মহাক্ত্রপ ব্রহ্মদাম যাহার শোভা সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং ৪৫৬ খৃষ্টাব্দে সৌরাস্ট্রের শাসনকর্তা পরাণদত্তের পুত্র চক্রপাণিদত্ত যাহার আমূল সংস্কার করিয়াছিলেন, সেই যুগব্যাপী রাজত্ববর্গের চেষ্টায় নির্মিত সুগঠিত চাকশিরে সমৃদ্ধ ‘সুদর্শন হ্রদের’ শত হস্ত দীর্ঘ দুই শত হস্ত প্রশস্ত উচ্চ পাষাণ-প্রাচীর কোথায় গেল! কোথায় গেল নালন্দা বিহারের সে অপূর্ণ অতুলনীয় কারুকার্য, যাহা দেখিয়া সপ্তম শতাব্দীতে হিউনসাঙ্গ বলিয়াছিলেন, “ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-বিহার অগুনতি, কিন্তু শোভা সমৃদ্ধি ও উচ্চতায় এই বিহারের কাছে আর কোনটি দাঁড়ায় না,”—কোথায় গেল তথাকার তাত্র নির্মিত ৮০ ফুট উচ্চ বিশাল বুদ্ধ মূর্তি, যাহা ৬০০ খৃঃ অব্দে অশোকের বংশধর পূর্ণবর্মা নির্মাণ করিতে যাইয়া তাঁহার রাজকোষ শূন্য করিয়াছিলেন? কুমার পালের রাজত্ব কালে একাদশ শতাব্দীতে তদীয় দেশ-বিস্তৃত-কীর্তি সেনানায়ক

বৈষ্ণবের অসংখ্য রাজন্তবর্গকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাঁহাদের স্বর্ণমুকুট সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তদ্বারা এক বিশাল স্বর্ণসিংহ-মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া তদীয় নানা চাকর-কলা-শ্রুশোভিত, নিখিল জনগণের দর্শনীয় প্রাসাদের তুঙ্গ শেখরে স্থাপন করিয়াছিলেন, (“বস্ত্রারতিকিরীটহাটক-রুতপ্রাসাদকঙ্কীরবগ্রাসত্রাসবশামুপৈচ্ছতি”) কোথায় গিয়াছে সেই স্বর্ণসিংহ ও সেই রাজপ্রাসাদ ? তবকাং ই নাসিরিতে যঃ ইবন বক্তিয়ারের তিব্বত অভিযান-প্রসঙ্গে কামরূপের এক মন্দিরের কথা উল্লিখিত আছে, তাহাতে হই তিন হাজার মন স্বর্ণের বিশাল বিগ্রহের কথা আছে, কোথায় গেল সেই বিশাল স্বর্ণবিগ্রহ । মহারাজ রাজ্যপাল যে সকল দীর্ঘ খনন করিয়াছিলেন তাহা “সমুদ্রের ছায় গভীর ছিল” এবং তৎকৃত “দেবমন্দিরগুলি হিমাদ্রির মত উচ্চ ছিল ।” সে সকল কোথায় গিয়াছে ! উত্তরবঙ্গের জগদল বিহারের কাচ-মণি খচিত যে সকল বিশাল স্তম্ভ ছিল, তাহার কিছু কিছু ভাঙ্গা টুকরা মাত্র পাওয়া গিয়াছে । কোথায় গেল হিমাদ্রি-সদৃশ বিশাল প্রছায়েশ্বরের মন্দির, যাহার উচ্চভাগে বিজয়সেন যে স্বর্ণ কলসী স্থাপিত করিয়াছিলেন, প্রস্তর-লিপির কবি সেই কলসীর শোভা বর্ণনা করিতে যাইয়া অতিরঞ্জিত ভাষায় বলিয়াছিলেন বিধাতাও বুদ্ধি তেমনটি প্রস্তুত করিতে পারেন না ? যাহা যুগ-যুগ-ব্যাপী শিল্পীর বংশ-পরম্পরা চেষ্টায় সিদ্ধ হয়, রাজার পর রাজা আসিয়া তাঁহাদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া যে কীর্তিতে শিল্পের চরম সৌন্দর্য্য প্রদান করেন, যাহা চিরকাল জগতে অক্ষয় অমর হইয়া থাকিবে, নিৰ্ম্মাতাদের এই বদ্ধমূল বিশ্বাস না থাকিলে এত তপস্তায় তাহা সিদ্ধ হইতে পারিত না,—সেই সমস্ত কীর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে কি কৃতিত্ব থাকিতে পারে ? কোন বর্ষরের হাতে একখানি মাত্র কুঠার দিলে সাজাহান বাদশাহের মার্শেল পাথরে প্রেমের স্বপ্ন—অপূর্ণ তাজমহল দিনেকের মধ্যে সে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে ; তাহাতে তাহার বর্ষরতাই প্রকাশ পায়, শিল্পী হইতে সে বড় হয় না । তাহাই তো হইয়াছে, কত শত তাজমহল আর্য্যাবর্তে—বিনষ্ট হইয়াছে, একটিমাত্র আছে । কালের হাত হইতে হয়ত ইহারা যুগ-যুগ-পরিমিত সময় নিজেকে রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু বর্ষরের হাতের কুঠার বড় সাংঘাতিক । হিন্দুর বৃকে সেইরূপ কুঠারঘাত কতবার পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই । স্মরণ্য যদি কোথায়ও কতকটা উজ্জ্বলের ভাষা আসিয়া পড়ে, তবে তাহা ক্ষণীয় । সেই যে যঃ ইবন বক্তিয়ার এ দেশে আসিলেন—তদবধি এদেশে বৃহত্তর বাঙ্গালার আর একটি দর্শনপাল হওয়ার আশা কি আছে, যাহার নাসির নামক হৃদ্যন্ত পদাতিক সৈন্তের চরণাঘাতোৎপন্ন ধূলিপটলে দিম্বগুল আচ্ছন্ন হইত, যাহার রাজধানীতে সমস্ত জম্মু দ্বীপের ভূপালগণ সমবেত হইয়া রাজাধিরাজের উপাসনা করিতেন, যাহাকে উদ্দিষ্ট নৃপতিগণ অসংখ্য হন-বাহিনী উপঢৌকন দিয়া আদেশের প্রতীক্ষা করিতেন, যাহার ‘ঘনাবন’ নামক রণকুঞ্জরগণ জলদজালের ছায় দিন-শোভাকে শ্রামায়মান করিয়া রাখিত এবং ভাগীরথীপ্রবাহে শ্রেণীবদ্ধ প্রশস্ত নৌকটক সেতুবন্ধ-নিহিত শৈলশিখর-শ্রেণীর ছায় প্রতিভাত হইত, যাহার দিগ্বিজয় উত্তরে হিমাদ্রি, পশ্চিমে কেদারতীর্থ, দক্ষিণে সেতুবন্ধের সন্নিহিত গোকর্ণ-তীর্থ এক-কথায় “বালারূপ-কিরণোজ্জ্বল পূর্বসমুদ্র হইতে অস্তাচলাবলম্বী ক্রান্ত রবির রক্তরাগরঞ্জিত পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত” বিস্তৃত ছিল ।

তাম্রশাসনগুলির উক্তি স্বপ্নের মত মনে হয়। সেগুলি পড়িলে আমরা যে তাহাদেরই একজাতি হিন্দু, মনে হইয়া আবুহোসেনের মত এক দিনের জন্ত সাম্রাজ্য লাভ করি। সেদিনও লক্ষণসেনের সময় “কন্তু শক্তিবিজ্ঞতে বিজয়রাজ্যে পরজীং ধর্মিতুং শক্লোতি।” (কার সাধ্য যে লক্ষণসেনের বিজয়রাজ্যে পরজীং ধর্মণ করিতে সাহস করে) প্রবাদ বাক্যের মত ছিল। জায়গর শক্তিমান হিন্দুর শাসন মঃ ইবন বক্তিয়ারের আগমনের দিন হইতে ফুরাইয়া গিয়াছে।

কিন্তু হিন্দু বহুদিন যাবৎ জড়জগৎকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। অর্থ সম্পদ কিছু নহে, ইহা বলিয়া আসিয়াছে “অর্থঃ অনর্থঃ ভাবয় নিত্যং”। এবার সত্যিকার পরীক্ষার দিন আসিল, ধনসম্পদ কিছু নহে, তবে সেগুলি অপরে লইয়া যাউক হিন্দুর কঠোর পরীক্ষা। সমস্ত ঐশ্বর্য্য নষ্ট করিয়া দেবতা পরীক্ষা করিতে আসিলেন—সত্যই অর্থ অনর্থ কিনা তাহাতে সত্যই সুখ-লেশ নাই কিনা? এই পরীক্ষায় হিন্দুরা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

জড় সভ্যতার সমস্ত আড়ম্বর ধ্বংস করিয়া ভগবান্ হিন্দুকে অধ্যাত্ম-সম্পদের উপযুক্ত করিলেন। মন্দির ভাঙ্গিয়া গেল, দেব বিগ্রহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইল, কিন্তু ভগবান্ সাধককে ছাড়িলেন না, ভক্ত তাহার আরও অন্তরঙ্গ হইল। শত শত মঠমন্দিরে যে ভক্তির খেলা না হইয়াছে, চৈতন্যদেব রিক্তহস্তে তদপেক্ষা অধিকতর প্রেম ভক্তি দেখাইলেন, আজ পর্য্যন্তও সে খেলার বিরাম নাই। দক্ষিণেশ্বরে একটা অশ্বখ বৃক্ষের নীচে বসিয়া সে দিনও এক মূর্খ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যে তপস্তা দেখাইয়াছেন, তাহার কণিকা-প্রসাদ সম্বল করিয়া এক মহাপণ্ডিত যুবক সুদূর পাশ্চাত্যদেশে দিগ্বিজয়ী হইয়া আসিয়াছেন। মন্দির গিয়াছে, ভগবান্ আমাদের কাছে ছাড়েন নাই। নালন্দা, বিক্রমলীলা, উদুপুর্ অত্যাচারীরা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া গিয়াছে কিন্তু গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে টোল বসিয়া গেল, তাহাতে জন্মিলেন—অদ্বিতীয় স্মার্ত রঘুনন্দন, স্মার্ত হরিভক্তিবিলাস-প্রণেতা সনাতন, জায়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার। রাজসভায় জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, গোবর্দ্ধন ও উমাপতিগণ আর উৎসাহ পাইলেন না, কিন্তু কবিকুলচক্রবর্তী চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস জন্মগ্রহণ করিয়া বুঝাইলেন যে এদেশের কবিত্ব-সম্পদ দেশজ; উহা স্বাভাবিক, উহা বসোরার গোলাপের জায়। কবিত্বের তপস্তা ত একবিন্দুও নষ্ট হয় নাই, তাহার পুষ্টিসাধনের জন্ত কোন রাজার উৎসাহের প্রয়োজন নাই। এই পরাদীন নিপীড়িত জাতি হইতে বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ উদ্ভূত হইয়া দেখাইলেন, আমরা জড় শক্তির প্রতীক্ষা করি না—আধ্যাত্মিক সম্পদে আমরা চিরকাল বড়, আমাদের সে তপস্তা ফুরায় নাই।

হিন্দু বাহ্য সম্পদের প্রত্যাশী
নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরবর্তী শিল্প ও স্থাপত্য

শিল্প ও ভাস্কর্য্য কতকটা জড়-বিষ্ঠা, মাল মসলার জন্তু সহায় সম্পদের প্রতীক করে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীও বিনা সাহায্যে তাজমহল গড়িতে পারেন না। বারোবোদর মন্দির অথবা অজন্তা, অমরাবতী, ভুবনেশ্বর—এ সমস্তের পশ্চাতেই রাজ-শক্তির সহায়তা চাই। আমরা এখন ভিখারীর জাতি, আমাদের শিল্প-সাধনা অব্যাহত রাখিবার উপায় কি? এই জন্তাই কি শিল্পকে আমাদের শাস্ত্রকারেরা অপেক্ষাকৃত হীন স্থান দিয়াছেন? কিন্তু শিল্প ও ভাস্কর্য্যের উন্নতির পথ অত্যাচারে অনেকটা বন্ধ হইয়া গেলেও উহার মূল উৎস শুকাইয়া যায় নাই। গ্রামে গ্রামে সেই শিল্পের অনুষ্টলন কিছু দিন পূর্বেও হইতেছিল, সে প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। গ্রহশিল্পে বাঙ্গালী মুসলমানাদিকারের কাল পর্য্যন্তও স্বীয় প্রতিভা দেখাইয়া আসিয়াছে, তাহাদের চিত্রপটে যে ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা বহুদিনের সংস্কারের ফল,—বহু তপস্তা-জাত। এই পুস্তকে একটি মাতৃমূর্তির ছবি

মাতৃমূর্তি।

দিয়াছি। তাহা বধ্যযন্ত্ররূপ ছবিতে ফোটে নাই। পৃথিবীর অল্প কোন দেশের শিল্পী বাঙ্গালীর মত মাতৃমূর্তির প্রকৃত গৌরবের উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন কিনা, জানি না। যে দেশে শিল্পে পূর্বোক্ত মাতৃমূর্তি ও কবিতায় রামপ্রসাদের মাতৃ-সঙ্গীত বিদ্যমান, সে দেশের শিল্প ও কাব্যলক্ষ্মী জাতীয় অধীনত্বের নিগড় পরিয়াও যে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন—এমন মনে হয় না, বর্তমান শিল্পীরা স্তন আকিতে ভয় পান, অথচ রমণীর স্তন আভাসে দেখাইয়া কুরুচির ইঙ্গিত করেন। ম্যাডনার অতুল চিত্রকরও শিশু বিস্তকে আকিতে যাইয়া মাতার স্তন দেখাইতে সাহসী হন নাই। তাহার দিগ্বিজয়ী প্রতিভা ও বহুযুগের সংস্কারাধীন হইয়া এই ক্ষেত্রে কতকটা বাধা পাইয়াছে। কিন্তু যে শিল্পী স্তন আকিতে ভয় পান, তিনি মাতৃমূর্তি আঁকিবেন কিরূপে? বড় জোর তিনি মাতৃমূর্তি আঁকিতে পারেন।

পূর্বে যে মাতৃমূর্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে শিশু এক হাতে ধরিয়া স্তন্যপান করিতেছে, আর এক হাত দিয়া অপর স্তনটি খুঁটিতেছে। এই ছবিতে মাতৃমূর্তি সম্পূর্ণ হইয়াছে, শিশুকে স্তন্য দেওয়ার সময় যে প্রশান্ত গরিমায় মাতৃমূর্তি উজ্জল হয়, তাহাও ইহাতে দেখান হইয়াছে। এমন কি কাঠের ভিতর শাড়ী খানির কুঞ্চন ও মাতার বসিবার ভঙ্গী এক অপূর্ণ ভাব জ্ঞোতনা করিতেছে।

এখন বাহারা শিল্প চর্চা করিতেছেন, তাহারা বিলাতী কুচির আভাসে জুজু বনিয়া গিয়াছেন। মাতৃস্তন দেখাইবার সাহস তাহাদের লুপ্ত হইয়াছে। তাহারা দেবাদিদেব দিগম্বর মহাদেবের অধিকারে বাস করিয়া তাহার মূর্তি আঁকিতে ভয় পাইতেছেন। বাঙ্গালী কবি ও চিত্রকরের স্বাধীনতা ও সাহস ১০০ বৎসর পূর্বেও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কবি অবশ্যে আঁধা বধুর সঙ্গে বিবাহিত রাজকুমারীর অতি বিস্তৃত প্রেম বর্ণনা করিতে ভয় পান নাই এবং দিগম্বর

মহাদেব-অঙ্কনের সময় চিত্রকরের মনে হীন রুচির দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই। বাঙ্গলা দেশ ও তৎপ্রভাবান্বিত সিংহল, জাভা প্রভৃতি দেশের ভাস্কর ও চিত্রকরেরা অনাবৃত্তা বক্ষা রমণীমূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বক্ষে সাত লহরী ও পাঁচ লহরী হার গঙ্গাধারার স্থায় বহিয়া গিয়াছে। এখনও বঙ্গের কৃষক-পত্নীরা শরীরের উত্তরার্ক সম্বরণ করে না। বস্তুতঃ শরীরের উত্তরার্ক বে কি হেতু দোষাবহ তাহা সহজ কল্পনায় আসে না। পাশ্চাত্ত্য রুচি পায়ের গোড়ালী সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে কেন, তাহাও আমরা বুঝি না। হিল (থুর) সংযুক্ত জুতা, আমাদেরকে মাতৃ পাদ-পদ্ম দর্শন হইতে বঞ্চিত করিতেছে।

কথিত আছে, এ দেশে পূর্বে “বাঙ্গলা” নামক একটি বড় রকমের সহর ছিল। ইহা গঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন বর্তমান ঢাকা নগরই সেই

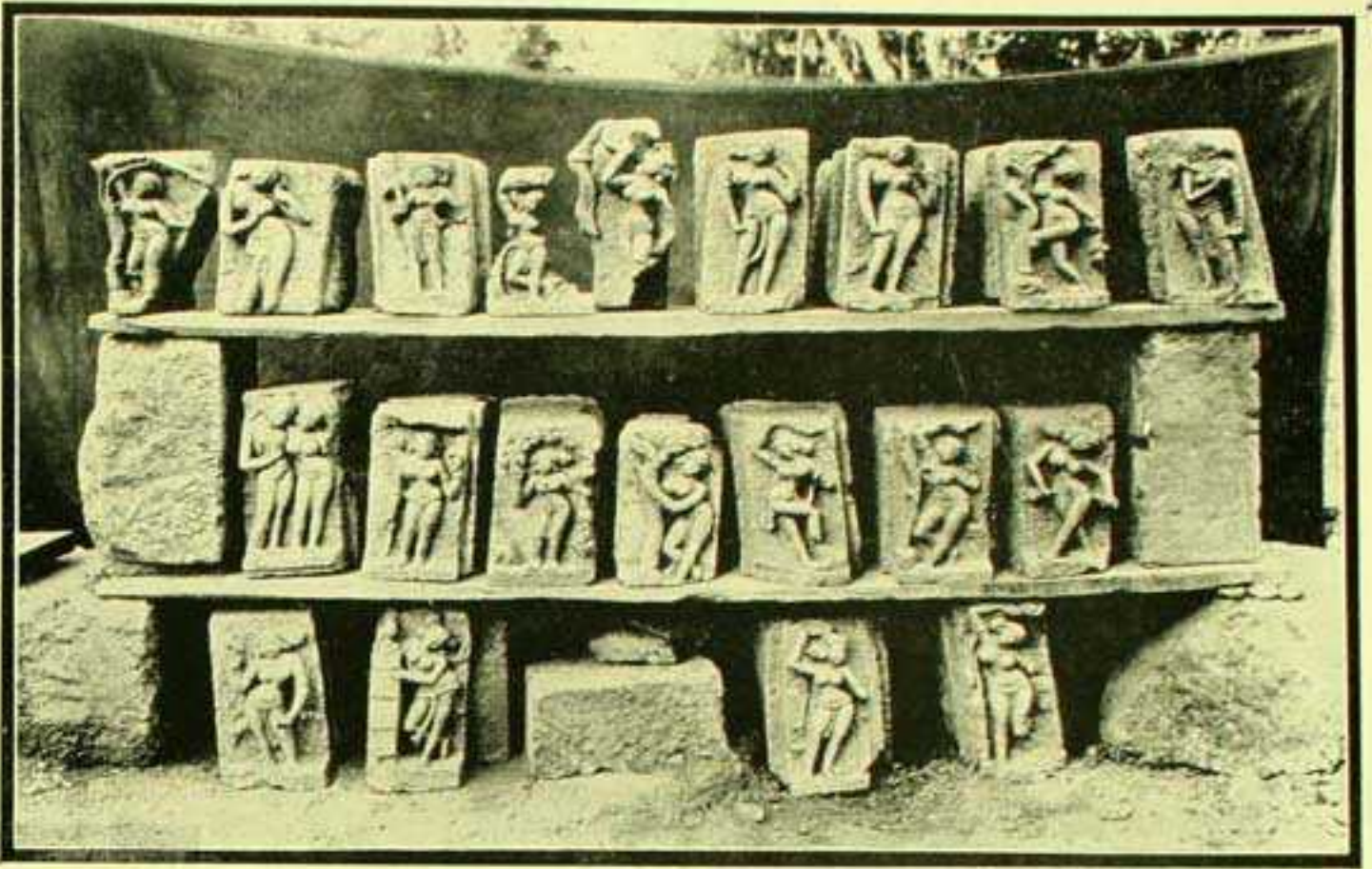
প্রাচীন বাঙ্গলা সহর, এবং বুড়িগঙ্গাই সেই প্রাচীন গঙ্গা;
বাঙ্গলা সহর।

কুন্তিবাসের সময়ও (৫০০ বৎসর পূর্বে) বুড়িগঙ্গার নাম “বড় গঙ্গা” ছিল। প্রাচীন কালের ‘ডবাক’—এখন ঢাকা এবং তৎকাল “বাঙ্গলা বাজার” সেই আদি নামের স্মৃতি অজ্ঞাবধি বহন করিতেছে। এই বাঙ্গলা সহরের সহিত যুরোপের বণিকদের বিদ্যুত রূপ বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। ঢাকার অদূরবর্তী “কাপাসিয়া”—মসলিনবস্ত্রের আদিস্থান। গ্রীস প্রভৃতি দেশে পূর্বকালে “মসলিন বস্ত্র” “কাপাস” নামে পরিচিত ছিল। এই বাঙ্গলা সহর হইতে সুপ্রসিদ্ধ “বাঙ্গলা ঘর” (Bangalow) জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সেই বাঙ্গলা সহরের নাম হইতে সমস্ত দেশটা বাঙ্গলা দেশ নামে পরিচিত হইয়াছে।

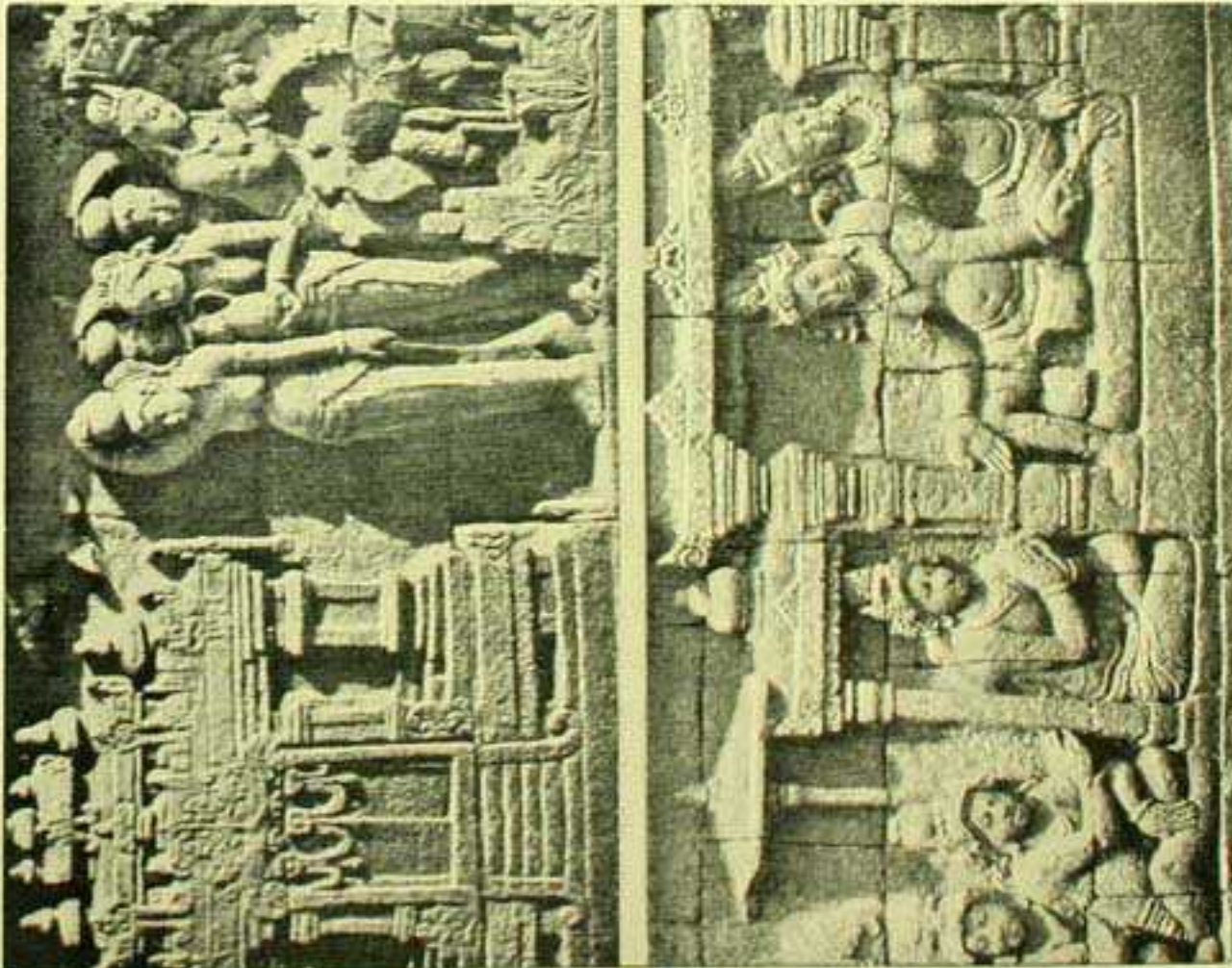
যখন নদীর ভাঙ্গনের ভয়ে পাকা বাড়ী তৈরী করা নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, তখন বঙ্গদেশের স্বাভাবিক শিল্পানুরাগ খড়ো ঘরেই বধা সাধা প্রযুক্ত হইয়াছিল। পূর্বকালে

ময়মনসিং, শ্রীহট্ট, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে এই খড়ো
খড়োঘর।

ঘরগুলির জন্ত লোকেরা মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহাদের স্বাভাবিক শিল্প-শক্তির এমন সকল নমুনা এই খড়ো ঘরে প্রদর্শিত হইত যে, এখনকার দিনে তাহার একটা ধারণা করা শক্ত। পূর্ববঙ্গের গীতিকায় অনেক স্থলে স্বল্প শিল্পকলা-মণ্ডিত খড়ো ঘরের উল্লেখ পাওয়া যায়। মল্লয়া গীতিকার নায়ক চাঁদ বিনোদ এ বিষয়ে একজন ওস্তাদ ছিলেন। তাহার খড়ো ঘর রচনার কথা সেই গীতে বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলির কোন কোনটিতে সাহ বেণের স্ত্রী অমলার “উদয়তারা” নামক ঘরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহার কারুকার্য ও মণিমুক্তার কালর ও সোণার “টুনি” প্রভৃতির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যখন বাঙ্গালী বণিকদের বিশ্ব-ব্যাপক বাণিজ্য ছিল, তখন ঐ সকল খড়ো ঘরের পাছে অজস্র অর্থ ব্যয় হইত। কবির বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইলেও উহা সাময়িক শিল্প-সম্ভারের কতকটা আভাস দিতেছে—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। পূর্ব-বঙ্গে ফরিদপুর জেলায় মধুখালি গ্রামে (উক্ত স্থানে ধানা ও ই. বি. আর. এর স্টেশন আছে) স্বর্গীয় ছরওয়ার জ্ঞান মিত্রার বাড়ীতে ঐরূপ এক খানি ঘর আছে। ময়মনসিংহ-অঞ্চলে কোন কোন স্থানে ছই একটি তরুণ ঘর আছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। এই শিল্প দেশ



রমনীশের শরীরের উত্তরাধি নগ্ন (ময়ূরভক্ত) • ই'গুয়ান মিউজিয়াম (এই পুস্তকের ৪৭৮ পৃষ্ঠা উষ্টব্য।)



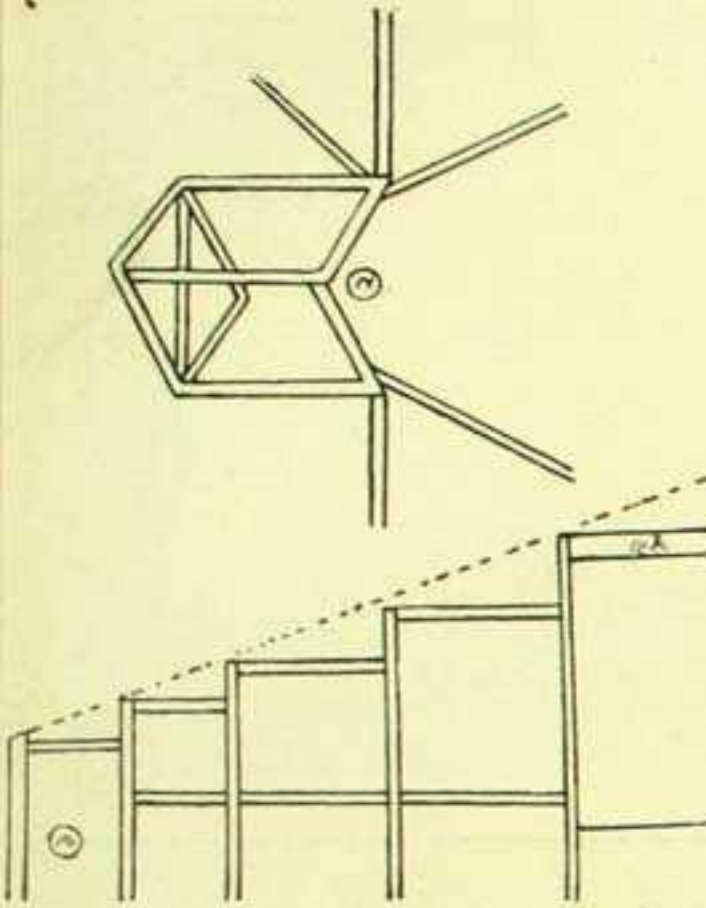
রমনীশের শরীরের উত্তরাধি নগ্ন (বরোবর, ৯ম শতাব্দী, ফাও সনের ইতিহাস, জন মারি কোর
সংস্করণ)। (এই পুস্তকের ৪৭৮ পৃষ্ঠা উষ্টব্য)। এরনও জাটিন ও নুতন বাঙ্গলার খাতি

পত্নী-শিল্পে এই রীতি বিজ্ঞান। ভূমিকা ২০ পৃষ্ঠার ১৫ইতে ২০শ জুড়ে উষ্টব্য।

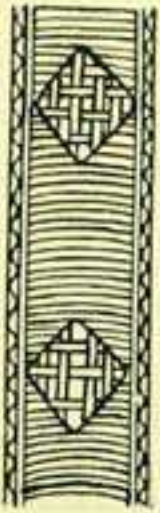
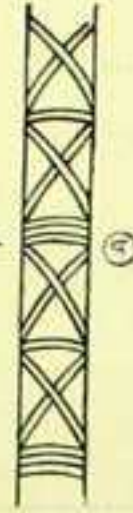
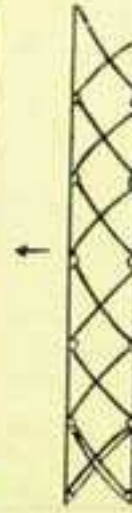
জাতি, বালি, কাথোজিয়া, সিংহল আকৃতি যে যে দেশের শিল্প ও সমাজ

মণ্ডলোদ্ভাবনার প্রত্যাবর্তিত, সেই সেই স্থানে নারীসেহের উত্তরাধি নগ্ন।

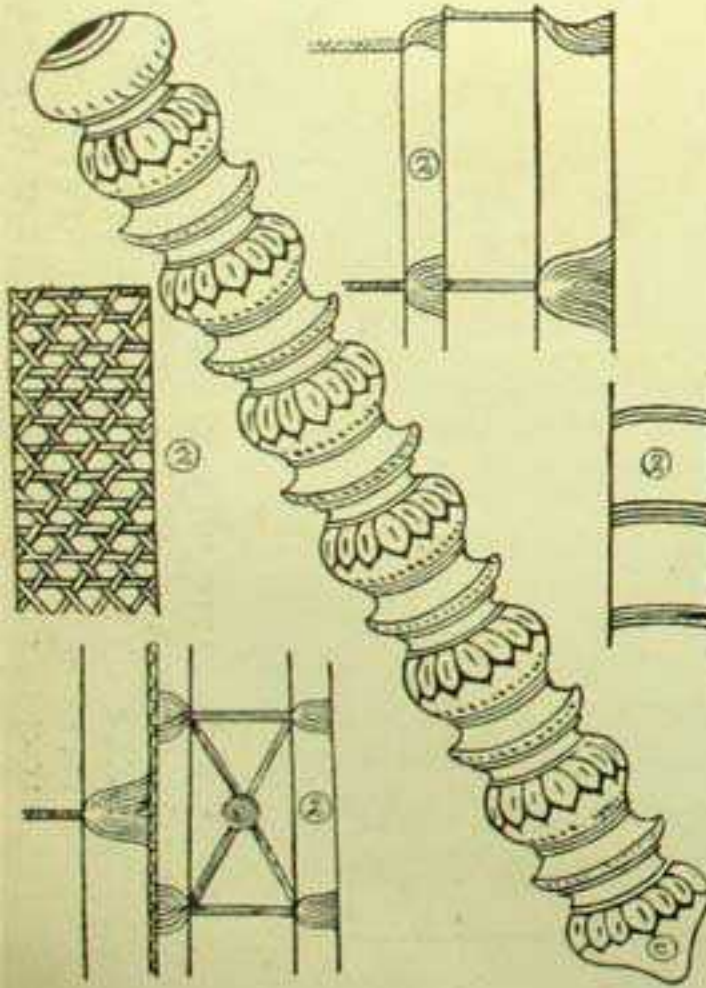
সারওয়ারজান মিয়ার ঘর



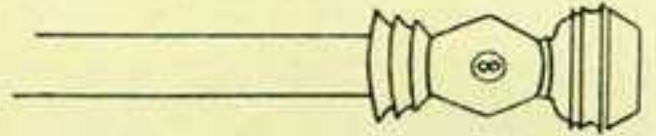
(১)। ঘরের সাজ, অর্থাৎ যে ভাবে পর পর গুলি [সিঁ] দিরা দাখানো।.....চিহ্ন ঘরের এক একটি কোণ নির্দেশ করিতেছে। (২)। চালের 'তীর'গুলি আটকাইবার জন্য এইরূপ 'তীর' বেওয়া হয়।



(৯)



(২)। প্রত্যেক চালের দুইটি কোণে দুইটি কাঠের চিত্রিত "কোণ" থাকে। (৩)। মূল-পাতের "চিত্রিত"। (৪)। "আঠানের" বেতের 'গোঁড়া' বাজান'। (৫)। মূলপাতের ভিত্তরূপ বেতের বীধন, ইহাকে 'জাপকে বীধন' বলে। (৬)। সাধারণ আঠানের বেতের বীধন।



(৩)। প্রত্যেকটি 'ধরোর' গোড়ায় এইরূপ চিত্রিত ফুল। 'ধরো'গুলি তিনরকম ভাবে চিত্রিত। ইহা ছাড়া 'ছাটন', 'কুরসী' ও 'সলা' ইত্যাদি গাঢ় নীলরঙে চিত্রিত। (৭) ও (৮)। সাধারণ 'কুরসী'—কুরসী বেতের বীধন, মাঝে পল্লফুল। গোড় 'কুরসী'র পাখে দুইটি চিত্রিত শলাকা। বেতের বীধন নানারূপ। (৮)। ঘরের প্রত্যেকটি খাম এইরূপ।

সারওয়ারজান মিন্‌গার ঘর



- (৬) শীতল পাটির উপর কাঠের ফুল। সাতেরের বিখ্যাত বহু মূল্য পাটির উপর চিত্রিত অতি সুন্দর বেতের ফুল নির্মিত। শীতল পাটির উপর এইরূপ ফুল তৈরী করাকে "খাঁদারি মারা" বলে।
- (৩) হাতীর শুঁড়ের মত কাঠের সহিত "ডাক" জলি আটকানো আছে।
- (৫) শীতল পাটির উপর কাঠের ফুল।

হইতে চলিয়া গেল। এখন পাকাবাড়ী—অন্ততঃ টিনের ঘর—লোকের আদরণীয় হইয়াছে। খড়ো ঘরের জন্ত কে আর এত শ্রম—এত অর্থব্যয় করিবে? আর এখন সে শিল্পের উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। কারণ যে সকল গুণ এ দেশের ভূষণ ছিল, যাহা মিগাভিনিস, হিউনসাজ, কাহায়েন প্রভৃতি বিদেশী পর্য্যটকেরা শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন, সেই সত্যবাদিন্দ, সারল্যা ও ধর্মভয় বাঙ্গলা দেশ হইতে তিরোহিত হইবার মধ্যে আসিয়াছে। ৮১০ হাজার টাকা খরচ করিয়া অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার যে গৃহ নির্মিত হইবে, তাহাতে হরত পরদিন তাহার প্রতিবেশী বন্ধু, অল্প কোন কারণ না থাকুক, শুধু হিংসার বশবর্তী হইয়া আগুন ধরাইয়া দিবে। সুতরাং এখন আর সেই প্রাচীন শিল্পের উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই নাই। ছারওয়ার জান মিশ্রের বাড়ীর কতকটা ধারণা নিম্নলিখিত বিবরণে পাওয়া যাইবে।

ঘরখানি চারি চালা বিশিষ্ট, সে দেশে ইহাকে “চৌরী” ঘর বলে। পূর্ববঙ্গে একরূপ ছন জন্মে তাহাকে “উলু ছন” বলে। এই উলু ছনের উল্লেখ পূর্ববঙ্গ-গীতিকার অনেক স্থলে পাওয়া যায়। সাধারণ ছন হইতে এই উলু ছন দীর্ঘ, স্থূল ও অনেক কাল স্থায়ী। এই উলু ছনকে

খুব কায়দা করিয়া “কুলিছন” তৈরী করিতে হয়। মুঠির মধ্যে

উলু ছন এক এক আটি ধরিয়া ধরিয়া তাহা ছাটিতে হয়, কোন একটি খড় বড় বা ছোট না হয় এইভাবে বাছাই হয় এবং সমান করিয়া কাটিতে হয়। তৎপরে এই “কুলি” ছনের এক এক আটি বিস্তৃত করিয়া সাজান হয়। চালের উপর ছন খুব পুরু করিয়া প্রত্যেকটি স্তর নির্মিত হয়, প্রত্যেক ছয় ইঞ্চি ব্যাপক ছনের স্তরের পর ‘আঠন’ (বাঁশের চটা উহা খুব সরু করিয়া গোলাকৃতি করে তাহারই নাম “ছাওনৌ কাঠি।”)। এইরূপ স্তরে স্তরে “কুলিছন” চালের সঙ্গে বাঁধিয়া ‘চালা’ (উপরকার দিক্) পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। উপরের দিকটা ঐ ছনই মোড় দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এমন করিয়া বাঁধে যে তাহা দেখিতে খুব সুন্দর হয়। এই চালের নীচের দিকটাই অতি সরু—কারুকার্য্যময় ‘পাটা’ থাকে। এই পাটাকে পূর্ববঙ্গে “শীতলপাটা” বলে। ইহার দাম খুব বেশী। কখনও কখনও এক খানির দাম ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত হইত। শীতল পাটাতে আটকাইবার জন্ত “ছাটন” (স্থূলভাবে চাঁচা বাঁশের চটা) ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি প্রত্যেক চার আঙ্গুল পরে পরে “ছাটন” থাকে, “ছাটন”-গুলির সঙ্গে “ফুরসো” (ছাটন হইতে বড় অর্ধ গোলাকৃত চাঁচা বাঁশ) বন্ধ এবং আড়ি-ভাবে আবদ্ধ থাকে। এই ‘ফুরসো’র সহিত দড়ি (‘তাইতা’) দিয়া চালের উপরকার আটন আবদ্ধ থাকে। এই সমস্ত বাঁধনে “কুলি ছন” খুব শক্ত ভাবে আঁটা থাকে। “ফুরসোর”

সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন পাকা বাঁশের নাতিস্থূল গোলাকৃতি “রুয়ো”

ছারওয়ার জান মিশ্রের ঘর। আড়াআড়িভাবে বাঁধা হয়, ইহাতে চাল এত শক্ত হয় যে কেহ চালের উপর তাণ্ডব নৃত্য করিলেও তাহা হেলে না। রুয়োকে আটকাইবার জন্ত বাঁশের “চটা” সর্ব্বনিম্নে আবদ্ধ হয়, এই প্রশস্ত চটাকে “মুখজোত” বলে। চালের একেবারে সম্মুখের সাজানো দিকটাকে “মুখ পাত” বলে। এখন ঘরের মধ্যে গিয়া উঠে তাকাইলে যে দৃশ্য দেখা যায় তাহা বর্ণনাভীত, যে সকল বাঁধ ও আটনের কথা বলা হইয়াছে সেই সমস্তই

নানা বর্ণে রঞ্জিত ও তাহার প্রত্যেকটিতে অসীম দৈর্ঘ্যের পরিচায়ক শিল্পকার্য আছে। বিচিত্র বর্ণের ফুল ও লতাতে উপরকার দৃশ্য অতি মনোরম হয়। নানা কারুকার্য-মণ্ডিত খুঁটির সঙ্গে কাঠের “ডাফ” দিয়া চাল আঁটা হয়। এই ডাফগুলির কোনটি নরাকৃতি, কোনটি হাতীর শুঁড়ের মত, কোনটিতে পরী বা অল্প কোন জীবজন্তুর মূর্তি গড়া থাকে। যেখানে যেখানে বেতের “গোরা”, সেইখানে সেইখানে বিচিত্রবর্ণ পশুপক্ষী ও ফুলপল্লবের কারিগরী। স্নকী বেত অতি সূক্ষ্মভাবে চাঁচিয়া তাহাতে নানা কায়দা করিয়া লতাপাতা বা ফুলের আকারে গের্ডোগুলি (গ্রাহি) গড়া হয়। নিম্ন হইতে উর্ধ্বে তাকাইলে মাঝে মাঝে শীতল পাটা ও বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত গের্ডো এবং ঠেকাগুলি অদ্বুত অদ্বুত মূর্তিতে এমন শোভাময় দেখায় যে চক্ষু সেই চারু দৃশ্যে ভুলিয়া যায়। খাশা অথবা বাশের খুঁটিতে যে বাশ থাকে এবং বাহার সঙ্গে চাল আঁটা থাকে তাহাকে ‘পাড়’ বলে। আবার ঘরের ভিতরে চালাকে শক্ত এবং উঁচু করিয়া রাখিবার জন্য ডাফের যে সরু বাশ দিয়া চালা বাধা থাকে সেই বাশকে তীর বলে, যে বাশের বিস্তৃত চটার দ্বারা বাধা থাকে তাহাকে ‘রয়ো আঠন’ বলে। এই শিল্প-শোভা প্রতিপদে অজন্তার ছাতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ছরওয়ার জান মিঞার খড়ো ঘর, পোঃ মধুখালি, গ্রাম বনমালদিয়া, জেলা ফরিদপুর। এই ঘরখানি প্রথমে ওস্তাদ রাজলোচন ঘরামী প্রস্তুত করিতে উদ্ধত হইয়া শেষে ভয় পাইয়া মিঞার নিকট অস্বীকার করে। কিন্তু তাহার এক আনাড়ী সাগরেং মহিম নমঃশূত্র এই ঘর অতি প্রশংসা ও গোরবের সহিত সমাধা করে। ইহা প্রস্তুত করিতে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে ১২,০০০ টাকা খরচ পড়িয়াছিল। পূর্বে এই ঘরে একটিমাত্র আলো আলাইলে সমস্ত ঘরখানি “মিনাপাত” এবং “অন্নে” প্রতিবিম্বিত হইয়া আলোকিত হইত। কিন্তু বর্তমানে “মিনাপাত” একেবারেই নাই, অল্প কিছু আছে। যে ঘরামী দিনে একটিমাত্র রয়ো প্রস্তুত করিতে পারিত, সেই চাকুরী পাইয়াছে; এবং মহিম নাকি প্রত্যেকটি জিনিষেরই পরীক্ষা করিবার জন্য জিনিষগুলির উপর দিয়া একগাছি রেশমী সূতা টানিয়া লইয়া যাইত, যদি সূতাটি ছিঁড়িয়া যাইত, তবে বুঝা যাইত যে জিনিষ ভালভাবে মসৃণ হয় নাই। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, এই চিত্র-বিচিত্র সর্কারসুন্দর শিল্পীর তপস্তার ফলস্বরূপ ঘরখানি দেখিলেই অজন্তার কারিগরদিগের কথা মনে পড়িবে। সে সার্কভোম রাজচক্রবর্তীরা আর নাই, স্তরাং পাথরের সে বিরাট স্বপ্ন গড়িবার পরিকল্পনা কে করিবে? কিন্তু তথাকার কারিগরের বংশধরেরা যে সেই অপূর্ণ শিল্প তাঁহাদের দীন দরিদ্র উপকরণ লইয়া এইরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি ও তপস্তার অর্ঘ্য সাজাইয়াছে, তাহাতে কে সন্দেহ করিবে? যত্ন সেই শিল্পিকুল, তাহারা নাম যশ অর্থ চাহে নাই কিন্তু বহু কষ্ট, দারিদ্র্য ও অভাব উপেক্ষা করিয়া যুগযুগান্তের তপস্তার ফল লইয়া আসিয়া আমাদের দিকে দিয়াছে। যদি তাহারা অর্থ কি প্রতিষ্ঠা চাহিত, তবে এ তপস্তার ফল দেশের চুর্দিনে আমরা পাইতাম না। শিল্প ছিল তাহাদের হোমকুণ্ড, অনাহারে, অর্জনশূন্যে এই আহিতান্নিগণ সেই হোমানল আলাইয়া রাখিয়াছে। আমরা মৃত, তপাতা ইংরাজী শিখিয়া ইহাদিগকে ঘৃণা করিতেছি, কলালক্ষী মুখ ফিরাইয়া একটু অশ্রু মুছিতেছেন।

যিনি নিজ চক্ষে এই ঘরখানি না দেখিবেন, তিনি এই শোভার একটা ধারণা করিতে পারিবেন না। প্রতি অবকাশ-স্থল, প্রত্যেক কক্ষ, ছাটন ও ফুরশি এমন সামঞ্জস্য-সহকারে নিয়মিত এবং প্রত্যেক জিনিষের ব্যবধান এরূপ স্থানীয়স্থিত যে মনে হয় যে কারিগর প্রতি স্থল কার্যের জন্ত গজকাঠি হাতে করিয়া কাজ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের এই শিল্পশিক্ষা বংশানুক্রমে এরূপ বিস্তৃতভাবে হইয়া আসিয়াছে, যে কোন গজকাঠি বা মানদণ্ডের সাহায্য ব্যতিরেকে সমস্ত জিনিষ কারিগরের স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানে সম্পাদিত হইয়াছে। চালটা পূর্বে ছই হস্ত পরিমিত পুরু ছিল, এখন আর উহা অত পুরু নাই। এই পুরু চালের নীচে দাঁড়াইয়া দারুণ গ্রীষ্ম কালেও সর্বদা জুড়াইয়া যায়। চালের মধ্যে মধ্যে সুদর্শন আবেশ চিত্রিত ছবির কারিগরী সর্বত্র। অপরাপর বিবরণ ;—৪ খানি চালা, চালা হইতে “মুখপাত” পর্য্যন্ত এক একটি “ধরো” ৪০ হাত। ঘরের দৈর্ঘ্য ৩৫ ফিট—এক একটি “আঠন”ও ৩৫ ফিট। ঘরখানি প্রস্থে ৩০ ফিট, খাড়াই ২৪ ফিট। এক একটি চালে ২০টি “ধরো,” ৫৪টি “আঠন,” ১৮৫টি “ফুরশি,” ৪৫০টি “ছাটন,” ১৭০টি “সলা,” ১৪টি “পট,” ৭টি “মুখপাত,” ৫টি “পাড়,” ৪০টি “ডাফ,” ১০টি খুঁটি, বারান্দায় ৮টি খুঁটি (ভিতরে) ও ২০টি “তীর” উপরি ভাগে একটি “ঢালা”।

ছরওয়ার জান মিক্রা এখন জীবিত নাই। তিনি অতি বৃদ্ধবয়সে মারা গিয়াছেন, তাঁহার পুত্রের বয়সই প্রায় পঞ্চাশ। এই ঘরখানি প্রায় ৮০ বৎসরের উৎকর্ষকাল হইল নির্মিত হইয়াছিল। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সময় ইহাতে ব্যয় পড়িয়াছিল ১২,০০০, (বার হাজার) টাকা। তখন বাশ, বেত প্রভৃতি উপকরণের মূল্য এবং শিল্পীদের দক্ষিণা অতি অল্প ছিল। সেই সময়কার একখানি খড়ো ঘরে যে বার হাজার টাকা ব্যয় হইতে পারে তাহা অসম্ভব মনে হইবে, কিন্তু ঘরখানির ভিতর দাঁড়াইলে মনে হইবে যে এখন যদি উহা কেহ নির্মাণ করিতে চাহেন তবে উহা অপেক্ষা অনেক গুণ খরচ করিয়াও কারিগরের অভাবে তিনি সফলকাম হইবেন না। কথিত আছে কোন বড় লোকের মেয়েকে ছরওয়ার জান বিবাহ করেন, তিনি পিত্রালয়ে বড় পাকা বাড়ীতে বাস করিয়া স্বামিগৃহের খড়ো ঘরের কথা শুনিয়া একটা জুর ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। মিক্রা মনে বড় দাগা পাইয়া তাঁহার জন্ত এমন একখানি খড়ো ঘর তৈরী করাইলেন, যাহা এখনও বহুদূর হইতে লোকে দেখিতে আসে ; অর্থাৎ ছরওয়ার জানের স্বপ্নের প্রাসাদোপম গৃহের শেষ ইষ্টকখানাও এখন বিলুপ্ত হইয়াছে, খড়ো ঘরের মহিমায় লোকে এখনও মুগ্ধ হয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্প দেবারাধনা বা রমণীর প্রেমের প্রেরণা পাইয়া চিরকাল বিকাশ পাইয়াছে। •

* এই ঘর খানি কয়েক দিন হইল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ২০শে আষাঢ়ের (১৩৪১ বাং) আনন্দবাজার এই নিদারুণ সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। “৩০,০০০ টাকা মূল্যের খড়ের ঘর—অপূর্ণ শিল্পবস্ত্র বজ্রপাতে ভগ্নদূত। (নিজস্ব সংবাদবাহতার পত্র), বালিয়ারকান্দি, ২রা জুলাই। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ভূদণা থানার অধীন বনমালদিয়া নিবাসী জমিদার সরাজান মিক্রা সাহেবের খড়ের ঘর খানি বজ্রপাতে একবারে ভগ্নদূত হইয়াছে।

চালের খুব পুরু ও শক্ত গাঁথনির দরুন ঘরের নিম্নের দিকটায় বহু বৎসরেও এক ফোঁটা জল প্রবেশ করিতে পারিত না, এই জন্তু চালের নিম্নভাগ নানাক্রমে সজ্জিত করা হইত। অনেক সময়ে ময়ূরের পাখা এবং সময়ে সময়ে মাছরাঙ্গা পাখীর পালক দিয়া তাহা সাজান হইত। (“মাছুয়া পক্ষের পাখা দিয়া সাজুয়া বানায়।”—মলুয়া, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৬২ পৃ°)। উৎকৃষ্ট ঘরগুলি যে সকল বাঁশ ও বেত দিয়া নির্মাণ করা হইত, তাহা সাধারণ বেত ও বাঁশ অপেক্ষা অনেক ভাল, কারণ তাহা গৃহস্থেরা আলাদা রকমের চারা তৈয়ারী করিয়া যত্নের সহিত উৎপাদন করিত। সময়ে সময়ে একটি সূক্ষ্ম বেত ২৩ শত হাত লম্বা হইত। এখনও পূর্ববঙ্গের কোন না কোন পল্লীতে সেরূপ বেত জন্মান হয়। খাঁটি বাঙ্গালী ঘরের সকল কাজই বাঁশ, বেত ও ছন দিয়া সম্পাদিত হইত, সূতা দিয়া যেক্রপ কাঁথা বা শালে নানাক্রপ ফুল, লতা ও জীবজন্তু প্রস্তুত করা হয়, শুধু সূক্ষ্ম বেত দিয়া সেইরূপ কারুকার্য হইত, সেই বেত চাঁচিয়া প্রায় সূতার মত সূক্ষ্ম করা হইত। বাঁশের দ্বারা নানাক্রপ জীবজন্তুর মুখ ও অবয়ব নির্মিত হইত। সূতরাং খাঁটি বাঙ্গালী গৃহস্থ খুব কমই কাঠ প্রভৃতি অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করিতেন। যত অল্প ব্যয়ে সম্ভব, তাহারই উপর তাহাদের অমূল্য কারুকার্য চলিত। পুরাণ কাপড়ের উপর, পুরাণ শাড়ীর সূতা বাহির করিয়া যেক্রপ কাশ্মীরী শালের মতন কাঁথা তৈরী হইত, এই সামান্য সামান্য উপকরণে তরুণ বাঙ্গলার পল্লীর সুদর্শন অপূর্ণ কারুখচিত খড়ো ঘর তৈয়ারী হইত। এককালে বঙ্গদেশে এইরূপ ‘ঘর’ অনেকেই প্রস্তুত করিতেন। এদেশে পাকা বাড়ী নির্মাণ নিরাপদ ছিল না, অথচ যে সকল শিল্পী অজস্র-গুহা ও মগধের রাজপ্রাসাদ কারুকার্য-খচিত করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরেরা সেই পৈত্রিক শিল্প-বিজ্ঞান বাহুকাঠি ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হন নাই। রাজার ঐশ্বর্য্য ও মন্দির এবং ক্রমপ্রস্তুতের আসবাব, তাহারা কোথায় পাইবেন? সূতরাং বেত ও বাঁশের সামান্য উপকরণ লইয়া তাহারা অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন; এদেশ দেবী ভারতীর নিজ স্থান, তাই প্রকাণ্ড বিহারগুলির শ্মশানে খড়ো ঘরের টোল বসিয়া গেল—ভারতীর আসন টলিল না। যে সকল শিল্পী তাহাদের অত্যাশ্চর্য্য শিল্প-মহিমায় জগৎকে বিস্মিত করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরেরা বহুন্মূল্য উপকরণের অভাবে, ছেঁড়া কাপড়, ছুঁচ সূতা, পিঠালী, বাঁশ, বেত ও খড় লইয়া বসিয়া গেলেন। এই স্থান শিল্পের ‘জন্মস্থান,’ যত বার সেই শিল্প নষ্ট করিবে, ততবার তাহা ভিন্নরূপ দরিদ্রা মাথা আগাইবে।

বাঙ্গলা দেশে যে এইরূপ ঘর অনেক ছিল, তাহার প্রমাণ শুধু পল্লী-গীতিকায় নহে—

এই ঘর খানি ৩০,০০০ টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত করা হইয়াছিল ও ইহার শিল্প বৈশুণ্য ও সৌন্দর্য্যের কথা এতবকলে অবশ্য-বাক্যের স্ফায় প্রচলিত ছিল। দূর দূরান্তর হইতে বহু লোক এই ঘর খানি দেখিতে আসিত। বনমালমিয়া কাপুখালি-ভাটিয়া-পাড় রেলের মধুখালি স্টেশনের নিকট বাড়ী।” ১২০০০ টাকা অথবা ৩০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারিব না।

আইন-ই আকবরিতেও আছে। আবুল ফাজল লিখিয়াছেন, “বাঙ্গালীদের ঘরগুলি প্রধানতঃ বাশ দ্বারাই নির্মিত হইয়া থাকে। ইহাদের কতকগুলিতে ৫০০০ টাকা কিংবা ততোধিক অর্থ ব্যয়িত হয়—এই ঘরগুলি খুব দীর্ঘস্থায়ী হয়।” (“Their (of the Bengalees) houses are chiefly made of bamboos, some of which will cost five thousand rupees and upwards and are of a very long duration.” Ain-i-Akbary, Pt. I, Soobha of Bengal, p. 303.) একখানি ঘর প্রস্তুত করিতে ৫০০০ এবং ততোধিক টাকা সেই সময়ে ব্যয় হইত, এখনকার দিনে ঐ টাকার মূল্য অনেক অধিক।

“ভেলুয়া” নামক গীতিকায় সদাগরের বাড়ী ও জাহাজগুলির যে বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে, ভাবিয়াছিলাম উহা নিছক কল্পনা, কিন্তু এখন মনে হইতেছে ঐ বর্ণনায় অতিরঞ্জন থাকিলেও তাহা সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ছরওয়ার জান মিঞার বাড়ীর মত সাবেকী ধরণের ঘর এখনও বঙ্গদেশের নানা স্থানে জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় নিগৃহীত হইয়া পড়িয়া আছে। দৃষ্টান্তস্বলে আমরা বীরভূমের অন্তর্গত “সীমাং” গ্রামের একজন ব্রাহ্মণের বাড়ীর ঘরের উল্লেখ করিতে পারি। গ্রামখানি বোলপুর হইতে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ঘরের মধ্যে নানা কারুকার্য, তাহা বেতের বাধনে ময়ূর, ফুল ও নানারূপ মূর্তি তুলিয়া সম্পাদিত হইয়াছে। কাঠের আড়ার মধ্যে নানারূপ মূর্তি খোদাই করা। ঐ ঘরখানি ২০০ বৎসর পূর্বে তৈয়ারী হইয়াছিল। ত্রিপুরা-ষ্টেটের রাজধানী আগরতলায় কর্নেল মহিমচন্দ্র ঠাকুরের বাড়ীতে ঐরূপ একখানি ঘর ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। খুলনা জেলার আসাসনি গ্রামের নিকট কোন পরীতে প্রতাপাদিত্যের সময়কার কাঠের একখানি ঘর ছিল, তাহাতে কাঠনির্মিত নানা দেবদেবী ও মানুষ এবং পশু-পক্ষীর মূর্তি গৃহের খুঁটি ও প্রাচীরের শোভাবর্দ্ধন করিত, তাহার কিছু কিছু উপাদান আমার কাছে আছে। বাকুড়া জেলার পাত্রসায়ের গ্রামে ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ হাজরা, এম. এ. ও তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের বাড়ীতে সারওয়ার জান মিঞার ঘরের মত এখনও একখানি প্রাচীন ঘর বিদ্যমান। যিনি আমাকে এই সংবাদ দিয়াছেন, তিনি বলিলেন—“এই ঘরখানির শিল্প-কার্য অদ্ভুত,—বেতের বাধনে ও কাঠের কাজে ময়ূর ও পশুপক্ষীর মুখ অতি উৎকৃষ্টভাবে নির্মিত হইয়াছে। বর্ণবৈচিত্র্যে, স্থল কারুকার্যসম্পদে, ও অপ্রত্যাশিত নানারূপ মনোহর চাকরলায় প্রাচীন ঘরখানি এখনও দর্শনীয় হইয়া আছে। এই একখানি খড়ো ঘর নির্মাণ করিতে যে অর্থব্যয় হইয়াছে তাহাতে অনায়াসে একখানি দ্বিতল বাড়ী নির্মিত হইতে পারিত।*

* এই ঘরখানি সম্প্রতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি বাকুড়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয়কে এই ঘরের একখানি ফটোগ্রাফ পাওয়া যায় কি না, তৎসম্বন্ধে নজান লইতে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি ২২শে জুন (১৯০৪) আমাকে লিখিয়াছেন—“আমি গত ২০শে জুন ডাঃ হাজার বাড়ীতে গিয়াছিলাম; আমি জানিতে পারিলাম, সেই শিল্প-সৌন্দর্যশালী প্রাচীন গৃহখানি গত ভূমিকম্পে একবারে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে (levelled to the ground).” এই অল্প সময়ের মধ্যে উক্তরূপ ঘরগুলির অনেকটি নষ্ট হইয়া গেল। বঙ্গের শিল্পলক্ষ্মী কি নিতান্ত অনাবর পাইয়া এই হতভাগ্য দেশকে ত্যাগ করিয়া গেলেন?

কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের “আমার জীবন” পুস্তকের ৪র্থ খণ্ডে (৬ পৃষ্ঠা) ৬০ বৎসর পূর্বে নির্মিত এইরূপ কতকগুলি ঘরের উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, “রাজার ঝি” দীঘির পাড়ে (নোয়াখালী—ফেনী মহকুমায়) এই গৃহগুলি দেশীয় ঘরামীরা ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে নির্মাণ করিয়াছিল। “প্রত্যেক ঘরের স্বতন্ত্র আকৃতি, প্রত্যেক ঘরের পনের কি বিশ চাল, নানারূপ কোণ ও চক্রে প্রত্যেক ঘরের স্বতন্ত্র শোভা। এ অঞ্চলে কি কোন অঞ্চলে এমন কবিত্বপূর্ণ বাশের ঘর কেহ কখনও দেখে নাই। বাশের কুটির যে এমন সুন্দর হইতে পারে, এ ধারণাও কাহারও ছিল না। এ অঞ্চলে এই সকল ঘর লইয়া মহা হলধূল পড়িয়া গেল। বহুদূর হইতে দলে দলে লোক এই সকল গৃহ দেখিতে আসিতে লাগিল।”

এই সকল সুনিপুণ শিল্পীরা বোধহয় এখনও নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। তাহাদের অপূর্ণ শিল্পের ক্ষেত্র নষ্ট হইয়াছে,—সুতরাং যে ছ একজন আছে তাহারা হয়ত সাধারণ ঘরামী সাজিয়া কোনরূপে জীবিকা নির্বাহ করিতেছে; আর ৮১০ বৎসর পরে তাহাদের কাহাকেও আর পাওয়া যাইবে না। যে ভাবে খোদাই করা ইটের শিল্প নষ্ট হইয়াছে, প্রস্তরবিগ্রহের অল্পপম ভাস্কর্য্য অন্তর্হিত হইয়াছে, কঙ্কাকারিগণের অপূর্ণ সৌবনশিল্প লুপ্ত হইয়াছে, ঢাকার মসলিন গিয়াছে,—দেশের বিচিত্র প্রেমভক্তিপূর্ণ চিত্র-কলা ধ্বংস পাইয়াছে, সেই ভাবে এই বাঙ্গালী ঘরামী,—অপূর্ণ কর্ম্মী কুটির-নির্মাণগণের কারিগরী বিলুপ্ত হইয়াছে। এজন্ত দায়ী আমরা;—এখনও হয়ত উদ্ধারের কোন কোন পথ একবারে নিরুদ্ধ হয় নাই।

আমরা ভারতীয় স্থাপত্যের পুনরুদ্ধারকল্পে কৃতসম্মত শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অমুরোধ করিতেছি, তিনি এই বিষয়ে অবহিত হউন। বড় বড় ইষ্টকালয়ের জন্ত বাঙ্গলার স্থাপত্য প্রসিদ্ধ নহে,—বাঙ্গলা দেশের প্রাচীন পল্লীগুলি এই সকল খড়ো ঘরের সম্পদে শ্রীমন্ত ছিল, এখনও যখন ইহাদের নিদর্শন একবারে লুপ্ত হয় নাই—এবং চেষ্টা করিলে অতি বৃদ্ধ—গৃহনির্মাণপটু কারিগর ছই একজন কোন পল্লীর কোণে হয়ত এখনও মিলিতে পারে, তখন কি এই স্থাপত্যকে উৎসাহ দিয়া পুনরুজ্জীবিত করা আমাদের উচিত নহে?

এই সকল শিল্পীদিগকে আমরা কোন উৎসাহই দিই নাই। তাহারা শুকাইয়া মরিতে বসিতেছে। আমরা করিহিয়ান ও গদিক স্থাপত্যের আলোচনায় ততক্ষণ প্রোক্ত হইয়া ‘ডাক্তার’ উপাধির জন্ত বিলাত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিতেছি। শিল্প-লক্ষ্যী যে বাড়ীর এত কাছে, তাহার কোন সন্ধানই লই নাই।

বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে, যেখানে পাহাড়িয়া মাটা শক্ত, সেখানে মাটির সুন্দর সুন্দর

ঘরের বেগালে চিত্র।

ঘর এখনও প্রস্তুত হইয়া থাকে। গৃহ-লক্ষ্মীরা সেই সকল ঘরের

দেওয়ালে যে সকল চিত্র আঁকিয়া থাকেন, তাহার শোভায় মুগ্ধ

হইয়া শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত উক্ত জেলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং সেই চিত্রের ফটোগ্রাফ লইয়া তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন। তিনি একখানি গ্রাম সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছেন, “সেই গ্রামের প্রতিটি দেয়াল, প্রতিটি ধাম, দরজা, জানালা,

মেয়েদের হাতের ছবিতে সূচিত, জানালাগুলির চারিদিকে নানারূপ কঙ্কা ও ফুলময় লতা। দেয়ালে দুর্গামূর্তি এবং অপরাপর দেবমূর্তি কিংবা পৌরাণিক বা সামাজিক দৃশ্য অঙ্কিত। গ্রামখানিতে ঢুকিয়া মনে হইল, যেন কোন চিত্রশালায় প্রবেশ করিয়াছি। গ্রামখানির চিত্রগুলির মধ্যে যে রংএর খেলা দেখা যায় তাহাতে চোখ জুড়াইয়া যায়, মাটির ঘরের একরূপ রূপলাবণ্য এবং সমস্ত পল্লীর একরূপ অপরূপ সৌন্দর্য ধারণা করা যায় না।" চিত্রগুলি ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতিতে আঁকা, কিন্তু তাঁহাদের প্রধান গুণ, রংএর খেলায়। একরূপ ভাবে রং দেওয়া হইয়াছে বাহাতে দর্শনমাত্র বিষ্ময় জন্মে। গ্রামখানি বাদলা দেশের ক্ষুদ্র একটি অজস্রা বলিয়া মনে হয়।

ইহা ছাড়া "টঙ্গিবাড়ী" বা "জলটুঙ্গী" নামক একরূপ ঘরের বহু প্রচলন ছিল। দীঘি বা পুকুরের মধ্যে বড়লোকেরা পাকা কোটা নিৰ্ম্মাণ করিতেন, সাধারণ গৃহস্থেরা খুঁটি পুঁতিয়া খড়ো ঘর নিৰ্ম্মাণ করিতেন, তাহা নানারূপ কলাশিল্পে মণ্ডিত হইয়া জলের উপর জলপদ্মের মত উচু হইয়া থাকিত। চারিদিকে কুমুদ ও পদ্মফুল ফুটিত, তাহার গন্ধে সুবাসিত বায়ু গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহীর অঙ্গ পুলকিত করিত, গ্রীষ্মকালে দম্পতীরা তাহাতে সুখে বাস করিতেন। পাকা জলটুঙ্গী ঘর আমরাও দেখিয়াছি। এখনও কোন কোন দীঘির নীচে পাকা ঘরের ভিত বা চূড়া নৌকা বাহিব্যবসায় সময়ে লগিতে ঠেকে।

গৃহস্থের ঘরের আসবাব প্রায় সমস্তই তাহার নিজের অথবা মেয়েদের হাতের তৈরি। বড় মানুষের বাড়ীতে খাট-পালঙ্কের উপর গ্রাম্য ছুতোর মিস্ত্রীরা নানারূপ মূর্তি ও ফুলপল্লব উৎকীর্ণ করিত। এখানে বলা উচিত যে সেকালের এই সকল সাত্তের নীতল পাটী। ছবির মধ্যে ঘোড়ার খুর অথবা শেকলের প্যাটার্ন থাকিত না। মেয়েরা পানের বাটা ও জলপাত্র বা হাঁড়ি রাখিবার জন্ত নানা শিল্পশোভিত শিকা তৈরি করিতেন; দেয়ালে ছবি আঁকিতেন। পাথার উপর, শাঁথের উপর নানারূপ কারিগরী প্রদর্শিত হইত। প্রত্যেক গৃহলক্ষ্মী কলালক্ষ্মীর ছায়া নিপুণভাবে বাঁশের উপর, মাটির ভাঙের উপর নানারূপ বিচিত্র কারুকার্য করিতেন। গৃহের সমস্ত কাজ করিয়াও তাঁহাদের মনে যে আনন্দ ও ভালবাসা ছিল তাহার নানা ভাবে অভিব্যক্তি হইত। মিছরি ও চিনির মঠ, পুতুল প্রভৃতির কথা আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি, এখনও গ্রামদেশে তাহা প্রস্তুত হয়, কিন্তু পূর্বে যাহা হইত তাহার তুলনায় এগুলি অতি নগণ্য। পূর্বে যে মিছরির মঠ হইত, তাহা দশ হাত উচু, এখনও ফরিদপুর নলিয়া গ্রামে কালামতি কুণ্ড নামক এক ব্যক্তি ঐরূপ মঠ তৈরি করিতে পারে, অত বড় মিছরির মঠ (নানারূপ স্থল কারুকার্যখচিত) দেশান্তরে লইয়া যাওয়া কঠিন, এজন্য আমি ২১ হাত উচু একখানি আনাইয়াছিলাম। ভয়ানক বৃষ্টির ছাট লাগিয়া কারুকার্য কতকটা গলিয়া গিয়াছিল এবং শেষে উহা সম্পূর্ণরূপ গলিয়া গেলে আমরা প্রায় ২৫ জন লোক উহা মুড়ি দিয়া মাখাইয়া সন্ধ্যাবহার করি। মঠের চারিদিকে ময়ূর ও পরী প্রভৃতি উৎকীর্ণ থাকে। মঠ ছাড়া একরূপ বাঘ, ভালুক, হাতী,

ঘোড়া, ময়ূর ও মিছরি বা চিনি দিয়া প্রস্তুত হইত। এখনও পূর্বোক্ত ব্যক্তি অর্ডার পাইলে তাহা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে। ফরিদপুর জেলায় সাঁতের নামক গ্রামে এরূপ মাদুর ও পাটী নিৰ্ম্মিত হইত, বাহার কারুকাৰ্য্য অতুলনীয়, শ্রীহট্টে সেই পাটী কখনও কখনও হাতীর দাঁত দিয়া তৈরি হইত। দাবা খেলিবার ঘর, পুষ্পোচ্ছান প্রভৃতি সেই পাটীতে অতি সুন্দর সৌন্দর্য্য সহকারে বুনন হইত। একখানি পাটীর মূল্য সেই আমলেও ৫০০০, এমন কি হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইত। এখন সেই কারিগরের বংশে আর কোন কৃতী লোক আছে কিনা জানি না। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের দুটি দান—একটি মসলিন আর একটি শীতল পাটী। আমরা মসলিন ধ্বংস করিয়াছি, কারণ আমরা তাহার মূল্য ও উপযোগিতা বুঝিতে পারি নাই। শীতল পাটী আর বাজারে বিক্রয় না, দামী বিলাতী ‘রাগু বা কম্বল’ ব্যবহার করিয়া থাকি। দুঃখের বিষয় আমরা যেরূপ বিলাতী নকলের হিড়িকে অস্বাভাবিক কষ্ট করিতেছি, দেশের আবহাওয়াটা সেইরূপ নকলবিজ্ঞা শিখে নাই। তাহা না হইলে এদেশে এত দিনে শীতপ্রধান হইয়া যাইত। আমরা মেদিনীপুর জেলার একখানি পাটীর প্রতিলিপি দিতেছি। ইহার মূল্য ২৫০ টাকা। একটিমাত্র বৃদ্ধ এরূপ পাটী নিৰ্ম্মাণ করিতে পারেন। তৃণ-লতা চাচিয়া প্রায় সূতার মত সুন্দর করা হইয়াছে। যে অধ্যবসায় ও নৈপুণ্য এই পাটীতে দেখা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত এখনকার দিনে বিরল। শ্রীহট্টের শীতল পাটীও নানা কারুকাৰ্য্য-খচিত, হাতীর দাঁতের পাটী, শাখের উপর ফোদিত নানারূপ দেবদেবীর মূর্তি, ত্রিপুরার শিল্প-খচিত “রিয়া” বস্ত্র, বাহা বড়মাহুদের বিলাস-কলার বস্ত্র ছিল, তাহা বিলাতী হিড়িকে এখন ক্রমশঃ বিরল হইয়া পড়িতেছে। চট্টগ্রামের মেয়েরা কলার নূতন পাতাকে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া তাহা কতকটা শক্ত করিয়া লন, তাহার উপর শেষে নানারূপ ছবি উৎকীর্ণ করিয়া সেই চিত্রলাঙ্ঘিত কদলীপত্র দিয়া মুড়িয়া বিবাহের পর নূতন আত্মীয়দের বাড়ীতে পান পাঠাইয়া থাকেন; এরূপ কদলীপত্র একটা দেখিবার জিনিষ বটে। শ্রীহট্টে এবং অপরাপর স্থানে মেয়েদের কপাল তিনবার রং দিয়া চিত্রিত করেন, অতি অল্প পরিসর ক’নের কপালে যেরূপ সুন্দর কারিগরী প্রদর্শিত হয়, তাহা অতি আশ্চর্য্য। বাঙ্গলার নানাস্থানে শিকার মধ্যে শুধু ফুল, লতা, পল্লব নহে, রাধাকৃষ্ণ ও অপর দেবদেবীর মূর্তি সূতা দিয়া নিৰ্ম্মিত হয়—তাহাও বিশেষভাবে দর্শনীয়। সূতরাং দেখা যায় পূর্বযুগের মেয়েদের প্রত্যেকে এক একটি কলা-লক্ষী ছিলেন। মেয়েলী শিল্প বাঙ্গলা দেশে এককালে যতটা বিকাশ লাভ করিয়াছিল, অল্প কোন দেশে এত দিক্ দিয়া তাহা বিকাশ পাইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। বাঙ্গলার “শিকে” বাহাতে কোঁটা, ভাঁড়, হাঁড়ি, জলপাত্র ও পানের বাটা প্রভৃতি ঝুলাইয়া রাখা হয়, তাহার মধ্যে নারীহস্তের কমনীয় শিল্প যে কত প্রাচীন রীতির পরিচায়ক তাহা বলিতে পারি না। মহাভারতে বাসুদেব ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। (এই পুস্তকের ২৩৫ পৃষ্ঠা ১১ ছত্র দ্রষ্টব্য)। নারিকেলের মালা দিয়া প্রাচীনকালে নরমুণ্ড প্রস্তুত হইত, সেই মুণ্ডে নারিকেলের গাছের উপাদান ছাড়া আর কিছু ব্যবহৃত হইত না। মুখের দাড়ি, গোপ, চুল নারিকেলের ছোবড়ায় তৈরী হইত। উহা একটা দেখিবার জিনিষ ছিল।

আমার এই পুস্তকে আমি হিন্দুর আমলে গৃহস্থের বাড়ীঘরের কথা লিখিলাম। পাকা বাড়ীর স্থাপত্য সম্বন্ধে অনেক ইংরেজী পুস্তক পাওয়া যাইবে। আমি আমাদের দেশের মঠমন্দিরের কয়েকখানি প্রতিচিত্র দিব। উহাতে অতি পুরাকাল

অস্তিত্ব শিল্পদ্রব্য।

হইতে বাঙ্গালী-স্থাপত্যের বিশেষত্ব কতকটা দৃষ্ট হইবে। দোতলা ঘরের মত মন্দির বাঙ্গালীর সৃষ্টি,—এই দেশ হইতে তাহা জগতের সর্বত্র অন্তর্কৃত হইয়াছে।

বাঙ্গালী গৃহিণীর হাতে রান্নার যে উন্নতি হইয়াছিল তাহাও অতীব প্রশংসনীয়, রন্ধনবিদ্যায় ইহাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কৃতিত্ব ছিল। আমরা সন্দেশের কথা বলিয়াছি। এই

আমিষ ও নিরামিষ রান্না।

সমস্ত গৃহস্থালীর মধ্যে বাঙ্গালী মেয়েদের মেহ, প্রেম ও ভক্তির অন্তর্নিহিত প্রবাহ টের পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি সামগ্রীর মধ্যে তাহাদের অসামান্য ধৈর্য ও কৌশল দৃষ্ট হয়। প্রেম, মেহ প্রভৃতি স্বর্গীয় ভাবের প্রেরণায় তাহারা এরূপ চাকুর্য্য করিতে পারিতেন। এক একখানি ভাল কাঁধা দেখিলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে।

আমিষ রান্না হইতে নিরামিষ রান্নারই ইহারা বেশী কৃতিত্ব দেখাইতেন। নিম্নে কতকগুলি আমিষ ও নিরামিষ রান্নার উল্লেখ-সম্বলিত বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের পত্রাঙ্ক নির্দেশ করিতেছি। পাঠক এই অংশগুলি পাঠ করিয়া দেখিবেন, এই সকল রান্নার অধিকাংশই অতি অল্পমূল্যের উপকরণ দ্বারা সম্পাদিত হইত, অথচ তাহা এত সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর ছিল যে, এখনকার রেস্টোরাঁগুলির সমৃদ্ধ দ্রব্যের সম্ভার তাহাদের তুলনায় দেশীয় স্বাস্থ্য ও সুবুচির একেবারেই উপযোগী নহে। এই সকল রান্না দস্তরমত কলা-বিদ্যার অন্তর্গত ছিল, গৃহলক্ষীদের ভালবাসার গুণে তাহাদের করপদ্ম হইতে ইহাদের উদ্ভব। আমরা অধুনা নানারূপ বিলাতী খাদ্যের অনুকরণের কসরৎ করিতে যাইয়া এই মুখরোচক, স্বাস্থ্যকর ও লোভনীয় বিদ্যাটি হারাইতে বসিয়াছি। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের ৪, ১৯৭, ১৯৮, ২২১, ২২২, ২৪৫, ৩৩৩, ৪৭৯ এবং ১৩০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ছাংখের বিষয় এই যে আমাদের সহরগুলির অলিগলিতে সাহেবদের দেখাদেখি আমরা রেস্টোরাঁ খুলিতেছি, তাহাদের একটির মধ্যেও দেশী রান্নার কিছুই পাওয়া যায় না। আমাদের রুচি এমনই বিকৃত হইয়াছে যে, এই দেশে এত নেংড়া, বোম্বাই, ফজলি আম এবং ভাল ভাল ফল থাকা সত্ত্বেও সেই সকল রেস্টোরাঁতে তাহার একটিও থাকিবার উপায় নাই। যেহেতু সাহেবদের দেশে ঐসকল ফল নাই, তাহাদের রেস্টোরাঁতে তাহারা কোন ফল রাখেন না। এমন কি কলিকাতা সহরে বাঙ্গালীর বড় বড় রেস্টোরাঁতে একখানি ভীমনাগের সন্দেশ বা একটি ডাব পর্য্যন্ত রাখিবার ব্যবস্থা নাই।

পালরাজ্য অবধি ভারতীয় দেবমূর্তি বুদ্ধদেবের প্রশান্ত গরিমাকেই আদর্শ করিয়াছিল, বড়বোদরের অপূর্ণ বুদ্ধমূর্তি, যাহাকে হাডেল সাহেব পৃথিবীর

ভাষ্য।

সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের গৌরব দিয়াছেন, এবং কাশীতে তিলভাণ্ডেশ্বর-মন্দিরে রক্ষিত জটাশঙ্কর-মূর্তি, বঙ্গ দেশের রাজসাহী জেলার থানা তাজোরের অধীন

মাদারিপু্রে প্রাপ্ত অধুনা বরেন্দ্র সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত বুদ্ধমূর্তি, ত্রিপুরার চৌদ্দগ্রামে প্রাপ্ত স্বর্ণমণ্ডিত চণ্ডীমূর্তি, কলিকাতা মিউজিয়ামের (২য় পি, ৩৪৯) তরুণ শিবমূর্তি, দেবপাল দেবের রাজ্যাক্ষচিত্রিত নালন্দার বিষ্ণুমূর্তি, ঐ রাজার রাজত্বকালে নির্মিত নালন্দায় প্রাপ্ত ধাতব ক্ষুদ্র কুবেরমূর্তি এবং ধাতব বুদ্ধমূর্তি নালন্দায় প্রাপ্ত নালন্দা-চিত্রশালায় রক্ষিত প্রস্তরনির্মিত তারামূর্তি, গুরপা পাহাড়ের উপরে (গয়া জেলায়) রক্ষিত বুদ্ধমূর্তি, অনিরুদ্ধপুরের প্রসিদ্ধ বুদ্ধমূর্তি এইরূপ বহু প্রস্তর ও ধাতব মূর্তিতে বুদ্ধের মহিমাযিত আদর্শ অঙ্কণের চেষ্টা হইয়াছে। এই অপূর্ণ ভাস্কর্যের আধ্যাত্মিক মহিমা সমস্ত চিত্রপণ্ডিত একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছেন। এই প্রশংসাকারীদের প্রধান পুরোহিত হ্যাভেল সাহেব, তাঁহার প্রশংসা স্তোত্রের মত শোনায। বস্তুতঃ মানুষের মনের গৌরব ও চিৎশক্তিকে অবয়বের মধ্যে ফুটাইতে জগতের আর কোন দেশ হিন্দুর মত পারেন নাই। জাভায় একখানি অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি আছে, তাহা চিত্রজগতের অতুল্য সম্পদ। এই মূর্তি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর। ইহার মুখমণ্ডলের দ্ব্যনুর ভাব কমনীয়তার মধ্যে ফুটিয়াছে। সমস্ত দেহে হৃদয়ের স্নেহময় ও আধ্যাত্মিক করুণা এমন মোহিনী শক্তি বিস্তার করিয়াছে যে মূর্তিখানি দেখিলে স্বতঃই মনে হইবে ইহা মানুষের নহে,—অমাত্যবী, স্বর্গীয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধ ও শৈব ভাবের বিভিন্নতা

কিন্তু বৌদ্ধজগৎ দীর্ঘ দীর্ঘে শাস্ত্রভাব অতিক্রম করিয়া চলিল। বৌদ্ধমূর্তির মূল লক্ষ্য শান্তি, কোন কোনটিতে সেই শাস্ত্রভাবের মধ্যে কিছু করুণা মিশ্রিত হইয়াছে, এই শাস্ত্র সমাধির আদর্শ অমূল্য নিস্তরঙ্গ জলধির ছায়া। ইহাতে শান্তির সর্বোচ্চ ভাব আছে এবং মাঝে মাঝে আনন্দ ও করুণার রেখা পড়িয়াছে। আমি পাশাপাশি তিনটি চিত্র দিলাম, একটি সম্যকপ্রবুদ্ধ জ্ঞানসমাধির, তাহাতে সমুদ্রের বক্ষে একটি রেখামাত্র নাই, তাহা স্থির, ধীর, নির্বাত, নিরুদ্ভ,—দ্বিতীয়টিতে একটু আনন্দের ছায়া পড়িয়াছে,—তৃতীয়টিতে করুণার ভাব শেষ রাত্রের ফুলের কুঁড়ির মত অর্ধশুট।

কিন্তু একাদশ শতাব্দী হইতে যৌনভাব সমাজে প্রবেশ করিল; এতদিন বৌদ্ধ-জগতে যৌনভাব অস্বীকৃত হইয়াছিল। বৌদ্ধভাব আত্মগত, নিজের মধ্যে পূর্ণ, কিন্তু শৈবভাবে সহধর্মিণী অপরিহার্য। এই ভাবপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে হিমাদ্রিসদৃশ স্থির সমাধির আদর্শ কতকটা টলিল। গৌরীর মুখমণ্ডলে আবদ্ধ-দৃষ্টি শিব প্রেমের তন্ময় প্রাপ্ত হইলেন। সমাজ

হইতে বিচ্ছিন্ন ধ্যান-মহিমার মধ্যে যেন লীলার মাধুরী দেখা দিল, যেখানে তরুপল্লব ছিল না, সেখানে সবুজ রত্নের খেলা খেলিল। বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম মানুষকে একা একা ধ্যান-পর হইয়া সমাদিপ্রাপ্তির পথ দেখাইয়াছিল। মানুষ সেখানে আত্মস্থ, আত্মগরিমায় পূর্ণ, নিঃসঙ্গ—একা। মল্লমাসমাজের সঙ্গে সাধকের একমাত্র সম্বন্ধ ছিল করুণার। প্রীতির বন্ধন, স্নেহ, ভালবাসা—বৌদ্ধধর্ম প্রথম যুগে অস্বীকার করিয়াছিল। শৈবধর্মও প্রথম যুগে “সোহহম্”এর যে সুর তুলিয়াছিল তাহাও আত্মমহিমায় পূর্ণ, বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু ক্রমশঃ ক্রমশঃ শিব “অর্দ্ধনারীশ্বর” হইলেন। একা তিনি অপূর্ণ, যুগলের পূর্ণতা একক লব্ধ হয় না। বঙ্গদেশের বৈশিষ্ট্য—আধ্যাত্মিক জগৎটা বুকের মধ্যে টানিয়া আনা। অপরাপর দেশে আধ্যাত্মিকতা একটা পোষাকী জিনিষ,—স্বর্গের পথ অনদিগম্য। আদর্শের সঙ্গে এই ব্যবধান বাঙ্গালী রাখিতে চায় না। স্মৃতরাং যখন দ্বী স্বীকৃত হইলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে পুত্র, কন্যা, দাস, দাসী সকলেরই সঙ্গে পুনরায় সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। ভিক্ষুর চক্ষে এ সকল আতঙ্কজনক বিভীষিকা ছিল, সে এই সম্বন্ধগুলি যথাসাধ্য এড়াইয়া আত্মস্থ হইতে চেষ্টা পাইত। কিন্তু এবার শিবের বৃহৎ পরিবার অধ্যাত্ম-জগতে আসন গাড়িয়া বসিল। কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী লইয়া চণ্ডীচক্র গঠিত হইল। তাহাতে নন্দী, ভৃঙ্গী, পালিত সিংহ, ময়ূর ও মুম্বিক পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। শিব এই স্রুবৃহৎ পরিবারের কর্তা, কিন্তু তাহার অনাসক্ত যোগীর ভাব, ভিক্ষুর কামনা-জয় তাহাকে

এখনও ছাড়ে নাই; তিনি এক মুহূর্ত্তে পরিবারবর্গের সঙ্গে বসিয়া আহার-বিহার করেন, ভগবতীর সহিত ঋগড়া বিবাদ করেন, পর মুহূর্ত্তে তিনি জটাঙ্গুট পরিয়া গায়ে চিতার ভস্ম মাখিয়া কোথায় চলিয়া যান, কে জানে? ভিক্ষুর ভাব ও পরবর্ত্তী গোড়ীর বৈষ্ণব ভাব ইহাদের সম্মুখলৈ শিবের আসন। একদিকে যেমন তিনি অর্দ্ধনারীশ্বর, অপর দিকে তেমনই তিনি যোগীশ্বর। একদিকে সোণার শাড়ী ঝলমল করিতেছে, কর্ণে মণিকুণ্ডল চলিতেছে, বেলীবন্ধ কেশের লহরী স্বর্ণসূত্র ও চম্পকদামে সজ্জিত, গলে সপ্ত লহরীতে মুক্তার হার চলিতেছে, শিবের একাধে মণিখচিত মুকুট; অপরাধে পরনে বাঘছাল, অঙ্গ ভস্মমাখা, কণ্ঠে নর-কপালের মালা, কর্ণে বিবাক্ত ধুতুর পুষ্প, শিরে জটাঙ্গুট ঘিরিয়া সর্প কৌস কৌস করিতেছে এবং ভয়ঙ্করী গঙ্গার গর্জন জটার লহরে লহরে শোনা যাইতেছে। এই অর্দ্ধগৃহস্থ, অর্দ্ধ-তাপস মুক্তির নাম অর্দ্ধনারীশ্বর। অর্দ্ধ নর, অর্দ্ধ নারী, গার্হস্থ্যপ্রীতি অঙ্গাদীভাবে তাত্ত্বিক তাপসের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। শিব বুকের মত জগতের উর্দ্ধে নহেন, তিনি জগতের কাছে ধরা দিয়াছেন, অথচ ধরা দেন নাই—ইহাই বঙ্গের বৌদ্ধাবসানের মূর্ত্ত প্রতীক। পরে সেনদের রাজত্বকালে ভাস্করের বাটালি ও চিত্রকরের তুলি—নরচিত্তের ভালবাসা গড়িতে ও আঁকিতে শুরু করিয়াছিল। আমাদের প্রদত্ত শিব-গৌরীর প্রস্তরমূর্ত্তির ভগ্নশেষ লক্ষ্য করুন; শিবের চক্ষু ও করাদ্বলীতে কত স্নেহ ও মাধুর্য্য ঝরিয়া পড়িতেছে। বৌদ্ধ চিত্র, ভাস্কর্য্য ও জীবনে এই ভাবটি ছিল না। সবে ভাস্কর ও চিত্রকর এই নূতন ভাবের

অনুপ্রাণনায় তাঁহাদের সাজসরঞ্জাম তহপযোগী করিয়া তৈরি করিতেছিল, এমন সময়ে মূর্তি-ধ্বংসকারী দল দেখা দিলেন, চিত্রকরের তুলি ও ভাস্করের বাটালি হস্তচ্যুত হইল। স্মৃতরাং বৌদ্ধ শাস্তির ভাব বেরূপ চিত্রে, শিলা বা ধাতব বিগ্রহে এক অনায়ত্ত অনধিগম্য লক্ষ্যকে চুশ্চর তপস্তা দ্বারা করতলগত করিয়াছিল, প্রেমের অক্ষর ও তাহার অধ্যাত্মতত্ত্ব তেমন করিয়া চিত্রপটে বা ভাস্কর্য্যে ফুটিতে পারে নাই। অত্যাচারীদের প্রলয়ঙ্কর চেষ্টায় ভাস্কর্য্য বঙ্গদেশ হইতে একেবারে লুপ্ত হইল। লক্ষ্মণসেনের পরে ভাস্করের অতুলনীয় বিপণির দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। গত সাত শত বৎসরে একখানিও উৎকৃষ্ট শিলামূর্তি এদেশে গড়া হয় নাই। ভক্তিরত্নাকরে দৃষ্ট হয়, নদীয়ার প্রসিদ্ধ ভাস্কর নবীন ঘোড়শ শতাব্দীতে পাথরের দেবতা তৈরি করিতেন, কিন্তু তাহার অবিকাংশই লিঙ্গমূর্তি, বাহা অত্যাচারীরা ভাঙ্গিবে না। সে সকল ছই তিন মণ ওজনের স্বর্ণবিগ্রহের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা

উপস্থাপন।

দেখিতে পাই, তাহার শতাংশের একাংশও কি আর স্বর্ণকার গড়িতে উৎসাহ পাইত। অত্যাচার অনেক সময়ে ছই ভাবে চলিয়াছে—

একদফা কোথায়ও কাহার বাড়ীতে কোন্ সুন্দরী রমণী আছেন—তাহার সংবাদ দিবার জন্ত “সিদ্ধুকী” নামক গুপ্তচর নিযুক্ত ছিল, এবং অপরেরা কোথায় কোন্ দেবতা নির্মিত হইতেছেন বা আছেন তাহারও খবর দেওয়ার জন্ত গুপ্তচর সর্বত্র আনাগোনা করিত। এ অবস্থায় সোণারূপার বিগ্রহ আর কে রচনা করিবে? বড় জোর অতি ক্ষুদ্রাকারে অষ্ট ধাতুর মূর্তি গড়িতে ছই এক জন শিল্পী চেষ্টা পাইত। কুমারেরা মাটির মূর্তি গড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু বাহা তিন দিন পরে নদীতে ডুবাইয়া দিতে হইবে তাহার উপর কি কোন শিল্পী সহিষ্ণু ও অধ্যবসায়জাত কারুকার্য্য প্রদর্শন করিতে উৎসাহ পাইত? শিল্পীর তপস্তা আজীবন তপস্তা। সেই তপস্তায় কনারক, ভুবনেশ্বর, খেজুরাহ, অজন্তা, অমরাবতীর শিল্পের উদ্ভব। কোনরূপে ভয়ে ভয়ে মূর্তি গড়িয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তাহা জলে বিসর্জন দিতে পারিলে মুখ রক্ষা হইত। এইভাবে কি শিল্পীর কার্য্যের প্রতি তাঁহার কোন অনুরাগ বা প্রবৃত্তি থাকিতে পারে? বাঙ্গলার বীতপাল ও ধীমানের বংশধরগণ তুলি ও বাটালি ফেলিয়া লাঙ্গল ধারণ করিল।

কিন্তু শৈব-ধর্ম্মের প্রভাবে যে যোন লীলা প্রকটিত হইয়াছে তাহা তাম্রশাসনের ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। তাহার ভাষা এই ভাবের,—“গৌরীর স্তনযুগ্মের প্রতি শিবের তৃতীয় নেত্রের আলো পড়াতে ব্রীড়াযিতা গৌরী অবগুষ্ঠন টানিয়া বক্ষের আবরণ লইয়া ব্যস্ত হইয়াছেন, তদ্বর্শনে যে শিব মন্দ মন্দ হাসিয়া পত্নীর এই সলজ্জ ভাব উপভোগ করিতেছেন, সেই শিব আমাদের কল্যাণ করুন।” শিবলীলা এখানে ভাবী কৃষ্ণলীলার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। শৈব-সাহিত্য হইতে আমরা দেখাইব যে গঙ্গাকে যেমন ভগীরথ শিবের জটার উদ্দেশ্যে হইতে ভূতলে আনিয়াছিলেন, এই শৈব ধর্ম্মও সেইরূপ বৌদ্ধ সমাধির সমুচ্চ রাজ্য হইতে বৈষ্ণব-প্রেমকে বঙ্গদেশে লইয়া আসিয়াছিল। একদিকে তাম্রশাসনে হরগৌরীর নানা ভঙ্গীতে ব্যক্ত লীলায়িত কামকলা, অপর দিকে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর লীলা-বিলাস একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে যুগল-মূর্তির বিশেষত্ব হইল। বিজয়সেনের দেওপাড়া অনুশাসনে (একাদশ শতাব্দী) “বক্ষোহংসুকাহরণ

সাম্প্রদায়িকমৌলিভিমালাছটাহতরতালয়দীপভাসঃ,” ভট্টদেবের ভুবনেশ্বর-তাম্রশাসনে “গাঢ়োপ-
গৃঢ়কমলাকুচকুস্তপত্রমুদ্রাদ্বিতেন বপুযা পরিরিঙ্গমানঃ,” (১০২৫-১০৫০ খৃঃ)। ১২৪৩ খৃঃ অব্দে
সম্পাদিত দামোদরের চট্টগ্রাম-অনুশাসনে “দেবি প্রাতরবেহি নন্দনবনানন্দঃ কদধানিলো
বাতি ব্যস্তকরঃ শশীতি কৃতকেনালপ্য কোতুহলী। তৎকালখলদঙ্গভঙ্গিম চ মালিন্দ্য লক্ষ্মীং বলাদ
লোলাননবিচুধনপরঃ প্রীণাতু দামোদরঃ” এবং একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আসামের রাজা
ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে বন্দনার শ্লোকে হরগৌরীর পাশা-খেলায় গৌরীর জয়-উপলক্ষে তাঁহার
দাবী (“শিব, তোমার সর্বস্ব খট্টাঙ্গ, পরশু, বৃষ, শশিকলা প্রভৃতি আমি জিতিয়াছি। কিন্তু
সমস্তই আমি ফিরাইয়া দিলাম। কেবল গঙ্গা আমার জল বহিবার কিঙ্করী হইয়া থাকিবে।”)।
এ সমস্তই যৌন লীলার আবির্ভাব-যুগ সূচনা করিতেছে। শেষোক্ত পদের বহুস্তি খেলায়
পরাস্ত শিবমূর্ত্তিকে অতি উপায়হীন ও করুণ করিয়া পরবর্ত্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের বাজি
রাখিয়া খেলার দৃষ্টের আভাস দ্ব্যতনা করিতেছে—“জিনিলে তোমার লব মোহন মুরলী,
হারিলে তোমারে দিব বেশর কাঁচুলী।”

শৈব সময়ের ভাস্কর্য্যে বৌদ্ধ-যুগের সাহস ও মৌলিকতা পাওয়া যায় না। দেশের
জ্ঞানের তপস্বী নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং প্রেমের সাধনা ভাল করিয়া শুরু হয় নাই। সূত্রাং
পূর্ব যুগের তপোলব্ধ উদ্ভাস এবং দ্বিধাশূন্য রেখাপাত লাক্ষণ্য যুগের শিল্পে নাই। এই অভাব
পূরণ করিয়াছে অলঙ্কারবাহুল্য। মহৎ ভাবের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে শিল্পী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারিগরী
লইয়া ব্যস্ত হইতে পারিতেন না। অলঙ্কারের বাহুল্যে মহান্ ভাব পদে পদে বাধা পায়।
লাক্ষণ্য-যুগের শিল্পে শিল্পী কারিগরী লইয়া অধিক ব্যস্ত হইয়াছেন, তথাপি ক্রমশঃ যে গার্হস্থ্য
প্রেমের—বিশেষ দাম্পত্যের লীলা—সমাজে প্রবেশ করিয়াছে তাহা হরগৌরী এবং বাসুদেবের
মূর্ত্তির পরিকল্পনায় ধরিতে পারা যায়। পূর্ব যুগের একখানি বাসুদেবের মূর্ত্তি ও লক্ষণসেনের
সময়কার বাসুদেব দুইটির চিত্র এখানে দেওয়া যাইতেছে, প্রথমটিতে বৌদ্ধ শাস্ত্রের মধ্যে
আনন্দের রেখাপাত মাত্র, এখানি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর; দ্বিতীয়খানি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ
ভাগের, ইহাতে অলঙ্কারবাহুল্য সর্বত্র চোখে পড়ে। প্রথমখানি একটা উচ্চ রাজ্যের
সংবাদ দিতেছে, কিন্তু দ্বিতীয়খানি মানুষের কমনীয়তা ও সৌকুমার্য্য-মাখা। “ইহার অঙ্গ
নয়নে তেরছ চাহনৌ” এবং ওষ্ঠের মাধুর্য্য ও অল্পম হাসি দাম্পত্য ও যৌন ভাবের পরিচয়
দিতেছে। যদি এই শিল্প আর একটু অগ্রসর হইতে পারিত, তবে বোধ হয় এই অলঙ্কার-
বাহুল্য থাকিত না, গোড়ের অনাগত প্রেমের আদর্শ চিত্রকর তুলিতে আঁকিতে পারিতেন।
চণ্ডীদাসের মত নিরাভরণ, প্রেম-সর্বস্ব, জগদ্বিস্মৃত অহুরাগ তাহা হইলে যে রূপ সাহিত্যে
সেইরূপ শিল্পেও হয়ত আমরা পাইতাম। কিন্তু শিল্পজগতে বুদ্ধ বড় হইয়া রহিলেন, কৃষ্ণ ততটা
উজ্জ্বল উঠিতে পারিলেন না।

কিন্তু তাই বলিয়া যে লক্ষণসেনের সময়ে চিত্রের মহিমান্বিত আদর্শ একেবারে অন্তর্হিত
হইয়াছিল তাহা নহে। সুপ্রসিদ্ধ যশোরেশ্বরীর মূর্ত্তির প্রশংসা করিতে যাইয়া সতীশচন্দ্র মিত্র
মহাশয় দস্তর মত স্তুতিপাঠ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

“এ মূর্তি এক অপূর্ণ ভাস্কর-শিল্পের নিদর্শন ; এমন অতুলনীয় সর্বাঙ্গসুন্দরী পাষাণময়ী দেবী যশোর-খুলনায় আর কোথাও নাই, সমগ্র বঙ্গদেশে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ-হল। শিল্পী এ মূর্তির মুখমণ্ডলে যে অল্পপম দেবভাব ফলাইয়া শিল্পকলার চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হই হাত তুলিয়া (?) প্রশংসা করিবার জিনিষ। দেবদেবীর মূর্তির বদন-মণ্ডলের চতুঃপার্শে এক স্বর্গীয় জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া থাকে, ইহা মুখের ভাষায় বৃদ্ধান যায়, চিত্রপটে বর্ণরেখায় প্রতিফলিত করা যায়, পাষাণের ভাষায় পাষাণের গায়ে পাষাণের রেখায় সে ভাব অভিযাক্ত করা অতীব দুঃসাধ্য, কিন্তু এ ক্ষেত্রে শিল্পী সাধকের মত সে কার্য্যও সিদ্ধ করিয়াছেন। (যশোর-খুলনার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, ২২৮ পৃঃ।)

সাহিত্যে যখন বৌদ্ধ-যুগের সংসার-বিরাগের ভূত আমাদের ঘাড় হইতে নামিল, তখন দীর্ঘ যুগের কঠোর বৈরাগ্যের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঘর-গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি লইয়া ধর্মপুস্তক রচনা হইতে লাগিল। প্রথম উপাস্ত্রুল শিব ঠাকুর, তিনি চাষাদের হাতে পড়িয়া চাষা হইলেন। ভীম নামক এক ভূত্যের সাহায্যে তাঁহার ভূমিকর্ষণ, ত্রিশূল বাধা দিয়া লাঙ্গল ক্রয়, ইন্দ্রের নিকট হইতে পদ্মনী জমি-লাভ, শস্তক্ষেত্রে পাহারা দেওয়া, চুপ লাগাইয়া জোক মারা, ক্ষেতে কাদামাটি ছানিয়া আইল তৈরি করা, হাঁটু পাতিয়া বসিয়া ক্ষেত্র-নিড়ানের কার্য্য—দল দুর্কা, সোণা দুর্কা

ত্রিশিরা দূর করিয়া বাবর্চে, চৌচুড়া প্রভৃতি আগাছা উৎপাটন করা
চাষার হাতে শিবঠাকুর। ইত্যাদি বহুবিধরূপ কৃষিকার্য্য মহাদেব করিতেছেন, তাহা আমরা

প্রাচীন শিবাঙ্গনগুলিতে পাইয়াছি। এই শিবাঙ্গনগুলির প্রাচীনতমগুলি প্রায় লক্ষণসেনের সমকালবর্তী, তখনও বাঙ্গলা গান ভদ্রসাহিত্যের অন্তর্গত হয় নাই। শিবের এই কৃষি-সম্বন্ধে যে সকল ধানের নাম পাওয়া যাইতেছে, তাহার অনেকগুলিই এখনকার চাষাদের অগোচর। সে সকল ইন্দ্রচন্দ্রসদৃশ রাজচক্রবর্তী নাই,—যাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহসেবার জন্ত শত শত কৃষক উৎকৃষ্ট দান্ত প্রস্তুত করিবার জন্ত প্রাণপণে লাগিয়া যাইত এবং বাঙ্গলার পল্লীতে যখন কৃষকগণ তাঁহাদের ফসল কিরূপে উৎকৃষ্ট হইবে, আজীবন তাহার তপস্তা করিত। শিবাঙ্গনে কতকগুলি দান্তের নাম আছে, যাহার অর্থ বুঝাইতে পারে এমন লোক এখন বিরল। হরিশঙ্কর, হাতী-পাঁজর, হরকুলি, হাতীনাড়, হীকি, হলুদগুঁড়া, কেলে কাম্বু, কেলেজীরা, কালিয়া, কাষ্টিকা, কয়কচা, কাশীকুল, কপোতকজী, কালিন্দী, কটকী, কুসুমশালী, কনক-চুড়, ছধরাজ, ছর্গাভোগ, পরদেশী, ধুস্তর, কুম্ভাশালী, কুমারভোগ, কুমারপূর্ণিমা, কন্দীলতা, কনকলতা, কামোদ-গরিমা, খেজুরথুপী, খয়েরশালী, ক্ষেম গঙ্গাজল, গদ্যাবলী, গদ্যভোগ, গৌরী-কাজল, গন্ধমালতী, গুয়াথুপী, গুণাকর, চামরচালী, চন্দনশালী, ছত্রশালী, জটাশালী, জগদ্বাণভোগ, জামাইলাড়ু, জলারঙ্গী, জীবনসংযোগ, ঝিঙ্গাশালী, বলাইভোগ, ধুজা, নিমুই, নন্দনশালী, রূপনারায়ণ, বাতাসাভোগ, পায়রারস, পিপীড়াবাক, তিলসাগরী, বাকশালী, বাকইবুয়ালী, দাড়বঙ্গী, বাকচুড়, বুড়ামাত্রা, রামশালী, রঙ্গী, রাজ্যমেটে, রামগড়, রঞ্জয়, লক্ষ্মীপ্রিয়া, লাউশালী, লক্ষী কাজল, ভবানীভোগ, ভোজনা, ভুবন-উজ্জল, সীতাশালী, শঙ্করশালী, শঙ্করজটা,—এই সকল দান্ত শিব তাঁহার ক্ষেতে ভীমের সাহায্যে জন্মাইয়াছিলেন।

কিন্তু এই সকল নামেই শেষ নহে। কবি লিখিয়াছেন, “কত নাম কব তার কহিছ কিঞ্চিৎ।” বাঙ্গলা ভূমি শস্তশালিনী বলিয়া আমরা গান বাঁদিয়াছি। কিন্তু কত শত শ্রেষ্ঠ, বহু তপস্কালক ধাত্তের প্রকারভেদ আমরা হারাইয়াছি। কুবকেরা ক্ষেত্রে এখনও কি কি ফসল উৎপন্ন করে, বাহা গিয়াছে তাহা ফিরিয়া পাইবার এবং বাহা বিলোপের পথে তাহা রক্ষা করা সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, কিছুই করি না। শুধু ধাত্ত নহে, বিদেশ হইতে নানারূপ সুস্বাদু ফলের চারা এদেশে জাহাজে আনীত হইয়া বঙ্গীয় বাগানের ত্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীহট্টের সুপ্রসিদ্ধ “ডিম্বা মাণিক” কলা নিশ্চয়ই কোন দূর দেশ হইতে বাঙ্গলার জাহাজে আনীত হইয়াছে, সবার দেশ হইতে সুপ্রসিদ্ধ “সবরী” কলার আবির্ভাব; এক সময়ে কর্ণের রাজধানী অঙ্গদেশ হইতে ফুল ফল বঙ্গদেশে আমদানী হইয়াছে। “চাঁপা কলা ও চাঁপা ফুল” আমরা এইভাবে পাইয়াছি; “সাত ভাই চম্পা” প্রভৃতি বাঙ্গলা ছড়ার উপরও চম্পক-নগর কতকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বিক্রমপুরের “মোহন বাঁশী” কলাও সেন কি পাল-রাজার হইতে কোন দূর দেশ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। জাবা দ্বীপ হইতে খুব সুপ্রাচীন যুগে “জবা” ফুল আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ প্রাচীন সংস্কৃতে জবা ফুলের নাম নাই। শেষকালে “জবাকুসুমসঙ্কাশং” প্রভৃতি শ্লোকের উৎপত্তি। জবার দ্বারা একরূপ লাল ফুল এ দেশে ছিল, তাহাকে ‘ওড় ফুল’ বলিত, প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে ওড় ফুলের উল্লেখ অনেক স্থলে দেখিতে পাই।

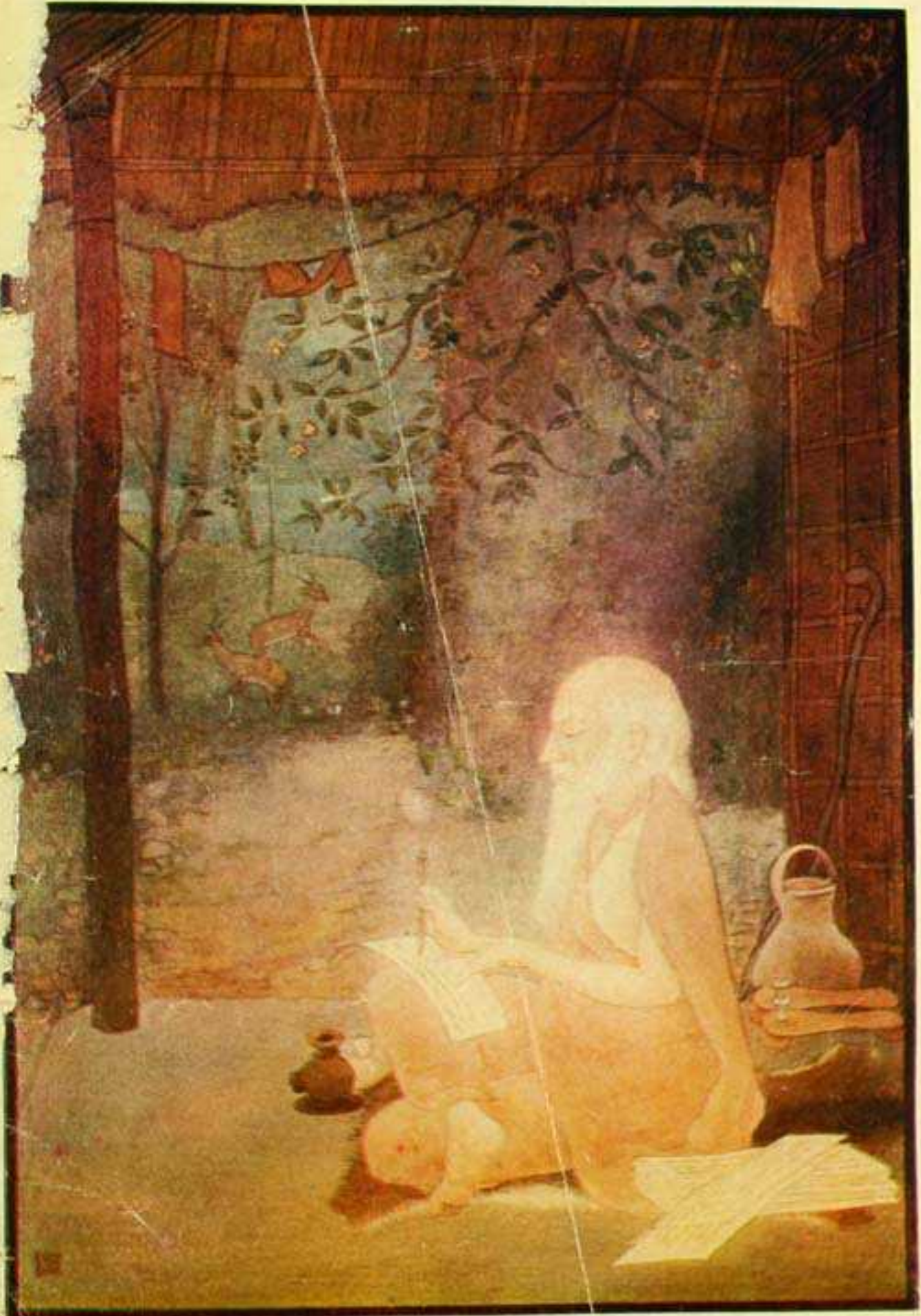
কুবক বেশে শিব ঠাকুর একেবারে পাড়াগাঁয়ের চাষাদের কুটারের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের অন্তরঙ্গ হইলেন। বাঙ্গালী যেরূপ তাঁহার দেবতাকে আপনার করিয়া লইতে পারে, এরূপ আর কোন জাতি পারে না। বাহিরের দর্শক এই সকল দেবলীলার

কুবকবেশী শিব।

মধ্যে কেবল বর্জরতা দেখিবেন। কিন্তু দেবতার সুখ-দুঃখের অংশীদার হইয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হওয়ার উপায় এক মাত্র এই যে, তাঁহাকে আমার মত করিয়া লওয়া। কিন্তু তাই বলিয়া কি শিবের গুঢ় মহিমা চাষাদের অজ্ঞাত? তাহাদের গানের অবকাশে মাঝে মাঝে এমন কথা আছে যাহাতে বুঝা যায় যে তাহারা দেবাদিদেব মহাদেবের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব ও শৈব ধর্মের তত্ত্ব-কথা সম্যক্ অবগত ছিল। এক চাষা-কবিকৃত আগমনী গানে মেনকা রাণী শিবঠাকুরকে ঘর-জামাই করিয়া রাখিতে চাহিতেছেন—“আমার শিবের অনেক দোষ কিন্তু একটা বিবপত্র দিলেই সে পরম সুখী, তাহাকে কৈলাসে রাখিলে বৎসরব্যাপী এই উমা-বিরহ আমাকে সহ্য করিতে হইবে না।” এই গান লিখিয়া কবি উপসংহারে বলিতেছেন—“রাণী, তুমি পাগল, কুবেরের ঐশ্বর্য্য দিয়া বিষ্ণু বাহার বল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে ভোলানাথ দিগম্বর, দেবাদিদেব অনাসক্ত যোগী, শ্মশানের চিতা ও ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য বাহার চক্ষে এক, বাহার নিকট চন্দন ও ভস্মের পার্থক্য নাই, সেই শিবকে তুমি “ঘর-জামাই” করিয়া রাখিতে চাহিতেছে, তুমি পাগল।” আশ্চর্য্যের বিষয় শিবের এই মহা অনাসক্ত রূপ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াও চাষা-কবি তাঁহাকে একজন চাষার মতই আঁকিয়াছে এবং তাঁহার

দাম্পত্য, ঝগড়া ঝাঁটি ও কুচনী পাড়ার ব্যাপারটা এমনভাবে বর্ণনা করিয়াছে যাহাতে শিবকে একটি পাড়ারগোঁয়ে অসভ্য কৃষক হইতে কিছুতেই উচ্চাসন দেওয়া যায় না। কিন্তু এই বর্ণনাগুলির মধ্যেও একটা প্রচ্ছন্ন পরিহাস-রস আছে। বৃদ্ধ পিতামহকে লইয়া তাঁহার শিশু নাতিয়া যেরূপ ঠাট্টা-বিজ্ঞপ করে, শিব ঠাকুরকে লইয়া চাষাবা কতকটা সেইরূপ করিয়াছে। তাহাদের ব্যবহারে চপলতা ও কচিবিকার থাকিতে পারে, কিন্তু অন্তর্নিহিত ভক্তি ও অনুরাগের কোন অভাবই নাই। শিব বাড়ীতে থাইতে বসিয়াছেন, তিনি পাঁচ মুখে খান, গৌরী পরিবেশন করিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, পরিহাসের স্বরে কবি এই গীতি গাহিয়াছেন। কিন্তু যেখানে দাম্পত্যের কথা, সেখানকার স্বর উচ্চগ্রামে বাধা, তিনি লিখিয়াছেন—গৌরী ও হরের সম্বন্ধ সূর্য্য ও সূর্য্যকিরণের মত। “সূর্য্যের কিরণ যেন দেখে জগন্ময়, সূর্য্যের আশ্রিত কিন্তু সূর্য্য ছাড়া নয়। তেমতি স্বানিবে সবে গৌরী আর হর। এক তিল দোহে ছাড়া নহে পরস্পর।” মেনকার যে মূর্ত্তি চাষা কবির আঁকিয়াছেন, তাহা হিন্দুগৃহের আদর্শ গৃহলক্ষীর—তিনি কতটা গৌরী এবং স্বামীকে আহার করাইয়া দাসদাসী সকলকে আহাৰ্য্য পরিবেষণ করিলেন, যৎকিঞ্চিৎ যাহা রহিল তাহাই তিনি সর্ব্বশেষে আহার করিলেন। “দাসদাসী সকলেরে সকল দিয়া পিছু, চেষ্টে পুঁচে খাইল রাণী রেখেছিল কিছু।” এই আদর্শ চাষা-কবি মন্থ বা যাজ্ঞবল্ক্যের স্থতিতে পান নাই। প্রত্যেক ঘরে তিনি এই অরপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, শৈশবে আমরাও তাহা দেখিয়াছি।

শিবের সঙ্গে তাল রাখিয়া প্রায় একই সময়ে উমা-সঙ্গীত চলিয়া আসিয়াছে। শিব বৃদ্ধ বর, অষ্টমবয়ীরা গৌরীকে লইয়া স্বগৃহ কৈলাসে গিয়াছেন, তিনি ভান্স ধুতুরা খান, সিঁচি বাটিতে বাটিতে গৌরীর হাতে কড়া পড়িয়াছে। আগমনী গানে আছে—“ভান্সেতে ভান্সেডের পীরিতি বড়, ত্রিভুবনের ভান্স করেছে জড়।” কেবল তাহাই নহে, ক্ষেপা-ভান্সেডের ভান্স খাইলে জ্ঞান থাকে না, বেহাল হইয়া পড়েন। যা’ তা’ বলেন, “ভান্স খেয়ে ভোলা হয়ে দিগম্বর, আমার উমারে কতকি বকেছে।” গৌরী রাজার মেয়ে, বিবাহের সময়ে অনেক বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়া গিরিরাজ উমাকে শিবের হাতে দিয়াছিলেন, কিন্তু শিব “উমার বসন ভূষণ, যত আভরণ, তাও বেচে ভান্স খেয়েছে।” এই সকল কথা শুনিয়া মেনকা-রাণীর যে কষ্ট তাহা বর্ণনাশীত। তিনি আঁচলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে স্বামীকে বলিতেছেন, “যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা কেমনে রয়েছে। আমি শুনেছি শ্রবণে—নারদ বচনে, মা মা বলি উমা কেঁদেছে।” বাঙ্গলার ঘরে ঘরে সেই শিশু মেয়ের অবরোধে কত যে লাঞ্ছনা, কত যে, চোখের জল অদৃষ্টে ঘটয়া থাকে তাহা সেকালের সকল লোকেই জানিতেন। এই কষ্টের প্রতিকার কি এবং সাধনা কোথায়! বারংবার চোখে জল উধলিয়া উঠে, ভাগ্যগাস অবগুষ্ঠন থাকে, কেহ দেখিতে পায় না। নিঃসহায়ভাবে বধূর মন মায়ের ক্রোড়ের জন্ত হাহাকার করিয়া উঠে, বহুদূরে অবস্থিত ধনি-গৃহিণীর বৃকে কত্কার হৃদয়ের আকুল আহ্বান সাড়া দেয়। এইরূপ শত শত আগমনী গান রচিত হইয়াছে। যা নিজে গিরিপুত্রের রাণী, তাহার সংসারে অপ্রতুল কিছু নাই। তাহার গৃহের অন্ন কাক-চিলে খায়,



বাণ্মীকির রামায়ণ রচনা ।

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী কর্তৃক অঙ্কিত ও শিল্পীর অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত ।

কিন্তু দরিদ্রের ধরে মেয়েটি দিয়া তাঁহার মনে সর্বদা শেলসম কষ্ট বিঁধিয়া থাকে। একদিন গঙ্গাদ কণ্ঠে স্বামীকে তিনি বলিতেছেন—“তুমি যে গিরিরাজ, কয়েছ আমার শত কথা, সে কথা শেলসম আছে আমার হৃদয়ে গাঁথা। আমার লম্বোদর নাকি ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদে কেঁদে বেড়াত, হয়ে অতি ক্ষুধার্তিক সোণার কার্তিক, ধলায় পড়ে লুটাত।” এত সাধের উমার ছেলেরা না খাইয়া থাকে, এই ছুঃখ মেনকা কিরূপে সহ্য করিবেন? এই জন্ত তিনি শিবকে ঘর-জামাই করিতে চাহিয়াছিলেন। “আমি জামাতা সহিতে, আনিব ছহিতে, গিরিপুরে করব শিবস্থাপনা। ঘর-জামাই করি রাখব কৃত্তিবাস, গিরিপুরী হবে দ্বিতীয় কৈলাস। হরগৌরীরূপ দেখব বারমাস, বৎসরান্তে আনতে বেতে হবে না॥” শাক্ত ও শৈব ধর্মের এই যে চিত্র তাহা লক্ষণসেনের পরবর্তী কালের বঙ্গ-সমাজের চিত্র, যদিও বহুকাল পরে কবিতা এই করুণ সুরে গাহিয়াছেন। কোলিত্ত প্রধায় দেশের সমাজে কুলীন হইলেন রাজা,—তিনি অন্ধ, খঞ্জ, অশীতিপর অনশন-ক্লিষ্ট বৃদ্ধ। ইহারা শুধু কোলিত্ত গর্বে সমাজের মেয়েদের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিতেন। ধনকুবেরগণ এমন কি রাজগণ যদি ভাল বড় কুলীন পাইতেন তবে শত ক্রটি থাকা সত্ত্বেও তাঁহার গলায় কল্যাণি কুলাইয়া দিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। কিন্তু সমাজ যাহাকে বড় করে, অন্তর্গামী সকল সময়ে তাহা অনুমোদন করেন না এবং সমাজে অশেষ প্রশংসিত কোলিত্তের দরুন অবরোধগৃহে আবদ্ধা মেয়েদের শত শত কণ্ঠের লেশমাত্র ক্রাস হয় না। এই সকল চিত্র বাঙ্গালী ঘরের অন্তঃপুরের বাঙ্গালী হৃদয়ের চিত্র। আমরা কৃষিব্যাপারে শিব-ঠাকুরকে চাবাদের দেবতাস্বরূপ দেখিয়াছি, এখানে তিনি কুলীন সমাজের একজন। এই ছই খানি ছবিই বাস্তব, আগমনী গান বাঙ্গলার ব্যাধাতুর জননীর হৃদয়ের আর্তনাদ। এজন্ত উহা হৃদয়কে একরূপ করণ ভাবে ছুঁইত। কুবক ও কুলীন ব্রাহ্মণ—এই ছই ছাঁচে গঠিত হইয়া শিব এ দেশবাসীর হৃদয়ে রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু পল্লী-গীতে দেবাদিদেব কোথায়ও গৌরবচ্যুত হন নাই।

এখানে শিব ঠাকুর সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বৌদ্ধগণ জীবজগতের প্রতি অশেষ করুণাপরবশ হইয়া পশু ও মনুষ্যগণের মধ্যে পীড়িত ও আর্তদের জন্ত অনেক চিকিৎসালয় খুলিয়াছিলেন, ত্যাগের উচ্চ আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ভিক্ষুর ধর্ম সংসারের উর্দ্ধে, তাহাতে অমুরাগ ও স্নেহের অবকাশ নাই। শৈব ধর্ম আসিয়া মানুষের হৃদয়ের কোমল ভাবগুলির উপর জোর দিল। বৌদ্ধধর্মে কর্তব্যজ্ঞান ছিল, কথায় কথায় বিচার ছিল, কিন্তু শৈব ধর্ম অমুরাগের রাগে রাঙ্গিয়া উঠিল, ধর্মের মন্দিরে মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা এ সকলেরই স্থান দিল। রামায়ণ এই গার্হস্থ্য ধর্মের বীজ বপন করিয়াছিল, কিন্তু শৈব-ধর্ম সেই বীজ অঙ্কুরিত ও অধ্যাত্মমহিমমণ্ডিত করিয়া দেখাইল। ভিক্ষুর ধর্ম সংসারকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল, শৈবধর্ম মানুষের দৃষ্টি উর্দ্ধ দিক্ হইতে ফিরাইয়া মাটির দিকে ছাপ্ত করিল। শৈব বলিলেন—সহধর্ম্মিনী না হইলে ধর্ম্মকার্য্য হয় না, শিব কৈলাস পর্ব্বতে বসিয়া গৌরীকে আগম-নিগমের তত্ত্ব শুনাইতেছেন, এদিকে সামাজিকগণ ও চাষারা শিবপ্রসঙ্গে গার্হস্থ্যের খুঁটিনাটির উপরও অমুরাগের রং ফলাইয়া শিবকে আপনার

স্বগণ করিয়া লইল। তিনি আর বুদ্ধের মত ধ্যানী হইয়া বসিয়া থাকেন না। তখনও ভারতের আকাশ হইতে বৌদ্ধ সমাধির শেষ রেখা বিলীন হয় নাই, এই জন্ত শিব-সমাধির কতকটা স্থান পূর্ব ধর্মের অনুযায়ী রহিয়া গেল, কিন্তু জনসাধারণ—শিবকে একেবারে তাঁহাদের স্বগণ ও পরিবারভুক্ত করিয়া রাখিল। বাঙ্গালী কখনও তাঁহার দেবতার জন্ত বাড়ীর বাহিরে মন্দির নির্মাণ করেন না, তাঁহার গৃহদেবতা, যেমন পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, স্বামী—তেমনই বা ততোধিক একজন। তথাপি চাষা চিত্রকর মাঝে মাঝে তাঁহার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, কে বলিবে ধ্যান-গৌরবে তিনি বৃদ্ধ অপেক্ষা ন্যূন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মৌর্যধর্ম—বাঙ্গলার ধর্মের উপর তামিল প্রভাব

এই যে সংসারের প্রতি ঔদাসীন্তের ছর্যোগ কাটিয়া বঙ্গাকাশে অম্বরাগের অরুণালোক দেখা দিল, তাহা শুধু শৈব ধর্ম নহে, তৎকালপ্রচলিত বঙ্গের সৌর ধর্মের দিক্চক্রবালেও খেলিয়া গেল। যতগুলি প্রাচীন ব্রতকথা আছে তাহাতে সূর্যের অর্ঘ্যদান, এবং ছোট ছোট মেয়েদের সমুদ্রযাত্রী পিতা ও ভ্রাতাদের জলপথে নিরাপদ ভ্রমণের জন্ত সূর্যের পুত্র আছে। আগমনী গানের স্তায় প্রাচীন সূর্যের ছড়া আমরা অনেকগুলি পাইয়াছি, তাহার কোন কোনটি খৃষ্টীয় দ্বাদশ একাদশ শতাব্দীর। গৌরী যেমন শিবের স্ত্রী তেমনি আর একটি গৌরীকেও সূর্যের পত্নীস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। এই বালবধুটাকে লইয়া সূর্য্যঠাকুর নৌকাযোগে স্বর্গহে বাইতেছেন :—অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী, তাহাকে স্বামিগৃহে ছাড়িয়া দিতে পিতামাতার কত কষ্ট! ছড়ায় আছে আড়সী পড়সীরা আসন্ন গৌরীবিরহে রহিয়া রহিয়া কাদিতেছেন, খেলার সাজি হাতে লইয়া গৌরীর ভাই কাদিয়া আকুল। অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী আসন্ন বিপদের সব কথা না বুঝিয়াও মাতার অঙ্ক হইতে তাহাকে যে কাড়িয়া লওয়া হইবে সেই আশঙ্কায় শুক মুখে মাকে বলিতেছে, “মা, তুমি আমাকে এদের হাতে দিও না।” মা কাদিতে কাদিতে বলিতেছেন, “সভার মধ্যে নিয়াছি টাকা, কেমনে রাখিব তোরে।”

গৌরী নৌকায় চলিতেছেন, দূরগত বায়ুতে মায়ের কান্নার সুর তাহার কানে প্রবেশ করাতে হৃদয়ে আকুলি-ব্যাকুলী হইতেছে, সে অতি ব্যগ্র ভাবে মাথিকে বলিতেছে, “দীরে দীরে বাহরে মাঝি ভাই মায়ের কাদন শুনি।” সেই কান্না বিবামৃত, কষ্টদায়ক হইয়াও স্নেহমধুর, বায়ুপ্রবাহে মনীভূত সেই কান্নার রেশটুকু শুনিবার জন্ত গৌরীর কত ব্যগ্রতা।

তারপর নৌকা দূরে চলিয়া গিয়াছে, অকূলে পড়িয়া গৌরী সূর্য্যের কর্ণলগ্ন হইয়া কাদিতে কাদিতে বলিতেছে—“সূর্য্যঠাকুর, আমি তোমার দেশে বাইব, আমাকে কে কাপড় কিনিয়া দিবে?” সূর্য্য আদরে বলিতেছেন—“লক্ষ্মীটি আমার, নগরে নগরে তোমার জন্ত শাড়ী তৈরি করার জন্ত তাঁতি বসাইব।” “তোমার দেশে আমি বাব, সূর্য্যঠাকুর, কে আমাকে শাঁখা দিবে?” “কেন! আমি তোমার হাতের মাপ লইয়া শাঁখা গড়িবার জন্ত নগরে নগরে শাঁখারী বসাইব।” “আমায় কে তেল-সিন্দূর দিবে, কে আমায় ভাত-কাপড় দিবে?” পরম স্নেহে বালিকা-বধূকে বক্ষে রাখিয়া সূর্য্য বলিতেছেন—“আমি সিন্দূর কিনিবার জন্ত নগরে নগরে বেনিয়া, তৈলের জন্ত বহু তেলী এবং ধানের জন্ত বহু হেলে চাষা বসাইব।”

ছোট্ট মেয়েটি কিন্তু শাস্ত হইল না, তাহার মর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র বেদনা যেখানে, সেখানটা সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এবার নিরুদ্ধ অশ্রু সামলাইতে পারিল না, কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—“তোমার সঙ্গে যাচ্ছি আমি, সূর্য্য ঠাকুর! কিন্তু আমি কাহাকে মা বলিয়া ডাকিব?” শিশুহৃদয়ের একমাত্র সাস্থনা ও সম্বল ‘মা’-ডাক। যখন এই বলিয়া গৌরী কাদিয়া উঠিল, তখন সূর্য্যঠাকুর স্বীয় সোণার উত্তরীয় দিয়া কত স্নেহে নববধূটির চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন—“কেন! আমার যে মা আছে মা বলিবে তারে।” (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম ভাগ, ১৭১ পৃঃ।)

অপরূপ দেশে সাধারণের মধ্যে দেবচরিত্র লইয়া নানা উপগল্প আছে। অসভ্য দেশের ঠাকুর ভূত, প্রেত কিংবা এমন দেবতা, বাহাকে দেখিলে ‘আত্মাপুরুষ’ শুকাইয়া যায়। কিন্তু বাল্মীকী জন-সাধারণ বাহাকে না বুঝিয়াছে তাহাকে পূজা দিতে চাহে না। মর্ম্মের সঙ্গে মর্ম্ম না মিলিলে সে অবাঞ্ছনসগোচর কোন চর্ভেস্ত প্রহেলিকা কিংবা ভয়ঙ্কর পিশাচ রাক্ষস-রূপ দেবতা খাড়া করিয়া তুষ্ট হয় না। তাহার দেবতা জীবন্ত, সেই দেবতাদের কথা বলিতে বলিতে তাহারই বাড়ীর স্নেহের পুতুলদিগকে মনে পড়ে। এই স্নেহপুতুলদের লইয়া খেলা করিতে করিতে তাহারা উচ্চ আধ্যাত্মরাজ্যের সন্ধান পায়। বালক যেক্রপ সিকতাভূমির উপলব্ধিও লইয়া খেলিতে খেলিতে সমুদ্রের গর্জ্জন শোনে, এই গার্হস্থ্য লীলার মধ্যে সে তেমনি আধ্যাত্ম উচ্চ তত্ত্বের সন্ধান পায়। বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্ম্ম গার্হস্থ্য ধর্ম্মকে উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক রাজ্যে কি ভাবে পৌছাইয়া দিয়াছিল, তাহা আমরা পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে বর্ণনা করিব। এখানে বৌদ্ধ যুগাবসানে সাংসারিক বিতৃষ্ণা ও বিরাগ ঘূচিয়া স্বকোমল ভাবরাশি বাল্মীকীর হৃদয়ে কি ভাবে উপস্থ হইয়াছিল তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। কার্ন (Kern) বলিয়াছেন—এই যে অমুরাগ ও ভক্তির বীজ, তাহা মহাবান বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শেষ যুগে বৌদ্ধগণই অঙ্কুরিত করিয়াছিলেন।

শৈব ধর্ম্ম কি ভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা বাঞ্ছনা করিতেছে, তাহা আর ছই একটি উদাহরণ দিয়া আমরা দেখাইব। তামিল দেশে এক সময়ে শৈব ধর্ম্মের প্রাধান্ত ছিল। আমরা দেখাইয়াছি (১২০-২১ পৃষ্ঠা) ত্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ্রগণ মগধ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তে তাঁহাদের রাজত্ব প্রায় তিন শত বৎসরব্যাপক ছিল।

দ্বিতীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে তামিল দেশে বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবের বিলোপ হইতে আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে মাদুরার রাজা জৈনধর্মাবলম্বী হইয়া যাওয়াতে বঙ্গীয় শৈব ও শাক্ত ধর্মের উপর তামিল-প্রভাব। তাঁহার মহিষী অত্যন্ত ছাখিতা হন। তিনি প্রসিদ্ধ শৈব সন্ন্যাসী

সম্বন্দরের সঙ্গে যুক্তি করিয়া জৈন নেতৃবৃন্দকে রাজসভায় তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। দীর্ঘকালব্যাপী তর্কের ফলে জৈনগণ পরাস্ত হন এবং মাদুরার অধিপতি পুনরায় শৈব ধর্ম গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে আট হাজার গৌড়া জৈন পণ্ডিতকে শূলে দেওয়া হয়। শৈব সন্ন্যাসী সাধনারের অনেক শিবস্তোত্র আছে, তাহার অনেকগুলির দ্বারা যে বঙ্গীয় শাক্ত ও বৈষ্ণব সঙ্গীত প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহা অনুমিত হয়। অপর স্বামীও সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর লোক; তাঁহার রচিত শৈব সঙ্গীতগুলিও যেন বাঙ্গলার বৈষ্ণব ও শাক্ত সঙ্গীতের পূর্বকার বাণী আনয়ন করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। একটি শৈব স্তোত্র এইরূপ “হে শিব, তুমি আমার কলতরু, আমার চক্ষের তারা, তুমি আমার অমূল্য রত্ন, তুমি আমার গৃহ, আমার জীবন ও আনন্দ তুমি।” (Hymns of the Tamil Saivite Saints, p. 49, by F. Kingsbury.) এই পদগুলি যেন চণ্ডীদাসের “কান্ন সে আমার, জাতি কুল মান, এ ছটি নয়নের তারা” এবং বিষ্ণুপতির “হাতক দরপনা, মাধক কুল, নয়নক অঞ্জন, মুখক তাবুল, হৃদয়ক মৃগমদ, গীমক হার, দেহক সরবস্ব, গেহক সার, পাখীক পাখ, মীনক পানি, জীবক জীবন, হাম তুয়া জানি।” প্রভৃতি পদের পূর্বাভাসের মত শোনায। বাঙ্গলার সর্জনবিদিত “যে জন গোরাঙ্গ ভজে সে জন আমার প্রাণ” গানটির কতকটা ইঙ্গিত অপর স্বামীর এই স্তোত্রটিতে আছে—“যে শিবকে

অপর স্বামী ও মানিক ভাবিয়া।

ভালবাসে সে যদি কুষ্ঠী হয়, পতিত অথবা গোহত্যাকারী হয়, তাহাকেও আমি বুকে জড়াইয়া ধরিব, সে আমার চক্ষে দেবতা।”

আর একটি স্তোত্র—“যখন এ দেহ ত্যাগ করিব, তখন আমার স্বর্গকে থাকিবে? হে কর্ণযুগল, তোমরা তাঁহার নামকীর্তন শোন।” (৪৫ পৃঃ) বিষ্ণুপতির “শ্রবণে হঁ শ্রায়নাম কর গান, শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ” সঙ্গে মিলাইয়া পড়ুন। অপর স্বামীর “কতকটা জীবন শৈশবে অতিবাহিত হইয়াছে, কতকটা জীবন দাম্পত্যের লীলায় বিগত, আমার মনে কতটুকু স্থান রাখিয়াছি প্রভু তোমার জন্ত” (৬৭ পৃঃ) ঠিক বিষ্ণুপতির—“আধ-জনম হাম, নির্দে গোয়ায়িছু, জরা শিশু কতদিন গেলি। নিধুবনে রমণী-রসরঙ্গে মাতিলু, তৌহে ভজবি কোন বেলি” গানটির অনুরূপ। এই তামিল-কবিগণের শৈব সঙ্গীতের ভাব-প্রবণতা আমাদের বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগের কতকটা অনুরূপ। অপর স্বামীর এই গানটি পড়ুন—“সেই হতভাগ্য নগর, যেখানে ভগবানের মন্দির নাই, যেখানে শ্বেত ভষ্ম কোন লোকের কপালে দীপ্তি পায় না, যেখানে স্তোত্র পাঠ বা দেবগুণ কীর্তিত হয় না, যেখানে কেহ কুৎকারপূর্বক শ্বেত শঙ্খ নিনাদিত করে না, যেখানে আঙ্গিনার চন্দ্রাতপ বিস্তৃত হইয়া দেবধ্বজ প্রোথিত হয় না, যেখানে ভোজনের পূর্বে কেহ সপুষ্প নৈবেদ্য দেবোদ্দেশে নিবেদিত করিয়া দেয় না, সে স্থানটাকে আমি নগর

বলি না—উহা ভীষণ অরণ্য।” মানিক ভাসহরার (খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী) পদ যথা—
“তুমি কি আমার অনায়ত্ত গাছের মধুচক্র” (১২১ পৃঃ); ইহা একই ভাবের স্তোতক।

তামিল শৈব সঙ্গীত শুধু বৈষ্ণব পদের প্রাক্কর্ষনি নহে, তাহাতে বঙ্গদেশের শাক্ত সঙ্গীতেরও পূর্বাভাস আছে। যথা মানিক ভাসহরার পদে “জয় হউক তোমার প্রভু, আমি স্বথাত সলিলে ডুবিয়া মরিলাম, আমি তোমাকে দোষ দিব না।” এই ছত্রটি দাশরথি রায়ের সুপ্রসিদ্ধ পদের প্রথম চরণ “দোষ কারু নয় গো মা! আমি স্বথাত সলিলে ডুবে মরিলাম” প্রভৃতির অনুরূপ। অপর স্বামীর পদ—“কেন গঙ্গায় অবগাহন করিবার জন্ত যাইতেছ? কেন কাবেরী বা কঙ্গুদেশের কুমারীতীরে ঘুরিতেছ, তুমি কি জান না যে অবোধ, যে ব্যক্তি তাহাকে সর্বস্থান হইতে ডাকিতে পারে, এক মাত্র সেই মোক্ষের অধিকারী?” এবং রামপ্রসাদের গান “কি কাজেরে মন গিয়া কাশী, মায়ের পদতলে পড়ে আছে কত কাশী-কাশী-বারাণসী” কি ঠিক একরূপ নহে?

খৃষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতে কিংবা তাহারও পূর্বে হইতে তামিলদেশীয় শৈব ধর্মের সাধুর মধ্যে যে ভক্তি ও প্রেমের বীজ পাওয়া যায়, তাহাই কোন্ পবনে উড়িয়া আসিয়া বঙ্গদেশের উর্ধ্বর ক্ষেত্রে গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে একরূপ কর্তব্যরূপে পরিণত করিয়াছে, কে বলিবে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাস্তলার তত্ত্বশাস্ত্র

হিন্দু তত্ত্ব পূর্বে কি বৌদ্ধ তত্ত্ব পূর্বে, ইহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলিয়া আসিয়াছে। হিন্দুর প্রবাদ, বশিষ্ঠ চীনদেশ হইতে তত্ত্বশাস্ত্র শিখিয়া আসেন। বৌদ্ধযুগে যে এই তত্ত্বশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বুদ্ধ ইন্দ্রিয়বিজয় ও কামনা-বিলোপকে প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। একদল সাধক মনে করিলেন, মনুষ্য সমাজ হইতে দূরে যাইয়া তপশ্চরণ করিলে হৃদয়ের শক্তির পরীক্ষা হয় না। কামনার বস্তুর সন্মুখে রাখিয়া ইন্দ্রিয়বিজয় করিতে পারিলে প্রকৃত ইন্দ্রিয়বিজয়ী হইতে পারা যায়। এই ভাবে পঞ্চ মকারের উৎপত্তি। কিন্তু ইহা কেউতে সাপ লইয়া খেলা। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, “যিনি মাকড়সার জাল দিয়া হিমাদ্রিকে আকাশে ঝুলাইয়া রাখিতে পারেন, কিংবা সাপের মুখে ভেককে নৃত্য করাইয়া তাহাকে অক্ষত দেহে ফিরাইয়া আনিতে পারেন, তিনিই এই পরীক্ষায় জয়ী হইতে পারেন, স্ততরাং এ পঞ্চ মকারের পরীক্ষাজয়ী সাধু খুব অল্প ছিলেন,

অধিকাংশই রমণীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভণ্ড ও কপটাচারী হইতেন। এই ভাবে ভয়কে দূর করিয়া একেবারে নির্ভয় হইবার জন্ত কোন কোন তাপস শবের উপর বসিয়া চিতার মধ্যে অমাবস্ত্য-রাত্রি সাধনা করিতেন। ক্রমে যখন তান্ত্রিকগণ তাহাদের উচ্চলক্ষ্য বিচ্যুত হইলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক প্রক্রিয়া-দ্বারা শক্তি লাভ করিবার জন্ত তাহারা লোলুপ হইলেন। অনিমা, লঘিমা প্রভৃতি ক্ষমতা লাভের জন্ত তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। শেষে পরীক্ষায় একবার বিফল হইয়া ব্যভিচারকেই শাস্ত্রীয় করিয়া সংস্কৃত বিধিব্যবস্থা রচনা করিয়া লিখিলেন, “পীড়া, পীড়া, পুনঃ পীড়া, পুনঃ পততি ভূতলে, উথায় চ পুনঃ পীড়া পুনর্জন্ম ন বিগতে।” কিংবা “স্বদারপরদারেষু স্বচ্ছন্দং বিহরেৎ সদা” ইহার পর এমন সকল শ্লোক আছে, যাহা দস্তরমত ভক্তারজনক। বৌদ্ধদিগের এই সকল বীভৎস তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের জন্ত তাহারা শেষ-যুগে সমাজের চক্ষে একান্ত হেয় ও ঘৃণ্য হইয়াছিলেন। তিব্বতে এক সময়ে এই তান্ত্রিক ব্যভিচারের শ্রোত অবাধভাবে চলিয়াছিল, তাই ধর্মসংস্কারের জন্ত তিব্বতের রাজারা দীপঙ্কর ত্রিজ্ঞানকে তথায় লইয়া যাইবার জন্ত এতটা আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। বৈদিক ধর্মের নবজাগরণের পর হইতে অতি দ্রুতভাবে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানগুলি এ দেশের সমাজ হইতে উঠিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু বিগত শতাব্দীতেও ভৈরবীচক্র নামক বীভৎস লোকবিগর্হিত কাণ্ডটা অনুষ্ঠিত হইত। বাঙ্গলা প্রাচীন গান ও ছড়ায় তান্ত্রিক প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক প্রভাব এককালে সমস্ত এসিয়াকে অধিকার-ভুক্ত করিয়া যুরোপ পর্য্যন্ত অভিযান করিয়াছিল। ডুইড পুরোহিতগণের আদেশে পর্ব্বতের শৃঙ্গগুলি অদৃশ্য হইত, তাহারা ইচ্ছা করিলে যে-কোন রূপ ধারণ করিতে পারিতেন, নদীকে ‘তিষ্ঠ’ বলিলে তাহার প্রবাহ থামিত এবং তাহারা মৃতদেহের বহুধা-বিচ্ছিন্ন, পরস্পর হইতে দূরবর্তী অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে যন্ত্র পড়িয়া জোড়া দিতে পারিতেন। গোদা যমকে রাণী ময়নামতী অনুসরণ করিবার কালে পরস্পরে যে সকল রূপ ধরিয়া ধাবমান হইয়াছিলেন, গ্যালিক

উপকথায়ও সেইরূপ কথা দৃষ্ট হয়। ময়নামতী যমদূতকে তাড়াইয়া তান্ত্রিক সিদ্ধি পঞ্চমে নদীতীরে লইয়া গেলেন, যমদূত জলে ডুবিয়া পড়িল; রাণী মহিষ-উপগম। রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে অনুসরণ করাতে সে শফরী হইয়া জলে

মিলিয়া গেল; রাণী পানিকোড়ী হইয়া শফরীকে আক্রমণ করিলেন, যমদূত চিংড়ী মাছ হইয়া লাফাইয়া চলিল; ময়নামতী রাজহাঁস হইয়া তাহাকে তাড়না করিলেন,—এই ভাবে পরস্পরের নানা প্রকার রূপান্তর চলিতে লাগিল। যমদূত শেষে পায়রা হইয়া পলাইতেছিল, রাণী বাজ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। সর্ব্বশেষে গোদা যম বৈষ্ণব সাজিয়া ভেকধারীদের মধ্যে যাইয়া বসিলেন, রাণী মোমাছি হইয়া সেই ছদ্মবেশী বৈষ্ণবের টিকির উপর বসিয়া যন্ত্রকে হল ফুটাইয়া দিলেন। (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম ভাগ, ৩৯ পৃষ্ঠা।) ম্যাবিনিজন নামক গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে (ট্যালিসন, ৩৫৯ পৃঃ) কারিডিয়োয়েন সম্বন্ধে এই উপাখ্যানটি আছে। “গুইনিবাচকে পালাইতে দেখিয়া কারিডিয়োয়েন তাহাকে অনুসরণ করিল। গুইনিবাচ খরগোস হইয়া ত্রাণ পাইতে চেষ্টা পাইলে, কারিডিয়োয়েন সারমেয় হইয়া তৎপশ্চাৎবর্তী হইল। গুইনিবাচ

মৎস্ত হইয়া জলে কাঁপ দিয়া পড়িলে, শত্রু পানিকৌড়ি হইয়া মৎস্তের পিছু পিছু চলিল। গুইনিবাচ পাখী হইয়া আকাশে উড়িয়া গেলেন, কারিডিয়োয়েন বাজ হইয়া অল্পসরণ করিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া গুইনিবাচ একটা গোলায় নিকট বাইয়া যবের তুপের মধ্যে একটি যবের দানা হইয়া মিশিয়া গেলেন। কিন্তু কারিডিয়োয়েন একটা কৃষ্ণ কুক্কুটী সাজিয়া যবের প্রত্যেকটি দানা খুঁজিয়া তাহাকে বহির করিল।” টুর উইনের পুস্তকগণ কর্তৃক হেসপেরিডিস্ উজ্জানের তিনটি স্বর্ণের আতা হরণের গল্পে লিখিত আছে—“সে দেশের রাজার তিন কন্যা ছিল, তাহারা তন্ত্রমন্ত্র জানিত। তাহারা মন্ত্রবলে ভৌদড় হইয়া বাজরূপধারী তিন রাজপুত্রকে আক্রমণ করিল।” কিন্তু রাজকুমারগণ রূপ পরিবর্তন করিয়া সারসরূপ ধারণ করিয়া সাগরে ডুবিয়া গেলেন। (কেণ্টিক মিথ এণ্ড লিজেন্ড, চার্লস স্কোয়ার, ২৯ পৃঃ।) আমাদের পূর্ববঙ্গ-গীতিকায় রাজকুমারকে হরণ করিয়া রাখা, রণক্ষেত্রে কোন রাজার চক্ষে মন্ত্রপুত ধূলি নিক্ষেপ করিয়া তাহার সৈন্ত-সামন্তকে একেবারে অন্ধ করিয়া ফেলা প্রভৃতি অনেক উপাখ্যান বর্ণিত আছে; ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে ইন্দা-চোরের শত্রুশিবিরের সকলকে নিদ্রিত করিয়া ফেলা, কৃষ্ণিবাসী রামায়ণে মহীরাবণ-কর্তৃক বানর-সৈন্তকে হতচেতন করা প্রভৃতি তান্ত্রিক প্রভাবের কাহিনী পাওয়া যায়।

কিন্তু এগুলি যে নিছক বৌদ্ধতন্ত্রের ফলশ্রুতি তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? কামরূপ-কামাখ্যার বহু প্রাচীন দেবীর মন্দিরে তন্ত্রের গুপ্ত সাধনের শিক্ষা দেওয়া হইত,—তথাকার মেয়েরা পুরুষের চুলে মন্ত্রপুত ক্ষুদ্র কিছু বাধিয়া দিলে পুরুষ ভেড়া হইয়া বাইত। এই প্রবাদ এদেশে বহুদিন এতটা প্রচলিত ছিল যে আমাদের পটুয়ারা তাহা লইয়া ছবি আঁকিত। এখানে প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন কালীঘাটের একখানি ছবি প্রদান করিলাম।

হিন্দুতন্ত্রেও এই সকল গুপ্ত তান্ত্রিক সাধনা ছিল। এখনও কানীধামে ভৈরবীচক্র বসিয়া থাকে। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে একরূপ রূপান্তরগ্রহণের উদাহরণ বিরল নহে। বেদে তিষ্ঠা কন্যা সরমার অগ্নিনীরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন এবং বিবস্থানের অধরূপে তাহাকে অল্পসরণ, শিবী রাজার উপাখ্যানে ইন্দ্র ও যমের যথাক্রমে স্ত্রেন ও কপোতরূপ-ধারণ, ধর্মগুপ্তকন্যা সোমপ্রভার কথা (কথাসরিৎ-সাগর, ১৭ তরঙ্গ) প্রসঙ্গে অগ্নিদেব ও গুহচন্দ্রের ভূঙ্গরূপ ধারণ, প্রভৃতি অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কথিত আছে স্বয়ং বল্লালসেন অত্যন্তম বৈদিক ধর্মপ্রবর্তক হইয়াও তান্ত্রিক আচার গ্রহণ করিয়া পদ্মিনীকে তিনি তান্ত্রিকমতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হিন্দুমতে তন্ত্রশাস্ত্র আগমের অন্তর্গত। তন্ত্রে—শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত—এই তিন শ্রেণীই বেদের দোহাই দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তন্ত্র হিন্দুর প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মকাৰ্য্যে এত নিগূঢ়-ভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, উহার আদি খুঁজিতে বৌদ্ধধর্ম সন্ধান করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। মন্ত্রশক্তি, বীজ, যন্ত্র, মূদ্রা, হ্রাস, ভূতসিদ্ধি, কুণ্ডলীযোগ, আত্মিক, চার্য্য প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রীয় ব্যাপারসম্বন্ধে অনেকেরই অন্ততঃ নামেমাত্র পরিচয় আছে। বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব তন্ত্র এক সময়ে প্রবল ছিল, তন্মধ্যে বৈষ্ণব তন্ত্রে অনেকটা বৌদ্ধ ভাব ঢুকিয়াছে ও

তাহা সহজিয়ারদের মধ্যেই বিশেষ প্রচলিত ছিল। শাক্ত-তন্ত্রের প্রধান গ্রন্থ কুলার্ণবতন্ত্র। শৈব ও শাক্ত তন্ত্রের মধ্যে বেশী বিভিন্নতা নাই। অর্ধনারীশ্বর মূর্তির শিবের দিক্‌টা শৈব তান্ত্রিকের উপাশ্রু ও গৌরীর দিক্‌টা শাক্ত তান্ত্রিকেরা পূজা করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় শাক্ত তান্ত্রিকেরা ৩৬ তন্ত্রকে তাঁহাদের ধর্মের ভিত্তি বলিয়া মনে করেন। কুলার্ণবতন্ত্র ও আনন্দ-লহরীতে এই তন্ত্রোক্ত ধর্ম বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। লক্ষণাচার্য্য-প্রণীত 'সারদাতিলক' নামক তান্ত্রিক গ্রন্থ বঙ্গীয় শাক্ত তান্ত্রিকদের

বৈষ্ণব ও শাক্ত তন্ত্র।

অন্ততম প্রধান অবলম্বন। বৈষ্ণব আগমের প্রধান কথা দক্ষিণাচার এবং বামাচার। শাক্ত ও শৈব তন্ত্র উভয়েই পরমাশ্রু ও জীবাশ্রু আর একই স্বীকার করেন। এই সকল তন্ত্রের বিভিন্নতা কতকটা বাহ্য এবং শুধু নাম-গত। বৈষ্ণব আগম পঞ্চতন্ত্রে লক্ষ্মী, শক্তিবাহু ও সঙ্কোচ বলিতে বাহ্য বুঝায়, শাক্ত তন্ত্রে ত্রিপুরাসুন্দরী, মহাকালী এবং কঙ্কুকস বলিতে অনেকটা তাহাই বুঝায়। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, "তন্ত্র বিদেশী জিনিষ, হিন্দুরা ইহা গ্রহণ করিয়া কতকগুলি বৈদিক শব্দ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া ইহা বেদসম্মত ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।" কিন্তু উড্ডফ সাহেব বলেন, "এ কথার উত্তর আমি এখন দিব না। কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে তান্ত্রিকেরা বহু শতাব্দী হইতে তাঁহাদের ধর্মের ভিত্তি বেদ এই মত প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। ইহাদের বেদান্তই প্রধান আশ্রয় ছিল, যদিও বেদান্তব্যাখ্যায় ইহারা নানারূপ মৌলিকতা দেখাইয়াছেন।" (শক্তি ও শাক্ত, ৭ পৃঃ।)

এই তান্ত্রিক ব্যাপারে এত সকল ছর্কোদ হুজ আছে বাহ্য লইয়া আমরা এখন আলোচনা করা একান্ত নিম্প্রয়োজন মনে করি। তান্ত্রিকদের মধ্যে কেহ কেহ ব্যভিচারী, বাহ্য ইচ্ছা তাহাই করেন; আহারে-বিহারে ইহারা অতিশয় ঘৃণ্য কাজ করিয়া থাকেন। দীক্ষিত না হইলে এই সকল কর্মের মধ্যে প্রবেশ করা হুঃসাধ্য। আমাদের

কুলার্ণবতন্ত্র।

সে দীক্ষা নাই। কুলার্ণবসংহিতায় শিব কতকগুলি ভয়ঙ্কর কাজের উপদেশ দিয়াছেন। বাছড় এবং ছুঁচোর মাংস দিয়া চণ্ডালরমণীর ব্যভিচারহুষ্ট বস্ত্র, শবের উত্তরীয় এবং অপরাপর জঘন্ত উপকরণ দিয়া সেই সকল বীভৎস কাণ্ড করিতে হয়। এই সকল প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে বলিয়া তিনি গৌরীকে বলিতেছেন, "এই তত্ত্ব কাহাকেও বলিবার নহে, স্তবরাং ভদ্রে। ইহা একান্তরূপে গোপন রাখিও।" "এই স্তব্ধকারজনক শাক্ত গোপন থাকাই ভাল। এক সময়ে কামরূপের কামাখ্যা দেবীর দোহাই দিয়া কত যে বীভৎস কাণ্ড অমুষ্ঠিত হইত, তাহা বলিবার নহে। বৌদ্ধগণ শেষ সময়ে এই বীভৎসতা ভয়ানক বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, লোকে কাপালিক বা তান্ত্রিক যোগীর নাম শুনিলে ভয় পাইত। বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলায় এইরূপ এক যোগীর মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে। এই তান্ত্রিক অমুষ্ঠানগুলি সেদিন পর্য্যন্তও হইয়াছে। আমার জ্ঞানগোচরে আমাদের পরিবার ইহার দুস্তভোগী হইয়াছিলেন। সেই ছর্কটনাটি আমার জন্মবার ৩০ বৎসর পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল, ইহারা এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহাদেরই মুখে আমি শুনিয়াছি। আমার পিতামহের

সহোদর স্বর্গীয় রামনাথ সেন মহাশয় পুলিশের দারোগা ছিলেন। তিনি এই সকল তাত্ত্বিক অনুষ্ঠান করিতেন। একদা মধ্যরাত্রে কানাই নদীর (গাজি খাল) তীরে শনি কিংবা মঙ্গলবারে মৃত চণ্ডালের শবের উপর বসিয়া ইনি মন্ত্র জপ করিতেছিলেন। হঠাৎ কে তাঁহার গালে একরূপ ভয়ানক চপেটাঘাত করিল যে তাঁহার কণ্ঠের নলী ভাঙ্গিয়া মুখ ফিরিয়া গেল। তাঁহার সঙ্গী ছিলেন স্বগ্রাম-সুয়াপুরবাসী শ্রামশূন্য চক্রবর্তীর পিতা। তিনিও দূরে অল্প স্থানে আসনে বসিয়া তরুণ তপস্যা করিতেছিলেন। রামনাথের গৌ গৌ শব্দে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হয়। বাটীতে লইয়া আসার পর তিন দিন মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন, কথা কহিবার বা পাশ ফিরিবার শক্তি ছিল না, শুধু গৌ গৌ শব্দ করিতেন, এবং অজ্ঞান হইয়া ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর (আমার ঠাকুৰমার) মুখে শুনিয়াছি, এবং গ্রামের সকলেই ইহা জানেন, তাঁহাদের বিশ্বাস ভূতে তাঁহাকে মারিয়াছে। কিন্তু তিনি পুলিশের দারোগা ছিলেন, কোন ছুট প্রকৃতির লোক-দ্বারা এই হত্যাকাণ্ডটা হওয়াও আশ্চর্যের বিষয় নহে। আমি স্বচক্ষে রক্তবস্ত্রপরিহিত দীর্ঘ জটাভূট-সম্পন্ন, গম্ভীর ও সৌম্যদর্শন এক সাধুকে পথের পার্শ্বে নিষ্কিপ্ত একটা কচ্ছপের আঁতুড়ি খাইতে দেখিয়াছি এবং আমার পরিচিত একটি তরুণ যুবক অতি দুর্গিত জিনিষ খাইতেন, তাহাও জানি। এই সমস্ত বীভৎস কাণ্ড এখনও বঙ্গদেশে চলিতেছে, যদিও সংখ্যায় অনেক কমিয়া আসিয়াছে।

হিন্দুধর্মের অন্তর্গত এই তত্ত্বশাস্ত্র; এমন কি বৈদিক শাস্ত্রও ইহার ভিত্তি হইতে পারে। কিন্তু হিন্দুধর্ম যেমন হিমাদ্রি-পেশোয়ার-বঙ্গোপসাগর-কামরূপ ও কুমারিকা সীমাবেষ্টিত একটা জনপদে আবদ্ধ, এই তাত্ত্বিক ধর্মদ্বারা গৃঢ় আধ্যাত্ম্য শক্তিবাদের চেষ্টার গভী তরুণ সীমাবদ্ধ নহে। মুসলমান ফকিরেরা নানারূপ কেরামত দেখাইয়া থাকেন, খাওয়াদািস্বক্ষে তাঁহারা বীভৎস আচরণ নাও করিতে পারেন, কারণ বিশেষ বিশেষ দেশের জিয়াপদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। পীরগণের কেরামত সকলেই জানেন। সেক শুভোদয়ার জালালুদ্দিন পীরের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে, খৃষ্টানগণের মধ্যে "ব্রিথ্রেন অফ দি ফ্রি স্পিরিট" (Brethren of the Free Spirit) দলের কার্যকলাপ অনেকটা তাত্ত্বিকদের মত (শাস্ত্র ও শক্তি, ৪ পৃ:), সুতরাং ভারতের প্রধান চারিটি ধর্ম,—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান, ইহাদের মধ্যে কোন না কোনরূপে তাত্ত্বিক আচার এখনও অল্পাধিক হয়। তত্ত্ব নামটি হয়ত অনেক শ্রেণীর নাই। কিন্তু পার্থিব নিয়মাবলী হইতে স্বতন্ত্র অধ্যাত্মনীতিচালিত একটা গৃঢ় জগৎ আছে, বাহ্যতে প্রবেশ করিতে পারিলে অতি শুষ্ক অলৌকিক শক্তি লাভ হয়—এই বিশ্বাস এবং সেই সকল পদ্ধতির অনুষ্ঠানকারী লোক জগতে সর্বদা দৃষ্ট হয়। ইহাদের রাজ্য হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি শ্রেণীর অধ্যুষিত স্থান অপেক্ষা অনেক ব্যাপক; আমরা যে বিষয়ের কিছুই জানি না, সে বিষয়ে এতগুলি কথা ব্যয় করিবার খৃষ্টতা দেখাইলাম, তজ্জন্ত মার্জনা ভিক্ষা করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। বস্তুতঃ উদ্ভূত আদি কতিপয় সাহেবকে এই তত্ত্বশাস্ত্রের এতটা অহুতাগী দেখিয়া, এই শাস্ত্রের প্রতি একটা বিশেষ কৌতুহলের ভাব

আসিয়াছে। আশা করি, এই বিষয়ের পুস্তক-শালাটা বাজুড় ও চামচিকার নিবাসভূমি মাকড়সার জালবেষ্টিত ভট্টাচার্য্যের আধার প্রকোষ্ঠ হইতে দিবালোকে আনয়ন করিয়া কেহ ইহার তত্ত্বগুলি আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

তন্ম্বের প্রচলিত দেহতত্ত্বের জ্ঞান এক সময়ে বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সাধনা বাঙ্গলা দেশের চাষাদের অবিদিত ছিল না। গোরক্ষবিজয়

গোরক্ষ-বিজয়। নামক প্রাচীন বাঙ্গলা পুস্তকে (১১শ শতাব্দীতে লিখিত, বর্তমান

আকার চতুর্দশ শতাব্দীর) গোরক্ষনাথ যে ৩১টি প্রশ্ন মীন-নাথকে করিয়াছিলেন এক সময়ে বাঙ্গলার নিম্নশ্রেণীর ও মুসলমান কৃষকেরা পর্য্যন্ত তাহা জানিত। যেহেতু এতকাল যাবৎ চাষারাই ঐ পুস্তক নকল করিয়া রক্ষা করিয়াছে, চাষারাই ছিল ইহার পাঠক, এবং তাহারাই ছিল ইহার শ্রোতা। প্রশ্নগুলি এইরূপ :—

কায়্য কোথা হতে পাইলা কাহাতে উদয়।

প্রথমে কহিবা গুরু কায়্য-পরিচয় ॥

দ্বিতীয়ে কহিবা গুরু এ তম্ব কারণ।

অজপা কাহাকে বলি জপে কোন জন ॥

...নবমে—পবন আছেয়ে কোন লক্ষে।

সভার আহার আছে বায়ু কিবা ভক্ষে ॥

দশমে নিদান বৃদ্ধি কেহ নাহি রয়।

দীপ নিবাইলে জ্যোতি কোথা গিয়া রয় ॥

...একাদশে কহি দেহ শব্দের অবস্থা।

শব্দ উঠিলে ধ্বনি চলি যায় কোথা ॥

...ত্রয়োদশে কহি দেয় পরম কারণ।

নিদ্রা কাহাকে বলি চেয়ায় কোন জন ॥” ইত্যাদি।

সহদেব চক্রবর্তীর দর্শনমঙ্গলে (১৫শ শতাব্দ) এবং অপরাপর অনেকগুলি বাঙ্গলা পুস্তকে প্রহেলিকার মত কতকগুলি কথা আছে, যথা—

“গুরুদেব, নিবেদি তোমার রাজ্য পায়।

• পুতকীর হৃৎকে সিদ্ধ উধলিল, পর্কিত ভাসিয়া যায় ॥

গুরুহে বৃদ্ধহ আপন মনে।

শুক কাষ্ঠ ছিল, পল্লব মুঞ্জরিল, পাষণ্ডি বিধিল ঘুণে।

শিলা নোড়াতে কোন্দল বাধিল, সরিষা ধরাধরি করে ॥

চালের কুমড়া গড়ায়ে পড়িল, পুঁইশাক হাসিয়া মরে।

এ বড় বচন অদ্ভুত। অকাট বাখিয়া প্রসব করিল,

ছেলে চায় পায়রার ছধ।

অনেক বতনে নৌকা বাধিল, কাকড়া ধরিল কাঁচি ।
মশার লাগিতে পর্কত ভাদিল ক্ষুদ্র পিপীলিকার হাঁচি ॥
আগে নৌকা উড়িল, পশ্চাৎ ডুবিল, মাঝে মাঝে উড়িল ধূলা ।
সরিষা ভিজাইতে জলবিন্দু নাই, ডুবিল দেউলচূড়া ॥”

এইগুলি প্রচলিত দেহতত্ত্বসম্বন্ধে ইঙ্গিত, এককালে আমাদের চাবারা ইহা বুঝিত, এখন আমরা ইহা বুঝিতে পারি না। হিন্দুর অধ্যাত্মবিজ্ঞানি যে কতটা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। দেহতত্ত্বসম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্বোক্ত শব্দ সেকালের পণ্ডিতেরা সকলেই বুঝিতেন, যথা পঞ্চকোষ—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। কুল্লুক ভট্ট মনুর টীকায় বলিয়াছেন, শ্রুতি ছই প্রকার, বৈদিক এবং তাত্ত্বিক। কলিযুগে বৈদিক কর্মকাণ্ডের জটিল বন্ধন অমুসরণ করা স্বাভাবিক লোকের সাধ্যাত্ত নহে, এজন্য একালের জন্ত তাত্ত্বিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা। পূর্বোক্ত অন্নময় প্রভৃতি কোষ আত্মার পর পর, আভরণস্বরূপ। অন্নময় কোষের ছয়টি আচ্ছাদন বা শরীরকোষ, তন্মধ্যে কেশ, রক্ত এবং মাংস মাতৃদত্ত, এবং অস্থি, স্নায়ু ও অস্থির ভিতরকার কোমল অংশ পিতৃদত্ত। শরীরের ইন্দ্রিয় ছই প্রকার; জ্ঞানেন্দ্রিয়—নাসিকা, শ্রবণ, জিহ্বা, দৃষ্টি এবং চক্ষু; কর্মেন্দ্রিয়—মুখ, বাহু, পদ এবং দ্বারদ্বয়।

অন্নময় কোষের পর প্রাণময় কোষ শ্বাসপ্রশ্বাসসম্বন্ধীয়, ইহাদের মূল ‘অনাহত’ ও বিশুদ্ধ চক্র। প্রাণময় কোষের অধিষ্ঠাতৃ প্রাণময় দেবতা, ইহাদের পঞ্চ বায়ু প্রধান—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান এবং সমান। কুণ্ডলিনী শক্তি ইহাদের মাতৃরূপিনী।

ইহার পরে মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ। ইহাদের প্রক্রিয়া অন্তঃকরণে ব্যক্ত হয় চারি প্রকারে,—বুদ্ধি, মানস, অহঙ্কার এবং চিত্ত। নিদ্রাকালে ইহাদের কার্য স্বগিত হয়। স্বপ্নের আবস্থায় জীবকে “তৈজস” নামে অভিহিত করা হয়। ইহার পর সুষুপ্তির অবস্থা অর্থাৎ স্বপ্নহীন নিদ্রা, এই অবস্থায় মনের কার্য অপসারিত হয়, এবং কেবলমাত্র তমসাবৃত্ত বুদ্ধি সজাগ থাকিয়া জীবের অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। এই অবস্থার উপাধি হিরণ্য-গর্ভ, বিরাট এবং অব্যক্ত। এই সুষুপ্তি অবস্থায়ও জীবের অবিজ্ঞা থাকে, এইজন্য জীব তখনও পরমাত্মার সহিত এক হইতে পারে না। সুষুপ্তির উর্দ্ধে তুরীয় এবং তুরীয় অবস্থার পরে যাহা হয় তাহা নিরূপাধি, তখন জীব শিবের সঙ্গে এক হইয়া যায়।

জীবশরীরে সাড়ে তিন কোটি নাড়ী পরিকল্পিত হইয়াছে, ইহাদের নাম নদী। নাড়ীগুলির মধ্যে ১৪টি প্রধান এবং এই ১৪টির মধ্যে পিত্তলা ও সঘৃণা সর্বশ্রেষ্ঠ। সঘৃণা মূলধার হইতে মস্তিষ্ক পর্যন্ত প্রসারিত। জীবশরীরে ছয়টি চক্র আছে, মূলধার, স্বাধিহান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং অজ্ঞ। সর্বোপরি সহস্রার পদ্ম (সহস্রদল পদ্ম)।

এই তত্ত্বানুষ্ঠানে গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গুরুর স্থান পিতামাতা হইতে উচ্চ। সং গুরু প্রথমতঃ শিষ্যকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দীক্ষা দিবেন।

তারপর আট প্রকার অভিষেকের ব্যবস্থা আছে। সিদ্ধির জন্ত সাধনার পথ অবলম্বন করিতে হয়। তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি স্বতন্ত্র রকমের। কুলার্ণবতন্ত্র আচার।

সাত প্রকার আচারের নির্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কোল আচার সর্কশ্রেষ্ঠ, তারপর ক্রমাধয়ে যোগাচার, অঘোরাচার (সিদ্ধাস্তাচার), বামাচার, দক্ষিণাচার, শৈবাচার, বৈষ্ণবাচার ও বেদাচার। বেদাচার সর্কাপেক্ষা নিকৃষ্ট। মন্ত্রের অসীম শক্তি, তন্ত্রশাস্ত্রে স্বীকৃত। প্রতিমাদ্বারা, মণ্ডল এবং বস্ত্র দ্বারা পূজা করিতে হয়। যোগিনীতন্ত্রের বিধানানুসারে মুদ্রা ১০৮ প্রকারের, তন্মধ্যে সাধারণতঃ ৫৫টি প্রচলিত মুদ্রা।

বৈদিক সন্ধ্যা তিন বেলা অনুষ্ঠান করিতে হয়, শূদ্রদের এই ত্রিসন্ধ্যার অধিকার নাই। কিন্তু তান্ত্রিক সন্ধ্যা সব শ্রেণীর জন্ত। তান্ত্রিক পূজা, যজ্ঞ, ব্রত, জপ, সংস্কার, পুরশ্চরণ, ভূতশুদ্ধি, ভ্রাস, পঞ্চতত্ত্ব (পঞ্চ মকার) প্রভৃতি বিশেষ অনুষ্ঠান তন্ত্রশাস্ত্রে আছে। বৈদিক অনুষ্ঠানে স্বকীয় মত খুব জোরের সহিত প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে একমাত্র সহদৃশ্বিনীই ধর্ম-কার্যের সঙ্গিনী। অষ্টাদশক্রিয়া—যথা, স্মরণ, কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, বৈদিক ও বীরাচার।

গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যাবসায় এবং ক্রিয়ানিষ্পত্তি—এ সমস্তেরই নিজের দ্বী সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইয়াছে। বীরাচারে অনেক বাতিচারের কথা আছে, কিন্তু তাহা অধিকারীর জন্ত।

বঙ্গদেশের সহজিয়াদের মধ্যে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের যে পরিণতি হইয়াছিল, তাহা বীভৎস, তৎপ্রসঙ্গ আমরা অতি সংক্ষেপে বৈষ্ণব অধ্যায়ে উল্লেখ করিব।

তান্ত্রিক অনুষ্ঠান-দ্বারা বাহ্যিক ক্ষমতা লাভ করিতে চান, তাহার মন্ত্র ও তপস্তা দ্বারা “নভঃসংকারিণী”, (আকাশভ্রমণ) “অগ্নিমা”, (বৃহদাকৃতিধারণ)

অলৌকিক ক্ষমতা। “লঘিমা” (ক্ষুদ্রাকারধারণ), “দহনী” (যে শক্তি প্রভাবে দগ্ধ করা যায়), “মনস্তন্তনকারিণী” (যে বিজ্ঞা দ্বারা মন তন্তন করা যায়), “দিনরাত্রিবিধায়িনী” (যে বিজ্ঞা দ্বারা দিনকে রাত্রি এবং রাত্রিকে দিনে পরিণত করা যায়), অজর ও অমর হওয়া, “অবলোকিনী” (যে শক্তি দ্বারা দৃষ্টি বস্তুর ভিতর দিয়া যায়), “বন্ধনী” (বাহার দ্বারা অপার বক্তিকে বন্ধন করা যায়), “মোচনী” (বন্ধারা বন্ধন হইতে মুক্তি দেওয়া যায়), “অনলন্তস্তিনী” (বন্ধারা অগ্নির ক্রিয়া বন্ধ করা যায়), “তোয়ন্তস্তিনী” (বন্ধারা জলের শক্তি রোধ করা যায়), “বশকারিণী” (বন্ধারা পরকে বশ করা যায়—বশীকরণ) প্রভৃতি মহাবিজ্ঞা লাভ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। এই সকল শক্তি তান্ত্রিকেরা অনেকে লাভ করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। নবদ্বীপের আগমবাগীশ (পঞ্চদশ শতাব্দী) এবং পূর্ববঙ্গের সর্কবিজ্ঞা (মেহরের) ও মিতরার অর্দ্ধ-কালী এই সকল সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রণী। এ সম্বন্ধে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই। এখনও বাঙ্গালীর মধ্যে হঠবাগী আছেন, এরূপ শুনিতে পাই। রাজবাগীদের এই সকল ক্ষমতা লাভের চেষ্টা নাই। তন্ত্রের এত পুস্তক রচিত হইয়াছে, ইহার অনুষ্ঠানের এরূপ অসংখ্য বিধি-ব্যবস্থা আছে, এই তন্ত্রধর্ম একদা এত লোককে আকর্ষণ করিয়াছিল, ইহার জন্ত মানুষ এত কষ্ট সহ করিয়াছে যে, অতিশ্রম-লভ্য, ছরহ-ও গুঢ় হইলেও

এই বিজ্ঞাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া মানুষ যেমন নিবিড় কোন জঙ্গল দেখিলে তাহা দূরে ফেলিয়া চলিয়া যায়,—আমাদের “ইহা অনদিগম্য এবং অসার” এই অভিযোগ দিয়া সেইরূপ এই মহাশাস্ত্রটাকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হইবে না। বোধ হয় তত্ত্বশাস্ত্রের মত একরূপ জটিল কোন বিজ্ঞা নাই, ইহার অধিকাংশই অমুষ্ঠানের ভিত্তির উপর স্থাপিত। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই শাস্ত্রের অমুশীলনজন্য কত ক্লম্ব করিয়াছেন। সকলই কি ভুয়ো? আনুষ্ঠানিক প্রচেষ্টা দ্বারা তত্ত্বশাস্ত্রের কতটা সত্য, কতটা মিথ্যা, তাহা

নির্ণয় করিবার পূর্বে কষ্টসাধ্য দেখিয়া উহাকে একটা ছর্নাম দ্বারা দৈবশক্তি ও জড়শক্তি।

নিম্নিত করিয়া একেবারে এতবড় শাস্ত্রটাকে অতলে ডুবাইয়া দেওয়া কি উচিত? অধ্যাত্মশক্তি জগতের সর্বাপেক্ষা বড় শক্তি, জড়শক্তিদ্বারা তাহা আয়ত্ত হয় নাই। অধ্যাত্মরাজ্য আধার ও হুজের, ইহার পথ জটিল এবং জড়জগতের নিয়মাবলী নহে। আমাদের দেশের লোকেরা অধ্যাত্মরাজ্যের কোন নিগূঢ় প্রদেশে যাইতে ভীত হন নাই। এখনকার পাশ্চাত্য জগতের লোকেরা যেকোন জড় জগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান লইতেছেন, এমন কি মঙ্গলগ্রহের লোকেদের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টা পাইতেছেন, মেকদেশে অভিযান করিয়া প্রাণ পর্যন্ত হারাইতেছেন, এদেশের লোকেরা তেমনই প্রবল অধ্যবসায়বলে অধ্যাত্মরাজ্য অদিগম্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই পথে কোন ক্লম্ব, কোন তপস্বী, কোন উৎকট কার্য তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। তাঁহাদের যে বিপুল শাস্ত্রের ডালি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, তাহার ইতিহাসটাও কি আমাদের জন্য উচিত নহে?

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের অনেকেই বৌদ্ধপ্রভাবে পৈতা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই পতিত ব্রাহ্মণেরা বৈদিক ব্রাহ্মণগণের ব্যবস্থায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় সাবিত্রীদীক্ষা লইয়াছিলেন। দিগন্তলনিবাসী “আনন্দচন্দ্র” ঘটক-রাজের সংগৃহীত প্রাচীন কারিকায় ইহার আভাস আছে। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ৩৩ পৃষ্ঠা।) এই সময়ে তান্ত্রিকতার এত অধিক প্রচলন হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মণগণ পর্যন্ত বেদবিহিত কর্ম নিষ্ফল মনে করিতেন। মহানির্দোষতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি কলিয়ুগে তন্ত্র ত্যাগ করিয়া বৈদিক আচার সমর্থন করেন, তিনি “তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কুপং খনিত হুস্মতিঃ।” পঞ্চমকারের সাধনার উপর এতটা জোর দেওয়া হইয়াছিল যে সাবিত্রীজপই ব্রাহ্মণত্বের মুখ্যলক্ষণ বলিয়া নির্দিষ্ট থাকিলেও

কৌলিকী সুরাপানই ব্রাহ্মণত্বের কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল।

সুরাপান।

“দেবানামমৃতং তদীয়ং কৌলিকী সুরা। সুরান্নং ভোগমাত্রেণ বহির্দীপ্তো ভবেন্নরঃ। শাপমোচনমাত্রেণ সুরা মুক্তিপ্রদায়িনী। অতএব হে দেবেশি ব্রাহ্মণঃ পানমাচরেৎ। স ব্রাহ্মণঃ সবেদজ্ঞঃ সোহগ্নিহোত্রী স দীক্ষিতঃ॥” (মাতৃকাভেদতন্ত্র, ৩য় পটল)। পিছলা তন্ত্রের দশম পটলে তান্ত্রিকদের প্রতি যে সকল উপদেশ দেওয়া আছে তাহা আমরা উদ্ধৃত করিতেও ঘৃণা বোধ করি। তান্ত্রিকেরা অবশেষে যোগ ফুলিয়া ভোগে নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন; এবং “ভোগই শ্রেষ্ঠ” এই স্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। “ভোগেন

লভ্যতে যোগং ভোগেন কুলসাধনম্, ভোগেন সিদ্ধিমাপ্নোতি ভোগেন মোক্ষ মাগ্নুয়াৎ।” (মাতৃকাভেদ, ৩য় পং)। তান্ত্রিক আচার তিন শ্রেণীর,—দিব্য, বীর ও পশু। দিব্যাচার অতি কঠিন। যিনি বিশ্বকে দেবতাস্বরূপ মনে করেন, সর্ব জগৎ স্ত্রীস্বরূপ এবং শিবই একমাত্র

দিব্যচারী।

পুরুষ (কুঞ্জিকাতন্ত্র, ৭ম পটল) এই অভেদ জ্ঞান বাহার হইয়াছে তিনিই দিব্য। বাহার নিকট শত্রু মিত্রসম, যিনি সত্যবাদী, কদাপি মিথ্যা বলেন না, এবং এইরূপ অপরাপর গুণবিশিষ্ট তিনিই দিব্য। বঙ্গাল সেন অসংখ্য ব্রাহ্মণের মধ্যে ১২ জনকে এই দিব্য-শ্রেণীভুক্ত করিবার উপযোগী মনে করিয়াছিলেন।

বীরচারী।

বীরচার ও লৌকিক সংস্কার বীভৎস—পরদ্বী (শক্তি) ব্যতীত বীরের জপাদি এবং মাংস ব্যতীত বীরের দেবীপূজাদি চলে না। ইহা ছাড়া বীরের সাধনায় আরও অকথা বিষয় আছে। পশুর আচারে দুর্গাপূজা, বিষ্ণুপূজা, নিত্য শিবপূজা, বেদোক্তব ক্রিয়াকাণ্ড নির্দিষ্ট আছে। এদেশে বীরচারই বঙ্গাল সেনের সময়ে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। স্মরণ্য দ্বাদশ-একাদশ শতাব্দীতে যে মন্দিরগায়ে সমস্ত বীভৎস চিত্র আঁকা হইবে, জয়দেবের কাব্যের অশ্লীল নিক্রম যে রাজসভায় আদৃত হইবে এবং ধর্মের অনুষ্ঠানে যে পঞ্চ মকারের জয় জয়কার হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বুদ্ধদেব কঠোরতার যে উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন এই যুগে ধর্মের তদপেক্ষা অধিকতর অবরোহণ হইল, ইহা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। হিন্দু তন্ত্রের দোহাই থাকিলেও বঙ্গালকর্তৃক

অধোগতি।

সম্মানিত বীরচারীরা গোপনে গোপনে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার সমর্থন করিতেন, (ব্রহ্মবামল ২২ পৃঃ)। এই যুগেই লক্ষণসেনের সভায় শুধু বিদ্যাংপ্রভা ও শশিকলার নর্তনমুখর মঞ্জীরধ্বনিতে শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইতেন না, ধোয়ী কবির পবনদূতে দৃষ্ট হয়, “সেন-রাজধানীর অলিগলিতে অভিসারিকাগণের অবাধগতিতে ও নাগর-নাগরীগণের দোলায় ঘূর্ণনকালে রহসি প্রেমমালাপে নিশীথিনী যেন প্রতিধামে বিলাস-কলার উত্তেজনায় কণ্টকিত হইতেন।” যখনই কোন জাতির অধঃপতন হইবে, তখনই দৃষ্ট হয়, নরনারীর সংযমশীলতা ও পরস্পরের প্রতি সন্মম দূর হইয়া তাহারা হোলিলীলার কর্দমাক্ত হন।

কিন্তু বৈদিক আচার প্রবর্তনে সমাজের অবস্থা সংশোধিত হইতে লাগিল। দেশ ‘বীর’-গণের প্রভাবে বশীভূত। কারণ প্রবৃত্তির আচ্ছান রোধ করা কঠিন। এই সময়ে হলায়ুধ মংস্ত্র-

মংস্ত্রহস্ত।

সূত্র লিখিয়া বীরচারিগণের মনোরঞ্জনার্থ তাহাদের মত কিছু সমর্থন করিলেন। কিন্তু তাহার প্রধান লক্ষ্য হইল চিত্তশুদ্ধি ও নিষ্ঠা। মংস্ত্রহস্তের ৩১ পটল হইতে ৪১ পটল পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে সহজেই মনে হইবে যে পূজা ও আহিক প্রভৃতি দ্বারা বাহাতে চিত্তশুদ্ধি ঘটে তদ্রূপ আচার তিনি মন্থদি স্মৃতিকারের পন্থা অনুসরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হলায়ুধের ভ্রাতা ঈশানও একই উদ্দেশ্যে “আহিকপদ্ধতি” রচনা করেন। তান্ত্রিক অনুষ্ঠানগুলি একদিনে উড়াইয়া দেওয়া তখন সম্ভব-পর ছিল না। কারণ দেশের বহুমূল সংস্কারের উপর তাহাদের ভিত্তির পত্তন হইয়াছিল।

তথাপি এখন হিন্দুর দেবদেবীপূজার জপ, তপ ও আহিক প্রভৃতি নিত্যকর্মে আমরা যে ব্যবস্থা মানিয়া চলি, লক্ষণসেনের সময় হইতে সহজে তাহা প্রচলনের সূত্রপাত হইয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আচার-ব্যবহারের কথা, জাতিতত্ত্ব

নবব্রাহ্মণ্যের পূর্বে এদেশে সামাজিক যে অবস্থা বিদ্যমান ছিল, তাহা এখন অনুমান করাও হ্রাসাধ্য। ব্রাহ্মণেরা সমস্ত সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নুতন করিয়া গড়িয়াছিলেন।

বৈদিক সময়ের অনেক পরেও পৈতাটা সর্বদা কাঁধে ঝুলাইয়া রাখা গৈতা।

ব্রাহ্মণগণের পক্ষে অপরিহার্য ছিল না। গৃহস্থত্রে পুনঃ পুনঃ যজ্ঞ অথবা অপরাপর ধর্মকর্মের সময়ে পৈতা-ব্যবহারের প্রয়োজন স্বীকৃত হইয়াছে। এমন কি পৈতা না থাকিলে উত্তরীয় গলে দিয়া ঐ সকল কার্য্য করিবার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। সহজবুদ্ধি দ্বারাও এটা বুঝা যায় যে অনাবশ্যক একটা ভার কাঁধে করিয়া দিনরাত লোকের পৈতা পরার সুখ মিটাইবার ইচ্ছা স্বাভাবিক নহে। পৈতার নাম যজ্ঞসূত্র, যজ্ঞের সময়েই উহা পরিবার বিধি, এই জন্তই উহার ঐ নাম হইয়াছিল। পুরোহিতগণের সর্বদা পূজা, যজ্ঞ ইত্যাদি করিতে হইত, তাহার পৈতা অনেক সময়েই গলায় পরিয়া থাকিতেন। বাঙ্গলা ময়নামতীর গানে দৃষ্ট হয়, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণের শুভ সময় নির্ণয় করিবার জন্ত পুরোহিতকে ডাকাইয়া পাঠান হইলে, তিনি উত্তরীয় ও পৈতাটি পরিয়া রাজসভায় চলিলেন। উহার কোনটিই তাহার গলায় ছিল না—“চটক ধুতি মটক ধুতি পরিধান করিয়া। বোড় বোড় পৈতা দিল গলায় তুলিয়া।” (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, প্রথম ভাগ, ৫৮ পৃঃ।) বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বাঙ্গলার অনেক ব্রাহ্মণই পৈতা ছাড়িয়াছিলেন। কুলজীওঁধের একটিতে এক ব্রাহ্মণসম্বন্ধে লিখিত আছে “পৈতা ছাড়ি পৈতা লয় বৈদিক দেয় পাতি।” (নগেন্দ্রবাবুর জাতীয় ইতিহাস।) সুতরাং ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে যে পৈতা নুতন করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে দৃষ্ট হয়, মুসলমানেরা বাছিয়া বাছিয়া সেই সকল ব্রাহ্মণকে বাঁধিয়া লইতেছে,—বাঁহাদের গলায় পৈতা ছিল। (“বাছিয়া ব্রাহ্মণ লয় পৈতা যার কাঁধে।”) সুতরাং পৈতা-ছাড়া ব্রাহ্মণও যে ছিল তাহা বুঝা যাইতেছে। মুসলমান-বিজয়ের বহু পরেও যে পৈতাসম্বন্ধে খুব আঁটাআঁটা নিয়ম ছিল না—তাহার আভাস লোচনদাসকৃত চৈতন্যমঙ্গলে দৃষ্ট হয়। চৈতন্য প্রভু যখন পূর্ববঙ্গে ভ্রমণের জন্ত যাইতেছিলেন, তখন তিনি তাহার স্বতিচিহ্নস্বরূপ নিজের গলায় পৈতাটি খুলিয়া

পত্নী লক্ষ্মীদেবীকে দিয়া যান। সপ্নদষ্ট হইয়া লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুর প্রাকালে তাঁহার স্বামীর পাছকা ও পৈতা সম্মুখে রাখিয়াছিলেন। উত্তরকালে অপরূপ শ্রেণীর সঙ্গে ব্রাহ্মণের পার্থক্য সুস্পষ্ট করিবার জন্ত ব্রাহ্মণগণ পৈতার ব্যবহারটা অপরিহার্য্য করিয়াছিলেন।

অপরূপ বহুবিধ আচার দেশে প্রচলিত ছিল, বাহা এখন উঠিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে গৌরীদানপ্রথা সমাজে বিশেষরূপে প্রচলিত হইল; কিন্তু পূর্ববঙ্গ-গীতিকায় দেখা

বর-মনোনয়ন।

যায় নব ব্রাহ্মণ্যাদিকারবহির্ভূত প্রদেশগুলিতে কুমারীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করিতেন এবং তাঁহারা বর-মনোনয়নের ক্ষমতাও অনেক পরিমাণে ব্যবহার করিতেন, এসম্বন্ধে পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। বিবাহকালে বর যে কস্তার পাণিগ্রহণ করিতেন, কোন কোন সময়ে সেই কস্তার ভগিনীকেও দানে পাইতেন। গোপীচন্দ্র অতীতকালে বিবাহ করিবার সময়ে তৎকনিষ্ঠা পছন্দকে দানে পাইয়াছিলেন, ময়নামতীর গানে উল্লিখিত আছে। বাঙ্গালার কোন কোন দেশে রাজার মৃত্যু হইলে বা দীর্ঘকালের জন্ত রাজ্য

ত্যাগ করিলে তাঁহার মহিষীগণ রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে স্বামিরূপে

বরণ করিয়া লইতেন। গোপীচন্দ্রের ছাদশ বংশের কালব্যাপী সন্ন্যাস-গ্রহণের সময়ে তাঁহার একশত মহিষী তৎকনিষ্ঠ খেতুর শ্যাসদ্দিনী হইলেন; শুধু অতীত ও পছন্দা শোকসন্তপ্ত হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যাদিকারে কুকুর অতি

কুকুর।

অস্পৃশ্য পশুর পণ্ডিত্যে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু পূর্বকালের রাজাদের কুকুর অতি প্রিয় পালিত জন্ত ছিল। গোপীচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার আদরের কুকুরটি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার পদতলে লোটাঁইয়া পড়িল; তাঁহার প্রাসাদে ৯ বুড়ি শিকারী কুকুর ছিল। যুদ্ধিষ্ঠির একটি কুকুরকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের সময়ে চিত্রকরেরা পর্য্যন্ত কুকুরের ছবি আঁকিতে দৃশ্য বোধ করিতেন। দেবমন্দিরে সিংহ, ব্যাঘ্র, গরু প্রভৃতি নানা পশু এবং ময়ূর, শুক প্রভৃতি নানা পাখীর চিত্র উৎকীর্ণ দেখা যায়, কিন্তু আমরা প্রাচীন কালের এক মন্দিরে শিকারের ছবিতে ঠিক একটা ব্লাড হাউণ্ডের মত কুকুরের প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছি (চিত্র দ্রষ্টব্য)। যে সময়ে ঐ কুকুর উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তখনও বোধ হয় ব্রাহ্মণের নিষেধবিধি ততটা প্রবল হয় নাই। বাঙ্গালীরা বহুদিন পর্য্যন্ত কোঁচা পেছনে আঁটিয়া ধুতি পরিত, ঐরূপভাবে ধুতি

কাপড় পরার রীতি ও
পাগড়ী।

পরার নাম মালকোঁচা, সম্ভবতঃ মল্লেরা পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়ে ঐভাবে কাপড় পরিত। হিন্দুস্থানীরা এখনও ঐ ভাবে কাপড় পরিয়া থাকে। বাঙ্গালী প্রাচীন পুস্তকেও ঐ ভাবে সর্কদা কাপড় পরিয়া থাকার কথা আছে। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে দৃষ্ট হয় সিংহলরাজ চাঁদ সদাগরের নিকট পট্টবস্ত্র পাইয়া তাহা বাঙ্গালী ভাবে পরিতে শিখিতেছেন, “একখানি কাচিয়া পিঙ্গে, আর একখানি মাথায় বান্ধে, আর একখানি দিল সর্কগায়।” পূর্ববঙ্গের লোক ৫০০ বৎসর পূর্বে মালকোঁচা-মারা খোঁটার মত কাপড় পরিত। এক কালে বোধ হয় পাগড়ী পরাটা সকলের পক্ষেই অপরিহার্য্য ছিল। এ সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যে অনেক ইঙ্গিত আছে। গোপীচন্দ্রের

প্রাচীন গানে দৃষ্ট হয়,—গোপীচন্দ্রের মাতার মৃত্যুসংবাদ জানাইয়া ভ্রাতা খেতুরি তাঁহাকে বলিতেছেন, “কার জন্ত পাগড়ী রেখেছ মাথার উপর”—তখন পাগড়ী পরার রীতিটা বঙ্গে প্রচলিত ছিল, অল্প অল্প প্রমাণ “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ২৪৫ পৃষ্ঠায় দেখুন (ষষ্ঠ সংস্করণ)। পশ্চিম দেশীয় হিন্দুরা সকলেই পাগড়ী পরিতেন। বৌদ্ধগণ মুণ্ডিতমস্তক ছিলেন এ জন্তই তাঁহারা উত্তরকালে হিন্দুগণকর্তৃক “নেড়া” নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধগণের অনেকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর উক্ত নামে বঙ্গীয় মুসলমানগণও পরিচিত হইয়া থাকেন। মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধগণের সঙ্গে পার্থক্য বিশেষ করিয়া রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দুরা পাগড়ী পরাটা একরূপ বাধ্যতামূলক করিয়াছিলেন; আজমীরের বুবরাজ বিশাল দেবকে তাঁহার পিতা বৌদ্ধধর্মে অমুরাগের জন্ত তিরস্কার করিয়াছিলেন। তিনি (সারঙ্গ দেব) শুনিয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্র “বুধ-ধর্ম লয়ে ন বাধে তেগ।” (চাঁদ বর্দাই)—বৌদ্ধ ধর্ম লইয়া পাগড়ী পরে না। ইহার দ্বারা এই বুঝা যায় যে বৌদ্ধগণ পাগড়ী মাথায় রাখিতেন না। কোন হিন্দু বৌদ্ধ হইলে তাঁহাকে পাগড়ী ত্যাগ করিতে হইত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মহাপ্রভুর প্রাচীন চিত্রপটগুলিতে সংকীর্ণনের যে দৃষ্ট দেখান হইয়াছে, তাহার কোন কোনটিতে দলের প্রায় সকল লোকেরই মাথায় পাগড়ী, ইহাদের অনেকের পাগড়ীই মারোয়াড়ী-ধরণের। এই দলের লোকের মধ্যে যে অধিকাংশই বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা সন্দেহ করিবার কারণ নাই। (চিত্র দ্রষ্টব্য।) বাঙ্গালী মেয়েরা যে শাড়ী পরিতেন তাহা সনাতন কাল হইতে এক ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। একখানি বস্ত্রে শরীরের সকল দিক্ একরূপ সুন্দর ভাবে আচ্ছাদন করা অতি চাকু শিল্পকলার পরিচায়ক। ইহার সারল্যের মধ্যে শিল্পের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন আছে। কিন্তু বাঙ্গালীর ধুতির অকুঞ্চিত কুসুমস্তবকাকৃতি কোঁচা এবং শাড়ীর মর্দনশরীরবাপী অল্পপম পরিধানভঙ্গিতে একটা মনোরম কোশল সুব্যক্ত। ভগিনী নিবেদিতা বলিতেন, “বাঙ্গলার প্রত্যেক নরনারী কাপড় পরিবার সম্বন্ধে একটি মৌলিক কলাশিল্পের পরিচয় দিয়া থাকেন। সেই ভাবে ধুতি বা শাড়ী পরা বিদেশীরা সহজে আরম্ভ করিতে পারে না। অথচ প্যান্ট বা ট্রাউজার কতকটা বালিশের খোলার মত, দরজীই সমস্ত কাজ করিয়া দেয়, যিনি পারিবেন, তিনি পা ছুটি চুকাইয়া দিলেই তাঁহার কাজ শেষ হয়।” বাঙ্গালীর কোঁচা ও শাড়ী পরায় যে কত মনোজ্ঞ ভঙ্গী ছিল তাহা প্রদত্ত চিত্রগুলিতে কিছু কিছু বুঝা যাইতে পারে। যখনমন দাসের গোবিন্দলীলামৃতে রাধিকার বাসরসজ্জার যে বর্ণনা আছে তাহা কলাশিল্পের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে। যে সকল বাঙ্গালীরা উত্তর-পশ্চিম হইতে আসিয়া বাঙ্গলায় উপনিবিষ্ট হইতেন, তাঁহারা প্রথম প্রথম উৎসব ও ধর্মকাণ্ডের সময়ে তাঁহাদের দেশের প্রাচীন পরিচ্ছদ পরিয়া রীতি রক্ষা করিতেন; কিন্তু শেষে এই বাঙ্গলার আবহাওয়ার গুণে এদেশী পরিধানই অধিকতর উপযোগী মনে করিয়া প্রাচীন রীতি ত্যাগ করিয়াছিলেন (দ্বিতীশ-বংশাবলী দ্রষ্টব্য)।

পূর্বে বাঙ্গালী অকুঞ্চিত করিয়া দীর্ঘ চুল রক্ষা করিতেন, প্রাচীন সাহিত্যে এই দীর্ঘ চুলের উল্লেখ অনেক স্থলেই আছে। খোঁপা বাধিবার যে কত কোশল এ দেশের মেয়েরা জানিতেন,

তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এ বিষয়ে চীন, তিব্বত, নেপাল ও ব্রহ্মদেশের মেয়েরা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাহাদের অহুকরণে ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, আসাম, মণিপুর প্রভৃতি দেশের মেয়েরা এই বিজ্ঞায় বিশেষ পটুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ময়নামতীর গানে অজ্ঞানার খোঁপা বাধিবার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। রাজ্যী একরূপ খোঁপা বাধিয়া তাহা পছন্দ না হওয়াতে

খোঁপা বাধা।

ফিরিয়া ফিরিয়া অল্প রূপ তৈরী করিতেছেন। এই বর্ণনা যে যথার্থ, তাহা নহে, ইহাতে খানিকটা বা অনেকটা কবিকল্পনা

থাকিতে পারে, কিন্তু বাদসাদ দিয়াও বাহা থাকে তদ্বারা খোঁপা-বাধা বিজ্ঞাটা যে কলাশির-হিসাবে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

বাঙ্গলাদেশে এই খোঁপা বাধিবার নানারূপ কৌশল মেয়েরা শিখিতেন। এই খোঁপাগুলির মধ্যে এক এক রকম খোঁপার এক এক নাম ছিল, যথা শুয়াঠুঁটি, মুটকী, ঝুটকী, বেলে, পেতে পাড়া, বিউনী, টিয়াপাখী, মিঁধি-কাটা, চ্যাটাই, প্রজাপতি, চূড়খোঁপা, গোয়ালিনী এবং ধারের সিতে খোঁপা প্রভৃতি। ফিরিলী খোঁপা ও এলবাট খোঁপা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের।

পাল ও সেন-রাজাদের সময়ে বৈজ্ঞ শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। সাম্রাট মহাশয় তাহার সামাজিক ইতিহাসে লিখিয়াছেন, লক্ষণসেন বৈজ্ঞদিগকে প্রত্যেক বস্তুর গুণ-নির্ণয়ের জ্ঞান আদেশ দিয়াছিলেন এবং সেই কার্যের সাহায্য জ্ঞান বিজ্ঞ কবিরাজদিগকে ‘রোমধা’ যোগাইতেন।

বৈজ্ঞাণ ও বৈজ্ঞগণ।

হিন্দুরাজ্যে অপরাধীদিগকে চারি প্রকারে প্রাণদণ্ড করা হইত। ১ম—মশানে লইয়া কালীদেবীর সম্মুখে বলিদান, ২য়—শূলে দেওয়া, ৩য়—হাত-পা বাধিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ, ৪র্থ—সজীব অবস্থায় মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা। অতি সম্রাস্তবংশীয় অপরাধীদিগের প্রথম প্রকার প্রাণদণ্ড হইত। আর মহাব্যাধিযুক্ত অপরাধীদিগের চতুর্থ প্রকারে প্রাণদণ্ড হইত। প্রথম ও চতুর্থ প্রকারের দণ্ডনীয় অপরাধীরা

“রোমধা”।

“রোমধা” হইত না। দ্বিতীয় ও তৃতীয়প্রকারের অপরাধীর মধ্যে বাহাদিগকে সবল ও সুস্থ দেখা যাইত, চিকিৎসকেরা তাহাদিগকে রাজার নিকট লইয়া “রোমধা” করিতেন। “রোমধা”-দিগের কপালে উল্কা দ্বারা “রোমধা” এই শব্দটি চিরস্থায়ী রূপে লিখিয়া দেওয়া হইত। “রোমধা”দিগের দেহ ও প্রাণ কবিরাজদিগের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন ছিল। কবিরাজেরা তাহাদের শরীরে ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিতেন। কোন্ ঔষধ খাওয়াইলে বা মালিস করিলে মনুষ্য-দেহে কি ফল হয়, তাহার নিরূপণজ্ঞ কবিরাজেরা সেই বস্তু রোমাধদিগকে খাওয়াইতেন বা তাহাদের শরীরে মালিস করিতেন। তাহাতে ‘রোমধার’ ব্যারামই হউক বা মৃত্যুই হউক, তাহাতে কবিরাজের কোন অপরাধ হইত না। কখনও বা “রোমধা”দিগকে বাধিয়া তপ্ত তৈল বা দ্ব্যতপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করা হইত। অল্প সময়ে রোমধারা কবিরাজের ভৃত্যের কাজ করিত। কখনও বা কবিরাজেরা ভুট্ট হইয়া কোন ‘রোমধা’কে বাড়ী যাইতে ছুটি দিতেন। কবিরাজেরা ছুটি দিলে “রোমধা”র পূর্ক অপরাধের জ্ঞান আর কোন

দণ্ড হইত না। ইংরেজ রাজত্বে 'রোমধা' না পাওয়ায় কবিরাজদিগের অনেক ঔষধ এখন তৈয়ারী হয় না। লক্ষণসেনের যুদ্ধে, বায়ে এবং উৎসাহে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-বিজ্ঞায় পৃথিবীমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। কালক্রমে রাজকীয় সাহায্যের অভাবে, অর্থান্ধাবে, ঔষধের সামগ্রীর অভাবে, বৈজ্ঞানিকচিকিৎসার গুণ বিস্তার হ্রাস পাইয়াছে বটে, তথাপি আর্ঘ্যচিকিৎসা-বিজ্ঞায় অল্প কেহ অজ্ঞাপি বাঙ্গালীর তুল্য হইতে পারেন নাই। নাড়ীজ্ঞান বাঙ্গালী চিকিৎসকের তুল্য অল্প কোন জাতীয় চিকিৎসকের নাই। (দুর্গাচরণ সান্যাল-কৃত সামাজিক ইতিহাসে, পৃঃ ৩৮-৩৯)। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—“নরপাল দেবের (১০২৫-১০৪৫ খ্রীঃ) রাজত্বকালে বৈজ্ঞ জাতির প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল, বৈজ্ঞ গ্রন্থকার চক্রপানি দত্তের পিতা নারায়ণ নরপাল দেবের রক্ষনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। জনার্দন মন্দিরের প্রশস্তি রাজবৈজ্ঞ সহদেব কর্তৃক এবং গদাধর মন্দিরের প্রশস্তি বৈজ্ঞ বজ্রপানিকর্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই ক্ষোদিত লিপিতে শিল্পীর অনবধানতা প্রযুক্ত বহু ভ্রম সত্ত্বেও রচিত্ত্বগণের বিস্তার ও রচনাকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, নরপাল দেবের রাজ্যকালে বিক্রমপুরবাসী শ্রীজ্ঞান নালন্দা মহাবিহারে সজ্জহবির নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিব্বত রাজ্যের অনুরোধে শ্রীজ্ঞান তথায় গমন করিয়াছিলেন।” (বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, ২৩৩ পৃঃ) এই বিষয়টি আমরা ২৬৩ পৃষ্ঠায় একবার উল্লেখ করিয়াছি, সেখানে ‘নরপাল’ শব্দটি ভ্রমক্রমে “নরপাল”রূপে লিখিত হইয়াছে।

এক সময়ে বৈজ্ঞদিগের প্রভাব অত্যন্ত বেশী ছিল। বুদ্ধ-সহচর, ক্রোড়পতি জীবক, বিশ্ববিখ্যাত ‘চরক’ প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও বঙ্গদেশে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মদন পালের প্রধান সেনাপতি “শুসেন”, বল্লাল সেনের প্রধান সেনাপতি “সংগ্রামদক্ষ হস্ত-বৈরিপক্ষ”, বালিনছি গ্রামনিবাসী “পান্থ দাস”, গোড়েশ্বর (সম্ভবতঃ বল্লাল সেন) হইতে “গজ তুরঙ্গ কনক ছত্র” প্রভৃতি উপঢৌকন প্রাপ্ত, সর্কশাস্ত্রবিৎ বাগ্মী, চিকিৎসাপটু বিনায়ক সেন, হুসেন খাঁর নিকট “কণ্ঠাভরণ পদবী” প্রাপ্ত “হরিহর খাঁ”, প্রভৃতি বহু পণ্ডিত বৈজ্ঞের নাম আমরা পাইতেছি। মহামহোপাধ্যায় সার্কসভোম, বিজ্ঞাবাচস্পতি প্রভৃতি উপাধিদারী বৈজ্ঞের নাম প্রাচীনকুলশাস্ত্রে এত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় যে পাণ্ডিত্য প্রভৃতি গুণে যে ইহারা ব্রাহ্মণগণের সর্বদা সমকক্ষতা করিয়া আসিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই।*

* বৈজ্ঞগণ সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ বৃৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এই দুই কার্যেই তাঁহারা ব্যতি লাভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণোচিত উপাধিগুলি তাঁহারা এত অধিক পরিমাণে লাভ করিতেন যে তাঁহাদের কুলগ্রন্থের যে কোন পৃষ্ঠা খুঁজিলেই ঐক্লপ উপাধির বহর দৃষ্ট হইবে। এসিদ্ধ বৈজ্ঞ চারুদাসের (“প্রধানঃ সর্ব-বৈজ্ঞানাং দেবানাং বাসবো যথা। বর্ণানাং ব্রাহ্মণ ইব কবীণামিব নারদঃ”—চন্দ্রসম্বাদ) বংশধরদের কুলজীর একটি পৃষ্ঠার প্রমাণ দেখাইব। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বংশে গুণাকর নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র দামোদর, উপাধি :—‘কবিরাজ’, দামোদরের পুত্র নরহরি, উপাধি ‘কবীন্দ্র’; নরহরির দুই পুত্র, ১ম রমানাথ, উপাধি ‘সার্কসভোম’, ২য় পুত্র বাণীনাথ, উপাধি ‘কবিশেখর’। রমানাথের ১ম পুত্র কান্দীনাথ, উপাধি ‘কবিকণ্ঠভূষণ’; দ্বিতীয় পুত্র কমলানাথ, উপাধি ‘কবিভিতিম’, কনিষ্ঠ; তৃতীয়নাথ, উপাধি ‘কবিকর্ণপুর’। পুরোক্ত কান্দীনাথ কবিকণ্ঠ-

হিন্দুরাজত্বের সময়ে বৈষ্ণব প্রভাব অটুট ছিল। তাঁহারা রাজাদের অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত ছিলেন এই জন্য অনেকে তাঁহাদিগকে দ্বৈত্যা করিতেন। কনোজাগত ব্রাহ্মণদের প্রভাববৃদ্ধির সঙ্গে বৈষ্ণব কতকটা হীনপ্রভ হইয়া পড়িলেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান রাজত্বের সময়ে অনেক সর্কশাস্ত্রবিৎ সার্কভোম বৈষ্ণব-পণ্ডিতের উল্লেখ পাওয়া যায়; নরোত্তমের প্রিয় সখা রামচন্দ্র কবিরাজ, প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দ দাস, ইহাদের মাতামহ কবি দামোদর, ষাঁহার সম্বন্ধে সঙ্গীতমাধবে এই শ্লোকটি পাওয়া যায়—“পাতালে বাসুকী বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ, মর্ত্তে গোবর্দ্ধনে দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ।” এবং পিতা চিরঞ্জীব সেন, চৈতন্যের প্রিয় সখা মুরারি গুপ্ত এবং শিবানন্দ সেন ও পরমানন্দ (কবি-কর্ণপুর) হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদ সেন এবং ভারতেচন্দ্রের সভার রাজবৈষ্ণব স্নগন্ধা নিবাসী গোবিন্দরাম ও আধুনিক গঙ্গাধর কবিরাজ প্রভৃতি শত শত বৈষ্ণব বঙ্গদেশে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি গত তিন চারি শত বৎসর যাবৎ সমাজে বৈষ্ণবের সেরূপ প্রতিষ্ঠা আর নাই। হিন্দুরাজত্বের অবসানের সঙ্গে তাঁহারা প্রধান অবলম্বন রাজশক্তির সহায়তা হারাইলেন, উচ্চ সমাজে হেকিমেরা প্রবল হইয়া উঠিলেন। বৈষ্ণববিদ্বেষিগণ এবার সুযোগ পাইয়া তাঁহাদের অনিষ্টসাধনে তৎপর হইলেন। বঙ্গীয় কবিগণ মাঝে মাঝে বৈষ্ণবজাতির উপর শ্লেষ বর্ণন করিতে ছাড়েন নাই। মুকুন্দরাম ব্রাহ্মণগণের পরই বৈষ্ণবের স্থান নির্দেশ করিয়াও তাহার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে বঙ্গদেশের একটি সর্বোচ্চ শ্রেণীর খরচায় নিজের পরিহাস-রসের পরিচয় দেওয়ার বাহাছরী লইয়াছেন, একটি উৎকৃষ্ট পল্লীগীতিকার এক মুসলমান কবিও বৈষ্ণবব্যাঙ্গে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, দুইটা কাব্যেরই সেই সেই স্থান পাদটীকায় দেওয়া গেল।*

ভূষণের ১ম পুত্র গোপীকান্ত, উপাধি ‘সরস্বতী-কণ্ঠান্তর’, কনিষ্ঠ পুত্র রমানাথ, উপাধি ‘কবিরাজশেখর’, কবিরাজ-শেখরের ১ম পুত্র রাঘবেশ্বর, উপাধি ‘কবিত্বষণ’, দ্বিতীয় পুত্র রত্নসেব, উপাধি ‘কবীন্দ্রভূষণ’; রাঘবেশ্বর কবিত্বষণের পুত্র রামেশ্বরের উপাধি ‘কবীন্দ্রভারতী’, রমানাথ কবিরাজশেখরের ভ্রাতা রঘুনন্দনের দুই পুত্র, প্রথম নরেশ্বর, উপাধি ‘কবীন্দ্ররত্ন’; দ্বিতীয় রাজবল্লভ, উপাধি ‘কবিরাজরত্ন’। এই বংশের আরও একটু নিম্নে অবরোধন করিয়া আমরা রূপরামের উপাধি ‘কবীন্দ্ররাজ’, কৃষ্ণকীর্তনের উপাধি ‘কবিরাজমণি’, রামচন্দ্রের উপাধি ‘শিরোমণি’, রামকান্তের উপাধি ‘কবিকর্ণমণি’, রামবাসের উপাধি ‘কবিচিন্তামণি’, রামেশ্বরের ‘কবিমণি’, অভিরামের ‘ভারতীভূষণ’, হরিহরের ‘কবিচন্দ্র’, রত্নরামের ‘কণ্ঠরত্ন’, নরোত্তমের ‘কবীন্দ্র’, জ্ঞানেশ্বরের ‘কবিকর্ণভূষণ’, রতিকান্তের ‘কণ্ঠান্তর’, গৌরীকান্তের ‘কবিতারতী’, রামকান্তের ‘কণ্ঠহার’ উপাধি দেখিতে পাই। ষোড়শ শতাব্দীর পরে একটা উপাধি বৈষ্ণবগণ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন—অন্ত কোন জাতির পক্ষে সে উপাধি অনায়ত্ত ছিল, উহা ‘কবিরাজ’; বৈষ্ণব কুলজীর্ণাশ্রমের নামে একটি পৃষ্ঠায় এই উপাধির বহর দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হইবে এজাতির মধ্যে সংস্কৃতানভিজ লোক অতি অল্পই ছিলেন। এখনও তাঁহাদের মধ্যে ‘চোবে’ ও ‘ভট্টাচার্য’ উপাধি-বিশিষ্ট পরিবার বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে বিদ্যমান।

* “বৈষ্ণবজনের তত্ত্ব, শুণ্ড সেন দাস রত্ন, কর আদি বৈসে কুলস্থান। চিকিৎসায় করে যশ, কেহ প্রয়োগের রস, নানা তত্ত্ব করয়ে বিধান। উঠিয়া প্রভাতকালে, উর্দ্ধ ঠোঁটা করি ভালে, বসন মণ্ডিত করি শিরে। পরিয়া উত্তম ধূতি, কক্ষবেশে করি পুঁথি, ডাকরাটে বৈষ্ণবগণ ফিরে। কার বেধি অসাধ্য রোগ, পলাইতে করে যোগ, নানা

যেখানে কবির বাইজ জাতিকে লইয়া গ্রেব করিয়াছেন, সেখানে চিত্রকাররাই বা ছাড়িবেন কেন? সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত কয়েকখানি ছবিতে বাইজের যে মূর্তি দেওয়া হইয়াছে সেগুলি ব্যঙ্গ-চিত্রের পর্যায়ভুক্ত।

মুকুন্দরাম ও পল্লীগীতিকার বাইজবিরূপ পড়িলে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী লেখক বেকনের ছত্রটি মনে পড়ে—“Physicians cure diseases as boat-men bring wind by whistling” (মানুষেরা যেরূপ শিশ দেয় এবং মনে ভাবে সেই শিশের জোরে বাতাস আসিবে, বাইজগণও সেইরূপ ঔষধের জোরে পীড়া সারাইবার দাবী করেন)।

অযোধ্যার স্কুল ইন্সপেক্টার জন. সি. নেসফিল্ড, এম. এ. (অবসর.) প্রণীত “কাষ্ট সিস্টেম” (উত্তর-পশ্চিম অযোধ্যা বিভাগের) নামক পুস্তকের (১৮৮৫) ৪৮ পৃষ্ঠায় (১০২ অনুচ্ছেদ) বাইজ জাতির ক্রমে ক্রমে লোপ পাওয়া সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত মত প্রচার করিয়াছেন; তিনি বলেন, “উত্তর-পশ্চিমের বাইজগণের অধিকাংশ সেই দেশে মুসলমান চিকিৎসকদের সমধিক প্রতিপত্তি দেখিয়া মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন, এখনকার হেকিমগণ সম্ভবতঃ সেই সকল বাইজের বংশধর। এ জন্য উক্ত প্রদেশে বাইজ নামক কোন স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব নাই।” এ কথা কখনও গ্রাহ্য নহে। অতীত দেশে এমন কি বঙ্গ দেশের একান্ত নিকটবর্তী আসামেও বাইজগণ ভিন্নশ্রেণীভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। আসামে তাঁহারা “বেজ বড়ুয়া”। বেজ শব্দের অর্থ যে বাইজ তাহা সকলেই জানেন। একমাত্র বঙ্গদেশেই সামাজিক নিগ্রহবশতঃ তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া আছেন, তথাপি বিজ্ঞা, বুদ্ধি, চরিত্রবলে, কাম্বলিতায়

ছলে মাগয়ে বিদায়। * * * * * কর্পুর পাঁচন করি, তবে জিরাইতে পারি, কর্পুরের করহ সন্ধান।
রোগী সবিনয়ে বলে, কর্পুর আনিতে ছলে, সেই পথে বাইজের প্রয়াণ।” (কবিকল্প চণ্ডী)।

“পহর তিন হাটি বাহু যায় সে তাড়াতাড়ি। তিনকড়ি যে মন্ত বাইজ পাইল তার বাড়ী। ঝাঁক ছাড়িয়া ডাকে বাহু কবিরাজ ম’শয়। আমার মা যে এখন তখন, তোমাকে যেতে হয়। তিনকড়ি কবিরাজ শুনি ধুতি চান্দর লইল। চান্দরের বুটির মধ্যে দাওয়াই বাইজা লৈল। হাতে লৈল বাবা লাঠি, কাছে লৈল ছাতি। তুলসী-তলায় বাইজ ঠেকাইল তার মাথি। কষ্টবর্ণ শরীল খানি ত্যাল ত্যালা তার গাও। বাটা বুটা, নাকা গোফা, ফাটা ফাটা পাও। কুতকুতিয়া চায় কবিরাজ গুরুরাইয়া বায়। পাছে পাছে বাহু নাপিত উন্টা হোচট বায়। বাহুর বাড়ী বাইজা বৈসে বাইজ তিনকড়ি। তোমার মা যে ভাল হবে খাইলে তিন বড়ি। আইজকা দিন বেলের ছাল, আর নিমের পাতার ঝোল। কাইলকা দিবা পরম কইরা সজ্জা ভিজাইনা জল। পণ্ডা দিবা লাল বড়িটা কাঞ্জী দিয়া ওইল। তন্তা দিবা নীল বড়িটা কুয়ার পানি তুইল। শেষেশি দিবা বাহু এই না থলা বড়ি। আরাম হইলে তোমার মা থাকবে না অরজারি। চাকুল খানের ভাত খিলাইও শরীরে চাইল জল। থলা বড়ি খাওয়াইলে দিও তেঁতুলের অখল। কবিরাজের কথা শুইনা বাহু নিল বড়ি। বিদায় হবার সময় হয়, নে কৈল তিনকড়ি। এক বুলা চাইল দিল, ডাইল এক ডালা। গাছের ধনে তুইলা দিল বাঙন মরিচ কলা। হুঙ্গি দিল লবণ দিল, পেটা ভইরা তেল। বিদায় পেয়ে কবিরাজ ম’শয় হাসতে হাসতে গেল। সন্ধ্যাবেলা বাহুর মা যে চকু মেইলা চাইল। জন্মের মত বাহুকে ধুইয়া মগো চইলা গেল।” পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, ২৪৮-৪৯ পৃঃ।

ও উচ্চশিক্ষায় বঙ্গদেশে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া স্বকীর আভিজাত্য বজায় রাখিয়াছেন।

কাণ্যকুলগণত ব্রাহ্মণগণ যে বঙ্গদেশে আসিয়া প্রবল প্রভাপাবিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। তাঁহারা যখন আসিয়াছিলেন, তখনই তাঁহারা সেই

প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই, তখনকার ইতিহাস কেহ
বাল্লভ্য কৌলীজ ও
বিদেশীরদের মতামত।
লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সামাজিক ইতিহাস লিখিবার

দ্বারাও তখন প্রচলিত ছিল না। বাল্লভ্য সেন কর্তৃক কৌলীজ প্রাপ্ত
হইবার পরে সম্ভবতঃ ইহারা কুলজী-গ্রন্থ-প্রণয়নে নিযুক্ত হন। আদিশূর কিংবা অপর যে কোন
রাজাই তাঁহাদিগকে বঙ্গদেশে আনয়ন করুন না কেন, সেই রাজা হইতে বাল্লভ্য সেন পর্য্যন্ত
৪৫ শতাব্দী চলিয়া গিয়াছিল। এই অন্তর্কর্ত্তী সময়টার ইতিহাস শুধু স্মৃতির উপর নির্ভর
করিয়া কুলজী-গ্রন্থকারগণ লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, এজন্য রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলজীর
আদি পর্ব্বটা ঠিক মিলিয়া যায় না। সচরাচর শ্রাদ্ধাদি ধর্ম্মকর্ম্ম উপলক্ষে যে কয়েক পুরুষের
নাম প্রয়োজন, মাতৃকুল ও পিতৃকুলসম্বন্ধীয় সেই কয়েকটি নামই লোকে স্মরণ রাখে। বাল্লভ্য-
সেনের পূর্ব্বের কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত নাম ঠিক আছে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী নাম ও সেই সকল ব্রাহ্মণগণ
সম্বন্ধে যে সকল কথা আমরা দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশ লুপ্ত স্মৃতির জোড়াতালি।
তাহার মধ্যে সত্য, মিথ্যা, ঐতিহাসিক ঘটনা ও উপগল্প আলো ও আধারের মত মিশিয়া আছে।
যখন কৌলীজ শুধু এক পুরুষের জন্ত সংস্থাপিত হইয়াছিল, তখনও কৌলীজমর্যাদার মূল্য খুব
বেশী ছিল না। বিশেষ তখন কৌলীজের বিরুদ্ধবাদী বহু লোক ছিল, যেহেতু নবমুঠ কৌলীজ-
দ্বারা সমাজ একেবারে উলট পালট হইয়া গিয়াছিল এবং বহু লোকের স্বার্থহানি, কুলভ্রংশ ও
সামাজিক পদের খর্ব্বতা ঘটিয়াছিল।

কিন্তু পরে যখন কৌলীজের পূর্ণ বিচার আরম্ভ হইল, তখন পদচ্যুত কুলীনগণের
মধ্যে বিবম ফোড় দৃষ্ট হইল। সাম্রাজ্য মহাশয় লিখিয়াছেন, “লক্ষণসেনের রাজত্বের পঞ্চদশবর্ষে
শ্রোত্রিয়দিগের দ্বিতীয়বার নির্বাচন করিয়া কৌলীজমর্যাদাদানের সময় হইল। রাজা নিজ
সভাসদগণ লইয়া নির্বাচন করিলেন। তৎকালে কোন সাধারণ পরীক্ষার নিয়ম ছিল না।
তুই চারি দিনের পরীক্ষা দ্বারাও প্রকৃত বিদ্যাবুদ্ধির পরিমাণ ঠিক হয় না, বিশেষতঃ ধর্ম্মশীলতার
পরিমাণ-নিরূপণজন্ত কোন সাধারণ পরীক্ষাই হইতে পারে না। সুতরাং লক্ষণসেনের কৃত
নির্বাচন যে খুব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। এই নির্বাচন হইতে কাহারও উন্নতি
হয় নাই। বরং কয়েক শ্রেণীর কয়জন লোকের অধঃপতন হইয়াছিল। বারেন্দ্র শ্রেণীর
মধ্যে ভরদ্বাজগোত্রীয় ভাদড় গাঁই কুলীনেরা পতিত হইয়া সিদ্ধ শ্রোত্রিয় হইলেন। রাঢ়ী
শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি কুলীন পতিত হইয়া ‘বংশজ’ নামে খ্যাত হইলেন। বারেন্দ্র
মধ্যে বংশজ নাই। এবার নির্বাচনক্রমে যাহাদের মর্যাদা পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইল,
অথবা তাহারা বঞ্চিত উন্নতিলাভে অথবা নিরাশ হইলেন, তাঁহারা মহা গোলযোগ উপস্থিত
করিলেন। এই উপলক্ষে অনেকগুলি শ্রোত্রিয় রাজা লক্ষণসেনকে প্রচুর তিরস্কার করিলেন

এবং অভিসম্পাত পর্য্যন্ত করিলেন। লক্ষণসেন বিবেচনা করিলেন যে, নির্বাচনপ্রথা প্রচলিত থাকিলে এইরূপ গোলযোগ প্রত্যেক নির্বাচন উপলক্ষে হইবে। অতএব তিনি নির্বাচনপ্রথা উঠাইয়া দিয়া নিয়ম করিলেন যে, এই অবধি কৌলীন্তমর্যাদা বংশাভ্যুত্থমিক হইবে এবং পুত্রকন্টার বিবাহের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দ্বারা সেই মর্যাদার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারিবে, পুনরায় আর নির্বাচন করিয়া মর্যাদা প্রদান করা হইবে না।" (৩৪-৩৫ পৃঃ) বল্লাল এই কৌলীন্তপ্রতিষ্ঠা-দ্বারা সমাজে গুণীর পূজা ও আদরের যে গঙ্গাধারা বহাইয়া দিয়াছিলেন, এইবার তাহা নিরুদ্ধ হইয়া গেল। তখন দেশের অতীব দুঃসময়, মুসলমানগণ কবে আসিবে, লোকের প্রাণ সংহার করিবে, সর্বস্ব লুণ্ঠ করিবে—এই আশঙ্কায় সমস্ত বঙ্গদেশ আতঙ্কিত হইয়াছিল। এই দুর্দিনে সমাজের সমস্ত শ্রেণী গৃহবিরোধ ভুলিয়া রাজার আশ্রয় লইল। কুলীনগণ তাঁহাদের মর্যাদা বংশাভ্যুত্থমিক হইল দেখিয়া রাজার প্রতি একান্ত অমুরক্ত হইলেন। দেশের গুণিগণও রাজার সাহায্য লইলেন, সুতরাং যদিও নির্বাচনপ্রথা উঠিয়া গেল, তথাপি এই অমুশাসন আপদস্বর্নাশে তৎকালোচিত ব্যবস্থাই বলিতে হইবে।

আভিজাত্য যদিও কৃত্রিমতার উপর স্থাপিত, তথাপি ইহাতে যে মানুষকে একেবারে কোনরূপ উন্নতই করে না, তাহা বলা যায় না। অনেক সময়ে ইহা আত্মসম্মান-বোধ প্রবুদ্ধ করে, মানুষকে হীন প্রবৃত্তি হইতে রক্ষা করে। পণ্ডিতপ্রবর প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী অষ্টৈতের বংশধর। তিনি একবার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তথায় এক অশীতিপর বৃদ্ধ বহু কষ্টে এক দূর পল্লী হইতে আসিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু, আমি আপনার

দর্শনকামনায় বাঁচিয়া আছি, আমার জীবনের প্রধান আশা কৌলীন্তের উদ্ধল সিদ্ধি।

আজ পূর্ণ হইল, আমার শারীরিক অসুস্থতার জন্ত খড়দহে যাইতে পারি নাই, কিন্তু অষ্টৈতের বংশধর খড়দহবাসী কাহাকেও না দেখিয়া যেন আমার মৃত্যু না হয়, বরাবর এই কয়েক বৎসর যাবৎ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি। আজ আমার সেই কামনা সিদ্ধ হইল।" এই বলিয়া সেই জরাজীর্ণ, কঙ্কালসার বৃদ্ধ প্রায় অর্ধ ঘণ্টা কাল তাঁহার পা ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাদিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন, "আমি বিস্মিত হইলাম, আমার মত পানী, তাপী, দুর্বল ব্যক্তির শরীরে যে মহাপুরুষের রক্তধারা বহিতেছে, তিনি কত বড় ছিলেন ভাবিয়া আমি প্রজ্ঞায় নত হইলাম। তাঁহার বংশে জন্মিয়া যদি পাপ করি, তবে আমার মত পানও আর নাই। সেই ঘটনা হইতে বখনই কোন অজ্ঞায় করিতে যাই, তখনই মনে হয় এদেশে শত শত লোক আছেন, বাঁহারা আমার দর্শনের দ্বারা পুণ্য অর্জন করিতে লালায়িত, আমার পক্ষে কি অজ্ঞায় করা শোভা পায়!"

এই বহুনিন্দিত কৌলীন্তের জন্ত যে কত শত লোক কত ত্যাগ, কত কষ্ট করিয়াছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে নিকট কুলীনের অনেকে বংশাভ্যুত্থমে শোচনীয় দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইয়া অপরিমিত অর্থ ও ঐশ্বর্য্যের লোভ সংবরণ করিয়াছেন,

তাহারা একটু নামিয়া বিবাহাদি করিলে তাহাদের আক্ষণিক লুপ্ত হইত না, পদমর্যাদার সামান্য পরিবর্তন হইত; কিন্তু সেই একটু কলঙ্কের দাগ যাহাতে বংশে না পড়ে তজ্জন্ত তাহারা রাজ-প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া অনাহারে অন্নাহারে খড়ো ঘরে জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন। সংগ্রাম সাহ নামক ক্ষত্রিয় সেনাপতি বলপূর্বক পূর্ববঙ্গে নিজেকে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত “Ancient Monuments of Bengal” নামক পুস্তকে তিনি ২০০ বৎসরের পূর্বের লোক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই উক্তি ভুল, সংগ্রাম সাহ বৈষ্ণবকুলপঞ্জিকা-প্রণেতা কবিকর্ণহারের সমকালবর্তী ছিলেন। তিনি এই বৈষ্ণব-কুলপঞ্জিকা ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ২২৭ বৎসর পূর্বে রচনা করেন। সংগ্রামসিংহ বলপূর্বক তাহার পুত্রকন্যাদিগকে কুলীন বৈষ্ণবসমাজে বিবাহ দিয়াছিলেন। ধর্মন্তরী গোত্রের মহাকুলীন বিমল সেন হইতে সপ্তদশ পর্ষাঘের হরিনাথ সেনের সহিত জোর করিয়া সংগ্রামসিংহ তাহার এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই মনোহুখে হরিনাথ বিরাগী হইয়া বাড়ীঘর ছাড়িয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিলেন, আর বাড়ীতে ফিরেন নাই। কর্ণহার লিখিয়াছেন—

“সংগ্রামসাহতনয়া-পাণিগ্রহণপীড়িতঃ। হরিনাথো নিজদেশাদতিদূরমুপাগতঃ॥” এক অকুলীন বৈষ্ণব সেনহাটীতে কুলকার্য্য করিতে বাড়ী হইতে জেদ করিয়া আসিয়া তথায় বহুকাল আড্ডা করিয়াছিলেন। বহু ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনেও কেহ তাহার সহিত কুটুম্বতা করিতে স্বীকৃত হন নাই। তথাপি তিনি চেষ্টা ছাড়েন নাই। কথিত আছে, তিনি ভৈরবের কূলে প্রথম আসিয়া যে অশ্বখ বৃক্ষের চারা পুঁতিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে বড় হইয়া যখন ছায়াপ্রদায়ী বিশাল তরুতে পরিণত হইয়াছিল, প্রায় দুই পুরুষ পরে তথাকার একঘর বৈষ্ণব তাহার সঙ্গে কাজ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কুলীন মকরন্দ ঘোষের বংশীয় রূপনারায়ণ নিজ বাসভূমি যশোহর ছাড়িয়া মাণিকগঞ্জে (ঢাকা) আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হন, মৃত্যুর পর তাহার দুই পুত্র জগন্নাথ ও বাণীনাথকে তথাকার হীন কায়স্থবংশীয় ‘কর’ উপাধিক জমিদার মহাশয় দুই কন্যা সম্প্রদান করিবার জন্ত অনেক অমুনয় বিনয় করেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই সম্মত হন নাই। তখন জমিদারের আদেশে দুই ভ্রাতা পদ্মাগর্ভে নীত হইলেন, তাহাদিগকে বলা হইল, যদি তাহারা জমিদারের কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হন, তাহাদিগকে পদ্মায় ডুবাইয়া মারিয়া ফেলা হইবে। এই সঙ্কটে বাণীনাথের সঙ্কল্প অটল রহিল, তিনি কিছুতেই কুল হারাইয়া করের কন্যা বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। বল্লালী বীর পদ্মাগর্ভে বীরের মতই প্রাণ বিসর্জন করিলেন,—তথাপি অতুল ঐশ্বর্য্য এবং সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান জীবনের প্রতি ভ্রক্ষেপ করিলেন না। জগন্নাথ অনেক অর্থসম্পত্তি পাইয়া জমিদারের এক কন্যাকে বিবাহ করিলেন। এই ঘটনা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঘটয়াছিল। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ, ৪৬০-৬১ পৃঃ)।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, কৌলীজ কতক পরিমাণে হীনপ্রভ হইলেও নিম্নের ঘরে নামিয়া বিবাহ করিলে জাতিচ্যুত হইতে হয় না। তথাপি কুলীনেরা যেরূপ প্রলোভন এবং ভয়প্রদর্শন এমন কি জীবন পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া কৌলীজ বজায় রাখিয়াছেন, তাহাতে

আভিজাত্যজনিত আত্মসম্মানজ্ঞান তাঁহাদের মধ্যে খুবই বিকাশ পাইয়াছিল। যে কৌলীজ লোককে এতটা তাগ স্বীকারে প্রবৃত্ত করাইত, তাহাতে তাহাদের চরিত্রের কতকগুলি নৈতিক গুণ বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ব্রাহ্মণদের মধ্যে ‘নিকব’ কুলীনগণ যে স্বীয় কুল নিম্নলব্ধ রাখিবার জন্ত কত তাগ ও ক্রুদ্ধ স্বীকার করিয়াছেন তাহা বলিবার নহে।

কুলীনের প্রধান কলঙ্ক বহুবিবাহ। এই বহুবিবাহ সর্বদা নিন্দিত হইয়াছে। ইহার এতটা বাড়াবাড়ি এই কুলীন সমাজে হইয়াছিল যে তাহা কোনরূপেই সমর্থন করা যায় না।

অশীতিপর বুদ্ধের হস্তে অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে দান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করা কুলীন সমাজেই বেশী দেখা যাইত। কিন্তু যুবক স্বামীরা

একশত দুইশত এমন কি চারিশত বিবাহ করিয়াছেন এরূপও শুনা যায়। কোথায় কাহার মেয়ে কে বিবাহ করিয়াছেন, ইহা অনেক সময়েই মনে থাকিত না। এজন্ত কুলীন স্বামীরা একটা ফর্দ সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। সেই ফর্দ দেখিয়া ২০ বৎসর পরে—অনেক সময়ে তদপেক্ষাও অনেক বেশী সময় পরে—শ্বশুরবাড়ী বাইয়া স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিতেন, তত্পলক্ষে শ্বশুর-মহাশয়কে অনেক টাকা দিতে হইত। কোন কোন সময়ে জামাতা মহাশয়ের অপর্ণ্যাপ্ত দাবী শ্বশুর মহাশয় মিটাইতে না পারিলে সেই চির-বিরহবিধুরা স্ত্রীর সঙ্গে দেখা না করিয়াই স্বামী রাগারাগি করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন। কুলীন সমাজে এই সকল ব্যভিচার প্রচলিত ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় হিন্দুদের কৌলীজ প্রথা সুপ্রসিদ্ধ বার্ডউড সাহেব এবং ভুবন-বিখ্যাত ঔপন্যাসিক বার্নার্ড শ সাহেব সমর্থন করিয়া টাইমস্ পত্রিকায় অনেক চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন। রিজলি সাহেবের People of India (ভারতের অধিবাসিগণ) শীর্ষক পুস্তকের ৮ম উপক্রমণিকায় তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। টাইমস্ পত্রিকায় ১৯০৭ খৃঃ অব্দে সার জর্জ বার্ডউড লিখিয়াছেন :—“আমরা ভাবি হিন্দুর কৌলীজ অবিচারের একটা রহস্ত-পূর্ণ দৃষ্টান্ত। কিন্তু হিন্দুদের কাছে ইহা একটি স্বর্গীয় ব্যাপার। যে পর্য্যন্ত তাহারা ইহা বিবেক-সম্মত ধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া গণ্য করে, সে পর্য্যন্ত ইহাতে তাহাদের নৈতিক অবনতির কোন আশঙ্কাই নাই।.....কুলীনেরা বিশিষ্ট ভঙ্গলোক—

সার জর্জ বার্ড উডের মত।

এই কুলীন শব্দ একটা সম্মানজনক উপাধি; ইংরাজীতে সম্মানিত (Honourable) অথবা মহাসম্মানিত (Right Honourable) বলিতে যাহা বুঝায়, কুলীন শব্দে তাহাই বুঝায়। এই কুলীনদের চেহারা প্রায়ই সুশ্রী, ইহারা বলিষ্ঠ। কারণ বহু-বিবাহের ফলে মানুষ অনেক সময়ে ততটা ইন্দ্রিয়সক্ত হয় না, একদার ব্যক্তিদের মধ্যে যতটা দেখা যায়; কুলীনদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজী না জানিলেও সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত। ইহারা সকলেই শ্রদ্ধার্থ এবং প্রাচীন হিন্দু-চরিত্রের আদর্শ রক্ষা করেন এবং সর্বদাই সঙ্গী হিসাবে ইহারা অতি প্রিয় এবং আনন্দদায়ক।”

টাইমস্ পত্রিকায় বার্নার্ড-শ লিখিয়াছিলেন :—“ইংরেজী পিতামাতা তাঁহাদের সামাজিক যত সুবিধা আছে তাহার মধ্যে স্বীয় ছুহিতাদিগকে অবাধভাবে ছাড়িয়া দিয়া স্বীয়

শ্রেণীর যুবকদিগের সহিত নির্দিষ্টারে মিশিতে দেন, উদ্দেশ্য এই যে, কাহারও সহিত যদি এই উপলক্ষে কন্যার বিবাহ হইয়া যায়, তবেই মঙ্গল।

বার্নার্ড শরমত।

মেয়েরা কিন্তু অনেক বেশী বয়স পর্য্যন্ত কুমারী থাকিয়া যান। তাঁহাদের মাতৃহের অপব্যয় হওয়াতে জাতি এইভাবে উৎকৃষ্ট ও চরিত্রবান্ সন্তানের অভাবে প্রকৃতই ধ্বংসের পথে উপনীত হয়। যদি ভাগ্যপ্রসাদে কোন মেয়ে স্বামী লাভ করেন, তিনি অনেক সময়েই মাতা হইতে একান্ত অনিষ্টক হন, যেহেতু তাঁহার সমাজ ও ধর্মের এই শিক্ষা যে, সন্তান হওয়াটা মানব জাতির আদিম পাপের ফল, মেয়েরা সন্তান-লাভটাকে গৌরবজনক কিছু মনে করেন না। তাঁহারা স্বামীকে লইয়াই গৌরব করেন, সুতরাং সন্তানহীনা রমণী স্বামিহীনা সন্তানবতী মাতাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন।

“সার হেন্‌রি প্রিন্সেপের কথা ঠিক হইলে বাঙ্গালী পিতারা তুল্য অবস্থায় পড়িয়া কি করেন? তিনি বাছিয়া একজন ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করেন। যে ব্রাহ্মণ চরিত্রগুণে শিক্ষাদীক্ষায় সমাজে আদর্শ তিনি সেই বরকে ১০০ শত পাউণ্ড উপঢৌকন দেন, ফলে তাঁহার কন্যা উৎকৃষ্ট সন্তানের প্রসূতি হন।

“যদিও অনেক ইংরেজ এই ব্যাপারটাকে ‘জঘন্ম’ ‘বীভৎস’ ইত্যাদি বিশেষণ দিয়া নিন্দা করেন, তথাপি ইহা কি সত্যই একটা কু-রীতি? আমার ত মনে হয়, ইহা অসম্ভব নহে, নির্দোষ নহে। এই প্রথা-দ্বারা জাতীয় অবনতি ঘটবার কোন আশঙ্কা নাই। পরন্তু জাতিকে ইহা উন্নতির পথে প্রবর্তিত করিতে সহায়তা করে। সার জর্জ বার্ডউড টাইম্‌স পত্রিকার স্তম্ভে জানাইয়াছেন যে, অনেক সময়ই কুলীনের মুখ ও চেহারা খুব সুন্দর ও সুগঠিত। সার জর্জ অবশ্যই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন যে, আমাদের সামাজিক রীতির ফলস্বরূপ যে সকল সন্তান হয়, তাহাদের চেহারা সুন্দর ও সুগঠিত হয় না। ইহা কি মনে করিতে হইবে যে এইরূপ হওয়ার কারণ আকস্মিক এবং দৈবাধীন। বরঞ্চ ইহা কি অধিকতর সম্ভব নয় যে সমাজের প্রচলিত প্রথা বেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ইহার বেশী কিছু প্রত্যাশা করা যায় না। যেখানে লোকে দৃঢ় সংকল্পিত উপায়-দ্বারা মানুষের শারীরিক গঠনের উন্নতি করে তাহা কি ইংরেজ জাতি বিসদৃশ মনে করিয়া তাঁহাদের কুসংস্কারগুলির উপর বেশী জোর দিবেন? এখন সমস্ত সমস্যাটি এই যে আমাদের সমাজের প্রত্যেকটি লোককে শারীরিক পূর্ণতা দেওয়ার উপায় কি? উৎকৃষ্ট মানুষ সৃষ্টি করিবার পক্ষে বর্তমান রীতি কার্যকরী হয় নাই; এখন কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া জাতীয় প্রত্যেক নরনারীকে পুষ্ট সুগঠিত দেহের অধিকারী করা যাইতে পারে? অপর দেশে, যেখানে আমাদের কুসংস্কারগুলি নাই, সেখানে যদি লোকেরা অন্তরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে, তবে সতীত্ব, পবিত্রতা, ঐচ্ছিত্য ইত্যাদি নানারূপ ওচ্ছ্রহাত ধরিয়া তাহাদিগকে নিন্দা করা কি আমাদের উচিত? একজন ব্রাহ্মণ যিনি এক শত বিবাহ করিয়া এক শত সন্তান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে কি চরিত্রহীন লম্পট বলিতে হইবে? ত্রিশবৎসর বয়স্ক একটি অবিবাহিত লোকের এক শত ছেলে থাকিতে পারে,

আমরা জয়সেন বিশ্বাসের কুলজীতে লিখিত শূর ও সেন বংশ সংক্রান্ত আর দুই একটি
 শূর, সেন ও চক্রবর্তীর
 সংস্ক-বিচার।
 কথ্য বলিয়া হিন্দু-রাজবংশের উপসংহার করিব। উক্ত কুলজীতে
 শূর বংশীয়দের ইতিহাস এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের
 পূর্বপুরুষ শালবান প্রথম গোড়ে প্রতিষ্ঠিত হন। শালবানের
 বংশে ১। প্রতাপ চন্দ্র ২। তেজঃশেখর ৩। লক্ষ্মীনারায়ণ, ইনিই প্রথমে শূর উপাধি ধারণ
 করিয়া আদিশূর নামে পরিচিত হন। ইনি বৌদ্ধবিজয় পূর্বক পঞ্চ সাগরিক ব্রাহ্মণ আনয়ন
 করেন,—ইহার জন্ম “ঋতুচন্দ্রাহিমে শাকে” (৮১৩) এবং সিংহাসনে আরোহণের সময়
 “বেদধর্মুফনি শাকে” (৮৬৪)। ইহার চারিজন প্রধান মন্ত্রীর নাম, স্মৃতি গুপ্ত, বৃষ সেন,
 কবি দাস ও শক্তিধর। আদিশূরের পুত্রের নাম ৪। বিমল, উপাধি ভূশূর—প্রধান মন্ত্রী
 ঋষি চন্দ্রশেখর, (বৃষ সেনের পুত্র) ইনি ১৪টি ভাষা জানিতেন। বিমলের পুত্র ৫। কুমার
 সেন, উপাধি ক্ষিত্তি শূর, ইহার প্রধান মন্ত্রী বিশ্বনাথ ১৮টি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কুমার
 সেনের পুত্র ৬। মুকুন্দ—উপাধি ধরা শূর। মুকুন্দের দুই পুত্র ৭। বলরাম—উপাধি
 প্রহ্লাদ ও রণ শূর, দ্বিতীয় পুত্র ৮। গোবিন্দ—উপাধি বরেন্দ্র শূর। এই দুই ভাই “চোলেনাপহন্তে
 রাজ্যো হ্যাতরো তো পলায়িতৌ। চোলেনাপি পলায়িতো পুনঃ রাজ্যাধিকারিনৌ”—এখানে
 স্পষ্টতঃই রাজ্যের ক্ষয়ের আক্রমণের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রহ্লাদ (রণ শূর) বরেন্দ্র-
 বিখ্যাত প্রহ্লাদেবীর মন্দির স্থাপন করেন। “বরেন্দ্র দৃষ্টতেহস্তাপি প্রহ্লাদেশ্বর মন্দিরং”—
 খুব সম্ভব এই মন্দিরের সংস্কার করিয়া এবং নানারূপ শ্রীবুদ্ধি সাধন করিয়া বিজয় সেন স্বীয়
 নামের সহিত ইহা জড়িত করিয়াছেন, উদ্যোগিত ধরের প্রশস্তিতে বিজয় সেনই উহার স্থাপয়িতা
 বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। প্রহ্লাদ বা রণশূরের পুত্র ৯। গদাধর—উপাধি অম্বশূর, ইনি
 “কৈবর্ত-রাজ-দিব্যো গোড়পুরাং বিতাড়িতঃ।” ইত্যং কতক দিন পর্য্যন্ত ইহাদের
 রাজ্য কৈবর্তদের অধীন থাকে। ইত্যবসরে—পূর্ববর্ত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, এবং
 তাহা পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত হইয়া দুইজন শাসনকর্তার অধীন হয়, ইহাদের
 নাম জাত বর্মা ও ত্রৈলোক্যচন্দ্র। এই দুই শাসনকর্তা প্রথমতঃ কৈবর্তদের ভয়ে বিগ্রহ
 পালের অধীন হইয়া “সামন্ত রাজা” বলিয়া পরিচিত হন, তৎপরে স্বাধীন হইয়া বৃহৎ রাজ্যের
 স্বাধীন ভূপতিরূপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র রাজচক্রবর্তী
 হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধে নিহত হইলে তাহার রাজ্য পাল-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়।
 ১০। অম্বশূরের পুত্র, চক্রধর—উপাধি লক্ষ্মীশূর, ইনি অপারমন্দারের অধিপতি হইয়াছিলেন
 এবং কনিষ্ঠ গিরিধরের কন্যা বিলাসদেবীকে বিজয় সেন বিবাহ করেন।

জয়সেন বিশ্বাসের কুলজী হইতে পূর্বেও কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি, এবারও তাহার
 একটি অংশের সারোদ্ধার করিলাম। এই পুস্তকের ঐতিহ্যের সত্যতা সন্দেহে আমাদের কোন
 মন্তব্য প্রকাশের এখনও সময় হয় নাই।

আচার-ব্যবহারের কথা, জাতিভেদ

৬০৯

আমরা জয় সেন বিশ্বাসের কুলজীতে লিখিত শূর ও সেন বংশ সংক্রান্ত আর দুই একটি কথা বলিয়া হিন্দু-রাজত্বের উপসংহার করিব। উক্ত কুলজীতে শূর বংশীয়দের ইতিহাস এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের পূর্বপুরুষ শালবান প্রথম গোড়ে প্রতিষ্ঠিত হন। শালবানের বংশে ১। প্রতাপ চন্দ্র ২। তেজঃশেখর ৩। লক্ষ্মীনারায়ণ, ইনিই প্রথমে শূর উপাধি ধারণ করিয়া আদিশূর নামে পরিচিত হন। ইনি বৌদ্ধবিজয়-পূর্বক পঞ্চ সাধিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন,—ইহার জন্ম “ঋতুচন্দ্রাহিমে শাকে” (৮১৬) এবং সিংহাসনে আরোহণের সময় “বেদধ্বজ শাকে” (৮৬৪)। ইহার চারিজন প্রধান মন্ত্রীর নাম, স্মৃতি গুপ্ত, বৃষ সেন, কবি দাস ও শক্তিধর। আদিশূরের পুত্রের নাম ৪। বিমল, উপাধি ভূশূর—প্রধান মন্ত্রী ঋষি চন্দ্রশেখর, (বৃষ সেনের পুত্র) ইনি ১৪টি ভাষা জানিতেন। বিমলের পুত্র ৫। কুমার সেন, উপাধি ক্ষিতি শূর, ইহার প্রধান মন্ত্রী বিশ্বনাথ ১৮টি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কুমার সেনের পুত্র ৬। মুকুন্দ—উপাধি ধরা শূর। মুকুন্দের দুই পুত্র ৭। বলরাম—উপাধি প্রহ্লাদ ও রণ শূর, দ্বিতীয় পুত্র ৮। গোবিন্দ—উপাধি বরেন্দ্র শূর। এই দুই ভাই “চোলে-পদ্মতে রাজ্যে জাত হইতে পলায়িতো। চোলে-পা পলায়িতো পুনঃ রাজ্যাধিকারিণো”—এখানে স্পষ্টতই চোলে-পা পলায়িতো রাজ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রহ্লাদ (রণ শূর) বরেন্দ্র বিখ্যাত প্রহ্লাদেবের মন্দির স্থাপন করেন। “বরেন্দ্র দৃষ্টতেহ্যপি প্রহ্লাদেবের মন্দিরং”—খুব সম্ভব এই মন্দিরের সংস্কার করিয়া এবং নানারূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া বিজয় সেন স্বীয় নামের সহিত ইহা জড়িত করিয়াছেন। উদ্যোতক ধরের প্রশস্তিতে বিজয় সেনই উহার স্থাপয়িতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। প্রহ্লাদ বা রণশূরের পুত্র ৯। গদাধর—উপাধি অমরশূর, ইনি “কৈবর্ত রাজ্য দিব্যে গৌড়পুরাং বিতাড়িতঃ।” স্মরণ্য কতক দিন পর্য্যন্ত ইহাদের রাজ্য কৈবর্তদের অধীন থাকে। ইত্যবসরে—পূর্ববঙ্গ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, এবং তাহা পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত হইয়া দুইজন শাসন কর্তার অধীন হয়, ইহাদের নাম জাত বর্মা ও ত্রৈলোক্যচন্দ্র। এই দুই শাসনকর্তা প্রথমতঃ কৈবর্তদের ভয়ে বিগ্রহ পালের অধীন হইয়া “সামন্ত রাজা” বলিয়া পরিচিত হন, তৎপরে স্বাধীন হইয়া বৃহৎ রাজ্যের স্বাধীন ভূপতিরূপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র রাজচক্রবর্তী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধে নিহত হইলে তাহার রাজ্য পাল সাম্রাজ্য দ্বারা হস্তান্তর হয়। ১০। অমরশূরের পুত্র, চক্রধর—উপাধি লক্ষ্মীশূর, ইনি অপারমন্দারের অধিপতি হইয়াছিলেন এবং কনিষ্ঠ গিরিধরের কন্যা বিলাসদেবীকে বিজয় সেন বিবাহ করেন।

জয় সেন বিশ্বাসের কুলজী হইতে পূর্বেও কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি, এবারও তাহার একটি অংশের সারোচ্ছার করিলাম। এই পুস্তকের ঐতিহ্যের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের কোন মন্তব্য প্রকাশের এখনও সময় হয় নাই।

পঞ্চদশ অধ্যায়

"Uneasy rests the head that wears the Crown."

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাঠান-রাজত্ব

নদীয়া জয় করিয়া মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার যে সকল বিপদে পড়িয়াছিলেন, তবকাৎ-ই-নাসিরী-প্রণেতা মিনহাজ তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। নদীয়া জয়ের সময়ে যে দুইজন সৈনিক মহম্মদ ইবন বক্তিয়ারের সহচর ছিলেন, মিনহাজ তাহাদেরই মধ্যে একজন। মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার বিজিত করিয়া লওয়া যাইতেছিল। ইবন বক্তিয়ার নবাবীপ বিজয়ের পরে গোড়ের এদিক্ সেদিক্ লুণ্ঠন করিয়া লওয়া যাইতেছিল। ইবন বক্তিয়ারের মধ্যবর্তী কোন স্থানের অধিবাসী মেচ্ছাভাষী একজন নায়ককে সশস্ত্রভাবে দীক্ষিত করেন এবং তাহাকে 'আলি' উপাধি দেন। আলি মেচ্ছের উপাধি দিলে তিনি দশ সহস্র সৈন্ত লইয়া তিব্বত জয়ের জন্ত রওনা হন। পথে বর্ধনকোটে গিয়া বিশালকোয়া বেগবতী নদী। এই নদীর কূল ধরিয়া তিনি দশদিনের পথ পথ করিয়া একটা প্রকাণ্ড সেতুর সাফাৎ পান। এই সেতু ২০টি পামাণনির্মিত খিলানের উপর স্থিত। ইবন বক্তিয়ার সেই সেতু পার হইয়া চলিলেন। দুইজন সৈন্যসহ সেতুর জন্ত রাখিয়া গেলেন, ক্রমাগত ১৬ দিন চলিয়া গিয়া একটা চতুর্ভুজ নদীর আক্রমণ করেন, তথায় শুনিতে পান, ২৫ কোশ দূরে একটা স্থান (করমাপুর) ৫০,০০০ তুর্ক সৈন্ত বিজিত আছে, তথায় বহু ব্রাহ্মণ বাস করেন এবং তথায় বহু সৈন্যের অনেক সহস্র টোলন ঘোড়া বিক্রয়ের একটা বাজার বসে। কেহ কেহ মনে করেন, উহা আধুনিক দিনাজপুর জেলার নেক-মর্দনের হাট। মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার ডয় পাইয়া অগ্রসর হইলেন না—ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। থাওয়ার ভয়ানক কষ্ট হইল। শত্রুরা সমস্ত ক্ষেত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। সৈন্তগণ ঘোড়া মারিয়া সেই মাংস খাইতে লাগিল। ইবন বক্তিয়ার কামরূপ ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, তাহার রক্ষকগণ ঝগড়া করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং শত্রুরা বেগবতী নদীর সেই বিশাল পামাণ নির্মিত সেতুর দুইট খাম ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। তিনি নিকটবর্তী এক দেবমন্দির আক্রমণ করেন। সেখানে দুই তিন হাজার মন স্বর্ণনির্মিত দেবপ্রতিমা ছিল। শত্রুবেষ্টিত হইয়া তিনি ঐ মন্দিরে বন্দীর মত হইয়া রহিলেন, বহুকষ্টে তাহার সৈন্তগণ প্রাচীরের একদিক্ ভাঙ্গিয়া নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তীরভূমি হইতে শত্রুর শর তাহাদের ধ্বংসক্রিয়া সাধন করিতে লাগিল। মুসলমান বীর বহুকষ্টে অতি অল্পসংখ্যক পরিকর লইয়া রক্ষা পাইলেন এবং আলি মেচ্ছের সাহায্যে

দেবকোট উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন এবং ১২০৫-৬ খৃষ্টাব্দে
মৃত্যু ১২০৫ খৃঃ।

প্রাণত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন মহঃ ইঃ বক্তিত্যারের অধীন
নারান্‌কোই স্থানের শাসনকর্তা আলিমর্দন খিলজি সুবিধা পাইয়া
রোগশয্যায় তাঁহাকে নিহত করেন। বহুসংখ্যক সৈন্যসহকারে জন্ত তাঁহার প্রতি তাঁহার
দলের লোকের আর কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। মৃত্যুকালে তিনি নিঃসহায় ও বান্ধবহীন
অবস্থায় দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরের দেশের সর্বনাশ সাধন করিয়া
আলেক্সান্দার আলোর মত যে স্বল্পস্থায়ী যশঃপ্রভা তাঁহাকে গৌরব দান করিয়াছিল তাহার
বিনিময়ে তিনি কি লাভ করিলেন?—পার্বত্য প্রদেশে অশেষ বিড়ম্বনা, পরাজয়জনিত
লাঞ্ছনা, স্বজনধ্বংস ও অকালমৃত্যু। মহঃ ইঃ বক্তিত্যার দ্বারা সমস্ত বাঙ্গলাদেশ মুসলমানাধিকৃত
হয় নাই। এমন কি নবদ্বীপকে ফিরিয়া জয় করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে সম্ভবতঃ
কেশবসেন (লক্ষ্মণের পুত্র) গোড় শাসন করিতেছিলেন এবং মুসলমানদের হাত
হইতে দেশ রক্ষা করিতে না পারিয়া পূর্ববঙ্গ আশ্রয় করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরে
স্বর্ণগ্রাম রাজধানী করিয়া সেনবংশীয়েরা আরও এক শতাব্দীর উজ্জ্বল পূর্ববঙ্গে রাজত্ব
করিয়াছিলেন।

ইহার কোন সময়ে সেন বংশের এক শাখা লাহোর ও কাশ্মীরে যাইয়া তথায় রাজ্য
লাভ করিয়া থাকিবেন। (৪০২ পৃঃ)

মহঃ ইবন বক্তিত্যার খিলজির প্রিয়পাত্র মহম্মদ শিরান বঙ্গদেশের রাজা বলিয়া নিজেকে
প্রচার করেন। এই ব্যক্তি একদম দুর্বল ছিলেন যে, একাই অশ্বারোহণপূর্বক লক্ষ্মণাবতীর
নিকট কোন জঙ্গলে ১৮টি হাতী ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার
মহম্মদ শিরান—১২০৫-
১২০৮ খৃঃ। অদ্বুত সাহস দেখিয়া তিব্বতে অভিযানের পূর্বে ইবন বক্তিত্যার
তাঁহাকে গোড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন।

প্রভুর মৃত্যুর পর সামন্তগণ ও নেতারা একত্র হইয়া মহম্মদ শিরানকে রাজপদ প্রদান
করেন। রাজা হইয়া তিনি প্রথমেই প্রভুহত্যায় অভিযুক্ত আলিমর্দনকে পরাস্ত করিয়া
কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কারাবাসকে ঘুষ দিয়া আলিমর্দন পলাইয়া মুজিলাভপূর্বক
দিল্লী যাইয়া কুতুবুদ্দিনের অমুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। কুতুবুদ্দিন এই সময়ে সাম্রাজ্যের
দৃঢ় ভিত্তি গড়িবার প্রয়াসী হইয়া অযোধ্যার শাসনকর্তা কাএমাজ রোমীকে পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধ-
বিগ্রহের ভার প্রদান করেন। গঙ্গোত্রীর শাসনকর্তা সম্রাট-সৈন্যদের সহযোগিতা করিয়া
দেবকোটের শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। অপর অপর সেনাপতিরা দিল্লীখবরের অধীনতা
স্বীকার না করিয়া কাএমাজ রোমীর সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চালাইয়াছিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া
কুচবিহারের দিকে পলায়নপর হন। ইহাদের মধ্যে আব্দুলহ উপস্থিত হয়, মহম্মদ শিরান
এই কলহের ফলে নিহত হন। মহম্মদ শিরান ১২০৫ হইতে ১২০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব
করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কুতুবুদ্দিন দিল্লীখবর ছিলেন (১২০৫-১২১০ খৃঃ) কিন্তু তিনি
দিল্লীখবরের অধীনত্ব স্বীকার করেন নাই।

শিরানের মৃত্যুর পর আলিমর্দন খিলজি দিল্লীখরের সমস্ত লইয়া বঙ্গদেশের মসনদ দখল করেন (১২০৮-১২১১ খৃঃ) ।

কৃত্ত্ববৃদ্ধির মৃত্যুর পর আলিমর্দন যেতক্ষণকারপূর্বক নিজেকে স্বাধীন মুপতি বলিয়া ঘোষণা করেন । এইবার তাঁহার কতকটা বুদ্ধিমত্তা হইয়াছিল, এ পর্য্যন্ত তিনি অক্রান্ত-কর্মী

আলিমর্দন গুলশান
খালাউদ্দিন—১২০৮-১১ খৃঃ

বোদ্ধা এবং রাজনীতিকুশল বুদ্ধিমান লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন । এখন সমস্ত জায়গার গভী অতিক্রম করিয়া তাঁহার গর্ভ আকাশ-পার্শী হইল । তিনি প্রকাশ্য দরবারে আপনাকে পারস্ত, তুর্কিস্তান এবং দিল্লীর বাদসাহপদ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন এবং “তাঁহার অধিকার হইতে বহু দূরে অবস্থিত খোরাসান, ইরাক, গজনী, গোব ও ইস্ফাহানের অধিকার প্রত্যাশিগণকে প্রদান করিতেন ।” এই সকল রাজ্য তাঁহার অধিকার-বহির্ভূত,—তিনি চট্টায়া যাইতেন । একটা পারস্ত দেশের এক বণিক্ বীর বহুমূল্য দ্রব্যাদি-বোঝাই জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে তাঁহার নিকট সাহায্যের প্রার্থী হন । খালাউদ্দিন তাঁহাকে ইস্ফাহানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া প্রধান মন্ত্রীকে এক ফরমান প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন । এই উপহাস-যোগ্য চর্য্য ফল হইতে তাঁহাকে মন্ত্রী বুদ্ধি-কৌশলে রক্ষা করিয়াছিলেন । কিন্তু নবাবকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিবার জন্য বণিক্কে অনেক অর্থ প্রদান করিতে হইয়াছিল । এই সকল বুদ্ধিমানতা অবশ্য পাশ্চবর্তী রাজাদের বিরুদ্ধে হইয়াছিল—তথাপি তাহা উপহাস-যোগ্য মনে করিয়া কেহ কোন প্রতিকূলতা করে নাই । কিন্তু তিনি কিছুদিন পরে অতিশয় নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন ; তাঁহার অত্যাচার শুধু মাদ্রাস ও সন্ন্যাস হিন্দুদিগের উপর সীমাবদ্ধ রহিল না, তিনি অবিচারে খিলিজিবংশীয় অনেক বড় বড় ব্যক্তি হত্যা করিলেন । তাঁহাদের বংশধরগণের চক্ষুগে ১২১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে পতিত হন । আলিমর্দনের হত্যার পর হসাম উদ্দিন ইউয়াজ নামক ইকন রাজ্যের একজন সৈন্য প্রায় সেনাপতি “গিয়াসউদ্দিন” উপাধি ধারণ করিয়া সোমের দেশে আসিয়া বসিয়া করেন, ইহার পূর্বে তিনি গজোজীর শাসন কর্তা ছিলেন ।

খিলাউদ্দিন ইউয়াজ
১২১১-১২২০ খৃঃ

উদ্ভূত আছে পারস্ত দেশের উই দরবেশ ইহার ভাবী সৌভাগ্যসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ইহাকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন । ইনি সিংহাসনে আরোহণ হইয়া কামরূপ, দিল্লী ও গুরী জয় করেন । কিন্তু যদিও বীর্যবতার ইনি নূন ছিলেন না, ইহার রাজত্বের অধিক সময়ই লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে । ইনি গৌড়ে অনেক রম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন, তথায় অতি মনোজ্ঞ ও বিশাল এক মসজিদ, একটি বড় বিদ্যালয় ও অতিশীলা প্রস্তুত করিয়া বীরকুম হইতে দেবকোট পর্য্যন্ত এক বিস্তৃত রাজপথ নির্মাণ করেন । দশ বৎসর কাল ইনি শাস্তির সহিত শাসন করিয়াছিলেন এবং ধনী ও দরিদ্র সর্বশ্রেণীর প্রতি সমভাবে ক্রোধপরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষে ইনি আর দিল্লীতে রাজত্ব পাঠাইতেন না, দিল্লীখর আলতামাশ ক্রুদ্ধ হইয়া বঙ্গে অভিযান করেন । নির্বিবাদে বিহার অধিকার করিয়া যখন তিনি বঙ্গের দিকে আসিতেছিলেন, সেই সময়ে গিয়াসউদ্দিন গজার সমস্ত জলদান দখল করিয়া সম্রাটের আসিবার

পথ বন্ধ করিয়া ফেলেন। বাহা হউক একটা সন্ধি হইয়া এই কলহের মিটমাট হইয়া গেল। বঙ্গাধিপ দিল্লীখবকে ৬৮টি হাতী এবং বহু লক্ষ টাকা দিয়া তাঁহার অধীনস্থ স্বীকার করেন। আলতামাস মূলক্ আলাউদ্দিনকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু সম্রাট বাইতে না বাইতেই গিয়াসউদ্দিন সন্ধির স্তম্ভ ভঙ্গ করিয়া বিহার অধিকার করিয়া প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হন। আলতামাসের পুত্র যুবরাজ নাসিরুদ্দিন অবোধ্য হইতে এক বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া তৎবিকক্ষে যাত্রা করেন। এই যুদ্ধে গিয়াসউদ্দিন নিহত হন। গিয়াসউদ্দিন অতি উদারচরিত্র এবং জ্ঞানপরাশর রাজা ছিলেন। এমন কি আলতামাস পর্যাঙ্ক বলিতেন, “ইনি প্রকৃতই স্থলতান হইবার যোগ্য।” ১২ বৎসর ব্যাপী রাজত্বের পর ১২২৬ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

যুবরাজ নাসিরুদ্দিন বঙ্গের রাজা হইয়া শ্বেতক্ষর ও রাজবস্ত্র-ব্যবহারের অনুমতি প্রাপ্ত

নাসিরুদ্দিন মহম্মদ—

১২২৬-১২২৮ খৃঃ।

হন। তিনি অতি দক্ষতার সহিত রাজবস্ত্র চালনা করিয়াছিলেন।

১২২৮ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়, তখন খিলিজি সামন্তেরা বিদ্রোহী

হইয়া বঙ্গদেশে অরাজকতা আনয়ন করে। আলতামাস পুনরায়

বঙ্গ সাজসজ্জায়ে আসিয়া সেই বিদ্রোহ নিবারণ করেন। বিদ্রোহীর নেতা হাসানুদ্দিন

হাসানুদ্দিন খিলিজি

১২২৮ খৃঃ, কলহের মাস উল্লেখ

কিয়ার উদ্দিন—১২২৮

২৮; আলতামাস জানি—

১২৩০-১২৩১ খৃঃ; সৈফ-

উদ্দীন—১২২৩-১২৩৩ খৃঃ।

খিলিজি অতি অল্প সময়ের জন্য বঙ্গের মসনদ অধিকার করিয়াছিলেন।

এক বৎসরের জন্য ইখতিয়ার উদ্দিন বঙ্গেশ্বর হইয়াছিলেন।

আলতামাস মূলক্ আলাউদ্দিনকে বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত

করেন, ইনি ঠাণ্ডা বৎসর রাজত্বের পর পরলোকগত হন। তৎপরে

মেক উদ্দিন কায়ক রাজা হইয়া তিন বৎসর রাজ্যশাসনপূর্বক বিধ

খাইয়া প্রাণত্যাগ করেন (১২৩৩ খৃঃ)। ইহার পরের বঙ্গাধিপ

তোগান খাঁ তাতারদেশীয় লোক ছিলেন, ইহাকে তৎকালে, তত্ৰী ও নানাভাবে ভূষিত দেখিয়া

আলতামাস ইহার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। ইনি প্রথমতঃ গোহাতিয়ায় পুরে বিহার এবং

সর্বশেষে বাঙ্গলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গের আত্মরক্ষার বাদসাহের কর্তা

তোগান খাঁ—১২৩৩—

১২৪৪ খৃঃ।

রিজিয়া দিল্লীর মসনদ প্রাপ্ত হন, তখন তোগান খাঁ তাঁহার নিকট

অনেক উপঢৌকনসহ একজন বাখ্শী দূত প্রেরণ করেন। রিজিয়া

বঙ্গেশ্বরের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়া তাঁহাকে ওমরাহগণের

মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ দান করেন এবং বঙ্গের মসনদে স্থায়িক্রমে ইহার আসন স্বীকার করেন।

রাজত্বের প্রথম দিকে ইনি বিহত বিজয় করেন, তৎপরে দিল্লীখব মানুষের শাসন বিশৃঙ্খল ও

শিথিল দেখিয়া কড়া-মানিকপুর বঙ্গের অধিকারভুক্ত করিলেন।

তোগান খাঁর সঙ্গে গঙ্গাবংশীয় অনঙ্গ ভীমদেবের পুত্র নৃসিংহদেবের প্রথম যুদ্ধ একটি

স্মরণীয় ঘটনা। নৃসিংহদেব তোগান খাঁর অস্থূলব্রিটিতে লক্ষ্যবাস্তী আক্রমণ করিয়া রাজ-

ভাগ্যের লুপ্তন করিয়া চলিয়া যায়। প্রতিশোধ লইবার জন্য তোগান খাঁ জাজনগর আক্রমণ

করেন। কিন্তু প্রবলপক্ষাক্রান্ত কলিঙ্গরাজ ও সামন্ত নামক তাঁহার সেনাপতির তৎকৌশলে

তোগান খাঁ পরাস্ত হইয়া কিরিয়া আসেন। এই ছরবস্থায় বঙ্গেশ্বর দিল্লীতে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করেন। এখানে বলা উচিত প্রথমতঃ তোগান খাঁ উড়িষ্যার কটাসিন দুর্গ আক্রমণ করেন, প্রতিশোধের জন্ত নুসিংহদেব লক্ষণাবতী আক্রমণ করিয়াছিলেন। (১২৪৩—৪৪ খৃঃ।) দিল্লী হইতে তমুর খাঁ অনেক সৈন্ত লইয়া বঙ্গে আগমন করেন। বঙ্গেশ্বর এই রাজকীয় সৈন্তের সাহায্যে কলিঙ্গরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া এবারও ব্যর্থকাম হন।

তোগান খাঁ ও তমুর খাঁ:

উভয়ের রাজত্ব—১২৪৪—

১২৪৩ খৃঃ।

পরন্তু তোগান খাঁর উপর তমুর খাঁ জুলুম করিতে আরম্ভ করিয়া নিজেকে লক্ষণাবতীর অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন। কোন একদিন প্রভাত হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত লক্ষণাবতীর বঙ্গের উপর ছই প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান সৈন্তের বিবাদ নগরবাসীদের একটা উপভোগ্য

বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তোগান খাঁর লোকেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, এবং তমুর খাঁই ক্ষেত্র-নাযক হন। শেষে একটা সন্ধি হইয়া এই স্থির হইল যে তমুর খাঁ রাজধানীর বত হস্তী, অশ্ব ও রাজভাণ্ডার তাহা লইয়া যাইবেন কিন্তু তোগান খাঁ বঙ্গের অধিপতি থাকিয়া যাইবেন। তাবকাৎ-ইনাসিরী লেখক মিনহাজ এই তোগান খাঁর সঙ্গে অনেক দিন ছিলেন এবং পূর্বোক্ত সন্ধি অনেকটা তাঁহারই চেষ্টায় হইতে পারিয়াছিল। তমুর খাঁ প্রায় দুই বৎসর লক্ষণাবতী শাসন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তোগান খাঁ স্বীয় সৈন্তগণ দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া পুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অদৃষ্টচক্রে এই ছই সামন্ত রাজা ১২৪৩ খৃঃাব্দে একই দিনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তোগান খাঁর রাজত্বকালে মুসলিম চের্চিস খাঁ ৩০,০০০ সৈন্ত লইয়া গোড় আক্রমণ করিয়াছিলেন। মুসলমান রাজগণ এই সময়ে প্রবল হইয়া মুসলমানদিগকে বারংবার পরাজিত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় নুসিংহদেবের তাম্রশাসনে প্রথম নুসিংহদেবের এই বিজয়ের কথা-উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে—“তাঁহার অমিত বিক্রমে রাঢ় ও বরেন্দ্রীয় যবনাস্ত্রনাগণের কজ্জলরাগমিশ্রিত অশ্ব-সুখা-ধবল-গজা-প্রবাহকে কালিন্দীর জায় গ্রাসায়মানা করিয়াছিল।”

পরবর্তী রাজা মুলুক যুজবেক সম্রাট আলতামাসের একজন তাতার দেশীয় দাস ছিলেন। ইনি দিল্লীর সম্রাটগণের প্রীতিলভ করিয়া পরমুহূর্ত্তেই তাঁহাদের বিপক্ষতা করিয়াছেন। ইনি

মুলুক যুজবেক (মুগীস

উদ্ভীন)—১২৪৪-১২৪৮ খৃঃ।

যড়বস্ত্রী, অকৃতজ্ঞ ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তিনি সম্রাজ্ঞী রিজিয়া ও সম্রাট বাইরাম সাহ ইহাদের উভয়ের বিরুদ্ধেই যড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।

নানাভাগ্যবিপর্যয়ের পর বঙ্গের মসনদ পাইয়া ইনি সর্বপ্রথমই

প্রতিশোধ লইবার জন্ত জাজপুরে অভিযান করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে কলিঙ্গ-রাজের পরাজয় হইল। কিন্তু তৃতীয় বারে যুজবেক ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পরাস্ত হইলেন। তাঁহার সমস্ত হস্তী শত্রুহস্তগত হইল। তন্মধ্যে অতি মূল্যবান একটি খেত হস্তী ছিল। এই পরাজয়ের পর তিনি দিল্লী হইতে সৈন্ত সাহায্য পাইয়া আর একবার গোপনে কলিঙ্গরাজের রাজধানী আক্রমণ করিয়া ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া লইয়া আসিলেন। বিজয়োল্লাসে যুজবেক দিল্লীস্থরের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া বঙ্গ, খেত ও কুক—এই ত্রিধর্মের চন্দ্রাতপ

ব্যবহার এবং সম্রাট মুগীশউদ্দিন উপাধিদারণপূর্বক নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তৎপরে তিনি অযোধ্যা-জয়ার্থ অভিযান করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কামরূপ-পতি পরাস্ত হইলে ইনি তাঁহার ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। তদবস্থায় কামরূপের রাজা মুগীশউদ্দিনের অধীনতা স্বীকারপূর্বক তাঁহাকে বাৎসরিক প্রদত্ত রাজস্ব দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া দূত প্রেরণ করেন, পরন্তু বঙ্গেশ্বরের নামাঙ্কিত মুদ্রা নিজরাজ্যে চালাইতেও স্বীকৃত হন। কিন্তু বিজয়দৃষ্ট মুগীশউদ্দিন এই সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। উপায়াস্তর না দেখিয়া হিন্দুরা পার্শ্ববর্তী সমস্ত শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করিয়া ফেলিল এবং নদীর বাধ ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাদের হুগ্ধ দেশ জলমগ্ন করিয়া ফেলিল। এইবার মুগীশউদ্দিন শত্রুহস্তে পড়িয়া নিতান্ত লাঞ্ছিত হইলেন। হস্তিপুষ্ঠে পলায়নপর বঙ্গেশ্বরকে সকলেই লক্ষ্য করিতে সুরবিধা পাইল; একটি মারাত্মক বাণে বিন্ধ হইয়া তিনি শব্দাশায়ী হইলেন। মৃণ্মু'কালে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে জীবিত বা নিহত পুত্রের মুখ দেখিতে চাহিলেন। কামরূপের রাজা এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া দিলেন। পুত্র বন্দী হইয়া সমীপবর্তী হইল, অশ্রুসিক্ত চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। (১২৫৮ খৃঃ।)

১২৫৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীখবরের সনদ পাইয়া জালালুদ্দিন মসুদ লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি মাত্র এক বৎসর ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার শাসনকর্তা আর্সলন সহসা এক বিপুল বাহিনী লইয়া লক্ষণাবতী আক্রমণ করেন, জালালুদ্দিন নিহত হন (১২৫৮ খৃঃ)। আর্সলন তাঁঁ ছয় বৎসর মাত্র বঙ্গের গদি দখল করিয়াছিলেন। ১২৬০ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাখালবাবু এই সময়ের মধ্যে ইজুদ্দিন বুলবন নামক আর একজন বঙ্গেশ্বরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

আর্সলন খাঁর পুত্র মহম্মদ তাতার খাঁ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া সকলের অমুরাগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সম্রাট বুলবনকে বহুবিধ উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন। এই উপঢৌকনের মধ্যে রেশমী কাপড় ও মসলিন বহু পরিমাণে ছিল, তাহা ছাড়া ৬৩টি হস্তী এবং বহু অর্থ রাজস্বস্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। বুলবন তাঁহার রাজত্বের সূচনার এই সুপ্রচুর ভেট পাইয়া উহা একটা শুভচিহ্ন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং তাতারের প্রতি বিশেষ অমুরক্ত হইয়াছিলেন। তাতার খাঁ ১২৭৭ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

তাতার খাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট তদীয় বিশ্বস্ত ও প্রিয় অমুরচর তোগ্রেলকে বঙ্গের অধিকার প্রদান করেন। তোগ্রেল সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই নিজেকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ইহাও প্রচার করেন

* রাখালবাবু তাতার খাঁর পরে শের খাঁ ও আমিন খাঁ এই দুই ব্যক্তির নাম এক ঘোষণে ১২৬০ খৃঃ হইতে ১২৭৮ খৃঃ নির্দেশ করিয়া তাঁহাদের রাজত্বের কাল উল্লেখ করিয়াছেন।

যে সম্রাট বেলিনের মৃত্যু ঘটনাচ্ছে। তখন দিল্লীখর পীড়িত ছিলেন তাঁহার প্রিয়তম

তোগেল বা মগীশুদ্দিন—

১২৭৮-১২৮২ খৃঃ।

অনুচরের এই অকৃতজ্ঞতা ও দুর্ব্যবহারে, একান্ত ব্যথিত হইয়া তিনি পীড়িত ধাকা সম্বন্ধে তাঁহার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ না রুটে এই জন্ত নিজে রাজধানীতে প্রকাশ্যভাবে দেখা দিতে লাগিলেন এবং তোগেলকে চিঠি লিখিলেন। তোগেল মগীশুদ্দিন খেতাব গ্রহণ করিয়া স্বাধীন নৃপতি হইয়াছেন, তিনি সে চিঠি উপেক্ষা করিলেন। সম্রাট তাঁহার বিরুদ্ধে দুইবার দুইজন সেনাপতি পাঠাইলেন, কিন্তু তোগেল (মগীশুদ্দিন) তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। সম্রাট স্বয়ং বঙ্গদেশে আসিয়া লক্ষ্মাবতীর দিকে অভিযান করাতে কতকটা ভয় পাইয়া কতকটা লজ্জায় পড়িয়া, বঙ্গেশ্বর তাঁহার অর্থসম্পদ লইয়া যাজনগরে আশ্রয় লইলেন। সম্রাট চলিয়া গেলে পুনরায় গোড়ে ফিরিবেন এই উদ্দেশ্য ছিল। সম্রাট গোড়ে হিসামউদ্দিন নামক সেনাপতিকে বঙ্গের মসনদে বসাইয়া যাজনগরে মগীশুদ্দিন তোগেলকে আক্রমণ করিতে অভিযান করিলেন। তোগেল এমন চতুরতার সহিত পলায়ন করিতে লাগিলেন যে দিল্লীখর কোথায়ও তাঁহার সন্ধান পাইলেন না। তিনি বহু চেষ্টার পর একদল বণিকের মুখে সংবাদ পাইয়া অত্যন্তভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন। দিল্লীখরের এই অভিযানে স্বর্ণগ্রামের দমুজ রায় তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্রাট স্বয়ং তোগেলের হস্তী ও ধনসম্পদ আত্মসাৎ করিয়া গোড়ে প্রত্যাবর্তনপক্ষক তাঁহার অন্তঃপুরের মহিলা ও শিশুদিগের শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাসিরুদ্দিনকে কখনও দিল্লীখরের বিদ্রোহিতা না করেন (যিনিই দিল্লীর রাজতন্ত্রের মালিক হউন না কেন) এই শপথ গ্রহণ করাইয়া বঙ্গের মসনদে স্থাপিত করেন (১২৮০ খৃঃ)।

নাসিরুদ্দিনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদের বঙ্গদেশে মৃত্যু হওয়াতে বৃদ্ধ সম্রাট অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তাঁহাকে দিল্লীতে শাসিতে লিখিলেন। তাঁহাকে নিজের কাছে ডাকাইয়া

নাসিরুদ্দিন বগড়া বা—

১২৮২-১২৮৩ খৃঃ।

আনিয়া বলিলেন, “আমি বৃদ্ধ ও শোকবিচলিত হইয়াছি, যদিও মহম্মদের পুত্র খসরুই এই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তথাপি সে অতি তরুণবয়স্ক, এত বড় রাজ্যের ভার সে বহন করিতে পারিবে না। আপাততঃ বঙ্গের শাসনের ভার অপর কাহারও উপর দিয়া তুমি কতক দিন এইখানেই থাক। আমি বেশীদিন বাঁচিব না। তুমি একটা ব্যবস্থা করিয়া রাজ্য রক্ষা করিও।”

কিন্তু সম্রাট একটু একটু করিয়া ভাল হইতে লাগিলেন। নাসিরুদ্দিনের আর দিল্লীতে থাকিতে ভাল লাগিল না। রাজ্যের বাহা হয় হইবে, এই মনে স্থির করিয়া, মৃগয়ার ছল করিয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

পুত্রের এই ব্যবহারে সম্রাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি মহম্মদের পুত্র খসরুকে আনাইয়া তাঁহাকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী পদে নিৰ্দ্ধিষ্ট করিয়া ৮০ বৎসর বয়সক্রমে পরলোকে গমন করিলেন (১২৮৬ খৃঃ)।

খসরু আইনতঃ উত্তরাধিকারী হইলেও, দিল্লীর আমিরেরা তাঁহার দাবী উপেক্ষা করিয়া বঙ্গেশ্বর নসিরুদ্দিনের অষ্টাদশবয়স্ক পুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। এই বালক কুসঙ্গীদের হাতে পড়িয়া বিলাসশ্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। নাজিমুদ্দিন নামক মন্ত্রীই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাজা মন্ত্রীর কুপরামর্শে অতি নিষ্ঠুরভাবে খসরু ও কয়েকজন মন্ত্রীকে হত্যা করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ

পুত্র সম্রাট হওয়াতে নসিরুদ্দিন আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন, নবীন সম্রাটের চরিত্রের অধঃপতন হইতেছে, তখন তিনি তাঁহাকে অনেক সত্বপদেশ ও মিষ্ট গল্পনা দিয়া একখানি চিঠি লিখিলেন। তিনি ছষ্ট মন্ত্রী নাজিমুদ্দিনকে বিদায় করিয়া দিতে পুত্রকে অনুরোধ করিলেন। সেদিন সম্রাট কিলখারী নামক স্থানে এক নবনির্ম্মিত বিলাসাগারে

আমোদপ্রমোদে লিপ্ত ছিলেন; তিনি পিতার চিঠি উপেক্ষা

নসিরুদ্দিন ও কায়কোবাদ করিলেন। বঙ্গেশ্বর এক বিপুলবাহিনী লইয়া দিল্লী আক্রমণ করিয়া রাজ্যশাসনের আমূল সংস্কার করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এদিকে পুত্র কায়কোবাদও পিতৃগঞ্জনা় বিরক্ত হইয়া এবং মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে সৈন্তসামন্ত লইয়া বাঙ্গলার দিকে অভিযান করিলেন। ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে পিতা ও পুত্রের সৈন্তেরা অল্প ব্যবধানে প্রায় মুখোমুখী হইয়া দাড়াইল। বঙ্গেশ্বর স্বীয় শিবির সরযু নদীর তীরে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং সম্রাটের শিবির ছিল গোগরা নদীর তীরে। এই দুইটি স্থানই বিহারে শারন জেলার অন্তঃপাতী।

নসিরুদ্দিন দেখিলেন তিনি সম্রাটের বিশাল সৈন্তের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, তখন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু অভিমানাহত পুত্র মন্ত্রীর প্রবর্তনায় সেই প্রস্তাব ঘৃণার সহিত অগ্রাহ করিলেন। তিন দিন এই ভাবে কাটিয়া গেল, চতুর্থ দিন নসিরুদ্দিন নিজ হস্তে সম্রাটকে এইভাবে একখানি চিঠি লিখিলেন, “প্রাণাধিকেবু, তোমার সঙ্গে আমার দেখা করিবার একান্ত ইচ্ছা। জেকবের মৃত্যুকালে পুত্র জোসেফকে দেখিবার জন্ত তাঁহার যেরূপ প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, তোমাকে দেখার সাধ আমার তদপেক্ষা কম নহে। আমার এই সনির্ব্বক অনুরোধটি পালন কর, ইহার পর আমি আর তোমাকে বিরক্ত করিব না এবং তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিব না।”

এই পত্র পড়িয়া কায়কোবাদ নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি লোকজন না লইয়া একাকী তখনই তাঁহার পিতৃসকাশে ছুটিয়া বাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কুটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী তাঁহার স্নেহের আধিক্য কমাইয়া দিলেন এবং বুঝাইলেন, তিনি সমস্ত হিন্দুস্থানের সাহেন সা সম্রাট, তাঁহার পক্ষে নিয়ন্ত্র এক রাজার কাছে—হউন না কেন তিনি পিতা—এভাবে বাইয়া প্রথমে সাক্ষাৎ করা তাঁহার পদোচিত মর্যাদার যোগ্য হইবে না।

শেষে এই স্থির হইল যে, দুই পক্ষের সৈন্তের মধ্যস্থলে কোন স্থানে বঙ্গেশ্বর সিংহাসনারূঢ় সম্রাটকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিবেন। জ্যোতিষীরা শুভ দিন-ক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়া দিল এবং সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক হইল। সম্রাট বহু আড়ম্বরের সঙ্গে সৈন্তসামন্তের ঘটা করিয়া দেহরক্ষিপরিবেষ্টিত হইয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন, তৎপরে পিতা সরযুদী পার হইয়া পুত্রের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। যখন তিনি সিংহাসন প্রথম দেখিতে পাইলেন, তখন একবার কুন্স করিয়া অভিবাদন করিলেন, আরো একটু অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয়বার কুন্স ও অভিবাদন করিলেন এবং যখন একেবারে সিংহাসনের পাদদেশে আসিয়া পড়িলেন, তখন তৃতীয়বার কুন্স করিতে উদ্যত হইলেন। পিতার এই হীনতা ও দৈন্ত দেখিয়া,

পিতাপুত্রের মিলন—
পুত্র আর সহ করিতে পারিলেন না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাদিয়া
১২৮৮ খৃঃ। পিতার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আলিঙ্গনবদ্ধ
হইয়া রহিলেন। এই করণ দৃষ্টের পরে পিতা পুত্রের হাত ধরিয়া
সিংহাসনে বসাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সম্রাট সেখানে বসিতে কিছুতেই স্বীকৃত
হইলেন না। পিতাকে সিংহাসনে বসিতে বাধ্য করিলেন এবং নিজে অতি সম্মানের সহিত
সিংহাসনের নিম্নে একটি স্থানে উপবেশন করিলেন। এই ঘটনায় রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী
সকলেই বিশেষ প্রীত হইলেন। কয়েক দিন পর্য্যন্ত খুব আনন্দোৎসব চলিল, বাজি ও
আলোর ঘটায় আকাশ প্রদীপ্ত হইল এবং রাজার সঙ্গে প্রধান প্রধান আমীরগণ দেখা
সাক্ষাৎ করিয়া মহাশুখে সময় কাটাইলেন।

ইহার পর উভয় পক্ষের সন্ধি হওয়ার কোন বাধাই রহিল না। নসিরুদ্দিন বঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির স্বাধীন নৃপতি হইলেন, কিন্তু দিল্লীর কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না এই সত্ত্ব হইল। ১২৮৮ খৃঃ এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল।

বিদায়ের সময়ে নসিরুদ্দিন পুত্রকে অনেক হিতোপদেশ দিলেন এবং প্রধান মন্ত্রীকে অবিলম্বে বিদায় করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। পরস্পর আলিঙ্গনাদির পর অতি স্নেহের সহিত বিদায়ের উপসংহার হইল। পিতাপুত্র স্বীয় স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এই ঘটনার পর নসিরুদ্দিন অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তিনি প্রায়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়া বন্ধুদিগকে বলিতেন—হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য ও তাঁহার পুত্র উভয়ই তিনি শীঘ্র হারাইবেন। তিনি বাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই হইল, কারণ এক বৎসর পরে ১২৮৯ খৃঃ কায়কোবাদ খিলিজিবংশীয় এক আমীর কর্তৃক গোপনে নিহত হইলেন।

ফিরোজসাহা খিলিজি ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট হইয়া নসিরুদ্দিনকে বঙ্গের মসনদে বহাল

রাখিলেন। তৎপরে আলাউদ্দিনের সময়েও কতকদিন ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সম্রাটের খামখেয়ালির ভাবদর্শনে তিনি আতঙ্কিত হন। তিনি স্বেচ্ছায় বঙ্গের মসনদ ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র লক্ষণাবতী অঞ্চল নিজ অধিকারে রাখেন। আলাউদ্দিন পূর্ববঙ্গের জন্ত বাহাছর খাঁকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সোণারগাঁয়ে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হয়। মোবারেক সাহ সম্রাট হইলে (১৩১৭ খৃঃ) বাহাছর বিদ্রোহী হন। ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট তোগলক বাহাছরকে দমন করিয়া পুনরায় নাসিরুদ্দিনকে বঙ্গের অধিপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কোন কোন লেখকের মতে দ্বিতীয় বার নাসিরুদ্দিন রাজত্ব করেন নাই, তখন রাজা ছিলেন রুকুদ্দিন। তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নসিরুদ্দিনের পরে বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া শাসনকেন্দ্র লক্ষণাবতী ও স্বর্বাঙ্গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাখালবাবু নসিরুদ্দিনের পর এই কয়েকজন নৃপতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন—রুকুদ্দিন কৈকাউস সাহ (১২৯১-১৩০২ খৃঃ), শমসুদ্দিন ফিরোজ সাহ (১৩০২-১৩২২ খৃঃ), নাসিরুদ্দিন ইব্রাহিম সাহ (১৩১২-১৩২৫ খৃঃ, ইনি লক্ষণাবতীতে শমসুদ্দিন ফিরোজ সাহের সমকালেই রাজত্ব করিতেছিলেন), গিয়াসুদ্দিন বাহাছর সাহ (১৩১০-১৩৩০ খৃঃ)। শেষোক্ত দুইজন নবাব ফিরোজ সাহের পুত্র। গিয়াসুদ্দিনের উল্লেখ বিজ্ঞাপতির পদে পাওয়া যায় “প্রভু গিয়াসুদ্দিন সুলতান”। ফিরোজ সাহের রাজত্বকালে হিন্দুর প্রাচীন একটি পাবাণ মন্দির কতকটা রূপান্তরিত করিয়া সপ্তগ্রাম-বিজয়ী জাফর খাঁ গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে মসজিদ নির্মিত করেন (১২২৮ খৃঃ)। এই জাফর খাঁর সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাস্নাত্ত অনেকেরই জানেন। এই পুস্তকের ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

অতঃপর বহরমখান সোণারগাঁয়ের এবং কুদ্রর খাঁ লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এই ভাবে বঙ্গের শাসন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দিল্লীখের উভয়ের ক্ষমতা খর্ব করেন। বহরম খাঁর মৃত্যুর পর ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে ফকীরুদ্দিন নামক তাঁহার এক দেহরক্ষী সেকেন্দর বাদসাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া সোণারগাঁয়ের গদী দখল করিয়া স্বাধীন নৃপতির ছত্রদণ্ড ধারণ করিলেন। এদিকে আলাউদ্দিন আদমসাহ লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা ছিলেন, ফকরুদ্দিন ও আলাউদ্দিন উভয়ের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছিল। আলাউদ্দিন ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে ফকরুদ্দিনকে নিহত করেন এবং তিনিও ইহার এক বৎসর পাঁচ মাস পরে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ইলিয়াস খাজে কর্তৃক নিহত হন।

ইলিয়াস খাজে ১০ বৎসর নির্বিবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার উপাধি ছিল ‘সামসুদ্দিন’—ইনি রাজত্বের প্রথমে জাজনগর আক্রমণ করিয়া বিস্তর অর্থ ও হস্তী প্রভৃতি লইয়া আসেন। দিল্লীখের কাশী-সমীপবর্তী কোন এক স্থান অধিকার করিতে সম্রাট ফিরোজসাহ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া আসেন।

নহরম খাঁ ও কুদ্রর খাঁ—
১৩০০-১৩৩৮ খৃঃ।

আলাউদ্দিন ও ফকরু-
উদ্দিন—১৩৩৮-১৩৪৩ খৃঃ।

সামন্তদ্বিনের পুত্র পাণ্ডুয়ায় ও তিনি স্বয়ং একডালা দুর্গে সৈন্ত-সামন্ত লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে সামন্তদ্বিনের পুত্র বন্দী হন, কিন্তু সম্রাট কিছুতেই বঙ্গেশ্বরের একডালা দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হন নাই। অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের পর সামন্তদ্বিন সম্রাটকে কিছু অর্থ ও সামান্য উপঢৌকন দিয়া সন্ধি করেন, তাহার পুত্র মুক্তি পাইয়াছিলেন। ইহার পরে ফিরোজসাহ বঙ্গেশ্বরের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। সামন্তদ্বিন ১৬ বৎসর ৫ মাস রাজ্য সুশাসন করিয়া ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

ইখতিয়ারউদ্দিন
ফাজিসাহ—১৩৪৯-১৩৫২ খৃঃ
পর্যন্ত স্বর্ণপ্রদানে রাজত্ব
করিয়াছিলেন। সামন্তদ্বিন
ইলিয়াস সাহ—১৩৪০-
১৩৪৮ খৃঃ।

সামন্তদ্বিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেকেন্দর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দিল্লীতে একটা বড় রকমের ভেট পাঠাইলেন। কিন্তু ফিরোজ সাহ এই স্ত্রে বাঙ্গলা দেশটা সরকারের অধীন করিবার চেষ্টা পাইলেন। তিনি বঙ্গাভিমুখে রওনা হইয়া সেকেন্দর সাহকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি তাহার ভেট পাইয়া খুসী হইয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গলা দেশটা তাহার সাম্রাজ্যভুক্ত এই কথাটা স্বীকার করিলে তিনি খুসী হইয়া সন্ধি করিতে পারেন। বঙ্গেশ্বর স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে স্বীকৃত হইলেন, পরন্তু আরও পাঁচটি হাতী ও মূল্যবান উপহার পাঠাইয়া সন্ধিস্থ্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

১ম সেকেন্দর সাহ
—১৩৪৮-১৩৫৯ খৃঃ।

যুদ্ধের উল্লেখ দেখিয়া সেকেন্দর একডালা দুর্গে আশ্রয় লইলেন। তথায় তাহাকে পরাস্ত করা অসম্ভব দেখিয়া সম্রাট ৪৮টি হাতী ও কতক উপহার আর বাৎসরিক কিছু কর দিতে সম্মত করাইয়া সেকেন্দরের সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। এই সময় হইতে তাহার রাজত্বের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত তিনি শান্তিতে কাটাইয়াছিলেন, শেষকালে তাহার দুই স্ত্রীকে লইয়া কিছু গোলবোগ উপস্থিত হইল। প্রথমার গর্ভে ১৭টি সন্তান জন্মে। দ্বিতীয়ার মাত্র একটি পুত্র হইয়াছিল। এই পুত্রের নাম গয়েসউদ্দিন। ইনি সর্বজনপ্রিয় ও পিতার আদরের ছিলেন। একদা প্রথমা রাজ্ঞী রাজাকে অনেক শপথ করাইয়া একটি গুপ্ত যড়যন্ত্রের কথা তাহাকে বলিতে চাহিলেন, রাজা তাহাকে অভয় দিয়া সেই কথা তাহাকে জানাইতে আদেশ করিলেন। আশ্বাস পাইয়া রাজ্ঞী তাহার নিকট জ্যেষ্ঠপুত্র গয়েসউদ্দিন সম্বন্ধে কতকগুলি কথা ব্যক্ত করিলেন—গয়েসউদ্দিন তাহাকে হত্যা করিয়া রাজ্য দখল করিতে উদ্বৃত্ত ইত্যাদি। রাজা বলিলেন, “দুর্ঘটি, তোমার সপত্নীর একটি মাত্র পুত্র, তাহাও তোমার সহ হইতেছে না—তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও।”

গয়েসউদ্দিন ভাবে-প্রকারে বিমাতার যড়যন্ত্র টের পাইয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদে এ অবস্থায় থাকা আর নিরাপদ নহে মনে করিয়া সোণারগাঁয়ে বাইয়া বিদ্রোহী হইলেন। সেকেন্দর তাহার বিরুদ্ধে রওনা হইলেন। যুদ্ধকালে গয়েসউদ্দিন তাহার সৈন্যদিগকে রাজার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও সেকেন্দর সাহ যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে আহত হইলেন। গয়েসউদ্দিন পিতার চরণধারণপূর্বক বারংবার ক্ষমা

চাহিলেন, সেকেন্দর অল্প দুই এক কথায় তাঁহার শুভ ইচ্ছা জানাইয়া ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন (১৩৬৭ খৃঃ)। কিন্তু ষ্টুয়ার্ট প্রদত্ত এই তারিখ গ্রাহ্য নহে। কারণ সেকেন্দর সাহের ১৩৮৯ খৃঃ অব্দের মৃত্যু পাওয়া গিয়াছে।

পিতার শব সমাধির ব্যবস্থা করিয়া গয়েসউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার প্রথম কার্য্য হইল, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাইদের প্রত্যেকের চক্ষু দুটি উপড়াইয়া ফেলিয়া সেগুলি গয়েসউদ্দিন আজিমসাহ—
১৩৮৯-১৩৯০ খৃঃ।

বিমাতাকে উপহার দেওয়া। তিনি আশ্চর্য্যকার জন্ত এই নিষ্ঠুরতা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এই তাঁহার ওজুহাত। সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া ইহার পর তিনি সর্বদা স্তায়পরতার সহিত রাজত্ব করিয়াছেন। একদিন তাঁহার একটি শর অজ্ঞাতসারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া একজন বিধবার পুত্রকে আহত করে। বিধবা কাজীর নিকট বিচারপ্রার্থী হয়, কাজী সিরাজুদ্দিন সম্রাটের উপর শমন জারি করিতে দ্বিধা বোধ করিয়া শেষে ভগবানকে শ্ররণ করিয়া স্বীয় কর্তব্য নির্দ্ধারণ করিলেন। যে ব্যক্তির উপর শমন জারি করার ভার ছিল সে ভয় পাইয়া অসময়ে মসজিদে উপাসনার ঘণ্টা বাজাইয়া দিল। ধর্ম্ম লইয়া কে এই ব্যঙ্গ করিতেছে, তাহা জানিবার জন্ত সম্রাট সেই লোকটাকে সম্মুখে আনিয়া এইরূপ অদ্ভুত কার্য্যের কারণ গয়েসউদ্দিনের স্তায়পরতা।

জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কাজীর আদেশের কথা বলিয়া কহিল, ভয় পাইয়া সে মহারাজের সকাশে উপস্থিত হইতে সাহসী হয় নাই, তজ্জন্ত এই উপায় অবলম্বন করিয়াছে। রাজা একটা ক্ষুদ্র তরবারি কটিবাসে গোপন করিয়া আদালতে উপস্থিত হইলেন। কাজী তাঁহার আসনে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন—বাদসাহকে কোনরূপ সম্মান দেখাইলেন না। সেই বিধবার ছেলেটি তিনি আহত করিয়াছেন কি না প্রশ্ন করিলেন, এবং যখন রাজার অপরাধ প্রমাণিত হইল তখন সেই স্ত্রীলোকটির ক্ষতিপূরণ করিবার জন্ত রাজাকে বহু অর্থদণ্ড করিলেন। রাজা সেই টাকা দিলেন। তখনই কাজী তাঁহার আসন হইতে নামিয়া আসিয়া রাজাকে যথোচিত সম্মান করিলেন। রাজা বলিলেন, “ভাগ্যে আপনি সুবিচার করিয়াছিলেন, নতুবা অসিদ্ধারা আমি আপনার শির কর্তন করিয়া ফেলিতাম।” কাজী বলিলেন, “আপনি আদালতে যদি আমার অবাধ্য হইতেন, তবে এই বেত্র দ্বারা আপনার পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত করিতাম।” স্বীয় রাজ্যে ধর্ম্মভীরু সংসাহসবৃত্ত এমন সুবিচারক আছেন, এজন্ত রাজা সন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন এবং কাজীকে পুরস্কৃত করিলেন।

এক সময়ে পীড়িত হইয়া পড়াতে রাজার মনে হইয়াছিল, তিনি আর বাঁচিবেন না, সুতরাং একটা উইল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে লিখিত ছিল যে তাঁহার প্রিয়তমা তিনটি অন্তঃপুর-চারিণী—‘সাইপ্রাস’, ‘গোলাপ’ এবং ‘তুলিপ’—মৃত্যুর পর তাঁহার শব ধুইবার অধিকার

* বিভাপতি যে গিটাহুন্দিমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি পূর্ববর্তী বংশের কিংবা এই গয়েসউদ্দিন তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে।

পাইবেন। তাঁহাদের প্রতি রাজার এই অনুকম্পাপ্রদর্শনে তাঁহার অপরাপের উপরাজ্যীরা নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও হিংসাভাবাপন্ন হইয়া এই তিনটি মহিলাকে 'সাইপ্রাস', 'গোলাপ' ও 'তুলিপ'। "ঘোষালী" বলিয়া বিক্রপ করিতে লাগিল। সাধারণের শব্দ ধোত করার ব্যবসায় যে ইতরজাতীয় লোকেরা করে তাহাদের উপাধি "ঘোষালী"। রাজা সারিয়া উঠিলেন। সেই রমণীত্ৰয় বিক্রপের কথা রাজাকে জানাইয়া হুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজা একটি কবিতা লিখিয়া তাঁহাদিগের মনস্তৃষ্টি সাধনের চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু একটি ছত্র লিখিয়া তাহার জোড়া মিলাইতে পারিলেন না। যে ছত্রটি লিখিলেন তাহার অর্থ এই—“হে সুরা-পাত্রধারিণি, তোমরা সাইপ্রাস, গোলাপ ও তুলিপের প্রশংসা গান কর।” এই কবিতা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তিনি পারস্তের শ্রেষ্ঠ কবি হাফেজের নিকট দূত পাঠাইলেন। তিনি তাঁহার চিঠিতে উক্ত কবিকে বহু অর্থ দেওয়ার কথা বলিয়া

বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। কথিত আছে রাজার কবিতার প্রথম চরণ না দেখিয়াই হাফেজ দ্বিতীয় চরণটি লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই—“এই সুসংবাদ তিনটি পরমাসুন্দরী ও প্রিয়তমা “ঘোষালী”দিগকে জ্ঞাপন করা হউক।” গয়েসউদ্দিনের পত্রের উত্তরে কবির যে সুন্দর কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার দিওয়ান নামক কাব্যগ্রন্থে অন্তর্নিবিষ্ট আছে, তাহার প্রত্যেকটি ছত্রের শেষে “আমার রুবুধ” এই শব্দটি আছে। কবিতাটির শেষ ছত্রের মর্ম্মার্থ এই—“রে হাফেজ! সুলতান গয়েসউদ্দিনকে দেখিবার জন্য তোমার যে তীব্র ইচ্ছা জন্মিয়াছে তাহা লুকাইবার কারণ কি? তুমি যে যাইতে পারিতেছ না তাহার কারণ, তুমি অনেক দূরে আছ—এ কথা সুলতানের নিকট ব্যক্ত কর।”

হাফেজ যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে এতটা দূর তিনি যাইতে সাহস পাইতেছেন না, ইহাই না আসার কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি সাংসারিক হিসাবে কতকটা উদাসীন ছিলেন। ছয় বৎসর করেক মাস দক্ষতার সহিত রাজত্ব করিয়া গয়েসউদ্দিন ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। পরবর্ত্তী রাজা সৈফউদ্দিন গয়েসউদ্দিনের পুত্র। তিনি রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। নির্ঝিবাদে দশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৪০৬ খৃঃ তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁহার রাজত্বের বিশেষ কোন ঘটনা জানা যায় নাই। সৈফউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পোন্তপুত্র ‘দ্বিতীয় সামসুদ্দিন’ নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছুদধিক দুই বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া তিনি ১৪০৯ খৃঃ। ভাতুরিয়ার রাজা গণেশ কর্তৃক নিহত হন।

রাজা গণেশ কে?—তাহা লইয়া অনেক বাক্বিত্তা চলিতেছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বহু বঙ্গদেশের অধিকাংশ রাজাকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি

সৈফউদ্দিন হান্ধা

সাহ—১৩৩৬-১৪০৬ খৃঃ।

২য় সামসুদ্দিন—১৪০৬-

১৪০৯ খৃঃ।

তাহার কায়স্থদিগের ইতিহাসের নামই দিয়াছেন—“রাজত্বকাণ্ড”। তাম্র-শাসনাদিতে প্রমাণাভাব হইলেও তাহার মতের পোষক কুলজী-গ্রন্থের অভাব হইতেছে না। এই কুলজীগুলির সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে, অনেকের বিশ্বাস নগেন্দ্রবাবু এই সকল কুলজী-লেখকদের দ্বারা বারংবার প্রতারণিত হইয়াছেন। এ বিষয়ে রাখালবাবু এত প্রমাণ দিয়াছেন যে নগেন্দ্রবাবুর উত্তর মুখে যোগাইতেছে না। রাখালবাবু লিখিয়াছেন—“বহুজ মহাশয় সন্দেহজনক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া দুই বার সেন-রাজবংশকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, সেই জন্ত প্রতিবারেই তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ১৮২৬ খৃঃ অব্দে বহুজ মহাশয় চন্দ্রদ্বীপের ঘটককারিকা অনুসারে চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতা দনোজ মাধবকে লক্ষণসেনের পৌত্র প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দম্বুজমর্দনের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইলে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষণসেনের পৌত্র হইতে পারেন না। ইহার পরে দম্বুজমর্দন ও মহেন্দ্র দেবের মুদ্রা প্রকাশিত হইলে সেনবংশের সহিত কায়স্থসমাজের নূতন সম্বন্ধ আবিষ্কারের প্রয়োজন হইল। তদনুসারে বটুভট্টের দেববংশ নামক কুলগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে।” (বঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩২৪, ১৮৮ পৃঃ)। এক একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ার পর পূর্ববর্তী সত্তোজাত কুলগ্রন্থ স্মৃতিকাগৃহ হইতে বহির্গত হইতে না হইতে সেটির সংশোধক ও পরিপূরক হিসাবে অপর একটি কুলগ্রন্থ পাওয়া যায়। এই নিত্য নব আবিষ্কারের বলে নগেন্দ্রবাবু যে সকল মত দাঁড় করাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা রাখালবাবু তাহার বঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, ১৮৮-১৮৯ পৃষ্ঠায় ও সান্যাল মহাশয় তাহার সামাজিক ইতিহাসের অনেক স্থলে বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিহারদ্ব মহাশয়ও এই ব্যাপারে উগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন; রাখালবাবু অতি গম্ভীর

গণেশ কোন জাতি? বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত মহিমার মধ্যে একটু চাপা রহস্তের ভাবা

অবলম্বন করিয়াছেন। নিখিলনাথ রায়, সতীশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কায়স্থ লেখকদের অভাব নাই, কিন্তু ইহাদের অপেক্ষা ঐতিহাসিক শাস্ত্রে অনেক বেশী জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এবং ইতিহাসক্ষেত্রে অপূর্ণ উদ্ভাসশীলতা ও অভূতপূর্ব বিজ্ঞার পরিচয় দিয়াও পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ নগেন্দ্রনাথ কুলজীশাস্ত্রকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করিয়া এবং ঘটকদিগের কথায় নির্দিষ্টারে প্রত্যয় স্থাপন করিয়া ঐতিহাসিকগণের শ্রদ্ধা কি তিনি কতকটা হারাইয়া ফেলেন নাই? কায়স্থ-সমাজ অতি বিরাট। যদি কোন জাতি সর্ব-বিষয়ে বংশের প্রাধান্তের দাবী করিতে পারেন—তবে কায়স্থ জাতি যতটা পারেন, ততটা আর কোন জাতি পারেন কি না সন্দেহ। কিন্তু সোণার উপর রং চড়াইবার প্রয়োজন কি? যাহা স্বভাবেই বড়, তাহাকে অধিকতর বড় করিবার চেষ্টা বাতুলতা নহে কি? তাহার এই সকল গবেষণার ফলে বঙ্গের বহুমূল্য কুলজীগ্রন্থ-সম্পদের উপর লোকের কতকটা অনাস্থা জন্মিয়াছে। অথচ খাঁটি কুলজীগ্রন্থগুলি

যে চারণদের গীতির ভাষা ইতিহাসের বহুমূল্য উপকরণ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

গণেশকে উত্তর রাঢ়ী কার্যস্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে নগেনবাবু চেষ্টা পাইয়াছেন। দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় নিজে ইচ্ছা করিয়া কিংবা স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তি-বলে কিছু লিখিয়াছেন, তাহার শত্রুর মধ্যেও কেহ এ কথা বলিবেন না। তবে হযত তিনি ঠাকুরমার কুলি হইতে মাঝে মাঝে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি শ্রুতি ও প্রবাদের উপর জোর দিয়াছেন, তজ্জগৎ স্থানে স্থানে তাহার মত ইতিহাসসঙ্গত হয় নাই। তথাপি রাজা গণেশসম্বন্ধে তিনি যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে পারিবারিক এত কথা আছে যে, সেই প্রবাদগুলি স্থানে স্থানে ভুল প্রতিপন্ন হইলেও উহা সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

কাহিনী ও ব্রাহ্মণ-সমস্ত।

বলিয়াই মনে হয়। কাহিনীকারিকায় গণেশসম্বন্ধে এত কথা, এত প্রবাদের শতাংশের একাংশও নাই—এই প্রবাদগুলি পারিবারিক দীর্ঘকালাগত সংস্কার ও স্মৃতির পরিচয় দিতেছে। এজগৎ আমাদের বিশ্বাস, গণেশ ব্রাহ্মণ-

ভাতুড়িয়ার জমিদার-
বংশ—ভাতুড়ীবংশ।

কুলজাত ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। বিশেষতঃ মুসলমান ঐতিহাসিক “ভাতুড়িয়ার” জমিদার বলিয়া তাহাকে নির্দেশ করিয়াছেন। এই “ভাতুড়িয়া” নাম হইতে প্রসিদ্ধ ভাতুড়ী বংশের উদ্ভব হইয়াছে এবং দীর্ঘকাল সেই স্থানের জমিদার বংশের ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রতিপত্তি ছিল।

নরসিংহ নাড়িয়াল নামক এক মস্তুর কৌশলে গণেশ মুসলমান বাদসাহকে নিহত করিয়াছিলেন (ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশ)—“বাহার মস্তুরাবলে শ্রীগণেশ রাজা। গোড়ের বাদসাহকে মারি নিজে হৈল রাজা।” * তাহার নামের কোন মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। কিন্তু বাদশা হইয়া তিনি সম্ভবতঃ মুসলমান উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক সময়েই রাজা বা বাদশাহের প্রচলিত নাম রাজকীয় দলিলপত্রে ব্যবহৃত হইত না; যিনি মুসলমানী রাজত্বকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহার তৎসময়ে সম্মানিত মুসলমানী উপাধি গ্রহণ করা অসম্ভব নহে। গণেশের রাজত্বকাল ১৩৮৫-১৪১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়। হযত তিনি সাহাবউদ্দিন বায়াজিদ সাহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে এই নাম কতকগুলি মুদ্রায় পাওয়া গিয়াছে। গণেশ অতি প্রথমে বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন; তিনি প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমান সামন্ত ও আমীরগণকে সমুদ্র করিয়া নির্কিভাবে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। একজন মুসমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, তিনি মুসলমানদিগের একজন প্রিয় হইয়াছিলেন যে, মৃত্যুর পর তাহার শব হিন্দুমতে দাহ করা হইবে কিংবা মুসলমানমতে তাহার সমাধি দেওয়া হইবে, এই লইয়া দুই শ্রেণীর মধ্যে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। কিন্তু এত করিয়াও তিনি সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের

* এই ‘নাড়িয়াল’ বংশোদ্ভূত বলিয়া চৈতন্য প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে ‘নাড়া’ ও ‘নাড়াবুড়া’ বলিয়া অভিহিত করিতেন।



১৫৩৪ ও ১৫৩৫ খ্রীঃাব্দে, নন্দন শতাব্দীর প্রথম ভাগে লিখিত পুথির কাঠের মলাটে অঙ্কিত ছবি (বৌদ্ধানুসারে মৎস্যগৃহীত), ৭৩৪ পৃঃ।



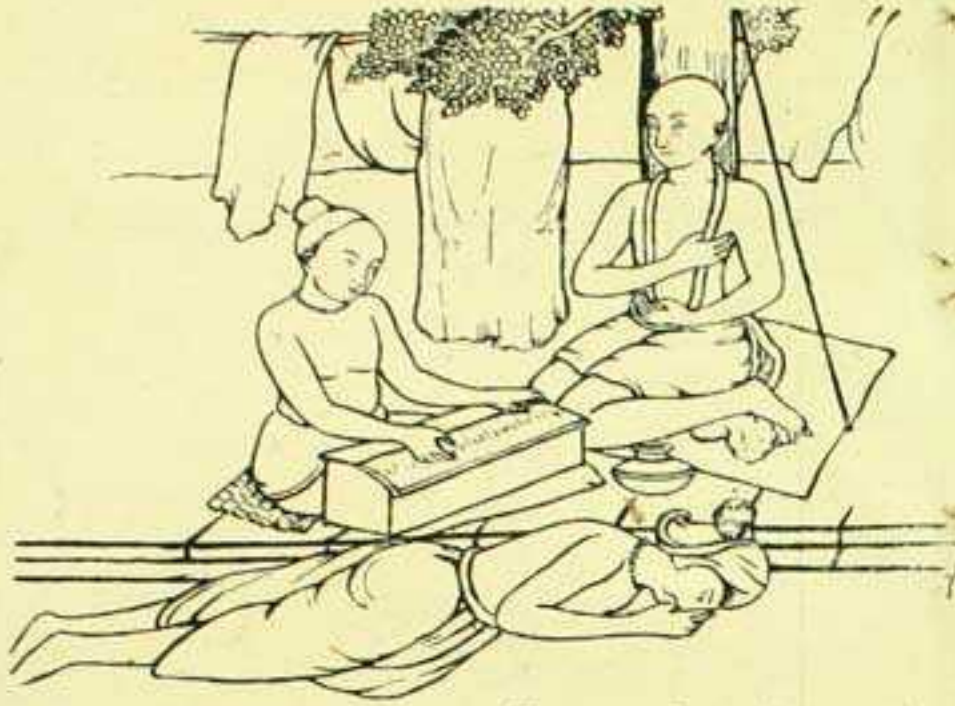
হরিনাম স্তোত্র, ১২৪ বৎসর পুরী বাগবাড়ীতে
লিখিত অঙ্কিত এবং মৎস্যগৃহীত, ৭১০ পৃঃ।



হরিনাম, গোড়শ শতাব্দীতে
লিখিত বনবিজয়পুরের পুথির
কাঠের মলাটে অঙ্কিত ছবি হাতে
গৃহীত, মৎস্যগৃহীত, ৭৩৪ পৃঃ।

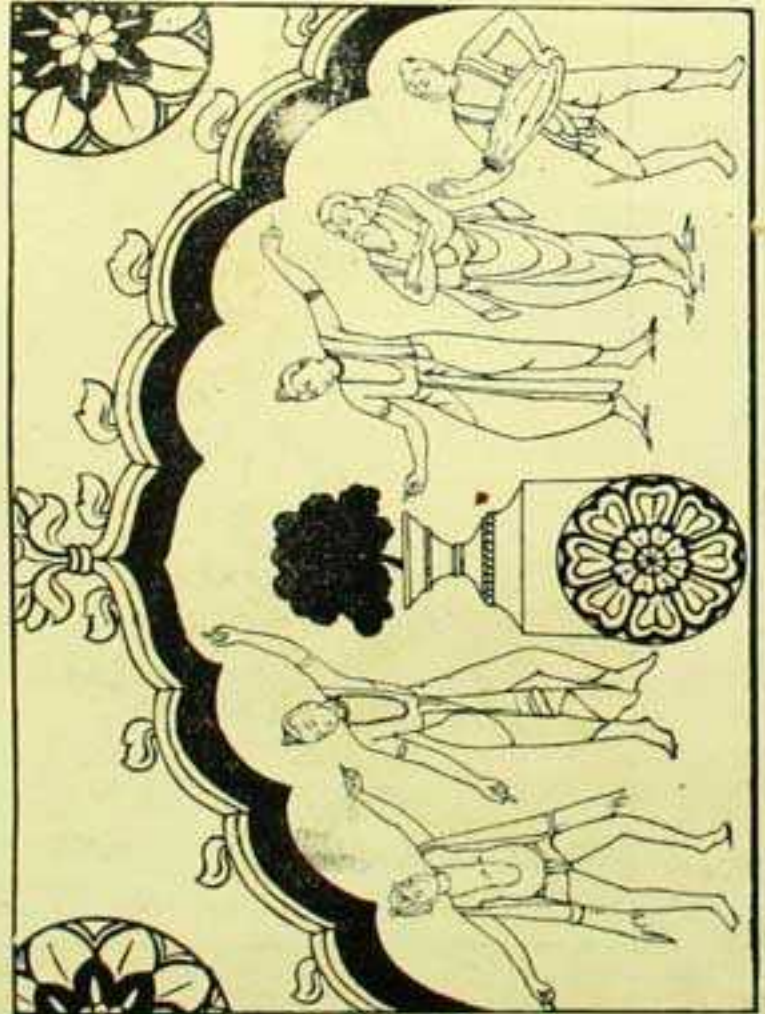
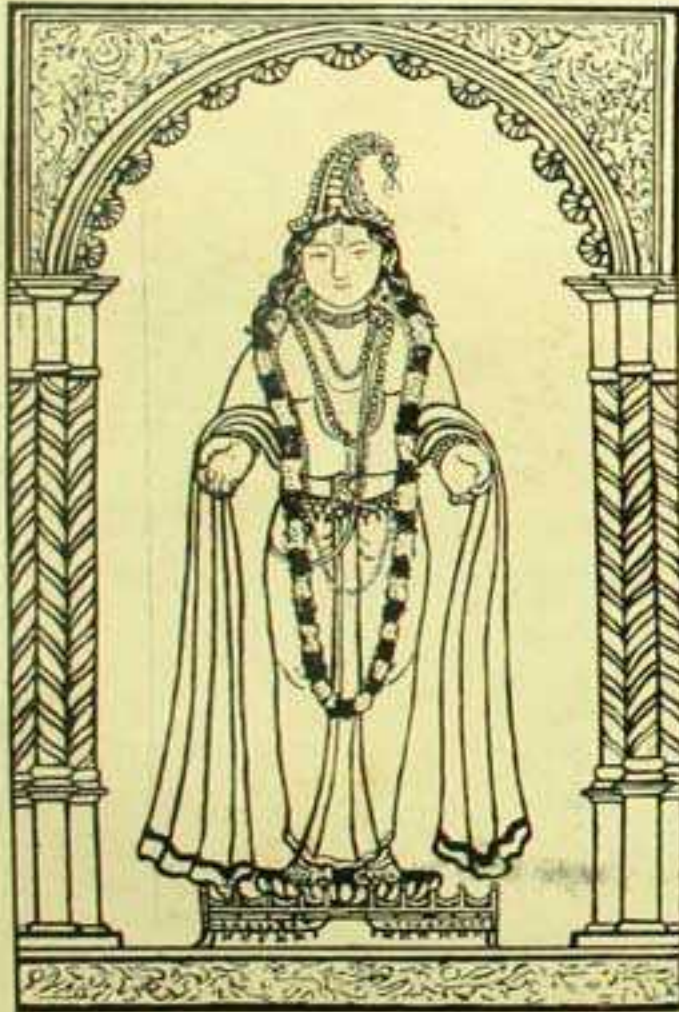


চেতন, নবদ্বীপ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অঙ্কিত রচিত চিত্রপট হইতে, (২৪শ পর্গণা)।
মূল ছবি কলিকাতার বনাইলাল মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীর।



চৈতন্য, আড়াই শত বৎসর পূর্বের রচিত চিত্রপট
হইতে সংসংৃহীত (২৪শ পর্বে)।

মহাপ্রভু, প্রতাপরুদ্র ও রঘুনাথ পণ্ডিত। মুন্সিরাবাদ কুঞ্জবাটীর মহারাজ নন্দকুমারের
গৃহের চিত্র। ছবি মহাপ্রভুর নন্দনামস্মিক বলিষ্ঠা কথিত।



মহাপ্রভু, নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ দান-মন্দির ছবি। ইহা ঠিক
মূলের অনুরূপ হয় নাই। কথিত আছে, ঐ মূল
মূর্তি চৈতন্য প্রভুর সময়ের।

বহরু গ্রামের (২৪শ পর্বে) রায় সাহেব দেবেন্দ্র বহরু মন্দির গাত্রে
ছবি, দুর্গারাম ভাস্কর কর্তৃক ১৮১৪ খৃঃ অব্দে অঙ্কিত।
চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিধাম ও জীবধাম

প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন, তিনি মুসলমানদিগের প্রতি অকথিত অত্যাচার করিয়াছিলেন। কথিত আছে সেখ বদর উল ইসলাম রাজাকে অভিবাদন না করাতে তিনি তাঁহাকে দণ্ড দিয়াছিলেন। কতকগুলি ওমরাহ তাঁহাকে বিধর্মী বলিয়া বড়বস্ত্রে লিপ্ত ছিল, এজন্য তিনি তাঁহাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিলেন। এইগুলি বিশেষ কোন অত্যাচার বলিয়া মনে হয় না। যদি তিনি সাহাব-উদ্দিন ব্যাজিদ উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার শবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া লইয়া কেন যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কলহ হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এদিকে যত যখন মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হন, তখন রাজা গণেশ স্বর্ণধ্বজব্রত করাইয়া তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

প্রায় চারিশত বৎসরের দীর্ঘরজনীর পরে হঠাৎ একটু উষার আলোর মত হিন্দুগগনে গণেশের উদয়। যে বংশে তিনি জন্মিয়াছিলেন, সেই ভাট্টা বংশ কি তাঁহাকে কখনও ভুলিতে পারে? তাঁহারা এখন নিম্প্রভ হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু গণেশের কীর্তিকথা তাঁহাদের কুল-কারিকায় একপ বিস্তৃতভাবে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, বাহিরের লোকেরাও তাহা ভুলিতে পারিবে না। সার্যাল মহাশয়ের সামাজিক ইতিহাসের এই গণেশের অধ্যায়টি পাঠ করুন, তাহা এত পুঙ্খানুপুঙ্খ ও এত বিস্তৃত যে এই সকল কথা যে মূলতঃ সত্যমূলক তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। যদি দিনাজপুরের সমৃদ্ধ রাজবংশে তাঁহার জন্ম হইত, তবে তাঁহার ইতিহাসসম্বন্ধে সেই পরিবারে সোণায় গিল্টীকরা চরিতকথা না থাকিলেও শত শত প্রবাদ থাকিত। সেরূপ একটি প্রবাদেরও অস্তিত্ব আমরা জানি না। তবে যেকোন দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে ঐরূপ প্রবাদসংবলিত পুস্তক অচির-ভবিষ্যতে আবিষ্কার একটা বিষয়ের বিষয় হইবে না। গণেশ নারায়ণের স্ত্রী মহারাজী ত্রিপুরা দেবী এবং যত্নর স্ত্রী নবকিশোরীর কাহিনী করণ রসের উৎস, সেই বিরোগান্ত দৃশ্যের উপর ভাট্টাবংশের চোখের জল এখনও শুকাই নাই। ইহা বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণকূলে সুবিদিত, যত্নর সহিত নবকিশোরীর এবং নবকিশোরীর সঙ্গে আসমানতারার চিঠিপত্রগুলি সার্যাল মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই চিঠিগুলি সেকালের রহস্তের মোড়কে আঁটা তপ্ত অশ্রু। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এত দিনের চিঠিপত্র এগুলি উপকথার মত শোনায। কিন্তু এই ভাবে চিঠিপত্র রক্ষা করিবার প্রথা ও ধারা আমরা বাদলার ইতিহাসে আরও কয়েকবার পাইয়াছি। রাজীবলোচনের কৃষ্ণচন্দ্রচরিত উক্ত রাজার মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে লিখিত। সকলেই জানেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদ পণ্ডিত কেরি সাহেবের অনুমোদনে উহা লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকে বলিয়া থাকেন ঐ পুস্তক ইংরেজদের অনুপ্রেরণায় বিরচিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে লইয়া সিরাজউদ্দৌলার

সঙ্গে জন কোম্পানির কতকগুলি চিঠিপত্র দেওয়া আছে—তাহাও এই ধরণের। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জীবগোস্বামীর সঙ্গে কবি গোবিন্দদাসের সংস্কৃত চিঠিপত্রগুলি নরহরিরচিত ভক্তি-রসাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ভক্তি-রসাকর বৈষ্ণবদিগের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এবং

নবকিশোরী ও আসমান-
তারার।

গোবিন্দদাস ও জীব গোস্বামী এই পুস্তক রচনার পূর্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। এই সকল চিঠিপত্রের ভাষা হয়ত কিছু রূপান্তরিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু ইহাদের মূল ভাবের ব্যত্যয় হইবার সম্ভাবনা নাই। মুসলমানগণ এই ভাবের চিঠিপত্র অনেক রক্ষা করিয়াছেন। এদেশের বাদশাহ আহমেদ শাহ (১৪০৯ খৃঃ) যখন জোয়ানপুরের রাজা ইব্রাহিমকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভয়ে ভীত হইয়া তাইমুরের পুত্র সাহরকের নিকট সাহায্য-প্রার্থী হন, তখন তাতার সম্রাট জোয়ানপুরের বাদশাহকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা ষ্ট্রয়ার্ট সাহেবের ইতিহাসে (১৯১০, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১২০ পৃঃ) উদ্ধৃত হইয়াছে। সাদ্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন, নবকিশোরী বাদশাহকে (যহ) যে কোটা পাঠাইলেন তন্মধ্যে একটি ভূরূপত্রে লিখিত কয়েকটি শ্লোক লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শ্লোক অবশ্য বাঙ্গলায় এবং সাদ্যাল মহাশয় তাহার সবগুলি দিতে পারেন নাই। তারকা চিহ্ন দিয়া পাদটীকায় লিখিয়াছেন, “মধ্যবর্তী শ্লোকগুলি অপ্রাপ্য।” নবকিশোরীর পুত্র অম্বুপনারায়ণ। যহ তাহার মাতা ও স্ত্রীর প্রতি যে নিশ্চয়তা করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত চির অমৃতপু ছিলেন। তিনি নিজে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিলেন, কিন্তু এই সময়ে একটাকিয়ার জমিদারির আয় তিনগুণ বাড়িয়া গেল, এই সকল ঘটনা ভাষ্করীবংশের চিরস্মরণীয়। স্মরণ্য মূলতঃ বাদসাদ দিয়া এই সকল কাহিনীর যে অনেক কথাই সত্যমূলক তাহা আমরা বলিতে পারি। পৃথিবীর সর্বত্রই ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাম্রশাসন ও মুদ্রায় যাহা নাই, তাহা যে ইতিহাস নহে, এবং বিজ্ঞানসঙ্গত বলিতে যে শুধু মুদ্রা ও তাম্রশাসন বুঝায় এই অদ্বিত কথ্য আমরা আধুনিক কয়েক জন বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের মুখেই প্রথম শুনিয়াছি।

একটাকিয়া বংশের প্রতাপ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের ইতিহাসের মশালের আলো। চলনবিলের স্বচ্ছ তোররাশি মুকুরের মত সম্মুখে রাখিয়া যে গভীর গড়খাই-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ এক সময়ে শত্রুর অনধিগম্য ছিল, যে একটাকিয়া বংশের গৌরবের জন্ত হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া লড়াই করিয়াছে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতেও যে রাজকুলের জন্ত পাঠান সেনাপতি কামতার খাঁ প্রাণপাত করিয়া সেই সুচিরাগত রাজভক্তির সংস্কার উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছিলেন, যেখানে ১২ মাসে ১৩ পার্শ্বপে উৎসবের শত শত দীপ জলিয়া উঠিত, যেখানে ব্রাহ্মণগণ পুঁথি ফেলিয়া একটু হইলেই তরবারি হস্তে সমরাস্রমে নামিতেন, সেই বঙ্গের শেষ গৌরবরাশি একটাকিয়া আজ কোন্ অস্তাচলে মিলাইয়া গিয়াছে!

যত্নসম্মে কেহ কেহ বলেন, তিনি গণেশের এক মুসলমানী উপস্রীর গর্ভসম্বৃত জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন, স্মরণ্য তিনি মুসলমান হইয়াছিলেন। কেহ আবার বলেন, তিনি কুতুব উল আলাম নামক কোন মুসলমান সাধুর চর্কিত পান যহ কেব মুসলমান হইলেন?

খাওয়াতে জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি আসমানতারা নামক কোন মুসলমান মহিলার প্রেমে পড়িয়া মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন। গণেশ কোন পাঠান ওমরাহের সম্পত্তি হরণ করেন নাই, পরন্তু অনেক মুসলমান বিদ্বান ও সাধু ব্যক্তিদিকে বৃত্তি দান করিতেন, এতৎ সবেও কতকগুলি যড়যন্ত্রকারী মুসলমানের

প্রবর্তনায় বিখ্যাত সাধু ছর কুতুব উল্ আলম বিহারের অধিপতি ইব্রাহিম সাহকে গণেশের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। গণেশ মুসলমান ধর্ম গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া এই শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান, কিন্তু নিজে মুসলমান না হইয়া বহুকে ঐ ধর্মে দীক্ষিত হইতে অমুমতি দেন। তৎসম্বন্ধে প্রচলিত নানারূপ উপাখ্যান দৃষ্টে মনে হয়, অসামান্য প্রতিভা ও বীর্যসম্পন্ন হইয়াও রাজা গণেশ খুব শাস্তিতে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। চারিদিকে তুর্দান্ত পাঠান বাদসাহ এবং আমীর ওমরাহ, হিন্দুদিগকে ইহারা বিধর্মী ও কাফের বলিয়া ঘৃণা করিতেন। ইহাদের সকলের শীর্ষস্থানে গণেশ রাজা প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্বক্ষণ শঙ্কিত ছিলেন। তাঁহার মাথার উপর চিরদিন শানিত খড়্গা স্থলিতেছিল। রাজনীতি-কৌশল, পরাক্রম, শাস্তিপ্রিয়তা প্রভৃতি নানা গুণে মণ্ডিত হইয়া তিনি তাঁহার রাজত্বের আপৎ কালটা কোনরূপে কাটাইয়া দিয়াছিলেন।

কথিত আছে রাজা যহ বা চেংমল 'জালালুদ্দিন' উপাধি ধারণ করিয়া হিন্দুদের প্রতি অমাত্যবী অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের জন্ত যে সুবর্ণধেনুত্রত অমুচিত হইয়াছিল, সেই কার্যের অমুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে তিনি

যহ কর্তৃক অত্যাচার।

গোমাংস খাওয়াইয়া বলপূর্বক মুসলমান করিয়াছিলেন। জালালুদ্দিন সুবিখ্যাত সাধু সেখ সাহেদকে সোণারগাঁ হইতে আনিয়া তাঁহারই নির্দেশ মত সমস্ত রাজকার্য করিতেন। তিনি রাজধানী পাণ্ডুয়া হইতে গোড়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং যহ শিল্পকলা-বিশিষ্ট মসজিদাদি নির্মাণ করিয়া প্রাচীন গোড় নগর সুসমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভগ্ন মসজিদ, অতিথিশালা, দিবা প্রভৃতি “জালালী কীর্তি” বলিয়া পরিচিত। অষ্টাদশ বর্ষকাল নির্বিস্বাদে রাজত্ব করার পর তিনি ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সম্ভবতঃ স্বীয় রাজ্যের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া ইনিই কবি চণ্ডীদাসকে হস্তীর পৃষ্ঠে বাধিয়া বেত্রাবাত করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু টেপলটন সাহেব অমুমান করেন,—উক্ত কবির হত্যাকারী সম্ভবতঃ ইনি নহেন, পরবর্তী বঙ্গেশ্বর।

জালালুদ্দিন—১৪১৪-

১৪৩১ খৃঃ।

জালালুদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র আহম্মদ সাহ ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, ইনি হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীরই প্রিয় হইয়াছিলেন। ইহার রাজত্ব কালে জোনপুরের বাদসাহ ইব্রাহিম বঙ্গদেশে এক দল সৈন্ত প্রেরণ করেন। ইহাদের আক্রমণে আহম্মদ সাহ ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাইমুরলেনের পুত্র সাহরুকের নিকট নিজ রাজ্যের ছরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া একখানি চিঠি পাঠান। সাহরুক স্থলতান ইব্রাহিমকে যে ভীতি প্রদর্শন করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা টুয়ার্ট তাঁহার ইতিহাসে আমূল উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা সেই সময়ে সম্রাটদের প্রতিহিংসার ইচ্ছা বেরূপ ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা রোমাঞ্চকর। সেই চিঠির মর্ম এই—“এই জগতের রাজ-চক্রবর্তীর আদেশ পাওয়া মাত্র এক দিনের মধ্যে আপনি বঙ্গদেশের যত লোক বন্দী করিয়া আনিয়াছেন, তাহাদের বাড়ী পৌছাইয়া

আহম্মদ সাহ—১৪৩১-

১৪৪২ খৃঃ।

সাহরুকের পত্র।

মর্ম এই—“এই জগতের রাজ-চক্রবর্তীর আদেশ পাওয়া মাত্র এক দিনের মধ্যে আপনি বঙ্গদেশের যত লোক বন্দী করিয়া আনিয়াছেন, তাহাদের বাড়ী পৌছাইয়া

দিবেন এবং কাজিদের দস্তখতি চিঠি দ্বারা প্রমাণ করিবেন যে আপনি আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন। যদি কিস্কিয়াত্র বিলম্ব করেন, তবে প্রথমতঃ আমার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্র কাবুলের শাসনকর্তাকে, তৎপর খোটান, গিজনি ও কান্দাহারের শাসনকর্তাদিগকে আপনাকে শান্তি দিতে পাঠাইব। ইহারা গেলে যদি আপনার যথেষ্ট শান্তি না হয়, তবে ক্রমাগত আমার সেনাপতি ফিরোজ সাহ, তৎপরে আমার প্রিয় পুত্র সামসুদ্দিন মহম্মদকে খোরাসান প্রকৃতি সমস্ত রাজ্যের সৈন্ত সহকারে প্রেরণ করিব।” এই ভাবে তাঁহার আর আর পুত্রগণ এবং তাঁহার প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যব্যাপী বিবিধ সেনানিবাসগুলির লক্ষ লক্ষ সৈন্ত পাঠাইবেন—তাঁহার একটা বড় রকমের তালিকা দেওয়া আছে। উপসংহারে লিখিত আছে—“আমার প্রিয় পুত্র উল্ক বেগ স্বরূপকে তুর্কিস্থানের সমস্ত সৈন্ত সহকারে পাঠাইব। তাঁহার উপর আদেশ থাকিবে যে আপনার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কঠিন করে, অথবা তাহা এমন জায়গায় ঝুলাইয়া রাখে, যেখান হইতে কাকগুলি মাংস চিরিয়া খাইতে পারে।”

এই ভীতি-প্রদর্শনের ফলে সুলতান ইব্রাহিম, তাইমুরলেনের পুত্রের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া নিকৃতি পাইয়াছিলেন এবং আহম্মদ সাহও নিকপদ্রবে অষ্টাদশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪৪২ খৃঃ অব্দে মৃত্যুবৃত্তে পতিত হন।

ইহার কোনও সময়ে দমুজমর্দিনদেব ও মহেন্দ্রদেব বাঙ্গলাদেশে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও বিশ্বাস গণেশ “দমুজমর্দিন” উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। মুসলমান-বিজয়ী হিন্দু রাজাদের ঐক্য উপাধি আমরা আরও দুই এক স্থানে পাইয়াছি। কিন্তু সন তারিখের গোলযোগ না মিটিলে এ প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি আবিষ্কৃত কুলজীগুলির উপর কোনই আস্থা স্থাপন করা যায় না। দমুজমর্দিন ও মহেন্দ্রদেব সম্বন্ধে আমরা ঐ সকল তথাকথিত বংশাবলী একবারে অগ্রাহ্য করি। শ্রামল বর্ধী সম্বন্ধেও ঐক্য বংশাবলী উপস্থিত করা হইয়াছিল। বংশাবলীর প্রমাণ ঠিক ঐতিহাসিক না হইলেও তাহাকে আমরা ইতিহাসের অন্ততম প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু জাল বংশাবলী ও মেকী টাকা চালাইতে গেলেই তাহা চলে না। রাখালবাবু এই সকল পর্কতপ্রমাণ জাল বংশাবলীর উপর সজোরে দস্তোলি নিক্ষেপ করিয়াছেন। দমুজমর্দিন ও মহেন্দ্রদেব কে ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে পারিলাম না। উভয়ের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয়, দমুজমর্দিন ১৩৪০ শকে (১৪১৮ খৃঃ) এবং মহেন্দ্রদেব ১৩৩৯ হইতে ১৩৪৫ শকে (১৪১৭-১৪২২ খৃঃ) বাঙ্গলায় রাজত্ব করিতেছিলেন।

আহম্মদের পুত্র ছিল না। নসির নামক এক দাস প্রবল হইয়া সিংহাসন দখল করেন, কিন্তু তিনি ৮ দিন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ওমরাগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া সামসুদ্দিন ভেঙ্গরের এক তরুণ বয়স্ক বংশধর নসির সাহকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন, ইনি অপ্রতিহতপ্রভাবে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া ১৪৪৯ খৃঃ অব্দে স্বর্গারোহণ করেন। ইনি গোড়ে এক বিশাল দুর্গ নির্মাণ করেন, তাঁহার সিংহদ্বারের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়।

দাস নাসিরের ৮ দিনের
রাজত্ব। নসিরউদ্দীন মহম্মদ
সাহ—১৪৪২-১৪৫২ খৃঃ।

নসির সাহের পুত্র বরবক সাহ রাজা হইয়া আফ্রিকার আবিসিনিয়াবাসী নিগ্রোদিগকে তাহার সৈন্তদ্বারা করেন, ৮ হাজার নিগ্রো অঝারোহী সৈন্ত তাহার অনুগমন করিত, তাহার দেখাদেখি গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের রাজারাও এই শ্রেণীর লোকদিগকে বিধাসী ও সাহসী দেখিয়া নিজেদের সৈন্ত শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। টুয়াট লিখিয়াছেন “যুরোপীয়দের হাতে পড়িলে বাহারা পশুর মত ব্যবহার পাইত, এই দেশের রাজারা তাহাদিগকে অমুরাগ ও প্রীতি প্রদর্শন করিতে তাহাদের কেহ কেহ বড় সেনাপতি, এমন কি প্রাদেশিক শাসনকর্তাও হইতে পারিয়াছিলেন।

নসির সাহের পুত্র ইউসফ সাহ ১৪৭৪ হইতে ১৪৮২ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি সুপণ্ডিত ও ছায়াপদ বাদসাহ ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। গরীব ও ধনী ইহাদের মধ্যে বিচার কালে কোন তারতম্য করিতেন না। পক্ষপাত-দোষ-দৃষ্টে কাজিদিগকে ইনি কঠোর শাস্তি দিতেন। ইহার রাজত্বকালে ত্রিহট্ট বিজিত হইয়াছিল। ইনি পাণ্ডুর অনেকগুলি সূর্য্য ও বাসুদেবের মন্দির মসজিদে পরিণত করেন। “বাইশ দরজা” নামক গোড়ের বিশাল মসজিদটি ভগ্ন সূর্য্যমন্দিরের উপাদানে নিৰ্ম্মিত।

ইউসফ সাহের সন্তান হয় নাই। আমির ও মন্ত্রীরা রাজকুলজাত একটি বোগ্য যুবককে রাজপদে মনোনীত করেন। ইনি “ফতে সাহ” উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি নবীন বয়সেই পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। নিগ্রো ও খোজারা রাজদরবারে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়াছে দেখিয়া ইনি খুব চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি গুরুতর দোষ প্রচলিত ছিল, তজ্জন্ত বাদসাহ তাহাদের কতকগুলি বড় লোককে

কঠিন শাস্তি দেন এবং অপর ব্যক্তিদিগকে সাধারণ ভৃত্য অথবা প্রজার শ্রেণীতে পরিণত করিয়াছিলেন। খোজাগণের অন্তঃপুরে গতিবিধির কোন বাধা ছিল না। এই সুবিধা পাইয়া তাহারা ইহাকে রাত্ৰিকালে শয়নাগারে হত্যা করে। ফতে সাহ ১৪২০ খৃঃ অব্দে নিহত হন। ইহার রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান ঘটনা—চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম; (১৪৮৬ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী)। অন্তঃপুর হইতে রাজা প্রাতে বাহিরে আসিবেন—দেহরকীরা অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময় দেখা গেল, বারেক নামক খোজা রাজ-পরিচ্ছদ পরিয়া সিংহাসনে আরুঢ় হইয়াছেন। তখন প্রধান মন্ত্রী খান-জাহান এবং প্রধান সেনাপতি খোজা মালেক আওল রাজধানী হইতে দূরে ছিলেন এবং অপরাধের সেনাপতিদিগকে ঘুস দিয়া বশীভূত করা হইয়াছিল—সুতরাং

বারেক খোজা “সুলতান সাহাজাদা” উপাধি লইয়া অনায়াসে সিংহাসন দখল করিয়া বসিলেন। তিনি খোজা ও নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদিগকে উচ্চপদ দিতে লাগিলেন, কারণ তিনি জানিতেন সম্রাস্ত লোকেরা সুবিধা পাইলেই তাহার প্রতিকূলতা করিবেন। তিনি রাজ্যময় খোজা গুপ্তচর নিযুক্ত করেন; তাহারা তাহার বিরুদ্ধে কে কি করিতেছে বা কহিতেছে, তাহার বিবরণী

রাজাকে স্তনাইত। প্রথমতঃ প্রধান মন্ত্রী খান জাহান ও প্রধান সেনাপতি খোজা মালেক আওলকে তিনি খুবই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার সিংহাসনের উপর চিরকাল বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন, এই শপথ গ্রহণ করাতে কতকটা দ্বিধার সহিত তাঁহাদিগকে স্ব-স্ব কার্যে বহাল রাখিলেন। ইহারা বাহিরে প্রভুভক্তির ভাণ করিলেও ভিতরে ভিতরে রাজাকে হত্যা করিবার সুবিধা খুঁজিতেছিলেন, অত্যন্ত চতুরতার সহিত উদ্দেশ্য গোপন রাখাতে রাজা ক্রমশঃ তাঁহাদের প্রতি আস্থা বান্ হইলেন। অন্তঃপুর-রাজগৃহরক্ষীর সঙ্গে বড়বয়স করিয়া আওল এক রাতে সম্রাটকে আক্রমণ করেন। তখন তিনি খোজার স্বভাবানুযায়ী স্ত্রীজনোচিত বস্ত্রাদি পরিয়া মদ খাইয়া সিংহাসনের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। আওল তাঁহাকে সিংহাসনস্থিত দেখিয়া মারিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কারণ তিনি সিংহাসনের প্রতি আজীবন বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন এই শপথ লইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে রাজা অপরিপাক্য মদিরা-পানে নেশার ঝোঁকে ঘরের মেজ্ঞেতে পড়িয়া যান, তখন আওল তাঁহাকে খড়্গাঘাত করিলেন। বাদসাহের গায়ে অস্ত্রের জোর ছিল, সেই খড়্গাঘাত খাইয়াও তিনি আওলকে ধরিয়া ফেলিয়া ধস্তাধস্তি করিতে লাগিলেন। আর দুই একটি লোকের সাহায্যে আওল রাজাকে মৃতবৎ করিয়া ফেলিলেন এবং তিনি মরিয়াছেন মনে করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। ইতিমধ্যে অন্তঃপুর-রক্ষী প্রধান খোজা তাওরাচি বাশী ঘরে আসিলে আহত রাজা তাহাকে বিখাসী মনে করিয়া আওলের কথা বলিলেন এবং কি কর্তব্য তাহার উপদেশ দিলেন। খোজা বাইরা আওলকে জানাইলেন, রাজা মরেন নাই। তখন আওল রাজগৃহে আসিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন। সাহাজাদা মাত্র ৮ মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজার মৃত্যুর পর অমাত্যেরা ঠিক করিলেন, স্বর্গীয় রাজা ফতেসাহের দুই বৎসর বয়স্ক শিশু কুমারকে রাজা করিবেন। তাঁহারা বিধবা রাণীকে যাইয়া এই কথা বলিলেন, এবং বলিলেন, শিশুর রক্ষকই অভিভাবকস্বরূপ রাজ্য শাসন করিবেন। এখন রাজ্ঞী কাহাকে ঐ পদে মনোনীত করিবেন? রাজ্ঞী এই

ফিরোজ সাহ—১৪৮৬-
১৪৮৭ খৃঃ।

আপংসদুল রাজপদে শিশুটিকে অধিষ্ঠিত করিতে মনে মনে ভয় পাইয়া বলিলেন যে, তিনি শপথ করিয়াছেন—যে তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে পারিবে, তাঁহাকে তিনি রাজসিংহাসনের যোগ্য মনে করিবেন। এই অবস্থায় শিশু আর রাজা হইলেন না—খোজা মালেক আওল ফিরোজসাহ নাম গ্রহণপূর্বক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি ইহার পূর্বেই যোগ্যতা ও সংসাহসের অনেক পরিচয় দিয়াছেন, রাজা হইয়া তিনি জনপ্রিয় নানা অনুষ্ঠান-দ্বারা সুনাম অর্জন করিলেন। কথিত আছে তিনি একদা একলক্ষ টাকা গরীবদিগকে দিতে আদেশ করিয়াছিলেন, টাকাগুলি একত্র করিলে কত বড় একটা বৃহৎ স্তূপ হয় ইহা দেখাইয়া রাজাকে এরূপ অপরিমিত দান সঙ্কোচ করিবার অভিপ্রায়ে মন্ত্রীরা টাকাগুলি জড় করিয়া রাজার বাইবার পথে রাখিয়া দিয়াছিলেন, রাজা ঐ টাকাগুলি দেখিয়া “এসব কি?” জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন এত অধিক অর্থ তাঁহার

আজাদ্য বিতরিত হইবার কথা একজন মন্ত্রী স্বরণ করাইয়া দিলেন। রাজা বলিলেন “এত অল্প।” ইহার দ্বিগুণ দেওয়া হউক। ফিরোজ সাহের নির্মিত মসজিদ, দীঘি ও রমণীয় এক হস্তোর ভগ্নাবশেষ এখনও গোড়ে দৃষ্ট হয়। ১৪৮৯ খৃঃ অব্দে ফিরোজ স্বর্গারোহণ করেন।

তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র নামে মাত্র রাজা হইলেন। হোরস খাঁ নামে এক আবিসেনীয় দাস মন্ত্রী হইয়া সমস্ত ক্ষমতা আয়সাৎ করিলেন। ইহার ব্যবহার সকলেরই বিরক্তিকর হইল।

মহম্মদ সাহ—১৪৮২-
১৪৯০ খৃঃ।

আবিসেনীয়াসী সিদ্ধিবন্দর নামক এক ব্যক্তি হোরস খাঁকে গোপনে বধ করিয়া তৎপরে মহম্মদ সাহকে নিধন করিলেন। কেহ কেহ বলেন মহম্মদ সাহ ফিরোজ সাহের পুত্র নহেন। তিনি ফতে সাহের শিশু পুত্র, (যাহাকে মন্ত্রীরা একদা রাজা করিতে চাহিয়াছিলেন)। মহম্মদ সাহের রাজত্বকাল এক বৎসর মাত্র।

সিদ্ধিবন্দর ‘মুজাফর সাহ’ উপাধি লইয়া রাজা হন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান সকলের প্রতি অতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতেন। তিনি দরবারের অনেক প্রধান ব্যক্তিকে হত্যা করেন ;

মুজাফর সাহ—১৪৯০-
১৪৯৩ খৃঃ।

রাজা, আমীর কিংবা জমিদার তাহার হাতে কাহারও নিস্তার ছিল না। তিনি নিজ হস্তে তাহাদিগকে বধ করিতেন। এই ভাবে তিনি স্বয়ং যে সকল লোকের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন ঐতিহাসিকগণ-প্রদত্ত তাহাদের সংখ্যা এত বেশী যে তাহা সহসা বিশ্বাস করা যায় না। অবশেষে প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন বিদ্রোহী হইয়া গোড় অবরোধ করেন। রাজা ৫,০০০ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী হাবিসী সৈন্ত এবং বাঙ্গালী ও পাঠান ২৫,০০০ সৈন্তসহ বহুকাল দুর্গরক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে বাহির হইয়া আসিয়া যুদ্ধ করেন। ২৫,০০০ লোক যুদ্ধে নিহত হয়, স্বয়ং মুজাফর সাহ নিহতদিগের একজন। কাহারও কাহারও মতে মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন মুজাফর সাহের পদাতিক সৈন্ত-নায়ককে উৎকোচ-দ্বারা হাত করিয়া লইয়া ১৬ জন গুপ্তঘাতকসহ রাজার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হত্যা করেন।

পরবর্তী বাদসাহ হুসেন সাহ বঙ্গের ইতিহাসে বিখ্যাত ব্যক্তি। ইনি ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহারই রাজত্বকালে চৈতন্য দেব বঙ্গদেশ প্রেমের বজ্রায় ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে প্রসঙ্গ পরে হইবে।

আল উদ্দিন হুসেন সাহ
—১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ।

হুসেন সাহ জীবনের প্রথম সময়টা স্রবুজি রায় নামক গোড়ের সর্কপ্রধান ভূম্যধিকারীর ভৃত্য ছিলেন। একদা পুষ্করিণী খনন করিতে যাইয়া কার্যে শিথিলতার জন্ত স্রবুজি রায় তাহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন। তাহার পৃষ্ঠে সেই বেত্রাঘাতের চিহ্ন অনেক দিন ছিল।

হুসেন সাহ প্রথমতঃ হুঃহ অবস্থায় থাকিলেও তিনি সৈয়দবংশজাত ছিলেন। চাঁদপুরের কাজি এই সংবাদ প্রথম জানিতে পারিয়া তাহার দুর্দশা মোচন করিলেন।

এখন যেমন হজরত মহম্মদের বংশধর 'সৈয়দ' বাঙ্গলায় অনেক দেখা যায়, তখন তাহা না।
একজ্ঞ এদেশে সেই সময়ে একজন সৈয়দের আবির্ভাব মুসলমান সমাজে খুব বড় কথা ছিল।
কাজি সৈয়দ হুসেনকে রাজদরবারে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, শুধু তাহাই নহে, তাহার নিজ
কন্যাকে এই যুবকের হস্তে সম্প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ক্রমে সৈয়দ হুসেন তাহার
শৌর্য্যবীৰ্য্য দেখাইয়া গোড়ে খুব পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন এবং মুজাফর সাহকে হত্যা করিয়া
বাঙ্গলার গদি দখল করিয়া লইলেন। তাহার বংশগোরব এবং রাজোচিত নানাশুণে মুগ্ধ হইয়া
আমীরগণ এক বাক্যে তাহাকে রাজপদে বরণ করিয়া লইলেন। পূর্ব নৃপতিকের হত্যা
করার পর তিনি যুদ্ধরীতি অনুসারে গোড় লুণ্ঠন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার
সৈন্তেরা তাহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে লুণ্ঠন করিবার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত
হইলে তিনি স্বীয় সৈন্তগণের ১২,০০০ লোককে হত্যা করিয়া লুণ্ঠিত সমস্ত বহুমূল্য সামগ্রী
আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন।

হুসেন সাহ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের খুব আদর করিতেন, পণ্ডিতদিগকে বৃত্তি দিতেন এবং
বহু বিদ্যালয়, চিকিৎসাগার ও অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি আসাম, কামরূপ,
ও হিমালয়ের উপত্যকা পর্য্যন্ত স্বীয় বিজয়ী সৈন্তসহ অভিযান করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সকল
পার্বত্য দেশবাসীকে জয় করিয়া তথা হইতে মধ্যে মধ্যে ধনরত্ন লুণ্ঠন করিলেও তত্তদ্দেশ-
গুলি তাহার অধিকারভুক্ত করিতে পারেন নাই, বর্ষাগমে তাহারা তাহাকে অহুসরণ করিয়া
ব্যতিব্যস্ত ও তাড়িত করিয়া দিয়াছে। হিমালয়ের দক্ষিণ উপত্যকায় তুরান দেশ হইতে
হুসেন সাহের পুত্র অনেক লাঞ্ছনা পাইয়া প্রত্যাঘর্ষন করেন। তিনি পণ্ডিত ও সাধু-
ব্যক্তিদিগকে এতদূর সম্মান করিতেন যে সুপ্রসিদ্ধ সাধু কুতব উল আলমের সমাধি দেখিবার
জন্য তাহার জন্মতিথিতে প্রতি বৎসর পায়ে হাঁটিয়া পাণ্ডুয়ায় বাইতেন।

হুসেন সাহ হাবিসী ও নিগ্রোদিগের ক্ষমতা একেবারে খর্ব্ব করেন, তাহারা বাঙ্গলাদেশে
খুব পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন কিন্তু ইহারা প্রায় বিশ্বাসঘাতকতা করিতেন। হুসেন
সাহের দৃষ্টান্তে আখ্যাবর্তের অপরাপর স্থানের রাজারা ইহাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া
দেন—ইহারা পরিশেষে "সিদ্ধি" নামে দাক্ষিণাত্যে আবার প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া
উঠিয়াছিলেন।

সৈয়দ হুসেনের দরবারে জোনপুরের বাদশাহ সাহ হোসেন বেলোললোডি-কর্তৃক
আক্রান্ত হইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করেন। গোড়েশ্বর এই সম্মানিত অতিথিকে বিশেষভাবে
আপ্যায়ন করিয়া তাহাকে রাজযোগ্য বৃত্তি নির্দেশ করিয়া দেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত সাহ হোসেন
সৈয়দ হুসেনের বৃত্তিভোগী ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর গোড়েশ্বর একটি সমাধি-মন্দির
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা এখন সুরক্ষিত অবস্থায় গোড়ে আছে।

রাজ্য হইবার পরে তাহার রাজ্যী স্বামীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত চিহ্ন দেখিয়া জানিতে পারিলেন
কে ইহা করিয়াছে। অশ্বুদ্ধি রায় মোটের উপর হুসেনকে পিতৃদ্বেষে পালন করিয়াছিলেন,
ভৃত্যকে দুই এক ঘা বেত মারা তখন একটা ধর্ষবোর মধ্যে গণ্য ছিল না। হুসেন সাহ

সুবুদ্ধি রায়কে খুবই ভালবাসিতেন, কিন্তু রাজা তাঁহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে প্ররোচিত করেন; রাজা অনেক বুঝাইলেও রাণী কিছুতেই সুবুদ্ধি রায়কে ক্ষমা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। হুসেন সাহ অগত্যা তাঁহার মুখে গোমাংস দিয়া তাঁহাকে জ্বাতিচ্যুত করিলেন। পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা চাহিয়া সুবুদ্ধি রায় জানিতে পারিলেন যে তাঁহার তুহানলে প্রাণত্যাগ করা উচিত। সুবুদ্ধি রায় সম্বন্ধে আমরা শেষে লিখিব। এই বিষয়টি চৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে এবং ঘটনাটি ঐ পুস্তক রচনার বেশী পরবর্তী নহে, এজন্য উহা অবিখ্যাত বলিয়া মনে হয় না। তিনি যে তরুণ বয়সে এক হিন্দু ভূম্যধিকারীর কৃত্য ছিলেন একথা অনেক ঐতিহাসিকই লিখিয়াছেন।

পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্র যখন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তখন হুসেন সাহ অতর্কিতভাবে যাইয়া উড়িষ্যার অনেক দেবালয় ও বিগ্রহ ভগ্ন করেন, প্রতাপ রুদ্র বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য গোড়বিজয়ের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব বহু লোকক্ষয় ও দেশের দুঃখ বৃদ্ধি হইবে, এই হেতু দেখাইয়া উক্ত সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করেন। কবি কর্ণপুর লিখিয়াছেন—প্রতাপ রুদ্রের বক্ষ লৌহকবাটের তায় নৃঢ় ছিল, এবং প্রসিদ্ধ পাঠান মল্লগণ তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ভয় পাইতেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেব মুসলমান লেখকদের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন, হুসেন সাহ পুরীর রাজাকে জয় করিয়া তাঁহাকে সামন্ত রাজার শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। মুসলমান-প্রদত্ত এই বিবরণ অলীক।

দিল্লীখ্বর সেকেন্দর জৈনপুর দখল করিয়া বঙ্গবিজয়ার্থ অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু আলাউদ্দিন হুসেন সাহ তৎপূত্র দানিয়ালকে বহু উপচৌকনসহ সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন। সেকেন্দর সাহ প্রীত হইয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। এই সন্ধিতে হুসেন সাহ স্বাধীন নৃপতি বলিয়া স্বীকৃত হন। তাঁহার সহিত ত্রিপুরারাজের যুদ্ধবিগ্রহাদি হইয়াছিল এবং তিনি চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরাবিজয়ার্থ পরাগল খাঁ নামক সেনাপতিকে ও তৎপূত্র ছুটি খাঁকে নিযুক্ত করেন। তাঁহার অন্ততম সেনাপতি মমারক খাঁকে ত্রিপুরেখর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন কালীমন্দিরে বলি দিয়াছিলেন। ত্রিপুরাপ্রসঙ্গে সে সকল কথা পুনরায় উল্লেখ করা হইবে। ১৫২০ খৃঃ অব্দে (কাহারও কাহারও মতে ১৫১৯ খৃঃ), হুসেন সাহের মৃত্যু হয়। গোড়ে তাঁহার সূচাক কাকুলেখাঙ্কিত সমাধি-মন্দিরে সিংহদ্বারের দুই দিক্ চিরিয়া বে বটবৃক্ষ উখিত হইয়াছে, তাহার জটিল, স্থূল ও দীর্ঘ শিকড়গুলি মহাদেবের বক্ষোলম্বিত জটাভূটের মত দেখায়।

হুসেন সাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরত সাহ পাঠান রাজাদের নীতির অমুবর্তী হইয়া তাঁহার ভ্রাতাদিগকে হত্যা বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই,—বরঞ্চ তাঁহার ১৭ ভাইয়ের প্রত্যেককে

রাজোচিত মর্যাদা ও উচ্চ শাসনকার্য্যভার দিয়াছিলেন। নসরত

নাসির উদ্দীন নসরত

সাহ—১৫১৯-১৫৩২ খৃঃ।

সাহের সময়ে দিল্লীতে অত্যন্ত রাজনৈতিক গোলযোগ উপস্থিত হয়,

সুলতান ইব্রাহিম লোডীকে পরাস্ত করিয়া বাবর ১৫২৯ খৃঃ দিল্লীর

সিংহাসন অধিকার করেন। ইব্রাহিমের ভ্রাতা মহম্মদ পলাইয়া নসরত সাহের আশ্রয় গ্রহণ

করিতে বাধ্য হন। ইব্রাহিম লোডির এক কন্যাকে মহম্মদ সাহ লইয়া গিয়াছিলেন। নসরত

সাহ এই কন্যাকে জাঁকজমকের সহিত বিবাহ করেন এবং মহম্মদকে রাজোচিত বৃত্তি দিয়া

গোড়ে থাকিতে সুবিধা করিয়া দেন। বাবর দেখিলেন, বঙ্গদেশকে নসরত সাহ পলায়িত আফগান আমির ও সেনাপতিদের একটা আড্ডায় পরিণত করিয়াছেন, সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া তিনি বঙ্গেশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া আসেন। নসরত সাহ তাঁহাকে অনেক উপঢৌকনাদি দিয়া নিরস্ত ও বশীভূত করেন। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হয়, তখন মহম্মদ সৈয়দ সংগ্রহ করিয়া মোগলদের হস্ত হইতে জোয়ানপুর রাজ্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। সৈয়দ-বংশোদ্ভূত হইলেও নসরত সাহের প্রকৃতি অতি নিষ্ঠুর ছিল। কোন খোজাকে তিনি গুরুতর শাস্তি প্রদর্শনের ভয় দেখাইয়াছিলেন। একদিন যখন তিনি পিতার সমাধি-মন্দিরে উপাসনা করিতে গিয়াছিলেন, সেই খোজা তাঁহাকে সুবিধা পাইয়া হত্যা করে (১৫৩২-১৫৩৩ খৃঃ)। এই ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয়, কারণ ঐ বৎসর চৈতন্যদেবের লীলাবসান হইয়াছিল।

নসরত সাহের হত্যার পর তাঁহার পুত্র ফিরোজ সাহ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিন মাসের মধ্যে তাঁহার খুল্লতাত (নসরত সাহের ভ্রাতা) মহম্মদ সাহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই নিষ্ঠুর কার্যের জন্ত হাজিপুরের শাসনকর্তা মকছুম আদম বিদ্রোহী হইয়া শের সাহের সঙ্গে মিলিত হন। শের সাহ উত্তরকালে হিন্দুস্থানের অধিপতি হইয়াছিলেন, এখন হইতেই সৌভাগ্যলক্ষী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। এদিকে বেহারাধিপতি তরুণবয়স্ক জেলাপ শের সাহের উপর বিরক্ত হইয়া মহম্মদের সহিত মিলিত হয়। শের সাহ বিহারের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জেলাপ এই দুর্গ অবরোধ করেন। এখানে পাঠান ও বাঙ্গালীদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। জেলাপের অধীনে গোড়সৈন্য শের সাহের কৌশল বুঝিতে না পারিয়া পরাস্ত হইল (১৫৩৫ খৃঃ)। শের সাহ চুনার অধিকার করিয়া সমস্ত বিহার দেশ দখল করিয়া লইলেন এবং গোড়ের দিকে অভিযান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গোড়েশ্বর মহম্মদ বিপদে পড়িয়া হুমায়ূনের নিকট উপস্থিত হইয়া সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তখন বঙ্গদেশ শের সাহের হস্তগত।

চুনার দুর্গ দখল করিয়া হুমায়ুন বঙ্গদেশটা শের সাহের হাত হইতে উদ্ধার করিতে মনঃস্থ করিলেন। কিন্তু তাঁহার গতি ও কার্যনীতি অতি মন্থর ছিল, সুবিধাগুলি হারাইয়া তিনি বঙ্গে উপস্থিত হইলেন। শের সাহ প্রাচীর তুলিয়া নিজের বাসস্থান শত্রুর অনধিগম্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। মোগল-সৈন্য বাঙ্গলার আবহাওয়া সহ্য করিতে না পারিয়া এখান হইতে চলিয়া বাইতে বাস্ত হইল। তিনমাস কালের মধ্যে কোন যুদ্ধবিগ্রহাদি হইল না। হুমায়ূনের মোগল-সৈন্য অত্যন্ত অসমুদ্র ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। শের সাহ একটা সন্ধির উদ্যোগ করিলেন, হুমায়ুন এই সুযোগ ভগবানের দান মনে করিয়া থুসী হইলেন। মোগল-সৈন্যদের আনন্দের পরিণাম রহিল না। শের সাহের গুরু দরবেশ খিলিলের বঙ্গে ও চেষ্টায় সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। হুমায়ুন শের সাহকে বঙ্গ ও বিহারের স্বাধীন নৃপতি বলিয়া স্বীকার

আলাউদ্দিন ফিরোজ-
সাহ—তিন মাস রাজ,
গিয়াতুদ্দিন মহম্মদ সাহ—
১৫৩২-১৫৩৩ খৃঃ।

করিয়া লইলেন। হুমায়ূনের রাজ্যে শের সাহ উৎপাত করিবেন না এবং সম্রাটের গতিবিধির
 শের সাহ কর্তৃক হুমায়ূনের
 পরাভব—১৫৩৯ খৃঃ।
 বিয় ঘটাইবেন না, এই সর্তে কোরান স্পর্শ করিয়া শের সাহ অঙ্গীকার
 করিলেন। রাত্রি-ভোর মোগল-সৈন্তের আনন্দোৎসব চলিল।
 কিন্তু শেষ রাত্রে শের সাহ কোরানের অবমাননা করিয়া ও সন্ধি-
 লজ্জনপূর্বক অতর্কিতভাবে হুমায়ূনের শিবির আক্রমণ করিয়া আট হাজার মোগল-সৈন্ত
 হত্যা করিলেন। হুমায়ূন স্বয়ং অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক সস্তরণ করিয়া গঙ্গা পার হইলেন।
 এই ঘটনা ১৫৩৯ খৃঃ অব্দে ঘটিয়াছিল।

শের সাহের পিতার নাম হসেন সুর। জোয়ানপুরের শাসনকর্তা যুবক হসেনকে
 শের সাহ—১৫৩২-১৫৫৩
 খৃঃ।
 সুদক্ষ ও পরিশ্রমী দেখিয়া মাসারাম ও তাণ্ডাতে কতকটা জমিদারী
 প্রদান করেন। হসেনের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মে, ফরিদ
 এবং নিজাম। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী হিন্দু ধরের মেয়ে ছিলেন,
 তাঁহার অনেকগুলি পুত্রকন্যা হইয়াছিল। ফরিদ জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

হসেন তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর বিশেষ অমুরক্ত ছিলেন, তজ্জন্ত প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত
 ফরিদ জ্যেষ্ঠ হইলেও তাহার প্রতি স্বাভাবিক স্নেহের কতকটা বাধা উপস্থিত হইয়াছিল।
 জোয়ানপুরের শাসনকর্তা জেম্মালের অমুগ্ধে ফরিদ ভাল লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।
 তরুণ বয়সেই তিনি সাদির সমস্ত কবিতা মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন এবং তৎকাল-
 প্রচলিত সমস্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন; ইতিহাস ও কবিতার দিকেই তাঁহার বিশেষ
 ঝোঁক ছিল। এই ফরিদ একদা একক এক ব্যাঘ্র স্বহস্তে বিনাশ করিয়া ‘শের সাহ’
 উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শের সাহ কতক কাল জোয়ানপুরে আসিয়া তাঁহার পিতার জায়গীর শাসন-সংরক্ষণ
 করেন। হসেন দেখিলেন, পুত্রের অসাধারণ প্রতিভায় কাজ অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন
 হইতেছে। তিনি উহাকে ঐ কার্যেই বাহাল করিতে সক্ষম করিলেন, কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয়
 স্ত্রী, তাঁহার দুই পুত্র সোলেমান ও আহাম্মদের জন্ত স্বামী কিছুই করিলেন না, এই আক্ষেপ-
 বাণী তাঁহার কর্ণে অবিরত গুঞ্জন করিতে লাগিলেন। সোলেমান এখন বড় হইয়াছে,
 তাহাকেই পরগনার শাসন কর্তৃত্ব দেওয়া হউক, তিনি এই আশঙ্কা করিয়া হসেনের জীবন
 অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। শের অতি দক্ষতার সহিত কাজ করিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহার

পিতা প্রিয়তমার অমুরোধ লইয়া সতাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।
 বালা ও কৈশোর।

শের সাহ দেখিলেন, অবস্থা বড় অটল হইয়া তাঁহাদের গার্হস্থ্য
 স্বচ্ছন্দতা ও শান্তি নষ্ট হইবার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। তখন তিনি স্বয়ং স্বেচ্ছায় ঐ পদ
 ছাড়িয়া দিয়া দিল্লী চলিয়া গেলেন। রাজধানীতে উপনীত হইয়া দৌলত নামক ইব্রাহিম
 লোডির এক প্রধান ওমরাহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই ব্যক্তি শের সাহের
 কার্যদক্ষতা ও নানা গুণে মুগ্ধ হইয়া সম্রাটের সঙ্গে শেরের আলাপ-পরিচয় করাইয়া
 দিলেন। দৌলতের মারফত শের তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি দাবী করিয়া এক আবেদন

দরবারে পেশ করিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন, তিনি তাঁহার পিতার পদোচিত মর্যাদা রক্ষা করিয়া বাহাতে জীবনযাপন করিতে পারেন তদুচিত ব্যবস্থা

বিদায় বহুবর্ষিতা।

তিনি করিবেন। উত্তরে সম্রাট বলিলেন, শের ভাল লোক নহেন, যেহেতু তিনি পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই শেরের পিতৃবিয়োগ হইল এবং শের শৈতনিক বিষয়ের অধিকার-প্রাপ্ত হইলেন।

বিষয়সম্পত্তির অধিকার লইয়া শেরের সঙ্গে তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতার কলহ চলিতে লাগিল—এসম্বন্ধে বেহারের অধিপতি সুলতান মহম্মদের মধ্যস্থতায় কোন ফলোদয় হয় নাই। সুলতান মহম্মদ বিরক্ত হইয়া সাদি নামক এক সেনাপতিকে সৈন্তসহ বাইয়া শেরের অধিকৃত সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া সোলেমানকে দিতে আদেশ করিলেন। সের সাহ সহসা আক্রান্ত হইয়া পরাস্ত হইলেন। এই ঘটনার পর শের সাহ কুড়া ও মাণিকপুরের শাসনকর্তা জুনেদ বরলাসের নিকট বহুল্য উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহার সাহায্যলাভে সমর্থ হইলেন। বরলাস নূতন মোগল বাদসাহ বাবরের বশ্ততা স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যে তিনি সুলতান মহম্মদকে পরাস্ত করিলেন এবং আগ্রা বাইয়া সম্রাটের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিলেন। বাবর শেরের দক্ষতাসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেও তাঁহার অকপটতা সম্বন্ধে সন্দেহ ছিলেন। কথিত আছে, তিনি একদিন ওমরাহদের সঙ্গে শেরকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। একটা শক্ত মাংসখণ্ড শেরের পাতে পড়িয়াছিল, কিন্তু সম্রাটের গোপনীয় আদেশ অনুসারে তাঁহাকে একখানি মাত্র চামচ দেওয়া হইয়াছিল, ছুরি দেওয়া

খলস্বারা কাটিয়া মাসে-

তক্ষণ।

হয় নাই। মাংসখণ্ড শের আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হইয়া ভৃত্যদিগের নিকট একখানি ছুরি চাহিলেন, কিন্তু সম্রাটের গুপ্ত আদেশে তাহার ছুরি দিতে বিলম্ব করিতে লাগিল। শের বিলম্বে অসহিষ্ণু হইয়া কোব হইতে তরবারি খুলিয়া তাহা দিয়া অনায়াসে মাংস কাটিয়া খাইতে লাগিলেন। সম্রাট আমির খলিকা নামক এক মন্ত্রী দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—“এই শের খাঁ আফগান তুচ্ছ করিবার মত লোক নহেন। ইনি কালে বড়লোক হইবেন।”

কিন্তু শের খাঁ বুঝিলেন, সম্রাট-দরবারে থাকা তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নহে। তিনি জোয়ানপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে সুলতান মহম্মদের মৃত্যু হওয়াতে তিনি তরুল রাজকুমার জেলালের অভিভাবক স্বরূপ সেই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। জেলাল বড় হইয়া শেরকে আর পূর্বের মত শ্রদ্ধাভক্তির চক্ষে দেখিতে পারিলেন না; এক সময় তিনি শের সাহের কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, এখন শেরের ক্রমবর্ধিত ক্ষমতায় আতঙ্কিত হইয়া তাঁহার হত্যা পর্য্যন্ত করণা করিতে লাগিলেন। এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়িল, জেলাল পলাইয়া গোড়ে বাইয়া মহম্মদ সাহর নিকট সেরকে পিতৃরাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন।

জেলালের পলায়নের পর শের সমস্ত বিহার দখল করিয়া ফেলিলেন, এই সময় চুনারা শাসনকর্তা তাজি অতি পরাক্রান্ত লোক ছিলেন। তাঁহার দ্বী লোদি মেলিকি পরমা সুলতানী

ও গুণবতী রমণী ছিলেন, তাজি ইহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। ইহার কোন সম্বানাদি ছিল না, কিন্তু তাঁহার সপত্নীগণের অনেক পুত্র ছিল। তাহারা বিমাতার প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া একদা তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশে অত্যাচার করে;—আঘাত গুরুতর হয় নাই; কিন্তু তাঁহার চীৎকারে তাজি উপস্থিত হইয়া পুত্রদের কার্য ধরিয়া ফেলিলেন। পুত্রেরা এই অবস্থায় পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র চালাইয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। লোদি মেল্লিকি এই বিপদে শের সাহের আশ্রয় বাজ্ঞা করিলেন। শের চুনারে আসিয়া সেই তরুণ ছেলেদিগকে নিরস্ত করিলেন। তাহারা সকলেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও শাসন কার্যের অবোগ্য ছিল। সুতরাং সমস্ত ক্ষমতাই শের সাহের হস্তগত হইল। লোদি মেল্লিকি শের সাহকে বিবাহ করিয়া বেটুকু বাকী ছিল তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। বিহারের জায় চুনারও শের সাহের অধিকার ভুক্ত হইয়া গেল।

এদিকে গোড়েশ্বর মহম্মদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে বঙ্গ বিজয়ে হুমায়ুন আসিতে ছিলেন। হুমায়ুন চুনার অধিকার ছাড়িয়া দিতে শের সাহকে আদেশ করিলেন, কিন্তু শের কাকুতি মিনতি করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। হুমায়ুন সন্ধিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু হুমায়ুন পূর্বাঞ্চল ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পর শের সন্ধির সত্ত্ব ভঙ্গ করিলেন।

শের এখন শাশারামে ফিরিয়া রোটার্স দুর্গের মালিক রাজা বকিসের সঙ্গে মৈত্রীর চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার অভিসন্ধি ছিল এই দুর্গ অধিকার করা, কিন্তু বাহিরে তিনি সৌহার্দ্য দেখাইয়া রাজা বকিসকে হস্ত গত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজা সেই সকল মৈত্রীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। শের সাহ উপায়ান্তর না দেখিয়া দূত-দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন “মোগল সম্রাট তাঁহার বিরুদ্ধে, এমনতাবস্থায় তাঁহার ধনরাশি ও পরিবারের মহিলাদিগকে রক্ষার উপায় কি? সুতরাং যদি তিনি দয়া করিয়া তাঁহার মহিলাবর্গকে ও ধনগুলি

রোটার্স দুর্গে স্থান দেন তবে শের নিশ্চিত হইয়া মোগলদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারেন। যদি তিনি যুদ্ধে নিহত হন, তথাপি

মোগলের হাতে তাঁহার পরিবারবর্গ ও ভাণ্ডার পড়ার অপেক্ষা রোটার্স রাজের হাতে তাহা দেওয়া সহস্র গুণে শ্রেয় মনে করেন, বেহেতু রাজা অতি উদার ও মোগলেরা নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রাজা বাহাদুর লোভে পড়িয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন। তিনি শের সাহের ভাণ্ডার সহজে করায়ত্ত করিবার সুবিধা পাইয়া অতি দ্রুত সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। শের সাহ কতকগুলি চৌদলায় কতিপয় বৃদ্ধ স্ত্রীলোক, সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রধারী কয়েকটি সৈন্য এবং অপর কতকগুলি চৌদলায় বহু অস্ত্রধারী সৈন্য—এই ভাবে বাহকের সঙ্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া সিসার গুলিতে বহু বস্তা ভর্তি করিয়া সেগুলিও দোলায় চড়াইয়া দিয়া বাহকের সঙ্গে পাঠাইলেন। দাররক্ষীরা প্রথম দুই একটি দোলা খুলিয়া বৃদ্ধ স্ত্রীলোক ও শেষের বস্তাটি খুব শক্ত ধাতব পদার্থ শক্তরূপে আবদ্ধ দেখিয়া আর কোন সন্দেহ করিল না। রোটার্স রাজা যখন গোঁফে চাড়া দিয়া এই আগন্তুক সারিবন্দী মহিলা ও ধন ভাণ্ডার দেখিতে ছিলেন,

তখন তাঁহার স্বকণী ও লেলিহান জিহ্বা হয়ত জ্বলন্ত হইয়াছিল। কিন্তু যখন বস্তাগুলি নামানো হইল, তখন তাহা চিরিয়া ফেলিয়া গুলি বাহির করিয়া দোবার সৈনিকগণ গুলি ছুড়িতে আরম্ভ করিল—অকস্মাৎ মহিলা-বেণী শত শত যোদ্ধা ঘোমটা খুলিয়া শাণিত খড়্গা লইয়া ব্যাব্রবং রোটার্স দুর্গের প্রহরীদিগকে বধ করিতে লাগিল—তখন রোটার্স-রাজ পলাইতে পথ পাইলেন না। বঙ্গ ব্যাব্র শেরের সৈন্তগণের হস্তে ধনলুপ্ত রাজা নিহত হইলেন।

রোটার্স দুর্গের মত এরূপ অজ্ঞেয় দুর্গ ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। একটি পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় এই দুর্গ নির্মিত, অতি বন্ধুর ও ছরারোহ দুই মাইল ব্যাপী এক সরু পথ বাহিয়া এই দুর্গের প্রথম তোরণে প্রবেশ করিতে হয়। তোরণ তিনটি—একটির বহু উর্দ্ধে আর একটি—এই ভাবে স্থিত। প্রত্যেকটি তোরণ অনেকগুলি কামান ও বড় বড় প্রস্তর খণ্ড কর্তৃক সুরক্ষিত। সর্বোর্দ্ধে দুর্গের চতুর্দোণ সীমারেখা দশ মাইলের অধিক স্থান ব্যাপক—তন্মধ্যে নগর, গ্রাম ও শস্তক্ষেত্র আছে, কয়েক ফুট নিচেই সুনির্মল জলধারা। এক দিকে ছরারোহ উচ্চনীচ বন্ধুর একটা দুর্গম পার্শ্বত্যা প্রদেশের উপান্তে শোণ নদী,—অপর দিকেও অপর একটি নদী—এই দুই নদী সুদীর্ঘ পথ অবতরণ করিয়া নিম্নের দিকে সুগভীর উপত্যকা ভূমিতে মিলিত হইয়াছে। এই ভূমি এরূপ ঘন তরুসম্বল অরণ্যপরিপূরিত যে উহাতে কোন ব্যক্তির প্রবেশ অসম্ভব হইতেও অসম্ভব।

এই একান্ত নিরাপদ নিভৃত স্থানে স্বীয় পরিবার ও ধনরাশি সুরক্ষিত করিয়া শের সাহ কৰ্মনাশা তীরে হমায়ুনের সঙ্গে কোরান স্পর্শ করিয়া যে সন্ধি করিয়াছিলেন তাহা একটা খেলনার ছায় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অতর্কিত ভাবে সম্রাটকে পরাজিত ও বিপর্যস্ত করিয়া ছিলেন, তাহা পূর্বেই লেখা হইয়াছে।

সকল দিক্ হইতে দেখিলে শের সাহের তুল্য প্রতিভা-সম্পন্ন কৰ্মবীর এবং যোদ্ধা ভারতবর্ষে তখনকার দিনে আর ছিল না। তাঁহার কথার কোন মূল্য ছিল না—তাঁহার সন্ধি ভাবী কোন চক্রান্তের অভিসন্ধি ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। তাঁহার কোরান স্পর্শ কতক গুলি কাগজ ছোঁয়া অপেক্ষা গুরুতর কিছু ছিল না। তথাপি তিনি হমায়ুনকে দিল্লী পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া সমস্ত হিন্দুহান অধিকার করার পর যে ছায়পরতা, ক্রমা, ও শাসন-দক্ষতা দেখাইয়া ছিলেন তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। শের সাহের ছায়-পরতা ও বিবিধ গুণরাশি সার্কভোম রাজপদ পাইবার পর হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

সম্রাট হইবার পূর্বে ও পরে।

দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়া শের সাহ বাঙ্গলার মসনদে খিজির খাঁ নামক শাসন কর্তা নিযুক্ত করিলেন। এই ব্যক্তি ভূতপূর্ব বদ্বৈশ্বর মহম্মদ সাহের কন্যাকে বিবাহ করিয়া খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে লাগিলেন, তিনি খুব রাজকীয় ভাবে চলাফেরা করিতে লাগিলেন, এবং মহম্মদ সাহের আত্মীয় ও ওমরাহগণকে বশীভূত করিলেন।

খিজির খাঁ।

লোকে কাণাকাণি করিতে লাগিল যে ইহার অভিসন্ধি ভাল নহে। শের সাহ অত্যন্ত সন্দিষ্ট প্রকৃতি ছিলেন, তিনি সংবাদ পাইয়া বাঙ্গলায় চলিয়া আসিলেন।

খিজির খাঁ তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি শের সাহ খাঁস ভুক্ত করিলেন।

খিজির খাঁর হাত হইতে শের সাহ শাসন ভার কাড়িয়া লইয়া বাঙ্গলা দেশকে দ্বাদশ মণ্ডলে বিভক্ত করিয়া ইহাদের সকলের উপর কাজি, ফজলৎ নামক এক বিজ্ঞ, রাজনীতি-কুশল ও ধার্মিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন। দ্বাদশটি শাসনকর্তার অধিকার সাম্য থাকে এবং কেহ কাহারও উপর মাথা ডিঙ্গাইয়া না উঠেন,—এই সকল পরিদর্শনের ভার তাঁহার উপর চ্যুত হইল। শের সাহের উপর তাঁহাদের কোন ভাবান্তর উপস্থিত হয় কি না অথবা কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া তাঁহারা স্বাধীন হইতে চেষ্টা করেন কি না ইত্যাদি সম্বন্ধে কাজি সাহেবকে নির্দিষ্ট সময়ান্ত্রে দিল্লীতে সংবাদ পাঠাইতে হইত। এই সকল ব্যবস্থা করিয়া শের সাহ বাঙ্গলা দেশে সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপন করিলেন, তথায় আর পাঁচ বৎসর কোন গোলযোগ হয় নাই। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে শের বুদ্ধেলখণ্ডের অন্তর্গত কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করেন, তথায় বোমাতে আগুন লাগায় তিনি নিহত হন।

শের সাহ অনেক মসজিদ ও প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সর্বপ্রধান কীর্তি সোণার গাঁ হইতে পাঞ্জাবের নীলাভ নামক সিদ্ধুর এক শাখা পর্য্যন্ত ১,৫০০ ক্রোশ-ব্যাপী একটি রাস্তা প্রস্তুত করা। এই রাস্তার প্রতি ক্রোশ পরে পরেই পাহাশালা স্থাপিত হইয়াছিল এবং পথিকের শ্রমোপনোদনের জন্ত দুই ধারে বৃক্ষ পঙ্ক্তি রোপিত ও কূপ খান হইয়াছিল। তিনি ঘোড়ার ডাক সর্ব প্রথম প্রচলিত করেন এবং স্বাস্থ্যের পরিমাণ-নির্ণয় ও স্বাস্থ্য-নিষ্কারের জন্য যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ শোডরমল্ল সেই ভিত্তির উপর তাঁহার বহু বিস্তৃত জরিপ কার্য্য সুসম্পাদিত করিয়াছিলেন।

শের সাহের দ্বিতীয় পুত্র সেলিম সাহ দিল্লীর তক্তে আরোহণ করিয়া মহম্মদ সাহ সুর নামক এক আত্মীয়কে বাঙ্গলার কর্তৃত্ব প্রদান করেন। সেলিম সাহ মহম্মদ আদিল কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে মহম্মদ সাহ সুর বাঙ্গলার স্বাধীন নৃপতি বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করেন এবং জোয়ানপুর পর্য্যন্ত অধিকার করেন। মহম্মদ আদিলের মন্ত্রী হিমুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া বঙ্গেশ্বর ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ছাপরা ঘাট নামক স্থানে নিহত হন।

মহম্মদ সাহ সুরের পুত্র খিজির খাঁ 'বাহাদুর সাহ' উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গের অধিপতি হইলেন। কিন্তু ইনি প্রবাসে সম্রাটসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকার সময় সাহ বক্স নামক এক ব্যক্তি বাঙ্গলার গদী দখল করিয়াছিলেন। বাহাদুর তাঁহাকে নিহত করিয়া অচিরে সম্রাট মহম্মদ আদিলের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিযান করিলেন। মুঙ্গেরের নিকট ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। সম্রাট এই যুদ্ধে নিহত হইলেন, এবং বাহাদুর বঙ্গদেশ ছাড়া জোয়ানপুরও স্বাধীকার ভুক্ত করিয়া লইলেন। বাহাদুর সাহ ১৫৬১ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মহম্মদ সাহ—১৫৫২-
১৫৫৪ খৃঃ।

বাহাদুর সাহ—১৫৫৪
১৫৬০ খৃঃ।

বাহাগ্রের সন্তান ছিল না। তাঁহার ভ্রাতা জালাল সাহ রাজা হইলেন কিন্তু তিনি তিন বৎসর পরে গোড়ে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার তরুণ বয়স্ক পুত্র সিংহাসন আরোহণ করেন।

গিয়াসুদ্দিন নামক এক হত্যাকারীর হস্তে এই পুত্র নিহত হইলেন।

জালাল সাহ—১২৬০—

১২৬০। জালালের এবং

তৎপুত্রের হস্তা গিয়াসুদ্দিন

—১২৬০ খৃঃ।

অতি অল্প সময়ের জন্ত হত্যাকারী গিয়াসুদ্দিন সিংহাসনে বসিয়া-

ছিলেন। সম্ভবতঃ সুপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড়, যাঁহার সম্বন্ধে দেশময়

নানারূপ কিংবদন্তী আছে, তিনি জালাল সাহের সময় বিজয়মান

ছিলেন। আমরা সংক্ষেপে সেই কিংবদন্তীর কতকগুলির উল্লেখ

করিব। দুর্গাচরণ সাম্রাজ্য মহাশয় তারিখ-ই খাজেহান, তারিখ-ই শেরসাহী প্রভৃতি পারস্য ইতিহাস এবং রাজসাহী জেলার কিংবদন্তী অবলম্বনে কালাপাহাড়ের জীবনচরিত লিখিয়াছেন বলিয়া আমরাগকে জানাইয়াছেন।

তাঁহার লেখা অনুসারে কালাপাহাড়ের নাম কালাচাঁদ রায়। তাঁহার বাল্যকালে মকলে তাঁহাকে 'রাজু' বলিয়া ডাকিত। রাজসাহীর অন্তর্গত বীরজাওন গ্রামে (ধানা মান্দা)

তাঁহার বাড়ী ছিল এবং তিনি প্রসিদ্ধ একটাকিয়া জমিদার-বংশে

কালাপাহাড়।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের উপাধি

ভাড়াড়ী এবং ইনি জগদানন্দ রায়ের বংশে জাত ("জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কুণ্ডর"

—কৃষ্ণিবাস)। কালাপাহাড়ের পিতা নয়ানচাঁদ রায় গোড়েশ্বরের ফৌজদারী বিভাগে

উচ্চ কাজ করিতেন, এবং তাঁহার উপাধি ছিল "ভুঁইয়া।" কালাপাহাড়ের মাতৃকুল বৈষ্ণব

ছিলেন এবং তিনিও অল্প বয়সে হরিভক্ত ছিলেন। অকালে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে

মাতামহই তাঁহার অভিভাবক হইয়াছিলেন। ত্রীপুর গ্রামবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর হই

কতাকে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন।

কালাপাহাড় বলিষ্ঠ, সুদর্শন এবং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন। একটাকিয়ার ভাড়াড়ী বংশের

রীতি অনুসারে তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গলা প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অখচালনা ও

অঙ্গব্যবহার প্রভৃতি বীরোচিত গুণেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। তখন নাসের সাহের

পুত্র বরাবক সাহ গোড়ের বাদসাহ। কালাপাহাড় তাঁহার বিবি

হুলারী বিবির প্রেম।

সদৃশ-দ্বারা শীঘ্রই বাদসাহের দরবারে উচ্চ চাকুরী পাইলেন এবং

গোড়ে বাদসাহের প্রাসাদের অতি নিকটে উচ্চ হিন্দু আমলাদের সহযোগে রাজকর্মচারীদের

জন্ত নিয়োজিত গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কালাপাহাড় রোজ অতি প্রত্যায়ে মহানন্দায়

দান করিতে যাইতেন। নবাব-কুমারী হুলারী বিবি তখন সপ্তদশ বর্ষীয়া পরমা সুন্দরী।

তিনি প্রত্যহ প্রাতে এই রূপবান্ যুবককে দানান্তে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে দেখিতেন।

একদিন তিনি সহচরীদিগকে বলিলেন, 'এই যুবক ছাড়া আমি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব

না।' অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির প্রতি এতাদৃশ অহুসার অশুচিত, সহচরীরা এই কথা বলিলে

রাজকুমারী উত্তরে বলিলেন 'উহার গলায় পৈতা—উনি ব্রাহ্মণ, ইহার পশ্চাৎ ছাতা-বন্দার

এবং হাতে সোণার কোষা স্ততরাং ইনি ধনী,—ইনি স্বকণ্ঠে স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে

যান স্ততরাং মুখ নহেন। তারপর ইহার মনভুলানো রূপ,—তাহার সাকী—আমার ছুটি চক্ষু, আর পরিচয় নিম্নয়োজন।’

বাদসাহ ও বেগম উভয়েই রাজকুমারীর মনোভাব জানিলেন। অহুস্কানে জানিলেন, ইনি একটাকিয়ার ভাছড়ী বংশজাত। এই বংশের অনেক যুবকের সঙ্গেই পাঠান বাদসাহেরা কল্লার বিবাহ দিয়াছেন, তাহা গ্রন্থভাগে উল্লেখ করিয়াছি। স্ততরাং তাঁহাদের আপত্তির কোন কারণ রহিল না। বাদসাহ কালাপাহাড়কে ডাকাইয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণপূর্বক কুমারীকে বিবাহ করিবার জন্ত জেদ করিলেন, কালাপাহাড় তেজের সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। জুহু হইয়া বাদসাহ কালাপাহাড়কে শুলে দেওয়ার আদেশ করিলেন। যখন সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, তখন অকস্মাৎ ভূতলে পতিত একটি বিছাতের জায় দুলারী বিবি রাজপ্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া ঘাতককে আদেশ করিলেন, “আগে আমায় হত্যা

করিয়া, তারপরে ইহার অঙ্গ স্পর্শ কর।” রাজকুমারীর অসামান্য রূপ এবং অপূর্ণ অহুরাগ দেখিয়া কালাপাহাড়ের গোঁড়ামি ভাঙ্গিয়া

গেল, ফুলশরের আঘাতে ধর্মবেদী বিদীর্ণ হইল। কালাপাহাড় বিবাহে সম্মত হইলেন, কিন্তু তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিলেন না। তিনি বহু অহুনের বিনয় এবং অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াও সামাজিক অত্যাচার ও নিগ্রহ হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। জগন্নাথে বাইয়া এ অবস্থায় কি কর্তব্য, প্রত্যাদেশের জন্ত সাত দিন অনাহারে ধর্ম দিয়া রহিলেন, কিন্তু কোন আদেশ পাইলেন না; পরন্তু পাওয়ার অত্যন্ত অপমান করিয়া তাঁহাকে শ্রীমন্দির হইতে তাড়াইয়া দিল।

ইহার পরে প্রতিশোধের পালা। সে প্রতিশোধ যে কি ভয়ানক, তাহা সমস্ত পূর্বভারত হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে। মুসলমান ধর্মগ্রহণ করিয়া বাদসাহের সৈন্তের সাহায্যে তিনি হিন্দুধর্ম জগৎ হইতে একেবারে বিলোপ করিবেন, এই সঙ্কল্প

প্রতিশোধ। করিয়া বসিলেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার পর তাঁহার নাম হইল “মহম্মদ ফারুখি”, কিন্তু তাঁহার ‘কালাপাহাড়’ নামই দেশবিশ্রুত। এই নাম অবশ্য হিন্দুরা দিয়াছিলেন; তাঁহার নাম কালাচাঁদ রায় হইতেই সম্ভবতঃ এই নামের উদ্ভব। এই নাম হিন্দুর দেবতা ভগ্নকারীদের পক্ষে যোগরূঢ় হইয়া গিয়াছে, কবিরাজ বলিতে বেরূপ বৈষ্ণবেই শুধু বুঝায়, কালাপাহাড় বলিতেও সেইরূপ দেবত্রোহীকে বুঝায়।

উড়িষ্যার পাণ্ডাদের রূত অপমান তিনি ভুলিতে পারেন নাই, স্ততরাং প্রথমেই বাদসাহের সৈন্ত লইয়া উৎকলবিজয়ার্থ অভিযান করিলেন। কালাপাহাড় উৎকল-পতিকে যুদ্ধে নিহত করিয়া ত্রীক্ষেত্রে বেরূপ রোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার নহে। উড়িষ্যা হইতে গোড়ে প্রত্যাগমন কালে তিনি শত শত হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া দেবমূর্তিসমূহ অপবিত্র স্থানে ফেলিয়া বহু লোককে অত্যাচার পূর্বক ইসলাম-ধর্মে দীক্ষিত করিয়া যে অশ্রুতপূর্বক কাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এখনও ভারতীয় চিত্রশালাগুলিতে ক্ষতবিক্ষত দেব-অঙ্গে এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ মন্দির-স্তম্ভে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গোড়ে ফিরিয়া আসিয়া কালাপাহাড়

ভাড়াড়িয়া, সাঁতোড় ও পূর্ববঙ্গের দিকে অগ্রসর হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভাড়াড়িয়ার রাজা কালাপাহাড়ের মাতা ও তাঁহার দুই পত্নীকে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া আসিতে অগত্যা তিনি তাঁহার অভিযানের মুখ ফিরাইয়া কামরূপ, আসাম, দিনাজপুর, রংপুর ও কোচবেহারের কতকাংশে ঘোর অত্যাচার করিয়াছিলেন ; কথিত আছে তাঁহার নিষ্ঠুরতা দর্শনে অনেক মুসলমানও ব্যাধিত হইয়া পলায়নপর হিন্দুগণকে রক্ষা করিবার গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ।

এই সময়ে বেলোল লোদি দিল্লীর সিংহাসনে আসীন, তিনি জোয়ানপুরের নবাবের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন । জোয়ানপুরাধিপতি কালাপাহাড়কে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্ত লোক পাঠাইলেন । কালাপাহাড় যুদ্ধে একদম হুর্দ্ব ছিলেন যে

কাশী ধামে ।

এই সংবাদ পাইয়া বেলোল লোদি চক্রান্তপূর্বক সৈয়দ নামক এক রাজনীতি-কুশল কর্মচারীকে পাঠাইয়া তাঁহাকে কৌশলক্রমে বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া আসেন । বেলোল লোদির সেনাপতি হইয়া এবার কালাপাহাড় জোয়ানপুরের বাদশাহের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া চলিলেন । ২৪ বৎসর যাবৎ দিল্লীধরের সঙ্গে জোয়ানপুরের যুদ্ধ চলিয়াছিল, কালাপাহাড় এই যুদ্ধের সমাপ্তিবাক্য উচ্চারণ করিলেন । জোয়ানপুরাধিপতি পরাস্ত ও নিহত হইলেন, এবং তাঁহার রাজ্য সম্রাটের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল । জোয়ানপুর হইতে আসিবার মুখে তিনি সেই প্রদেশের নিকটবর্তী সমস্ত দেবতা ও দেবমন্দির ভগ্ন করিয়াছিলেন । কাশীধামে এক কেশবস্বর-লিঙ্গ ভিন্ন প্রাচীন দেবতা আর একটিও রহিল না । পাণ্ডারা জাহি জাহি ডাক ছাড়িল, এবার সেই ডাক মালিকের সিংহাসনের নিকট পৌঁছিল ।

কালাপাহাড়ের এক মাতুলানী কাশীবাসিনী ছিলেন । কালাপাহাড়ের ছরাচার সৈন্তেরা তাঁহাকে ধর্ষণ করিল । কালাপাহাড়ের কাছে আসিয়া তিনি কাঁদিয়া সমস্ত কথা বলিয়া তৎসাক্ষাতেই বিব পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন । কালাপাহাড় অশ্রুশোচনা ।

সম্রাট মহাশয় লিখিয়াছেন, সেই দিবস রাত্রিতে কালাপাহাড় সুরক্ষিত গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরদিন আর তাঁহাকে দেখা গেল না । কেহ বলেন, তিনি মনের

নিরুদ্দেশ ।

অনুতাপে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, কেহ বলেন তিনি গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছিলেন, কাহারও মতে কাশীর পাণ্ডারা তাঁহাকে নিদ্রিত অবস্থায় হরণ করিয়া হত্যাপূর্বক শব মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিয়াছিল, কেহ কেহ বলেন বেলোল লোদি তাঁহার ক্ষমতাবুদ্ধি দর্শনে গোপনে গুপ্তচর-দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করাইয়াছিলেন, কেহ কেহ আবার একথাও বলেন যে তিনি বিনাশরূপী রক্তের অংশে জন্মিয়াছিলেন, বিধেয়রে লীন হইয়া গিয়াছিলেন,—সার কথা এই যে, কাশীতে অত্যাচারের তৃতীয় দিবসে তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন । তিনি একাদশ বর্ষ হিন্দুধর্ম-নাশে ব্রতী ছিলেন । বরাবক সাহের কথা ছলারীর গর্ভে তাঁহার এক কন্যা হইয়াছিল—ঔহার নাম ‘কতেমা’ ।

কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকদের বর্ণিত বিবরণের সহিত রাজসাহীতে প্রচলিত কিংবদন্তীর কোন কোন বিষয়ে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। এই অনৈক্য রাজাদের নাম সম্বন্ধে হওয়া স্বাভাবিক,— ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতা-নিবন্ধন জনসাধারণ এক রাজার কথা মাঝে মাঝে অল্প এক রাজার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এবং ছর্গাচরণ সান্যাল উভয়েই কাল-সম্বন্ধীয় সমস্তার সমাধান করিতে না পারিয়া হইজন কালাপাহাড় পরিকল্পনা করিয়াছেন। আমার মনে হয় উক্ত হই গ্রন্থকারই এসম্বন্ধে ভ্রম করিয়াছেন। কালাপাহাড় বাদশাহ একজন মাত্র ছিলেন, তিনি দ্বিতীয় রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন নাই। সোলেমান খাঁ ও দাউদ খাঁর রাজত্বকালেই কালাপাহাড়ের সমস্ত সামরিক অভিবান হইয়াছিল। সোলেমান খাঁর রাজত্বকালে (১৫৬৪-১৫৭২ খৃঃ) কালাপাহাড় উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ দেব ও তাঁহার বিদ্রোহী সামন্তরাজ রঘুভঙ্গ ছোট রায় উভয়কেই পরাস্ত করিয়া নিহত করেন। মনোমোহন চক্রবর্তী লিখিয়াছেন ঐ ঘটনা ১৫৬৮ খৃঃ হইয়াছিল (রাখালদাসবাবুর বাদশাহার ইতিহাস ২য় ভাগ—১৩২৪ বাং ৩৬৭ পৃঃ)। তখন সোলেমান কররানী বঙ্গের বাদশাহ। ১৫৬৮ খৃঃ অঙ্গে কালাপাহাড় কোচবেহার-রাজভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ চিলারায় (শুক্রস্বজকেও) পরাস্ত করেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কাকশালদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন; তখন দাউদ খাঁ বঙ্গেশ্বর। সুতরাং আমরা কালাপাহাড়ের প্রায় সমস্ত সামরিক বিজয় এই হই নৃপতির রাজত্ব কালে সংঘটিত হইয়াছিল, এরূপ দেখিতে পাইতেছি।

কিন্তু যদি বরাবক খাঁর কন্যাকে কালাপাহাড় বিবাহ করিয়া থাকেন এবং বেলোল লোদির পক্ষ হইয়া জোয়ানপুরের নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া থাকেন, তবে পূর্বোক্ত ঘটনাগুলির সঙ্গে তাঁহার কালের একটা সামঞ্জস্য করা কঠিন হয়। ঐ ঘটনাগুলি সমস্তই ১৫৬৮ হইতে ১৫৭৫—এই সাত বৎসর কাল ব্যাপক। এদিকে বেলোল লোদি দিল্লীর সিংহাসনে ১৪৫১ খৃঃ হইতে ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বরাবক সাহার বঙ্গের রাজত্ব কাল ১৪৫৯-৭৪ খৃঃ পর্য্যন্ত। উড়িষ্যা ও কোচবেহার রাজ-ঘটিত ব্যাপার এই হই বাদশাহের রাজত্বের এক শতাব্দিক কাল পরে সংঘটিত হইয়াছিল। এদিকে আবার সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন যে কালাপাহাড় ৩৪ বৎসর বয়সে নিরুদ্দেশ হন, তখন হুলারী বিবির গর্ভে তাঁহার একটি মাত্র কন্যা সন্তান জন্মিয়াছিল। এই প্রণের উত্তর হুসুহ দেখিয়া লেখকগণ হইজন কালাপাহাড়ের প্রবাদের পরিকল্পনা করিয়াছেন। সান্যাল মহাশয় দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ খুঁজিয়া পান নাই। বাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা একই কথায় পুনরুক্তির মত শোনায। হই ভিন্ন স্থানে একই প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে যেটুকু প্রভেদ থাকিতে পারে এই পার্থক্য প্রায় সেইরূপ। তিনি লিখিয়াছেন “দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ বলিবার উপায় নাই। তাঁহার পূর্ব নাম কি ছিল এবং শিক্ষা কতদূর হইয়াছিল এবং তাঁহার পিতার নাম কি ছিল কিছুই জানা যায় নাই” (সামাজিক ইতিহাস ১১৩ পৃঃ)। “দ্বিতীয় কালাপাহাড়ও প্রথম কালাপাহাড়ের তায় স্থন্দরাকৃতি ও বলবান পুরুষ ছিলেন। উভয়েই ব্রাহ্মণ-সন্তান এবং মুসলমান হইয়া মুসলমানী বিবাহ করিয়াছিলেন। উভয়েই

ঘোরতর হিন্দুবিদ্বেষী হইয়াছিলেন এবং হিন্দুধর্মের অনিষ্ট করিয়াছিলেন” (সামাজিক ইতিহাস, ১১৫ পৃঃ)। সুতরাং দেখা যাইতেছে কালের গোলমাল দূর করিতে অসমর্থ হইয়া লেখকেরা দ্বিতীয় কালাপাহাড় নামক এক বক্তির কল্পনাপূর্বক গোজামিল দিয়াছেন। কিন্তু অল্প এক স্থান হইতে আমরা যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে অনায়াসে এই গোলযোগের সমাধান হইয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদের একখানি ইতিহাস সংকলিত হইয়াছিল। জেমস্ ওয়াইজ সাহেব তখন ঢাকার সিভিল সার্জান, তিনি তৎকালের জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান শোভান দাদ খাঁকে এতদর্থে অনুরোধ করেন। দেওয়ান সাহেব মুন্সী রাজচন্দ্র ঘোষের উপর এই কার্যের ভার দেন। মুন্সী মহাশয় বিশেষ তৎপরতার সহিত এই কার্য আরম্ভ করেন। জঙ্গলবাড়ীর দপ্তরের দলিল, কাগজ-পত্র, স্থানীয় প্রবাদ ও জনশ্রুতি প্রভৃতি যাবতীয় উপকরণ এজ্ঞ সংগৃহীত হইয়াছিল। মুন্সী মহাশয় কালীকুমার চক্রবর্তী নামক জঙ্গলবাড়ী স্কুলের প্রধান পণ্ডিত, এবং ষ্টেটের প্রধান কর্মচারী ইন্ডিস খাঁর বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় ২০ বৎসর জঙ্গলবাড়ীতে ছিলেন এবং অনেক বিষয় অপর সকল ব্যক্তি হইতে বেশী জানিতেন। অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত এই কার্য আরম্ভ হইলেও শোভান দাদ দেওয়ানের আকস্মিক মৃত্যুতে এই কার্য কিছু কাল স্থগিত ছিল। কিন্তু নূতন দেওয়ান আজিম দাদ খাঁ স্বয়ং এই কার্যে উদ্যোগী হওয়াতে এই ইতিহাস সংকলনে সমস্ত বিঘ্ন দূর হইল। এদিকে ঢাকা ডিভিসনের কমিসনার লার্ডস সাহেব এবং প্রখ্যাতনামা (তখন তরুণবয়স্ক) রমেশচন্দ্র দত্ত বৈয়াকরণসিংহের এ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয়দের পুনঃ পুনঃ তাগিদে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইল। এই পুস্তক একাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। বইখানি যে অসম্পূর্ণ তাহা বলা যায় না, তবে ইহার অধিকাংশ ভুল স্বেচ্ছাকৃত। ঈসা খাঁকে দাউদ খাঁর সহোদর প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া লেখকগণ দেওয়ান বংশের রাজকীয় রক্ত ঘোষণা করিবার জন্য যে ঐতিহাসিক গোজামিল দিয়াছেন, তাহা আধুনিক ঐতিহাসিকগণের চক্ষে সহজেই ধরা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু দেওয়ানদের বংশ-গৌরব বৃদ্ধির জন্য লেখক যে আরোজন করিয়াছেন, তাহা ছাড়া আর সর্ব বিষয়ে তাঁহারা প্রামাণিক ঐতিহাসিক উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন ও স্বল্প বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে যে সকল কথা লিখিয়াছেন তাহা সর্বত্র বিশ্বাস-যোগ্য। এই ইতিহাসে লিখিত আছে, কালাপাহাড় বাদসাহ জালাল সাহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মুন্সী রাজচন্দ্র ঘোষ প্রামাণিক ঐতিহাসিক সংবাদ পাইয়াই একথা লিখিয়াছিলেন, বেহেতু দেওয়ান বংশের গৌরবের সঙ্গে এই কথার কোন সংশয় নাই।

এখন যদি বাদসাহ জালালের কন্যাকে কালাপাহাড় বিবাহ করিয়া থাকেন—তবে ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় সম্বন্ধে সমস্ত গোল চুকিয়া যায়। জালাল সাহের রাজত্ব কাল ১৫৬০-৬৩ খৃঃ অব্দ। কালাপাহাড়ের কর্ম-জীবনের ইতিহাস যাহা প্রামাণিক ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়, তাহা ১৫৬৮ হইতে ১৫৭৫ পর্য্যন্ত। বেলোল লোদির নাম সম্বন্ধে ও জনশ্রুতিতে এই

ভাবের কোন গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। এই সকল প্রমাণের পর আমরা অনায়াসে সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, কালাপাহাড় মাত্র একজন ছিলেন এবং তাঁহার বিবাহ ১৫৬০ হইতে ১৫৬৩ এই তিন বৎসরের মধ্যে কোন সময় হইয়াছিল এবং তিনি ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তাঁহার ধ্বংসলীলা সমাধা করিয়া অনুমান ৩৪ বৎসরে নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে যদি তাঁহার বিবাহ হইয়া থাকে এবং ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে যদি তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার বয়স তখন ৩০ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে ছিল।

কেরানী (বা কররানী) বংশ শের সাহ ও তৎপুত্র সেলিম সাহ কর্তৃক আদৃত হইয়া অনেক স্থানের শাসন কর্তৃত্ব করিয়া ছিলেন। সম্রাট মহম্মদ জালালের পুত্র এবং তাঁহার হস্তা গিয়াসুদ্দিন—১২৬৩ খৃঃ। আদিলের আনুগত্য ইহারা করেন নাই। বরাবর শের সাহের উত্তরাধিকারীদের আনুগত্য করিয়া আসিয়াছিলেন।

গিয়াসুদ্দিনের বঙ্গ দখলের সংবাদ শুনিয়া সোলেমান কররানীর ভ্রাতা তাজ খাঁ কররানী অনায়াসে তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন দখল করেন। তিনি ইহার পরে এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। সোলেমান তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুর পর ১৫৬৪-৬৫ খৃঃ অব্দে বঙ্গের মসনদ অধিকার করেন। তিনি গোড়ের নিকটবর্তী তাওড়া নামক স্থানে রাজধানী পরিবর্তন করিয়া সম্রাট আকবরকে বহু উপঢৌকনাদি পাঠাইয়া প্রীত করেন। ইনি ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যা বিজয় করেন, ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে কোচবিহার অধিকার করেন; ইনি পুনঃ পুনঃ সম্রাট আকবরকে ভেট পাঠাইয়া প্রসন্ন রাখিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব মোটের উপর নির্ধারিত ও শান্তিপূর্ণ ছিল। সোলেমান কররানী ১৫৭২ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তখন কবিকঙ্কন মুকুন্দ রাম আড়ারা ব্রাহ্মণ-ভূমিতে থাকিয়া তাঁহার চণ্ডী-কাব্য শেষ করিয়াছিলেন।

সোলেমানের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ সাহ সিংহাসন আরোহণ করেন (১৫৭২ খৃঃ অব্দে)। কিন্তু আফগান ওমরাহগণ তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা দাউদ খাঁকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। ইনি রাজা হইয়া দেখিলেন, যে তাঁহার রাজ-ভাণ্ডার অপরিমিত, তাঁহার সৈন্ত নিবাসে ৪০,০০০ অশ্বারোহী, ১,৪০,০০০ পদাতিক সৈন্ত, নানা শ্রেণীর ২০,০০০ কামান, বহুশত বুদ্ধ-জাহাজ এবং ৩,৬০০ হস্তী মজুত। তিনি মনে করিলেন, এই প্রবল শক্তির সহায়ে তিনি ছনিয়ার মালিক হইতে পারেন। সুতরাং তিনি বেতজ্জর, রাজদণ্ড, এবং অপরাপর রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন; শুধু তাহাই নহে, তিনি আকবরের সাম্রাজ্যের কোন কোন স্থান আক্রমণ করিয়া সম্রাটের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন। দাউদ প্রথমতঃ জেমিনিয়া দুর্গ (পদ্মার দক্ষিণ পারে, গাজীপুরের কিছু উত্তরে অবস্থিত) আক্রমণ করিবার জন্ত একদল সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। আকবর সেনাপতি মনিয়মকে দাউদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। দাউদের প্রধান মন্ত্রী লোডিখীয়ের সঙ্গে মনিয়ম পাটনার

নিকটে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইলেন, কিন্তু এই সময়ে লোডিখাঁয়ের সঙ্গে মনিয়মের একটা সন্ধি হইয়া যায়। এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে বঙ্গেশ্বর সম্রাটকে নগদ দুই লক্ষ টাকা এবং একলক্ষ টাকার যোগ্য বেশমের কাপড় ও মসলিনাদি দিতে বাধ্য হইলেন এবং মনিয়মও বিহার হইতে সৈন্ত ফিরাইয়া লইয়া বাইবেন, স্থির হইল। সন্ধির কথা শুনিয়া দাউদ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া—“লোডিখাঁ তাঁহার মন্তক হেঁট করিয়া দিয়াছেন” এই অভিযোগ করত তাঁহার মৃত্যুদণ্ড করিয়া তদীয় সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। এদিকে আকবরও মনিয়মের সন্ধি সম্রাটের পক্ষে গৌরবজনক হয় নাই—এই ভাবিয়া তাঁহার উপর বিরক্ত হন, এবং দশ হাজার সৈন্ত সহ তোডরমল্লকে বেহারে মনিয়মের উদ্ধৃতন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া বেহারে প্রেরণ করেন।

এদিকে দাউদ সন্ধিতে স্বীকৃত হন নাই এবং লোডিখাঁকে হত্যা করিয়াছেন শুনিয়া মনিয়ম পাটনায় অভিযান করিয়া উপস্থিত হন। দাউদের নিযুক্ত হাজিপুরের শাসনকর্তা ফতে খাঁ অত্যন্ত সাহসিকতা ও কৌশলের সঙ্গে দুর্গ রক্ষা করিয়া-
অধীকার।
ছিলেন এবং মোগলদিগকে প্রায় নিঃশেষ করিবার মধ্যে আনিয়া-
ছিলেন। সম্রাট আকবর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই অবরোধ ও যুদ্ধের ব্যাপার লক্ষ্য করিতে ছিলেন, তিনি মোগল সৈন্তের এই ধ্বংস দেখিয়া বহুসৈন্তপূর্ণ তিনটি জাহাজ পাঠাইয়া দেন। মোগলেরা এই সাহায্য পাইয়া উৎসাহের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের ভীষণ বেগ সহ করিতে না পারিয়া দুর্গস্থানী পরাস্ত হন। ফতে খাঁ ও তাঁহার বহু সৈন্তসামন্তের কষ্টিত মন্তক এক নোকা বোঝাই করিয়া সম্রাট আকবর দাউদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া জানান যে অচিরে তাঁহারও এই অশুচরদের গতি হইবে। দাউদ ভয় পাইয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ লইয়া তেরিয়াগড়িতে উপস্থিত হন। এদিকে মোগলেরা হাজিপুরে আফগানদের উপর যে অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার করিয়াছিল, তেরিয়াগড়িতে পলায়ন।
তাঁহার সংবাদ পাইয়া দাউদের সৈন্তেরা তেরিয়াগড়িতে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল। সুতরাং তেরিয়াগড়ির দুর্গম গিরিপথে থাকিয়া মোগলদিগকে বাধা দেওয়ার আশা তাঁহার বিফল হইল। তিনি ধনসম্পত্তির সহিত পুনরায় পলায়নপর হইলেন, এদিকে বঙ্গ-প্রবেশের একমাত্র দ্বার তেরিয়াগড়ি অনায়াসে মনিয়ম খাঁর হাতে পড়িল।

দাউদ পলাইয়া উড়িষ্যার পথে চলিলেন। এদিকে রাজা তোডরমল্ল গোড় এবং তাণ্ডা অনায়াসে দখল করিয়া পলাতক দাউদের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। দাউদ এক স্থান হইতে অল্পস্থানে পরিবার ও অর্থাদি লইয়া পলাইতে লাগিলেন। মাত্র পথে দুই এক স্থানে দাউদের সৈন্ত কর্তৃক মোগলেরা বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। অবশেষে দাউদ কটকে বাইয়া “মারি কি মরি” এই সঙ্কল্প করিয়া একেবারে মরিয়া হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইলেন। মনিয়ম খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে কতকগুলি ভীষণ কামান গাড়ীতে বহাইয়া আনিয়াছিলেন। দাউদেরও ২০০ অতি দুর্দান্ত বন্দু হস্তী সঙ্গে ছিল। দুই পক্ষের সৈন্ত-সংখ্যা প্রায় তুল্য ছিল। এই যুদ্ধে আফগানগণ যেরূপ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল,

মোগলেরা সেরূপ বাধা আর এদেশে কখনও পায় নাই। এই মহামারিতে মোগল সেনাপতি গুরুতরভাবে আহত এবং দাউদের প্রধান সামন্তগণ হতাহত হইয়াছিলেন। দাউদ যদিও শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইতে পারেন নাই, তথাপি মোগলেরাও বহু ধ্বংসের পর জয়লাভ করিয়াও কোন উৎসাহ বোধ করিতে পারে নাই। দাউদ কটকে উপস্থিত হইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। দাউদের দূতের অসামান্য বিজ্ঞতা ছিল। তিনি যখন এক ধর্ম্মাবলম্বী ছই দলের পরস্পরের এরূপ বিরোধ ও হত্যা ধর্ম্মসঙ্গত নহে, দাউদ আত্মসমর্পণ করিতেছেন, তাঁহার এবং তাঁহার অনুচরবর্গের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্ত

মনিয়ম খাঁর ব্যবসারে যদি সম্রাট কিছু স্থান ছাড়িয়া দেন, তবে তাঁহার তাঁহার চিরায়ুগত সেবক হইয়া থাকিবেন ইত্যাদি কথা করণ স্বরে বলিতে লাগিলেন।

তখন মনিয়ম খাঁর হৃদয় প্রকৃতই আর্দ্র হইল। তিনি বলিলেন, যদি দাউদ স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইয়া এই সকল কথা বলেন, তবে তিনি সম্রাটের নিকট তাঁহাদের হইয়া বিশেষ অনুরোধ করিবেন।

কয়েক জন ওমরাহ পরিবৃত্ত হইয়া দাউদ মোগল শিবিরে উপস্থিত হইলেন। মোগলেরা তাঁহাকে যথেষ্ট সংবর্দ্ধনা করিল। ছই দিকে সৈন্তগণ দাঁড়াইয়া তাঁহাকে রাজকীয়ভাবে অভিবাদন করিল এবং শিবিরে উপবিষ্ট মোগল ওমরাহগণ তাঁহার প্রবেশ মাত্র সকলেই সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাইয়া মনিয়ম খাঁয়ের নিকট লইয়া আসিলেন। মনিয়ম স্বয়ং কতকদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। দাউদ খাঁ কটকট হইতে তরবারি বাহির করিয়া মনিয়ম খাঁয়ের হাতে দিয়া বলিলেন, “এই অসি-দ্বারা আপনার মত বন্ধুর শরীরে আমি অস্ত্রাঘাত করিয়াছি, ইহা ধারণ করিবার আমি যোগ্য নহি, আমি এখন হইতে বোদ্ধার নাম গ্রহণের আর উপযুক্ত নহি, আপনি এই অস্ত্রটি গ্রহণ করুন।” মনিয়ম খাঁ হস্তে ধরিয়া দাউদকে সম্মানিত স্থানে বসাইলেন। দাউদ কোরান এবং অপর সমস্ত পবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া বলিলেন—“সম্রাট যদি দয়া করিয়া আমাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন, তবে আমি চিরদিনের জন্ত তাঁহার বিশ্বস্ত সেবক হইয়া থাকিব, তাঁহার কোন শত্রুর সঙ্গে যোগদান করিব না।” এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ হইল এবং দাউদ সেই সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। মনিয়ম খাঁ তাঁহাকে একখানি বহুমূল্য তরবারি রাজকীয় উপহার স্বরূপ দিয়া বলিলেন—“আজ আপনি আমাদের মহিমান্বিত সম্রাটের বশুতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি আপনাকে এই তরবারিখানি উপহার দিতেছি। আশা করি আপনি ইহা সম্রাটের পক্ষে এবং তাঁহার শত্রুগণের বিপক্ষে আজীবন ধারণ করিবেন। আমি আমার মহামান্য সম্রাটের নামে সমস্ত উড়িষ্যা রাজ্যের অধিকার আপনাকে দিতেছি, আমি অমুমাত্র সন্দেহ করি না, যে আপনি চিরকাল সম্রাটের অনুগত ও বিশ্বস্ত প্রজা স্বরূপ সাম্রাজ্যের সহায়তা করিবেন।”

মনিয়ম খাঁ তাণ্ড্রায় প্রবেশ করিয়া সমারোহের সহিত বাঙ্গলাদেশ অধিকার করিলেন। গৌড় নগর পরিদর্শন করিয়া উহার বিচিত্র কারুকাণ্ডখচিত হর্ম্মা, মসজিদ, মন্দির প্রভৃতি

দেখিয়া তিনি এতই আনন্দ লাভ করিলেন যে তিনি তাড়াতাড়ি হইতে পুনরায় গোড়ে রাজধানী পরিবর্তন করিতে সক্ষম করিলেন। তৎকালকার ভিজামাটি হইতে বিষাক্ত বায়ু বহির্গত হইয়াই হউক অথবা জল বা আবহাওয়ার দোষেই হউক, তৎকাল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক মহামারী দেখা দিল। সহস্র সহস্র লোক মরিয়া পথে পড়িয়া রহিল, তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া বা দাহ করিবার লোক রহিল না। লোকে সেই মহামারীতে ত্রাহি ত্রাহি করিয়া পলাইতে শুরু করিল। স্বয়ং মনিয়ম খাঁ এই নিদারুণ প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, (১৫৭৫ খৃঃ)।

মনিয়ম খাঁর মৃত্যুর পর বাঙ্গলায় আফগানেরা আবার তাহাদের নষ্ট ক্ষমতা লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল এবং গোড়ের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা সাহেম খাঁ জেলিয়ারকে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। আশ্চর্যের বিষয় ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া,

পুনরায় সন্ধি-লক্ষণ।

কোরান স্পর্শ করিয়া এত প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও দুর্ভাগ্য দাউদ এই বিদ্রোহীর দলে যোগদান করিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত কর্মচারী হরি রায়, বাঁহাকে দাউদ বিক্রমাদিত্য উপাধি দিয়াছিলেন, তাঁহাকে পুনরায় সম্রাটজোহী হইতে নিষেধ করিয়া ছিলেন; কিন্তু পঞ্চাশ হাজার সুশিক্ষিত অধারোহী সেনা হাতে পাইয়া দাউদ ধরাকে সরা জ্ঞান করিলেন। সম্রাটের সেনাপতি হুসেন কুলি খাঁ (উপাধি খাঁ জাহান) দাউদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তিনি রাজমহলে আসিয়া দাউদের সৈন্তের সম্মুখীন হইলেন। প্রথম প্রথম দাউদের পরাক্রান্ত দলবল বিজয়ী হওয়ার ভরসা করিয়াছিল, কিন্তু যখন মোগল সেনাপতির সাহায্যের জন্য পাটনা, ত্রিহত এবং অপরাপর স্থান হইতে অগণ্য সৈন্ত আসিতে

লাগিল, তখন আফগানদের ভরসার স্থল জোনিয়েদ কররানী

(দাউদের ভ্রাতুষ্পুত্র) এবং অপরাপর প্রধান সেনাপতিরা মোগলদের কামানের বেগ সহ্য করিতে পারিলেন না, তাহাদের অনেকেই রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। দাউদ দূত হইয়া মোগল দরবারে আনিত হইলেন। তৎকৃত কৃতজ্ঞতার ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গের উত্তরে তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। রাজজোহীর দণ্ড তাঁহাকে দেওয়া হইল, তাঁহার ছিন্নমস্তক একজন বিশেষ দূত সহ আগ্রায় প্রেরিত হইল (১৫৭৬ খৃঃ)। প্রায় চারিশত বৎসর বঙ্গদেশে যে পাঠান প্রাধান্য ছিল, দাউদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহা এ দেশে বিলুপ্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠান রাজত্বসম্বন্ধে নানা কথা

মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার খিলজির সময় হইতে ১৫৭৬ খৃঃ পর্যন্ত প্রায় চারিশত বৎসর বঙ্গে আফগানদের প্রাধান্ত ছিল। এই কিকিরূন চারিশত বৎসর বঙ্গদেশটাকে সুন্দর বনের মধ্যবর্তী ব্যাঘ্র-বাস বলিলেও বোধ হয় অত্যাশ্রিত হয় না—বিশেষ বঙ্গের সিংহাসন। এরূপ মাথার উপর সুলান খড়া লইয়া সিংহাসনে বসার সুখ কেনই বা বঙ্গেশ্বরগণ খুঁজিয়াছিলেন? ইবন বক্তিয়ার হইতে

পাঠান সম্রাটগণের
অপমৃত্যু।

দাউদ পর্যন্ত ৪৩ জন ভূপতি সিংহাসনে কণিকের জন্ত বসিবার সুখ লাভ করিয়াছিলেন। মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার কামরূপের রাজার হাতে লাহিত হইয়া এবং সর্ব সৈন্ত কয় করিয়া বখন গোড়ের নিকট উপস্থিত, তখন তিনি উৎকট রোগশয্যাশায়ী, কিন্তু ভগবান্ মরিবার সময়ও তাঁহাকে শাস্তি দিলেন না, প্রিয় সেনাপতি আলিমর্দন তাঁহার পীড়িত অবস্থায় খড়াঘাতে তাঁহাকে বধ করিলেন (১৩০৮ খৃঃ)। এই ঘটনার মাত্র দুই বৎসর পরে ইবন বক্তিয়ারের প্রিয় মন্ত্রী বঙ্গেশ্বর মহম্মদ শিরান নিজের দলের একজন লোক কর্তৃক নিহত হন (১৩১০ খৃঃ)। এবার বক্তিয়ারের হত্যাকারী আলিমর্দন খিলজির পালা, তিনি স্বীয় বংশের একজন বড়বহু-কারীর হাতে প্রাণ হারাইলেন (১২১১ খৃঃ)। বঙ্গের মসনদ পূর্ণ করিলেন গিয়াসুদ্দিন, কিন্তু তিনিও কয়েক বৎসর পরে যুদ্ধে নিহত হইলেন (১২২৭ খৃঃ)। এই চারিটি হতভাগ্য নৃপতির পর নাসিরুদ্দিন বাদসাহের কপাল ভাল, তিনি হেকিম ও কবিরাজদের চিকিৎসাধীন থাকিয়া মরিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। পরবর্তী দুই প্রতিদ্বন্দী রাজা তোগন খাঁ ও তমুর খাঁ যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ে ১২৪৬ খৃঃ অব্দের একই দিনে প্রাণত্যাগ করিলেন। সিংহাসনে বসিয়া তোগন খাঁ বোধ হয় একটি রাত্রিও শাস্তিতে ঘুমাইতে পারেন নাই। সুলতান মগীসুদ্দিন (সপ্তম বাদসাহ) ১২৫৮ খৃঃ কামরূপের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, মরিবার সময় তিনি তাঁহার বিজয়ী শত্রুর নিকট গলদ্রব্ধনেত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাঁহার পুত্রের মুখখানি জীবনে শেষবার দেখিতে। পরবর্তী বাদসাহ জালালুদ্দিন কড়ার শাসনকর্তা আর্গলান খাঁ কর্তৃক নিহত হন। একটা অভিসন্ধির ফলে মগীসুদ্দিন (মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার খিলজি হইতে একাদশ) বাদসাহের হত্যাকাণ্ড ঘটাইল। কাইকোবাদকে খিলজি বংশীয় এক আমীর নিহত করেন (১২৮৯ খৃঃ)। তৎপরবর্তী নবাব ফকরুদ্দিনকে তাঁহার খুল্লতাত হত্যা করেন। সেকেন্দর বাদসাহকে তাঁহার পুত্র গয়াসুদ্দিন যুদ্ধে নিহত করেন (১৩৬৮ খৃঃ)। দ্বিতীয় সামসুদ্দিন বাদসাহকে নুসিংহ ওয়ার বুদ্ধিবলে রাজা গণেশ হত্যা করিয়াছিলেন। হতভাগ্য নাসিরুদ্দিন (যহুর পৌত্র) মাত্র ৮ দিন রাজত্বের বসিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। নবমদিনে তাঁহাকে বড়বহুকারীরা হত্যা করিল। ফতে সাহ ১৪৯৫ খৃঃ অব্দে খোজা

বারেক কর্তৃক নিহত হইলেন। সাহাজাদা অন্তঃপুরে আমোদ করিতেছিলেন; তিনি ছিলেন খোজা, শুইবার সময় স্ত্রীজনোচিত (খোজাদের অভ্যাস) পরিচ্ছদ পরিয়া মদ খাইয়া আমোদ করিতেছিলেন, এমন সময় হাবিসী মস্ত্রিপ্রবর তাঁহার বৃকে অগ্নি বসাইয়া দিল, তাঁহার গায়ে ছিল অশ্বরের বল, খড়্গাঘাত সহ্য করিয়া তিনি মস্ত্রীর সঙ্গে খুব কতক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়াছিলেন। অবশেষে রক্তক্ষয়ে ক্লান্ত হইয়া যখন মড়ার মতন পড়িয়া ছিলেন, তখন হাবিসী মস্ত্রী তাঁহাকে মৃত ভাবিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এই সময় বাদসাহের এক খোজা চাকর তথায় উপস্থিত হইল; তিনি মরেন নাই, তাহাকে দেখিয়া যেন পুনর্জীবন পাইয়া তাহার নিকট মস্ত্রীর কাণ্ডটা বলিতে লাগিলেন। বিনয়ের ভাণ করিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে বিবস্ত্র চাকর বাহিরে লোকজন ডাকিতে চলিয়া গেল, কিন্তু সে লইয়া আসিল সেই হাবিসী মস্ত্রিপ্রবরকে। রাজা তখনও মরেন নাই দেখিয়া মস্ত্রী ও বাদসাহের 'বিবস্ত্র' খোজা চাকর বাকী কাজটুকু সারিয়া ফেলিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

অতঃপর ফিরোজসাহ মাত্র একটি বৎসর রাজত্বের পর সিদ্ধিবন্দরের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। সিদ্ধিবন্দর (মুজাফর সাহ) সৈয়দ হুসেনের দ্বারা নিহত হন। হুসেন সাহের

পুত্র নসরত সাহ তাঁহার পিতার সমাধি-মন্দিরে ভজন করিতে-
 পাঠান রাজগণের অগ- ছিলেন, ইতিপূর্বে তিনি এক খোজাকে গুরুতর অপরাধের
 দ্বারা।

জন্ত উচিত দণ্ড দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন, সে দণ্ড
 আর দিতে হইল না, খোজাই উপাসনা-মন্দিরে তাঁহাকে একা মুক্তিতনেত্র দেখিয়া তাঁহার
 প্রাণদণ্ড করিল (১৫৩২ খৃঃ)। মৃত বাদসাহের পুত্র ফিরোজ সাহ তিনটি মাস মাত্র
 রাজত্বের বসিয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহার খুল্লতাত মহম্মদ সাহ এই অভিশপ্ত বঙ্গ-সিংহাসনের
 লোভে তাঁহাকে হত্যা করিলেন। মহম্মদ সাহের পরবর্তী বাদসাহ সুপ্রসিদ্ধ সের সাহ
 বঙ্গের মসনদ তাঁহার এক মস্ত্রীকে দিয়া সমস্ত হিন্দুস্থানের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি
 যুদ্ধের আয়োজন করিতে যাইয়া একটা বোমা ফাটায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। মাঝে এক
 রাজা স্বাভাবিক কারণে মরিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তী বাদসাহ মহম্মদ সাহ
 ১৫৫৪ খৃঃ অব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। জেলালুদ্দিন বাদসাহের পুত্র অল্লাহায়া রাজত্বের
 পর গায়েহুদ্দিন কর্তৃক নিহত হন। গায়েহুদ্দিনের হত্যাকারক তাজ খাঁ, তাজ খাঁর পুত্র
 বরজাদ আমিরদিগের বড়বয়ে নিহত হন। পরবর্তী রাজা দাউদ এই তুর্ভাগ্য নৃপকুলের
 শেষ আহুতিস্বরূপ মোগল সম্রাট আকবরের সঙ্গে বহু যুদ্ধবিগ্রহ চালাইয়া স্বীয় জীবন সেই
 সমরানলে প্রদান করেন (১৫৭৬ খৃঃ)।

সুতরাং এই রাজগণের অধিকাংশই সিংহাসন দখল করিবার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রাণদান
 করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আট দিনের মধ্যে, কেহ বা তিন মাস,

প্রতিশ্রুতির মূল্য।

কেহ বা এক বৎসর পরেই নিহত হন; এক সম্রাট তাঁহার প্রিয়তম
 পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, কেহ বা উপাসনা-
 মন্দিরে প্রার্থনায় বসিয়া অপরাধী ভূত্যের হস্তে, কেহ বা রাজিকালে শয়নাগারে বিবস্ত্র মস্ত্রীর

খজাঘাতে, কেহবা স্বীয় ঘেহনীল খুলতাকর্ষক যমমন্দিরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহারা এই ভাবে অপঘাতে মরেন নাই, তাহারাও দিবারাজ মৃত্যুর ছায়া চক্ষের সন্মুখে রাখিয়া হীরকখচিত রাজতক্তে বসিয়াছেন। হতভাগ্য দাউদের মৃত্যুকাহিনী পড়িলে চক্ষু সজল হয়। এই আফগান রাজগণের অনেকেরই ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না—কেবল যেমন করিয়া হউক বঙ্গের মসনদে বসিতে পারিলেই হয়। শের সাহ হুমায়ুন বাদসাহের সঙ্গে কোরান ছুঁইয়া শপথ করিলেন, যাহা কিছু পবিত্র সকলের নাম করিয়া শপথ করিলেন, পরক্ষণেই সেই সন্ধি ছেলের হাতের মাটির পুতুলের মত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তিনি হুমায়ুনের নিশ্চিন্ত, নিদ্রিত শিবির আক্রমণ করিলেন। দাউদ খাঁ মনিয়ম খাঁর নিকট বে প্রতিশ্রুতি-সহকারে শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে পবিত্রতর দলিল কেহ করনা করিতে পারে না, কিন্তু বঙ্গের তক্তে বসিলে মাহুকের বুদ্ধি বিকৃত হয়, এই প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিয়া তিনি সম্রাটদ্রোহী হইলেন।

অবশ্য রাজপদের মত লোভনীয় কি আছে? কিন্তু মোর্শা, গুপ্ত, পাল ও সেনদের রাজত্বকালেও যুদ্ধবিগ্রহের বিরাম ছিল না, তাহারাও স্বগণদের সঙ্গে কলহ করিয়াছেন।

কিন্তু এই পাঠানদের মত নৃশংসতা হিন্দুর ইতিহাসে খুব বিরল।
দিল্লীবিদ্রোহী দুর্দান্ত 'বঙ্গ-
বাহা'।

কিন্তু এই পাঠানদের মত নৃশংসতা হিন্দুর ইতিহাসে খুব বিরল।
কিন্তু প্রতিশ্রুতি ছলনায় ছিল—অভিমত্যা-বধ, পাণ্ডবদের পুত্রগণের
হত্যা মহাভারতের কলঙ্কস্বরূপ, কিন্তু তাহাতেও প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের
উদাহরণ বড় দেখা যায় না। সত্যরক্ষা, প্রতিশ্রুতি-পালন, রাজভক্তি প্রভৃতি গুণের উদাহরণ-
স্বরূপ হিন্দুসাহিত্যে যে কত কাহিনী বর্ণিত আছে তাহার অবধি নাই। অপেক্ষাকৃত
আধুনিক কালে লাউসেনের অমুগত ভৃত্য ও সেনাপতি কালুডোম সত্যরক্ষার্থ নিজের প্রাণ
দিয়াছিল। ধর্ম্মাধিকরণে একটি মাত্র মিথ্যা কথা বলিলে হরিহর বাইতি বহু পুরস্কার
পাইত—সত্য বলিলে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত, কিন্তু বিধাকম্পিতচিত্তে হরিহর মিথ্যা বলিতে
অস্বীকার করিয়াও সাক্ষীর কাষ্ঠাসনে দাঁড়াইয়া মিথ্যা বলিতে পারিল না। তাহার পত্নীর সরল
প্রাণ মিথ্যা বলিতে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল, জিহ্বায় ভাষা ঠেকিয়া গেল। এই সকল কথা
উপাখ্যান মাত্র, কিন্তু হিন্দুর সত্যবাদিতাসম্বন্ধে বিদেশী ভ্রমণকারীরা যে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা
করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া এই সকল গল্প পড়িলে মনে হইবে, উপাখ্যানগুলিতে
জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে এবং উহা সত্য হইতে দূরবর্তী নহে। এই ধর্ম্মভীরু
জাতি রণকুশল সাম্রাজ্যলোভী পাঠানগণের সংস্পর্শে আসিয়া নিতান্ত আতঙ্কিত ও অবসন্ন
হইয়া পড়িয়াছিল। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে পশু-যুদ্ধের রূপক স্থলে হিন্দু রাজা ও জমিদারবর্গের
এই ভয় বর্ণিত হইয়াছে।

এই যুগের বঙ্গেশ্বরগণের ইতিহাসে দেখা যায় ইহারা স্বাধীনতার জন্ত অসাধ্যসাধন-চেষ্টা
করিয়াছেন; প্রায় প্রত্যেকটি বাদসাহই দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছেন, হযত দায়ে
পড়িয়া সন্ধিস্থলে আবদ্ধ হইয়াছেন—আবার প্রবিধা পাইলেই বিদ্রোহী হইয়াছেন। ইহারা
প্রকৃতই বঙ্গের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজব্যাঘ্র (Royal Tiger)। এই ব্যাঘ্রকে দিল্লীশ্বরগণ

কিছুতেই পোষ মানাইতে পারেন নাই। শের শাহকে দমাইতে যাইয়া হুমায়ুন দিল্লীর তক্ত-
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; সর্ব-শেষ পাঠানব্যাঘ্র দাউদের বিরোগান্ত জীবন-নাট্য।
কি ভীষণ তাঁহার অব্যবসায়। কতবার হারিয়াছেন, সন্ধিপক্ষে দস্তখত করিয়াছেন, সেগুলি
তিনি সুবিধা পাইলেই তৃণবৎ নগণ্য মনে করিয়া কোমর বাধিয়া যুদ্ধে লাগিয়া গিয়াছেন,
তাঁহার পিতা সোলেমান খাঁ আকবরের নামে মাত্র বশত্যা স্বীকার করিয়া নির্ঝিয়ে দীর্ঘকাল
রাজত্ব করিয়া গেলেন। দাউদ ইচ্ছা করিয়া একটিবার মাথা নোয়াইলেই তদপেক্ষা
বৃহত্তর রাজ্যে স্থায়িত্বে অভিষিক্ত হইয়া পরম নির্ঝিয়ে জীবনটা কাটাইয়া দিতে
পারিতেন। কিন্তু এই পাঠান-ব্যাঘ্র জীবনে সুখ-শান্তি চান নাই। পুনঃ পুনঃ হারিয়া
গিয়া পুনঃ পুনঃ লড়াই করিয়াছেন। প্রায় জীবনব্যাপী যুদ্ধ চালাইয়াও যুদ্ধরাস্তা হয়
নাই; শেষে যে সন্ধি হইল তাহাতে সমস্ত উড়িষ্যার সাম্রাজ্যটা হাতে পাইলেন, হয়ত বা
আকবরের বশত্যা স্বীকার করিলে আরও অধিকার বাড়াইতে পারিতেন, কিন্তু সে সকল
সুবিধা ও ব্যবস্থা লইয়া তিনি সুখী হন নাই। পবিত্র কোরাণ অমাত্র করিয়া পুনরায়
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন। এই আফগানদের প্রত্যেকের রক্তে দিল্লীর বিরুদ্ধে
বিরোধের বীজ ছিল, এই বীজ জরাসন্ধ, পৌণ্ড্রবাহুদেব, নরক ও সমুদ্র সেন প্রভৃতি
হইতে আসিয়াছে—বাঙ্গলাদেশের রাজারা চির-বিরোধী। পাঠান সময়ে আমরা এই সত্য
বতটা দেখিতে পাই, এতটা আর কখনও নহে—ইসলামের অতুল বিজয়পতাকা, মগুরার
সমৃদ্ধি, বৈবতকের অলঙ্কারী দুর্গ এবং সর্বশেষে মুসলিম অধিকৃত দিল্লী—বঙ্গের ব্যাঘ্রদিগকে
স্ববশে আনিতে পারে নাই।

বাঙ্গালী-চরিত্রের এক দিকে বিরাগ অপরদিকে রাগ। বিরাগে সে বিরোধী কিন্তু
অনুরাগে সে অবহেলায় মৃত্যু বরণ করিয়া লয়। বাঙ্গালীর রাজ-ভক্তি অপূর্ণ। লাউসেনের
সেনাপতি কালু ডোম, তৎপত্নী লক্ষ্মা ও শাকা-শুকা পুত্র-দ্বয়ের যে রাজভক্তির কথা
ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত আছে, তাহার তুলনা নাই। লক্ষ্মা তাঁহার ছই পুত্রকে গভীর
নিদ্রা হইতে জাগাইয়া রাজার জন্ত নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করিতে রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন।
এ যুগেও বাঙ্গালী-পুলিশ অনেক সময় স্বীয় বন্ধুবান্ধবদিগের গঞ্জন সহ করিয়াও রাজার
জন্ত কথায় কথায় মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছে।

যদিও আমরা যঃ ইঃ বক্তৃত্বারের আগমন হইতে ১৫৭৬ খৃঃ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়টা
‘পাঠান-যুগ’ নামে মূলতঃ পরিচিত করিয়াছি, তথাপি এই যুগের রাজগণের মধ্যে সকলেই
আফগান ছিলেন না, কেহবা আরব দেশের, কেহবা খোজা,
হিন্দুর সহিত মিশ্রবংশ।

কেহবা হাবসী, এবং কেহবা হিন্দু ছিলেন। মোটামুটি এই
সময়টাকে ‘পাঠান-প্রাধান্তের যুগ’ বলা যাইতে পারে। এই সকল রাজাদের শরীরে প্রচুর
পরিমাণে হিন্দুরক্ত বহমান ছিল। সুলতান গারেকুদ্দিনের বিমাতা, সমসুদ্দিনের নিকা-
হরের স্ত্রী, ফুলমতী বেগম—এক সময়ে শুরজাহান দিল্লীতে বাসা করিয়াছিলেন—বঙ্গদেশের
শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে সেইরূপ ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন। ফুলমতী ঢাকা জেলার বিক্রমপুর

পরগনার সুবিখ্যাত বজ্রবোগিনী গ্রামের এক বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা; সমসুদ্দিন সুবর্ণগ্রাম যাওয়ার পথে নদীর ঘাটে এই অসামান্য রূপসী বোড়ীকে দর্শন করিয়া বলপূর্বক তাহাকে স্বীয় অন্তরমহলে লইয়া আসেন; সমসুদ্দিনের নিকট তথাকার প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ ও অপরাপর শ্রেণীর বিস্তৃত হিন্দুরা উপস্থিত হইয়া এই কার্যের প্রতিবাদ করেন। বাদসাহ

বলিলেন. “আচ্ছা বেশ! ফুলমতীকে আমি ছাড়িয়া দিতেছি, ইহার

ফুলমতী বেগম।

সমান দরের কোন সংব্রাহ্মণ ইহাকে বিবাহ করুন,—নতুবা গণিকা-বৃত্তি করিবার জন্ত এবং সমাজচ্যুত হইয়া নিরাশ্রয়া হইয়া থাকিবার জন্ত আমি এমন সুন্দরী মহিলাকে কখনই প্রত্যর্পণ করিব না।” বাদসাহের কথায় কেহ অবশ্য রাজী হইলেন না, তখন তিনি স্বয়ং তাহাকে নিকা করিলেন। এই রমণী যেরূপ অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন, তেমনই বুদ্ধিমতী ছিলেন, তৎসময়ের আফগান-দরবারে আসিয়া তিনি বিলাসকলা ও কূটনীতি শিখিয়াছিলেন। সমসুদ্দিনের উপর ফুলমতী বিবির প্রভূত ক্ষমতা ছিল, এমন কি তাহার মৃত্যুর পর কংসরাম, জুনা খাঁ প্রভৃতি রাজ-দরবারের প্রধান ব্যক্তিগণকে তিনি নিকা করিবেন সেই লোভ দেখাইয়া ক্রীড়াপুত্তলীর মত ব্যবহার করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ হিন্দুপ্রভাবের কোন উল্লেখই করেন নাই—কিন্তু ফুলমতী বেগম যে কতটা শক্তির সহিত বাদসাহের দরবারে শাসনকার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাহা বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-কুলজীওঁষে বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে। সাম্রাজ্য মহাশয় লিখিয়াছেন—গায়েসুদ্দিনের মৃত্যুর পর ফুলমতীর পুত্র মইজুদ্দিন গোড়ের বাদসাহ হন। মধু খাঁ ও ফুলমতী—নিতান্ত অলস, বিলাসী ও অকর্ম্মণ্য মইজুদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া প্রকৃত শাসনকার্য্য তাহারাই সম্পাদন করিতেন। কিন্তু মইজুদ্দিন বাদসাহের অস্তিত্ব অল্প কোন স্বত্রে এখনও প্রমাণিত হয় নাই। তাহার সময়ে রাজসাহীর একটাকিয়া ও গাতড়ার রাজারা বাদসাহের অহুগ্রহে খুব প্রবল হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তাহার। যে ঐ সময়ে প্রভূত শক্তিশালী হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঘটককারিকা ও প্রবাদবাক্যের ভিত্তি অনেক সময়ই সত্যমূলক, কিন্তু সময়ে সময়ে উদ্যের পিণ্ডি বৃন্দোর ঘাড়ে পড়িয়া ইতিহাসকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে নানারূপ জন্ম, প্রমাদ ঘটয়া থাকিলেও ফুলমতী বিবির অস্তিত্ব ও বাদসাহ-দরবারে তাহার প্রভাব কখনই অবিখ্যাত বলিয়া মনে হয় না, দেশব্যাপী জনবর ও প্রবাদের ভিত্তিতে নিশ্চয়ই সত্য নিহিত আছে।

ফুলমতীর প্রভাবেই হউক অথবা অল্প বে কোন কারণেই হউক, এই বাদসাহদের সময়ে হিন্দুরা যে রাজসভায় অতি প্রধান ছিলেন—তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। ইহার পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমরা দেখাইব, মুসলমান রাজা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ “সিদ্ধকী” লাগাইয়া ক্রমাগত সুন্দরী হিন্দুললনাগণকে অপহরণ করিয়াছেন—তাহাদিগকে নিকা করিয়া বহু সন্তান উৎপন্ন করিয়াছেন। বোড়শ শতাব্দীতে ময়মনসিংহের জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানগণ এবং ত্রিহট্টের বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানেরা এইরূপে যে কত হিন্দু রমণীকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছেন, তাহার অবধি নাই। পল্লীগীতিকাগুলিতে সেই সকল করণ কাহিনী বিবৃত আছে। কোন

এক রাজার কন্যাকে বঙ্গের মুসলমান বাদসাহ বিবাহ করিতে চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে যে অনর্থ ঘটয়াছিল তদ্বিবরণ ময়মনসিংহ গীতিকার প্রথম খণ্ডে রূপবতী নামক আখ্যায়িকায় বর্ণিত হইয়াছে। আমরা বাধ্য হইয়া নায়ক, নায়িকা, রাজা ও বাদসাহের নাম রূপান্তর করিয়া ছাপাইয়াছি। কিন্তু ঘটনাটি সত্য। পূর্ব হইতে দেশে যে আবহাওয়া বহিতেছিল, হুসেন সাহ সেই দিকে পাল খাটাইয়া বঙ্গের বাদসাহের অন্তঃপুরে হিন্দুপ্রভাবের অল্পকূল গতি দ্রুততর করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সৈয়দ। এ দেশে তখন কুলগৌরব অত্যধিক ছিল। আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি এই কুলগৌরবই তাঁহাকে অতি সামান্ত অবস্থা হইতে মহোন্নতির সোপানে আরুঢ় করাইয়াছিল। ইনি নিজের কন্যাদিগকে পাঠানদের সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তখন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে ভাট্টাভীষণ কুলমর্যাদায় অগ্রগণ্য—তাঁহাদেরই একজন বঙ্গের রাজা ছিলেন এবং তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষ সকলেই সুদর্শন এবং শুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। একদা একটাকিয়ার রাজা মদন খাঁ তাঁহার দুই পুত্র কন্দর্প ও কামদেবকে লইয়া হুসেন সাহের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন, তাঁহাদের সুগঠিত গৌরদেহ এবং বিজ্ঞাবুদ্ধিতে কৃত্তিব দেখিয়া তিনি মদন খাঁর নিকট ইহাদের সহিত তাঁহার দুই কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, “আমি আপনার দুই পুত্রের ধর্ম নষ্ট করিব না, আপনি যদি গ্রহণ করেন আমার কন্যারা হিন্দু হইবে।” যাহা হইবার নহে, তাহা আর কি করিয়া হইবে? মদন খাঁর দুই পুত্র বাদসাহের কন্যা বিবাহ করিয়া অগত্যা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলেন। ইহার পর বাদসাহ মদন খাঁর রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতৃপুত্র সর্বসমেত ১১ জনকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহার বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়াইলেন। মদনের চতুর্থ পুত্র রতিকান্ত ভিক্ষুদিগকে প্রচুর উৎকোচ দিয়া বলাইলেন যে তিনি রাতে চোখে দেখেন না, স্বতরাং তিনি একটাকিয়ার রাজবংশের ঘৃণার সলিতাটির মত একাকী সেই পরিবারের গৌরব রক্ষা করিলেন। বাদসাহ রতিকান্ত সখকে বলিয়াছিলেন, “বুঝেছ বেহাই! যে অন্ধ সে হিন্দু থাকুক, বাহার চক্ষু আছে তাহার মুসল-মান হওয়াই উচিত।” সন্ন্যাস মহাশয় লিখিয়াছেন—“ইহার পর অনেক নবাব ও বাদসাহ একটাকিয়ার যুবক ধরিয়া তৎসহ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।” ঘটকদের পুস্তক হইতে জানা যায়, “২৯ জন একটাকিয়ার বংশধর মুসলমান রাজকুমারী বিবাহ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন (১০২ পৃঃ)।” ময়মনসিংহ গীতিকায় কালাপাহাড়ের যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তাহা মুসলমানের লেখা, মুসলমান রাজহুহিতা যে কি অদ্বুত কৌশলে ব্রাহ্মণযুবককে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত অতিরঞ্জিত বর্ণনা এই গীতিকায় আছে (পৃঃ ৬৪০-৬৪২)।

ঘটককারিকার ব্রাহ্মণবংশের আখ্যায়িকায় এইরূপ উল্লেখ কখনই করনাসম্মত হইতে পারে না। তাঁহারা নিজেদের বংশাবলীতে এই কলঙ্কের ছাপ নিজেরা কেন দিতে যাইবেন? পারসীক, যবন (গ্রীক), শক, হন প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিরা হিন্দুসমাজের উচ্চ গণ্ডিতে স্থান পাইবার অল্প চিরদিন লালায়িত ছিলেন, তাহা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু

মুসলমানেরা নব আভিজাত্যের ফলে অপরাপর জাতিকে উপেক্ষা করিয়াও হিন্দুর ব্রাহ্মণদিগের প্রতি শ্রদ্ধা হারান নাই। এখনও একজন ব্রাহ্মণকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে তাঁহারা বিশেষ গৌরব বোধ করিয়া থাকেন।

হিন্দু ও পাঠান প্রভৃতি মুসলমান শ্রেণীর সহিত রক্তের সম্বন্ধ একটা প্রবাদ-বাক্য নহে, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে, বহুল। আকবর মোগল রক্তের সঙ্গে রাজপুতের রক্ত-সংশ্লেষের পথ দেখাইয়া ছই জাতিকে মিলনের দিকে টানিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের বৈরুপ মেশামেশি হইয়াছিল, বোধ হয় ভারতের আর কোনও দেশে তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। পরীক্ষিতিকায় এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে।

মুসলমান বাদশাহেরা সময়ে সময়ে হিন্দু সাধুদের প্রতি বৈরুপ অহুবাগ ও ভক্তি দেখাইতেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, মুসলমান ঐতিহাসিকগণই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া

গিয়াছেন। একটির কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। বঙ্গাধিপ হিন্দু-মুসলমানে জাতি।
ইলাইস খাঁ (সামসুদ্দিন—১৩৫৩ খৃঃ) তখন দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ

খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। ফিরোজ পাণ্ডুয়া হইতে একডালা দুর্গ অবরোধ করিলেন। সামসুদ্দিন সেই দুর্গে ছিলেন। এই একডালা দুর্গের সরিকটে ভবানী নামক এক হিন্দু সাধু ছিলেন, সামসুদ্দিন তাঁহার অমুরজ ভক্ত। তিনি শুনিলেন সাধুবাবার দেহত্যাগ হইয়াছে, তখন সমস্ত বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া তিনি ফকিরের বেশে দুর্গ হইতে একাকী বাহির হইয়া সাধুর মৃত দেহের প্রতি সন্মান দেখাইবার জন্ত সাধুর আশ্রমে উপস্থিত হন। পথে সম্রাটের শিবির। সামসুদ্দিন তাঁহার গুরুদেবের শবের প্রতি শ্বেষ সন্মান দেখাইয়া সেই ছদ্মবেশেই ফিরোজ সার দরবারে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন, তৎপরে শনৈঃ শনৈঃ স্বীয় দুর্গে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সম্রাট তখন শুনিলেন তাঁহার প্রবল শত্রু, যাহাকে ধরিবার জন্ত তিনি ২২ দিবস বাবৎ একডালা দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন, তিনি ফাঁকি দিয়া তাঁহার মৃত গুরু দর্শন করিয়া, এমন কি তাঁহার শিবিরে ঢুকিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহিয়া গেলেন, তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা-পরিসীমা রহিল না। কিন্তু তিনি সামসুদ্দিনের দুর্দান্ত সাহসিকতা এবং অচলা গুরুভক্তির প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। পূর্ববঙ্গগীতিকায় মুসলমান গায়কগণ যে সৌভ্রাতের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি কি করিয়া এই ছই জাতি, মত ও ধর্মের এতটা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, শতাব্দীর পর শতাব্দী পরস্পরের চালে চালে ঠেকাঠেকি করিয়া বাস করিতেছেন। পীর বাতাসীর মুসলমান গায়ন স্বীয় গুরু জিন্দাগাজীর নিকট বর প্রার্থনাপূর্বক “মক্কা মদিনা বন্দুলাম কাশী গয়াধান” ইত্যাদি বন্দনা-গীতে হিন্দুর তীর্থগুলির প্রতি সন্মান দেখাইয়াছেন (৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩৪১-৩৪২)। নেজাম ডাকাইতের গীতিকার মুসলমান কবি তদেন্দীয় (চট্টগ্রামের) সমস্ত গ্রাম্য দেবতাকে পর্য্যন্ত প্রশংসা করিয়া গীতি আরম্ভ করিয়াছেন, উপসংহারে তিনি “সীতা শক্তি (সতী) মাকে মানি, রঘুনাথ গোসাই” প্রভৃতি পদ গাহিয়া “ছনিয়ার সার” পিতামাতার চরণ

বন্দনা করিয়াছেন (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ: ৩২৫)। চৌধুরীর লড়াই গীতিকায় মুসলমান গায়ের পশ্চিমে মক্কা মূল স্থানের উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া 'জগন্নাথ দেউ' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—
 "বন্দি ঠাকুর জগন্নাথ। ভেদ নাই, বিচার নাই, বাজারে বিকায় ভাত। চণ্ডালে রাখে ভাত ব্রাহ্মণেতে খায়। এমন সুখ দেশ জাত নাহি যায়। ভাত লইয়া তারা মুণ্ডে মুছে ভাত। সে কারণে রাইখাছে নাম ঠাকুর জগন্নাথ" (৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ: ৩১০)। শেষের দুইটি ছত্র পড়িয়া পরবর্তী ভারতচন্দ্রের—“চল ভাই নীলাচলে। খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাধায় মুছিব হাত, নাচিব গাহিব কুতূহলে।” প্রভৃতি কবিতার কথা সহজেই মনে হয়। আর একজন মুসলমান পল্লীকবি লিখিয়াছেন—“হিন্দু আর মুসলমান একই পিণ্ডের দড়ি—কেহ বলে আত্মা রত্নল কেহ বলে হরি।”

আফগান-প্রাধান্তের সময়ে হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ছিলেন, দুই জাতির মধ্যে আত্মীয়তা হইলে যদিও হিন্দুগণ সমাজ-বহির্ভূত হইয়া পড়িতেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি ও হিন্দুসমাজের প্রতি অনুরাগ বিস্তৃত হইতেন না। হসেন সাহের পুত্র নসরত সাহ মহাভারত কাব্যের বাঙ্গলা অনুবাদ করাইয়াছিলেন, উক্ত বাদসাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ মহাভারতের আর একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়া ছিলেন; সঙ্কলিতার নাম কবীন্দ্র পরমেশ্বর। পরাগল খাঁর পুত্র ছুঁটি খাঁ (চট্টগ্রামের শাসন-কর্তা) শ্রীকরণ নন্দী নামক কবি দ্বারা মহাভারতের অশ্বমেধপর্বের অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর সামসুদ্দিন ইউসুফ গুণরাজ খাঁ উপাধিদারী বসুবংশীয় মালাধর নামক কবির (কুলীনগ্রামবাসী) দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। বিজ্ঞাপতি “প্রভু গায়েসউদ্দিন সুলতান”কে প্রশংসাসূচক এই পদাংশ উপহার দিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি সুলতানের উৎসাহ পাইয়াছিলেন। এই গায়েসুদ্দিন কবি হাফেজকে পারস্য দেশ হইতে বাঙ্গলায় লইয়া আসিতে লালারিত ছিলেন। মিথিলার রাজ-সভার দীর্ঘায়ু কবি একাধিক গোড়েশ্বরের আহুকুল্য পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বিজ্ঞাপতি লিখিয়াছেন—“সে বে নসিরা সাহ জানে, যারে হানিল মদন বাণে, চিরজীব রহ পঞ্চ গোড়েশ্বর, কবি বিজ্ঞাপতি জানে।” যশোরাজ খাঁ নামক কবি হসেন সাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—
 “সাহ হসেন জগতভূষণ, ভনে যশোরাজ খানে।” স্বদূর চট্টগ্রাম হইতে এই সুরে সুর মিলাইয়া কবীন্দ্র পরমেশ্বর হসেন সাহকে কলিযুগের কৃষ্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এক্ষণ উদাহরণ অসংখ্য। আমার এ সকল কথা এখানে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে বাদসাহের পরিবারে হিন্দুললনার আমদানী হওয়াতে এবং এদেশের বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দু

বঙ্গভাষার আদর।

মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে বাদসাহী দরবারে বাঙ্গলা ভাষা আদর লাভ করিয়াছিল। হযত হিন্দুরাজ্য থাকিলে

এটি গটিতে পারিত না। বিজ্ঞার অর্গব্যানসদৃশ, দেব-ভাষার প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাবান টুলো পণ্ডিতগণের বাঙ্গলা ভাষার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার দরুন আমাদের দেশের ভাষা যে কোন কালে রাজদ্বারে প্রবেশ করিতে পারিত, এমন মনে হয় না। পাঠান-

প্রাধান্যকালে বাদসাহগণ একেবারে বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের দলিলপত্রও অনেক সময়ে বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হইত। শের সাহের কামানের উপর বাঙ্গলা অক্ষরে তাঁহার নাম ও উপাধি পাওয়া গিয়াছে। ২৩ শত বৎসর পূর্বে ত্রিপুররাজ্যের তাম্রশাসনগুলি বঙ্গভাষায় ও বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ হইত; সে সময়ে মুসলমানেরাই বাঙ্গলার এই বিস্তারের সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা হিন্দুর পুরাণ ও অপরাপর শাস্ত্রের মর্ম জানিবার জন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। সংস্কৃত সম্পূর্ণ অনধিগম্য এবং বাঙ্গলা তাঁহাদের কথা ভাষা ও সুখপাঠ্য ছিল, এজন্য তাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ তর্জমা করিতে উপযুক্ত পণ্ডিতদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হিন্দুর গান ও উৎসবাদি মুসলমান বাদসাহের দরবারে অবিরত উৎসাহ পাইত। এইভাবে কীর্তন শুনিবার স্পৃহাবশতঃ গোড়ের কোন সম্রাট আমাদের কবিসম্রাট চণ্ডীদাসের হত্যার কারণ হইয়াছিলেন।

রাজরাজড়ার সতত সংঘর্ষ ও নিরবধি যুদ্ধবিগ্রহাদি—উখানপতন প্রভৃতি রাজকীয় পতাকার নিত্য পরিবর্তনশীল অবস্থান্তর পল্লীসমাজকে একেবারেই স্পর্শ করে নাই। ব্রাহ্মণ তাঁহার খড়ো ঘরের মেজেয় মাত্র পাতিয়া খাগের কলম দিয়া তেরেট বা তালপত্রের উপর বেদবেদান্তের ব্যাখ্যা লিখিয়া যাইতেন; বৈয়াকরণ, তার্কিক, ও নৈয়ায়িক যখন স্বীয় স্বীয় গ্রন্থের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন, তখন তাঁহারা মুক্তকণ্ঠ হইয়া তন্মত প্রাপ্ত হইতেন। বিলাস তাঁহাদের বাড়ীরজি সীমানায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাঁহাদের খড়ো ঘরের চালার উপর অনাবুলতা ছলিয়া তাঁহাদের একান্ত উপেক্ষিত দারিদ্র্য ও সাংসারিক সিম্পৃহতা প্রমাণ করিত। কোন কোন সময় এক একটা রাজনৈতিক ঝড় বহিয়া যাইত সত্য, কিন্তু তাহার ফল বেশীদিন থাকিত না। দেশের বাণিজ্যাদির উপরও বাদসাহেরা কোনরূপ হাত দিতেন না। পাঠানেরা তরবারি লইয়া এদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এদেশে তরবারি তাঁহারা একদিনও পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা বাদসাহের বা তৎপ্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রয়োজনের জন্ত শরীরে বর্মচর্ম আটিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের জন্তই উদ্ভূত হইয়া থাকিতেন; ইহারা কৃষির কোন ধার ধারিতেন না। সুতরাং ধনশালী হিন্দুরাই

তখন কৃষিপ্রধান বাঙ্গলার একরূপ মালিক ছিলেন; শুধু কৃষি পাঠান-রাজত্বকালে হিন্দুদের নহে, ব্যবসায়-বাণিজ্য বাহা কিছু তাহা সমস্তই হিন্দুদের হাতে বাণিজ্য ও অর্থগম।

ছিল। ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন, “অধিকাংশ আফগানই তাঁহাদের জায়গীরগুলি ধনবান্ হিন্দুদের হাতে ছাড়িয়া দিতেন; গৃহস্থ তাঁহাদের কপালে বড় থাকিত না, কারণ প্রায়ই তাঁহাদের নেতাদের আফ্রানে তাঁহাদিগকে গৃহ ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইত, বিশেষ ইহাদের বাণিজ্যাদি কার্যের প্রবৃত্তি আদৌ ছিল না। এই জায়গীরগুলির ইজারা সমস্তই ধনশালী হিন্দুরা লইতেন এবং ইহারাই ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেন।” (ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গলা ইতিহাস, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৯১০ খৃঃ, পৃঃ ১২০।) এই সকল কারণে বঙ্গদেশে কোন স্বর্ণধনি না থাকিলেও মহাসমৃদ্ধির জন্ত এদেশ “সোণার বাঙ্গলা” উপাধি পাওয়ার যোগ্য হইয়াছিল। ষ্টুয়ার্ট সাহেব ১৪৮৯ খৃঃ অব্দের এবং তৎসম্বন্ধিত সময়ের

বঙ্গদেশসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “এই সময়ে বাঙ্গলার প্রধান ব্যক্তিত্বা খাওয়ার সময়ে স্বর্ণপাত্রের একটা জমকালো ঘটা দেখাইতেন, ইহা তাহাদের একটা রীতিতে দাঁড়াইয়াছিল। নিমন্ত্রণ-কালে কাহার একপ সোণার সরঞ্জাম বেশী তাহা লইয়া একটা গোরবের প্রতিঘন্দিতা চলিত” (১৩৪ পৃঃ)। এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। বাঙ্গলাদেশ কত যুগ ধরিয়া বাণিজ্য ও কৃষিতে জগতে সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া এই বিপুল স্বর্ণাগম করিয়াছিল তাহার পরিচয় পূর্ববঙ্গ-গীতিকায় পাঠকেরা পাইবেন। এই গীতিকাগুলি তাম্রশাসন, শিলালেখ বা মুদ্রার জায় ‘ইতিহাস’ নামে বাচ্য হইবার অধিকারী নহে, তথাপি সমাজের যে প্রতিবিম্ব তাহাতে পড়িয়াছে তাহা নিখুঁত। এই গীতিকবিতার ভাঙারে কত অলঙ্কারের উল্লেখ আছে, তাহা ছাড়া গৃহ ও নৌযানসজ্জায় যে প্রভূত স্বর্ণ ও মুক্তা ব্যবহৃত হইত তাহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভোজন ও পানীয়ের জন্ত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে স্বর্ণের পাত্র ব্যবহৃত হইত। বণিকবধূরা সর্বদাই সোণার জলের কলসী লইয়া দীঘি, পুষ্করিণী বা নদীর পাড়ে জল আনিতে যাইতেন; অর্ণবমানগুলির মাস্তুল স্বর্ণমণ্ডিত, এবং মণিখচিত জলটুকি, চৌচালা, আটচালা ঘরে প্রকাণ্ড আয়নার কপাট ও সোণা-রূপার কয়া প্রযুক্ত হইত।

এ দেশের বাশের ‘বারজয়ারী’ ঘর যে ঠিক একখানা সাজানো প্রতিমার জায় হইত, তাহা ফরিদপুর জেলার সারওয়ারজান মিল্লার বাঙ্গালা ঘরখানি-সম্বন্ধীয় দীর্ঘ বর্ণনায় সবিস্তারে বলা হইয়াছে। সে সময়ের যত ইষ্টকালয় প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই বিলুপ্ত, কিন্তু সেইরূপ করেকখানি ঘর কতকটা গোরব বিচ্যুত হইয়াও কালের সঙ্গে বৃদ্ধ করিয়া হয়ত কোন কোন স্থানে এখনও টিকিয়া আছে। পূর্ববঙ্গ-গীতিকায় দেখা যায় এক বণিক-শ্রেষ্ঠের এইরূপ ঘরে হীরামণির কালর শোভা পাইত এবং কয়া ও ধাম সোণারূপায় ঝলমল করিত, সোণার পাত দিয়া চাল ছাওয়া হইত। ময়ূরপুচ্ছ ও মাছরাঙ্গা পাখীর পাখা দিয়া অনেক সময়ে চালের নীচের দিক্‌টা সাজানো হইত। “ভেলুয়া” নামক গীতিতে বণিকরাজ মুরাইএর বাড়ীর কথায় লিখিত আছে—
“বড় বড় ঘর, তার আটচালা চৌচালা—আর সোণা দিয়া মুড়াইছে মাধারে। রূপাতে দিয়াছে ঠুনি, সোণার পাতে দিছে ছানি, টুয়ের মধ্যে রত্ন অলঙ্কার, হাজার বাণিজ্য নায় সাগর বহিয়া যায়—দেখিতে অতি চমৎকার রে।” (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৪১-৪২ পৃঃ)। আমরা মনে করিয়াছিলাম এই বর্ণনার সকলই উপকথা, কিন্তু বখন ফরিদপুরের এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীতে কতকটা এইরূপ ঘর দেখিতেছি, তখন মনে হয় না যে কবি সত্যের উপর খুব জোরসে তুলি চালাইয়া রং অতিরিক্ত পরিমাণে দিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু বখন অজস্রা গুহার পাথরের ছাদের উপর ছবির সহিত এই ঘরের গ্রন্থিস্থলে হস্তিগ্রাসকারী সিংহ, পরস্পরবদ্ধ নরহস্ত ও বিবিধ ফুল-লতায় একটা পরম ঐক্য দেখাইতেছে এবং বখন আমরাও কলাশিল্প-জাত নানারূপ প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছি—(বিশেষতঃ মুকুলবাবু প্রমাণ করিয়াছেন যে, অজস্রার কঙ্গিগণের মধ্যে অনেক বাঙ্গালী ছিলেন) তখন এরূপ সিদ্ধান্ত করা স্বাভাবিক যে সেই

শুভযুগের অপূর্ণ শিল্পী ও কন্ঠগণের বংশধরেরা অবস্থার নিদাক্ষণ বিপর্যয় সত্ত্বেও তাহাদের কার্যকার্যের পূর্ণ সংস্কার ভুলিয়া যান নাই।

এই শিল্পিকুল দেশের আদিম অধিবাসীরা। তাহারা দ্রাবিড়ী হউক বা দস্থ্যই হউক,—
যাহাদের বহুসংখ্যক বক্তি আৰ্য্যদের সঙ্গে মিশিয়া সমাজের নিম্ন গণ্ডীতে স্থান করিয়াছিল,
যাহারা খৃষ্টপূর্ব ৫০০০ শতাব্দীতে মহেঞ্জদোরো আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য দেখাইয়াছিল, তাহারাই কি
ভারতীয় লিপিমালার আদিপ্রবর্তক এবং এই যে নমঃশূদ্ররা “চাষা নাগরী” জানিত তাহারা
শিল্পীরা অনাথ্য।

কি সেই আদিম অধিবাসীদের বংশধর এবং বহুযুগ-পূর্বকার শিল্প-
সংস্কার বহন করিয়া আসিয়াছে? নতুবা মহা মহা পণ্ডিতগণ যে
ভাষা বৃষ্টিতে অক্ষম তাহা বৃষ্টিতে নমঃশূদ্রের নিকট শরণ লইবার হেতু কি? (৩৩-৩৪ পৃঃ।)
ইহাও একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা যে কাষ্ঠশিল্পী, সোণার, কণ্ঠকার প্রভৃতি শিল্পী,
যাহারা দেবমন্দির, দেববিগ্রহ ইত্যাদি রচনা করে, তাহাদের অনেকের জল হিন্দুসমাজের
আচরণীয় নহে, অথচ তাহাদের অপেক্ষা যাহারা নৌচকার্য্য করে, যথা কাহার, নাপিত—ইহাদের
জল আচরণীয়। এত গুণবত্তা থাকা সত্ত্বেও আদিম অধিবাসিগণ আৰ্য্যগণ্ডীতে উচ্চস্থান
প্রাপ্ত হন নাই, এজন্ত ধুবন্ধর শিল্পীদিগের পরিচয় রাক্ষস, দানব প্রভৃতি। স্বাধেদে দৃষ্ট হয়
আৰ্য্যদের সঙ্গে অনাৰ্য্যদের যখন সংঘর্ষ হয়, তখনও সেই শূদ্র অতীতকালে এদেশের
অধিবাসী অনাৰ্য্যদের বড় বড় প্রস্তর-গৃহ ও তুর্গাদি ছিল। বাৎস্তায়নের মতে সমস্ত
কলাশাস্ত্রের মধ্যে চিত্রবিজ্ঞাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এবংবিধ চিত্র-বিজ্ঞা আমরা নিম্নশ্রেণীর হস্তেই
পাইতেছি। সখ্ করিয়া বড়লোকেরা চিত্র ও স্থাপত্য-বিজ্ঞার অনুশীলন না করিতেন, এমন
নহে, কিন্তু কলাবিজ্ঞার মধ্যে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞা নিম্নশ্রেণীদেরই একচেটিয়া ছিল।* শুধু
চিত্র ও স্থাপত্য নহে—লেখকের বৃষ্টিটাও কতক পরিমাণে নিম্নশ্রেণীদেরই হাতে ছিল,
যদিও গণদেবতার উপরে এককালে এই বৃষ্টি আরোপ করা হইয়াছিল।

পাঠানদের সময়ে শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতিতে হিন্দুদিগেরই প্রধানতঃ অধিকার ছিল, যেহেতু
আফগানগণ নিরবধি রণক্ষেত্রে ও পরদেশ আক্রমণে ব্যস্ত থাকিতেন। হুই একজন ব্যতীত

পাঠান রাজারা শিল্পচর্চার
ভাবশ্চ হযোগ পান নাই।

এই যুগের মুসলমান সম্রাটগণ দেশের শিল্প বা স্থাপত্যের বিশেষ
কোন উন্নতি করেন নাই। যে সকল মুসলমান পশ্চিম হইতে
এদেশে আসিতেন, তাহারা স্বীয় ভূজবলে খজাহস্তে ভাগ্যের দ্বার
উন্মুক্ত করিতে আসিতেন, তাহাদের অধিকাংশই আফগান, তাহা ছাড়া, হাবসী, নিগ্রো,
খোজা, আরবি প্রভৃতি অন্ত্যাত্ম জাতীয় লোকেরাও এদেশে অনেক আসিয়া পড়িয়াছিলেন।
শের সাহ, হুসেন সাহ এবং অপর হুই এক জন বাদসাহ ছাড়া ইহাদের মধ্যে কেহই
শিল্পচর্চার সুযোগ পান নাই। পদ্মপত্রের জলের ত্রায় ইহাদের সিংহাসন ভাগ্য-বাগিধির

* ভারতচন্দ্রের অনুমানমতে ব্যাসদেব-কৃত বিশ্বকর্ম্মার প্রতি প্রতিশাপ এই যে তাহার পুত্রক শিল্পিকুল না
বাহিয়া মরিবে।

উপর টলমল করিত, এই সকল আবুহোসেন শিন্ন ও স্থাপত্যের চিত্রা কখন করিবেন ? বরঞ্চ সেই যুগে গুপ্তগৃহ, গুপ্তদ্বার, অনতিদীর্ঘ অন্ন প্রশস্ত গৃহ ও অন্তর, কোন কোন স্থানে হঠাৎ পর-আক্রমণকালে পলাইবার উপায়স্বরূপ জলনালী (Tunnel) প্রভৃতি রাজ-প্রাসাদের অঙ্গীয় হইয়াছিল। এমন কি হিন্দুরাও অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত তাঁহাদের মন্দিরে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সময়ের অধিকাংশ প্রাচীন মন্দিরেই প্রবেশদ্বার অতি সঙ্কীর্ণ, ত্রিপুরার সপ্তরত্ন মন্দিরের (কুমিল্লার অদূরবর্তী) উক্কে উঠিলে পথিক নীচে নামিতে পারিবেন না। এই উচ্চ মন্দিরের আগম ও নির্গম পথ একটা ছরস্ত হইয়ালা। বহুদিন যাতায়াত না করিলে সেই রহস্তের সমাধান হয় না। এইরূপ মন্দির পাঠানাদিকারের সময়ে বহু হইয়াছিল, গোড়ের "লুকোচুরী" তোরণ দুর্গ, মুসলমানদের কৃত, উহা এইরূপ একটা রহস্ত। উহার উদ্ধৃত্তরের স্থাপত্য ছত্রপুরের সুবিখ্যাত "রাজগড়" দুর্গের কথা শ্রবণ করাইয়া দেয়। এই সকল মন্তব্য লিখিয়া আমরা বলিতে বাধ্য এখনও এদেশে পাঠান-যুগের শিন্ন ও স্থাপত্যের বহু নিদর্শন রহিয়াছে। গুপ্ত, পাল ও সেন-যুগের কথা মনে হইলে পাঠান-যুগের শিন্নের স্বরূপ তুলনায় শ্রীহীন মনে হইবে ; কিন্তু তাই বলিয়া তাহা কখনই উপেক্ষণীয় নহে।

ইহা নিশ্চয় যে পূর্বকালের দেশীয় স্থপতি ও শিল্পবিশারদগণই গোড়ের রাজপ্রাসাদ, দুর্গ ও মসজিদ প্রভৃতি নির্মাণ করিতেন। বঙ্গের চিরপ্রসিদ্ধ "বারহুয়ারী ঘর," বাহার কথা মসজিদ-রচনা হিন্দু শিল্পী।

মত ছাদবিশিষ্ট বাঙ্গালা ঘর—যাহা বঙ্গীয় মস্তিষ্ককর্তৃক প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল,—গোড়ের ও পাণ্ডুয়ার নবাবদের কীর্তির মধ্যে তাহারই নমুনা বেশী পাওয়া যায়। গোড়ের সোণা মসজিদ এখনও বারহুয়ারী মসজিদ নামটি রক্ষা করিয়াছে। ইহা বাঙ্গালার নিজস্ব স্থাপত্য। ইহা ছাড়া রাজসাহীর "বাঘার মসজিদ," গোড়ের "হুসেন সাহের মসজিদ" এবং "চাঁদ দরওয়াজা", তধাকার "জানজান মিকার মসজিদ", সাঙ্গারামের ইসলাম সাহের সমাধিস্থান প্রভৃতি মসজিদগুলিতে উৎকীর্ণ আরব লিপি ভিন্ন বঙ্গে বিদেশীয় স্থাপত্য-প্রভাব খুব অল্পই দৃষ্ট হয়। গোড়ের "কদম রহুল" বা "কদম শরীফ"টি ঠিক হিন্দু মন্দিরের মতই, উক্কে একটি গম্বুজ রচনা করিয়া উহাকে মুসলিম ছাপ দেওয়া হইয়াছে। লোটন বা নোটন মসজিদটি গোড়ের একখানি বাঙ্গালা ঘরেরই অন্তর্করণে নির্মিত। গোড়ের ভাস্কর্যের নিদর্শনস্বরূপ কলিকাতার চিত্রশালায় যে প্রস্তরখণ্ডের রাখালদাসবাবু তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৭৬ পৃষ্ঠায় স্থান দিয়াছেন তাহার ফুল-পল্লবের সূচক কার্য্যও বোধ হয় অমরাবতীর শিল্পীদের বংশধরগণ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। মঙ্গলকোটের নূতন হাটের মসজিদটি হিন্দুর প্রাচীন মন্দিরাদির লক্ষণাক্রান্ত। ত্রিবেণীর জফর খাঁর সুপ্রসিদ্ধ মসজিদ এখনও একটা দর্শনীয় সামগ্রী, এই মসজিদ একটি হিন্দু মন্দির ভাস্কর্য্য রচিত হইয়াছিল। দেব-দেবীর চিত্র পশ্চাদ্দিগের আন্তর থুলিলেই ধরা পড়ে। এই মসজিদের কোন কোন স্থলে হিন্দু মন্দিরের প্রাচীন অংশ পুনর্নির্মিত হয় নাই, যেমনটি ছিল সেই ভাবেই রক্ষিত আছে।

বঙ্গদেশের অনেক স্থলেই প্রাচীন হিন্দু মন্দির ছাড়িয়া মুসলমানগণ এইভাবে মসজিদ রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল মসজিদ তো হিন্দু মন্দিরের মালমশলা দিয়াই রচিত হইয়াছিল; পরন্তু সম্ভবতঃ দেশীয় যে সকল শিল্পিগণ ঐ সকল প্রাচীন মন্দির রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদেরই বংশধরগণ অনেক স্থলে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া অথবা কোন কোন স্থলে স্বধর্মে থাকিয়াও সেই সকল মসজিদ রচনা করিয়াছিলেন, মোগলেরা পারস্ত হইতে যে শিল্পপ্রভাব আনিয়াছিলেন, তাহা তখনও বাঙ্গলায় প্রবেশ করে নাই। ১৫৭৬ খৃঃ অব্দের পরে সেই হাওয়া কিছু কিছু এদেশে ঢুকিয়াছিল, তাহা পরে উল্লেখ করিব। হাভেল সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন—ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধগণ এসিয়ার চিত্র ও স্থাপত্য শিল্পের গুরু। পারস্তের শিল্প ও বিদেশী মসজিদগুলির স্বল্প কাজ ও গঠনপ্রণালী সমস্তই মুসলমানগণ বৌদ্ধশিল্পীর নিকট পাইয়াছেন। আর্য্য বর্ষে এই শিল্প ও স্থাপত্য যেরূপ বিকাশ পাইয়াছে, খাস পারস্ত দেশে তাহা হইতে পারে নাই। বৌদ্ধগণের পদ্ম-চিহ্ন লোপ করিয়া মুসলমানেরা যে গম্বুজ রচনা করিয়াছেন, তাহাও এদেশেরই স্থাপত্য হইতে নেওয়া। ভারতবর্ষের বহু শিল্প ও স্থাপত্য-বিশারদ মুসলমানদের বিজিত দাসরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশে চালান হইতেন। তাহারা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইতে বাধ্য হইলেও তাহাদের তুলি ও বাটালি হিন্দু শিল্পের কুশলতা-বিচ্যুত হয় নাই।

পাঠান-প্রাধাত্য যুগের মুসলমানী মসজিদ ও প্রাসাদাবলীর মধ্যে শের সাহের সমাদি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। শের সাহের বালালীলা-ক্ষেত্র সাসারামে এই সমাদিটি উন্মিত হইয়াছিল। এই সমাদির উর্দ্ধ গম্বুজটি ছাড়িয়া দিলে ইহার অনেকটা একটি হিন্দু রথের অনুরূপ, তফাৎ এই যে ইহা রথের মত বেমানান দীর্ঘ হইয়া উঠে নাই। ছই দিকে সমতা-সহকারে প্রসারিত করিয়া ইহার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের এমনই একটি সুসামঞ্জস্য রক্ষা করা হইয়াছে যে উহা উত্তর কালে শিল্প-স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ পরিণতির আদর্শ তাজমহল-পরিকল্পনার পূর্বাভাস দেখাইতেছে। এই মন্দিরের চারিদিকে কৃত্রিম হ্রদের বিস্তৃত জলরাশি এক মাইল ব্যাপক, তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর কয়েকটি সমাদি-মন্দির আছে। সেই বিস্তৃত জলরাশির উপর প্রবমান জলযানের মত দূরবর্তী স্বল্পায়তন সমাদিমন্দিরের উর্দ্ধে শ্রামতরাজির অবকাশে এই সুরহং মন্দিরটি তাহার একক রাজত্বের মহিমা দেখাইতেছে। ইহা দেখিয়া একজন ইংরাজ কবি মুগ্ধ হইয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছেন (Asiatic Miscellany) তাহার অনুবাদ আমি নিম্নে দিলাম—

স্বচ্ছ নীর হতে উর্দ্ধে মহিমা-প্রকাশ
সুবিশাল গৃহচূড় ছুঁইছে আকাশ;
উপকূল বেড়া ছোট সমাদি-মন্দিরে
বিখণ্ড সৈনিক বেন ঘিরে আছে বীরে।
সম্রাট একক, তাঁর অখণ্ড বৈভব
মৃত্যুতেও হারায়নি স্বাতন্ত্র্য-গৌরব।

মুসলমান নবাবদের অনেকেই খামখেয়ালী ছিলেন। বাঙ্গলাদেশ আপেক্ষা দিল্লীর অঞ্চলে সময়ে সময়ে দৌরাখ্যটা খুব প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। সম্রাট আলাউদ্দিন হুসু

খামখেয়ালী সম্রাটগণের
হত্যাকাণ্ড।
পাগল ছিলেন, তাঁহার মস্তিষ্ক হইতে কত যে নূতন নূতন আইন-
কানুন উদ্ভাবিত হইত, তাহা কবির কল্পনায়ও আসে না।

“সুলতান” তাঁহার রাজধানীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা নিবারণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পরের গৃহে যাতায়াত করিতে পারিতেন না, পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে পারিতেন না। তাঁহাদিগকে সভাসমিতি করিতে দেওয়া হইত না। রাজার অমুমতি ভিন্ন তাঁহাদের মধ্যে কোন বিবাহ হইতে পারিত না। তাঁহারা স্বগৃহে কোন বিদেশী লোককে স্থান দিতে পারিতেন না। চারিদিকে এত গুপ্তচর ছিল যে তাঁহারা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে ভয় পাইতেন। তাঁহাদের মধ্যে ভাব-
বিনিময়ের কোন সুযোগ ছিল না। যদি তাঁহারা কোন হোটেলে বা সরাইতে একত্র হইতেন, সেখানে তাঁহাদের মুখব্যাধান করিবার ক্ষমতা ছিল না, পরস্পরের ছুখের কথা বলা অসম্ভব ছিল (তারিকি ফিরোজ সাহী)। যেখানে মুসলমান আমিরদের উপরই এইরূপ আইন জারি হইত, সেখানে হিন্দুরা যে কি কষ্টে ছিলেন তাহা অমুমান করা যাইতে পারে। “হিন্দুরা বাড়ীতে ঘোড়া রাখিতে পারিত না, তাহাদের ভাল কাপড় পরিতে দেওয়া হইত না—কোন বিলাস সম্ভোগ করিতে পারিত না। কোন হিন্দু মাথা উঁচু করিয়া রাস্তায় হাঁটিতে পারিত না—তাহাদের গৃহে সোণ-রূপার কোন সামগ্রী রাখিতে দেওয়া হইত না।” সুলতান মহম্মদ টোগলকের দৌরাখ্য একরূপ অকথ্য। এক সময়ে (১৩৪২ খৃঃ) তিনি আদেশ করিলেন—
“তিন দিনের মধ্যে সমস্ত দিল্লীবাসীকে নগর ছাড়িয়া যাইতে হইবে। অবশ্য অনেকেই সম্রাটের ভয়ে দিল্লী ছাড়িয়া দৌলতাবাদে পলাইয়া গেলেন, কিন্তু কয়েকজন রহিয়া গেলেন—
তাঁহারা লুকাইয়া গৃহ-মধ্যে রহিলেন। সম্রাট অতি কঠোরভাবে তাঁহাদের সন্ধান লইতে লাগিলেন। সম্রাটের চরেরা একটি পশু ও একটি অন্ধকে রাস্তায় পাইয়া কুড়াইয়া আনি। সম্রাট সেই পশুটাকে প্রাসাদশিখর হইতে গুলি করিয়া মারিলেন এবং অন্ধকে হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে টানাইয়া আনিলেন। দিল্লী হইতে দৌলতাবাদ ৪০ দিনের পথ। এই সমস্ত রাস্তাটা অন্ধকে টানিয়া আনার ফলে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রাস্তায় কাটিয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে পড়িতে চলিল। যখন দৌলতাবাদে এই লোকটার অবশিষ্ট অংশ আনা হইল, তখন দেখা গেল হতভাগ্যের মাত্র একটি পা সেই নগরে পৌঁছিয়াছে। (ইবন বতুতুর ভ্রমণ)। তাইমুর দিল্লীতে হিন্দুদের উপর যে রূপ হত্যাকাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহা লোমহর্ষণ। “তিনি আদেশ করিলেন, যে মুসলমান যতগুলি হিন্দু বন্দী করিয়াছে, সেই সকল বন্দীর সকলটিকে সে আদেশমাত্র হত্যা করিবে, নতুবা তাহাকে হত্যা করা হইবে। ইসলামের বীরপুরুষেরা এই আদেশ শ্রবণমাত্র তাহাদের খড়্গ কোষ হইতে বাহির করিয়া সমস্ত বন্দীদের নিশ্চল করিল, একদিনে একলক্ষ কাফের নিহত হইয়াছিল। একটি আমির রাজসভায় তাঁহার পাণ্ডিত্য, চরিত্র ও দয়াদাক্ষিণ্য-গুণে সকলের আদৃত ছিলেন, তিনি জীবনে

একটি চড়ুই পাখীও মারেন নাই, সেই স্বর্ণীয় দিবসে তিনিও স্বহস্তে ১৫টি হিন্দু বন্দীর শির কণ্ঠন করিয়াছিলেন (তাইমুরের আত্মবিবরণী)। ভূনেনয়ারার আকবরের জীবনচরিতে উল্লেখিত আছে, বখন মুসলমান রাজকর্মচারী হিন্দু প্রজার নিকট কর আদায় করিতে যাইতেন তখন সেই কাফেরকে হাঁ করিতে হইত, কারণ রাজকর্মচারীটি যেন তাহার মুখে থুতু নিক্ষেপ করিতে পারেন, এই ছিল আইন; ইহার উদ্দেশ্য “ইসলাম ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি এবং আশ্রিত কাফেরগণের বশুতার পরীক্ষা করা।” দিল্লীর বাদসাহগণের বে কতরূপ খামখেয়ালী ছিল তাহার অবধি নাই। একজন (সেকেন্দর লোডি—১৪৮৮-১৫১৮ খৃঃ) তাহার আমির বা অতিথিদিগকে কি কি দ্রব্য খাইতে দিতেন, তাহার ফর্দ নিজে করিয়া দিতেন, একবার যাহা করিলেন তাহা যেন পাণ্ডরের দাগ হইত—“হাকিম নড়ে, তো হকুম নড়ে না।” গ্রীষ্মকালে জোয়ানপুর হইতে এক সম্ভ্রান্ত অতিথি তাহার সঙ্গে দেখা করিতে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। সে সময়টা অতি দারুণ গ্রীষ্ম এবং লোকজন সারাদিন তৃষ্ণায় ছটফট করিতেছিল। সুলতান সেই অতিথির সমস্ত খাওয়ার ব্যবস্থা ও বরাদ্দ করিয়া শেষে তাহার জন্ত ছয় জালা সরবৎ মঞ্জুর করিলেন। তারপর সেই অতিথি শীতকালে আবার আসিলেন, তখনও দেখিলেন তাহার জন্ত সেই ছয় জালা সরবতের ব্যবস্থা রহিয়া গিয়াছে (তারিকই দাউদি)।

দিল্লীখরগলের এই খামখেয়ালী ও অত্যাচারের হাওয়াটা বাঙ্গলায়ও আসিয়া পৌছিয়াছিল। বিশেষতঃ পাঠান জাতির স্বভাবতঃই নির্ধর্ম ছিলেন। আমাদের কোন ইতিহাস নাই, সুতরাং সেই সময়ের অত্যাচার-কাহিনী লিপিবদ্ধ হয় নাই। তবে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করিলে মাঝে মাঝে এই অভিশপ্ত দেশের অবস্থার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। বাহারা ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া পুস্তক লিখিতেন, তাহারাও স্পষ্ট করিয়া এসকল কথা লিখিতে সাহসী হইতেন না। প্রবল শাসনকর্তাদের অত্যাচারের কথা সেই দেশের লোকেরা লিখিতে স্বভাবতঃই ভয় পাইয়া থাকে। ভয় পাইয়াই বোধ হয় বৈষ্ণবগণ আইন করিলেন, কোন নিতান্ত কষ্টকর কথা লিখিতে নাই।

বঙ্গদেশে পাঠান রাজত্বের শেষকাল ও মোগলদের আবির্ভাব—এই সময়টায় প্রজারা কাজীদের হাতে অত্যন্ত বিড়ম্বিত হইত। এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে কবি চন্দ্রাবতী যথাযথ চিত্র দিয়াছেন—

“টাকা পয়সা রাখে লোকে মাটিতে পুঁতিয়া ।
ডাকাত কাড়িয়া লয় গামছা মোড়া দিয়া ॥
ডাকাত দেশের রাজা পাতসায় না মানে ।
উজাড় হইল রাজ্য কাজীর শাসনে ॥
দোছক পাইয়া সবে ছাড়ে লোকালয় ।
ধনেপ্রাণে মরে লোক চন্দ্রাবতী কয় ॥”

কাজীদের সঙ্গে সহযোগে ডাকাতেরা দেশ লুটতরাজ করিত। কেনারাম এবং নেজামত প্রভৃতি দস্যুদের যে চিত্র পল্লী-কবিদের হাতে ফুটিয়াছে, তাহা পড়িলে প্রাণ আতঙ্কিত হইয়া উঠে।

পূর্ববঙ্গে হিন্দুরাজত্বের অবসানে ও গাজিদের প্রথম অভ্যুদয়ে দেশে এইরূপ অরাজকতা আরম্ভ হইয়াছিল, বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে তাহার চিত্র দেওয়া হইয়াছে। “যাহার মন্তকে দেখে তুলসীর পাত। হাতে গলায় বাঁধি লয় কাজির সাফাং। কক্ষতলে মাথা খুইয়া বহু মারে কিল। পাথর প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল। পরেয়ে মারিতে পরের কিবা লাগে বাধা। চড়াপড় মারে আর ঘাড়ে গোতা ॥”—“ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে। কার পৈতা ছিঁড়ে কারো থুথু দেয় মুখে।” “ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা বৈসে অতিশয়। ঘরেতে গোময় না দেয় ছুর্জনের ভয়।” “বাঁছিয়া ব্রাহ্মণ লয় পৈতা যার কাঁধে। পেয়াদাগণ লাগ পাইলে হাতে গলায় বাঁধে।” হুসেন সাহ একটা ভবিষ্যৎ বাণী শুনিলেন যে, “নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ আবার রাজা হইবে।” মন্ত্রীরা বলিলেন—পুরাণে ও গন্ধর্ব্বশাস্ত্রে এরূপ কথা লিখিত আছে বটে; বিশেষ নবদ্বীপের লোকেরা বলশালী ও দম্বু চালনায় পারদর্শী।” তখন হুসেন সাহ নবদ্বীপ ধ্বংস করিতে আদেশ করিলেন। “পিকল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ। বিষম পিকল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে” ইত্যাদি। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, মুসলমানেরা বাদসাহের আদেশ পাইয়া নবদ্বীপে বিষম অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। “কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে। ঘরদ্বার লোটে আর লৌহপাশে বাঁধে।” অত্যাচারীরা অখণ্ড ও মনসা গাছের মূলচ্ছেদ করিয়া ফেলিল ও তুলসী গাছ মূলশুদ্ধ উপাড়িয়া ফেলিতে লাগিল। যে ঘরে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিত, সে ঘরে বাইয়া উৎপাত সুরু করিত। গঙ্গাঙ্গান নিবিদ্ধ হইল, দেবালয়গুলি চূর্ণ করিল,—পণ্ডিতগুলিকে ধরিয়া জোর করিয়া মুসলমান করা হইতে লাগিল। বাহুদেব সার্কভোম পলাইয়া পুরীতে আসিলেন, তথায় রাজা প্রতাপ-রুদ্র তাঁহাকে স্বীয় সভায় রত্নসিংহাসনে বসাইয়া সম্মান করিলেন। তাঁহার পিতা বিশারদ কান্দিবাসী হইলেন। বাহুদেবের ভ্রাতা বিজ্ঞাবাচস্পতি মহাশয় গোড়দেশে চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই অত্যাচার বেশী দিন চলে নাই। হুসেন সাহ বুঝিলেন, এরূপ ভবিষ্যৎ বাণীর কোন মূল্য নাই, তখন সেই অত্যাচার নিবারণ করিয়া দিলেন। বিজ্ঞাবিরিকি, বিজ্ঞারণ্য এবং ভট্টাচার্য্য, শিরোমণি ও অপরাপর মহাজনেরা যাহারা নবদ্বীপ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা নবদ্বীপে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। খামখেয়ালী নবাবগণের ওদার্যাও নিষ্ঠুরতার মতই অত্যধিক ছিল। হুসেন সাহ যে সকল হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়াছিলেন, তাহা রাজকোষের অর্থদ্বারা পুনরায় সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন।

যখন বাঙ্গলাদেশ প্রথম পাঠানদিগের অধিকৃত হয়, তখন এই ভাবে অত্যাচার কতক দিন চলিয়াছিল। তারপর রাজাদের মধ্যে যাহারা খামখেয়ালী তাঁহারাও মাঝে মাঝে এই অত্যাচারের অন্তর্য্যাস্তন করিয়াছিলেন। শের সাহের জবরদস্ত শাসনে কতক দিনের অন্তর এই অত্যাচার বন্ধ ছিল। কিন্তু মোগলরাজ্য-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার অত্যাচার সুরু

হইয়াছিল। দামুস্তার কবি মুকুন্দ ডিহিনার মামুদ সরিফের যে অত্যাচারের বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে গ্রামগুলি উজ্জয় বাইবার মধ্যে আসিয়াছিল। হিন্দু আমলে রাজকর্মচারীরাও যে এরূপ না করিতেন তাহা নহে। রাজা মাণিকচন্দ্রের বাঙ্গালী মন্ত্রী জিয়াফলাপ ও ডিহিনার মামুদ সরিফের অত্যাচার প্রায় এক শ্রেণীর। খিলভুমি আবাদি বলিয়া লিখিত হইল, তাহার উপর রাজস্ব নির্দিষ্ট হইল। কুবকেরা, একদিকে বাজারে জিনিষের মূল্য অত্যন্ত হ্রাস পাওয়াতে এবং প্রত্যেক টাকার মূল্য ৮/১০ আনা হওয়াতে, ছই দিক্ দিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। জিনিষের দাম তথ্যপ্রতি ৮/০ কমিয়া গেল। প্রজারা বীজ ধান ও গরু বিক্রয় করিয়া ডিহিনারের দাবী মিটাইতে পারিল না। এদিকে গ্রাম হইতে পালাইয়া বাইবার উপায় নাই। পথে পথে কোটালগণ রাস্তা বন্ধ করিয়া পাহারা দিতে লাগিল এবং প্রত্যেক বিধা পাঁচ কাঠা কম করিয়া হিসাব করা হইতে লাগিল। বাহার দশ বিধা জমি ছিল তাহার হইয়া গেল সাড়ে সাত বিধা; বাকী রাজ-সরকারে জমা হইল। মুকুন্দরামের এই চিত্রের সঙ্গে ষাদশ শতাব্দীর মৈমনসিংহ ("ভাটি")-বাসী বাঙ্গালী মন্ত্রীর অত্যাচারের কাহিনী মিলাইয়া পড়ুন। উভয়ের কার্যকলাপের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পাইবেন।

মুসলমানেরা বিলাস-ক্ষেত্রে এবং রাজপ্রাসাদ-সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ই একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। হিন্দুদের সেই মহাপাত্র, নিশাপতি, মন্ত্রী প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের পদবী উঠিয়া গিয়া উজির, নাজির, সেরেস্তাদার, কাজি, ওয়রাহ, জমানবিশ, খাসনবিশ, তালুকদার প্রভৃতি নানা পারসী ও আরবী-সম্বৃত্ত নাম রাজসভায় প্রচলিত হইল। গৌড়েশ্বরগণের সভায় সেই অস্থপতি, গজপতি, নরপতি, রাজত্ৰয়াধিপতি, বিবিধবিজ্ঞা-বিচার-বৃহস্পতি, আর্ধ্যকুল-কমলভাস্কর, সোম বা সূর্য্যবংশপ্রদীপ, প্রতিপন্ন-কর্ণ, সত্যব্রত গান্ধেয়, শরণাগতবক্ষঃপঞ্জর, পরমেশ্বর-পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি সংস্কৃতাত্মক কোন উপাধির চিহ্নমাত্র রহিল না। এমারত, ঝাড়, দেয়ালগিরি, ফাহুস, আতর প্রভৃতি বিদেশী শব্দ সমাজের উচ্চস্তরের বিলাসীদের ভাষা হইল। সহরে হিন্দুর ভাষা দীরে দীরে মুসলমানী ছাপ গ্রহণ করিয়া পরাধিকারের প্রভাব সপ্রমাণ করিল। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে হিন্দুদের অবাধ রাজত্ব—সেখানে আরতির মেটে প্রদীপটি হইতে তুলসীতলা, চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু, আকাশ-ঘেরা কুটিরটি পর্য্যন্ত সমস্ত কথাই বাঙ্গলা রহিয়া গেল। পাঠান আমলে হিন্দু সহর ছাড়িয়া দিয়া এই পল্লীতে রাজত্ব করিয়াছে। পল্লীতে বসিয়া পণ্ডিতেরা মেটে প্রদীপের সাহায্যে বড় বড় ভায়দর্শনের টীকা করিয়াছেন। পটুয়ারা অজস্তার শেষ চিত্র বজায় রাখিয়াছে, যেহেতু তাহাদের আলপনা ও কাঁথার মধ্যে যে সকল কথা আঁকিয়াছেন তাহা অমরাবতীর চিত্রশিল্পের শেষ নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের পুঁথিতে শিল্পিগণ বিচিত্র ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন, কাঠের মলাটে গালা দিয়া লাল রংএর জমি তৈরী করিয়া তাহার নিপুণভাবে দেবতাদিগের পৌরাণিক লীলা অঙ্কন করিয়াছেন। ছুতোরেরা তাহাদের কর্ণে অজস্তা, গাঁচি, অমরাবতী ও মগধের সমস্ত শিল্পের শেষ নমুনা

রাজসরকারে ও বিলাসের
কক্ষে বিদেশী ভাষার
প্রভাব।

রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়াছে এবং মন্দির-নিৰ্মাণকারীরা পোড়া ইটের গায় যে সমস্ত জীবজন্তু,

পানী খায় তার বজায়
রাখিয়াছে

নরনারী ও ফুললতার চিত্র উৎকীর্ণ করিয়াছে, তাহাতে শিল্পলক্ষীর

অভয়বাণী শোনা যায়। তিনি যেন বলিতেছেন—“বাজলার

নগর সহর হইয়া গিয়াছে—সেখানে আমার স্থান নাই; কেবল

অর্থের ছড়াছড়ি, অর্থ আমাকে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাজলার পল্লীতে এখনও তপস্তা

চলিতেছে—আমি সেই তপস্বীদিগকে এখনও ছাড়িতে পারি নাই।” ফুললতার কঙ্কার

বাহাদুরী বাজলার প্রত্যেক মন্দিরে পাওয়া যায়। তাহার অধিকাংশই মোগলাধিকারের

কিঞ্চিং পূর্বের। পাঠান আমলের শেষ দিকে ২০০ বৎসর পূর্বে বাজলার প্রায় প্রত্যেক

প্রাচীন পল্লীতে শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বিগ্রহ বড় বেশী পাওয়া যায় না। বিগ্রহের

নাম শুনিলেই বিগ্রহবিরোধী দল আসিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিত, লিঙ্গ ভাঙ্গিতে তাহাদের

ততটা উৎসাহ ছিল না। এই জন্ত অধিকাংশ মন্দিরেই লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা হইত। এই সকল

মন্দিরে দেবলীলা এবং নানাপ্রকার সামাজিক চিত্র অঙ্কিত থাকিত। কিন্তু ইহাদের

বাহার ছিল কঙ্কায়। প্রত্যেকটি মন্দিরে বিভিন্নরূপ কঙ্কা, এক মন্দিরেই ফুল ও ফুল বিবিধ

প্রকারের কঙ্কা। এই কঙ্কার কত আদর্শ যে কারিগরদের মাথায় ছিল, তাহা বলা যায় না।

এই অফুরন্ত কঙ্কার আদর্শ যেমন আমরা মেয়েদের কাঁধায় পাই, তেমন মন্দিরগাত্রে পাই।

আমার ঐশ্বর্য বিশ্বাস, মন্দির সাজাইবার ভার সমস্ত আখ্যাবর্তে এমন কি দাক্ষিণাত্যেও বাঙ্গালী

শিল্পীরা জোগাইত। এই বাঙ্গালী শিল্পীরাই মগধের প্রসিদ্ধ শিল্পীদের বংশধর। মগধ-

মন্দিরগাত্রে চারুশিল্প।

গৌরব নষ্ট হওয়ার পরে গৌড়ের প্রভুত্বকালে সেই শিল্পীরা

বাজলার আসিয়া বাস করিয়াছিল। তিন চারি শত বৎসর হইতে

দুই শত বৎসর পূর্ব পর্যন্ত বাজলার শত শত মন্দিরগাত্রে যে কঙ্কার অপূর্ণ মৌলিক শোভার

ছড়াছড়ি দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, বলোরা বেক্রপ গোলাপের জন্মস্থান—বাজলাদেশ

তেমনই চারুশিল্পকলার জন্মস্থান—এখানেই কলালক্ষীর সিংহাসন ছিল। আপনারা মাটি

খুঁড়িয়া অশোকস্তম্ভ ও তাহার রাজপ্রাসাদ আবিষ্কার করিয়াছেন, বাজলার শিল্পলক্ষীর

রাজধানী খুঁজিতে আপনাদের মাটি খুঁড়িতে হইবে না। প্রত্যেক বাঙ্গালী মেয়ের পদ্মহস্তে

সেই পদ্মাসনার করকমলের সুরভি পাইবেন, প্রত্যেক মন্দির-রচকের বাটালী ও ক্ষুদ্র যন্ত্রিকার

অগ্রে তাঁহার চরণকমলের ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, নতুবা এত পদ্ম ফুটিয়া উঠিবে কিরূপে।

আমি উৎকৃষ্ট কঙ্কাগুলির ফটোগ্রাফ পাইলাম না, তাহারা অনেক স্থলেই দূরে অবস্থিত।

আমি বৃদ্ধ—সঙ্গতিহীন, চেষ্টা সত্ত্বেও সেগুলি পাইবার উপায় করিতে পারিলাম না। আমার

প্রিয়তম দেশবাসীদিগের এ বিষয়ে কৌতুহল উদ্বোধন করিয়া আমি বেহালা, বড়িবা প্রভৃতি

নিকটবর্তী স্থানের কয়েকটি মন্দিরগাত্র হইতে কঙ্কার নমুনা দিতেছি। যুরোপীয় শিল্পকারের

মত আমাদের দেশের শিল্পকারেরা নকলবাজ নহেন। ঠিক একটি ফুল দেখিয়া ফুল আঁকা;—

অল্প কিছু শিল্পবিষ্ঠার বর্ণনামাত্র জানিলেই এই নকল কার্যটি অতি সহজে শেখা যায়। কিন্তু

যে শিল্পী সমস্ত পুষ্পজগৎকে হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া তাহার সৌন্দর্য উপভোগ করিতে

পারিয়াছেন, তিনি ভগবানের সৃষ্টি ভাদিয়া চুরিয়া নূতন সৃষ্টি করিবার দক্ষতা লাভ করেন, তখন জগতের বিবিধ বর্ণশোভা তাঁহাকে বর্ণ আকিয়া শেখায়, জগতের দাবতীয় ফুল-লতা তাঁহার নবসৃষ্ট ফুল-লতার মধ্যে অপকৃপ মাধুরী ঢালিতে শক্তি দেয়। এই মৌলিক সৌন্দর্যের উপলব্ধি লইয়া ভারতীয় শিল্পী অবাধে আকিয়া যান। তিনি যে পদ্য আঁকেন, তাহা জগতের পদ্য নহে, তাঁহার আঁকা লতা জগতে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁহার অপূর্ণ প্রতিভা তাঁহার হাতে অবাধ গতি প্রদান করে, বর্ণের বিস্তার দিয়া কাঁধার শোভা চিত্র হরণ করে। হয়ত ছবিগুলি একটি একটি করিয়া দেখিলে তেমন কিছু আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমগ্রভাবে এই অপূর্ণ কারুকার্য্য দেখিলে মনে হইবে,—একি আশ্চর্য্য রংমহাল, ইহাতে রঙ্গের বিচিত্র বিস্তার, কলালগ্নীর কি অপূর্ণ ও গৌরবান্বিত মহিমাই না এই অপার্থিব ফুল-লতার প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছে। ভারতীয়, বিশেষতঃ বঙ্গীয়, শিল্পীর যে সহিষ্ণুতা, তাহার উদাহরণ অল্প কোথাও নাই। এই জন্ত বাঙ্গালী শিল্পী ছবি আঁকে, মূর্তি গঠন করে—এ বলিলে কথাটা ঠিক বোঝা যাইবে না, বলা উচিত বাটালি, ছুঁচ বা পিঠালী এই সকল সামান্য উপকরণ দিয়া তাহারা তপত্তা করে। প্রত্যেকটি মন্দিরের কারুকার্য্য, প্রত্যেকটি কাঁথা দেখিলেই তপত্তা কথাটাই জিহ্বাগ্রে আসিবে। কারণ এ সকল ঢালাই করা কার্য্য নহে, ইহার প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম কাজ, হাতের কাজ।

এই পল্লীলক্ষী বিত্তা-ধর্ম্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী; এখানে চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন এবং এই পাঠান আমলেই কত ভক্ত, কত তান্ত্রিক, কত নৈয়ামিক, কত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন। সত্য বটে মুসলমান-বিজয়ের পর আর কোন রাজকবি পবনদূত বা গীতগোবিন্দ রচনা করিয়া মহারাজাধিরাজ-রাজচক্রবর্তীর মনোরঞ্জন করেন নাই। কিন্তু পল্লীকবিদের স্বরলহরী তো ধামে নাই, সময়ে সময়ে কোন ক্ষুদ্র জমিদারের নিকট “সাত আড়া” ধান মাপিয়া লইয়া পরম তৃপ্তির সহিত কোন কবিচূড়ামণি কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু মোটের মাথায় বাঙ্গলার বিদ্বান, বাঙ্গলার ভক্ত, বাঙ্গলার শিল্পী এবং বাঙ্গলার ধার্মিক আর রাজাভুগ্নহের প্রত্যাশা করে নাই। বাঙ্গলার সভ্যতা পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িয়া গণতন্ত্রতার একটা রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে রাজার কোন স্থান ছিল না,—সমস্ত দেশ পাঠানের অধিকারে থাকিলেও তাহার অধ্যাক্ষসাম্রাজ্য বজায় রাখিয়াছিল—তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলার পল্লীর প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন ব্রাহ্মণ,

তাঁহাদের ইচ্ছিতে সমস্ত সমাজ চলিত। ব্রাহ্মণের পর ঐ সময়ে

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব।

আর এক দল প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—বৈষ্ণব। ইহার নূতন আভিজাত্য সৃষ্টি করিয়া দেশের একাংশ অয় করিয়া লইয়াছিলেন। সমাজের উচ্চস্তরে কুলীনেরা একেবারে দৃঢ়রূপে স্বপ্রভাব সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক এক শ্রেণীর লোক তাঁহাদের কুলীনদিগকে সমাজে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। এই সুদৃঢ় হিন্দুত্বের মধ্যে বিদেশী শাসনকর্তাদের হস্তক্ষেপ করিবার বিশেষ সুবিধা ছিল না, তবে মাঝে মাঝে সুন্দরী হিন্দু ললনাদিগের খোঁজ করিবার জন্ত “গিল্লুকী”রা পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইত। পল্লীবাসিনী

রমণীরা অবরোধ কি জানিতেন না। কিন্তু মুসলমান, মগ, পর্তুগীজ, হাশ্মাদ প্রভৃতি বিদেশী ঈশ্বাদের ভয়ে মোগল রাজত্বের শেষভাগে এদেশে অবরোধ-প্রথা কতক পরিমাণে প্রবর্তিত হয়। “নৃত্যগীতাহরক্তি” হিন্দুললনাগণের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণের পরিচায়ক ছিল—পদ্মিনী-শ্রেণীর রমণীর লক্ষণের মধ্যে এই “নৃত্যগীতে অম্বরক্তি” উল্লিখিত আছে। এদেশের রাজকুমারীরা গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া চিত্রাঙ্কন, নৃত্য ও সঙ্গীতবিজ্ঞা শিখিতেন, বৃহন্নলাই শুধু একমাত্র শিক্ষক ছিলেন না। চিত্রলেখার সময় হইতে সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ বাঙ্গালী মেয়েরা চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করিতেন। বিদেশীয়দের অত্যাচারে তাঁহারা এই সকল বিজ্ঞার অমূল্যলন ছাড়িয়া দিলেন। ইচ্ছাবর (স্বয়ংবর)-প্রথা এদেশে এখন লুপ্ত; কিন্তু পালরাজগণের সময়েও কতকটা পরিবর্তিত আকারে প্রচলিত ছিল। “পূর্ববঙ্গ-গীতিকা”য় এই ইচ্ছাবর-প্রথার অজস্র প্রশংসা কৃষক কবি গাহিয়াছেন। স্বকীয় মনোনয়নে যে রমণী প্রাণী লাভ করিতে পারেন তাঁহার মত সৌভাগ্য জগতের কাহারও নাই, এই কথা কবি অকুণ্ঠিত ভাবে বলিয়াছেন।

কিন্তু বোড়শী কুমারীর বিবাহ হইবে, তিনি স্বয়ংবর মনোনয়ন করিবেন, কিংবা কোন রমণী সুগায়িকা, নৃত্যকলায় পারদর্শিনী, কিংবা চিত্রবিজ্ঞায় নিপুণা এই সকল সংবাদ সিদ্ধকীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাহারা বাঘের ছায় গুণবতী ও মেয়ের নৃত্যগীত।

সুন্দরী মহিলাদের ঘোঁজে পাড়ায় পাড়ায় এং পাতিয়া থাকিত, সুতরাং বাঙ্গলাদেশ হইতে এই সকল গুণ রমণীসমাজে লুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু এখনও কোন কোন পল্লীতে প্রাচীন রীতির শেষ চিহ্ন আছে। ফরিদপুর অঞ্চলের মেয়েরা অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বেও বিবাহ উপলক্ষে নৃত্য করিতেন। শ্রীহট্টের কোন কোন পল্লীতে বিশ বৎসর পূর্বেও পাক্পর্শের পূর্বে লাল-চেলী-পরিহিতা কন্যা গুরুজনসমক্ষে নৃত্য করিতেন। তাহারা এই ভাবে নৃত্য করিতেন তাঁহাদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন।

এখনও ঢাকা ও মৈমনসিংহের মেয়েরা বিবাহ উপলক্ষে গান গাহিয়া থাকেন। বঙ্গের কোন কোন দেশ হইতে এই রীতি লুপ্ত হইয়া থাকিলেও কোথাও কোথাও তাহা এখনও প্রচলিত আছে।

শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও যে সকল রীতি প্রচলিত আছে তাহাতে বাঙ্গালীর গৃহ যে কিরূপ অনাবিল আনন্দনিলয় ছিল তাহার কতকটা ধারণা পাওয়া যায়। কন্যা জন্মিলে মাতা একখানি কাঁধা শেলাই করিতে আরম্ভ করিতেন—থুকুমণির বরের জন্ত। সেই একখানি কাঁধা গৃহকর্ত্তের অবসরে প্রত্যহ শেলাই করিয়া তিনি ৮/১০ বৎসরে সমাধা করিতেন, তখন বর তাহা পাইতেন। এত মেহের, এত বস্ত্রের শিলসামগ্রী জগতে কোন মহারাজাদিরাজও পান নাই। বিবাহের এক বৎসর পূর্বে হইতে “পীড়িচিত্র” আরম্ভ হইত, সেই চিত্রিত পীড়ির উপর পাতিবার জন্ত নানা কারুকাণ্ডমণ্ডিত কাগজের ফুল-লতা অঙ্কিত হইত। তাহার ছই একটা নমুনা আমরা দেখিয়াছি। শান্তির জল রাখিবার জন্ত ঘট ও বরণডালা ছয়মাস ধরিয়া চিত্রিত হইত। কত হাসি কত গল্প ও আনন্দের মধ্যে মেয়েরা এই সকল চিত্রকলা

সম্পাদন করিতেন, তাহা এখনকার মহিলারা বুঝিবেন না—কারণ এখন বিলাতী চকানাদে কর্মকর্তা ও গৃহিনীর আত্মা শুকাইয়া যায়—হয়ত মেয়ের বিবাহের সরঞ্জামের জন্ত ভিটাটি বাধা পড়িয়াছে। যে আঙ্গিনায় বরকত্তার “সাতপাক” অর্থাৎ সপ্তবার প্রদক্ষিণ এবং “মুখচন্দ্রিকা”

মেয়েদের হাতের কাজ।

অর্থাৎ মুখদর্শন হইবে তাহার উপর ৪।৫ জন লোক কত্তা ও বরকে লইয়া ঘুরিতে পারে তত্প্রবোগী আর একখানি আসন মেয়েরাই চিত্রিত করিতেন। এইরূপে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাতদিন পরে ‘সাদিনা’, দশদিন পরে ‘দশা’ এবং ত্রিশ দিন পরে ‘ত্রিশা’ প্রভৃতি নানা উৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া কত্তাসম্প্রদান এবং এয়ে-কর্মসম্বন্ধীয় বাবতীয় কার্য মেয়েরা সম্পাদন করিতেন। বাহিরের কোন শিল্পী বা কারিগরের এই অন্তঃপুরের কলাসদনে প্রবেশ নিষেধ। কেবল যখন মেয়েরা নাচিতেন, তখন নিয়ন্ত্রণের তুলিয়া আস্তে আস্তে ঢোল বাজাইয়া নৃত্যের তাল রক্ষা করিত।

পল্লীর বিগ্রহই পল্লীর প্রকৃত রাজা ছিলেন, তাঁহার ভোগের জন্ত ত্রাত্রিদিন খাটিয়া চাষারা অতি সুগন্ধ নর গোপালভোগ, কৃষ্ণভোগ প্রভৃতি চাউল প্রস্তুত করিত। বাহার বাড়ীতে যে ফলটি জন্মিত, তাহা গৃহস্থ আগে মন্দিরে আনিয়া দিয়া বাইত, কত মালী বাগান হইতে রাশি রাশি ফুল তুলিয়া তাহার মালা গাঁথিত, কত শিল্পী বিগ্রহের অঙ্গরাগ করিত। প্রতি উৎসবে মন্দিরবাড়ীতে যে ধুমধাম হইত রাজ্যের বাড়ীর উৎসব হইতে তাহা কোন অংশে নূন ছিল না। স্ত্রীধরগণ সারা বৎসর ভরিয়া দেবতার জন্ত রথ তৈরী করিত। বঙ্গের পল্লীগুলি এই ভাবে পল্লীবিগ্রহের অধিকারে বাস করিত, তাহারই আঙ্গিনায় কীর্তন, কথকতা, যাত্রা প্রভৃতি নানা অস্থলানে পল্লীবাসী নিত্য নূতন আনন্দ পাইত। এমন সুখের রাজ্য, এমন শান্তির রাজ্য কোন রাজা কখনও শাসন করে নাই। সুতরাং বঙ্গপল্লী পাঠান আমলেও হিন্দুর ধর্মকর্ম ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ বিঘ্ন করে নাই।

তবে মধ্যে মধ্যে অত্যাচারের স্রোত বহিয়া বাইত, তাহার ফল কি দাঁড়াইত তাহার কিছু কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। বশোহরে পুকুর কাটিতে কাটিতে একটি বাগুদেব-বিগ্রহ পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহার চারিদিক্ অর্ধচন্দ্র নরকঙ্কাল-বেষ্টিত—বশোহরের ইতিহাস-লেখক স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় আমাকে ইহা জানাইয়াছিলেন। সহজেই অনুমিত হয়, ঐ সকল কঙ্কাল সেই বিগ্রহের ভক্ত কিংবা পাণ্ডাদের, তাঁহারা তাঁহাকে রক্ষা করিতে বাইয়া প্রাণ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহ মন্দিরসংলগ্ন দীঘিতে বিগ্রহটি লইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন, অপর সকলের কর্তৃত্ব দেহ সেই দীঘিতেই ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কোন কোন গৃহস্থ মুসলমান নবাবের ছাড়পত্র পাইতেন, সেই চিহ্ন থাকিলে মুসলমানেরা মন্দির ভাঙ্গিতে অগ্রসর হইত না। একখণ্ড লৌহের উপর নবাবের পাক্ষা মার্কা থাকিত, এই মন্দির কিরূপ তাহারও ইঙ্গিত থাকিত। আমার নিকট সেইরূপ একটি পাক্ষা আছে। উহা নারিকেলডাঙ্গার এক ভদ্রলোক আমাকে দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই লৌহখণ্ডটি মিরজাফরের আমলের, উহার একদিকে ত্রিশূলচিহ্ন আছে, তদ্বারা নির্দিষ্ট হইতেছে যে উহা কোন শিবমন্দিরের গায়ে সংলগ্ন ছিল। ইহাতে ইংরাজী ভাষায় তারিখ দেওয়া

আছে, পলাশীর যুদ্ধের পর এই ছাড় চিহ্নটি দেওয়া হইয়াছিল। বৈষ্ণবচূড়ামণি অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, খড়দহের শ্রীমদ্ভক্তের মন্দিরেও একটি ছাড়পত্র বা চিহ্ন ছিল।

পল্লীবাসীরা সময়ে সময়ে মুসলমান নবাবের ক্রোধে পড়িতেন। বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের ইতিহাসে সেই সকল অগ্রিয় কথা লিখেন নাই। যে সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থ গোস্বামিগণের বিধিসম্মত হইত, তাহাতে নিত্যন্ত হুঃসংবাদ তাঁহারা প্রকাশ করিতেন না। হয়ত বা নবাব বা অপরাপর শাসনকর্তাদের

কোপে পড়িবার ভয়েও রাজনৈতিক হুঃসংবাদগুলি তাঁহারা চাপিয়া যাইতেন। কিন্তু হিন্দুগণ সহজেই সাংসারিক হুঃখ ও বিপদের বিষয় সাহিত্যে প্রবেশ করাইতে অনিচ্ছুক ছিল। এজন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে বিরোগান্ত নাটক লেখার নিয়ম ছিল না, এবং এজন্তই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক সমস্ত কীর্তনাদিতে বিরহ, খণ্ডিতা, বিপ্রলজ্জা প্রভৃতি নায়িকার সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া 'যুগলমিলন' দিয়া গানের উপসংহার করিতে হইত। যে সকল কষ্ট শুধুই কষ্ট—মর্মান্তিক বেদনার সৃষ্টি করে অথচ বাহার বর্ণনায় সাময়িক উত্তেজনা ব্যতীত মনের কোন স্থায়ী উপকার হয় না—সে সকল প্রসঙ্গ সংস্কৃত কবিরা লিখিতেন না। কিন্তু যে হুঃখ আমাদের আত্মার সম্পদ—বাহার পাবনী শক্তি মাহুকের কলুব নষ্ট করে এবং হৃদয়ের ভাবগুলি উন্নতির পথে লইয়া যায়, বাহার ফল মহৎ ও হিতকারী—সেই সকল হুঃখ তাঁহারা বর্ণনা করিতেন, যথা রামের বনবাস সত্যরক্ষাকে উজ্জল করিয়া দেখাইতেছে, পাণ্ডবদিগের বনবাস, চৈতন্যসন্ন্যাস, এই সমস্ত মহাহুঃখময় ব্যাপার মহাশিক্ষার বিষয়। কিন্তু ডেসডেমনার শোচনীয় মৃত্যু, জনের নিযুক্ত দাস্তককর্তৃক আরধারের চক্ষু উৎপাটন, হামলেট-কর্তৃক নাটকের শেষ অধ্যায়ে হত্যাকাণ্ড—এই সকল হুঃখবর্ণনায় সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করে, গ্রীক-রীতি-অনুমোদিত পাশ্চাত্য সাহিত্য এই উত্তেজনাটুকু উপভোগ করাইবার জন্ত বিরোগান্ত নাটকের পক্ষপাতী। হিন্দুগণ অনাবশ্যকভাবে পাঠকের মনে পীড়া দেওয়ার বিরোধী, কতক এই কারণে—কতক রাজনৈতিক আতঙ্কে বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলিতে হুঃসংবাদ প্রকাশ করেন নাই। বৃন্দাবনের বড় গোস্বামীদের অনুমোদিত প্রধান গ্রন্থ—চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্য-ভাগবত এই বিধি পালন করিয়াছে, এই জন্ত চৈতন্যের তিরোধানের সম্বন্ধে তাঁহারা নীরব। কিন্তু এই গোস্বামিগণের বিধি প্রকাশিত হইবার পূর্বে যে কয়েকজন লেখক গভীর বাহিরে বেচ্ছাকৃত সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে জয়ানন্দ একজন। ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং যদিও গোঁড়া বৈষ্ণবেরা গোস্বামিগণের বিধিবহির্ভূত কথা লিপিবদ্ধ করার দরুন জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলকে তেমন আদর করেন না, তথাপি এই পুস্তকে কতকগুলি মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য আছে—বাহার জন্ত আমরা এ পুস্তকখানির বিশেষ পক্ষপাতী। ইনি চৈতন্যদেবের তিরোধানসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রামাণ্য এবং ইতিহাসসঙ্গত, নতুবা লৌকিক প্রবাদ অনুসারে মহাপ্রভুর গোপীনাথ অথবা জগন্নাথবিগ্রহের মধ্যে জীন হইয়া বাণ্ডয়ার কথাটা আজকালকার দিনে কতজনে

বিশ্বাস করিবে? জয়ানন্দ লিখিয়াছেন নৃত্য করিবার সময়ে একটা ইট তাঁহার পদতলে বিদ্ধ হয়, এবং তাহার টাঙসে জর হইয়া তিনি নিত্যধামে প্রয়াণ করেন। পুত্রের এইরূপ আঘাত পাওয়ার ভয় শচীদেবীর চিরকাল ছিল, তিনি কতবার অধৈর্য ও নিত্যানন্দকে বলিয়াছেন—
“তোমরা ইহাকে দেখ, নৃত্যকালে ইহার জ্ঞান থাকে না, কোথায় পড়িয়া চোট লাগিয়া মরিবে তাহার ঠিকানা নাই, আমার হরিবোলা পাগল বেহঁস হইয়া নাচে গায়।” শচীর সেই আশঙ্কাই শেষে ফলিয়াছিল।

বাহা হউক শুধু চৈতন্তদেবের তিরোধানের কথা নহে, জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে আরও কতকগুলি বিবাদাস্ত্র কথা আছে—বাহা বৈষ্ণবসাহিত্যের অপর কোথায়ও নাই। চৈতন্তমঙ্গল গোস্থামিগণের বিধিবহির্ভূত হইলেও এক কালে ইহার প্রচার খুব বেশী ছিল, আমরা এই পুস্তকের অনেক হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি পাইয়াছি ও দেখিয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন।

সেই সকল বিয়োগান্ত কথার মধ্যে মুসলমান কাজীদেবের অত্যাচারের কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ আছে। চন্দ্রাবতী যে সময়কার কথা লিখিয়াছেন, অর্থাৎ পাঠান আমলের শেষভাগের কথা (যখন রাজনৈতিক অবস্থা কতকটা অরাজকতায় দাঁড়াইয়াছিল), জয়ানন্দও সেই সময়কার কথা লিখিয়াছেন, উহা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা। তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে মহাপ্রভুর প্রিয় সখা গদাধর দাস কাজীর সহিত ঝগড়ার ফলে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন করেন। অপরাপর বৈষ্ণব লেখকেরা একথা চাপিয়া গিয়াছেন। কি বিষয় লইয়া এই নির্দাক্ষণ ঝগড়া হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু কাজীগণের একজন তো হরিদাসকে কতই লাঞ্ছনা করিয়াছিল, বাইসটি বাজারের প্রত্যেকটি বাজারে তাঁহাকে লইয়া নির্মমভাবে প্রহার করিয়াছিল। পেয়াদারা ত “বাহার মস্তকে দেখে তুলসীর পাত, হাতে গলে বাঁধি লয় কাজীর সাফাং।” নবাবপের গোড়াই কাজী তো মহাপ্রভুর সংকীৰ্ত্তন বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছিল, সুতরাং বৈষ্ণবেরা যে অনেক সময়ে কাজীগণের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল—তাঁহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈষ্ণবেরা সে কথা বলেন নাই। সনাতন মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—“আপনি রামকেলী ছাড়িয়া যাউন, যদিও হুসেন সাহ এখন পর্য্যন্তও আপনার প্রতি বিপক্ষতা করেন নাই, উহাকে বিশ্বাস করিবেন না, কখন কি অত্যাচার করিয়া বসিবেন, তাহার ঠিকানা নাই।” গদাধরকে হত গোমাংসাদি ভোর করিয়া খাওয়াইয়া থাকিবে, তখন হত মহাপ্রভুর তিরোধান হইয়াছে—কে তাঁহাকে বাঁচাইবে? তরুণ অবস্থায় তিনি সুরুদ্ধি রায়কে রক্ষা করিয়াছিলেন। গদাধর অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিয়া প্রাণশিষ্ট করিয়া থাকিবেন। শুধু গদাধর নহে, জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে আরও দুইজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবের উপর অত্যাচারের কথা উল্লেখিত আছে; তন্মধ্যে একজন গৌরীদাস পণ্ডিত, ইহার নাম গৌরীদাস সরকার। ইহার ভ্রাতা সূর্য্যদাসের কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীকে নিত্যানন্দ বিবাহ করেন, বাড়ী কালনায়া। এই গৌরীদাস চৈতন্তের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর ছিলেন। কাটোয়ার ইহারই স্থাপিত চৈতন্ত ও নিত্যানন্দের মূর্তি অতি

প্রসিদ্ধ, এই বিগ্রহসম্বন্ধে একটা অলৌকিক প্রবাদ আছে, তাহা এখানে বলিবার দরকার নাই। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—“কাজী সনে বাদ করি প্রেমে উন্মাদে, সাতদিন গৌরীদাস ছিলা গঙ্গাহুদে”, গৌরীদাস পণ্ডিত কি কারণে কোন কাজীর ক্রোধের ভাজন হইয়া গঙ্গার কোন নিভৃত কোণে বৈপাশন হুদে ত্র্যযোধনের ছায় লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু সেই অরাজকতার সময়ে কাজীদের ক্রোধের খুব গুরুতর কারণ থাকার দরকার ছিল না, অবাধে অত্যাচার চলিয়াছিল, এ সময়ে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণী সমভাবে অত্যাচার সহ্য করিতেন। মল্লয়া গীতিকায় দেখা যায় এক দিকে কাজী বৈষ্ণব নিরপরাধ চাঁদ বিনোদের উপর মারাত্মক অত্যাচার করিতেছেন, অপর দিকে বিচারের প্রতীক্ষা না করিয়াই বেওয়ান জাহাঙ্গীর কাজীকে শূলে দেওয়ার আদেশ প্রচার করিতেছেন। এই সকল গীতি কাল্পনিক হইলেও অনেক সময়ে উহাদের ভিত্তি সত্যঘটনামূলক হইত। গদাধর দাস এবং গৌরীদাস পণ্ডিত ছাড়া এই অত্যাচারীদের দলে আর এক জনের কথা জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, পুরুষোত্তম দাসকে বিষ ভক্ষণ করিতে হইয়াছিল। প্রাসঙ্গিক ভাবে কবি এই ভাবের কতকগুলি ঐতিহাসিক ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন, তাহা এই যুগের অরাজকতা প্রমাণ করিতেছে।

নবাবদের খেয়ালের অস্ত ছিল না। চণ্ডীদাসকে হাতীর পিঠে বাধিয়া কোন্ গোড়াধিপ নির্ধর্ম ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই, সম্ভবতঃ তিনি জালালুদ্দিন বা
 যত্ননারায়ণ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন রাজা গণেশ যে বাদসাহকে
 চণ্ডীদাসের দৃত্য।

হত্যা করেন সেই দ্বিতীয় সামসুদ্দিনই চণ্ডীদাসের হত্যাকারী। তিনি নিত্যস্ত অযোগ্য, অত্যাচারী ও বিলাসাসক্ত ছিলেন এবং মাত্র দুইটি বৎসর রাজত্বের পর ১৩৮৪ খৃঃ অব্দে নিহত হন। এই সময়ে বাদসাহদের অস্তঃপুর মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিতা বহু হিন্দু (বিশেষতঃ বারেক্স ব্রাহ্মণকন্তা) ললনার পূর্ণ ছিল। যত্নর প্রথমা দ্বী নবকিশোরী তাঁহার ধর্ম্ম পরিবর্তন করেন নাই। তাঁহার প্রধানা মহিষী ছিলেন আসমানতারা। কিন্তু তৎকালে কোন বাদসাহেরই এক দ্বী ছিল না, তাঁহাদের অনেক বেগম থাকিত। রাধাকৃষ্ণের সঙ্গীত হিন্দু বেগমদেরই বেশী ভাল লাগিবার কথা। যত্নর খুব সম্ভব অনেক হিন্দু বেগম ছিল, তাহাদের মধ্যে কাহারও চণ্ডীদাসের গুণাহুরাগিনী হওয়ার বেশী সম্ভব। অবশ্য সামসুদ্দিনের অস্তঃপুরেও যে সেরূপ হিন্দু বেগম ছিল না—তাহা বলা যায় না। এদিকে এই সকল বাদসাহ হিন্দুদের সঙ্গে বৈবাহিক আত্মীয়তা-নিবন্ধন ইরান, তুরান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সম্বন্ধত্যাগ এবং স্থায়ীভাবে বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গলায় বাস করিবার ফলে তাঁহারা একেবারে বাঙ্গালী বনিয়াদ গিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গলায় পুস্তক রচনা করাইয়া দরবারে তাহা শুনিতেন। মুসলমান কবিরাজ অনেক রাধাকৃষ্ণের গান এবং পল্লীগীতিকা বাঙ্গলায় রচনা করিয়াছেন। এই সকল কারণে মনে হয় চণ্ডীদাসের গুণাহুরাগিনী মুসলমান কোন রাজা হইতে পারেন, কিন্তু অধিক সম্ভব রাজা কোন হিন্দু-ললনা ছিলেন। হাতীর দ্বারা কোন দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাণ নাশ করা এই যুগের ইতিহাসে একটি সচরাচর সংঘটিত ব্যাপার।

যাহা হউক, মুসলমান নবাব ও কাজীদেব অত্যাচারে যে অনেক বৈষ্ণব বিশেষভাবে নিপীড়িত হইয়া তাহা নীরবে সহ্য করিয়াছেন তাহা পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে প্রমাণিত হইবে। যে দেশে রাজতন্ত্র ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন লোক অধিকার করিয়াছেন, সে দেশের লোকের ইতিহাস লেখা সম্ভবপর নহে, নিরাপদও নহে। প্রশংসা ও অপ্রশংসা উভয়রূপ লেখারই বিপদ ছিল। বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের সামাজিক ইতিহাস অনেক লিখিয়াছেন, ঘটক-কারিকার বংশাবলী এত পছন্দপূজ্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে বোধ হয় জগতের অন্য কোন দেশে এরূপ বিস্তৃত পারিবারিক ইতিহাস লিখিত হয় নাই, অথচ রাজনৈতিক ইতিহাস কেহ লিখিতে সাহসী হন নাই।

বৌদ্ধ-যুগের অবসানে উচ্চশ্রেণীর অল্পসংখ্যক লোক ও জনসাধারণের মধ্যে একটা ব্যবচ্ছেদ-রেখা টানা হইল। মহাভারত ও অপরাপর পুরাণে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে যে ব্যবধানের অঙ্কশাসন মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা প্রক্ষিপ্ত কিনা—তাহা বিবেচনার যোগ্য। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ সুদ্রবংশীয় পুণ্ড্রামিত্রের সময়ে শাস্ত্রগুলি ফিরিয়া লেখা হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণকে দেবতাদের তুল্য কিংবা তদপেক্ষাও উচ্চে আসন দেওয়া হইয়াছিল; এই সময়ে প্রাচীন স্মৃতিকারদিগের উপর অবাধভাবে হাত চালাইয়া ব্রাহ্মণদের গৌরবান্বিত করা হইয়াছিল; শ্রীযুক্ত জয়শ্যামলা সাহেব তাঁহার ‘ঠাকুর-ল লেকচারে’ ইহা বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রের নিষেধ-বিধি-সম্বন্ধেও প্রতিলোম-বিবাহের এত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এবং মাঝে মাঝে ছুই একটি স্থলে শূদ্রাঙ্গের নিন্দা থাকিলেও ভোজনাদি-ব্যাপারে এত শিথিলতার দৃষ্টান্ত আছে যে, মনে হয়, পরবর্তী কালে শাস্ত্রগ্রন্থগুলি ফিরিয়া, কতকাংশ বাদ দিয়া এবং কতক কথা সংযোগ করিয়া, লেখা হইয়াছিল এবং ব্যাসদেবের উপর একালের নীতি বহুল পরিমাণে আরোপ করা হইয়াছিল; ইহা অনায়াসে প্রমাণ করা যাইতে পারে। বঙ্গের ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের উপাধি পরিবর্তন করিয়া অপরাপর শ্রেণী হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া দেবতার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। কলিকাতার কোন বিশিষ্ট মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশের কিছুদিন পূর্বে উপাধি ছিল ‘কর’। ধরবংশীয় ব্রাহ্মণ-পরিবার এখনও চট্টগ্রামে আছেন, তাঁহারা উপাধি পরিবর্তন করেন নাই।

নবমুঠ সমাজে শূদ্রশ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত হইল। আচরণীয় এবং অনাচরণীয়—এই দুই থাক করা হইল। বড় থাক, যথা—নমঃশূদ্র, জেলে-কৈবর্ত, পোদ প্রভৃতি পতিত হইল। দ্বিতীয় থাকে কতকগুলি জাতিকে দয়া করিয়া আচরণীয় বলিয়া স্বীকার করা হইল—ইহাদের নাম হইল নবশাখ—অর্থাৎ নব শাখা। কিন্তু শূদ্রমাত্রেরই উচ্চশ্রেণীর লেখাপড়ার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল। ব্রাহ্মণগণ শূদ্রগণের সম্পূর্ণ বশতাপাইবার জন্যই জনসাধারণকে এই ভাবে উচ্চ-শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিলেন। ফল এই পাড়াইল যে হিন্দুজাতির স্রবহং অংশ—এই জনসাধারণ—অজ্ঞ ও মূর্খ হইয়া রহিল। ইহাদেরই রক্তসঞ্চয় গৌরবান্বিত করিয়া এক কালে ব্যাস, বিশিষ্ট, নারদ, সত্যকামাদি

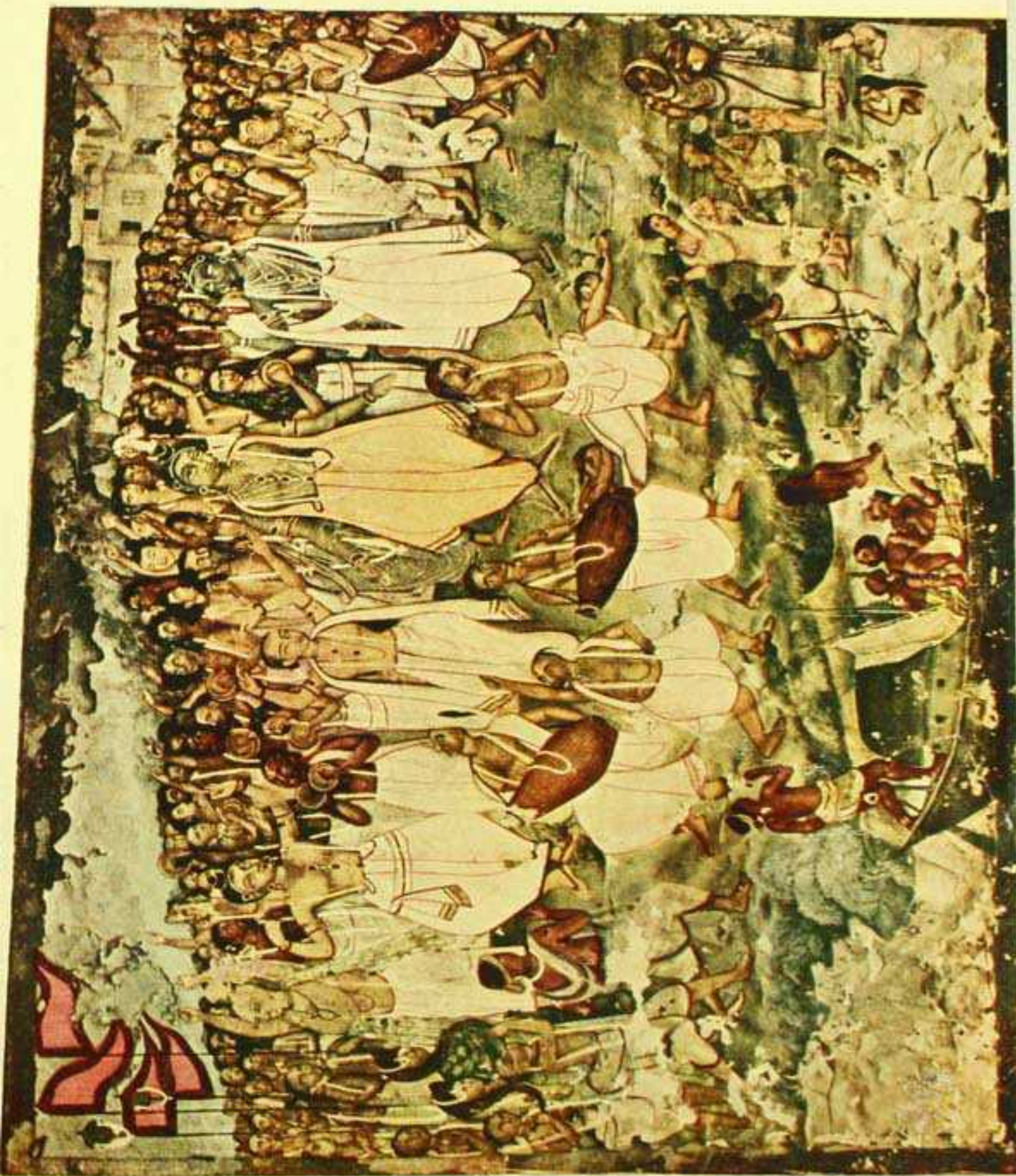
জন্মিয়াছিলেন এই শ্রমিকের জন্ম হীন-কুলে। নবব্রাহ্মণ্য এক সহস্র বৎসর বাবৎ বাঙ্গলার স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে যদি শিক্ষার দ্বার উদঘাটিত থাকিত তবে জন-সাধারণের মধ্যে হইতে কত মনীষী ও জ্ঞানী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের গৌরব বাড়াইয়া দিতেন। ব্রাহ্মণ্যবতন্ত্রতায় আমাদের জাতীয় সম্পদের উপর কত বড় হানি পড়িয়াছে। লোক-সংখ্যাই জাতির প্রধান সম্পত্তি, এই সম্পত্তির স্ববৃহৎ অংশের প্রতিভা আমরা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। মূর্ত্তা-নিবন্ধন অত্যাচার, কুসংস্কার ও উচ্চজাতির নিগ্রহের জন্ত ইহারা যে সময়ে সময়ে বিদ্রোহী হইয়া ভিন্নধর্ম অবলম্বন করিয়া ক্রীণকায় হিন্দু জাতিকে আরও সংখ্যালঘিষ্ঠ করিয়া দিতেছে—তজ্জন্ত অপরাধী কে? এত প্রতিকূলতা-সত্ত্বেও ভারতবর্ষে দাছ (চর্ম্মকার), কবীর (জোলা, তাঁতি), আসামের শঙ্করদেব (শূদ্র) প্রভৃতি মহাপুরুষ ইহাদের মধ্যে জন্মিয়াছেন,—এই বৃহৎ জনসংখ্যা আজ ফুলফলে পল্লবিত হইয়া উঠিত, নানাদিক্ দিয়া ইহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিয়া আমাদের আধুনিক শাস্ত্রকারেরা হিন্দু জাতিকে একান্ত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন।

গৌড়া ব্রাহ্মণগণ এই ভাবে আমাদের সমাজের ক্ষতি করিয়াছেন সত্য—কিন্তু অপর একদিক্ হইতে দেখিলে তাঁহারা তাঁহাদের গভীর মধ্যে ভারতীয় ধর্ম্মকে বিশেষ ঐচ্ছল্য দিয়াছেন। বিশাল ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে গৌড়ানীর গভীর বাহিরে যে অপূর্ণ উদারতা, সংসাহস, নির্ভা ও প্রেম ছিল তাহার ফলে আমরা চৈতন্তকে পাইয়াছি। এই অনিষ্টকর গৌড়ানীর অচলায়তন ভাদ্রিতে যে সকল বিশালবাহু সংস্কারক জন্মিয়াছেন, যাহাদের পুণ্যকর্ম্ম, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার পাবনী দ্বারায় বঙ্গদেশের অনেক আবর্জনা ভাসিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণের মত উপবাস কে করিবে? ব্রাহ্মণের মত ভোগবঞ্চিত কোন্ জাতি? ব্রাহ্মণের মত নিঃস্পৃহ কে? ব্রাহ্মণের মত দারিদ্র্য-দুঃখ বরণ করিবে কোন্ জাতি? এই সকল গুণ থাকার দরুনই তাঁহারা সমাজে শিরোভূষণ হইয়াছিলেন। জগতের যখন সর্ব্বত্র জড়বাদে তমসাজ্জর, তখন একমাত্র ব্রাহ্মণই নিবৃত্তির হোনাঘি জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন—ইহাই হিন্দুর বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণ না থাকিলে জড়বাদী জগতে সেই স্মৃতি নীরব হইয়া যাইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিন্দুসমাজ ও বৈক্যবধর্ম্ম

এইবার আমরা বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস-সম্বন্ধে লিখিব। বাঙ্গলাদেশে পাঠান-প্রাবল্যের যুগ এক বিষয়ে বাঙ্গলার ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান যুগ। আশ্চর্য্যের বিষয় হিন্দু-স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশের সভ্যতার যে ত্রী ছুটিয়াছিল এই পরাধীন যুগে সেই ত্রী



কাগজে অঙ্কিত (২'৬" × ২' ফিট) অপূর্ণ ছবি। শিবুজ বলাহীলাল মলিক মহাশয়ের কোন পূর্বপুরুষকে তাঁর ভক্তদের উপহার দিয়াছিলেন। একসময়ে ভবিখানি শ্রীনিবাস আচাধ্য প্রভুর বংশধরগণের গৃহে ছিল। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ভবিখানি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের। এখন ভবিখানি দক্ষিণেশ্বরের অদূরবর্তী এঁড়েবহে মলিক মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীতে আছে। পরমহংসদের এই ভবিখানি দেখিতে প্রায়ই এঁড়েবহে যাইতেন ও করজোড়ে দাঁড়াইয়া অশ্রুচক্ষে ভবিখানি দেখিতেন।

শতাব্দে বাড়িয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের অবনতির সময়ে উহা কতকগুলি বীভৎস তাত্ত্বিক অমুঠানে পরিণত হইয়াছিল। বৌদ্ধাধিকারে ধর্ম সত্ত্বের গভীতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী পৌরোহিত্যের ভার লওয়ায় নরনারীর অবাধ সংমিশ্রণের ফলে বিহারগুলি হীন বিলাসের ক্ষেত্র হইয়াছিল। এমন কি বুদ্ধ কে ছিলেন, তাহা পর্যন্ত জনসাধারণ ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন যেমন হিন্দুরা বেদপন্থী বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করেন কিন্তু বেদ কি জনসাধারণে তাহার কিছুই বিদিত নহে—বৈদিক আচার কতিপয় ব্রাহ্মণের পুঁথিগত বিজ্ঞার অঙ্গীয় হইয়াছে এবং জনসাধারণ কিছুই না বুঝিয়া না শুনিয়া শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে কতকগুলি ছর্কোদ মন্ত্র আওড়াইয়া যায়, দুর্কাদলের গ্রন্থি তৈরী করিয়া করাদুলীতে পরে এবং হস্তের নানারূপ ভঙ্গিয়া করিয়া কখনও গালে কখনও অঙ্গের অস্ত্রাঙ্গ স্থান স্পর্শ করিয়া যোগের কসরৎ করে, বৌদ্ধধর্ম তেমনই কতকগুলি ছর্কোদ এবং বাহ্য অমুঠানে দাঁড়াইয়াছিল। শৃঙ্গ-পুরাণ ও ধর্মপূজা-পদ্ধতি জনসাধারণের আনুষ্ঠানিক ধর্মের কতকগুলি ছর্কোদ ভেঁকি,—বুদ্ধের সরল নীতিমার্গের বিকৃত পরিণতি।

ধর্মজগতের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে নৃতত্ত্ববিদের নিকট এই দুই পুস্তকের একটা স্থান হইতে পারে। কোন বিলুপ্ত পণ্ডুর কঙ্কাল হইতে

পণ্ডিতগণ যুগবিশেষের জীবনতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ফেলেন, এই দুই পুস্তকও তদ্রূপ মনুষ্য-সমাজের প্রাচীন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের জীর্ণ কঙ্কাল ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। “ধর্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে” কিংবা “সিংহলে ত্রীধর্মরাজের বহুত সন্মান” প্রভৃতি দুই একটি বচন দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে এই পুস্তকগুলির লক্ষ্য ভুবনপাবন বৌদ্ধ ধর্ম। পাঠান-নেতা দ্বারা কাশীরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে তাঁহার দেহ ও মুখমণ্ডল একপভাবে বিকৃত হইয়াছিল যে তাঁহাকে চিনিবার কোনই উপায় ছিল না, শুধু তাঁহার সোণাবীধা দাঁত কয়েকটি তাঁহাকে চিনাইয়া দিয়াছিল; শৃঙ্গপুরাণের বিহারগুলিতেও তেমনই ঘর-পণ্ডিতদের প্রসঙ্গে দুই একটি পদমাহাত্ম্য এবং সত্ত্বের উদ্ভট বিকৃতি “শব্দের” উল্লেখ এই পুরাণকে সাবেকী বৌদ্ধধর্মের অঙ্গীয় বলিয়া মনে হইতে পারে, নতুবা বৌদ্ধধর্মের কোন নীতি বা জ্ঞান এই দুইখানি পুস্তকে পাওয়া যায় না। এই দুই পুস্তক মূলতঃ অবলম্বন করিয়া বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে “ধর্মতলায়” কচ্ছপরূপী ধর্মঠাকুরের খুব জোরে ঢাক পিটিয়া পূজা দেওয়া হইয়াছে মাত্র। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলির বাহা সার কথা তাহা হিন্দু শাস্ত্র সমস্তই আয়ত্ত করিয়া ঐ ধর্মকে ভারতবর্ষের ত্রিসীমানা হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল, জনসাধারণের মধ্যে যে ধর্ম শৈব ও বৌদ্ধধর্ম এই উভয়ের প্রতীকস্বরূপ গৃহীত হইয়াছিল তাহা ‘নাথধর্ম’—তাহা উদ্ভট রকমের সিদ্ধপুরুষ ও নারীদিগের অলৌকিক লীলা ও আজগুबी গল্পপূর্ণ। এই আকারে বঙ্গদেশের নাথধর্মও জনসাধারণের উন্নতির জন্ত কিছু দিয়া যায় নাই। শুধু বুদ্ধের সংঘের ভাবটা গোত্রক যোগীর চরিত্রে আভাসে পাওয়া যায় ও ত্যাগের আদর্শটা গীতিকথাগুলির মধ্যে পূর্ণভাবে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। এই গীতিকথাগুলিই বৌদ্ধধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। মালকমালার মত একটি

গয়ে যে মহানীতি ও স্বর্গীয় ভাগ প্রেম-মহিমার যুগিত হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা বহু ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যাইবার নহে।

কিন্তু মোটের উপর ব্যভিচারী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর এমন কোন গুণই ছিল না, বাহাতে সমাজ আর তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে। এদিকে রাজশাসন সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইল, ফলে সংস্কৃতির প্রভুত্ব নষ্ট হইয়া গেল। বিলাসের দিকে পতনোন্মুখ সেন-রাজারা যে কৃচি প্রবর্তিত করিয়াছিলেন তাহার গতি অল্প দিকে ফিরিল। মুসলমান সম্রাট ও বাদসাহেরা আসিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের দ্বারাই সংস্কৃত শাস্ত্র অমুবাদ করাইতে আরম্ভ করাইয়াছিলেন, পরবর্তী কালে সেই ভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহাপণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়কে কেরি সাহেব এই যুগের বাঙ্গলায় গল্প লেখার প্রণালী প্রবর্তিত করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা তাঁহাদের অন্তরের বিদ্বেষ ও ঘৃণা চাপিয়া রাখিয়া বাঙ্গলা পয়ার লিখিতে আরম্ভ করিলেন, এমন কি যে ধর্মঠাকুরের আঙ্গিনা মাড়াইলে পাপ হইত, তাঁহার সম্বন্ধে এক মহাকাব্য ব্রাহ্মণ-কুলজাত মানিক গাঙ্গুলী লিখিয়া ফেলিলেন। স্বপ্নে তিনি ধর্মঠাকুরের প্রত্যাদেশ পাইয়া একবার ঘাড় নাড়িয়া বলিয়াছিলেন, “পারিব না”—“জাতি যায় যদি প্রভু ইহা করি গান।” কিন্তু বাস্তবিক স্বপ্নের প্রত্যাদেশবশতঃই হউক অথবা অর্থলোভেই হউক গাঙ্গুলী মহাশয়কে ডোম ও ‘যোগী’-পূজিত এই কচ্ছপ দেবতার প্রশংসাসূচক কাব্য রচনা করিতে হইয়াছিল।

এদিকে মুসলমান-আগমনে প্রশ্ন উঠিল, এই যে দেবদেবী আমরা পূজা করি, এগুলি কি ভুল? শিব কি ভুল? দুর্গা, বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ ইহারা কি ভুল? ব্রাহ্মণ-শূদ্র কি ভুল? ডোমের হাতে ভাত খাইলে কি পরকাল নষ্ট হয়? সকলেই কি একখানে বসিয়া ঈশ্বরের নাম লইতে পারে? ঈশ্বর তো আমাদের নিজের মধ্যেই আছেন তবে আর ডাকিব কাহাকে? (১৫ ভা.) ‘সোহহম্’ বাদ কি ভুল? সত্যই কি ঈশ্বর যুদ্ধক্ষেত্রে—কর্মক্ষেত্রে মাহুদকে সহায়তা করেন? আমরা পাপপুণ্য দ্বারা কি সত্যই শাস্তি ও পুরস্কার অর্জন করি? স্বকর্মের দ্বারা কি সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়? সত্যই কি নিজ কর্ম ব্যতীত আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা আর কেহ আছেন?

এই সকল প্রশ্ন বেদ-বেদান্তের সময় হইতে এ দেশের পণ্ডিতগণের মাথায় আসিয়াছে। তারপর মহাবান-পন্থী বৌদ্ধগণও এই সকল প্রশ্ন লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন। সহজিয়ারা শুদ্ধ-শিষ্ট-সংবাদে এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের মতামত আশ্চর্য্য স্বাধীনতা ও মৌলিকতার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড—ভূমিকা)।

কিন্তু হিন্দু জনসাধারণের মনে এ সকল প্রশ্ন উদ্ভিত হয় নাই। সেন-রাজত্ব-কাল হইতে তাঁহারা ব্রাহ্মণের অত্যাচার একান্ত মূর্খতার সহিত মানিয়া আসিয়াছে; যে বাহা সংস্কৃত অক্ষরে লিখিয়াছে তাহাই বেদ ও ঈশ্বরবাক্য হইয়া গিয়াছে। মাঘে সূলা খাইলে ঘোর নরকে পড়িতে হইবে, ইহাই তাহারা বিশ্বাস করিয়াছে। বাঙ্গালীর মাথা নাড়ায় ভূমিকম্প,

দিক-হস্তীর কাঁধে পৃথিবী, আকাশে চাঁদ বুড়ী চরকা কাটিতেছে, এ সকল মহাসত্য সম্বন্ধে তাঁহারা প্রায় করিতে সাহসী হন নাই। এমন কি যে মহা হিন্দু জ্যোতিষিগণ আকাশে গ্রহনক্ষত্রের সূক্ষ্মতম গতি এবং বহু শতাব্দী পূর্বে সূর্য্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর ভ্রমণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন সেই হিন্দুর বংশধরেরা—রাহ-ব্রাহ্মস বিষ্ণু-চক্র-দ্বারা কর্তৃত্ব হইয়া চাঁদকে গ্রাস করিতে চেষ্টা পায়,—এই সকল কথা পরম ভক্তিসহকারে বিশ্বাস করিতেছিল। যুরোপে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হইলে সে দেশের প্রত্যেক নরনারী সেই সত্য শিখিয়া ফেলে কিন্তু আমাদের দেশে সেন-রাজত্বের সময় হইতে ব্রাহ্মণগণ ও সংস্কৃতের বৃহত্তম করিয়া কোন বৈজ্ঞানিক সত্য সমাজের নিয়ন্ত্রণে বাইতে পারে নাই; তাঁহাদের রক্তের হাড়ির মত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের জ্ঞানের ভাণ্ড অস্ত্রের স্পর্শের অনদিগম্য করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু এই পাঠান-যুগে সর্ব্ব প্রথম হিন্দু-সমাজে নূতন বিকোভ দৃষ্ট হইল। জনসাধারণের মধ্যে শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হওয়াতে তাহারা গুরুত্ব পক্ষী হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট কড়জোড়ে থাকিতে বিদ্যা বোধ করিল। ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হইয়া শাস্ত্রগ্রন্থ বাঙ্গলায় প্রচার করিলেন, তাঁহারা বোর অনিচ্ছায় ইহা করিয়াছিলেন, এই অনুবাদকার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা শাস্ত্রের অনুবাদ ও শ্রোতাঙ্গির বাপান্ত করিয়া অভিযান দিতে লাগিলেন। “অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্ত চরিতানি চ। ভাষায়াং যানবঃ শ্রদ্ধা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।” এদিকে মুসলমান-ধর্ম্মের প্রভাব, অপর দিকে বাঙ্গলা ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার, এই দুই কারণে বঙ্গীয় জনসাধারণের মন নব ভাবে জাগ্রৎ হইল।

শাসন ও কুচি হইতে মুক্ত হইয়া চিন্তা-জগতে হিন্দুরা গণতান্ত্রিক হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরাও রাজশাসন হইতে মুক্তি পাইয়া অবাধে স্বীয় মত সমাজে চালাইতে লাগিলেন। এই পাঠান-প্রাধান্যযুগে চিন্তা-জগতে সর্ব্বত্র অভূতপূর্ব্ব স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হইল। এই স্বাধীনতার ফলে বাঙ্গলার প্রতিভার যেক্রপ অদ্ভুত বিকাশ পাইয়াছিল, এদেশের ইতিহাসে অল্প কোনও সময়ে তদ্রূপ বিকাশ সচরাচর দেখা যায় নাই। শুক জ্ঞান-যুগ তখন অবসানপ্রায়, সেই সময়ে ভক্তিপন্থানে শুকতারার জায় নাথবেঙ্গ পুরীর অভ্যাস হইল। তিনি অদ্বৈত প্রভু ও ঈশ্বর পুরীর গুরু ছিলেন এবং নিত্যানন্দের সঙ্গে ত্রী পর্ব্বতে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অমুমান ১৪০০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে তাঁহার জন্ম হইয়া থাকিবে।

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ইতিপূর্বেই দেশে প্রচারিত ছিল। নারদ, শুক, প্রহ্লাদ প্রভৃতি বৈষ্ণব-শিরোমণিগণ ইতিহাসপূর্ব্ব যুগে বিষ্ণু-ভক্তির মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে রামানুজ (জন্ম ১০৭০ খৃঃ) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে চেন্নলাই পরগনায় শৈবানুদ্বারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম

সেন-রাজত্ব ব্রাহ্মণগণ-
কর্তৃক বিভাগে স্বীয় শ্রেণীর
মধ্যে আবদ্ধ করা।

জনসাধারণের জাগরণের
হইল কারণ।

মাধবেঙ্গ পুরী।

রামানুজ—১০৭০ খৃঃ।

কেশব, যাতার নাম কান্তিমতী দেবী। ইনি শ্রীসম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান ব্যক্তি। একাদশ শতাব্দীতে ভক্তিবাদ প্রচার ছাড়া বৈষ্ণব ধর্মের আরো দুটি গৌণ উদ্দেশ্য ছিল, একটি শঙ্করের মাদ্রাবাদ-নিরসন এবং দ্বিতীয় শৈব ধর্মকে দলন করা। রামানুজের শিষ্য গোবিন্দ শৈব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব হইয়া নিম্নলিখিত ভাবের শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন—

“হে বিষ্ণু। আমি তোমার শরণ লইলাম, আমাকে পাপ হইতে ত্রাণ কর, আমি বৈকুণ্ঠনাথকে ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়াছিলাম। আমি পুণ্ডরীকাক্ষকে ত্যাগ করিয়া বিরূপাক্ষকে ভজনা করিয়াছি। আমি পীতাধরকে ছাড়িয়া দিগম্বরের পিছনে পিছনে ঘুরিয়াছি। আমি স্বর্গায় তুলসী-কানন ত্যাগ করিয়া হরীতকীর জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিলাম।”

শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের এই ঝগড়ার রেশটা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলা সাহিত্যে পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র ব্যাসদেবের বৈষ্ণবসাধনা ত্যাগ করিয়া শৈবধর্ম-গ্রহণ উপলক্ষে এই দ্বন্দ্বের আভাস দিয়াছেন—“ব্যাস হরিমন্দির-তিলক কপাল হইতে মুছিয়া ফেলিয়া তৎস্থলে অর্ধচন্দ্র চিহ্ন আঁকিলেন, গলা হইতে তুলসীমালা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া রুদ্রাক্ষমালা পরিলেন। তুলসীপত্র ফেলিয়া দিয়া বিবপত্র লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শালগ্রাম টানিয়া ফেলিয়া দিয়া শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিলেন।” (ভারতচন্দ্রের ব্যাসের—শিবনিন্দা, গুণাহুবাদ)। এখনও বঙ্গদেশে শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব আছেন।

শ্রীসম্প্রদায় ছাড়া সনক, রুদ্র প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবও চৈতন্যদেবের বহু পূর্ব হইতে ভারতবর্ষে নানা স্থানে বিস্তারিত ছিলেন। সনক-সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি নিম্নাদিত্য।

ইহার নাম ভারতচন্দ্র, কথিত আছে হর্ষদেব নিমগাছের আড়াল

সনক-সম্প্রদায়—নিমগাছ।

হইতে ইহাকে দর্শন দিয়া ইহার প্রায়োপবেশনের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন, তদবধি ইহার উপাধি “নিমগাচার্য্য” হইয়াছিল। এই সনক-সম্প্রদায়ের মতামত-সম্বন্ধে যথুরার ইতিহাসলেখক গ্রাউস সাহেব লিখিয়াছেন,—“সনক-সম্প্রদায়ের অনেকে অতি সরল ও সাধুচরিত্র, তাঁহাদের জীবন ও মতামত আলোচনা করিলে ধারণা হয় যে যদিও ইহারা খৃষ্টীয় দীক্ষা পান নাই, তথাপি তাঁহাদের চরিত্রে সেই দীক্ষার ফল ফলিয়াছে, তাঁহাদের ধর্মপ্রবৃত্তির উৎকর্ষের দরুন তাঁহারা ঈশ্বরের চক্ষে প্রকৃত খৃষ্টান বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য” (অনুবাদ)। কথিত আছে—আরম্ভেই সনক-সম্প্রদায়ের

রুদ্রসম্প্রদায়—বিষ্ণুস্বামী,

বলভাচার্য্য ও চৈতন্য।

বহু সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ দ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রুদ্র-সম্প্রদায়ের বিষ্ণুস্বামী অতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার শিষ্য বলভাচার্য্য ষোড়শ শতাব্দীতে বৃন্দাবন অঞ্চলে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের নূতন একখানি টীকা করিয়া তাহা পুরীতে চৈতন্যদেবকে দেখাইতে আসিয়াছিলেন। এই টীকা সুপ্রসিদ্ধ শ্রীধর স্বামীর টীকার প্রতিকূল হওয়াতে চৈতন্য বিরক্ত হইয়া তাহা শুনিতে চান না, বরং মিষ্ট কথায় এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বলভাচার্য্য নাছোড়বান্দা হওয়াতে তিনি বলিয়াছিলেন—“আপনার টীকা আমি-পরিত্যাগিনী, হুতরাং

ব্রট।" চৈতন্য-চরিতামৃত্তে বলভাচার্য্যের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকারের বিবরণ আছে। কথিত আছে বলভাচার্য্য চৈতন্যের পার্শ্চর জগদানন্দ, স্বরূপ, দামোদর প্রভৃতি পণ্ডিতের অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বলভাচার্য্য চৈতন্যদেবকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—“আমি বহুদিন আপনার সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আজ আপনাকে দেখিয়া আমার চক্ষু সার্থক হইল। মহাশয়, জগতে আপনার ছায়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, কারণ আপনার দর্শন পাওয়া মাত্রই অন্তঃকরণে কুরুভক্তি লাভ হয়।” চৈতন্যদেব বলিলেন, “মহাশয়, আমার যে সকল প্রশংসা করিলেন, আমি তাহার একান্তই অবোধ্য। যদি আপনার প্রশংসার কণামাত্রেরও উপর আমার কিঞ্চিৎ দাবী থাকে তবে সেই দাবীর কণিকা-প্রসাদ আমি পাইয়াছি অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট, যিনি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; আর পাইয়াছি এই নিত্যানন্দের নিকট যিনি যড়দর্শনে ব্যুৎপন্ন এবং বীহার সমকক্ষ ব্যক্তি ভারতবর্ষে নাই; আমার যদি কিঞ্চিৎ ভক্তি লাভ হইয়া থাকে তবে ইহারই স্বর্গীয় অতি পবিত্র সংসর্গের দরুন। ইহাদের ছাড়া আমি পণ্ডিত গদাধর, বক্রেশ্বর ও জগদানন্দ প্রভৃতি সুদী মহাজনের নিকট অনেক শিখিয়াছি এবং আরও শিখিব একরূপ আশা করি। যদি আপনি শাস্ত্রালোচনা করিতে চান, তবে ইহাদের সহিত করুন।” জগদানন্দের সহিত দীর্ঘকাল আলোচনা করার ফলে বলভাচার্য্যকে তাঁহার অনেক মত পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল (চৈঃ চঃ, অস্ত্য খণ্ড, ৭ম অঃ)। বলভাচার্য্যের শিষ্যের দল এখন আখ্যায়িক্তে বিশেষ পুষ্ট। বৃন্দাবনে ইহার “গোকুল গোঁসাই” নামে পরিচিত। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রি-প্রণীত রামায়ণচরিতে ইহাদের বহু সস্ত্রাচারের গুরুভক্তি।

সদ্বন্ধে অনেক কথা আছে, তাহার কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাহা জানি না, তবে ইহাদের মধ্যে গুরুভক্তি অতীব প্রবল। গুরুকে দেখার অধিকার পাইতে হইলে না কি শিষ্যকে ২ টাকা দক্ষিণা দিতে হয়, তাঁহাকে স্পর্শ করার অধিকারের জন্য ২০ টাকা, তাঁহার পা চুঁইতে হইলে ৩৫ টাকা, তাহার পদাঘাতের মূল্য ১১ টাকা, তাঁহার নিকট বেত্রাঘাত পাইবার অধিকারের জন্য ১৩ টাকা এবং তাঁহার সঙ্গে একাসনে বসিতে হইলে ৬০ টাকা দিতে হয়। শিষ্যেরা এইভাবে গুরু-প্রণামী স্বেচ্ছায় দেয় কিংবা এ বিষয়ে অপরিহার্য্য নিয়ম আছে, তাহা জানি না। এই সকল কথা শরৎবাবুর পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি, কত দূর সত্য বলিতে পারি না।

কথিত আছে চৈতন্যদেব মাধ্বী-সম্প্রদায়ভুক্ত। মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী, কেশব ভারতী ইহারাই বঙ্গে ভক্তির প্রবাহ প্রথম আনয়ন করেন এবং ইহার মাধ্বী-সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু চৈতন্যদেবের যতামত ঠিক মাধ্বী-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহে, তাঁহার ধর্ম কতকটা তাঁহারই নিজের, একজন্ত তিনি বার বার তাঁহার শ্রেণীর সন্ন্যাসীদের নিয়ম

মাধ্বাচার্য্য—১১২১ খৃঃ।

ভঙ্গ করিয়া স্বরূপ দামোদরের নিকট তাড়া খাইতেন। অনেকের মতে চৈতন্যদেবের ধর্মমতের সঙ্গে মাধ্বী-মতের ঐক্য নাই, তথাপি বঙ্গের বৈষ্ণব-জগতের প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে আমরা তাঁহাকে মাধ্বী-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াই ধরিয়া লইতেছি। মাধ্বাচার্য্য ১১২১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন, ইনি মঙ্গলের নামক জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র।

ইহাদের নিবাস দাক্ষিণাত্যে তুলসী পরগনার উদিলী নগরের নিকটবর্তী তাজিকক্ষেত্র নামক গ্রামে। মাধ্বাচার্যের শৈশবে নাম ছিল বাহুদেব, ৯ বৎসর বয়সে ইহাকে অচ্যুতপ্রচ্য নামক এক সন্ন্যাসী শিষ্যে গ্রহণ করিয়া আনন্দতীর্থ উপাধি দেন। দাক্ষিণাত্যের অনন্তেশ্বর মন্দিরে ইহার প্রথম শিক্ষা-দীক্ষা হয়। মাধ্বাচার্যের ব্রহ্মসূত্রের টীকা অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ছাড়া "পুরাণপ্রজ্ঞা-দর্শন" নামক একখানি পুস্তকে তিনি বৈষ্ণব দর্শনের উচ্চাঙ্গের মত প্রচার করেন। মাধ্বাচার্য হইতে পঞ্চমস্থানীয় জয়তীর্থ বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। জয়তীর্থ অল্প বয়সে ১২৪৫ খৃঃ অব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইহার রচিত তত্ত্বপ্রকাশিকা, উপাধিখণ্ডন, জ্ঞানদীপিকা, উপাধিখণ্ডন টীকা, তত্ত্বনির্ণয়-টীকা প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত পুস্তক মাধ্বীশ্রেণীর অবগুণ্ঠা পুস্তকের তালিকায় দৃষ্ট হয়। মাধ্বী সম্প্রদায়ের সমস্ত আচার্যের নাম ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি পুস্তকে পাওয়া যায়, তাহাতে মাধ্বাচার্য হইতে চৈতন্যদেব পর্যন্ত সকলের নামই আছে। কিন্তু চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃতের মত দার্শনিক চরিত্রগ্রন্থেও মাধ্বী সম্প্রদায়ের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না, এমন কি কেশব ভারতী কিংবা ঈশ্বর পুরী যে ঐ শ্রেণীভুক্ত তাহাও উল্লিখিত হয় নাই।

বৈষ্ণবদিগের এই বিবিধ শ্রেণীর মধ্যে ভাবের অনুলীলনই প্রধান লক্ষ্য ছিল। যদিও প্রাচীন শাস্ত্রে 'রাগাহুগা' ভক্তির উল্লেখ মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায় তথাপি চৈতন্যের পূর্বে এই ভক্তির পূর্ণ বিকাশ আর কোথাও ছিল না। বহু যুগ ধরিয়া বৈষ্ণবধর্ম ঐশ্বর্যের গভী এড়াইতে পারে নাই। ভগবান্ সর্কশক্তিমান, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্তা—এই ধারণা বহুমূল ছিল। চৈতন্য ভগবানের বিভূতির দিকে লক্ষ্য করেন নাই। উপনিষদের "আনন্দস্বরূপ" ভগবান্ই তাঁহার আরাধনীয় ছিলেন। তিনি ভগবানের ঐশ্বর্য প্রভৃতি গুণ দেখিতে চান নাই, অথচ চৈতন্য-ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি সমস্ত চরিত-লেখকই তাঁহার জীবনে ঐশ্বর্যের লীলা দেখাইতে চেষ্টিত হইয়াছেন। কেহ তাঁহার ষড়্ভুজ, কেহ তাঁহার বরাহমূর্তি, কেহ তাঁহার দামোদরত্ব পরিকল্পনা করিয়া তাঁহার জীবনে ঐশ্বরিক বিভূতি আরোপ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। চৈতন্য-ভাগবত তাঁহাকে ভগবানের অবতার প্রমাণ করিবার জন্ত কখনও তাঁহাকে কল্পরূপে বর্ণনা করিয়াছেন; কখনও তাঁহাকে বরাহরূপী করিয়া তাঁহার মুখে ভীষণ গর্জন করাইয়াছেন; কখনও বা অতি-শৈশবে তাঁহাকে অনন্তশায়ী নারায়ণ পরিকল্পনা করিয়া এক ভীষণ সর্পের উপর শায়িত করিয়াছেন; কেহ কেহ বা তাঁহাকে রামের অবতার প্রমাণ করিবার জন্ত লক্ষ্য হইতে অমর বিভীষণকে আনাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার ও সংবর্দ্ধনাদি করাইয়াছেন; কেহ বা তাঁহার ভক্ত মুরারি গুপ্তকে হনুমানের অবতার বানাইয়া তাঁহার দেহ হইতে একটি দীর্ঘ লাম্বুল বাহির করাইয়াছেন। প্রেমের সম্পূর্ণ জটিলতাশূন্য অনাবিল পবিত্র দেহচরিত্রকে লইয়া গোড়া শ্রেণীর চরিত্রকারগণ বৈষ্ণব-বিভূতির ছাই ভালরূপে মাখাইয়া তাঁহাকে যে ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, সেই বিকৃত রূপ এখনকার দিনে গ্রাহ্য হইবার নহে। শুধু তাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানের অবতার পরিকল্পনা করিয়াই তাঁহার

কাস্ত হন নাই, পূর্ণ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্তা ভগবানের পার্শ্বচর হিসাবে নিজেরাও যে সেই ঐশ্বর্যের অংশীদার তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য “গৌরগণোদ্দেশ” নামক অসংখ্য পুস্তিকা লিখিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় তাহার এক রাশ পুস্তিকা বিদ্যমান, তাহাতে চৈতন্তের পার্শ্বচরের মধ্যে কে কাহার অবতার তাহার একটা পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইয়াছে। অবৈত মহাদেবের, হরিদাস ব্রহ্মার, নিত্যানন্দ অনন্তদেবের অবতার তো আছেনই, তাহা ছাড়া কেহ হনুমানের, কেহ অন্নদের, কেহ রাধিকার সখী বিশাখা, ললিতা, বা মধুমতীর অবতার এইরূপ পরিকল্পিত হইয়াছেন। এই গৌরগণোদ্দেশের এতগুলি পুঁথি পাওয়া বাইতেছে যে তাহাতে মনে হয় প্রত্যেক বৈষ্ণব বালককে ইহা মুখস্থ করিতে হইত। বৈষ্ণব গুরুগণ এইভাবে সত্য, জ্ঞেতা ও স্বাপর যুগের দেবতা বা দেবতাস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া শিষ্যমণ্ডলীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গুরুতর স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় এই সকল পুস্তকের কোন একটা পণ্ডিতের সত্যতাসম্বন্ধে যদি কেহ প্রশ্ন করেন, তবে সমস্ত বৈষ্ণব-সমাজে যে ক্রোধবহি প্রজ্জ্বলিত হয় তাহাতে সমালোচক দৃষ্টি হইয়া যাইবার পথে দাঁড়ান। যখন গোবিন্দ দাসের করচার আমি একটা সংস্করণ প্রকাশ করি, তখন এক বিশিষ্ট বৈষ্ণব গোস্বামী আমাকে বলিয়াছিলেন—“আপনি চৈতন্ত-চরিতামৃত ও চৈতন্ত-ভাগবতের অলৌকিক অংশ গ্রহণ করুন, আমরা তাহা হইলে গোবিন্দদাসের করচার প্রতিকূলতা করিতে বিরত হইব।” চৈতন্তের এই সকল চরিত-কথা নানা দিক্ দিয়া অতি মূল্যবান। ইহারা চৈতন্তেতিহাসের প্রধান অবলম্বন, বিজ্ঞাবত্তা, সাধুতা ও মহাকুতা, শ্রম ও জীবনব্যাপী তপস্তার ফলস্বরূপ ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু কোথায় বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনের গরুর রাখাল, কিংবা মধু-মুর-নরক-বিনাশী কালীয়, বক, পুতনা, ভৃগুবর্ত, কংস প্রভৃতি দানবধ্বংসকারী মহাবীর আর কোথায় নবমীপের টোলের শাজ্ঞামোদী শেষে ভক্তিপ্রেমের অবতার নিরীহ টুলো তরুণ ব্রাহ্মণ যুবক—ইহাদিগকে এক পণ্ডিতের আনিয়া এক করিয়া দেখাইবার চেষ্টা বাতুলতা। বৃন্দাবন দাস এতদর্থে না করিয়াছেন এমন কাণ্ড নাই। টোলে বসিয়া চৈতন্ত শিষ্যদিগকে পড়াইতেছেন ইহার বর্ণনা উপলক্ষে বদরিকাশ্রমে কিংবা নৈমিষারণ্যে কৃষ্ণ ঋষি-দিগকে উপদেশ দিতেছেন—সেই প্রাচীন কাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন কৃষ্ণ গর্গমুনির নিবেদিত অন্ন খাইয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন, এখানেও অতিথি ব্রাহ্মণের নিবেদিত অন্ন শিশু-চৈতন্ত খাইয়া লুকাইয়া পড়িতেছেন। পাঁচ বৎসরের শিশু চৈতন্ত গঙ্গার তীরে ক্রীড়া-লীলা, অতি শিশু মেয়েদের সঙ্গে খেলা ও কলহ করিতেছেন, এখানেও বৃন্দাবন দাস “পূর্বে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার। তেমনই দেখিয়ে তোমার পুত্রের ব্যবহার” লিখিয়া কৃষ্ণের গোপীদের সঙ্গে লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, চৈতন্তের বাল্যকালের গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাপক সান্দীপনি মুনির সঙ্গে উপমিত হইয়াছেন। এই সকল চেষ্টার এত বাড়াবাড়ি চৈতন্ত-ভাগবতে দৃষ্ট হয় যে, চৈতন্ত যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার তাহা ন্দাবন দাস যেমন প্রমাণ করিয়াছেন এমন আর কেহ পারেন নাই—এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া পরম পরিতোষসহকারে বৃন্দাবনের

গোপালীরা চৈতন্যমঙ্গল নাম কাটিয়া ঐ পুস্তকের চৈতন্য-ভাগবত নাম দিয়াছিলেন। ভাগবতের কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্য-ভাগবতের চৈতন্যলীলা একই বস্তু, ইহাই দেখাইবার জন্য এই নাম।

অথচ যে ব্যক্তিকে লইয়া এই দেবদ্যুহ পরিকল্পিত হইয়াছিল তিনি দীনের দীন ছিলেন, কেহ তাঁহার পা ছুঁইতে গেলে তিনি বিরক্ত হইতেন। পুরীতে পাছে কেহ তাঁহার পাদোদক পান করে এই ভয়ে তিনি একটি বৃক্ষের তলে অতি সঙ্গোপনে দ্বানের একটা বায়গা

চৈতন্যের বিনয়।

করিয়া লইয়াছিলেন। একবার ‘কৃষ্ণজয়’ স্থানে ‘চৈতন্যজয়’ বলিয়া

কোন বিশিষ্ট ভক্ত তাঁহারই নামকীর্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি অত্যন্ত বিরক্তিসহকারে তাহা ধামাইয়া দিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে পুরী-প্রত্যাগমনের পর বাহুবল সার্কসভোম তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া সংবর্ধনা করিতে গিয়াছিলেন, তিনি ক্র কুপিত করিয়া সার্কসভোমকে একজ্ঞ গজনা করিয়াছিলেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত বহু পাওয়া যাইবে।

সুতরাং এখন এমন একটা সময় আসিয়াছে, যখন ক্ষুদ্র গৌড়া বৈষ্ণবসমাজে প্রতিষ্ঠিত চৈতন্য-জীবনীগুলির ঐতিহাসিকতা আলোচনা করিয়া গ্রহণ ও বর্জননীতি অবলম্বন করিতে হইবে। গৌসাইদের ক্রকুটির ভয় করিলে চলিবে না। এই ভাবে সত্যের ভিত্তির উপর চৈতন্যচরিত দাঁড় করাইলে তাহার স্বরূপ দেখিবার ও দেখাইবার সুবিধা হইবে। নিজের বাড়ীটি লোকের প্রিয় হইলেও তথাকার আবর্জনা কোনগুলি তাহা দেখাইলে গৃহের মহিমা বাড়িবে ভিন্ন কমিবে না। এখন উহার চৈতন্যগুণীর বাহিরে কতকটা অবিখ্যাত হইয়া আছে। উপযুক্ত ভূমিকার ঐতিহাসিক কারণ দেখাইয়া সেই আবর্জনা কিভাবে আসিল তাহা বুঝাইয়া দিলে পুস্তকগুলির দর কমিবে না, বরঞ্চ ইহা সর্কজনগ্রাহ্য হইবে। মধ্য-যুগের জগতের সর্কজই সাধু পুরুষদের চরিতাখ্যানগুলি এইরূপ অলৌকিক গল্পময়, অথচ তাহারা সর্কজ সন্ধান পাইতেছে। তাহার কারণ এই যে সেই পুস্তকগুলির গুণাগুণ বিচারের দিগদর্শনীর আলোতে দেখান হইতেছে না। বিচারহীন অন্ধ বিশ্বাসে উদ্ভিষ্ট ত্রব্যের মূল্য কমিয়া যায় মাত্র। ভক্তদের নিজ ভক্তি অতি হ্রস্ব সামগ্রী, কিন্তু ঐতিহাসিকদেরও একটা কর্তব্য আছে।

চৈতন্যদেব ভারতীয় ধর্মের কি উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহাই এখন আমাদের বিবেচ্য। বৈষ্ণব-ধর্ম প্রধানতঃ ভাবমূলক। চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণব-ধর্মের প্রধান লক্ষ্যও

“মহাভাব”।

তাই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা উহার নাম দিয়াছেন

“মহাভাব”, এই মহাভাবই এদেশের বৈষ্ণবধর্মের প্রাণস্বরূপ এবং

চৈতন্যদেব ‘মহাভাবের’ জীবন্ত প্রতীক।

এই ভাব কি?—মহাভাব তো দূরের কথা—অপর দেশের লোকেরা এখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আমি চৈতন্যদেবকে বুঝ হইতে কোন কোন গুণে শ্রেষ্ঠ বলাতে ভাঃ সিলুভান লেভি মহাশয় আমাকে অহুযোগ দিয়াছিলেন (মংকৃত Chaitanya and

his age" পুস্তকের Dr. Sylvan Levitt ভূমিকা)। ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ প্রতীতি অল্প দর্শাবলম্বীরাও বিশ্বাস করেন। যদি তাঁহার সভা স্বীকৃত হয়, তবে তাঁহাকে ভালবাসা যায়—এ কথাটা অবিশ্বাস করা বাইতে পারে না। অনেক দেশের সাধু ও মহাজনেরা ভগবানের প্রত্যাদেশের কথা বিশ্বাস করেন, কারণ জগতের বড় বড় ধর্ম-গ্রন্থের অনেকগুলিই এই প্রত্যাদেশের উপর স্থাপিত। বাহার প্রত্যাদেশ শোনা যায়, তাঁহার রূপদর্শন কেনই বা অসম্ভব হইবে? একমাত্র চৈতন্যদেব তাঁহার জীবনে প্রমাণ করিয়াছেন, তাঁহার রূপদর্শন সম্ভবপর। শ্রবীরা কখনও কখনও তাঁহাকে বিদ্যাসুন্দরের মত আভাসে মাত্র দেখিয়া থাকেন; যে মুহূর্ত্তে সেই আভাসে দর্শন লাভ হয় সেই মুহূর্ত্তে ধ্যানীর ধ্যানের সার্থকতা। শুক, প্রহ্লাদ ও ভ্রূবের ভগবদর্শন এত উপগমে জড়িত যে তাহা ঐতিহাসিক যুগের প্রামাণিক কথা বলিয়া অনেকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবেন না। কিন্তু জীবনে এই দর্শনটি সর্বোপেক্ষা বড় কথা এবং ইহার ফল তাঁহার জীবনব্যাপী হইয়াছিল। গয়ায় বাইরা তিনি কিছু দেখিয়াছিলেন; কি দেখিয়াছিলেন, তাহা অনেকবার বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। সেই অবধি "অবাঞ্ছানসগোচরে"র কথা বলিতে বাইরা তিনি একবার প্রদাহর আর একবার শ্রীমান্ পণ্ডিতের কাঁধে ঢলিয়া পড়িয়া মুগ্ধিত হইয়াছিলেন। একবার তিনি বলিয়াছিলেন—"সর্বত্র তাঁহার রূপ করে স্বলমল। সে দেখিতে পারে যার আঁখি নিরমল।" (গোবিন্দদাসের করচা)। তিনি কি দেখিয়াছেন বলিতে পারেন নাই, বলিতে গেলে আনন্দাধিক্যে তিনি মুগ্ধিত হইয়াছেন। কিন্তু বাহাই দেখুন না কেন, তাহার ফলসম্বন্ধে বিধার কোন কারণ নাই। এই দেখার ফলে তিনি কৃষ্ণকেলী ধুতি ছাড়িলেন; আমলকী দিয়া যে দীর্ঘ বক্রাস্ত স্বকেশ মার্জনাপূর্ব্বক ফুলমালায় জড়াইয়া রাখিতেন, সে কেশসজ্জা দূর হইল; পালক ছাড়িয়া ভূমিশয্যা লইয়াছিলেন, তাঁহার যে শরীর চন্দন, অগুরু, কস্তুরী দ্বারা স্রবাসিত হইত, তাহা ধুলায় ধূসর হইল। সে কণ্ঠে আর স্রবর্ণ মাছলী স্থান পাইল না, এমন কি

রূপদর্শন।

তিনি সন্ধ্যা, আত্মিক, শালগ্রাম-সেবা প্রভৃতি ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম সকলই ছাড়িয়া দিলেন। কোন শব্দ শুনিলে 'কে এল, কে এল' বলিয়া উক্কে দৃষ্টিপাত করিতেন, চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা; একবার ঘরে আর একবার বাহিরে বাতায়াত করেন—"পুনঃ পুনঃ গতাগতি কর ঘর পহু। কণে কণে ফুলবনে চল একান্ত।" মাথার চুল আলুলায়িত, দ্রব বসনে শচী দেবী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেন, কিন্তু মাতার দিকে আর তাঁহার দৃষ্টি নাই। "না করে দান গোরা না করে ভোজন, না করে শ্রী অঙ্গে বেশ তৈল উত্তর্জন।" বিনি জীবন-মরণের সখা, জীবের অনন্তশরণ, বাহার সৌন্দর্যের কণিকা-প্রসাদ পাইয়া জগৎ সুন্দর—তাঁহার প্রথম রূপদর্শনে চৈতন্যদেবের এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। এই ভাব কণিক নহে—ইহা তাঁহার জীবনব্যাপী ছিল। চণ্ডীদাস চৈতন্য জন্মবার পূর্বে তাঁহার আগমনী গাহিয়াছিলেন—শ্রেষ্ঠ কবিদের চিত্ত মুকুর-স্বরূপ, তাহাতে আগন্তুক দৃশ্য প্রতিবিম্বিত হয়। এ সকল কি গুঢ় আধ্যাত্মিক নিয়মে ঘটিয়া থাকে, তাহা কে বলিবে? তিনি বাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখি না কেন?

সে কথা পরে হইবে—কিন্তু এই যে তিনি রূপ দেখিয়াছিলেন, সে দেখাটা ত ঠিক,—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কারণ সেই দর্শনের ফলে তাঁহার জীবনের রূপ উন্টাইয়া গিয়াছিল। চণ্ডীদাসের রাধার মত “বিরতি আহারে, রাজ্যবাস পরে, যেমন যোগিনী পারা”—ভাব তাঁহার হইয়াছিল; তিনিও মেঘের মধ্যে সেই লুকানো রূপ দেখিয়া ধ্যানীর মত নিশ্চল চক্ষে উর্দ্ধদিকে তাকাইয়া থাকিতেন, “সদাই দেখানে, চাহে যেখানো, না চলে নয়নের তারা।”

তিনি বাহ্য দেখিয়াছেন, তাহা আর কেহ দেখে না কেন? আমাদের বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলির অতীত সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয় আছে—এ সম্বন্ধে আমি কোন জটিল দার্শনিক প্রসঙ্গের অবতারণা করিব না। গবাদি পশুকে কুলবনে ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়—সৌন্দর্য্য দেখিবার যে চক্ষু, বাহ্য মানুষের আছে—তাহা তাহাদের নাই। বাহ্য আমরা চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া পরম তৃপ্তি উপভোগ করি, তাহারা সেইগুলি তখনই খাইয়া ফেলে। ক্ষুধার তাড়নায় সৌন্দর্য্যদর্শনাক্ষম চক্ষুর উপর তাহাদের একটা আচ্ছাদন পড়িয়াছে—তাহাদের সেই দৃষ্টি ফোটে নাই। আমরাও বহিরিন্দ্রিয়তাড়নায় আসক্তিবশতঃ জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি অনুভব করিবার শক্তি তেমনই হারাইয়াছি, কিংবা আমাদের সেই স্বর্গীয় দৃষ্টির এখনও উন্মেষ হয় নাই।

রূপদর্শনের ফল পূর্ব্বরাগ—জগতে সৌন্দর্য্যের জন্ত মানুষ পাগল, এই উন্নততার মত সুখকর আর কিছু নাই, এই রূপদর্শনজাত অনুরাগের ভিত্তিতে পৃথিবীর যাবতীয় মহাকাব্য দাঁড়াইয়া। নায়ক-নায়িকার প্রেম শ্রেষ্ঠ কাব্যের উপাদান। প্রত্যেকে যদি অকপটে তাঁহার মনের কথা বলেন তবে অবশ্যই স্বীকার করিবেন—জীবনে প্রথম যে ভালবাসা আত্মদান করিয়াছিলেন, অনাবিল স্বার্থশূন্য ত্যাগ-পূর্ণ হৃদয়ের আবেগে প্রথম যে ভালবাসা হইয়াছিল, তদপেক্ষা বড় সুখ তিনি পান নাই।

যদি ঈশ্বরসৃষ্ট সূত্র সূত্র সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে মানুষ এরূপ অপূর্ণ সুখের আত্মদান পায়, তবে যিনি সৌন্দর্য্যের শেখর, আত্মার একমাত্র কাম্য,—রূপের উৎস, তাঁহাকে দেখা যদি সম্ভবপর হয় তবে মানুষের মনের অবস্থা কি হইতে পারে, চৈতন্তের জীবন তাহাই প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছে। আর কোন সাধু মহাজন জগতে তাহা পারিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। স্ত্রী, পুত্র, প্রণয়ী, প্রণয়িনীর জন্ত যেরূপ কেহ কাঁদিয়া মরে, পাগল হয়, কাব্য লেখে, গান গায়, কত কি করে, চৈতন্ত ভগবানের জন্ত তদপেক্ষা শতগুণ উন্মাদনা দেখাইয়াছেন। ভগবানের প্রেম যে সত্য বস্তু, তাহা কারনিক নহে, তাহা মানুষ লাভ করিতে পারে, তাহা চৈতন্ত বেরূপ দেখিয়াছেন অপর কেহ তেমন পারে নাই।

কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে কোন বড়লোকের বাড়ীতে বাইয়া দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া আসা কত কঠিন, আর যিনি রাজাধিরাজ তাঁহার দর্শন লাভ কি সহজ? কত যুগের তপস্তা থাকিলে তবে এই সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে।

ভারতবর্ষ এই তপস্তার মধ্য দিয়া যুগ-যুগান্তর যাবৎ চলিয়া আসিয়াছিল। যিশুর শিক্ষা মনুষ্যের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ব-স্থাপন—“তুমি যদিও বাইবার পূর্বে স্বরণ করিয়া আইস কাহারও সঙ্গে তোমার কলহ আছে কিনা, যদি থাকে, তবে মিটাইয়া এস—নতুবা তোমার নৈবেদ্য গৃহীত হইবে না। যে তোমাকে প্রহার করিয়াছে, তাহার নিকট পুনরায় যাও প্রহৃত হইতে; যে তোমাকে এক ক্রোশ বেগার খাটাইয়াছে, তাহার দুই ক্রোশের বেগার খাটিয়া আইস; যে তোমার জামা লইয়াছে, তাহাকে তোমার কাপড়খানিও দিয়া আইস।”—এই ক্ষমাশীল ভ্রাতৃত্বাভিযুক্ত শিক্ষাইয়াছিলেন, তোমার মনে কলুষলেশ থাকিলে তুমি রাজার দ্বারে ঢুকিতে পারিবে না। তীর্থঙ্করগণ ও বুদ্ধ জীবে দয়া শিক্ষাইয়াছিলেন। শুধু মানুষ নহে একটি সামান্য পশু ও পাখীর জন্ত প্রাণ দিয়া ঐ সার্বজনীন প্রেম দেওয়ার শিক্ষা তাঁহারা দিয়াছিলেন। গল্পে কথিত আছে, এক জন্মে বুদ্ধ একটি ব্রাহ্মীর জীবনরক্ষার জন্ত নিজ প্রাণ দিয়াছিলেন, সেই জাতকটির কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। একরূপ আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

যখন এইভাবে মানুষের সঙ্গে এবং সমস্ত জগতের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ব ও দয়ার সন্ধন সৃষ্ট হইল—তখন ভগবৎপ্রেমলাভের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। বহু যুগ যাবৎ ভারতবর্ষ

হোমকুণ্ডে যজ্ঞাগ্নি জালিয়া পুনরায় তাহা নির্মাণ করিয়া অতি ছুঁচর গোড়ীর বৈষ্ণবধর্ম।
তপস্তা করিয়া যে সিদ্ধি চাহিয়াছিল, চৈতন্যদেবই সেই সিদ্ধি।

অপরূপ সাধুদের জীবনে তপস্তা আছে—কিন্তু চৈতন্য সাফাং তপঃসিদ্ধি, অতি সহজ, বাস্তবিক কাব্য, চণ্ডীদাসের গান, রবীন্দ্রের গীতাবলী যেমন সহজ—ইহা তেমনই সহজ। শ্রমজাত একটি বিন্দুও তাহার নাই, ধর্মজগতের সম্যক বিকশিত পক্ষ, ইহা সৃষ্টি করিতে যে জাতীয় কত যুগের তপস্তার দরকার হইয়াছে, তাহার চিন্তামাত্র ইহাতে নাই। তিনি খুব কমই উপদেশ দিয়াছেন, তিনি কোন কঠিন পন্থা দেখান নাই—তাঁহাকে দেখা যাত্র লোকে ভুলিয়াছে। কোন স্তম্ভরীকে দেখিলে বেক্রপ নাগক ভুলিয়া যায়—তাঁহার মুখে প্রেমের বক্তৃতা না শুনিয়াও সে তাঁহাকে পাগলের মত ভালবাসিয়া ফেলে, চৈতন্যকে লোকেরা তেমনই সহজে ভালবাসিয়াছিল, কারণ তিনি যে রূপ দর্শন করিয়াছিলেন সেই রূপের ছাপ তাঁহার মুখে আঁকা ছিল—তাঁহার সে অপূর্ণ রূপ যাহার উদ্দেশে শত শত কবি গানের উৎস বহাইয়াছেন, শত শত বীণাবাদক বীণার সুরলহরীতে আকাশ ভাসাইয়া দিয়াছেন, সেই রূপ তিনি ভগবৎরূপ-দর্শনের ফলে পাইয়াছিলেন, রাজার মোহরাহিত সে রূপ-আকর্ষণ কে এড়াইবে? চণ্ডীদাসের রাধিকার মুখে এই তত্ত্বটি একটি ছত্রে লিখিত হইয়াছে—
“তোমার গরবে, গরবিলী হাম—রূপসী তোমার রূপে।”

তাঁহার ধর্মের পঞ্চ শাখা—ইহা গোড়ীর বৈষ্ণবগণ ছাড়া আর কাহারও শাণ্ডে নাই, রাম রায় তাহা চৈতন্যের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা শান্ত, দান্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুর।

প্রথম শান্ত্যাব—বুদ্ধদেব যাহার উপর হোর দিয়াছেন, সমস্ত কামনা দূর করিতে

হইবে। এই কামনা নির্দোষিত করা দরকার—তাহা না হইলে অত্যন্তঃখ-নিবৃত্তির উপায়

ভাবপদ্ধতি।

নাই। বুদ্ধদেব ছন্দকে বলিয়াছিলেন—“আমাকে অগ্নি-শলাকা-
দ্বারা দগ্ধ কর—অন্তল জলে নিমজ্জিত কর,—কিছুতেই আমি হৃৎকের
সংসারে প্রবেশ করিব না।” এই জগতের ত্রিবিধ তাপে যখন মানুষ আর্ন্ত হইয়া ‘ত্রাহি,
ত্রাহি’ রব করিতে থাকে, তখন তাহা হইতে পলাইয়া সে অরণ্য আশ্রয় করে, বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দ
এইভাবে বুদ্ধের শরণ লইয়াছিলেন। সুতরাং বুদ্ধ অমৃতের সন্ধানে বনবাসী হন নাই—তিনি
দ্রঃখ হইতে জগৎকে রক্ষা করিবার উপায়ের অন্বেষণে গিয়াছিলেন। জপের দ্বারা শান্ত্যাব
পাওয়া যায়। যিনি জপের পথে প্রথম ব্রতী, তিনি বৃষ্টিবেদ এ পথ কত কষ্টকর। ভগবানের

শান্ত্যাব।

নামই হউক, রূপই হউক বা বুদ্ধযুগের মহাবান-সম্প্রদায়ের
মতামুসারে শূন্য বা মহাশূন্যই হউক, একটা কেন্দ্র মনে আবদ্ধ করিয়া
জপ শুরু করিলে দেখা যায় পৃথিবী সাধনার পথের পথিককে কিরূপ শত বন্ধনে বাঁধিয়া
ফেলিয়াছে। জপের সময়ে পুনঃ পুনঃ সাংসারিক বিষয়ে মন প্রধাবিত হইবে। বাহা
প্রথমতঃ অতি সহজ মনে হইয়াছিল, জপের ব্রতী দেখিবেন তাহা কত কঠিন, পদ্মপত্র
জলের মতন মন টলটলায়মান, কিছুতেই তাহাকে কেন্দ্রে আটকাইয়া রাখিতে পারা
যাইতেছে না। কিন্তু কয়েক বৎসরের দৃঢ়সঙ্কলিত অমোঘ চেষ্টার ফলে মনকে বশীভূত
করা যায়। তখন সংসারের যত বিপদই আসুক না কেন, মনকে তাহাদের উর্দ্ধে
লইয়া গিয়া সেই কেন্দ্রটিতে আবদ্ধ করা যাইতে পারে। জপে যখন এইভাবে মনে শান্তি
আইসে তখন বৃষ্টিতে হইবে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে—উহাতে আগাছা বা আবর্জনা নাই।
তখনকার প্রশ্ন—আমার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে, এখন ভগবানের সঙ্গে একটা সন্ধকের বীজ
বপন করিতে হইবে।

প্রথম সন্ধক তুমি প্রভু—আমি দাস। তোমার আজ্ঞা পালন করা আমার কর্তব্য।
এই স্থানে নীতিবাদ শুরু হইল। দান্তভাবটা নৈতিক রাজ্য। কি ভাল কি মন্দ মনের

দান্ত।

মধ্যে বিচারপূর্বক সর্বদা তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিয়া
ধাকিতে হইবে। দান্তভাবের সঙ্গে কর্মকাণ্ড জড়িত। সর্বদা
কর্ম করা—ভগবানের নিয়ম বুঝিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রিয়কাণ্ড সাধন করা—ইহাই দান্তের
লক্ষণ। অধুনা যুরোপ-প্রচলিত খৃষ্ট-ধর্ম—এই দান্ত,—নীতিজ্ঞান ইহার ভিত্তি।

কিন্তু কর্মী কর্ম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তিনি ভগবানের সঙ্গে নিকটতর
সন্ধকের জন্ত ইচ্ছুক হইলেন। নীতিজ্ঞান নীরস ও শুষ্ক। তাহাতে ভগবানের সঙ্গে

সন্ধা।

আনন্দের সন্ধক নাই। সারাজীবন বিবেক-সম্মতভাবে অহোরাত্র
কর্ম করিয়া কর্মী দেখিলেন, কি পাপ কি পুণ্য তাহা তিনি বৃষ্টিতে
পারেন নাই। এক শ্রেণীর জীবের ধ্বংসের উপর অল্প শ্রেণীর আহাৰ চলিতেছে, বাহা
কিছু শুভ, আলোর পশ্চাতে ছায়ার জায় তাহার পশ্চাৎ অন্তর্ভুক্ত আছে। জগতের একদিকে
হিতসাধন করিলে, অজ্ঞদিক্ আহত হয়। পাপ-পুণ্যের কথা সমস্তা হইয়া দাঁড়ায়। তখন

ভক্ত ক্রমে ক্রমে নীতির সীমার উর্দ্ধে লীলার জগৎ পাইয়া রসের সন্ধান পাইলেন। তিনি বলিলেন, আমি ভালমন্দ কিছুই বুঝি না, আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ করিলাম, তোমার এই খেলার আমাকে টানিয়া লও। এই স্থানে সখ্য। দাস্তের মধ্যে শাস্ত্যভাব আছে— কারণ প্রথমতঃ মন স্থির করা দরকার—মন স্থির না করিলে ভগবানের প্রত্যাদেশ শোনা যাইবে না। বোলা জলে স্বর্গাকিরণ বিধিত হয় না। শুদ্ধ, অপাপবিক্ত, অনাসক্ত মন প্রস্তুত হইলে তাহাতে কি প্রেয়ঃ কি শ্রেয়ঃ, তাঁহার কি আদেশ তাহা বুঝা যায়। আর সখ্যের মধ্যে শাস্ত্য আছে, দাস্তও আছে—সখ্য দাস্ত হইতে আর একটু অগ্রসর। জগৎ লীলাময়ের লীলা, আমি তাঁহার সঙ্গী, সহচর ও খেলার সাথী। যাহা কিছু করি সর্বদা তিনি আছেন, আমি তাঁহারই সঙ্গে আছি, আমি তাঁহাকে ছাড়া কিছু জানি না। বিপদে পড়িলে বক, তৃণাবর্ত প্রভৃতি দানবের দ্বারা উৎপীড়িত হইলে, আমি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরি, তিনি আমাকে রক্ষা করেন। এই সখ্যের মধ্যে দাস্ত্যভাব আছে, কৃষ্ণ-সখ্যার দিনরাত্র তাঁহার সেবা করিতেছে, তাঁহার জন্ত ফল কুড়াইতেছে; যে ফলটি মিষ্ট লাগিল তাহা তাঁহার মুখে আনিয়া দিল, তাঁহাকে কাঁধে করিল, তাঁহার কাঁধে চড়িল; এখানে উচ্ছিষ্টজ্ঞান নাই, প্রভুভূতা সম্বন্ধ নাই, তথাপি রাখালেরা কৃষ্ণকে বলিতেছে— “বিনি কড়িতে হেন নফর কোথা পাবি।” এখানে ভক্ত কৃষ্ণের বাহির আত্মনা ছাড়িয়া— দাস্তের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া—তাঁহার গৃহের ভিতরে ক্রীড়াক্ষেত্রে ঢুকিয়াছে। এখানে কর্তব্যজ্ঞান, নৈতিক বিচার নাই, এত ঘণ্টা খাটিতে হইবে, এত ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে হইবে, ঘড়ি ধরিয়া কর্তব্যের সেরূপ কোন সীমা নির্ধারণ করা নাই। বৃন্দাবনে সখ্যাদের নিত্যলীলা চলিতেছে। সখ্য হইতে ভগবানের সঙ্গে রসের সম্বন্ধ—আনন্দের সম্বন্ধ।

তদুর্দ্ধে আনন্দ ঘনীভূত হইয়াছে। প্রত্যেক নবমুঠে জীবের মধ্যে ভগবান্ তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্য লইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। নতুবা কালো কুৎসিত ছেলেটা তাহার মায়ে

কাছে রূপের ডালি বলিয়া বোধ হইত না। রাত্রি জাগিয়া দীপ উদ্ভাইয়া মাতা ছেলের অধরপ্রান্তে হাসিটুকু ছুটিতে দেখেন এবং আনন্দে আত্মহারা হন। প্রত্যেক জননীকে ভগবান্ শিশুরূপে দেখা দেন। নতুবা কুৎসিত ছেলেটার মধ্যে তিনি অনন্তরূপ আবিষ্কার করিবেন কিরূপে? প্রত্যেক মায়ে

ধারণা তাঁহার ছেলের মত এমন সুন্দর কেহ হাত-পা নাড়িতে জানে না, এমন সুন্দর আধ-আধ বুলি কেহ বলিতে পারে না। এত রূপ, এত সৌন্দর্য কালো ছেলেটার মধ্যে প্রকাশ পায় কিরূপে? বাৎসল্যের মধ্যে শাস্ত্যভাব আছে, দাস্ত্য আছে—কারণ মাতার মত অক্লান্ত কর্ম্মী দাসী আর কে আছে? এখানে দাস্ত কর্তব্য-জ্ঞানমূলক নহে, এ দাস্ত অনুরাগের। এখানে কর্ম্ম কোন নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে। সেই অসীম অনন্ত রূপের উৎস ক্ষুদ্র শিশুটিকে অবলম্বন করিয়া মাতৃবক্ষে ধরা দিয়া তাঁহার নিঃস্বার্থ, অবাচিত, অজস্র কল্পনা ও কর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবুদ্ধ করে। বাৎসল্যে সখ্য আছে, সমানে সমানে না হইলে সখ্য হয় না। মাতা শিশুর সঙ্গে যখন খেলা করেন, তখন শিশুর সঙ্গে শিশু হইয়া যান।

বাৎসল্য।

প্রচলিত ভাষায় তাহার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন না, এজন্য ছেলে-ভুলানো ছড়ার মত অর্থহীন কাকলীর সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহার সঙ্গে কথা বলেন। একদা রোমের সিনেট-সভাপতির নিকট বিদেশী এক রাজদূত আসিয়াছিলেন, ভুলক্রমে তিনি তাঁহার একটা গোপন-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখেন, রোমের এত বড় সভাপতি ঘোটক সাজিয়াছেন ও তাঁহার শিশুপুত্র তাঁহার পিঠে চাপিয়া তাঁহাকে চাবুক মারিয়া চালাইতেছে। সভাপতি মাঝে মাঝে চিঁচিঁ রব করিতেছেন। বস্তুতঃ বাৎসল্যে শান্ত, দান্ত ও সখ্য আছে—তার উপর আরো কিছু আছে। অতঃপর হইয়া কি সখ্য অমুরাগী হইতে পারে? কিন্তু কৃষ্ণসখ্য শ্রীদাম স্ত্রীদাম তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা ঘুমাইলেও স্বপ্নে কৃষ্ণের সঙ্গে আলাপ করিতেন—শ্রীদাম বলিতেছে—“আমরা মায়ের কোলে ঘুমায় থাকি। স্বপ্নে তোর চাঁদ মুখখানি দেখি।” স্ত্রীরাং সখ্য বড় কি বাৎসল্য বড় তাহা লইয়া তর্ক আছে। সখ্যার নিকট বাহা বলা যায়, তাহা মায়ের নিকট বলা যায় না। শিশু একটু বড় হইলেই মাতৃস্নেহ তাহাকে সম্যক রূপে ধরিতে পারে না, সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে পারে না, পেটের ক্ষুধা হইতে ক্ষুধার ক্ষুধা বড়, মাতা তাহা বুঝিতে পারেন না। এই হিসাবে সখ্য বড় হইতে পারে, যেহেতু সখ্যার নিকট মনের সকল কথা ব্যক্ত করা চলে। শ্রীকৃষ্ণের সুবল-সখ্যার নিকট তিনি মনের নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিতেন। স্ত্রীরাং সখ্য হইতে যে বাৎসল্য বড় এ কথা শ্রীকৃষ্ণ-সখ্যার স্বীকার করিতেন না—শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন “কি করিব ওরে সুবল, করিব আমি কি? চূড়া বাঁধি ধড়া পরি ব’সে রয়েছি। মায়ে না বলিয়া আমি যাই রে গোষ্ঠে, মরিবে আমার মা, পড়িব সঙ্কটে॥ একদিন নবনীত খেয়ে ছিলাম লুকাইয়া। মরিতে গেছিলেন মা, আমায় না দেখিয়া॥” উত্তরে সুবল বলিতেছে, “জানি রে তোর মায়ের প্রেম—কত ভালবাসে। সামান্য নবীর তরে বেঁধেছিল গাছে॥ বমল অর্জুন যেদিন পড়েছিল গায়। সেদিন তোর মা নন্দরাণী আছিল কোথায়?”

বে পুত্র মরিয়া যায়, সন্তান-শোকে বিধুরা মাতা অপর একটিকে জোড়ে পাইয়া তাহাকে ভুলিয়া যান। কিন্তু মাধুর্য্য, একনিষ্ঠ প্রেম,—ইহা আনন্দের নিত্য প্রসবণ, কৃষ্ণ কাছে থাকুন বা না থাকুন—রাধার মন সর্বদা কৃষ্ণময়—“গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি সদা ছলছল আঁখি। পূলকে আকুল দিক্ নেহারিতে সব শ্রামময় দেখি।” (চণ্ডীদাস) প্রতি পত্রমর্শ্বরে কৃষ্ণ-পদধ্বনি, প্রতি বায়ুহিলোলে বাঁশীর তান, রাধিকার আর কোন জ্ঞান নাই। চোখে কৃষ্ণরূপের অঙ্কন, কর্ণে অমৃতময় বেণু-শ্রবণ; এই প্রেম রাগাঘুরাণী। ইন্দ্রিয় তখন অন্তর্মুখী, তাঁহার পাদপদ্ম হইতে তাড়াইয়া অস্ত্রদিকে চালাইতে চাহিলে তাহারা বাগ মানেন না। রাধিকা বলিতেছেন—“বত নিবারিয়ে তায়, নিবার না যায়, আন পথে ধাই, তবু কান্দুপথে ধায়”—মনকে বত নিবারণ করিতে চেষ্টা করি, কিছুতেই নিবারণ করিতে পারি না, আমি অস্ত্র পথে বাইতে চাই, কিন্তু পদ আমার অতর্কিতে কাছুর পথেই চলিয়া যায়। “এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম। বার নাম নাহি লব, লয়” তার

নাম। এ ছাড়া নাসিকা মুক্টি কত কর বদ্ধ। তবু তো দারুন নাসা পায় শ্রামগন্ধ ॥
সে কথা না শুনিব করি অহুমান। পরসঙ্গে শুনিবে আপনি যায় কাশ ॥ বিক্ রহ
আমার ইন্দ্রিয় আদি সব। সদা যে কালিয়া কান্থ হয় অহুভব ॥” কখনও কখনও রাধা
সেই বিশ্বহৃন্দর পরম দেবতার আদরের কথা বলিতে যাইয়া আত্মহারা হইতেছেন :—
“এ কথা কহিবে সহ—এ কথা কহিবে। অবলা এমন তপ করিয়াছে কবে ॥ পুরুষ
পরশমণি নন্দের কুমার। কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার ॥” তিনি ত স্পর্শমণিতুল্য,
তিনি যাহা স্পর্শ করেন, তাহাই সোণা হইয়া যায়—তবে, আমার নিকট কি ধন চান
যে আমার পা ধরিয়া বসিয়া থাকেন ? “আমি যাই যাই যাই—বলে তিন বোল। কত না
চুষন দেয়, কত দেহি কোল ॥” যাইতে চাহিয়াও যাইতে পা উঠে না। চিবুক ধরিয়া
“আমি যাই, যাই, যাই” বলিয়া বারংবার সজলচোখে বিদায় গ্রহণ করেন। কত চুষন
ও নিবিড় আলিঙ্গনে বিদায় লওয়ার পালার পরিসমাপ্তি। কিন্তু এত করিয়াও পালা শেষ
হয় না। “পদ আদ যায়-পিয়া চায় পালটিয়া। বদান নিরখে কত কাতর হইয়া ॥
করে কর ধরি গিয়া শপথি দেয় যোরে। পুনঃ দরশন লাগি কত চাটু বোলে ॥” এক পা
যাইয়া আবার ফিরিয়া কত কাতরভাবে আমার মুখখানি দেখেন, এবং আমার হাতে
নিজ হাত দিয়া বলেন, “আমার শপথ, আবার যেন দেখা পাই।” পুনরায় দর্শনের জন্ত
কত মিষ্ট কথা বলেন, কত খোসামুদি করেন। এহেন কৃষ্ণের প্রসঙ্গ বেখানে হয়, সেখানেই
তিনি পুলকে আত্মহারা হইয়া যান—“দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে,—পুলকে পুরষ তহু
শ্রাম পরসঙ্গে ॥” কৃষ্ণের প্রসঙ্গে শরীর পুলকে রোমাঙ্কিত হয়, অন্তরের সেই আনন্দ
ঢাকিতে গেলে “পুলক ঢাকিতে কত করি পরকার। নয়নের ধারা যোর বহে অনিবার ॥”
সে কথা শুনিলেই চক্ষে পুলকাক্ষ দেখা দেয়। যাহা কিছু করি, যত দূরেই যাই না
কেন—তাহার মুখের হাসিটি মনে জাগে, তখন সর্বজ্বালাব অবসান হয়। “যথা তথা
যাই আমি—যত দূর চাই। চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই ॥”

আমরা এই রাগামৃগ প্রেমের কথা পুনরায় উত্থাপন করিব। বুদ্ধদেব মানুষের সঙ্গে—
সমস্ত জীবজগতের সঙ্গে একমাত্র করুণার সম্বন্ধ রাখিয়া অপর সমস্ত সম্পর্ক বাদ দিয়াছিলেন।

ঐহার মৃতি স্বতন্ত্র, একক—তিনি জীবের সঙ্গে যে পারিবারিক
হৃৎখবদ ও আনন্দ।

বন্ধন তাহা অস্বীকার করিয়া সমস্ত কামনার উর্দ্ধে আসন
লইয়াছিলেন, ঐহার ধর্মমতের ভিত্তি হৃৎখবদ। কিন্তু মহাপ্রভু মানুষের সমস্তগুলি সম্বন্ধ
গরীয়ানু করিয়া উহা আনন্দময়ের সঙ্গে আনন্দের সম্বন্ধের প্রতীক স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন।
এই সম্বন্ধগুলির দ্বারা আমরা পরিবারে আবদ্ধ—ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে ভগবদাধিনার
উপাদান আছে। দারা, পুত্র, পরিবার মিথ্যা নহে—ইহাদের পশ্চাৎ সেই অন্তরঙ্গ
বন্ধ দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন,—যিনি বেদান্তের কথায় বলিতে গেলে “আমাদের পিতা,
ধাতা ও পিতামহ ॥” এই সম্বন্ধগুলিকে তুচ্ছ করিলে—আনন্দস্বরূপের দ্বারে পৌছান
সহজ হয় না।

সুতরাং মহাপ্রভু মানুষের পারিবারিক সম্বন্ধগুলির উপর ভগবৎপ্রেমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন দেবাদিদেবের প্রেমের ইঙ্গিত পারিবারিক সম্বন্ধ।

আমরা গৃহে পাইতেছি—বনবাসী তাহা পাইতে পারে না। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী গৃহী না হইয়াও গৃহী, কারণ গার্হস্থ্য জীবনের শিক্ষা দিয়া তিনি তাঁহার উদ্দিষ্ট দেবতার পূজোপকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন।

এই পঞ্চরস—গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূলকথা। বৈষ্ণবেরা নীতিশাস্ত্র, জ্ঞান ও কর্ম মানেন না। তাঁহারা বলেন রসই সর্বপ্রধান—বাহার চিন্তে সেই অমুরাগ জন্মিয়াছে তাঁহার চিন্তে নীতিকথা স্বতঃসিদ্ধ। ভগবানে বাহার প্রেম জন্মিয়াছে,

নীতিশাস্ত্র

তিনি নীতিবিগর্হিত কোন কর্ম করিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে তাহা অসম্ভব—সুতরাং নীতিকথা নীচেকার কথা। ইহা কি কখনও কেহ মনে করিতে পারে যে চৈতন্যদেব মিথ্যা কথা বলিবেন,—পরের অপকার করিবেন? বৈষ্ণবধর্মের উচ্চাঙ্গের রস-শাস্ত্রের নিকট নৈতিক ধারাপাতের বুলি আওড়ান বাতুলতামাত্র।

চৈতন্যদেব ঈশ্বরপ্রেমের বে আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহা জগতে অতুলনীয়,—“রূপ লাগি আখি झुरে গুণে মনভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর।” ঈশ্বরের সত্তা, তাঁহার প্রতি অমুরাগ—কল্পনার বস্তু নহে। এই অলৌকিক রস আত্মাদনযোগ্য ও আত্মাদিত হইয়াছে—ইহাই তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রেমে আজ বাঙ্গলা দেশ ভরপুর। বাঙ্গলার দূরদূরান্তরে, নগরে ও পল্লীতে ঘরে ঘরে গৌরান্দের নাম কীর্তিত। চাষা লাঙ্গল ফেলিয়া, কামার হাতুড়ী ছাড়িয়া, তাঁতি বস্ত্রবয়ন রাখিয়া সন্ধ্যায় মাদল লইয়া বসে, বাঙ্গলায় এমন পল্লী নাই, বলিলেও অত্যাক্তি হয় না—যেখানে গৌরান্দের নাম কীর্তিত হয় না। সমস্ত বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার তিনি মালিক। তিনি খুব বড় পণ্ডিত বা তর্কিক ছিলেন, কিংবা কোন অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছেন, চাবাদের গানে তাহার উল্লেখ নাই, এমন কি তাঁহার দিগ্বিজয়ী জয় কি বড়ভুজদর্শন প্রভৃতির কথা একবারও তাহারা বলে নাই। তাহারা যে নিত্য সন্ধ্যায় তাঁহার জন্ত ভক্তিফুলের মালার অর্থ্য সাজায়—তাহা সহজ সরল কথার সুরভিমাখা। “আমার গোরা জাতের বিচার মানে নারে—দেখুবি যদি আয় সকলে।” “দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোণা, তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গিয়ে আর পেলাম না। সে মানুষ চেয়ে চেয়ে, ফিরতেছি পাগল হয়ে—মরমে অলছে আঙুন আর নিবে না,

আমার বলে বলুক লোকে মন্দ, বিরহে তার প্রাণ বাঁচে না।” যিনি গানে গানে চৈতন্যের ইতিহাস-রচনা।

জুংথের দিনের অবসানে বাহার চরণকমল পাইব বলিয়াই জীবন-ধারণ, সেই পরম আশ্রয়, রূপেশ্বর প্রিয়বন্ধুর যিনি সন্ধান দিয়েছেন, সেই সোণার মানুষটির জন্ত জাতীয় ব্যাকুলতা বাঙ্গলার শত শত চাষার গানে ছুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে ইহারা কত ভালবাসে এই ছুটি চরণ, বাহা বাঙ্গলার হাটে মাঠে শোনা যায়, তাহা হইতেই তাহা বুঝা বাইবে—“ভজ গৌরান্দ লহ গৌরান্দ কহ গৌরান্দের নাম। যে জন গৌরান্দ ভজে সেজন



গৌৰ্ভন-ধারণ, গণি বাঙ্গালী ছবি। স্বৰ্গীয় সত্যজিৎ মিত্রৰ ব্যতীৰ দল জৰি ৯২.০০ টুকুৰা, (বঙ্গবাসীত) ১২৬ বঙ্গবাসীত প্রচলিত।
(চিত্ৰকৰেৰ নাম শৰী কয়াল (সত্য-ধোলা পাড়া, কলিকতা)।

আমার প্রাণ।" শত শত গানে এই ভাবটি আছে,—“দেখ এসে এক সোণার মাহুব পতিতের গলা ধরিয়া কাঁদিতেন।” গৌরাঙ্গদেব জাতীয় গানের বত উপহার পাইয়াছেন, বোধ হয় জগতে আর কেহ তেমন পান নাই। তাঁহার নিজের জীবনটি ছিল একটি গানেরই মত। এই রুঢ় জগতের কোন জটিল কথা তাহাতে ছিল না। দুইটি অশ্রমের পদাচকু, “চল চল অঙ্গের লাগণী”, কৃষ্ণপ্রেমে শীর্ণদেহ—এই ছিল তাঁহার সম্বল। জনম ভরিয়া এই রূপের কথা বলিয়া বঙ্গীর জনসাধারণের তৃষ্ণা মিটে নাই। জগদ্বদ ভদ্র মহাশয় যে এক সহস্র গৌরাঙ্গপদ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা সেই অক্ষরস্ত ভাণ্ডারের অতি নগণ্য অংশ। তাঁহার যে সমস্ত বড় বড় জীবন-চরিত লেখা হইয়াছে—তাহার মধ্যে চৈতন্তকে বত না পাওয়া যায়, এই সকল গানের মধ্যে তাঁহার জীবন্ত রূপ তদধিক পাওয়া যায়—স্বরধুনীর তীরে তাঁহার কীর্তনের যে খোল বাজিয়া উঠিয়াছিল, অস্তাবদি সেই স্বরতরঙ্গ এখানে আকাশে-বাতাসে খেলিতেছে। গৌরাঙ্গের বিশিষ্টবৈতাত্ত্বিকতাবাদ তাহাতে নাই, কিন্তু তিনি পতিতকে কোল দিয়াছিলেন, তিনি যে শ্রবণামৃত কৃষ্ণকথা শুনাইয়াছিলেন—কত ভঙ্গীতে কত ছন্দে কত সুন্দররূপে বাঙ্গলার জনসাধারণ তাহাই গাইয়া আসিতেছে। তাঁহার অপূর্ণ কীর্তন মনোহরসাই, গড়নহাটি, রেনেটি প্রভৃতি স্থরে—ভাবের মদিরা ঢালিয়া বাঙ্গালী-কুটিরের সর্ব্বহঃখের আলা ভুলাইয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী এমন করিয়া কোন সমগ্র জাতি জগতে গুণের পূজা করে নাই। গৌরাঙ্গ প্রকৃতই বাঙ্গালীর চোখের অঙ্গন, কণ্ঠের আভরণ, হস্তের দর্পণ, মুখের তাপল, হৃদয়সর্ব্বস্ব, গৃহের সার। তিন ভগবানের রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া পাগল হইয়াছিলেন। বাঙ্গলার জনসাধারণ ‘রূপাভিসার’ গাহিয়া সেই স্মৃতি এখনও উপভোগ করিতেছে। নব-বিবাহিতা বধু পিতালয়ে গেলে যেমন নূতন বরটি ঘুরিয়া ফিরিয়া খণ্ডরালয় হইতে আগত কোন লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে ভালবাসে—সেই প্রাণের মাহুবটি যে স্বর্গলোক তাহাদিগকে দেখাইয়াছিলেন সেই স্বর্গের স্মৃতি সম্বল করিয়া বাঙ্গালীচিত্ত তেমনি মহাজন-পদাবলী বুকের ধন করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহা শুনিতে এত ভালবাসে।

চণ্ডীদাস, বিজ্ঞাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির কীর্তনকে ‘মহাজন’-পদাবলী আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। বাঙ্গালী আর কোন জাতীয় গানকে এইরূপ সম্মান দেখায় নাই। রামপ্রসাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সঙ্গীত, রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত, ফকির ও বাউলদের গান এবং আগমনী গান—ইহারা সত্যসত্যই ধর্ম্মের কথা শুনাইতেছে, কিন্তু ইহার কোনটিই ‘মহাজনপদ’ নহে। চৈতন্তের পরিকরগণ কিংবা চৈতন্ত বাহাদুরের নিকট প্রেমের প্রেরণা পাইয়াছেন এবং চৈতন্তের পরবর্ত্তী একটি নির্দিষ্ট কবির দল, ইহারা রাধাকৃষ্ণ-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন—তাঁহারা ‘মহাজন’; চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত একটি নির্দিষ্ট বৈষ্ণব কবির দল—‘মহাজন’। রূপজীবীরাও কীর্তন গাহিয়া থাকে, তাহারা রামপ্রসাদের গান,

কীর্তনের সঙ্গে চৈতন্তের সম্বন্ধ।

মহাজন গান।

আগমনী গান, কিংবা শাস্ত্র-সঙ্গীত, ব্রাহ্ম গান, ফকিরের দেহতত্ত্বের গান—এ সমস্তই গাহিয়া থাকে—কিন্তু কীর্তন গাহিতে হইলে তাহাদের ভাব অল্প প্রকার হইয়া যায়, তখন তাহারা বলিবে “মহাশয়, বাসি কাপড়ে, হাত মুখ না ধুইয়া কীর্তন গান করিব কিরূপে?” অথচ এই কীর্তনের মধ্যে শীলতার হানিকর অনেক আপত্তিজনক বিষয় আছে। তথাপি কীর্তনগানও অপরাপর গান এক পাঙ্ক্ত্যে নহে। কীর্তনগান চৈতন্তের ছাপ যারা—মোহরাঙ্কিত। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্র যখন তাহার সঙ্গী পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “এমন অমৃতবর্ষী সুরতো কখনও শুনি নাই, শুধু সুরেই যে প্রাণ কাড়িয়া লইল, এই আশ্চর্য্য সঙ্গীত, এই আশ্চর্য্য সুর কাহার সৃষ্টি?” সঙ্গী বলিলেন, “এই কীর্তন-সুর ঠাকুর চৈতন্তের সৃষ্টি (চৈ. চ. অস্ত্য)। মোট কথা সুরচি-কুরচির কথা ছাড়িয়া দিয়া অমৃতসিঁদু ব্যক্তির পক্ষে কীর্তনের আসরটি দেখা উচিত। ষাঁহার বৈষ্ণব ভক্তির দীক্ষা নাই, যিনি চৈতন্তের জীবনী স্বরূপে পড়েন নাই তিনি যেন বটতলা-প্রকাশিত পুস্তকগুলি হইতে কীর্তনের পদ না পড়েন। চালি ও কাঠামো বাদ দিয়া অমৃত-সিংহ-কার্তিক-গণেশ-লক্ষী ও উর্দ্ধদিকে শব্দ এই সমস্ত আসবাব ছাড়িয়া দিয়া যদি দুর্গা ঠাকরণকে নামাইয়া আনা যায়, তবে দুর্গা প্রতিমার সে মহিমায়িত রূপ আর থাকে কি? সেইরূপ ষাঁহার কীর্তন বুঝিতে চাহিবেন তাহারা ভাল কীর্তনকার মুখে আসরে আসিয়া একবার কীর্তন শুনুন। দেখিবেন খণ্ডিতার কলুব কাটিয়া গিয়াছে, বিপ্রলঙ্কার উদ্যম ভাব আর নাই—কলহাস্তুরিতার মান—এ সমস্তই অনাবিল, অপাপবিদ্ধ। যে সন্তোগ-মিলন শুধু পুস্তকে পড়িলে বিভাসুন্দরী তোটকের মতই শুনাইবে—আসরে ভাই-ভগিনী, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে একত্র বসিয়া শুনিয়া বুঝিবেন—সন্তোগ-মিলনে ভোগের লেশ নাই—যে ভোগ আছে তাহা

পার্শ্ব মোড়কে আঁটা দেবভোগ। অধিকাংশ বৈষ্ণবপদই চৈতন্তের চরিত্র স্মরণ করিয়া লেখা হইয়াছে, তাহা পার্শ্ব মোড়কে আঁটা একখানি স্বর্গের চিঠি। চিঠি। কীর্তনকার সেই পৃথিবীর মোড়কটি ভাঙ্গিয়া যে সংবাদটি দিবেন, তাহা স্বর্গের। এজন্য প্রথমই “তৎকালোচিত গৌরচন্দ্রিকা” দিয়া গান শুরু হইয়া থাকে। অর্থাৎ পূর্বরাগ, মান, মাধুর প্রভৃতি যে বিষয়ই লইয়া গান হইবে, তাহার পূর্বে চৈতন্তদেবের তত্ত্ব অবস্থাসূচক একটি গান গাহিয়া নেওয়া হয়—ইহাই ‘গৌরচন্দ্রিকা’। যেমন ধরন, পূর্বরাগের পদ গাওয়া হইবে, তাহার পূর্বে রাধামোহন ঠাকুরের গৌরাঙ্গলীলার এই পদটি গাওয়া হইল, “আজু হাম কি পেখিলু নবঘীপচন্দ্র। করতলে করই বদান অবলম্ব। পুনঃ পুনঃ গতাগতি কর ঘর পথ। ফণে ফণে কুলবনে চলই একান্ত। ছল ছল নয়নে কমল সুবিলাস। নব নব ভাব করত পরকাশ। পলুক মুকুল-বর ভর সব দেহ। রাধামোহন কছু না পাওল দেখে” (পদকল্পতরু, প্রথম অঃ, ৬৪ পদ)।

গৌরচন্দ্রিকা। খুব জোরে মৃদঙ্গ বাজাইয়া খোল-করতালের সুরে, তাণ্ডব নৃত্যে দূর দূরান্তরের পল্লীগুলিকে যেন আসরে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়া গায়কেরা এই “গৌরচন্দ্রিকা” (গৌরবিষয়ক গান বা মুখবন্ধ) গাহিল। এই ডঙ্কানিনাদ ও

চীৎকারের মধ্যে বড় একটা পটে চৈতন্তদেবের ভুবনপূজ্য মূর্তিখানি আঁকা হইল—তাহা প্রথম অমুরাগের। তিনি করতলে বদন অবলম্বন করিয়া কি ভাবে বিভোর হইয়া ধ্যান করিতেছেন? হঠাৎ উঠিয়া একবার বাহিরে একবার ঘরে বাতায়ত করিতেছেন। কখনও বা ফুলবনের দিকে চাহিয়া প্রফুল্ল ফুলদাম দেখিয়া কাহাকে মনে পড়াতে তাঁহার পয়চক্ষু বারংবার সজল হইতেছে এবং কি এক আনন্দে শরীর পুলকিত ও রোমান্তিক হইয়া উঠিতেছে—রাধামোহন তাঁহার এই মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তনশীল ভাবগুলির তাৎপর্য ঠিক ধরিতে পারিতেছেন না। চৈতন্তের এই মূর্তি প্রথমে পটে আঁকা হইল, তাহা শ্রোতার মনে মুদ্রিত করিয়া—রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগের অবতারণা করা হইবে। এইভাবে মহাপ্রভুর লীলার ভিত্তির উপর রাধাকৃষ্ণের লীলা দাঁড় করান হইল। চৈতন্তলীলার এই গানের পরেই পূর্বরাগ। প্রথম গানটি হয়ত চণ্ডীদাসের “ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিল তিল আসে যায়। যন উচাটন, নিখাস সঘন, কদম্ব-কাননে চায়। রাই এমন কেনই বা হৈল? গুরু হুরুজন ভয় নাই মনে কোথা বা কি দেব পাইল। সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল সম্বরণ নাহি করে। বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়া পড়ে।” এই গান কীর্তনীয়া “আখর” দিয়া আসরে বুঝাইয়া যান। শ্রোতার মনের তার বাহাতে সর্বোচ্চ গ্রামে আঁটা থাকিতে পারে, ভূতলের পক্ষে নামিয়া না পড়ে—এই জন্ত কীর্তনীয়া ‘গৌরচন্দ্রিকা’র সঙ্গে সুর মিশাইয়া ভাবের পবিত্রতা বজায় রাখেন, “কোথাবা কি দেব পাইল।” গাহিয়া কোন্ দেবতা রাধিকাকে পাইয়াছে—তাহার আধ্যাত্মিক সন্ধান অমূল্যসঙ্কেতে প্রদান করেন। আগাগোড়া “আখর” দিয়া গায়ক কীর্তন গানের মহিমা অব্যাহত রাখেন। এমন কি খণ্ডিতার মত ভাবছুষ্ট গান আমি কীর্তনীয়ার মুখে ব্রাহ্মকাগণের সঙ্গে বসিয়া শুনিয়াছি; কীর্তনীয়া এমনই উচ্চগ্রামে শ্রোতার মনকে লইয়া গিয়াছেন বাহাতে কোন দোষের কথা দূরে থাকুক, অনাবিল শুভ্র পবিত্রতার চিত্ত ভরপুর হইয়া গিয়াছে। ভাল গায়ক না হইলে “আখর” দিতে পারে না, অন্নদরের কীর্তনীয়া “আখর” দিতে চেষ্টা করিলে কীর্তন মাটি হইয়া যায়, আসর ভাঙ্গিয়া যায়। সুকণ্ঠ বা সুগায়ক হইলেই যে কীর্তন জমিবে তাহা নহে, কীর্তনীয়া ভগবৎ-রসের রসিক হওয়া চাই, শুধু তাহাই নহে, শ্রোতা-দিগেরও আসরে একটা বিশেষ মনোবৃত্তি লইয়া বসিতে হইবে। কিরূপে যে নিতান্ত পার্থিব বিষয়গুলি স্বর্গের উপাদানে পরিণত করা হয় তাহা কতকটা আশ্চর্য। অভিসার গানে রাধিকা গোপনে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইতে বাইতেছেন। জয়দেব ঠাকুর রাধিকাকে উপদেশ দিতেছেন—“মুখর মঞ্জীর ত্যাগ কর, নীলশাড়ী পর।” যেহেতু পথে নৃপুত্রের শব্দ হইতে পারে,—অন্ত রঙ্গের শাড়ী আধারেও দেখা বাইতে পারে। যথাসাধ্য গোপন রাখার ব্যবস্থা,—ইহাই ত অভিসারের কথা। আলঙ্কারিকেরা ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু পরবর্তী কবিরা রূপাভিসার বলিতে ত্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গৌরের যাত্রা, অর্থাৎ তাঁহার সংকীর্ণনের অভিযান বুঝিতেন। তাঁহার রাধিকাকে সাজাইয়া বাহির করিতেছেন। যিনি রূপেশ্বরের নিকট রূপের সন্ধানে বাইতেছেন, তাঁহার মত রূপ কাহার? তাঁহার “পিঠে দোলে

হেমচাঁপা, রঙ্গিয়া পাটের খোপা",—“একে সে তরুণ ইন্দু, মলয়জ বিন্দু বিন্দু, তরুণরি কঙ্করি
 তিলক”, তাঁহার গতি “অতি সুলাবনী”, তিনি সখীর স্বক অবলম্বন করিয়া যাইতেছেন।
 “কুন্তলে বকুলমালা গুঞ্জরে ভ্রমরী,” রাজনন্দিনীর ক্রান্ত হাঁটিবার অভ্যাস নাই, “রাই
 যাইতে যাইতে পুছে, কেলিকুঞ্জবন, কদম্বকানন, আর কতদূরে আছে?” এইভাবে রাধিকা
 যাইতেছেন—ইনি জয়দেবের অভিসারিকা নহেন, ইনি সগর্ভে বলিয়াছেন—“কলকী বলিয়া
 ডাকে সবলোকে, তাহাতে নাহিক দুঃখ, তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।”
 ইনি কুল শীল জাতি সমস্ত ‘কৃষ্ণায় নমঃ’ বলিয়া তাঁহার পদে সমর্পণ করিয়াছেন, ইনি বলিয়াছেন
 “নন্দিনী বল্ গিয়ে নগরে, ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী, কৃষ্ণপ্রেম-কলঙ্ক-সাগরে।” কানে কানে
 কথা বলিয়া চাঁপা সুরে নিন্দা প্রচার করিবার দরকার নাই। বল্ গিয়ে নগরে—অর্থাৎ
 ঢাক বাজাইয়া প্রচার কর্ আমি নিখিলভয়হরণের পায়ে শরণ লইয়াছি—আজ আমি
 নির্ভর। কবি অনন্তদাস মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ণন বা অভিসারযাত্রা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।
 তিনি সুন্দরী রাধিকাকে সাজাইয়া বাহির করিলেন এবং লিখিলেন—“কঙ্কণ রণরপি, বঙ্ক-
 রাজধনি, চলইতে সুমধুর বাজে। চৌদিকে রমণী সাজে, ডম্ফ রবাব বাজে;” শুধু
 কঙ্কণের রুণু রুণু বা বাকমলের সুমধুর ধ্বনি নহে, উচ্চৈঃশ্রবে মধ্যো মধ্যো ভেঁপু বাজিয়া
 উঠিতেছে—ডম্ফ ও রবাবের শব্দ শুনিয়া অভিসারিকাকে দেখিবার জন্ত রাজপথে ভিড়
 জমিয়া গিয়াছে। ইহা অভিসারের নামে সংকীর্ণন। চৈতন্যদেব যে এই রাধাকৃষ্ণ-লালা
 গানের প্রাণ, তাহা কি এখনও বলিতে হইবে? অথচ এই সকল গানের আধ্যাত্মিক
 ইঙ্গিতগুলি কবিদিগের অপূর্ণ কবিত্বের হানিকর হয় নাই। এই পদটিতেই আছে,
 রাধিকা চলিতেছেন, তাঁহার পায়ে আলতার ছোপ মাটিতে পড়িয়া রাঙ্গা দাগ রাখিয়া
 যাইতেছে। তাঁহার অঙ্গ-গন্ধে ভ্রমরেরা অন্ধের মত তাঁহার পায়ে পায়ে চলিতেছে এবং
 যেখানে যেখানে তাঁহার রাঙ্গাচরণচিহ্ন পড়িয়াছে, তাহাই পদ্ম বলিয়া ভ্রম করিয়া চুষন
 করিতেছে—“চলইতে চরণের—সঙ্গে চলে মধুকর—মকরন্দ পান কি লোভে। সৌরভে
 উনমত, ধরণী চুষয়ে কত, বাহা বাহা পদচিহ্ন শোভে।”

শ্রীকৃষ্ণের পায়ে সর্বস্ব অর্পণ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণই এই শিক্ষা, ইহা অতি কঠিন।
 শ্রীকুমার জীবনে অভ্যস্ত, চিরদেহে পালিত তরুণকে তপস্তার ব্রত করিতে হইবে। রাধিকা
 বলিতেছেন—“নিজের আধিনায় কাঁটা পুঁতিয়া—কলসী কলসী জল
 ঢালিয়া তাহা পিছল করিয়াছি। তরুণরি রাজি জাগিয়া আস্থুল
 চাপিয়া বাতায়াত করিয়াছি—বেহেতু “আমার যেতে যে হবে গো,
 রাই ব’লে বাজিলে বানী, বঁধুর লাগি পিছল পথে” অন্ধকারে বন-জঙ্গলে ঘুরিতে হইবে এজন্ত
 “করবুগ মুদি চলু ভামিনী, তিমির পয়ান কি আশে।” তিমিরে প্রয়াণ করিবার আশায়
 ভামিনী হাতের দ্বারা চক্ষু চাপিয়া রাখিয়া বাতায়াত করা শিখিতেছেন। আর পথে পথে
 হয়ত বিবাক্ত সাপ এজন্ত “মণিকঙ্কণপণ, ফণিমুখবন্ধন, শিখয়ে ভুজগ-গুরু পাশে।” মণি-
 নির্মিত কঙ্কণপণ (পুরুষের) স্বরূপ দিয়া ‘ভুজগ-গুরু’ (সাপের রোষার) নিকট ফণি-

সন্ন্যাসের অঙ্গ প্রস্তুত
 হওয়া।



দশ্য কর্তৃক রমণী-হরণ, ২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র (পুথির গলাটি) হইতে, ঝাঁকুড়া।



রাইমানিনী, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, বর্তমান। বীণাবাহিনীর চন্দ্রাবেশে কৃষ্ণ।



হাজিরমুখো রথে কৃষ্ণের মধুরা-যাত্রা। বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রা এক সময়ে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল, রথও তাহার। নৌকার ছন্দে নির্মিত। সপ্তদশ শতাব্দী, বীরভূম।

মুখবন্ধন, (সাপের মুখ কি উপায়ে বন্ধ করা যায়) তাহা শিখিয়াছি। সন্ধ্যা-গ্রহণকালে গুরুজনের গজনা শুনিতে হইবে—পরিজনেরা বাধা দিয়া উপদেশ দিবেন—তজ্জন্ত এখন হইতেই প্রস্তুত হইতেছেন, “গুরুজন বচন বধির সম মানই আন শুনই কহ আন। পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই গোবিন্দ দাস পরমাণ।” গুরুজনের কথা শুনিতে বধির হওয়ার ভান করেন—এক কথা শুনিয়া আর কথার উত্তর দেন। পরিজনের কথা শুনিতে মুগ্ধার (পাগলের) ভাষা হাসেন—গোবিন্দ দাস ইহার সাক্ষী। বর্ষার অভিসারের গোবিন্দদাসের কি বর্ণনা। শব্দের ললিত স্বাক্ষর ও ভাবের গুরুত্ব তাহাদের তুলনা নাই। পঙ্কিল বাট (কর্দমাক্ত পথ), মন্দির-বাহিরে কঠিন কপাট, তাহার উপর দূরতর আকাশ বাহিয়া বাদলের ধারা আসিতেছে, হে সুন্দরি, তোমার একখানি নীল শাড়ীর আঁচল দিয়া কি এই হৃদ্যোগ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে? আবার পরক্ষণেই বিদ্যুৎ ঘেরপ এক মুহূর্ত চমক দিয়া মর্ত্যবাসীকে স্বর্গ দেখাইয়া দেয়, সেইরূপ একটি মাত্র পূর্ণ সঙ্কেতে কবি আধ্যাত্মিক রাজ্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন “হরিরহ মানস স্বরধুনী পার। সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার?” কি ভাবে এই হৃদ্যোগে অভিসারে যাইবে, হরি মন-গঙ্গার অপর পারে—ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে। এই যে সৌন্দর্য্য, এই যে হৃদয়ের তপস্তার কথা—এ সমস্তেরই প্রেরণা দিয়াছিলেন চৈতন্যদেব। তাহার জীবনের অলৌকিক প্রেমের লীলা, অশ্রুর একটি স্বরধুনীর জায়, কিন্তু সে বেগশালী শ্রোত হৃদয়ের তপস্তার শৈলভেদ করিয়া আসিয়াছিল। তাহার জীবনের কৃষ্ণ ঢাকা পড়িয়াছিল, তাহার হৃদয় বিকশিত—শতদলপ্রভ সজল চক্ষুর অন্তরালে; লোকে তাহাই দেখিয়া ভুলিয়াছে। কিন্তু শতদলের নীচে ভুজঙ্গশয্যা-পঙ্কের ভিত, তাহা কে দেখিয়াছে? কত উপবাস, কত অনিদ্রা, কত হর্গম ভ্রমণ, কত বিপদ—সেগুলি তাহার জীবনে রসের উৎস ও প্রফুল্লতার হানি করিতে পারে নাই।

এই পদাবলী ও কীর্তন-সাহিত্য একটি খরশোতা নদীর জায় ছুটিয়াছে। ইহার হৃদকূলে কত উপবন, কত লোকালয়, কত মধুর প্রাকৃতিক দৃশ্য,—কিন্তু ইহা যেখানে যাইয়া পড়িয়াছে—সেখানে আর কলরব নাই, তরঙ্গের তান নাই—সে প্রেমের সাগর-সঙ্গম।

নিশ্চল প্রশান্ত চিররহস্যময় মহাসমুদ্র। ইহার প্রত্যেক তরঙ্গ সেই আধ্যাত্মিক অভিধানের ইঙ্গিত দিয়া ছুটিয়াছে—ইহাতে যদি কিছু মলিনতা থাকে, তাহা ইহার চির-অমল প্রেমের উৎসের ঘূর্ণপাকে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহার ঠিকানা নাই। বিভাপতির রাধা বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণ, আমি তোমাকে আমার সর্কস্ব দিয়াছি। তোমাকে ভিন্ন আমি মুহূর্ত বাঁচিতে পারি না। কত উপমায় কত সুন্দর সুন্দর কথায় এই আত্মসমর্পণের কথা বলিয়া শেষে কবি বলিয়াছেন “মাধব তুহ কৈছে কহবি মোর”—আমি সর্কস্ব দিয়াছি সত্য, কিন্তু কাহাকে দিয়াছি তাহা জানি না। তুমি কেমন তাহা আমাকে বল। সাধনার এই হৃদয়ের তপস্তার পর একি প্রশ্ন? ব্রহ্মের স্বরূপ-জিজ্ঞাসা। বিভাপতির ভাব-সংকলনের পদে কৃষ্ণ আর দেহী নহেন, তিনি চিন্ময়, রাধিকা তাহাকে

মঙ্গলাচরণ করিয়া আনিতেছেন। সেই মঙ্গল-উপচারও সমস্ত মনের, বাহিরের উপকরণ তাহাতে কিছুই নাই।

“পিয়া যব আওব এ মধু গেহে,
মঙ্গল আচার করব নিজ দেহে,
বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে,
ঝাড়ু করব হাম চিকুর বিছানে,
আলিপন দেওব মোতিম-হার
মঙ্গল-কলস করব কুচভার।”

যখন তিনি আসিবেন, তখন আমার দেহ দিয়াই সমস্ত মঙ্গল-আচরণ করিব। আমার অঙ্গই বেদী হইবে এবং আমার সুদীর্ঘ কুন্তলের দ্বারা ঝাঁটা তৈরী করিয়া তাহা পরিষ্কার করিব। আমার বক্ষের লবিত মণিমালা আলিপনার কার্য্য করিবে এবং আমার পীনবক্ষ মঙ্গল-কলসী স্বরূপ হইবে।

মহুশ্বেদেহই ভগবৎ-মন্দির। ইহাই এই পদের অর্থ। সুতরাং চৈতন্তের জীবন-চ্ছটায় এই পদাবলীর অর্থ ফুটিয়াছে এবং তাঁহার প্রসাদে সমস্ত বাঙ্গলার জনসাধারণ এই পদাবলীর আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য উপভোগ করিবার বোগ্য হইয়াছে।

এখন আমরা তাঁহার জীবন ও কার্য্যাবলীর সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া যাইব। ৮১০ বৎসর হইল গৌরীদাস কীর্তনীয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যেন বঙ্গীয় নিকুঞ্জবনের শত শত কোকিলকণ্ঠ ধামিয়া গিয়াছে। তাঁহার গোষ্ঠ ও মাথুর বাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তপুর ও নারদকে শ্রবণ করাইত; তাঁহার ব্যাখ্যার কাছে ভাগবতের শ্রীধর স্বামীর ভাষ্য জ্ঞান হইত। এই অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকটির ভিতরে দেবী ভারতী যে প্রেরণা দিয়াছিলেন, তাহাতে গৌরীদাসের কণ্ঠে যেন দেবীর বীণাই বাজিতে থাকিত। পৃথিবীতে থাকিয়া তিনি স্বর্গের সংবাদ দিয়া গিয়াছেন, কোন ধর্ম্ম-মন্দির বা বেদী হইতে সেরূপ সংবাদ আমরা শুনি নাই। আজ গৌরীদাস নাই, তাঁহার অগ্রজ আসর-বিজয়ী রসিক নাই, আজ শিবুও পরলোকগত, এখন গণেশ সাঁঝের বাতি জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু উক্ত কীর্তনীয়াদের কূলপ্লাবী ভক্তিবন্তার আসর যদিও ভাঙিয়া গিয়াছে, তথাপি নূতনভাবে ভাবিত, নবমস্ত্রে দীক্ষিত ঋগেন্দ্রনাথ ও অপর্য্যাপ্ত দেবী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্ত যে আসর বীধিতেছেন তাহা কালে হৃদয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

পদাবলীর অশ্লীলতা-স্বধ্বংসে বীহারী বিজ্ঞপ করেন, তাঁহার গঙ্গার একপ্রাস ঘোলা জল দেখিয়া বিরক্ত হইয়া থাকেন, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর বিশ্ববন্দিত প্রবাহের শুভ্রতা ও পবিত্রতা অহুমান করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই।



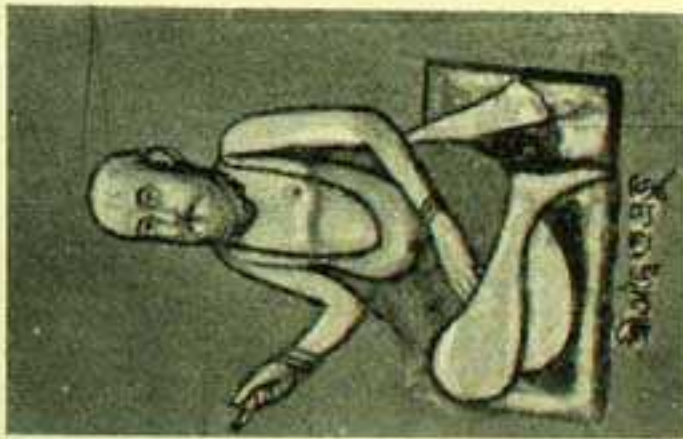
যড়ভুজ গৌরাঙ্গ—বহরু গ্রামের (২৪শ পরগণা) রায় নাহেব দেবেশ্বর বহরু মন্দির গাত্রে ছবি, দুর্গারাম ভাস্কর কর্তৃক ১৮১৪ খৃঃ অব্দে অঙ্কিত।



অধৈত, সপ্তদশ শতাব্দীর ছবি হইতে গৃহীত।
(২৪শ পরগণা।)



নিত্যানন্দ, ২০শ বৎসরের প্রাচীন চিত্র (২৪শ পরগণার) হইতে সংকলিত।



অধৈত, দুর্গাবস্থা—২০শ বৎসরের প্রাচীন চিত্র (২৪শ পরগণা) হইতে সংকলিত।



হরিনাদ—সপ্তদশ শতাব্দীর ছবি হইতে গৃহীত। (২৪শ পরগণা)।



জগৎ গোষ্ঠী—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পত্রগণা), ৭১৭ পৃঃ।



গনেশ—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পত্রগণা, ৭০৩ পৃঃ)।



রায় রামানন্দ—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত। (২৪শ পত্রগণা ৭২৫ পৃঃ)।



শ্রীগোবিন্দ—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত। (২৪শ পত্রগণা)



সনাতন—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পত্রগণা, ৭১৭-১৮ পৃঃ)।



রাজা প্রতাপ রায়—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পত্রগণা, ৭৩৪ পৃঃ)।



জীব গোখলী—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র
হইতে মৎকর্জুক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা, ২৪শ
পরগণা ৭৫২ পৃঃ ১)



গোপাল ভট্ট—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে
মৎকর্জুক সংগৃহীত (২৪ পরগণা, ৭৫২ পৃঃ ১)



ব্রহ্মনাথ দাস—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র
হইতে মৎকর্জুক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা
৭৫২-৫২ পৃঃ ১)



ব্রহ্মনাথ ভট্ট—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র
হইতে মৎকর্জুক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা)।



স্বকর্ণ নামোদর ২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে
মৎকর্জুক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা)।



শ্রীজগদানন্দ—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে
মৎকর্জুক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা) ১০৪ পৃঃ।



গদাধর পতিত, সপ্তদশ শতাব্দীর ২৪শ পরগণার
চিত্র হইতে ১০২ পৃঃ।



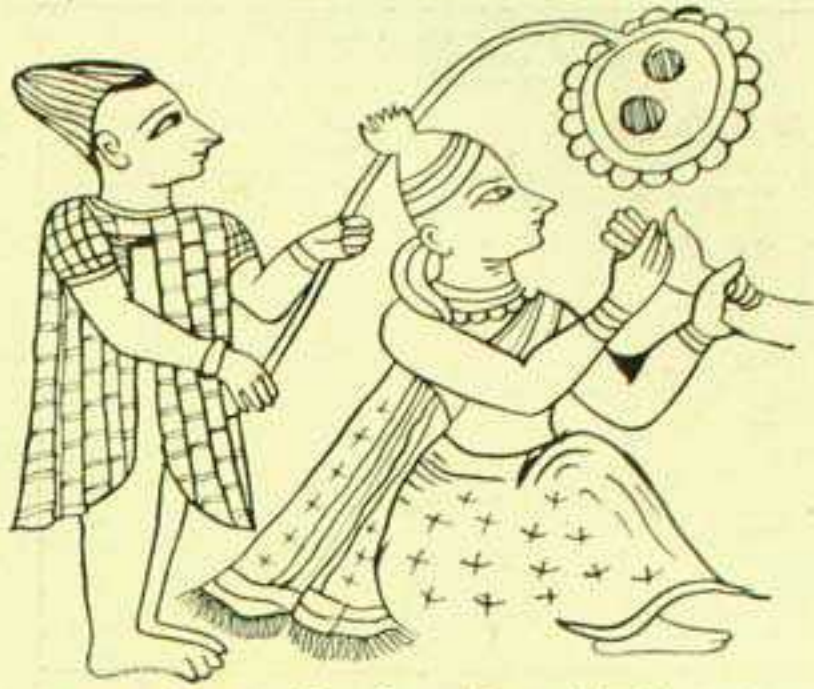
গদাধর—সপ্তদশ শতাব্দীর রঞ্জিত চিত্র
তে (২৪শ পরগণা) ১০৪ পৃঃ।



উদ্ধরণ দত্ত—২১০ শত
বৎসর পূর্বের ভগ্ন কষ্টি-
মূর্তি হইতে মৎসংগৃহীত
১০৩ পৃঃ।



জীবাস, ২৪০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র
হইতে ১১২ পৃঃ।



অমিত্য কবিরাজ। পুথির রঞ্জিত মলাট, দশদশ শতাব্দী ৭৬০ পৃঃ।



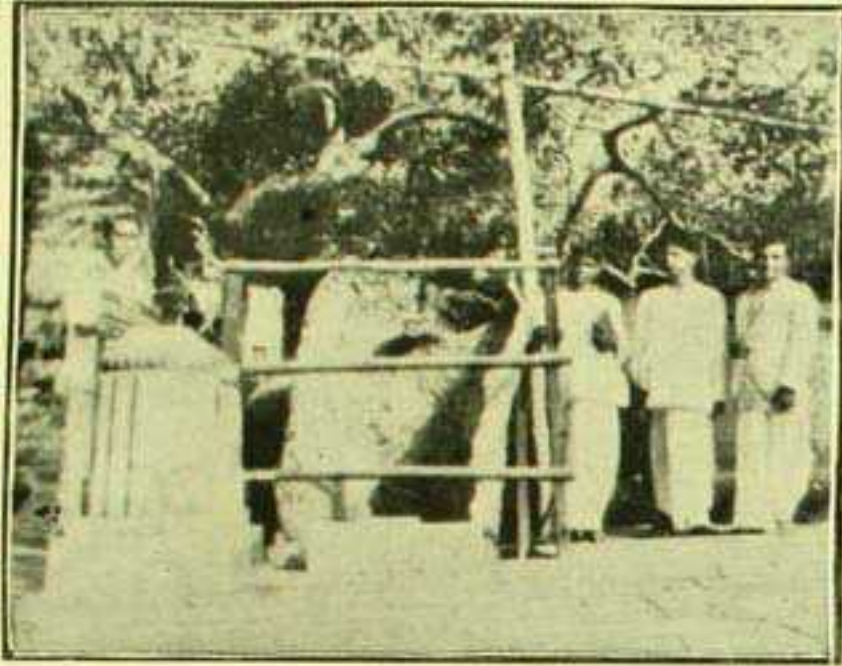
মুর্ছাপন্ন শ্রীনিবাস ও কবিরাজ। পুথির রঞ্জিত মলাট, দশদশ শতাব্দী ৭৪৭ পৃঃ।



হে-বজ্র। ভূমিকা ৩, - ৩/০।



বীর হাথীর। (স্বাক্ষর) ২৫০ বৎসরের প্রাচীন
পুথির মলাট হইতে। ৭৪০-৩০ পৃঃ।



হরিনামের আশ্রম, পুরী। ইতিহাসে এসিদ্ধ বকুল গাছ, ৫০০ বৎসরের
উচ্চকালের গাছ, মূল কাণ্ডটি নাই, গাছটি একটি বাকলের
উপর দাঁড়িয়ে আছে। আশ্রম স্থানী নীন বলভের আশ্রুকল্যাণ।



চৈতন্য-সংকীর্ণ। ইহার রচিত প্রতিলিপি (৩৭৪ পৃঃ) পানডিকা বেগুন



বাগ্‌দেব সাক্ষাৎভোম, — পুরীর বাগ্‌দেব-বাটির দেয়ালে অঙ্কিত
স্থাপত্যীন ছবি হইতে ৭২৬ পৃঃ।



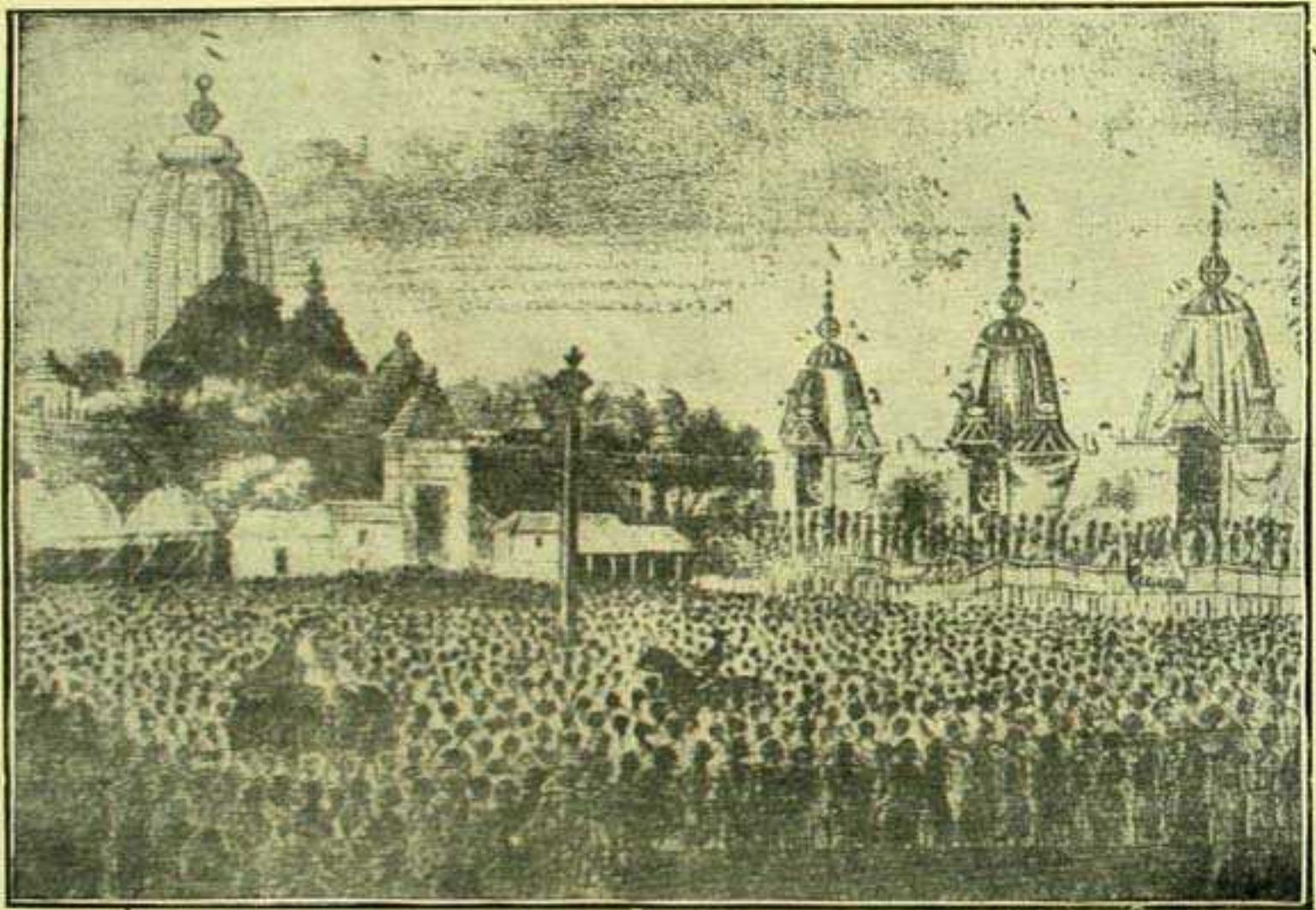
মহারাজা প্রতাপরুদ্র । ৬৭৩৪ পৃঃ।



পদ্মন আচাৰ্য্য—সপ্তদশ শতাব্দীর চিত্র হইতে।



শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ । বনবিষ্ণুপুরের রাধাশ্রাম মন্দির গায়ে
পোড়া ইটের উপর অঙ্কিত চিত্র । (১৭৫৮ পৃঃ) ৭৪৭-৪৯ পৃঃ।



এক শত বৎসর পূর্বে কলিকাতার রথের মিছিল (সাময়িক পত্রিকা হইতে) 'আনন্দবান্ধব' হইতে প্রাপ্ত ।

গৌরাঙ্গ ও তাঁহার পরিকরবর্গ

৫৪৫
৬৯৭
৪৪৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গৌরাঙ্গ ও তাঁহার পরিকরবর্গ

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে হুসেন সাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া “নবদ্বীপে পুনরায় ব্রাহ্মণ রাজা হইবেন,” এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়াছিলেন। নবদ্বীপের প্রজারা ধনু চালনায় সুদক্ষ ছিল। এই প্রবল জনশ্রুতিতে আতঙ্কিত হইয়া তিনি নবদ্বীপ উৎসন্ন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। নবদ্বীপের অনতিদূরে পিরুল্যা গ্রামে শিবিরস্থাপনপূর্বক মুসলমানেরা নানাবিধ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, (জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, কালী তাঁহাকে স্বপ্নে ভীতি প্রদর্শন করেন) রাজার মত পরিবর্তিত হইয়াছিল। তখন রাজদরবারেও সম্রাস্ত ও সুপণ্ডিত সভাসদ ছিলেন; আর এদিকে তখন নবদ্বীপের খ্যাতি সমস্ত ভারতব্যাপী ছিল, মিথিলায় পক্ষদর মিশ্রের প্রতিপত্তি-বিলোপের

সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের নাম ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানকেন্দ্ররূপে পরিচিত হইয়াছিল। বোধ হয় বিজ্ঞোৎসাহী হুসেন সাহ তাঁহার সভার পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুরোধে এই অত্যাচার শেষে থামাইয়া দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, টুলো বামুন-পণ্ডিতেরা নিতান্ত নিরীহ, ইহাদিগকে নিপীড়ন করা ভাল নহে। চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে, হুসেন সাহ অল্পতপ্ত হইয়া নবদ্বীপের ভগ্ন দেবালায়গুলির পুনঃসংস্কারের আদেশ প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন। এই শুভ সংবাদে নবদ্বীপত্যাগী বহু ব্রাহ্মণ আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। যখন দেশের অবস্থা এইরূপ, তখন চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষ মধুকর মিশ্র উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের অত্যাচারে বাজপুর হইতে পলাইয়া শ্রীহট্টে বাস করেন। কপিলেন্দ্রদেবের উপাধি ছিল “ভ্রমরবর,” মধুকর মিশ্রের পিতার নাম বিষ্ণু মিশ্র—ইহারা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ—বাংলায়নগোত্রীয়।

বংশাবলী।

মধুকরের ৪ পুত্র:—উপেন্দ্র, রঙ্গদানাথ, কীর্তিদানাথ, কুন্তিবাস।

উপেন্দ্র মিশ্রের স্ত্রীর নাম কমলাবতী, তাঁহাদের ৭ পুত্র—কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্বেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দন, ত্রৈলোক্যনাথ। জগন্নাথ নীলাধর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করেন।

(যখন জগন্নাথ মিশ্র তরুণবয়স্ক, তখন শ্রীহট্টে দুর্ভিক্ষ ও ঘোর অরাজকতা ঘটিয়াছিল। জগন্নাথ নবদ্বীপে শিক্ষাসমাপ্তির জন্ত আসিয়াছিলেন, সেইখানেই রহিয়া গেলেন, আর ঢাকা-দক্ষিণেই এই পরিবার বংশপরম্পরায় বাস করিয়াছেন।) শ্রীহট্টের আর একটি পল্লীও এইরূপ দাবী উত্থাপন করিয়াছেন—কিন্তু তাহা গ্রাহ্য বলিয়া মনে হয় না। ষাংহারা শ্রীহট্ট হইতে এই বিপৎকালে নবদ্বীপে পলাইয়া আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নীলাধর চক্রবর্তী (অপর একজন বৈদিক) ছিলেন। তিনি নবদ্বীপের বেলপুকুরিয়া গ্রামে বাসস্থাপন করেন।

জগন্নাথ মিশ্র বঙ্গাল রাজার বাড়ীর নিকট বাস করিয়াছিলেন—ইহা তখন নবদ্বীপের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত ছিল, এবং এই স্থানটি সম্ভবতঃ নগরের শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল। মুসলমানেরা এই স্থান অধিকার করার পর এই স্থানের নাম দিয়াছিল “মেঞাপুর,” কারণ অনেক মুসলমান এখানে বাস করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর জন্মস্থানটিকে মুসলমানী নামে অভিহিত করিতে ভক্তচরিতকারেরা স্বভাবতঃই কুণ্ঠাবোধ করিতেন। সুতরাং বৃন্দাবন দাস, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি আদি-লেখকেরা পল্লীর নাম উল্লেখ না করিয়া মহাপ্রভুর জন্মস্থান শুধু নবদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী লেখকেরা (তন্মধ্যে ভক্তিরত্নাকর-রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য) “মেঞাপুর” শব্দটি হিন্দুভাবাপন্ন করিয়া উহাকে “মায়াপুর” নাম দিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন মুসলমানদের দলিলপত্রে এবং চলিতকথায় মিঞাপুর বা মেঞাপুর নাম এখনও প্রচলিত দেখা যায়। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে হইতে হিন্দুরা উহাকে মায়াপুর নামে অভিহিত করিয়া আসিয়াছেন। নবদ্বীপে দ্বিতীয় মায়াপুর নাই। যেখানে বহু শতাব্দীর পূর্বে হইতে রামচন্দ্রের পূজা হইত এবং রামের রথোৎসব অনুষ্ঠিত হইত সেখানে বাদলার কোন প্রতাপশালী ব্যক্তি রামচন্দ্রের একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহা ঠিকই করিয়াছিলেন, যেহেতু ঐ স্থানটি রামের লীলার একটি প্রাচীন তীর্থ ছিল। সেই মন্দির এখন নদীগর্ভে কিন্তু, সেই রামচন্দ্রের মন্দির কখনই চৈতন্যমন্দির হইতে পারে না, এবং সে স্থানের নামও মায়াপুর নহে। জোর করিয়া কেহ কেহ নিজেরা উহার নাম ‘মায়াপুর’ দিয়াছেন।

জগন্নাথ মিশ্র সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার হাতের লেখা একখানি সংস্কৃত মহাভারতের আদিপর্ক এখনও পণ্ডিত ৬ মহামহোপাধ্যায় অজিত ভায়রঙ্গের বাড়ীতে আছে, উহা ১৪৬২ খৃষ্টাব্দের লেখা। একটি বর্ণাঙ্কিত নাই, হাতের অক্ষর মুক্তার

জগন্নাথ মিশ্র।

ছায়। এই মহাভারতের পুঁথিখানি অতিবন্ধে রাখা উচিত।

আমি উহা দেখিয়াছি। এই পুঁথি লেখার ১৭ বৎসর পরে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। জগন্নাথ মিশ্রকে তাঁহার পত্নী শচীদেবী অর্থাগমের জন্ত মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবপূজার পৌরোহিত্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, “তুমি পণ্ডিত অথচ তোমার চিরদারিদ্র্য।” এই অমুযোগ দেওয়াতে জগন্নাথ বলিয়াছিলেন, “ঐ দেখ আকাশের পাখীগুলি; উহাদিগকে কে খাইতে দেয়? আমরা সত্যপথে থাকিব, তুচ্ছ অর্থের জন্ত অশুচিত আগ্রহ আমার নাই।” (চৈতন্য-ভাগবত)

জগন্নাথ মিশ্রের আটটি মেয়ে হইয়াছিল, তাহারা আঁতুড়ে অথবা অপোগণ্ড বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তৎপরে বিশ্বরূপ নামক পুত্র জন্মে এবং (বিশ্বরূপ জন্মবার ১১ বৎসর পরে একদিন অতিক্রান্ত সন্ধ্যায় (১৪০৭ শকে, ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী) যখন সম্পূর্ণ গ্রাস হইতে পূর্ণচন্দ্র সবেমাত্র মুক্ত হইয়া আকাশে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছেন, সেই শুভক্ষণে সমস্ত নবদ্বীপবাসী গঙ্গারানান্তে “হরিবোল” শব্দে আকাশ মুখরিত করিতেছিলেন—ঠিক সেই সময়ে চৈতন্যদেব মায়াপুরে একটি নিমগাছের নীচে

আত্মত্যাগে ভূমিষ্ঠ হইলেন, এ জন্ত চৈতন্যকে 'নিমাই' নাম দেওয়া হইয়াছে। পূর্ণচন্দ্র হইতেও তিনি প্রিয়দর্শন, এজন্য লোকে তাঁহাকে নবদ্বীপচন্দ্র নাম দিয়াও স্বখী হন নাই, কবি গাহিয়াছেন—“চাঁদে যে কলঙ্ক আছে, ছি ছি চাঁদ কি গোরাচাঁদের কাছে।”

বিশ্বরূপ ও নিমাই উভয়েই বড় সুদর্শন ছিলেন,—বিশেষ নিমাই, বাহার রূপের কথা লিখিতে যাইয়া কত লেখক কবি হইয়া গিয়াছেন। বিশ্বরূপ যখন বোড়শবর্ষবয়স্ক এবং নিমাই সবে পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন, তখন তিনি

বিশ্বরূপ ও নিমাই।

অষ্টমের কাছে পড়িতে যাইতেন এবং আহারের সময় হইলে কনিষ্ঠ তাঁহাকে ডাকিয়া আনিত। দুইটি ভাই হাত ধরাধরি করিয়া বাড়ী ফিরিতেন, নিমাইয়ের মুখখানি ফুলপত্রের ছায়, তন্মধ্যে বিন্দু বিন্দু কালি, কারণ তিনি বিশ্বরূপের দোয়াত ও কলম লইয়া খাঁটাখাঁটি করিয়াছেন, সেই কালির বিন্দুতে তাঁহার মুখ স্রবণবেষ্টিত শতদলের মত ঢলঢল করিত, পায়ে নুপুর বাজিত, কত মধুর কথা বলিতে বলিতে দুইটি ভাই শচীদেবীর কাছে আসিতেন। বিশ্বরূপের বিবাহ স্থির হইল—তখন তাঁহার ১৬ বর্ষ বয়স—কিন্তু বিশ্বরূপ বিবাহ করিয়া সংসারী হইবেন না, অথচ যদি প্রতিবাদ করেন তবে “জননী দুঃখ পাবে বিপর্যাস।” এ দিকে নহবৎ বাজিতেছিল, পুরনারীরা শুভ বিবাহের উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন এক প্রদোষে বিশ্বরূপ জালাময় সংসার হইতে ত্রাণ পাইবার জন্ত সাতারিয়া গঙ্গা পার হইলেন। কোথায় গেলেন কে জানে? সে কথা এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে—এইটুকু জানা গিয়াছিল যে কোন সিদ্ধ পুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তরুণ যোগী “শঙ্করারণ্য পুরী” নাম লইয়া বনবাসী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। শচীদেবীর অভিযোগ “অষ্টম আচার্য্যই তাঁহার পুত্রকে সন্ন্যাস-বুদ্ধি দিয়াছিলেন।” ইহার পরে যখন নিমাই বড় হইয়া অষ্টমের নিকট যাতায়াত করিতেন, শচীদেবীর তাহা ভাল লাগিত না। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, “কে বলে এই বুড়র নাম অষ্টম, ইনি একটি দৈত্য। আমার চাঁদের মত ছেলেটিকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া কণিকা-প্রসাদের মত এই শিশুটির কাণে আবার কি মন্ত্রণা দিতেছেন, কে জানে?” শচীদেবী অষ্টমকে দৈত্য নামেই অভিহিত করিতেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের পর জগন্নাথ মিশ্র পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক নিমাইয়ের পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ “এই যদি সর্বশাস্ত্রে লভিবেক জ্ঞান। ছাড়িয়া সংসারস্থ করিবে প্রাণ ॥ অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাই। মুখ হইয়া ঘবে মোর থাকুক নিমাই ॥”

কিন্তু ছেলেটি বড় দৌরাগা আরম্ভ করিল। তাঁহার পায়ে নুপুর, পরনে নীল ধুতি, মাথায় চুল বেণী করিয়া বাধা, তাহাতে সোণার ঝাঁপা, কটিতে কিঙ্কিনী—মুষ্টি অতি সুন্দর, কিন্তু কাজগুলি আদৌ সেরূপ সুন্দর নহে। সন্ধ্যাকালে বালক

হরম্মশনা।

কোন দেবমন্দিরে ঢুকিয়া বিগ্রহের নিকটবর্তী আরতির পঞ্চপ্রদীপ নিবাইয়া আসিত; কখনও কোনও ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে চক্ষু বুজিয়া গীতাখানি সন্মুখে রাখিয়া ধ্যান করিতেছেন, নিমাই গীতাটি লইয়া ছুটিয়া পলাইত; কোন ব্রাহ্মণ দানার্থ গঙ্গায়

নামিয়াছেন, তাঁহার উত্তরীয় ও শিবলিঙ্গ চুরি করিত; কখনও জলে ডুবিয়া কাহারও একটা পা ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া বাইত; কখনও কোন বালকের কাণে জল প্রবেশ করাইয়া তাহার বিপদে আনন্দ অনুভব করিত; কখনও কোন বালিকার চুলে ওকড়ার বীচি ফেলিয়া দিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার ভয় দেখাইত (তখন বালকের বয়স পঞ্চবর্ষমাত্র); অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্টকর খেলার মধ্যে—গঙ্গার বালুচরে বকের পিছনে ছোট্টা কিংবা কোন বালকের উপর চড়িয়া শিব হইয়া নাচা। হয়ত কাহারও কলাবনে চুকিয়া নিমাই গায়ে কৃষ্ণ কঙ্কল দিয়া বুধ সাজিয়াছে, তার পরে সেই কদলী চুরি করিয়া পলায়ন। এই সকল উৎপাতে নবদ্বীপের লোকদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলাতে গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা জগন্নাথ মিশ্রকে অমুযোগ করিতে লাগিলেন; বাধ্য হইয়া কয়েকমাস পাঠ-বন্ধের পরে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে পুনরায় টোলে ভর্তি করিয়া দিলেন।

(নিমাই বিষ্ণুদাস, সুদর্শন এবং গঙ্গাদাস—এই তিনজন পণ্ডিতের নিকট পড়িয়াছিলেন, ইহাদিগের মধ্যে গঙ্গাদাস খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। যে আগ্রহে তিনি বালকোচিত ছরস্তুপনা করিতেছিলেন সেই আগ্রহে পড়িতে শুরু করিয়া দিলেন।)

অধ্যয়ন।

তিনি সতীর্থদের একজনকে প্রতিপক্ষ করিয়া বিচার করিতেন এবং তাঁহাকে পরাজয় করিয়া পুনরায় তাঁহাকে তাঁহারই পূর্বকার মতের পক্ষে বিচার করিতে নিযুক্ত করিতেন, এবারও তাঁহার জয় হইত। বিজ্ঞোৎসাহী বালক নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগের পথ আগলাইয়া তাঁহাদের সহিত বিচার করিতে আগ্রহান্বিত হইতেন। মুরারি গুপ্তের মত প্রাচীন পণ্ডিতকে “মুক্তির” লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে একদিন দাল করিয়া শাসাইয়া বলিয়াছিলেন, “প্রভু কহে বৈষ্ণু তুমি ইহা কেন পড়। লতাপাতা নিয়া গিয়া রোগ দূর কর।” তাঁহার এইরূপ রূঢ় ব্যবহারে পণ্ডিতেরা মনে মনে খুব চট্টিয়া থাকিতেন; তথাপি তাঁহার তরুণ সুদর্শন মূর্তি ও নবোন্মেষিত প্রতিভার জ্যোতিতে সকলে মুগ্ধ না হইয়া পারিত না। তাঁহার ছরস্তুপনার তখনও বিন্দুমাত্র হাস্য হয় নাই। অবকাশ পাইলেই যার তার উপর দোরাঙ্গা করিতেন। শ্রীহট্টবাসিগণের ভাবা লইয়া তিনি তাহাদিগকে ফেপাইতেন, তাহারা সহজেই চট্টিয়া বাইত, এবং বলিত “তুমি কত দিনের নদেবাসী হে? তোমার পিতামাতা সকলের জন্মস্থানই ত শ্রীহটে—এ কথাটি কি ভুলিয়াছ?” কিন্তু কে সেই তর্ক করিতে যায়, তিনি এরূপ তীব্র ব্যঙ্গ দ্বারা তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতেন যে তাহাদের কেহ কেহ লগুড় লইয়া তাঁহাকে মারিতে বাইত, কেহ বা কাজির কাছে নালিশ পধ্যস্ত করিতে উদ্বৃত্ত হইত।

বল্লভাচার্যের মেয়ে লক্ষ্মী বড় সুন্দরী ছিলেন, তিনি গঙ্গার ঘাটে বাইতেন, নিমাই তাঁহাকে দেখিতেন এবং তিনিও তাঁহাকে তরুণ স্তন্যের মেহঢালা দৃষ্টি ফিরাইয়া দিতেন।

বিবাহ ও পরীক্ষাযোগ।

একদিন নিমাই বনমালী ঘটককে বিবাহের প্রস্তাব করিতে অমুরোধ করিলেন। তখন জগন্নাথ মিশ্র স্বর্গগত, এবং নিমাই গঙ্গাতীরে সুকুন্দসজ্জয়ের বাড়ীতে টোল স্থাপন করিয়াছিলেন। বল্লভও আনন্দের সহিত

প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। নিমাই বনমালী ঘটককে তাঁহার মাতা শচীদেবীর নিকট পাঠাইলেন, শচীদেবী ঘোর আপত্তি করিলেন—“এতটুকু ছেলে লেখাপড়া করিতেছে, এখনই বিবাহের কথা কেন?” এই কথা শুনিয়া ঘটক মহাশয় ফিরিয়া বাইতেছিলেন—পথে তাঁহার মুখে সমস্ত শুনিয়া নিমাই মাকে বাইরা বলিলেন, “তুমি কি বলিয়াছ বাহাতে ঘটক মহাশয় এত হুঃখিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন? তোমার একপ করা ভাল হয় নাই, তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন, তাহাই কর।” (চৈ. ভা.) এখন শচীদেবী বুঝিলেন, তাঁহার পুত্রই এই ঘটককে নিমুক্ত করিয়াছিল এবং তখনই তিনি বিবাহে সম্মতি দান করিলেন। এই বিবাহ বর ও কস্তার পরস্পরের মনোনয়নের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। যখন নিমাই পূর্ববঙ্গ গিয়াছিলেন তখন তিনি তাঁহার পৈতা ও পাছকা স্বর্ণচিহ্নস্বরূপ লঙ্ঘীকে দিয়া গিয়াছিলেন। লঙ্ঘী অতি নিপুণ চিত্রকরী ছিলেন, তিনি স্বহস্তে তাঁহার স্বামীর মূর্তি আঁকিয়াছিলেন। যখন সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন সেই চিত্র ও পাছকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সাধনী মৃত্যুর আলা তুলিয়া গিয়াছিলেন।

এদিকে নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি “বিজ্ঞাসাগর” উপাধি পাইয়াছিলেন, তাঁহার ভাল নাম ছিল “বিম্বস্বর মিশ্র।” তিনি ব্যাকরণের একখানি টীকা করিয়াছিলেন। উহা পূর্ববঙ্গের টোলগুলিতে অদীত হইত, এই টীকার নামও ছিল “বিজ্ঞাসাগর-টিপ্পনী।” ক্রমে তাঁহার অর্থ ও খ্যাতি উভয়ই লাভ হইয়াছিল। তিনি পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করিয়া পণ্ডিত-বিদায় হিসাবে বহু অর্থ লইয়া গৃহে আসিয়াছিলেন; গঙ্গার উপরে পাঁচখানি সুন্দর বড় ঘর নির্মিত হইয়াছিল, সেখানে এই নিরামিশ-ভোজী বৈষ্ণব পরিবার অতি সুখে দিন যাপন করিতেছিলেন। শচীদেবী নিজ হস্তে পরমান্ন, পিষ্টক, বেতো শাক, করলা ভাজা প্রভৃতি রন্ধন করিয়া বিষ্ণুর ভোগ দিতেন। শচীদেবীর মূর্তি শাস্ত ছিল কিন্তু তিনি অতি খর্বাকৃতি ছিলেন। “শাস্ত মূর্তি শচীদেবী অতি ক্ষুদ্রকায়” (গোবিন্দদাসের করচা)।

এই সময়ে কেশব কাশ্মীরী নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আর্য্যাবর্তের বহু স্থানের পণ্ডিতদিগকে জয় করিয়া নবদ্বীপ পরাজয় করিতে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা ভাবিলেন, “এই ছুটে ছেলেটা কেবলই ‘যুদ্ধং দেহি’ বলিয়া তর্ক করিবার জন্য লালায়িত। প্রবীণদের টিকি ধরিয়া টানিতে চায়—আমরা বয়স্ক, ইহার উপরই দিগ্বিজয়ীকে লেলিয়া দেওয়া যাক।” সুতরাং তাঁহারা বলিলেন, গঙ্গাতীরে অতি অল্পবয়স্ক একটি মহাপণ্ডিত আছেন, আপনি তাঁহার সহিত বিচার করুন। চৈতন্য-ভাগবতে সবিস্তারে এই বিচারের কথা বর্ণিত আছে—দিগ্বিজয়ী হারিয়া গেলেন। সেদিন “নবদ্বীপের মুখ রক্ষা হইল”—এই বলিয়া সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া এক সভা করিলেন এবং নিমাইকে উপাধি দিলেন “বাদিসিংহ”, সুতরাং নিমাই পণ্ডিতের পুরো নাম হইল “শ্রীবিম্বস্বর মিশ্র বিজ্ঞাসাগর বাদিসিংহ।”

ব্যঙ্গ করাই ছিল নিমাইয়ের রীতি ও স্বভাব, বৌবনের প্রারম্ভেও এই বৃত্তি হাস পায় নাই। কেবল বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তিনি একটি বিষয়ে সতর্ক হইয়া উঠিয়াছিলেন। কৈশোরে

পদার্পণ করিয়াই স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গ পরিহার করিয়া চলিতেন, “সবে মাত্র পরস্ত্রী প্রাপ্তি নাহি উপহাস। স্ত্রী দেখি প্রভু হন এক পাশ।” ঈশ্বর পুরীর নিমাই ও ঈশ্বর পুরী। বাড়ী ছিল হালিসহর, তিনি বয়স সন্ন্যাসী, ভক্তিপন্থী, স্থপণ্ডিত, মাঝে মাঝে নবদ্বীপে আসিতেন। তাঁহাকে দেখিতে নবদ্বীপের লোকের ভিড় হইত। নিমাইয়ের সতীর্থ পরম পণ্ডিত গদাধরের চিরকালই ধর্মের দিকে বোঁক ছিল, তিনি ঈশ্বর পুরীর বড় প্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। অপর কেহ কোন বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে শুনিলে নিমাইয়ের হিংসা হইত। ঈশ্বর পুরী কেন গদাধরকে ভালবাসেন, এজন্ত নিমাই মাঝে মাঝে তাঁহার আশ্রমে যাইয়া গদাধরের পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। ঈশ্বর পুরী এই স্থলফল বালকটাকে দেখিয়া বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিতেন এবং স্বপ্রণীত ধর্মপুস্তক হইতে শ্লোক তুলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। কিন্তু একদিন যখন পুরী গোসাঁই সোৎসাহে একটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তখন নিমাই বলিয়া উঠিলেন—“এ ধাতু আত্মনেপদী নহে।” ঈশ্বর-পুরীর ধর্মের আগ্রহ জুড়াইয়া গেল, এ বালককে বাগে আনা তাঁহার কর্ম নহে, তিনি বুদ্ধিতে পারিলেন।

পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণের পর যখন নিমাই শুনিতে পাইলেন, তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, তখনই তাঁহার ভাবান্তর হইল। পথে গদাধর, শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতি সহচরের সঙ্গে দেখা, পূর্ববঙ্গের ভাষা ব্যঙ্গ করিয়া নিমাই হাসিমুখে কথা বলিতে লাগিলেন—কিন্তু সহচরেরা সেই ব্যঙ্গের সাহায্য দিলেন না। মাতা কাঁদিয়া ফেলিলেন। নিমাই বুঝিলেন, লক্ষী নাই,—যে লক্ষীকে তিনি ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, যিনি গুণশীলা ও সাক্ষী—এবং কৈশোর-সঙ্গিনী, নবযৌবনের নব অমুরাগ বাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জন্মিয়াছিল, সেই লক্ষীর অভাবে তাঁহার যে ভাবান্তর হইল তাহা পরবর্তী জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, বলা যায় না। এদিকে নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি-প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে—তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্ত নবদ্বীপের ধনশালী রাজসভা-পণ্ডিত সনাতন মিশ্র আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শচী পুত্রের ইচ্ছা না জানিয়াই বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিলেন। বিবাহের দিন নিমাই শুনিলেন, তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে। তিনি বিরক্ত হইলেন, বিবাহ করিবেন না, বলিলেন। অগত্যা শচী সখরু ভাঙ্গিয়া দিবার জন্ত চেষ্টা করিলেন। কিন্তু চৈতন্য বুঝিলেন একপ করিলে তাঁহার মায়ের মুখখানি ছোট হইয়া যায়—সনাতন মিশ্র অনেক আয়োজন করিয়াছেন—তাহা পণ্ড হইয়া যায়, সুতরাং অনিচ্ছাক্রমে শেষে স্বীকৃত হইলেন; বিষ্ণুপ্রিয়াস সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল। ইহার পর নিমাই পিতৃপিতৃ প্রদান করিতে গয়ায় যাত্রা করিলেন। পথে কুমারহট্টে তিনি ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বর পুরীকে দেখিতে ছুটিলেন, আজ তাঁহার চক্ষু ছল ছল—আজ ঈশ্বর পুরীকে তাঁহার এত ভাল লাগিল কেন? সাধুসঙ্গে মুহূর্তঃ চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইতে লাগিল, মনে হইল ঈশ্বর পুরীর দেবচরিত্র, তাঁহার মত অন্তরঙ্গ তাঁহার কেহ নাই। ঈশ্বর পুরী বলিলেন, “তুমি গয়ায় যাও, আমিও সেখানে যাব—তথায় আমার সঙ্গে তোমার দেখা হইবে।” ঈশ্বর পুরীকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার আজ বড় কষ্ট হইল। কুমারহট্টের কতকগুলি ধূলি

তিনি কোঁচার খুঁটে বাঁধিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, “ঈশ্বর পুরীর জন্মস্থান, এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ,” উন্নতের মত সাক্ষ্যদেয় দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং কুমারহট্টকে করজোড়ে প্রণাম করিয়া “প্রভু কহে কুমারহট্টের নমস্কার, শ্রীঈশ্বরপুরীর যে গ্রামে অবতীর।”

সঙ্গীরা দেখিল সে নিমাই আর নাই। সে ব্যঙ্গপ্রিয় সততবহুতময় নিত্যপ্রফুল্ল তরুণ নিমাই,—দিগ্বিজয়ী অয়দর্পিত পণ্ডিত নিমাইয়ের জীবনের চাক্ষু্যপূর্ণ অধ্যায় শেষ হইয়াছে। তিনি কেন কাদিতেছেন, কেন সজল চক্ষে উর্জ্জ্বল তাকাইয়া আছেন, কেন মুহূর্ত্তঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না; তাঁহার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইহার পর পিও দেওয়ার পালা। শ্রীপাদপদ্মে দাঁড়াইয়া নিমাই দেখিলেন, পাদপদ্মের উপর পাহাড় সমান উচ্চ ফুলরাশি পড়িতেছে! কত বস্ত্র-অলঙ্কার, চারিদিক্ হইতে পুষ্পস্তবকের সঙ্গে সঙ্গে কত নয়নাশ্রু! পাণ্ডুরা শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিতেছে “সংসারের ছুখী তাপী জীব, তোমরা এই পাদপদ্ম

দেখ,—যোগী ঋষি মহর্ষিরা এই পাদপদ্ম ধ্যান করেন, এই পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা নিঃসৃত হইয়াছেন, ইহা যোগেশ্বর শিব ধ্যান করেন,

ত্রিতাপদম্ মানুস—তোমাদের আর গতি নাই, এই পাদপদ্ম আশ্রয় কর।” নিমাই কি শুনিলেন, কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন, তিনিই জানেন, পাদপদ্মের উদ্দেশে তাঁহার পদ্যচক্ষে যে ধারা ছুটিল, তাহার শেষ নাই, বিরাম নাই! সেই বহুপন্নের মধ্যে তাঁহার মুখপদ্ম অশ্রু-গঙ্গার প্রাবনে ভাসিয়া যাইতেছে—দেখিতে দেখিতে সেই পাদপদ্মের কাছে তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সঙ্গীরা তাঁহাকে ধরিয়া কোনোক্রমে বাসায় লইয়া আসিল—তখন ঈশ্বর পুরী আসিয়াছেন। নিমাইয়ের জ্ঞান নাই, কেবল অশ্রু, উর্জ্জ্বল তাকাইয়া কি দেখেন, আবার মুচ্ছিত হইয়া পড়েন। কোনও প্রকারে তাঁহাকে সহচরেরা বাড়ী ফিরাইয়া আনিল—কিন্তু পথে পথে তিনি বলিতে লাগিলেন, “আমার বাড়ী নাই, আমার বাড়ী বৃন্দাবন, তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি প্রাণেশ্বরকে দেখিতে বৃন্দাবন চলিলাম।” কতকটা বলপূর্ব্বকই সঙ্গীরা তাঁহাকে বাড়ীতে আনিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া আসিবার পর কাহারও সঙ্গে কথা নাই, চুপটি করিয়া ঘরে বসিয়া থাকেন, আর কাদিতে থাকেন। প্রিয় গদাধর আসিল, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—“আমি গয়ায় কি দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা তোমায় বলিব,” কিন্তু বলিতে গিয়া অশ্রুপূর্ণ চক্ষু ও গদগদকণ্ঠ হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

কি দেখিয়াছেন আর বলা হইল না। শচী দেবীর অবস্থা সহজেই অনুমেয়, প্রতিবেশিনীরা বলিলেন—“পাগল হইয়াছে, এর আর কথা কি? চিকিৎসা করাও।” ভিষক্ শিবাঈয়তের ব্যবস্থা করিয়া গেল? কোথায় গেল সেই কৃষ্ণকলী সৌখীন ধুতি, সেই চন্দন, অগুরু, গন্ধদ্রব্য, সেই সখের পুষ্পমালা। বিষ্ণুপ্রিয়ায় সাজাইয়া আনিয়া শচীদেবী পুত্রের নিকট বসাইয়া রাখেন। কিন্তু “দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়। কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ, দিবানিশি শ্লোক পড়ি করয়ে ক্রন্দন।”

শ্রীরাম পণ্ডিতের বাড়ীতে এক ঝাড় কুন্দফুলের গাছ ছিল—তথায় দিবারাত্র ফুল ফুটিত। প্রাতে ব্রাহ্মণেরা ফুল তুলিবার জন্য বেতের সাজি লইয়া তথায় যাইতেন এবং পল্লীর সমস্ত কথার আলোচনা করিতেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন শুক্লাধর, গদাধর, শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতি, শ্রীবাস তো অবশ্যই ছিলেন। ইহারা সকলেই বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন, জগতে ভক্তির অভাব দেখিয়া আক্ষেপ করিতেন। তাঁহারা নিমাই পণ্ডিত সম্বন্ধে নানা কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিলেন “সে পাগল নয়, এ যে কি তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না;—এত জলও মানুষের চোখে থাকে! কৃষ্ণনাম বলিলেই উদ্ভাস্ততা বৃদ্ধি পায়—কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়ে।” শ্রীমান্ পণ্ডিত বলিলেন, “আজ আমার বাড়ী নিমাই আসিয়াছিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ‘তোমার কি হইয়াছে?’ সে বলিল আমি তোমার বাড়ী যাইয়া আমার কথা শুনাইব। আজই তার আমার এখানে আসার কথা।” সকলেই এ সম্বন্ধে কুতূহলী হইলেন। এই সময়ে একটি লোক ছুটিয়া আসিয়া শ্রীবাসকে বলিল, “চলুন, শচী দেবী বড় বিপন্ন, নিমাই বড় বাড়াবাড়ি করিতেছেন, শচী ঠাকুরাণী বিপদে পড়িয়া আপনাকে ডাকিতেছেন।” শ্রীবাস চলিয়া গেলেন, শচী দেবী বলিলেন “আপনারা আমার ছেলের একটা উপায় করিয়া দিন, আমি কি করিব? নিমাই যে আমার সর্কস্ব, আমার সর্কস্ব যাইবার পথে।” যে ঘরে নিমাই ছিলেন, শচী শ্রীবাসকে সেই ঘর দেখাইয়া দিলেন। শ্রীবাস যাইয়া সেই ঘরে থিল দিলেন। তারপর প্রায় চারি দণ্ড পরে শ্রীবাস বাহির হইলেন, তাঁহার চক্ষু অশ্রুপ্লুত। তিনি শচীকে বলিলেন, “মা তোমার ছেলে পাগল হয় নাই। উহাকে বিরক্ত করিও না। ঐব, শুক, প্রহ্লাদের কথা আমরা শুনিয়াছিলাম, আমাদের ভাগ্যবশে তেমনই একজন নবদ্বীপে আসিয়াছেন। এই সময়টুকুর মধ্যে নিমাই আমাকে পাগল করিয়া ফেলিয়াছে, অচিরে সমস্ত দেশটা পাগল করিবে।”

এইবার শচী আশ্বস্ত হইলেন। এদিকে দিনের বেলায় নিমাই পণ্ডিত গঙ্গাতীরে যান, সেখানে কাহারও বস্ত্র ধুইয়া নিঙড়াইয়া শুকাইতেছেন, কাহারও ধুতি প্রভৃতি কাঁধে করিয়া বাড়ীতে পৌছাইয়া দেন, কাহারও পা ধোয়াইয়া দেন। লোকে আপত্তি করিলে তিনি বিনীতভাবে বলেন—“তোমাদের সেবা করিলে আমি কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ-ভক্তি পাই, এই সেবা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।” রাত্রে শ্রীবাসের ইতিহাস-বিশ্রুত আশ্বিনায় সংকীৰ্ত্তন। নির্দিষ্ট কয়েকটি লোকের সঙ্গে এই সংকীৰ্ত্তন। দলের প্রধান ৭২ বৎসরের বৃদ্ধ অশ্বৈত আচার্য্য “পক্ কেশ পক্ দাড়ি বড় মোহনীয়। দাড়ি পড়িয়াছে, তার জন্ম ছাইয়া;” এইদলে শ্রীবাস স্বয়ং, গদাধর, শুক্লাধর, শ্রীমান্ পণ্ডিত, গঙ্গাদাস প্রভৃতি আরও কয়েকজন ছিলেন। এই দলে ছিলেন বজ্রেশ্বর পণ্ডিত, “প্রভুর মতন যার নর্ত্তন সুন্দর।” শারারাত্রি কি ভাবে কাটিয়া যাইত তাহা তাঁহারা জানিতেন না। এই ৫০০ বৎসর যাবৎ কীৰ্ত্তনে গোটা বাঙ্গলা দেশটা মাতাইয়া রাখিয়াছে। এখনও ভাল কীৰ্ত্তন শুনিলে লোক ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা সমস্ত তুলিয়া যায়—আর বিনি কীৰ্ত্তনানন্দের হরিষ্কার, বাহার শ্রীমুখে এই স্বর প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল,

পূর্বরাগের আবেগে সম্পূর্ণ ভগবানের প্রেমে আত্মহারা প্রেমিক পাগলের সেই নৃত্য—সেই গান যে কি প্রেরণা দিয়াছিল, তাহা কি করিয়া বুঝাইব? পৃথিবীর অন্তান্ত দেবকর ব্যক্তির ধর্মসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, ধর্মজীবনের উজ্জল আদর্শ ও নীতির স্তম্ভতা দ্বারা ভগতে পূজ্য হইয়া আছেন—কিন্তু ভগবৎপ্রেম লোকচক্ষে একপ স্পষ্ট করিয়া আর কে দেখাইয়াছেন? সেই যে মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিয়াছিল তাহার বোল এখনও নীরব হয় নাই, সেই শতকণ্ঠ-উচ্চারিত বাণী, যাহা শ্রীবাসের আশ্রিত প্রথম আকাশে উঠিয়াছিল—তাহা এখনও আমাদের প্রাণ হরণ করিতেছে। যে রাত্রি নিমাই রঞ্জিণী সাজিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই রাত্রি তাঁহাকে দেখিয়া লোকে বলিয়াছিল—“ইনি কি নৃসিংহী ভক্তি? ইনি কি ভূতলে আবির্ভূত পদ্মাসনা কমলা, না মানবদেহধারিণী ভারতী,—বাগিণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী?” স্বয়ং সেদিন রঞ্জিণী রূপকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা সত্যিকার রূপ-প্রেমের অশ্রুতে মাখা; রঙ্গমঞ্চে এমন সত্যিকার অভিনয় ভগতে কেহ কখনও দেখে নাই। সেদিন নবদ্বীপে স্বয়ং রূপভক্তি আসরে নামিয়া আসিয়া মানুষকে ভগবৎপ্রেম শিখাইয়া দিয়াছিল। প্রাতঃকাল হইল, দর্শকমণ্ডলী বলিল “এমন রাত্রিও প্রভাত হয়।”

ঈশ্বর পুরী নবদ্বীপে আসিলে নিমাই আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া তাঁহার কাছে পড়িয়া থাকিতেন। একদিন শচী দেবী নির্জনে নিমাইকে বলিলেন, “নিমাই, আমার বড় ভয় হইতেছে, আমাকে অভয় দাও, আমার বুকেটা বড় অস্থির হইয়াছে।” নিমাই বলিলেন, “মা, সে কি কথা? তুমি যাহা আদেশ করিবে তাহাই করিব। কি হইয়াছে বল।” তখন শচী দেবী চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, “তুমি সন্ন্যাসী পাইলে এত খুসী হও কেন? মনে হয় যেন তোমার কোন প্রাণের অন্তরঙ্গের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, তোমার আহার-নিদ্রা-জ্ঞান থাকে না, আমাদের গুলি যাইয়া পড়িয়াছে, তুমি ছাড়া আমার কেহ নাই, আমাকে ছাড়িয়া যাইও না।” নিমাই মাকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া আশ্বস্ত করিলেন। শচী দেবী কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিলেন—“আমি তোমার নিকট বড় অপরাধ করিয়াছি, তুমি বল আমাকে ক্ষমা করিবে।” নিমাই বলিলেন—“কি করিয়াছ? তুমি মা, ছেলের কাছে মা কি কোন অপরাধ করিতে পারে? ওরূপ বলিলে যে মা আমি অপরাধী হই।” শচী দেবী বলিলেন—“বিশ্বরূপ নিজহাতে একখানি বই লিখিয়াছিল, সে তাহা আমার কাছে রাখিয়া দিয়া বলিয়াছিল—নিমাই বড় হইলে এই বই পড়িবে। আমি সেই বই ছিঁড়িয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়াছি, পাছে সেই বই পড়িয়া তুমি সন্ন্যাসী হও।” নিমাই বলিলেন—“দাদার চিহ্ন নষ্ট করিয়া ভাল কর নাই, কিন্তু আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া তোমার সম্ভব নহে—আমি যে তোমার একান্ত মেহের অধুগত ছেলে—এরূপ ক্ষমা চাহিলে আমার অকল্যাণ করা হয়।” পূর্বোক্ত সমস্ত কথাই আমি চৈতন্য-ভাগবত এবং অপরাধের প্রামাণ্য পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

শ্রীমাম পণ্ডিতের বাড়ীতে এক ঝাড় কুম্ভলুলের গাছ ছিল—তথায় দিব্যরাত্রি ফুল ফুটিত। প্রাতে ব্রাহ্মণেরা ফুল তুলিবার জন্য বেতের সাজি লইয়া তথায় যাইতেন এবং পন্নীর সমস্ত কথার আলোচনা করিতেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন শুক্লাধর, গদাধর, শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতি, শ্রীবাস তো অবশ্যই ছিলেন। ইহারা সকলেই বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন, জগতে ভক্তির অভাব দেখিয়া আক্ষেপ করিতেন। তাঁহারা নিমাই পণ্ডিত সম্বন্ধে নানা কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিলেন “সে পাগল নয়, এ বে কি তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না;—এত জলও মানুষের চোখে থাকে! কুম্ভনাম বলিলেই উন্নততা বৃদ্ধি পায়—কুম্ভ কুম্ভ বলিয়া আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়ে।” শ্রীমান্ পণ্ডিত বলিলেন, “আজ আমার বাড়ী নিমাই আসিয়াছিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ‘তোমার কি হইয়াছে?’ সে বলিল আমি তোমার বাড়ী যাইয়া আমার কথা শুনাইব। আজই তার আমার এখানে আসার কথা।” সকলেই এ সম্বন্ধে কুতূহলী হইলেন। এই সময়ে একটি লোক ছুটিয়া আসিয়া শ্রীবাসকে বলিল, “চলুন, শচী দেবী বড় বিপন্ন, নিমাই বড় বাড়াবাড়ি করিতেছেন, শচী ঠাকুরাণী বিপদে পড়িয়া আপনাকে ডাকিতেছেন।” শ্রীবাস চলিয়া গেলেন, শচী দেবী বলিলেন “আপনারা আমার ছেলের একটা উপায় করিয়া দিন, আমি কি করিব? নিমাই যে আমার সর্বস্ব, আমার সর্বস্ব যাইবার পথে।” বে ঘরে নিমাই ছিলেন, শচী শ্রীবাসকে সেই ঘর দেখাইয়া দিলেন। শ্রীবাস যাইয়া সেই ঘরে খিল দিলেন। তারপর প্রায় চারি দণ্ড পরে শ্রীবাস বাহির হইলেন, তাঁহার চক্ষু অশ্রুপ্লুত। তিনি শচীকে বলিলেন, “মা তোমার ছেলে পাগল হয় নাই। উহাকে বিরক্ত করিও না। ঋষ, শুক, প্রহ্লাদের কথা আমরা শুনিয়াছিলাম, আমাদের ভাগ্যবশে তেমনই একজন নবদ্বীপে আসিয়াছেন। এই সময়টুকুর মধ্যে নিমাই আমাকে পাগল করিয়া ফেলিয়াছে, অচিরে সমস্ত দেশটা পাগল করিবে।”

এইবার শচী আশ্বস্ত হইলেন। এদিকে দিনের বেলায় নিমাই পণ্ডিত গঙ্গাতীরে যান, সেখানে কাহারও বঙ্গ ধুইয়া নিঙড়াইয়া শুকাইতেছেন, কাহারও ধুতি প্রভৃতি কাঁপে করিয়া বাড়ীতে পৌছাইয়া দেন, কাহারও পা ধোয়াইয়া দেন। লোকে আপত্তি করিলে তিনি বিনীতভাবে বলেন—“তোমাদের সেবা করিলে আমি কিঞ্চিৎ কুম্ভ-ভক্তি পাই, এই সেবা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।” রাত্রে শ্রীবাসের ইতিহাস-বিশ্রুত আশ্রিনায় সংকীৰ্ত্তন। নির্দিষ্ট কয়েকটি লোকের সঙ্গে এই সংকীৰ্ত্তন। দলের প্রধান ৭২ বৎসরের বৃদ্ধ অম্বৈত আচার্য্য “পঞ্চ কেশ পঞ্চ দাড়ি বড় মোহনীয়। দাড়ি পড়িয়াছে, তার ছদয় ছাইয়া;” এইদলে শ্রীবাস স্বয়ং, গদাধর, শুক্লাধর, শ্রীমান্ পণ্ডিত, গঙ্গাদাস প্রভৃতি আরও কয়েকজন ছিলেন। এই দলে ছিলেন বক্রেস্বর পণ্ডিত, “প্রভুর মতন যার নর্ত্তন স্বন্দর।” সারারাত্রি কি ভাবে কাটিয়া যাইত তাহা তাঁহারা জানিতেন না। এই ৫০০ বৎসর যাবৎ কীর্ত্তনে গোটা বাদলা দেশটা মাতাইয়া রাখিয়াছে। এখনও ভাল কীর্ত্তন শুনিলে লোক কুখা তৃষ্ণা নিত্যা সমস্ত তুলিয়া যায়—আর যিনি কীর্ত্তনানন্দের হরিধার, বাহার শ্রীমুখে এই স্বর প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল,

পূর্বরাগের আবেগে সম্পূর্ণ ভগবানের প্রেমে আত্মহারা প্রেমিক পাগলের সেই নৃত্য—সেই গান যে কি প্রেরণা দিয়াছিল, তাহা কি করিয়া বুঝাইব? পৃথিবীর অস্তিত্ব দেবকর ব্যক্তির দর্শনকে উপদেশ দিয়াছেন, দর্শনজীবনের উজ্জ্বল আদর্শ ও নীতির স্তম্ভতা দ্বারা জগতে পূজ্য হইয়া আছেন—কিন্তু ভগবৎপ্রেম লোকচক্ষে এরূপ স্পষ্ট করিয়া আর কে দেখাইয়াছেন? সেই যে মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিয়াছিল তাহার বোল এখনও নীরব হয় নাই, সেই শতকণ্ঠ-উচ্ছাসিত বাণী, যাহা শ্রীবাসের আশ্রিনায় প্রথম আকাশে উঠিয়াছিল—তাহা এখনও আমাদের প্রাণ হরণ করিতেছে। যে রাতে নিমাই কল্লিণী গাছিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই রাতে তাঁহাকে দেখিয়া লোকে বলিয়াছিল—“ইনি কি নৃসিংহী ভক্তি? ইনি কি ভূতলে আবির্ভূত পদ্মাসনা কমলা, না মানবদেহধারিণী ভারতী,—রাগিণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী?” স্বয়ং সেদিন কল্লিণী কৃষ্ণকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা সত্যিকার কৃষ্ণ-প্রেমের অশ্রুতে মাখা; রঙ্গমঞ্চে এমন সত্যিকার অভিনয় জগতে কেহ কখনও দেখে নাই। সেদিন নবদ্বীপে স্বয়ং কৃষ্ণভক্তি আসরে নামিয়া আসিয়া মানুষকে ভগবৎপ্রেম শিখাইয়া দিয়াছিল। প্রাতঃকাল হইল, দর্শকমণ্ডলী বলিল “এমন রাত্রিও প্রভাত হয়।”

ঈশ্বর পুত্রী নবদ্বীপে আসিলে নিমাই আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া তাঁহার কাছে পড়িয়া থাকিতেন। একদিন শচী দেবী নির্জনে নিমাইকে বলিলেন, “নিমাই, আমার বড় ভয় হইতেছে, আমাকে অভয় দাও, আমার বুকেটা বড় অস্থির হইয়াছে।” নিমাই বলিলেন, “মা, সে কি কথা? তুমি যাহা আদেশ করিবে তাহাই করিব। কি হইয়াছে বল।” তখন শচী দেবী চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, “তুমি সন্ন্যাসী পাইলে এত খুসী হও কেন? মনে হয় যেন তোমার কোন প্রাণের অন্তরঙ্গের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, তোমার আহার-নিদ্রা-জ্ঞান থাকে না, আমাদের গুলিয়া যাও। নিমাই, আমাকে ছুঁইয়া শপথ কর, তুমি সন্ন্যাসী হইবে না। বিধিবশ প্রাণে বড় দাগা দিয়া গিয়াছে, তুমি ছাড়া আমার কেহ নাই, আমাকে ছাড়িয়া যাইও না।” নিমাই মাকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া আশ্বস্ত করিলেন। শচী দেবী কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিলেন—“আমি তোমার নিকট বড় অপরাধ করিয়াছি, তুমি বল আমাকে ক্ষমা করিবে।” নিমাই বলিলেন—“কি করিয়াছ? তুমি মা, ছেলের কাছে মা কি কোন অপরাধ করিতে পারে? ওরূপ বলিলে যে মা আমি অপরাধী হই।” শচী দেবী বলিলেন—“বিধিবশ নিজহাতে একখানি বই লিখিয়াছিল, সে তাহা আমার কাছে রাখিয়া দিয়া বলিয়াছিল—নিমাই বড় হইলে এই বই পড়িবে। আমি সেই বই ছিঁড়িয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়াছি, পাছে সেই বই পড়িয়া তুমি সন্ন্যাসী হও।” নিমাই বলিলেন—“দাদার চিহ্ন নষ্ট করিয়া ভাল কর নাই, কিন্তু আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া তোমার সম্ভব নহে—আমি যে তোমার একান্ত বেহের অস্থগত ছেলে—এরূপ ক্ষমা চাহিলে আমার অকল্যাণ করা হয়।” পূর্বোক্ত সমস্ত কথাই আমি চৈতন্য-ভাগবত এবং অপরাধের প্রামাণ্য পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি :

এদিকে টোল বন্ধ হইয়া গেল, হরিকথা ভিন্ন নিমাই আর কিছু বলেন না, ব্যাকরণের স্বত্র পড়াইতে বাইয়া হরিকথার ব্যাখ্যা করেন; ছাত্রেরা মুগ্ধ হইয়া শোনে—কারণ নিমাইয়ের মুখে হরিকথা—সে যে অমৃত হইতেও অমৃত। কিন্তু তাহারা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের (নিমাইয়ের শিক্ষক) কাছে বাইয়া নালিশ করিল, “নিমাই পণ্ডিত আর পড়ান না, কেবল ক্লককথা বলেন আর কাঁদিতে থাকেন।” গঙ্গাদাস বাইয়া বলিলেন, “দেখ নিমাই, তোমার পিতা জগদ্রাধ মিশ্র, যাতামহ নীলাধর চক্রবর্তী ইহারা সকলেই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তাহারা দার্শনিক ও ভক্তিপরায়ণ বলিয়াও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তুমি হরিকথার প্রচার কর, ভাল,—কিন্তু ছেলেদের পড়াশুনা বন্ধ করা কি ঠিক?” নিমাই বলিলেন, সেদিন হইতে তিনি পড়াইবেন। নিমাই টোলে গেলেন, খানিকটা মনোযোগের সহিত পড়াইলেন, তখন ভূগর্ভ জয়দেবের গান করিতেছিলেন, গঙ্গাতীরে তাহার মধুর স্বরলহরী কাণিয়া নাচিয়া আকাশে উঠিতেছিল—নিমাই সেই গান শুনিয়া পাগল হইয়া গেলেন। “আবার গাও”

টোল-তাগ।

“আবার গাও” বলিয়া ভূগর্ভের পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন, ছই চক্ষু অশ্রুতে প্লাবিত হইল, সেদিন আর পড়ান হইল না। তিনি বুঝিলেন, আর পড়াইতে পারিবেন না। তখন পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “ভাইসব। তোমরা দেখিতেছ, আমি কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না, আমার মন তাহার পাদপদ্মে বিলাইয়াছি, তিনি যে সর্বক্ষণ আমার সামনে দাঁড়াইয়া তাহার ভুবনভুলানো হাসি হাসিতেছেন, আমি কি করিয়া পড়াইব?—আজ হইতে আমি আর পড়াইতে পারিব না, আমার শত শত অপরাধ তোমরা ক্ষমা করিও। আমি জীবনে যদি কোন ভালকাজ করিয়া থাকি সেই পুণ্যের ফল তোমাদিগকে দিলাম, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।” অশ্রুতে চক্ষু ভরিয়া আসিল; এইভাবে তিনি পুণিতে ডুরি বাধিলেন। নদের চাদের টোল এইখানে সমাপ্ত হইল।

এদিকে নবদ্বীপে মাঝে মাঝে চৈতন্তের দল সংকীৰ্ত্তন করিতে বাহির হন; দলের লোক কম নয়। তাহারা যেন প্রেমাত্মক হার গাঁথিয়া পরেন, ক্লক-প্রেম-গর্ভের ধ্বজা তুলিয়া উচ্চরবে নাম সংকীৰ্ত্তন করিতে করিতে চলেন। নদীয়ার ভট্টাচার্য্যদের এই সকল অশ্রু, উচ্চৈশ্বরে ভগবানকে ডাকা, ভাল লাগিত না। তাহারা

ভট্টাচার্য্যের দল ও গোরাই
কাজির আবেশ।

কেহ বলিলেন, “খাসা ছেলেটা ছিল, একেবারে মাটি হইল।

ব্যাকরণ ও অলঙ্কার এমনই বিজ্ঞা যে একদিন অভ্যাস না থাকিলে স্বত্রগুলি ভুলিয়া বাইতে হয়—নিমাইয়ের কি আর বিজ্ঞাবুদ্ধি কিছু থাকিবে?” একজন বলিলেন, “আমরাও তো ভাই ভাগবত পড়িয়াছি, একপ হরিনাম লইয়া নর্ত্তনকুর্দনের কথাতো কোথাও দেখি নাই, ভগবানকে চীৎকার করিয়া না ডাকিলে বুঝি তিনি শুনিতেন না।” অপর একজন বলিলেন, “আমিই তো ঈশ্বর; জীবাত্মা ও পরমাত্মায় প্রভেদ কি? তবে কে কাহাকে ডাকিবে?” অনেকে বলিলেন—“রাজে ইহাদের চীৎকারে ঘুম হয় না, বাদসাহ এসকল কথা শুনিতে নিশ্চয়ই সৈন্ত পাঠাইয়া নবদ্বীপ উৎসন্ন করিবেন।”

আবার কেহ বলিল, “শ্রীবাস পণ্ডিতের আশ্রিনায় ইহারা নিশ্চয়ই মধুমতী-পরী সাধনা করে” (চৈ. ভা.)। ইহারা বাইরা নবদ্বীপের গোরাই কাজির কাছে আরজী করিয়া রাজপথে সংকীৰ্ত্তন বন্ধ করিয়া দিলেন।

সেইদিন নবদ্বীপের একটি স্মরণীয় দিন। কাজির আদেশ-প্রচারের সংবাদ শুনিয়া নিমাই বলিলেন, “আজ আমরা সকলে প্রকাশ্যভাবে সংকীৰ্ত্তন করিব। এতদিন শ্রীবাসের আশ্রিনায় আমাদের কীৰ্ত্তন আবদ্ধ ছিল, মাঝে মাঝে দুই একটি মাত্র দল রাজপথে কীৰ্ত্তন করিত, আজ আমি সকলকে আহ্বান করিতেছি, আপনারা রাত্রে রাজপথে একত্র হইয়া বাহির হউন।” সেদিন দেখা গেল, নিমাইয়ের বিরুদ্ধ দল কত নগণ্য! নিমাই রাজপথে বাহির হইবেন, বিদ্যাতের মত এই সংবাদ প্রচারিত হইল। শত শত, সহস্র সহস্র নরনারী সে রাত্রে রাজপথে বাহির হইল; নানাবর্ণ-রচিত পতাকা এবং সুগন্ধ তৈল-নিবেদিত সহস্র মশালের আলোকে মনে হইল নবদ্বীপে সে রাত্রে কোন রাজাধিরাজের অভ্যর্থনা হইবে। জন-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। নবদ্বীপের পরডাঙ্গা, গড়িগাছা প্রভৃতি পাড়াগুলি তাঁহার পরিক্রমণ করিয়া কাজির বাড়ীর কাছে আসিলেন।

যে যে পথ দিয়া এই সংকীৰ্ত্তনের দল চলিয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ চৈতন্ত-ভাগবত, ভক্তি-রত্নাকর ও প্রেম-বিলাসে পাওয়া যাইবে। গোরাই কাজি এত বড় বিপুল জনতা প্রত্যাশা করেন নাই, বিশেষ জনতা নেহাৎ ভাল মানুস হইয়া থাকে নাই, কিছু কিছু আক্রমণের ভাবও দেখাইতেছিল। কতকটা ভয়ে, কতকটা নিমাইয়ের মূৰ্ত্তিদর্শনে কাজির ভাবান্তর হইল। তিনি দেখিলেন—লোকে লোকারণ্য, তাহার নিমাইকে কেন্দ্র করিয়া উচ্ছ্বসিত ব্যক্তির মত ছুটিয়াছে—তাহাদের আনন্দধ্বনিতে বোধ হয় স্বর্গ হইতে দেবতারা সাড়া দিতেছেন, কুলবধূরা পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছেন—নিবেদ্য করিবার কেহ নাই, নিবেদ্য-বিধি মানিবার কেহ নাই। মশালের আলোকে প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে, কপোলে সকলেরই অশ্রু টল টল করিতেছে, এই বৃহৎ জনতা শুধু অশ্রু উপহারে কৃষ্ণের পূজা করিতেছে। যে দিকে বিভোর হইয়া পরম সুন্দর কুক্ষিত-কেশদামপূর্ণ মন্তক দোলাইয়া কাদিতে কাদিতে গোরা হরিনাম গাহিয়া চলিতেছেন, শত শত

মশাল তাঁহার রূপদর্শনেই শত শত ভ্রমরপঙ্ক্তির স্তায় সেই দিক্

কাজির ভীতি।
উজ্জ্বল করিয়া চলিয়াছে, কি অপূর্ণ রূপ। কাজি মুগ্ধ হইলেন, তিনি গৃহ হইতে নামিয়া আসিয়া নিমাইকে আলিঙ্গন করিয়া অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন।

এই সময়ে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীতে আর একটি সম্মানিত অতিথি উপস্থিত হইলেন।

ইহার নাম **নিত্যানন্দ**, ইনি হড়াই ওয়ার পুত্র—বাড়ী
নিতাইয়ের আবির্ভাব।
বীরভূম, একচাকা গ্রাম। ইনি নিমাই হইতে নয় বৎসরের বড়,

সুতরাং ইনি ১৪৭৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্পবয়সেই ইহার কৃষ্ণপ্রেম জন্মিয়াছিল। বাল্যকালে শকটভঞ্জন, পুতনাবধ, কালীদমন প্রভৃতি কৃষ্ণের নানারূপ লীলার অভিনয় করিয়া বাল্যসঙ্গীদের অমুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কৈশোর অতিক্রম করিবার পূর্বেই ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং দ্বাদশ বৎসরকাল ভারতবর্ষের সর্বত্রীর্থ ঘুরিয়া বেড়ান। কথিত

আছে শ্রীপর্কতে ইহার সঙ্গে **মাধবেন্দ্র পুরী**র সাক্ষাৎ হয়। এই মাধবেন্দ্র পুরীই বঙ্গদেশে প্রথম কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপাত করিয়াছিলেন। নানাকারণে মনে হয় **পুরী** বাঙ্গালী ছিলেন। ইনি অবাচক-বৃত্তি সন্ন্যাসী ছিলেন, কেহ কিছু স্বেচ্ছায় দিলে খাইতেন—নতুবা উপবাসী থাকিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে, ইনি একদা বৃন্দাবনে বাইরা গোবর্দ্ধন-পর্কত-দর্শনে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিয়া তথায় বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। তিন দিন কিছু খাওয়া হয় নাই, তথাপি দৈহিক কোন কষ্ট হয় নাই, শতদলের মত মুখখানি প্রেমে ঢলঢল করিতেছে। সাধ্যাঙ্কে কৃষ্ণবর্ণ পরম সুন্দর একটি কিশোরবয়স্ক বালক এক ভাঁড় হুধ মাধার করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, “আপনি এই হুধ পান করিয়া তৃপ্ত হউন। সম্মুখে ঐ ঝরনার জল—

মাধবেন্দ্র পুরী।

উহাতে ভাঙটি পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দিবেন,—আমি ঐ নিক পরে আসিয়া লইয়া যাইব।” মাধবেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “কে তোমাকে এই হুধ দিয়া পাঠাইয়াছে?” বালক বলিল, “ব্রজমায়েরা তোমার উপবাসের কথা জানেন, তাঁহারাি আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন, এখানে বসে মাধুসন্ন্যাসী আসেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের কাছে আহাৰ্য্য ভিক্ষা করেন, কেহ যব, ছাতু, হুধ, রুটি, কেহ বা ফল-মূল ভিক্ষা করেন, কিন্তু তুমি তাঁহাদের কাছে কিছুই চাও নাই। তাঁহারাি আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। যিনি কাহারও কাছে কিছু চান না, আমিই তাঁহার খাবার যোগাইয়া থাকি।” এই বলিয়া বালক চলিয়া গেল, তাহার পরমসুন্দর মুখশ্রী, উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ এবং সুন্দর রূপ সন্ন্যাসীর মন মুগ্ধ করিল।

মাধব সেই হুধ পান করিলেন, তাহা অমৃতের জায় স্থানান্ত, ভাঙটি দুইয়া মুছিয়া একবারে রাখিয়া দিয়া সন্ন্যাসী পুনরায় তপস্যায় বসিলেন। কৃষ্ণের ককণা-শ্রবণে তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতে লাগিল। শেষরাত্রে তজ্জার অবস্থায় ধ্যানের বশে তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই তরুণবয়স্ক বালক তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া, বড় মধুর তাঁহার মূর্তি, কিন্তু বড় বিষয়। গব্গদকণ্ঠে বালক যেন বলিতেছে, “মাধব! আমি বহুদিন যাবৎ তোমার অপেক্ষা করিয়া আছি, মৃত্তিকার নীচে শীতাতপে আমার বড় কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। তুমি আমাকে উদ্ধার করিবে, এই প্রত্যাশায় আমি কত বর্ষ কাটাইয়া দিয়াছি—কান্ধাণ জগতে তুমি আমাকে যেক্রপ ভালবাস, এক্রপ কেহ আমাকে ভালবাসে না।” এই বলিয়া স্থান-নির্দেশ করিয়া বালক অদৃশিত হইল। তখন গোবর্দ্ধনের শূঙ্গে রাধা মাণিকের মত সূর্য্য-কিরণের প্রথম ঝলক ঝিকিমিকি করিতেছিল—সন্ন্যাসী সাশ্রুনেত্রে বৃন্দাবনের পল্লীতে ছুটিলেন। বহু লোক কোদাল ও শাবল লইয়া তাঁহার পিছনে পিছনে গোবর্দ্ধন পাহাড়ে ছুটিল। নির্দিষ্ট স্থান পুঁড়িয়া তাঁহারা এক বিশাল প্রস্তরমূর্তি পাইলেন, এই গোপালমূর্তি মাধবাচার্য্য বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠা করিলেন, তিনি বাঙ্গালী পুরোহিত আনিয়া সেই মূর্তির পূজার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি আবার স্বপ্ন দেখিলেন যেন সেই বালক তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন—“মাধব! বহুদিন তুমিই থাকিয়া আমার শরীরের তাপ দূর হয় নাই—উড়িষ্যাতে খুব উৎকৃষ্ট চন্দন আছে, তুমি যদি

তাহা আমার সঙ্গে লেপন কর, তবে এই আলা জুড়াইবে। মাধব উড়িয়ার অভিমুখে চলিলেন, তখন পথে রাজায় রাজায় বিরোধ, পথ অতি দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল।
 "যার জন্ত গোপীনাথ
 ক্ষীর করিলেন চুরি।"
 মাধবের মাত্র কটিবাস সম্বল, বিপদ সম্পদ তাঁহার জ্ঞান নাই—
 তিনি রেমনা নগরীতে উপস্থিত হইয়া গোপীনাথ-বিগ্রহ দর্শন করিলেন, এই বিগ্রহকে ক্ষীরভোগ দেওয়া হয়—গোপীনাথের ক্ষীরভোগ অতি প্রসিদ্ধ।
 মাধব ভাবিলেন, "যদি এই ক্ষীরের একটু আস্বাদ পাইতাম তবে আমি বৃন্দাবনে বাইয়া গোপালকে এইরূপ ক্ষীরভোগ দিতে পারিতাম।" কিন্তু পরক্ষণেই মনে বিরাগ উপস্থিত হইল, "ছিঃ, আমার ক্ষীর খাইবার জন্ত জিহবার লালসা হইয়াছে।" অমৃতপ্ত হইয়া তিনি বাজারের অনতিদূরে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া ধ্যান-ধারণায় প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে। গোপীনাথ-মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা দেবতাকে ভোগ দেওয়ার পর আহাতিদি সমাপ্ত করিয়া থুমাইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময়ে হঠাৎ ঘুম ভাঙার পর তিনি চমকিয়া উঠিলেন, এবং ক্রতগতিতে মন্দিরে বাইয়া দেখিলেন—গোপীনাথের পুটে তাঁহার উত্তরীঘের সঙ্গে কতকটা ক্ষীর বাধা আছে। তখন পাণ্ডার ছই চক্ষু জলে পূর্ণ। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "গোপীনাথ আমায় বলিতেছেন, 'আজ আমি ভোগ খাই নাই, আমা ভিন্ন যে জানে না সেই মাধব না খাইয়া বাজারে উপবাসী হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার জন্ত আঁচলে কতকটা ক্ষীর রাখিয়াছি, মাধবকে ক্ষীর খাওয়াইয়া এস, তবে আমি ভোগ পাইব।'" সেই ক্ষীরখণ্ড হাতে করিয়া পাগলের মত পাণ্ডা বাজারে ছুটিলেন, "এমন ভাগ্যবান কে বাহার জন্ত স্বয়ং গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়াছেন, তাঁহার দর্শনের পূণ্য কবে পাইব? কোন্ সন্ন্যাসীর নাম মাধব?" এই চীৎকারে মাধবের ধ্যানভঙ্গ হইল, তিনি ধরা দিলেন। ইহার মধ্যেই সমুদ্র-তরঙ্গের মত বিপুল জনতা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তিনি সমস্ত স্তনিয়া রোমাক্তিত কলেবরে ক্ষীরপ্রসাদ পাইলেন এবং আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই সঙ্গে সমস্ত রেমনাবাসী লোক নৃত্য করিতে লাগিল—তাহারা তাঁহার সঙ্গে ছাড়িতে চায় না। কিন্তু প্রতিষ্ঠা বৈষ্ণবদের চক্ষে অতি দুষ্কার বিষয়, এই প্রতিষ্ঠার ভয় পাইয়া সন্ন্যাসী রেমনা হইতে উদ্ধার পাইবার পথ খুঁজিতে লাগিলেন; রাত্রে তিনি উর্জ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া বহুদূরে চলিয়া গেলেন।—এখনও বৃন্দাবনের পাণ্ডারা বাঙ্গলায় রচিত এই ছইটি চরণ আবৃত্তি করিয়া থাকে—
 "ধন্ত ধন্ত মহাভক্ত মাধবেন্দ্র পুরী।
 যার জন্ত গোপীনাথ ক্ষীর করিলেন চুরি।"
 এই চুরির অখ্যাতি উক্ত বিগ্রহের এখনও যায় নাই—এখনও রেমনার গোপীনাথ "ক্ষীর-চোরা গোপীনাথ" নামে পরিচিত। পুরী হইতে চন্দন লইয়া মাধবেন্দ্র বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন।

দাক্ষিণাত্যে ত্রীপুর্নতে মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে নিত্যানন্দের দেখা হইয়াছিল। মাধবেন্দ্রের ভক্তি অসাধারণ—আকাশে মেঘোদয় হইলেই তিনি কৃষ্ণরূপে মৃৎ মূর্তিতে চাহিয়া থাকিতেন এবং মূর্ত্তিত হইয়া পড়িতেন। "মাধবেন্দ্র পুরীর কথা অকথা কখন। মেঘদর্শনমাত্র হয় অচেতন।" এই মাধবেন্দ্র পুরীর রচিত শ্লোকগুলি চৈতন্য আগ্রহসহকারে আবৃত্তি করিতেন।

তন্মধ্যে একটি শ্লোক—“অয়ি দীন-দয়ার্জ-নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। জদয়ং
অদালোক্যাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্”—চৈতন্তের অতি প্রিয় ছিল; তিনি
বলিতেন, “এই শ্লোকচন্দ্র জগৎ আলোকিত করিতেছে, ঘষিতে ঘষিতে যেরূপ চন্দনের গন্ধ
বাড়ে, এই শ্লোক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি ও আলোচনা করিলে ইহার উৎকর্ষ তেমনই উপলব্ধ
হয়। রত্নগণমধ্যে শোভে কৌস্তভমণি। রসকাব্যমধ্যে এই শ্লোক গণি।” (চৈ. চ. মধ্য,
৪র্থ পঃ।) এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে তিনি কতবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, এবং মুচ্ছাভঙ্গের
পর সাশ্রুনেত্র গদগদকণ্ঠে শুধু “অয়ি দীন, অয়ি দীন” বলিতে বলিতে আর বলিতে পারেন
নাই, পুনরায় সংজ্ঞাহারা হইয়াছেন। নিত্যানন্দ বহু তীর্থ ভ্রমণের পর মাধবেন্দ্রের উদ্দাম
ভক্তিদর্শনে বলিয়াছিলেন, “যত তীর্থ দর্শন করিয়াছি—তাহার সর্বপ্রধান এই মাধবেন্দ্র-পুরী-
সঙ্গমস্থান, তুমি সর্বতীর্থের সার, যেহেতু তোমার মধ্যে যেরূপ আর কোথাও এরূপ কৃষ্ণভক্তির
বিকাশ দেখিতে পাই না। তীর্থগুলি পড়িয়া আছে—সিংহাসন শুল্ক, কোথাও ঠাকুরকে
পাইলাম না।” তখন নিত্যানন্দ শুনিলেন—কেহ বলিতেছেন, “তুমি গোড়ে ফিরিয়া যাও,
সেইখানে কৃষ্ণের দর্শন পাইবে, নবদ্বীপে তাঁহার লীলা দেখিবে।” এই বাণী কোন
দুস্তের অলক্ষ্য শক্তিতে তাঁহাকে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীতে টানিয়া আনিল।

মাধবেন্দ্র পুরীই ভক্তিরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা—ইহার উপাধি ছিল “ভক্তিচন্দ্রোদয়।” ইহার
স্থাপিত গোপালের অদৃষ্ট নানারূপ বিপদজালে জড়িত। বজ্রনামক কোন ব্যক্তি এই বিগ্রহ
গোবর্ধনে স্থাপন করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা উহাকে ধ্বংস করিতে আসিয়াছে, এই সংবাদে
ইহার মন্দিরের পরবর্তী এক মালিক ইহাকে মৃত্তিকার নীচে পুঁতিয়া পালাইয়া যান, তথা হইতে
মাধবেন্দ্র ইহাকে উদ্ধার করিয়া ছইজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে ইহার সেবায় নিযুক্ত করিয়া যান।
সেখানে পুনরায় মুসলমানেরা হানা দেয়, তথায় একমাস কাল ইনি বিটুলেশ্বরের গৃহে বাস
করেন, তৎপরে বহু ভাগ্যবিপর্যয়ের পর ইনি এখন জয়পুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মাধবেন্দ্র পুরী
মহাপ্রভুর জন্মের কিছু পূর্বে বা পরে স্বর্গগত হন, অনুমান ১৪০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ
পর্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন—ইহার শিষ্যগণের মধ্যে অষ্টৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ, কেশবভারতী
ও ঈশ্বর পুরী প্রধান। এই বৈষ্ণবচক্র শেষে চৈতন্তকে আশ্রয় করিয়াছিল।

চৈতন্তের নামের সঙ্গে নিত্যানন্দের স্থায় আর একজনের নাম অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত, ইনি
অষ্টৈতাচার্য্য। ইনি শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউর নগরে ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।
ইনি চৈতন্ত হইতে ৫২ বৎসরের বড় ছিলেন। রাজা গণেশের প্রধানমন্ত্রী নৃসিংহ নাড়িয়াল
ইহার পূর্বপুরুষ ছিলেন। (দীহার মন্ত্যাবলে শ্রীগণেশ রাজা, গোড়ের বাৎসাহে মারি নিজে হৈল
রাজা—অষ্টৈতপ্রকাশ।) লাউয়ের রাজা কৃষ্ণদাসের সভায় অষ্টৈতের পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন
মন্ত্রী ছিলেন। উত্তরকালে এই কৃষ্ণদাস অষ্টৈতের নিকট বৈষ্ণব দীক্ষা লইয়া “বাল্যলীলাসুত্র”
নামক একখানি অষ্টৈতজীবন সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। কথিত আছে অষ্টৈত লোকের
নাস্তিকতা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত অন্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেন, সেই
প্রার্থনার ফলে চৈতন্তের আবির্ভাব হয়। শান্তিপুত্রের শাস্ত্যচার্য্য নামক এক বিখ্যাত পণ্ডিতের

নিকট পাঠ সমাপন করিয়া ইনি শান্তিপুর্বেই উপনিবিষ্ট হন। ইনি যেরূপ পণ্ডিত ছিলেন তেমনি ধনশালী হইয়াছিলেন। শান্তিপুর্বে ইহার রাজপ্রাসাদের স্থায় অট্টালিকার নাম ছিল “উপকারিকা।” মুসলমান হরিদাসের সঙ্গে ইহার একান্ত অন্তরঙ্গতা ছিল; ইহার দুই স্ত্রী সীতা ও শ্রী বৈষ্ণব-সমাজে সুবিদিতা। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর চৈতন্য একবার শান্তিপুর্বে ইহার বাড়ীতে যাইয়া “উপকারিকায়,” দশদিন আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন,—তখন তিনি শান্তিপুর্ হাড়িয়া চলিয়া যান, তখন বৃদ্ধ অষ্টৈতাচার্য্য বালকের স্থায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ছিলেন। চৈতন্য বলিয়াছিলেন, “তুমি নিজেই যদি এরূপ ব্যাকুল হও, তবে আমার বৃদ্ধ মাতাকে কে প্রবোধ দিবে?” কথিত আছে একদা জ্ঞানের দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়াতে ভক্তিবাদীরা পুরীতে চৈতন্যের নিকট ইহার কুৎসা করিয়াছিলেন। চৈতন্য চিঠি লিখিয়া উত্তর আনাইয়া দেখাইলেন—ইনি যে প্রেমিক সেই প্রেমিকই রহিয়াছেন, শুধু জ্ঞানবাদ গ্রহণ করেন নাই। অষ্টৈতের টোলে বঙ্গদেশ ছাড়াও ভারতের নানাস্থল হইতে ছাত্র পড়িতে আসিত। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে, তাঁহার প্রেমের ধর্মের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার এক মহারাষ্ট্রীয় শিষ্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যান। “অষ্টৈতাচার্য্য” তাঁহার উপাধি,—নাম ছিল—কমলাকর ভট্টাচার্য্য। শান্তিপুর্বে অষ্টৈতের বংশধরেরা এখনও বাস করিতেছেন। ১৪৩৪ খৃঃ অব্দে ইহার জন্ম এবং প্রেমবিলাসের মতে ১৫৩৯ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু। ঈশান নাগরকৃত অষ্টৈত-প্রকাশে ইহার মৃত্যু ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে ঘটিয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে।

চৈতন্যের সহচর অষ্টৈত ও নিত্যানন্দ ছাড়া আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আমরা অল্পসংখ্যক কয়েকজনের উল্লেখ করিব—শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার, শ্রীবাস, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, হরিদাস, প্রতাপরুদ্র, বাসুদেব সার্কভৌম, বাসু ঘোষ, লোকনাথ, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ, রামানন্দ রায় এবং উদ্ধরণ দত্ত।

নরহরি সরকার শ্রীখণ্ড গ্রামের পদ্মদাসবংশীয়। পদ্মদাস বল্লালসেনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, ইহার আদি নিবাস ছিল সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী বালিনছি গ্রামে; উত্তরকালে ইহারা শ্রীখণ্ড, মোড়েশ্বর ও অপরাপর গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

নরহরি সরকার।

ইহাদের এক প্রধান শাখা—নীলাধর, দিগম্বর ও বিষ্ণুদাস ফৌজদার অমুমান ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের এক বিস্তৃত স্থানের অধিকার পাইয়া ঢাকা জেলার সূর্যাপুর গ্রামে বাস করেন। অধ্যাপক ডাঃ তমোনাশ দাশ-গুপ্ত এই বংশের বংশধর। নরহরির পিতার নাম নারায়ণ, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ হসেন সাহার গৃহচিকিৎসক ছিলেন। নরহরি ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চৈতন্যদেবের গণ্ডিতে পা দিবার পূর্বে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ লিখিয়া কবিশ্রুতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—তাঁহার একটি পদ এইরূপ—“আদিনিয় রহিল আমার এই হিয়ার হেম হার। পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার। রোপিণ্ড মল্লিকা নিজকরে, গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে...। এ বনে আসিতে তারে কইও। নরহরি ক’র এই কাম, সে সময়ে কাণে শুনাও কৃষ্ণনাম।” ইহা দশম দশা অর্থাৎ অন্তিম অবস্থায়

রাধার উক্তি। চৈতন্যের প্রতি অহুরাগ হওয়ার পরে, তিনি আর রাধাকৃষ্ণবিশ্বয়ক পদ রচনা করেন নাই, সমস্ত পদই গৌরাঙ্গ-বিষয়ে রচনা করিয়াছেন। এই সকল পদে গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণরূপে বর্ণনা করিয়া সহচরদিগকে গোপী বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন; এই গোপীভাবের ভজনা চৈতন্যভাগবতকার কৃন্দাবন দাসের ভাল লাগে নাই—সে কথা তিনি নরহরির নাম উল্লেখ না করিয়া ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। কিন্তু নরহরি আর একটি কাজ করিয়াছেন, যাহা গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে একটি নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিল—ইনি শাস্ত্রবিধিতে চৈতন্যপূজার মত রচনা করিয়াছেন—সেই বিধি সমস্ত গোড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। নরহরিরচিত গৌরাঙ্গলীলার বহু পদ আছে—তন্মধ্যে জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় তাঁহার গৌরলীলাতরঙ্গিনীতে প্রায় একশত গান উদ্ধৃত করিয়াছেন। নরহরির বংশধরেরা শ্রীখণ্ডে “বৈষ্ণব গোঁসাই” বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীর মধ্যে বহু শিষ্য আছে। নরহরি ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগত হন। চৈতন্য নরহরিকে এত ভালবাসিতেন যে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ-সময়ে প্রলাপের মধ্যে পর্য্যন্ত তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। “কখন বলেন এস প্রাণ নরহরি। হরিনাম শুনি তোরে আলিঙ্গন করি।” নরহরি-কৃত অনেক সংস্কৃত পুস্তক আছে।

শ্রীবাস চৈতন্য হইতে অন্ততঃ ৪০ বৎসরের বড় ছিলেন, ইহার মাতা মালিনী দেবী শচীর বন্ধু ছিলেন। ইহারা শ্রীহট্টবাসী ছিলেন, অদ্বৈত এবং শ্রীবাস একত্র হইয়া মাতৃভূমি

শ্রীবাস।
পরিভ্রমণপূর্বক গঙ্গাতীরে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীবাসের আরও তিন ভ্রাতা ছিলেন, শ্রীনিধি (শ্রীকৃষ্ণ), শ্রীরাম এবং শ্রীপতি।

এই ব্রাহ্মণপরিবার সম্ভ্রতিপন্ন ছিলেন। সেকালে ব্রাহ্মণেরা সেলাই কাপড়—অর্থাৎ জামা প্রভৃতি প্রায়ই ব্যবহার করিতেন না, কিন্তু সে সময়েও শ্রীবাসের বাড়ীতে একজন মুসলমান দরজি বারমাস নিযুক্ত ছিল। ১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শ্রীবাস উদ্ধামপ্রকৃতি ছিলেন—কুসঙ্গে মিশিতেন এবং উচ্ছৃঙ্খল হইবার পথে আসিয়াছিলেন। সেই বৎসর এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, “শ্রীবাস, তুমি কি করিতেছ? তোমার আয়ু আর একবৎসর মাত্র আছে।” প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, শ্রীবাস দেখিলেন স্বপ্নে দৃষ্ট সেই সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছেন এবং তিনিও তাঁহাকে সেই সতর্কতাসূচক উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। তদবধি শ্রীবাসের সমস্ত আনন্দ ও উচ্ছৃঙ্খলতার অবসান হইল। এমন সময়ে তিনি পথে এক টুকরা কাগজ কুড়াইয়া পাইলেন, তাহাতে বৃহদ্রারদীয়পুরাণোক্ত এই শ্লোকটি লিখিত ছিল—
“হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথা॥”
জলে নিমজ্জিত ব্যক্তি যেরূপ একটি তুণ পাইলেও তাহা আঁকড়াইয়া ধরে, তিনি ঐ শ্লোকটি সেই ভাবে গ্রহণ করিলেন এবং নিরন্তর নাম জপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে ক্রমশঃ তাঁহার মনে আধ্যাত্মিক শক্তির সঞ্চার হইল। তাঁহার কণ্ঠ অতি মিষ্ট ছিল, যখন রাস্তায় দাঁড়াইয়া তিনি ভক্তির আবেগে নাম কীর্তন করিতেন, তখন তথায় ভিড় জমিয়া যাইত। দেবানন্দ পণ্ডিতের বাড়ী রোজ শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা হইত, শ্রীবাস ভক্তির উচ্ছ্বাসে চীৎকার

করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। এই অপরাধে পণ্ডিতেরা তাঁহাকে একদিন সভা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন; পণ্ডিত-সমাজে এই উজ্জ্বাস ও ভাবুকতা, অস্বাভাবিক হয় নাই। যেদিন সর্ষপ্ৰথম শচী দেবীর গৃহে বাইয়া তিনি চৈতন্তের ভক্তি দেখিলেন, সেইদিন তাঁহার জীবনের সর্ষাপেক্ষা স্মরণীয় দিন। ইহার বহুপূর্বে একদিন তিনি বধারীতি দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতে গিয়াছিলেন, সেইদিন সন্ন্যাসীর নির্দিষ্ট একবৎসরের শেষ দিন, হঠাৎ তিনি মূচ্ছিত ও নিষ্পন্দ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া সকলে তাঁহাকে বাহিরে লইয়া আসিল, এমন সময়ে কোথা হইতে সেই সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া বলিলেন, “শ্রীবাস উঠ, জগতে তোমার আরও অনেক কাজ করিবার আছে—তুমি নব জন্ম পাইলে।”

চৈতন্তের ভক্তি-লীলা প্রকাশ হইবার পরেই শ্রীবাসের বিবৃত কুন্দ-কুসুমাকীর্ণ আঙ্গিনায় রাত্রিকালে প্রত্যহ একটি বিশিষ্ট ভক্তদল লইয়া কীর্তন হইত। গঙ্গাদাস পণ্ডিত বাহির ঘারে পাহারা দিতেন, আর কোন লোক ঢুকিতে পারিতেন না। চৈতন্তের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে পর্য্যন্ত এই আঙ্গিনায় বে লীলা হইত, তাহা দেবলীলা। সে লীলার কথা এখনও লোকে ভুলিতে পারে নাই। সেই আঙ্গিনা এখন গঙ্গাগর্ভে, কিন্তু অদূরবর্তী একটা স্থানকে “শ্রীবাসের আঙ্গিনা” নাম দিয়া গোবামৌরা এখনও সেই পবিত্র স্মৃতি বজায় রাখিয়াছেন। এই আঙ্গিনায় একদিন কীর্তন হইতেছিল, তখন শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র মারা যায়। কিন্তু শ্রীবাসের বাড়ীর মেয়েরা ফুকরিয়া কাঁদেন নাই। শ্রীবাস বধারীতি কীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে, গলার সুরে এবং ব্যবহারে কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। সংকীর্তনের শেষে মৃত শিশুকে পোড়াইবার জন্ত বাহির করা হইল, তখন চৈতন্ত এবং তাঁহার সহচরগণ সেই দুর্ঘটনার কথা প্রথম জানিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্ত বলিয়াছিলেন, “পুত্রশোক না জানিল যে আমার প্রেমে। হেন তব সঙ্গ মুই তাজিব কেমনে” (চৈ. ভা. মধ্য, ২৫ অ)। একদা পুরীতে চৈতন্ত-সংকীর্তনে শ্রীবাস মহারাজ প্রতাপরুদ্রের গা ঠেলিয়া চৈতন্তের দিকে বাইতেছিলেন, তাহাতে রাজমন্ত্রী হরিচন্দন তাঁহাকে ভৎসনা করাতে তিনি মস্তুর গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন, মন্ত্রী জ্বল হওয়াতে রাজা তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিয়াছিলেন,—“তুমি রাগ করিও না, প্রভুর প্রতি উহার ভক্তির কণিকা প্রসাদ পাইলে আমরা ধন্ত হইতাম।”

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কীর্তন হইত; তিনি হরিদাস (মুসলমান) ও জাতিচ্যুত নিত্যানন্দকে দুইবৎসরকাল তাঁহার বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলেন। এই কারণে ভট্টাচার্য্যগণ সর্ষদা তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা করিতেন। হসেন সাহার নৌসৈন্ত আসিয়া বাহাতে শ্রীবাসের আঙ্গিনা ও গৃহাদি ধ্বংস করিয়া ফেলে, এইরূপ একটা ষড়যন্ত্রও তাঁহারা করিতেছিলেন। শ্রীবাস ও তাঁহার পরিবারবর্গ চৈতন্তগতপ্রাণ ছিলেন, তাঁহারা ঐসকল কথা গ্রাহ্য করিতেন না। চৈতন্ত-ভাগবতকার লিখিয়াছেন, “সপরিবারে করে তারা চৈতন্তের সেবা। শ্রীচৈতন্ত বিনা নাহি মানে দেবীসেবা।” নবদ্বীপ ছাড়া শ্রীবাসের কুমারহট্টে এক বিশাল প্রাসাদ ছিল,

তথায় ভগ্ন অট্টালিকা এখনও আছে। চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন, “লক্ষ্মীকেও যদি ভিক্ষাভাণ্ড হাতে লইতে হয়, তথাপি শ্রীবাসের সম্মানের দরিত্র হইবেন না।” যখন চৈতন্য শিশু ছিলেন, তখন শ্রীবাস প্রবীণবয়স্ক, তিনি শিশু চৈতন্যকে প্রায়ই একাজ সেকাজ করিতে ফরমাইস দিতেন, একদিন চৈতন্যের হাত ধরিয়া তিনি ধমকাইয়া বলিয়াছিলেন, “কোথায় চলেছ উদ্ধতের শিরোমণি।” চৈতন্য অবশ্য কোন অন্তায় কার্যের দিকে অভিযান করিতেছিলেন। শ্রীবাস অল্পমান ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্য নবদ্বীপে যে অভিনয় করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীবাস নারদ সাজিয়া তাঁহার স্বরলহরীতে শ্রোতৃবর্গকে মাতাইয়াছিলেন।

হরিন্দাসকে কেহ কেহ ব্রাহ্মণের পুত্র প্রমাণ করিতে চাহিয়া তাঁহার পিতামাতার নাম-
ধাম সমস্ত করিয়াছেন, তিনি মুসলমানের গৃহে পালিত এইজন্য “যবন হরিন্দাস” নামে

“হরিন্দাস।”

পরিচিত হইয়াছিলেন, এই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। এমন কি প্রাচীন
লেখক জয়ানন্দও এই মত প্রচার করিয়াছেন। পরিণামে হরিন্দাস

ব্রাহ্মণ-সমাজে গৃহীত হন, এমন কি বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য হন। মহাপ্রভুর বিয়োগের পর হিন্দুয়ানী ও জাতিভেদ আবার উদার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে, তখন তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া পরিচিত করিতে লজ্জা বোধ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ এই জনাই এই গল্পের উৎপত্তি, আমরা এই দেশের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা আরো অনেক জানি। যখনই কোন মুসলমান বা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু কমতাশালী হইয়া উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন, তখনই এই সকল গল্পের উৎপত্তি হইয়াছে। কুচবেহার, বনবিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের ইতিহাসে এইরূপ প্রচেষ্টার উদাহরণ আছে। স্মরণ্য হরিন্দাস এ বিষয়ে একা নহেন। বৈষ্ণব ইতিহাসে অলৌকিক অংশ বাদ দিলে চৈতন্যভাগবতের তুল্য বিশ্বাসযোগ্য পুস্তক আর নাই। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের সঙ্গে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুস্তক-
খানিও নিত্যানন্দের প্রেরণা ও তাঁহার সাক্ষাৎ উপদেশাদির ফলে রচিত হইয়াছিল। হরিন্দাস ও নিত্যানন্দ দুইজন একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং বহুদিন একগৃহে বাস করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় চৈতন্যভাগবতের প্রমাণই সর্বদা গ্রাহ্য। চৈতন্যভাগবত স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে, কাজি হরিন্দাসকে বলিতেছেন, “তুমি বহুভাগ্যে মুসলমানকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার পক্ষে কাফেরদের সঙ্গে মেশার মত অপরাধ আর নাই।” তিনি যদি ব্রাহ্মণের পুত্র হইতেন, তাহা হইলে কাজি এবং অপরাপর মুসলমানের তাঁহার প্রতি এরূপ জাতক্রোধ হইতে পারিত না। চৈতন্য-ভাগবত কিংবা চৈতন্য-চরিতামৃত এই দুই সর্কাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থে হরিন্দাসের ব্রাহ্মণকূলে জন্মবার গল্প নাই। হরিন্দাসের পিতার নাম মলয় কাজি, অথবা অঞ্চলে ইহাদের বিদ্যুত জমিদারী ছিল। যশোহর জেলার বনগ্রামের নিকট বুঢ়ন পল্লীতে হরিন্দাসের জন্ম হয়। ১৪৬৪ খৃঃ অব্দে শান্তিপুরে আসিয়া ইনি সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং অদ্বৈত কর্তৃক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। একজন মুসলমান বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, এই সংবাদে ঘোর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, এবং ফুলিয়া গ্রামের গোরাই কাজি এবং আরও বার জন কাজি একত্র হইয়া হরিন্দাসের বিচার করেন। যদি হরিনাম ত্যাগ না করেন

তবে তাঁহাকে এক একটি করিয়া ২২ বাজারে দাড় করাইয়া বেত্রাঘাত করিতে হইবে, এই আদেশ প্রচারিত হয়; উদ্দেশ্য—যেন এই শাস্তির ভীষণতা মুসলমানসমাজে দৃষ্টান্তস্থানীয় হয়। এই বেত্রাঘাতের ফলে হরিদাস মৃতপ্রায় হইলে তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

বেনেপোলের জমিদার রামচন্দ্র খাঁ মুসলমানদিগের শিক্ষামত ইহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন। যে গুফায় বসিয়া হরিদাস তপস্তা করিতেন, সেইখানে তিনি এক পরমা সুন্দরী গণিকাকে পাঠাইয়া দেন। হরিদাসের নিকট গণিকা উপযাচিকা হইয়া প্রণয় প্রার্থনা করে। তিনি উত্তরে বলেন, “বেশ, আমি জপ শেষ করিয়া লই, শেষে তোমার কথা শুনিব।” সন্ধ্যা হইতে জপ শুরু করিয়া সেই জপ প্রভাতে শেষ হয়। কারণ তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ বার নাম জপ করিতেন। প্রভাত হওয়ার পরে তিনি গণিকাকে বলিলেন, “কাল আসিও।” কারণ প্রাতঃকাল হইতে বহু ভক্ত তাঁহার দর্শনকামী হইয়া আসিয়া গুফায় ভিড় করিয়াছিল। পরদিন এবং তার পরদিনও সেইরূপ;—জপ সারাদিন হইতে সারারাত্রি কাটিয়া যায়—গণিকা কোন সুবিধা পাইল না। তাহার চক্ষে আর একটি জগৎ প্রকাশিত হইল, সেই ভক্তিরাজ্যের দেবোপম ইন্দ্রিয়জয়ী সংযমী পুরুষের হরিনামের প্রতি অম্লবাগ, গলদণ্ড চক্ষু এবং সমাধির প্রণাস্তি দেখিয়া সেই রমণী দৈহিক সৌন্দর্য্য একান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে করিল। হরিদাসের চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইল।

পুরীতে যথাকালে চৈতন্তদেব প্রত্যহ হরিদাসকে দেখিতে তাঁহার নিভৃত আশ্রমে যাইতেন। এই আশ্রমে কতকদিন সনাতন বাস করিয়াছিলেন। সনাতন হরিদাসকে বলিয়াছিলেন, “এমন অনেক লোক আছেন যাহারা ধর্ম্মের উপদেশ দেন, কিন্তু নিজেরা সে পথে চলেন না, আবার এমন লোকও আছেন যাহারা জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ কাটিয়া ফেলিয়া নিজেরা ধ্যান-ধারণায় প্রমত্ত আছেন, কিন্তু এমন লোকতো তোমার মত দেখিলাম না, যিনি ধর্ম্ম শিক্ষা দেন এবং স্বয়ং ধর্ম্মের পথে অটল, যিনি একাধারে সন্ন্যাসী ও জগতের হিতে রত।” (চৈ. চ. অন্ত্য, ৪র্থ অ.) চৈতন্তদেব বলিয়াছিলেন, “তোমার চিন্তাগুলি গঙ্গাবারীর স্থায় পবিত্র, তোমার আত্মা নিয়ত তাহাতে অবগাহন করে। ধর্ম্মের যে সকল শাস্ত্রসঙ্গত অনুষ্ঠান সকলে করিয়া থাকে, তোমার জীবনের প্রত্যেকটি কার্য্যই তজ্জপ পবিত্র। তোমার নিত্য আচরিত আদর্শ বেদপাঠের পুণ্যময়। জগতে তোমার মত সাধু ও প্রকৃত ব্রাহ্মণ কোথায় পাইব?”

হরিদাস একদা চৈতন্তদেবকে বলিলেন—“আমার এ কি হইল? আমি নিত্য তিন লক্ষ নাম জপ করিয়া থাকি, কিন্তু এখন দেহে ক্লান্তি আসিয়াছে, সংক্লিষ্ট নাম জপ করিয়া উঠিতে পারি না।” উত্তরে চৈতন্তদেব বলিলেন, “এখন বৃদ্ধ হইয়াছ, এত নাম জপ করিবার তোমার প্রয়োজন নাই। তুমি নিজে পাবন, নামজপে তোমার পাবনী শক্তি আর কি বাড়াইবে।” ১৫১০-১১ খৃষ্টাব্দে হরিদাস দেহত্যাগ করেন। তখন চৈতন্তদেব তাঁহার সম্মুখে ছিলেন, তিনি তাঁহার সমস্ত উচ্চ ব্রাহ্মণকুলজাত সহচরদিগকে মুম্বু হরিদাসের পাদোদক সেবন করাইলেন এবং তাঁহার সমাধির জন্ত নিজ হস্তে প্রথম মাটি খুঁড়িলেন। পুরীতে সেই

সমাবিধানটি আছে, তথায় বে বকুলবৃক্ষনিম্নে বসিয়া হরিদাস অপ করিতেন, সেই বৃক্ষটি এখনও আছে, উহার কাণ্ড নাই, বুল বকের উপর গাছটি দাঁড়াইয়া আছে। প্রায় ৪৫০ বৎসরের বৃক্ষটি দেখিলেই তাহার প্রাচীনত্ব প্রতীয়মান হইবে। আমি এমন গাছ আর দেখি নাই।

হরিদাস বৈষ্ণব-সমাজে বে আদর, শ্রদ্ধা ও পূজা পাইয়াছিলেন, তাহা অপূর্ব। এই মুসলমান সাধু বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে এক পঙ্ক্তিতে বসিয়া আহার করিতেন, এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের বিদায় প্রাপ্ত হইতেন। মৃত্যুকালে হরিদাসের বয়স কিকিম্বদ্বয় ৭০ বৎসর হইয়াছিল।

লোকনাথ গোস্বামী চৈতন্তের সতীর্থ ছিলেন। ইহার পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্তী কেশের জেলায় তালগড়িয়া গ্রামের অধিবাসী, ইহার মাতার নাম সীতা। ১৪২০ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যখন চৈতন্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন ইনি চৈতন্তের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্ত ইহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। বৃন্দাবনতীর্থ লুপ্তগোরব হইয়া

লোকনাথ গোখারী।

একটা অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, এই তীর্থকে পুনরায় পূর্ব-গোরবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত চৈতন্ত অত্যন্ত প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

তদনুসারে তপ, সনাতন, ভূগর্ভ ও লোকনাথকে তিনি বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। যাত্রাকালে লোকনাথ বলিয়াছিলেন, “তোমার মুখদর্শনের জায় তোমার সঙ্গলাভের জায়—সুখ আমার নাই—তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া তুমি আমাকে এখানে পাঠাইলে” (প্রেমবিলাস)। চৈতন্তদেব বলিলেন—“তোমার ও আমার ভাগ্যে বিদাতা সংসারের সুখ লেখেন নাই।” যখন লোকনাথ বৃন্দাবন গমন করেন, তখন পথ অতীব বিয়সস্থূল ছিল। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহদের লড়াই চলিতেছিল। ভূগর্ভ ও লোকনাথ তাজপুরের পথ ধরিয়া পূর্বিয়া গিয়াছিলেন। তথা হইতে লক্ষ্যে দিয়া নবদ্বীপ হইতে ২৩ দিন ভ্রমণের পর তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছিলেন। লোকনাথ মহাপ্রভুর দক্ষিণাত্যে যাত্রা শুনিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, পথে শুনিলেন তিনি বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়াছেন; বৃন্দাবনে গিয়া শুনিলেন, তিনি তথা হইতে চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে আর লোকনাথের দেখা হয় নাই; বাঙ্গলা ও উড়িষ্যায় তাঁহার আসা নিষিদ্ধ হইয়াছিল, কারণ তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকনাথের মত নীরব কর্মী এবং নির্লোভ সাধু বৈষ্ণব ইতিহাসে খুব বেশী নাই। তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজকে চৈতন্তচরিতামৃত লেখায় অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু কবিরাজকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল যে তিনি তাঁহার পুস্তকে তাঁহার নামোচ্চারণ করিতে পারিবেন না। তিনি একান্তভাবে প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন, এজন্য কোন শিষ্য গ্রহণ করেন নাই। শেষকালে নরোত্তমের গভীর অমুরাগ, দৈহিক ও মিনতি এড়াইতে না পারিয়া সেই একটি মাত্র লোককে তিনি মঙ্গলদীক্ষা দিয়াছিলেন। লোকনাথ দীর্ঘজীবন বৃন্দাবনে কাটাইয়াছিলেন, তথায় তাঁহার স্মৃতি এখনও বিশেষভাবে পূজিত।

দক্ষিণাত্যের কোন রাজকুলে রূপ, সনাতন ও অনুপম (অপর নাম বসন্ত)

এই তিন ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের অবস্থার অবনতি হওয়াতে ইহারা ইহাদের পিতৃবন্ধু
 বাঙ্গলার পাঠান নৃপতিদিগের সভায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। সনাতন
 মনোভাব ও রূপ।
 ছিলেন পরম পণ্ডিত, সংস্কৃত, পারসী ও আরবীতে তাঁহার মত
 সুপণ্ডিত সেকালে দুর্লভ ছিল। রূপের অসামান্য কবিত্বশক্তি ছিল এবং তিনিও নানাশাস্ত্রবিৎ
 ছিলেন। অধিকন্তু রূপের হাতের লেখা ঠিক মুন্সীর মত ছিল। চৈতন্য কতবার তাঁহার
 সুন্দর হস্তলিপির প্রশংসা করিয়া বলিতেন, “রূপের আখর বেন মুকুতার পাতি।” ছই ভ্রাতাই
 ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলেও কতকটা মুসলমান-ধর্ম্মানুরাগী এবং আচার-ব্যবহারে ঠিক মুসলমানের
 মত হইয়া গিয়াছিলেন। ইহারা হিন্দু নাম ত্যাগ করিয়া মুসলমান উপাধিতে পরিচিত
 হইয়াছিলেন। সনাতন ছিলেন হুসেন সাহের প্রধান মন্ত্রী এবং রূপ সম্রাটের লেখা-পড়ার
 দপ্তরে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। সনাতনের উপাধি ছিল “সাকর মল্লিক” এবং রূপ “ববির
 খান” নামে পরিচিত ছিলেন। ইহাদের হিন্দু নাম ছিল অমর ও সম্ভাব। তৃতীয় ভ্রাতা
 অম্বুপম একটি মাত্র পুত্র (জীব গোস্বামী) রাখিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে
 চৈতন্য বৃন্দাবনের পথে গোড়ের নিকটবর্তী রামকলী নগরে উপস্থিত হন, তখন রূপ ও সনাতন
 তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। উভয় ভ্রাতারই জীবনে এই স্মরণীয় দিনে যে মহৎ পরিবর্তন
 ঘটিয়াছিল, তাহা বৈষ্ণব-সমাজের একটা গুরুতর ঘটনা। চৈতন্য সনাতনের সঙ্গে আলাপ
 করিয়া মুগ্ধ হন, যদিও সেই দিনই সনাতন তাঁহাকে মনুষ্য-দেবতা বলিয়া গ্রহণ করেন, তথাপি
 তাঁহাকে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে উপদেশ দিতে কুষ্ঠা বোধ করেন নাই। এদিকে রামকলীতে
 চৈতন্যদর্শনের জন্ত লক্ষাধিক লোকের ভিড় হওয়াতে হুসেন সাহ কেশব ক্ষেত্রী নামক এক
 রাজকর্মচারীকে পাঠাইয়া দেন। একজন তরুণবয়স্ক সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্ত এত লোক
 জমিয়াছে কেন—এই বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ জানিবার ভার কেশবের উপর ছিল। কেশব
 ফিরিয়া গেলে হুসেন সাহ তাঁহাকে চৈতন্যসম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন, চৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত
 আছে যে, এই সকল প্রশ্নের উত্তরে সম্রাট বাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে চৈতন্যের প্রতি তাঁহার
 বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, ইহাই বুঝা যায়। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া সনাতন চৈতন্যকে
 বলিলেন, “আপনি সন্ন্যাসী, তীর্থদর্শনে যাইবেন, অথচ সহস্র সহস্র লোক উৎসবানন্দ করিয়া
 আপনার পিছনে পিছনে ছুটিয়াছে—মনে হইতেছে বেন কোন রাজাধিরাজ সমারোহপূর্বক
 যাইতেছেন, ইহা আপনার বোধ্য নহে। দ্বিতীয়তঃ হুসেন সাহ অতি খামখেয়ালী সম্রাট,
 সেদিনও উড়িষ্যায় কতকগুলি দেবমন্দির ও বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া আসিয়াছেন। যদিও এখন
 আপনার উপর তাঁহার ভাল ভাব—কিন্তু ইহার ভাবান্তর হইতে এক মুহূর্ত্ত লাগে না। এত
 সমারোহ যদি তিনি জীতিচরিত্র চক্ষে না দেখেন এবং কেহ যদি কুপরামর্শ দেয়, তবে আপনার প্রতি
 অত্যাচার হইতে পারে—সুতরাং আপনি ফিরিয়া যাউন।” চৈতন্যের সঙ্গে যে লক্ষাধিক লোক
 চলিয়াছিল, কীৰ্ত্তনানন্দে যে দিঘগুলি নিরবধি প্রতিধ্বনিত হইতেছিল—চৈতন্যের সে দিকে
 মোটেই লক্ষ্য ছিল না, অনেক সময়েই তিনি এ রাজ্যে থাকিয়াও অপররাজ্যে বাস করিতেন।
 সনাতনের কথায় তাঁহার এদিকে দুটি পড়িল, তিনি পুরী ফিরিয়া চলিলেন।

যাইবার পূর্বে তিনি সনাতনের “সাকর মল্লিক” নাম ঘুচাইয়া তাঁহার “সনাতন” নাম দিয়া গেলেন এবং “দবির খাস”কেও “রূপ” নামে পরিচিত করাইলেন। চৈতন্য বলিয়া গেলেন, যেন পুরীতে ইহার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। গোড়ে ফিরিয়া সেই রাতে রূপ রাজকার্য্য-বসানে স্বপ্নে শয়ন করিয়াছেন। মধ্যরাতে তাঁহার পায়ে একটা বিষাক্ত কীট দংশন করে। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে জাগাইয়া একটা আলো আলিতে বলেন; ব্যস্তভাবে স্ত্রী জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারে মোমবাতি হাতের কাছে না পাইয়া রূপের বহুমূল্য একটা পরিচ্ছদের মধ্যে আগুন ধরাইয়া ফেলেন। রূপ বলিলেন, “তুমি আমার এত দামের পোষাকটা নষ্ট করিলে?” স্ত্রী বলিলেন, “তোমার ইষ্ট ও স্বখস্বচ্ছন্দ্যের কথা যেখানে, সেখানে এই ঘরবাড়ী, বহুমূল্য পোষাক আমার কাছে অতি তুচ্ছ কথা।” রূপ মনে ভাবিলেন, “ইহার প্রভুর সেবা ত এ সর্ব্ব দিয়া করিতে প্রস্তুত! আমার প্রভুর সেবার জন্ত আমি কি করিয়াছি বা করিতেছি? আমি তো ঘরবাড়ী-বিষয় লইয়াই আছি।” চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার পর তাঁহার হৃদয়ে স্বর্ণাকরে যে স্বর্গীয় প্রেমের চিঠি লিখিত হইয়াছিল, এই তুচ্ছ ঘটনায় তাহার বার্তা উজ্জল হইয়া তাঁহার মনে পৌছিল। তিনি সেই রাতেই গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। যাইবার পূর্বে তাঁহার বিপুল বিষয়ের এক-চতুর্থাংশ ব্রাহ্মণদিগকে, এক-চতুর্থাংশ ছাত্রদিগকে, অপর দুই অংশের একাংশ পরিবারবর্গকে এবং অপর অংশ সনাতনকে লিখিয়া দিলেন; সঙ্গে একটুকরা কাগজে একটি শ্লোক সনাতনকে লিখিয়া গেলেন তাহা সর্ব্বত্র পরিচিত; প্রথম ছত্রটি এইরূপ “বহুপতে: কু গতা মথুরাপুরী, রঘুপতে: কু গাতাত্তরকোশলা।”

রূপ পুরী আসিয়া চৈতন্যের সঙ্গে দেখা করিলেন—রূপ সংস্কৃতে যে দুইখানি নাটক লিখিতেছিলেন, তাহার সম্বন্ধে চৈতন্যের সঙ্গে কথাবার্তা হইল। রূপ একই নাটকে ত্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ও মথুরার কাহিনী লিখিতেছিলেন। চৈতন্য ঐশ্বর্যের সঙ্গে মাধুর্য্য জড়াইতে নিষেধ করিয়া রূপের পরিকল্পিত উপাদানে দুইখানি নাটক লিখিতে উপদেশ দিলেন। তাহার ফলে আমরা বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব—মধ্যযুগের সংস্কৃত-সাহিত্যের কোহিনূরসদৃশ এই দুইখানি নাটক পাইয়াছি। ঐশ্বর্য্য হইতে মাধুর্য্য বিচ্যুত হইবার পর হইতে কৃষ্ণলীলার এক নবভাব আবিষ্কৃত হইয়াছে, বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কোথায়ও সেই রস প্রগাঢ়ভাবে আত্মদিত হয় নাই।

রূপ আরও অনেকগুলি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন, তন্মধ্যে দানকেলীকৌমুদী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ। বৃন্দাবনে ইনি যে ভাবে জীবনযাপন করেন, তাহা সন্ন্যাসীর আদর্শ জীবন।

সনাতন রূপের চিঠিটুকু লইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহারও মন হইতে বিষয়তৃষ্ণা দূর হইয়াছিল। চৈতন্যের দর্শনাবধি তিনিও বর্ষণোত্তম মেঘের তায় কোন স্তবোগের সঙ্কল্প লইয়া রাজসভায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজকার্য্যে মন নাই, ক্রমে কয়েক দিন রাজসভায় উপস্থিত হন না। রাজার মনে সন্দেহ হইল, হয়ত রূপের মত ইনিও পালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। রাজা তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহার সঙ্গে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে বলিলেন। সনাতন স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, “আপনি হয়ত কোন দেবমন্দির ভাঙ্গিবেন—হিন্দুর ধর্ম্মে হাম্মা দিবেন, এমন কার্য্যের জন্ত আমার সহায়তা চাহিবেন না।

আপনার অনেক মুসলমান মন্ত্রী আছেন, তাঁহাদের কাহাকেও লইয়া যাউন।” হুসেন সাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। এদিকে সনাতনও রাজসভার কাজ প্রায়ই উপেক্ষা করেন, এবং সভায় উপস্থিত হন না। সম্রাট রাজবৈজ্ঞান পাঠাইয়া জানিতে চাহিলেন, সত্যসত্য সনাতনের কোন অস্থখ হইয়াছে কি না। ভিষক জানাইলেন, সনাতন দিব্য সুস্থ দেহে আছেন। হুসেন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী সনাতনকে এবার কারাগারে পাঠাইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য গোড় ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। ৭০০০ টাকা খুব দিয়া সনাতনের আত্মীয়েরা কারাধ্যক্ষ মীর হাবুলের নিকট হইতে সনাতনের মুক্তিলাভ করাইলেন। বন্দীরা গঙ্গায় স্নানার্থ মাঝে মাঝে নীত হইতেন। সেই সুযোগে সনাতন পলাইলেন, তাঁহার জন্য নৌকা প্রতীক্ষা করিতেছিল। এদিকে মীর হাবুলও খুব সতর্ক অনুসন্ধানের একটা বাহাদুর করিয়া কিছুতেই তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না। ঈশান নামক একটি ভৃত্যের সঙ্গে সনাতন সন্ন্যাসীর বেশে গোড় ছাড়িয়া পলাইলেন। ঈশান গোপনে ১৫টি স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে লইয়াছিল। গঙ্গা পার হইয়া সনাতন পাত্র নামক একটি ছোট পাহাড়ের নিকট এক পল্লীতে জনৈক “ভূঁইয়ার” বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই ভূঁইয়ার অতিরিক্ত আপ্যায়ন ও ভদ্রতায় সনাতনের মনে সন্দেহ হইল। তিনি ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার সঙ্গে কোন অর্থ আছে কিনা। ঈশান সেই ১৫টি মোহর তাঁহার হাতে দিল। তিনি উহা ভূঁইয়াকে দিলেন। ভূঁইয়া অকপটে বলিল, “ইহা দিয়া ভালই করিয়াছেন, নতুবা আজ রাতেই আমরা আপনাদিগকে হত্যা করিতাম।” দয়ার শিরোমণি ভূঁইয়া ঐ অর্থ হইতে একটি মোহর পঞ্চখরচের জন্য সনাতনকে ফিরাইয়া দিল। সনাতন উহা ঈশানকে দিয়া তাহাকে বাড়ীতে ফিরিয়া বাইতে বাধ্য করিলেন। সমগ্র বাঙ্গলা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী কোপীন পরিয়া একক ছুটিয়াছেন। পথে এক ময়দানে তিনি কতকগুলি মাটির ডেলা দিয়া শিয়রের বালিশ ও পাশবালিশ প্রস্তুত করিয়া শুইয়াছিলেন। জলের ঘাটের ঘাটী কোন মহিলা তাঁহাকে দেখিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল, “সন্ন্যাসী হইয়াছেন, কিন্তু ভোগের অভ্যাস যায় নাই।” সনাতন বুঝিলেন, বহুদিনের অভ্যাস হইতে মুক্ত হওয়া অতি কঠিন। তিনি সেই মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়া চলিলেন। হাজিপুরে একটা খড়ের গাদার নীচে শীতের রাতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্তন করিতেছিলেন। পার্শ্ববর্তী একটা বড় বাড়ী সনাতনের ভয়ীপতি শ্রীকণ্ঠ ভাড়া লইয়াছিলেন। হুসেন সাহ তাঁহাকে সেখান হইতে ঘোড়া কিনিবার জন্য তিন লক্ষ টাকা দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীকণ্ঠ সনাতনের চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, তিনি তাড়াতাড়ি যাইয়া সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। দেখিলেন গোড় রাজ্যের সামন্ত রাজারা বাহার নিত্য দ্বারস্থ থাকিতেন, সেই রাজচক্রবর্তিসদৃশ মহামন্ত্রীর কটিতে কোপীন-বাস।

পৌষমাসের শীতে তাঁহার ক্ষীণদেহ কাপিতেছে—নগদেহ, অথচ মুখখানি প্রেমসরোবরের শতদলের মত আনন্দে ঢলঢল। শ্রীকণ্ঠ তাঁহাকে ফিরাইতে বহু চেষ্টা করিলেন, পাশে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই দারুণ শীত নিবারণের জন্য শালদোশালা দিতে চাহিলেন, কিন্তু কুসুম হইতেও মুছ এবং বজ্র হইতেও কঠোর এই লোকোত্তরগণের চরিত্র।

শ্রীকর্ত্তের বহু অঙ্গনয়ে বাধ্য হইয়া তিনি তিনটাকা মূল্যের একখানি ভোট বহল গায়ে পড়িতে স্বীকৃত হইলেন। সনাতন কানীতে যাইয়া চৈতন্তদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। শীতকাল, তবু সকল সন্ন্যাসীরই নগ্নদেহ, শীতবাত উপেক্ষা করিয়া লতাটির গায়ে শত শত ফুল ফোটে—চৈতন্ত সেইরূপ ভক্তি-সরোবরের সরস পদ্মের ছায় ছুটিয়া আছেন। সনাতনের লজ্জা বোধ হইল, কারণ “ভোট কবলের পানে প্রভু চাহে বার বার।” কবলখানি এক ভিক্ষুককে দিয়া সনাতন লজ্জার হাত এড়াইলেন। কানীতে সনাতন চৈতন্তদেবকে বলিলেন, “আমার এই দেহ-মন আপনাকে সমর্পণ করিলাম।” কানী হইতে রূপের সঙ্গে দেখা করিতে সনাতন বৃন্দাবনে গেলেন, তথা হইতে চৈতন্তের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছায় পুনরায় পুরীর দিকে রওনা হইলেন। পথে ঝারিখণ্ডের বন, ছোট নাগপুর। জঙ্গলের পথে নিতান্ত অপরিহার্য ভোবার জলে স্নান করার ফলে সনাতনের সোণার কাস্তি স্নান হইল। গা-ভরিয়া ফোড়া হইল—এই অবস্থায় পুরীতে আসিয়া তিনি হরিদাসের আশ্রমে অতিথি হইলেন। গা-ময় ফোড়া, তিনি চৈতন্তের সঙ্গে দেখা করিতে সাহসী হইলেন না, কিন্তু চৈতন্ত তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়া টানিয়া আনিয়া বাহির করিলেন এবং ঘন ঘন আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সনাতনের শরীরের রক্ত-পুঁয়ে চৈতন্তের শরীর আশ্রুত হইল। সনাতন লজ্জিত হইলেন, তিনি সঙ্কল্প করিলেন, আবাত্ত মাসে জগন্নাথের রথযাত্রার সময়ে তিনি রথের চাকার নীচে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবেন—কারণ তিনি বিধর্মী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার শরীর ব্যাধিছুষ্ট। একদিন চৈতন্তের নিত্যসহচর জগদানন্দকে সনাতন তাঁহার কলঙ্কিত দেহস্পর্শে চৈতন্তের দেহের মানি হইতেছে, এই কথা অতি দুঃখিত ভাবে বলিলেন। চৈতন্ত বে সনাতনকে আলিঙ্গন করেন ইহা জগদানন্দের ভাল লাগিত না। জগদানন্দ বলিলেন, “আপনার মথুরায় যাওয়াই উচিত।”

সেদিন মহাপ্রভু সনাতনকে আবার টানিয়া আনিয়া আলিঙ্গন করাতে সনাতনের মুখ শুকাইয়া গেল। চৈতন্ত বলিলেন, “তুমি জগন্নাথের রথের নীচে প্রাণত্যাগ করিবে? আত্মহত্যার পাপসঙ্কল করিয়াছ? তুমি তো কানীতে তোমার দেহ-মন আমাকে দিয়াছ, এই দেহের উপর তোমার কোন অধিকার নাই।” এই বলিয়া তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করায় চৈতন্তের দেহ রক্তাক্ত হইল। সনাতন লজ্জায় মরিয়া গেলেন। চৈতন্ত বলিলেন, “তোমার দেহ মন্দির, উহার স্পর্শে আমার পাপ দূর হইল।” সনাতনকে মথুরা যাওয়ার পরামর্শ দেওয়ার জন্ত তিনি জগদানন্দকে ভৎসনা করিলেন। আর একদিন রাজপথ দিয়া না যাইয়া চৈতন্তের আছানে সনাতন উত্তপ্ত বালুকার পথ দিয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছিল। চৈতন্ত বলিলেন, “রাজপথ দিয়া আস নাই কেন?” সনাতন বলিলেন, “ব্রাহ্মণদের হয়ত আপত্তি হইতে পারে।” চৈতন্ত বলিলেন, “তোমার স্পর্শে দেবতারাও পবিত্র হইতে পারেন, তথাপি তুমি মন্দিরের আচার-ব্যবহারের প্রতি একরূপ সতর্ক, তোমার দৈন্ত জগতে অতুল্য।” সনাতন চৈতন্তের উপদেশ লইয়া “হরিভক্তি-বিলাস” নামক স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন, ইহা এখন গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একমাত্র অবলম্বন। ধর্মচ্যুত ব্যক্তির রচিত এই পুস্তক পাছে সমাজে গ্রহীত না হয়, এজন্য এই পুস্তক সনাতনের ইচ্ছাক্রমে

গোপাল ভট্টের নামে চলিয়াছিল। কিন্তু চৈতন্য-চরিতামৃতের লেখক এবং জীব গোস্বামী তাঁহাদের গ্রন্থে এই পুস্তকের রচনাসম্বন্ধে সকল কথা লিখিয়া জানাইয়াছেন। সনাতন বৃন্দাবনের প্রকৃত উদ্ধারকর্তা। রূপ ও সনাতনের হৃৎচর তপস্বী সে অঞ্চলে সর্বজনবিদিত, ভক্তমাল গ্রন্থে তাহা উল্লিখিত আছে। সম্রাট আকবর সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং মহারাজ মানসিংহ বহুব্যয়ে বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর যে মন্দির স্থাপন করেন, তৎসংলগ্ন প্রস্তরফলকে লিখিত আছে যে, ভক্ত রাজা তাঁহার গুরু রূপ ও সনাতনের আদেশে ঐ মন্দির রচনা করেন। রামদাস কাপুরি নামক বণিকের জাহাজ নদীর চড়ায় আটকাইয়া যায়, তিনি সনাতনের বিগ্রহ মদনমোহনের নিকট মানত করেন—জাহাজের উদ্ধার হইলে তিনি একলক্ষ টাকা ব্যয়ে বৃন্দাবনে উক্ত বিগ্রহের মন্দির স্থাপন করিবেন। বণিকের প্রতিশ্রুত অর্থে বিগ্রহের অল্প মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এই ছইজন নগদেহ সন্ন্যাসীর রূপায় বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার হয় এবং উহা শত সৌধমালায় বিভূষিত হয়। চৈতন্য-চরিতামৃত-কার লিখিয়াছেন, ছই ভ্রাতার থাকিবার কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। পাছে কোন স্থান-বিশেষের প্রতি আসক্তি জন্মে, এইজন্ত “একৈক বৃক্ষের নীচে” এক রাত্রি শয়ন করিতেন, কোপীন ও কঞ্চলমাত্র সঞ্চল ছিল, মুষ্টিভিক্ষা যথেষ্ট ছিল এবং দিনরাত্র কৃষ্ণনাম-কীর্তন ও তৎসঙ্গে নর্তন করিতেন। সনাতনবচিত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। রাজপুতনার অনেক রাজা সনাতনের শিষ্য হইয়াছিলেন, সে অঞ্চলে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে। ভক্তমালে লিখিত আছে তিনি একটা পরশপাথর পাইয়া তাহা অস্পৃশ্য বলিয়া যমুনার জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, সম্রাট আকবর যমুনার জলে হাতী নামাইয়া তাহার খোঁজ করিয়াছিলেন (গ্রাউসের মথুরার ইতিহাস দ্রষ্টব্য)। উত্তরকালে রূপ ও সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র **জীব গোস্বামী** বৃন্দাবনে বৈষ্ণব-সমাজের কর্ণধার হইয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম বাঙ্গলার সর্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। অতি প্রাচীন কালেও ইহার খ্যাতি যুরোপ পর্য্যন্ত প্রচারিত ছিল। রোমানদিগের “গ্যাজা রিডিয়া” বোধ হয়

এই সপ্তগ্রাম-অঞ্চল, সরস্বতী নদী শুকাইয়া বাওয়াতে এই নগর ধ্বংস
হইয়াছিল।

পাইয়াছে। পুরাকালে কনোজের কোন রাজার সাত পুত্রের নামে এই গ্রামের নাম সপ্তগ্রাম হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ। গোড়ের পাঠান রাজার অধীন এক শাসনকর্তা সপ্তগ্রাম শাসন করিতেন। কিন্তু এই বাণিজ্যকেন্দ্রের বিপুল আয় থাকার দরুন শাসনকর্তারা প্রায়ই প্রবল হইয়া গোড়ের বিদ্রোহী হইতেন। এইজন্ত বাদশাহ শাসনকর্তা উঠাইয়া দিয়া সপ্তগ্রাম জমিদারীর মত হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন নামক ছই ভ্রাতাকে ইজারা দিয়াছিলেন। ছই ভ্রাতাকে গোড়ে বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে হইত, ইহা ছাড়াও এই সম্পত্তির আয় অতি বিপুল ছিল। জাহাজের উপর যে কর স্থাপিত হইত তাহাও একটা বড় রকমের আয়ের পথ হইয়াছিল। রাজস্ব ছাড়াও ছই ভ্রাতা প্রায় ১২ লক্ষ টাকা বৎসরে নিজেরা পাইতেন। ষোড়শ শতাব্দীতে বারলক্ষ টাকা একটা সামান্য কথা ছিল না। হিরণ্যের কোন সম্ভান ছিল না, গোবর্দ্ধনের পুত্র **রঘুনাথই** এই বিশাল সম্পত্তির একমাত্র

উত্তরাধিকারী ছিলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন উভয়েই সংকুত, আরবী ও পার্শীতে কৃতবিদ্য ছিলেন। গোবর্দ্ধনের মত দাতা এদেশে কেহ ছিল না। এজন্য প্রবাদ আছে,—“মর্তে গোবর্দ্ধন দাতা” (সংস্কৃত-মাতৃক)। বলদেব আচার্য্য নামক এক শিক্ষকের উপর রঘুনাথের শিক্ষার ভার দ্রুত ছিল। বলদেব “বন হরিদাসে”র প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং সর্বদা চৈতন্যের গুণানুবাদ কীর্তন করিতেন। এই সময় হইতেই বালক রঘুনাথের মনে চৈতন্যের মূর্তি একখানি দেবমূর্তির দ্বায় অঙ্কিত হইয়া যায়। ১৫১০ খৃঃ অব্দে চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই বার্তা তড়িৎগতিতে সর্বত্র প্রচারিত হয়। ভ্রাতৃদ্বয়ের রাজসভায় চৈতন্যের কথা প্রায়ই হইত, বালক রঘুনাথ গৃহের এককোণে বসিয়া সেই করুণ কাহিনী শুনিয়া অশ্রুপাত করিতেন, তিনি বোড়শ বৎসর বয়সে একান্ত উন্মনা হইয়া গেলেন, রাজপ্রাসাদ তাঁহার ভাল লাগিত না, একাকী নির্জনে থাকিতেন। পিতা ও গুরুতাত আশঙ্কা করিলেন, ছেলেটি পাছে চৈতন্যের মত পাগল হইয়া সংসার ত্যাগ করে,—এইজন্য তাঁহারা কয়েকটি সৈনিক ও দুইজন ব্রাহ্মণ তাঁহার কাছে সর্বদা নিযুক্ত রাখিলেন। ব্রাহ্মণেরা গার্হস্থ্য কর্তব্যনীতি তাঁহাকে ভাল করিয়া শিখাইবেন—এই ভাব তাঁহাদের উপর ছিল। চৈতন্যের সন্ন্যাসের পর রঘু পিতাকে বলিলেন, তিনি চৈতন্যদেবকে দেখিতে যাইবেন। বাড়ীর সকলে প্রমাদ গণিলেন, এইবার বুদ্ধি পাখী শিকল কাটিয়া বাহির হয়। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন সহজে সম্মতি দিলেন না। কিন্তু রঘুনাথ বলিলেন, চৈতন্যকে দেখিতে না পাইলে তিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন। ইহার ভাব দেখিয়া তাঁহারা বুঝিলেন—উহা ভীতি-প্রদর্শন নহে, বালক সত্যসত্যই ঐক্য কিছু করিতে পারে,—কারণ চৈতন্যের নাম শুনিতেই তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয় এবং তিনি গ্নান-ভোজন একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বাধ্য হইয়া কয়েকজন অধারোহী সৈন্য ও অপরামর লোকজন সহ গোবর্দ্ধন রঘুনাথকে চৈতন্যের নিকট পাঠাইয়া দিলেন; চৈতন্য তীব্রভাষায় তাঁহাকে গজনা দিয়া বলিলেন, “তুমি অকালে এই আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিবে না—আগে সংসারের কর্তব্য অনাসক্ত হইয়া সম্পাদন কর—তবে সন্ন্যাসের যোগ্যতা জন্মিবে। এখন যে বৈরাগ্য দেখাইতেছ, তাহা মকট-বৈরাগ্য, তুমি গৃহে চলিয়া যাও এবং সমস্ত কর্তব্য সমাধা করিয়া যোগ্যতা অর্জন কর।” রঘুনাথ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। বাঙ্গলার প্রতি পক্ষী তর তর করিয়া সন্ধানপূর্বক পরমা শ্রদ্ধারী এক কস্তার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। পিতা ও পিতৃব্য দেখিলেন, তাঁহার সম্পূর্ণ ভাবান্তর হইয়াছে। তিনি সুবোধ ও শাস্ত্র ছেলেটির মত সর্বদা তাঁহাদের অধীন হইয়া বিষয়কর্ম করিতেছেন। এই সময়ে সপ্তগ্রামের ভূতপূর্ব মুসলমান শাসনকর্তা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা কথা বাদশাহের হজুরে জানাইল। বাদশাহ ভ্রাতৃদ্বয়কে ধরিয়া আনিবার জন্য ফৌজ পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা বাড়ী ছিলেন না—ফৌজগণ রঘুনাথকে ধরিয়া লইয়া গেল। বাদশাহ বলিলেন, “তোমার পিতা ও গুড়ী সপ্তগ্রাম হইতে বহু অর্থ অর্জন করে এবং আমাকে ফাঁকি দেয়। তুমি তাঁহারা কোথায় আছেন বলিয়া দেও, নতুবা ভীষণ শাস্তি পাইবে।” রঘুনাথের মুখে চোখে অপর এক রাজ্যের জ্যোতি, তাঁহার কর্তব্যের স্বর্ণের মাধুর্য্য, কথায় অপূর্ণ

লালিত্য, চোখে বিশ্বপ্রেম—তিনি যে সকল কথা বলিলেন তাহাতে বাদশাহের মন খেহরসে আত্ম হইল, তাঁহার দাড়ি বহিয়া চোখের জল পড়িতে লাগিল। কতকগুলি সামান্য সন্তে আবদ্ধ হইয়া রঘুনাথ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এই যে কঠোর কর্মীর বেশ—ইহাতো রঘুনাথের নিতান্ত ছদ্মবেশ ছিল, ভিতরে ভিতরে তিনি অনাসক্ত বোগীর মত থাকিয়া চৈতন্যের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেছিলেন। এই সময়ে রঘুনাথ পানিহাটি গ্রামে আসিয়া নিত্যানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। তিনমাসব্যাপী কীৰ্ত্তনানন্দে পানিহাটীর আকাশ নারদের বীণাভিনন্দিত বৈকুণ্ঠের স্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। রঘুনাথ বুঝিলেন—রাজপ্রাসাদ তাঁহার স্থান নহে, ইহাই তাঁহার প্রকৃত নিকেতন। নিত্যানন্দ বলিলেন, “চোরা তোকে এবার ধরে ফেলেছি। তোকে দণ্ড দিব।” সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইয়াও আসক্তির ভান দেখাইতেছিলেন, এই মিথ্যাচরণের জন্ত তিনি ‘চোরা’ উপাধি পাইয়াছিলেন। বাহা হউক রঘুনাথ দণ্ডগ্রহণ করিলেন। সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের জন্ত মহোৎসবের ব্যবস্থা করিলেন, এই উপলক্ষে তাঁহার বহু ব্যয় হইয়াছিল। তৃপ্তির সহিত ভোজন ছাড়া প্রধান বৈষ্ণবেরা সকলেই বধাবোগ্য দক্ষিণা পাইয়াছিলেন,—নিত্যানন্দের জন্ত সাত তোলা সোণা এবং একশত টাকা প্রণামীর ব্যবস্থা হইল। নিত্যানন্দ রাধাবপুত্রিতের গৃহে ছিলেন, তিনি পাইলেন একশত টাকা প্রণামী ও দুইতোলা সোণা, ইহা ছাড়া লক্ষ লক্ষ বৈষ্ণবকে তিনি ২০ টাকা হইতে ২০ টাকা পর্যন্ত দিয়াছিলেন। এই উৎসবের নাম “দণ্ড-মহোৎসব।” অত্য়াবধি প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কলিকাতার সমগ্রিত পানিহাটি গ্রামে এই উৎসব হইয়া থাকে।

এবার গৃহে ফিরিয়া রঘুনাথ পুনরায় ঔদাসীন্ত দেখাইতে লাগিলেন, তিনি অন্তঃপুরে শোওয়া ছাড়িয়া দিলেন, তাঁহার আহার ও নিদ্রা একেবারে গেল। বহুসৈন্য-পরিবেষ্টিত হইয়া রাজপ্রাসাদে তিনি বন্দীর মত হইয়া রহিলেন। তাঁহার মাতা একদিন গোবর্দ্ধনকে বলিয়াছিলেন, “ইহাকে একটা ধামের সঙ্গে দড়ি দিয়া বাধিয়া রাখ, তবে পলাইতে পারিবে না।” গোবর্দ্ধন বলিলেন, “ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, স্ত্রী অঙ্গরাসম, এসকল বাধিতে নারিল বার মন,—দড়ির বাধনে তাঁরে বাধিব কেমনে?” সতর্ক পাহারার চোখ এড়াইয়া কুলগুরু বহ্ননন্দন আচার্য্যকে ফাঁকি দিয়া ১২ বৎসর বয়সে রঘুনাথ গৃহ ত্যাগ করিলেন, তিনি একদিনে শুধু-পায়ে ত্রিশ মাইল হাঁটিয়া রাত্রি একটা পরিত্যক্ত গরুর গোয়ালে কাটাইলেন। তারপরে যাত্রাভোগ হইয়া শারণে আসিলেন। পুরীতে আসিতে তাঁহার ১২ দিন লাগিয়াছিল। তখন কাশী মিশ্রের বাড়ীতে চৈতন্য ছিলেন। মুকুন্দ দত্ত অম্বুলিষায়া রঘুনাথকে দেখাইয়া মহাপ্রভুকে বলিলেন, “ঐ দেখুন, আমাদের রঘু আসিয়াছে, আহা! কত ক্লশ ও দুর্বল হইয়া গিয়াছে!” চৈতন্য স্বতঃপন্যামোদনের উপর রঘুনাথের শিকার ভার দিলেন। তাঁহার পিতা ও যুগ্মভ্রাতা দশজন অঝারোহী সৈন্য ও অস্ত্রাস্ত্র লোকজন পাঠাইয়া শিবানন্দ সেনের নিকট সন্ধান লইয়া গিয়াছিলেন। তখনও শিবানন্দের সঙ্গে রঘুনাথের সাক্ষাৎ হয় নাই। অবশেষে হুঃখিত অন্তঃকরণে পুরীতে আছেন জানিয়া হুঃখাৎ বালকের হস্ত-ধরচের জন্ত তাঁহার সামান্য ৪০০০

টাকা পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে পাছে ব্যথা লাগে, এইজন্ত তিনি সেই টাকা ফিরাইয়া না দিয়া তাহা হইতে মাসিক ৮/০ আনা গ্রহণ করিয়া সেই ব্যয়ে বৎসরে একদিন চৈতন্তকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। ছই বৎসর এইরূপে চালাইয়া সেই অর্থ হইতে আর কর্ণদকও গ্রহণ করেন নাই। চৈতন্ত তারপর একদিন স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করেন, “রঘু আর আমাকে নিমন্ত্রণ করে না কেন?” স্বরূপ বলিলেন, “রঘু বিষয়ীর অর্থ গ্রহণ করা পাণ মনে করে।” চৈতন্ত এই কথায় মহাসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। রঘুনাথ যে কৃষ্ণ করিতেন তাহা অসাধারণ। পুরীর মন্দিরের ঘারে ছই ঘণ্টা দাঁড়াইয়া এক একটি তুলু ভিক্ষা-স্বরূপ এক এক জনের কাছে গ্রহণপূর্বক যে এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইতেন, তাহাই একবার রাঁদিয়া খাইতেন। অবশেষে তাহাও ছাড়িয়া দিলেন। মন্দিরের বাহিরে যে সমস্ত পচা প্রসাদ পাওয়া ফেলিয়া দিত, গাভীগণ তাহা খাইয়া গেলে— তাহারই এক মুষ্টি বারংবার পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া তিনি দিনান্তে একবার খাইতেন, প্রায় সবদিনই উপবাসে যাইত। উপবাস এবং অন্নাহারে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও প্রেম প্রবল হয়—ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এই বিনয়নয়ন মধুরপ্রকৃতি সুন্দর কুমার চৈতন্তদেবের কাছে আসিতে লজ্জিত ও ভীত হইতেন। একদিন তবু স্বরূপ-দামোদরকে দিয়া তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি চৈতন্তের শ্রীমুখের উপদেশ শুনিতে চান। চৈতন্ত তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন, “আমি ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষ খবর জানি না। নিজ খেয়ালে চলি, এসকল বিষয়ে স্বরূপ-দামোদরই বিশেষ প্রাজ্ঞ, সেই তোমাকে শিক্ষা দিতেছে—তথাপি যদি আমার কথা শুনিতে চাও, ‘গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥ তৃণাদপি স্তনীচেন, তরোরিব সহিসুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥’ ” ১৯ বৎসর বয়সে রঘুনাথ পুরীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার যখন ৩৫ বৎসর বয়স তখন মহাপ্রভুর তিরোধান হয়। একদিন রঘুনাথ চৈতন্তকে বলিয়াছিলেন, “আর কোন্ ঠাকুরের কথা আমাকে বলিতেছেন? আপনি ছাড়া আমার আর ঠাকুর নাই।” ইহার পর রঘুনাথ বৃন্দাবনে বাইয়া দীর্ঘকাল তথায় যাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত অনেক সংস্কৃত পুস্তক আছে। মহাভাবস্বরূপিণী রাধার সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা একটি কবিতায় তিনি বাহা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি জীবাত্মার কৃষ্ণাভিসারে যাত্রার গুণরাশি ব্রজনাট্যকাতে আরোপ করিয়াছেন,—“রাধা তারুণ্যামৃতে স্নান করিয়া লাবণ্যামৃতের তিলক পরিয়াছেন, তাঁহার সলজ্জভঙ্গিমা নীলবাসের শ্রায় অঙ্গে ঐজ্জল্য সাধন করিতেছে, তাঁহার প্রিয়ের উপর একান্ত-নির্ভরতা এবং সহচরীদের প্রেম অঙ্গের সুরভির কার্য্য করিতেছে, তাঁহার একাগ্রতা দীপস্বরূপ অভিসারের পথ দেখাইতেছে।” ইত্যাদিরূপ ব্যাখ্যায় রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের খোসা ও বহিরাবরণ বাদ দিয়া তিনি প্রেমের আধ্যাত্মিক রসটি গ্রহণ করিয়াছেন। (মংকৃত “Chaitanya and his Companions” পুস্তক দ্রষ্টব্য।) তাঁহার সব পুস্তকগুলিই ভক্তির ব্যাখ্যা। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের অনেক উপাদান তিনি দিয়াছিলেন। জন্ম ১৪৯৮ খৃঃ, মৃত্যু ১৬ বৎসরে, ১৫৮৪ খৃঃ।

চৈতন্যের পরিকরদের মধ্যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন, রামানন্দ রায়। ইনি উড়িষ্যার মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং ইহার উপাধি ছিল 'রাজা'। ইহার পিতার নাম ভবানন্দ রায় এবং চারি ভ্রাতার নাম গোপীনাথ পট্টনাথক, রামানন্দ রায়।

কলানিধি, সুধানিধি এবং বাণীনাথ। ইহাদের বাড়ী ছিল মধ্যভারতে বিষ্ণানগরে। ইনি "জগন্নাথবল্লভ" নামক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকের লেখক। যে কয়েকখানি পুস্তকের শ্লোক চৈতন্যদেব দিনরাত গান করিতেন—তন্মধ্যে 'রায়ের নাটকগীতি' একখানি। গোদাবরীতীরে চৈতন্য ইহাকে দেখিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক অশ্রুপাত করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া তথাকার ব্রাহ্মণমণ্ডলী বিস্মিত হইয়া বলিতেছিলেন, "এই না ব্রাহ্মণ তেজে দেখি স্বর্গ্যসম। শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন।" বিষ্ণানগরে মহাপ্রভুর সঙ্গে রামানন্দের দশদিন-ব্যাপক যে কথাবার্তা হয়, তাহাতে গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সার কথা বিবৃত হইয়াছিল। চৈতন্যের অনুজ্ঞাক্রমে রামানন্দ বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল কথাগুলি ব্যাখ্যা করেন। প্রথমতঃ সাধ্যা ভক্তি, বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক এই ব্যাখ্যার প্রমাণ। সাধকের এতদপেক্ষা উন্নত পথ গীতার নবম অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোকের প্রমাণ-দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল। তৎপরের অবস্থায় প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১৩শ স্কন্ধ, ৩২শ শ্লোক এবং গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোক, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থা গীতার ১৭শ অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোক-দ্বারা প্রমাণিত। তৎপরের অবস্থা ভক্তিবোগের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১৫শ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে প্রমাণিত। এই অবস্থায় গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলভিত্তি পঞ্চতত্ত্বের কথা—প্রথম দান্ত (প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক)। তৎপরে সখা (ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১২শ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক), ইহার পর বাৎসল্য (ভাঃ ১০ম স্কন্ধ, ১৮শ অঃ, ৩৭শ শ্লোক)। তৎপরে গোপীদের মাধুর্য্য (গোবিন্দ-লীলামৃত, ১০ম অধ্যায়, ৮ম শ্লোক এবং ভাঃ ১০ম স্কন্ধ, ৩৭শ অঃ, ৫৪শ শ্লোক এবং ভাঃ ৩৭শ অঃ, ১২শ শ্লোক এবং ৪০শ অধ্যায়ের ২০শ শ্লোক)। রামানন্দকে প্রণের উপর প্রণ করিয়া চৈতন্যদেব সর্ব্বশাস্ত্র মন্থনপূর্ব্বক অবশেষে স্বয়ং রাবিকার মহাভাব প্রমাণ করিবার জন্ত ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ২৫শ অঃ, ৯ম শ্লোক এবং ১১শ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৪শ শ্লোক স্বয়ং ব্যাখ্যা করিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন, কোন ব্যক্তি একটা হারানো পরসা খুঁজিতে বাইয়া বেরূপ মাটি খুঁড়িয়া হীরামুক্তার ভাণ্ডার আবিষ্কার করে, চৈতন্যের সঙ্গে সাধারণ ভক্তির সম্বন্ধে আলাপ করিতে বাইয়া রামানন্দ সেইরূপ "রাগানুগা"র উত্তম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। রামানন্দ সেদিন চৈতন্যকে সাক্ষাৎ ভগবানের প্রেমাবতার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তিনি যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন তাহা বৈষ্ণবজগতে সুবিদিত "পহিলিহি রাগ নয়নভঞ্জে ভেলা। অহুদিন বাড়ল অবদি না গেল। না সে রমণ না হাম রমণী, এ যখি সে সব প্রেম কাহিনী, কান্থ ঠাম কহবি বিছরিব জানি। না খোঁজল দূতি, না খুঁজল আন, হুইক মিলন মাঝহি পাউঁ বাণ। অবসই বিরাগ তুহু ভেল দূতি। সুপুরুষ প্রেম ঐছন রীতি।"

এই কয়েকটি পরিকর ছাড়া কল্যাণকান্দ গোবিন্দদাস, যিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে

ঊইবৎসর কাল দাক্ষিণাত্যে পুরীয়া পুথ্যপুথ্যরূপে অমণবৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন এবং খুব সম্ভব যিনি “শ্রীগোবিন্দ” নামে উত্তরকালে চৈতন্যের বাত্রিদিনের সঙ্গী হইয়া পুরীতে দিন যাপন করিয়াছেন; ইহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার জীবন নাম শশিমুখী ছিল এবং তিনি জীবন সঙ্গে খগড়া করিয়া স্বীয় আবাসপল্লী কাকননগর পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চৈতন্যের চিরসাথী হইয়াছিলেন।

কাঁচড়াপাড়ার মহা ধনাঢ্য ও পণ্ডিত শিবানন্দ সেনকে মহাপ্রভু পিতার জ্ঞান মাত্র করিতেন, তাঁহার পুত্র বিখ্যাত পদ্মনানন্দ সেন, যিনি “কবিকর্ণপুর” নামে বৈষ্ণব জগতে সুপরিচিত এবং বাহার রচিত চৈতন্য-চন্দ্রোদয়, চৈতন্য-চরিতামৃত কাব্য চৈতন্যসম্বন্ধে আদি গ্রন্থসমূহের অঙ্গতম। **মুরারিগুপ্ত**—বাহার আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্ট—এবং বাহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য এক সময়ে নবদ্বীপের গৌরব ছিল। ইহার রচিত চৈতন্যের জীবনীতে সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বপর্ধ্যন্ত ঘটনাগুলি বিবৃত হইয়াছে। কবিকর্ণপুর ও মুরারিগুপ্ত উভয়েই সংস্কৃতে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, মুরারিগুপ্তের কতকগুলি বাঙ্গলা পদ আছে। চট্টগ্রামবাসী **পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি**—ইনি ভোগের বাহ্যাবরণের আড়ালে নিবিড় কৃষ্ণানুরাগ এবং সংসারের প্রতি বিরাগ বহন করিতেন। চৈতন্য ইহাকে পিতৃ-সম্বোধন করিতেন। **বাসুদেব সার্কভৌম**—যিনি পণ্ডিতদের শিরোমণি ছিলেন,—পুরীতে যেদিন চৈতন্যের নিকট ইহার বিচারে পরাজয় হয় সেদিন বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী তরুণ চৈতন্যের নিকট বিশ্বাস ও ভক্তিতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। যে সার্কভৌম অল্পবয়স্ক চৈতন্যকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “তুমি সন্ন্যাসের যোগ্য নহ, আমার শাস্ত্রব্যাখ্যা শুন, তারপর তুমি তোমার বর্তমান কর্তব্য বুঝিবে,”—সেদিন তিনি কি জানিতেন এই তরুণবয়স্ক যুবক অলস্ত অশিশুলিঙ্গতুল্য চৈতন্যের ভক্তিব্যাখ্যায় ও কৃষ্ণানন্দে বিহ্বলতা-দর্শনে পরাস্ত ও বিমুগ্ধ হইয়া ত্তোজরচনাপূর্বক তাঁহার স্বতিপাঠ করিবেন? প্রবাদ চৈতন্য তাঁহাকে বড়-ভুজ দেখাইয়াছিলেন। ঊই হস্তে রামজন্মের ধনুর্কোণ, অপর এক হস্তে কৃষ্ণজন্মের বাণী, এবং অপর ঊইহস্তে বর্তমান জন্মের করঙ্গ ও কমণ্ডলু। বাসুদেব সার্কভৌম চৈতন্যের এতটা অমুরক্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহার অদর্শনে অস্থির হইয়া পড়িতেন—“শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়, প্রভুর বিরহ-বাণ সহ্য নাহি যায়।” কানীর **প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসী** এই ভাবেই চৈতন্যের ভক্তদের খাতায় তাঁহার নাম লিখাইয়াছিলেন, ইনি ছিলেন কানীর দণ্ডিসন্ন্যাসীদের নেতা। প্রথমতঃ চৈতন্যের ভাব-বিহ্বলতা দেখিয়া তিনি কতই না ঠাট্টাবিক্ষিপ করিয়াছিলেন! তাহার শাস্ত্রজ্ঞান কি থাকিতে পারে—সে এক তরুণ যুবক! চৈতন্য এই সকল গালাগালি শুনিয়া প্রথমবার চলিয়া গেলেন কিন্তু দ্বিতীয় বার প্রকাশানন্দের সহিত তাঁহার বিচার হইল।

এই ভক্তি-দর্শ সে যুগের পরম বিশ্বাসের কথা। তখন একদিকে মুসলমানেরা হিন্দুর মন্দির ও বিগ্রহাদি ভঙ্গ করিতেছিল, অপরদিকে পল্লীর ছায়ায় বসিয়া ব্রাহ্মণগণ বেদবেদান্তের চর্চা করিতেছিলেন,—এই সময়ে রঘুনাথ শিরোমণি জ্ঞানশাস্ত্রকে অতি স্বল্পবিচার-পারদর্শী পণ্ডিত-গণের বোধগম্য করিয়া চিন্তা-শীলতার একরূপ উত্তম সৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন, যাহাতে সমস্ত

পণ্ডিত বিশ্বয়ে নবদ্বীপের টোলের নিকট মন্তক অবনত করিয়াছিলেন;—এই সময়ে

পাণ্ডিত্যের যুগে ভাবের নবদ্বীপের স্নানস্নান সংস্কৃত সর্কশাঙ্গ মনন করিয়া যে স্থতি
লীলা। রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গলাদেশে এখনও কোটী কোটী হিন্দুর

একমাত্র অবলম্বন;—এই সময়ে স্মাৰ্গানন্দাঙ্গীশ তাত্ত্বিক ধর্মের

সমুদ্রত ব্যাখ্যাধারা তাত্ত্বিক অমৃতানন্দের গূঢ়মর্ম সকলকে বুঝাইয়া দিয়া তত্ত্বের প্রতি জন-
সাধারণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, বাঙ্গলাদেশে সার্বভৌম উদ্ভিদ্ধার বসিয়া, প্রকাশানন্দ সরস্বতী
কাশীর বিজ্ঞানকেন্দ্রের নায়ক এবং সন্ন্যাসীদিগের নেতৃস্বরূপ এবং দাক্ষিণাত্যে ভারতী

পৌসাই—চিন্তাজগতের কর্ণধারস্বরূপ সমস্ত হিন্দুস্থানের পূজা পাইতেছিলেন; এই সময়ে

একদিকে নবদ্বীপে অপরিদ্রষ্টে পূণ্যনগরে (পুণ্য) সংস্কৃত বিজ্ঞান যে অমূল্য হইতেছিল

তাহার একখানি বৃহৎ ইতিহাস লিখিবার বিষয় বটে; তখন মিলিয়ার দ্বীপ নির্মাণিত,

এবং নবদ্বীপের বালকেরাও অদ্বৈতবাদের গূঢ় মর্ম লইয়া আলোচনা করিত—“বালকেহ ভট্টাচার্য্য

সনে কক্ষা করে” (চৈ. ভা. আদি),—এই অমূল্য বিজ্ঞান ও চিন্তার অভাবনীয় প্রভাবের দিনে

কেবল নাচিয়া গাহিয়া, কেবল ঢল ঢল শতদল-প্রভ আনন্দাশ্রুপূর্ণ একখানি সুন্দর মুখ

দেখাইয়া এক তরুণ যুবক সমস্ত ভারতবর্ষকে মাতাইয়া তুলিলেন, এমন কি আকবর বাদশাহ

পর্যন্ত তাঁহার স্তুতিবাজ্যক পদ রচনা করিলেন, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? মোটকথা

চৈতন্য পণ্ডিত-শিরোমণি ছিলেন। কিন্তু তিনি টোলে বাইয়া আজীবন শাস্ত্রচর্চা করেন নাই,

ভগবদ্ভক্ত অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার বলে তিনি শাস্ত্র পড়িয়া যে জ্ঞান লাভ

করিয়াছিলেন, তাহা প্রগাঢ়, গভীর ও গ্রন্থ-কীটদিগের বিজ্ঞা হইতে অনেক বেশী। তিনি

ভাবে মাতিয়া গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সাংসারিক জ্ঞান, সতর্কতা ও দূরদর্শন এরূপ ছিল

যাহা বড় বড় সমাজ-ও ধর্ম-সংস্কারকগণের ছিল না। সনাতনকে দিয়া যখন তিনি হরিভক্তি-

বিলাস লিখাইয়াছিলেন, তখন তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে সতর্ক করিয়াছেন যে প্রত্যেক

অনুশাসনের জন্ত যেন শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেওয়া হয়। বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ তিনি নিজে কহিয়া

দিয়াছিলেন (চৈ. চ. সনাতন শিকা)। বস্তুতঃ ইহা বড়ই বিশ্বাসের বিষয় যে যিনি পণ্ডিতের

শিরোমণি ছিলেন, যিনি মেঘ দেখিলে সূক্ষ্মিত হইতেন, ক্রুদ্ধপ্রেমে উদ্ভূত হইয়া তরুণ তমালকে

নির্জ্বলিত আলিঙ্গন করিয়া ধাক্কিতেন—“বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল,”—এবং

তাঁহার চক্ষের জল দ্বিতীয় হরিদ্বারের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার নিভৃত প্রেমের উৎস হইতে

অবিরত উছলিয়া পড়িত, তিনি শাস্ত্র-বিচারের সময়ে একটিও ভাবের কথা বলিতেন না।

বাণী যেন স্বয়ং জিহ্বাগ্রে বসিয়া তাঁহার ত্রিমুখে সর্কশাঙ্গ হইতে অবিরত প্রমাণ

জোগাইত। তাঁহার আজীবন কোন এক বিশেষ শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার

আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতেন, ঠিক সেই শাস্ত্রে চৈতন্যের অমূল্য গভীরতর ও সূক্ষ্মতর; সেই

শাস্ত্রের মর্ম তিনিই বুঝিয়াছিলেন, আজীবন খাটিয়াও তাঁহার সেই জ্ঞানের সীমান্ত

প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন জনসাধারণ শাস্ত্রকে ত্যাগ করিয়া কোন

কথা স্থায়ী ভাবে বিশ্বাস করিবে না। এজন্য তিনি তাঁহাদের হৃদয় চোখের জলে ও

মধুর হরিনামে আর্দ্র করিয়াও “হরিভক্তি-বিলাসে”র সর্ব্বাংশে শাস্ত্রকে ভিত্তি করিয়াছিলেন। চৈতন্য ভিন্ন অস্ত্র কেহ এই অসাধারণ কাজ সম্পাদন করিতে পারিতেন না, তিনি ছিলেন একদিকে চিন্তাজগতের অপরদিকে চোখের জ্বলের রাজা—তিনি ১৩/১৪টি ভাষা জানিতেন। অল্পবয়সে তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে প্রাকৃত ও পালিভাষা পড়িয়াছিলেন (গৌড়পদ-তরঙ্গিনী), দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে ইহার অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের উল্লেখ আছে, পালিভাষা স্বয়ং শিখিয়া তিনি বৌদ্ধধর্মের মর্ম্মাভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। উড়িষ্যা ১৮ বৎসর থাকিয়া ইনি সেই ভাষা খুব ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন, তিনি উড়িয়া ভাষায় বৈষ্ণবপদ প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন, “জগন্নাথ প্রভু পরিমুণ্ডাই”—প্রভৃতি উড়িয়া পদ তিনি সর্ব্বদা আবৃত্তি করিতেন; অনেক উড়িয়া কবি তাঁহার অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। তেলেগু ও মালায়ালাম ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। নারোজি দস্যুর ভাষা ছিল—মালায়ালাম, তাঁহার অল্পচরেরা চৈতন্যদেবের সঙ্গে কথা কহিয়াছিল, এসম্বন্ধে গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন :—“একজন লোক আসি কাই মাই করি। কি কহিল আমি বুঝিতে না পারি। তার বাক্য বুলি সব প্রভু সমঝিয়ে। কাই মাই বলি তারে দিলেন বুঝায়।” তামিল সম্বন্ধে এই উল্লেখ আছে—“কখনও তামিল বুলি বলে গোরা রায়। কছু বা সংস্কৃত বলি লোকেরে বুঝায়।”—এই ব্যাপারে কোন অলৌকিকত্বের অবকাশ গোবিন্দদাস রাখেন নাই; তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—“এই দেশে ভ্রমি দীর্ঘকাল। সকলের ভাষা বুঝে শচীর ছলাল।” তাঁহার সময়ে বিজ্ঞাপতির মৈথিল পদের উপর বাঙ্গলার প্রভাব পড়ে নাই—বিজ্ঞাপতির পদ তখন খাস মৈথিলী ছিল। চৈতন্য দিনরাত্র চণ্ডীদাস ও বিজ্ঞাপতির পদ গান করিতেন। (চণ্ডীদাস, বিজ্ঞাপতি, রায়ের নাটকগীতি, কর্ণামৃত শ্রীকীর্তনগোবিন্দ। স্বরূপরামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে, গায় শোনে পরম আনন্দ।” (চৈ. চ.)। বৃন্দাবনে তিনি ছয়টি বৎসর ছিলেন, হিন্দী তখনকার দিনের আখ্যাবর্তের সর্ব্বজন-বিদিত ভাষা ছিল। সেই হিন্দীর অগ্রতম কেন্দ্র মথুরা ও বৃন্দাবনে ক্রমাগত ছয় বৎসর থাকিয়া তিনি অবশ্য হিন্দী ভাষা জানিতেন। পাঠান বিজলী খানের সঙ্গে চৈতন্যের মুসলমান ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল, বিজলী খাঁ আরব ও পারস্য দেশীয় শাস্ত্রে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে চৈতন্যের মুসলমান পণ্ডিতদের সঙ্গে বে বিচারের আভাস আছে, তাহাতে মনে হয় পারসী ও আরবী ভাষার মোটামুটি জ্ঞান তাঁহার ছিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে চৈতন্য আরবী, পারসী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, হিন্দী, উড়িয়া, মৈথিল, তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম—অন্ততঃ এই সকল ভাষা ভালরূপ জানিতেন। ইহা ছাড়া তিনি তাঁহাদের পরিবারের নিবাসভূমিতে যাতায়াত করিতেন। আসামী ভাষার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় থাকিবার কথা। নানা প্রদেশে হরিনাম ও প্রেমধর্ম্মপ্রচারের জন্য তাঁহাকে এই সকল ভাষা শিখিতে হইয়াছিল। ভাষা-শিক্ষায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

শুধু সংস্কৃতে নহে, এতগুলি ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকার দরুন তিনি জনসাধারণকে সর্বত্র উপদেশ দিতে পারিতেন। তিনি আখ্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের বহু পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করিয়া তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে সহজে তিনি বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। “আমি মূর্খ সন্ন্যাসী, কি বিচার করিব?” এইরূপ পরম দৈন্তোজ্জ্বল দ্বারা বিচার-সভা এড়াইয়া যাইতেন। কিন্তু যখন তিনি “কৃষ্ণ” বলিয়া ডাকিতেন, হঠাৎ শত সহস্র লোক সেই নামামৃত পান করিবার জন্য লালায়িত হইত, অকস্মাৎ বেন সেখানে পদ্মগন্ধ ছুটিত—শ্রোতৃবর্গ অসংখ্য নরনারী মুগ্ধ হইত, তাহাদের দেহ ঘন ঘন রোমাঞ্চিত ও চক্ষু সজল হইত, “পশ্চাৎ ভাগেতে মুই দেখি তাকাইয়া, শত শত নারীগণ আছে দাঁড়াইয়া। নারীগণ অশ্রুজল মুছিছে আঁচলে,” এবং “অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিয়া। হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুদিয়া।” মহারাষ্ট্র দেশে শুধু একরূপ দৃষ্ট সংঘটিত হয় নাই, যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই এইরূপ। কৃষ্ণের মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া ভোলা মহেশ্বর অবধি বৈষ্ণব শত শত দেবতারা অজ্ঞান হইয়া পিছনে পিছনে ছুটিয়াছিলেন, পরমা সুন্দরী কোন ঘোড়শী রমণী রজমঞ্চে দাঁড়াইলে যেমন শত শত চক্ষু নির্নিমেমে তাহার প্রতি আবদ্ধ হয়—চৈতন্যের অশ্রুপ্লাবিত হুইট চক্ষু ও কণ্ঠস্বরের অপার্থিব মোহিনী শক্তি বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য, সার্কভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী হইতে আরম্ভ করিয়া আবার বৃদ্ধ নরনারী সকলেরই মন সেইভাবে—রূপ সাগরের পাড়ে টানিয়া লইয়া যাইত। এত বিজ্ঞাবুদ্ধি, এত পাণ্ডিত্য ও এত ভক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যুগের প্রয়োজন সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। সেই শুদ্ধ চিন্তাশীলতার যুগে পাণ্ডিত্য না থাকিলে কেহ আদর পাইত না।

নবদ্বীপে জগাই মাধাইএর জীবন-সংশোধন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শুভানন্দ রায় নামক জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে অতিশয় ধনাঢ্য ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। হসেন সাহের সঙ্গে ইহার অন্তরঙ্গতা ছিল এবং ইনি সম্রাটের নিকট হইতে জগাই ও মাধাই। রাজা খেতাব পাইয়াছিলেন। শুভানন্দের দুই পুত্র রঘুনাথ ও জনার্দন; সুপ্রসিদ্ধ জগাই বা জগন্নাথ রঘুনাথের পুত্র এবং মাধব বা মাধাই—জনার্দনের পুত্র, এই দুই যুবক নবদ্বীপে অসুর-কল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

জগতে এমন কোন পাপ নাই—বাহা ইহারা না করিত। দিবারাত্র মত্তপান করিয়া বিভোর থাকিত—“ব্রাহ্মণ হইয়া মজ্জ গোমাংস ভক্ষণ, ডাকা চুরি গৃহদাহ করে অম্লক্ষণ” (চৈ. ভা.) ; চৈতন্য ও নিত্যানন্দের উপর ইহাদের আক্রোশ ছিল, এই দিনরাত্র হরিবোলের হট্টগোল ইহাদের অসহ্য হইয়াছিল;—ইহারা একদিন দুই তরুণ সাধুকে পথে পাইয়া তাহাদের মস্তুর ভাঁড়টা ছুঁড়িয়া মারিল; নিত্যানন্দের কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল; তথাপি প্রসন্নমুখে তিনি বলিলেন—“আমাকে মারিয়াছ দোষ নাই, কিন্তু একবার তোমার শ্রীমুখে হরিনাম কর—আমার ব্যথার আলা জুড়াইবে।” এই কথাই পরেও মাধাই আর একবার তাঁহাকে মারিতে উচ্চত হইয়াছিল, কিন্তু তরুণ সাধুঘরের ক্ষমাশীল ভক্তিপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া জগাইএর নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল, সে মাধাইকে বারণ করিল। কি মধুর কণ্ঠ—স্নেহার্জ ও দয়ালু। চৈতন্য কেবল বলিলেন,—“মাধাই, তুমি উহাকে না মারিয়া আমাকে মারিলেই

পারিতে।” ছই ভ্রাতা বাড়ী ফিরিয়া গেল, কিন্তু তাহাদের অহুতাপে রাজে ঘুম হইল না। রাজি থাকিতে থাকিতে তাহারা চৈতন্তের শয্যাগৃহের দ্বারে আঘাত করিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া বলিল, “আপনি আমাদের ক্ষমা করুন।” চৈতন্ত বলিলেন, “আমি সর্পাস্ত্রকরণে তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু তোমাদের অপরাধ তো আমার কাছে নহে, তোমরা নিতাইয়ের কাছে যাও।” নিতাই বলিলেন, “শিশু যদি পিতামাতার কাছে অপরাধ করে, তবে কি তাঁহারা তাহা গণ্য করেন—আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম, পরন্তু আমি যদি জীবনে কোন পুণ্য করিয়া থাকি তবে তাহার ফল বেন তোমরা পাও—ইহাই আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।” নিতাইয়ের চোখে অশ্রু ও মুখে হরিনাম এবং বাহুদয় আলিঙ্গনের জন্ত প্রসারিত। চৈতন্ত ও নিত্যানন্দের ছই দেবমূর্তি ভ্রাতৃযুগলের মনে চিরকালের জন্ত অঙ্কিত হইয়া রহিল। কতক দিন পরে ইহারা নিত্যানন্দের নিকট আবার উপস্থিত হইল। মাধাই কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিতে লাগিল, “ঠাকুর, তুমিত আমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছ, কিন্তু তোমার মত সাধুর গায়ে হাত দেওয়ার জন্ত হৃদয়ের জালা কিছুতেই কমিতেছে না—কত শত লোকের উপর যে আমরা অত্যাচার করিয়াছি তাহার অবশি নাই। অহুতাপের বৃশ্চিক-জালা যে কিছুতেই কমিতেছে না, তুমি আমার পাপের বোঝা গ্রহণ কর।” নিত্যানন্দ তাহাদিগকে দীক্ষা দিয়া বলিলেন, “গঙ্গার ঘাটে যেসকল লোকের উপর অত্যাচার করিয়াছ, পায়ে পড়িয়া তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।” মাধাই তাহার উপর অত্যাচার করে নাই। মাতাল হইয়া করিয়াছে, তাহা কি তাহার মনে আছে? একখানি কোদাল হাতে সে মাটি কাটিয়া একটি ঘাট প্রস্তুত করিল এবং বে সকল লোক স্নানার্থ তথায় আসিত, করজোড়ে সাক্ষিনেত্রে যাইয়া তাহাদের প্রত্যেকের পা ধরিয়া ক্ষমা চাহিত। এইভাবে দুশ্চর সেবাবৃত্তি ও সাধুজীবনের দ্বারা তাহারা তাহাদের অসাধু জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে নরহরি তাঁহার ভক্তিরত্নাকর রচনা করেন, তখনও “মাধাইয়ের ঘাট” বিচলিত ছিল, এই ঘাট কোন দেশবিজয়ের স্মৃতিস্তম্ভ নহে,—অপরাধ-ভঞ্জন প্রায়শ্চিত্তের চিরস্মরণীয় স্তম্ভ। স্বর্গীয় অজিতনাথ মহামহোপাধ্যায় আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি এই ঘাটের সামান্য অংশ তাঁহার বাল্যকালে দেখিয়াছিলেন। এখন আর উহার কোন চিহ্ন নাই।

এই জগাই-মাধাইয়ের জীবনের পরিবর্তনসম্বন্ধীয় যে কত গান পল্লী-কুসুমের মত বাদলার তরুচ্ছায়ার শীতল বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহার অবশি নাই। একটিতে জগাই-মাধাই বাহা বলিতেছে, তাহার ভাবার্থ এই :—বারে,—জগাই-মাধাই তুই শুনে আয়, গঙ্গাতীরে ঐ মধুর হরিনাম কার শ্রীকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, পূর্বেতো ঐ নাম বজ্রের মত কঠোর লাগিত, আজ নাম শুনিয়া কেন ঘন ঘন চোখের জল পড়িতেছে?

ইহার পর চৈতন্ত সন্ন্যাসী হইলেন—ভট্টাচার্য্যগণ তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন, ভয় দেখাইয়াছিলেন। চৈতন্ত মুকুন্দকে বলিলেন—আমি গৃহী, এইজন্ত আমার মুখে ইহারা নাম গ্রহণ করিবেন না। তাহারা আমাকে মারিতে চাহিতেছেন, কাল যাইয়া সন্ন্যাসী হইয়া

তাঁহাদের পায়ে পড়িয়া হরিনাম দিব—তখন তাঁহারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না।

“চণ্ডাল যুবক গৃহী বালবৃদ্ধ নারী।
নামে মত্ত হইয়া দাণ্ডাইবে সারি সারি ॥
বালক বলিবে হরি বালিকা বলিবে।
পাষাণ অঘোর-পত্নী নামে মত্ত হবে।
আকাশ ভেদিয়া নামের পতাকা উড়িবে
রাজা প্রজা এক সঙ্গে গড়াগড়ি বাবে ॥”

চৈতন্তের সন্ন্যাসে দেশময় যে শোক হইয়াছিল, তাহা শত শত গানে বস্ত্রের ঘরে ঘরে এখনও কারুণ্য জাগাইয়া থাকে। শচী ১২ দিন উপবাস করিয়াছিলেন—“দ্বাদশ উপাসে আই করিলা ভোজন” (চৈ. ভা.)। তাঁহার অহুমতি না লইয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ অসম্ভব। তিনি যে ভাবে অহুমতি পাইয়াছিলেন, তাহা অতি করুণ। শচী কাদিতে কাদিতে বলিলেন, আমার উপর—তোমার এই তরুণ-বয়স্কা স্ত্রীর উপর কি তোমার কোন কর্তব্যই নাই? এখানে থাকিয়া কি ভগবানকে ডাকা চলে না? আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে ত্যাগ করাই কি তোমার ধর্ম? তুমি ধর্মাবতার, তোমার মাকে ত্যাগ করিয়া তুমি কি ধর্ম করিবে?—আমাকে বুঝাইয়া যাও।” চৈতন্ত বলিলেন, “মা, তুমি কি জান না কি ভাবে কৌশল্যা রামকে বনে যাওয়ার অহুমতি দিয়াছিলেন। দেবহুতি অসহ্য বাৎসল্য-বিরহ সহ করিয়াও তাঁহার পুত্রকে বৈরাগ্যের পথ হইতে নিবৃত্ত করেন নাই। তুমিতো সেই দেশেরই রমণী! আমি জগতে হরিনাম বিলাইব, মা, তুমি আমার সাধুপথে বাধা দিও না, এই পরিবারে আবদ্ধ থাকিয়া আমি তাহা পারিব না। তোমার ছেলে সকলকে ভগবানের প্রেম দিতে যাইতেছে,—তুমি ভারতের পূজা—নারীকূলে জন্মিয়া আমার হোমানল নিবাহিও না।” শোকে মৃতপ্রায়া শচী অহুমতি দিয়াছিলেন, কারণ ধর্মের আহ্বানকে তিনি প্রাণ দিয়াও শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা ঈশান-নাগর অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিয়াছেন—সে উৎকট তপস্যা চৈতন্তের সহধর্মিণীরই উপযুক্ত। নবদ্বীপ অশ্রুর বস্তায় ভাসিয়া গিয়াছিল, ভট্টাচার্য্যগণ অহুতপ্ত হইয়া কাদিয়াছিলেন, বাজারে দোকান-পাট সমস্ত বন্ধ ছিল, কেহ উচ্চৈঃস্বরে কথা কহে নাই, চৈতন্ত ছাড়া আলাপের অস্ত্র প্রসঙ্গ ছিল না, সে আলাপ অশ্রুময়—চৈতন্তগুণ-স্মারক। শ্রীবাসের আত্মিনায় শচী অনিঙ্গরজনী ধূল্য পড়িয়া কাটাইয়া দিতেন। শ্রীবাস হরিপূজার জন্ত কুন্দ ফুল তুলিতে বাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাদিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়া যাইতেন, কখনও বা ‘শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ’ বলিয়া গৃহদেবতাকে পূজা করিতে বাইয়া ‘চৈতন্তায় নমঃ’ বলিয়া কাদিয়া উঠিতেন। এখনও নবদ্বীপবাসীরা মাথুর গাহিতে দেন না—মাথুর অর্থ শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-

যাত্রা—কিন্তু তাঁহাদের কাছে উহা চৈতন্যের সন্ন্যাসের স্মারক। তাঁহারা চৈতন্যের সন্ন্যাসমুখি আঁকিবেন না, বা মুখিতে গড়িবেন না—সন্ন্যাসের পর বাহা কিছু হইয়াছে তাঁহারা এখনও তাহা শুনিতে চান না—তাঁহাদের সেখানে সর্বদাই “নবদ্বীপ-লীলা”স্মারক গান ও কীর্তন। নবদ্বীপ পরিত্যাগ করার পরের কথা তাঁহারা শুনিতে চান না।

নবদ্বীপ হইতে বাহির হইয়া ২৩ বৎসর বয়স্ক চৈতন্য কাটোয়ার কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-লীলা গ্রহণ করেন (১৫০৮)। যে সুন্দর চাঁচর কেশ পুষ্পমালায় শোভিত হইয়া তাঁহার অপূর্ণ রূপের শ্রী বাড়াইয়া দিয়াছিল, সেই কেশ-মুণ্ডনের উপলক্ষে কাটোয়ার নরনারী কাদিয়া আকুল হইয়াছিল। পরবর্তী বৈষ্ণব-সমাজের নেতা—চৈতন্যের দ্বিতীয় অবতার—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পিতা চাখনীনিবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ ও কেশমুণ্ডনের সংবাদে এতটা অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি কতকদিনের জন্ত উন্মত্ত হইয়াছিলেন—তরুণ নিমাই বাঙ্গলার এতই স্নেহের ছালা ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল “বিষ্ণুস্বর মিশ্র, বিজ্ঞানাগর বাদী-সিংহ”, এখন সন্ন্যাসগ্রহণের পর যে নাম হইল তাহাও কম উদ্ভট নহে, সন্ন্যাসীর নাম কেশবভারতী দিলেন “শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য,” কিন্তু বাঙ্গালী জন সাধারণ এ সকল আত্মনামিক নামে তুষ্ট হয় নাই, তাহারা তাঁহাকে “গোরা,” “প্রাণের গোরা,” “গোরা চাঁদ,” “নদের চাঁদ” ইত্যাদি নামে ডাকিয়া থাকে।

দিন কয়েক শান্তিপুর থাকিয়া চৈতন্য পুরী গেলেন। তদবধি তাঁহার জীবনের গতি অন্তরূপ হইল। ক্রমে তাৎকালিক ভারতের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাসুদেব সার্কভৌম তরুণ সন্ন্যাসীকে অল্পবয়সে প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্ত গঙ্গনা দিয়া শেষে তাঁহাকে জগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সাতদিন বাসুদেব শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলেন, অগাধ প্রেমের তরুণ তাপস মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিলেন—একটি কথাও বলেন নাই। বাসুদেব বলিলেন, “বালক, তোমার প্রতিভার কথা সকলের মুখে শুনি। কিন্তু আমার এই দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী ব্যাখ্যার সময় তুমিতো একটিও কথা বলিলে না। কত লোক কত প্রশ্ন করিয়াছে—তুমি মাথা ওঁজিয়া বসিয়া আছ। তুমি কি আমার ব্যাখ্যা শোন মাই।” চৈতন্য বলিলেন, “আপনার মত প্রবীণ পণ্ডিতের কাছে আমি কি বলিব,— তবে আমি অন্তরূপ বুঝিয়াছি।” স্পর্ধা তো কম নয়! বৃদ্ধ বাসুদেব সমস্ত শাস্ত্র মন্বন করিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নীলাধর পণ্ডিতের দৌহিত্র, জগদ্বাদ মিশ্রের তরুণ পুত্র তাহা হইতে অন্তরূপ বুঝিয়াছে। কিন্তু সত্যসত্যই যখন চৈতন্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন বৃদ্ধ বাসুদেব দেখিলেন, প্রবীণতা ও পাণ্ডিত্য প্রতিভার নিকট দাঁড়ায় না, ক্ষুদ্র গিরিনদী বেক্ষণ বিশাল শাল-শাল্মলী অনায়াসে খরবেগে ডাসাইয়া লইয়া যায়, চৈতন্য সার্কভৌমের যুক্তিতর্ক তেমনি অনায়াসে ঠেলিয়া ফেলিলেন এবং ভক্তিবাদ স্বদৃঢ় করিলেন। উপসংহারে চৈতন্য পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর ছাড়িয়া ভক্তিগদগদকণ্ঠে হরিনামের শুধা বর্ণন করিলেন। পরাজয়ের আহত অভিমানে বাসুদেবের হৃদয়ে যে আলা হইয়াছিল,

এবার তাহা জুড়াইয়া গেল। বৃদ্ধ পণ্ডিত চৈতন্তের দেবমূর্তি আবিষ্কার করিয়া শ্লোকচ্ছন্দে তাঁহার স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কাশীর প্রকাশানন্দ চৈতন্তের কতই নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন চৈতন্তের অপূর্ণ ভক্তিব্যাখ্যা শুনিয়া সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও দণ্ডীদের নেতা সন্ন্যাসী বাঙ্গালী বালককে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তখন কাশীতে হলহুল পড়িয়া গিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ চুণ্ডীরাম তীর্থ, ভারতী গৌসাই প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতের দশাও একই রূপ হইল। কিরূপে তিনি গুজরাটে যোগাগ্রামে নটী-শ্রেষ্ঠা সুনন্দী বারমুখীকে সংপথে আনিয়াছিলেন, তাহা ভক্তমালা আভাসে বর্ণিত আছে, কিন্তু গোবিন্দ কর্মকার তাহার এমন বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন, যে তাহা একটি দৃশ্যপটের জায় মনোহর হইয়াছে।

থাণ্ডা গ্রামে সেবাদাসী ইন্দিরা বাই, নারোজী দস্তা, ভিল পাছ প্রভৃতি হুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণের কি অতুতপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাঁহার শ্রীকণ্ঠে হরিনাম শোনার পর। তাঁহার মুখে চোখে যে অপূর্ণ অধ্যাত্ম শক্তি ফুটিয়াছিল,—গলদস্ত শতদলপ্রভ চোখে যে স্বর্গীয় প্রেমের কথা লিখিত ছিল, তাহাতেই ঐ সকল অসাধ্যসাধন সম্ভবপর হইয়াছিল। তিনি উপদেশ অতি অল্পই দিয়াছেন। জগতের ইতিহাসে এরূপ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখা যায় না—যিনি উপদেশ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা প্রভৃতি চির-ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার না করিয়া শুধু নাম-বলে লোকের চিত্ত এমন ভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। যে মহাবনী তীর্থরাম যুবক ছইটি বেস্তা লইয়া তাঁহাকে বিচলিত করিতে আসিয়াছিল—সে তাঁহার মুখে শুধু হরিনাম শুনিয়া স্বয়ং দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে লইয়া সন্ন্যাসী সাজিল, তাঁহার নিযুক্ত সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাইনামক বেস্তাদ্বয় রূপের গর্কে ফাটিয়া পড়িয়াছিল—তাহারা এই প্রেমোন্মাদের ভগবদ্ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া কাঁদিয়া পায়ে পড়িল। বাট বৎসরের ব্রাহ্মণ দস্তা নারোজী—চৈতন্তের প্রেমোচ্ছ্বাস দেখিয়া পাগল হইয়া গেল, সে তাহার অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত চিরতরে ফেলিয়া দিয়া সেই দিন হইতে চৈতন্তের যে সঙ্গ লইল, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাহা ছাড়ে নাই। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা রুদ্রপতি, উড়িষ্যার প্রবলপ্রতাপাধিত রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্তের পিছনে পিছনে অনুগত দেবকের জায় চলিতেন। যে প্রতাপরুদ্রের কবাট-তুলা বিশাল বক্ষে মর্দনে প্রধান প্রধান পাঠান মল্লগণ নিষ্পেষিত হইতেন, কবিকর্ণপুর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন—এই মহাবীর রাজরাজেশ্বর চৈতন্তকে দেখিলে নবনীতের জায় কোমল হইয়া তাঁহার দাসানুদাস হইতেন কোন্ গুণে? এই প্রতাপরুদ্র হুসেন সাহের হাত হইতে গোড়দেশ কাড়িয়া লইবার জন্য একবার সমরোদ্ভোগ করিয়াছিলেন। ইনি দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রদেশ জয় করিয়া সার্কভোম রাজচক্রবর্তী হইয়াছিলেন। ইহার আদেশে চৈতন্তের যে ছবি আঁকা হইয়াছিল, তাঁহার পাদপীঠে—সর্বাঙ্গপ্রণতির ভঙ্গীতে রাজার তুলুস্তিত মূর্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। ইনিই চৈতন্তের সঙ্কীর্ণন শুনিয়া গোপীনাথ মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “এ কোন্ রাগিনী? অর্থবোধ না হইলেও যেমন কোকিল-কাকলী, এ যে তেমনই মিষ্টি, এরূপ মধুর রাগিনী ত আমি শুনি নাই, ইহা কে উদ্ভাবন করিয়াছেন?” গোপীনাথ মিশ্র বলিলেন—“ইহা মনোহর-সাই কীর্তন, ইহার অষ্টা স্বয়ং চৈতন্তদেব।” প্রতাপরুদ্র রাজা পুরুষোত্তম দেবের

একমাত্র পুত্র ছিলেন। পরমা সুন্দরী পদ্মিনী কাজিভরম রাজ্যের রাজকন্যা ছিলেন। প্রতাপ-
রুদ্রের পিতা ইহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়া রাজ্যের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। রাজা উত্তরে
লিখিয়াছিলেন, “বে সামান্য ঝাড়ুদারের কাজ করে—তাঁহার হাতে আমার কন্যা দিতে পারিব
না।” বৎসরে একদিন উড়িষ্যার রাজারা সোনার ঝাঁটা হস্তে পুরীর মন্দির সাফ করেন, ইহা
চিরাগত রীতি ছিল, রাজা ইহাই লইয়া ব্যস্ত করিয়া পুরুষোত্তমকে ঝাড়ুদার বলিয়াছিলেন। তিনি
ক্রোধে কাজিভরম আক্রমণ করেন এবং রাজাকে পরাস্ত করিয়া পদ্মিনীকে পুরীতে লইয়া আসেন
এবং সভাসমক্ষে সংকল্প করিয়া বলেন, “এই বন্দী রাজকুমারীকে আমি সত্যসত্যই এক ঝাড়ু-
দারের হস্তে দিব।” মন্ত্রীরা হুঃখিত হইয়া একটা বড়বস্ত্র করিলেন।
আপনিই সেই ঝাড়ুদার।

এবারও বৎসরের সেই দিন আসিল—যেদিন রাজা স্বর্ণ ঝাঁটা হস্তে
পুরীর মন্দির পরিষ্কার করিতে গেলেন। এই সুযোগে প্রধান মন্ত্রী বন্দী রাজকুমারীকে লইয়া
রাজ্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “মহারাজ, আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ইহাকে
কোন ঝাড়ুদারের সঙ্গে বিবাহ দিবেন, আপনিই সেই ঝাড়ুদার, ইহাকে গ্রহণ করুন।” রাজার
মন আর্ত হইয়াছিল, তিনি এই অত্যাচার এড়াইতে পারিলেন না, পদ্মিনীকে বিবাহ করিলেন।
কাঙ্ক্ষী-কাবেরী নামক উড়িষ্যা-কাব্যে এই কৌতুহলজনক ঘটনা লিখিত আছে। আমাদের
কবি রত্নলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয় লইয়া একখানি সুন্দর বাঙ্গলা কাব্য লিখিয়াছেন। *
প্রতাপরুদ্র রাজা পুরুষোত্তম ও রাণী পদ্মিনীর পুত্র। চৈতন্তের তিরোধানের পর প্রতাপরুদ্র
যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন শোকে মৃতপ্রায় ছিলেন। একদা কবিকর্ণপুরকে (পরমানন্দ
সেনকে) তিনি বলিয়াছিলেন, “ঐ দেখ রথযাত্রার সময় উপস্থিত, নীলাঙ্গিনাথ রূপের ছটায়
স্বলম্বল করিতেছেন, একদিকে নীল সিঁদু-জলের অশ্রুট গর্জ্জন, অপর দিকে লক্ষ লক্ষ লোকের
আনন্দ-কোলাহলে পুরী যেন নবজীবন পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু চৈতন্ত বিহনে এই
উৎসবে আমার কণিকাপ্রমাণও আনন্দ হইতেছে না, তুমি তাঁহারই লীলা বর্ণনা করিয়া
আমাকে শুন।” এই আদেশের ফল—সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্ত-চন্দ্রোদয় নাটক।

চৈতন্ত একবার পুরী হইতে পালাইয়াছিলেন। পার্শ্বব ব্রহ্ম-মমতার সম্পূর্ণ খপ্পরে পড়িলে
নির্মল সার্বজনীন প্রেম ও সত্যদৃষ্টির বাধা পড়ে। পুরীতে আসিয়া দেখিলেন, সেখানেও
নদীয়ার মত তাঁহার দ্বিতীয় একটা সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে। অগদানন্দ তাঁহার প্রতি মাতার
অধিক যত্ন করেন—এবং তাঁহার ঘান, ভোজন, শয়ন প্রভৃতি লইয়া অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যস্ত
হইয়া পড়েন,—নানারূপের উপহারের খাজদ্রব্য আনিয়া তাঁহাকে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি
করেন,—তিনি না খাইলে হয় নিজে উপবাসী থাকেন, না হয়

পুরীত্যাগের সঙ্কল্প।

অভিমান করিয়া তিন দিন চৈতন্তের সঙ্গে কথা বলেন না। একদিন
ইনি চৈতন্তের জন্য একটা তুলার বালিশ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখন সন্ন্যাসী অতি

* প্রতাপরুদ্র স্বর্ণঝাড়ু লইয়া যে অগদানন্দ মন্দির বৎসরে একদিন সাফ করিতেন, তাহার উল্লেখ
চৈতন্ত-চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের ১৪শ অধ্যায়ে আছে।

কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া শুধু মেঝের পাথরের উপর শুইয়া থাকিতেন, জগদানন্দের তাহা সহ্য হয় নাই। সেই তুলার বালিশ দেখিয়া চৈতন্ত বলিয়াছিলেন, “জগদানন্দ, বিলাসের আর আর আস্বাদ বাকি রাখিলে কেন? এখন একটা খাট লইয়া এস এবং আমাকে দিয়া বিদায় ভোগ করাইবার অত্যাচ্ছা যোগাড় কর।” আর একদিন এক ভক্ত চৈতন্তকে এক হাড়ী সুগন্ধ তৈল উপহার দিয়াছিলেন, চৈতন্ত বলিলেন, “ইহা মন্দিরে লইয়া যাও এবং জগদানন্দের আরতির সময়ে জ্বালাইও।” এই কথায় জগদানন্দ রাগিয়া গিয়া সেই তৈলের হাড়ী ভাঙিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরিব্রজ্যার নিয়ম পালন করিয়া চৈতন্ত শীর্ণদেহে মাঘের নিদারুণ শৈত্য অগ্রাহ্য করিয়া শেষরাত্রে স্নান করিতেন। মুকুন্দের ইহা সহ্য হইত না। চৈতন্ত বলিলেন, “মুকুন্দ, জগদানন্দের মত রাগ করে না; কিন্তু অতি হিংখিত হইয়া চুপ করিয়া থাকে, তাহাতে আমার অধিকতর কষ্ট হয়।” এদিকে স্বরূপ-দামোদর চৈতন্তের উপর শিক্ষা-দণ্ড খরিয়া ছিলেন। চৈতন্ত শাস্ত্র-নিয়মের ধার ধারিতেন না, উজ্জ্বলিত প্রেমের আবেগে কোন বিধি পালন করিতেন না। কিন্তু স্বরূপ-দামোদর “ইহা করা উচিত নহে, সন্ন্যাসীর পক্ষে উহা উচিত নহে” ইত্যাদিরূপ অমুশাসন দ্বারা তাঁহাকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন।

চৈতন্ত দেখিলেন,—ইহারা তাঁহার জন্ত পুনরায় স্নেহ ও শাসনের গৃহের মতই একটা কারাগার সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরীর এই ঘেহের বন্ধনী হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্ত তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। একবার ছুটিয়া পালাইবার মুখে তিনি সনাতনের বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। বিবাহের বরের স্থায় এক বিপরীত মিছিল সঙ্গে তিনি যে চলিয়াছিলেন, একথা তাঁহার খেয়াল ছিল না। সনাতনের উপদেশ তিনি গ্রহণ করিলেন। পুরীতে ফিরিয়া তথায় আর কিছুকাল থাকিয়া এবার প্রকৃতই পলাতক আসামীর স্থায় গোপনে দাক্ষিণাত্যের দিকে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে কালাকৃষ্ণ দাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি গোদাবরীর তীর পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। একমাত্র গোবিন্দ কৰ্ম্মকার বিশ্বস্ত কুকুরের স্থায় দীর্ঘপথ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং এই ভ্রমণের যে সবিস্তার বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন তাহা দৃষ্টপটের স্থায় সম্পষ্ট। গোবিন্দ কৰ্ম্মকারের বাড়ী ছিল—বর্ধমান, কাঞ্চন নগর; তাঁহার পিতার নাম ছিল শ্রামাদাস এবং মাতার নাম মাধবী, গোবিন্দ তাঁহার স্ত্রী শশিমুখীর সহিত ঋগ্ভা করিয়া চিরদিনের জন্ত চৈতন্তের সঙ্গী হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উক্তর কালে ইনিই “শ্রীগোবিন্দ” নামে বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। এই করচা-লেখক সম্বন্ধে সমস্ত কাহিনী মৎসম্পাদিত “গোবিন্দ দাসের করচা”র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ্য। ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ তিনি দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে বহির্গত হন ও ১৫১১ খৃষ্টাব্দের ৩রা মাঘ পুরীতে প্রত্যাগত হন। স্মরণ্য এক বৎসর আট মাস ছাব্বিশ দিনে এই ভ্রমণ শেষ হয়, পুরীতে ফিরিয়া আসিয়া চৈতন্ত বলদেব ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে মথুরা, বৃন্দাবন, কানী প্রভৃতি অঞ্চলে ছয় বৎসর ভ্রমণ করেন। তিনি অষ্টাদশ বর্ষ কাল পুরীতে ছিলেন। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে রবিবার দিন বেলা ৩ টার সময়ে তিনি পুরীর গুণ্ডিচা গৃহে দেহ-রক্ষা করেন।

বৈষ্ণব-সমাজের উপর—সমস্ত বাঙ্গলা দেশটার উপর—চৈতন্যের যে প্রভাব তাহার তুলনা নাই। নিত্যানন্দ পুরীতে আসিলেই চৈতন্য সংস্থাপনে এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া তাহাকে সমাজ-সংশোধনের উপদেশ দিতেন. (চৈ. ভা.)। তিনি জানিতেন—

চৈতন্যের প্রভাব।

নিত্যানন্দের স্থায় সর্বজাতির প্রতি সমদর্শী, উদারহৃদয় ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-সমাজে আর দ্বিতীয়টি নাই। এই জন্ত জাতিভেদের উৎকট বৈষম্য দূর করিয়া উদার বৈষ্ণব-সমাজের দ্বার উন্মুক্ত করিবার ভার তিনি নিত্যানন্দের উপর দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ ও তাহার পুত্র বীরভদ্র খড়্গহে বসিয়া পতিতদিগকে যে মেহ-মধুর আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ১২০০ নেড়া (মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষুক) ও ১৩০০ নেড়ী (উজ্জরপ বৌদ্ধ ভিক্ষুণী) সাগ্রহে আসিয়া বৈষ্ণবধর্ম আশ্রয় করিয়াছিল। এইভাবে রামকলী নগরে আর এক বৃহৎ নেড়ানেড়ী সম্প্রদায় ভেদাশ্রিত হইয়া বৈষ্ণব বৈরাগী সাজিয়াছিল। বহু বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু নিত্যানন্দের প্রসারিত-ভূজাশ্রিত হইয়া বৌদ্ধ-জনসাধারণ সাধারণ বৈষ্ণব-মত অবলম্বন করিয়া হিন্দুসমাজের গণ্ডিতে স্থান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। বৌদ্ধ-আখড়ায় বিবাহপ্রথা ছিল না। ব্যভিচার-দুই নেড়ানেড়ীসমাজ তাহাদের নেতৃদলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া বিলাসের শ্রোতে আকর্ষিত অবস্থায় ঘূর্ণাহ হইয়াছিল, তাহাদের সম্মান-সম্মতি নাম-গোত্রহীন হইয়া অতি হেয় অবস্থায় ছিল,—নিত্যানন্দ ইহাদের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলন করিয়া সমাজে ইহাদের একটা স্থান করিয়া দিয়াছিলেন। বৈরাগীরা কখনই ভেদাশ্রয়ের পূর্বে তাহারা কোন্ জাতীয় ছিল তাহা বলিবে না। এই ভাবে তাহাদের পূর্বজীবনের কলঙ্কিত অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্তির জলে বিসর্জন দিয়া তাহারা লোক চক্ষে শুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বাউলদের মধ্যে চৈতন্য-নিত্যানন্দকে গ্রহণ করার পরও বৌদ্ধধর্মের দেহতত্ত্ব এখনও চলিয়া আসিয়াছে। পূর্ব ধর্মের সংস্কার বাউলদের সহজিয়া গানে স্পষ্টরূপে বিজ্ঞমান আছে। একদিন এক বাউলকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, “তুমি চৈতন্য ও নিত্যানন্দের বিগ্রহ পূজা কর কি না?” সে বলিল, “ইহাদের কি বিগ্রহ আছে? চৈতন্য হচ্ছেন ‘শূন্য মূর্তি।’” এই উক্তি মহাবান বৌদ্ধগণের “ধ্যায়েৎ শূন্যমূর্তিম্” ইত্যাদি ভাবে ব্যক্ত শূন্য-বাদের প্রতিধ্বনি করে। নিত্যানন্দের নাম হইয়াছিল “জাতনাশা”। তিনি সুবর্ণ-বণিক-শিরোমণি—সপ্তগ্রামের ধনকুবের—সন্ন্যাসাবলম্বী উদ্ধারণ দত্তের সঙ্গে একত্র ভোজন করিতেন। অথচ সূর্য্যদাস সরকারের দুই কন্যা “বসুধা” ও “জাহ্নবী”কে বিবাহ করিয়া নিত্যানন্দ দত্তরমত গৃহী সাজিয়াছিলেন। চৈতন্যের আদেশে তিনি অবধূতের ব্রত ভঙ্গ করিয়া সংসারাপ্রমী হইয়াছিলেন। তিনিই সমস্ত নিম্ন-জাতীয় হিন্দুর গৃহে বৈষ্ণব গোপ্বামীদের পূজাদি করিবার ব্যবস্থা চালাইয়াছিলেন; ব্রাহ্মণেরা ইতিপূর্বে বাহাদের বাড়ীর দ্বারে পদার্পণ করাও মহাপাপ মনে করিতেন, বৈষ্ণব গোপ্বামীরা তাহাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া তাহাদের বাড়ীতে ভোজনাদি ও দেবপূজা অবাধে করিতে লাগিলেন। এজন্তই নিত্যানন্দের নাম হইয়াছিল “পতিত-পাবন।” ভক্তি ও প্রেমের রাজ্যের রাজচক্রবর্তী চৈতন্য; তিনি ভাবে বিস্তার থাকিতেন, কিন্তু সমাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিতেন—নিত্যানন্দ।

চৈতন্যের অমূল্যক্রমে বৈষ্ণব-সমাজে সমস্ত নীচজাতির প্রবেশ-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া নিত্যানন্দ তঁাহাদিগকে অশেষরূপ সামাজিক উন্নতি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাদের প্রচ্যায় নিত্যানন্দের নাম চৈতন্যকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি গানে এই কথা সুব্যক্ত আছে। “হাটের রাজা নিত্যানন্দ, পাত্র হৈল ত্রীচৈতন্য” প্রভৃতি গানে নিত্যানন্দ রাজা এবং চৈতন্য তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছেন। নিত্যানন্দ এই মহৎ কার্য না করিলে আজ পতিত জাতির অধিকাংশই ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করিত। চৈতন্যদেব পুরীতে তাঁহাকে সমাজ-সংস্কারসম্বন্ধে কোন পন্থা অবলম্বনীয়,—দ্বার বন্ধ করিয়া এক প্রকোষ্ঠে অতি গোপনীয়ভাবে সেই উপদেশ দিতেন।

চৈতন্য স্বয়ং ভগবৎপ্রেমে বিভোর থাকিয়াও বাঙ্গলার নবগঠিত বৈষ্ণব-সমাজকে সংশোধিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। সনাতনকে দিয়া তিনি এই সমাজের জন্ত বিধিব্যবস্থা সংকলন করাইয়াছিলেন। এই কার্যের জন্ত সনাতন অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কেহ ছিলেন না। সনাতন বাঙ্গলার সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, ব্যবহার-শাস্ত্র তাঁহার নখাণ্ডে ছিল, তিনি হিন্দুদের দর্শন, কাব্য ও পুরাণ উৎকৃষ্টরূপে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু স্মৃতিই ছিল তাঁহার বিশেষভাবে পঠিতব্য বিষয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, নবদ্বীপের তরুণ পাগল দেবতাটি ভাবে বিভোর থাকিয়াও সংসারের প্রয়োজন এবং স্মৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বসম্বন্ধে সনাতনের মত পণ্ডিতকে কলের পুতুলের ছায় পরিচালিত করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে চৈতন্য-চরিতামৃতের সনাতন-শিক্ষা শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

একদিকে সমাজ-সংস্কার, অপরদিকে উহা পরিচালিত করিবার বিধি-ব্যবস্থা করিয়া তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কে জানিত হরিপ্রেমে উন্মাদ এই তরুণ যুবকের একরূপ অসাধারণ সমাজ-সংগঠনী শক্তি ও প্রতিভা ছিল?

তাঁহার “মহা-ভাব” অতুলনীয়—সমুদ্রের মত অপ্রমেয়। সেই মহাভাবের সৌন্দর্য্যে বৈষ্ণব-পদসাহিত্য ভরপুর; চণ্ডীদাস তাহার আভাস পাইয়া তাঁহার আগমনী গাহিয়াছিলেন, বাসুদেব নরহরি তাঁহার স্বর্গীয় প্রেমলীলায় আত্মহারা হইয়া শত শত পদ রচনা করিয়াছেন। হরিনাম করিতে করিতে যখন তিনি কাঁদিতেন, তখন নারদের বীণাধ্বনিবৎ তাঁহার সুকণ্ঠ-উচ্চারিত হরিলীলা যেন শ্রোতৃবর্গের প্রত্যক্ষ হইত। এই মনোহর কণ্ঠের ধ্বনিতে নূতন নূতন স্বরের সৃষ্টি জাগিয়া উঠিত। শুধু মনোহর সাহী, রেনেটি বা গরান-হাটার কীর্তন নহে,—একদিন এমনই করুণ-মধুর কণ্ঠে তিনি সাক্ষ্যদেয় হরিনাম কীর্তন করিতেছিলেন যে তাহাতে “মায়ুর” নামক এক নবরাগিণীর সৃষ্টি হইয়া গেল। তাঁহার প্রেম-বিহ্বল চোখের মধুরিমা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নানাভাবে নানা মধুর বার্তা মর্ত্যলোকে বহন করিয়া আনিত। একদিন তাঁহার চোখে অভিমানের অঙ্গুণিমা খেলিতেছিল, অতিশয় অভিমান ও লজ্জাজনিত ক্ষোভ দুইটি অশ্রুতে সুব্যক্ত হইয়াছিল, তাঁহার চোখে কি কথা ফুটিতে চাহিয়া যেন ফুটিতে পারিতেছিল না, দেহলতা অতিশয় আবেগে ছলিতেছিল। রূপ-গোপ্যমী মুখ্যদেয় এই মহাভাবের পাগলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, অমনি সেই দৃষ্ট তাঁহাকে কল্পনার স্বর্গলোকে লইয়া গেল,

তিনি রাধিকার একটি ভাব উহাতে আরোপ করিয়া দানকেলী-কৌমুদী নামক নাটকের মুখবন্ধে “অন্তঃ স্নেহতরোজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষাঙ্গুরা।” ইত্যাদি শ্লোকটি রচনা করিলেন, তাহাতে সাতটি ভাবের সমাবেশ আছে; আলঙ্কারিকগণ উহাকে “কিলকিঞ্চিৎ” ভাব সংজ্ঞা দিয়াছেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর স্বপ্নবিলাস এবং রাই উন্মাদিনী প্রভৃতি পুস্তক রাধিকার নামে চৈতন্ত-লীলা;—বিশেষ রাই উন্মাদিনী গ্রন্থখানি চৈতন্তচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ছানিয়া, তাহাদের সারাংশ কবিত্বমণ্ডিত করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহাতে এমন একটি কথা নাই, বাহা চৈতন্ত-জীবন হইতে সংগৃহীত হয় নাই। অথচ এই পরিপূর্ণ অধ্যাত্মত্ব বা ভক্তি-সংবাদ এমনই করুণভাবে লিখিত হইয়াছে যে রাধিকার এই রূপ ও চরিত্র—মহা করুণার প্রস্রবণস্বরূপ হইয়াছে। কে বলিবে এই কাব্যের উৎস মর্ত্য-বাহিনী ভাগীরথী—স্বর্গ-গামিনী মন্দাকিনী নহে? উহা সংসারের বেশ ধরিয়া আসিয়াছে সত্য কিন্তু উহার উৎপত্তিস্থান স্বর্গে। চৈতন্তদেবের মূর্তি যদি অতি স্পষ্টভাবে কেহ দেখিতে চান, ভাল গায়কের মুখে ‘রাই উন্মাদিনী’ যাত্রাখানি শুুন। গোবিন্দ দাস প্রভৃতির পদে বর্ণিত আছে যে সময়ে সময়ে রাধিকা কৃষ্ণের ক্রোড়ে থাকিয়াও ‘কোথা কৃষ্ণ’ ‘কোথা কৃষ্ণ’ বলিয়া কাদিয়া মুর্ছিত হইতেন। যিনি দিনরাত্র কৃষ্ণের সঙ্গবিচ্যুত হইতেন না, তিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া বিরহীর মত কাদিতেন—রাধাতে আরোপিত এই ভাব সেই লীলার স্রোতক।

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বহু দেববিগ্রহ ও মন্দির মুসলমান অত্যাচারীরা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। তখন বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে কষ্টিপাথর-নির্মিত বাসুদেব-বিগ্রহের পূজা হইত। এই সকল বিগ্রহ ভক্তদের প্রাণের ছায় প্রিয় ছিল। যাহার কাছে বসিয়া রাত্রিদিন জপ চলিয়াছে,—নিত্য শত শত কুলবধু যাহার জন্ত নৈবেদ্য ও পুষ্পপত্র রচনা করিতেন,—যাহার ভোগ কত যন্ত্রের সহিত রান্না হইত,—যাহার আরতির জন্ত কত মালী বাগানের ফুল সংগ্রহ করিয়া মালা প্রস্তুত করিত এবং যাহার মন্দির-দুপ অস্তরের সমস্ত কলুব দূর করিত, এবং গঙ্গান্নাত, পট্টবাস-পরিহিত ব্রাহ্মণ শুদ্ধদেহ ও শুদ্ধান্তঃকরণে যাহার পূজা অর্চনা করিতেন, সেই সকল প্রাণাধিক বিগ্রহের ধ্বংসের পর ভগ্নদেবমন্দির শূন্য হইয়া পড়িল। কত পুরোহিত ও পাণ্ডা হয়ত স্বীয় প্রাণ বিধর্মীর খড়্গাঘাতে বিসর্জন দিয়া ত্রীবিগ্রহ-রক্ষার বিফল প্রয়াস পাইয়াছিলেন—সেই সকল বিগ্রহ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইল। কিন্তু ভক্তের মানসপটে তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া তাহার কল্পনাকে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই চন্দনানুরঞ্জিত কষ্টিপাথরের কৃষ্ণবর্ণ রূপ তাহাদের বুকে শেলসম বিদ্ধ হইয়াছিল। কালো কিছু দেখিলেই সেই কালো রূপের কথা মনে হইত। বঙ্গের প্রাচীন এবং আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্যে কালোরূপের প্রেম-দ্রষ্ট উল্লেখ সর্বত্র দৃষ্ট হয়; এজন্ত রাধিকা কাজল পরিতেন না, কালো শাড়ী দেখিলে চমকিত হইতেন। তিনি সখীকে বলিতেছেন, “কালো কুসুমকরে, পরশ না করি ডরে, এ বড় মনের মনোবাধা” (চণ্ডীদাস)। এজন্তই তিনি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখিলে নিশ্চল ও মুগ্ধ চক্ষুছটি সেই দিকে নিবদ্ধ রাখিতেন, “সদাই ধোয়ানে চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা;” এজন্তই তিনি মালতী মালা খুলিয়া কালো

চুলের রাশি হাতে লইয়া মুক্ত চোখে চাহিয়া থাকিতেন, এবং ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠের উজ্জ্বল নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া উন্মত্ত হইতেন। কালো রঙ্গের বিগ্রহ সমুখ হইতে অপসারিত হওয়ার সেই বর্ণ আরও প্রিয় এবং ধ্যানের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; এজ্জাই মাধবেন্দ্র পুরী মেঘদর্শনে অজ্ঞান হইতেন এবং চৈতন্য দেব দাক্ষিণাত্যে চণ্ডপুর গ্রামে এক তমালতরু দেখিয়া তাহাকে সাক্ষনেজে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন—কখনও যে-কোনও নদীকে কালিন্দী মনে করিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন। এক পদকর্তা রাধিকার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—“বিজনে আলিঙ্গনে তরুণ তমাল।” এবং বহু বৈষ্ণব কবি রাধার মৃত্যুকালীন ইচ্ছা—মরণান্তে তমাল-ডালে তাঁহার তনু বাধিয়া রাখিবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভগবদারাধনায় এই কৃষ্ণবর্ণটি ক্রমশঃ একটি স্মারক চিহ্নস্বরূপ হইয়া বৈষ্ণব কবিতায় এক অপূর্ণ উন্মাদনার অমৃত ঢালিয়া দিয়াছিল। এই কালো বর্ণ বৈষ্ণবের চক্ষে ধ্যানলোকের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং ষাঁহাকে মন্দির হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইল, সেই বিগ্রহ স্থান লইলেন ভক্তের চক্ষে ও মনে—বিশ্বের সর্বত্র—সমুদ্রের নীললহরীতে, স্রুগাম তমালতরুতে, কৃষ্ণবর্ণ মেঘে ও ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠের বর্ণে। কবিরা এখনও গান বাধিয়া বলেন, “কালো কি হয় না ভালো-রে” চৈতন্যের মুহুমূহঃ

মূর্ত্তা এবং ভগবানের সঙ্গে আনন্দমিলন অনেক সময়ে এই কৃষ্ণবর্ণকে কালোর উপরে দয়দ।

সমাশ্রয় করিয়া হইত। কৃষ্ণের বর্ণ অবশ্যই কালো, কিন্তু ভারতবর্ষে কালো রঙ্গের উপর এত দয়দ বাঙ্গালীদের মত আর কেহ দেখায় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চৈতন্যের তিরোধান ও বৈষ্ণব সমাজ

১৫৩৩ অব্দে চৈতন্যের তিরোধান হয়। এই তিরোধান কিরূপে হইয়াছিল, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। তিনি সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, একথা চৈতন্যচরিতামৃতে লিপিবদ্ধ

আছে, এই স্থানে সমুদ্রের জলে তাঁহার তিরোধান হয়—এই যে তিরোধান-সম্বন্ধে নানা মত।

সংস্কার কয়েকজন শিক্ষিত লেখক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে কোন আস্থা দেওয়া যায় না। প্রাচীন সাহিত্যের কোথায়ও ইহার প্রমাণ নাই। স্থানীয় প্রবাদ, তিনি জগন্নাথের সঙ্গে অথবা গোপীনাথের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন—তাঁহার দেহ ছিল চিন্ময়, স্মৃতরাং রক্তমাংসের দেহের ধ্বংসের মত তাহার বিলয় হইতে পারে না, এই সংস্কার-বশতঃ প্রবাদটির সৃষ্টি হইয়াছিল। কোন একটি প্রাচীন পদে “মহাপ্রভু হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে” এই ছত্রটি আছে। ইহা গোপীনাথের সঙ্গে তাঁহার মিশিয়া

বাইবার ইঙ্গিত-বাণী কিনা জানি না। কিন্তু, আমাদের মনে হয়, জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্য-মঙ্গলে মহাপ্রভুর তিরোধানের যে কাহিনী দিয়াছেন, তাহাই এতৎসম্বন্ধে সর্বাশেষ প্রাচীন ও যুক্তিসঙ্গত কথা। রথযাত্রার সময়ে কীর্তনানন্দে চৈতন্য উদ্ভূত খাইয়া পড়িয়া যান এবং তাহাতে পায়ে জয়ানন্দ চোট লাগে। অনতিকাল-পরে গুণ্ডিচা গৃহে তাঁহাকে আনা হয়, এবং তথায় তাঁহার প্রবল জ্বর হয়। জয়ানন্দ বলেন, আবার মাসের রবিবার সপ্তমী তিথিতে (১৫৩৩ খৃঃ) বেলা তিনটার সময়ে তিনি স্বর্গধামে গমন করেন, কিন্তু লোচনদাস বলেন রাত্রি আটটার তাঁহার বিয়োগ হয়। সেদিন অপরাপর দিনের জায় বেলা তিনটার পর গুণ্ডিচা বাটীর দরজা খোলা হয় নাই। চৈতন্যের পার্শ্বচর্যগণ মন্দিরের দ্বারে ভিড় করিয়া ছিলেন। কিন্তু আটটা রাত্রিতে দরজা খুলিয়া পাণ্ডারা বলেন—মহাপ্রভু স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তাঁহার দেহের আর কোন চিহ্ন নাই। বেলা তিনটা হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত সেই গৃহে পাণ্ডারা খিল লাগাইয়া কি করিয়াছিলেন? পূর্বোক্ত দুই পুস্তকের কথা এবং ঈশান নাগরের অশ্বৈত-প্রকাশের কয়েকটি ছত্র হইতে আমাদের অনুমান হয়, বেলা ৩টার সময়ে তাঁহার দেহত্যাগ হইলে মন্দিরের মধ্যেই দেববিগ্রহের প্রকোষ্ঠ-সংলগ্ন বুহৎ মণ্ডপের এককোণে তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হয়। প্রতাপরুদ্রের অনুমতি লইয়াই সম্ভবতঃ ঐরূপ করা হইয়াছিল, যেহেতু উক্ত পুস্তকের একখানিতে লিখিত হইয়াছে, বহু পুষ্পমালা সেই মন্দিরের গুপ্তদ্বার দিয়া তখন লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। বেলা তিনটা হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত তাঁহার সমাধিকার্যে ব্যস্ত হয়, তৎপরে সেই মণ্ডপের পাথরগুলি যদ্যাহানে সন্নিবেশিত করিয়া সমাধির চিহ্ন বিলুপ্ত করা হইয়াছিল। বাহারা সঠিক অবস্থা জানিয়াছিলেন—তাঁহারা তিরোধান বেলা ৩টার হইয়াছিল এরূপ লিখিয়াছিলেন; কিন্তু আটটা রাত্রে সংবাদ রাষ্ট্র হয় যে তিনি আর ইহলোকে নাই। সেই মণ্ডপের দেবপ্রকোষ্ঠের একটি নিকটস্থ কোণে গৌরান্দের প্রস্তর-নির্মিত পদচিহ্ন আছে। ঐ মন্দিরে চৈতন্যের সেই পদচিহ্ন থাকার কোন কারণ নাই। জগন্নাথ মন্দির ও গোপীনাথ মন্দির এই দুইটি চৈতন্যের প্রধান লীলা-স্থল। গুণ্ডিচা মন্দিরের সেই পদচিহ্ন কি লুপ্তায়িত সমাধির নিদর্শন? বাহা হউক এ বিষয়ে আমি আর বেশী কথা লিখিব না। আমি আমার অনুমান মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম। বাহারা বিগ্রহের সঙ্গে তাঁহার চিন্ময় দেহ মিশিয়া বাইবার কথা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের বিশ্বাসে আমি 'খা' দিতে ইচ্ছা করি না। পুরীর পাণ্ডাদের মধ্যে আর একটি ভীষণ প্রবাদ প্রচলিত আছে—তাহা আমি তথায় শুনিয়াছি। জগন্নাথ বিগ্রহ হইতেও চৈতন্যের প্রতিপত্তি বেশী হওয়াতে পাণ্ডারা নাকি গোপনে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্র বাহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া মাজ করিতেন, বাহার তিরোধানের পর রাজার ঘোর বিরাগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহারই রাজধানীতে কি এরূপ একটা ঘটনা ঘটিতে পারে? উদ্ভিষ্টার রাজপত্নী সন্ধান করিলে হয়ত সত্য ঘটনা ব্যক্ত হইতে পারে।

চৈতন্যের তিরোধান-সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি সকলেই নীরব। যে কয়েকখানি পুস্তকে একটু ইঙ্গিত আছে, তাহা বৈষ্ণব-সমাজের সর্বজনদ্রুত গ্রন্থ নহে। শুধু লোচনদাস

একশ্রেণীর বৈষ্ণবদের মধ্যে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা, তাঁহার পুস্তকেও এ সম্বন্ধে সামান্য কয়েকটি কথা আছে।

চৈতন্যের তিরোধানের পর
বৈষ্ণব-সমাজের অবস্থা।

যে কারণেই হউক, এই নীরবতা হুঃসহ শোকজ্ঞাপক। ভগবান্
ধৃতি চান্দর পরিয়া বাঙ্গালী সাজিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে লীলা করিয়া
গিয়াছেন, এত বড় গৌরবে এদেশের লোকেরা গৌরবাধিত ছিল,
চৈতন্যের তিরোধানে সেই আতীয় গৌরব-কিরীট শিরশ্চ্যুত হইল। জাহাজ ভূবিয়া ভাঙ্গিয়া
চুরিয়া গেলে বেক্রপ তাহার ভগ্ন অংশগুলি অর্গবে ইতস্ততঃ দৃষ্ট হয়—এই মহাবিপদের দিনে
বৈষ্ণব-সমাজ তেমনই বিচ্ছিন্ন ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। গঙ্গাতীরে যে মহাকীর্তনের দল
মন্দিরা, করতাল, ডম্ফ ও মৃদঙ্গনিম্বাদে আকাশ দিবারাত্র প্রতিশব্দিত করিত, হঠাৎ সেই
‘আনন্দোৎসব ধামিয়া গেল।’ অবৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস ও নরহরি ধীরে ধীরে শোকসন্তপ্ত হইয়া
অব্যক্ত হুঃখে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। শচী তাঁহার পুত্রের সম্মানসের পর প্রতিবৎসর প্রাণের
নিমাইয়ের সংবাদ পাইতেন,—শেখবার চৈতন্য পুরী হইতে অগলানন্দকে পাঠাইয়াছিলেন,
তাঁহাতে বলিয়া দিয়াছিলেন, “মা, আমি তোমার বৃদ্ধ বয়সে সেবা করিতে পারি নাই। আমার
ধর্মকর্ম কিছুই হইল না,—আমি পাগল হইয়া কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছি, আমি তোমার
চিরস্নেহের ছেলে, আমার শত অপরাধও তোমার নিকট মার্জনীয়—মা, তোমার স্নেহের
নিমাইকে মাফ করিও।” একবার শান্তিপু্রে শোকাবুলা মাকে সান্ত্বনা দিয়া চৈতন্য বলিয়া-
ছিলেন, “মা, আমি তোমারই রান্নাখরে ও শ্রীবাসের আঙ্গিনায় অশরীরিভাবে সর্পদণ্ড থাকিব;
তুমি যেদিন কোন ভাল জিনিষ রান্না করিবে,—জানিও, আমার আত্মা তোমার ঘরে সেই
সময়ে বিরাজ করিবে, আমার দেহ অন্তত থাকিলেও প্রাণ-মন নদীয়ায় তোমার ঘরে থাকিবে।”
এই সকল সংবাদ পাইয়া শচীর শতধাবিদীর্ণ হৃদয়ের আলা কথঞ্চিৎ জুড়াইত; কিন্তু আজ
তিনি কি করিবেন? চিরবিধ্বস্ত ভৃত্য ঈশান আজ তাঁহাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবেন?
চির-ব্রহ্মচর্যা ও কঠোর নিয়মপালনে কঙ্কালসার তব্বলী বিষ্ণুপ্রিয়ায় দশা কি হইল, জানা নাই।
নিত্যানন্দ দান খেতুরীর মহোৎসব এবং গৌরাঙ্গ-বিগ্ৰহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সেই বিষয়,
ভগবৎপরায়ণার অপূর্ণ সাধীমুষ্টি আভাসে দেখাইয়াছিলেন, তারপর তৎসম্বন্ধে কোন
লেখক কিছু বলেন নাই।

এদিকে বৃন্দাবন নূতন নগর হইয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। চৈতন্য তাঁহার প্রিয়
ভক্তদিগকে সেখানে পাঠাইয়া তীর্থগুলির উদ্ধার করার পর সমস্ত ভারতবর্ষের চক্ষু
বৃন্দাবনের দিকে পড়িয়াছিল। দলে দলে তীর্থদর্শনকারীরা তথায় ভিড় করিয়াছিল।
লোকনাথ, রঘুনাথ দাস, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ
প্রভৃতি বরেন্দ্র সাধুগণের অলৌকিক ভক্তি-দর্শনে সমস্ত আত্মাবর্ত্ত বৈষ্ণব-ধর্মের
অমুরাগী হইয়াছিল,—তথায় শত শত মঠ মন্দির উখিত হইল। গ্রাউজ সাহেবের মধুরার
ইতিহাস ও নাভাজি-কৃত ভক্তমালা তথাকার সমৃদ্ধি ও ভক্তিধর্মের সাফল্যের কথা
বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। যে সনাতনের ভক্তিদর্শনে সম্রাট আকবর বিম্বিত
হইয়াছিলেন, রাজা মানসিংহ শিখার গ্রহণ করিয়া বিষয়বিরাগীর নির্দেশান্ত্রসারে ১৬১২ খ্রষ্টাব্দে

আকাশস্পর্শী মন্দির রচনা করিয়াছিলেন, সেই সনাতন এবং তাঁহার ভারতপ্রসিদ্ধ ভ্রাতা
অর্দ্ধশতাব্দী পরে।

রূপ গোস্বামী চৈতন্তের তিরোধান শুনিয়া তাঁহার সর্বজনবন্দিত
চরণ ধ্যান করিয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ১৫৩৩ খৃঃ

অন্দের পর গোড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের কাজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী বন্ধ ছিল। মহাশোকে মতিচূর
চৈতন্তের অনুচরগণ যেন বজ্রাঘাতে চেষ্টাহীন ও নীরব হইয়াছিলেন—কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী পরে
আবার ধীরে ধীরে নবজীবনের আলোকচ্ছটায় দিগ্বলয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চৈতন্ত, নিত্যানন্দ
ও অবৈত—এই তিনজন প্রথম অধ্যায়ের নেতা ছিলেন। পরবর্তী যুগে শ্রীনিবাস, নরোত্তম
ও শ্রীমানন্দ এই তিনজন নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। আবার তেমন করিয়া খোল বাজিয়া
উঠিল—যেমন করিয়া চৈতন্তের সময়ে বাজিত, আবার সঙ্কীর্ণনের উচ্চরোলে, রামসিদ্ধার চীৎকারে
ভক্তিবর্ষ শুধু বঙ্গ-উড়িয়ায় নহে, মথুরা, বৃন্দাবন ও রাজপুতনায় বিজয়ী হইল। বাঙ্গালী
কবির বাঙ্গলা-ভাষা কতক পরিমাণে ত্যাগ করিয়া ব্রজবুলীতে পদ রচনা করিতে
লাগিলেন, কারণ তাঁহাদের অপূর্ণপদগুলি এখন আর শুধু বাঙ্গালীর জন্ত নহে—সমস্ত
আর্য্যাবর্তে তাহা গীত হইবে। চিরঞ্জীব সেনের পুত্র, দামোদরের দৌহিত্র বৃন্দাবন-গ্রামবাসী
সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবির বিজ্ঞাপতির অনুসরণ করিয়া এই ব্রজবুলি ছন্দে যে রস
বিলাইয়া দিলেন, তাহা বৃন্দাবনবাসীরা পর্য্যন্ত উপভোগ করিতে সমর্থ হইলেন। বাঙ্গালী
কবির পদ সমস্ত আর্য্যাবর্তে প্রচারিত হইল। নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকরে জীব গোস্বামী
ও গোবিন্দদাসের যে সকল সংস্কৃত-পত্র উদ্ধৃত আছে, তাহাতে দেখা যায় বাঙ্গালী কবির
ব্রজবুলি ছন্দ অবলম্বন করিয়া কিভাবে সমস্ত আর্য্যাবর্ত বিজয় করিয়াছিলেন।

গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পর পর তিনটি কেন্দ্র হইয়াছিল। প্রথম কেন্দ্র নবদ্বীপে, যেখানে

তিনটি কেন্দ্র।

সর্বপ্রথম বাসুদেব ঘোষের ছই ভ্রাতার হাতে খোল বাজিত এবং

মুকুন্দ ও শ্রীবাস মধুর কণ্ঠে হরিনাম গাইতেন আর বক্তৃৎসর তাঁহার

স্বর্গীয় নৃত্যে দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিতেন। এই কেন্দ্রের মধ্যবর্তী ছিলেন চৈতন্ত।

চৈতন্ত পুরীতে গেলে নবদ্বীপ হতশ্রী হইল। এবার খোল বাজিয়া উঠিল পুরীতে।
বর্ষাকালে বাঙ্গালী ভক্তেরা শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বে পুরীতে চলিয়া আসিতেন, তখন শ্রীবাসের
কণ্ঠের স্বরলহরী ফিরিয়া আসিত; মুকুন্দ আবার গাইতেন,—বক্তৃৎসরের নৃত্যে, নিত্যানন্দ-
সমাগমে, স্বরূপ-দামোদর, রামরায় এবং রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্রের প্রোমোক্ষাসে ভক্ত
জনসাধারণ নীলাজিনাথের পথ ভুলিয়া বাঙ্গালী ভগবানের কীর্তনে বোঁগ দিতেন। মহাপ্রভুর
লীলাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই কেন্দ্র নিম্প্রভ হইয়া গেল।

তৃতীয় কেন্দ্র—বৃন্দাবন। মহাপ্রভুর লীলাবসানের পর বৃন্দাবন কতকদিন শোকে
সমাজহীন ছিল। এখানে শুধু ভক্তি ও প্রেমের চর্চা হয় নাই, অশেষ দৈন্ত—ব্রহ্মচর্য্যের
অশেষ কঠোরতা, ও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদিগের অশেষ পাণ্ডিত্য—এই কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য হইয়া
ইহাকে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিল। এখানে সনাতনের হরিভক্তিবিলাস, রূপের ললিতমাধব,
বিদগ্ধমাধব, উজ্জ্বল-নীলমণি, দানকেলী-কৌমুদী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত

হইয়াছিল। এখানে বুদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার আজীবন ব্রহ্মচর্য ও অশেষ পাণ্ডিত্য ও সাধুতার অমৃতফলস্বরূপ বাঙ্গলা ভাষায় বিরচিত অপূর্ণ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; এখানেই নরহরি চক্রবর্তী তাঁহার অসামান্য অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের কীর্তিস্তম্ভ ভক্তিব্রতাকর গ্রন্থ সংকলন করেন। উত্তরকালে জীব গোস্বামী এই বৃন্দাবন কেন্দ্রের নেতা হইয়াছিলেন। এখানে রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, জীব ও গোপাল ভট্ট—এই ছয়জন গোস্বামী বাস করিয়া গিয়াছেন। উত্তরকালে যে সকল বৈষ্ণবগ্রন্থ বাঙ্গলাদেশে লিখিত হইত, তাহা এই গোস্বামীদের নিকট প্রেরিত হইত। যে সকল গ্রন্থ ইহারা অনুমোদন করিতেন, তাহাই বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত হইত। যাহাতে ইহাদের শিলমোহর থাকিত না, তাহা বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত হইতে পারিত না। ইহারা বৈষ্ণব-সমাজের বিধানকর্তা ও নিয়ন্তা ছিলেন। বৃন্দাবন দাস তাঁহার ‘চৈতন্যমঙ্গল’ লিখিয়া ইহাদের অনুমোদনের জন্ত বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, গোস্বামীরা ইহা পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাঙ্গাপক ভাগবতের সঙ্গে ইহার সৌসাদৃশ্য দেখিয়া ইহার নাম ‘চৈতন্যভাগবত’ রাখিয়াছিলেন।

জীব গোস্বামী ছিলেন রূপ ও সনাতনের সহোদর অনুপমের পুত্র। জীব অতি সুন্দর ছিলেন, তাঁহার পিতৃব্যেরা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহারা চৈতন্যের পাগল—এই সমস্ত কথা বাল্যে যখন তাঁহার মাতা বলিতেন, তখন বালকের গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িত। অল্পবয়সে তিনি সর্বশাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করেন। কিন্তু ভক্তির আকর্ষণে তিনি একেবারে উন্মত্ত হইয়া যাইতেন। এই সংসার তাঁহার নিকট অল্পবয়সেই অসার বোধ হইত—পিতৃব্যদের পরিত্যক্ত অতুল ঐশ্বর্য, কৈশোরাতিক্রান্তে তাঁহার অতুলা রূপ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য—এসকলের আকর্ষণ তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। যাহাকে চৈতন্য আকর্ষণ করিতেন—তাঁহাকে কে রোধ করিবে? একদিন ষোড়শবর্ষীয় বালক জীব তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, সন্ন্যাসী হয় কেমন করিয়া?” মাতা কাদিতে কাদিতে সন্ন্যাস লওয়ার পদ্ধতি বলিতে লাগিলেন, কারণ—শুধু তাঁহার স্বামীর জাতারা নহেন, তাঁহার স্বামীও মৃত্যুর অনতিকালপূর্বে সন্ন্যাসদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতাশ্রমে মাতা কিরূপে মস্তক মুগুন করিতে হয়, কিরূপে দীক্ষা লইতে হয়, কিরূপে গৈরিক বস্ত্র পরিতে ও দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়—এই সকল কথা বলিলেন। বালক বলিল, “আমার পিতৃব্যেরা অতুল সম্পদের অধিকারী ছিলেন, তাঁহারা সন্ন্যাস লইয়া জঙ্গলের বৃক্ষপত্র শয়ন করিয়া ও তথাকার কদম্ব ফল খাইয়া কিরূপে থাকেন?” মাতা বলিলেন, “ধর্ম বিশ্বাস ও চৈতন্যের প্রতি ভালবাসার দরুন তাঁহারা দৈহিক কষ্টকে কষ্টের মধ্যেই গণ্য করেন না।” পরদিন জীব দণ্ডহস্তে ও গৈরিক পরিয়া মাতার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, “মা, আমায় কি সন্ন্যাসীর মত দেখায় না? এখন হইতে সকলে আমাকে প্রণাম করিবে—আমি একজন সাধু!” সুন্দর বালককে গৈরিক বাসে বড়ই মানাইয়াছিল। মাতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “এমন সুন্দর চাঁচর কেশ মাথায় করিয়া কি কেহ সন্ন্যাসী হইতে পারে?” বালক অণকাল নিরন্তর থাকিয়া বলিল, “আচ্ছা, কাল দেখিবে।”

পরদিন মস্তক মুণ্ডিত করিয়া গৈরিকপরিহিত কিশোর জীব মাতাকে বলিল, “মা, প্রণাম, তোমার স্নেহের ছালাকে চিরদিনের জন্ত বিদায় দাও, আমি ব্রাহ্মণ, আমার পিতা ও পিতৃব্যদের যে গতি, আমারও তাহাই। আমি বিষয়ভোগের জন্ত জন্মগ্রহণ করি নাই। মা, আমি চলিলাম, তোমার স্নেহের ছেলেটিকে আর দেখিতে পাইবে না।” জীব ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতাকে প্রণাম করিল। বজ্রাহতের জ্বায় মাতা জ্ঞানহারা হইয়া রহিলেন। রূপ-সনাতনের পরিবারবর্গ যত্নেয়াবাদে বাস করিতেছিলেন, তথা হইতে জীব সন্ন্যাস লইয়া প্রথমতঃ নবদ্বীপে আসিলেন। তিনি শ্রীবাসের বাড়ীতে আসিয়া নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

বৃন্দাবন—বাঙ্গালী সন্ন্যাসী-
দের সৃষ্টি।

শ্রীবাসের আশ্রিনা চৈতন্যের পদরজে পবিত্র হইয়াছিল। বালক সন্ন্যাসী কাদিতে কাদিতে সেই আশ্রিনায় গড়াইয়া পড়িলেন।

নবদ্বীপ হইতে কাশী যাইয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির নিকট তিনি কয়েক বৎসর উপনিষদের শিক্ষালাভ করিলেন। বৃন্দাবনে আসিয়া স্বীয় পিতৃব্যদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অচিরে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইল। রূপ ও সনাতনের পরে বৈষ্ণব-সমাজে তেমন প্রতিষ্ঠা আর কাহারও হয় নাই। তিনি ২৫ খানি সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন, ইহাই গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান ভিত্তি। এই পুস্তকগুলির মধ্যে বটসন্দর্ভই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। উত্তরকালে জীব গোস্বামীই বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র কর্ণধার হইয়াছিলেন। কোন পণ্ডিত বা সামাজিকের শাস্ত্র-বিষয়ে বিধা উপস্থিত হইলে তাঁহারাই জীব গোস্বামীর নিকটে বৃন্দাবনে পত্র লিখিতেন, তাঁহার সিদ্ধান্তই শিরোধার্য্য হইত। নাভাজি ভক্তমালে লিখিয়াছেন, “শ্রীরূপ সনাতন ভক্তিজল শ্রীজীব গোসাই সর গম্ভীর। বেলা ভজন স্থপক রসায়ন কবছ ন অভিলাষী। বৃন্দাবন দৃঢ়বাস যুগলচরণ অমুরাগী। সন্দেহ গ্রন্থচ্ছেদন সমর্থ রসবাসী উপাসক পরম বীর। শ্রীরূপ সনাতন, শ্রীজীব গোসাই সর গম্ভীর।” গ্রাউজ সাহেব তাঁহার মথুরার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, “এই সময়ে বৃন্দাবনের সর্বাপেক্ষা লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ, বৈষ্ণব-সমাজের নেতা ছিলেন রূপ ও সনাতন। ইহাদের সহিত তাঁহাদের ভ্রাতৃপুত্র জীব গোস্বামীর নাম করাও কর্তব্য। মানসিংহ গোবিন্দজীর যে মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই কয়েকটি কথা উৎকীর্ণ হয়—“মহারাজ পৃথ্বীরাজের বংশোদ্ভব মহারাজ শ্রীভগবান্দাসের পুত্র, মহারাজ মানসিংহকর্তৃক এই মন্দির তাঁহার গুরু রূপ ও সনাতনের আদেশে সম্রাট আকবরের ৩৪ রাজ্যাব্দে নির্মিত হয়। গ্রাউজ সাহেব বলেন, “It is the most impressive religious edifice that the Hindu art has ever produced at least in Upper India. It is not a little strange that of all architects who have described this famous building, not one has noticed its most characteristic feature—the harmonious combination of dome and spire which is still noted as the great crux of modern art, though nearly 300 years ago; the difficulty was solved by the Hindus with characteristic grace and ingenuity.” [ভারতবর্ষে অস্তুত; আখ্যাবর্তে এই ধর্মমন্দির

স্থাপত্য হিসাবে সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হিন্দুরা যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন—এই মন্দির তন্মধ্যে সৰ্ব্বাপেক্ষা মহিমাযিত। আশ্চর্য্যের বিষয় যত স্থপতিবিশারদ এই মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহই ইহার একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন নাই। গম্বুজ ও চূড়ার অপূৰ্ণ সামঞ্জস্য এই মন্দিরে যাহা দৃষ্ট হয়—তাহা শুধু সম্প্রতি যুরোপের স্থপতিবর্গ কলাকোশলের সৰ্ব্বাপেক্ষা জটিল প্রশ্ন বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে হিন্দুরা তাঁহাদের অভ্যন্ত বৈশিষ্ট্য, মনোহারিত্ব ও কৌশল সহকারে এই সমস্তার উৎকৃষ্ট সমাধান করিয়াছিলেন]। গ্রাউজ এই সকল মন্দিরের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। এই মন্দির স্থপতিবিজ্ঞাবিশারদ কল্যাণ দাস, স্থপতি গোবিন্দ দাস এবং মণিকচাঁদ চোপরের সাহায্যে নির্মিত হইয়াছিল।

বৃন্দাবনে রূপ, সনাতন ও জীব যে ভাবে জীবন বাপন করিতেন, একটি ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা দ্বারা তাহা বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

এককালে কামরূপের রাজধানী এগারসিন্দুরের নিকটবর্তী ভাটাদিয়া গ্রামে লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য নামক এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাহার সাক্ষী

রূপনারায়ণ।

পত্নীর নাম কমলা দেবী। ইহাদের একমাত্র সুদর্শন পুত্র ছিলেন

রূপনারায়ণ। অল্পবয়সে তিনি লেখাপড়ায় অমনোযোগী ও দ্রবৃত্ত ছিলেন। সংশোধনের সমস্ত চেষ্টা বিফল হওয়াতে একদা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পত্নীকে আদেশ করিলেন, বালককে অঙ্গার খাইতে দিতে। সাক্ষী কমলা দেবী স্বামীর আদেশ অমান্য করিতে না পারিয়া ভাতের থালার এক পার্শ্বে একটুকরা কদলা ধুইয়া তাহা পুত্রকে পরিবেষণ করিলেন। কিন্তু রূপনারায়ণের দৃষ্টি সেই কদলাটুকুর দিকেই সৰ্ব্বাগ্রে পড়িল। মাতার নিকটে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া কারণ জানিতে পারিলেন এবং তদন্তে অঙ্গের থালা তেলিয়া ফেলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। প্রথম পঞ্চবটী নামক এক গ্রামের টোলে আসিয়া তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন, তারপর নবদ্বীপে আসিয়া তথাকার টোলে নান্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তথা হইতে অহুমান ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পুরীতে আসিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা করেন, কিন্তু উক্ত যুবক ভক্তির সেই প্রবল বস্তার পাশ কাটাইয়া কাশীতে আসিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র আরও বিশেষ করিয়া অধ্যয়ন করেন। সর্বশেষে রূপনারায়ণ বোম্বাইয়ের পুণা নগরীতে যাইয়া পাঠসমাপ্তিপূর্বক “সরস্বতী” উপাধি লাভ করেন।

তেজস্বী উক্ত যুবক এখন পণ্ডিত-শিরোমণি হইলেও তাঁহার স্বভাবের কোন পরিবর্তনই হয় নাই। তিনি আখ্যায়িক্তে আসিয়া হস্তার দিয়া বলিলেন, “আমি মিথিঙ্গয়ী, যদি কোন পণ্ডিতের গোরব থাকে, তবে সেই গোরব পরীক্ষা করিবার কষ্টিপাথর আমি। আমার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হউন।” বহু পণ্ডিতকে ঘাল করিয়া এক বোঝা জয়পত্র সঙ্গে লইয়া তিনি বৃন্দাবনের দিকে ছুটিলেন, কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন, রূপ ও সনাতনের যত পণ্ডিত তখন ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। দৈতের অবতার ভ্রাতৃত্ব রূপনারায়ণের গর্ভিত আক্রমণের উত্তরে বলিলেন, “ভাই, তুমি ভুল শুনিয়াছ, লোকে আমাদের সামান্য গুণ বাড়াইয়া তোমাকে

বলিয়াছে। আমরা দীনহীন কৃষ্ণকৃপাপিপাহু, তোমার মত পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামিবার সামর্থ্য আমাদের নাই।” স্পর্ধিত পণ্ডিত বলিলেন, “সে হইলে ছাড়িব না। তর্কে না পার, আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দাও।” সদাশয়তার আতিশয্যে এবং বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও দৈন্তের বশবর্তী হইয়া তাঁহার উহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন, কারণ বৈষ্ণবের নীতি “অমানিনা মানদেন কীৰ্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।” এই জয়পত্র হাতে করিয়া রূপ সরস্বতী মনে করিলেন—তিনি ভারতের বিস্তারাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট। কিন্তু কে যেন বলিল, বৃন্দাবনেই এই ছই ভ্রাতার এক পাণ্ডিত্যভিমानी ভ্রাতৃপুত্র আছেন, তিনিও বড় কম নহেন। রূপনারায়ণ অমনি বাইয়া জীব-গোস্বামীর কুটিরে উপস্থিত। তাঁহার পিতৃব্যজয়ের স্বাক্ষরিত জয়পত্র দেখিয়া যুবক জীব-গোস্বামী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তখনই সরস্বতীর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঁচদিন পর্য্যন্ত বিচারে সমকক্ষতা চলিল, কিন্তু বষ্ট দিনে জীবের নিকট রূপনারায়ণ পরাস্ত হইলেন,—সপ্তম দিনে উপনিষৎ এবং অদ্বৈতবাদের বিচার সমাধার পর জীব গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। রূপনারায়ণের নিকট ইহা সম্পূর্ণ নূতন। সপ্তমদিনের ব্যাখ্যায় পাথর গলিয়া জল হইয়া গেল—অহঙ্কার ও দর্প রসাতলে গেল। অন্তশোচনায় দগ্ধ হইয়া রূপনারায়ণ রূপ-সনাতনের নিকট বাইয়া তাঁহার অকৃত্রিম দৈন্ত ও অহুতাপ জ্ঞাপন করিলেন এবং বৈষ্ণব-ধর্মের দীক্ষিত হইলেন। তারপর তিনি বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতার নিকটবর্তী পঞ্চপল্লীর রাজা নৃসিংহের সভাপণ্ডিত হইলেন এবং বৈষ্ণবশাস্ত্র চর্চা করিতে লাগিলেন। রূপনারায়ণ সঙ্গীত-শাস্ত্রেও কৃতি ছিলেন, রাজসভায় তাহারও আলোচনা চলিল।

এদিকে জীবকে রূপ গোস্বামী বলিলেন, “তোমার বিচারজয়ের প্রবৃত্তি এখনও দূর হয় নাই—তুমি বৃন্দাবনে বাস করিবার যোগ্য নও; সর্বতোভাবে অহঙ্কার বিলুপ্ত না হইলে বৃন্দাবনবাসের যোগ্যতা হয় না, তুমি বৃন্দাবনের সীমানার মধ্যে

রূপ-সনাতনের সৈন্য।

ধাকিতে পারিবে না।” পিতৃব্যের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া জীব বৃন্দাবন ছাড়িয়া যমুনা-তীরে এক কুটিরে বাস করিয়া প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া এক বৎসর কাটাইলেন। একদিন সনাতন রূপকে বলিলেন, “বলতো ভাই, বৈষ্ণব-ধর্মের প্রধান গুণ কি?” রূপ বলিলেন, “জীবে দয়া।” সনাতন বলিলেন, “তবে তুমি জীবের প্রতি এত নিষ্ঠুর কেন?” জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া রূপ জীব-গোস্বামীকে বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিতে অহুমতি দিলেন।

১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর রূপ ও সনাতনের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। গাউজ সাহেব লিখিয়াছেন, এই দর্শনের ফলে সম্রাট এতই প্রীত হইয়াছিলেন যে, সমস্ত হিন্দুরাজাদিগকে বৃন্দাবনে বড় বড় মন্দির-নির্মাণের অহুমতি দিয়াছিলেন। স্বয়ং চৈতন্তের বহু গুণকীৰ্ত্তন শুনিয়া তিনি চৈতন্তসদৃশ একটা হিন্দী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের ‘গৌরলীলা-তরঙ্গিনী’তে দ্রষ্টব্য। কথিত আছে অদ্বৈত সর্বপ্রথম মদনমোহন বিগ্রহ আবিষ্কার করেন, তিনি উহা মথুরা চৌবে নামক এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, উক্ত চৌবে উহা সনাতনকে দিয়াছিলেন। রামদাস কাপুরী নামক একজন ক্ষেত্রী নদীতে তাঁহার

বহুশ্রম বাণিজ্যব্যবসায় জাহাজ আটকাইয়া যাওয়াতে মদনমোহন-বিগ্রহের নিকট যানত করেন, জাহাজ উদ্ধার পাইলে তিনি সেই বৎসরের সমস্ত আয় দিয়া উক্ত বিগ্রহের জন্ত মন্দির নির্মাণ করাইবেন। মদনমোহনের বিশাল মন্দির এই যানতের ফলে প্রস্তুত হইয়াছিল। গ্রাউজ সাহেবের ইতিহাস, চৈতন্যচরিতামৃত, নাভাজিকৃত ভক্তমাল ও লক্ষণদাসপ্রণীত ভক্তিসিদ্ধ পুস্তকে এই বিগ্রহ-সংক্রান্ত অনেক কথা আছে। উত্তরকালে এই বিগ্রহ জয়পুরের রাজা লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি উহা তাঁহার ভ্রাতা কারাউলির রাজা গোপাল সিংহকে প্রদান করেন, তিনি ইহার জন্ত তথায় একটি নূতন মন্দির তৈরী করিয়া পূজার ভার রামকিশোর গোসাঁই নামক মুর্সিদাবাদের এক ব্রাহ্মণের হস্তে ছত্ত করেন। এই ভাবে চৈতন্যের প্রভাবে তাঁহার ভক্তগণকর্তৃক যে নব বৃন্দাবন স্থাপিত হয়, তাহা ক্রমে একরূপ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ

মহাপ্রভুর তিরোধানের পর বৃন্দাবনের ষট্ গোস্বামী গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের নিয়ন্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের স্থলে আর তিনজন

নেতৃত্বপদে অভিবিক্ত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্মের ক্ষেত্র অশেষরূপে
শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও
শ্যামানন্দ।

বাঙ্গলা গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, তন্মধ্যে ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, নরোত্তমবিলাস, বংশী-শিক্ষা, অমুরাগবল্লী, কর্ণামৃত প্রভৃতি পুস্তক উল্লেখযোগ্য। এই তিনজনের মধ্যে প্রথম নাম শ্রীনিবাস আচার্য্যের।

কথিত আছে চৈতন্যদেব ইহার আবির্ভাবসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। ইনি নবদ্বীপের নিকটবর্তী চাখন্দিবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের পুত্র। বর্কমান যাজিগ্রাম ছিল ইহার মাতুলালয়। ইহার মূর্তি অতি সুন্দর ছিল; বৈষ্ণব-সমাজে ইনি মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলিয়া পরিচিত। ধনঞ্জয় বিজ্ঞানিবাসের নিকট ইনি শৈশবে সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

কিন্তু ইহার পিতা ছিলেন চৈতন্যের অমুরাগী। সেই অমুরাগ
শ্রীনিবাস।

পুত্রে বর্ধিতাছিল। শৈশবে গঙ্গাধর নবদ্বীপে ইহাকে লইয়া যাইয়া চৈতন্যলীলার সমস্ত স্থান দেখাইতেন ও সেই মধুরাদপি মধুর লীলাকাহিনী শুনাইতেন। বক্তা ও শ্রোতা—পিতাপুত্র—দুই জনেই কাঁদিয়া আকুল হইতেন। গঙ্গাধরের মৃত্যুর পর ইনি নবদ্বীপে শচী দেবীর সঙ্গে দেখা করেন। তৎপরে পুরীতে গঙ্গাধরের নিকট ভাগবত পড়িতে যান। গঙ্গাধরের একখানি মাত্র ভাগবতের পুঁথি ছিল, তাহার অক্ষর মহাপ্রভুর অক্ষরে মুদ্রিত গিয়াছিল। বঙ্গদেশ হইতে একখানি বিশুদ্ধ পুঁথি আনিলে তিনি পড়াইবেন—

স্বীকার করিলেন। তৎকালে যাতায়াত সহজ ছিল না। কয়েক মাস পরে শ্রীনিবাস ভাগবতের পুঁথি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া গুনিলেন, গদাধর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তখন ফিরিয়া বাঙ্গলায় আসিয়া নিত্যানন্দের পত্নী শ্রীজাহ্নবী গোস্বামিনীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁহার আদেশে বৃন্দাবনে রওনা হন, উদ্দেশ্য রূপ-সনাতনের নিকট ভক্তিশাস্ত্রপাঠ। বাজিগ্রাম হইতে পাঁচদিনে রাজমহল আসিয়া তথা হইতে গোড়ঘার হইয়া পাটনায় আসিলেন। কানীতে বাইয়া চৈতন্তের লীলাক্ষেত্রগুলি, বিশেষতঃ চন্দ্রশেখরের বাড়ীর তুলসীতলা, যেখানে মুসলমান দরবেশবেশী হরিদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, সেই সকল দেখিয়া তাঁহার মনে প্রেম ও শোকের বহা বহিয়া গেল। চৈতন্ত-প্রেমে তিনি প্রায়ই উপবাস করিতেন, তাঁহার জীবনের কথা বলিতে বলিতে গদগদকণ্ঠ হইয়া আর কথা বলিতে পারিতেন না,—প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি হইত চোখের জলে। যে এই সুদর্শন বালককে দেখিত সেই ইহাকে প্রাণের হ্রাল ও অন্তরঙ্গ ভাবিয়া আলিঙ্গন করিতে চাহিত। তাঁহার জিহ্বাগ্রে ছিলেন সরস্বতী করুণ রসের ভাণ্ডার লইয়া। বৃন্দাবনের পথে গুনিলেন, রূপ ও সনাতন উভয়েই অল্প সময়ের ব্যবধানের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; বৃন্দাবন তাঁহাদের শোকে অন্ধকার।

নিরাশ বালক বহু পরিতাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু জীব গোস্বামী ইহার ভক্তি ও প্রতিভাদর্শনে ইহাকে আশ্রয় দিয়া ভক্তিশাস্ত্র সম্যাক্রূপে শিখাইতে লাগিলেন। এই সময়ে অপর দুই জন প্রসিদ্ধ যুবকের সঙ্গে ইহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি রাজসাহী জেলার খেতুরী নামক নগরীর রাজা কৃষ্ণানন্দের একমাত্র পুত্র নরোত্তম দত্ত। খেতুরী বেয়ালিয়া হইতে ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং পদ্মার তীরস্থ প্রেমতলী গ্রামের এক মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। কৃষ্ণানন্দের বহুদিন কোন সন্তান জন্মে নাই। নরোত্তম সেই রাজবাড়ীর চোখের মণিরূপ ছিলেন। শ্রীনিবাসের ছায় নরোত্তমও অতি প্রিয়দর্শন। শৈশব হইতেই তাঁহাকেও চৈতন্তপ্রেম পাইয়া বসিয়াছিল। একদিন পদ্মার তীরে বালক সেই সমুদ্রতুল্য অসীম জলরাশি দেখিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তিনি দেখিলেন এক গৌরঙ্গ পুরুষ উজ্জলোক হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, “নরোত্তম, তুমি তো বিষয়ভোগের জন্ত জন্মগ্রহণ কর নাই—তুমি যে আমার। আমার কাছে এস।” সেই পরম অন্তরঙ্গের স্বর যেন তিনি স্বপ্নপটে শুনিতে পাইলেন। তখনই তিনি অজ্ঞান হইয়া নদীতীরে পড়িয়া গেলেন। রাজবাড়ী হইতে বহু সন্ধ্যাে তাঁহার খোঁজ মিলিল। চিকিৎসকেরা শিবাদিদ্বয়ের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু নরোত্তম বলিলেন, “যদি আমার জন্ত শিবা হত্যা করা হয় তবে আমি না খাইয়া প্রাণত্যাগ করিব।” কিন্তু রাজা দেখিলেন—যেমন দেখিয়াছিলেন কপিলাবন্তর শুদ্ধোদন,—যেমন দেখিয়াছিলেন সখ্যগ্রামের গোবর্দ্ধন দাস—ভরা যে ভূবি হয়। চৈতন্তের নাম করিতে সন্তোষিকশিত সরসিজের ছায় বালকের শ্রীমুখ অশ্রুতে ভাসিয়া যায়। গোড়ের সম্রাট কৃষ্ণানন্দ দত্তের অন্তরঙ্গ ছিলেন। কৃষ্ণানন্দ তাঁহার ইজারাদার ছিলেন। তিনি রাজার বিপদ শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, “নরোত্তমকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও, আমি তাহার রোগ সারাইয়া দিব।” বহু অথারোহী সৈন্ত-পরিবেষ্টিত করিয়া বোড়শবর্ষবয়স্ক

নরোত্তমকে গোড়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু তরুণ নরোত্তম সন্ন্যাসের কাঁদে পা দিলেন না।

উর্দ্ধ হইতে সেই বাণী যে তিনি সর্বদা শুনিতেছিলেন। তারপর সিদ্ধার্থ যাহা করিয়াছিলেন, রঘুনাথ দাস যাহা করিয়াছিলেন, রূপ-সনাতনের জীবনে যে বিরাগ দেখা দিয়াছিল সেইরূপ বিরাগের বশবর্তী হইয়া বালক-নরোত্তম পালাইয়া গেলেন। প্রহরীরা জাগিয়া দেখিল—পিঞ্জর খালি, পাখী উড়িয়া গিয়াছে। উর্দ্ধস্থানে ছুটিয়া বালক পালাইতেছেন, সংসারকে বিভীষিকা ভাবিয়া—বিলাসকে নরকের বাগুরা মনে করিয়া বিখ-হিতের আহ্বানে সে কি উন্নতভাবে ছুটিয়াছেন! ক্ষুদ্র গিরিনদী যেরূপ শৈলখণ্ড ভাসাইয়া লইয়া যায়, হৃদয়মনীয় ভক্তি তাঁহাকে সেইরূপ তাড়াইয়া লইয়া চলিল। কয়েক দিন পরে দুর্গম জঙ্গলের অজ্ঞাত পথ ভাঙ্গিয়া বালক কাশীর নিকট রাজঘাটে উপস্থিত হইলেন—তখন তাঁহার সুন্দর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। দুই দিনের উপবাসী, পদ্মপ্রভ মুখখানি স্নান, ভ্রমণে অনভ্যস্ত দুইটি পদতল কণ্টকবিদ্ধ হইয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। এক বৃক্ষতলে পড়িয়া তিনি আর উঠিতে পারিলেন না—আবার সম্পূর্ণ স্বর শুনিলেন, “তুমি আমার জন্ত এত সহিয়াছ, তরুণ জীবনে সমস্ত সুখভোগের আশা বিসর্জন দিয়া আসিয়াছ, আমি তোমাকে ছাড়িব না, উঠ খাও।” তাঁহার তন্ত্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তখনই কোন ব্যক্তি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে এক বাটা দুধ দিয়া গেল। তিনি উহা পান করিয়া কুধাতৃষ্ণা দূর করিলেন এবং তৃপ্ত হইলেন। বৃন্দাবনের নিকট কয়েক জন তীর্থগামী সন্ন্যাসী জুটিল। চৈতন্তের কথা বলিতে গেলে বালকের প্রেমে কণ্ঠরোধ হয়, আনন্দাশ্রুতে গণ্ড প্লাবিত হয়। সন্ন্যাসীদেরও চোখ হইতে জল পড়ে এবং ঘনঘন রোমাঞ্চ হয়—তাহারা ভাবিল “এ দেববালক কে?”

বৃন্দাবনে আসিয়া সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত, নিঃসঙ্গ বালক পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান, অগ্নাহারে শরীর ক্লশ, কিন্তু কোন স্বাধীন নৃপতি যদি কারাগার হইতে মুক্তি পান, হাত-পায়ের লৌহশৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলেন, তবে তাঁহার সেই মুক্তির আনন্দই যেরূপ সকল আলা জুড়াইয়া দেয়—নরোত্তমেরও সেইরূপ হইল। তাঁহার মুখ অলৌকিক প্রফুল্লতায় উজ্জল। এই অবস্থায় সুপ্রসিদ্ধ লোকনাথ গোস্বামীর আশ্রমে শেখরাব্রু চুকিয়া নিত্য নিত্য তাহার আবের্জনা মুক্ত করিয়া ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া আসেন। সেই অদ্ভুতকন্ধ্যা, বিষয়নিঃস্পৃহ, সম্পূর্ণ অনাসক্ত, অপ্রতিগ্রাহী সন্ন্যাসী দেখিলেন, কে বেন তাঁহার আশ্রম ও আশ্রিনা ফিটফাট করিয়া রাখিয়াছে। একদিন, দুইদিন, তিনদিন তিনি বিষয়সহকারে এই অদ্ভুত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়া এক রাত্রি জাগিয়া রহিলেন—চোরকে ধরিবার জন্ত। হঠাৎ সেই জ্যোৎস্না-পুলকিত নিশীথে তিনি দেখিতে পাইলেন, দেবতার মত সুন্দর এক কুমার ঝাঁটা হস্তে আশ্রিনার দাঁড়াইয়া। তাঁহার চক্ষু দুটি পদ্মদলের মত জলে ছলছল করিতেছে, কখনও ঝাঁট দিতেছেন এবং কখনও বা ঝাঁটাটি বুকে রাখিয়া অজস্র চক্ষুজলে গণ্ড প্লাবিত করিতেছেন। লোকনাথ পরম স্নেহভরে পিছন দিক্ হইতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—“চোর। তুমি কে? আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না।” লজ্জিত ও বিস্মিত বালক লজ্জাবর্তী তরুণীর

জায় আর কথা বলিতে পারিলেন না, ভাঙ্গা সুরে অল্প কথায় বলিলেন, “যদি ছাড়িবেন না, তবে আমাকে শিষ্য করুন।”—যে যোগিবর পাছে মনে অহঙ্কারের উদয় হয় এজন্ত কখনও শিষ্য গ্রহণ করেন নাই, তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তাঁহার গ্রন্থের বহু উপকরণ দিয়া নিজের নাম উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তিনি চৈতন্তের বাল্যসখা এবং তাঁহারই আদেশে বুকভরা ব্যথা লইয়া—চৈতন্তের শ্রীমুখদর্শনে চিরজীবন বঞ্চিত হইয়া—বৃন্দাবনের এককোণে হৃৎচর প্রেম-তপস্জায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই বিষয়বিরাগী, কৃষ্ণে সমর্পিতজীবন প্রেমের সন্ন্যাসীর অটল সঙ্কল্প আজ টলিল। বিশাল বিটপিশাখা বেক্রপ বনলতাকে আশ্রয় দেয়, তিনি সেই ভাবে নরোত্তমকে দীক্ষা দিয়া তাঁহার নিকট রাখিলেন। ক্রমে বালকের পাণ্ডিত্য, অসীম ভক্তি ও পদগৌরব বৃন্দাবনে বিদিত হইল, জীব গোস্বামী শ্রীনিবাসের সঙ্গে তাঁহারও শিক্ষার ভার লইলেন।

তৃতীয় ব্যক্তির নাম **শ্রীমানন্দ**। ইনি নিম্ন শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার পিতা কৃষ্ণ মণ্ডল উড়িষ্যার দণ্ডকেশ্বর পরগনার ধারেন্দ্র বাহাদুরপুরবাসী ছিলেন। কিন্তু

শ্রীমানন্দ।

এই পরিবার শেষে বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীমানন্দের নাম ছিল হুখী। অল্পবয়সেই ইহার বিরাগ উপস্থিত

হইয়াছিল। ইনি কালনায় আসিয়া গৌরীদাস পণ্ডিতের চৈতন্তমন্দিরে কতকদিন বাস করিয়াছিলেন। এখানকার পুরোহিত হৃদয়চৈতন্ত দয়া করিয়া ইহাকে ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং ইহার হুখী নাম ঘুচাইয়া কৃষ্ণদাস নাম দিয়াছিলেন। কালনা হইতে ইনি যাত্রা করিয়া ভারতের বাবং তীর্থস্থান দর্শন করেন। “রসিকমঙ্গল” নামক পুস্তকে ইহার বিস্তৃত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত দেওয়া আছে। ইংরেজেরা বাহাকে mystic বলেন, ভারতের সাধু-সম্প্রদায়ের সকলেই সেই শ্রেণীভুক্ত। ইহারা যে সকল রূপ বা দৃশ্য দর্শন করেন, তাহা সাধারণ লোকেরা চন্দ্রচক্ষে দেখিতে পায় না। নরোত্তম তাঁহার মানস গৌরান্দের রূপ দেখিয়াছিলেন, শ্রীনিবাসও কত কি দেখিয়া সমাধির দশা প্রাপ্ত হইতেন, “কর্ণানন্দ” প্রভৃতি পুস্তকে তাহা বর্ণিত আছে। তিনি মূর্ছিত অবস্থায় মৃতকর হইয়া থাকিতেন, আত্মীয় ও ভক্তগণ তাঁহার জীবনের আশঙ্কা করিয়া বিষন্ন হইতেন। মহাপ্রভুর তো কথাই নাই, স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে ছিল তাঁহার জীবন। সেই আশ্চর্য্য কবিত্বময় স্বপ্নগুলি স্বপ্ন অব্যাক্ষজগতের দৃশ্যের জায়—তাহা ধরা-ছোঁয়া যাইত না। ক্যাথারিন অব সিয়েনা (১৩৪৭ খৃঃ জন্ম) ছয় বৎসর বয়সে এক গির্জা-ঘরের উপরে খুঁটের মূর্তি দেখিতেন, তাঁহার জীবনই এই স্বপ্নদ্বারে কাটিয়াছিল। জীবনে কতবার যে এই মূর্তি দেখিয়া তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া অলৌকিক আনন্দ উপভোগ করিতেন তাহার ঠিকানা নাই। সেন্ট টেরেসা (১০২১-১১৪৩ খৃঃ) খুঁটমূর্তি এতবার দেখিয়াছেন যে তাঁহার পুনঃ পুনঃ প্রেমের আবেগে মনে হইয়াছে যে তিনি ও খুঁট এক। জয়দেবের রাধার সম্বন্ধে “মুহুরবলোকিত মণ্ডনলীলা, মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা”, বিজ্ঞাপতির “অমুখন মাধব মাধব সোঙরিতে হৃন্দরী ভেল মাধাই” এবং ভাগবতের গোপীদের “অমুগুণ কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহারা নিজেই কৃষ্ণ এই ভাবিতে লাগিলেন” প্রভৃতি কাহিনীর সঙ্গে এই সকল ক্যাথলিক সাধুজীবনের অমুভূতির অনেকটা ঐক্য আছে। আণ্ডার হিলের ‘মিষ্টিসিজম’ পাঠ করিলে পাঠক

এ সম্বন্ধে বহু কথা জ্ঞাত হইবেন। মুসলমানদের মধ্যে জেলালুদ্দিন (১২০৭-১২৭৩ খৃঃ), হাফিজ (১৩০০-১৩৮৮ খৃঃ), এবং জামি (১৪১৪-১৪৯৩ খৃঃ) প্রভৃতি সুফী কবি ও সাধুদিগের আধ্যাত্মিক অমুভূতি এইরূপ হইয়াছিল। শ্রামানন্দ একদিন বৃন্দাবনে এক মন্দিরে বাইরা দেখিলেন, আরতি হইয়া গিয়াছে, পাণ্ডারা চলিয়া গিয়াছেন—এমন সময়ে স্বয়ং রাধিকা তথায় আসিয়া কৃষ্ণকে পরিক্রমা করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, সে কি স্বর্গীয় ভঙ্গী! কি আনন্দ কি ‘গতি অতি শুলবনী’! শ্রামানন্দ অপলক হইয়া দেখিতে লাগিলেন, দেবনৃত্যের বিরাম নাই। সমস্ত রাত্রি নিমেষের মত চলিয়া গেল। পাখীরা কাকলী করিয়া উঠিল। চমকিত হইয়া রাধিকা তাঁহার এক পায়ের স্বর্ণনুপুর ফেলিয়া গিয়াছেন। সমস্তটাই একটা স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিত, কিন্তু স্বর্ণনুপুরটিও একটা বাঁটি সামগ্রী, তাহা কি করিয়া সেখানে আসিল? সেই নুপুরটি হাতে করিয়া যখন শ্রামানন্দ সাশ্রুনেত্রে জীব গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন বৃন্দাবনের সমস্ত ভক্তমণ্ডলী এই অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করিয়াছিলেন, অনেক পুস্তকে এই কাহিনীটি বর্ণিত আছে। নিম্ন-কুলজাত হইলেও জীব গোস্বামী বিশেষ যত্নের সহিত শ্রামানন্দকে ভক্তিশাস্ত্র পড়াইয়া ছিলেন। যুবকের অসামান্য মেধা ও ধারণাশক্তি-দর্শনে জীব গোস্বামী আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া গুরু তাঁহার শিষ্যের নিকট হইতে একরূপ সন্তোষজনক উত্তর পাইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার বিশেষ পক্ষপাতী না হইয়া পারেন নাই। বৈদী ভক্তি, রাগানুগ, স্বকীয়া ও পরকীয়া ইত্যাদি বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে তিনি শ্রামানন্দকে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার সর্বশেষ উপদেশ ছিল:—“তুমি তোমার উপদেশ দেওয়ার পূর্বে ভাল করিয়া বুঝিবে, তোমার শ্রোতা জড়বাদী কিনা, যদি তাহা হয়—তবে তাহাকে কিছুই বলিবে না, তোমার সমধর্মী ও চিত্তবৃত্তির অমুকুল ব্যক্তির সহিত শাস্ত্রালোচনা করিবে।”

ইহার প্রথম নাম ছিল “হুঃখী”, দ্বিতীয় নাম “কৃষ্ণদাস”, তৃতীয় নাম জীব গোস্বামীর দেওয়া “শ্রামানন্দ”, এই নামই উত্তরকালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কোন কোন রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক পদে ইনি ‘হুঃখী’ ‘হুঃখিনী’ অথবা “হুঃখী কৃষ্ণদাস” এইরূপ নাম ভণিতায় ব্যবহার করিয়াছেন। ইনি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের একখানি পঞ্চানুবাদ রচনা করেন, তাহার এক মাত্র পুঁথি বিশ্ববিজ্ঞালয়ে আছে।

এই যে তিন ব্যক্তির কথা বলা হইল, ইহারা ই গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান পাণ্ডা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্পূর্ণ সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে এই তিন ব্যক্তির কীর্তিপ্রদীপে উজ্জ্বল। সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের একটু বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইয়াছে। জনসাধারণের উপর ইহাদের যে প্রভাব হইয়াছিল, তাহার তুলনা বঙ্গদেশে বিরল।

জীব গোস্বামী কৃষ্ণের প্রিয় বলিয়া হুঃখী কৃষ্ণদাসের উপাধি দিলেন ‘শ্রামানন্দ,’ শ্রীনিবাসের উপাধি হইল ‘আচার্য্য’ এবং নরোত্তমের উপাধি হইল ‘ঠাকুর মহাশয়’। বৈষ্ণব-সমাজে আচার্য্য প্রভু বলিতে একমাত্র শ্রীনিবাসকে ও ঠাকুর মহাশয় বলিতে শুধু নরোত্তমকে বুঝাইবে। এই তিন জনেই জীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র শিখিয়াছিলেন। তিনি

আদেশ করিলেন—“আমাদের এই ভক্তিগ্রন্থগুলি লইয়া তোমরা গোড়দেশে যাও, নতুবা শুধু বই পাঠাইলে কি হইবে—ইহাদের ব্যাখ্যা করিবে কে?”

শ্রীনিবাস বলিলেন—“আমরা সন্ন্যাসী, কি করিয়া আমরা গৃহে যাইব, আপনাকে ছাড়াই বা আমরা থাকিব কিরূপে? আপনার সঙ্গ ছাড়া স্বর্গও সুখকর নহে। জীব উত্তর করিলেন, “সত্য নিজে পাইয়া অপরকে বিতরণ করা ইহাই মুখ্য কর্তব্য। আমি তোমাদের শুক। আমি তোমাদিগকে আদেশ করিতেছি, বিরক্তি করিও না।”

১২১খানি ভক্তিগ্রন্থ—তন্মধ্যে সনাতনের হরিভক্তিবিলাস, হরিভক্তিরসামৃতসিদ্ধি, চৈতন্যচরিতামৃত, উজ্জল-নীলমণি, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, দানকেলী-কৌমুদী প্রভৃতি গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্কপ্রধান রত্নভাণ্ডার ছিল। একটি কাঠের ঝাঞ্জে মোমজমার আবরণে সুরক্ষিত করিয়া তাহা বড় একটা শকটে উত্তোলিত হইল। চারিটা বিশালকার বৃষচালিত শকট ও তৎপরিচালক ১০ জন সশস্ত্র ব্রজবাসীর সহিত যুবক সন্ন্যাসিত্রয় জয়পুর রাজের নিকট হইতে অহুমতিপত্র লইয়া গোড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে ছোটনাগপুরের বিশাল অরণ্য—ঝারিখণ্ড। ইহারা তথায় কোকিল-কলরব-মুখরিত বনশোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং চৈতন্য একদা ঐ বনে ভক্তির আবেশে বৃক্ষ ও লতাপল্লবকে কৃষ্ণ ভাবিয়া প্রিয়সম্বোধন-পূর্বক ছুটিয়া কাদিয়া বেড়াইয়াছেন, সেই প্রেমের পাগল দেবতার কথা সর্কত্র মনে করিয়া ইহারা কখনও তাহার পদরঞ্জের স্পর্শের আশায় সেই ভূমিতে লুটাইয়া পড়িতেন। বামে মগধের প্রান্তভূমি, তাহার আগ্রা হইয়া ইটা নামক স্থানে একটা প্রশস্ত পথ দিয়া চলিলেন।

এই সময়ে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাঙ্গির অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি দস্যু-বৃত্তি করিয়া স্বরাজ্যের বাহিরে নানাবিধ অত্যাচার করিতেন। সময়টা ছিল ১৬০০ খৃষ্টাব্দের সন্নিহিত, পাঠান ও মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ চলিতেছিল। গোড়েশ্বর প্রবল বহিঃশত্রুকে দমন করিতে ব্যস্ত, সমস্ত নৃপতিরা দেশ লুটপাট করিতেন, রাজস্ব দিতেন না, কিন্তু গোড়ের বাদশাহের মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যোগ করার সময়ে, গৃহকলহ বাড়াইবার ইচ্ছা বা শক্তি ছিল না; এইজন্য দেশে একরূপ অরাজকতা চলিয়াছিল। বীরহাঙ্গির কতকটা স্বাধীন হইয়া নানারূপ অত্যাচার করিতেন। সম্ভবতঃ কতলু খাঁ নবাবের নিকট তিনি উত্তরকালে ১,৬৭,০০০ টাকা বাৎসরিক রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখনও তিনি ঐরূপ কোন সন্ধি করেন নাই। তাহার নিজের ১৫টি প্রধান গুর্গ ছিল এবং তাহার অধীন ১২ জন সামন্ত রাজার আরও ১২টি গুর্গ ছিল। যদিও শেষে রাজস্ব দেওয়ার একটা বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কিন্তু মুরসিদ কুলিখাঁএর রাজত্বের পূর্বপর্যন্ত বনবিষ্ণুপুরের রাজারা একরূপ স্বাধীন ছিলেন।

একটা শকটের পিছনে গেরুয়াধারী তিনজন সন্ন্যাসী এবং ১০ জন সশস্ত্র ব্রজবাসীকে দেখিয়া বীরহাঙ্গিরের গুপ্তচরেরা মনে করল—নিশ্চয়ই এই শকট বহু ধনরত্নে বোঝাই। তারপর যখন সন্ন্যাসিগণের একজনকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, ইহার মধ্যে কি আছে? তখন তিনি শাস্ত্রগ্রন্থগুলির প্রতি প্রকার আতিশয্যে নিশ্চিন্তমনে বলিয়া ফেলিলেন—

“রত্ন”,—এই কথাটা মনের ভিতর উঠে রহিল। চরেরা এখন ঠিক বুঝিল ইহা মণিমানিক্য না হইয়া যায় না। বীরহাধিরের রাজসভায় জ্যোতিষিপ্রবর গণিদা বলিলেন—ঐ শকটের বাঞ্চে ধনরত্ন আছে। গুপ্তচরেরা শকটের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, সঙ্গে বীরহাধিরের নিযুক্ত দস্তায়েন্দ। তামর নামক একস্থানে আসিয়া দস্তারা কালীপূজা করিয়া লইল এবং সেই গ্রামেই তাহারা শকটটি আক্রমণ করিবে প্রথমতঃ এরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু সেই গ্রামে স্থবিধা হইল না। তারপর রঘুনাথপুর হইয়া শকট বীরগতিতে পঞ্চবটী নামক স্থানের দিকে আসিল, এই গ্রামের দক্ষিণে মালিয়ারা গ্রামে সন্ন্যাসিত্রয় এক সদাশয় জমিদারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া রাত্রিবাস করিলেন, পরদিন ইহারা গোপালপুর পল্লীতে আসিয়া পৌঁছিলেন,—ঐ সময়ে রাত্রিকালে হুইশত দস্তা রাহাজানি করিয়া শকটসহ বৃহৎ কাঠাধার লইয়া চম্পট দিল।

বীরহাধির প্রচুর ধন-লোভের আশায় সেই রাত্রে ঘুমান নাই। সেই রাত্রেই বাজ আসিয়া তাহার রাজপ্রাসাদে পৌঁছিল। তিনি উহা পাইয়া এত হুঁপে হইয়াছিলেন যে বাজ খুলিবার পূর্বেই দস্তাদিগকে পারিশ্রমিক ও পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

তিনি ভাঙারে যাইয়া বাজ খুলিলেন। কিন্তু একি, প্রথমেই একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ। “রূপের আখর যেন মুকুতার পাতি”, মহাপ্রভু বলিতেন। সেই মুক্তাসম অক্ষরগুলি দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন, সমস্তই পুস্তক—ধর্মগ্রন্থ, রত্নের নামগন্ধ নাই। বীরহাধির সভার জ্যোতিষী পণ্ডিতকে বলিলেন, “তোমার ভবিষ্যদ্বাণী এইরূপ।” জ্যোতিষী লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন। রাজা বলিলেন, “রত্ন বই কি? যে জহরত চিনে, তাহার নিকট এগুলি রত্নই বটে।” গুপ্তচরকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন সাধু—কোন পণ্ডিতের আজীবন সাধনার ফল তোমরা লইয়া আসিয়াছ? তাহাদের উপর তো অত্যাচার হয় নাই? তাহাদের নিঃখাসে আমার রাজপ্রাসাদ দগ্ধ হইয়া যাইবে।” গুপ্তচরেরা বলিল, “মহারাজের নিবেদ আমরা সর্বদা স্মরণ রাখি, যেখানে বিনা অত্যাচারে কার্য্যসিদ্ধি হয়—সেখানে আমরা কোন আঘাত করি না, এক্ষেত্রে নিরীহ সাধুদিগের প্রতি কোনই অত্যাচার হয় নাই। রাজা চুপ করিয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ তিনি অন্ততপ্ত হৃদয়ে মোন হইয়া রহিলেন। রাণী স্নদক্ষিণা আসিয়া তাহাকে অস্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

এদিকে তিন সাধু-যুবকের মনে যে শোক হইল—তাহা বর্ণনীয় নহে। সাধু-মহন্তদের আজীবন তপস্তার ফল তাহাদের হাতে তুল্য ছিল, সেই পবিত্র মহামূল্যবান স্নানস্নান অপহৃত হইল। তাহাদের আর নকল ছিল না, বঙ্গদেশ হইতে এতগুলি নকল করিয়া ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রেরিত হইবে—এই ছিল ব্যবস্থা। হরি-ভক্তিবিলাস ও চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি মহারত্ন চিরদিনের জন্ত বিলুপ্ত হইল। ধৈর্য্যহারা না হইয়া শ্রীনিবাস গ্রামবাসী একজনের নিকট হইতে কাগজ-কলম লইয়া জীব গোস্বামীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের তখন বৃদ্ধ বয়স, এই শোকসংবাদ তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, সেইখানেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন এবং তখনই বা তাহার অব্যবহিত পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

অপরদিকে শ্রীনিবাস তাহার ছই বন্ধকে গোড়মুণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন, নরোত্তমের

হাতে শ্রামানন্দকে মণিরা দিলেন এবং বলিলেন, “যাবৎ এই হতবুদ্ধের সন্ধান করিতে না পারি তাবৎ আমি এখানেই থাকিব। এই গ্রন্থগুলির উদ্ধার-চেষ্টায় আমার প্রাণ গেলে তাহাও মঙ্গল।” নয়দিন পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের সমীপবর্তী স্থানগুলি ঘুরিয়া শ্রীনিবাস জানিলেন, সে দেশের রাজা স্বয়ং একজন দম্ভ্য স্তত্রাং অপহৃত পুস্তকগুলি সম্বন্ধে সেখানে কোন সন্ধান পাওয়া সহজ নহে। দশমদিনে তিনি দেওয়ালি নামক গ্রামে পৌঁছিলেন—এই গ্রাম বিষ্ণুপুর হইতে এক মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত এবং যশোদা নদীর তীরবর্তী। সেইখানে কৃষ্ণবল্লভনামক এক তরুণ ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়; ব্রাহ্মণ বটু ব্যাকরণ পড়িতেছিলেন। শ্রীনিবাসের সঙ্গে আলাপ করিয়া তিনি বুঝিলেন, ইহার পাণ্ডিত্য অগাধ। যুবক তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া সেখানে প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তিনি তাঁহাকে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার পড়িতে একটু সাহায্য করেন, তবে তিনি চিরকৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ হইবেন। স্বপাকে শুধু সিদ্ধ তরকারী দিয়া একবেলা দুটি ভাত খাইতেন, পরণে ছোট একখানি কটিবাস, শ্রীনিবাস কৃষ্ণবল্লভকে পড়াইতে লাগিলেন। চুম্বক-পাথর যেরূপ ইম্পাতকে আকর্ষণ করে, শ্রীনিবাসের বিবরণ ও করুণ মূর্তি ও অগাধ পাণ্ডিত্য কৃষ্ণবল্লভকে সেইরূপ আকর্ষণ করিল। কৃষ্ণবল্লভ রাজসভায় ব্যাসাচার্য্যের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিতে বাইতেন। হিন্দু রাজগণ সম্ভবতঃ সেনবংশের সময় হইতেই অপরাহ্মে ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা শুনিতেন, কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায় যে ধর্মপাল প্রভৃতি রাজাও ঐ ভাবে ভাগবত-পাঠ শুনিতেন; তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন। ধর্মমঙ্গলের এই উক্তি বিশ্বাস্য নহে। পরবর্তী হিন্দু রাজারা ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিতেন। গ্রাম্য কবি প্রাচীন সংস্কারগুলির মধ্যে এই গোলযোগ ঘটাইয়া থাকিবেন।

বীরহাষির দম্ভ্যপতি হৃদান্ত রাজা হইলেও তাঁহার সভাপণ্ডিত ব্যাসাচার্য্যের নিকট সেই দেশের চিরাগত রীতি অমুসারে অপরাহ্মে শাস্ত্রপাঠ শুনিতেন। উৎসুক হইয়া শ্রীনিবাস জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাগবত-পাঠ কেমন শুনিলে?” কৃষ্ণবল্লভ বলিলেন, “আমার মন আপনার পাদপদ্মে পড়িয়াছিল, আপনার সঙ্গের জন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলাম, তাই তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়াছি।” শ্রীনিবাসকর্তৃক অমুদ্রিত হইয়া কৃষ্ণবল্লভ সেই শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতে তাঁহাকে পরদিন রাজসভায় লইয়া গেলেন। প্রথম দিন শ্রীনিবাস নির্ঝাঁকু হইয়া সেই ব্যাখ্যা শুনিলেন। দ্বিতীয় দিন আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন “আপনি প্রশস্ত পথ ছাড়িয়া এ কি ব্যাখ্যা করিতেছেন!” ব্যাসাচার্য্য একধার কোন উত্তর করিলেন না, তৃতীয় দিনও শ্রীনিবাস বলিলেন, “আপনি ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন, অথচ শ্রীধরকে ত্যাগ করিয়া নিজের মত স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। শ্রীধরের টীকা ছাড়িয়া আপনি রাসপঞ্চাধ্যায় বুঝিতেই পারিতেছেন না।” এ কথার উত্তর না দিয়া ব্যাসাচার্য্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তখন রাজা সভাপণ্ডিতকে বলিলেন, “এই ব্রাহ্মণ আপনার ব্যাখ্যায় ভুট্ট নহেন, আপনি কি ভুল ব্যাখ্যা করিতেছেন?” বিরক্তির সুরে ব্যাসাচার্য্য বলিলেন, “এই গৈরিকধারী যুবকের আশ্পর্শ দেখুন, আমার ব্যাখ্যায় ভুল ধরিতে পারে এমন পণ্ডিত এদেশে কে আছে?” শ্রীনিবাসের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আম্বন, আপনি ভাগবত

ব্যাখ্যা করুন, দেখি আপনি কত বড় পণ্ডিত।” এই বলিয়া তিনি বেদী ছাড়িয়া উঠিলেন, অকুণ্ঠিতভাবে শ্রীনিবাস তাহাতে আসীন হইয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সে কি কষ্ট, সে কি অদ্ভুত পাণ্ডিত্য। তাহার হৃদয়ের ব্যথা অসীম ভক্তিতে যেন উছলিয়া উঠিতেছে। সেই ব্যাখ্যা যেন নৈবেদ্যের মত, অশ্রুর ডালির মত তাহার প্রাণের দেবতাকে উৎসর্গ করিতেছেন, যেন সপ্ততন্ত্রী বীণা নারদের অমূল্যস্পর্শে বাজিতেছে। রাজা ও অপরাপর শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়া গেলেন, এমন কি ব্যাসাচার্য্যও বুঝিলেন যে সত্য সত্যই সেদিন বনবিষ্ণুপুরের রাজ্যের প্রকৃত গুরু আসিয়াছেন। পর দিন শীঘ্র শীঘ্র যার যার কাজ সারিয়া শত শত লোক আবার শ্রীনিবাসের ব্যাখ্যা শুনিতে রাজবাড়ীতে ভিড় করিল, বিপুল হরিশ্রবণের সঙ্গে শ্রীনিবাস ভাগবতের ডুরি খুলিলেন। সেদিনের ব্যাখ্যায় পাষণ্ড গলিয়া গেল। দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুর তুফান বহিয়া গেল—অশ্রুচক্ষে সকলে দেখিল শ্রীনিবাস মাহুঘ নহেন,—দেবতা। রাজা সভাভঙ্গের পর অমুগত ভূত্যের দ্বারা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। রাজবাড়ীর এক বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠে তাহার স্থান করিয়া দিয়া নানারূপ উপায়ে ভোজ্যের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু শ্রীনিবাস নিজে ভাতেভাত রাধিয়া এক বেলা মাত্র আহার করিলেন। সেই সন্ধ্যাকালে রাজা তাহাকে নিভৃত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্রাহ্মণ! আপনি কে? কেন আসিয়াছেন? শুনিয়াছি কোন বিপদে পড়িয়া আপনি এ রাজ্যে আসিয়াছেন, আমার

হাথিরের অনুগত।

দ্বারা যদি আপনার কোন সাহায্য হয় তবে অকুণ্ঠিতচিত্তে আমার বলুন।” শ্রীনিবাসের বুকের ব্যথা উছলিয়া উঠিল। তিনি গদগদ-

কণ্ঠে সকল কথা বলিলেন। উপসংহারে বলিলেন, “গোস্বামিগণের এই অমূল্য রত্নভাণ্ডার আমার হাতে হস্ত ছিল, এগুলি না উদ্ধার করিতে পারিলে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, আমার সঙ্গী এক রাজকুমার ও অপর এক তরুণ সাধু শোকাধিত হইয়া বঙ্গদেশে চলিয়া গিয়াছেন।”

তখন রাজা ভুলুপ্তিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন,—“আমার মত নরপিশাচ আর নাই, আপনারা যে দস্যুকে ধ্বংস করিতেছেন, আমিই সেই দস্যু—আমার মত অপরাধী এত বড় রাজ্যে দ্বিতীয় নাই। আপনার সেই গ্রন্থগুলি যেমন ছিল তেমনই আছে, আপনি আশ্বস্ত হউন। আমার রাজ্যের নরহত্যাকারীর যে সাজা তাহাই আমাকে দিন।” এই বলিয়া নতজানু হইয়া রাজা সাক্ষাৎ শ্রীনিবাসের পায়ে পড়িলেন, তাহার রাজবেশ ধুলায় লুপ্তিত হইল। সমসাময়িক প্রেমবিলাসে বর্ণিত এই ঘটনা আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম। ভক্তিরত্নাকর ইহার প্রায় এক শতাব্দী পরের লেখা। তাহার কাহিনীও প্রায় এইরূপ; ছুই একটি জায়গায় সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ভক্তিরত্নাকরের সময়ে শ্রীনিবাস দেবতাহানীয় হইয়া উঠিয়াছেন; তিনি যেদিন প্রথম বীরহাথিরের রাজসভায় প্রবেশ করেন—সেই দিন তাহার উজ্জলচ্ছটামণ্ডিত স্বর্গীয় রূপ দেখিয়া সকলে দাঁড়াইয়া তাহার সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। রাজা তাহাকে বসিতে অমরোধ করিলেও তিনি বলিয়াছিলেন, “যে পর্য্যন্ত ভাগবত-পাঠ শেষ না হইবে, তাবৎ বসিয়া শোনা আমার রীতি নহে।” ইহা ছাড়া প্রেমবিলাসের মতে রাজসভায় রাস-পঞ্চাধ্যায় প্রথম দিন পঠিত হইতেছিল, কিন্তু ভক্তিরত্নাকরের

বর্ণনায় “ভ্রমর-গীতা”র কথা লিখিত হইয়াছে। মোটামুটি কাহিনীটি একরূপ, তবে পরবর্তী ভক্তি-রচাকরের অতিরঞ্জিত ভক্তির বর্ণনা হইতে প্রেমবিলাসের সরল স্বাভাবিক বর্ণনা আমাদের কাছে অধিকতর প্রামাণিক মনে হয়।

এই ঘটনার পর রাজা স্বয়ং, সভাপণ্ডিত ব্যাসাচার্য্য, রাণী সুদক্ষিণা প্রভৃতি সকলেই শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার রাজ্যশাসনের ভার শ্রীনিবাসের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। গৈরিকবসনপরিহিত সাধুর রাজ্য-শাসনের ভার গ্রহণ করা এই নূতন নহে; মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের উপর এইরূপ ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, দেবপাল তদীয় মন্ত্রী দণ্ডপাণির উপর সমস্ত বিষয়ে নির্ভর করিতেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে ত্রিপুরেশ্বর ঈশান মণিক্য তাঁহার গুরুদেব বিপিনবিহারীর হস্তে স্বর্ণজালজড়িত ত্রিপুররাজ্যের ভার হস্ত করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞাপতি ও চণ্ডীদাসের পর বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে সর্কশ্রেষ্ঠ কবিগণ ও সংকীর্ণনীয়ারা বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান অঞ্চলের লোক। গোবিন্দ দাসের বাড়ী ছিল শ্রীখণ্ড (বর্দ্ধমান)। ইনি শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের একান্ত অন্তরঙ্গ, রামচন্দ্র কবিরাজের সহোদর; জ্ঞান দাসের বাড়ী কাঁদরা, লোচন দাসের বাড়ী কোগ্রাম, আর আর প্রায় সমস্ত বৈষ্ণব কবিই বর্দ্ধমান ও বীরভূমনিবাসী।

বীরহাথিরের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষাগ্রহণের ফলে দেশে স্থাপত্যশিল্প বিশেষরূপে শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। বনবিষ্ণুপুরে বহু বৈষ্ণবমন্দির গঠিত হইয়াছিল, তাহাদের স্থাপত্য ও কারুকার্য বঙ্গদেশে বোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর কলাচর্চার নিদর্শনস্বরূপ। বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে পুঁথির মলাটে, প্রাচীরের গায়, কাঁঠফলকে, কাগজে ও কাপড়ে এই সময়ে গৌরান্বিতবিষয়ক সহস্র সহস্র চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীনিবাস ধর্মপ্রচারকার্য্য থুব বিদ্যুত ভাবে চালাইয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরের রাজাদের সাহায্যে শুধু বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল নহে, ত্রিপুরা, মণিপুর, ময়নামতী-পাহাড় এবং কুর্কী প্রভৃতি উল্লঙ্গ পার্বত্য জাতিদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার হইয়াছিল। পার্বত্য ত্রিপুররাজ্যের পাহাড়িয়া লোকদিগকে আমি কুমিল্লায় নিম্ন সমতলভূমে প্রায়ই দেখিয়াছি। তাহারা প্রীপুর্বে কাঁঠ বিক্রয় করিবার জন্ত কুমিল্লায় অবতরণ করে এবং তাহাদের কেহ কেহ পাহাড়ে ফিরিবার মুখে দোকান হইতে চৈতন্য-চরিতামৃত কিনিয়া লইয়া যায়। তাহারা টিপ্রা ভাষায় কথা বলে—সে ভাষা আমাদের নিকট হুর্কোথ, কিন্তু কিছু কিছু ভাষা বাঙ্গলা বলিতে পারে, অথচ চৈতন্য-চরিতামৃতের মত কঠিন পুস্তক তাহারা লইয়া যায়। শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের প্রচারকগণ ও তাঁহাদের বংশধরেরা যে, গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মপ্রচারের জন্ত বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সহায় ছিল—বনবিষ্ণুপুর ও খেতুরীর রাজভাণ্ডার। এদিকে জামানন্দ সমস্ত উড়িষ্যাদেশবাসী রাজভবগণকে এই ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রধান শিষ্য রাজা বসিকানন্দের রাজভাণ্ডার এই প্রচারকার্য্যের সহায় ছিল। চৈতন্য দীর্ঘকাল উড়িষ্যায় ছিলেন। তথাকার বহু পন্নীতে গৌরান্বিতদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে,

খাস্ বাঙ্গলা দেশে যত গৌরাঙ্গবিগ্রহ তদপেক্ষা অনেক বেশী বিগ্রহ উড়িষ্যার পরীতে পরীতে পূজা পাইয়া থাকেন। এই প্রচারের উত্তমশীলতা শ্রীনিবাস, নরোত্তম এবং শ্যামানন্দ বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহারা স্বরধুনীর তীরের কীর্তন সমস্ত বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা দেশে প্রচলন করিয়াছেন। সনাতন, রূপ, জীব গোস্বামী এবং গোপাল ভট্টের চেষ্টায় মধ্যভারত ও রাজপুতনায় প্রচার চলিয়াছিল, শেষোক্ত স্থানে কতকগুলি ষ্টেট গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম স্বীকার করিয়াছেন। মধ্য ভারতের ছতরপুরের রাজা ৪৭ বৎসর পূর্বে মহাসমারোহের সহিত গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অষ্টৈত প্রভুর বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি শান্তিপুরবাসী অষ্টৈত প্রভুর এক বংশধরের শিষ্য। দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে চৈতন্য প্রভুর ধর্মে দীক্ষিত দল আছেন। ত্রিবাঙ্কুরের সন্নিহিত কোন স্থানে ঐরূপ একটি দল থাকার কথা আমরা শুনিয়াছিলাম। এমন কি একজন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির মুখে আমি শুনিয়াছি, আফগানিস্থানবাসীদের মধ্যে চৈতন্যসম্প্রদায়ভূক্ত লোক আছেন। সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্র কবি ও সাধু তুকারামের চৈতন্যসম্বন্ধে একটি 'অভঙ্গ' আছে, তাহাতে তুকারাম তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তিনি গৌরাঙ্গকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। ডাক্তার আর. ডি. ভাণ্ডারকরের নিকট এই অভঙ্গটি আছে। আকবর বাদশাহ যে গৌরাঙ্গসম্বন্ধে একটি গান রচনা করিয়াছিলেন,—সেই হিন্দি গানটি ভগবদ্ভক্ত মহাশয়ের গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি পূর্বেই লিখিয়াছি।

সুতরাং দেখা যায়—অনুসন্ধান করিলে সমস্ত ভারতবর্ষে গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিকাশ এবং বিস্তারসম্বন্ধে একখানি ইতিহাস লিখিত হইতে পারে। ইহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া আছেন, তাঁহারা এক হইতে পারেন। গোস্বামিগণ তো সে চেষ্টা করিবেনই ধর্মের বিস্তারে যার উপাটন।

না। সাহেবেরা যখন অগ্রণী হইয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায় কোন্ সাহসে সেরূপ মৌলিক ব্যাপারে হাত দিবেন? অথচ ব্যাপারটি গুরুতর হইলেও খুব কঠিন নহে। খড়দহ ও শান্তিপুরের গোস্বামিগণের শিক্ষাতালিকা এবং শ্রীনিবাসের বংশধরগণের শিক্ষাতালিকা খুঁজিলে বিস্তর উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে। মণিপুর, ত্রিপুরা, মধ্য-ভারতের ছতরপুর এবং উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি রাজ্যগণের পুঁথিশালায় এবং বংশতালিকায় এসম্বন্ধে অবশ্য অনেক তথ্য আছে। কোন শিক্ষিত ও কর্মী যুবক যদি এসম্বন্ধে উদ্যোগী হইয়া কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন তাহা হইলে দেশের প্রকৃত একটা উপকার হয়। বঙ্গদেশের কোন রাজা বৈষ্ণবধর্মে তাঁহার অমুরাগ দেখাইবার জন্য নবদ্বীপের ধুলটে একবৎসর একলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, এমন শুনিয়াছি। কিন্তু এই ইতিহাস-লেখার কার্যে উৎসাহ কে দিবেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যিনি বাহিরের কোন উৎসাহের উপর নির্ভর না করিয়া স্বীয় প্রাণের অমুরাগে কাজ করিবেন, রিক্তহস্ত হইলেও ভগবান্ তাঁহার ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া দিবেন এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা বেশী কৃতকাৰ্য্য হইবেন হিন্দুরা নবব্রাহ্মণ্যের যুগে তাঁহাদের ধর্ম অস্ত্রের অনদিগম্য করিয়া রাখিয়াছিলেন—বৈষ্ণবেরা এই যুগে সর্বপ্রথম সেই অচলায়তনের দ্বার উন্মোচন করেন।

শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুর হইতে খেতুরীতে (রাজসাহী জেলা) নরোত্তমের নিকট গ্রন্থগুলির উদ্ধার ও রাজার দীক্ষাদিসম্বন্ধে সমস্ত কথা জানাইয়া চিঠি পাঠাইলেন। নরোত্তম ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পিতা কৃষ্ণানন্দ দত্ত হাতে স্বর্গ পাইলেন, কিন্তু নরোত্তম রাজপ্রাসাদে গেলেন না, তিনি তথাকার কৃষ্ণমন্দিরে রহিয়া গেলেন এবং পিতামাতাকে জানাইলেন, তিনি যে সন্ন্যাসী সেই সন্ন্যাসী থাকিবেন, গেকয়া ছাড়িবেন না, এবং কৃষ্ণমন্দিরের যে নির্দিষ্ট ভোগ আছে, তাহা হইতে প্রসাদ পাইবেন। খাওয়া-দাওয়া কিংবা অল্প কোন সম্বন্ধে অহুরোধের বাড়াবাড়ি করিলে তিনি খেতুরী ছাড়িয়া পালাইবেন। তাঁহার স্থানে তাঁহার খুল্লতাত-ভাতা সন্তোষ দত্ত রাজা হইয়াছিলেন। নূতন রাজা ও বৃদ্ধ কৃষ্ণানন্দ দত্ত ভয়ে আর কোন বাড়াবাড়ি করিলেন না। কিন্তু কৃষ্ণানন্দ ভিন্ন অপর সকলে নরোত্তমের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলেন, তাঁহার রাজপরিচ্ছদ নাই, শিরোভূষণ নাই, রাজদণ্ড নাই, শুধু গেকয়া, মুণ্ডিত মস্তক ও দণ্ডকমণ্ডল লইয়া বেন একখানি দেবমূর্তি ঝলমল করিতেছে। সেই মূর্তিতে এমন একটা গোরবের ঘটা ছিল যে স্বয়ং পিতা কৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছিলেন। গ্রন্থোদ্ধারের সংবাদ খেতুরী রাজধানীতে ঢাকঢোল এবং অপরপর বাজবজের উচ্চতানে এবং রজনীতে শত শত দীপের আলোকে বিঘোবিত হইয়াছিল। নরোত্তম মনে মনে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, খেতুরীতে গোরাক্ষদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবেন। সেই ইচ্ছার কথা আভাসে জানিতে পারিয়া সন্তোষ দত্ত তাঁহার সমস্ত রাজভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিলেন, বথাসকলস্ব ব্যয় করিয়া এই উৎসব সম্পন্ন করিবেন—ইহাই সঙ্কল্প করিলেন। সম্ভবতঃ ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে এই স্মরণীয় উৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল। এত ঘটা বৈষ্ণব-সমাজে আর হয় নাই; পাণিহাটির দণ্ডমহোৎসবের (১৫০২ খৃঃ) পর এই উৎসব বঙ্গদেশে বৈষ্ণব-সমাজের সর্বপ্রধান ঘটনা। সহস্র সহস্র বৈষ্ণব বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে আসিয়াছিলেন; নিমন্ত্রণ-পত্রিকা বঙ্গদেশের সর্বত্র বিতরিত হইয়াছিল; তাহার মন্ত্র এইরূপ—“আমরা সকলের নাম জানি না, জানা সম্ভবপরও নহে। যিনি এই উৎসবে যোগ দিয়া আমাদের উৎসব সফল করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনিই দয়া করিয়া আমাদের এখানে আসিয়া আমাদের অহুগৃহীত করিবেন। রবাহৃত ও আহুতের মধ্যে কোন পার্থক্য আমরা রাখিব না।” এইরূপ সার্বজনীন নিমন্ত্রণ আর কোথাও কখনও হইয়াছে কিনা আমরা জানি না। এই উৎসব বৈষ্ণবদিগের “মহোৎসবের” মতই উদার এবং সর্বব্যাপী। সন্তোষ দত্ত উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের পাথের দিয়াছিলেন; সেই শত সহস্র অভ্যাগতের মধ্যে একজনের উপর সকলের দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়াছিল, শতবর্ষব্যবস্থা, অতি শীর্ণা, উপবাসক্লেশ, তপঃপ্রভায় উজ্জলকান্তি, বিশ্বজননীকল্পা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার স্বামীর বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা দেখিবার জন্ত খেতুরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যখন মন্দিরে স্বামীর বিগ্রহের দিকে যুক্ত করে চাহিতে চাহিতে তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা বহিয়া পড়িতেছিল তখন শত শত লোকের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল। ভৃত্য ঈশানের মুখে সন্তোষ দত্ত জানিতে পারিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া শেষ দশায় বৃন্দাবন বাইবার ইচ্ছা পোষণ করেন, জানিয়া তদর্থে গোপনে তরুণ রাজা বিষ্ণুপ্রিয়ার পাথের এবং ১৫০০ টাকা

প্রদান করেন। শ্রীনিবাস, বীরহাম্বির, ব্যাসাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছিলেন। সম্ভব দস্ত শ্রীনিবাসকে দুইটি স্বর্ণমুদ্রা এবং বহুমূল্য গরদের এক জোড়, ব্যাসাচার্য্যকে একখানি রেশমী বস্ত্র এবং ৫০ টাকা প্রণামী দিয়াছিলেন। সকলেরই পাখের এবং পদগোরব অনুসারে মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। এই বিরাট উৎসবে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিরূপ উপস্থিত ছিলেন, পূর্ব্ববর্ণিত প্রসিদ্ধ রূপনারায়ণ পণ্ডিত, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি অনেকের নামই এই উপলক্ষে প্রেমবিলাসে বর্ণিত আছে। এই সকল ঘটনা প্রেমবিলাস-প্রণেতা নিত্যানন্দ দাসের চাক্ষু্য বিষয়, সুতরাং তাহাতে বর্ণনার সমস্ত খুঁটিনাটিই পাওয়া যায়। শ্রামানন্দ স্বয়ং যে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গানটি রচনা করিয়াছিলেন, সেই “তুনলো পরাণ সহি, মরম কথা তোরে কই”—আম্র পদটি উৎসবে যখন গাওয়া হয়, তখন লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছিল নরোত্তমের উপর, রাধার কথা ভুলিয়া তাঁহার তখন তাঁহাদের সন্ন্যাসী রাজকুমারের কথাই ভাবিতেছিলেন। “আমার ধৈর্য্যশালা হেমাগার, গুরু গোরব সিংহদার,—আমার সকলই ত ছিল সহি—বংশীরব বজ্রাঘাত প’ড়ে গেল অকস্মাৎ” ইত্যাদি কথায় যিনি কৃষ্ণের আত্মানে রাজকুলের গোরব—হৈম প্রাসাদ ছাড়িয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কার ছাড়িয়া নিরহঙ্কার, দীনাতীতীন হইয়াছেন—তাঁহারই কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক হইয়াছিল। এই উৎসবে দেবীদাস ও গোবুলদাস দুই প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীর সুমধুর পদকীর্ত্তনে—বিষ্ণুপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি মহাজনের পদবসাস্বাদনে উপস্থিত জনমণ্ডলী যেরূপ তৃপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে খেতুরী কয়েক দিনের জন্ত বৈকুণ্ঠপুরীতে পরিণত হইয়াছিল। উৎসবের পূর্ণবৃত্তান্ত, নরহরি চক্রবর্ত্তীর নরোত্তমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকর, নিত্যানন্দের প্রেমবিলাস, শিশিরকুমার ঘোষের নরোত্তম-চরিত প্রভৃতি পুস্তকে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। এই স্থানটিকে কি একটা প্রস্তর-লিপিদ্বারা স্মরণীয় করিয়া রাখা যায় না?

নরোত্তম বঙ্গীয় সমাজে আর একটি বিপ্লব উপস্থিত করিলেন, তিনি কায়স্থ কিন্তু তাঁহার অনেকগুলি ব্রাহ্মণ শিষ্য হইয়াছিল। এই সকল ব্রাহ্মণ আবার পণ্ডিত-শিরোমণি ছিলেন।

কায়স্থ ও কায় ব্রাহ্মণ শিষ্য।

ভগবান্ তাঁহার ললাটে সাধুত্বের তিলক আঁকিয়াছেন তাঁহার প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নরোত্তমের সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণ-শিষ্য ছিলেন বলরাম মিশ্র। একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ নরোত্তমের শিষ্য হইয়াছেন, এ সংবাদে সমস্ত ব্রাহ্মণ-সমাজ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। এই উত্তেজিত দলের নেতা হইলেন পদ্মার তীরে গান্তিলা-গ্রাম-নিবাসী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও ধনশালী লোক ছিলেন। ইহার বাড়ীতে যে টোল ছিল তাহাতে পাঁচ শত ছাত্রের ব্যয়ভার ইনি বহন করিতেন। “বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তেঁহো পণ্ডিত প্রধান। পাঁচ শত পঢ়ুয়ার নিত্য অন্নদান”—(প্রেমবিলাস, বিংশ তরঙ্গ)। এই সময়ে বলরাম মিশ্র ছাড়া আরও দুইটি ব্রাহ্মণ নরোত্তমের চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন—ইহাদের নাম রামকৃষ্ণ ও হরিনারায়ণ। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও উত্তেজিত হইয়া ইহাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। তবে তাঁহার কৃষ্ণে ভক্তি ও শাস্ত্রে বিশ্বাস ছিল, সুতরাং ভাবিয়াছিলেন, নিয়জাতিকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকে শিষ্য করার প্রমাণ কোন শাস্ত্রে

পাওয়া যাইবে না, এই বিশ্বাসে ইনি নরোত্তমের কাঁদে পা দিলেন। বহু তর্ক ও আলোচনার পর তিনি দেখিলেন, ইহারা দেবদূতের জায় দেশে যে নূতন সংবাদ আনিয়াছেন তাহা গ্রহণ না করিলে বাঙ্গালীর উদ্ধারের দ্বিতীয় পন্থা নাই। পরাভূত এবং সমাগ্রূপ নূতন ভাবে প্রণোদিত হইয়া স্পর্ধিত ও হৃদ্যন্ত গঙ্গানারায়ণ স্বয়ং নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু নরোত্তমের প্রধান সংস্কারকার্য্য গোড়ঘারে হইয়াছিল। গোড়ঘার রাজমহলের নিকটবর্তী। তখাকার রাজা রাঘবেন্দ্র অতি প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ ভূস্বামী ছিলেন, তাহার দুই পুত্র

চাঁদ রায় ও সন্তোষ রায়।

ইহারা অতি প্রবলপরাক্রান্ত দম্ভা হইয়া

উঠিয়াছিলেন। পাঠান বাদশাহ মোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে

লিপ্ত ছিলেন, সুতরাং এই রাজার রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তখন বাদশাহ ইহা-
দিগকে খাটাইতে ইচ্ছা করেন নাই। মোগলদের সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য দাউদ খাঁ সর্ব্বস্ব
পণ করিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি সমস্ত নৃপতিদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া বলক্ষয় করা
সময়োচিত মনে করেন নাই। কয়েকবার বাদশাহের কক্ষচারীরা রাজস্ব আদায় করিতে
গোড়ঘারে গিয়াছিলেন, কিন্তু চাঁদ রায় তাহাদিগকে মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

একটি নিরপরাধ ব্রাহ্মণকে হত্যা করার পর চাঁদ রায় বায়ুরোগগ্রস্ত হইলেন, তাহার
ঘন ঘন মূর্ছা হইত, এবং তিনি প্রলাপ বকিতেন। এতবড় হৃদ্যন্ত রাজা একেবারে শয্যাশায়ী
হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন। চাঁদ রায় এই অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, কেহ যেন বলিতেছে—
“খেতুরীর সন্ন্যাসী রাজ-কুমারের শরণ লইলে তাহার রোগ আরোগ্য হইবে।” কিন্তু অহঙ্কারী
ব্রাহ্মণ রাজা—একটা কার্য্যের শরণ লওয়ার কথা তাহার পক্ষে অসম্ভব। বৃথা কল্পনাজাত
স্বপ্ন মনে করিয়া তিনি কথাটা উড়াইয়া দিলেন, কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল
এবং লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল—সেই নির্দোষ হত ব্রাহ্মণের ভূত চাঁদ রায়ের কাঁধে
চাপিয়াছে। ভিবক্দের আগ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ হইল, চাঁদ রায়ের অবস্থা শঙ্কটাপন্ন হইল।

এ অবস্থায় সমস্ত অহঙ্কার বিসর্জন দিয়া বৃদ্ধ রাজা রাঘবেন্দ্র রায় নরোত্তমকে আনিবার
জন্ত লোক পাঠাইলেন। নরোত্তম আসিলেন না, বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি বাছবিজ্ঞা
জ্ঞানেন না, তাহার কোন অলৌকিক ক্ষমতা নাই। তিনি চাঁদ রায়ের হৃদ্যন্ত রোগ
সারাইবেন কিরূপে? কিন্তু এবার অন্ততঃ চাঁদ রায় প্রাণের দায়ে অনেক কাকুতি মিনতি
করিয়া স্বয়ং চিঠি লিখিলেন—রোগও যদি না সারে, তবে তাহার মুখে মৃত্যুকালে হরিনাম
ভুনিলেও একটা গতি হইবে। এবার নরোত্তম থাকিতে পারিলেন না, কারণ পাপী
আর্জ হইয়া ডাকিয়াছে। তিনি তাহার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধ বন্ধুরির শ্রুতিখ্যাত পণ্ডিত ও
ভিবক্ এবং কবিবুলচূড়ামনি গোবিন্দদাসের সহোদর রামচন্দ্র কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া
গোড়ঘারে উপস্থিত হইলেন। তাহার রাজধানীতে বিপুলভাবে সংবর্ধিত হইলেন।
চাঁদ রায়ের ব্যাধি ছিল মানসিক। কতকটা নরোত্তমের প্রাণ-জুড়ানো উপদেশে কতকটা
বা রামচন্দ্র কবিরাজের চিকিৎসার ফলে তাহার মনের উপর বৈক্য-প্রভাব পূর্ব হিতকর
হইল। চাঁদ রায় অল্পদিনের মধ্যে সারিয়া উঠিলেন। তখন নরোত্তমের উপর তাহার অচলা

ভক্তি হইল। তাঁহারা ছিলেন ঘোর শাক্ত; শরৎকালে রাজবাড়ীতে বহু আড়ম্বরপূর্ণ যে দুর্গাপূজা হইত, তাহাতে শতসহস্র মেঘ ও মহিস বলি দেওয়া হইত। কিন্তু এই সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারের মনে যে পরিবর্তন হইল, তাহার ফলে বুদ্ধ রাঘবেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া রাজবাড়ীর সকলেই কায়স্থ নরোত্তমের নিকট বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন। এই ঘটনা একরূপ বিস্ময়কর হইয়াছিল যে, লোকে সহসা ইহা বিশ্বাস করিতে চায় নাই।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই চাঁদ রায় পূর্বকৃত দুর্কর্মগুলির জন্য বহু অনুতাপ করিয়া গোড়ের বাদশাহকে চিঠি লিখিলেন এবং বলিলেন, এবার বাদশাহের কর্মচারী আসিলেই তিনি বাকী রাজস্ব সমস্ত পাঠাইয়া দিবেন। পাঠান-রাজসভায় এই চিঠি লইয়া অনেক আলোচনা হইল, অধিকাংশ রাজমন্ত্রী এই চিঠির উপর নির্ভর করা অবিবেচনার কার্য্য মনে করিলেন—মহা দুর্ভাগ্য চাঁদ রায় কি গুপ্ত বড়যন্ত্র করিয়া ভাল মানুষটি সাজিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। যুদ্ধবিগ্রহাদি না করিয়া এই ফন্দির জালে পা দিতে কোন রাজকর্মচারী স্বীকৃত হইলেন না।

চাঁদ রায় গেকুয়া পরেন, সংসারে ঔদাসীন্য, নিজে দুই বেলা কৃষ্ণপূজা করেন। গুরু নরোত্তম দীক্ষা দিয়া চলিয়া গেলেন। চাঁদ রায় খেতুরীর দেবমন্দিরে অগণিত মণি-মানিক্যা ও বস্ত্রালঙ্কার উপঢৌকন পাঠাইলেন, নরোত্তম স্বয়ং এক কপর্দকও গ্রহণ করিলেন না। নরোত্তমের যাওয়ার পর একদা চাঁদ রায় মাত্র ১০০ অশ্বারোহী ও ৪০০ পদাতিক সঙ্গে নিশ্চিন্তমনে গোড়দ্বার হইতে গঙ্গাঘাটের জন্ত যাত্রা করিলেন। গুপ্তচরেরা গোড়ের বাদশাহকে জানাইল—চাঁদ রায় অরক্ষিত অবস্থায় দূর পথে বাইতেছেন। এই সুবোগ পাইয়া গোড়েশ্বর বহু সৈন্য পাঠাইয়া চাঁদ রায়কে বন্দী করিয়া লইয়া আসিলেন। লোহশৃঙ্খলে আবদ্ধ, অসামান্য দৈহিক বলসম্পন্ন চাঁদ রায়কে সন্ধান করিয়া বাদশাহ বলিলেন, “পাপিষ্ঠ, তোমার এত বড় বৃকের পাটা যে তুমি বহুকাল যাবৎ আমার রাজ্য লুট করিয়া খাইতেছ?” চাঁদ রায় রাজোচিত মর্যাদা রক্ষা করিয়া বৈষ্ণব-দৈত্যের সঙ্গে বলিলেন, “আমি হুজুরে পূর্বেই জানাইয়া-ছিলাম—পূর্বকৃত দুর্কর্মের জন্য আমি অনুতপ্ত, আমাকে উচিত শাস্তি প্রদান করুন।” বাদশাহ তাঁহার গাভীর্ণ্য ও সরলতা-দর্শনে কতকটা মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। “ইহার বিচার পরে হইবে” এই বলিয়া একটা অন্ধকার কারাগারে ইহাকে পাঠাইয়া দিলেন। মাটির নীচে কারাগার, আলোর প্রবেশপথ নাই; দাঁড়াইলে ছাদে মাথা ঠেকে—দিনান্তে অতি দুচ্ছ খাণ্ডের ব্যবস্থা। কিন্তু সংসারের কোলাহল হইতে এই গুহায় ঢুকিয়া—ইনি ইহাকে আশ্রমের জায় পবিত্র মনে করিয়া মুক্তির নিধাস ফেলিলেন। তিনি সেই নিভৃত নিকেতনে সারাদিন কৃষ্ণাধ্যানে রত থাকিতেন। কোন সময়ে ভাবিতেন তিনি কৃষ্ণের জন্ত চন্দন বসিতেছেন এবং অতি যত্নে তাঁহার টিপ বিগ্রহের মাথায় পরাইয়া দিতেছেন। কখনও ভাবিতেন, তিনি তাঁহার আরতি করিতেছেন, পঞ্চপ্রদীপের আলোতে বিগ্রহ স্থলমল করিতেছে; কখনও মনে করিতেছেন, তাঁহাকে ব্যাজন করিতেছেন, অথবা নৈবেদ্য সাজাইতেছেন। কখনও মনে

হইত, বনে বনে ঘুরিয়া তিনি ক্রমের জন্ত সত্ত্বাপ্রস্তুত ফুল চয়ন করিতেছেন, অথবা তাহার দ্বারা মালা রচনা করিতেছেন। এই ভাবে দিনযামিনী কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত, তাহা তিনি জানিতেন না। মনুষ্যের হৃদয়ে যখন এই সহজ আনন্দ শতদলের মত ফুটিয়া উঠে, তখন বাসস্থান কর্দমাক্ত বা নিবিড় বন্ধনযুক্ত কারাগৃহ—তাহা ভাবিবার অবকাশ কোথায় থাকে ?

চাঁদ রায়ের পিতা রাঘবেন্দ্র রায় কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ পাঠাইয়া তাঁহার আহারের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। আর একজন লোক পাঠাইয়া এমন একটা স্ত্রযোগ করিয়া ছিলেন, বাহাতে অনায়াসে চাঁদ রায় মুক্তি পাইতে পারিতেন। সেই লোক অতি গোপনে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, “আপনি কালীবিগ্রহকে ফুল-বেলপাতা দিয়া পূজা করুন; তারপর আমি আপনার বাহির হইবার ব্যবস্থা করিব।” এই বলিয়া একটি ক্ষুদ্র কালীবিগ্রহ উপস্থিত করিলেন। চাঁদ রায় বলিলেন, “কৃষ্ণ ভিন্ন আমার উপাস্ত্র আর কেহ নাই, এখানে মরি তাহাও ভাল—কিন্তু আমি অস্ত্র কোন দেবের পায়ে ফুল দিব না। আমার সকল ফুল, সকল নৈবেদ্য, আমার দেহমন তাঁহার পায়ে বিলাইয়া দিয়াছি; অপর কাহাকেও দিবার মত আমার কিছুই নাই। আমার পিতাকে বলিও, আমি ভাল আছি, রাজপ্রাসাদে যেক্রপ ছিলাম তদপেক্ষা অনেক ভাল আছি, আমি মুক্তির আনন্দ অহুভব করিয়া দেহমানে পরম পবিত্রতা ও অপূর্ণ শাস্তি অহুভব করিতেছি, আমি চুরি করিয়া পলাইয়া যাইতে চাহি না।” পিতার নিযুক্ত দূত দেখিলেন, কালীপূজা না করিলে এসম্বন্ধে কিছু করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। তিনি ফিরিয়া গেলেন।

যথা সময়ে দরবারে চাঁদ রায়ের ডাক পড়িল। বাদশাহ বিচার করিয়া “হস্তিপদদলিত করিয়া হত্যা করা হউক”—এই আদেশ দিলেন। চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে সমস্ত এশিয়াতে বন্দী ও শত্রুদিগকে হস্তিযা হত্যা করার প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।

চাঁদ রায়ের শক্তি ছিল অসীম। একটা বৃহৎ হস্তীকে তাঁহার দিকে ধাওয়াইয়া দেওয়া হইল। তিনি তাঁহার হস্তযা হাতীর গুঁড় ধরিয়া এমনই জোরে মোচড় দিলেন যে, হাতীটা চীৎকার করিয়া উর্দ্ধ্বাঙ্গে ছুটিয়া পলাইল। এই অমাহুতিক বল দেখিয়া বাদশাহ বিস্মিত হইয়া চাঁদ রায়কে বলিলেন, “তুমি বহুদিন যাবৎ অতি তুচ্ছ খাণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া একরূপ অনশনে আছ, এ অবস্থায় তোমার এরূপ অদ্ভুত বল হইল কি প্রকারে ?”

চাঁদ রায় প্রথমে কারাধ্যক্ষের জন্ত অভয় চাহিয়া বলিলেন, “আমি কারাগারে উত্তম খাদ্য খাইয়াছি। কারাগারে আমি খুব ভাল ছিলাম—আমি সাংসারিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ মনে কৃষ্ণসেবা করিতে পারিয়াছি। আমার পিতা আমার মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু কালীপূজা করিবার কথা থাকিতে আমি তাহাতে রাজী হই নাই। হজুর আমায় মৃত্যু-দণ্ড বা যে কোন দণ্ড দিবেন, আমার তাহাতে ক্ষোভ নাই। আমি কৃষ্ণে আত্মনিবেদন করিয়া দিয়াছি।” বলিতে বলিতে চাঁদ রায়ের চক্ষু সজল হইল। বাদশাহ তাঁহার কথা শুনিয়া এত প্রীত হইলেন যে, তখনই তাঁহার মুক্তির আদেশ দিয়া যে সকল স্থান চাঁদ রায় বলপূর্বক দখল করিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকারও তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

চাঁদ রায় গোড়ঘারে প্রত্যাবর্তনের পর বাদশাহ তাঁহাকে পুনরায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং অতি প্রীতির সহিত বলিলেন, “সেবার আমি তোমাকে শুধু তোমার পৈত্রিক ও বাহুবল-র্জিত সম্পত্তির অধিকার দিয়াছি, আজ তোমাকে একটা পুরস্কার দিব।” বাদশাহের আদেশ-অনুসারে চাঁদ রায়কে একটি ফারমান দেওয়া হইল, তাহাতে তিনি আহেদি পরগনার অধিকার পাইলেন।

চাঁদ রায়ের দলে যে সকল ব্রাহ্মণ দম্ভা ছিলেন তাঁহারা অনেকেই নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ইহাদের মধ্যে গোবিন্দ বাডুঘো, কালিদাস চট্টো, নিরারণ চক্রবর্তী, রামজয় চক্রবর্তী, হরিনাথ গাঙ্গুলী এবং শিব চক্রবর্তীর নাম নরোত্তম-বিলাস ও অপরাপর পুস্তকে উল্লিখিত দেখিতে পাই।

মহাপ্রভুর জীবনে ভক্তির মাধুর্য্যই বেশী ছিল, তাহা জনসাধারণকে মুগ্ধ করিত। নিত্যানন্দ পতিত জাতিদের মধ্যে বৈষ্ণব গৌসাইদের পৌরোহিত্য চালাইয়াছিলেন, সমাজ তাঁহাকে প্রথম বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। নিত্যানন্দের সঙ্গে কস্তুর পরিণয় সম্পাদন করার জন্ত সূর্য্যদাস সরথেল ব্রাহ্মণ-সমাজে খুব বেশী বেগ পাইয়াছিলেন। অদ্বৈত হরিন্দাসকে আশ্রয় দেওয়ার জন্ত শান্তিপু্রে বিলক্ষণ লাঞ্চিত হইয়াছিলেন। ইহারা বুঝিয়াছিলেন হিন্দু সমাজের সঙ্গে বিরোধ করিলে সমাজে অচল হইয়া পড়িবেন—তাহা হইলে সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা সফল হইতে পারিবে না। নিত্যানন্দের বংশধর ক্ষীরোদবিহারী গোস্বামিকৃত “নিত্যানন্দ বংশাবলী ও সাধনা” পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের বংশধরেরা বহু চেষ্টায় এবং অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া ব্রাহ্মণ কুলীন-সমাজে আদানপ্রদান-সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা যদি বিনীত হইয়া সমস্ত দাবী-দাওয়া মিটাইয়া কুলীন-সমাজকে হস্তগত না করিতেন, আজ খড়দহ ও শান্তিপুর্ একেবারে সমাজ-বহির্ভূত হইয়া থাকিত।

কিন্তু নরোত্তম সমাজের কাছে একটুও অবনতি স্বীকার করেন নাই। বরঞ্চ বৈষ্ণবেরা জনসাধারণের এক বিশাল সভা আহ্বান করিয়া নরোত্তমকে খাঁটি ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাকে যজ্ঞশূত্র দান করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র। এখন আর শুধু বলরাম মিশ্র কিংবা গঙ্গারাম চক্রবর্তী নহেন, চাঁদ রায়-প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ প্রকাশ্যভাবে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণ ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ-সমাজের ক্রোধ সকল সীমা অতিক্রম করিল, তাঁহারা একেবারে ক্ষেপিয়া গেলেন।

কলিকাতার নিকট পকপল্লী (আধুনিক পাইকপাড়া) তখন সমৃদ্ধ নগরী ছিল, তথাকার রাজা নৃসিংহ রায় একজন ব্রাহ্মণভক্ত গোড়া হিন্দু ছিলেন। এই রাজপরিবার কায়স্থ হইলেও সমাজে ইহাদের খুব প্রভাব ছিল। ব্রাহ্মণেরা সমবেত হইয়া সমাজসংস্কারের একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহারা ছয়জন প্রতিনিধি নৃসিংহ রাজার নিকট পাঠাইলেন। এই ছয় জনের নাম যত্ননাথ বিজ্ঞানভূষণ, কাশীনাথ তর্কভূষণ, হরিন্দাস শিরোমণি, চন্দ্রকান্ত জ্ঞানপঞ্চানন, শিবচরণ বিজ্ঞাবাগীশ এবং হর্গাদাস বিজ্ঞারত্ন। ইহারা পকপল্লীর

রাজাকে বলিলেন, “আপনি ধর্মের রক্ষক, সনাতন ধর্ম যে ঘোর কলিতে রসাতলে
তর্কযুদ্ধে আহ্বান ও বাইতেছে। ব্রাহ্মণ শূত্রের উচ্ছিষ্ট খাইতেছে, ইহা হইতে কি
পরামর্শ। বীভৎস ব্যাপার হইতে পারে? আপনি দেশ রক্ষা করুন।” অনেক

আলোচনার পর এই ঠিক হইল যে রাজা নৃসিংহ পণ্ডিতগণসঙ্গে
খেতুরী বাইয়া নরোত্তমকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিবেন। পণ্ডিতগণ বলিলেন, “যদি সেই
কার্য-শূত্র এই সকল অনাচার শাস্ত্রদ্বারা সমর্থন করিতে পারেন, তবে আমরা সকলে তাঁহার
নিকট মাথা নুড়াইব, নতুবা তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে।”

পণ্ডিতেরা চলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পড়ুয়ারাও চলিলেন, বহুশকট বোঝাই পুঁথি চলিল।
রাজা নৃসিংহের সভাপণ্ডিত রূপনারায়ণ মধ্যস্থতা করিবার অল্প সহযাত্রী হইলেন। এই ভাবে
রাজা একটা মস্ত বড় দল লইয়া খেতুরীর অভিমুখে রওনা হইলেন। এই অভিযানের সংবাদ
খেতুরীতে পৌছিল। নরোত্তমের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, অন্তরঙ্গ শূত্রং রামচন্দ্র কবিরাজ
ও তৎসহোদর কবিচূড়ামণি গোবিন্দদাস এই রাজকীয় দলের বিরুদ্ধে একটা বড়বন্দ্র করিলেন।
তাঁহারা তাঁহাদের জগন্নাথ আচার্য্য নরোত্তমকে এই বন্দ্রযুদ্ধে অবতরণ করাইতে সম্মত
হইলেন না। “আমরা তাহাদিগকে বুঝিয়া লইব, আপনি খেতুরীতে বসিয়া থাকুন”—এই
অভিপ্রায় জানাইয়া তাঁহারা তিনজন অগ্রসর হইলেন। খেতুরী আসিবার পথে কামারপুর
গ্রাম। নৃসিংহ রাজা তথায় শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপূর্বেই গঙ্গানারায়ণ, রামচন্দ্র
ও গোবিন্দ সেই গ্রামে তিনখানি ছোট দোকান খুলিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। গঙ্গা-
নারায়ণের তেলের দোকান, রামচন্দ্রের মুদিখানা এবং গোবিন্দ একখানি পানের দোকানের
মালিক হইলেন। নৃসিংহ রাজার সঙ্গে পণ্ডিতদের পড়ুয়ারা জিনিষ কিনিতে বাইয়া দেখে
তেলী, মুদী ও পানওয়াল্য সকলেই সংস্কৃতে কথাবার্তা বলে। আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের
শিক্ষাসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ছদ্মবেশীরা বলিলেন, “আমরা খেতুরীর লোক, সেখানে ঠাকুর
মহাশয়ের কাছে বহু পণ্ডিতের সমাগম হয়, খেতুরীর লোকেরা সকলেই অল্প-বিস্তর সংস্কৃত
জানে।” কিন্তু এতো অল্প বিজ্ঞা নহে! পড়ুয়ারা শাস্ত্রের যে কথা পাড়িল, তাহাতেই তাহারা
পরাস্ত হইল। স্মরণে অতি বিস্ময়ে তাহারা বাইয়া তাহাদের অধ্যাপকদিগকে এই বৃত্তান্ত
অবগত করাইল। সেই ক্ষুদ্র তিনটি দোকানের কাছে রাজকীয় দলের অসম্ভব ভিড় হইল।
ছয়জন পণ্ডিত তাঁহাদের বহু পড়ুয়া ও কয়েক শকট পুঁথি একদিকে, অপরদিকে তেলী, মুদি
ও পানওয়াল্য। রাজা স্বয়ং সভা জাঁকাইয়া বসিয়া গেলেন, মধ্যস্থ স্বয়ং পণ্ডিতরাজ রূপনারায়ণ
সরস্বতী। পণ্ডিতদল আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, প্রতিপক্ষ তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী
পণ্ডিত—উপরন্তু ভক্তিশাস্ত্রে, বাহাতে তাঁহাদের প্রবেশমাত্র নাই, তাঁহারা সেই নব অমোঘ
অস্ত্রের নিপুণ সন্ধানী। সনাতনরূত হরিভক্তিবিলাসের “বধা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্তং
ব্রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিগুণং জায়তে নৃণাম্” প্রভৃতি শ্লোক ও অনিবার্য্য যুক্তির
ব্যাহে পড়িয়া পণ্ডিতেরা একান্তরূপে অসমর্থ হইলেন। তাঁহাদের মনোহারী কথা, ভক্তির
আবেগ ও পাণ্ডিত্য সকলকে মুগ্ধ করিল। রাজা নৃসিংহ এবং সতীর্থ পণ্ডিতমণ্ডলী নরোত্তমের

শরণ লইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজা নুসিংহ ও রাজ্ঞী রূপমালা একত্র দীক্ষিত হইলেন। (বিস্তারিত বিবরণ নরোত্তমবিলাস ও প্রেমবিলাসে দ্রষ্টব্য।)

নরোত্তম আরও অনেক লোকের জীবনের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দস্যুতন্ত্র ছিল। সলোপ-কুলজাত শ্রামানন্দ পুনরায় দেশে আসিয়া তাঁহার পূর্বপুরুষের আদিনিবাস ধারেন্দা-বাহাদুরপুরে উপস্থিত হন (পরগনা দণ্ডকেশ্বর, উড়িষ্যা)। এখানে তিনি অদ্বৈতবাদী দামোদরকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন। শের খাঁ নামক এক মুসলমান দস্যু তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া এতই ভক্তিভাবাপন্ন হন যে, তিনি শ্রামানন্দের নিকট বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া চৈতন্যদাস নামে পরিচিত হন। এই চৈতন্যদাস একজন পদকর্তা। ভক্তিরত্নাকরের ১৫শ তরঙ্গে ইহার সংস্কারকাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। রাধাকৃষ্ণ-গানে ইনি আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন (প্রেমবিলাসে দ্রষ্টব্য)।

রয়ানি ধানার নিকটবর্তী ভারজিৎ নগরে তৎকালে এক পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন, ইহার নাম অচ্যুত। ইহার অধিকার মল্লভূমির অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। ভারজিৎ নগরের একদিকে দোলঙ্গা নদী। এই নদীর তীরদেশ অতি রমণীয়, তথায় একটি বাগেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা অচ্যুত তাঁহার রাজ্ঞী ভবানীর সহিত অনেক সময়ে এই মন্দিরের নিকটে বাস করিতেন। অচ্যুতের জ্যেষ্ঠপুত্র রসিকমুরারি পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন অধিকার করেন। তিনিও অনেক সময়ে দোলঙ্গা-নদীতীরে বাস করিতেন। শান্তশীলা নামক স্থানে রসিকমুরারি শ্রামানন্দের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সেই সাক্ষাতের পর রসিকমুরারি ভক্তি-সুধার রসাস্বাদ পাইলেন—তাঁহার মনের ভাব ও জীবনের গতি ফিরিল। তিনি মানুষ চিনিলেন, জাতের খোঁসাটা তাঁহার নিকট অসার বোধ হইল। ক্ষত্রিয় রাজা রসিকমুরারি তাঁহার দুই রাজ্ঞী ঈশানী ও মালতীর সহিত সলোপ শ্রামানন্দের শিষ্য হইলেন। উড়িষ্যার প্রায় সমস্ত রাজারাই এই রসিকমুরারির শিষ্য। সুতরাং মধুরভঙ্গ প্রভৃতি উড়িষ্যার অন্তর্গত যাবতীয় রাজ্যের অধীশ্বরদের গুরু গুরু শ্রামানন্দ। ভক্তিরত্নাকরে শ্রামানন্দের শিষ্যগণের মধ্যে উদ্ধব, অকুর, মধুবন, গোবিন্দ, জগন্নাথ, আনন্দানন্দ এবং রাধামোহনের নাম উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহার সর্বপ্রধান শিষ্য রসিকমুরারি। সমস্ত উড়িষ্যাদেশে শ্রামানন্দ চৈতন্যধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পরে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্রামানন্দ বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজের নেতা হইয়াছিলেন। ইহারা জাতিভেদ একেবারে অস্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রেণী-নির্কির্দেশে ধর্মমন্দিরের দ্বার সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র একান্ত অন্ত্যজ বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীদিগকে বৈষ্ণব-পর্যায়ে স্থান দিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহারা পতিতের উদ্ধারকারী ছিলেন, শাস্ত্রানুশাসিত জটিলতাগ্রস্ত কৃত্রিমতাপূর্ণ হিন্দুসমাজকে একেবারে ইহারা জাগরণমগ্নে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। নব-জীবনের শূন্যতে বৈষ্ণবগণ মণিপুর হইতে মধ্যভারতের ছতরপুর, উড়িষ্যা হইতে আফগানিস্থান পর্য্যন্ত সর্বত্র, পাহাড়িয়াদের মধ্যে কুকী, ত্রিপুরবাসী প্রভৃতি নানা জাতি ও দেশবাসীকে

চৈতন্যের প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন। চৈতন্যের সঙ্কীর্ণনের খোল ও মন্দিরা বঙ্গদেশের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখনও ধামে নাই। ইহারা ভিন্ন ধর্মের গ্রাস হইতে জনসাধারণকে অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য যে এই ধর্মপ্রচার ও সমাজসংস্কার সমস্তই চৈতন্যের প্রেরণা-জাত। তিনি ভাবের পাগল, ভগবৎ-প্রেমানন্দে বিভোর ছিলেন। কিন্তু সর্ববিষয়ে তাঁহার ইঙ্গিত ছিল। সেই ইঙ্গিত ক্ষুদ্র গিরিনির্ব্বরের মত কালে বিশালতোয়া স্রোতস্বিনীতে পরিণত হইয়াছিল। জাতিভেদসম্বন্ধে তাঁহার উক্তি সুস্পষ্ট, “মোর জাতি—মোর সেবকের জাতি নাই” (চৈ. ভা. অস্ত্য ১১)। “সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে সর্বনাশ। নীচ শূদ্র দিয়া করে ধর্মের প্রকাশ” (চৈ. চ. অস্ত্য)। রঘুনাথ-দাসের জাতি কালিদাস ঝড়ু ভূঞামালীর উচ্ছিষ্ট খাইয়াছিলেন, চৈতন্য এজ্ঞ তাঁহার সাধুবাদ করিয়াছিলেন। যবন হরিদাসের মৃত্যুকালে চৈতন্য সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে তাঁহার পানোদক পান করাইয়াছিলেন, শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে তিনি হরিদাসকে সদ্‌ব্রাহ্মণদের তুল্য আদর ও শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। জাতি-নির্কির্শেবে তাঁহার প্রেম ও উদার ব্যবহার গৌড়া ব্রাহ্মণসমাজে নিষিদ্ধ, এজ্ঞ কীর্তনীয়ারা গাহিয়া থাকে,— “সব অ-বিধি, নদের বিধি” (অর্থাৎ যত অনাচার—তাহাই নদীয়ার ধর্ম)। শাক্ত কবি চৈতন্যের এই উদারনীতিকে ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছিলেন, “গৌর ব’লে আনন্দে মেতে, একত্রে ভোজন ছত্রিশ জেতে, বাগ্‌দী কোটাল ধোপা কলুতে একত্র সমস্ত।”

পববর্তী কালে হিন্দুবিধি অতিক্রম করিয়া বৈষ্ণবেরা যে প্রচারকার্য চালাইয়া কৃতকার্য হইয়াছিলেন, সেই প্রচারকার্যের প্রস্রবণ চৈতন্য হইতে নির্গত হইয়াছিল।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে এই বিপুল উত্তম প্লথ হইয়া পড়ে। বীরহাধির বন-বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্ম লইয়া একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন, অবশ্য তথাকার শিল্প ও স্থাপত্য বৈষ্ণবপ্রভাবে অত্যন্ত শ্রীমঙ্গর হইয়াছিল। বহু দুর্লভ বৈষ্ণব পুস্তক রাজার পুঁথিশালায় সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তিনি সাধারণ রাজধর্মের গভী অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বলে বলা বাইতে পারে তিনি প্রত্যহ একটা নির্দিষ্টসংখ্যক নাম জপ করার জ্ঞ প্রজাদিগকে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। লিখিত আছে, কোন কোন লোক রাত্রি জাগিয়া নাম জপ করিত, পাছে ঘুমাইয়া পড়িয়া নির্দিষ্টসংখ্যক নাম জপ করিতে অক্ষম হয়, সেই ভয়ে তাহারা নিজেদের টাকি ঘরের টুয়া বা আড়ার সঙ্গে সূতা দিয়া বাধিয়া রাখিত। বসিয়া বসিয়া জপ করিবার সময়ে যদি তন্দ্রাবশে ঘুমাইতে থাকিত, তবে টাকিতে টান পড়িত। তখন জাগ্রৎ হইয়া পুনরায় জপে মনোযোগী হইত। ধীরে ধীরে বৈষ্ণব গৌসাইগণ প্রচুর ক্ষমতা ও লোকশ্রদ্ধা লাভ করিয়া আভিজাত্যদর্পী ও কতকটা ধর্মের বিকৃত অর্থবাদী হইয়া পড়েন। আমরা বলিতে বাধ্য, চৈতন্য যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, বাঙ্গলার গোস্থামিগণ-প্রবর্তিত ধর্ম আর সেরূপ নাই। চৈতন্যের অশেষ দৈন্ত ছিল, তাহাকে যদি কেহ ভগবানের অবতার বলিত, তিনি তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। কিন্তু তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করার পর তাঁহার সম্বন্ধে বহু আজগুবি গল্পের

সৃষ্টি হইল, তদ্বারা তাঁহাকে ভগবানের অবতার প্রতিপন্ন করিতে । তিনি বরাহ হইয়া গর্জন করিতে লাগিলেন, ভীষণ এক সর্পের উপর শুইয়া অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণুর অভিনয় করিলেন, বহুলোকের খাণ্ড একা খাইয়া দামোদর হইলেন, চতুর্ভুজ ও ষড়্ভুজ মূর্তিতে ঘন ঘন দেখা দিতে লাগিলেন, একদিনে আম্রবীজ বপন করিয়া সেইদিনই গাছে ফল উৎপন্ন করিলেন, জামীরের গাছে কদম্ব ফুটাইলেন, কখনও নৃসিংহমূর্তি ধারণ করিলেন (চৈ. ভা. মধ্য ২য়, মধ্য ৩য়, চৈ. চ. মধ্য, ১৭ প., ১২-১৩ শ্লোক, চৈ. চ. মধ্য, ৩য় প. ৪২ শ্লোক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) । লোচন দাস লিখিয়াছেন, তিনি পুরীতে আছেন শুনিয়া লঙ্কা হইতে বিভীষণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, এ সকল কথা পূর্বে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে । বস্তুতঃ চৈতন্য-বিরহখিন্ন নবদ্বীপবাসীদের মধ্যে যে-কেহ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেই আদৃত হইয়াছে । কেহ কেহ লিখিয়াছেন, ‘অলৌকিক গল্পে যে বিশ্বাস না করিবে—তাহার মস্তকে তিনি পদাঘাত করিবেন ।’ চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়—চৈতন্যের পূর্বলীলাতেই যত অলৌকিক ব্যাপার, রূপ গোস্বামীরা কৃষ্ণদাস কবিরাজকে যে সকল বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, তাহাতে অলৌকিক অংশ খুব অল্প । এই পূর্বলীলার বর্ণনা নবদ্বীপবাসীরা করিয়াছিলেন । যাহাকে তাঁহার ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে ভাগবত-লীলা আরোপ করা তাঁহার দোষাবহ মনে করেন নাই, বরঞ্চ উহা অবিশ্বাস করা তাঁহার পাপ মনে করিয়াছেন । এজ্ঞ মুন্সুরি গুপ্তের মত প্রবীণ পণ্ডিতও অনেক আজগুবি কথা বিশ্বাস করিয়া তাঁহার কাব্যে স্থান দিয়াছেন । শুধু গোবিন্দদাসের করচা এই দোষ হইতে মুক্ত । একথা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে চৈতন্য নবদ্বীপে থাকিলে ভক্তির ক্ষেত্রে ঐ সকল আগাছা জন্মাইতে পারিত না । তিনি এসকল অলৌকিক কথার কখনই প্রশংসা দিতেন না । তিনি শতবার এই সকল ভক্তির আতিশয্য নিরস্ত করিয়াছিলেন, এমন কি সার্কভোমের মত পূজাপাদ প্রবীণ পণ্ডিত তাঁহাকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু বলাতে তিনি জুদ্ধস্বরে বলিয়াছিলেন, “প্রভু কহে সার্কভোম আর কথা কহ । আতাল পাখাল কথা কেন বা বলহ ।” তাঁহার অহুপস্থিতিতে গোড়দেশে ভক্তির রাজ্যের পথঘাট, ঘরের আলিঙ্গন উপগল্লের আগাছায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ।

চৈতন্যদেবকে ভগবান রূপে প্রতিপন্ন করার পর গোস্বামীরা নিজেরাও তাঁহার দেবত্বের অংশীদার হইতে দাবী করিলেন । চৈতন্য স্বয়ং বিষ্ণু, নিত্যানন্দ বলরাম এবং অদ্বৈতকে সদাশিব করা হইয়াছে । কেশব ভারতী—শ্রীকৃষ্ণ-গুরু সান্দীপনি মুনি, পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধি—বৃষভানু, নরহরি দাস—মধুমতী, রামানন্দ—বিশাখা, রূপ—শ্রীরূপমঞ্জরী, গদাধর—রাধিকা, রাঘব—চম্পকলতা, সনাতন—লবঙ্গমঞ্জরী, গদাধরভট্ট—সুদেবী, রঘুনাথ দাস—রূপমঞ্জরী, মুকুন্দ—বৃন্দাদেবী, দেবানন্দ—গর্গমুনি, কানীশ্বর—ইন্দুরেখা, ভুগুর্ভ—প্রেমমঞ্জরী, এইরূপ প্রত্যেকেই রাধাকৃষ্ণলীলা-সংক্রান্ত ছাপর যুগের কোন সঙ্গীর অবতার বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন । গোস্বামিগণ এইভাবে মনুষ্যজগতের উর্দ্ধে সিংহাসন স্থাপন করিয়া দেবকল্প হইলেন এবং জনসাধারণের নিকট পূজার দাবী দৃঢ়

করিলেন। চৈতন্তের “না খাইয়া অহিচর্য হইয়াছে সার”, “নিরবধি দান্তপ্রমে
প্রভুর বিহার, মুই কৃষ্ণদাস বই না বলায় আর। হেন কার শক্তি নাই সম্মুখে
তাহানে। ঈশ্বর করিয়া বলিবেক দাস বিনে” (চৈ. ভা. অস্ত্য ১০), “ত্রিভাজ চলিয়া গেল
বৃক্ষের তলায়। অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায়। বহিছে হৃদয়ে দরদর অশ্রুধারা।
শত ভাকে কথা নাই পাগলের পারা।” “ছিন্ন এক বহির্বাস পাগলের বেশ” (করচা)
“ধলামাথা জটাধারা অল্প কথা নাই। পথে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি চলিছে নিমাই।” “অনাহারে
শীর্ণদেহ চলিতে না পারে। তবু প্রভু হরি নাম দেন ঘরে ঘরে।” (করচা) এই প্রেমাজ
চৈতন্ত-মূর্তি আর বৈষ্ণব-সমাজে নাই। কৃষ্ণনগরের কুমারেরা তাঁহার যে মূর্তি প্রস্তুত করে,
তাহাতে চৈতন্তদেব গোসাঁইদের মত নখরকান্তি, ভূ ডিটি অগ্রগণ্য, তৈলে ঘূতে মাখনে পুষ্ট দেহ।
গোপ্বামিগণ এই ভাবে নিজেরা অংশ-অবতাররূপে লোকবিশ্বাসে স্থান অধিকার করিয়া বৈষ্ণব-
ধর্মের প্রধান সূত্র দৈন্ত ও আর্তি হইতে বিচ্যুত হইলেন। চৈতন্তদেব রঘুনাথ দাসকে শিক্ষা
দিয়াছিলেন—“ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।”—তাঁহাকে তরুর মত হইতে
বলিয়াছিলেন—তরু ঝড়বৃষ্টি রোজ বিজ্যং স্বয়ং মাথা পাতিয়া লয়—কিন্তু পরকে ছায়া দান
করে, যে কুঠারাঘাতে তাহাকে কণ্টন করে, তাহাকেও স্বীয় অমৃতফল ও সুগন্ধ পুষ্প প্রদান
করে; কুধাতৃক্ষায় মরিয়া গেলেও কাহারও কাছে কিছু প্রার্থনা করে না। নিজকে রিত্ত করিয়া
তাঁহার তপস্তার্জিত পুষ্পফল—পুষ্পরস ও ফল অপরকে বিনামূল্যে প্রদান করে। জগতে
তরুর মত সহিষ্ণুতার আদর্শ, দৈন্তের, দানের, অযাচক বৃত্তির আদর্শ—আর কোথায় আছে?
এইজন্য চৈতন্ত রঘুনাথ দাসকে তরুর মত হইতে বলিয়াছিলেন। চৈতন্তচরিতামৃতকার তরুর
গুণ ব্যাখ্যা করিয়া টিপ্পনী করিয়াছেন।

এই জগতে নিত্য ধ্বংসলীলা চলিতেছে, প্রস্ফুট ফুল শুকাইয়া খরিয়া পড়িতেছে, কত
পল্লব, কত পত্র, কত সৌন্দর্য, কত সুরভির ধ্বংসের মধ্যে জগৎ প্রতিদিন জাগ্রৎ হইতেছে,

তথাপি এই ধ্বংসলীলার মধ্যে পরমানন্দ। সেই আনন্দময়ের
হাসির বিরাম নাই। নিত্য বিহঙ্গের আগমনী গান, নিত্য নবকুসুম-
সম্ভার, নিত্য নির্ঝরির কুলুকুল, উষার স্রবশ; এই অস্থায়ী চিরচঞ্চল
জগতের মধ্যে চিরস্থায়ী আনন্দের রূপ আছে—সেই রূপ-সমুদ্রে অবগাহন করিলে মানুষ
আনন্দনিকেতনে পৌঁছিতে পারে—“আনন্দং ব্রহ্মণো বেত্তি ন বিভেতি কদাচন।” চৈতন্ত
সেই আনন্দময়ের দেখা পাইয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম—আনন্দের ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম হৃৎথের ধর্ম।
সেই আনন্দময় পুরুষবরকে দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ আত্মা নিজসত্তা ভুলিয়া আনন্দসাগরে
ডুবিয়া যায়, যেমন নদী সমুদ্রে পড়িয়া নিজকে হারাইয়া ফেলে—এই অবস্থার নাম “বিশিষ্ট
ষেতাষেতবাদ,” এই অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া জয়দেব বলিয়াছেন—“মুহুরবলোকিত-
মণ্ডনলীলা মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা” ভাগবতও তাহার আভাস দিয়াছেন। চৈতন্তদেব
ভগবানের সেই অপূর্ণ ছায়াবর্ণিত শক্তির প্রকাশস্বরূপ। তিনি শুধু তাঁহার ভগবদ্ভক্তিপ্রবন্ধ,
অপাপবিদ্ধ, স্বনির্মল মূর্তি দেখাইয়া সর্বলোককে পাগল করেন নাই। তাঁহার প্রেমে

রঘুনাথ দাস, রূপ, সনাতন, উদ্ধরণ দত্ত, নরোত্তম, বীরহাধির, চাঁদ রায় প্রভৃতি রাজা ও রাজকর ব্যক্তির তঁহাদের অতুল বৈভব পরিত্যাগ করিয়া সম্যাসী হইয়াছিলেন। ইহাদের প্রত্যেকটি এক এক জন বুদ্ধের স্থায়। এই বাংলাদেশে গোপীচন্দ্র, দীপকর হইতে লালাবাবু ও চিত্তরঞ্জন পর্য্যন্ত যত রাজা, রাজপুত্র ও রাজকর ব্যক্তি সম্যাস গ্রহণ করিয়াছেন জগতের এত স্বল্প-পরিসর কোন দেশে বোধ হয় সেরূপ-সংখ্যক রাজর্ষিদের আবির্ভাব হয় নাই। কিন্তু এই রাজর্ষিদের দেশেও ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে চৈতন্তের প্রভাবে যতজন রাজতুল্য ব্যক্তি ইন্দ্রতুল্য বৈভব পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন, এত আর কোন যুগে হয় নাই। এই দেশ খুব বড় আদর্শ ও খুব বড় ত্যাগের দেশ। এ হাটে ক্ষুদ্রকথা বিকায় না, এখানে জীবন-মরণ পায়ের তৃত্য—কিন্তু ধ্বংসের জন্ত নহে, অমুরাগ ও প্রেমের জন্ত। এদেশে অশ্রুর বে বল, অস্ত্র গোলাগুলি ও বাকদের সে বল নাই। চৈতন্ত আনন্দাশ্রম উপর তঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। জগৎ কতকাল পরে তঁহার এই উচ্চ আদর্শকে বুদ্ধিতে পারিবে, জানি না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গুরুবাদ ও পরকীয়া

আমরা দেখাইয়াছি, মহাপ্রভুকে ভগবান্ করনা করিয়া সেই কেন্দ্রের পরিধিতে যে সকল নরদেবতার মণ্ডলী পরিকল্পিত হইয়াছিল তাহা কখনই চৈতন্তের অনুমোদিত হইত না। চৈতন্তের অবতার-বাদ এই করনার ভিত্তি। ইহা কখনই তিনি গ্রহণ করিতেন না, বরঞ্চ তিনি সর্বদা ইহার বিরোধী ছিলেন।

রামরায় তঁহার সঙ্গে যে সকল কথাবার্তা বলেন, এবং যে সকল গান ও নাটক রচনা করেন, তাহা চৈতন্তের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। বস্তুতঃ যে কয়েকখানি পুস্তক তিনি নিত্য আবৃত্তি করিতেন, তন্মধ্যে “রায়ের নাটকগীতি”-খানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামানন্দের প্রসিদ্ধ “সো

নহ রমণ হাম নহ রমণী” গানটি চৈতন্তচরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

গুরুবাদ।

ইহাতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, জীব ও ভগবানের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা ভগবানের অমুরাগমূলক। “পহিলিহি প্রেম নয়নভঙ্গে ভেল”—তঁহার দৃষ্টির ভঙ্গীতে আমার প্রেম প্রথম উদ্ভূত হইল, দিনে দিনে তাহা বাড়িয়া চলিল, তাহার অবধি হইল না। এই প্রেমের মধ্যে আর কেহ ছিল না, দূতী বা অতৃপ্তীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয় নাই। “না মিলল দূতী, না মিলল আন, হুহঁক মাখে শুধু পাঁচবান” এই কথায় গুরুবাদকে স্পষ্ট অস্বীকার করা হইয়াছে। চৈতন্তের নিজ উক্তি “ঈশ্বরে বিখাস ঈশ্বরে আনিয়া মিলায়”

সেই বিশ্বাস অপর কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায় না। শুভ মুহূর্ত্তে তিনি স্বয়ং তাঁহার অবাচিত করুণা কোন ভাগ্যবানকে দিয়া যান।

কিন্তু বর্তমান গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম গুরুবাদের উপর দাঁড়াইয়া আছে। গোস্বামিগণ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন—“বৃন্দাবন-লীলার সখীরাই মহাপ্রভুর (স্বয়ং কৃষ্ণের) সহচর হইয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রজরস আশ্বাদন করিবার আর উপায় নাই, গোপীগণের হাতেই সেই রসের চাবি। গোস্বামিগণের বংশধরদিগের শরণ না লইলে বৃন্দাবনে প্রবেশাদিকার কাহারও হইতে পারে না। গৌরগণোদ্দেশের শ্লোক মুখস্থ করা ইয়া বৈষ্ণব-শিষ্যদিগের মনে গোস্বামিগণের দেবত্ব বিশ্বাস সমাজে দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছিল। এই ভাবের বর্তমান বৈষ্ণব-ধর্মমত চৈতন্তের ধর্ম সমাশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয় নাই। তাহাতে কুল-শীলের—বংশের কোন মর্যাদা নাই। “কহে চণ্ডীদাস, কান্থর পীরীতি—জাতিকুলশীল ছাড়া।” এক এক গোস্বামীর শিষ্যগণ হইলেন—তাঁহার পরিবার। ইহারা গ্রন্থাদি লিখিতে গিয়া নিজ পিতামাতা কিংবা পূর্বপুরুষদের নাম উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার গুরু ও গুরুভ্রাতাদের পরিচয়ার্থ দীর্ঘ বন্দনাত্মক কবিতা লিখিয়া মুখবন্ধ করিয়াছেন। নিজের জাতি-বংশ, গোষ্ঠী বা পারিবারিক অপরাপের সমস্ত বন্ধন ছাটিয়া ফেলিয়া ইহারা গুরুপদে মাথা বিকাইয়াছেন ও তৎসমর্পিতকর্মা হইয়াছেন। একপ গুরুবাদ বৈষ্ণবেরা পাইলেন কোথা হইতে? বৌদ্ধগণের মধ্যে গুরুবাদ অত্যন্ত প্রবল ছিল—“তুনহে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ বড়, তাহার উপরে নাই”—চণ্ডীদাসের এই মানুষ কে তাহা জানি না, কিন্তু বৌদ্ধগণের যে গুরুই সর্বশক্তিমান—অনন্তসাধারণ, একমাত্র পূজার্ত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। নেপালে হিন্দুদিগকে “দেভাজু” ও বৌদ্ধদিগকে “গুভাজু” বলা হয়। দেভাজু অর্থ “দেবতা-ভজনশীল” ও “গুভাজু” অর্থাৎ “গুরুকে ভজনশীল”। নাথধর্মেরও গুরুর প্রতি অসামান্য ভক্তির বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গোরক্ষনাথ তাঁহার গুরুর জন্ত কি অসামান্য কষ্ট সাধন করিয়াছিলেন! চৈতন্ত দেব-মন্দির ও তীর্থস্থানগুলি দেখাইয়া বেড়াইতেন—সুতরাং তাঁহাকে “দেভাজু” বলা যাইতে পারে। গুরুর প্রতি এই অসাধারণ ভক্তির লীলা তিনি কোথায়ও দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আমার বিশ্বাস এই গুরুবাদ বৌদ্ধতত্ত্ব এবং হিন্দুতত্ত্ব উভয় তত্ত্ব হইতেই বৈষ্ণবগণ লইয়াছিলেন, ইহার মধ্যে চৈতন্তের কোন প্রেরণা ছিল না। এই গুরুবাদের দ্বারা গোস্বামিগণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও অর্থসম্পদের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

পরবর্তী বৈষ্ণবেরা বৌদ্ধ মত হইতে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অশোকের ধর্মমহামাত্রের পদে গোস্বামিগণ নিজেরা অবিস্তিত হইয়া পুরস্কার ও নিগ্রহ বিতরণ করিতেন। অনেক বৈষ্ণববাড়ীর গৃহে জেল ছিল। শিষ্যদের অপরাধের বিচার গোস্বামীরা স্বয়ং করিতেন, এবং তাঁহাদের জেলে অপরাধীরা দণ্ড পাইত। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন, খড়মহে তাঁহাদের জেল ছিল,—নিত্যানন্দের বংশধর-গণ বিচার করিয়া তাঁহাদের শিষ্যদিগকে শাস্তি দিতেন। ছই হাজার তিন শত বৎসর পূর্বে মহারাজ প্রিয়দর্শী যে ধর্মমহামাত্রপদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এককাল পরে সেই পদে

গোস্বামীদিগকে সমাসীন দেখিয়া মনে হয়—ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠাও নষ্ট হয় নাই। নব ভারতের পল্লী খুঁজিলে জীর্ণশীর্ণ অবস্থায়—সেই সকল পত্র এখনও পাওয়া যায়। মহারাজ প্রিয়দর্শী শুধু “ধর্মমহামাত্র” পদের সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ধর্মের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও ধর্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে উচ্চশিক্ষিতা চরিত্রবতী মহিলাদিগকেও সেই ভাবে নিযুক্ত করিতেন। এই ব্রীধর্মমহামাত্রগণের ধারাটিও গোস্বামিনীগণ বজায় রাখিয়াছেন। ইহারা ভক্তপরিবারে বাতায়াত করিয়া ধর্মের অমুশাসন ও তত্ত্ব প্রচার করিতেন। চলিত ভাষায় ইহাদের নাম ছিল “মা গোসাই।”

বৌদ্ধধর্ম শেষকালটা দেহতত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত ছিল, আমরা পূর্বের এক অধ্যায়ে (১৪ অঃ, ৫ম পঃ, ৫৮৪-৮৫ পৃষ্ঠায়) তাহা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। মহাপ্রভুর ভাবপ্রবণ ভক্তি-ধর্মে এই দেহতত্ত্ব একটা স্থান জুড়িয়া বসিল। গোরক্ষবিজয়ে দেখিতে পাই, ছদ্মবেশী গোরক্ষ মৃদঙ্গের বোলে “কায় সাধ—কায় সাধ” এই ধ্বনি তুলিয়া গুরু মীননাথকে উদ্বোধন করিতেছেন। “যাহা নাই ভাঙে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে” এই উক্তির সঙ্গে বঙ্গের জনসাধারণ বিশেষভাবে পরিচিত। অনেক সময়ে পূর্ববর্তী ধর্মকে বর্জন করিয়া নহে—আত্মসাৎ করিয়া পরবর্তী ধর্ম শির উত্তোলন করিয়া থাকে। মহাপ্রভুর নাম করিয়া অনেক কথা বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বৌদ্ধতত্ত্ব ও হিন্দুতত্ত্ব হইতে গৃহীত। চণ্ডীদাস স্বয়ং তাঁহার কৃষ্ণকীর্তনে “এড়িয়া টানিরে খাস” প্রভৃতি তত্ত্বোক্ত খাসনিয়ামক প্রাণায়ামের তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, সহজিয়া পুস্তকমাত্রেরই হরিভক্তি ও হরিপ্রেমসম্বন্ধে বিশেষ কোন উপদেশ নাই।

দেহতত্ত্ব।

মহাপ্রভুর অষ্ট সাত্বিক বিকার অথবা শাস্ত, দাস্ত, সখা, বাৎসল্য মাধুর্য্য এই পঞ্চ অবস্থার সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ সহজিয়া-সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। তাহাতে কেবলই দেহতত্ত্বের কথা। অমৃত-রত্নাবলীর প্রথম ও শেষ কথা “সকলের সার হয় আপন শরীর। নিজ দেহ জানিলে আপনি হবে স্থির।” (৩ পৃঃ) চণ্ডীদাসের উক্তিও সেই একই কথা—“নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে, সহজ ভজন বলিব তারে।” সহজিয়া-সাহিত্যে ভক্তি বা প্রেমবাদ অত্যন্ত সর্বত্র দেহতত্ত্বের কথা। ইহা সেই সুপ্রাচীন তাত্ত্বিক ধারা। সহজিয়ারা হিন্দুতত্ত্বের সঙ্গে যোগ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধতত্ত্বই তাঁহাদের ভিত্তি। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে খুসী-বিখাসী, রাম-বল্লভী, সাহেবধনী, দরবেশী, সহজিয়া, কঠাভজা, বলরামী, হজরতী, গোবরাই, পাগলনাথী, পাঁচ ফকিরী প্রভৃতি যে সকল শ্রেণী আছে, তাঁহারা হিন্দুগণের প্রধান প্রধান সংস্কারগুলির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন; কোন কোন স্থানে মুসলমান গুরু এবং ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য; হিন্দুদের মধ্যেও গোমাংস কোন কোন শ্রেণীর নিষিদ্ধ নহে।

ব্রীজাতিসম্বন্ধে এই সহজিয়াদের যে সকল মত আছে তাহা একেবারে সামাজিক আদর্শকে উলটপালট করিয়া দিয়াছে। ইহাদের আদর্শ সীতা সাবিত্রী নহেন, সহজিয়াদের মতে তাঁহারা স্বেচ্ছায় তাঁহাদের সর্বস্ব স্বামীর পদে বিকাইয়া দেন নাই। হিন্দুসমাজ পতিব্রততার স্থান যতটা উচ্চ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পাতিব্রতের অল্প প্রচুর তৈলবটের ব্যবস্থা

আছে—তাহাতে ইহকালে ইষ্টবদ্ধজাতির উচ্চতান-প্রশংসা এবং পরকালে অক্ষয় স্বর্গ। ইহাদের কোনটির লোভ অলক্ষিতভাবে সীতা-সাবিত্রীদের মনের উপর বেশী কার্য্য করিয়াছিল—ইহা একটি জটিল প্রশ্ন। অন্ততঃ সহজিয়াদের আদর্শ ইহারা হইতেই পাবেন না। পরকীয়া-প্রেমে যে রমণী আত্মসমর্পণ করিল, সেই মুহূর্ত্তে সে লোকচক্ষুর বালাই হইল।

পরকীয়া।

নিজের পিতামাতা তাহার জন্ত চিরতরে গৃহের অর্গল বন্ধ করিলেন, স্বামিগৃহে সে অস্পৃশ্য, ঘৃণিত, অপাণ্ডিত্য। বন্ধ ও স্বগণেরা তাহাকে

অস্বীকার করিল, শাস্ত্রকারেরা তাহাকে নিম্নতম নরক দেখাইলেন। সুতরাং পরকীয়ার প্রথম অবস্থা হইতে সে পার্থিব বাহ্য কিছু কাম্য তাহা সমস্ত বিসর্জন দিয়া—পরকালের সমস্ত ভীতি অগ্রাহ্য করিয়া কলঙ্কের ডালি মাধায় করিয়া পথে দাঁড়াইল। সুতরাং ত্যাগ-সম্বন্ধে সে যে উচ্চতম আদর্শে পৌছাইয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

দ্রীলোক লইয়া ধর্মচর্চা বা প্রেমের আদর্শ প্রদর্শন করা এক সময়ে যুরোপের সর্বত্র প্রচলিত ছিল। মধ্য যুগের “নাইট এরাণ্ডী” বেশী দিনের কথা নহে। কিন্তু খৃষ্টের পূর্বেও অনেক শ্রেণী এই রমণীদের লইয়া ব্যভিচারকে ধর্মের অঙ্গীয় মনে করিতেন। তাহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে দ্রীলোকের গণিকাবৃত্তি অতি সাধুকার্য্য এবং প্রশংসনীয় ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইত। পুরাকালে উর্ধ্বশী-তিলোত্তমা প্রভৃতি স্বর্গের গণিকারা লোকমতে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এমন কি মুচ্ছকটিকে বসন্তসেনাই সেই নাটকের সর্বগুণসম্পন্ন প্রধান নায়িকা। গণিকাদের নৃত্য, গীত এবং সমস্ত কলাবিজ্ঞান পারদর্শিতা লাভ করিতে হইত। উদ্দালক মূনির পুত্র-কর্তৃক বিবাহপ্রথা আর্য্য-সমাজে প্রচলিত হইবার পূর্বে পর্য্যন্ত দ্রীলোকদের বহনায়কের সহিত সম্বন্ধ প্রশংসনীয় ছিল। যে রমণী বহনায়ককে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন, সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা হইত। বিনি পুরুষের নিবেদন অগ্রাহ্য করিতেন, তিনি সমাজে নিন্দিতা হইতেন, তাহাকে সমাজ “কর্কশা” নাম দিয়া তাহাদের প্রতিকূলভাব দেখাইতেন। (ছর্গাচরণ সান্ত্বালের সামাজিক ইতিহাস দ্রষ্টব্য।) যদিও বুদ্ধদেব ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর মিলনসম্বন্ধে বহু কঠোর নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি কালে সংঘের মধ্যে নরনারীর অবাধ মিলন হইতে লাগিল। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতেও যে একাভিপ্রায়ীর দল বিস্তারিত ছিল তাহা পূর্বেই (৩২১ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হইয়াছে। তাহারই নব নব সংস্করণ এখনও পল্লীতে পল্লীতে উৎপন্ন হইয়া সেই অক্ষয়-বটের অবিনাশী বংশধারা বজায় রাখিয়াছে। ঘোষপাড়ার মত শত শত গ্রামে রজনীর অন্ধকারে অর্গলবদ্ধ গৃহে নরনারীর অবাধ ধর্ম্মানুশীলন এখনও চলিতেছে। আমরা পার্কীচরণ কবিশেখর-প্রণীত চাক্ষুদর্শন নামক পুস্তক হইতে এই নরনারী-মিলনের একটা দৃষ্ট উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

‘কিশোরী-ভজনের মেলায় যাইয়া হাকিম চতুর্দিকে তাকাইয়া দেখিলেন প্রায় পাঁচশত লোক উপস্থিত। সেই লোকের মধ্যে দ্রীলোকের সংখ্যাই বার আনা। সেই দ্রীলোকদের মধ্যে বিধবার সংখ্যাই দশ আনা। সেই বিধবাদের মধ্যে যুবতীর সংখ্যা আট আনা। কোন দ্রীলোকের কোলেই শিশু নাই। যুদ্ধের সংখ্যাও বড় কম, যুবতী ও যুবকদের সংখ্যাই পনের

আনা।পদে পদে এত ক্রটি দেখিলেও তিনি একটা প্রধান বিষয়ে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাদৃশ সন্তুষ্ট উন্নত ব্রাহ্ম-সমাজেও অগ্নিতে পারে নাই। ব্রাহ্মগণ ক্রী-
স্বাধীনতার ঘোর পক্ষপাতী হইলেও সভায় বসিবার কালে একত্র মিলিয়া নিশিয়া বসেন
না। কিন্তু এখানে তাদৃশ সন্ধীর্ণতা নাই। স্ত্রীপুরুষ যার যেখানে ইচ্ছা, সেখানে
কিশোরী-ভজনের মেল।

পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়া বসিয়াছে। কাজেই ঐদৃশ ক্রীস্বাধীনতা-
দর্শনে হাকিমবাবু সমস্ত অভাব ও সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া
গেলেন। হাকিমের এই চিন্তা শেষ হইতে না হইতেই ভজন-ক্রিয়া আরম্ভ হইল।
সেই মোকদ্দমায় অভিযুক্ত বৈষ্ণবীগণ ও কৃষ্ণপুরের কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবী হাকিমবাবুর
অতি নিকটে আসিয়া গান ধরিল—“এই পাগলের দলে—এই দলে কেউ এসনা রে
ভাই। কেউ এসনা, বস'না, কেউ ঘে'ব না গায়। এই দলেতে এলে পরে—জাতের বিচার
নাই। এক পাগল উড়িয়াতে জগদ্বাণ গোঁসাই, চণ্ডালেতে আনে অন্ন ব্রাহ্মণেতে খায়।
এক পাগল চিতলাইতে শস্ত্র চাঁদ গোঁসাই। সে বে হিন্দুর গুরু, ব্রাহ্মণের শিব, মোসলমানের
সাঁই।” উক্ত গান-সমাপনের পর কমলদাস আসিয়া ঘোষণা করিল—“সেবানন্দে প্রেমানন্দ
বাধে” অর্থাৎ ক্ষুধানিবৃত্তি না করিতে পারিলে ভগবানের প্রেমানন্দ লাভ ঘটে না।

কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অন্নব্যঞ্জনের পাত্র সভার মধ্যস্থলে বিছানার উপর আসিয়া
উপস্থিত হইল, তৎসঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপুরুষগণ সেই পাত্রের চতুর্দিকে ঘিরিয়া বসিল, এবং
এক এক জনের মুখের অন্ন টানাটানি ও হাসাহাসি করিয়া অল্পে অল্পে খাইতে লাগিল।
এই দৃশ্যে হাকিমবাবু মহাসন্তুষ্ট হইলেন। এত বিভিন্ন জাতির একত্র সম্মিলিত মেলার
মধ্যস্থলে বিছানার উপর হিন্দুজাতির অন্নব্যঞ্জন আসিতে পারে, তাহা হাকিমবাবু স্বপ্নেও
কল্পনা করিতে পারেন নাই। তত্পরি আবার এক-খালার খাদ্য টানাটানি করিয়া সকলে
খাইতে পারে, ইহা অসম্ভব হইতেও মহা অসম্ভব।.....সুতরাং ঐদৃশ জাতিভেদবিরোধী
আচরণ হিন্দুজাতির মধ্যে পাইয়া হাকিমবাবু আশ্চর্যে গলিয়া গেলেন। তাঁহার ‘জাতিভেদ’
নামক পুস্তকখানিতে যে নূতন অধ্যায় লিখিত হইবে তাহাও মনে মনে স্থির করিয়া
লইলেন। সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত করিবার আশাও
জাগিয়া উঠিল। সেই আশা হঠাৎ বর্জিত হওয়াতে হাকিমবাবু স্থির থাকিতে পারিলেন না।
তাই তিনি হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, “হে প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ—
আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করিতে আমি দণ্ডায়মান হই নাই। এই মেলায় জাতিভেদ-
নাশক সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা দেখিয়া এত আনন্দিত হইয়াছি যে, তাহা হৃদয়ে চাপিয়া
রাখিতে পারিলাম নাএই জাতিভেদ-নিবারক ভোজনক্রিয়া-নির্বাহকালে সদর
দরজা খুলিয়া সকলকে দেখান উচিত। নতুবা এই মহাসত্য-প্রচারের সুবিধা হইবে না।
ব্রাহ্ম-সমাজের ক্রীস্বাধীনতা প্রকাশ্য দিবালোকে। তাই এই মহাসত্য-প্রচারের মহাসম্মেলন
ধটিতেছে। আপনাদের ক্রীস্বাধীনতা রাত্রিতে অতীব গোপনে পাপকার্যের মত সম্মুখে
সম্পন্ন হয় কেন? আপনারা যখন ধর্মের বলে বলীয়ান, তখন আর ভয় করেন কাকে?.....

“হিন্দুজাতির অধঃপতনের অন্ততম কারণ অবরোধপ্রথা। ঈদৃশ বর্জিততা কোন স্রমজ্য জাতির মধ্যে নাই। দেশ জাগাইতে হইলে স্রীস্বাধীনতার আবশ্যক। দেখুন বৃক্ষের অর্দ্ধাংশে স্বর্ষ্যের উত্তাপ পাইয়া যদি বাকী অর্দ্ধাংশ উহা না পায়, তবে সেই বৃক্ষ রীতিমত স্তম্ভপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে না।—এই জন্তই চিন্তাশীল কবি বঙ্গনিদানে ঘোষণা করিয়াছেন, ‘না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।’……আপনাদের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে সুশিক্ষিত উন্নত ব্রাহ্ম-সমাজের বেশ মিল আছে। তাই আপনাদিগকে আগামী রবিবার সেই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতে অনুরোধ করি। তথায় আমি থাকিয়া বহু উন্নতির পথ দেখাইয়া দিব।……আমি স্বয়ং কয়েকখানি গাড়ীসহ এই আখড়ায় আগামী রবিবার ১২টার আসিতে প্রস্তুত আছি। আমার সঙ্গে আপনারা গেলে ব্রাহ্ম-সমাজ দত্ত হইবেন।”

হাকিমবাবুর এই বক্তৃতার মর্ম্ম কেহ বুঝিলেন না। তাঁহাদের পক্ষে যে তাহা বুঝিবার কোন আবশ্যকতা আছে তাহাও তাঁহারা মনে করেন না। শ্রীগুরুর শ্রীমুখের উপর যে হাকিমের মুখ বা অস্ত্রের মুখ থাকিতে পারে, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা নিভুল এবং বাকী সমস্তই ভুল, ইহাই তাঁহাদের মজ্জাগত দৃঢ় ধারণা। তাঁহারা বিজ্ঞা ও বুদ্ধিকে কুপথের সহায় বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বেদ বা শাস্ত্রকে ঐহিকের খেলা বলিয়া মনে করেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে বৃথা মনুষ্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা সংসারে থাকিয়াও সাংসারিক নিয়মকে তুচ্ছ মনে করেন। গুরু, পুরোহিত, স্বামী ও গুরুজনকে তত গ্রাহ করেন না। দেবপূজা, উপবাস, শ্রম, ঘণ্টা, পবিত্রতা, নিয়ম ও নিষ্ঠা প্রভৃতিকে অসার মনে করেন, আনন্দময়-মেলায় আনন্দময় ভজনকেই জীবনের সারাংশ মনে করেন। তাই হাকিমের বক্তৃতার উত্তরে এই মেলার সাধু ও সাধুনীরা নিম্নোক্ত গান ধরিল :—“মন বাহুড় সন্ধ্যার সময় উড়িস্ না,—কাল কাক পেলে তোরে ছেড়ে দিবে না। শোন বলি মূর্খ বাহুড়, দিনে ষেকো দিন-কানার মত, রাত্রে হইও চতুর। উপর দিকে দিয়ে লেঙ্গুর, ঝুলন স্বভাব গেল না।……” এই গান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভোজনকার্য্য নির্বাহিত হইয়া আচমনের সময় আসিল। তাই দশ বারো জন স্রীলোক—হাকিমবাবুর মুখ ধোওয়া জল খাইবার জন্ত প্রস্তুত হইল।

কাজেই এবার বিবম হড়াহড়ি বাধিয়া গেল। তাহার ফলে হাকিমবাবুকে রাত্রি দশটার সময়ে স্নান করিতে বাধ্য হইতে হইল। এমন সময়ে কমলদাস মনে মনে স্থির করিল, হাকিমবাবু অবশ্য সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু ব্যক্তিভেদে যে বৈষম্য ঘটে, তাহা সে জানিত না। যে উপাদানে অশিক্ষিত নীচলোকের আনন্দ জন্মে, সুশিক্ষিত সম্রাস্ত দর্শ-প্রাণ লোকের তাহাতে আনন্দ না জন্মিবারই সম্ভাবনা বেশী। বরঞ্চ স্রীলোকের এত নির্লজ্জতা ও অসভ্যতায় তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছিল। তাই তিনি স্নানের পর কাহাকেও গাত্র মোছাইবার অধিকার দিলেন না। কমলদাস এই আমোদকে দর্শসম্মত বলিয়া প্রমাণের প্রত্যাশায় হাকিমকে লক্ষ্য করিয়া ঘোষণা করিলেন :—“পাশবজ্জো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ” অর্থাৎ ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, নিন্দা ও আসক্তিকে অষ্টপাশ (আট প্রকার বন্ধন) বলে। সাধনবলে সেই

পাশমুক্ত হইতে হইবে। পাশমুক্ত না হইলে জীব বালকের জায় সরল হয় না। সরল না হইলে ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না।" হাকিমবাবু শ্রীলোকদের নির্লজ্জতা ও কমলদাসের উক্তি মিলাইতে গিয়াও মিলাইতে পারিলেন না। এমন সময়ে কমলদাস আবার ধর্মব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল। বধা—ধর্মজগতের দেশ চারি প্রকার—(ক) স্থূল, (খ) প্রবর্তক, (গ) সাধক, (ঘ) সিদ্ধ। প্রত্যেক দেশের জন্ত ছয়টি শিক্ষিতব্য বিষয় আছে, বধা—(১) দেশ, (২) কাল, (৩) আশ্রয়, (৪) পাত্র, (৫) আলম্বন (৬) উদ্দীপক.....দেশের অর্থ ও গানের অর্থ হাকিমবাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তজ্জন্ত হাসাহাসির সঙ্গে যোগ দিতে পারিলেন না, বলিয়া অনেকের মুখে হাসি জাগিল.....তাই তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। বাতায়ত কালে যাহা চক্ষে দেখিলেন বা অনুমান করিলেন তাহা বর্ণনার যোগ্য নহে' (১৪০-১৪২ পৃষ্ঠা)।

ইহা একটি ব্যঙ্গদৃষ্ট হইলেও এই বর্ণনার ভিতর বে কতকটা সত্য আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ছবির আর একটা দিক আছে। উন্নত সহজধর্মীর আদর্শ—সংস্কারের উর্দ্ধে।

নরনারীর প্রেমসম্বন্ধে সহজিয়াদের ধারণা খুব উচ্চ। তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, "প্রণয় করিয়া ভাঙ্গয়ে যে, সাধন-অঙ্গ পায় না সে।" বাহাকে

সহজিয়াদের আদর্শ-প্রেম। প্রেম দিয়াছ, তাহা হইতে সে প্রেম আর ফিরাইয়া আনিতে

পারিবে না—সে ব্যভিচারী হউক বা ব্যভিচারিণী হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না; সাংসারিক সুখ হয়ত হইল না, হয়ত প্রেমের পাত্র বা পাত্রী পুনরায় নির্বাচন করিলে ঘরকরা সুখের হইত। কিন্তু সহজিয়া সে সুখ চায় না। স্থূল বেকপ তাহার সৌরভ বিতরণ করিয়া তাহা ফিরাইয়া আনিতে পারে না, ভালবাসিয়া প্রকৃত প্রেমিক তাহা নষ্ট করিতে পারে না। দান-ধর্ম ইহা নহে, দান করিয়া তুমি নিঃস্ব হইতে পার দ্বিতীয় হরিশ্চন্দ্রের মত;—কিন্তু প্রেমকে যিনি সাধনার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি হৃৎস্বখের অতীত হইয়া গিয়াছেন। হৃৎস্বখের বোঝা মাথায় করিয়া তাঁহাকে সাধনার পথ পরিষ্কার রাখিতে হইবে—প্রেম আদান-প্রদানের—করিবারের বা বিনিময়ের সামগ্রী নহে। যিনি শেষ রক্ষা করিতে পারিবেন না—তিনি সাধন-অঙ্গ পাইবেন না। সহজিয়া-প্রেমে "তলাকনামা" অগ্রাহ্য। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন, তাঁহার সময়ে "সহজ প্রেমের" নেশায় যুবক-যুবতীরা উন্মত্ত ছিল। কিন্তু এ সাধনা বড় শক্ত। কবি বলিয়াছেন, যোগ্য ব্যক্তি "কোটিকে গোটিক হয়", এক কোটা সাধনপন্থীর মধ্যে একজন হয়। সে ব্যক্তি কেমন, তৎসম্বন্ধে চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—যিনি "স্বমেরু পর্বতকে সূতা-তন্ত দিয়া বাদিয়া আকাশে ঝুলাইয়া রাখিতে পারেন, যিনি বিষধরের কবলে ভেককে পাঠাইয়া তথায় তাহাকে নৃত্য করাইয়া ফিরাইয়া আনিতে পারেন—তিনি যোগ্য। অর্থাৎ যিনি অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, তিনিই যোগ্য। "অঙ্কাবলী" গীতিকায় (পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ) এইরূপ প্রেমের দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম উপদেশ নিজদেহকে "কাষ্ঠ-লৌহসম" করিতে হইবে। অর্থাৎ উহাতে ইন্দ্রিয়সক্তির লেশ মাত্র থাকিবে না। দৈহিক উত্তেজনার লেশ থাকিলে

দেবতারা সে প্রেমের স্বর্ণ হইতে সাধককে তাড়াইয়া দিবেন। “মরম না জানে, ধরম বাধানে, এমন আছে যারা। কাজ নাই সখি, তাদের কথায়, বাহিরে বহন তারা। আমার বাহির ছুয়ারে, কপাট লেগেছে—ভিতর ছুয়ার খোলা।” তাহারা শাস্ত্র লইয়া ব্যাখ্যা করেন—মর্শী নহেন—তাহারা দূরে থাকুন,—বহিরিঙ্গিরের লেশ বাহার আছে—তাহার অধিকার নাই। “চৌঙকি রয়েছে সেখা”—প্রহরী আছে, দৈহিক কোনরূপ চাকল্য দেখিলে তাহারা তাড়াইয়া দিবে—“সে দেশের কথা, এদেশে কহিলে, লাগিবে মরমে ব্যথা।” সে দেশের সুখদুঃখ—এদেশের সুখদুঃখ নহে। চণ্ডীদাস বলিতেছেন—“ত্রিসঙ্খ্যা যাজ্ঞন, তোমার ভজন, তুমি বেদমাতা গায়ত্রী, তুমি হও পিতৃমাতৃ।” ইত্যাদি কথায় কবি যে স্বর্গলোকের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার পঞ্চদশট প্রাচীন কবি তরঙ্গীরমণ তাহার চণ্ডীদাস-জীবনীতে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহার মূল পুঁথি বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তাহা ছাপাইয়াছেন। ইহাতে আছে—প্রণয়ী ও প্রণয়িনী পরস্পরকে নির্দোষ করার পর পরস্পরের নিকট হইতে দূরে,—পুরুষ স্ত্রীর মধ্য, ও নারী স্ত্রীর যুবকগণের মধ্যে,—বাস করিবেন। নির্দিষ্ট কালের মধ্যে যদি শত প্রলোভনসম্মত তাহাদের একনিষ্ঠ প্রেমের পরিবর্তন না হয়, তবে তাহাদের প্রথম পরীক্ষা হইয়া গেল। দ্বিতীয় অবস্থায় তাহারা একগৃহে বাস করিবেন, তখন স্বীয় চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বভাব লইয়া তাহারা কি কি গুণ অতিক্রম করিবেন তাহা তরঙ্গীরমণ রামীর মুখে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—“চারিমাংস আগে তার চরণ সেবিয়া। পদতলে পড়ি রবে স্বভাব লইয়া। পুনঃ আর চারিমাংস চরণ সেবিয়া। বামভাগে গুতি রবে স্বভাব লইয়া। পুনরুপি চারিমাংস সর্বাঙ্গ সেবিয়া। হৃদ-বন্দে গুতি রবে স্বভাব লইয়া। আর চারিমাংস তার চরণ ধরিয়া—হৃদয়ে রাখিবে তাকে স্বভাব লইয়া।” প্রত্যেক পদের পশ্চাতে “স্বভাব লইয়া” কথাটি আছে—অর্থাৎ স্বীয় সংঘর্ষের ও দৈহিক পবিত্রতার আদর্শটি বজায় রাখিয়া শুদ্ধভাবে এইরূপে সেই মানস প্রেমপাত্রের মানসী-পূজা করিতে হইবে। এত বড় কষ্টপাথর কে কবে কল্পনা করিতে পারিয়াছে?

পুনঃ পুনঃ বেদকে অগ্রাহ করা হইয়াছে। বেদ-বিরুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের এই বানী সুপরিচিত। পরকীর্ত্তার ধর্ম এই “লোক বেদধর্ম পাপ-পুণ্য যে নাহি মানয়। মন নিষ্ঠে অস্ত্র কাণ্ডে করয় প্রণয়।” ইহাই পরকীর্ত্তার ধর্ম—লোকধর্ম, বেদধর্ম, পাপপুণ্যে রসদার।

ভেদজ্ঞান—এই সমস্ত পরিত্যাজ্য। এই তান্ত্রিক মতের ধ্বনি আমরা চৈতন্যচরিতামৃতে পর্য্যস্ত দেখিতে পাই। উজ্জলচন্দ্রিকা নামক সহজিয়া-পুঁথিতে পাই “লোকশাস্ত্র করে বারে অনেক বারণ” তাহাই পরকীর্ত্তার শ্রেষ্ঠ বিধান। স্বকীর্ত্তা অগ্রাহ, “পরকীর্ত্তারূপ অতি রসের উল্লাস। তাহাতে পরম রতি বন্ধনের হয়।” এই পরকীর্ত্তা-ধর্ম কিরূপ উচ্চ এবং তাহা যে শুধু একটা ধর্মমত নহে, তাহা অমুদ্রিত হইবার যোগ্য এবং এখনও হইতেছে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীধ্বজ অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি-প্রণীত ‘সাধুচরিতে’র আখ্যায়িকা এখানে অতি সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে :—

শ্রীহট্ট জেলার ইটা পরগনায় ক্ষেমসহস্র গ্রামে দুর্গাপ্রসাদ কর (পিতার নাম হরিবল্লভ কর

এবং মাতার নাম শান্তা দাসী) নামক একজন কারয় ১৮৫১ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি তরুণ বৌবনেই একান্ত ধর্ম্মানুরাগী এবং সাধুচরিত্র বলিয়া খ্যাতি সহজিহা আনন্দ।

লাভ করেন। ইনি শৈশব হইতে মনোমোহিনী নামী তাঁহার এক দূর আত্মীয়াকে ভালবাসিতেন। এই ভালবাসা অর্থ মানসিক পূজা। ইহা দুর্গাপ্রসাদের মনের নিভৃতে থাকিয়া তাঁহাকে সমস্ত সাধুকার্য্যে প্রেরণা দিত। ইহা এত গুপ্ত ছিল যে বহুদিন পর্য্যন্ত মনোমোহিনী নিজেও ইহার অস্তিত্ব জানিতেন না। তাঁহার ২৪ বৎসর বয়সে তিনি মনোমোহিনীর নিকট প্রত্যহ তিনবার যাইতেন—প্রত্যেকবার অতি অল্প সময় থাকিতেন, সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতেন। কিন্তু মধ্যাহ্নে একখানি খালাহাতে তাঁহার দ্বারে দাঁড়াইলে মনোমোহিনী তাঁহাকে অনব্যঞ্জন দিতেন, তাহার কিছু তিনি উচ্ছিষ্ট করিয়া দিলে দুর্গাপ্রসাদ তাহা গৃহে আনিয়া খাইতেন। এই সময়ে দুর্গাপ্রসাদ মৌনব্রত অবলম্বন করেন। তাঁহার সাধু নিষ্কলঙ্ক জীবনদর্শনে প্রথম প্রথম লোকে কিছু বলিত না এবং মনোমোহিনীও এই অদ্বুত খেয়ালী লোকটির আবদার প্রতিপালন করিতেন। কিন্তু কালক্রমে লোকেরা কানাকানি করিতে লাগিল। তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণই ছিল না—কিন্তু তথাপি লোকেরা বলাবলি করিত, “মনোমোহিনীই বা কিরূপ?” সে উহাকে প্রণাম করিতে দেয় কেন এবং তাহার উচ্ছিষ্টই বা খাইতে দেয় কেন?” হিন্দুরমণীর সম্মুখে বা পড়িল। পরদিন খালাহস্তে দুর্গাপ্রসাদ তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলে তিনি অত্যন্ত ভৎসনা করিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। সেদিন ভাতৃবর্গের বহু অনুরোধ ও উপরোধসত্ত্বেও দুর্গাপ্রসাদ কোন খাণ্ড গ্রহণ করিলেন না। দুর্গাপ্রসাদের বয়স তখন মাত্র ২৪ বৎসর। ক্রমাগত উপবাস চলিল, আত্মীয়বন্ধগণ নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া ব্যর্থ হইলেন, দুর্গাপ্রসাদের উপবাসব্রত ভাঙিতে পারিলেন না। নিরুপায় হইয়া তাঁহারা মনোমোহিনীকে তাঁহাদের বাড়ী আসিয়া খাণ্ড উচ্ছিষ্ট করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। বিরক্তির সুরে মনোমোহিনী বলিলেন, “কেউ খেল বা না খেল তাহাতে আমার কি? আমাকে তোমরা আর ঐ লোকটার জন্ত আলাইয়া মারিও না।” আরও দুই তিন দিন গেল, তাঁহার ভাতারা নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে লইয়া তাঁহাদের এক নিকট আত্মীয়ের বাড়ী গেলেন। সেই আত্মীয়াকে দুর্গাপ্রসাদ অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। রাস্তায় বহবার তাঁহারা উহাকে খাওয়াইতে

চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। যেদিন সাধু দুর্গাপ্রসাদ।

তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া সেই আত্মীয়ের বাড়ীতে পৌছিয়াছেন সেদিন ধরিয়া পুরো দশদিন দুর্গাপ্রসাদ উপবাসী। কিন্তু সেই আত্মীয়া অনেক কাঁদিয়া-কাটিয়া কিছুতেই দুর্গাপ্রসাদের ধনুর্ভঙ্গ পণ টলাইতে পারিলেন না। তাঁহার ভাতারা তাঁহাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিলেন, তখন চতুর্দশ দিবস সাধু-যুবক নিরুপ উপবাসী, তিনি কঙ্কালসার ও শয্যাশায়ী। তাঁহার বিস্তৃত চরিত্র ও সাধুদের প্রতিষ্ঠা সর্বত্র প্রচারিত, এমন নিম্নলিখিত যুবক না খাইয়া মরিতে বসিয়াছেন—এজন্ত প্রতিবাসীদের মন বিগলিত হইল। তাঁহারা সকলে যাইয়া মনোমোহিনীকে দয়া করিয়া উহাকে উচ্ছিষ্টাদি দিতে অনুরোধ করিলেন।

মনোমোহিনীর মন গোপনে তাঁর আলা বোধ করিতেছিল—কেবল লোকলজ্জায় তিনি নির্মমতা দেখাইতেছিলেন। এখন লোকাহরোধে তিনি অত্যন্ত আত্মদ-সহকারে দুর্গাপ্রসাদের বাড়ীতে বাইয়া তাঁহার অন্ন উচ্ছিষ্ট করিয়া দিলেন। ১৫ দিন পরে তিনি আহার করিলেন। অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন—বাহারা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এখনও অনেকে জীবিত। জীবনের এক সময়ে দুর্গাপ্রসাদ প্রত্যেক মাহুষের আদেশ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া মান্ত করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত কালীচরণ তরঙ্গদার নামক একব্যক্তি তাঁহাকে সন্ধ্যাকালে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার গোশালায় লইয়া গেলেন, সেখানে গোবরের তৃপ এত বেশী ছিল যে দাঁড়াইবার স্থান ছিল না, তাহারই এক কোণে কোন রকমে দুর্গাপ্রসাদকে ঠেলিয়া দিয়া কালীচরণ আদেশ করিলেন, “এইখানে দাঁড়াইয়া থাক।” সে রাত্রে ঘোর বিদ্যুৎ, ঝড় ও মেঘবৃষ্টি, গোয়ালের চাল জরাজীর্ণ, অনর্গল বৃষ্টি পড়িয়া দুর্গাপ্রসাদের দেহ সিক্ত করিতেছে, এদিকে সহস্র সহস্র মশক তাঁহার রক্ত চুষিয়া খাইতেছে,—অপরদিকে পচা গোময়ের অসহ্য দুর্গন্ধ। কিন্তু নির্ভীকার মহাপুরুষ প্রস্তরবিগ্রহের ছায় অনড় অটল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ৬৭ ঘণ্টা পরে রাত্রি একটার সময়ে কালীচরণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া মুক্তি দিয়া বলিলেন, “এখন ঘরে যাও।”

এইরূপ তপস্তার কথা যুরোপ কি কখনও শুনিয়াছেন? তাঁহারা জানেন অল্প তৈরী করার তপস্তা—পৃথিবীর শক্তিপুঞ্জের উপর আধিপত্য-স্থাপনের তপস্তা। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক জগতের তপস্তা তাঁহারা বর্ষারোচিত বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের অনারত্ত এবং ইহাই আমাদের সম্পদ। প্রতীচীকে যদি জয় করিতে হয় তবে প্রাচ্যের এই নির্ভীকার, নির্ভীকরোধ, ইন্দ্রিয়জয়ী, দেহতুচ্ছকারী, অসীমসহিষ্ণু—অনন্ত বিশ্বাসপূর্ণ প্রেমের তপস্তা দ্বারা তাহা করিতে হইবে, যাহাদ্বারা প্রাচ্যের বুদ্ধ অর্ধেক জগৎ জয় করিয়াছিলেন—প্রাচ্যের বীজ প্রতীচ্য জয় করিয়াছিলেন—এ সেই শ্রেণীর তপস্তা, পথ ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু অধ্যাত্মশক্তির উদ্বোধনই এই তপস্তার মূল লক্ষ্য।

প্রেমের জন্ত অসাধ্যসাধন—সহজপন্থীরা দেখাইয়াছেন। ভূমাই আনন্দের কারণ, ভূমা না হইলে তৃপ্তি হয় না—উপনিষদের এই মহাবাক্য, প্রেম-জগতে বাঙ্গালীরা যাহা দেখাইয়াছেন অত্যন্ত তাহা স্মরণ নহে। চিন্তার এই স্বাধীনতার পথে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া কোন বাধা না মানিয়া ভূমাকে লক্ষ্য করা, ইন্দ্রিয়-সংযমের শেষচেষ্টা—ত্যাগের শেষ দৃষ্টান্ত, ইহাই সহজিয়া-মত। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বলসেডিক্ এবং অধ্যাত্মজগতে সহজিয়া—ইহারা প্রাচীন সংস্কার সমস্ত ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন। এরূপ নির্ভীক বীরত্ব জগতে বিরল। ভারতবর্ষে দাঁড়াইয়া স্বাধীনমতের ধ্বজা তুলিয়া সীতাসাবিত্রীর আদর্শ প্রেমের ক্ষেত্রে উপেক্ষা করিয়া—তাহা হইতে উচ্চতর আদর্শের পরিকল্পনা ইহারা করিয়াছেন; ইহাদের বৃকের পাটা কত বড়

প্রশস্ত। “অন্ধাবন্ধ”তে স্বামীকে বলিয়া কহিয়া প্রণয়ীর সঙ্গে যাওয়ার

হৃদ্যন্ত স্বাধীনতা বাঙ্গালী ভিন্ন কে করনা করিতে পারিয়াছে?

কোথায় শাস্ত, কোথায় পুরাণকার—কতটা পেছনে ফেলিয়া ইহারা অগ্রসর হইয়াছেন।

সহজিয়ারা বলেন কাঠ-পাথরের বিগ্রহ সহজে তুষ্ট করা যায়—কয়েকটি ফুলবেলপাতা পায়ে ফেলিয়া দিলেই যথেষ্ট। কিন্তু মানুষের মন জোগান বড় উৎকর্ষিত তপস্তার কাজ, তিনি যাহা করিবেন আমি তাহাই দেবতার কাজ বলিয়া গ্রহণ করিব, তাঁহার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা একেবারে ডুবাইয়া দিব; উপবাসী আমি, আরাধ্য ব্যক্তি আমার হাত হইতে থালা ফেলিয়া দিয়া আমার বিরুদ্ধে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন, তথাস্ত—তথাপি তিনি ভগবান, হুর্গাপ্রসাদের এই হুঁচর তপস্তার মহিমা ভুলোক হইতে ছালোক স্পর্শ করিয়াছে। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, “আমি নিজ সুখদুঃখ কিছু না জানি। তোমার কুশলে কুশল মানি”—অতি সরল সহজ ছোট কথা—কিন্তু অনুষ্ঠান করিতে হইলে বড় শক্ত। শত্রুব্যবহার করিতেছে, তাহাকে শুধু ক্ষমা নহে—সর্বাস্তঃকরণে ভালবাসা এবং তাঁহার হাতের শূল ফুল বলিয়া গ্রহণ করা।

চণ্ডীদাস সহজিয়ার তান্ত্রিক অংশের উপর জোর দেন নাই, তিনি অমুরাগের দিকটায় বেশী ঝুঁকিয়াছিলেন। আর একটি নতুনত্ব তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা এই :—নরনারীর প্রেম ঈশ্বরপ্রেমের পথ চিনাইয়া দেয়। বোধ হয় তাঁহার পূর্বে আর কোন সহজিয়া একথাটা বলেন নাই। “ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে যে জন, কেহ না জানয়ে তারে। প্রেমের আরতি যে জন জানয়ে সেই সে চিনিতে পারে”, এই পার্থিব প্রেমের সিঁড়ি বহিয়া স্বর্গলোকে বাইতে হয়, এবং এই নরনারীর প্রেমই গম্ভীরা স্থানে লইয়া বাইবার একমাত্র উপায়—তথায় পৌছিলে এই প্রেমের আর প্রয়োজন হয় না। কবি এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর উপমা দিয়া বলিয়াছেন, যদি দীপহস্তে কেহ গৃহে প্রবেশ করিয়া তথায় কোথায় কি আছে তাহা জানিতে চাহে, তবে সেই ভাবে সমস্ত জানিয়া লইলে তখন দীপের আর কোন প্রয়োজন হয় না।” (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ১৬৬৩-১৬৬৫ পৃঃ।)

৩০৯ পৃষ্ঠায় তিব্বতপ্রসঙ্গে আমরা যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় বঙ্গের বাউল ও সহজিয়াদের সঙ্গে কোন কোন বৌদ্ধ শ্রেণীর মতের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। একসময়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের নরনারীর অবাধ মিলন ও ব্যভিচারে উত্থিত হইয়া তিব্বতের রাজা বঙ্গদেশ হইতে দীপঙ্করকে লইয়া বাওয়ার জন্ত প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের অবাধ মিলনের বিরোধী ছিলেন। তিনি ছোট হরিদাসকে শিখী মাহিতীর ভগিনী মাধবীর কাছে ভিক্ষা চাহিবার অপরাধে একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন। “প্রভু কহে সন্ন্যাসী করে প্রকৃতি সম্ভারণ, দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।” হরিদাস প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াও চৈতন্তের দর্শনলাভে বঞ্চিত হইয়া অবশেষে ত্রিবেণীতে বাইয়া জলে পড়িয়া আত্মহত্যা করেন। চৈতন্ত-চরিতামৃতে কথিত আছে, সহচরদের সঙ্গে কোন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে চৈতন্ত সমুদ্রতীরে বাইয়া আকাশে এক মধুর ও করুণ আর্তনাদ শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং চৈতন্ত “ক্ষমা করিলাম” বলিয়াছিলেন। তিনি সহচরদিগকে বলিলেন, “হরিদাসের আত্মা আমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছে।” সে পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যুসংবাদ কেহ জানিতেন না। পার্শ্বদগণ আশ্চর্য্যাবিত হইলেন। চূড়াধারী মাধব যখন মেয়েদের দলবল লইয়া পুরীতে আসিয়াছিল, তখন চৈতন্ত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন—তাঁহার

পার্বদগণ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। শৈশবের পর চৈতন্য মেয়েদের সম্বন্ধে অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, “সবে পরস্রী মাত্র নহে উপহাস, স্রী দেখি প্রভু হন একপাশ।” সহজিয়াদের অবলম্বিত স্ত্রীসাধনপদ্ধতি তাহার অমুমোদিত ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন, “প্রেম প্রেম করে লোকে প্রেম জানে কেবা, প্রেম করা কি হয় রমণীর সেবা? অভেদ পুরুষ নারী যখন জানিবে। তখন প্রেমের তব উদিত হইবে।”

সুতরাং এই সহজিয়া-ধর্ম চৈতন্যের ধর্ম নহে। চৈতন্য মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিয়া বেড়াইতেন। সহজিয়াদের মধ্যে একদল বাউল বিগ্রহপূজা মানে না, কৃষ্ণের রূপ অগ্রাহ্য করে। একখানি সহজিয়া-পুস্তকে কৃষ্ণবিগ্রহপূজা, কৃষ্ণের বর্ণ এবং রূপ,—এমন কি বৈষ্ণব-শাস্ত্রোক্ত সমস্ত মূল স্বত্রগুলি সুস্পষ্টভাবে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, প্রথম ভাগ, ভূমিকা।)

কৃষ্ণের রূপ করনা করা পাপ। এমন কি ঈশ্বরে বিশ্বাসও ইহাদের মতে নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং নানা সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ যে সহজিয়া নাম গ্রহণপূর্বক বীরচন্দ্রের কৃপায় বৈষ্ণব-সমাজে প্রবেশ পাইয়া বৌদ্ধ-চিন্তাধারার সঙ্গে হিন্দু তত্ত্ব ও ভক্তিশাস্ত্রের কতকটা যোগস্থাপন-পূর্বক “জয় চৈতন্য, নিত্যানন্দ” দোহাই দিয়া বৈষ্ণব-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। সহজিয়াদের নৈশমিলন যে একাভিপ্রায়ী দলের মিলনের ধারা চালাইয়া রাখিয়াছে—তৎসম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি (৩২১ পৃঃ), হই একখানি পুস্তকে বৌদ্ধ-মতের প্রকাশভাবে দোহাই আছে। “লোকশাস্ত্র করে বারে আনক বারণ। তাহাতে পরমা রতি মন্থনের হয়। মহামুনি নিজ শাস্ত্রে এই মত কয়।” (উজ্জলচন্দ্রিকা দ্রষ্টব্য, মণীন্দ্রনাথ বঙ্গ-কৃত পোষ্ট-চৈতন্য বৈষ্ণব-সাহিত্য দেখুন)। এই ‘মহামুনি’ বুদ্ধ ছাড়া আর কে? চট্টগ্রামে এখনও ‘মহামুনির’ মেলা হয়।

বাঙ্গালীর মত বর্তমান জগতে আর একটি জাতি আছে কিনা জানি না, যাহারা কোন বিষয়েই চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়েন না। যাহারা ক্ষুদ্রে সন্তুষ্ট নহেন, বৈষয়িকের গণ্ডী, লোকাচার, ধর্মের অমুশাসন, পারিবারিক বন্ধন যাহারা নিমেষের মধ্যে ছিন্ন করিয়া ভূমার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া বান। দানের আতিশয্য দেখাইবার জন্য দাতাকর্ণের করনা। অতিথি গৃহে আসিয়াছেন তাহার একমাত্র পুত্রকে কাটিয়া সেই মাংস দিয়া অতিথির সংকার করিতে হইবে। পিতা ও মাতা রাজকুমারকে করাত দিয়া কাটিবেন—অতিথির এই অকৃত্য আবদার। পুত্রকে কাটিবার সময়ে মাতার এক কোঁটা জল গণ্ড বাহিয়া পড়িলে আতিথ্য নষ্ট হইবে, মাতা স্বয়ং পুত্রের মাংস রন্ধন করিয়া খাওয়াইবেন। জাতক-গ্রন্থে মাঝে মাঝে এইরূপ উপাখ্যান আছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বাঙ্গলার শত শত লোক বসিয়া এই দানের কথা লিখিয়াছে ও সহস্র সহস্র লোক ইহা শুনিয়াছে। কেহ বলে নাই—এই গল্পে বড় বেশী রকমের বাড়াবাড়ি হইয়াছে, কেহ বলে নাই—অতিথির এই আবদার হাস্য। বঙ্গবাসীর চক্ষু তখন এই গল্পের সাংসারিক দিক্‌টার উপর পড়ে নাই। তাহারা এই গল্পে ভূমার আনন্দ লাভ করিয়াছে, দানের অতুলনীয় মাহাত্ম্য তাহাদের মন ভরিয়া গিয়াছে। এই দানের আতিশয্য তাহাদের

চোখে পড়ে নাই, অতিথির স্পর্কার কথা, রাজার নিরুজ্জিতার কথা, তাহারা ভাবে নাই। যদি ভাবিতে পারিত, তবে বঙ্গমহিলা স্বস্থ—সবলদেহে মৃত স্বামীর পাশে শুইয়া হরি-
নাম করিতে করিতে পরমানন্দে পুড়িয়া ছাই হইতে পারিত না। কাঞ্চনমালা যে স্বামীর
ভালবাসার জন্ত সর্বস্ব পণ করিয়াছিল, সেই স্বামীকে সহজে এই কড়ারে সপত্নীকে দিয়া
গেল যে, সে তাঁহাকে আর জীবনে দেখিতে পাইবে না। সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, যদি
তোমার এককোঁটা অশ্রু পড়ে তবে তোমার সাধনা ব্যর্থ হইবে। অন্ধ স্বামী চক্ষু ফিরিয়া
পাইবেন, এই আনন্দে সে যে আজ দীন ভিখারিণী অপেক্ষাও হীন হইয়া সর্বস্বহারী হইল—
“অন্ধাবন্ধুর” জন্ত স্বামীকে ছাড়িয়া রাজকন্যা ভিখারিণী হইল। স্বামীর কাছে সে নিজেকে
ভিক্ষাবরূপ চাহিয়া লইল। এই সমস্তই আতিশয্য—কল্পনা এই সকল স্থানে পৃথিবী ডিম্বাইয়া
চলিয়া গিয়াছে—বাঙ্গালী সীতা-সাবিত্রীর সাধনা তুচ্ছ করিয়া উচ্চতর সাধনার ক্ষেত্র
আবিষ্কার করিয়াছে। একদিকে কৃত্রিমতার একশেষ, অন্ধসংস্কারের কূপ, আটবৎসর-বয়স্কা
রাসমণি ছুইহস্ত-পরিমিত ঘোমটা টানিয়া দিয়া তাহার স্বামীর বাড়ীর ঘোটকটিকে দেখিয়া
লজ্জায় জড়সড় হইতেছে (রাসমণির আত্মচরিত দ্রষ্টব্য)—অপরদিকে অভিসারিকা বলিতেছে—
নগরে ঢাক পিটিয়া ঘোষণা কর যে, আমি প্রণয়ীর প্রেমকলঙ্কসাগরে ডুবিয়াছি, ভালবাসা
আমাকে ভয়শূন্য করিয়াছে, আমি তাঁহার নামের কুণ্ডল কানে পরিব; তাঁহার অমুরাগের
রক্ত-তিলক ভালে পরিব, তাঁহার কলঙ্ক হার করিয়া গলায় পরিব; “কাহু পরিবাদ মনে ছিল
সাধ, সফল করিল বিধি”, জন্ম জন্ম আমি এই কলঙ্কের জন্ত তপস্তা করিয়াছিলাম, আজ
বিধাতা আমার মনের সাধ মিটাইয়াছেন। এদেশের একদিকে স্বামীর নাম লইতে ধুলের
কুড়ির মত লজ্জাশীলার মুখ মুদিত হইয়া পড়ে, অপরদিকে কালী স্বামীর বৃকের উপর নৃত্য
করিতেছেন এবং রাধা শ্রাম-অঙ্গে পা দিয়া নিজা বাইতেছেন, “নিন্দা যায় চাঁদবদনী শ্রাম অঙ্গে
দিয়া পা।” একদিকে ভক্তি ও প্রেমের বজ্রা—গোরা তাঁহার পাগলামীর লীলাশ্রোতে
জগৎ ভাসাইয়া দিতেছেন, অপরদিকে রঘুনাথ শিরোমণি স্বপ্ন জ্বায়ে যে জাল প্রস্তুত
করিতেছেন—সেই কূটবুদ্ধির বাগুরায় পড়িয়া জগতের বুদ্ধিমানের শিরোমণিগণ নিকৃতির পথ
খুঁজিয়া পাইতেছেন না। বাঙ্গালীর চিন্তাধারা এই স্বাধীনতা, এই কেন্দ্রবহিমুখ এবং
কেন্দ্রাভিমুখ গতি উভয়েরই ভূমাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে। উভয়ের গতি অবাধ, উভয়েই
লৌকিক গভ্রী অতিক্রম করিয়া স্বপ্ন হইতে স্বপ্নতর সাধনার পথে গিয়াছে। এ বেন ঘড়ির
পেণ্ডুলম্ চলিতেছে। দাত-প্রতিদাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বাঙ্গালী যে ক্ষেত্র আকিয়
দেখাইয়াছে—সেই ক্ষেত্রের কোন গভ্রীর সীমা সে মানে নাই। উচ্চে উঠিতে তাহার নরদৃষ্টি
দেবদৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। অবতরণ করিতে সে কূপ হইতে গভীরতম কূপে নিপতিত হইয়াছে
তাহার ভক্তের পা ধরিয়া বসিয়া তাহার ঈশ্বর মানভঞ্জন করিতেছেন। ধর্মজগতে এরূপ
ছঃসাহস কোন জাতি করে নাই, তথাপি এই পরিকল্পনায় অসত্যের লেশ নাই। পুত্ররূপে,
পত্নীরূপে, সখারূপে ভগবান্ তো সর্বদাই আমাদের পা ধরিয়া বসিয়া মান ভাঙ্গাইতেছেন।
এই জন্ত চণ্ডীদাস বলিতেছেন—আমার তায় সৌভাগ্যবতী জগতে কে আছে—বিনি

স্পর্শমণিস্বরূপ, যাহা স্পর্শ করেন তাহাই সোনা হয়—তিনি—সেই পুরুষের মধ্যে স্পর্শমণিস্বরূপ—“নন্দের কুমার, কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার।” বাঙ্গালী মানুষ চিনিয়া ভগবান্কে চিনিয়াছে—পৃথিবীর ফাঁক দিয়া সে স্বর্গ দেখিতে পাইয়াছে, এজন্ত সে ভগবান্কে দিয়া ভক্তের পায় ধরাইবার পরিকল্পনা করিতে সাহস করিয়াছে।

বাঙ্গলাদেশে সহজিয়াদের লিখিত পুস্তক অসংখ্য। তন্মধ্যে অমৃতরসাবলী, আগমসার, আনন্দভৈরব, অমৃতরসাবলী—এই চারিখানি পুস্তক বিশেষ আদৃত। ‘বিবর্তবিলাস’ মুকুন্দ নামক এক লেখকের রচিত। ইনি নিজেকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের (চৈতন্য-চরিতামৃত-প্রণেতা) শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সহজিয়াদের “সদানন্দগ্রাম” নামক

সহজিয়া-সাহিত্য।

আনন্দসদন—কখনও “সহজপুর” বলিয়া পরিচিত। উহা হিন্দুর বৈকুণ্ঠ, বুদ্ধের সুখাবতী এবং মুসলমানের বেহস্তের জায় পরিকল্পিত। এই সদানন্দগ্রাম কেবল সাধকদেরই গয়া, নরনারীর মিলনানন্দে উহাকে অধ্যাত্মরাজ্যে পরিণত করা হইয়াছে। বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রের সঙ্গে সহজিয়ারা তাঁহাদের স্বর্গপরিকল্পনার আশ্চর্য্যরূপ মিল রাখিয়াছেন।

ষোড়শ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাঠান-বিদ্রোহ

মোগল-পাঠান—“যেন ভুজঙ্গ-নকুল।”

এইবার আমরা মোগল অধ্যায়ের সমিহিত হইলাম। দাউদখাঁর পরেও পাঠানেরা তাহাদের দাবি ছাড়ে নাই, সুবিধা পাইলেই বিদ্রোহ করিয়াছে। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে পাঠানেরা কতলু খাঁর নেতৃত্বে উড়িষ্যা বিদ্রোহী হইয়াছিল,—মোগল সৈন্তেরা বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে সম্যক্ বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই। এমন কি ১৫৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার নবাব সাহাবাজ খাঁ কতলু খাঁর সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সন্ধিতে কতলু খাঁ বঙ্গদেশের উপর কোন হাত দিতে পারিবেন না, উড়িষ্যার অধিকার লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন, এই কথা ছিল। আকবর সাহাবাজ খাঁ-কৃত সন্ধিতে সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহার বিশ্বাস হইল, খাঁ সাহেব উৎকোচ-গ্রহণপূর্বক বিদ্রোহীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়াছেন,—সুতরাং সম্রাট তাঁহাকে বাঙ্গলার মসনদ হইতে বিচ্যুত করিয়া উজির খাঁ হেরেবীকে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করিলেন; এই শাস্তিই প্রচুর হইল না, বহু অর্থ উৎকোচ-গ্রহণের সন্দেহে সাহাবাজ তিন বৎসর কাল বন্দী হইয়াছিলেন।

১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ বঙ্গের মসনদ পাইয়া কতলু খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে উড়িষ্যা ছাড়াইয়া লইতে কৃতসঙ্কর হইলেন। কতলু খাঁ নিজে উড়িষ্যা থাকিয়া তাঁহার এক প্রবল দল ধেরপুর (জাহানাবাদ হইতে ৫০ মাইল দূরবর্তী) নামক গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। মানসিংহের তরুণ পুত্র জগৎসিংহ তখন কতলু খাঁকে বশীভূত করিবার ভার লইয়া আসিয়াছিলেন। পাঠানেরা ধূর্ততা করিয়া সন্ধির প্রস্তাব চালাইতে লাগিল—তাহারা যুবরাজের কাছে আত্মসমর্পণ করিবে এই সন্ধির কথা লইয়া মৈত্রীস্থাপনের চেষ্টা পাইতে লাগিল। কিন্তু ইহা একটি ষড়যন্ত্রমাত্র। কোন প্রকারে দেয়ী করিয়া স্বদেশের পৃষ্টি ও শৃঙ্খলাসাধন ছিল ইহাদের উদ্দেশ্য। যুবরাজ সন্ধির কথা বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই অবস্থায় অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া তাহারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। এই ঘটনায় পাঠানেরা অত্যন্ত উল্লসিত হইল এবং মানসিংহের পরিতাপ ও

মনঃকষ্টের সীমা-পরিসীমা রহিল না, কারণ একথাও জনরব হইয়াছিল যে তাহারা জগৎ-সিংহকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু মোগলদের বরাং ভাল। কতলু খাঁ কিছু দিন হইতে অসুস্থ ছিলেন, হঠাৎ (১৫১০ খৃঃ) তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্রেরা নাবালক ছিল, এবং সৈন্যদিগকে প্রবলপরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে পারেন, তাহাদের মধ্যে একরূপ কোন নেতা ছিলেন না। পাঠানেরা ভয় পাইয়া জগৎসিংহকে মুক্তি দিল, মানসিংহকে বহু অর্থ ও ১৫০ শত হস্তী উপঢৌকন দিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল—উড়িষ্যা তাহাদের থাকিবে কিন্তু তাহারা সম্রাটের অধীন হইয়া থাকিবে। উড়িষ্যায় আকবর বাদশাহের নামে মুদ্রা অঙ্কিত হইবে, এতদ্ব্যতীত তাহারা মানসিংহকে পুরীর অধিকার ছাড়িয়া দিল। সন্ধির শেবোক্ত দফায় “বিক্রপদাধুজে ভঙ্গ” মানসিংহ বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন।

আকবর এই সন্ধিতে বিশেষ সন্তুষ্ট না হইলেও তিনি ইহা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল যাইতে না যাইতে পাঠানদের প্রধান মন্ত্রী খাজে ইস্‌সার মৃত্যু হওয়াতে তাহাদের কতলু খাঁ ও ওসমান।

স্বাভাবিক উচ্ছ্বলবৃত্তি বৃদ্ধি পাইল। তাহারা পবিত্র জগন্নাথ মন্দির অধিকার করিয়া লুণ্ঠন করিল। মানসিংহ পুনরায় রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। মোগলেরা একটা যুদ্ধের পরই পাঠানদিগকে বিধ্বস্ত করিল। এবারও তাহারা সন্ধির প্রস্তাব করিল, সন্ধিতে উড়িষ্যা পুনরায় মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। পাঠান-নেতৃগণ কতক জায়গীর পাইলেন, কিন্তু উড়িষ্যার রাজস্ব মোগল সম্রাটের প্রাপ্য হইল (১৫২২ খৃঃ), কিন্তু পরবৎসরই পাঠান জায়গীরদারগণ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গদেশে লুটপাট চালাইতে লাগিল। তাহারা রাজার প্রধান বন্দর লুণ্ঠন করিল। পুনরায় মানসিংহ তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। তাহারা অতিশয় দৈন্তের সহিত বশতা স্বীকার করিল। রাজা তাহাদিগকে একেবারে নিরাশ করা অবिवেচনার কাজ মনে করিয়া জায়গীরগুলির অধিকার প্রত্যর্পণ করিলেন।

কিন্তু মানসিংহ বাঙ্গলা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পর, কতলু খাঁর পুত্র ওসমান বিদ্রোহী হইলেন। তিনি বাঙ্গলাদেশে লুটপাট আরম্ভ করিয়া দিলেন, মোহন সিংহ ও প্রতাপ সিংহ নামক মোগল পক্ষের সেনানায়কদ্বয় ঘোর যুদ্ধ করিয়া ওসমান খাঁর হস্তে বেড়ারক নামক স্থানে পরাস্ত হন। মোগলরাজ-ভাণ্ডারের প্রধান আয়ব্যয়ের হিসাবরক্ষক আব্দুল রজ্জককে পাঠানেরা বন্দী করিয়া লইয়া যায়। এই ঘটনায় বঙ্গদেশ কিছুকালের জন্য ওসমান খাঁর অধিকারে আসে এবং পাঠান-শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৬০০ খৃঃ)।

সুতরাং রাজা মানসিংহকে সম্রাটের আদেশে পুনরায় বঙ্গদেশে পাঠান-দলন-কার্যের ভার লইয়া আসিতে হয়। ত্রিপুর অন্তর নামক স্থানে পাঠানেরা বিপুল ক্ষতির সহিত পরাস্ত হয়। আব্দুল রজ্জককে তাহারা লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া আসিয়াছিল। তিনি যে হাতীর পিঠে ছিলেন, তথায় এক চূর্ণাস্ত ভীষণদর্শন পাঠান মুক্তকৃপাণ-সহ তাঁহার রক্ষকের কাজ

করতেছিল, তাহার উপর আদেশ ছিল, যোগলেরা জয়ী হইলে তৎক্ষণাৎ যেন তাহার মৃত্যু কাটিয়া ফেলে। কিন্তু দৈবক্রমে যোগলদের এক গোলা আসিয়া রক্ষকের শরীরে পড়ে, সে তখনই নিহত হয়। যোগলেরা শৃঙ্খলিত রজ্জ্বককে মানসিংহের হস্তে অর্পণ করেন, তিনি তাহার শৃঙ্খল মোচন করিয়া সানন্দে তাহাকে আলিঙ্গন করেন।

এই ঘটনার পর পাঠানদের সকল আশা প্রায় নিমূল হইয়া গেল—তাহারা পালাইয়া উড়িয়া যাইয়া আর কোন স্বযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু ইসলাম খাঁ যখন বাঙ্গলার নবাব হন, তখন পাঠানেরা পুনরায় মাথা তুলিয়া বিদ্রোহী হইল। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে ওসমান খাঁ বহুকষ্টে ২০,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নিজেকে খুব

ওসমানের অপূর্ণ সাহস ও
মৃত্যু, ১৬১২ খৃঃ।

প্রবল ব্যক্তি মনে করিলেন। ৬০০ বৎসর যাবৎ পাঠানেরা ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছেন, আগন্তুক মোগল-শাসন তাহাদের নিকট তৎসহ

বোধ হইয়াছিল। এই বিদ্রোহের আভাস পাইয়া নবাব ইসলাম খাঁ

পাঠান-নেতা ওসমানের নিকট দূত পাঠাইয়া অনেক মিষ্ট ও হিতকর বাক্যদ্বারা তাহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু অল্প কোন জাতি হইলে হয়ত তাহার এই শুভার্থক চেষ্টা সফল হইত, কিন্তু পাঠান বড় দুর্দান্ত জাতি, তাহারা লেখনী বা দাড়িপাল্লা অথবা লাঙ্গল, ইহার কোনটিই ধরিতে প্রস্তুত নহে,—তাহাদের একমাত্র অবলম্বন মুক্ত তরবারি। ওসমান সন্ধির প্রস্তাবে কাণ দিলেন না। নবাব ইসলাম খাঁ, স্বজাত খাঁকে ওসমানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। স্বর্ণরেখার তীরে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে ওসমানের অপূর্ণ সাহস ও বীরত্ব মোগলদিগকে বিস্মিত করিয়াছিল। বহু মোগল সেনাপতি ও ওমরা এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া গোলাগুলির মত ক্ষিপিকারিতার সঙ্গে পাঠান নবাব-পুত্র মোগলদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। এক সময়ে মোগলসেনাপতি স্বজাত খাঁর প্রাণ-সংশয় হইয়াছিল। কিন্তু পরিণামে ভাগ্যলক্ষী তাহার বরপুত্র আকবরের পক্ষপাতী হইলেন; অপরিমিত বুলদেহ ওসমানের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিবার পর সেই রাত্রিতেই তাহার বীরদেহ পৃথিবীতে পড়িয়া রহিল, আর মুক্ত আত্মা তাহার কাম্য স্বাধীন রাজ্যে মহাপ্রয়াণ করিল (১৬১২ খৃঃ)। তাহার মৃত্যুর পর ভেলি এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুম্বিজ স্বজাত খাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করিল, তাহাদের অবশিষ্ট সম্পত্তি—৪৯টি হাতী এবং কিছু মণিমাণিক্য—সকলই মোগল সেনাপতির নিকট উপস্থিত করা হইল এবং মোগল সম্রাটের অধীন হইয়া তাহারা তাহারই উপর জীবিকানির্ভারের ভার দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

বঙ্গদেশে এই ১৬১২ খৃষ্টাব্দ অরণীয়—এই বৎসরে পাঠান-শক্তির শেষ আশা নিমূল হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গলার বিদ্রোহিগণ

কিন্তু পাঠান নবাব ও তাঁহার বংশধরেরাই শুধু মোগল সম্রাটের বিদ্রোহিতা করে নাই। বঙ্গদেশ পাঠানযুগে একরূপ স্বাধীন ছিল, বাঙ্গলার নৃপতিরা কেহবা শুধু মুখে, কেহবা নামমাত্র, পাঠান বাদশাহের বশ্বতা জানাইলে—তাঁহারা স্বাধীন থাকিতেন। তাঁহারা নিজের নিজের রাজ্যে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা থাকিতেন। পাঠান আমলে বঙ্গের সিংহাসন লইয়া পরস্পরের মধ্যে বেক্রপ হত্যাকাণ্ড ও কাড়াকাড়ি চলিয়াছিল, তাহাতে দেশটা অনেক পরিমাণে হিন্দুর হাতেই পড়িয়াছিল। অবশ্য এক এক সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝড় দেশে বইয়া যাইত, তখন দেব-মন্দির ও বিগ্রহ ভাঙ্গার ধুম পড়িয়া যাইত, এবং বাহারা ঝড়ের মুখে পড়িত, তাহারা মরিত। কিন্তু মোগল সম্রাট সমস্ত দেশটি আয়সাৎ করিতে চাহিলেন, তৌদরমল্লকে পাঠাইয়া সমস্ত দেশ জরিপ করিয়া রাজস্বের হার স্থির করিয়া দিলেন, পাঠানদের ও অনেক হিন্দুর জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিলেন, এমন কি পাঠানদের হাত হইতে যে সকল জায়গীর দখল করিয়া মোগলদিগকে দিলেন, তাঁহাদিগকে তাহা নিকষেগে ভোগ করিতে দিলেন না,—তাঁহাদিগকে রীতিমত রাজস্ব দিতে হইত এবং অত্যন্ত কঠোর নিয়মের বশবর্তী হইয়া সেই জায়গীর ভোগ করিতে হইত। কোথায় জঙ্গল-বাড়ীতে ক্ষুদ্র ভৌমিক ইশা খাঁ, শ্রীপুরে কৈদার রায়, যশোহরে প্রতাপাদিত্য—কে কি করিতেছে, আকবর তাহার সন্ধান লইতেন। পাঠান শক্তি প্রবল ঝড়ের ছায় উচ্চ বৃক্ষগুলি ভাঙ্গিয়া চলিত, কিন্তু মোগল সম্রাটের চক্ষুতে বেক্রপ পাহাড়-পর্বত পড়িত, দুর্কীধাস ও তৃণশূন্যও সেইরূপ তাঁহার ছেন-দৃষ্টি এড়াইত না। পাঠান রাজাদের দৃষ্টি ছিল ক্ষুদ্র বাঙ্গলার মসনদের উপর, দিল্লীশ্বরগণের অনেকেই দুর্বল ছিলেন, সুতরাং বাঙ্গলার বাদশাহের ক্ষমতা তাঁহারা প্রায়ই লোপ করিতেন না। কিন্তু এবার বাঙ্গলায় প্রকৃত স্বাধীনতার সময় আরম্ভ হইল। বৃহত্তর বাঙ্গলার সঙ্গে দিল্লীর লড়াই নূতন কথা নহে। চিরকাল বাঙ্গলাদেশ দিল্লীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিয়াছে। সেই ইতিহাস-পূর্বযুগে জরাসন্ধ, পৌণ্ড্র, বাহুদেব, ভগদত্ত, বাণ, মুর, নরক প্রভৃতির সময় হইতে বাঙ্গলাদেশ দিল্লীর সম্রাটের সার্বভৌমত্ব সহ্য করিতে পারে নাই। নন্দবংশের সময় হইতে বৃহত্তর বাঙ্গলা জয়ী হইল—ইন্দ্রপ্রস্থ আড়ালে পড়িল। যুগ যুগ ধরিয়া মগধ ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিল। তারপর গুপ্তগণ পূর্বাঞ্চলের সমৃদ্ধি নানাদিকে বাড়াইয়া দিলেন, গুপ্তদের শেষকালে রাজলক্ষী মগধ ছাড়িয়া খাস গোড়ে আসিলেন। পালেরা খাস বাঙ্গলার রাজা। তখন ইন্দ্রপ্রস্থ নিবিয়া গিয়াছে, তথাপি পশ্চিম-ভারতের সহিত বাঙ্গলার বিরোধ থামে নাই, বঙ্গরাজকে প্রতারণা করিয়া কাশ্মীরাবিধি নিধন করিলেন, বঙ্গসৈন্ত পরিহাস-কেশবের মন্দির ভাঙ্গিবার জন্য যে অদম্য সাহস ও আত্মোৎসর্গ দেখাইয়াছিল তাহা কলহণ কবি নানা উপমাখচিত করিয়া স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

বাঙ্গলার রাক্ষস শশাঙ্ক কনোজাধিপ রাজ্যবর্ধনকে প্রতারণা করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন—
এই হুর্নাম আছে। প্রাচ্য ভারতের সঙ্গে ইঙ্গপ্রস্থ ও তৎসম্বন্ধিত প্রদেশগুলির সংঘর্ষ নূতন
নহে। বাঙ্গলাদেশ শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার করে নাই, রৈবতকে বাইয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল।
বৃহত্তর বাঙ্গলার জরাসন্ধের ভয়ে তিনি স্বদেশত্যাগী হইয়া সমুদ্রের তীরে রাজধানী নিৰ্ম্মাণ
করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর রাজকীয় রক্তে দিল্লীর বিদ্রোহ নিহিত ছিল। পাঠানদের সময়ে
যে স্বাধীনতা তাঁহাদের নৃপ্ত হয় নাই, এবার মোগলদের সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির আওতায় তাহা বিলুপ্ত
হইবার সম্ভাবনা হইল।

এই বিদ্রোহীদের প্রথম নাম করিব—ইশা খাঁ মসনদ আলির।

অযোধ্যাতে বাইশওয়ার পরগনায় ভগীরথ নামক এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। ইনি
দিল্লীখবরের সামন্ত রাজা এবং অস্তরঙ্গ বদ্ধ ছিলেন। ভগীরথ বঙ্গদেশে তীর্থদর্শনে আসিয়া
সুলতান গিয়াসুদ্দিনের সঙ্গে প্রীতিস্থরে আবদ্ধ হন এবং অবশেষে সুলতানের মন্ত্রিত্ব
গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে থাকিয়া বান। ভগীরথের বংশে কালিদাস জন্মগ্রহণ করেন; ইনি
অতি পণ্ডিত, নিষ্ঠাবান্ ও প্রিয়দর্শন পুরুষ ছিলেন। কথিত আছে প্রত্যহই ইনি
একটি ছোট সোণার হাতী নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহা ভাগ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান
করিতেন। এজন্য তিনি “কালিদাস গজদানী” নামে খ্যাত হন। কাহারও কাহারও
মতে সুলতান জালালউদ্দিনের তৃতীয় কন্যা মমিনা খাতুন,—কাহারও মতে হুসেন
সাহের এক কন্যা—কালিদাসের গদ্যদ্বারা সুন্দর গৌর বপু ও সুদর্শন মুখচোখ দেখিয়া
ঘাচিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু কালিদাস সুলতানের কন্যার
কাছে যে উত্তর লিখেন, তাহাতে অনেক সহপদেশ ছিল—এবং তাহার শেষ কথা
ছিল—কুমারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। ক্রুদ্ধ ও অবমানিত হইয়া রাজকুমারী কৌশল-
ক্রমে তাঁহাকে গোমাংস খাওয়াইয়া তাঁহার জাতি নষ্ট করেন। অনন্তোপায় হইয়া
কালিদাস গজদানী ইসলামধর্ম গ্রহণপূর্ব্বক মমিনা খাতুনকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন।
ইহার মুসলমানী নাম হইল—সোলেমান খাঁ। কয়েকজন মুসলমান পল্লীগীতিকার এই
ভালবাসার ব্যাপার বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—কিন্তু অপর কয়েকজন ঐতিহাসিকের
মতে মুসলমান মমিনগণের জ্ঞানগর্ভ উপদেশে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইসলামধর্ম অবলম্বন
করিয়াছিলেন। দেওয়ান পরিবারের ইতিহাসে এই সকল কথা লিপিবদ্ধ আছে। আইন-ই-
আকবরীর মতে সোলেমানের দুই পুত্র ইসমাইল ও ইশা খাঁ,—সোলেমান তাজ খাঁ এবং সালিম
খাঁ কর্তৃক নিহত হওয়ার পর—দাসবং পারস্তদেশে প্রেরিত হন। তাঁহারা তাঁহাদের এক
খুল্লতাতকর্তৃক পুনরায় বঙ্গদেশে আনীত হইয়া ক্রমে ক্রমে ভাটী অঞ্চলের অধিপতি হন।
ইশা খাঁ তরুণ যৌবনে ত্রিপুরেশ্বর অমর মানিক্যের সেনাপতিগণের তালিকাভুক্ত হইয়া
ত্রিহট্টের (তরপের) রাজা ফতে খাঁর বিরুদ্ধে যুবরাজ রাজ্যধরের সঙ্গে অভিযান করেন।
ত্রিপুরেশ্বরকে সহায়তা করিয়া ইনি মোগল সেনাপতি সাহবাজ খাঁকে পরাস্ত করেন। তখন
ত্রিপুরায় সরাইল পরগনার মালিক হইয়া ইনি অমর মানিক্যের রাজ্যকে মাতৃসম্বোধন

করিয়া রাজপরিবারে প্রতিষ্ঠা ও আদর লাভ করেন। বখন অমর মানিকা চৌদ্দগ্রামে বিখ্যাত অমরসাগর দীঘি কাটাইতেছিলেন, তখন (১৫৮২ খৃঃ) ইশা খাঁ তাঁহাকে সরাইল

১৫৮২ খৃঃ।

হইতে এক হাজার মজুর পাঠাইয়া সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজকুমার রাজ্যধরের সরাইল পরগনায় শিকারবোগ্য পশুপক্ষি-বহুল অরণ্য দেখিয়া ঐ স্থানের উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। এদিকে সাহবাজ খাঁ পরাস্ত হইয়া প্রতিশোধে ক্রতসঙ্কল্প হন—তখন সরাইল পরগনায় থাকিতে না পারিয়া সাহবাজের বিরুদ্ধে সৈন্যসংগ্রহাদি ও যুদ্ধোদ্যোগ করিবার জন্ত ইশা খাঁ কোন নিভৃত অরণ্য-সংরক্ষিত স্থান খুঁজিতে থাকেন। অমর মানিকা তাঁহার রাজ্যের অধুরোধে ইশা খাঁকে ‘মসনদ আলি’ উপাধি এবং ৫০,০০০ সৈন্য দিয়াছিলেন। উপাধিটি দিল্লীশ্বর-প্রদত্ত নহে—আবুল ফজল ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। রাজমালায় ইহার উল্লেখ আছে। ইশা খাঁ সহসা একরাতে একটা তুফানের মত ময়মনসিংহে কিশোর গজের অন্তর্গত কোচ রাজাদের রাজধানী

১৫৮৫ খৃঃ জঙ্গলবাড়ী।

জঙ্গলবাড়ীতে হানা দেন (১৫৮৫ খৃঃ)। উক্ত স্থানে লক্ষণ হাজরা ও রাম হাজরা ভ্রাতৃদ্বয় রাজত্ব করিতেছিলেন। অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া তাঁহারা রাজ্যের অধিকাংশে পলায়নপর হন। তদবধি জঙ্গলবাড়ী ইশা খাঁর অধিকৃত হয়। ইশা খাঁ জঙ্গলবাড়ী দখল করিয়া ক্রমে ক্রমে ২২টি পরগনা (সেরপুর, জোয়ানসাহী, আলপসিংহ, জোয়ানসাই, নসির-উ-জিরাল, হুসেন সাহ, ডাওয়াল, মহেশ্বরদি, কটরার, কুড়িখাই, সিন্দ, হাজরাহি, দরজিরাবু, গোঘের ও হুসেনপুর প্রভৃতি) অধিকার করেন ও নানাস্থানে দুর্গ নির্মাণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে দিল্লীশ্বরের বিদ্রোহিতা করেন। তিনি রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন। এগার সিন্দুরের দুর্গ ইহার অজেয় নিরাপদ নিবাস ছিল। আবুল ফজল লিখিয়াছেন, ইনি সমস্ত ভাটি অঞ্চলের রাজা হইয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে ইনি ঘোড়াঘাট হইতে সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া ছিলেন। ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে সাহবাজ খাঁ ইশা খাঁর বক্তব্যরপূরের রাজপ্রাসাদ ধ্বংস করেন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ইশা খাঁ মানসিংহের আক্রমণের জন্ত প্রস্তুত হইয়া কতকগুলি কামান প্রস্তুত করেন, তন্মধ্যে ৩টি পাওয়া গিয়াছে। তাহার একটিতে “সরকার ত্রীমুখ ইশা খাঁ, মসনদালি ১০০২” উৎকীর্ণ আছে। ১০০২ বাৎ সনে অর্থাৎ ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে মানসিংহ আসিয়া ইশা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। যদিও ইশা খাঁ অত্যন্ত দুর্দ্বন্দ্ব ছিলেন, তথাপি সম্রাট-বাহিনীর সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া প্রথমতঃ বৃকাই নগরে পরাস্ত হইয়া সেরপুর গড়জরিপা অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেরপুর হইতে দেওয়ানবাগ—তথা হইতে মুড়াপাড়া এইরূপে এক দুর্গ হইতে ক্রমাগত তাড়িত হইয়া দুর্গান্তরে উপস্থিত হন। এখানে পরিশেষে মানসিংহ চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। দিল্লীশ্বর তাঁহার বিক্রম ও সাহসে, তদধিক আত্মসমর্পণে প্রীত হইয়া তাঁহার সমুচিত আতিথ্য করেন, এবং সম্মানিত করিয়া তাঁহাকে রাজধানী জঙ্গলবাড়ীতে প্রেরণ করেন। এই আখ্যায়িকা বহু প্রাচীন পল্লীগীতিকার স্থান পাইয়াছে। ইশা খাঁর বংশধরেরা দেওয়ান ভগীরথ—তৎপরে দেওয়ান কালিদাস

গজদানীর উপাধি-অনুসারে জঙ্গলবাড়ীর 'দেওয়ান পরিবার' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। শ্রীপুরের ভূঞা কৈদার রায়ের ভগিনী সোণামণি (অপর নাম সুভদ্রা) স্বেচ্ছায় ইশা খাঁকে আত্মদান করিয়া শ্রীপুর হইতে পলায়ন করিয়া ইশা খাঁর অধশায়িনী হন। বঙ্গবিশ্রুত এই ঘটনাসম্বন্ধে অনেক পল্লীগাথা আছে। মৎসম্পাদিত পূর্ববঙ্গ-গীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা ইশা খাঁ, তাঁহার যুদ্ধবিগ্রহ, প্রণয়কাহিনী, সোণামণির দুই পুত্র আরাম-বিরামের কথা—ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। করিমুল্লার হস্তে কৈদার রায়ের মৃত্যু ও শ্রীপুর-ধ্বংসের বৃত্তান্তও তথায় বিবৃত হইয়াছে। ইশা খাঁর বংশধর বলিয়া বাহারা দাবী করিয়া থাকেন—তাঁহাদের সংখ্যা অগণ্য। কথিত আছে হয়বংপুরের দেওয়ানেরা সোণামণির সন্তানের কুলোদ্ভব। এই দেওয়ান পরিবারেরা সোলেমানকে দাউদ খাঁর সহোদর প্রতিপন্ন করিয়া বঙ্গের নবাবের সঙ্গে তাঁহাদের রক্তসম্বন্ধ প্রমাণ করিতে যে চেষ্টা পাইয়াছেন, ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে তাহা অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় বিদ্রোহী যশোরের প্রতাপাদিত্য। ইহার পিতা বিক্রমাদিত্য এবং খুল্লতাত বসন্ত রায় পাঠান বাদশাহ দাউদ খাঁর অন্তরঙ্গ সূহৃৎ ও বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। বঙ্গদেশের শাসনসংক্রান্ত ও রাজস্বের হিসাবপত্রের সমস্ত কাগজপত্র ইহাদের হস্তে ছিল। সুতরাং দাউদের মৃত্যুর পর বঙ্গাধিপ রাজা তৌদরমল্ল ইহাদিগের অনুসন্ধান করেন। ইহারা মোগলদিগের বশ্বতা স্বীকার করায় তৌদরমল্ল ইহাদিগকে বিস্তৃত ভূমির অধিকার প্রদান করিয়া বিক্রমাদিত্যকে মহারাজা উপাধি প্রদান করেন। যশোরে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপাদিত্য জন্মগ্রহণের পর রাজজ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন—“ইনি পিতৃহস্তা হইবেন।” বিক্রমাদিত্য এই ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করিয়া ইহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এরূপ কিংবদন্তী আছে। কিন্তু খুল্লতাত বসন্ত রায় শিশুর প্রতি কোন অত্যাচার হইতে দেন নাই। তিনিই পিতার অধিক বাৎসল্য দেখাইয়া প্রতাপাদিত্যকে লালনপালন করিয়াছিলেন। বসন্ত রায় স্বয়ং সুদক্ষ বীরপুরুষ ছিলেন, তাঁহার 'গঙ্গাজল' নামক এক সূর্যহং খড়্গ ছিল। তিনি বালক প্রতাপাদিত্যের রণশিক্ষার গুরু। কৈশোর অতিক্রম করিয়া প্রতাপাদিত্য দুই বৎসর কাল আগ্রায় অতিবাহিত করেন, তথায় তিনি মোগল সম্রাটের সভা, রাজনীতি, সৈন্তব্যূহ—এ সকল দেখিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করেন। যৌবনে তিনি নাগবংশীয়া শরৎকুমারী নামী এক

পরমা সুন্দরী ও গুণবতী কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্য

প্রতাপাদিত্য।

মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার রাজ্যের দশ আনা প্রতাপাদিত্যকে ও ছয় আনা বসন্ত রায়কে ও তাঁহার পুত্রগণকে প্রদান করিয়া যান। প্রতাপাদিত্যের ক্ষমতা-লিপ্সা ও চূর্ণাস্ত চরিত্র শ্রবণ করিয়া বসন্ত রায় এই অসম রাজ্যবিভাগে বরং সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে প্রতাপাদিত্য কতলু খাঁর পক্ষ হইয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মানসিংহ বঙ্গাধিপ হইয়া আসিলে তিনি মোগলদের বশ্বতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি ক্রমাগত সৈন্তব্যূহ ও চূর্ণাদি রচনা করিয়া উত্তরকালে

মোগলশক্তি নির্মূল করিয়া সমস্ত বাঙ্গলাদেশে স্বাধীন রাজা হইবার কল্পনা করিয়াছিলেন। তাহার রাজধানী কোথায় ছিল—ইহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন সাগর-দ্বীপ, কেহ বলেন ঈশ্বরপুরের নিকটে, কেহ বা বলেন চ্যাণ্ডিকানে। কিন্তু সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় অনেক অকাটা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ধুমঘাটেই প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল। পৰ্তুগীজগণ বাহাকে চ্যাণ্ডিকান বলিয়াছেন, আমার মনে হয় তাহা সাগরদ্বীপের সম্মিহিত স্থানগুলির প্রাচীন নাম—চণ্ডিকানগর—হইতে পারে। প্রতাপাদিত্যের বহু দুর্গের মধ্যে ১৪টি প্রধান দুর্গ ছিল—(১) বশোর দুর্গ, (২) ধুমঘাট দুর্গ, (৩) রায়গড় দুর্গ, (৪) কমলপুর দুর্গ, (৫) বেদকাশী দুর্গ, (৬) শিবসাহ দুর্গ, (৭) প্রতাপনগরের দুর্গ, (৮) শালিখা দুর্গ, (৯) মাতলা দুর্গ, (১০) হায়দার গড়, (১১) আড়াইকাকী দুর্গ, (১২) মণিহুর্গ, (১৩) রামমঙ্গল দুর্গ, (১৪) চকশ্রী বা চাকশ্রী দুর্গ। কথিত আছে বর্তমান কলিকাতার নিকটে প্রতাপাদিত্যের ৭টি দুর্গ ছিল—বধা, মাতলা, রায়গড়, টালা, বেহালা, শালিখা, চিৎপুর, মূলাজোড়। প্রতাপাদিত্য জাহাজনির্মাণের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। তাহার নৌবহরের জন্ত সুন্দরী কাঠের অনেক জাহাজ ও রণতরী নির্মিত হইত। কোন কোন নৌকার ৬৪টি বা তদধিক দাঁড় ছিল এবং অনেক তরীতেই কামান থাকিত। তাহার নৌকা, রণতরী ও জাহাজের অনেক নাম ছিল, এখনও তাহাদের কতক নাম বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত আছে। বশোরে প্রতাপাদিত্যের নৌবহরে ‘পিয়রা’, ‘মহলগিরি’, ‘ঘুরাব’, ‘পাল’, ‘মাচোয়া’, ‘পশত’, ‘ডিম্বি’, ‘গছাড়ি’, ‘বালাম’, ‘পলওয়ার’, ‘কোচা’ প্রভৃতি অনেক শ্রেণীর তরী ছিল। প্রতাপাদিত্যের সময়ে বশোরের কারিগরেরা জাহাজ-নির্মাণে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। তাহার ফলে সার্বভৌমতা খাঁ অনেক জাহাজ বশোর হইতে প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলেন। (বশোর-খুলনার ইতিহাস, ২১১ পৃষ্ঠা।) প্রতাপের উৎকৃষ্ট যুদ্ধ-জাহাজের সংখ্যা ১০,০০০-এর উপরে ছিল এবং অস্ত্রাস্ত্র পোতের সংখ্যাও দ্বিসহস্র কিংবা তদধিক ছিল। জাহাজবাটা এখনও নামে মাত্র বর্তমান। আবহুল লতিফের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায়—“প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের উপকরণ শত শত তরীতে বোঝাই থাকিত।” এই রণতরীগুলি প্রথম বাঙ্গালী কন্সটারীর অধীন ছিল, কিন্তু পরে পৰ্তুগীজ ফ্রেডারিক ডুডলীই এই কার্গোর ভার প্রাপ্ত হন। প্রতাপের সৈন্ত (১) ঢালী, (২) অশ্বারোহী, (৩) তীরনাজ, (৪) গোলনাজ, (৫) নৌসৈন্ত, (৬) গুপ্তসৈন্ত, (৭) রক্ষিসৈন্ত, (৮) হস্তিসৈন্ত—এই আট বিভাগে বিভক্ত ছিল। ঢালী সৈন্তের অধিনায়ক ছিলেন কালিদাস রায় মদন মল্ল (“যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী”—ভারতচন্দ্র)। অশ্বারোহী সৈন্তের প্রধান অধ্যক্ষ প্রতাপসিংহ দত্ত, সহকারী মহিউদ্দিন ও হুরউল্লা। তীরনাজের অধ্যক্ষ সুন্দর ও ধুলিয়ান বেগ। নৌবহরের অধ্যক্ষ অগষ্টাস পেড্রো। বিপক্ষদের গতিবিধির গুপ্ত সংবাদ লইবার জন্ত যে গুপ্তসৈন্ত সৃষ্ট হইয়াছিল তাহার অধ্যক্ষ ছিল ‘সুখা’ নামক এক অসমসাহসী বীর (“গুপ্তসেনাপতিশচাপি সুখাখ্যো ভীম-বিক্রমঃ”—ঘটককারিকা)। কুকীসেনাদের অধ্যক্ষের নাম রঘু। “বোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাতী, বায়ান হাজার বীর ঢালী”—প্রতাপাদিত্যের সৈন্তসংখ্যার এই নির্দেশ ভারতচন্দ্র

করিয়াছেন। পূর্ববিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন জগৎসহায় দত্ত। প্রতাপাদিত্যের বহু কামান ও গোলার নিদর্শন এখনও যশোরে দৃষ্ট হয়। চব্বিশ পরগনার অধিকাংশ এবং সমুদ্রতীরবর্তী সুন্দরবনের সমৃদ্ধিশালী বহু নগর ও পল্লী এবং পূর্ববঙ্গের কতকাংশ লইয়া প্রতাপাদিত্যের রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে অসংখ্য ও পরাজিত পাঠান সৈন্য, পর্তুগীজ ও পার্শ্বীয়া ত্রিপুরার কুকী সৈন্য বিস্তর ছিল; বান্দালী রায়-বেশে ও ঢালী সৈন্যগণ অতীব দুর্দ্বন্দ্ব ছিল। কতলু খাঁর পুত্র জমাল খাঁ তাঁহার অন্ততম সেনাপতি ছিলেন।

মানসিংহের সময়ে হিন্দু রাজার অমায়িক ব্যবহারে প্রতাপাদিত্য কিছুকাল পোষ মানিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি ইসলাম খাঁর শাসনকালে পুনঃ পুনঃ তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে লাগিলেন। মূল কথা তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু শঙ্কর চক্রবর্তী এবং মহাবলশালী সূর্য্যকান্ত গুহ (সূর্য্যকান্তো মহাশূরো গুহকুলস্ত ভূষণম্) এই দুইজনে মিলিয়া পাঠানাদিকারের পরে দেশে হিন্দুরাজ্য ফিরাইয়া আনিতে যড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাঁহার সৈন্যবল এবং প্রতাপ ছিল—এবং তিনি নিজে যেক্রপ বীরবিক্রম ছিলেন, তাহাতে এইরূপ আশা করা অসম্ভব ছিল না। কমল (সম্ভবতঃ কামাল) নামক এক বিশ্বস্ত অতি দুর্দান্ত রণদক্ষ খোজা তাঁহার এই আশার এক প্রধান অবলম্বন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে এবং তৎসঙ্গে বান্দালী চরিত্রের কতকগুলি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিলে কেন যে তিনি হারিয়া গেলেন তাহা বুঝা যাইবে।

তিনি তান্ত্রিকভাবে শক্তির উপাসনা করিতেন, এজন্য মন্তপায়ী ছিলেন। তাঁহার ক্রোধ হইলে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকিত না। তিনি খুল্লতাত বসন্ত রায়কে হত্যা করেন। যে ভাবে এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়, তাহাতে তাঁহার খুব দোষ দেখা যায় না। বসন্ত রায়ের পুত্র গোবিন্দ প্রথমতঃ তাঁহার প্রতি তীর বর্ষণ করে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ খড়্গাঘাতে তাহাকে নিহত করেন। শ্রাদ্ধকার্য্যে উপবিষ্ট বসন্ত রায় ভৃত্যকে “গঙ্গাজল” আনিতে বলেন; প্রতাপ বুঝিলেন, পুত্রহত্যার প্রতিশোধার্থ বসন্ত রায় তাঁহার প্রসিদ্ধ ‘গঙ্গাজল’ নামক খড়্গ আনিতে আদেশ করিলেন। তখনই পিতা হইতে অধিক রেগে যিনি তাঁহাকে লালনপালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহাকে নিশ্চমভাবে বধ করিলেন (১৫৯৫ খৃঃ)। ক্রোধের সময়ে তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান থাকিত না।

তাঁহার সজোবিবাহিত জামাতা বান্দলার অধিপতি তরুণবরদ্ব রামচন্দ্রকে তিনি হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে ‘রামাই চন্দী’ নামক এক ভাঁড় আসিয়াছিল। বিবাহ-উৎসবে সে তাহার ভাঁড়ামী দেখাইয়া খুব ‘বাহবা’ পাইয়াছিল। কিন্তু সে দ্বীলোকের বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রমণীমহলে ভাঁড়ামী করিতে থাকে। কিন্তু অবিলম্বে তাহার রমণীর ছদ্মবেশ ধরা পড়ে এবং মহারাণী শরৎকুমারী একথা প্রতাপাদিত্যকে জানান। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া প্রতাপাদিত্য রামাই চন্দী এবং তৎসঙ্গে জামাইকে কাটিয়া ফেলিতে হুকুম দেন। হয়ত মুহূর্ত্ত পরে ক্রোধ থামিয়া যাইত এবং জামাইকে তিনি

নিম্নোক্ত জানিয়া লজ্জিত হইতেন, কিন্তু ভীত হইয়া বাড়ীর সকলের পরামর্শে সেই রাতেই রামচন্দ্র ৬৪ দাঁড়যুক্ত এবং কামান দ্বারা সুরক্ষিত নৌকাযোগে পলায়ন করেন। রাজকুমারী পরমা সাক্ষী বিমলা অবশ্য শেষে বাকুলার অন্তঃপুরে তাঁহার স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বস্তর-জামাই যেন 'ভুজঙ্গ-নকুল' হইয়া চিরকাল শত্রু হইয়া রহিলেন। বসন্ত রায় ও তাঁহার পুত্রের নিধন এবং স্বীয় জামাতার প্রতি ঈদৃশ ব্যবহারে তিনি জনসমাজের শ্রদ্ধা হারাইলেন। এই সকল পাপ ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনামূলক, হুতরাং ক্ষমাই হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তিনি যেভাবে সম্বীপের অধিপতি কার্তালোকে হত্যা করিয়াছিলেন তাহা কোন ক্রমেই ক্ষমা করা যাইতে পারে না। আরাকানের রাজাকে তাঁহার চিরশত্রু কার্তালোর মুণ্ড উপহার দিতে পারিলে মগরাজার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপিত হইবে এবং মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহে তাঁহার আত্মকল্যাণ পাইবেন, এই ছিল তাঁহার অভিসন্ধি। আরাকানাধিপের সঙ্গে বড়বঙ্গ দৃঢ়ীভূত করিয়া তিনি অতিশয় অন্তরঙ্গভাবে তাঁহার বাহ্য সরল ব্যবহারে ও মৈত্রীর প্রস্তাবে পশ্চাদ্গম্য বীরকে মুগ্ধ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে লইয়া আসিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। ভুজারিকের বিবরণীতে এই ঘটনার সবিস্তার উল্লেখ আছে। আত্মীয়ভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া এইরূপ আতিথ্য বঙ্গেশ্বর শশাঙ্গ একবার কান্তকুজাধিপতি রাজাবর্দ্ধনকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার বাঙ্গলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রতাপাদিত্য এই কলঙ্ক প্রক্ষেপ করিলেন। ইহা ছাড়া অতিশয় ধনবান্ ও ক্ষমতাশালী "হ'রে শুঁড়ি" নামক আর এক বণিককে তিনি নিঃশ্রমভাবে হত্যা করেন, তাঁহার পরিবারবর্গ প্রতাপাদিত্যের ব্যবহারে এত ভীত হইয়াছিল যে তাহারা রাজভয়ে জলমগ্ন হইয়া মরিয়াছিল। বমুনা হইতে ঢলুনিয়া মোহনার কাছে এখনও লোকে "হ'রে শুঁড়ির দহ" দেখাইয়া থাকে। এই 'হ'রে শুঁড়ি' গোবরডাঙ্গার নিকট একটি অতি বৃহৎ রাস্তা করাইয়া দিয়াছিলেন। এখনও "হ'রে শুঁড়ির রাস্তা"র অনেকটা বিদ্যমান আছে।

কথিত আছে, একদা মত্তপানে উন্মত্ত হইয়া তিনি এক বৃদ্ধা ভিখারিণীর স্তন কাটিয়া ফেলেন। এদিকে তাঁহার সঙ্গুণরাশিরও শেষ ছিল না। তাঁহার উদারতার খ্যাতি সমস্ত যশোরবাসীর মুখে এখনও স্তনা যায়। তিনি আশার অতীত অর্থ প্রার্থীকে দিতেন। এমন কি, কথিত আছে, ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি রাজ্যসনে উপবিষ্ট হইয়া কলতরু হইয়াছিলেন—তখন একজন ব্রাহ্মণ রাজ্ঞী শরৎকুমারীকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। ইহা শুধু পরীক্ষার জন্ত। কলতরু হওয়ার প্রথা বমুৎশীয় রাজা দিলীপের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে; কালিদাস তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই রীতি বৌদ্ধযুগেই বিশেষরূপে অচলিত হইয়াছিল। হিউনসাঙ্গ হর্ষবর্দ্ধনের এই কলতরু হওয়ার ব্যাপার সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কান্তকুজরাজ সর্গপ দান করিয়া তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে লজ্জা-নিবারণার্থ একখানি বস্ত্র চাহিয়া লইয়াছিলেন। দিলীপ সম্বন্ধে কুন্তিবাস কালিদাসের বর্ণনা অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "অত্র ভক্ষ্য মহারাজা নাহি রাখে ঘরে। মৃত্তিকার ভাণ্ডে রাজ্য জলপান করে।" কিন্তু হিন্দুরাজত্বকালে এ প্রথা ছিল কি না সন্দেহস্থল। বাঙ্গালিকর

রামায়ণে ইহার উল্লেখ নাই। বুদ্ধের ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ ও ত্যাগের আদর্শে যে বৌদ্ধরাজগণ ইহার অনুসরণ করিতেন, তাহাই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হয়। বঙ্গদেশে ত্রিপুরা রাজ্যে সেদিন পর্য্যন্ত এ প্রথা নামে মাত্র অমুষ্ঠিত হইত। রাজা কর্তৃত্ব হওয়ার পর মহারাণী সর্বপ্রথম তাঁহার রাজত্ব ও সর্বস্ব চাহিয়া লইতেন। প্রতাপাদিত্য সিংহাসনে বসিয়া কর্তৃত্বভরত সঞ্চাল করিয়াছিলেন। তিনি কোন গুরুতর ব্যাপার লইয়া ছিনিমিনি খেলার লোক ছিলেন না। ব্রাহ্মণ শরৎকুমারীকে পাইলেন, শরৎকুমারীও রাজ্যের ধর্মকাব্যে বাধা দিলেন না। এইস্থানে শরৎকুমারী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দাসীর বৃত্তি করিবেন—এই পর্য্যন্ত, কিন্তু গ্রহীতা পরদ্বীর উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা কখনই পান নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজাকে জানাইলেন, তিনি শুধু রাজ্যের দানবল পরীক্ষা করিবার জন্য এইভাবে রাণীমাকে যাজ্ঞা করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহাকে বিধিমত প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বিনিময়ে রাজ্যের ওজনমত স্বর্ণ পাইলেন। প্রতাপাদিত্যের শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্ট ছিল। প্রবলপরাক্রান্ত রাজা রাজ্যের একরূপ অশৃঙ্খলা করিয়াছিলেন যে সকলে রামরাজ্যে বাস করিত। তাঁহার অপূর্ণ দানশক্তি ও উদারতাসম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে, —রামরাম বসু ও সতীশ মিত্র মহাশয়ের পুস্তকে তাহা বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি দুর্দান্ত পর্ভুগীজ জলদস্যুগণকে নিরস্ত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার রাজ্যের লোকেরা বহিঃশত্রুর আক্রমণসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল। তাঁহার পিতা বিক্রমাদিত্য ও পিতৃব্য বসন্ত রাঘবের সময় হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ—কুলীন এবং পণ্ডিতগণ যশোরে আমন্ত্রিত হইয়া বসবাস করিয়াছিলেন। সুতরাং সর্ববিষয়ে তখন যশোর বঙ্গদেশে শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়াছিল। পুরাকালে এই রাজ্য সমৃদ্ধ ও শ্রীসম্পন্ন ছিল—প্রাচীন কীর্তির অনেক ভগ্নাবশেষ তথায় দৃশ্য নহে। প্রতাপাদিত্য যশোরেখরীর প্রস্তরময়ী মূর্তি পাইয়া তাহা অতি আড়ম্বরের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে এই বিগ্রহের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল এবং এই জন্যই ভারতচন্দ্র তাঁহাকে “বরপুত্র ভবানীর” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যখন বসন্ত রাঘবের আত্মীয় কুটবুদ্ধি রূপরাম বসু কচু রায়কে লইয়া জাহাঙ্গীরের দরবারে তাঁহার হত্যার কথা জানাইল, সেই স্মরণীয় দিনে বাঙ্গলার স্বাধীনতার শেষ আশা-রশ্মি অন্তর্মিত হইল। মানসিংহ ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইলেন, তিনি প্রতাপাদিত্যের নিকট একখানি তরবারি ও একটি বেড়ী (শৃঙ্খল) পাঠাইলেন। বেড়ী স্বাধীনত্বের চিহ্ন—এবং তরবারি যুদ্ধের। কেশবভট্ট নকীব উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—“এই বেড়ী যেন মানসিংহ তাঁহার প্রভু জাহাঙ্গীরের পায়ে পরাইয়া দেন”—“বেড়ি দিও আপনার মনিবের পায়ে” (ভারতচন্দ্র)। সাদরে তিনি তরবারিটা গ্রহণ করিয়া বেড়ী ফিরাইয়া দিলেন, তৎসঙ্গে রাজা মানসিংহ মোগলের আত্মীয়তা করিয়া যে জাতিচ্যুত ও কুলচ্যুত হইয়াছেন, তাহাও বলিতে ছাড়িলেন না।

মানসিংহ আকবরের নিকট যুদ্ধনীতি বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, পথে পথে

বঙ্গের যে সকল জমিদার ও রাজা প্রতাপাদিত্যের ("ভয়ে যত নৃপতি ছারছ") দরবারে গরুড় পক্ষীর ছায় থাকিতেন, তাহাদিগকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন। প্রতাপের নিজ সেনাপতিদের মধ্যেও কাহাকে কাহাকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিতে চেষ্টা করিলেন। বাঙ্গালীসমাজ তখনও প্রায় এখনকার সমাজের মতই ছিল। কোন সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে একত্র হইবার প্রবৃত্তি তাহাদের ছিল না। কেহ কেহ প্রতাপাদিত্যের শ্রেষ্ঠত্বে ঈর্ষান্বিত ছিলেন; কেহবা মোগলের অন্ত্রগ্রহপ্রার্থী ছিলেন, কেহবা প্রতাপাদিত্য-কৃত পিতৃবা ও ভ্রাতৃপুত্রের হত্যা, কার্তালোর হত্যা, স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিবার চেষ্টা ইত্যাদি ছনৌতি ও পাপ খুব বাড়াইয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি যে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, কোন হিন্দুরাজা তাহা বুঝিলেন না, তাহার দানশীলতা ও উদারতার কথা কেহ বলিলেন না, তাহাকে খর্ব করিতে পারিলেই তাহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল মনে করিলেন। সুতরাং রূপরাম ও কচু রায়কে সঙ্গে করিয়া ২২ লক্ষের সঙ্গে যে দিন মানসিংহ বঙ্গে পদার্পণ করিলেন—সেদিন বাঙ্গলাদেশে তিনি সহায়তার অভাব অনুভব করিলেন; যদিও কিছু ঐক্যের গুঁড়া বঙ্গদেশে তখনও ছিল, তাহা মানসিংহের ছায় রাষ্ট্রনৈতিক খেলোয়াড়ের ভেদনীতিতে সম্যক বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

(১) ককনগরের রাজাদের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহকে বিশেষ সাহায্য করেন। ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রার প্রকোপে যখন মানসিংহের সৈন্তদল মৃত্যুদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল—তখন তিনি রসদ জোগাইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করেন এবং প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে অনেক সন্ধান দেন। তাহার গৃহদেবতা গোবিন্দ ও লক্ষীর মহাসমারোহে বিবাহ দিবার জন্ত তিনি বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই উপকরণে মোগল সেনাদের মহা-বিপদ ঘুটিল। ভবানন্দ মজুমদার নিশ্চয়ই ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি বহুদিন যশোরে প্রতাপাদিত্যের অন্ত্রগ্রহীত হইয়া ছিলেন।

(২) চাঁচড়ার রাজবংশের পূর্বপুরুষ ভবেশ্বর রায়ের বংশধর মহাতাব রায় বা মুকুট রায় যশোর রাজ্যের উত্তর সীমান্তের প্রধান কিয়াদার এবং প্রতাপাদিত্যের অন্ততম প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তিনি মানসিংহকে গোপনে রসদ ও সৈন্ত পাঠাইয়াছিলেন।

(৩) নলডাঙ্গার রাজবংশের পূর্বপুরুষ রণবীর খাঁ এবং কুশদহের জমিদার রাঘব সিদ্ধান্ত-বাগীশ উভয়ে মানসিংহের সহায়তা করিয়াছিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মানসিংহের দরবারে বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

(৪) কামদেব ব্রহ্মচারীর পুত্র লক্ষীকান্ত প্রতাপের বিশেষ অন্ত্রগ্রহীতদের অন্ততম। কেহ কেহ বলেন, রূপরাম বহুর কোশলে গুপ্তভাবে কামদেবের লিখিত পত্র প্রেরিত হয় এবং মানসিংহ যশোহরের সমীপবর্তী হইলে লক্ষীকান্ত গোপনে আসিয়া তাহার সহিত যোগ দেন। শুধু যোগ দেওয়া নহে যুদ্ধের প্রাকাল পর্যন্ত প্রতাপ কি ভাবে আয়োজনাদি করিয়াছিলেন, লক্ষীকান্ত সে সকল গুপ্ত সন্ধান ব্যক্ত করিয়াছেন—তদ্বারা মোগল সৈন্তের জীবনরক্ষা হয়।

উদ্যানন্দ মজুমদার, লক্ষীকান্ত মজুমদার * এবং বাশবেড়িয়ার রাজাদের পূর্বপুরুষ জয়ানন্দ মজুমদার—এই তিন মজুমদার বঙ্গদেশটাকে ভাগবাটরা করিয়া লইয়াছিলেন—এরূপ প্রবাদ আছে। ইহারা সকলেই মানসিংহকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

“জিয়া বঙ্গাধিপান্ বীরান্
রাজাধিপান্ মহাবলান্। আ-
সমুদ্রকরগ্রাহী বহুব নর-
শাৰ্দ্ধুলঃ।”

ইহা হইতে দেশের অবস্থাটা বেশ বুঝা যায়। ব্যক্তিগতভাবে বাঙ্গালী প্রতিভার এখনও পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগেও পরম-হংস দেব, রাজা রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত কীর্তিমান পুরুষদের অভাব নাই। কিন্তু বাঙ্গলার সে ঐক্য আর নাই, বাহা মহীপালকে ভীম কৈবর্তের বিরুদ্ধে শক্তি দিয়াছিল, বাহার বলে বল্লাল সেন সমস্ত বঙ্গদেশে কোলীচ চালাইয়াছিলেন, বাহা আদিকালে গোপালের হস্তে সমস্ত রাজশক্তি তুলিয়া দিয়াছিল। কোন মনস্বী ব্যক্তি প্রতিভাঘারা কিছু কালের জন্ত উজ্জলোকে শির উত্তোলন করিতে পারেন,—কিন্তু

প্রতাপসম্বন্ধে ঘটক-
কারিকা।

লক্ষ্যভেদ করিতে অর্জুন উত্তত হইলে ব্রাহ্মণেরা বেক্রপ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিল (‘‘এত বলি ধরাধরি করি বসাইল’’—কানীদাস)—বঙ্গদেশের লোক সেইরূপ কাহারও উদীয়মান প্রতিভা দেখিলে তাঁহাকে সহায়তা করা দূরে থাকুক—তেমনই নিরস্ত করে। পরস্পরের গাৰ্হস্থ্য বিবাদ তুলিয়া সর্বজনহিতকামী হস্তে বলসঞ্চার করার যোগ্য ঐক্য-বন্ধন আর এদেশে নাই। সেই শকুনির সময় হইতে যে গৃহবিবাদ চলিয়া আসিয়াছে, বাহাতে পৃথীরাজ ভারতসাম্রাজ্য হারাইলেন—তাহা কবে নির্দোষিত হইবে ?

প্রতাপ এইভাবে স্বগণকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিশ্বস্ত খোজা কমল সাতদিন উপবাসী থাকিয়া অবিশ্রান্ত লড়াই করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছিলেন, সূর্য্যকান্তের মৃতদেহের উপর হয়ত তাঁহার চিরবিশ্রুততার জন্ত দেবতার পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের এই যুদ্ধ তিনদিন বাবৎ চলিয়াছিল ; ইহাতে শৌর্য্যবীর্য্যের চূড়ান্ত প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্য শুধু খোজা কমল ও আশৈশব বদ্ধ সূর্য্যকান্তকে হারান নাই—এই যুদ্ধে তাঁহার প্রাণপ্রিয় অন্তরঙ্গ শত্রু চক্রবর্তী বন্দী হইলেন, তৎপক্ষীয় ফিরঙ্গী সেনানায়ক রডা নিহত হইলেন এবং তাঁহার অন্ততম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি মদন-মল্ল প্রাণ হারাইলেন। মোগলদিগের বহু ওমরাহ নিহত হন। শেষে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হইলেন। তখন বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ষায় বাঙ্গলাদেশের অবস্থা মানসিংহের ভালরূপই বিদিত ছিল, পূর্ববৎসর বর্ষায় তাঁহার বিপুল সৈন্তের কোনরূপে প্রাণ-রক্ষা হইয়াছে, বর্ষার বিপদ তিনি জানিতেন। সুতরাং যখন প্রতাপ সন্ধিপ্রার্থী হইলেন, তখন তিনি তাহা মঞ্জুর করিলেন। সন্ধিঘারা প্রতাপ নামে মাত্র মোগলদের বশ্বতা স্বীকার করিলেন এবং বসন্ত রায়ের পুত্র কচু রায়কে তাঁহার প্রাণ্য ‘হুয় আনি’ প্রত্যর্পণ করিলেন। ১৬০৩ হইতে ১৬০৮ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রতাপাদিত্য নিরুচ্ছেদে রাজ্য করিয়া বহু মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা

করিয়া রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিলেন। ১৬০৮ খৃঃ অব্দে ইসলাম খাঁ নবাব হইয়া বঙ্গের মসনদ অধিকার করেন। তিনি একটু উগ্রপ্রকৃতি ছিলেন। বক্রপুরে তাঁহার সঙ্গে প্রতাপের দেখাসাক্ষাৎ ও সন্ধির প্রস্তাব দৃঢ়ীভূত হইলেও স্বাধীনতার সেই চিরপোষিত ইচ্ছা তিনি কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না। এ ছুতো সে ছুতো ধরিয়া তিনি সন্ধির নিয়ম ভাঙ্গিলেন। পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এইবার প্রতাপাদিত্য ধুমঘাটের নৌযুদ্ধে ইসলাম খাঁর সেনাপতি ইনায়েৎ খাঁ ও মীরজা সহনের হাতে সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া বন্দী হইলেন। তাঁহার বন্দী হওয়ার সংবাদে তৎপুত্র উদয়াদিত্য মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া প্রাণের আশা পরিত্যাগপূর্বক মোগলসৈন্যসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শালিখার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি নিবৃত্ত হন, এবং পিতার যোগ্য পুত্রের প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। এদিকে বন্দী প্রতাপাদিত্যকে লইয়া ঢাকায় গিয়া ইসলাম খাঁ পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রকে আশ্রয় প্রেরণ করেন। পথে কাশীধামে ১৬১১ খৃষ্টাব্দে ৫০ বৎসর বয়সে প্রতাপের লীলাবসান হয়। ভারতচন্দ্র এবং অপর দুই একজন লেখক লিখিয়াছেন—মানসিংহের দ্বারাই তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া আশ্রয় প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা ভুল। মানসিংহ নহে, ইসলাম খাঁর হাতেই তাঁহার পতন।

প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস বহুস্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে। রামরাম বহু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে একখানি নাতিশুদ্ধ ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, একখানি পাশাতে লেখা ‘প্রতাপাদিত্য-চরিত’ হইতে তাঁহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নূরজাহানের ভ্রাতা আসাদ খাঁর অমুচর আবদুল লতিফ খাঁ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে প্রতাপসম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক মীরজা সহন আলাউদ্দিন ইম্পাহিনী (অপর নাম ঘাইবী) “বাহিরিস্তান ঘাইবী” নামক গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের কথা সবিস্তারে লিখিয়াছেন, তাহা মূলতঃ বিশ্বাসযোগ্য এবং খুঁটি-নাটি তবে পূর্ণ। ঘটককারিকা গ্রন্থসমূহেও প্রতাপসম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। বিভায়েজ-লিখিত বাখরগঞ্জের ইতিহাস, পর্দুগীজদের লিখিত অনেক বিবরণ, বিশেষতঃ ডুজারিকের ইতিহাস—প্রভৃতি বহুগ্রন্থে যশোররাজসম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া যশোর ব্যাপিয়া প্রতাপাদিত্য ও বসন্ত রায় সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে। আমাদের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাসের সঙ্গে প্রতাপের খুল্লতাত ও ভ্রাতৃপুত্র উভয়েরই সখ্য ছিল—তিনি তাঁহার পদে ইহাদের নামের উল্লেখ করিয়াছেন।

আর একটি কথা বলিয়া প্রতাপাদিত্যের কথা উপসংহার করিব। মোগলদের বিরুদ্ধে ইশা খাঁ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কেদার রায়ের সঙ্গে মানসিংহের অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়াছিল, অস্ত্রতম ভূঞা সত্ৰাজিৎ ও আরও অনেকে মোগলদিগের প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। এদিকে পাঠানেরা মোগলের চিরশত্রু, বঙ্গদেশে তখনও তাঁহাদের প্রভাব একেবারে নষ্ট হয় নাই। সুতরাং মোগল সমস্ত দেশের শত্রু-স্বরূপ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহারা কেন মিলিত হইলেন না—প্রতাপের শুভাকাঙ্ক্ষী স্বরূপ ইশা খাঁ, যিনি নানা উৎসবে ধুমঘাটে আসিয়া প্রতাপাদিত্যের

শুভকাৰ্য্যে যোগ দিয়াছেন, তিনিই বা প্রতাপকে সাহায্য করিলেন না কেন? এক একটি করিয়া প্রতিপক্ষ রাজা ও মুসলমান নায়ক পতনের মত মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন—সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিলেন না কেন? একথা দূরে থাকুক, প্রতাপের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বিশ্বস্ত কর্মচারীরা পর্য্যন্ত মোগলদিগকে তাঁহার সর্বনাশের পথ দেখাইয়া দিল। তাঁহার নিজ জামাতা বাকুলারাজ কি ক্ষণকালের জন্য পারিবারিক কলহ তুলিয়া তাঁহার সাহায্যে দাঁড়াইতে পারিতেন না? অনেকে দেশ নষ্ট হইল, ঐক্য-লক্ষী এদেশে থাকিলে রাজলক্ষী এস্থান হইতে বিদায় লইতেন না। তাঁহার সিংহাসন পাতা ছিল—আমাদের নৈতিক অধঃপতন হইয়াছে, তাই সমস্ত বিদ্রোহীকে বরণ করিয়া আসিয়াছি। (এই অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই আমরা সতীশ মিত্র মহাশয়ের ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।)

তথাকথিত “বারভূঞা”র অত্যন্ত বীর কৈদার রায়। চাঁদ রায় ও কৈদার রায় সহোদর ছিলেন। ইহাদের রাজধানী পদ্মার এক শাখা কালীগঙ্গার কূলে শ্রীপুরে অবস্থিত ছিল।

ইহাদের পূর্বপুরুষ নিম রায় সম্ভবতঃ সেন-রাজাদের সময়ে কর্ণাট কৈদার রায় ও চাঁদ রায়।

হইতে আসিয়া বিক্রমপুর আরা কুল-বেড়িয়াতে বাসস্থাপন করেন, নিম রায় তৎকালীন বঙ্গাধিপের নিকট ‘ভূঞা’ উপাধি লাভ করিয়া বঙ্গদেশের একজন পরাক্রান্ত জমিদার বলিয়া গণ্য হন। ডাক্তার ওয়াইজের মতে আকবরের সময়ে নিম রায় কর্ণাট হইতে আসিয়াছিলেন। (বারভূঞাসম্বন্ধে জেমস ওয়াইজ সাহেবের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল, ১৮৭৪।) চাঁদ রায় ও কৈদার রায় সমস্ত বিক্রমপুর পরগনা ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি স্থান অধিকার করিয়া পাঠান-রাজহের শেষভাগে স্বাধীন নৃপতিরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামের নিকটবর্তী সন্দ্বীপ মোগলদের দখলে ছিল—কিন্তু জনৈক পর্তুগীজ সেনাপতি কার্ডালো কৈদার রায়ের নামে ঐ স্থান অধিকার করেন। কৈদার রায় তাঁহার সেনাপতি কার্ডালোর দ্বারা ঐ স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কারস্বরূপ ঐস্থান সেই পর্তুগীজ যোদ্ধাকেই প্রদান করেন। এই সন্দ্বীপের অধিকার লইয়া আরাকানের রাজার সঙ্গেও কৈদার রায়ের যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। চুইবার তিনি আরাকানের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হন, কিন্তু শেষে সন্দ্বীপের অধিকার শেষোক্তের ভাগেই ঘটিয়াছিল (১৬০২ খৃঃ)। কাম্পোস লিখিত “Portuguese in Bengal” পুস্তকে দৃষ্ট হয় আরাকানরাজ মানরাজগিরি-কর্তৃক সন্দ্বীপ অধিকৃত হওয়ার পর কার্ডালো তাঁহার নৌবহর লইয়া শ্রীপুরেই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি কৈদার রায়ের নৌবলের ভার প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপুরের রাজকীয় সেনার অত্যন্ত অধিনায়ক হইয়াছিলেন। মোগলেরা বৃষ্ণিল তাঁহাদের অধিকৃত দ্বীপটি কৈদার রায়ের সাহায্যে কার্ডালো কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা শ্রীপুরের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। মহারাজ মানসিংহের সেনাপতি মন্দারায়ও কৈদার রায়ের সঙ্গে যে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন—তাহা অনেকটাই জলযুদ্ধ। তাহাতে কালীগঙ্গার শ্রাম সলিল উভয় পক্ষের শোণিতে লোহিত হইয়াছিল। যুদ্ধে কৈদার রায় জয়ী হইলেন এবং মোগল-পক্ষীয় দুর্ব্বল যোদ্ধা মন্দারায় নিহত হইলেন (Pareh's Pilgrims, Pt. IV, Bk. V, p. 513)। কথিত আছে এই যুদ্ধে

কার্তালো অতিশয় বীরব প্রদর্শন করেন এবং আহত হন। তখন (১৬০৬ খৃঃ) মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধে বিশেষরূপ ব্যস্ত ছিলেন। প্রতাপের সর্বনাশ সাধন করিয়া তিনি কেদার রায়ের বিরুদ্ধে সমস্ত সৈন্য লইয়া অভিযান করিলেন। প্রথমতঃ তরবারি ও শৃঙ্খল প্রেরিত হইল, দর্পিতভাবে কেদার রায় শৃঙ্খল ফিরাইয়া দিলেন এবং মানসিংহকে বিক্রম করিয়া প্রত্যুত্তরে একটি সংস্কৃত শ্লোক পাঠাইলেন, তাহা তদবধি সংস্কৃত-সাহিত্যের উদ্ভূত শ্লোকগুলির মধ্যে স্থান পাইয়াছে। “ভিনন্তি নিত্যং করিরাজকুন্তং। বিভর্তি বেগং পবনাতিরেকম্। কবোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে। তথাপি সিংহঃ পশুরেব নাত্তঃ॥” মানসিংহ বলশালী, ক্রমতাপন্ন, রাজানুগ্রহে প্রতিষ্ঠার শিখরদেশে স্থিত, তথাপি তিনি পশুতুল্য। এই বিক্রমে উত্তেজিত হইয়া মানসিংহ শ্রীপুর অবরোধ করেন। কেদার রায় এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে মানসিংহ সন্ধির প্রস্তাবে স্বীকৃত হন। কথিত আছে মানসিংহ কেদার রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন, এ সম্বন্ধে হিন্দুস্থানে অনেক প্রবাদ চলিত আছে, তাহার একটি এই—“যদি রাজা মানসিংহজীউকি বেটি মাপি। যদি রাজা কেদার দেনী করী। আর মিলাপ হবো। যদি নীজর করি।” (অম্বরের শিলাদেবীর পুরোহিতগণের বংশাবলী)। কিন্তু এই সন্ধি স্থায়ী হইল না। কেদার রায়ের সঙ্গে মানসিংহের পুনরায় সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কথিত আছে নয় দিন পর্যন্ত ভীষণ যুদ্ধের পর কেদার রায় পরাস্ত ও নিহত হন। এই যুদ্ধের কথা Elliot's History of India, Vol. vi, এবং আকবরনামার ১১১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে। (যোগেন্দ্রবাবুর বিক্রমপুরের ইতিহাসের ১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কথিত আছে কেদার রায় তাহার ৫০০ রণতরী লইয়া এই যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং মোগল সেনাপতি কিল্মককে বন্দী করিয়াছিলেন কিন্তু পরিণামে মোগলেরই জয় হইয়াছিল। কিন্তু জনপ্রবাদ অন্তরূপ। ইশা খাঁ যে কেদার রায়ের ভগিনী সোণামণিকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইয়া বিবাহ করেন, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এতৎসম্বন্ধে বিক্রমপুরের ইতিহাস (যোগেন্দ্রবাবু-কৃত) এবং অপর্যাপ্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থে যে বিবরণ দেওয়া আছে, তাহাতে জানা যায় ইশা খাঁ ও চাঁদ-কেদার সাতঘরের মধ্যে এক সময়ে খুব সৌহার্দ্য ছিল। ইশা খাঁ এক সময়ে শ্রীপুর রাজধানীতে আতিথ্য স্বীকার করিয়া স্নানার্থিনী সোণামণির অপূর্ণ রূপ দেখিয়া বেক্রমে পারেন তাহাকে লাভ করিবেন এইজন্ত কৃতসংকল্প হন। রায় রাজাদের এক অসঙ্কট কর্মচারী শ্রীমন্ত খাঁর সাহায্যে তিনি কতকদিন পরে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই অপমানে ও লজ্জায় চাঁদ রায় যে দুঃসহ পরিতাপ পাইলেন— তাহাতে পীড়িত হইয়া পড়েন এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। কেদার রায় প্রতিশোধার্থ পদ্মার অপর পারে থাকিয়া ইশা খাঁর অস্তুতম রাজধানী খিজিরপুর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন, তাহা ছাড়া কৈলাগাছা দুর্গ ভূমিসাৎ করেন। কিন্তু “ইশা খাঁ” শীর্ষক যে পল্লীগাথা বহুদিন যাবৎ ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমান কবিকর্তৃক রচিত হইয়া মুসলমান গায়ন-কর্তৃক গীত হইয়া আসিতেছে—তাহাতে এই বিষয়টি ভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, একদা ইশা খাঁ তাহার অপূর্ণ শিরশ্চিহ্ন স্ববৃহৎ কোবা লইয়া যখন শ্রীপুরের

নদী দিয়া যাইতেছিলেন তখন চাঁদ রায়ের ভগিনী সুভদ্রাকে দেখিতে পান (সোণামণি হরত তাঁহার আদরের দেওয়া নাম ছিল, পোষাকী নাম সুভদ্রাটাই হরত তিনি মুসলমান অনুর-মহলে প্রচার করিয়াছিলেন)। উভয়ের প্রতি উভয়ে আকৃষ্ট হন। সুভদ্রা সোণার মাঝে চিঠি লিখিয়া ইশা খাকে কোন নির্দিষ্ট যোগের দিনে কোথা লইয়া ত্রীপুরে আসিতে অনুরোধ করেন—সেই যোগ উপলক্ষে তিনি নদীতে পুনরায় স্নান করিতে আসিবেন, তখন ইশা খাঁ তাঁহাকে অনায়াসে তাঁহার ক্ষিপ্ৰগতি কোষাতে উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। এই ইঙ্গিত পাইয়া ইশা খাঁ সেই যোগ উপলক্ষে সন্তোষাত্মক সুভদ্রাকে ধরিয়া লইয়া যান। কেদার রায় তাঁহার কোথা লইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত পলাতক তরুরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন—শেবে ইশা ঢাকায় মুসলমান নবাবের রাজ্যে আসিয়া পড়িলে তিনি ইহার প্রতিশোধ লইবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। কেদার রায় তদবধি ইশা খাঁর সহিত চিরশত্রুতা করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি অঙ্গলবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভগিনীর সঙ্গে দেখা করেন। তখন বিধবা বেগম (নাম “নিয়ামৎ জান” হইয়াছিল) ছই পুত্র আরাম ও বিরামের সহিত রাজধানীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি নানা ছন্দে ভগিনীকে আদর করিয়া বলেন—তাঁহার ছই কস্তার সঙ্গে আরাম ও বিরামের বিবাহ দিবেন, মুসলমানী-মতে বিবাহ হইলে ইহাতে কোন বাধা হইবে না। কেদার রায় আরও বলেন যে তাঁহার

কেদার রায়ের মৃত্যু-
কালে নানাক্রপ প্রবাহ।

বৃদ্ধা মাতা বালক দুটাকে দেখিতে চান, সুতরাং মাতুলের সহিত
কয়েকদিনের জন্ত তাহারা যাইয়া ত্রীপুরে বেড়াইয়া আসুক।

নিয়ামৎ জান এই যোহের প্রস্তাবের মধ্যে তপ্ত লৌহশলাকার ছায়
ভ্রাতার জুর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন এবং কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এদিকে কেদার
রায় বিপুল ভোজের আয়োজন করিয়া অঙ্গলবাড়ীর গণ্যমান্য সকল ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া
তাঁহার কোথা নৌকাগুলিতে আনাইলেন, আরাম-বিরামও সঙ্গে আসিল। অনেক রাত্রি
পর্য্যন্ত আমোদ-আহ্লাদে ব্যস্ত হইল এবং কেদার রায় তাঁহার ভাগিনেয়দিগকে এক্রপ
মধুর ও অমায়িক ব্যবহারে তুষ্ট করিলেন যে তাহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।
তিনি তাহাদিগকে “আজ বাকী রাতটুকু এখানে থাক,” এই অনুরোধ করিলে তাহারা
আনন্দের সহিত স্বীকৃত হইল। রাজপুত্রদ্বয় নিদ্রিত হইলে বহুহস্তসঞ্চালিত কোথা অবশিষ্ট
রাত্রি বাহিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে ত্রীপুরে আসিল। “কালেনমী মামা” কেদার রায়ের
মুষ্টি পরিবর্তিত হইল। ভাগিনেয়দ্বয়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তিনি কারাগারে প্রেরণ করিলেন
এবং তাহাদিগকে কালীমন্দিরে বলি দেওয়ার জন্ত সমারোহ করিয়া আয়োজন চলিল। এদিকে
কেদার রায়ের ছই কস্তা শুনিয়াছিলেন যে তাহাদের পিসতুত ভাইয়েদের সঙ্গে তাহাদের
বিবাহ হইবে। তাহাদের পিতা স্বয়ং এই কথা দিয়াছেন, তাহারা প্রতারণা বুঝিল না, “যখন
পিতার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, তখন আমরা তাহাদেরই হইয়া গিয়াছি” এই মনে করিয়া
তাহারা বন্দিদ্বয়ের নিকট কারাগারে যাইয়া মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব করিল। আরাম-বিরাম

বলিলেন, “আমরা চোরের মত তোমাদিগকে বিবাহ করিয়া পালাইয়া যাইব না, বিবাহ করিলে প্রকাশ্যভাবেই করিব।” যখন কালীর কাছে তাঁহাদিগকে বলি দেওয়ার জন্ত উপস্থিত করা হইল, তখন এই দুই রাজকুমারী খজা হস্তে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে দাঁড়াইল, ভয়ে কেহ অগ্রসর হইল না। এদিকে শতযুদ্ধের বীর, অসাধারণ বলসম্পন্ন, ইশা খাঁর দক্ষিণহস্ত করিমুল্লা—বিধবা বেগমের শোকোন্মত্ততা দেখিয়া অধীর হইলেন। তিনি নৌবাহিনীর নেতা সাধনের সাহায্য লইয়া শ্রীপুরে উপস্থিত হইয়া রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিলেন, এবং যখন আরাম ও বিরাম কালীমন্দিরে রাজকুমারীদ্বয়ের আত্মকুল্যে জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—তখন অকস্মাৎ ধূমকেতুর মত উপস্থিত হইয়া ইহাদিগকে রক্ষা করিলেন। কৈদার রায় নিকটবর্তী বনে পালাইয়া গিয়া তাহার ভূনিবৃত্ত প্রাসাদ নিরাপদ মনে করিয়া তথায় আশ্রয় লইলেন। রাজকুমারীরা দেখিল, কৈদার রায় বাঁচিয়া থাকিলে তাহাদের নিজেদের জীবন ও আরাম-বিরামের জীবন সর্বদাই শঙ্কটাকীর্ণ থাকিবে। তাহারা সেই গুপ্ত স্থানের সন্ধান দিল। রাজধানীর নিকটবর্তী ‘আস্থয়া’ নামক স্থান ঘোরজঙ্গলাকীর্ণ, সেই জঙ্গলের মধ্যে কৈদার রায়ের একটি বৃহৎ প্রাসাদ ছিল, উহা শ্রীপুর হইতে মাত্র পাঁচ রসী দূরে—সেই আশ্রয়ের রাজপ্রাসাদে একটা গুপ্ত সুরঙ্গ ছিল, তাহার দ্বারা নদীতে পৌছান যায়। করিমুল্লা সেই স্থানে যাইয়া কৈদার রায়কে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন—তিনি নিশ্চিত মনে ঘুমাইতেছিলেন।

আরাম-বিরাম বে ইশা খাঁর দুই পুত্র ও সোণামণির গর্ভজাত তাহার উল্লেখ অনেকেই স্থলে পাওয়া যায়। (পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।) এই সময়ে কৈদার রায় মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, হয়ত এই ঘটনাই খাঁটি, কিন্তু করিমুল্লার ছায়া মল্লবারের বীরত্বের বশ লুপ্ত করিয়া মোগলেরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা আশ্রয় দরবারে বাড়াইবার জন্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভিন্নরূপ বিবরণ দিয়াছেন। কথিত আছে, ইশা খাঁর মৃত্যুর পর ব্রহ্মরাজ হাজিগঞ্জ দুর্গ আক্রমণ করিলে সোণামণি উপায়ান্তর না দেখিয়া অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। অপর এক প্রবাদ যে, সোণামণির স্বামীর মৃত্যুর পর পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

যে ছাদশ জন ভৌমিক মোগল-আগমনের পূর্বে বঙ্গদেশ একরূপ শাসন করিতেছিলেন, তন্মধ্যে ভূষণা বা ফতেয়াবাদ (আধুনিক কালে অনেকটা ফরিদপুর জেলা লইয়া এই রাজ্য গঠিত হইয়াছিল) রাজ্যের অধিপতি মুকুন্দরাম রায় মোগলদিগের বিরুদ্ধে প্রায় সমস্ত জীবন যুদ্ধ করিয়াছেন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরাম অতি অল্প সময়ের জন্ত মোগল রাজ-প্রতিনিধি বঙ্গেশ্বর ইসলাম খাঁর সঙ্গে সৌহার্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কুচবিহার অভিযানের সময়ে কিছু সৈন্য দিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন; কিন্তু মূলতঃ ইনি মোগলদের চিরশত্রু ছিলেন। কণকালবাণী সখোর ফলে কতকদিনের জন্ত তিনি পাণ্ডুয়া ও গোহাটীর স্বেদার হইয়া মোগলদের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতি

এই কার্য্য একেবারেই পছন্দ করেন নাই, তাঁহার পুত্র সত্ৰাজিৎকে ঐ স্ববেদারী দিয়া তিনি
 ভূষণার মুকুন্দরাম রায়। স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তনপূর্ব্বক সৈন্য সংগ্রহ ও রাজ্যের আয়তন
 বৃদ্ধি করিয়া মোগলের বিরুদ্ধে পুনরায় বিদ্রোহ করেন। কথিত
 আছে, প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পরও তিনি মোগলদিগের সঙ্গে কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহ
 চালাইয়াছিলেন। তিনি মোগল-সেনাপতি মোরাদের পুত্রগণকে ভূষণায় আমন্ত্রণ করিয়া
 নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন (বেভারিজ—আকবরনামা, ৩য় খণ্ড, ৪৬৯ পৃঃ)। কথিত আছে
 মুকুন্দরাম রায় মোগলরাজপ্রতিনিধি বঙ্গেশ্বর সৈয়দ খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন।
 পুত্র সত্ৰাজিৎও তাঁহার পৈত্রিক বিদ্রোহভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি সময়ে
 সময়ে মুখে বশ্বতা স্বীকার করিলেও মোগলদিগের বিরুদ্ধ-পক্ষের সঙ্গে বড়বস্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।
 কোচদের সঙ্গে যখন মোগলেরা যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, তখন কোচরাজ বলদেবের সঙ্গে
 একটা গুপ্তসন্ধি করিয়া ইনি মোগলদিগের গতিবিধির সমস্ত সংবাদ শত্রুপক্ষকে দিতেছিলেন।
 ব্লকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন, “Satrajit gave Jahangir's governors of Bengal no
 end of trouble and refused to send in the customary *peskash* or do homage
 at the court of Dacca.” (Blockman, p. 332.) সত্ৰাজিৎ জাহাঙ্গীরের বাঙ্গলার
 শাসনকর্তাদের যৎপরোনাস্তি অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি ঢাকায় বঙ্গেশ্বরকে
 প্রচলিত পেশকাশ প্রদান কিংবা বশ্বতা স্বীকার করিতে কখনই স্বীকৃত ছিলেন না। ১৬৩৬
 খৃষ্টাব্দে তিনি বন্দী হইয়া ঢাকায় আনীত হন এবং তথায় তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

বার ভূঞার অল্পতম ভুল্ল্যার লক্ষণমাণিকা অতি প্রবলপরাক্রান্ত ছিলেন, তাঁহার পাণ্ডিত্য
 ও কবিত্ব-শক্তিরও অনেকস্থলে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে তিনি “বিখ্যাত-বিজয়” নামক
 সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র ইহার
 ভুল্ল্যার লক্ষণমাণিকা। সহিত চক্রান্ত করিয়া মাধব পাশাকে হত্যা করেন।

মোগলদিগের বিরুদ্ধে বঙ্গবীরদের জাতক্রোধ ছিল। যে শক্তি দ্বারা বঙ্গস্থলে আনীত
 পশুরা তাহাদের আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারে, বাহাদুরা কসাইয়ের কাছে বিক্রীত গাভী
 বা বুঘ তাহার আসন্ন বিপদ বুঝিয়া ছটফট করে—সেই শক্তি দ্বারা বঙ্গীয় বীরেরা
 বুঝিয়াছিলেন, মোগলদের অধীনত্ব স্বীকার করার অর্থ চিরকালের জন্য দাসত্বের যুগকাষ্ঠে
 নিজেদের আবদ্ধ করা। পাঠানেরা তাহাদের নিকট সামান্য কিছু দক্ষিণা পাইলেই পুরোহিতের
 মত সন্তুষ্টচিত্তে ফিরিয়া যাইতেন এবং শুধু যুদ্ধবিগ্রহকালে তাহাদের সহায়তা চাহিতেন—
 কিন্তু সাম্রাজ্যলোভী বহুকামী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মোগলদের খপ্পরে পা দিলে আর রক্ষা নাই।

বঙ্গদেশ মোগলদের বিরুদ্ধে
 কেন হইল? তোদরমল্লের জরিপে কোথায় কাহার কতটুকু জমি তাহা ধরা পড়িয়া
 গিয়াছিল,—দেশের শাসনকর্তারা মোগলাহুগ্রহে থাইতে পরিত্তে
 পারিতেন বটে, কিন্তু তাহাদের চলাফেরা, কার্য্যকলাপ সমস্তই

মোগল বাদশাহের সুস্পর্শ্যবেক্ষণাধীন হইত। মোগলব্যাঘ্রের নখের দাগ, সাম্রাজ্য-গঠনের
 কঠোর নিয়মাবলী ও তীব্রদৃষ্টি রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে পড়িয়াছিল। দেশের লোকগণ

স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার অবকাশ পাইত না, আকবরের প্রেরণায় তৌদরমল্ল ও মানসিংহ যে ভারতব্যাপী জাল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সে জালে পড়িলে আর উদ্ধারের সম্ভাবনা ছিল না। রাজস্ব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে—লুন্ড মোগলগণ ভারতের সর্বত্র অর্থসংগ্রহ করিয়া তাজমহল, ময়ূর-সিংহাসন, দেওয়ানী, খাস প্রস্তুত করিবেন, রাজপ্রাসাদে নরোজা উৎসব সম্পাদন করিবেন, মোগল অন্তঃপুরের বিলাসিনীদের জন্ত অমূল্য হীরামণিক্যের অলঙ্কার প্রস্তুত করিবেন—এই বিপুল অর্থ সংগৃহীত না লইলে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের রক্ষা নাই; সুতরাং রাজারা শৌর্যবীৰ্য্য হারাইয়া জমিদারে পরিণত হইলেন, সে জমিজমার যতই কেন উন্নতি হউক না, রাজস্ব-সচিবের খরদৃষ্টি এড়াইয়া তাহা আর নিরুদ্বেগে ভোগ করা তাঁহাদের অসাধ্য হইবে। এই অর্থের জন্ত উত্তরকালে “নরককুণ্ডে”র সৃষ্টি হইয়াছিল, ময়মনসিংহের স্কুমার রাজপুত্রদের দেহ বেত্রাবাদে ছিন্নভিন্ন হইয়া রক্তপ্লাবিত হইয়াছিল,—বাহার এই পরিণাম—সেই সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গীর হইয়া ছঃখলাঞ্ছনার চূড়ান্ত ভোগ করিতে হইবে, তাহা সম্ভবতঃ পাঠান-রাজ্যবসানে বঙ্গের রাজগণ আভ্যাসে টের পাইয়া মরিয়া হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। আরম্ভজের হিন্দুদের উপর বাহু অত্যাচার করিয়াছিলেন, কিন্তু আকবর প্রীতি ও সৌহার্দ্যের গিল্টি করিয়া যে স্নদূত লৌহশৃঙ্খল গড়িয়াছিলেন, তাহা বাহারা স্বর্ণশৃঙ্খল কিংবা স্বর্ণহার বলিয়া গলায় পরিয়াছিলেন তাঁহারাই চিরদাসত্ব বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই বারভূঞার পতনের পর বীর বাঙ্গালীজাতির প্রকৃত শৌর্যবীৰ্য্য লুপ্ত হইল। আকবরের পরিকল্পিত সাম্রাজ্যশক্তি-নিষ্পেষণে সেই বিক্রমবাহি একেবারে নির্বাপিত হইল। প্রচণ্ড অগ্নিদাহের পর যেমন মাঝে মাঝে ভয়তূপের মধ্যে ছই একটা ফুলিঙ্গ অলিয়া উঠে, তেমনি হিন্দু ও মুসলমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদের সঙ্গে ছই একটা খণ্ডযুদ্ধের বিবরণ আমরা দেখিতে পাই। হুর্গাচরণ সাত্তাল মহাশয় একটাকিয়ার জমিদারের সঙ্গে অপর কয়েকটি জমিদারের যুদ্ধ-বিগ্রহাদির বর্ণনা অতি কৌতূহলপ্রদ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু এগুলি নির্বাপিততেজ অনলকুণ্ডের ছই একটি ফুলিঙ্গমাত্র। মোগল-রাজপ্রতিনিধি বঙ্গের নবাব যে পক্ষকে আশ্রয় দিয়াছেন, সেই পক্ষের বিজয়লাভে এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় নাই। এই সকল আসন্ন ছঃখ-বিপদ বোধ হয় বারভূঞাগণ আভ্যাসে উপলব্ধি করিয়াছিলেন—এজন্ত তাঁহাদের বংশধরগণকে সেই অজগরতুল্য সাম্রাজ্য-নীতির বদন হইতে রক্ষা করিতে বাইয়া জীবনপণ করিয়াছিলেন। এই ‘ভূঞা রাজাদের’ পর একমাত্র সীতারাম রায় বীরব্রতের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন—কিন্তু তিনি একক কি করিবেন? মোগলের সর্বগ্রাসী বিজয়শক্তির বিরুদ্ধে ভূষণার বীরবরের জীবনপণ-বীরত্ব তুণের মত ভাসিয়া গেল।

ভূঞাদের মনে মোগলবল্যতা যে কিরূপ ছঃসহ ছিল, তাহা ইশা খাঁর বংশধর (সম্ভবতঃ প্রণৌত্র) ফিরোজ খাঁর তরুণ যৌবনের কতকগুলি মনোভাবে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। ইশা খাঁ ছিলেন রাজপুত্র কালিদাসের পুত্র। ক্ষত্রিয় রক্ত তাঁহার ধমনীতে বহিত। তিনি যদিও মানসিংহের সহিত বহু যুদ্ধ করিয়া অবশেষে মোগলদের সঙ্গে সখ্যস্থলে আবদ্ধ হইয়াছিলেন,

তথাপি তাঁহার বংশধরগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত মোগলদের বশত্বা একান্ত ফোড়ের কারণ বলিয়া মনে করিতেন। আমরা 'ফিরোজ খাঁ' শীর্ষক পল্লীগাথায় এই ভাব দেখিতে পাই।

তরুণ ফিরোজ খাঁ জঙ্গলবাড়ীর গদীতে উপবিষ্ট হইয়া একদা তাঁহার স্বন্দ ও সামন্তদিগকে তাঁহার স্ববৃহৎ 'বারহুয়ারী' গৃহে আহ্বান করিলেন। তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি

বিষয়ভাবে বলিলেন, “আমি দিনরাত আমার মহিমান্বিত পূর্ব-পুরুষদের কথা স্মরণ করিয়া থাকি—তাঁহারা তো দিল্লীশ্বরের সঙ্গে

যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমার পূর্বপুরুষ এই দেওয়ানবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি ইশা খাঁ এত বড় পরাক্রান্ত ছিলেন যে, স্বয়ং দিল্লীশ্বর তাঁহাকে ভয় করিতেন। আমি তাঁহারই বংশধর একথা একমুহূর্তও ভুলিতে পারিতেছি না। আপনারা এখন আমার সঙ্কল্পের কথা শুনুন—ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়া এই জঙ্গলবাড়ীতে পাঠাইয়াছেন। আমি এই প্রদেশের মালিক। আমি বৎসর বৎসর আমার সমস্ত রাজ্যের আয়ের অর্দ্ধাংশ দিল্লীতে পাঠাইয়া এই অপমানসূচক দেওয়ানগিরি আর রাখিতে চাই না। এখন আমি কি ঠিক করিয়াছি, শুনুন—আমি দিল্লীতে রাজস্ব দেওয়া এখন হইতে বন্ধ করিয়া দিব। আমি দিল্লীর দরবারে আর হাজিরা দিতে পারিব না। সম্রাটের সৈন্য আমায় যাহা ইচ্ছা করুক। আমার যদি মৃত্যু হয়—ঈশ্বর যদি তাহাই বিধান করেন, তবে সেই মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই। ইহাই আমার স্থির সঙ্কল্প, আমি মৃত্যুকে আমার গৃহদ্বারে ডাকিয়া আনিতেছি।”

যখন ফিরোজ খাঁ এই কথাগুলি শেষ করিয়াছেন সেই মুহূর্তে অস্তঃপুর হইতে এক দাসী আসিয়া জানাইল যে তাঁহাকে রাজমাতা আহ্বান করিয়াছেন। ফিরোজ খাঁ সেদিনের জন্ত দরবার শেষ করিয়া অস্তঃপুরে মাতার সঙ্গে দেখা করিতে চলিয়া গেলেন।

“অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অবিলম্বে তিনি তাঁহার মাতার সহিত দেখা করিলেন। দাসীরা তাঁহাকে সুশ্লিষ্ট সরবৎ আনিয়া দিল। তিনি তাহা পান করিয়া তৃপ্ত হইয়া কৌচের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় উপবেশন করিলেন। বেগম তাঁহার উদীয়মান চন্দ্রিকার ছায়া তরুণ কাস্তি মুগ্ধনেত্রে দেখিয়া গৌরব অহুভব করিলেন। দেওয়ান মাতাকে অভিবাदन করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তাঁহাকে কেন ডাকিয়াছেন। বেগম গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—“বৎস, আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইও না। তোমার মুখখানি আমি যতবার দেখি ততবার আমি মনে করি, তোমার বিবাহ না হইলে আমি কিছুতেই সোয়াস্তি পাইব না। বিবাহ করিতে সম্মতি দাও; তোমার তরুণ যৌবন, কেন বল যে ‘বিবাহ করিব না?’ আমার বারংবারের অমুরোধ কি তুমি এইভাবে অগ্রাহ্য করিবে? আমার বয়স হইয়াছে, আমার বড় ইচ্ছা যে কবরে যাওয়ার পূর্বেই আমি একটা স্ত্রীর বউ দেখিয়া মরি।”

“দেওয়ান তাঁহার মাতার কথা শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সহিত শুনিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন—“আমার মনের কষ্ট যা তুমি বুঝিতে পারিবে না, আমার পূর্বপুরুষ ইশা খাঁকে দিল্লীশ্বর স্বয়ং ভয় করিতেন; তাঁহার শৌর্য, বীৰ্য ও পরাক্রমের পরিচয় পাইয়া তিনি যাচিয়া

তাহার সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। দিল্লীখবের অতি প্রসিদ্ধ সামন্তগণও তাহাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। আমাদের এই মহাবংশে আরও অনেক বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখন আমার সঙ্গর শুধুন—আমি অবিবাহিত জীবন যাপন করিব। আমার রাজ্যের চিন্তা দিনরাত আমার সকল চিন্তার উপরে। আমি দিল্লীতে কিছুতেই রাজস্ব পাঠাইব না। আমি আর সম্রাটের দরবারে পাগড়ী পরিয়া হাজিরা দিতে বাইব না।”

মাতা এই কথা শুনিয়া প্রমাদ গণিয়া পুত্রকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন। (পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ।) পূর্ববঙ্গের পয়ারের ভাষা কঠিন বলিয়া আমরা গল্পানুবাদ করিয়া দিলাম। অনুবাদটি প্রায় আক্ষরিক হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ফিরোজসম্বন্ধে আরও ছই একটি কথা বলিব। কেলা তাজপুরের দেওয়ান ওমর খাঁর কন্যা সখিনার সহিত ফিরোজ খাঁর প্রেম হয়। ফিরোজ খাঁ তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করিয়া পাঠান,—ওমর খাঁ, জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানেরা হিন্দুবংশসম্বৃত, এই আপত্তি করিয়া প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করেন এবং ফিরোজ খাঁর বংশের নানাক্রম নিন্দা করেন। জোশের বশীভূত হইয়া ফিরোজ খাঁ কেলা তাজপুর আক্রমণপূর্বক রাজধানী ধ্বংস করিয়া সখিনাকে লইয়া আসেন। সখিনা বেচ্ছায় তাহার অনুগামিনী হন;—বিবাহ হইয়া যায়। ওমর খাঁ দিল্লীখবের নিকট উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত ঘটনা নিবেদনপূর্বক সহায়তা যাজ্ঞা করেন। ওমর খাঁ ইহাও বলেন যে ফিরোজ বিদ্রোহী, সে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। দিল্লীর এক সুবৃহৎ মোগলবাহিনী লইয়া আসিয়া ওমর ফিরোজ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কেলা তাজপুরের সুবৃহৎ ময়দানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের সমস্ত বার্তা বধাসময়ে জঙ্গলবাড়ীতে পৌছে। তখন সখিনা স্বামীর বিজয়সংবাদ শুনিতে উন্মুখী হইয়া ছিলেন। এমন সময়ে দাসী দরিয়া হুঃসংবাদ-জ্ঞাপনার্থ তাহার নিকট উপস্থিত হন। তাহাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া সখিনা স্বয়ং বলিলেন, “গত পরন্তু আমার স্বামী যুদ্ধে গিয়াছেন, তিনি অবশ্য আজ অপরাহ্নে বিজয়ী হইয়া ফিরিবেন। দরিয়া, বাগানের বড় বড় গোলাপ সংগ্রহ করিয়া রাখ, আমার বিজয়ী স্বামীকে আমি ফুলের মালা দিয়া সংবর্দ্ধনা করিব। যুদ্ধরাস্ত হইয়া স্বামী ফিরিবেন, দরিয়া, তুমি স্বর্ণ ভূঙ্গারে সুবাসিত সুগন্ধ জল ভরিয়া রাখ, তিনি আসিয়া ‘অজু’ করিবেন। যুদ্ধশ্রম অপনোদনের জন্ত সেবার দরকার হইবে, আভের পাখা কাছে রাখ। আমরা তাহাকে ব্যঞ্জন করিব।

“সুগন্ধি তৈল এবং গোলাপ জলের বোতলগুলি সাজাইয়া রাখ, সোনার পানের বাটা ভর্তি করিয়া পান রাখ, পাঁচ পীরের দরবার পবিত্র মাটি আনিয়া রাখ; দরিয়া, তিনি আসিয়া সেই মাটি বে মাথায় ছোঁরাইবেন। পীরদের পদ্বীরা আমার আশীর্বাদ পাঠাইয়াছেন, দরিয়া, তাহার জয়সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।” এই কথা বলিতে বলিতে আনন্দে তাহার ছই রক্তিম গুণ্ড উজ্জল হইল। তিনি ধামিয়া আবার বলিলেন—“দরিয়া, একি! আজ তোমার মুখের হাসি কোথায় গেল? তোমার মুখ রান দেখাইতেছে কেন? কিন্তু জানিও আমার স্বামী আজ নিশ্চয়ই বিজয়ী হইয়া ফিরিবেন, তখন তুমি নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবে।”

দরিয়া আর ধৈর্যধারণ করিতে পারিল না, সে কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল, “আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে, রাজকুমারি, শোণিতাক্ত পতাকাসহ দেওয়ানের ঘোড়া ফিরিয়া আসিয়াছে, আপনার পালকে শব্দার দিন ফুরাইয়াছে,—এখন ধরাশয্যা গ্রহণ করিতে হইবে, এখন হইতে বিধবার মলিন সাজ গ্রহণ করিতে হইবে, হাত হইতে কঙ্কণ ও চুড়ী খুলিয়া ফেলুন—হীরার হার আর কণ্ঠে শোভা পায় না; এখন মুখের হাসি ফুরাইবে, রাজকুমারি। আপনার যৌবনের আশা এখন প্রাতে ফোটাফুল যেমন সন্ধ্যায় ঝরিয়া পড়ে, তেমনই অল্প সময়ের মধ্যে ফুরাইল। সংবাদ আসিয়াছে, তরুণ দেওয়ান এখন কেলা তেজপুরের দুর্গে বন্দী।”

কণকাল সখিনার মুখে বৈশাখী মেঘের সমস্ত আঁধার কেহ ঢালিয়া দিল। তখন রাজমাতা ফিরোজা বিবি এবং অন্তঃপুরের নারীগণ ক্রন্দনশব্দে জঙ্গলবাড়ীর রাজপ্রাসাদ মুখরিত করিতেছিলেন। কিন্তু সখিনা কাঁদিলেন না, তিনি দরিয়াকে বলিলেন, “বোজ্জার সাজ লইয়া আইস। তাঁহার একটা ঘোড়া আমাকে দাও, আমি পুরুষবেশ ধরিয়া যুদ্ধে যাইব। আমার সৈন্তদলকে বলিও আমি দেওয়ান সাহেবের সম্পর্কে ভ্রাতা।”

এই তরুণ বীরবেশধারী নেতার পশ্চাৎ জঙ্গলবাড়ীর অবশিষ্ট সৈন্ত চলিল। দেওয়ানের প্রিয় ঘোড়া ‘হুলালে’র পিঠে চড়িয়া সখিনা সৈন্তসহ দ্রুতগতিতে চলিলেন, এক দিনের পথ আধ ঘণ্টায় গেলেন, কারণ তিনি সমস্ত মনের আগ্রহ সহ সৈন্ত পরিচালনা করিয়াছিলেন। কেলা তেজপুরের মাঠে মোগল সৈন্তের সঙ্গে তিন দিন ব্যাপী তাঁহার যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই তিন দিন তিনি লৌহবর্ষ পরিধান করিয়া অক্লান্ত, অমাত, দিন রাত “হুলালে”র পিঠে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। “পিতাই আমার শত্রু” ইহা বলিয়া তিনি তৃতীয় দিবসে কেলা তেজপুরের রাজপ্রাসাদে আগুন জ্বালাইয়া দিলেন। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা শব্দে পুড়িয়া যাইতে লাগিল। সেই অমোঘ বীরত্বের নিকট তৃতীয় দিবস অপরাহ্নে মোগল সৈন্ত পরাজিত হইল। তখনও তিনি অদম্য উৎসাহে ঘোড়ার পিঠ হইতে সৈন্তদিককে উৎসাহ দিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। আমি এই স্থানে পুনরায় মূলের গজামুবাদ দিতেছি—

“সেই মুহূর্ত্তে তেজপুরের দুর্গ হইতে একটি সৈন্ত উপস্থিত হইল। সে তরুণ বীরবেশী সখিনাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, “আপনি মহাবীর হানিক হইতেও বড় বোজ্জা। আমি জঙ্গলবাড়ীর সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। মোগলেরা জঙ্গলবাড়ীর প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এই দুর্ভাগ্য রাজধানীর পক্ষে আপনি কে যুদ্ধ করিতেছেন, তাহা আমরা জানি না। ফিরোজ খাঁ এই চিঠি দিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি মোগলদের সঙ্গে যে সন্ধি করিয়াছেন, তাহা এই দলিলে আছে। তিনি আমাকে জানাইতে বলিয়াছেন—তিনি সখিনাকে তালুক দিয়াছেন—তাঁহারই অস্ত্র সোনার জঙ্গলবাড়ী আজ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। সন্ধি আরও আরও যে প্রস্তাব আছে, তাহাতেও তিনি এই সপ্তাহেই সম্মত হইবেন। সুতরাং যুদ্ধ শেষ হইয়াছে।” এই বলিয়া সে ফিরোজ সাহাব স্বাক্ষর-যুক্ত তালুকনামা সখিনার হাতে দিল।

এক মুহূর্ত সখিনা সেই দলিলটির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। তারপর সর্পদষ্ট মানুষ যেরূপ চলিয়া পড়ে, তেমনই ভাবে ঘোড়ার শিঠ হইতে চলিয়া পড়িলেন। তাঁহার মাথার সোণার মুকুট ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া “হুলাল” ঘোড়াটা অশ্রুপাত করিতে লাগিল। চারিদিক্ হইতে সৈন্তেরা আর্তনাদ করিয়া কাদিয়া উঠিল। একমুহূর্ত পূর্বে যিনি সর্পে ঘোড়ার পৃষ্ঠে বসিয়া ছিলেন, এখন তিনি ভুলুঙিতা। জঙ্গলবাড়ীর সহর আজ প্রকৃতই তিমিরচ্ছন্ন হইল। তাঁহার সুদীর্ঘ কুন্তলরাজি এলাইয়া পড়িল। তাঁহার দেহ হইতে পুরুষের ছয়াবশ খসিয়া পড়িল। তাজপুর কেল্লায় এই সংবাদ তড়িৎবেগে রাষ্ট্র হইল; সেনাপতি ও সৈন্তেরা রাজ্যীকে চিনিতে পারিল। ওমর খাঁ ফিরোজ খাঁকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া দেখাইলেন—পূর্ণচন্দ্র মাটিতে পড়িয়া মান হইয়া গিয়াছে।

তারপর ওমর খাঁ ও ফিরোজ খাঁর অহুতাপ ও ২২ জন লোকের দ্বারা খাত সমাধিতে শবের শেষকার্য্য-সম্পাদনের বিবরণী আছে।

যে রমণী স্বামীর ভালবাসার জন্ত মোগলের শত শত গুলি সহ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সাফাং শক্তিরূপিনী মহিলা একটা সাংঘাতিক গুলি সহ করিতে পারেন নাই,—তাহা অবিশ্বাসী নির্দয় স্বামীর স্বাক্ষরিত তালুকনামা। আজও কেল্লা তাজপুরের মাঠ পড়িয়া আছে, সেখানে সাধুর মাথার সিন্দূরের স্তায় উজ্জল—সখিনার স্মৃতি হয়ত এখন সেই দেশের আকাশে বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে। এই কাহিনীর ভিত্তি যে ইতিহাসমূলক তাহা বিশ্বাস করায় বাধা নাই।

সব দিক্ দিয়া দেখিলে এই সকল পল্লীগানের কথা কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাহা অবশ্য বলা যায় না। তবে বহু বাঙ্গালী নারী যে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার নিদর্শন আছে। “চৌধুরীর লড়াই” নামক পল্লীগীতির ভিত্তি ঐতিহাসিক, তাহাতে কয়েকটি মুসলমান রমণীর অসাধারণ বর্ণপাণ্ডিত্যের কথা বর্ণিত আছে। “মাণিকতারা” নামক গীতিকায়ও সেইরূপ বীরত্বের দৃষ্টান্ত আছে। পাঠান-রাজত্বকালে যে দ্বীপুত্রব সকলেরই দেহে বল এবং হৃদয়ে সাহস ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—সেই সাহস ও বল লুপ্ত করিবার জন্ত ব্যাপকভাবে মোগলশক্তি বস্তার মত আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার পূর্ক আভাস হৃদয়ঙ্গম করিয়া মোগলশক্তির বিরুদ্ধে দেশের লোকেরা দাঁড়াইয়াছিল। মোগল রাজনৈতিকগণ ক্রমাগত ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া প্রতিপক্ষদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া শেষে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। ‘ভূঞা রাজারা’ যদি একত্র হইতে পারিতেন, তবে মানসিংহ কিংবা ইসলাম খাঁ এদেশে কিছুই করিতে পারিতেন না। যে একটি জিনিষের অভাবে তাঁহাদের শৌর্য্যবীৰ্য্য বিফল হইয়া গেল, তাহা—ঐক্য।

মোগলেরা এদেশে আসিয়া যে শুধু পাঠান ও ভূঞা রাজগণের প্রতিপক্ষতা নিবারণ করিয়াছিলেন তাহা নহে। প্রথমতঃ বঙ্গেশ্বর মজঃফর খাঁ পাঠান ওমরাদের জমিদারী কাড়িয়া লইয়া তাহা মোগলদিগকে প্রদান করিলেন। পাঠানেরা তো অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহী হইলই, পরন্তু মোগল ওমরাগণও প্রীত হইলেন না, কারণ তাঁহারা যে জায়গীর পাইলেন, তাহা

নির্দিষ্টবাদে ভোগ করিবার সুবিধা পাইলেন না। যোগলসম্রাট কর্তা করিয়াও কাহাকেও কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দেন নাই। বড় বড় রাজা হইতে ছোট ছোট ভূস্বামী পর্যন্ত সকলের টাকি তিনি এমন ভাবে বাধিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যে সকলেই এক মহাশক্তির অধীন এবং তাঁহাদের কর্তৃত্ব যে নামমাত্র, তাহা সর্বক্ষণ তাঁহারা বুঝিতেন। জায়গীরদারগণ রাজকীয় সৈন্তরক্ষার জন্ত যে রাজস্বের দরকার তদতিরিক্ত সকল টাকাই বঙ্গেশ্বরের মারফৎ দিল্লীতে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। শুধু ইহাই চূড়ান্ত নহে—পাছে কেহ দীর্ঘকাল জায়গীর ভোগ করিয়া কোন প্রদেশে পরাক্রান্ত হইয়া উঠে, সেই আশঙ্কায় যোগলদরবারে কোন জায়গীরদার বেশী দিন তাঁহার সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিতেন না। প্রায়ই জায়গীরগুলি হস্তান্তরিত হইত। এই সকল কারণে যোগল ওমরাগণও পাঠানদের জায়গীর পাইয়া সুখী হইতে পারেন নাই। শাসনকর্তার উপর এ সকল বিষয়ে কড়া হুকুম ছিল ("He was ordered frequently to change the Jaigirs to prevent the troops establishing themselves in any one place."—Stewart). যোগল আমীরেরাও এই সকল কারণে একত্র হইয়া আকবরের বিদ্রোহী হইলেন। এই বিদ্রোহী যোগলদের নেতা ছিলেন—খলৌ খাঁ (জলেশ্বরবাসী) এবং বাবা খাঁ (ঘোড়াঘাটের শাসনকর্তা), ইহারা শীঘ্রই গোড় দখল করিয়া লইলেন। আকবর এই সংবাদ পাইয়া বঙ্গেশ্বর মজঃফর খাঁকে যোগল আমীরদের সঙ্গে রক্ত বাবহারের দরুন কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করিতে আদেশ করেন। আমীরেরা ঐ আদেশের কথা শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, আগে রাজস্ব বিভাগের কর্তা ফিজবী খাঁ ও সেই বিভাগের প্রধান কন্সচারী পুত্রনাস আসিয়া তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ ভাল করিয়া জানিয়া যাউন, তৎপরে মিটমাট হইবে। তদনুসারে উক্ত দুই প্রধান রাজকর্মচারী তাঁহাদের শিবিরে আগমন করিলেন। আমীরেরা তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া কারাগারে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদের আপ্পকী ও দাবী আরও বাড়িয়া যায়। অবশেষে বিদ্রোহীরা রাজধানী ত্যাগ করিয়া অবরোধ করিয়া মজঃফর খাঁকে হত্যা করিয়া আপনাদিগকে বঙ্গদেশের মালিক বলিয়া ঘোষণা করেন।

বিদ্রোহীদের দলে ৩০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্ত ছিল এবং বঙ্গেশ্বর মজঃফর খাঁর হত্যার পর এই দল ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। আকবর দেখিলেন—এত রক্তক্ষয়, এত কুচ্ছুরাধন এবং চেষ্টার পর বঙ্গদেশের অধিকার—তাঁহারই স্বশ্রেণীর লোক—তাঁহারই পূর্বতন ওমরাহগণ তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতেছে।

এই সময়ে আকবর রাজা তোদরমল্লকে বঙ্গের মসনদে স্থাপিত করিয়া যোগল-বিদ্রোহ-দমনের ভার তাঁহার উপর স্তম্ভ করেন; আকবর তাঁহাকে ৫,০০,০০০ টাকা ডাকঘোগে প্রেরণ করেন। এই টাকার অধিকাংশই উৎকোচাদি দিয়া প্রতিপক্ষকে বশীভূত করার জন্ত। তিনি ভাগলপুরে আসিয়া বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হন। কয়েক মাস যাবৎ উভয় পক্ষ পরস্পরের সন্নিহিত হইয়া খণ্ড যুদ্ধ-বিগ্রহ করিলেও কোন বড় সংগ্রামে লিপ্ত হয় নাই। ইহার মধ্যে রাজা তোদরমল্ল হিন্দু জমিদারদিগকে নানাপ্রকার প্রলোভন এবং

কখনও কখনও উৎকোচে বশীভূত করিয়া এতটা হস্তগত করেন যে, বিদ্রোহীরা রসদ-সংগ্রহে অসমর্থ হইলেন। চুক্তিজনিত নানারূপ বিপদে শত্রুশিবির বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এই সময়ে ককেশিলানদের নেতা বাবা খাঁর মৃত্যু হয়, বিদ্রোহীদের অগ্রতম মানুষ কাবুলী বিহারের দিকে অগ্রসর হন। আকবর লোক বশীভূত করিবার নানা উপায় জানিতেন। যে সকল ওমরা এককালে তাঁহার সভায় অবমানিত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছিলেন, এই বিপৎকালে তিনি তাঁহাদের কার্যদক্ষতা ও নানাগুণ স্বরণ করিয়া স্বয়ং বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া তাঁহাদিগকে বড় বড় কার্যে নিযুক্ত করিলেন। এইভাবে আজিম খাঁ ও সেরিফ খাঁকে তিনি বশীভূত করিয়া সেনাপতিরূপে নিয়োগ করেন। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে আজিম খাঁ মৃত্যুকে বঙ্গেশ্বররূপে নিযুক্ত হইয়া উৎকোচের বলে ককেশিলানদিগের নূতন নেতা জরবদিকে বশীভূত করেন, এবং অপরাপর বিদ্রোহীদের মধ্যে গৃহবিবাদের সৃষ্টি করেন। এইভাবে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের শেষ না হইতে হইতেই বঙ্গেশ্বর তাণ্ডা রাজধানী পুনরায় দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা ঘোড়াঘাটে অবস্থিত হইয়া যশোর অঞ্চলে উৎপাত করিতেছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করেন। তাঁহারা জঙ্গলে লুকাইয়া ছিলেন—কিন্তু যুবরাজ জগৎসিংহ তাহাদিগকে সেখানেও নিকৃতি দেন নাই। তিনি তাঁহাদের বড় বড় গোলাসকল দখল করিয়া লইলেন এবং তাঁহাদের অবশিষ্ট ৫৪ টি হস্তী অধিকার করিয়া দরবারে প্রেরণ করিলেন। মোগলদের প্রবল বিদ্রোহ এইভাবে নির্মূল হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পৰ্তুগীজ দস্যু, কুচবিহার-যুদ্ধ প্রভৃতি

উৎকোচ দেওয়া, বৈবাহিক আত্মীয়তা স্থাপন করা, শত্রুশিবিরে ভেদ সৃষ্টি করা, মিষ্ট ও শিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ করা ইত্যাদি নানা বিজ্ঞা আকবরের করায়ত্ত ছিল। যেখানে এইসকল বিজ্ঞা কার্যকরী হয় নাই, সেখানে হুজুং সিংহের মত তিনি শত্রুকে আক্রমণ করিতেন। যে কোন প্রকারে সাম্রাজ্য বৃদ্ধি ও শত্রুশিবিরে হেঁট করিয়া সকল মাধার উপর স্বীয় মাধার প্রতিষ্ঠা করা—এই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। বিশাল সাম্রাজ্যের আয় দিয়া তাঁহার ডাঙার পূর্ণ করা, ক্ষমতাশালী কাহাকেও একদণ্ড দ্বিরধাকিতে না দেওয়া—পাছে তিনি বড় হইয়া সেখানে প্রভাব বিস্তার করিয়া বিদ্রোহী হন, শাসনকর্তাদিগকে ঘন ঘন একস্থান হইতে অপরস্থানে নিয়োগ, বড় ছোট

সকলের ভাণ্ডারের দিকে খরদৃষ্টি এবং চিরস্থায়ী ভাবে সেই ভাণ্ডার হইতে শ্রেষ্ঠাংশগ্রহণ— এই ছিল তাঁহার রাজনীতি। কিন্তু নিতান্ত বাধ্য না হইলে কোন দেশ লুণ্ঠন করা, কিংবা বলপূর্ব্বক কাহারও সম্পত্তি গ্রাস করা—এসকল তিনি করেন নাই। পাঠানেরা যে ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতেন—লুণ্ঠনাদি ছিল তাঁহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক রাজকাৰ্য্যের অন্তর্গত,—এসকল বিগর্হিত কাজ তিনি করেন নাই। তিনি লুণ্ঠন করিতেন না, শোষণ করিতেন। নিতান্ত অব্যর্থ না হইলে তিনি কাহারও নিকট পরাক্রম দেখাইতেন না। কিন্তু প্রীতির বন্ধনে বাঁধিয়া তিনি কোন সুদূর পত্রপুষ্পাচ্ছাদিত লতার ছায় এই প্রবল ভারত-বিটপীকে আসমুদ্রহিমাচল জড়াইয়া ধরিয়া নির্বীৰ্য্য ও অন্তঃসারশূন্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সাম্রাজ্যনীতির ফলে সমস্ত জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়—লোকে খাইয়া পরিয়া সুখে থাকিয়াও জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এই বিরাট রাজধানীমুখী অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে যোগলদের সৃষ্ট রাজধানী ইন্ডের অমরাবতী কিংবা বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ-তুলা হইয়াছিল, কিন্তু যোগল-শাসনের সময়ে বৃন্দাবনের কয়েকটা মন্দির ব্যতীত সমস্ত দেশে হিন্দুদের বিশেষ কোন কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সম্রাটের মহাশক্তির আওতায় হিন্দুস্থানের জাতীয় শক্তির অপচয় ছাড়া শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে নাই। বিদেশীর অধিকারে বঙ্গদেশের বাহা কিছু পৌরব—তাহা পাঠান আমলের। পাঠানগণ বিদেশী কারিগর আমদানী করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না—তাঁহাদের বাহা কিছু শিল্প—তাহা খাস বাঙ্গালী শিল্পী ও স্থপতিদের কাৰ্য্যের নিদর্শন। আকবর এই সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা হিন্দুদের সহযোগে করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাদ দিয়া যুদ্ধজয় হইতে পারিত, কিন্তু এরূপ বিশাল সাম্রাজ্য কেহ স্থাপন করিতে পারিতেন না। তিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ করেন নাই। হিন্দুদের প্রতি তাঁহার অহুগ্রাগ শুধু মুখের অহুগ্রাগ ছিল না—উহা আন্তরিক ও যথার্থ ছিল। রাজা বীরবল একজন সামান্ত ভাট কবি ছিলেন, তাঁহাকে আকবর রাজপদে উন্নীত করিয়া অস্ত্ররঙ্গ বন্ধ করিয়াছিলেন। বীরবলের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তিনি তিন দিন কাহারও সহিত কথা কহেন নাই—এবং মানসিংহের ভগিনীকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়া রাজাকে সাম্রাজ্যের প্রধান কাণ্ডারী স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মানসিংহ ৭,০০০ সৈন্তের মনসবদার হইয়াছিলেন, কোন মুসলমান আমীরও এত বড় পদ পান নাই। তিনি হিন্দুদের ধর্ম্মের অহুগ্রাগী হইয়া ‘এলাহীধর্ম্ম’ নামক এক নব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কাথত আছে তিনি তিলক পরিতেন এবং অনেক সময়ে আশ্বিন ভক্ষণ করিতেন না। তিনি ব্রাহ্মণদ্বারা হাতে রাখি বাঁধিতেন এবং তাঁহার রাজপুত্র জীদিগের মনস্তত্ত্বের জ্ঞান ‘হোম’ করিতেন।* তিনি খৃষ্টান

* "Akbar marked his forehead like a Hindu and wore jewelled strings tied to his wrist by Brahmins. He forbade slaughter of cows and the eating of their flesh. From early youth in conjunction with his Rajput wives he burnt hom and prostrated himself before the sun."

—Nizamuddin Tabakati Akbari.

পাদ্রীদের মনেও বিশ্বাস জন্মাইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহাদের ধর্মের অমুরাগী। এই সকল বিবিধগুণসম্বন্ধে তিনি হিন্দুধর্মের জাতীয় উন্নতির প্রধান অস্ত্ররায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি নিজের মাথা আকাশে ঠেকাইয়া অস্ত্র সকলের মাথা হেঁট করাইয়াছিলেন—রাজ্যবিস্তারের চেষ্টায় তিনি ক্ষুদ্র বিদ্রোহীকেও তুচ্ছ করেন নাই। রাজকীয় সমস্ত সৈন্য লইয়া তিনি তৃণ-দূর্ষাকেও নিষ্পেষিত করিয়াছেন। অধিকণার দ্বারা অতি ক্ষুদ্র বিদ্রোহকেও তিনি যারায়ক মনে করিতেন, তাঁহার প্রভাবে দেশের সমস্ত জ্যোতির্ষ্যর শক্তি সূর্যের প্রভাবে নক্ষত্রের দ্বারা হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছিল। আকবরের সময় হইতে হিন্দুধর্মের প্রকৃত দাসত্ব আরম্ভ হয়। এই দাসত্বের বেড়ী হাতে লইয়া মানসিংহ ও তৌদরমল্ল দেশে দেশে ঘুরিয়াছিলেন। বাঙ্গলার প্রতাপ ঘুণাভরে সেই বেড়ী ফিরাইয়া দিয়া দূতকে বলিয়াছিলেন, “বেড়ী দিও আপনার মনিবের পায়।” প্রতাপ শুধু বশোরের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন—ইহা সঙ্গ্রহ করেন নাই,—দিল্লী পর্যন্ত অভিযান করিয়া রাজধানী বিধ্বস্ত করিবেন—ইহা জানাইয়া বলিয়াছেন (তরবারিখানি রাখিয়া) “যমুনার জলে ধোব এই তরবারি।” যে অনৈক্যের বীজ বাঙ্গলার জাতীয় চরিত্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল—সেই বীজ সম্রাটের কূট-নীতিতে অঙ্কুরিত হইয়া প্রতাপাদিত্য ও কেমদার রায়ের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল। হিন্দু রাজাদের কেহ ছিলেন আকবর ও অশোক।

এই ব্যাঘ্রবিক্রম সম্রাটের নথ, কেহ ছিলেন দস্ত। সাম্রাজ্যনীতির শ্রীবৃদ্ধির উপলক্ষ হইয়াছিলেন ইহারা,—কিন্তু ইহার উদ্ভাবনী শক্তি সমস্তই আকবরের। অশোকের সার্বভৌমত্ব বাহ্যদৃষ্টিতে আকবরেরই মত, কিন্তু হইটী সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। মোগল-রাজার অহুশাসনে স্পষ্ট করিয়া লিখিত ছিল—“আমার পুত্র ও পৌত্রগণ যেন দেশ-বিজয় বাঞ্ছনীয় মনে না করেন, তাঁহারা যেন ধর্ম-বিজয়কেই বর্থাৎ বিজয় মনে করেন।”

আমরা দেখাইয়াছি, আকবর কিরূপে পাঠানশক্তি নিমূল করিয়া স্বয়ং মোগল ওমরাদের প্রবল বিদ্রোহ দলন করিয়া—ভূঞারাজগণের দুর্দমনীয় শক্তি নিরস্ত করিয়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় মোগল-আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই কার্যে তিনি ভেদনীতি ও উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করার কৌশল যথেষ্ট প্রয়োগ করিয়াছেন। যেখানে দরকার হইয়াছে, সেখানে যুদ্ধাদি-ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছেন, অগ্নির শেষ ও শত্রুর শেষ রাখিতে তিনি দেন নাই। জাহাঙ্গীর তাঁহার পিতার পথেই চলিয়াছিলেন, তবে আকবর তাঁহার সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য নিষ্ঠুরতা পরিহার করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীরের রাজত্বে সে দয়াটুকু ছিল না। পরাজিত শত্রুকে তিনি ক্ষমা করেন নাই। আকবর ইশা খাঁর সহিত সখ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু জাহাঙ্গীর প্রতাপাদিত্য, মুকুন্দ রায়, তৎপুত্র সম্রাজিৎ এবং কেমদার রায়কে অব্যাহতি দেন নাই। এই সার্বভৌমত্বের চেষ্টা সাম্রাজ্যতান পর্যন্ত চলিয়াছিল; আকবরের পর হইতে এই সাম্রাজ্যনীতির রথ অতি দুর্দর্ঘভাবে চলিয়াছিল, আগ্রার দেওয়ানি-খাসের দ্বারের উপরিভাগে লেখা আছে “স্বর্গ যদি থাকে, তাহা এইখানে—এইখানে।” দিল্লীখর লোকমতে জগদীশ্বরের স্থান লইয়াছিলেন—“দিল্লীখরো বা জগদীশ্বরো বা”—এই মোগল বাদসাহত্বের হিন্দু-মুসলমানে প্রভেদ জানিতেন না। শেষোক্ত দুই জনের ধর্মনীতি হিন্দুত্ব প্রবাহিত ছিল। কিন্তু আকবর

অথবা নিশ্চয়তা করিতেন না—বস্ত্রতা বীকার করিয়া রাজপুত্রের শ্রেষ্ঠভাগ যোগল দরবারে পাঠাইলে তিনি কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতেন না, শত্রুপক্ষকে বশীভূত করিবার জন্য ডাকযোগে অর্থ পাঠাইতেন। আমরা দেখিয়াছি রাজা তৌদরমল্লকে তিনি পাঁচলক্ষ টাকা এই জন্য পাঠাইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের জায়-অজায়বোধ অনেক সময়ে লুপ্ত হইত। নৌরজা উৎসবে আকবর মাতাল হইয়া নানারূপ দুষ্কার্য করিতেন, কিন্তু জাহাঙ্গীর যে ভাবে সের আফগানকে হত্যা করিয়াছিলেন এমন অজায় আকবর স্বপ্নেও প্রশংসা দিতে পারিতেন না।

পাঠান-শত্রু-দলন, ভূঞা রাজগণের শক্তিস্বংস এবং যোগল শিবিরের পরাজয় ও মরাদের বিদ্রোহদমনের কথা আমরা লিখিয়াছি; কিন্তু ইহা ছাড়া এক প্রবল শত্রু বঙ্গের পূর্বদক্ষিণ সীমান্তে যোগল সম্রাটের শত্রু হইয়া অত্যাচার করিয়া দেশ ছাড়িবার করিতেছিল। ইহারা পৰ্তুগীজ দস্যু, লৌকিক ভাবায় হার্মাদ (‘আরমাদা’ হইতে উদ্ভূত)। মগেরা শেষ সময়ে এই জল-দস্যুদের সঙ্গে যোগ দিয়া পূর্ববঙ্গে লুণ্ঠন, অপহরণ, দ্রীলোকের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি অবাধে চালাইতেছিল—এই জন্য হার্মাদ শব্দ প্রথমতঃ পৰ্তুগীজ দস্যুদিগকে বুঝাইলেও শেষে মগদিগের প্রতিও প্রযুক্ত হইত। পল্লীগীতিকাসমূহে এই পৰ্তুগীজ জলদস্যু ‘হার্মাদ’।

হার্মাদদিগের সম্বন্ধে বহু স্থানে উল্লেখ আছে (চতুর্থ খণ্ড, ‘নসির মালুম’ দ্রষ্টব্য)। ইহাদের গায়ে লাল কুণ্ডা এবং মাথায় নানা বর্ণের পাগড়ী থাকিত (এই পাগড়ী সম্ভবতঃ মগদস্যুরা ব্যবহার করিত)। ইহাদের হাতে দূরবীণ থাকিত। শ্রেনপক্ষীর জায় ইহারা সেই দূরবীণযোগে বহুদূর হইতে সমুদ্রগামী জাহাজ লক্ষ্য করিত, এবং অকস্মাৎ অতর্কিতভাবে বাণিজ্যজাহাজ-বোম্বাই জাহাজগুলি আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিত। কবিকঙ্কণ ষোড়শ শতাব্দীতে ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমন্ত সঙ্গারের নাবিকেরা “রাজিদিন বাহি বায় হার্মাদের ডরে।” ইহারা সময়ে সময়ে সমুদ্রতীরবর্তী স্থান-সমূহে অবতরণ করিয়া অকথ্য অত্যাচার করিত। চট্টগ্রামের উপকূলের বাণিজ্য-তরীগুলি ইহাদের উৎপাতে সমুদ্রে একা যাইতে সাহস করিত না। উক্তরূপ বহুসংখ্যক জাহাজ একত্র হইয়া মিছিল বাধিয়া যাইত। এই তরণীর মিছিলকে “বহর” বলিত, ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধের নানা বিদ্যাক্ত অস্ত্রশস্ত্র থাকিত, এবং বহরের মধ্যে যিনি রণপণ্ডিত থাকিতেন তাঁহারই নির্দেশে জাহাজের গতি-বিধি এবং নদর প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হইত। এই প্রধান ব্যক্তির উপাধি ছিল “বহরদার”। তৎকালে সমুদ্রতীরবর্তী লোকদের সাহস ও বীর্যবত্তা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। হার্মাদদের সঙ্গে মাঝে মাঝে অধিবাসীদের লড়াই চলিত। একটি পল্লীগীতিতে দেখিতে পাই—জেলেরা একত্র হইয়া তাহাদের বৃহৎ দলপতির পরামর্শ অনুসারে হঠাৎ পশ্চাৎ দিক্ হইতে আসিয়া হার্মাদদের প্রত্যেকের চক্ষে মুষ্টি মুষ্টি লঙ্কার গুঁড়া নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে পালাইয়া যাইতে বাধ্য করিতেছে। হার্মাদেরা ছোট ছোট ক্ষিপ্ৰগতি ভিজিতে আসিয়া মধুর মাছি বা পল্লপালের জায় বণিকদের জাহাজ ঘিরিয়া ধরিত। পল্লীগ্রামে ইহারা যে লুণ্ঠনকার্য চালাইত, তাহা দেশবাসীদের অসহ্য হইয়াছিল। সুন্দরী গৃহস্থ-বধূদের হৃদ্যশাসনকে আমরা অনেক পল্লীগাথা পাইয়াছি। কোন কোনটিতে বর্ণিত আছে—হতাশমণী তাঁহার স্বামীকে

স্বরণ করিয়া বিলাপ করিতেছেন, “অভাগিনীকে মনে রাখিও। ঘাটে আমার কলসী পড়িয়া রহিল, আমার হাতের কঞ্চ ফেলিয়া আসিয়াছি; আমাকে মনে করিয়া ছুঁথ হইলে কঞ্চ ও কলসী তোমার হাত ছুঁথানি দিয়া ছুঁইও—তাহাতে আমি জুড়াইব। আর সুন্দরী দেখিয়া একটি মেয়ে বিবাহ করিও। আমি যে আদর ও স্নেহের জন্ত পাগল ছিলাম, তাহা তাহাকে দিও, হতভাগিনীর অদৃষ্টে তাহা নাই।” বার্নিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায়—পর্ন্তুগীজ দস্যুরা কুস্ত্র কুস্ত্র ক্ষতগামী জাহাজে শুধু সমুদ্রে বা উপকূলে নহে, কখনও শতাধিক মাইল দূর পর্য্যন্ত স্থলপথে যাইয়া লুণ্ঠন করিত। বিবাহ-বাসরে এবং অপরাপর উৎসবে ইহারা হঠাৎ রবাহুতের দ্বায় উপস্থিত হইয়া অকণ্ঠ অত্যাচার করিত। ইহাদের ভয়ে সমুদ্রের তীরবর্তী অনেক দ্বীপ ও নগরী জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। যত্নাধ সরকার মহাশয় অক্সফোর্ড লাইব্রেরীর তালীসের গ্রন্থের পরিশিষ্ট (Persian MS., Bod 569, Entry No. 240) হইতে এই দস্যুদের একটি বিবরণী দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়—ইহারা বন্দীদিগের হাতের তালু ছিজ করিয়া তন্মধ্যে সৰু বেত চালাইয়া দিয়া শত শত স্ত্রীপুরুষকে পশুর মত টানিয়া আনিয়া জাহাজের পাটাতনের নীচে রাখিত এবং লোকে যেরূপ পাখীদের জন্ত শয় ছড়াইয়া দেয়—সেইভাবে তগুলমুষ্টি হতভাগাদের সম্মুখে ছড়াইয়া দিত। অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। যাহারা বাঁচিত, তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্যের ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিকের নিকট বিক্রয় করিত। কোন কোন সময়ে তমলুক ও বালেশ্বর বন্দরেও তাহাদিগকে বিক্রয় করা হইত। পাত্রী ম্যানরিকের বর্ণনায় পাওয়া যায়, “প্রত্যেকেই জানেন এই পর্ন্তুগীজ দস্যুরা কিরূপ প্রতিবৎসর বাকলা, শালিমাবাদ, বশোর, হুগলী, হিজলী, উড়িয়া প্রভৃতি রাজ্য আক্রমণ করিয়া (মোগল) শত্রুর শক্তি নাশ করিয়াছে। এমনও বৎসর গিয়াছে, যে বৎসর তাহারা এই রাজ্যের এগার হাজার পরিবারকে আনিয়া বিক্রয় করাইয়াছে” (Bengal Past and Present, 1916, Part II, p. 58)। এই দস্যুরা এক সময়ে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১৮,০০০ লোক ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। মগদস্যুরা এই পর্ন্তুগীজদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া দেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা অতি ভয়াবহ। তাহাদের স্পর্শদোষে অনেক ব্রাহ্মণ-পরিবার এখনও পতিত হইয়া আছেন। বিক্রমপুরে ‘মগব্রাহ্মণ’দের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। মগ ও পর্ন্তুগীজদের ঔরসজাত অনেক সম্ভানে এখনও বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ। ফিরিঙ্গীদের সংখ্যা চট্টগ্রাম, খুলনা ও ২৪-পরগনার উপকূলে, নোয়াখালীতে, হাতিয়া ও সন্দীপে, বরিশালে, শুণসাখালি, চাপলি, নিশানবাড়ী, মউধোবি, খাপড়াভাঙ্গা, মগপাড়া প্রভৃতি স্থানে অগণিত। ঢাকায় ফিরিঙ্গি বাজারে, তাহা ছাড়া কলকাতায় ও সুন্দরবনে হরিণঘাটার মোহানায় অনেক ছুঃখ ফিরিঙ্গী বাস করিতেছে। বাঙ্গলাদেশে পর্ন্তুগীজদের কীৰ্ত্তি এইখানেই শেষ হয় নাই। অনেক পর্ন্তুগীজ শব্দ বাঙ্গলার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তদ্বারা এই জাতির বাঙ্গলাদেশে ব্যাপক প্রভাব প্রতীয়মান হয়। আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, জামরুল, কামরাজা, নোনা, আতা, রাঙ্গাআলু প্রভৃতি আমরা পর্ন্তুগীজদের নিকট হইতে পাইয়াছি। এখনও এদেশে ‘ফিরিঙ্গী খোপা’ প্রচলিত।

পাঁউকাটির পূর্বে নাম ছিল “ফিরঙ্গী কটি।” কড়ি-বরগা, জানেলা, গরাদিয়া, কামরা, বারেন্দা, আলমারি, কেদারা (chair), মেজ, আলপিন, ফিতা, চাবি, বোতাম, বরেন, বোতল, বালতি, বাসন, কামান, পিস্তল, লস্কর, বজরা, বরা, মাতুল, তুফান, মিস্ত্রী, কামিজ, ইন্দ্রী, কাপড়, কুঠি, আয়া, ছাপা, জোলাপ, নীলাম প্রভৃতি শব্দের অনেকগুলিই বোধ হয় পৰ্তুগীজ ভাষা হইতে আমদানী। হালহেড সাহেব লিখিয়াছেন, এক সময়ে ভদ্রলোকেরা এই সকল বিদেশী শব্দের বহু বেশী মিশ্রণদ্বারা বাঙ্গলাভাষায় কথা কহিতেন, ততই তাহাদের বাহ্যভরী ছিল। (মুদ্রিত Bengali Prose Style এবং সতীশ মিত্র মহাশয়ের যশোর ও খুলনার ইতিহাস দ্রষ্টব্য। এই শেষোক্ত পুস্তক হইতে আমি অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।) পৰ্তুগীজগণ তাহাদের নিৰ্ব্বিচার ও অবাধ ব্যভিচারদ্বারা বাঙ্গলাদেশে কতকগুলি ব্যাধির সৃষ্টি করিয়াছিল। ভাবপ্রকাশে “ফিরঙ্গী ব্যাধি” নামক রোগের উল্লেখ আছে। এই ছঃসাধ্য-পীড়ার ফলে গলিতকুষ্ঠাদি জন্মে। “গুরুরোগঃ ফিরঙ্গোহং জায়তে দেহিনাং এবম্” (শব্দকল্পদ্রুম—ফিরঙ্গ শব্দ, ২৮০-৪ পৃঃ)।

ভাস্কোডিগামার সময় হইতে পৰ্তুগীজগণ এদেশে আসিতে থাকে। কালিকটের এক মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভাস্কোডিগামা এক তুর্গাদেবীর মন্দিরকে মেরুর মন্দির মনে করিয়া পাণ্ডাদের গঙ্গাজলকে জরডনের জল ভাবিয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুসেন সাহের সময়ে বাঙ্গলায় ইহাদের প্রথম আবির্ভাব। কোয়েলেহ, সিলভিরা প্রভৃতি পৰ্তুগীজ নেতৃগণ আসিয়া এদেশে দস্তুরমত আড্ডা স্থাপন করেন। ১৫২৮ খৃঃ অব্দে ইহাদের অধিনায়ক মেলো বাণিজ্যের ছলে অত্যাচার করার অপরাধে অনেকদিন গৌড়ে বন্দী হইয়া থাকেন। কালে চট্টগ্রাম, মধুগ্রাম ও হুগলী ইহাদের বাণিজ্য-কেন্দ্র হইয়া পড়ে। শের খাঁর সময়ে ইহারা মামুদ সাহের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে চট্টগ্রাম ইহাদের সম্পূর্ণ অধিকৃত হয়। ইহারা বিজয়ভাবে বঙ্গের নানা স্থানে আড্ডা স্থাপন করিয়া দেশবাসীদের উপর অত্যাচার চালাইত। কোন স্থায়ী অধিকার বা সর্বজনসম্মত নেতা বা শাসনপদ্ধতি ইহাদের ছিল না। একসময়ে ইহারা আরাকানপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল—ইহাদের নৌবল যথেষ্ট ছিল। মগদিগের সঙ্গে শেষে ইহাদের বেশ ভাব হইয়া যায়। তখন মগ ও পৰ্তুগীজ একত্র হইয়া বঙ্গদেশ লুটপাট করিয়া খাইত। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে আরাকান-রাজ তাহার রাজ্যের সমস্ত পৰ্তুগীজকে নিহত করিতে আদেশ দেন। তখন ইহারা অতিশয় দুর্ভাগ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা সন্দ্বীপের মোগল শাসনকর্তা ও সেই স্থানবাসী পৰ্তুগীজদিগকে নিহত করে। ইহাদের অত্যাচারে ফতে খাঁ (সন্দ্বীপের শাসনকর্তা) ইহাই চূড়ান্ত ব্যবস্থা মনে করিয়া পৰ্তুগীজ জলদস্যুদিগকে একেবারে নিমূল করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া দক্ষিণ সাহাবাজপুরে উপস্থিত হন। কিন্তু পৰ্তুগীজগণ জলযুদ্ধে বিশেষ ওস্তাদ ছিল। সিবাতিয়ান গঞ্জালেস নামক এক নেতার অধীনে জলদস্যুগণ ফতে খাঁর সহিত অতি বিক্রমসহ যুদ্ধ করিয়া মোগল-সেনাপতি ও তাহার সমস্ত সৈন্য ধ্বংস করে। গঞ্জালেসের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পায়, এবং তিনি সন্দ্বীপ দখল করিয়া তথাকার রাজা হন। সেখানকার মুসলমানদিগকে

তিনি একেবারে নিম্ন করেন। পার্শ্ববর্তী রাজারা তাঁহার আকস্মিক সফলতায় আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্বস্থাপনের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন—কিন্তু গঞ্জালেস অহঙ্কারে দৃষ্ট হইয়া সেই সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এদিকে আরাকান-রাজের ভ্রাতা অনাপরম তাঁহার রাজভ্রাতার দ্বারা কোন অপরাধের জন্ত দণ্ডিত হন। তিনি গঞ্জালেসকে বহু অর্থ ও তাঁহার ভগিনীকে পত্নীস্বরূপ দিয়া আরাকান-রাজ্য জয় করিতে যত্নবন্ত করেন, কিন্তু গঞ্জালেস ও অনাপরমের অভিমান ব্যর্থ হয়—আরাকান-রাজের সঙ্গে ইহারা পারিয়া উঠেন না। তথাপি অনাপরমের দত্ত বহু অর্থ পাইয়া পর্তুগীজ বীর প্রীত হন এবং উক্ত যুবরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি স্বয়ং আত্মসাৎ করেন। ১৬১০ খৃঃ অব্দে আরাকানের রাজা গঞ্জালেসের সঙ্গে বাঙ্গলাদেশে আসিয়া লক্ষ্মীপুর পর্য্যন্ত দখল করিয়া লন। মোগলেরা এক প্রকাণ্ড বাহিনী সঙ্গে আনিয়া উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন, আরাকানরাজ ও গঞ্জালেস উভয়েই বহুকষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়া পলায়ন করেন। গঞ্জালেস অতি বড় ছবুঁত ছিলেন, ইনি এই সময়ে মগরাজের কয়েকজন অমাত্যকে সক্রিয় একটা প্রস্তাব করিবার ছলে নিজ জাহাজে আনিয়া নিহত করেন এবং পরে গোয়ার শাসনকর্তার অধীনস্থ স্বীকার করিয়া তাঁহাকে আরাকানরাজ্য অধিকারের লোভ দেখাইয়া তথা হইতে ডন ফ্রান্সিস নামক সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্ত আনয়ন করেন। ইহারা আরাকানরাজ্যের প্রান্তভাগ লুণ্ঠন করিতে থাকেন। আরাকানের রাজা ওলন্দাজদের সহায়তায় পর্তুগীজদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে ডন ফ্রান্সিস নিহত হন এবং গঞ্জালেস পালাইয়া যান। আরাকানরাজ অনায়াসে সন্দীপ দখল করিয়া লন (১৬১৮ খৃঃ অব্দ)। ১৬৬৩ খৃঃ অব্দে নবাব সায়েস্তা খাঁ আরাকানরাজকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া হসেনবেগ সেনাপতির দ্বারা মোগলের নষ্ট ক্ষমতা উদ্ধার করেন। প্রায় ৫০ বৎসর কাল এই মগেরা এবং পর্তুগীজ চর্তুস্তেরা মিলিত হইয়া বঙ্গদেশে যে অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে তাহার কতক কতক বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে; বানিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিলে তৎসম্বন্ধে আরও অনেক ভয়াবহ কথা জানিতে পারা যায়। এই পর্তুগীজ দস্যুরা গর্হ করিয়া বলিত, “পাত্রীরা ১০ বৎসরের চেষ্টায় যত লোককে খৃষ্টান করিয়াছে আমরা এক বৎসরে তদপেক্ষা বেশী করিয়াছি।” ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে সায়েস্তা খাঁর সেনাপতি ওমেদ খাঁ ও হসেনবেগ চট্টগ্রাম ও সন্দীপ দখল করেন। মগেরা ১,২২৩টি কামান ফেলিয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ ধনরত্ন ভূনিমে প্রোথিত করিয়া যাওয়াতে মোগলেরা আশাহুরূপ অর্থ পাইতে পারেন নাই। আরাকানরাজের সঙ্গে একত্র হইয়া ইহারা মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করিত। আরাকানরাজের সৈন্তগণের মধ্যে অনেক পর্তুগীজ সৈন্ত ছিল, কিন্তু ইহারা কোন বেতন পাইত না। বাঙ্গলা দেশটা আরাকান-রাজের অস্থমতিক্রমে ইহারা জায়গীর বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। সেখানে বারমাস ইহারা লুণ্ঠন, হরণ এবং অত্যাচার চালাইত (J. A. S. B., 1907, No. 6, p. 425)।

ইসলাম খাঁ তাঁহার রাজধানী ঢাকায় স্থাপন করিলেন। এই মগ ও পর্তুগীজদিগকে দমন করাই তাঁহার এই রাজধানী-পরিবর্তনের প্রধান কারণ ছিল। তৎপূর্বে প্রতাপাদিত্য

মগ ও পৰ্তুগীজদের দৌরাঙ্গা অনেক পরিমাণে দূর করিয়াছিলেন। এমন কি ছলনাপূৰ্ণক সন্দীপের শাসনকর্তা কার্ডালোকে ধূমধাটে আনিয়া অবিচারে নিহত করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় পৰ্তুগীজদের মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। অনেক পৰ্তুগীজ পাজী এদেশ হইতে পালাইয়া যান। ইসলাম খাঁ পৰ্তুগীজদিগের অত্যাচার অনেকটা নিবারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সায়েস্তা খাঁ ইহাদিগকে একেবারে সায়েস্তা করিয়াছিলেন। পৰ্তুগীজ ও মগেরা সায়েস্তা খাঁর অভিযানে চট্টগ্রাম হইতে যেভাবে পালাইয়া যায়, তাহাতে পৰ্তুগীজ ও ফিরিশীগণ একেবারে শক্তিহীন হয়; এবং “মগের মুন্সুকের” বহুবিধ অত্যাচার একেবারে গরের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। মগেরা যে ফিপ্রকারিতার সহিত চট্টগ্রাম হইতে পালাইয়া গিয়াছিল—তাহার স্থিতি এখনও তদ্বন্দী লোকের স্থিতিতে জাগরক আছে। মগদিগের পলায়ন জেনোফোনের “Retreat of the Ten Thousand” এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। লৌকিক কথায় এই পলায়নের নাম “মগ-ধাওনি।” মগেরা পালাইবার সময়ে তাহাদের দেববিগ্রহ ও অতুল ঐশ্বর্য মৃত্তিকার নীচে পুঁতিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। আরাকানে যাইয়া সেই গচ্ছিত ধন ও দেবমূর্তি প্রোথিত করিবার স্থানের একটা সাঙ্কেতিক মানচিত্র তাহারা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। বহুকাল পরে যখন দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল, তখন মগ-পুরোহিতেরা সেই মানচিত্রহস্তে ধূমকেতুর মত চট্টগ্রামে উদ্ভিত হইয়া সেই গুপ্ত দেববিগ্রহ ও মণিরত্নমোহরপূর্ণ কুন্ত উঠাইয়া লইয়া যাইতেন। এখন পর্য্যন্ত নাকি মগ-পুরোহিতেরা সে সন্ধান ত্যাগ করেন নাই, তাহারা মানচিত্র লইয়া মাঝে মাঝে দেখা দেন। সম্প্রতি চট্টগ্রামের দেয়াঙ্গ পাহাড়তলীতে বহু বুদ্ধ ও অপরাপর বিগ্রহ ভূনিমে পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি অটুট ও উৎকৃষ্ট অবস্থায় আছে—ইহারা যে সেই মগ-ধাওনির সময়কার পরিত্যক্ত বিগ্রহ, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বহুকাল পূর্বে আমি মগ-ধাওনির সময়কার কয়েকখানি বুদ্ধ ও গণেশমূর্তি পাইয়াছিলাম, তাহার একখানি আমি জয়নগর-মজিলপুর-বাসী প্রত্নতত্ত্বাঙ্গসকানী কালিদাস দত্ত মহাশয়কে দিয়াছি। ‘নছর মালুম’ নামক পল্লীগাথার (পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড) মগ-পুরোহিতগণ কিরূপে চট্টগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া সেই সকল গুপ্তধন পুনরুদ্ধার করিতেন, তাহার একটি কৌতুকবহু কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে।

সায়েস্তা খাঁ এই ভাবে মগদিগের হস্ত হইতে চট্টগ্রাম উদ্ধার করিয়া উহাকে ‘ইসলামবাদ’ নামে পরিচিত করেন। মগ ও পৰ্তুগীজ দস্যুর অত্যাচার বিশেষভাবে সেই সময় হইতে নিবারণিত হইলেও, পৰ্তুগীজদের সাময়িকভাবে এখানে-সেখানে দস্যুতার কথা ইংরেজ আমলেও শুনা যাইত। লঙ্গ সাহেব লিখিয়াছেন—১৮২৪ খৃঃ অব্দেও মগ দস্যু-কলিকাতাবাসীরা ভয় করিত। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্নমেন্ট গঙ্গার একটা বীধ তৈরী দিগকে করিয়া মগ ও পৰ্তুগীজ দস্যুদের আসিবার পথ বন্ধ করিয়া দেন। বর্তমান “উদ্ভিদ-বীধিকার” (Botanical Garden) কাছে এই বীধ ছিল।

পাঠান ও ভূঞারাজগণের প্রতিপক্ষতা ও খাস যোগল শিবিরের বিদ্রোহদমন এবং পরিশেষে মগ ও পৰ্তুগীজ দস্যুদের অত্যাচার-নিবারণের পর বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যাতে

মোগল-সাম্রাজ্যের অধিকার মেঘনির্মুক্ত আকাশের জায় পরিষ্কার হইয়া গেল। তখন দিল্লীখবরের একাধিপত্য। যে সকল বীর আত্মা পর্য্যন্ত অভিযান করিয়া যমুনার জল মোগলরক্তে রঞ্জিত করিয়া তাঁহাদের জয়ী খজ্ঞা সেই জলে দ্রব করিবেন, এই সঙ্কল্প করিয়া ছিলেন, তখন সেই সকল উচ্চাভিলাষী বীরের বংশধরেরা সম্রাটের প্রতিনিধির দরবারে কুনিশ করিতে করিতে যাইয়া রাজস্বদানপূর্ব্বক কুনিশ করিতে করিতে দরবার ত্যাগ করিতেন। প্রবল দম্ভা, প্রবল রাজা, প্রবল পাঠান, প্রবল মোগল—ইহারা সকলেই কেহ-বা শির দিয়া, কেহ-বা শির হেঁট করিয়া স্বীয় অধিকারভ্রষ্ট হইলেন। আকবরের চাল-বাজিতে মোগল শক্তির এইভাবে জয় হইল। ইহার পরে রাষ্ট্র-বৃদ্ধির কথা। তাহাও আমরা সংক্ষেপে বলিয়া যাইব।

কুচবিহার রাজ্যের পূর্ব্বসীমায় ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট, পশ্চিমে ত্রিহৃত এবং উত্তরে আসাম ও তিব্বতের পর্ব্বতমালা। এই পার্শ্বতা প্রদেশ বহুকাল হইতে স্বাধীন ছিল।

১৪২২ শকে (১৫০০ খৃঃ) বর্তমান রাজবংশের আদিপুরুষ বিত্ত সিং বা বিশ্বনাথ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন ; প্রবাদ ইনি শিবপুত্র। ছুয়াট

সাহেব মোগলদিগের সঙ্গে কোচরাজাদের যে সংঘর্ষের বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই :—১৫২৫ খৃঃ অব্দে কুচবিহারের রাজা লক্ষ্মণনারায়ণ মানসিংহের সহিত দেখা করিয়া স্বেচ্ছায় মোগলদের বশতা স্বীকার করেন। এই রাজার একলক্ষ পদাতিক সৈন্য, ৪,০০০ অশ্বাত্তোহী সৈন্য, ৭০০ হস্তী এবং ১,০০০ রণতরী ছিল। মোগলদিগের সঙ্গে এই অহেতুকী প্রেম ও দাসত্বের নাগপাশ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লওয়াতে তাঁহার আত্মীয়, স্বজন এবং পার্শ্ববর্তী রাজারা অত্যন্ত বিরক্ত হন ; তাঁহারা একত্র হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। উপায়াস্তর না দেখিয়া রাজা স্বীয় দুর্গে আশ্রয় লইয়া বঙ্গাদিপের নিকট স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপনপূর্ব্বক সাহায্য প্রার্থনা করিয়া চিঠি লিখেন। মোগলেরা এই সুবর্ণ-সুযোগ কেনই বা ছাড়িবেন ? জেহাজ খাঁর অধীন একদল মোগল সৈন্য যাইয়া রাজশত্রুদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে মুক্তি দান করে— এই ভাবে কুচবিহার রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কুচবিহারের রাজা ধৈর্যোজ্জনারায়ণের মৃত্যু হয়, তৎকালে তাঁহার পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণ শিশু ছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্ব প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীস্থাপক ছিল। ইহার খাস মুন্সী জয়নাথ ঘোষ (মুন্সী) রাজার রাজ্যভার গ্রহণের সময়ে কুচবিহাররাজ্যের একখানি ইতিহাস লিখিতে আদিষ্ট হন। যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতি পুস্তকে উক্ত রাজ্যের পূর্ব্বতন ইতিহাস লিখিত ছিল, এরূপ জানা যায়। জয়নাথ মুন্সীর ইতিহাস ১৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ। ১৫২৩ খৃঃ অব্দে মহারাজ বিশ্বসিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এই চর্লভ পুস্তকখানির একখানি পাণ্ডুলিপি আমি পাইয়াছি, ইহা এপর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। অমুমান ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এই ইতিহাসের লেখা শুরু হইয়াছিল। প্রাচীন কালের ধরনে ইহাতে আজগুবি গল্পের অভাব নাই, কিন্তু রাজাদের রাজনৈতিক জীবন এবং রাজত্বের প্রধান প্রধান

ঘটনা এই পুস্তকে বর্ণনাক্রমে বিবৃত হইয়াছে। জয়নাথ মুন্সী রাজবাড়ীর সমস্ত কাগজপত্র, প্রাচীন দলিল দেখিয়া এবং বহু বৃদ্ধ ব্যক্তির বাচনিক বিবরণগুলি শুনিয়া ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। 'প্রত্যক্ষ' খণ্ড অর্থাৎ হস্তেন্দ্রনারায়ণ ও তৎপরবর্তী রাজার ইতিহাস তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চোখে দেখা। তন্মধ্যে কোন ভুল আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

মোগলদিগের সঙ্গে কুচবিহারের যে সংঘর্ষের বিবরণ টুংটা দিয়াছেন, তাহার অনেকটাই সম্ভবতঃ মুসলমান ঐতিহাসিকগণকর্তৃক প্রদত্ত কাহিনী হইতে সংগৃহীত। এই বিবরণের সঙ্গে জয়নাথ মুন্সীর কথিত বৃত্তান্তের অনেকাংশে মিল নাই। প্রথমতঃ রাজার নাম লক্ষ্মণ-নারায়ণ নহে,—লক্ষ্মীনারায়ণ। এসম্বন্ধে রাজবাড়ীর স্থানীয়কালের কণ্ঠচরী রাজাহুগৃহীত লেখক রাজাদেশে লিখিত পুস্তকে রাজার বংশাবলীসম্বন্ধে ভুল করিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। লক্ষ্মীনারায়ণ ১৫৮৭ খৃঃ সিংহাসনে আরুঢ় হইয়া ১৬২১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। জয়নাথ মুন্সীকৃত "রাজাবলী"তে দৃষ্ট হয়, মোগল সেনারা কুচবিহারে আসিয়া উৎপাত করে। রাজা স্বয়ং রণক্ষেত্র অপেক্ষা অন্তঃমহলই বেশী আরামপ্রদ মনে করিতেন, এজন্ত স্বয়ং যুদ্ধে না যাইয়া সেনাপতিদিগকে প্রেরণ করিলেন,—তাঁহারা মোগল সৈন্যদের দ্বারা পরাস্ত হইলেন। মোগলেরা রাজ্যের অনেক ক্ষতি ও লুণ্ঠনাদি করিয়া চলিয়া গেল। রাজার দুই পুত্র বজ্রনারায়ণ আর ভীষনারায়ণ অসীম দৈহিক শক্তিশালী ছিলেন, কিন্তু রাজা বিলাসী ও অলসপ্রকৃতি ছিলেন। একদা মুকুন্দ সার্ক্সভোম নামে এক মহাপণ্ডিতকে রাজা অবমানিত করেন। এই ব্যক্তি মোগলসম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট যাইয়া নালিশ করেন। জাহাঙ্গীর হিন্দুর নোহিত্র, তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে আদর করিতেন। মুকুন্দ পণ্ডিত তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন, তাঁহার প্রবর্তনায় কুচবিহার দখল করিবার জন্ত তিনি গৌড়ের রাজপ্রতিনিধিকে আদেশ করেন। মোগল সৈন্যগণ কুচবিহার আক্রমণ করে, কিছু সময় বাণিয়া যুদ্ধ হইতে থাকে। কোন কোন যুদ্ধে মোগলেরা পরাস্ত হইলেও মোটের মাথায় তাগারাষ্ট জয়ী হইয়া রাজ্য লণ্ডভণ্ড করিতে থাকে। উপরাস্তর না দেখিয়া মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। দিল্লী থাকা কালীন তৎপুত্রদ্বয় বজ্রনারায়ণ ও ভীষনারায়ণ-কর্তৃক কতকগুলি অলৌকিক কার্য সাধিত হয়— তাহাতে দরবারে তাঁহাদের বীরত্বের কথা প্রচারিত হয়। এই সকল ঘটনা নিছক গল্প বলিয়া মনে হয়। একটা ক্ষুদ্র গল্প দিয়া রাজা বাইতেছিলেন—একটা হাতী বিপরীত দিক্ হইতে আসিতেছিল। রাজাদের ফিরিয়া বাইবার প্রথা নাই,—হুতরাং রাজা অগ্রসর হইতে থাকেন। পথ হাতীকে ফিরাইবার যোগ্য প্রশস্ত ছিল না; মাহত কি করিবে? এমন সময়ে কুমার বজ্রনারায়ণ "হস্তীর দুই দস্ত ধারণ করিয়া পিছু পানে এমন করিয়া ঠেলিয়া দিলেন যে হস্তী চাৎকার করিয়া পশ্চাৎগামী হইল।" আর একদিন রাজা যমুনাতে স্নান করিয়া তর্পণ ও ষাঙ্ক করিতেছেন—এমন সময়ে একটি ১৬ দাঁড়ী নৌকা সেই ঘাটে বেগমহকারে উপস্থিত হইল, রাজা হস্ত গলুইয়ের আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত

হইতেন কিন্তু ভীমনারায়ণ তাঁহার কবটতুলা বিশাল বক্ষ দ্বারা নৌকাটা অতিবেগে ফিরাইয়া দিলেন। তৃতীয় গল্পটি এই যে রাজা যাহাতে মাথা হেঁট করেন এমনকি তাঁহার পথে জাহাজীর একটা ক্ষুদ্র তোরণ নির্মাণ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন শিববংশীয় নৃপতিরা কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিবেন না, এই তাঁহাদের পন। বজ্রনারায়ণ “ঐ দ্বার মস্তকে ধারণ করিয়া আরো উচ্চ করিলেন—রাজা ও ভীমনারায়ণ মাথা নত না করিয়া স্বচ্ছন্দে প্রবিষ্ট হইলেন।

জয়নাথ মুন্সী লক্ষ্মীনারায়ণের এই সকল কাহিনী দিয়াছেন, তাহা তাঁহার সময় হইতে চুইশত বৎসর পূর্বের ঘটনা। ভীমনারায়ণ ও বজ্রনারায়ণ অবশ্যই বীরপুরুষ ছিলেন, কিন্তু এই সকল গল্পগুচ্ছ এই চুই শত বৎসরের মধ্যে সৃষ্ট হইয়া কুচবিহাররাজ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। রাজপুত্রদের সেহে শক্তির প্রবাদের উপর খুব মোটা তুলিতে রং ফলান হইয়াছিল। জাহাজীরের সঙ্গে রাজার দেখা-শুনার কথাটা বোধ হয় সত্য। জয়নাথ মুন্সী-কথিত রাজা ও সম্রাটের সঙ্গে সন্ধির সর্ব ঠিক বলিয়াই মনে হয়। গ্রন্থকার সম্ভবতঃ উহা রাজকীয় দলিল-পত্রের মধ্যে পাইয়াছিলেন। সর্ব অল্পসারে মোগলেরা কুচবিহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারিবে না। কিন্তু তদবধি “রাজার নারায়ণী মুদ্রা পুরা থাকিবে না, অর্ধমুদ্রাতে মোগল সম্রাটের নাম অঙ্কিত থাকিবে।” এইরূপে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ দিল্লীধ্বংসের বশত স্বীকার করিয়া বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণের এই বশত স্বীকার্য্য হইতে পারে না। মধ্যে মধ্যে মোগলদের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং সাময়িকভাবে বিজিত হইলেও কুচবিহার ১৭০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। তাঁহাদের নারায়ণী মুদ্রা একই ভাবে সদর্পে প্রচলিত হইত। কুচবিহারের পরবর্তী অধ্যায়গুলি ভীষণ আত্মকলহ, ভুটিয়াদের সহিত সংগ্রাম প্রভৃতির বিবরণে পূর্ণ।

মুওমালা ও তুরুককাটা।

পঞ্চবর্ষব্যয় মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণের সময়ে অমাত্যগণ স্ব স্ব প্রধান হইল। তাঁহার এব্রাহিম খাঁ এবং তৎপুত্র জবরদস্ত খাঁর সঙ্গে তাঁহারা মিলিত হইয়া কক্ষিৎ কর দিতে স্বীকৃত হইয়া তখন ঘোড়াঘাটে যে ফৌজদার থাকিত তাহারই অস্থগত হইতে লাগিল। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে মহীন্দ্রনারায়ণের সেনাপতি মুসলমানদিগের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। “মোগল-সৈন্ত এক যুদ্ধ জয় করিয়া রাজসৈন্তের মস্তক কাটিয়া মালা গাঁধিয়া বাঁশের উপর লটকাইয়া রাখিয়াছিল,—ইহাতেই সেই স্থানের নাম হইল ‘মুওমালা’। রাজসৈন্ত প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে নাই, তাহারিও একস্থানে অনেক যবনের শিরশ্ছেদ করিয়াছিল, সে স্থলের নাম হইল ‘তুরুককাটা’। জয়নাথ মুন্সীর বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে টুয়ার্ট সাহেবের উক্তির অনেক স্থলেই মিল নাই। কিন্তু এই সকল যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস মুন্সী মহাশয় এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে তাঁহার কথা আমরা অবিধাস করিতে পারি না। আমরা দেখিতেছি যে টুয়ার্ট সাহেব পুনঃ পুনঃ কুচবিহার-জয়ের কথা লিখিয়াছেন (১২১, ২১৪, ২৭৪, ৩২৪, ৩২৫, ৩৬২ ও ৪০৫ পৃঃ, বঙ্গবাসীর সংস্করণ)। কিন্তু একবার জয় হইলে তাহার পরে যে রাজারা পুনরায় স্বাধীন কি ভাবে হইয়াছিলেন—সেই অবকাশ

পূরণ করেন নাই। মুসলমান লেখকেরা তাঁহাদের পরাজয়ের কথা সাধামত গোপন করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ঢাকার ফৌজদার মহম্মদ আলি মহারাজ রূপনারায়ণের (১৬৮৪-১৭৬৩ খৃঃ) সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রংপুরে পালাইয়া গিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, একথা মুসলমানেরা কোন ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। ১৬৮৪-৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাঙ্গলার নবাব জবরদস্ত খাঁর সহিত মহারাজ রূপনারায়ণের এক সন্ধি হইয়াছিল। মহারাজ হারিয়া গিয়া এই সন্ধিতে দস্তখত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে ঢাকাতে ছিলেন নবাব জবরদস্ত খাঁ, তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন, চাক্লে বোলা ও চাক্লে পাটগ্রাম ও চাক্লে পূর্বভাগ মহারাজের অধিকারে থাকিবেক সুবাদে কিছু কর দিবে। ছত্রধারী—গজসিদ্ধার রাজা, অস্ত্রকে কর দেওয়া কর্তব্য নহে—এমতে শাস্তনারায়ণ নাজির দেও বনামে ইজারা লিখিয়া ঐ নামে কর দিতেছিলেন।* কিন্তু সুবেজাতের সেরেস্তাতে শাস্তনারায়ণের মারফৎ চাক্লে বোলা ও গয়রহ তরফ রূপনারায়ণ মহারাজা বেহার এই প্রকার লেখা হইত। ১১১৮ সনে (১৭১০ খৃঃ) এই প্রকার বন্দোবস্ত হইল। তখনও মহারাজ নিজনাযাকিত মুদ্রা চালাইতেন ও ছত্রধারী ছিলেন, অপরকে রাজকর দেওয়া অকর্তব্য মনে করিতেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেব সম্ভবতঃ এই সন্ধির কথাই মুবসিদ কুলি খাঁর কুচবিহারের স্বাধীনতা-লোপের নিদর্শন মনে করিয়াছেন। মিরজুমলা ১৬৬১ খৃঃ অব্দে কুচবিহার জয় করিয়া উহার নাম দিয়াছিলেন “আলমগীর নগর”—(ষ্টুয়ার্ট, ৩১৮ পৃঃ।) এই উক্তির কোন ভিত্তি নাই। এই নাম হয়ত মুসলমান সময়কার সরকারের দলিলপত্রেই ছিল। এই সময়ে কুচবিহারের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল, এই যুদ্ধে মিরজুমলা যে কিছুতেই পারিয়া উঠিতে-ছিলেন না, তাহা ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন, যদিও মুসলমান-লিখিত ইতিহাসের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করাতে তিনি সাময়িক সন্ধি বা জয়, বাহা মুসলমানের পক্ষে গৌরবজনক, তাহারই উপর জোর দিয়াছেন। জয়নাথ বোষ এই সকল বিষয়ে অকপটে সত্য লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাসখানি খুব মূল্যবান। আমার নিকট যে পাণ্ডুলিপি আছে তাহা ৪৬৯ পৃষ্ঠা ব্যাপক (ফুলফুল কোয়ার্টো সাইজ)। বস্তুতঃ যোগলেরা সময়ে সময়ে কুচবিহারের রাজত্ব ও বস্তুতঃ নিদর্শন পাইলেও এই রাজ্য সম্পূর্ণ বশীকৃত করিতে পারেন নাই। মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণ ভুটিয়াদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া ইংরাজের শরণাপন্ন হন। পারলিং (Mr. Parling) সাহেবের অধীনে কতকগুলি সিপাহী কুচবিহারের সৈন্যসহ মিলিত হইয়া ভুটিয়াদিগকে পরাস্ত করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে কুচবিহারের যে সন্ধি হয়, তাহাতে রাজসরকার হইতে বৎসর বৎসর লক্ষ-টাকার কিঞ্চিৎ নূন রাজস্ব দেওয়া এবং অপরাপর কথা নির্ধারিত হইয়া রাজ্য ইংরেজদের দখলে আসে।

আসামের সৈন্য ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আসিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া বঙ্গের অনেক পল্লী ও নগর লুণ্ঠন করে। তাহার স্মরণে ৫০০ বণিক লইয়া আগমন করে। ইসলাম খাঁ ইহাদিগকে পরাস্ত করিয়া পলায়নপর রাজসৈন্তের পশ্চাদ্ধাবনপূর্বক আসামে প্রবেশ করেন

এবং রাজার ১৫টি দুর্গ অধিকার করেন। কিন্তু বর্ষা আসিয়া পড়াত্তে রসদের অভাবে দুর্গতির একশেষ ভোগ করিয়া পালাইয়া রক্ষা পান।

১৬৬২ খৃঃ অব্দে মিরজুমলা আসামের স্বাধীনতা লুপ্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু আসামের জঙ্গলে রসদের অভাবে ও শত্রুদের অবিশ্রান্ত শরবর্ষণে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। বর্ষার অবসানে রাজা পালাইয়া পাহাড়ে বাইতেন—তখন ত্রিপুরা ও আসাম।

মিরজুমলা জয়ের আশায় উৎফুল্ল হইতেন। কিন্তু বর্ষায় আবার বিড়ম্বনা আরম্ভ হইত। কিন্তু পরিশেষে মিরজুমলার জয় হইল। রাজা তাঁহাকে ২০,০০০ তোলা সোনা, ১০,০৮,০০০ তোলা রৌপ্য, ৪০টি হস্তী এবং রাজাস্ত্রপুত্রের দুইটি স্ত্রী কুমারী প্রদান করিয়া অব্যাহতি পান। তিনি বাৎসরিক একটা নিদিষ্ট রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হন, এবং এই রাজস্ব বীতিমত দেওয়া হইবে—তাহার জামিনস্বরূপ চারটি রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া আসেন। মোগলদিগের সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বরেরও সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। মোগলেরা যে কোন উপলক্ষ পাইলেই তাঁহাদের সাম্রাজ্যবৃদ্ধির সুবিধা খুজিতেন। পাঠানেরা বেকপ অর্থের অভাব হইলে বা প্রতিহিংসানিবন্ধন নিকটবর্তী রাজ্যে উৎপাত করিয়া লুণ্ঠনদ্বারা ভাণ্ডার ভর্তি করিয়া আনিতেন এবং বিজিত রাজ্য এইভাবে লাজিত করিয়া খোস মেজাজে চলিয়া বাইতেন—মোগলদের রাষ্ট্রনীতি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে, তাঁহারা রক্তপথ পাইলেই তৎসূত্রে প্রবেশপূর্বক রাজ্যটি চিরকালের তরে আত্মসাৎ ও পদানত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইতেন। কিন্তু কুচবিহার, ত্রিপুরা ও আসাম বহুদিন এই দুর্ভিক্ষ শত্রুর আক্রমণ ও তৎকর্তৃক রাজ্যের অধিকার ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। আমরা স্বতন্ত্রভাবে এই তিন রাজ্যের সম্বন্ধে আলোচনা করিব, এজন্য এখানেই এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম। ত্রিপুরেশ্বরের প্রধান পুরোহিত বাদশাহের নিকট-আত্মীয় এক মুসলমান বোদ্ধাকে কালীমন্দিরে বলি দিয়াছিলেন। এসকল কথা আমরা এই পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে বর্ণনা করিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মোগলসম্রাটের বঙ্গীয় শাসনকর্তৃগণ

বঙ্গদেশে মোগলেরা ধীরে ধীরে সমস্ত শত্রুপক্ষ জয় করিয়া আত্মশিবিরের বিজ্ঞোহ মলনপূর্বক পার্শ্ববর্তী রাজ্যের প্রায় সকলগুলিকে তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া সার্বভৌম অধিকার পাইয়াছিলেন; তাহার ইতিহাস সংক্ষেপে দিলাম। আকবর যাত্রা করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান সেই নীতিই মূলতঃ অনুসরণ করিয়াছিলেন। আকবর

মিষ্ট ও শিষ্ট ব্যবহার দ্বারা ভারতবর্ষকে করতলগত করিয়া রাজচক্রবর্তী হইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তিনি খুব বড় বোকা ছিলেন, তথাপি তিনি যুদ্ধ ভালবাসিতেন না; যেখানে ক্ষমা ও মিষ্ট ব্যবহার বার্থ হইত, সেখানে তিনি এক টুকরা জমির আকবরের নীতি।

জ্ঞাতও তাঁহার বিপুল বাহিনীকে জীবন পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত করিতেন। অধীন ব্যক্তিরা সদয় ব্যবহারের যুক্ত পরিবেশে তৃপ্ত হইতেন। কিন্তু যিনি মাথা হেঁট করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন, তাঁহাকে তিনি উপেক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দিতেন না। তাঁহার সার্বভৌম পদগোরবের কণামাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে তিনি সক্ষম হইতেন না। শাসনকর্তাদের মধ্যে যদি কেহ ক্ষমাশূণ্যের একটু বেশী পরিচয় দিতেন, তবে তিনি তাহা ক্ষমা করিতেন না। শত্রুকে যে যতটা বেশী দলন করিতে পারিত, তাহার উপর তিনি ততটা সন্তুষ্ট হইতেন। শাসনের শিথিলতা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। বঙ্গের রাজপ্রতিনিধি সাহাবাজ খাঁ মোগলবিদ্রোহী ককেশিলানদের নেতা এবং পাঠান কতলু খাঁর প্রতি একটু বেশী সদয় হইয়া সন্ধি করিয়াছিলেন (১৫৮৫-৮৬ খৃঃ), এজন্য আকবর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কারাগারে—এমন কি উৎকোচ-গ্রহণের সন্দেহ করিয়া তিন বৎসর তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। অধীন ব্যক্তির প্রতি দয়ার আদর্শ—অধীন যোগ্য ব্যক্তির স্বগ্রাহী সম্রাট আকবর লৌহমুষ্টিতে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রতি স্বভাবতঃ বিরাগসম্পন্ন—অথচ একদম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অটল, অধ্যবসায়-শীল যোদ্ধা জগতের ইতিহাসে বেশী দেখা যায় না। ১৫৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ উড়িষ্যায় পাঠানদের সঙ্গে কতকটা তাহাদের অমুকূলে সন্ধি করিতে আকবর বিরক্ত হইয়াছিলেন। (“The Emperor was displeased at the want of energy evinced by the Raja on the occasion.”—Stewart, Bangabasi edition, p. 209.) আকবর বধাসাধা জায়গার হইতে চেষ্টা পাইতেন। সের আফগানকে বলিয়াছিলেন, মেহেরুঙ্গেসাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিবেন কিন্তু শেষে যখন জানিলেন, সেলিম তাঁহার জন্ত পাগল—হয়ত ইহাকে না পাইলে তাঁহার জীবন বার্থ হইবে, তখনও তিনি যুবরাজের মুখের দিকে না চাহিয়া যে কথা দিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিলেন; মেহেরুঙ্গেসা সের আফগানের পত্নী হইলেন। তাঁহার বাক্যের মর্যাদারক্ষা রাজোচিত। শত্রুকে সমূলে ধ্বংস করিতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন, সেখানে ক্ষমা অথবা শিথিলতা-প্রদর্শন তাঁহার নীতিবিরুদ্ধ—সে শত্রু যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, আকবর বহির শেষের জায় শত্রুর শেষকে আপৎসঙ্কুল মনে করিতেন। এই সাম্রাজ্যনীতিতে তদায়ত্ত ভারতবর্ষের বিশাল অধিকার তাঁহার অঙ্গুলী-সঞ্চালনে চলিত। তিনি নিজের নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু আবুল ফজল, তান সেন, মানসিংহ, তোদরমল্ল প্রভৃতি বিজ্ঞ ও প্রতিভাপন্ন লোককে তিনি ইঙ্গিতমাত্রে চালাইতেন। এতবড় রাষ্ট্র-প্রতিভার দৃষ্টান্ত জগতে খুব বেশী নাই। কিন্তু তিনিই হিন্দুহানের বলক্ষয় করিয়াছেন, হিন্দুহানের রণশার্দূলদিগকে নিধন করিয়া তিনি সমস্ত শক্তি দিল্লীর কেন্দ্রস্থী করিয়াছেন—যখন তাঁহারা মেঘ বনিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহারা তাঁহার অমুগ্রহ লাভ করিয়াছেন।

এইভাবে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ আবার জাঁকিয়া উঠিয়াছিল—ভারতবর্ষের সমস্ত শক্তি দিল্লী অভিমুখী হইয়াছিল, তদবধি ভারতবর্ষ দিল্লীর আওতায় পড়িয়া গেল। চারিদিকে অসংখ্য নক্ষত্র এমন কি চন্দ্রকুলা জ্যোতিষ্ক সূর্য্যোদয়ে বিলুপ্ত হওয়াতে একমাত্র প্রথর মোগলশাসন রোহের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। আমরা এখানে বঙ্গেশ্বরগণের সংক্ষিপ্ত একটা তালিকা দিব।

১। হুসেন কুলি খাঁ, খান জিহান	১৫৭৮-১৫৮০ খৃঃ
২। রাজা তোদরমল্ল	১৫৮০-১৫৮৫ খৃঃ
৩। খান আজিম মির্জা কোক্	১৫৮২-১৫৮৪ খৃঃ
৪। সাহাবাজ খাঁন কুমবো	১৫৮৪-১৫৮৭ খৃঃ
৫। উজির খান হেরেবি	১৫৮৭ খৃঃ
(অকালমৃত্যু)			
৬। সৈয়দ খাঁন	১৫৮৭-১৫৮৯ খৃঃ
৭। মানসিংহ	১৫৮৯-১৬০৪ খৃঃ
৮। আবহুল-মজিদ আসফ খাঁ	১৬০৪-১৬০৮ খৃঃ
৯। মানসিংহ	১৬০৯-১৬১০ খৃঃ

আকবর পীড়িত হইয়া পড়াতে জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু বাহাতে দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইতে পারেন, মানসিংহ সেই চেষ্টা করিতেছিলেন; কারণ খসরু মানসিংহের ভাগিনের ছিলেন। এদিকে জাহাঙ্গীর (সেলিম) আকবরের রাজত্বের শেষের দিকে কতকটা অবাধাতাপ্রদর্শন এমন কি পিতার প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিতে উত্তত ছিলেন। মানসিংহ এই সুবিধা পাইয়া বড়বস্ত্রটি কার্যো পরিণত করিতে চেষ্টা ছিলেন।

কুতুবুদ্দিন খাঁ কোকুলটাস কোকা—১৬০৬-১৬০৭। ইহার সময়ে বঙ্গদেশে বর্তমান জেলায় বিখ্যাত সের আকগানের হত্যা হয় এবং মেহেরুয়েসা বর্তমান হইতে জাহাঙ্গীরের রাজাস্থপুরে নীত হইয়া হুরজাহান (জগতের আলো) নাম গ্রহণ করিয়া ভারত-সম্রাজ্ঞী হন। এইখানে আমরা সংক্ষেপে হুরজাহানের কাহিনী বর্ণনা করিব।

দক্ষিণ তাতারে তাজা আয়াস নামক সম্রাট কুলোদ্ভব এক ব্যক্তি অবস্থার বিড়ম্বনায় ভাগ্যপরীক্ষার জন্য ভারতবর্ষে আসিতে সক্ষম করেন। তাঁহার স্ত্রী পরমা সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারও পিতৃকুল অতি নিঃস্ব ও দরিদ্র ছিল, এই দম্পতী ভারতবর্ষের পথে হুরবস্থার চরমে উপনীত হন। আয়াসের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন; তাঁহাকে একটি ঘোড়ায় চড়াইয়া স্বামী বরা ধরিয়া আস্তে আস্তে হাঁটিয়া যাইতেছিলেন। দম্পতী তিন দিন উপবাসী ছিলেন, তাঁহাদের সমস্ত সংস্থান ফুরাইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় রমণীর সন্তানপ্রসবের কাল উপস্থিত হইল, এবং বিনি কালে জগতের মহীয়সী মহিলাদের অন্ততম হইয়া ভারত-সম্রাজ্ঞী হইবেন, সেই 'জগতের আলো' তথায় আবির্ভূত হইলেন। তখন রজনী আসন্ন, নিকটে দ্বিতীয় ব্যক্তি

নাই, তাজা আয়াস ও তাঁহার পত্নী এত দুর্জল যে তাঁহারা আর চলিতে পারেন না। নবজাত শিশুসহ চলা অসম্ভব দেশ ছাড়িয়া দুরাশায় বিদেশে আসার জন্ত পত্নী পতিকে দিকার দিতে লাগিলেন। সে স্থান হিংস্রশত্ৰুপূর্ণ, রাত্রি হইলে মৃত্যু নিশ্চিত হুরজাহানের জন্মস্থান।

জানিয়া দম্পতী কোন দয়াজীচিত্ত আগন্তকের ভরসায় তাঁহাদের সুন্দরী নবজাত কন্তাকে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিশুটিকে লতাপাতা দিয়া কতকটা ঢাকিয়া একটি বৃক্ষের নিম্নে রাখিয়া গিয়াছিলেন। এক মাইল চলিয়া বাওয়ার পর সেই গাছটি যখন জননীর অদৃশ্য হইল, তিনি তখন ভুলুস্তিত হইয়া শিশুর জন্ত কাদিতে লাগিলেন। তিনি এত দুর্জল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে উঠিয়া বসিতে পারিলেন না। তাজা আয়াস পত্নীকে শান্ত করিবার জন্ত এবং বাৎসল্যবশতঃ পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া এক রোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন।

তিনি দেখিলেন এক প্রকাণ্ড কৃষ্ণমূৰ্শ শিশুটিকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে ও তাহাকে গ্রাস করিবার জন্ত ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়াছে। সেইখানে দ্রুতবেগে আসিয়া সোর গোল করাতে সাপটা হঠাৎ ভয় পাইয়া শিশুকে ছাড়িয়া গেল। তিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া নিরাপদে দ্বীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তখন কয়েকটি লাহোরবাসী বণিক সেই পথে চলিতেছিল, তাহারা এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া বিপর পরিবারকে সাহায্য করিয়া তাহাদের সঙ্গে লইয়া গেল। তখন আকবর লাহোরে ছিলেন। আমফ খাঁ নামে তাঁহার এক প্রধান মন্ত্রী সঙ্গে তাজা আয়াসের সম্পর্ক ছিল, ইহার আত্মকুলো এই দরিদ্র ব্যক্তি ক্রমশঃ রাজ-দরবারে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি মোগল দরবারে রাজস্বসচিব হইলেন। সেই নবজাত কন্তার রূপলাবণ্য দর্শনীয় বিষয় হইল। তাঁহার নাম হইল মেহেরুন্নেসা অর্থাৎ “রমণীকুলমিহির”, কারণ তাঁহার সৌন্দর্য্য সত্যই সূর্য্যের জায় চক্ষে ধাঁধা দিত। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে নানাভাবে গুণবতী হইয়া উঠিলেন। সঙ্গীতে, চিত্রবিজ্ঞান, কবিতারচনার ও নর্ত্তনে তিনি রমণীসমাজে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার মুক্তি দীর্ঘ ও সুগঠিত, কথা চাতুরীপূর্ণ অথচ সম্ভবাস্বক, হাস্য মধুর ও দিবিজয়ী ছিল। কোন নিমন্ত্রণ-সভায় সেলিম তাঁহাকে দেখিলেন, তাঁহার রূপ তাঁহাকে আবিষ্ট করিল, তাঁহার গানে তিনি তন্ময় হইয়া গেলেন। যুবতীরও স্বেষ্টা ছিল যুবরাজের হৃদয় জয় করা। হঠাৎ যেন অতর্কিতে তাঁহার অবগুঠন মুখ হইতে অপসারিত হইল, তখন তাঁহার সলজ্জ-রক্তিম গণ্ড, সুরিতাধর ও কুন্তলাবৃত্ত কপোল এবং চকিতহরিণীবৎ দৃষ্টি সেলিমের বুকে বাইয়া শেলের মত বিঁধিল। (“Then, as by accident, she dropt her veil and shone upon him at once with all her charms. The confusion which she could well feign on the occasion heightened the beauty of her face. Her timid eye by stealth fell upon the prince and kindled all his soul into love.”—Stewart, p. 232.) সেলিম সমস্তদিনটা কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে পারিলেন না। কিন্তু তাজা আয়াস ইহার পূর্বেই প্রসিদ্ধ সের আকগানের সঙ্গে কন্তার বিবাহ দিবেন, এইরূপ বাগদান করিয়া-

ছিলেন। নিকুপার হইয়া সেলিম তাঁহার পিতার নিকট প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু জায়ের অবতার আকবর বাদশাহ তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারীর প্রতি শত স্নেহসঙ্গেও বাগ্‌দত্তা কস্তুর বিবাহে বাধা জন্মাইতে সম্মত হইলেন না। আকবরের জীবদ্দশায় সেলিম সের আফগানের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করিতে পারিলেন না। কিন্তু সেলিম ও নূরজাহানের প্রেম লইয়া এতটা নিন্দা জনসমাজে প্রচারিত হইল যে, সের আফগান বিবস্ত্র হইয়া আণ্ডা পরিত্যাগপূর্ব্বক বঙ্গদেশে আসিলেন এবং বঙ্গাধিপের আবুকুল্যে বর্দ্ধমান জেলার শাসনকর্ত্ত্ব লাভ করিলেন।

আকবরের মৃত্যুর পর যে আশুন চাপা ছিল, তাহা আবার জ্বলিল। তরুণবয়সে যে কুলশর বক্ষে আসিয়া পড়ে, তাহা সহজে যায় না। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরুঢ় হইয়া সের

সের আফগানের বিরুদ্ধে
বড়বয়স।
আফগানকে বঙ্গদেশ হইতে ডাকাইয়া আনিলেন, তাহাকে বিশেষ-
ভাবে সম্মানিত করিলেন; সের আফগানও নিতান্ত উপেক্ষণীয়
লোক ছিলেন না। তরুণবয়সে তিনি পারস্তরাজ সফবিরংশের তৃতীয়

রাজা সা ইসমাইলের একজন প্রিয় সঙ্গী ছিলেন এবং আকবরের সময়ে নানা যুদ্ধে অতিশয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন; বিশেষতঃ অপরিসীম দৈহিক বলের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সিদ্ধ-বিজয়কালে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া আকবর ইহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ইহার নাম ছিল আস্তা জিন্নো, কিন্তু একটি ব্যাঘ্র বধ করিয়া তিনি সের আফগান নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহার হৃদয় উদার এবং সাহসের খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত ছিল—সুতরাং ইনি সেই সময়ে সর্বজনপ্রিয় ও রাজদরবারে সকলের সম্মানিত ছিলেন। ঈদৃশ ব্যক্তির পত্নীকে জাহাঙ্গীর কি করিয়া বল বা ছলনাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন? তাহাতে নিন্দা ও বিপদের উভয়বিধ আশঙ্কাই ছিল। কিভাবে মেহেরুয়েসাকে পাওবেন, সম্রাট তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু নানাঙ্গনের নানাকথায় সের আফগান কর্ণপাত করিতেন না, তাঁহার উদার অন্তঃকরণে সন্দেহের কালিমা থাকিতে পারিত না। সম্রাটের বাহ্য-সৌজন্ত তিনি প্রকৃত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। একদিন একটা ব্যাঘ্রের উৎপাতে লোকজন বড়ই উৎপীড়িত হইতেছিল, সম্রাট উহা শিকার করিতে গেলেন, অস্ত্রাস্ত্র ওমরাদের সহিত সের আফগানকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন। ব্যাঘ্র যেখানে ছিল সেই স্থানটা কেন্দ্র করিয়া একটা বুহৎ পরিধি নির্দেশপূর্ব্বক সম্রাটের লোকজন পশুকে ঘিরিয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহারা ব্যাঘ্রের এত সন্নিক্ত হইল যে উহার লালুল-আফোটন, গর্জন ও লক্ষ্যস্থলের শব্দ পরিষ্কার শোনা যাইতে লাগিল। সম্রাট বলিলেন, “আমার ওমরাদের মধ্যে কে আছেন, যিনি একাকী যাইয়া বাঘটি নিধন করিয়া আসিবেন?” সম্রাট ভাবিয়াছিলেন, সের আফগান অবশ্য প্রস্তুত হইবেন। এদিকে সের আফগান ভাবিলেন, “কিছুকাল দেখা যাক; ওমরাদের মধ্যে একজন সাহসী কেহ নাই, তাহারা পশ্চাৎপদ হইলে তখন আমি প্রস্তুত হইব।” এই ভাবিয়া তিনি নীরব ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনজন ওমরা লজ্জার দায়ে উপস্থিত হইয়া সম্রাতি জানাইলেন। তখন সের আফগান

দেখিলেন, তাঁহার প্রাপ্য বশ অস্ত্রে লইয়া যায়, তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “ব্যাঘ্রের যে বল ভগবান্ দিয়াছেন, আমাদেরও তাহাই দিয়াছেন। নিরস্ত্র অবস্থায় কে বাইতে পারেন?” ওয়রাগণ এ প্রস্তাবে বিমুগ্ধ হইলেন, তখন সের আফগান নিরস্ত্র হইয়া স্বয়ং ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে অমুমতি চাহিলেন। সম্রাট বাহু অনিচ্ছা দেখাইয়া দুএকবার নিবেদন করিয়া শেষে মনে মনে আনন্দের সহিত অমুমতি দিলেন। রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত-দেহে সের আফগান ব্যাঘ্রটিকে হত্যা করিয়া সম্রাট-শিবিরে ফিরিলেন। অসম্ভব সম্ভব হইল এবং সের আফগানের বীরত্বখ্যাতি সমস্ত সহরে মুখে মুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

কিন্তু জাহাঙ্গীর পুনরায় চক্রান্ত করিলেন। তাঁহার একটা প্রকাণ্ড হাতীর মাহুতের উপর গোপনে আদেশ হইল যে, কোন ক্ষুদ্র অলিগলির ভিতর দিয়া যখন সের আফগান যাইবেন, তখন ‘হাতীটা পাগল হইয়াছে’ এই ভাব দেখাইয়া সের আফগানকে উহার পদতলে ফেলিয়া মারিতে হইবে। কিন্তু সের আফগানের কি অপূর্ণ বীরত্ব! তিনি হাতীটার গুঁড়ের মূলে এমনই জোরে খড়াঘাত করিলেন যে, গুঁড় ছিন্ন হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং হস্তী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। জাহাঙ্গীর রাজপ্রাসাদের এক জানালা দিয়া উদ্গীৰ্ণ হইয়া দেখিতেছিলেন; তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। হয়ত এই মহামনা বীরের প্রতি একরূপ নীতিবিরুদ্ধ দৃষ্ট বাবহারে অমৃতপ্ত হইয়া সম্রাট হৃদমাস নিরস্ত ছিলেন। ইহার পরে সের আফগান বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এবার কুতুবুদ্দিন যিনি নাকি জাহাঙ্গীরকে ক্রমাগত উস্কাইয়া দিতেছিলেন, তিনিই বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন; সম্ভবতঃ তাঁহার বঙ্গের মসনদ পাওয়ার একটা সৰ্ত্ত ছিল, সের আফগানকে বধ করা। সের আফগান রাজ্যে অস্ত্রধারী কোন দেহরক্ষক রাখিতেন না, দরজা খুলিয়া রাজ্যে শুইয়া থাকিতেন, তাঁহার আবাসগৃহে একটি বৃদ্ধ চাকর থাকিত, অপরাপর দাসদাসীরা সন্ধ্যার পর বার বার বাটীতে চলিয়া যাইত। ৪০জন অস্ত্রধারী লোক একরাত্রে ঘুমন্ত সেরের গৃহে প্রবেশ করে, তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধ সৈনিক বলিয়া উঠিল, “ঘুমের মাহুতকে মারিতে নাই।” তখন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে,—তিনি বৃদ্ধ সৈনিককে ধস্তাবাদ দিয়া সিংহবিক্রমে এই ৪০জন সশস্ত্র লোককে আক্রমণ করিলেন, অনেকে হত হইল, অনেকে আহত হইল, এবং জীবিতদের মধ্যে সকলেই পালাইয়া গেল। কুতুবুদ্দিনের ষড়যন্ত্র বিফল হইল। কিন্তু এই ঘটনায় সের আফগানের খ্যাতি অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গেল। তিনি যে পথ দিয়া যাইতেন তাঁহাকে দেখিবার জন্য রাস্তায় ভিড় হইত। রাজধানী নিরাপদ মনে না করিয়া সের আফগান বর্ধমানে চলিয়া আসিলেন,—ইচ্ছা মেহেরুদেবসাকে লইয়া বাকী জীবন নিশ্চিন্তভাবে কাটাইয়া দিবেন। তাঁহার অপূর্ণ সফলতার সম্ভাবনা, ভাবী জীবনের উন্নতি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা—এ সব বিসর্জন দিয়া নির্বিষয় দাম্পত্যজীবনের শান্তির জন্ত লালায়িত হইয়া তিনি বর্ধমানে আসিলেন। কিন্তু নির্ভর, নীতিবিগহিত, ষড়যন্ত্রকারী কুতুব নিরস্ত্র হইলেন না। আকবর হইলে একরূপ অসাধু ব্যক্তিকে একটা রাজ্যশাসনের ভার কখনই দিতেন না। জাহাঙ্গীরকে তুষ্ট করিবার জন্ত তিনি প্রকাণ্ডভাবে বলিতেন, সের আফগানকে নিহত করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। সহজ

সৌহার্দ্যের ছলনায় তিনি রাজমহল ঘুরিয়া বর্তমানে উপস্থিত হইলেন, সেখানে সের আফগানের সঙ্গে মিত্রভাবে মিশিয়া পথে যাইতে লাগিলেন—কিন্তু একটা সৈনিকের উপর হঠাৎ সেরকে হত্যা করার আদেশ ছিল। অহেতুক ভাবে সের আফগানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাতে সের আফগান তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিলেন। কুতুবুদ্দিনের বড়বয়স সেদিন এতটা প্রকাশ্যভাবে ধরা পড়িয়াছিল যে, সের আফগানের উদার হৃদয়ও এই উদ্দেশ্যে অনুভব করিতে পারিয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ কুতুবুদ্দিনকে তরবারীর আঘাতে বিধ্বস্ত করিলেন। জাহাঙ্গীরের প্রীতির জন্য যে ব্যক্তি কিন্তু কুকুরের মত লোককে দংশন করিতে পারিত, সেই হীনচরিত্র শাসনকর্তা নিজের জালে নিজে পড়িয়া মারা গেল। কিন্তু সম্রাটের ওমরারা সের আফগানকে ঘিরিয়া ফেলিল—সের আফগান একক সেদিন চারিটা ওমরাকে হত্যা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একজন পাঁচহাজারী মনসবদার ছিলেন। কিন্তু সশস্ত্র বহু যোদ্ধা তাঁহাকে আক্রমণ করিল, কেহ তীর, কেহ গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। সের ডাকিয়া বলিলেন, “তোরা এক একজন করিয়া আয়, দেখি বল কার বেশী” কিন্তু সে কথা কেহ শুনিল না। সপ্ত রথী ঘিরিয়া ঘেরাপ অভিযন্তাকে বধ করিয়াছিল,—এই বীরশ্রেষ্ঠ তেমনই ভাবে অসম ও অস্ত্রায় যুদ্ধে নিহত হইলেন। মৃত্যুকালে তিনি পশ্চিমমুখী হইয়া জলের অভাবে রাস্তার ধূলি মাথায় ছড়াইয়া তর্পণ করিলেন। তাঁহার শরীরে ছয়টি গুলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ১৬০৬ খৃঃ অব্দে আকবরের মৃত্যুর এক বৎসর পরে এই ঘটনা ঘটয়াছিল। হুরজাহান স্বামীর হনন-সংবাদ পাইয়া বিচলিত হন নাই। তিনি নাকি এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে তাঁহার স্বামী, তাঁহার নিশ্চিতমৃত্যু পূর্ক হইতে অস্বপ্ন করিয়া, তাঁহাকে বিনা আপত্তিতে সম্রাটের অঙ্কশায়িনী হইবার অস্বপ্ন দিয়া গিয়াছেন। কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুসংবাদে জাহাঙ্গীর এরূপ বিখল ও প্রিয় কর্মচারী মারা পড়িলেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যেহেতু রেসার মুখ তিনি দর্শন করিবেন না; কিন্তু তাঁরপর যেহেতু রেসা হুরজাহান হইলেন। তাঁহার নাম সম্রাটের নামের সঙ্গে মূদ্রায় ও রাজকীয় দলিলপত্রে মুদ্রিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের যুগলনামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রায় এই কথাগুলি উৎকীর্ণ থাকিত :—

“বহুত শাহ জাহাঙ্গীর বাফ্ৎ সপ জেবর

বনামে হুরজাহাঁ বাদসহে বেগম অর ॥”

কুলি থা কাবুলী আগে বেহারের শাসনকর্তা ছিলেন। ইহার চরিত্র লীলাময়। ইনি সর্বদা একশত ঘোড়ার সঙ্গে রাখিতেন। তাঁহাদের প্রত্যেকে কোরান আবৃত্তি করিতেন।

প্রতি আবৃত্তির পর তাঁহাদিগকে বলিতে হইত—“এই আবৃত্তির পুণ্য-ফল বাদশাহ পাইবেন।” তিনি পাঁচবার নমাজ পড়িতেন, জাহাঙ্গীর; কুলি থা
কাবুলী ১৬০৭ খৃঃ।

কিন্তু সেই সময়ে মুখের ভদ্রী ও করমকালন দ্বারা কাহাকেও বেত্রাঘাত, কাহাকেও কাঁসি দেওয়া অথবা শিরশ্ছেদের হুকুম দিতেন। যখন বাহির হইতেন, তখন সঙ্গে একশত ঢাকী থাকিত। কোন বিবাদ-বিসংবাদের স্থলে উপস্থিত হইলে তিনি সেই

এক শত টাকীকে ঢাক বাজাইতে আদেশ করিতেন, সেই বিরাট শব্দে অত্যাশ্চর্য্য বিবাদের গোলমাল চাপা পড়িয়া যাইত। তাঁহার সঙ্গে এক শত অব্যর্থসদ্ধানৌ ধর্ম্মর সৈন্য থাকিত, ইহারা কাশ্মীরবাসী ছিল এবং আকাশে উড়ীয়মান ক্ষুদ্রতম পাখীটিকেও যারিয়া মাটীতে ফেলাইতে পারিত—কোন ভিড়ের মধ্যে কাহাকেও বধ করিবার জন্ত তাহারা সর্বদা রাজ্যদেশ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। বঙ্গদেশ শীঘ্রই এই পাগলামীর হাত হইতে ত্রাণ পাইয়াছিল, তিনি একটি বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সেখ আলাউদ্দিন ইসলাম খান	১৬০৮-১৬১০ খৃঃ
কাশীম খাঁ	১৬১০-১৬১৮ খৃঃ
ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ	১৬১৮-১৬২২ খৃঃ
সাজাহান	১৬২২-১৬২৬ খৃঃ

জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী হইয়া সাজাহান বঙ্গদেশ অধিকার করেন। তিনি ঢাকায় আসিয়া বঙ্গের তৎকালীন শাসনকর্তার সম্পত্তি ও সরকারী রাজস্ব হস্তগত করেন। তৎপরে পাটনা বিজয় করিয়া রোটাস দুর্গ দখল করেন। দরাব নামক কোন ব্যক্তিকে এই সময়ে তিনি বঙ্গদেশের মসনদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। কতকগুলি যুদ্ধবিগ্রহের পর সম্রাটের সহিত সাজাহানের প্রীতির ভাব পুনঃ স্থাপিত হইয়াছিল।

মহাবাৎ খাঁ	...	অল্প সময়ের জন্ত	...	১৬২৬ খৃঃ
খানজেদ খাঁ	...	ঐ		

মুকুরেম খাঁ—ইনি ঢাকায় বাস করিতেন; সম্রাটের পুত্র আসিয়াছেন শুনিয়া রাজদূতকে অতি শ্রদ্ধার সহিত সংবর্দ্ধনা করিয়া আনিতে বাইরা ইনি ধলেশ্বরীগর্ভে জন্মগ্রহণ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

ফিদাই খাঁ	১৬২৭-১৬২৮ খৃঃ
কাশীম খাঁ যোবানি	১৬২৮-১৬৩২ খৃঃ

ইহার সময়ে পর্ন্তগীজগণ হুগলী হইতে অধিকারভ্রষ্ট এবং তাড়িত হয়।

আজিম খাঁ—১৬৩২ খৃঃ-১৬৩৭ খৃঃ—ইহার সময়ে ইংরেজেরা বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিতে অমুমতি পান এবং পিপলি বন্দরে (বালেশ্বরে) তাঁহাদের প্রথম কুঠি স্থাপিত করেন।

ইসলাম খাঁ মুসেদি	১৬৩৮-১৬৩৯ খৃঃ
সুজা বাদশাহ (সুলতান মহম্মদ সুজা)	১৬৩৯-১৬৪৭ খৃঃ

২৪ বৎসর বয়সে সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা বঙ্গের মসনদে প্রতিষ্ঠিত হন (১৬৩৯ খৃঃ)। কিন্তু পাছে ইহার শক্তি অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় সাজাহান শায়েস্তা খাঁকে (সুজাহানের ভ্রাতৃপুত্র) বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই সময়ে সাজাহানের এক কন্তার সর্বাঙ্গ আগুনে পুড়িয়া যায়—গেব্রিয়েল বাউটন (Gabriel

Boughton) নামক এক ইংরেজ-ডাক্তার তাহাকে আরোগ্য করাতে পুরস্কারস্বরূপ সম্রাট তাঁহার প্রার্থনামত বঙ্গদেশে ইংরেজদিগকে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন। বাউটন রাজমহলে আসিয়া প্রজার সঙ্গে দেখা করেন; তখন রাজান্তঃপুরে এক মহিলা স্বকৃতরূপে পীড়িতা ছিলেন—বাউটন তাহাকেও আরোগ্য করেন। সুল্লা বাদশাহ ইংরেজ-জাতির উপর বিশেষ সদয় হন এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে মিঃ ব্রিজম্যানকর্তৃক বালেশ্বর ও ছপলীতে ইংরেজদের কুঠি স্থাপিত হয় (১৬৪০ খৃঃ)।

সুল্লা রাজমহলে রাজধানী পরিবর্তিত করেন, তিনি বিলাসী ও ভাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন। রাজমহলকে তিনি প্রায় দিল্লীর মত সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। মানসিংহকর্তৃক নির্মিত দুর্গগুলির তিনি সংস্কার করিয়াছিলেন এবং সেই নবনির্মিত রাজধানীর নানারূপ শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে মনোযোগী হইয়াছিলেন; কিন্তু বৎসর ঘুরিয়া যাইতে না যাইতেই এক ভীষণ অগ্নিদাহে নগরী দগ্ধ হইয়া যায়, এমন কি অতিকষ্টে বাদশাহের পরিবারবর্গ মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পান। পরবৎসর আবার রাজধানীর কতক অংশ গঙ্গাগর্ভস্থ হয়, কিন্তু সুল্লা বাদশাহের প্রাসাদের কতকগুলি প্রকোষ্ঠ এখনও বিজ্ঞমান আছে।

সুল্লা ঘোড়ের উপর উন্নতমনা, জায়গরায়ণ রাজা ছিলেন; দারার মত উদার ও মুক্তপ্রাণ ছিলেন না, তিনি কূটনীতির পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু প্রজারা তাঁহার শাসনকালে খুব সুখী ছিল। ১৬৩৯ হইতে ১৬৪৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্বকাল রাম রাজ্যের যুগ ছিল। তাঁহার প্রভাব বঙ্গদেশে বেশী হইয়াছে আশঙ্কা করিয়া সাজাহান তাঁহাকে কাবুলের শাসনকর্তা করিয়া পাঠান, কিন্তু সুল্লা ইহাতে প্রীত হন নাই। এক বৎসর পরে তিনি বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া স্বীয় মসনদ অধিকার করেন। এই সময়ে সাজাহানের শঙ্কটাপন্ন রোগ হওয়াতে সুল্লা তাঁহার মৃত্যুসংবাদ রটাইয়া বাদশাহের সিংহাসনে তাঁহার দাবী প্রতিপন্ন করিবার জন্ত বহু সৈন্ত সংগ্রহপূর্বক পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দারার সহিত তাঁহার চিরশত্রুতা ছিল, সুতরাং দারা সম্রাট হইলে যে তাঁহার মৃত্যু অবধারিত—ইহাই আশঙ্কা করিয়া তিনি এই বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। সাজাহান তাঁহাকে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়া জানাইলেন যে, তিনি মরেন নাই, ভাল হইয়াছেন, কিন্তু সুল্লা প্রচার করিলেন সেগুলি সমস্ত জালচিঠি, দারা তৈরী করিয়াছেন। রাজকীয় সৈন্তের সঙ্গে তাঁহার কাশ্মীরের নিকটে সংঘর্ষ হয়। জয়সিংহ এবং দারার পুত্র সোলেমান সম্রাটের সৈন্তের নেতা ছিলেন। জয়সিংহ সুল্লার সঙ্গে সন্ধি করিলেন, কিন্তু তৎকালবয়স্ক সোলেমান সেই সন্ধি স্বীকার করিয়া অতর্কিতভাবে সুল্লার শিবির আক্রমণ করেন। বাহাদুরপুরের নিকটে যুদ্ধ হয়, সুল্লার বিশাল বাহিনী পরাস্ত হয়, সুল্লা পাটনা অঞ্চল ত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরের দূর দুর্গ আশ্রয় করেন। এই সময়ে সংবাদ আসে, দারা পরাস্ত হইয়াছেন, সম্রাট বন্দী এবং আরঙ্গজেব সিংহাসন দখল করিয়াছেন। সোলেমান বঙ্গদেশ ছাড়িয়া দিল্লী অভিমুখে রওনা হইয়া গেলেন, এদিকে সুল্লা আরও শুনিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ সিংহাসনের দাবী করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। সুল্লা পুনরায় এক মহতী বাহিনীর পুরোভাগে আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ১৬৪৯ খৃঃ অব্দে এলাহাবাদের

কুদগা নামক স্থানে এক মহাবুকু ঘটিয়াছিল। সুজার দূরদর্শিতা এবং নির্ভীক স্বভাব ও কার্য-
তৎপরতার অভাব এবং আরঙ্গজেবের দৃঢ়সঙ্কল্পিত অদ্বৈত কৰ্মশীলতা বিজয়লক্ষীর গতি
নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। সুজার অনেক প্রবিদা ছিল, বঙ্গদেশের সৈন্তেরা তাঁহাকে ভালবাসিত
এবং তাঁহার অস্ত্র প্রাণ দিতে দাঁড়াইয়াছিল; তাঁহার হস্তী, অশ্ব ও ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না,
এদিকে আরঙ্গজেবের সৈন্তগণ তাঁহার প্রতি খুব অহুঙ্কৃত ছিল না; এক সময়ে এরূপ
অবস্থা হইয়াছিল যে, তাঁহার সৈন্তের কতক অংশ সুজার সঙ্গে যোগদান করিবে কিনা,
এই বিদার ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অস্ত্রতম প্রধান সেনাপতি যশোবন্ত
সিংহ প্রকান্তভাবে বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। সুজা এসকল
সংবাদ রাখিতেন কিনা জানা যায় নাই। কিন্তু তাঁহার এই গুরুতর বিষয়গুলির
প্রতি অবহিত থাকার একান্ত প্রয়োজন ছিল। তিনি অনায়াসে যশোবন্ত সিংহকে ও তৎসহ
আরঙ্গজেবের সৈন্তের বহু অংশ স্বপক্ষে টানিয়া আনিতে পারিতেন—তাহা হইলে যুদ্ধের ফল
অন্তরূপ হইত। এদিকে আরঙ্গজেবের বিশ্বস্ত সেনাপতি য়ীরজুমা অকুতোভয়ে স্ত্রেনদৃষ্টিতে
শত্রুশিবিরের প্রত্যেক কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিলেন। যশোবন্ত সিংহের বিদ্রোহে
অগণিত রাজপুত সৈন্ত আরঙ্গজেবের বিপক্ষ হইয়া তাঁহার শিবির আক্রমণপূর্বক লুটপাট
করিতে লাগিল। সম্রাট প্রমাদ গণিলেন, কিন্তু সুজা চোখ বুজিয়া এই প্রবিদাগুলি
হারাইলেন। বুদ্ধ অতি ভীষণ হইল, সুজার জয় একরূপ নিশ্চিত, এই সময়ে যখন তাঁহার
ক্লান্ত হস্তীর উপর হইতে আরঙ্গজেব নামিয়া আসিতেছিলেন তখন য়ীরজুমার স্বর তাঁহার কাণে
পৌছিল—“আরঙ্গজেব কি করিতেছ? তুমি তোমার সিংহাসন হইতে নামিতেছ।” চতুর
সম্রাট তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণপণ করিয়া সেই ক্লান্ত হস্তীর উপরই
চাপিয়া বসিয়া বুক করিতে লাগিলেন। এদিকে সুজা বাদশাহের প্রকাণ্ড হস্তীটা অবাধ্য
হইয়া উঠিল। আরঙ্গজেবকে শুঁড় দিয়া ধরিয়া পিষিয়া মারিতে যতই মাহত তাহাকে
তাড়না করিতে লাগিল, ততই সেই পশু গুলিগোলাবর্ষণে ও যুদ্ধের কলরবের মধ্যে দাঁড়াইয়া
কাঁপিতে লাগিল এবং ঘামিতে লাগিল। সে এক পা অগ্রসর হইল না,—হইলে আরঙ্গজেবের
জীবন শেষ হইত এবং সুজা বাদশাহই ভারতেশ্বর হইতেন। হস্তীর বল কে কাড়িয়া লইল,
কে তাহার গতিরোধ করিল?—দৈব; সেই অকৰ্মণ্য হস্তীর উপর হইতে সুজা নামিয়া
অশ্বারোহণ করিলেন, এই তাঁহার কাল হইল। বহু পূর্বে আলেকজান্ডারের সহিত যুদ্ধে
পুরুরাজ (পোরাস) হস্তীর উপর হইতে নামিয়া আসায় তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া তিনি হত
এই মনে করিয়া তাঁহার বিশাল সৈন্ত ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন পূর্বে দারা হস্তী
হইতে নামিয়া যাওয়াতে তদীয় সৈন্তেরা যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়াছিল। এবারও তাহাই হইল,—
সৈন্তেরা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইতে লাগিল। কথিত আছে,
য়ীরজুমার ঘুমে বশীভূত হইয়া খালিবর্দী বা নামক সুজার এক সেনাপতি তাঁহাকে হস্তী
হইতে নামিয়া আসিতে পরামর্শ দিয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুসংবাদ রাষ্ট্র করিয়াছিল।
জনপ্রবাদ এই “সুজা জেং বাজি, আপনা হাত হারা” (সুজা বাজি জিতিয়া আপনার হাতে

হারিলেন)। সূজা মুন্সেরের দুর্গে আশ্রয় লইলেন, মীরজুয়া এবং আরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ তাঁহার অহুসরণ করিতে লাগিলেন। এখানে সূজা পুনরায় যুদ্ধের প্রচুর আয়োজন করিতেছিলেন এবং ছয়দিন পর্যন্ত মুন্সের দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে অবস্থা সুবিধাজনক না বুঝিয়া রাজমহলে চলিয়া আসিলেন। সঙ্গে পরিবারবর্গ ও বিশ্বস্ত সৈন্তগণ ছিলেন। কিন্তু এই সময়ে বর্ষার ভয়ানক দুর্ভোগ বৃদ্ধি পাওয়াতে সন্তাটের বাহিনী তাঁহাকে আর অহুসরণ করিতে পারে নাই। এই সময়ে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। আরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদের সঙ্গে সূজার এক কস্তার বিবাহ-প্রস্তাব বহুদিন পূর্ব হইতে স্থির ছিল। কস্তা বাগদত্তা ছিলেন। পিতার এই বিপদের সময়ে কস্তা রাজকুমার মহম্মদকে তাঁহার ভালবাসা এবং বিবাহের কথা শ্রবণ করাইয়া এক পত্র লিখিলেন। ইহাতে তিনি তাঁহার অদৃষ্টকে নিন্দা করিয়া বাহাকে তিনি মনে মনে স্বামিপদে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের আশঙ্কায় অনেক মর্মান্তিক দুঃখ জ্ঞাপন করিলেন। এই পরমসুন্দরী রূপসীর পত্র পাইয়া মহম্মদের সূচিরপোষিত ভালবাসা জাগিয়া উঠিল। তিনি আরঙ্গজেবের পক্ষ ত্যাগ করিয়া সূজার সঙ্গে মিলিত হইলেন। তাঁহার অদৃষ্টে বাহাই থাকুক, তিনি তাঁহার বাগদত্তা স্ত্রীকে ত্যাগ করিবেন না, এই পণ করিলেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সূজা বাদশাহ নিরতিশয় সুখী হইয়া খুব ধুমধামের সহিত কস্তার বিবাহ দিলেন। আরঙ্গজেব এই সময়ে এক অমোঘ চাতুরী খেলিয়া এই প্রীতির সম্বন্ধ ভেদ করিয়াছিলেন। তিনি মহম্মদকে একখানি চিঠি লিখিলেন—বেন উহা রাজকুমারের পত্রের উত্তর। তাহাতে লিখিত ছিল, “তুমি যে অহুতপ্ত হইয়া আমাদের দরবারে আত্মসমর্পণ করিতে চাহিয়াছ এবং ঈশ্বরের নাম করিয়া ক্ষমা চাহিতেছ—এজ্ঞ ক্ষমা পাইবে। আমরা মনে করিয়াছিলাম তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে সূজা বাদশাহের শিবিরে বদ্ধভাবে বাইয়া তাঁহাকে কৌশলে বন্দী করিয়া আনিবে—কিন্তু দেখিতেছি তুমি রূপের জালে ধরা পড়িয়াছ এবং স্ত্রীর হাসিমুখ দেখিয়া কর্তব্যের পথ ভুলিয়াছ।” পত্রখানি আরঙ্গজেব গোপনে পাঠাইলেন, কিন্তু বাহাতে সূজা বাদশাহের গুপ্তচরদের হাতে তাহা ধরা পড়ে এরূপ কৌশল ও ব্যবস্থা ছিল। বধাসময়ে পত্রখানি দ্রুত হইয়া সূজার হাতে পড়িল, তাহাতে আরঙ্গজেবের রাজকীয় শীলমোহর ছিল এবং পত্রের ভাষা এরূপ সরল ও নিপুণ ছিল যে উহার যথার্থ্য সম্বন্ধে কাহারো কোন সন্দেহ থাকিতেই পারে না। যুবরাজ মহম্মদ ঈশ্বর সাফী করিয়া শপথ করিলেন, তিনি কোন পত্র তাঁহার পিতাকে লিখেন নাই,—এই তথাকথিত প্রত্যাশ্রিত পিতার চালবাজি মাত্র। কিন্তু কিছুতেই সূজার মনে আর জামাতার উপর বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল না, তাঁহার অমাত্যগণও একবাক্যে বলিলেন এই পত্র জাল বলিয়া বোধ হয় না। সূজা জামাতাকে কোন শাস্তি দিলেন না। তাঁহাকে কস্তাসহ ধনরত্ন দিয়া স্বশিবির হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। কস্তা ও জামাতা কাঁদিতে কাঁদিতে সেখানে পরিত্যাগ করিলেন। পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলে হতভাগ্য পুত্রকে ক্রুর ও নির্দয় পত্নী বন্দী করিয়া সেলিমগড়ের দুর্গে আবদ্ধ রাখেন। ১৬৭০ খৃঃ অব্দে ইহার মাসিক ব্যয় ১০০০০

ধাৰ্য্য হয়—কিন্তু পরে ইহাকে ২০,০০০ সেনার অধিনায়কত্বে নিযুক্ত করা হয়। ১৬৭৬ খৃঃ অঙ্গে ইনি কিস্তবারের রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন এবং ১৬৭৮ খৃঃ অঙ্গে ইহার মৃত্যু হয়। ১৬৫০ খৃঃ অঙ্গে সুজা স্ত্রী নামক স্থানে পুনরায় মীরজুয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বহু বাঙ্গালী সৈন্য নিহত হয় এবং সুজা তাঁহার অবশিষ্ট ১,৫০০ অশ্বারোহী সৈন্যকে বিদায় করিয়া চট্টগ্রামে পালাইয়া যান। এইখান হইতে তিনি আরবে যাইয়া অবশিষ্ট জীবন যাত্রায় বাপন করিতে সক্ষম করেন। কিন্তু সে বৎসর অত্যন্ত দুর্ঘোষণ হওয়াতে আরব-যাত্রী একখানি জাহাজও পাওয়া যায় নাই। অগত্যা তিনি তাঁহার সমস্ত অমূল্যচরবর্ণ বিদায় দিয়া শুধু পরিবারবর্গ ও দাসদাসী সমেত আরাকানের দিকে যাত্রা করেন। ১৬৬১ খৃঃ নাক্ নদী উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্থলপথে আরাকানের সীমান্তে উপস্থিত হন। তাঁহার এক দূত পূর্বেই তৎধাকার রাজাকে তাঁহার আগমনের কথা জানাইয়াছিল। রাজা তাঁহার এক প্রধান কর্মচারী পাঠাইয়া সেই সীমান্তপ্রদেশ হইতে তাঁহাকে সংবন্ধিত করিয়া স্বীয় রাজধানীতে লইয়া আসেন। সুজা আরাকানের রাজার আতিথেয় কিছু কাল সুখস্বাস্থ্যভোগ্য ছিলেন। কিন্তু সহসা রাজার ভাবের পরিবর্তন হইল। হযত বঙ্গের রাজ-প্রতিনিধির উৎকোচে বশীভূত হইয়া নতুবা কতকগুলি গুজবে বিশ্বাস করিয়া সুজার সহিত শত্রুবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং নানারূপে তাঁহাকে অপদস্থ করিয়া এক কড়া হুকুম জারি করিলেন যে, অবিলম্বে তিনি তাঁহার রাজ্য হইতে চলিয়া যাইউন। সুজা বলিলেন যে, সে সময়ে দ্বোর বর্ষা, জাহাজ পাওয়া যাইবে না, যদি তিনি এই বর্ষা ঋতু পর্যন্ত সেখানে থাকার অনুমতি পান, তবে আরাকান-রাজের সৌজন্যের প্রতিদান ও মূল্য তিনি দিবেন। (তাঁহার হাতে তখন অনেক মণিমুক্তা ও ধনরত্ন ছিল।) আরাকানরাজ তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। তাইমূলের বংশীয় দিল্লীশ্বরের পরিবারের কন্যা বিধবী মগ-রাজের হাতে দেওয়া—এত বড় একটা অপমানজনক প্রস্তাব সুজা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাজা তখন, সুজা আরাকান অধিকার করিবেন এইরূপ বড়বস্ত্র করিতেছেন—এই একটা অভিযোগ দিয়া সুজার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। আমরা কবি আলোচ্যালের লিখিত আত্মচরিত হইতে জানিতে পারি যে, কবি সুজার এই বড়বস্ত্রে লিপ্ত আছেন—মুজা নামক সাফীর এই মিথ্যা অভিযোগে আরাকানরাজ তাঁহাকে সাতবৎসরের জন্ত কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। সুজা তাঁহার পরিবারবর্গ ও পরিকরদিগকে বলিলেন, “তোমরা ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়া আরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হও। আমি এখানে নিহত হইলে আরঙ্গজেব খুব সম্ভব তোমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইবেন।” কিন্তু তাঁহারা কেহই সুজাকে এই বিপৎকালে ফেলিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছিল। মুষ্টিমেয় মোগল অগণিত আরাকানবাসীর বিরুদ্ধে কি করিবে? অনেকেই নিহত হইলেন, সুজা বাদশাহ ও তাঁহার পরিবারবর্গ আহত হইয়া ধৃত হইলেন। সুজার পরমসুন্দরী কন্যা পরীবাহু, যিনি সন্ন্যাসবিজ্ঞা, নর্ত্তন, চিত্রাঙ্কন ও অপূর্ণ সৌন্দর্য্যে মোগল অন্তঃপুরের সেরা রমণী ছিলেন, তাঁহাকে জোর করিয়া আরাকানরাজ বিবাহ করিতে চেষ্টা পাইলেন।

রাজকুমারী বক্ষঃস্থিত ছুরিকা দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া নিজে আত্ম-হত্যা করিলেন। সাহ স্রজাকে জলগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইল। স্রজার ষোড়শ-বর্ষীয় পুত্র যুদ্ধ করিয়া হত হইলেন, তাঁহার অপর দুই কন্যা রাজাস্থঃপুরে বন্দী হইয়া আরাকান-রাজের ভোগভূক্ষা-নিবারণের জন্য নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা অত্যন্তকালের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন,—বৈশীদিন এই অপমান সহ করেন নাই। পূর্ববঙ্গ-গীতিকায় স্রজা-সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে। আরাকানের অরণ্যে ও রেঙ্গুনের সমুদ্রকূলে পরীবাহু সম্বন্ধে শত শত গান আছে—আমরা তাহাদের মধ্যে দুইটি মুদ্রিত করিয়াছি। গীতোক্ত কাহিনীর পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক বিবরণের সঙ্গে অনেকটা ঐক্য হইলেও কিছু কিছু বিভিন্ন। আমরা তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

দেওয়ান ইশা খাঁর পুত্র দেওয়ান মুসা খাঁ, মুসা খাঁর পুত্র মাহুম খাঁ (১৬৬৭ খৃঃ), মাহুম খাঁর পুত্র মম্বুর খাঁ। মম্বুর খাঁ ইশা খাঁর বৃদ্ধ-প্রপৌত্র। ইহার সম্বন্ধে আমরা একটি নাতিক্ষুদ্র গ্রাম্য-গাথা পাইয়াছি। এই গাথাটি এখনও প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু ইহার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া আমরা Eastern Bengal Ballads পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগের ভূমিকায় দিয়াছি। এই গীতিকায় স্রজা বাদশাহ সম্বন্ধে আরও কতকগুলি কথা আমরা পাইয়াছি; মোটামুটি সেগুলি ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই মনে হয়। ইনি স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে বেশী কামনা করিতেন এবং বিলাসী ছিলেন—টুয়ার্ট সাহেবের এই উক্তি সহিত গীতি-কথিত বর্ণনার বেশ সঙ্গতি আছে। ঢাকায় সম্রাটবংশীয় নবাব-উপাধিদারী আমির আলী নামক এক জমিদার বাস করিতেন। “সোনাই” (চলিত নাম বলিয়া মনে হয়) নামে নবাব সাহেবের এক সুন্দরী কন্যা ছিলেন। স্রজা বাদশাহ ইহাকে দেখিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন এবং কন্যাপণ দুইলক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করেন। এসময়ে স্রজা বাদশাহের শরীরটা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় মোটা হইয়াছিল। নবাব-নন্দিনী ইহাকে পছন্দ করেন নাই। ইহার মধ্যে কার্যগতিকে মম্বুর খাঁ দেওয়ান ঢাকায় আসিয়া কোন উপলক্ষে সোনাইকে দেখিতে পান, তিনি সোনাইকে পাইতে জীবনপণ করিয়া বসেন। নর্তকীর ছদ্মবেশে মম্বুর খাঁ নবাবের অস্থঃপুরে ঢুকিয়া নাচিয়া গাহিয়া নবাব-নন্দিনীর মন হরণ করেন। নর্তকী যে মম্বুর খাঁ একথা জানিতে পারিয়া সোনাইও এই তরুণবয়স্ক সুন্দর যুবকের প্রতি অনুরাগিণী হন। তাঁহার জননী দেওয়ানের প্রস্তাবে কিছুতেই সন্মত হন না। কোথায় সাহান শা সাজাহান বাদশাহ প্রিয় পুত্র বদশ্শুর স্রজা বাদশাহ, আর কোথায় জঙ্গলবাড়ীর ক্ষুদ্র এক দেওয়ান। মাতা কন্যার ভাব বুঝিয়া বিশেষ বিরক্ত হন। কিন্তু মম্বুর খাঁ কৌশলে সোনাইকে হস্তগত করিয়া মহাসমারোহে তাঁহাকে বিবাহ করেন। আহত অভিমানে এবং নিজের মনোনীত পাত্রীকে তাঁহার অধীন এক সামন্ত-নেতা এইভাবে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে শুনিয়া স্রজা আগুনের মত জলিয়া উঠেন। তিনি নিজের সৈন্যসহ এবং মুরসিদাবাদের কতকগুলি লোককে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া মম্বুর খাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ

ধাবিত হন। মঘুর খাঁ উক্তস্থানে পলায়নব্যতীত উপায়ান্তর না দেখিয়া নদীর বক্র শাখা ধরিয়া স্বীয় ক্ষুদ্র নৌবাহিনীর সহিত ছুটেতে থাকেন। ৩২ পাড়ি এক নৌকায় তিনি ঢাকার নিকট ডেবরা নামক স্থানে উপনীত হন। তথা হইতে বিশালতোয়া শীতলাক্ষার বক্ষে প্রদাবিত হন। এপরাষ্ট্র নোনাইকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে তাঁহাকে লইয়া চলা নিরাপদ নহে বুঝিয়া দ্রুতকৈ জঙ্গলবাড়ী পাঠাইয়া দেন। শীতলক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া দেওয়ান ক্যাটারা নামক স্থানে উপস্থিত হন। কিন্তু সুজার অশুচরগণের গতি লক্ষ্য করিয়া ফিরিয়া নারায়ণগঞ্জ আসেন। এই সংবাদ পাইয়া চল্লিশটি রণতরীর সহিত সুজা নারায়ণগঞ্জের দিকে ধাবিত হন। এবার মঘুর খাঁ বরিশালে পলায়ন করেন। সুজা বরিশালের দিকে আসিতেছেন শুনিয়া দেওয়ান ঝালকাঠিতে উপস্থিত হন। ঝালকাঠী হইতে খুলনা এবং তথা হইতে কেশবপুর—এই ভাবে অশ্রুস্রবৎ এবং অশ্রুস্রব-কারীর সঙ্গে নৌকাদোড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। কেশবপুর হইতে মঘুর খাঁ আরও কয়েকটি স্থানে গমন করেন। এই অশ্রুস্রব-ব্যাপারে সুজা ক্লান্ত হইয়া পড়েন, কারণ প্রায় এক বৎসর কাল তিনি এইরূপ ছুটাছুটি করিতেছিলেন। তাঁহার নৌবাহিনীর রসদ সংগ্রহ করা অসম্ভবজনক হইয়া পড়িল, যেহেতু নিতান্ত দূর ও অতি ক্ষুদ্র পল্লীর নিকট দিয়া তাঁহাকে অনেক সময়ে যাইতে হইয়াছিল। এবার তিনি ৫০টি মাত্র শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ বাহিনী লইয়া বেহরফা নিযুক্ত করিলেন এবং অপর সকলকে বিদায় করিয়া দিলেন। কিন্তু নবাবনন্দিনীর অপহরণে তিনি একরূপ নিদারুণ মনস্তাপ পাইয়াছিলেন যে, কিছুতেই তিনি মঘুর খাঁর অপরাধ ভুলিতে পারিলেন না। এইবার দেওয়ান সম্বোধে আশ্রয় লইয়াছিলেন, কোন ক্রমে এই সংবাদ পাইয়া হঠাৎ সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে তিনি তথায় মঘুর খাঁকে আক্রমণ করেন। একেবারে নিরুপায় হইয়া মঘুর খাঁ তথাকার এক মসজিদে আশ্রয় লইলেন। সুজা মসজিদের অবধাননা করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, হয়তো অনাহারে মারা যাইবে নচেৎ শত্রু আত্মসমর্পণ করিবে। অনেক দিন গত হইল, মসজিদে যে কেহ আছে এমন কোন চিহ্ন বাদশাহ পাইলেন না। তিনি ভাবিলেন মঘুর খাঁ না থাইয়া মরিয়া গিয়াছে। এই বিবাহে মসজিদের কবাট বলপূর্বক খোলা হইল, কিন্তু একি দৃশ্য! উপবাসক্লান্ত অর্ধচ এক বারমূর্ত্তি দরজার পাশ হইতে অসি লইয়া যুদ্ধ করিতে দাঁড়াইল। মঘুর খাঁর প্রিয়দর্শন দেবরূপ দেখিয়া সুজা মুগ্ধ হইলেন। অপর তাঁহার সিংহবিক্রমে কোন ধোকা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, পক্ষাশ্রয় সহচরের অনেকেই আহত হইয়াছে। তিনি সোনাইর স্বামিনিক্ষাচনের কারণ ভালরূপেই উপলব্ধি করিয়া তাঁহার বিশাল বক্ষের দ্বারা মঘুর খাঁকে আলিঙ্গন করিয়া সন্তানের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন। উভয়ে মিলিত হইয়া চট্টগ্রামের রাজা রহনগামের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। মঘুর খাঁর বিক্রম ও কৌশলে উক্ত রাজা নিহত হইলেন; তখন সুজা বাদশাহ তাঁহার নব বন্ধুবরের সহিত রাজভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন পাইলেন। নানাদিক্ হইতে বহু মুসলমান আনাইয়া তথায় বাসস্থান নিরূপিত করিয়া তাঁহাদিগকে লাখেরাজ দিলেন। লুণ্ঠিত ধনরত্নের এক

ভাগ মন্থর বাঁ পাইলেন; ধনরত্নে বোকাই দুই নৌকা জঙ্গলবাড়ীতে প্রেরিত হইল। ইহার পর সাহ সূজা রাজমহলে এবং মন্থর বাঁ জঙ্গলবাড়ীতে চলিয়া গেলেন। গীতিকারক লিখিয়াছেন, “এইবার সূজা বাদশাহের জীবনের এক নূতন অধ্যায় হুঃখের মধ্য দিয়া আরম্ভ হইল”; ইতিহাস-লেখকেরা তাহা সকলেই জানেন।

ত্রিপুরার রাজমালায় পাওয়া যায়, এই সময়ে ছত্র মাণিক্যের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য আরাকান-রাজের আতি-্য গ্রহণ করেন। আরাকান রাজ সুধর্ম্মা এবং গোবিন্দ মাণিক্য দুই সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে সূজা উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গোবিন্দ মাণিক্য সিংহাসন ছাড়িয়া তাঁহাকে সেই সিংহাসনে বসাইলেন। রাজা সুধর্ম্মা গোপনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি এই বিদেশীকে এতটা সম্মান দেখাইলেন কেন? উত্তরে গোবিন্দ মাণিক্য বলিলেন, “আমার ও আপনার মত ইহার অনেক সামন্ত রাজা আছে।”

পথে গোবিন্দ মাণিক্যকে সূজা বলিলেন—“আপনি এই দেশী রাজার সভায় আমাকে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। আমার এখন আর কি আছে, যাহা এই বন্ধুত্বের প্রতিদানস্বরূপ দিতে পারি?” এই বলিয়া তাঁহার কোষ হইতে বহুমূল্য হীরকখচিত একটি ছুরিকা ও একটি মূল্যবান হীরকাসুরীয় তাঁহাকে বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ প্রদান করিলেন। গোবিন্দ মাণিক্য ত্রিপুরার রাজ্য পুনর্বার লাভ করিয়া কুমিল্লাতে সেই অসুরীয়টির বিক্রয়-লব্ধ টাকাত্তে সূজার নামে এক মসজিদ স্থাপন করিয়া তাহার উপস্থিত ঐ মসজিদে প্রদান করেন। কুমিল্লায় এখনও সেই মসজিদ বিস্তমান এবং সূজানগরের উপস্থিত এখনও মসজিদের প্রয়োজনে ব্যয়িত হইয়া থাকে।

এই পল্লীগীতিকার একটিতে সূজা বাদশাহের সহিত আরাকান-রাজের (সুধর্ম্মার যে সংঘর্ষের বিবরণ দেওয়া আছে—তাহা ষ্ট্রাটপ্রদত্ত বিবরণের সহিত রেখায় রেখায় মিলিয়া যায় না। পল্লীগাথায় দৃষ্ট হয়—সূজা-আরাকান-রাজ সুধর্ম্মার এক কন্যাকে বিবাহ করেন। সূজা আরাকান রাজ্য দখল করিবার উদ্দেশ্যে রাজকন্যাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার অছিলায় ৪০খানি পাকী রাজবাড়ীর অস্তঃপুরে পাঠাইয়া দেন। এই পাকীগুলির প্রত্যেকখানিতে দুইজন করিয়া সশস্ত্র বোকা ছিল। রাজাকে অস্তঃপুরে নিহত করা ইহাদের অভিপ্রায় ছিল। ছয় দেউড়ী পার হইয়া বখন পাকীগুলি সপ্তম দেউড়ীতে পৌঁছিল, তখন তধাকার প্রধান দ্বাররক্ষকের মনে সন্দেহ হইল, এত পাকী অস্তঃপুরের ভিতর যায় কেন? ফলে সন্ধান আরম্ভ হওয়াতে বোদ্ধবর্গ বাহির হইল। তাহাদের সঙ্গে দ্বাররক্ষক ও রাজার সৈন্তের ছোটখাট যুদ্ধ হইল। সূজার লোকেরা নিহত হইল এবং সূজা স্বয়ং ধৃত হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিহত হইলেন। এই বিবরণটি বিশ্বাসযোগ্য নহে। সূজা বিপদে পড়িয়া যাহার আতিথ্য লাভ করিয়া প্রাণ পাইয়াছিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে যে হীন ষড়যন্ত্র করিবেন একরূপ মনে হয় না। বরং ষ্ট্রাটের উক্তির সহিত সূজাতনয়া পরীবাস্তুর যে সকল বারমাসী প্রচলিত আছে—তাহার সঙ্গে ঐক্য দৃষ্ট হয়। আরাকানের নিকটে সমুদ্রতটে চট্টগ্রামের পূর্বে সূজা ও পরীবাস্তুরসংঘর্ষে

অনেক গাথা প্রচলিত আছে। কৈলাস সিংহ মহাশয় তাঁহার রাজমালায় এই গাথাগুলির অস্তিত্বের কথা লিখিয়াছেন, আমরা তাহার দুইটি প্রকাশিত করিয়াছি। সুধর্মার কন্যাকে যে সূজা বাদশাহ বিবাহ করিয়াছিলেন এ কথা তাহাতে নাই। উহা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। এই গাথা দুইটিতে দৃষ্ট হয়—(১) সূজা ও তাঁহার পত্নী সমুদ্রে পড়িয়া মারা যান, (২) তাঁহাদের সঙ্গে বহুমূল্য ধন ও মণিমুক্তা ছিল, তাহা আরাকান-রাজ লুণ্ঠন করেন, (৩) পরীবাহু সুধর্মার অন্তঃপুরে নীত হন, “নাপ্তী” খাইতে বাইরা তাঁহার ঘৃণায় সর্বদেহ কটকিত হইয়া যায়, সোণার “নাথং” কাণে পরাইতে বাইরা দশজন সহচরী তাঁহাকে জ্বালাতন করে, (৪) ব্রহ্মদেশের পোবাক তাঁহার অসহ হয়, তিনি তাঁহাদের পাচিকার রান্না খাইতে স্বীকৃত হন না। এই গীতিকায় ব্রহ্মদেশবাসীদের আচার-ব্যবহারের প্রতি একটু কটাক্ষ আছে। কিন্তু মূলতঃ এগুলি বড়ই করুণ, পরীবাহুর হৃদয়ে আর্দ্র হইয়া গ্রাম্য কবির উহা রচনা করিয়াছিলেন। ষ্ট্রাটের বিবরণ অনুসারে পরীবাহু সুধর্মাকে হত্যা করিতে অসমর্থ হইয়া নিজে আত্মঘাতী হন। এই গাথা দুইটিতে তাঁহার মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে ঐরূপ করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। ষ্ট্রাট মুসলমানদিগের ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন—সূজা চট্টগ্রাম হইতে স্থলপথে আরাকান রাজ্যে প্রবেশ করেন, কিন্তু বারুনিয়ার বলেন, তিনি একখানি জাহাজে আরাকান গিয়াছিলেন। ষ্ট্রাটের কথাই সত্য। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব কমিশনার মিঃ লুইন, যে স্থানটিতে আরাকান-রাজের প্রতিনিধি সূজাকে সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, তাহা নির্দেশ করিতে পারিয়াছেন। উহা নাক নদীর তীরে। সূজার মৃত্যুর বহু পরেও আরঙ্গজেব তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ গল্প শুনিয়া অনিত্র রজনী যাপন করিতেন। কেহ কেহ বলিত, সূজা কনষ্ট্যান্টিনোপলে গিয়াছেন, তথা হইতে বহু সৈন্ত লইয়া দিল্লী আক্রমণ করিবেন। সম্রাট কখনও শুনিতেন, সূজা পারশ্বদেশ পর্য্যন্ত অভিযান করিয়া আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে আসিতেছেন, আর একটি জনরব রটিয়াছিল যে, সূজা পেগু এবং শ্রাম-দেশের রাজাদের দত্ত দুইটি সশস্ত্র সৈনিকপূর্ণ বৃহৎ রণতরী লইয়া রওনা হইয়াছেন; তাঁহার জাহাজের নিশান রক্তবর্ণ।

কিন্তু কয়েক দিন পরে তাঁহার পুত্রকন্যাসহ সমূলে নিধনের কথা সর্বত্র প্রচারিত হইল। বন্দী সাজাহান রাজা এই সংবাদ শুনিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিয়াছিলেন, “হতভাগ্যের একটি বংশধরও প্রাণ রক্ষা করিতে পারিল না যে, সেই বর্কের রাজাটার প্রতিশোধ লইতে পারিত।”

মীরজুমলা—১৬৬১-১৬৬৪ খৃঃ

ইনি পারশ্ববাসী ছিলেন। ইনি তেলিঙ্গনার (দাক্ষিণাত্যে) রাজার অধীনে সেনানায়ক হইয়া গোলকুণ্ডার খনিজক বহু অর্থের মালিক হন। কিন্তু ইহার পুত্র মীর মহম্মদ আসীন অহঙ্কৃত ও মত্তপায়ী হইয়া যথেষ্ট ব্যবহার করেন। কথিত আছে মদ খাইয়া একদিন তিনি রাজার শয্যায় শুইয়াছিলেন। নানারূপ ঘর্ষণনার পর মীরজুমলা আরঙ্গজেবের আশ্রয় লাভ করেন। সূজা বাদশাহের পর ইনিই বাঙ্গলার গদি অধিকার করেন। ইহার সময়কার

প্রধান ঘটনা—কুচবিহার-রাজ বিষ্ণুনারায়ণের সঙ্গে বাদ-বিসংবাদ, তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। ইনি আরঙ্গজেবের অতি বিশ্বস্ত ওমরা ছিলেন।

সায়ের্ত্তা খাঁ—১৬৬৪-১৬৭৭ খৃঃ (প্রথম বার)

আরাকান-রাজের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ এবং মগদিগের দৌরাত্ম্য-নিবারণ ইহার রাজত্বের প্রধান ঘটনা। ইহার সময়ে ইংরেজদের বাণিজ্যের খুব শ্রীবৃদ্ধি হয়, বাণিজ্যের জন্য ইহাদের কোন কর দিতে হইত না। কিন্তু সায়ের্ত্তা খাঁ মাঝে মাঝে ইংরেজদিগকে উৎপীড়ন করিতেন। ১৬৭৭ খৃঃ অব্দের ৭ই মে তারিখের এক পত্রে মাদ্রাজের গভর্নর সায়ের্ত্তা খাঁর নিকট কয়েকটি অভিযোগ করেন—(১) ইংরেজদের নিকট হইতে হিন্দু প্রজাদের মত বাণিজ্যকর লওয়া হইতেছে। (২) আরাকান-রাজের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে বলপূর্ব্বক ইংরেজ সৈন্তের সাহায্য লওয়া হইতেছে, (৩) রাজ-কর্মচারীরা অশেবরূপ নির্যাতন করিয়া ইংরেজ বাণিকদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতেছে। গভর্নর সাহেব উপসংহারে ভয়-প্রদর্শনপূর্ব্বক লিখিলেন, “বদি এই সকল অত্যাচার নিবারিত না হয়, তবে তাঁহারা বাঙ্গলা হইতে সমস্ত ব্যবসায় তুলিয়া চলিয়া যাইবেন” (threatening if the English are not better treated, they will entirely withdraw from Bengal.—Stewart, p. 332).

ফিদাই খাঁ আজিম খাঁ—১৬৭৬-১৬৭৮ খৃঃ

রাজকুমার সুলতান মহম্মদ আজিম—১৬৭৮-১৬৭৯ খৃঃ

রাজা যশোবন্ত সিংহের শিশুসন্তানদিগকে নানা ছলে যোধপুরের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা, হিন্দুদের অসম্ভবরূপ করবৃদ্ধি, হিন্দুবিগ্রহ ও মন্দির ভঙ্গ করা প্রভৃতি কারণে সমস্ত রাজপুতনা আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন সম্রাট শিবাজিকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত। এই সময়ে রাজকুমার আজিম বঙ্গের শাসনকর্ত্ত্বকের ভার অপর লোকের হাতে ছত্ত করিয়া ঢাকা হইতে এক বিপুল সৈন্তদল লইয়া রাজপুতনার দিকে অভিযান করেন, সঙ্গে তাঁহার নয়বৎসরবয়স্ক পুত্র বেদার বক্ত ছিলেন। প্রায় ৫০ দিনে তিনি যোধপুরের নিকটবর্ত্তী হন। শেষের একদিন তিনি ৭০ ক্রোশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। এই অভিযান ও শিশুকুমারের সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে। আরঙ্গজেব রাজকুমারকে রাজপুতনার বিরুদ্ধে যে বিপুল বাহিনী অগ্রসর হইতেছিল তাহার সেনাপতিত্ব প্রদান করেন।

সায়ের্ত্তা খাঁ—১৬৭৯-১৬৮৯ খৃঃ (দ্বিতীয় বার)

ইংরেজ বাণিজ্যের এই সময়ে অনেকটা অবস্থান্তর হয়। ইংরেজেরা নবাবের কর্মচারীদের দ্বারা নানারূপে উত্ত্যক্ত হইয়া বিলাতে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া পত্র লিখেন। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে হগলী হইতে মিঃ গাইফোর্ড সায়ের্ত্তা খাঁকে সমস্ত অভিযোগ নিবেদন করিয়া কতকগুলি প্রার্থনা করেন, তন্মধ্যে গঙ্গার উপকূলে একটি দুর্গ নির্মাণের অহুমতির প্রার্থনা ছিল।

সায়ের্ত্তা খাঁ উহা মঞ্জুর করেন নাই। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় জেমস—গ্র্যাডমিরাল নিকলসনের অধীনে এক রণতরী পাঠাইবার আজ্ঞা দেন, উদ্দেশ্য ছিল,—আরাকানের রাজা ও অসন্তুষ্ট হিন্দুপ্রজাদের সহিত যোগ দিয়া মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আরঙ্গজেবের আজ্ঞার অমুবর্ত্তী হইয়া সায়ের্ত্তা খাঁ বঙ্গদেশে হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর প্রচলন করেন এবং তাঁহাদের অনেক দেবমন্দির ভগ্ন করেন, এজন্য হিন্দুরা একান্ত উত্তেজিত হইয়াছিল। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে চারুনক সাহেবের নেতৃত্বে কিছু কিছু যুদ্ধবিগ্রহ হয়। ইংরেজেরা প্রথমতঃ সূতামুটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু মোগলসৈন্যকর্তৃক বিতাড়িত হইয়া উলুবেড়িয়া ও তৎপরে ইঞ্জিলি নামক গঙ্গার এক উপদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোগল সেনাপতি আব্দুল সমাদ খাঁ মিঃ চারুনককে এই উপদ্বীপ হইতে তাড়াইতে ইচ্ছা করিলেন না, তিনি জানিতেন সেখানকার জলবায়ু এত খারাপ যে আবহাওয়াই তাঁহার শত্রুপক্ষের ধ্বংসসাধন করিবে। ফলে তাহাই হইল। অর্ধেকের উপরে ইংরেজ সৈন্য তিনমাসের মধ্যে কালাজরে প্রাণত্যাগ করিল। এদিকে আরাকানের রাজার সঙ্গে প্রস্তাবিত সন্ধি ব্যর্থ হইল। ক্রমাগত ইংরেজেরা তাঁহার আদেশ অমান্য করায় আরঙ্গজেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষ তিনি যখন জানিতে পারিলেন, ইংরেজেরা তাঁহার বন্ধ শত্রু শম্ভুজির সহিত যোগদানের চেষ্টা করিতেছেন, তখন তিনি বিবম উত্তেজিত হইয়া ইংরেজদিগের মুসলিমস্তানের বিস্তৃত কারবারগৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং তথাকার সমস্ত ইংরেজকে হত্যা করিলেন, ইহা ছাড়া ভিজগাপট্টমের তাঁহাদের দোকান-পাট এবং কারবারগৃহ লুণ্ঠিত হইল। সায়ের্ত্তা খাঁ সম্রাটের আদেশে ঢাকার সমস্ত ইংরেজকে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন। আরঙ্গজেব আদেশ করিয়াছিলেন—ইংরেজদিগকে তাঁহার রাজ্যে সর্ব্বত্র সমূলে ধ্বংস করিতে।

সায়ের্ত্তা খাঁর সময়ে বিহারের জমিদার গঙ্গারাম বিদ্রোহী হইয়া পাটনা অঞ্চলে অনেক লুটপাট করেন। সায়ের্ত্তা খাঁর নিশ্চিত অনেকগুলি হর্ম্ম্যর ধ্বংসাবশেষ এখনও ঢাকায় দৃষ্ট হয়।

নওয়াব ইব্রাহিম খাঁ—১৬৮৯ ১৬৯৭ খৃঃ

ইব্রাহিম খাঁর সময়ে সম্রাট আরঙ্গজেব ইংরেজদের প্রতি কিছুকালের জন্য প্রসন্ন হইয়াছিলেন, যেহেতু ইংরেজদের বাণিজ্য দ্বারা রাজকোষে একটা আয় হইত, তাহা ছাড়া ইংরেজদের রণতরীর মক্কাযাত্রীদের উপর উৎপাত করিবার সম্ভাবনা ছিল। এই প্রসন্নতার ফলে ইব্রাহিম খাঁ মাদ্রাজ হইতে চারুনক সাহেবকে এদেশে আসিয়া পুনরায় বাণিজ্যাদি করিতে আমন্ত্রণ করেন। তাঁহার মাত্র বৎসর ৩০,০০০ টাকা দিবেন—তাঁহাদিগকে বাণিজ্যের জন্য আর কোন শুদ্ধ দিতে হইবে না এই প্রস্তাব হইল। কিন্তু ইংরেজেরা এসম্বন্ধে অত্যন্ত দ্বিধা বোধ করিতে লাগিলেন। যেহেতু একটা দুর্গ না হইলে তাঁহারা কিছুতেই নিজদিগকে নিরাপদ মনে করেন নাই। বারংবার চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা এই অসুখমতি পান নাই। এবার আকস্মিকভাবে একটা সুযোগ ঘটিল। শোভাসিংহ নামক বর্ধমানের এক জমিদার

বর্ধমান-রাজ্যের ব্যবহারে অসম্মত হইয়া বহু সৈন্য সংগ্রহ করেন। সেই নির্ধাপিত পাঠানবাহি যাহা একেবারে নিরস্ত হইয়া গিয়াছিল—তাহার একটা শুল্লিও তখনও দেশের এক কোণায় ছিল। পাঠান-শক্তির এই শেষ দীপটি হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। রহিম সেখ পুনরায় বঙ্গে মোগলশক্তি বিলোপ করিয়া পাঠান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম করিয়া শোভাসিংহের সঙ্গে যোগ দিলেন। ইহারা বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামকে বধ করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিলেন। কৃষ্ণরামের এক পরমা স্ত্রী কচ্ছা ছিলেন, শোভা সিংহ তাঁহার বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্ত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে বাওয়ার রাজকুমারীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিলেন। তাঁহার ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ পাঠানদের সহযোগে দেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। সৈন্যসামন্তেরা একবাক্যে রহিমকে তাহাদের নেতৃত্বে বরণ করিল। রহিম অপ্রতিহত গতিতে মালদহ হইতে রাজমহল এবং মুরসিদাবাদ পর্য্যন্ত সর্বস্থান দখল করিয়া লইলেন। শেষোক্ত স্থানে নিয়ামৎ খাঁ নামক এক জমিদার তাঁহাকে প্রবল বাধা দিয়াছিলেন। কিন্তু রহিম তাঁহাকে নিহত করিয়া বিলাতের লোকেরা বাণিজ্য দ্বারা অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন জানিয়া হুতাহুট, চুঁচুড়া এবং চন্দননগর লুটপাট করিলেন। সাহেবেরা ইহাকে বিশেষরূপে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং এই সুযোগে তাঁহাদের কারবারখানার চূর্ণগুলি দিনরাত লোক খাটাইয়া খুব স্ফূট করিয়া লইলেন। এদিকে কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম নবাব ইব্রাহিম খাঁকে সমস্ত ব্যাপার জানাইলেন, অলপপ্রকৃতি নবাব বশোরের কোজনার হুয়উল্লাকে একটা হুকুম দিয়া ক্ষান্ত রহিলেন। হুয়উল্লা অর্থসংগ্রহে যেরূপ পটু, সামরিক ব্যাপারে তজ্রপ ছিলেন না। তিনি তিন হাজার সৈন্য লইয়া কিছুই করিতে পারিলেন না। বিদ্রোহীদের আশ্রয় বাড়িয়া গেল। ইব্রাহিম খাঁর কর্ণে চুঁচুড়ি হইতে সংবাদ পৌঁছিতে লাগিল, তিনি উপেক্ষার ভাবে তাঁহার পুত্র জবরদস্ত খাঁ এবং মদ্রীদিগকে বলিলেন, “এসকল ঘরাও যুদ্ধ ভাল নহে, ইহাতে বলক্ষয় হয় মাত্র। করুক না কেন—পাঠানেরা কিই বা করিবে? এর পরে আপনা হইতেই নিরস্ত হইয়া যাইবে। কিছু রাজস্বের ক্ষতি হইতেছে এই মাত্র।” এদিকে তখন সমস্ত বাঙ্গলা দেশটা পুনরায় পাঠানদের প্রায় দখলে আসিয়াছে। আরঙ্গজেব এই বৃত্তান্ত প্রথম শুনিয়া বিষম বিচলিত হইলেন এবং তখনই তাঁহার পৌত্র কুমার আজিম ওসমানকে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার গদিতে অভিষিক্ত করিয়া এবং নবাব ইব্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত খাঁকে সেনাপতিত্ব প্রদান করিয়া বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করিলেন।

শুলতান আজিম ওসমান—১৬৯৭-১৭০৭ খৃঃ

জবরদস্ত খাঁ ১৬৯৭ খৃঃ অব্দে পাঠানদিগকে পরাস্ত করেন। রাজমহলের যুদ্ধে রহিম খাঁর সেনাপতি থিরেট খাঁ নিহত হন। জবরদস্ত খাঁ ইংরেজ ও ডাচদিগের কারবার-গৃহগুলি উদ্ধার করেন, কিন্তু পাঠানদের লুণ্ঠিত ধনরত্ন ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করেন। এই সময়ে মুরসিদকুলি খাঁ নামক এক প্রতিভাপন্ন ব্যক্তিকে আরঙ্গজেব রাজস্ব বিভাগের কর্তা ‘দেওয়ান’ করিয়া পাঠান। মুরসিদকুলি খাঁ বোবনে মুসলমানদের হাতে পড়িয়া হাজি সূফিয়া নামে

ইসপাহানে নীত হন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু বলপূর্বক তাঁহাকে মুসলমান করা হইয়াছিল। তখন ইহার নাম হইয়াছিল মহম্মদ হাদি। ইনি প্রথমতঃ হায়দ্রাবাদে কাজ করেন, তখন নাম হয় জাকর খাঁ। হায়দ্রাবাদে ইনি আরঙ্গজেবের সুনজরে পড়িয়া দেওয়ান হন, তখনকার নাম করতলব খাঁ। বঙ্গের দেওয়ান হইয়া ইহার নাম মুরসিদকুলি খাঁ হইল। ইনি বাঙ্গলার তৎকালীন রাজস্ব-বিভাগের গোলমাল মিটাইয়া সেরেস্তা পূর্ণাঙ্গ করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের প্রিয়, এজন্য সুলতান ইহাকে প্রেরণ করিতেন। কিন্তু যতবার ইহার সহিত আজিম ওখানের সংঘর্ষ হইয়াছে, ততবার সম্রাট রাজকুমারকে লালিত ও অবমানিত করিয়াছেন। সুলতান ইহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। জবরদস্ত খাঁ পাঠানদিগকে পরাস্ত করার পর সুলতানের সহিত দেখা করিতে যান, কিন্তু আজিম ওখান তাঁহাকে অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়া উপেক্ষার ভাব দেখান। জবরদস্ত খাঁ পদত্যাগ করেন। পাঠানেরা আবার মাথা জাগাইয়া লুটপাট করিতে আরম্ভ করে। সুলতানের সহিত শেষ যুদ্ধে পাঠানেরা জয়ী হওয়ার মধ্যে আসিয়াছিল, এবং আজিম ওখানেরও মৃত্যু প্রায় অবধারিত হইয়াছিল, কিন্তু হামিদ খাঁ নামক মোগল পক্ষের এক আরব হঠাৎ বিদ্রোহি-নেতা রহিম সেককে নিহত করায় পাঠানেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে।

ইংরেজরা মিঃ ওয়ালসের দ্বারা সুলতানের নিকট অনেক আবেদন নিবেদন করিয়া পাঠান, তাঁহার কলিকাতা, সূতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি স্থানসম্বন্ধে নানারূপ সুবিধা প্রার্থনা করেন এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে থাকেন। এই সকল বিষয়ের মীমাংসা হইবার পূর্বে একটা অবস্থাস্থর হয়। ১৬৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা উইলিয়াম আরঙ্গজেবের নিকট উইলিয়াম নরিস্ নামক এক রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেন—ইনি বহু কষ্টে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করিয়া ইংরেজদের পক্ষে অনেকটা সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ে সংবাদ আসিল যে তিনখানি মোগলা জাহাজ মক্কাবাত্তীদিগকে ফিরাইয়া দেশে লইয়া আসিতেছিল, ইংরেজ দস্যবা তাহা আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিয়াছে। সম্রাটের ক্রোধ দাবানলের মত জলিয়া উঠিল। তিনি রাজদূতকে (“He must know his way back to England.”—Stewart, p. 382.) ইংলণ্ডের পথ চিনিয়া বাড়ী যাইবার হুকুম দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। সম্রাট তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, যদি তিনি এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন যে, ভবিষ্যতে কোন ইংরেজ দস্যব আর জলপথে মক্কাবাত্তীদের উপর দৌরাত্ম্য করিবে না—তবে তিনি তাঁহার বিষয়টি সুবিবেচনা করিবেন এবং এই সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াও তিনি অল্পগ্রহ বিতরণ করিতে পারেন, কিন্তু রাজদূত এরূপ দায়িত্ব লইতে স্বীকার করিলেন না। ইংরেজ দস্যবদের উৎপাত জলপথে ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। সম্রাট হুকুম দিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে যত যুরোপবাসী আছে তাহারা সকলেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে।

মুরসিদকুলি খাঁকে সুলতান যড়যন্ত্র করিয়া রাস্তায় হত্যা করিবার জন্ত আবছল বাহিয়া নামক এক গুণ্ডাকে নিযুক্ত করেন। মুরসিদকুলি দেওয়ান হইয়া সমস্ত রাজস্ব-বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। সম্রাটপ্রদত্ত ক্ষমতার বলে জমিদারগণ তাঁহার

আদেশ অমান্য করিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহাদের দেয় রাজস্ব অনেকগুলে বাড়াইয়া সম্রাটের অতীব প্রিয় হইয়াছিলেন, রাজকুমার সুলতান আজিম ওসমানের আদেশ মান্য না করিয়া দেওয়ানকে তাঁহারা ভয়ে ভয়ে মানিয়া চলিতেন। এই কারণে এবং ঈর্ষার বশীভূত হইয়া তিনি বাহা করিয়াছিলেন, মুরসিদকুলির উপস্থিতবুদ্ধি ও সাহসের জন্ত সেই অভিসন্ধি ব্যর্থ হইল; বরং মুরসিদকুলি সর্বসমক্ষে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া তাঁহার সহিত সম্মুখদ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করিলেন। কুমার ভয় পাইয়া অনেকরূপে নিজদোষ গোপন করিতে চেষ্টা পাইলেন। আরঙ্গজেব এই ঘটনা জানিতে পারিয়া পৌত্রকে অত্যন্ত তীব্রভাবে ভৎসনা করিয়া এবং নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিলেন, বাঙ্গলা ছাড়িয়া তাঁহাকে বিহারে থাকিতে আদেশ দিলেন। মুরসিদকুলি রাজস্ব-বিভাগের সমস্ত কর্মচারীদিগকে লইয়া—সুলতানের বিনা অনুমতিতে ঢাকা হইতে মুরসিদাবাদ চলিয়া আসিলেন।

সম্রাটের আদেশ অনুসারে রাজমহলে বহু ইংরেজ বন্দী হইলেন। ৫১ দিন তাঁহারা কারাবাস করিয়াছিলেন, মুরসিদ কুলির কড়া অনুশাসনে হগলীতে তাহারা ভীত হইয়া পড়িলেন। সুজা-দত্ত মূল সনদ তাঁহারা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, সুতরাং ইংরেজেরা দেওয়ান সাহেবের সেক্রেটারীকে অনেক উৎকোচ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এদেশের কারবার একেবারেই উঠিয়া বাইত, কিন্তু সুলতান আজিম ওসমান তাঁহাদের প্রতি সদয় ছিলেন, এবং মুরসিদকুলিও তাঁহার কড়া শাসন একটু শিথিল করিলেন। সুলতান রাজমহলে বন্দী ইংরেজদিগকে মুক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে কলিকাতায় আসিতে অনুমতি দিলেন। তাঁহাদের বাণিজ্য আবার বাড়িয়া চলিল। এই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দুই দলের মধ্যে ঝগড়া মিটিয়া যাওয়াতে এবং মাদ্রাজের সঙ্গে সশস্ত্র বিচ্যুত হওয়াতে তাঁহাদের ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি হইল। কোম্পানির দুইদল একত্র হইলেন এবং তাঁহাদের সঞ্চিত বহু অর্থ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে মজুত রহিল।

এই সময়ে (১৭০৬ খৃষ্টাব্দে) আরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। তিনি মরিবার পূর্বে তাহার রাজ্য তিন ভাগ করিয়া তিন পুত্রকে দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা মান্য না করিয়া ঝগড়া করিতে লাগিলেন। আজিম সাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন; বঙ্গের মসনদ ত্যাগ করিয়া আজিম ওসমান সিংহাসনের দাবী করিয়া অগ্রসর হইলেন। আগ্রার শাসনকর্তা আজিম সাহের স্বস্তর আজিম ওসমানের গতিরোধ করিলেন এবং আজিম সাহ বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত এককোটি টাকা রাজস্ব দখল করিয়া শাসনকর্তাকে পরাভূত করিয়া বন্দী করিলেন। তাঁহার নিজ তহবিলে এক কোটি টাকা ছিল। এই বিপুল অর্থ তিনি অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আগ্রার নিকটে জাজু নামক স্থানে আজিম সাহের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে আজিম সাহ ও তাঁহার দুই পুত্র বেদার বজ্র এবং বালুকা নিহত হইলেন (১৭০৭ খৃঃ)। আজিম ওসমানের পিতা মহম্মদ মজিযাম “সাহ আলম” উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। আজিম ওসমান বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অধিপতি হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

সহি আলমের মস্তিষ্ক খারাপ হওয়াতে সাম্রাজ্যের ভার অনেকটা আজিম ওসমানের

উপর পড়িল। ১৭১২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল। আজিম ওস্তানের ব্যবহারে আমির উল ওমরা প্রভৃতি মন্ত্রীরা চটয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার তিন ভ্রাতা ময়জদ্দিন, জিনসাহ এবং রাক্ষা হুসেনের সঙ্গে যোগ দিলেন। আবার সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ বাধিল। ভীষণ আহবে আজিম ওস্তানের আহত হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া রবি নদীতে বাঁপাইয়া পড়িল, সেই সঙ্গে আজিম ওস্তানের জীবনলীলা শেষ হইল। ময়জদ্দিন “জাহান্দার সাহ” উপাধি লইয়া আগ্রার তক্তে বসিলেন।

মুরসিদকুলি খাঁ—১৭০৭-১৭২৫ খৃঃ

১৭০৭ খৃঃ অব্দের অনেক পূর্বে হইতে মুরসিদকুলি খাঁ বাঙ্গলার একরূপ কর্তা ছিলেন। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আজিম ওস্তান আগ্রার যুদ্ধবিগ্রহ এবং তৎপরে রাজ-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন; তিনি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার নামে মাত্র গুলতান হইয়া এদিকে বেশী মনোযোগ দিতে পারেন নাই, মুরসিদকুলিই প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে আজিম ওস্তানের মৃত্যু হইলে মুরসিদকুলিই নবাব হন। তিনি মুরসিদাবাদ রাজধানীই তাঁহার স্থায়ী বাসস্থানে পরিণত করেন। ভূপতি রায় এবং কেশরী রায় নামক দুইটি ব্রাহ্মণ যুবককে (সম্ভবতঃ তাঁহার আত্মীয়) তাঁহার বিশ্বস্ত সহকারিস্বরূপ নিযুক্ত করেন। তিনি হিন্দু-জমিদারদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করেন। ক্রমাগত রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া তিনি ইতিপূর্বে হিন্দু জমিদারদিগকে হারান করিয়াছিলেন। এখন নবাব হইয়া তাঁহাদের জমিজমা একরূপ কাড়িয়া লইলেন। সমস্ত জমির মাপ হইল। প্রজার সঙ্গে কোন সম্পর্কই জমিদারের রহিল না, নবাব সরকারের লোকেরা রাজস্ব প্রজাদের হাত হইতে আদায় করিতে লাগিল, যাহা কিছু সামান্য জমি তাঁহাদের রহিল, ক্রমাগত রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া তাহার উপস্থিত ভোগ করার অধিকার লুপ্ত করা হইল। রাজকর্মচারীরা রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারদিগকে লাঞ্ছনা ও কষ্টজনক চরম শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন। এই জাতীয় কর্মচারীদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন নাজির আহম্মদ ও রেজা খাঁ। নাজির আহম্মদ জমিদারদিগকে ধরিয়া আনিয়া কখনও তাঁহাদিগকে পা বাধিয়া ঝুলাইয়া, কখনও বা কোঁড়া প্রহারে নির্যাতন করিতেন। গ্রীষ্মকালে রৌদ্রে খাড়া করিয়া রাখা এবং শীতকালে শীতল জলে নিমজ্জন প্রভৃতির কথাও শোনা যায়। তিনি পুরীষাদিপূর্ণ এক খাতের নাম রাখিয়াছিলেন “বৈকুণ্ঠ” এবং উহাতে জমিদারদিগকে নিমজ্জিত করা হইত—সেই ভয়ে তাঁহারা সর্বদাই কম্পাঙ্কিত থাকিতেন। (যশোর খুলনার ইতিহাস, ৫৮১ পৃঃ)। মুরসিদকুলি খাঁ হিন্দুদিগের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিয়াও রাজভাণ্ডার বাড়াইয়াছিলেন, এজন্য রাজসভায় তাঁহার এত প্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ইনি হিন্দুদের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে পারিতেন বলিয়াই বোধ হয় আরঙ্গজেবের তিনি এত প্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসন যে খুব কড়া ছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, যেহেতু তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিবার দরুন তিনি স্বীয় পুত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যে হিন্দুদিগের প্রতি কিরূপ সন্নিচার করা হইত, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

চুনাখালির জমিদার বৃন্দাবনের নিকট এক মুসলমান ফকির সাহায্য চাহিতে আসে। ইহার ব্যবহার অত্যন্ত গর্বিত ও বিরক্তিকর দেখিয়া জমিদার তাহাকে কিছু না দিয়া তাড়াইয়া দেন। ফকির কতকগুলি ইট সংগ্রহ করিয়া একটা ছোট মসজিদের মত ঘর তৈরী করে। বৃন্দাবনের বাড়ীর কাছে এই কাণ্ডটা করে। ঐখানে দাঁড়াইয়া ফকির বিকট চীৎকার করিয়া লোকজনকে নমাজ পড়িতে আহ্বান করিত। বৃন্দাবন ঐ পথে বাইবার সময়ই ফকির বিশেষ করিয়া ঐরূপ চীৎকার করিত। বিরক্ত হইয়া বৃন্দাবন খানকদেক ইট ফেলিয়া দিয়া ঐ ফকিরকে তাড়াইয়া দেন। ফকির মুরসিদকুলি খাঁর নিকট নালিশ করে। কাজি মহম্মদ শরীফ্ এবং অপর একজন আইনজ্ঞ মুসলমান বিচারক এই মোকদ্দমার বিচারের ভার গ্রহণ করেন। কাজি মহম্মদ শরীফ্ প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া স্বহস্তে বৃন্দাবনকে বধ করেন। সদয়হৃদয় মুরসিদকুলি নাকি বৃন্দাবনের পক্ষে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কাজি ফকিরের প্রতি এত বড় গর্বিত অত্যাচারের মার্জনা করিতে কিছুতেই সম্মত হন নাই। কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত শত শত স্বর্ণমণ্ডিত দেব-মন্দির ভাঙ্গা বাহাদের নিত্যকর্ম ছিল, তাহাদের মসজিদ-নামদেয় ইষ্টক-তূপের একখানি ইট সরাইলে সে অপরাধের মার্জনা ছিল না। স্বয়ং আজিম ওয়ান যখন এই সংবাদটা আরঙ্গজেবের নিকট জানাইলেন, তখন আরঙ্গজেব লিখিলেন, “কাজি বাহা করিয়াছেন, তাহা ঈশ্বরানুমোদিত।” যখন এই কাজি শরীফ্ বার্কাকোর জন্ত অবসর প্রার্থনা করিলেন, তখন এই সচিবচরকে রাখিবার জন্ত সরকার হইতে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজা সীতারাম রায়

মুরসিদকুলি খাঁর রাজত্বের প্রধান ঘটনা—সীতারামের অভ্যুদয় ও পতন। সীতারামের পূর্বপুরুষ রামদাস খাঁ গজদানী বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। ইহার কায়স্থ দাস, কান্তপগোত্রীয়। রামদাস খাঁ এত বড় লোক ছিলেন যে তাঁহার পিতৃশ্রদ্ধে স্বয়ং রাজা গণেশ ও বহু উপস্থিত হইয়াছিলেন। কান্দী মহকুমার কুলিয়া গ্রামে ইহার বাস ছিল। তথায় ইহার নির্মিত দীঘি ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। অনন্তরাম এই রামদাসের পুত্র। অনন্তরামের দুই পুত্রের মধ্যে সীতারাম ধরাধরের দ্বারা জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তরাম হইতে বটস্থানীয় হিমকর দাসের পুত্র শ্রীরামদাস মুসলমান সরকার হইতে “খাঁ বিশ্বাস” উপাধি প্রাপ্ত হন

সীতারাম “বাঁ বিশ্বাস” মহাশয়ের প্রপৌত্র ও উদয়নারায়ণের পুত্র। ইহার উচ্চকূলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। রামদাস গজদানীর পর হইতে ইহাদের অবস্থার কতকটা অবনতি হইয়াছিল। সীতারামের পিতামহ হরিশ্চন্দ্র মোগল সরকারে কাজ করিয়া “রায় রায়” উপাধি লাভ করেন, তখন হইতে আবার এই পরিবারের অবস্থার উন্নতি আরম্ভ হয়।

বার ভূঞার অন্ততম ভূষণার রাজা মুকুন্দ রায় ও তৎপুত্র সত্রাজিতের মোগলদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও নিহত হওয়ার কথা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি। সত্রাজিতের মৃত্যুর পর উক্ত পরগনা তথাকার ফৌজদারের হাতে পড়ে। তখন মোগল সরকারের এক বিশ্বস্ত ক্ষত্রিয় সেনাপতি সংগ্রামসিংহ ভূষণার উপস্থিত ভোগ করিয়া রাজ্যগ্রহণে প্রবল হইয়া উঠেন। ইনি জোর করিয়া পূর্ববঙ্গের বৈষ্ণব-সমাজে মিশিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাহাদুরের পুত্র-কন্তা ইনি জোর করিয়া গ্রহণ করেন, তাহার “হাম বৈষ্ণব” নামক এক পৃথক্ থাক হইয়া বৈষ্ণবসমাজে কলঙ্কলাঞ্ছিত হইয়া আছেন।* মোগল সরকারে উদয়নারায়ণের বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তিনি ভূষণার কতকাংশ জমা লইয়া তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত হন। সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশে তেমন কেহ ছিলেন না। এখনও নালিয়া, মথুরাপুরী প্রভৃতি স্থানে সংগ্রামসিংহের অনেক মন্দির দৃষ্ট হয়। এই সময়ে মগ, পাঠান ও পর্তুগীজ দস্যুগণের দ্বারা ভূষণা বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। অনুমান ১৬৫৮-৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে উদয়নারায়ণের ঔরসে দয়াময়ীর গর্ভে সীতারামের জন্ম হয়।

উদয়নারায়ণ তহসিলদারের কার্য্য করিতেন, সীতারাম বাল্যকাল হইতে লেখাপড়ায় অমুরাগী ছিলেন, কিন্তু অল্পশব্দ লইয়া খেলা শিক্ষা করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। প্রতিভা চাপা থাকে না। তাঁহার অসাধারণ সাহস ও বিক্রমের কথা শীঘ্রই প্রচারিত হইল। তখন ভূষণা পরগনায় একদিকে মগদস্যু, অপরদিকে পাঠানবিদ্রোহী সীতারামের নিকট পরাভূত হইয়াছিল। মায়েস্তা বাঁ প্রীত হইয়া সীতারামকে ভূষণার অন্তর্গত নলদি পরগনা জায়গীর দিলেন।

এই পরগনা খুব বড় ছিল, কিন্তু দস্যুতন্ত্রের অত্যাচারে ইহা একরূপ জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। সীতারাম ইহার স্ত্রী একেবারে ফিরাইয়া দিলেন। মুকুন্দরায় ও সত্রাজিতের পর ভূষণা প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষপূর্ণ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। সীতারাম দস্যু-তন্ত্রের যমস্বরূপ ছিলেন। সে দেশের এক বড় দস্যু ছিল—তাঁহার নাম বক্তার বাঁ; এই দস্যুপতিকে পরাস্ত করিয়া সীতারাম বশব্দী হইলেন। বক্তার বাঁ সীতারামের সাহস ও অমিতবিক্রম দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বীয় দলবল লইয়া সীতারামের সৈন্তশ্রেণীভুক্ত হইলেন। অস্ত্রাস্ত্র দস্যুরা সীতারামের ডয়ে দূর দূরান্তরে চলিয়া গেল। নলদি পরগনায় শত শত লোক আসিয়া বাস করিতে লাগিল। সীতারাম বহু দীর্ঘ খনন

* কথিত আছে, বঙ্গদেশে আসিয়া ইনি বিজালা করেন, “এদেশে ব্রাহ্মণের পরে কোন জাতি শ্রেষ্ঠ?” উত্তরে শুনিলেন—“বৈষ্ণবজাতি”। তখন নিজ পরিচয়-স্থলে ইনি বলিলেন, “হাম বৈষ্ণব”।

করাইয়াছিলেন—প্রবাদ এই যে, এই দীর্ঘিকা-খনন-ব্যাপারের অগ্রতম উদ্দেশ্য সৈন্ত সংগ্রহ করা। প্রকাশ্যভাবে সৈন্ত সংগ্রহ করিলে উহা নবাবের নজরে পড়িতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি দীর্ঘি-খননকারী সহস্র সহস্র লোককে রাত্রে সামরিক শিক্ষা প্রদান করিতেন। একদল লোকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া নূতন দল নিযুক্ত করিতেন। এই ভাবে রাজ্যের বহু লোক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শিখিয়াছিল। প্রয়োজন হইলে তাহারা সীতারামের আশ্রানে একত্র হইয়া যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইত। তাহার পরগনায় মগ, পাঠান ও দস্যুদের অত্যাচার নিবারিত হইয়া শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মায়েস্তা বাঁ সীতারামের বিক্রম ও দস্যু-নিবারণের কথা শুনিয়া বরং প্রীত হইলেন। তিনি আরঙ্গজেবের নিকট হইতে ‘রাজা’ উপাধির সনন্দ আনাইয়া তাহাকে দিলেন। অমুহূর্তে ১৬৮৭-৮৮ খৃঃ অব্দে সীতারাম এই ‘রাজা’ উপাধি প্রাপ্ত হন।

নলদি পরগনা বহুজননিবাসে পরিণত হওয়াতে ইহার আয় খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, তাহা ছাড়া সাঁতের পরগনার অনেকটা তিনি তালুক হিসাবে লইয়াছিলেন। তাহার প্রত্যপ এখন প্রবাদবাক্যের মত লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইল। তিনি বিপুল উৎসবে পিতৃশ্রদ্ধ করিলেন। সেকালে এই ব্যাপারে তাহার ২৮,২৭২, টাকা ব্যয় হইয়াছিল। সতীশ মিত্র বলেন, “এখনকার দিনে উহা অনান দুই লক্ষ টাকার সমান।” (৫৩৯ পৃঃ)। রাজা উপাধি প্রাপ্তির পর ইনি মহম্মদপুরে রাজধানী স্থাপনপূর্বক বেক্সবাহু ঘটার সহিত অভিযোক্তাংসব করিয়াছিলেন, বহুদিন কোন হিন্দু রাজা বাঙ্গলায় সেরূপ করেন নাই। লোকে মুখে মুখে গাহিয়া বেড়াইত—“ধন্য রাজা সীতারাম বাঙ্গলা বাহাদুর। যার বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেল দূর ॥ বাঘ মানুষে একুই ঘাটে স্থখে জল খায়। রামী-শ্রামী পুঁটলী বাঁধি গঙ্গাগানে যায় ॥”

শৈশব হইতে শিবাঙ্গির মত সীতারাম সার্বভৌম হিন্দুরাজ্যপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাহার উদ্দেশ্যসাধনে কয়েকজন অক্লান্তকর্মী মহাবীর তাহার সহায় হইয়াছিলেন, ইহাদের একজনের নাম “মেনা হাতী।” বস্তুতঃ তাহার বিরাট দৃষ্টপুষ্টি দেহ ও বলিষ্ঠ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিলে তাহাকে ছোটখাট একটি হাতী বলিয়াই মনে হইত। দস্যুরা ইহার নাম শুনিলেই অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া পালাইত। ইহার প্রকৃত নাম রামরূপ ঘোষ (আকনার দক্ষিণ-বাড়ীর ঘোষবংশীয়)। অপর একজনের নাম মুনিরাম ঘোষ—খুলনা জেলার বঙ্গজ কায়স্থ। মুনিরামের ঊঃসাহসিক মনুষ্য ও মেনা হাতীর দৈহিক বল ও অদম্য বীরত্ব—সীতারামকে সর্বকার্যে প্রবুদ্ধ করিত। ইহা ছাড়া পাঠান বক্তার বাঁ, মোগল আমল বেগ, রূপচাঁদ ঢালী ও ফকির (মাছকাটা) প্রভৃতি সেনাপতিও যুদ্ধকালে তাহার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিল। এই নবগঠিত বীরদলের মধ্যে অনেকে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, ইহাদের মধ্যে সীতারামের জীবনীলেখক অন্ধ বছবাবু রথো, রামা, শুস্তো, শ্রামা, বিশে, হরে, কালা, নিমে, দীনে, ভুলো, জগা ও মেধো—এই বীরজন প্রধান দস্যুবীরের উল্লেখ করিয়াছেন, সকলেই বাঙ্গালী ছিল এবং শেষে সীতারামের দলভুক্ত হইয়াছিল। রাজা সীতারাম পাঞ্জাব

হইতে শিখ, নেপাল হইতে গুর্খা আমদানী করেন নাই। বাঙ্গালী রাজা বাঙ্গলার ভাইদের লইয়া দেশের অনাচার-নিবারণের জন্ত লড়াই করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানে ভেদ দেখেন নাই। এসম্মুখে পন্নীকবি সেই সময়ে এই গানটি বাধিয়াছিলেন—“শুন সবে ভক্তিভরে করি নিবেদন। দেশ গায়েতে বাহা হইল তার বিবরণ ॥ রাজাদেশে হিন্দু বলে মুসলমানে ভাই। বাজে লড়াই কাটাকাটির নাহিক বালাই ॥ হিন্দু বাড়ীর পিঠে কাসন (কাসন্দী) মুসলমানে খায়। মুসলমানের নস (রস) পাটালী হিন্দুর বাড়ী যায় ॥ রাজা বলে আরা হরি নহে দুইজন। ভজন পূজন যেমন ইচ্ছা করুক সে তেমন ॥ মিলে মিশে থাকা স্বখে, তাতে বাড়ে বল। ভয়েতে পলায় মগ ফিরিঙ্গীর দল ॥ চুলে ধরে নারী লয়ে চড়তে নারে নাথ। সীতারামের নাম শুনিয়া পলাইয়া যায় ॥” (যতুবাবুর—সীতারাম ১১২ পৃঃ)। সীতারাম হিন্দুরাজার আদর্শ লইয়া যে স্ব-শাস্তির সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন তাহা এই দেশে টিকিল না। এই ভ্রাতৃবিরোধধর্ম, স্বার্থান্ধ, পরশ্রীকাতর—ঐক্যহীন উর্বর মরুভূমিতে স্বর্গের কর্তৃত্বের চারা বাড়িবে কিরূপে?

সীতারাম ক্রমশঃ তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সম্রাজ্ঞিতের মৃত্যুর পর ভূষণা পরগনার অনেকাংশ অবশেষে কালীনারায়ণ নামক এক ব্যক্তির হস্তগত হয়। ইহার পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদের মৃত্যু হইলে সেই জমিদারীর শিশু মালিকগণের পক্ষে সীতারাম অভিভাবক হইয়া রূপাপাত, লোকভানী, রকনপুর প্রভৃতি পরগনা শাসন করেন। মামুদসাহী পরগনার ভূস্বামী রামদেবের জমিদারীর পূর্বাংশ সেনাপতি মেনা হাতী বলপূর্ব্বক দখল করেন। উত্তরে ষাণ্ডার নিকটবর্ত্তী নান্দুয়ালীতে শচীপতি মজুমদার নামক এক বৈষ্ণব জমিদার ছিলেন, সীতারাম তাঁহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন। “উত্তরে পদ্মা পর্বাশ্রু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারিগুলি সীতারামের হস্তে আসে” (সতীশ বাবু—৫৫৭ পৃঃ)। সাউন্ডের উত্তরে নসিব ও নসরৎ নামক দুই পাঠান বিদ্রোহী হইয়াছিল। সীতারাম নবাবকর্তৃক ইহাদিগকে দমন করিবার ভার প্রাপ্ত হন। এই সুযোগে তিনি অনেকগুলি নতুন দুর্গ ও মহম্মদপুরে কামান প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করেন। পাঠানেরা সহজেই পরাভূত হয়, এবং নবাব সরকারে তাঁহার প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া যায়। চাঁচড়ার রাজা মনোহর রায়, মীর্জানগরের ফৌজদার নূরউল্লা খাঁর সাহায্যে সীতারামের রাজধানী আক্রমণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন। তখন সীতারাম তাঁহার দুর্গতির একশেষ করিয়াছিলেন (১৭০৩ খৃঃ)। সুন্দরবনের জায়গীর সীতারামের ছিল, কিন্তু কতিপয় জমিদার প্রজাদিগকে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করেন। রাজা স্মরণ তথায় যাওয়াতে সকলে নিরস্ত হইয়া যায়। এই সূত্রে নলদী, তেলিহাটা ও মকিমপুর তাঁহার হস্তগত হয়। জানকী বিশ্বাস মজুমদার নামক এক বৈষ্ণবজমিদারের বংশধরেরা সুলতানপুর খড়্গিয়া পরগনার মালিক ছিলেন। সীতারাম এই সমস্ত জমিদারের নিকট হইতেই রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন। বাগেরহাট-রামপালে বিদ্রোহী জমিদারদের সঙ্গে তাঁহার একটা খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি রামপাল জয় করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রদত্ত সনদে তাহা পাওয়া যায়। পরমধুদিয়ার নিকটে “রগভূম” বা রণের মাঠ নামক একটা স্থান

আছে, সম্ভবতঃ এইখানে যুদ্ধ হইয়াছিল। সীতারাম এইবার চিকলিয়া, মধুদিয়া প্রভৃতি পরগনা অধিকার করিয়া লইলেন।

যশোর খুলনার ইতিহাস-লেখক সতীশ বাবু বলেন “সীতারামের রাজ্য পদ্মার উত্তর পার হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গোপসাগরের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।” (৫৬৩ পৃঃ)। উত্তরে পাবনা, দক্ষিণে ভৈরব নদ, পশ্চিমে মামুদসাহী পরগনা—তেলিহাটা পরগনার শেষ। এই এক অংশ, আর দ্বিতীয় অংশ—দক্ষিণে সুনন্দরবনের আবাদী মহল, উত্তরে ভৈরব নদ হইতে আবাদ শেষ, পূর্বে বালেখর হইতে বরিশালের কতকাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিস্তৃত অধিকার ৪৪টি পরগনায় বিভক্ত ছিল এবং ইহার আয় তখনকার দিনে এককোটি টাকার উপরে হইত।

মোগলেরা সীতারামকে এতদিন পর্য্যন্ত প্রশ্রয় দিয়াছিলেন কেন?—তাহার একমাত্র কারণ—তাহারা হিন্দুজমিদারদিগকে নগণ্য মনে করিয়াছিলেন, জনশ্রুতিতে যত কিছু শোনা যাইত, নবাব তাহা কাণে আনিতেন না। সীতারামের স্বশাসনে মুসলমানেরা প্রীত ছিল। তৎকালে নবাবেরা পাঠানদিগকে ও মগদিগকে আশঙ্কা করিতেন। সীতারাম নবাবের পক্ষ হইয়া হুদাঙ্গ পাঠান ও মগদিগকে দলন করিয়াছিলেন, ইহাতে সারোস্তা বা প্রমুখ শাসনকর্তারা বরং তাহার উপর প্রীতই হইয়াছিলেন। সীতারাম যে রাজস্ব দিতেন না—ইহাতে তাহারা এই কারণে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধির একটা সীমা আছে, সীতারাম যখন সে সীমানা লঙ্ঘন করিয়া গেলেন, তখন তাহার প্রতি নবাব সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

পাঠান-নির্ঘাতনের অছিলায় সীতারাম বহু দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, দীর্ঘিকা-খননের উপলক্ষে তিনি রাজ্যের শতসহস্র প্রজাকে সামরিক শিক্ষা দিয়াছিলেন, দস্তাদলন-প্রচেষ্টায় তিনি বহু দস্তাকে করতলগত করিয়াছিলেন। তাহার সৈন্তশ্রেণীতে হিন্দু, পাঠান, মোগল প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোক রাজভক্তিপরায়ণ ও সমুদ্বিগ্ন ছিল।

এইভাবে বলসংকল্পপূর্বক সীতারাম রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি মহম্মদপুরের দুর্গকে অতি দুর্গম করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিশাল অরণ্য ও তিনদিকে বিল পরিবেষ্টিত থাকায় নিভৃত প্রদেশে তিনি স্বদেশী কর্মকারকর্তৃক বড় বড় কামান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মহম্মদপুর বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইল। রাজার আয় বাড়িয়া গেল। রাজা নিজে বিদ্বান ছিলেন। শৈশবে তিনি টোলে সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গলা ও উর্দু খুব ভাল জানিতেন। জয়দেব ও চণ্ডীদাসের পদ খুব ভাল করিয়া আবৃত্তি করার পুরস্কারস্বরূপ তিনি জগন্নাথ চক্রবর্তীকে জমি দান করিয়াছিলেন—সেই সনন্দে লিখিত ছিল—“পরমপূজনীয় জগন্নাথ চক্রবর্তী শ্রীচরণে—আমার জমিদারি পরগনে মাহিমসাহীর হোগলডাঙ্গা ও কল্যাণপুর গ্রামে বার পাখী ও পরগণে নলদীর নারায়ণপুর ও নহাটি গ্রামে আট পাখী জমি আপনার চণ্ডীদাস ও জয়দেবের মুখস্থ কবিতা শুনিবার জন্য ব্রহ্মোত্তর দিলাম—আপনি পুরুষাত্মকমে আশীর্বাদ করিয়া ভোগদখল করুন। সন ১১১৩, তাং এই বৈশাখ (১৭৭৭ খ্রঃ)। মহম্মদপুর অঞ্চলে

পূর্ক হইতেই শিল্পের খ্যাতি ছিল। সীতারাম শিল্পের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন। এখনও নালিয়া গ্রামে সাত হাত উচ্চ নানারূপ কারুকার্যশোভিত চিনির মঠ, বধ, ময়ূরপঙ্খী প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য পাওয়া যায়—ময়ূরারা চিনির যে কদমা এখনও তৈরী করিয়া থাকে—তাহার অধিকারে তাহার বেড় ছই হাত এবং উচ্চতায় দেড় হাত হইত। এই জিনিষটা তুলার ছায় হাকা, কাজ এত স্বল্প ও সুন্দর যে মনে হয় এত বড় কদমাটা দু দিলে উড়িয়া যাইতে পারে। তাহারই রাজধানীর নিকটবর্তী স্থানে অতি স্বল্প বঙ্গ তৈরী হইত, এখন তাহার লুপ্ত গৌরবের চিহ্ন আছে। সাতেরের পাটী ও মাছর একসময়ে ভারতবিশ্রুত ছিল। কয়েক বৎসর মাত্র অতীত হইল তখনও এমন কারিগর বর্তমান ছিল যে ৫০০ টাকা মূল্যের মাছর তৈরী করিতে পারিত। তাহারই মন্দিরাদির ইটে যে কারুকার্য দৃষ্ট হয়, তাহা বঙ্গ স্বল্প শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কাঠের উপর, কাগজের উপর তাহার সময়ের যে কত সুন্দর সুন্দর কারুকার্যের নমুনা আমরা পাইয়াছি তাহাতে মনে হয়, বীর সীতারাম রায় কেবল যুদ্ধবিজ্ঞায় দেবসেনাপতির পূজা করিতে অর্থা প্রস্তুত করিয়া ক্ষান্ত রহেন নাই, তিনি স্বর্ণপদ্মের ডালি অর্থা দিয়া বঙ্গের কলালঙ্কার পূজা করিতেন। ভূষণা পরগনা পূর্ক হইতে বঙ্গ ও কাগজ প্রস্তুত করার জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল (“বনাত-মখমল-পটু ভূষণাই খাসা। বুটাদার ঢাকাই দেখিতে তামাসা।” রামপ্রসাদ—বিদ্যাসুন্দর।) ভূষণাই কাগজ সেকালে বঙ্গের সর্বত্র সুপরিচিত ছিল। আমরা ইতিপূর্বে এই অঞ্চলের যে শিল্পমণ্ডিত ঘরের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও সীতারামের রাজধানীর অনতিদূরবর্তী। মহম্মদপুরে এখনও কাচার নামক একজাতীয় লোক বাস করে, তাহারা কাচের চুড়ী প্রস্তুত করিত। গালা, মোম, তামা, পিত্তল, কাঁসা এবং সোণারূপার কারুশিল্পের জন্ত সীতারামের ভূষণা বিখ্যাত ছিল। মুরসিদাবাদ নবাববাড়ীর যে স্রবহৎ কামান আছে—তাহা ঢাকার জনাঙ্গিন কামার ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে নির্মাণ করিয়াছিলেন, পিত্তলফলকে এই কথাই উৎকীর্ণ আছে। এই কামানের নাম “জাহান-কোবা” বা “জগজ্জয়ী”। সীতারাম এই জনাঙ্গিন কর্শকারের স্বজাতীয় শিল্পীদিগকে ঢাকা হইতে আনিয়া মহম্মদপুরে উপনিবিষ্ট করেন। তাহারাই তাহার সুবিখ্যাত “কালু খাঁ ও কুমঝুম খাঁ” নামক কামান নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঢাকায় উক্ত নামধেয় কামানদ্বয়ের মত একটি বৃহৎ কামান আছে, তাহা সীতারাম রায়ের কি না বলিতে পারি না। সীতারামের বহু পুত্রপৌত্র ও দীঘি এখনও বিজ্ঞমান। ইষ্টকমন্দির নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই সকল দীঘির পুণ্য নীর এখনও সুপের। সর্কাপেক্ষা বড় দীঘি “রামসাগর”, এখনও পাহাড় লইয়া তাহার বেটনৌ ৬,০০০ হাতের কম হইবে না, ইহার বর্গফল অন্যান ২০০ বিঘা। “সুখসাগর” নামক দীঘিতে গুরুতর রাজ্যশাসন ও যুদ্ধবিগ্রহের শ্রান্তি দূর করিবার জন্ত নানা কারুশিল্পমণ্ডিত “ময়ূরপঙ্খী” নৌকাতে বহু রমণী-পরিবৃত হইয়া ‘বিলাসী’ সীতারাম নৌরিহার করিতেন। অতি জটিল ও কঠিন রাজনৈতিক সমগ্রাপূর্ণ তাহার জীবন, যিনি দরিদ্র অবস্থা হইতে সার্কভৌম সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাকে ‘বিলাসী’ বলা মূর্থতা, তবে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও রুচি অল্পগত “একপত্নীক” ধর্ম তখনও বঙ্গদেশে প্রচলিত

হয় নাই, নর্তন, গান, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আমোদপ্রমোদজনিত ক্ষণিক স্বথভোগে তখনকার বড়লোকেরা নৈতিক বিভীষিকা দেখিতেন না। ‘স্বথসাগর’ ছাড়া ‘কৃষ্ণসাগর’ ও অন্যান্য দীর্ঘিও এই মহাপ্রাণ ব্যক্তির সাধারণের হিতকামনার নিদর্শনস্বরূপ রহিয়াছে।

সীতারামের রাজসভা বহুপণ্ডিতমুখরিত ছিল। তাঁহার রাজ্যে বাকুইখালি, নালিয়া, নহাটা, বাটাঙ্গোর প্রভৃতি স্থান বৈদিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের কেন্দ্রস্থান ছিল। পলিতা নহাটার প্রসিদ্ধ ভাস্করানন্দ আগমবাগীশ, বৈষ্ণবচূড়ামণি কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। আগমবাগীশ মহাশয় তৎসম্বন্ধে বাদ্রলায় এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন; “ভাস্করে উদয়ভাস, উদয়নারায়ণ দাস, তনয় রাজেন্দ্র সীতারাম। গুণেন্দ্র, দেবেন্দ্র তর্কি, ভূ-অধিপতি, ভূবণে ভূষিত গুণগ্রাম।” “বৈষ্ণুকুল-প্রদীপ” অভিরাম কবীন্দ্র-শেখর কবিরাজ রাজসভার অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের, জ্ঞান তিনি রাজার নিকট হইতে “মহোপাধ্যায়” উপাধি পাইয়াছিলেন (সতীশবাবু, ৫৬৮ পৃঃ)। “অভিরামঃ কবীন্দ্রোহসৌ সীতারামাচ্ছিত্তি ভূপতেঃ। মহোপাধ্যায়পদবীং মহৎপূরীমবাপ্তবান্” (রামতনু হড়—কুলপঞ্জী)। সীতারামের সভায় দর্শন, সাহিত্য, জ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রের সর্বদা আলোচনা চলিত। “তিনি মুসলমান প্রজাদের শিক্ষার জন্ত মৌলভী-দ্বারা বহুসংখ্যক মক্তব খুলিয়াছিলেন” (সতীশবাবু, ৫৬৯ পৃঃ)।

সীতারামের “দোলমঞ্চ”, “দশভুজার মন্দির”, “কৃষ্ণজীর মন্দির”, “রামচন্দ্রবাটা”, “পঞ্চরত্ন” প্রভৃতির উদ্ভাবনশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। তাঁহার মালধী গ্রামের প্রসিদ্ধ দুর্গ, কালিকাপুরের গড়, এমন কি মহম্মদপুরের দুর্গ এখন টিপিতে পরিণত।

একটি দরিদ্র বালক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বীয় প্রতিভাবলে আদর্শ হিন্দু-সাম্রাজ্য গড়িতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। প্রথমজীবনে তাঁহার দুই অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন, রামজীবন ও রামরূপ (মেনা হাতী), উহারাই তাঁহার আজীবন-সঙ্গী। কত গভীর রজনীর পরামর্শ, কত উদ্বেগ, কত জীবন-পণ যুদ্ধ, যগ-পাঠান-হিন্দু-দস্যুর সহিত সংঘর্ষ, কত কষ্ট ও বিপৎসঙ্কুল অভিযান ও বিলবেষ্টিত স্থানে দুর্গম রাজধানীতে কামান-নির্ধাণ, দীর্ঘ-খননোপলক্ষে দুর্দর্শ বাদ্দালী সৈন্যের সৃষ্টি—একটা অজ্ঞাত অরণ্যপ্রদেশকে সহসা বাহুমন্ত্রপ্রভাবে যেন রত্ন-মেখলা সৌবিকিরীটিনী লঙ্কার মত করিয়া গড়া এবং বিজ্ঞা, শিল্প, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের প্রতিষ্ঠা এবং বাণিজ্যের বিলাসক্ষেত্ররূপে গড়িয়া তোলা—প্রজাদিগকে রামরাজ্যের স্বপ্ন সফল করিয়া প্রদর্শন—১৬৯০ খৃঃ হইতে ১৭১২ খৃঃ—এই স্বল্প ছাব্বিশশত-বর্ষব্যাপী অধ্যবসায়ে “দিল্লীখরো বা জগদীখরো বা”—সেই সাহান সা সম্রাটের বিরুদ্ধে অটল প্রতিজ্ঞায় দাঁড়ানো—এভাবে এতটা বড় স্বপ্ন আর কোন্ বাদ্দালী গত চারিশত বৎসরের মধ্যে এতটা সফলতার দিকে আনিতে পারিয়াছেন? হিন্দু-মুসলমানে এই প্রীতি, জাতিধর্ম্মনির্কির্শেবে গুণগ্রাহিতা, কায়স্থ হইয়া বৈষ্ণ পণ্ডিতকে “মহোপাধ্যায়” উপাধিপ্রদান, মন্দির ও মসজিদ, চতুষ্পাঠী ও মক্তব একত্র প্রতিষ্ঠা, জয়দেব ও চণ্ডীদাসের গীতি শুনিয়া নিকর জমিদান, শিল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং রাজধানীর “মহম্মদপুর” নামকরণ—এমনভাবে প্রতাপাদিত্যের পরে আর কে

করিয়াছেন? অপর মহাবীরেরা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু সীতারাম তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের গঠন-শক্তি সর্বদিকে সপ্রমাণ করিয়াছেন। যখন মুরসিদকুলি খাঁ রাজস্ব দেওয়ায় দেরি হইলে ব্রাহ্মণ জমিদারদিগকে ধরিয়া ধরিয়া ‘বৈকুণ্ঠে’ নিক্ষেপ করিতেন, সেখানে পুরীষমিশ্রিত জল তাঁহাদিগকে গলাধঃকরণ করিতে হইত, তখন সীতারাম অটলভাবে দাঁড়াইয়া জমিদারদিগকে বলিতেন, “রাজস্ব দেওয়া বন্ধ কর।” তিনি জানিতেন—এই সংঘর্ষ শুধু মুরসিদাবাদের সঙ্গে নহে, সমস্ত ভারত-সাম্রাজ্যের মালিকের—হিমাদ্রিপ্রমাণ গুরুতর রাষ্ট্র-শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ, সেই বিশাল যন্ত্রের নিষ্পেষণে তাঁহার মহম্মদপুর বৃদ্ধদের মত বিলীন হইবে। পতঙ্গ যেমন অগ্নিকুণ্ডে স্বেচ্ছায় ঝাঁপাইয়া পড়ে—সেইরূপ তিনি এই বিপদকে বরণ করিয়া লইলেন। এ যুদ্ধ দাঁউদের সঙ্গে আকবরের যুদ্ধ নহে—দ্বাদশ ভৌমিকের সমবেত শক্তির সহিত মানসিংহের যুদ্ধ নহে, জয়পরাজয় সে সকল ক্ষেত্রে অনিশ্চিত ছিল, এই যুদ্ধ নগণ্য মহম্মদপুরের সঙ্গে দিল্লীর বাদশাহের। এ সকল জানিয়াও তিনি মুরসিদকুলি খাঁ-কৃত হিন্দুজমিদারদের অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না, ফৌজদার তরপ খাঁকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি রাজস্ব দিবেন না। মেনা হাতীর সঙ্গে যুদ্ধে তরপ খাঁ নিহত হইলেন। যে সকল হিন্দু জমিদার তাঁহার শাসনে গরুড় পক্ষীর ছায় হইয়া ছিলেন, তাঁহারাই রং বদলাইয়া মুরসিদকুলি খাঁর পক্ষাশ্রয়পূর্বক সীতারামকে টিটকারী দিতে লাগিলেন। স্বয়ং দয়ারাম রায় বক্সার খাঁর সঙ্গে যোগ দিয়া মোগল সৈন্তের নেতা হইয়া মহম্মদপুরে অভিযান করিলেন, গুপ্ত গুপ্তা লাগাইয়া মেনা হাতীকে অতর্কিতভাবে বধ করিলেন। মুরসিদকুলি শত্রু হইলেও ততটা হীন ছিলেন না, তিনি সেই বিশাল নরমুণ্ড দেখিয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, “তোমরা কি করিয়াছ? এরূপ বিশালকায় বীরকে না মারিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনা উচিত ছিল।” (“The Nawab seeing the huge head said, ‘A man like that you should have brought alive and not killed!’ He directed the head to be taken back to Muhammadpur and it was there buried and a great tomb raised over it.” Westland’s Report, p. 27.) সীতারামের সহিত বারাসিয়ায় মোগলদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে ৬০০ মুসলমান সৈন্য নিহত হয়।

দয়ারামের দ্বারাই সীতারামের পতন ঘটে। শেষ পর্য্যন্ত মহম্মদপুরের দুর্গ সমাশ্রয় করিয়া তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বন্দী হইয়া তিনি মুরসিদাবাদে নীত হন। তাঁহার বহু পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কেহ পূর্বে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার তিন বিবাহিতা পত্নীর মধ্যে একজন শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কোন ফিরিঙ্গী লেখক আপনাকে সীতারামের বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া পত্নীগণ ভাষায় বই লিখিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরমহলের বহু রমণীর মধ্যে ছই একজন ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ভুক্ত থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

তাঁহার দেশীয় লোকের শত্রুতার ফলে তাঁহার পতন হইয়াছিল, তাঁহার রাষ্ট্রনীতি আদর্শ-নরপতির যোগ্য ছিল। তাঁহার সংগঠন-প্রতিভা সম্রাটের যোগ্য ছিল। অদম্য বীরত্ব, সাহস, ছায়াবোধ প্রভৃতি গুণে তিনি জগন্নাথ মহাবীরদের পর্য্যায়ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত।

তিনি নিজের দোষে বিনষ্ট হন নাই। “জাতি যদি অভিযোগে, গন্ধে পান্থা থমে—” নিজের লোক যদি পর হয়—স্বজাতি যদি দ্রোহী হয়—তবে বিনাশ অনিবার্য। ভারতের ইতিহাস—বিশেষ হিন্দুজাতির ইতিহাস পুনঃ পুনঃ এই কথাটা প্রমাণ করিয়াছে। যেদিন তাঁহার শৈশবসঙ্গী, নিত্যসহচর, উচ্চাকাঙ্ক্ষার অংশীদার, রাজ্যের প্রধান ভিত্তি “মেনা হাতী”র মৃত্যু হইল—বাহার সহায়তায় তিনি শত দস্যুর অত্যাচার হইতে বঙ্গদেশকে বাঁচাইয়াছেন—যিনি জগতে জায়রাজ্যস্থাপনের জন্য রাউণ্ড টেবলের নাইটের ছায় আর্থারতুল্য রাজার পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন, কতদিন রাত্রিতে জল্পনা করিয়া পরদিনই তাহা কার্যে পরিণত করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন, সেই চিরস্মৃদ্ধ মেনা হাতীর মৃত্যুসংবাদ যখন পৌঁছিল, সেদিন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়াছিল—তাঁহার দূরকল্পন আজও আমরা আমাদের হৃদয়ে অনুভব করিতেছি। ১৭১২ খৃঃ অব্দে সীতারামের মৃত্যু হইয়াছিল। জন্ম ১৬৫৮(৬০)—মৃত্যু ১৭১২, সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৪ অথবা ৫২ বৎসর হইয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পরবর্তী বাদসাহগণ

মুরসিদকুলি খাঁর সময়ে ইংরেজদের বাণিজ্যসংক্রান্ত অনেক গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইংরেজেরা বৎসরে শুধু ৩,০০০ টাকা দিয়াই মুক্তি চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দুদের ও অন্যান্য প্রজাদের প্রতি যে ব্যবহার, তাহা হইতে বেশী সুব্যবস্থা চাহিয়াছিলেন। মোগল এবং আরব বণিকেরা যেরূপ সর্বদা শুরু হইতে মুক্ত, ইংরেজেরা সেইরূপ মুক্তি পাইতে আবদার করিয়াছিলেন। নবাব এই আবদারের প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি স্বজা বাদশাহের মঞ্জুরী-পত্র অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি জানিতেন উৎকোচ দিয়া ইংরেজ বণিক রাজকর্মচারীদের বশীভূত করিয়া অনেক সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন। স্বজার মঞ্জুরী দলিল যখন নবাব একখণ্ড ছিন্ন কাগজের মত উড়াইয়া দিলেন, তখন তাঁহারা স্বভাবতঃই ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট ফেরোজসেয়ারের নিকট আবেদন করিলেন। এই উপলক্ষে জন অরম্যান সম্রাটকে যে বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠাইলেন, তাহার মূল্য ৩০,০০০ পাউণ্ডের কম নহে। ইংরেজদের পক্ষীয় খোজা সরহাদ সম্রাটের নিকট ঐ মূল্যকে অতিরঞ্জিত করিয়া ১,০০,০০০ পাউণ্ড বলিয়া বর্ণনা করিলেন, সম্রাট সেগুলি যাহাতে নিরাপদে পৌঁছিতে পারে, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু এত খরচ করিয়াও ইংরেজেরা খুব সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। নবাব দেখিলেন, ইংরেজেরা তাঁহাকে ডিঙ্গাইয়া খুব অন্তায়রূপ দাবী করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং ওমরাদিগকে বিস্তর উৎকোচ দিয়া কাজ উদ্ধার করিতে উদ্বেগী। তিনি তাঁহার ভ্রাতা প্রধান মন্ত্রী হুসেন আলি খাঁর দ্বারা আবেদনের বিরুদ্ধতা করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন, কিন্তু

এই সময়ে দৈব ইংরেজদের সহায় হইল। ফেরোক্সেসয়ার রাজপুত্ররাজগণের অস্তুতম রাজসিংহের সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিবেন, সব ঠিকঠাক, এমন কি কন্যা রাজধানীতে আনীত হইয়াছেন,—এই সময়ে সম্রাট গুরুতর পীড়াগ্রস্ত হইলেন, দেশী চিকিৎসকেরা হার মানিল। ইংরেজদের ডাক্তার হামিলটন অস্ত্রোপচার করিয়া সম্রাট ফেরোক্সেসয়ারকে শীঘ্র শীঘ্র ভাল করিয়া দিলেন। তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন, ডাক্তার যাহা চাহিবেন তাহাই দিবেন। ডাক্তার নিজের স্বার্থ না খুঁজিয়া তাহাদের আবেদন-মঞ্জুরীর প্রার্থনা করিলেন। বিবাহোৎসবের গোলমালে ছয়মাস কাটিয়া গেল। ফেরোক্সেসয়ার হামিলটনকে অনেক বহুমূল্য উপহার ও জাতীয় সুবিধার কয়েক দফা মঞ্জুর করিয়া দিলেন, কিন্তু বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়গুলিসম্বন্ধে মন্ত্রিবর্গকে রিপোর্ট করিতে বলিলেন। আবেদন যাইয়া পড়িল হসেন আলি খাঁর কাছে। সুতরাং আবার বিভ্রাট। অস্ত্রপুরের এক খোজাকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করা হইল। মহাভিকের দত্ত ঔষধের মত এই উৎকোচের ক্রিয়া তখনই দেখা গেল। কিন্তু নবাব বাদশাহদেশে তাহা কার্যে পরিণত হওয়ার পথে, প্রকাশ্যভাবে না পারিয়া, নানারূপ বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। একটা দফা এইরূপ ছিল যে, ইংরেজগণ কলিকাতার পার্শ্বে ৩৮টি নগর কিনিতে পারিবেন। সর্বনাশ, তাহা হইলে তাহারা এত বড় হইয়া উঠিবেন যে ফোর্ট উইলিয়ামের জোরে পদে পদে তাহারা নবাবের প্রতিপক্ষতা করিতে সাহস করিবেন। নবাব জমিদারদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, যত মূল্যই দিক না কেন তাহারা যেন বিদেশীদিগের নিকট জমি বিক্রয় না করেন। তবে কলিকাতার মুরসিদকুলি খাঁ ফেরোক্সেসয়ারের মঞ্জুরী দলিলের বলে যে সকল সুবিধা দিলেন, তাহাতে তাহাদের অবস্থাবিশেষ উন্নতি হইল।

এই সময়ে ফেরোক্সেসয়ার নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন (১৭১৯ খৃঃ)। মহম্মদাবাদের পাঠানেরা পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছিল, কিন্তু হুগলীর ফৌজদার আসান আলি খাঁ তাহাদিগকে দমন করেন। তাহারা মুরসিদাবাদের নিকট সরকারী ৬০,০০০ টাকা লুট করিয়াছিল। মুরসিদকুলি খাঁ সেই টাকা পার্শ্ববর্তী জমিদারদিগের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইলেন। তাহারা কেন পাঠানদিগকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—এই অপরাধে পাঠানদের সমস্ত জমিদারি তিনি তাহার প্রিয় রামজীবন নামক এক হিন্দুকে প্রদান করেন। রামজীবন রাজসাহীর জমিদার ছিলেন। নবাব ত্রিপুরা, আসাম ও কুচবিহারের রাজাদের সঙ্গে প্রীতিস্থিত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এই সকল রাজারা একরূপ স্বাধীনই ছিলেন। নবাবের অত্যাচারে বঙ্গের হিন্দুজমিদারদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল; কেবল বীরভূম ও বনবিষ্ণুপুরের রাজারা অনধিগম্য আরণ্য-রাজধানীতে কতকটা নিরাপদ হইতে পারিয়াছিলেন।

মুরসিদকুলি খাঁ হিন্দু ব্রাহ্মণ-সম্মান হইয়া হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যে গৌড়ামি দেখাইয়াছেন, তাহা ধর্মদ্রোহী, অপর ধর্ম্মাশ্রয়িগণই সর্বদা দেখাইয়া থাকেন। তিনি মোগল-সম্রাট আরঙ্গজেবের প্রিয় ওমরাহ ছিলেন এবং দোষেগুণে সেই নৃপতিই তাহার আদর্শ ছিলেন। তিনি ২০,০০০ মৌলভী ও গায়ক রাজসভায় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন, তাহারা সদাসর্বদা তাহার কাছে

কোরান আবৃত্তি করিতেন। মুসলমানী উৎসবগুলি তিনি খুব জাঁকজমকের সহিত সম্পাদন করিতেন। কথিত আছে, তিনি একদ্বী-নিষ্ঠ ছিলেন, আহারে, বিহারে ও পরিচ্ছদে সংযত ছিলেন—কথা বলিয়া তিনি কখনই তাহা লঙ্ঘন করেন নাই। মুসলমান লেখকেরা তাঁহার খুবই প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার সদগুণগুলি একমাত্র গোঁড়াদলই বেশী দেখিতে পাইতেন,—বাহিরের লোক—বিশেষতঃ হিন্দুরা—তাঁহার উদ্ভাবিত ‘বৈকুণ্ঠ’ নামক নরক ও শত প্রকার অপমান ও যন্ত্রণাদায়ক বিধানের ভয়ে সশঙ্ক থাকিতেন। কাফেরের ছুং ছুং নয়—কাফের ও বলির পশুর চীৎকার উপেক্ষণীয়—উহারা প্রকৃত ধর্মপরায়েণের হাতে নিহত হইলে অক্ষয় স্বর্গলোক পাইবে—সুতরাং তাহাদের জন্ত বাহারা ছুং করে—তাহারা বুদ্ধিহীন।—এই সকল গোঁড়া মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসগুলির পার্শ্বে হাফেজের এই উক্তি সোণা দিয়া লিখিয়া রাখা উচিত—“মদ খাও, কোরান পুড়াইয়া ফেল, কাবা-মন্দিরে আগুন ধরাইয়া দাও, পৌত্তলিকেরা যেখানে বাস করে সেইখানে ঘাইয়া গৃহ নির্মাণ কর—কিন্তু ভাই মানুষের মনে বাধা দিও না”—সকল মন্দির, সকল মসজিদের চূড়া ডিঙ্গাইয়া এই কথাগুলি স্বর্গের তোরণের উপর লিখিত হওয়ার যোগ্য।

নবাব মুরসিদকুলি খাঁ ১৭২৫ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

সুজা উদ্দীন খাঁ—১৭২৫-১৭৩৯ খৃঃ

সুজা উদ্দীন খাঁ মীরজুমলার এক মাত্র কন্যা জিয়তয়েসাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মৃত নবাবের ইচ্ছা ছিল তাঁহার দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ নবাব হন। কিন্তু সম্রাটের আদেশে সুজা উদ্দীন নবাব হইলেন।

সুজা উদ্দীন নবাব হইয়া বন্দী হিন্দুজমিদারদিগকে মুক্তি দিলেন। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার রাজকুমার নির্ধাসিত হইয়া নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সুযোগে নবাব-সৈন্য অতর্কিতভাবে আগরতলায় প্রবেশ করিয়া রাজাকে রাজ্যচ্যুত করেন, আশ্রিত রাজকুমার মোগলসম্রাটের বশত স্বীকার করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ষ্টুয়ার্ট সাহেব এই কথা লিখিয়াছেন। এই সময়ে জার্মানদেরা নবাবের সনন্দ পাইয়া ওয়েস্টেও কোম্পানির নামে ঝাকিবাজারে (কলিকাতা হইতে ১৫ মাইল দূরে) তাঁহাদের এক বিস্তৃত কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ডাচ ও ইংরেজগণ ইহাদের বিপক্ষতা করিয়া নবাবের কর্মচারীদিগকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করাইয়া জার্মানদের নামে মিথ্যা অভিযোগ প্রমাণিত করেন। ফলে নবাব-সৈন্যদল ঝাকিবাজারের কারখানাটি ধ্বংস করিয়া বঙ্গদেশে জার্মান বাণিজ্যের অস্তিত্ব-ক্রিয়া সম্পাদন করেন। এই নবাব বঙ্গের রাজত্ব এক বৎসরের মধ্যে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা হইতে এক কোটি আটচল্লিশ লক্ষ টাকায় পরিণত করেন। জমিদারদের প্রতি ভূতপূর্ব নবাবের কড়া শাসনে যাহা হয় নাই—সুজা উদ্দীনের উদারনীতির ফলে তাহা হইল। ইনি মীরজুমলার অত্যাচারের সহায় নাজির আহাম্মদ ও মোরাদ এই ওমরাহদ্বয়কে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ইহার ৫০০ রাজকর্মচারীর

মধ্যে দুইটি হিন্দুকে তিনি খুব ভালবাসিতেন। তাঁহাদের একজন রায় আলমচাঁদ, ইহাকে নবাব “রায় রায়” উপাধি দিয়াছিলেন, অপর জগৎ শেঠ; ইহাদের পরামর্শে কাজ করিয়াই ইনি সরকারী আয় এত বাড়াইতে পারিয়াছিলেন। ইহারা নবাবের এত প্রিয় ছিলেন যে মৃত্যুর পূর্বে যে সকল চুক্তিতে স্বীকার করাইয়া পুত্র সরফরাজ খাঁকে উত্তরাধিকারি-পদে মনোনীত করেন, তাহার প্রধান এক দফা এই যে, তিনি সর্ববিষয়ে রায়রায় ও জগৎ শেঠের মত লইয়া কাজ করিবেন। মীরজুমলা বেরূপ অতিরিক্ত পরিমাণে মিতব্যয়ী ছিলেন, সূজা উদ্দীন তেমনই অপরিমিত বিলাসী ছিলেন, তিনি তাঁহার রাজধানী বাহাতে দিল্লীর সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৭৩৮ খৃঃ তাঁহার সেনাপতি আলিবর্দী খাঁ পাটনার দস্যদের অত্যাচার নিবারণ করেন এবং ঐ সময়ে মির হবিব নামক তাঁহার অল্প এক সেনাপতি ত্রিপুরার রাজভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাকে অনেক অর্থ দেন। কথিত আছে, সূজা উদ্দীনের সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের একাংশের নাম পরিবর্তিত হইয়া ‘রোসনাবাদ’ হইয়াছিল।

সরফরাজ খাঁ—১৭৩৯-৪০ খৃঃ

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সূজা উদ্দীনের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সরফরাজ খাঁ বঙ্গের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। সরফরাজ খাঁ ১৭৩৯-৪০ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সৌখীন নৃপতির অন্দর মহলে ১,৫০০ রমণী ছিলেন, ইহাদের লইয়া তিনি প্রমত্তাবস্থায় দিন রাত্রি কাটাইতেন কিন্তু তিনি সুরাপায়ী ছিলেন না। কোন সুন্দরী রমণীর কথা শুনিলে তিনি অসহিষ্ণু হইয়া হ্রাস-অন্ময় বোধ হারাইতেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি নাদির সাহের আক্রমণে দিল্লীর ছরবস্তার কথা শুনিতে পাইলেন। ভয় পাইয়া ইনি বাঙ্গলার তিন মনের বাকী খাজনা নাদির সাহকে পাঠাইলেন, শুধু তাহাই নহে—নাদির সাহের নামাঙ্কিত করিয়া তিনি মুদ্রার প্রচলন করিলেন। এই ঘটনা পরিশেষে তাঁহার শত্রুরা যন্ত্ররূপ ব্যবহার করিয়া উত্তরকালে দিল্লীশ্বর সম্রাট মহম্মদ সাহার মন নবাবের প্রতি বিমুখ করিয়া দিয়াছিল। যে তিন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে তাঁহার পিতা বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হাজি আহম্মদ একজন, বাকী দুইজন আলমচাঁদ ও জগৎ শেঠের কথা পূর্বেই আমরা বলিয়াছি। প্রথম প্রথম নবাব ইহাদের কথামত চলিতেন। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী হইয়া ইহাদের দুইজনকে বিষম চটাইয়া দেন। হাজি আহম্মদের নাত্তি ও নাতিনীর মধ্যে একটি বিবাহ স্থবির হইয়াছিল, ইনি তাহা ভাঙ্গাইয়া দিয়া কল্যাণটিকে তাঁহার নিজের ছেলের সঙ্গে জোর করিয়া বিবাহ দেন। জগৎ শেঠের পুত্রের সঙ্গে একটি অপূর্ণ-রূপসী কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। জগৎ শেঠ তাঁহার পুত্রবধূকে নবাবের অন্তঃপুরে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যদিও নবাব কোন ব্যভিচার করিতে স্থবিধা পান নাই। এই ঘটনায় জগৎ শেঠের পরিবারে যে কলঙ্কের দাগ পড়িয়াছিল, তাহাতে শেঠজীর উচ্চ-কুলগর্ভ খর্ব হইয়া গিয়াছিল। নবাবের শত্রুগণ মহম্মদ সাহের দরবারে এই সকল কথা এবং নাদির সাহের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ও সম্রাটকে অবজ্ঞা করার কথা অতিরঞ্জিতভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন

বং হাজি আহম্মদের ভ্রাতা আলিবর্দী খাঁকে নবাব করিলে সম্রাটকে যে তিনি অপরিমিত অর্থ দিবেন তাহার এমন একটা লোভনীয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, সম্রাট পাটনার শাসনকর্তা আলিবর্দী খাঁকে গোপনে বাঙ্গলার গদি দখলের জন্য নিয়োগপত্র দিলেন। এদিকে হাজি মহম্মদ ও জগৎ শেঠ নবাবকে কুপরামর্শ দিয়া ব্যয়-সঙ্কোচের উপলক্ষে তাঁহার বহু সৈন্য বিদায় করিয়া দিলেন। নবাবের মাঝে মাঝে সন্দেহ হইত, কিন্তু আলিবর্দী খাঁ নানারূপ বাহ্য-রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিতেন ও হাজি মহম্মদ এবং জগৎ শেঠ মিষ্ট কথা বলিয়া নবাবকে ভুলাইয়া রাখিতেন, তারপরে ভোজপুরীদের বিদ্রোহদমনের ভান করিয়া আলিবর্দী খাঁ তাঁহার বিপুল বাহিনীর সঙ্গে পাটনা হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি একজন মৌলভির হাতে কোরান ও একজন ব্রাহ্মণের হাতে গঙ্গাজলের ঘটি ও তুলসীপত্র দিয়া সমস্ত সেনাপতি ও সৈন্যদিগকে আহ্বান করিলেন। মুসলমান কোরান ও হিন্দু গঙ্গাজল ও তুলসী স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল—আলিবর্দী যাহা বলিবেন, ছায় হউক অন্তায় হউক তাহারা তাহা করিবে। এই প্রতিশ্রুতির পরে, আলিবর্দী যে নবাবের বিরুদ্ধে যাইতেছেন তাহা তাহাদিগকে জানাইলেন। হাজি মহম্মদ, আলিবর্দী ও জগৎ শেঠ মন্ত্রগুপ্তি এত চাতুর্যের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন যে, যখন আলিবর্দী সৈন্য লইয়া একেবারে রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী, তখনও নবাব সম্যক্ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, তাঁহার তাঁহার বিরুদ্ধে সত্যসত্যই বড়বস্ত্র করিতেছেন। শেষ মুহূর্ত্তে যখন শত্রুপক্ষের শিবির হইতে কামান গর্জন করিয়া বলিল যে আলিবর্দী তাঁহার শত্রু, তখন নবাব হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মাহত বলিল, এ অসম যুদ্ধে অগণিত শত্রুর মধ্যে প্রাণ দেওয়ার কোন সার্থকতা নাই, বরঞ্চ হাতী দ্রুতবেগে ছুটাইয়া দিই,—বনবিষ্ণুপুরের রাজার প্রবল সাহায্যে হয়ত তিনি শত্রুদলনে সমর্থ হইবেন। নবাব সে কথা শুনিলেন না, বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দীর বিরুদ্ধে মহাবীরের ছায় বাজা করিয়া রণক্ষেত্রে তিনি মহাপ্রয়াণ করিলেন (১৭৪০)।

আলিবর্দী খাঁ—১৭৪০-১৭৪৬ খৃঃ

নবাব সরফরাজ খাঁকে হত্যার পর মুরসিদাবাদে প্রবেশ করিয়াই আলিবর্দী মৃত নবাবের মাতা জেন্নতঅলনিস্তার দর্শনপ্রার্থী হইয়া স্বয়ং তাঁহার গৃহদ্বারে যাইয়া সংবাদ পাঠাইলেন—“আমি নবাবকে হত্যা করিয়া অকৃতজ্ঞতার অন্ততাপে পুড়িয়া মরিতেছি। আমি ক্ষমাই নহি, তথাপি ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছি। আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি এই ঘোর পাপকাণ্ডের পর আপনার মনে আর কোন কষ্ট দিব না, সর্ববিষয়ে আপনার আদেশের অমুবর্ত্তী হইয়া চলিব।” অনেকক্ষণ আলিবর্দী দ্বারে অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু শোকসন্তপ্তা মাতা কোন জবাবই দিলেন না। সুতরাং পূজহস্তা নবাবকে তাঁহার সঙ্গে দেখা না করিয়াই ফিরিয়া আসিতে হইল। পাপটি কম গুরুতর নহে—নবাব সরফরাজ খাঁ স্বয়ং তাঁহার অন্তরঙ্গ স্ত্রী আলিবর্দীকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন—তাঁহাকে হত্যা করা।

কিন্তু সিংহাসনপ্রাপ্তির জন্ত এই সকল গুরুতর অপরাধ, স্বগৃহে ডাকিয়া আনিয়া বন্ধুত্বের ভান করিয়া অতর্কিতভাবে হত্যা করা—এই সকল গর্হিত ও নিষ্ঠুর কার্য মোগল ইতিহাসে বারংবার দৃষ্ট হইয়াছে। সাম্রাজ্যের লোভ অতি প্রবল, এজন্ত শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, “মুক্তিমিচ্ছসি রে তাত, বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ।”

আলিবর্দী নবাব হইয়া সম্রাটদের রাজত্বে অহর্নিশ-সংঘটিত এই সকল ক্রুর ব্যবহারের একটিও বাদ দেন নাই। কিন্তু শত্রু ও বান্ধাদিগকে তিনি শত্রু বলিয়া মনে করিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে “মারি অরি, পারি যে কৌশলে” নীতি চালাইয়াও তিনি অপর সকলের সঙ্গে অবাধ ও মুক্ত প্রাণের উদারতা, সুস্থ ভ্রাতৃ-অভ্রাতৃবোধ ও প্রজাহিতৈষণা প্রভৃতি মহৎ গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সকল বাদশাহদের অনেকেই বীরত্বের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। কিন্তু আলিবর্দী ছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ। তিনি বহু যুদ্ধ করিয়াছেন, শত্রুর শেষ না করিয়া তিনি ছাড়েন নাই, কিন্তু কোন যুদ্ধেই তিনি পরাজিত হন নাই। বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি একপদও হটিয়া যান নাই, এবং প্রাণপ্রিয় অন্তরঙ্গ স্ত্রীস্বামী বান্ধাদিগকে তিনি প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের উচ্চতম শিখরে লইয়া গিয়াছেন—তাঁহারা যখন অক্লান্ত হইয়া তাঁহার বিদ্রোহী হইয়াছেন তখন সেই অপ্রত্যাশিত দুর্ভাগ্যবাহারে তিনি তিলমাত্র ধৈর্য্য-চ্যুত হন নাই। বাঙ্গলার বাদশাহদের মধ্যে আলিবর্দী সামরিক ব্যাপারে সর্বশ্রেষ্ঠ বীরদের সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে আসন-গ্রহণের উপযুক্ত। শেষবয়সে যখন তাঁহার মেহের নন্দহুলাল, পরমসুন্দর, তরুণ সিরাজুদ্দৌলা বিদ্রোহী হইয়া পাটনা দখল করিতে অভিযান করিলেন—তখন সেই চিরমেহপালিত বালক তাঁহার কি অপকার করিবেন, তাহা মুহূর্ত্তমাত্রও ভাবিলেন না, পাছে তাহার অনিষ্ট হয়, গায়ে কাঁটার আঁচড়ের দাগ লাগে সেই ভাবনায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে লাগিলেন।

তিনি রাজত্বের প্রথমেই সরফরাজ খাঁর পরিবারবর্গকে ঢাকায় পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদের জন্ত প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। তিনি পূর্ববর্তী নবাবগণের সঞ্চিত বহু অর্থ লাভ করিয়া অকাতরে ও মুক্তহস্তে তাহা ব্যয় করিতে লাগিলেন। সম্রাট মহম্মদকে এককোটি টাকা নগদ ও সমস্ত লক্ষ টাকার উপযোগী উপঢৌকন নজরানা পাঠাইলেন। নবাব বিহার ও উড়িষ্যার শাসনভার তাঁহার আত্মীয়দিগের মধ্যে বিতরণ করিলেন। এইভাবে যখন স্থির হইয়া কেবল সিংহাসনে বসিয়াছেন, তখন শুনিতে পাইলেন সম্রাট মহম্মদ সাহ তাঁহার অতুল ঐশ্বর্যের কথা শুনিয়া যাহা পাইয়াছেন তাহাতে খুসী না হইয়া আরও অপরিসীম দাবী দিয়া মুরাদ খাঁ নামক এক প্রতিনিধিকে পাঠাইয়াছেন। আলিবর্দী এই লোকটিকে প্রচুর উৎকোচে বশীভূত করিয়া, একটা হিসাব দাখিল করিয়া এবং সম্রাটের জন্ত আর একটি মূল্যবান উপঢৌকনের ব্যবস্থা করিয়া মুরাদকে রাজমহল হইতে বিদায়পূর্বক পুনরায় সিংহাসনে স্থির হইয়া বসিলেন। (১৭৪১ খৃঃ।)

ইহার পরে সুজা উদ্দীন বাদসাহের জামাতা মুরসিদ খাঁকে উড়িষ্যার শাসনকর্তৃত্ব হইতে বিদায় করিয়া নবাব তৎস্থলে তাঁহার ভ্রাতা হাজি মহম্মদের পুত্র সৈয়দ মহম্মদকে নিযুক্ত করিতে

সম্মত করিলেন। তিনি তদনুসারে মুরসিদ খাঁকে লিখিলেন—তিনি যদি স্বেচ্ছায় উড়িষ্যা ত্যাগ করেন, তবে তাঁহার সমস্ত ধন-রত্ন ও পরিবারবর্গ লইয়া যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন, বাহাতে তাঁহার অবসরগ্রহণ ও উড়িষ্যা হইতে প্রয়াণ নিরাপদ হয় তাহার সমস্ত ব্যবস্থা তিনি করিবেন। এই প্রস্তাবে সম্মত না হইলে যুদ্ধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। মুরসিদ খাঁ শান্তিপ্রিয় ভালমানুষ ছিলেন—তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে উচ্চত হইলে তাঁহার স্ত্রী ছদ্মনা বেগম সিংহীর মত বিক্রমে তাঁহাকে কাপুরুষতার জন্ত ডংগনা করেন। তাঁহার আমীরগণও শেষপর্যন্ত লড়াই করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সুতরাং যুদ্ধ হইল, আলিবর্দীর জয় হইল। মুরসিদ পালাইয়া দাক্ষিণাত্যে যাইয়া মসলিপত্তনের ফৌজদার আনোয়ার উর্দী খাঁর আশ্রয় লাভ করিলেন; সৈয়দ মহম্মদ উড়িষ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। গোলমাল এখানেই ধামিল না, সৈয়দ মহম্মদ তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহার এবং সুন্দরী রমণী-সংগ্রহাদি ব্যাপারদ্বারা প্রজাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন, তাঁহারা মুরসিদ খাঁকে পুনরায় আসিয়া শাসনভার লইতে আমন্ত্রণ করিল। কিন্তু তিনি এই গোলমালের মধ্যে আসিয়া পড়িতে স্বীকৃত না হওয়াতে বখর খাঁকে নেতা করিয়া অতি গোপনে একদল লোক সৈয়দ মহম্মদকে বন্দী করিয়া ফেলিল। বখর খাঁ উড়িষ্যা দখল করিয়া বসিলেন, এদিকে সৈয়দ মহম্মদের জন্ত নবাবের ভ্রাতা হাজি মহম্মদ ও পরিবারবর্গ ভাবিয়া আকুল, তাঁহারা সৈয়দকে নিরাপদে পৌছাইয়া দিবার সন্তে সন্ধি করিতে নবাবকে উপদেশ দিলেন। কিন্তু আলিবর্দী কোনকালেই ভয়প্রদর্শন কিংবা স্বীয় বিপদের আশঙ্কায় দুর্বলতা দেখাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। বখর খাঁ সৈয়দ মহম্মদকে এমন ভাবে বন্দী করিয়া রাখিলেন যে, যুদ্ধে যদি বখর খাঁ পরাস্ত হন, তবে রক্ষকদিগের উপর আদেশ ছিল, যেন তাহারা তখনই বন্দীর মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলে। যুদ্ধ হইল, বখর খাঁ পরাস্ত হইলেন, কিন্তু দৈবক্রমে সৈয়দ মহম্মদ নিহতি লাভ করিলেন। আলিবর্দী খাঁ মহম্মদ মস্তম খাঁর উপর উড়িষ্যাশাসনের ভার দিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে মৃগয়া করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে অকস্মাৎ সংবাদ আসিল, ভাস্কর পণ্ডিত-প্রমুখ বগৌরা বাদলাদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহারা বঙ্গাধিপের কাছে 'চৌখ' অর্থাৎ রাজস্বের চতুর্থাংশ দাবী করিয়া বসিল (১৭৪১-৪২ খৃঃ।) নবাব টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাহারা অতি দ্রুত অভিযানপূর্বক আলিবর্দীর অবস্থা শঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিল। নবাব বর্ধমানের আশ্রয় লইলেন, তাঁহার সৈন্তগণ ছতভঙ্গ হইল এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা চারিদিকে লুণ্ঠনকাণ্ড চালাইতে লাগিল। দৃঢ় অধ্যবসায় এবং বিপদে সর্বদা উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াও আলিবর্দী খাঁ চারিদিকে সরিষাফুল দেখিতে লাগিলেন। তিনি দশলক্ষ টাকা দিয়া ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে সন্ধি করিতে চাহিলেন, কিন্তু অচতুর বগৌ অবস্থা বুঝিয়া এককোটি টাকা এবং নবাবের সমস্ত হস্তী চাহিয়া বসিল। একপ অপমানজনক প্রস্তাবে আলিবর্দী কিছুতেই সম্মত হইলেন না। যে দশলক্ষ টাকা বগৌদিগকে দিবেন বলিয়া যজ্ঞত রাখিয়াছিলেন, তিনি তাহা সৈন্তসংগেহে ব্যয় করিয়া যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এদিকে ভাস্কর পণ্ডিতকে তিনি সেই

এককোটি টাকার প্রস্তাবের উত্তরে হাঁ, না, কিছু না বলিয়া—কথার ছলে ভাঁড়াইয়া রাখিতে লাগিলেন। ভাস্কর ইহার মধ্যে প্রায় মুরসিদাবাদের কাণের কাছে পলাশী ও দাউদপুর প্রভৃতি গ্রাম লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। তিনি নবাবের বিদ্রোহী কর্মচারী মীরহাবিবের সহায়তায় হুগলী ও হিজিলি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান জেলার সমস্ত অংশ এবং উড়িষ্যা বালেশ্বর পর্য্যন্ত, এতদ্ব্যতীত পুর্ণিয়া, বীরভূম ও রাজমহল প্রায় দখল করিয়া লইলেন, সুতরাং মুরসিদাবাদ ও তাহার সমীপবর্তী কয়েকটি পল্লীছাড়া গঙ্গার পশ্চিম পারে নবাব আলিবর্দীর আর কিছুই রহিল না। এই সময়ের রচিত বাঙ্গলার ছড়া “খোকা ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বগী এল দেশে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে?”—সকল বাঙ্গালীই জানেন। য়েহের ছালাকে ঘুম পাড়াইবার সময়ও মাতা বগীর বিভীষিকা ভুলিতে পারেন নাই।

এই সময়ে নবাব আলিবর্দীর অনুমতিক্রমে ইংরেজেরা কলিকাতা অঞ্চলের চারিদিকে একটা পরিখা খনন করিতে লাগিয়া গেলেন। এই পরিখা মাত্ৰ মাইল ব্যাপক হইবার কথা ছিল, ছয় মাসে তিন মাইল পর্য্যন্ত খনন করা হইয়াছিল, কিন্তু কলিকাতার দিকে বগীরা না আসাতে তারপর আর খননকার্য্য চলে নাই।

নবাব এবার যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন। নৌসৈন্য দ্বারা ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সহস্রা মারহাট্টা শিবিরের নিকটবর্তী হইলেন। এই আক্রমণের জন্ত ভাস্কর পণ্ডিত প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া অতি দ্রুত পালাইয়া বিষ্ণুপুরের বনবহল চূর্ণমস্থানে আশ্রয় লইলেন। এদিকে নাছোড়বান্দা আলিবর্দী যত জোরে শত্রুসৈন্য পালাইতেছিল, তত জোরে তাহাদিগকে অনুসরণ করিতেছিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত স্থির হইয়া কোনস্থানে থাকিতে পারেন নাই। বিষ্ণুপুরের লোকেরা মনে ভাবিল, বগীরা তাহাদের রাজধানী লুট করিবে। রাজাকে তাহারা সমস্ত অবস্থা জানাইল, রাজা বলিলেন, “আমি জানি কি? তোমাদের কথা মদনমোহনকে জানাও;” এই বলিয়া তিনি ধন্য দিয়া স্বয়ং মন্দিরের দ্বারে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িয়া রহিলেন। পাণ্ডা শেষ রাত্রে দেখিল এক দীর্ঘাকৃতি কুম্ভস্থাকৃতি শ্রামমূর্তি পুরুষের বগীদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছেন। প্রাতে সকলে দেখিল বগীরা অনেক গোলাগুলি নিকটবর্তী স্থানে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। পাণ্ডা মন্দিরদ্বার খুলিয়া দেখিল, মদনমোহন-বিগ্রহের সর্ব্বাঙ্গে বারুদ, হস্তপদ বারুদের কালী মাখা। বাঙ্গলার ছড়াটির মর্ম্ম এই যে, বগীরা পলায়নের পথে বিষ্ণুপুরে উকি মারিয়া গিয়াছিল। প্রজারা ভাবিল স্বয়ং ভগবান্ তাহাদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া বগীদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। অকস্মাৎ অজ্ঞাতভাবে বিপদ হইতে মুক্তি পাইয়া তাহারা ইহা ভগবানের রূপা এবং তাহারই বাহুবলের আশ্রয়ের ফল মনে করিয়া সেই স্থন্দের ভক্তি ও কাৰুণ্যমিশ্রিত ছড়াটি রচনা করিয়াছিল (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ)। মেদিনীপুরে ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে নবাবের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বগীরা হারিয়া যায়।

কিন্তু বগীর হাদ্ধামা এখানেই শেষ হইল না। রঘুজী ভোসলা তাহার সেনাপতির পরাজয়-সংবাদে চটিয়া গিয়া বহু সৈন্য স্বয়ং লইয়া বঙ্গদেশে অভিযান করিলেন। সকলেই

জানেন মারহাট্টাদের ইহার মধ্যেই আশ্রয়লব্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। বেরার অঞ্চলের নেতা ছিলেন রঘুজী ভোঁসলা এবং পুনর নিকটবর্তী স্থানগুলি বালাজীর অধিকৃত ছিল। যখন রঘুজী ভোঁসলা আলিবর্দীর বিরুদ্ধে আগমন করেন, সেই সময়ে বালাজীও নবাবের নিকট হইতে সম্রাটপ্রদত্ত সনদের বলে এগার লক্ষ টাকা চৌধুর দাবী করিয়া বৃহৎ সৈন্তের সহিত বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। এই দুই দলের লুণ্ঠনাদিব্যাপারে সোণার বাঙ্গলা ছারখার হইবার দশায় উপস্থিত হইল, এবং আলিবর্দী দুই দলকে সামলাইতে না পারিয়া বালাজীকে তাঁহার প্রার্থিত দাবী মিটাইয়া দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, এই সন্ধিসূত্রে বালাজী নবাবকে রঘুজীর বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং শত্রুশিবিরের লুণ্ঠনলব্ধ ধনরত্নের অর্দ্ধেকটা তাঁহার হইবে, আলিবর্দী এই প্রতিশ্রুতি পাইলেন। রঘুজী এই দুই শত্রুর হাত হইতে নিরাপদ হইবার মানসে তৃতীয় পন্থা অর্থাৎ পলায়নবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। যদিও যুদ্ধে নবাবের জয় হইল, তথাপি বর্গীকর্তৃক লুণ্ঠনের ফলে তাঁহার রাজস্বের বিস্তর ক্ষতি হইল।

এই মহারাষ্ট্র হাঙ্গামার সময়ে মুস্তাফা খাঁ আলিবর্দীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই বীরত্ব ও সাহসে আলিবর্দী জয়ী হইয়াছিলেন, এজন্য নবাব কৃতজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু মুস্তাফা খাঁর আশ্রয়ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। বিহার প্রদেশের যুদ্ধে ইহার নিকট পূর্ণ ঋণ শ্রবণ করিয়া তিনি সেই দেশও তাঁহাকে দিতে মনন করিয়াছিলেন কিন্তু মুস্তাফা খাঁ তাঁহার অধীন থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তথাকার স্বাধীন নৃপতি বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার দাবী করিলেন। ইহার পর এই ব্যক্তি বাঙ্গলাদেশও দখল করিতে চাহিতে পারে—এই আশঙ্কায় নবাব ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইহাকে থুসী করিবার জন্য নবাব অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সকল জমিদারের প্রতি তিনি প্রতিকূল আদেশ দিতেন, মুস্তাফা খাঁ

তাঁহাদের নিকট প্রচুর উৎকোচ পাইয়া নবাবকে তাঁহার আদেশ পরিবর্তন করিতে অহুরোধ করিতেন। নবাব সমস্ত জানিয়া

গুনিয়া শুধু খাঁ সাহেবকে সমুদ্র করিবার জন্য নিজের হুকুম বদলাইয়া ফেলিতেন। কিন্তু শেষে উভয়পক্ষই পরস্পরকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন এবং কতকগুলি কারণে তিনি মনে করিলেন, নবাব তাঁহাকে হত্যা করিতে বড়বন্দ করিতেছেন। তিনি নবাবকে প্রকাশভাবে অভিযুক্ত করিয়া বেহারের শাসনকর্তৃত্বের দাবী ছাড়িয়া দিলেন এবং নানারূপ হিসাব দেখাইয়া নবাবের নিকট সতের লক্ষ টাকা দাবী করিলেন, এবং প্রকাশ করিলেন যে ইহা পাইলেই তিনি নবাবের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া চলিয়া যাইবেন। এই প্রস্তাবে নবাব মনে মনে থুসী হইয়া তখনই হিসাব না দেখিয়া তাঁহাকে সেই দাবীর টাকা মিটাইয়া দিলেন। কিন্তু মুস্তাফা খাঁ নবাবের পাঠান সেনাপতি সমসের খাঁ ও রহিম খাঁকে লোভ দেখাইলেন যে, আলিবর্দীকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পুনরায় বাঙ্গলাদেশ পাঠানদিগকে দেওয়াইবেন, তাঁহারা যদি যোগ দিয়া মুস্তাফার সঙ্গে মিলিত হন। তাঁহারা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মুস্তাফা বগাদের সঙ্গে একযোগে আলিবর্দীর বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন, এই বড়বন্দ চলিতে লাগিল।

১৭৪৫ খৃঃ অব্দে মুস্তাফা খাঁ রাজমহল লুণ্ঠন করিয়া মুন্সের হইয়া পাটনায় জিনউদ্দিনের রাজধানী আক্রমণ করেন। যদিও জিনউদ্দিনের সৈন্যসংখ্যা অল্প ছিল, তথাপি তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করেন। একটা তীর লাগিয়া মুস্তাফার ডান চক্ষুটা নষ্ট হইয়া যায়। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে কষ্টে আনা হয়—ইহার পর তিনি বেশী দিন বাচেন নাই।

কিন্তু সমসের পাঠানও বেশীদিন বিখলিত রহিলেন না। তিনি গোপনে রঘুজীর সহিত যড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। একসময়ে নবাবসৈন্য রঘুজীকে অনায়াসে বন্দী করিতে পারিল, কিন্তু সমসের তাঁহাকে পালাইতে সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। আলিবর্দী সমস্তই জানিতে পারিলেন। সমসের হঠাৎ পাটনায় বাইয়া জিনউদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং নির্দয়ভাবে জিনউদ্দিনকে নিহত করিলেন; তাঁহার ভূ-প্রাধিত সমস্তরত্ন টাকা ও বহু মণি-মাণিক্য সমসেরের হাতে পড়িল। সমসের এতদ্ব্যতীত জিনউদ্দিনের পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল, ইহাদের মধ্যে বেগম আমনাও (আলিবর্দীর কন্যা) ছিলেন।

এদিকে রঘুজীর পুত্র জানোজী কটকের নিকট লুণ্ঠনাদি চালাইতে লাগিলেন। আলিবর্দী ইহাদিগকে দমন করিবার জন্ত বহু সৈন্যসহ সেনাপতি মীরজাফরকে মেদিনীপুর অঞ্চলে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু মীরজাফর ভয়ে মেদিনীপুর হইতে বর্ধমানে পালাইয়া গেলেন এবং তাঁহার ধনরত্ন ও হস্তীগুলি বর্গীরা সহজেই লুণ্ঠন করিয়া লইল। মীরজাফরকে একেবারে অকর্মণ্য দেখিয়া আলিবর্দী আতাউল্লা নামক এক কর্মঠ সেনাপতিকে নিযুক্ত করিলেন। ইনি প্রথম জানোজীর একদল সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া কার্যতৎপরতা দেখাইলেন, কিন্তু এক পাগলা ওমরাহ গণিয়া বলিল যে, তিনি শীঘ্রই বাদসাহ হইবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া আতাউল্লার মূণ্ড ঘুরিয়া গেল এবং তিনি নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। মীরজাফরকে তিনি নবাব হইয়া বেহারের শাসনকর্ত্ত্বক দিবেন—এই লোভ দেখাইয়া নিজের দলে টানিয়া লইলেন।

আলিবর্দীর গুপ্তচরেরা এ সমস্ত সংবাদই তাঁহাকে দিয়াছিল। তিনি সময় নষ্ট না করিয়া এই দুই সেনাপতিকে অবমানিত করিলেন; তিনি মীরজাফরকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু এই ব্যক্তি তাঁহাকে হিসাব-নিকাশ দিতে অসম্মত হওয়াতে তাঁহাকে কর্মচ্যুত করিলেন। ইহার পরে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে নবাব জয়ী হন, সমসের নিহত হন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ নবাবের হস্তগত হয়। নবাব তাঁহার কন্যাকে আশাতীতরূপে ফিরিয়া পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে জিনউদ্দিনের মৃত্যুর পর নবাব জানকীরামকে বেহারের শাসনকর্ত্ত্বকে নিযুক্ত করেন।

তখন আলিবর্দীর বয়স্ক্রম ৭২ বৎসর; জানোজীর আক্রমণ তখনও থামে নাই।

অবশেষে উভয় পক্ষই দীর্ঘকালের যুদ্ধবিগ্রহে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া-
বর্গীদের সঙ্গে শেষ সন্ধি।
ছিলেন। বর্গীদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া নবাব এই বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন; সন্ধির সর্ত্তানুসারে বর্গীদিগকে কটক প্রদেশের অধিকার ছাড়িয়া দিলেন এবং

বঙ্গদেশ হইতে বৎসরে বারলক্ষ টাকা মহারাষ্ট্র-সরকারে পৌছাইয়া দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন (১৭৫১ খৃঃ)। ইহার পর বর্গীরা আর কোন উপভব করে নাই।

আলিবর্দী এত বড় বীর হইয়াও মেহজনিত দুর্বলতা এড়াইতে পারেন নাই। তিনি সিরাজকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন এবং এই সুশ্রী কিশোরবয়স্ক দৌহিত্রের শত অপরাধ মার্জনা করিতেন। সিরাজের বিবাহে তিনি এমন ঘটা এবং বিপুল অর্থব্যয় করিয়াছিলেন যে, বহুদিন পর্যন্ত এই সমারোহ-ব্যাপারের কথা বাঙ্গলাদেশের সর্বত্র আলোচিত হইত।

যখন আলিবর্দী খাঁ এইভাবে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা সুশাসন করিয়া বার্লুকো উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি সিরাজউদ্দৌলাকেই তাঁহার উত্তরাধিকারিপদে মনোনীত করিলেন। মাতামহের আদরে সিরাজউদ্দৌলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন, আলিবর্দী তাঁহার শত দোষ দেখিতেন না। সিরাজউদ্দৌলা বাহাকে তাঁহার দাদা মহাশয় বা তাঁহার ভাইদের প্রিয় মনে করিতেন, তাঁহাকেই হত্যা করিতেন। এই ভাবে হসেনকুলি খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিলেন। নবাব তাঁহার মেহের হুলালকে কোন দণ্ড দিলেন না। প্রজারা সিরাজউদ্দৌলার প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। ইহাই শেষ নহে—হঠাৎ সিরাজ মুরসিদাবাদ হইতে কতক সৈন্ত লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন, নবাবকে লিখিলেন, “আপনি আমাকে পুতুলের মত আদর দিয়া রাখিয়াছেন, কোন রাজ্যের শাসনভার দেন না, সুতরাং আমি আপনার সঙ্গে লড়াই করিব এবং বলপূর্ব্বক রাজ্য কাড়িয়া লইব।” সিরাজ পূর্ণিয়ার দিকে সসৈন্তে বাইয়া তথাকার শাসনকর্তা জানকীরামের শাসনভার তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার দাবী করিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে নবাব তাঁহার হুলালটি পাছে এইরূপ অস্বাভাবিক যুদ্ধবিগ্রহে আহত হন,— তাঁহার অধিকার নষ্ট হওয়া অপেক্ষা উহাই তাঁহার বেশী ভাবনার বিষয় হইল। তিনি অতি মেহের সহিত তাঁহাকে জানাইলেন—“তুমি এই সিংহাসন পাইবে, ফিরিয়া এস” ইত্যাদি। সিরাজ সে সকল মেহের বাক্যে ভুলিলেন না। জানকীরাম দেখিলেন, সিরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে পাছে তিনি হত বা আহত হন, ইহাও বেক্ষপ ভাবনার বিষয় হইল, এদিকে নবাবের বিনা অন্তিমতিতে তিনি সিরাজকেই বা কি করিয়া শাসনকর্তৃত্ব ছাড়িয়া দেন— এই সমস্তায়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন; অবশেষে যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। সিরাজের প্রধান পরামর্শদাতা মাধি নিম্পার খাঁ যুদ্ধে নিহত হইল এবং সিরাজ দূর এক পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জানকীরাম কোশলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার বাসস্থানের জন্ত মস্ত বড় এক প্রাসাদ নিয়োজিত করিয়া দিলেন এবং অল্প পরেই তাঁহাকে শরীররক্ষকগণ-পরিবৃত করিয়া মুরসিদাবাদে নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নবাব তাঁহাকে কিছুমাত্র তিরস্কার না করিয়া অক্ষতদেহে যে তিনি তাঁহাকে ফিরিয়া পাইলেন, এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। নবাবের ভ্রাতা হাজি মহম্মদের ছেলেরা একে একে দুইজন এই সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহারা উভয়েই জনপ্রিয় ছিলেন। নবাবজহিতা ঘেবেটি বেগম বিস্তর টাকাকড়ি লইয়া মতিঝিলে বাস করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে সিরাজ না হইয়া তিনিই পিতৃ-রাজ্যের

অধিকারী হন, তাহার বড়বয়স করিতে লাগিলেন। পূর্ণিমাতে হাজি মহম্মদের পৌত্র সৈয়দ আহম্মদের পুত্র শকৎজঙ্গ শাসনভার গ্রহণ করিলেন। আলিবন্দী ৮০ বৎসর বয়সে শোণরোগে দেহত্যাগ করিলেন, মৃত্যুর পূর্বে তিনি সিরাজউদ্দৌলাকেই তাহার উত্তরাধিকারী নির্দেশ করিয়া গেলেন। মৃত্যুর পূর্বে অন্দের মহলের বেগমেরা তাঁহাদের পক্ষে নবাব বাহাতে সিরাজকে কিছু বলিয়া যান এই অমুরোধ করিলে আসন্নমৃত্যু নবাব বলিলেন, “হায়! যদি তিনটি দিনও সিরাজ ভাল হইয়া থাকিত ও তাঁহার মাতামহীর সহিত ভাল ব্যবহার করিত, তবে এই অমুরোধের ফল প্রত্যাশা করা যাইত।” ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের ২ই এপ্রিল বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার মালিক, মহাবীর, দীর্ঘজীবন সর্বজনপ্রিয় নবাব ১৬ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহাকে জমিদারেরা এতটা বিশ্বাস করিতেন যে বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে তাঁহাকে তাঁহার সাহায্যার্থ এককোটি টাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা—১৭৫৬-৫৭ খৃঃ

যখন শৈশবে আমরা নবাব সিরাজউদ্দৌলার কথা শুনিতাম, তখন মনে হইত তিনি পুরুষ, পুরুষশ্রেণী এক মহা অত্যাচারী দানবপ্রকৃতির লোক। তখনকার দিনের ইতিহাস ও জনশ্রুতি তাঁহাকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা হইতে অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। সিরাজউদ্দৌলা যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়সক্রম উনিশ বৎসর মাত্র। তিনি চার মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি অতি প্রিয়দর্শন এবং বুদ্ধ নবাবের চোখের মণির স্থায় ছিলেন। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় (ফোর্ট উলিয়ম্ কলেজের অধ্যাপক) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজ “কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত” নামক যে পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহাতে লিখিত আছে—সিরাজ সিংহাসনে উঠিয়া গর্ভবতী রমণীর পেট চিরিয়া সন্তান কিরূপে থাকে তাহা দেখিতেন, গঙ্গাগর্ভে নৌকা হইয়া লোকে কি ভাবে মরে তাহা দেখিয়া ছুটে হইতেন। আমাদের দেশের একটা কথা আছে, যদি তাঁহারা কোন সাধুর জীবন বর্ণনা করেন তবে পূর্ববর্তী সাধুরা যে সকল অলৌকিক কাণ্ড ও লীলাখেলা করিয়াছেন সেগুলির সমস্ত তাঁহার জীবনে আরোপ করেন; সেইরূপ কোন ছুটে চরিত্র বর্ণনা করিতে বাইয়া পূর্ববর্তী অসাধুগণ বাহা কিছু করিয়াছে—তাহাও বর্তমান চরিত্রে আরোপ করিয়া থাকেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ভাবেই সিরাজচরিত্রে এই সকল কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। ইহা কোন মুসলমানের ইতিহাসে নাই, কোন সাহেবের বর্ণনায় নাই। মুতাক্করিন ও ষ্টুয়ার্টের ইতিহাস এবং অপরাপর লেখকেরা—বাহারা সিরাজের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ সকল কথা লিখিয়াছেন—তাঁহারা কেহই ঐরূপ অদ্ভুত কথা লিখেন নাই। কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত-লেখক যত পাড়ার্গেয়ে আজগুবি কথা শুনিয়াছেন, সবই নির্ঝিঁচারে লিখিয়া গিয়াছেন।

সিরাজ, তরুণ বয়সে—যখন হরত তাঁহার ঈষৎ গোঁফের রেখা উদ্ভূত হইয়াছিল—তখন তিনি বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার অধিপতি হইয়া চারিমাসের কিছু উর্জ্জকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এই চারিমান বিদেশীদিগের সঙ্গে মনোমালিঙ্গ এবং স্বীয় দরবারের ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি একটি দিনও শান্তিতে নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। এই অল্প সময়ে তিনি এত কি অত্যাচার করিতে পারিতেন যে জগতের ইতিহাসে তাঁহাকে 'নিরো'র পার্শ্বে স্থান দিতে হইবে? জগৎ শেঠের অন্তরে রমণীর বেশে প্রবেশ করিয়া তিনি সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগকে অপমান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে এবং নবীনচন্দ্র সেন "বেগমের বেশে পাপী পশি অন্তঃপুরে" ইত্যাদি সরোষ উক্তি শেঠজীর মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন, কিন্তু আমরা দেখিতে পাইয়াছি, ঐরূপ একটা হুঙ্কার্য নবাব আহম্মদ করিয়াছিলেন। গোলাম হুসেন নবাব আহম্মদ সম্বন্ধে এই কথা লিখিয়াছিলেন। সিরাজের সম্বন্ধে এই অপবাদ সম্পূর্ণ অমূলক। অন্ধকূপ হত্যাটা অমূলক নহে, কিন্তু উহা নিশ্চয়ই অত্যন্ত অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে শত্রুপক্ষের বন্দীদিগকে কেহই রাজপ্রাসাদে স্বর্ণখটায় শোয়াইয়া রাখেন না। হয়ত সেখানে কর্মচারীরা কিছু অত্যাচার করিয়াছিল, কিংবা বন্দীদিগের অভাব-অভিযোগের দিকে কর্মচারীরা মনোযোগী হয় নাই। ঠিক ঘটনার সময়ে এই বিষয়টা এত অকিঞ্চিৎকর ছিল যে তাহা সাহেবেরা প্রথম দিক্কার রিপোর্টে উল্লেখ করেন নাই, শেষকালে উহার একটি অতিরঞ্জিত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে বলিয়াছেন, নবাব উহার কিছুমাত্র খবর রাখিতেন না। এখনই কি বড়লাট ভারতবর্ষের কোন্ জেলে কোন্ বন্দীর প্রতি কি অত্যাচার হইতেছে, কাহার কি অশুবিধা হইতেছে ইহার সকল সংবাদ রাখেন? জেলের কর্মচারীরা কি বন্দীদিগের সহিত ব্যবহারে প্রত্যেক বিষয়ে বড়লাটের মঞ্জুরী লইয়া কাজ করেন? আমাদের বিশ্বাস অন্ধকূপ-হত্যা ব্যাপারটা একেবারে অমূলক নহে, কিন্তু শেষকালে তিলকে তাল করিয়া লেখা হইয়াছে। রাজীবলোচন, যিনি ইংরেজদের পক্ষ হইয়া কেরি সাহেবের প্রেরণায় তাঁহার পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, তিনিও এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয় এবং ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত লওনে ছাপা হয়;—ইহাতে সিরাজ সম্বন্ধে অতি বীভৎস বহু মিথ্যাকথা—বাহা আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি—লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কে মাত্র ৫০ বৎসর পরের লিখিত এই বিবরণটিতেও সিরাজ উদৌলার বিরুদ্ধে নানা দোষারোপ থাকা সত্ত্বেও অন্ধকূপের কথা একবারও উল্লিখিত হয় নাই। যুদ্ধবিগ্রহের সময় এইরূপ সকল ঘটনা এত সচরাচর দৃষ্ট হয় যে তাহা কেহ অত্যাচারের দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করে না। এই ঘটনা অত্যাচারমূলক স্বীকার করিলেও নবাবকে এ সম্বন্ধে অভিযুক্ত করা সম্ভব হইবে না।

তবে নবাব যে জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই, তাহা নিশ্চিত কথা। তিনি তাঁহার দাদা-মহাশয়ের আদরে অত্যন্ত প্রশ্রয় পাইয়াছিলেন, তিনি গুরুতর অপরাধ করিলেও বৃদ্ধ নবাব তাঁহাকে শাসন করেন নাই, এজন্য তিনি বাহা ইচ্ছা তাহা করিতেন। প্রজাদিগকে অঘথা পীড়ন করিতেন, লোকে জানিত সিরাজ বাহা করিবেন, তাহার উপরে নালিশ চলিবে না। সুতরাং জনসাধারণ এই অতিরিক্ত প্রশ্রয়প্রাপ্ত খামখেয়ালী তরুণ যুবকের প্রতি বীতরাগ

হইয়াছিল। নিশ্চয়ই তিনি সুন্দরী স্ত্রীলোক খুঁজিয়া বেড়াইতেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ববর্তী নবাব ওস্তাদ ছিলেন, তাঁহার রাজত্বকালে তিনি এইভাবে বহু অপরাধ করিয়াছেন, কিন্তু সিরাজ ৪ মাস কালের মধ্যে এরূপ অপরাধ কতটাই বা করিতে পারিয়াছিলেন? নাটোরের মহারানী ভবানীর কথা তারাসুন্দরী রাজসাহী-বাজুরাগ্রামবাসী রঘুনাথ লাহিড়ীর পত্নী ছিলেন, তিনি নিরুপমা সুন্দরী ছিলেন, তিনি বালবিধবা। তাঁহার দিকে সিরাজের লোভ ছিল। এসম্বন্ধে দেশব্যাপী এত প্রবাদ আছে যে তাহা অবিদ্বাস করা চলে না।

তারাসুন্দরী।

তারাসুন্দরীকে লইয়া রাণী ভবানী এতটা বিব্রত হইয়া পড়িয়া ছিলেন যে, তাঁহার একটা মূর্তি গড়িয়া তাহা শ্মশানে পোড়াইয়া তাঁহার মৃত্যু প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আত্মরে ছেলে তাঁহার অভিভাবক গুরুজনের যত আদর পায় সেই পরিমাণে সে অপরাধের লোকের চক্ষুশূল হইয়া থাকে। এই হিসাবে সিরাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব হইতেই লোকের বিষচক্ষে পড়িয়াছিলেন। অবশ্যই হসেনকুলি ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া বিনা শাস্তিতে ক্ষমা লাভ করাতে এবং পূজনীয় মাতামহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাতে অত্যধিক আদরে নষ্ট এই বালককে দেখিতে না পারার জন্য আমরা জনসাধারণকে দোষ দিতে পারি না। তিনি লোকশ্রদ্ধা এতটা হারাইয়াছিলেন যে, তাঁহার নিষ্ঠুর মৃত্যু এবং তাঁহার বিরুদ্ধে হেয় বড়যন্ত্র—লোকে জানিলেও তাঁহার স্মৃতি কোন কারুণ্যের সৃষ্টি করে নাই, এমন কি যে ফকির তিনদিনের উপবাসী নবাবকে খাবার দেওয়ার লোভে ডাকিয়া আনিয়া মীরজাফরের লোকের হাতে ধরাইয়া দিল, তাহার বিরুদ্ধে লোকে একটা কথাও বলিল না। কয়েক দিনের নিরধু উপবাসের পর ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর হতভাগ্য নবাব যখন আহায়ে বসিবেন, তখন ধৃত হইয়া হত্যার জন্য মীরজাফর-গৃহে নীত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শব হস্তিপৃষ্ঠে রাজপথে নীত হইলে তাঁহার মা আমনা বেগম আর্তনাদ করিয়া সেই হস্তীর পদতলে পতিত হইলেন। যে প্রিয়দর্শন কিশোর তাঁহার দাদামহাশয়ের আদরের ছলল ছিলেন, তাঁহার অনাহার-অনিদ্রা-ক্লান্ত দেহের উপর নির্দম খজাঘাত ও রাজনন্দিনীর পরিতাপে বোধ হয় পাষণ্ডও বিগলিত হইত, কিন্তু তাঁহার এই করুণ শোচনীয় পরিণাম উপলক্ষে পল্লীকবির একটা ছড়া বা গীতিকা রচনা করিল না। পলাশীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে চাষারা বেক্রপভাবে হলচালনা করিত, সেইভাবেই কৃষি-কার্য চলিল, কোন পল্লী-কবি এরূপ শোকাবেহ ব্যাপার লইয়া একটি গান বাধিল না, ইহার কারণ কি? অথচ ইংরেজদের গুণগানে আকাশ-বাতাস পূর্ণ হইয়া গেল, চারিদিকে জয়জয়কার পড়িল—এই বিসদৃশ কাণ্ডের অর্থ কি? নবাব জনমত অগ্রাহ করিয়া চলিয়াছেন—অত্যাচার করিয়াছেন—এবং প্রজারা এমন কি রাণী ভবানীর ছায় পূজনীয়া সম্রাস্ত মহিলাও তাঁহার ভয়ে অনিদ্ৰ নিশা যাপন করিয়াছেন। সেনবংশের রাজত্বনাশের পরেও তৎসম্বন্ধে পল্লীকবির নীরব ছিলেন, নিম্ন সম্প্রদায়ের শতসহস্র লোকের প্রীতি তাঁহারা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, শুধু ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাদের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষাকে ইতরের ভাষা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, বাঙ্গলা ভাষায় শাস্ত্রপ্রচার ও ইতরশ্রেণীর সম্বন্ধে

হোয়াচে রোগের চূড়ান্ত লীলা দেখাইয়া জনসাধারণকে সর্বপ্রকার উন্নতির পথ হইতে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সেনবংশের কীৰ্ত্তিগুলি তাঁহাদের পল্লীগাথার অন্তর্কর্তী করেন নাই। কিন্তু সহস্র দোষসত্ত্বেও হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলাকে রাজনীতিকক্ষেত্রে কোনরূপ দোষ দেওয়া চলে না।

সিরাজউদ্দৌলার মাসী ঘেষিটি বেগম বহু ঐশ্বর্য্য লইয়া মতিঝিলে বাসা করিয়াছিলেন। আলিবর্দীর মৃত্যুর পর তিনি কতকগুলি ওমরাহকে হাত করিয়া সিংহাসন লাভ করিবার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। সিরাজ মুতাক্করিনের লেখক লিখিয়াছেন—এই দুশ্চরিত্রা এবং বুদ্ধিহীন রমণী যদি সিরাজকে নিজের ছেলের মত দেখিতেন, তবে কত ভাল হইত। তাঁহাকে বাহারা উৎসাহ দিয়া প্রচুর অর্থ গ্রাস করিয়াছিল, সেই সকল ওমরাহ—মীর নজর আলি, দোস্ত মহম্মদ এবং রহিম খাঁ—সেই অর্থের দূরে বাইয়া প্রাসাদ-নির্মাণপূর্ব্বক স্থখে বাস করিতে লাগিলেন, এবং সিরাজ তাঁহার বিপুল অর্থ স্বীয় ভাণ্ডারে আনিয়া তাঁহাকে মতিঝিল হইতে বন্দীবাসে প্রেরণ করিলেন।

সিরাজ প্রাচীন কর্ম্মকর্ত্তাদিগের কয়েকজনকে বিদায় দিয়া বাকী কয়েকজনের মাথা ডিঙ্গাইয়া—স্বীয় মনোনীত ছই তিনটি প্রধান কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। কথিত আছে ইহাদের স্পর্ধা ও অহঙ্কারে প্রবীণ কর্ম্মচারী ও ওমরাহরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি আলোচনা করিলে সিরাজ যে অববেচনার কাজ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। যাহাদিগকে তিনি বিদায় করিয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন মীরজাফর। ইনি আলিবর্দী খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা অনেকবার করিয়াছেন, বুদ্ধ নবাব তথাপি ইহাকে ছই একবার কর্ম্মচ্যুত করিয়াও শেষে ক্ষমা করিয়াছিলেন। সিরাজ কুসদ্বীদিগের সঙ্গে মিশিয়া অত্যাচার করিতেন—এই অভিযোগ তাঁহার কার্য্যকলাপে সমর্থিত হয় না, বরঞ্চ তিনি যাহাদিগকে পদমর্য্যাদা দিয়া শাসনভার দিয়াছিলেন—তাঁহাদের একটিও অবিস্থাস্ত বা অবোগ্য ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার উদারহৃদয় দাদামহাশয় বরং যাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই বিশ্বাস হারাইয়া বিদ্রোহী হইয়াছেন, কিন্তু সিরাজ এবিষয়ে চতুর ছিলেন। মীরজাফরকে তিনি প্রথম হইতেই অবিস্থাস করিয়াছিলেন। যে ছই ব্যক্তিকে নবাব শাসনবিভাগের সর্পেসর্পী করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন মোহনলাল। ইনি সিরাজের পারিবারিক বিভাগের দেওয়ান বা প্রধান সরকার ছিলেন; সিরাজ ইহাকে “মহারাজা” উপাধি দিয়া সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রীর পদ (Prime Minister-ship) দিয়াছিলেন। বাজার-সরকার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইলেন, তারপর তিনি কাফের। প্রবীণ ওমরাহদের দল তাঁহার নামে যেসকল কথা রাষ্ট্র করিল, তাহা সত্য কি না কে বলিবে? হিসো, ঘেব প্রভৃতি ভাবের উত্তেজনায় মানুষ অনেক মিথ্যা কথার সৃষ্টি করিয়া থাকে। কথিত আছে, মোহনলালের একটি ভগিনী ছিলেন, তিনি প্রাচ্য আদর্শ-অনুসারে শ্রেষ্ঠ স্ত্রন্দরী ছিলেন—সে আদর্শের কথা আমরা সংস্কৃত, বাঙ্গলা, পারসী প্রভৃতি অনেক ভাষায় লিখিত দেখিতে পাই; “দীর্ঘকেশী কুশাদী”—পদ্মিনীলক্ষণাপ্রিত নারীর বর্ণনায় পাওয়া

যায় ; “কুশোদরী,” “কীর্ণমধ্য,” “কীর্ণকটি”—ইত্যাদি বিশেষণ বাগ্মীকি সীতার প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন ; কালিদাসের “মধ্যে ফায়া”ও এ প্রসঙ্গে স্বরণীয়। বাঙ্গলায় কৃত্তিবাস “মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাকলী” লিখিয়া এই সৌন্দর্য্যতত্ত্ব আরও জটিল করিয়াছেন। পার্শ্বাতে জেলেখার রূপ-বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন, “জেলেখার কটিদেশ চুলের স্তায় সুশ্ল, বরং তাহারও অর্ধেক।”—আমরা বুঝিতে পারি এই সকল বর্ণনায় কবিরা কোন সুন্দরী রমণীর দিকে চাহিয়া রূপবর্ণনা করেন নাই—তাহারা অলঙ্কারশাস্ত্রের কেরামত ও বুদ্ধির কসরৎ দেখাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন, তথাপি একথা নিশ্চয় যে চীনা রমণীর ক্ষুদ্রপদের মত ভারতীয় কিংবা পারস্যের রমণীদের কীর্ণ কটি ও দেহ প্রশংসিত।

কথিত আছে মোহনলালের ভগিনীটি ওজনে শুধু ২২সের ছিলেন এবং পান খাইলে মাত্র তাঁহার ঠোট দুইটি লাল হইত না, তাঁহার কণ্ঠের খানিকটা অংশ পর্য্যন্ত আরক্তিম হইয়া উঠিত। ইনি নর্ত্তকী ছিলেন—ইহাকে নাকি মোহনলাল সিরাজউদৌলাকে দিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ইনি সিরাজউদৌলার এক শ্রাণকের সঙ্গে ব্যভিচারে দৃত হন। নবাব তাঁহাকে বলিলেন, “কুমারি! আমি দেখিতেছি, আপনি একটি গণিকা মাত্র।” সুন্দরী জানিতেন, এবার তাঁহার রক্ষা নাই, সুতরাং ভারতরমণীর স্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া তিনি ঘৃণার সহিত উত্তর করিলেন, “হাঁ নবাব সাহেব, আমি গণিকাই বটে, আমি নর্ত্তকী—গণিকাবৃত্তি আমার ব্যবসায়,” তৎপরে সিরাজের মাতা আমনা বেগমের সম্বন্ধে একটা জুর ব্যঙ্গ করেন। (অবশ্য সিরাজের মাতা আমনা বেগম সম্বন্ধে নানারূপ কুৎসা প্রচলিত ছিল।) সিরাজ এই কুমারীকে জীবিত অবস্থাতেই চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া বদ্ধ করিয়া মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা জানি না, মৃতফরিনে বেরূপ বর্ণিত আছে, আমি অবিকল তাহাই লিখিলাম (সিয়ার মৃতফরিন, ২য় খণ্ড, ১৮৭ পৃঃ)। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, এই রমণী আদবেই মোহনলালের ভগিনী ছিলেন না।

মোহনলালের ভগিনীসম্বন্ধে এই সকল কথার মূলে যাহাই থাকুক না কেন, একথা কখনই স্বীকার্য্য নহে যে মোহনলাল সেই হতভাগিনী রূপসীর খাতিরে নবাবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তিনি নবাবের বাল্যসখা ছিলেন, দক্ষতা, বীরত্ব ও বিশ্বস্ততায় যে তাঁহার দ্বিতীয় ছিল না—তাহা ইতিহাসে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় ওমরাহ বাহার উপর সিরাজ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন, তিনি ছিলেন ঢাকানিবাসী মীরমদন। ইহারও অনেক মহা গুণের কথা ইতিহাসে লিখিত আছে। সুতরাং সিরাজ যে তাঁহার দৃষ্ট কুসঙ্গীদিগকে বড় বড় পদ দিয়াছিলেন, একথা গ্রাহ্য নহে। বরং যখন প্রবীণ মন্ত্রী ও ওমরাহের দল চিরকাল তাঁহার মুন খাইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তখন এই দুই চিরবিশ্বস্ত, রণনিপুণ ও স্বীয় আপদ-বিপদে সম্পূর্ণ নির্ভীক ব্যক্তি সিরাজকে রক্ষা করিবার জন্য অসাধ্য সাধন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

সিরাজ তাঁহার মামাত ভাই পুর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা সকৎজাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সকৎজাদ হাজি মহম্মদের পৌত্র এবং সৈয়দ মহম্মদের পুত্র। এই যুবকের বুদ্ধির প্রার্থনা

সম্বন্ধে তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গগণও প্রশংসাপত্র দিতে পারিবে না। সিরার মুতাক্করিনের লেখক গোলাম হসেন স্বয়ং ইহার এক ওমরাহ ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে সকৎজঙ্গের ব্যবহারের অনেক রহস্যজনক ঘটনা উক্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। পূর্ণিয়ার এই তরুণ নবাবের নাম-দস্তখতের মত বিজ্ঞাও ছিল না। স্বতরাং গোলাম হসেন তাঁহার আদেশমত যে সকল পত্রের মুসাবিদা করিতেন, তাহা তাঁহাকে বুঝাইতে বাইয়া অনেক কিসাট উপস্থিত হইত। কোন অক্ষর কেমন করিয়া লিখিতে হইবে, কোথায় নোজা, কোথায় বক্ররেখা বা সরল রেখা দিতে হইবে, প্রতি পদে নবাবকে তাহা বলিয়া দিতে হইত। এইরূপ করিতে বাইয়া গোলাম হসেন একদিন দেখিলেন, নবাব কলম ফেলিয়া দিয়া দূরে বাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার ওমরাহ আর কি করেন, এক ঘণ্টা তিনিও চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার কি অপরাধে নবাব বিরক্ত হইয়াছেন ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। আর একদিন নবাব বলিলেন, “দেখ, তুমি আমার ওমরা, তুমি আমার মাষ্টার নও, তবে তুমি আমার লেখাপড়া লইয়া এত মাথা ঘামাও কেন?” গোলাম হসেন সতর্ক হইয়া গেলেন, ইহার কিছুদিন পরে সকৎজঙ্গ আবার ইহাকে সাহ্ননয়ে অহুরোধ করিলেন, “তোমায় আমাকে কিছু লেখাপড়া শিখাইতে হইবে বৈকি? অমন চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে কেন?” যুদ্ধকালে ওমরাখী নামক এক মন্ত্রী তাঁহাকে সুপারামর্শ দিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি বছবৎসর নিজামুলমুলুকের অধীনে কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং নবাব যে ভাবে সৈন্ত পরিচালনা করিতেছেন, তাহা যুদ্ধরীতিসঙ্গত নহে। তখন নবাব নিজামুলমুলুককে গালাগালি দিয়া বলিলেন “আমি কোন উপদেশ শুনিতে চাহি না, আমি তিনশত যুদ্ধে দক্ষতা দেখাইয়াছি।” সিরাজউদ্দৌলা রাজা রাসবিহারীকে পূর্ণিয়ায় পাঠাইয়া ছইটি পরগনাসম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বদেখর শুনিয়াছিলেন, মীরজাফর এবং অপর কয়েকজনের প্রবর্তনায় সকৎজঙ্গ তাঁহার অধীনত্ব স্বীকার করিয়া অনেক রকম কাণ্ড করিতে উদ্বেগ করিতেছেন। সিরাজের পত্রখানি খুব ভদ্রভাবে লিখিত হইলেও তাহার ভিতরে একটা রাজনৈতিক চাল ছিল। এই পত্রের উত্তর যাহা দিতে হইবে, গোলাম হসেন সকৎজঙ্গের আদেশমত তাহার একটা খসড়া করিয়া রাজসভায় উপস্থিত করিলেন। এই খসড়াটায় খুব রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় ছিল; স্পষ্ট জবাব বলিয়া কিছু ছিল না, কিন্তু নানা অছিলায় দেবী করিয়া সময় লইবার অভিসন্ধি ছিল। সিরাজউদ্দৌলা সেই গুপ্ত উদ্দেশ্য যাহাতে না বুঝিতে পারেন সেইরূপ লিপিকৌশলের সঙ্গে মুসাবিদাটি করা হইয়াছিল, সকৎজঙ্গ উহা শুনিয়া খুবই খুসী হইলেন। কিন্তু যখন সভাসদেরা গোলাম হসেনের চিঠির অতিরিক্ত মাত্রায় প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন “ঋদ্ধিবৃদ্ধা হি পুরুষা ন সহস্তে পরস্তবম্,”—নবাব নিতান্ত চটিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, “ইহার (গোলাম হসেনের) অবশ্যই বুদ্ধিভুলি আছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমার বুদ্ধির সঙ্গে ইহার তুলনা হয়? ইহার ঘটে যদি দশ হাজার লোকের বুদ্ধি থাকে, তবে আমার ঘটে লাখ লোকের বুদ্ধি আছে, আমি ইহার লেখাটা অহুমোদন করিব না।” স্বতরাং তিনি অল্প এক মন্ত্রীর বুদ্ধিতে সিরাজকে লিখিয়া পাঠাইলেন, “আমি দিল্লী

হইতে তিন প্রদেশের সনন্দ পাইয়াছি, তদনুসারে আমি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের মালিক। কিন্তু যেহেতু আপনার সঙ্গে আমার নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে, তজ্জন্ত আপনার প্রাণের উপর হস্তক্ষেপ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। আপনি এই পত্র পাওয়া মাত্র টাকা কি অল্প প্রদেশে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত জায়গীর গ্রহণ করিয়া চলিয়া বাউন, কিন্তু খবরদার, আপনি মুর্সিদাবাদের রাজপ্রাসাদ হইতে একটি কপর্দক বা কোন দ্রব্যসামগ্রী লইতে পারিবেন না, এই পত্রের উত্তরের জন্ত আমি ঘোড়ার পাদানিতে পা দিয়া অপেক্ষা করিতেছি।” সত্যসত্যই কতকগুলি নিবৃদ্ধি আমীরের মন্ত্রণায় সকলজঙ্গ বহু টাকা খরচ করিয়া সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মালিকানির সনন্দ আনাইয়াছিলেন, উক্ত সম্রাটকে এক কোটা টাকা বৎসরে রাজস্ব দেওয়ার সর্ত্ত তাহাতে ছিল। মৃতফরিনে লিখিত আছে—এই সনন্দ পাইয়া “তিনি ছিলেন চন্দ্রলোকে, লাফ দিয়া একেবারে উঠিলেন সূর্যালোকে,” বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকার পাইয়া তিনি কি কি করিবেন, তাহার বিখ্যস্ত মন্ত্রীদিগের সহিত তাহা আলোচনা করিয়া বলিতেন, “আমি তাহার পর স্বজা উদ্দিন খাঁ ও সাহেবুদ্দিনকে দমন করিব, তারপর ইচ্ছামত একজন সম্রাটকে আমার হাতের পুতুলের মত আগ্রার সিংহাসনে বসাইব। অতঃপর আমি লাহোর ও কাবুল হইয়া কান্দাহার ও খোরাসানে যাইয়া বাস করিব, যেহেতু বাঙ্গলার হাওয়া আমার একেবারেই সহ্য হয় না।” আলাদাভাবে মত এই ক্রমোন্নতির পরিকল্পনা করিতে যাইয়া তাহার পূর্ণিয়া রাজ্যটি একটা খেলানার মত ভাঙ্গিয়া গেল। মীর আলি খাঁ নামক এক ফৌজদার একদা তাহাকে “জগতের একমাত্র আশ্রয়” বিশেষণ দিয়া চিঠি দিয়াছিলেন। সকলজঙ্গের এই উপাধিটি এত ভাল লাগিয়াছিল যে সরকারী সমস্ত দলিলপত্রে ও সনন্দে তিনি ঐ উপাধি ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি তাহাকে ঐ উপাধি ছাড়া চিঠিপত্র লিখিত, তাহার পত্র তিনি না পড়িয়াই টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। সেরূপ কোন পত্র নবাবের সেরেস্তায় গৃহীত হইত না। তিনি সমস্ত প্রবীণ ও তাহার পিতার বিখ্যস্ত কর্মচারীদিগকে অকণ্ঠ্য ভাষায় গালাগালি দিয়া চটাইয়া দিলেন। এমন কি রণস্থলেও তিনি তাহার বড় বড় ওমরাহদিগকে এইরূপ ভাষায় তাড়া করিতেন,—“গুলিগোলায় লক্ষ্য হইয়া ধামের মত দাঁড়াইয়া আছ কেন? দেখছ না হিন্দু শ্রামহুন্দর কতটা এগিয়া গেল?” বয়স্ক যোদ্ধাগণ এইরূপ সম্বোধনে এরূপ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে যখন সিরাজের সঙ্গে প্রকৃত সংঘর্ষ আরম্ভ হইল—তখন খুব অল্পলোককেই তিনি স্বীয় অমুচরস্বরূপ পাইলেন। মীরজাফর লোভ দেখাইয়া তাহাকে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে গোপনে চিঠি পাঠাইয়াছিলেন। তিনিও কার্যকালে তাহার কোন সহায়তা করিলেন না। সমস্ত মন্ত্রী ও ওমরাহ তাহার উপর বিরক্ত ছিল, তিনি তাহার প্রধান কর্মচারী লালীকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার দুই দিন বদল পুত্রকে হাতীর পিঠে চড়াইয়া তাহাকেই সেনাপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। লালীকে তিনি বেত্রাঘাত করিতে ছকুম দিয়াছিলেন, সমস্ত মন্ত্রী ও ওমরাহগণ একত্র হইয়া নিবেদন করিলেন—এরূপ উচ্চ রাজকর্মচারীকে এভাবে দণ্ডিত করা নীতিবিরুদ্ধ,

তাই লালী রেহাই পাইয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে তিনি এত মদ খাইয়াছিলেন যে, আলিতপদে টলিতে টলিতে মাহতের কাঁধে ভর করিয়া কোনরূপে হাতীর পিঠে চড়িয়াছিলেন এবং শত্রুশিবিরের গুলিতে যখন তাঁহার মাথাটা উড়িয়া যায়, তখন সে মাথায় মদের নেশা ছাড়া কোন বুদ্ধি এমন কি বেদনা-বোধটাও ছিল কিনা সন্দেহ।

অনেক ঐতিহাসিক সকৎজঙ্গের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার তুলনা করিয়াছেন; মাসতুতো ভাইদের প্রকৃতি কতকটা একরূপ ইহাই তাঁহারা বলিয়া থাকেন, একথা সর্বৈব ভুল। একটা বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল, উভয়েই জনমতকে একেবারে অগ্রাহ করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন কর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পদ-মর্যাদাহুমারে তাঁহাদের সহিত ব্যবহার করিতেন না। কিন্তু সিরাজ অবিখ্যাসীদিগের প্রতিই ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলেন—সকৎজঙ্গ নির্দোষে সকলকে অপদস্থ করিয়া গালাগালি করিতেন। সিরাজের সঙ্গে তাঁহার তুলনাই হয় না।

ঢাকার সহকারী শাসনকর্তা রাজবল্লভ নানা উপায়ে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষদের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন, সিরাজের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল; সুতরাং কোন্ মুহূর্তে খামখেয়ালী নবাব তাহার প্রতিশোধ লইবেন, তাহার ঠিকানা নাই;—এই ভয়ে তিনি তৎপূত্র

ইংরেজ-সংঘর্ষ।

রাজা কৃষ্ণবল্লভকে বহু অর্থসহ ইংরেজদের আশ্রয়ে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। ডেক সাহেবের তখন কলিকাতায় অসীম প্রতিপত্তি। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে কৃষ্ণবল্লভ তাঁহার সমস্ত ভাণ্ডারসহ নিরাপদ হইলেন। নবাব এই সংবাদ শুণ্ডচরের নিকট পাইয়া ডেক সাহেবের নিকট উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভকে তাঁহার অর্থাদির সহিত মুর্সিদাবাদে পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিয়া চিঠি লিখিলেন। ডেক অস্বীকার করিলেন। নবাব ফেপিয়া গেলেন। তিনি বঙ্গদেশে ইংরেজ-বাণিজ্য একেবারে উন্মূলিত করিতে সংকল্প করিয়া পূর্ণিয়া হইতে অবিলম্বে বাঙ্গলাদেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অল্পতম প্রধান মন্ত্রী হুর্লভরাম এবং অপরাপর প্রধান অমাত্যগণ ইংরেজদের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি তাঁহাদের কাহাকেও অনুরোধ করিলেন না, ইংরেজের কারখানা আক্রমণ করিয়া মিঃ ওয়াটকে বন্দী করিলেন। ডেক সাহেবের স্পর্ধিত উত্তরে তিনি যে জুড় হইয়াছিলেন, তাহা উক্ত সাহেব বুদ্ধিতে পারিয়া প্রথমতঃ চুঁচুড়ায় ডাচ ও তৎপরে চন্দননগরে ফরাসীদের নিকট সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা কোন সাহায্য দিলেন না। সুতরাং সাহেব পলায়ন-পর হইলেন। তিনি গুনিয়াছিলেন, সিরাজ তাঁহাকে হত্যা করিবেন—তিনি প্রথমতঃ ১,৫০০ বন্দুকধারী বাঙ্গালী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার বাকদ ভিজিয়া বাওয়াতে বন্দুকগুলি অকর্মণ্য হইয়াছিল, সুতরাং তিনি কতকগুলি সাহেববিবি লইয়া কলিকাতা হইতে তিন মাইল দূরবর্তী গোবিন্দপুরের জাহাজে উঠিয়া মাস্তোজে প্রয়াণ করিলেন। এদিকে হাউএল সাহেব পূর্ব বীরত্বের সহিত দুর্গরক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়া যখন ১২০ জন মাত্র ইংরেজ অবশিষ্ট—তখন নবাবের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। এইখানে বন্দীদের জন্ত ভাল বন্দোবস্তই হইয়াছিল—তাঁহারা বারান্দায় থাকিবেন এই কথা ছিল। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত-

কর্মচারী বলিলেন, খোলা জায়গায় বন্দীদিগকে রাখা নিরাপদ নহে, আর কোন স্থান আছে কিনা খুঁজিয়া দেখ, অধীন কর্মচারীরা বলিল, “হরস্ত কয়েদীদের জন্য একটা কামরা আছে।” প্রধান কর্মচারী না দেখিয়াই বলিলেন, “বেশ, সেইখানেই রাখা হউক।” এই ঘটনাই ইতিহাসবিশ্রুতা অন্ধকূপ। ইহার সংবাদ সিরাজউদ্দৌলা দূরে থাকুক, তাঁহার ওমরাহদের কেহও জানিতেন না। এখানে যে গ্রীষ্মকালে তৃষ্ণা ও গরমে আর্ন্ত হইয়া সাহেবেরা প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা ইংরেজদের প্রাথমিক রিপোর্টে লিখিত হয় নাই। সুতরাং এই ঘটনা যুদ্ধের আনুমানিক একটা অতি ক্ষুদ্র ঘটনা বলিয়া ধরা হইয়াছিল। যুদ্ধবিগ্রহ তো মৃত্যুর শয্যা পাতিয়াই রাখিয়াছে—রণক্ষেত্রে, কি যুদ্ধের পরক্ষেণেই অবরোধ-গৃহে মৃত্যুটা খুব একট অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। অনেকেই প্রমাণ করিয়াছেন যে স্বরূপসির গৃহে, বতগুলি লোক মরিয়াছে বলিয়া ধরা হইয়াছে—তাহা সম্ভবপর নহে, তাহা প্রথমতঃ বঙ্গবাসীর সম্পাদক ৮বিহারীলাল এবং পরে ৮অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। ঘটনাটি নিশ্চয়ই খুব অতিরঞ্জিত করিয়া শেষে বর্ণিত হইয়াছে। এখন এদেশী লোকের অপরাধে পতিত এক বিন্দু ইংরেজরক্তের ঘটটা মূল্য—যুদ্ধসম্পর্কিত ব্যাপারে তখন সেই রক্ত তত মহামূল্য ছিল না। এখনকার পাশ্চাত্য মাপকাঠির দ্বারা এই বিষয়ের ওজন নিরিখ করা ঠিক হইবে না। এ বিষয়ে কাহারও কোন ইচ্ছাকৃত নির্ভরতা হয় নাই। নিম্ন কর্মচারীদের অনবধানতার দরুনই এই অনর্থটি ঘটিয়াছিল। (“The prisoners were at first ordered to draw up in the Verandah, but the officer commanding the guard, thinking that they would not be sufficiently secure there—inquired where was the prison of the fort.” (Stewart, p. 539.) সেটা ইংরেজদিগেরই ভ্রূর্ণ এবং সেই বন্দীখানার একটি গৃহে তাহাদের স্থান করা হইয়াছিল। অধ্যক্ষ মহাশয় “without examining the extent of the apartment”—সেই গৃহের আয়তন পরীক্ষা না করিয়াই সেখানে তাহাদের স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে ইংরেজদিগের প্রাথমিক ঘটনার বিবরণীতে ইহার উল্লেখ নাই। রাজীবলোচনের মত ইংরেজের ভক্ত এবং সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষপক্ষীয় লেখকও ইহার উল্লেখ করেন নাই। এমন কি গোলাম হুসেন, যিনি সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার পরিবারবর্গকে নির্দাসিত করিয়াছিলেন—এই অভিযোগ দিয়া যেখানে-সেখানে উক্ত নবাবের নিন্দাবাদ ও সাহেবদের সুখ্যাতি করিতেন, তিনি তাঁহার মুতফরিনের মত সিরাজের রাজত্বের সুবিস্থিত ইতিহাসে এই অন্ধকূপ হত্যার উল্লেখ-মাত্র করেন নাই। সুতরাং এবিষয়ের জন্য নবাবকে দায়ী করা কতটা সত্য-সঙ্গত তাহা বিবেচনা করা উচিত।

মন্ত্রীরা সকলেই সিরাজউদ্দৌলার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। মীরজাফর আলিবর্দীর সময় হইতে বিদ্রোহভাব পোষণ করিয়া মাঝে মাঝে লাহিত হইয়াছেন। কিন্তু দয়ার সাগর বৃদ্ধ নবাব তাঁহাকে তাড়াইতে বাইয়াও তাড়ান নাই। সিরাজউদ্দৌলা মীরজাফরকে ও প্রধান মন্ত্রী হুর্লভরামকে ডিঙ্গাইয়া মীরমদন ও মোহনলালকে সর্বসর্গ করিয়া শাসন-বিভাগের

কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন। এজন্য এই হুইজনের ইহার বিরুদ্ধে জাতকোষ ছিল। বুখা-প্রজ্ঞাভিম্যানিনী
 যেসেটি বেগমের মাথায় হাত বুলাইয়া মীরজাফর যে বিপুল অর্থ
 লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সিরাজের বিরুদ্ধে বড়বঙ্গ পাকাইয়া
 তুলিবার জন্য তিনি সৈন্তসংগ্রহে এবং সৈন্তদিগকে সম্পূর্ণ হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে ব্যয়
 করিয়াছিলেন। পূর্ণিয়ায় সৰ্ব্বজয়কে সিরাজের বিরুদ্ধে সৰ্ব্বপ্রথম তিনিই নাচাইয়া তুলিয়া
 তাঁহার সৰ্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। দাদামহাশয়ের আমলের লোক—এবং আত্মীয়, এইজন্য
 সিরাজ তাঁহার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়াও তাঁহাকে শাসন করিতে পারেন নাই।
 এমন কি পলাশীর যুদ্ধের কিছু পূর্বে মীরজাফর ও দুর্লভরাম যে ইংরেজদের সঙ্গে একযোগ
 হইয়া তাঁহার সৰ্ব্বনাশ-সাধনের চেষ্টা পাইতেছে—একথা জানিয়াও তিনি তাঁহাদিগকে দণ্ডিত
 করিতে সাহস পান নাই। সেই সময়ে মুঁসিও লাস (ফরাসী সেনাপতি) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,
 “নবাব সাহেব, আপনার আমলা ও ওমরাহ সকলে আপনার শত্রু—ইহাদের ইচ্ছা ফরাসীদের
 তাড়াইয়া আপনি ইংরেজদের হাতে বাইয়া পড়েন। তখন আপনার সৰ্ব্বনাশ ইহারা সহজেই
 করিতে পারিবেন। আমাকে যদি আপনার অধীনে কাজ দেন, তবে আমি ও আমার
 সৈন্তদল প্রাণপণে আপনার জন্য যুদ্ধাদি করিব” (মুতফরিন, ২য় খণ্ড, ২২৭ পৃঃ)। লাস
 সাহেব ফরাসী এবং ইংরেজের শত্রু,—এদিকে নবাব স্পষ্ট বুঝিলেন হুই একটি লোক ছাড়া
 সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে বড়বঙ্গে লিপ্ত; এজন্য কতক মীরজাফরের ভয়ে, কতক ইংরেজেরা
 চটিয়া বাইবেন এই আশঙ্কায় তিনি বিখাসী ফরাসী সেনাপতিকে নিযুক্ত করিতে পারিলেন
 না। লাস সাহেব ঠিক বুঝিয়াছিলেন, বড়বঙ্গকারীদের হাতে নবাব অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত
 হইবেন, এজন্য যখন নবাব অত্যন্ত দ্বিধার সহিত বলিলেন, “সময় হইলে আপনাকে আহ্বান
 করিব,” তখন সাহেব স্পষ্টাঙ্গরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “আপনার সহিত আমার আর
 দেখা হইবে না।” শেষমুহুর্তে যখন বিপদ আসিল, তখন তিনি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিয়া
 লাসকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু অনিবার্য বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া লাসের আসিতে গৌণ
 হইল, যখন আসিলেন, তখন সিরাজ আর মর্ত্যলোকে ছিলেন না। লাসকে ইংরেজেরা
 তাড়া করিয়া ধরিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোনক্রমে তিনি ভাগ্যবলে রক্ষা
 পাইয়াছিলেন।

ইংরেজেরা নবাবের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে ক্লাইভ আসিয়া পুনরায়
 যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সন্ধি অহুসারে যে টাকা দেওয়ার কথা ছিল, নবাব
 তাহা দিতে বিলম্ব করিয়াছিলেন, এইরূপ অজুহাতের অভাব হইল না। মোট কথা
 মীরজাফর, দুর্লভরাম, কৃষ্ণচন্দ্র, অগৎ শেঠ প্রভৃতি দেশের প্রধান ব্যক্তির ইংরেজদিগকে
 উদ্ধাইতে ছিলেন। এদিকে কলিকাতার দুর্গক্ষয়ংসের ব্যাপারে তাঁহারাও মনে মনে প্রতিশোধ
 লওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। চতুর ক্লাইভ বুঝিতে পারিলেন,—মুসিদাবাদে নবাবের
 মিত্র নাই, সকলেই শত্রু। মীরজাফরাদির পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি তিনি অবিশ্বাস করিতে
 পারিলেন না। এদিকে মীরজাফরের প্রবর্তনায় যেসেটি বেগম আসিয়া সিরাজ তাঁহার প্রতি

কত অত্যাচার করিয়াছেন, তাহার বিবরণ দিয়া সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিলেন। সিরাজের ধনভাণ্ডার কুবেরের ভাণ্ডারের মত, যড়যন্ত্র সফল হইলে তাঁহারা একদিনে এত দীর্ঘকালের তপস্বী সফল করিতে পারিবেন—যড়যন্ত্র বিফলই বা কেন হইবে? নবাবের বিশালকায় কামানগুলি—অসংখ্য সৈন্যবল—ইহারা তো মীরজাফরের করতলগত। যাহা অসাধ্য—অভাবনীয়, তাহা সহজেই দৈবানুগ্রাহে সিদ্ধ হইবে।

নবাব পূর্ণিয়ার যুদ্ধ জয় করিয়া ঘেসেটি বেগমের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ভাবিয়াছিলেন—তাঁহার ভয়ের কারণ নাই; কলিকাতার দুর্গ ধ্বংস করিয়া ভাবিয়াছিলেন—তাঁহার একমাত্র শত্রু ইংরেজের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন; স্মরণ্য যখন জানিলেন, জগৎ শেঠ, দুর্লভরাম ও মীরজাফর সকলজনে উত্তেজিত করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতেছেন, তখন প্রথমতঃ নগণ্য মনে করিয়া তাঁহাদিগকে দণ্ড দেন নাই, বরং রাজদরবারে তাঁহাদের যে স্থান ছিল কিছু ভয়প্রদর্শনাদির পর তাহাতেই তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি ও দৈন্ত দেখিয়া কোন কোন সময়ে তাঁহার এমনও মনে হইত যে, ইহারা নির্দোষ, কিন্তু তথাপি নির্দোষ ব্যক্তির যে ব্যবহার পায় ইহারা নবাবের কাছে সে ব্যবহার পাইতেন না। তিনি মীরজাফরের বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া একটা বৃহৎ কামান রাখিয়া দিয়াছিলেন, উহা নবাবের ঋকুটির মত মীরজাফরের গৃহের দিকে সর্বক্ষণ বদ্ধলক্ষ্য ছিল। জগৎ শেঠকে তিনি স্মরণ্য করিয়া মুসলমান করাইবেন, সর্বদা এই ভয় দেখাইতেন। দুর্লভরাম অত্যন্ত প্রধান মন্ত্রী—ইহার কোন কথাই তিনি শুনিতেন না—ইহারা তলে তলে ইংরেজের সঙ্গে চক্রান্ত করিবার উদ্দেশ্য করিতেছিলেন,—এজন্য নবাবের এই সকল ব্যবহার অসঙ্গত মনে করিতে পারা যায় না। তাঁহার দোষ তরুণ বয়সের; তিনি জুহু হইলে অতি তীব্র ভাষায় ইহাদিগকে অপমান করিতেন এবং বড় বড় মন্ত্রীদিগকে মীরমদন ও মোহনলালের ছায় তরুণবয়স্ক প্রিয় মন্ত্রীদের দ্বারা অপদস্থ করাইতেন। অথচ তাঁহাদিগকে দণ্ড দিয়া নিরস্ত করা, কিংবা কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখার মত তাঁহার মনের সাহস বা দৃঢ়তা ছিল না। তাহার ফলে এই দাঁড়াইল যে, তাঁহাদের বাহিরের ঠাট্ট বজায় থাকাতে তাঁহারা প্রাসাদে বসিয়াই যড়যন্ত্রটি পাকাইবার বেশী সুবিধা পাইলেন। তিনি মীরজাফর, জগৎ শেঠ ও দুর্লভরামসম্বন্ধে পূর্ক হইতে যে সকল সংবাদ পাইতেছিলেন, বিশেষ মুঁসিয়ার লাস তাঁহার নিকট যে সকল গুপ্ত রহস্য ভেদ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ইহাদিগকে পিপীলিকার ছায় পিষিয়া মারিলে শ্রদ্ধ আর বেশী দূর গড়াইত না। কিন্তু নষ্টা বধুকে যেসকল ঘোর শাসন করিয়াও কোন কোন স্বামী ছাড়িতে পারেন না—সেইরূপ ইনি এই সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখ নষ্ট করিয়াও ইহাদিগকে ছাড়িতে পারেন নাই। নষ্টবধুর ছায়ই ইহারা এই দুর্কলতার সুযোগ লাভ করিয়া স্বীয় প্রভুর সর্বনাশ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহারা নবাবের নানাদোষ সাধারণের নিকট প্রচার করিয়া তাঁহাকে সর্বজননিন্দিত ও সকল লোকের অপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। ঘরের শত্রু যাহা পারে, বাহিরের শত্রু অত্যন্ত প্রবল হইলেও তাহা করিতে পারে না। রাণী ভবানীর কল্পার প্রতি নবাবের লোভের ব্যাপার সমস্ত রাজা ও ওমরাহদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিল।

এইজন্ত নবদীপের কৃষ্ণচন্দ্র ও আসিয়া এই দলে ভিড়িয়া গেলেন। তিনি তাঁহার বংশের পূর্বসংস্কার ও ব্রাহ্মণসমাজের গুরু স্থান অধিকার করার দরুন বহু ব্যয় করিতেন,—পূজার্কনা, দানধ্যান, বার মাসে তের পার্শ্ব খুব জাঁকিয়া করিতেন, এইজন্ত তিনি একজন চির-দেউলিয়া জমিদার ছিলেন। বণিক ও অর্থশালী ব্যক্তিদের কাছে, ঋণগ্রহণের ব্যপদেশে তাঁহাকে সর্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত—ইংরেজদের সঙ্গে সম্ভবতঃ এই স্বত্রে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। মুর্সিদাবাদে যখন মীরজাফর, ছলভরাম ও জগৎ শেঠ এই বড়বড় করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণচন্দ্রের ডাক পড়িল। মীরজাফর রাজাকে তথায় আনিবার জন্ত লোক পাঠাইলেন। রাজীবলোচন বিস্তারিত ভাবে এই দৌত্যের বিবরণ লিখিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র সহসা একরূপ একটা ব্যাপারে মাথা দিতে দ্বিধা বোধ করিলেন, তিনি তাঁহার প্রধান অমাত্যকে প্রথমতঃ পাঠাইয়া দিলেন। ছলভরামের সাহায্যে অমাত্য নবাবের দেখা পাইয়া বলিলেন, “আমাদের রাজা হজুরের সঙ্গে সিংহাসন পাইবার পর দেখা করেন নাই—একবার দর্শনপ্রয়াসী,—হজুরের অমুমতির জন্ত আসিয়াছি।” তাঁহার হঠাৎ মুর্সিদাবাদে আসা যদি কোন সন্দেহের সৃষ্টি করে, এই আশঙ্কায় নবাবদর্শনের অছিলায় কৃষ্ণচন্দ্র রাজধানীতে আগমন করিলেন। এদিকে কিরূপে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করা যাইতে পারে, ধৃত্তরয় সেই বিষয়ে প্রতি রাতে জটলা করিতেছিলেন। কেহ বলিলেন—ইহাকে গুপ্তভাবে হত্যা করা যাউক। কেহ বলিলেন, আমরা প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করি, কেহ বলিলেন, যবনের অধিকার আর কোনরূপে সহ্য করা যায় না—অপর একজন মীরজাফরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, “আপনি কি বলিতেছেন? এখানে যে মীরজাফর উপস্থিত, তাহা কি ভুলিয়া গেলেন।” তখন একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, কৃষ্ণচন্দ্র অতি চতুর ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া পরামর্শ করা হউক; তিনি ধীর স্থির-বুদ্ধি, এ সমস্তার তিনি যে সমাধান করিবেন, তাহাই গৃহীত হইবে। এই অবস্থায় কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া বুদ্ধি দিলেন, “ইংরেজদের সঙ্গে একযোগে কাজ করা হউক, আমি কালীঘাটে মাথের দর্শনকামনায় (বোধ হয় ঋণ পাওয়ার চেষ্টাও বটে) প্রায়ই কলিকাতায় বাইরা থাকি। তাঁহারা মন্ত, বদান্ত, বুদ্ধিমান, রণনিপুণ, তাঁহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ লাগাইয়া আমরাই দাবার চাল চালিব, শেষ পর্যন্ত নবাব আমাদের হাতে কলের পুতুলের মত থাকিবেন, আমরাই যুদ্ধ চালাইব; ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’-নীতি অবলম্বন করিলে কেহ আমাদের সঙ্গে সন্দেহ করিতে পারিবে না, অথচ অভীষ্টসিদ্ধি অতি সহজেই হইবে, মীরজাফরকে আমরা নবাব করিব।” এই যুক্তি শুনিয়া সভায় “বাহবা” পড়িয়া গেল। তখন মীরজাফরের সঙ্গে ক্লাইভের গোপনে চিঠি-পত্র চলিতে লাগিল। এদিকে নবাবকে জব্দ করিবার জন্ত ক্লাইভ ও ইংরেজেরা নানা উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সুবর্ণ-সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। এদিকে মীরজাফর অর্থের ঘে লোভ দেখাইলেন, তাঁহাদের অবাধ বাণিজ্য ও নবাবের অপরিমিত ধনভাণ্ডারের বখরার যে আশা দিলেন, তাহাতে নিতান্ত উদাসীন ব্যক্তিরও মাথা ঘুরিয়া যাইতে পারিত। ইংরেজ-সৈন্য দক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে “সাজ সাজ” রব পড়িয়া গেল।

সিরাজের তেজ, বিক্রম, বুদ্ধি সকলই ছিল,—এত অল্পবয়সে এরূপ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও লোকচরিত্র বুঝিবার শক্তি বোধ হয় আলিবর্দীরও ছিল না। তাঁহার দোষ ছিল—তিনি

সিরাজের পোষ।

মাতামহের আদরে একেবারে বাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন, চারিদিকের লোকজনকে কীটের মত গণ্য করিতেন, কাহাকেও হস্তগত করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিবার শক্তি তাঁহার আদৌ ছিল না। আলিবর্দী তাঁহার অমায়িক ব্যবহার দ্বারা শত্রুকেও মিত্র করিতে পারিতেন। এক রাত্রির কথা মনে পড়ে। আলিবর্দীর প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ ও অপরাপর পাঠান সামন্তগণ নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাঁহারা শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিয়া আলিবর্দীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্রস্তুত,—গুপ্তচরের মুখে নবাব সমস্ত কথা শুনিয়া বিনা অস্ত্রে শরীর-রক্ষী ছাড়া একাকী সিরাজের হাত ধরিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রে মুস্তাফা খাঁর শিবিরে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে এই অবস্থায় নবাবকে দেখিয়া পাঠান সেনাপতি বিস্মিত হইয়া গেলেন। আলিবর্দী খাঁ

বলিলেন, “আপনাকে আমি আমার প্রধান সহায় বলিয়া জানিতাম, মুস্তাফা খাঁ ও আলিবর্দী।

আপনি আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। এখন জানিতে পারিলাম আপনি আপনার নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। অতি নিঃসহায়, নিরস্ত্র ও অসমর্থ অবস্থায় বৃদ্ধ নবাব আপনার দ্বারস্থ; আপনি অনায়াসে এখানে তাঁহাকে হত্যা করিতে পারেন, তাহা হইলে যুদ্ধ করিয়া লোকক্ষয় করিবার প্রয়োজন হয় না। আমার প্রাণ আপনার হাতে দিতে আমি আসিয়াছি, আর (সিরাজকে দেখাইয়া) যদি আমার প্রাণ অপেক্ষা বেশী প্রিয় কিছু থাকে, তবে এই সিরাজ, যদি ইচ্ছা করেন, তবে ইহাকেও হত্যা করিতে পারেন; আমি অকপট হৃদয়ে আমার জীবন, জীবনাদিক প্রিয়বস্তু ও সর্বস্ব আপনার হাতে দিয়া আপনার বন্ধুপ্রার্থী হইয়া এই অসময়ে আপনার নিদ্রা ভঙ্গ করিলাম।”

এই কথার পরে পাঠানদের সমস্ত বিদ্রোহভাব তূণের মত ভাসিয়া গেল। মুস্তাফা খাঁ প্রতিশ্রুত হইলেন, “যে পর্য্যন্ত আমি জীবিত থাকিব, সে পর্য্যন্ত নবাব সাহেবের নিম্নতম সৈনিকের ঘোড়ার খুরে আমার মাথা বাধা রহিল। যে পর্য্যন্ত দেহে প্রাণ থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আলিবর্দী, তাঁহার সম্মান ও পরিবারবর্গের হিতার্থ আমার জীবন অর্পণ করিলাম।” (সিয়ার মুতফরিন, ১ম খণ্ড, ৩৮৪ পৃঃ)।

আলিবর্দীর এই রাজনৈতিক কাণ্ডা ও চাল সিরাজ একেবারেই জানিতেন না। যখন শেষ মুহূর্ত্তে বিপদ আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল, তখন তিনি মীরজাফরের পায়ে পাগড়ী ফেলিয়া কাদিতে লাগিলেন, কিন্তু সে অসময়ের কান্না। যদি সময়ে মিষ্ট ব্যবহার করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতেন, তবে তাঁহার কেশ স্পর্শ করা সহজ হইত না। একদিকে দুর্লভরাম বিষ ছড়াইতেছিলেন, অপরদিকে জগৎ শেঠ—বাহার বিপুল অর্থ বহলোকের টাকি তাঁহার ভাণ্ডারের দ্বারে বাধিয়া রাখিয়াছিল—তিনি জনমত সিরাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে ছিলেন। চিরশত্রু, জুর ও কুটক্রী মীরজাফর—সমস্ত সৈন্তগণকে ঘেসেটি বেগমের অর্পে করতলগত করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া জুটিলেন। সমস্ত বঙ্গদেশ এই

অনতিক্রান্ত-কৈশোর বালকের নিন্দাবাদে মুখরিত হইতে লাগিল। হঠাৎ তিনি একদিন দেখিলেন, চারিদিকে কেহই তাঁহার মিত্র নহেন, ঘেসেটি বেগম হইতে ক্ষুদ্র সৈনিকেরা পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার সর্বনাশের চেষ্টা করিতেছে,—এমন কি তাঁহার স্বপুত্র পর্য্যন্ত বিপদের দিনে তাঁহাকে আশ্রয় দিতে সন্মত হইলেন না। মাত্র মীরমদন প্রাণ দিয়া মুমূর্শুশয্যায়া তাঁহাকে শুনাইয়া গেলেন, তিনি দুখ দিয়া কালসাপ পুখিয়াছিলেন—মাত্র মোহনলাল রণক্ষেত্রে রোষ-কষায়িত নেত্রে মীরজাফরের বড়বয়স আবিষ্কার করিয়া অসমর্থ হইয়া প্রাণ দিলেন—মাত্র ফরাসী সেনাপতি লাস হতভাগ্য বালক-নবাবের হুঃখে পরম হুঃখ পাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার বৃথা চেষ্টা করিলেন।

আর পলাশীর যুদ্ধ—উহা যুদ্ধ নহে, দৈবের খেলা। যাঁহারা বিলাসী, অত্যাচারী, স্বেচ্ছাতত্ত্ব এবং অলস—তাঁহাদের হাত হইতে ভগবান্ ঐশ্বর্যালক্ষ্মীর প্রকৃত সেবক, স্বার্থ-বিস্তৃত, জাতীয়স্বার্থসর্ব্বস্ব, গিরি-মাগর-লজ্জী, অদম্য-উৎসাহশীল, নবগঠিত, নব-তেজোদৃষ্ট একটি জাতির হাতে এই বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করিলেন, পলাশী উপলক্ষ্যমাত্র। উহা রাজলক্ষ্মীর কৌটী—একটা ময়দানে বসিয়া যুদ্ধের ছলে ভাগ্যলক্ষ্মী তাহা তাঁহার যোগ্য সন্তানদিগকে দিলেন। মীরজাফর আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা দিকের প্রতীক। শকুনি, জয়চন্দ্র, মীরজাফর প্রভৃতি ব্যক্তির যুগে যুগে অভ্যুদয় হইয়াছে—ভারতবর্ষ যে এখনও স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য হয় নাই, তাহা প্রমাণ করিতে। আমাদের রক্তের মধ্যেই মীরজাফর ও জয়চন্দ্র রহিয়াছে—উহা বহুদিনের ব্যাধি।

সিরাজউদ্দৌল্লা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কোন নিষ্ঠুরতা করিয়াছেন একথা ইতিহাসের কোথাও নাই, বরঞ্চ সর্বত্র তাঁহার উদারতার প্রমাণ আছে তিনি হসেন কুলি খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন, উহা সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে—তখন তিনি বালক, এবং এই ব্যাপারে ঘেসেটি বেগম ও অপরাপর বয়োবৃদ্ধ লোকের বিশেষরূপ হাত ছিল; তথাপি উহা অতি গর্হিত কর্ম্ম এবং এজন্য যে তিনি কত অন্ততপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুকালীন কাতরোক্তি হইতে জানা যায়। রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভের জন্তই ইংরেজদের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ অন্ত্যায় উপায়ে লক্ষ অপরিমিত ঐশ্বর্য্য লইয়া রাজবল্লভ ঢাকায় ছিলেন এবং ঘেসেটি বেগমের সহিত সিরাজের বিরুদ্ধে বড়বয়স করিতেছিলেন, তথাপি সিরাজ রাজবল্লভকে কিছু বলেন নাই। কিন্তু মনে পাপ থাকিলে ভিতরে সোয়াস্তি থাকে না। রাজবল্লভ তাঁহার অর্থের এক বিপুল অংশ রাজা কৃষ্ণবল্লভের হাতে দিয়া কলিকাতায় ইংরেজদের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠাইয়াছিলেন। এ অবস্থায় মুল্লকের অধিপতির এই দাবী জায়সঙ্গত,

সবর ব্যবহার।

তিনি কৃষ্ণবল্লভকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে ডেক সাহেবকে চিঠি লিখিলেন, ডেক স্বীকৃত হইলেন না। নবাব কলিকাতা

দুর্গ দখল করিয়াই ইহাকে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিতে বলিলেন। নবাবের আর একজন বিদ্রোহী প্রজা ছিলেন উমিচাঁদ। তিনিও ইংরেজের আশ্রয়ে গা-ঢাকা দিয়াছিলেন। নবাব

উভয়কেই আনিতে আদেশ করিলেন। Stewart সাহেব তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "He (Nawab) immediately ordered Umichand and Krishnaballabh to be brought before him and received them with civility" (p. 538). (তিনি তখনই উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভকে তাঁহার নিকটে আনিতে আদেশ করিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত ভদ্রব্যবহার করিলেন); তিনি এ অবস্থায় কৃষ্ণবল্লভের টাকাকড়িগুলি অন্ততঃ আশ্বসাৎ করিতে পারিতেন, অথচ কেহ হইলে শুধু টাকাকড়ি গ্রহণ নহে, তাঁহার অধিকার অগ্রাহ করিয়া তদ্বিরুদ্ধপক্ষ আশ্রয় করার জন্য তাঁহার একটা ছায়সঙ্গত দণ্ডও হইতে পারিত। কিন্তু নবাব তাঁহাকে আদরে আপ্যায়িত করিয়া গ্রহণ করিলেন। হলওয়েল সাহেব তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিয়াছেন—ইহাতো একটা গুরুতর অপরাধ—তাঁহার সহিত ব্যবহারসম্বন্ধে Stewart সাহেব লিখিয়াছেন: "He dismissed him with assurance of safety" (p. 538). (তাঁহার ভয় নাই, তিনি নিরাপদে থাকিবেন, এই আশ্বাস দিয়া নবাব তাঁহাকে বিদায় দিলেন)। কলিকাতায় ইংরেজেরা বাণিজ্য করিয়া অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহাদের দুর্গ অধিকার করিয়া তিনি মাত্র ৫০,০০০ টাকা পাইলেন। তাঁহার সন্দেহ করিবার কারণ যথেষ্ট ছিল যে হয়ত হলওয়েল সাহেব টাকাপরস্যা গুপ্ত স্থানে রাখিয়াছেন, এজন্য তিনি তাঁহাকে কতকটা ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন: "However finding that no discoveries could be obtained concerning the treasures which he supposed to be buried in Calcutta he released Mr. Holwell and other English prisoners" (p. 541). (কিন্তু যখন সেইরূপ কোন গুপ্তসম্পত্তির সন্ধান পাওয়া গেল না তখন তিনি মিঃ হলওয়েল এবং অপরাপর ইংরেজ বন্দীদের মুক্তি দিলেন।) ক্লাইভ মীরজাফরের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিতে প্রথমতঃ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন নাই। যখন সেই সকল বন্ধুত্বচক্ৰ চিঠির বলে তিনি সৈন্ত লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন,—তখন রোজ তিনি চন্দননগর হইতে গোপনে চিঠি পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু একখানির মাত্র জবাব পাইলেন, তাহাতে লিখিত ছিল—মীরজাফর নবাবের সঙ্গেই সৈন্ত লইয়া অগ্রসর হইবেন, কিন্তু ঠিক সময়ে তিনি ক্লাইভকে সাহায্য করিবেন। চিঠিটা যেমন তিনি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তেমন নহে, তাহাতে আগ্রহ বেশী দেখা গেল না, তখন ক্লাইভ মহা ভাবনায় পড়িয়া গেলেন,—হয়ত নবাবের মন্ত্রী তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিয়া শেষে প্রভুর শত্রুর প্রতিশোধ লইবেন! ইহার পরে ক্লাইভ মন্ত্রীর নিকট হইতে আরও দুইখানি চিঠি পাইলেন, কিন্তু কতকটা আশ্বস্ত হইলেও মীরজাফরকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করার মতন মনের ভাব তখন ইংরাজদের মধ্যে কাহারও ছিল না।

ভারতবর্ষে ক্লাইভ "সবৎজঙ্গ" নামে সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন; ক্লাইভ বলিলে তাঁহাকে অল্প লোকেই চিনিত। তাঁহার অধীনে ৮০০ ইংরেজ পদাতিক সৈন্ত, ১০০ কামান-চালক, ৫০ জন—কামান লইয়া

যাইবার নৌসেনা। এই কামানের মধ্যে মাত্র ছয় পাউণ্ড বারুদ ধরে এমন আটটি কামান ছিল;

তাহা ছাড়া পর্ভ গীজ ও ২,১০০ সিপাই ছিল। নবাবের সঙ্গে ১,৮০০ স্ত্রীদল অথারোহী সৈন্য,
৫০,০০০ পদাতিক, তাহাদের হাতে বন্দুক, বর্শা, ধনু, বোমা ইত্যাদি
পলাশীর যুদ্ধ।

অস্ত্র ছিল। ইহা ছাড়া ৪০টি কামান ছিল, তাহার মধ্যে অধিকাংশেই
২৪ হইতে ৩২ পাউণ্ড বারুদ ধরিত। এই অসম প্রতিদ্বন্দিতায় মীরজাফরের সম্পূর্ণ আশ্বাস
না পাইলে অগ্রসর হওয়া বাতুলতা। মীরজাফর আশ্বাস দিয়াছিলেন, কিন্তু তেমন
আগ্রহাতিশয় দেখান নাই। তারপর নবাবের সৈন্তের নেতা হইয়া যিনি আসিয়াছেন, তিনি
যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন, তবে ত সর্বনাশ। ক্লাইভ (সবৎজঙ্গ) তাঁহার ২০ জন প্রধান
কর্মচারীকে লইয়া একটা সভা করিলেন। তিনি বলিলেন, “মীরজাফরের কথার উপর
নির্ভর করিয়া নবাবকে আক্রমণ করা—এই পথ খোলা আছে। দ্বিতীয় পথ—আমরা
কাটোয়া হইতে অনেক খাজদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি—এখানে অনায়াসে কয়েক মাস
প্রতীক্ষা করা চলে, ইহার পর বর্ষাশেষে মারহাট্টারা আসিবে, তখন তাহাদের সঙ্গে একত
হইয়া নবাবকে আক্রমণ করা যাইতে পারে।”

২০ জনের মধ্যে ১৩ জন অপেক্ষা করার পক্ষপাতী হইলেন। ৭ জন তখনই নবাব-
শিবির আক্রমণ করার পরামর্শ দিলেন। ক্লাইভ কিছু না বলিয়া নিকটস্থ তরুকুলে যাইয়া
গভীর চিন্তায় এক ঘণ্টাকাল নিবিষ্ট ছিলেন। অবশেষে যাহা স্থির করিলেন, তাহা বীরের
মত; এতদূর অগ্রসর হইয়া এখন আর স্থিতির ভাব ভাল নহে; যে করিয়া হউক
যুদ্ধ করিতে হইবে। নদী পার হইয়া তখনই তিনি দূরে—৮০০ গজ দীর্ঘ এবং ৩০০
গজ প্রস্থ আমবাগে শিবির স্থাপন করিলেন, এই আমবাগই সুপ্রসিদ্ধ পলাশীক্ষেত্র। তিনি
তথায় যাইয়া দেখেন নবাবের মানকরে যাইবার যে কথা ছিল তিনি সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন,
তিনিও সৈন্তদল লইয়া অতি নিকটেই আছেন।

নবাবের অবস্থা তখন শোচনীয়; তিনি দেখিলেন যেন তাঁহার লোকেরা আর কেহ
তাঁহার নহে। তাঁহার পরিকরবর্গ নমাজ পড়িবার ছলে সকলেই চলিয়া গিয়াছে।

এমন কি সেই শিবির একরূপ জনশূন্য যে একটা চোর তথায়
পরিত্রাণ-বর্জিত নবাব। চুকিয়াছিল। একটা পরিচারককে তিনি ভৎসনা করিয়া বলিলেন,

“তোরা কি ভাবিয়াছিস্ যে আমি এখনই মরিয়াছি?”

এদিকে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, মীরমদন ও মোহনলাল সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে
লাগিলেন; মোহনলাল ২৫,০০০ সৈন্য লইয়া তুমুল রণোচ্চমে মাতিয়া গেলেন। একটা গোলা
লাগায় মীরমদন অবসর হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় সিরাজের শিবিরে আনীত হইলেন, তিনি
মরিতে মরিতে বলিয়া গেলেন, “নবাব সাহেব, আপনার নিজের লোকই আপনার সর্বনাশ
করিতেছে, সকলেই আপনার শত্রু। আমি প্রাণ দিয়াও আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না।”
এই বিপদে সিরাজউদ্দৌলা মীরজাফরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, দূতের পর দূত গেল, ‘আসছি,’
‘যাচ্ছি’ করিয়া মীরজাফর অনেক বিলম্বে নবাবের নিকট আসিলেন। নবাব তাঁহার পায়ের
নীচে নিজের পাগড়ী ফেলিয়া বহু অস্থনয় বিনয় করিলেন, তাঁহার পূর্বকৃত অপরাধ মার্জনা

করিতে অহুরোধ করিলেন। কিন্তু মীরজাফর পাণ্ডরের মত নিশ্চল থাকিয়া নবাবের সাগ্ৰহ অহুরোধের উত্তরে বলিলেন, “আজ রাজি হইয়াছে, কাল সমস্ত ব্যবস্থা করা যাইবে।” উত্তরে নবাব বলিলেন, “আজ যুদ্ধ বন্ধ করিলে যে প্রমাদ হইবে—রাত্রে শত্রুরা শিবির আক্রমণ করিবে।” মীরজাফর বলিলেন, “সে ভার আমার উপর দিয়া আপনি নিশ্চিত থাকিতে পারেন।” মুতফরীনের পাদটীকায় লিখিত আছে, “সিরাজ এই অবস্থায় মীরজাফরের সঙ্গে যে সকল কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, তাহা বুদ্ধিহীন বা অত্যাচারী রাজার মত আদৌ নহে। সকলজন্মের পরিজনবর্গ ও সন্তানগণের প্রতি তিনি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং গোলাম হুসেনের স্বগণদিগকে তিনি যেরূপ দয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে বুদ্ধি বা বিচক্ষণতার অভাব কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না, তিনি অত্যাচারী ছিলেন—একথা তো একেবারেই বলা চলে না। ইনি বাল্যকালে অত্যধিক গ্ৰেহে লালিতপালিত হইয়া সংশিক্ষা পান নাই, এবং যখন তাঁহার কিছু কাল স্কুলে থাকা উচিত ছিল,—তখন হঠাৎ তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।”

মোহনলাল পুনর্বার বেগে ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিলেন। গোলাম হুসেন এবং রাজীবলোচন উভয়েই লিখিয়াছেন—ইংরেজেরা বিপর্যস্ত হইলেন। জয়লক্ষ্মী নবাবের দিকে সবে মাত্র প্রসন্নবদন ফিরাইবেন, তখনই মীরজাফর আদেশ দিলেন, “আজ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দাও।” মোহনলাল তীব্রস্বরে বলিয়া পাঠাইলেন, “এই কি যুদ্ধ ধামাইবার সময়? আমি কিছুতেই এই অত্যাচার আদেশ পালন করিব না, তাহা হইলে আমার সৈন্তেরা নিরুৎসাহ হইবে, এবং ইংরেজেরা সোৎসাহে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া আমাদের ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।” নবাবের এই কথাগুলি খুব মনে লাগিল, কিন্তু মীরজাফর বলিলেন, “তাহা হইলে হজুরের যাহা মজ্জি, তাহাই করুন—আমি আর কি করিব?” যে ব্যক্তি তাঁহার কাঁধে চাপিয়া তাঁহাকে অতলে ডুবাইবে, অশুভ মুহূর্ত্তে শনির কোপে নবাব সেই মীরজাফরকেই আশ্রয় করিলেন। তাঁহাকে চটাইতে ভয় করিয়া মোহনলালকে যুদ্ধ করিতে বারংবার নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন। নিতান্ত নিরাশ ও বিরক্ত হইয়া মোহনলাল রূপাণ ত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হটিয়া আসিলেন। তখন শত্রুরা সোৎসাহে তাঁহার সৈন্তদিগকে আক্রমণ করিল। মোহনলাল চলিয়া গিয়াছিলেন—তখন ইংরেজদের বিজয় সম্পূর্ণ হইল। গোলাম হুসেনের বিবরণানুসারে মোহনলাল বন্দী ও আহত হইয়া হুর্লভরামের হাতে সমর্পিত হন, তথায় অল্প পরেই তিনি নিহত হন। কিন্তু রাজীবলোচন লিখিয়াছেন—যুদ্ধক্ষেত্রে যখন মীরজাফরের আদেশ বারংবার লঙ্ঘন করিয়াও তিনি যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন মীরজাফরের এক চর পশ্চাৎ ভাগ হইতে গুলি করিয়া তাঁহাকে নিহত করে। যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই মীরজাফর সৈন্তদল লইয়া ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন।

হতভাগ্য নবাব এখন আর রাজপ্রাসাদের লোকজন কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কে তাঁহার গলায় ছুরি দিবে, ঠিকানা নাই। তিনি তাঁহার বেগম লুৎফুন্নেসা এবং বহুসূতা কতকগুলি মণিমুক্তা লইয়া মুর্সিদাবাদ ছাড়িয়া চলিলেন। তিনি তাঁহার

সেনাপতিদিগকে আদেশ করিলেন, যে পর্যন্ত তিনি কোন নিরাপদ স্থানে না পৌঁছিবেন, সে পর্যন্ত যেন তাঁহারা তাঁহার অনুগমন করেন। তাঁহারা মীরজাফরের করতলগত, কেহ তাঁহার আদেশে কর্ণপাত করিলেন না। এমন কি তাঁহার খণ্ডর মির্জা রেজার্থীও তাঁহাকে কোন সহায়তা না করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। একটা দিন তিনি রাজপ্রাসাদে ছিলেন, তখন জনপ্রাণী তাঁহার খোঁজ নিতে আসে নাই। মহাবিপদ আশঙ্কা করিয়া তিনি রাজমহলের দিকে চলিলেন, পথে ফরাসী সেনাপতি মুঁসিয়ার লাসকে আসিতে চিঠি পাঠাইলেন। গোলাম হসেন লিখিয়াছেন, “রাজমহলে যদি স্থলপথে যাইতেন তাঁহার অনেক সুবিধা হইত; কিন্তু পূর্ক সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া তিনি জলপথে চলিলেন। কিছু খিচুড়ীর ব্যবস্থার জন্ত তিনি নৌকা ভিড়াইলেন। এমন সময়ে একটি ফকির আসিয়া আতিথ্য করিতে আগ্রহ দেখাইতে লাগিল। তিন দিন তিনি, বেগম সাহেবা, সন্ততিবর্গ ও অপরাপর স্ত্রীলোকেরা এক ফোটা জল পর্যন্ত খাইতে পান নাই; এই সম্পূর্ণ অভুক্ত রাজ-পরিবারকে দানা সা ফকির খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া ডাকিতে লাগিল। এদিকে সে মীরজাফরের চরদিগকে পূর্কই খবর দিয়া রাখিয়াছিল, তাহার নাকি সিরাজউদ্দৌলার প্রতি আগেকার কি এক আক্রোশ ছিল! যখন অভুক্ত ব্যক্তিগণ খাইতে বসিবেন, এমন সময়ে মীরজাফরের লোকজন আসিয়া নবাবকে ধরিয়া লইয়া গেল। নবাব অভুক্তই রহিয়া গেলেন, এ জীবনে তাঁহার আর খাওয়া হইল না।

মীরন যখন সিরাজউদ্দৌলাকে মুঁসিদাবাদে লইয়া আসে, তখন তাঁহার অভুক্ত ও বিড়ম্বিত অবস্থা দেখিয়া সৈন্তগণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। আটদিন পূর্ক যিনি তরুণ স্বর্ঘ্যের জ্য দীপ্তি পাইতেন, আজ তাঁহার একি ছন্দা! সেই বিচলিত সৈন্তগণ কোন উৎসাহই পাইল না, কারণ সেনাপতিগণ সকলেই বড়যন্ত্রে লিপ্ত। মীরজাফরের পুত্র মীরন একটা হিংস্র পশু, মূর্খতা ও নিষ্ঠুরতার অবতার। সিরাজকে আবদ্ধ করিয়া সে বহু অর্থের লোভ দেখাইয়া একজন হত্যাকারীর খোঁজ করিল। কিন্তু এই ছন্দে কেহই স্বীকার পাইল না। অবশেষে মহম্মদী বেগ নামক অপর এক পশু-প্রকৃতি লোক জুটিল। সে আলিবর্দী ও সিরাজের অগ্রে চির-প্রতিপালিত। এক আঘাতে সে হত্যা করিতে পারিত কিন্তু তাহা না করিয়া বারংবার আঘাত করিয়া হতভাগ্য নবাবকে নিহত করিল। মরিবার পূর্ক সিরাজ বলিলেন, “আমি সত্যই আমার যোগ্য শাস্তি পাইলাম, হসেন কুলি, তোমার আত্মার এখন তৃপ্তি হইবে।” * যখন সিরাজ এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন, তখন

* গোলাম হসেন লিখিয়াছেন, “তিনি বেশী কিছু বলিতে পারিলেন না, কারণ কসাইটা তাঁহার উপর ক্রমাগত থল্লাঘাত করিতেছিল। এই আঘাতগুলির কয়েকটি তাঁহার মুখের উপর পড়িল; যে মুখের দাষণ্য ও অনুপম সৌন্দর্য্য সমস্ত বঙ্গদেশে প্রবাদবাক্যের মত হইয়াছিল, সেই মুখশ্রী আঘাতে আঘাতে নষ্ট হইল। মুখখানি হেলিয়া পড়িল।” গোলাম হসেন এই মারনের নিষ্ঠুরতার অনেক কথা লিখিয়াছেন, এই নরশিখার একটা নীতি ছিল বাহাকে সন্দেহ করিবে, তাহাকেই শেখ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগকে এই ছষ্ট ব্যক্তি পশুর মত

মীরজাফর সেই নবাবের শয্যায় আরামে (প্রকৃতই হউক কিংবা ভান করিয়াই হউক) দিবা-নিদ্রা যাইতেছিলেন, চক্ষু মেলিয়া যোগ্য-পুত্র মীরনকে দেখিয়া বলিলেন, “দেখ যেন নবাব পলাইয়া না যায়।” একথা ঠিক সত্যকার কথা কি ছিলনা তাহা বলা যায় না। মীরন উত্তর করিল, “তজ্জল তোমাকে ভাবিতে হইবে না।”

সিরাজউদৌলার ছিন্ন-ভিন্ন দেহ হস্তীর পৃষ্ঠে রক্ষা করিয়া সেই হস্তীকে মুর্সিদাবাদের সর্কাপেক্ষা অনাকীর্ণ পথ দিয়া লইয়া বাওয়া হইয়াছিল। কারণ জনসাধারণকে বুদ্ধিতে দেওয়ার দরকার যে পুরাতন নবাব আর নাই, নতুন নবাব হইয়াছেন। যেখানে হুসেন কুলি খাঁ কয়েক বৎসর পূর্বে নিহত হইয়াছিলেন, কি এক প্রয়োজনে মাহত সেইস্থানে হাতীকে থামাইল এবং ঠিক সেই জায়গায়ই সিরাজের দেহ হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতে লাগিল। হস্তী ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই স্থান দিয়া চলিল এবং যে গৃহে সিরাজের মাতা ছিলেন, সেইখানে আসিয়া থামিল। হতভাগিনী তাহার পুত্রের এই শোচনীয় পরিণামের কিছুই জানিতেন না। অকস্মাৎ এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি ভুলিয়া গেলেন যে তিনি মুসলমান অন্তরমহলের সম্ভ্রান্ত মহিলা, ভুলিয়া গেলেন যে তিনি আলিবর্দীর ছললী কন্যা আমনা বেগম। ভিখারিণীর মত চীৎকার করিয়া নগ্নপদে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং তাহার পুত্রের ছিন্ন-ভিন্ন দেহের উপর পড়িয়া চীৎকার করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া চারিদিকের লোকেরা

হত্যা করিত। ইহার সর্বশেষ দৃশ্য—যেসেটি বেগম ও সিরাজ-মাতা আমনা বেগমকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা। আলিবর্দী খাঁর এই দুই কন্যাকে হত্যা করিয়া উদ্দেশ্যে মীরন ঢাকার শাসনকর্তাকে লিখিয়াছিল—“আপনার তত্ত্বাবধানে এই দুই রাজকুমারী আছেন, আপনি অবিলম্বে ইঁহাদিগকে হত্যা করিবেন।” কিন্তু ঢাকার রাজপ্রতিনিধি এই দুই নিরপরাধ রাজকুমারীকে হত্যা করিতে স্বীকৃত না হইয়া উত্তরে লিখিয়াছিলেন, “আপনি ঢাকার ভক্ত অস্ত্র এক শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া তাহার দ্বারা এই কাণ্ড সম্পাদন করুন। আমি ইহা পারিব না।” মীরন একজন লোককে ঢাকার পাঠাইয়া দিল এবং ঢাকার শাসনকর্তাকে লিখিল,—“ইনি বেগমদ্বয়কে মুর্সিদাবাদে আনিতে যাইতেছেন, ইঁহার সঙ্গে তাঁহাদিগকে পাঠাইবেন।” লোকটির উপর এই আদেশ ছিল—ইঁহাদিগকে পথে জলে ডুবাইয়া মারিতে। আসন্নকাল বুদ্ধিয়া বৃদ্ধা যেসেটি বেগম কাহিতে লাগিলেন, কিন্তু কনিষ্ঠ বেগম (সিরাজ-মাতা—আমনা বেগম) বলিলেন—“ভিদি, কাঁদিয়া কি হইবে? আমরা উভয়ে ভগবানের কাছে অশেষ অপরাধে অপরাধী। এইভাবে তিনি যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিলেন, তাহা তাঁহার ঘর। মীরনের উপর তাঁহার রোগাঘি বর্ধিত হউক।” এই অভিসম্পাতের পর দুই ভগিনী গলাগলি করিয়া অতলজলে প্রাণত্যাগ করিলেন। যেদিন এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ঘটিল, ঠিক তাহার আটদিন পরে (১৭৬০ খৃঃ) ও সিরাজের মৃত্যুর দুইবৎসর পরে মীরন আজিমাবাদের জঙ্গলে ক্ষুদ্র একটি শিবিরে বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করে। আজিমাবাদের প্রধান সাধু—সা মহম্মদ আলি হাজিন—এই সংবাদ পাইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, “বিধাতার রোষাঘি কেমন দৃষ্টান্তাবে সজ্ঞান লইয়া জঙ্গলের এক ক্ষুদ্র শিবির হইতে তাহার লক্ষ্য খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে।” দুইবৎসর পূর্বে সিরাজের শব যে পথ দিয়া লইয়া বাওয়া হইয়াছিল, মুর্সিদাবাদের সেই পথেই মীরনের মৃতবেহ হস্তিপৃষ্ঠে আনীত হইয়াছিল। মৃত্যুর পর মীরনের পকেটে পুস্তিকায় ৩০০ শত সম্ভ্রান্ত গ্রী-পুত্রদের নাম পাওয়া গিয়াছিল। ইঁহাদিগের সকলকেই সে হত্যা করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল। যেসেটি ও আমনা বেগমের অনুগ্রহেই সে প্রথমজীবনে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ইঁহাদের সর্বনাশ-সাধন ভগবান সহিতে পারেন নাই (মৃত্যুকবিত্ত, ২য় খণ্ড, ৩৬৩-৩৭২ পৃঃ)।

আবার চকল হইয়া উঠিল। এই সময়ে খোদাম হসেন খাঁ বারান্দা হইতে তাঁহার আশ্রয়-
দাতার পুত্রের এই দুর্দশা দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছিলেন। তিনি কতকগুলি গুপ্তা
লাগাইয়া লাঠির গুঁতা মারিয়া বেগম সাহেবাকে জোর করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মীরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন, তাঁহার সংবর্দ্ধনার্থ মৈত্ৰদল অসি
নিদ্রাসন করিল। মীরজাফর ইংরেজের কাযদা জানিতেন না, সুতরাং তাহারা বুঝি তাঁহাকে
হত্যা করিবে, এই ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন; এই সময়ে স্বয়ং ক্লাইভ আসিয়া তাঁহাকে 'নবাব'
সম্বোধন করিয়া প্রীতিভরে করমর্দনপূর্ব্বক আশ্বস্ত করিলেন।

সিরাজের মৃত্যুসম্বন্ধে ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন, "কর্ণেল ক্লাইভকে সমর্থনার্থ আমরা
এই বলিতে পারি যে, ভারতীয় কোন ইতিহাস-লেখকই সিরাজউদৌলার মৃত্যুতে তাঁহার
কোন হাত ছিল, একথা বলেন নাই। অনেকে বিশ্বাস করেন, সিরাজ যে বন্দী হইয়াছেন,
একথাই তাঁহাকে জানিতে দেওয়া হয় নাই। তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর পর তাঁহাকে এসকল
কথা জানান হইয়াছিল" (৫৬৯ পৃঃ)।

বাস্তবিক ক্লাইভের মত বীরপুরুষ এরূপ হেয় কার্য্য কখনই অনুমোদন করিতেন না,
এমন কি মীরজাফরের এবিষয়ে কিছু ইঙ্গিত ছিল, কেহ কেহ এ সন্দেহ করিলেও তৎসম্বন্ধে
হিসসিজাস্ত করার যোগ্য কোন প্রমাণ নাই। তবে মীরজাফরকে কেহই দেখিতে
পারিত না। নবাব হওয়ার পর তিনি নিজে মস্ত বড় জাঁকালো একটা নাম ধারণ
করিয়াছিলেন, "সুজা এল মুল্ক হিসামএদ্ দৌলত মীরজাফর খাঁ বাহাদুর মেহাবুজঙ্গ"
("But as he was very much smitten with the charms of the title of Mehabut
djung, which had been borne by Alybardy Khan, he ordered a new seal
to be engraven for himself, where he assumed the title of Sujah-el-Mulk
Hysam-ed-doulat Mirdjafar Ally Khan Bahadur, Mehabut djung—that
is, the high and valiant Lord Mirjafar khan, who is the valorous of the
State, the sword of the Empire and the formidable in War and the Majestic
in Battles." (Metagherin, Vol. II, p. 208), কিন্তু তাঁহার এক রহস্যপ্রিয় সভাসদ
তাঁহার মসনদে বসিবার অল্প কয়েক মাস পরে আর একটি সহজ নাম দিয়াছিল, "কর্ণেল
ক্লাইভের গর্দভ"—এই উপাধি দ্বারা তিনি আজীবন পরিচিত হইয়াছিলেন। (A very
few months after Mirzafar's accession, he was nicknamed by some of
the wits of the Court, "Colonel Clive's Ass" and retained the title till
his death (Stewart, p. 569). মীরজাফর মৃত্যুকালে নন্দকুমারের উপদেশানুসারে
কিরীটেশ্বরীদেবীর পাদোদক পান করিয়াছিলেন। গোলাম হসেন লিখিয়াছেন, "ইহাই
তাঁহার শেষ খাওয়া—খোদা আমাদিগকে এই ভাবের পীড়া ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন"।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শিক্ষা-দীক্ষার কথা

পাঠানদের সময়ে বাঙ্গালী হিন্দুর যে তেজ ছিল, তাহা মোগলদের সময়ে অনেকটা নির্দীপিত হইয়া গিয়াছিল। পাঠানেরা এদেশের হিন্দুদের সঙ্গে যতটা মিশিয়াছিলেন—

মোগলেরা তাহা করেন নাই। হুসেন সাহ প্রভৃতি প্রধান রাজারা পাঠানদিকারে বাঙ্গালী।

সম্রাট ব্রাহ্মণদিগের পুত্রকন্যা খুঁজিয়া তাঁহাদিগের সহিত স্বীয় সম্ভতিবর্গের বিবাহ দিতেন। আমরা একটাকিয়ার ব্রাহ্মণ জমিদারদিগের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশের অনেক সুন্দরী কন্যা এবং গুণশালী যুবকের সহিত মুসলমান বাদশাদের পুত্রকন্যার বিবাহ হইয়াছে। অবশ্য এই সকল কন্যা ও পুত্রদিগকে বিবাহের পূর্বে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা হইত। এইভাবে অযোধ্যা প্রদেশের বাইশোয়ারা পরগনার অধিপতি ক্ষত্রিয় ধনপৎ সিংহের বংশীয় ভগীরথের পুত্র কালিদাস গজদানীর রূপে মুদ্র হইয়া নবাব বাহাদুর সাহের কন্যা তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই কাহিনীতে কবিত্বের রং ফলাইয়া মুসলমান কবি যে পল্লী-গীতিকা রচনা করিয়াছেন, তাহা “ইশা খাঁ” শীর্ষক কাব্যে আছে, বিশ্ববিদ্যালয় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। কালিদাস স্বর্ণহস্তী (অবশ্য ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তি) ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া গজদানী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি গোড়া হিন্দু ছিলেন। নবাবকন্যার প্রেমে পড়িয়া তিনি ধর্মবিসর্জনপূর্বক ‘সোলেমান’ নাম গ্রহণ করেন। এই দেওয়ান কালিদাস গজদানীর পুত্রই জঙ্গলবাড়ীর সুপ্রসিদ্ধ বোদ্ধা ইশা খাঁ, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের ইতিহাসে যিনি একটা কলঙ্কের দাগের মত হইয়া রহিয়াছেন, সেই ‘কালাপাহাড়’ও হিন্দু ছিলেন, তিনি মুসলমান বাদশাহের কন্যা বিবাহ করিয়া জাতিধর্ম বিসর্জন দেন; তাহার কথা ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। পাঠানেরা হিন্দুর রাজ্য জয় করিলেও তাঁহাদের মধ্যে সম্রাট বংশীয়দিগকে স্বীয় সমকক্ষ মনে করিতেন। মোগলদের বিরুদ্ধে যেমন দাউদ খাঁ, কতলু খাঁ প্রভৃতি পাঠানেরা যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তেমনই চাঁদ রায়, কৈদার রায়, প্রতাপাদিত্য, ভূবনার মুকুন্দরাম ও সত্ৰাজিৎ রায় প্রভৃতি হিন্দু জমিদারগণও যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কারণ পাঠানেরা শুধু মাথা হেঁট করাইতে চাহিতেন, কিছু রাজস্ব চাহিতেন, দক্ষিণা পাইলেই চলিয়া যাইতেন; হিন্দু রাজারা প্রায় স্বাধীনই ছিলেন, তাহারা ঐ রাজস্ব দেওয়ার পর নিজ রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই শাসন করিতেন, এমন কি পার্শ্ববর্তী রাজারা অপর শত্রুদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ করিতেন—গোড়ঘারের রাজা চাঁদ রায় ও সন্তোষ রায় এইভাবে কতলু খাঁকে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে ইহারা এত প্রবল হইতেন যে, বঙ্গাধিপের রাজ্য আক্রমণ করিবার কথাও মনে মনে পোষণ করিতেন। এইভাবে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাথীর একদা নবাবের রাজধানী আক্রমণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ত্রিপুরেশ্বরের প্রধান পুরোহিত হুসেন সাহের সেনাপতি মমারক থাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ত্রিপুরেশ্বরের মন্দিরে বলি

দিয়াছিলেন। পাঠানদের সময়ে হিন্দুর প্রকৃত দাসত্ব আরম্ভ হয় নাই। পূর্বকালে জরাসন্ধ ও পৌণ্ড্র বাহুবল্যে বেক্রপ মথুরা ও দ্বারকার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, বোড়শ শতাব্দীর বঙ্গের নগণ্য জমিদারেরাও সেইরূপ দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধোদ্যোগ করিয়াছিলেন। এমন কি প্রতাপাদিত্য মানসিংহকে পরাস্ত করিয়া আগ্রার রাজধানী পর্য্যন্ত যাইবেন, ভারতচন্দ্র কবি তাঁহার এই ইচ্ছা আভাসে জানাইয়াছেন (“যমুনার জলে ধোব এই তরবার”), দিল্লী, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলের প্রতি এই বিদ্রোহ বাঙ্গালীর চিরসংস্কারাগত। মহারথরা পূর্বকাল হইতে পূর্বভারতকে ভয় করিয়া চলিতেন। জগজ্জয়ী আলেকজান্ডার পূর্বাঞ্চলের নাম শুনিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিলেন। স্বয়ং মঃ ইবন বক্তিয়ার খাঁ এদেশের স্বাধীনতা মাত্র হরণ করিয়া আরো পূর্বে অভিযান করিবার চেষ্টায় নানারূপে লাঞ্চিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। এদেশ ইতিহাসের পূর্বযুগ হইতে ইন্দ্রপ্রস্থের আশ্রয়গত্যের বিরোধী। পুরাণের যুগ ছাড়িয়া দিলেও ইদানীং কালে প্রতাপাদিত্য, তৎপুত্র উদয়াদিত্য, বাক্সালীর খাত্তা ও দিল্লীর বিদ্রোহ। মুকুন্দরাম, তৎপুত্র সত্যজিৎ এবং কেদার রায়, ইশা খাঁ, ফিরোজ খাঁ সেই ইন্দ্রপ্রস্থ-বিরোধী পতাকা বহন করিয়া প্রাণ দিয়াছেন, কিন্তু পণ ছাড়েন নাই।

পাঠান-রাজত্ব পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের এই স্বাধীনতার চেষ্টা সর্বত্র চলিয়াছিল। পাঠানেরা ভূম্যধিকারী ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন রণক্ষেত্রের বীর—সংগ্রামবিজয়ী। কৃষি-ব্যবসায়, বাণিজ্য, দেশের উৎপাদিকা শক্তি এবং তজ্জাত অর্থগম—এসকল বিষয় অসহিষ্ণু, সততরূপাণ-পাণি, রণজয়ী বীরগণের করুনাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাঁহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য জানিতেন না; কি জমির কত আয় হইতে পারে, রাজস্ব কত হওয়া উচিত—এসকল লইয়া তাঁহারা মাথা ঘামাইতেন না। অর্থের প্রয়োজন হইলে নিকটবর্তী কোন রাজভাণ্ডার বা দেবমন্দির লুণ্ঠন করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের ঐহিক-পারত্রিক উভয় প্রকারের সুফল লাভ হইত। শুধু শের সাহ ও হুসেন সাহ জমিজমার আয়সম্বন্ধে খবর রাখিতেন, অপরাপর পাঠান নবাবেরা দিনরাত্রি যুদ্ধের উদ্যোগ ও সেই চিন্তাই করিতেন। যাহারা অর্থের চিন্তা হইতে মুক্ত থাকেন, তাঁহাদের মন স্বভাবতঃই উদার হয়। পাঠান নবাবদের কতকটা সেরূপ উদারতা ছিল। এই সুযোগে এদেশে হিন্দুরা বাণিজ্যাদি দ্বারা বিপুল অর্থশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই ধনকুবেরদের শেষ দীপশিখা পরবর্তী কালে জগৎশেঠের গৃহ হইতে অলিয়াছিল। ঐতিহাসিকেরা লিখিয়াছেন, জগৎ শেঠের মত ধনী তখন পৃথিবীতে ছিল না।

পাঠানাবিকারে হিন্দু শিল্পিগণই হিন্দু-মুসলমান সকল নৃপতিবৃন্দ ও গণ্যমাত্র লোকের উৎসাহ পাইত। বিদেশ হইতে পাঠান নবাবেরা শিল্পী বেশী আনিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যাহারা প্রস্তর ও স্বর্ণরৌপ্যের

বিগ্রহ নির্মাণ করিত, পাঠানদের অত্যাচারে তাহারা একেবারে উন্মূলিত হইয়াছিল।

হাভেল সাহেব পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে মোগল ও পাঠান-শিল্প বলিয়া যাহা সচরাচর কথিত হইয়া থাকে, তাহা বৌদ্ধ ও হিন্দু শিল্পেরই মূলতঃ রূপান্তর।

তাহাতে ইরানী প্রভাব কতকটা আছে সত্য, কিন্তু ভারতীয় শিল্পই তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ফতেপুর সিক্রি এবং অন্যান্য স্থানের আকবর-কৃত মসজিদসমূহের সিংহদ্বারের কারুকার্যের মত উৎকৃষ্ট চাকরলা—কি গঠনে কি কারুকার্যে—পারশুদেশীয় কোন মসজিদে দৃষ্ট হয় না। (A Handbook of Indian Art, E. B. Havell, p. 113.) তিনি বলেন হিন্দু কারিগরদিগকে আকবর ঐ সকল ইরানী মসজিদের আদর্শে মসজিদ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের অপূর্ণ শক্তিবলে তাহারা বিদেশী আদর্শ অনেকদূর ডিঙ্গাইয়া গিয়াছিল। হিন্দুদিগের মূর্তি ও চিত্রনির্মাণের কথা উল্লেখ করিয়া আবুল ফজল বলিয়াছেন, “ইহাদের চিত্রাঙ্কনশক্তি আমাদের ধারণার অতীত। সমস্ত জগতে ইহাদের সমকক্ষ শিল্পী অল্পই আছে।” (আইন-ই-আকবরী—ব্রহ্মম্যানের অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, ১০৭ পৃঃ) (“Their pictures surpass our conception of things. Few in the whole world we found equal to them.”) হ্যাভেল বলেন, “হিন্দু শিল্পীদের দ্বারা গড়া এই সকল মুসলমানী মসজিদ এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, আরব, তুরস্ক, ইজিপ্ট এবং স্পেনের মুসলমানী শিল্পের নিদর্শনগুলি ইহাদের কাছে দাঁড়ায় না। হিন্দুর আধ্যাত্মিক ধারণা এবং তাহাদের স্বল্প-কারুকার্যে মণ্ডিত হইয়া বিজাপুর, দিল্লী, ফতেপুর সিক্রি, আহমদাবাদের মসজিদগুলি কেইরো এবং কনষ্টান্টিনোপলের মসজিদগুলি হইতে এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে শেষোক্তগুলি ইহাদের তুলনায় একেবারেই অকিঞ্চিৎকর।” (The Ideals of Indian Art, Havell, p. 119) “Inlay workers who were all Hindus from Kanoj and a Hindu garden designer from Kashmere.” (A Handbook of Indian Art, Havell, p. 137) হ্যাভেল সাহেব নানা প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বৌদ্ধশিল্প-প্রভাব সমস্ত এশিয়ার উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। চীন ও জাপানে, সিংহল, জাভা, শ্রাম এবং সমস্ত ভারত সাগরের দ্বীপপুঞ্জে এই ভারতীয় শিল্পের আদর্শ সুপ্রোথিত হইয়াছিল,—পারশু ও আরবও এই শিল্প (মূর্তি বা বিগ্রহ-নির্মাণপ্রথা অবশ্য বাদ দিয়া) হিন্দুস্থানের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছিল। আহমদাবাদ ও বিজাপুরের আশ্চর্য্য মসজিদগুলি কিছু সামান্য পরিবর্তনের পর বৌদ্ধ বিহারের আদর্শ অনুসরণ করিয়া এক্রপ অপূর্ণ সুন্দর হইয়াছিল। আহমদাবাদের বিশাল ও সুন্দর হস্তা ও মসজিদগুলি বোড়শ শতাব্দীতে সেই প্রাচীন রীতি অনুসারে গঠিত হইয়া দর্শনীয় হইয়া আছে। বোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যপ্রভু আহমদাবাদ গিয়াছিলেন, তাহার অনুচর গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন, “আশ্চর্য্য আহমদাবাদ জাঁকের সহর।”

মোগলদের সময়ে শাসনকর্তারা বঙ্গের শিল্পীদিগকে কোন বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু পাঠানেরা যে হিন্দু শিল্পী দিয়া তাহাদের সমস্ত মসজিদ, প্রাসাদ ও সমাধিক্ষেত্র গড়িয়াছিলেন, তাহার প্রভূত উদাহরণ বাঙ্গলার সর্বত্র বারহুয়ারী মসজিদ। এখনিও আছে। গোড়ের “বড় সোনা মসজিদ” বা “বারহুয়ারী” মসজিদে মাত্র বারটি গম্বুজ লাগাইয়া উহাতে মুসলমানী প্রভাবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

এই “বারহুয়ারী” গৃহ হিন্দু আমল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, প্রাচীন পল্লীগীতিকায় বঙ্গদেশের এই “বারহুয়ারী ঘরের” পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এখনও মৈমনসিংহ জেলার শ্রামীরা “বারহুয়ারী ঘর” নির্মাণ করিয়া থাকে। ফাওর্সন সাহেব লিখিয়াছেন, “প্রাচীন গোড়ের সৌধমালার মাল-মসলা দিয়া মুসিদাবাদ, মালদহ, রঙ্গপুর, রাজমহল প্রভৃতি নগরী সমগ্রভাবে গঠিত হইয়াছে, এমন কি কলিকাতা ও হুগলীর অনেক স্থানে সেই উপকরণ গৃহীত হইয়াছে।”

বাঙ্গলাদেশে ইট দিয়া বাড়ী-ঘর নির্মিত হইত, পাথর এখানে কতকটা দুর্লভ ; পোড়া মাটিতে (terracotta) নানারূপ কারুকার্য করা হইত। ইটের দ্বারা বঙ্গীয় কোঠাবাড়ীতে খিলান প্রস্তুত করা সহজ—পাথর দিয়া গোলাকৃতি কি অর্ধচন্দ্রাকৃতি (চামচিকা) খিলান তৈরী করা কঠিন। দিল্লী অঞ্চল অপেক্ষাও এদেশে মুসলমানদের মসজিদ প্রভৃতিতে পোড়া ইটের উপর হিন্দু কারিগরদের হস্ত-নৈপুণ্যের চিহ্ন বেশী। গোড়ের মসজিদ ও সমাধিমন্দিরগুলিতে এইরূপ ইটের উপর যেসকল অপূর্ণ কারুকার্য দৃষ্ট হয় তাহা এদেশের হিন্দুকারিগরের হাতের কাজ। আমার মনে হয়, ইট কাঁচা থাকিতেই, এখন যেসকল মালিকের নামের ছাঁচ তাহার উপর ছাপ দিয়া পোড়ানো হয়, সেইরূপ প্রাচীন কালে নানারূপ পৌরাণিক এবং সামাজিক ঘটনা, নানারূপ মূর্তি ও শিল্প-সৌষ্ঠবের ছাঁচ তৈরী থাকিত, তাহারই ছাপ দিয়া ইট পোড়ানো হইত। পাণ্ডুয়ার আদিরা মসজিদের খিলানের কাজ, ত্রিবেণীর জাফর খাঁর মসজিদের কারুকার্য, এগুলি সমস্তই হিন্দুমন্দিরের উপকরণে নির্মিত, এমন কি শেবোক্ত মন্দিরের প্রাচীন নিদর্শনের একাংশ মসজিদের অঙ্গীয় হইয়া রহিয়া গিয়াছে। গোড়ে হুসেন সাহর সমাধি এবং কয়েকটি মসজিদে যে নানা রঙ্গের এনেমেল করা টালির উপর কাজ দেখা যায়, তাহাও এই দেশের লোকের মৌলিক কাজ—বাঙ্গলার নিজস্ব শিল্প। “The Pathan mosques and tombs of Gour, Pandua and Malda on this account are even closer imitation of Hindu and Buddhist buildings than they were in the neighbourhood of Delhi, where stones of large dimensions were procurable and consequently the arch was not used by Hindu masons to secure a structural purpose. The terracotta and fine moulded brick-decorations used both in mosques and temples in Bengal were certainly not imported by Muhammedans. The cognate art of enamelled tiles and bricks so much used in Muhammedan buildings in India was probably a local one in Gour”—(A Handbook of Indian Art, Havell, p. 123).

হুসেন সাহের সময়ে অনেক মসজিদ ও সমাধিমন্দির নির্মিত হইয়াছিল, বঙ্গের নানাস্থানে তিনি মসজিদাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন, শিলালিপিতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ১৫০২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে পাটনা জেলায় বিহার মহকুমার বোনহারা গ্রামে, ঢাকা জেলায় বল্লীপুর পরগনায় মাচাইন গ্রামে ১৫০১ খৃষ্টাব্দে, মালদহ জেলায় ১৫০২ খৃঃ অব্দের ১০ই মার্চ, ১৫০৩ খৃঃ অব্দে গোড়ে কদম রসুলের নিকট সারন জেলায় চোরান গ্রামে, ১৫০২ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ার—

এইরূপ বহুস্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হুসেন সাহ মসজিদ, তোরণ ও কূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহার ওমরাহ ও অধীন লোক ও আত্মীয়বর্গও অনেক মসজিদ ও সমাধিমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বঙ্গের ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগে ২৫২ হইতে ২৬৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এই দেশব্যাপী স্থাপত্যের নিদর্শনগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু যে কয়েকটির উল্লেখ আছে তাহাতেই প্রায় দশটি পৃষ্ঠা ভরিয়া গিয়াছে। গোড়, পাণ্ডুয়া ও মালদহই এই স্থাপত্যের প্রধান ক্ষেত্র ছিল। সারন ও বিহার হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত হুসেন সাহের এই উত্তম সর্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। হুসেন সাহ ছাড়া পাঠানদের মধ্যে শের সাহের মসজিদ, সমাধি ও রাস্তা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শের সাহের সমাধি-মন্দিরে স্থাপত্যের সেরা সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়। তিনি স্থানি ছিলেন, এজন্য তদীয় স্থিতি-চিহ্নে পার্শ্ববর্তী মোগল বাদশাহ হুমায়ূনের সমাধির আড়ম্বরপূর্ণ জাঁকালো ভাবটি নাই। একটি কৃত্রিম হ্রদের মধ্যবর্তী এই সমাধি স্বীয় মহিমাম্বিত স্বাতন্ত্র্য প্রকটিত করিয়া দেখাইতেছে। উহা অনেকটা তাঁহার স্বীয় মহানু চরিত্রের স্থায়। চারিদিকের সমতলভূমি ও জলরাশির মধ্যে থাকিয়া উহা সেই

শের সাহের সমাধি।
উন্নত স্বদৃঢ় চরিত্রের মহিমায় ঐন্দ্রজালিক প্রভাব প্রকটিত করিতেছে। ইহাতে স্থল কারুকার্য্য বেশী নাই, কারণ স্থানিরা

সহজ নিরাভরণ, সতেজ সারল্য বেশী পছন্দ করিতেন। কিন্তু উহাতে ইরানী প্রভাব কিছুই নাই, উহা ভারতবর্ষের বৌদ্ধ স্তূপগুলির অমল-ধবল শারদ জ্যোৎস্নার মত প্রভা-জ্যোতক। হাভেল সাহেব লিখিয়াছেন, “ইনি স্থানিদের নিবেদ্যক বিধি মানিয়া হিন্দু কারিগরদিগকে এই মন্দিরটি নির্মাণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এজন্য সেই সকল শিল্পী ইহা কারু-কার্য্যে অলঙ্কৃত করে নাই, এই সমাধিমন্দিরও সর্ব্বাংশে ভারতীয়। এই সমাধিতে প্রাচীন আর্য্যাবর্তের সমাধি-মন্দির ও বৌদ্ধস্তূপেরই পঞ্চদশ শতাব্দীর বিকাশ দৃষ্ট হয়” (He set Hindu craftsmen to work in carrying out his building projects in conformity with the Sunni prescriptions; just as the Indian mosque is always Indian so is the tomb of the great Pathan: it is the fifteenth century development of the Indo-Aryan heroes' tomb—the Buddhist *stupa*—(A Handbook of Indian Art, Havell, p. 115). অজান্তার গুহা-মন্দিরাদি হইতে দৃষ্ট হয় বৌদ্ধস্তূপগুলি গোলাকৃতি স্বদৃঢ় আকৃতিতে পরিবর্তিত হইয়া ধীরে ধীরে ভারতীয় শিল্প-কলার সূচিরাগত আদর্শে পদ্মাকৃতি হইয়া আসিতেছিল। মসজিদের গম্বুজগুলি এই পরিবর্তিত ভাবের জ্যোতনা করিতেছে। কি ইরানে, কি আরবে, কি ভারতবর্ষে, মসজিদের গম্বুজগুলি ভারতীয় বৌদ্ধস্তূপের অনুরূপ। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধশিল্প অর্দ্ধজগৎ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। স্থানিরা মূর্তি বাদ দিয়াও সেই প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। পাঠানের সময়ে এদেশের হিন্দু ও মুসলমান-কীর্্তি সমস্তই বাঙ্গালী হিন্দু কারিগরের হাতের। হিন্দুধর্ম্মের জটিল নিবেদ্যবিধি কতকপরিমাণে এড়াইয়া এবং ইসলামের সহজ ও সরল আদর্শের অনুবর্তী

হইয়া কাজ করিতে আদিষ্ট হওয়াতে হিন্দু কারিগরদের হাত একটু বেশী স্বচ্ছন্দ ও গতিশীল হইয়াছিল।

সকলেই অবগত আছেন যে, হিন্দুগণিত ও ভিক্ষুগণ বোগদাদের রাজসভায় বিশেষরূপে আদৃত হইতেন। আমরা দেখিতে পাই ইসলামের বীরবরগণ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে পাইলেই সংহার করিতেন, কিন্তু তাহারা ভারতীয় কারিগরদিগকে রক্ষা করিতেন। মহম্মদ গজনী ভারতীয় মন্দিরাদির অতুলনীয় সৌষ্ঠব এবং স্থাপত্যের পরা কাটা দেখিয়া সহস্র সহস্র হিন্দুকারিগরকে গজনীতে রাজপ্রাসাদাদি নির্মাণ করিতে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। গজনীতে তিনি হিন্দু রমণী ও হিন্দু কারিগরদিগের একটি হাট বসাইয়াছিলেন। সমস্ত মুসলিম-এশিয়ায় এই হাট হইতে দাসী এবং নিপুণ কারিগর ক্রয় করা হইত।

এই কারিগরদের শ্রেষ্ঠ ছিল—মাগধ শিল্পীরা। ‘মাগধ বন্দী’ ভায়ে মাগধ শিল্পীও জগতের সর্বত্র জয়মাল্য পাইয়াছিল। পাঠান আমলে হিন্দু কারিগরদের এই খ্যাতি লুপ্ত হয় নাই। হাভেল সাহেব লিখিয়াছেন, হিন্দুস্থান হইতে কারিগরেরা যাইয়া ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা বিদেশে নূতন প্রভাবে পড়িয়া তদনুযায়ী জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল।

পূর্বদিকের হিন্দুকারিগর
উপনিবিষ্ট হইয়াছিল।

বাধ্য হইয়া তাহারা পারস্ত, আরব, তুরস্ক, স্প্যানিয়াড ও ইজিপ্সিয়ান নাম গ্রহণ করিল। এই ভারতীয় শিল্পাচার্যগণের বংশধরেরাই মুসলমান হইয়া সর্বত্র প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্যের দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। (A Handbook of Indian Art, p. 129) “Thousands of craftsmen, each expert in his own special branch, were forced into the service of Islam in different parts of Asia and Europe and set to work indiscriminately at the bidding of their masters” (p. 129). হিন্দু কারিগরেরা ‘বিমান’ নির্মাণ করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহারা সহজেই গম্বুজ করিতে পারিল। তাহারা মূর্তি তৈরী করিতে নিবিদ্ধ হইল, কিন্তু তাহাদের স্বল্প চাক্ষুশিল্প, বাহা নানারূপ সপুষ্পলতিকার ভঙ্গীতে মন্দিরদ্বারে প্রদর্শিত হইত, সেই শিল্পজ্ঞান ও হাতের অবলীলাক্রমে ভঙ্গীদ্বারা তাহারা কোরানের ‘মোক’গুলিকে মসজিদের দ্বারদেশে অতি সুন্দর করিয়া চাক্ষুশিল্পকার্য্যে পরিণত করিল। তাহারা হযত মানুষের ছবি আঁকিতে নিবিদ্ধ হইল, কিন্তু মসজিদ টালির উপর এবং প্রাচীরের গায়ে নানারূপ বিচিত্র চিত্র আঁকিয়া তাহাদের শিল্পপ্রতিভা প্রদর্শন করিল।

বৌদ্ধ যুগের স্তূপ, তোরণ এবং মন্দিরাদি পাশাপাশি রাখিয়া এশিয়ায় ইসলামের মসজিদ ও সৌধমালায় হিন্দু কারিগরের এই হস্তচিহ্ন বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা হাভেল সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন; ইতিহাসের সাক্ষ্যও তাহার সহায় হইয়াছে। বস্তুতঃ বৌদ্ধযুগে স্থাপত্য ও চাক্ষুশিল্পের প্রভাব অতি আশ্চর্য্যভাবে সমস্ত এশিয়াতে এবং যুরোপের স্থানে স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; তাহার আদি খুঁজিতে গেলে হযত আমরা অতল ঐতিহাসিক কূপের ধৈ পাইব না। খৃঃ পূঃ ৫০০০ বৎসর পূর্বের মহেঞ্জো-দারোতে যে সকল

শিল্প-নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে—তাহা আর্ঘ্যসভ্যতার পূর্ববর্তী, তাহারই জন্মবিকাশ আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম-যুগে দেখিতে পাই এবং তাহার কেন্দ্রভূমি ছিল ভারতবর্ষ।

মোগল-সম্রাট আকবর ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মিলন ঘটাইতে চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহারই উদারতার ফলে মোগল-দরবারে স্থাপত্য ও শৃঙ্গশিল্পের এরূপ আশ্চর্য্য বিকাশ হইয়াছিল। তাঁহারই উদারতার ফলে তাঁহার সময়ে ও তাঁহার পরবর্তী দুই বিশ্ববিশ্রুতকীর্তি বংশধরের রাজত্ব-কালে হিন্দু ও মুসলিম এই উভয় জাতির আদর্শে তাজমহল, শাজাহানের মসজিদ, সম্মনবুরুজ (আগ্রা), ইতি মাদউল্লাহ সমাদিমন্দির (আগ্রা), দেওয়ানি খাস প্রভৃতি বিখ্যাত সৌধমালা

গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু আরঙ্গজেব শিল্প ও স্থাপত্যের শেষশিখা নিবাহিয়া ফেলিলেন। তিনি সাদা জামা ও সাদা কাপড় পরিতেন, সভাসদ সমস্ত নৃপতি প্রভৃতিকেও তাহাই পরিয়া দরবারে আসিতে হইত। তিনি চিত্রকর ও শৃঙ্গশিল্পের কারিগরদিগকে নিরস্ত করিলেন। বেশভূষায় নিযুক্ত গল্প বলিবার লোক থাকিত, তাহারা নাচিয়া গাহিয়া এবং নানারূপ মুদ্রাসহযোগে অভিনয় করিয়া গল্পে প্রচুর রস সঞ্চার করিত, তাহাদিগকে তিনি কর্মচ্যুত করিলেন না বটে, তবে নৃত্য, গীত, বাণ্য ও অঙ্গভঙ্গী একেবারে নিবেদন করিয়া দিলেন (মুতফরিন)। এ যেন জটায়ুর পক্ষচ্ছেদ করা হইল। সঙ্গীত বিজ্ঞাটাকে তিনি অতি হেয় মনে করিয়া তাহা নিগৃহীত করিলেন। যমুনার পারে বীণা ও বেণুরব ধামিরা গেল, কোরানের আবৃত্তি চলিল। এই কার্যের দ্বারা দুইটি বিষয় প্রতিপন্ন হয়—প্রথমতঃ ইসলাম ধর্মের সুরম্যতের গোড়ামি, কিন্তু মূলতঃ বোধ হয় পিতৃদেবী পুত্র তাঁহার বাপের কীর্তিগুলি কিছুই নহে বলিয়া উহার অসারতা প্রমাণ করিতে চেষ্টিত ছিলেন, তাই নিজে একটা নূতন সহজ সরল জীবনের মৌলিক আদর্শ খাড়া করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার শিল্প ও কলা-চর্চার বিধেব ধর্মের গোড়ামি না পিতৃবিদ্বেষের ফল তাহা বলা কঠিন।

সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে যে টাকা আসিত, তাহা আগায় ব্যয় হইত। আরঙ্গজেব সে অর্থ ব্যয় করিতেন যুদ্ধবিগ্রহে, কিন্তু তাঁহার পূর্ববর্তী সম্রাটের তাহা শিল্পচর্চায় ব্যয় করিতেন। এই মোগল যুগের শিল্প বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতে

বাঙ্গালী মোগল কলমের গন্ধপাতী কেন হয় নাই।

পারে নাই। শিল্পের কায়দা-কাছুন ও পরিচ্ছন্নতার এই ইঙ্গিত যদিও অজান্তায়ুগেও অনেক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, (সুতরাং তাহাকে ভারতীয় শিল্প নাম দিতে বাধে না)—তথাপি মোগল-শিল্প এদেশের জনসাধারণের অনায়ত্ত। বাঙ্গলাদেশ সর্বদা গণতান্ত্রিক, মোগলের সাম্রাজ্যবাদ ও কেন্দ্রীয় শাসন তাহাদের প্রকৃতির অনুকূল নহে, এইজন্য তাহারা মোগলাধিকারের পথে এত বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। যে প্রভূত অর্থে মোগল স্থাপত্য-শিল্পের আদর্শ রচিত হইয়াছিল, তাহা সার্বভৌম শক্তি ভিন্ন অস্ত্রের আয়ত্ত নহে। বিশেষ তটভঙ্গে নিত্য-লীলা-চঞ্চল নন্দনদীপূর্ণ বাঙ্গলা দেশে স্থাপত্যের সেরূপ অবকাশ নাই। কিন্তু মোগলচিত্রও বাঙ্গালীদিগকে ততটা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। এদেশ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের প্রতি বহুলক্ষ্য। হাভেল সাহেব বলেন,

তাহা তাজমহলেও নাই। শিল্প-পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—তাজমহলাদি উচ্চাঙ্গের স্থাপত্যের সঙ্গে অজান্তার শিল্পের এই স্থানে প্রভেদ। বৌদ্ধ ও হিন্দুজগতের আধ্যাত্মিক মহিমা মোগলশিল্পে নাই। এইজন্ত সৌন্দর্যের পরা কাঁটা প্রদর্শন করিয়াও মোগল-শিল্প বাঙ্গালীদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ মোগল-শিল্পের আদব-কায়দা বাঙ্গালীর মোটেই ভাল লাগে নাই। দিল্লীখর জগদীশ্বরের আসন দেখল করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে যতটা সম্ভব ও সতর্ক দৃষ্টির দরকার, ভক্ত দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতেও ততটা দেখাইতে পারেন না। দৃষ্টান্তস্থলে সাজাহানের সভা, আকবরের জন্ম প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রত্যেক সভাসদ ও দ্বারী চাকর পর্যন্ত আদব-কায়দার চূড়ান্ত দেখাইতেছে, তাহাদের বসিবার ভঙ্গীতে একটুও ত্রুটি নাই, পরিচ্ছদে সর্বত্র ঘেরা। এমন কি ফকির ও সন্ন্যাসী আঁকিতে যাইয়াও তাহাদের ভঙ্গী বা বেশভূষায় মুহূর্তের জন্তও মোগল-শিল্পী—তাঁহার অতি সুক্ল ও মার্জিত আদব-কায়দার জ্ঞান ভুলিতে পারেন নাই। বাহিরের এই কায়দাকাছন, অবাস্তব বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু প্রভৃতি সর্ব চিত্রের মধ্যে উঁকি মারিতেছে। সর্বত্রই যেন রাজদরবার—বসিবার বা চলিবার ভঙ্গী পাছে বেকায়দা হইয়া যায় মোগল শিল্পী সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। বাগ্মীকি রাবণসম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন, “নিকম্পপত্রান্তরবো নন্তশ্চ ত্তিমিতোদকাঃ।”——“আমি যেখানে থাকি বা চলাফেরা করি সেখানে তরুগুলি নিকম্প ও নদীর জল ত্তিমিতগতি হইয়া যায়” (রামায়ণ, আরণ্য, ৩৮ সর্গ, ৯ শ্লোক) তরুণ দিল্লীখরের প্রবল প্রতাপ যেন মোগল-শিল্পকে অতি মাত্রায় স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে, সকল মূর্তিই যেন রোমের সিনেটারগণের মত স্থিরগম্ভীর, এরাভ্যো যেন হাসা, কান্দা ও অঙ্গসঞ্চালন নিবদ্ধ। এই ভাব বাঙ্গলার লোক পছন্দ করিবে কি করিয়া? তাহাদের আদর্শ—চাকল্যা, স্থৈর্য্য তাহারা মোটেই পছন্দ করে না। বৌদ্ধগুণের বুদ্ধবিগ্রহে অবিচলিত স্থৈর্য্য আছে বটে, কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিকতা মোগল-শিল্পে নাই। মোগল-শিল্পে সমস্ত মূর্তিই যেন বাহ্য-দৃষ্টিতে বুদ্ধাবতার। মোগল যুগে বাঙ্গলার হরি-সংকীর্ণনের তুমুল ধুম পড়িয়া গিয়াছিল, সংকীর্ণন-ক্ষেত্রে নৃত্যকারীদের লক্ষকম্প, খোলবাদক লাফাইয়া আড়াই হাত উঁচু উঠিয়াছে—এক পা ধরণীতলে আর এক পা বায়ুর উপর। তাহার দুই হাতের উদ্দণ্ড গতিতে খোলের আওয়াঙ্গের উচ্চতার করুনা করা যায়। যেখানে বাঙ্গালী ছবি আঁকিতে বসিয়াছে, সেইখানেই ক্ষিপ্ৰগতি ও প্রাণের দ্রুত স্পন্দন দেখাইয়াছে; হয়ত কোন সময়ে তাহারা মাত্রা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে—এই নর্তন, কুর্দন, টাকি নাড়া ও বাহাফালনের দেশে, সারি সারি বুদ্ধদেবের মত প্রশান্ত ছবি, তাহা যতই নিপুণ-হস্ত ও সৌন্দর্যের পরিচায়ক হউক না কেন, তাহা ভাল লাগিবে কেন? বাঙ্গালী হয়ত এককালে বৌদ্ধমূর্তির প্রশান্ত ভাব পছন্দ করিত, কারণ তাহাতে আধ্যাত্মিক ভাব ছিল, সে যুগ চলিয়া গিয়াছিল। মোগল-শিল্পের অস্ত এক সম্পদ সুক্ল রেখাঙ্কন; মানুষের মুখ ও শরীর-অঙ্কনে তাহা এত সুক্ল অন্তর্দৃষ্টি দেখাইয়াছে যে, ছবি দেখিলে মনে হয়—ছবি মানুষ হইতে সুন্দর। ভোগবিলাসের রাজা সাহেন সা

বাদশাহাদের অন্তর মহলে ছবি যাইবে, বেগম, বাদশা, নবাব ও রাজপুত্রদের ছবি আঁকিতে হইবে, চিত্রকর তুলি ধরিয়া রং ঘষিতে ঘষিতে বর্ণের ভিতর এক্রপ পরিমার্জনা, এক্রপ অলৌকিক লাভণ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে যে, তাহার সমকক্ষতা করা সহজ নহে। চিত্রকর জানে, ছবিখানি ভাল হইলে তাহার আজীবনের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে, বিস্ত্রী হইলে হয়ত তাহার মৃত্যু হইবে—এইজন্য নুরজাহান, মমতাজ, জাহাঙ্গীর, শাজাহান প্রভৃতির ছবি হাতীর দাঁতের উপর আঁকিতে যাইয়া তাহারা যত্নের কোন ত্রুটি করে নাই। এক কথায় বলিতে গেলে তাহারা প্রাণপণ করিয়াছে। কিন্তু এত যত্নের আঁকা ছবি কি সেই আধ্যাত্মিক সম্পদ দিতে পারিবে, যদ্বারা হিন্দু বা বৌদ্ধ শিল্পী কোন দেবতা বা দেবপ্রতিম ব্যক্তির মূর্তিতে সেই দেবদ্ব পরিমূর্ত করিয়া তুলিয়াছে? দৃষ্টান্ত স্থলে বুদ্ধের সেই অনির্কচনীয় মূর্তির কথা বলা যাইতে পারে, যাহাতে অজাস্তাণ্ডহা উজ্জল হইয়া আছে—যেখানে কুলরমণী ভিক্ষা দিতে আসিয়া মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার শিশুপুত্রের হাতে ভিক্ষাভাণ্ড, সেই অলৌকিক প্রভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে দেখিয়া শিশু ভুলিয়া গিয়াছে; ভিক্ষা দেওয়ার কথা যেন মনে নাই; কিংবা চৈতন্যদেবের গঙ্গার কূলে সেই অপূর্ণ নৃত্যের ছবিখানি, যাহাতে তাঁহার মূর্তি দেখিয়া মাঝি লগি হাতে দাঁড়াইয়া আছে—নৌকা বাহিতে ভুলিয়া গিয়াছে, নৌকার স্বামীর হাতের হাঁকা হইতে কন্ডে পড়িয়া গিয়াছে, তাহার হাঁস নাই; অথবা কাঠের উপর সেই অপূর্ণ মাতৃমূর্তি—যাহার মাথার মুকুট মাতৃগরিমার স্ফোতনা করিতেছে, অঙ্কস্থিত শিশুর স্তন্যদানের সময়ে তাঁহার ভাবগম্ভীর মুখে মেহের মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মোগল আর্ট অত সূচিস্থিত, অত সুদক্ষ কারিগরী ও সাবধানতার পরিচায়ক হইয়াও কি ভক্তের বা সাধকের একটানে অবলীলাক্রমে আঁকা ছবির সমকক্ষতা করিতে পারিয়াছে? শুক্রনীতি মাহুঘের ছবি আঁকিতে নিবেদন করিয়া শুধু দেবতার ছবি আঁকিতে উপদেশ দিয়াছে; কেন এই নিবেদন-বিধি তাহা পূর্বোক্ত বিষয়টি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। সকলেই অবগত আছেন আরঙ্গজেবের অত্যাচারে আগ্রার শিল্পীরা রাজধানী ত্যাগ করিয়াছিল। ফ্রাঙ্কেল সাহেব বলিয়াছেন—তাহারা রাজপুতনার যাইয়া রাজাদের আশ্রয় লইল। এইখানে তাহারা যে সকল ছবি আঁকিয়াছে তাহা কতকটা মোগল-শিল্পের পরিচ্ছন্ন ভাব ও কতকটা হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা বজায় রাখিয়াছে। মানসিংহের পর হইতে রাজপুতনার সঙ্গে বাঙ্গালীদের একটু বেশী মেশামিশি হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে সংগামসিংহ একেবারে বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন। স্বয়ং মানসিংহ কুচবেহারের রাজকন্যা এবং কৈদার রায়ের কন্যা বিবাহ করেন, ইহা ছাড়া তিনি বঙ্গদেশ হইতে আরও অনেক রমণী লইয়া গিয়া অন্তরমহলে পুরিয়াছিলেন। মোগল বাদশাগণ প্রায়ই বহু বিবাহিত পত্নী ও বহু উপরাজ্ঞী অন্তরমহলে রাখিতেন, মানসিংহ এ বিষয়ে তাঁহার প্রভুদের অনুকরণ করিয়াছিলেন। সনাতন ও জীবগোপ্যামীর রূপায় রাজপুতনার অনেক রাজা গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গলাদেশ হইতে ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়া পুরোহিত নিযুক্ত করিতেন, এইভাবে

রাজপুত-শিল্প বাঙ্গলাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। এই শিল্পের নমুনা বাঙ্গলায় বাহা পাই, তাহা একের উপর অল্পের প্রভাব বিস্তার করার প্রমাণ ছাড়া সৌন্দর্যের আদর্শ হিসাবে খুব উচ্চ মূল্যের বোধ্য বলিয়া মনে হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জয়পুরের শিল্প বাঙ্গলা চিত্রশালার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জয়পুরী কুম্ভ অত্যন্ত মহিমা-সহকারে ঐশ্বর্য দেখাইয়া বাণীহাতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন—তাহার সহিত বঙ্গের হুচিরসম্পদ—মাধুর্যের সম্পর্ক অল্প। রংএর খেলায় জয়পুরী চিত্রকর সিদ্ধহস্ত—তাহাদের ছবিগুলি কমনীয়তা মাখানো, লাভণ্যপূর্ণ বর্ণসংযোগে বেশ চিত্তাকর্ষক। কিন্তু বাঁটা বাঙ্গলা চিত্রের লীলাচকল প্রাণের খেলা তাহাতে অল্প।

কাঙ্গড়া কলমের চিত্র এখানে উল্লেখযোগ্য। আমরা উল্লেখ করিয়াছি পাঞ্জাবের উত্তর-পূর্বসীমায় হিমালয়ের উপত্যকাপ্রদেশস্থ কতকগুলি রাজ্যের অধীশ্বর আপনাদিগকে

কাঙ্গড়া কলম। সেন-রাজবংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কাশ্মীর, পুঞ্চ, সূকুত, মণ্ডী এবং জুঙ্গার রাজবংশের প্রাচীন তালিকায় দৃষ্ট হয় যে

গৌড়ের লক্ষণসেনের বংশধর সুরসেন ১২৫৯ বিক্রম সংবৎসরে মুসলমানকর্তৃক গৌড়দেশ হইতে তাড়িত হইয়া প্রয়াগে গিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত দেশগুলির অধীশ্বরেরা সুরসেনের পুত্র রূপসেনের বংশধর। * যখন রাজবংশের বংশতালিকায় একথা উল্লিখিত আছে, তখন আমাদের তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। পাঞ্জাব গেজেটিয়ার উক্ত রাজগণের যে বংশতালিকা দিয়াছেন, তাহাতেও এই কথা পাওয়া যায় এবং পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ কশ্মীরী স্বর্গীয় রামভূজ দত্ত চৌধুরী মহাশয়ের জী বঙ্গের বিদ্যুৎ কথ্য সরলা দেবী তথা হইতে এই বংশাবলী সঠিক জানিয়া আসিয়াছেন। ১২৫৯ বিঃ অব্দ, ইংরেজী ১২০২ খৃঃ অব্দ, এই সময়েই লক্ষণসেন মুসলমানের আক্রমণে বিব্রত হইয়া পড়েন, তিনি তখন অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং গৌড়ের শাসনভার তৎপুত্র কেশবসেনের উপর ছাপ্ত ছিল। কেশবসেনের সঙ্গে মুসলমানদের যে যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ কোনস্থলে পাওয়া যায় না। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে পিতা নবদ্বীপ হইতে চলিয়া গেলে কেশব শত্রুদিগকে সহজে গৌড়ে প্রবেশ করিতে দেন নাই। সেই ক্ষতরাজ্য রাজগণের ইতিহাস কোন দেশীয় লোক লিখিয়া যান নাই। ১২০২ খৃঃ অব্দে সুরসেন মুসলমানকর্তৃক গৌড় হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন, ইনি কেশবসেনের পুত্র হওয়াই সম্ভব। যদি তাহাও না হয়, তবে তিনি যে লক্ষণসেনের পৌত্র ছিলেন—তাহা সহজেই অনুমিত হয়। লক্ষণসেন উত্তর-ভারতে “হিন্দুধর্মের খলিকা” বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন। মুসলমানকর্তৃক উত্তর-ভারত-বিজয়কালে যে বঙ্গদেশের রাজা একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন এমন মনে হয় না। তাহা হইলে এতগুলি পার্শ্বত্যা প্রদেশে লক্ষণসেনের বংশধরেরা কখনই রাজত্বপদ পাইতেন না। খুব সম্ভব সুরসেন হিন্দু-মুসলিম সমরে উত্তর-ভারতে কোন না কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কিংবা নিপীড়িত হিন্দুদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন—নতুবা

কোনরূপ কৃতজ্ঞতা বা কৃতিত্বের পরিচয়-প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত না পাইলে সহজে স্বরাজ্য-তাড়িত রাজকুমারকে পার্শ্বত্যাগের হিন্দুরা রাজপদে বরণ করিয়া লইবে কেন? মঃ ইবন বক্তিয়ার খিলজী গুনিয়া আসিয়াছিলেন আখ্যাবর্তে লক্ষণসেন অপর সকল রাজার ধর্মগুরু ছিলেন। সম্ভবতঃ এই আভিজাত্যের ফলে এবং সুরসেনের রণনৈপুণ্য কিংবা অপর কোন মহৎ গুণের পরিচয় পাইয়া ভূস্বর্গ কাশ্মীর ও অপরাপর দেশের লোকেরা মুসলমানকর্তৃক নিহত পূর্বরাজগণের বংশধরের অভাবে, ইহার পুত্রগণকে স্বীয় স্বীয় রাজ্যের অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। রাজা হইয়া ইহারা অবশুই ঐসব দেশে বাঙ্গালী ভাস্কর ও বাঙ্গালী চিত্রকর লইয়া গিয়াছিলেন। শিল্পবিদগণ বাহাকে “কাদড়া কলম” নাম দিয়াছেন, তাহা খুব সম্ভব “বাঙ্গলা কলম।” বাঙ্গালী চিত্রকরেরাই এই চিত্রশালার প্রতিষ্ঠাতা। তাহা না হইলে কালীঘাটের প্রাচীন চিত্রপটগুলির সঙ্গে কাদড়া চিত্রপটের এরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য কেন হইবে? আমরা একখানি মহাদেবের চিত্রে ও পরীর চিত্রে এবং অপরাপর কালীঘাটের চিত্রে যে অদ্ভুত লীলায়িত কালীর রেখাঙ্কন দেখিয়াছি, কাদড়ার অনেক চিত্রে ঠিক তাহাই আছে। বাঙ্গালী চিত্রকরের কালীর রেখাগুলি সুস্পষ্ট ও তাহাদের বহুমুখ কাদড়ার ঐরূপ রেখাঙ্কন হইতে স্পষ্টতর। কাদড়ার সমীপবর্তী দেশগুলির রাজপুত কি মোগল-শিল্পীকৃষ্ণ-রেখার এই লীলায়িত ভাব আদৌ নাই।

কাদড়ার চিত্রগুলির গণতন্ত্রতাও বাঙ্গালী চিত্রের অমূল্য। মোগলচিত্রের বাদসাহী ভাব এবং রাজপুত চিত্রের দেবভাবের প্রাধান্য কাদড়ার চিত্রে নাই। রাজপুত চিত্রের দেবতারা আসন জুড়িয়া বসিয়া থাকেন, তাহারা খুব সুন্দর হইলেও নড়াচড়াটা তাহাদের স্বভাববিরুদ্ধ। কাদড়া ও বাঙ্গলার চিত্রে যে গতিশীলতা আছে—তাহা অনেকটা একরূপ। মোগলদের কতকগুলি চিত্রে বিশেষ একটা শিকার-চিত্রে গতি স্থচিত হইয়াছে—কিন্তু সে গতিও যেন একটু সম্ভ্রমাত্মক। হরিণেরা ছুটিয়াছে—ক্ষিপ্ৰগতিতে, কিন্তু যে চাহনী তাহারা পশ্চাতে নিষ্ফেপ করিতেছে তাহাতেও যেন শিকারী রাজকুমারের প্রতি একটা বিশ্বয়বিমূঢ় আবেশ আছে। কাদড়ার বৈষ্ণব চিত্রগুলি বাঙ্গালীর হাতের ছবির ছায়। এই চিত্রকরদের পূর্বপুরুষেরা বাঙ্গলার লোক—এই ধারণার অনেক কারণ আছে। ১৯২১ সনের ‘রূপম’ পত্রিকায় প্রকাশিত কাদড়ার একখানি স্বাধীনভর্তৃকার ছবি লাহোর মিউজিয়ামে আছে। ভূতপূর্ব স্কুল ইনস্পেক্টর এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সাত্তাল, এম. এ. মহাশয় তাহার “ভক্তপ্রবর মহাকবি সুরদাস” নামক পুস্তকের ভূমিকায় (১/ পৃষ্ঠায়) সেই ছবিখানি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—“এই ছবিতে বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণের গীতের ভাব এত সুস্পষ্ট যে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না।” বাঙ্গালীর সঙ্গে আখ্যাবর্তের অপরাপর দেশের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বা মেশামেশি ছিল ইতিহাসে তাহা উল্লিখিত হয় নাই। বৃন্দাবনে রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীরা বৈষ্ণব-ধর্ম নানা ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস তাহার পদ রচনা করিয়া জীব গোস্বামীর নিকট বৃন্দাবনে পাঠাইতেন। ঐ পদগুলি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বড়ই উপাদেয় মনে হইত। ব্রজবুলিতে লিখিত হওয়াতে

তাহা বৃন্দাবনে গাওয়া হইত। বঙ্গীয় কবি ও চিত্রকরেরা বাঙ্গালীকর্তৃক নবভাবে সৃষ্ট বৃন্দাবন তীর্থে নিশ্চয়ই যাতায়াত করিতেন। কাঙ্গড়ার চিত্রগুলির উপর বাঙ্গালীর এরূপ বেশী প্রভাবের কারণ সহজেই অনুমান করা যায়।

বৌদ্ধযুগে শিক্ষা সার্বজনীন ছিল। যে কোন জাতির লোক শ্রমণ হইতে পারিতেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু সর্বস্বর্ণের মধ্যে দৃষ্ট হইত। বৌদ্ধ-সংস্কারগুলি কতক পরিমাণে এখনও বৈষ্ণব-দিগের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। যে কোন জাতি এখনও বৈষ্ণব হইতে পারেন। মুসলমানদের অন্তর্গত তাঁহারা অর্গল বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। চৈতন্য-যুগের কথা ছাড়িয়া দিলে পরবর্তী যুগেও এই উদারতা অনেক পরিমাণে বজায় ছিল এবং এখনও আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গঙ্গারাম মৈত্র নামক কুলীন ব্রাহ্মণ এক মুসলমানী ও তাহার ভ্রাতা আবদুলকে বৈষ্ণব করিয়া ভূষণা ও রূপদয়াল নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা লইয়া বৈষ্ণব-সমাজে কোন বিশেষ গোলমাল হয় নাই। (সামাজিক ইতিহাস, ১৫৪ পৃঃ) মুসলমান হরিদাস, মুসলমান-ভাবাপন্ন এবং সম্পূর্ণরূপে জাতিচ্যুত রূপ-সনাতন বৈষ্ণব-সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। মুসলমান সেনাপতি এবং আরবী পারসী প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিজলী খাঁ, শ্রীবাসের বাড়ীর মুসলমান দরজী প্রভৃতির বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ চৈতন্য প্রভুর সময়েই তাঁহার প্রভাবে ঘটিয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্রীমানন্দ দ্বারেন্দ্র-বাহাদুরপুর নামক স্থানে শের খাঁ নামক শক্তিশালী মুসলমান দস্যকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। নিম্নজাতি বৈষ্ণবদলে এত ঢুকিয়াছিল যে, তাহারাই এখন ‘জাত-বৈষ্ণব’ দলের প্রধান শক্তি। সহজিয়া বৈষ্ণবদলে হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান সর্বজাতির একটা উৎকট সমন্বয় হইয়াছিল। সমাজের নিম্নস্তরে সহজিয়ারা বৌদ্ধ-সংস্কার এখনও বজায় রাখিয়াছে। সহজিয়াদের গুরু অনেকেই মুসলমান ছিলেন। ঢাকা জেলায় রোয়াইল গ্রামের নিকট খারার বাসী পঞ্চুফকির মুসলমান—শত শত হিন্দু তাঁহার শিষ্য। সহজিয়াদের সাহেব-দনী সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন মুসলমান। তাঁহারই নামে সম্প্রদায়টির নাম হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের নিকট সালিগ্রাম, দোগাছিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাদের প্রধান আড্ডা। ইহারা জাতিভেদ একেবারেই মানেন না। হিন্দু ও মুসলমান এক থালায় বসিয়া খান। ইহারা বিগ্রহ পূজা করেন না এবং নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি এরূপ গাঢ়রূপে অনুরক্ত যে পরম্পরের অন্ত প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইতে পারেন। দরবেশী সম্প্রদায় সনাতনকর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল এরূপ প্রবাদ আছে। রামকেলীর নিকট চৈতন্যের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর হুসেন সাহের মগ্নিত্ব ত্যাগ করিয়া পলায়ন-পর সনাতন কিয়ৎকালের অন্ত দরবেশের ছদ্মবেশ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এই হেতুতে প্রবাদটির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। দরবেশী সম্প্রদায়ের মূল শিক্ষা—“কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান। মিল-জুলকে কর সাইজীকো নাম।” (হিন্দুই কি মুসলমানই বা কি, একত্র মিলিত হইয়া সাইজীর নাম কর) এখানে সাইজী শব্দ দ্বারা সনাতন গোস্বামীকে বুঝাইতেছে। (সাইজি গোসাইজি শব্দের অপভ্রংশ)। হজরতি সম্প্রদায়ের নেতা হজরতের বাড়ী ছিল

বাঁশবেড়িয়া। পাগল নাথী ও গোবরা সম্প্রদায়ের উক্ত নামধের নেতৃদ্বয়ও মুসলমান ছিলেন। প্রথমোক্তের বাড়ী মুরাদপুর এবং দ্বিতীয়টির নিবাস ছিল নাগদা গ্রামে। রামবল্লভী-সম্প্রদায় জাতিভেদ অগ্রাহ্য করিয়াছেন; তা ছাড়া প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে তাঁহারা সর্বদর্শনসম্বন্ধের কতকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একটি গান এইরূপ “কালী-কৃষ্ণ-গড়-খোদা, কোন নামে নাহি বাধা, বাদীর বিবাদ দ্বিধা, তাতে নাহি টল। মন কালী-কৃষ্ণ-গড়-খোদা বল রে।” ইহারও পূর্বে বঙ্গের ভক্ত কবি গাহিয়াছিলেন, “মগে বলে ফারা, তারা, ‘গড়’ বলে ফিরিঙ্গী যারা খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজি।” নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ঔদার্য্য এবং সম্পূর্ণরূপে সংস্কারশূন্যতা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

একদিকে সমাজের স্বকাকট হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেক্রম সামাজিক শাসন অতি উৎকট ভাবে কড়া করিয়া গড়িতেছিলেন, অপরদিকে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শাস্ত্র না জানিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া দলের পর দল গঠন করিয়াছেন। ইহারাই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধনীতির সারোচ্চার করিয়া বাঙ্গলার সমস্ত দ্বারগুলি সুখকর—স্বাস্থ্যদায়ী অনাবিল ভাবপ্রবেশের জন্ত মুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে মালাপাড়া গ্রামে বলরাম হাড়ী-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে চৌকিদারী করিতেন। কিন্তু একসময়ে তিনি চৌর্য্য অপরাধে অভিযুক্ত হন, মেহেরপুরের (নদীয়া জেলায়) মল্লিক বাবুদের সরকারে ইনি কাজ করিতেন। অভিযোগ টিকিল না,—কারণ বলরাম নির্দোষ ছিলেন। কিন্তু এই অভিযোগের পর তিনি ঘৃণায় চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন। বহুবৎসর তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে ঘুরিয়া যখন দেশে আসিলেন, তখন লোকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া মানিতে লাগিল। তিনি পাগলের মত থাকিতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সকল কথা বলিতেন—যাহা লোকের মধ্যে তীরের মতন যাইয়া প্রবেশ করিত; ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধে গভীর তত্ত্বকথা শুনিতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। একদা কয়েকজন ব্রাহ্মণ নদীতীরে দাঁড়াইয়া তর্পণ করিতেছিলেন, তাঁহারা জল নদীতে নিক্ষেপ করিতেছিলেন।

বলরাম হাড়ী।

ঐ সময়ে বলরাম গঙ্গার জল লইয়া নদীর পাড়ের দিকে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। এরূপ করার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, “তোমাদের তর্পণের জল যদি তোমাদের পূর্বপুরুষেরা পাইতে পারেন, তবে আমার নিক্ষিপ্ত জলই বা আমার শাকসব্জীর বাগানে যাইবে না কেন, উহাতো মাত্র কয়েক ক্রোশ দূর বই নয়।” খুসী বিশ্বাসী দলের নেতা মুসলমান ছিলেন, তিনি বলিতেন “তোমরা কষ্টে পড়িলে আমাকে প্রার্থনা জানাইও, আমার যদি কেহ থাকে তবে আমি তাঁহাকে জানাইব।” এই সহজিয়া

সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অত্যন্ত প্রধান দলের স্থাপয়িতা বাবা আউল বাবা আউল।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার ২২ জন শিষ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে রামশরণ পাল, নিতাই ঘোষ প্রভৃতি প্রধান। ইহার সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ে একটি চলিত গান আছে, তাহা এই “এভাবেই মানুষ কোথা হইতে এলো। এর নাহিক রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বল ॥ এর সঙ্গে বাইশজন, সবার একমন, জয়কর্তা বলি,

বাহ তুলি, করে প্রেমে ঢল ঢল। এয়ে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়, এর হকুমে গাঙ্গ শুকালো।” বঙ্গতঃ সহজিয়া দলের প্রায় সমস্ত ব্যক্তিই তাহাদের গুরুদের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন। আমরা তিব্বতের বৌদ্ধধর্মপ্রসঙ্গে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সময়কার নানা শ্রেণীর মত সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছি, তদ্বারা স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে—বৌদ্ধ ধর্মের ভাঙ্গা দল বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়া এই সহজিয়াদের নানাদলের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা সামাজিক বা ধর্মের চিরাগত সংস্কারের কোনটিই মানে নাই, ইহাদের চিন্তাশীলতার গতি অবাধ। ইহারা সামাজিক অনুশাসনের প্রতি ভ্রক্ষেপ করে নাই এবং সময়ে সময়ে এক্রপ উচ্ছাসের তরুণতা এত সংক্ষেপে কহিয়াছে যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ও সেই সকল কথা শুনিলে ডঙ্কাইয়া বাইতে পারেন। জীলোকের সতীত্বসম্বন্ধে ইহারা সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ মানে নাই। আমাদের সমাজে পতিব্রতের জন্ত যে স্বর্গলোক পরিকল্পিত হইয়াছে এবং জনসাধারণ পতিব্রতের যে উচ্চ মূল্য দিয়া থাকে, সহজিয়ারা তাহা দিতে সম্মত নহে। তাহাদের মতে সাধবীর তথাকথিত একনিষ্ঠ প্রেমের মধ্যে কতটা পরকালের সুখ-কামনা ও ইহকালের লোক-খ্যাতির আশা হইতে সজাত, তাহা জানিবার উপায় নাই; হিন্দুর সংস্কার-জাত সতীত্ব এতটা মিশ্র ভাবের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে, এজন্ত তথাকথিত সতীত্ব বা দাম্পত্য ভাব—প্রেমের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বাচাই করিবার জন্ত বিচার-সহ কষ্টপাধ্য নহে। “বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে”র প্রথম ভাগের ভূমিকায় ‘জ্ঞানাদি সাধন’ হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় ইহাদের ভগবান্ সম্বন্ধে ধারণাও একেবারেই কোন সংস্কারাধীন নহে—উহাতে চিন্তার যে দৃষ্টি বিলম্ব-শক্তি দেখা যায় তাহা নৈয়ায়িক পণ্ডিতের মত। সমাজে জাতিভেদ প্রভৃতির সংস্কারের ইহারা কোন ধার ধারে না। ইহারা প্রকাশ্যভাবে কোন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে নিজের দলে টানিয়া আনিয়া তাহার কপালে স্বীয় সম্প্রদায়ের ছাপ মারিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে না। অথচ ইহাদের দলের লোক, খৃষ্টান হউক, মুসলমান হউক, ব্রাহ্মণ হউক, দলের নেতার প্রতি এতটা অনুরক্ত যে জগতে তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও মানে না, তাঁহার এক কথায় অবলীলাক্রমে প্রাণ দিতে পারে। কর্তাভজাদের নেতা বাবা আউল বা আউল চাঁদ পরবী নামক গ্রামে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগত হন। রামশরণ এবং বাবার আর সাত শিষ্য তাঁহার দেহ পরবী গ্রামে (চক্রদহ হইতে ছয় মাইল পশ্চিমে) শ্মশানে ভস্মীভূত করেন। বাবা আউলের পরলোক-গমনের পরে, রামশরণ পাল গদীর অধিকারী হইয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই দলে খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু আছে এবং যদিও নরনারীর অবাধ মিলনে কোন বাধা নাই তথাপি ইহাদের নীতি অতি উচ্চ। ইহাদের একটি অনুশাসন এইরূপ “দ্বী হিজড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হবে কর্তা ভজা।” কর্তাভজা লাল শরীর গানগুলি ‘সন্ধ্যাভাবায়’ লিখিত, তাহা চর্যোদ, কিত্ত কতকগুলি বোঝা যায়। সহজিয়াদের একটি গান—“তুফান আসছে কণ্ঠে, জলে জল যাবে মিশে, মাজি হাল ধর কণ্ঠে। আবার বাঁহা নৌকা, তাঁহা তুফান, নৌকা রাখ কি কারণ! ওরে মাজি দাঁড়িয়ে শোন। মাজি সত্য বাদাম লও, দীরে দীরে বাও, তুফান পানে কেন চাও, হাল ধরেছে নিরঞ্জন।” মাহুব এখানে মাঝি,—দাঁড় বাহিবার তাহাকে ক্ষমতা দিয়াছেন

ভগবান্, কিন্তু কোন্‌দিকে নৌকা চলিবে, তাহার নিয়ন্তা ভগবান্ স্বয়ং হাল ধরিয়া আছেন। অর্থাৎ পুরুষকারের কিছু ক্ষমতা আছে—তাহা দাড় বাহা পর্য্যন্ত, কিন্তু দৈবই নিয়ন্তা; যে ক্ষমতাটুকু আছে, তাহা ব্যবহার না করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকি উচিত নহে। আর মানব-জীবনরূপ তরণী, তাহা তো তুফানের মধ্যে চলিবেই, কোন নৌকা এমন নাই, বাহা তুফানের হাতে পড়ে নাই। তুফানের দিকে লক্ষ্য করিতে নাই, তাহা হইলে ভয় পাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবে। তুফানে নৌকা চালাইবেন যিনি তিনি তো কর্ণধার—হাল ধরিয়া আছেন, উহাকে বিশ্বাস করিয়া তুমি দাড় বাহিয়া যাও। উপনিষদের “স ন বদ্ধুর্জনয়িতা স এব বিধাতা” পদের ভাব গানের শেষ ছত্রটিতে স্পষ্ট।

সহজিয়াদের অনেক কথাই ‘সন্ধ্যাভাষায়’ লিখিত, এই ভাবাভিজ্ঞ ভিন্ন কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। শব্দের সাধারণ যে অর্থ, অনেক সময়ে সন্ধ্যাভাষায় তাহা ভিন্নার্থ-বোধক। সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলে তাহারা সে সকল কুট অর্থ কাহাকেও বলিবে না। সমস্ত ধর্ম ও সমাজের সংস্কারগুলি পদদলিত করিয়া যে সকল মত অসামান্য মৌলিকতা দেখাইয়া অতিরিক্ত সাহসিকতার সহিত কথিত হইয়াছে তাহা সাধারণ লোক জনিলে বিদ্রোহী হইবে—এজন্য সহজিয়ারা সন্ধ্যাভাষায় সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। “সে দেশের কথা, এ দেশে কহিলে, লাগিবে মরমে ব্যথা”—চণ্ডীদাস।

বাঙ্গলাদেশের সহিত পরিচয় বতই ঘনিষ্ঠ হইবে, ততই নিয়ন্ত্রণের প্রতি শ্রদ্ধা বেশী হইবে। আমরা বারংবার বলিয়াছি—ইহারা আমাদের জাতির নিজস্ব ভাব বজায় রাখিয়াছে।

বাঙ্গলার তথাকথিত নিয়ন্ত্রণী। উর্দ্ধতন পর্য্যায়ের বিদেশীর প্রভাবের ঝড়,—পাণ্ডিত্যের দর্প, সংস্কারের বোকা, এবং নানারূপ আবর্জনা জুটিয়া সমস্ত প্রশ্ন জটিল ও হস্তহ

করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু নিম্নে গ্রামলশস্তপূর্ণ—নিত্য সজীব তরু-শুল্কময় সবুজ পল্লী—এখানেই বঙ্গলক্ষী তাহার ধন-ভাণ্ডার রাখিয়াছেন। এখানেই বঙ্গের চাক্ষুশী—অজান্তার শেষ চিহ্ন, এখানেই নিরঙ্কর কবির অপূর্ণ পল্লী-গীতি, রায়বেশে, বাউল ও বৈষ্ণব নৃত্য, এখানেই সহজিয়ার সুনির্মল অদ্বিতীয় প্রেমের আদর্শ—কিছুদিন পূর্বেও ছিল। পাশ্চাত্য বহুতায় আজ সেই রত্নভাণ্ডার চলিয়া যাইবার পথে। যদি বাঙ্গলার পল্লী-গীতিকা, মনোহর সাহি কীর্ত্তন, সহজিয়ার আদর্শ প্রেম, রায়বেশে নাচ, পল্লীর শিল্পকলা চলিয়া যায়, তবে বাঙ্গলার ভৌগোলিক তত্ত্ব জানিয়া আমরা কি করিব? বাঙ্গলাদেশ তো তাহা হইলে লুপ্ত হইল। কতকগুলি গিণ্টী করা বিদেশী শিক্ষার ফলে এদেশের কি গৌরব থাকিবে? যাহা বিদেশের নকল, তাহা তো নকল ছাড়া কিছুই নয়। জগতের শিক্ষা-দীক্ষায় বাঙ্গালীর যে সকল অসাধারণ দান ছিল—তাহা লুপ্ত হইলে বাঙ্গলাদেশকে অথ যে নাম দাও, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু “বাঙ্গলা—সোনার বাঙ্গলা” নাম দিয়া সেই পবিত্র নামের অবমাননা করিও না।

বিদেশী শিক্ষা-সজ্জাত উপেক্ষা ও ঘৃণায় এই কিঞ্চিৎ অধিক অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গলার

শৌর্য-বীৰ্য, শিল্প, চিত্রশীলতা প্রভৃতি সমস্ত লুপ্ত হওয়ার মধ্যে আসিয়াছে। সহজিয়াদের বিপুল সাহিত্য—যাহা এখনও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট কিছু কিছু পাওয়া যায়,— তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায়, রামমোহন ও কেশব ধর্মসম্বন্ধে নূতন কথা কিছুই বলেন নাই।

বাঙ্গলার পল্লীবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ নিরক্ষর থাকিলেও তাহাদের শিক্ষার অভাব কোন কালেই হয় নাই। আকবর লিখিতে পড়িতে জানিতেন না। আমাদের দেশে আর্ধ্যগণ পূর্বকালে মুখে মুখেই বেদ-বেদান্ত আবৃত্তি করিতেন। পুস্তক লেখা ও পড়ার পাঠ বৈদিক যুগে কমই ছিল। মনে ও স্থিতিতে তাহারা জগতের সকল তত্ত্ব গাঁথিয়া রাখিতেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অর্থ—সমস্ত জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া চরিত্রের অঙ্গীভূত করা, জ্ঞান শুধু লিপি-পরিচয়-প্রচারের অপরিহার্য অঙ্গীয় বলিয়া অনেক সময়ে বিবেচিত হইত না। আমাদের দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা মুখে মুখে এখনও বড় বড় গণিতের সমস্তা পূরণ করিতে পারে—তাহাদের কতকগুলি এমনতর বাধা নিয়ম ছিল যাহাতে অতি সহজে তাহারা গণিতে এক্রপ জ্ঞান অর্জন করিতে পারিত, যাহা অক্ষশাস্ত্রে এম. এ. উপাধিধারীর পক্ষেও কষ্টসাধ্য। ১২৬৩ বাঃ সনের (১৮৫৫ খৃঃ অব্দের) হাতের লেখা একখানি শুভঙ্করী আমার নিকট আছে, তাহাতে গণিতের কতকগুলি সূত্র ও দৃষ্টান্ত আছে। আমি সকল স্থানে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, সুতরাং বুঝাইতে চেষ্টা করিব না, যেমন পাইয়াছি, নিজে তাহা তেমন ভাবেই উদ্ধৃত করিতেছি :—

সাজাকশী (সাজাকশু)—

- (১) বিধা প্রতি দর খণ্ডা, আড়ায় ধর সোলগণ্ডা
কুড়িয়া গণ্ডা লেখা জান যানে কড়া সমাধান
সেরে কাক বুঝ শিত্ত কহেন শুভঙ্কর সাজাকশু।

(২) শুনহ কাএহু ভাই করি নিবেদন। শত গজ কিন্তা দেহ লেহ কিছু ধন।
কার কার গণ্ডা কার ডেড় বুড়ি। সত গজ কিনে দেহ চার কো(ড়ি ?)।

আসামী	গজ	দর	নেট
বড় গজ	৫	১৭০	১৭০
মাজারি	২৫	২	৫
ছোট গজ	৭০	১০	১৭০
	১০০	...	১০

শিক্ষা-দীক্ষার কথা

৮৯৭

(৩) এক এক এগার মাথে। একশত শাক্তিতিশ দিআ তাথে। কি কড়ি পাতএ নাথ। পনের বাইসার সুরি শাত।

পাতন	১	১	১	১
ভাগ	১৩৭			
	১	৫	২	২ ০ ৭

(৪) ছই ছই বাইস মাথে। কিবা ভাগ দিব তাতে ॥
সুত কহে ওহে তাত। পনের বাইসার সুরি সাত ॥

পাতন	২	২	২	২
ভাগ	৬৮৥০			
	১	৫	২	২ ০ ৭

(৫) রাজা বলে অবধানে শুনরে কোটাল
শত তদ্বাস শত পক্ষ আনহ ততকাল ॥
কিনিবে সারস পক্ষ ছই টাকা দরে
অর্দ্ধতদ্বা দিআ শুক কিনহ সম্বরে ॥
শিকা শিকা পাখরা, মঅনা তিন শিকা
কিনে আন শত পক্ষ দিয়া শত টকা ॥

আসামী	...	জি	...	দর	...	নেট
সারস	...	৪২	...	২	...	৮৪
শুক	...	৪	...	৥০	...	২
পাখরা	...	৫৩	...	১০	...	১৩০
মঅনা	...	১	...	১০	...	১০
		১০০				১০০

(৬) টাকাস ছাগ শিকাস গাই। পাচ টাকাতে মোহিশ পাই। শঅ টাকাস শঅ জিব। বলে গেল সদাশিব ॥

আসামী	...	জি	...	দর	...	নেট
ছাগ	...	২৪	...	১	...	২৪
মোহিশ	...	১২	...	৫	...	৬০
গাই	...	৬৪	...	১০	...	১৬০
		১০০				১০০

(৭) তিন টাকায় ছাগ শিকায় গাই। আট আনাতে মোহিশ পাই। কুড়ি টাকায় কুড়ি জিব। বলে গেল সদাশিব ॥

আসামী	...	জি	...	দর	...	নেট
ছাগ	...	৫	...	৩	...	১৫
গাই	...	১০	...	১০	...	২০
মোহিশ	...	৫	...	১০	...	২০
		২০				২০

বোটকে আউটি

(৮) বটেক ছবট বটেক সাত। ছয় পাঁচ ছয় দিখা তাত ॥ এগার হাজার ছয় আশী। ভাগ জাননে সূতে বশী।

পাতন	১০	১০	১৫০	১১০	১১০	১১০
ভাগ	১১৬৮০					
	১১	১১	১১	০	০	

(৯) তুনি অথ পাখা পাখা পাখা। রামচন্দ্র দিখা সখা ॥ ঘোড়ার পৃষ্ঠে দিখা রাম। অষ্ট কোটির এই নাম।

পাতন	১	৫	২	২	০	৭
ভাগ	৫৮৪					
	১১	১১	১১	১১		

(১০) পন শশী পঞ্চম—শরগজ বাণ। নবহ নবহ রস বোস্ত পন ॥ অষ্টাদশ পন বুড়ী দিজে। আদি বিসম খোড়ি শিবরাম কিজে ॥

পাতন	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
ভাগ	১০৫								

(১১) নব কোঠার আরজা

এক হই তিন চার পাঁচ ছয়। সাত আট ছাড়া নয় ॥ গিহ ভাগ দিখা জান। নবকোঠার জন্মস্থান ॥

পাতন	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ভাগ	২							
	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১

(১২) অষ্ট কোঠার আরজ্য।

চার চার চোআলিস মাথে । সম্মা চোত্তস দিআ তাথে
কি কড়ি পাতএ নাথ । পনের বাইশার শুনি সাত ।

পাতন	৪	৪	৪	৪
ভাগ	৩৪।০			
	১	৫	২	২

(১৩) বাণ বাণ বোহু পণ । সোল গণ্ডা দিআ আন ॥ বাণের ভাগে পুরি আন ।
মুনি মুনি জন্মস্থান ॥

পাতন	৫	৫	১১৬
ভাগ	৫		
	২	৭	৭

(১৪) মুনি মুনি বামে পাখা । ডাহিনা বার পণ দিআ । সম্মা শোল দিআ পুরি আন ।
চার চার জন্মস্থান ।

পাতন	২	৭	৭	১০
ভাগ	১৬			
	৪৪		৪৪	

(১৫) মাস মাহিনা

মাস মাহিনা আর জত । দিন তার পড়ে কত ।
টাকা প্রতি ২০॥ = দশ গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি হয় ।
আনা প্রতি ॥ = দুই কড়া দুই ক্রান্তি শিবরাম কয় ॥

(১৬) বৎসর মাহিনা

বৎসর মাহিনা আর জত । দিন তার পড়ে কত ।
টাকা প্রতি ২৫ তিন কড়া পাঁচ দস্তি হয় ।
আনা প্রতি দুই দস্তি শিবরাম কয় ॥

(১৭) বৎসর মাহিনা আর জত । মাস তার পড়ে কত । টাকা প্রতি ১/৬॥ = ছাব্বিশ
গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি হয় । আনা প্রতি ২॥ = অষ্ট ক্রান্তি শিবরাম কয় ।

(১৮) সনা (সোনা) কেনা

সনা (সোনা) কিনিতে যখন যাবে । ছিআনই (ছিআনকর ই) রতিতে মোহর
লাবে । টাকা প্রতি ২০/ তের কড়া এক ক্রান্তি হয় । আনা প্রতি = ৮ আড়াই ক্রান্তি
শিবরাম কয় ।

(১৯) সনা (সোনা) কিনিতে জখন জাবে। সন্স রতিতে মোহর লবে। টাকা প্রতি ২৩/৪ তিন গণ্ডা তিন কাক চার তিল হঅ। আনা প্রতি ১/৪ তিন কাক চার তিল শিবরাম কঅ।

(২০) চারি ধানে রতি হঅ, দশ রতিতে মাসা, দশ মাসায় তলা (তোলা) হঅ, সুন সত্যভাষা। চৌষট্টি তোলায় সের বর্ডিস প্রমাণি। চোল্লিশ সেরে মন হঅ সর্বলোকে জানি। পাঁচ সেরে পোশরি হঅ চারি সেরে বিশা। ইহাতে জানিলে ঘুচে অবোধের দিশা।

মাধতের আরজ্যা

(২১) জতেক তঙ্কার গ্রামে মাধত করিবে। তত গণ্ডা মাধতের তলে ভাগ দিবে। আসলে হরিলে অঙ্ক যত টাকা হঅ। টাকা প্রতি তত গণ্ডা শিবরাম কঅ।

আসল নফার আরজ্যা

(২২) লাভে মূলে যত পাই। বিকি-দরে কিন ভাই। কিনন-দরে হরে লবে। আসলের ঠিকানা পাবে।

বগড়া ধান কেনা

(২৩) ধাত্ত কিনিতে জাবে নিবে দর করে। আনা প্রতি কুড়িতে দেড়পাই লবে ধরে। মনে লবে দেড় কনা পেআ্যাচো ঠিকনা। আমঠি এক। শিবরাম দাশ কহে হিসাব করে দেখ।

(২৪) মনের করার জার সের পড়ে কত। টাকা প্রতি অষ্টগণ্ডা হঅ লেখার মত। আনা প্রতি ছই কড়া সুন শিশুগণ। এই মত মনকরা শিবরাম কন।

(২৫) সেরের করার জার ছটাক পড়ে কত। টাকা প্রতি এক আনা হয় লেখার মত। আনা প্রতি পাঁচ কড়া গণ্ডা কাক হয়। এই মত সেরকরা শিবরাম কঅ।

(২৬) সেরের করার জার তলা (তোলা) পড়ে কত। টাকা প্রতি এক পাই হঅ লেখার মত। আনা প্রতি পাঁচ কাক সুন শিশুগণ। এই মত সেরকরা শিবরাম কন॥

ধান কেনার আরজ্যা

(২৭) তকা দিআ জত আড়া কিনিবে সে ধান। আড়া প্রতি কুড়ি হঅ আনার প্রমাণ। কুড়ির প্রতি সের হঅ পুঅ ধর মানে। সেহেতে ছটাক ধাত্ত শিবরাম ভনে॥

মন করার আরজ্যা

(২৮) তঙ্কা লইবে জত মন আশবাব। মনেতে আড়াই সের আনার হিসাব। জত সের থাকঅ ছটাক তত হঅ। ছটাকেতে আড়াই সের শিবরাম কঅ॥

(২৯) মনের করার জার পুস পড়ে কত। তহা প্রতি হই গণ্ডা হঅ লেখার মত।
আনা প্রতি হই কড়া শুন শিশুগণ। এই মত মনকরা ভিত্ত (ভৃগু) রাম কন ॥

আনা মসার (মাসার ৭) আরজ্যা

(৩০) কাহনে লইবে পন চোকে লবে বুড়ি। গণ্ডায় লইবে কাক পোনে পাচ
কোড়ি ॥ কড়া লইবে পঞ্চ তিলের লিখন। আনা মসা কর শিশু আনন্দিত মন ॥

গণ্ডা কোড়ির আরজ্যা

(৩১) কাহনে লইবে গণ্ডা করিয়া জতন। পনেতে লইবে কাক শুন শিশুগণ।
গণ্ডায় লইবে তিল কড়া অধুল হঅ। এই মত গণ্ডার কোড়ি শিবরাম কঅ।

জমাবন্দির আরজ্যা

(৩২) জমি বিধা যত তহা করিবে বর্ণন। তহা প্রতি বোল গণ্ডা কাঠা অধরন।
জত আনা তত গণ্ডা পাই প্রতি বট। গণ্ডা প্রতি বোল তিল জানি অকপট। কড়া প্রতি
চারি তিল শুভঙ্কর ভনে। জমাবন্দি কর শিশু আনন্দিত মনে। *

(৩৩) তেরিজের আরজ্যা—“তেরিজ ধারণ কথা শুন শিশুগণ। দক্ষিণে কড়ার স্থান
করিবে গণন। কড়া খুয়ে চাড়িকড়ায় গণ্ডা লবে হাতে। হাতশুদ্ধ গণ্ডা ধোবে দশক
পশ্চাতে। দশকে দশকে পণ কমি হৈলে ধোবে। পণে পণে এক কড়ি চৌখ ধরে লবে।
চারি চোকে টাকা হর তেরিজ লেখা কর। নরসিংহ রচয়ে ক্রমে এই অংশ ধর।

(৩৪) জমা-ওয়াশিলের আরজ্যা—“জমা ওয়াশিল বাকী শুন শিশু ডাই। জমা ছোট,
খরচ বড় ফাজিল বলি তাই। জমা বড়, খরচ ছোট, বাকীদার হয়, জমা ওয়াশিল সমান হৈলে
সাধু খালাস হয়।

(৩৫) দেউলের মাপ—আছিল দেউল এক পর্কত প্রমাণ। ক্রোধ করি ফেলে দিল
বীর হুম্মান। অর্ধেক পক্ষেতে তার তিন ভাগ জলে। দশম ভাগের ভাগ সেহালার তলে।
উপরে ৫২ গজ দেখি বিস্তমান। সকলে কতক শিশু কর পরমাণ।

(৩৬) আরজ্যা—বাণবট দুতসের, আটা এক বটে। কড়ায় তিন সের চালু আইলের
হাটে ॥ দশ কড়া কড়ি দিয়া গেল সদাগর। পাঁচ সের দধি কেন ইহার ভিতর ॥

(৩৭) রামচন্দ্র দ্বাপরেতে কৃষ্ণরূপ ধরি। চন্দ্রবদনে নিলেন মোহন মুরলী। ভুজে
ধরি অষ্ট সখী বিহারয়ে বনে। বাণে বিদ্ধি হয়স্বর স্থিতি বৃন্দাবনে। ভুবন মোহিত হৈল
যীর বাণী রবে। আছয়ে প্রকাশ চক্ষু দেখিবারে পাবে। গাঁথিয়া যুক্তার হার যদি দিবা

* ফিরিস্তি কাগজ বোই পঠনার্বে অীফোকি(৪) হাস নিমেক্তদার পরগনে জাহানাবাদ সাকিম বলরামপুর।
সন ১২৬৩ সাল তারিক ২৩ চৈত্র। [(১) হইতে (৩২) পর্যন্ত একখানি পুঁথি হইতে উদ্ধৃত।]

গলে। করহ ইহার হৃত আপন বুদ্ধি বলে। হইপাশে চন্দ্র হবে মনো তারাগণ। তবে সে হইবে হার গুন সৰ্বজন।

পাতন	১৪২৮৫৭১৪৩
	৭৮৪৬৫২৭৮১
	২১৫৩৪৭২২
	১০০০০০০০০১

সাত দিয়া পুরিবে ৭

(৩৮) তক্ষা প্রতি মোন যার হইবেক দর। তক্ষা প্রতি অষ্টগুণা সের প্রতি দর। আনা প্রতি ছই কড়া গুণায় অষ্ট তিল। শুভকর দাস কহে এই মত মিল।

(৩৯) তক্ষা প্রতি মোন যার হইবেক দর। তক্ষা প্রতি ছই কড়া ছটাক প্রতি দর। আনা প্রতি দশ তিল গুণায় অষ্টকৈক কয়। শুভকর দাস কহে এই মত হয়।

(৪০) তৈল লবণ দ্বিত চিনি বাহা কিনিতে যাই। মোন দরে সেরে টাকায় অষ্ট গুণা পাই। পোয়া প্রতি ছই গুণা সেরে ছটাক জান। কহেন শুভকর গুন বালক বুঝান।

(৪১) ইন্ডের অমরাপুরে পারিজাত আছে। দিনে শত লক্ষ ফুল ফোটে সেই গাছে। এক এক ফুলের মূল্য সোয়া মন সোনা। চারি যুগে কত পুষ্প কত মোন সোনা। [ইহা একটা খুব দীর্ঘ পুরণের ব্যাপার—কিন্তু শিশুরা ইহা মনে মনে কথিতে পারিত। (১২ বৎসর = ১ যুগ)]

(৪২) মুনি গেলা তপস্যায় শূন্য ঘর করে। ছই পাখা গরুড় নিল বাণ কন্দর্পের ঘরে। পৃথিবীতে চন্দ্র নাই উদয় আকাশে। কোথা গেল পোনর বাইশ অঙ্ক হবে কিসে। গুরু অগ্নি বহু রাম রত্নাকর তায়। একাদশে পুরে নিল অষ্ট কোঠা হয়।”

পাতন	১৩৮৩৭
ভাগ পূরণ	১১
	১৫২২০৭

এইরূপ আখ্যা ও প্রশ্ন শত শত এখনও পাড়াগায়ের অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের জানা আছে—কিন্তু কিছুকাল পরে এই বিজ্ঞা বাহা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পক্ষে এখনও অপরিহার্য, তাহা একবারে নষ্ট হইবে। আর একটা কথা, অঙ্কের অসংখ্য পারিভাষিক শব্দ ছিল, তাহা বহুযুগ ধরিয়া দেশময় প্রচলিত ছিল, সেগুলি উপেক্ষা করিয়া আমরা মনগড়া শব্দ নির্মাণ করিতেছি,—পদ্মার তীরে বসিয়া কৃপ খনন করার বৃথা শ্রম করিয়া মরিতেছি। আমরা বাহাকে “পাটাগণিত” বলি, হিন্দুস্থানীরা তাহা তাঁহাদের পারিভাষিক ঠিক রাখিয়া “অঙ্কগণিত” বলেন। আমাদের মনগড়া “ক্ষেত্রতত্ত্ব”-শব্দ তাঁহাদের পারিভাষিকে “রেখাগণিত।”

শুভঙ্করী আখ্যায় অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহা রূপা করিয়া গণিতের অধ্যাপকগণ চক্ষু খুলিয়া একবার দেখিলে ভাল হয়। যথা—‘হার্য’, ‘হারক’, ‘লক্ষ’, ‘হীন’, ‘হস্তহরণ’, ‘দীর্ঘহরণ’, ‘পাতন স্তাস’, ‘পর্যাস্তাক’। শুভঙ্করের আখ্যায় প্রাচীন পাতড়া হইতে এই গণ্যংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—“তাহার বিবরণ এই, যে অঙ্কে অঙ্কান্তর দ্বারা বিভাগ করা যায় তাহার মান হার্য, এবং যে অঙ্ক দ্বারা তাহা হরণ করি তাহার নাম হারক, আর হরণ করিলে যে অঙ্ক পাওয়া যায় তাহার নাম লক্ষ। এবং হরণ করিলে অবশিষ্ট যে থাকে তাহার নাম হস্তাবশেষ।” এই পাতড়া-সাক্ষেতিক অঙ্কসম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা আগে শিশু মাত্রই জানিত। এখন তাহার কতক কতক জানা থাকিলেও অনেক শব্দ দূর হইয়া উঠিয়াছে। পাতড়া হইতে আর একটা অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

১=চক্র, মহী, শশী, গুরু। ২=পক্ষ, কর, পাখা, ভূজ। ৩=নেত্র, রাস, লোচন, অগ্নি। ৪=বেদ, যুগ। ৫=বাণ, শর। ৬=মদ, ঋতু। ৭=সমুদ্র, অশ্ব, মূনি। ৮=বস্ত্র, গজ। ৯=গ্রহ, রক্ত। ১০=দিক্। ১১=রক্ত।

জমির মাপ—৮ যবে এক অঙ্গুলী ; ৪ অঙ্গুলীতে এক মুট ; ৩ মুটে এক বিগৎ ; ২ বিগতে এক হাত ; ৫ হাত দীর্ঘ ৪ হাত প্রস্তু এক ছটাক ; ১৬ ছটাকে এক কাঠা ; ২০ কাঠায় বিঘা ; ১৬ বিঘায় এক খাদ। সময় নিকপণ—১৮ নিমিষে ১ কাঠা, ৩০ কাঠায় এক কলা, ৩০ কলায় এক অঙ্গুল (ফল), ৬০ অঙ্গুলে এক পল, ৬০ পলে এক দণ্ড, ৭৯ দণ্ডে এক প্রহর, ৮ প্রহরে এক দিবারাত্র, ৭ দিবসে এক সপ্তাহ, ১৫ দিবসে এক পক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, ছয় ঋতুতে এক বৎসর, ১২ বৎসরে এক যুগ, ৭১ যুগে এক মহন্তর।

গণিতের অনেক সূত্র নিয়ন্ত্রণের লোকের মুখে মুখে জানা ছিল। এজন্য তাহাদের কাগজ কলম লইয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া অঙ্ক কবিত্তে হইত না। তাহারা অতি জটিল হরণ-পূরণ, ও বাজার দরের সূক্ষ্মতম হিসাব মুখে মুখে করিতে পারিত। শ্রীমান্ সোমেশ বসু আমেরিকা, জার্মানী প্রভৃতি দেশে বাইয়া বড় বড় জটিল হরণ-পূরণ অতি অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে বিভূষণরূপে মুখে মুখে বলিয়া তথাকার মনীষী অধ্যাপকবৃন্দকে চমৎকৃত করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা কি যোগবলসম্বৃত? ভারতবর্ষে যোগবল অবিখ্যাস করা উচিত নহে। সেই বিশ্বাস আমাদের অস্থি-মজ্জাগত, কিন্তু তাহাতে এত ভেল চলিয়াছে যে, তাহা অনেক সময়ে বৈজ্ঞানিক বিচারসহ হয় না। হয়ত সে বিজ্ঞা জনসমাজে অনেক পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছে এবং ভণ্ডের প্রতারণা এই বিজ্ঞার উপর একটা অশ্রদ্ধার ভাব আনিয়াছে। কিন্তু বসুমহাশয়ের এই গণিতের অপূর্ণ সফলতা হয়ত বা প্রাচীনকালের অধুনাবিলুপ্ত সূত্রের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকিবে। মুখে মুখে সাধারণ লোকেরা এদেশে যেকোন আশ্চর্য্যভাবে গণিতের জটিল অঙ্ক কবিত্তে শিখিয়াছিল—তাহা এখন লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। আমরা বার্নার্ড স্মিথ মুখস্থ করিয়াছি, কিন্তু শুভঙ্কর, শিবরাম ও ভৃগুরামকে বিচারের সুবিধা না দিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছি। নিত্যকার প্রয়োজনে এখনও গণিতের

অনেকখানি প্রয়োজন আছে; জমিজমার হিসাব, বাজার দর, কীসা, তামা, পিত্তল প্রভৃতির দর ও ওজন, শস্তাদির দরের হিসাব প্রভৃতি বিষয়ে চাষারা মুখে মুখে বাহা এখনও করিতে পারে, আমাদের এম. এ. উপাধিধারী গণিতের অধ্যাপকগণ অনেক সময়ে তাহা অনেক বেশী সময়ে কষ্টেষ্টি করিতে পারেন। চাষারা কাগজে-কলমে অভ্যস্ত নহে, নিতান্ত জটিল অঙ্ক হইলে তাহাদেরই মধ্যে অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট মাতব্বর ছই একজন লোক তাহা 'কালী' করিতে বসে। নিতান্ত জটিল অঙ্ক না হইলে তাহারা মসি, মস্তাদার বা কাগজের সহায়তা লয় না। এই জন্ত বাহারা "কালী" করিতে জানে, চাষাসমাজে তাহাদের প্রভূত মান। এই নিম্নশ্রেণীর লোকদের অতি স্থূল হিসাব, বাহা তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করে, তাহা ভুল হয় না। কিন্তু এখনকার শিক্ষিত লোক সেইরূপ করিতে গেলে দ্বিগুণ চৌগুণ সময় তো লইবেনই—তাহাতে অনেক সময়ই ভুল হইয়া থাকে। এখন বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গলার সাহায্যে সমস্ত অধিতব্য বিষয়ের জ্ঞান বিস্তার করিবেন। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের পূর্বে যে বিষয়টা স্বতঃসিদ্ধ ছিল, —জগতের সমস্ত জাতি যে সকল কথা নিজের ভাষায় শিখে, ৩০৪০ বৎসরের মধ্যে জাপান যেভাবে সর্কবিষয়ের জ্ঞান তাহাদের নিজের ভাষায় শিখাইয়া উন্নতির তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন,—এখনও হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর বাহা নিজরাজ্যে প্রচলন করিয়াছেন, তাহা এদেশে অগ্রাহ্য হইয়া আছে। স্বদেশের ভাষায় জ্ঞান প্রচার করার বিরুদ্ধে কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়াছেন, ইহাদের মাথা অনেকটা ইংরেজী শিক্ষায় বিগড়াইয়া গিয়াছে। যিনি এখন অঙ্ক শিখেন, তিনি বিদেশী ভাষায় তাহা শিখিতে অর্ধেকের বেশী সময় সেই বিষয়ের উপযোগী ভাষা শিখিতে ব্যয় করেন। আসল বিষয় শিখিতে আর কতটুকু সময় থাকে?

বাহা হউক এখন যখন বাঙ্গলা ভাষায় গণিতাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে, তখন আমাদের গণিতের যে সকল স্থত্র বিলাতী পুস্তকে পাওয়া যায় না, অথচ নিত্যকার জীবনযাত্রার পক্ষে বাহা অপরিহার্য্য, সেইগুলি কি শুভঙ্করের আর্ঘ্যা হইতে শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত নহে? এই আর্ঘ্যাগুলিতে কড়া, কাঠা, জ্ঞান্টি প্রভৃতি যে সকল শব্দ আছে—তাহা প্রয়োজন হইলে, পাউণ্ড, টাকা, পয়সা, পেন্স প্রভৃতি এখনকার প্রচলিত গণিতাঙ্কে পরিণত করিয়া প্রাচীন আর্ঘ্যাগুলির অমুসরণপূর্ব্বক স্থত্র রচনা করিতে বোধ হয় এখনকার অধ্যাপকেরা অসমর্থ হইবেন না। অনেক সময়ে দেশীয় মাপ, দর এবং মূল্যাদি বাঙ্গলাদেশের চিরাগত সংস্কারাধীন করাতে বিশেষ দোষ নাই, তবে যখন বিলাতের সঙ্গে কারবারের প্রয়োজন হইবেই, তখন ছইরূপ গণিতাঙ্কে মূল্য ও ওজনের সম্বন্ধে পারিভাষিক শব্দজ্ঞানের ব্যবস্থা রাখা উচিত। বড়ই চুংখের বিষয়, যে সকল স্থত্র শিখিয়া এতদেশের লোকেরা এত সহজে গণনাকার্য্য নির্বাহ করিত, সেই অসামান্য বিজ্ঞা—অশিক্ষিতপটুতা—আমরা বিবেচনাহীন হইয়া হারাইতে বসিয়াছি। রয়াল এডিয়াটিক সোসাইটীর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের সংখ্যায় হিন্দুদিগের গণিতশিক্ষা-সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পাদ্রী লঙ সাহেব শুভঙ্করকে "The Cocker of Bengal" (বাঙ্গলাদেশের 'ককার') উপাধি দিয়াছেন। এই নামে শুভঙ্করের কোন গৌরব বৃদ্ধি যদ

নাই। গণিতের যে সকল অতি সুন্দর বিষয়ের সুত্র আবিষ্কার করিয়া শুভঙ্কর সমস্ত কুট প্রণেয় সহজ সমাধান করিয়াছেন, অল্পত তাহার দৃষ্টান্ত স্মৃতি নহে। লঙ সাহেব উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিয়াছিলেন, “১৪০ বৎসর যাবৎ শুভঙ্করের আখ্যায়িকায় আবিষ্কৃত অসংখ্য ৪০,০০০ বঙ্গবিজ্ঞানীয় মুখরিত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং আমাদের ইংরেজী শিশু-বিজ্ঞানসমূহে যে ভাবের শিক্ষা পরবর্তী সময়ে প্রচলিত হইয়াছে তাহার পূর্বগৌরব হিন্দুদেরই প্রাপ্য।” হিন্দুরা মানসিক বিজ্ঞান ওস্তাদ ছিলেন। হিন্দুর এই সূচিবাবলম্বিত পদ্ধতি এখন mental arithmetic আখ্যায়িকায় শিক্তদের মধ্যে গৌরবান্বিত হইয়াছে। শুধু গণিতের নহে, জ্যোতির্বিজ্ঞান গুরুতর প্রশ্নগুলি ডাক ও খনার প্রসাদে বাঙ্গালী নিয়ন্ত্রণের লোকেরা একরূপ আশ্চর্য্যভাবে সমাধান করিতে পারিত, বাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোন্ দিন চন্দ্রগ্রহণ হইবে, তাহা অতি সহজে নিয়ন্ত্রণের লোক গণিয়া কহিতে পারে। “যে যে গৃহের যে রাশি, তার সমুদ্রে থাকে শশী, সেদিন যদি হয় পৌর্ণমাসী, অবশ্য রাহ গ্রাসে শশী। ছই তিন পাঁচ ছয় একাদশে দেখতে হয়।” সহজে প্রশ্নটার উত্তর হইয়া গেল। আর কোন্ দেশের ইতর জনসাধারণ এভাবে প্রশ্নটির সমাধান করিতে পারে তাহা আমি জানি না। আশ্চর্য্যের বিষয় বোগ ও তত্ত্ব সাধারণ লোকের মধ্যে একরূপ বহুলপ্রচার লাভ করিয়াছিল যে, আমরা মনেই করিতে পারি না, অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত লোকেরা কিরূপে এই দুর্ভাগ্য সাধনার পথে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছিল। সহজিয়ারদের বিদ্বত সাহিত্যের অনেকাংশ সন্ধ্যা-ভাবায় লিখিত, তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি। এই সাহিত্যের পাঠক, শ্রোতা ও লেখকগণের অধিকাংশই মূর্খ পাড়ারগেয়ে লোক—কিন্তু তাহাদের সাহিত্যে যেকোন ভাবে নিখাস-প্রশাস নিয়ন্ত্রিত করিয়া ঘটপটভেদের ও সহস্রারের সুন্দর সুন্দর বিবরণ আছে, তাহা অতীব বিশ্বয়কর। “গোরক্ষবিজয়” নামক বাঙ্গলা পুস্তকখানি এতদিন অবজ্ঞাত হইয়া নিয়ন্ত্রণের কুটিরে পড়িয়াছিল। ইহার লেখক নিয়ন্ত্রণের হিন্দু ও মুসলমান, এবং পাঠকও সেই শ্রেণীর। অথচ এই কাব্যের শেষাংশে গোরক্ষনাথ যে ৩১টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গুরু মীননাথের মায়া-মোহ ভঙ্গ করিলেন, তাহা বোগপথের পন্থী—কৃত্তী সাধক ভিন্ন কেহই উত্তর দিতে পারিবেন না। আমরা সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি; তথাপি বিশ্ব-পণ্ডিতেরা যখন এম. এ. পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যতালিকা হইতে গোরক্ষ-বিজয়ের সেই অংশ বাদ দিতে উজ্জত হইয়াছিলেন, আমি বলিয়া কহিয়া এ বৎসরের জন্ত তাহার কতকাংশ রাখিয়া দিয়াছি। এই ৩১টি প্রশ্নের মধ্যে একটি “অজপা কাহাকে বলে, জপে কোন জন?” এখন জানিতে পারিয়াছি, “অজপা” কথাটি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ও যোগের অতি প্রাথমিক কথা, তাহা পূর্বকালে এদেশের আপামর সাধারণ সকলেই বুঝিত। প্রশ্নগুলির আর দুইটি—প্রদীপ “নির্বাণ হইলে জ্যোতিটা কোথায় যায়? এবং ধ্বনি ফুরাইয়া গেলে শব্দ কোথায় বিলীন হয়?” ইত্যাদি। এদেশে মহোৎসবে যেমন ছোট বড় সকলে নির্ঝিঁচারে একত্র বসিয়া যায়, জ্ঞানবিস্তারের পরিবেষণেও এদেশের লোকেরা অপর সকলকে বঞ্চিত করিয়া নিজেরা শুধু তাহা ভোগ করিতেন না। অন্ততঃ বৌদ্ধাধিকারের সময়ে এইরূপই নিয়ম ছিল। মাঝে কয়েক শতাব্দীর জন্ত গোড়া ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানের দ্বার

আগুলাইয়া পাহারা দিয়া উহার ভাণ্ডার একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন ; কিন্তু এই গণ-
তান্ত্রিক দেশে সেরূপ প্রভুত্ব টিকিল না—বৈষ্ণবেরা আসিয়া ঠেলা দিয়া সেই প্রাচীন দরজা
ভাঙ্গিয়া দিলেন ; সমস্ত শাস্ত্রের আদেশ ও ব্রাহ্মণের নিষেধ-বিধি উলট-পালট করিয়া দিয়া
সহজিয়ারা সতীত্বের আদর্শ ভাঙ্গিয়া চূরমার করিয়াছিল ; বৈষ্ণব গোস্বামী নিম্নতম শ্রেণীর
বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে শিষ্য করিতে লাগিলেন ; অশেষ গালাগালির ভাজন
হইয়াও অনুবাদকগণ সংস্কৃত পুরাণ, কাব্য প্রভৃতি বাঙ্গলায় লিখিতে বসিয়া গেলেন । নরোত্তম
কায়স্থ ও শ্রামানন্দ সলোপ হইয়াও ব্রাহ্মণদিগকে শিষ্য করিতে লাগিলেন—গৌড়ার দল
রোষ-কবায়িত চোখে তাহাদিগকে বার বার ভয় দেখাইতে লাগিলেন ।

প্রাচীনকালে বিজ্ঞার কিরূপ সম্মান ছিল তাহা পূর্বে এক অধ্যায়ে (২৯১-৩০০ পৃঃ) আমরা
দেখাইয়াছি । “অজ্ঞাতমৃতমুর্খেভ্যো মৃতাজাতৌ স্মৃতৌ বরম্ । যতন্তৌ স্বল্পহুঃখায় যাবজ্জীবং

উচ্চশিক্ষা ।

জড়ো দহেৎ” (পঞ্চতন্ত্র) । বাঙ্গলা প্রাচীন সরস্বতীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক

কাব্যে আমরা দেখিতে পাই, রাজা সুরেশ্বর তাঁহার মূর্খ পুত্রকে
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতেছেন । অবশ্য এতটা বাড়াবাড়ি কবিকল্পনার অবাধগতিশীলতা
প্রমাণ করে ; কিন্তু দয়্যারাম কৃত ‘সারদামঙ্গল’ের সমস্ত অতিরঞ্জনের মধ্যে এইটুকু সত্য যে,
বঙ্গীয় সমাজে এক সময়ে মূর্খ পুত্র অতিশয় ঘৃণার পাত্র ছিল । ব্রাহ্মণ্য-যুগে শিক্ষার ক্ষেত্র
অনেকটা সঙ্কুচিত করিয়া ফেলা হইয়াছিল ।

আমাদের দেশের ইতিহাস জানিতে চাহিলে ইতরসাধারণের মধ্যে তাহার বতটা উপকরণ
এখনও পাওয়া যাইবে—লিখিত পুস্তকে কি অনুশাসনাদিতে তাহা ততটা পাওয়া যাইবে না ।
অধুনা আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায় এদেশের কোন ঐতিহাসিক পুস্তক বা সন্দর্ভ (thesis)
লিখিতে যাইয়া কেবলই লাইব্রেরীর সাহায্য গ্রহণ করেন । যে সকল উপকরণ তাঁহাদের
চারিদিকে পড়িয়া রহিয়াছে—তাহা দেখিবার শক্তি তাঁহারা হারাইয়া ফেলিয়াছেন । বাহা কোন
সাহেব দেখেন নাই বা বলেন নাই, এমন কোন সত্য একান্ত স্পষ্টভাবে দেখিলেও তাহা বলিবার
মত তাঁহাদের সাহস নাই । টলেমি যে ভৌগোলিক বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, (খৃষ্টীয় দ্বিতীয়
শতাব্দী) তাহা ভাল করিয়া পড়িয়া আমি বুঝিয়াছি, তদ্রূপ “সলসোলু,” “সাবার,” “দাসরা,”
এবং “বেনিয়াজুডম” এই কয়টি নগর খাস বাঙ্গলার । যে সকল সাহেব সেই ভৌগোলিক
বৃত্তান্তের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা খুব সম্ভব বাঙ্গলাদেশের অধুনা নগণ্যত্বপ্রাপ্ত ঐ কয়টি
পল্লীর অস্তিত্ব জানিতেন না, সুতরাং উহাদের স্থাননির্ণয় করিতে যাইয়া নানারূপ উৎকট কল্পনার
সাহায্য লইয়াছেন । সোলসুনো টলেমির বিবরণে খুব বড় অক্ষরে অনেকটা জায়গা জুড়িয়া লেখা
হইয়াছে, যে জায়গায় উহার সংস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, আমার মনে হয় তাহা কালীঘাটের
নিকট । “সরসুনো” গ্রাম এখনও বেহালার দক্ষিণে বিদ্যমান । উহা যে অতি প্রাচীন
তাহাতে সংশয় নাই । প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায়ের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও তথায়
দৃষ্ট হয়—তাঁহার ছই কজার নামে যে পাশাপাশি দুইটি বৃহৎ দীঘি আছে—তাহাও ঐ
গ্রামের প্রাচীনত্বের প্রমাণ ; কারণ সম্ভবতঃ এই দুই দীঘি বহু পূর্বে হইতেই ছিল—উহাদের

পুনঃসংস্কার করিয়া শেষে বসন্তরায়ের কন্যাদের নামে উহাদের পরিচয় হইয়াছে। পদ্মাতীরে সুপ্রসিদ্ধ রাজবাড়ীর মঠ, যাহা সেদিনমাত্র উক্ত নদীর কবলিত হইয়াছে—তাহার ভিত্তি হইতে সমস্তই বৌদ্ধস্থাপত্যের নিদর্শন, অথচ উহা কেদার রায়ের নামের সঙ্গে জড়িত হইয়াছে। সম্ভবতঃ কেদার রায় উহা সংস্কার করিয়া উহাতে কোন দেবতা স্থাপনা করিয়া থাকিবেন। সরস্বতীর দীঘিও এইভাবে নাম পরিগ্রহ করিয়া থাকিবে। প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন ভগ্ন রাজবাড়ীর সঙ্গে গঙ্গার যোগ করিয়া তথায় একটা বৃহৎ সুউচ্চ-পথ ছিল। কিন্তু দুই হাজার বৎসর পূর্বের ভগ্নাবশেষ অনেকস্থলেই মৃত্তিকার উপরে থাকে না। তাহা খুঁড়িয়া বাহির করিতে হয়। বসন্তরায় যে গ্রামে প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন, সে গ্রাম পূর্ব হইতেই সমৃদ্ধ ও ভদ্রনিবাস ছিল, নতুবা তিনি সেখানে বাড়ী করিতে যাইবেন কেন? তিনি ঐ গ্রাম স্থাপন করেন নাই। গ্রামটা দেখিলেই খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। বোধ হয় এক কালে বাসুদেবপুর, বেহালা, বড়িবা প্রভৃতি অনেক গ্রাম লইয়া ‘সরস্বতী’ একটা পরগনার মত ছিল, এজন্ত টেলিগ্রাফ উহার আয়তন এত বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। “সাবার” যে ঢাকা জেলার প্রসিদ্ধ “সান্ডার”—তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতে পাই নাই, ঐ অঞ্চলটা ভীমসেনের পুত্র ধীমন্ত সেন কীরাতদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন (সপ্তম শতাব্দীতে)। হরিশ্চন্দ্র এবং তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। আমরা ২৭৭-৭৮ পৃষ্ঠায় এই বৌদ্ধ নৃপতিবর্গের উল্লেখ করিয়াছি। “দাসরা” সান্ডার হইতে অনতিদূরে। টেলিগ্রাফ সংস্থাপনানুসারেও তাহাই দৃষ্ট হয়। দাসরা গ্রাম এক কালে কুলীন বৈষ্ণবগণের ২৭টি সমাজের মধ্যে অন্যতম ছিল। ছয় সাত শত বৎসর পূর্বে এই সকল সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। তিন-চারি শত বৎসর পূর্বের কুলজি গ্রন্থসমূহে এই গ্রামের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই গ্রামের সরিহিত ‘শিববাড়ী’ বহু প্রাচীন, তথায় শিব একটি বৃহৎ অসম পাথররূপে গভীর কূপের মধ্যে বিরাজিত। শিববাড়ীতে যে সকল প্রাচীন প্রস্তর-মূর্তি রক্ষিত আছে, তাহাদের মধ্যে বাগলী অতি প্রাচীন, নবম-দশম শতাব্দীর বাসুদেব মূর্তিও তথায় দৃষ্ট হয়। দাসরার খালের ধারে একটি প্রাচীন কালীবাড়ী ছিল। ১০১২ বৎসর পূর্বে সেই স্থানটির একাংশে পুষ্করিণী করিতে ইচ্ছুক হইয়া মালিক খুঁড়িয়াছিলেন। প্রায় একশ হাত নিয়ে একটি প্রস্তরস্তম্ভ তন্মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। উহাতে হস্তীর উপরে সিংহমূর্তি ও অপরাপর কারুসৌষ্টবের চিহ্ন আছে। উহা গুপ্তযুগের শেষের দিকের বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ ঐ স্তম্ভটি কোন দেবমন্দিরের ছিল। আমাদের দেশে যেখানে কোন মন্দির থাকে, যুগ যুগ ধরিয়া সেই খানটায় নব নব মন্দির নির্মিত হইয়া থাকে। সেই যে নবম শতাব্দীতে তথায় মন্দির ছিল, সেদিনকার কালীবাড়ী এতকাল পরেও সেই স্থানটির স্মৃতি করিতেছে। স্তম্ভটি দাসরার প্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল; উহা শিবলিঙ্গ বলিয়া পুরোহিত পূজা করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। পূর্ণবাবু আমার শিক্ষক ও আত্মীয়; তিনি উহা আমাকে দিয়াছেন। অধুনা উহা আমাদের বাড়ীর

‘রূপেশ্বর’ মন্দিরে আছে। টলেমির নির্দেশ অনুসারে “বেনিয়াজুড়ম” দাসরার নিকটবর্তী। এই “বেনিয়াজুড়ম” এখনও বিজ্ঞান—ইহার বর্তমান নাম “বানিয়াজুরী”। গ্রামটীতে কিছু কিছু প্রাচীন চিহ্ন আছে। সাহেবেরা অজ্ঞতাবশতঃ এই তিন গ্রামের ঠিকানা না জানিয়া যেখানে সেখানে উহাদের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। আমার মতই যে সত্য—একথা আমি বলিতেছি না, অন্ততঃ এ বিষয়টা বাঙ্গালীর পক্ষে এত গুরুতর, যে এসম্বন্ধে কতকটা আলোচনা চলে। বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের ইতিহাস, এমন কি ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চ পরীক্ষা দিতে হইলে আমাদের বিলাতে যাইয়া পড়িতে হয়। সাহেবদের লিখিত পুস্তকগুলি তো আমরা বাড়ীতে বসিয়াই পড়িতে পারি, কিন্তু একবার অজন্তা, অমরাবতী, সাঁচি, গয়া, ভুবনেশ্বর, হস্তিশূক্ষা, খেজুরাহ প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া দেখিবার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় করেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তাহাতে অল্পসময়ে অনেক কাজ হয়, এবং ভারতীয় ইতিহাস-লক্ষীর সঙ্গে আমাদের মুখোমুখী পরিচয় হইতে পারে। খরচও কম পড়ে। জায়া, প্রদ্বনম, শ্রাম ও কাষোজ প্রভৃতি স্থানও প্যারি বা লণ্ডন হইতে অনেক কাছে।

সঙ্গীতে যখন সাক্ষাৎ জগদীশ্বর দিল্লীশ্বর আকবর তানসেনপ্রমুখ সঙ্গীতাচার্যগণের দ্বারা রাগ-রাগিণীর বৈজ্ঞানিকভাবে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করাইতেছিলেন, তখন বাঙ্গলা-পন্নীতে সেই সুর পৌছায় নাই। কিন্তু হিন্দুগণে এদেশে বৈজ্ঞানিক ভাবে সঙ্গীতের চর্চা বিশেষ-রূপেই হইয়াছিল। লক্ষণ সেনের সময়ে রাগ-রাগিণী রাজসভায় মূর্ত হইত বলিয়া কথিত আছে। যে সময়ে সমুদ্রগুপ্ত বীণা বাজাইতেন, তাঁহার সেই সুরলহরী, নারদ ও তুঙ্গ প্রভৃতি সঙ্গীত সম্রাটদিগকেও লজ্জা দিত বলিয়া তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে। এই বীণাতে তিনি এরূপ সুর দক্ষ ছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুও তাঁহার মূর্তি বীণাবাদকরূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। লক্ষণ সেনের সভায় জয়দেবের হুবহাবিষ্ঠাত্রী পদ্মাবতী ‘গান্ধার’ রাগে গান গাহিয়া কপিলেশ্বরের সভা-জয়ী সঙ্গীতাচার্যকে জয় করিয়াছিলেন, স্বয়ং জয়দেব তাঁহার চরণের গতির ক্রম লক্ষ্য করিয়া তান রাখিতেন এবং নিজকে “পদ্মাবতীচরণচারণ-চক্রবর্তী” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। লক্ষণ সেনের রাজসভার নর্তকী শশিকলা এবং বিদ্যাং-প্রভার গানে রাগ-রাগিণী এরূপ মূর্ত হইয়া উঠিত যে, লোকে তাহা শুনিয়া বেহঁস হইয়া যাইত। এক রমণী সেইরূপ অবস্থায় বিদ্যাং-প্রভার মুখে ‘সুহে’ রাগের গান শুনিয়া নিজের শিশুকে কলসী মনে করিয়া রজ্জু বাঁধিয়া কূপোদকে নামাইয়া দিয়াছিল। সেক শুভোদয়াতে এই ঘটনাটির উল্লেখ দৃষ্ট হয় (সেক শুভোদয়া, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, ৬৮-৬৯ পৃঃ)। জয়দেবের গীতগোবিন্দ সমস্ত ভারতবর্ষে গীত হইত, কিন্তু এই সকল গান সর্বদাই গুজর, খাখাজ, গান্ধার প্রভৃতি রাগে গীত হওয়ার নির্দেশ আছে। সম্ভবতঃ গুজরাট, কাষোজ, কান্দাহার প্রভৃতি স্থানের নাম হইতে ঐসকল রাগের নাম গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু বঙ্গদেশ চিরকালই গণতান্ত্রিক, এখানকার জনসাধারণ কোন কালেই একটা নির্দিষ্ট কাযদা বা বিধানের বশবর্তী হইয়া চলিতে রাজী নহে। জনসাধারণ সঙ্গীত-বিজ্ঞানের প্রচলিত ধারা শিরোধার্য্য করিয়া

লয় নাই, তাহাদের নিজস্ব একটা স্বর ছিল—এই স্বর হিন্দী মনসামঙ্গলে (বেহলাকাব্যে) ‘বান্দাল রাগ’ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা আমাদের চিরপরিচিত ভাটিয়াল রাগ। এই স্বর কোন প্রচলিত রাগরাগিণীর ধার ধারে না, উহা খাটি পল্লীহৃদয়ের সমস্ত করুণ রস নিংড়াইয়া লইয়া আত্মপ্রকাশ করিত। এই স্বর পদ্মা, ধলেশ্বরী, ভৈরব, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদীর গর্ভে মাঝিদের মুখে যিনি শুনিয়াছেন, তিনি বুঝিবেন এই নদীমাতৃক দেশের উহা নিজস্ব স্বর।

আকাশ ও নদী যেখানে তুল্য রূপই বিশাল, বাতাসের গতি যেখানে ভাটিয়াল ও মনোহর সাই।

অবাধ, সেই অসীম রাজ্যের অসীম বেদনা বা ভক্তির সমস্ত বাধা-নির্মুক্ত এই স্বর বেন নৈসর্গিক দৃশ্যপটের নিজস্ব। মাঝি যখন উহা গায়, তখন তাহার সেই স্বরতরঙ্গ পদ্মার তরঙ্গের মতই আকাশ-বাতাসকে উদ্মাদনা দিয়া চলিয়া যায়। যে স্বরে মনসাদেবীর কীর্তন গাহিয়া দ্বিজ-বংশীদাস কেনারামের মত হিংস্র পশুকে বিমুগ্ধ করিয়া তাহার পঙ্কিল জীবনশ্রোত মন্দাকিনীতে পরিণত করিয়াছিলেন এবং ভেলুয়া কাব্যের নায়ক সারেন্দ্র বাজাইয়া পশুপক্ষী বশীভূত করিতেন বলিয়া বান্দলা পল্লীগীতিকার বর্ণিত আছে,—ইহা হৃদয়ের সেই তরঙ্গী স্পর্শ করিয়া অদীর বেদনার সৃষ্টি করে। “আমার গুরু বড় দয়াল সত্য আমি হলাম অপদার্থ, আমি যে ভক্তিহীন—ভক্তিহীন” কথাগুলি অতি সরল সহজ—কিন্তু ভাটিয়াল রাগে যখন নদীর উপর এই গানের স্বর বহিয়া যায়—তখন ভগবানের অসীম দয়ায় মানুষের নিজ অস্তিত্ব ভুবিয়া যায়।

এতকাল ভাটিয়াল রাগ—করুণ রসের প্রস্রবণস্বরূপ পল্লীর হৃদয় ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিল—হঠাৎ এক সোনার মানুষ তাহার যাজকাঠি দিয়া এই রাগটি স্পর্শ করিলেন—অমনই তাহা সোনা হইয়া গেল; যেন গুড়কে চিনি কিংবা চিনিকে মিহরিতে পরিণত করা হইল। বোধহয় এটি দেখান যাইতে পারে যে রেনেটি, গড়নহাটা এবং মনোহর সাই প্রভৃতি কীর্তনের স্বর—এই ভাটিয়ালের উপাদানেই সৃষ্ট। আমি জানি না—মনোহর সাই কীর্তনের মত একরূপ প্রেমের উদ্মাদনা জগতের আর কোন স্বরে আছে কিনা—কারণ উহা প্রেমের উদ্মাদেরই স্বর—সে স্বর বিজ্ঞানসঙ্গত কিনা জানি না; যদি না হয়, তবে এই স্বরকে বুঝিবার ক্ষমতা নববিজ্ঞান সৃষ্ট করা উচিত। আজ প্রায় পঞ্চশত বৎসর যাবৎ বান্দলা এই স্বরের মোহে পাগল হইয়া আছে। যেদিন চৈতন্যচন্দ্রের উদয় হইল, সেইদিন হইতে গীতগোবিন্দের প্রাচীন স্বর এদেশ হইতে উঠিয়া গেল এবং বান্দলা কীর্তনের স্বরে তাহা গাওয়া হইতে লাগিল।

বহু রূপকথা ও গীতিকথায় দৃষ্ট হয় স্ত্রীলোক ও পুরুষ এক গুরুর নিকট এক পাঠশালায়

বসিয়া পড়িতেন।

সখীসোনার গল্পে রাজকন্যা ও কোটালের পুত্র

একত্র এক পাঠশালায় পড়িতেন—সেই স্বত্রে একটা প্রতিশ্রুতির

ফলে উভয়ে পলায়ন করিয়া স্বামি-স্ত্রীর মত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। পল্লীগীতিকায়ও একরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে এই প্রথা রহিত হইয়া গেল। ষোড়শ শতাব্দীতে ফকির-রাম কবিত্ববর্ণ বর্দ্ধমান জেলায় বাস করিয়া সখীসোনার গল্পের একটা নূতন কবিত্বপূর্ণ সংস্করণ সঙ্কলন করেন। গল্পটি কিন্তু বহু প্রাচীন, ফকির-রামের সময়ে বিষয়টা একটা সংস্কারে

দাঁড়াইয়াছিল, তখন হয়ত এ প্রথা প্রচলিত ছিল না। এতগুলি রূপকথায় আমরা রমণী ও পুরুষের একত্র পড়াশোনার কথা পাইতেছি, যাহাতে মনে হয় ইহা দেশব্যাপী একটা প্রাচীন রীতির প্রতি অনুলিসংকেত করিতেছে। কিন্তু পাঠশালায় একত্র না পড়িলেও স্ত্রীলোকের পড়াশুনা যে এ দেশে মুসলমানদের সময়েও প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমরা গার্মী, মৈত্রেয়ী, খনা, অরুন্ধতী প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুতা ইতিহাস-পূর্ব যুগের পণ্ডিতাদিগকে লইয়া টানাটানি করিব না। কালিদাস তাহার স্ত্রী ভোজরাজের কথার নিকট স্বীয় মূর্ততার জন্ত বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন, কিংবা বিজ্ঞানরত্নায় রাজকুমারীরা পণ করিয়া বসিতেন যে, যে তাঁহাদিগকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারিবে, তাঁহাকেই বিবাহ করিবেন—এই সকল গল্পকেও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান দিব না। কিন্তু মধ্যযুগে আমরা চণ্ডীদাসের প্রণয়িনী রামী, শিখী মাইতীর ভগিনী মাধবী এবং চন্দ্রাবতী প্রভৃতি কবিদিগের লেখার সহিত পরিচিত হইয়াছি। চণ্ডীকাব্যে দেখা যাইতেছে যে বণিকের বধূরাও লিখিতে পড়িতে জানিতেন, পল্লীগীতিকায় ছেলে-কৈবর্তের কথা মলুয়া ও খুলনা পত্রাদি লিখিতে পারিতেন—এরূপ উল্লিখিত আছে। ইহার সকলগুলিই গল্প কিনা, কিংবা ইহাদের কোন কোন কাহিনী সত্যমূলক, তাহা নির্ণয় করিবার অবসর আমাদের নাই। যাহারা শিল্পবিজ্ঞান—সঙ্গীতে এবং অপরাপর কলাবিজ্ঞান এতটা পারদর্শী ছিলেন, তাহারা যে লেখাপড়া জানিতেন না, এমন মনে হয় না। আমরা গত একশত-দেড়শত বৎসর পূর্বের অনেক শিক্ষিতা মহিলার কথা জানি—তাঁহারা শুধু লেখাপড়া জানিতেন না—কিন্তু অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

ফরিদপুর যপসা-গ্রামনিবাসী লালারামগতি সেনের কথা বিদ্বতী আনন্দময়ী দেবীর নাম সুপরিচিত। ইনি পলাশী যুদ্ধের সময়ে জীবিত ছিলেন। ইনি চন্দ্রাবতী, আনন্দময়ী, জবময়ী।

অধর্কবেদ হইতে যজ্ঞকুণ্ডের আকৃতি আঁকিয়া রাজা রাজবল্লভকে তাঁহার যজ্ঞের জন্ত দিয়াছিলেন। বেদনির্দিষ্ট সেই যজ্ঞকুণ্ডের খসড়া পণ্ডিতমণ্ডলীকর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। তাঁহার খুলতাত জয়নারায়ণ সেন যে ‘হরিলীলা’ নামক কাব্য রচনা করেন, তাহাতে ইহার অনেক পদ আছে, তাহাতে সংস্কৃতে তাঁহার অসামান্য অধিকার প্রমাণ করে। ষোড়শ শতাব্দীর অগ্রতম শ্রেষ্ঠ কবি চন্দ্রাবতীর নাম এখন সুপরিচিত। ইনি সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং মলুয়া, কেনারাম প্রভৃতি অপূর্ব গীতিকা রচনা করিয়াছিলেন এবং পিতার আদেশে রামায়ণের পঞ্চানুবাদও করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গ-গীতিকার ১ম ও ৪র্থ খণ্ডে এই কবির সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে এবং তাঁহার রচিত কাব্যগুলিও সংকলিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের পল্লীসাহিত্য খুঁজিলে আমরা বহু রমণী-কবির রচনা পাইতে পারি। কিন্তু সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ১০০ বৎসর পূর্বেও কোন কোন বঙ্গীয় মহিলার আয়ত্ত ছিল, তাহার পরিচয়ও কিছু কিছু পাওয়া যাইতেছে। শুধু চন্দ্রাবতী এবং আনন্দময়ী নহেন, বঙ্গদেশে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও এমন সকল পণ্ডিতা রমণী ছিলেন, যাহারা বিদ্বৎসমাজে বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের ১৯শে এপ্রিল তারিখের “সমাদ-ভাস্কর” নামক পত্রিকায় জবময়ী দেবীর সবিস্তার উল্লেখ আছে। ইহার কাহিনী আমার ছাত্র শ্রীযুক্ত বতীন্দ্র-

মোহন ভট্টাচার্য্য, এম. এ. সম্বাদ-ভাস্করের প্রাচীন স্তূপ হইতে আবিষ্কার করেন এবং তাহার সহায়তায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রবাসীতে (১৩৩৮ সন, ফাল্গুন) প্রকাশিত করিয়াছেন। দ্রবময়ী দেবী ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মাত্র চতুর্দশ বৎসর-বয়স্কা ছিলেন। সম্বাদ-ভাস্করে তাঁহার সেই সময়ের কথাই লিখিত হইয়াছিল। এই অদ্বুত প্রতিভাশালিনী বালিকা কৈবর্তের ব্রাহ্মণ চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের কন্যা। ইনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত বেড়াবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর আমরা সম্বাদ-ভাস্কর হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—“দ্রবময়ী বালিকাকালে বিধবা হইয়া পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের টোলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও মূল সাতখানি টীকা এবং অভিধান-পাঠ সমাপ্ত হইলে চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার স্বকল্পার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া কাব্যালঙ্কার পড়াইলেন এবং ছায়শাস্ত্রেরও কিয়দংশ শিক্ষা দিলেন; পরে দ্রবময়ী গৃহে আসিয়া পুরাণ মহাভারতাদি দেখিয়া হিন্দুজাতির প্রায় সর্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা হইলেন, এইক্ষণ দ্রবময়ীর বয়ঃক্রম চৌদ্দবৎসর। পুরুষেরা নিঃশক্তি বৎসর শিক্ষা করিয়াও বাহা শিক্ষা করিতে পারেন না, দ্রবময়ী চতুর্দশ বৎসরের মধ্যে ততোধিক শিক্ষা করিয়াছেন। এইক্ষণে তাঁহার পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার বৃদ্ধ হইয়াছেন, সকল দিন ছাত্রগণকে পড়াইতে পারেন না, তাঁহার টোলে ১৫, ১৬ জন ছাত্র আছেন, দ্রবময়ী কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এক আসনে বসিয়া পিতার ছাত্রগণকে ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্র পড়াইতেছেন, তাঁহার বিজ্ঞার বিবরণ শ্রবণ করিয়া নিকটস্থ অধ্যাপকেরা অনেকে বিচার করিতে আসিয়াছিলেন, সকলে পরাজয় মানিয়া গিয়াছেন। দ্রবময়ী কর্ণাটরাজের মহিষীর ছায় যবনিকান্তরিতা হইয়া বিচার করেন না। আপনি এক আসনে বৈসেন, সম্মুখে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে বসিতে আসন দেন, তাঁহার মন্তক ও মুখ নিরাবরণ থাকে; তিনি চার্কদ্বী, যুবতী, ইহাতেও পুরুষদিগের সাক্ষাতে বসিয়া বিচার করিতে শঙ্কা করেন না, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সহিত বিচার কালে অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথা কহেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাঁহার তুল্য সংস্কৃত ভাষা বলিতে পারেন না, গোড়ীয় ভাষায় বিচারেও পরাস্ত হন। দ্রবময়ীর ভাব দেখিতে বোধ হয় লক্ষ্মী কিংবা সরস্বতী হইবেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে ভক্তি প্রকাশ পায়, এ জীলোককে দেখিবার জন্ত কাহার উৎসাহ না হয়। বেড়াবাড়ী গ্রামে বাইয়া দ্রবময়ীকে দেখুন, তাঁহার সহিত বিচার করুন, আমরা দ্রবময়ীর বিজ্ঞা-শিক্ষার বিষয়ে বাহা লিখিলাম যদি ইহার এক বর্ণ মিথ্যা হয়, তবে আমরা দ্রবময়ীকে মিথ্যাজ্ঞক বলিবেন, এরূপ সত্যি বিজ্ঞাবতী জীলোক কেহ লীলাবতীর পরে এদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।”

১২৩১ বাং সনে কলিকাতা পুস্তক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত “স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক” নামক পুস্তক হইতে হট্টা বিজ্ঞালঙ্কার নামী অপর এক মহিলার বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।—

“রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কন্যা হট্টা বিজ্ঞালঙ্কার নামে একজন ছিলেন, তিনি

হট্টা বিজ্ঞালঙ্কার।
বাল্যকালে আপন আপন গৃহকার্য্যের অবকাশে পড়াশুনা করিয়া ক্রমে ক্রমে এমন পণ্ডিতা হইলেন, যে সকল শাস্ত্রের পাঠ দিতেন। পরে তিনি কানীতে

বাস করিয়া গোড় দেশের ও সে দেশের অনেক লোককে পড়াইতে পড়াইতে তাঁহার স্মৃতি অতিশয় বাড়িলে সেখানকার সকল লোকে তাঁহাকে অধ্যাপকের ছায় নিমন্ত্রণ করিতেন। এবং তিনি সভার আসিয়া সকল লোকের সহিত বিচার করিতেন” (৩৭৮ পৃষ্ঠা)।

এই পুস্তকে আরও লিখিত আছে: “ফরিদপুর কোটালী পাড়া গ্রামের শ্রামাসুন্দরী নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণের স্ত্রী ব্যাকরণাদি পাঠ সমাপ্ত করিয়া ছায়-দর্শনের শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। আর উলা গ্রামের শরণ সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যের ছই কছা বাক্তা-বিজ্ঞা ও ক্ষেত্র-বিজ্ঞা শিখিয়া পরে মুক্তবোধ ব্যাকরণ পাঠ করিয়া পাণ্ডিত্য হইয়াছিলেন, ইহা সকলেই জানেন।” (৩৭ পৃঃ)

আমরা আনন্দময়ী দেবীর কথা উল্লেখ করিয়াছি, ইহার আত্মীয়া গঙ্গামণি দেবীর রচিত অনেক গান বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। ইনি হরিলীলা কাব্য নকল করিয়াছিলেন, ইহার হস্তাকর বড় সুন্দর ছিল। পার্শ্বতী দাসী নামী আর এক জন মহিলার হস্তাকরের নমুনাও আমরা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। ইনি একখানি বৈষ্ণব পুঁথি নকল করিয়াছিলেন, হস্তাকর মুক্তার ছায় সুন্দর।

ফরিদপুর জেলায় সুন্দরী দেবী নামী এক ব্রাহ্মণ-রমণী এক শতাব্দী পূর্বে ছায়শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। লঙ সাহেবের ক্যাটালগে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবংশীয়া অনেক রমণী গৃহে বসিয়া চিকিৎসা করিতেন, আমরা জানিতে পারিয়াছি। তাঁহারা আয়ুর্বেদ পাঠ করিয়া কৃতী হইতেন, কিন্তু গাছগাছড়া ও অমোঘ মৃষ্টিযোগ সাহায্যে দুঃসাহা ব্যাধি আরাম করিতে বেশী পটু ছিলেন। তাঁহাদের খ্যাতি বহুদূর ব্যাপী হইত এবং তাঁহাদের গৃহদ্বারে প্রত্যহ বহু রোগীর—বিশেষ মহিলা-রোগীর ভিড় হইত।

আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি এক চাকার রথ চলে না। সংসারে রমণী ও পুরুষদের তুল্যরূপই কাজ ছিল। গৃহলক্ষ্মী না হইলে একদিনের জন্ত গৃহ চলিত না। গৃহখানি তাঁহারা অতি যত্নে প্রদর্শনীর মত সাজাইতেন। তাঁহাদের হাতের মৃৎ-ভাণ্ডের উপর নানা রূপ রং-বিরঙের কাজ, শিকায় বিচিত্র কারুকার্য, শয্যা বাধিয়া রাখিবার জন্ত নানারূপ নিপুণ কারুখচিত দড়ি-দড়া, কারুকার্য ও চিত্রমণ্ডিত সাজি ও কুলা, পান ও পানের বাটা রাখিবার সুন্দর সূচীকার্যে সম্পাদিত বটুয়া ও বস্তাবরণ, বালিসের খোল, বসিবার আসন, লাঠি, বরণ-ডালা, ও পাখার বিচিত্র পুঁতির কার্যের শিল্পকলা, চিত্রিত পীড়ি, দেয়ালের চিত্র, ছেলেদের খেলিবার সোলা ও মাটির পুতুল—এমন কি কাঠের উপর বিচিত্র মূর্তি, পাশা ও দাবা খেলিবার ছক ইত্যাদি কত জিনিষ যে আমরা দেখিয়াছি, তাহার অবধি নাই। শ্রীহট্টের মেয়েরা কাঠের ঘোড়া ও কাঠের হাতী এখনও নির্মাণ করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরা এদেশে দেবী ছিলেন, তাঁহাদের যুদ্ধবিজ্ঞায় কৃতিত্বের নমুনা আমরা দিয়াছি; চৌধুরীর লড়াই নামক গীতি-কথায় যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা সত্য ঘটনা-মূলক। আমাদের দেশে যে কালী, হিরণ্যস্তা, ভৈরবী, দশভুজা প্রভৃতি শক্তিমূর্তির পূজা হয়, তাহার মূল উপকরণ এইদেশের অস্তঃপুরে বিद्यমান। এই মহিলারা প্রেমের জন্ত না করিতে

পারেন, এমন কিছুই নাই, গীতি কবিতাগুলির পত্রে পত্রে দেখিতে পাইবেন ; বীরত্ব, ত্যাগ, আত্মসমর্পণ, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, স্বার্থের বলিদান এবং তপস্তা—এ সমস্ত বিষয়েই তাঁহারা পুরুষকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। আমরা মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কাজল-রেখা, সখিনা প্রভৃতি নারী-চরিত্রের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই চিত্রগুলি আমি যখন প্রথম দেখিয়াছিলাম, তখন আমার মনে হইয়াছিল যে দশমহাবিষ্কার রূপ আমার চাক্ষুষ হইল। এক একটি দেবী-চরিত্র পড়িয়া আমি ২৩ দিন আবিষ্টের মত থাকিতাম। হিন্দু মেয়েরা যে কিরূপ নির্ভীকভাবে সহমরণে যাইতেন, তাহা বিদেশী লোকেরা বিশ্বাসের সহিত লিখিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্বে কিছু দৃষ্টান্ত দিয়াছি, কিন্তু গ্রীক ঐতিহাসিক হইতে সেদিনকার হ্যালিডে সাহেব পর্য্যন্ত যে সকল চাক্ষুষ দৃষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড প্রভৃতি সাহেবেরা তাহা চাপা দিয়া এই ব্যাপারের একটা বীভৎস দিক্ দেখাইয়াছেন। খুব উচ্চ পরিবারে ও খুব নিম্নস্তরে মাঝে মাঝে যে অত্যাচার না হইত তাহা নহে। কিন্তু বঙ্গের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে, এই সহমরণ যে কত পবিত্র ও উজ্জল ছিল, তাহার স্মৃতি বঙ্গের বহু পরিবারে প্রবাদবাক্যের মত হইয়া আছে। আমরা শৈশবে বহু পরিবারে সংঘটিত সহমরণের ইতিহাস শুনিয়াছি, সর্বত্রই তাহা প্রেমের উচ্চবার্তা বহন করে—সহমৃতাদের স্মৃতি বঙ্গের ইতিহাসের অতি পবিত্র ও গৌরবজনক। সে কাল গিয়াছে, সে আদর্শ ভাঙ্গিয়াছে, আমরা তাহা আর ফিরিয়া চাহি না—তাহা আর হইবার নহে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় পাদ্রীদের সঙ্গে সুর মিলাইয়া রাজ্জা রামমোহন সেই জগদ্-বন্দিতাদের স্মৃতির পূজা দিতে ভুলিয়াছেন, কেবলই অত্যাচারের পৈশাচিক লীলা দেখিয়াছেন। সহমরণের বিরুদ্ধে চেষ্টা করিয়া তিনি ভালই করিয়াছিলেন, এই চেষ্টা যুগোপযোগী। কিন্তু তিনি দেশের ছেলে হইয়া সেই দেবীদিগের অলৌকিক গুণের জন্ত একটি মাত্র প্রশংসার কথা বলেন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী উদার চিত্ত সেই স্বর্গীয়া রমণীদের পায়ে পূজার অর্ঘ্য দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন : “বাংলার প্রাণ-বিসর্জন-পরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি। তিনি যে জাতিকে স্তম্ভ দিয়াছেন, স্বর্গে গিয়া তাহাকে বিস্মৃত হইবেন না। হে আর্ঘ্য ! তুমি তোমার সম্ভানদিগকে সংসারের চরম ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দাও। তুমি কখনও স্বপ্নেও জান নাই যে তোমার আত্ম-বিস্মৃত বীরত্বদ্বারা তুমি পৃথিবীর বীরপুরুষদিগকেও লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন দিবাসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহণ করিতে, দাম্পত্য লীলার অবসান-দিনে সংসারের কার্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তুমি তেমনি সহজে বধু-বেশে সীমন্তে সিঙ্গুর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ, —চিতাকে তুমি বিবাহশয্যার স্থায় আনন্দ-ময় করিয়াছ। বাংলা দেশের পাবক তোমারই পবিত্র জীবনাহুতি দ্বারা পূত হইয়াছে, আজ হইতে এই কথা আমরা স্মরণ করিব। আমাদের ইতিহাস নীরব, কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে ঘরে তোমার বাণী বহন করিতেছে। তোমার অক্ষয়—অমর স্মরণ-নিলয় বলিয়া সেই অগ্নিকে

—তোমার সেই অন্তিম বিবাহের জ্যোতিঃ-স্বপ্নময় অনন্ত পটু-বসনখানিকে আমরা প্রত্যহ প্রণাম করিব। সেই অগ্নিশিখা তোমার উজ্জ্বল বাহুরূপে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুক। মৃত্যু যে কত সহজ, কত উজ্জল, কত উন্নত, হে চিরনীরব স্বর্গবাসিনি! অগ্নি আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই বার্তা বহন করিয়া অভয় ঘোষণা করুক।” অবশ্য অল্পসংখ্যক স্থানে যে জোর-জবরদস্তি না চলিত তাহা নহে, কিন্তু এই ব্যাপক পদ্ধতির মূলকথা ছিল প্রেমার্থে আত্মবিসর্জন। যাহারা বাঙ্গলার পল্লীগীতিগুলি পড়িবেন, তাঁহারা ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন। বঙ্গের মহিলাদের সর্বস্ব দেওয়া প্রেমের প্রকৃত দৃষ্টের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন—বঙ্গের মর্ম্মকথা বলিতে সুদক্ষ পল্লী-কবিরা। একদিকে স্বামীর চিত্তানলে প্রাণ বিসর্জন, অপরদিকে জীবনে প্রেমের জন্ত সমস্ত দুঃখ ও মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়া এই নায়িকারা যে ভাবে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—তাহাতে এই উভয় ব্যাপারেরই মর্ম্মকথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ আভিধানিক জি. সি. হটন তাঁহার বাঙ্গলা ও ইংরাজী শব্দের নির্ঘণ্টে (A Glossary of Bengali and English—1825 A.D.) লিখিয়াছিলেন, “To crown all, the matchless constancy and fearless indifference of death in the Indian widow, who voluntarily mounts the funeral pile in the expectation of accompanying her husband to a region of bliss.” [সকলের সেরা দৃষ্টান্ত, হিন্দু বিধবার অতুলনীয় নিষ্ঠা এবং মৃত্যুর প্রতি অক্লেপহীন উপেক্ষার ভাব, বাহাতে তাঁহারা স্বামীর চিত্তানলে প্রাণ বিসর্জন করেন।]

এক সময়ে বঙ্গের মহিলাদিগের চিকিৎসার ভার পল্লীর মেয়েদের হাতেই ছিল বলিয়া মনে হয়। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন, কৃষ্ণলীলার অভিনয় দেখিতে দেখিতে বখন রাধিকা মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন, তখন রাজধানীর এক প্রাচীনা আহিরিনীকেই চিকিৎসার জন্ত আনা হইল, তিনি মন্ত্র-তন্ত্র, তুচ্ছাক এবং গাছগাছড়া প্রভৃতি ঔষধের উপাদান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। বখন রাজকন্টার চিকিৎসার জন্ত এইরূপ মহিলা-চিকিৎসকের আহ্বান হইল, তখন মনে করিতে পারা যায়, মেয়েদের চিকিৎসার জন্ত মেয়ে-চিকিৎসকই ডাকা হইত। অবশ্য চণ্ডীদাসের রচনা কাব্য-কথা, কিন্তু তথাপি রূপ-কথা ও কবি-কল্পনার ফাঁক দিয়া আমরা সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার আভাস পাইতে পারি—এই হিসাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ও তাহাদের স্থান আছে।

কবিকল্প চণ্ডী প্রভৃতি বহু প্রাচীন কাব্যে বাঙ্গলাদেশের তাৎকালীন প্রসিদ্ধ দেবমন্দির-গুলির উল্লেখ আছে। অজ্ঞ পুঁথিলেখকগণের দোষে সেই স্থানগুলির নাম অনেক পরিবর্তিত ও বিকৃত হইয়াছে, দেববিগ্রহগুলির নাম ও তাহাদের ভৌগোলিক সংস্থান লইয়া আলোচনা চলিতে পারে। হরত পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার যে সকল তীর্থস্থান ছিল, তাহার কতকগুলি এখনও বিদ্যমান আছে। সেই দেবতাগুলির কোন কোনটির পূজা হরত বৌদ্ধযুগ কিংবা তৎপূর্ব্ব হইতেও চলিয়া আসিয়াছে। দেবত্ব জানিতে হইলে স্বাং

যাইয়া তত্ত্বস্থল পরিদর্শন করা দরকার—এই দেববিগ্রহের সহিত অনেক সময় প্রাচীন ইতিহাসের কথা জড়িত আছে। যাহারা বাঙ্গলার ইতিহাসের গবেষণা করেন, আমি তাঁহাদিগের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

বাঙ্গলার চাষাদিগের শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা দরকার। ইহাদের একখানি নিজস্ব শাস্ত্র আছে,— তাহা ইহাদের কাছে বেদের ত্যায়; নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে এই শাস্ত্রের অনুশাসন তাহারা সর্ববিষয়ে মানিয়া চলে। এই শাস্ত্র তাহারা লিখিত আকারে শিখে না— ইহা তাহাদের মুখে মুখে কত যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ভাবা অবশ্যই রূপান্তরিত হইয়াছে এবং যুগে যুগে নূতন কথার সংযোজন হইয়াছে—তথাপি ইহা খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যখন বাঙ্গলার সমস্ত লোকই কৃষি-কার্য্য করিত ও বীজবপন, বাণিজ্যের আরম্ভ অথবা শুভকার্য্য অনুষ্ঠানের জন্ত গ্রহ-উপগ্রহের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত—এই শাস্ত্র তখন হইতে বিরচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা অনেক সময়েই একান্ত নিভুল এবং চাষাদের স্বপ্ন অন্তর্দৃষ্টি ও বাঙ্গলার স্বভূত্বে উৎপাদিকা শক্তির বৈষম্য এবং আবহাওয়া প্রভৃতির গভীর অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। এই প্রবচনগুলি ডাক ও খনার বচন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য যে বিলাত হইতে যে সকল বাঙ্গালী কৃষিতত্ত্বের উপাধি লইয়া এদেশে আসেন, কিংবা যাহারা বোম্বাই সহরে যাইয়া কৃষিবিজ্ঞানে পারদর্শী হন—তাঁহারা এতদেশের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং বাঙ্গলার অবস্থার সহিত সম্যক্ পরিচিত “ডাক ও খনার” এই অভ্রান্ত শাস্ত্রকে নিতান্ত উপেক্ষা করেন। গণিতের পণ্ডিতেরা যেরূপ শুভঙ্করী আখ্যার কোন খবরই রাখেন না, কৃষি-বিষয়ক বিজ্ঞানবিদ এদেশের পণ্ডিতেরাও ডাক-খনার কোন তথ্যই অবগত নহেন। যাহা লইয়া উক্ত বিষয়গুলির হাতেখড়ি হওয়া উচিত, সেই উপকরণ অগ্রাহ্য করাতে এই পণ্ডিতগণের শিক্ষার ভিত্তি চিরকালই কাঁচা থাকিয়া যায়। ডাক ও খনার সহস্র সহস্র প্রবচন এখনও পল্লীগ্রাম খুঁজিলে উদ্ধার করা বাইতে পারে। কয়েকটি প্রবচন নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। (১) চৈত্রে কুয়া (-সা) ভাদ্রে বান। নরের মুণ্ড গড়াগড়ি বান। (চৈত্রে কোয়াসা ও ভাদ্রে বান হইলে মড়ক লাগে।) (২) পূর্ব আষাঢ়ে দখিনা বয়। সেই বছর বন্তা হয়। (দখিনা = দক্ষিণা হাওয়া।) (৩) পৌষে গরমি বৈশাখে জাড়া। প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া। (পৌষ মাসে যদি গরম হয় এবং বৈশাখ মাসেও যদি শীত থাকে, তবে সে বৎসর আষাঢ়ের প্রথম দিকেই ভয়ানক বর্ষা হইবে।) (৪) কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা। মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা। বল্গে চাষারে বাধতে আল। আজ না হয় জল হবে কাল। (কোদাল ও কুড়ুল দিয়া কোপাইলে বেরূপ হয়, যখন মেঘগুলি সেইরূপ ছিন্ন হয় এবং তখন যদি মাঝে মাঝে হাওয়া দেয়, তবে বৃষ্টি আসন্ন বুঝিতে হইবে, স্বতরাং তখনই চাষাদের বৃষ্টি ধরিবার জন্ত ক্ষেতে আইল বাধিয়া রাখা উচিত।) (৫) যদি বরে আগনে, রাজা নামেন মাগনে। যদি বরে পৌষে, কড়ি হয় তুষে। যদি বরে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।

যদি বরে ফাগুনে, চিনা কাওন হয় দিগুণে । জ্যৈষ্ঠ শুকে আবাড়ে ধারা, শস্তের ভার না সহে ধরা । মাঘ মাসে বর্ষে দেবা, রাজা ছেড়ে প্রজার সেবা । (যদি অগ্রহায়ণে বৃষ্টি হয়, তবে একরূপ হ্রিষ্ক হইবে যে, রাজাকেও ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া বাহির হইতে হইবে । পৌষে বৃষ্টি হইলে হ্রিষ্ক আরও ভয়ানক হয়, তখন তুব বিক্রয় করিয়াও অর্থলাভ হয় । যদি জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষ্টি না হইয়া আবাড়ে খুব বৃষ্টি হয় তবে অপরিপাণ্ড শম্ব হয় । মাঘ মাসে বৃষ্টি হইলে প্রজারা এত ধনী হইবে যে, রাজা ছাড়িয়া প্রজার কাছে গেলেও অর্থলাভ হইবে ।) (৬) মেঘ করে রাত্রে আর দিনে হয় জল । তবে জেনো মাঠে যাওয়াই বিফল । (৭) আবাড়ে নবমী শুকল পথা, কি কর স্বস্তর লেখা জোখা । যদি বর্ষে রিমিকিমি । শস্তের ভার না সহে মেদিনী । যদি বর্ষে মুঘলধারে, মধ্যসমুদ্রে বগা চরে । যদি বর্ষে ছিটে কৌটা, পর্কতে হয় মীনের ঘটা । (শুকপক্ষীয় আবাড়ের নবমীতে যদি মুঘলধারে বৃষ্টি হয়, তবে খনা তাহার স্বস্তরকে বলিতেছেন, কেন আর হিসাবটিসাব করিতেছেন—আমার কথা মানিয়া লউন, ঐ তিথিতে ঐরূপ বৃষ্টি হইলে সেবার একরূপ অনাবৃষ্টি হইবে যে, মধ্যসমুদ্রও শুকাইয়া যাইবে—সেখানে চড়া পড়িবে ও তথায় বক চরিয়া বেড়াইবে । যদি খুব প্রবল বৃষ্টি না হইয়া ঐ তারিখে ছিটেকৌটা অর্থাৎ অল্প বৃষ্টি হয়, তবে সেবার বর্ষা একরূপ বেশী হইবে যে, পর্কতের উপরও মৎস্ত দেখা দিবে । যদি রিমিকিমি বৃষ্টি হয় অর্থাৎ অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া ছোট ছোট বিন্দুতে অবিশ্রান্ত বর্ষা হয়, তবে সেবার অপরিপাণ্ড শম্ব হইবে ।) (৮) খনা ডেকে ব'লে বান । রোদে ধান ছায়ায় পান । (যত রৌদ্র বেশী পাইবে, ততই ধান ভাল হইবে এবং যত বেশী ছায়া পাইবে, ততই পান বেশী হইবে ।) (৯) আখিনে উনিশ কার্তিকের উনিশ, বাদ দিয়া যত পারিস মটর কলাই বুনিস । (১০) খনা বলে চাষার পো । শরতের শেষে সরিয়া রো । (১১) সাত হাত তিন বিঘতে । কলা লাগাবি মায়ে পুতে । কলা লাগিয়ে না কাট পাত । তাতেই কাপড় তাতেই ভাত । (১২) যদি থাকে টাকা করবার গো, তবে চৈত্র মাসে ভুট্টা রো । (১৩) দিনে রোদ রাতে জল, তাতে বাড়ে ধানের বল । (১৪) শুনরে বাপু চাষার বেটা । মাটীর মধ্যে বেলে বেটা । তাতে যদি বুনিস পটোল । তাতেই তোর আশা সফল । (১৫) বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে হলুদ রোও । দাবা পাশা খেলা ফেলিয়া ধোও । (১৬) ফাল্গুনে আগুন চৈতে মাটা । বাশ বলে শীঘ্র উঠি । শুন বাপু চাষার বেটা । বাশের ঝাড়ে দিও ধানের চিটা । দিলে চিটা বাশের গোড়ে । ছই কুড়া জুই বেড়বে ঝাড়ে । (১৭) খনা বলে শুন শুন । শরতের শেষে মুলো বুন । (১৮) তামাক বুনে গুড়িয়া মাটা । বীজ পুত গুটি গুটি । ঘন ঘন পুত না । পৌষের অধিক রেখো না । (১৯) ব'লে গেছে বরাহের পো । দশটি মাস বেগুন রো । চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ । ইথে নাই কোন বিবাদ । (২০) অগ্রহায়ণে যদি না হয় বৃষ্টি । তবে না হয় কাঁটালের সৃষ্টি । (২১) ডাকছেড়ে বলে রাবণ । কলা রোবে আবাড় প্রাণ । তিন শত ঝাড় কলা রুয়ে । থাক গৃহী ঘরে শুয়ে ।

এইরূপ অসংখ্য প্রবচন আছে । কতকগুলি রন্ধন সম্বন্ধে—যথা, যত আলে ব্যঞ্জন মিষ্ট । তত আলে ভাত নষ্ট । (ব্যঞ্জন রাঁধিতে যত বেশী আল দিবে ততই ভাল, কিন্তু ভাত রাঁধিতে

মূহ জল ভাল।) আতুড় ঘর সম্বন্ধে, আকাশের অবস্থা সম্বন্ধে, সর্কপ্রকার কবি সম্বন্ধে— এই সকল প্রবচন বাঙ্গলার পক্ষে খাটি সত্য। যখন বাঙ্গালীর চাকুরী মিলিতেছে না, তখন আমাদের কবির জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে; কিন্তু এই প্রবচনগুলি কি এখন আমাদের উদ্ধার করা উচিত নহে?

আমার নিকট খনার বচনের একটা সংগ্রহ আছে। বাঙ্গলা পঞ্জিকাগুলিতে কিছু কিছু সংগ্রহ আছে, কিন্তু চাষার পরীতে না গেলে এ সংগ্রহ সম্পূর্ণ হইবে না। শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুর যে সেইটিই মহাভয়ের কথা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মৈথিলি ভাষার অধ্যাপক শ্রীবৃন্দ বাবুয়া মিশ্র জ্যোতিষাচার্য মহাশয় বলেন যে তাঁহাদের দেশের জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় অনেক মৈথিলী পুঁথিতে (কোন কোনটি ৩০০।৪০০ বৎসরের পূর্বের) অথ “খনাবচনং” বলিয়া বাঙ্গলা ভাষায় রচিত খনার বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই সকল প্রবচনের বটতলার কতকগুলি সংস্করণ আছে। তাহাতে বেশী বচন সংগৃহীত হয় নাই। ইহাদের কাল নির্ণয় করা সহজ নহে, বৃহৎসংহিতা (৫ম শতাব্দী), এমন কি পতঞ্জলির মহাভাষ্য (খৃঃ পূঃ ৩০০ শতাব্দী) প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে এই সকল প্রবচনের মত কতকগুলি বচন সূত্রাকারে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এতদেশ-প্রচলিত খনার বচন নামধেয় প্রবচনগুলিতে ঠিক বাঙ্গলা দেশের কথাই বেশী করিয়া পাওয়া যায়। নারী-চরিত্র, জ্যোতিষিক প্রসঙ্গ এবং সামাজিক বিষয়ের প্রবচনই ডাকের কথায় বেশী।

এই সকল প্রবচনে মাঝে মাঝে প্রাচীন ইতিহাসের ইঙ্গিত আছে। ভগীরথ যে গঙ্গার গতি ফিরাইয়া দিয়া একটা বিরাট পুঁথকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, পৌরাণিক উপাখ্যানের আড়ালে তাহা চাপা পড়িয়াছে—কিন্তু খনার বচনে “মরবি যদি মরগে ভগার খাদে”—ছত্রটি পাওয়া যায়। “খাদ” অর্থ “খাল”—সুতরাং ভগীরথ যে খাল কাটিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যাইতেছে। আর একটি প্রবচন এইরূপ :—“উঠ্তে ত্তে পাশমোড়া, তার অর্ধেক ভীমে ছোড়া, ভবার চৌদ্দ ভবীর আট, এই সব ক’রে জন্ম কাট। এ যদি না কর্তে পারিস, ভগার খালে গিয়ে ডুবে মরিস।” এখনও গোড়া ব্রাহ্মণদের রীতি আছে যে গঙ্গায় স্নান করিবার পূর্বে তাঁহারা এক মূঠ মাটি নদী হইতে তুলিয়া তীরে ফেণা করিয়া শেষে স্নান করেন। এই বিরাট পুঁথকার্যে যে হিন্দুমাত্রই সহযোগিতা করিয়াছিল এবং কোন কালে এই ধারা রুদ্ধ না হয়, এজন্য প্রত্যেক নাগরিকেরই নিত্য-সাহায্য বাধ্যতামূলক ছিল, এই রীতিদ্বারা বেন সেই কথার আভাস পাওয়া যায়।

আবার শুভদিন ও অশুভদিন সম্বন্ধে অনেক লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী জনসাধারণ প্রতি মুহূর্ত্তে সমস্ত শাস্ত্রীয় শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া সিংহবিজ্রমে বকন মুক্ত হইতে পারে। খনার এই বচনটির প্রতি লক্ষ্য করুন—

“রজক দেখবে যখন, কাপড় ছাড়বে তখন ॥ নাপিত দেখবে যখন, খেউরি হবে তখন ॥ কিসের তিথি কিসের বার। লাফ দিয়া হও গহিন পার ॥ জল ভাল গঙ্গার জল, বল বল বাহ বল ॥ আর যত সব ভাসা দিসা। খনার বিচারে বুজিনাশা ॥”

ইহার পূর্বেই একটি বচনে পাই সোম ও শুক্র বার বাদ দিয়া নূতন কাপড় পরিবে, রবিবারে ও মঙ্গলবারে খেউরি হইবে না, জলপথে বিদেশে যাইতে হইলে অনেক অশুভ দিন বর্জন করিতে হইবে। কতকগুলি নিষিদ্ধ দিনে বঙ্গকালয়ে কাপড় দিতে নাই; কিন্তু এইবার শুমালিত পুরুষ বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইয়া বলিতেছেন—যখন বঙ্গক আসিবে, তখনই কাপড় দিবে—তাহাতে দিন-ক্ষণ নাই। নাপিত পাইলেই খেউরি হইবে এবং লাফাইয়া সমুদ্র পার হইও, তাহাতে দিন-ক্ষণ দেখিতে হইবে না। জলের মধ্যে গঙ্গা-জল শ্রেষ্ঠ, এবং বলের মধ্যে বাহ বলই শ্রেষ্ঠ, গ্রহাদির বল কিছুই নহে। খনা বলিতেছেন ওসকল শাস্ত্রের বচনে কেবল বুদ্ধি নাশ করে এবং উহার নিরর্থ।

আশ্চর্যের বিষয় অজ্ঞাত প্রাকৃতিক উপদ্রবের মত, ভূমিকম্প সম্বন্ধেও কতকগুলি পূর্ব লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—“ভন্ ভন্ করে উড়ে মশা। এক চাপড়ে শতেক মরে সে দিন মেদিনী নড়ে॥” (মশার যদি একরূপ বাহুল্য হয় যে, এক চাপড়ে একশটি বিনষ্ট হয়—সেই দিন ভূমিকম্প হইবে, জানিবে।) এইভাবে বজা ও ঝড়ের সূচনা, ছাউক্ষ ও মহামারির সূচনা প্রভৃতি ব্যঙ্গক অনেক প্রবচন আছে। ধান, চাল হইতে স্কন্ধ করিয়া মাষ কলাই প্রভৃতি বিবিধ ডাল, কচু, পান, বেগুন, কলা, আম, কাঁটাল প্রভৃতি বিবিধ ফল উৎপাদন করিবার উপযোগ্য আবহাওয়া এবং শস্ত ও ফলের ব্যাধি নষ্ট করিবার উপায়—বাজলার কৃষিতত্ত্বের সমস্ত কথাই অতি সংক্ষেপে খনা দিয়াছেন। ডাকের বচনেও এ সকল কথা আছে, কিন্তু তাহাতে নরনারীর চরিত্রের অন্তর্দৃষ্টি সম্বন্ধে প্রবচনই বেশী। মৎসঙ্গলিত বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে উহা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে বিদেশী লোকেরা অনেকেই মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংরেজদের মন আমাদের উপর অনেকটা সদয় ছিল; তখন তাঁহারা আমাদের দোষগুণ বিদেশীর অভিমত।

উভয়ই সরলভাবে ব্যক্ত করিতেন। কেরি, ওয়ার্ড ও মার্সম্যান এদেশের রীতিনীতি অনেক সময়ে অতিরিক্ত ভাবে নিন্দা করিয়াছেন—তাঁহাদের খৃষ্টধর্ম প্রচারের সুবিধার জন্ত। কিন্তু এদেশের ভাল দিকটাও তাঁহারা দেখিয়াছিলেন; তখনও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও কুটরাষ্ট্রনীতি ইংরেজ কি দেশীয় সমাজে প্রবেশ করে নাই। মিস মেগর মত লোক তখন একটিও ছিল না, বরঞ্চ এদেশের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে কত এলফিনষ্টন, ফাণ্ড'সন, উইলসন, কোলব্রুক লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এখনও মহামনা গীয়ারসন জীবিত আছেন—তুলসীদাসের প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ কাউএল সাহেব মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডী পড়িয়া বিমুগ্ধ। তিনি এই কবিকে কখনও চসার এবং কখনও ব্রেকের সঙ্গে তুলনা করিয়া উচ্চাসন দিয়াছেন এবং স্বয়ং চণ্ডীকাব্যের অনেকাংশ ইংরেজী পণ্ডে অনুবাদ করিয়াছেন। হটন তাঁহার বাজলার অভিধানের (বাজলা হইতে ইংরেজী; ইহা একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ)

নির্যন্তের ভূমিকায় উচ্ছ্বসিত ভাবায় বাহা লিখিয়াছেন, তাহার কতকটা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি :—

“তাপ ভূ-নিরে প্রবেশ করিতে যেরূপ দেবী হয়, সমাজের নিম্নস্তরে জ্ঞানের প্রসারও তেমনই সময়-ও কষ্ট-সাপেক্ষ। এই জ্ঞানের পরিধি যুগযুগান্তরের চেষ্টায় ভারতীয় কুটার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। যিনি এই তথ্য সহজ ও সরল স্বাভাবিক জীবনে আবিষ্কার করিতে সমর্থ, তিনি এই দেশের পাণ্ডিত্য ও পারিভাষিক মুন্সিয়ানার জটিলতা ব্যতীতও সেই জ্ঞান যে কতটা বিশ্বজনীন প্রসারতা এবং গভীরতা লাভ করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাইবেন। সেই জ্ঞান যে সকল লোকের আছে, তাহার যে উহা কত দুর্লভ ও মূল্যবান তাহা আদৌ অবগত নহে। হৃদয়দর্শী ব্যক্তি প্রায়-নগদেহ কোন কুটারবাসীর মুখে নর-চরিত্র এবং মাহুষের কর্তব্যাদি সম্বন্ধে এরূপ আশ্চর্য্য জ্ঞানের কথা শুনিবেন, বাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া যাইবেন। তিনি তাঁহার এতদেশীয় নিম্নতম চাকর-বাকরের মুখে চারিদিকের লোকের স্বভাব সম্বন্ধে এরূপ অন্তর্দৃষ্টি ও হৃদয় বিল্লেষণ শক্তির পরিচায়ক আলোচনা শুনিবেন, বাহা অন্ত দেশের মাত্র মহাজ্ঞানীদের মধ্যে আশা করা যায়। তিনি পল্লীগুলির মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে খোলা হাওয়ার মধ্যে এরূপ হৃদয় শিল্প ও কারুকার্যের নমুনা দেখিবেন, বাহা যুগযুগান্তরের চেষ্টালক।

এই প্রদেশগুলির পর্য্যটক তাঁহার ভ্রমণকালে বর্তমান শিল্পের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। তিনি অনেক মন্দির, মসজিদ এবং obelisk দেখিবেন, বাহা সত্তাফোটা ফুলের ছায় শিল্পীর কোমল হস্তের গন্ধ এখনও হারায় নাই। এইসকল মন্দিরের যে কোনটি যুরোপে কোন স্থানে থাকিলে তাহা সেই দেশের, সেই শিল্পীর ও সেই যুগের গৌরব বলিয়া স্বীকৃত হইত। সেইরূপ মন্দিরের খ্যাতিতে সমস্ত খৃষ্টীয় দেশগুলির এক প্রাপ্ত হইতে অপর প্রাপ্ত পর্য্যন্ত মুখরিত হইয়া উঠিত। এই শিল্পের অসাধারণ শ্রম, গঠন-নৈপুণ্য, নির্মাণের কষ্ট ও অর্থব্যয় সম্বন্ধে কতই-না সুবৃহৎ পুস্তক লিখিয়া ইহাদিগকে সম্মানিত করা হইত। প্রাদেশিক এই সমস্ত শিল্পকার্যের নিদর্শন আমাদের গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু যিনি একবার ইলোরার গুহা-মন্দিরগুলি দেখিবেন, শিল্পসাধনা—স্বরুচি ও আয়তন সম্বন্ধে এই অত্যাশ্চর্য্য মন্দিরগুলির সমকক্ষতা করিতে পারে, তিনি জগৎ খুঁজিয়া এরূপ স্থাপত্য-শিল্পের নমুনা কোথায়ও পাইবেন না। যখন পর্য্যটক এই মন্দিরময় নগরটি দেখিবেন, তখন যে অসামান্য প্রতিভাশালী ইহাদের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং যেসকল কর্মনিপুণ অধ্যবসায়শীল হস্ত ইহাদের আকার দিয়া গ্রানাইট পাথরে তাঁহাদের অমরকীর্তি চিরকালের জন্ত ফোদিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের পরিচয় পাইয়া তিনি সহজেই বুঝিবেন যে তিনি জগতের এমন এক অত্যাশ্চর্য্য জাতির মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন, বাহাদের তুলনা নাই। তিনি তাঁহাদেরই বংশধরগণের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, বাহাদের অসাধারণ কল্পনাশক্তি স্বয়ংসীল ও অস্থায়ী উপকরণগুলি উপেক্ষা করিয়া তিনি

যে সকল অদ্ভুত কৰ্ম করিতে পারিত, তাহা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী পৰ্ব্বতের শিলা কাটিয়া তাহারা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন।

এমন সকল লোকও আছেন যাহারা এতদেশীয় লোকের নীতিজ্ঞান আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। যাহারা এরূপ অসার মত পোষণ করেন, তাহারা একবার এদেশের সৈনিকদের অসাধারণ বিশ্বস্ততা, আত্মসম্মানজ্ঞান এবং অপূৰ্ণ বীরত্বের কথা ভাবিয়া দেখুন। এদেশের লোকের সখের আদর্শ কত বড়, তাহা একবার ভাবুন, বন্ধুর জন্ত বন্ধু—স্বখে দুঃখের চূড়ান্ত পরীক্ষাতুলে কিরূপভাবে আত্মনিবেদন করিয়াছেন—এদেশের ভৃত্যেরা সামান্য কিছু উপকার পাইলে প্রভুভক্তির কি আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শন করে—এই সকল তাহারা একবার চিন্তা করুন। এই দেশের তপস্বীরা ভগবানের প্রীতিলভের অকুবিধাসে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কি উৎকট ভাবে নিপীড়ন করেন—তাহা ভাবুন। কিন্তু সৰ্ব্বাগ্রে আমি সত্যীদের কথা কহিব। অতুলনীয় নিষ্ঠা এবং মৃত্যুর প্রতি একান্ত উপেক্ষার প্রতীক হিন্দু বিধবা স্বামীর সঙ্গলাভ করিবার আশায় বেচ্ছায় চিতানলে আত্মবিসর্জন করিয়া থাকেন, সেই দৃষ্টের কথা আপনারা একবার স্মরণ করুন। যে জাতির মধ্যে এই সকল মহাপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহারা সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ভুক্ত নহেন। যদি বিধি-প্রবর্তক শাসনকর্তারা এই সকল একনিষ্ঠ নৈতিক গুণ লক্ষ্য করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন, তবে এই জাতিকে উন্নতির শেখরদেশে আকর্ষণ করাইরা অনায়াসে ইহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।”

[“Knowledge, which like heat, pervades with difficulty the mass beneath, has in the progress of ages penetrated into the cottage; and the man who knows how to discover it in the simple language of nature, even though it be unaccompanied by pedantic commonplace or technical obscurity, will be astonished at its universality and profundity without its possessor being conscious either of its rarity or its value. He will hear the most profound dissertations on human life and actions from the mouth of the almost naked peasant. He will discover a knowledge of character in the lowest of his menial servants, that would not dishonour the most acute penetration and accurate observation. He will behold in his progress through the country, the most delicate arts pursued in the open air and each affected by a simplicity of process that could only result from the felicitous contrivances of centuries upon centuries.

In his travels through the provinces it may be his fortune to see many splendid specimens of modern art. He may observe temples, mosques and obelisks that have scarcely lost the bloom of the artificer's hand: Works that in Europe would each have been the glory of its age, its country and its projector; the fame of which would have resounded

from one end of christendom to the other, and be consecrated in elaborate descriptions, commemorative of its proportions and its extension, its difficulties and its expense. These he may view with amazement ... he will be convinced that he is amongst the most surprising race of men that ever existed; among the descendants of those who wishing to proclaim to posterity the mighty things of which they were capable, and feeling the frail and perishable nature of the common records, conceived the bold design of cutting a memento of their skill and power in the living rock for ever.

There are those who would deny the possession of moral principles to the natives. Let such prejudiced and superficial observers bear in mind the moral dignity, the jealous sense of honour and the heroic fortitude of the native soldier; the singular fidelity and affection of the people in their plighted friendship for each other, through every extreme of good or evil; the devoted attachment of servants who are treated with any degree of kindness and consideration by their masters; the self-inflicted torments of the ascetic in the blind hope of making himself acceptable to his God; and to crown all, the matchless constancy and fearless indifference of death in the Indian widows, who voluntarily mount the funeral pyre in the expectation of accompanying her husband to a region of bliss. A people capable of these things are of no common character and nothing but the skill of the legislator is required to direct such steadfastness of principle to whatever can advance and perpetuate their happiness." (Pages viii, ix.)]

এদেশের চাষাদের হয়ত বর্ণজ্ঞান অনেকেরই ছিল না বানাই, কিন্তু পূর্বকালে গ্রামে গ্রামে এত পাঠশালা ছিল যে, লঙ্কা সাহেব তাঁহার ক্যাটালগে বিশ্বয়ের সহিত প্রাচীন বঙ্গে লেখাপড়ার বিস্তারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক সময় বর্ণজ্ঞান না থাকিলেও বিষয়জ্ঞান তাহাদের এতটা ছিল এবং হয়ত এখনও আছে বাহাতে তাহারা শিক্ষিত রূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। এ সম্বন্ধে হটন সাহেব ও তৎসময়ের অপরাপর অনেক ইংরেজও ইঙ্গিত করিয়াছেন। পাঠক বর্ণজ্ঞানশূন্য বাঙ্গলার চাষাকে ভিল, সাঁওতাল বা কুকী মনে করিবেন না। বাঙ্গলার চাষা সহস্র সহস্র বৎসর বাবৎ পৃথিবীর অতি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মতগুলির সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ ঋষির আশ্রম হইতে উপনিষদের উপদেশ শুনিয়াছে; পরে বৌদ্ধ ধর্মের ইন্দ্রিয়সংযম, নীতিশূত্র ও ত্যাগসম্বন্ধে অবহিত হইয়াছে। নব ব্রাহ্মণ্য তাহাদিগকে ভক্তির বস্ত্রায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব মহাজনগণ, কথক ও বাউল-দরবেসের প্রসাদে, তাহারা ভক্তি, ধর্ম ও জ্ঞানের নানা সারগর্ভ উপদেশ শুনিয়াছে। অত্র দেশে জনসাধারণ ভাগবত জ্ঞান-সম্বন্ধে অজ্ঞ—শ্রেষ্ঠ মনীষীরা যে চিন্তা করেন, জনসাধারণকে তাহা তাঁহারা বিলাইতে জানেন

না। ইলিয়াড কাব্য হইতে টেনিসনের গীতি পর্য্যন্ত উচ্চশিক্ষিতের পাঠাগারের সমস্ত দ্রব্যই জনসাধারণের পক্ষে নির্বিঘ্ন। বিলাতের কয়জন চাষা সেতুপীড়নের নাটক বা চমারের কাব্যের কথা জানে? কিন্তু এদেশের কোন্ চাষা—মুসলমান চাষাকে বাদ দিয়া বলিতেছি না,—রামায়ণ, মহাভারতের কথা জানে না? ৫০০ বৎসরের কৃত্তিবাস, বহু প্রাচীন ধর্মমঙ্গল, এমন কি শুল্কপুরণ, গোরক্ষবিজয়, মহীপালের গান, চণ্ডীমঙ্গল, মনসাদেবীর গান—এই চাষারাই জিয়াইয়া রাখিয়াছে। বর্ণজ্ঞান না থাকিলেও পদাবলীর অপূর্ণ সম্পদ ও পালা-গানের আশ্চর্য্য কবিত্বের ভাণ্ডারের চাষি ইহাদেরই কাছে। ডাক ও খনার বচন ইহাদেরই কর্তে, কবিকঙ্কণের চরিত্র-বিশ্লেষণের এবং মহাজনের পদ-কীর্তনের আসর ইহারাই জমাইয়া রাখিয়াছে। বঙ্গের যাহা কিছু প্রেম ও জ্ঞানের গরিমা—নিরঙ্কর চাষীরাই তাহার মালিক। ইংরেজী বিজ্ঞার প্রচলন অবধি যে জ্ঞানের ধারাবাহিকত্ব এতকাল আপামর সাধারণের মধ্যে (বর্ণজ্ঞান থাকুক বা না থাকুক) চলিয়া আসিয়াছিল, তাহার গতি ধামিয়া গিয়াছে।

এই জন্তই বাঙ্গলার চাষা যাহা জানে বা বলে তাহা শুনিয়া বিদেশীরা স্তব্ধ হইয়া যায়, হটন সাহেবের উক্তি কিছুমাত্র অতিবাদ নহে। বাঙ্গলার চাষা কত বিপ্লবের মধ্যে বাস করিয়াছে,—দুর্ভিক্ষ, অজন্মা, মহাজন ও জমিদারের অত্যাচার, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী এ সকল তো তাহাদের নিত্যকার সঙ্গী, তবু ক্ষেতে দাঁড়াইয়া সে যাহা দেখে, তাহাতে বাস্তব অপেক্ষা অবাস্তবের কথাই তাহার বেশী মনে পড়ে। ইংরেজ কবির আর্ন্তনাদ—
I am acquainted with sad misery as the galley-slave is with his oar.
[শৃঙ্খলিত জাহাজের ক্রীতদাস বেক্রপ জাহাজের দাঁড়কে চিনে, (তাহা হইতে তাহার মুক্তি নাই, সারাদিন সেই দাঁড় টানিতেই হইবে) দুঃখের সহিত আমি তেমনই পরিচিত ।
(John Webster)] কিন্তু আমাদের চাষা দুঃখকে সর্দাঙ্গে বহন করিয়া অবাস্তবের স্বপ্ন দেখে। বৌদ্ধদর্শন ও হিন্দুর প্রেমশাস্ত্রের তত্ত্ব তাহাকে যে উর্দ্ধলোকে স্থাপিত করিয়াছে সে আসন টলায় কে? তাহাদের জন্ত রামপ্রসাদাদি কবি তাহাদের মনের কথাগুলি ছন্দে বাধিয়া দিয়াছেন। ঘাস নিড়াইতে নিড়াইতে, লাঙ্গল চালাইতে চালাইতে সে তাহাই গাহিয়া শাস্তি লাভ করে—“মনরে কৃষিকাজ জান না—এমন মানব জীবন রইল পড়ে, আবাদ করলে ফলতো সোনা।” কলু ঘানি চালাইতে চালাইতে গাহে—“মা আমার ঘুরাবি কত, কলুর চোখঢাকা বলদের যত, ভবের গাছে বেঁধে দিয়া মা, পাক দিতেছে অবিরত—কি দোষ করিলে আমার ছটা রিপূর অহুগত।” দুঃখোয়, ঝড় তুলানে পড়িয়া যখন তাহার তরীখানি ডুবু ডুবু—তখনও সে বাহিরের বিপত্তি অগ্রাহ করিয়া তাহার জীবনতরঙ্গীর কথা স্মরণ করে—“কাল সমুদ্র দেখে আমার একা যেতে ভয় করে—শুরু আমার ফেলে যেও নারে!” কিংবা তাহার জীবনতরঙ্গীর একমাত্র কর্ণধারের কাছে কাঁদিয়া বলে, “মন মাখি তোর বৈঠা নেয়ে—আমি আর বাইতে পারি না। জীবন ভরে বাইলাম বৈঠারে, তরী—ভাটার সময় আর উজার না।” দিন-মজুর কুরো খুঁড়িতে খুঁড়িতে গায়—“দোষ কারু নয়গো মা—আমি স্বখাত সলিলে

ভূবে মরি শ্যামা। বড়রিপু হল কুদ্রওস্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটলাম কুপ।" ঘরে বসিয়া পাশা খেলিতে খেলিতে চাষা গায়—"ভবের আশা খেলব পাশা বড় আশা মনে ছিল।"

এরূপ শত শত উদাহরণ দিয়া দেখান যাইতে পারে বাঙ্গলার চাষা মাটিতে বাস করিয়াও প্রকৃত পক্ষে অবাস্তব রাজ্যের অধিবাসী। সে জমিদার কি মহাজন—বা অদৃষ্টের ভৃত্য নহে, সে বুদ্ধ ও জৈন গুরুদের শিষ্য। একটুখানি বর্ণজ্ঞান দিয়া ইহাকে উন্নত করা এবং আকবরকে নাম সহ করিতে শিখাইয়া শ্রেষ্ঠতর করিবার বাহ্যিক লওয়া—উভয়ই তুল্যরূপ। বাঙ্গালী চাষা প্রশ্ন করে—"দীপ নিবিলে, আলো কোথা যায়? সুর ধামিলে শব্দ কোথায় যায়?" (গোরক্ষবিজয়।) এইরূপ দার্শনিক প্রশ্ন কোন্ দেশের চাষা করিতে পারে? অন্য দেশের গ্রাম্য কবিতায়—বেদনার গভীরতা, জীবনের উপভোগ, স্বাভাবিক কবিত্ব আছে, কিন্তু বাঙ্গলা পল্লীগাথায় প্রেমের যে তপস্তা আছে,—জগতের আর কোথায়ও সেরূপ সাধনা আছে কিনা তাহা জানি না। পল্লীগাথাগুলিতে সেই আশ্চর্য্য তপস্তার কথা পড়িয়া নিতান্ত বিদেশী ভাবাপন্ন পাঠকও বাঙ্গলার চাষার প্রতি সশ্রদ্ধ হইবেন। এদেশের কবি অধ্যাত্ম-রাজ্যের নিজ জন। বাঙ্গলার গ্রাম্য কবির গাথা পড়িয়া এজ্ঞাত তাহাদের সৃষ্ট নায়িকাদিগকে চিত্রবিজ্ঞাবিশারদ মিসেস হেগ, সেক্সপীয়র ও রেইনীর নায়িকাদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন; রোমা রৌলা পল্লীগাথায় অপূর্ণ কাব্যশিল্পের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছেন এবং উইলিয়াম রথনষ্টাইন তাহাদের মধ্যে অজস্র বিখ্যাত রমণীমূর্ত্তিদিগকে জীবন্ত পাইয়াছেন। জীবন্ত, দেহতব যদি চাষারা বৌদ্ধ-শ্রমণের নিকট পাইয়া থাকে,—হিন্দু ব্রাহ্মণের নিকট তাহারা ভক্তি ও প্রেম পাইয়াছে। সংসারের দুঃখ সে মায়ের হাতের 'মার ধ'র' মনে করিয়া সেই মাতাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে—"বারে বারে যত দুখ দিয়াছ, দিতেছ তারা, সে কেবল দয়া, তব জেনেছি মা দুখহরা।" ক্ষেতের কাজ করিতে করিতে সে যে গান গায়, তাহার মর্ম্ম ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন্ দেশের চাষা বুঝিবে? বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে সন্ধ্যাভাবায় বিরচিত লাল শশীর যে গানগুলি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলির মর্ম্মার্থ আমরা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকটি যে খুব উচ্চ অঙ্গের ভাবরাজ্যের কথা ও অবাস্তব তত্ত্বের সম্পদ তাহা সেগুলি পড়িলে পাঠকমাত্রেই ইঙ্গিতে বুঝিবেন।

বাঙ্গলার বণিকেরা যে ক্রমশঃ অর্থগৃহ ও হীনীতিপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিল তাহা আমরা বোড়শ শতাব্দীর কাব্যগুলিতেই দেখিতে পাই। পল্লী-বণিকদের কথা।

গীতিকায় দেখিতে পাওয়া যায়—মগ ও মুসলমানদিগের মত হিন্দু ললনাদিগকে নদীর ঘাট হইতে বণিকেরাও হঠাৎ তুলিয়া লইয়া চম্পট দিতেছে। রূপকথায় শৈশবে আমরা শুনিয়াছি—সদাগরেরা ঝানার্ধিনী স্নানরী রমণী পাইলে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক তুলিয়া লইত। চট্টগ্রামের মঘাই বণিকের চিত্র 'মহিষাল-বন্ধু' নামক গীতিকায়, ভেলুয়া গীতির ভোলা বণিকের চিত্রে, এবং মহুয়া-গীতির বিলাসী বণিকের চরিত্রে ইতিহাসের একটা পৃষ্ঠা কাব্য-কথায় লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই বণিকেরা পরস্বাপহারী এবং অর্থলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পল্লী-গীতিকায় দৃষ্ট হয় সাধারণ কাচ কি প্রস্তরখণ্ড ইহারা সময়ে সময়ে

মহামাণিক্য বলিয়া সরলপ্রকৃতি গ্রাম্য লোকদিগের নিকট বিক্রয় করিতেছে (Folk Literature of Bengal দ্রষ্টব্য)। কবিকঙ্কণ মুরারি শীলের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা একান্ত ধূর্ত, সদসদজ্ঞানবর্জিত ঠক বণিকের। সমাজে বহু মুরারি শীল না থাকিলে হয়ত কবি কার্লনিক মুরারি শীলের এরূপ জীবন্ত চিত্র আঁকিতে পারিতেন না। বঙ্গ দেশের বিপুল বাণিজ্য যে নষ্ট হইয়া গেল তাহা হুনীতির ফল বলিয়াই মনে হয়। যে পর্য্যন্ত কোন শ্রেণীর লোক হুনীতিপরায়ণ ও ধার্মিক থাকে, ততদিন তাহাদের পতন হয় না। এক সময়ে বাঙ্গালী বণিকের নাম ছিল “সামু”। এই ‘সামু’শব্দের অপভ্রংশ ‘সাউ’ (শাহা, সাহ)। নৈতিক জগতেও এই সামুদের চরিত্র-ভ্রংশ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

জাহাজ-নির্মাণ।

বঙ্গদেশের বিস্তৃত বাণিজ্য-সম্বন্ধে উল্লেখ অনেক প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথি ও গীতিকায় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে জাহাজগুলির আকার ও আয়তনাদিসম্বন্ধে অনেক পুস্তকে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঝংগীদাসের (১৫৭৫ খৃঃ) মনসামঙ্গলে জাহাজ-নির্মাণের একটা উৎসাহিত বিবরণ আছে। কবিকঙ্কণের তরুণ বর্ণনায় অত্যধিক অতিরঞ্জন প্রবেশ করিয়াছে। জাহাজগুলি এক যুগে খুব বৃহৎ হইত, সেই সংস্কার অতিরঞ্জিত করিয়া কবিরা যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা অশ্রদ্ধেয়। “কোবা” নামক ডিম্বির উল্লেখ পল্লী-গাথার অনেক স্থলে পাওয়া যায়। ইশা খাঁর গীতিতে এই কোবার এক অতিরঞ্জিত বর্ণনা আছে। এখনও ঢাকা অঞ্চলে “কোব” নৌকার ব্যবহার প্রচলিত আছে। জাহাজগুলির মধ্যে বেটিতে স্বয়ং সদাগর থাকিতেন এবং যাহা বিশেষ সুসজ্জিত হইত, তাহা ‘মধুকর’ নামে অভিহিত হইত। আমরা কাব্যগুলিতে জাহাজের বহু নাম পাইয়াছি, তাহার কোন কোনটি বেশ কবিত্বময়, যথা—“রাজবল্লভ,” “রাজহংস,” “সমুদ্রফেনা,” “শম্ভুচূড়,” “উদয়তারা,” “গঙ্গাপ্রসাদ,” “হুর্গাবর”। কোন কোন নাম প্রাকৃত-যুগের, যথা—“ওয়ারেখী,” “টিয়াটুটি,” “ভাড়ার-পটুয়া,” “বিজু স্রজু” (বিজয় গুপ্ত)। ইহারা পুরাকালে যে খুব বৃহদাকৃতি হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাব্যের অতিরঞ্জনের মূলে কিছু না কিছু সত্য আছে। সমুদ্রযাত্রা নিবিদ্ধ হওয়ায় যুগযুগান্ত পরে যে সকল সংস্কার ছিল, তাহা ক্রমশঃ পাড়ারগেয়ে কবিরা বাড়াইয়া অশ্রদ্ধেয় করিয়া ফেলিয়াছেন। চাঁদ সদাগরের একটি জাহাজের মাস্তুল এত উঁচু ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে যে তাহার উপর উঠিলে বাঙ্গলা দেশ হইতে রাবণের লক্ষা দেখা যাইত। কোন কোন বৃহৎ জাহাজে চাঁদ সদাগর হাট বসাইতেন; তামিলদেশীয়া নর্তকীরা কোন কোনটিতে নৃত্য করিত। এই জাহাজের বহর এত বড়—দীর্ঘ ছিল যে, একদিকের নৌকায় যখন রৌদ্র খেলিত, সেই সময়েই অপরদিকের নৌকার উপর বৃষ্টি হইত (“তার পিছু বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে উদয়-তারার। অনেক নায় ঝড় বৃষ্টি অনেক নায় খরা। ”—বিজয় গুপ্ত)। কোন কোন জাহাজে কলিঙ্গদেশীয় সৈন্তগণ থাকিত। চাঁদ সদাগরের কোন ডিঙ্গা এত বড় ছিল যে তাহা ৮০ গজ জল ডাঙ্গিয়া যাইত। কোন জাহাজ এত বড় ছিল যে তাহা একদিকে ঠেকিলে নদীর পাড় ধসিয়া পড়িত ও নিম্ন ভূমিতে আটকাইয়া যাইত, তখন তাহাকে চালাইবার

জল ছাগ-মহিষ বলি দিয়া কালী মায়ের তুষ্ট সাধন করিতে হইত। এই সকল আজগুবি বর্ণনার কতকগুলি অতিরঞ্জিত সংস্কার হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহা চাঁদ সদাগরের অতুলনীয় বাণিজ্য, তরণী, নৌবল এবং বিপুল বৈভবের প্রতি ইঙ্গিত করে। তখন রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্রের মর্যাদা প্রায় তুল্য ছিল। চাঁদ সদাগর রাজদণ্ড কেন ব্যবহার করেন, লঙ্কার রাজা এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙ্গলা দেশে বণিকেরা রাজার মতনই সম্মানিত। রূপকথা গুলিতে দৃষ্ট হয়, রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্রের মর্যাদা প্রায় তুল্য। সেই সকল বণিক-রাজের দেশে আজকাল জেলেরাও চারটি ভাত পায় না। সপ্তগ্রাম বাঙ্গলার প্রাচীন বন্দর ছিল। এখানে জাহাজ নির্মিত হইত। সমুদ্রযাত্রার প্রাক্কালে সরস্বতী নদী হইতে বণিকেরা “মিঠা পানি” তুলিয়া লইত। ঐ নদী শুকাইয়া যাওয়ার পর সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্য্য লুপ্ত হয় এবং চট্টগ্রাম বঙ্গদেশের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। পল্লীগাথায় যে সকল বাণিজ্য-তরণীর বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে অতিরঞ্জন অতি অল্প। চট্টগ্রামে নির্মিত জাহাজে চড়িয়া বাঙ্গালীরা এককালে লঙ্কা, লঙ্কাদ্বীপ, মাটাবান প্রভৃতি দেশে যাইতেন। “নিলক্ষা” শব্দ বোধ হয় লঙ্কাদ্বীপকে, “প্রলম্ব” প্রাধনমকে ও “আবর্তনা” মাটাবানকে বুঝাইতেছে। “নাকুট,” “অহীলঙ্কা,” “চন্দ্রমালা” প্রভৃতি যে সকল দেশের নাম পাওয়া যাইতেছে, তাহারা খুব সম্ভব ভারত-সাগরের কোন কোন দ্বীপ। চট্টগ্রাম ও তাম্রলিপ্ত বঙ্গদেশের এই দুই বন্দর বিশ্ববিশ্রুত। চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর তীরবাসী “বালামী” নামক এক শ্রেণীর লোক জাহাজ নির্মাণ করিত। এখনও বালামীদের বংশধরেরা ছোট ছোট জাহাজ নির্মাণ করিয়া থাকে। “বালামী নৌকা” ইহাদের নামানুসারে পরিচিত। চীন পরি-ব্রাজক মাহুন্দের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়—একদা তুরস্কের সুলতান আলেকজান্ডার জাহাজ-নির্মাণপদ্ধতিতে অসন্তুষ্ট হইয়া চট্টগ্রাম হইতে অনেকগুলি জাহাজ নির্মাণ করাইয়া লইয়াছিলেন। আরবী লেখক ইব্রিস দ্বাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন—তিনি সে দেশের নাম করিয়াছেন “কর্ণবুল”—এইশব্দ ‘কর্ণফুল’ শব্দের অপভ্রংশ। ১৪০৫ খৃঃ অব্দে চীন দেশের মন্ত্রী চেং হো বাণিজ্য-সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্নের সমাধানার্থ স্বয়ং চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন, এবং ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ আরবীয় পর্য্যটক ইবনবতাতু চট্টগ্রামের জাহাজে চড়িয়া জাবা এবং চীনে গমন করিয়াছিলেন। ১৫৫৩ খৃঃ অব্দে পর্তুগিজ নাবু ডি চোনা (গোয়ার শাসনকর্তা) তাঁহার সেনাপতি দি মাদ্রাকে চট্টগ্রামে তাঁহাদের একটা বাণিজ্য-কেন্দ্রস্থাপনার্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যুরোপীয় নব-উদ্ভাবিত বন্দ-চালিত জাহাজের প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রামের এই বিপুল জাহাজ-নির্মাণ কারবারটি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে হতশ্রী হইয়া পড়িল। চট্টগ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক জাহাজের মালিকদের নাম লোকে বলিয়া থাকে—তাঁহারা জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাইতেন। মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে তাঁহারা জীবিত ছিলেন—রঙ্গ, বসির, গুমানি মালুম, মদন কেরানি, দাতারাম চৌধুরী প্রভৃতি জাহাজাধ্যক্ষদের কোন কোন জনের শতাধিক জাহাজ ছিল। ইহারা হান্সাদদিগের অত্যাচারের সময়ে বৃহৎ নৌসম্মেলন লইয়া অগ্রসর হইতেন। এই শ্রেণীবদ্ধ জাহাজ-

গুলিকে ‘প্লুপবহর’ বলা হইত। যিনি হাশ্মাদদিগকে দমন করিয়া খ্যাতি লাভ করিতেন, তাঁহাকে “বহরদার” বলা হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর আদিকালেও নাবিকগণের কেহ কেহ জীবিত ছিলেন; পিরু সদাগর, নস্রমালুম, রামমোহন দারোগা প্রভৃতির নাম এখনও শোনা যায়। রামমোহন দারোগার জাহাজ বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া স্বটলগেজ টুইড বন্দরে গিয়াছিল। চট্টগ্রাম-নির্মিত কতকগুলি জাহাজের বিবরণ সংক্ষেপে আমরা এখানে দিব :—

১। বালাম নৌকা—ইহা পূর্বে যত বড় হইত, এখন আর তত বড় হয় না। সাধারণতঃ ইহারা ১৬ দাঁড়ে, পাল উড়াইয়া চলে। ইহাদের মধ্যে বড় গুলি ২০০ এমন কি ২৫০ টন ধাতু বোকাই লইয়া বাইতে পারে। কিন্তু ৫০ টনের অধিক মাল লইয়া ইহাদিগকে সমুদ্র-পথে বাইতে দেওয়া হয় না। এই কিপ্রগামী বালাম নৌকা যন্ত্রাদির সাহায্য বিনাও অনায়াসে ভারত-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ কাটিয়া চলিয়া যায়। এক সময়ে ইহারা অতি প্রকাণ্ড হইত।

২। গোধা নৌকা—ইহাও অতি প্রাচীন। এই নৌকাগুলি সচরাচর অতি দীর্ঘ হয়। ইহারা সাধারণতঃ তুটুকি মাছের কারবারের জন্ত ব্যবহৃত হয়। বর্তমান কালে ইহারা সমুদ্র-পথে সোনাদিয়া, লালদিয়া, রাঙ্গাবালী প্রভৃতি বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে মৎস্তের কারবার উপলক্ষে যাতায়াত করে। এই নৌকাগুলি লৌহের পেরেক দিয়া আটকান হয় না। “গল্লক” নামক বেত দিয়া নৌকার বিভিন্ন অংশ জোড়া দেওয়া হয়, এবং সেই বেতের অবকাশে “শ্রামা” গুলি (ছিন্ন) দড়ি, তুলা, ধুনা প্রভৃতির দ্বারা এমন শক্ত করিয়া আটকান হয় যে, তাহাতে জলপ্রবেশের কোন সম্ভাবনা থাকে না। গোধা নৌকার ভিন্ন ভিন্ন অংশ খুলিয়া রাখা হয়। বর্ষাকালে সেগুলি জোড়া দিয়া নৌকা সমুদ্রবাত্রার জন্ত প্রস্তুত করা হয়; ইহাদের গলুই হালধরমুখো করা হয়। যখন বর্ষাকালে সমুদ্রপথ পর্য্যটন করিয়া বিপুল মৎস্তের পশার লইয়া শত শত গোধা নৌকা কর্ণফুলী নদীতে আসিয়া নঙ্গর করে, তখন সেই মৎস্তব্যবসায়ীদের আত্মীয়স্বজন দামামা, দগড় ও ঢোল পিটিয়া ও বাঁশী বাজাইয়া তাহাদিগকে যেরূপ অভিনন্দন করে, তাহা একটা দর্শনীয় ব্যাপার।

৩। প্লপ নৌকাগুলি অনেকটা বালামের মতই, পল্লীগাজ প্রভাবে কতকটা রূপান্তরিত হইয়া ঐ নাম পরিগ্রহ করিয়াছে।

৪। সারোঙ্গা নৌকা—কতকটা ডোঙ্গা বা সালাটির মত। এগুলি সমুদ্রে বাইতে সাহসী হয় না; একটি বড় গাছ কুঁদিয়া নির্মিত হয়।

৫। সাম্পান—অনেকটা হাঁসের মত আকৃতি, ইহা চীনা নৌকার ধরণে প্রস্তুত।

৬। কোন্দা—চট্টগ্রামের অরণ্যসমূহের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বৃক্ষ কুঁদিয়া এই শ্রেণীর নৌকা তৈরী হয়। ইহা বহু মাল লইয়া যাতায়াত করে, মাঝিরা ইহা লগি দিয়া ঠেলিয়া চালাইয়া থাকে।

এখন চট্টগ্রামের বাঙ্গালীরা যন্ত্রচালিত জাহাজনির্মাণ শিক্ষা করিতেছে। মিঃ উইলিয়ামস্ এবং লেকটুজান্ট উইলসনের উৎসাহে ইহারা এই বিষয় শিখিয়াছে। উইলসন বালামীদের হাতের কাজ দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারা জাহাজ-নির্মাণে সুদৃর্লভ কৃতিত্ব দেখাইতেছে।

অধুনা মাধব, কালীকুমার ও দ্বারকানাথ জাহাজ-নির্মাণে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। আমাদের স্বদেশী নেতাদের ইহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত, যুগ্মেয় বিষয় ইহাদের নাম পর্য্যন্ত অনেকেই জানেন না।

পল্লী-গীতিকা-সাহিত্যে “নসর মালুম” নামক গাথায় (পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ১-৪৪ পৃঃ) জাহাজ ও সমুদ্রযাত্রাসম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মালুমেরা সমুদ্রপথের সমস্ত বিষয় অবগত হইতেন, তাঁহারা দীর্ঘ পর্য্যটনের প্রাক্কালে মানচিত্র আঁকিয়া লইতেন এবং নক্ষত্র দেখিয়া দিক্ নির্ণয় করিতে পারিতেন। সায়েস্তা খাঁর চট্টগ্রামে অভিযান-প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের ডিঙ্গিগুলির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা কৌতুকাবহ (পূর্ববঙ্গ-গীতিকা দ্রষ্টব্য)।

জাহাজের অংশগুলির যে নাম চট্টগ্রামে প্রচলিত আছে তাহার কয়েকটি এখানে দিতেছি:—বাক (Rib), কাহন (floor), ইরাক (keel), স্কানকিলা (keelson), শুদস্তা (stern post), বাদ (stem), মাস্তুল (mast), মাস্তুলের চালুতা (rake of the mast), ইস্কা (batten)। “মুরগেহা ও কবর” নামক গাথায় (পৃঃ গীঃ, ৪র্থ খণ্ড, ৯৩-১৩০ পৃঃ) নৌ-সৈন্য লইয়া জাহাজের বহর কি ভাবে যুদ্ধ করিতে বাইত, তাহার একটা উল্লেখযোগ্য বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মুসলমানেরা কোরানবাহী জাহাজকে অগ্রগামী করিয়া যুদ্ধের অভিযান করিতেন। কোরানের পশ্চাতে ধর্মপ্রচারের অগ্রবিধ উপকরণ, যথা—গোলা, গুলি, কামান প্রভৃতি জাহাজে বোঝাই থাকিত। প্রাচীন হিন্দু বানিজ্য সম্বন্ধে অনেক কথা ৪৭০-৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

গৃহ-নির্মাণাদিসম্বন্ধে অনেক কথা প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। কোন কোন পুরাণে এ সম্বন্ধে কতকগুলি সূত্র প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের ডাক ও খনা এ বিষয়ে

গৃহ-নির্মাণ। নীরব নহেন, তাঁহাদের সূত্র বাঙ্গলার কৃষকগণের মুখে মুখে—“পুবে
হাঁস (পূর্বদিকে জলাশয়—তথায় হংস বিচরণ করিবে), উত্তরে বাশ,
পশ্চিম ঘিরে, দক্ষিণ ছেড়ে, বাড়ী করগে ভেড়ের ভেড়ে।”

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে তারাপতি নামক কর্মকাররাজের যে লৌহ-গৃহ-নির্মাণের বর্ণনা আছে, তাহা পড়িলে কিরূপ সমারোহের সহিত পুরাকালে আমাদের হর্ম্মাদি নির্মিত হইত তাহার একটা আভাস চোখের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই স্থপতিরা হয়ত ভিন্ন দেশাগত ছিল, নতুবা স্বতন্ত্র ও লৌহকর্ম্মকারদের জ্ঞান অনাচরণীয় রহিয়া গেল কেন? ইহারা কোনরূপ নোংরা কাজ করে না, তথাপি ইহাদের জন্ত পতিতের ব্যবস্থা কেন? বংশীদাসের বর্ণনায় স্থপতিশ্রেষ্ঠ তারাপতির রূপবর্ণনা পড়িলে মনে হয় যে এইজাতীয় লোক যে ভিন্ন দেশবাসী, তাহার একটা সংস্কার কবির মনে ছিল। তারাপতি অবশ্য করিত চরিত্র, কিন্তু এই চরিত্র যে শ্রেণী-নির্দেশ করিতেছে তাহা ঐতিহাসিক।

“তারাপতি কর্ম্মকার সকলের প্রধান।

অধিক গুণ তার জানে সর্বকাম ॥

দীর্ঘ দীর্ঘ হাত পা, মাথায় ঝাটা চুল।

ডান হাতে হাতুর বাম হাতেতে তুল ॥

পিঙ্গল মাধার চুল বেকা কাকলী ।

নাকে মুখে চক্ষুতে লাগিয়াছে কালী ॥”

ইহার পর হাজার হাজার কামার একত্র হইয়া “আড়ে সাত গজ,” “নয় গজ দীর্ঘে” এবং “উড়ে নয় গজ” লৌহের ঘরখানি কি ভাবে গড়িয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে ।

বঙ্গে যে সকল কুটিরশিল্পের চর্চা হইত, তাহার কথা পূর্বেই লিখিয়াছি । বাণিজ্যের জন্ত বঙ্গের বস্ত্রশিল্প জগতের সর্বত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল । ঢাকার মসলিনের কথা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি । বঙ্গদেশের বাণিজ্যশিল্পের মধ্যে “শঙ্খশিল্প” একটি প্রধান, ঢাকা নগরী তাহারও শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ।

শঙ্খের কারবারটা প্রথমতঃ দাক্ষিণাত্যেই ছিল । শঙ্খ-শিল্পীগণ তথায় ‘পারওয়া’ নামে অভিহিত হইত । দুই হাজার বৎসর পূর্বের অনেক শাখার কাজ তামিল দেশের প্রাচীন রাজধানী কোরকাই এবং কায়লের ভগ্নস্থাপে আবিষ্কৃত হইয়াছে । যে ভাবে তথায় শঙ্খ কাটা এবং কারুকার্যমণ্ডিত হইত, তাহাতে বুঝা যায় এই শিল্পীদের অস্ত্রশস্ত্র ঠিক ঢাকার শাখারীদের ব্যবহৃত হাতিয়ারের মতই ছিল । মালিক কাকুর কর্তৃক চতুর্দশ শতাব্দীতে টিনিভেলি জেলায় হিন্দু-রাজধানীধ্বংসের পর এই শিল্পীগণ বঙ্গদেশে ঢাকায় আগমন করেন বলিয়া শ্রীযুক্ত জে. হোরনেল বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের মেময়রের (memoir) ৪১১ পৃষ্ঠায় যে মত অত্যন্ত বিধার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না । এ সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই । কিন্তু ঢাকার এই শিল্প যে এত আধুনিক তাহা মনে হয় না । হাতের শাখা বাঙ্গলা গৃহস্থ রমণী বহু পূর্ব হইতেই ব্যবহার করিতেন এবং সেই শাখা যে দূরদেশবাসী শিল্পীরা প্রস্তুত করিয়া দিত, এমন মনে হয় না । শিবের প্রাচীন ছড়ায় বাঙ্গালী কবিরা দেবাদিদেবকে শাখারী সাজাইয়া গৌরীর সঙ্গে তাঁহার দাম্পত্য-কলহের পরিকল্পনা করিয়াছেন । হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় শ্রেণীর লোকেরাই শঙ্খকে অতি পবিত্র সামগ্রী বলিয়া মনে করিতেন ; বিজ্ঞাপতি ও চণ্ডীদাসের সময়ে এতদেশীয় মেয়েরা যে শাখা পরিতেন, তাহা দাক্ষিণাত্য হইতে আমদানী হইত বলিয়া মনে হয় না ; “শঙ্খ কর চুর, বশন করহ দূর—তোড়হ গজমতি হাররে”—বিজ্ঞাপতির এই কবিতা চতুর্দশ শতাব্দীর । পুরাকালে অবশ্য মহীশূর, বেলেরি, হায়দ্রাবাদ, অনন্তপুর, কর্ণাল, কাণিওয়ার, কৃষ্ণা, গুজরাট প্রভৃতি নানা কেন্দ্রে শাখার কাজ হইত । কিন্তু স্বরণাতীত কাল হইতে ঢাকাও এই শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । ট্যাভারনিয়ার সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিয়াছেন ঢাকা ও পাবনা (অহুবাদক ভুল করিয়া পাবনাকে পাটনা করিয়াছেন,—এ. সো. মেময়ার, ৪২৫ পৃঃ) এই দুই নগরীতে অনূন ২০০০ শাখারী ছিল । বাঙ্গলায় ঢাকা, নবদ্বীপ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি নানাস্থানে শাখার কারবার চলিতেছে । এই ব্যবসায়ীরা পূর্বে সকলেই হিন্দু ছিল, কিন্তু এখন দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানেরা এই ব্যবসায়টা প্রায় একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন । তথাপি মোটামুটি ধরিলে হিন্দু শিল্পীর সংখ্যাই সমধিক । ঢাকার শাখারীবাজারে যে সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পী বাস করেন, তাঁহাদের

পূর্বপুরুষেরা কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলা যায় না। তাঁহাদের মেয়েদের বর্ণ এত ফরসা ও মুখের গড়ন এরূপ যে, তাঁহারা খাঁটি বাঙ্গলাদেশের লোক বলিয়া মনে হইত না। তাঁহারা যে বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহিতেন, তাহাও কতকটা বিদেশী ভাষার মত, কলহের সময়ে তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহা কিছুতেই বাঙ্গলা বলিয়া মনে হইত না। আমি অষ্ট শতাব্দী পূর্বে বাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি। বর্তমান সময়ে ইহারা শিক্ষাদীক্ষায় অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়াছেন, কিন্তু কিছু দিন পূর্বেও স্বীয় শিল্পকার্যে সুদক্ষ হইয়া বহির্জগতের সঙ্গে কোন সঘন্থ রাখিতেন না। ইহারা তখন অতি ক্ষুদ্র গুহার ছায় ছোট ছোট বাড়ীতে থাকিতেন এবং সেই সকল বাড়ী ত্রিতল-চৌতল হইত,— এক একখানি ঘরের মত দেখাইত। ঢাকার শাঁখারীবাজার সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের নিবাস ছিল—অতি সঙ্কীর্ণ ৩০০ গজ পরিমিত রাস্তার দুই ধারে দ্বিতল, ত্রিতল ও চৌতল ছোট ছোট ঘরগুলি; শাঁখারীদের, বিশেষ তাঁহাদের মেয়েদের অতিশয় ধবধবে খেতবর্ণ; শাঁখ কাটিবার একরূপ অদ্ভুত লৌহের করাত এবং অপরাপর যন্ত্র, শাঁখ কাটার সেই একঘেয়ে শব্দ, বাহা লইয়া তামিল কবি তাঁহার সমালোচককে ধুঃ পুঃ কোন এক শতাব্দীতে ঠাট্টা করিয়াছিলেন, এই সকল বৈশিষ্ট্য লইয়া ঢাকার শাঁখারী সম্প্রদায়—বহুবৃগ যাবৎ ঢাকা কোতওয়ালীর নিকটে বাস করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে তখন একটি করিয়া কূপ ছিল; সেই কূপে রান এবং সেই গৃহে আহালাদি সমাপনপূর্বক দিনরাত তাঁহারা শাঁখা তৈরী করিতেন—তাঁহারা কদাচিত্ত বাহিরে যাইতেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে যদিও বুড়ীগঙ্গার ঘাট তাঁহাদের গৃহ হইতে অর্ধ মাইল মাত্র দূরে, তথাপি অনেক অশীতিপর বৃদ্ধ বুড়ীগঙ্গার ঘাট কোথায় তাহা জানিতেন না। এ সকল প্রবাদ অবশ্যই অতিরঞ্জিত, কিন্তু ইহার মূলে এই সত্যটুকু নিহিত যে এই স্বীয়-কার্যে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্টচিত্ত-সম্প্রদায় বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ঢাকা জেলার দাসরা গ্রামে ইহাদের এক কেন্দ্র ছিল। ইহারা পূর্বে অতিশয় কারুকার্য করিতে পারিতেন; রেখাগুলি এরূপ সূক্ষ্মভাবে টানিয়া যাইতেন ও তাহা গালা দিয়া এরূপ সুন্দরভাবে রঞ্জিত করিতেন যে, তখন শাখাগুলি অনাড়ম্বর হইয়াও একান্ত সুস্বাদু ও সংবত কলার নিদর্শন হইত। এখন নানারূপ কারুকার্য তাহাতে ঢুকিয়াছে সত্য, কিন্তু কাজগুলি আর সেরূপ যত্নের সহিত হয় বলিয়া মনে হয় না। এখনকার শাঁখা বা; চুড়ি পূর্বের মত সূচাক্রমে কর্তিত হয় না, এখন বাহিরে নানারূপ চিত্রাকর্ষক চিত্র অঙ্কিত থাকে, কিন্তু ভিতরটা উচুনিচু ও খুব ভাল ভাবে কাটা হয় না। কিন্তু অষ্টশতাব্দী পূর্বের ভাল শাঁখার পশ্চাদ্ভাগ নিখুঁতভাবে সমতল হইত।

হরনেল সাহেব লিখিয়াছেন, এক সময় ঢাকার শাঁখার ব্যবসায়টার অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। বিলাতী বেলোয়ারী চুড়ি ও বিদেশী পাটারনের গহনার প্রতি অহুরাগের জন্ম বাঙ্গালী ভদ্রঘরের মেয়েরা আর শাঁখার প্রতি বেশী আকৃষ্ট হইতেন না; কিন্তু স্বদেশী আরম্ভ হওয়ার পর হইতে মেয়েরা আর বিলাতী চুড়ি পরেন না, আবার শাঁখার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়াছে; এজন্য আবার এই শিল্প জাগিয়া উঠিয়াছে।

১৯০৫ হইতে ১৯১০ পর্যন্ত বিদেশ হইতে কলিকাতায় শাখার আমদানীর নিম্নলিখিত ফর্দ হরনেল সাহেবের প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে :—

১৯০৫-৬	১৯০৬-৭	১৯০৭-৮	১৯০৮-৯	১৯০৯-১০
সিংহল হইতে				
১৪৪৭৭২	১৮৯২৮০	৮৬৫১৫	১৮১২২৩	১৬৬০৬০
মাদ্রাজ হইতে				
৩৩৭৫৫	৩৬০৫৭	৫৫৮৯	৫৫২৪১	৬৮০১৯
ত্রিবাঙ্গুর হইতে				
১১৪	শূন্য	৫৯২	শূন্য	৫০০
বোম্বাই হইতে				
৬৭৪৪	১৩৭৩০	৩৮২৩	২৩০৫	৪২৯৮
মোট	১৮৫৩৮৫	২৩৯০১৬৭	২৩৮৭৬৯	২৩৮৮৭৭

এই তালিকায় দৃষ্ট হয় শাখার চাহিদা এদেশে বাড়িতেছে। ইহা একটু শুভ লক্ষণ। ছুঃখের বিষয় পরবর্তী এই বিশ বৎসরে ব্যবসায়টি কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাও হিসাব আমাদের কাছে নাই।

বর্তমানকালে শাখার যে সকল কার্যকার্য চলিতেছে তাহার নমুনা নিম্নে দিতেছি।

শ্রীহট্টে দেবালয়ে ব্যবহৃত শাখার উপর অতি সুন্দর হস্তে অনেক চিত্রাদি ফোদিত হইত। তাহাতে কোন পৌরাণিক দেবলীলার চিত্র আঁকা হইত,—এখনও সেই দেবতাদের লীলার ফোদিত সুন্দরভাবে অঙ্কিত চিত্রযুক্ত শাখা কোন কোন দেবালয়ে পাওয়া যায়। একটি চিত্র দেওয়া হইল। এখনকার দেবতার নৈবেদ্য হইতেই বঞ্চিত হইতেছেন, কে আর তাঁহাদের অন্ন মন্দির ও পূজার উপকরণ সাজাইবে?

কবি জসীম উদ্দীনের মারফৎ ঢাকা ৬৩নং শাখারীটোলাবাসী শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ষ্ট্র শাখারী এবং তাঁহার পুত্র এবং আত্মীয়গণের নিকট হইতে অতীত ও বর্তমানকালের ঢাকার শাখার কারবারের নিম্নলিখিত বিবরণ পাইরাছি।

(১) যে যে স্থান হইতে শাখা আমদানী হয় :—তিতপুর (মাদ্রাজ), ঝাপনা (কলম্বো) ইত্যাদি।

(২) শব্দের জাত :—তিত্পুটী, রামেশ্বরী, ঝাঁজী, দোয়ানী, মতি-ছালামত, পাটী, গারবেশী, কাচ্চাধর, ধলা, ভেজাল, কেলাকর, জামাই পাটী, এলপাকার পাটী, নায়াখাদ, খগা, হুকীচোনা।

(৩) শব্দের দ্বারা কি কি তৈরী হয় :—শাঁখা, আতরদানী, মালা, এস্ট্রে, সেফ্‌টীপিন, খড়ির চেন, আংটি, বোতাম, ক্রশ, ব্যাংগেল, ব্রেসলেট, পো, ক্রমালদানী, জলশঙ্খ, বাগুশঙ্খ।

(৪) শাঁখার নাম :—

প্রথম যুগ—গাড়া (২ গাছা হইতে ৪০ গাছা পর্য্যন্ত)।

মধ্য যুগ—সাতকাণা, পাঁচদানা, তিনদানা, বাচ্চাদার, সাদাবালা, আউলাকেশী।

বর্তমান যুগ—সোণা বাধানো, টালী, লাইনমোড, চিত্তরঞ্জন, পানবোট, মোড়ানো, সতীলক্ষী, জালফাঁস, হাইসাদার, দানাদার, সাদাশাঁখা, শঙ্খবালা, আইপেটেরন, ইংলিশপ্যাচ, তেড়াশঙ্খ, শিকলি বালা, নেকলেস বালা।

লতাবালা, ধানছড়ি, চৌমুফি, হাসিখুসী, দার্জিলিং, তারপেঁচ, জয়শঙ্খ, পাথুরহাটা, গোলাপ ফুল, মোটালতা, মাজ, মুড়িদার, আতুরপাতা, বেগী, উপবেগী, বাশগীর, গোলাপবালা, নাগরী বয়লা।

বঙ্গদেশ বঙ্গবয়ন-শিল্পের জন্মভূমি। বসোরার যেমন গোলাপ, হিমালয়ের যেমন দেবদারু, বঙ্গবয়নশিল্প তেমনই বঙ্গের নিজস্ব। একেত্রে বাঙ্গালীর বঙ্গবয়ন-শিল্প। প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।

এদেশে এককালে চরকা মেয়েদের হাতের অপরিহার্য অস্ত্র ছিল, যেমন বিষ্ণুর হাতের সূদর্শন চক্র। এখন উহা মহাত্মা গান্ধীর হাতে উঠিয়াছে। চরকা কথাটা ‘চক্র’ কথাটিরই অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। উহার আকারটা কতকটা সূদর্শন চক্রেরই মত।

চরকাকাটা। পূর্বকালে রাজার রাণী হইতে দীনতম কুটিরস্বামিনী সকলেই চরকায় হুতা কাটিতেন। বাঙ্গলার ব্রত-কথার অনেকগুলিতেই চরকা দিয়া হুতা কাটার কথা আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে সুসঙ্গহুগাপুরের রাণী একদারাজাকে বলিয়াছিলেন, “তুমি আমাকে কেমন ভালবাস ?” রাজা জানকীনাথ তাঁহার ভালবাসা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। রাণী কমলা মাথা হেলাইয়া বলিলেন, “আমার মৃত্যুর পরে তুমি দানসাগর শ্রদ্ধ করিলে, চিত্তায় মঠ দিলে, আমি তো আর তাহা দেখিতে আসিব না। আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে তুমি কি করিতে পার, আমি দেখিতে চাই।” রাজা বলিলেন, “তুমি যা বলিবে তাই করিব।” রাণী বলিলেন, “বেশ, আমি সাত দিন সাত রাত ধরিয়া চরকায় ‘এক টাকিয়া’ হুতা কাটিব, সেই হুতা বতটা দীর্ঘ হইবে, সেই মাপে তুমি আমার জন্ত একটা দীঘি কাটাইয়া দিবে— তাহার নাম রাখিবে ‘কমলা-সায়র’।” কমলা সায়রের কতকাংশ এখন সোমেশ্বর নদের গর্ভে, বাকী অংশ এখনও বিদ্যমান। সেই দীঘিসংক্রান্ত হুঁচটনা এবং রাজ্ঞী কমলা দেবীর

শোচনীয় মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক পল্লীগীতি এখনও সে অঞ্চলে প্রচলিত, তাহাদের ছইটি আমি প্রকাশ করিয়াছি (পৃ: গী: ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড) ।

“চরকা আমার ভাতার পুত, চরকার দৌলতে আমার ছয়ায়ে হাতী বাধা,” প্রভৃতি অর্থ-বাচক প্রবচন এখনও পাড়ারগায়ের মেয়েদের মুখে মুখে শোনা যায়। মেয়েরা চরকার ভাবে এতটা অভিভূত ছিলেন যে, চাদের কলঙ্কটাকে “চাদের মা বুড়ী চরকা কাটিতেছে” এই ব্যাখ্যা করিয়া ছেলেদের বুঝাইতেন। চরকার হুতা এত সফল হইত যে এখনও তাহার যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়; অথচ চরকার ব্যবহার তো এযুগে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এখনও বিক্রমপুরের বামুণের মেয়েরা চরকার হুতায় একরূপ সূক্ষ্ম পৈতা তৈরী করেন যে, চার দণ্ডী পৈতার চার পাঁচটা একটা বড়-এলাচের খোসার মধ্যে অনায়াসে পুরিয়া রাখা যায়। আমি যখন ঢাকা কলেজে পড়িতাম, তখন আমার এক বিক্রমপুর-নিবাসী

সহপাঠী বড়-এলাচের খোসার মধ্যে পুরিয়া তাঁহার মাতার হাতের কাটা চারিটি পৈতা আমাকে উপহার দিয়াছিলেন; সেই চারিটি পৈতায় ২৪০ হাত হুতা ছিল। সেই হুতা মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম হইলেও বেশ শক্ত ছিল, আমি তাহা বহুদিন ব্যবহার করিয়াছিলাম।

বাঙ্গলার চরকা ও বাঙ্গলার হুতা বাঙ্গলার গৃহগুলির একরূপ অপরিহার্য্য অঙ্গীয় উপকর হইয়া পড়িয়াছিল যে, লোকে কথাবার্তা, উপমা দেওয়া প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই এই

চরকা ও হুতার উত্থাপন করিত। এমন সকল ব্যাপারে হুতার বাঙ্গলার হুতার ব্যবহার। উল্লেখ ও উপমা দেওয়া হইত, বাহা এখন অদূত থেকে; কিন্তু সেইভাবে প্রয়োগ দ্বারা বুঝা যায়, বাঙ্গলার হুতার কারবারটা কত প্রিয় ও বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। একটি প্রাচীন বৈষ্ণবগান এইরূপ :—

“(সে হাটে) বিকায় নাকো অস্ত্র হুতো।

বিনা তাঁতি নন্দের হুত ॥

সে হাটের প্রধান তাঁতি, প্রজাপতি পশুপতি,

আর যত আছে তাঁতি—তাদের শুধু যাতায়াত ॥”

কিন্তু পুরুষেরা চরকা কাটিতেন না—তাহা তাঁহাদের অপমানের বিষয় ছিল। গ্রন্থের পূর্বভাগে দেখাইয়াছি, যদি কোন সেনাপতি যুদ্ধে অক্ষমতা দেখাইতেন, তবে রাজা প্রায়ই তাঁহাকে অপমান করিয়া বলিতেন, “তোমার আর যুদ্ধে বাইরা কাজ নাই, তোমাকে একখানি চরকা পাঠাইয়া দিব।” বঙ্গদেশে চরকার পাট উঠিয়া গেলেও আসামের মেয়েরা এখনও চরকা ছাড়েন নাই। তাঁহারা রেশমের উপর এখনও ঐরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করেন, তাহা অতি সুন্দর। চাদের উপর ককা বড়ই শোভন হয়। বড় বরের মেয়েদের হাতের কাজ দেখাইয়া বরপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে হয়, তবেই ভাল বিবাহ হয়। বাঙ্গলার মেয়েরা এখন বিলাতীর নকল করিয়া ‘লেস’ তৈরী করেন এবং বাহা কচিং ব্যবহারে লাগে তাহাই

রচনা করিয়া বাহাহরী লইতে চেষ্টিত হন। কিন্তু আসামের মেয়েরা ভাল বেশমে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি বয়ন করিয়া থাকেন।

কার্পাস দ্বারা বস্ত্রবয়ন ভারতবর্ষে যে কত প্রাচীন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশে তাঁতিদের স্থতের উল্লেখ আছে (“হে শতক্রতু, ছুঁচোঙলি যেকপ তাঁতিদের স্থতা খাইয়া ফেলে, হুশিচিন্তা আমাকে তেমনই খাইয়া ফেলিতেছে—১০৫-৫৮)। এই শ্লোকের ইঙ্গিতার্থ—তাঁতিরা সেই প্রাচীন কালেও স্থতায় মাড় দিত। খৃঃ পূঃ ২০০ বৎসর পূর্বে গ্রীকেরা ভারতীয় কার্পাসের কথা জানিতেন। ষ্ট্যাটিটিয়াস (Statitius) কার্পাসকে “কার্বাসম” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। জে. ফর্বেস্ রয়েল (J. Forbes Royle, M. D., F. R. S.) তাঁহার “Early History of Cotton” পুস্তকে লিখিয়াছেন, “গ্রীকেরা ঢাকার মসলিনের কথা বিলক্ষণ জানিতেন, তাঁহারা বস্ত্রশিল্পের সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ইহাকে নির্দেশ করিয়াছেন এবং ‘গ্যাঞ্জোটিকা’ নাম দিয়াছেন, যেহেতু ইহা গঙ্গার উপকূলে প্রস্তুত হইত (১২০ পৃঃ)।” বাঙ্গালী শিল্পী যে এ বিষয়ে জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্লিনি হইতে আরম্ভ করিয়া ডাক্তার উরে (Dr. Ure) এবং টেইলর পর্য্যন্ত বহু লেখক ঢাকার মসলিনের অশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন।

প্লিনির সময় বাঙ্গলার মসলিনের নাম ছিল “কার্পাসিয়াম” ; এই শব্দটি সংস্কৃত ‘কার্পাস’ শব্দের অপভ্রংশ। অতীতকালের মসলিনের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র, ঢাকার অদূরবর্তী ভাওয়াল পরগনার অন্তর্গত “কাপসিয়া” এখনও ঐ নামে পরিচিত।

বাইবেলে এই মসলিনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (ইজেকিল, ১৪শ অধ্যায়, ১০, ১৩ এবং ইসিয়া, ৩য় অধ্যায়, ২৩)।

প্লিনি লিখিয়াছেন, “রোমের মেয়েরা মসলিনের ডান করিয়া স্বীয় নয় অবয়ব সাধারণের চক্ষুর নিকট উপস্থিত করেন।”—“A dress under whose slight veil our women continue to show their shapes to the public.”

ডাক্তার উরে বলিয়াছেন, “রোমের পূর্ণতম ঐখ্যের যুগে ঢাকার মসলিন তখাকার মহিলাদের সর্বপ্রধান ও প্রিয় বিলাসের সামগ্রী ছিল (Cotton Manufacture of Great Britain by Dr. Ure)। ইয়েটস্ লিখিয়াছেন, ভারতীয় কার্পাস খৃষ্ট জন্মবার দুইশত বৎসর পূর্বে গ্রীসদেশের বাজারে প্রচলিত ছিল। (Tessitrium Antiquorum.)

জুভিনেলের পুস্তকেও মসলিনের প্রশংসাসূচক উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্লিনির লেখাতে পাওয়া যায় যে বঙ্গদেশের ঢাকানগরীই এই বস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রভূমি ছিল। সমস্ত জগতে সুপ্রাচীন কাল হইতে ইহার ব্যবহার ও আদর হইত। “একদিকে চীন, অপর দিকে তুরস্ক, সিরিয়া, আরব, ইথিওপিয়া এবং পারস্যদেশের সহিত এই বাণিজ্য চলিত ; ইহার কিছুদিন পরে প্রভেন্স, ইটালী, ল্যাংগুই ডক এবং স্পেন দেশেও ঢাকার মসলিন প্রেরিত হইত (১৩২০,

৬০ হাত কাপড় হাতে রাখিলে টের পাওয়া যায় না।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ঢাকার মসলিন শীর্ষক প্রবন্ধ—আবদুল আলি)। ইজিপ্টের সুবিখ্যাত রাজা এ্যাটোনিও তাঁহার সৈন্যদিককে “কার্বাসাম” বস্ত্র উপহার দিতেন। ট্রেভারনিয়ার লিখিয়াছেন, মহম্মদ আলিবেগ ভারতবর্ষ হইতে পারস্যদেশে ফিরিয়া রাজা চাসেফিকে একটি মূল্যবান প্রস্তর-খচিত বৃহৎ ডিম্বের মত ক্ষুদ্র নারিকেল উপহার দেন, ইহার মধ্যে ৬০ হাত দীর্ঘ একখানি মসলিন কাপড় ছিল; উহা এত পাংলা যে হাতে রাখিলে আদৌ কোন জিনিষ হাতে আছে বলিয়াই মনে হইত না।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে এরিয়ান ঢাকার মসলিনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, (Periplus of the Erythrean Sea)। নবম শতাব্দীতে হুইজেন চীন পর্য্যটক ভারতবর্ষের বিবরণ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন (Account of India and China by Two Mahammedan Travellers)। এই পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন আবিব তিও ইছারাং। টেলার সাহেব তাঁহার ‘টপোগ্রাফি অব ঢাকা’ গ্রন্থে (১৬৩ পৃঃ) লিখিয়াছেন—“উক্ত হুই মুসলমান লেখকের মতে ঢাকার লোকেরা এমন চমৎকার কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত করে যে জগতের অন্তত তাহার তুলনা হইতে পারে না। গোল আধারে এই বস্ত্রগুলি রক্ষিত হয় এবং ইহার একখানি এত স্থল যে একটি অশ্বুরীয়কের রক্তপথে সমস্ত কাপড়খানি টানিয়া আনা যায়।” প্রফেসর উইলসন লিখিয়াছেন “৩০০০ বৎসর পূর্বে হিন্দুগণ বস্ত্রশিল্পে জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন” (Introduction to Rigveda Samhita)। কুলভা নামক একখানি তির্কতীয় পুস্তকে

৩০০০ বৎসর পূর্বে হিন্দু
অশ্বাতত্ত্বন্দী।

লিখিত আছে Gteing Dgahmo নামী একজন ধর্ম্ম-যাজিকা মসলিন পরিয়া বাহির হইছিলেন বলিয়া তিনি উলঙ্গ হওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া অপমানিতা হইয়াছিলেন। গ্রীসের লেখকগণ প্রাচীনকালে তথাকার তরুণ ও তরুণীদের এইরূপ বস্ত্র ব্যবহারের নিলজ্জতার জন্ত তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছেন। টেলর যুরোপীয় প্রাচীন লেখকদের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহাদের মতে “ঢাকার মসলিন মানুষের হাতের তৈরী নহে—উহা পরীদের হাতের কাজ” (১৬৩ পৃঃ)। একদা মসলিন-পরিহিতা রাজকুমারী জেবউন্নিসাকে দেখিয়া তাঁহার পিতা আরজ্জেব উলঙ্গ মনে করিয়া ভৎসনা করিতে কুমারী বলিয়াছিলেন, “আমি কাপড়খানি সাতবার ঘুরাইয়া পরিয়াছি।”—এই সাদীখানি ২০ গজ লম্বা ছিল, ইহার ওজন প্রায় ১০ আউন্স (Bolt's Consideration on the Affairs of India, p. 206)। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান এইরূপ বস্ত্রের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহার সহচরীরা মসলিন পরিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন।

মোগল সম্রাটগণ এই মসলিন বস্ত্রের প্রচার সম্বন্ধে এতটা

ঈর্ষান্বিত ছিলেন যে কোন কোন সম্রাট এই বস্ত্র বিদেশে পাঠাইতে নিষেধ করিয়া আইন প্রচার করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে নূরজাহানের স্বকৃতি ও ফ্যাসানের প্রতি অত্যধিক অমুরাগের ফলে ভারতবর্ষীয় সমস্ত প্রধান নগরে সম্রাটগণের মসলিন বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল।

বখন মসলিনের সৌভাগ্য প্রায় অন্তিমিত, তখনও বাঙ্গলার কয়েকজন রাজা বিশেষ

ত্রিপুরেশ্বরগণ এই বস্ত্রের উৎসাহ দিয়া ইহাকে কথকিত বাচাইয়া রাখিয়াছিলেন। “India of Ancient and Middle Ages” নামক পুস্তকে মিসেস ম্যানিং লিখিয়াছেন—বাসের উপর বিছানো একখানি সুদীর্ঘ মসলিন এক গাভী বাসের সঙ্গে খাইয়া ফেলিয়াছিল; এই জন্ত সেই গাভীর মালিক নির্দাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। ইতিহাস লেখক কাফি খাঁ মোগল রাজ-অন্তঃপুরে মসলিনের আদর সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন; তাহাতে দেখা যায়, এই বস্ত্রশিল্প রাজাবাদসাহের কতটা মনোযোগ এবং অমুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ইম্পিরিয়াল গেজেটয়ার হইতে (১৯০৫ খৃঃ) নিম্নলিখিত বিবরণ ত্রীযুক্ত আব্দুল আলি সাহেব সংগ্রহ করিয়াছেন (রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২০, ১ম সংখ্যা, ৩১ পৃঃ):—১৮৫১ খৃঃ অব্দের প্রদর্শনীতে ঢাকার মসলিন জগতের যত বস্ত্রশিল্পের নমুনা পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবধারণিত হইয়াছিল; অধ্যাপক কুপার এই প্রদর্শনীর বিবরণে এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের প্রদর্শনীতে ভাল মসলিন একটু ছুপ্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছিল, অনেক আয়াসে কিছু সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৮৬১ খৃঃ অব্দের প্রদর্শনীতে উৎকৃষ্ট মসলিন “শিল্পের জয়চিহ্ন” নাম অর্জন করিয়াছিল, তখন উহা এতটা ছুপ্রাপ্য হইয়াছিল যে ঢাকায় মাত্র একঘর তাঁতি উহা বয়ন করিতে পারিত। লণ্ডনের শিল্পশালায় একখানি মসলিন রক্ষিত ছিল, তাহা দৈর্ঘ্যে বিশ গজ ও প্রস্থে এক গজ এবং তাহার ওজন ৭½ আউন্স ছিল। Textile Manufactures নামক গ্রন্থে ডা° এল্. ওয়াটসন জগতের সমস্ত বস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া ইহার অপ্রতিদ্বন্দ্বিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, শুধু গুণে নয়—এরূপ সুন্দর কাপড় যে এতটা টেকসই হইতে পারে তাহা ধারণার অতীত। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে একখানি মসলিনের ৬০ পাউণ্ড মূল্য ছিল, জাহাঙ্গীরের সময়ে একখানি উৎকৃষ্ট মসলিন (আবরোরান) ৪০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হইত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই মসলিন যুরোপে বিশেষতঃ ফ্রান্সদেশে প্রভূত পরিমাণে রপ্তানি হইত। ১৮১৭ অব্দে কেবল ঢাকা হইতেই এককোটি বাহাদুরলক্ষ টাকার মসলিন রপ্তানি হইয়াছিল। ভারত-নির্মিত সাধারণ বস্ত্রেরও যুরোপে বর্ধেষ্টি কাটতি হইত।

“টপোগ্রাফি অব ঢাকা” পুস্তকে লিখিত আছে, ১৬০ হাত লম্বা একখানি মসলিনের ওজন ছিল মাত্র ৪ তোলা। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে অবনতির সময়ও ১৭৫ হাত মসলিনের ওজন ৪ তোলা। সোনারগাঁয়ে নির্মিত একখানি ১৭৫ হাত দীর্ঘ মসলিনের ৪ তোলা মাত্র ওজন ছিল। পূর্বে ঢাকায় ইহা হইতেও অনেক সুন্দর মসলিন নির্মিত হইত।

ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও মেঘনা এই নদনদীর সঙ্গমস্থলে ১৯৬০ বর্গমাইল পরিমিত ভূখণ্ডে সর্বোৎকৃষ্ট মসলিন প্রস্তুত হইত, ইহাদের কেন্দ্রস্থান কাপাশিয়া এখন ভাওয়ালের জঙ্গলে পরিব্যাপ্ত। ঢাকা, মুড়াপাড়া, সোনারগাঁ, ডেমরা, তিতবন্দী, বালিয়াপাড়া, নপাড়া, মৈকুলী, বহারক, চরপাড়া, বাশটেকি, নবিগঞ্জ, সাহাপুর, ধামরাই প্রভৃতি স্থানে মসলিনের স্বতি এখনও তাঁতিরা বহন করেন। তাঁহারা হয়ত ভুলিয়া গিয়াছেন যে, এককালে তাঁহাদের

পূর্বপুরুষেরা জগৎ জয় করিয়াছিলেন এবং শিরাজগতে তাঁহারা রাজচক্রবর্তীর আসনে সমাসীন ছিলেন।

বেখানে পদ্মা, মেঘনা ও ধলেশ্বরী বিরাট জলরাশি লইয়া বহিয়া বাইতেছে,—বেখানে নির্মল সৌরকরোজ্জ্বল আকাশ ঐ নন্দনদীর মতই দিগন্ত প্রসারিত,—বেখানে ডিঙ্গা বাহিয়া জেলেরা তাহাদের অবাধ স্ফুর্তির জ্যোতক ভাটিয়াল গান গাইয়া আকাশ বাতাস ও জলরাশির সুরে সুর মিশাইয়া থাকে—সেই রাজ্যের তত্ত্বাবধান আকাশ, রৌদ্র ও জ্যোৎস্নার বর্ণ ধরিয়া রাখিয়া, জলরাশি ও অস্ত্রের স্বচ্ছতা লইয়া—স্রোতের প্রবহমান গতি আরম্ভ করিয়া বস্ত্রশিল্পের যে বর্ণ, স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্য্য পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা যে “বস্ত্রের স্বপ্ন”, “বিজয়চিহ্ন”, “পরীগণের লীলা”, “সাক্ষাশিশির”, “প্রবহমান নৌয়া”, “গঙ্গাজলী”, “মেঘভূষণ”, “বাতাসের জাল” প্রভৃতি নামে পরিচিত হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি?

মাজাজের অস্ত্রপাতী মহলিপত্তন বন্দর হইতে বিদেশীয় বণিকেরা এই বস্ত্র যুরোপে চালান দিতেন। এই মহলিপত্তন হইতে ‘মসলিন’ নাম বাঙ্গলার কার্পাস বস্ত্র গ্রহণ

করিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন তুরস্কের সম্রাটেরা বাঙ্গলার এই কার্পাস বস্ত্রের পাগড়ী পরিতেন, এজন্ত তথায় ইহার চাহিদা

খুব বাড়িয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন পর্তুগীজ জলদস্যুদের ভয়ে বঙ্গোপসাগরে বাতায়াত কঠিন ও অসুবিধা-জনক হইয়া উঠে, তখন তুরস্কের রাজধানী মোসল নগরের বস্ত্র-নির্মাতারা বস্ত্রের বস্ত্র-শিল্পের অমুকরণে একরূপ স্বল্পবস্ত্র তৈরী করিতে আরম্ভ করেন। সেই নাম হইতে ‘মসলিন’ শব্দের উদ্ভব হয়। আমাদের মনে হয় মহলিপত্তন নাম হইতেই মসলিন নামের উদ্ভব বেশী সম্ভবপর।

মসলিনের নিম্নলিখিত প্রকার ভেদ পরিদৃষ্ট হয় :—(১) খুনো—ইহা ঠিক মাকড়সার জালের মত স্বল্প—ইহা পরিলে কোন কাপড় শরীরে আছে বলিয়াই মনে হইত না। (২) রং—ইহাও খুব স্বল্প। (৩) সরকার আলি—নবাব বাদসাহেরা এই বস্ত্র পরিধান করিতেন, ইহা যেমনই স্বল্প তেমনই শক্ত হইত,—তাঁহাদের উৎসাহের জন্ত এই বস্ত্রের বয়নকারীদিগকে সরকার হইতে জায়গীর দেওয়া হইত। (৪) খাসা—ইহাও স্বল্প ঘন-সন্নিবিষ্ট স্বত্রে প্রস্তুত হইত। আইন আকবরিতে ইহা ‘কসাক’ নামে অভিহিত হইয়াছে। সোনারগাঁয়ে উৎকৃষ্ট খাসা নির্মিত হইত। (৫) সবনম্ (সাক্ষা শিশির) নামেই ইহার পরিচয়—শিশিরের মতই ইহা স্বচ্ছ এবং সফ্যার মতই ইহার বর্ণ। (৬) আবরোয়ান (প্রবাহিত জল-স্রোত), ইহা পরিধান করিয়া জেবউদ্দিনা পিতার নিকট উপস্থিত হইলে আরজেব তাঁহার কন্ডাকে উলঙ্গ ব্রহ্ম করিয়া ভৎসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজ কুমারী সাত বেড় দিয়া কাপড় পরিয়াছিলেন। আবছল আলি ৭০ বেড় লিখিয়াছেন—ইহা স্পষ্টই অতিরঞ্জন।

ইহা ছাড়া তাজেব, সরবন্দ, বদনখাস, আলাবালে, সরবতী, তরদাম, কুমীস, তুরিয়া, নয়নস্বক, চারখানা, মলমল-খাস ও জামদানি প্রভৃতি বহু প্রকারের মসলিন প্রস্তুত হইত। টেলরের টপোগ্রাফী পুস্তকে এই সকল বস্ত্রের স্বত্র-সংখ্যা, ব্যবহার, ওজন, মূল্য প্রভৃতি বিষয়ে

অনেক কথাই লিখিত হইয়াছে। ঢাকার ইতিহাস লেখক ত্রীকুন্ড বতীন্দ্রমোহন রায় তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থে এই সকল বিবরণ বিস্তারিত ভাবে সঙ্কলন করিয়া আলোচনা করিয়াছেন (১৫৪—২২৪ পৃঃ)। ঢাকাই মসলিনের যে সকল শ্রেণীর বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহার অনেকগুলির আবার স্বল্পভেদ আছে, যথা—জামদানী বস্ত্রের মধ্যে, তোড়াদার, কারেলা, বুটাদার, তেরছা, জলবার, পায়াহাজার, মেল, ছবলিজাল, ছাওয়াল, বাল আর, ডুরিয়া, গেদা, মাবুরগা প্রভৃতি নানা প্রকার ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঢাকার মোটা কাপড়ের এক সময়ে খুব আদর ছিল, যথা—বাক্তা, বুদ্রি, এক পাট্টা ও জোর, হাখাম, লুঙ্গি, কসিদা। মসলিনের ছিটও পূর্বে নানারকমের ছিল। যথা—নন্দন-সাহী, আনার-দানা, কবতুর খোপী, সাকুতা, পাছাদার, কুস্তিদার প্রভৃতি। এই যুগে সেই স্বপ্ন ভাবিয়া গিয়াছে, এ দেশের কৌশল, পারিজাত, চিত্তামণির মতই সেগুলি নামে মাত্র পরিণত হইয়াছে। অবনতির দিনেও ১৮০০ খৃঃ অব্দে ঢাকায় ৪৫০০০০, সোনার গাঁয়ে ৩৫০০০০, ডেমরাতে ২৫০০০০, তিত্তবর্দিতে ১৫০০০০ টাকার মসলিন প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দেও ঢাকায় ১৫০০, সোনার গাঁও ডেমরাতে ২০০, তিত্তবর্দিতে ১০৬০ এবং মুড়াপাড়া, আবহুল্লা পুর প্রভৃতি স্থানে ৭০০—সকল সমেত ৪১৬০ খানি তাঁত ঢাকা জেলায় চলিত। বতীন্দ্রবাবু নবাবী আমলের বস্ত্রের চাহিদা ও বিক্রয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হিসাব দিয়াছেন, ইহার অনেক কথাই টেলরের পুস্তকে পাওয়া যাইবে। ১৮০০ খৃঃ অব্দের তালিকা এইরূপ :—

“দিল্লীর বাদশাহের জন্ত সাদা ও বুটাদার মসলিন ও রোপা-খচিত বস্ত্র ১০০০০০ (আর্কট মুক্তা), মুসিদাবাদ নবাবের জন্ত ৩০০০০০, জগৎশেঠের জন্ত ১৫০০০০, তুরানীদের জন্ত ১০০০০০, পাঠান ব্যবসায়ীদের জন্ত ১৫০০০০, যোগল ঢাকা মসলিনের চাহিদা। ব্যবসায়ীদের জন্ত ১৫০০০০, ইংরেজ কোম্পানী ৩৫০০০০, হিন্দু ব্যবসায়ী ২০০০০০, ফরাসী ব্যবসায়ী ৫০০০০, ওলন্দাজ কোম্পানী ১০০০০০ টাকা (১৮৯ পৃঃ)।”

১৭৫৩ খৃঃ অব্দে ২৮৫০০০০ টাকার বস্ত্র বিক্রয় হইয়াছিল। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ঢাকা হইতে ৫০০০০০০ টাকার বস্ত্র বিদেশে প্রেরিত হয়। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে ১৩৬২১৫৪ মূল্যের বস্ত্র ঢাকা হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে ১৩৬২৬০১৮ ৥৫ মূল্যের বস্ত্র ঢাকা হইতে নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল।

ইংরেজরা অনেক কল-কজা করিয়াও ঢাকার এই অপূর্ণ বস্ত্র-শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারেন নাই। ওয়াটসন লিখিয়াছেন, “With all our machines and wonderful inventions we have hitherto been unable to produce a fabric which for fineness or utility can equal the ‘woven air’ of Dacca.”—আমাদের সমস্ত বস্ত্র এবং নানাবিধ অত্যাশ্চর্য্য উপায়গুলি দ্বারাও আমরা এপর্য্যন্ত কি ব্যবহারের পক্ষে উপযোগিতায় কি চারুশিল্প হিসাবে ঢাকার এই “হাওয়ার ইন্ডুস্ট্রি”র সমকক্ষতা করিতে পারি নাই।

বাহারা অসামান্য সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহাদের অসামান্য কঠোর পরীক্ষা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, এই বৃথা বিধাতার নিয়ম। ঢাকার এই বিরাট ও শ্রেষ্ঠ শিল্পটি কিভাবে বিলোপ প্রাপ্ত হইল সেই করুণ ইতিহাস না বলাই ভাল। মুসলমান রাজত্বের শেষদিকে হইতে এই তত্ত্বাবগণ যত বিড়খনা সহিয়াছে, তাহা সাধনার শাস্তি, প্রতিভার প্রায়শ্চিত্ত। দালাল-দিগের হাতে তত্ত্বাবগণ লাঞ্ছনার একশেষ সহ্য করিয়াছে, হতভাগ্যগণ বন্দীশালায় আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের উপর যে সকল জুলুম হইয়াছে, তাহাতে তাহারা প্রাণপণ করিয়াও পারিশ্রমিকের ভাগ নানা জনকে দিয়া তাহাদের হাতে একরূপ কিছুই রাখিতে পারিত না। বড় দুঃখে এই অত্যাচারী ব্যবসায়টি তাঁতিরা ছাড়িয়া দিয়াছিল—সে সকল দুঃখের কথা William Bolts (১৭৭২) তাঁহার Considerations of Indian Affairs নামক গ্রন্থে, Mill তাঁহার History of British India, Sir George Birdwood তাঁহার Report on the Old Records of the India Office এ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডের সহিত প্রতিযোগিতায় এই কারবার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ১৮০০ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড তদদেশজাত বস্ত্রশিল্পের উন্নতিকল্পে ঢাকার মসলিন ইংলণ্ডে বিক্রয় নিষেধ করিয়া আইন পাস করেন।

কারবারীদের কষ্ট ও
কারবার ধ্বংস।

মলমল, আবরোয়া, খুনা, তারেন্দাম, তাঞ্জাব, জামদানি, ডুরিয়া ও
খাসা এই আট প্রকার মসলিনের উপর নিষেধবিধি জারি হইয়াছিল।
ইহার পূর্বেই (১৭৮৭ খৃঃ) ম্যাক্লেইয়ের সঙ্কো-জাত শিল্পের
রক্ষার জন্য মসলিনের উপর শতকরা ৭৫ টাকা কর বাধ্য হয়; বেড়া জালে পড়িয়া
এই শিল্প নষ্ট হইয়াছে।

কিরূপে মসলিন তৈরী হইত, টেলর সাহের তাহার সবিস্তার বর্ণনা দিয়াছেন। সম্প্রতি
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (১৩৩৭, প্রাবণ) প্রবাসী পত্রিকায় কোন সুদক্ষ
ব্যক্তির সাহায্য লইয়া মসলিন বয়ন সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক কথা লিখিয়াছেন এবং চিত্র দ্বারা
বুঝাইয়া দিয়াছেন।

তিনি দেখাইয়াছেন যুরোপের প্রস্তুত নকল মসলিনের হুতায় প্রত্যেক ইঞ্চিতে গড়ে
৬৮০৮ এবং ৫৬০৬ পাক দেওয়া হয়, তৎস্থলে ঐ পরিমিত ঢাকা
মসলিনের হুতায় গড়ে ১১০০১ এবং ৮০০৭টি পাক দেওয়া হইত।
হাতে কাটা হুতা ও কলের হুতার পার্থক্য অনেক। কলে কাটা
হুতা তাদৃশ মজবুত হয় না, কাপড় পরিবার অবোধ্য হয়, অতঃপূর্ব কাপড় ধোপে নষ্ট
হইয়া যায়, কিন্তু হাতে কাটা হুতার মসলিন ধোয়াইলে তাহার চাকচক্য বাড়ে, আরও বেশী
টেকসই হয় এবং ব্যবহারের পক্ষে অত্যন্ত আরামপ্রদ।

সাধারণতঃ যে সকল উৎকৃষ্ট মসলিন তৈরী হইত, তাহার হুতা ৩০ বৎসরের নূন বয়স
যেহেতু প্রস্তুত করিত। বস্ত্রবয়নকারীরা যে যন্ত্রের সাহায্যে মসলিন তৈরী করে তাহাতে
জটিলতা কিছুই নাই। তাহা অতি আদিম প্রণালীতে কয়েকখানি কাঠ, দড়ি ও কয়েকটি
খাণ্ডি দ্বারা প্রস্তুত। এই উপায়ে মসলিনের মত উৎকৃষ্ট বস্ত্র তাহারা কিরূপে নির্মাণ করিত,

তাহা যুরোপীয় শিল্প-সমালোচকগণের বিশ্বয় উৎপাদন করিয়াছে। কেদারবাবু লিখিয়াছেন, “ঢাকার তাঁতিদের দেহের গড়ন ছিপ ছিপে ও কোমল। তাহাদের দৈহিক শক্তি ও উত্তমের ক্রিয়ণ অভাব পরিলক্ষিত হইলেও অপর পক্ষে তাহারা সূক্ষ্মস্পর্শজ্ঞান ও ওজন সম্পর্কে সূক্ষ্ম অকুণ্ঠিত-সম্পন্ন; শুধু তাহাই নহে,—দেহপেশীর পরিচালনে তাহাদের যে অসামান্য ক্ষমতা আছে, তাহার ফলে হাতের আঙ্গুলের সঙ্গে পায়ের আঙ্গুল ঠিক সমান ভালে পরিচালিত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক অর্থে ইহাদের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় বলিয়াছেন যে ইহারা যে সকল বস্ত্রপাতির সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন করিতে পারে, ঐ সকল বস্ত্রপাতি দ্বারা ইয়ুরোপীয় তাঁতিরা তাহাদের শক্ত ও স্থূল অঙ্গুলির সাহায্যে মোটা চট্‌ও তৈরী করিতে কদাচিৎ সমর্থ হয়.....

ঢাকার তাঁতিরা সূতা দেখিবামাত্র তাহার সূক্ষ্মতা ঠিক করিতে পারে, নলের মধ্যে কতটা সূতা থাকানো আছে তাহা ঠিক করিবার তাহাদের কোন ভৌলদও নাই। সূতার শ্রেষ্ঠত্ব চোখ চাহিয়াই ঠিক করে এবং দৈর্ঘ্য ঠিক করিতে হইলে খানিকটা খোলাজমিতে কিছু দূরে দূরে কাঠি পুঁতিয়া তাহাতে সূতা ঘেলিয়া দিয়া স্থির করে।.....সূতা মাপিতে এক হাত দুই হাত করিয়া গণনা করে এবং রতি দিয়া ওজন করে। এক রতির ওজন প্রায় দুই গ্রেন। পূর্বকালে যখন দিল্লীর বাদশাহের দরবারে মসলিন পাঠান হইত, তখন সেই মসলিনের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ছিল ১৫০ হাত, ওজন এক রতি; কিন্তু সময় সময় কম বেশী হইয়া ১৪০ হাত হইতে ১৬০ হাত পর্য্যন্ত হইত। টানায় ১৪০ হাত এবং প’ড়েনে ১৬০ হাত সূতা আবশ্যক হইত” (প্রবাসী, ১৩৩৭ শ্রাবণ)।

সূতা প্রস্তুত করিবার প্রণালীও অতি সূক্ষ্ম শিল্পকলার পরিচায়ক। বেশী গরমে সূক্ষ্ম সূতা হইতে পারিত না। কাটুনীরা প্রহ্লাষ হইতে বেলা এক প্রহরের মধ্যে সূতা কাটিত। কিন্তু অত্যাংকুষ্ট সূতা সূর্যোদয়ের পূর্বে ভাল হয়। যদি গরম বেশী হয়, তবে একটা আধারে জল রাখিয়া তাহার উপর সূতা কাটা হইত। জলের স্বাভাবিক বাষ্প গরমের সময় সূতা কাটার অম্লকূল।

সূক্ষ্ম মসলিন ধোওয়াও নানারূপ উপায়ে সম্পাদিত হয়—পাটে আছড়াইলে ইহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। প্রথমে কাপড়খানি ঈষৎ উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া পরে সাজিয়াটি ও সাবানের জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। তারপর এক নবদুর্জাদল যুক্ত খোলা-স্থানে উজ্জল রোজ-করে শুকাইতে হয়। আধা শুকনো হইলে মসলিন পুনরায় জলে সিদ্ধ করিয়া সর্বশেষ নেবুর রসযুক্ত খুব পরিষ্কার জলে সিদ্ধ করিয়া কিছুকাল রাখিয়া দিতে হয়। যে সকল কাপড়ের সূতা ব্যবহারের দরুন এদিক সেদিক সরিয়া গিয়াছে তাহা সোজা করিবার প্রথাকে ঢাকার লোক ‘কাটা করা’ বলে। উহা ঢাকার নর্দিয়া নামক এক শ্রেণীর লোকেরাই জানে; ঢাকা ছাড়া অন্ততঃ ঢাকার মসলিন তেমন সুন্দর করিয়া কেহ ধোত করিতে পারে না, কারণ অন্য কোন স্থানে এই ‘কাটা করা’র রীতি পরিচিত নহে।

ঢাকার রিপুকরেরা মসলিনের চোঁড়া জায়গাগুলি এমন সুন্দরভাবে মেরামত করিতে পারে যে তাহাতে রিপুর চিহ্নমাত্র থাকে না। টেলর সাহেব লিখিয়াছেন ঢাকার রিপুকর্মীরা অহিফেন খাইয়া রিপু করিতে বসে, তাহাতে নাকি তাহাদের কাজের নেশা বাড়িয়া যায় এবং রিপু উৎকৃষ্ট হয় (Topography of Dacca, p. 176) ।

হুতা কাটার ছই প্রধান বস্ত্র চরকা ও ডলন কাঠি। খুব ভাল মসলিলেন হুতা ডলন কাঠি দিয়া তৈরী করিতে হয়। দশইকি দৈর্ঘ্য একটি হুঁচের নিম্নভাগে ক্ষুদ্র গোলাকৃতি মৃত্তিকা রাখিয়া দেওয়া হয়, উহাকে “ডলন কাঠি” বলে। টেকো চালাইবার সময় হাত ঘামে ভিজিলে খড়ির গুঁড়া দিয়া ঘাম শুকাইয়া লইতে হয়। ডলন কাঠির সাহায্যে ছই আঙ্গুলে টেকো ঘুরাইতে বেশ ভার বোধ হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে অধিক লেখা নিম্নপ্রয়োজন, যেহেতু হুতা ও কাপড়ের প্রস্তুত-প্রণালী স্বচক্ষে না দেখিলে ইহার একটা পরিষ্কার ধারণা করা অসম্ভব।

ঢাকার মসলিন বহু প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভেই ইহার খ্যাতি জগন্ময় প্রচারিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় যুগের পরেও জগতের ঈশ্বর সমকক্ষ দিল্লীর ঈশ্বরেরা উত্তর-কালে এই কারবারটা বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বরগণ ময়ূরসিংহাসনে বসিতেন, তাজমহলের সৃষ্টি করিতেন, মসলিন পরিতেন এবং যমুনার নীলসলিলে দেওয়ানী খাসের প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেন ; এই যুগে ইহাদের কোনটির মতই কিছু হয় নাই।

ঢাকার মসলিন সম্বন্ধে ১৮৬০ খৃঃ অব্দে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ‘শিল্পিক দর্শন’ নামক পুস্তকে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার অনেকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

“ঢাকাই বস্ত্র সকলেরই প্রিয় ; অপিচ হিন্দুদিগের শিল্পকর্মণৈপুণ্য বিষয়ে এই অল্পপম বস্ত্র এক মহতী ধ্বজা। পৃথিবীর সর্বত্র সকল পারদর্শী তত্ত্ববাদের ইহার জুলা বস্ত্রবয়নে বহুকালাবধি বস্ত্রশীল আছে ; কিন্তু অস্বদেশীয় এই জয়পতাকার গর্ব খর্ব করিতে অতাপি কেহই সক্ষম হয় নাই। ঢাকাই বস্ত্র বংশরোনাতি সামান্য বস্ত্রে প্রস্তুত হয়, কিন্তু এই সামান্য বস্ত্র ও তত্ত্বাবহারকর্তৃদের কি আশ্চর্য ক্ষমতা, যে বিলাতের অধিতীয় শিল্পকুশল ব্যক্তিরা বহুমূল্য বাস্পীয় বস্ত্রসহকারেও তাদৃশ হস্তবস্ত্র প্রস্তুত করণে পরাস্ত হইয়াছে। ছই সহস্র বৎসর পূর্বে এই অল্পপম বস্ত্র প্রাচীন রোম রাজ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া হিন্দুদিগের শিল্প-সাফল্যের অনির্বচনীয় প্রমাণ স্বরূপ গণ্য ছিল ; এবং অধুনা ইংলওদেশের তত্ত্ববাদেরিগের তিরস্কার স্বরূপ জনসমাজে বিখ্যাত আছে। জনৈক যুরোপীয় শিল্পকর ইহার প্রশংসায় কহিয়াছিলেন যে ‘বোধহয় ইহা বিজ্ঞানদরী ও অগ্নিরারা বপন করিয়াছে ; এতাদৃশ হস্তবস্ত্র মনুষ্যের দ্বল হস্তে সম্ভবে না।’ ফলতঃ এই প্রশংসা অপ্রযোজ্য নহে।

“ঢাকা প্রদেশের সর্বত্র এই উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হয় ; পরন্তু পশ্চাৎ লিখিত নগর সকল ইহার প্রধান বাণিজ্য স্থল ; তন্মধ্যে : ঢাকা, সুবর্ণগ্রাম, ডুমরা, তিতবাদী, জঙ্গলবাড়ী ও বজেন্দপুর। এই সকল নগরী মধ্যে ঢাকা সর্বোত্তমভাবে সুপ্রসিদ্ধ। এতদনগরীর বস্ত্রার্থে

পূর্বকালে পৃথিবীর সকল অসভ্যদেশ হইতে বনিগ্ৰবর্ণ ঐ স্থানে আগমন করিত। অধুনা অল্পমূল্যের বিলাতি বস্ত্র ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হওয়াতে বহুমূল্য ঢাকাই বস্ত্রের প্রতি জনগণের তাদৃশ অহুরাগ ও স্পৃহা নাই; তথাপি ঐ নগর নিতান্ত শ্রীলষ্ট হয় নাই। অত্য়াপি তথায় নানাবিধ ব্যবসায়ীদিগের সমাগম হইয়া থাকে।

“বস্ত্রবয়নের প্রথম ক্রিয়া সূত্র প্রস্তুত করণ। এই কৰ্ম এদেশীয় পল্লীগামের স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই স্ত্রীলোকদিগকে সামান্য লোক কাটনী বা ‘সূতা কাটনী’ বলিয়া থাকে। এই কাটনীদিগের স্বগিস্থিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তদ্বারা ইহার সূত্রের স্বত্ব—তারতম্য যে প্রকার উত্তমরূপে করিতে পারে পৃথিবী মধ্যে এরূপ আর কুত্রাপি কোন জাতীরেয়া পারে না। অল্পবয়স্কা স্ত্রীরা সর্কোংকষ্ট সূত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। বয়ঃক্রম ত্রিশং বৎসর অতীত হইলে তাহাদিগের নয়ন ও স্বগিস্থিয় তৎকর্মে অপটু হয়, সূতরাং তাহারা আর তত উত্তম সূত্র প্রস্তুত করণে সক্ষম থাকে না। পূর্কালে বেলা ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ও অপরাহ্নে ৪ ঘটিকার পর সূত্র কাটিবার সময়, এতদ্ব্যতীত অন্য সময়ে বিশেষতঃ রৌদ্র প্রখর থাকিলে, উত্তম সূত্র প্রস্তুত হয় না। ‘মলমলখাস’ নামক সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্র বুনিবার সূত্র অতি প্রত্যায়ে কাটিতে হয়; এবং যতপি সেই সময় কাটনীর চতুর্ভুক্ত স্থানে শিশির না থাকে, তবে এক পাড়ে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া তত্পরি সূত্র কাটিবার প্রয়োজন হয়; নচেৎ সূত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এই প্রকারে যে সূত্র প্রস্তুত হয় তাহা উর্গনাভের সূত্র হইতেও স্বত্ব। ইহার ১৭৫ হস্ত সূত্রের পরিমাণ এক রতি মাত্র। ফলতঃ ইহার একসের পরিমাণ সূত্র বিস্তার করিলে প্রায় ৪০০ জ্যোতিষীয় কোশ স্থান ব্যাপ্ত হয়।।। অপিচ এই অদ্বুত সূত্র বাদৃশ স্বত্ব ইহা প্রস্তুত করণের শ্রমও তৎপরিমাণে বহুল। ছইমাস কাল নিয়ত পরিশ্রম করিলে এক তোলাক পরিমাণ সূত্র প্রস্তুত হয়; সূতরাং ইহার মূল্যও অত্যন্ত অধিক। একসের সর্কোংকষ্ট সূত্র ৬৪০ টাকার ন্যূনে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সূত্র প্রস্তুত হইলে ‘ফেটা’ বা ‘লুটার’ আকারে রাখিতে হয়। পরে তত্ত্বায়েয়া ঐ ফেটা বা লুটা জলে ভিজাইয়া উহা বংশনির্গিত এক চরকিতে বেটন করিয়া ঐ সূত্কে ছই অংশে পৃথক্ করে, বাহা উত্তম তাহা ‘টানার’ (বস্ত্রের লম্বসূত্র) নিমিত্তে ব্যবহার হয়, এবং অবশিষ্ট ‘পড়েনের’ (বস্ত্রের প্রস্থসূত্র) উপযোগ্য। সূত্র ঐ প্রকার পৃথক্ পৃথক্ হইলে টানার সূত্র তিন দিবস নির্মল জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। চতুর্থ দিবসে উহা হইতে নিম্পীড়ণ করত ঐসূত্র এক চরকিতে বেটন করিয়া রৌদ্রে শুক করিতে হয়। অনন্তর তাহা অঙ্গারচূর্ণ মিশ্রিত জলে পুনরায় ভিজাইতে হয়। অঙ্গারচূর্ণের পরিবর্তে ভূয়া অর্থাৎ পাক-পাড়ের তলজাত অঙ্গারবৎ পদার্থও ব্যবহৃত হয়। ছই দিবস এই জলে রাখিয়া ঐ সূত্কে পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া ছায়ায় শুক করা হয়। অতঃপর ঐ সূত্র পুনরায় এক রাত্রিকাল পরিষ্কার জলে ভিজান থাকিলে মাড় দিবার উপযুক্ত হয়। ঢাকা অঞ্চলে খৈয়ের যণ্ডের ব্যবহার আছে এবং উহা সূত্রোপরি লিপ্ত করিবার পূর্কে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ ধূনা মিশ্রিত করিয়া থাকে। এই প্রকারে টানার সূত্র প্রস্তুত হইলে তাহাকে

‘উত্তম’ ‘মধ্যম’ ও ‘অধম’ সূত্র মধ্যভাগে ব্যবহার করিয়া থাকে ; সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্রবয়ন কালেও এই নিয়মের অঙ্গনা করে না। ‘পড়েন’ প্রস্তুত করণে পূর্ববৎ পরিশ্রম নাই। তাহাকে একরাত্রি কাল জলে ভিজাইয়া তৎপর দিবস প্রাতে মণ্ডে লিপ্ত করিতে হয় ; পরন্তু টানার সূত্র এককালে প্রস্তুত করিতে হয়। পড়েনের সূত্র প্রত্যহ প্রস্তুত করিতে হয়। এককালে এক ধানের ব্যবহারোপযোগী সূত্র প্রস্তুত করিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

“পূর্ব প্রকারে সূত্র প্রস্তুত হইলে বধানিয়মে বপনকর্ম আরম্ভ হয় ; কিন্তু স্থান সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত তাহার বিস্তারিত বিবরণে অধুনা নিরস্ত থাকিতে হইল। ‘মলমলখাস’ বস্ত্রবপনের উত্তম সময় আষাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাদ্র মাস। এতদ্ভিন্ন অল্প সময়ে তৎকর্ম করিতে হইলে তাইতের নীচে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া কেবল প্রাতঃকালে পরিশ্রম করত তাহা সুসম্পন্ন করিতে হয়। ঢাকা প্রদেশে যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে মলমলখাস, সরকার আলি, খুনা, রঙ্গ, আবরওয়া, খাসা, শবণম, আলাবালী, তঞ্জাব, তরন্দম, সরবন্দ, সরবতী, কোমিস, ডোরিয়া, চারখানা এবং জামদানী—এই কয়েক প্রকার বস্ত্র সর্বপ্রসিদ্ধ।

“মলমলখাস মুসলমান রাজাদিগের আধিপত্য সময় রাজপরিবারেরা ব্যবহার করিত। তৎপ্রযুক্ত ইহা ‘খাস’ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার টানায় ১৮০০ সূত্র থাকে এবং এক অর্দ্ধ (আধি) ধানের পরিমাণ ৮ তোলা ৭০ আনা মাত্র !!! ঐ ধান অনায়াসে এক অঙ্গুরীর মধ্য দিয়া চালিত হইতে পারে। ইহা বপনে ছয়মাস কাল ব্যয় হয় এবং ইহার মূল্য ১০০/১৫০ টাকা।

“সরকার আলি পূর্বাশ্রমের মধ্যম। রাজপ্রতিনিধিরা ইহা ব্যবহার করিত এবং ইহার টানায় ১৯০০ সূত্র থাকে। ‘খুনা’ বস্ত্র এমত অত্যন্ত সূক্ষ্ম যে ইহা পরিধান করিলে শরীরোপরি বস্ত্র আছে এমন বোধ হয় না। ইহার তুলনায় ‘গাজ’ নামে প্রসিদ্ধ বস্ত্রও অতি স্থূল জ্ঞান হয়। ইহার দুই হস্ত প্রশস্ত বস্ত্রে ২০০০ টানার সূত্র থাকে। মুসলমান রাজমহিষীরা ও নর্তকীরা এই বস্ত্র ব্যবহার করে। অস্ত্র ইহার ব্যবহার নাই। প্রাচীন বৌদ্ধ-গ্রন্থে এই বস্ত্রের ব্যবহার দ্রোলোকের পক্ষে নিষেধ আছে। তাবর্ণিয়ার সাহেব লেখেন যে মুসলমান রাজাদিগের আজ্ঞাক্রমে কোন বণিক এই বস্ত্র ক্রয় করিয়া স্থানান্তর করিতে পারিত না। ‘রঙ্গ’ বস্ত্র পূর্ববৎ, কেবল বপনের প্রথা স্বতন্ত্র। ইহার টানায় ১২০০ সূত্র মাত্র থাকে। ‘আবরওয়া’ অতি প্রসিদ্ধ বস্ত্র। ইহার তুল্য স্বচ্ছ বস্ত্র আর কুড়াপি হয় নাই। ইহার টানায় ৭০০ সূত্র মাত্র থাকে। যবনেরা ইহার স্বচ্ছতা প্রোতোজলের তুল্য জ্ঞান করিয়া ইহাকে ‘আব’ (বারি), ‘রওয়া’ (গতিবিপ্লিষ্ট) উপাধি দিয়াছেন। এই বস্ত্রোদ্দেশে কথিত আছে যে কোন সময় আরঙ্গজেব বাদশাহ স্বতনয়ার বর্ণ তাহার বস্ত্র ভেদ করিয়া প্রকাশ হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার করাতে সে কহিয়াছিল, “পিতঃ, সপ্তপুত্র বস্ত্র পরিধান করিয়াছি, তথাপি কেন তিরস্কার করেন ?” ‘খাসা’ বা ‘জঙ্গল খাসা’ পূর্বে সোনারগাঁয়ে প্রস্তুত হইত। ইহা অস্ত্রাচ্ছ মলমল অপেক্ষা ঘন এবং অধিক প্রশস্ত। ৩ হস্ত প্রশস্ত খাসা অপ্রাপ্য নহে। ‘শাবণম,’ এই মলমল অতি মনোহর। ইহা রজনীযোগে

তৃণময় ক্ষেত্রে বিস্তৃত করিয়া রাখিলে শিশির দ্বারা সিক্ত হইয়া পর প্রাতে শুষ্ক হয় ; ক্রমাগত যত দিবা বৃদ্ধি হইতে থাকে তত শিশির শুষ্ক হইলে তাহা পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয় । সর্বোত্তম শবণমের টানায় ৭০০ হুত্র থাকে ।”

রেশম

বঙ্গদেশে রেশমের কীট-উৎপাদকদিগের নাম তুতচাষী । তুতপত্রের জন্ত সাধারণতঃ ১০ বিঘা জমির প্রয়োজন । তুত চারি প্রকার, ১ম সার,—পত্রবৃহৎ ও ফল কালো বর্ণ হয় ; ২য় ভোর—পত্র অপেক্ষাকৃত ছোট—হালী ও মেনদীপুর অঞ্চলে ইহা বেশী জন্মে ; ৩য় দেশী ; ৪র্থ চীনি ।

পূর্বে বঙ্গদেশে চারি প্রকারের কীট দ্বারা রেশম প্রস্তুত হইত । ১ম বড়—ইহাতে বৎসরে একবার মাত্র রেশম জন্মে । ২য় দেশী—বৎসরে ইহা হইতে পাঁচবার রেশম হয় । ৩য় চীনি (অপর নাম মাদ্রাজী)—বৎসরে ছয় সাতবার রেশম হয় ; ৪র্থ বর্ষশব্দর—দেশী ও চীনি কীটের মিশ্রণে জন্ম—ইহাতে উত্তম রেশম হয় না ।

রেশমের কীটকে তুতচাষীরা সাধারণতঃ “পুলো,” “পোকা” বা “পোক” বলে । দেশী কীটের ডিম বসন্তকালে ১০ দিনে, বৈশাখে ৮ দিনে, আষাঢ় মাসে ৭ দিনে ও শরৎকালে প্রায় দুই মাস পরে ফুটিয়া থাকে । বড় কীটের ডিম ফাল্গুনের শেষে জন্মে এবং দশমাস পরে অর্থাৎ মাদ মাসের প্রথমে কীটাবস্থায় পরিণত হয় । ফাল্গুনের শেষে ৪০টি পুংকীট ও ৪০টি স্ত্রীকীট ভাল হইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২৮০০ (১০ কাহন) হুত্র হুত্র ডিম প্রসব করে । ডিমগুলি প্রথম পীতাভ তারপর মেটে পাথরের বর্ণ হয় । নব জাত কীটদিগকে চাষীরা প্রত্যহ চারবার নূতন তুতের পাতা খাইতে দেয় । চারিদিন তুতের পাতা খাইয়া কীটগুলি ঘুমাইয়া পড়ে । এই ঘুমকে চাষীরা “আধারে ঘুম” বলে । এই ঘুম দুইদিন পর্যন্ত থাকে ; ঘুম ভাঙ্গিলে কীটের চর্ম পরিবর্তিত হইয়া অশ্লীল চর্ম হয় এবং এই অবস্থায় তাহারা পুনরায় তুত খাইতে থাকে । এই খাওয়া ও তৎপরবর্তী অপরিহার্য ঘুম—এই প্রক্রিয়া ৪ বার হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে বহু পরিবর্তন করিয়া কীট ৩২ অশ্লীল প্রমাণ দীর্ঘ হয় । এইবার পুনরায় ইহাদিগকে ১০ দিন তুত খাইতে দেওয়া হয়—তারপর তাহারা আর কিছু খাইতে চাহে না । এই সময় একটা ডালা হইতে তাহাদিগকে দরমা দিয়া প্রস্তুত ২৫০ হাত প্রস্থ এবং ৩৫০ হাত দীর্ঘ অপর একটা আধারে রাখা হয় । এই আধারের নাম “ফিং” । ফিংএর উর্ধ্বে দুই অশ্লীল গভীর তিন অশ্লীল প্রস্থ সর্ব বাশের খোপ সকল নির্মিত থাকে । চাষীরা ঐ খোপে এক একটি কীট রাখিয়া দেয় । তখন কীটগুলি তাহাদের মুখ হইতে এক প্রকার হুত্র বাহির করিয়া স্বীয় দেহ আবৃত করে । ক্রমাগত ৫৬ ঘণ্টা হুত্র প্রস্তুত করার পর কীটেরা নিশ্চক হইয়া পড়ে । এই শুষ্ক প্রস্তুত হওয়ার ৪৫ দিন পরে চাষীরা

এটি মধ্যস্থ কীট রোগের উদ্ভাৱে অথবা “তুন্দুর” নামে গৃহে রাখিয়া নিহত করে, তৎপরে ওটিগুলি তত্ত্ব জলে সিদ্ধ করিলেই অনায়াসে স্বত্র প্রস্তুত হয়।

এখনও বহরমপুর বাঙ্গলার রেশমী বস্ত্রের গৌরব কতক পরিমাণে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। “রেশম” ফার্সি শব্দ। আমাদের দেশে এইরূপ বস্ত্রের নাম ছিল ‘কৌষেয়’ ‘ফোম,’ ‘পট’। রামায়ণে সীতার পীত কৌষেয় বাসের উল্লেখ আছে। মহাভারতে সভা পর্বে দৃষ্ট হয়, হিমালয়ের উত্তর প্রদেশস্থ শক জাতীয় রাজারা যুদ্ধটিরকে “কীটজ বস্ত্র” উপঢৌকন দিয়াছিলেন। ভারতীয় সাহিত্যে চীন দেশীয় রেশমী বস্ত্রের অনেক স্থলে উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রথের পতাকা পর্যন্ত চীনা বস্ত্রে প্রস্তুত হইত। এ সম্বন্ধে কালিদাসের সুপরিচিত “চীনাংগকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানশ্চ” সহজেই মনে পড়িবে।

চীন সম্রাট ফোহির (Fo-hi) বংশোদ্ভব রাজা চীননং (Chin Nong) ২৮০০ খৃঃ পূর্বে রেশমী বস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। ২৬০২ খৃঃ পূর্বে চীন সম্রাট হোয়েনটি (Hoan Ti) তাঁহার পাটরাণী সিলিং চিকে (Si-Ling-Chi) রেশমী স্বতার উৎকর্ষ সাধনের ভার প্রদান করেন। এ বিষয়ে রাজ্যীর কৃতিত্ব এত বেশী হইয়াছিল যে, লোকে তাঁহাকে রেশমের দেবতা বলিয়া জানিত।

Economics of Silk Industry নামক পুস্তকের লেখক আর. সি. রওয়াল্লি (R. C. Rawalley) প্রকৃতি রেশমতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারতবর্ষের রেশম—এই দেশজ, উহাকে অল্প কোন স্থান হইতে আনিতে হয় নাই। শুধু রামায়ণ মহাভারতে নহে, পুথিবীর আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদেও ইহার উল্লেখ আছে। মহু বহু স্থানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, (পঞ্চম অধ্যায়, ১২০ শ্লোক; নবম অধ্যায়, ১৬৮ শ্লোক; ষাটশ অধ্যায়, ৬৪ শ্লোক)। বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতে এই বস্ত্রের যে যে নাম পাওয়া যায় (উর্ণ, কৌষেয়, কীটজ, ফোম) তাহাদের কোনটিরই চীন দেশীয় রেশমী বস্ত্রের নামের সঙ্গে সাদৃশ্য নাই। সে সকল নাম ভারতবর্ষের নিজস্ব, এবং এই বস্ত্রের উল্লেখ বখন খৃষ্ট জন্মবার বহু পূর্বে হইতে (চীনদেশীয় বস্ত্রের আদিকাল হইতে প্রাচীনতর সময়ের) ভারতীয় সাহিত্যে পাওয়া যাইতেছে—তখন এই শ্রেণীর বস্ত্র এদেশেই উৎপন্ন হইয়াছিল, পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, (R. C. Rawalley's Economics of Silk Industry, p. 15)।

ইয়ুরোপে এই বস্ত্র দুর্লভ ছিল। রোমের রাজারা এই বস্ত্রের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। কিন্তু ইহা এত দুর্লভ ছিল যে রাজরাণীগণও ইহা পরিতে পাইতেন না। সম্রাট আরিলিয়ানের পত্নী একটা অঙ্গরক্ষা এই বস্ত্রে বানাইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সম্রাট বহুবায়-সাধ্য বলিয়া তাহা রাজ্যীকে দিতে সম্মত হন নাই। ১৬০০ বৎসর পূর্বে রোম সম্রাট হেলিওসেবলস রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন বলিয়া তৎদেশীয় রাষ্ট্রসভা তাঁহাকে অপরিমিত ব্যয়শীলতার জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন। খৃষ্ট জন্মবার অল্প সময় পরেই যুরোপে ভারতীয় রেশমেরই পরিচয় হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের প্রাচীন লেখকদিগকে করুণাপ্রিয় ও ইতিহাস-জ্ঞান-শূন্য বলিয়া নিন্দা করিতে যুরোপীয় পণ্ডিতগণের কেহ কেহ উৎসাহ বোধ করেন। কিন্তু তাঁহারা যে বাস্তবক্ষেত্রেও কোন জাতি হইতে নান নহেন, যুরোপীয় প্রাচীন লেখকগণই তাঁহাদের গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ইসনার্ড লিখিয়াছেন, শুধু তুত খাওয়াইয়া একটা গাভীকে বহুদিন রাখিয়া দেওয়া হয়, তারপর তাহার বাছুর হইলেও তাহাকেও তুত খাওয়াইয়া শেষে মারিয়া ফেলা হয়। ঐ বাছুরের মাংস একটা পায়ে রাখিয়া দিলে তাহা পচিয়া যায় এবং তন্মধ্যে রেশমী কীট দেখা দেয়,—সেই কীটজ হুত্রে ভারতীয় কোষেয় বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যে গৃহে এইভাবে কীটের ক্রমবিকাশ হয়—তাহার নাম “বানক”; ইহার পরিমাণ ১০ হাত দীর্ঘ, ১০ হাত প্রস্থ, ৬ হাত উচ্চ। এই গৃহে পর পর পাঁচটি মাচান থাকে, প্রত্যেক মাচানে ১৬টি ডালা—উহার পরিমাণ ৩৮ হাত দীর্ঘ, ও ২৮ হাত প্রস্থ; এক একটি ডালায় ৩২০০ কীট রক্ষিত হয়। সুতরাং সকলগুলি ডালাতে ২,৫৬,০০০ কীট পালিত হইতে পারে। এই গৃহে এককালে তিন মণ, তিন সের রেশম প্রস্তুত হয়—তাহা ছাড়া আরও কিছু অল্পদরের রেশম পাওয়া যায়—তাহাকে “ওছা রেশম” বলে।

রেশম দৌত করিয়া মাজা ঘষা করিতে হয়। তাহাতে প্রতি সেরে এক পাদ পরিমাণে রেশম নষ্ট হয়। চীনি গুটীতে এক রতি পরিমাণ রেশম জন্মে এবং ঐ রেশম প্রায় ৮০০ হাত দীর্ঘ হয়। ঐ রেশমের বাট তোলায় এক জোড়া উত্তম গরদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই পরিমাণ বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পাঁচ হাজার সাতশো বাট (৫৭৬০) গুটীর সূত্র দরকার।

এ সম্বন্ধে ৯২ বৎসর পূর্বে এক বিখ্যাত বাঙ্গালী পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন, “৫৭৬০ জীবের প্রাণ নষ্ট না করিলে এক জোড়া গরদের বস্ত্র পরিধান করা অসাধ্য। অধুনা যাহারা অবিরত বৈধ হিংসার নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাস্য যে তসর, গরদ, চেলি, সাটিন ও মকমল ইত্যাদি কীটজ বস্ত্র তাঁহারা কি বিবেচনায় ধারণ করেন? তাঁহারা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন যে বিংশতি বৎসর প্রত্যহ ছাগমাংস ভক্ষণে বস্ত্র সংখ্যক জীবহত্যা ঘটে, এক জোড়া গরদের বস্ত্রার্থ ততোধিক পাণের (?) সম্ভাবনা; কারণ উক্ত বস্ত্রের প্রত্যেক গজ-পরিমিত পদার্থ প্রস্তুতকরণে সহস্রাধিক জীবের প্রাণহানি হয়। ১২৪৯ বঙ্গাব্দে (১৮৪১ খৃঃ) ১৬,১১৮।০ মণ রেশম ও ৭৬, ৮৪৬ ধান কোড়া আর ৭,৫৮,৭৮০ ধান রেশম মিশ্রিত কার্পাস বস্ত্র বঙ্গদেশ হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। তন্নিম্ন এতদ্দেশে যে রেশমের বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল তৎসমুদয় প্রস্তুতকরণার্থে ১,২০,০০০ মণ রেশমের আবশ্যক; এবং এই রেশম উৎপন্ন করণার্থ প্রতিবর্ষে অভাবতঃ ৮,৩২,৫২,০৩,২৫২ জীব-হত্যা হইয়া থাকে। বৈধহিংসাধর্মী মহাশয়েরা কোষেয় বস্ত্র ব্যবহারে বিরত হইলে উক্ত সংখ্যক জীবের অনেকে রক্ষা পাইতে পারে।।।” (বিবিধার্থ সংগ্রহ, ২য় পর্ক, ২৫ পৃঃ ।)

নৈতিক ও অধ্যাত্ম জগতের এই গুঢ় প্রশ্ন সমাধানের আমাদের অবকাশ নাই। কিন্তু উপরে যে সংখ্যার অঙ্ক দেওয়া হইল তাহা দ্বারা ৯২ বৎসর পূর্বে ইংরেজ রাজত্বের প্রাকালে

আমাদের রেশম, ব্যবসায়ীদের যে সমৃদ্ধি ছিল তাহার কথা স্বতঃই মনে হইবে। আমরা যোগল রাজত্ব পর্য্যন্ত এই ইতিহাসের দাঁড়ি টানিয়াছি। সুতরাং পরবর্ত্তী সময়ের বঙ্গের বাণিজ্য-ঋৎসের বিবাদময় তুলনা-মূলক চিত্র উদ্ঘাটন করা আমাদের বিবদ-বহির্ভূত। এখন সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে যে রেশম বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, তাহার একটা তালিকা আমার টেবিলের উপর আছে। এই তালিকা হইতে শুধু বঙ্গদেশের অংশটা কতক পরিমাণে অনুমান করা যাইতে পারে। ১৮৬৭—৬৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার রেশম বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৮৮৭—৮৮ অব্দে যে চালান যায় তাহার মূল্য শুধু ৪০ লক্ষ টাকা। ১৮৯২—৯৩ অব্দে রপ্তানি বাড়িয়া গিয়াছিল, উহার মূল্য ৬৭,১৫,০০০ টাকা—ইহা সমস্ত ভারতবর্ষের হিসাব।

বাঙ্গালীর পাণ্ডিত্য

আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি, বঙ্গদেশে বহু পূর্বে আৰ্য্য-নিবাস হইয়াছিল এবং অধিবাসীরা বেদোক্ত ধর্ম পালন করিতেন। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, আসামের পাহাড়ে এখনও বৈদিকধর্ম-পালনকারী এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাহারা ঠিক বৈদিক ঋষিদের মন্ত্রের অনুরূপ মন্ত্র জপ করিয়া বৈদিক অনুষ্ঠান করেন।

পরবর্ত্তী জৈন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এদেশে বৃদ্ধি পাওয়ার পরে এবং এদেশের জনসাধারণ স্বভাবতঃই পশু-বধ-বিরোধী হওয়াতে বৈদিকধর্ম এদেশে ততটা প্রচলিত হইতে পারে নাই। মহাত্মা যের উদাহরণ-প্রসঙ্গে পতঞ্জলি লিখিয়াছেন, “লোকেষ্বর আজ্ঞাপয়তি.....প্রাগজং গ্রামেভ্যো ব্রাহ্মণা আনীয়স্তামিতি।” এই লোকেষ্বর শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণ রাজা পুষ্যমিত্র। তিনি বৌদ্ধ প্রভাবে পূর্বদেশ বৈদিকাচার-বিরহিত দেখিয়া তথায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, উহা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর কথা।

কিন্তু নিম্নস্তরে যদিও জৈন ও বৌদ্ধধর্ম বিশেষ করিয়া প্রচলিত হইয়াছিল, তথাপি খৃষ্টীয় প্রথম দিক্কার কয়েক শতাব্দীতে এদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কোন কালেই অভাব হয় নাই। তাম্রলিপিতে ইহার বহুল প্রমাণ দৃষ্ট হয়। দামোদরপুরের (দিনাজপুর) পাঁচখানি তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয়, খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে এদেশে ব্রাহ্মণগণ “অগ্নিহোত্র” ও “পঞ্চ মহাযজ্ঞ” সম্পাদন করিতেন, গুপ্তভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষে এই সকল বৈদিক কার্য্য অমুষ্ঠিত হইত। ফরিদপুর জেলার তিনখানি তাম্রশাসনে জানা যায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বঙ্গদেশের “বারক মণ্ডলে” বহুর্কোন্দের বাজাসন শাখাবলদী ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন। ত্রিপুরার তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয় প্রদোষ শর্মা নামক জনৈক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ চারিবেদে অভিজ্ঞ শতাব্দিক ব্রাহ্মণকে তদ্রূপে উপনিষিত করাইয়াছিলেন। নেপালের রাজকীয় পুথিশালায় চতুর্ভূজ-বিরচিত হরিচরিত কাব্যের পুস্তিকায় দৃষ্ট হয়, পালবংশীয় ধর্মপালের রাজত্বকালে

ইহারই কাছে ভাষা শিক্ষা করিতেন।" মৃত্যুঞ্জয় প্রণীত প্রবোধচন্দ্রিকার ইংরেজী ভূমিকায় মাস'ম্যান লিখিয়াছেন, "মৃত্যুঞ্জয় বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের অন্ততম" ("One of the most profound scholars of the age"). এই প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের শুধু পাণ্ডিত্য নহে, ইহাদের নৈতিক দৃঢ়তা ও ধর্মবিশ্বাস দেখিয়া সেই সকল সুপণ্ডিত পাত্রী সাহেবেরাও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। কেরি সাহেবের জীবনচরিতে লিখিত হইয়াছে যে এক সদাশয় ব্রাহ্মণ একদা একটি লোককে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন; এই ব্যাপার আদালতের বিচারাধীন হয়, এবং ব্রাহ্মণকে সাক্ষী মানা হইয়াছিল। কিন্তু সাক্ষীকে আদালতে যাইয়া শপথ লইতে হয়। ব্রাহ্মণ শপথ লইতে অস্বীকার করেন, এই অপরাধে মহাত্মা ব্রাহ্মণকে হাজত ভোগ করিতে হয়। তিনি একটি লোককে জীবন দান করিয়াছিলেন, প্রতিদান স্বরূপ আদালত তাঁহার উপর এই উৎকট ব্যবস্থা করিলেন। ফোভে ব্রাহ্মণ হাজতে তিন দিন তিন রাত্রি উপবাস করিয়া রহিলেন, প্রাণত্যাগ করিবেন তবুও আদালতে শপথ গ্রহণ করিবেন না, এই তাঁহার পণ। এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সাধুচরিত্র ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান দেখাইয়া কেরি সাহেব বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎপূর্বক তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। বঙ্গদেশে তখনও বৈষ্ণব ধর্মবিশ্বাস ও সাধুতা বিরাজ করিতেছিল, তাহা দেখিয়া পাত্রীরা অনেক সময় বিলাপ করিয়া বলিতেন, "কুসংস্কার সবেও হিন্দুরা তাঁহাদের ধর্মের প্রতি বৈষ্ণব অচলা ভক্তি ও ঐকান্তিকী নিষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন, আমাদের খৃষ্টানদিগের মধ্যে তাহার সিকি পরিমাণ অমুরাগও তো দেখিতে পাই না।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ, ৫৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

টমাস সাহেব নবদ্বীপে যাইয়া তৎকালীণ পণ্ডিতদের আশ্চর্য্য চরিত্রবল, নির্ভীকতা ও প্রগাঢ় বিভাবুদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সেই যুগের বাঙ্গালীদের উদারতা, বন্ধুর জন্ত, প্রতিশ্রুতির জন্ত অকাতরে স্বীয় প্রাণদান প্রভৃতি মহাগুণের অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। এই পুস্তকে সে সকল লিপিবদ্ধ করিবার অবকাশ নাই। বাঙ্গালীদের অসামান্য বিভাভূষণে সাহেবেরাও বিস্মিত হইয়াছেন। প্রতাপাদিত্য-চরিত-লেখক ক্লাইভ বসু সধকে ডাঃ কেরি লিখিয়াছেন, "ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিভাভূষণী পণ্ডিত আমি দেখি নাই। ১৬ বৎসর বয়সের পূর্বেই ইনি আরবী ও পারসী ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষায়ও ইহার তুল্যরূপ অধিকার ছিল।" "A more devout scholar than him I never sawBefore his 16th year he became a perfect master of Arabic and Persian. His knowledge of Sanskrit was not less worthy of note." কেরির মত বহুভাষাবিদ পণ্ডিতের এই প্রশংসা উপেক্ষা করিবার কথা নহে। রামরাম বসু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং নিমতা গ্রামের এক পাঠশালার প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে আরও অনেক দেশবিদ্রোহ পণ্ডিত বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে গঙ্গাধর কবিনন্দাভট্টের নাম স্মরণীয়। ইহার সধকে ১৩৩৯ সনের ১৯শে জ্যৈষ্ঠের "নায়েক" পত্রিকার কৃতবিদ্য কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন লিখিয়াছেন,

“বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে বলিতে শুনিয়াছি—‘আর্য্য-চিকিৎসার শেষ স্ববি গঙ্গাধর। ত্রীচৈতন্যদেবের যুগের পর এত বড় পণ্ডিত ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই’।”

ইনি সর্বশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন এবং ৭৭ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে আয়ুর্বেদ-সংক্রান্ত ৩২খানি, তন্ত্রগ্রন্থ ২খানি, জ্যোতিষ ১খানি, ব্যাকরণ ৮খানি, স্থিতি ৭খানি, নাটক, আখ্যায়িকা, মহাকাব্য ও ছন্দগ্রন্থ ১৩খানি এবং ১৪খানি বিবিধ বিষয়ক। তাঁহার রচিত আয়ুর্বেদ-সংক্রান্ত টীকা “জরকল্পতরু” এখন বঙ্গদেশীয় শ্রেষ্ঠ ভিবৃগণের প্রধান অবলম্বন। গঙ্গাধর যশোহর জেলার মাগুরা গ্রামে ১৭২৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে (২৪শে আষাঢ়, শুক্রবার) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৪ সনের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ মৃতকল্পরোগে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পিতার নাম ছিল ভবানী রায় ও মাতার নাম অভয়া দেবী—এবং ইনি তাঁহাদের একমাত্র সন্তান ছিলেন।

এই পণ্ডিতদিগের শিরোমণি-স্বরূপ আমরা ব্রাহ্মজ্ঞা ব্রাহ্মমোহন ব্রাহ্মোত্তর নাম উল্লেখ করিতে পারি; ইনি প্রাচীন ও আধুনিক কালের সন্ধিহলে বিরাজমান। ইনি হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর বৃষ্টল নগরীতে প্রাণত্যাগ করেন। পরাধীন জাতির একটি লোক, ধন-মান-ঐশ্বর্য্য-বিজ্ঞাপকিত ইংরেজদিগের মধ্যে তখনকার দিনে যে উচ্চ প্রশংসা ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পাইরাছিলেন, তাহাতে বুঝা যাইবে, আর্য্যসভ্যতার প্রধান লীলাকেত্রসমূহে তখনও জ্ঞান-ধর্ম্মের পূণ্য-প্রদীপ জ্বলিতেছিল; জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ বাঙ্গলার ব্রাহ্মণকে যে জগদ্-গুরু বলিয়া মান্ত করিয়াছিলেন—তাহা তাঁহাদের অজস্র অকপট হৃদয়ের অভিনন্দন দ্বারা প্রতীতি হয়। আমরা এখানে কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির অভিযত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব—বঙ্গীয় মন্দিরের হোমানল বিদেশী শ্রদ্ধাভক্তি কতটা আকর্ষণ করিয়াছিল। লণ্ডনের ইউনিটারিয়ান সমিতি হইতে রামমোহন রায়কে যে অভিনন্দন দেওয়া হয়, সেই সমিতির মুখপাত্র হইয়া রাজাকে মানপত্র দেওয়ার সময় তার জন বাউরিং (Sir John Bowring) যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই :—“কেহ কেহ কল্পনা করিয়াছেন, যদি এখন আমাদের মধ্যে বিশ্ব-বিশ্রুত অমর-কীর্ত্তি ব্যক্তিগণ, যাহাদের যশ যুগযুগান্ত বাবৎ চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ যদি হঠাৎ সশরীরে উপস্থিত হন, তবে আমাদের মনে কি ভাব হইবে? যদি হঠাৎ প্লুটো, সফ্রেটিস্, মিলটন কি নিউটন অকস্মাৎ আসিয়া দেখা দেন, তবে আমরা কি ভাবিব? আমাদের একজন কবি, যিনি স্বর্গীয় প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস, তিনি দক্ষিণ মেরুর সেই সুন্দর জ্যোতিষ্মান আলোকপুঞ্জ যাহা ‘স্বর্ণ ক্রুশদণ্ড’ (Golden Cross) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা যাহারা সর্বপ্রথম দেখিয়াছিলেন, তাহাদের বিশ্বব্যাপ্তি মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা অঙ্কন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমি এই সমিতির পক্ষ হইতে রাজা রামমোহন রায়কে আপ্যায়ন করিতে যাইয়া সেইরূপ ভাব-বিবরণতার সহিত হস্ত প্রসারিত করিতেছি।” আমেরিকার ডাঃ বুথ মিঃ ইষ্টলিনের নিকট ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে নভেম্বর যে চিঠি লিখিয়াছিলেন,

তাহাতে রামমোহন সম্বন্ধে এই কথাগুলি ছিল :—“ইহার মৃত্যুর পরে আমি ইহার সমস্ত গ্রন্থাবলী ভাল করিয়া পাঠ করিলাম। তাহার ফলে আমার এই ধারণা বহুমূল হইয়াছে যে, রামমোহন রায়ের সমকক্ষ ব্যক্তি জগতে বর্তমান কালে বা অতীতে কখনও জন্মেন নাই।” রেভারেণ্ড জে. স্কট পোর্টার প্রিন্সিটনের সভায় বলেন, “যে কোন বিষয় আলোচনায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া বাইত, সেজন্য পাণ্ডিত্য আমি আর কাহারও মধ্যে দেখি নাই। তাঁহার যুক্তির সারবত্তা এবং মৌলিকত্ব এরূপ ছিল, বাহার অধিক আর কাহারও হইতে পারে না। জগতে যত লোক যে কোন যুগে জন্মিয়াছেন, রামমোহন রায় তাঁহাদের সর্ব শ্রেষ্ঠগণের অন্ততম।” ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের ১৪ই অক্টোবর তারিখে ফিন্স্ বাড়ী গির্জায় (লণ্ডন) বক্তৃতা কালে রেভারেণ্ড জে. ফক্স বলিয়াছিলেন, “একটা কবিত্বপূর্ণ স্বপ্নের দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি মৃত হইয়াও এখনও যে স্বরে কথা কহিতেছেন তাহা যুগ যুগান্তর ভরিয়া শুধু ভারতবাসী নহে, যুরোপের ও আমেরিকার অধিবাসীদের কাণে বাজিবে।” নিউ গ্রাভেল পিটে রেভারেণ্ড এ্যাসপ্ল্যাণ্ড রামমোহন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “যে পর্য্যন্ত জগতে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারিত হইবে, ততকাল রামমোহনের নাম কেহ ভুলিতে পারিবেন না।” কর্নেল ফিট্জ্ লরেন্স (মানচেষ্টারের আরল) তাঁহার ইংলণ্ড, ইজিপ্ট ও ভারতবর্ষের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে (১৮১৭-১৮ খৃঃ) লিখিয়াছেন, “অত্যাশ্চর্য্য শক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ; আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত, ইংরেজী, বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানী ইহার নখাগ্রে এবং ইনি কথায় কথায় লক (Locke) এবং বেকনের (Bacon) গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করেন।” সামাজিক সাম্যবাদের তৎকালের প্রধান নেতা সুবিখ্যাত রবার্ট ওয়েল ইহার সঙ্গে তর্কে হারিয়া গিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে মিঃ রেকর্ডার হিল (Recorder Hill) লিখিয়াছেন, “রাজা আমাদের ভাষায় তর্ক করিলেন, ইংরেজী ভাষায় তাঁহার বিশ্বয়কর অধিকার আমাদের কাছে অভিজ্ঞত করিল। রবার্ট হারিয়া গিয়া একটু চটিয়া গেলেন। তাঁহার এরূপ বিচলিত ভাব ও অসহিষ্ণুতা আমি আর কখনই দেখি নাই। রাজার ভাব স্থির, সংযত ও প্রশান্ত।” ডাঃ বুট ইষ্টলিন সাহেবকে ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের নভেম্বর মাসে লিখিয়াছিলেন, “আমার চক্ষে রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের পূর্ণ বিকাশ, জগতের অতীত ইতিহাসে ও বর্তমানে জ্ঞান ও বিনয়ের এরূপ পূর্ণ প্রতিমা আর একটিও আমি কল্পনা করিতে পারি নাই।” আর একজন ইংরেজ লিখিয়াছিলেন, “তর্কযুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে এক্ষেত্রে রাজা ইংলণ্ডে তাঁহার সমকক্ষ একজনও পান নাই।” মেরি কার্পেন্টার লিখিয়াছেন, “শ্রীরামপুরের মিঃ এডামস্ রাজাকে ব্যাপটিষ্ট্ মতে দীক্ষিত করিতে আসিয়া নিজে রাজার সঙ্গে তর্কে পরাস্ত হইয়া তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, একথা সকলেই জানেন।” সেই সময়ের সর্ব প্রধান হেতুবাদী দার্শনিক জেরেমী বেহাম রামমোহনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি রাজাকে একবার চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, “আপনার পুত্রকে নাম না থাকিলে আমি কিছুতে ধরিতে পারিতাম না যে উহা হিন্দুর লেখা,—বরঞ্চ উহা কোন শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চশিক্ষিত

ইংরেজের দ্বারা লিখিত বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল।” জন টুয়ার্ট মিলের ভারতবর্ষের ইতিহাসের সুখ্যাতি করিয়া বেংগাম রাজাকে লিখিয়াছিলেন,—“মিলের ইংরেজী লেখাটা যদি আপনার মত সুন্দর ও নিখুঁত হইত, তবে আর কিছু বলিবার থাকিত না।” বিলাতের তৎকালের প্রসিদ্ধ কবি ক্যাথেল রামমোহনকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। তিনি যতদিন ইংলণ্ডে ছিলেন, ততদিন সেই দেশের আভিজাত্য এবং বিজ্ঞানপিত ইংরেজ সমাজ তাঁহাকে গুরুর জায় সম্মান করিয়া আতিথ্য দেখাইতে ব্যস্ত হইয়াছিল। তিনি ইংলণ্ডের সভায় এবং ফরাসী রাজ লুই ফিলিপের প্রাসাদে সর্বোচ্চ সম্মান পাইয়াছিলেন।

এই বাঙ্গলার এক নগর প্রদেশ রঙ্গপুর—তৎকাল কালেক্টরের সেরেস্তাদার, যিনি তৎকালের বিধি অনুসারে কেরানিগিরি হইতে উচ্চতর কোন পদের দাবী করিতে পারিতেন না, তিনি এত বড় হইয়াছিলেন যে সমস্ত সভ্য জগৎ সমগ্রমে তাঁহার নিকট মাথা নোয়াইয়াছিল। এতদেশীয় পণ্ডিতগণ ‘মুকুটহীন রাজশ্রীর’ প্রভাবে চিরকাল সমস্ত জগতের উপর রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন। কুটিরবাসী এক নগর পল্লীর পণ্ডিতকে দেখিয়া পণ্ডিতশিরোমণি কেরি প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রথিতযশা ব্যক্তি তাঁহাদের বেতনভুক্ সেই দরিদ্র ব্যক্তিকে তৎকালীন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের একজন বলিয়া সংবন্ধিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী পণ্ডিতের মস্তিষ্কের অপূর্ণ সৃষ্টি—নব্যজ্ঞানের কূটতর্কের মধ্যে এখনও যুরোপীয় পণ্ডিতগণ মাথা প্রবেশ করাইতে পারিতেছেন না। হে ভারতবাসী! চারিদিকে বিপদজাল ঘিরিয়া ধরিয়াছে, উর্দ্ধে মহামেঘের উদামলীলা। এই ছর্ঘ্যোগের গভীর নিশার গাঢ় অন্ধকারে পথ দেখা যাইতেছে না; কিন্তু যুগে যুগে নব নব প্রতিভার সুরণে, নানক, কবির, তুকারাম, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, রামমোহন, গান্ধী, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত পুরুষবরদিগের অভ্যাদয়ে কি মনে হয় না যে, এই তপস্তার ক্ষেত্রে—এই যজ্ঞস্থলে এখনও হোমায়ি জলিতেছে, এখনও আহিতাঘ্নিকের চির জ্যোতিষ্মান্ বহির্দীপ্তি হেথায় নিরূপিত হয় নাই? এই যুগের মুক্তিমন্ত্র শিখাইবার যোগ্য কোন পুরোহিত আসিবেন, কি আসিয়াছেন; তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত বাণীর প্রত্যাশায় সমস্ত দেশ স্তম্ভিত ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে।

এই শিক্ষাপ্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থাপিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি কথা বলিব।

ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাশিক্ষার উপর এই বিদ্যালয় জোর দিয়াছিল, বস্তুতঃ ইহা খুবই স্বাভাবিক ছিল। এ কথাটা ভাবিতে পারা যায় না যে, বাহারা কোটা কোটা লোকের ভাগ্যান্বিত্য শাসনকর্তা, তাঁহারা সেই দেশের ভাষা না জানিয়া কৰ্ম্মক্ষেত্রে কাজ কি করিয়া সুসম্পন্ন করিতে পারেন। এই প্রাদেশিক ভাষা অগ্রাহ্য করাতে শিক্ষাশালাগুলিতে নানারূপ বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। এদেশের লোকেরা মৌলিক চিন্তাশীলতার প্রতিষ্ঠা একরূপ হারাইতে বসিয়াছে। গণিত পড়িবে গণিতের ভাষা ইংরেজী; ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, উদ্ভিদবিজ্ঞা, জায়, ভিষকশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্তই ইংরেজীতে শিখিতে হয়। ফলে প্রত্যেক বিষয় শিখিতে সময়ের অর্ধেকটা যায় তৎসম্বন্ধীয় ভাষাটা দখল করিতে। এমন কি

সংস্কৃত ও বাঙ্গলায় এমন প্রগতি আছে বাহাতে ঐ দুই ভাষার জ্ঞান না থাকিলেও শুধু ইংরেজী জানিলেই পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হইতে পারে। ভাষা লইয়া কসরৎ করাতে বিষয়জ্ঞান অতি অল্পই হয় এবং যেটুকু হয় তাহা গতানুগতিক হয়—স্বাধীন চিন্তাশীলতার কোন উৎসাহ দেওয়া হয় না। বিদেশী ভাষার নানারূপ কসরৎ দখল করিতে করিতেই জীবনের অধিক চলিয়া যায়। এতকাল মেডিক্যাল কলেজে এত ভাল ভাল ছাত্র গত অর্ধশতাব্দীকালে এদেশে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু গুডিস চক্রবর্তী হইতে ডাঃ সরকার পর্য্যন্ত একজনও এমন দাঁড়ান নাই, যিনি মৌলিক গবেষণা দ্বারা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কোন নূতন তথ্য দান করিতে পারিয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যে আমরা এত কৃতী যে আমরা একরূপ ইংরেজীতে হাসি, ইংরেজীতে কান্না এবং ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখি বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য হয় না, অথচ আমরা মেয়াদীয়ার সম্বন্ধে লিখিতে গেলে কেবলই টেইন, ডাউডন, ডিকটর হিউগো কি বলিয়াছেন, তাহারই অনুবৃত্তি করিয়া থাকি; আমাদের যে কোন স্বাধীন মত বা স্বকীয় আদর্শ আছে তাহা জানিও না, ভাবিতেও পারি না। এদিকে ২৪ বৎসরের ইংরেজ যুবক বেদ, পুরাণ, বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বাহা কিছু পড়িবেন, বুড় বাঙ্গালী, ছৈপায়ন কিংবা ঋগ্বেদের ঋষি কেহই ইহাদের অগ্রদূত সমালোচনা হইতে রেহাই পান না। ইহারাই বা চিন্তাশীলগণে এমন স্বাধীন ও আমরাই বা একরূপ পরানুগ ও শেকলে-বঁধা গোলাম হইলাম কেন? ইতিহাস এবং দর্শনেও আমরা কেবলই পরের মত রোমন্থন করিতেছি। ইহার একমাত্র কারণ আমরা নিজের কথার ও নিজের ভাষায় পড়িতে পাই না। এ সম্বন্ধে এফ. এচ. ক্রাইন, আই. সি. এস. বলেন, “কুক্ষণে মেকলে সাহেব বাঙ্গলার শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়াছিলেন, নতুবা বাঙ্গালীরা যে মৌলিকতাহীন বলিয়া অভিযুক্ত হইয়া থাকেন সেই নিদার দশমাংশের একাংশেরও তাঁহারা ভাজন হইতেন না।”

প্রাদেশিক ভাষা অগ্রাহ করার ফল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই অধিকতর দৃষ্ট হয়। এই যে কোটি কোটি লোকের ভাষা না জানিয়া রাজপুরুষেরা এদেশ শাসন করিতেছেন, তাহার ফলে শত শত মতবৈজ্ঞানিক (অনুবাদক) অফিসে অফিসে বসিয়া গিয়াছে। একজন ইংরেজ যদি আমাদের ভাষা শিক্ষা করেন, তবে শত শত উকীল মোক্তারের ভাষা, অশুদ্ধ ও অপরিস্ফুট ইংরেজী দিয়া বিচারককে সকল কথা বুঝাইতে হয় না। ইহাদের এই পণ্ডিত্যে ব্যয়িত সময়ের কি কোন মূল্যই নাই? সাক্ষীর জবানবন্দীর ইংরেজী অনুবাদে যে কত বৃথা সময় ও শক্তির অপচয় হয় তাহা সকলেই জানেন। মাত্র জনকয়েক হাইকোর্টের জজ, ছোট আদালতের জজ ও জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা জজ এদেশীয় ভাষা শিখিবেন না আর তজ্জন সমস্ত জাতি এই ভাবে ঘোর প্রারম্ভিত করিবে, ইহা যুক্তিসহ নহে। বিচারককে ইংরেজীতে কি সকল কথাই এই সকল উকীল ভাল বুঝাইতে পারেন, না, নাম-মাত্র দেশী ভাষার জ্ঞান লইয়া বিচারক সাক্ষীর জবানবন্দী বুঝিতে পারেন? শালনকর্তাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দেশের অবস্থা বুঝিয়া লইতে হয়, দেশীয় ভাষা না জানিয়া তিনি এই কার্য কি ভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন? প্রাদেশিক ভাষায় তিনি যে পরীক্ষা দিয়া পাস করেন, তাহা খেলা মাত্র; ম্যাট্রিকুলেশনের বাঙ্গলা পরীক্ষার

উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্য জ্ঞান তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই নাই। কি আশ্চর্য যে বাঙ্গালী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বাঙ্গালী উকীল ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। ইংরেজী শিক্ষা এখন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া যে ইংরেজীর বর্ণজ্ঞান-শূন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যবহারকালেও সেই ভাবের শরণ লইতে হইবে তাহার কথা নাই। সংস্কৃত দায়ভাগ, মুসলমানী আইন কাহুন ও ইংরেজী ব্যবহার-শাস্ত্র শিক্ষা করা অপরিহার্য, কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃত, ফারসী কি ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতে হইবে এবং সাক্ষীর জবানবন্দী তর্জমা করিতে হইবে এ কথাতো সমর্থন করা যায় না। শাসক ও শাসিতের সঙ্গে পরস্পরের সহায়ভূতি ও প্রীতির অগ্রতম মূল-বন্ধন পরস্পরের ভাবাজ্ঞান। আমাদের ভাষা জানিলে—সাহিত্যপাঠে ও কথোপকথনে বিদেশী শাসন-কর্তা আমাদের মনোভাব বুঝিয়া যতটা শ্রদ্ধা ও প্রীতিপ্রদায়ক হইবেন—আমরা যদি চিরকালই কৃত্রিম বুলি বলিয়া তাঁহাদের কাছে পশুপক্ষীর জায় হুর্কোদ হইয়া থাকি, তবে সে সহায়ভূতি ও শ্রদ্ধা আমরা তাঁহাদের কাছে কখনই পাইব না।

মহাত্মা লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ অতি বড় সহযোগে স্থাপিত হইয়াছিল।

এই দেশস্থ সিভিলিয়ানগণকে তাঁহাদের পদ পাইবার পূর্বেই সেই পদে উন্নতি লাভ করিবার জন্য দেশী ভাষায় খুব শক্ত পরীক্ষাশূলে স্বীয় স্বীয় গুণপনার পরিচয় দিতে হইত। তাঁহাদিগকে চারটিবার বিচারস্থলে উপস্থিত হইয়া দেশী ভাষায় তর্কবিতর্ক দ্বারা তাঁহাদের শাসিত প্রদেশের ভাষাজ্ঞানের প্রমাণ দিতে হইত। এই তর্কসভায় দেশীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ, রাজগণ, বিদেশী রাজদূতেরা, মন্ত্রিগণ এবং বিশিষ্ট মুন্সী ও মোলভিরা উপস্থিত থাকিতেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সিভিলিয়ানদের বাঙ্গলা ও ফার্সীতে এই বিচার কলিকাতার বিজ্ঞানমণ্ডলীর সমক্ষে হইত। এদেশের উচ্চকর্মচারীদের কর্মোন্নতি এই কলেজের অভিমতের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত। এখানে বিজ্ঞান পরিচয় না দিয়া সমস্ত ভারতে কোন সিভিলিয়ানের পদ বা বেতনের উন্নতির সম্ভাবনা ছিল না। (No promotion was to be given in the public service throughout India in any branch of the service held by civilians except through the channel of this College."—Memoirs of Dr. Buchanan, Vol. I, p. 208.) এই কলেজে বড় বড় ইংরেজ অধ্যাপক ও দেশের পণ্ডিতগণের ভাব-বিনিময়, চিরস্থায়ী অন্তরঙ্গতা ও পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্যের একটা বিশিষ্ট স্থান সৃষ্টি করা হইয়াছিল। সিভিলিয়ানদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পড়িতে হইত—(১) যুরোপের বর্তমান কালের প্রধান প্রধান ভাষা, (২) ল্যাটিন, গ্রীক ও ইংরেজী প্রাচীন সাহিত্য, (৩) গণিত, (৪) ভূগোল, (৫) সাধারণ ইতিহাস, (৬) উদ্ভিদবিজ্ঞা, (৭) রসায়নশাস্ত্র, (৮) জ্যোতির্বিজ্ঞা, (৯) নীতিবিজ্ঞান, (১০) স্বাস্থ্য, (১১) সমস্ত জগতের সংক্ষিপ্ত ব্যবহারশাস্ত্র, (১২) ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জঙ্গ আরবী, পারসী, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গলা, তেলেগু, মহারাষ্ট্রী, তামিল এবং কেনারিজ প্রভৃতি

সাহিত্য, ভারতবর্ষের ও দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস। এই কলেজ রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রের একটা বড় বিভাগ ছিল এবং প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীরা অধ্যাপকদিগের সহিত সহযোগ করিয়া ইহা পরিচালনা করিতেন। ওয়েলসলীর ইচ্ছা ছিল যে গার্ডেন রিচে একটা বড় প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া কলেজকে স্থাপ্রোথিত করা—তাহাতে সমস্ত অধ্যাপকগণ থাকিবেন, ৫০০ ছাত্র থাকিবার ব্যবস্থা থাকিবে, তাহা ছাড়া একটা বৃহৎ পাঠাগার, বক্তৃতাশালা, ভোজনাগার এবং আবহবিক গৃহাদি থাকিবে।

বহু উপরচেষ্টা ইংরাজ এই মহৎ উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। একটা কোম্পানী কর্তৃক এত বড় সাম্রাজ্যের পত্তন হওয়ার ব্যাপদেশে এমন মহৎ প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা আর কোথায়ও হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। ভারত সরকারের সঙ্গে এদেশের প্রধান প্রধান লোকের একটা মিলন-স্থল স্বাভাবিক ক্রমে এই ভাবে গড়িয়া উঠিলে বোধ হয় পরবর্তী নানা রাষ্ট্রনৈতিক বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না; প্রাকালেই মিলনের পথ সুগম হইলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে মতবৈধ একরূপ উৎকট হইয়া দাঁড়াইত না।

এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরিপন্থী হইলেন মেকলে ও রাজা রামমোহন রায়। ১৮০০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৩৫ সন পর্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় প্রধানতঃ ইংরেজদের সহায়তায় যে অতৃপূর্ণ সাহিত্যিক প্রচেষ্টা হইয়াছিল—বাহাতে বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্য একরূপ গড়িয়া উঠিয়াছিল—তাহা মূলতঃ এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে।

মোগলাধিকারে বাঙ্গালী

মোগল রাজত্বেও দেখা যায় বাঙ্গলাদেশে প্রধান প্রধান বোদ্ধার অভাব হয় নাই। কিন্তু পাঠান আমলে হিন্দু রাজা ও অপরাপর ভূঞারাজগণ বেরূপ দিল্লীখবরের ত্রুটি অগ্রাহ করিয়া যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছেন, মোগল-যুগে আকবর-প্রতিষ্ঠিত বিপুল সাম্রাজ্যের আওতায় পড়িয়া বাঙ্গলার সে সাহস ও বীর্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সাম্রাজ্যতন্ত্রী মোগলের তীব্র লক্ষ্য মুসলমান বাদসাহগণের উপর বেরূপ ছিল, ক্ষুদ্র নগণ্য পল্লীবীরের উপরও সেইরূপ ছিল,—সেই শ্রেন-দৃষ্টি এড়াইয়া কেহ কিছু যড়যন্ত্র বা বিদ্রোহের উদ্যোগ করিতে সাহস পাইত না। আরজেব অত্যন্ত সন্দিগ্ধমনা ছিলেন, পাছে কেহ দীর্ঘকাল একস্থানে থাকিয়া শক্তি সঞ্চয় করে, এজ্ঞ তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকে একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে দিতেন না। আরজেব বলিয়া নয়, মোগল রাজত্বে এই সাম্রাজ্যতন্ত্র অন্ন-বেশী সকল সম্রাটের রাজত্ব-কালেই দেখা বাইত। আরজেবের সময়ে হিন্দুদিগের উপর অশ্রুতপূর্ণ অত্যাচার চলিয়াছিল—সুতরাং সেই যুগে বাঙ্গালীরা কতকটা অসাড় ও হীনবীর্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি মুসলমান নবাবদিগের অধীনে থাকিয়া ইহারা যুদ্ধবিগ্রহ করিতেন এবং অনেক সময়েই বিখ্যাত-নিবন্ধন

বাদসাহগণের প্রিয়পাত্র হইতেন। গোলাম হসেন দেখাইয়াছেন যে, আরজেব তাঁহার নানা প্রকার অত্যাচারের অহুমোদনে গোড়া মৌলভীদিগের নিকট উৎসাহ পাইতেন। তাঁহার কাকের-দলনের সদিচ্ছার জন্ত ইহারা তাঁহাকে নিরন্তর “বিখ্যাসী সম্রাট” (Faithful Emperor) “সনাতন ধর্মের আশ্রয়” (The cherisher of religion) ইত্যাদি উপাধি দিয়া স্তোক-বাক্য বলিতেন, ফলতঃ ইহাদের দ্বারা দেশের ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল। আরজেবের শত্রুরাও বলিতে বাধ্য যে, তিনি অতি দৃঢ়হস্তে শাসন করিতেন, সুতরাং তৎকৃত অস্তায়গুলি দ্বারাও দেশের শাসনযন্ত্র শিথিল হইতে পারে নাই। কিন্তু পরবর্তী সম্রাটগণের অর্থগুরুতা এবং শক্তিসামর্থ্যের অভাবে দেশ উত্তরোত্তর ধ্বংসের মুখে চলিতে লাগিল; ইহারা আইনজ্ঞ ও সুবিচারক তাঁহারা ক্রমশঃ হটিয়া গেলেন এবং নিতান্ত চষ্টচরিত্র লোকেরা সিংহবিক্রমে প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিল। (“At last the office of the Cazy or Judge and that of Sadar or great Almoner, with many other Magistratures came to be publicly put up to sale, so that the people skilled in law and in distributive justice, entirely disappeared from the land; nor was anything else thought of, but how to bring money to hand by any means whatever.” (Mutakharin, Vol. III, p. 160.)) বাংলাদেশে এই অর্থগুরুতার ফলে হিন্দু জমিদারদিগের জন্ত ‘বৈকুণ্ঠের’ ব্যবস্থা হইতে সেই অত্যাচার কতক পরিমাণে বৃদ্ধা যাইবে—সামান্য হিন্দু প্রজারা যে কত সহিয়াছিল, তাহা না বলাই ভাল। যোগলের সাম্রাজ্যতন্ত্র অর্থকেই মূলমন্ত্র করিয়া সমস্ত প্রদেশে এই বিধের আওতা প্রসারিত করিয়াছিল।

সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বের অব্যবহিত পূর্বেও হিন্দুরা সাময়িক ব্যাপারে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বাধীন হইবার প্রচেষ্টা অবশ্যই নিরন্তর হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা শৌর্য্যবীৰ্য্যে তখনও বঙ্গেশ্বরগণের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। দেওয়ানী বিভাগে—বিশেষতঃ রাজস্বসংক্রীয় সমস্ত কার্যে—তাঁহারা অপ্রতিদ্বন্দী ছিলেন। গুণপনা দেখিয়া নবাবেরা জাতি বা ধর্ম গ্রাহ না করিয়া ইহাদিগকে উচ্চতম পদ দিয়াছিলেন। যোগল ও পাঠান উভয় জাতির মধ্যে বৈরত অবিধাস ও ক্রতয়তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিতে দেখা যায়, হিন্দুদিগের মধ্যে সেইরূপ বিশ্বাসের অভাব কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শুধু সিরাজের সর্বনাশসাধনে কয়েকজন হিন্দু বড়লোক মুসলমান-চক্রীদের সহিত যোগ দিয়া ছিলেন। মুসলমানের অধিকার-বিলোপের পর সেই সকল বিক্রান্ত ওমরাহ ও নবাব কোথায় গেলেন? বঙ্গদেশের জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের তালিকায় তাঁহারা মুটিমের হইয়া পড়িলেন। শত অত্যাচারেও হিন্দু স্বীয় চরিত্রবল বজায় রাখিয়াছেন, এজন্যই তাঁহারা এপর্যন্ত টিকিয়া আছেন, অল্প কোন জাতি হইলে ভীষণ অত্যাচারের ফলে হয় তাঁহারা বিজেতাদের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণে কোনরূপে বাঁচিয়া থাকিবার একটা অবকাশ করিয়া লইতেন, নতুবা নির্মূল হইয়া যাইতেন। কতক পরিমাণে ধর্মচ্যুত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াও আজও বঙ্গ হিন্দুরাই প্রবল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও আমরা বহু হিন্দুকে শাসন-বিভাগের শেখরদেশে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। ঢাকার দেওয়ান বশোবস্ত রাও নবাব সরকারের খাঁর শিক্ষা-গুরু ছিলেন। তিনি এই সময়ের ইতিহাসে এক প্রসিদ্ধ চরিত্র। সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তি পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাদবাক্য হইয়া আছে। তাঁহার রাজধানী রাজনগরের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিরাশি—দোলমঞ্চ, নবরত্ন, একুশরত্ন প্রভৃতি বহু হস্তা কীর্ত্তিনাশার অন্তল জলে ডুবিয়া গিয়াছে—এই সময়ে প্রধান মন্ত্রী হুর্ন্তরামের ভ্রাতা রাসবিহারী পূর্ণিয়ার কৌজদার নিযুক্ত হইয়া কৰ্ম্মকুশলতা দ্বারা নবাবের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ঐ নবাবের (সকৎজঙ্গ) অকৃতম প্রিয়পাত্র কায়স্থ গ্রামহুন্দর তাঁহার কামান ও অস্ত্রশস্ত্র-বিভাগের কর্ত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময়ে সকৎজঙ্গ তাঁহার মুসলমান সেনাপতিদিগকে বলিয়াছিলেন, “তোমরা ধামের মত দাঁড়াইয়া কি করিতেছ? দেখু না হিন্দু গ্রামহুন্দর অগ্রগামী হইয়া কেমন যুদ্ধ করিতেছে!” একথা পূর্ব্ব একবার লেখা হইয়াছে। রাজা রামনারায়ণ ও হুন্দরসিংহ পূর্ণিয়ার ও মুরসিদাবাদের যুদ্ধবিগ্রহে প্রধান কৰ্ম্মরূপে নবাবের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। মৃতকরিনে ইহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা উল্লিখিত আছে। আলমচাঁদ রায়রাঁয়ার পুত্র দেওয়ান রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রায়রাঁয়া নবাবের রাজস্ব-বিভাগের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। জগৎ শেঠ ও বর্দ্ধমান রাজার এককোটি কয়েক লক্ষ টাকার হিসাব আলিবর্দীর দপ্তরে বহুদিন যাবৎ চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, ইহার অস্তিত্বও নবাব সরকারে বিস্তৃতির সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল। কীর্ত্তিচন্দ্র এই হিসাব ধরাইয়া দিয়া ইহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া আলিবর্দীর রাজভাণ্ডারে প্রদান করেন। এই কার্য্যের জন্ত তাঁহার খুব সুখ্যাতি হইয়াছিল। হুর্ন্তরাম রাজস্ব-বিভাগে আলিবর্দীর সরকারে অনেক ভাল কাজ করিয়াছিলেন এবং ইহার অসামান্য বোগ্যতার জন্তই ইনি প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইয়াছিলেন। তরুণবয়স্ক মোহনলাল সিরাজের সর্ব্ববিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর উপর কর্ত্ত্ব চালাইতেন,—হুঃসহ অভিযানে হুর্ন্তরাম সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে বোগ দিয়াছিলেন; মৃতকরিনে লিখিত আছে, মোহনলাল পলাশীর ক্ষেত্রে বন্দী হইয়া ইহারই করতলগত হইয়া নিহত হন। পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা, আলিবর্দীর জামাতা, যেসেটি বেগমের স্বামী নবিসমহম্মদ খাঁন দয়াদাক্ষিণ্যের অবতার ছিলেন। তিনি মাসিক ৩৭ হাজার টাকা জাতিধর্ম্ম-নির্ক্কিচারে গরীব, বৃদ্ধ ও দুঃস্থদিগের মধ্যে দান করিতেন, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন আজীব রায়, এই বিখ্যাত দেওয়ানের সহযোগে পুণ্যবান্ নবাব সর্ব্বজন-প্রিয় আদর্শ-নৃপতি হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের রাজার দেওয়ান মালিকচাঁদকে নবাব ৫০০০ অঘারোহী সৈন্ত ও ২০০০ পদাতিকের নেতৃত্ব প্রদান করিয়া সেই দুর্গরক্ষার ভার দিয়া চলিয়া যান। এই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যসময়ে আরও বিস্তর হিন্দুরাজকৰ্ম্মচারীর কথা মুসলমান ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন, ইহারা শান্তিপ্রিয় হইলেও রণক্ষেত্রে সিংহবিক্রান্ত ছিলেন। আলিবর্দী যখন মহারাষ্ট্রাদের হাতে পড়িয়া দুর্গতির চরমসীমার উপনীত হইয়াছিলেন, তখন এক বঙ্গপ্রদেশের হিন্দু রাজা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া বাইতে প্রস্তুত হইয়া ভ্রম-

বশতঃ বিপথে লইয়া গিয়াছিলেন, এই ব্যাপারে তিনি এতদূর লজ্জিত ও অসুস্থ হইয়াছিলেন যে তিনি নিজের তরবারি দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। সীতারাম রাই নামক এক হিন্দু কর্মচারী, অতি অল্পবেতনের কর্মচারীর পর হইতে আজিমগঞ্জের সর্বপ্রধান ব্যক্তি হইয়াছিলেন। ইংরেজের পক্ষ হইয়া ইনি ফরাসীদের সঙ্গে যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ও তদীয় সেনানৌদিগের সাহস ও রণকৌশলের ভূমসী প্রশংসা গোলাম হুসেন করিয়াছেন (মুতফরিন, ১৫০ পৃঃ, দ্বিতীয় খণ্ড)। ইনি ক্লাইভকে সম্পূর্ণরূপে আশ্রিত করিয়া রাজনৈতিকক্ষেত্রে অমিত প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। ইহার দয়াদাকিণ্যাদি গুণের কথা মুতফরিনে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। ইনি আজিমগঞ্জ ফলদুলের বাগানগুলির উন্নতিসাধন ও সাধারণকে বিনা ব্যয়ে তাহাদের উৎপন্ন ফলভোগ

কাহ্না জাতি।

করিবার সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমরা হুন্দরসিংহের কথা পূর্বেই লিখিয়াছি, ইনিও সেই যুগের একজন সর্বজনবিদিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এক নর্তকীর পুত্র গোলাম খোঁউস্ ইহারই প্রাসাদে বড় হইয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক ইহাকে নিহত করেন। বিহারের শাসনকর্তা আলিবর্দীর অতি-বিখ্যাত জানকীরামের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য। এখানে বলা উচিত বঙ্গদেশের এই যুগে কার্যসংগণই অধিকাংশ সময়ে বড় বড় রাজ-পদবী ও সমরকুশলতার খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

ক্লাইভ ও মীরজাফর যখন সিরাজের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া পরস্পরের বখরা টাকা গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন নবাবের অন্তঃপুরে যে বিরাট ধনাগার লুক্কায়িত ছিল তাহার সন্ধান ক্লাইভ পান নাই। কথিত আছে নগদ আটকোটি টাকা ও বহু মণিমুক্তা ও জহরৎ রাজ-অন্তঃপুরে ছিল। মীরজাফর ও লাভকৃষ্ণ নামক ক্লাইভের এক দেওয়ান এই টাকা আত্মসাৎ করেন। লাভকৃষ্ণ ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে ৬০ টাকা বেতনে কর্ম করিতেন। ইহার দশবর্ষ পরে মরিবার সময়ে তিনি নগদ ৭২ লক্ষ টাকা, ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের জমিজমা ও ৪০০ শত প্রকাণ্ড ঘড়া প্রভৃতি রাখিয়া বান। এই ঘড়াগুলির ৮০টির মধ্যে খাঁটি সোনার মুদ্রা ও বাকী ৩২০টিতে রৌপ্য-মুদ্রা ছিল।

ক্লাইভের প্রধান মন্ত্রী (দেওয়ান) ছিলেন রামচাঁদ। আমি শুধু নবাবের কর্মচারীদেরই কথা এখানে বলিলাম। রাজাদের কথা বলিবার অবকাশ এখানে নাই। এই কাহিনী পড়িলে স্বতঃই মনে হইবে, স্বাধীনতা-হার হইলেও হিন্দুগণ রাজসরকারে সম্মানিত সমস্ত পদই প্রাপ্ত হইতেন। ধর্মের বাধা থাকিলেও অধিকাংশ বড় কর্মচারীরাই হিন্দু ছিলেন, এবং ধনৈশ্বর্যে জগৎ শ্রেষ্ঠ শুধু ভারতবর্ষে নহে, সমস্ত জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। প্রত্যেক যুদ্ধেই আমরা হিন্দু সেনাপতিদের শৌর্যবীর্যের কথা পাইতেছি এবং মুসলমান ঐতিহাসিকগণই ইহা কহিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর ইতিহাস হিন্দুরা লিখেন নাই, হিন্দুর কথা হিন্দু নিজে কহেন নাই। তথাপি অনেক বাদ দিয়া বিদেশীদের এদেশীয় লোকের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতেও চক্ষু ঝলসিয়া যায়। এই সময়ে আহমদাবাদের নবাব দাউদ খাঁর এক হিন্দু দ্বী ছিলেন। রাজমহিবী যখন পূর্ণগর্ভা তখন নবাব মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হিন্দু স্ত্রী সহমরণ বাওয়ার জন্ত উতলা হইয়া পড়েন, কিন্তু এখনতো তিনি রাজকুমারী হইয়াও মুসলমান নবাবের পত্নী—বেগম। স্বামিদত্ত একখানি ছোরা তাঁহার ছিল। তিনি চিতানলে উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু সেই ছোরা দিয়া স্বয়ং অতি কৌশলে স্বীয় গর্ভ বিদৌর্ণ করিয়া গর্ভস্থ শিশুকে ধাত্রীর হস্তে দিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্ত মিনতি করিয়া শাস্ত্র সমাহিতভাবে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন। স্থির মস্তিষ্কে এমন কাজ জগতে হিন্দুমহিলা ভিন্ন কে করিতে পারিত? মৃত্যুঞ্জয় শর্মা প্রণীত রাজাবলীতে পৌরাণিক এক রাজসৌমন্ত্রিনী সম্বন্ধে এইরূপ একটি উপাখ্যান পড়িয়াছিলাম। দার-রাজ-কন্তা স্বীয় স্বামী গুরুসেনের মৃত্যুতে শোক-কাতরা হইয়া “তীক্ষ্ণধার এক ছুরি লইয়া আপনার পেট চিরিয়া ফেলিলেন, তৎক্ষণাৎ রাজকন্তার প্রাণবিয়োগ হইল। বালক অক্ষত দেখে গর্ভ হইতে নির্গত হইল।” মুতাক্বরিনে লিখিত আছে :—

“Daud Khan (of Ahamadabad) had left a consort by whom he was tenderly loved. She was the daughter of a zemindar or great landlord of that kingdom where it was a standing rule, that some of these gentoo (Hindu) Princes should give their daughters to the viceroy in being. This lady who had been initiated in the Musalman religion, on her entrance into the seraglio, was now pregnant and seven months gone with the child and she had entreated for the liberty of following her husband of whom at his departure, she had obtained his poignard, as a token of his love. The news of his death in the middle of a victory having now reached Ahamadabad, she took the poignard, and opening her own belly with a precaution and dexterity that amazed everyone, she carefully drew out the child and tenderly recommended it to the by-standers, after which few words, she expired.” (Mutakharin, Vol. I, p. 98.) এই আহমদাবাদের

হিন্দুরমণীর সঙ্গে পূর্বোক্ত স্ত্রীর নাম করা যাইতে পারে। আমরা খাস বাঙ্গলাদেশের আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব—ইনি বর্ধমানের সুন্দরী রাজকন্তা। ইনি শোভা সিংহকে যে ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। শোভা সিংহ বর্ধমান আক্রমণ করিয়া রাজা কৃষ্ণরামকে হত্যা করেন, রাজ-হস্তা, মহাকমতাশালী শোভা সিংহ রাজকুমারীর প্রেমপ্রার্থী হইয়া তাঁহার শয়্যাগৃহে প্রবেশপূর্বক অনেক অশ্লুণ্ডবিনয় করেন, তৎপরে বলপূর্বক তাঁহাকে ধরিতে গেলে—[“she drew from under her garment a knife which she had concealed in hopes of finding an opportunity to gratify her revenge. With this weapon she ripped up his belly.” (“Narrative of the Govt. of Bengal” by Francis Gladwin, 1788, pp. 5-8.) রাজকুমারী প্রতিহিংসা লইবার জন্ত যে শাণিত ছুরিকাখানি বস্ত্রাকলে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা শোভা সিংহের পেটে বিঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ—আদিযুগ

“নানান দেশের নানান ভাষা।

বিনে স্বদেশী ভাষা ঘিটে কি তৃষা ॥”—নিধুবাবু।

বাঙ্গলা ভাষা বা পৃথিবীর যে কোন ভাষার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে যাওয়া বাতুলতা। আদিযুগের মানব প্রথম যে ভাষা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাই যুগে যুগে রূপান্তরিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে। এই অচিহ্নিত আদিস্থান খুজিবার চেষ্টা। বড়শনা যাত্র। বাঙ্গালী যতদিন, বাঙ্গলা ভাষা ততদিন;—কারণ এমন কোন যুগ নাই, যখন এদেশের লোক কথা কহে নাই। পূর্বে এই দেশের ভাষাকে পণ্ডিতেরা ঘৃণা করিয়া ‘প্রাকৃত’ বা শুধুই ‘ভাষা’ নাম দিয়াছিলেন, তারপর সংস্কৃত ভাষার লোকেরা ইহাকে ‘গৌড়ীয় ভাষা’ নামে অভিহিত করিতেন, ‘বাঙ্গলা ভাষা’ নামটা খুবই আধুনিক।

তবে এই ভাষায় কবে পুস্তক, কবিতা, নীতিসূত্র ইত্যাদি নানাবিষয়ক রচনা হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাই বিবেচ্য। অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত লোকেরা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষা বুঝে না। কিন্তু তাহাদের মনেও আনন্দ, প্রেম, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি ভাবের উচ্ছ্বাস বহিয়া যায়; আনন্দ ও দুঃখের আতিশয্যে কথার সুর আসে; সেই সুরই গান, সেই সুরই বেদ; সামবেদে তাহা রাগ-রাগিণীতে মূর্তিমান হইয়াছিল।

বুদ্ধদেব মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি যে ভাষায় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেই ভাষায়ই যেন তাহা লিপিবদ্ধ হয়। এই আদেশের ফল “ধম্মপদ।” শুধু ধম্মপদ নহে, হীন-যানাবলম্বী বৌদ্ধগণের সমস্ত সমৃদ্ধ পল্লী-সাহিত্য। এই পল্লীভাষার নাম হইল পালি। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষারও এই একসঙ্গে শ্রীবৃদ্ধি হয়। পণ্ডিতেরা যে শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং যাহা পাণিনি ও অপরাপর বৈয়াকরণ বহু গবেষণা ও বিজ্ঞান-সম্মত অহুশীলন দ্বারা সুধীমণ্ডলীর গ্রাহ্য এবং একমাত্র অবলম্বন করিয়া তুলিয়াছিলেন, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর—সেই ভাষার নিয়ন্তরে আর এক ভাষা লিখিত ভাষায় পরিণত হইয়া গেল এবং তাহাও কালে এতটা বিস্তৃত ও উন্নত হইয়া গেল যে তজ্জন্তুও পুনরায় ব্যাকরণ-সঙ্কলনের প্রয়োজন পড়িল। এই ভাষার সাধারণ নাম প্রাকৃত। সাহিত্য-দর্পণকার ইহার ১৮ প্রকার ভেদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির সংখ্যা আরও অনেক বেশী।

এক সময়ে এই ভাষাগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্রী ও মাগধী ভাষাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। আৰ্য্যভাষায় ইহাদের ভিত্তি গড়িয়া উঠিলেও তৎসঙ্গে বহু দেশজ আদিম ভাষার শব্দ এই প্রাকৃত ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল।

বাঙ্গলা দেশে যে প্রাকৃত কথিত হইত, তাহার অনেকটাই অর্দ্ধ-মাগধী নামে পরিচিত ছিল। আমরা অনেকবার লিখিয়াছি, বাঙ্গালীরাই মগধের শিক্ষা-দীক্ষার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন এবং আদিকালে কথিত বাঙ্গলা ভাষার উপর মাগধী প্রাকৃতের প্রভাব খুব বেশী হইয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, শুধু অর্দ্ধমাগধী নহে, পৈশাচিক প্রাকৃতেরও কতকগুলি লক্ষণ এই ভাষায় স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। বাহা হউক, এই সকল ভাষাতত্ত্বের হৃদয় বিশ্লেষণ করিবার স্থান বা অবকাশ আমাদের নাই।

বৈদিক যুগের ভাষার ব্যাকরণ আছে, তাহার সাহায্যে বৈদিক-সাহিত্যে আমরা প্রবেশ লাভ করিতে পারি। দ্বিতীয় যুগে আৰ্য্যভাষা সংস্কৃত; পাণিনি ও তৎপূর্ববর্তী কয়েকজন বৈয়াকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বোপদেব এবং ক্রমদীপক পর্য্যন্ত শত শত পণ্ডিত ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৃতীয় যুগে সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে পালি ও প্রাকৃত ভাষা সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, এই দুই ভাষায় বহু গ্রন্থ লিখিত হয় এবং ইহাদের রীতি, নীতি, রচনাপ্রণালী ও প্রকৃতি বুঝাইবার জন্তও ব্যাকরণের অভাব হয় নাই।

ক্রমে পালি ও প্রাকৃত ভাষা সাধারণের অনধিগম্য হইয়া উঠিল। অলঙ্কার-শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্য ইহাদিগকে গ্রাস করিয়া বসিল, সুতরাং জনসাধারণের সুখদুঃখ ও মনের ভাব বুঝাইবার পক্ষে ইহারা আর উপযোগী রহিল না, তখন জনসাধারণের কথিত ভাষায় পুনরায় সংগীত ও প্রবচনাদি রচিত হইতে লাগিল। সংস্কৃতের আদিযুগে পণ্ডিতেরা প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে “প্রাকৃত” নাম দিয়াছিলেন,—এই নাম কতকটা ঘৃণাব্যঞ্জক; শিক্ষিতগণের গভীর বহির্ভূত লোকেরা “প্রাকৃত” সংজ্ঞায় অভিহিত হইত। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের শেষ দিকে সন্দ্বিগ্নচিত্ত রামের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সীতা বলিয়াছিলেন, “রাম, তুমি প্রাকৃত ব্যক্তি যেহেতু তাহার দ্বীকে গালি দেয়, সেইরূপ অপভাষা ব্যবহার করিতেছ কেন?” ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ‘প্রাকৃত’ শব্দের প্রতি আৰ্য্যগণ কি ভাব পোষণ করিতেন।

বাঙ্গলাদেশে যে সকল পুস্তক প্রাকৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, তাহা কি হইল—এই প্রশ্ন সহজেই মনে হয়। প্রাকৃত ভাষায় সাধারণতঃ বৌদ্ধগণই গ্রন্থাদি রচনা করিতেন, সুতরাং অনায়াসে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে পরাভূত শৌদ্ধ পণ্ডিতগণ এদেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার পরে প্রাকৃত ভাষায় লিখিত পুঁথি, তথা ঐ ভাষার প্রভাব, এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইল।

সেন-রাজাদের সময় হইতে সংস্কৃতের উপর লোকদের অত্যধিক বৌদ্ধ হইল। সুতরাং সংস্কৃত নাটকাদিতে দ্বীলোক ও ইতর ব্যক্তিদের বধোপকথনের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা ছাড়া এদেশ-প্রচলিত প্রাকৃত ভাষায় লিখিত পুস্তক খুব অল্পই দেখা যায়—কতকটা নিশ্চয় হইয়া প্রাকৃত ভাষা উত্তর-ভারত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। “গৌড়বহু”

‘ব্রহ্মবুজি’ এ দেশ-প্রচলিত
প্রাকৃতের নিদর্শন কিনা?

প্রভৃতি অতি অল্পসংখ্যক পুস্তক আমরা প্রাকৃত ভাষায় পাইতেছি। নেপালের পার্শ্বত্যা উপত্যকায় এই প্রাকৃতের নিদর্শন কিছু কিছু আছে, যেহেতু বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার পুঁথি-পত্র লইয়া তদেশে আশ্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয় গোবিন্দদাস, ঘনশ্যাম, রায় শেখর প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব কবি যে ভাষায় পদ লিখিয়া গিয়াছেন, যাহা সাধারণতঃ “ব্রজবুলি” বলিয়া পরিচিত,—তাঁহার উপর মৈথিল কবির প্রভাব খুব বেশী হইলেও উহা হয়ত এদেশ-প্রচলিত প্রাকৃতের প্রাচীন ধারাটি বজ্রাধরাধিয়াছে। গোবিন্দ দাসাদি কবি যে হঠাৎ একটা নূতন ভাষা সৃষ্টি করিয়া তাহাতে পদ রচনা করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। কোন স্থানে ব্যক্তি-বিশেষের

ব্রজবুলি।

চেষ্ঠায় একটা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, এরূপ দেখা যায় না। ব্রজবুলির সঙ্গে মৈথিলীর সাদৃশ্য থাকিলেও ব্রজবুলি মৈথিলী নহে।

তাই কারণে আমাদের এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে। জনসাধারণের মধ্যে প্রাকৃত ভাষা লিখিবার জন্ত ব্যবহৃত হইত, ইহা অনুমান করিবার কারণ আছে। প্রথমতঃ প্রাকৃত ভাষা যে সংস্কৃতের টোলে পঠিত হইত—তাঁহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শুধু নাটকে প্রাকৃত আছে বলিয়াই যে উহা অদীত হইত, এরূপ অনুমান হয় না,—নিশ্চয়ই প্রাকৃত ভাষা জন-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা না হইলে প্রাকৃত ও পালি উভয়বিধ ভাষা লিখিবার ব্যবস্থা এক সময়ে সংস্কৃত টোলে থাকিবে কেন, গৌর-পদ-তর দ্বিতীয় একটি পদে দৃষ্ট হয় গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে চৈতন্য দেব পালি ও প্রাকৃত উভয় ভাষাই শিক্ষা করিয়াছিলেন। কাব্য-কথা সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক না হইলেও অনেক সময়ে ইতিহাসের ইঙ্গিত উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে; কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে দৃষ্ট হয় “বানিয়ার বালা” শ্রীমন্ত প্রাকৃত পিঙ্গলাদি পাঠ করিতেছেন, ভারতচন্দ্রও প্রাকৃত জানিতেন, স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন। জয়-নারায়ণ প্রভৃতি কবির লেখায়ও ইহার ইঙ্গিত আছে। যদি শুধু নাটকাদি পাঠ করিবার জন্তই প্রাকৃত পড়িবার ব্যবস্থা হইত, তবে এখনকার টোলগুলিতেও পালি ও প্রাকৃত পড়িবার ব্যবস্থা থাকিত।

দ্বিতীয়তঃ রূপ গোস্বামিকৃত প্রাকৃত ভাষায় বিরচিত কবিতা চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে, “ধরিঅ পবিচ্ছন্নং রূপং স্নন্দরং” ইত্যাদি পদে বিজ্ঞাপতির প্রভাব আদৌ নাই। এই প্রাকৃতই কতকটা সহজ করিয়া এবং বিজ্ঞাপতির ভাষার কতকটা অমৃগ করিয়া গোবিন্দদাসাদি কবিরা পদ লিখিয়াছিলেন। এদেশ-কথিত প্রাচীন কালের লিখিত প্রাকৃতই উত্তর কালে “ব্রজবুলি” হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বস্তুতঃ উহা হাওয়া হইতে আসে নাই। তাই কারণে এই প্রাকৃত মৈথিল ও বৃন্দাবনী (ব্রজ) ভাষার বেশী সন্নিহিত হইয়াছে। (১) বিজ্ঞাপতির অমৃগরূপ, (২) বাঙ্গলা দেশের বাহিরে রাধাকৃষ্ণ-লীলা-প্রচার। গোবিন্দদাসাদি কবি এই ব্রজবুলি আখ্যাবর্তে সর্বতোগ্রাহ্য করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। একদিকে উড়িয়া অপর দিকে যথুয়া, বৃন্দাবন এমন কি রাঙ্গস্থান পর্য্যন্ত তাঁহাদের গানের শ্রোতা ছুটিয়াছিল—ভক্তিরসাকর প্রভৃতি পুস্তক পড়িলে ইহা বুঝা যাইবে। ব্রজবুলি প্রাকৃত কবিতারই ধারাটি রক্ষা করিয়াছে।

চট্টগ্রাম ও মহম্মনসিংহের পূর্বভাগে যেখানে বৌদ্ধ প্রভাব (হীনযানী বৌদ্ধ) বহুদিন পর্য্যন্ত বজায় ছিল, সেখানে “গীতি-কথা”র অন্তর্কর্ত্তী কবিতাগুলিকে “পালি” বলে। ইহাতে মনে হয়, পূর্বে বৌদ্ধগণ গল্পভাগ কথিত প্রাকৃত ভাষায় আবৃত্তি করিয়া গানের অংশগুলিকে বিশিষ্টতাদান করিবার জন্য উহা পালি ভাষায় রচনা করিতেন।

উড়িয়া, হিন্দী, বাঙ্গলা, মৈথিলী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষা সহস্র বৎসর পূর্বে অনেকটা একরূপ ছিল, তখন ইহাদের মধ্যে সৌসাদৃশ্য খুব বেশী ছিল। এই কারণে স্বগায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সংকলিত দোহাগুলির মধ্যে বাঙ্গলা-ভাষার কিছু কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু “বৌদ্ধ দোহা ও গান” এবং “ডাকার্ণব” কখনই বাঙ্গলা ভাষার আদিকল্প বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহাদের সঙ্গে হিন্দীর সাদৃশ্যই বেশী। যে সকল শব্দ ‘বাঙ্গলা শব্দ’ বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা পার্শ্ববর্ত্তী প্রাদেশিক

ভাষাগুলিতেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া অপরাপর বৌদ্ধ দোহা ও গান।

লক্ষণ অনুধাবন করিলে ঐ সকল দোহা ও গানের ভাষা হিন্দী প্রভৃতি ভাষারই নিকটতর বলিয়া মনে হয়। স্তার ব্রজেননাথ শীল, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বিবিধ ভাষাবিদ পণ্ডিতের এই মত, এবং বতদূর জানিয়াছি তাহাতে ডাঃ সিলভ্যান লেভি, ডাঃ ব্লক ও ডাঃ গ্রিয়ারসনেরও কতকটা এই মত। যদি এ কথাও প্রমাণিত হয় যে এই সকল লেখকদের মধ্যে কোন কোন জনের বাড়ী বঙ্গদেশে ছিল, তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে সেই সেই লেখক বঙ্গ ভাষায় দোহা লিখিয়াছিলেন। বরঞ্চ ইহা মনে করাই বেশী সম্ভব যে তাঁহারা তৎকালে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষায় কবিতা লিখিয়াছিলেন, নতুবা তাঁহাদের লেখার টীকা সংকৃত ভাষায় রচিত হইবে কেন? সেই সকল কবিতার ভাষার লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিলে বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে তাহার বিশেষ কোন সাদৃশ্যই দৃষ্ট হয় না, পার্শ্ববর্ত্তী প্রাদেশিক ভাষাগুলির কোন কোনটির সঙ্গেই তাহাদের বেশী সাদৃশ্য। এই দোহা লেখকদিগের কেহ কেহ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজয়মান ছিলেন বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন। সেই যুগের খাঁটি বাঙ্গলার দৃষ্টান্ত হুল্লভ হইলেও একেবারে হুজাপা নহে। শূন্তপুরাণ, ধর্মপূজা-পদ্ধতি, গোরক্ষবিজয়—ডাক ও খনার বচন প্রভৃতির ভাষা অনেকটা রূপান্তরিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের মাঝে মাঝে কতক কতক অংশ সেই আদ্য ভাষা বজায় রাখিয়াছে, দৃষ্টান্তস্বলে বলা যাইতে পারে—শূন্তপুরাণের গজাংশ, যেখানে পূজা-পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে, ডাকের অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত প্রবচনগুলি যথা—আতুর-বিধি, স্ত্রী-চরিত্র এবং পিতাপুত্র কলহ সংক্রান্ত সূত্রগুলি, গোরক্ষ-বিজয়ের সাধনা-সম্বন্ধীয় একত্রিশটি প্রশ্ন—এই সকল অংশ কতকটা অবিকৃতভাবে প্রাচীন বাঙ্গলার প্রকৃতি রক্ষা করিয়াছে; এবং দুই শতাব্দী পরে লিখিত চণ্ডীমাসের কৃষ্ণকীর্তনের ভাষা খাঁটি আছে বলিয়া পণ্ডিতগণ জানাইয়াছেন। সুতরাং একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর ভাষার দৃষ্টান্ত আমাদের সাহিত্যে একেবারে বিরল নহে। এই সকল দৃষ্টান্তের সঙ্গে বৌদ্ধ দোহা ও গানের ভাষা মিলাইয়া পড়িলে একেবারে আকাশ পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হইবে। এমন কি কান্দুশাদের ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ‘র’ বা ‘এর’ বাহা

বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরা হয়—তাহার উদাহরণও অপরাপর ভাষায় দুলভ নহে। এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, অপরাপর দোহাকারেণা যে ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা আদৌ বাঙ্গলা নহে, কিন্তু কাহ্নণাদের ভাষার মাঝে মাঝে বাঙ্গলার লক্ষণ একটু একটু দৃষ্ট হয়,—কিন্তু তাহা এত প্রচুর নহে যে তদ্বারা উহা বাঙ্গলা ভাষারই আদিরূপ বলিয়া নিঃসন্দেহে গৃহীত হইতে পারে। “ডাকার্ণব” নামধেয় পুস্তক একেবারে হুর্দোষ; শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় নিজেই লিখিয়াছেন যে উহার এক বর্ণও তিনি বোঝেন নাই, তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই, তথাকথিত নবম কি দশম শতাব্দীতে লিখিত রচনার মধ্যে তিনি কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি চিহ্ন দিয়া এবং মাঝে মাঝে দাঁড়ি টানিয়া তাঁহার সংস্করণটি বাহির করিয়াছেন। এই সকল চিহ্ন তিনি নিশ্চয়ই মূল পুঁথিতে পান নাই।

বৌদ্ধ দোহা ও গান ছাড়িয়া দিয়া আমরা অতি সংক্ষেপে খাঁটি বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনা করিব।

সংস্কৃতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবার পূর্বে বাঙ্গলা ভাষার যে রূপটি ছিল, তাহা প্রাকৃত শব্দবহুল। বস্তুতঃ বাঙ্গলা ভাষাকে বহু প্রাচীন বাঙ্গলা লেখক “প্রাকৃত” সংজ্ঞায়ই অভিহিত করিতেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, বষ্ট সংস্করণ দ্রষ্টব্য)।

বাঙ্গলার নাম প্রাকৃত।

সংস্কৃতের প্রভাব চণ্ডীদাসের সময় হইতে আমরা পাইতেছি। সেই প্রভাবের লক্ষণগুলি এই—(১) বহু আভিধানিক সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ, যাহা সেকালে পাড়ারগেয়ে লোকেরা ব্যবহার করিতেন না। (২) সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত উপমার ছড়াছড়ি যথা—উকুর সহিত কদলী-তরু-কাণ্ডের, বাহুর সহিত নাগের এবং উহা আজ্ঞামূল্যবিত বলিয়া বর্ণনা, কর্ণের সঙ্গে গৃধিনীর কাণের, স্বক্স বুকের জ্বায়, মুখের সহিত পদ্মের, কণ্ঠের সঙ্গে কদুর, অধরের সঙ্গে পকু বিষের, স্তনের সঙ্গে শ্রীফলের, গমনভঙ্গীর সঙ্গে গজগতির কিংবা রাজহংসের গতির, চকুর চাকুল্যের সঙ্গে খঞ্জনের গতির, বেণীর সঙ্গে ভুজঙ্গের ইত্যাদি। (৩) বিষয়গুলির বিস্তারিত বর্ণনা ও একই কথার পুনরাবৃত্তি। (৪) ব্রাহ্মণের প্রতি অগাধ ভক্তি। (৫) প্রতিবিষয়ে দেবতার নিকট সাহায্যপ্রার্থনা। (৬) দেবতার ও দৈবের উপর অচলাভক্তি ও বিশ্বাস।

মোটামুটি এইগুলি চতুর্দশ হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত পাঁচ শতাব্দীর ভঙ্গ-সাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা উচিত, এইরূপে সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ করিতে যাইয়া সব সময়ে আমাদের কালের পৌরোপায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত হইবে না। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্যকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; এক ভাগ সংস্কৃত-প্রভাবের পূর্ববর্তী ও অপর ভাগ সংস্কৃত-প্রভাবের অন্তর্গত। প্রথম ভাগের আদিকাল নবম কি দশম শতাব্দী কিন্তু তাহা এখনও শেষ হয় নাই। দ্বিতীয় ভাগের উৎপত্তি চতুর্দশ শতাব্দী এবং ইহারও শেষ হয় নাই। প্রথম যুগের ভাষা ও ভঙ্গীতে এখনও হয়ত বাঙ্গলার কোন নিতৃত পল্লীতে বসিয়া নিরঙ্কর কবি গান বাঁধিতেছেন বা গল্প রচনা করিতেছেন, তাহা একান্তরূপে সংস্কৃত

প্রভাব-বর্জিত এবং সেই আদি যুগের লক্ষণাক্রান্ত। দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ সংস্কৃতের প্রভাবাবিত সাহিত্যেরও প্রচেষ্টা এখনও অস্ত হইয়া নাই, হয়ত এখনও কোন কবি কবিকল্প বা ভারত-চন্দ্রের অমুকরণে গণেশ ও সরস্বতী-বন্দনা লিখিতেছেন। ইতিমধ্যে নব জাগরণের দিনে ‘দস্তোলি’ ‘ইরশাদ’ প্রভৃতি শব্দযোগে মধুসূদন গ্রীকগীতির অমুবর্তী হইয়া ইলিয়ড বা প্যারাডাইস্ লষ্টের অমুকরণে যে মহাকাব্য রচনা করিয়া গেলেন, কিংবা রবীন্দ্রের শতবেণুবীণা-মুরজমনিরানিন্দিত গীতিধ্বনি বঙ্গীয় কুঞ্জে ধ্বনিত হইয়া গেল—তাহাদের রচনায়ও সেই সংস্কৃত প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সুতরাং লক্ষণ দেখিয়া—(কালের হিসাবটা কতক পরিমাণে আড়াল রাখিয়া) সাহিত্যকে আমরা পূর্বকথিত দুইশ্রেণীতে বিভাগ করিয়া লইব। প্রথম শ্রেণীতে ৯ম-১০ম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ও তদুদ্ভাবপর সমস্ত সাহিত্যকে অন্তর্গত করিয়া লইব। দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণগুলি কতক কতক নির্দেশ করিয়াছি, এখানে প্রথম শ্রেণীর লক্ষণগুলি বিবৃত করিব—

(১) খাঁটি প্রাকৃত শব্দের বাহুল্য। (২) উপমাগুলি কোন পুস্তক বা সাহিত্য হইতে ধার

করা নহে—

পাড়াগাঁয়ে যাহা সচরাচর চোখে পড়ে, তাহাই উপমা-

রূপে ব্যবহার করা, যথা মুখের সঙ্গে ‘মহুয়া’ ফুলের, চোখের সঙ্গে

‘অপরাজিতা’ ফুলের, শুভ্র দস্তুর সঙ্গে ‘সোলা’র। উপমার বাহুল্য একেবারেই নাই। সংস্কৃত প্রভাবাবিত সাহিত্যে যেরূপ বিস্তৃত রূপবর্ণনা, সংস্কৃতের কৃত্রিম উপমা কেনাইয়া দীর্ঘ করা হয়, অথচ উহাতে কোন রূপবান্ বা রূপবতীর রূপ একেবারেই চিত্রিত হয় না, বৃথা পাণ্ডিত্যের কোয়াসার মধ্যে রূপ অদৃশ্য হইয়া যায়,—প্রাক্ সংস্কৃত সাহিত্যে তাহা হয় না। অতি অল্প কয়েকটি ছত্রে সুন্দর বা সুন্দরীর ছবি যথাযথরূপে স্পষ্ট হয়—যথা “সোণার তরুয়া বঁধু একবার পেখ, আমার নয়ন দিয়া একবার দেখ” (মহুয়া)—“শয্যায় পড়িয়া কস্তা, এলোথেলো বেশ। সারাটি পালক জুড়ি আছে কস্তার দীঘল মাথার কেশ”—সেই মেরু-মান্দার-হংস-গৃধিনী-গজরাজ-নাগ প্রভৃতি উপমানের বাহুল্য-বিড়ম্বিত রূপ-বর্ণনা অপেক্ষা পূর্বোক্তভাবে ছুটি ছত্রে অনাড়ম্বরে ব্যক্ত বর্ণনা চিত্রটিকে কত বেশী উজ্জ্বল শ্রী দান করিয়াছে! দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যগুলির প্রকৃতি বর্ণনায় এক বেয়ে কৃত্রিম সংস্কৃতের দাসদ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ কতকগুলি বীধা গৎ সর্বত্র দৃষ্ট হয়। বসন্ত কাল হইলেই কোকিল ডাকিবে, ভ্রমর গুনগুন করিবে; বর্ষা হইলেই ভেক ডাকিবে, কেয়াফুল ফুটিবে—এই ভাবে কয়েকটা নির্দিষ্ট কথা সমস্ত কাব্যেই পাওয়া যায়; কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কাব্যে, কবি নিজের চক্ষে প্রকৃতি দেখেন ও নিজের কাণে প্রকৃতির বিচিত্র ধ্বনি শুনে, তাই ছচার কথায় ছবি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। মল্লিকা গীতিকার পাড়াগাঁয়ে এঁধো পুকুর ও কদম-মন্দার ও কদলীসমবিস্ত পুকুর-পাড়টি কবি যেন কয়েকটি ছত্রে একেবারে চোখের সামনে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন—“শাওনিয়া মেঘ শিরে, বজ্র ধরি মাথে। বউ কথা কও বলি কীদে পথে পথে।” মাথার উপরে বজ্র, ঝড় বৃষ্টি তুফানে সিক্ত শরীরটা উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে—কিন্তু তাহা

অগ্রাহ্যের মধ্যে—পাখীটা তাহার প্রণয়িনীর মান ভাবিবার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। “হাতেতে সোণার ঝাড়ি বধা নেমে এসে” (কঙ্ক ও লীলা) এখানে সোণার ঝাড়ি অর্থ বিজ্ঞান।

প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের আর এক লক্ষণ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিরা এমন কি আধুনিক ঔপন্যাসিক ও কবিরা যাহা একশত পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিতেন তাহা প্রাক-সংস্কৃত সাহিত্যের লেখকগণ দশ পৃষ্ঠায় শেষ করিবেন। ইহারা যাহা স্বচক্ষে দেখেন এবং নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করেন, তাহাই লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকগণ তাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িক ধর্মমত ও সংস্কৃত কাব্যগুলির কথা কিছুতেই ভুলিতে পারেন না, যেখানে সেখানে উপলক্ষ পাইলেই ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, তীর্থভ্রমণের পুণ্য ও সংস্কৃত পুরাণের গল্পগুলি জুড়িয়া দিয়া স্বীয় কাব্য অবধা ভারাক্রান্ত করেন। পল্লীসাহিত্যে দেবলীলা একেবারেই দৃষ্ট হয় না। কর্ম-গৌরবই নায়ক-নায়িকাদের প্রধান অবলম্বন। তাঁহারা বিপদের চূড়ান্ত ভোগ করিয়াও দেবতার নাম জপ করিতে বসিয়া যাইবেন না, বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। সংস্কৃতের প্রভাবাবিহীন সাহিত্যের পথ একেবারে উন্টা—সেখানে নায়ক-নায়িকা বিপদে পড়িলেই স্তোত্রপাঠ আরম্ভ করিয়া দিবেন এবং উদ্ভিষ্ট দেবতা যে তখনই অসিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাদিগকে বিপদ হইতে ত্রাণ করিবেন, সে সম্বন্ধেও পাঠকের পূর্ক হইতেই কোন সংশয় দৃষ্ট হয় না—এবং এইজন্ত চরিত্রগুলির অণুমাত্র স্বকীয় গৌরব লক্ষিত হয় না।

ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের পূর্ক বৌদ্ধনীতিই সমাজে কার্যকরী হইয়াছিল। বৌদ্ধনীতি কর্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত; এই সূত্র অনুসারে কর্মফল কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, যেমন কর্ম করিবে, তেমনই ফল ভোগ করিবে। এই জন্ত প্রাক-সংস্কৃত সাহিত্যে নায়ক-নায়িকারা অবিরত কর্মশীল। ব্রাহ্মণ্য নীতি ভক্তিবাদ আশ্রয় করিয়া শেষকালে এদেশে বিকাশ পাইয়াছিল। বাঙ্গলা মহাভারতেও বৈষ্ণবগ্রন্থাদির শিক্ষা—একবার মাত্র হরিনাম করিতে যত পাপ নষ্ট হয় মানুষ একজন্ম তত পাপ করিতে পারে না। “সর্বশাস্ত্রে বীজ হরি-নাম দ্বি-অক্ষর। আমি অন্ত নাহি যার বেদে অগোচর” (মহাভারত, আদি)। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে কর্ম ও জ্ঞান প্রধান স্থান পায় নাই। ভক্তিই মুক্তি ও সফলতার একমাত্র পথ। সুতরাং ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবাবিহীন সাহিত্যে ভক্তির জয়জয়কার, পুরুষকার আড়ালে পড়িয়া গেল। মহা প্রণয়ীকে যখন কোন স্থানেই খুঁজিয়া পাইল না, তখন আত্মত্যাগ করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিল, কিন্তু তখনই ভাবিল আমার খোঁজা তো শেষ হয় নাই, সন্ধান করার কাজ বাকী আছে, শেষ পর্যন্ত না দেখিয়া আমি নিরাশ হইব না, সুতরাং আবার খুঁজিতে আরম্ভ করিল। নিজের চেষ্টায় চূড়ান্ত না করিয়া এই সকল নায়ক-নায়িকারা হাল ছাড়িয়া দেন নাই। নব ব্রাহ্মণ্যের পূর্ক দেশে যে হিন্দুধর্ম ছিল তাহা বৌদ্ধ কর্মবাদ আশ্রয় করিয়াছিল। কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাবাবিহীন সাহিত্যে মশানে যাইয়া শ্রীমন্ত চণ্ডীর “চৌতিশা” আবৃত্তি করিতেছেন, গুণবন্ধ রাজার গুণধর পুত্র মশানে বসিয়া ককারাদি করিয়া বর্ণবালার সমস্তগুলি অক্ষর দিয়া কালীর একএকটি নাম প্রস্তত করিতেছেন। কালকেতুর জায় মহাবীরও স্বীয় ‘লোহার সাবলে’র

জায় হুই বাহ ও অস্ত্রশস্ত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া চণ্ডীমাতার নাম স্মরণ করাই একমাত্র উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

প্রাক-সংস্কৃত সাহিত্যে মানুষই বড়—দেবতার কোন হাত নাই। “সবার উপরে মানুষ বড়, তাহার উপরে নাই।” এই জ্ঞান সিদ্ধ ব্যক্তি ও তাপসগণ দেবতাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। হাড়িসিদ্ধা “স্বর্ঘ্যের পৃষ্ঠে রাঁধে বাড়ে চাঁদের পৃষ্ঠে খায়” এবং দেবরাজের পুত্র স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে “চামর ঢুলায়।” ময়নাবুড়ি যমরাজকে তাড়া করিয়া তাঁহাকে জাহি মধুন্দন ডাক ছাড়াইতেছেন ও গোরক্ষনাথ চণ্ডীর গর্জ খর্জ করিয়া নিজের তপঃপ্রভাব দেখাইতেছেন। ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের যুগে কতকটা এইভাবে ব্রাহ্মণকে বাড়ানে হইয়াছে।

প্রাক-সংস্কৃত সাহিত্যকে নিম্নলিখিত কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—

- ১। পালরাজাদের গান; এই গান এপর্যন্ত খুব অল্পই সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু রাজ্যপাল, ধর্মপাল, মহীপাল প্রভৃতি রাজত্ববর্গের সম্বন্ধে যে বাঙ্গলা গান ছিল তাহা অনুশাসনাদিতে উল্লিখিত আছে। মহীপালের গানের সামান্য অংশ সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু ইহার যে একটা

প্রাক-সংস্কৃত যুগের বঙ্গ-সাহিত্য।

দীর্ঘ পালা গান এখনও আছে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত চৈতন্য-ভাগবতে যোগীপাল, ভোগীপাল ও মহীপাল সম্বন্ধে যে ভাবের উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহাতে মনে হয় যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই গীতিকাগুলির বহুল প্রচলন ছিল।

- ২। নাথ-গীতিকা; নাথধর্মের গুরুদিগের কীর্তির বর্ণনা উপলক্ষে এই সকল গান বিরচিত হইয়াছিল। হাড়িসিদ্ধা ও ময়নামতীর অদ্ভুত শক্তি ও লীলা বর্ণনা করিতে বাইয়া ময়নামতী-সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। ময়নামতী ছিলেন মেহেরকুলের রাজা তিলকচন্দ্রের কন্যা। বিক্রমপুরের “চন্দ্র” রাজাদের একজন ইহাকে বিবাহ করেন। ইহার নাম মালিকচন্দ্র। ইনি

গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দ-চন্দ্র।

উত্তরাধিকার-স্বত্রে বিক্রমপুরের অনেকাংশের অধিকারী হইয়া যশোরের পুত্র না থাকাতে মেহেরকুলও লাভ করেন, তাহা ছাড়া গোড় অঞ্চলে রংপুর প্রভৃতি স্থানের একটা খণ্ডরাজ্যের

ইনি ইজারা লইয়াছিলেন। তৎপুত্র গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র মাতার আজ্ঞায় অল্পবয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ষাটশ বর্ষ পরে রাজ্যে ফিরিয়া আসেন, তখন ইহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর। গোপীচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র) সাতারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের অহুনা ও পহুনা নামক দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। সম্ভবতঃ এই গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে রাজেন্দ্র চোলের ১০২৫ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ হইয়াছিল। নাথসম্প্রদায়ের সাহুকুলো এই ময়নামতীর গান (অথবা মালিকচন্দ্র-গাথা কিংবা গোবিন্দচন্দ্রের গীতি—প্রভৃতি নামবিশিষ্ট পল্লী-গীতিকা) একদিকে উড়িষ্যা অপর দিকে বোম্বাই এবং ভারতবর্ষের বহুস্থানে প্রচারিত হইয়াছিল।

নাথ-গীতিকার মধ্যে গোরক্ষবিজয় একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহাতে যোগী গোরক্ষ-

নাথ কিভাবে তাঁহার গুরু মীননাথকে কদলীপত্রে মহিলাবর্ণের প্রতি অশ্লীল আশঙ্কিত ও তজ্জনিত অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত আছে। এই কাব্যে ফরজুল্লা, ভবানীদাস প্রভৃতি কবির ভণিতা পাওয়া যায়।

৩। ধর্মপূজার পুঁথি—ইহার রচয়িতা রামাইপণ্ডিত; বৌদ্ধধর্ম শেষকালে ধর্মপূজার পরিণত হইয়াছিল। এই পূজার বিধিব্যবস্থাদি ‘শূণ্যপুরাণ’ ও ‘ধর্মপূজা-পদ্ধতি’ প্রভৃতি পুস্তকে পাওয়া যায়। এই পুস্তকদ্বয়ে অনেক ঐতিহাসিক ইঙ্গিত আছে।

৪। গীতিকথা, রূপকথা ও পল্লী-গাথা—প্রাক-সংস্কৃত সাহিত্যের ইহারাই মধ্যমণি—সমস্ত বঙ্গসাহিত্যের ও বাঙ্গালীজাতির গৌরব। কিছুদিন পূর্বেও ইহাদের অস্তিত্ব জানা ছিল না। রামায়ণ প্রভৃতি পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়, রাজাদিগের সভায় রূপকথা শুনাইবার লোক ছিল। ভারত যখন হুঃস্থগ দেখিয়া মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মাতুলদের সভার “কথা বলিয়ে”রা তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য নানারূপ গল্প বলিয়াছিল। শুধু রাজসভায় নহে, রাজাস্তঃপুরেও কথা বলিবার জন্য স্ত্রীলোক নিযুক্ত ছিল—ইহাদের নাম ছিল “আলাপিনী”। রাজাস্তঃপুরে এই “আলাপিনী”দের প্রত্যহ কথা শুনাইতে হইত। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান অধিকারে এই শ্রেণীর লোকের উল্লেখ সর্বদা পাওয়া যাইতেছে। বৌদ্ধ পালরাজগণের সময়ে তাঁহাদের কীর্তিকথা ইহারা গান বাধিয়া শুনাইত। তাম্রশাসনে উক্ত আছে যে ধর্মপাল (?) নিজের প্রশংসাসূচক এই সকল গান ও গল্প শুনিয়া লজ্জায় মুখাবনত করিতেন। মুসলমানরাজাদের সময়েও এই ‘কথা বলিয়ে’দের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। আলিবর্দী খাঁর সম্বন্ধে মুতক্ষরিনে লিখিত আছে যে, তিনি প্রত্যহ একটা নির্দিষ্ট সময়েই এই গল্পকারীদের মুখে গল্প শুনিতেন। মীরজাফরের পুত্র মীরন বেদিন ঘোর অন্ধকার ও ঝড়বৃষ্টি-পূর্ণ নিশীথে আজিমগঞ্জের নিকট গভীর অরণ্যে স্বীয় ক্ষুদ্র শিবিরে বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন, তখনও তাঁহার সঙ্গে ছইটি গণিকা ও গল্প বলিবার জন্য একজন ‘আলাপিনী’ ছিল। এই গল্পকারিকাও সেই বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করে, গোলাম হসেন এই উপলক্ষে একটা ফারসী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়াছেন, যে ব্যক্তি ছুইটির সঙ্গে থাকে সেও সেই ছুইটির গতি প্রাপ্ত হয়। আরম্ভেও রাজসভার গল্পকারক ও আলাপিনীদের পদ বজায় রাখিয়াছিলেন।

এই সকল “আলাপিনী” ও গল্পকারক রাজা ও রাজতুলা সম্রাস্ত ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রাসাদে নিযুক্ত হইত, সুতরাং সুকৌশলে গল্প করার নীতি তাহাদের শিক্ষা করিতে হইত। রাজাদের আশ্রয়ে এতদ্দেশে যেসকল অপূর্ণ চারুশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল, এই গল্প বলিবার ভঙ্গী, বিষয়বর্ণন, চরিত্র, মূল ঘটনার বিবৃতি—গল্পকারীরা সেইরূপই আশ্চর্য্য কৌশলের সঙ্গে শিখিয়াছিল। এই গল্পের মধ্যে বৌদ্ধ জাতকের আশ্চর্য্য আত্মত্যাগ, হিন্দুর নিষ্ঠা, পাতিব্রত্যা এবং নরনারীর বিবিধ আদর্শগুণ একরূপ মনোরম ভাবে ফুটিয়া উঠিত, যাহার তুলনা ভঙ্গ-সাহিত্যেও বিরল। অথচ এক একটি গল্পে অক্ষুরস্ত পরিহাস-রস এবং বালকের মনোরমতার উপযোগী উপাদানও থাকিত। কথাস্থলির অধিকাংশই গল্প, মাঝে মাঝে গান থাকিত—

ইহাদের যেমনই উচ্চশিক্ষা, তেমনই করণরস ; পাঠক কখনও হাসিবেন এবং কখনও কাদিবেন এবং এক সঙ্গে রোজ-বৃষ্টির খেলা—আলো ও ছায়া—ঠাঁহার মুখে চোখে দেখা যাইবে। মাঝে মাঝে অলৌকিক ঘটনা থাকতে বালকদের কল্পনা-শক্তি উদ্বোধিত হইবে। গীতি-কথাগুলির মধ্যে মালকমালা, কাকনমালা, আদ্য বহু শ্রামরায়, নহর মালুম, শম্মমালা, কাজলরেখা, ধোপার পাট প্রভৃতি কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর। ইহাদের মত গল্প অল্প কোন ভাষায় আছে কিনা জানিনা। কারণ যে জাতির মসলিন স্বপ্ন শিল্পের অপ্রতিদ্বন্দী সামগ্রী, তাহাদের নব্যতায় স্বপ্ন বুদ্ধিবৃত্তির অতুলনীয় নিদর্শন, সেই জাতি ভিন্ন স্বপ্ন সৌন্দর্যের জাল বুনিয়া আর কে এরূপ গল্প রচনা করিবে? মনে হয়, উপনিষৎ, বৌদ্ধ জাতক, হিন্দু পুরাণ, রামায়ণাদি কাব্য প্রভৃতি সকলের রস নিংড়াইয়া এই গীতিকথা-গুলি প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা বাঙ্গলার গার্হস্থ্য জীবনের মর্ম্মকথা বেরূপভাবে প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছে তাহার তুলনা নাই।

রূপকথা শুধুই ছেলেদের আমোদ-প্রমোদের জন্য রচিত। ২২ জোয়ান ও ২৩ জোয়ানের কথা প্রভৃতি এই শ্রেণীর। ইহা সমস্তই গল্পে রচিত। গীতি-কথার শ্রেষ্ঠত্ব ইহাদের নাই। সম্ভবতঃ বঙ্গীয় রূপকথাই সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া পাশ্চাত্যদেশ বিজয় করিয়াছে। এসম্বন্ধে আমরা Folk Literature নামক পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

পল্লীগীতিকা—ইহাদের খুব প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। যেগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কোনটিই মুসলমান-রাজত্বের পূর্বের নহে। সম্ভবতঃ পাল-রাজাদের প্রশংসা-স্বচক যে সকল গাথা প্রচলিত ছিল—পল্লীগীতিকাগুলি সেই ধারাটি রক্ষা করিয়াছে। গঙ্গার আদি খুঁজিতে বেরূপ হরিদ্বারে যাইতে হয়, এই পল্লীগাথাগুলির উৎপত্তি নির্দেশ করিতে হইলেও আমরা গকে সেইরূপ অপ্রাচীন হিন্দুরাজত্ব যাইতে হইবে। ইহাদের ভাব ও চরিত্রাঙ্গন সমস্তই নবব্রাহ্মণ্যের বিরোধী। ইহাদের অনেকগুলিতে মেয়েরা বৌবনে উপস্থিত হইয়া নিজেরা বর নির্বাচন করিয়া বিবাহ করিতেছেন। নিজের মতের সঙ্গে অভিভাবকের নির্বাচনের গরমিল স্বতন্ত্র ভাবনা হইতে দ্বিচারিণী হইতে স্বীকৃত হন নাই, স্বীয় প্রণয়ীর গলেই বরমালা দিয়াছেন। ইহাদের কোন কোন গল্পের মধ্যে সমুদ্র-যাত্রার বর্ণনা অতি চমৎকার। ব্রাহ্মণদিগকে এই সকল পল্লীগাথার কোন স্থান দেওয়া হয় নাই এবং সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের নববিধানগুলি ইহারা অগ্রাহ করিয়াছে। সমস্ত পল্লীগাথা-সাহিত্যে একটা আশ্চর্য্য ক্ষুধা ও স্বাধীনতার হাওয়া বহিয়া যাইতেছে। এই ক্ষুধা ও স্বাধীনতা একদল গোড়া ব্রাহ্মণের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা গাথাগুলি হিন্দুবাড়ীতে এখন আর গাহিতে দিতেছেন না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুসলমান গায়কগণ ইহাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ভূতপূর্ব ডিরেক্টার ওটেন সাহেব বলিয়াছিলেন যে, ধুমাক্কর, বালুময় সহরের ধূসর আকাশ ছাড়িয়া হঠাৎ পদ্মার অবাধ হাওয়া ও আলোর মধ্যে আসিলে মন বেরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠে, কৃত্রিম সাহিত্যের গম্বী ছাড়িয়া এই পল্লীসাহিত্যের স্বন্দর রাজ্যে আসিলে তেমনই আনন্দ হয়,

পল্লীগীতিকাগুলির কতটা আদর বর্তমানে বাঙ্গলা দেশে হইবে, তদ্বারা বুঝা যাইবে বাঙ্গালী তাহার ভবিষ্যৎ গড়িবার কতটা শক্তি রাখে। এই পল্লীগাথাগুলির সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে (৩৮৪-৪০২ পৃঃ) একবার আলোচনা করিয়াছি। মলুয়া, মহুয়া, চন্দ্রাবতী, রাণী কমলা, বণিকু হুহিতা কমলা, দেওয়ানা মদিনা, মঞ্জুর মা, ভেলুয়া, নছর মালুম, ছুরমেহা ও কবর, আন্ধা বন্ধু, গ্রামরায় প্রভৃতি গাথা উৎকৃষ্ট। আমরা বড় বড় কাব্য ও পুরাণে দুই চারিটি প্রধান নায়িকা পাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গাথাগুলির প্রায় প্রত্যেকটি স্বীয় দশ বার পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র গভীর মধ্যে এক একটি অমর আলেখ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ইতিহাস-বিশ্রুত ভারতের সাবিত্রী, সীতা, শকুন্তলা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতির পার্শ্বে বঙ্গীয় গাথাগুলির নায়িকারা এক পঙ্ক্তিতে স্থান লইতে পারেন। বসোরার বাগানের গোলাপের মত এই গাথাসাহিত্যে আদর্শ নারীগণ অদ্বৈত। ইহারা একত্বাঙ্গে ঢালা নহেন। পাতিব্রতাই ইহাদের একমাত্র আদর্শ নহে, অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণ্যবিধি লঙ্ঘিত এবং গ্রামরায়, আন্ধা বন্ধু প্রভৃতি পালায় পাতিব্রতাকে আড়ালে ফেলিয়া একনিষ্ঠ প্রেম তাহার বিজয়ী ধ্বজা উত্তোলিত করিয়াছে। ইহারা সামাজিক নিন্দা-প্রশংসা দ্বারা তিলমাত্রও বিচলিত হন নাই। হিন্দু-সাহিত্যের সহিত অভ্যস্ত পাঠক চমৎকৃত হইয়া দেখিবেন এই গাথাকথিত মহিলারা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ছাঁচে ঢালা, অথচ ইহারা কোন স্থানেই স্বভাবকে অতিক্রম করেন নাই। এমন কি আন্ধা বন্ধুর পালায় যখন রাজকুমারী স্বামীকে বলিয়া কহিয়া তাঁহার রাজ-প্রাসাদের শয্যাভ্যাগ করিয়া একটা অন্ধ ভিক্ষকের জন্ত প্রেমের মাল্যহস্তে নির্ভীকভাবে চলিয়া গেলেন তখনও তাঁহার প্রতি দোষারোপ করার প্রবৃত্তি হয় না। মনে হয় যেন বিস্তৃত একখানি স্বর্ণপ্রতিমার মত প্রেমের দেবতা বিশ্বয় উৎপাদন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। মহত্ত্ব, সামাজিক বিধি এই নৈসর্গিক খাঁটি নিষ্ঠার কাছে যেন ফুৎকারে উড়িয়া গেল। সহজিয়ারা যে পরকীয়া প্রেমের আদর্শ গঠন করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গলার হাওয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাধীন ও একনিষ্ঠ প্রেমিকাদের এই সকল ছবি দেখিয়া। গাথা-রচকেরা সংসার পর্য্যন্ত সীমা-রেখা চিহ্নিত করিয়াছেন, সহজিয়ারা সেই চিহ্ন ডিঙাইয়া যাইয়া ইহাদের জন্ত স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বলিয়াছেন—তোমরা ইহাদিগকে মাটির মানুষ মনে করিয়াছ, কিন্তু ইহারাই স্বর্গের অধিবাসী; এইরূপ সমাজ-ভোলা সাহসিক প্রেমই ভগবানকে পাইবার একমাত্র পন্থা—“ব্রহ্মাও ব্যাপিয়া আছয়ে বে জন, কেহ না চিহ্নে তারে, প্রেমের আরতি যেজন জানয়ে—সেই সে চিনিতে পারে”—চণ্ডীদাস। ইহাদের হৃদয়ের নির্মল, যুধিকান্ত্র সাধু এবং তপস্তা ও কষ্ট সহিবার অসীম শক্তি দর্শনে স্বতঃই হৃদয়ের অর্ঘ্য ইহাদের পায় দিতে ইচ্ছা হয়,—ইহাদের সমাজনিষ্ঠিত দুঃসাহসিক কর্মের জন্ত অভিযোগের ভাষা মুখে আসিয়া ফিরিয়া যায়। এই গাথা-সাহিত্যে বাঙ্গলার সমাজ, রাজনৈতিক অবস্থা, ভৌগোলিক তত্ত্ব, আচার-ব্যবহার, বাণিজ্য-শিল্প প্রভৃতি নানাবিষয়ের যে উদাহরণ পাওয়া যায়, তাহা ঐতিহাসিকের পক্ষে অমূল্য।

প্রবচন—ডাক ও খনার বচন সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা গিয়াছে। (১২১৫-১৮ পৃষ্ঠা)।

বাঙ্গলার কতকগুলি ধর্মকাব্য প্রাক-সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত, যথা—মনসামঙ্গল, শিবায়ন ও ধর্মমঙ্গল কাব্য এবং কৃষ্ণ-ধামালী। ইহাদের পত্তন দেওয়া হইয়াছিল প্রাক-সংস্কৃত

যুগে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে মহারাজ ধর্মপালের স্থালিকা রজাবতীর
মঙ্গল-কাব্য। পুত্র মেদিনীপুরের ময়না গড়ের রাজা কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন

কর্তৃক কামরূপ (কাউর) ও 'অজৈয়ডেকুর' বিজয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া লাউসেনের মাতুল মহামদের (মাহুজার) বড়বস্ত্র ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত আছে। পাল-রাজাদের সময়ের এদেশের লোকের আদর্শ ও রাজভক্তি যে কত বড় ছিল, তাহার বহু আভাস এই কাব্যে দৃষ্ট হয়। হিন্দু রমণীর তপোবল রজাবতীর চরিত্রে উজ্জ্বল ভাবে আঁকা হইয়াছে। কালু ডোমের আশ্চর্য্য বীরত্ব ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার জন্য ক্রক্ষেপহীন ভাবে জীবন-ত্যাগ এবং বৌদ্ধ জগতের কতকগুলি গুণকে খুব রং ফলাইয়া দেখান হইয়াছে।

লক্ষ্যার চরিত্রে অসামান্য রাজভক্তি, স্বামিপুত্রকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াও যে রাজভক্তি বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই, এদেশের অধস্তন স্তরের লোকদের উন্নত নৈতিক আদর্শ প্রতিপন্ন করিতেছে। রাজদ্বারে সাক্ষা দেওয়ার বিভীষিকা হরিহর বাইতির চরিত্রে এবং হিন্দুললনার ধর্মভীরুতা তাঁহার জীব চরিত্রে দৃষ্ট হইতেছে। ধর্মমঙ্গলের আদিলেখক ময়ূরভট্টের রচনা এখনও সমস্তটা পাওয়া যায় নাই; কিন্তু পরবর্ত্তী কবি মাণিক গাঙ্গুলী, রূপরাম, ঘনরাম ও সীতারাম প্রভৃতি কয়েক জনের কাব্য আমরা পাইয়াছি। এই সকল কবি ব্যতীত আরও বহুকবি ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কবিরা ব্রাহ্মণ্যের আদর্শের সঙ্গে বৌদ্ধ আদর্শ মিশাইয়া

কাব্যগুলির গৌরবের হানি করিয়াছেন। এত বড় বীর লাউসেনকে ভক্তের পঙ্ক্তিতে ফেলিয়া তাঁহাকে দিয়া এবং প্রহ্লাদের অভিনয় করাইতে যাইয়া—তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্য সমস্তই মাটি করিয়া ফেলিয়াছেন। তথাপি প্রত্যেক খানি ধর্মমঙ্গলে হিন্দুরাজত্বের কিছু-না-কিছু উপকরণ

আছে, তাহা অতীব মূল্যবান; অনেক ভৌগোলিক ও প্রাচীন সমাজের তত্ত্ব এই পুস্তকগুলিতে পাওয়া যায়, শৈললিপি ও তাম্রশাসনগুলির সঙ্গে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি মিলাইয়া পড়িলে বঙ্গের ইতিহাস-সঙ্কানী পাঠক অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিবেন। এখনও বহু কবির রচিত ধর্ম-মঙ্গল বঙ্গের পল্লীতে পড়িয়া রহিয়াছে, কে তাহাদের খোঁজ করে? এখনও

কামরূপে ইছাই ঘোষের শ্রামরূপার মন্দির, কর্ণগড়ে লাউসেনের ভগ্ন রাজপ্রাসাদ সেই প্রাচীন রাজাদের কীর্ত্তি-কথা ঘোষণা করিতেছে। যে হরিপাল রাজার কন্যা কানোড়ার সঙ্গে

যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার নামাঙ্কিত হরিপাল-নগরী এখনও বিজয়মান এবং তাঁহার বিশাল পুরীর বাহিরের দিক্‌টা এখনও 'বাহিরখণ্ড' বলিয়া পরিচিত। ইছাই ঘোষ তাম্রশাসনের দ্বন্দ্ব ঘোষ কিনা ইহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতর্ক চলিতেছে এবং প্রাচীন রাজা পাইলে তাঁহাকে স্বশ্রেণীতে টানিয়া আনিয়া স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধির জন্য কেহবা তাঁহাকে

কায়স্থ, কেহবা সদ্‌গোপ, কেহবা গয়লা করিবার চেষ্টায় আছেন। প্রাচীন বাঙ্গলা পঞ্জিকা-গুলিতে কলিযুগের রাজচক্রবর্ত্তিগণের মধ্যে লাউসেন, মহীপাল প্রভৃতির নাম ছিল। আধুনিক পঞ্জিকাগুলি অনাবশ্যক মনে করিয়া লাউসেনের নামটি তুলিয়া ফেলিয়াছে। মাণিক গাঙ্গুলীর

শ্রায় ব্রাহ্মণ অতি-দ্বিধার সহিত বৌদ্ধ রাজস্ববর্গের কীর্তিজ্ঞাপক এই পুস্তকের যখন একটি সংস্করণ প্রণয়ন করেন, তখন জাতি বাওয়ার ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন। হিন্দুরা প্রথমতঃ বৌদ্ধ জগতের প্রাচীন কাব্যগুলি, যাহা জনসাধারণের হাতে ছিল, তাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিয়াও এই সকল কাব্যের শ্রোতার সংখ্যা ও প্রাপ্তব্য অর্থের লোভবশতঃ শেষে সর্ব সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়াছিলেন, একটা প্রত্যাদেশের দোহাই দিয়া অবশেষে তাঁহারা এই বিষয় হাতে লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ধর্মমঙ্গলকে নূতন আদর্শের আমলে আনিতে চেষ্টা করিয়া ইহার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়াছেন।

শিবায়ন সম্বন্ধে পূর্বেই লেখা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের পূর্বে শিবঠাকুর ইতর লোকের মধ্যে কৃষাণ-দেবতারূপে পূজা পাইতেন। তারপর ব্রাহ্মণ্য-যুগে এই শিবঠাকুরকে

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, রামেশ্বর চক্রবর্তী, জয়নারায়ণ সেন এবং শিবায়ন।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর প্রভৃতি কবিরা একটু উন্নত করিতে চেষ্টা করেন। মুকুন্দরাম শিবকে কতকটা কালিদাসের শিবের মহিমা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, মহাভারতকার কাশীদাস ইহাকে স্বকীয় গৌরবে স্প্রতিষ্ঠিত করেন; তাঁহার শিবের মধ্যে—জনসাধারণের ধারণার চিহ্নমাত্র নাই—সে শিব কুচুনী পাড়ায় যান না, ক্ষেতে হল চালনা করেন না, বাঁড়ের উপরে চড়িয়া ভিক্ষায় বাহির হন না, এমন কি শিবানীর সঙ্গে কৌদলও করেন না। কিন্তু ভারতচন্দ্র এতবড় সংস্কৃতের ভাব লইয়াও সাধারণের আদর্শটা ছাড়িতে পারেন নাই। সেই পুরাতন খসড়ার উপর তুলি বুলাইয়া তিনি তাঁহাকে কতকটা সভ্যভবা করিয়াছেন মাত্র। একমাত্র রামেশ্বর “শিবের গীতের” প্রাচীন সুরটি বজায় রাখিয়াছেন; ইহাতে শিবঠাকুর কৃষাণ, তাঁহার ভৃত্য ভীম,—শিব ক্ষেতের আগাছা তুলিয়া ফেলেন, আইল বাঁধেন, শষ্যে পোকা লাগিলে ঔষধ দেন—এবং জোঁকের উৎপাত হইলে তাহাদের মুখে চূণ লাগাইয়া হত্যা করেন। ইনি খেয়া পাড়ি দিয়া কুচুনী পাড়ায় যান এবং শিবানীর সঙ্গে কৌদল করেন এবং তাঁহার যান ডাঙ্গাইবার জন্ত শাঁখার বোঝা কাঁধে করিয়া হিমালয়ে যান। বিজয়-গুপ্তের মনসামঙ্গলের শিবও কতকটা এই ধরনের। শিবের গীত সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা ৫৭২-৭৩ পৃষ্ঠায় একবার লিখিয়াছি। বস্তুতঃ এই গীত যে অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহার একটি প্রমাণ এই যে বাঙ্গলা ভাষায় হিন্দুর বতগুলি দেবমহিমা-জ্ঞাপক প্রাচীন পুথি পাওয়া যায়, যথা—চণ্ডীমঙ্গল, মনসাদেবীর ভাসান, অরদামঙ্গল প্রভৃতি তাহার সকলগুলিতেই শিবের ছড়া দিয়া মুখবন্ধ করা হইয়াছে। এই প্রাচীন শিব সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব-বিরহিত। অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর শিব বঙ্গদেশের শত সহস্র কৃষকের ঘরের লোক; এই দেবচরিত্রটি কৈলাসেরও নয়, স্বর্গশান-মঙ্গানেরও নয়, নিবাতনিকম্প দীপশিখার শ্রায় নির্দ্বিকল্প যোগ-সমাধি-প্রাপ্ত তাপসও নহেন, এমন কি কালিদাসোক্ত মার্জিত-কুচি, কতকটা সন্নিধ-চিন্ত প্রেমিকও নহেন, তিনি চাবার ঘরের খাটি মাছ। পরবর্তী যুগে সংস্কৃত পুরাণের যে প্রভা দেশময় সর্বত্র পড়িয়া শিবকে ঔজ্জ্বল্য দান করিয়াছিল—

জনসাধারণও যে আদর্শের ভাগীদার হইয়াছিল—এই প্রাচীন শিবচরিত্রে তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

শিবের গানে শিব যে রূপ, কৃষ্ণ-ধামালীতে কৃষ্ণও কতকটা সেই প্রকারের, ইনি চাষার ঘরের ছেলে, রাধা চাষার ঘরের মেয়ে; কৃষ্ণ রাধার দইয়ের ভাঁড় বহিবার বাক তৈরী করিবার জন্ত বাশ চাচ্ছিলে, কখনও তাহার মোট বহিতেছেন—সমস্তই রাধার একটি চুধন পাইবার প্রত্যাশায়। কৃষ্ণ-ধামালী।

ধামালীর দৃষ্ট অমার্জিতরুচিযুক্ত চাষার ঘরের; এই ধামালী ছই শ্রেণীর : এক শ্রেণীর নাম শুকুল, অপর শ্রেণীর নাম আসল। এই আসল এত অশ্লীল যে তাহা চাষার পৰ্য্যন্ত নিজের ঘরে গাহে না—স্রলোক ও শিশুদিগকে দূরে রাখিয়া তাহারা মাঠে যাইয়া গায়। কিন্তু শুকুল ধামালীতেও যে রুচি পাওয়া যায়—তাহাতে মধ্য মধ্য কাণে হাত দিতে হয়—চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন এই কৃষ্ণ-ধামালীরই সংশোধিত সংস্করণ। বৌদ্ধযুগের এই শিবচরিত্র ও কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করিলে বুদ্ধিতে পারা যায় যে চাষাদের দেবতা তাহাদের মাথা ভিড়াইয়া যায় নাই, তাহাদের ঠাকুরকে চাষারা নিজের দলে ভিড়াইয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। এই সকল দেবচরিত্রে কৃত্রিমতা, সাজসজ্জা বা আড়ম্বর কিছুই নাই,—কোন দ্বিধা বা সন্দেহের সহিত চাষারা তাহাদের দেবতাকে দেখে নাই, তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া ভালবাসিয়াছে। এইভাবে দেবতাকে মনের মানুষ করিয়া লইবার ফলে আমরা উত্তরকালে বৈষ্ণবদের পঞ্চতত্ত্বের অপূর্ণ দার্শনিক মহিমা দর্শন করিতে পাই। গৃহস্থালীকে শাস্ত্র, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য এই পঞ্চরসের গৌরবে মগ্নিত করিয়া ইহার আদর্শ বৈষ্ণবেরা ধর্মবেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই উচ্চ আদর্শের ভিত্তি গড়িয়া দিয়াছিল চাষারা।

চণ্ডীপূজা বহু প্রাচীন। ত্রীব্রজ ভাঃ আর. এন. সাহা, এম. আর. এ. এস. ১৯৩১ মনের ১৮ই অক্টোবর তারিখের Advance সংবাদপত্রে চণ্ডীপূজা সম্বন্ধে একটি সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। তাহাতে এই পূজার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ

চণ্ডী-মঙ্গল।

দিয়াছেন; তিনি বলেন, “বাঙ্গালী বণিকেরা অষ্টাদশভূজা উগ্রচণ্ডী

পূজার মুক্তা শ্রাম, কধোজ, চীন, কোরিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহ, স্রমাজা, জাভা, সালো, বোর্নিও, সেলিবেস্ এবং ফিলিপাইন দ্বীপসমূহে লইয়া যান। এই সকল স্থানে ব্রাহ্মণ বর্ণমালার আঠারটি অক্ষর (বাঞ্জনবর্ণ) মাত্র প্রচলিত। ১৮ মহাপুরাণ, ১৮ উপপুরাণ ও মহাভারতের ১৮ পর্ক, বাঙ্গলার ১৮টি বীজ অক্ষরের মহিমা-জ্ঞাপক।” দক্ষিণ-পথের একটি গিরিগুহায় অঙ্কিত অষ্টাদশ হস্তবিশিষ্টা প্রাচীন মহিষমর্দিনীর মূর্তি বেকরপ, সেইরূপ প্রাচীন শক্তিমূর্তি দ্রুপদাভীত কাল হইতে জগতের নানাস্থানে দৃষ্ট হয়।

আমরা “History of the Bengali Language and Literature নামক পুস্তকের ২৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি, ক্রীট দ্বীপ হইতে ডাঃ ইভান্স ৩০০০ খৃঃ পূঃ অব্দের সিংহবাহিনী মূর্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। খৃঃ পূঃ ২৮০০ অব্দে প্রস্তুত এসিয়া মাইনরের ‘ইয়াসিলি’

গিরিমন্দিরে (ভোগাজ্জ কিউ নামক স্থানে) ‘মা’ দেবতার মূর্তি এইরূপ,—৬০০ খৃঃ পূঃ অব্দের কার্ণেজের দুর্গাও বোধ হয় এক পঙ্ক্তির।

স্বতরাং দেখা যাইতেছে এই মাতৃপূজা বহুপ্রাচীন। জাভার পম্বনম্ নামক স্থানে অন্যান্য একসহস্র চণ্ডীমন্দির আছে। এই সমস্ত মন্দির ৫২৫ খৃঃ হইতে ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। প্রাচীন বাঙ্গলাদেশে দেখা যায় মাতৃপূজা বাঙ্গলার আৰ্য্যগণ প্রথমতঃ স্বীকার করেন নাই। বণিক্দের মধ্যে উহা প্রাচীনকালেই প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রথমতঃ মেয়েদের দ্বারাই উহার প্রচলন ঘটিয়াছিল। বণিক্-সীমন্তিনীরা লুকাইয়া পূজা করিতেন এবং তাঁহাদের স্বামীর চণ্ডীকে “ডাইনী” দেবতা বলিয়া দেবীর ঘটে লাগি পর্য্যন্ত মারিতেন। কিন্তু যে করিয়াই হউক বণিকেরা শেষে উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার মূচি, হাড়ি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির এককালে শক্তির উপাসক ছিল। বোধ হয় মায়ের পূজায় পশুবলি এমন কি নরবলি দেওয়া হইত, এজন্য শেষে বণিকেরা পর্য্যন্ত উহা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগে শক্তির এবংবিধ পূজা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়, শেষে মূচির হাতে পৌরোহিত্যের ভার পড়ে—শূত্রপুরাণের হুই একটি কথায় উহাই অল্পমিত হয়। ‘দুর্গাকে’ কখনও “হাড়ির মেয়ে” বলা হয়, হাড়ির বাড়ীতে বাস্তব না বাজিলে দুর্গাপূজা কোন কোন স্থানে আরম্ভই হইত না, এরূপ জনশ্রুতি আছে। “হাড়িকাঠ” শব্দ দ্বারা শুধু “হাড়ি”দের সহিত এই পূজার সম্বন্ধ স্থচিত হয় নাই, পশুবলি ব্যাপারগুলি যে এই শ্রেণীর লোকেরাই করিতেন তাহা অল্পমান করা যায়। এখনও কোন স্থানের কালীর মন্দিরে হাড়িরাই পূজার পাণ্ডা। দিনাজপুরের কোন কোনও স্থানে এরূপ পৌরোহিত্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

বাঙ্গলাদেশে এই পূজা বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত বিদ্বেষের সহিত দেখিতেন। বৃন্দাবন দাস ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই পূজা এবং এতৎসংক্রান্ত গানগুলির প্রচলন খুব প্রসন্নচিত্তে দেখেন নাই। শ্রীবাসের বাড়ীর দরজায় বিবপত্র ও সিন্দূর-মাখা বৈষ্ণবদের শাস্ত-বিদ্বেষ।

চণ্ডীর আশীর্বাদী সামগ্রী কোন ব্রাহ্মণ রাখিয়া গিয়াছিল, এজন্য বৈষ্ণব-সমাজের সে কি ক্রোধ! সেই ব্রাহ্মণের এই অপরাধে কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। নরোত্তমবিলাসে শক্তিপূজকের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতই ভয়াবহ। কোন কোন শাস্ত্র মদ খাইয়া খজ্জাহস্তে নৃত্য করিতে থাকিত, তখন যাহাকে পাইত, তাহাকেই হত্যা করিত। “হলেও ব্রাহ্মণ তার হাত না এড়ায়।” বৈষ্ণবগণ কালীর নাম করিতেন না, দোয়াতের কালীকে ‘সেহাই’ ও জবাকুলের সঙ্গে কালীর পাদপদ্মের সংস্রব আছে, এজন্য তাহাকে ‘ওড়’ ফুল এবং বিবপত্রকে ‘অর্কপাতা’ সংজ্ঞায় অভিহিত করিতেন। অদ্বৈত আশ্চর্য্যের বিষয়, স্বয়ং চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে অষ্টভুজার মন্দির দর্শন ও দেবীকে প্রণাম করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রধর্ম্ম মুসলমান আবির্ভাবের পর এদেশে খুব প্রচলিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্ম জগতের বাবতীর মনুষ্যের জন্ত দরজা খুলিয়া রাখিয়াছে, কাহাকেও বাদ দেয় নাই। বোধ হয় জগতে এরূপ ঔদার্য্য আর কোন ধর্ম্ম দেখাইতে পারে নাই। চোর, ডাকাত, সিঁদকাটা,

‘গামছামোড়া’ সকলেই মায়ের সম্মান। যে জন যে ব্যবসায় করিবে, সেই কালীকে মা বলিয়া পূজা দিয়া যায়। আমি একখানি খজা দেখিয়াছিলাম, তাহার উপর কালীর ক্ষুদ্র একখানি ধাতব মূর্তি। সেই মূর্তির নাম “ডাকাইতা কালী”। মাতা সম্মানের কলঙ্ক নিজে লইয়া কলঙ্কিত হইয়াছেন, তথাপি সম্মানকে ছাড়েন নাই।

বাংলাদেশে সপ্তদশ শতাব্দীর পর হইতে শাস্ত্রধর্ম বাঙ্গালীর গার্হস্থ্যের অঙ্গীয় হইল, সে কথা পরে বলা যাইবে। এখানে মাত্র এই বলা উচিত যে প্রাক-সংস্কৃত সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গলের যে খসড়া প্রস্তুত হইয়াছিল, বিজয় গুপ্ত, বংশীদাস, নারায়ণ দেব ও ক্ষেমানন্দ একদিকে, অপর দিকে কবিকঙ্কণ, মাধবাচার্য্য ও জয়নারায়ণ তাহাই কবিত্বমণ্ডিত করিয়াছিলেন। নবম শতাব্দী এমন কি তৎপূর্ববর্তী সময়ের খসড়ার উপর পরবর্তী বঙ্গীয় কবিরা বারবার তুলি চালাইয়াছেন, তজ্জন্ত শেষের কাব্যগুলির স্বক-মাংস ব্রাহ্মণ্যযুগের হইলেও উহাদের অস্থিগর্ভর সেই আদি যুগের। চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল যে প্রাগ্ ব্রাহ্মণ্য যুগের খসড়া, তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে নায়ক-নায়িকা নিম্নশ্রেণীর লোক এবং এই দুই পুস্তকের কোনটিতেই ব্রাহ্মণকে সমুচিত সম্মান দেওয়া হয় নাই। এই কাব্যগুলির নায়ক-নায়িকারা আদৌ সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত নহে। উক্ত শাস্ত্রানুসারে নায়ক ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভূত হইবেন, তিনি বিদ্বান্ ও সর্বগুণসম্পন্ন হইবেন; কিন্তু এই কাব্যগুলির মধ্যে চণ্ডীমঙ্গলের নায়ক ব্যাধ কালকেতু, সে তো প্রিয়দর্শন আদৌ নহে, বরং কুশ্রী—“গ্রাসগুলি তোলে যেন তেখাঠিয়া তাল। ভোজন কুৎসিত বীরের শয়ন বিকার।” পণ্ডিত হওয়া দূরে থাকুক সে হস্তিমুখ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তো সে নহেই—ঘণিত ব্যাধ,—যাহার গৃহে প্রবেশ করিবে তাহার “উচিত হয় দ্বান।” চণ্ডীমঙ্গলে ব্রাহ্মণগণের অবস্থা এত শোচনীয় যে, একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ মত্ত-বিরুদ্ধ কথা বলিয়াছিল, এজন্ত বেণে ধনপতি “নফরে আদেশ করি মারে তারে ধাকা” (মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য)।

কথা হইতে পারে, চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবি প্রাচীন কবিদের খসড়াটা বদলাইয়া ফেলিলেন না কেন? কেন তাহা আলঙ্কারিকদের মতামতানুসারে নূতন ছাঁচে ঢালিলেন না? উত্তর, এই সকল কাব্য যুগ-যুগ ধরিয়া উৎসব-উপলক্ষে চণ্ডীমঙ্গলে গাওয়া হইত, সেগুলির আখ্যানবস্তু নূতন হইলে জন-সাধারণ সেই অনভ্যস্ত কথা শুনিবে কেন? কিন্তু তথাপি নব-ব্রাহ্মণ্যের একজন প্রধান পাণ্ডা মুকুন্দরাম একেবারে নীরব হইয়া প্রাচীন গল্পের উপর ভরসা বুলাইয়া যান নাই। গুল্লনার সঙ্গে ধনপতির হাতপরিহাস ও রসিকতা এবং তাহার বেশী বয়সে বিবাহ—তিনি বাদ দিতে পারেন নাই। সেগুলি শ্রোতার চিরকাল উপভোগ করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কবি তাহার সমস্ত আক্রোশ জনার্দন ঘটকের মুখে ব্যক্ত করিয়া গুল্লনার পিতা লক্ষপতি কেন অষ্টম বৎসর বয়সে মেয়েকে গৌরীদান না করিয়া ‘ধাড়ি’ করিয়া রাখিয়াছেন, এজন্ত তাহাকে খুব তীব্র ভৎসনা করিয়া মনের ঝাল মিটাইয়াছেন।

ভারতচন্দ্র সংস্কৃতির গোড়া। তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের অপলাপ করিতে কিছুতেই স্বীকার করেন নাই। এজন্ত তিনি ব্যাধের ছেলে ও বেণের ছেলেকে কাব্য-নায়ক না করিয়া তদীয়

চণ্ডীমঙ্গল (অন্নদামঙ্গল) একেবারে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়াছেন। কাব্য-নায়ক গুণবন্ধু রাজার পুত্র সুন্দর—কৃত্রিয়, রাজপুত্র এবং সর্বগুণাধার। নারিকাও সর্বতোভাবে তাঁহার যোগ্যা ও অলঙ্কারশাস্ত্রের অমুমোদিতা।

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে—এগুলির আদত লেখার উপর নানারূপ চাকুশিয়ার খেলা দেখাইয়া পরবর্তী কবিরা “নূতন মঙ্গল” লিখিয়াছেন। আদিযুগ ও মধ্যযুগ দুইয়েরই প্রভাব ইহাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

গাথা-সাহিত্যে ও নাথ-সাহিত্যের কালসম্বন্ধে আমরা কিছুই বলি নাই। ইহার অনেক-গুলিতে চতুর্দশ, পঞ্চদশ এমন কি তৎপরবর্তী যুগের হস্তচিহ্ন থাকিলেও ইহাদের খসড়া বহুপূর্বে রচিত হইয়াছিল। গোরক্ষনাথের সময় ও রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সময় আমরা জানি; তাঁহাদের সম্বন্ধে গাথাগুলি সেই সময়ে কিংবা তাঁহাদের মৃত্যুর অনতিপরে রচিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়, তবে যুগে যুগে তাহাদের ভাবা পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে এবং নূতন নূতন কবিরা তাহাদের নূতন নূতন অঙ্গরাগ পরাইয়াছেন, তথাপি ইহাদের মধ্যেই সেই প্রাচীন ভাষা ও ভাবের অনেক চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। ডাক ও খনার বচন এবং গীতিকথাগুলি পালরাজাদের সময়কার জিনিষ বলিয়া অনুমিত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টম কিংবা নবম শতাব্দী হইতে এই শ্রেণীর কবিতাগুলি আরম্ভ হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করিবার অনেক কারণ আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংস্কৃত প্রভাবান্বিত বাঙ্গলা-সাহিত্য

যে বঙ্গদেশ এক সময়ে দীপঙ্কর, শাস্ত-রক্ষিত, ভদ্রশীল প্রভৃতি বৌদ্ধনেতার বাসস্থান ছিল—যাহার এক প্রান্তে সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র পরিণত বয়সে ভিক্ষু সাজিয়া ধলেশ্বরীর তীরে বৌদ্ধ মঠগুলিতে জীবনের শেষ-বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, এবং নানার ও সূর্যাপুরের মধ্যবর্তী বিশাল বিহার জয়দৃপ্ত শির উত্তোলন করিয়া “বাজাসন” নামে পরিচিত হইয়াছিল, অপরদিকে বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী পরী বৌদ্ধ যোগী ও যোগিনীগণের তান্ত্রিক অমুষ্ঠানের এক প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, যেখানে হিউন সাঙ্গ সপ্তম শতাব্দীতে অগুপ্তি বৌদ্ধ বিহার দেখিয়া গিয়াছেন—সেই বঙ্গদেশ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নব ব্রাহ্মণ্যের লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণগণ সমাজে যে সকল পরিবর্তন আনয়ন করিলেন, তন্মধ্যে প্রধান এই কয়েকটি : (১) সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হইল। (২) গৌরীদানের ব্যবস্থা হইল। (৩) কথিত

ভাষাগুলি ঘৃণ্য বলিয়া কোন ভদ্র রচনার গভীতে স্থান পাইল না। (৪) দেবভাষা সংস্কৃতের প্রভাব অশেষরূপে বৃদ্ধি পাইল। (৫) ব্রাহ্মণগণ সমাজের শীর্ষস্থানে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলেন—তঁাহারাই সমাজের একমাত্র আরাধ্য—অপরায়ণ জাতি পতিত শূদ্র। ক্ষত্রিয় বৈষ্ণবের কোনপ্রকার প্রাধান্য স্বীকৃত হইল না। কলিতে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র ছাড়া অল্প কোন জাতি নাই; ইহাই তঁাহারা প্রচার করিলেন।

ভক্তিই একমাত্র লক্ষ্য; জ্ঞান ও কর্মের অধিকার লোপ পাইল। কর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণকে দান ও ব্রাহ্মণকে পূজা করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এককালে দ্বৈপায়ন ব্যাস ব্রাহ্মণকে কোন তিথিতে কি দান করিলে কি ফল হয়, তাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন (৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)—সেই লেখাটাই বঙ্গীয় সমাজের অনুরাগস্বরূপে বদ্ধমূল হইল। ব্রাহ্মণবোদ্ধিত রাজ-সভায় এই সংস্কৃতের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের ক্ষেত্রে বাঙ্গলা ভাষার কোন ভরসা ছিল না। পল্লীর কোকিলের কণ্ঠ অবশ্য ধামে নাই, এবং দূর ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, গাড়োদেশে প্রভৃতি যে যে স্থান সেন-রাজাদের অধিকৃত হয় নাই, সেখানে হিন্দুদিগের প্রাচীন আদর্শ বৌদ্ধ-কর্মবাদে পুষ্ট হইয়া পল্লীগাধায় গুপ্ত যুগের সৌন্দর্য্যবোধ ও পূর্ব্বরূপের লীলাখেলা দেখাইতে লাগিল, ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব সে সকল দেশে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ—যে স্থান হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পল্লীগাথাগুলি পাওয়া গিয়াছে—তাহা বহুযুদ্ধে সেন-রাজগণের হাত হইতে স্বীয় স্বাধীনতা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। এক সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশ এই গাথা-সাহিত্য লইয়া বিভোর ছিল, কিন্তু এবার সেন-রাজগণের যুগে সেই গাথা-সাহিত্যের উপর পটক্ষেপ হইল। গাথার কবিগণ সেন-রাজগণের কীর্ত্তি কেনই বা গান করিবেন? তাই মহীপাল, রাজ্যপাল, ধর্মপাল, রামপাল, যোগীপাল প্রভৃতি পাল-রাজত্ববর্গ সধকে বাঁহারা গান বাঁধিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ হেমন্ত সেন, বিজয় সেন, বল্লাল সেন, লক্ষণ সেন, কেশব সেন, বিশ্বরূপ সেন বা সুর সেন সধকে একটি গাথাও রচনা করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ নাই। অথচ তাঁহাদের পরে ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্য, ধর্মমাণিক্য ও রাজ্ঞী কমলা দেবী সধকীয় বহু গাথার উল্লেখ আছে—এদিকে ঈশা ধী, মম্বর ধী, ফিরোজ ধী প্রভৃতি বহু মুসলমান নবাব-বাদশাহ-সধকীয় পল্লীগাথা আমরা পাইয়াছি। সেন-রাজগণ ব্রাহ্মণদিগের মত অবলম্বন করিয়া পল্লীভাষার কোন উৎসাহ দেন নাই। বিশেষ কর্ম-গৌরব অস্বীকৃত হওয়াতে মানুষের বীরত্ব, শৌর্য্য, জ্ঞান, এ সমস্ত উপেক্ষার বিষয় হইয়া পড়িল। ইহারা অঙ্গীকার করিয়া বসিলেন, মানবের কীর্ত্তিকথা লইয়া কোন কাব্য-রচনা পণ্ডিত্রম মাত্র—বিশেষ, ঘৃণ্য কথিত ভাষায়। এই অল্প নরলীলাস্থলে দেবলীলার বর্ণনাই কবি ও অপরায়ণ লেখকগণের লক্ষ্য হইল। আমরা এইভাবে মালকমালা, কাজল-রেখা, কাকনমালা প্রভৃতি আদর্শ-রমণীর কথা হারাইলাম,—পাইলাম ঋবের উপাখ্যান, প্রহ্লাদের কৃষ্ণপ্রীতি ও দেব-বীর্য্যে উৎপন্ন পাণ্ডবদিগের কথা, ভগবানের অবতার রামের লীলা ও কৃষ্ণসধকীয় শত শত কাহিনী। পল্লীগাথার স্থানে পাইলাম কথকতা, গীতিকথার স্থলে পাইলাম কীর্ত্তন। আমরা হারিয়াছি কি জিতিয়াছি—তাহার বিচারস্থল এখানে নহে।

পল্লীসাহিত্য একেবারে আড়ালে পড়িয়া গেল; ব্রাহ্মণ শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন ও ব্রাহ্মণ কথকেরা পুষ্পমাল্যের দ্বারা মস্তক বেষ্টন করিয়া বেদীতে বসিয়া ব্যাখ্যা, বর্ণন ও কীর্তনের ভার লইলেন। পল্লীভাষার বিরুদ্ধে রাজস্বার বন্ধ হইল। যাহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের কথা কথিত ভাষায় লিখিবেন, অথবা শ্রবণ করিবেন—তাহাদিগের জন্ত রৌরব নরকের ব্যবস্থা হইল; ব্রাহ্মণগণ এই অভিসম্পাত করিলেন।

বঙ্গ-ভারতী এই বিপদের সময়ে বিদেশী রাজগণের বাহু আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইলেন। মুসলমান নবাবেরা এ দেশের শত শত ধর্ম-উৎসব সম্বন্ধে তথ্য ও বিবরণ জানিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণেরা এই দুর্ভাগ্য ব্যাপার কতবড় অসম্ভব কার্য্য, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। মোটকথা তাহারা মুসলমান নবাবদিগকে শাস্ত্রকথা জানাইবেন না, ভয় দেখাইলেন—শুধু ব্যাকরণ পড়িতেই এক জীবন কাটিয়া যাইতে পারে। তুর্কিরা এদেশে বাস করিয়া এদেশের একরূপ অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহারা বাঙ্গলা কথা কহিতে ও লিখিতে জানিতেন। মুসলমান রাজারা সংস্কৃতের মাহাত্ম্য শুনিয়া কতকটা সন্তুষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাহারা সংস্কৃত হইতে মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় অনূদিত করিয়া তাহাদিগকে শুনাইতে আদেশ করিলেন। এই কার্য্য ব্রাহ্মণগণ অবশ্য বোর অনিচ্ছায় গ্রহণ করিতে বাধ্য

হইয়াছিলেন। নসরত সাহের আদেশে একখানি মহাভারত রচিত হইয়াছিল, তাহা এখন লুপ্ত কিন্তু তাহার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে।
তুর্কী নবাবদের দ্বারা বঙ্গভাষার উৎসাহ প্রদান।

এই মহাভারত হযরত খুব উৎকৃষ্ট ভাবে সঞ্চলিত হয় নাই—এজন্য হুসেন সাহের সেনাপতি চট্টগ্রাম-বিজয়ী পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক আর একজন কবি-দ্বারা মহাভারতের অমূল্য সঞ্চলন করাইয়াছিলেন। এই অমূল্যবাদের প্রাচীন পুঁথি বঙ্গদেশের সর্বত্র পাওয়া যাইতেছে এবং ইহার পত্র পত্র পরাগল খাঁর অনেক স্তুতিবাদ আছে। জৈমিনী-কৃত অশ্বমেধ পর্বের একখানি অমূল্য পরাগল খাঁর পুত্র বীরবর ছুটি খাঁর আদেশে বিরচিত হইয়াছিল, সহিত্য-পরিষৎ এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এই অমূল্য-কারকের নাম শ্রীকরণ নন্দী। গোড়েশ্বর সামন্তদ্বিন ইউসুফের আদেশে মালাধর বহু ভাগবতের অমূল্য খৃঃ ১৪৭৩-৮০ অব্দে সঞ্চলন করেন, বঙ্গেশ্বর তাহাকে ‘গুণরাজ খাঁ’ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বিজ্ঞাপতি সসম্মানে “প্রভু গয়েশ্বরদ্বিন সুলতানের” উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি একটি পদে লিখিয়াছেন যে, নসিরা শাহ প্রেমের প্রকৃত মর্ম অবগত আছেন এবং “চিরজীব—রহ

গোড়েশ্বর, কবি বিজ্ঞাপতি ভণে” বলিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল মুসলমান বাদসাহগণের মধ্যে হুসেন সাহই “দেশী ভাষার” সর্বাপেক্ষা বেশী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া

মনে হয়। পরাগলী মহাভারতে ইহাকে “কলিযুগের কৃষ্ণ অবতার” বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। খৃঃ ১৪৯৪ অব্দে রচিত মনসামঙ্গলে বিজয়গুপ্ত ইহাকে “সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি-তিলক” বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। আরও কয়েকখানি প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যে ইহার স্তুতি আছে।

হসেন সাহ তাঁহার দীর্ঘ ছাক্সিস বৎসরের রাজত্বকালে সমস্ত বঙ্গদেশের প্রজার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় ; ইনি চৈতন্যদেবকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং কথিত আছে ইহারই রাজ-প্রাসাদে হিন্দু ও মুসলমানকে এক দেবতার উপাসক করিবার উদ্দেশ্যে ‘সত্যপীর’ নামক মিশ্র দেবতা পরিকল্পিত হন। এই সত্যপীর সম্বন্ধে সর্বপ্রথম মৈমনসিংহ-নিবাসী কঙ্ক নামক জাতিচ্যুত এক ব্রাহ্মণ-যুবক তাঁহার গুরু এক পীরের আদেশে কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে সত্যপীরের মহিমা-প্রচারের বাণদেশে বিজ্ঞানস্বন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই বঙ্গভাষার সর্বপ্রথম বিজ্ঞানস্বন্দর। পুস্তকখানি কবিত্ব-পূর্ণ সরল ভাষায় লিখিত, ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। আমার নিকট ইহার হস্ত-লিখিত একখানি নকল আছে। কাব্যখানি অনুমান ১৫০২ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। সত্যপীরের ছায় ‘মাণিকপীর’ এবং ‘কালুগাজি’ হিন্দু-মুসলমানের উপাস্ত মিশ্র দেবতা এবং ইহাদের মহিমজ্ঞাপক অনেক পুস্তকও বঙ্গভাষায় বিরচিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষার উৎসাহ-দাতা আরও অনেক মুসলমান বাদসাহ-ওমরাহের নাম আমরা পাইয়াছি। এখানে তাঁহাদের উল্লেখের অবকাশ নাই। আমাদের ধারণা যে মুসলমান বাদসাহদের অনুগ্রহেই বঙ্গভাষা রাজ-দরবারে ও ভদ্র-সমাজে প্রবেশের প্রথম সুবিধা পাইয়াছিল, নতুবা সংস্কৃতের ভ্রুকুটি সহ করিয়া আমাদের দীন-হীন মাতৃভাষা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকিলে ব্রাহ্মণ্য-শাসিত ভদ্র-সমাজে স্থান লাভ করিতে পারিত না। বঙ্গীয় মুসলমানের অধিকাংশই বৌদ্ধসম্প্রদায় হইতে গৃহীত হইয়াছিল। বৌদ্ধজন-সাধারণের মধ্যে বঙ্গভাষার চর্চা প্রচলিত ছিল। সুতরাং স্বদেশের ভাষার উপর অনুরাগ বঙ্গের মুসলমানেরা পূর্ব-সংস্কার হইতে পাইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণেরা এই সকল কার্যে হয়ত উৎসাহ দেখান নাই। কবীন্দ্র পরমেশ্বর কি জাতীয় ছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণ হইলে তাঁহার অসংখ্য ভণিতার মধ্যে কোন না কোন স্থানে “বিজ” শব্দের প্রয়োগ থাকিত বলিয়া মনে হয়। এক ‘কবীন্দ্র’ ছাড়া তাঁহার আর কোন উপাধির উল্লেখ নাই। এখনও হয়ত চট্টগ্রাম বা নোয়াখালীর কোন পুঁথিতে তাঁহার আত্মবিবরণ পাওয়া যাইতে পারে। শ্রীকরণ নন্দী ব্রাহ্মণ ছিলেন না—বৈষ্ণব বা কায়স্থ ছিলেন। মালাধর বসু কায়স্থ ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণগণ সহজে স্থণিত ভাষায় কাব্য লিখিতে দাঁড়ান নাই, কিন্তু তৎপরে শাহেন সা বাদসাহগণের আদেশ ও উৎসাহে তাঁহারা এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং রাজা মহারাজদের রাজসভা ও বাদসাহের দরবারের দেখাদেখি বঙ্গভাষার অল্প তাহাদের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন।

মহাভারতের সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন সঞ্জয়। ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় বৈষ্ণব ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, তাঁহার বাড়ী বিক্রমপুর ছিল, তথায় ঐ গোত্রীয় বৈষ্ণব এখনও অনেক আছেন। আবার কেহ কেহ বলেন তিনি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। পরবর্ত্তী

সঞ্জয়।

অনুবাদকগণের মধ্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও দুটি বা পূর্ববঙ্গবাসী ছিলেন

এবং পশ্চিমবঙ্গবাসী নিত্যানন্দ ঘোষ সমগ্র মহাভারতের যে অনুবাদ

করেন, তাহা রাঢ় দেশে ও চব্বিশ পরগনায় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। পূর্ববঙ্গে

কবি যদীবর ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহারা বিক্রমপুর-খিনারদিবাসী এবং সুবর্ণবণিক ছিলেন। যদীবরের পিতা কুলপতির কথা গঙ্গাদাস খুব গৌরবের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ একই সময়ে এবং কাশীদাসের কিছু পূর্বে রামেশ্বর নন্দী নামক আর একজন কবি মহাভারতের একটি অনুবাদ সঙ্কলন করেন। মহাভারতের প্রায় সমস্ত অনুবাদই ব্রাহ্মণের জাতীয় ব্যক্তির লিখিত—ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ষোড়শ শতাব্দীতেও ইহাদের বঙ্গভাষার প্রতি বিরূপতা ঘোচে নাই।

এই অনুবাদকণ্ঠের মধ্যে অবিসংবাদিত ভাবে কাশীদাস সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহার বাড়ী বর্ধমান জেলায় সিঙ্গি গ্রামে। এই সিংহগ্রাম ইতিহাস-বিশ্রুত, সিংহলজয়ী বিজয় সিংহের প্রতিষ্ঠাপিত

কবি কাশীদাস এবং “সিংহপুর।” কাশীদাসের সুদীর্ঘ বংশাবলী তিনি স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেকগুলি ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুকবি ও গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণদাসের “কৃষ্ণমঙ্গল”

ও গঙ্গাদাসের “জগন্নাথমঙ্গল” দুইখানি উল্লেখযোগ্য কাব্য। কাশীদাসের মহাভারতে সংস্কৃত শব্দের ছড়াছড়ি; স্থূললিত শব্দচয়ন এবং বর্ণনা জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী করার ক্ষমতা তাঁহার বিশেষরূপ ছিল। তিনি আদি, সভা, বন ও বিরাটের কতদূর লিখিয়া স্বর্ণগত হন এবং তাঁহার মৃত্যুকালীন আদেশ রক্ষা করিয়া তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র নন্দরাম দাস বাকী কয়েক পর্ক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই শেষ পর্কগুলির অনুবাদ প্রায়ই পূর্ববর্তী কবিগণের ভাল-ভাল অংশের জোড়াতালী। নন্দরাম দাস নিত্যানন্দ ঘোষের নিকটেই এ বিষয়ে বেশী শ্রুতি। তাঁহার মহাভারত হইতেই তিনি বেশী সঙ্কলন করিয়াছেন। এমন কি দ্রৌপদীর “গান্ধারী-বিলাপের” উৎকৃষ্ট অংশটি তিনি নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত হইতে হুবহু নকল করিয়া নিজের ভণিতা দিয়া চালাইয়াছেন। বাঙ্গলার কত কবি যে মহাভারত এবং ইহার অংশ-বিশেষের অনুবাদ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। রাজেন্দ্রদাসের শকুন্তলা উপাখ্যানটি বড় সুন্দর, এবং গোপীনাথ দত্তের “দ্রৌপদীযুদ্ধ” প্রভৃতি পালা সম্পূর্ণরূপে মৌলিক। কাশীদাসী মহাভারতে শ্রীবৎস ও চিত্তার মত কতকগুলি উপাখ্যান মূল-বহির্ভূত। ঐ উপাখ্যানটি গ্রাম্য গাথা হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে এবং “তিলক-বসন্ত” পালার (৪র্থ খণ্ড, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা) সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য সকলেরই চোখে পড়িবে। কাশীদাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার মহাভারত শেষ করেন।

সম্ভবতঃ রাজা গণেশের আজ্ঞায় ফুলিয়া গ্রামের মুরারি ওকার পুত্র বনমালী মুখুটির ঔরসে এবং মালিনীর গর্ভজাত কবি কৃত্তিবাস সর্বপ্রথম বাঙ্গলা রামায়ণ রচনা করেন। রচনার প্রাঞ্জলতা, প্রসাদগুণ এবং গ্রন্থ-বর্জিত সঙ্কল্পে উপযোগিতা-বোধ

রামায়ণ, কৃত্তিবাস।

কৃত্তিবাসের প্রধান গুণ। মূল রামায়ণের কোন অংশ বাদ দিয়া কি রাখিলে কাব্যখানি বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হইবে, ইহা তিনি বিশেষরূপে জানিতেন; এবং ঠিক এই বোধ না থাকাতো সুপণ্ডিত ও সুকবি রঘুনন্দনের ‘রামরসায়ন’ খানি কৃতকাৰ্য্য হইতে পারে নাই। কৃত্তিবাসের পরে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ময়মনসিংহ-নিবাসী

বংশীদাসের কল্পা চন্দ্রাবতী পিতার আদেশে পল্লীগাথার আকারে যে সংক্ষিপ্ত রামায়ণখানি রচনা করেন, তাহা এখনও পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে পল্লীবাসিনীগণ বিবাহ-বাসরে গাহিয়া থাকেন। মাইকেল মধুসূদন সীতা-সরমার কথোপকথনের অংশটি চন্দ্রাবতীর রামায়ণের একটি স্থল হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সহজ সরল কবিত্বপূর্ণ ভাষায় মনের কথা করণ ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিতে চন্দ্রাবতী সিদ্ধহস্ত। তাঁহার অসম্পূর্ণ রামায়ণ সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়াছেন। (পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খণ্ড, ২য় ভাগ)।

কিন্তু এই রামায়ণগুলির মধ্যে সর্বাধিক বৈশী মৌলিকত্বের দাবী কবিচন্দ্রের। ইহার নাম শঙ্কর, উপাধি 'কবিচন্দ্র'। বাঙ্গলার রামায়ণে 'অঙ্গদের রায়বার' 'তরণীসেন ও বীরবাহুর যুদ্ধের পালা' প্রভৃতি অংশ কবিচন্দ্রের লেখা। কবির সম্মুখে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ ভগবানের অবতার হইয়া লীলা করিয়া গিয়াছিলেন। জগাই, মাধাই, নারোজী, ভীলপঙ্ক প্রভৃতি দানব-প্রভৃতি লোকেরা ইহাদের রূপা-স্পর্শে উদ্ধার পাইয়া গেল। এই সকল জীবন্ত ঐতিহাসিক ঘটনা কবির হৃদয়পটে গাঢ় বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছিল। তৎকৃত রামায়ণে সেই সকল চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। বায়ীকির যুদ্ধ-কাণ্ডটাকে তিনি ভক্তির কুঞ্জ বা সংকীর্ণন-ভূমিতে পরিণত করিলেন। রাক্ষসগণ জগাই-মাধাইএর ছায় রাম-লক্ষণের প্রতি অস্ত্র ছুড়িয়া শেবে অমৃততাপের উজ্জ্বলে স্তোত্র আবৃত্তি করিতে বসিল, কেহ কেহ বা রামনামের ছাপ স্বীয় অঙ্গ ও রথের চতুঃপার্শ্বে অঙ্কিত করিয়া রণভূমিতে কীর্ণভূমির অভিনয় করিতে লাগিল। একটা জীবন্ত ঐতিহাসিক ঘটনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এই সকল বিষয়ের বিসদৃশতা আমাদের চোখে ঠেকে না। যিনি যুদ্ধ করিবেন, তাঁহার বৈষ্ণবোচিত অশ্রু-বিসর্জন এবং যিনি শত্রু তিনি তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ভক্তি ও ক্ষমার লীলা-প্রদর্শনের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ও বিজ্ঞপের উপযোগী উপাদান আছে—তাহা আমাদের এই সকল কাহিনীর বর্ধার রস উপভোগ করিতে বাধা জন্মায় না। যাহুবতো চিরদিনই স্রষ্টার সহিত যুদ্ধ করিতেছে—তাঁহার বিধি নিত্য লঙ্ঘন করিতেছে অথচ অমৃতপ্ত হইয়া তাঁহারই পদে আত্মসমর্পণ করিতেছে। কবিচন্দ্রের বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে শুধু বৈষ্ণব ইতিহাসের অংশ নহে, পূর্বোক্ত সনাতন ধর্ম্মের উপাদান থাকিতে উহা চিরকাল হৃদয়স্পর্শী ও সুখপাঠ্য হইয়া থাকিবে। 'অঙ্গদের রায়বারের' মধ্যে যে পরিহাস-রসিকতা আছে, তাহা বিশেষ মার্জিত রুচির পরিচায়ক না হইলেও উহা তৎকালোপযোগী হইয়াছিল। এই মৌলিকত্বই কবিচন্দ্রের বাহ্যচরী। হুঃখের বিষয়, তথাকথিত 'কৃষ্ণিবাসী' রামায়ণ কবিচন্দ্রের সমস্ত রচনাগুলি বেমালাম আত্মসাৎ করিয়া এবং নিজ দেহে কৃষ্ণিবাসের নামের শিলমোহর লাগাইয়া তাঁহারই স্বত্ব সাব্যস্ত-পূর্বক আজ পর্য্যন্ত সমানে বাজারে চলিতেছে।

রামানন্দ ঘোষ নামক একব্যক্তি বর্ত্তমান হইতে 'রামলীলা' নামক একখানি রামায়ণ প্রণয়ন করেন। উহা ১৬৯৪ খৃঃ অব্দে বা তৎসম্মিলিত কালে বিরচিত হয়। এই পুস্তকখানির মধ্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য ও স্থানে স্থানে কবিত্ব আছে—কালিদাসের রঘুবংশ হইতে ইনি কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে ইনি বৌদ্ধ ছিলেন, এবং

নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইনি সোচ্ছ্রাসে লিখিয়াছেন যে পুরীর দারু-
বুদ্ধের অবতার রামানন্দ
যে।
ত্র্যম্বকে ইনি 'পাপিষ্ঠ' বৈষ্ণব ও মুসলমানগণের হাত হইতে বলপূর্বক
গ্রহণ করিয়া পুনরায় বৌদ্ধভগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। দারুত্র্যম্বকে
এইভাবে অভিহিত করিয়া তিনি তৎসম্মুখে তাঁহার রামলীলা

(রামায়ণ) পাঠ করিবেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। কাব্যভাগে প্রদত্ত
তাঁহার আত্মবিবরণ পাঠ করিলে মনে হয় যে তাঁহার বহু শিষ্য ও অনুরক্ত ছিল। তিনি নিজেকে
শুদ্ধ বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এই কাব্যের মাত্র একখানি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে—
তাহা প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ষি নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট আছে। তিনি এতৎসম্বন্ধে হরপ্রসাদ-
সংবর্দ্ধনার পুস্তকে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তৎপূর্বে আমি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এই
পুস্তকের কথা লিখিয়াছিলাম। পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়া উচিত। রামায়ণের অন্ত্যন্ত
অনুবাদকগণের মধ্যে মহাভারতের লেখক ষষ্ঠীর সেন ও গঙ্গাদাস সেনের রামায়ণ
উল্লেখযোগ্য। অদ্বুত আচার্য্যের রামায়ণখানি প্রকাশিত হইয়াছে। বহু পাণ্ডিত্য ও

অপরূপ রামায়ণ।

কবিত্বপূর্ণ বৃহদায়তন 'রামরসায়ন'খানি কবি রঘুনন্দন গোস্বামীর
অপূর্ব কীর্তি—ইনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত
ছিলেন। এই কাব্য বটতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। রামমোহনের রামায়ণ ভক্তির
অনুরক্ত সুধাভাণ্ডের মত; তাহার একখানি মাত্র পাণ্ডুলিপি সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালায়
আছে। জয়চন্দ্র রাজার আদেশে দ্বিজ ভবানী রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে 'লক্ষ্মণ-দ্বিজজয়'
নামক এক কাব্য প্রণয়ন করেন। এই কাব্য-রচনার জন্ত তিনি ঊক্ত রাজার
নিকট হইতে প্রত্যহ ১০ টাকা পারিশ্রমিক পাইয়াছিলেন। এই কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে
বিরচিত। সেই সময়ে এই পারিশ্রমিকের মূল্য অনেক বেশী ছিল। শিবচন্দ্র সেনের "সারদা-
মঙ্গল"—রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। শিবচন্দ্র সেন বৈষ্ণবংশীয়, বিক্রমপুরনিবাসী ছিলেন।
পাঁচপুরুষ পূর্বে তিনি জীবিত ছিলেন। এই পুস্তক একবার ছাপা হইয়াছিল।

ভাগবতের অনুবাদের মধ্যে মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'ই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

অনুবাদ-গ্রন্থ।
বিখ্যাত শ্রামানন্দ, শঙ্কর কবিচন্দ্র, লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস ও মাধবাচার্য্য

প্রভৃতি কবিরা ভাগবতের অংশবিশেষ রচনা করেন। গোড়ীয়
বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য গ্রাহ করেন না, সুতরাং অধিকাংশ অনুবাদই ভাগবতের ১০ম ও ১১শ
স্কন্ধ সম্পর্কিত এবং ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ভাগবতবহির্ভূত কথা
ভাগবত ও অপরূপ পুরাণ।

আছে। রাধার প্রেমলীলা অনেকগুলির মধ্যেই বর্ণিত হইয়াছে। এই
প্রসঙ্গটি অবশ্য ভাগবতে নাই। আমরা প্রায় সমস্ত পুরাণেরই প্রাচীন বঙ্গানুবাদ পাইয়াছি।
তাহা ছাড়া রূপ-গোস্বামীর বিদম্ব-মাধব, ললিত-মাধব, উজ্জল-নীলমণি, কৃষ্ণদাস কবিরাজের
গোবিন্দ-লীলামৃত প্রভৃতি বহু সংস্কৃত পুস্তকের বঙ্গীয় প্রাচীন পট্টানুবাদ আমরা পাইয়াছি।
শেবোক্ত কাব্যের অনুবাদ করিয়াছিলেন কবি যখনন্দন দাস। ইনি ত্রিনিবাস আচার্য্যের কন্যা
হেমপ্রভা দেবীর মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন।

রসময় দাস ও অপর কয়েকজন কবি জয়দেবের গীতানুবাদের পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তী (১৭৩৬ খৃঃ) অনুবাদক গিরিধর জয়দেবের ছন্দের মাধুর্য্য বজায় রাখিয়া অনুবাদ প্রণয়ন করেন, তাহাতে জয়দেবের ঠিক সুরটি ধরা পড়িয়াছে।

গীতগোবিন্দ।

১৬৩৮ খৃঃ অব্দে সৈয়দ আলোয়ালা মলিক মহম্মদ জ্যোসি রচিত হিন্দী পদ্যাবতের যে বঙ্গীয় পদ্যানুবাদ করেন তাহা শুধু অনুবাদ বলিলে তৎপ্রতি অবিচার করা হয়। বাঙ্গলা 'পদ্যাবতে' আলোয়ালা যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, কবিত্ব-শক্তি, হিন্দুর পূজা-পার্বণের জ্ঞান এবং সংস্কৃতের উপর অধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতীব বিস্ময়কর। ভারতচন্দ্রের বহুপূর্বে আলোয়ালা বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের যে ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অপ্রত্যাশিত-ভাবে আমাদেরকে একেবারে চমৎকৃত করিয়া ফেলে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সংস্কৃতবহুল এই কাব্যের অনেক প্রাচীন পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে ফারসী অক্ষরে লিখিত দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি কোন কোন ইংরেজের মনে বঙ্গাক্ষর রোমান অক্ষরে পরিবর্তন করিবার কথা উদয় হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইবার নহে। পালি ভাষাটা দেবনাগর অক্ষর ছাড়িয়া রোমান অক্ষর গ্রহণ করিয়াছে। সংস্কৃতের অতি সন্নিহিত পালি ভাষার এই বেশ-পরিবর্তন আমরা একেবারেই অনুমোদন করি না। তাই বলিয়া তাহার সংস্কৃত, বাঙ্গলা এবং অপরাপর প্রাদেশিক ভাষার উপর এই জুলুম চালাইতে সফল হইবেন, এমন বোধ হয় না।

প্রত্যেক বিষয়ে জাতীয়তার একটা দিক আছে। বাঙ্গলায় তিনটা 'শ,' তিনটা 'র,' প্রভৃতির কোন উপযোগিতাই নাই। সাহেবেরা এদেশে আসিয়া গরম বস্ত্র ছাড়িয়া এখানকার উপযোগী ধুতি চাদর পরেন না, দেহটা গ্রীষ্মকালে ঘর্মে সিঁকু করিয়া নিদারুণ কষ্ট সহ করেন, তবু গরম কাপড় ছাড়েন না। বাঙ্গলা অক্ষরে যত অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে কথাগুলি লিখিত হয়, রোমান অক্ষরে লিখিলে তদপেক্ষা অনেক বেশী স্থানের দরকার। আর ভারতবর্ষে যে শত শত প্রাচীন পুঁথি আছে, রোমান অক্ষর প্রবর্তিত হইলে তাহা পড়িবার লোক জুটিবে না। এই জাতীয়তা-বিরোধী প্রস্তাব কখনও সমর্থিত হইতে পারে না, মুসলমানেরা ফারসী অক্ষর চালাইবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টে কিছু কিছু আছে। আশা করি কেহ বাঙ্গলা ভাষার বুকুর উপর এই শেল বিধাইতে চেষ্টা করিবেন না।

বাঙ্গলার বিরাট অনুবাদ-সাহিত্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। হঠাৎ সংস্কৃতের মহাভাগার নিজের গৃহের দ্বারে উন্মুক্ত দেখিয়া বঙ্গীয় অনুবাদ-কারেরা দুহাতে শব্দ লুণ্ঠন আরম্ভ করিতে লাগিয়া গেলেন। প্রথম প্রথম বঙ্গভাষায় সংস্কৃত অনুবাদ-সাহিত্যের স্বায়ী কল।

যোজনা বিসদৃশ হইয়াছিল; কৃষ্ণদাস কবিরাজের "একাদশ্যপবাস" 'দ্বাত্রিংশ' প্রভৃতি সন্ধি-প্রয়োগ উৎকট। এমন কি বহু পরে রামপ্রসাদের "জননী জাগৃহি জাগৃহি এবমুচিতমধুনা তব নহি নহি নহি"ও হুসহ। কিন্তু আলোয়ালের "মলয়সমীর সুসৌরভ সুশীতল, বিলোলিত পতি অতি রসভাবে; প্রফুল্লিত বনস্পতি, কুটিল তমালফল, মুকুলিত চূত-লতা কোরকজালে।" প্রভৃতি পদে বাঙ্গলার সঙ্গে সংস্কৃতের রাজ-ঘোটক হইয়াছে। এই ব্যাপারে সর্দাপেক্ষা কৃতী ভারতচন্দ্র; তিনি সংস্কৃত ছরহ তোটক, ভুজঙ্গ-প্রয়াত প্রভৃতি

হন্দ নির্দোষভাবে বাঙ্গলায় আনিয়াছেন। বাঙ্গলা বর্ণমালায় লঘু-গুরু ভেদ নাই, স্মৃতরাং সংস্কৃতের] হন্দগুলি নির্ভুল করিয়া বাঙ্গলায় আনা যে কত বড় কঠিন কাজ তাহা সহজেই অনুমিত হয়। ভারতচন্দ্র শুধু এই কার্যে আশ্চর্য্য সফলতা দেখাইয়া ফাস্ত হন নাই, উপরন্তু সংস্কৃত কবিতায় যাহা নাই, সেই স্বকঠিন মিল দেওয়ার রীতিও সংস্কৃত ছন্দে রচিত বাঙ্গলা পক্ষে প্রবর্তিত করিয়াছেন। তাঁহার রচিত কবিতার কোন কোনটি সংস্কৃতের এত অধিক অনুগামী হইয়াছে যে তাহা কাণী কি পুনর পণ্ডিতেরা দেবনাগর অক্ষরে পাঠ করিলে তাহা সংস্কৃত বলিয়াই ভুল করিবেন, যথা :—“জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃষধ্বজেশ্বর, মৃগাঙ্কশেখর দিগম্বর, জয় শ্মশান-নাটক, বিবাণ-বাদক, হতাস-ভালক মহেশ্বর।”

ক্রমে বাঙ্গলা ভাষা এতই সংস্কৃত শব্দে বিভূষিত হইল যে, এদেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলা দেখিয়া বঙ্গভাবকে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

প্রাচীন কালে বহু ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল লেখা হইয়াছিল। সেগুলি প্রাক্-সংস্কৃত যুগের। তাহাই পরবর্ত্তী যুগে সংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমানাকারে পরিণত হইয়াছে।

দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত কাণাহরি দত্ত রচিত মনসা-মঙ্গল সম্বন্ধে সংস্কৃত-বিৎ বিজয় গুপ্ত বলিয়াছিলেন—“উহা বহু প্রাচীন কালের লেখা, অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ;

লেখকের ভাষা ও ছন্দের জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না”—ইত্যাদি। ইহা মনসাদেবীর গান।

দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে কাণাহরি দত্ত প্রাক্-সংস্কৃত যুগের কথিত ভাষায় লিখিয়াছিলেন, শিক্ষিত বিজয় গুপ্তের তাহা ভাল লাগে নাই। প্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্যকে যাহারা সংস্কৃত শব্দের নববেশ পরাইয়া ভদ্র সমাজের কাছে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাথরগঞ্জের ফুলতী গ্রাম-নিবাসী বিজয়গুপ্ত (১৪২৩ খৃঃ), সমকালিক কবি ময়মনসিংহ-নিবাসী নারায়ণদেব, ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত

পাতুয়ার-নিবাসী বংশীদাস ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার বিহবী কন্যা চন্দ্রাবতী মনসা-মঙ্গলের কবিগণ।

(১৫৭৫ খৃঃ), বিক্রমপুর খিনারদি-নিবাসী যজ্ঞীদাস ও গঙ্গাদাস সেন (ষোড়শ শতাব্দী), বর্ধমান সিলিমাবাদ পরগনানিবাসী কেতকাদাস-ফেমানন্দ প্রভৃতি কবিরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এপর্য্যন্ত মনসামঙ্গল-রচক এক শতের উপর প্রাচীন কবি পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশ—বিশেষ পূর্ব্ববঙ্গ নদীমাতৃক সীাতসেতে, হাওরপূর্ণ জঙ্গলা দেশ, এখানে সর্পভীতিহেতু মনসাদেবী অতি জাগ্রৎ দেবতা; ভাদ্রমাসে ইহার পূজার মন্দিরে গান করিবার জন্ত বহু “নূতন মঙ্গল” রচিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত কবিগণের মধ্যে বিজয়গুপ্তের সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান-সংঘর্ষের যুগ, কবি সেই সংঘর্ষের কয়েকটি জীবন্ত চিত্র দিয়াছেন। নারায়ণ দেবের হাতে বেহলার বিলাপ চিত্তদ্রাবী কারুণ্যমণ্ডিত হইয়া হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বংশীদাস তাঁহার সময়কার সামাজিক ছবিগুলি—দেশে শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা, জাহাজনির্মাণ ও স্থপতিবিজ্ঞার প্রসঙ্গগুলি খুব হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। ফেমানন্দ সমস্ত অপ্রাসঙ্গিক বাহ্যিক বর্জন করিয়া

কাব্যখানিতে এত করুণ রস ঢালিয়া দিয়াছেন, যাহাতে বেহলার দীর্ঘ চঃখকাহিনীতে যেরূপ পাঠকের হঃখাশ পড়িয়া থাকে, তেমনি তাঁহার মাতার সঙ্গে মিলন এবং স্বপুত্রালয়ে প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গে চক্ষে অবিরল পুলকাস্ত পতিত হয়।

চণ্ডীমঙ্গল—এই শ্রেণীর কাব্যও দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচিত কতক কতক পাওয়া গিয়াছে। চৈতন্য-ভাগবতকার লিখিয়াছেন পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বভাগে—চৈতন্যের

আবির্ভাবের পূর্বে, বহু ভক্ত চণ্ডীমঙ্গলের পালা গাহিয়া রাজ-
জাগরণ করিতেন। রাজা লক্ষণসেনের সমকালবর্তী বা অব্যবহিত

পূর্বে বিক্রমশীল নামক এক রাজা মঙ্গলকোট রাজত্ব করিতেন, ইহার কাহিনী কোন কোন ফার্সী পুস্তকে পাওয়া যায় এবং “সেক শুভোদয়া” নামক পুস্তকেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ধনপতি সদাগর এই রাজার আশ্রিত ছিলেন। বহু চেষ্টার পর মুসলমানগণ এই রাজ্য ধ্বংস করেন। সুতরাং সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই এই কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে। বলরাম, কবিকঙ্কণ, মাধবাচার্য প্রভৃতি কবিরা মুকুন্দরামের পূর্বে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যই এইক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ। মুকুন্দরাম সন্ধি-যুগের কবি, তাঁহার ভাষা ও ভাব—উভয়েই প্রাক-সংস্কৃত যুগ ও সংস্কৃত-যুগের নিদর্শন আছে। এই আখ্যানের সমস্ত উপাদানই মুকুন্দরাম পূর্ববর্তী কবিগণের নিকট পাইয়া-ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বল্প কবিদৃষ্টিতে খুঁটিনাটি বিষয়গুলির নানারূপ সৌন্দর্য ধরা পড়িয়াছে। চরিত্রাঙ্কনে এবং সামাজিক কি গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনীবর্ণনায় তাঁহার অসামান্য শক্তি ছিল। তিনি ব্যাধ-নায়ককে পরিবর্তন করিতে সাহসী হন নাই, যেহেতু স্বচিরাগত গল্প পূজা-মণ্ডপে যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিতে হইবে—মূলগল্পের পরিবর্তন শ্রোতার সঙ্ক করিবেন না; কিন্তু মুকুন্দরাম তাঁহার চরিত্রগুলিকে জীবন্ত মানুষ করিয়াছেন—এইখানে তাঁহার বাহাদুরী। ব্যাধ-নায়কের ছই বাহ “লোহার সাবল”, তাহার বক্ষে ব্যাঘ্রনখের পদক, সে শৈশব হইতে মল্ল-বিজ্ঞায় পটু, “অঙ্গে রাজা ধূলি মাখে।” সে যখন খাইতে বসে—তখন হাঁড়িতে হাঁড়িতে ক্ষুদ্র, পুঁইশাক, হরিণের পায়ের গোড়ালীর মাংস প্রভৃতি খাইয়া নিজের সাক্ষী ও অমুসাগিণী স্ত্রীর জন্ত কিছু রহিল বা না রহিল—সে চিন্তা না করিয়াই বলিয়া উঠে,—“রন্ধন করেছ ভাল আর কিছু আছে?”—তাঁহার গ্রাসগুলি “তেয়াটিয়া তালের মত” এবং ভোজনটি অতীব কুৎসিত। সে এত বড় মূর্খ যে যখন পার্শ্ববর্তী তাহাকে সাতঘড়া ধন দিয়া তাহারই অমুসাগিণী একঘড়া নিজে কাঁখে করিয়া লইয়া চলিলেন, তখন “মনে মনে মহাবীর করেন যুক্তি। ধনঘড়া লয়ে পাছে পালায় পার্শ্ববর্তী”, সে যখন কথা কহে তখন স্ত্রীকে প্রতি কথায় বর্জনের মত ধমক দেয়—“স্বব্যস্ত করিয়া রামা কহ সত্য-ভাষা। মিথ্যা হলে চোয়ারে কাটিব তোরা নাশা”—সুতরাং সে যে মূর্খ ব্যাধ, তাহা বুদ্ধিতে তিলার্দ্র ও বিলম্ব হয় না; অথচ নৈতিক জগতে সে রাজচক্রবর্তী, তাহার বাহু-বর্জরতার মধ্যে তরুণ-স্বর্ঘ্যের জ্বালা চরিত্রের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধৃত মুরারি শীলের সঙ্গে কথাবার্তায় তাহার শিশুর জায় সরলতা দৃষ্ট হয়। চণ্ডীর সঙ্গে ব্যবহারে তাহার

দাম্পত্য-জীবনের শুভ্র সত্যতা, অসামান্য নৈতিক বল, দ্বীলোক-ঘটিত ব্যাপারে সরল সতেজ সাবধানতা, অত্যাশ্রয় প্রতি ক্রোধ বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার এই সকল মহৎগুণ সত্ত্বেও তাহার সাধুর ছায় দৈন্ত এবং নিজেকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে করিয়া পরকে সম্মান করার বৃত্তি তদীয় চরিত্র মধুর করিয়া তুলিয়াছে। ফুল্লরার চরিত্র কষ্টসহিষ্ণুতা, সংযম এবং স্বামি-ভক্তির ধনি; সে স্বামীকে এত ভালবাসে যে নিদাকণ দারিদ্র্য এবং উপবাসাদির কষ্ট সে তিলমাত্র গণ্য করে না; সে তাহার বারমাসীতে চণ্ডীকে যাহা যাহা বলিয়াছিল—তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য—কিন্তু সেগুলিও সে হৃৎসহ মনে করে নাই; স্বামি-প্রেমে অগ্নান মুখে সে পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ সহিয়াছে; সেকথাগুলি বলার উদ্দেশ্য শুধু চণ্ডীকে ভয় দেখাইবার ইচ্ছা। চণ্ডীর প্রতি তাহার সন্দেহ বতই বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই তাহার ভয়াতুর প্রাণের গভীর স্বামি-ভক্তি দেদীপ্যমান হইয়া উঠিতেছে। তারপর যখন চণ্ডী বলিলেন, “এনেছে তোমার স্বামী বাধি নিজগুণে—হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ বীরবরে”—তখন যেন স্বর্ণপ্রতিমা ভয়ে দ্বান হইয়া গেল। ফুল্লরা এতক্ষণ পর্যন্ত উপদেশকের যে মুখোদ্য পরিয়াছিল, তাহা খুলিয়া গেল এবং অসহ দুঃখে সে কাঁদিয়া ফেলিল। কবিকঙ্কণ যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্বর্ণের কথা হউক কি নরকের কথাই হউক,—সমস্তই বাঙ্গলার মাটির। বাঙ্গলাদেশের পল্লীগুলি তাঁহার অক্ষন-কৌশলে জীবন্ত হইয়াছে। তিনি পশুপক্ষী, প্রাকৃত দৃশ্য প্রভৃতি যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন—সমস্ত বিষয়ই মানব-সমাজকে প্রত্যক্ষবৎ করিয়া তুলিয়াছে। কালকেতুর সঙ্গে পশুদের যুদ্ধ—ষোড়শ শতাব্দীতে মোগলদের সঙ্গে হিন্দুদের লড়াইয়ের একখানি চিত্র। মনুষ্য-সমাজ তাঁহাকে এতটা পাইয়া বসিয়াছিল যে, অমরগুলি ফুলে ফুলে উড়িয়া যাইতেছে একথা বলিতে যাইয়াও কবি মানুষের সমাজই স্মরণ করিয়াছেন। “এক ফুলে মকরন্দ, পান করি সদানন্দ, ধায় অলি অপর কুসুম। এক গৃহে পেয়ে মান, গ্রামবাজী দ্বিজ যান, অস্ত্র ঘরে আপন সম্মুখে।” ধনপতির গৃহে তর্কমুখর বণিক্-সভা একরূপ সূচিত্রিত হইয়াছে যে তাহা দেখিলে মনে হয় আমরা বড় মানুষের বাড়ীর একটা বড় রকমের সামাজিক কোলাহলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

আমরা বলিয়াছি, মুকুন্দরাম সন্ধিযুগের কবি। তাঁহার ভাবায় একদিকে প্রাক্-সংস্কৃত যুগ, অপরদিকে সংস্কৃতায়ক যুগ—গঙ্গাবনুনার মত—আসিয়া মিলিত হইয়াছে। “ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর তালপাতের ছাউনি, ভেরেণ্ডার ধাম তার আছে মধ্য ঘরে” প্রভৃতি ছত্রের সঙ্গে সঙ্গে “জান্নভান্ন ক্ববাণু শীতের পরিজ্ঞান”—এক পঙ্ক্তিতে বসিয়া গিয়াছে। ফুল্লরার বারমাসী, বণিক্দের কলহ, মুরারি শীলের সঙ্গে কালকেতুর আলাপ প্রভৃতি আখ্যান প্রাক্-সংস্কৃত যুগের ভাবার প্রকৃতি দেখাইতেছে। অপর দিকে দশভুজার বর্ণনা, খুলনার ছাগ লইয়া বনে বিচরণ এবং সুশীলার বারমাসী প্রভৃতি অংশ নিছক সংস্কৃত শব্দে রচিত। প্রাচীন আখ্যানের বিষয়-বস্তুটি ঠিকই আছে, কিন্তু জনার্দন-বটকের গোবিন্দদানের মাহাত্ম্যকীর্তন প্রভৃতি অংশে নব-ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব পড়িয়াছে। এইজন্য কবিকঙ্কণকে সন্ধিযুগের কবি বলা যাইতে পারে। মুকুন্দরাম বর্ধমান দামুড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহারায় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কয়টি কুলের রাজা তপন ওয়া”র সম্মতি। কবির পিতার নাম দ্বন্দ্ব মিশ্র, পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র,

পুত্রের নাম শিবরাম। ইনি যৌবনকালে মামুদ সরিফ নামে এক অত্যাচারী ডিহিদারের উৎপীড়নে রাজা বাকুড়া রায়ের আশ্রয়ে চলিয়া যান এবং রাজকুমার রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। চণ্ডীকাব্য ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে বিরচিত হইয়াছিল। এই কাব্যের অধিকাংশ সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ই. বি. কাউএল (E. B. Cowell) সাহেব ইংরেজী কবিতায় অনুবাদ করেন। কবিকঙ্কণের পর যে সকল কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে জপ্পা (ফরিদপুর)-নিবাসী জয়নারায়ণ কর্তৃক লিখিত “চণ্ডীকাব্যই” সর্দাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহার একখানি পুথি “বার ভূঞা”র লেখক আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে আছে। এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজনীয়।

ধর্মমঙ্গলের আদি লেখক ময়ূর-ভট্ট সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক, তাহার রচিত পুস্তক বঙ্গের কোন পল্লীতে হয়ত এখনও আছে। একখানি স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পাইয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম কিন্তু তাহা নাকি হারাইয়া গিয়াছে। এই পুস্তকখানির সন্ধান হওয়া অতীব প্রয়োজনীয়।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চক্রবর্তী, এম. এ. এই পুস্তকের প্রথমার্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই কাব্যে যে সকল প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছে আমরা তাহার একবার উল্লেখ করিয়াছি। পরবর্তী লেখকগণ এই প্রাক-সংস্কৃত যুগের কাব্যখানিকে রূপান্তরিত করিলেও ইহার মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক উপাদান আছে। ভিন্ন ভিন্ন কবিকৃত “ধর্মমঙ্গল”কে একস্থানে জড় করিয়া রীতিমত আলোচনা করিলে ইহাদের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক উপকরণ পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ময়ূর-ভট্টের পরে মাণিক গাঙ্গুলী, রূপরাম, সীতারাম এবং বনরাম প্রভৃতি কবি ধর্মমঙ্গল প্রণয়ন করেন। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ-কবি বিলুপ্ত বৌদ্ধযুগের রাজত্ববর্ণের মহিমাজ্ঞাপক কাব্য লিখিতে যাইয়া ভয় পাইয়াছিলেন। স্বপ্নের দোহাই দিয়া শেষে এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াও জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে আড়ষ্ট হইয়াছিলেন। মাণিক গাঙ্গুলী, রূপরাম, বনরাম চক্রবর্তী, সীতারাম প্রভৃতি কবি-রচিত পূর্বোক্ত মঙ্গল-কাব্যগুলি ছাড়া লক্ষ্মী, সরস্বতী, শীতলা, শনি প্রভৃতি বহু দেবতা-সম্বন্ধে ক্ষুদ্র বৃহৎ কাব্য বাঙ্গলার রচিত হইয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণগুলিও এই সকল মঙ্গল-কাব্য দ্বারা বাঙ্গলার ঘরে ঘরে নব-ব্রাহ্মণের বার্তা পৌছাইয়া দিয়াছিল। ইহাদের চেষ্টায় বঙ্গভাষা সাধুভাষায় পরিণত হইয়াছে। প্রাকৃত যুগের দৈন্ত ঘুচিয়া গিয়া এই ভাষার অশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। জনসাধারণ এখন এত সংস্কৃতায়ক কথা বুদ্ধিতে পারে যে ভারতের অল্প কোন ভাষা-ভাষী লোকেরা এ বিষয়ে বাঙ্গলার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতির শিক্ষা বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জায় ঢুকিয়াছিল—তাহাতে এই ভাষা পূর্ব হইতে পাণ্ডিত্যের জন্ম প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থগুলির এই যে অনুবাদের বহু দেশময় বহিয়া গেল, তাহাতে এই ভাষার স্বর্ণফল ফলিয়া উঠিল, এখন ভারতে সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে বাঙ্গলা ভাষাই সংস্কৃতের সর্দাপেক্ষা বেশী সন্নিহিত। মুসলমান-প্রভাবে বাঙ্গলার নাগরিক জীবনে ও

রাজসভায় বহু ফারসী ও আরবী শব্দ ঢুকিয়াছে; আইন ও আদালতের ভাষা মুসলমানী ভাষার অধিকৃত হইয়াছে। 'নিশাপতি,' 'মহাপাত্র,' 'পাত্র,' 'মণ্ডল,' 'মহামণ্ডল' প্রভৃতি পদবী কোথায় চলিয়া গিয়াছে! তৎস্থলে—উজির, ওমরাহ, নাজির, চাকলাদার, কাজি, দেওয়ান, নাদেব, কারকুন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র সর্দার ও বরকন্দাজ প্রভৃতি সমস্তই মুসলমানী শব্দ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অত্যধিক প্রচলন হেতু পাইক (পদাতিক), কোটাল প্রভৃতি কয়েকটি হিন্দুযুগের প্রাকৃত শব্দ কথঞ্চিৎ জীবন রক্ষা করিয়া আছে। এই বিদেশী প্রভাব বৃদ্ধির পল্লীতে ঢুকে নাই, সেখানে চন্দ্রহর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র মেটে দীপটি পর্য্যন্ত হিন্দু কুটিরের সঁজের বাতিটা জ্বলাইয়া রাখিয়াছে। এই নিত্যচকলা রাষ্ট্রলক্ষীর লীলাখেলা পন্নানদীর উদ্দাম ক্রীড়ার ছায়। এদেশের প্রাচীন বৈভব ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, কিন্তু পল্লীর কুটিরখানি নিশ্চল দীপ-শিখার ছায়। এতদিন পর্য্যন্তও স্থির হইয়াছিল—সম্প্রতি পাশ্চাত্য ঝড়ে তাহা বিকম্পিত হইতেছে।

এই যে সংস্কৃত-যুগ আরম্ভ হইল, তাহার প্রধান কথা আচার ও নিয়মের প্রতিষ্ঠা। সর্কগ্রাসী বৌদ্ধপ্রভাবের শেষ সময়ের ব্যভিচার—যাহা চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি বাবতীয় বিদেশী রাজ্য হইতে আসিয়া উৎকটভাবে এদেশে তাণ্ডব করিতে ছিল,—তাহার হাত হইতে দেশবাসীকে বাঁচাইতে যাইয়া ব্রাহ্মণ স্মৃতিকারেরা সামাজিক নিয়মের খুঁটিনাটি লইয়া ব্যস্ত হইলেন, খাঁজাদির নিয়মসম্বন্ধে খুব আঁটা আঁটি হইল। বৌদ্ধাধিকারে বিবাহ-সম্বন্ধে অত্যন্ত শিথিলতা ঘটিয়াছিল, খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকেও জ্ঞানার রাজারা সহোদরা বিবাহ করিতেন, দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মামাত ভগিনী থাকিলে অন্ত্র বিবাহ করা সামাজিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। পুণাতে এই রীতি এখনও বিদ্যমান। উড়িষ্যায় দেবরের সঙ্গে বিবাহ-প্রথা বর্তমান ছিল। নব ব্রাহ্মণ্য এবিষয়ে এত আঁটা আঁটি নিয়ম বাধিয়া দিল যে, ব্রহ্মদেশে সর্ক শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ ব্যাপারটা একটা সমস্তার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। কোন্ তিথিতে কি খাইতে হইবে—অষ্টাবিংশতিতবে শ্রাদ্ধ রঘুনন্দন তৎসম্বন্ধে কঠোর বিধি প্রণয়ন করিলেন। কাশীদাস লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাঘ মাসে মূলা ভোজন করে, সে ব্রহ্ম-হত্যাকারীর পাপ করে।

জাতিসম্বন্ধে স্মৃতিকারেরা ব্রাহ্মণকে উঁচুতে রাখিয়া অপর সর্কজাতিকে এতটা নীচে নামাইয়া দিলেন যে, বাঙ্গালী জাতি কোন অসীম সমুদ্রোচ্ছিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলির মত স্বতন্ত্র হইয়া শতাব্দী বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। দাক্ষিণাত্যে এই অসমতা এখনও উৎকট ভাবে বিরাজ করিতেছে।

কিন্তু বাঙ্গলা দেশ চিরকালই হৃদ্যন্ত,—স্বাধীনতা-প্রিয়, সিংহকে খাঁচার পুরিলে সে যেরূপ শৃঙ্খলকে হুঃসহ মনে করিয়া ছটফট করিতে থাকে, অত্যধিক ব্রাহ্মণ-শাসনে পীড়িত হইয়া বাঙ্গালী এই দৌরাঘোর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ব্যাকুল হইল। ব্রাহ্মণেরা মন্দিরগুলি আত্মসাৎ করিয়া দেবতাদিগকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন, জনসাধারণ ও তাহাদের দেবতার মধ্যে এক দুর্লভ্য প্রাচীর উথিত হইল। অভিমানে এদেশের অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল।

এই সকল অল্পশাসনের বিরুদ্ধে চৈতন্যদেব সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও রাগানুগ প্রেমের আদর্শ লইয়া অভিযান করিলেন। সমস্ত বিধিব্যবস্থা ভাঙাইয়া দিয়া তিনি ভগবৎ-প্রেমের ডিঙ্গি বাঙ্গলার ঘরে ঘরে ভিড়াইয়া দিলেন। তাঁহার অহুচরেরা জাতিবর্ণ-নির্কিশেয়ে সমস্ত লোকের গৃহে দেবতা স্থাপন ও স্বপ্নের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের দ্বারা তাহাদের পৌরোহিত্যের ব্যবস্থা করিলেন। আবার দেবের ছয়ার আচড়াল সর্বজাতির জন্ত খোলা হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চৈতন্য-যুগ

এপর্যন্ত রূপকথায়, গীতিকথায় ও পল্লীগীতিকায় যে সকল মহীয়সী নারীর চরিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়,—বঙ্গের শত শত সতী যে প্রেমের আদর্শ দেখাইয়া মৃত্যুতেও প্রেমের বৈজয়ন্তীর গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, সহজিয়া প্রেমের সমাজ-বিরুদ্ধ স্বাধীন-ভর্তৃকাদের তপস্তা—এই সমস্ত উপকরণ ও জাতীয় সাধনার ফল আত্মসাৎ করিয়া বঙ্গীয় বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হইল। উহা বঙ্গদেশের সর্বোচ্চ তপস্তার কথা। আমাদের দেশের মহিলাদের একনিষ্ঠ স্বর্গীয় প্রীতি, সুজ্ঞানবৃত্তি মনোভাবের বৈচিত্র্য—সমাজ-বিরোধ ও অবাধ স্বাধীনতাজনিত নির্ভীক হৃদয়বল এই সমস্তই এক রাধিকাচরিত্রে আছে। ইনি গয়ের নাটিকা নহেন, ইনি সাধনার ধন। ইনি কোন কাব্যের চরিত্র নহেন—ইনি ‘মহাভাব’। চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিরা এই মহাভাব-ময়ীকে আঁকিয়াছেন। প্রথমে হরিনাম-মাহাত্ম্য—যে নাম চণ্ডীদাসের কবিতা।

সাধকেরা জগতে একমাত্র সত্য বলিয়া দেখাইয়াছেন, মৃত্যুকালে যে নামই একমাত্র সঞ্চল—সেই নামের কথা দিয়া চণ্ডীদাস তাঁহার গীতি আরম্ভ করিয়াছেন। “মই, কেবা শুনাইল শ্রাম নাম”—ভক্ত নাকি এই নাম জপ করিতে করিতে এমন এক স্থলে পৌছেন, যেখানে ইন্দ্রিয়ের কোলাহল নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই নামজপের কথা চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, “জপিতে জপিতে নাম অবশ করিলগো”—“অবশ” অর্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উদ্বেগ বিলুপ্ত হওয়া। যিনি সর্বস্থানে আছেন, অথচ বাহার অস্তিত্ব অবিদিত, যদি হঠাৎ তাঁহার সেই সর্বব্যাপী সত্তা অহুত হয়—সাধক যদি প্রকৃতই বৃত্তিতে পারেন,—এই মুহূর্ত্তে এখানে তিনি আছেন, তবে সেই সত্তার মহিমায় অভিভূত হইয়া গৃহস্থ কি আর গৃহধর্ম করিতে পারেন? তাই “বেখানে বসতি তার, সেখানে থাকিয়া গো যুবতী-ধরম কৈছে রয়”—নামের মাহাত্ম্যের কথা বলিয়া চণ্ডীদাস রূপের কথা বলিয়াছেন; অরূপের রূপ সে আবার কি প্রকার? সেতো “স্বর্ণের পিত্তল-কলসী;” জগৎ দেখিতেছি,

জগদীশকে কি দেখিতে পাইব না? এই জগৎকে চারিদিকে শ্রাম ও কৃষ্ণ বর্ণ বিরিয়া বসিয়াছে; আকাশ,—প্রাকৃতিক দৃশ্য, নদ-নদী, সমুদ্র—এ সমস্তই সেই নীলাভ শ্রাম-মিশ্র কৃষ্ণবর্ণ। অপরাপর রঙের খেলা ময়ূরপুচ্ছের ছায়া, সেই কৃষ্ণ-মধুরিমাকে সাজাইতেছে। চণ্ডী-দাসের রাধা সেই কৃষ্ণবর্ণের মাদুরীতে ডুবিয়া আছেন। তিনি চুল হইতে মালতীর মালা খসাইয়া ফেলিয়া মুক্ত-কুন্তলে কৃষ্ণের আভা দেখিয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া আছেন—“এলাইয়া বেণী, কুলের গাঁথুনি, দেখয়ে খসায় চুলে”—ক্ষণে ক্ষণে মেঘের মধ্যে অরূপের রূপের আভা দেখিয়া “না চলে নয়নে তারা”—ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠের বর্ণ দেখিয়া সেই কৃষ্ণ-বর্ণ মনে পড়িতেছে। তাঁহার নাম শুনিয়াছেন, ইন্দ্রিয় নিরস্ত হইয়া গেলে জীবমাত্র তাঁহার আব্ধান শুনিতে পায়, কারণ তিনি সকলকেই তাঁহার মধুরাকরা ভাবায় ডাকিতেছেন। সেই সঙ্গীত আমাদের কাছে ব্যর্থ হইয়া যায়, কারণ আমাদের কাণ সংসারের কোলাহলের দিকে—এজন্ত সেন্সপীয়ার বলিয়াছেন, “Such music is in our eternal soul, but for the vesture of decay that enshrouds it, we cannot hear.”

রাধা সেই ডাক শুনিয়াছেন, এজন্ত “বিরতি আহায়ে, রাঙ্গা বাস (গেকুয়া) পরে, যেমন যোগিনী পারা” এই প্রেমের বাউড়িয়ার ক্ষুধাতৃষ্ণা কোথায়? তিনি গৈরিক পরেন, “সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে। বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়া পড়ে।”

রাধিকা “ধরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিল তিল আসে যায়, মন উচাটন, নিখাস সঘন, কদম্ব-কাননে চায়।” এই ছবির সঙ্গে চৈতন্যদেবের ছবি মিলাইয়া দেখুন।

রাধিকা “যে করে কান্থর নাম—তার ধরে পায়, পায় ধরি কাদে সে চিকুর গড়ি যায়। সোনার পুতুলী যেন তলে লুটায়”—যিনি কৃষ্ণনাম শুনিলে আচণ্ডাল সকলের পায় গড়াগড়ি দিতেন,—এই রাধার চিত্র কি তাঁহারই পূর্বাভাস নহে? যাহারা বৈষ্ণব পদাবলী সামান্ত নাট্যকার প্রেম বলিয়া ভুল করিবেন, সেই সকল সংসারী লোক এই পদাবলী-রাজ্যে প্রবেশের অধিকারী নহেন।

ভগবান্ পুত্রকল্যাণীরূপে দিনরাত্রি আমাদের সেবা করিতেছেন। এই আমাদের চিরন্তন প্রভু—চিরন্তনসেবকের—সত্তা যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন, “একথা কহিবে সহি একথা কহিবে। রমণী এমন তপ করিয়াছে কবে। পুরুষ পরশমণি নন্দের কুমার। কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার?” যাহার স্পর্শ বাহুকাঠি, তাহাতে সীসা ও লোহা পর্য্যন্ত সোণা হইয়া যায়, তিনি কেন—কোন ধনের জন্ত—আমার পায়ে ধরেন? সেই বিরাট পুরুষ ক্ষুদ্র হইয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমার নিকট এক ভিক্ষার জন্ত (তাহা ভালবাসা) আমার কুটির-দ্বারে আসিয়া হাত পাতিয়া থাকেন। তাঁহাকে না চিনিয়া আমরা প্রত্যহ ফিরাইয়া দিতেছি। তাঁহার সেই অসীম প্রেম—পুত্রকলত্র মাতাভগিনীর মারফৎ আমরা প্রত্যহ পাইতেছি,—“আমি বাই-বাই-বাই—বলে তিন বোল, কত না চুখন দেয়—কত দেয় কোল। পদ আধ যায় পিয়া চায় পালটিয়া। বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া। করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে। পুন দরশন লাগি কত চাটু বলে।” এই যে প্রেমের খেলা তাঁহারই বিধে নিরন্তর চলিয়াছে—

এই নিত্য লীলার খেলোয়াড় তিনি। তিনি বৃহৎ হইতে বৃহৎ বৃহত্তের নিকট, কীট হইতে কীট কীটের নিকট, এই ভাবে প্রত্যেক জীবের দ্বারস্থ। যিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, যিনি রাজচক্রবর্তীর মহোৎসবের বিধাতা, তিনি ক্ষুদ্র পিপীলিকার মিষ্টান্নকণা লইয়া ক্ষুদ্র গর্তটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আহ্বান করিতেছেন।

রাধিকা ধর্মকর্ম কিছুই মানেন না, কারণ ধর্মকর্মের মালিককে পাইয়াছেন, “কি আর শুনাও ধরম করম—মন স্বতন্ত্র নয়”—“মরম না জানে, ধরম বাখানে, এমন আছয়ে যারা, কাজ নাই সখি তাঁদের কথায়, বাহিরে রহন তাঁরা।”

“আমি কাহ্ন অমুরাগে এ দেহ মঁপেছি, তিল তুলসী দিয়া”—তিল-তুলসী দিয়া যে দান হয়, তাহা আর ফিরাইয়া আনা যায় না। কে এরূপ আছেন, যিনি বলিতে পারেন—ভগবানকে তিনি কিছুমাত্র না রাখিয়া দেহ দান করিয়াছেন? তাহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, স্বক—সমস্তই ভগবানের অধীন, তাহারই প্রীত্যর্থ তাহারা চালিত, তাহাদের অস্ত্র কোন কাজ নাই। রাধিকা যাহা দিয়াছেন—তাহা চেষ্টা করিয়াও ফিরাইয়া আনিবার সাধ্য নাই। “কত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়রে। আনপথে যাই, পদ কাহ্ন পথে ধায়রে॥ এ ছার নাসিকা মুই কত করি বন্ধ; তবুতো দারুণ নাসা পায় তার গন্ধ।”

প্রেমিক হিসাবে চণ্ডীদাস অদ্বিতীয়, কবি-শিল্পী হিসাবেও তিনি অদ্বিতীয়। তাহার উৎকৃষ্ট কবিতাগুলির মধ্যে পাঠক বা শ্রোতার কল্পনা উদ্বোধন করিবার অবকাশ আছে, তিনি সমস্ত কথা খুলিয়া বলেন নাই, চর্তুভ ভাবগুলির ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। যেদিন ভগবানের প্রতি ভালবাসা জন্মে, সেদিন সেই পুলকের তরঙ্গ সর্বত্র বহিয়া যায়—সেই ভাবাবিষ্ট হইয়া মানুষ আত্মহারা হইয়া যায়; “গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি, সদা ছল ছল আঁখি। পুলকে আকুল, দিক্ নেহারিতে—সব শ্রামময় দেখি।” যমুনায যাওয়ার সময়ে সে কি ভাব! তখন তিনি সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারেন না—“সখীর সহিতে, জলেতে যাইতে—সেকথা কহিবার নয়।” যমুনায যাওয়ার সময়ে তাহার যে অবস্থা হয়—তাহা বলিতে বাইয়া মুখের কথা ফিরিয়া দাঁড়ায়। সে অপ্রকাশ্য অসহ্য আনন্দের কথা মনে হইতেই তিনি আবিষ্ট হইয়া পড়েন। “যমুনার জল, করে ঝলমল, তাহে কি পরাণ রয়?” কেন যমুনার জল ঝলমল করে—তাহা আর তিনি বলিতে পারেন নাই—“সেকথা কহিবার নয়।” কৃষ্ণ কদম ডালে বসিয়া থাকেন, তাহারই মধুর-পক্ষসংযুক্ত উজ্জল নৃতির প্রতিবিম্ব জলের উপর পড়িয়া ঝলমল করে—রাধা এত কথা বলিতে পারেন নাই, পরবর্তী এক কবি বলিয়াছেন—“ঢেউ দিও না কেউ জলে, বলে কিশোরী। দরশনে দাগা দিলে হবে পাতকী।”

রাধা লোকনিন্দা সহিতেছেন—তাহার জাতি-কুল-শীল ছাড়া প্রেম, জগ-ভরা নিন্দা, তিনি কলঙ্কী, কিন্তু তাহাতে ক্রক্ষেপ নাই—তাহা শতবার বলিয়াছেন; “দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে—এজন্য মুখ আর দেখিতে না হবে।” উপবাস, লোকনিন্দা, গুরুজনের গল্পনা, এসমস্তই তিনি প্রফুল্লমুখে সহিয়াছেন “যথা তথা যাই আমি, যতদূর চাই। চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই।” এমন অমৃত ধাক্কিতে সংসারের বিষ আর তাহার কি করিবে?

কিন্তু এত ভালবাসিয়াও তিনি সময়ে সময়ে বৃদ্ধিতে পারেন না বাহাকে তিনি ভালবাসেন তিনি কে? “পর কৈহু আপন, আপন কৈহু পর—বর কৈহু বাহির, বাহির কৈহু বর। বৃদ্ধিতে নারিহু বধু তোমার পিরীতি।” সাদক সর্বস্ব দান করিয়াও সেই অধ্যাত্মলোকের হৃদয়ের শক্তি, বাহা তাঁহাকে চুষকের মত আকর্ষণ করে, তিনি কে, তিনি প্রকৃতই তাঁহাকে ভালবাসেন কি না এসম্বন্ধে তাঁহার মনে কখনও কখনও বিধার ভাব আসে—পূর্বোক্ত পদ তরুণ এক মুহূর্তের উক্তি। বিজ্ঞাপতির বাধা এইরূপ এক মুহূর্তে বলিয়াছেন—“মাধব তুহঁ কৈছে কহবি মোয়।”

চণ্ডীদাসের কবিতা—বাঙ্গলার লোকের প্রাণের সুর। বহুকাল হইতে প্রেমের মর্ম্মবেদনা যে পরীগীতি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে—তাহা চণ্ডীদাসের পদে ক্ষণে ক্ষণে মূর্ত হইয়া প্রমাণ করে—এই কবি আমাদের কত আপনার। “চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ী নিঙাড়ী” প্রকৃতি পদে সন্তোষাতা পরীকল্পসীগণের ছবি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া যায়। এই কবির কবিতা মানুষের মনের মনোহরনিত তীব্র কষ্ট, সর্বস্ব দেওয়া গাঢ় প্রেম—একেবারে বিনাস্তে আত্মদান ও চিরবিরহ-বিধুর এবং চিরমিলন-সুখ প্রেমিকের হৃদয়ের যে সকল কথা আছে, সেই সর্বকালোপযোগী ভাবের এমন একটা ছাপ মারিয়া গিয়াছে, বাহা বর্তমান বাঙ্গলাভাষা থাকিবে ততদিন থাকিবে। একদিকে সংসার, অপরদিকে স্বর্গ—চণ্ডীদাসের পদ—ইহাদের মিলনের সেতু, একের পরিণতি অপরে, প্রকৃত পক্ষে ইহাদের ছাড়াছাড়ি নাই। চণ্ডীদাসের কবিতা ধর্ম্মকে একটা উচ্চস্থানে রাখিয়া ভক্তকে তাহা দূর হইতে দেখায় নাই, তাহাকে একেবারে নিজের ঘরের সংলগ্ন মন্দিরের দেবতার পাদপীঠে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে; এত সান্নিধ্যে আনিয়াছে বলিয়া সংসারের ধূলি লাগিয়া দেবমূর্তি মলিন হইয়াছেন,—শীলতার অভাবে তাঁহার গায়ে কলঙ্কের ছায়া স্পর্শ করিয়াছে, এমন কথা বাহারা বলেন, তাঁহার বাহাকে লইয়া আমরা নিত্য বাস করিতেছি—সেই অন্তরের দেবতাকে ধনিষ্ঠ সধ্বন্ধে জানিতে চাহেন না।

চণ্ডীদাস বীরভূম নাম্নর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, সেখানকার বাঙালি মন্দিরের তিনি পুরোহিত ছিলেন। রামী (রামতারা) নামক এক ধোবানীর প্রেমে পড়িয়া তিনি জাতিচ্যুত হন। তাঁহার ভ্রাতার নাম নকুল ছিল। তিনি স্বয়ং সুপণ্ডিত ও সুগায়ক ছিলেন এবং তাঁহার অনেক বন্ধু—তাঁহাদের মধ্যে, একজন রাজা তাঁহাকে জাতে তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গোড়েশ্বর (সম্ভবতঃ জালালুদ্দিন) স্বীয় বেগম সাহেবাকে কবির অমুরাগিণী মনে করিয়া চণ্ডীদাসের হত্যার আদেশ দেন। একটা হাতীর উপর তাঁহাকে রাখিয়া তীব্র বেত্রাঘাতে তাঁহার মাংস উঠাইয়া ফেলিয়া গোড়ের রাজধানীতে তাঁহাকে বধ করা হয়। কথিত আছে সেই নিষ্ঠুর দৃষ্ট দর্শনে বেগম সাহেবা অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং হৃদয়ের স্পন্দন স্থগিত হওয়াতে তাঁহারও সেই সঙ্গে মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে চণ্ডীদাসের বয়স চল্লিশের বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইনি মৈথিল কবি বিজ্ঞাপতির সমসাময়িক ছিলেন। গঙ্গাতীরে উভয় কবির দেখা হইয়াছিল এবং উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ কথাবার্তা হইয়াছিল, অনেক প্রাচীন কবি তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের মনে হয় চণ্ডীদাস ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। কৃষ্ণকীর্তন তাঁহার তরুণ বয়সের

লেখা বলিয়া মনে হয়। এই কাব্যের শেষের দিকে চণ্ডীদাসের পরিচিত অধ্যাত্ম-সঙ্গীতের সুরটি আছে। অধুনা কয়েকজন পণ্ডিত রামীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রেমসম্বন্ধীয় সংশ্লিষ্ট অস্বীকার করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের সঙ্গে ধোবানীর প্রেম, এষে অসম্ভব! এইসকল ছোঁয়াচে রোগাক্রান্ত পণ্ডিতকে চণ্ডীদাসের কথায় উত্তর দেওয়া বাইতে পারে “কান্নুর পিরীতি জাতি-কুলশীল ছাড়া।” পঞ্চপুষ্প নামক মাসিক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য সবিস্তারে লিখিয়াছি। বস্তুতঃ চণ্ডীদাসের সুরটি না চিনিয়া বাহারা বৃথা প্রজ্ঞাভিমানী হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা চণ্ডীদাসের কথাতেই বলিব “কাজ নাহি সখি, তাঁদের কথায়, বাহিরে রহন তাঁরা।” কেহ কেহ চণ্ডীদাসের গান যে মহাপ্রভু আবৃত্তি করিতেন, তাহাও অস্বীকার করেন।

মৈথিল কবি বিজ্ঞাপতির জন্মস্থান মিথিলার বিসফি গ্রামে। ইনি রাজা শিবসিংহ ও তাঁহার পরবর্ত্তী অনেক রাজার অনুরূপ পাইয়া কাব্য লিখিয়াছিলেন। এমন কি সুলতান

গয়েসুদ্দিন ও নসির সাহার প্রশংসাও ইহার ভণিতায় পাওয়া যায় ;
বিজ্ঞাপতি।

তাহাতে মনে হয় শুধু মিথিলার রাজগণ নহে, গোড়েশ্বরগণের মধ্যেও কাহারও কাহারও কৃপাদৃষ্টি ইহার উপর পড়িয়াছিল। ইহার জীবন শতাব্দীর উচ্চকাল ব্যাপক থাকাতো ইনি বহু রাজার রাজত্বকালের ঘটনাবলীর সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত ছিলেন। ইনি সংস্কৃতে ‘পুরুষ-পরীক্ষা’ প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন, বংশানুক্রমে ইহার পূর্বপুরুষেরা পাণ্ডিত্যের জ্ঞান খ্যাতিলাভ করিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার অনুরূপ রাজা ও রাজস্বীগণের মধ্যে শিবসিংহ ও লছিম দেবীই কবির বিশেষ উৎসাহ-দাতা ছিলেন। ইনি রাজার এতটা অনুরক্ত ছিলেন যে শিবসিংহের মৃত্যুর ৩৪ বৎসর পরেও তাঁহাকে ইনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, “স্বপ্নে দেখিছ শিবসিংহ ভূপ। চৌত্রিশ বৎসর পরে শ্রামল রূপ।” প্রায় সমস্ত চতুর্দশ শতাব্দী ও পঞ্চদশ শতাব্দীর কয়েক বৎসর অবধি ইনি জীবিত ছিলেন। ইহার রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে যশোরের বসন্তরায় এবং অপর কয়েকজন বাঙ্গালী পদকর্ত্তা হিন্দী-মিশ্র বাঙ্গলা ভাষায় পরিবর্ত্তিত করেন। সেই পরিবর্ত্তিত আকারে মৈথিল কবির পদ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে এখনও গীত হইয়া থাকে। মহাপ্রভু স্বয়ং দিনরাত্র বিজ্ঞাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ গান করিতেন, এইজন্য বাঙ্গলা দেশে ইহার প্রতিপত্তি খুব বেশী হইয়াছে। উপমা ও অন্ত্যন্ত অলঙ্কারের ছটায় বিজ্ঞাপতির সঙ্গীতগুলি ঝলমল করিতেছে। ইহার শেষ দিক্কার পদাবলীর ভাবের প্রগাঢ়তাও কম নহে। প্রবাদ এই যে চণ্ডীদাসের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎকারের পরে অলঙ্কারশাস্ত্রের পরিবর্ত্তে ভাব-প্রবণতার দিকে ইহার মনো বশী হইয়াছিল। বিজ্ঞাপতির ভাব-সম্মিলনের পদ ভাব-সমৃদ্ধিতে অতুলনীয়। “পিয়া যব আওব এ মনু গেহে, মঙ্গল আচার করব নিজ দেহে। বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে, ঝাড়ু দেহব তাহে চিকুর বিছানে। আলিপনা দেওব মোতিম হার। মঙ্গল কলস করব কুচ ভার” প্রভৃতি পদে কবি অশরীরী মিলনের কথা গাহিয়াছেন, যেখানে নরদেহই দেবমন্দির এবং কৃষ্ণ স্বয়ং সেই মন্দিরের দেবতা। মাথুরের পর কৃষ্ণ আর বৃন্দাবনে আসেন নাই, কিন্তু গোপীরা তাঁহাকে বাহিরে না

পাইয়া মনের ভিতর পাইয়াছিলেন। ভাব-সম্মেলন বৈষ্ণব কবির অপূর্ণ সৃষ্টি,—চিরবিরহের মধ্যে চিরমিলন।

চণ্ডীদাস ও বিজ্ঞাপতির পরে বাঙ্গলায় শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, অনন্ত দাস, বংশী দাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, জ্ঞান দাস, চন্দ্রশেখর বা শশিশেখর, ঘনশ্যাম দাস প্রভৃতি শত শত কবি পদ রচনা করেন। **নরহরি সরকার** অপরাপর বৈষ্ণব পদ-কর্তা। শ্রীখণ্ডের সর্লজনপরিচিত বৈষ্ণবগুরু ও চৈতন্যের অন্তরঙ্গ। ইহার রচিত “অঙ্গনে রহিল মোর হিয়ার হেম হার, পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার, রোপিছু মল্লিকা নিজ করে, গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে। নরহরি ক’র এই কাম, সে সময়ে কর্ণে শুনা’ও হরিনাম”—প্রভৃতি পদ প্রেমের পীযুষপূর্ণ; অনন্ত দাসের অভিসার অতি সুন্দর; বংশীবদনের “না যেও না যেও, রাই, বৈস তরুতলে, আসিতে পেয়েছ ব্যথা চরণকমলে।” প্রভৃতি পদ অতুলনীয়। ইহাদের অনেকেই চৈতন্যের সহচর ছিলেন। গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, শশিশেখর, বলরাম প্রভৃতি কবি পরবর্তী যুগের। গোবিন্দ দাসের কথা ইতিপূর্বে ৭৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, ইনি ব্রজবুলিতেই অধিকাংশ পদ লিখিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাস ও বিজ্ঞাপতির পর ইনিই বৈষ্ণব কবিকুলের শীর্ষস্থানীয়—ইহার রচিত “করযুগ নয়ন মুদি চলু ভামিনী তিমির পয়ানক আশে।” “মণিকঙ্কণপন ফণিমুখবন্ধন, শিখরে ভুজগ-স্কন্ধ পাশে” এবং “যো পদতল ধলকমল ধরণী-পরশে উপশঙ্ক। অব কষ্টকমর বাটহি আওত বাত নিশঙ্ক।” প্রভৃতি পদ—প্রেম যে ইন্দ্রিয়বিকার নহে—কঠোর সাধনা, তাহাই প্রমাণ করিতেছে। কান্দড়া-বাসী **জ্ঞানদাস** ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইনি চণ্ডীদাসের পদের বিবৃতি করিয়া, কোথাও বা আশ্চর্য্য মৌলিকতা দেখাইয়া যে সকল পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহা এখন কীর্ত্তন-গায়কদের প্রধান আশ্রয়। কতকগুলি পদের তুলনা নাই, যথা “রূপলাগি আঁখি বুঝে, গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। পরাণ পীরতি লাগি স্থির নাহি বাধে ॥”—পদে মাহুষ যে অপূর্ণ—শুধু নর কি নারী একক যে স্বীয় স্বাভাবিক অপূর্ণতায় ব্যথিত এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলনের জন্ত বেদনাতুর ও চিরপিপাসিত—তাহাই বুঝাইতেছে। এই অপূর্ণতা লইয়া নারী-জাতি পুরুষকে ছাড়িয়া টিকিবেন কিরূপে? যদি ভগবানের প্রেম দ্বারা এই চিরতৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণা না মিটে, তবে নরনারীর দেহ ও মনের অপূর্ণতা লইয়া দাঁড়াইবার আর স্থান নাই। “কবি নৃপজ-বংশজ জয় ঘনশ্যাম বলরাম।” **বলরাম দাস ও ঘনশ্যাম**—গোবিন্দ কবিরাজদের বংশজাত। ঘনশ্যাম গোবিন্দ-পুত্র দিব্যসিংহের পুত্র। বলরাম দাসের পদ অতি সরল পল্লীভাষায় রচিত, ইহার “সখি হের দে আসিয়া বা। নির্দ যায় চাঁদবদনী শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা ॥ নিখাসে ছলিছে, রতন বেশর, হাসিখানি তাহে মিশা ॥” এবং শশিশেখরের “তুঙ্গ মণিমন্দিরে, বিজুলী ঘন সঙ্করে—মেঘকুচি বসন পরিধানা” কিংবা “অতি শীতল, মলয়ানিল, মন্দমধুর-বহনা” প্রভৃতি পদ বাঙ্গলাদেশে সুপরিচিত। গোবিন্দ দাস-প্রমুখ ঐ সকল কবিগণ বোড়শ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। ইহাদের প্রত্যেকের

লেখায় চৈতন্য দেবের জীবনের প্রভাব অতি সুস্পষ্ট; এইজন্য ইহারা এমন একটি পৃথক পঙ্ক্তির সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহাতে ইহাদিগকে অন্যান্য প্রেম-সঙ্গীত-রচকদের সঙ্গে একত্র একটা স্থান নির্দেশ করা উচিত নহে। ইহারা মহাকবি সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্গদেশ ইহাদিগকে আর একটি নাম দিয়াছেন—যাহা ইহাদিগের গুণের বিশেষত্বের পরিচায়ক—সে সংজ্ঞাটি “মহাজন”।

ইহাদের পদে কবিত্বের শিল্পকলা অলঙ্কিতে খেলিয়া গিয়াছে; একটি পদের উল্লেখ করিব। চন্দ্রা কৃষ্ণকে খুঁজিয়া ক্লান্তা হইয়াছেন, রাধার নিষ্ঠুর ব্যবহারে হয়ত কৃষ্ণ আত্মহত্যা করিয়াছেন—এই আশঙ্কায় দূতীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে; তাহার চক্ষে অবিরত অশ্রু ঝরিতেছে, তিনি আঁচলে মুছিয়া তাহা সামলাইতে পারিতেছেন না। হঠাৎ যমুনা-কূলে “নৌপহি” মূলে তিনি কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন—“চূড়া এক ঠাই, বাঁশী এক ঠাই” ধূলিধূসর দেহে তিনি নদী-সৈকতে লুটিয়া পড়িয়াছেন। চন্দ্রা কৃষ্ণকে দেখিয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন, কিন্তু গোপীর চিরাত্যস্ত কপটতার সহিত মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন করিয়া ফেলিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন, দূতী নিশ্চয়ই তাঁহাকে খুঁজিতে আসিয়াছেন; রাধা নিশ্চয়ই অহুতপ্তা হইয়া তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন। তখন এত দুঃখের সুখ-সমাপ্তিতে পুলকিত হইয়া কৃষ্ণ দেহ হইতে ধূলি ঝাড়িয়া দূতীর জন্ত অসহিষ্ণু হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ধূর্তা চন্দ্রা তাঁহাকে দেখিয়াও তাঁহাকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন; তখন শুক-মুখে কৃষ্ণ ‘দুতি-দুতি’ বলিয়া পিছন হইতে ডাকিতে লাগিলেন, কারণ রাধাকে না দেখিয়া ধাকা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। দূতী উপেক্ষার ভাবে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, ‘পেছন হইতে ও ভাবে ডাকা ডাকি করিয়া অকল্যাণ করিতেছে কেন?’ “কি কহবি রে, মাধব, তুরিতহি কহ কহ (আমার দাঁড়াইতে সময় নাই) হাম যাওব আন কাজে”—“তব সনে বাত নহে মঝু সমুচিত, দোষ দেওব সখী মাঝে।” অন্তরে কৃষ্ণের সঙ্গ-লাভ—সুদুর্লভ সুখ-প্রাপ্তি, কিন্তু বাহিরে উদাসীনতা। কবি বিলম্বিত ছন্দে এই দুই ভাবের লীলা অতি নিপুণভাবে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। প্রথম কৃষ্ণকে ধূলি ঝাড়িয়া দূতীর জন্ত প্রতীক্ষা-সূচক পদটির বিকৃতচ্ছন্দ এবং দ্বিতীয় পদটিতে দূতীর বাহু-উদাসীনতা কিন্তু কৃষ্ণ-সঙ্গের জন্ত নিবিড় পিপাসা ছন্দের কোশলে ধরা দিতেছে। দূতী যে কথা বলিতেছেন তাহাতে মনে হইবে যে তাঁহার কথা বলিবার এক মুহূর্তও অবকাশ নাই। এদিকে ছন্দটি এত বিলম্বিত যে তাহাতে তো ব্যস্ততা আদৌ নাই, বরং দূতীর যেন যতটা দেবী করিতে পারেন ততই ভাল—এই ভাবটি প্রদর্শিত হইতেছে। মুখে যাহা বলিতেছেন—ছন্দ তাহার প্রতিবাদ করিয়া মিথ্যাটা জ্বালায়মান করিতেছে। “কি কহবি রে, মাধব,—তুরিতহি কহ কহ—হাম যাওব আন কাজে, আমার দাঁড়াইবার সময় নাই”—দাঁড়াইবার সময় আছে বরং আরও কিছু বেশী, নতুবা এত টানা সুদীর্ঘ ছন্দে কি জরুরী কথা বলা হয়! কথায় যে ব্যস্ততা, সুরে তাহার উল্টা। পদটি ব্রাহ্ম শৈথিল্যের। একপ কোশল বৈষ্ণব পদের অনেকগুলিতেই দৃষ্ট হইবে। পড়িতে তাহা বেকপ বোঝা যায়—গানে তাহা আরও পরিষ্কার হয়।

আর একটি গানে রাধা কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখিতেছেন—“রজনী শাওন ঘন, ঘন দেওয়া গরজন, সে যে রিমি ঝিমি শরৎে বরিবে। পালঙ্কে শরন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে, আমি নির্দ যাই মনের হরিবে। শিখরে শিখণ্ডী বোল, মস্ত দাহরী বোল, কোকিলা ডাকিছে কুতূহলে। ঝিঁঝিঁ ঝিনকী ঝাঁজে, ডাহকী সে গরজে, আমি স্বপন দেখিলাম হেন কালে।” নিদ্রিতার চক্ষু এখানে মুদ্রিত, স্তবরাং বর্ষাশ্লভ যমুনের নৃত্য নাই, নীপ-পুষ্পের ঘটা নাই, কুস্তলোপম কৃষ্ণমেঘের খেলা নাই—আছে শুধু ঐতির বিষয়। বর্ষার শত সৌন্দর্য ও দৃশ্যাবলী ছাড়িয়া কবি শুধু সুরটির উপর জোর দিয়াছেন, বাহাতে ঘুমের গাঢ়তা আনয়ন করে—ঘন ঘন দেওয়া গরজন—‘শাওন’-রজনীর রিমি ঝিমি বৃষ্টি-বিন্দু-পতনের শব্দ,—ঝিরি ঝাঁজ, ডাহকীর চীৎকার—এসকলই শব্দ-মস্ত, ঘুমের প্রগাঢ়তা বাড়াইবার ঐক্সজালিক উপায়; দৃশ্যপটের অবতারণা না করিয়া কবি স্বপ্নাবিষ্টের স্মৃতির সহায়ক শব্দ-জগতে আমাদিগকে লইয়া গিয়াছেন। এই কবিতা অপূর্ণ সাহসিকতার সহিত সংস্কৃতজ হইয়াও কবি-প্রসিদ্ধি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এজন্ত বর্ষাকালে কোকিলের ডাক শুনাইয়াছেন ও অনন্তদাস অভিসারিকার যাত্রায় ডম্ফ ও বরাবের শ্বনির পরিকল্পনা করিয়াছেন।

চৈতন্যের সহচর এবং অনুবর্তীগণ যে বিরাট সাহিত্য রচনা করিয়াছেন—তন্মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃতের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণদাস বর্তমান ঝামটপুরে বৈষ্ণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে বিরক্ত হইয়া তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। চিরকুমার বিজ্ঞানরাগী কৃষ্ণদাস পণ্ডিতাগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অমুরোধে ৮৭ বৎসর বয়সে চৈতন্য-চরিতামৃত মহাগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়া ৯৩ বৎসর বয়সে ৭ বৎসরের অক্সান্ত চেষ্টায় ইহা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে সমাধা করেন। পাণ্ডিত্যে, ভক্তিতে ইহার সমকক্ষ পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় নাই, এবং ইহার শেষ ভাগের আখ্যায়িকাগুলি বাহা ইনি রূপ, সনাতন, রঘুনাথ প্রভৃতি সাধুগণের মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন, তাহা নিতুল। গ্রন্থের একমাত্র পাণ্ডুলিপি অপহৃত হওয়ায় তিনি শোকে প্রাণত্যাগ করেন। তৈল ছুরাইয়া আসিয়াছিল, তথাপি যেন আপটা বাতাসে দীপ নিবিয়া গেল। কৃষ্ণদাস অনেক ঐতিহাসিক তথ্য লিখিয়াছেন, তাঁহার দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুদের কথা কহিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর গোড়ামি-জনিত নিষেধ-বিধি মানিয়া পিতা-মাতার নাম পর্য্যন্ত লিখেন নাই। তাঁহার পিতার নাম ছিল ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্রামদাস।

চৈতন্য-চরিতামৃতের পূর্বে মুরারি গুপ্ত সংস্কৃতে “চৈতন্যচরিতম্” কাব্য রচনা করেন, ইহাতে অনেক অলৌকিক কথা লিপিবদ্ধ আছে—ভাবা সহজ ও কবিত্বপূর্ণ। কবিকর্ণ-পূর্ণ (শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ) এই সময়ে তাঁহার চৈতন্যের জীবনী সংস্কৃতে রচনা করেন—কিন্তু তাঁহার চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকই (সংস্কৃত) সর্বাশ্রেষ্ঠ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। চৈতন্যের তিরোধানে মহারাজ প্রতাপরুদ্র বিরূপ শোকাবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার একটি করুণ-রসাত্মক চিত্র মুখবন্ধ করিয়া কবি নাটকখানি আরম্ভ করিয়াছিলেন। করচা-লেখক গোবিন্দদাস দুই বৎসরের চৈতন্য-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পদ্যর ছন্দে লিপিবদ্ধ করেন। চৈতন্যের

জীবন-সম্বন্ধে এরূপ ঐতিহাসিক ও চিত্তাকর্ষক পুস্তক আর নাই। চৈতন্যভাগবত শ্রীবাসের ভ্রাতৃপুত্রী নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন দাসের রচিত। ইহা একখানি সর্বজন-সমাদৃত গ্রন্থ। চৈতন্যের জীবন-সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা ইহাতে থাকিলেও পারিপার্শ্বিক ও তাৎকালিক ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা হেতু ইহার গুরুত্ব খুব বেশী। চৈতন্যের সমকালবর্তী জ্ঞানানন্দেন্দ্র চৈতন্যমঙ্গলেও অলৌকিক কথা এবং ঐতিহাসিক তথ্য উভয়ের সংমিশ্রণ আছে। কোগ্রাম-নিবাসী নরহরি-শিষ্য লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল কবিত্বের নির্ঝর-স্বরূপ, কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অল্প।

রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধবে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। রূপ প্রথমতঃ একই পুস্তকে এই দুই নাটকের বিষয় লিখিতে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্য-প্রভুর উপদেশে মথুরার ঐশ্বর্যময়ী লীলা ও বৃন্দাবনের মাধুর্য্যপূর্ণ কথা স্বতন্ত্র করিয়া কবি দুইটি নাটক লিখিয়াছেন। মধ্যযুগের সংস্কৃত-সাহিত্যে এই দুই নাটকের স্থান খুব উচ্চ। রূপের 'উজ্জল-নীলমণি' বৈষ্ণব অলঙ্কারশাস্ত্রের চূড়ান্ত গ্রন্থ। সনাতনের 'হরিভক্তিবিলাস' চৈতন্যের উপদেশ-ভিত্তির উপর পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই গ্রন্থ বৈষ্ণব-সমাজের পরিচালক একমাত্র স্বতন্ত্রগ্রন্থ। রূপ ও সনাতনের ভ্রাতৃপুত্র জীব গোস্বামীর 'মৃৎসনর্ভ' গোড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ। এই সকল এবং ইহা ছাড়া সংস্কৃত বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ—বাহা বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনে বসিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ নরহরিকৃত 'ভক্তিরত্নাকর' এবং আমার Medieval Vaishnava Literature of Bengal নামক পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

এই সকল পুস্তক ছাড়া সপ্তদশ শতকের শেষভাগে পূর্বোক্ত নরহরি চক্রবর্তিকৃত 'ভক্তিরত্নাকর' ও নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' দুইখানি অমূল্য ঐতিহাসিক পুস্তক। ইহাতে তাৎকালিক বৈষ্ণব-সমাজের বধাবধ চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকরের সম্মীত-বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় অধ্যায়টি উক্ত শাস্ত্রের একটি মূল্যবান সম্পদ। চৈতন্যচরিতামৃত ছাড়া প্রাচীন বাঙ্গলায় ইহার মত পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক আর নাই। হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈত-চরিত', ঈশান নাগরেন্দ্রের 'অদ্বৈতপ্রকাশ', নরহরির 'নরোত্তম-বিলাস', লোকনাথের 'সীতা-চরিত' প্রভৃতি অসংখ্য পুস্তক সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম সময়ের মধ্যে লিখিত হয়। বৈষ্ণব মহাজনগণের পদ-সংগ্রহ অনেকগুলি আছে—তন্মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লিখিত বৈষ্ণবদাস (গোকুলানন্দ সেন, মুর্সিদাবাদ টেঁরা-নিবাসী)-কৃত 'পদকরত্ন' সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তৎপূর্বে ঈনিবাস আচার্য্য প্রভুর পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত-সমুদ্র নামক গ্রন্থে অনেক বাঙ্গলা পদ সংগ্রহ করিয়া তাহার টীকা সংস্কৃতে করিয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগ-অবসানে "ভাষায়" লিখিত পুস্তকের এতাদৃশ সমাদর আর কেহ দেন নাই। নরহরি চক্রবর্তী স্বয়ং সংস্কৃতে কৃতবিদ্য পণ্ডিত হইয়াও তাহার ভক্তিরত্নাকরে সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে বাঙ্গলা গ্রন্থের শ্লোকও প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। বৈষ্ণবের

মাথুর গান, একদিকে নিমাই-সন্ন্যাসের দ্বারা কারুণ্যে ভরপুর হইয়াছে, অপরদিকে বঙ্গের তাৎকালিক ইতিহাস সেই বিয়োগান্ত দৃষ্টের উপাদান জোগাইয়াছে।

মুসলমানগণ আসিয়া দেবমন্দির ও দেববিগ্রহ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। রাজসাহী জেলায় ক্ষন্দগুপ্তের মহিষী যে দেবমন্দিরগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাম্রশাসনের কবি লিখিয়াছেন, তাহারা কারুকার্যে জগতে অদ্বিতীয় ছিল, এইরূপ শত শত মন্দির শুধু স্থাপত্য-শিল্প হিসাবে নহে অল্প হিসাবেও বড় ছিল। ইহাদের আঙ্গিনায় যে কীর্তন-গান

মাথুর গান।

হইত, প্রত্যহ যে রাজ-ভোগ হইত, রাজা ও প্রজা একত্র হইয়া ভক্তির যে লীলা প্রকটিত করিতেন, যে সকল পর্কত-প্রমাণ কুসুমস্তবকের স্তূপ প্রত্যহ দেব-সেবার জন্য আহুত হইত এবং বিগ্রহের অঙ্গরাগের জন্য যে বিপুল সস্তার সমানীত হইত, শত শত ভক্তিপ্রেম ও ত্যাগের স্মৃতিজড়িত, হিন্দুর ধর্ম ও সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায় যে সকল মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া নিত্য সমাহিত হইত, সেই সকল মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, বিগ্রহ-প্রস্তর রেণুতে পরিণত হইয়া ধূলির সঙ্গে মিশিয়া গেল—হিন্দুর প্রাণাধিক প্রিয় এই মন্দিরগুলির চিতা-শয্যায় দাড়াইয়া কবি যখন গাহিলেন, “কুসুম তাজিয়া অলি, মহীতলে লুঠত,—কোকিলা না করতহি গান,—সোহি যমুনা-জল, অনল সমান ভেল—বাঁশীস্বরে না বহে উজান, সখাগণ, ধেমুগণ,—বেগুরব বিসরণ”—তখন ঐতিহাসিক দৃষ্ট অধ্যাস্ত সম্পদের অঙ্গীয় হইল এবং “মাথুর”-শ্রোতার করণ সুরে আঁটা হৃদয়তন্ত্রীতে বারবার ঘা দিতে লাগিল। বৈষ্ণবদের এই “মাথুরে”র পালা—মর্শাস্তিক পরিদেবনার সুর।

এই মাথুরের মত করণ গান এদেশে আর কিছু হয় নাই—ইহা জাতীয় গৌরব। কবির তীব্র ব্যাধার সুরে একদিকে কৃষ্ণ-ভক্তির বজ্রা, অপরদিকে রাজকীয় ঐশ্বর্যের বিলোপ-জনিত—মর্শাস্তিক বিলাপ।

কত বীর, কত বিক্রান্ত রাজাধিরাজের শ্মশান এই বঙ্গভূমি; এখানে লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোম যখন “খাসা যখমলী” পাছকা পায়, শিরে রণটোপ স্বেচল গায়। ঘন গোঁফে চাড়া, ঘুরায় আঁখি” এই মূর্তিতে সৈন্তগণের পুরোভাগে রণক্ষেত্রে অভিযান করিতেন,—তখন শ্রামরূপা দেবীর অভয়-দানে চির-নিশ্চিন্ত ইচ্ছাই ঘোষেরও বক্ষ কম্পিত হইত, এখানে “সেনার প্রধান চলে গীতারাম ভূঞা, যার ভরে প্রমত্ত কুঞ্জর পড়ে হুঞা,” প্রভৃতি দৃষ্ট সচরাচর দেখা যাইত এবং যখন রায়বেশেগণ তাণ্ডব করিতে করিতে সৈন্তগণের অগ্রভাগে যাইতে থাকিত, তখন বঙ্গের পৌণ্ড্র বাহুদেবের বিদ্রুত অভিযান ও সমুদ্রগুপ্ত, ধর্মপাল প্রভৃতি সম্রাটগণের দ্বিধিজয়-যাত্রার কথা মনে হইত। এখানে প্রতাপাদিত্যের নিকট যখন মানসিংহের দূত আসিয়া বেড়ী (শূঁচল) ও তরবারি রাখিয়া জানাইল, “এক হয় বেড়ী (অধীনত্বসূচক) রাখুন, তরবারি ফিরাইয়া দিন, নতুবা যদি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা থাকে—তবে শুধু তরবারিটি রাখুন।” প্রতাপাদিত্য বেড়ী ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, এই বেড়ী লইয়া যাও, “বেড়ী দিও আপনার মনিবের পায়ে।” আর “আমি শুধু মানসিংহকে জয় করিয়া ক্ষান্ত হইব না, আগায় দিল্লীখরকে পরাস্ত ও নিধন

করিয়া শত্রুরক্ত-রঞ্জিত অসি যমুনার জলে ধোত করিব।” “যমুনার জলে ধোব এই তরবারে।” কোথায় গেল সেই সীতারাম রায়, যিনি মগ ও মুসলমানের অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন? কোথায় গেল “মেনাহাতী,” ছলনাপূর্ব্বক যাহার মস্তক কর্তন করিয়া শত্রুরা নবাবের নিকট উপস্থিত হইলে নবাব বিশ্বয়-সহকারে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, “মাতুষের এতবড় মাথা আমি দেখি নাই, এই বীরকে ধরিয়া আনিতে পারিলে না? কি ছর্ভাগ্য যে এমন লোকটাকে ছলপূর্ব্বক বধ করিয়া মাথাটা লইয়া আসিয়াছে।” (৮৪৯ পৃঃ) দোড়শ ও মগদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলা দেশে এই যে বীরত্ব ও জয়পরাজয়ের লীলাখেলা হইয়াছে, তাহা সেই যুগের বাঙ্গলাসাহিত্যে স্বীয় প্রভাব অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। শুধু ‘মাথুরে’ নহে, বঙ্গসাহিত্যের অপরাপর বিভাগেও সেই জাতীয় হুঃখের স্মৃতি বাজিয়া উঠিয়াছিল।

কত বীর, কত রাজা যে এই দেশে যুদ্ধে হত হইয়াছেন, তাহার অবধি নাই। কত স্বর্ণচূড়, উজ্জলদীপ-শোভিত রাজ-প্রাসাদ, কত নগর-শোভা বিপণী ও প্রমোদ-উজ্জান নৈশ স্বপ্নের ছায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। এদেশের যে ধূলিকণায় পা দেওয়া যায়, তাহাই ভক্তির অশ্রু-মাথা বিগত পৌরবের শেষ রেণু। কৃত্তিবাস বখন লিখিলেন, “লঙ্কার আসিয়া দেখে ছিন্নভিন্ন সব। নাহিক সে নৃত্যগীত নাহিক উৎসব”—তখন শ্রোতার মনে কত শত ক্ষুদ্র বিলুপ্ত লঙ্কার স্মৃতি উদ্ভিত হওয়ার তাঁহার অশ্রুমাথা দীর্ঘশ্বাস কবির লেখা সার্থক ও বাস্তবিক করুণাপূর্ণ করিত। কাশীদাস বখন লিখিলেন, “অষ্টাদশ অকোহিণী যার সঙ্গে যায়। হেন হর্যোধন রাজা ধূলায় লুটায়” তখন কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হর্যোধনের স্মৃতিমণ্ডিত করুণ কথা পাঠকের মনে হইত। বঙ্গীয় কবিগণ সংস্কৃতেরই অনুবাদ করুন, কি কোন নূতন বিষয়েরই অবতারণা করুন, তাঁহারা তাহাদের কাহিনী ঘরে আনিয়া বাঙ্গলার ছাঁচে পুনরায় ঢালাই করিয়া লইয়াছেন, এইজন্ত বঙ্গের প্রাচীন কাব্যগুলি বাঙ্গালীর এত প্রিয় সামগ্রী। মুকুন্দরাম-সম্বন্ধে Cowell সাহেব বাহা বলিয়াছেন, বঙ্গীয় সমস্ত কবি সম্বন্ধেই অল্প বেশী পরিমাণে তাহা খাটে—“কবি স্বর্গের কথাই বলুন বা মর্ত্ত্যের কথাই বলুন, তিনি সর্ব্বত্রই নিজ গ্রাম ও সমাজের দৃষ্ট আঁকিয়াছেন।” এই ঘরে আনিয়া নিজের প্রাণের রসের ভিধান দিয়া কথাগুলি সরস ও জীবন্ত করার রীতিটা বাঙ্গালী প্রাচীন কবিদের বৈশিষ্ট্য। এইজন্ত মুকুন্দরাম পশু-জগৎ ও উদ্ভিদ-জগৎ বর্ণনা করিবার সময়েও চমৎকার কৌশলের সঙ্গে বাঙ্গালীগৃহের স্থখ-দুঃখের চিত্র উদ্ঘাটন করিয়াছেন—“বনে থাকি বনে খাই, জাতিতে ভালুক। নেউগী চোখুরী নহি না রাখি তালুক।” হস্তী বলিতেছে, “বড় নাম, বড় গ্রাম, বড় কলেবর। লুকাইতে স্থান নাই বীরের গোচর॥” এই সকল কথার ইঙ্গিত অতি স্পষ্ট।

কত বিয়োগান্ত নাটকের সার নিংড়াইয়া যে ‘মাথুর’ গান রচিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। কুমারস্বামী লিখিয়াছেন,—“যে বাণী শতসহস্র লোকের মর্ম্মের সংবাদ দেয়, তাহাই প্রকৃত কাব্য”—এই সকল গানে বাঙ্গালীর হৃদয় সর্ব্বত্র সাড়া দিয়াছে, এজন্ত মাথুরের করুণা, রামায়ণ-মহাভারতের বঙ্গীয় অনুবাদের সুর, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের যুদ্ধ-দৃষ্টান্তগুলি দেশময় ভাবের

বহু আনন্দন করিয়াছিল। “গলার কবচ মোর, শিকাদার ধর ধর, দিও মোর বেখানে জননী। নিশান অম্বরী লয়ে, ময়ূরার হাতে দিয়ে, ক’য়ো তুমি হ’লে অনাধিনী, শুকার সূৰ্য্য ছড়া, বাপেরও ঢাল খাড়া, সব দিয়া সমাচার ব’লো। রণে অকাতর হ’য়ে, শত্রুর সৎহারিয়ে, সম্মুখসমরে শাকা মলো” (ধর্মমঙ্গল) মৃত্যুকালে মহাবীর শাকার এই উক্তির সঙ্গে মাথুরের “ললিতা লহ কঙ্কণ, বিশাখা লহ অম্বরী, চিত্রা লহ নীলমণি চুড়ি” ইত্যাদি পদ মিলাইয়া পড়ুন; বাঙ্গালীর রণক্ষেত্র ও কামকুঞ্জ একযোগে একই বিরোগাস্ত দৃষ্ণের অবতারণা করিয়াছিল—এই জন্ত বঙ্গ-সাহিত্যময় সর্বত্র একই সুরের সাড়া পাইতেছি। জয়দেবের কবিতা ধরে ধরে আনন্দময়ের যে আনন্দ-লীলার বার্তা ঘোষণা করিয়াছিল, সেই বার্তার উপসংহার পরবর্তী মাথুর গীতে। বিজয়সেনের প্রহ্মেশ্বরের মন্দিরের নিকটবর্তী প্রমোদ-উজানে অভিসারিকাগণ মুখর নুপুর ত্যাগ করিয়া নীলাম্বরী ও মেঘডুপুর শাড়ী আধার রাত্রির সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া “বাধি তাপুল আঁচলে”—যে লীলা করিয়াছিলেন, জয়দেবের চক্ষে ছিল সেই দৃশ্য, কিন্তু পরবর্তী কবিগণের শ্রেষ্ঠ নায়িকার নিরাভরণা যোগিনীর বেশ—তিনি উপবাস-ক্লিষ্টা, গেকরা-পরিহিতা—“বিরতি আহারে—রাজা বাস পরে—যেমন যোগিনী পারা।” ক্লম্বিরহে তিনি সর্বস্বত্যাগিনী—“শয্য করহ চুর, ভূষণ করহ দূর, তোড়হি গজমোতি হাররে”—“সীধাক সিন্দূর—মুছিয়া করহ দূর।” এই সর্বস্বত্যাগিনীর নিরাভরণ রূপ তখন বঙ্গের আকাশে বাতাসে খেলিতেছিল। তখন উৎকৃষ্ট কটিপ্রস্তর-নির্মিত চন্দন-চর্চিত নীলকলেবর অতুলনীয় জামরূপ, বিদম্বাদের হাতের নির্মম আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ;—তখন ভক্ত সাশ্রুচক্ষু উজ্জ্বল তুলিয়া নব-মেঘে, স্বীয় বিপুল কুন্তলরাশিতে এবং ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠে সেই কালো রূপ আবিষ্কার পূর্বক ধ্যানস্থ হইলেন—তখন “আকুল নয়নে চাহে মেঘ পানে কি কহে হুহাত তুলে, এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথুনী দেখয়ে থসায় চূলে।” এবং “এক দিগ্ধি করি, ময়ূর ময়ূরী কণ্ঠ করে নিরক্ষণে।”

শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহধ্বংসের পর বৈষ্ণব কবি—মাথুরলীলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজলীলার সম্পূর্ণ পার্থক্য ধারণা করিতে পারিলেন। ভারতের অল্প কোন জাতি জড় ও অধ্যাত্মরাজ্যের পার্থক্য এতটা বুঝিতে পারে নাই। হীরামণির ডাঙার ও মথুরার অতুল ঐশ্বর্যকে দূরে ফেলিয়া কাম্বাল ভক্ত ব্রজের একটু ধূলিকণার প্রার্থী হইলেন; মথুরার সমস্ত শক্তি অপেক্ষা যে প্রেমের শক্তি সহস্রগুণে বড়—মাথুরে তাহাই প্রতিপন্ন হইল। এইভাবে বাঙ্গালী জড়-সম্পদের বিরোগে অধ্যাত্ম-রাজ্যের প্রজ্ঞা হইলেন ও ভক্তির স্বল্প-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

প্রাচীন যুগের শেষ অধ্যায়

বহু সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে বাঙ্গালার শব্দ-সম্পদ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। কাশীরাম দাসের মহাভারতে এই সম্পদ বিশেষরূপে পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু মুসলমান কবি আবুলোশ্বাল সংস্কৃত যে পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন, পরবর্তী কবি ভারতচন্দ্র ভিন্ন এতটা পাণ্ডিত্য আর কেহ দেখান

নাই। ইনি ফতেয়াবাদ (আধুনিক ফরিদপুর ও তন্নিকটবর্তী কয়েকটি স্থান লইয়া ফতেয়াবাদ পরগনা গঠিত হইয়াছিল) মুল্লকের অধিবাসী। জাহাঙ্গীরের সময়ে ইহার জন্ম হয়। ইনি আরাকানে যাইবার পথে জাহাঙ্গে জলদস্যুগণ দ্বারা আক্রান্ত হন—কোনও ক্রমে ইহার জীবন রক্ষা হয়—কিন্তু ইহার পিতা সমসের কুতুব যুদ্ধ করিতে করিতে দস্যুদের দ্বারা নিহত হন। আরাকানে ইনি মাগন ঠাকুর নামক এক রাজপুরুষের অশ্রুগ্রহ লাভ করিয়া পদ্মাবৎ কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। সূজা বাদশাহের সঙ্গে এই সময়ে আরাকান-রাজের মনোমালিঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং আলোয়াল সূজার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন,—সূজা নামক এক ব্যক্তির মিথ্যা সাক্ষ্যে এই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়াতে কবি সাতবৎসর কারাভোগ করেন। এই ঘটনা ১৬৫৭-৫৮ বর্ষাব্দে ঘটিয়াছিল। কারাগার হইতে বাহির হইয়া বৃদ্ধ বয়সে ইনি ছয়ফুল বদিউজ্জামাল প্রভৃতি আরও কয়েকখানি কাব্য রচনা করেন। কিন্তু পদ্মাবৎই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে শুধু তাঁহার প্রগাঢ় সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণের জ্ঞান প্রদর্শিত হয় নাই, প্রত্যেকটি হিন্দু পূজা-পার্বণ, আয়ুর্ষেদ ও জ্যোতিষশাস্ত্রে অসামান্য অধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোকও রচনা করিয়া পদ্মাবৎ কাব্যের কোন কোন অধ্যায়ে সন্নিবেশ করিয়াছেন। ইহার অনেক কবিতায় গীত-গোবিন্দের ছন্দ ও শব্দ-স্বাক্ষর বাঙ্গলা ভাষার অমূল্য হইয়াছে। এই কাব্যের বিষয় চিতোরের ইতিহাস-বিশ্রুত রাজার উপাখ্যানটি। ১৫১৯ খৃঃ অব্দে মীর মালিক মহম্মদ বোশী পদ্মাবৎ হিন্দীতে রচনা করিয়াছিলেন—আলোয়ালের কাব্য তাহারই পঞ্জাম্বাদ। কিন্তু বাঙ্গলার কবি এই পুস্তকে এত মৌলিক বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন যে আসলটি ভাল হইয়াছে কিংবা নকলটি ভাল হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ হওয়া অসম্ভব নহে।

এই প্রসঙ্গে মুসলমান কবিগণের সম্বন্ধে আমাদের একটি কথা বক্তব্য আছে। মুসলমান নৃপতিগণের অশ্রুগ্রহে রাজসভায় বাঙ্গলা ভাষার অমূল্য সর্বপ্রথম সুবাস্তাস বহিয়াছিল। বাঙ্গলায় অনেক মুসলমান কবি বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানী বাঙ্গলা পুস্তকের সীমা-সংখ্যা নাই, তাহারা এত বেশী যে তৎসম্বন্ধে একখানি বড় ইতিহাস লেখা চলে। এই সকল পুস্তকের কতকগুলিতে উর্দুর প্রভাব এত অধিক যে তাহা বাঙ্গলা-সাহিত্যের অন্তর্গত করা চলে না, অপরগুলি খাঁটি বাঙ্গলা। নগর ও সহরের সংশ্লিষ্ট-বর্জিত বহু দূর পল্লীতে হিন্দু ও বৌদ্ধগণ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার পরেও রূপকথা, গীতিকথা ও পল্লীগাথার প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় অশ্রুগ্রহ বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও এক সুবিস্তৃত সাহিত্য বাঙ্গলার পল্লীতে পড়িয়া আছে—তাহাতে দৃষ্ট হইবে বাঙ্গলা দেশের রূপকথাগুলির অধিকাংশ মুসলমানেরাই রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। নব-ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে হিন্দুসমাজে তাহা অধিকাংশস্থলে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই সকল গীতিকথা ও রূপকথা প্রভৃতিতে এই দেশের প্রাচীন ইতিহাসের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। “মল্লিকার পুণি” নামক একখানি কাব্যে মুসলমানগণ কিরূপে হিন্দু রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতেন, অতি সুন্দর বাঙ্গলায় তাহা বর্ণিত আছে, উহার আখ্যান-বস্তুর মধ্যে অনেক কথাই ঐতিহাসিকেরা অগ্রাহ্য করিবেন, সন্দেহ নাই—কিন্তু তথাপি হিন্দু-

মুসলমান-সংঘর্ষের যে কৌতুকবহু চিত্র এই কাব্যে প্রদত্ত হইয়াছে—তাহাতে এই দুই সমাজের কতকটা খাঁটি কথা আমরা জানিতে পারি। এইরূপ অনেক কাব্য আমরা দেখিয়াছি। আমার Folk Literature of Bengal নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে কতকটা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। সহজিয়াদের পুঁথির সংখ্যা নাই—তাহা এক সমুদ্র-বিশেষ। এই সহজিয়া পুঁথিগুলির কতক কতক সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত এবং অনেকগুলির মধ্যেই উক্ত সম্প্রদায়ের সাংকেতিক শব্দ আছে, বাহিরের লোকের পক্ষে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বলে আমার বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩৪-৫০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত লালশশীর গানের উল্লেখ করিতে পারি, এই সকল গানের ভাষা অতি সহজ বাঙ্গলা, কিন্তু ইহাদের ভাব এত জটিল যে আমরা মাথা খুঁড়িয়া অনেকগুলির কোন অর্থ করিতে পারি নাই। সহজিয়া-সাহিত্য বাঙ্গলার জনসাধারণের নিজস্ব। এই সাহিত্যে হিন্দু দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন এবং মুসলমান সুফী সম্প্রদায়ের মত ও তাহাদের আনুষ্ঠানিক সাধনা—সহজ ভাষায় কিন্তু অতি জটিল ভাবের সঙ্কেতের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। এই সুপ্রসার সাহিত্যের বিস্তৃতি ও সংখ্যা-বাহুল্যদৃষ্টে মনে হয়—বৌদ্ধগণ প্রস্থানের পথে এই প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কারের অবশেষ এতদ্দেশে রাখিয়া গিয়াছিলেন; আউল, বাউল, ফকির প্রভৃতি বিভিন্ন নামধারী সম্প্রদায়-গুলির অনেকেই বৈষ্ণব-মোড়কে আঁটিয়া সেই বৌদ্ধ-যুগের কথাগুলি এখনও এদেশে চালাইতেছেন। এই অক্ষয় বটের বংশ ধ্বংস হইবার নহে, যুগ-যুগ ধরিয়া ইহা এদেশের ভূমিতে শিকড় গাড়িয়াছে, বৈষ্ণবেরা ইহা তুলিয়া ফেলিয়া নিজেদের ভগবদ্-ভক্তির উন্মাদনার ফুল গাছ রোপণ করিতে পারেন নাই, বরঞ্চ ইহাদের সাধনপ্রণালী গুরুবাদ, পরকীয়া, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় এই অরণ্যের আশে পাশে আজ ১১/১২ বৎসর বাবৎ ঘুরিয়াও খেঁই পাইতেছেন না। চারুদর্শন নামক পুস্তকে লেখক স্বর্গীয় পার্শ্বতীচরণ কবিশেখর মহাশয় খানিকটা তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি এই সম্প্রদায়ের প্রতি অতি বিক্রপ, স্মরণ্য তাঁহার আলেখ্য কতকটা বিবর্ণ হইয়াছে। আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে ৭৬৯-৮২ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছি।

এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে বর্তমান বঙ্গদেশীয় মুসলমান সমাজের নিম্ন শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে গৃহীত, স্মরণ্য ইহাদের কতক শ্রেণীর মধ্যে বৌদ্ধসাধনার প্রভাব খুব বেশী। বৌদ্ধভাবাপন্নসুফী সম্প্রদায়ের মত দীর্বে দীর্বে বাঙ্গলার পল্লীভবনকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। মুসলমান ফকিরেরা পল্লীবাসীদিগের মধ্যে সুফীদিগের মত চালাইতেছেন। হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া সেই ফকিরদের শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে—স্মরণ্য আমরা যে ক্ষুদ্র একদল শিক্ষাভিমানী হইয়া বাঙ্গলা ভাষাটার উপর কর্তৃত্ব ও মুরব্বীমানার চাল চালাইতেছি, তাহা শুধু ভাষার উপকার স্তরটি স্পর্শ করিয়াছে। বিদেশী প্রভাবের দরুন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাহিত্য, ঠিক দেশজ উপকরণে নিষ্প্রিত হয় নাই। কিন্তু অবজ্ঞাত কোটী কোটী নরনারীর মধ্যে যে শিক্ষা এখনও প্রচারিত হইতেছে—পাগলা কানাই প্রভৃতি খাঁটি জন-নেতারা যাহা দেশময় চালাইয়াছেন—আমাদের অগোচরে যে সাহিত্য বাঙ্গলার

কুটির গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহার বিবরণ আমরা কিছুই রাখি না। কিন্তু এই মুসলমান ফকিরদের মুরসেদী এবং দেহতত্ত্ব-বিষয়ক গান যাহা বঙ্গের পল্লীগুলির হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে,—তাহা তুর্কিস্থান, আরব, আফগানীস্থান ও পারস্য হইতে আসে নাই। তাহা খাঁটি দেশজ সামগ্রী ও বৌদ্ধ-বান্দলার নিজস্ব। উহা বৌদ্ধ-জগতের কথা,—দেহতত্ত্বের কথা। পরকীয়া প্রভৃতি মত খাঁটি মুসলমান ধর্মের শিক্ষা নহে। বৌদ্ধগণ ইসলাম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ-সংস্কার ছাড়িতে পারেন নাই, শত শত বাউল ও ফকিরের দেহতত্ত্ব-বিষয়ক গানে তাহা আত্মপ্রকাশ করিতেছে, ইহাদের সংখ্যা নাই। বান্দলার ছ'চার জন বাদসাহ ও আদীরের নাম করিলেই হইবে না, সৈয়দ মর্ত্তুজা, আলোয়াল প্রভৃতি কয়েকজন কবির নামই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নহে, এমন কি কয়েকজন সুবিখ্যাত পল্লীগাথা-রচকদিগের কাহিনী শুনাইলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হইবে না। শত শত বাউল-ফকিরের গান, শত শত কেছা, বাহা মুসলমান ও হিন্দুর ঘরে ঘরে এখনও দূর পল্লীতে কথিত হইয়া থাকে, সহজিয়া-সাহিত্যের এক বিপুল অংশ ও মুসলমান বহালয়ের দ্বারা প্রকাশিত বহু বান্দলা পুঁথি, জারি-গান, তরঙ্গ-গান প্রভৃতির সন্ধান লইতে হইবে; এমন কি বাউলদের নৃত্য কি পরিমাণে পাঠান-নৃত্যের নিকট নবী তাহারও খোজ লইতে হইবে। আমার বিশ্বাস এই অল্পসন্ধান সুনিরূপিত হইলে অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হইবে যে বান্দলা ভাষার ঐশ্বর্য্যগঠনে মুসলমানের হাত তিলমাত্রও কম নহে, বরঞ্চ দূর পূর্বাঞ্চলের পল্লীতে সে প্রভাব আরও বেশী। মাত্র কয়েকজন মুসলমান 'উর্দু' 'উর্দু' বলিয়া বক্তৃতা করিয়া তাঁহাদের মাতৃভাষার দাবী ত্যাগিয়া ফেলিতে পারিবেন না। মাতৃভাষার সঙ্গে যাহা শিথিয়াছেন, যাহা যুগ-যুগ ধরিয়া তাঁহাদের সমাজে বদ্ধমূল, তাহার প্রভাব তাঁহারা এড়াইবেন কিরূপে ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎপরবর্তী যুগে বান্দলা-সাহিত্যের অবস্থা

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বান্দলার হিন্দুসমাজের কর্তা ছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নদীয়া-সমাজ সমস্ত বান্দালী হিন্দুদের ধর্মকর্ম ও রুচি পরিচালনা করিতেন। পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরে প্রতিবৎসা রাজবল্লভ সর্কবিষয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। রাজবল্লভ ঢাকার সহকারী শাসনকর্তা (Deputy governor) ছিলেন, এবং মুর্সিদাবাদেও ঘেসেটি বেগমের অগ্রগৃহে আলিবর্দী খাঁর সময়ে তাঁহার প্রভাব খুব বেশী ছিল। জায়পূরক হউক কিংবা অজায় করিয়া হউক, রাজবল্লভ স্বীয় প্রতিষ্ঠিত রাজধানী রাজনগরে কুবেরের ঐশ্বর্য্য

সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইহাকে কতকটা ভয়ের চক্ষে দেখিতেন, প্রথমতঃ নবাব দরবারে রাজবল্লভের প্রতিপত্তির দরুন তাঁহাকে রাজাদের খাতির করিতেই হইত, বিশেষ দেউলিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজবল্লভের হাতে 'রাখি' বাধিয়া দক্ষিণাস্বরূপ পূর্ণকৃত ঋণ কয়েক লক্ষ টাকা হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। প্রকৃতভাবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজবল্লভের বিরুদ্ধাচারী হইতে সাহসী হইতেন না। 'ক্ষিতীশবংশাবলী'তে দৃষ্ট হয়, রাজা রাজবল্লভ কান্দী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় হইতে পণ্ডিতগণ আনাইয়া বৈষ্ণবদিগের উপবীত-গ্রহণের বিষয়ে চেষ্টা করিলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভিতরে ভিতরে এই কার্য পণ্ড করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কোন বৈষ্ণবে তিনি উপবীত গলায় দিয়া তাঁহার রাজসভায় যাইতে দিতেন না। রাজবল্লভ বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের জন্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু রাজনীতি-চতুর কৃষ্ণচন্দ্রের কৌশলে সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া যায়। মহারাজ রাজবল্লভ তৎস্থাপিত রাজনগরের রাজধানী যে অপূর্ণ গৌরব-মণ্ডিত করিয়াছিলেন তাহার কারুকার্য দেখিবার জন্ত বহু ভূপৰ্য্যটক রাজনগরে আসিয়া ছবি আঁকিয়া লইয়া যাইতেন। তাহার দেখাদেখি নবদ্বীপরাজ 'শিবনিবাস' নির্মাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজবল্লভের বৈভব তাঁহার ছিল না, সুতরাং সেই সমকক্ষতার চেষ্টা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল নির্মাণ করিয়া তাজমহলের যশোলোপ করিবার চেষ্টার মত বিফল হইল। কিন্তু এক বিষয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার সমকক্ষতা রাজবল্লভ করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণচন্দ্র বহু পণ্ডিতমণ্ডলীকে তাঁহার দরবারে পাইয়াছিলেন, রাজবল্লভ যদিও পণ্ডিতগণকে অকুণ্ঠিত হস্তে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তথাপি হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্কভোম, প্রাণনাথ ঞ্জায়-পঞ্চানন এবং শিবরাম বাচস্পতি প্রভৃতির ঞ্জায় সার্কভোম পণ্ডিত তাঁহার সভায় ছিলেন কিনা সন্দেহহীন। এদিকে কৃষ্ণনগরের রাজকবি ভারতচন্দ্র ও রাজানুগ্রহ-প্রাপ্ত রামপ্রসাদ বঙ্গদেশের প্রাণ অধিকার করিয়াছিলেন। রাজনগরের রাজকবি জয়নারায়ণ ও আনন্দময়ী প্রতিভাপন্ন হইলেও অবশ্য পূর্ণোক্ত দুই কবির সমকক্ষতা করিতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্র বায়ের আদিনিবাস ছিল পৈঁড়ো বসন্তপুর গ্রাম।

ভারতচন্দ্র। বর্ধমানের রাজার অত্যাচারে এই পরিবার সর্বস্বান্ত হন।

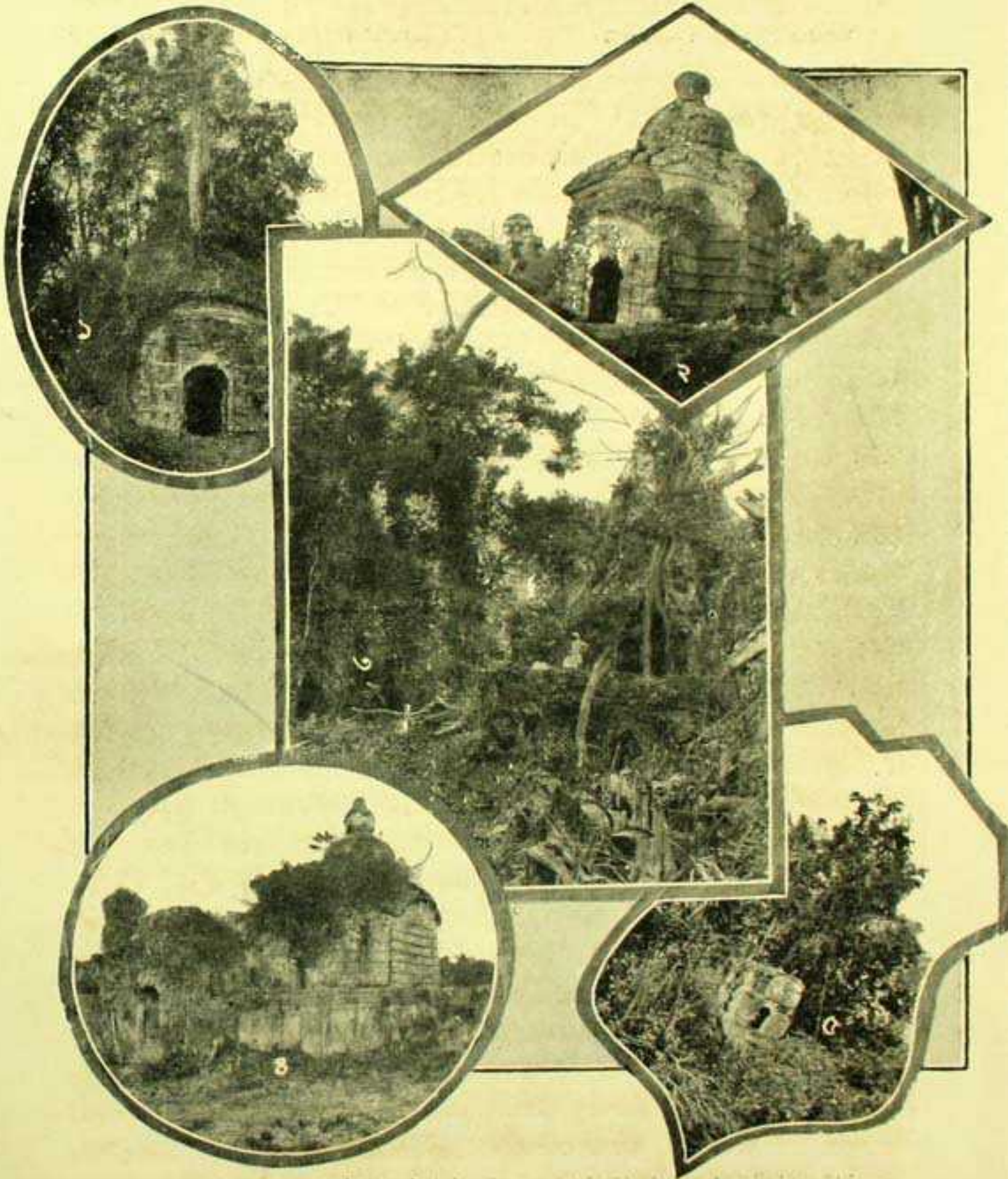
ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষগণ ভূরস্ট পরগনার রাজা ছিলেন। এদিকে তিনি কেশবকুনী বংশের এক কস্তার পাণিগ্রহণ করিতে তাঁহাকে স্বগ্রহ হইতে তাড়িত হইতে হইয়াছিল। দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া তাঁহাকে উন্নতির দুরূহ পথে আরোহণ করিতে হইয়াছিল। সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গলার তাঁহার তুল্যামিকার ছিল, একথা তিনি অন্নদামঙ্গলে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। বিজ্ঞোৎসাহী এবং বিদ্বান্ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে ৪০০ টাকা বেতনে তাঁহার রাজসভার কবির পদে নিযুক্ত করেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্যে তাঁহার স্বগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। বিজ্ঞানসুন্দরের বিচার উপলক্ষে "আত্ম-তবে পূর্বপক্ষ হৃদয় করিল" ইত্যাদি কবিতায় তিনি তাঁহার ঞ্জায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রমাণ করিয়াছেন। তোটক, মন্দাকিনী, ভূজঙ্গপ্রয়াস প্রভৃতি ছন্দ তিনি বাঙ্গলায় যে ভাবে আনয়ন করিয়াছেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর সফলতার

পরিচায়ক। বাঙ্গলা শব্দের উচ্চারণে লঘুগুরু ভেদ নাই, তথাপি তৎপ্রবর্তিত ছন্দগুলি অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুগত হইয়াছে, কোথাও তিলপ্রমাণ ভুল হয় নাই। এই কবিত্ব অসাধারণ, কিন্তু ইহা ছাড়া তাঁহার আরও বাহ্যদ্রব্য আছে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ যে নিয়ম করেন নাই, তাহা—অর্থাৎ, পঙ্ক্তির চরণে মিল দেওয়ার রীতি—ভারতচন্দ্র বাঙ্গলায় প্রবর্তিত করিয়াছেন, তিনি কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছন্দোবদ্ধ কবিতাগুলিকে মিল দান করিয়াছেন। আর একটি প্রধান প্রশংসার বিষয় এই যে, এই সংস্কৃত ছন্দগুলির প্রবর্তন করিবার মধ্যে কবির কোনরূপ পরিশ্রমের চিহ্ন দেখা যায় না। স্বগায়কের কণ্ঠের গানের স্থায় এই ছন্দোবদ্ধ পদগুলি শ্রুতিমধুর ও একান্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বহু কবি ইহার পূর্বে সংস্কৃত শব্দ দ্বারা বাঙ্গলা কাব্যের শোভাবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের অনেকের চেষ্টায়ই কবিরা যে গলদবর্ষ হইয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু ভারতচন্দ্রের ভাষায় সংস্কৃত ও বাঙ্গলার অতি সহজ মিলন হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দগুলি যে ভিন্ন ভাষার, তাহা এই বাঙ্গলা কাব্য পড়িয়া মোটেই মনে হয় না। ইনি ভাষাসম্বন্ধে সংস্কৃত যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, কেহ ইহার কাব্যগুলিকে ‘ভাষার তাজমহল’ সংজ্ঞা দিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত ছন্দের অমুরোধে প্রাকৃত শব্দগুলিকে অনেক সময়ে সংস্কৃতায়ক করিয়াছেন—যথা “ছলছল কলকল টলটল তরঙ্গা।” প্রবাহ, নিকণ ও নির্মলতা—এই ত্রিগুণবোধক শব্দদ্বারা কবি একটি ছত্রে গঙ্গার বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে সংস্কৃতায়ক করিবার জন্ত তিনি বাঙ্গলা ‘ছলছল’, ‘কলকল’, ‘টলটল’ এই তিনটি শব্দকে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের রচনা কখনও কখনও এইভাবে বাঙ্গলা পদগুলিতে সংস্কৃতের মোহর অঙ্কিত করিয়া নবত্বী প্রদান করিয়াছে। বিজ্ঞার রূপবর্ণনা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে সংস্কৃতের দ্রুত তাঁহার মাথায় চাপিয়া গিয়াছিল, অলঙ্কারের দোরাখ্যে রচনা উদ্ভট হইয়াছে। অতিশয় ভাল করার চেষ্টা এইভাবে বিড়ম্বিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র কোন গৌরবাধিত চরিত্র, কোন করুণ মর্ম্মস্তদ ঘটনা, কোন মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী বর্ণনা করিতে পারেন নাই—কিন্তু ভাব-সম্পদে, সাধারণ কোন আখ্যায়িকা-বর্ণনে, পরিহাস-রসিকতায় তিনি প্রাচীন কবিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার অনেক কবিতা সহজ কথার একরূপ গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক যে তাহা বাঙ্গলায় প্রবাদ-বচনের স্থায় হইয়া আছে।

ভারতচন্দ্রের সমকালবর্তী রামপ্রসাদ। বিজ্ঞানন্দ-রচনায় রামপ্রসাদ ভারতের গুরু। ভারতের এমন কোন উচ্চভাব নাই, এমন কোন অলঙ্কার নাই, বাহা রামপ্রসাদ পূর্বে লিখেন নাই; কিন্তু ভাষার লালিত্যের দ্বারা ভারতের কাব্য রামপ্রসাদের

রামপ্রসাদ।

মৌলিকত্বকে একেবারে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছে। রামপ্রসাদ বৈষ্ণবদের ভাব চুরি করিয়া কঠোর শাস্ত্রধর্ম্মকে যে কোমলত্বী প্রদান করিয়াছেন, বাঙ্গলার শাস্ত্রধর্ম্মের এখন তাহাই বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাক্ষাৎ শক্তিরূপিনী দশভুজা বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পাশ, অঙ্গুষ্ঠ, খেটক, ধনু, অসি, চক্র, শূল প্রভৃতি আয়ুধ-ধারিণী হইয়াও বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি হইয়াছেন। বাহ্যের পদতলে সিংহ ও অশুর, জটাভূটে নাগিনী—সেই



মহারাজা দুর্গামাণিক্য ১৮০৮-২০ খৃঃ।

মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্য ১৮৩৮-৪০ খৃঃ।



মহারাজা অংশনমাণিক্য ১৮৫৫-৬২ খৃঃ।

মহারাজা রামগতমাণিক্য ১৮৫৫-১৮৫৮, পুনঃ ১৮৭১-৭৬ খৃঃ।

ভীষণ-দর্শন শক্তিমূর্তি বাঙ্গলার 'মা' হইয়া আছেন। এক সময়ে কবিচন্দ্র বাঙ্গালীর যুদ্ধকাণ্ডটাকে সংকীর্ণত্বের ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন, বাঙ্গলায় রামপ্রসাদ প্রভৃতি শাস্ত্র কবিগণ সেইরূপ শেলশূলধারিণী মহাশক্তিকে যশোদার মত জননী করিয়া তুলিয়াছেন। এই শক্তি এখানে উমা। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীদের মাতা শরৎকালের শেফালিকার স্থায় যে অশ্রুবর্ষণ করিতেন, বাঙ্গলার শারদীয় উৎসবে সেই মেহাতুরা জননীর মনের আকুলী ব্যাকুলী শত শত আগমনী গানে ব্যক্ত হইয়াছে। রামপ্রসাদের সুরে বাঙ্গলার লক্ষ লক্ষ বিপন্ন সন্তানের 'মা'-ডাক মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে—সমস্ত বাঙ্গলা দেশ তাঁহার গানে মাড়া দিয়াছে। রাজনৈতিক বিপ্লব ও ভুক্তিকাদি নানা বিপদে পড়িয়া বাঙ্গলা তখন নয়নজল দিয়া মাতাকে পূজা করিতে চাহিয়াছিল—রামপ্রসাদের গান সেই শত সহস্র বঙ্গসন্তানের নয়নজল—আকুল-কণ্ঠের 'মা'-ডাক।

রামপ্রসাদ হালিসহরে জন্মগ্রহণ করেন, কথিত আছে তিনি কলিকাতা সোনাগাছির দেওয়ান-বাড়ীতে মুহুরীগিরী করিতেন, কিন্তু হিসাবের খাতায় “দে মা আমায় তবিলদারী। আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী” প্রভৃতি গান টুকিয়া যাইতেন, দেওয়ান মহাশয় তাঁহার অসাধারণ শক্তি দেখিয়া তাঁহার মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহাকে চাকুরীর দায় হইতে নিষ্কৃতি দেন। তৎপরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে কতকটা জমি নিষ্কর দান করিয়া তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেন। ইহাও প্রবাদ যে সিরাজউদ্দৌলা রামপ্রসাদকে স্বীয় নৌকায় ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার মুখে মাতৃসংগীত শুনিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে কালীবিসর্জনের সময়ে ভাবের পাগল রামপ্রসাদ দেবীমূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দেহত্যাগ করেন।

রাজা রাজবল্লভের জ্যোতি জয়নারায়ণ সেনের হরিলীলা ভারতচন্দ্রের বিজ্ঞানন্দর বা অন্নদামঙ্গলের সমকক্ষ কাব্য না হইলেও তাহাতে সেই যুগের উপযোগী গুণ অনেক আছে। সামাজিক চিত্রগুলি হরিলীলায় খুব ফুটিয়াছে। কবি স্বয়ং রাজবংশোদ্ভূত ও বিশিষ্ট অবস্থাপন্ন। তিনি যে খুব বৈভবশালী ছিলেন, তাহা “হরিলীলা”র রাজার হারের মূল্যনির্ণয়-বর্ণনায় যথেষ্ট প্রসাদিত হইয়াছে। সেই স্থানটি উদ্ধৃত করিলাম :—

“রাণীর গলার মণিময়ানন্দ হার। তিন হারে ছয় লহরে মুক্তা বিশ হাজার। বিশ বিশ রত্ন অতি মুক্তার ওজন। তাখে মাণিকের বদ্ধ অঙ্কণ কিরণ। পঞ্চবিশ পঞ্চবিশ বদ্ধ অতি হারে। দেড়শত হৈল বদ্ধ লিখিতে হুমায়ে। মধ্য হারে মুক্তুকি সহ মণিময়। লঘুতরা বিশ রত্ন লট্করের মুক্তি। অন্ধকারে দীপ প্রায় প্রকাশিল জ্যোতি। মধ্যোতে অলিছে অতি শ্বেত হীরা পান। বিশ মাথা আভ্যপূর্ণ চন্দ্রের সমান। মাথা বার বিশ হাজার আর জবা বার। মালার মেজতে তিন ঘুটিহ মুক্তার। সেই তিন বিশ রত্ন হইল ওজনে। চন্দ্রকান দেখি তাহা আঁকে হর্ষ মনে। আঁকিলেন মূল্য সেই হার মনোহরে। চন্দ্রকান তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজারে।”

আনন্দময়ী জয়নারায়ণের ভ্রাতৃপুত্রী, তাঁহার রচিত অনেকগুলি অংশ হরিলীলায় স্থান পাইয়াছে—তাহা সংস্কৃতায়ক শব্দপূর্ণ এবং মহিলা-কবির পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৫ম সংস্করণ), ৫১২-১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বহু ধর্ম-সংগীত রচিত হয়। এখানে তাহার উল্লেখের অবকাশ নাই। যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর স্বপ্নবিলাস ও রাই-উন্মাদিনী (দিব্যোন্মাদ) এই দুইটি অমর কীর্তি। কৃষ্ণকমলের জন্মস্থান নদীয়া জেলার ভাঙ্গন ঘাট গ্রামে এবং কর্মস্থল ঢাকায়। তিনি

১৮১০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরিণত বয়সে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করেন। সমস্ত চৈতন্যচরিতামৃতখানি এবং পদাবলী-সাহিত্যের রস নিঙড়াইয়া কবি তাহার এই দুই গ্রন্থ রচনা করেন, বিশেষ রাই-উন্মাদিনী। এই পুস্তকে রাধার নামে চৈতন্যের প্রেমমুগ্ধি দেখান হইয়াছে। যিনি চৈতন্যের সধকে অবিদিত—তাহার এই অপূর্ণ কাব্যের স্বাদগ্রহণের সুবিধা হইবে না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কৃষ্ণকমল-রচিত বিচিত্র বিলাসের ২০,০০০ পুস্তক বিক্রীত হইয়াছিল। ঢাকার উপর দিয়া বড় বড় বস্তা ও টর্ণেডোর প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাই-উন্মাদিনী যে অশ্রু বস্তার সৃষ্টি করিয়াছিল— তাহার তুলনা নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পূর্ববঙ্গ এই অপূর্ণ উন্মাদনার বস্তায় ভাসিয়া গিয়াছিল। চৈতন্য যে কত সত্য, তাহার প্রেমের কথা যে কত মর্মান্তিক এবং তিনি যে বাঙ্গালী হৃদয়ের কত আপনার জন, তাহা এই দিব্যোন্মাদ যাত্রা শুনিয়া লক্ষ লক্ষ শ্রোতা বুঝিয়াছিল এবং এই লক্ষ লক্ষ লোক উক্ত গীতিনাট্যের প্রত্যেকটি গান জপমালা করিয়া রাখিয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কবিওয়ালাদের মধ্যে হরঠাকুর ও রামবনু বঙ্গের বহুজন-সমাদৃত কবি। প্রাচীন কালে যে কৃষ্ণ-ধামালী নামক কবিতা বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত—সেই ধামালীর সমস্ত আবর্জনা ঘুচিয়া গিয়াছিল এবং উহা কবিওয়াল।

চৈতন্য-প্রেমের পুত-সলিলে অবগাহনপূর্বক শুদ্ধমাত অবস্থায় নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রায় ৪০০ বৎসর যাবৎ নির্মল ও শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। তাহার ফলে কবি-ওয়ালাদের গানগুলি শুধু শ্রুতিমধুর নহে, সহজ সুন্দর শব্দ-সম্পদ-সম্পন্ন এবং নির্মলভাব-স্বোতক হইয়াছিল। শিবসংগীত ও কৃষ্ণ-ধামালীর দুই ধারা কবির গানে নবজীবন ধারণ করিয়াছিল। ঐ দুই শ্রেণীর গানও খুব নিম্নশ্রেণীর মধ্যে গীত হইত। কবিওয়ালারাও প্রায়ই নিম্নশ্রেণীর লোক—ইহাদের মধ্যে মুচি, ডোম প্রভৃতি জাতীয় কবিও ছিল। রামবনুর এই গানটি অতি-পরিচিত, “মনে রহিল সেই মনের বেদনা, তারে বলি বলি বলি বলা হ’ল না, সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না। যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে, তবে নির্লজ্জা রমণী ব’লে হাসিত লোকে। সখি বল্বে সে বিধাতাকে, নারীজনম যেন আর হয় না। যখন হাসি হাসি সে আসি বলে, সে হাসি দেখি ভাসি নয়ন জলে। তার মুখ দেখি মুখ ঢাকি কাঁদিতাম সজনি। অনায়াসে প্রবাসে গেল সে গুণমণি।” শেষের কয়েকটি ছত্রের করুণ স্বর দরদীর প্রাণে দাগা দিয়া যায়। বিদায়কালেও তার হাসি। কি নিষ্ঠুর, সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল, যাইবার সময়ও তাহার চোখে মুখে একটু দুঃখের ছায়া পড়িল না, বরং হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। শেষ ছত্রের

“অনায়াসে” শব্দটি বড় করণ। সে “অনায়াসে” চলিয়া গেল, একটুও কষ্ট হইল না। সলজ্জা বধু তাঁর হাসিমুখ দেখিয়া চোখের জল সামলাইতে পারিলেন না—আঁচল দিয়া মুখ ঢাকিয়া সে অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন পাছে নিষ্ঠুর সে, তাঁহার সেই অশ্রু দেখে।

এই গানটি “বঙ্গের সেই বুকভরা মধু” পল্লীবধুর সলজ্জ মধুর মূর্তির একখানি ছাপা ছবি, এই ছবি কি আর দেখিতে পাইব? সেই যে “বলি বলি বলি বলা হ’ল না। সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না”—কুটিবার মুখে কুঁড়িটির মত নূতন অমুরাগে ভরা হৃদয়টি—এখনও বাহার সুগন্ধ বাতাস বিলাইতে পারে নাই, কোমল দলগুলি তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, এখনও ছাড়িয়া দেয় নাই। সেই স্বর্গীয় রূপ কি আর দেখিতে পাইব? নারী-স্বাধীনতার এই যুগে কি পল্লীবাসিনীর লাজময়ী মূর্তির গৌরব আর থাকিবে?

বাঙ্গলার কবিগণের শ্রেষ্ঠ দান—আগমনী গান। তখন কোলৌন্তের মর্যাদা অত্যধিক হইয়াছিল। পুত্রকন্টার বিবাহে লোকে শুধু কুল খুজিত। এখন বেকরূপ বি এ., এম. এ. পাসকরা ছেলের চাহিদা খুব বেশী, সেকালে কুলীনের ছেলেমেয়ের মর্যাদা অত্যন্ত অধিক ছিল; কুলীনের ঘরে জন্ম হইলে কাণা, খোঁড়া—কন্দর্পের দরে বিকাইত। কবি ঈশ্বর গুপ্ত নিজে খুব সুশ্রী ছিলেন, কিন্তু নিতান্ত কুৎসিত ও অঙ্গহীন-দোষযুক্ত একটি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা কুলকার্য্য করিয়া এইরূপ এক শব্যাসঙ্গিনীকে পুত্রের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছিলেন। আমার কোন আত্মীয় অতিশয় ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ততোলা এবং কুরূপা মহিলার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন, কুলের গৌরব তখনকার দিনে সর্বগৌরবের উপর ছিল। এই সকল বিবাহের ফলে অনেক সময়ে বিসদৃশ ঘটনা ঘটিত। অনেকেই জানেন ঈশ্বর গুপ্ত এই পরিণয়ের ফলে দ্বীজাতি-বিষেবী হইয়াছিলেন। আমার সেই আত্মীয়ের পুত্র তরুণ হৃষ্যের স্থায় প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন,

বিবাহের অল্প পরেই তিনি পাগল হইয়া গেলেন। কুলীনেরা ঈশ্বর গুপ্ত।

অর্থের গৌরব চাহিতেন না, তাঁহারা সাধারণতঃ চিরদরিদ্র থাকিতেন, কেবল কুলের বড়াই করিয়া অনেক সময়ে বিজ্ঞাচর্চায়ও বিরত হইতেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রত্যেকের শতাধিক বিবাহ তো নিত্যকার কথা ছিল। এদিকে অষ্টমবর্ষে গৌরী সাজাইবার চেষ্টায় ধনী ব্যক্তির মূর্খ, একান্ত দরিদ্র ও নেশাখোর বৃদ্ধের হস্তে তাঁহাদের অপোগণ্ড বালিকাদিগকে সমর্পণ করিয়া সামাজিক প্রশংসা অর্জন করিতেন। সমাজের যখন এই অবস্থা—তখন এই বিসদৃশ ও অস্বাভাবিক ব্যাপারের বাহা কিছু অশুভ ও কষ্ট তাহা ভোগ করিতে হইত—সেই বালিকা কন্যাকে ও তাঁহার মাতাকে। আমরা পূর্বে অনেকবার বলিয়াছি যে বাঙ্গলার লোকে হিন্দুধর্মকে ব্যাবহারিক জীবন হইতে পৃথক্ করিয়া দেখেন নাই—পোষাকী ধর্ম লইয়া বাঙ্গালী কখনই তৃপ্ত হন নাই। ঘরের কথার মধ্যে তাঁহারা স্বর্গের কথা আবিষ্কার করিতেন, মন্দিরের ঠাকুর যতদিন তাঁহাদের অন্তরের ঠাকুর না হইতে পারিতেন, ততদিন তাঁহারা ঠাকুরের উপাসনা করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না।

বাঙ্গলার আগমনী গানে বাঙ্গলার জননী ও কন্টার হৃদয়ের নিভৃত বাৎসল্যের প্রবাহ

বহিয়া তাহা চিরপবিত্র করিয়া রাখিয়াছে। স্বামীর কাছে গৌরীর হৃৎথের কথা শুনিয়া
মেনকা রাণীর বৃকে প্রতি নিয়ত শেল বিবিত। তিনি রাজ্ঞী,
আগমণী গান।

তাহার অন্ন বাড়ীর পোষা জীবজন্তু পর্যন্ত প্রচুররূপে ভোগ
করে, অথচ কল্লার পেটে ভাত নাই, কল্লার ছেলেরা ক্ষুধার তাড়নায় পথে পথে ঘুরিয়া
বেড়ায়—এ কষ্ট মায়ের অসহনীয়। তিনি গিরিরাজকে বলিতেছেন, “তুমি
যে কয়েচ গিরিরাজ, আমায় কতদিন কত কথা, সেকথা আমার মনে শেলসম রয়েছে
গাথা। আমার লম্বোদর নাকি উদরের জালায় কেঁদে কেঁদে বেড়াত, হ’য়ে অতি ক্ষুধাভিক,
সোনার কার্তিক ধুলায় প’ড়ে লুটাত।” গণপতিতো চিরকালই লম্বোদর—কিন্তু এই পদে
লম্বোদরের ক্ষুধা-নিপীড়িত উদরের কুঞ্জন মনে পড়ে, এবং কত আদরের সোনার
কার্তিকদের এই মর্মান্তিক হৃৎকাহিনী ধনিগৃহের কল্লাবিরহবিধুরা গীমস্ত্রিনীদের মনে
অপূর্ণ কারুণ্যের সৃষ্টি করে। এসকল গান মায়ের মর্ম্মবেদনায় লিখিত। কবিতা একরূপ
সরল হৃদয়স্পর্শী কথা কহিতেন, যাহাতে বাঙ্গলার অধ্যাক্ষরাজ্যের রাজা মহেশ্বরের গৃহবর্ণনা
করিতে যাইয়া তাহাদের বাঙ্গলার মায়ের চক্ষে দরদর অশ্রুপ্রবাহ বহাইয়া দিতেন।

একরূপ গান শুধু একটি নহে, শরৎ শেফালীর ছায় ইহার অঙ্গশ্র; কোনটিতে মেনকা
বলিতেছেন—“গিরি, গৌরী আমার এসেছিল”—সে আসা ফণিকের জন্ত। স্বপ্নে দর্শন দিয়া
গৌরী চলিয়া গেলেন, মায়ের হৃৎথের কথা শুনিতে একটি দণ্ড প্রতীক্ষা করিলেন না। মেনকা
কল্লার নিষ্ঠুরতা স্বরণ করিয়া বলিতেছেন, তাহারই বা কি দোষ? “পাষাণের মেয়ে পাষাণী
হ’ল” গিরিরাজতো পাষাণই বটেন, কিন্তু এখানে গিরিরাজের হৃদয়ও যে পাষাণেরই মত
তাহারই ইঙ্গিত দিয়া স্বামীর উপেক্ষার প্রতি রাণী কটাক্ষ করিতেছেন। অল্প একদিন নারদের
মুখে রাণী শুনিলেন, “মা-মা- ব’লে উমা কেঁদেছে” আর কি অভিমান করিয়া থাকা যায়? স্বামীর পা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন, “বাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী, উমা কেমনে
রয়েছে”—তিনি তো কত কথাই শুনিয়াছেন, পাগলা জামাই নাকি ভান্স খাইয়া দিগম্বর
সাজিয়াছেন এবং প্রাণের গৌরীকে কত গালাগালি করিতেছেন—“উমার বসন ভূষণ, যত
আভরণ,—তাও বেচে ভান্স খেয়েছে,” এসকল কথা তখনকার দিনে প্রায় প্রত্যেক মায়েরই
প্রাণের কথা ছিল—ইহাদের সেই চাপা কান্নার ভাষা দিয়াছিলেন—কবিতা, এবং এই করুণায়
হৃর্গোৎসব ভাসিয়া যাইয়া বিসর্জনের বিদায়-বাজনার সুর বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে একটা
মর্ম্মস্কন্দ স্রোত বহাইয়া দিত।

মেনকা কখনও আর সহিতে পারিতেন না। সেই বৎসর ভরিয়া বিরহের হৃৎথ প্রাণ
আকুল হইয়া উঠিত। তিনি একটি গানে বলিতেছেন, “গিরি আমার মনের এই বাসনা, আমি
জামাতা সহিতে, আনিব ছহিতে, গিরি-পুরে করব শিব স্থাপনা। ঘরজামাই করি রাখবো
কুস্তিবাঁস, গিরিপুরী হবে দ্বিতীয় কৈলাস—হরগৌরী রূপ হেরব বারমাস—বৎসরান্তে
আন্তে বেতে হবে না।” গিরিরাজ অচল,—একটি গানে কবি তাহাকে বেতোরোগী বলিয়া বর্ণনা
করিয়াছেন, তাহাকে নড়ান খুব সহজ ব্যাপার নহে, স্তত্রাং শিবকে যদি হিমালয়ে স্থাপন করা

যায়, তবে প্রতি বৎসর অনড় স্বামীকে নড়াইবার চেষ্টা করার দায় হইতে মুক্তি পাওয়া যায়—এই যে মেনকারাণীর আর্ন্ত-বাৎসল্য এবং যেহ, বাহা কবির মর্মান্তিক করুণার সুরে বর্ণনা করিয়াছেন—আগমনীর অতুলনীয় পদ সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহা বাঙ্গলার তদানীন্তন শরৎ কালের নিজের সুর। ছর্গোৎসবের সর্কপেক্ষা করুণ রসের উৎস—মিলনোৎসবের মধ্যে কত্যা-বিরহের জন্ত ব্যাকুলা জননীর প্রাণের নিভৃত বিলাপ। এই কবিতাগুলি নাকি উৎকট, কবিওয়ালারা নাকি অতি বীভৎস—অনুপ্রাস দোষ-দৃষ্ট পদের বিকৃত রুচির পথ-প্রদর্শক—কবি-সম্রাটের এই মন্তব্যের সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাণ কখনই সাড়া দিবে না।

কবিওয়ালারা যে এই পবিত্র উৎস বহাইয়াছেন, তাহা বাঙ্গলার শুধু পারিবারিক মর্ম্মকণার সন্ধান দেয় না—শুধু তাহা হইলে ইহার মূল্য ততটা বেশী হইত না, করুণ রসের উদাহরণস্বরূপ বাঙ্গলার আগমনী গান একটা দর পাইত এই পর্য্যন্ত। কিন্তু উপসংহারে কবির যে সকল ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মহেশ্বরের মহিমাযুক্ত মূর্ত্তি বাঙ্গালী-হৃদয় কতটা উপলব্ধি করিয়াছিল—তাহার আভাস পাওয়া যায়। কবি শেষ গানটির সমাপ্তি-বাক্যে বলিতেছেন, “রাণী তুমি বাতুল হইয়াছ, কুবেরের ভাণ্ডার দিয়া বাহাকে বিফু ভুলাইতে পারেন নাই, যিনি এক মুহূর্ত্তে পারিবারিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পর মুহূর্ত্তে যোগীশ্বরের মহেশ্বর্য্যপূর্ণ উর্দ্ধলোকে বিহার করেন, বাহার তপস্তায় যুগ যুগ চলিয়া যায়—দেবতার বাহার যোগ-নিমগ্ন সমাদিস্থ রূপের কাছে আসিতে ভীত হন, শ্মশানের চিতা হাড়মালা বাহার কাছে কোষে বস্ত্র ও পারিজাত হইতে গ্রাহ—সেই চিতাভস্মামোদী, অমৃতহলাহলের বৈষম্য-বিস্মৃত, যোগীশ্বর মহেশ্বরকে তুমি “ধরজামাই” করিয়া বাধিয়া রাখিতে চাও—যিনি লীলাবশতঃ ক্ষণেকের জন্ত ভক্তের কাছে ধরা দেন, তাঁহাকে তুমি চিরবন্দী করিতে চাহ, তুমি বাতুল।”

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গলার অন্তঃপুরের মর্মান্তিক ও বাঙ্গালী জীবনের নিগূঢ়-ভাবের প্রস্রবণ হইতে এই আগমনী গানের ধারা বহিয়া আসিয়া শিব-সমাদির স্বর্গলোক স্পর্শ করিয়াছে। বাহার আগমনী গান বুঝেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে বাঙ্গলাদেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস বুঝিতে বিলম্ব হইবে।

আমরা এইখানেই সাহিত্যের ইতিহাস শেষ করিলাম। এই যুগে শব্দ-মস্ত্রের গুরু কয়েক জন কবি জন্মিয়াছিলেন এবং ভাব-মস্ত্রের গুরু কয়েকজন কবি জন্মিয়াছিলেন।

গোপাল উড়ে। তাঁহাদের সম্বন্ধে, সংক্ষেপে দুইটি কথা বলিয়া উপসংহার করিব। শব্দ-মস্ত্রে গোপাল উড়ে কত উৎসবের রাত্রিকে

যে উজ্জ্বল করিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই তরল হাস্য, সে নৃত্য, সেই সকল মিষ্ট কথা, যে দেখিয়াছে শুনিয়াছে—সে জীবনে ভুলিবে না। সেই “ফুল জোগাই কেমন করে। যামিনীতে কামিনীফুল নিত্য নে যায় চোরে।” কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের তাল ও নৃপূরের ধ্বনি মনে পড়ে। “কোথাকার হাবা ছেলে হাসি পায় শুনে, সদায় বলে কই মাসী তুই বিজ্ঞা দিলিনে—কথায় যেন কচি থোকা, রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা, মনে একটু হয়না ঘোঁকা, হয়না ভাবনা—আরে, আঁচলে

কি বাধা আছে দিব যে এনে"—কালেংড়া রাগিণীর এই গানের সঙ্গে ঠুংরি তালে মালিনী মাসী নাচিয়া গাহিয়া আসর মাৎ করিয়া দিত—সে দৃষ্ট যে দেখিয়াছে সে কি তাহা কখনও ভুলিতে পারে? শরৎ কালের শিউলি একটি দুইটি পড়ে না—তাহা অজস্র, এই গানগুলিও তাহাই। “কে শিখাল তোরে এই সিধ-কাটা বিচ্ছে—ধাক্ ধাক্ ধাক্, হয়ে দাড়কাক—ঠোকর দিলি শিব নৈবেদ্যে—গোবরা পোকা হয়ে বসিলি পদ্মে।” জীবনে সর্বদাই বিকার-রহিত নিবাতনিকম্প হ’য়ে তৃষ্ণীভাবে বসিয়া থাকা যায় না—একটু তরল আমোদ-প্রমোদের জন্ত মনের মাঝে মাঝে একটা ইচ্ছা হওয়া যে গর্হিত, তাহা আমরা মনে করি না। যদি সত্য সত্যই কেহ স্থাণু কিংবা অচলায়তন তেমন ধারা থাকেন, তবে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, বাক্সার হীরামালিনী যদি নাচিয়া গাহিয়া তাঁহার প্রতি ঐ সকল গানের জুল-শর হানেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমস্ত গান্ধীয়া ভূমিগাৎ হইবে।

এই সকল কবিত্বের কৃতিত্ব, গোপাল উড়ের বাধনদার ভৈরব হালদারের কিন্তু এই গানগুলি গোপাল উড়ের নামেই চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া আমরাও তাঁহারই নামের উল্লেখ করিলাম। বর্ধমান বাদিমোড়-নিবাসী পাঁচালীকার দাশরথির

দাশরথি।

শব্দের উপর অতি আশ্চর্য্য অধিকার ছিল, ইনি বমক-অলঙ্কারের একরূপ অপূর্ণ খেলা বাঙ্গলা শব্দের উপর দেখাইয়াছেন যে, স্বীকার করিতে হইবে, ইনি একজন প্রকৃত খেলোয়াড় বটেন। সে সকল খেলা দেখিয়া প্রীত হই এবং বোধ হয় বিস্মিতও হই; কিন্তু যখন এই চটুল লোকটি তাঁহার ক্ষিপ্ত ও উজ্জ্বল প্রতিভা দ্বারা আসর জমাইবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া স্বগৃহে আসিয়া গৃহদেবতার কাছে “দোষ কারও নয়গো মা, আমি স্বথাত সলিলে ডুবে মরি শ্রামা” বলিয়া কাদিতে থাকেন, কিংবা সেই দেবতার রূপে মাধুর্য্য ও ভীষণতার সংমিশ্রণের আভাস পাইয়া “নীলবরণী, নবীনা রমণী” বলিয়া স্তোত্র পড়িতে থাকেন—কখনও “নীল-নয়ন-জিনি ত্রিনয়নী, নিরখিলাম নিশানাথ নিভাননী” আবার পর মুহূর্ত্তে “লোলরসনা করালবদনী” বলিয়া ভয়ে চক্ষু নিম্নীলিত করেন, তখন তাঁহার সেই মর্ম্মস্পর্শী অমৃত্যু-তাঁহার দেবতার পরিপূর্ণ দয়ার মূর্ত্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে সংহার-মূর্ত্তির ধ্যান আমাদেরিগকে তাঁহার আঙ্গিনায় পদরজের প্রার্থী করিয়া তোলে।

এই শব্দ-মস্তুর গুরুত্বকে ছাড়িয়া আমরা কলিকাতার এক সময়ের বড় লোকদের সংগীত-কলার অবলম্বনস্বরূপ রামনিধি গুপ্ত সম্বন্ধে কিছু বলিয়া শেষ করিব—

রামনিধিবাবু (নিধুবাবু) ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ৯৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। বাগবাজার অঞ্চলে এখনও তাঁহার অর্দ্ধভগ্ন গৃহখানি আছে। বাহার ভক্তের এককালে সীমাসংখ্যা ছিল না, এবং তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বড়লোক ছিলেন, এখনও সংগীতবিজ্ঞান-অনুশীলন-কারীদের মধ্যে তাঁহার ভক্তের অভাব নাই, এতাদৃশ ব্যক্তির গৃহখানি সংস্কার করিয়া স্মৃতিরক্ষার কোনই ব্যবস্থা হইতেছে না—বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! রামনিধি গুপ্তের গানগুলি অধিকাংশই সারি মিঞার উপায় অমুকরণে রচিত; রাধাকৃষ্ণের কথা বাদ দিয়াও যে প্রেম-সংগীত বাঙ্গলা ভাষায় রচিত হইতে পারে—তাহা নিধুবাবু দেখাইয়াছেন। “কাহ্ন ছাড়া

গীত নাই” একধারও অলৌকিক তিনি প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার গানগুলি প্রায়ই অতি সংক্ষিপ্ত, সেই স্বল্পাঙ্কুরা গীতিকার প্রত্যেকটিই একটি সমগ্র ভাব প্রকাশ করে। সেই ক্ষুদ্র গীতিগুলি বিয়োগান্ত করুণা ও স্বতঃসিদ্ধ কবিতার সার্থক হইয়াছে। “ভালবাসবে বলি ভাল বাসিনে, আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।” বিধুমুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি, তাই দেখে যেতে আসি—দেখা দিতে আসিনে” * গানটি সর্বজন-বিদিত। [ইহাতে প্রেমের “স্বভাব” বর্ণিত হইয়াছে—সে স্বভাব এই যে তাহা দিতে চায়—নিতে চায় না।] “যার মন তারই কাছে, লোকে বলে নিলে নিলে, দেখা হ’লে জিজ্ঞাসিব, সে নিলে কি আমায় দিলে। দৈবযোগে একদিন, হয়েছিল দরশন। না হ’তে প্রেম-মিলন, লোকে কলঙ্ক রটালে।” [ইহার অর্থ, সে আমাকে ভালবাসে নাই, বরং আমিই তাহাকে ভালবাসিয়াছি, সে আমাকে কিছুই দেয় নাই, বরং সেই নিয়াছে; তথাপি, লোকে রটাইতেছে যে আমি তাহার মন নিয়াছি—একথা সত্য নহে, তাহার মন তাহারই কাছে।] আর একটি গান “প্রেমে কি স্থখ হ’ত। আমি বারে ভাল বাসি, সে যদি ভালবাসিত। কিংবদন্ত শোভিত ভ্রাশে, কেতকী কণ্টক বিনে, ফুল হ’ত চন্দনে ইক্ষুতে ফল ফলিত।” কবির এই সিদ্ধান্ত কি ঠিক? সত্যি কি জগতে ভালবাসার প্রতিদান পাওয়া যায় না, তাহা কি পলাশের সুগন্ধের মত, কাঁটাহীন কেয়ার মত, চন্দন তরুর ফুল ও ইক্ষুর ফলের মত দুর্লভ ও অসম্ভব? সত্যি কি বাহাকে যে ভালবাসে—সমস্ত প্রাণমন দিয়া ভালবাসে,—সে সেই অতিরিক্ত উজ্জ্বল দেখিয়াই সরিয়া পড়ে—একজনের অতিরিক্ত আগ্রহে কি অপরের আগ্রহ জুড়াইয়া যায়? হয়ত কবি বাহা ইঙ্গিত করিয়াছেন, জীবনে সত্যি তাহাই ঘটে। প্রেমিক বাড়াবাড়ি করিয়া বঞ্চিত হন। যে নৈবেদ্য একমাত্র ভগবানকে দেয়, তাহা বাহাকে তাহাকে দিলে এবংবিধ বিড়ম্বনাই ঘটে। নিধুবাবু আর একটি গানে বলিয়াছেন—“সে এত নিদ্রুর, তোমার প্রতি করুণার বিন্দু তাহার নাই—তবু তুমি তাহাকে এত ভালবাস কেন?” একটি ছন্দে প্রেমিক এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন,—“তবু যে কেন ভালবাসি, তাহা নিজেই জানি না।” কিন্তু কবি এই প্রশ্নের উত্তর অল্প এক গানে স্বয়ং দিয়াছেন, “আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানিনে।” ইহাই প্রেমের স্বভাব। নিধুবাবুর প্রধান ভক্ত ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা (Miss Margaret Noble); তিনি বলিতেন, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে নিধুবাবুর তুল্য কবি আর নাই।

বাঙ্গলা গল্পসাহিত্যের উল্লেখ নিম্নয়োজন। যতদূর দেখা যায়—পূর্ববঙ্গে ত্রিপুরা ও আসামের রাজারা প্রাচীনকাল হইতে রাজদরবারে বাঙ্গলা ভাষাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার রাজাদের তিন চারিশত বৎসর পূর্বের কোন কোন তাম্রশাসন আমরা বাঙ্গলায় লিখিত দেখিয়াছি। তরুণ একখানি তাম্রশাসন আমার নিকটই ছিল, স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তাহা আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়া আর ফিরাইয়া দেন নাই। বঙ্গভাষা

* এই গানটি কেহ কেহ শ্রীধর পাঠকের রচিত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা ভুল।

ও সাহিত্যে তাহার কতকাংশের নকল দেওয়া হইয়াছে। ত্রিপুরার রাজাদের বাঙ্গলায় লিখিত অনেক তাম্রশাসন রাজমালায় দৃষ্ট হয়। সহজিয়ারা বহুপূর্ব হইতে তাঁহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মব্যাখ্যা-সম্বলিত পুস্তিকা বাঙ্গলা গঞ্জে লিখিতেন। স্বতীশাস্ত্রের অম্বুবাদ বাঙ্গলা গঞ্জে রচিত হইত। রাধাবল্লভ শর্মা প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে সমস্ত স্বতীগ্রন্থ গঞ্জে অম্বুবাদ করিয়াছিলেন। সে বাঙ্গলা সহজ, ছত্রগুলি একেবারেই জটিল নহে— অল্পসংখ্যক শব্দে পরিসমাপ্ত। তাহা ছাড়া দলিল ও চিঠিপত্র আমরা ছই তিন শত বৎসর পূর্বের অনেক পাইয়াছি। গল্প সাংসারিক প্রয়োজন ও ধর্মব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হইলেও উহা দেড়শত বৎসর পূর্বেও সাহিত্যের আসরে বিশেষ কোন স্থান লাভ করে নাই। ৫০০ বৎসর পূর্বের কবি চণ্ডীদাসেরও সহজতত্ত্বজ্ঞাপক বাঙ্গলা গঞ্জে লিখিত পাতড়া পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু যে দেশে গণিতের সূত্র পর্য্যন্ত কবিতায় রচিত হইত, সে দেশে গল্প বিশেষ আদৃত হয় নাই, তাহা বলা নিম্প্রয়োজন। ইংরেজদের আগমনে— ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সংস্থাপনের পর হইতে বাঙ্গলা গল্পসাহিত্য বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। এই সময়ের (১৮০০ খৃঃ) কিছু পূর্ব হইতেই কেরি প্রভৃতি ইংরেজ লেখকগণ বাঙ্গলা গল্পসাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা-গল্পরূপ ইংরেজী বাগানের ফলই আমরা খাইতেছি।



অষ্টাদশ অধ্যায়

পারিশিষ্ট

প্রথম পরিচ্ছেদ

বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস—ত্রিপুরারাজ্য

"গোড় সৈন্ত আসিয়াছে যেন যম কাল। তোমার নৃপতি হৈল বনের শূণ্য।
 রাণীবাণী শুনি সবে বীরবর্ষে বলে। প্রতিজ্ঞাকরিল যুদ্ধে যাইব সকলে।"—রাজমালা।
 "রাণী সঙ্গে সৈন্ত-গণ যুদ্ধে প্রবেশিল। ত্রিপুরাশুল্কের রাণী হস্তী সোয়ার হৈল।
 ছয় শত পঞ্চাশ সন ত্রিপুরা যখন। ত্রিপুরাশুল্কের রাণী করে এই রণ।
 গোড়দেশী ভগ্ন-পাইক বেশেতে যাইয়া। বলিলেক যুদ্ধ-বার্তা মহাছুৰী হৈয়া।
 দূত বলে মহারাজ করি নিবেদন। ত্রিপুরাশুল্কের নাম রাজ-রাণী হন।
 এত বড় যুদ্ধা রাণী কভু নাহি শুনি।...মহাবুদ্ধ করিলেন রাণী।"—ত্রিপুর-বংশাবলী।

দিল্লীস্বরদের দরবারে এবং অপরাপর রাজসভায় সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য লোক নিযুক্ত থাকিত। আরজেব যখন বুঝিলেন, তাঁহার অত্যাচারে দেশভুক্ত লোক ক্ষুব্ধ হইয়াছে, এবং তাঁহার বিবেচনাহীন বুদ্ধির দোষে দাক্ষিণাত্যের কতকগুলি যুদ্ধে তিনি হারিয়া গেলেন, তখন তিনি দরবারের ইতিহাস-লেখকদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। তাঁহার রাজত্বের দশম বর্ষে তিনি ইতিহাস লিখিবার পথ এইভাবে বন্ধ করিলেন; এজন্য তাঁহার সুদীর্ঘ শেষ সময়কার ঘটনার বিবরণ এত অসম্পূর্ণ (And hence the reason why after those ten years we find no detail of many parts of his long reign. Mutaqherin, Vol IV, p. 159.) হিন্দুরাজাদের কেহ কেহ শকাব্দ, বিক্রমাব্দ প্রভৃতি কোন কোন স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীনকালের বড় বড় রাজারা প্রত্যেকে নিজ নিজ রাজত্বের আরম্ভকাল হইতে রাজ্যত্ব চালাইতেন।

এই দেশ বহুখণ্ডে বিভক্ত। সেইসকল প্রাদেশিক রাজ্যগুলি দেশে অরাজকতার সময়ে স্বাভাব্য অবলম্বন করিয়া প্রবল হইত এবং সময়ে সময়ে কোন সার্বভৌম নৃপতির আনুগত্য স্বীকার করিত। ক্রমাগত রাষ্ট্রবিপ্লব এবং এক বংশের উচ্ছেদ প্রাদেশিক ইতিহাস।

করিয়া অপর বংশের প্রতিষ্ঠার ব্যাপদেশে পূর্বতন রাজত্বের ইতিহাস লুপ্ত হইয়া যাইত। গাঁহার শত্রুকে জয় করিতেন, তাঁহার শত্রুবংশের গৌরব-কাহিনী রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই করিতেন না। এইভাবে ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক রাজ্যের ইতিহাসই লুপ্ত হইয়াছে। ত্রিপুরার রাজমালাতে এইরূপ কয়েকখানি ইতিহাসের উল্লেখ আছে, লামা তারানাথ সেনবংশীয় ও পালবংশের রাজাদের কয়েকখানি ইতিহাসের উল্লেখ

করিয়াছেন (এই পুস্তকের ২৮৮-৮৯ পৃঃ)। এই সকল ইতিহাস এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, সেক শুভোদয়া, গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্ট-রচিত বনালচরিত প্রভৃতি সামান্য কয়েকখানি পুস্তক ছাড়া এদেশে বিশাল হিন্দুরাজত্বের ইতিহাসের কিছুই নাই। আখ্যায়িক বৈষ্ণব আখ্যায়িকের অসামান্য স্থাপত্য ও শিল্পকীর্তি ধ্বংস পাইয়াছে, তথায় তাহাদের ইতিহাসও সেইরূপ ধ্বংস পাইয়াছে। কিন্তু এখনও চেষ্টা করিলে কিছু উপকরণের উদ্ধার হইতে পারে। রাষ্ট্রবিপ্লবই এই ইতিহাস-বিলোপের প্রধান কারণ। রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রগৌরব—এদেশে কোনকালেই জাতীয় গৌরবের বিষয় হয় নাই—উহা বংশগৌরবের কারণ হইত, স্মৃতিরাজ একবংশের ধ্বংসের পর অপর বংশের অভ্যুদয়ে সেই গৌরব ধ্বংস পাইত। ধর্ম-গৌরবই এই দেশের জাতীয় গৌরবের হেতু ছিল; এই অল্প সমস্ত জাতি তাহা রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু দুই প্রবল ধর্মের সংঘর্ষ হইলে, বিজিত ধর্মের গৌরব জয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীরা বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই ভাবে হিন্দুরা বৌদ্ধ ধর্মের গৌরবজনক ইতিহাসের বিলোপ-সাধন করিয়াছেন। জাতীয় ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা মাত্র **ধর্ম-শাস্ত্রের আশ্রয় লইয়া** কথঞ্চিৎ জীবন রক্ষা করিয়াছে। পুরাণগুলিতে এই ভাবে প্রাচীন রাজগণের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা এদেশে এত বেশী ছিল যে, এদেশের রাজগণ তালপত্র, তেরুপত্র এবং কাগজের উপরও সম্যক-বিশ্বাস স্থাপনা না করিয়া শিলাখণ্ডে ও তাম্রপত্রে—তাহাদের কীর্তিকথা উৎকীর্ণ করিয়া রাখিতেন। অশোকের ৮৪০০০ অক্ষুশাসনের মধ্যে মাত্র ৪০১৪টি পাওয়া গিয়াছে। সেদিনও (১৬০৫ খৃঃ অব্দে) অশোকের এলাহাবাদ অক্ষুশাসনের কতকাংশ কাটিয়া ফেলিয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ তাহার উপর স্বীয় দোরাত্মের চিহ্ন রাখিয়াছেন। মুসলমানেরা ইতিহাস লিখিতে জানিতেন, হিন্দুরা তাহা জানিতেন না—একথা আমি বিশ্বাস করি না। হিন্দুরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে বেশী অহুরাগী ছিলেন বলিয়া পার্থিব কোন ব্যাপারেই তাহাদের অহুরাগের ক্রটি দেখা যায় না। শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতি ব্যাপারেও তাহারা জগজ্জয়ী হইয়াছিলেন। এখনও জগতে হিন্দু ও বৌদ্ধের যে সকল কীর্তিচিহ্ন সহস্র বৎসরের অত্যাচার সহিয়া জগতে টিকিয়া আছে, অল্প কোন ধর্মাবলম্বীদের তাহা নাই। মুসলমানগণের ইতিহাস লেখার প্রবৃত্তি তাহারা বৌদ্ধগণের নিকট পাইয়াছিলেন। তাহাদের এশিয়াতে প্রাধান্য অল্পকাল হইল বিলুপ্ত হইয়াছে, এইজন্য তাহাদের খাতাপত্রগুলি লুপ্ত হয় নাই; এবং প্রাচ্য সভ্যতায় সমস্ত মহাদ্ব্যজ্ঞাতীর ইতিহাসের জন্ত জায়গা করা হইয়াছে, এজন্য হয়ত সেগুলি ভবিষ্যতে লুপ্ত নাও হইতে পারে। কিন্তু আজ যদি মারহাট্টারা বিজয়ী হইয়া ভারত অধিকার করিতেন, তবে বালাজি বিশ্বনাথ, নানা ফার্নারিশ কিংবা ডাক্তর পণ্ডিতের হাতে মুসলমানদের ইতিহাস রক্ষা পাইত কি না সন্দেহ। বগীরা হিন্দু, কিন্তু হিন্দুমন্দিরও তাহাদের অত্যাচার হইতে বাদ পড়ে নাই। বাঙ্গলার প্রান্তভাগে যে কয়েকটি হিন্দুবংশ শত শত বৎসর টিকিয়া আছে তাহাদের ইতিহাস দুই একখানি পাওয়া গিয়াছে। বর্তমান ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের দুই একটি অট্টালিকার লুপ্তাবশেষ বৈষ্ণব তথাকার অতীত ইতিহাসের সাক্ষী হইয়া থাকে, এই দুই একখানি পুস্তকও আমাদের ঐতিহ্যের

সেইরূপ সাক্ষী ; ইহারা প্রাচ্যের বাহিরে ছিল বলিয়াই রক্ষা পাইয়াছে, ইহাদের একখানি 'রাজমালা'—ত্রিপুরার ইতিহাস। আর একখানি কোচবিহারের ইতিহাস। আসামের অহম্ রাজাদের বুরুঞ্জি অতি মূল্যবান ইতিহাস। গেটসাহেব লিখিয়াছেন—“অহম্ রাজাদের বুরুঞ্জির মত একরূপ খাটি ও বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস দুর্লভ। বুরুঞ্জি-লেখকগণ মুসলমান ইতিবৃত্তকারগণ হইতেও অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য ও লিপিদক্ষ।”

ধর্ম্মের সংশ্রব রাখার জন্ত পুরাণগুলিতে রাজাদের কাহিনী কিছু কিছু বজায় আছে, এবং ভগবান্ রামচন্দ্রের সংশ্রবহেতু সন্ধ্যাকর নন্দীর রামপাল-চরিত টি কিয়া আছে।

রাষ্ট্রবিপ্লব আমাদের দেশের ইতিহাস-বিলোপের প্রধান কারণ, তাহা ছাড়া আরও একটি কারণ আছে, তাহা এদেশে নব-ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব। এই নব-ব্রাহ্মণ্য জগতের সমস্ত বিষয় হইতে হিন্দুর মুখ ফিরাইয়া তাহাকে অন্তর্মুখী করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহারা রাজত্ববর্গের কীর্তি অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া তৎসম্বন্ধে কোন সংবাদ দেওয়া উচিত মনে করেন নাই। পার্শ্বিক সমস্ত কীর্তির প্রতি ইহারা ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন। এই ইতিহাস-বিলোপের চেষ্টা ইহাদের এত বেশী হইয়াছিল যে, প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে বর্ত্ত পল্লীগীতিকা ছিল—তাহা তাঁহারা হিন্দু সমাজের গভী হইতে বিতাড়িত করিয়া ফেলিয়া-

পার্শ্বিক ইতিহাসের প্রতি উপেক্ষা।
 ছিলেন, নর-নারীর প্রেমসম্বন্ধে সত্যঘটনা-মূলক বর্ত্ত কবিত্বপূর্ণ কাহিনী দেশময় প্রচলিত ছিল—তাহা তাঁহাদের ক্রকুটীতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। মহয়া, জামরায় ও আন্ধা বন্ধুর জায় অমর

গীতি ময়মনসিংহে এখন আর হিন্দুর বাড়ীতে গাইতে দেওয়া হয় না। বৃন্দাবন দাস (ব্রাহ্মণ) রোষ-কব্যায়িত চক্ষে এই সকল গীতির প্রতি দৃষ্টি হানিয়া বলিয়াছেন, “এই ভাবে জগতের মিথ্যা কাল যায়।” বৈষ্ণব সমাজ ইহা হইতে আরও অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের মতে ধর্ম্মগুরুই প্রকৃত গুরু, মাতাপিতা কেহই নহেন। শরীরটা উপেক্ষণীয়—ইহা কাহার নিকট হইতে পাইয়াছি, তাহা জানিবার কোন দরকার নাই,—কাহার দ্বারা আত্মার পুষ্টিসাধন হইয়াছে তাহাই একমাত্র জ্ঞাতব্য গৌরবের বিষয় ; কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত প্রসিদ্ধ লেখক, যিনি বৈষ্ণবগুরুদের কথা প্রতি পত্রে পত্রে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের বিবরণ সংবলিত এত বড় গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তিনি একটবার তাঁহার মাতাপিতার নাম বলেন নাই।

আমরা এখন রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাসসম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভারতবর্ষে বর্ত্তমান কালে বর্ত্ত রাজা বিজয়মান আছেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিপুরার রাজবংশই প্রাচীনতম।

আদিকাল হইতে ১৮৪ পুরুষের নাম এই বংশে আমরা পাইতেছি।
 রাজমালা।

রাজমালার প্রথমাংশের অনেক কথাই খাটি ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যায় না—কিন্তু পরবর্ত্তী অংশ অধিক পরিমাণেই খাটি ঐতিহাসিক সত্য। কলহণের রাজতরঙ্গিনী হইতেও আমরা এই পুস্তকখানিকে মোটের মাধ্যম বেশী প্রামাণিক মনে করি। প্রথমাংশ প্রাচীন প্রবাদ ও গল্পমূলক। যযাতি-পুত্র ক্রতু, ত্রিপুর রাজবংশের আদিপুরুষ বলিয়া কথিত। ক্রতু, কপিল নদীর তীরে ত্রিবেণ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।

তাহার রাজ্যের পূর্ব সীমানার মেখলী, পশ্চিমে কোচরং, উত্তরে তৈবঙ্গ নদী এবং দক্ষিণে আচরং ছিল এবং লৌকিক বিশ্বাসে এই বংশ কিরাত বলিয়া আখ্যাত হইতেন। ত্রিপুরা-রাজের অনাচার ও অনার্য্য শ্রেণীতে বিবাহাদির জন্ত এই বংশে কিরাতত্ব চুকিয়াছিল। এই কপিল-আশ্রম ‘সাগর’ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। সাগর-সন্নিহিত বিস্তৃত ভূখণ্ড পাঁচটি সমৃদ্ধ নগরী ও দুই লক্ষ লোকসহ ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে জল-প্লাবনে ডুবিয়া গিয়াছে।

রাজ্য-আলোচনা প্রথমভাগ—দৈত্যখণ্ড, ত্রিপুরখণ্ড, ত্রিলোচনখণ্ড, দক্ষিণখণ্ড, তৈদক্ষিণখণ্ড, প্রতীতখণ্ড, বৃক্ষাখণ্ড, ছেংখোম্পাখণ্ড, ডাঙ্গরফাখণ্ড, রত্নমাণিক্যখণ্ড—এই দশ খণ্ডে বিভক্ত।

প্রথমভাগের ইতিহাসভাগ সংস্কৃতে ছিল—সে বৃত্তান্ত শুক্রেখর ও বাণেশ্বর রাজপণ্ডিতদ্বয় ভাষায় অমুবাদ করিতে স্বীকার করিলেন না। অগত্যা ধর্ম্ম-মাণিক্য চস্তাই চরমভেদের শরণাপন্ন হইলেন। ইনি ত্রিপুরভাষায় রচিত ইতিহাস হইতে বাঙ্গলা করিয়া যে কাহিনী শুনাইলেন, তাহাই **শুক্রেখর ও বাণেশ্বর** বাঙ্গলা পয়ারে অমুবাদ করিয়া লইলেন। (আদিকাল হইতে ১৪৫৮ খৃঃ)।

দ্বিতীয়ভাগ—অমরমাণিক্যখণ্ড, রত্নমাণিক্যখণ্ড, ধনুমাণিক্যখণ্ড, বিজয়মাণিক্যখণ্ড, অনন্ত-মাণিক্যখণ্ড, উদয়মাণিক্যখণ্ড, জয়মাণিক্যখণ্ড, অমরমাণিক্য(২য়)খণ্ড, রাজ্যধরমাণিক্যখণ্ড, যশোধরমাণিক্যখণ্ড ও কল্যাণমাণিক্যখণ্ডে বিভক্ত—এবং একাদশ জন রাজার বিবরণ-সংবলিত। এইভাগে ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা-রাজ্যের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃত আছে। এই ভাগের সঙ্কলয়িতা **সিদ্ধান্তবাগীশ**, ইনি এই খণ্ড-সঙ্কলনে সেনাপতি রণ-চতুর নারায়ণের নিকট উপকরণ পাইয়াছিলেন।

এই সময়ে প্রাচীন রাজমালার সংশোধন হয়—“পুরাতন রাজমালা আছিল রচিত। প্রসঙ্গতে অলম্বিক ভাষা যে কুৎসিত।” ‘অলম্বিক’ অর্থ অসংলগ্ন এবং কুৎসিত ভাষা অর্থ খাঁটি প্রাকৃত। মনসামঙ্গল-রচক বিজয়গুপ্ত যেরূপ তাহার পূর্ববর্ত্তী কবি কাণা হরিদত্তের ভাষার দোষ গাহিয়াছেন, এই অভিযোগ তদনুরূপ। তথাপি আমরা সেই প্রাচীন রাজমালাখানি পাইলে বেশী সুখী হইতাম।

তৃতীয়ভাগ—গোবিন্দমাণিক্য, ছত্রমাণিক্য, রামমাণিক্য, রত্নমাণিক্য, মহেন্দ্রমাণিক্য, ধর্ম্ম-মাণিক্য(২য়), মুকুন্দমাণিক্য, ইন্দ্রমাণিক্য, জয়মাণিক্য, উদয়মাণিক্য এই দশজন নৃপতির ইতিহাস-সংবলিত। ইহাতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর কিঞ্চিৎ উৎকাল পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণ আছে। এই ভাগ **দুর্গামণি উজ্জিন্ন**-বিরচিত। এই ভাগের উপক্রমণিকায় দুর্গামণি উজ্জিন্ন লিখিয়াছেন, তিনি পূর্বভাগের শুধু ভাষা পরিবর্তন করেন নাই, তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে অনেক তথ্য তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের (১৪৫৮ খৃঃ) রাজত্বকালে রাজমালা ত্রিপুর-ভাষায় লিখিত ছিল, আমরা এরূপ উল্লেখ পাইয়াছি, “পূর্বে রাজমালা ছিল ত্রিপুর-ভাষাতে”—কিন্তু এই রাজার আদেশে রাজমালা “সুভাষাতে” বিরচিত হইল। ‘সুভাষা’ অর্থ বাঙ্গলাভাষা এবং রাজা ধর্ম্মমাণিক্যের কালের এই “সুভাষাকে” দুর্গামণি উজ্জিন্ন

আক্রমণ করিয়া বলিয়াছেন, ইহা “অলয়িক কুৎসিত।” এইখানে আর একটি কথা বলার দরকার—কোন কোন ত্রিপুর-রাজের নাম মঙ্গোলিয়ান ভাষার চিহ্ন স্পষ্টই বহন করে, যথা, “ছেং থোম্পা” “ডান্সর ফা” “খিতুঙ্গ” প্রভৃতি। এক সময়ে চীনরাজাদের প্রভাব যে আঘাবর্তের উত্তর সীমানায়, বিশেষতঃ বঙ্গের উত্তরভাগে, খুব বেশী হইয়াছিল—তাহার প্রমাণ আছে। উত্তরের প্রভাব এদেশের শিল্পকলায়ও পরিদৃষ্ট হয়। যদিও ধীমান, বীতপাল প্রভৃতি ভারতীয় শিল্পাচার্যগণের প্রভাব স্বদূর উত্তর ও পূর্ব এশিয়ায় ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং যদিও ভারতীয় বৌদ্ধগণের প্রভাব চীন-জাপানের সর্বত্র দৃষ্ট হয়, তথাপি চীন সম্রাটের অধিকার মাঝে মাঝে বঙ্গদেশের উত্তর দিক পর্য্যন্ত ব্যাপক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; তন্মাত্র দৃষ্ট হয় বিশিষ্ট মুনি চীনদেশে বাইরা তান্ত্রিক সাধনা শিখিয়া আসিয়াছিলেন। ভারতীয় রাজগণ বিশেষ মগধাধিপতিরা এমন কি গোড়রাজগণের কেহ কেহ চীনরাজের নিকট দূত পাঠাইতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বঙ্গদেশেরই অনেক দেবমূর্তির চকু চীনদেশীয় লোকের চকুর ছায়। হয়ত প্রাচীন কোন যুগে উত্তর দেশের ভাস্করগণ কখনও কখনও এদেশে মূর্তি নির্মাণ করিতেন, তাহাদের তান্ত্রিক শিক্ষণরম্পরার প্রচেষ্টায় “দেবচকুর” উক্ত সংস্কার চলিয়া আসিয়াছে। জ্ঞানবংশীয়দের উপাধি ত্রিপুরা ও নিকটবর্তী জনপদের রাজারা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

মুসলমানদিগের প্রাধান্তের সময়ে মজুমদার, জুমলাদার, খাসনবিস, মহালানবিস প্রভৃতি উপাধি দ্বারা ব্রাহ্মণগণও পরিচিত হইতেন। ত্রিপুর-রাজগণের ঐরূপ চৈনিক বা জ্ঞানদিগের উপাধি গ্রহণ করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

আমরা পূর্বে লিখিয়াছি পুরাকাল হইতে এই রাজবংশের ১৮৪ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। ঋহু ইহাদের মধ্যে সপ্তমস্থানীয়—সুতরাং ঋহু হইতে মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য পর্য্যন্ত ১৭৭ জন ত্রিপুরার রাজার নাম রাজবংশাবলীতে আছে। ঋহু নামে কোন রাজা ছিলেন কিনা এবং যযাতির পুত্র ঋহুই এই ত্রিপুর-রাজদের আদিপুরুষ কিনা, এই সকল দ্রুহ প্রশ্ন-সমাধানের স্থান এখানে নহে। যখন চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় রাজগণের গোড়ায়ই ঐতিহাসিক গলদ দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ কোন জ্যোতিষ হইতে মাহুবের আবির্ভাব-ব্যাপার ঐতিহাসিকগণের ধারণার অতীত), তখন শুধু ত্রিপুর-রাজগণের কথা নহে, সেই চন্দ্রসূর্য্যবংশের অভিমানী সমস্ত রাজগণের বংশাবলীরই আদিকথা ঘোর অন্ধকারাবৃত। এই-সকল জল্পনা-কল্পনা লইয়া কালক্ষয় করা বিফল।

যে মুষ্টিমেয় আঘাবীর ত্রিপুর-রাজ্যে প্রথম আসিয়াছিলেন, তাহারা যে বিবৃত কিরাত ও অপরাপর অনাঘ্যসমাজে মিশিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। দৈত্যের পুত্র ত্রিপুর

ত্রিপুর। “জন্মাবধি না দেখিল ঘিজ সাধু ধর্ম্ম। সেই হেতু নৃপতি হইল
ক্রুরকর্ম্ম। দানধর্ম্ম না দেখিল আগম পুরাণ। বেদশাস্ত্র না

পঠিল নাহি কোন জ্ঞান। দীক্ষিত না হৈল, দেববিজ না চিনিল। সন্ন্যাসের ব্যবহার কিছু না দেখিল। কিরাত-প্রকৃতি হৈল কিরাত-আচার।” শুধু ইহাই যথেষ্ট নহে, ত্রিপুর নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

“আপনাকে আপনি দেবতা করে জ্ঞান।

মানা করে অথবা যদি করে যজ্ঞ দান ॥”—রাজমালা, ত্রিপুরখণ্ড ।

কিন্তু তাঁহার অত্যাচার ও অনীখর-বাদ বশুত্বরা বেশী দিন সহ করিতে পারিলেন না। তিনি নিহত হইলেন এবং তৎপত্নী হীরার গর্ভে শিবাংশে ত্রিলোচন রাজার জন্ম হইল। এই শিব হইতে উদ্ভবের প্রবাদ কুচবিহারের রাজাদেরও আছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের বাণ রাজা শিবের পুত্রবৎ ছিলেন, পুরাণে লিখিত আছে শিব কার্তিক হইতেও তাঁহাকে বেশী ভাল-বাসিতেন। কোচ, কিরাত প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা শিবের অনুচর বলিয়া কল্পিত হইয়াছে।

ସମ୍ଭବ, ଚଳା ଓ ସ୍ଥିରାବସ୍ଥା

স্বৰ্গ, চন্দ্র ও ত্রিশূলচিহ্ন
হীরাব গর্ভে শিবের ঔরসে উৎপন্ন বলিয়া ত্রিলোচন রাজা পরম
শৈব হইলেন। ইহার পার্শ্বত্যা নাম ছিল “সুবড়াই।” ইনি ত্রিপুর-
রাজের ক্ষেত্রজ-পুত্র, স্মতরাং চন্দ্রবংশীয় চিহ্ন—নিশান ও চন্দ্রস্বজের উত্তরাধিকারী, এদিকে
শিবসম্বৃত—এজন্ত ত্রিশূলচিহ্নযুক্ত স্বজও ব্যবহার করিতেন। তদবধি ত্রিপুরার রাজবংশের
স্বজে চন্দ্র ও ত্রিশূল উভয়বিধ চিহ্নই দৃষ্ট হয়।

ত্রিলোচন রাজার সময়ে রাজ্যে কয়েকটি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। কপিলমুনির আশ্রম—
ত্রিবেগে প্রথমতঃ এই বংশের রাজধানী ছিল। ত্রিপুর খুব পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন এবং

জিলাচন ।

বহু রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যে নানা পার্শ্ব-
জাতির বাস হেতু—দেশময় অনার্য-প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ত্রিলোচন সর্বপ্রথম ত্রিপুর-সমাজে আর্থ্য-আচার প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সমুদ্রকূল হইতে চতুর্দশ দেবতা আনিয়া রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে যে সকল 'দেওড়াই' পুরোহিত আসিলেন, তাঁহারা লোকদিগকে আর্থ্য আচার শিখাইলেন। ত্রিলোচন রাজার রাজ্যের দ্বিতীয় গুরুতর ঘটনা,—কাছাড়ের রাজার (হেরদাধিপতির) কন্যার সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বরের বিবাহ। অপুত্রক হেরদাধিপতি তাঁহার এক দৌহিত্রকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করেন। এই দুই রাজ্যের সঙ্গে এবং বিধি সম্বন্ধ হওয়ায় ত্রিলোচনের পুত্রদের রাজ্যের সীমা ও

শক্তি খুব বাড়িয়া যায়। কথিত আছে, ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের
সমকালিক এবং নিমগ্নিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত
হেরথাষিপতির কস্তার
সঙ্গে বিবাহ।

হইয়াছিলেন। ত্রিলোচনের বারটি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে একটি

হেরদ্বরাজ্যের অধিকার লাভ করেন। তিনিই ছিলেন সৰ্ব্বজ্যেষ্ঠ। আর একাদশ জনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ 'দক্ষিণ' সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অপর দশজনের প্রত্যেককে পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্তের অধিপতি করিয়া 'মণ্ডলাধিপতি' নিযুক্ত করেন। আদি-উপনিবেশের সময়ে যে আৰ্য্যসৈন্য আসিয়াছিল, রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে পরিচালনা করিতেন। জ্যেষ্ঠপুত্র কাছাড়ের অধিকার পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তিনি উত্তরাধিকার-হত্রে সমস্ত রাজ্যের অধিকারী—এই দাবী ফাঁদিয়া বহুদিন যুদ্ধবিগ্রহ করেন।

এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে ক্লান্ত ও মহাক্ষতিগ্রস্ত হইয়া একাদশ ভ্রাতা ত্রিবেগের রাজধানী
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হেরম্মাদিপতিকে দিয়া তাঁহারা আরও সন্নিহিত আসিয়া বরবক্র নদীর তীরবর্তী

খলংমা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন। বরবক্র-তীরে দক্ষিণ রাজ্যের সৈন্তেরা আত্মকলহ করিয়া এবং মারামারি কাটাকাটি করিয়া অনেকে (৫০,০০০) ধ্বংস পাইল। দক্ষিণের মৃত্যুর পর তৈদক্ষিণ রাজা হইয়া মেখলী রাজ্যের (মণিপুরের) কন্যাকে বিবাহ করিলেন। সুতরাং ত্রিপুর-রাজগণ কাছাড় ও মণিপুরের রাজাদের সঙ্গে আদান-প্রদান ঘাণী তাঁহাদের সামাজিক প্রগতি আরও একটু জটিল করিয়া তুলিলেন। তৈদক্ষিণ হইতে একচল্লিশ স্থানীয় ভূপতি শিক্ষারাজ্য নরমাংস খাইতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই সময়ে ছাখুল নগর (কৈলাসহরের অন্তর্ভুক্ত) শিবমন্দিরাদি শোভিত হইয়া সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠে। ক্রম্ভু হইতে ৯৫ স্থানীয় 'কুমার রাজা' অনেক সময়ে এই নগরীতে বাস করিতেন। কাছাড়ের সঙ্গে ত্রিপুর-রাজগণের মধ্যস্থ ঘনিষ্ঠতর হইল। ক্রম্ভু হইতে ১০৭ স্থানীয় প্রতীত নামক ত্রিপুর-রাজের সহিত হেরদ্বরাজের একসময়ে খুব বেশী ভাব হইয়াছিল। উভয় কুলই উত্তরকালে একব্যক্তি হইতে সম্ভূত, এজন্ত দুই রাজা একত্র হইয়া উভয়রাজ্য শাসন করিবেন, এই মনস্থ করিয়াছিলেন। এদিকে কামাখ্যা, জয়ন্তী পাহাড় প্রভৃতি দেশের রাজারা দেখিলেন, এই দুই পরাক্রান্ত রাজা সম্মিলিত হইলে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি ইহাদের রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া যাইতে বিলম্ব হইবে না। সুতরাং তাঁহারা চক্রান্ত করিয়া এক সুন্দরী রমণীকে ইহাদের মধ্যে ভেদ জন্মাইবার নানারূপ শিক্ষা দিয়া ভেটস্বরূপ রাজদ্বয়ের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। সুন্দ-উপসুন্দের মত, দুই রাজা এই রমণীকে উপলক্ষ করিয়া পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে উত্তৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে হেরদ্বরাজ

অহতপ্ত হইয়া ত্রিপুর-রাজের বিরুদ্ধে সংকল্পিত অভিযান হিমতি রাজা। পরিত্যাগ করিলেন। রাজা হিমতি (প্রতীত হইতে ৫ম স্থানীয়)

রাজ্যমাটি দখল করেন। রাজ্যমাটিতে 'লিকা' নামক এক জাতি বাস করিত, তাহারা যুদ্ধ পরাক্রান্ত হইল। এই রাজ্য অধিকার করিয়া ত্রিপুর-রাজ নিম্নভূমিতে অবতরণ করিয়া বঙ্গদেশের বিশাল-গড় প্রভৃতি পর্তুগীজ-সম্মিলিত পল্লীগুলি দখল করিয়া লইলেন। রাজ্যমাটিতেই

বিশাল-গড়, বৈকুণ্ঠপুর হিমতি রাজার অতি বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু ঘটে—যে স্থানে তাঁহার ভৌতিক দেহ চিতাঘাতে দগ্ধ করা হয়, সেই স্থানের নাম 'বৈকুণ্ঠপুর'

দিয়া ত্রিপুরবাসীরা এক মঠ নির্মাণ করেন।

ক্রম্ভু হইতে ১৩৩ স্থানীয় ছেংখোম্পা রাজার সময়ে গোড়ের রাজার এক প্রবল-পরাক্রান্ত সেনাপতি ছিলেন। তিনি ত্রিপুর-রাজ্যের দক্ষিণাংশ লুণ্ঠনাদি করাতে উভয় রাজার মধ্যে যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। সেনাপতি হীরাবস্ত্র খা

কীর্ত্তির বা ছেংখোম্পা।

গোড়ের দুই তিন লক্ষ সৈন্ত লইয়া ছেংখোম্পার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। ত্রিপুর-রাজ ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ত্রিপুরার মহারাজী ত্রিপুরাসুন্দরী স্বীয় কাপুরুষ মহারাজী ত্রিপুরাসুন্দরী স্বামীকে বিস্তর ভৎসনা করিয়া স্বীয় সৈন্তদলের নেতৃত্ব করিতে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহার উৎসাহবাক্যে ত্রিপুর-সৈন্তেরা জীবন পণ করিয়া

যুদ্ধ করিতে অঙ্গীকার করিল। তিনি ত্রিপুর-সৈন্তদিগকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “গৌড়সৈন্ত আসিয়াছে যেন যম কাল। তোমার নৃপতি হৈল বনের শূণ্য। যুদ্ধ করিবারে আমি বাইব আপনে। যেই জন বীর হও চল আমা সনে।” (রাজমালা, ছেংখোম্পাখণ্ড)। তাঁহাদের অহুকুল প্রতিশ্রুতি পাইয়া মহাদেবী স্বয়ং রক্তন-কাঞ্চীর তত্ত্বাবধায়িকা হইয়া মহিষ, গবয়, মেঘ, হংস, হরিণ, নানারূপ পক্ষী, অসংখ্য শূকর প্রভৃতির মাংস রক্তন করাইলেন, “সহস্র সহস্র মস্তুর কলস ও দধি-হুঙ্কাতির ভাণ্ড” আনীত হইল এবং ত্রিপুরার কুকি ও রাজ-সৈন্ত একত্র হইয়া মহারাজ্যের এই খাণ্ড-সম্ভার উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হইল। মহারাজ্যের রণবেশ ও উগ্রচণ্ডী মূর্তি দেখিয়া অগত্যা রাজাকেও রণক্ষেত্রে যাইতে হইল।* হীরাবস্ত খাঁর খড়্গের কোষ স্বর্ণ-নির্মিত ছিল এবং মাধায় সোনার পাগড়ী এবং অঙ্গে সোনার ‘জিরা’ (বস্ত্র) ঝলমল করিতেছিল। ত্রিপুর-সৈন্ত মহারাজ্যের নেতৃত্বে দুর্জয়বেগে গৌড়সৈন্তকে আক্রমণ করিল এবং হীরাবস্ত খাঁয়ের রাজবেশ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার দিকেই জোরে আক্রমণ চালাইল। গৌড়সৈন্ত পরিণামে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল। কথিত আছে এই মহাহবে একলক্ষ সৈন্ত নিহত হইয়াছিল। এই সময়ে রাজা উর্জদিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, একটি মুণ্ডহীন কবন্ধ আকাশে নাচিতেছে, একদণ্ড নৃত্য করিয়া কবন্ধ ধরাশায়ী হইল। এক লক্ষ সৈন্তের মৃত্যু হইলে নাকি রণক্ষেত্রে—একটি কবন্ধ দেখা দেয়।† রাজা বুঝিলেন, এই যুদ্ধে একলক্ষ লোক মরিয়াছে। ভীকু রাজা চোখে সরিষা ফুল দেখিয়াছিলেন, কিংবা কবন্ধ দেখিয়াছিলেন বলা যায় না। যুদ্ধ জয় করিয়া ছেংখোম্পা সেই হতাহত সৈন্ত-সমূহ যুদ্ধক্ষেত্রে এক তিল স্থান বসিবার উপযোগী পাইলেন না; তখন তাঁহার জামাতা রণে পতিত এক অতিকায় হস্তীর বৃহৎ দন্তদ্বয় খড়্গাঘাতে কাটিয়া রাজাকে বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। রাজা জামাতার বিক্রম দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং জামাতাকে সম্মানিত করিলেন। তদবধি রাজপুত্রদের সঙ্গে ত্রিপুরায় রাজ-জামাতারা একসঙ্গে একাসনে বসিবার অধিকার পাইলেন এবং জামাতারা সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পূর্বে তাঁহাদের প্রত্যেকের জ্ঞাত রাজ-সরকারের দৈনিক একসের মাত্র চাউল বরাদ্দ ছিল। ত্রিপুরা-সুন্দরী জোয়ান ডি আর্কের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। গৌড়েশ্বরের সঙ্গে এই যুদ্ধ ১২৪০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল, তখন

*

“রাণি সঙ্গে সৈন্তগণ যুদ্ধে প্রবেশিল।”

ত্রিপুরা-সুন্দরী রাণি হস্তী সোয়ার হৈল।

*

দ্বাদশত পকাশ সন ত্রিপুরা যখন (১২৪০ খৃঃ)

ত্রিপুরা-সুন্দরী রাণি করে এই রণ।—ত্রিপুর-বংশাবলী।

† কোন কোন পুরাণে এবং তুলসীদাসের রামায়ণে এক লক্ষ লোক রণক্ষেত্রে নিহত হইলে ঐরূপ কবন্ধ বেশা যায়, এই প্রবাদ পাওয়া যায়। রাজমালা-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন তাহা তাঁহার উক্ত রাজ্যসম্বন্ধীয় “মধ্যমণি”তে উল্লেখ করিয়াছেন।

গৌড়েশ্বর ছিলেন সম্ভবতঃ লক্ষণসেনের বংশধর স্বর্ণগ্রামের কোন রাজা। * পূর্ববঙ্গে তখনও হিন্দু শাসন অক্ষুণ্ণ ছিল। কেশবসেন অথবা দনোজ মাধব হয়ত এই সময়ে স্বর্ণগ্রামে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইহারা সকলেই 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করিতেন।

ছেংখোম্পার পুত্র আচোঙ্গ ফার সময়ে আর একটি প্রথা প্রবর্তিত হয়। রাজার নাম অনুসারে শুধু "মা রাণী" যোগ দিয়া মহারাজার নাম রচিত হইত, যথা আচোঙ্গের মহিষীর উপাধি হইল "আচোঙ্গ মা-রাণী", তৎপুত্র "খিচোঙ্গের" রাজ্য "খিচোঙ্গ মা-রাণী" এই নামে অভিহিত হইতেন। কিন্তু এই প্রথা খুব দীর্ঘকাল ছিল না। আচোঙ্গরাজ জয়ন্তের (জৈন্তাপাহাড়) রাজ-কন্ডার পাণিগ্রহণ করেন। সুতরাং ত্রিপুর-রাজ্যের সঙ্গে কাছাড়, মণিপুর ও জৈন্তাপাহাড়-রাজ্যের আদান-প্রদানের সম্বন্ধ হইয়াছিল। আচোঙ্গ রাজার পুত্র ডাঙ্গর ফার ১৮টি পুত্র জন্মে; ইহাদের কাহাকে রাজ্যদান করিবেন, এই সমস্তায় তিনি বিব্রত হইয়া পড়েন; অবশেষে স্থির করিলেন, যিনি সর্কাপেক্ষা বুদ্ধিমান তিনিই রাজ্যের অধিকারী হইবেন। বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করিবার জন্ত তিনি ১৮টি পুত্রকেই একস্থানে খাওয়াইতে বসাইয়া কুকুর-রন্ধককে ত্রিশটি অভুক্ত কুকুর ছাড়িয়া দিতে ইঙ্গিত করিলেন। ক্ষুধার্ত কুকুরগুলি ছুটিয়া আসিয়া কুমারগণের পায়ে মুখ দিল, সুতরাং তাহারা খাত্ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন; সর্ককনিষ্ঠ পুত্র রত্ন ফা কিন্তু আসন ত্যাগ করিলেন না, কুকুর তদীয় অন্নপাত্রের সন্নিহিত দেখিয়া তিনি দূর হইতে ভাত ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন, তাহাতে কুকুরগুলি দূরেই রহিয়া গেল, ইতিমধ্যে তিনি আহার সমাধা করিয়া ফেলিলেন। কনিষ্ঠ পুত্রের বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া রত্ন ফাকে গৌড়েশ্বরের সভায় পাঠাইয়া দিলেন এবং বাকী ১৭ জনের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া তাহাদিগকে "রাজাফা" নামক জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধীনে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। রাজাফা যৌবরাজ্য পাইয়া "রাজনগরে" স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন। তৎপরে নিম্নলিখিত স্থানগুলির শাসনভার অপরাপর কুমারদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন—(১) কাইচরঙ্গ (২) আচরঙ্গ (৩) তারক (৪) বিশালগড় (৫) ঘুটিমুড়া (৬) নাকি বাড়ী (৭) আগরতলা ("আগরফা পুত্রে রাজা আগরতলা দিল"—ডাঙ্গফাখণ্ড, রাজমালা) (৮) মধুগ্রাম (৯) ধর্ম্মনগর (১০) ধানাংচি (১১) ধোপাপাথর (১২) লাউগঙ্গা (১৩) মোহিরীগঙ্গা (১৪) বরাক নদীতীর অবধি (১৫) তেলাইকঙ্গ (১৬) মণিপুর। রাজাফা—সকলের উপরে; তিনি রাজনগরে বাস স্থাপন করিলেন, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এই প্রদেশগুলি এক বহু বিস্তৃত রাজ্যের সীমা প্রদর্শন করে। এক দিকে পদ্মানদী—অপর দিকে নাগা-পাহাড়। উত্তরে খাসিয়া পাহাড় এবং দক্ষিণে সমুদ্র—মোটামুটি এই ভাবে সীমা নির্দেশ করা বাইতে পারে।

রত্নফা বহুসৈন্ত ও ধনরত্ন লইয়া গোড়ে গমন করেন। গৌড়েশ্বরের সঙ্গে ডাঙ্গরফার বিশেষ মোহাদ্দ্য ও মৈত্রী ছিল এবং রত্নফা তথায় থাকিয়া রাজনীতি শিখিতে পারিবেন,—

"যে সময়ে এই যুদ্ধ ত্রিপুরায় হইল।

গৌড়দেশে সেনবংশী রাজগণ ছিল।"—ত্রিপুর-বংশাবলী।

পিতা মহারাজের এই অভিপ্রায় ছিল। রত্নকার মাতা পুত্র-বিরহে যে বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া অনেক পল্লীগাথা রচিত হইয়াছিল। (“তান মাতা মনঃ

রত্নকার মাতার পুত্র-
বিরহ, পল্লীগাথা।

জুখে কাঁদিল বিস্তর। সে কথা গীতেতে গায় লোকে ততঃপর।
ত্রিপুরার কত বয়স ছাগ অস্ত্রে বাজে। সেই বস্ত্রে গীত গায় ত্রিপুর
সমাজে।”—রাজমালা, ডাঙ্গরফা খণ্ড)। গোড়েশ্বর রত্নফাকে
আশ্রয় দিলেন; তাঁহার সৈন্তেরা ঘুঘুরা-কীট মাটা হইতে ধরিয়া খাইত, এইজন্ত গোড়ীয়েরা
গোড়েশ্বর এবং রত্নফা। তাহাদিগকে উপহাস করিত। গোড়েশ্বর তাহা শুনিয়া রাজকুমারকে
এজন্ত একটু ঠাট্টা করেন। রত্নফা বলিলেন, “ত্রিপুরার ভদ্রসমাজে—

রাজবংশে এজুপ আচার নাই। আমাদের রাজ্যের কুকী প্রজারা এইরূপ খাওয়া খাইয়া থাকে।”
গোড়েশ্বর এই উত্তরে প্রীত হইলেন, এবং কুকী, কিরাত প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় প্রজার
বাস-বিশিষ্ট ত্রিপুর-সাম্রাজ্যের বিশালতা অনুমান করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ হইলেন।

একদা শুভ সোমবারে যথারীতি গোড়ের বেণ্ডারা রাজদর্শনার্থ রাজপ্রাসাদে সমাগত
হইল। ইহারা সমারোহ করিয়া আসিতেছিল, কাহারও নফর চাকরেরা স্বর্ণখচিত নিশান লইয়া
অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে; কোন রমণী রত্নভূষিত বস্ত্র ও মণিমাণিক্যের গহনা পরিয়া ঘোড়ায়
চড়িয়া আসিতেছে, কেহ শকটে চলিয়াছে; তাহাদের “প্রধানিকা” বহুমূল্যবস্ত্রাবৃত
চৌদোলার বাইতেছে, উৎসুক দর্শকগণ চৌদোলার নিকট ভিড় করিলে ছড়িদারেরা বেত্রাঘাত
করিয়া জনতা ঠেকাইয়া রাখিতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া কুমার রত্নফা প্রধানিকাকে
গোড়ের রাজা মনে করিয়া সন্তোষে বাইয়া অগ্রে দাঁড়াইলেন এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।
চতুর্দিকে হাসির রোল পড়িয়া গেল। সেই প্রধানী গণিকার চক্ষেও হাসি খেলিয়া গেল;
কুমারের সুশ্রী মুষ্টি ও বুদ্ধিহীনতা দেখিয়া তাঁহার ক্রোধ হইল। এই ঘটনা গোড়েশ্বরের কাণে
গেল। তিনি কুমারকে এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। লজ্জায় রত্নফার মুখ রাঙ্গা হইয়া গেল;
তিনি আড়ষ্ট ভাবে অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, তিনি উহাকে মহারাজা বলিয়া ভুল
করিয়াছিলেন। বাদসাহ কুমারের এই নিষ্পাপ হৃদয়ের সারল্যে
গণিকাকে সন্তোষে প্রণাম। মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার মুখ স্নান দেখিতেছি, তোমার
পিতা কি তোমাকে রীতিমত বৃত্তি পাঠান না।” রত্নফা বলিলেন, “আমি কনিষ্ঠপুত্র, পিতা
আমাকে আপনার আশ্রয়ে পাঠাইয়াছেন এবং অপর্যাপন্ন ভ্রাতাদিগের মধ্যে রাজ্য বণ্টন করিয়া
দিয়াছেন।”

গোড়েশ্বর এই কথায় ক্রোধাবিত হইলেন এবং তাঁহাকে পিতৃরাজ্য বলপূর্বক গ্রহণ
করিবার জন্ত বহু সৈন্তসমেত ত্রিপুরার পাঠাইয়া দিলেন। “জমির খাঁর গড়ে” যে যুদ্ধ
হইল, তাহাতে ডাঙ্গরফা পরাস্ত হইয়া পর্বতে পলাইলেন,
‘জমির খাঁর গড়ে’ যুদ্ধ। তথায়ই তাঁহার মৃত্যু হইল। এই যুদ্ধ জয় করিয়া রত্নফা
রাজ্যমাটির অধিকার লাভ করিলেন; তৎপরে ক্রমে ক্রমে অপর সমস্ত ভ্রাতাকে জয় করিয়া
সমস্ত ত্রিপুর-রাজ্য দখল করিয়া ফেলিলেন। এই সকল যুদ্ধ-সংক্রান্ত স্থানগুলি রাজমালায়

উল্লিখিত আছে—যথা, থানাংচি, তৈতানব, ছায়ের নদী (এইখানে ভ্রাতৃগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ার মন্যতা করেন), তৈলাইঙ্গ, কাবটৈ (এই স্থানে ভ্রাতারা বন্দী হইয়া জন্দন করিয়াছিলেন), সমার (এই স্থানে এক রাজকুমারের শির কর্তিত হইয়াছিল) (আমরা এখানে কালীপ্রসন্নবাবুর সহিত একমত হইয়া—মুড়া অর্থে পর্কতের শৃঙ্গ মনে করিতে পারি না), তৈলাইঙ্গ (এই স্থানে ভ্রাতারা খাড়াভাবে কদলীর খোসা খাইয়াছিলেন) ।

যুদ্ধ জয় করিয়া রত্নফা গোড়েশ্বরকে বহু হস্তী ও অন্ত্যস্ত উপঢৌকন প্রদান করেন । রত্নফা গোড়েশ্বর হইতে “মানিক্য” উপাধি প্রাপ্ত হন । রত্নফার মৃত্যু পাওয়া গিয়াছে, তাহার তারিখ ১৩৬৩ খৃঃ অব্দ । সুলতান সামসুদ্দিন ১৩৪৭ খৃঃ হইতে ১৩৫৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন । ইহার রাজনগর (ত্রিপুরা)

আক্রমণ করিয়া বহু অর্থ ও হস্তী পাওয়ার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় । সুলতান খুব সম্ভব সুলতান সামসুদ্দিন হইতেই ত্রিপুরার রাজাদের ‘মানিক্য’ উপাধি চলিয়া আসিয়াছে । মহারাজ রত্নমানিক্যের সঙ্গে গোড়েশ্বরের এই সৌহার্দ্যের হেতুতে তিনি

মানিক্য উপাধি ।
বঙ্গলা হইতে ১০,০০০ ঘর বঙ্গালী লইয়া গিয়া তথায় তাঁহাদিগকে উপনিবিষ্ট করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন । তদনুসারে তিনি বঙ্গে স্বর্ণগ্রাম হইতে ৪,০০০ সেনা ও বহু ভদ্রলোক লইয়া তাঁহার রাজ্যে বাস করাইয়াছিলেন । রাজ্যমাটিতে দুই হাজার ঘর, রত্নপুরে এক হাজার, বশপুরে ৫০০ এবং হীরাপুরে ৫০০ ঘর বঙ্গালী উপনিবেশিক । বঙ্গালী উপনিবিষ্ট করাইয়াছিলেন । ইহাদের অনেকে সৈন্ত-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল । রত্নমানিক্যের সময় হইতে বঙ্গালীর সঙ্গে এই ভাবে ত্রিপুরার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হওয়ায় তথায় এদেশের শিক্ষাদীক্ষা প্রবেশের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল ।

দ্বিতীয়া পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মমানিক্য

ক্রম্ হইতে ১৪১ স্থানীয় মহামানিক্যের পুত্র মহারাজ ধর্ম্মমানিক্য প্রথম-যৌবনে সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিলেন । কালীতে কোতুক নামক এক ব্রাহ্মণ, ইনি রাজা হইবেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন । ধর্ম্মমানিক্য অতঃপর দেশে ফিরিয়া আসিয়া রাজা হইলেন । তিনিই ত্রিপুরা-ভাষা হইতে রাজমালা বঙ্গলা পদ্যে অনুদিত করাইয়াছেন । “পূর্বে রাজমালা ছিল ত্রিপুর ভাষাতে । পদ্যে গাথিল সব সকলে বুঝিতে । সুভাষাতে

ধর্ম্মমানিক্য—১৪৩১ খৃঃ

১৪৬২ খৃঃ ।

ধর্মরাজ রাজমালা কৈল। রাজমালা বলিয়া লোকেতে নাম হৈল।” এতদ্বারা বোঝা যায় ত্রিপুরার বৃহৎ সাম্রাজ্যে তখন বাঙ্গলা ভাষাই প্রচলিত হইয়াছিল। ধর্মমাণিক্যের সময়ে বহু দীর্ঘ খনন করা হইয়াছিল। কুমিল্লার বৃহৎ “ধর্মসাগর” এই রাজ্যের প্রধান কীর্তি। ইনি বহু ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। একখানি তাম্রপত্রের কতকাংশ রাজমালায় উদ্ধৃত হইয়াছে—উহা ১৩৮০ (১৪৫৮ খৃঃ) শকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ত্রিলোচন রাজ্যের সময় হইতে ১০ জন সেনাপতির উপর সৈন্তবিভাগের কর্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছিল। ইহারা ক্রমে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। ধর্মমাণিক্যের

প্রতাপমাণিক্য (কয়েক পুত্র প্রতাপমাণিক্য অত্যাচারী হওয়ার সেনাপতিগণ তাঁহাকে হত্যা

করে ; রাজ্যী তৎকনিষ্ঠ ধনকে লুকাইয়া রাখেন—বালক তখন একাদশবর্ষীয় ছিলেন। পুরোহিত ইহাকে লইয়া আসেন এবং সেনাপতিরা ইহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। প্রধান সেনাপতি ইহাকে স্বীয় কন্যা দান করেন। ইনিই ত্রিপুরার ইতিহাস-বিশ্রুত রাজ্ঞী কমলা দেবী। ধর্মমাণিক্য সিংহাসনে আরুঢ় হইয়া অল্প বয়সেই প্রবীণের দ্বায় অভিজ্ঞতা দেখাইতে লাগিলেন। ইনিই ত্রিপুর-রাজ্যের অবিসংবাদিতভাবে

সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। ইহার পুরোহিতই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, রাজমালায়

ধর্মমাণিক্য—১৪৬৩ খৃঃ—
১৫১৪ খৃঃ।

প্রথমে রাজ্যের সর্বপ্রধান কার্য্য হইল, সেনাপতিদিগকে খর্ব্ব করা।

প্রত্যেক সেনাপতির অধীন ৫,০০০ সৈন্ত ছিল, সুতরাং ১০ জন সেনাপতি ৫০ হাজার সৈন্তের অধিনায়ক ছিলেন। এই দশ জন সেনাপতির ভ্রত্বদ্বীতে রাজাকে উঠিতে বসিতে হইত। পুরোহিত রাজাকে উপদেশ দিলেন, “কোলাহল কি কারণে বাড়াইতে চাহ। নখে ছেদি বৃক্ষে, কেন কুঠার লাগাহ। মহা ব্যাধি জন্মে যদি অধিকাদ্ব হয়। বিকৃতি আকার দেখি লজ্জা যে জন্ময়। অল্প দিয়া ছেদ করি তারে যদি ফেলে। তবে তাকে উপহাস না করে সকলে।

অতি শিষ্ট না হইবে নাতিক্রোধমতি। এই মতে বুঝায়েছে গুঢ় বৃহস্পতি। রাজসিক ভাব যদি রাজ্যের না হয়। অতি শিষ্ট হৈলে তাঁর জীবন সংশয় ॥” (রাজমালা, ধর্মমাণিক্যখণ্ড)।

পুরোহিতের উপদেশে রাজা তিন মাস কাল অন্তঃপুরে থাকিয়া মল্লবিজ্ঞা শিখিতে লাগিলেন, তাঁহার দেহ বলিষ্ঠ ও বিশাল হইল। পীড়ার ভান করিয়া ইনি কাহারও সহিত দেখা করিতেন

না, এমন কি মহারাজ্ঞী কমলা দেবীও তথায় ঢুকিতে পারিতেন

না। অতঃপর একরাত্রে সেনাপতিদিগকে রাজদর্শনের অহুমতি

দেওয়া হইল ; রাজগৃহে ৩০৪০ জন গুপ্তদাতক প্রস্তুত ছিল। সেনাপতিরা যখন রাজাকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া বাইবেন, তখন গুপ্তদাতক-দল রাজ্যের ইন্ধিতে তাঁহাদের প্রত্যেককে বধ করিল। এই সেনাপতিগণের বল-দৃশ্য মণ্ডলী হইতে নিকৃতি লাভ করিয়া রাজা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে অলস্ত ভাবেরের দ্বায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

সেনাপতিগণের গৃহ লুপ্ত হইল, তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রগণকে পর্য্যন্ত বধ করা হইল এবং তৎস্থলে স্বীয় আয়ত্ত্ব ভূত্যের দ্বায় আজাদীন সেনাপতি নিযুক্ত হইল। কথিত আছে,

ধন্তমাণিক্যের বার কোটি পদাতিক সৈন্ত ছিল। এই বর্ণনা নিশ্চয়ই অতিরঞ্জিত। সেনাপতিগণের উপাধি হইল “বড়ুয়া”; এই দুর্জয় সৈন্তবল লইয়া ত্রিপুরেশ্বর মেহেরকুল, পাটীকারা, গঙ্গামণ্ডল, বাগসারি প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া ক্রমশঃ বঙ্গদেশের নিম্নভূমির প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বেজুরা, ভাটুগাছ প্রভৃতি দেশের জঙ্গল কাটিয়া তিনি আবাদ করাইলেন। অবশেষে গোড়েশ্বরের রাজ্যান্তর্গত বরদাখাত পরগনা বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। বরদাখাতের রাজা প্রতাপ গোড়েশ্বরকে অগ্রাহ্য করিয়া ধন্তমাণিক্যের আত্মগত্য স্বীকার করিলেন। কেবল বিদ্রোহী রহিল খণ্ডল; এই রাজ্যও

বরদাখাত দখল।

গোড়েশ্বরের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং দ্বাদশ ‘বসিক’ বা মণ্ডলেশ্বরের দ্বারা শাসিত হইত। ধন্তমাণিক্য তথায় এক সেনাপতি পাঠাইয়া তাঁহাকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। বসিকেরা ইহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া গোড়েশ্বরের দরবারে হাজির করাইলেন। হস্তীর পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া ইহাকে হত্যা করিবার হুকুম হইল। কিন্তু এই দুর্জয় সেনাপতি খড়্গদ্বারা বিশজন সেনাকে হত্যা করিয়া হস্তীর শুণ্ডের উপর ক্রমাগত খড়্গাঘাত করিতে লাগিলেন। হস্তী ছুটিয়া পলাইয়া গেল, কিন্তু সেনাপতির খড়্গ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—এই অবস্থায় তাঁহাকে অল্প হস্তীর পদতলে ফেলিয়া বধ করা হইল। রাজমালায় লিখিত আছে, এই অদ্ভুত কর্ম্ম সেনাপতির

সেনাপতি চরচাগ।

বীরত্বের কথা শুনিয়া কেন ইহাকে হত্যা করা হইল বলিয়া গোড়েশ্বর হুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ধন্তমাণিক্যের ক্রোধ কালানলের জ্বায় অলিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি মনের ভাব সংবরণ করিতে পারিতেন। স্বীয় ক্রোধ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তিনি খণ্ডলের বৃসিকদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া ঠাঁহাদিগকে স্বীয় রাজধানীতে ডাকাইয়া আনিয়া কৌশলে প্রত্যেকটিকে হত্যা করিয়া খণ্ডল নির্ব্বিবাদে অধিকার করিলেন। ধন্তমাণিক্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন “চরচাগ”; ইনি খণ্ডলবাসীদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থকে বৃক্ষপত্র পরাইয়া ভিক্ষুক করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

ধন্তমাণিক্য তাঁহার সৈন্তগণের মধ্যে জাতিভেদের বৈষম্য ভালবাসেন নাই। সমস্ত সৈন্তকে একত্র করিয়া একদা এক মহোৎসব করিয়াছিলেন। পঙ্ক্তি অহুসারে যখন তাহারা খাইতে বসিয়াছিল, তখন কতকটা খাওয়ার পর এক হীনকুল-জাত কুকী-সরদার তাহাদিগের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবার ছলে একটা কাঠি দিয়া সকলের মস্তক স্পর্শ করিল। স্বয়ং মহারাণী কমলাদেবী

সৈন্তগণের মধ্যে জাতি-ভেদ বিলোপ, কাঠি ছোয়া।

এই ভোজন-ব্যাপারের পরিদর্শিকা ছিলেন। রাজভয়ে কুকীদ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াও কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না এবং ভোজন-ব্যাপারও কান্ত করিতে পারিল না। এই সকল সৈন্ত “কাঠি ছোয়া” নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই সময়ে একটি খেত হস্তীর অধিকার লইয়া আসামের (হেরদ দেশ) রাজার সহিত ধন্তমাণিক্যের বিরোধ উপস্থিত হইল। ধন্তমাণিক্য কাছাড়ের প্রসিদ্ধ ধানাহুর্গ অবরোধ করিলেন, এই গড় উচ্চ পাবাণ-নির্ম্মিত এবং দুর্লভ্য ছিল। আট মাস কাল সেনাপতি চরচাগ দুর্গ বেঁটন করিয়া রহিলেন, তথাপি আসাম-সৈন্ত

পর্যায় স্বীকার করিল না। একদা ত্রিপুর-সৈন্ত একটা গোসাপ ধরিল, পার্শ্বতা-প্রদেশের

গোদিকা—মহাকায় ও প্রবল শক্তিশালী। কথিত আছে, এই অদ্বিত

ধানাংছি হুগ্গ অধিকার।

জীব দৈর্ঘ্যে আট হাত ও প্রস্থে তিন হাত পরিমিত ছিল। চয়চাগ

ইহাকে ধরিয়া ইহার পুচ্ছের সহিত বেত্রের রজ্জু বাধিয়া দুর্গ-প্রাচীরের উপরে উঠিতে সৈন্তদের

তাড়না করিলেন, সেই বেত্র ধরিয়া একটি করিয়া সৈন্তেরা উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। তখন গভীর

রাত্রি, আসামসৈন্ত এই কার্যের কিছুই জানিত না। ত্রিপুর-সৈন্ত দুর্গ-প্রাচীরের সর্বোচ্চস্থানে

রজ্জু আটকাইয়া ফেলিয়া বস্ত্রার মত ধানাংছি গড়ে ঢুকিয়া পড়িল। দুর্গ অধিকৃত হইয়া গেল।

ধানাংছির সৈন্তেরা এত কাল দুর্গের প্রাচীরের উর্দ্ধদেশে বসিয়া নিয়ন্ত্রিত ত্রিপুর-সৈন্তের দিকে পা

খুলাইয়া দিয়া নানারূপ বিক্রম করিত, এইবার তাহারা শাস্তি পাইল। ধানাংছি গড় ত্রিপুরগণ

কর্তৃক অধিকৃত হইলে ইহার নাম হইল “ত্রিপুরা-পুরী।” এই দুর্গবিজয় সম্বন্ধে নানা কথা

রাজমালায় আছে। আট মাস ধরিয়াও যখন সেনারা প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই,

তখন চয়চাগ রাগিয়া সৈন্তদিগকে গালি দিয়া বলিয়াছিলেন—“তোমরা পুরুষ নও—মেয়ে

মানুষ, চরকা হাতে লইয়া অন্তঃপুরে যাও।” তাহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া শিবিরে ঘুমাইতে দেখিয়া

তিনি চালে দ্রুত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে সারা রাত্রি বৃষ্টিতে ভিজিয়া ত্রিপুর-সৈন্ত ঘুমাইতে

পারিত না। বাহা হউক অবশেষে দুর্গ জয় করিয়া চয়চাগ ধানাংছি গড় নররক্ত রঞ্জিত

করিলেন,—ত্রিপুর-সৈন্ত নারীগণকে লুণ্ঠন করিয়া অত্যাচারের একশেষ করিল। চয়চাগ

ইহার পরে পার্শ্বতা প্রদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত পাহাড়-

বিগম্বর কুকীদের বস্ততা

স্বীকার।

বাসী লোকদিগকে ত্রিপুরেশ্বরের অধীন করিলেন। সাখুল নামক

স্থানে স্বীয় শিবির স্থাপন করিয়া ‘ছাইমার’, ‘ছাইবেম’, ‘ছাকাচেঙ্গ’,

‘খামাচেব’, ‘বাম’, ‘রঙ্গ’, ‘ছাকা’, ‘রাঙ্গল’, ‘খামা’, ‘গুণৈছা’, ‘খুছুং’, ‘মাছিল’, ‘রাদ্দারব’

প্রভৃতি জাতীয় টিপ্রাগণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, তাহারা সকলে আসিয়া রাজধানীতে

স্বীয় স্বীয় প্রতিনিধিসহ ভেট পাঠাইল। ত্রিপুরার রাজধানীতে “সহস্র সহস্র কুকী আসিল

দিগম্বরী”—ইহারা ‘গজদন্ত’, ‘গবয়’, ‘ছাগ’, ‘কাংস্ত’, ‘বাত্ত’, ‘বোঙ্গ’, ‘রক্ত-কৃষ্ণ-শ্বেত-বস্ত্র’,

‘কাংস্ত ধালি’, ‘পিকদানী’, ‘তামার কঙ্কণ’, ‘উবাকের জলপাত্র’, ‘কিরাতিয়া খড়্গ’, ‘পিত্তল ও

কাঁসার ঝারি’ প্রভৃতি ভেট লইয়া আসিয়াছিল। ধন্তমাণিকা অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং

যখন কোন কোন সভাসদ সেনাপতি চয়চাগের দুই বৎসরের অস্থপস্থিতি এবং আসামের

বড়ুয়া কন্তাদের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তথায় কালাতিপাত সম্বন্ধে দুই একটি ইঙ্গিত করিল,

তখন রাজা একটু হাসিলেন মাত্র। বস্ত্ততঃ চয়চাগকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

ইহার পর চট্টগ্রাম বিজয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া ধন্তমাণিকা সৈন্ত পাঠাইলেন। হসেন

সাহের একদল সৈন্ত সেই স্থান অধিকার করিয়াছিল, ধন্তমাণিক্যের সৈন্তেরা তাহাদিগকে জয়

করিয়া ১৪৩৪ (১৫১৩ খৃঃ) অব্দে চট্টগ্রাম ত্রিপুর-রাজ্যের অন্তর্গত

হসেন সাহের সঙ্গে বিরোধ।

করিল। হসেন সাহ এই সংবাদ পাইয়া গৌড়মল্লিকের অধীন

বহু সৈন্ত দিয়া ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। এই সৈন্তশ্রেণীর মধ্যে ‘বার

ভূঞা'দের সৈন্তেরাও ছিল "(বার-বাঙ্গলা সৈন্ত গোড়মল্লিক সঙ্গে)"—গজারোহী, অখারোহী ও পদাতিক সৈন্তের অবধি ছিল না। মেহেরকুলে প্রথম যুদ্ধ হইল। ত্রিপুরার সৈন্তেরা এই যুদ্ধে পরাস্ত হইল, মেহেরকুল পাঠানের দখল করিল। হটিয়া গিয়া ত্রিপুর-সৈন্ত চণ্ডীগড়ে আশ্রয় লইল, গোড়মল্লিক কিছুতেই দুর্গ জয় করিতে পারিলেন না। ধন্তমাণিক্য গোমতীর একটা দিক্ সোনা মুরার মাটি কাটিয়া ভগ্নি করিয়া ফেলিলেন। এই নদী স্বল্পায়তন এবং অগভীর—কিন্তু খুব বেগশীলা। পাঠানেরা নিশ্চিন্তমনে সেই স্থানে শিবির স্থাপন করিল—এদিকে এক রাত্রে ধন্তমাণিক্য সেই নদীর বাধ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। পাঠান সৈন্ত বহু সংখ্যক ডুবিয়া মরিল। তখন ত্রিপুরেশ্বর শত্রুজয় কামনা করিয়া অভিচারের অনুষ্ঠান করিলেন। একটা চণ্ডালের মূণ্ড কাটিয়া অর্ঘ্যরূপে এই অনুষ্ঠান করা হইল, ত্রিপুর-সৈন্য সেই গোড়-মল্লিকের অপমান।

অভিচার-দর্শন করিয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। পাঠানেরা ভাবিল বহু সৈন্ত লইয়া বিজয়োল্লাসে ত্রিপুরগণ আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তাহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল এবং গোড়মল্লিক পরাস্ত হইয়া হুসেন সাহের দরবারে অবমানিত হইলেন। এই যুদ্ধ জয় করিয়া ধন্তমাণিক্য চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হইয়া পুনরায় সেই দেশ অধিকার করেন,—সেইখানে সেনাপতি "রসাদ্বর্মদন নারায়ণ"কে শাসন-কর্ত্তা নিয়োগ করিয়া ধন্তমাণিক্য রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু এই রসাদ্বর্মদন নারায়ণ—আরাকান (রসাদ) স্বয়ং অধিকার করিতে অসমর্থ হন। রাজা রায়চাগ ও রায় কছম এই দুই সেনাপতিকে তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। এইবার চট্টগ্রাম ও

চট্টগ্রাম ও আরাকান বিষয়। সমস্ত আরাকান প্রদেশ (১৪৩৭ শক, ১৫২৫ খৃঃ) অধিকৃত হইল।

হুসেন সাহ একশত হস্তি-আরোহী, পঞ্চসহস্র অখারোহী এবং এক লক্ষ পদাতিক সৈন্তসহ তাঁহার প্রিয় সেনাপতিদ্বয় হৈতেন খাঁ ও করা খাঁকে ত্রিপুরা বিজয় করিতে পাঠাইলেন। "দ্বাদশ বাঙ্গলা (বার ভূঞার সৈন্ত সামন্ত) চলে হৈতেন খাঁ সহিতে।" সরাইলের পথে ত্রিপুর-সৈন্ত হটিয়া গেল। পাঠানেরা অগ্রসর হইয়া জামির খাঁর গড়ে উপস্থিত হইল। ত্রিপুর-সেনাপতি খজুরায় বহু যুদ্ধ করিয়াও সেই দুর্গ রাখিতে পারিলেন না। ইতিপূর্বে পাঠানেরা কৈলাগড় ও বিশালগড় দখল

ত্রিপুর-সৈন্তের উপস্থাপরি পরাজয়।

করিয়াছিলেন, সুতরাং বিজয়ী পাঠান সৈন্ত আরো উত্তরে অগ্রসর হইয়া ছঘরিয়াগড়ে বাইয়া রাজ-সেনাপতি গগন খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করিল। তিন প্রহরব্যাপী প্রাণপণ যুদ্ধের পর গগন খাঁ পরাস্ত হইলেন। ধন্তমাণিক্য যশপুর ছাড়িয়া রাঙ্গামাটির দিকে হটিয়া চলিলেন। গঙ্গানগর পাড়ি দিয়া রাজা ডোমঘাটিতে শিবির স্থাপন করিলেন। হৈতেন খাঁ স্থপতি ডাকিয়া সেই স্থানে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গড় নির্মাণ করাইলেন। এদিকে গোমতীর জল ত্রিপুরার লোকেরা বিবাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে, এই আশঙ্কা করিয়া হৈতেন খাঁ দুই প্রহরের মধ্যে সেই স্থানে এক দীঘি খনন করাইলেন। ডোমঘাটিতে ডোম-মেয়েরা তাত্ত্বিক অনুষ্ঠান জানিত—কথিত আছে, তাহারা মাহুব খাঁত, লোকেরা তাহাদিগকে ডাইনি বলিত। প্রধানা ডাইনি "বসাগমা-যুবতী" রাজার আজ্ঞায় সাত দিন

গোমতীর জল বাধিয়া রাখিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিল ও দুইটি কুলা বাহুমূলে বাধিয়া স্বত্র-যোগে উহা উড়াইয়া দিল। সেই কুলা ২০০ হাত উচ্চে উঠিয়া নদীতে পড়িয়া গেল। যেক্ষণেই হউক, এই ডাইনীরা নদীর জলের নানা সন্ধান জানিত। হয়ত যেখানে জল খুব কম, সেখানে কৃত্রিম কোন উপায় করিয়া রাখিয়াছিল বাহাতে জল অন্তরিক্কে অগোচরে সরিয়া যাইত।* হঠাৎ গোমতীর একটা জায়গায় চড়া পড়িল। হৈতেন খাঁ উহা ভগবানের দান

অদ্বুত উপায়ে গোমতীর
জল বাধা।

মনে করিয়া সেই চড়ার উপর শিবির স্থাপন করিয়া উৎসব করিতে লাগিলেন। এদিকে ত্রিপুর-সৈন্তেরা বহু কদলী তরু কাটিয়া শত

শত ভেলা তৈরি করিল। প্রত্যেকটি ভেলার উপর তিন তিনটি

কৃত্রিম মনুষ্যমূর্তি, এক একটির হাতে দুইটি করিয়া বুনো (মশাল)। হঠাৎ গোমতীর বাধ ভাঙ্গিয়া দিয়া স্বথ-শয়ান পাঠানগণের শিবিরে ইহারা জল প্রবেশ করাইয়া দিল। চড়া ভাসিয়া গেল, হস্তী অথ সৈন্ত সকলে জলে ডুবিল। এদিকে মশাল-হস্তে মনুষ্যমূর্তি ভেলার উপরে; শত সহস্র মশালের আলোতে পাঠানেরা দেখিল যেন শত্রুরা আসিতেছে, পশ্চাতে সহস্র সহস্র সত্যকার সৈন্ত—এদিকে বাধ ভাঙ্গার দরুন পার্শ্বতঃ গোমতী নদীর প্রবল বেগ। সম্মুখের দিকে ভীষণ অরণ্যে ত্রিপুর-সৈন্তেরা আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। দাবদাহে বৃহৎ বৃক্ষাদি পুড়িয়া বাইবার ভীষণ শব্দ, জলের উৎকট কমলো, ও ত্রিপুর-সৈন্তের

হৈতেন খাঁ ও করা খাঁর
পরাজয়।

গর্জন! হৈতেন খাঁ ও করা খাঁ রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেলেন, এবং হসেন খাঁর দরবারে অবমানিত হইলেন। যে স্থানে পাঠানেরা

ত্রিপুর-সৈন্তের বুদ্ধি-কৌশলে এরূপ অভূতপূর্বভাবে পরাস্ত হইয়াছিলেন, সে স্থানের নাম বলগমা। মহারাজ ধন্তমাণিক্য যুদ্ধ জয় করিয়া সে স্থানে চতুর্দশ দেবতার খটা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। পূর্বে পার্শ্বতঃ ত্রিপুরায় সহস্র সহস্র বাঙ্গালীকে

মণ্ড-বলি নিবেদন।

বলি দেওয়া হইত, ধন্তমাণিক্য এই বলি বন্ধ করিয়া দিলেন।

রাজার আদেশে বলির এইরূপ ব্যবস্থা হইল:—১৪ দেবতার তিন বৎসর পরে একটি নরবলি, কালীমন্দিরে এক নরবলি, “দৌচা পাথর” নামক দেবতার স্থানে দুইটি নরবলি কিন্তু তাহাও শত্রুপক্ষীয় লোক পাইলে হইবে। “ইহার অধিক বলি

দুই মন সোনার ভুবনেশ্বরী
মূর্তি।

মানা করে রাজা।” ধন্তমাণিক্য চট্টগ্রামে দুই মন সোনা দিয়া ভুবনেশ্বরীর মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কুকীদের এক জাগ্রৎ

শিবলিঙ্গ আছে জানিয়া তিনি তাঁহার জামাতা হেপাকলাউকে তাহা আনিতে পাঠান। কুকীরা ইহাকে হত্যা করাতে এই ছকার্যের নেতৃবর্গ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

* বঙ্গদেশের কোন একখানি ইতিহাসে আমি পড়িয়াছিলাম একটা নদীর নীচে কৌশলপূর্বক লৌহ-খার নিশ্চিত হইয়াছিল। তাহা বন্ধ করিলে নদীর গতি ধামিয়া যাইত; এতৎসংক্রান্ত নোটটি আমি পুজিয়া পাইলাম না। গোমতী নদীর বাধ সেইরূপ কোন উপায়ে নিশ্চিত হইয়া থাকিবে।

ধন্তমাণিক্য যেমন বীর ছিলেন, তেমনই রাজনীতি-বিশারদ ছিলেন; তিনি সর্বত্র জয়যুক্ত হইয়া ত্রিপুরারাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। তিনি বিদ্বান্ ও বিদ্বাৎসাহী ছিলেন। “শ্রীধন্তমাণিক্য রাজা—কমলার পতি। উৎকল-খণ্ড উৎকলখণ্ড পাঁচালী।

পাঁচালী রচাইল মহামতি ॥ জ্যোতিষে যাত্রা-রত্নাকর-নিধি আর। পাঁচালী রচাইল রাজা লোকে বুঝিবার ॥ ত্রিহত দেশ হইতে নৃত্যগীত আনি। রাজ্যেতে শিখায় গীত নিত্য নৃপমণি ॥ ত্রিপুর সকলে গীত সেই ক্রমে গায়। ছাগ অস্ত্রে তার যন্ত্র ত্রিপুরে বাজায় ॥” (ধন্তমাণিক্য খণ্ড।) রাম নামক এক কবির দ্বারা তিনি ‘প্রেত-চতুর্দশী’

নামক পুস্তক রচনা করাইয়াছিলেন, এই কাব্যখানি তাঁহার প্রিয় প্রেত-চতুর্দশী।

ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে ইনি সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলারই বেশী প্রচলন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রজাদের মধ্যে বাহাতে শিক্ষার বিস্তার হয়, এইজন্য তিনি ‘সুভাষা’—বাঙ্গলা ভাষাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। মহারাজী কমলা তাঁহার বোগ্যা ছিলেন,

“মহারাজী কমলা নাম পৃথিবীতে ধন্তা”—ইহার সম্বন্ধে অনেক পল্লী গাথা।

পল্লীগীতি ত্রিপুরার সর্বত্র গীত হইত। ধন্তমাণিক্য অনেক দীঘি, দেব-মন্দির ও মঠ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পূর্বকালে রাজারা মঠ-মন্দির ও বিগ্রহ-নির্মাণে যে কিরূপ মুক্তহস্ত এবং সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কারুকার্যের জন্ত চেষ্টিত ছিলেন, তাহা ধন্তমাণিক্যের একটি কার্যে প্রতীয়মান হইবে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধন্তমাণিক্য করেকটি মঠ নির্মাণ করান। তিনি স্থপতিকে বলিয়াছিলেন, তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যেন সেই মঠগুলি সর্বাঙ্গসুন্দর করে। কার্য সমাধা হইলে রাজা কারিগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে বাহা করিয়াছে তাহা হইতে আরও ভাল করিতে পারে কি না। স্থপতি একটি বক্র হাসিরেখা অধর-প্রান্তে

টানিয়া বলিল, “অবশ্য পারি।” রাজা বলিলেন, “তোমাকে যথাসাধ্য স্থপতির মুওচ্ছেদ।

করিতে বলিয়াছি, যত অর্থ হয়, দিতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু তথাপি তোমার বিত্তার কতকটা পেটে রাখিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়াছ।” রাজা তরবারি দ্বারা তখনই তাহার মুও বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। বাঙ্গলায় পঞ্চদশ শতাব্দী ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে ধন্তমাণিক্যের মত এত বড় রাজা এদেশে হয় নাই। তাঁহাকে এই যুগের “সমুদ্রগুপ্ত” বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না।

ধন্তমাণিক্যের পর ধ্বজমাণিক্য ৬ বৎসর রাজত্ব করেন, তৎপরে তৎকনিষ্ঠ দেবমাণিক্য ভুলুয়া দখল করেন। দেবমাণিক্য তাত্ত্বিক অহুষ্ঠানে সর্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। মিথিলাবাসী

লক্ষ্মীনারায়ণ নামক এক চুট তাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ দ্বিতীয়া রাজ্ঞীর সহিত দেবমাণিক্য—১৫২২-১৬২৭ খৃঃ।

ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল, সে তাত্ত্বিককার্যে শ্রমশানে মহারাজের সহযোগিতা করিত। দেবমাণিক্য ইহার হস্তে নিহত হন। প্রধানী রাজ্ঞী সহমৃতা হন এবং তৎপুত্র যুবরাজ বিজয়কুমারকে বন্দী করিয়া হীরাপুরে রাখা হয়,—দ্বিতীয়া রাজ্ঞীর পুত্র নামে যাত্র রাজা হন—সেই ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীনারায়ণই রাজত্ব করিতে থাকে। এক বৎসর কাল এই চরাচর ব্রাহ্মণ রাজ্য করিতেছিল। প্রজারা ফেপিয়া যায় এবং

প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ কৌশল-ক্রমে ব্রাহ্মণকে বধ করেন। বিদ্রোহী প্রজারা শিশু রাজা ইন্দ্রমাণিক্যকে আছাড় দিয়া হত্যা করে, এবং সমস্ত প্রজারা ছুরাচার তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ। রাজ-অন্তঃপুর ঘের দিয়া পাণিষ্ঠা রাজমাতাকে সংহারপূর্বক হীরাপুর বন্দীশালা হইতে বিজয়মাণিক্যকে আনিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজয়মাণিক্য সিংহাসনে আরুঢ় হইয়া দেখিলেন, সমস্ত ক্ষমতাই দৈত্যনারায়ণের হাতে, এমন কি বাজ্ঞভাণ্ড বাজাইবার অমুমতি দেওয়ার ক্ষমতাও রাজার নাই। দৈত্য-

বিজয়মাণিক্য—১৫২০-

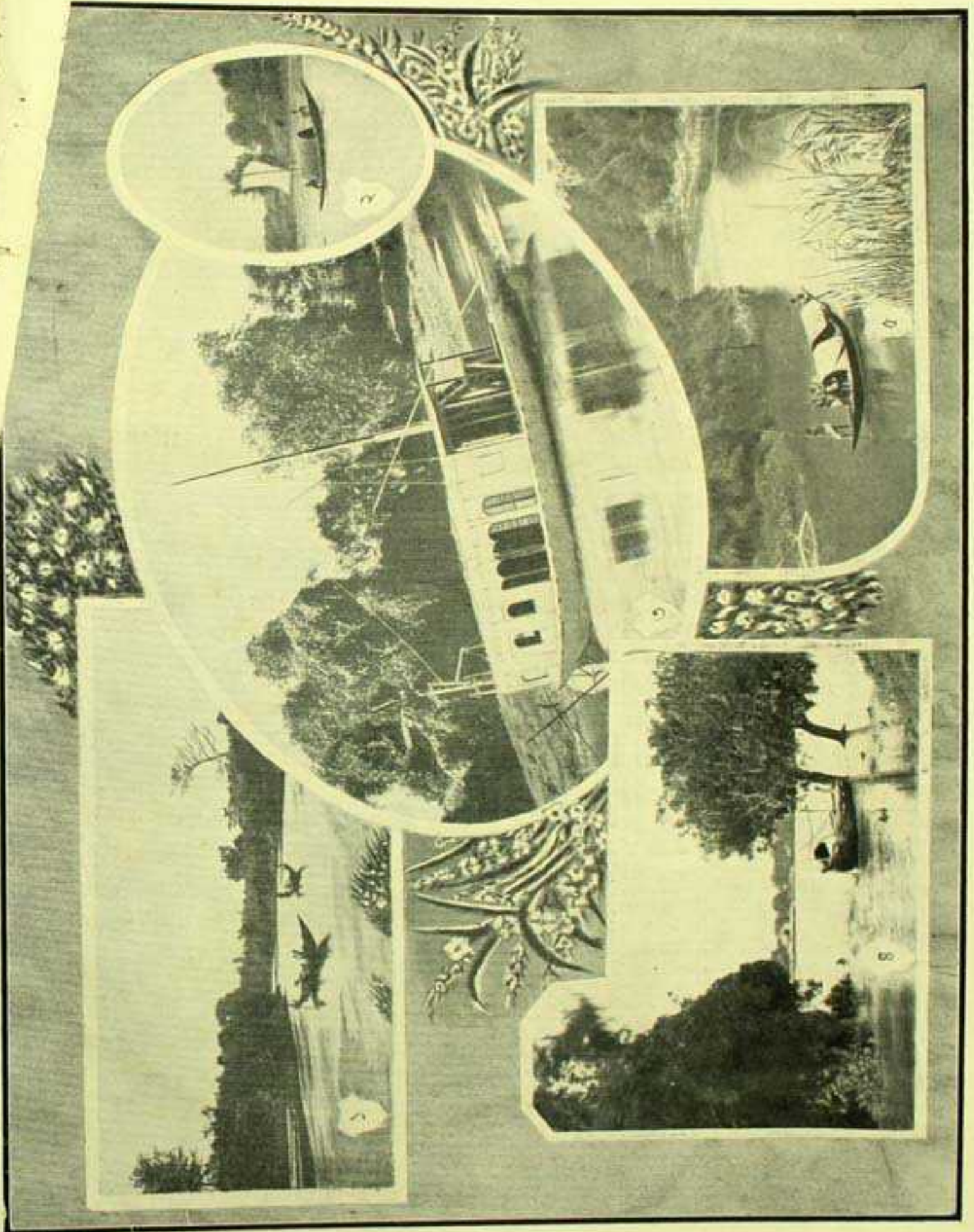
১৫৭০ খৃঃ।

নারায়ণের ভ্রাতা দুর্জয় নারায়ণের অত্যাচারে দেশ জর্জরিত হইল। শাক-বেচা এক রমণীকে স্থানরী দেখিয়া দুর্জয় বলপূর্বক লইয়া আনিয়া তাহার বাড়ীতে রাখিল। সেই রমণীর স্বামী রাজার কাছে নালিশ করিল। রাজা চেষ্টা করিয়াও দুর্জয়ের হাত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না। রাজা দৈত্যনারায়ণের কন্যা পুণ্যবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজার ইচ্ছিতে তাঁহার জামাতা মাধব দৈত্যনারায়ণকে হত্যা করিয়া সেই গৃহে আগুন লাগাইয়া দিলেন—এবং প্রচার করিলেন অগ্নিদাহে দৈত্যের মৃত্যু হইয়াছে। মহারাজী পিতৃহন্তা মাধবকে ছলনাপূর্বক ডাকাইয়া হত্যা করিলেন। রাজা পুণ্যবতীকে এই অপরাধে নির্দাসন করিয়া দ্বিতীয় মহাদেবী গ্রহণ করিলেন। বিজয়মাণিক্যকে সার্বভৌম রাজা স্বীকার করিয়া খাসিয়া পাহাড়ের রাজা, ত্রিহট্টের রাজা, জয়ন্তীর রাজা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন।

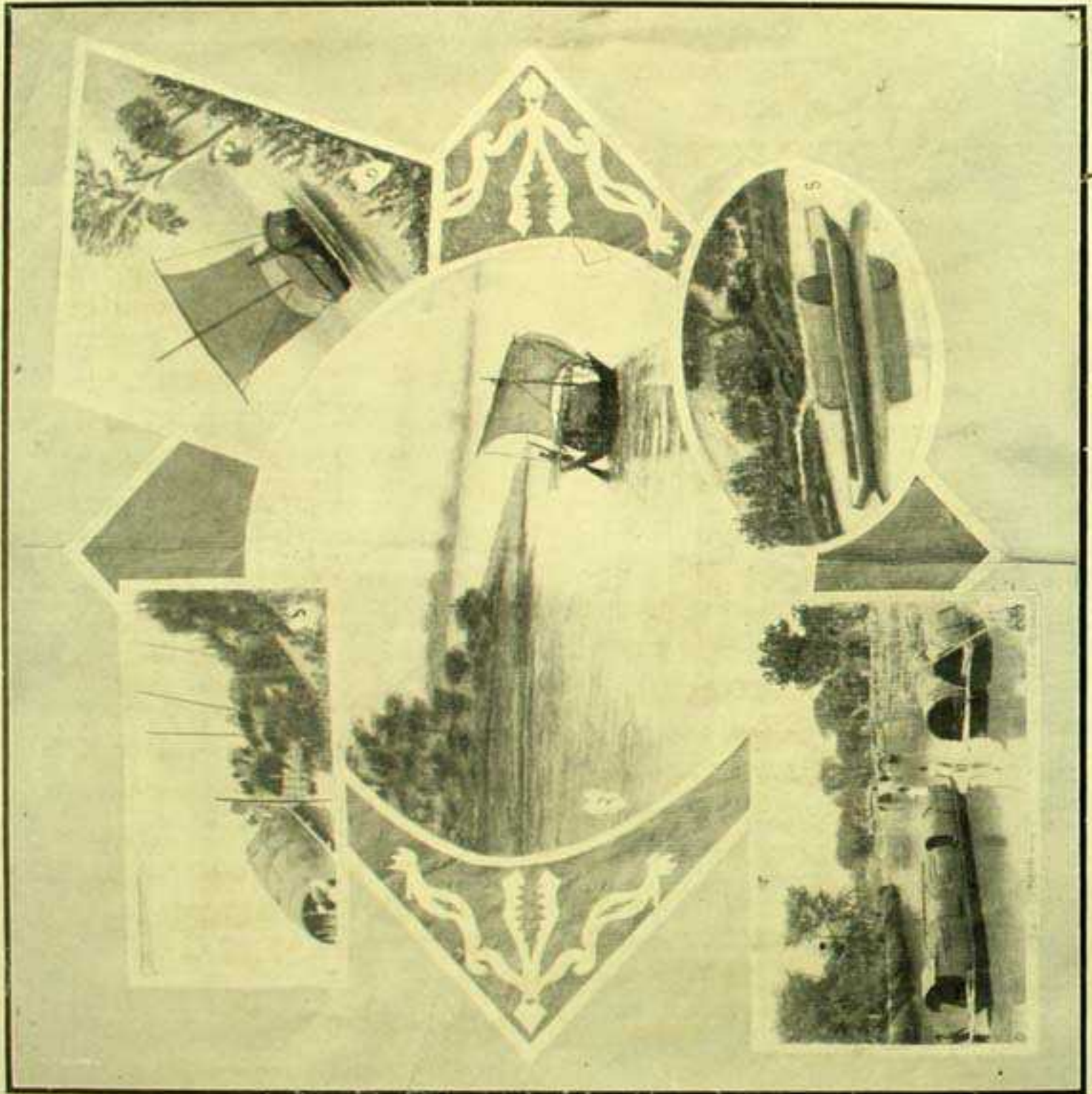
খাসিয়া, ত্রিহট্ট ও জয়ন্তীর আনুগত্য স্বীকার।

বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকালে আবার পাঠানদের সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বরের যুদ্ধবিগ্রহাদি হইয়াছিল। সোলেমান কররানী তাঁহার শ্রালক মমারক খাঁকে বহু সৈন্ত দিয়া চট্টগ্রামে পাঠান। প্রথম কয়েকবার পাঠানদিগের জয় হইয়াছিল। রাজার সেনাপতি কালা নাজির যুদ্ধে নিহত হইলে, ত্রিপুরেশ্বর সেনাপতিদিগকে চরকা পাঠাইয়া দিলেন (অর্থাৎ তোমরা চরকা কাট গিয়া, যুদ্ধের যোগ্য নও)। বাহা ইউক প্রধান সেনাপতি গজভীম শেষে জয় লাভ করিয়া ঘোর অহংকৃত বাদসাওর শ্রালক মমারককে বন্দী করিয়া আনিলেন। ত্রিপুরেশ্বর তাঁহাকে খুব আদর যত্ন দেখাইলেন, কিন্তু মমারক নৃপতিকে অভিবাদন বা নমস্কারাদি করিলেন না। রাজার ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও চতুর্থাই (পুরোহিত) মমারককে চতুর্দশ

সেনাপতি গজভীম কর্তৃক সোলেমান কররানীর শ্রালক মমারক খাঁকে বন্দী করা ও কালীমন্দিরে বলি দেওয়া।



বিজয়-মানিকোর নৌ-স্বত্বের আদর্শ (১)।



বিভিন্ন-ধরনের নৌ-বাহিনীর আদর্শ (২)।

দেবতার নিকট বলি দিলেন। বলির সময় পাঠান অধিনায়ক পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রাজার লোকেরা তাহা দেয় নাই। তাঁহার এক ভৃত্য তাঁহাকে বলিল, “খাঁ সাহেব পূর্বই বা কি পশ্চিমই বা কি, ঈশ্বর সর্বত্র আছেন” ; তখন পূর্বদিকেই তিনি মুখ ফিরাইলেন, তাঁহার কণ্ঠিত মুণ্ড দেখিয়া রাজা অনেক হুঃখ প্রকাশ করিলেন। ইহার মধ্যে বাদসাহের চিঠি আসিল—মমারককে ছাড়িয়া দিলে তিনি পদ্মানদীর তীর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ত্রিপুরেশ্বরকে ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু যখন মমারকের হত্যা-সংবাদ পৌছিল, তখন রণহুম্বি আবার বাজিয়া উঠিল। কিন্তু এই সময় দাউদ খাঁ বাদসাহ হইয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধে জীবনপণ যুদ্ধে নিযুক্ত, এই জন্ত এই সকল অন্তবিরোধ স্থগিত হইল। চট্টগ্রাম বিজয়ের পর বিজয়মাণিক্য দিগ্বিজয়ার্থ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রওনা হইলেন। কেহ তাঁহার সহিত বিবাদ করিতে সাহসী হইল না। স্বর্ণ-গ্রামে আসিয়া তিনি দেখিলেন, বিক্রমপুরের লোকেরা ত্রিপুর-সৈন্তদিগকে বিক্রম করে। রাজা এক সহস্র টাকা ও এক এক খানি চতুর্দোলা পাঠাইয়া কুলীন চৌধুরীদিগের সুল্লরী কত্তাদিগকে শস্যাসঙ্গিনী করিতে লাগিলেন। এই অভিযানের সময় বিজয়মাণিক্য ব্রহ্মপুত্রের উপরে এক সেতু নির্মাণ

বিজয়মাণিক্যের দিগ্বিজয়, ত্রিপুরার খাল, ত্রিপুরার জাঙ্গাল, ‘বিজয়-নন্দিনী’ ও ‘বিজয়পুর’।

করাইয়াছিলেন। কৈলাগড়ে তিনি একটি স্রুবহং খাল কাটাইলেন। উহা নদীর মতই হইল, এই নদীর নাম হইল “বিজয়-নন্দিনী”। তারপর শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত পথ নির্মাণ করািলেন—ইহা “ত্রিপুরার জাঙ্গাল” নামে পরিচিত হইল। জিনারপুরে তিনি আর একটি খাল কাটাইলেন, তাহার নাম হইল “ত্রিপুরার খাল”।

বালিশিরা নামক এক স্থানে যাইয়া রাজা সেই স্থানের নাম ‘বিজয়পুর’ রাখিলেন। বিজয়ের দুই পুত্র—ডাঙ্গরফা ও অনন্ত। গণকগণ গণিয়া বলিল ডাঙ্গরফার ‘ছেদ যোগ’ আছে। রাজা তাঁহার বদ্ধ উড়িয়ার অধিপতি মুকুন্দদেবের নিকট ছোট পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন, তাঁহাকে বহু ধনরত্ন দিয়া বুঝাইলেন, জগদ্রাথতীর্থে থাকিলে তাঁহার ইহকাল ও পরকালের সলগতি হইবে। মুকুন্দদেব রাজপুত্রকে আটখানি গ্রাম দিলেন। বিজয়মাণিক্যের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত সিংহাসনে আসীন হইলেন। বিজয়মাণিক্য মৃত্যুকালে ভিষক-শ্রেষ্ঠ বাজুরায়কে মিনতি করিতে লাগিলেন, “আমাকে বাঁচাইয়া দিন, আমি আপনার সর্বস্ব স্বর্ণ ঘারা জড়িত করিয়া দিব।” এই ভাবে রাজা ৪৭ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি দেখিতে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও অতি সুদর্শন ছিলেন। রাজমালায় বিজয়মাণিক্যের দিগ্বিজয় কৌতূহলপ্রদ ভাষায় বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। তাঁহার বিখ্যাত অভিযানে ৫০,০০০ নৌকার এক বহর ছিল। প্রথমতঃ ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া তথায় জয়ধ্বজ প্রোথিত করিয়া “পঞ্চদ্রোণা” নামক ব্রাহ্মণাধ্যুষিত গ্রাম স্থাপন করেন। তৎপরে তিনি লক্ষ্য্য পার হইয়া ইচ্ছামতি অতিক্রমপূর্বক পদ্মাতীরে উপস্থিত হন। তিনি পথে পথে ব্রাহ্মণদিগকে মুক্তহস্তে তাম্রশাসনাদি দ্বারা বহু ভূমি ও স্বর্ণ দান করিয়া নির্দয়ভাবে শত্রু দলনপূর্বক অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং মনে হয় তিনি সমস্ত পূর্ববঙ্গ দখল করিয়া লইয়াছিলেন। আবুল ফজল বিজয়মাণিক্যের নাম আইন

আকবরীতে উল্লেখ করিয়াছেন,—এই রাজার সমসাময়িক কাছড়ের রাজা নির্ভরনারায়ণ এবং জয়ন্তিয়ার রাজা বিজয়মাণিক্য ।

অনন্তমাণিক্যকে তাঁহার স্বপুত্র গোপীনাথ কৌশলক্রমে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন; তদুপলক্ষে গোপীনাথ-কন্যা মহারাজী জয়া দেবীর যে তেজোগর্ভ উক্তি ও ব্যবহার রাজমালায় উক্ত আছে, তাহাতে এই মহীয়সী রমণীর পাতিব্রত্য, নিষ্ঠা ও স্বায়পরতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। গোপীনাথ ইহাকে জোর করিয়া সহমৃত্যু হইতে দেন নাই। গোপীনাথ পূর্বে বিজয়মাণিক্যের সামান্য কর্মচারী ছিলেন। একদা তিনি এক ব্রাহ্মণের কুলগাছে উঠিয়া কুল পাড়াতে সেই ব্রাহ্মণের হাতে বিশেষ প্রহার সহ করিয়াছিলেন। বিজয়মাণিক্য ইহাকে ‘বড়ুয়া’র পদ দিয়াছিলেন। শেষকালে ইনি মহারাজের রন্ধনশালার প্রাধান কর্মচারী হইয়াছিলেন। অন্ন-পরিবেষণ-কালে রাজা ইহার হাতে রাজচিহ্ন দেখিয়া ইহাকে ‘গোপীপ্রসাদ নারায়ণ’ উপাধি দিয়া প্রাধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন, শুধু তাহাই নহে ইহার নিরুপমসুন্দরী কন্যা জয়াদেবীর সঙ্গে স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেন। এখন এই বিশ্বাস-হস্তা সেনাপতি স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিয়া “উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রাচীন রাজধানী জয়াদেবীর ভৎসনায় অতিষ্ঠ হওয়াতে, ইনি চন্দ্রপুরে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ইনি অতীব অত্যাচারী রাজা ছিলেন। অরিভীম সেনাপতির পুত্র গরুড়ধ্বজ বহু রমণীর সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল। রাজার কাছে অভিযোগ আসিলে

অনন্তমাণিক্য ও উদয়-
মাণিক্য—১৫৭০-১৫৮০ খৃঃ।

তিনি অভিযোগকারীর কর্ণ-নাসিকা ছেদন করিয়া তাড়াইয়া দিতেন।

ইহার স্বীয় মহলে ২৪০ জন রমণী ছিল। ইহাদিগকে ইচ্ছামত

স্বীয় অন্তঃপুরে রাখিয়া তিনি শেষে যাকে তাকে বিলাইয়া দিতেন।

ইহার পুত্রের অত্যাচার ততোধিক হইয়াছিল। রাজ্যের শাসন-গ্রন্থি শিথিল হইয়াছে শুনিয়া মোগলেরা চট্টগ্রাম দখল করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। রাজা স্বীয় ভগিনীপতি রণাগণকে প্রাধান সেনাপতি করিয়া তৎসঙ্গে চন্দ্রসিংহ নারায়ণ, আশুয়ান নারায়ণ, গজভীম নারায়ণ প্রভৃতি বীরদিগকে ৫২,০০০ সৈন্যসহ মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। কথিত আছে ইহাদের পরিচালক ৩,০০০ সেনাপতি ছিল। পিরোজখাঁ আদ্রি এবং জামালখাঁ পনি এই দুই সেনাপতির হস্তে ত্রিপুর-সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। এই যুদ্ধে ৪০,০০০ ত্রিপুর-

চট্টগ্রাম হইতে বেরখল।

সৈন্য এবং ৫,০০০ মুসলমান সৈন্য নিহত হয়; এইভাবে চট্টগ্রাম

ত্রিপুর সাম্রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। ১৫৭৬ খৃঃ অব্দে

এই যুদ্ধ ঘটিয়া ছিল।

উদয়মাণিক্যের পুত্র জয়মাণিক্য রাজা হইয়া দেখিলেন—সমস্ত ক্ষমতাই সেনাপতি রণাগণের হস্তে। ইহাকে রণচতুর-নারায়ণের পুত্র বধ করেন। জয়মাণিক্য সেনাপতির দৌরাণ্ড্য হইতে রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু সৈন্তেরা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিল।

উদয়মাণিক্য ও জয়মাণিক্যের রাজত্বকাল ১২ বৎসরের কিছু উর্দ্ধকাল। ইহারা ত্রিপুর-

রাজবংশের বাহিরের লোক, কিন্তু দেবমাণিক্যের পুত্র অমরমাণিক্য এইবার সিংহাসনে আরোহণপূর্বক পূর্ব রাজবংশের যোগসূত্র পুনরায় স্থাপন করেন।
 উত্তরমাণিক্য—১৫৮৫-
 ১৫৯৬ খৃঃ, জয়মাণিক্য—
 ১৫৯৬-১৫৯৭ খৃঃ।

ইনি এক “হাজরা”র দ্বীর গর্ভে মহারাজ দেবমাণিক্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া হাজরার সম্মতিক্রমে তাঁহারই গৃহে পালিত হন।
 এইবার সৈন্তসকল তাঁহাকে লইয়া আগিয়া রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিল। অমরমাণিক্যের প্রধান কীর্তি “অমরনাগর।” এই দীঘি-খনন উপলক্ষে ত্রিপুর-
 অমরমাণিক্য—১৫৯৭-
 ১৬১১ খৃঃ।

রাজার পদমর্যাদা ও মহিমা কতকটা অলুভব করা যায়। দীঘি-
 খননের জন্য স্বনামধন্য ত্রিপুরপতি চাঁদরায় ৭০০, বাকলার বহু ৭০০,
 সলৈ গোয়ালপাড়ার গাজি ৭০০, ভাণ্ড্যালের রাজা ১০০০, অষ্টগ্রামের
 জমিদার ৫০০, বানিয়াচঙ্গের জমিদার ৫০০, রণভাণ্ড্যালের জমিদার ১০০০, সরাইলের ইসা খাঁ
 ১০০০ এবং ভুল্ল্যার রাজা ১০০০ জন লোক দিয়াছিলেন। কিন্তু

অমর দীঘি।

শ্রীহট্টের (তরাবের) পাঠান রাজা কোন সাহায্য করেন নাই।
 এজন্ত অমরমাণিক্য এক বিপুল সৈন্ত পাঠাইয়াছিলেন, এই সেনার অধিনায়কগণের নাম
 রাজমালায় আছে—রণগিরি নারায়ণ, রণভীম নারায়ণ, রণজুস্তার
 ভুল্ল্যার জয়—১৫৭৭ খৃঃ।

নারায়ণ, বীরকম্প নারায়ণ, গজকম্প নারায়ণ, অর্জুন নারায়ণ,
 গজসিংহ নারায়ণ, ত্রিবিক্রম নারায়ণ, শত্রুমর্দন নারায়ণ, স্ত্রুপ্রতাপ নারায়ণ, হিন্দুল নারায়ণ,
 রণসিংহ নারায়ণ, সমরবীর নারায়ণ। ইহাদের সঙ্গে প্রথিতবশা ইতিহাস-বিশ্রুত ইসা খাঁও
 ছিলেন। এই দর্পিত অভিযানের উপলক্ষে ধর্মমঙ্গলের বীরদিগের কথা মনে পড়ে—“সেনার
 প্রধান চলে সিতারাম ভূইঞা, যার ভরে প্রমত্ত কুঞ্জর পড়ে গুইঞা।” অমরমাণিক্যের
 পুত্র রজ্যধর এই সৈন্তগণ পরিচালনা করিয়াছিলেন। সূক্ষ্মী পার হইয়া ত্রিপুর-সৈন্ত গোদারাবী

শ্রীহট্টের রাজা ফতে খাঁ
 বন্দী—১৫৮২ খৃঃ, ইছা খাঁ
 মহলন্দী, বাকলা বিজয়।

গ্রামে যুদ্ধ করিয়াছিল। শ্রীহট্টের রাজা ফতে খাঁ বন্দী হইয়া ত্রিপুরায়
 আনীত হইয়াছিলেন, রাজা তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া-
 ছিলেন। অতঃপর তিনি ইসা খাঁকে বহু সৈন্তদ্বারা সাহায্য করাতে
 এই সেনাপতি মোগলদের বিরুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন, তাঁহার ‘মহলন্দী’
 উপাধি আকবর দেন নাই, উহা ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্য দিয়াছিলেন।* ইসা খাঁ অমরমাণিক্যের
 রাজ্যকে মাতৃস্বোধন করাতে রাজা তাঁহার উপর প্রীত হইয়াছিলেন, ইহার সবিস্তার বর্ণনা
 রাজমালায় আছে। সরাইল পরগনায় অনেক শিকারযোগ্য পশুপক্ষী আছে, এইজন্ত যুবরাজ

* নানা প্রমাণে প্রতিপন্ন হইতেছে ইসা (ইছা) খাঁ ত্রিপুর-রাজার প্রদাণেই উন্নতির পথে উন্নীতছিলেন।
 তাঁহার বংশধরেরা জঙ্গলবাড়ীর যে ইতিহাস গ্রন্থের সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ব অবস্থা সমস্ত চাপা
 বিয়া তাঁহাকে বাউলের ভ্রাতা ধাঁড় করাইবার চেষ্টা হইয়াছে—তিনি নবাবপুত্র ছিলেন এবং আকবরের প্রথম
 “মহমদখান” উপাধি পাইয়া ছিলেন, সেই পুস্তকে এই সকল দাবী প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ-স্মৃতিকার
 আমরা এই দাবীর অন্যায়তা প্রমাণ করিয়াছি।

রাজধর উহার প্রতি লুপ্ত হওয়াতে ইসা বাকি ঐস্থান ত্যাগ করিয়া জঙ্গলবাড়ীতে বাইতে হইয়াছিল। অমরমাণিক্য ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে ত্রিহট্ট জয় করেন, তৎপূর্বে ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে ভুলুয়া রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। ভুলুয়ার অধিপতি হর্ষভরায় যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সৈন্তশ্রেণীতে ৩০০ শত পাঠান সৈন্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজ স্বয়ং সিংহরথ নারায়ণ নামক সেনাপতির সঙ্গে ভুলুয়ায় ৩৬,০০০ সৈন্ত লইয়া যুদ্ধ জয় করিয়া আসেন, তৎপরে বাকুলার অধিপতি কন্দর্প রায়কে যুদ্ধে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠন করেন। সুপ্রসিদ্ধ অমর দীঘির কথা পূর্বেই লিখিয়াছি, এই দীঘি খনন করিতে তিনটি বৎসর লাগিয়াছিল; ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার খনন কার্য শেষ হয়। সেইখানে জগন্নাথ মঠ নির্মিত হয় এবং মহারাজ ১৪খানি গ্রাম এই মঠে উৎসর্গ করেন “তদবধি চৌদগ্রাম নাম তার হৈল।” অমরমাণিক্য স্বয়ং পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার সভায় দুইশত ভট্টাচার্য্য

সর্বদা শাস্ত্রালোচনা করিতেন। অমরমাণিক্য ‘ফুলকোয়াড়ি ছড়া’র ভূতই বড় না রাজাই বড়।

নিকট দুইটি বটবৃক্ষে ভূতে আড্ডা করিয়াছে শুনিয়া সেই দুইটি বৃক্ষ কাটিতে আদেশ করেন; এসম্বন্ধে বহুলোকের ভয়প্রশ্ন ও নিবেদন তিনি শুনে নাই। বৃক্ষ দুইটি কাটা গেলে সকলে দেখিল, ভূতের উৎপাত ধানিয়াছে,—ভূতবল হইতে যে রাজবল বেশী তাহা লোকে বুঝিল। রাজার একবার উৎকট ব্যাধি হইয়াছিল,—এক ছুট লোক প্রচার করিল, রাজা তাঁহার আরোগ্য কামনায় দেবাদেশ প্রাপ্ত হইয়া ১২৫টি শিশু ‘ফুলকোয়াড়ির ছড়া’র ডুবাইয়া পূজা দিবেন। ভয়ে সহস্র সহস্র লোক নিজ শিশুদিগকে লইয়া পলাইয়া বাইতে লাগিল। রাজা সেই ছুট লোককে দণ্ড দিবার জন্ত ধরিয়া আনিতে আদেশ দিলেন এবং প্রজাগণকে ধনরত্ন বিতরণপূর্বক সেই মিথ্যা কথার অসারতা প্রমাণ করিলেন। আরোগ্যলাভ করিয়া অমরমাণিক্য আরাকান-বিজয়ে বহির্গত হইলেন। আরাকানরাজ ফিরিজিদের সহিত যোগ দিয়া প্রথমতঃ ত্রিপুর-সৈন্তকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে অমরমাণিক্যেরই জয় হইল। এই যুদ্ধে অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধর ও তাঁহার ভ্রাতারা অশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। যুদ্ধ জয় হইল বটে, কিন্তু কনিষ্ঠ রাজপুত্র অমর-হর্ষভকে পাওয়া গেল না। সন্ধ্যা হইয়া গেল—রণক্ষেত্র খুঁজিয়া তাঁহার মৃতদেহ বা কর্তিত-মুণ্ড না পাইয়া ত্রিপুর-সৈন্ত নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল। অবশেষে দুই অস্বারোহীর সহিত রাজপুত্র ঘোড়ায় বিদ্যুৎ-বেগে আসিয়া নিজ শিবিরে দেখা দিলেন। তাঁহার সর্দার

মগ-বিজয়।

শোণিতার্জ, হস্তে অসি এরূপ ভাবে মুষ্টিবদ্ধ ছিল যে শিরগুলি টানিয়া ধরায় সেই অসি হস্তে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সহজে খোলা গেল না—“অথ হ’তে রাজপুত্র যখন নামিল। রক্তসমে হাতে খড়্গ তাতে না খসিল। উজ্জ্বল দিয়া তারা হস্ত পাখালিল। তিন সোয়ারের হস্তের খড়্গ তখন খুলিল।” এই মহাযুদ্ধে কর্ণফুলির তীরে বহু মগ ও ফিরিজি সৈন্ত নিহত হইয়াছিল। মগ-বিজয়ের পর অমরমাণিক্য উড়িষ্যার রাজাকে আহুগত্য স্বীকার করাইবার জন্ত দূত প্রেরণ করেন। উড়িষ্যারাজ যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন, উদ্যোগের জন্ত কিন্তু সময় চাহিয়া লইলেন।

ইতিমধ্যে সেকেন্দর সাহ নামক মগরাজ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

মগাধিপতি সেকেন্দরের
বিবরণ।

ত্রিপুরসৈন্য মগদিগকে কাটিতে কাটিতে তাহাদের দুর্গ পর্য্যন্ত
ধাবমান হইল, কিন্তু দুর্গাভ্যন্তর হইতে মগদিগের গোলাগুলি অজস্র

ত্রিপুর-সৈন্তের উপর পতিত হইতে লাগিল। পঁচিশ বৎসর
বয়স্ক মহাবীর রাজকুমার যুঝার সিংহের জয়মঙ্গল নামক হস্তী এক প্রচণ্ড গোলার আঘাতে
ক্ষিপ্ত হইয়া রাজপুত্রকে পদতলে পিষিয়া মারিয়া ফেলিল, এবং স্বয়ং যুবরাজ রাজধর সিংহও
উক এবং উদরে গুলির আঘাত সহ্য করিলেন। ত্রিপুর-সৈন্তের সম্পূর্ণ পরাভব হইল। এদিকে
মহারাজ সেকেন্দর সাহ রাজপুত্রকে তাহার সৈন্তেরা নিহত করিবে, ইহা কখনও ভাবেন
নাই। হুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া তিনি অল্পকূল সন্ধির প্রস্তাব করিয়া অমরমাণিক্যের নিকট
দূত পাঠাইলেন। কিন্তু পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া অমরমাণিক্য ক্রোধে অলিয়া উঠিলেন,
তিনি সেকেন্দরের সহিত পুনরায় যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মগেরা উদয়পুর পর্য্যন্ত
অভিযান করিয়া আসিল। হঠাৎ তাহারা উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ ঘিরিয়া ফেলিল।
অত্যন্ত অবস্থায় আক্রান্ত হইয়া রাজা বস্ত্রা বোঝাই করিয়া কড়ি রাখিয়া ধনজন সহিত
উদয়পুরের পার্কতা-জঙ্গলে পলাইয়া গেলেন। সেকেন্দর দুইজন “দেওড়াই”কে খুঁজিয়া
পাইয়া তাহাদিগকে রাজা উপাধি দেওয়ার লোভ দেখাইয়া অমরমাণিক্যের গুপ্তধনের
সন্ধান পাইলেন এবং তাহা লুণ্ঠন করিলেন। ত্রিপুরা-রাজ্যের এই বিপদ ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে
সংঘটিত হয়। কুড়ামণী নামক এক ব্যক্তিকে শাসনকর্তৃত্ব প্রদানপূর্বক সেকেন্দর উদয়পুর
ত্যাগ করিয়া যান। আরাকান-রাজ ইহার পর অমরমাণিক্যের নিকট দূত পাঠাইয়া প্রস্তাব
করেন যে, যদি ত্রিপুররাজ আরাকানের বিদ্রোহী সেনাপতি আদম সাহকে প্রত্যর্পণ করেন,

অমরমাণিক্যের অন্তত সাহস
ও আত্মহত্যা—১৬১১ খৃঃ।

তবে তিনি উদয়পুরে আর কোন উৎপাত করিবেন না। রাজা অমর-
মাণিক্য উত্তরে লিখিলেন, “শরণাগত আদম সাহ না দিব কখনি।

ক্ষত্রিয় বংশেতে জন্ম হইছে আমার। তুমি মথ কি জানিবে আমা
ব্যবহার। দৈব যোগে এক পুত্র যুদ্ধেতে মরিছে। আর দুইপুত্র আমা প্রধান যে আছে।
তাহা দুই তোমা যুদ্ধে মরে কদাচিত। তথাপি আদমে আমি না দিব নিশ্চিত।” পুত্র-বিয়োগ-
হুঃখ-কাতর রাজা বিদ্রোহী শালককে হত্যা করিয়া অমৃতপুত্র হইয়া মনুদীর তীরে আফিম খাইয়া
মৃত্যুমুখে পতিত হন। মহারাজ্ঞী স্বামীর সহিত অমৃতপুত্র হন। পুত্র রাজধরমাণিক্য গোড়ীয়
বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি সার্কভোম ও বিরিঞ্চি নারায়ণ নামক পরম বৈষ্ণব পুরোহিত

রাজধরমাণিক্য ১৬১১-
১৬২৩ খৃঃ।

ও ২০০ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে সর্কদা ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেন।
আটজন কীর্তনীয়া দিনরাত্র কীর্তন গান করিত; তিনি অনেক
দানধ্যান করেন ও মঠমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। গৌড়ের

বাদসাহ “দ্বাদশ বাঙ্গলা” (বারভূঞা) সমভিব্যাহারে এক দল সৈন্য ত্রিপুরা বিজয় করিতে
পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা কৈলাগড় পর্য্যন্ত আসিয়া রাজ্যের বিপুল সৈন্য-বল দেখিয়া যুদ্ধ
করিতে সাহসী হইল না, ফিরিয়া গেল। রাজধরমাণিক্য ১২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তৎপুত্র যশোধরমাণিক্য ১৬২৩ খৃঃ অব্দে রাজ্য হইলেন—ইহার সময়ে ভুলুয়ার রাজা গন্ধৰ্ব-
নারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে ত্রিপুর-সৈন্তের জয়লাভ হইয়াছিল।

• যশোধরমাণিক্য—১৬২৩

কিন্তু জাহাঙ্গীর ইহার রাজ্যের সমস্ত হস্তী ও ঘোড়া চাহিয়া পাঠাইলে,
ত্রিপুর রাজ উত্তর দিলেন, “হস্তী নাহি দিব আমি না যাব কখন।” ইম্পিন্দার ও নুরুল্যা
নামক সেনাপতিদ্বয় ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। ইম্পিন্দার উদয়পুর রাজধানী
অধিকার করিলেন, পলাতক যশোধরমাণিক্যকে মোগলেরা ধরিয়া আনিয়া ঢাকায় বন্দী
করিয়া রাখিল। তথা হইতে ফতেজঙ্গ নবাব তাঁহাকে জাহাঙ্গীরের নিকট পাঠাইয়া
দিলেন। যশোধরমাণিক্য রাজ্য ত্যাগ করিয়া কানীবাসী হইবেন এই বলিয়া মুক্তি পাইলেন।
নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া যশোধরমাণিক্য বাহাদুর বর্ষ বয়সে বৃন্দাবনে প্রাণত্যাগ করেন।

আড়াই বৎসর কাল বিজয়ী মোগলেরা উদয়পুর দখল করিয়া রাখিয়াছিল। “পাপিষ্ঠ মগল
জাতি ছষ্ট ছরাচার। ধর্মকন্ড নিবেধিল নগর বাজার। যত কিছু রহে প্রজা উদয়পুরেতে।
মোগলের সৈন্তে লুটে না পারে থাকিতে। চতুর্দশ দেব পূজা নিষেধে যবন। কালিকা দেবীর
পূজা করিল বারণ। অমরসাগর আদি যত সরোবর। খাল কাটিয়া শুকায় মগল বর্ষর।
যত ধন আছিলেক উদয়পুর দেশ। সরোবরে লুকাইছে জানিয়া বিশেষ।” (যশোধরমাণিক্য
খণ্ড।) কিন্তু মোগল সেনার মধ্যে মহামারি উপস্থিত হইল। কিছুতে তাহারা তথায় তিষ্ঠিতে
না পারিয়া মেহেরকুলে আসিয়া আস্তানা স্থাপন করিল। তখন সেনাপতি ও প্রজারা
কল্যাণমাণিক্যকে রাজ্য করিয়া উদয়পুরে প্রত্যাবর্তন করিল।

যশোধরমাণিক্যের পূর্বে যেকোন ত্রিপুরারাজ্যে অস্ত্রের ঝন্ডনা ও বীরের গর্জন শোনা
যাইত—তার পর হইতে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণের বেদপাঠ, খোলবাঞ ও সংকীর্তনের রোলই বেশী
শোনা যাইতে লাগিল। কল্যাণমাণিক্য ত্রিপুর-রাজবংশীয়

কল্যাণমাণিক্য—১৬২৫ খৃঃ।

লজ্জানারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধাদি করিয়া বিরাগ বোধ করিতে লাগিলেন।
তিনি গুরু চরণে ধর্ম্মপাণ সমর্পণ করিয়া “আজি হৈতে অস্ত্র ত্যাগ করিলাম আমি” এই শপথ
করিলেন। তাঁহার পুত্র গোবিন্দকে যৌবরাজ্য প্রদান করার
উৎসবে তিনি তুলাদান করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবন, মথুরা, সেতুবন্ধ
ও উড়িয়া প্রভৃতি দেশ হইতে ৫০,০০০ ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন।

গোবিন্দমাণিক্য—১৬৪৮-

১৬৬০ খৃঃ।

“চন্দ্র গোপীনাথ” মূর্তি মগেরা লইয়া গিয়াছিল, তিনি তাহা আনাইয়া পুনরায় স্থাপন করিয়া-
ছিলেন, এবং তৎকর্তৃক ধর্ম্মমঠ নামে এক মন্দির ও তৎ সংলগ্ন “জগমোহন” নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মধ্যে ছত্রমাণিক্য—১৬৬০-

১৬৬০ খৃঃ।

তৎকৃত কৈলাগড়ের দেবীমন্দির অতি প্রসিদ্ধ। কল্যাণ-সাগর তাঁহার
অপর এক কীর্তি। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইনি স্বর্গগত হন। তাঁহার পুত্র
গোবিন্দমাণিক্যের সময়ের বিশেষ কোন ঘটনা নাই, ইহার সঙ্গে
আরাকান-রাজ সন্দ্বজ্জয়ের খুব সৌহার্দ্য ছিল, ইনি আরাকানরাজ-সভায় সাহস্রজার সঙ্গে

• রাজমালার তারিখের সহিত এইরূপে কৈলাসচন্দ্র সিংহের ইতিহাসের তারিখের মিল নাই। নানা কারণে
আমরা কৈলাসবাবুর তারিখই গ্রহণ করিয়াছি।

বন্ধুত্বপাশে বদ্ধ হন। উক্ত হতভাগ্য সম্রাট-কুমার ত্রিপুরেশ্বরকে যে হীরক-অমূল্য দিয়াছিলেন, তৎ-বিক্রয়-লব্ধ টাকা দিয়া গোবিন্দমাণিক্য কুমিল্লায় “সুজা বাদসাহের মসজিদ” ও “সুজাগঞ্জ” নগর স্থাপন করিয়া তাঁহার স্মৃতি-তর্পণ করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের সনদের বলে গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্ব কতক দিনের অন্তর্গত তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নফর সিংহ দখল করিয়া নিজেকে “ছত্রমাণিক্য” বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্বক রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ছত্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর গোবিন্দমাণিক্য পুনরায় রাজা হইয়াছিলেন। ইহার পরে ত্রিপুরা-রাজমালায় যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে সার্ক্সভোম নৃপতিদের বংশধরগণের লাজনার কথাই বেশী। মোগল সাম্রাজ্য তখনও হৃদ্যন্ত, মুর্শিদাবাদের শাসন কর্তারা মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি—

রামমাণিক্য—১৬৭০-
১৬৮২ খৃঃ।
তাঁহারাই সর্ক্স-সর্ক্স। গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রামমাণিক্য অতিপুণ্যবান্ ও দয়াল ছিলেন। সরাইল পরগনার জমিদার নছর-আলির পুত্র শিকার করিতে বাইরা দৈবদৃষ্টিনায় ত্রিপুরেশ্বর-কুমার চন্দ্র-সিংহের প্রতি গুলি করিয়াছিল, কুমারের তখনই মৃত্যু হইল। নছর আলি মিত্র পুত্রকে ধরাইয়া মহারাজ রামমাণিক্যের নিকট বিচারার্থ পাঠাইলেন। রামমাণিক্য তাহাকে ক্ষমা করিলেন। এখন হইতে কিছু হইলেই জাতিরা

বাইরা মুর্শিদাবাদে নবাবের কাণে লাগাইত। ঘারিকা নামক এক ব্যক্তি নবাবকে জানাইল, “রামমাণিক্য চক্ষেও দেখেন না কাণেও শোনে না, বুড়া ও অধর্ব হইয়াছেন, আমাকে রাজা করুন।” কিন্তু এই অভিযোগ তদন্তে টিকিল না। রামমাণিক্যের

রত্নমাণিক্য (২৪)—১৬৮২
খৃঃ, নরেন্দ্রমাণিক্য—১৭১১
খৃঃ, পরে আবার রত্নমাণিক্য
—১৭১২ খৃঃ।
পুত্র রত্নমাণিক্যকে পুনরায় সেই ঘারিকা নানা ছলে মুর্শিদাবাদ-নবাবের ফারমানের বলে অধিকার চ্যুত করিয়া স্বয়ং ‘নরেন্দ্রমাণিক্য’ নামে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু নবাবদের “ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে ভুষ্ট” স্বভাব; এই নরেন্দ্রমাণিক্য অল্পকাল পরেই

মহেন্দ্রমাণিক্য—১৭১২-
১৭১৪ খৃঃ।
নবাবের ক্রোধে পড়িয়া রাজ্য-চ্যুত হইলেন। পুনরায় রত্নমাণিক্য রাজা হইলেন। ইহার রাজত্বকালে কুমিল্লার প্রসিদ্ধ ‘১৭ রতন’

মন্দির নির্মিত হয়। অল্প পরেই রাজার ভ্রাতা ঘনশ্যাম ঠাকুর মুর্শিদাবাদ হইতে ফৌজ আনিয়া রত্নমাণিক্যের সিংহাসন কাড়িয়া লইলেন এবং তাঁহাকে হত্যা করিলেন। ঘনশ্যাম ঠাকুরের উপাধি হইল “মহেন্দ্রমাণিক্য।” ভ্রাতৃহত্যার অমৃত্যুতে তাঁহার শরীর শুকাইতে লাগিল এবং তিনিও কয়েক মাসের মধ্যেই পঞ্চত্ব পাইলেন। তৎপরে যুবরাজ হৃদ্যোদন (কাহার কাহারো মতে হৃদ্যদেব) ধর্মমাণিক্য নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মহারাজ ধর্মমাণিক্যের প্রকৃতি হৃদ্যন্ত ছিল। তাঁহার রাজত্ব-স্বরূপ বৎসরে ৫০টি হস্তী মুর্শিদাবাদে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি এই রাজত্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং পুনঃ পুনঃ তাগিদ সত্ত্বেও চূপ করিয়া রহিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, ছত্রমাণিক্য মহারাজের জগৎরাম নামে এক প্রপৌত্র ছিলেন। ইনি যথেষ্ট অর্থ ও

হস্তী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া নবাব হুজাউদ্দিনের নিকট হইতে ফৌজ ও সনদ লইয়া আসিয়া ধর্ম্মমাণিক্যের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন। মীর হবীবের অধীনে যুদ্ধ চলিল, রাজা

ধর্ম্মমাণিক্য (২য়) —

১৭১৪-১৭৩২ খৃঃ।

পলাইয়া পর্তুগীজ আশ্রয় লইলেন। জগৎরাম 'জগৎমাণিক্য' নামে সিংহাসনারূঢ় হইলেন এবং নবাব সৈন্ত পরাস্ত হইল। ইতিমধ্যে ধর্ম্মমাণিক্য মুর্শিদাবাদে বাইয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট তরবারিকে অত্যন্ত

খরাপ কোবে রাখিয়া, খরাপ তরবারিগুলি উৎকৃষ্ট কোবে রাখিলেন; কতকগুলি অল্পমূল্যের পাখর রং করিয়া ভাল বাক্সে এবং বহুমূল্য পাখর ধূলিমাটিমাখা খরাপ বাক্সে রাখিলেন। উৎকৃষ্ট ঘোড়াগুলিকে খরাপ সাজে সজ্জিত করিয়া অল্প মূল্যের ঘোড়াগুলির গায়ে মূল্যবান সাজ পরাইয়া দিলেন। এদিকে নবাবের কাছে বাইয়া কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "নবাব সাহেব! আমার যাহা কিছু আছে সমস্তই আপনাকে দিতে আনিয়াছি।" নবাব দেখিলেন, ধর্ম্মমাণিক্য নেহাত ভালমানুষ। এদিকে জগৎ শেঠকে ঘুস খাওয়াইয়া ধর্ম্মমাণিক্য হাত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন নবাবের নির্দেশ অনুসারে জিনিষের মধ্যে মূল্যবানগুলি বাছিয়া নবাব নিজ ভাণ্ডারে রাখিতে বলিলেন, তখন জগৎ শেঠ প্রতারণা করিয়া সেই খরাপ জিনিষগুলিই খুব ভাল বলিয়া নবাবের জন্ত গ্রহণ করিলেন এবং রাজা স্বচ্ছন্দ মনে মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। ধর্ম্মমাণিক্য

মহাভারতের বঙ্গানুবাদ।

মুকুন্দমাণিক্য—১৭৩২-

১৭৩৮ খৃঃ।

অষ্টাদশ বর্ষ রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ইনি মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়া ছিলেন।* ধর্ম্মমাণিক্যের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রমণি 'মুকুন্দমাণিক্য' উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজতন্ত্বে অধিষ্ঠিত হন। এই রাজা বিনা অপরাধে ত্রিপুর-রাজবংশীয় রত্নমণি

নামক এক প্রধান কর্মচারীর হট-কারিতা-নিবন্ধন নবাবের সন্নিধি দৃষ্টিতে পড়িলেন; যে পাণিষ্ঠ ফৌজদার হাজি মুনসমের তিনি প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি নবাব সৈন্ত লইয়া আসিয়া রাজাকে বন্দী করিলেন। নিরীহ রাজা অপमानে জর্জরিত হইয়া কারাগারে বিষপানে প্রাণত্যাগ করিলেন। মহারাণী প্রভাবতী সহমৃত্যু হইলেন। মহারাজার মৃত্যুকালের নিবেদন অগ্রাহ করিয়া সেনাপতিরা রত্নমণিকেই 'জয়মাণিক্য' উপাধি দিয়া

জয়মাণিক্য—কয়েক মাস। সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন (১৭৩৮ খৃঃ)। কিন্তু অল্পকাল পরেই

ইন্দ্রমাণিক্য—১৭৩৮ খৃঃ।

পরে আগার জয়মাণিক্য প্রাপ্ত হইয়া জয়মাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া "ইন্দ্রমাণিক্য" নাম গ্রহণপূর্বক রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু জয়মাণিক্য

পরাস্ত হইবার পরও ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না, তিনি রাজাকে যুদ্ধে অহ্বান করিয়া পুনঃ

* মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের মৃত্যুর "শিব উপাস্ত তেবতাজপে" দৃষ্ট হন। তৎপিতা চন্দ্রমাণিক্যের মৃত্যুরও "হরগৌরী-পায়পয়-মধুল শ্রীশ্রীজয়মাণিক্য" দৃষ্ট হয়। মহারাজ রত্নমাণিক্যের মোহরে "কালীভজ", কাশিচন্দ্র মাণিক্যের মোহরে "শিবাজা" কিন্তু পরবর্তী সময়ে "রাধাকৃষ্ণ" নাম উৎকীর্ণ হইয়াছে।

পুনঃ বিপর্যস্ত করিতে লাগিলেন। অগত্যা ইন্দ্রমাণিক্য পুনরায় নবাবের শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে আলিবর্দী খাঁর প্রিয়পাত্র হাজি হুসেনকে হাত করিয়া জয়মাণিক্য ত্রিপুরার সনদ পাইবার চেষ্টায় ছিলেন,—ইন্দ্রমাণিক্য মুর্শিদাবাদে তদ্বির করিতে যাইয়া আর ফিরিলেন না, মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পুনর্বার জয়মাণিক্য রাজা হইলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তাহার মৃত্যু ঘটিল। জয়মাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিধন ঠাকুর

বিজয়মাণিক্য ও
লক্ষ্যমাণিক্য—১৭৬০ খৃঃ
পঞ্চাশত।

“বিজয়মাণিক্য” উপাধি লইয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন, ইনিও অতি অল্পকাল পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং ইন্দ্রমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ কৃষ্ণমণি সিংহাসনের দাবী করিলেন। কিন্তু

এই সময়ে এক সামান্ত প্রজা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া কিছু দিনের অল্প ত্রিপুরা শাসন করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস আমরা এখানে একটু বিস্তারিত ভাবে প্রদান করিয়া উপসংহার করিব, যেহেতু আমার এই ইতিহাস ইংরেজ-শাসনের পূর্ব পর্য্যন্তই আপাততঃ লিখিত হইল। এখন হইতে ত্রিপুর-রাজ্যের প্রকৃত স্বাধীনতা ও হৃদ্য প্রতাপ লুপ্ত হইয়াছিল। যে বংশের এক রাজা গোড়েশ্বরের সমবেত সৈন্তের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ ক্রোধের সহিত স্বয়ং রণ-অভিযানের নেতৃত্ব করিয়া স্বীয় রাজ-স্বামীকে শৃগালবৎ গণ্য করিয়াছিলেন—রণস্থলে হস্তীর উপর তাহার মহীষমূর্তি দেখিয়া—এক লক্ষ সৈন্ত বিনাশের পর—গোড়েশ্বরের বিরাট বাহিনী ভঙ্গ দিয়াছিল, যে বংশের যজ্ঞমাণিক্য তাহার মহাবীর সেনাপতি চ্যাচাগের সাহায্যে হুসেন সাহের ছায় পরাক্রান্ত বাদসাহকে পরজয়পূর্ব্বক চট্টগ্রাম ও আরাকান কাড়িয়া লইয়াছিলেন, যে উজ্জল মহিমাযিত বংশের এক রাজা সোলেমান সাহের শ্রালক মমারককে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া চতুর্দশ দেবতার মন্দিরে বলি দিতে সাহসী হইয়াছিলেন,—অন্য এক রাজা হেরাধিপতির অজের ধানাংছি হুর্গ আট মাসের চেষ্টায় বিধ্বস্ত করিয়া তত্পরি ত্রিপুরার বিজয়ক্ষমতা উদ্ভূত করিয়াছিলেন এবং যে মহাবংশের উজ্জল রত্ন বিজয়-মাণিক্য দ্বিধিজে অভিযান করিয়া একদিকে নানারাজ্য জয়, অপরদিকে নানা দীর্ঘ, সরোবর, মন্দির ও নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বীয় নামে এক নদীর ছায় সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত খাল খনন করিয়া বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন, চন্দ্রবংশীয় সেই প্রধিতবংশ নৃপতিদের বংশধরদিগকে এইবার নবাবের সামান্ত তালুকদারের মত নথি-পত্র লইয়া জাতিদের সঙ্গে বিরোধ ও অভিযোগ করিতে ঘন ঘন মুর্শিদাবাদে যাইতে দেখিলে মনে হয়—ত্রিপুরলক্ষ্মীর পদাঙ্ক এত নিম্নস্ত ও দীন হইয়া গিয়াছিল যে তাহার চিহ্নও ঐতিহাসিকগণের পক্ষে খুঁজিয়া বাহির করিতে কষ্ট পাইতে হইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লক্ষণমাণিক্য—কুম্ভমাণিক্য

যে সামান্য প্রজার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার নাম সমসের গাজি। ইহার পিতা পীর মহম্মদ দ্রবঙ্গার চরমসৌম্য উপনীত হইয়া একটা কুমড়া চুরির অপরাধে দক্ষিণ-শিকের জমিদার নাসির মহাম্মদের নিকট আনীত হন। জমিদার ইহার প্রতি সমসের গাজি। সদয় হইয়া আট কানী জমি দান করিয়া ইহার পরিবার প্রতিপালনের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করেন; এই পীর মহাম্মদের এক লক্ষণাক্রান্ত পুত্র হয়; শ্রীধর আচার্য্য নামক এক গণংকার ইহার ঠিকুজি দেখিয়া কুম্ভ রাশিতে জন্ম নির্ণয়পূর্বক সমসের গাজি নাম রাখেন। ছেলেটিকে অপূর্ব মেধাবী দেখিয়া জমিদার ইহাকে নিজ পুত্রদের সঙ্গে অপত্যস্নেহে পালন করেন এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সমসের আরবী, পারসী, উর্দু ও বাঙ্গলায় পারদর্শী এবং প্রভূত দৈহিক বলসম্পন্ন হইয়া উঠেন। এই সময় হইতে ইহার সতীর্থ ছাদ ঠাকুর (মুসলমান) ছায়ার ছায় ইহার অনুগামী হন। ছাদের দৈহিক বল অতুলনীয় ছিল। কথিত আছে ইনি একক ছইটি বাঘ, একটি বুনো হাতী এবং একটি বিশালকার্য্য কুমীর স্বহস্তে মারিয়াছিলেন। দক্ষিণ-শিকে এই সময়ে খুব ডাকাতি হইত। ছাদের সাহায্যে সমসের গাজি ডাকাতদিগকে নিরস্ত করেন, পরন্তু তাহারা প্রতিশ্রুত হয় যে তাহারা দক্ষিণ-শিকে আর ডাকাতি করিবে না, এবং অন্তত যেখানে যেখানে ডাকাতি করিবে সেখানে সেখানে লক্ষ অর্ধের একটা ভাগ সমসেরকে দিবে, ডাকাতদের সংখ্যা পাঁচ শতের উপরে ছিল। এই সময়ে গদা হোসেন খন্দকার নামক এক মস্তবড় সাধু ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, সমসের ত্রিপুরার রাজা হইবেন। তিনি তাঁহাকে একটি মস্তপুত বিজয়ী ঘোড়া ও তরবারি প্রদান করেন। ডাকাতির অর্থে সমসের ধনবান্ হইয়া উঠিলেন, এবং জমিদার নাসির মহাম্মদের রূপসী কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব করেন। নাসির এই প্রস্তাবে জুড় হন; এই ঘটনায় সমসের গাজি বাসস্থান কুম্ভরা হইতে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন। ইহার পর তিনি কৌশলক্রমে জমিদার ও তাঁহার ছই পুত্রকে হত্যা করিয়া স্বয়ং জমিদার বলিয়া ঘোষণা প্রচার করেন। যে রূপসী কন্যার জন্ত এই দুর্ভবিগ্রহ—হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল, সেই দৈয়া-বিবি পিতা ও ভ্রাতাদের শোকে আঙনে পুড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। একটা ডাকাত জমিদারকে হত্যা করিয়া নিজে সেই স্থান লইয়াছে শুনিয়া, ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য তাঁহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্ত পাঠাইয়া দিলেন; উজির হইলেন সেনাপতি। কিন্তু সমসের ছাদের সাহায্যে অতি অতর্কিত ভাবে উজিরকে বন্দী করিলেন, কিন্তু অনেক টাকা নজরানা দিয়া বশতা স্বীকার করায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন; সমসের বিস্তর অর্থ ও উপঢৌকন পাঠাইয়া ত্রিপুরেশ্বরকে বশীভূত করিলেন। ইহার পরে খাজানা বন্ধ করা-সত্ত্বেও কৌশলক্রমে রাজক্ৰোধ হইতে অব্যাহতি পাইয়া দক্ষিণ-শিক মেহেরকুলের জমিদারী প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তিন বৎসর

কাল গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যবল ক্রমশঃ বাড়াইয়া তিনি হঠাৎ ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মহারাজ কৃষ্ণমণি যতবার যুদ্ধ করিলেন, ততবারই হারিতে লাগিলেন। সমসের উদয়পুরে বাইয়া হানা দিলেন। রাজা একবার জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু শেষে হারিয়া গিয়া মণিপুরে পলাইয়া গেলেন। সমসের রাজ্য-বিজয় করিয়া বহু অর্থ দ্বারা নবাবের কৰ্মচারীদেরকে বশীভূত করিয়া ত্রিপুরা-সিংহাসনের সনদ আনাইলেন। ইনি ছাদের ভগিনীকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে ক্রমশঃ মনোমালিন্য বাড়িয়া

চলিল। ছাদের অভিযোগ “আমি করি যুদ্ধ-জঙ্গ নাম হয় তার।
“আমি যুদ্ধ-জঙ্গ করি, আমি মারি ব্যাঙ্গ-ভালুক দোহাই তাহার। রাজ্য লইলাম কাড়ি—
তুমি অধিকারী।” রাজা ভাগে ডরে। আদেল ইনছাফ করে, না জিজ্ঞাসে মোরে।”

একদিন প্রকাশভাবে সে সমসের গাজিকে বলিল, “তোমার লাগি জমিদার নাসিরেরে মারি। রাজকংশ তাড়াইহু রাজদণ্ড কাড়ি। হকুম-জারি কর তুমি মোরে পরিহরি। আমি যুদ্ধ-জঙ্গ করি—তুমি অধিকারী।” এইভাবে মনোমালিন্য বাড়িয়া চলিল; শেষে সমসের গাজি গোপনে ও কৌশলক্রমে ছাদকে নিহত করিলেন। ছাদের ভগিনী—সমসের গাজীর বেগম—ব্রাহ্মণ্যশোকে প্রাণ দিলেন; তিনি মৃত্যুর পূর্বে স্বামীকে কহিয়াছিলেন, “তাহার কল্যাণে তোমার এসব সম্পদ। কে আর ধরিবে ঢাল আসিলে বিপদ।”

এই সমসের গাজির জীবনী লিখিয়াছেন, তাহার প্রিয়বন্ধু ও ভক্ত সেক্ ময়ূর। তিনি লিখিয়াছেন, রাজার সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ত্রিপুরেশ্বরী কালী সমসেরকে স্বপ্ন দেখাইয়া তাহার

পূজা দিতে আদেশ দেন। গাজি ব্রাহ্মণ ডাকাইয়া দেবীর বোড়শো-
লক্ষণমাণিক্য—১৭৬০
পচারে পূজা দিয়াছিলেন। রাজ্য বিজয় হইল বটে, কিন্তু পাহাড়ের
কুকীরা ত্রিপুর-রাজবংশ ব্যতীত অপর কাহারও আনুগত্য করিবে

না—এই কথা জানাইলে, সমসের গাজি উদয়মাণিক্যের ব্রাহ্মপুত্র বনমালীকে “লক্ষণমাণিক্য”
উপাধি দিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত করান। মহারাজ কৃষ্ণমণি সিংহাসন লইয়া গিয়াছিলেন, এজন্ত একটা বাঁশের সিংহাসন তৈরী করিয়া রাজাকে অভিষেক করা হইয়াছিল, কিন্তু লক্ষণমাণিক্য সাক্ষীগোপাল হইয়া ছিলেন; সমসের গাজিই প্রকৃত রাজা। অতঃপর গাজি ভুলিয়া জয় করেন। নবাব সরকারে তিনি প্রতিবৎসর একলক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা রাজস্ব দিতেন, এবং তাহার রাজ্য—দক্ষিণে শ্রীহট্ট—কর্ণজুলির উত্তর পর্য্যন্ত এবং মেঘনা নদীর পূর্বে—যাবদি পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। রাজা হইয়া সমসের প্রজাদিগকে স্বশাসনে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি অনেক হিন্দু ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন; বাজারে প্রত্যেক জিনিষের মূল্য ধাৰ্য্য করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারিত না (১৭৪২-৫১ খৃঃ)।

মূল্য-তালিকা এইরূপ :—চাউল—/১ সের=২৫। লঙ্কামরিচ—/১ সের=২৫। শুড়—/১ সের=২০। লবণ—/১ সের=২০। রত্ননগিয়াজ—/১ সের=২০। কাপাঁশ—/১ সের=/৫। কলাই /১ সের=২৫। মুস্তরি /১ সের=২০। মটর /১ সের=২০। অড়হর /১ সের=/০। মুগ /১ সের=/০। তৈল /১ সের=/০। ঘৃত /১ সের=/০ আনা।

এসকলই বিরাশির ওজন ছিল। পলাশীর যুদ্ধের প্রাকালে বাজার দর কিরূপ ছিল, ইহা হইতে তাহা বুঝা যায়। “সমসের গাজির গানে” অনেক কৌতুকবহু কথা আছে। চন্দ্র ও উৎসব নামে দুই নাপিত তাঁহাকে নিম্নিত অবস্থায় খেউরি করিয়া পুরস্কার পাইয়াছিল। ক্ষৌর-কাণ্ডের সময়ে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গে নাই। তিনি স্বীয় প্রাসাদে স্কুল খুলিয়া বহু ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন, তাহাতে সন্দীপ হইতে এক অন্ধ হাফেজ আনাইয়া তিনি কোরান পড়াইতেন, হিন্দুস্থান হইতে মোলভি আনাইয়া আরবি পড়াইবার ও জুগদিয়া হইতে গুরু মহাশয় আনাইয়া বাঙ্গলা এবং ঢাকা হইতে মুনসী আনাইয়া পারশী পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রাতে ৬টা হইতে ১০টা এবং মধ্যাহ্নে ১২টা হইতে ৪টা,—পড়িবার এই সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। গাজি শাসন-সংক্রান্ত এরূপ কড়াকড়ি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, চোর-দস্যুর উৎপাত ত্রিপুরা রাজ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। সমসের গাজির এক কন্তাকে ঢাকার নবাব বিবাহ করেন। ইহার পরে পুনঃ পুনঃ মুর্শিদাবাদে যাইয়া গাজিকে আলিবর্দি খাঁ নবাবের সঙ্গে দেখা করিবার হুকুম আসিতে লাগিল। ঢাকার নবাবের নিবেদে গাজি প্রথমতঃ তথায় বাইতে দ্বিধা বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অবশেষে এক সন্ন্যাসীর প্ররোচনায় গাজি ১৭৫১ খৃঃ অব্দে মুর্শিদাবাদ গেলেন। এদিকে আবু বখর নবাবকে বুঝাইয়াছিলেন “ভাটীর বাঘ বন্দী করি ছাড়ি দিবা কেনে। আসিয়া মারিবে দেশ সমুখে সে রণে। কাড়ি নিল দক্ষিণ-শিক জমিদারে মারি। রাজবংশ খেদাইল রোসনাবাদ (ত্রিপুরা) কাড়ি। অতাপি ভাল আছে বন্দী করি আনি। নতুবা পশ্চাতে তব হবে পেরশোনি।” ভীত হইয়া নবাব নিমরাজি হইলেন, বিনা অপরাধে গাজিকে তোপের মুখে ফেলিয়া হত্যা করা হইল। “হুঃখীরাম চণ্ডাল বলবানু অতি। গাজীর সহিত তার আছিল পীরিতি। পাঁচ শত লোক জন তার সঙ্গে ছিল। গাজির পরিবার সেই দেশে আনি দিল।”

কৃষ্ণমাণিক্য ১৭৬০ খৃঃ অব্দে রাজা হন। রামগঙ্গা বিশারদ নামক এক পণ্ডিত ‘কৃষ্ণমালা’ নামক পুস্তকে ইহার বিস্তৃত কাহিনী লিখিয়াছেন।
কৃষ্ণমাণিক্য, ১৭৬০ খৃঃ—
“কৃষ্ণমালা”।
কিন্তু ইংরেজাধিকারের পূর্ব পর্যন্ত আমি এই পুস্তকের বিষয় নির্দিষ্ট করিয়াছি, স্তবরাং এই স্থানে ত্রিপুরার ইতিহাস শেষ করিলাম।

আমরা ত্রিপুর-রাজ্যের ইতিহাসে বাঙ্গালী জাতীর গৌরব করিবার অনেক বিষয় পাইয়াছি। এই বংশ শুধু ভারতের প্রাচীনতম রাজবংশ নহে, ইহার কীর্তিকথা চিরস্মরণীয় এবং বঙ্গের ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিতেছে। ইহার কয়েকটি স্থানে স্বতন্ত্র স্থাপিত হইলে তাহা বাঙ্গালী জাতির দর্শনীয় পুণ্যস্থানে পরিণত হইবে।

(১) যেখানে প্রতীত হইতে ৫ম স্থানীয় মহারাজ হিমতির (হামতরজার) শ্মশান লোক-স্মৃতিতে অক্ষয় করিবার জন্ত “বৈকুণ্ঠপুর” স্থাপিত হইয়াছিল, (২) মহারাজ

কীৰ্ত্তিধরের (ছেং খোংফার) বৈজয়ন্তী-স্বরূপা মহারানী ত্রিপুরা-সুন্দরী যেখানে হস্তিপৃষ্ঠে আরুঢ়া হইয়া গোড়েখরের সেনাপতি হীরাবন্ত খাঁর সোণার পাগড়ীর উপর স্বীয় বিজয়-চিহ্ন লাক্ষিত করিয়া দিয়াছিলেন, (৩) যেখানে এই বীর-রমণীর দুর্দ্বন্দ্ব সমরে লক্ষ সৈন্য হত হইয়াছিল—এবং উর্দ্ধে কবন্ধ-দর্শনের পরিকল্পনা করিয়া রাজা বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন, রাজ-জামাতা সেই শোণিতার্জ শব-সঙ্কুল রণ-ক্ষেত্রে বসিবার জন্য তিলমাত্র স্থান না দেখিয়া বিশালকায় হস্তীর দন্ত খড়্গাঘাতে কাটিয়া রাজার জন্য সাময়িক সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন—ত্রিপুরার রাজ্যী কর্তৃক গোড়ের এই পরাজয়-কাহিনী চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই সকল স্থানে কোন স্থতিচিহ্ন রাখা করা কি উচিত নহে? যেখানে যেখানে ত্রিপুর-রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজধানী ছিল, যথা ত্রিবেগ, খলংমা ছাঙ্গলনগর, কাইচারঙ্গ, আচরঙ্গ, তারক, বিশাল গড়, খুটিমুড়া, নাকিবাড়ী, ধানাংচি, ধোপা-পাধর, লাউগঙ্গা, মোহরী গঙ্গা, তেলাইরঙ্গ, মণিপুর, উদয়পুর—সেই সকল স্থান এখন নিশ্চিহ্ন,—ইহাদের স্থতিচিহ্ন রাখার কোন ব্যবস্থা হইতে পারে।

(৪) যেখানে হুসেন শাহের সৈন্যদিগকে উপর্যুপরি মহারাজ ধন্তমাণিক্যের সেনাপতি মহাবীর চয়চাগ জয় করিয়াছিলেন, যেখানে ত্রিপুর-সেনারা আট মাস ব্যাপী চেষ্টার পর অষ্ট হস্ত দীর্ঘ ও তিন হস্ত প্রশস্ত গোধিকার সাহায্যে অজয়ের ধানাংচি দুর্গ জয় করিয়াছিলেন, তথায়ও একটি স্থতিস্তম্ভ উথিত হইতে পারে। (৫) মহারাজ অমর মাণিক্যের অমর কীৰ্ত্তি 'অমর-দীঘি' এখনও বিজ্ঞমান, এই দীঘির খনন-কার্য ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হইয়া ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়,—এই খনন-কার্যে সহায়তা করিবার জন্য সামন্ত-রাজারা লোক পাঠাইয়াছিলেন, শ্রীপুরের চাঁদ রায় ৭০০, বাকুলার বহু ৭০০, গোয়াল পাড়ার গাজি ৭০০, ভাওয়ালের রাজা ১০০০, সরাইলের রাজা ইসা খাঁ ১০০০, ভুলুয়ার রাজা ১০০০, একথা পূর্বে অমরমাণিক্যের রাজদ্রুপসঙ্গে একবার লিখিয়াছি; সেই অমর-দীঘির তীরে এক স্থতিস্তম্ভ রচনা করিয়া তন্মধ্যে এই কথাগুলি উৎকীর্ণ করিলে ত্রিপুর-রাজবংশের গৌরবের বিষয় হইতে পারে। (৬) যেখানে যুবরাজ রাজধর—ইসা খাঁ প্রভৃতি সামন্ত-রাজগণ সহ তোরাপের (শ্রীহট্টের) রাজা ফতে সিংহকে ভীষণ যুদ্ধের পর পরাজয়পূর্বক বন্দী করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন—সেই স্থানে সুখ্যা নদীর তীরে গোদারানী-পল্লীতে বিজয়স্তম্ভ উথিত করিয়া সেই জয়বার্তা চিরস্মরণীয় করিবার যোগ্য। (৭) এক্ষণ আরো অনেক স্থান আছে, বাহ্য-ভরে তাহার উল্লেখ করিলাম না। যেখানে যেখানে মহারানীরা সহমৃতা হইয়াছিলেন,—তাহার উল্লেখ রাজমালায় আছে—সেখানে সেখানে সমস্ত বাঙ্গালী-জাতির তপ্ত অশ্রুর অর্ঘ্য দ্বারা—সেই পুণ্যশীলাদের স্থতি অভিনন্দিত হইতে পারে। (৮) এই কার্যে ব্যয় খুব বেশী হইবার নহে। শুধু প্রস্তরলেখ প্রস্তুত করা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ রচনার খরচ কতই বা পড়িবে? আমার মনে হয় এক একটি স্তম্ভে ১৫০ টাকা খরচ হয় না।

ত্রিপুরার রাজারা অনেকেই বাঙ্গলাভাষার উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন—তাহারা যে সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থ বাঙ্গলায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন—সেগুলি কোথায় গেল? তাহা কি

পাওয়া যায় না? মহারাজ ধর্মমাণিক্য উৎকল-খণ্ড পাঁচালী এবং জ্যোতিষের যাত্রা-
রত্নাকরের বঙ্গানুবাদ রচনা করাইয়াছিলেন, অমর-মাণিক্য
বঙ্গভাষার উৎসাহ-দান। ও রাণী কমলা সম্বন্ধে অনেক পল্লী-গীতিকা ছিল, গ্রিহত
হইতে গায়ক ও নর্তক আনাইয়া ধর্মমাণিক্য তাঁহার লোকদিগকে সেই সকল গীত
বিশুদ্ধ ভাবে গাহিতে শিখাইয়াছিলেন। মহারাজ ধর্মমাণিক্য (২য়) অষ্টাদশ পর্ক
মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। আরও কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ
ত্রিপুরেশ্বরগণের উৎসাহ ও চেষ্টায় হইয়াছিল। এই সকল পুস্তক ও গান কোথায় গেল?
আমার বিশ্বাস, সন্ধান করিলে উহা আংশিক ভাবেও উদ্ধার করা বাইতে পারিবে—সেই
সন্ধান করিবে কে? আমরা বর্তমান বিজ্ঞোৎসাহী নরেশ শ্রীমন্তমহারাজ বীরবিক্রমকিশোর
মাণিক্য বাহাদুরের দৃষ্টি এইদিকে সশ্রদ্ধভাবে আকর্ষণ করিতেছি। ত্রিপুরার অনেক তাম্রপট
ও প্রাচীন দলিল আমরা বঙ্গভাষায় লিখিত পাইয়াছি।

ত্রিপুর-রাজাদের অনেকেই দান ও বদান্ততার উদাহরণ রাজমালায় পাওয়া যায়—কিছু-
দিন পূর্বেও ত্রিপুরেশ্বরগণ খুব বিলম্বে আহার (মধ্যাহ্ন গত হইলে) করিতেন, এবং আহারের
পূর্বে জিজ্ঞাসা করিতেন, “আমার রাজ্যে কোন প্রজা অভুক্ত আছে
উদারতা ও দানশীলতা। কি?” তাঁহাদের দানপত্রে লেখা থাকিত—“যদি কেহ আমার
বংশের লোপ করিয়া এই সিংহাসন অধিকার করেন, তবে আমি তাঁহার দাসানুদাস হইয়া শ্লাঘা
বোধ করিব, যদি তিনি আমার প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তরে হস্তক্ষেপ না করেন।” যদিও এই সকল রীতি
পূর্বযুগের সংস্কার—ভারতীয় অনেক রাজ্যের তাম্রশাসনে একরূপ কথা পাওয়া যায়—তথাপি
যতবার ইহা পাঠ করি, ততবারই সেই স্বতঃপ্রবৃত্ত দানশীলতার উৎস—যাহা হইতে ইহার প্রথম
উদ্ভব হইয়াছিল তাহা মনে পড়িয়া সেই মহানুভব রাজাদের আদর্শের উচ্চতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া
থাকি। এখন রাজপ্রাসাদ হইতে এই মহৎ সংস্কারগুলি লুপ্ত হইয়া থাকিলে তাহা দুঃখের বিষয়
হইবে। পূর্বে রাজারা মেখলী রমণীদের কোমল হস্তের নিত্য নবনির্মিত কারুকার্যশোভিত
ফুলের মশারি ও ফুলের শয্যায় শয়ন করিতেন; আমি মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের শয়ন-
গৃহে সেইরূপ শয্যা হইত, তাহা জানি।—সেই শয্যার রূপ ও সুরভিতে মন মুগ্ধ হইয়া বাইবার
কথা। এখন সে সকল রীতি আছে কি না জানি না। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য তাঁহার চির-
শত্রু মুসলমান সমসের গাজির প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর ও অস্ত্রান্ত্র দানের উপরও হস্তক্ষেপ করেন নাই।

ত্রিপুর-রাজ্যে প্রজা ও সেনাপতিদের যে কতটা ক্ষমতা ছিল, তাহার অনেক উদাহরণ
রাজমালায় দৃষ্ট হয়। ১৩১ সংখ্যক মহারাজার অভিষেক সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—“সাধু-
রায় নামে তার ছোট ভাই ছিল। সর্বলোকে রাজি হইয়া তাকে
গণতন্ত্র, প্রজাদের ক্ষমতা। রাজা কৈল।” (বৃদ্ধার খণ্ড।) মহারাজ সাধুরায় ১২০০ খৃষ্টাব্দে
জীবিত ছিলেন। ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ধর্মমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—মহারাজ ধর্মমাণিক্যের
পুত্র মহারাজ প্রতাপমাণিক্যকে প্রজারা হত্যা করিয়াছিল। (“প্রতাপ কনিষ্ঠ পুত্র লোকে
রাজা করে। স্বার্থিক দেখি তাকে লোকে মারে পরে।”—রত্নমাণিক্য খণ্ড।) লিখিত

আছে, রাজা ইন্দ্রমাণিক্যের মাতার প্রিয় এক ব্রাহ্মণ আড়াই বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই ছরাস্বাকে প্রজারা হত্যা করিয়াছিল (১৫২৮ খৃঃ)। ত্রিপুরেশ্বর জয়মাণিক্যকে উত্তেজিত সৈন্তেরা বধ করিয়া অমরমাণিক্যকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিল (১৫২৭ খৃঃ)। অরাজকতা দেখিয়া বেরুপ প্রজারা পালবংশের প্রদীপ গোপালকে অভিষিক্ত করিয়াছিল, ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার প্রজারা সেইরূপ কল্যাণমাণিক্যকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। “রাজপুত্র-পৌত্র নাই, নাহি রাজ-ভ্রাতা। কাহাকে করিব রাজা জানিয়া সর্কধা। সেনাপতি মন্ত্রিগণ চিন্তিত তখন। কাহাকে করিব রাজা না দেখি লক্ষণ। মহামাণিক্যবংশে কল্যাণ নাম খ্যাতি। যশোধর-কালে কৈলাগড়ে সেনাপতি। করিছে অনেক যুদ্ধ সেই মতিমান। রাজযোগ্য হয় সেই দেখি বিজ্ঞমান। এসব চিন্তিয়া সেনা পাত্র মিত্রগণ। কল্যাণ নাম সেনাপতি বৈসে সিংহাসন।” (কল্যাণমাণিক্য খণ্ড)। ত্রিপুরা-রাজবংশের ইতিহাসে এইরূপ উদাহরণ আরও আছে। আমরা এক গোপালকে লইয়া এদেশে গণতান্ত্রিকতার প্রমাণ খাড়া করিয়াছিলাম। কিন্তু ত্রিপুর-রাজবংশে এইরূপ কত গোপাল দেখিতে পাইতেছি। অবশ্য একথা বলা উচিত, যে সকল রাজাকে প্রজারা নির্বাচিত করিয়াছিল, তাঁহাদের ধমনীতে রাজব্রত কম-বেশী প্রবাহিত থাকিত। ত্রিপুর-রাজ্যের একটা ইতিহাস আছে—এইজন্য এই সকল কথা জানিতে পারিলাম। অত্যাচর দেশের ইতিহাস লুপ্ত হওয়াতে তাহার প্রমাণ নাই; কিন্তু আমার মনে হয় হিন্দুস্থানের প্রাদেশিক রাজ্যগুলির সকলেরই এক আদর্শ ছিল।

ত্রিপুরার পূর্ণ-গৌরবের সময়ে এই রাজ্যের সীমানা নিম্নলিখিতরূপ ছিল :—উত্তরে ভূটান—ব্রহ্মপুত্র বা তৈরঙ্গ নদ, পশ্চিমে গাড়ে পাহাড়—কোচবিহারের সীমান্ত পর্য্যন্ত এবং ময়মনসিংহের নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ সমেত ঢাকানগরীর পূর্বে মেঘনা নদী পর্য্যন্ত, পশ্চিম-দক্ষিণে মেহেরকুল, চট্টগ্রাম ও ধোপার পাথরের দক্ষিণ পর্য্যন্ত, সময়ে সময়ে ভুলুয়াও অধিকৃত হইত। দক্ষিণে রাজামাটি, লিকাপাহাড় প্রভৃতি এবং পূর্বে সীমান্তে প্রাগজ্যোতিষপুর লইয়া খলংমা, থানাংচি প্রভৃতি। প্রাচীন ত্রিবেগ হইতে ত্রিপুররাজ্য আরো পূর্বে সরিয়া আসিয়া উত্তর-দক্ষিণে অনেকটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

ত্রিপুর-রাজবংশ—রাজমাধার নবসংস্করণের ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয় বেরুপ বংশলতা দিয়াছেন, তদনুসারে :—১ চন্দ্র, ২ বৃধ, ৩ পুরুষবা, ৪ আয়ু, ৫ নহষ, ৬ যযাতি, ৭ ব্রহ্মা, ৮ বজ্র, ৯ সেতু, ১০ অনন্ত, ১১ গান্ধার, ১২ ধর্ম, ১৩ ধৃত, ১৪ হর্ষদা, ১৫ প্রচেতা, ১৬ পরাচি (শতধর্ম), ১৭ পরাবস্ত্র, ১৮ পারিষদ, ১৯ অরিজিত, ২০ সৃজিৎ, ২১ পুরুষবা (২য়), ২২ বিবর্ণ, ২৩ পুরু সেন, ২৪ মেঘবর্ণ, ২৫ বিকর্ণ, ২৬ বসুমান, ২৭ কীর্তি, ২৮ কনৌয়ান, ২৯ প্রতিশ্রবা, ৩০ প্রতিষ্ঠ, ৩১ শত্রুজিৎ, ৩২ প্রতর্দন, ৩৩ প্রমথ, ৩৪ কলিন্দ, ৩৫ ক্রম, ৩৬ মিজারি, ৩৭ বারিবর্হ, ৩৮ কার্ণক, ৩৯ কলিন্দ, ৪০ ভীষণ, ৪১ ভাহুমিত্র, ৪২ চিত্রসেন, ৪৩ চিত্রবর্হ, ৪৪ চিত্রায়ুধ, ৪৫ দৈত্য, ৪৬ ত্রিপুর, ৪৭ ত্রিলোচন, ৪৮ বীরসেন, ৪৯ তদ্বদক্ষিণ,

বংশাবলী।

৫০ সুদক্ষিণ, ৫১ তরদক্ষিণ, ৫২ ধর্মতরু, ৫৩ ধর্মপাল, ৫৪ সধর্মী, ৫৫ তরবঙ্গ, ৫৬ দেবাহ, ৫৭ নরাসিত্ত, ৫৮ ধর্মাস্তদ, ৫৯ কুম্ভাস্তদ, ৬০ গোমাস্তদ, ৬১ নৌযুগরায়, ৬২ তরজুঙ্গ, ৬৩ রাজধর্ম (তররাজ), ৬৪ হামরাজ, ৬৫ বীররাজ, ৬৬ শ্রীরাজ, ৬৭ শ্রীমান, ৬৮ লক্ষ্মীতরু, ৬৯ রূপবাণ, ৭০ লক্ষ্মীবাণ (মাইলক্ষ্মী), ৭১ নাগেশ্বর, ৭২ যোগেশ্বর, ৭৩ নীলধ্বজ (ঈশ্বরফা), ৭৪ বহুরাজ (রঙ্গধাই), ৭৫ ধনরাজফা, ৭৬ হরিহর (মুচংফা), ৭৭ চন্দ্রশেখর (মাইচন্দ্রফা), ৭৮ চন্দ্ররাজ (তরুরাজ), ৭৯ ত্রিপলি (তরফলাই), ৮০ সুনন্ত, ৮১ রূপবন্ত, ৮২ তরহোম, ৮৩ হরিরাজ, ৮৪ কাশীরাজ (কচরফা), ৮৫ মাধব (কোলাতরফা), ৮৬ চন্দ্রফা, ৮৭ গজেশ্বর, ৮৮ বীররাজ, ৮৯ নাগেশ্বর, ৯০ শিখিরাজ, ৯১ দেবরাজ, ৯২ ধূসরাজ, ৯৩ বারকীর্তি, ৯৪ সাগরফা, ৯৫ মলয়চন্দ্র, ৯৬ সূর্য্য রায়, ৯৭ ইন্দ্রকীর্তি, (আচন্দ্র ফগাই), ৯৮ বীরসিংহ, ৯৯ সুরেন্দ্র (হাচুংফা), ১০০ বিমান, ১০১ কুমার, ১০২ স্কুমার, ১০৩ বীরচন্দ্র (তৈছরাও), ১০৪ রাজ্যেশ্বর, ১০৫ নাগেশ্বর, ১০৬ তৈছংফা (তেজংফা), ১০৭ নরেন্দ্র, ১০৮ ইন্দ্রকীর্তি (২য়), ১০৯ বিমান (পাইমরাজ), ১১০ বশোরাজ, ১১১ বঙ্গ, ১১২ গঙ্গারায়, ১১৩ চিত্রগণ (ছাজুরায়), ১১৪ প্রতীত, ১১৫ মারিচি, ১১৬ গগন (কাকুধ), ১১৭ কীর্তি (নওরাজ), ১১৮ হিমাত্তি (যুদ্ধারফা বা হামতরফা), ১১৯ রাজেন্দ্র (জঙ্গীফা), ১২০ পার্শ্ব, ১২১ সেবরায়, ১২২ কীরীট (ধর্মপা বা ভুদুরফা), ১২৩ রামচন্দ্র (খারুংফা), ১২৪ নৃসিংহ (ছেংফনাই), ১২৫ ললিতরায়, ১২৬ মুকুন্দফা, ১২৭ কমলরায়, ১২৮ কুম্ভদাস, ১২৯ বশোরাজ, ১৩০ উদ্ধব (মোচংফা), ১৩১ সাধুরায়, ১৩২ প্রতাপরায়, ১৩৩ বিষ্ণুপ্রসাদ, ১৩৪ বাণেশ্বর, ১৩৫ বীরবাহু, ১৩৬ সম্রাট, ১৩৭ চম্পকেশ্বর, ১৩৮ মেঘ, ১৩৯ ধর্মধর (ছেংকাছাগ), ১৪০ কীর্তিধর (ছেংযুমফা), ১৪১ রাজসূর্য্য (আচংফা), ১৪২ মোহন (মিচুংফা), ১৪৩ হরিরায় (ডাঙ্গরফা), ১৪৪ রাজফা, ১৪৫ রত্নফা (রত্নমাণিক্য), ১৪৬ প্রতাপমাণিক্য, ১৪৭ মুকুটমাণিক্য (মুকুন্দ), ১৪৮ মহামাণিক্য, ১৪৯ ধর্মমাণিক্য (২য়), ১৫০ প্রতাপমাণিক্য, ১৫১ ধর্মমাণিক্য, ১৫২ ধ্বজমাণিক্য, ১৫৩ দেবমাণিক্য, ১৫৪ ইন্দ্রমাণিক্য, ১৫৫ বিজয়মাণিক্য, ১৫৬ অনন্তমাণিক্য, ১৫৭ উদয়মাণিক্য, ১৫৮ জয়মাণিক্য, ১৫৯ অমরমাণিক্য, ১৬০ রাজধরমাণিক্য, ১৬১ বশোধরমাণিক্য, ১৬২ কল্যাণমাণিক্য, ১৬৩ গোবিন্দমাণিক্য, ১৬৪ ছত্রমাণিক্য, ১৬৫ রামদেবমাণিক্য, ১৬৬ রত্নমাণিক্য (২য়), ১৬৭ নরেন্দ্রমাণিক্য, ১৬৮ মহেন্দ্রমাণিক্য, ১৬৯ ধর্মমাণিক্য (২য়), ১৭০ মুকুন্দমাণিক্য, ১৭১ জয়মাণিক্য, ১৭২ ইন্দ্রমাণিক্য, ১৭৩ বিজয়মাণিক্য, ১৭৪ কুম্ভমাণিক্য।

পরবর্তী রাজগণ—১৭৫ রাজধরমাণিক্য, ১৭৬ রামগঙ্গামাণিক্য, ১৭৭ তুর্গামাণিক্য, ১৭৮ কাশীচন্দ্রমাণিক্য, ১৭৯ কুম্ভকিশোর মাণিক্য, ১৮০ ঈশানচন্দ্রমাণিক্য, ১৮১ বীরচন্দ্রমাণিক্য, ১৮২ রাধাকিশোর মাণিক্য, ১৮৩ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য, ১৮৪ মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য।

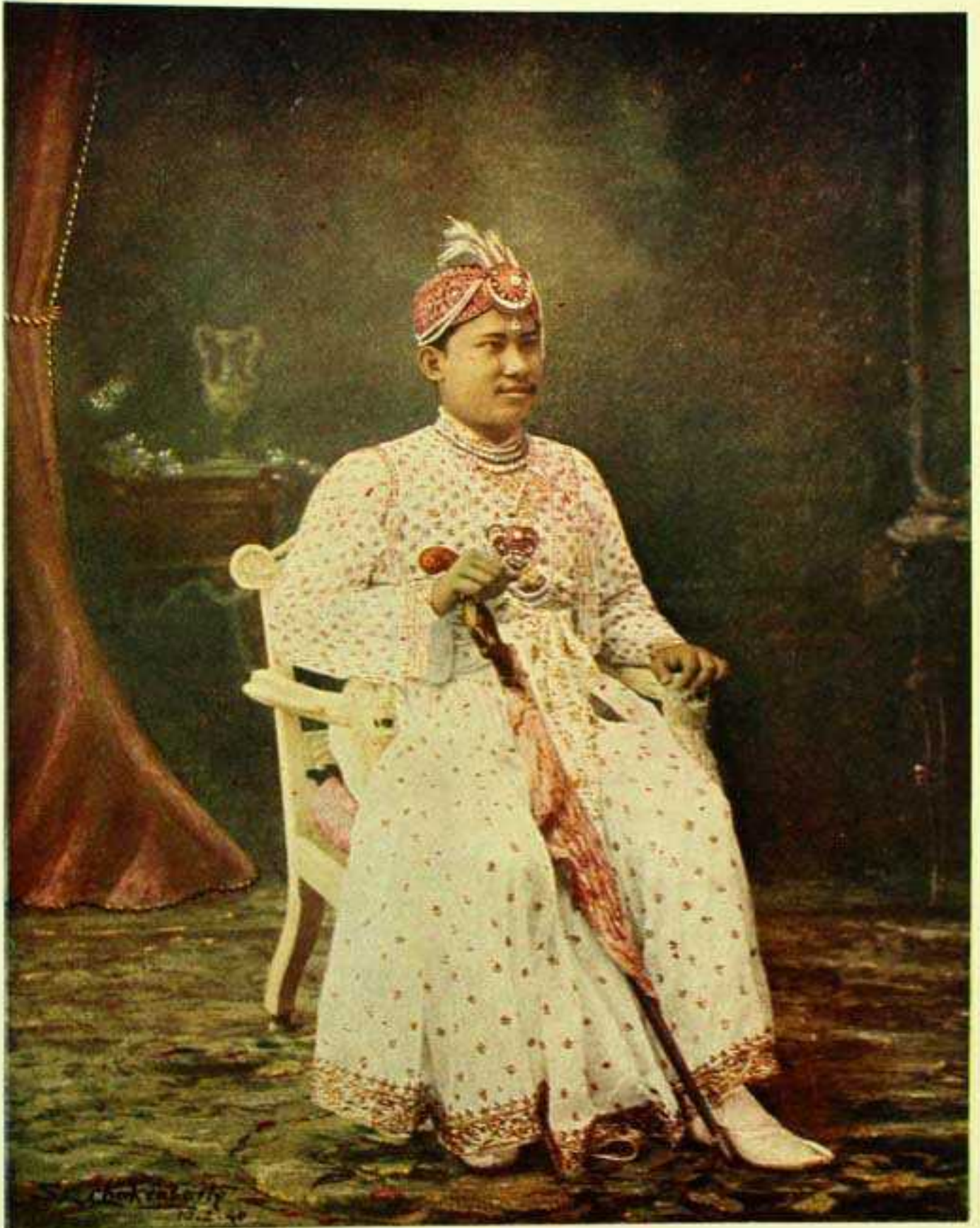
ঐযু ভারতবর্ষে কেন চীনদেশ ছাড়া জগতে এরূপ সুদীর্ঘকাল এক রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত নাই। প্রথমে এই বংশের রাজধানী ছিল সগর দ্বীপের কপিলানগরের



মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্য—রাজত্বকাল ১৮৭০-১৮৮৬ খ্রিঃ।



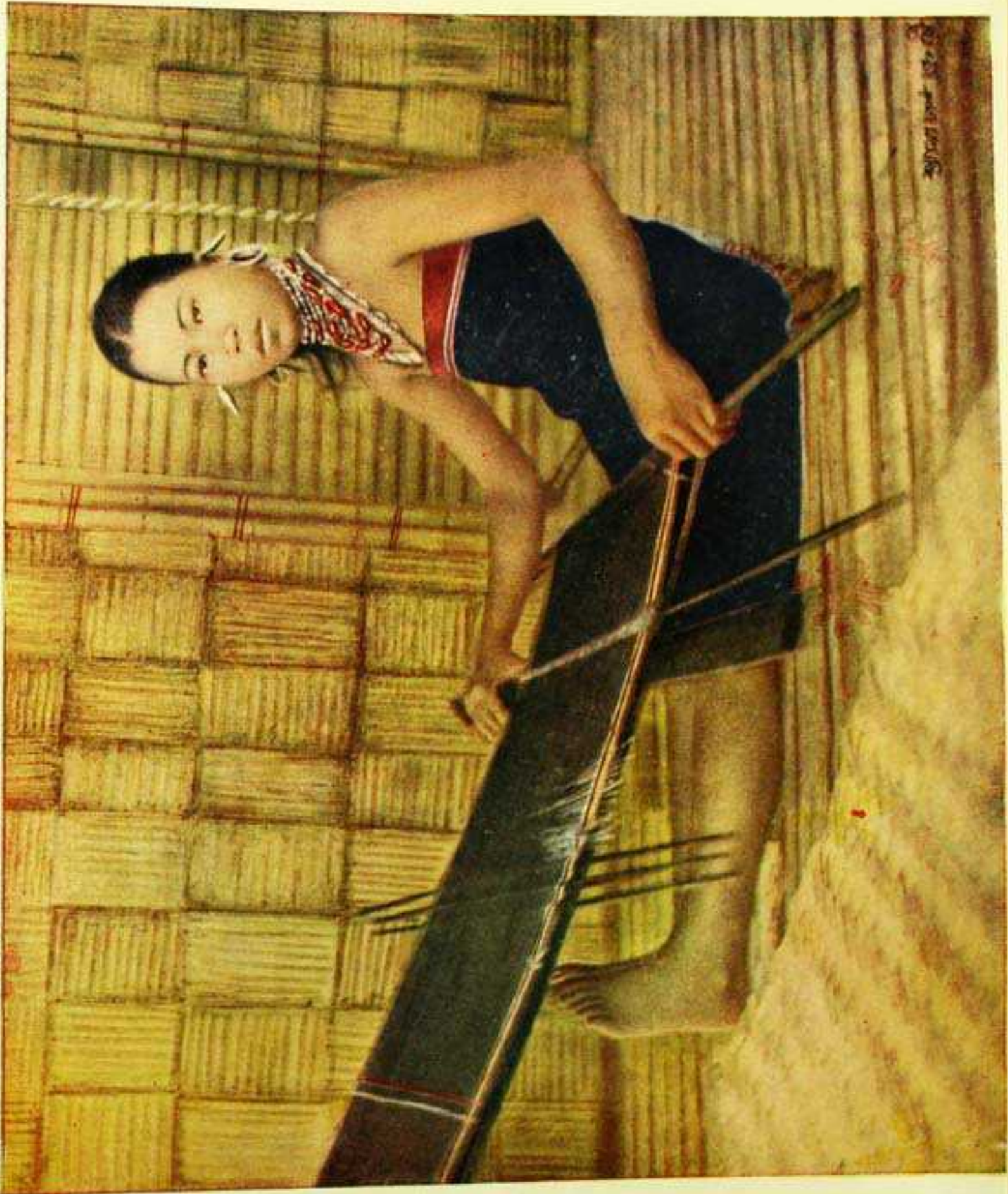
মহারাজা রঘোবিশোর মল্লিক—রাজত্বকাল ১৮২৭-১৮৬২ খৃঃ।



মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মণিক্য—রাজত্বকাল ১৯০২-১৯২৩ খৃঃ।



"রিয়া" প্রস্তুতকারিতা রমণীগণ ।



নিকট। ৩২ সংখ্যক নৃপতি প্রতর্দন সগরদ্বীপের রাজধানী ছাড়িয়া কিরাতদিগকে পরাজয়-পূর্বক কাছাড়ে বাইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বর্তমান ত্রিপুররাজ্য সংস্থাপিত করেন। এই

কিরাত-জাতি-বেষ্টিত হইয়া ইহারা অনাথ্য আচার ও উপাধি
হালামদের উপাধি।
অবলম্বন করেন। ৭৩ সংখ্যক রাজার সময় হইতে ত্রিপুর-রাজগণ

অনেকে “ফা” (পিতা বা প্রভু) উপাধি ধারণ করিয়াছেন। চীনদেশের প্রভাবাবিহিত ‘হালাম’ নামক পার্শ্বত্যা জাতির এক সময়ে ত্রিপুরাঞ্চলে বিশেষ প্রভুত্ব ছিল, সেই জাতির সংস্পর্শে আসিয়া ত্রিপুরায় পুনরায় আর্থ্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিপত্তি আরম্ভ হইবার পূর্বে ত্রিপুর-রাজগণ উক্ত চীন-প্রভাবাবিহিত হালাম জাতির ভাষা হইতে অনেক সময়ে উপাধিগুলি গ্রহণ করিয়া ছিলেন। এইভাবে শক ও হুণ রাজারা তাঁহাদের নিজেদের নামের সঙ্গে হিন্দু উপাধি গ্রহণ করিতেন (১২০ পৃঃ)। এই ‘হালাম’ ভাষার প্রচলন এত বেশী হইয়াছিল যে দ্ব্যমাবিক্য (১৪৬৩ খৃঃ-১৫১৩ খৃঃ) পর্য্যন্ত রাজত্বের প্রথম সময়ে বাঙ্গলা ভাষা বুদ্ধিতে পারিতেন না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানে, বৌদ্ধ প্রভাব এদেশ হইতে সম্পূর্ণ লোপ পাইবার পর, সংস্কৃত ও “সুভাষার” (বাঙ্গলা ভাষার) প্রচলন এতদ্দেশে বেশী হইয়াছিল।

স্মরণাতীত কাল হইতে ত্রিপুরার পার্শ্বত্যা প্রদেশে বয়ন-শিল্পের প্রচলন আছে। পাছুড়ি, ছুবেড়া, পরী (আসন) প্রভৃতি বস্ত্র প্রায় সমস্ত পাহাড়িয়া রমণীরাই প্রস্তুত করিতে পারেন। যুধিষ্ঠিরের সম-সাময়িক বলিয়া কথিত সুলোচন
ত্রিপুরার শিল্প।
রাজা শিল্পের বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনিই তদ্দেশে

কার্পাস-বস্ত্রের বেশী প্রচলন করিয়াছিলেন। ১৪১ স্থানীয় রাজা রাজ-স্বর্ঘ্যের (আচঙ্গ ফা) মহিষী জয়ন্ত-রাজ-কুমারীই রাজ-পরিবারে বস্ত্র-শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করেন। তাঁহার পুত্রবধুও পরে এবিষয়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ জয়ন্ত-রাজ-কুমারী আচঙ্গ ফার মহিষীই ত্রিপুরার সর্কাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র “রিয়া”র উদ্ভাবন করেন। এই “রিয়া” ঐচীন কালের সুপ্রসিদ্ধ “কাঁচুলী”, ইহাতে নানারূপ ফুল-লতা, পশুপক্ষী, মনুষ্য ও দেব-দেবীর মূর্তি স্বজঘারা প্রস্তুত হইত। এই “রিয়া” শুধু রাজপরিবার ও ঠাকুর সাহেবদের গৃহ-ললনারাই প্রস্তুত করিয়া থাকেন; ইহার ব্যবহারও তাঁহাদের মধ্যেই আবদ্ধ। মসলিনের স্থায় রিয়ার আদরও বঙ্গে সর্কজন-বিদিত। ত্রিপুরেশ্বরগণের অনেকেরই শিল্পের দিকে এতটা ঝোঁক ছিল যে শিল্পের পটুত্ব দেখিয়া তাঁহারা রমণীকুল হইতে মহিষী নির্বাচন করিতেন। কথিত আছে, উদয়মাণিক্য শিল্পকুশলী ২৪৩টি রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহাদের প্রত্যেকেই বস্ত্রশিল্পে কৃতী ছিলেন (১৫৭২-৭৬ খৃঃ)। ত্রিপুর-রমণীগণ এখনও হাতের চরকা ছাড়েন নাই, ১৯২০ সনের সেন্সাসে দৃষ্ট হয়, পার্শ্বত্যা-ত্রিপুরায় মোট ৩৪,৮৫৬

ঘর গৃহস্থ, তন্মধ্যে ৩১,৪৮৫ খানি তাঁত চলিয়াছে। বয়ন-
ভাঙ্গা।
শিল্পের সঙ্গে স্বর্ণ-খচিত গজদন্তের পাটির জন্তও ত্রিপুর-বাসীরা

খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। মহারাজ বিজয়মাণিক্য (১৫২৫-৭২ খৃঃ) স্বজঘাট হইতে অনেক কাংশ-বণিক আনিয়া ত্রিপুরায় কাঁসা-পিতলের শিল্পের ত্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা

রাজ্যের পার্শ্বতা-প্রদেশে ও সমতল ক্ষেত্রের যেখানে সেখানে ধাতব ও প্রস্তরনির্মিত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

ত্রিপুরার কোন কোন স্থানের প্রস্তরে ফোদিত এবং পাহাড়ের গায় উৎকীর্ণ মূর্তি খুঁটি জন্মিবার পূর্বের বলিয়া বোধ হয়। বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য উনকোটি তীর্থের উনকোটিখর শিব। যে যুগে মনুষ্য-কলনা অতিকায় মূর্তি ধারণা করিতে ভালবাসিত, এই মূর্তি সেই যুগের। শত শত ভয় ও অর্কভয় ফোদিত অজ্ঞাত দেব-মূর্তি-সঙ্কুল ধূসর পর্বতে উনকোটিখর এখনও সমাধি আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কৈলাসহর হইতে কাছাড়ের সীমা পর্য্যন্ত—উনকোটি তীর্থ—এই দেবতার অধিকার-ভুক্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। এই মহা-মূর্তি পর্বত খুঁড়িয়া প্রস্তত হইয়াছিল, ইহার নিম্নভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মূর্তির এক কান হইতে অপর কান পর্য্যন্ত ২১ ফুট এবং সমগ্র মূর্তিটি ১৮০ ফুট। গৌফের একটা দিক্ ভয়, অপর দিক্ দুই ফুট তিন ইঞ্চি। ত্রিপুরার একটি পল্লীতে আর একটি মহাকায় দেবমূর্তি আছেন, ইনি মৃন্ময় এবং নির্দিষ্ট সময় পরে ইহাকে সংস্কার করা হয়—এই মূর্তিও স্মরণাতীত কাল হইতে পূজিত হইতেছেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে জানা যায়, মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা অনেক সময়েই সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। রাজা বীর হাখীর (বিষ্ণুপুরে), রাজা চাঁদরায় (গৌড়দ্বারে), ত্রিপুর, কোচবিহার ও আসামের রাজারা মুসলমান-ধিকারের অনেক কাল পর্য্যন্ত বঙ্গেশ্বরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া

হিন্দু ও মুসলমান
ইতিহাস-লেখক।

মধ্যে মধ্যে যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন। সোলেমান খাঁর জালক সেনাপতি মমারক খাঁকে পূজক চত্বাই চতুর্দশ দেবতার নিকট বলি দিয়াছিলেন, একথা মুসলমান লেখকেরা গোপন করিয়া গিয়াছেন, অথচ রাজমালার লেখকেরা তাহাদের পরাজয় গোপন করেন নাই। দত্তমাণিক্য বহু যুদ্ধে হসেন সাহের সৈন্ত পরাভূত করিয়াছেন, কিন্তু পাঠানদের আশ্রিত কবি শ্রীকরণ নন্দী লিখিয়াছেন, “ত্রিপুর-নৃপতি যার ভরে এড়ে দেশ। পর্বত-গহবরে গিয়া করিল প্রবেশ।” এদিকে উদয়মাণিক্যের সঙ্গে পাঠানদের যুদ্ধে ত্রিপুরসৈন্ত গুরুতর ক্ষতি সহ-পূর্বক হারিয়া গিয়াছিল, রাজমালার লিখিত হইয়াছে—“পঞ্চ সহস্র পাঠান পড়িল এই রণে। চল্লিশ সহস্র পড়ে ত্রিপুরার গণে।”—আমরা কোচবেহারের ইতিহাসেও মুসলমান লেখকদের এই পক্ষ-পাতিয়ের পরিচয় পাইয়াছি। হিন্দুদের প্রাদেশিক ইতিহাসগুলি লুপ্ত হইয়াছে, এজন্ত এইরূপ ক্ষেত্রে সত্যনির্ণয় দুর্বল হইয়াছে।

এক সময়ে ত্রিপুররাজ্য উত্তর সীমানার পার্শ্বতা-প্রভাবে পড়িয়া—অনার্য্য রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু রাজারা ক্রমাগত নিম্ন ভূমে অভিবান করিয়া, কেহ কেহ স্থিতিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাপাশে বদ্ধ হইয়াছেন। দত্তমাণিক্যের পূর্বে ত্রিপুর-দেশ বাঙ্গালীদিগকে শত্রু বলিয়া গণ্য করিত; ত্রিপুরেশ্বরীয় মন্দিরে বাঙ্গালীদিগকে বলি দেওয়া হইত। দত্তমাণিক্য এই

বাঙ্গালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

হীনোতি ও শত্রুতার স্থলে সৌহার্দ্য ও শান্তি স্থাপন করেন, কিন্তু তাঁহার পৌত্র বিজয়মাণিক্যের সময়েও নির্দোষিত বহির কিছু কিছু শুল্ক দেখা দিত। উক্ত রাজ্য খণ্ডলবাসী বাঙ্গালীদের এক্ষণে উর্গতি করিয়াছিলেন যে বস্ত্রাভাবে তাহারা বৃক্ষপত্র পরিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, বিক্রমপুরের ভদ্র-সমাজে ইহার অকথ্য অত্যাচার ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। এদিকে ইনিই আবার বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগকে মুক্তহস্তে স্বর্ণ ও ভূমি দান করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব-বঙ্গে দিগ্বিজয়ের ফলে একদিকে যেমন জনসাধারণের অকথ্য কষ্ট হইয়াছিল, অপর দিকে ক্রমশঃ বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে পার্শ্বতা-ত্রিপুরার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়া এক্ষণে অবস্থা দাঁড়াইল যে, যদিও রাজ্যের সীমান্তে টিপ্রা ভাষা এখনও প্রচলিত রহিয়াছে—তথাপি সমগ্র ত্রিপুরা দেশ এখন বাঙ্গলা সমাজের অঙ্গীয় হইয়া গিয়াছে এবং বাঙ্গলাভাষা গ্রহণ করিয়াছে। ধন্যমানিক্য পাঠানদিগের নিকট হইতে বলপূর্বক মেরহরকুল, পাটিকারা, গঙ্গামণ্ডল, বরদাখাত, বিষণ উড়ি, প্রভৃতি পরগনা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। উত্তরে থানাংচি রাজ্য এবং কুকী অধ্যুষিত সমস্ত পাহাড়িয়া দেশ তিনি ভীষণ যুদ্ধের পর দখল করিয়াছিলেন, চট্টগ্রাম তিনি এবং পরে বিজয়মাণিক্য দখল করিয়াছিলেন। বিজয়মাণিক্য গ্রীষ্ম জয় করিয়া স্বর্ণ-গ্রামের পাঠানদিগকে দলন-পূর্বক পদ্মাতীর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীর হইতে পশ্চিমে জাহ্নবী (বুড়ী গঙ্গা) এবং সরস্বতীর তীর পর্য্যন্ত বিশাল জনপদ তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। এই ভাবে ত্রিপুরেশ্বর বঙ্গের এক প্রকাণ্ড বিভাগ স্বাধিকারে আনিয়া বাঙ্গলার শিক্ষাদীক্ষা ও শিল্প পার্শ্বতা-প্রদেশে প্রচলিত করিয়াছিলেন। এক কালে এই সমস্ত স্থান মহাভারতের শিক্ষায় প্রভাবান্বিত হইয়াছিল; রাজারা মহাভারত ও অপরাপর শাস্ত্র-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন, উত্তর কালে মহাপ্রভুর সান্নিধ্যের বংশধরেরা খোল করতাল লইয়া এই রাজ্যকে প্রেমধর্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। আমি দেখিয়াছি, কুমিল্লায় পাহাড়িয়া কুকীরা কাষ্ঠ বিক্রয় করিতে যখন নিয়-ভূমে অবতরণ করে, তখন তাহাদের কেহ কেহ বটতলার প্রকাশিত চৈতন্য-চরিতামৃত ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বৈষ্ণব-শাস্ত্র-প্রকাশের জন্য বহরমপুরের রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকে এক লক্ষ টাকা দিয়া বৈষ্ণব-সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

এই রাজাদের কাহিনী পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে—বোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেক রাজাই বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সে দেশে কি বাঙ্গলা টীকা লওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল না? ত্রিপুরারাজ্যে যে এই ব্যাদি খুব সংক্রামক

বসন্ত রোগ।

ভাবে কোন কালে দেখা দিয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

মহারাজ মহামাণিক্য, ধন্যমাণিক্য, ধর্মমাণিক্য, বিজয়মাণিক্য, হুমায়ুনমাণিক্য ইহারা সকলেই বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া রাজমালায় লিখিত হইয়াছে; মহামাণিক্য ১৪৩১ খৃঃ অব্দে, ধর্মমাণিক্য ১৪৬২ খৃঃ অব্দে, ধন্যমাণিক্য ১৫১৫ খৃঃ অব্দে, বিজয়মাণিক্য

১৫৭০ খৃঃ অব্দে, ছত্রমাণিক্য ১৬৬০ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন। ১৪৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৬০ খৃঃ অব্দ—এই ২২৯ বৎসরের মধ্যে ৫ জন নৃপতি পর পর বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করেন, রাজমালার এই উক্তির মধ্যে কিছু ভুল আছে বলিয়াই মনে হয়।

আর একটি কথা, বহু পূর্বে হইতে এই রাজকাহিনীতে বাঙ্গলার দ্বাদশ মণ্ডলাধিপের কথা পুনঃ পুনঃ পাওয়া বাইতেছে—ইহারাই বাঙ্গলার “বারভূঞা”। ধর্মমঙ্গল কাব্যেও ইহাদের

বর্ণনামূল্য।

কথা আছে। গোড়েশ্বরগণ কর্তৃক দ্বাদশ সামন্ত-রাজ নিযুক্ত করার প্রথা বহু প্রাচীন। “প্রাচীনকালে ত্রিপুররাজ্য ৭,৫০০

বর্গ মাইল ব্যাপক ছিল।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাগ্জ্যোতিষপুর

প্রাগ্জ্যোতিষ পুরপ্রাচীনকালে অতি বিস্তৃত স্বাধীনরাজ্য ছিল; এক এক সময়ে এই রাজ্য সিলেটের অনেকাংশ গ্রাস করিয়া পূর্ববঙ্গের বহুস্থান নিজ কুক্ষিগত করিয়াছিল। বহুকাল পর্যন্ত কোচবিহার এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, এবং বঙ্গের ভাটিদেশ মৈমনসিংহের পূর্বাংশ এমন কি ঢাকা পর্যন্ত এই রাজ্যের অধিকার-ভুক্ত হইয়াছিল। ঢাকা জেলার উত্তরাংশে বিশেষ ভাওয়াল ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের বহু মুদ্রা আমরা দেখিয়াছি।

প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অন্ত নাম কামরূপ। এখানে বহু প্রাচীনকাল হইতে কামাখ্যা দেবী প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই রাজ্যের গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন।

তান্ত্রিক-ধর্মের অভ্যুদয় ও বিকাশ এই তীর্থেই বিশেষ রূপে হইয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে নরক, ভগদত্ত, মুর প্রভৃতি রাজারা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন; মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি বহু পুরাণে ইহাদের বিষয় বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। বাণ রাজাও সেই যুগের এক কীর্ত্তিমান পুরুষ—ইহার সকলেই কৃষ্ণদেবী ছিলেন। রামায়ণে যে নরক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়—কৃষ্ণের সমকালিক নরক কখনও তিনি হইতে পারেন না। এই নরক কর্তৃক দেবমাতা অদিতির কর্ণের কুণ্ডল হরণ করার অপরাধে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়, কৃষ্ণ ইহাকে ও ইহার প্রধান সেনাপতি মুরকে বধ করিয়া কুণ্ডল গ্রহণ করেন। জয়দেব এই নরক ও মুরের কথা তাঁহার অমর-গীতিকার স্তোত্রে উল্লেখ করিয়াছেন : “মধু-মুর-নরক-বিনাশন গরুড়াসন হে—শ্রীমুখচন্দ্রচকোর জয় জগদীশ হরে।” বাণের কথা উদ্যাকে কৃষ্ণের পৌত্র অনিষ্টক গন্ধর্ব্ব-রীতিতে বিবাহ করেন, বাণ তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করেন,—এইসূত্রে কৃষ্ণের সঙ্গে বাণের যুদ্ধ হয়। ইহার রাধধানী শ্রীহট্টের লাউর-নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ দাবী করিয়াছেন। বাণ শিবের ভক্ত ছিলেন।

কথিত আছে, শিব ইহাকে স্বীয় পুত্র কার্তিকেয় হইতেও বেশী ভালবাসিতেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বীরগণের সম্বন্ধে এইরূপ নানারূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। ঐতিহাসিকগণ সেগুলির মধ্যে অবশ্য অনেক কথা অগ্রাহ্য করিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া রাজাদের অন্তরে অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই।

হরিবংশ ও মহাভারত পাঠ করিলে জানা যায় প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজারা অতি পরাক্রান্ত ছিলেন এবং ইহারা যুদ্ধির সময় ভারতীয় রাজত্ববর্গের পুরোভাগে অবস্থিত ছিলেন। ইহাদের অনেকেই প্রাচ্য-সম্রাট জরাসন্ধের সঙ্গে সখ্যত্বে আবদ্ধ ছিলেন। প্রাচ্যবিজ্ঞানমহর্ষি নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, রামায়ণের বর্ণনায় যে লোহিত-সাগর পাওয়া যায়, তাহা আরবের পশ্চিমে অবস্থিত “রেড সি” নহে, তাহা লোহিত্য নদ। এই নদ এককালে হ্রত সাগরোপম ছিল, বনমালের তান্ত্রশাসনে এই নদকে “লোহিত্যসিন্ধু” বলা হইয়াছে। বলবর্মার তান্ত্রশাসনে ইহাকে “বারিধি” ও রত্নপালের শাসনে ‘সিন্ধু’ এবং ইন্দ্রপালের শাসনে “সরিংপতি” নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহার বর্তমান নাম করতোয়া। সম্ভবতঃ এই সাগরোপম বাধা অতিক্রম করিতে না পারিয়া ভারত-বিজয়ী জাতিরা গৌড় দেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া এইখানে ঠেকিয়া পড়িতেন। নগেন্দ্রবাবু প্রমাণ করিয়াছেন, এই স্থানে বেদোক্ত পণিজাতি ও আৰ্য্যগণের নানা শাখা বেদের সময় হইতে বসবাস করিতেছেন, এখান হইতে পণি (বণিক্ জাতি) পৃথিবীর সর্বত্র বাণিজ্য-জাহাজ লইয়া যাতায়াত করিত, এখানও এখানে চর্ম্মোপবীতধারী ঋষির বংশধরগণ ঠিক বেদমন্ত্রের জ্ঞায় মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোমকার্য্য করিয়া থাকেন। গেট সাহেব লিখিয়াছেন—খাস বঙ্গদেশে বেক্রপ সমস্ত জাতি মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, আসামে তাহা হয় নাই। আসামে বহু-পূর্বকালের আচার ব্যবহার লইয়া এক এক জাতি স্বীয় স্বীয় স্বাভাব্য রক্ষা করিয়া আছে। এই দেশকে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার একখানি সংক্ষিপ্ত ও জীবন্ত ইতিহাস বলা যাইতে পারে। ঐতিহাসিকগণের তীক্ষ্ণ সন্ধানী উৎসুক দৃষ্টির আলো-রেখা এখনও এই পার্শ্বত্যা প্রদেশের নিগূঢ় নিকেতনে প্রবেশ করে নাই। এই খনি আবিষ্কৃত হইলে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য এখান হইতে পাওয়া যাবার সম্ভাবনা আছে। এককালে বশিষ্ঠের মত মহর্ষি নাকি কামাখ্যা দেবীর মন্দির হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তথায় প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। লোহিত্য নদের তীরে যুগে যুগে যে রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম বিপ্লবের অভিনয় হইয়াছে, তাহার সন্ধান করার স্থান এখানে নহে, সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিষয় লইয়া আমরা বিলম্ব করিব না। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে আৰ্য্যাবর্ত্তে—বিশেষ গৌড়দেশে ইহাদের কি দান, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

১। বাণলিঙ্গ (মহারাজ বাণের দ্বারা পূজিত একরূপ শিবলিঙ্গ) আৰ্য্যাবর্ত্তের

বাণলিঙ্গ।

সর্বত্র শৈবগণ কর্তৃক বিশেষ আদৃত। কথিত আছে অল্প প্রকার শত শত শিবলিঙ্গ পূজার যে ফল, একটিমাত্র বাণলিঙ্গ-পূজার

ততোধিক ফল।

২। কামাখ্যাতীর্থ, সমস্ত হিন্দুর একটি প্রধান ধর্মস্থান,—এই স্থানে তান্ত্রিক বাহু-
বিজ্ঞার এতটা প্রচলন হইয়াছিল যে, এককালে অন্ততঃ গোড়দেশবাসী সকল তান্ত্রিকই
কামাখ্যাতীর্থে সর্গবিবয়ে কামাখ্যার দোহাই দিতেন। বাঙ্গলা শত শত পল্লীগাথায়

বাহুবিজ্ঞার কথা হইলেই কামাখ্যা তাহার একমাত্র শিক্ষার স্থল
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; এমন কি বহু উর্দ্ধ-শব্দ-কণ্ঠকিত “মুসলমানী বাঙ্গলায়” লিখিত
পুঁথিতেও আমরা বাহুবিজ্ঞা-প্রসঙ্গে কামাখ্যা দেবীর উল্লেখ পাইয়াছি। পুরুষকে ভেড়া
করিয়া রাখিবার যে সকল টোনা আছে, বাঙ্গলা দেশ এক বাক্যে কামরূপ-বাসিনীদিগকেই
সেই টোনার একমাত্র অধিকারিণী বলিয়া জানে। কালীঘাটের পটুয়ারা সেদিন পর্য্যন্তও
কামরূপ বা কামতাবাসিনীদিগের এইরূপ ভেড়া বানাইবার ছবি আঁকিয়া বিক্রয় করিত।

৩। কামরূপের চিত্রভাস্করদের নাম ইতিহাস-বিশ্রুত। চিত্রকর ও চিত্রকরীর
বহু উল্লেখ আমরা ভারতীয় সাহিত্যে পাইয়াছি। অজস্র প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত স্থানে
চিত্রবিজ্ঞা। হিন্দু ও বৌদ্ধগণের চিত্র-নিদর্শনের অভাব নাই। কিন্তু চিত্রাদ্দাই

ভারতীয় সাহিত্যে চিত্রকরী বলিয়া সর্বপ্রথম উল্লিখিত হইয়াছেন,
ইনি বাণ-রাজকন্যা উবার সঙ্গিনী ছিলেন এবং মহুয়ের প্রতিকৃতি এরূপ সুন্দরভাবে আঁকিতে
পারিতেন যে তদ্ব্যক্তি ছবিগুলি মুকুরে বিদ্যিত মূর্তির স্থায় অবিকল হইত। বহু চেষ্টার পর
এই চিত্রকরীর চিত্র দেখিয়া উবা অনিরুদ্ধের প্রথম পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। হরিবংশ-
পুরাণে এই বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। তৎপরে সংস্কৃত সাহিত্যের নানা স্থানে
চিত্রবিজ্ঞার উল্লেখ আছে—উত্তর-চরিতে রামের বাল্যজীবনের চিত্রলেখমালা দর্শনে রাম,
লক্ষণ ও সীতার পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল; শকুন্তলা নাটকে রাজা দুয়ন্ত যে ছবি
আঁকিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা চিত্র-শিল্পের অতি সুন্দর জ্ঞানের পরিচায়ক। কেহ
কেহ বলিয়া থাকেন, দূরত্ব-বোধক রেখা এবং আলো ও ছায়া ভারতীয় শিল্পী আঁকিতে পারিতেন
না। অজস্র চিত্রাবলীতে জিনিষ ও আসবাব-পত্রের আকৃতি ও সংস্থান এরূপ যথাযথ-
ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে তাহা দেখিয়া কোন্‌ দ্রব্য কতটা দূরে—তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়,—
উহা এদেশে বিদেশী সভ্যতার দান নহে। বিদূষক বলিতেছেন—“সাহ বঅস্ম। মহরাবখাণ-
দংসগিজো ভাবাগুগ্গবেসো। খলদি বিশ্ব মে দিটুঠা গিয়ু গদগদেসেসু।” (বয়স, সাধু!—
অবস্থানের নৈপুণ্যে ভাবের সমাবেশ সুন্দর হইয়াছে, নিম্ন ও উন্নত অংশগুলিতে যেন দৃষ্টি
খলিত হইতেছে)। এই নিয়োগিত স্থান-প্রদর্শন আলো ও ছায়ার সম্যক জ্ঞান ব্যতীত হইতে
পারে না। দুয়ন্ত তাঁহার ছবির অঙ্কনের যে পূর্ব-কল্পনা দিয়াছেন, তাহাতে শিল্প-কুশলতা ও
অন্তর্দৃষ্টি বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে—“শাখালদিতবকলস্ত চ তরোনির্দ্দাতুমিচ্ছাম্যধঃ।
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্ত বামননয়নং কণ্ঠয়মানং মৃগীম্” (শাখা হইতে বকল ছিলিত, এইরূপ একটি
বৃক্ষের নীচে মৃগী কৃষ্ণ মৃগের শৃঙ্গে আপনার বামন নয়ন ঘষিতেছে ইহাই আঁকিতে ইচ্ছা করি)।
কবির দৃষ্টি ও চিত্রকরের দৃষ্টি এখানে “মিশিয়া স্বর্ষ জড়িত যেন হীরা” হইয়াছে। ভারতীয়
চিত্রকলার অত্যন্তম আদি স্থান প্রাগজ্যোতিষপুর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক যুগের আদিকাল

আদি যুগের উপকণ্ঠ কোয়াসা-বিজড়িত অশুট তরুণালোকের রাজ্য ছাড়িয়া আমরা ঐতিহাসিক যুগে অবতরণ করিব। এ পর্যন্ত কামরূপ রাজ্যের দশখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১। ভাস্কর বর্ম্মার নিধনপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন।

২। হর্জর বর্ম্মার হাযুংখলে প্রাপ্ত তাম্রফলক। ৩। তেজপুরে প্রাপ্ত মহারাজ বনমালার তাম্রলিপি। ৪। নোগায় প্রাপ্ত বলবর্ম্মার তাম্রশাসন। ৫। বড় গায়ে প্রাপ্ত রত্নপালের ১ম তাম্রশাসন। ৬। সোয়ালকুচিতে প্রাপ্ত ঐ রাজার তাম্রশাসন। ৭। গোহাটিতে প্রাপ্ত ইন্দ্রপালের প্রথম তাম্রশাসন। ৮। শুয়াকুচিতে প্রাপ্ত ঐ রাজার ২য় তাম্রশাসন। ৯। ধর্ম্মপালের শুভদ্র পাটক লিপি। ১০। ঐ রাজার পুষ্পভদ্রা লিপি। ইহা ছাড়া হর্জর বর্ম্মার প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিও এখানে উল্লেখযোগ্য।

১। ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রলিপি সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে উৎকীর্ণ। এই ভাস্কর বর্ম্মার সময়ে ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে হিউনসাং তাঁহার সভায় অতিথি হইয়াছিলেন। কনোজাধিপ হর্ষের

ভাস্কর বর্ম্মা—৭৪৩ খৃঃ।

সঙ্গে গোড়েশ্বর শশাঙ্কের যুদ্ধের প্রাক্কালে ইনি কনোজের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। তাম্র-শাসনখানি কর্ণস্বর্ণ স্বাক্ষার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। হয়ত সাময়িক ভাবে তখন উক্ত রাজধানী ভাস্কর বর্ম্মার অধিকৃত ছিল। ভাস্কর বর্ম্মার পরিচয়স্থলে তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়াছে, ইনি কৃষ্ণকর্কুক নিহত নরক রাজের বংশোদ্ভব। নরকের পুত্র ভগদত্ত,—তৎপুত্র বজ্রদত্ত। নরকবংশীয় রাজারা তিন হাজার বৎসর রাজত্ব করার পর সেই বংশে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পুষ্পবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন। ১ পুষ্প বর্ম্মা, ২ সমুদ্র বর্ম্মা, ৩ বল বর্ম্মা (দত্তা দেবীর গর্ভজাত), ৪ কল্যাণ বর্ম্মা (রত্নাবতীর গর্ভজ), ৫ মহেন্দ্র বর্ম্মা (বজ্রবতীর গর্ভজাত), ৬ নারায়ণ বর্ম্মা (রাজ্ঞী স্ত্রীততার গর্ভজাত), ৭ মহাভূত বর্ম্মা (দেববতীর গর্ভজাত), ৮ চন্দ্রমুখ বর্ম্মা (দেববতীর গর্ভজাত), ৯ হিত বর্ম্মা, ১০ স্থিতি বর্ম্মা (নয়ন দেবীর গর্ভজাত শ্রীমৃগাঙ্ক উপাধি), ১১ সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ম্মা (শ্রামা দেবীর গর্ভজাত)। ভাস্কর বর্ম্মা এই সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও শ্রামা দেবীর গর্ভজাত। কথিত আছে ইনি “স্বীয় বাহুবল দ্বারা সমস্ত সামন্তচক্রের বল খর্ব্ব করিয়া” সার্বভৌম নৃপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কানোজের সহিত মৈত্রী নিবন্ধন ইনি পশ্চিম হইতে বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার রাজ্যে আনয়ন করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছিলেন।

২। হর্জর বর্ম্মা—এই অমুশাসনে শুপ্রাঙ্গ ৫১০ পাওয়া বাইতেছে, সুতরাং ৮২৯ খৃষ্টাব্দ। ইহা হারুপ্পেশ্বর স্বাক্ষার হইতে প্রকাশিত, সম্ভবতঃ এই স্থানটি তেজপুরের নিকটবর্ত্তী ছিল।

হর্জর বর্মার পিতার নাম প্রাগলভ ও মাতার নাম জীবদা, ইনি সালস্তম্ভ-বংশসম্ভূত। ইহার
 হর্জর বর্মা। পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রাজা বনমালা। “ত্ৰীমান্ হর্জর দেব সিংহাসনে
 আরুঢ় হইয়া দেবগণ কর্তৃক ইন্দ্রের স্তায়, প্রণত রাজগণ কর্তৃক
 পরিবৃত হইয়া সর্ক-তীর্থবারি-পরিপূর্ণ মাদ্রা রোপা-কলসের জলের দ্বারা বণিগ্জন-পুরঃসর
 সঙ্গশ-জাত রাজ-পুত্রগণ কর্তৃক অভিবিক্ত হইয়াছিলেন।”

৩। বনমাল,—অনুমান নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি
 মহারাজ হর্জর বর্মার পুত্র। এই অনুশাসনে দৃষ্ট হয়, ইহারা নরক ও ভগদত্তের বংশীয়
 বনমালা। বলিয়া দাবী স্থাপন করিয়াছেন। শাসনখানির সংস্কৃত নির্দোষ
 ও অতিশয় কবিত্বপূর্ণ—বিশেষ লৌহিত্য নদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি।

৪। বল বর্মা, ইনি বনমাল বর্মার পৌত্র, দশম শতাব্দীর প্রথম-ভাগ ইহার রাজত্ব
 কাল। এই অনুশাসনে ভক্তিমান্ মহারাজ বনমাল-দেবের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,
 বল বর্মা। “ক্রোধ বা হাশ্তে তাঁহার মুখ-বিকৃতি কেহ দেখেন নাই, কোন
 নীচ বা অভদ্র কথা তিনি উচ্চারণ করেন নাই, সর্বদা হিতবাক্য
 তাঁহার মুখে শোনা বাইত। তাঁহার বিশাল ও অতুল্য প্রাসাদশ্রেণী নানা চিত্র-
 সমন্বিত এবং বহু প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ছিল।” বোধ হয় সেই প্রাচীন আদর্শে এখনও আসামের
 রাজপ্রাসাদ নির্মিত হইয়া থাকে। গেট সাহেবের পুস্তকে প্রদত্ত রাজপ্রাসাদের ছবি দ্রষ্টব্য।
 এই অনুশাসন হইতে জানা যায়, বনমাল দেবের পুত্রের নাম জয়মাল,—ইহার উপাধি
 বীরবাহু, বল বর্মা তাঁহার পুত্র।

৫। রত্নপাল—সময় খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বভাগ। যদিও সালস্তম্ভবংশীয়
 নৃপতিগণ আপনাদিগকে নরক-ভগদত্তবংশীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তথাপি বোধ হয়
 রত্নপাল। তাঁহারা সেই প্রাচীন রাজবংশের কেহ ছিলেন না। রত্নপালের
 অনুশাসনে ইহাদিগকে স্নেহবংশসম্ভূত বলিয়া নিন্দাবাদ করা
 হইয়াছে। রত্নপালের অনুশাসনে আছে—“বংশানুক্রমে নরকবংশীয় রাজারা পৃথিবী
 পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্দৈববশতঃ স্নেহাধিপতি সালস্তম্ভ সেই শাসনভার গ্রহণ
 করিয়াছিলেন..... তাঁহাদের একবিংশতিতম রাজা ত্যাগসিংহ নিরুৎসাহ অবস্থায় স্বর্গারুঢ়
 হওয়াতে ‘পুনশ্চ আমাদের নরকবংশীয় রাজারই প্রয়োজন’ এই স্থির করিয়া প্রজাগণ.....
 ত্রীকাল পালকে রাজা মনোনীত করিয়াছিলেন।” রত্নপাল—ত্রকপালের পুত্র। ইহার
 পরাক্রমের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, ইহার রাজধানী, প্রাগজ্যোতিষপুরের দুর্জয়নামক
 নগরী—(১) শকরাজরূপ ক্রীড়া-পক্ষীর দৃঢ় পঙ্কর, (২) গুর্জরাধিপতির অর-স্বরূপ, (৩) দুর্দান্ত
 গৌরাধিপতিরূপ হস্তীর কূট পাকল (একরূপ হস্তিরোগ) সদৃশ, (৪) কেরলেশ্বররূপ
 পর্বতের ঘর্ষস্বরূপ, (৫) বাহিক ও তাদিক (কাশ্মীর রাজ্যের সমিহিত প্রদেশ) রাজ্যের
 আতঙ্কজনক ছিল। এই সকল রাজাদের সঙ্গে রত্নপালের কোথায় কিভাবে সংঘর্ষ হইয়া
 ইহার প্রাধাত্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

৬৩৭। রত্নপালের পুত্র পুরন্দর-পালের অকালমৃত্যুতে তৎপুত্র (রত্নপালের পৌত্র) ইন্দ্রপাল রাজা হইয়াছিলেন, সময়—একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ইহার তাম্রশাসনের শিববন্দনাটি বড় সুন্দর। আমরা বৈষ্ণবপদে পুনঃ পুনঃ পাইয়াছি, রাধা-কৃষ্ণ বাজি রাখিয়া পাশা খেলিতেছেন—“হারিলে তোমারে দিব বেশর কাঁচুলি। জিনিলে লইব তোমার মোহন মুরলী।” অম্বুশাসনের বন্দনায় পাওয়া যাইতেছে, হরগৌরী বাজী রাখিয়া পাশা খেলিতেছেন ও শিব পরাস্ত। গৌরী বলিতেছেন, “তোমার সর্বস্ব—খট্টাঙ্গ, পরশু, বৃষ, শশিকলা প্রভৃতি আমি জিতিয়াছি, কিন্তু সমস্তই আমি ফিরাইয়া দিলাম, কেবল গঙ্গা আমার জলবহনार्থ কিছুই হইয়া থাকুক।”

ইন্দ্রপাল।

৮। ধর্মপাল—এই বংশের আদি পুরুষ ব্রহ্মপাল, ২য় রত্নপাল, ৩য় ইন্দ্রপাল, ৪র্থ গোপাল, ৫ম হর্ষপাল, ৬ষ্ঠ ধর্মপাল। ধর্মপাল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিজয়মান ছিলেন।

ধর্মপাল।

ভাস্কর বর্মার সময়ে প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ্য চতুর্দিক বেড়িয়া ১৬৬৭ মাইল ব্যাপক ছিল। কানিংহামের মতে সমস্ত ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকা ভূমি, কোচবিহার এবং ভূটান এই সুবিস্তৃত রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। চীন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ‘সু’ জনপদ এবং শ্রীহট্টের কতকাংশও প্রাগজ্যোতিষপুরের অধীন ছিল। গেট সাহেব বলেন, এই বংশের ইন্দ্রপাল রাজাকে বল্লালের পিতা বিজয় সেন পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই যুগের কোন সময়ে তিষ্ঠদেব নামক প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা পাল-সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করাতে বৈষ্ণদেব নামক তাঁহার (কুমারপালের) ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী কর্তৃক পরাস্ত ও নিহত হন। বৈষ্ণদেব তৎকালর রাজা হইয়াছিলেন (২৭০ পৃঃ)।

নীমা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পাঠান-আক্রমণ ও ক্রমশঃ অধিকার-সঙ্কোচ

এই বিপ্লবের পরে আমরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম সময়ে মহম্মদ ইবনু বক্তিম্যার খিলজির আসামের বিরুদ্ধে অভিযান করার সংবাদ পাইতেছি। বক্তিম্যার বহু বিড়ম্বিত হইয়া এই রাজ্য হস্ত হইতে কণক্ষিৎ নিকৃতি পাইয়া মৃত্যুর অন্ত বাঙ্গলা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ১২৫৭ খৃঃ অব্দে যুজবক তোগ্রেল খাঁ কামরূপের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া কিয়ৎকালের অন্ত বিজয়ী হইয়াছিলেন, একটি মসজিদ পর্য্যন্ত স্থাপিত হইয়াছিল,—কিন্তু বর্ধাগমে তাঁহার সৈন্ত-সামন্ত কোথায় ভাসিয়া গেল। তিনি কামরূপেধরের হাতে নিহত হইলেন। ১৩৩৭ খৃঃ অব্দে

মহম্মদ সাহার ১,০০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্ত কামরূপ-রাজ্যের রাজ-বিজ্ঞার প্রভাবে সমস্তই বিনষ্ট হইল। (আলমগিরি নামা, ৭৩১ পৃঃ)। কিন্তু এই সময় হইতে প্রাগজ্যোতিষপুর বহু খণ্ড-রাজ্যে পরিণত হইয়া প্রত্যেকটি কোন কোন পার্শ্বত্যা রাজবংশীয় নেতার অধিকারে আসিল। চুটিয়া রাজারা সুবর্ণশ্রী ও দিশাং নদীর পূর্বভাগে, পশ্চিমে কাছাড় রাজগণ, এবং পরবর্তী সময়ে অহম্ রাজগণ, স্বীয় স্বীয় অধিকার লইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়াছেন। চুটিয়াদের উত্তরে এবং কাছাড়ীদের পশ্চিমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূঞা রাজারা (দ্বাদশ ভৌমিক) আধিপত্য করিতেন। দক্ষিণে, পূর্বে মৈয়মনসিংহে চুর্গাপুর, জঙ্গলবাড়ী, দশ কাহনিয়া, বোকাইনগর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশের রাজবংশীয় নেতারা এই সময়ে স্বাধীন হইয়াছিলেন। এদিকে কোচবিহার প্রবল হইয়া এক সময়ে প্রাগজ্যোতিষপুরের অনেকাংশ গ্রাস করিয়াছিল। চুটিয়াদের আদি রাজা বীর পাল, —তৎপুত্র গৌরীনারায়ণ (সোনা গিরিপাল) ভদ্রসেন নামক এক রাজাকে হত্যা করিয়া ব্রহ্মপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই বংশে গৌরীনারায়ণের (রাজ-উপাধি রত্নধ্বজ পাল) পর নয়টি রাজা হইয়াছিলেন। অষ্টম রাজা বীরনারায়ণের নাবালক পুত্রের অভিভাবক এবং জামাতা সাধক অহম্দের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। বারভূঞাদের আদিপুরুষ সমুদ্র, তৎপুত্র মনোহর, —মনোহরের কস্তা লক্ষীর গর্ভে শান্তনু এবং সামন্ত জন্মগ্রহণ করেন। সামন্তের বংশধর রাজধর নোয়াগাঁয়ে বরদোয়াতে উপনিবিষ্ট হন, রাজধরের পুত্র কসুমবরের দেশবিশ্রুতকীর্তি মহাপুরুষ শঙ্কর দেবের কথা আমরা পরে লিখিব। বার ভূঞাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অহম্গণের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল। চুটিয়া রাজগণের সময়ে কামাখ্যাদেবীর মন্দির নিত্য নববলির রঞ্জে প্রাবীত হইত। কামতার রাজগণের শেষ বংশধর নীলাধর ১৪৯৮ খৃঃ অব্দে হুসেন সাহ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিলেন। খেন রাজগণের আদি পুরুষ

কামতা বধল।

গরুড় রাখাল ছিলেন, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ-পূর্বক নীলধ্বজ উপাধিতে পরিচিত হইলেন। হামিল্টন কামতাপুরের রাজ্য ১৯ মাইল ব্যাপক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। নীলধ্বজের পুত্র চক্রধ্বজ এবং তৎপুত্র নীলাধর। এই নীলাধরের রাজ্যী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর পুত্রের প্রেমে আবদ্ধ হন। রাজা উহা জানিতে পারিয়া সেই মন্ত্রিপুত্রকে বধ করিয়া তাহার মাংস রান্নাইয়া অজ্ঞাতসারে মন্ত্রীকে খাওয়ান। শেষে স্বয়ং ঘটনাটি মন্ত্রীকে জ্ঞাপন করেন। মন্ত্রী প্রতিশোধ লইবার জন্য অভিসন্ধি করিয়া হুসেন সাহার শরণ গ্রহণ করেন। হুসেন সাহ ১২৯৮ খৃঃ অব্দে কামতাপুর অবরোধ করিয়া বহু কালের চেষ্টায় কিছুই করিতে পারেন নাই। অবশেষে মন্ত্রীর পরামর্শে রাজ্যীর সঙ্গে হুসেন সাহের বেগম দেখা করিতে অহুমতি লইয়া অন্তঃপুরে ছদ্মবেশী কতকগুলি বোদ্ধাকে প্রেরণ করেন। এই ভাবে কামতা মুসলমানের অধিকৃত হয়। রাজা পলাইয়া আশ্রয়লাভ করেন। ১৫৯০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত কামতা মুসলমান শাসনাধীন থাকে। ইহার পরে মুসলমানেরা অহম্ রাজাদের রাজ্যের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করার ফলে, সমস্ত মুসলমান সৈন্ত নিশ্চিহ্ন হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং পূর্বাধিকৃত কামতা রাজ্যও তাহাদের হস্তচ্যুত হয়। ইহার পরে চন্দন এবং মদন নামক দুই ক্ষুদ্র রাজার নাম পাওয়া

যায়, ইহারা বিশ্বসিংহের ভ্রাতা ছিলেন। এই বিশ্বসিংহ ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রতাপে—প্রাগজ্যোতিষ-পুরের বড় নদী পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান অধিকার করেন।

অহম্মরাজদের যে বৃক্ষজী আছে, গেট সাহেবের মতে তাহার পূর্বভাগ—যেখানে সৃষ্টিতত্ত্ব ও বংশের উৎপত্তির কথা আছে—তাহা ছাড়া বাকী সবই বিশ্বাস-যোগ্য। অনেকগুলি বৃক্ষজী পাওয়া গিয়াছে,—গেট সাহেব বলেন, এই জাতির মত ইতিহাস-লেখক পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে বিরল,—এমন কি মুসলমানেরাও তাহাদের সমকক্ষ নহেন।

সৃষ্টিতত্ত্ব তাঁহারা বাহা বর্ণন করিয়াছেন, গেট সাহেব বলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে মৌলিক, হিন্দুদের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু সেই সৃষ্টি-তত্ত্বের সার সঙ্কলন তিনি বাহা করিয়াছেন, তাহাতে দৃষ্ট হয়—শূন্য পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে ইহার মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। ইহাদের মধ্যেও আদি-কালে যে প্রবল বক্তা জগৎকে পরিপ্লাবিত করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে উপগম আছে।

অহম্মরাজ টায়া ও খুনজানের বংশ ৩৩০ বৎসর রাজত্ব করেন, তৎপরে রাজা খুজুর পৌত্র সুকাফা আসামে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহারা সান-বংশীয় এবং মৌল্য

খুকাফা—১২২৮-১২৬৮ (সুয়েলী নদীর তীরস্থ) নগর হইতে আসামে আগমন করেন।
খঃ। ১২১৫ খৃঃ অব্দে সুকাফা আসামে অবতরণ করেন, তাঁহার সঙ্গে

দুইটি শ্বেত হস্তী, ৩০০ হাতী ও ৯,০০০ লোক ছিল। তিনি নাগাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া মোরান, বোরাহী প্রভৃতি দেশের রাজাদিগকে পরাজিত করেন। তিনি ১২২৮ খৃঃ হইতে

সুতিফা—১২৬৮-১২৮১ ১২৬৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুকাফার পুত্র সুতিফা
খঃ। ১২৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ১৩ বৎসর রাজত্ব করেন। নর নামক এক

জাতি (সানবংশসম্ভূত) অপেক্ষাকৃত সুদভা এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল; ইহাদের রাজা সুতিফার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, মগেরা তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সুতিফা নররাজ্যের কন্তাকে বিবাহ করিতে চান,—তাহাতে সম্মতি পাইলে সাহায্য করিবেন,

সুবিনফা—১২৮১-১২৯৩ বলিয়া পাঠান। কিন্তু নররাজ তাহাতে সম্মত হন না। ইহার পরে
খঃ। যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় তাহাতে সুতিফা বিজয়ী হইয়াছিলেন। পরবর্তী

রাজা সুবিনফা ১২৮১-১২৯৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি রাজ্য বৃদ্ধি করেন নাই, কিন্তু দেশের আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন, বরগোহাইন এবং বুড়া গোহাইন এই

সুখাংফা—১২৯৩-১৩০২ দুই সেনাপতির মধ্যে তুল্যরূপে প্রজা ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন।
খঃ। সুবিনফার পুত্র সুখাংফা চুটিয়া, কাছাড়ি, ও কামতার রাজাদের

সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিয়াছিলেন, শেবোস্ত রাজার কন্তা 'রাজনী'কে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহার ৩৯ বৎসর-ব্যাপক রাজত্ব-কালে অহম্মরাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

তৎপর সুখাংফার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুখাংফা রাজা হন। তৎকনিষ্ঠ চাওপুলাইএর ষড়যন্ত্রে ইহাকে বহুকাল ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহার ৩৩ বৎসর-ব্যাপক দীর্ঘ

রাজত্ব-কাল একটা কণ্টকাকীর্ণ শয্যায় রাজবিষাপনের মত অতি কষ্টে উদ্ভাসিত হয়।

সুখাংকা—১৩৩২-১৩৩৪ খৃঃ। এই রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা সুভূক্ষা রাজা হন।
চুটিয়ার রাজার সঙ্গে কিছুকাল ইহার যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। কিন্তু
সুভূক্ষা—১৩৩৪-১৩৩৬ খৃঃ। এই রাজা সক্ষির ছলে নদীতে লইয়া গিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণক
সুভূক্ষাকে হত্যা করেন।

চার বৎসর কাল সিংহাসন রাজশূন্য থাকে এবং বরগোহাইন এবং বুড়া গোহাইন রাজ্য
শাসন করেন। এই অবস্থা সম্ভাবজনক না হওয়াতে সুখাংকার তৃতীয় পুত্র টায়াওখাম্টি
রাজপদে অভিষিক্ত হন। চুটিয়া রাজার প্রতি প্রতিশোধ লইবার
জন্ত ইনি অভিযান করেন, এবং ইহার অল্পপস্থিতি-কালে বড়রাণী
ছোটরাণীকে মিথ্যা অভিযোগ দিয়া গর্ভাবস্থায় ব্রহ্মপুত্র-নদের মধ্যে
নিঃসহায় ভাবে ভাসাইয়া দেন। চুটিয়ারাজ্য বিজয় করিয়া রাজা ছোটরাণীর এই নিষ্ঠুর
অপমৃত্যুর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়েন। কিন্তু বড়রাণীর ভয়ে কিছু করিতে সাহসী
হন নাই। রাণী শেষে একপ অত্যাচারিণী হইয়া উঠেন যে, প্রজারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া
নিরীহ রাজাকে হত্যা করে।

আবার কতক সময়ের জন্ত রাজতত্ত্ব শূন্য পড়িয়া থাকে। আমরা টায়াওখাম্টির
ছোটরাণীকে জলে ভাসাইয়া দিবার কথা লিখিয়াছি; হাবাং গ্রামবাসী এক বুদ্ধ ব্রাহ্মণ
তাঁহাকে জল হইতে উদ্ধার করেন, কিন্তু তিনি সম্ভ্রান্ত প্রসব করিয়াই
মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই অনাথ বালক ব্রাহ্মণের যত্নে পালিত
হন, এবং, তাঁহার পরিচয় বিদিত হইলে, ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে ‘সুদাংফা’
উপাধি লইয়া রাজা হন। পুনঃপুনঃ সামন্তবিগ্রহে ইনি ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, বিশেষ ইহার
ছুচরিত্রা রাণী নানা স্থানে বাইয়া টিপম্, খামজাং এবং এইটন্ প্রভৃতি দলের নেতৃবৃন্দের
সহায়ত্ব আকর্ষণ করেন। ইহার সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব অহম্ম-জাতির মধ্যে বৃদ্ধি পায়।
রাজার পূর্বতন আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি এই রাজা খুব বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, রাজা
খুব বীর ছিলেন—যুদ্ধে সর্বদা পুরোভাগে থাকিতেন। পঞ্চদশ বর্ষে রাজা হইয়া সুদাংফা
দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ইহার পরে সুজাংফা—১৪০৭-১৪২২, সুফাকফা—১৪২২-১৪৩৯, এবং সুহেনফা—১৪৩৯-
১৪৮৮ খৃঃ অঙ্গ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; ইহাদের রাজত্বকালে বিশেষ
কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় নাই এবং অহম্মরাজ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি
হইয়াছিল। রাজা সুহেনফা নাগাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কিন্তু
কাছাড়-রাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া একটি রাজকন্যা, ১২টি
দাসী এবং ২টি হস্তী যৌতুক দিয়া সন্ধি করেন। সুহেনফাকে
একদল আততায়ী বড়বল্ল করিয়া হত্যা করে। তৎপুত্র সুপিংফার
রাজ্য স্বামীর সাক্ষাতে এক নাগা রাজার রূপের প্রশংসা করাতে রাজা জুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এক

সুখাংকা হইতে সুহেনফা
—১৪০৭-১৪৮৮ খৃঃ,
সুপিংফা—১৪৮৮-১৪৯৭ খৃঃ,
সুহংফা—১৪৯৭-১৪৩৯ খৃঃ,
পাঠানদের পরাজয়।
একদল আততায়ী বড়বল্ল করিয়া হত্যা করে। তৎপুত্র সুপিংফার
রাজ্য স্বামীর সাক্ষাতে এক নাগা রাজার রূপের প্রশংসা করাতে রাজা জুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এক

নাগাপল্লীতে নির্বাসিত করেন। পরবর্তী রাজা স্ত্রহংমংয়ের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল; অহম্-রাজেরা এই সময় হইতে ‘স্বর্গনারায়ণ’ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে রাজা স্বীয় রাজ্যে আদমশুমারি করিয়া শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে চুটিয়া রাজা দীরনারায়ণের অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছিল। পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়া বিদ্রোহ করিতে চুটিয়া-রাজ্যটি অহম্-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। এই সময়ে হসেন সাহ অহম্-রাজের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। হসেন সাহার সৈন্যসংখ্যা ২৪,০০০ পদাতিক, বহু অশ্বারোহী ও অনেক যুদ্ধ-জাহাজ ছিল। প্রথমবার ইটিয়া খাইয়া রাজা বর্গাকালে হসেন সাহার পুত্রসহ সমস্ত সৈন্য ধ্বংস করিয়াছিলেন (রিয়াজুজালতিন)। এই পরাজয়ের পর মুসলমানেরা আবার দুইবার আক্রমণ করিয়াছিলেন। তুরবক এবং হসেন খাঁ বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিছু করিতে পারেন নাই, শেষে পরাজিত হইয়াছিলেন; শেবোক্ত সেনাপতি নিহত হইয়াছিলেন এবং অহম্-রাজ শক্রশিবিরের ২৮টি হাতী, ৮৫০টি ঘোড়া, অনেক কামান, বন্দুক ও সোনা-রূপা পাইয়াছিলেন। স্ত্রহংমংকে কাছাড়ী, খামজাং, টাবলং এবং নামসাংএর নাগাদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু প্রায় সর্বত্রই ইনি বিজয়ী হইয়াছিলেন, এবং কোচ-রাজ বিশ্বসিংহ এবং মণিপুররাজের সঙ্গে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইনি বিশেষ পরাক্রম ও দক্ষতার সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার পুত্র স্ত্রেনফা ইহাকে এক ভৃত্য দ্বারা হত্যা করেন। ইহার পূর্বে এই স্ত্রেনফা স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে মুসলমানদের সঙ্গে যড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। স্ত্রেনফা রাজা হইয়া পিতৃহত্যার অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ

স্ত্রেনফা—১৫৩২-১৫৪২

খঃ।

করিবার জন্য হত্যাকারীর ভ্রাতাদিগকে বধ করেন। ইহার রাজত্বকালে কোচ-রাজ নরনারায়ণের সঙ্গে বহু যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। নরনারায়ণের ভ্রাতা চিলা রায় (শুরুধ্বজ) অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও মহাবীর ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে অহম্-রাজ কতককালের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া পড়েন। নরনারায়ণ ১৫৪৬ খৃঃ অব্দ হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিক্রারে নদী পর্যন্ত দখল করিয়া খারাপা, কলিষাবার প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করেন।

স্ত্রেনফার পুত্র স্ত্রখাম্ফা। ইনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া যাওয়ায় ইহার একটি পা খোঁড়া হইয়া যায়, এবং ইনি ‘খোঁড়া রাজা’ নামেই পরিচিত হন। নরনারায়ণের ভ্রাতা চিলা রায়

স্ত্রখাম্ফা—১৫৮২-১৬০৩

খঃ।

পুনরায় অহম্-রাজকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার পশ্চাচ্ছাবন-পূর্বক নামরূপের চরাইখারং পর্যন্ত গিয়াছিলেন। অহম্-রাজ সম্পূর্ণ পরাভব স্বীকার করিয়া কোচরাজের অধীনস্থ স্বীকারপূর্বক জামীনস্বরূপ তাঁহার প্রধান সামন্তগণের পুত্রগুলিকে প্রদান করেন এবং অনেক অর্থাদি দিয়া সন্ধি করেন, কিন্তু কোচ-সেনাপতি চলিয়া গেলে পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সময়ে কোচরাজ মুসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে জামীন প্রত্যর্পণ করিয়া অহম্-রাজের প্রস্তাবিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। স্ত্রখাম্ফা নর এবং চুটিয়াদের সঙ্গে কয়েকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরে বহু মহিষী ছিলেন এবং ইহাদের কেলেকারিতে রাজা

১০৬০

বুহৎ বদ্র

ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোন সময়ে এক ব্যক্তি রাজ্যের সঙ্গে অভিযুক্ত হওয়ার ফলে তিনটি লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

সুখাশ্ফার পুত্র সুসেংফা বৃদ্ধ বয়সে রাজা হন, সুতরাং তাঁহাকে লোকে 'বুড়া রাজা' নাম দিয়াছিল। ইনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন, এজন্য ইহার আঃ এক নাম হইয়াছিল "বুদ্ধ স্বর্গনারায়ণ", ইহার রাজ-উপাধি ছিল প্রতাপসিংহ, এই নামেই ইনি সুপরিচিত। রাজ্যের প্রথম সময়ে কাছাড়ের রাজা ভীমদর্পের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ হয় এবং ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইনি কোচরাজ পরীক্ষিতের

প্রতাপসিংহ—১০০৩-

১০৪১ খৃঃ।

কন্যা "মঙ্গলধাই"কে বিবাহ করেন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে কোচরাজ বালীনারায়ণ মুসলমানদের উৎপাতে ইহার শরণাপন্ন হন। ইনি তাঁহাকে আশ্রয়দান করেন। এই সময়ে কোলাইবার নামক স্থানে এক মুসলমান বণিক নিহত হয়; বঙ্গের শাসনকর্তা শেখ কোয়াজিম এইসকল কারণে অহম্রাজের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সৈয়দ আবুবকর এবং ঢাকার জমিদার সত্ৰাজিৎ বহু সৈন্য লইয়া অহম্রাজের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সৈয়দ আবুবকর এবং মুসলমান সেনাপতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন এবং বন্দীদের মধ্যে সত্ৰাজিৎের এক পুত্র কামাখ্যাদেবীর মন্দিরে বলিস্বরূপ অর্পিত হন। বালীনারায়ণকে সুসেংফা দাড়াংএর সামন্তরাজার পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পর মুসলমানগণ সৈয়দ জৈনুল আবদিনের অধীনে বহু বণতরী লইয়া অহম্রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন বঙ্গেশ্বর ছিলেন ইসলাম খাঁ। মহম্মদ সাহ, মজলিস বয়জিদ এবং সত্ৰাজিৎ অহম্গণ কর্তৃক পরাস্ত হন, প্রথমোক্ত সেনাপতিদ্বয় নিহত হন এবং মুসলমানদের বহু বণতরী অহম্রাজের করতলগত হয়। সত্ৰাজিৎের ব্যবহার এই সকল যুদ্ধে অতিশয় সন্দেহাত্মক ছিল। তিনি কোন সময়ে মুসলমানপক্ষীয় হইয়া আবার কোন সময়ে অহম্রাজের সঙ্গে গোপনে মৈত্রী স্থাপন করিতেন। মীর জৈনুদ্দিন কর্তৃক হৃত হইয়া তিনি ঢাকায় প্রেরিত হন এবং পরে নিহত হন। জৈনুদ্দিন, কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের সাহায্যে এবার জয়ী হন এবং সুসেংফা রাজ্যের কতকাংশ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধিতে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে 'বড়নদী' এবং দক্ষিণে 'অম্বুরার আলি' মুসলমান ও অহম্রাজ্যের এই সীমা নির্দিষ্ট হয়। প্রতাপের রাজত্বকালে কাছাড়ীরাজ ইন্দ্রবল্লভ তাঁহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন।

তৎপরে ভগারাজা (সুখাশ্ফা) অত্যন্ত বিলাসী, কামাচারী এবং প্রজাপীড়ক ছিলেন, তাঁহার

ভগারাজা—১০৪১-১০৬০

খৃঃ।

নরিয় রাজা—১০৪৪-

১০৪৮ খৃঃ।

অমাত্যবর্গ তাঁহাকে বিষ দিয়া হত্যা করেন। ইহার পরে নরিয় রাজা (সুতয়িনফা) রাজা হন। ইনি চিররোগী এবং অসমর্থ ছিলেন, সুতরাং প্রজাদের বড়বঙ্গে ইনি সিংহাসনচ্যুত হন।

পরবর্তী রাজা সুতান্না 'জয়ধ্বজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত হন। মীরজুম্মার

জয়ধ্বজ—১০৪৮-১০৬০ খৃঃ।

সঙ্গে ইহার দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। পরিণামে ফরহাদ খাঁ প্রভৃতি সেনাপতির কোশলে মুসলমানেরা বিজয়ী হইয়াছিলেন এবং অহম্রাজের সঙ্গে তাঁহাদের সন্ধি হইয়াছিল। এই সন্ধি অনুসারে জয়ধ্বজ তাঁহার

এক কন্ঠাকে সম্রাট-প্রাসাদে দিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ হন। ইহার সঙ্গে রাজকুমার মহম্মদ আজিমের বিবাহ হইয়াছিল। মাসিরি আলমগিরিতে উক্ত হইয়াছে এই বিবাহে অহম্মরাজ কন্ঠাকে ১,৮০,০০০ টাকা যৌতুক দিয়াছিলেন।

এই সন্ত ছাড়া আরও কয়েকটি সন্ত হইয়াছিল। ২০,০০০ তোলা সোনা এবং ইহার ছয়গুণ রূপা রাজাকে দিতে হইয়াছিল, তাহা ছাড়া তাঁহার প্রধান অমাত্যদের ছয়টি পুত্রকে জামীনস্বরূপ প্রেরণ করা স্থির হইয়াছিল। এই সন্ধি অনুসারে অহম্মরাজ ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে ভারুলী নদী এবং দক্ষিণে কল্লাল পর্য্যন্ত সমস্ত জায়গার অধিকার মোগল সম্রাটকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

জয়ধ্বজের পর চক্রধ্বজ রাজ্য হইয়াছিলেন। ইহার সময়ে মুসলমানদের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটে। ফিরাজ খাঁ পরাজিত হন। যে অংশ মোগলদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল,

চক্রধ্বজ—১৬৬৩-১৬৬৯ তাহা দেওয়া হইবে না—অহম্মরাজের এই উক্তির ফলে পুনরায় যুদ্ধ হয়। ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে আরাঞ্জীব রামসিং নামক সেনাপতিকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু মোগলেরা পুনঃপুনঃ পরাভূত হইয়া অহম্মরাজের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধবিগ্রহকালে অনেক আসাম-বাসী মোগলদিগের সঙ্গে গোপনে যড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তন্মধ্যে শঙ্কর দেবের বংশধর চক্রপাণি একজন ছিলেন।

ইহার পরে সাময়িক ভাবে কয়েক জন রাজা হইয়াছিলেন: উদয়াদিত্য ১৬৬৯-১৬৭৩ খৃঃ, রামধ্বজ ১৬৭৩-১৬৭৫ খৃঃ, সুহাং ১৬৭৫ খৃঃ, গোবর ১৬৭৫ খৃঃ, সূজিন্কা ১৬৭৫-১৬৭৭ খৃঃ,

উদয়াদিত্য হইতে ও শেষোক্ত রাজা সামন্তচক্রের বড়য়ন্ত্রে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া জন নৃপতি—১৬৬৯-১৬৭৭ অবশেষে তাঁহাদের এক জনের দ্বারা উৎপাটিতচক্র হইয়া বিনষ্ট হন।

সূজিন্কার পরে সুপাইকা রাজা হইলেন। বড়াকুকন এবং বড় ফুকনের মধ্যে অসন্তোষের ফলে, বড় ফুকনের বড়য়ন্ত্রে রাজকুমার মহম্মদ আজিম আসাম আক্রমণ করিয়া গোহাটি দখল করেন। বড় ফুকন প্রবল হইয়া রাজাকে নিহত করেন এবং রাজবংশের একটি বালককে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন, ইহার নাম স্থলিকফা কিন্তু সাধারণতঃ ইনি 'লরা' রাজা নামে খ্যাত, 'লরা' অর্থ শিশু। বড় ফুকনের অবিমূঢ়কারিতা এবং রাজকীয়

লরা রাজা—১৬৭৭-১৬৮১ সর্ববিধ গৌরব আশ্রয়সাং করার চেষ্টাতে ইনি লোকের অত্যন্ত বিরাগভাজন হন, অবশেষে পুত হইয়া ইনি ইহার পুত্রদের সহিত

নিহত হন। লরা রাজা এই সকল বড়য়ন্ত্র ও হত্যাকাণ্ডের ভয়ে অতিশয় নির্মম হইয়া পড়েন। ইনি ভূতপূর্ব রাজার জাতিগোষ্ঠি শত শত লোককে হত্যা করেন। কিন্তু বহির শেষের স্থায় গদাপাণি নামক একটি রাজকুমার কৃষকের বেশে কৃষকের কার্য করিয়া আত্ম-গোপন করিয়াছিলেন। একটি গারো কৃষকের গৃহে তিনি গারো হইয়াছিলেন, অবশেষে প্রজারা রাজার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রথমে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত এবং শেষে নিহত করে। অতঃপর গদাধর (গদাপাণি) সিং রাজা হইয়া মুসলমানদের হস্ত হইতে গোহাটি উদ্ধার করেন। গোহাটির ফৌজদার উদ্ধবাসে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করেন এবং মুসলমানদিগের

বংশাল ধনরত্নের ভাণ্ডার রাজার হস্তগত হয়। ভাটধর ফুকন মুসলমানদিগকে আনিবার বড়বন্দে লিপ্ত ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার পুত্র দুই জন, পুত্রকে হত্যা করিয়া তাঁহার মাংস পিতাকে খাওয়ান হয়,—তৎপরে পিতাও নিহত হন। মুসলমানদিগের এই শেষ চেষ্টা। মহম্ম খাঁ সেনাপতি পরাস্ত হইলে আসামের দিকে আর মুসলমানেরা অগ্রসর হন নাই। এই যুদ্ধে যে সকল কামান আসাম-রাজ-কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, তাহার দুই তিনটি এখনও আছে, একটি ব্রিটিশ মিউজিয়মে, এবং একটি, লক্ষীপুরের ডেপুটি কমিশনারের বাড়ীর কাছে রক্ষিত আছে। ইহাতে এই কয়টি কথা উৎকীর্ণ আছে "গদাধরসিং গোহাটিতে মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়া এই অস্ত্র অধিকার করেন শকাব্দ ১৬০৪ (১৬৮২ খৃঃ)।" রাজা মিরি এবং নাগাদের বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু ইহার পরে ইনি শঙ্করদেবের শিষ্য বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। অপরাধ ১ম, তিনি যখন ছদ্মবেশে দিন যাপন করিতেছিলেন, তখন শঙ্কর-শিষ্যগণ তাঁহাকে কোন সাহায্য করে নাই। ২য়,—শঙ্কর-শিষ্যগণ আসাম ছাইয়া ফেলিয়াছিল এবং তাহার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এদিকে তাহার মন্ত-মাংস বারণ করাতে প্রজাদের দেহ ক্রমশঃ দুর্বল হইতেছিল। গদাধর সিংহ নিজে অতিশয় দৈহিক বল-সম্পন্ন ছিলেন, প্রজাদের দৈহিক অবনতির তিনি প্রশ্রয় দিতে পারেন নাই। এদিকে শঙ্করের শিষ্যগণ প্রজাদের অত্যাচারে ধাবন ও যুদ্ধাদিতে বোগদান নিষেধ করিয়াছিলেন; এতন্ত রাজার বলক্ষয় ঘটিয়াছিল। রাজা দক্ষিণপাটের গোঁসাইয়ের চক্ষু উৎপাতিত এবং নাসিকা কর্তন এবং তাঁহার সমস্ত ভাণ্ডার বাজেয়াপ্ত করিলেন, সোনা-রূপার শত শত বিগ্রহ গলাইয়া ফেলিলেন এবং বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী শত শত কেওট, কোচ, ডোম এবং হাড়িকে ধরিয়া তাহাদিগকে গরু, হাঁস এবং নুগীর মাংস খাওয়াইয়া তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন। গদাধর সিংহ সাড়ে চৌদ্দ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬২৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে দেহ-ত্যাগ করেন। এই রাজা আরাজ্জের সম-সাময়িক ও তাঁহারই মত নিষ্ঠুর ও প্রতাপশালী ছিলেন, ইনি একজন গোঁড়া শাস্ত্র ছিলেন।

গদাধর সিংহ—১৬০১-

১৬২৬ খৃঃ।

গদাধর সিংহের পুত্র রত্নসিংহ রাজা হইয়া বৈষ্ণবদের প্রতি অবিচার কাস্ত করেন। নির্কাসিত বৈষ্ণব গোস্বামীরা পুনরায় মন্দির অধিকার করিলেন, এমন কি রাজা স্বয়ং আউনিরাটি গোঁসাইয়ের নিকট বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজ-প্রাসাদ নির্মাণার্থ ইনি সুবিখ্যাত বাঙ্গালী স্থপতি ঘনশ্যামকে কোচবিহার হইতে আনাইয়া অনেক অট্টালিকা নির্মাণ করাইলেন, কিন্তু তাঁহাকে পারিতোষিক দিয়া বিদায় করার পরে বৃঃ। দেখা গেল—ইনি আসামের প্রত্যেক দুর্গ ও নগরীসম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনায়ুক্ত কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া বাইতেছেন। মুসলমানদিগের সহিত কোন বড়বন্দ আশঙ্কা করিয়া গুপ্তচর বলিয়া ইহাকে হত্যা করা হয়। ইনি জয়ন্তী-রাজ রাম সিংহ ও কাছাড়-রাজ তাম্রধ্বজকে বহু যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া আসেন। কিছু কালের জন্য জয়ন্তী পাহাড় ও কাছাড়রাজ্য খাণ করিয়া আসামের অধিকারভুক্ত করা হয়—পরে ইনি

গদাধর সিংহের পুত্র রত্নসিংহ রাজা হইয়া বৈষ্ণবদের প্রতি অবিচার কাস্ত করেন। নির্কাসিত বৈষ্ণব গোস্বামীরা পুনরায় মন্দির অধিকার করিলেন, এমন কি রাজা স্বয়ং আউনিরাটি গোঁসাইয়ের নিকট বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজ-প্রাসাদ নির্মাণার্থ ইনি সুবিখ্যাত বাঙ্গালী স্থপতি ঘনশ্যামকে কোচবিহার হইতে আনাইয়া অনেক অট্টালিকা নির্মাণ করাইলেন, কিন্তু তাঁহাকে পারিতোষিক দিয়া বিদায় করার পরে বৃঃ। দেখা গেল—ইনি আসামের প্রত্যেক দুর্গ ও নগরীসম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনায়ুক্ত কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া বাইতেছেন। মুসলমানদিগের সহিত কোন বড়বন্দ আশঙ্কা করিয়া গুপ্তচর বলিয়া ইহাকে হত্যা করা হয়। ইনি জয়ন্তী-রাজ রাম সিংহ ও কাছাড়-রাজ তাম্রধ্বজকে বহু যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া আসেন। কিছু কালের জন্য জয়ন্তী পাহাড় ও কাছাড়রাজ্য খাণ করিয়া আসামের অধিকারভুক্ত করা হয়—পরে ইনি

রত্নসিংহ—১৬২৬-১৭১৪

খৃঃ।

রাজাদিগকে মুক্তি দিয়া স্বীয় স্বীয় রাজ্যে ফিরিয়া যাইতে অমুমতি দেন। এই দুই রাজ্য লুণ্ঠ করিয়া ইনি অগণিত অর্থ পাইয়াছিলেন। কদ্রসিংহ গোড়া হিন্দু হইয়াছিলেন, তিনি গঙ্গার কতকটা অংশ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের রাজ্য আক্রমণপূর্বক বঙ্গবিজয়ের উদ্যোগ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে উপরিওয়ালার ডাক পড়াতে তিনি এই সংসার ত্যাগ করিলেন। অহম্মগণের প্রচলিত নিয়মামুদারে ইহার দেহ সমাধিস্থ না করিয়া হিন্দুমতে শ্মশানে ভস্মীভূত করা হয়।

কদ্রসিংহের পুত্র শিবসিংহ গোড়া শাক্ত ছিলেন। গণকেরা তাঁহার অকালমৃত্যু ভবিষ্যদ্বাণী করাতে ইনি রাজ্যী পরমেশ্বরীকে রাজ্য প্রদান করিয়া “বড়রাজা” উপাধি দেন।

শিবসিংহ—১৭১৪-১৭৪৪ এই রাজ্যীর ১৭৩১ খৃঃ অব্দে মৃত্যু হয়, তখন ইনি মৃত রাজ্যীর ভগিনী পুঃ।

‘অধিকা’কে বিবাহান্তে সেইরূপ রাজ-পদ প্রদান করেন, ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে এই রাজ্যীরও মৃত্যু হয়, তখন ইনি ‘সর্কেশ্বরী’কে বিবাহ করেন। রাণীরা গোড়া শাক্ত ছিলেন, রাজা ইহাদের প্রভাবে আসামের সর্কবৈষ্ণবের গুরু মোয়ামারিয়া এবং অপরাপর গুরুকে ভূগাপূজা করিতে বাধ্য করেন, তাঁহারা অস্বীকৃত হইলে তিনি ইহাদিগকে দেবীর মন্দিরে লইয়া যাইয়া বলির রক্তের তিলক তাঁহাদের কপালে অঙ্কিত করিয়া দেন। বৈষ্ণবেরা গুরু-কুলের এই অপমান তুলিতে পারেন নাই। শিবসিংহের রাজত্বকালে চারজন ইংরেজ—বিল, গডউইন, লিষ্টার এবং মিল—রাজার সঙ্গে দেখা করেন। গেট সাহেব লিখিয়াছেন, ইহারা রাজার পদতলে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিলেন (“It is said, they did him homage by falling prostrate at his feet.” Gait's History, p. 185).

শিবসিংহের মৃত্যুর পর প্রমথসিংহ ১৭৪৪-১৭৫১ এবং রাজেশ্বরসিংহ ১৭৫১-১৭৬৯ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। রাজেশ্বরের দুই পুত্র নির্বাসিত হইয়াছিলেন, তৃতীয় পুত্র লক্ষ্মীসিংহ-

লক্ষ্মীসিংহ—১৭৬৯-১৭৮০ সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ ছিল যে ইনি রাজার ঔরসজাত পুত্র পুঃ।

বৈষ্ণব-বিদ্রোহ। স্বয়ং বলিতেন—এই ছেলে আমার নহে। অনেক বাদ-প্রতিবাদের পর ইনিই রাজপদে অভিষিক্ত হন, তখন ইহার বয়স ৫৩। লক্ষ্মীসিংহের সময় বিখ্যাত বৈষ্ণব-বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। সেই মোয়ামারিয়ার ও বৈষ্ণব-গুরুর অপমানের স্বত্তি আসামের বৈষ্ণব-সমাজের বুকে দাগা দিয়া গিয়াছিল, এবার শিখ সম্প্রদায়ের ভ্রাতা ইহারাও রাজদ্রোহ ঘোষণা করিল। নাহার নামক মোরাণদিগের দলপতির উপর রাজার কোন প্রধান সেনাপতি অত্যাচার করে, সে ব্যক্তি তাঁহার গুরু মোয়ামারিয়ার গোসাঁইয়ের শরণে। ইহারা একটা ছল খুজিতে-ছিলেন। স্ততরাং অবিলম্বে গুরুর বণভঙ্কা বাজিয়া উঠিল, মোরাণ ও কাছাড়ী দলের লোকেরা দলে দলে যোগ দিল। লক্ষ্মীসিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্জনা গোহাইন রাজা হইবার প্রতিক্ষণে পাইয়া এই দলে ভিড়িলেন। মোয়ামারিয়ার গোসাঁইয়ের পুত্র বানগান নিজেই রামরূপের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। লক্ষ্মীসিংহ ও তাঁহার প্রধান অমাত্য ও কর্মচারীরা বন্দী

হইলেন। বিদ্রোহীরা তাঁহাদের কাহারও কাহারও শিরশ্ছেদ করিল। এমন কি বৃথা প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ বর্জনা গোহাইনও বিদ্রোহিগণ কর্তৃক নিহত হইলেন। বানগান রাজসিংহাসন অধিকার করিতে গেলে—তাঁহার পিতা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া মোরাণ-দলনেতা নাহারের পুত্র রাঘ এবং তাঁহার দুই ভ্রাতাকে সমস্ত আসামের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভাগ করিয়া প্রত্যেককে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। রাঘ সর্বোপরি রাজা হইলেন, কিন্তু বানগানেরই সমস্ত প্রভুত্ব রহিল, তিনি “বড় বড়ুয়া” পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। বানগান লক্ষ্মীসিংহের মহিষী-মণ্ডলীকে স্বীয় অন্তঃপুরভুক্ত করিয়া লইলেন, তন্মধ্যে মণিপুরের এক রাজকুমারীও ছিলেন। এদিকে লক্ষ্মীসিংহ কারাগার হইতে কৌশলক্রমে মুক্ত হইয়া অতর্কিতভাবে রাঘকে আক্রমণ করিয়া ১৭৭০ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহাকে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং সেইখানেই তাঁহাকে হত্যা করা হইল। কথিত আছে, অন্তঃপুর হইতে মণিপুরের রাজকন্যা বাহির হইয়া রাঘের শরীরে শেষ খড়্গাঘাত করেন। ইহার পরে লক্ষ্মীসিংহ স্বীয় রাজ্য ফিরিয়া পান। গোঁসাইয়ের দল কিছুকাল ধরিয়া নির্দাপিত অগ্নির ফুলিঙ্গের মত এদিক্ সেদিক্ স্বীয় প্রভাব দেখাইতেছিলেন, কিন্তু পরিণামে তাঁহারা বিধ্বস্ত হইলেন। লক্ষ্মীসিংহের অভিষেক এই সকল বিপ্লবের জন্ত স্থগিত ছিল, এবার তাহা ধুমধামের সহিত সম্পাদিত হইল। লক্ষ্মীসিংহ ঘোর শাক্ত ছিলেন এবং দেবী-মন্দিরে অনেক দান ও পূজাদি কার্যের অনুষ্ঠান করেন। আমরা ইহার পরের অধ্যায় আর লিখিব না—কারণ বাদ্দের ইতিহাসও আমরা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পর আর লিখি নাই। এইখানে আমরা পরবর্তী রাজগণের বংশতালিকা দিয়া শেষ করিব।

গৌরীনাথ সিংহ ১৭৮০-১৭৯৫ খৃঃ, কমলেশ্বর সিংহ ১৭৯৫-১৮১০ খৃঃ, চন্দ্রকান্ত সিংহ ১৮১০-১৮১৮ খৃঃ, পুরন্দর সিংহ ১৮১৮-১৮১৯ খৃঃ।

আসামের রাজাদের কথা বলা হইল, কিন্তু তথাকার রাজচক্রবর্তীর কথা বলা হয় নাই। যিনি প্রায় পাঁচশত বৎসর বাবৎ প্রকৃতই আসাম-বাসীর হৃদয়ের উপর রাজত্ব করিতেছেন—এখন পর্যন্ত বাহার রাজত্ব অমোঘ প্রতাপে চলিতেছে, যিনি কায়স্থকুলে সম্ভূত হইয়াও ব্রাহ্মণ এবং সর্ববর্ণের পূজা, যিনি ঘোর তান্ত্রিকতা এবং নর-পশু-পক্ষি-রক্ত-কলঙ্কিত রাজ-রাজত্বগণের সহায়তাপুষ্ট দেবীমন্দিরের প্রবলপ্রতাপাবিত শাক্ত উপাসকদিগের অত্যাচারের মূলে তুলসীপত্র-ভূষিত, ক্ষমাসুন্দর, দিব্য প্রীতির বাছ-কুঠারাদাত করিয়াছিলেন, যিনি আমাদেরই চৈতন্যদেবের সমকালবর্তী এবং তাঁহারই মত সর্ববর্ণের সাম্য-প্রচারক, সেই বৈষ্ণব-চূড়ামণি আসামবাসীর হৃদয়ের অমূল্য-কণ্ঠহার—শঙ্করদেবের জীবনের পবিত্র প্রসঙ্গ দ্বারা আমরা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

শঙ্করদেবের পিতা কুসুমবর পরম শৈব ছিলেন, ইহাদের আদিবাস বটজুবি (নোয়াগাঁয়)। অল্পবয়সে শঙ্করের মাতার মৃত্যু হয়। শৈশবকালে তিনি অতি দুর্দান্ত ছিলেন, কিন্তু পিতার ভৎসনায় তাঁহার চৈতন্য হইল এবং অল্পকালের মধ্যেই তিনি সর্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত হইলেন, তাঁহার উপাধি হইল “দেবগিরি।” তিনি এতটা যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন যে, কথিত আছে,

তিনি চার দিন আসরোধ করিয়া থাকিতে পারিতেন, দীর্ঘকাল তিনি একটিমাত্র পাদাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং একাদিক্রমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে ডুবিয়া থাকিতে পারিতেন। আসামে এইরূপ যোগাভ্যাসের রীতি তৎকালে প্রচলিত ছিল, শাক্তগণ তাত্ত্বিক-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে যোগাভ্যাস করিয়া নানারূপ বিভূতি দেখাইতেন। এইখানে চৈতন্ত্য-দেবের সঙ্গে শঙ্করের বৈষ্ণব-ভক্তিবাদের মূল প্রভেদ; বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা এইসকল বিভূতি কিছু কিছু না দেখাইতেন, এমন নহে। বীরভদ্র ও তাঁহার সাদ্রোপাঙ্গদের মধ্যে নানারূপ বিভূতি-প্রদর্শনের কথা। প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়—কিন্তু চৈতন্ত্যদেব এইসকল পন্থার বিরোধী ছিলেন। শঙ্করদেবকে তাঁহার পিতামহী গৌসাই খেরাসতি লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি অল্পবয়সে তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে গৃহী করিয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্কর গৃহে আবদ্ধ থাকিবার জন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। নব-যৌবনে স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হন; শঙ্কর তাঁহার তিন শত দুগ্ধবতী গাভী, স্বীয় ভৃত্য রাখালগণের মধ্যে বিতরণ করেন, এইভাবে তাঁহার ষাট জোড়া বলদও বিতরিত হইল। অবশিষ্ট সম্পত্তি তাঁহার দুই জ্ঞাতি ভ্রাতা জয়স্ব ও মাধবকে দিয়া তিনি একদিন গেরুয়া পরিয়া সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক গৃহ হইতে বহির্গত হন। বারবৎসর তিনি নানাতীর্থে অতিবাহিত করিয়া পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং দার-পরিগ্রহ করেন। তাঁহার ভ্রাতা বনগায়া গিরি তাঁহার গৃহ-নির্মাণপূর্বক যে সকল গাভী তিনি রাখাল বালকদিগকে দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েকটিকে ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করেন; তাহারা অস্বীকার করিতে বনগায়া এরূপ জুঁক হইয়াছিলেন যে তিনি একটি রাখালকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই ঘটনায় শঙ্কর অত্যন্ত মর্শ্ব-পীড়া পাইয়াছিলেন। শঙ্করের জ্ঞাতিভ্রাতা জগদানন্দ তাঁহার বাসস্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই ভ্রাতা স্পৃহণ্ডিত ছিলেন; শঙ্কর ইহার সঙ্গে মন্দিরে সর্বদা ধর্ম্মালোচনায় সময় কাটাইতেন। জীবনের এই অধ্যায়ে মাধবের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। মাধবই তাঁহার সর্বপ্রধান শিষ্য এবং তিনিই মহাপুরুষিয়া-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। মাধব সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং ঘোর শাক্ত ছিলেন,—ইহার বাড়ী তেখুনিয়াবন্ধে ছিল। ইহার মাতার গুরুতর পীড়া হওয়াতে ইনি তাঁহার আরোগ্য কামনা করিয়া কামাখ্যাদেবীর নিকট দুইটি ছাগবলি মানত করিয়াছিলেন। শঙ্কর-শিষ্য গয়াপাণির সঙ্গে এই উপলক্ষে মাধবের তর্ক হয়, এবং মাধব তর্কে পরাজয় করিবার জন্ত শঙ্করের নিকট উপনীত হন। মাধব সংস্কৃতশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে শঙ্করের নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে শঙ্কর ভাগবতের এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন : “বধা তরোমূলনিষেচনে ন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রানোপহারাক্ত বধেন্দ্রিয়াণাং তদৈব সর্কার্হণমচ্যুতেজ্য।” (যেহ্রুপ তরুমূলে জল নিষেক করিলে তাহার কাণ্ড-শাখা-উপশাখা সমস্ত পুষ্ট হয়, যেহ্রুপ প্রাণের তৃপ্তি হইলে সর্কেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, সেইরূপ অচ্যুতের অর্চনায় সর্কদেবতা অচ্চিত হইয়া থাকেন।)

মাধবের মত এত বড় শাক্তের পরাজয়ে সমস্ত শাক্ত-নেতাদের টিকি নড়িয়া উঠিল।

শ্রীধর ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ মিশ্র, বামনাচার্য্য এবং রত্নাকর কন্দলী প্রভৃতি শাস্ত্র নেতারা কি উপায়ে বৈষ্ণবধর্মের বীজ অঙ্কুরে নষ্ট করিবেন, তজ্জন্ত চেষ্টিত হইলেন। শ্রীধর ভট্টাচার্য্য স্বয়ং নৈরায়িক ছিলেন, তিনি বলিলেন “তর্ক-যুদ্ধে শঙ্করকে পরাস্ত করা যাক।” ব্রহ্মানন্দ ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “তর্কে কোন প্রয়োজন নাই, উহাতে শঙ্করকে অনাহুতভাবে গৌরব দান করা হইবে। বৈষ্ণব ধর্ম কামাখ্যা দেবীর দেশে আপনিই নিবিয়া যাইবে, অপেক্ষা করা যাক।” রত্নাকর কন্দলী শঙ্করকে চিনিতেন, তিনি বৈষ্ণবধর্ম এই ভাবে বিলুপ্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখিলেন না। তিনি বলিলেন, “সকলে মিলিয়া এই ধর্মের নিন্দা ও বিক্রম করা যাক, তাহা হইলে সাধারণের মধ্যে ইহার বিস্তার নিরুদ্ধ হইবে।” শাস্ত্রেরা তাহাই করিতে লাগিলেন, যেখানে সেখানে বৈষ্ণব-নিন্দা ও তাঁহাদিগকে লইয়া উপহাস চলিতে লাগিল। একদিন বুদ্ধধা নামক এক ব্যক্তির বাড়ীর শাস্ত্রের নিমন্ত্রণে প্রধান প্রধান শাস্ত্র পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন; ব্রাহ্মণেরা হয়ত তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিতে স্বীকার করিবেন না, এই জন্ত শঙ্কর অতি বিনীত শিষ্যের দ্বারা কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া তাঁহাদিগকে এমন সমস্তায় ফেলিলেন যে, তাঁহাদের দর্প চূর্ণ হইয়া গেল। রত্নাকর কন্দলী নিজের জালে নিজে জড়িত হইয়া পড়িলেন। শাস্ত্রেরা বিধ্বস্ত হইয়া অহম্মরাজ স্ক্রেন-কার (১৫৩৯-১৫৫২ খৃঃ) নিকট শঙ্করের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। অভিযোগ টিকিল না। এদিকে শঙ্কর প্রকাশ্য শত্রুতার ভাব ত্যাগ করিয়া শাস্ত্র ব্রাহ্মণদিগের মন যোগাইতে চেষ্টিত হইলেন,—তিনি তাঁহার শিষ্যদের দ্বারা অনেক টাকা উঠাইয়া তাঁহার আশ্রমে ব্রাহ্মণদের দ্বারা গীতা পাঠ করাইয়া প্রচুররূপে দক্ষিণা দিতে লাগিলেন; ইহাতে ব্রাহ্মণ দলের ভাব অনেকটা অম্লকুল হইল এবং হরিকথাও দেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি স্বয়ং ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র অতি সরল সুন্দর আসামী ভাষায় অনুবাদ করাইয়া সাধারণের মধ্যে ভাগবত-ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু অহম্মরাজেরা শাস্ত্র পণ্ডিতদের প্ররোচনায় বৈষ্ণবদিগের উপর পুনরায় অত্যাচার করিতে লাগিলেন; এমন কি একদা শঙ্কর কোনরূপে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রিয় শিষ্য হরি নিহত হইলেন। অহম্মরাজগণের অত্যাচারে শঙ্করদেব বুঝিলেন, কামাখ্যা দেবীর প্রতাপ আসামে কিছুতেই ক্ষুদ্র হইবার নহে। তিনি বরপেটায় আসিয়া কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের শাস্তিময় রাজত্বে ধর্মপ্রচারের খুব সুবিধা পাইলেন। ইহার মধ্যে তাঁহার এক প্রধান শিষ্য জুটিল—নারায়ণ দাশ। এখানেও প্রথম শঙ্কর বড়ই কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন, কারণ ব্রাহ্মণেরা রাজা নরনারায়ণকে জানাইলেন, শঙ্কর-শিষ্যেরা ভগবতীর নিকট মাথা নত করে না, কামাখ্যা দেবীকে মানে না ইত্যাদি। রাজা শঙ্করকে ধরিয়া আনিতে লোক পাঠাইলেন; শঙ্কর বিপদ আশঙ্কা করিয়া পলাইয়া গেলেন। তাঁহার দুই শিষ্য নারায়ণ দাশ ও গোবুল দাশ ধৃত হইয়া রাজার নিকট আনীত হইলেন। ইহারা কিছুতেই জর্গী-প্রতিমার নিকট মাথা নোয়াইবেন না—এজন্ত রাজা নিরতিশয় জুড় হইয়া ইহাদিগকে বংগরোনাঙ্গি কঠোর দণ্ড দিয়া শেষে হত্যা করিতে আদেশ করিলেন,

ভীষণ আঘাতে নারায়ণ নামক শিষ্যের একখানি হাত ভাঙ্গিয়া গেল, শেষে অসহ্য পীড়ন সহ্য করিয়া ইহারা দেবীর নিকট মস্তক অবনত করিলেন; কিন্তু শঙ্করদেব-সদৃশে কোন প্রণের উত্তর দিলেন না। রাজে ইহাদের দেহ হইতে লৌহশৃঙ্খল খসিয়া পড়িল, তখন ইহারা বক্ষীদিগকে পুনরায় তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে অমরোদ্যম করিলেন। এই আশ্চর্য্য সত্যতা দেখিয়া গ্রহরীরা স্তম্ভিত হইয়া কমা চাহিল। শঙ্কর লুকাইয়া কতদিন থাকিবেন? তিনি নরনারায়ণের ভ্রাতা চিলা রায়ের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। চিলা রায়ের চেষ্টায় শঙ্কর নরনারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। শঙ্করের সৌম্য মূর্তি, সরস্বতীর বীণার মত স্বর, এবং চরিত্রের মর্যাদা-পূর্ণ গাভীরা রাজাকে মোহিত করিল। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সভায় ডাকাইয়া আনিয়া বিচার করিতে আদেশ করিলেন। শঙ্করের নিকট ব্রাহ্মণেরা পরাজয় স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাঁহার এমনই বিনয় ছিল যে, ব্রাহ্মণেরা ক্রোধপ্রকাশের কোন সুবিধা পাইলেন না। গেট সাহেব দুইটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। একটিতে কথিত আছে, রাজা নরনারায়ণ শঙ্করের ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বোধ হয় দ্বিতীয়টিই সত্য, রাজা নরনারায়ণ নহেন, চিলা রায় তাঁহার ভগিনীপতি হইয়াছিলেন। রাজা স্বয়ং শঙ্করের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্করের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে তাহা হইতে পারে নাই। রাজা শঙ্করকে পাড়াবাউসী এবং তৎসম্বন্ধিত স্থানগুলির শাসনকর্তৃত্ব দিয়াছিলেন, কিছুকাল এই কাজ করিয়া শঙ্কর দেখিলেন, তাঁহার ধর্ম-প্রচারকার্যের ব্যাঘাত হইতেছে, তিনি বৈবরিক হইয়া পড়িতেছেন; তখন সেই কাজে ইস্তফা দিয়া তিনি কোচবিহারে আসিয়া বাস করেন, এই সময়ে তাঁহার বহু শিষ্য হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে মথুরাদাস আতা (বরপেটা-নিবাসী), মধুপুরের বিষ্ণু আতা, কমলবাড়ীর বহু আতা, কেশব আতা (ভাটোঁকুচি-নিবাসী), চামারিয়ার বিষ্ণু আতা, জৈনিয়ার নারায়ণ দেব ঠাকুর, দালগোমার রামচরণ ঠাকুর, বড়হেরামদার পরিয়া মাধব এবং হাজোর-বাসী লক্ষ্মীকান্ত আতা—এই কয়েকজনকে তিনি সত্রেখর করিয়াছিলেন। মাধব পুরুষোত্তম-সম্প্রদায়ের এবং দামোদর আর এক সম্প্রদায়ের নেতা হইয়াছিলেন। দামোদর ব্রাহ্মণ ছিলেন, এইজন্য বহু ব্রাহ্মণ এই দলে ভিড়িয়াছিলেন। আসামী লেখকগণের মধ্যে কছাভূষণ দৈত্যারী এবং রামরায়ই শঙ্করদেবের জীবনীকারদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, ইহারা এবং অপরাপর কয়েকজন তদেবীয় লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে শঙ্করদেব চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। একখানি প্রাচীন আসামী হাতের লেখা পুঁথিতে অঙ্কিত চিত্রে চৈতন্য ও শঙ্কর উভয়কেই উপবিষ্ট দৃষ্ট হয়, চৈতন্যদেব উপদেশ দিতেছেন এবং শঙ্কর তাহা সঙ্গমের সহিত শুনিতেন। শঙ্কর চৈতন্য হইতে বয়সে বড় ছিলেন এবং উভয়েই সমসাময়িক ও অতি নিকটবর্তী দেশবাসী—উভয়েই বৈষ্ণব ধর্মের নেতা। এরূপ অবস্থায় উভয়ের এই মিলন-কথা যখন এতগুলি আসামী পুঁথিতে বর্ণিত আছে, তখন দুইজনের দেখাসাক্ষাতের কথাটা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু শঙ্কর বৈদী ভক্তি এবং জ্ঞানমার্গের দিকে বেশী জোর দিয়াছিলেন, চৈতন্যদেবের প্রেমের গতি 'রাগানুগা'—উভয়ের দুই স্বতন্ত্র পন্থা। শঙ্কর নৈতিক উপদেশের মুক্তাবলী ছড়াইয়া গিয়াছেন,

চৈতন্তদেব স্বীয় প্রেম-রূপ দেখাইয়া লোকের মন ভুলাইয়াছেন—সেই ভাববিহ্বলতার বস্তার মধ্যে উপদেশ দেওয়ার অবকাশ খুব কমই ছিল। সুতরাং চৈতন্তদেবের কোন প্রভাব যে শঙ্করদেবের উপর পড়িয়াছিল, এমন বোধ হয় না।

কথিত আছে শঙ্করদেব একদিনের মধ্যে ভাগবতের একখানি মন্ত্যনুবাদ আসামী ভাষায় রচনা করিয়া রাজা নরনারায়ণকে বিম্বিত করিয়া দিয়াছিলেন, কোন ব্রাহ্মণ তাহা এত অল্প সময়ের মধ্যে করিতে পারেন নাই। শঙ্করের এই ভাগবতের অনুবাদখানির নাম ‘গুণমালা’। মৃত্যুকালে শঙ্করের পাদমূলে বসিয়া পুত্র রামানন্দ ঠাকুর বলিলেন, “বাবা, আমাকে কি দিয়া যাইতেছেন?” শঙ্কর বলিলেন, “তোমার মাতার স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যের বৈভব আছে, তাহা ছাড়া রাজা গুরুদ্বজ এবং রাজকুমারী ভুবনেশ্বরী যে অতুল ঐশ্বর্য দিয়াছেন তাহা তোমারই রহিল।” রামানন্দ চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন, “আমি এ সকল পার্থিব ঐশ্বর্যের কথা বলিতেছি না, বাবা, আমার পরকালের সহায় হয়, এমন ধন আমি আপনার নিকট চাই।” মৃদু মৃদু মুখমণ্ডল আনন্দ-গোরবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, “তুমি আমার যোগ্য পুত্র—আমার ধর্মজীবনের সর্বস্ব আমি আমার শিষ্য মাদবকে দিয়াছি, তাহার সহিত আমার কোন প্রভেদ নাই। তুমি যাহা চাও, তাহার নিকট পাইবে।”

কিরূপে এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ক্রমশঃ বড় হইয়া সমস্ত দেশ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল এবং পরিশেষে অহম্মরাজদের অকথ্য অত্যাচারে তাহারা হস্তের জপমালা ফেলিয়া অসি ধারণ-পূর্ব্বক এক রাজাকে নিধন করিয়া কিছুকালের জন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিল,—তাহার বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে সংক্ষেপে দিয়াছি।

আসাম নানারূপ শিল্পের জন্ত বিখ্যাত। আসামের রেশমী বস্ত্র মেয়েরা প্রস্তুত করিয়া থাকেন; তাহাদের কারুকার্য্য, বিশেষ শাড়ীর অঞ্চলের ফুললতার চারুশিল্প—অদ্ভুত। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে আসামে যে প্রাসাদ ছিল, তৎসম্বন্ধে একজন সাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, “এই রাজপ্রাসাদের মধ্যে কাঠের যে অপূর্ব্ব কার্য্য দেখা যায়, এবং অপরাপর শিল্পের যে নিদর্শন আছে—তাহা স্তূর্ভ, তাহা আমার লেখনীর বর্ণনার অতীত। বোধ হয় জগতের আর কোন স্থানে কাঠের ঘরে এরূপ অদ্ভুত সৌন্দর্য্য এবং শিল্পকলা অত্ন কোন জাতি দেখাইতে পারে নাই। প্রতি প্রকোষ্ঠে গবাকগুলির পিত্তলনির্ম্মিত আরশী নানারূপ মনোজ্ঞ আকৃতিতে গঠিত হইয়া এরূপ মন্থনতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে যখন সূর্যের আলো

শিল্প ও স্থাপত্য। তাহাদের উপর পড়ে, তখন প্রকোষ্ঠগুলি ঝলমল করিয়া চোখ ঝাঁপিয়া দেয়। রাজার শয়ন-গৃহ ছাড়াও অত্যন্ত কাঠের অট্টালিকা

এত সুন্দর, তাহাদের সুগঠিত অবয়বে চারুশিল্পের এরূপ মনোহারী খেলা যে, তাহা দেখিবার সামগ্রী, ভাষা দিয়া এই অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য বোঝান যায় না।” (গেট সাহেবের ইতিহাস, ১৫১ পৃঃ)। এইরূপ কাঠ ও বেত বাশ দ্বারা নির্ম্মিত ঘরের প্রাচুর্য্য এক সময়ে খাস বাঙ্গলা দেশেও ছিল। আমরা ৫৫৮-৬৪ পৃষ্ঠায় তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কোচবিহার

কোচবিহার বহুকাল ধাবৎ নরক-বংশীয় রাজাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। স্মৃতরাং আদি যুগে প্রাগজ্যোতিষপুরের ইতিহাস হইতে বর্তমান কোচ-রাজ্যের ইতিবৃত্ত এক সময়ে অভিন্ন ছিল। পালবংশের কয়েকজন রাজার নামও আমরা পূর্বে করিয়াছি। ইহারা সেনবংশের সমসাময়িক বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন; রঙ্গপুর হইতে তেজপুর পর্য্যন্ত এক বৃহৎ-জনপদ ইহাদের শাসনাধীন ছিল। পালদের রাজধানী ছিল, ডিম্‌লা। ব্রহ্মপাল হইতে হর্ষপাল পর্য্যন্ত পাঁচ পুরুষ। হর্ষপালের পুত্র ধর্মপাল; কথিত আছে পল্লীগীতিকার মাণিকচন্দ্র রাজার সঙ্গে ইহার কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল; মাণিকচন্দ্র রাজার উপকথা-সাহিত্যে দৃষ্ট হয়, প্রসিদ্ধ রাজ্যোন্নয়নামতীর সঙ্গে ধর্মপালের যুদ্ধ হইয়াছিল। ধর্মপালের পরে গোপীচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র) রাজা হন। ইহার সন্ন্যাসসম্বন্ধে অনেক কথা সমস্ত ভারতবর্ষে গীতির আকারে প্রচলিত আছে। গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র অগ্ৰভাবে দেশময় খ্যাতি (অখ্যাতি?) অর্জন করিয়াছিলেন। ভবচন্দ্র ও তাঁহার মন্ত্রী গবচন্দ্রের নির্লিপ্ত ক্রিয়াসম্বন্ধে বহু উপকথা আমরা বাল্যকালে শুনিয়াছি। গল্পবাজগণ এই রাজা ও তাঁহার মন্ত্রীর বেকুবীর ইতিহাস যথাশক্তি কল্পনার ব্রহ্মপাল হইতে ভবচন্দ্র।

সাহায্যে বাড়াইয়া তাঁহাদিগকে কিস্তৃতকিমাকার করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, সে সকল কথা শুধুই ভিত্তিহীন গল্প। ভবচন্দ্র ও গবচন্দ্র মন্ত্রী নাকি কর্ণ ও নাসিকা-রক্ত তুলা দিয়া বন্ধ করিয়া রাজসভায় বসিতেন—পাছে সেই বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি রক্ত-পথে পলাইয়া যায়—ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে ইহারা প্রজাদের আবেদন-নিবেদনে কাণ দিতেন না। আর একটি গল্প এই যে একদা একটা কাক ঠোটে করিয়া চিতুই পিঠা আনিয়া সেই রাজ্যে ফেলিয়াছিল। সে দেশে চিতুই পিঠা অজ্ঞাত ছিল, রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ জিনিষটা কি? মন্ত্রী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, “ঘুণে পূর্ণিমার চাঁদটাকে খাইয়া ফেলিয়া দিয়াছে।” ভবচন্দ্রের রাজধানী রঙ্গপুর জেলার বাগছুর পরগনায় ছিল। এখানে তাঁহার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই শাখার পালদের শেষ রাজার নাম “পালা রাজা”—ইহারও রাজবাড়ীর চিহ্ন এখনও বাগছুরে দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় “পালাগড়” দুর্গের অবশেষ এখনও বিদ্যমান।

অনেক দিন পর্য্যন্ত এই দেশে অরাজকতা চলিয়াছিল, ইহার পরে কোচবিহার-রাজ স্বীয় স্বাভাব্য স্থাপন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ অহম্মরাজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। খেন রাজাদের সঙ্গে মুসলমানদের এবং অহম্মরাজগণের যুদ্ধ-বিগ্রহ পূর্বাখ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। খেন রাজাদের পতনের পর কতকগুলি কোচ (রাজবংশী) নেতারা স্বীয় স্বীয় ক্ষুদ্র রাজ্যে প্রাধান্ত্য স্থাপন-পূর্ব্বক দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। এই খণ্ডরাজ্যের একজন দলপতির নাম ছিল হাজো। জীরা ও হীরা নামে ইহার দুই সুন্দরী কন্যা ছিল। ইহারা উভয়েই চিক্‌না পাহাড়-নিবাসী

মেচ্ বংশীয় হাড়িরা মেচ্ (নামাস্তর বেহরি বা হরিদাস) নামক এক ব্যক্তির সহিত পরিণীতা হন। জীরার গর্ভে চন্দন ও মদন নামক দুই পুত্র জন্মে। কিন্তু হীরা যেমনই রূপবতী, তেমনই শিবে সমর্পিত-কায়-মন ভক্তিমতী রমণী ছিলেন। কথিত আছে স্বয়ং শিবের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তিনি বর প্রাপ্ত হন। সেই বরের ফলে তাঁহার বিত্ত নামক এক অদ্বুত প্রতিভা-সম্পন্ন পুত্র লাভ হয়।

শিবের বর-লব্ধ, এই জন্ত বিত্তর সন্ততিরা “শিব-বংশ” বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। বিত্তর জন্মকাল ১৪২২ শক (১৫০০ খৃঃ অব্দ)—মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন। হীরার গর্ভে শিশু নামক আর একটি পুত্র হইয়াছিল। চিক্না পাহাড়ে তুড়কা কোটাল নামক এক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দু আটটি পরী-সংবলিত একটি খণ্ড-প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন।

দৈবক্রমে বিত্ত একদিন একটি ষালককে হত্যা করাতে তুড়কা কোটালের লোকজন বিত্ত ও তাঁহার সহচরগণকে ধৃত করিবার জন্ত আদিষ্ট হইল। বিত্ত এই সময়ে তাঁহার অমিত দৈহিক বল ও বুদ্ধির প্রখরতা দ্বারা বহু লোককে করায়ত্ত করিয়াছিলেন। তুড়কা কোটালের সহিত এই শিশু নায়কের সংঘর্ষে বিত্তর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জীরার গর্ভজাত পুত্র মদন নিহত হন, কিন্তু বিত্ত তুড়কা কোটালকে হত্যা করিয়া তাঁহার বাড়ীঘর ও পরিবারবর্গ দখল করিয়া লইলেন। তুড়কার পরিবারবর্গ হিন্দুই ছিল—সে নিজে মুসলমান হইয়াছিল। তাঁহার তিনটি সুন্দরী কন্যাকে জীরার পুত্র চন্দনসিংহ—১৫১০-১৫২২ চন্দন বিবাহ করিলেন। চন্দন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং তিনিই রাজা হইলেন। এই ভ্রাতাদের প্রত্যাপে শঙ্কিত হইয়া, দশ গ্রামের নেতা, আট গ্রামের নেতা ও পাঁচ গ্রামের নেতারা চতুর্পার্শ্ব হইতে আসিয়া ভ্রাতৃঘরের অধীনত্ব স্বীকার করিল। চন্দন ১৫১০ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। ইনি ১৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন।

বিত্ত ‘বিশ্বসিংহ’ উপাধি গ্রহণপূর্বক ২২ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৫২২ খৃঃ অব্দে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রথমে ভুটিয়ারা সন্ধি করিয়া ইহার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিল। ভোট-রাজ্য-বিষয়—১৫২২-১৫৫৫ বাৎসরিক কর দিবেন, যুদ্ধ-সময়ে সাহায্য করিবেন, এবং রাজ্য-সংক্রান্ত সমস্ত গুরুতর বিষয়ে কোচবিহার রাজ্য কর্তৃক পরিচালিত হইবেন, সন্ধির এই সর্ত।

হীরার আদেশে মহারাজ চিক্না পর্ত্ত হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া বৈকুণ্ঠপুরে পাট স্থাপন করেন। ইনি ইহার বাল্য সহচরদিগকে খণ্ডরাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া বার ভূঞার অমুরূপ “বার-ঘরিয়া”র সৃষ্টি করেন। বিশ্বসিংহ ৩১ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে ৫৩ বৎসর বয়ঃক্রমে ইনি যোগ-সাধনার জন্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া চিক্না পর্ত্তে বাইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়েন। ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে মহারাজ বিশ্বসিংহের দ্বিতীয় পুত্র নরনারায়ণ রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইহার রাজত্ব শিববংশীয় ভূপতিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গুরুধ্বজ (চিলা রায়) চিরজয়ী মহাবীর ছিলেন, ইহার পরাক্রমে বহু রাজা কোচবিহারের প্রাধান্য স্বীকার করেন। নরনারায়ণ রাজা হইয়াই

গৌড়দেশ আক্রমণ করেন,—নিয়তুমির কোন মুসলমান ফৌজদারকে নিহত করিয়া চিলা রায়
চিলা রায়। গৌড়েশ্বরের রাজ্যের কতকাংশ স্বাধিকার-ভুক্ত করেন। এই সময়টা

পাঠান নৃপতিদের রাজত্বের শেষকাল। সোলেমান কররানীর মৃত্যুর
পর তৎপুত্র দাউদ পুনঃ পুনঃ আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে থাকেন। যখন বহিঃশত্রু লইয়া
পাঠান নৃপতি ব্যস্ত, সেই বিপত্তিকালে নরনারায়ণ গৌড়েশ্বরের কোন সেনাপতিকে হত্যা করিয়া
উত্তরবঙ্গের খানিকটা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। চিলা রায় অহম্মরাজ সুখাম্ফা (ধোঁড়া) রাজাকে
পরাস্ত করেন। সুখাম্ফা নরনারায়ণের অধীনস্থ স্বীকার করিয়া রাজকুমার সুন্দর গোহাইন
এবং আরো কয়েকটি সম্ভ্রান্ত বংশের যুবককে জামীনস্বরূপ বহু উপঢৌকনসহ পাঠাইয়া সন্ধি
করেন। অতঃপর চিলা রায় কাছাড়ের রাজা হরমেশ্বরকে পরাজয় করিয়া উক্ত রাজাকে
নরনারায়ণের সামন্ত-রাজে পরিণত করেন। কথিত আছে কোন যুদ্ধে সোলেমান কররানী
চিলা রায়কে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং চিলা রায়ের উপর শেষে বিশেষ প্রসন্ন হইয়া
তঁাহার সহিত স্বীয় এক কন্তার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিংবদন্তী এই, একদা চিলা রায় মনে
মনে চিন্তা করিলেন—সমস্ত রাজ-কার্য্য তো আমি করি। আমি রাজার জন্ত যুদ্ধ জয় করি,
অপরাপর রাজাদিগকে এই রাজ্যের অধীন করি, অথচ দাদা নরনারায়ণ রাজ্যভোগ করেন।
ইহা অসহ্য, আমি আর এইভাবে থাকিব না। এই মনে করিয়া তিনি খড়্গহস্তে রাজসভায়
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নরনারায়ণের মুখে প্রশান্ত ওদার্য্য, সন্দেহ বা বিধার লেশ
নাই, তঁাতাকে দেখিয়া তঁাহার মুখমণ্ডল মেহে উজ্জ্বল হইয়াছে। পরন্তু বেন স্বপ্নের ঘোরে

দেখিলেন, স্বয়ং ভগবতী তঁাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন।
নরনারায়ণ—১৫৫৫-
১৫৮৭ খৃঃ। তখন হাতের খড়্গ ফেলিয়া দিয়া তিনি রাজার পায়ে লুটাইয়া
পড়িয়া “আমি রাজদ্রোহী আমাকে হত্যা করুন—আমার পাপের
কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই।” বলিয়া কাদিতে কাদিতে তঁাহার চুপ্ত অভিপ্রায়ের কথা জানাইলেন
যে তিনি রাজাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিলেন। রাজা তঁাহাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া
নিজে কাদিয়া বলিলেন, “ভাই, তুমি পুণ্যবান্, তুমি জগন্মাতাকে দেখিলে, আমাকে তিনি
কোলে করিয়া ছিলেন, কিন্তু আমি দেখিলাম না।”

গণকেরা রাজার রিষ্টি গণনা করিয়া বলিয়াছিল, যদি এক বৎসর রাজা সম্ভ্রাসী হইয়া
থাকেন, তবে রিষ্টি কাটিতে পারে, তদনুসারে মহারাজ নরনারায়ণ একবৎসর সম্ভ্রাস লইয়া
গৃহাশ্রম ছাড়িয়াছিলেন। এই সময়ের জন্ত শুরুম্বজ (চিলা রায়) রাজত্ব করিয়াছিলেন।
এই সময়ে পর্য্যটক রাল্ফ ফিচ্ (Ralph Fitch) কোচবিহারে আসিয়াছিলেন, তঁাহার
ভ্রমণকাহিনী হইতে জানা যায়, তখনও কোচবিহারে জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব খুব বেশী ছিল।
রাজধানীতে বড় বড় পণ্ড-চিকিৎসালয় ছিল এবং প্রজারা পিপড়াকে চিনি খাওয়াইত।
কালাপাহাড় কামাখ্যা-মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল—নরনারায়ণ তাহা সংস্কার করেন।
মন্দির-গাত্রে নরনারায়ণ ও চিলা রায়ের প্রতিমূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। নরনারায়ণ যে মুদ্রা প্রচলন
করিয়াছিলেন, তাহার নাম নারায়ণী মুদ্রা—বহুকাল উহা কোচবিহার রাজ্যে প্রচলিত ছিল।

নরনারায়ণ স্বয়ং গুণশ্রুতি ছিলেন এবং বিজ্ঞার আদর করিতেন। তাঁহার সভাপণ্ডিত পুণ্ড্রবোত্তম বিজ্ঞাবাগীশ সংস্কৃতে ব্যাকরণ রচনা করেন এবং অনন্ত কন্দলী ভাগবত ও রামায়ণের পঞ্চাশুবাদ সঙ্কলন করেন। ইহার রাজত্বকালে শঙ্কর ও মাধবের স্থললিত পদ রচিত হয়।

নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইনি ইন্দ্রিয়াসক্ত, হৃদর্শন ও বহুদ্রাবলম্ব ছিলেন। কথিত আছে মুকুন্দ সার্কভৌম নামক এক

লক্ষ্মীনারায়ণ—১৫৮৭-

১৫২১ খৃঃ।

পণ্ডিতকে তাঁহার অবিমুখ্যকারিতার জন্য রাজা অবমানিত করেন। এই ব্রাহ্মণ দিল্লী যাইয়া জাহাঙ্গীরকে উত্তেজিত করেন। মোগল-দিগের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে লক্ষ্মীনারায়ণ পরাজিত হইয়া দিল্লী যাইয়া সন্ধি করিয়া আসেন। তাঁহার এক কন্যাকে তিনি মানসিংহের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। আকবরনামায় কথিত আছে যে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের ৪,০০০ অশ্বরোহী সৈন্য, ২,০০,০০০ পদাতিক, ৭০০ হস্তী এবং ১,০০০ জাহাজ ছিল—তাঁহার রাজ্যের আয়তন দৈর্ঘ্যে ২০০ ক্রোশ এবং প্রস্থে ১০০ হইতে ৪০ ক্রোশ ছিল—উহা পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট এবং পশ্চিমে ত্রিহত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোগলদিগের সঙ্গে সন্ধি হওয়ার পরে নারায়ণী মুদ্রার অর্ধেক মোগলানুগত্যের চিহ্ন থাকিবে, উভয় রাজত্বের সীমা বহাল থাকিবে এবং কেহ কাহারও রাজ্যে উপদ্রব করিতে পারিবেন না, এই স্থির হইয়াছিল। মহারাজ নরনারায়ণ তাঁহার রাজ্যের পূর্বাংশ চিলা রায়ে সন্ততিদিগকে দিয়া গিয়াছিলেন। এই অংশের রাজার সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণের অসন্তাব হইয়াছিল। ফলে মোগল সাহায্যে পূর্ব-কোচরাজ্যের রাজা পরীক্ষিতকে লক্ষ্মীনারায়ণ পরাস্ত করেন এবং পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর সেই অংশ মোগল সরকারের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু কোচেরা বেশীদিন মোগল-বশতা স্বীকার করিল না। আকবরের সৈন্য সমস্তই তাহারা ধ্বংস করিল। পুনঃ পুনঃ জয়পরাজয়ের পরে ১৬৩৫ খৃঃ অব্দে মুসলমানেরা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। কিন্তু ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে তাহারা পুনরায় প্রবল হইয়া রাজা বলিনারায়ণকে পরাস্ত করিয়া তাহাকে হত্যা করিল। পূর্বাংশের রাজারা অহম্ রাজ্যদিগের বশতা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমানেরা অবশেষে বড় নদীর পশ্চিমের প্রদেশ অধিকার করিল। পরীক্ষিতের রাজ্য অহম্ রাজাদের অধিকারভুক্ত হইয়া গেল। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের সময়ে অহম্ রাজ এবং ভুটিয়া-রাজ কোচবিহার-সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় স্বাভাব্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৬২১ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তিনি মোট ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তৎপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র বীরনারায়ণ রাজা হইলেন, তখন কোচবিহারের সীমা অনেক সঙ্কুচিত হইয়াছিল। রাবাকত নেতারা স্বাধীন এবং মহারাজের অভিষেকোৎসবে ছত্রধরের

বীরনারায়ণ—১৬২১-

১৬২৫ খৃঃ।

কাজ করিতে অসম্মত, ভুটিয়ারা রাজার আনুগত্য স্বীকার করিল না। মহারাজ বীরনারায়ণ আঠার-কোঠায় রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার রাজ-প্রাসাদের নাম দিলেন “মণ্ডপ আবাস”। তাঁহার রাজত্বকালে নারায়ণ ত্রৈলোক্যদর্শী নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কোচবিহারে

আসিলেন, রাজধারীরা তাঁহার দীনহীন বেশ দেখিয়া অপমান করিয়াছিল। রাজা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত লজ্জা পাইয়াছিলেন এবং শিক্ষার মর্যাদা বাহাতে বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য পরীতে পরীতে পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন; তাঁহার পুত্র ও স্বগণবর্গের জন্ত উচ্চশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাজারা বহুপত্নীক ছিলেন। এই রাজার কোন মহিষীর গর্ভে এক পরমহুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন; বড় হওয়ার পরে ইহাকে রাজা আর দেখেন নাই। হঠাৎ অস্ত্রপুরের উজ্জানে পরমহুন্দরী ঘোড়শী মূর্তি দেখিয়া ইনি কামাতুর হইয়া তাঁহাকে

ধরিতে বান, রাজকুমারী বিশেষ লজ্জায় আর্ন্ত হইয়া রাজার হাত ছাড়াইয়া অস্ত্রপুরে প্রবেশ করেন। রাজ-উপাখ্যানে জয়নাথ মুন্সী এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—“রাজকুমারী, তাঁহার বিবাহের বে স্বর্ণ চালুনি ও পাঁচটি স্বর্ণ দিয়ড় অর্থাৎ দীপদান ছিল, তাহা এবং স্বর্ণধাল ও তীক্ষ্ণ অস্ত্র সমেত নদীর তটে গমন করিয়া দিয়ড় প্রজ্জ্বলিত করিয়া স্তনদ্বয় অস্ত্রদ্বারা ছেদনপূর্বক স্বর্ণ ধালাতে রাখিয়া সহচরীকে দিয়া কহিলেন, ‘পিতাকে দিও, তিনি তাঁহার বাহা বাঞ্ছিত তাহা নেন। আমি গমন করিলাম।’ ইহা বলিয়া চালুনিবাতি মন্তকে করিয়া নদীতে মগ্না হইলেন। ঐ নদীর নাম হইল কুমারী নদী—ইহা অজ্ঞাপি আছে। সহচরী ধাল সমেত রাজার নিকট আসিয়া বলামাত্র মহারাজ হাহাকার শব্দ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মুহম্মদঃ মুর্ছা হইতে লাগিল। শোকে ও লজ্জাতে মৃত্যুতুল্য হইয়া কহিতে লাগিলেন, ‘হে মহাদেব, ত্রুণা সন্ধ্যাতে উপগত হওয়ার চেষ্টা করাতে তুমি উর্দ্ধশির ছেদন করিয়াছিলে, আমাকে কেন শূলে আঘাত কর না।’ মন্ত্রিবর্গ নানাপ্রকার প্রবোধ-বাক্যে সাশ্বনা করিল, ফলে মহারাজ পুনরায় রাজসভাতে তাদৃক বসিলেন না; লজ্জিত ভাবেই অলকাল ছিলেন। পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১১৭ শকে (কোচরাজ-শক) বাহাতে ১০৩৩ সন বাঙ্গলা, ১৫৪৮ শকাব্দা হয়, রাজা বীরনারায়ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসগামী হইলেন।”

বীরনারায়ণের পুত্র মহারাজ প্রাণনারায়ণ ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রাণনারায়ণের সময় মুসলমানেরা পুনরায় কোচবিহার রাজ্যে হানা দিয়াছিল। রাজা কিছুকাল পলাইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস-ঘাতক জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষ্ণুনারায়ণ তাঁহার লুকাইবার স্থানের সন্ধান দিয়াছিলেন। এই ভাবে তিনি ধৃত হইলেন, কিন্তু কোনক্রমে

মুক্তি পাইয়া প্রবল সৈন্ত লইয়া আসিয়া মুসলমানদিগকে স্বরাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন। মীরজুমা বহু সৈন্ত লইয়া কোচবিহার রাজ্য দখল করিতে আসিতেছিলেন, কিন্তু পথে তাঁহার মৃত্যু ঘটতে মুসলমানেরা ফিরিয়া গেল। তদবধি মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজ্যে আর কোন উৎপাত হয় নাই। জয়নাথ মুন্সী লিখিয়াছেন :—“রাজা প্রাণনারায়ণ ব্যাকরণ ও স্বতি সাহিত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, দ্রুতকবি, শ্রুতিধর। মহারাজ বীরনারায়ণ যত বালককে পড়িতে দিয়াছিলেন, সকলেই পণ্ডিত হইল। রাজসভাতে অনেক পণ্ডিত;—তন্মধ্যে বিশেষ পাঁচজন, তাঁহাদের দ্বারা পঞ্চরত্ন সভা হইল। রাজা বিক্রমাদিত্যের পর এমত পণ্ডিতের সভা আর

হয় নাই। কবিরত্ন ও কবিভূষণ ছই মন্ত্রী। সভাস্থ যাবতীয় লোকই পণ্ডিত। ভূত্যবর্গ সমুদায় ও দ্বারী প্রহরী সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ। সংস্কৃত-বহিভূত অল্প ভাষাতে কথা ছিল না। অল্প দেশের রাজাদিগের দূত ও প্রেরিত মন্ত্রী রাজসভাতে আসিতে ইতস্ততঃ করিত। সর্বদা সর্বশাস্ত্রালাপ হইত।” মহারাজ প্রাণনারায়ণ জলেশ্বরের ইষ্টকমর মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে জয়নাথ মুন্সী লিখিয়াছেন : “আমার দৃষ্টমানে এমত তাৎপর্য্য ও অতবড় মন্দির কুত্রাপি দেখি নাই। বরং বাঁহারা বহু দেশ দেখিয়াছেন—তাঁহারাও বলেন এমত মন্দির কেহ দেখেন নাই, ফলে অমাব্যুদী ক্রিয়া জ্ঞান হয়।” প্রাণনারায়ণ একজন আদর্শ প্রজারাজক রাজা ছিলেন। জলেশ্বরের মন্দির ছাড়া ইনি গোসানি মন্দির, বাণেশ্বর ও সন্তেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন (১৬৬৫ খৃঃ)। রাজার মৃত্যুর পূর্বেই ছষ্ট লোকেরা তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছিল, এই অপরাধে অভিযুক্ত কবিরত্ন ও কবিভূষণের শিরশ্ছেদ হইল। “মহারাজ প্রাণনারায়ণ বড়ঋতুর মধ্যে পাঁচ ঋতুতে রাজকার্য্য করিতেন। বসন্ত ঋতুর পূর্বে সকল কার্য্য হইতে অবসর হইয়া অতি রম্যস্থানে পরমসুন্দরী রমণী সকল সমভিব্যাহারে নানা রস ও ক্রীড়া করিতেন। পুষ্পচয়ন, পুষ্পমালা-গ্রন্থন, পুষ্প-আভরণ ও পুষ্প-শয্যা নির্মাণ করিতেন এবং নানা খেলা হইত—সেখানে পুরুষের গম্য ছিল না। বসন্ত ঋতু অতীত হইলে পুনরায় রাজকার্য্য করিতেন। রাজা নিজে গান বাজ ও সঙ্গীত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন। স্বকৃত এক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, অতি আশ্চর্য্য, তাহা আমি শুনিয়াছি। এমত গ্রন্থ ছিল তাহা পড়িলে রাগ-রাগিণী সকল ব্যুৎপত্তি জন্মিত এবং এমত পুঁথি অল্প কাহারো কৃত সাধ্য নাই। অনেকে গান শুনিলে প্রতিষ্ঠা করিত। পুঁথিখানি অগ্নিতে লোপ হইয়াছে, তাঁহার নকল যে কোন থানে আছে, এমত শুনি না।” (রাজ-উপাখ্যান।)

প্রাণনারায়ণের পুত্র মোদনারায়ণের সময় জাতি-বিরোধ প্রবল হইয়া উঠে; এই সকল উৎপাতে রাজা স্থির ভাবে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তিনি ১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার জাতি মহীনারায়ণ ও তৎপুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহই মোদনারায়ণের রাজত্বের প্রধান ঘটনা।

ইহার পরে কতক দিনের অল্প বাহুদেবনারায়ণ ‘রায়কত’দিগের চেষ্টায় রাজা হইয়াছিলেন। ইনি মহারাজ প্রাণনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি ছইবৎসর মাত্র রাজত্ব

করার পর মহীনারায়ণের পুত্রদের বড়যন্ত্রে নিহত হন। রায়কত-নেতা জগদেব এবং ভুজদেব মহারাজ প্রাণনারায়ণের প্রপৌত্র মনোনারায়ণের পাঁচ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। ইহার সময়ে যোগলেরা ইবাজত খাঁর নেতৃত্বে কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া কতেপুর, কাজির হাট এবং কাকিনা চাকুলা দখল করে, অপরাপর প্রদেশের কোন কোনটি গোপনে বঙ্গেশ্বরকে রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইয়া কোচরাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। মহেন্দ্রনারায়ণ ৫ বৎসর বয়সে রাজা হইয়াছিলেন,

বাহুদেবনারায়ণ—১৬৮০-
১৬৮২ খৃঃ।
মহেন্দ্রনারায়ণ—১৬৮২-
১৬৮৩ খৃঃ।

১৬ বৎসর বয়সে এই নামে-মাজ-রাজা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং তিনি কোন সম্ভানাদি রাখিয়া যান নাই।

মূল রাজবংশের ধারা এইখানে শেষ হয়, উজির মহীনারায়ণের বংশধর রূপনারায়ণ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে মুসলমানেরা আসিয়া পুনরায় চাকলা বোড়া, রূপনারায়ণ—১৬০৩-১৭১৪ পাটগ্রাম এবং পূর্বভাগ আক্রমণ করে। ১৭ বৎসর যুদ্ধবিগ্রহ হুঃ।

চলে, পরে সন্ধি হয়। এই সময় হইতে কোচবিহার রাজ্যের প্রকৃত স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। পূর্বোক্ত চাকলাগুলি নামে মাত্র কোচবিহার কর্তৃক অধিকৃত থাকে, কারণ রাজা সেগুলি পত্তনি মহল স্বরূপ বঙ্গেশ্বরের নিকট হইতে গ্রহণের পাট্টা প্রাপ্ত হন। ছত্রপতি রাজার পক্ষে ঐরূপ ভাবে প্রজাস্বত্ব গ্রহণ করা অপমানকর, এজন্য রাজার পক্ষ হইতে তাঁহার জ্ঞাতি শান্তনারায়ণ ইজারা গ্রহণ করেন। এই সন্ধি ১৭১১ খৃঃ অব্দে সম্পাদিত হয়।

মহারাজ রূপনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব সুদীর্ঘকাল-ব্যাপক ছিল। ইহার সময় মহম্মদ আলি খাঁ নামক রঙ্গপুরের ফৌজদার রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু ভুটিয়াদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া মহারাজ রণজয়ী হইলেন। ৪৯ বৎসর রাজত্ব করিয়া মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ পরলোকে গমন করেন। তাঁহার প্রাধান্য রাজ্যী সহমৃত্যু হইলেন।

ইহার পরে রাজপুত্র দেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন, তখন তাঁহার বয়স পঞ্চ বৎসর মাত্র। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে এক অচিন্তনীয় করণ ঘটনায় রাজপুরী শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সম্ভবতঃ নাজির রূপনারায়ণের যড়যন্ত্র-ফলে দেবেন্দ্রনারায়ণ—১৭৬৩-১৭৬৪ হুঃ।

গৌসাই রামানন্দ একটা কুৎসিত কসাইএর কাজ করিলেন। “অনেক কসাই ভাল গৌসাইএর চেয়ে”—ঈশ্বর গুপ্তের এই কথাটি এখানে প্রমাণিত হইল। আমি জয়নাথ মুন্সীর বর্ণনা হইতে ঘটনাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—“রামানন্দ গোসাইএর সমভিব্যাহারে এক ব্রাহ্মণ ছিল, তাহার নাম রতি শর্মা। সে প্রায় সত্ত্বৎসর বলরামপুরে থাকিত। মহারাজের তখন ষষ্ঠ বৎসর বয়স। একদিন অপরাহ্ন বেলাতে কয়েকজন সমবয়স্কের সহকারে রাজবাটীর অগ্নিকোণে, পদ্মপুকুরিণীর বায়ব্য কোণে—বেখানে অশোকের একটা বৃক্ষ আছে—কুমারলোক কূপ খনন করিতেছে—ঐ স্থানে রাজা ক্রীড়া করিতেছেন, হস্তকৌতুকে পরম আনন্দে আছেন, এই সময় রতি শর্মা অকস্মাৎ কোন্ দিক্ হইতে কি প্রকারে তীক্ষ্ণ এক তরবারি হস্তে ধারণ করিয়া আসিয়া একাঘাতে মহারাজের শিরশ্ছেদ করিয়া বাম হস্তে কেশ ধরিয়া মুণ্ড লইয়া দ্রুতগতি ঐ পদ্মপুকুরিণীর অগ্নিকোণে চণ্ডীর একটা ইষ্টকময় মন্দির ছিল, তাহাতে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজের স্বর্ণ পুতুলীর স্তায় শরীর ধূলাতে পতন হইয়া কবন্ধপ্রায় লুপ্ত হইতে লাগিল। ঝাড়া-ধরা প্রভৃতি রাজার বক্ষক ও ভৃত্য সকল হাহাকার শব্দ করিয়া রতি শর্মার পশ্চাৎ দাবমান হইয়া ঐ মন্দির মধ্যেই কেহ শূল, কেহ তরবারি, কেহ বর্শাঘাতে অতি দুরায় রাজ-বধী ব্রহ্মণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নষ্ট করিল। ইহা প্রকাশ

হইতে পারিল না, রতি শর্মা কি কারণে—কাহার কথামত এই দুঃস্থ কণ্ঠ করিল। রাজবাড়ী হাংকার ক্রন্দনের ধ্বনিতে পূর্ণিত হইল। কোন ভৃত্য রাজার মুণ্ড আনিয়া শরীরের নিকট রাখিল। ‘দেবাই’ অর্থাৎ রাজমাতা নিম্নোদ্দেশে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ‘হা পুত্র হা পুত্র’ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহারাজের কাটা মাওয়ার সংবাদ গৌরীন্দ্রনন্দন মুক্তফি ও গৌরপ্রসাদ খাসনবিস শুনিয়া হতবুদ্ধি পাগলের জায় হইয়া রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আর আর মন্ত্রিবর্গ সহিত শোকসাগরে মগ্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।” বৃষ্ট বৎসর বয়স্ক বালক রাজার এবংবিধ শোচনীয় মৃত্যুর কথা বলিয়া আমরা এইখানে কোচবিহারের ইতিহাস শেষ করিলাম। কারণ এখন হইতে রাজস্ব সাহ আলম সম্রাটের নির্দেশ-অনুসারে মুসলমানের হস্ত হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে পড়িল (১৭৬৫)। ইংরেজাধিকারের কথা আমাদের বিষয়বহির্ভূত। সংক্ষেপে নিম্নে পরবর্তী রাজগণের একটা তালিকা দিতেছি মাত্র :—

মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ১৭৬৫-১৭৮৩ খৃঃ। (ইহার মধ্যে কতক সময়ের জন্য রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং রাজা হইয়াছিলেন রাজেন্দ্রনারায়ণ।) মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ১৭৮৩-১৮৩২ খৃঃ। মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ ১৮৩২-১৮৪৭ খৃঃ। মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ ১৮৩২-১৮৬৩ খৃঃ। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ১৮৬৩ খৃঃ।

নবম পরিচ্ছেদ

কাছাড় (হেরম্ব)

আমরা ত্রিপুরা, আসাম ও কোচবিহারের ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া কাছাড় রাজ্যের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি; এই বংশের রাজারা একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইলেও এক সময়ে প্রবল ও পরাক্রান্ত ছিলেন।

বর্তমান কাছাড় রাজ্য ইংরেজ গভর্নমেন্ট খাস করিয়া লইয়াছেন; ইহার আধুনিক আয়তন ৪,২০০ বর্গ মাইল। বর্তমান নাগাপর্কতে কাছাড় রাজ-বংশের দুইটি প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়: দিমাপুর ও মাইবাং। দিমাপুর রাজধানীর বিশাল অট্টালিকার স্তূপ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়; ইহার রাজারা যে কিরূপ পরাক্রান্ত ছিলেন,— তাহা ঐ সকল কীর্তি দেখিলে সহজেই অস্বীকৃত হয়। এক সময়ে কাছাড় রাজ-বংশের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা খুব বেশী ছিল। কাছাড়ের বৃদ্ধ নৃপতি যখন ত্রিপুরাধিপতি ত্রিলোচনের (যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক) সঙ্গে তাঁহার কস্তার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান, তখন ত্রিপুরেশ্বর নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন। এই বিবাহের

প্রস্তাবের কথা শুনিয়া “সর্ব লোক পুলকিত কহে জনে জন। ত্রিপুরকুলের বৃদ্ধি হবে হেন দেখি” (রাজমালা, ত্রিলোচন-খণ্ড)। এদিকে ত্রিপুরার লোকেরা এই বিবাহ ‘কুলক্রিয়া’ বলিয়া মনে করিয়াছিল। কাছাড়ের রাজা এই সম্বন্ধ দ্বারা স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিতে চাহিয়াছিলেন,—শ্রেষ্ঠ ও কোচদিগের আক্রমণে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বৃদ্ধ ও অপুত্রক রাজা ত্রিপুরেশ্বরের সহায়তায় স্বীয় রাজ্যের বিলয়োন্মুখ ক্ষমতার পুনরুদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন; সুতরাং একদিকে ছিল ‘কুলক্রিয়া’ ও অপরদিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় কাছাড় রাজবংশের আভিজাত্যের গৌরব সেই সময়ে খুবই ছিল। কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় এই বিবাহাদির কথা না বলিয়া লিখিয়াছেন—“রাজ্যলুপ্ত নরপতির জ্যেষ্ঠপুত্র কাছাড় রাজ্যের স্থাপন কর্তা, সেই নরপতির কনিষ্ঠপুত্র ত্রিপুরা রাজবংশের আদি-পিতা।” অর্থাৎ ত্রিলোচনাদির অস্তিত্বই তিনি অস্বীকার করেন এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এক রাজার দুই পুত্র, একজন ত্রিপুরা ও অপরটি কাছাড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এই অনুমানের ভিত্তি কোথায় তাহা জানি না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বৃদ্ধ কাছাড়-রাজ আভিজাত্য-গর্ভিত, কিন্তু বর্ষের জাতিদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ত্রিলোচনের সঙ্গে কস্তুর বিবাহ দিয়া তাঁহার দ্বাদশ দ্রোহিত্র হইয়াছিল,—এই দ্বাদশ দ্রোহিত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ দৃকপতিকে তিনি রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছিলেন। এই জ্যেষ্ঠপুত্রকে গ্রহণ করাতেও দৃষ্ট হয় যে তিনি মানসম্মত নান ছিলেন না, তাহা না হইলে ত্রিপুর-রাজ কখনই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে স্বত্ত্বাধীনে চিরদিন থাকিতে দিতে সম্মত হইতেন না।

ত্রিপুর-রাজবংশ বৈষ্ণব যবান্তি-পুত্র ক্রম হইতে তাঁহাদের বংশলতিকা টানিয়া দেখান,—কাছাড়-রাজারাই সেইরূপ ভীম-পুত্র ঘটোৎকচকেই তাঁহাদের আদিপুরুষ বলিয়া নির্দেশ করিতেন। মণিপুরের রাজারা অর্জুন-পুত্র বক্রবাহনকে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া কীর্তন করেন। প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজারা কৃষ্ণাঙ্গদেবী নরকাসুরের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং পূর্বাঞ্চলের রাজারা মহাভারতের রাজসুগণের শাখা-উপশাখার সঙ্গে সংশ্লেষের দাবী করিয়া আপনাদিগকে গোরাধিত মনে করিয়াছেন। উত্তর-বঙ্গের কোন কোন স্থানে বিরাটের গোপূহ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আমরা দেখাইয়াছি, ঢাকা জেলার উত্তরে ভাওয়ালের জঙ্গলে চেন্দ্রিাজ শিশুপালের গৃহাবশেষ এখনও গলনবিশগণ দেখাইয়া থাকেন। মহাভারত এদেশের কল্পনাকে এরূপ প্রবুদ্ধ করিয়াছিল যে সেই মহাপুরাণের উল্লিখিত বীরগণের সঙ্গে রক্তসম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে এদেশের রাজারা কৃতার্থ হইতেন। এ শুধু পূর্বভারতের কথা নয়, কোন কালে আবু পাহাড়ে যজ্ঞ করিয়া শক-জাতীয় কয়েকজন বীরকে ব্রাহ্মণেরা “অগ্নিকুল” নাম দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা এখন স্বর্গ্যবংশীয় ক্ষত্রিয়। এই দুইটি জ্যোতিষ একটি উজ্জল, অপরটি শীতল—আর্য্যাবর্তের রাজপুরুষদের পূর্ব-পুরুষ,—এখনও পূর্ব ও পশ্চিমে উদয়াস্তের লীলা করিতেছেন ও মানুষের দাবীর স্পর্শ দেখিয়া হত

মহাভারতের বীরগণের
সহিত সম্বন্ধ।

হাসিতেছেন। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার মুখ হইতে উদ্ধৃত হইয়া অস্ত্রাভ্যাস জাতিকে নগণ্য মনে করিতেছেন। আভিজাত্যের মূলে এই সকল গল্প ও রূপ-কথা। কোন কালে কেহ কি এগুলি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন? তথাপি একথা নিশ্চিত যে রাজপুত্র ও আৰ্য্যাবর্তের পশ্চিমে অবস্থিত অপরাপর দেশের রাজাদের অপেক্ষা ত্রিপুরা ও প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজাদের বংশাবলী সুপ্রাচীন। প্রাগজ্যোতিষপুর বিনষ্ট হইয়াছে—অহম্ রাজারা নরকবংশীয়দের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন, কিন্তু ত্রিপুরার গৌরব এখনও অক্ষুণ্ণ। কাছাড়ের রাজাদের (১) ঘটোৎকচ হইতে, (২) মেঘবর্ন, (৩) মেঘবল, (৪) তাম্রধ্বজ, তৎপরে (৫) কেতুধ্বজ হইতে অর্কধ্বজ পর্য্যন্ত ৪৫ জন “ধ্বজ”-ঔপাধিক এবং ৫০ সংখ্যক প্রতাপনারায়ণ হইতে মদননারায়ণ পর্য্যন্ত ৭ জন “নারায়ণাস্ত” ঔপাধিক, তৎপরে (৫২) চিত্রধ্বজ হইতে হেমধ্বজ পর্য্যন্ত পুনরায় ৭ জন ধ্বজ-ঔপাধিক,—(৬৪) শিখণ্ডীচন্দ্র হইতে বীরচন্দ্র পর্য্যন্ত ১৫ জন “চন্দ্র” উপাধি-বিশিষ্ট এবং (৭২) গুণ্ডরীকান্দ হইতে ১১০ গোবিন্দনারায়ণ পর্য্যন্ত ‘ধ্বজ’ ও ‘নারায়ণ’ এই দুই উপাধিরই রাজাদের নাম এই দীর্ঘ বংশাবলীতে পাইতেছি। স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁহার “রাজমালায়” এই সকল নামের তালিকা দিয়াছেন (২৫৬-২৬১ পৃঃ)। শুধু কতকগুলি নামের তালিকা দেওয়া নিম্নয়োজন, বিশেষ যখন সেই রাজবংশ এখন লুপ্ত। এই জন্ত আমরা বিরত হইলাম। হাটটার Statistical Account of Assam নামক পুস্তকে আর একটি বংশাবলী দেওয়া হইয়াছে (২য় খণ্ড, ৪০৩ পৃঃ)। এই সকল বংশাবলীর কতকগুলি প্রবাদ ও পৌরাণিক উপাখ্যানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, ‘কাছাড়’—নেপালী শব্দ। কেহ কেহ বলেন, উহা সংস্কৃত একটি শব্দ হইতে উদ্ভূত, তাহার অর্থ “প্রান্তদেশ।” পুরাকালে এই দেশ সম্ভবতঃ ‘মেচ’ বা মেচ্ছ জাতির নিবাস ছিল। একটি সুবিহ্বৃত দেশে বড়ো এবং তৎসংমিশ্রিত ভাষা প্রচলিত, তাহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে এককালে হয়ত সমগ্র আসাম এবং বঙ্গ দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল সমস্তই ‘বড়ো’ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কাছাড়ীদের কোন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না,—তাহাদের সহিত অহম্ রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহের কথা আসাম দেশীয় বুদ্ধজীতে প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লিখিত আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাছাড়ীরা ব্রহ্মপুত্রের সমস্ত দক্ষিণ উপকূল, অর্থাৎ দিখু হইতে কল্যাণ পর্য্যন্ত এবং ধানক্রী উপত্যকা এবং বর্তমান উত্তর-কাছাড় বিভাগ অধিকার করিয়াছিল। ১৪৯০ খৃঃ অব্দে ইহারা অহম্দিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করিয়াছিল। ১৫২৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৩৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অহম্দিগের সহিত অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল—উভয়-পক্ষের জয়পরাজয় ঘটিয়াছিল কিন্তু পরিশেষে অহম্দের জয় হইয়াছিল। এই যুদ্ধে কাছাড়-রাজ খুনখার বন্দী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আত্মীয় দেৎসংকে রাজপদ দেওয়া হইয়াছিল।

কিন্তু দেৎসং পুনরায় বিদ্রোহী হওয়াতে অহম্গণ তাঁহার রাজধানী ধ্বংস করিয়া ফেলে,—এইবার ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে কাছাড়ীরা দিমাপুর ছাড়িয়া মাইবঙ্গে রাজধানী স্থাপন করে।

কাছাড়ীদের পূর্ব-যুগের ইতিহাসের কিছুই পাওয়া যায় না, প্রবাদ এই যে আদি কালে কাছাড় ত্রিপুরেশ্বরের অধিকৃত ছিল,—কিন্তু কাছাড়ী রাজার সহিত ত্রিপুর-রাজ স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া ঐ রাজ্যের একচ্ছত্র অধিকার তিনি জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করেন।

১৬০৩ খৃঃ অব্দে জয়ন্তীরাজ ধনমানিককে পরাস্ত করিয়া কাছাড়-রাজ শত্রুদমন "অরি-মর্দন" উপাধি গ্রহণ করেন, ধনমানিকের মৃত্যুর পর কাছাড়-রাজ যুবরাজ যশোমানিককে জয়ন্তীর অধিকার দান করেন। শত্রুদমনকে নায়ক করিয়া বাঙ্গলা "রণচণ্ডী" নামক উপজাতি বহু পূর্বে বিরচিত হইয়াছিল। ইহার পরে মুসলমানদের সঙ্গে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়; প্রথম বার মুসলমানেরা পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বঙ্গেশ্বরের (কাসিম খাঁ) সময় কাছাড়ীদের হই প্রধান দুর্গ অম্বরাতিকিরি ও প্রতাপগড় মুসলমানেরা দখল করে এবং রাজা প্রতাপসিংহকে এক লক্ষ টাকা, সম্রাটকে ২০,০০০ টাকা, বঙ্গেশ্বরকে এবং ধানাদার মুরাজ খাঁকে ২০,০০০ টাকা দিয়া সন্ধি করেন। ইহা ছাড়া তিনি ৪০টি হাতী সম্রাটকে এবং ৫টি হাতী সুবেদারকে (বঙ্গেশ্বর) দিয়াছিলেন। প্রতাপনারায়ণ মাইবঙ্গ ছাড়িয়া কীর্তিপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৬৪৪ খৃঃ অব্দে বীরদর্পনারায়ণের সঙ্গে অহম্-রাজ চক্রবর্ত্তের মনোমালিখ ঘটে, কিন্তু চক্রবর্ত্ত মুসলমানদিগকে পরাজয় করিয়াছেন শুনিয়া বীরদর্প তাড়াতাড়ি অহম্-দিগের আত্মগত্য স্বীকার করিয়া সন্ধি করিয়া ফেলেন। একটি শত্ৰু পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে ক্রোধের দশ অবতার চিত্রিত হইয়াছে এবং উহা ১৬৭১ খৃঃ অব্দে বীরদর্পনারায়ণের রাজত্ব কালে ক্ষোদিত হইয়াছিল—ইহা লিখিত আছে। ১৭০৬ খৃঃ অব্দে তাম্রধ্বজ রাজা অহম্-রাজ রুদ্রসিংহের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অহম্-রাজ-দরবারে নীত হন; তথায় আত্মগত্য স্বীকার করাতে রুদ্রসিংহ তাঁহাকে ক্ষমা করেন। কিন্তু গৃহে ফিরিবার পথে খাসপুরে পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। মহারাজ রুদ্রসিংহ তাঁহার স্মৃচিকিৎসার জন্য স্বীয় ভিষককে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল (১৭০৮ খৃঃ)। তাম্রধ্বজের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সুরদর্পনারায়ণ রাজ্য অধিকার করেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে বাণেশ্বর বাচস্পতি নামক এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ কর্তৃক 'নারদীয় পুরাণ' বিরচিত হয়। রাজমাতা চন্দ্রপ্রভার আদেশে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে কীর্তিচন্দ্রনারায়ণ অহম্-রাজ রাজেশ্বরের আত্মগত্য স্বীকার না করাতে পুনরায় যুদ্ধ হয়, কিন্তু পুনরায় সন্ধি স্থাপিত হইল। ১৭৭১ খৃঃ অব্দে হরিশ্চন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অহম্-রাজের আত্মকূল্য প্রাপ্ত হন। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র স্বর্ণ গাভী নিষ্কাণপূর্বক তৎগর্ভ হইতে নিষ্কাশিত হইয়া ভ্রাতা দোষ দূর করিয়া বিত্তক ক্ষত্রিয়রূপে গণ্য হন। গাভীর অংশগুলি ব্রাহ্মণেরা অবশ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ১৮১০ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন—গোবিন্দচন্দ্র রাজা হন। এই রাজাকে নানা বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কোহিদান নামক রাজার এক গোলাম দল পাকাইয়া রাজ্যের উত্তরাংশ অধিকার করে। রাজা তাহাকে নিহত করেন, কিন্তু তৎপুত্র তুলারাম রাজ্যের উত্তরাংশ দখল করিয়া বসে। মণিপুরের রাজা মারজিৎ সিংহ এই সময়ে কাছাড় আক্রমণ করেন।

বিপদে পড়িয়া গোবিন্দচন্দ্র মণিপুরের নির্বাসিত রাজা সুরজিৎ সিংহের সাহায্য গ্রহণ করেন। তাঁহার সাহায্যে মণিপুর আক্রমণ করিলেন সত্য, কিন্তু যুদ্ধজিৎ সিংহের পুত্র মারজিৎ এবং গম্ভীর সিংহ তাঁহার রাজ্য দখল করিয়া বসিলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের নিকট সাহায্য চাহিয়া সাহায্য পাইলেন না, সুতরাং ব্রহ্ম-রাজার দ্বারে উপনীত হইলেন। ব্রহ্ম-রাজের সৈন্ত কাছাড়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল—ইহাই ইংরেজ রাজের সঙ্গে তাঁহাদের শত্রুতার সূত্রপাত, কিন্তু ইহার পরের কথা এই পুস্তকের বিবরণ-বহির্ভূত।

এই বৃত্তান্ত উপসংহার করিবার পূর্বে দিমাপুরের ভ্রমাবশেষ সম্বন্ধে ছই একটি কথা লিখিব। রাজধানীর দক্ষিণ দিক্‌টা ছই মাইল পর্য্যন্ত ধলশ্রী নদীর উপকূল ইষ্টক ও প্রস্তর-নির্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। অহম্-রাজাদের অপেক্ষা কাছাড়ের রাজগণের বৈভব ও শিল্পজ্ঞান অনেক বেশী ছিল, কারণ অহমেরা ইটের কাজ একবারে জানিতেন না। কাছাড়ীরা বাঙ্গলা দেশের শিল্প ও ভাস্কর্য্য আদর্শসাং করিয়া লইয়াছিল। ইটের উপর নানারূপ হরিণ, কুকুর ও হাতীর মূর্তি অঙ্কিত, এবং অট্টালিকাগুলির ইটের গাঁথুনি একরূপ শস্ত্র যে উপর্যুপরি ভূমিকম্প হওয়ার পর এতকাল যাবৎ তাহারা একরূপ অটুট অবস্থায় আছে। কতকগুলি বেলে-পাথরের ১২ ফুট-উচ্চ নানা কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভ দৃষ্ট হয়—তাহারা প্রায় দশ মাইল জায়গা জুড়িয়া আছে। সেই দেশের কারিগর যে এই সকল কারুকার্য্য বাঙ্গালীদের নিকট শিখিয়াছিল—তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ যুদ্ধ কারুকার্য্যপূর্ণ স্তম্ভগুলি দূর হইতে অটুট অবস্থায় আনা সম্ভবপর নহে। দিমাপুরে কতকগুলি দীঘি দেখা যায়, উহারা বড়ই সুন্দর। ৬০০ হস্ত পরিমিত বেড়যুক্ত ছইটি দীঘি আছে—অপরগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। এই সকল স্থানের কোনই সন্ধান হয় নাই, হয়ত অনেক নূতন তত্ত্ব জঙ্গলের অভ্যন্তরে চূপ করিয়া বসিয়া আছে, ঐতিহাসিকদিগকে কিছু বলিবার সুবিধা তাহারা আজও পায় নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রী হট্ট

বাঙ্গলার লোকদিগের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দুই বৈষ্ণব। পতিত জাতিদের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব গোস্বামীদের শিষ্য। পূর্বে মণিপুর হইতে পশ্চিমে মেদিনীপুর এবং উত্তরে রঙ্গপুর হইতে দক্ষিণে সুন্দরবন—এই বিশাল জনপদ বাসীরা অধিকাংশই গোস্বামিগণের অধিকারভূক্ত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, পাহাড়িয়া টিপ্রা এবং সাঁওতাল-গণের মধ্যেও গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রবেশ করিয়াছে, এবং যে সকল পার্শ্বত্যা জাতি ভাল

করিয়া বাঙ্গলা বলিতে বা লিখিতে পারে না, তাহাদের মধ্যেও অনেকে নিম্ন-ভূমিতে প্রবেশ করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত কিনিয়া লইয়া যায়; বাঙ্গলার উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম—এই সমগ্র সীমানার মধ্যে মহাপ্রভুর খোল-করতাল বাজে না, এমন স্থান বিরল। মহাপ্রভুর পিতা-মাতা, পিতামহ-মাতামহ, ও প্রমাতামহ, মাতুল এবং বালাসখাগণের অনেকেই শ্রীহট্ট-নিবাসী। পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও আদি-পুরুষ মধুকর মিশ্র, মাতামহ নীলাধর চক্রবর্তী ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণ,—তাঁহার গুরু এবং অনুরাগী অদ্বৈতাচার্য্য

শ্রীহট্টের শাসন।

যাঁহার তপোবলে তিনি ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া চিরাগত প্রবাদ, তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত শ্রীবাস—যাঁহার অঙ্গিনার ধূলি তাঁহার সোণার অঙ্গ হইতে শচীদেবী নিত্য মুছিয়া ফেলিতেন, তাঁহার চির অন্তরঙ্গ পণ্ডিত মুরারি গুপ্ত, শ্রীরাম পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর দেব, রত্নগর্ভ আচার্য্য এবং পদকর্তা যত্ননাথ দাস—প্রভৃতি বৈষ্ণববন্দিত আচার্য্যগণ, বিশেষ ঢাকা দক্ষিণ-গ্রামবাসীরা এবং সুহৃদমণ্ডলীর অনেকেই—শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। চৈতন্য এবং তাঁহার পরিকর-বর্গের মধ্যে বিশিষ্ট অনেক লোককে শ্রীহট্ট দাবী করিতেছে। এই হিসাবে সমস্ত বঙ্গদেশ এমন কি উৎকলেরও কতকাংশ, অর্থাৎ যে যে দেশবাসীরা চৈতন্যের দোহাই দিয়া থাকেন,—তাঁহারা সমস্তই শ্রীহট্ট-সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত। এই সাম্রাজ্যের রাজ-চক্রবর্তী চৈতন্যদেব এবং অগ্রতম নেতা অদ্বৈতাচার্য্য। আমরা সকলে ইহাদেরই রাজ্যে বাস করিতেছি। শুধু বৈষ্ণবগণ নহেন, শাক্তগণ—শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায় নহে, খড়কাটা চাষারাও আজ তাঁহারই করতাল বাজাইতেছে। বঙ্গদেশ আজ শ্রীহট্টের শাসন মানিয়া লইয়াছে, শ্রীহট্টের এক ব্রাহ্মণ-কুমার অনুরাগের রাজদণ্ড লইয়া এই বিশাল ভূভাগ শাসন করিতেছেন।

নবদ্বীপই এ যুগে হিন্দুর রাজধানী,—হিন্দুরাজত্ব সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হয় নাই; যাঁহারা রাজস্ব আদায় করেন—প্রজাদিগকে অনুগ্রহ-নিগূহ করেন, তাঁহারা সাময়িক ভাবে প্রভাব বিস্তার করেন মাত্র। তাঁহারা আমাদের উপর কর্তৃত্বের দাবী করিলেও সমস্ত জাতি যাঁহাদের নিকট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাথা নোয়ায়, যাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রভাব দূর হয় না, বংশানুক্রমে লোকবৃন্দ যাঁহাদের প্রজা; সেই সকল বিধিদত্ত রাজদণ্ডধারীরাই প্রকৃত রাজা। এই হিসাবে নবদ্বীপের রাজ্য ‘নবদ্বীপচক্র’ উপাধিতে আজ সমস্ত বঙ্গদেশ দখল করিয়াছেন এবং অপর এক রাজা রঘুনাথ শিরোমণি—তৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানকেন্দ্র মিথিলা বিজয় করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে নবদ্বীপের প্রাধান্য—বঙ্গদেশের প্রাধান্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই রঘুনাথ শিরোমণিরও বাড়ী শ্রীহট্টে।* বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসে সর্বাগ্রে শ্রীহট্টের উল্লেখ করা উচিত।

* কেহ কেহ বলেন, তাঁহার বাড়ী নবদ্বীপে। কিন্তু নবদ্বীপে তাঁহার টোল ছাড়া তাঁহার বসত বাড়ী, বংশলতা প্রভৃতির কোন প্রবাদ নাই। শ্রীহট্টে তৎসময়কে নানাজন প্রবাদ আছে এবং এই সমস্ত প্রবাদ ‘বেদিক সংবাদিনী’ নামক সংস্কৃত কুল-গ্রন্থ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে (৩৬১-৩৫ পৃঃ) এবং তাহাতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত।

শ্রীহট্টে লাউড়ের পাহাড়ে একটা স্থান দেখাইয়া এখনও লোকে তথায় ভগদত্তের বাড়ী ছিল বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এককালে প্রাগজ্যোতিষপুর-রাজ্য যে বহু বিস্তৃত ছিল, এতৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ অহুমান করেন, লাউড় হইতে ত্রিপুরার সীমা পর্য্যন্ত সমগ্র জনপদ ঐ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

ভগদত্ত ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহারাই তাঁহার বংশধর বলিয়া দাবী করিয়াছেন, তাঁহারই আসামের ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন,—তাঁহাদের কথা পূর্বাধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীহট্টের অর্দ্ধাংশ শুধু আসামের অন্তর্গত ছিল এমন নহে, উহার কোন কোন স্থান বহুকাল ত্রিপুরারও অধীন ছিল। তাহা ছাড়াও পুরাকালে এই ভূভাগ অল্প অল্প বংশের স্বাধীন রাজগণ কর্তৃক শাসিত হইয়াছে; সুতরাং আর্য্যনিবাসের প্রথম যুগে পূর্ব-ভারতের এই পূর্বাংশ তাঁহাদের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই রাজ্যের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। ভিন্ন ভিন্ন বংশ লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল দেশের ইতিহাসও লুপ্ত হইয়াছে। পার্শ্ববর্তী রাজ্য—ত্রিপুরা, জয়ন্তী পাহাড় বা নাগা দেশ, মণিপুর, আসাম প্রভৃতির ইতিহাস-প্রসঙ্গে শ্রীহট্টের ইতিহাসের দুইএকটি কথা আমরা পাইতেছি। কিন্তু এই দেশ যে অতি প্রাচীন, ইহা যে শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্রভূমি ছিল এবং নানা তীর্থ অধ্যুষিত হইয়া আর্য্যবর্ষের হিন্দুমান্বরেরই বাতায়নের স্থান ছিল, তাহার বহু প্রমাণ আছে।

প্রথমতঃ শ্রীহট্টের প্রাচীন তীর্থস্থানগুলির বিষয় লিখিব, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানসমূহ

শ্রীহট্টের প্রাচীন তীর্থ। আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করিব,—“উত্তরে পণা তীর্থ হইতে

আরম্ভ করিয়া মহাদেব রূপনাথ, সিদ্ধেশ্বর, উনকোটি, তুঙ্গেশ্বর ও ব্রহ্মকুণ্ড পর্য্যন্ত জেলার তিন দিকেই বৃহদাকার দেবস্থান রহিয়াছে” (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, ২২ পৃঃ)।

১। বামজজ্বা মহাপীঠ—জয়ন্তীয়া পাহাড়ের বাউরভাগ পরগনায়। দেবীর নাম জয়ন্তী ও শিবের নাম ক্রমদীশ্বর। এই দুই দেবতাই ইষ্টকনির্মিত প্রকাণ্ড ভিত্তির উপর চতুষ্কোণ কূপে অবস্থিত প্রস্তর-রূপী। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এখানে অসংখ্য নরবলি হইত।

২। রূপনাথ গুহা—নৈসর্গিক প্রস্তরময় গুহার মধ্যে বিচিত্র দৃশ্য। অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন, “কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই ‘নক্ষত্রপুঞ্জ’। এমন মনোজ্ঞ দৃশ্যে কাহার না বিস্ময় উৎপন্ন হয়? মস্তক উত্তোলন করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, সহস্র সহস্র নক্ষত্র উজ্জ্বল জ্বলিতেছে। উপরে ক্রম চক্রাতপের দ্বারা প্রস্তরের অঙ্গে সমুজ্জ্বল বিন্দুগুলি ভ্রম উৎপাদন করে; ঐ তারকাবলী জলবিন্দু মাত্র। বিন্দু বিন্দু জল চুয়াইয়া প্রস্তরের ছাদে ঝুলিতে থাকে। ব্যক্তিগণের দীপালোকে উহাই নীলাকাশে বিচিত্র প্রোজ্জ্বল নক্ষত্রের দ্বারা প্রতিভাত

আছে। চৈতন্যসেবকেও আমরা ‘ন’দের টাব’, ‘নবদীপচন্দ্র’ প্রভৃতি উপাধি দ্বারা নবদীপের করিয়া লইয়াছি, কিন্তু তাঁহার পিতৃকুল-মাতৃকুল সকলের নিবাস-স্থান শ্রীহট্ট—বহুনাথের কর্মক্ষেত্র নবদীপে থাকায় সেই ভাবেই তাঁহাকে নবদীপবাসী বলা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার উপর শ্রীহট্টের দাবী আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না।

হয়" (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, ১০৫ পৃ:)। এইরূপ কোন দৃষ্ট দেখিয়াই হয়ত নবম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে আসামের রাজা বনমালের তাম্রশাসনের কবি শিব-বন্দনায় উক্ত দেবতা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—“যাহার শিরঃস্থিত গজাবারি রেচক বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া তারাপ্রকরের জায় শোভা প্রাপ্ত হয়।” এই স্থানের অনতি দূরে “এক অপূর্ণ শিবলিঙ্গ, তাহাতে অগণ্য স্বর্ণরেণু ঝিকি-মিকি করিতেছে।” পার্শ্বে স্তম্ভাকার পাঁচটি পাথর। লোকে উহাদিগকে “পঞ্চপাণ্ডব” নাম দিয়াছে। স্থানান্তরে বটগাছের বোয়ার মত চারিটি স্তম্ভহং প্রস্তর নামিয়াছে, ইহাকে “চারি যুগের খাস্তা” বলে; তৎপরে “স্বর্গদ্বার”। অত্র একটি গুহাতে কয়েকটি পাথরের ত্রিশূল—কোন প্রস্তর-যুগের সংস্কার বহন করিয়া আনিয়াছে; ঐ স্থানের নাম “যোগনিদ্রা”, গুহার দ্বারে বঙ্গাকরে রাজা রাম-সিংহের নাম উৎকীর্ণ; ইনি কোন জয়ন্তী-রাজ হইবেন, হয়ত তাহারই দ্বারা দুইটি প্রকাণ্ড প্রস্তরের হস্তী নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু অপরাপর চিহ্ন অতি প্রাচীন, স্মৃতিরাজ্য তীর্থটি বহু-পূর্ব যুগের।

৩। গ্রীবা পীঠ—“ইহা মহাশক্তি স্থাপিত নহে, দেবতা এখানে চিরকাল বর্তমান আছেন” (ইতিবৃত্ত, ১১৫ পৃ:)। শিব ৮ হাত দীর্ঘ। পার্শ্ববর্তী দেবতা সমস্তই ভয় ও কণ্ঠিত। পাণ্ডারা ইহাকে লুকাইয়া রাখিয়া পূজা বন্ধ করিয়া দিয়া কালাপাহাড়ী দৌরাঙ্গা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ইহা গোটাটিকর নামক স্থানে অবস্থিত।

৪। বালিশিরা পরগনায় বাণেশ্বর শিব। কথিত আছে নির্মাই ও হর্মাই নামক ত্রিপুরার দুই রাজকুমারী এই স্থানে ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে ‘নির্মাই শিব’ স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই স্থান সম্ভবতঃ বহু পূর্ব হইতেই তীর্থস্বরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

৫। উনকোটী তীর্থ—কৈলাসহরের প্রান্ত হইতে কাছাড়ের পশ্চিমদিকের পর্বত পর্যন্ত এই উনকোটী তীর্থের সীমানা। উনকোটী পাহাড়ের উচ্চতম শৃঙ্গের পশ্চিম পার্শ্বে কতকগুলি দেবমূর্তি আছে। “শিরোভাগের মূর্তিগুলি প্রস্তরনির্মিত, পার্শ্বের গুলি পর্বত-গাত্রে ক্ষোদিত।” উপরকার মূর্তিগুলি বহু প্রাচীন, এমন কি চিনিতে পারা যায় না। প্রত্যেক মূর্তির কাণে “পান-পাশা”র জায় বৃহৎ কুণ্ডল আছে। বহুসংখ্যক মূর্তি ক্ষোদিত ছিল, তাহা কালক্রমে প্রায় সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উনকোটী শৃঙ্গের পশ্চিমে অনেক দেবদেবীর মূর্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, মূর্তি বুদ্ধিবার উপায় নাই। কিন্তু একটি মহাদেব-মূর্তি উল্লেখযোগ্য, দুইটি কর্ণ দুইটি কবাটের জায়, দুইটি কুণ্ডল দুইখানি ঢালের জায়। গোপের একদিক্ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অপর দিক্ এক হাত কি দেড় হাত হইবে। হাতে ত্রিশূল, সম্মুখে দুইটি প্রকাণ্ড বৃষ। ত্রিপুররাজ বিজয়মানিক্য (দ্বাদশ শতাব্দীতে) উনকোটী তীর্থ দেখিতে গিয়াছিলেন। তখনও কালাপাহাড় এগুলি ভাঙ্গে নাই। এইরূপ বিশাল দেবমূর্তি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এদেশে নির্মিত হইত। আমরা ত্রিপুরা-প্রসঙ্গে একবার এই মূর্তিসম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছি।

এইসকল দেবতা ছাড়া চালাঘাট পরগনায় গৌরীপল্লীর নিকটে “সিদ্ধেশ্বর শিব”, শ্রীহট্টের “হাটেশ্বর”, সায়েস্তাগঞ্জের নিকট খোয়াই নদীর তীরে “ভূদেব” নামক বৃহদাকৃতি

শিবলিঙ্গ, পঞ্চাশতের “বাসুদেব” প্রতীতি প্রাচীন দেবতা ত্রীহট্ট জেলায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাদের কোন কোন দেবতার অদ্বিত অজানিত মূর্তি; শুধুই শিলাখণ্ড রূপী শিব-দর্শনে মনে হয়, ত্রীহট্ট অতি প্রাচীন কালে আর্য্যগণের অধ্যুষিত ও পূর্বভারতের অতি বিশিষ্ট স্থান ছিল, কারণ যেখানে শিব লিঙ্গও নহেন, বিগ্রহও নহেন,—শুধু দীর্ঘাকৃতি শৈল-খণ্ড,—তাহা অতি পুরাতন যুগের। পূর্বভারতের বৈশিষ্ট্য, শৈবধর্মের প্রাধান্য—তাহা যেমন তাম্রপটে, তেমনই এদেশের তীর্থগুলিতেও পরিদৃষ্ট হয়। শৈব ও শাক্ত তীর্থই এখানকার প্রাচীনতম।

ত্রিপুরা ও কামরূপের রাজারাই অনেক সময় এই দেশ শাসন করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন কালের আর একটি রাজবংশের পরিচয় আমরা পাইয়াছি। ছইখানি তাম্রফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে; এই ছইখানিই ত্রীহট্টের নিকটবর্তী ভাটেরা গ্রামের “হোমের টিখা” নামক এক ক্ষুদ্র শৈল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে তারিখ দেওয়া আছে, তাহার কতকটা কালক্রমে বিকৃত ও রূপান্তরিত হইয়া যাওয়াতে—ঐ দানপত্র-স্বরের সময় সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান করিয়াছিলেন, প্রথমখানির তারিখ ১২৪৫ খৃঃ অব্দ। এদিকে পদ্মনাথ বিজ্ঞাবিনোদ ও অচ্যুতচরণ চৌধুরী

প্রাচীন ইতিহাস।

ইহার সময় বহু পূর্ববর্তী মনে করেন। এমন কি অচ্যুত-বাবু ঐ তাম্রফলকখানি খৃষ্ট জন্মবার পূর্বের বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমার মনে হয় উভয় পক্ষের মতেই একটু অতিরিক্ত মাত্রায় অনবধানতা আছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র “কেশব দেব গোবিন্দের ছায়” এই লেখাটা দেখিয়া উক্ত রাজাকে সাহজালাল কর্তৃক পরাজিত রাজা গৌড়গোবিন্দের সহিত অভিন্ন মনে করিয়াছেন,—“গোবিন্দের ছায়” বলিলেই গোবিন্দ হয় না। বিশেষ সাহজালাল জয়ী হওয়ার পর হিন্দুরাজ্য বিনষ্ট হয়, দেশ মুসলমানদের করতলগত হয়। তাহা হইলে কেশব দেবের পর ঈশান-দেব আবার সার্কভোম রাজা হইবেন কিরূপে? এইরূপ বহু বিসদৃশ কথা মিত্র মহাশয়ের মন্তব্য হইতে বাহির করা যায়। কিন্তু তদ্বিকল্পে প্রধান প্রমাণ এই যে তাম্রপটের লিপি কখনই ত্রয়োদশ শতাব্দীর নহে, স্পষ্টই তাহার পূর্ববর্তী। অপর দিকে অচ্যুতবাবু যে ঐ লিপি খৃষ্টীয় অদের পূর্ববর্তী মনে করেন, তাহা একবারে অগ্রাহ্য। মোর্যা, গুপ্ত, পাল প্রভৃতি যুগের বহুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কামরূপের ভাস্করবর্ণা হইতে বনমাল ও তৎপরবর্তী ধর্মপালের লিপিও পণ্ডিতগণের সম্যক্ অধিগম্য। এই সকল লিপির সঙ্গে তুলনা করিলে কেশব-তাম্র-পটের লিপি নবম কি দশম শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়। এই লিপি অনেকটা হর্জরবর্ণা এবং বনমালের লিপির ন্যায় (মূল লিপি ১৮৮০ আগষ্ট মাসের এসিয়াটিক সোসাইটির জারনালে প্রদ্রব্য)। কেশব দেবের স্বদৃঢ় প্রস্তরনির্মিত বিষ্ণুমন্দির কোথায় গেল? স্বতরাং তাহা বহু বহু প্রাচীন এবং কালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অচ্যুতবাবুর এই যুক্তির উত্তর অতি সহজ। আর্য্যাবর্তের যত কিছু পাবাণ ও লৌহ নির্মিত কীর্তিস্তম্ভ ও মন্দির, তাহার প্রায় সমস্তই গত সহস্র বৎসরের রাষ্ট্র-বিপ্লবে অধিকাংশ স্থলেই নিশ্চিহ্ন হইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার উপর কালের হাত অবশ্য কিছু আছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের

অনুমানের আর একটি বিকল্প বৃত্তি এই যে একাদশ, দ্বাদশ, এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর তাম্রপট-গুলির শিববন্দনার বৈশিষ্ট্য, তাহারা যত প্রাচীন, ততই যৌন-লীলার কথা তাহাতে কম ; নবম শতাব্দীর পর হইতে ঐ সকল বন্দনায় গৌরীর সঙ্গে লীলাখেলার বর্ণনা বেশী। অপেক্ষাকৃত আধুনিক অর্থাৎ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর তাম্রশাসনে এই লীলা চরমে উঠিয়াছে। সন্নিকটবর্তী কামরূপ-শাসনাবলীতে দেখা যায়,—৭ম শতাব্দীর ভাস্করবর্ষার লিপিতে গৌরী কিংবা অন্য দেবীর রূপের কথার লেশ নাই, নবম শতাব্দীতে হর্জরদেবের তাম্রশাসনও উক্তরূপ বর্ণনা-বিরহিত, কিন্তু পরবর্তী বনমালের তাম্রশাসনে রমণীরা আসিয়া

পড়িয়াছেন—লোহিতা নদের বন্দনায় বলা হইয়াছে, ঐ নদের জল—
কেশবের তাম্রশাসন।

কীড়ানিরত সুরাঙ্গনাদের কেশ ও হস্ত হইতে স্রষ্ট সুরতরুর কুসুমের আরক্ত হইয়াছে। একাদশ শতাব্দীর ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয়—গৌরী পাশায় জিতিয়াছেন এবং শিবকে বলিতেছেন—‘তুমি হারিয়াছ, কিন্তু পণের সকল দাবী আমি ছাড়িয়া দিতেছি, কেবল গঙ্গাকে আমার কিঙ্করী করিয়া দাও।’ দ্বাদশ শতাব্দীতে ধর্ম্মপালের তাম্রপটে অর্ধনারীশ্বরের বন্দনায় বলা হইয়াছে শিবের একদিকে ভগ্ন ও অপর দিকে গৌরীর উত্ত্বঙ্গ স্তনমণ্ডলের কুসুম। যদি এই তাম্রপট ত্রয়োদশ শতাব্দীর হইত, তবে অনেকটা লক্ষণসেনের শাসনের স্থায় তাহাতে “কলিঙ্গাঙ্গনানাং”এর মত কোমল যৌনলীলা-সূচক পদ থাকিত। কেশবের তাম্রপটের সঙ্গে বরং ভাস্করবর্ষার তাম্রশাসনের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, ইহাতে অনেক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করার কথা আছে, ইহাতেও এইরূপ দানের প্রশংসা ও ভূমি-অপহারকদের উপর অভিসম্পাত আছে। কামরূপের পরবর্তী সময়ের তাম্রপটগুলিতে তাহা নাই। কেশবদেব ও তৎপুত্র ঈশানদেবের বংশাবলী এইরূপ :—১। নবগীর্দান, ২। গোকুলদেব, ৩। নারায়ণদেব, ৪। কেশবদেব, ৫। ৩য় পুত্র, ঈশানদেব। ইহারা শৈব হইলেও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, তৎপ্রীত্যর্থ মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ইহাদের নামেও বিষ্ণুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা মার্কভোম রাজা ছিলেন,—ইহাদের অনেক যুদ্ধ-জাহাজ ও রথ ছিল। ঈশানদেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন “বৈষ্ণুকুল-প্রদীপ বনমালী কর” এবং সেনাপতি ছিলেন সমর প্রবীর বীরদত্ত। কেশবের তাম্রপটে যে হট্টপাটকে বটেখরের উল্লেখ আছে—তাহা বোধ হয় করিমগঞ্জের স্বর্ধ্মানদীর বামতীরে জয়ন্তীপুরের হাটকেখর হইতে অভিন্ন (আসাম জেলা গেজেটিয়ার, ৩ অধ্যায়, ৮৭ পৃঃ)। অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন, “গৌড়গোবিন্দ এই হাটকেখর শিবপূজা করিতেন। মিনারের টিলা বা নিকটের অল্প কোন টিলাতে হাটকেখর স্থাপিত ছিলেন। হজরত সাহজালালের সময় যখন গ্রীবা-পীঠ সংগোপন করা হয়, তখন রাজপুজিত হাটকেখর জঙ্গলে নীত হন। বহুকাল ঐ লিঙ্গ সেইখানে ছিলেন, তথা হইতে চুড়াধাইড় পরগনার সেনগ্ৰামে নীত হন।” (ইতিবৃত্ত, ১ম ভাগ, ৯ম অধ্যায়, ১২৯ পৃষ্ঠা।) তাম্রপটে এই রাজাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া লিখিত আছে, ইহারা যে গৌড়গোবিন্দের পূর্বপুরুষ নহেন, তাহাই বা কি করিয়া বলা যায় ? আমরা তাম্রপটের জাতি সম্বন্ধে কোন কথার উপর বেশী আস্থা

স্থাপন করিতে পারি না। পরাক্রান্ত হইয়া যাহারা চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন, ইহা অবস্থাতে পড়িয়া তাহাদের বংশধরগণ যে-কোন জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা সাভারের শিলালিপি হইতে জানিতে পারিয়াছি।

কথিত আছে, ত্রিপুরেশ্বর ছেং কাহাগ (স্বধর্মপা বা সুধর্মপা) কৈলাগড়ে রাজধানীতে একটি বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করেন। তাহা নিধিপতি নামক এক বিশিষ্ট পণ্ডিত ও চরিত্রবান্ ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে নির্বাহিত হয়। এই যজ্ঞোপলক্ষে শ্রীহট্ট-জেলার বহু বৈদিক ব্রাহ্মণের আগমন হয়। নিধিপতি দক্ষিণাশ্বরূপ রাজার নিকট অনেক ভূমি দানপ্রাপ্ত হন (৬০৪ ত্রি = ১১২৪ ধূঃ)। কিন্তু ইহার অনেক পূর্বে হইতে পূর্ব-ভারতে বহু ব্রাহ্মণ বিত্তমান ছিলেন, ডাক্তরবর্মার তাম্রশাসন হইতে আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি।

মুসলমান অধিকারের প্রাক্কালে শ্রীহট্ট রাজ্য এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল।

১। গোড়—বর্তমান শ্রীহট্টের উত্তরাংশ এবং পূর্ব-দক্ষিণের কতকাংশ।

২। লাউড়—গোড়ের পশ্চিমাংশ,—বর্তমান হবিগঞ্জের কতকাংশ ও প্রায় সমুদ্র সুনামগঞ্জ।

৩। জয়ন্তীয়া—শ্রীহট্টের উত্তর-পূর্বাংশ,—স্বরমা নদীর সীমা পর্যন্ত, ইহার দক্ষিণ-পূর্বে ত্রিপুরা। ইহা ছাড়া সমগ্র জয়ন্তীয়া পাহাড় ইহার অন্তর্গত।

এই তিনটি বৃহৎ ভাগ ছাড়া তরপ, ইটা ও প্রতাপগড় মুসলমান বিজয়ের পর গোড়ের অন্তর্গত হয়।

মুসলমানেরা গোড়গোবিন্দের হস্ত হইতে শ্রীহট্টের অধিকার বলপূর্বক গ্রহণ করেন। এই গোড়গোবিন্দ কে তাহা জানা যায় নাই। নানা গল্পে জড়িত হইয়া এই রাজার ইতিহাস অতীত শ্রীহট্টের একটা প্রহেলিকা হইয়া আছে। কথিত আছে, তিনি নির্বাসিত কোন

ত্রিপুর-রাজ-কন্ডার গর্ভে এবং সমুদ্রের ঔরসে জাত। প্রাচীন
গোড়গোবিন্দ কে ?
উপাখ্যানে সমুদ্র একাধিক রাজার জনয়িতা রূপে কল্পিত হইয়াছেন।

এই আখ্যানের মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে, তবে রাজকুমারীকে কোন অভিযোগে অভিযুক্ত, কলঙ্কিতা ও গর্ভবতী ত্রিপুর রাজকন্ডা বলিয়া ধরা যায়। দ্বিতীয় প্রবাদ এই তিনি গোড় হইতে আসিয়া শ্রীহট্ট দখল করিয়াছিলেন বলিয়া গোড়গোবিন্দ নামে পরিচিত; সুহেল-ই-এমন নামক পারস্ত ভাষায় লিখিত গ্রন্থে এই প্রবাদটি পাওয়া যায়। তৃতীয় অনুমান, তিনি হরত বা সেই নরকবংশীয়দেরই কেহ হইবেন। যে বংশে কেশব ও ঈশান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি হাটকেশ্বরের মন্দিরের কর্তৃক উত্তরাধিকার-স্বত্বে পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শ্রীহট্টের আগন্তুক এই অনুমান যেন একটু প্রবল দৃষ্ট হয়, যেহেতু সে দেশের লোকেরা তাহার পূর্ব-ইতিহাসের কোন সন্ধানই রাখেন না। সে দেশের লোক হইলে অন্ততঃ কোন একটা প্রবাদ থাকিত। এদিকে শ্রীহট্টের ৩৭ মাইল দূরে “পাতার” নামক এক জাতি আছে—তাহারা সহরে কয়লা, কাঠ, পাতা ইত্যাদি বিক্রয় করে, তাহারা আপনাদিগকে “গুড়গোবিন্দী” বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। মুসলমানেরা

রাজার রাজ্য কাড়িয়া লইয়া কি তাঁহার পরিবার ও স্বগণবর্গের এই চূর্ণান্তি করিয়াছিলেন ?
যাহা হউক, আধারে আর বেশী ঢিল ছুড়িলেও লক্ষ্য ভেদ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

বজ্রাল সেনের কোলিতের বাহারা প্রতিবাদী ছিলেন এবং ‘পদ্মিনী’ সংক্রান্ত ব্যাপারে
বাহারা বিরক্ত হইয়াছিলেন, এমন বহু ব্রাহ্মণাদি বর্ণের লোক বঙ্গদেশ হইতে পলাইয়া সীমান্ত-
প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। শ্রীহটে বহুদিন পর্য্যন্ত হিন্দুরাজাদের আধিপত্য ছিল, এজন্য
এই নিরাপদ আশ্রয়ে বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার শ্রীহট্ট-বাসী হইয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর
শেষভাগে শ্রীহট্ট মুসলমানদের অধিকৃত হয়—তখন বঙ্গদেশে মুসলমান প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত ;—
এজন্য আমরা দেখিতে পাই, দেশের অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীহট্টের অধিবাসী। তখনও
শ্রীহট্ট বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে সুরক্ষিত। ইহার পরে শ্রীহটে রাষ্ট্রবিপ্লব ও দ্রুত উপস্থিত
হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ আমরা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে দেখিতে পাই।* এদিকে নবদ্বীপ
ও শান্তিপুরের টোল তখন খুব জাঁকিয়া উঠিয়াছে। দলে দলে শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণগণ দেশত্যাগী
হইয়া নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে উপনিবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা হিন্দু-নৃপতিগণের উৎসাহে সংস্কৃত
শাস্ত্রে ইতিপূর্বেই বিশেষ বুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং সহজেই নবদ্বীপের টোলে
প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে রঘুনাথ শিরোমণি ও অদ্বৈত
আচার্য্যের নাম নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর পুরোভাগে। শ্রীহট্ট প্রভৃতি হিন্দুরাজগণ-শাসিত
দেশে সংস্কৃতের চর্চা এত বেশী হইয়াছিল যে দলিলপত্রের ভাষায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও
বহু সংস্কৃত শব্দের সংমিশ্রণ ছিল। আরাজ্জবের শাসনকালে, বঙ্গের সুবেদার সারেন্তা খাঁর
সময় এবং শ্রীহট্টের ফৌজদার আবদুল বহেম খাঁর সরকারে নিম্নলিখিত দলিলখানি সম্পাদিত
হইয়াছিল। ইহা ২৪৭ বৎসর পূর্বে লিখিত, সুতরাং সে সময়েও যে আদালতে সংস্কৃত ভাষার
প্রাধান্য ছিল, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। দলিল—“শ্রীমকল পাট্টা আজকরার মাহে ২৫ আষাঢ়
সন ১০৯২ সাল স্বস্তি দিনবত্মান্তরসহস্রতমাদে আষাঢ় পঞ্চবিংশতিদিবসে শ্রীশ্রীমতাং
জুলতান আরঙ্গ সাহ পাদপদ্মানামভাদারিনি রাজ্যে বঙ্গানামধীশ্বরেণু শ্রীযুক্ত সাহইস্তু খাঁন
মহোগ্রপ্রতাপেণু শ্রীহট্টাধিকারিণী শ্রীযুত আবদুল রহেম খান মহাশয় শ্রীযুক্ত হাজি সাহারাজকন্ত
পঞ্চথণ্ডাধিকারত্বে বিলসিত সাহস্রিয় পঞ্চথণ্ড চন্দ্রকান্তগত খাসাপাটকস্থ শ্রীহুদাম দাস
শ্রীগোবিন্দ দাস শকাব্দ ১০৯২ সপ্ত মুদ্রাং গৃহীত্বা শ্রীমদুসুদন পাল শ্রীকৃষ্ণবল্লভ পালাভ্যাং
দক্ষিণে শ্রীবংশিকার্য্যাকাটিকা পশ্চিমে পূর্বে-রাজমার্গ ৫ উত্তরে পুষ্করণ্যস্তরপারং পূর্বে
ঈশান কোণাবধিক প্রমাণেন গোলক আর ফলাইর বাড়ীর গোলে ৫ জুরিয়ার ত্রিসীমা
ইথং চতুঃ সীমাবচ্ছিন্না শ্রীমনিপস্তন বাটিকা মোজে খেসরা সখকিনী বিক্রীতেতি তমুল্যাং
৭ শত তকা ত্রব্য একবাড়ী চতুঃ সীমান সন—তারিখ—সদর।” (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত,
২য় ভাগ, ৪র্থ অঃ, পৃঃ ৯২) আমরা কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি

* শ্রীহট্ট দেশে অনাচার দ্রুতক অছিল। ডাকাচুরি অনাবৃষ্টি মড়ক পড়িল। উচ্ছন্ন হইল দেশ অরিষ্ট
যেথিয়া। নানা দেশে নরক লোক গেল পলাইয়া।” চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দ।

(‘কোচবিহার’), যে উক্ত রাজার নফর চাকরেরা পর্যন্ত সংস্কৃতে কথাবার্তা করিত। হিন্দুরাজকে সংস্কৃতে চর্চা যে অত্যধিক হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরেজাধিকারে মাদ্রাজি আয়া ও চাকরেরাও ইংরেজীতে কথা করিয়া থাকে।

মহারাজ গোড়গোবিন্দ বাহু-বিজ্ঞান কৃতী ছিলেন, বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। রাজা বীরপুরুষ ছিলেন, তিনি “শব্দভেদী” বাণ সন্ধান করিতে জানিতেন। এই শব্দভেদী বাণ যে কিরূপ এবং তাহাতে হিন্দুরা যে কিরূপ ক্রতিত লাভ করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত ১৬২-৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এই রাজার সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক ভাবে আর একটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায়, তাহা দত্ত-বংশের বংশাবলী হইতে গৃহীত হইল। একদা রাজার উদরে সাংঘাতিক বেদনা অনুভূত হয়,—দেশীয় ভিক্ষকেরা তাঁহার কোন উপকার করিতে পারেন নাই। তখন বঙ্গদেশের ভিক্ষক-কুল-চূড়ামণি চক্রদত্ত জীবিত ছিলেন, তাঁহার বশ ভারতবিশ্রুত। রাজা তাঁহার অল্প দূত পাঠাইয়া দেন, কিন্তু চক্রদত্ত তখন অতিবৃদ্ধ—তিনি গঙ্গাতীর ছাড়িয়া শ্রীহটে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। এই সংবাদে রাজা অত্যন্ত কাতরা হইয়া তাঁহার অঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া সেই বহুমূল্য পেটিকাটি সহ পুনরায় দূতকে ভিক্ষকবরের নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন, “আমি আপনার কল্যাণ-স্বরূপা, আমার স্বামি-বিয়োগ হইলে এ সকল গহনা দিয়া কি করিব? আপনিই এগুলি রাখিবেন, নতুবা জলে বিসর্জন দিবেন—আর বিধবা হইলে আমি সহমৃতা হইব, সুতরাং আপনি নারী-বধের অল্প দায়ী হইবেন, কারণ হয়ত আপনার দ্বারা রাজার ও আপনার দুঃখিনী কল্যায় জীবন রক্ষা হইতে পারে।” ধর্মভীরু চক্রপাণি এই সঙ্কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। রাজা তাঁহার স্মৃচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিলেন। রাজা তাঁহাকে বিশাল ভূমিখণ্ড প্রদান করিলেন। কিন্তু তিনি গঙ্গাতীর ছাড়িয়া কিছুতেই এদেশে থাকিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার ভ্রাতা ভানুদত্তকে সেই সম্পত্তির অধিকারী করিয়া চলিয়া গেলেন।

মহারাজ গোড়গোবিন্দ নিরাময় হইয়াও জীবনে আর সুখী হইতে পারিলেন না। গোহত্যা অপরাধে তিনি শ্রীহটে টুলটিকর-বাগী বুরহান উদ্দীন এবং কাজি মুহম্মদীনকে

ভীষণ ভাবে দণ্ডিত করিয়াছিলেন; এই দণ্ডের সঙ্গে অপরাধের
মুসলমান-বিজয়।

স্থানের হিন্দু রাজাদের গোহত্যা অপরাধে মুসলমান-নিগ্রহের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের ঝগড়া এখন পর্যন্তও গোহত্যা লইয়া চলিতেছে, সুতরাং একইরূপ বাপার যে একাধিক স্থানে অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাহা প্রমাণাভাবে ঠিক করিয়া বলা যায় না। এইরূপে দণ্ডিত ব্যক্তিদের বঙ্গেশ্বরের শরণাপন্ন হন। আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহ স্বীয় ভাগিনের সেকেন্দারকে গোড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বাহুবলি-প্রভাবে সেকেন্দর ছইবারই হিন্দু-রাজার নিকট পরাভূত হন। তোয়ারিখে জালালি নামক পুস্তকে এই যুদ্ধের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম যুদ্ধে হারিয়া গিয়া সেকেন্দর দ্বিতীয়বার খুব সমারোহ করিয়া বিশাল সৈন্য সঙ্গে গোড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে

অভিযান করিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তকে সেই অভিযান সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে; শেষ পঙ্ক্তি এইরূপ “হইল সাবেকী দশা সিকন্দর সাহার।” ইহার পরে তিনি দিল্লীখরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে বঙ্গেশ্বর শ্রীহট্টের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ গোড়-গোবিন্দের সঙ্গে তাঁহার সন্ধি হইয়াছিল, অর্থাৎ মসজিদ এই সন্ধির ফলেই হইয়া থাকিবে।

কিন্তু এই সময়ে আর একজন মুসলমান নেতা সমরাজ্যে অবতীর্ণ হইলেন, ইনি বিখ্যাত সাধু সাহ জালাল। ইনি হজরত মোহাম্মদের জাতির বংশধর এবং ইহার মাতাও সৈয়দবংশীয়া ছিলেন এবং পিতা মাহমুদ কাকেরের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। সাহ জালালের জন্মস্থান আরবের অন্তর্গত পবিত্র তীর্থ হেজাজ। সাহ জালাল চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, ইনি অল্প বয়সেই সাধনার পথে এতটা অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, একটা বায়কে তদীয় আশ্রম-পালিত হরিণ আক্রমণ করিতে দেখিয়া সেই ব্যাঘ্রের গণ্ডে একরূপ ভীষণ চপেটাম্বাত করিয়াছিলেন যে, ব্যাঘ্র দম্ভরাজি বিকশিত করিয়া তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সাহ জালাল ভারতবর্ষে আসিবার পর তাঁহার তপঃপ্রভাবের কথা সর্বত্র প্রচারিত হইল, তিনি বিধ খাইয়া বিধ হজম করিয়াছিলেন এবং চর্খ-পাছুকা পায়ে নদ-নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিয়া জন-শ্রুতি আছে। তোয়ারিখে জালালিতে এইরূপ অনেক উপাখ্যান বর্ণিত আছে। দিল্লীতে আসার পর হতভাগ্য হিন্দু রাজার দ্বারা দণ্ডিত বুরহান উদ্দিন (বাহার এক হস্ত গোড়-গোবিন্দ কর্তৃক কব্ধিত হইয়াছিল) এবং কাজি হুসুদ্দিন তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। সাহ জালাল ইসলাম-ধর্ম-প্রচারার্থ শ্রীহট্টের অভিমুখে রওনা হইলেন। তাঁহার নামে আকৃষ্ট হইয়া শত শত লোক তাঁহার দলে ভিড়িয়া গেল। তিনি বার জন সঙ্গী সহ রওনা হইয়াছিলেন, কিছু দূর যাইতে যাইতেই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬০ জন হইল। এ দিকে কাজি হুসুদ্দিনের অধীনেও বিস্তর সৈন্য ছিল। তিনি বতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অলৌকিক সাধনা-বলের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া তদীয় অস্থচরেরা সংখ্যায় পুষ্টি লাভ করিল। শ্রীহট্টের সীমায় অবস্থিত চৌকি (দিনারপুর পরগনার) নামক স্থানে আসিলে গোড়-গোবিন্দ এই অভিযানের সংবাদ পাইলেন। সাহ জালাল ব্রহ্মপুত্র উত্তীর্ণ না হইতে পারেন, এজন্য হিন্দু-রাজা সেই নদে সমস্ত তরীর যাতায়াত নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমান সৈন্য কোশলক্রমে সেই নদ অতিক্রম করিল; তারপর তাহারা বরাক নদীর তীরবর্তী বাহাদুরপুরে পৌঁছিলে—সেখানেও গোড়-গোবিন্দ সমস্ত নৌকার যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই চেষ্টায়ও তিনি ব্যর্থ হইলেন। সাধুর কেবামতের কথা সর্বত্র প্রচারিত হইল। রাজার মুসলমানের প্রতি অত্যাচারে এক শ্রেণীর লোক তাঁহার প্রতি বিমুখ ছিল, অপরদিকে হজরতের বংশোদ্ভব সাধুর অলৌকিক ক্ষমতার উপর চারিদিকে একরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, গোড়-গোবিন্দ নিজেকে নিতান্ত নিঃসহায় মনে করিয়া পেঁচাগড় হুর্গে আশ্রয় লইলেন। কথিত আছে, রাজার যে গগনস্পর্শী প্রস্তর-মন্দির ছিল, তাহা সাহ জালাল

ও তাঁহার অমৃতচর-বর্ণের আজানের শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কেশব দেবের যে বিখ্যাত মন্দির : : :
কথা আমবা তাম্রপটে উল্লিখিত দেখিতে পাই, এই মন্দির কি তাহাই? যদি তাহাই হয়,
তবে তাহা কোথায় গেল বলিয়া কাহারো আধারে হাতড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই।
গৌড়-গোবিন্দ স্বয়ং অনেক কেরামৎ জানিতেন, কিন্তু সাহ জালালের নিকট কোনটিই টিঁকিল
না। এইভাবে বিনা যুদ্ধে যেরূপ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে লক্ষণসেনের নবদ্বীপ অধিকৃত

হইয়াছিল, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে সেইরূপ বিনা রক্ত-পাতে
শ্রীহট্টের স্বাধীনতা-লোপ, শ্রীহট্ট অধিকৃত হইল। হাণ্টার সাহেব বলেন, ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট
১৩৮৪ খৃঃ।

সাহ জালাল কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল; সাহ জালালের সঙ্গে
সুপ্রসিদ্ধ পীর নেজামুদ্দিনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, নেজামুদ্দিন তাঁহাকে দুইটি পায়রা উপহার
দেন। সাহ জালাল তাহাদিগকে শ্রীহট্টে লইয়া আসেন, সেই পায়রার বংশধরেরা ‘জালালী
পায়রা’ নামে পরিচিত, ইহারা অবধা।

সাহ জালালের প্রভাবে মুসলমান ধর্ম শ্রীহট্টে খুব বিস্তার পাইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান
সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। তাঁহার চরিত্র নিম্নলিখ ছিল, তিনি স্বীলোকের মুখ দর্শন
করিতেন না, চাদর দিয়া মুখ ঢাকিয়া পথে চলিতেন। তাঁহার দরগায় হিন্দু ও মুসলমান উভয়
সম্প্রদায়ই সিরি দিয়া থাকেন। ঐ দরগায় কয়েকটি শিলা-লেখ
সাহ জালালের দরগা।

আছে; একটিতে লিখিত আছে, সামসুদ্দীন ইউসুফের সময়ে (১৪৭৪-
১৪৮১) উহা নিশ্চিহ্নিত, পরবর্তী বাদসাহেরা উহার সংস্কার ও উন্নতি করিয়াছিলেন। একটিতে
১১১ হিজরী (১৫০১ খৃঃ), আর একটিতে ১০৮৮ হিজরীর (১৬৭১ খৃঃ) অঙ্ক আছে।
ঐ দরগাতে সাহ জালাল আনীত একটি উট পাখীর ডিম, তাঁহার “জুল দুকার” নামক তরবারি,
মৃগচর্মের আসন (মোসজা) এবং কাষ্ঠ পাছকা আছে। তদীয় দুইটা তামার পেয়ালাও
তথায় রক্ষিত আছে, উহাদের উপরে আরবী শ্লোক উৎকীর্ণ। ঐ দরগায় আরাঞ্জেব একটি
ডেগ উপহার দিয়াছিলেন,—উহা তাম্রনির্মিত, উহাতে ১০১২ মণ চাঁউলের ভাত রাগা হইতে
পারে। তাহার উপর যে লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহা ১১১৫ হিজরীর (১৭০৭ খৃঃ) অঙ্ক
বহন করে। সাহ জালালের সঙ্গে ৩৬০ জন আউলিয়া আগিয়াছিলেন। শ্রীহট্টবাসীরা কখনও
কখনও তাঁহাদের দেশকে “তিনশ বাটে আউলিয়ার মুলুক” বলিয়া থাকেন। “শ্রীহট্টে
সাহ জালাল”, “আনোয়ার আলিয়া” এবং “শ্রীহট্ট নূর” প্রভৃতি পুস্তকে এই আউলিয়াদের নাম
ও বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। অচ্যুতবাবু তাঁহার ইতিবৃত্তে অনেকেরই নাম-ধাম দিয়াছেন।

সাহ জালালের মৃত্যুর পর (অম্বুমান ১৪১৪ খৃঃ) নবাব ইসপেনদিয়ার শ্রীহট্ট শাসন করেন।
তৎপরে রুকন খাঁ, গহর খাঁ, মোহম্মদ খাঁ, সরওয়ার খাঁ, মীর খাঁ, ইউসুফ খাঁ, খোয়াজা ওসমান,
শ্রীহট্টের নবাবগণ।

লোদী খাঁ, জাহান খাঁ ক্রমান্বয়ে শ্রীহট্ট শাসন করেন। ইহাদের
উপাধি ছিল ‘কাছুনগো’, কিন্তু সমস্ত রাজস্ব ও শাসনভার ইহাদের
উপরই ব্রত ছিল। ইহাদের প্রত্যেকেরই শাসনকাল অত্যন্ত ছিল। বাদসাহেরা কিছুকালের
জন্ত এক একজনকে কাছুনগোর পদ দিয়া তাঁহাদের নব-প্রীতির পাত্রদিগকে সেই পদের

উত্তরাধিকারী করিয়া মনস্ফট্ট জ্ঞাপন করিতেন। ১৪৯৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৫৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই ভাবে শ্রীহট্টের শাসনকার্য চলিয়াছিল। সর্দানন্দ নামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া সরওয়ার খাঁ নাম গ্রহণ করেন, পূর্বোক্ত তালিকায় দৃষ্ট হইবে তিনিও এই কানুনগোদের একজন। সরওয়ার খাঁর পুত্র মীর খাঁ, তৎপুত্র ইউসুফ খাঁ (১৫২৬ খৃঃ)—এক বংশের এই তিনজন কানুনগো-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইউসুফ খাঁর সময়ে আনন্দনারায়ণ গুপ্ত নামক এক ব্যক্তি শ্রীহট্টের দেওয়ান ছিলেন। এই আনন্দ-নারায়ণের সাহায্যে পরবর্তী কানুনগো খোয়াজ ওসমান ইটার রাজা সুবিদনারায়ণকে পরাজিত করিয়া তরপ ও ইটা অধিকার করেন। জাহান খাঁ কানুনগো অন্ন-বয়স্ক থাকিতে রাজেন্দ্র, বহুদাস, কদ্রদাস ও তরপের জমিদার সুবিদারাম প্রকৃতপক্ষে রাজ্য শাসন করিতেন।

কিন্তু আকবর শাসন-বিভাগ ও রাজস্ব-বিভাগ পৃথক করিলেন; তদনুসারে কানুনগোগণ তাঁহাদের ক্ষমতা হারাইলেন। তাঁহারা দেওয়ান হইয়া রাজস্ব-বিভাগের কর্তা হইলেন, এবং শাসন-কর্তা হইলেন “আমিল” নামে ফৌজদারগণ। আকবরের

আমিল।

সময়ে শ্রীহট্টের রাজস্ব ১,৬৭,০৪০ টাকা অবধারিত হইয়াছিল। শ্রীহট্টের ‘আমিল’গণের শিলমোহর হইতে ৪০ জনের নাম সংগৃহীত হইয়াছে। মোট আমিল বোধ হয় ৬০ জন ছিলেন, তন্মধ্যে অচ্যুতবাবুর পুস্তকে ৪৩ জনের নাম-ধামের তালিকা আছে। কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ তাঁহার ভ্রাতা চিলা রায়ের সাহায্যে একজন আমিলকে পরাস্ত করেন। যুদ্ধস্থলেই আমিল নিহত ও তাঁহার ভ্রাতা বন্দী হন। নরনারায়ণ শ্রীহট্টের ২০০ ঘোটক, ১০০ হস্তী, তিন লক্ষ টাকা, দশ হাজার মোহর কর-স্বরূপ পাইবেন—এই সর্ত্তে উক্ত ভ্রাতা মুক্তি লাভ করেন।

ইহার পরবর্তী শ্রীহট্ট-শাসনকর্তা ফতে খাঁর সহিত ত্রিপুর-রাজ অমরমাণিক্যের যুদ্ধের কথা ‘ত্রিপুর-রাজ্য’ অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ফতে খাঁ এই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। ফতে খাঁর পরে মোহাম্মদ জামন ভুয়লদার, সৈয়দ ইব্রাহিম (১৬৫৭ খৃঃ), নবাব লুৎফউল্লা খাঁ বাহাজুর (১৬৬৩ খৃঃ), নবাব জান মোহাম্মদ (১৬৬৭ খৃঃ), নবাব ফরহাদ খাঁ (১৬৭০ খৃঃ), নবাব মহাফতা খাঁ, নবাব মুরউল্লা খাঁ (১৬৭৮ খৃঃ) নবাব সৈয়দ মোহাম্মদ আলি খাঁ, কাইমজঙ্গ (১৬৮০ খৃঃ), নবাব আব্দুরহেম খাঁ (১৬৮০ খৃঃ), নবাব সাদক বাহাজুর (১৬৮৬ খৃঃ), নবাব ককতলব খাঁ (১৬৯৮ খৃঃ), নবাব আহমদ মজিদ (১৬৯৯ খৃঃ), নবাব কারগুজার খাঁ (১৭০৩ খৃঃ)—এই কয়েকজন আমিলের নাম পাওয়া যায়। ইহাদের সকলেরই ভূমি-দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ইহারা নির্বিচারে বোগ্যতা-অনুসারে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। আরাজেবের পরে নবাব

নবাব হরেকৃষ্ণ—১৭০৯-১৭১১ খৃঃ। তানিব আলি খাঁ ও নবাব শুকুরউল্লা খাঁ আমিল হইয়াছিলেন;

শুকুরউল্লা খাঁর পরে একজন হিন্দুকে এই উচ্চপদ দেওয়া হয়, ইহার নাম নবাব হরেকৃষ্ণ, উপাধি মনসুর-উল-মূলুক বাহাজুর। যে বংশে সর্দানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়া মুসলমান-ধর্মগ্রহণের পর সরওয়ার খাঁ নামে শ্রীহট্টের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন, সেই বংশে

কবিরাজ রায় নামক এক বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। কবিরাজের পুত্র শ্রীমদাসের দুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে হরেকৃষ্ণই নবাবী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুরসিদাবাদের নবাব শুকুরজার উপর বিরক্ত হইয়া হরেকৃষ্ণকে এই পদ দিয়াছিলেন। কিন্তু দুই বৎসর না যাইতে যাইতেই শুকুরজা চক্রান্ত করিয়া গুপ্তঘাতক দ্বারা পূজায় সমাধীন হরেকৃষ্ণকে দেবমন্দিরের মধ্যেই হত্যা করান। তাঁহার সেনাপতি রাধানাথ এই শোক অসহ্য হওয়াতে আত্মঘাতী হন। শুকুরজা হরেকৃষ্ণের ছিয়মুও একটা উচ্চ বংশদণ্ডের উপর জুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। তদর্শনে এক পাগল ফকির চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, “আরে বাঃ জী লাল! হরকীবণ! জীতে সবকো সেরা, মরণে ভি সবকো উপরিওয়ালা!” হরেকৃষ্ণ দুইটি বৎসরের মধ্যে বহু দান করিয়া গিয়াছেন। অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন, “শ্রীহট্ট কালেক্টরীতে নবাবী আমলের যে সকল দানপত্র পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অধিককই “নবাব হরকীবণ প্রদত্ত।” সম্রাট মোহাম্মদ সাহের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষ হইতে চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত হরেকৃষ্ণ শ্রীহট্ট শাসন করিয়াছিলেন। নবাব হরেকৃষ্ণের পর শুকুরজা পুনরায় শ্রীহট্টের শাসনকর্তা হন, তৎপরে নবাব সমসের খাঁ বাহাদুর (১৭৩৫ খৃষ্টাব্দ)। এই সময়ে চাক্লে সিলেটে ১৪টি পরগনা ছিল, এবং ইহার রাজস্ব ছিল—২,৩১,৪৫৫ টাকা। সমসের খাঁ যুদ্ধে নিহত হন, তৎপর নবাব বহরম খাঁ (১৭৪৪ খৃঃ), নবাব আলাকুলি বেগ (১৭৪৮ খৃঃ), নবাব তালিব আলি, নবাব নজীব আলি (১৭৫১ খৃঃ), নবাব সাহ মতজঙ্গ নোয়াজিস মোহাম্মদ খাঁ (১৭৫৭ খৃঃ), নবাব মোহাম্মদ আলি খাঁ (২য়), নবাব এক্রাম আলি খাঁ (১৭৬৪ খৃঃ) ও নবাব আজাদ খাঁ ক্রমান্বয়ে শ্রীহট্টের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। মোগল সম্রাটগণ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকে স্থির হইয়া গদীতে বসিতে দেন নাই, পাছে তাঁহারা প্রজাদিগকে বশীভূত করিয়া বিদ্রোহ করেন এই ভয়ে। পাঠানদের—এক মুহূর্তে কোরাণ স্পর্শ করিয়া সন্ধি করা, তৎপরমুহূর্তে সেই সন্ধি ভাঙ্গিয়া বিদ্রোহ করা—এই বিভ্রাটে মোগলেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ ঘন ঘন শাসনকর্তার নিয়োগ ও পরিবর্তনের অল্প এক কারণও ছিল। যাহারা সম্মুখে থাকিতেন, তাঁহারাই প্রিয় হইতেন এবং তাঁহাদের উপর সম্রাটদের সন্তোষ-জ্ঞাপনের একমাত্র উপায় ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্তৃদ্বন্দ্ব-দান। গুপ্ত অভিসন্ধিতে লিপ্ত প্রবল অমাত্যকে দূরে তাড়াইয়া দিয়া বড়বড় ভাদ্রিয়া দেওয়ার মতলবেও তাঁহারা তাঁহাদিগকে দূরে শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইতেন।

ইটা, প্রতাপগড় ও লাউড়,—বর্তমান শ্রীহট্টের এই তিন অংশ একসময়ে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইটার রাজা সুবিদনারায়ণের * সঙ্গে ওসমান ইটা, প্রতাপগড় ও লাউড়। খাঁর যুদ্ধের কথা ষ্ট্রাটের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, জাহাঙ্গীরের সময়ে খোয়াজ ওসমান তাঁহাদের আদেশে অবাধ্য ব্রাহ্মণ রাজা

* আমরা পরীক্ষিতিকায় পুনঃ পুনঃ শ্রীহট্টের শাসনকর্তাদের দ্বারা অগ্রবর্ত্ত হইয়া মোগল সম্রাটদিগকে বিদ্রোহিবাদের জন্য সৈন্ত পাঠাইবার কাহিনী পাঠ করিয়াছি। সুবিদনারায়ণের পুত্র মুসলমানী নামে

সুবিদনারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন শের সাহের সময়ে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। সুবিদনারায়ণের কনিষ্ঠা কন্যা ভানুমতী অতিশয় রূপসী ছিলেন। খেয়াজ ওসমানের উপর তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার হুকুম ছিল। সুবিদনারায়ণ সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে নিহত হন। তাহার সাক্ষী পত্নী কমলা সহমৃতা হন এবং ভানুমতী বিয় খাইয়া আত্মহত্যা করেন। সুবিদনারায়ণের চার পুত্র—জামাল খাঁ, কামাল খাঁ, ইজি খাঁ ও জৈশা খাঁ নাম গ্রহণপূর্বক মুসলমান-ধর্মাবলম্বী হইয়া বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তদবধি এই ব্রাহ্মণ রাজার সম্পত্তি মুসলমান-অধিকৃত হইয়াছিল। অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন, “রাজা সুবিদনারায়ণের বংশীয়গণ মুসলমান ধর্মাবলম্বী হইলেও হিন্দু রীতিনীতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলেন।”

প্রতাপগড় এক সময়ে ত্রিপুর-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, সুতরাং ইহার ইতিহাস সেই দেশের ইতিবৃত্তের অন্তর্গত। পরবর্তী সময়ে শ্রীহট্টের দত্তবংশোদ্ভূত রাধারাম জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদের বংশীয় মুসলমান শাসনকর্তার হস্ত হইতে কৌশলক্রমে অনেক সম্পত্তি অধিকার করিয়া ‘নবাব’ উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি অতি হৃদ্যন্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। কথিত আছে, একটা মাদুরে তাহার দুই একজন কর্মচারী শুইয়া ছিল, তাহাদের পা মাদুর হইতে বাহির হইয়াছিল, এই জ্ঞাত্তি তিনি সেই মাদুর-নির্গাতাকে ছোট মাদুর প্রস্তুত করার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া তাহার পা কাটিয়া দিয়া ছিলেন। তিনি একদিন নৌকাযোগে যাইতেছিলেন, নৌকার মাঝি একটা বড় মৎস্ত বঁড়ুশি দিয়া ধরিয়াছিল,—তাহার বিনা-অনুমতিতে সে ঐরূপ করিল, এজন্ত তিনি সেই মাঝিকে জলে ডুবাইয়া মৎস্তের মত গলায় বঁড়ুশি বিধাইয়া হত্যা করেন। কিন্তু এসকল নিতান্তই উপগল্পের মত শোনায়।

রাধারাম তাহার সরল-প্রাণ বন্ধু জমিদার কান্ধুরামকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মিথ্যা সন্দেহে কালীর নিকট বলি দিতে চাহিয়াছিলেন। কান্ধুরামের ভৃত্য এই অভিসন্ধি টের পাইয়া তাহার প্রভুকে ঘৃণীর প্রস্তুত একটা গিলাপের মধ্যে ঢুকাইয়া গভীর রাত্রে কাঁধে করিয়া ভীষণ বজ্রজন্তুসমূহ ছালািয়া পাহাড়ের জঙ্গল দিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিবার যোগ্য। নবাব রাধারাম ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়া ছদ্মবেশে পলায়নপর হইলেন। তিনি পথে আত্মহত্যা করেন এবং তৎপুত্র কুমার জয়মঙ্গল ডোমের ছদ্মবেশে ঘুরিয়া ঘিরিয়া অবশেষে ধৃত হইয়া বন্দী হন। এখনও কৃষকগণ লাজল চালাইতে চালাইতে গাহিয়া থাকে—“কান্দে চরণগোলায় লোক দেশে দেশান্তর। জয়মঙ্গল আসিবে যবে চরণগোলায় নগর। ডোম চাড়া মিলিয়া বানাইয়া দিমু ঘর।”

পরিচিত কামাল খাঁ ও জামাল খাঁ সম্বন্ধে পরীক্ষা পাইয়াছি। সুবিদনারায়ণের কন্যার আত্মহত্যা-সম্বন্ধেও সম্ভবতঃ পরীক্ষা লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উৎসাহ পিতৃ বৃদ্ধের খাড়ে পড়িয়াছে—‘পূর্ববঙ্গ-গীতিকা’ প্রভৃতি।

লাউড় অতি প্রাচীন রাজ্য—কথিত আছে লাউড়-পর্বতে ভগদত্তের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজয়-মালিক্য নামে এক রাজা তথায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার একটি রোপ্যমুদ্রায় “রাজা বিজয়মালিক্য শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেব্যা—শক ১১১৩” লেখা পাওয়া গিয়াছে, স্মৃতরাং উহা ১১২১ খৃষ্টাব্দের, এই রাজা সম্ভবতঃ ত্রিপুর-রাজাদের বংশীয় হইবেন। কিন্তু বিজয় রাজার শাখা কোথায় কি ভাবে বিলুপ্ত হইল জানা যায় নাই। তারপরে আমরা একেবারে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে আসিয়া পড়ি। তখন দিব্যসিংহ নামক এক ব্রাহ্মণ রাজা লাউড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইহারই মন্ত্রী কুবের পণ্ডিত বিখ্যাত “দত্তক-চন্দ্রিকা”—গ্রন্থপ্রণেতা কুবের পঞ্চানন—অদ্বৈতাচার্য্যের পিতা। দিব্যসিংহ উত্তরকালে বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত হইয়া “কৃষ্ণদাস” নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং “বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রিকা” নামক ভাগবতের সারোচ্ছার-সংবলিত গ্রন্থ সংকলন করেন (“লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের ভক্তিলীলা সূত্র, যে গ্রন্থ গুনিলে হয় ভুবন পবিত্র।”) ইহার পরে জগন্নাথপুরে গোবিন্দসিংহ নামক এক ব্রাহ্মণ রাজার উল্লেখ পাইতেছি, ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক, এবং তৎসময়েই বানিয়াচঙ্গের কেশব মিশ্র নামক আর এক রাজার কথা জানিতে পারি। এই দুই শাখাই এক মূল ব্রাহ্মণ-বংশের বলিয়া অনুমিত হয়। গোবিন্দসিংহের সঙ্গে কেশব মিশ্রের বংশধর জয়সিংহের ঝগড়া হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর গোবিন্দসিংহের অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ তাঁহাকে মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত করিয়া “হবির খাঁ” নাম দেন; তাঁহার ভ্রাতা বিজয়ের সহিত সম্পত্তির সীমা লইয়া বিবাদ করেন। ইতিমধ্যে হবির খাঁ তাঁহার পুত্রের সহিত বিজয়ের কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। ইহাতে বিজয় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু মোখিক আত্মীয়তার ভান করিয়া হবির খাঁর পুত্র আলম খাঁকে স্বীয় বাড়ীতে আনিয়া বন্দী করেন। আলম অতি রূপবান্ ছিলেন। বিজয়ের কন্যা কৌশলক্রমে তাঁহাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করেন। উভয় ভ্রাতার ঘৃণার ফলে বিজয়সিংহ নিহত হন এবং হবির খাঁর বংশ প্রবল হইয়া উঠে। পূর্বে এই লাউড়-রাজ্য বহু বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ১৭২২ খৃষ্টাব্দে ইহার সমুচিত পরিমাণ ২৮টি পরগনা এবং অনেক পতিত জমি লইয়া গণ্ডীবদ্ধ হইয়াছিল। ঐ সময়ে ইহার মালিক ছিলেন আনোয়ার খাঁ, তিনিই সর্বপ্রথম “দেওয়ান” উপাধি প্রাপ্ত হন, তদবধি বানিয়াচঙ্গের “দেওয়ান”গণ ঐ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। এখানে আর একটি কথা বক্তব্য। আলম খাঁ ও বিজয়-কন্যার ঘটনাটিকে রূপান্তরিত করিয়াই বোধ হয় একটি গীতিকা বিরচিত হইয়াছিল (মৈমনসিংহ-গীতিকা, ১ম খণ্ড)।

এই সকল ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যদিও শ্রীহট্ট জেলার অনেক নবাবই মুসলমান, তথাপি ইহাদের অনেকেই ব্রাহ্মণ-রাজকুল-জাত। যে সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশ মুসলমানদের অধিকৃত হইয়াছিল,—সে সময়েও শ্রীহট্ট বহুদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণাধিকারে ছিল, এজন্যই এই প্রদেশে বহু পণ্ডিত ও গুণী জন্মিয়া স্মরণীয় হইয়া আছেন।

শ্রীহট্ট এক সময়ে নানারূপ শিল্পের জন্ত বিখ্যাত ছিল। লঙ্করপুরের ‘উনি চান্দর,’

হবিগঞ্জের উত্তরে মাহলিয়া গ্রামের ‘এণ্ডি’ (নমঃশুভ্রেরা ইহা প্রস্তুত করে), গায়ে দিবার যুগীদের “গেলাপ”, ৭০ হাত দীর্ঘ ৬ হাত প্রস্থ মৎস্ত ধরিবার জাল, ‘ঝাঁকিজাল’, ‘হরাজাল’, ‘খেতজাল’, ‘হৈফাজাল’, ‘উধাল জাল’, ‘সদ্বাজাল’, ‘কার্তিজাল’, ‘হাটজাল’, ‘পেলুইনজাল’, ‘বাথেরজাল’, ‘পাখীরজাল’ প্রভৃতি কত প্রকার জালই প্রস্তুত হইত। তাহাদের উপযোগিতা ও প্রয়োজন কমে নাই। আমরা দুর্লভ দ্বিবশতঃ এই শিল্পটি হারাইতেছি, পূর্ববঙ্গ বড় বড় নদ-নদীর লীলাভূমি—সেই নদনদীর তরঙ্গের সঙ্গে তাল রাখিয়া এই বিচিত্র শিল্প শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সকল নদনদী এখনও আছে, মৎস্ত-হারের প্রবৃত্তি কিছুমাত্র কমে নাই। ভদ্রলোকেরা এখন বহুমূল্য

বিলাতী বড়শি লইয়া পুকুরের তীরে বকের মত বসিয়া থাকেন, কচিং চুই একটি মৎস্ত দৈবযোগে তাঁহারা পাইয়া কৃতার্থ হন। এখন প্রয়োজনের কথা কেহ বলে না। উহা সখে দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীহট্টের রণতরী ও জাহাজ এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। মোগলাধিকারের সময়ে লাউড়াধিপতিকে সমর-তরীই রাজস্বস্বরূপ দিতে হইত। ভাটেরার তাম্রফলকে ঈশান দেবের ‘সমরতরী’র উল্লেখ আছে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে লিওসে সাহেব একাদশ সহস্র মণ-বাহী এক জাহাজ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি বিশখানি জাহাজের একটি বহর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এখনও হবিগঞ্জ অঞ্চলে দীর্ঘ ‘পলওয়ার নৌকা’ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সুনামগঞ্জের সুরজিত কাঠের খেলানা এবং কাঠপাছকা (খড়ম) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তরপের কচুয়াদি গ্রামে উৎকৃষ্ট বেহালা প্রস্তুত হয়। নবিগঞ্জ ও আখাইলকুড়ার রথে কাঠ-শিল্পের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ প্রশংসারযোগ্য।

শ্রীহট্টের “পাটিয়ারা দাস” নামক এক শ্রেণীর লোক বেতের পাটী প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহা উৎকৃষ্ট নৈপুণ্যের পরিচায়ক। জলসুখা, জগন্নাথপুর, জফরগড়, প্রতাপগড়, চাপঘাট প্রভৃতি স্থানে ঐ শিল্প বিশেষ শ্রীসম্পন্ন ছিল। এক একখানি পাটীর মূল্য ২০০ টাকা পর্য্যন্ত হইত। ধুলিছুরার (ইটার অন্তর্গত) শিল্পী যহরাম দাস ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কুবি-প্রদর্শনীতে ২০ টাকা মূল্যের একখানি পাটী দেখাইয়া স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন।

ইহাছাড়া মেয়েদের কাঁথা-শেলাই অতি উৎকৃষ্ট শিল্প ছিল। ঢাকা-দক্ষিণের মেয়েদের এ বিষয়ে কৃতিত্ব অসাধারণ ছিল। শ্রীহট্টের হাতীর হাতের কাজ, শাঁখা-শিল্প, ‘চাঁচ’ বা বাঁশের দরমাতে অতি সুন্দর নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইত। জগন্নাথপুর ও জলসুখা হইতে ১৯০২ খৃঃ অব্দে ১৪,০০০ মণ দরমা বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়াছিল। শ্রীহট্টের শিল্পীর হাতের বাঁশের টুকরি, ধামা, পাখীর পিঞ্জর, পেটারী, বাক্স, মোড়্য, চেয়ার উল্লেখযোগ্য। শ্রীহট্টের পাতার ছাতি প্রশংসনীয়। সেখাটস্থ কারিগরের হাতের বাঁশ ও বেত-নির্মিত একটি ছোট গৃহ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডের প্রদর্শনীতে বিশেষ প্রশংসা ও পারিতোষিক পাইয়াছিল।

শ্রীহট্টের ঢাল একসময়ে ভারত-প্রসিদ্ধ ছিল। শ্রীহট্ট এক সময়ে কামান-নির্মাতার অস্থ

খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ইটার পাঁচগাঁয়ের কর্মকারগণের পূর্বপুরুষ জনাৰ্দ্দন কর্মকার ১০৪৭
 হিজরী সনে হরবল্লভ নামক এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে প্রসিদ্ধ ‘জাহান-
 কামান’ কামান তৈরী করিয়াছিল, ইহার দৈর্ঘ্য ১২ হাত, পরিধি
 তিন হাত, মুখের বেড় ১২ হাত ও অগ্নি-সংযোগের ছিদ্র দেড় ইঞ্চি।

আমাদের প্রত্যেক দেশের কর্তব্য, তথায় কোন্ কোন্ স্থানে এখনও এই মহিমাঘিত
 ভারতীয় শিল্পের স্থানে ছই একটি শুলিঙ্গ পাওয়া যায় তাহার একটা বাৎসরিক বিবরণ প্রস্তুত
 করা; সমস্ত শিল্পই তো ধ্বংস পাইয়াছে, যদি কিছু কোথায়ও থাকে—তবে তাহার
 অল্পবোলাগণের চেষ্টা করা এবং তাহার মূলে উৎসাহের বারি সেচন করিয়া সেগুলির জীবন রক্ষা
 করার চেষ্টা করা।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মণিপুর

‘মণিপুর’ মহাভারতোক্ত মণিপুর কিনা, তৎসম্বন্ধে আমরা ৩১-৩২ পৃষ্ঠায় আলোচনা
 করিয়াছি। ত্রিপুরার উত্তর ও কাছাড়ের পূর্বে এই রাজ্যের সীমানা। লগতাক্ হ্রদের
 পাশ্বেবর্তী স্থান প্রকৃতির সুরমা নিকেতন। ইক্ষালতুরেল-আদি নানা নদী এই হ্রদের
 মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, মনে হয় যেন নূতন রাজধানী নির্মাণ করিয়া রাজরাজেশ্বরী-
 বেশে বীণাপাণি সেই সকল নদীর নিকণ-মধুর-রবে বীণা বাজাইতেছেন। প্রকৃতির
 এতপ মনোরম ও অপূর্ণ সৌন্দর্য্য সচরাচর দৃষ্ট হয় না। রাজারা বক্রবাহন হইতে
 তাহাদের বংশাবলী টানিয়া আনিয়াছেন। মিতাই রাজবংশাবলীতে ৬২টি রাজার নাম
 পাওয়া যাইতেছে। বক্রবাহন যদি সত্যই এই রাজগণের আদিপুরুষ হইয়া থাকেন, তবে
 বংশাবলীর পূর্ববর্তী বহু নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পাঁচ রাজ্যে এক শতাব্দী ধরিলে
 ৬২টি রাজা ১২ শত বৎসরের কিছু উচ্চ সময় যাবৎ রাজত্ব করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত হয়। উহা
 খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে এরূপ পরিকল্পনা করা যায়। এই রাজগণের
 প্রথমে পাখংবার নাম পাইতেছি। কৈলাসচন্দ্র সিংহ বলেন, এই রাজ্যের প্রকৃত নাম “মিতাই
 লেইপাক,” কিন্তু তিনি “মণিপুর” নামটি যত আধুনিক মনে করেন, আমাদের নিকট
 উহা সেরূপ আধুনিক বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ ৪৫ শত বৎসর পূর্বে লিখিত কোন কোন

পুস্তকে ঐ স্থানের নাম ‘মণিপুর’ বলিয়াই উল্লিখিত দৃষ্ট হয়।
 মিতাই রাজবংশ।

বাহা হউক এ বিষয়ে তত্ত্বাত্মসন্ধানের প্রয়োজন, কয়েকটি সাহেবের
 মতের উপর শিল্পের জায় নির্ভর করিয়া কোন প্রাচীন প্রবাদকে অগ্রাহ্য করা উচিত নহে।
 পূর্বাঞ্চলের প্রায় সর্বত্র, যেখানে যেখানে সমুদ্র মাতৃবের বসতির জন্ত একটু স্থান দিয়া

সরিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সৰ্ব্বত্রই আৰ্য্যগণ কর্তৃক অধ্যুষিত হইয়াছিল। ভগদত্ত, নরক প্রভৃতি রাজাদের অস্তিত্বে সন্ধিহান হওয়ার কোন কারণ নাই। স্বভাবের স্বরম্য নিকেতন মণিপুরে যে আৰ্য্যগণ পদার্পণ করেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? অবশ্য একথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে প্রাগজ্যোতিষপুর ও ত্রিপুরার মত এই মণিপুরেও কয়েক বিন্দু আৰ্য্য-রক্ত বিপুলায়তন কিরাত-রক্ত-সমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছিল।

পৌরাণিক জগতের স্বপ্ন-মহিমার ঘোর কাটাইয়া আমরা ঐতিহাসিক যুগের সংবাদ পাওয়ার জন্তই চেষ্টিত হইব। মণিপুর লকতক্ হুদে প্রবাহিত নদী সমূহের কর্দ্দমে সৃষ্ট—মৈয়াং, থোমান, অঙম, এবং লোয়াং এই চারিটি উপদ্বীপের সমষ্টি। মিতাই- (মিশ্র জাতি) গণের উপাত্ত “গুরু সিদবা,” “লাইব্রেন সেদরি,” “সেনামহি” প্রভৃতি রাজা এবং রাজ্ঞী দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছিলেন, ইহারা নাগাদিগের এক শাখা বলিয়াই মনে হয়। ইতিহাসের পূৰ্ব্ব যুগে পাহাড়িয়া কত অনাৰ্য্য জাতির দেব-দেবী যে আৰ্য্য-দেবতাগণের সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে মিশিয়া গিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা হ্রহ। এই বঙ্গদেশেও বহু অনাৰ্য্য দেবদেবী সংস্কৃত মন্ত্র দ্বারা শোধিত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও শক্তির অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছেন, ভারতের যত পূৰ্ব্বদিকে যাওয়া যায় ততই এই প্রভাব বেশী দৃষ্ট হয়। বিশেষ বৌদ্ধগণ জগতে তাহাদের “সঙ্ঘ” প্রচার করিবার জন্ত আৰ্য্য-অনাৰ্য্য-নির্কীৰ্ত্তারে সকলকে লইয়া পঙ্ক্তি করিয়াছিলেন, কাহাকেও বাদ দেন নাই। সেই মুক্ত পরিবেশে মণিপুর কেন, ভারতের সমস্ত জাতিই মিশ্রজাতিতে পরিণত হইয়াছিল। পাখংবা হইতে ৪৯ খাখি লাল ধোবা পর্য্যন্ত মিতাই রাজবংশের সকলগুলি নামই পাহাড়ী ভাষায়। ৫০ নং নিংখোখম্বার—উপাধি ‘ভরত’। এই সময় হইতেই বোধ হয় সংস্কৃত-মূলক সংশোধন আরম্ভ হয়। ৫১ নং রাজার নাম মরধা, কিন্তু উপাধি ‘গৌরী-শ্রাম’। ৫২ চিংখং খম্বার উপাধি ‘জয়সিংহ’। ৫৩ নং খাস সংস্কৃত—‘মধুচন্দ্র’। ৫৪ চৌরাজিং, ৫৫ মারজিং, ৫৬ গম্ভীরসিংহ, ৫৭ নরসিংহ, ৫৮ দেবেঙ্গসিংহ, ৫৯ চন্দ্রকীৰ্ত্তি, ৬০ স্বরচন্দ্র, ৬১ কুলচন্দ্র, ৬২ চুড়াচাঁদ। কৈলাস সিংহ অল্পমান করিয়াছেন, বৈষ্ণবেরাই ইহাদিগকে আৰ্য্যপথাবলম্বী করিয়া এই সকল উপাধি দিয়াছিলেন; কিন্তু রাজাদের নাম দৃষ্টে তাহা বোধ হয় না, যেহেতু ভরত, গৌরী-শ্রাম, মারজিং প্রভৃতি নাম বৈষ্ণব লক্ষণাক্রান্ত নহে। ১৬২৪ শকে (১৭০২ খৃঃ) ৪৭ নং রাজা চেরাইরংবা সামজুক-পতি মণিপুর আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হন। মণিপুরীরা এই প্রসঙ্গে “সামজুকডবা” (সামজুক-বিজয়) নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৬৩৬ শকে (১৭১৪ খৃঃ) ৪৮ নং রাজা পামহেইবা (উপাধি ‘করিকর মনওয়ারাজ’) ত্রিপুরেশ্বর দ্বিতীয় ধর্ম্মমানিক্যের সীমান্তরক্ষক সৈন্যদিগকে জয় করিয়া “তখলেংবা” (ত্রিপুর-বিজয়ী) উপাধি ধারণ করেন। মণিপুরীরা “তখলেংবা” নামক পুস্তকে এই যুদ্ধের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পামহেইবার সময় বৈষ্ণব অধিকারীরা মণিপুরে প্রবেশ করিয়া রাজাকে বৈষ্ণব দীক্ষা প্রদান করেন। ইহার পূৰ্ব্ব হইতেই মণিপুরে সংস্কৃতের আদর হইয়াছিল, এইবার রাজপরিবার বৈষ্ণব ধর্মে

দীক্ষা পাইয়া বিষ্ণুভাগবত (চৈতন্য-ভাগবত), ও চৈতন্য-চরিতামৃতাদি গ্রন্থের বিশেষ ভক্ত ও অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। ১৭৪১ শকের (১৮১৯ খৃঃ) পূর্বে মণিপুররাজ মারজিৎ কাছাড়পতি গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া উক্তদেশে অধিকার করিয়াছিলেন। এখন মারজিৎ স্বীয় ভ্রাতা চৌরজিৎ, গম্ভীরসিংহ ও বিশ্বনাথসিংহের সঙ্গে একত্র হইয়া স্থবিস্তৃত কাছাড় ও মণিপুর রাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মণিপুরের রাজা ব্রহ্ম-নৃপতির সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হন। ব্রহ্মের রাজ্য কাছাড় জয় করিলেন। গম্ভীরসিংহ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ইংরেজদিগের শরণাগত হইলেন। ইংরেজ সরকার ইহাদিগকে আশ্রয় দানপূর্বক “গম্ভীর সিং লেভি” নামক একদল সৈন্তের সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বান্দবোন নগরে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি হয়, তাহাতে ব্রহ্ম-রাজ গম্ভীরসিংহকে মণিপুরের রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। গম্ভীরসিংহ পুরুষ-সিংহ ছিলেন। ইংরেজেরা মুক্তকণ্ঠে ইহার বীরত্বের কথা স্বীকার করিয়াছেন (Wilson's, Burmese War, p. 207)। ব্রহ্মযুদ্ধের পর ব্রহ্মদেশের পশ্চিমে কাইবো পরগনা গম্ভীরসিংহের রাজ্যের অন্তর্গত হয়, যদিও ব্রহ্ম-রাজার দাবী অস্বীকার করিতে না পারিয়া ঐ পরগনা গভর্নমেন্টকে ফিরাইয়া দিতে হয়, তথাপি গম্ভীরসিংহ ক্ষতিপূরণার্থ ইংরেজ সরকার হইতে বাৎসরিক ৬,০০০ টাকা প্রাপ্ত হইতে থাকেন। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে মণিপুর রাজ্যের আয়তন বর্দ্ধিত হইয়া ৭,০০০ বর্গ মাইলে পরিণত হইয়াছিল। ঐ সালে রাজা গম্ভীরসিংহ পরলোক-গমন করেন। তাঁহার এক বৎসর বয়স্ক পুত্র চন্দ্রকীর্তিকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া সেনাপতি নরসিংহ রাজত্ব করিতে থাকেন।

নরসিংহকে হত্যা
করিতে নবীন সিংহের চেষ্টা
—১৮৪২ খৃঃ।

চন্দ্রকীর্তির জননী নবীনসিংহ নামক এক গুপ্ত ব্যক্তির প্রবর্তনায় নরসিংহের প্রভুত্ব বিলোপ করিবার জন্য তাঁহাকে হত্যা করিবার যড়যন্ত্র করেন। নরসিংহ যখন দেবমন্দিরে পূজায় নিরত ছিলেন,

তখন নবীনসিংহ তাঁহার উপর অতর্কিতভাবে খড়্গাঘাত করে (১৮৪২ খৃঃ)। নরসিংহ হস্তে আঘাত পান, কিন্তু তাঁহার জীবন রক্ষা পায়। নরসিংহ রাণীর কীর্তি শ্রবণ করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন এবং নবীনসিংহকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ৬ বৎসর কাল রাজা থাকিয়া নরসিংহ ১৭৭২ শকে (১৮৫০ খৃঃ) পরলোক-গমন করেন। নরসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রসিংহ রাজা হইয়া মাত্র তিন মাস রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সপ্তদশ বর্ষীয় বালক চন্দ্রকীর্তি একদল সৈন্ত লইয়া বীর-বিক্রমে স্বীয় পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করেন। মহারাজ চন্দ্রকীর্তি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগত হন, তৎপুত্র স্বরাজ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

এই মণিপুর রাজ্য এখন সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী; মহাপ্রভুর রাজত্বে যাহারা বাস করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে মণিপুরীদের মত ভক্তিমান আর কেহ আছেন কিনা জানি না। চৈতন্যের জন্মোৎসবে শত শত নরনারী পথের সর্ববিধ কষ্ট সহ্য করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া সোৎসায়ে যোগদান করে, তাহা শ্রবণীয়। নবদ্বীপ পল্লী দূর হইতে দেখিয়া ইহারা চৈতন্যের নাম করিয়া উজ্জৈঃস্বরে কাদিতে থাকেন, কেহ কেহ বহুদূর হইতে বৃকে

হাটিয়া মন্দির-পঞ্চবর্তী হয়। মণিপুরী মেয়েদের রাস-নৃত্য—নৃত্যকলার সম্পদ, তাঁহাদের হাতের নানারূপ শিল্প অতীব প্রশংসনীয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মেদিনীপুর

মাদলাপঞ্জী অনুসারে পুরাকালে উড়িষ্যা রাজ্য ৩১টি “দণ্ডপাঠ” বা খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে বর্তমান মেদিনীপুর ৬টি ‘দণ্ডপাঠ’ লইয়া স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিগণিত হয় : (১) টানিয়া, (২) নারায়ণপুর, (৩) ভঙ্গভূমি বারিপদা, (৪) নইগাঁ, (৫) জৌলতি, (৬) মালঝিটা।

(১) টানিয়া=বর্তমান কালে বালেখরের কিয়দংশ ও দাতন থানা। (২) নারায়ণপুর=নারায়ণ গড়। (৩) ভঙ্গভূমি বারিপদা=মেদিনীপুর, কেশপুর, শালবনৌ, খজাপুর, বিনপুর, ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর থানা, এবং ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অধিকাংশ। (৪) নইগাঁ ও জৌলতি=এগরা নগরী, পটাশপুর ও সবঙ্গ। (৬) মালঝিটা=রামনগর, কাঁধি, খাজুরি ও ভগবানপুর থানা।

যখন মাদলাপঞ্জীর এই বিভাগ উল্লিখিত হয়, তখন তমলুক (তামলিগু) উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল না, এজন্ত উহার নাম এই তালিকায় নাই।

আকবর মেদিনীপুর জেলার যে নূতন বিভাগ করেন, তাহাতে এই জেলার অধিকাংশই সরকার জলেখরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। রাজা তোদড় মল্ল-কৃত বিভাগে জলেখরের অন্তর্গত কুড়িটি মহাল মেদিনীপুরের মধ্যে পড়িয়াছে :—(১) ঘগড়ী, (২) ব্রাহ্মণভূম, (৩) খরকপুর, (৪) কুতুবপুর (মহাকাল ঘাট), (৫) মেদিনীপুর, (৬) কেদারকুণ্ড, (৭) সবঙ্গ, (৮) কাশীজোড়, (৯) তমলুক, (১০) নারায়ণপুর, (১১) তরকোল, (১২) মালঝিটা, (১৩) বালি সাহী, (১৪) ভোগবাই, (১৫) দ্বাদশভূম, (১৬) জলেখর, (১৭) গগনপুর, (১৮) রাইন, (১৯) করোই, (২০) বাজার।

মেদিনীপুর জেলার তমলুকের প্রাচীন বন্দর বিশ্ববিশ্রুত; এখানকার বর্গভীমার মন্দির একটি মহাতীর্থ। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত জগমোহন পণ্ডিতের “দেশাবলী বিবৃতি” নামক পুস্তকে লিখিত আছে তখনও আদিগঙ্গার পশ্চিমের অনেকগুলি পল্লীকে লোকে ‘তমলুক’ বলিত। তদনুসারে বেহালা, বড়িশা, মণ্ডলঘাট প্রভৃতি সমস্ত দেশই তমলুকের অন্তর্গত ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই “দেশাবলী বিবৃতি” উদ্ধার করিয়াছেন। পাটনার সুবেদার বিজয়লদেব নামক এক চৌহান রাজার আদেশে জগমোহন পণ্ডিত ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে

ভারতবর্ষের এই ভৌগোলিক বিবরণ সংস্কৃতে প্রণয়ন করেন। এই বিবরণ হইতে জানা যায় যে মেদিনীপুর জেলার কতকটা 'ভান দেশ' নামে পরিচিত ছিল।

মহাভারতে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা মত উল্লেখ-বোধ্য। পূর্বে এই তাম্রলিপ্তের আর একটি নাম ছিল "দামলিপ্ত"। দামল জাতীয় লোকের নিবাসবশতঃ ঐ নাম হইয়াছে এবং এই "দামল" জাতিই ক্রমে দক্ষিণ-দেশে যাইয়া "তামিল" নামে পরিচিত হইয়াছে। তাহা হইলে মেদিনীপুর জেলার আদিম লোকেরাই তামিল দেশের প্রতিষ্ঠাতা। তমলুকের আরও অনেক গৌরবের কথা আছে। মহাভারতের আদিপর্বে, সভাপর্বে, দ্রোণপর্বে এবং ভীষ্মপর্বে তাম্রলিপ্তের বৈরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান করা যায় যে এককালে তাম্রলিপ্ত একটি স্বতন্ত্র এবং বৃহৎ রাজ্য ছিল। জৈমিনীয় ভারতে তাম্রলিপ্তের (ময়ূরভূজের পুত্র) সঙ্গে অর্জুনের যে যুদ্ধ-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, অনেকে মনে করেন উক্ত রাজাদের তাম্রলিপ্তই রাজধানী ছিল।

মহাভারতের পরবর্তী সময়ে আমরা জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে তাম্রলিপ্তের বহু উল্লেখ দেখিতে পাই। জৈন গুরু ভদ্রবাহর (চন্দ্রগুপ্তের দীক্ষাগুরু) প্রধান শিষ্য গোদাস জৈনদিগের চারটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন, তন্মধ্যে "তাম্রলিপ্তিকা" অত্যন্ত। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক লেখক রচিত "Periplus of the Erythraean" (ইংরেজী নাম) পুস্তকে তাম্রলিপ্ত যে ভারতীয় প্রধান বন্দরগুলির একটি, তাহা উল্লিখিত আছে। উত্তর-ভারত হইতে ভারত-সাগরের দ্বীপগুলিতে যাতায়াত তাম্রলিপ্ত বন্দর দ্বারা সম্পাদিত হইত। এই বন্দরের চারিদিকে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও কুপের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, এমন কি প্রমাণিত হইয়াছে যে বর্গভীয়ার মন্দির একটি প্রাচীন বৌদ্ধকুপের উপর নির্মিত। মেগেস্থেনিস সম্ভবতঃ এই তাম্রলিপ্তবাসীদিগকেই "তালুক" নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং গ্রীক লেখক প্লিনিও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। "তালুক" জাতি অতি পরাক্রান্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। চন্দ্রগুপ্ত কিংবা তৎপুত্র বিন্দুসার কেহই তাম্রলিপ্ত রাজ্য অধিকার করিতে পারেন নাই। অশোক যে যুদ্ধে অসংখ্য লোক বিনষ্ট করিয়া কলিঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন—সেই কলিঙ্গের সৈন্তগণ বোধ হয় তাম্রলিপ্তবাসীরাই ছিলেন, ইহারাই তখন অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিলেন। হিউনসান্স তাম্রলিপ্ত নগরে অশোকের অশ্বশাসন-স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অশোকের অশ্বশোচনা দুর্দান্ত কলিঙ্গবাসীদিগকে কতকটা নিরস্ত করিয়াছিল। এই তাম্রলিপ্তের জাহাজে অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্র ও সহোদরা সত্যমিত্রা (মতান্তরে পুত্র ও কন্যা) সিংহলে গিয়াছিলেন। চীন পরিব্রাজক ফাহায়েন (৪১১-৪১২ খৃঃ) দুই বৎসর তাম্রলিপ্তে বাস করিয়া তথা হইতে অর্ধবদানে সিংহলে যাত্রা করেন। তিনি এই স্থানে ২৪টি সঙ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে হিউনসান্স তাম্রলিপ্তে ১০টি বৌদ্ধমঠ ও সহস্রাধিক শ্রমণ দেখিয়াছিলেন। ৬৩৫ খৃঃ অব্দে তাম্রলিপ্ত একবার সমুদ্র-দৌত হইয়াছিল। হিউনসান্সের পর ৬৭৩ খৃঃ অব্দে ইচিং নামক চৈনিক পরিব্রাজক কাংচাউ নগর হইতে সমুদ্রযানে তাম্রলিপ্ত নগরে আগমন করিয়াছিলেন।

ইহারা ছাড়া তাও-লিন, তাং চেং তেং, হইলুন, উহিং চেংকন, চাংমিন প্রভৃতি বহু সংখ্যক চীন-পর্যটক তাম্রলিপ্তের বন্দরে আসিয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত পর্যটক তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধির যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে এই দেশের তত্তৎকালের বাণিজ্যের প্রসার এবং সমস্ত বিষয়ে গৌরবের কথা উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

বদিও অশোকের পরে কলিঙ্গ ও তদন্তর্গত তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা হারাইয়া সামন্তরাজ্যে পরিণত হয়, তথাপি এই প্রদেশ তখনও প্রবলপরাক্রান্ত ছিল। ১০২৫ খৃঃ অব্দে রাজেন্দ্র-চোল তাম্রলিপ্ত ও তৎসম্বিহিত স্থানগুলির অধিপতি ধর্মপালকে (দণ্ডভুক্তির অধীশ্বর) জয় করিয়াছিলেন বলিয়া তিরুমলয়ের শিলা-লিপিতে ঘোষণা করিয়াছেন। রামপাল একাদশ শতাব্দীতে যে সমান্ত-চক্র রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কোটাটবীর বীরগুণ, দণ্ডভুক্তির জয়সিংহ ও অপারমন্দারের অধিপতির উল্লেখ আছে; ইহাদের তিন জনই যে উড়িষ্যার রাজা তাহাতে সন্দেহ নাই। দণ্ডভুক্তি মেদিনীপুর জেলার দাতন ও তৎসম্বিহিত স্থানগুলি, অপারমন্দারের বর্তমান নাম মান্দারণ। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কর্ণগড়ের রাজা কর্ণসেন—ধর্মপাল রাজার স্থালিকা রজাবতীর স্বামী ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র শ্রুতকীর্তি লাউসেন বা লবসেন ধর্মমঙ্গল-কাব্যের নায়ক। লাউসেন, কাঁউর- (কামরূপের) অধিপতি এবং হরিপাল প্রভৃতি রাজাদিগকে পরাজয় করিয়া “অজয় ঢেকুরের” অধিপতি সোমঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষকে নিহত করেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বোড়শ শতাব্দীর আদি-সময় পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০ শত বৎসর কাল গঙ্গাবংশীয় রাজারা উড়িষ্যা শাসন করিয়াছিলেন, ইহারা বাঙ্গালী ছিলেন এবং ইহাদের আদি পুরুষ অনন্তবর্মা গাঙ্গারাঢ়ী (গঙ্গা সম্বিহিত তমলুক ও মেদিনীপুরের) রাজা ছিলেন। তিনি সমস্ত উড়িষ্যা বিজয় করিয়াছিলেন।

খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তাম্রলিপ্ত হইতে পেগুতে যাতায়াত করিতেন। পেগুর কল্যাণ-গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে ইহা জানা যাইতেছে, এবং ১০০১ খৃঃ অব্দে তাম্রলিপ্তের জনৈক রাজা তাম্রলিপ্ত হইতে চীন দেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, এ কথা উল্লিখিত আছে (Hamilton's East India Gazetteer, Vol. II, p. 682)।

সুতরাং এই মেদিনীপুর ও তদন্তর্গত তমলুক সর্ব-ভারত-প্রসিদ্ধ এবং বাঙ্গালীর বিশেষ গৌরবের রাজ্য। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে রূপনারায়ণের খাদে উইলসন সাহেব (মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট) কতকগুলি মুদ্রা প্রাপ্ত হন। উহা সচ্ছিন্ন এবং কোন রাজার নাম বা অঙ্ক তাহাতে নাই, কোন কোনটিতে পশুপাখীদের মূর্তি অঙ্কিত। তমলুকের আদিম পরাক্রান্ত রাজাদের সময় খৃঃ পূঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে ঐ মুদ্রাগুলি নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই রাজাদের কাহারও সঙ্গে অশোকের ইতিহাস-বিশ্রুত সংঘর্ষ হইয়াছিল। দীনবন্ধু মিত্র ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে কতকগুলি “পুরাণ” নামক মুদ্রা তমলুকে পাইয়াছিলেন। এই পুরাণ মুদ্রা বহু প্রাচীন। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে তমলুকে কণিষ্কের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, ইহা ছাড়া কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি কোন কোন গুপ্ত-রাজত্বের মুদ্রা তমলুক ও মেদিনীপুরের অন্তর্গত স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রা দেখিলে তমলুকের

প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। ভারতবর্ষের আদি ঐতিহাসিক যুগ হইতে পরবর্তী সভ্যতার ইহারা পর পর সাক্ষী। এখনও এই সকল স্থানের বিশেষরূপ সন্ধান হয় নাই, ভূগর্ভে যে অনেক প্রমাণ অজ্ঞাত অবস্থায় বর্তমান—তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এই দেশের অনেক স্থলেই আছে।

এই দেশ কয়েকটি কারণে বাঙ্গালীর চিরস্মরণীয়। অশোক কলিঙ্গ-দেশে কোন রাজার সঙ্গে তরুণ ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু তখন তাম্রলিপ্তই সে দেশের মুখ-পাত ছিল এবং সেই স্থানের শৌর্যবীর্যের কথা মহাভারতের সময় হইতে নানা স্থত্রে আমরা জানিতে পারি। তাহা হইলে খুব সম্ভব কলিঙ্গ-যুদ্ধের নেতা ছিলেন, তমলুকের অধিপতি; সেই সময়ে উড়িষ্যার আর কোন রাজা এত প্রবল ছিলেন না। খারবেল সেই সময়ের পরবর্তী। যদি তমলুকের লোকেরা এই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব ও সাহস দেখাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন, তবে এই স্থান হইতেই অশোকের মনের উপর যে বিপ্লব চলিয়া গিয়াছিল সমস্ত জগৎবাসী সেই মানসিক পরিবর্তনের ফলভাগী হইয়াছিলেন। হিউনসাঙ্গ তাম্রলিপ্তে অশোকের যে ২০০ ফুট উচ্চ স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন, তাহা তাহার বিজয়-স্তম্ভ কিনা বলা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ বঙ্গদেশের এই তমলুক বন্দর বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু কত শত সাধুর পদরঙ্গুপুত তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বিশ্ববিশ্রুত হিউনসাঙ্গ, ইচিং, ফাহায়েন প্রভৃতি বিদেশী পর্য্যটকগণ এই স্থানে অর্ণবস্থানে আসিয়াছিলেন, এবং এদেশ দেখিবার অল্প নানাকল্প স্বীকার করিয়াছিলেন। যে বৌদ্ধ ভিক্কুর দল যুগে যুগে এই দেশ হইতে যাবা, বালী, স্রমিত্রা, শ্রাম, পেণ্ড, কাম্বোডিয়া, সিংহল এবং বহু উপদ্বীপে ধর্ম প্রচারার্থ গমনাগমন করিয়াছেন, মহেন্দ্র ও সজ্জমিত্রা হইতে—আচার্য্য বোধিধর্ম (৫২৬ খৃঃ অব্দে) তাওলীন এবং তাং চেং তং পর্য্যন্ত শত শত সাধু ভারতসাগর অতিক্রম করিয়া দূরদূরান্তরে গিয়াছিলেন, তাহাদের সকলকেই এই পথের পথিক হইতে হইয়াছিল। ফাহায়েন ছইটি বৎসর তাম্রলিপ্তে বসিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন এবং ছবি অঙ্কন করিতে শিখিয়াছিলেন,—সুতরাং এই দেশটি যে বৌদ্ধ ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, এবং এখানে যে বিস্তৃত পাঠাগার ও বহু সজ্জারাম ছিল, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমরা অনুমান করিতে পারি, বঙ্গীয় গল্পসাহিত্যে যাহারা বিখ্যাত, সেই ধনপতি ও ত্রীপতি সদাগর মঙ্গলকোট হইতে এই তমলুকের বন্দর দিয়া সিংহলে গিয়াছিলেন। বাঙ্গলার শত শত অর্ণবপোত এই বন্দরে বাধা থাকিত, এবং বাণিজ্য-সম্ভার, শিল্পদ্রব্য এবং বাঙ্গলার ধর্ম লইয়া সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণ করিত। তাম্রলিপ্ত জৈনদিগের চতুর্গাম সম্প্রদায়ের অগ্রতম প্রধান কার্য্য-কেন্দ্র ছিল।

তৃতীয়তঃ এই তমলুকের রাজা অনন্তবর্মা (১০৭৮-১১৪২ খৃঃ) সমস্ত উড়িষ্যাদেশ জয় করিয়া প্রসিদ্ধ গঙ্গাবংশ তন্দেশে স্থপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিছুদিন পঞ্চ শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালী গঙ্গাবংশ উড়িষ্যার অধিকারী ছিলেন, ইহা মেদিনীপুরবাসী তথা সমস্ত বাঙ্গালীর কম গৌরবের কথা নহে। এই মেদিনীপুর এক সময়ে জঙ্গলাবৃত ছিল, এখান হইতে ঝাড়খণ্ডের বিশাল অরণ্য দূরবর্তী ছিল না। বোড়শ শতাব্দীতে (১৫১০ খৃঃ)

চৈতন্যদেব পদব্রজে দশ ক্রোশ ব্যাপক এক স্রবহং জঙ্গল অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং প্রায় এক শতাব্দী পরেও শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্রামানন্দ এই জঙ্গল পাড়ি দিয়া বন-বিষ্ণুপুরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এককালে এই জনপদ দণ্ড্য-তরুরের আবাসভূমি ছিল এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ দুর্গ আশ্রয় করিয়া অনেক রাজবংশই এই প্রদেশ শাসন করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে সংক্ষেপে তাঁহাদের কয়েকটির উল্লেখ করিয়া যাইব।

কেহ কেহ অনুমান করেন, তাম্রলিপ্তের বরাহ-মন্দিরটি বোধাই প্রেসিডেন্সীর কালাভূগ জেলায় চালুকা বংশীয় দ্বিতীয় পুলকেশীর বংশীয় কোন রাজা কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। পুলকেশী ষষ্ঠ শতাব্দীতে কলিঙ্গের কতকাংশ জয় করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ কতক কালের জন্ত তাঁহার বংশধরেরা মেদিনীপুর ও তমলুকে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরানে তমলুকের রাজা দেব-রক্ষিতের নাম পাওয়া যায়। যদি ঐ পুরাণ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত হইয়া থাকে, তবে দেবরক্ষিত ঐ সময়ে রাজা ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নাই।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংগৃহীত রামচন্দ্র নামক জনৈক কবি-রচিত একখানি পুরাতন সংস্কৃত পুঁথিতে (ত্রয়োদশ শতাব্দী) দেখা যায়, তখন তাম্রলিপ্তের রাজা গোপীচন্দ্র ছিলেন; ইনি ছত্রেখরী মন্দিরে এক ব্রাহ্মণের শিরচ্ছেদ করেন এবং শেষে অনুতপ্ত হইয়া গঙ্গাসাগরে আত্মবিসর্জনপূর্বক প্রায়শ্চিত্ত করেন।

রাজার মৃত্যুর পর কৈবর্ত জাতীয় কাকর দেশের রাজা (সম্ভবতঃ কালভূঞা) রাজধানী তিন দিবস নির্ব্বিচারে লুণ্ঠন করিয়া শেষে রাজা হন।

এই রাজার বংশের তালিকায় তাম্রধ্বজের বংশের সঙ্গে অপিচ গোপীচন্দ্র ও দেবরক্ষিতের সঙ্গে বংশলতা জড়িত করার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু মেদিনীপুরের ইতিহাস-লেখক যোগেশ-চন্দ্র বসু মহাশয় নানা কারণে ঐরূপ বংশাবলী বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন (১০২-১০৩ পৃঃ)।

ময়ূরধ্বজ, তাম্রধ্বজ (জৈমিনীয় ভারতোল্লাস), হংসধ্বজ, গরুড়ধ্বজ, বিজ্ঞানরায় প্রভৃতি ৩৬ জন নৃপতির নাম এই তালিকায় আছে, তারপর কালভূঞার নাম। কিন্তু সময়ের অসামঞ্জস্যের দরুন উক্ত হইয়াছে যে দেবরক্ষিত, গোপীচন্দ্র প্রভৃতি অনেক রাজার নাম তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতের নাম দেখিলেই আমাদের একটু দ্বিধার ভাব হওয়া স্বাভাবিক। বাস্তবিক এমন কি সমগ্র আর্য্যাবর্তেরও বহু সংখ্যক রাজবংশের আদিপুরুষ চন্দ্র-সূর্য্য বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, এরূপ জনশ্রুতিও অনেক বংশাবলীতে বিবৃত হইয়াছে, রাজ-বংশাবলী লেখকদের এই স্বভাব কিছু নূতন নহে। গোপীচন্দ্রকে ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; কালভূঞা কৈবর্ত। ময়ূরধ্বজ, তাম্রধ্বজ হইতে নিঃশঙ্ক-নারায়ণ রায়—বংশলতায় উক্ত ৩৬টি রাজার প্রত্যেকের নাম বিশুদ্ধ-সংস্কৃতায়ক, তাহাতে বেশ একটা পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে—কিন্তু তারপরই নামের নমুনা এইরূপ—কালভূঞা, ধান্ডভূঞা, মুরারিভূঞা, হরবারভূঞা ও ভান্ডভূঞা। ভান্ডভূঞার মৃত্যু হয় ১৪০৩ খৃঃ অব্দে। সুতরাং কালভূঞার সময় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ধরা যাইতে পারে।

যখন রামপাল গোড়রাজ্যে ভীম-কৈবর্ত ও তাঁহার দলবলের উচ্ছেদ সাধন করেন, তখন সম্ভবতঃ তাঁহাদের অনেকে উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হইয়া পরবর্তী ২।১ শতাব্দীর মধ্যে বলসঙ্কল্পপূর্বক তমলুক অধিকার করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ 'মেদিনীকোষ' রচয়িতা মেদিনীকর 'মেদিনীপুর' প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পিতা প্রাণকর নামক জনৈক রাজা এই অঞ্চল ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের পূর্বভাগে শাসন করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে মেদিনীকর ১২০০ হইতে ১৪৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে তাঁহার কোষ-গ্রন্থ রচনা করেন। রাজা গণেশের সভাসদ বৃহস্পতি মতিলাল ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে অমর-কোষের যে টীকা প্রণয়ন করেন, তাহাতে মেদিনীকোষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যোগেশ বঙ্গ মহাশয় অনুমান করেন ১২৩৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে মেদিনীকরের সময় নিরূপণ করা বাইতে পারে। কর বংশের একখানি তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয়, ইহারা ভুবনেশ্বর অঞ্চল পর্য্যন্ত রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অনঙ্গভীমদেবের দ্বারাই এই কর বংশের ধ্বংস সাধিত হয়। "পণ্ডিত সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, করেরা বৈষ্ণব।" (যোগেশ-বাবুর ইতিহাস, ১২৮ পৃঃ)। শাস্ত্রী মহাশয় ইহাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া মনে করেন এবং যোগেশবাবু ইহাদিগকে তাণ্ডুলী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, যেহেতু সেই অঞ্চলে 'কর' উপাধিদারী অনেক তাণ্ডুলী দৃষ্ট হয়। আমার অনুমান, এই তিন মতই সত্য। করেরা প্রথমতঃ বৈষ্ণব ছিলেন, তৎপরে বৌদ্ধ হইয়া জাতিচ্যুত হওয়ার দরুন শেষে তাণ্ডুলীদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। সাভারের হরিশ্চন্দ্র রাজারও ঠিক এই গতি হইয়াছিল (২৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

মেদিনীপুরের অতীত ইতিহাস-লেখক ত্রৈলোক্যনাথ পাল নারায়ণগড়ের রাজাদের বিস্তৃত ইতিহাস দিয়াছেন। এই রাজবংশ ১২৭৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৮৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ২৬ পুরুষ রাজত্ব করিয়াছেন।

ইহাদের প্রথম রাজা গঙ্গর্ক ১২৭৩ খৃঃ অব্দে এতদেশের শাসনকর্তৃ-স্বরূপ জগন্নাথ দেবের ন্যাকুণ্ডস্থিত চন্দন দ্বারা খুরদার রাজা কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তদবধি ইনি এবং ইহার বংশধরগণ "শ্রীচন্দন" উপাধি-লাভিত।

রাজা গঙ্গর্ক-শ্রীচন্দন পালের পুত্র নারায়ণবল্লভ-শ্রীচন্দন পালের নামানুসারে এই স্থান নারায়ণগড় নামে অভিহিত হইয়াছে। রাজা গঙ্গর্ক ব্রহ্মাণী দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ত্রৈলোক্যবাবু লিখিয়াছেন, "যে দিন ভগবতী ব্রহ্মাণী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন, সেদিন মন্দিরভিত্তরে যে ঘৃত-প্রদীপ জলিয়াছিল ৬২০ বৎসর সেই দীপ সমভাবে জলিয়া আলো দান করিয়াছে।

এক মুহূর্তের জ্বলও নির্দোষিত হয় নাই।" এই বংশের শেষ রাজা পৃথ্বী-বল্লভের জীবনদীপ নির্দোষের সঙ্গে সঙ্গে বিগত ১২২০ সালে (১৮৮৩ খৃঃ) সেই সুচির-প্রজ্বলিত দীপ-শিখা অকস্মাৎ নির্দোষিত হইয়াছে। রাজা গঙ্গর্ক ১২৯৬ খৃঃ অব্দে পরলোক-গমন করেন, তদীয় মহারাজ্ঞী পুণ্যশীলা মধুমঞ্জরী স্বামীর চিত্তানলে সহগামিনী হন।

রাজা গঙ্গর্ক-শ্রীচন্দন পাল—
১২৭৩-১২৯৬ খৃঃ।

নবাব ও ইংরেজ পৈতৃকদের রসদ-সংগ্রহ, দস্তাভিগের ক্রমাগত নিরীহ গৃহস্থদিগকে উৎপীড়ন, অন্তর্দিকে ৭৬এর মহাস্তর—প্রভৃতি উপদ্রবে দেশবাসীরা নারায়ণগড় ছাড়িয়া চলিয়া বাইতে লাগিল। সুশীর্ষ ২১টি বৎসর রাজ্যভোগ অথবা দুর্ভোগ ভুগিয়া রাজা পরীক্ষিত পরলোক-গমন করেন।

এই দেশে মুসলমান অধিকারের প্রতিষ্ঠা-কাল ১৫৬৮ খ্রী বাইতে পারে। তৎপূর্বে হিজলীতে তাজ খাঁ একটি ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। উত্তরকালে প্রতাপাদিত্য হিজলীর অধিকার মুসলমানদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন। আমরা গ্রন্থভাগে দেখাইয়াছি, উড়িষ্যা এক সময়ে মোগলদের বিরুদ্ধে পাঠানদের বড়বাহের অস্ত্রতম কেন্দ্রস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দাউদ খাঁ মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া উড়িষ্যার অব্যাহত অধিকার পাইয়াছিলেন, কিন্তু হুরদুষ্ট তাঁহাকে কোন দিনই সিংহাসনে স্থায়ীভাবে বসিতে দেয় নাই। প্রতাপাদিত্যের পর বলভদ্র দাস নামক এক ব্যক্তি হিজলীর মণ্ডলাধিকারী হইয়াছিলেন। গোপীনাথবল্লভ দাস কৃত রসিকানন্দের জীবনেতে উল্লিখিত আছে, বলভদ্র রাজরাজেশ্বরের মত তাঁকজমকে থাকিতেন—“হিজলী মণ্ডলে নাহি হেন ভাগ্যবান”—ইহার কথা ইচ্ছা-দেবীকে রোহিণী নামক স্থানের রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র রসিকানন্দ মুরারি বিবাহ করেন। রসিকানন্দ ভ্রামানন্দের শিষ্য হইয়া সমস্ত উড়িষ্যা-মণ্ডলে চৈতন্যধর্ম প্রচার করেন। রসিকানন্দ ১৫২০ খৃঃ হইতে ১৬৫২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বিজয়মান ছিলেন। এই সময়ে হিজলীর শাসনকর্তা এবং প্রধান ব্যক্তিত্বরূপ এই কয়েক জনের নাম আমরা পাইয়াছি :—বিভীষণ দাস (পদ্মনাভ দাসের পুত্র) ১৫৮৪ খৃঃ, বিভীষণের পুত্র ভীমসেন মহাপাত্র, বলভদ্র দাস ও সদাশিব দাস, সলিম খাঁ (১৬০৯ খৃঃ)। পাঠানদিগের সময়ে নানারূপ রাজনৈতিক বিপ্লবে হিজলী ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছিল।

তোদড় মল্ল কর্তৃক রাষ্ট্র বিভাগের পর সাজাহান পুনরায় এই অঞ্চলের বিভাগ করিয়াছিলেন। তদনুসারে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই সরকার জলেশ্বর, সরকার মুজকুতি, সরকার মালখিটা ও সরকার গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত করা হইয়াছিল। ঐ সময় হিজলী সুবা উড়িষ্যা হইতে স্বতন্ত্র করা হয় এবং উহা বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে সুলতান সুজা সুবা-বাঙ্গলাকে নূতনরূপ বিভাগ করেন; তিনি তোদড় মলের কৃত বাঙ্গলার ১০টি সরকারের সহিত হিজলী ও বালেশ্বরের ছয়টি এবং নবমুঠে নয়টি সরকার মিলাইয়া সুবা-বাঙ্গলাকে ৩৪ সরকারে—১৩৫০ মহালে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ইহার পর পুনঃ পুনঃ রাজস্ব সংক্রান্ত বিভাগ হয়, তাহার তালিকা দেওয়া নিম্নয়োজন। কিছু দিন পূর্বে বর্তমান মেদিনীপুর ৪টি জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল :—বর্ধমান, জলেশ্বর, মেদিনীপুর ও হিজলী। “১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে জলেশ্বর জেলাকে মেদিনীপুর জেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়…… উত্তরকালে বর্ধমানের অন্তর্গত বগড়ি পরগনা ও হিজলীর অন্তর্গত কতকগুলি পরগনা ও সমগ্র হিজলী জেলাকে মেদিনীপুর জেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।” (যোগেশ-বাবুর ইতিহাস, ২৫ পৃঃ)। মেদিনীপুরের প্রস্তর-বিগ্রহ ও মন্দিরাদি সম্বন্ধে যোগেশবাবু যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা অতীব কৌতূহলোদ্দীপক। দুঃখের বিষয় সেই প্রস্তর

প্রাচীন কীর্তিগুলির কোন ছায়া-চিত্র দেওয়া হয় নাই, আমরা মূলতঃ তাঁহার ইতিহাস অবলম্বন করিয়া কয়েকটি কথা উল্লেখ করিব।

(১) বর্গভীমার মন্দির—কথিত আছে এই মন্দির ও বিগ্রহ জৈমিনীর ভারতোক্ত ময়ূরধ্বজের বংশীয় গরুড়ধ্বজ স্থাপিত করেন, কিন্তু উহা একটি গল্প মাত্র। মনে হয় মন্দিরটি পূর্বকালে কোন বৌদ্ধ মঠ ছিল, পরবর্তী কোন হিন্দু রাজা উহা হিন্দুভাবাপন্ন করিয়াছেন। বর্গভীমার মূর্তি উগ্রতার মত। মন্দিরটি ৬০ ফুট উচ্চ এবং অপূর্ণ শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ। এই উচ্চতা ছাড়া ইহার বনিয়াদ ত্রিশ ফুট উচ্চ। (২) ময়নাগড়—ভিতর গড়ের পরিমাণ ৫,৬২,৫০০ বর্গ ফুট, ইহার চতুঃপার্শ্বের প্রত্যেক দিকে ৭০০ ফুট দীর্ঘ পরিখা। বাহির গড়ের পরিখা প্রত্যেক দিকে ১৪০০ শত ফুট। (৩) মহিষাদলের রাণী জানকী-দেবীর নবরত্ন মন্দির (১৭৮৮ খৃঃ), রামজিউর মন্দির, রাণী ইন্দ্রালীদেবীর রাসমণ্ডপ, সিংহবাহিনী দেবী প্রভৃতি। (৪) দোরো পরগনায় মাধব, সাগরমাধব ও নীলমাধব—নীল প্রস্তরের অতি প্রাচীন বৌদ্ধ-যুগের মূর্তি—চমৎকার শিল্প-নিদর্শন। (৫) ঝাকড়ার দীঘি—বড় দীঘিটি নাই, ছোট দীঘিটি আছে—এই ছোট দীঘির এক পারে দাঁড়াইলে অপর পারে মানুষ লিলিপুটের মত ছোট দেখায়। ছোট দীঘি যদি এই হয়, বড়টি কিরূপ ছিল, তাহা অহুমান করা যায়। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ যুগে এই দীঘিগুলি খাত হইয়াছিল। (৬) গোপ-গিরিতে যে সকল কীর্তি-চিত্র আছে, তাহা মহাভারতের বিরাট রাজার সঙ্গে জড়িত করিয়া অনেক উপকথা তদেখে প্রচলিত করা হইয়াছে। রামপালের সামন্ত-চক্রের অত্যন্ত বিরাট গুহ (একাদশ শতাব্দী) কর্তৃক ঐ সকল নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অহুমান করেন। (৭) কর্ণগড়—গড়টি একক্রোশ ব্যাপক ছিল। ইহা ছাড়া বৌদ্ধযুগের বহু ভগ্ন মূর্তি ও মন্দিরাদির কথা মেদিনীপুরের ইতিহাস-লেখকেরা উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব।

এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভের অনেক কথাই আমি বোগেশচন্দ্র বসু ও ত্রৈলোক্যনাথ পাল মহাশয়দের ইতিহাস হইতে সঙ্কলন করিয়াছি। মেদিনীপুর কান্টারাম দাস ও তাঁহার ভ্রাতাদের কশ্ম-ক্ষেত্র, কবিকল্প মুকুন্দরামের চণ্ডী লিখিবার স্থান, মহাপ্রভুর পদাঙ্ক-পুত, অশোকের স্থতি-বিজড়িত, চীনপণ্ডিতক বোধিদর্শ, প্রসিদ্ধ গ্রীকদূত প্রভৃতি বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তির স্থতি-সংগৃহীত, ইদানীংকালে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতাশ্রয় মৃত্যুঞ্জয় ও দয়ার সাগর বিজ্ঞানাগরের জন্মভূমি—সুতরাং এই স্থান বাঙ্গালীর হৃদয়কে সহজেই আকর্ষণ করে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বন-বিষ্ণুপুর *

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলা সমাজে বন-বিষ্ণুপুর রাজবংশ একটা নূতন জীবন ও প্রেরণা আনিয়াছিল—এই নাট্যশালার প্রধান নাটক রাজা বীর হাথির নূতন জীবন পাইয়া বঙ্গের সামাজিক জীবনে একটা নূতন জীবনের প্রেরণা দিয়াছিলেন। বন-বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করিয়া দুই শতাব্দী কাল বঙ্গের শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং এদেশের শিক্ষা-দীক্ষার যে বিষয়ের সলতেটি নিবু নিবু হইয়া অলিতেছিল, তাহা কিয়ৎকালের অন্ত বিষ্ণুপুরের রাজবংশ একটু উত্তাইয়া দিয়া প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমরা এজন্ত বন-বিষ্ণুপুরের ইতিহাসটি এই পরিশিষ্টে সংক্ষেপে জুড়িয়া দিলাম।

মহাভারতের সময়ে মল্লভূমি বা মল্লবনি সমুদ্রের উপাঙ্গে বিস্তারিত ছিল বলিয়া মনে হয়। ফরিদপুর, নদীয়া, বশোহর, খুলনা, বরিশাল এবং ২৪-পরগনা যখন সমুদ্রগর্ভে ছিল, তখনও বোধ হয় মল্লভূমি মাথা জাগাইয়া ছিল। এই দেশের প্রাচীন মন্দিরের গাঙ্গে পাথরে ও ইটের উপরে বহু রণতরীর ছবি উৎকীর্ণ দেখা যায়, তাহাতেও মনে হয় সমুদ্র এক সময়ে এদেশের অতি নিকটবর্তী ছিল। জনশ্রুতিও এই সংস্কারের অস্বকূল।

খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোক কলিঙ্গ জয় করেন—সম্ভবতঃ কলিঙ্গের একাংশ তখন মল্লভূমি ছিল। মালব দেশের রাজা চন্দ্রবর্ম্মা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মল্লভূমি আক্রমণ করিয়াছিলেন, সুস্থনিয়া লিপি হইতে এই তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক রাঢ় দেশের আধিপত্য লাভ করেন (৭ম শতাব্দী), তখন সম্ভবতঃ মল্লভূমি রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল।

মল্লরাজবংশের আদিপুরুষের নাম আদিমল্ল। আদিমল্ল আদিশুরের মত নাম। হয়ত যখন বংশাবলী রচিত হয়,—তখন বংশের আদিপুরুষের নাম হারাইয়া গিয়াছিল, শেষে ঐরূপ একটা উপাধি দিয়া কুলজি শাস্ত্রে গোঁজামিল দেওয়া হইয়া থাকিবে। আদিমল্ল বাগ্দিদের ষাড়া শৈশবে পালিত হন—কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন,—রাজপরিবারে এইরূপ কিংবদন্তী; এই আদিমল্লের নাম ‘রঘুনাথ’ বলিয়া রাজবংশের কুলজিতে উল্লিখিত আছে এবং তিনি ক্ষত্রিয়-বংশের চন্দ্রকুমারী নামী কন্তাকে বিবাহ করেন, কুলজি-লেখক এ সংবাদ দিতেও ভুলেন নাই। কথিত আছে, আদিমল্ল ৬২৪ খৃষ্টাব্দে মল্লরাজ্য স্থাপন করেন। রাজ-পঞ্জীর লেখক এতটা ঠাট বজায় রাখিয়াছেন যে, উহাতে কোন তবই বাদ পড়ে নাই। ইহাতে সপ্তম শতাব্দী হইতে রাজাদের প্রত্যেকের নাম ও তারিখ ঠিক মত দেওয়া আছে। এত দীর্ঘ কালের এরূপ সন-তারিখ সংবলিত ইতিহাস বোধ হয় বাঙ্গলা দেশে ত্রিপুরা ছাড়া আর কোন রাজবংশের

* বন-বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে এই সন্দর্ভটি আমরা অভয়পদ মল্লিক মহাশয়ের বিষ্ণুপুরের উৎকৃষ্ট ইংরেজী ইতিহাস, বিষকোষের ঐ পক্ষ এবং নরহরি চন্দ্রবর্ম্মীর ভক্তিবিহারের মূলতঃ অবলম্বন করিয়া লিখিলাম।

নাই। তালিকাটি আমি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি; রাজাদের নাম ও অভিষেকের সময় ইহাতে দেওয়া হইল।

আদি মল (রঘুনাথ) ৩২৪ খৃঃ, মল্লিক ১। জয় মল ৭০০ খৃঃ অব্দ। বেণু মল ৭২০। কিশু মল ৭৩০। ইন্দ্র মল ৭৪২। কাশু মল ৭৪৭। পল মল ৭৬৪। শূর মল ৭৭৫। কনক মল ৭৮৪। কন্দর্প মল ৮০৭। সনাতন মল ৮২৮। খল্ল মল ৮৪১। দুর্জয় মল ৮৬৪। যাদব মল ৮৮০। জগন্নাথ মল ৯১০। বিরাট মল ৯৩১। মাধব মল ৯৪০। দুর্গাদাস মল ৯৭৭। জগৎ মল ৯৯৪। অনন্ত মল ১০০৭। রূপ মল ১০১৪। সুল্ল মল ১০২৯। কুন্দু মল ১০৪০। কৃষ্ণ মল ১০৭৪। রূপ মল (২য়) ১০৮৪। প্রকাশ মল ১০৯৭। প্রতাপ মল ১১০২। সিন্ধুর মল ১১১০। সুল্ল মল ১১২৯। বনমালী মল ১১৪২। যদু মল ১১৪৮। জীবন মল ১১৬৭। রাম মল ১১৮৫। গোবিন্দ মল ১২০০। জীম মল ১২৪০। কস্তুর মল ১২৬০। পুণ্ড্রী মল ১২৮৫। তপ মল ১৩১৯। দীনবন্ধু মল ১৩৩৪। কাশু মল (২য়) ১৩৪৫। শূর মল (২য়) ১৩৪৮। শিবসিংহ মল ১৩৭০। মধন মল ১৪০৭। দুর্জয় মল (২য়) ১৪২০। উদয় মল ১৪৩৭। চন্দ্র মল ১৪৬০। বীর মল ১৪৮০। খাড়ি মল ১৪৩৯। বীরহাথির ১৪৮৭। খাড়ি হাথির ১৪২০। রঘুনাথ সিংহ ১৪২৬। বীর সিংহ ১৪৪৬। দুর্জয় সিংহ (৩য়) ১৪৮২। রঘুনাথ সিংহ (২য়) ১৭০২। গোপাল সিংহ ১৭১২। চৈতন্য সিংহ ১৭৪৮-১৮০২।

চৈতন্য সিংহ পর্যন্ত মল্ল-রাজারা ১১০৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। চৈতন্য সিংহ এই তালিকার ৫৬ সংখ্যক নৃপতি। এই দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন—তাহাদের কুলপঞ্জী অবশ্যই রাজগৃহে সুরক্ষিত ছিল, সুতরাং নাম সম্বন্ধে গোল হইবার সম্ভাবনা অল্প—তারিখও প্রত্যয়-বোধ্য বলিয়াই মনে হয়,—কারণ আদি হইতে শেষ পর্যন্ত একই বংশের লোকেরাই শাসন করিয়াছিলেন। অধিকার যদি অপর কোন বংশের হাতে যাইয়া পড়িত, তবে দ্বারা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিত, এবং গোঁজামিল দিয়া বংশাবলী প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হইত। এক্ষেত্রে তাহা হয় নাই, এরূপ অসম্ভব করাই সম্ভব। কিন্তু তথাপি দৃষ্ট হইবে যে, বীর হাথিরের পর হইতে রাজারা মল উপাধি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। খাড়ি হাথিরের ভ্রাতা রঘুনাথের সময় হইতে সমস্ত রাজাই ‘সিংহ’ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এত দীর্ঘকাল যে ‘মল্ল’-উপাধি বংশগত ছিল, তাহা সহসা তাহারা ছাড়িলেন কেন? নবাবেরা এই উপাধি দিয়াছিলেন, ইহা প্রত্যয়বোধ্য নহে। ইহা বী বেতাবে দিল্লীর হইতে মসনদখালি উপাধি পাইয়াছিলেন বলিয়া বীর গৌরব বাড়াইতে চাহিয়াছিলেন, মল্ল-রাজারাও হয়ত সেইভাবে নবাবের দত্ত উপাধি বলিয়া গাথা করিয়াছেন। এইরূপ অসম্ভব করার কারণ আছে। প্রকৃত পক্ষে উপাধিটি রাজাদের স্বত্ব। উহা জাতে উঠিবার উপায় নাই, এবং স্বত্ব-উপাধি; বস্তুতঃ ‘সিংহ’ শব্দ এত বহুল যে উহা নবাব-দত্ত উপাধির মত শোনায় না। “মাণিক্য” উপাধিটার বরং একটা গৌরব আছে। বৈষ্ণব-ধর্মই মল্লজাতীয় রাজাদিগকে প্রকৃত শিক্ষিত ও সুসভ্য করিয়াছিল—এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বৈষ্ণবদের প্রভাবেই রাজারা এই ‘মল্ল’ উপাধি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—কেন ছাড়িয়া ছিলেন তৎসম্বন্ধে প্রত্যেকে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, “কজিয় সিংহ উপাধি-গ্রহণের পূর্বে বিষ্ণুপুরের রাজারা বহু শতাব্দী

যাবৎ আপনাদিগকে ‘মল’ (অনার্য উপাধি) বলিয়া পরিচয় দিতেন, এবং এখন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে ইহাদিগকে ‘বাগ্দি রাজা’ বলিয়া জানে—তাহা ছাড়া স্থানীয় নানারূপ প্রবাদ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বিষ্ণুপুরের রাজারা বহুকাল স্বাধীন এবং ক্ষত্রিয়ধর্মী ছিলেন, তৎকালেই তাঁহারা ক্ষত্রিয়—কিন্তু ইহারা বংশগত ক্ষত্রিয় ছিলেন না। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরের রাজাদের ক্ষত্রিয়ত্বের যে দাবী, উত্তর-পশ্চিমে রাজপুত এবং তথা-কথিত মৌলিক ক্ষত্রিয়দেরও সেই দাবী—অর্থাৎ ইহারা বহু বৃগ রাজাশাসন করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্মী হইয়াছিলেন।”

এই রাজাদের প্রতাপ এত বেশী হইয়াছিল যে, বাহিঃশত্রুরা ইহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। পাহাড়-বেষ্টিত বিষ্ণুপুর নিজেকে নিজে রক্ষা করিয়াছে। বিষ্ণুপুরে ৭টি বাধ (বন্ধ) ছিল। এই বন্ধের এক একটি সুগভীর জলপূর্ণ হ্রদ-বিশেষ। নৌকা লইয়া নানারূপ ক্রীড়ার ইহাদের সুনির্মল জলরাশি অহঃরহ আনন্দালিত হইয়া থাকে। বাধের জল নিয়ে ছাড়িয়া দেওয়ার উপযোগী ব্যবস্থা আছে—ঐ জলে কৃষিকার্য্য সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু এই বাধের জল প্রবলবেগে ছাড়িয়া দিলে উপকূলবর্তী স্থানগুলি বস্তাবিশ্রোত হইয়া যায়—বিপক্ষ সৈন্যদিগকে এই বহুতা শ্রোত ভূণের মত ভাগাইয়া লইয়া যাইতে পারে। ইহা বিষ্ণুপুরের অনোখ অস্ত্র-স্বরূপ; শত্রুসৈন্য এই বাধা অতিক্রম করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত এ রাজ্যের কিছুই করিতে পারে নাই। বিষ্ণুপুরের পূর্বে তিনটি বাধ আছে—লালবাধ, কৃষ্ণবাধ এবং জামবাধ। পশ্চিমে বসুনাবাধ, কালিন্দীবাধ এবং গণ্টনবাধ। নগরের মধ্যভাগে পোকাবাধ। পাহাড়িয়া জল নীচের দিকে প্রবাহিত হওয়ার পথে খুব উচ্চ মৃন্ময় প্রাচীরের আবেষ্টনী দ্বারা তাহা অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, এবং ইহাই বাধে পরিণত হইয়াছে। বাধগুলি খুব বৃহৎ—ইহাদের একটি এক বর্গ মাইলের অষ্টমাংশ ব্যাপক। পূর্বে এই বাধ-গুলির পাড়ে রাজাদের মনোরম পুষ্পোচ্চান ছিল, রাজারা নানাদেশ হইতে পুষ্পতরু আনাইয়া ইহাদের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত কলিকাতার শাসনকর্তা হলওয়েল সাহেবের বিবরণীতে লিখিত আছে : “কিন্তু এদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধায় বিষ্ণুপুর ভারতবর্ষীয় অস্ত্যক্ত রাজ্য হইতে সর্বাপেক্ষা স্বাধীন রাজ্য, কারণ যে কোন সময় রাজা ইচ্ছা করিলে বাধের দুখ খুলিয়া দিয়া বিপক্ষ পক্ষকে ধ্বংস করিতে পারেন। সুজা বাদসাহের রাজত্বের প্রারম্ভে তিনি বহু অস্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়া বিষ্ণুপুরের স্বাধীনতা হরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন কিন্তু বিষ্ণুপুরাধিপতি একটি বাধের দুখ খুলিয়া দেওয়াতে মোগল সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল—তাহাদের একটিও জীবিত ছিল না। তদবধি বিষ্ণুপুর অধিকার করিতে আর কেহ চেষ্টিত বা সাহসী হয় নাই।.....সুতরাং এই রাজারা কখনই মোগলদিগের স্বাধীন হন নাই।” মাঝে মাঝে “দিল্লীখরও বা অঙ্গদীখরো বা”—এই ভারতব্যাঙ্গী প্রবাদের প্রতি খাতির দেখাইয়া বিষ্ণুপুরের রাজারা সেলামী স্বরূপ কোন বৎসর ১৫,০০০, কোন বৎসর ২০,০০০ টাকা মোগল সরকারে সেলামী পাঠাইতেন আবার কোন কোন বৎসর একটি পয়সাও দিতেন না। সুতরাং ব্যাপারটা তাঁহাদের ইচ্ছাধীন দাঁড়াইয়াছিল।

বিদেশী পণ্যটেকেরা বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রশংসার

অতীতের মত শোনায। অপরূপ বেন একটা উত্তম মরুভূমি, বিষ্ণুপুর তদ্ব্যপ্ত ওয়েলসের মত। হলওয়েল সাহেব লিখিয়াছেন, "In this district are the only vestiges of the beauty, purity, regularity, equity and strictness of ancient Indoostan-Government. Here the property as well as the liberty of the people are inviolate, here no robberies are heard of either private or public" (Interesting Historical Events, by Holwell, published in 1765).

ইহার মর্মার্থ—“এই জেলায় প্রাচীন হিন্দু শাসন-তত্ত্বের সৌন্দর্য, পবিত্রতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং জায়গার একখানি জীবন্ত চিত্র রহিয়া গিয়াছে; এই দেশের মত আর কোথাও তাহা নাই। প্রজাদের স্বাধীনতা ও সম্পত্তি এখানে সুরক্ষিত, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার সাধ্য কাহারো নাই। এখানে গোপনে অথবা প্রকাশ্যে দস্যুবৃত্তি কোথাও সংঘটিত হয় না।”

ফরাসী পর্যটক এ্যাঁবি রেনেল লিখিয়াছেন :—“এই দেশকে প্রকৃতি এমন ভাবে নিরাপদ করিয়া রাখিয়াছেন যে অধিবাসীদের চরিত্রের মাধুর্য এবং হৃদয়ের আনন্দ সেই আদিকাল হইতে একভাবে চলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের হস্ত কখনই নর-রক্তে রঞ্জিত হয় না। ইহারা চারিদিকে জলের দ্বারা একরূপ সুরক্ষিত যে, বাধ খুলিয়া দিলেই সমস্ত দেশ ভুবিয়া যায়। কতবার বাহিরের শত্রু এই ভাবে ধ্বংস পাইয়াছে। ফলে আর কেহ ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না।”

বাহিরের লোক এদেশে আসিলে যে রূপ আতিথ্য পাইত, যুরোপীয় লেখকেরা একবাক্যে তাহার অল্প প্রশংসা করিয়াছেন। হলওয়েল সাহেব লিখিয়াছেন, “কোন বিদেশী—বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রয়োজনে অথবা শুধু দেশ-ভ্রমণার্থ—যে মুহূর্তে বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করেন, সেই মুহূর্তে তিনি রাজ-অতিথি বলিয়া গণ্য হন। সরকারী ব্যয়ে তাঁহার শরীর-রক্ষা নিযুক্ত হয়,—তাঁহার চলাফেরা প্রভৃতির বাহাতে সুবিধা হয়—প্রতি-পদে এই সকল লোক তাহা সম্পাদন করিতে আদিষ্ট হয়। প্রথম রক্ষীর দল কতক দিন পরে তাঁহাকে তরুণ দ্বিতীয় একটি দলের নিকট সমর্পণ করে—এই ভাবে এক দলের কর্তব্য শেষ করার সময় পর্যটক মহাশয়কে ইহাদের ব্যবহারাদি সবকিছু নানারূপ প্রশংসা হয় এবং ইহাদের ব্যবহারে কোন ত্রুটি হয় নাই, প্রধান কর্মচারীর নিকট তরুণ একখানি লিখিত সার্টিফিকেট দিতে হয়। এই ভাবে ক্রমাগত এক দলের পর অপর দলের রক্ষকদিগের সঙ্গে তিনি রাজ্যের সর্বত্র পর্যটন করেন। যে দিন বিষ্ণুপুরে তিনি পদার্পণ করেন, সেই দিন হইতে তাঁহার আহারাদি ও থাকিবার ব্যবস্থা সমস্তই রাজ্যব্যয়ে নির্বাহিত হইয়া থাকে। তাঁহার সঙ্গে দ্রব্যাদি বহন প্রভৃতি আত্মসম্বল সমস্ত বরচ রাজ্য দিয়া থাকেন। কোন পীড়া বা দৈব বাধা উপস্থিত না হইলে একস্থানে তিন দিনের বেশী থাকিলে অবশ্য পর্যটকের নিজেই ব্যবস্থা নিজেই করিতে হয়। রাজ্যের মধ্যে যদি কেহ কোন জিনিস হারায়, তবে যে তাহা কুড়াইয়া পায়—সে তৎক্ষণাৎ

নিকটবর্তী গাছের উপর তাহা ঝুলাইয়া রাখিয়া চোকিদারকে খবর দেয়, এবং তৎক্ষণাৎ সরকার হইতে সর্বত্র চোল পিটাইয়া দিয়া ঐ সামগ্রীর স্বামীকে আমন্ত্রণ করা হয়।

যুরোপীয় পর্যটকেরা যে প্রশংসা করিয়াছেন,—তাহার অতি অল্প অংশ মাত্র উপরে উদ্ধৃত করিলাম। সে রাজ্যে চুরি, ডাকাতি ছিল না,—সেখানকার সকল লোকই মূর্তিমান মৌজত এবং সরলতার বিগ্রহ। এই রাম-রাজ্য আবহমান কাল হইতে এই ভাবে চলিয়া আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বীর হাধির রাজা স্বয়ং দম্ভ্যপতি ছিলেন এবং ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে জনসাধারণ রাজা কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া কষ্টে থাকিত, তাহা দেউলী-নিবাসী কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্তী নামক এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে ত্রিনিবাস আচার্য্যের কথোপকথনে প্রতীয়মান হয় (প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকর ভ্রষ্টব্য)। বৈষ্ণবগণের প্রভাবেই এই দেশ হিন্দু আদর্শ রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। সেই আদর্শ সনাতন কাল হইতে হিন্দু-শাসিত দেশে পালিত হইয়া আসিয়াছিল। ম্যাগেগ্লেহিনিস, ফাহায়েন প্রভৃতি সমস্ত বিদেশী পর্যটক এই বিষয়ে একই কথা বলিয়া গিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মার্কো পোলো হিন্দু-শাসিত এক দেশ দেখিয়া (১২৯৮-৯৯) লিখিয়া গিয়াছেন,—“অধিবাসীদের অনেকে বলিষ্ঠ এবং সকলেই বিশ্বাসী ও রাজভক্ত, ইহারা কোন কারণেই কখনও মিথ্যা কহেন না, এবং জগতে ইহাদের মত সাধু দ্বিতীয় কোন জাতি নাই। ইহারা মাংস আহার করেন না, মত্তপান করেন না এবং পরস্পর প্রতি অনুরাগী হন না—ইহাদের জীবন সর্বতোভাবে পবিত্র।”

বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে ফরাসী আবে রেনল (Abbe Raynal) লিখিয়াছেন—“যে সকল সাম্রাজ্য পৃথিবীর পীড়ক, অত্যাচারী রাজাদের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে এই বিষ্ণুপুরের কত তফাৎ। এই রাজ্যের ভিত্তি সুশৃঙ্খলা এবং স্বাভাবিক ধর্মনীতি, বাহ্য চিরকাল অক্ষয়। অত্যাচারীদের রাজ্য বৃদ্ধদের মত উৎপন্ন হইয়া বিলীন হয়—কিন্তু এইরূপ রাজ্যের ধ্বংস নাই।” *

বিষ্ণুপুরের এই যুগ বৈষ্ণবদের প্রবর্তিত। হলওয়েলের সময় (১৭৬৫ খৃঃ) রাজধানী ও তৎসন্নিগটে ৩৬০টি মন্দির ছিল। ইহাদের অনেকগুলিই বীর হাধির ও তাহাদের বংশধরদিগের দ্বারা গত ৩৫০ বৎসরের মধ্যে রচিত। মহাপ্রভুর ধর্ম মাধুর্য্যের সেবা। এই প্রেম ও অনুরাগপূর্ণ ধর্ম জনসাধারণকে শিল্পকলায় দীক্ষিত করিয়াছিল—সেই প্রেরণার যে কি সফল ফলিয়াছিল, তাহা মন্দিরগুলি দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে।

হিন্দু রাজাদের আদর্শ শাস্তি। বর্তমান প্রতীচ্য জগতের উদ্বেগ অশান্তি ও অবিরত কলহ। কে কাহার মাথা ডিঙ্গাইয়া বড় হইতে পারে—ইহাই প্রতীচ্য জীবনের লক্ষ্য। যে অপরকে ডিঙ্গাইয়া উঠিবে, বাচিয়া থাকিবার তাহারই দাবী—অপরের মৃত্যু অনিবার্য। Survival of the fittest নীতির ইহাই মর্ম্মকথা। হিন্দু সকলকে লইয়া বিনা ধ্বংসে,

* History of Bishnupur Raj by A. P. Mallik, B.A., B.T., p. 132 (1921).

বিনা হিংসায়, বিনা প্রতিযোগিতায় এক স্ত্রীয়া গাথা ফুলগুলির মত সর্বজাতির সমন্বয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করাকে তাঁহাদের সামাজিক পরম লক্ষ্য বনে করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্বার্থ উগ্রমুর্তিতে অপরকে ধ্বংস করিবার জন্য স্পর্ধার খজা হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়াছে। অদৃষ্টের রহস্য এই যে, আমরা বিশ্বের সংহারিণী-শক্তি কালী-মূর্তির পূজক এবং প্রতীচ্য জগৎ ফনার অবতার যিশুর উপাসক।

বৈষ্ণব ধর্ম জগতকে কিরূপ পুণ্যময় করিতে পারে, বন-বিষ্ণুপুর কয়েক শতাব্দীর জন্য সর্বসমক্ষে সেই চিত্র উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছে।

এখানে বিষ্ণুপুর রাজ্যের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছি।

আদিমল্ল সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ আছে। ইহার নাম 'রঘুনাথ' এবং ইনি বৃন্দাবন-সন্নিহিত জয়নগরের ক্ষত্রিয় রাজবংশে (বাণ্ডেল পরিবারে) জন্মগ্রহণ করেন। রঘু ভ্রমরগড়

আদিমল্লের অভিষেক—
১২০-১২২ খৃঃ।

নামক জয়নগরের এক স্থানে ইহাদের রাজধানী ছিল। রাজা সিংহাসনচ্যুত হইয়া সতীক পুরীধামে যাত্রা করেন, পথিমধ্যে লোথ্রামে পূর্ণগর্ভা পত্নীর ভার মনোহর পঞ্চানন নামক এক ব্রাহ্মণকে দিয়া ও ভগীরথ ওহ নামক এক কায়স্থের হস্তে স্বীয় 'জয়শঙ্কর' খজা অর্পণ করিয়া স্বয়ং তীর্থ-দর্শনে চলিয়া যান। রাজা তথায় বিহুচিকা রোগে প্রাণ ত্যাগ করেন। এদিকে একটি পুত্র জন্মিবার পরেই রাণী পরলোক-গমন করেন। নিরাশ্রয় পুত্রটিকে পঞ্চানন শিক্ষাদান করেন, এবং জটনৈক বাগিদজাতীয় মল্লবীর ইহাকে মল্লক্রীড়ায় সুদক্ষ করে। বাঙ্গলার নানাস্থানে প্রচলিত গল্পের কথা ইহার কাহিনীতেও বাদ পড়ে নাই। নিমিত্ত বালকের (রঘুনাথ) মস্তকে একটা বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া ইহাকে রোদ্রে ছায়া দান করিয়াছিল। সুতরাং ইনি যে রাজা হইবেন, তাহা সকলেই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে লাগিল। ইহার মূর্তি সুদর্শন ছিল এবং সেই সময়ে উক্ত অঞ্চলে মল্লবিজার ইহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। প্রহ্মম-পুরের রাজা নৃসিংহদেব ইহার গুণপনার পরিচয় পাইয়া ইহাকে লোথ্রাম ও তৎসন্নিহিত ছয়টি গ্রামের অধিকার প্রদান করেন। প্রহ্মমপুরের রাজার অধীন জটবিহারের রাজা বিদ্রোহী হওয়াতে আদিমল্ল (রঘুনাথ) বিদ্রোহ-দমনে নিযুক্ত হইয়া বিজয়ী হন—সুতরাং রাজা সন্তুষ্ট হওয়ায় সেই রাজ্যের অধিকারও আদিমল্লকে প্রদান করেন। পঞ্চানন আদিমল্লের সভাসদ ও মন্ত্রিরূপে রাজ্য শাসনে সহায়তা করিতেন।

আদিমল্লের পর তৎপুত্র জয়মল্ল ৭০২ খৃঃ অব্দে রাজা হন। তাঁহার রাজ্যের প্রধান ঘটনা প্রহ্মমপুরের রাজার সঙ্গে বিবাদ। প্রহ্মমপুরের রাজা সেই অঞ্চলের রাজচক্রবর্তী ছিলেন এবং আদিমল্ল ইহারই আশ্রিত ছিলেন। কিন্তু মল্লরাজ্যের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা দর্শনে ভীত ও ঈর্ষাতুর হইয়া নরসিংহ দেব (প্রহ্মমপুরের রাজা) তাঁহাকে দমাইয়া রাখিবার জন্য বিবিধ ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। জয়মল্ল প্রহ্মমপুর আক্রমণপূর্বক দুর্গ অধিকার করেন। রাজা ও তাঁহার পরিবারবর্গ কানাই সরোবরে প্রাণ বিসর্জন করিয়া অপমান ও লাজনা হইতে নিষ্কৃতি পান। কানাই সরোবর এখনও বিজ্ঞান। জয়মল্ল প্রহ্মমপুরেই তাঁহার

রাজধানী করেন। ক্রমেই এই রাজ্যের প্রসার বৃদ্ধি হইতে থাকে। কিছুময় (৭৩০-৭৪২ খৃঃ) ইন্দাস স্বরাজ্যভুক্ত করেন। কাহুময় (৭৫৭-৭৬৪ খৃঃ) কক্কা অধিকার করেন, শূরময় (৭৭৫-৭৯৫ খৃঃ) অধুনা মেদিনীপুরের অন্তর্গত বগড়ী পরগনা স্বীয় রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া নানা যুদ্ধে বিজয়ী হন। খজ্জাময় (৮৪১-৮৬৪ খৃঃ) অধুনা খজ্জাপুর নামেয় অঞ্চলটা জয় করিয়া স্বীয় নামানুসারে নগর স্থাপন করেন।

জগৎময় (৯৯৪-১০০৭ খৃঃ) রাজধানী বিষ্ণুপুরে স্থাপিত করিয়া মন্দির ও প্রাসাদে তৎস্থান ছাইয়া ফেলেন এবং বিষ্ণুপুরকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। শূরপুরাণের লেখক রামাই পণ্ডিত তাঁহার সময়ে বর্তমান ছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

রামময় (১১৮৫-১২০৮ খৃঃ) ও শিবসিংহময় প্রভৃতি রাজাদের সময় বিষ্ণুপুরের শ্রী ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে থাকে। জগৎময় সৈন্তদের শৃংখলা, দুর্গাদি নবপদ্ধতিতে নির্মাণ এবং সমরোপযোগী অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়া রাজ্যের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং শিবময় বিষ্ণুপুর-রাজসভা সংগীতবিদ্যার অত্যন্তম প্রদান কেন্দ্রে পরিণত করেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ময়রাজারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। বাহিরের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ অল্পই ছিল। বীর হাধিরের পিতা বাড়িময় (১৫৩৯-১৫৪৭ খৃঃ) সর্কপ্রথম বঙ্গাদিপের অধীনত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু এই অধীনত্ব নামে মাত্র ছিল। একটা রাজস্ব দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু রাজারা যখন যাহা ইচ্ছা দিতেন এবং কোন কোন সময় কিছুই দিতেন না। বীর হাধির রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন, এমন কি এক সময় বঙ্গ-বিজয় করিবার কল্পনাও তাঁহার মাথায় ঢুকিয়াছিল।

৪৯শ সংখ্যক নৃপতি এই বীর হাধির (১৫৮৭-১৬২০ খৃঃ) বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়া যে সকল উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা রাজশ্রীর কুণ্ডলে নূতন মূল্যবান্ মণিমুক্তা সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিল। এই পুস্তকের ৭৫২-৫৬ পৃষ্ঠায় তৎসম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে।

বীর হাধিরের সময় হইতে চৈতন্ত-সিংহের (১৭৪৮-১৮০২ খৃঃ) রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুর রাজধানী বৈষ্ণব ধর্ম-প্রচারের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল। বাঙ্গলার শির ও স্থাপত্য-লক্ষী বিষ্ণুপুর রাজাদের বাহু আশ্রয় করিয়া সগৌরবে দাঁড়াইয়াছিলেন। হলওয়েল সাহেব যে বিষ্ণুপুর ও তদ্রূপান্তে ৩৬০টি মন্দিরের কথা বলিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই ১৬০০-১৮০২ খৃঃ অব্দ মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাবের ফলে স্থাপিত হইয়াছিল। গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান কেন্দ্র সর্কপ্রথম ছিল—নবদ্বীপ। চৈতন্তের সন্ন্যাসের পর নবদ্বীপের আলোক নিবিয়া যায়। চৈতন্ত অষ্টাদশ বৎসর পুরীতে ছিলেন, তাঁহার তিরোধান পর্য্যন্ত সেই আলোককেন্দ্র পুরীধামে প্রবর্তিত হয়। তৎপরে কয়েক বৎসর—১৫৩৩ হইতে ১৬০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ত্রিবিংশ অধিক অর্ধ শতাব্দীকাল সেই আলোক বৃন্দাবনে জলিতে থাকে, ষট্ গোবামৌরী এই আলোক জ্বলাইয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহাদের স্বর্গারোহণের পরে—বিশেষ জীবগোবামৌরী অন্তর্ধানের সহিত এই আলোক বৃন্দাবনে কতকটা নির্জীপিত হইলে শ্রীনিবাস আচার্য্যের

প্রভাবে বিষ্ণুপুরে এই শিখা প্রজ্বলিত হয়। পূর্ণ দুই শতাব্দীকাল পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের রাজ-সভাই বৈষ্ণব শিকাদীকার প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ ছিল।

গোড়ায় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর বীর হাথির 'চৈতন্য দাস' নাম গ্রহণ করিয়া কতকগুলি গীত রচনা করিয়াছিলেন; নরহরি চক্রবর্তী তাঁহার ভক্তিব্রতাকরে তাহাদের কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বৃন্দাবন তীর্থের এতটা অমুরক্ত হইয়াছিলেন যে, সেই তীর্থ সংক্রান্ত কতকগুলি নাম স্বীয় অধিকারে প্রচলিত করিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণুপুরের কয়েকটি দীঘির সেইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন যথা,—কালিন্দী, শ্রামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড এবং কয়েকটি গ্রামের দ্বারকা, যথুরা প্রভৃতি নাম দিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যকে তাঁহার রাজ্যে চিরদিনের জন্ত রাখিবার জন্ত বিষ্ণুপুরের রঘুনাথ চক্রবর্তীর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ সংঘটন করিয়াছিলেন। তিনি কুরমান খাঁ নামক মুসলমান সাধুকে নিজ রাজ্যে বাস করিবার জন্ত নিকর জমি দিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণব ভক্ত বাবা আউল মনোহর দাসের জন্ত (দীনমণি চন্দ্রোদয়ের লেখক) বননগঞ্জ ও সোনামুখীতে দুইটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বীর হাথিরের পুত্র খাড়ি হাথিরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা রঘুনাথ সিংহ রাজসিংহাসন অধিকার করেন (১৬২৬ খৃঃ)।

বীরসিংহ দ্বিতীয় আরাঞ্জের মত স্বীয় বংশের উজ্জ্বল সাধনে তৎপর ছিলেন (১৬৫৬-৮২ খৃঃ)। তিনি তাঁহার ভ্রাতা মাধব সিংহকে বিব প্রয়োগে হত্যা করেন। অপর ভ্রাতা ফতে সিংহ পলাইয়া বাইরা রায়পুরে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত করেন। বীরসিংহ তাঁহার নিজ তিন পুত্রকেও হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু দুই পুত্র হত্যার পর জ্বলাদের দয়াগুণে জ্যেষ্ঠ পুত্র নিষ্কৃতি পান। কিন্তু রাজাকে জানান হয় যে, তাঁহার তিন কুমারকেই হত্যা করা হইয়াছে। তিনি অনেক ব্রহ্মোত্তর জমি আশ্রয়সাং করিয়াছিলেন। এই নিষ্ঠুর কার্যের প্রতিবাদ করাতাই মাধবসিংহ প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার চূর্ণদন্ত শাসনে কাহারও কথা বলিবার সাধ্য ছিল না। প্রজাদিগকে তিনি প্রাচীরের মধ্যে গাঁথিয়া হত্যা করিতেন। মালিয়ারার জমিদার মনিরাম বিদ্রোহী হওয়াতে তিনি তাঁহাকে পরাভূত করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। কথিত আছে বৃদ্ধ বয়সে যখন তিনি রাজকুমারকে হত্যা করার দকন তাঁহার মনে ঘোর অমৃতাপ হইয়াছিল, তখন তাঁহার কর্মচারীরা মুক্তিপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র চর্জুন সিংহকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলেন। রাজা আনন্দাক্রমে অভিযুক্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আরাঞ্জের সঙ্গে বীরসিংহের এই স্থানে একটু তফাৎ। আরাঞ্জের তাঁহার হত্বের জন্ত একদিনের জন্তও অমৃতপ হন নাই।

রঘুনাথ সিংহ (দ্বিতীয়) মোগলদের পক্ষ অবলম্বনপূর্বক বিদ্রোহী শোভা সিংহ ও রহিম খাঁকে পরাস্ত করেন। শোভা সিংহের কন্যাকে তিনি পাটবাগী করেন এবং মৃত রহিম খাঁর পত্নী লালবাইকে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া আসেন। এই রমণী অনিন্দ্যশূন্দরী, সংগীতবিদ্যায় পারদর্শী ও যদুকণ্ঠী ছিলেন। রাজা ইহার অমুরাগে মজিয়া আত্মবিশ্বস্ত

হইয়া পড়িলেন। এক বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া তথায় তাঁহার বাসস্থান নির্দেশপূর্বক তাঁহার নামানুসারে লাল-বাঁধ নামে এক প্রকাণ্ড দীঘিকা খনন করাইলেন। রাজা দিন-রাত লালবাইএর কাছে পড়িয়া থাকিতেন। মহাবৈষ্ণবের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি লালবাইএর সঙ্গে মুসলমানী থানা খাইতেন,—রাজ্যশাসন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের কোনও খোজ খবর লইতেন না; মন্ত্রীরাই রাজ্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু ইহার পরে এক সর্জনশয়ের ব্যাপার ঘটিল। লালবাই রাজাকে মুসলমান ধর্ম পরিগ্রহ করিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, শুধু তাহাই নহে, রাজ্য শুদ্ধ একদিনে একসময়ে সমস্ত বিষ্ণুপুরবাসীদিগকে মুসলমান হইতে হইবে—এই আদ্যার করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি সত্ত্বেও এবংবিধ সর্জনশয়কর প্রস্তাবে সন্মতি দান করিতে যিধা বোধ করিতে লাগিলেন এবং বিনয়ের সহিত ইহার প্রতিবাদ করিলেন। মুসলমানী রাজাকে হাতের মুঠোর ভিতর পাইয়াছিল, সে তাহার নিজ শক্তি সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া একটা অমোঘ অস্ত্র সন্ধান করিল। রাজা যদি তাঁহার প্রস্তাবে সন্মত না হন, তবে সে বিষ্ণুপুর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। রাজা অকূল চিন্তাসাগরে পড়িয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন এবং অবশেষে মুসলমানীর আদ্যার রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন। বিষ্ণুপুরের শ্রমশানখাটের নিকট নূতন মহলের পশ্চিমে এখনও ভোজনতলা বলিয়া যে স্থানটি বিজ্ঞান, তথায়ই রাজ্যশুদ্ধ সকল নিমজ্জিত ব্যক্তির আহারের বিরটি আয়োজন হইতে লাগিল। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে বিষ্ণুপুরের শতসহস্র নরনারী আতঙ্কিতভাবে তথায় উপস্থিত হইতে বাধ্য হইল—সেই নিমজ্জণ যিনি উপেক্ষা করিবেন, সপরিবারে তাঁহাকে নৃত্যাদিতে দণ্ডিত করা হইবে।

এদিকে রাজপরিবারে গুপ্তভাবে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। গোপালসিংহ ও মহারাজী স্বয়ং রাজার প্রধান মন্ত্রীদিগকে লইয়া পরামর্শ ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। লালবাইএর তথ্যবদানে মুসলমানী থানা পরিবেষণের আয়োজন হইতেছিল। হঠাৎ মহারাজীর হস্ত-নিক্ষিপ্ত এক বাণে রাজার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। লালবাইকে লোহশৃঙ্খল পরাইয়া দীঘিতে নিমজ্জিত করা হইয়াছিল। ১৮২৬ খৃঃ অব্দে সেই দীঘি হইতে কতকগুলি মুসলমানী ভোজনপাত্র ও একটা নরকঙ্কাল উত্তোলিত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরের হুজুহান—লালবাইএর ইহাই কি পরিণাম ও শেষচিহ্ন ?

মহারাজী খানীকে হত্যা করিয়া তাঁহারই চিতায় প্রাণত্যাগ করেন। এই ঘটনার পর লালবাইএর প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করা হইল। রাজা ও মহারাজী যে স্থানে একত্র বসত হইয়াছিলেন, তাহা লোকে এখনও দেখাইয়া থাকে। এই রাজ্যকে লোকে “পতিঘাতিনী সতী” আখ্যা দিয়াছিল। প্রজার কল্যাণার্থ এবং ধর্মের জন্ত তিনি প্রাণপ্রিয় পতিকে হত্যা করিয়া তাঁহারই চিতায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি তাই একাধারে সতী ও পতি-ঘাতিনী বটেন। পরবর্তী রাজা গোপালসিংহ সর্ববিষয়ে আদর্শ নৃপতি ছিলেন, কিন্তু ধর্মবিষয়ে তিনি একটু অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিয়া কতকটা উপহাস্যাপদ হইয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রজাকে তিনি প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক নাম জপ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। দীনতম

প্রজাও এই নিয়ম পালন না করিলে দণ্ডিত হইত। এই নিয়ম পালন করা হয় কি না, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্ত তিনি অনেকগুলি গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই জপের ব্যাপারটা বিষ্ণুপুরে “গোপালসিংহের বেগার” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যসিংহের দীর্ঘ রাজত্ব (১৭৪৮-১৮০২) কাল বর্গীর হাঙ্গামা ও তাঁহার পৌত্র দামোদরসিংহের বিদ্রোহ প্রভৃতিতে অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমরা ইহার রাজত্ব সম্বন্ধে আর কিছু লিখিব না, যেহেতু মোগল-রাজত্ব পর্য্যন্ত এই ইতিহাসের সীমা। চৈতন্যসিংহের সময়ই রাজ্য নানা অংশে বিভক্ত ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা পীড়িত হইয়া ইষ্টে ইষ্টিয়া কোম্পানির করতলগত হয়।

রঘুনাথসিংহের সময় বিষ্ণুপুরের অশেষ ত্রিবুদ্ধি হইয়াছিল। যে সাতটি বাধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পাঁচটিই রাজা রঘুনাথ কর্তৃক নির্মিত। তিনি ১২৮ মল্লাদে মল্লেশ্বরের মন্দির স্থাপন করেন :—“বহুকরনবগণিতে মল্লশকে

মল্লেশ্বর—১৩২২ খৃঃ।

শ্রীবীরসিংহেন। অতিললিতং দেবকুলং নিহিতং শিবপাদপদ্মেসু ॥”

এই শিলালিপিয়ুক্ত মন্দিরটি রাজা তাঁহার পিতা বীরসিংহের নামে উৎসর্গ করেন, বন-বিষ্ণু-পুরের ইতিহাস-লেখক এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ১২৮ মল্লাদে রঘুনাথ রাজা হন নাই। বহু কর নব=১২৮ (অকের বামাগতি ধরিয়া)। বীরমল্লের রাজত্ব ৮০৭ হইতে ৮৪৫ মল্লাদ। আমার মনে হয়—বীরমল্লই বীরসিংহ বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছেন এবং মল্লেশ্বরের মন্দির বীরমল্ল-প্রতিষ্ঠিত। অপর অপর যে সকল মন্দির নির্মিত হইয়াছিল, তাহাদের যেগুলিতে তারিখ দেওয়া আছে, তাহাদের সঙ্গে রাজপঞ্জীর তারিখ মিলাইয়া—কোন রাজা কোন মন্দির স্থাপন করিয়াছেন—তাহা জানা বাইতে পারে।

শ্রামরায়ের পঞ্চরত্ন মন্দির—“শ্রীরাধাকৃষ্ণমুদে শশাঙ্কবেদাক্ষয়ুজ্ঞে নবরত্নম্, শ্রীবীর-
হাধীর নরেশহৃদদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ।” মল্লাদ ১৪৮ =
শ্রামরায়।
১৬৪৬ খৃঃ।

জোড়-বাগলা মন্দির—“শ্রীরাধাকৃষ্ণমুদে স্ববাংস্তরসাক্ষমে সৌধগৃহং শকেহক্ষে।
শ্রীবীরহাধীরনরেশহৃদদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ।” ১৬১ মল্লাদ=১৬৫৫ খৃঃ।
কালটাদের মন্দির “শ্রীরাধাকৃষ্ণমুদে শকে ধিরসাক্ষয়ুজ্ঞে নবরত্ন-
জোড় বাগলা—১৬৫৫ খৃঃ।
মেতৎ। শ্রীবীরহাধীরনরেশহৃদদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ।”

১৬১ মল্লাদ=১৬৫৫ খৃঃ।

লালজীর মন্দির—“শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদে শকেহ্কিরসাক্ষয়ুজ্ঞে নবরত্নমেতৎ। মল্লাধিপঃ
শ্রীরঘুনাথহৃদদৌ নৃপঃ শ্রীযুতবীরসিংহঃ।” ১৬৪ মল্লাদ=
লালজী—১৬৫৮ খৃঃ।
১৬৫৮ খৃঃ।

মুরলীমোহন মন্দির—“শ্রীশ্রীচূড়ামণিসিংহভূপজননী মল্লাবনীবল্লভঃ। শ্রীল-শ্রীযুক্তবীরসিংহ-
মহিবী শ্রীলশ্রীচূড়ামণিঃ। মল্লাদে শশিসপ্তরত্নবিমিতে শ্রীরাধিকা-
কৃষ্ণায়োঃ শ্রীতৈত্য় সৌধগৃহং ভবেদয়দিদং পূর্ণেন্দুতোহপ্যুজ্জলম্।”
মুরলীমোহন—১৬৬৫ খৃঃ।

মল্লাদ ১৭১=১৬৬৫ খৃঃ

১১১৮

বৃহৎ বঙ্গ

মদনগোপাল মন্দির—“রাধাকৃষ্ণদ্বন্দ্বপ্রাপ্তে সোমসপ্তাহগে শকে । রঘুনাথমহীনাথ-
তনুহস্তোচিতপ্রাচ্যঃ । বীরসিংহনরেশস্ত ভীরবমানসংশয়া । মহিষ্ঠ্যতি

মদনগোপাল—১৬৬৫ খৃঃ ।

প্রমোদ নববহুং সমপিতং ॥” ১৭১ মল্লাব্দ=১৬৬৫ খৃঃ ।

মদনমোহন মন্দির—“শ্রীরাধাব্রজরাজেশু নন্দনপদাঙ্কোজ তৎপ্রীতয়ে । মল্লাব্দে
ফলিতাশীর্ষগণিতে মাসে শুচৌ নির্মলে । সৌধং সুন্দররত্নমন্দিরমিদং

মদনমোহন—১৬২৪ খৃঃ ।

সর্দ্ধিং স্বচেতোহলিনা । শ্রীমদ্ভক্তনসিংহভূমিপতিনা দত্তং

বিগুডায়না ।” ১০০০ মল্লাব্দ=১৬২৪ খৃঃ ।

রাধাশ্রাম মন্দির—“শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ

শ্রীরাধাশ্রামচন্দ্রাজ্যৌ সরসিজতলে দিব্যমেতং সুশোভং মল্লাব্দে বেদকালান্বয়বিধু

রাধাশ্রাম—১৭৫৮ খৃঃ ।

গণিতে বাহলে পৌরমাত্তাং গেহং নানাবিচিত্রবিমিতিদৃঢ়ং পূজিত-
কাপি ভক্তৈঃ শ্রীচৈতন্যো নৃপেন্দ্রঃ শুভকৃতিনিপুনঃ সম্প্রযচ্ছেৎ

সভায়াম্ ।” শকাব্দ ১৬৮০=১৭৫৮ খৃঃ ।

রাধামাধব মন্দির—“শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ

মল্লাব্দে গুণবেদধেনুগণিতে শ্রীরাধিকামাধবপ্রীত্যৌ সৌধমিদং সুধাংসুবিমলং মাধে

রাধামাধব—১৭৩৭ খৃঃ ।

দদৌ চিত্রিতং । শ্রীশ্রীমহীমহেন্দ্রগুণবিদ্যোপালসিংহান্বজ-
শ্রীলশ্রীযুক্তকৃষ্ণসিংহমহিবৌ শ্রীশ্রীল চূড়ামণিঃ । সন ১০৪৩ সাল ।”

১০৪৩ মল্লাব্দ=১৭৩৭ খৃঃ ।

সদেব মন্দির—বিষ্ণুপুরের ৪ মাইল উত্তরে—একটি গুপ্তজাকৃতি চূড়াবিশিষ্ট—কোন
শিলালিপি নাই । উহা রাজা পৃথ্বীমল্ল কর্তৃক ৬৪১ মল্লাব্দে=১৩৩৫ খৃঃ অব্দে গঠিত হইয়াছিল ।

বিষ্ণুপুরে প্রাচীন অনেক দেবীদেবীর জিনিস আছে ইহাদের মধ্যে সর্কপেক্ষা উল্লেখ
যোগ্য বিখ্যাত দলমাদল (দালমর্দন) কামান । কেহ কেহ বলেন “ইহা পৃথিবীর মধ্যে
সর্কপেক্ষা বড় কামান । ইহা লালবাঁধ হ্রদের ধারে অবস্থিত । কত যুগ চলিয়া গিয়াছে,
ইহাতে এখনও মরিচা ধরে নাই । ইহার দৈর্ঘ্য ১২ ফুট ৫½ ইঞ্চি । ইহার মুখ ১১½ ইঞ্চি
এবং ভিতরটা সর্কাত্র ১৪½ ইঞ্চি । এই কামানের উপর ফারসীতে এই কথাটি উৎকীর্ণ আছে—
এক লক্ষ পঁচিশ টাকা (বোধ হয় উহা সেই সময়কার নির্মাণ করিবার ব্যয়) । ভাস্কর
পণ্ডিত বখন বর্গী সৈন্ত লইয়া বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন, তখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দলমাদলে
অগ্নি-সংযোগ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন—এই ভাবের কথা-স্মৃচক
অনেক পল্লী-গীতি আছে । পরদিন প্রত্যুষে নাকি মদনমোহনের হাতে বাক্রদের কালী
ও অঙ্গে বাক্রদের গন্ধ পাওয়া গিয়াছিল ।

কুচিরাকোল-নিবাসী মল্লরাজ বংশে জাত যোগেন্দ্রনাথ সিংহের বাড়ীতে রঘুনাথ-
সিংহের (১ম) খজা সংরক্ষিত আছে । ২০০ বৎসর পূর্বে ইহা নির্মিত হইয়াছিল,
কিন্তু এখনও ইহা ঠিক নূতনের মত আছে । এই খজা অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘ এবং
ইহার মুখ স্চির মত স্থল, তাহা দিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করা যায় ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ভুলুয়া বা নোয়াখালী

পূর্বে বিশাল ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্গত বহু খণ্ড দেশ ছিল; চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও শ্রীহট্টের অনেকাংশ ত্রিপুরার রাজারা শাসন করিতেন। এখন যে স্থানটি নোয়াখালী জেলা, তাহার সকল অংশই যে সমুদ্র-জলে সঞ্চয়িত হইয়া মাথা আগাইয়াছে, তাহা মনে হয় না। বরাহীমূর্তি এই জেলারই কোন স্থানে পাওয়া গিয়াছিল; এখনও নানা স্থানে হরগোরী ও বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যাইতেছে—সেই সকল মূর্তি দেখিলে মনে হয় না যে বিশ্বস্তরশূর হইতেই এ দেশ জনপদে পরিণত হইয়াছে। বিশ্বস্তর হইতে বর্তমান বংশধর বতীন্দ্র চৌধুরী ১৭ পুরুষ,—মাত্র ৫০০ বৎসরের কিছু উর্দ্ধকালের কথা; পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই দেশ প্রথম লোক-বসতিযুক্ত হইয়াছিল—ইহা বিখ্যাত নহে। ঐ সকল মূর্তি বহু প্রাচীন; এবং এই জেলার কতকগুলি দীঘি-পুকরিণী আছে—বাহার প্রাচীনত্ব সন্দেহ সংশয় নাই। হয়ত কোন সময়ে সুন্দরবনের মত এই স্থানের কতক অংশ জলের নীচে গিয়াছিল,—এই ভাবে লৌকিক প্রবাদ সমর্থিত হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, এই জেলার প্রথম রাজা বিশ্বস্তর-শূর বঙ্গাধিপ আদিশূরের বংশ। বর্তমান কালে জাতীয় যে সকল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ফলে এই কথাটির উদ্ভব হইয়াছে। কারণ, এই বংশোদ্ভব লোকেরাও কিছু দিন পূর্বে প্রবাদটি অবগত ছিলেন না। তাঁহারা নোয়াখালী ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার সঞ্চলনের সময় নিজেদের যে বংশাবলী দিয়াছিলেন—তাহাতে লিখিত আছে যে মিথিলার রাজা আদিশূরের নবম পুত্র বিশ্বস্তরশূর চট্টগ্রামে তীর্থ দর্শনে আসিয়া বরাহীমূর্তি লাভ করিয়া স্বপ্রাদেশে নোয়াখালীতে রহিয়া গেলেন এবং তথায় রাজ্য স্থাপন করিলেন। সুতরাং ইহারা মৈথিল রাজবংশ। গৌড়াধিপ আদিশূরের সমকালিক লোকদের ৩৭ হইতে ৪০ পযায়ে বংশের ধারা চলিতেছে,—কিন্তু এই নোয়াখালীর শূর-বংশের শেষ বংশধর তাঁহাদের পূর্বপুরুষ আদিশূর হইতে মাত্র ১৮শ পুরুষ। ইহারা যে মিথিলাধিপের বংশ তাহা বেরূপ নোয়াখালী ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়, সেইরূপ অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের দ্বারাও লিখিত হইয়াছে বতীন্দ্রমোহন রায়ের ঢাকার ইতিহাসে এই বংশকে মৈথিল রাজবংশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও তাঁহার রাজমালায় এই প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন :—“আদিশূরের বংশধর বিশ্বস্তর শূর মিথিলা প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন” ইত্যাদি (রাজমালা, ৩৯২ পৃঃ)। আনন্দনাথ রায় মহাশয় তাঁহার ‘বারুড়া’ নামক পুস্তকে (১৪৯ পৃঃ) লিখিয়াছেন, “এই স্থলে যে আদিশূরের কথা লিখিত হইল, তিনি বঙ্গদেশের নৃপতি আদিশূর নহেন, ইনি মিথিলার ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত।”

মিথিলার রাজবংশের তালিকা এইরূপ :—

- ১। আদিশূর ২। বিশ্বস্তরশূর ৩। গণপতি ৪। সুরানন্দ খা ৫। বিজানন্দ খা ৬। বিজয়ঠাকুরতা ৭। রামভদ্র কর্ণশূর ৮। হরিদাস ৯। কবিকীর্তিশূর

১০। কৃষ্ণরাম ১১। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ১২। "নরোত্তম" ১৩। রামরতন ১৪। গোপাল-
কৃষ্ণ ১৫। নন্দকুমার ১৬। যতীন্দ্র (বিজ্ঞান)। নবম সংখ্যক কবিকীর্তিশূরের অন্ত পুত্র
রাজা প্রসাদনারায়ণ রায়ের প্রণোক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে মুসলমান জমিদার ইছা চৌধুরীর
যে যুদ্ধ হইয়াছিল সেই প্রসঙ্গে "চৌধুরীর লড়াই" নামক পল্লীগীতিকা রচিত হইয়াছিল। উক্ত
গীতিকাখানি স্থলে স্থলে অস্বীকৃত্য-দোষে ছুট প্রমাণিত হওয়াতে বিচারালয় হইতে তাহা
নিষিদ্ধ হইয়া যায়। সম্প্রতি বহু সন্ধানে আদি গীতিকাটি আমি সংগ্রহ করিয়াছি এবং
তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়াছেন (পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ,
২২৫-৩৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন রাজাদের অধঃপতনের সময় তাঁহাদের রাজত্ব কিরূপ
নৈতিক নরককুণ্ডে পরিণত হয়—এই গীতিকা তাহার জ্বালাময় নিদর্শন। তথাপি এই
গীতিকায় তাৎকালিক নোয়াখালী-সমাজের যে চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে,—তাহা পল্লীকবির
কল্পনামিশ্রিত একখানি ঐতিহাসিক পট।

মিথিলাধিপতি শূররাজারা বঙ্গীয় রবুনন্দনের ব্যবস্থা যাত্র করেন নাই। তাঁহাদের
বংশধরেরা এখনও বাচস্পতি মিশ্রের ব্যবস্থা অনুসারেই দশক্রিয়া করিয়া থাকেন। অনিন্দনাথ
রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "এই বংশের গুরুপুত্রোচিতরা সকলেই মৈথিল ব্রাহ্মণ বলিয়া
পরিচয় দেন" (বারভূঞা, ১৫১ পৃঃ)। ভুলুয়ার শূরেরা কায়স্থকুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন,
তাঁহারা প্রথমে বঙ্গীয় কায়স্থ ছিলেন না। তেলিহাটী ও ভুলুয়া সম্পর্কে ঘটক কারিকায়
উক্ত হইয়াছে—

"গঙ্গায়াঃ পূর্বভাগে চ ব্রহ্মপুত্রস্ত পশ্চিমে।

ইচ্ছামত্যা দক্ষিণেনু বিশাখাসু তদন্তরে॥

কায়স্থা অত্র বৈনস্তাঃ (৭) ভিন্নদেশনিবাসিনান্।

ভুলুয়া-তেলিহাটীয়ো শূরাদিতৌ প্রশস্তকৌ॥"

আমরা শূর-বংশের যে তালিকা দিয়াছি তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। উত্তরকালে রাজাদের
জাতিগোষ্ঠী এক বাড়িয়া গিয়াছিল যে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে ভুলুয়া রাজ্য ১৪টি অংশে বিভক্ত
হইয়াছিল, সুতরাং ইহারা শেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক এক রাজার
বহু ভ্রাতা হওয়াতে এই তালিকা একান্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যতীনবাবুর
নিকট হইতে যে বংশলতা পাইয়াছি তাহা তাঁহারই পূর্বপুরুষদের শাখা অবলম্বন করিয়া
লিখিত হইয়াছে। আমরা "রাজমালার" (ত্রিপুরার) প্রাচীন পুথি হইতে জানিতে পারিয়াছি
যে নোয়াখালী বা ভুলুয়া রাজ্য এক সময়ে ত্রিপুরেশ্বরগণের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু
ত্রিপুরা-রাজ-বংশের এক রাজাকে হত্যা করিয়া যখন উদয়মানিক্য সিংহাসনে আরোহণ
করেন, তখন ভুলুয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। "হর্ষভনারায়ণ নামে শূর জমিদার। নৃপমাঞ্চে
বসে সে যে ভুলুয়া মাঝার॥ পূর্বপুরুষ তাঁর ত্রিপুর সঙ্গে মিলে। নাহি মিলে উদয়মানিক্য
রাজ্য কালে॥" সুতরাং দেখা যাইতেছে—হর্ষভনারায়ণ নামে শূরবংশীয় এক ব্যক্তি

নৃপতির যোগ্য মর্যাদায় ভুলুয়াতে প্রভুত্ব করিতেছিলেন। ভুলুয়ার পূর্ব পূর্ব স্বামীরা ত্রিপুরাধিপের অভিব্যেককালে সেই রাজদরবারে সামন্তরাজরূপে উপস্থিত হইতেন। কিন্তু হর্ষভনারায়ণ উপস্থিত হন নাই। পরন্তু তিনি বলিয়া পাঠান “রাজবংশ মারিয়া তুমি উদয়-মাণিক্য। আমিও ভুলুয়া-রাজ তুমি সমকক্ষ ॥” (রাজমালা, অমর খণ্ড।)

ত্রিপুরেশ্বর উদয়মাণিক্য এই উত্তর পাইয়া ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন, কিন্তু নানা কারণে তিনি সামরিক অভিযান করিয়া ভুলুয়া আক্রমণ করিতে পারিয়া উঠিলেন না। অমরমাণিক্য রাজা হইয়াই ভুলুয়ায় পুনরায় দূত পাঠান, কিন্তু হর্ষভনারায়ণের উত্তর এবার আরও প্রগল্ভ। “ত্রিপুরেশ্বরেরা আমার অধীন, আপনার সেই সিংহাসনে দাবী নাই।” এবার অমরমাণিক্য আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি এবার স্বয়ং তাঁহার চারি পুত্র সহ ৩৬,০০০ সৈন্য লইয়া ভুলুয়ায় রওনা হইলেন। সঙ্গে রাজার শালক ছত্র-নাভির এবং উজির সিংহ-সরব নারায়ণ সেনাপতি হইয়া চলিলেন। পথে রাজা মহাসমারোহে কালীপূজা করিয়া ভুলুয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সৈন্তেরা ভুলুয়া লুট-পাট করিতে লাগিল। এদিকে ভুলুয়াপতি হর্ষভনারায়ণ স্বয়ং মাত্র তিন শত অশ্বরোহী সৈন্য লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার অধিকাংশ অশ্বরোহী ও পদাতিক সৈন্য পাঠান বংশীয়। ত্রিপুরেশ্বরের সঙ্গে ইহারা ঝাঁটিয়া উঠিতে পারিল না। এই যুদ্ধে অমরমাণিক্য হর্ষভনারায়ণ ভ্রমে এক ব্রাহ্মণ সেনাপতিকে গুলি দ্বারা হত্যা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। ভুলুয়া জয় করিয়া অমর-মাণিক্য বাকলা হইয়া ত্রিপুরায় ফিরিয়া আসিলেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে ভুলুয়া ত্রিপুরেশ্বরের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল—ভুলুয়ায় বলরাম শূর প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সেই বংশেরই অমরমাণিক্য যে বিশাল অমরদীঘি খনন আরম্ভ করাইয়াছিলেন—সেই কার্য সমাধা করিবার জন্ত বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত দেশ হইতেই রাজারা মজুর পাঠাইয়া ত্রিপুররাজের আয়ুগতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ভুলুয়াধিপ বলরাম শূর এই উপলক্ষে এক হাজার মজুর পাঠাইয়া ছিলেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে তিন বৎসরে এই দীঘির খননকার্য সমাপ্ত হইয়াছিল। হর্ষভ-নারায়ণকে পরাস্ত করিয়া অমরমাণিক্য বাকলা দখল করেন—সেই সময়ে অর্থাৎ ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে বাকলা কন্দর্পরায় শাসন করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ ভুলুয়ার যুদ্ধের পর এই রাজ্য হইতে জুগীদিয়া ও দাঁদড়া এই দুইটি পরগনা স্বতন্ত্র হইয়া যায়। তোদড় ময় এই তিন স্থানের রাজত্ব এই ভাবে নির্দেশ করিয়াছিলেন, ভুলুয়ার রাজত্ব ১৩,৩১,৪৮০ দাম। জুগীদিয়া—৫,১২,০৮০ দাম। দাঁদড়া—৪,২১,৩৮০ দাম।

বিখন্তরশূর হইতে লক্ষণমাণিক্য ৭ পুরুষ। কথিত আছে বিখন্তরশূর ১২০২ খৃষ্টাব্দে ভুলুয়ায় রাজপাট স্থাপন করেন। লক্ষণমাণিক্যের বংশাবলী কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁহার রাজমালায় এইরূপ দিয়াছেন:—১। বিখন্তর ২। গণপতি ৩। সুরানন্দ ৪। দেবানন্দ ৫। কবিচন্দ্র ৬। রাজবল্লভ ৭। লক্ষণমাণিক্য।

আমরা ত্রিপুরার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রাজমালা হইতে দেখাইয়াছি, ১৫৭৮ খৃঃ অব্দে বাকলার রাজা কন্দর্পরায়ণ ত্রিপুরেশ্বর কর্তৃক বিজিত হন, এবং তিনি ভুলুয়ার রাজা হর্ষভনারায়ণের

সমসাময়িক। কন্দর্পনারায়ণ যখন যুবক, তখন চূর্ণভনারায়ণ বৃদ্ধ—এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে, লক্ষণমাণিক্যের সঙ্গে কন্দর্প-পুত্র রামচন্দ্রেরই সংঘর্ষ হইয়াছিল। সুতরাং লক্ষণমাণিক্য ১৩০০ খৃষ্টাব্দ বা তৎসম্মিলিত কোন সময় বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইনি মগ ও পর্তুগীজ দস্যাদিগকে বিশেষভাবে দমন করিয়াছিলেন এবং ইহার বীরত্বের বিশেষ খ্যাতি শোনা যায়। কোন কারণে বাকলাধিপতি কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষণমাণিক্যের মনোমালিঙ্গ ঘটিয়াছিল। তাহার ফলে লক্ষণমাণিক্যকে রামচন্দ্র (প্রতাপাদিত্যের জামাতা) অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেন।* রামচন্দ্র ভুলুয়ার রাজাকে অতিশয় আদর ও সম্মান দেখাইয়া প্রীতির অভিনয় করেন। সরল লক্ষণমাণিক্য তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের রাজকীয় কোষ-নোকায় উপস্থিত হইলে বিশ্বাসঘাতক বাকলা-(চন্দ্রদ্বীপ) নরেশ তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে আনিয়া তাঁহার সেনাপতি রামাই মাল (রামমোহন সিংহ—উজিরপুরনিবাসী কায়স্থ) ও অপরাপর লোক দ্বারা লোমহর্ষণ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক নৃসংশভাবে হত্যা করেন। লক্ষণমাণিক্য শুধু বীরাগ্রগণ্য ছিলেন না, তিনি শ্রুতিবি ও পণ্ডিত ছিলেন। তদ্রচিত সংস্কৃত নাটক ‘বিখ্যাত বিজয়’ মধ্য-যুগের বঙ্গের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। অর্জুন কর্তৃক কর্ণ বধ—এই নাটকের বিষয়। কথিত আছে রামচন্দ্র শৃঙ্খলিত অবস্থায় নিরস্ত্রভাবে যে তালবৃক্ষের সঙ্গে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা স্বীয় পুত্রের আঘাতে ধরাশায়ী করিয়াছিলেন (ব্রজসুন্দর-বাবুর চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস দ্রষ্টব্য) এবং তিনি যুদ্ধ কালে যে বর্ম পরিতেন—তাঁহার ওজন এক মন ছিল।

লক্ষণমাণিক্যের পুত্র বলরামশূরের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের আহুগত্য স্বীকার করিয়া অমর-দীঘির খনন কালে মজুর পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।

রাজা চূর্ণভনারায়ণের পত্নী শশিমুখার শাসনকালে ভুলুয়া তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়; ইহা ষোড়শ শতাব্দীর কথা। তৎপরে এই প্রদেশ ১৪টি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। এই ভাবে রাজ্যটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডগণের শাসনাধীন থাকিয়া ক্ষীণমান হয়। এখন এই বংশের ধাহারা আছেন, তাঁহারা মধ্যবৃদ্ধ গৃহস্থ মাত্র। সেই বীর-প্রবর লক্ষণমাণিক্য—যিনি মগদিগকে জয় করিয়া নানা বৃদ্ধে স্বীয় বীরত্ব ও শৌর্য্যবীর্ঘ্য দেখাইয়াছিলেন,—যে ক্রতকীর্তি রাজা চূর্ণভনারায়ণ ত্রিপুরেশ্বর উদয়মাণিক্য ও অমরমাণিক্যকে স্পর্ধিত উত্তর দ্বারা অসম-সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন,—যে রাজা ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে গোলন্দাজদিগের টের-হিলিং নামক বৃহৎ জাহাজ জলমগ্ন হইলে তদারোহিগণকে অশেষ আদর-আপ্যায়ন করিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন,—এবং তাঁহাকে ওলন্দাজ কাপ্তেন “বোলোয়ার” (ভুলুয়ার) প্রিন্স নামে অভিহিত করিয়াছিলেন—সেই সনামধন্য মহামাত্র রাজাদের ভুলুয়া এখন আর নাই—

* আনন্দনাথ রায় মহাশয় এই হত্যা বিশ্বাস করেন না, কিন্তু এই ঘটনার প্রধান ঐত ব্যাপক এবং সাময়িক নানা গ্রন্থে উল্লিখিত যে রামচন্দ্রকে এই অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি দেওয়ার চেষ্টা বিফল।

এখন উহা সন্ধ্যাপ, সিদ্ধি, হাতিয়া প্রভৃতি ৪৮টি দ্বীপের সমষ্টিকৃত নোয়াখালী জেলায় পরিণত হইয়াছে। বাবুপুরে এই বংশের রাজাদের বিশাল কামানটি পড়িয়া থাকিয়া ইহাদের পূর্ব গৌরবের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছে এবং “চৌধুরীর লড়াই” নামক পল্লীগীতিকার বর্ণনা রাজবংশের অবশেষে বাওয়ার চিত্র গ্রাম্য-কল্পনায় সজ্জিত করিয়া আমাদেরকে উপহার দিয়া বুঝাইতেছে—কি কি দোষে রাজলক্ষী বিচলিত হইয়া চলিয়া যান।

‘ভুল হ্যা’ শব্দ হইতে ভুলুয়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ গল্পগুস্তব পল্লীবৃদ্ধগণ শুনাইয়া থাকেন, এগুলি নিতান্তই বাজে বলিয়া বোধ হয়। কোন প্রমাণ না পাইয়া একটা শব্দ হাতে পাইলেই ইহারা উহা নিংড়াইয়া বথাসাধ্য ঐতিহাসিক রস দোহন করিতে থাকেন—এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া গিয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সুন্দরবন

ভূতত্ত্ববিদগণের মতে সুন্দরবন অঞ্চল সম্প্রতি সমুদ্র হইতে শির উত্তোলন করিয়াছে। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদগণের এই “সম্প্রতি” অর্থ লক্ষ লক্ষ বৎসর,—সুতরাং ঐতিহাসিক আলোচনার সময় তাহাদের মতামত বর্তমানের মধ্যে নহে।

এ পর্য্যন্ত যতটা জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় সুন্দরবন অঞ্চলের পশ্চিম দিকটাই খুব প্রাচীন। এই খানেই সুপ্রাচীন কপিল তীর্থ। ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত মথুরাপুর থানার অধীন ২৬ নং লাট কল্লণ-দীঘির পশ্চিমে রাধ-দীঘির পশ্চিম তীরে ভাটার সময় প্রায় ১৮ ফুট মাটির নীচে প্রাচীন গৃহাদির ভিত দৃষ্ট হয়—তাহার ইট খুব বড় বড়, মোর্চা-যুগের ইটের জায়। সেখানে বহু স্তূপ-দেব-বিগ্রহও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে ঐ সকল স্থান ভূবিয়া যাওয়াতে তাহারা ভূগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত স্থান ছাড়া সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চলেও ঐরূপ প্রাচীন ইটের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল স্থান খাত হইলে বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাসের নূতন আরও অনেক সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

রামায়ণের বালকাণ্ড ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ে আমরা নিম্নবঙ্গের নাম “রসাতল” রূপে দেখিতে পাই। মহাভারতে (বনপর্ক, ১১৪ অঃ) দৃষ্ট হয়, অর্জুন তীর্থযাত্রার বাহির হইয়া

গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে অবগাহন করিয়াছিলেন। পরাম্পরাতে বর্ণিত পুরাতত্ত্ব।

আছে—এই সাগরসঙ্গম অঞ্চলে সুবেণ নামক এক রাজা প্রাচীন কালে রাজত্ব করিতেন। তাহার সভায় আগত প্রজাপতি দীপাস্তী নগরীর রাজা গুণাকরের কন্যা (তালধ্বজ নগরের রাজপুত্র বাধবের পত্নী) সুলোচনা পুরুষ-বেশে “বীরবর” নাম ধারণ

পূর্বক ভীমনার নামক এক প্রকাণ্ড গড়ার বধ করিয়াছিলেন (পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াবোগসার, ৫ম অধ্যায়)। কালিদাস রঘুর দ্বিবিজয় উপলক্ষে নিম্নবঙ্গের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ঐ সময় এ দেশেবাসিগণ নৌযুদ্ধে বিশেষ পরাক্রম প্রদর্শন করিতেন।

পাল রাজত্ব কালে, গোপাল দেবের রাজত্বের প্রথম ভাগেই এই নিম্নবঙ্গ তাঁহাদের দখলে আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। দেবপালের তাম্রলিপিতে দৃষ্ট হয় গোপাল-সাগর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া ‘তাহার পর আর কোন ভূভাগ নাই’—এই জন্তই তাঁহার বণকুঞ্জর-দিগকে মুক্তি দিয়াছিলেন। এই সাগর পর্য্যন্ত ধরিত্রী অবশ্যই নিম্নবঙ্গের শেষ সীমাকে বুঝাইতেছে। গোপালের পুত্র ধর্মপাল তাঁহার ভূতাদিগকে পর্য্যন্ত সাগরতীরে অবগাহনের সুবিধা প্রদান করিয়া তাহাদের পূণ্যার্জনের সহায়ক হইয়াছিলেন (দেবপালের নালন্দা-তাম্র-লিপি)।

২৪-পরগনা জেলার ১১৬ নম্বর লাটে ১০০ ফুট উচ্চ একটি ভাঙ্গা দেউল আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা সরকার বাহাদুর মেরামত করিয়াছেন। মেরামতের পূর্বের ও পরের দুইখানি ছবি দেওয়া হইল। এই মন্দিরের নাম “জটার দেউল,” ইহার নিকটে কিছুদিন পূর্বে একখানি তাম্রপট পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে লিখিত আছে, ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে (৮৯৭ শকে) জয়চন্দ্র নামক কোন রাজা কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের কথা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কেহ কেহ অনুমান করেন জয়চন্দ্র সেই চন্দ্রবংশীয় রাজাদের স্বগণ। এই বংশের ত্রৈলোক্যচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে এখনও অনেক আলোচনা চলিতেছে।

হুন্দরবন ও তদ্বিকটবর্তী স্থানসমূহে আরও কতকগুলি ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহা গুপ্তযুগের। তন্মধ্যে কালীঘাটে প্রাপ্ত গুপ্তমুদ্রা (British Museum Catalogue of Indian Coins—Allan, p. xvii), খুলনা জেলার ভরতভাটনার স্তূপ (Annual Report, Archaeological Survey of India for 1921-22, p. 76), ২৪-পরগনার অন্তর্গত জয়নগর ধানার অধীন কাশীপুর ও সরিষাদহ গ্রামে প্রাপ্ত স্থূঁ ও নৃসিংহ-মূর্তি এবং মথুরাপুর ধানার অধীন ১১৪ নম্বর লাট গোবিন্দপুর গ্রামের শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ উল্লেখযোগ্য।

কতকগুলি পুরাকীর্তির নিদর্শন গুপ্তযুগের পূর্বসময়ের প্রতিও ইঙ্গিত করে। ২৪-পরগনা জেলার উত্তরাংশে বেড়া চাপা ও জাক্সা গ্রামের ধু: পু: ১ম ও ২য় শতাব্দীর কয়েকটি Steatite Seal এবং Punch-marked মুদ্রা উল্লেখযোগ্য। উক্ত বেড়া চাপা গ্রামে চন্দ্রকেতুর গড় ও বরাহমিহিরের বাটী নামক দুইটি স্তূপ হইতে বহু প্রাচীন ইষ্টক ও পোড়া মাটির দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গভর্নমেন্ট প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পূর্ব-চক্রের অধ্যক্ষ মহাশয় ঐ সকল নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া ঐ স্থানটিকে “নিম্নবঙ্গের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থানগুলির অন্যতম” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (Annual Report, Archaeological Survey of India for 1922-23, p. 109)।

লক্ষণসেনের সুন্দরবন ও দক্ষিণ-গোবিন্দপুরের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, সুন্দরবন ও তৎসন্নিকট প্রদেশ পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত খাড়িমগুলের অধীন ছিল। তাম্রশাসনে উল্লিখিত “বেতড় চতুরকের” নাম হাওড়ার অন্তর্গত বেতড় গ্রামের নাম হইতে এবং খাড়িমগুল ২৪-পরগনার খাড়ি গ্রামের নাম হইতে হইয়াছিল। (বান্দলার ইতিহাস, রাখালবাবু প্রণীত, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৩৫)।

জয়নগর-মজিলপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয় সুন্দরবনের ইতিহাস উদ্ধার-করেন প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এ সম্বন্ধে ইংরাজী ও বাঙ্গলায় বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন এবং প্রাচীন শিল্পনিদর্শনগুলি সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং একটি ছর্জড চিত্রশালা স্থাপন করিয়াছেন; এই সন্দর্ভটি মূলতঃ তাঁহারই সাহায্যে লিখিত হইল।

সম্প্রতি সুন্দরবনের “খাড়ি মণ্ডলে”র পূর্বভাগে “পাথর প্রতিমা” নামক পল্লীর নিকটে একখানি তাম্র-শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ১১২৬ খৃষ্টাব্দে (১১১৮ শকে) বাসুদেব নামক কার্ণশাখার এক ব্রাহ্মণ-বটুকে ভূমি-দানপত্র। তাম্রপটে শকাব্দা উৎকীর্ণ হওয়াতে কালসম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত প্রমাণ পাইতেছি যে, মুসলমান-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে সেন-রাজারা আর খাড়িমগুলের অথও অধিপতি ছিলেন না, বরং এই শাসনে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে যে তৎসময়ের সার্ক্সভৌম সম্রাটের (সেন রাজার) বিদ্রোহী অযোধ্যাগত শ্রীশ্রী (অস্পষ্ট) মহামাণ্ডলিক পালোপাধিক কোন রাজা এই স্থান শাসন করিতেছিলেন। “পাথর প্রতিমা” পল্লীর অনতিদূরে এক বৃহৎ মন্দির ছিল, এবং তথাকার চতুঃপার্শ্বে এত পাথর ও প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, যদ্বারা সহজেই অনুমিত হয় যে এক সময়ে এ স্থানটি একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। উক্ত পালরাজার সামন্ত-রাজ মড়ম্মন পাল এই ভূমি দান করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনখানির প্রতিলিপি, ইংরেজী অনুবাদ ও তৎসম্বন্ধীয় অপরাপর বিবরণ ইণ্ডিয়ান এসিয়াটিক কোয়ার্টার্লিতে (দশম সংখ্যা, ২ জুন, ১৯৩৪ খৃঃ) অধ্যাপক ডাক্তার বিনয়চন্দ্র সেন, এম. এ., পি এচ. ডি. (লণ্ডন) এবং শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

১৪৬৫ খৃষ্টাব্দের সম্বিহিত কোন সময়ে সুলতান রুকুনুদ্দিন বরাকের রাজত্বকালে দক্ষিণ দেশটা মুসলমানদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়াছিল। তৎপূর্বে সেনরাজগণের বংশধরগণ বহু চেষ্টায় হিন্দু অধিকার তথায় কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছিলেন। মুসলমানদের সময়ে দক্ষিণ-বঙ্গের প্রসিদ্ধ গ্রামগুলির উল্লেখ বহু প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায়। কথিত আছে মহাপ্রভু কুলীন গ্রামটিকে এত ভালবাসিতেন যে তিনি ঐ গ্রামের কুকুরটিকে নিজের অন্তরঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। এই কুলীন গ্রামেই ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসু, গুণরাজ ঐ, রামানন্দ বসু ও অপরাপর বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, এক সময়ে এই অঞ্চলে রামানন্দ ঐ অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন।

আকবরের সময়ে সুন্দরবন অরণ্যবহুল হওয়াতে কয় আদায়ের অযোগ্য ছিল (Ayeeni-

Akbari, Gladwin, p. 427)। এই সময়ে ফিরিঙ্গির অত্যাচারে এই অঞ্চলের অনেকস্থান জনশূন্য হইয়াছিল।

এই পুস্তকার্থ শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের লিখিত সন্দর্ভ

সুন্দরবনের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ

বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত পঞ্চদশ অসংখ্য বৃক্ষগুহ্য-সমাচ্ছাদিত নদীবহুল বিস্তীর্ণ ভূভাগ সুন্দরবন নামে প্রসিদ্ধ এবং বর্তমান সময়ে বাথরগঞ্জ, খুলনা ও ২৪-পরগনা এই তিনটি জিলার অন্তর্গত। পূর্বে ইহা উত্তরে মুসলমান আমলের পরগনাগুলির শেষসীমা হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, ও পশ্চিমে হুগলী নদীর মোহানা হইতে পূর্বদিকে মেঘনার মোহানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে ইংরাজ গভর্নমেন্টের চেষ্টায় এই প্রদেশের হাসিলকার্য্য আরম্ভ হইয়া এখনও চলিয়াছে, এবং তাহার ফলে ইহা বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদগণের সিদ্ধান্ত হইতে অনেকে স্থির করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের এই অংশ খুব প্রাচীন স্থান নহে, এবং অল্পকাল হইল সমুদ্রগর্ভ হইতে উথিত হইয়াছে। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদগণ যে লক্ষ লক্ষ বৎসরের কথা বলেন এবং তাঁহাদের নিকট যে দেশ খুব নূতন, ঐতিহাসিকের নিকট তাহা যে খুব পুরাতন সে কথা তাঁহারা ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিবার সময়ে মনে রাখেন না। ভূতত্ত্ববিদগণের অহুস্কান হইতে ইহাও জানা যায় যে সুদূর অতীতকালে ভূমি নিমজ্জিত হওয়ায় এই প্রদেশের প্রাচীন ভূসংস্থানের বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, (Revenue Survey Report on the districts of Jessore, Faridpur and Bakhergunge—Colonel Gastrell. Manual of Geology of India—R. D. Oldham)। ইহা ব্যতীত এখানকার নানাস্থানে, অরণ্য হাসিলের পর, অরণ্যমধ্য হইতে ও পুকুরিণী প্রভৃতি খননকালে ভূগর্ভ হইতে, যে সকল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, ইষ্টকস্তূপ, গড়, মজা পুকুরিণী তাম্রপট্টলিপি ও প্রস্তরমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে সেইগুলি হইতেও বুঝা যায় যে বঙ্গদেশে মুসলমান আগমনের পূর্বে গুপ্ত, পাল ও সেন-রাজগণের রাজত্বকালে এখানে বহু সমৃদ্ধ জনপদ বিদ্যমান ছিল (যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র)। The Antiquities of Khari, North-West Sundarbans, and the Sundarbans. By Kalidas Datta, Varendra Research Society's Monographs Nos. 3, 4 and 5 এবং পুরাতন গ্রন্থাদি ও ঐ সকল পুরাকীর্তির নিদর্শন হইতে প্রতিপন্ন হয় যে সুন্দরবনের পশ্চিমাংশ প্রদেশই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থান এবং তদাধীনে সভ্যতালোক সর্বাপেক্ষা প্রকাশিত হইয়াছিল। পূণ্যতোয়া ভাগীরথী নদী সুদূর অতীত যুগ হইতে এখানে সাগরসলিলে আত্মবিসর্জন করার বহু প্রাচীনকাল হইতেই কপিল

মুনির আশ্রম ও গঙ্গাসাগর-সঙ্গম তীর্থরূপে এই প্রদেশ প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান সময়ে ইহা ২৪-পরিগণনা জেলার অন্তর্গত। এখানে ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্ভুক্ত মথুরাপুর থানার অধীন ২৬ নম্বর লাট, কঙ্কণ-দীঘির পশ্চিমে, রায়দীঘি নদীর পশ্চিমতীরে, ভাটার সময়ে প্রায় ১৮ ফুট মাটির নিচে মোঘাযুগের ইষ্টকের ছায়া খুব বড় বড় ইষ্টকনির্মিত প্রাচীন গৃহের ভিত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নদীতে কঙ্কণ-দীঘির কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া বাওয়ায় ঐরূপ ভিত্তির ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সুন্দরবনের অজ্ঞাত অংশেও ভূগর্ভে এইরূপ প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভূমি-নিমজ্জনের জন্তই যে ঐ সকল প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ ঐরূপে ভূগর্ভে নিহিত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কখনও এতদঞ্চলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খনন আরম্ভ হইলে হয়তো ঐ সকল পুরাকীর্তির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়া সুন্দরবনের গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীত ইতিহাসের উপর আলোকপাত করিতে পারে।

পৌরাণিক গ্রন্থে সুন্দরবন

প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে রামায়ণেই সর্বপ্রথম গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের উৎপত্তির কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু উহাতে “রসাতল” নামে নিম্নবঙ্গের উল্লেখ ব্যতীত অন্য কোনরূপ পরিচয় নাই (রামায়ণ, বালকাণ্ড, ত্রিচত্বারিংশ সর্গ)। রামায়ণের পরে নিম্নবঙ্গের পরিচয় আমরা সর্বপ্রথম মহাভারতে প্রাপ্ত হই। উহাতে দেখা যায় যে তৎকালে নিম্নবঙ্গে ভাগীরথী নদী বহুসংখ্যক শাখায় বিভক্ত ছিল। অর্জুন তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে আসিয়া ঐ সকল নদীর মধ্যে অবগাহন করত কলিঙ্গ দেশান্তর্গত বৈতরণী-তীর্থাভিমুখে গিয়াছিলেন (মহাভারত, বনপর্ক, ১১৪ অঃ)।

মহাভারত ব্যতীত অনেকগুলি পুরাণেও গঙ্গাসাগর-সঙ্গম তীর্থের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে উক্ত তীর্থক্ষেত্রে এক বিস্তৃত জনপদ ছিল এবং অবেণ নামক একজন চন্দ্রবংশীয় রাজা তথায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সভায় আগত প্রক্ষধীপস্থ দীপান্তী নগরীর রাজা গুণাকরের কথা ও তালধ্বজ নগরের রাজপুত্র মাধবের পত্নী স্থলোচনা পুরুষবেশে বীরবর নাম ধারণ করিয়া ভীমনাদ নামে এক গুপ্তার বধ করিয়াছিলেন (পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, ৫ অঃ)। ইহাতে বুঝা যায় যে পদ্মপুরাণে উল্লিখিত গঙ্গাসাগর-সঙ্গম সুন্দরবনেই ছিল এবং তথায় উক্ত পুরাণ রচনাকালে অরণ্য ও জনপদ উভয়ই বর্তমান ছিল।

ঐতিহাসিক যুগে সুন্দরবন

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে এ পর্যন্ত ঐতিহাসিক যুগের যে সমস্ত কীর্তি-নিদর্শন সুন্দরবনে পাওয়া গিয়াছে সেগুলি সমস্তই গুপ্ত, পাল ও সেন-রাজত্বকালের। তৎপূর্ববর্তী

সময়ের সভ্যতার কোন নিদর্শন এখনও এখানে আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে ইহার সন্নিকটে ২৪-পরগনা জিলার উত্তরাংশে কতকগুলি খুব প্রাচীন পুরাকীর্তির নিদর্শন বাহির হইয়াছে। উহাদের মধ্যে বেড়াটাঙ্গা ও জাক্রাগ্রামের খৃঃ পূঃ ১ম ও ২য় শতাব্দীর কয়েকটি Steatite Seal ও punch-marked coins উল্লেখযোগ্য (Descriptive List of Sculptures and Coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parisad—R. D. Banerjee, p. 16)। উক্ত বেড়াটাঙ্গা গ্রামে চক্রকেতুর গড় ও বরাহমিহিরের বাটী নামে দুইটি স্থাপত্য হইতেও বহু প্রাচীন ইষ্টক ও পোড়া মাটির দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গভর্ণমেন্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পূর্ব-চক্রের অধ্যক্ষ মহাশয় ঐ সকল নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া এই স্থানটিকে “One of the earliest settlements in Lower Bengal” বলিয়া স্থির করিয়াছেন, (Annual Report, Archaeological Survey of India for 1922-23, p. 109)।

ঐ সকল নিদর্শন ব্যতীত হুন্দরবন ও তন্নিকটবর্তী স্থানে যে সমস্ত বেশী পুরাতন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলি সমস্তই গুপ্তযুগের। তন্মধ্যে কালীঘাটে প্রাপ্ত গুপ্ত-মুদ্রা-সমূহ (British Museum Catalogue of Indian Coins—Allan, p. xvii), খুলনা জেলার ভরতভারনার স্থাপত্য (Annual Report, Archaeological Survey of India for 1921-22, p. 76), ও ২৪-পরগনার অন্তর্গত জয়নগর ধানার অধীন কাশীপুর ও সরিষাদহ গ্রামে প্রাপ্ত স্থাণী ও নৃসিংহমূর্তি ও মধুরাপুর-ধানার অধীন ১১৪ নম্বর লাট গোবিন্দপুর গ্রামের শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ উল্লেখযোগ্য (The Antiquities of Khari and the Sundarbans, Kalidas Datta, V. R. Society's Monographs, Nos. 4 and 5)। এই সকল নিদর্শন হইতে বুঝা যায় যে গুপ্ত-রাজত্বকালেও বঙ্গোপসাগর-তীরবর্তী নিম্নবঙ্গ সমৃদ্ধ ছিল। এই যুগেই সম্রাট ২য় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব হয় (Early History of India, V. S. Smith)। তিনি রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় উপলক্ষে নিম্নবঙ্গের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে ঐ সময়ে এদেশবাসিগণ নৌযুদ্ধে খুবই পারদর্শী ও পরাক্রমশালী ছিলেন।

পাল রাজত্বকাল

গুপ্তযুগের অবসানে বঙ্গদেশে মাৎসরাজ্যের ফলে পাল-রাজ্যের সৃষ্টি হয়। গোপালদেব এই রাজ্যের সংস্থাপক। তাঁহার পুত্র ও পৌত্র—ধর্মপাল ও দেবপালের—রাজত্বকালই বাঙ্গলার ইতিহাসের গৌরবময় যুগ। দেবপালের মৃত্যুর ও নালন্দা তাম্রপট্টলিপির তৃতীয় শ্লোক পাঠে প্রতীয়মান হয় যে সম্ভবতঃ গোপালদেবের রাজত্বকালের প্রথমভাগেই এতদেশ পাল-রাজ্যান্তর্গত হইয়াছিল। উক্ত শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে পাল-নরপতি গোপাল বঙ্গদেশের মাৎসরাজ্য দুরীভূত করিয়া সমুদ্রপর্ধ্যন্ত ধরণীমণ্ডল জয় করিয়াছিলেন। সে কারণে আর যুদ্ধোচ্চয়ের প্রয়োজন নাই বলিয়া তাঁহার মদমন্ত্ৰ রণকুঞ্জরগণকে বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন (গৌড়লেখমালা, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পৃঃ ৪১, Nalanda Copper-plate of Devapala,

V. R. Society's Monograph, No. 1, p. 24)। ঐ শাসন দুইখানির সপ্তম শ্লোকে দেখা যায় যে গোপালদেবের পুত্র প্রসিদ্ধ নরপতি ধর্মপালদেবের সমভিব্যাহারী ভূত্যবর্গও নিম্নবঙ্গে আসিয়া গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে ধর্মকন্ঠের অমুষ্ঠান করিয়াছিল।

২৪-পরগনা জেলার অধীন সুন্দরবনাস্তর্গত প্রদেশে ১১৬ নম্বর লাটে, প্রাচীন নাগর-রীতিতে নিৰ্ম্মিত প্রায় ১০০ ফুট উচ্চ একটি ভগ্ন মন্দির অরণ্য মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার বর্তমান নাম জটার দেউল। কিছুদিন পূর্বে ঐ মন্দিরের সন্নিকটে একখানি তাম্রপট্ট-লিপি আবিষ্কৃত হয়। তাহাতে দেখা যায় যে পাল-রাজত্বকালের শেষভাগে, ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তচন্দ্র নামক জনৈক নৃপতিকর্তৃক উহা নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল (List of Ancient Monuments in Bengal, Presidency Division, No. I)। এই জয়ন্তচন্দ্র কে তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। পূর্ববঙ্গে শ্রীচন্দ্রদেবের যে কয়খানি তাম্রপট্টলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেইগুলি হইতে বুঝা যায় যে ঐ সময়ে বঙ্গদেশে চন্দ্রবংশীয় রাজগণও কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন (Inscriptions of Bengal, Part III. By N. G. Mazumdar, published by the Varendra Research Society)। জটার দেউল-প্রতিষ্ঠাতা জয়ন্তচন্দ্র এই বংশীয় কেহ হইলেও হইতে পারেন। পুরাতন গ্রন্থাদির মধ্যে গোরক্ষবিজয় ও ময়নামতীর পুঁথিতেও উক্ত চন্দ্রবংশীয় রাজগণের কথা আছে (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৫০-৬৩)। পূর্বোক্ত জটার দেউলের প্রায় ১ ক্রোশ পশ্চিমে ২৬ নম্বর লাট, কঙ্কণ-দীঘিতে এক বিস্তৃত জনপদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে যে সকল ইষ্টকস্তূপ ও গৃহের ভিত্তি দেখা যায় সেগুলির ইষ্টকের সহিত জটার দেউলের ইষ্টকের গঠন-পদ্ধতির ও আকারের যেরূপ মিল আছে তাহা দেখিলে এই স্থানটি ঐ সময়ে সুন্দরবনের একটি প্রধান স্থান ছিল বলিয়া বোধ হয়।”

সেন-রাজত্বকাল

“পাল-রাজত্বকালের অবসানে বঙ্গদেশে সেন-রাজত্বের উদ্ভব হয়। বিজয় সেন এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাহার পৌত্র মহারাজ লক্ষণ সেনের সুন্দরবন ও দক্ষিণগোবিন্দপুরের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে সেন-রাজত্বকালে বর্তমান ২৪-পরগনা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, যাহা ভাগীরথী-প্রবাহের পশ্চিমে অবস্থিত, (আলিপুর, খিদিরপুর, বেহালা, ফলতা, ডায়মণ্ড হারবার, কুলপী প্রভৃতি থানার অধীন ভূভাগ) বর্তমান ভুক্তির অন্তর্গত বেতড় চতুরকের মধ্যবর্তী এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্বাংশ প্রদেশ, যাহা উক্ত ভাগীরথী নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত, পৌণ্ড্রবর্ধনাস্তর্গত খাড়ীমণ্ডলের অধীন ছিল (The Antiquities of Khari and North-West Sundarbans. By Kalidas Datta. Varendra Research Society's Monographs, Nos. 3 and 4)। উক্ত বেতড় চতুরকের মধ্যে হাওড়া জেলার অন্তর্গত বেতড় এবং খাড়ীমণ্ডল ২৪-পরগনা জিলার অধীন ‘খাড়ী’—এই দুই গ্রাম তাম্রলিপির

উল্লিখিত পল্লী। (বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৩৫। *The Antiquities of Khari.*)

ইতিপূর্বে এতদেশে আবিষ্কৃত প্রস্তরমূর্তি প্রভৃতি যে সকল পুরাকীর্তি-নিদর্শনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই উক্ত পাল ও সেন-রাজত্ব-সময়ের। ঐগুলি দেখিলে বুঝা যায় যে ২৪-পরগনা জেলার মধ্যে সাগরতীরবর্তী সুনন্দরবন-প্রদেশই এই পাল ও সেন-রাজত্বকালে বহু গ্রামনগরাদিতে সমৃদ্ধ ছিল এবং সে সময়ে তথায় ব্রাহ্মণা ধর্মের প্রভাবই সর্বাধিক ছিল। বাঙ্গলাদেশের অস্তাত্ত অংশের জায় তৎকালে বৌদ্ধধর্ম এতৎ অঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠিতে পারে নাই। কোন্ সময়ে কি কারণে এই প্রদেশের ঐ সমস্ত লোকালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা আজিও ঠিক জানা যায় নাই। তবে এখানে এ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র মুসলমান রাজত্বকালের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়ের সভ্যতার নিদর্শনসমূহের আবিষ্কার হওয়াতে বোধ হয় মুসলমান আমলের পূর্বে, সম্ভবতঃ সেনরাজত্ব-কালের শেষ সময়ে, এতদেশের প্রাচীন জনপদসমূহ, হয় কোনরূপ প্রাকৃতিক বিপ্লবে অথবা বৈদেশিক আক্রমণে, নষ্ট হইয়া বর্তমান সুনন্দরবনে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল।

মুসলমান অধিকারকাল

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার ইতিহাস যতদূর সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা পাঠে বুঝা যায় যে মুসলমানগণ গৌড়-বিজয়ের বহুদিন পরে নিম্নবঙ্গ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেন বংশীয় নরপতিগণ বঙ্গদেশের অস্তাত্ত অংশের অধিকার হারাইয়া অবশেষে বাধ্য হইয়া পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই নদীবহুল দুর্গম প্রদেশে থাকিয়াই বহুদিন মুসলমানগণের সহিত সংঘর্ষ চালাইয়াছিলেন। বখতীয়ার খিলজির মৃত্যুকালে বরেন্দ্রভূমির কিয়দংশ মাত্র তাঁহার পদানত হইয়াছিল (*Tabkati Nasiri*, pp. 484-486, বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)। মহারাজ লক্ষণ সেনের বংশধরগণ সে সময়ে পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গের অধিকারী ছিলেন (*Ibid.*, p. 538)। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে যোগল-সম্রাট গিয়াসউদ্দীন বলবনের মধ্যম পৌত্র, বাঙ্গলার স্বাধীন সুলতান রুকনুদ্দীন কৈকাসের রাজ্যের শেষভাগে, দেবকোটের শাসনকর্তা বহরম ঈংগীন জাফর খাঁ কর্তৃক সপ্তগ্রাম বিজিত হইয়াছিল, কিন্তু তখনও সমুদ্রোপকূলবর্তী দক্ষিণ-বঙ্গ মুসলমানগণের অধিকারে আসে নাই (বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)। ঐ সময়ের প্রায় ১৬৭ বৎসর পরে, ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে, অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে সুলতান রুকনুদ্দীন বরাবকের রাজত্বকালে, সমগ্র দক্ষিণ-বঙ্গ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল (*Epigraphia Indica, Moslemica*, 1909-10, p. 112)। এই সময়ে বসিরহাটে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। উহা এখনও তথায় বর্তমান আছে এবং সাহী মসজিদ নামে প্রসিদ্ধ (বসিরহাটের সাহী মসজিদ, শ্রীম্ভিক্সেনারায়ণ রায়চৌধুরী, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দশ অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ)।

চৈতন্যভাগবতে দেখা যায় যে, এই পাঠান রাজত্বকালের শেষভাগে, হুসেন সাহের শাসনসময়ে বর্তমান ২৪-পরগনা জেলার ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত মথুরাপুর ধানার অধীন ছত্রভোগ পর্য্যন্ত স্থানে মহুম্বাবাস ছিল, এবং উহার দক্ষিণ প্রদেশ অরণ্যাবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সে সময়ে ছত্রভোগ একটি প্রধান বন্দররূপে প্রসিদ্ধ ছিল এবং রামচন্দ্র খাঁ নামক হুসেন সাহের একজন কর্মচারী তৎকালে সমগ্র দক্ষিণদেশ শাসন করিতেন (চৈতন্যভাগবত, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৮৩-২৮৫)। এই রামচন্দ্র খাঁ কে ছিলেন, তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। ঐ সময়ে ছত্রভোগের ১২।১৩ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব দিকে মাহীনগর নামক স্থানে পুরন্দর খাঁ নামক হুসেন সাহের জনৈক হিন্দু অমাত্য বাস করিতেন। তাঁহার বংশে অনেকের খাঁ উপাধি ছিল। উক্ত রামচন্দ্র খাঁ এই বংশের কেহ হওয়াই সম্ভব। ভাগবতের অনুবাদক প্রসিদ্ধ মালাধর বসু বা গুণরাজ খাঁও এই বংশীয়। ইহাদের বংশধরগণই অধুনা বঙ্গদেশে মাহীনগরের বসু নামে প্রসিদ্ধ। এই মহী- (বা মাহী) নগর প্রাচীনকালে ভাগীরথী নদীর উপর একটি সমৃদ্ধ স্থান ছিল। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য ও বিপ্রদাস চক্রবর্তীর মনসার ভাসান প্রভৃতি পুরাতন পুস্তকে এই স্থানের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, উক্ত বসুবংশীয় কায়স্থগণের পূর্বপুরুষ মহীপতি বসুর নাম হইতে এই স্থানের নাম মাহীনগর হইয়াছিল। এখানে দক্ষিণ-রাষ্ট্রীয় কায়স্থ-সমাজের তিনবার একজাই হওয়ায় ইহা প্রাচীনকালে সামাজিকগণের নিকটও খুব প্রসিদ্ধ ছিল (কায়স্থ-পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, পুরন্দর খাঁ ও মাহীনগর সমাজ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু), এবং কুলীনগ্রাম নামেও অভিহিত হইত। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে কুলীনগ্রামের অবস্থানের বৈকল্প পরিচয় লিখিত আছে, তাহা হইতেও এই স্থানটি ঐ নামে প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া বুঝা যায়। ঐ পুস্তক অনুসারে চৈতন্যদেব শান্তিপুর হইতে অম্বুয়ায় গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে গঙ্গার বামতীর অবলম্বনে কাচমনি বেতড় (বর্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত বেতুর) দক্ষিণে রাখিয়া উক্ত কুলীনগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন (চৈতন্যমঙ্গল, পরিবদ্-গ্রন্থাবলী—৭, পৃষ্ঠা ২৫)। মাহীনগরের এই বসুবংশীয়গণ বৈষ্ণবধর্মে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। ইহাদের মধ্যে বসু রামানন্দের নামও বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত। শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে তাঁহাকে জগন্নাথের পট্টভূরী বজমান করিয়াছিলেন (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৪ পরিচ্ছেদ)। গুণরাজ খাঁ কৃত ভাগবতের বঙ্গানুবাদের জন্তও এই কুলীনগ্রামকে মহাপ্রভু খুবই মেহের চক্ষে দেখিতেন। কুলীনগ্রাম-বাসিগণের জগন্নাথের পট্টভূরী লইয়া যাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই :—

“কুলীনগ্রামেরে কহে সম্মান করিঞা।

প্রত্যক্ষ আসিবে যাত্রার পট্টভূরী লঞা ॥

গুণরাজ খাঁ কৈল শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।

নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।

এই বাক্যে বিকাইলু তার বংশের হাত ॥

তোমার বা কথা কিবা তোমার গ্রামের কুকুর।

সেও মোর প্রিয় অস্ত্রজন বহদুর ॥” (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা)।

পাঠান রাজত্বের অবসানে বঙ্গদেশে মোগল রাজত্বের আরম্ভ হইলে ২৪-পরগনা জেলার উত্তরাংশে সরকার সাতগাঁর অন্তর্গত মুড়াগাছা, খারার (খাড়ী), হাতীয়াঘর, সেদনমল, ও বালাগু প্রভৃতি পরগনার অধীন হইয়াছিল, কিন্তু দক্ষিণাংশে সুন্দরবন প্রদেশে ঐ সকল পরগনার বহির্ভাগে অবস্থান করিয়া কর আদায়ের অল্পপুঙ্ক্ত অবস্থায় ছিল। Ayeeni Akbari—Gladwin, p. 427. Hunter's Statistical Account, Vol. I, p. 381)। এই সময়ে ভাগীরথী-তীরবর্তী ছত্রভোগ প্রভৃতি বহু জনপদ মগ ও ফিরঙ্গীর অত্যাচারে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে সুন্দরবনের সীমা আরও বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছিল। এই কারণে ইংরেজ-রাজত্বের প্রারম্ভকালেও কলিকাতার সন্নিকটে অরণ্য দেখা যাইত।”

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অম্ভান্য রাজা ও জমিদারগণ

মুরসিদাবাদের নবাবদের ইতিহাস পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে—তৎপরবর্তী নবাবদের শুধু নামোল্লেখ করিয়া যাইব। মীর জাফর ইংরেজদিগকে কলিকাতার চতুঃপার্শ্ববর্তী সমস্ত বিভাগের জমিদারী স্বত্ব প্রদান করেন। এই স্থানটিই বর্তমান ২৪-পরগনা, (পরিমাণ ৮৮২ বর্গ মাইল), ইহার রাজস্ব দশ লক্ষ টাকা, ইহার মধ্যে ইং ই কোম্পানীকে বাৎসরিক ২,২২, ২৮৫ টাকা নবাব-সরকারে খাজনা দিতে হইত। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে মীর জাফর এই ভূভাগের মালিকানা স্বত্ব কোম্পানীকে দিয়া খাজনার ২,২২, ২৮৫ টাকা ক্রাইবকে প্রদান করেন। মীরনের মৃত্যু হওয়াতে মীর জাফরের জামাতা মীর কাশিম নবাব হন। ইনি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে মেজর মনরো কর্তৃক পরাভূত হইয়া বক্সারের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। এই যুদ্ধবিগ্রহকালে মীর কাশিম অগতঃ, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে ইংরেজের পক্ষীয় দেখিয়া জলে ডুবাইয়া নিহত করেন—দৈবক্রমে কৃষ্ণনগরের অধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধার পান। মীর কাশিমের সঙ্গে সঙ্গে মুরসিদাবাদের নবাবদের প্রাসাদের শেষ দীপ নির্ধাপিত হয়। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে মীর কাশিম রাজ্যচ্যুত হইলে মুরসিদাবাদের সিংহাসনে মীর জাফর পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই (১৭৬৫ খৃঃ অব্দে) কুষ্ঠ রোগে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপরে তাহার দৌহিত্র নিজামউদ্দৌলা ও সৈয়দউদ্দৌলা নবাব হন। প্রথমোক্ত নবাব ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি সৈয়দউদ্দৌলা ১৭৭০ খৃঃ অব্দে সেই একই রোগে

মৃত্যুসুখে পতিত হইলেন। তৎপরে যথাক্রমে নবাব মুবারকউদ্দৌলা (১৭৭০-৯৩ খৃঃ), নবাব কবরজঙ্গ (১৭৯৩-১৮১০ খৃঃ), নবাব জমুনদ্দিন (১৮১০-২১ খৃঃ), নবাব ওয়ালাজা (১৮২১-২৪ খৃঃ), নবাব হুমায়ুন জা (১৮২৪-৩৮ খৃঃ), (ইহার সময়ে বর্তমান হাজার-ছয়দারী প্রাসাদ ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়, ১৮২৯-৩৭ খৃঃ); হুমায়ুন জার পরে নবাব মনসুর আলি খাঁ (১৮৩৮-৯০ খৃঃ), হুসেন আলী মির্জা খাঁ (১৮৯০-১৯০৮ খৃঃ), এবং বর্তমান কালে সর্বজনপ্রিয় ওয়াসিফ আলী মির্জা খাঁ মুরসিদাবাদের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছেন।

কৃষ্ণবংশের রাজবংশ—ইহারা এদেশের ব্রাহ্মণ-সমাজের সমাজ-পতি এবং ভট্টনারায়ণের বংশোদ্ভূত। ভট্টনারায়ণের সপ্তম স্থানীয় কান্দীনাথ ১৫৯৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জমিদারী পরিচালনা করিতেন। কান্দীনাথের পুত্র রামচন্দ্রকে আন্দুলের জমিদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দার পোষ্য গ্রহণ করেন, তৎপুত্র ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের দ্বারা পুরস্কৃত হইয়া, হরি হোড়ের বিশাল সম্পত্তি অধিকারপূর্ব্বক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ভবানন্দের পুত্র রামগোপাল, তাঁহার পুত্র রাঘবচন্দ্র রায়—এবং তাঁহার পুত্র রুদ্রনারায়ণ দিল্লীখর হইতে ‘রাজা’ উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে যথাক্রমে রামকৃষ্ণ, রামজীবন এবং রঘুরাম রাজা হন। রঘুরামের মৃত্যুর পর (১৭২৮ খৃঃ) স্বনামধন্য কৃষ্ণচন্দ্র সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। কৃষ্ণচন্দ্র যেমন পণ্ডিত, তেমনই বুদ্ধিমান ছিলেন; রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন, এবং ধনুর্বিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাত্ত্বিক শাস্ত্র ছিলেন এবং অগ্নিহোত্র, বাজপেয় প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। রাজস্ব দেওয়ার ক্রটি হওয়াতে মুরসিদকুলি কর্তৃক তাঁহার “বৈকুণ্ঠবাসের” আজ্ঞা হইয়াছিল, কিন্তু দৈবক্রমে তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইব তাঁহাকে ১২টি কামান উপহার দিয়াছিলেন। তিনি ‘শিবনিবাস’, ‘গঙ্গাবাস’ প্রভৃতি বিখ্যাত প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ক্লাইবের অমুগ্রাহে তিনি দিল্লীখরের নিকট হইতে ‘মহারাজা’ উপাধি পাইয়াছিলেন। ১৭৮২ খৃঃ ২২শে আষাঢ় তিনি ৭০ বৎসর বয়সে স্বর্গীয় হন। তাঁহার সভায় বহু পণ্ডিত বিজ্ঞান ছিলেন। প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র রায় তাঁহারই সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পরে যথাক্রমে শিবচন্দ্র রায় (১৭৮২-৮৮ খৃঃ), ঈশ্বরচন্দ্র রায় (১৭৮৮-১৮০২ খৃঃ), গিরীশচন্দ্র রায় (১৮০২-৪১ খৃঃ), শ্রীশচন্দ্র রায় (১৮৪১-৫৭ খৃঃ), সতীশচন্দ্র রায় (১৮৫৭-৭৫ খৃঃ), ক্ষিতীশচন্দ্র রায় (১৮৭৫-১৯১০ খৃঃ) এবং ফৌজীশচন্দ্র রায় সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

ভাওয়াল রাজবংশ—কথিত আছে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পরে, ঢাকায় কোন কোন স্থান গাজির অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ জেলার সূয়াপুর গ্রামের প্রান্তবাহী “কানাই” নদের নাম পরিবর্তন করিয়া ইহারা “গাজিখালী” নাম দিয়াছিলেন। পাল ও চাঁদ গাজির পুত্র ভাওয়াল গাজির নামানুসারে ঢাকার উত্তরবর্তী ভূভাগের “ভাওয়াল” নাম হইয়াছে। গাজি-বংশীয় ফজল গাজির পুত্র দৌলত গাজির এক ব্রাহ্মণ

দেওয়ান ছিলেন। ইনি বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী-গ্রামবাসী এবং ইহার নাম ছিল কুশধ্বজ, দেওয়ানজী বর্তমান জয়দেবপুরের পশ্চিমে চান্দনা গ্রামে গৃহ নির্মাণ করান। কুশধ্বজের পুত্র বলরাম গাজিদের সম্পত্তির নয় আনা অংশ নিলামে ক্রয় করিয়া নবাব-সরকার হইতে ‘রায় চৌধুরী’ উপাধি প্রাপ্ত হন, তারপর রাজা উপাধি হয়। বলরামের পরে শ্রীকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, জয়দেব রায় চৌধুরী, গোলোকনারায়ণ রায় চৌধুরী এবং কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী বধাক্রমে রাজা হন। কালীনারায়ণ গবর্নমেন্ট হইতে ‘রাজা’ উপাধি পাইয়াছিলেন। কালীনারায়ণের পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন, ইহারই দেওয়ান ছিলেন পূর্ববঙ্গের উজ্জল রত্ন রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ। রাজেন্দ্রনারায়ণ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় হন। তাঁহার তিন পুত্র কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ, কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ এবং কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ—সকলেই স্বর্গীয় হইয়াছিলেন—এই কথাই প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু সম্প্রতি রমেন্দ্রনারায়ণ চিতা-শয্যা হইতে উঠিয়া স্বীয় অধিকারের দাবী করিতেছেন, খবরের কাগজে এই কথা পড়া যাইতেছে। সে বিচার এখনও শেষ হয় নাই।

অশ্বনাগড়—এই সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাজ্যের পূর্বপ্রবাদ ধর্ম-মঙ্গল কাব্য-প্রসাদে সকলের নিকটই বিদিত। ইহা এককালে কর্ণ সেনের রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্র মহাবীর লাউ সেনের (লব সেনের) অনেক কীর্তিকথা প্রবাদবাক্যের জায় হইয়া আছে; লাউ সেনের পুত্র চিত্র সেন।

কিন্তু প্রাচীন রাজবংশের কি হইল জানা যায় নাই। বর্তমানকালে ময়না রাজ্যের রাজাদের আদিপুরুষ—১। গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীজ, ২। পরমানন্দ বাহুবলীজ, ৩। মাধবেন্দ্র বাহুবলীজ, ৪। গোকুলানন্দ বাহুবলীজ, ৫। রূপানন্দ বাহুবলীজ, ৬। জগদানন্দ বাহুবলীজ, ৭। ব্রজানন্দ বাহুবলীজ, ৮। আনন্দানন্দ বাহুবলীজ, ৯। রাধাশ্যামানন্দ বাহুবলীজ। রাধাশ্যামানন্দ ১৮২৮ খৃঃ অব্দে রাজ্যসন প্রাপ্ত হন। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজা জ্ঞানানন্দ, তাঁহার ভ্রাতা নিরঞ্জনানন্দ ও ভ্রাতৃপুত্র সাধনানন্দ সাধারণ গৃহস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের রাজ-বিভূতি আর নাই।

পুঁতিয়া—বংসরাচার্য্য এই বংশের আদিপুরুষ, তাঁহার পুত্র পীতাম্বর রায় জমিদারী অর্জন করেন। তৎপরে নীলাম্বর রায় ও পরে আনন্দচন্দ্র রায় জমিদার হন, আনন্দচন্দ্র দিল্লীস্থ হইতে ‘রাজা’ উপাধি প্রাপ্ত হন। আনন্দচন্দ্রের পুত্র রতিকান্ত,—তারপর ক্রমান্বয়ে রামচন্দ্র রায়, নরনারায়ণ রায়, দর্পনারায়ণ রায়, জয়নারায়ণ রায়, রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। যোগেন্দ্রনারায়ণের বিধবা পত্নী শরৎসুন্দরী দেবী এদেশের গৃহলক্ষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারিণী, তিনি প্রাতঃস্মরণীয়। রাণী শরৎসুন্দরী বৈধব্য-দশায় ভূতলে কথল-শয্যায় শুইতেন, উপবাস ও নানাবিধ কষ্টসাধন করিয়া তিনি তপস্বী হইয়াছিলেন। একদা কোন উচ্চ ইংরেজ কর্মচারী তাঁহার ষ্টেট দেখিতে আসিয়া বহুভাবে বলিয়াছিলেন, “ইনি তো এখনও তরুণ-বয়স্কা, আর একবার বিবাহ করিতে পারেন।” এই পাপ-কথা শুনিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সারাদিন অশ্রুমোচন করিয়াছিলেন

এবং আড়ম্বরহীন-ভাবে নিঃশেষে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তিনি জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ১৬ বৎসর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ৩৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি স্বশাসন করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে তিনি গবর্নমেন্ট কর্তৃক ‘রাণী’ উপাধি প্রদত্ত হন এবং ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ হেমন্তকুমারী এখন রাণী—তিনিও অনেক দান করিয়া বশবিনী হইয়াছেন।

নাটোর—বারেন্দ্র-কুলীন স্বর্গে এই রাজবংশের আদি পুরুষ। ইহার এক স্বদূর বংশধর কামদেব মৈত্র পুঁটিয়ার রাজা নরনারায়ণ রায়ের জমিদারীতে কাজ করিতেন। এই কামদেবের পুত্র রঘুনন্দন একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি মুর্সিদকুলি খাঁর প্রীতিভাজন হইয়া বিপুল সম্পত্তি অর্জন করেন। কামদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন ‘মহারাজ’ উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৩০ খৃঃ অব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার পুত্র মহারাজ রামকান্তের মৃত্যুর পর রাণী ভবানী রাজ্যশাসন করেন। ইহার পবিত্র জীবন ও দানশীলতা বঙ্গদেশে প্রবাদবাক্যের দ্বারা হইয়া আছে। ইনি ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। ইনি অহল্যাবাই-এর মতই কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে বহু মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন করিয়া ছিলেন। তাঁহার জমিদারীর আয় এত প্রভূত ছিল যে তাঁহাকে লোকে “অর্দ্ধবঙ্গের অধিকারিণী” বলিত। ১৭৭০ খৃঃ অব্দের (ছিয়াত্তরের) মনস্তরে তিনি যেরূপ মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া ছিলেন, তাহা গল্পের মত শুনায। তাঁহার পুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ সমস্ত সম্পত্তি ও বিষয় অনর্থের মূল মনে করিয়া বাহ্য বৈভবের প্রতি যে ঔদাসিন্য দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে সে বৈভব নিঃশেষ হইয়া গেল। তিনি উত্তরসাহক ভোলাকে লইয়া তান্ত্রিক অমুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং ভারতীয় সাধুদের পঙ্ক্তিতে স্থান পাইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গানগুলি ভক্তি ও প্রেমে ভরপুর। “আমার মন যদি রে ভুলে, তবে বালির শয্যায় কালীর নাম রেখ কর্ণমূলে—আমায় এনে দে ভোলা জপের মালা ভাসাই গঙ্গাজলে” প্রভৃতি গান শ্রুতির অমৃত, বিষয়-রোগ-নিরাময়ের ভেষজ। রামকৃষ্ণের পর মহারাজ বিখনাথ রায়, মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র রায়, মহারাজ গোবিন্দনাথ রায়, মহারাজ জগদ্বিন্দনাথ রায় রাজপদ লাভ করেন। এখন জগদ্বিন্দনাথের পুত্র কৃতবিজ্ঞ, মহাবৈষ্ণব মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায় সিংহাসনে অভিষিক্ত আছেন। ছোটতরফে শিবনাথ রায়, আনন্দনাথ রায়, চন্দ্রনাথ রায়, যোগেন্দ্রনাথ রায় ক্রমান্বয়ে রাজা হন। রাজা যোগেন্দ্রনাথ ১৯০১ খৃঃ অব্দে পরলোকগমন করেন।

কাশিমনাজার—কালীপদ নন্দীর পুত্র রাধাকৃষ্ণ নন্দী—তৎপুত্র কৃষ্ণকান্ত নন্দীই (কান্তবাবু) এই রাজবংশের গৌরব-ভিত্তি। হেষ্টিংসের প্রসাদে ইনি অতুল বৈভবের অধিকারী হন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোকে গমন করেন। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে কান্তবাবুর পুত্র লোকনাথ নন্দী ‘রাজা’ উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে হরিনাথ নন্দী (১৭৯৮-১৮৩৬ খৃঃ), এবং শেষে তৎপুত্র কৃষ্ণনাথ নন্দী রাজা হন। কোন ভৃত্যকে খুন করার অপরাধে ইহার উপর ওয়ারেন্ট জারি হয়, সেই অপরাধে ইনি বিব ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইহার বিধবা পত্নী মহারাণী স্বর্ণময়ীর দানের বশ বঙ্গের সর্বত্র বিদিত। কথিত আছে, এই পুণ্যশীলা

রমণী ৬০ লক্ষের উপর টাকা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু কাশীমবাজার গদির তৎপরবর্তী উত্তরাধিকারী মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের দানের যশ যেন তাঁহাকেও ছাপাইয়া গিয়াছে। মহারাজ বাহাদুরের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের সর্ববিষয়ে প্রার্থীরা যেন একমাত্র লক্ষ্যহারা হইয়াছে। তদীয় পুত্র মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী তখন বয়সে রাজ-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া বিদ্বজ্জন-সমাজে প্রতিপত্তি লাভের জন্ত চেষ্টিত আছেন।

দীবাপতিহা—দয়ারাম রায় এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি পুঁটিয়ার রাজার কর্মচারী ছিলেন। ইনি রণনীতি-কুশল ছিলেন, ইহার বুদ্ধি-বলে মুর্গিদকুলী খাঁ বহু রাজনৈতিক ব্যাপারে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। ইহারই চেষ্টায় বিদ্রোহী গীতারাম রায় বন্দী হইয়া নিহত হন। দয়ারাম রায়ের পুত্র জগন্নাথ রায় এবং তৎপরে ক্রমান্বয়ে—প্রাণনাথ রায়, প্রসন্ননাথ রায় এবং প্রমথনাথ রায় রাজা হন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের দিল্লীর দরবারে প্রমথনাথ ‘রাজা বাহাদুর’ উপাধি প্রাপ্ত হন। এখন তৎপুত্র প্রমথনাথ রায় রাজপদে অধিষ্ঠিত আছেন। রাজা প্রমথনাথের ভ্রাতারা সকলেই কৃতী। বিদ্বান্ এবং গম্ভীর-প্রকৃতি বসন্তকুমার পরলোক-গত হইয়াছেন, শরৎকুমারের মত দেশহিতৈষী ও অনাড়ম্বর দাতা বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যাুক্তি হইবে না। হেমেন্দ্রকুমার সৌজন্তের একটি জীবন্ত বিগ্রহ-স্বরূপ।

দিনাজপুর—কথিত আছে দীনরাজ ঘোষ নামক এক কায়স্থ উত্তর-বাঙ্গলায় রাজা গণেশের উচ্চ কর্মচারী হইয়াছিলেন; এসম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে তাহা আমি এখানে উল্লেখ করা দরকার মনে করি না; স্বরেন্দ্রমোহন বসু প্রণীত ‘ভারত-গৌরবে’র ৪৯০ পৃষ্ঠায় ও দুর্গাচরণ সান্যাল প্রণীত ‘বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে’ তাহা লিখিত আছে। দীনরাজ ঘোষের পুত্র শুকদেব রায়ের সময় এই বংশের জমিদারী বৃদ্ধি পায়। ইনি ১৬৭৭ খৃঃ অব্দে লোকান্তরিত হন। তারপরে ক্রমান্বয়ে জয়দেব রায়, প্রাণনাথ রায়, রমানাথ রায়, বৈষ্ণনাথ রায়, রাধানাথ রায়, গোবিন্দনাথ রায়, তারকনাথ রায় ও গিরিজানাথ রায়—ইনি ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে ‘মহারাজা’ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি দিনাজপুরে একটা খাল কাটিতে ৭৫,০০০ টাকা ব্যয় করেন এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের জন্ত ২৫ হাজার টাকা দিয়াছিলেন।

টাকার নবাব-বংশ—আব্দুল হাকীম নামক এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী এই বংশের আদিপুরুষ—তৎপরে যথাক্রমে হাফিজুল্লা, খোজা আলিমুল্লা এবং আব্দুল গনি এই সম্পত্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হন। আব্দুল গনিই এই বংশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে ইনি সি. এস. আই. উপাধি এবং সেই বৎসরেই বংশানুক্রমে নবাব উপাধি পাইবার অধিকার পাইয়াছিলেন। নবাব বাহাদুর জীবনে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা সাধারণের হিতার্থে ব্যয় করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কে. সি. এস. আই. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া ছোট-বড় অনেক রাজা-মহারাজা ও জমিদার খাস বাঙ্গলায় আছেন, তাহাদের উল্লেখের স্থান আমাদের নাই। ইহাদের মধ্যে চাঁচড়া, নলডাঙ্গা, মহিষাদল, হেতমপুর,

আন্দুল, চকদীঘি, নড়াইল, কাকিনা, তাজহাট, চন্দ্রদ্বীপ, নষ্টপুৰ, নাড়াঙ্গোল, শিয়ারশোল, পাইকপাড়া, ভূঁইলাস, পাখুরিয়াঘাটা, লালগোলা, রোয়াইল, তেওতা প্রভৃতি কয়েকটির নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া ফাস্ত হইলাম। কলিকাতার ঠাকুর-পরিবারে রাজ্য-মহারাজ্যের অভাব নাই, কিন্তু জড় ঐশ্বর্য ছাপাইয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রতিভার বিম্বোজ্জ্বল খ্যাতি।

এই হতভাগ্য দেশের হতশ্রী রাজ-বৈভবের ক্রম-বিলীয়মান শেষ দৃশ্য আর দেখাইতে ইচ্ছা হয় না। স্বর্ণকিরীটিনী বঙ্গভূমির শ্রুতির কুণ্ডলে আর সে মণিহ্রাস্তি নাই। আমরা জড় ঐশ্বৰ্য্যের চিতা-শয্যার দৃশ্য আর উদ্ভাটিত করিব না। সে দিন গিয়াছে, বখন কোন তরুণ রাজ্যের গুপ্তদান উপলক্ষে রাজভাণ্ডার মুক্ত করিয়া রাজমাতা কোটি কোটি টাকা ব্রাহ্মণ-দিগকে দান করিয়াছিলেন। ভারতে সে সকল কথা স্বপ্নের মত মনে হয়, কিন্তু বোড়শ শতাব্দীতেও তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ দুর্গোৎসব উপলক্ষে তখনকার দিনের সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বঙ্গের একজন জমিদার ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তাহার একটি প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন,— সে দিনও গিয়াছে।

কিন্তু আমাদের খেদ করিবার কারণ নাই। বঙ্গদেশ হইতে চৈতন্যদেবের খোল, কর্তাল ও মন্দিরা বাজিয়া উঠিতেছে—তাহা কোকিল-কুজনের ছায় সমস্ত জগতে মোহ ঢালিয়া দিতেছে; রবীন্দ্রনাথের গীতি বিশ্বকে মাতাইতেছে, সমগ্র জগৎ বিম্বিতনেত্রে উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখিতেছে। গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের ললাম-বর্ণ-মাধুরীতে পৃথিবী আকৃষ্ট হইতেছে; পরমহংস দেবের সৰ্ব্ব-ধর্ম-সমবয়ের তত্ত্ব জগৎবাসী কাণ পাতিয়া শুনিতেছে। আত্মার জয়ই জয়। সেই জয়-কিরীট যদি বাঙ্গালীর থাকে, তবে “ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর, তাল পাতার ছাউনি” লইয়াও আমরা গর্ব করিতে পারিব; প্রাভাতিক নহবৎ বাজের ভঁয়রো ও ললিত রাগিণীর সুরে না হয় আমাদের ঘুম আর নাই ভাঙ্গিল, এবং নহবতে সাক্ষ্য-পূর্ববী রাগিণীর সুর না হয় আমাদের শ্রম-সমাপ্তির কথা আর নাই জানাইল। আমাদের কুটীরপার্শ্বে আম-বাটিকায় কোকিল-কুজনের ধামিবে না, নীলাকাশে ‘বউ-কথা-কণ’ ও ‘চোখ-গেল-রে’ আমাদের কর্ণ তৃপ্ত করিয়া মোটর গাড়ী ও এরোপ্লেনের অভাবের দুঃখ ভুলাইয়া দিবে। আমাদের শস্ত-শ্রামলা সুবিস্তৃত মাতৃ-লক্ষীর অঞ্চল আমাদের খাণ্ড লইয়া নিরবধি প্রসারিত থাকিবে, এবং এদেশের বিশালতোয়া নদনদী শত শত বাহু বিস্তার করিয়া সর্বদাই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য উচ্ছত আছে ও থাকিবে,—আমরা শ্রমবিমুখ না হইলে দারিদ্র্য আমাদের মারিতে পারিবে না; আমাদের উপাশ্রু স্বয়ং দিগম্বর মহাদেব।

বঙ্গদেশে যে কত প্রাচীন মন্দির, দুর্গ, রাজপ্রাসাদ ও দীঘির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; ইহাদের অনেকগুলিতেই বাঙ্গলা স্থাপত্যের নিজস্ব রূপটি আছে; এই ঐশ্বৰ্য্যের শ্রমশানভূমি পরিক্রমা করিতে আমার মাঝে কুলাইল না। আশা করি, বঙ্গীয় নবীন যুগের যুবকেরা এই দেশের উপেক্ষিত পূর্ব-কীর্তিগুলির প্রতি মনোযোগী হইবেন,

তাহা দেখিবার ও তাহাদের ঐতিহ্য-গুরুত্ব নির্ণয় করিবার জন্য সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে হইবে না, বাড়ীর চতুর্দিকে চোখ মেলিয়া চাহিলেই হইবে। বাঙ্গলার কত দীঘি যে প্রাচীন কীৰ্ত্তি লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহার অবশিষ্ট নাই। শত্রুর আক্রমণ-নিরোধে অশক্ত হইয়া বহু রাজা তাহাদের ধনসম্পত্তি-সহ দেব-বিগ্রহসমূহ সেই দীঘির কোন কোনটির জলে বিসর্জন দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, রাজ-অস্ত্র-পুরের কত সুন্দরী বিপৎকালে সেই দীঘির জলে ডুবিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছেন। ত্রিপুরেশ বশোধরমাণিক্য সেইরূপ এক দীঘিতে ধনসম্পত্তি লুকাইয়া গিয়াছেন সন্দেহ করিয়া, যোগলেরা একটা খাল কাটিয়া সেই দীঘির জল নিঃসরণপূর্বক তাহা শুকাইয়া ফেলিয়াছিলেন (১০৩৬ পৃ:)। প্রতাপপুরের রাজা যুদ্ধে বিষ্ণুপুরের জয়মলের (১০২ পৃ:) হস্তে পরাকৃত হইয়া স্বায় প্রাসাদ-সংলগ্ন 'কানাই' সরোবরে রাজ্ঞী ও অপরাপর মহিলাগণ সহ প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন, সেই দীঘিটি এখনও আছে। রাজ্ঞী জানকীনাথের (হুসঙ্গ হুর্গাপুরের অধিপ) রাজ্ঞী কমলাদেবী কমলাসায়রে প্রাণ বিসর্জন করিয়া স্বামীর পূর্বপুরুষদিগকে নরক হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার সংস্কার ভুল হইতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য মহান; এইজন্য সেই দীঘি একটি তীর্থস্বরূপ। সুপ্রসিদ্ধ অমর দীঘি খনন করার ইতিহাসের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজগণের অধিকার কত ব্যাপক ছিল, তাহার ইতিহাস জড়িত (১০৩৩ পৃ:)। ভারত-বিশ্রুত মহীপাল দীঘি বিশালত্বে ও নির্মল সলিলের খ্যাতিতে পাল-সম্রাটগণেরই যোগ্য। এই দীঘির পরিমাণ ৩৮০০ × ১১০০ ফুট; ইহার তীরে যে মন্দির ছিল তাহা ধূলি-রেণু হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উচ্চতায় ও কারুকার্যে তাহা যে এই দীঘিরই যোগ্য ছিল, তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি। এই দীঘি দিনাজপুরে অবস্থিত, এবং এই জেলারই দেবীকোটে তপন দীঘি ৪৭০০ × ১৭৫০ ফুট, দোহাল দীঘি ৪০০০ × ১০০০ ফুট, কালা দীঘি ৪০০০ × ৮০০ ফুট, এবং প্রসিদ্ধ মেলান দীঘি, গোর-দীঘি ও আলতা দীঘি কুটীবাড়ীতে এখনও বিদ্যমান। আমরা পালাগানে দেখিতে পাই, কখনও কখনও রাজ্ঞীরা নিজ হাতে সূতা কাটিয়া রাজাকে আদেশ করিতেন, সাতদিনে সূতা কাটিবেন, সেই মাণে দীঘি খনন করিতে হইবে। কমলা সায়র (মৈমনসিংহ) এই ভাবের এক সৰ্ত্তে কাটা হইয়াছিল, মৈমনসিংহের সূতানরীর দীঘিও এইরূপ সৰ্ত্তে খাত হইয়াছিল (পূর্ববঙ্গ-নীতিকা, দ্বাদশ তীর্থের কথা)। পূর্বোক্ত দীঘিগুলি ছাড়া এদেশে যে আরও কত অতিকায দীঘি বিদ্যমান, তাহাদের খোঁজ কে করে? আমরা ততক্ষণ লক ক্যাট্রিন এবং লক লেমন্ দীঘির কথা মুখস্থ করিব। মেদিনীপুরে ঝাকুরার বড় দীঘিটি নাই, ছোট দীঘিটি আছে, এই দীঘির এক পারে দাঁড়াইলে অপর পারের মানুষ অতি কুজ্জাকৃতি দেখা যায় - তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মেদিনীপুর গরবেটায় জলটুঙ্গী দীঘি, ইন্দ্র পুষ্করিণী, পাখুরিয়া জমা, মঙ্গলা, কবেশ দীঘি, অমরপুষ্করিণী এবং হাছায়া প্রভৃতি বৃহৎ দীঘি এবং তাহাদের নিকট অনেক তৃণ ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। বগুড়ায় সিকোলার প্রাচীন দীঘির নোচে একটি দেব-মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ২৪-পরগনায় সরস্বনা গ্রামের কমলা-বিমলার দীঘি এখানে উল্লেখযোগ্য। এখন আমাদের পল্লীর ক্ষুদ্র পুকুরটি সংস্কার করিতে শক্তি নাই, এই সকল

আন্দুল, চকদীঘি, নড়াইল, কাকিনা, তাজহাট, চন্দ্রদ্বীপ, নন্দীপুর, নাড়াঙ্গোল, শিয়ারশোল, পাইকপাড়া, ভূকৈলাস, পাথুরিয়াঘাটা, লালগোলা, রোয়াইল, তেওতা প্রভৃতি কয়েকটির নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। কলিকাতার ঠাকুর-পরিবারে রাজা-মহারাজার অভাব নাই, কিন্তু জড় ঐশ্বর্য ছাপাইয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রতিভার বিদ্যোজ্জ্বল খ্যাতি।

এই হতভাগ্য দেশের হতশ্রী রাজ-বৈভবের ক্রম-বিলীয়মান শেষ দৃশ্য আর দেখাইতে ইচ্ছা হয় না। স্বর্ণকিরীটনৈ বঙ্গভূমির ক্ষতির কুণ্ডলে আর সে মণিহ্রাসি নাই। আমরা জড় ঐশ্বর্যের চিতা-শব্দ্যার দৃশ্য আর উদ্ঘাটিত করিব না। সে দিন গিয়াছে, যখন কোন তরুণ রাজার গুণ্ধোদগম উপলক্ষে রাজভাণ্ডার মুক্ত করিয়া রাজমাতা কোটি কোটি টাকা ব্রাহ্মণ-দিগকে দান করিয়াছিলেন। ভারতে সে সকল কথা স্বপ্নের মত মনে হয়, কিন্তু বোড়শ শতাব্দীতেও তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ দুর্গোৎসব উপলক্ষে তখনকার দিনের সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বঙ্গের একজন জমিদার ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তাহার একটি প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন,— সে দিনও গিয়াছে।

কিন্তু আমাদের খেদ করিবার কারণ নাই। বঙ্গদেশ হইতে চৈতন্যদেবের খোল, কর্তাল ও মন্দিরা বাজিয়া উঠিতেছে—তাহা কোকিল-কুজনের ছায় সমস্ত জগতে মোহ ঢালিয়া দিতেছে; রবীন্দ্রনাথের গীতি বিশ্বকে মাতাইতেছে, সমগ্র জগৎ বিস্মিতনেত্রে উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখিতেছে। গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের ললাম-বর্ণ-মাধুরীতে পৃথিবী আকৃষ্ট হইতেছে; পরমহংস দেবের সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের তত্ত্ব জগৎবাসী কাণ পাতিয়া শুনিতেছে। আশ্চর্য জয়ই জয়। সেই জয়-কিরীট যদি বাঙ্গালীর থাকে, তবে “ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর, তাল পাতার ছাউনি” লইয়াও আমরা গর্ব করিতে পারিব; প্রাতাতিক নহবৎ বাজের ভঁয়রো ও ললিত রাগিণীর সুরে না হয় আমাদের ঘুম আর নাই ভাঙ্গিল, এবং নহবতে শাক্য-পূরবী রাগিণীর সুর না হয় আমাদের শ্রম-সমাপ্তির কথা আর নাই জানাইল। আমাদের কুটারপার্শ্বে আম-বাটিকায় কোকিল-কুজনের ধামিবে না, নীলাকাশে ‘বউ-কথা-কণ’ ও ‘চোখ-গেল-রে’ আমাদের কর্ণ তৃপ্ত করিয়া মোটর গাড়ী ও এরোপ্লেনের অভাবের দুঃখ ভুলাইয়া দিবে। আমাদের শস্ত্র-শ্রামলা সুবিস্তৃত মাতৃ-লক্ষীর অঞ্চল আমাদের খাণ্ড লইয়া নিরবধি প্রসারিত থাকিবে, এবং এদেশের বিশালতোয়া নদনদী শত শত বাহু বিস্তার করিয়া সর্বদাই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য উজ্জত আছে ও থাকিবে,—আমরা শ্রমবিমুখ না হইলে দারিদ্র্য আমাদের মারিতে পারিবে না; আমাদের উপাত্ত স্বয়ং দিগম্বর মহাদেব।

বঙ্গদেশে যে কত প্রাচীন মন্দির, দুর্গ, রাজপ্রাসাদ ও দীঘির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; ইহাদের অনেকগুলিতেই বাঙ্গলা স্থাপত্যের নিজস্ব রূপটি আছে; এই ঐশ্বর্যের স্বশানভূমি পরিক্রমা করিতে আমার সাধ্যে কুলাইল না। আশা করি, বঙ্গীয় নবীন যুগের যুবকেরা এই দেশের উপেক্ষিত পূর্ব-কীর্তিগুলির প্রতি মনোযোগী হইবেন,

তাহা দেখিবার ও তাহাদের ঐতিহ্য-স্মরণ নির্ণয় করিবার জন্য সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে হইবে না, বাড়ীর চতুর্দিকে চোখ মেলিয়া চাহিলেই হইবে। বাঙ্গলার কত দীঘি যে প্রাচীন কীৰ্ত্তি লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহার অবধি নাই। শত্রুর আক্রমণ-নিরোধে অশক্ত হইয়া বহু রাজা তাহাদের ধনসম্পত্তি-সহ দেব-বিগ্রহসমূহ সেই দীঘির কোন কোনটির জলে বিসর্জন দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, রাজ-অস্ত্র-পুরের কত সুন্দরী বিপৎকালে সেই দীঘির জলে ডুবিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছেন। ত্রিপুরেশ যশোধরমাণিক্য সেইরূপ এক দীঘিতে ধনসম্পত্তি লুকাইয়া গিয়াছেন সন্দেহ করিয়া, মোগলেরা একটা খাল কাটিয়া সেই দীঘির জল নিঃসরণপূর্বক তাহা শুকাইয়া ফেলিয়াছিলেন (১০৩৬ পৃ:)। প্রতাপপুরের রাজা যুদ্ধে বিষ্ণুপুরের জয়মলের (১০২ পৃ:) হস্তে পরাভূত হইয়া স্বায় প্রাসাদ-সংলগ্ন ‘কানাই’ সরোবরে রাজ্ঞী ও অপরাধের মহিলাগণ সহ প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন, সেই দীঘিটি এখনও আছে। রাজা জ্ঞানকীনাথের (সুসঙ্গ দুর্গাপুরের অধিপ) রাজ্ঞী কমলাদেবী কমলাসায়রে প্রাণ বিসর্জন করিয়া স্বামীর পূর্বপুরুষদিগকে নরক হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার সংস্কার ভুল হইতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য মহান; এইজন্য সেই দীঘি একটি তীর্থস্বরূপ। সুপ্রসিদ্ধ অমর দীঘি খনন করার ইতিহাসের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজগণের অধিকার কত ব্যাপক ছিল, তাহার ইতিহাস জড়িত (১০৩৩ পৃ:)। ভারত-বিশ্রুত মহীপাল দীঘি বিশালত্বে ও নিম্নল সলিলের খ্যাতিতে পাল-সম্রাটগণেরই যোগ্য। এই দীঘির পরিমাণ ৩৮০০ × ১১০০ ফুট; ইহার তীরে যে মন্দির ছিল তাহা ধূলি-রেণু হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উচ্চতায় ও কারুকার্যে তাহা যে এই দীঘিরই যোগ্য ছিল, তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি। এই দীঘি দিনাজপুরে অবস্থিত, এবং এই জেলারই দেবীকোটে তপন দীঘি ৪৭০০ × ১৭৫০ ফুট, দোহাল দীঘি ৪০০০ × ১০০০ ফুট, কালা দীঘি ৪০০০ × ৮০০ ফুট, এবং প্রসিদ্ধ মেলান দীঘি, গোর-দীঘি ও আলতা দীঘি কুটীবাড়ীতে এখনও বিদ্যমান। আমরা পালাগানে দেখিতে পাই, কখনও কখনও রাজ্ঞীরা নিজ হাতে হুতা কাটিয়া রাজাকে আদেশ করিতেন, সাতদিনে যতটা হুতা কাটিবেন, সেই মাপে দীঘি খনন করিতে হইবে। কমলা সায়র (মৈমনসিংহ) এই ভাবের এক সঠিক কাটা হইয়াছিল, মৈমনসিংহের হুতানরীর দীঘিও এইরূপ সঠিক খাত হইয়াছিল (পূর্ববঙ্গ-ঐতিহ্য, দ্বাদশ তীর্থের কথা)। পূর্বোক্ত দীঘিগুলি ছাড়া এদেশে যে আরও কত অতিকায় দীঘি বিদ্যমান, তাহাদের খোঁজ কে করে? আমরা ততক্ষণ লক ক্যাট্টিন এবং লক লেমন্ দীঘির কথা মুখস্থ করিব। মেদিনীপুরে স্বাক্ষরার বড় দীঘিটি নাই, ছোট দীঘিটি আছে, এই দীঘির এক পারে দাড়াইলে অপর পারের মানুষ অতি ক্ষুদ্রাকৃতি দেখা যায় - তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মেদিনীপুর গরবেটায় জলটুঙ্গী দীঘি, ইন্দ্র পুষ্করিণী, পাথুরিয়া ছায়া, মঙ্গলা, কবেশ দীঘি, অমরপুষ্করিণী এবং হাছয়া প্রভৃতি বৃহৎ দীঘি এবং তাহাদের নিকট অনেক স্থল ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। বগুড়ায় সিকোলার প্রাচীন দীঘির নোচে একটি দেব-মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ২৪-পরগনায় সরস্বনা গ্রামের কমলা-বিমলার দীঘি এখানে উল্লেখযোগ্য। এখন আমাদের পল্লীর ক্ষুদ্র পুকুরটি সংস্কার করিতে শক্তি নাই, এই সকল

দীঘির কথা ভাবিবার মত মনোবৃত্তিই বা কই? সহরে নিতান্ত নিঃসঞ্চল ব্যক্তিও জল কিনিয়া খাইতেছে। মণিপুরের নিকট দিসাপুরে ৬০০ হস্ত বেড় যুক্ত ছইটি দীঘি দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর একটি দীঘির সংবাদ পাইয়াছি, তাহা নাকি মহীপাল দীঘি হইতেও বড়। কুষ্টিয়ার নিকটে মাধবপুরে মুসলমান-বিজয়ের কিছু পূর্বে কোন হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল। সুলতান সামসুদ্দিনের পিতার নাম কতকগুলি সূত্রায় তথ্য পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহা ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বের। এই মাধবপুরে প্রাচীন অনেক কীর্তি-চিহ্ন আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই পল্লীতে পাশাপাশি ৩০টি বৃহৎ দীঘির চিহ্ন আছে, তন্মধ্যে ২০টিতে এখনও গ্রীষ্মকালে জল থাকে। বাঙ্গলা দেশের রাজারা যে ধনরত্ন—এমন কি তামা-কাসার বাসনপত্র দীঘিতে ফেলিয়া রাখিয়া আপৎকালে চলিয়া যাইতেন, তাহার একটা প্রমাণ এই যে, বহু দীঘি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, যে-কোন উৎসব উপলক্ষে কেহ বাসনপত্র চাহিলেই দীঘি হইতে পাওয়া যাইত এবং উৎসবান্তে তাহা ফিরাইয়া দিতে হইত। মাধবপুরের কোন কোন দীঘি সম্বন্ধেও এরূপ প্রবাদ আছে। এই দীঘিগুলির মধ্যে “গোবিন্দ-পুকুর” প্রসিদ্ধ;—দীঘির আয়তন ১৬ বিঘা। ইহা ছাড়া “কুলবাড়ী পুকুর,” “কালা পুকুর,” “বর্ষা গাড়া,” “মোচা পুকুর,” “গোপাল গাড়া,” “চিন্তা গাড়া,” “গোয়াল গাড়া,” “সোনা গাড়া” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এত অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে এতগুলি পুকুর কেন খাত হইয়াছিল, ইহা একটা সমস্যা। হয়ত কোন রাজা বা রাণী নির্দিষ্ট সংখ্যক দীঘি খনন করিতে দেবতার কাছে সঙ্কল্প করিয়া থাকিবেন। বঙ্গের বহু স্থানে “জিয়াস পুকুর” নামধের কতকগুলি দীঘি আছে। প্রবাদ, এক সময়ে উহার জলস্পর্শে মৃত ব্যক্তি জীবন পাইত, এইরূপ বহু দীঘি তান্ত্রিক অমুষ্ঠানপূত ছিল। মাধবপুরের বিস্তৃত বিবরণ আমি ঢাকা জেলার বারুদি হাইস্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম. এ. মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি।

জে. সি. ক্রেক সাহেব লিখিয়াছেন, মহাস্থান খুঁড়িলে বহুমূল্য ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যাইবে, কিন্তু ঐতিহাসিকগণ উদাসীন (১৪০৮ পৃঃ)। এই স্থান হইতে মিঃ দীক্ষিত ব্রাহ্মীলিপিতে উৎকীর্ণ তাম্রপট আবিষ্কার করিয়াছেন। ২৪-পরগনায় জটার দেউল ১৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজা জয়স্তু কর্তৃক নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল (১১২৯ পৃঃ)। যশোরে মহম্মদপুরে রাজা সীতারামের মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক রাজারই দুর্গ ছিল, এই দুর্গগুলিকে ‘কোট বাড়ী’ বলা হইত। দিনাজপুরে বিরাটগড় (বিরাট রাজার বলিয়া প্রবাদ), চান্দেবার দুর্গ, বাণগড়ে বাণ রাজার দুর্গ, বর্দ্ধমানে রাণীগঞ্জের অধীন চুকলিয়া পল্লীতে রাজা নরোত্তমের দুর্গ, বাকুড়ায় নুতন গ্রামে (ধানা ওড়া) করাস গড়, কৃষ্ণ গড়, অম্বর গড়, শ্রামসুন্দর গড় প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। মেদিনীপুরে ময়নাগড়ের দুর্গ (লাউসেন নিৰ্ম্মিত, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী), ২৪-পরগনার কাউগাছির দুর্গ (আয়তনে চার মাইল, চতুর্দিকে পরিখা), মৈমনসিংহে গড় জরিপা দিলীপ সিংহের গড় (১৫৮৫ খৃঃ অব্দে ইশা খাঁ কর্তৃক অধিকৃত), হুগলী জেলায় ভাস্তাড়ার গড়, দিনাজপুরে সাতপাড়া গড় ও যোগীধোপা গড়,—এই সকল প্রাচীন দুর্গের

অন্ত নাই। যশোরে প্রতাপাদিত্য বহু দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন যশোর-খুলনার ইতিহাসে (দ্রষ্টব্য)। মৈমনসিংহ গজারি পাড়ার দুর্গ ৫০৩ বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল।

প্রাচীন দেবমন্দির, রাজপ্রাসাদ, সেতু, বিজয়স্তম্ভ যে কত ছিল, তাহার গণনা কে করিবে? ঢাকাতে ধামরাই, ভাওয়াল, সাভার, দাসোরা প্রভৃতি স্থান বহু প্রাচীন। মুসলমান-বিজয়ের পূর্বে বিক্রমপুর, স্বর্ণগ্রাম ও সাভার প্রভৃতি স্থানে বহু রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। সাভারে হরিশ্চন্দ্র রাজার বাড়ী, ভাওয়ালে শিবপালের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। স্বয়ংপুর ও নারায়ণের মধ্যবর্তী স্থানে বিরাট বৌদ্ধস্তূপের নিদর্শন এখনও বিদ্যমান; ঐস্থান বাজাসন নামে পরিচিত। বিক্রমপুরে বঙ্গালবাড়ী, বঙ্গযোগিনী প্রভৃতি স্থপ্রাচীন স্থান হইতে অনেক প্রাচীন বিগ্রহাদি পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গযোগিনী (চলিত নাম বদর যোগিনী) দীপঙ্করের জন্মস্থান। রাজবাড়ীর প্রসিদ্ধ মঠ সম্প্রতি পদ্মাগর্ভে সমাহিত হইয়াছে। মীরকাদিম ও তালতলায় বঙ্গাল সেন নির্মিত সেতু এখনও বিদ্যমান। ফরিদপুরে নলিয়া গ্রামের নিকটবর্তী মথুরাপুরের মন্দির হইতে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় অনেক মূর্তির ছবি লইয়া আসিয়াছেন। বাশবেড়িয়ার বিষ্ণুমন্দির ১৪০১ শকে নির্মিত, তৎপাকার হংসেশ্বরীর মন্দির অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক। দিনাজপুর কান্তনগরের কান্ত-মন্দির গত দুইশত বৎসর পূর্বে নির্মিত। ইহার কারুকাৰ্য্য অতি সুন্দর। ঐ জেলার জাগদল, ধীবর, বিয়াটপুর, কীচক প্রভৃতি গ্রামে বিস্তর প্রাচীন কীর্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তথায় জলেশ নামে এক প্রাচীন শিবমন্দির আছে। উহা ২২ ফুট উচ্চ। প্রবাদ, জলেশ্বর নামক কোন আসাম-রাজ কর্তৃক এই শিব স্থাপিত। বাঁকুড়ার হাড়মাসরা গ্রামে ধর্মদাস রায়ের বাড়ীর নিকটবর্তী মন্দিরটিও মুসলমান আগমনের পূর্বেই নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আমার নিকট বহু গ্রামের প্রাচীন মন্দিরাদির তালিকা সংগৃহীত আছে। বর্ধমান, বাঁকুড়া, সুন্দরবন, ২৪-পরগনা প্রভৃতি স্থানে যে সকল প্রাচীন কীর্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাদের সীমাসংখ্যা নাই, কিন্তু আমার স্থানাভাব। কালীঘাট, খড়দহ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের মন্দির ৩৪ শত বৎসরের মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। মুসলমানদের কীর্তি সমস্ত বঙ্গদেশে ময় ছড়াইয়া আছে। তাঁহারা মন্দির ভাঙ্গিয়াছেন, কিন্তু মসজিদ গড়িয়াছেন, যথা—ত্রিবেণীর জাফর খাঁর মসজিদ; প্রাচীন হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া অল্পমান ১৩০০ খৃঃ অব্দে উহা নির্মিত হইয়াছিল। অনেক মসজিদের আশ্রয় খুঁড়িলেই হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিবিশিষ্ট প্রস্তর দৃষ্ট হইবে। প্রাচীন এই কীর্তিগুলির ধ্বংসাবশেষ—বিশেষ গোড়, পাণ্ডুরা ও মহাস্থানের বিরাট ধ্বংসস্থলগুলির মধ্যে দাঁড়াইলে বাঙ্গলাদেশকে মহাশ্মশানভূমি বলিয়াই মনে হয়। দেশ ভক্ত ঐতিহাসিককে মহাদেবের মতই এই মহাশ্মশানের চিতাভস্ম লইয়া কঠোরতম সাধনা করিতে হইবে।

দীঘির কথা ভাবিবার মত মনোবৃত্তিই বা কই? সহরে নিতান্ত নিঃসম্বল ব্যক্তিও জল কিনিয়া খাইতেছে। মণিপুরের নিকট দিসাপুরে ৬০০ হস্ত বেড় যুক্ত দুইটি দীঘি দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর একটি দীঘির সংবাদ পাইয়াছি, তাহা নাকি মহীপাল দীঘি হইতেও বড়। কুষ্টিয়ার নিকটে মাধবপুরে মুসলমান-বিজয়ের কিছু পূর্বে কোন হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল। সুলতান সামসুদ্দিনের পিতার নাম কতকগুলি মন্তায় তথ্য পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহা ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বের। এই মাধবপুরে প্রাচীন অনেক কীর্তি-চিহ্ন আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই পল্লীতে পাশাপাশি ৩০টি বৃহৎ দীঘির চিহ্ন আছে, তন্মধ্যে ২০টিতে এখনও গ্রীষ্মকালে জল থাকে। বাঙ্গলা দেশের রাজারা যে ধনরত্ন—এমন কি তামা-কাসার বাসনপত্র দীঘিতে ফেলিয়া রাখিয়া আপংকালে চলিয়া যাইতেন, তাহার একটা প্রমাণ এই যে, বহু দীঘি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, যে-কোন উৎসব উপলক্ষে কেহ বাসনপত্র চাহিলেই দীঘি হইতে পাওয়া যাইত এবং উৎসবান্তে তাহা ফিরাইয়া দিতে হইত। মাধবপুরের কোন কোন দীঘি সম্বন্ধেও একরূপ প্রবাদ আছে। এই দীঘিগুলির মধ্যে “গোবিন্দ-পুকুর” প্রসিদ্ধ;—দীঘির আয়তন ১৬ বিঘা। ইহা ছাড়া “ফুলবাড়ী পুকুর,” “কালী পুকুর,” “বর্ষা গাড়া,” “মোচা পুকুর,” “গোপাল গাড়া,” “চিন্তা গাড়া,” “গোয়াল গাড়া,” “সোনা গাড়া” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এত অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে এতগুলি পুকুর কেন খাত হইয়াছিল, ইহা একটা সমস্যা। হয়ত কোন রাজা বা রাণী নির্দিষ্ট সংখ্যক দীঘি খনন করিতে দেবতার কাছে সঙ্কল্প করিয়া থাকিবেন। বঙ্গের বহু স্থানে “জিয়স পুকুর” নামধের কতকগুলি দীঘি আছে। প্রবাদ, এক সময়ে উহার জলস্পর্শে মৃত ব্যক্তি জীবন পাইত, এইরূপ বহু দীঘি তাত্ত্বিক অমুঠানপূত ছিল। মাধবপুরের বিস্তৃত বিবরণ আমি ঢাকা জেলার বাকদি হাইস্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম. এ. মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি।

জে. সি. ফ্রেন্স সাহেব লিখিয়াছেন, মহাস্থান খুঁড়িলে বহুমূল্য ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যাইবে, কিন্তু ঐতিহাসিকগণ উদাসীন (৪০৮ পৃঃ)। এই স্থান হইতে মিঃ দীক্ষিত ব্রাহ্মীলিপিতে উৎকীর্ণ তাম্রপট আবিষ্কার করিয়াছেন। ২৪-পরগনায় জটার দেউল ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজা জয়ন্ত কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল (১১২৯ পৃঃ)। যশোরে মহম্মদপুরে রাজা গীতারামের মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক রাজারই দুর্গ ছিল, এই দুর্গগুলিকে ‘কোট বাড়ী’ বলা হইত। দিনাজপুরে বিরাটগড় (বিরাট রাজার বলিয়া প্রবাদ), চান্দেবার দুর্গ, বাণগড়ে বাণ রাজার দুর্গ, বর্তমানে রাণীগঞ্জের অধীন চুকলিয়া পল্লীতে রাজা নরোত্তমের দুর্গ, বাঁকুড়ায় নূতন গ্রামে (ধানা ওড়া) করাস গড়, কৃষ্ণ গড়, অম্বর গড়, শ্রামশ্রমর গড় প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। মেদিনীপুরে ময়নাগড়ের দুর্গ (লাউসেন নির্মিত, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী), ২৪-পরগনার কাউগাছির দুর্গ (আয়তনে চার মাইল, চতুর্দিকে পরিখা), মৈমনসিংহে গড় জরিপা দিলীপ সিংহের গড় (১৫৮৫ খৃঃ অব্দে ইশা খাঁ কর্তৃক অধিকৃত), হুগলী জেলায় ভাস্তাড়ার গড়, দিনাজপুরে সাতপাড়া গড় ও বোগীধোপা গড়,—এই সকল প্রাচীন দুর্গের

অন্ত নাই। যশোরে প্রতাপাদিত্য বহু দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন যশোর-খুলনার ইতিহাস দ্রষ্টব্য)। মৈমনসিংহ গজারি পাড়ার দুর্গ ৫০৩ বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল।

প্রাচীন দেবমন্দির, রাজপ্রাসাদ, সেতু, বিজয়স্তম্ভ যে কত ছিল, তাহার গণনা কে করিবে? ঢাকাতে ধামরাই, ভাওয়াল, সাভার, দাসোরা প্রভৃতি স্থান বহু প্রাচীন। মুসলমান-বিজয়ের পূর্বে বিক্রমপুর, স্রবর্ণগ্রাম ও সাভার প্রভৃতি স্থানে বহু রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। সাভারে হরিশ্চন্দ্র রাজার বাড়ী, ভাওয়ালে শিশুপালের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। স্রবর্ণপুর ও নান্দারের মধ্যবর্তী স্থানে বিরাট বৌদ্ধস্তূপের নিদর্শন এখনও বিদ্যমান; ঐস্থান বাজাসন নামে পরিচিত। বিক্রমপুরে বল্লালবাড়ী, বজ্রযোগিনী প্রভৃতি সুপ্রাচীন স্থান হইতে অনেক প্রাচীন বিগ্রহাদি পাওয়া গিয়াছে। বজ্রযোগিনী (চলিত নাম বদর যোগিনী) দীপঙ্করের জন্মস্থান। রাজবাড়ীর প্রসিদ্ধ মঠ সম্প্রতি পদ্মাগর্ভে সমাহিত হইয়াছে। মীরকাদিম ও তালতলায় বল্লাল সেন নির্মিত সেতু এখনও বিদ্যমান। ফরিদপুরে নলিয়া গ্রামের নিকটবর্তী মথুরাপুরের মন্দির হইতে শ্রীকৃষ্ণ গুরুসদয় দত্ত মহাশয় অনেক মূর্তির ছবি লইয়া আসিয়াছেন। বাশবেড়িয়ার বিষ্ণুমন্দির ১৪০১ শকে নির্মিত, তথাকার হংসেশ্বরীর মন্দির অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক। দিনাজপুর কাস্তনগরের কাস্ত-মন্দির গত দুইশত বৎসর পূর্বে নির্মিত। ইহার কারুকার্য অতি সুন্দর। ঐ জেলার জাগদল, ধীবর, বিয়াটপুর, কীচক প্রভৃতি গ্রামে বিস্তর প্রাচীন কীর্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তথায় জলেশ নামে এক প্রাচীন শিবমন্দির আছে। উহা ৯২ ফুট উচ্চ। প্রবাদ, জলেশ্বর নামক কোন আসাম-রাজ কর্তৃক এই শিব স্থাপিত। বাকুড়ার হাড়মাসরা গ্রামে ধর্মদাস রায়ের বাড়ীর নিকটবর্তী মন্দিরটিও মুসলমান আগমনের পূর্বেই নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আমার নিকট বহু গ্রামের প্রাচীন মন্দিরাদির তালিকা সংগৃহীত আছে। বর্দ্ধমান, বাকুড়া, সুন্দরবন, ২৪-পরগনা প্রভৃতি স্থানে যে সকল প্রাচীন কীর্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাদের সীমাসংখ্যা নাই, কিন্তু আবার স্থানাভাব। কালীঘাট, খড়দহ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের মন্দির ৩৪ শত বৎসরের মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। মুসলমানদের কীর্তি সমস্ত বঙ্গদেশ ময় ছড়াইয়া আছে। তাহারা মন্দির ভাঙ্গিয়াছেন, কিন্তু মসজিদ গড়িয়াছেন, যথা—জিবেগীর জাফর খাঁর মসজিদ; প্রাচীন হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া অল্পমান ১৩০০ খৃঃ অব্দে উহা নির্মিত হইয়াছিল। অনেক মসজিদের আন্তর খুঁড়িলেই হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিবিশিষ্ট প্রস্তর দৃষ্ট হইবে। প্রাচীন এই কীর্তিগুলির ধ্বংসাবশেষ—বিশেষ গোড়, পাণ্ডুরা ও মহাস্থানের বিরাট ধ্বংসস্তূপগুলির মধ্যে দাঁড়াইলে বাঙ্গলাদেশকে মহাশ্মশানভূমি বলিয়াই মনে হয়। দেশ ভক্ত ঐতিহাসিককে মহাদেবের মতই এই মহাশ্মশানের চিত্তাভ্রম লইয়া কঠোরতম সাধনা করিতে হইবে।

ভূমিকার পরিশিষ্ট

আমরা ২৭৭-৮৪ পৃষ্ঠায় সাভারের রাজ-বংশের আদিপুরুষ ভীম সেনের উল্লেখ করিয়াছি। এই নাম সাভারের কোন মঠের শিলা-লিপিতে পাওয়া গিয়াছে।

বঙ্গাল-চরিতে “রাজবল্লভ” বলিয়া যে ভীম সেনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাও সম্ভবতঃ এই ভীম সেনকেই নির্দেশ করিতেছে। বঙ্গাল এবং তাঁহার বংশধরগণের রাজত্ব-কাল সম্বন্ধে অনেক মত-ভেদ দৃষ্ট হয়, সুতরাং বঙ্গাল চরিতোক্ত বঙ্গাল সেনের প্রিয় ভীম সেন শিলা-লিপির ভীম সেন হওয়ার বিপক্ষে কাল হিসাবে কোনও গুরুতর প্রমাণ বা যুক্তি নাই। “বঙ্গাল-চরিতে” দৃষ্ট হয়, পিতৃ-পিতৃ যজ্ঞের তত্ত্বাবধানের ভার যুবরাজ লক্ষণ সেন ও এই ভীম সেনের উপর তত্ত্ব ছিল। সুতরাং ভীম সেনকে রাজা বঙ্গালের একান্ত অন্তরঙ্গ কোন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা নাই, (৪৮৬ পৃঃ) বৈষ্ণব কুলজীকার জয়সেন বিশ্বাস বঙ্গাল-প্রপৌত্র ভীম সেনের উল্লেখ করিয়াছেন, (২৮১ পৃঃ)। তাঁহার মতে ‘নৃপেন্দ্র’ ভীম সেন বিশ্বরূপ সেনের পুত্র এবং পিতার মৃত্যুর পরে বঙ্গভাগে রাজত্ব করেন। জয়-সেন বিশ্বাস ভীম সেনের পুত্র কার্তিক সেনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইনিও পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন (২৭৭-৭৮ পৃঃ)।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত-প্রবর মৃত্যুঞ্জয় শর্মা ১৮১০ খৃষ্টাব্দে রাজাবলী নামক একখানি ইতিহাস প্রকাশিত করেন, এই বহিখানির অল্পসময়ের মধ্যে বহু সংস্করণ হইয়াছিল; ইহাতে সেন-বংশের যে বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এইরূপ :—১। বঙ্গাল সেন, ২। লক্ষণ সেন, ৩। মাধব সেন, ৪। শূর সেন, ৫। ভীম সেন, ৬। কার্তিক সেন, ৭। হরি সেন, ৮। শঙ্কর সেন, ৯। নারায়ণ সেন, ১০। লক্ষণ সেন, ১১। দামোদর সেন। নানা কারণে এই বংশাবলী সমগ্রভাবে বিস্তৃত বলিয়া মনে হয় না, সম্ভবতঃ হরি সেন নামটি বাদ পড়িবে।

সাভারের শিলালিপি ছাড়া অন্য কোন প্রস্তর-লিপি বা তাম্র-শাসনে ভীম সেনের নাম পাওয়া যায় নাই। কুলজী গ্রন্থের প্রমাণও অনেক সময় সংশয়াপন্ন হইয়া থাকে,—তাহাতে নাম বাদ পড়া কিংবা উলট পালট হওয়া সচরাচর দৃষ্ট হয়।

কিন্তু তথাপি যখন বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত নানারূপ প্রমাণে একটি বিষয় সম্বন্ধে ঐক্য দৃষ্ট হয়, তখন তাহা উপেক্ষিত হইবার কারণ নাই। এই সকল প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয় যে বঙ্গালের অনতিদূরবর্তী কালে ভীম সেন রাজা এইদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তিনি বঙ্গালেরই বংশধর।

বঙ্গাল সেন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানকারীদের মধ্যে অন্ততম। কিন্তু তখনও বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল। সাভারের শিলা-লিপিতে দৃষ্ট হয়, ভীম সেনের পুত্র দীমন্ত সেন বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী হওয়াতে তাঁহার ভ্রাতারা (সম্ভবতঃ কার্তিক সেন ও অপরাপর স্বগণেরা) তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন (২৭৭ পৃঃ)।

বঙ্গাল-চরিত, সাভারের শিলালিপি, জয়সেন বিশ্বাসের কুলজী এবং রাজাবলী—এই পৃথক পৃথক চারিটি স্থানের উল্লিখিত ভীম সেন এক সময়ের এবং বঙ্গালের বংশধর।

আমাদের স্মৃতিস্তম্ভ ধারণা এই যে ইহারা অভিন্ন এবং এই রাজা ও তাঁহার বংশধরেরা পরবর্তী কালে কিছু কালের জন্য সেন-রাজ-প্রাসাদের শেষ প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়া ছিলেন।

১১৩৬ পৃষ্ঠায় দীঘাপতিয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারামকে পুঁটিয়ার রাজ-কর্মচারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি নাটোরের রাজ-কর্মচারী ছিলেন।

ভূমিকার ৩৮/০ পৃষ্ঠায় গ্রীহট গবর্নমেন্ট হাই স্কুলের প্রধান পণ্ডিত মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার নিকট হইতে আমি আমার শিল্পসংগ্রহের কতক কতক উপকরণ পাইয়াছি, তাঁহার নাম প্রসন্নচন্দ্র কাব্যতীর্থ, নামটি ভুলিয়া যাওয়াতে যথা স্থানে তাহা উল্লেখ করিতে পারি নাই।

একুপ বৃহৎ পুস্তকে নানারূপ ভ্রুটি ও ভুল থাকা বিচিত্র নহে, বিশেষ আমি বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত, ইতিহাস রচনায় ইহাই আমার হাতে-খড়ি। সহৃদয় ব্যক্তিদের সহানুভূতিই আমার পুরস্কার। এই পুস্তক দ্বারা আমার অর্থাগমের কোন সম্ভাবনা নাই; অথচ ইহার জন্য শুধু প্রাণান্ত পরিশ্রম নহে, আমাকে সাধ্যাতীত অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, ছবি সংগ্রহ ও ব্রুক করার ব্যয় বাবদ আমি ত্রিপুরেশ্বরের নিকট যে সাহায্য পাইয়াছি, তাহা ছাড়া কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ধনী ও বিদ্বৎ-সমাজে বরেন্দ্র ডাক্তার বিমলাচরণ লাহা মহাশয় আমাকে আর্থিক আশ্রয় করিয়াছেন। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু দীঘাপতিয়ার কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ মহাশয় আমাকে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া ব্রুকের দরুন স্বপ্নভার কিয়ৎ পরিমাণে লঘু করিয়া দিয়াছেন।

আমি একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্রীমানপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি। স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার প্রতিভাশালী পরিবারবর্গ আমাকে অক্লান্ত মেহ ও উৎসাহ-দ্বারা এই হ্রস্ব কার্যক্ষেত্রের পথ দীর্ঘকাল সুগম করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের স্বর্ণ অপরিশোধনীয়। অধ্যাপক সত্যীশচন্দ্র ঘোষ এম. এ., মহাশয় এই বহির শেবাংশ-প্রকাশে প্রেসের কাজ শীঘ্র সমাধা করিবার ব্যবস্থা করিয়া আমার ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন।

এখানে আর একটি কথা লিখিয়া উপসংহার করিতেছি।

নানারূপ বিয় ও ঝঞ্জাট উপস্থিত হওয়াতে কোন কোন স্থলে ছবিগুলি যথাস্থানে বিস্তৃত হয় নাই। অনেক স্থলেই ছবির নীচে যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহার দ্বারা ছবির বৃত্তান্ত পুস্তকের কোন পৃষ্ঠায় আছে তাহা ধরা পড়িবে। যেখানে তাহাও স্পষ্টরূপে স্মৃতি হয় নাই, সেখানে পাঠক ছবির স্মৃতিপত্র দেখিবেন—তদ্বারা ছবির বৃত্তান্ত কোন স্থানে তাহা নির্ণীত হইবে। ৬১৯ পৃষ্ঠার ১৮ ছত্রে ১৯২৮ স্থলে ১৪২৮ এবং ৬৪৯ পৃষ্ঠার ৮ ও ১০ ছত্রে ১৩০৮ ও ১৩১০ স্থলে ১২০৮ ও ১২১০ হইবে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

শব্দ-সূচী

অ

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ২৫২, ৮৬২, ১১২৮
 অকোম্বা ৮
 অগ্নিকুল ১৮৬
 অগ্নিপূরণ ৯২
 অগ্নিহোত্র ৯৪৬
 অগ্রম ১০২৭
 অগ্রগণিত ২০২
 অগ্র ৫, ৬, ২২, ২৩, ২৬, ৩১, ৬৪, ২৬১, ২৮৫
 অগ্রন ৬৮১, ৯৮০
 অচ্যুত ২১২
 অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি ৩৮, ৭৭৬, ৭৭৮, ১০৮৪
 অজ ২০২
 অজস্র ৭১, ২২৭, ২৪৩-২৪৭, ৩০২, ৩৪০, ৪১৬, ৪১৭,
 ৪২৩, ৪৩৫, ৪১২, ৪৫৪, ৮৮২, ৯০৮, ১০৫২
 অজপা ৫৮৪, ৯০৫
 অজরচেকুর ২৫৬, ৯৭০, ১১০১
 অজ্ঞাতশত্ৰু (অজ্ঞাতশত্রু) ১০৫, ১১২, ১২২, ১৪৩, ১২৮
 অজিত স্মারক ৬৯৮
 অজিতমান ২৮৫
 অজ্ঞান ৯০
 অজ্ঞানা ১১৬
 অগ্নিমা ৫৮০, ৫৮৬
 অতীশ ৩১০, ৩১২, ৩১৩, ৩১৫
 অতুলকৃষ্ণ গোখামী ১১৩১
 অত্রি ১৬৮
 অত্রিসংহিতা ১৬১
 অহ্না ২৭৪, ২৭৫, ২৮৩, ২৮৬, ৪৩২, ৫২০, ৯৩৬
 অধৈত ২০, ৫২, ৫২৭, ৬৮১, ৬৯২, ৭১০, ৭১১, ৭৪১,
 ৭৪২, ৭৪৬, ৭৪৭, ৭৬৫, ১০৮১, ১০৮৭

অধৈতপ্রকাশ ৩২৪, ৭৩১, ৭৪০

অধুত-সাগর ৪২০

অনঙ্গপাল ৫২৪, ৫২৫

অনঙ্গভীষদেব ১১০৪

অনন্তকলনীভাগবৎ ১০৭২

অনন্তদাস ৯২৩

অনন্তদেবী ২১৬

অনন্তপুর ৯২৮

অনন্তবর্মা ৫৭, ৬০, ৪৬৬, ১১০১, ১১০২

অনন্তভট্ট ৫৫২

অনন্তমাণিক্য ১০৩১, ১০৩২

অনন্তমাণিক্যগু ১০১৬

অনন্তরাম ৮৪২

অনন্তেশ্বর ৬৮০

অনাচরণীষ ৫৩৩

অনিরুদ্ধ ৩৮, ৭২, ১১৬, ১০৫০, ১০৫২

অনিরুদ্ধ ভট্ট ৪২০

অনুপম ৭১৬

অনুবৈজয় ২৭

অহর ৭৩, ৭৪

অনুরুদ্ধ ৫৩৩

অনুশাসন ৪২, ৫০, ৫১, ২০৫, ৫৩২, ৯৮৮, ১০১৪, ১০৫৩,

১০৫৪, ১০৫৫

অজকুপ-হত্যা ৮৬২

অজহাফেজ ১০৪২

অজাবজু (অজাবজু) ৫৫৭, ৭৭৫, ৭৭৮, ৭৮১, ৯৬৮, ৯৬৯,

১০১৫

অজবংশ ১২০, ১২১, ২০২, ২৬১, ২৯২

অজবামল ৯৭১, ৯৭৪, ১০০৩

অজবরকোষ ৫৮৫

১১৪৪

বৃহৎ বদ

অগারমন্ডার ৫৭, ৬০৭, ১১০১
 অঙ্গরখানী ৫২১, ৫৭৮
 অবস্থিতি ৩০৬
 অবনীলনাথ ১১৩৭
 অবলোকিতা ৩২১
 অবলোকিতেশ্বর ২৩২, ৩২৪
 অবিজ্ঞা ১০০
 অভঙ্গ ৭৫৭
 অভঙ্গি ২৭
 অভয় দত্ত ১৪২
 অভয়পর মল্লিক ১১০৮, ১১০৯
 অভয় সেবী ২৪২
 অভিধর্ম ৩০১
 অভিধান ৩৭২, ২১৮
 অভিমন্যু ৪৬৫
 অমরকোষ ১১০৪
 অমর বীথি ১০৩৩, ১০৩৬, ১০৪৩, ১১৩৮
 অমরদুর্ভেদ ১০৩৪
 অমরমণিকা ১৩, ২২০, ৭৮৭, ৭৮৮, ২৭৬, ১০৩৩, ১০৩৪,
 ১০৩৫, ১০৪৩, ১০৪৪, ১০৪৫, ১০২১, ১১২১, ১১২২
 অমরমণিকাবণ্ড ১০১৬, ১১২১
 অমরাবতী ৪৩৬, ৪৫১, ৫১২, ৫৫৭, ৫৭০, ২০৮
 অমৃত ৫
 অমৃতচরণ বিভাকৃৎ ৭০
 অমৃতহস্তাবলী ৭৮২
 অমৃতসাবলী ৭৮২
 অমৃতানন্দ কবিরাজ ২৮০, ২৮৩
 অমোঘবর্ণ ২৫৭
 অমৃতহস্ত ৪২, ১২৫, ১২৭
 অধিকা ১০৬৩
 অধিকারের চৌধুরী ২৮২
 অধুরায় ১১৩১
 অযোধ্যা ৩২, ২৫, ৭৮৭
 অযোধ্যাপ্রসাদ ৮৭
 অরিন্দ্র ১০৩২
 অরুণকী ৪২৭, ২১০
 অরুণক ১০৭৮
 অর্জুন ২৮, ৩১, ৪০, ৪২, ২৫, ১৫৮, ১৬৩, ৭২৫, ১১২৭

অর্জুননারায়ণ ১০৩৩
 অর্প ১২১
 অর্জুনারায়ণ ৫৮২
 অর্জুনগদী ২২৭, ২৬০
 অর্হৎ ১০০
 অলংকিত ২২৩
 অলঙ্কারশাস্ত্র ২৬০, ২৬৩, ২৬৮
 অশোক ৫, ৮, ১৫, ১২, ২৭, ২৮, ৪৩, ৫১, ৫৩, ৫৬, ৬৫,
 ৮৭, ৮৯, ১৫১, ১৫৩-১৭৩, ২০৫-২৩১, ২২১, ৮১০,
 ১০১৪, ১১০০, ১১০১, ১১০২, ১১০৭, ১১০৮
 অষ্টাঙ্গক্রিয়া ৫৮৬
 অশোকস্তম্ভ ৬৬৬
 অশ্বঘোষ ২১, ২৪, ২০৪
 অশ্বমেধ ১৮২, ৪১৩
 অশ্বম ৪৮
 অষ্টগ্রাম ১০৩৩
 অষ্টমার্গ ১০৫
 অষ্টসাহস্রী ৩৩৫
 অষ্টাঙ্গক্রিয়া ৫৮৬
 অষ্টাঙ্গশাস্ত্র ২৭২
 অষ্টেগিয়া ১৮, ২২২
 অশুর গড় ১১৩২
 অশুর আলি ১০৬০
 অস্তি ২৬, ২৭, ৪০, ৫১
 অহম ২৮২, ১০১৫, ১০৫৬, ১০৫৭, ১০৫৯, ১০৬০, ১০৬১,
 ১০৬৩, ১০৬৬, ১০৬৮, ১০৬৯, ১০৭১, ১০৭২, ১০৭৮
 অহিলজ্ঞা ২২৫

আ

আইন আকবরী ৩৩, ৫৬৩, ৭৮৭, ১০৬১
 আভিনিয়টি ১০৬২
 আউল ৩২৪, ৩২৭, ১০২০, ১১১৫
 আউল চাঁদপুরী ৮২৪
 আউলাকেশী ২৩১
 আকবর ১৪, ১৫, ৬৪৫, ৬৫২, ৬৫৫, ৬৬৩, ৭২১, ৭৪১,
 ৭৪৪, ৭৪৬, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৮৮, ৮০২,
 ৮০৭, ৮০৯, ৮১০, ৮১১, ৮১৬, ৮২০, ৮২১, ৮২২, ৮২৩,

৮২৪, ৮২৬, ৮৪২, ৮৮৭, ৮৮৮, ৯০৮, ৯৪৪, ১০৩৫,
১০৭১, ১০৭২, ১০৯১, ১১২৫
আখণ্ড ৬০৮
আগমবাগীশ ৭২৭, ৮৪৮
আগমনী ৬৮৩, ৭৩৭
আগমনী গান ১০০৮
আগমসার ৭৮২
আগরতলা ৮৫২
আজগান নারায়ণ ১০৩২
আজুপাতি ৯৩১
আজী ১৫১, ৭৮২, ৭৯৬, ৮১০, ৮১৬, ৮২৪, ৮৪৫, ৮৪৯
আচর ১০১৬
আচর ১০৪৩
আচার ৫৮৬, ৫৮৭-৬০২
আচার্য ৪৮১
আচুঙ্গক ১০২১
আজমীড় ১২৭, ৪২৫
আজস ১২০
আজাব বী (নবাব) ১০৯২
আজিম ওয়ান ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪২
আজিম বী ৮০৮, ৮২২, ৮২৭, ৮৩৬
আজীব রায় ২৫৬
আতরদানী ৯৩১
আত্মপরীক্ষা ৩৩৮
আজেরী ৪২৭
আবম ১০, ৫৪৯, ৫৫০
আবম সাহ ১০৩৫
আধিতা ৬০৫
আধিম ১১০৮, ১১২৩
আধিশূর ৪৬১, ৪৬২, ৫২৬, ৬০৩
আধিশূর-বংশ ১১১৯
আনন্দ ৩১৯
আনন্দচন্দ্র রায় ১১৩৪
আনন্দনাথ রায় ১১২০, ১১২২, ১১৩৫
আনন্দনারায়ণ গুপ্ত ১০৯১
আনন্দ ভট্ট ৫৫২, ৫৫৩
আনন্দভৈরব ৭৮২
আনন্দময়ী ৯১০, ৯১২

আনন্দানন্দ বাহুবলী ১১৩৪
আনারদান ৯৩৭
আনাম ৪৪
আনুগত প্রবেশ ১০৫
আনোমা ৯৭
আনোয়ার বী ১০৯৪
আন্তিল ৬৩০
আনুল ১১৩৩, ১১৩৭
আপ্তমীমাসোলভিত্তি ৩৩৫
আফগান ৪৮০
আফগানিস্থান ১৫১, ১০০২
আবরোধান ৯৩৬, ৯৪২
আবর্তনা ৯২৫
আবিবতিও ইজারৎ ৯৩৪
আবুবকর ১০৬০
আবুল ফজল ২২৩, ২৭০, ৫৬৩, ১০৩১
আবুহোসেন ৫৫৬
আবু রহেম বী (নবাব) ১০৯১
আবুল আলি সাহেব ৯৩৪
আবুল গনি ১১৩৬
আবুল মনির আসফ বী ৮২২, ৮২৩
আবুল রজ্জক ৭৮৪
আবুল লতিফ বী ৭২৬
আবুল সামান বী ৮৩৭
আবুল হাকিম ১১৩৬
আবুল্লাপুর ৫৪৮, ৯৩৭
আমলবেগ ৮৪৪
আমিনা বেগম ৮৩৫, ৮৭৯
আমিল ১০৯১
আমীর আলি ৮৩২, ৮৪১
আমীর খলিফা ৬৩৬
আমেরিকা ১৮, ২৩১
আয়রলও ১৮
আয়ুর্কেষ ৯১২, ১০০০
আরজা, নব কোঠার ৮৯৮
.. মাসমাহিনা ৮৯৯
.. বৎসরমাহিনা ৮৯৯
.. মাথতের ৯০০

আরজা, আনল নফর ২০০
 .. বগড়া ধান কেনা ২০০
 .. আগমসার ২০১
 .. গণ্ডাকড়ি ২০১
 .. জমাবন্দির ২০১
 .. তেরিজের ২০১
 আরব ৫১২, ৮৮৬, ২৩৩, ১০০২
 আরবী ২৫৩, ২৮৭, ১০৪০, ১০৪২
 আরাকান ১১, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ২২৩, ৭২২, ৭২৭,
 ১০০০, ১০২৭, ১০৩৪, ১০৩৫, ১০৩৬
 আরাকানরাজ ৮১৩, ৮১৪, ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৪, ৮৩৬, ৮৩৭
 আরাকান (আরাকান) ১৮৫, ২৪৮, ৮০২, ৮২৮, ৮২৯,
 ৮৩০, ৮৩১, ৮৩৪, ৮৩৬, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪৪,
 ৮৮৭, ৮৮৯, ২৪২, ২৫৪, ২৫৫, ২৬৭, ১০১৩, ১০৬১,
 ১০৮৭, ১০৯১, ১১১৫
 আরাম ৮০০
 আর্ঘ্য ৪৭
 আর্ঘ্য ও অনাৰ্ঘ্য সামগ্রী ১১২-১২৫
 আর্ঘ্যমঞ্জরীমূলকল্প ২৪৭, ২৪৯
 আর্ঘ্যসমাজ ২, ৩
 আর্ঘ্যবর্ষ ১, ২, ২১, ৩০, ৪৩, ৫২, ৮৭, ৯২, ২২৩, ৫৫৪,
 ৭২৯, ৭৪৪, ৭৪৫, ২৬১, ১০৭৭
 আর্নল থী ৬১৫
 আলওয়াল (আলওয়াল) ১৬, ৪২৯
 আলতাঈদি ১১৩৮
 আলতামস ৩১৭, ৬১৩
 আলমগীর (দ্বিতীয়) ৮৬৭
 আলমগীর নগর ৮১৯
 আলমগীরনামা ১০৫৬
 আলম থী ১০২৪
 আলমচাঁদ ৮৫৩
 আলমচাঁদ রাইরাণী ২৫৬
 আলবেরুনী ২১১
 আলভিদ্দিন ৬১২, ৬১৩, ৬১৯, ৬৬২, ৭২৬, ১০৮৮
 আলভিদ্দিন ইসলাম থী ৮২৭
 আলপিনী ৩৮৬, ২৬৭
 আলখান্নে ২৩৬
 আলিপুর ১১২৯

আলিমদ্দিন খিলজি ৬১২, ৬৪৯
 আলিমচ ৬১০
 আলিবর্দি থী ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯,
 ৮৬০, ৮৬১, ৮৬৪, ৮৬৯, ৮৭৩, ৮৮০, ২৫৬, ২৫৭, ২৬৭,
 ১০০২, ১০৩৯, ১০৪২
 আলিমুল্লা (খোজা) ১১৩৬
 আলেকজান্ডার ১৩৯, ১৪১, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ৫২৪, ৮২৯
 আলেকজান্ডার ২২৪
 আলোরহল ৬৫৬
 আশাই ৬০৮
 আশুতোষ ৩৫১
 আশুতোষ চৌধুরী ১৬
 আসমানতারা ৬২৫, ৬৭২
 আনলাম থী ৬৪৯
 আসাম ১৮, ২০, ৫২২, ৮১৬, ৮১৯, ৮২০, ৮৪১, ২৩২,
 ২৪৬, ১০১৫, ১০২৫, ১০২৬, ১০৪৮, ১০৫৭, ১০৬১,
 ১০৬২, ১০৬৪, ১০৬৫, ১০৬৮, ১০৭৬, ১০৮১
 আসানী ভাষা ১৮, ১৯, ১০৬৬
 আসানী হাতের লেখা ১০৬৭
 আহমদি ৭০
 আহমেদ শাহ ৬২৬
 আহমদ সাহ ৬২৭
 আহিরিণী ২১৪

ই

ইউনিটারিয়ান সমিতি ২৪৯
 ইউরোপ ১৫০, ২৩৫, ২৪৪
 ইউলিসিস ১৬২
 ইউসফ সাহ ৬২৯
 ইউসুফ থী ১০২০, ১০২১
 ইরাক ৮১২, ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৫২, ৮৭২, ৮৭৫,
 ৮৭৭, ৮৮০
 ইংরেজী ২৫৩
 ইংরেজী ব্যবহারশাস্ত্র ২৫৩
 ইংলও ২৩৮, ২৪০, ২৫০
 ইফাক ১২১, ২৩৪
 ইখতিয়ার উদ্দিন ৬১৬
 ইখতিয়ার উদ্দিন গাজিলাহ ৬২০

১১৪৮

বৃহৎ বঙ্গ

উজির খাঁ ৮১২
 উজিরপুর ১১২২
 উজির সিংহ সবারনারায়ণ ১১২১
 উজনি ৭২
 উজ্জয়িনী ২০৮, ২৫৩, ৫১৫
 উজ্জলচন্দ্রিকা ৭৭৬, ৭৮০
 উজ্জল নীলমণি ৭৪২, ৭৫২, ২৮১
 উড়িয়া ২৬১, ২৬২
 উড়িয়া সাহিত্য ১৭
 উড়িয়া ১৫, ১৭, ১৮, ২১, ৩১, ৫৭, ৬২৭, ৭০৮, ৭১৬, ৭২৮, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৪০, ৭৬৫, ৭৮৩, ৭৮৪, ৮১৫, ৮২১, ৮৩৮, ৮৪০, ৮৪১, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬৭, ২৬৬, ১০৩৪, ১০৩৬, ১০২২, ১১০১, ১১০২, ১১০৪, ১১০৬
 উৎকল ১২, ২১, ২৫৭, ১০৮১
 উৎকল-খণ্ড ১০২২, ১০৪৪
 উৎকল-ভাষা ১২
 উত্তমা ৫১১
 উৎসব ১০৪২
 উদয়তারা ২২৪
 উদয়ন ৩৫৬
 উদয় নারায়ণ ৮৪৩, ৮৪৮
 উদয়পুর ১০৩৫, ১০৪১, ১০৪৩
 উদয়মানিকা ১৩, ১০১৬, ১০৩২, ১০৪১, ১০৪৭, ১১২০, ১১২১, ১১২২
 উদয়মানিকা-খণ্ড ১০১৬
 উদয়মান ২৮৫
 উদয়শঙ্কর ১১৩৭
 উদয়সিদ্ধ ৭২৬, ১০৬১
 উদয়সিদ্ধ ১০৬
 উদীচ্য ৭১
 উদয়পুর ৫২৭
 উদ্যালক ৭৭২
 উদ্যোৎকর বাৎস্তায়ন ৩৫৪
 উদয়ন দত্ত ৭৬২
 উদ্ভিদ বিজ্ঞা ২৫৩
 উদ্ভিদবীথিকা ৮১৫
 উদ্বুর ৬৮

উপভোগ ২০, ১৫৭
 উপতিস ৭২, ৮২
 উপনিষদ ৭৭৮, ৮২৫
 উপনিবেশ ৪১০
 উপপুর ২৬৮
 উপানি ১১৬
 উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১১৩২
 উপেন্দ্র নারায়ণ ১০৭৫
 উপাশ্রিত ২২৬, ৪২২, ৪২৬
 উমেশ বটব্যাল ৫১৬
 উয়ার্ড ২১৩, ২৪৭
 উরবিষ ৭২
 উরে (ডাক্তার) ২৩৩
 উর্দু ১০৪০
 উল ওমরা ৮৪১
 উলা ২১২
 উলুবেড়িয়া ৮৩৭
 উহিং ১১৩১

উ

উনকোটিতীর্থ ১০৪৮, ১০৮২, ১০৮৩
 উনকোটিখর শিব ১০৪৮
 উর্ধ্বশী ৭৭২
 উবা ৩৮, ৪০, ১০৫০
 উবাকুটি ২২২

ঊ

ঊষ্মালী ২৩৮
 ঊষ্ম ১, ৪, ২৫৪, ২৩৩, ২৪৪, ২৫২
 ঊষ্মাহার ২৪২
 ঊষ্মদত্ত ১২০
 ঊষ্মদেব ১৩০
 ঊষ্মি ১০, ২৫২
 ঊষ্মপত্তন ১১৫

ঐ

ঐইটন ১০৫৮
 ঐকমটা ৮

একটাকিয়া ৬২৬, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪৪, ৮০২, ৮৮১, ৯০১
 একডালা দুর্গ ৬৫৫
 একবটন ১৭৬
 একান্তিগারী ৩২১, ৩২৮, ৭৭২
 একুশরত্ন ২৫৬
 এক্রাম আলি খাঁ (নবাব) ১০২২
 এগারসিন্দুর ৭৪৫
 এগারসন ২২৮
 এসেশের প্রকৃতি ৬০৪
 এরেস্‌মাস্ ৩৪০
 এলপাকার পাট ২৩১
 এলাহাবাদ ১০১৪
 এলাহিধর্ম ৮০২
 এসিয়া ১১, ৮৩, ৯১, ১০১৪
 এসিয়াটিক সোসাইটি ৩৬৬, ৯২৮
 এ্যারিস্টোটল ১১৬
 এ্যাপ্টনিও ২৩৪
 এ্যাপ্টিওকাস ২০৩
 এ্যাপ্টিগোনাস ১৫০, ১৬৬
 এ্যাবেরেনল ১১১২
 এ্যারাকোসিয়া ১৫৩
 এ্যারিয়ান ১৪৫
 এ্যালেন ৪০১

ঐ

ঐতরেয় ৫
 ঐরাবত ১৯৬

ও

ওছা রেশম ৯৪৫
 ওটেন ৪০১, ৯৬৮
 ওড্রুসেল ৪২৪
 ওথেলো ৬১
 ওদমপুর ৮, ১১, ১৬, ১৯, ২২৪, ২২৯, ৩০০, ৩০৬, ৩৩০,
 ৩৩৯, ৩৪৪, ৪৪৬
 ওমর খাঁ ৮০৪, ৮০৬, ৮৬৬
 ওয়াইজ ৬৪৪, ৭২৭
 ওয়াটসন ৯৩৪, ৯৩৭

ওয়ার্ডিন ৭১
 ওয়ালাজা (নবাব) ১১৬০
 ওয়াসিক আলি মির্জা খাঁ ১১৩০
 ওয়েবষ্টার ৬০, ১৭৯
 ওয়েবার ১৩৮
 ওয়েলেনসি (লর্ড) ৩৪৩, ৯৫৩, ৯৫৪
 ওয়েলস ১৮
 ওলন্দাজ ৮১২, ৮১৪, ৯৩৭
 ওসমান খাঁ ৭৮৪, ৭৮৫

ক

কংস ২৬, ৪০, ২১৬
 কংস নারায়ণ ১১৩৭
 কংসাই ৩৩১
 ককতা ১১১৪
 ককুদ নারায়ণ ১০৫, ১০৮, ১১৩
 ককরাজ ২৫৫, ২৫৯
 কক্সবাজার ৮১২
 কক ১৬২, ১৬৩, ৪০৪, ৯৭৮
 কক ২২৯
 ককগৌড়ি ১১২৩, ১১২৭, ১১২৯
 কক্কী ৮৮
 কচুগামি ১০২৫
 কচু রায় ৭২৩, ৭২৪, ৭২৫
 কচ্ছপতি ৩০
 ককুকস ৫৮২
 কটক ৮৫৯
 কড়া খাঁ ১০২৭, ১০২৮
 কণিক ১৮৬ ২০৩, ২০৪, ৩৩৭, ১১০১
 কতলু খাঁ ৭৫২, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৯, ৭৯১ ৮২১, ৮৮১
 কথাবন্ধু ৩২৮
 কথা-সাহিত্য ৩৮১, ৪০৬
 কনষ্টান্টিনোপল ৮৩৫
 কনাদ তর্কবাণীশ ৩৪৯
 কনোজ ১২, ৫২, ৪৬২, ৫২৫, ৭৮৭, ১০৫৩
 কন্দর্প ৬৫৪
 কন্দর্প নারায়ণ ১১২১ ১১২২
 কন্দর্প রায় ১০৩৪, ১১২১

১১৫০

বৃহৎ বঙ্গ

কপিল ৬, ২২২, ৩০৮, ১১২৩
 কপিল নদী ১০১০
 কপিলাবল্লভ ১২, ৫২ ২০, ২৫, ২৭, ২২৬, ৭৪৮
 কপিলাস্রম ৫, ৪৪
 কপিলোত্তম দেব ৬২৭
 কবর ২৬২
 কবরজ (নবাব) ১১৩৩
 কবিকঙ্কণ ২২০, ৩৭২, ৪৫৩, ৫১৬, ২২২, ২২৪, ২৬১, ২৬৪
 ২৭১, ২৭৪, ২৮৬, ১১০৭
 কবিকঙ্কণ ঈশ্বরী ৭০, ৬৫১, ২১৪, ২১৮
 কবিকর্ণপুর ৭৩৪, ২২৫
 কবিকার্ত্তিস্থির ১১১২
 কবিচন্দ্র ২৮০, ১১২১
 কবিকব্জ রাঘ ১০২২
 কবিভূষণ ১০০৪
 কবির ৫২১, ৫২৩, ৬৭৪, ২৫১
 কবিরত্ন ১০৭৪
 কবিরাজ মিশ্র ১০৫৬
 কবেশ দীপ্তি ১১০৮
 কমল ৩১৭
 কমল (পৌজা) ৭২৫
 কমলধাস ৭৭৩, ৭৭৪
 কমল শীল ৩১৮, ৩৩২
 কমলা ২২৪
 কমলা দেবী ২২০, ৭৪৫, ২৩১, ২৬২, ২৭৬, ১০২৪, ১০২৫,
 ১০২৬, ১০৪৪, ১১৩৮
 কমলা-বিমলার দীপ্তি ১১৩৮
 কমলা সাগর ২৩১, ১১৩৮
 কমলেশ্বর সিংহ ১০৬৪
 কমোলি লিপি ২২৫
 কাম্বোজ ৪৪, ২৩৫, ২৫৭, ২৮৮, ২৭২
 কাম্বোজি ৭১, ৮৩, ৮৪, ২৩২, ১১০২
 করণশূর্য (কর্ণশূর্য) ১২, ১৬, ১১০৮
 করতোয়া ১৮, ১০৫১
 করার ২০৬
 করাসগড় ১১৩২
 করিকরমনগুজ ১০২৭
 করিমগড় ১০৮৫

করিমুল্লা ৮০০
 কর্কশ ১৩৭, ৭৭২
 কর্ণ ২২, ২৩, ২৪, ৪৬, ২৫৬ ২৮৫
 কর্ণগড় ২৭০, ১১০১, ১১০৭
 কর্ণদেব ২৬৪
 কর্ণপুর ৬৩৩
 কর্ণফলি ২২৫, ২২৬, ১০৩৪, ১০৪১
 কর্ণরাজ ৩০৬
 কর্ণসেন ২৮৬, ২৭০, ১১০১, ১১৩৪
 কর্ণটি ৪৬৫, ৪৬৬ ৭৬৭, ২১১
 কর্ণানন্দ ৭৫০
 কর্ণাল ২২৮
 কর্ত্তাভজা ৭৭১, ৮২৪
 কর্ণগৌরবের যুগ ৩৮৪
 কর্ণাস্ত ৭, ১২, ১৬, ২২২
 কলচুরি ২৫২
 কল্যাণ ২৩০
 কলি ২০
 কলিকাতা ১৭৪, ৮৩২, ৮৫১, ৮৫২, ৮৫৭
 কলিঙ্গ ৫, ৬, ৮, ১২, ১৫, ৩১, ৫৬, ৫৭, ৬৩, ৭২, ১৬৬,
 ২৬২, ২৮৩, ৪২০, ৫৪৫, ২২৪, ১১০০, ১১০১, ১১০২,
 ১১০৩, ১১০৮, ১১২৭
 কলিঙ্গ ৫৪
 কলিয়ার ১০৫২
 কলিসিদ্ধ ৩৩
 কল্লতর ৭২২, ৭২৩
 কল্লতরত ৭২৩
 কলাপগ্রাম ১১০১
 কলাপবন্দী ১০৫৩
 কলাপমাণিকা ১০১৬, ১০৩৬, ১০৪৫
 কলাপমাণিকাখণ্ড ১০৪৫
 কলাপশ্রী ৩০৫
 কলাপসাগর ১০৩৬
 কলাপীদেবী ২২৫
 কল্হন ২২৩, ২২৫, ২২৬, ২৩০, ১০১৫
 কল্লপ ১০৫
 কল্হনবর ১০৫৬
 কাইটার ১০৪৩

কাউএল (কাউয়েল) ৩৪৭, ২১৮, ২৮৬

কাউগাছির দুর্গ ১১৩২

কাউচাউ নগর ১১০০

কাউবেদিয়া ১৩৫

কাধা ৪৩২, ১০২৫

কাধি ৫৬

কাকা ২১২

কাকিনা ১১৩৭

কাকিনা চাকলা ১০৭৪

কাকুতী ৬০৮

কাকড়াকলম ৮২০, ৮২১, ৮২২

কাচ্চাথর ২৩১

কাছাড় ১৬, ১০১৮, ১০১৯, ১০২১, ১০২৫, ১০৪৭,

১০৪৮, ১০৬০, ১০৭৬-১০৮০, ১০৯৬

কাছাড়ী ১০৫৬, ১০৫৭, ১০৫৯

কাজল রেখা ৪০৫, ৪২৫, ২১৩, ২৬৮, ২৭৬

কাজী ১০, ৮২৩

কাজীমের অত্যাচার ৬৭১

কাজীর হাট ১০৭৪

কাকননগর ৭৩৫

কাকনবৃক্ষ ২৪৮

কাকনমালা ১৭২, ৩২৩, ৪০৪, ৭৮১, ২৬৮, ২৭৬

কাজিবিদী ৬০২

কাজিভরম ৭৩৪

কাটা ৪৬

কাটুনী ২৩৯, ২৪১

কাঠিছোয়া ১০২৫

কাণা শিরোমণি ৩৪০

কাণাহরিবন্ত ২৮৩

কাণেড়া ২৭০

কাণবংশ ১৭৪

কাতাঘন ১১৬

কাণিওয়ার ৬২, ৬৩, ৭১, ১২০, ১৫১, ২২৮

কাসথরী ২২৫, ৪০১, ৪৬৫

কানাই নব ১১৩৩

কানাই সরোবর ১১১৩, ১১২৮

কানাড়া ৮৮, ২৮৬, ২৯৯

কানিহোম ৩৩, ২৮, ১০৫৫

কাশুনগো ১০২০, ১০২১

কাশুনপত্ৰ ২৬২, ২৬৩

কাশুনর ১১১৪

কাশুনরাম ১০২৩

কান্দাহার ২৫৩, ৬২৮, ২০৮

কাছকুজ ২১, ২১৩, ২৫৩, ২৬৬, ৪২১, ৫২৬

কাস্তনগর ১১৪০

কাস্তমন্দির ১১৪০

কাপড়-পরার রীতি ৫২০-৫২১

কাপাশিয়া ৫৫৮

কাফের ৮৫২

কাবুল ৬২৮

কাবেরী ৫২

কামতা ৭, ৯, ২২২, ১০৫৬, ১০৫৭

কামতাপুর ১০৫৬

কামতার খাঁ ৬২৬

কামদেব ১০০

কামদেব ব্রহ্মচারী ৭২৪

কামদেব মৈত্র ১১৩৫

কামন্দিকা ৩২১

কামরূপ ৩৫, ৬৪, ২১২, ২২০, ২৬২, ২৮৬, ৪২০, ২৪৭, -

২৭০, ১০৫০, ১০৫২, ১০৫৩, ১০৫৫, ১০৮৪, ১০৮৫

কামাখা ১৫, ৩৪, ১০১৯, ১০৫১, ১০৫২, ১০৭১

কামাল খাঁ ১০২৩

কায়েকোবাব ৬১৭, ৬১৮

কায়েমজঙ্গ ১০২১

কায়েল ২২৮

কারটন ১৬৩

কারণ ১২৫

কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন ২৩, ৪২, ১৮৫

কার্ত্তিক ১০, ৪০, ২২৪

কার্ত্তিকপুর ২১২

কার্ত্তিকসেন ২৮০, ২৮৪

কার্ত্তিকেয় ১০৫১

কার্থেজ ২৭৩

কার্পেটির ২৫০

কার্ভালোর ৭২৪, ৭২৭, ৭২৮, ৮০০

কালকেতু ৭০, ২৬৫, ২৮৫

কালকৈয় ৪৪
 কালকৈয়ল ২৩
 কালনেমি মামা ৭২২
 কালসেন ৭৮
 কালাচাঁদ রায় ৬৪১
 কালাচর ২৩১
 কালাচোর ৩৩
 কালাউগি ১১০৩
 কালারোগি ১১৩৮
 কালানাহির ১০৩০
 কালাপাহাড় ৪০৩, ৪৩৫, ৫২৩, ৬৪০, ৬৪১, ৮৮১, ১০৭১,
 ১০৮৩
 কালাপুকুর ১১৩৯
 কালিকট ৮১৩
 কালিগ্র ৫২৫, ৬৩৯
 কালিহাস ৪৫, ১৭৮, ২১০, ২১১, ২২৭, ২৩৪, ২৪২, ২৪৫,
 ৩২৭, ৪০১, ৪১০, ৪৭১, ৪৮০
 কালিহাস গজদানী ৭৮৭, ৭৮৮, ৮৮১
 কালিহাস মন্ত ৪৫, ১৩৫, ১১২৫, ১১২৬
 কালিহাস রায় ৪২৬
 কালিন্দী ১১১৫
 কালিঙ্গ ১২
 কালী ৮, ৬২৭, ৮০০, ৮২৩, ৯০৪, ৯২২
 কালীকুমার ২২৭
 কালীগঙ্গা ৭২৭
 কালীঘাট ৪, ১৫, ৫৩, ৮৫, ৪২৩, ৪২৪, ৪৪৮, ৮৭২, ৮৯১,
 ৯০৩, ১১২৩, ১১২৪, ১১৪০
 কালীচন্দ্র ২৮৯
 কালীচরণ তরফদার ৭৭৮
 কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী ১১৩৪
 কালীপদ নন্দী ১১৩৫
 কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১১৩৪
 কালীপ্রসন্ন সেন ১০২০, ১০২৩
 কালীপ্রসন্ন সিংহ ২৩
 কালু খাঁ ৮৪৭
 কালু গাভি ২৭৮
 কালু জোম ১৩২, ৬৪১, ৯৭০, ৯৯৫
 কালু জুজা ১১০৩

কালোগাতি ২২৪
 কাশিম খাঁ ৮২৭
 কাশিম খাঁ খোবানি ৮২৭
 কাশিমপুর ১১২৪, ১১২৮
 কাশিমবাজার ১১৩৫, ১১৩৬
 কাশী ২৬, ২০৮, ৫৪৫, ৭২০, ৭৩৫, ৯৮৩
 কাশীদাস ৯৭১, ৯৭২, ৯৯৮, ১১০৭
 কাশীনাথ ১১৩৩
 কাশ্মীর ২৬, ১৪৭, ২২৪, ২২৫, ২২৬
 কাছপ ১১৫, ১১৬
 কাব্যগ্রন্থ ২৮
 কিন্নর ১১১৪
 কীরাত ৪, ২২, ৩০, ৪০, ৪৪, ২৮৩, ২০৭, ১০১৭, ১০২২,
 ১০৪৭
 কীরাতবংশ ১০১৬
 কীরীটেশ্বরী ৮৮০
 কিলখারী ৬১৭
 কিশোরগঞ্জ ৯৮৩, ১০৪৫
 কিশোরীসুজন ৭৭২
 কিকিছা ১১৩
 কীচক ৩৮, ১১৪০
 কীটজ বঙ্গ ২৪৪
 কীর ২৫৩
 কীর্তিচন্দ্র নারায়ণ ১০৭২
 কীর্তিচন্দ্র রায়দাস ২৫৬
 কীর্ত্তিধর ১০৪৩
 কীর্ত্তিবর্মা ২৬২
 কুইটন ৫৪
 কুকি ৪, ৪০, ১০২২, ১০৪৯
 কুকুরী ৭৬
 কুপ ২৬২
 কুচবহ ৭২৪
 কুজবটি ২৬৫
 কুকিকা তত্ত্ব ৫৮৮
 কুটিবাড়ী ১১৩৮
 কুড়মখা ১০৩৫, ১০৩৬
 কুতবউল ৬৩২
 কুতবউদ্দিন ৫৪২, ৬১১, ৬১২

- কুন্দর খাঁ ৩১৯
 কুনাল ১৭২
 কুন্তী ২৫
 কুন্দনাচাণ্য ৪৮৬
 কুবজা ৭৬, ৮১
 কুবলয়া ৩৬৯
 কুবের ৪৮৩
 কুবের শঙ্কানন ১০২৪
 কুমরাহার ২৪২
 কুমারগুপ্ত ২০২, ২১৫, ২১৭, ২১৮, ১১০১
 কুমারপত্র ৩৭৬, ৪২২, ৫০৬, ৫০৭
 কুমারপাল ২৩, ৮৪
 কুমাররাজা ১০১৯
 কুমারসম্বৎ ২৪২
 কুমারিকা ৮৪২
 কুমারী নদী ১০৭৩
 কুমিলা ৭, ৭৫৬, ৮৩৪, ১০৩৭, ১০৪৯
 কুমীস ২৩৬, ২৪২
 কুন্ত ৫০০
 কুন্তকর্ণ ৮
 কুন্তকার ৪৮৮
 কুন্ড ২৫৩
 কুন্ডকেন্দ্র ১৩, ২৮
 কুন্ডপাণ্ডব ১৩৬-১৪০
 কুলচন্দ্র ১০২৭
 কুলতুঙ্গ ৪৯
 কুলল ২৫
 কুলপী ১১২৩
 কুলবংশ ৪৫, ৮৩, ৮৮
 কুলার্ণবতন্ত্র ৪৮২
 কুলীনগ্রাম ১১২৫, ১১৩১
 কুলীনকুল-সর্কষ ৩০২
 কুলুকস্ত্র ৩৭১
 কুলধ্বজ ১১৩৪
 কুললী ৩০৬
 কুলমগড় ১০৬৪
 কুলমসেব ২২২
 কুন্তিকা ৪৮
 কুন্তিবাস ৩৭৭, ২৭৯
 কুপানন্দ বাহুবলীল ১১৩৪, ১১৩৯
 কুসা ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩২, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৫, ১৬৩, ১২৮, ২০৫, ২১৬, ২৩৫, ২৮৬, ৪০২, ৪২৩, ৪৮১, ৫৮৮, ৭৮৭, ৮২৪, ৯১৪, ৯৭২, ১০৫০
 কুসুমকমল গোখামী ৭৩৮, ১০০৬
 কুসুমকান্ত ৩৪৯
 কুসুমকান্ত নন্দী ১১৩৫
 কুসুমকলী ধৃতি ৬৮৩, ৭০৩
 কুসুমগড় ১১৩৯
 কুসুমগিরি ৩০৬
 কুসুমচন্দ্র ৮৭২, ১০০২, ১০০৩ ১০০৫, ১০৭৯, ১১৩২, ১১৩৩
 কুসুমচন্দ্রচরিত ৮৬১
 কুসুমাস ২৭৯, ২৮১, ২২৫, ১০২৪
 কুসুমাস কবিরাজ ৩২৮, ৩৭০, ৭১৬, ৭৪১, ৭৪৩, ৭৮২, ১০১৫
 কুসুম খামালী ২৭০, ২৭২, ১০০৬
 কুসুমগর ৭২৪, ৮২২, ১১৩২, ১১৩৩
 কুসুমবল্লভ ৭৫৪, ৮৬৮, ৮৭৪, ৮৭৫
 কুসুমবল্লভ চন্দ্রবর্তী ১১১২
 কুসুমবিষ্ময় ৪০০-৪৬
 কুসুমমল ২৭৯
 কুসুমমণি মাণিক্য ১০৩৯, ১০৫০, ১০৪১, ১০৪২
 কুসুমমালা ১০৪২
 কুসুমরাম ৮৩৮, ২৫৮, ১১২০
 কুসুমলীলা ৫৮২
 কুসুমসাগর ৮৪৮
 কুসা ২২৮
 কুঁহুলি ৪২৩, ৪২৫, ৪২৯
 কুঁহুলিকা ৪৬৮, ২৮৩
 কুঁহুল ১০৭৮
 কেশরনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৩৮, ২৩৯
 কেশরমিশ্র ২৫৭
 কেশর রায় ১৩, ১৪, ৭৮৬, ৭৮৯, ৭৯৩, ৭৯৭, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০০, ৮১০, ৮৮১, ৮৮২, ২০৭
 কেনারাম ৫৬৪
 কেনারাম ২৫৩

১১৫৪

বৃহৎ বঙ্গ

কেন্দ্রবহিমুখ ৭৮১
 কেন্দ্রাভিমুখ ৭৮১
 কেরল ২৬২
 কেরি ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯
 কেলাকর ২৩১
 কেলাতাঙ্গপুর ৮০৪, ৮০৫, ৮০৬
 কেশব ৪০
 কেশব আতা ১০৬৭
 কেশব কান্দিরী ৩৭৩, ৭০১
 কেশবচন্দ্র ৭২৫
 কেশব দেব ১০৮৪, ১০৮৫, ১০৮৬, ১০৮৭
 কেশবপুর ৮৩৬
 কেশব ভট্ট ৭২৩
 কেশব ভারতী ৭১০, ৭৩২, ৭৬৭
 কেশব মিশ্র ১০২৪
 কেশব সেম ৮২০, ৮২৬, ৮৭৬
 কেশরী রায় ৮৪১
 কেশু ২৩১
 কৈলাগড় ১০২৭, ১০৩১, ১০৩৫, ১০৩৬, ১০৮৬
 কৈলাগাছা দুর্গ ৭২৮
 কৈলাসচন্দ্র সিংহ ৮৬৪, ১০১১, ১০৩৬, ১০৭৭, ১০৭৮,
 ১০৮৬, ১০৮৭, ১১০০, ১১১২, ১১২১
 কৈলাসহর ১০০৮, ১০৮৩
 কোকাহার ৪২৫
 কোবুলটাস কোকা ৮২২
 কোচ ১০৬২, ১০৭৭
 কোচবিহার ২৮, ২৮২, ৭১৪, ৮১৬, ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯,
 ৮২০, ৮৩৬, ৮৪১, ৮৮২, ১০১৫, ১০৪৫, ১০৪৮, ১০৫০,
 ১০৫৫, ১০৫৬, ১০৬২, ১০৬২-১০৭২, ১০৮৭, ১০৮৮,
 ১০৮৯
 কোচবিহারের ইতিহাস ২৮২
 কোচর ১০১৬
 কোচিঙ্গাকোল ১১১৮
 কোচিঙ্গাড়া ১১৩৪
 কোচাটনী ৪৭, ২৬৬, ১১০১
 কোচাঙ্গিপাড়া ২১২
 কোণাসেবা ২২০
 কোনারক ৫১২

কোনা ২২৬
 কোরকাই ২২৮
 কোরান ৮৮৩, ১০৪২
 কোরিয়া ৩৩০, ২৭২
 কোলকাক ১৪০, ২৪৭
 কোশরাইগ্রাম ২৬৪
 কোশল ২৫
 কোথা ২২৪
 কোহিমান ১০৭২
 কোটীলা ১৪৮, ১৬৪, ১৬৮, ২২১, ৩৪০, ১১০০
 কোত্তিমা ১১৫
 কোমুর্নিকী ২২, ৪৩
 কোলিনা ৪৭২-৫০৪, ৫২৬-৫২৮
 কোশকী ৩০
 কোশালা ৭৩১
 কোশা ১৬৫, ২৬৭
 কোষে ২৪৪
 কোস্ত ১২৫
 ক্যান্ডাট ৫১৫
 ক্রমণয়েল ৩৪০
 ক্রমদীঘর ২৬০
 ক্রীট ২৩০
 ক্রুসেড ৩৪০
 ক্রাইট ৮৭০, ৮৭২, ৮৭৫, ৮৭৬, ৮৮০, ২৫৭, ১১৩৭,
 ১১৩৮
 ক্রুগেরা ২৩১
 ক্রিয়া ৪২
 ক্রপলক ৩৩৫
 ক্রান্তশক্তি ১৮৫-১৮৭
 ক্রীতশিল্প রায় ১১৩৩
 ক্রোম ২০২
 ক্রোমান ২২০, ২৭৪, ২৮৩
 ক্রোমশিল্প রায় ১১৩৩
 ক্রোম ২৪৪
 খড়হ ১১৪০
 খড়পুর ১১১৪

শব্দ-সূচী

১১৫৫

ষড়ঙ্গময় ১১১৪
 ষড়ঙ্গবংশ ১৬, ২২১, ৩০১
 ষড়ঙ্গরায় ১০২৭
 ষড়ঙ্গকালম ২২১, ২২২
 ষড়ঙ্গ ১০২৫
 ষড়ঙ্গবাসী ১০৪৯
 ষনা ২০৫, ২১০, ২১৫, ২১৭, ২১৮, ২২২, ২২৭, ২৬২, ২৬৯
 ষরখা ১০২৭
 ষরজুর ২৫৫
 ষলংমা ১০১৯, ১০৪৩, ১০৪৫
 ষলিফা ৫৪১, ৫৪৫
 ষলেদি খাঁ ৮০৭
 ষস ৪০
 ষসক ৮২২
 ষসকই ৬১৬
 ষাখিলাল খোয়া ১০২৭
 ষাডিমগুল ১১২৫, ১১২৯
 ষাড্ডি ১১২৯
 ষানজাহান ৬২৯
 ষানাকুল ২১১
 ষানাংচিরাজা ১০৪৯
 ষামজাং ১০৫৮, ১০৫৯
 ষামটি ১০৪৮
 ষারাজা ১০৫৯
 ষারার (ষাডী) ১১৩২
 ষালিমপুর ২৫৫
 ষালিল মাউল ৫৩৯
 ষামা ২৩৬, ২৪২
 ষামিলা পাহাড় ১০২১, ১০৩০
 ষাচোঙ্গ ১০২১
 ষিঙ্গির খাঁ ৬৩৮, ৬৩৯
 ষিঙ্গিরপুর ৭২৮
 ষিঙ্গুর ১০১৭
 ষিঙ্গিরপুর ১১২৯
 ষিরেট খাঁ ৮৩৮
 ষষ্ট ১০২, ২৪০
 ষটান ৮০২, ৮২২

ষক ১০৫৭
 ষড়োখর ৫৫৮
 ষুটিমুড়া ১০৪৩
 ষুনখার ১০৭৮
 ষুনজামের বংশ ১০৫৭
 ষুলনা ৮১২, ৮১৩, ৮৪১, ৮৪৪, ৮৪৬, ১১০৮, ১১২৬, ১১২৮, ১১৪০
 ষুলনা ৫৮৪, ২১০, ২৭৪
 ষুনিবিশাস ৮২৩
 ষুনিবিশাসী ৩২৭, ৭৭১
 ষেজুরাহ ২৩২, ২৪১, ৪৩৬, ৪৪১, ৫০৫, ৫৭০, ২৭৮
 ষেতু ৫২০
 ষেন ১০৫৩
 ষেজাভোগ ৫৪৪, ৫৪৬
 ষৌপাবীরা ৫২২
 ষোটান ৬২৮
 ষোলা ৮২৩
 ষোলাম হুসেন খাঁ ৮৮০
 ষোমান ১০২৭
 ষোজাজ ওসমান ১০২০, ১০২১

গ

গজা ১, ২, ৪, ৫, ৬, ১৫, ১৯, ২০, ১০৭, ২২৪, ২৪৪, ৬২৬, ৬২৯, ৭০০, ৭০১, ৭৩০, ২০৭, ২১৭, ২৪৮, ১০৮৮
 গজাজল ৩, ৭৮৯, ৭৯১
 গজাজলী ২৩৬
 গজাবাস ৭১৩
 গজাবাস পণ্ডিত ২৬১
 গজাবাস সেন ২৭৯, ২৮১, ২৮৩
 গজাবাস কবিরাজ ৩৭২, ২৪৮, ২৪৯
 গজানারায়ণ চক্রবর্তী ৭৫৯, ৭৬০
 গজাঙ্গনাধি ২২৪
 গজাবংশ ১৮, ৫৭, ৬৩
 গজাবাস ১১৩৩
 গজামঙ্গল ১০২৫
 গজামগুল ১০৪৯
 গজারাম ৮৩৭
 গজারাম মিত্র ৮২২

১১৫৬

বৃহৎ বঙ্গ

গঙ্গারিতি ১৪৫, ভূমিকা ১৮৮

গঙ্গাসাগর ১০২৭

গঙ্গাসাগর সঙ্কলন ১১২৭, ১১২৮

গঙ্গেশ শিরোমণি ৩৫৫, ৩৫৮

গঙ্গেশ্বর নারায়ণ ১০৩৩

গঙ্গাভীম ১০৩০

গঙ্গাভীম নারায়ণ ১০৩২

গঙ্গানিহে নারায়ণ ১০৩৩

গঙ্গালেন্স ৮১৩, ৮১৪

গঙ্গাধাই ১১০৫

গঙ্গানহাটি ৬২১, ৭৩৭, ৯০৯

গঙ্গামন্দির ২৬৬

গঙ্গেশ্বর ৫২

গঙ্গাপতি ১১১৯, ১১২১

গঙ্গিত ২৫৩

গঙ্গেশ্বরনাথ ১১৩৭

গঙ্গেশ ১০, ২০৫, ২০৮

গঙ্গেশ (রাজা) ৬২৩, ৬২৪, ৬২৬, ৬২৭, ৮৫২, ৯৬৪, ৯৭৯, ১১০৫, ১১৩৬

গঙ্গেশ নারায়ণ ৬২৫

গঙ্গক ৩৪

গঙ্গকী ৩৫, ১১৫

গঙ্গফার্মেস ২০৪

গঙ্গাধর ৩৪৯, ৭০২, ৭০৩, ৭০৪

গঙ্গাধর দাস ৯৭৯

গঙ্গাধর (গঙ্গাপানি) নিহে ১০৩১, ১০৩২

গঙ্গাহোসেন গঙ্গাকার ১০৪০

গঙ্গানন্দন ৯

গঙ্গার্ক ১১০৪

গঙ্গার্ক নারায়ণ ১০৩৬

গঙ্গার্ক শ্রীচন্দন পাল ১১০৪

গঙ্গার্ক সেন ৯৫৮

গঙ্গচন্দ্র ১০৬৯

গঙ্গন বী ১০২৭

গঙ্গার নিহে ১০৮০, ১০৮৭, ১০৮৮

গঙ্গা ৪২, ১৭৬, ৬০৩, ৭০৩

গঙ্গাপানি ১০৬৫

গঙ্গারাম ৮৭

গঙ্গেশ উদ্ভিদ ৬২০, ৬২১, ৬২২

গঙ্গবেটা ১১৩৮

গঙ্গভূষণ ১০৩২, ১১০৩, ১১০৭

গঙ্গভূষণ ৯৪৭

গঙ্গ ৩৭৮

গঙ্গ ৪০৫

গঙ্গাই ২২৬

গঙ্গক ২২৬

গঙ্গর বী ১০২০

গাইফোর্ড ৮৩৬

গাইনী ২১০

গাইজি ১০

গাইজি খালি ১১৩৩

গাইজি বেশ ৯৭৬, ১০৪৫

গাইজি—ভূমিকা ১৮৮

গাইজি—ভূমিকা ১৮৮

গাইজি ১৮৫

গাইজি ১৮, ২১, ২৬, ২৩৩

গাইজি রাণ ৯০৮

গাইজি (মহাশক্তি) ৫৩, ৯৩১, ৯৫১

গাইজি ৯৩১

গাইজি ৩০৮

গাইজি ৩০৮

গাইজি ২৫৪

গাইজি ৬২৮

গাইজি ৬১২, ৬১৩, ৬১৯, ৬৪০, ৭৮৭, ৯৭৭

গাইজি বালবন ১১৩০

গাইজি ১১৩৬

গাইজি ৪১, ১৫০

গাইজি ১১৩৩

গাইজি ১৮৪

গাইজি ২২৬, ৩৬৯, ৪২৬, ৪২৭, ৫০৫, ৯০৮

গাইজি ২৮১

গাইজি ৩৮৭

গাইজি ৫৮১

গাইজি ২, ৬২, ৭০, ৭১, ৮৯, ১৩১, ৯০৮, ৯২৮

গাইজি চন্দ্রবর্তী ৯৫২

গাইজি ৭০

গণবিষ্ণু ২৪৭
 গণমতি ৩০১
 গণমালা ১০৬৮
 গণরাজ ৩৭৮
 গণরাজ খাঁ ৬৫৬, ২৭৭, ১১২৫, ১১৩১
 গণশাখালি ৮১২
 গণকির ১১২৩, ১১২৭
 গুপ্তা ২২৭
 গুপ্ত ২০, ২৭, ২০৮, ২১১, ২২৭, ২৪৩, ২৪৬, ৭৮৬, ২০৭
 গুপ্তসূত্রা ১১২৪, ১১২৮
 গুপ্তযুগ ১১২৮
 গুপ্তরাজত্ব ১১২৭
 গুপ্তসাম্রাজ্য ২০২-২২৩
 গুমানি ২২৫
 গুয়ারেখী ২২৪
 গুরব মিশ্র ২৪৭
 গুরুবাব ৭৬২, ১০০১
 গুরুসদয় দত্ত ৪৪০, ৫৬৪, ১১৪০
 গুরুসিঙ্গবা ১০২৭
 গুর্খা ৮৪৫
 গুর্জর ২৪৭
 গুলাচি ৩৫
 গুল্ম ১৪২
 গুল্মজ্ঞানবল্ল ৩০৬
 গৃহ (গেহ) ৬৮
 গৃহস্থ ৬০৬
 গেট সাহেব ২৮২, ১০৫১, ১০৫৪, ১০৫৫, ১০৫৬, ১০৬৩
 গেত্রিয়েল বাউটন ৮২৭, ৮২৮
 গোকর্ণ ২৪৫
 গোকর্ণ তীর্থ ৫৫৫
 গোকুল দাস ১০৬৬
 গোকুল দেব ১০৮৫
 গোকুলানন্দ বাহুবলীল ১১৩৪
 গোগরা ৬১৭
 গোড়া ৮৮
 গোদাবরী ২
 গোদান ১০০
 গোদানোকা ২২৬

গোদারানি পল্লী ১১৪৩
 গোপা ২৬, ২২
 গোপগিরি ১১০৭
 গোপাল ২৪০, ২৪১, ২৪৩, ২৪৪, ৩০২, ১০৪৫, ১০৪৬
 গোপাল উড়ে ১০০২, ১০১০
 গোপাল কৃষ্ণ ১১২০
 গোপাল গাড়া ১১৩২
 গোপাল দেব ১১২৪, ১১২৮, ১১২৯
 গোপাল ভট্ট ৪৪৪, ৫৫২, ৭৪৩
 গোপাল সিংহ ১১১৬, ১১১৭
 গোপীচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র) ২০, ২৭৪, ২৮৩, ২৮৬, ৪৬৮, ৪৬৯, ৫২২, ৫৮২, ২৬৬, ২৭৫, ১০৬২, ১০৭২, ১০৮০, ১০৮৮, ১১০৩, ১১২৪
 গোপীচন্দ্রের গান ৪৬৮
 গোপীনাথ ৭০২, ৭৪০
 গোপীনাথ (গোপীজ্ঞানদাস নারায়ণ) ১০৩২
 গোপীনাথ দত্ত ২৭২
 গোপীনাথ মিশ্র ৭৩৩
 গোপীরাজবল্লভ দাস ১১০৬
 গোপীরাষ্ট্রগ্রাম ১০৩৩
 গোবর ১০৬১
 গোবরা ৮২৩
 গোবরাই ৩২৭, ৭৭১
 গোবর্দ্ধন ৫০৭, ৫০৮, ৫৫৬, ৬০৪, ৭২১, ৭২২, ৭৪৮
 গোবর্দ্ধনাচাৰ্য ৩৭৬, ৩৭৭, ৪২৩
 গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীল ১১৩৪
 গোবিন্দ গুপ্ত ২১২
 গোবিন্দচন্দ্র (গোপীচন্দ্র ভট্টাচার্য) ১১৩৫
 গোবিন্দচন্দ্র রায় ১১৩৫
 গোবিন্দ দাস ৪৭৮, ৫৫৬, ৫২৪, ৬২৬, ৬৮১, ৬২৫, ৭০১, ৭২৫, ৭২৮, ৭৩৩, ৭৫৬, ৭৫২, ৭৬০, ৭৬৪, ৭৬৭, ৭৮৬, ৮২১, ৮২৩, ৮২৫, ৮৬১
 গোবিন্দনাথ রায় ১১৩৫, ১১৩৬
 গোবিন্দনারায়ণ ১০৭৮
 গোবিন্দপুকুর ১১৩২
 গোবিন্দপুর ৮৩২, ১১২৮
 গোবিন্দ মণি-কা ৮৩৪, ১০১৬, ১০৩৬, ১০৩৭
 গোবিন্দসিংহ ১০২৩

১১৫৮

বৃহৎ বঙ্গ

গোমতী ১০২, ১০২৮
 গোয়া ৮১৫, ২২৫
 গোয়াল পাড়া ১১৩৯
 গোয়ালপাড়া ১১০৬
 গোয়ালপাড়ার গাতি ১০৩৩, ১০৪৩
 গোয়ালিয়র ৫২৫
 গোরক্ষনাথ ২৭৪, ৬৭৮, ৭৭০, ২০৫, ২৬৬, ২৭৫
 গোরক্ষপুর ১২, ২০, ২৮৬
 গোরক্ষবিহার ২৭৬, ৩২৫, ৫৮৪, ৭৭১, ২২২, ২৬২, ১১২২
 গোরদীঘি ১১৩৮
 গোরবরা ৩৩৫
 গোরাই কাজি ৭০৭, ৭১৪
 গোলকুণ্ডা ৮৩৫
 গোলাম খোউশ ২৫৭
 গোলাম হোসেন ৮৩৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৮০, ২৫৫, ২৫৭, ২৬৭
 গোলাম হোসেন ৬২৫
 গোলোকনারায়ণ চৌধুরী ১১৩৪
 গোলোকনারায়ণ রায়চৌধুরী ৩৪
 গোসাই খেসারতি ১০৬৫
 গোসাইজী ৮২২
 গোসানী মন্দির ১০৭৪
 গোসাল ১০৭, ১১৪
 গৌড় ৭, ১২, ১৬, ২১, ২৮, ৬৩, ৭১, ২০৬, ২২৪, ২২৫, ২৮৬, ৬২৭, ৭১৮, ৭৩৩, ৭৮৬, ২১২, ১০২১, ১০৮৬, ১১৪০
 গৌড়গোবিন্দ ১০৮৫, ১০৮৬, ১০৮৮, ১০৮৯, ১০৯০
 গৌড়দ্বার ৮৮১
 গৌড়বহ ২৬০
 গৌড়লেখমালা ১১২৮
 গৌড়ীক আলমারিক ৭
 গৌড়ীক ভাষা ২৫২
 গৌড়ীক রীতি ১২
 গৌতম ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ১৬১, ৩৫৩
 গৌতমী ২০
 গৌরগনোদেপ ৬৮১, ৭৭০
 গৌরপদতরঙ্গিণী ২৬১
 গৌরপ্রসাদ বাসনবীণ ১০৭৬

গৌর মন্দির ১০২৬, ১০২৭
 গৌরাজ ৬২০, ৬২১, ৬২৭, ৭৩২, ৭৪০, ৭৫৭
 গৌরী ১০০, ৫৭৫, ২২৮, ১০০৮
 গৌরীদান ৪৭২-৪৭৬, ৫২০
 গৌরীদাস ৬৭২, ৬২৬
 গৌরীন্দন মুস্তফা ১০৭৬
 গৌরীনাথ সিংহ ১০৬৪
 গৌরীনারায়ণ ১০৫৬
 গৌরীশ্রাম ১০২৭
 গৌহাটী ৮০০, ১০৫৩, ১০৬১
 গায়ৎসন এসেনগি ৩০৭, ৩১০, ৩১৩
 গ্যাঞ্জারিডিয়া ৭২১
 আগার ৭২
 গ্রীক ১৭৭, ১৭৮, ২০৪, ২৩৩, ২৩৫, ৩০৬, ২৩৩, ২৫৩, ১১০০
 গ্রীক প্রভাব ১৭৮
 গ্রীকপীঠ ১০৮৩
 গ্রীষ্মরসন ২১৮, ২৬২
 গ্রীষ্ম ১৭৬-১৮৩, ২৩৩

ঘ

ঘটোৎকচ ৪৬৫, ১০৭৭, ১০৭৮
 ঘটোৎকচ গুপ্ত ২০৭, ২০৮, ২১৬
 ঘণাঘণ ২৫৩, ৫৫৫
 ঘনরাম ২৭০, ২৮৬
 ঘনশ্রাম ২৬১, ২২৩, ১০৬২
 ঘনশ্রাম ঠাকুর ১০৩৭
 ঘরের দেয়ালে চিত্র ৫৬৪
 ঘেবেটিবেগম ৮৬০, ৮৬৪, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭২, ২৫৬, ১০০২
 ঘোড়াখাট ৮০৮, ৮১৬
 ঘোষপাড়া ৭৭২
 ঘোষালী ৫২২

চ

চকীঘি ১১৩৭
 চকলিয়া ১৪

চক্রবর্ত্ত ১০৮৮	চন্দ্রগোপীনাথ ১০৩৬
চক্রবর্ত্ত ৮২৪	চন্দ্রাংশু ২০৫
চক্রবর্ত্ত ১০৫৬, ১০৬১	চন্দ্রদেব ৮০১
চক্রপানি ১০৬১, ১০৮৮	চন্দ্রদীপ ১১২২, ১১৩৭
চক্রপানি দত্ত ৩৭২	চন্দ্রনাথ ৬, ১৫
চক্রাযুধ ২৫৫	চন্দ্রনাথ রায় ১১৩৫
চট্টগ্রাম ১১, ১৮, ৮৪, ৫৫৬, ৭৮০, ৮১১, ৮১২, ৮১৩, ৮৩৫, ৯২৩, ৯২৫, ৯২৭, ৯৬২, ৯৮২, ১০২৩, ১০২৭, ১০২৮, ১০৩১, ১০৩২, ১০৩৯, ১০৪৫, ১০৪৯, ১১১৯	চন্দ্রনারায়ণ ৩৫০
চণ্ডিগিরি ১৫৬	চন্দ্রশাল ৩০১
চণ্ডাল ১০	চন্দ্রপুর ১০৩২
চণ্ডী ২৩৮, ৪৭২, ৯৬১, ৯৬৫, ৯৬৬, ৯৮৫, ১০৭৫	চন্দ্রপ্রভা ১০৭৯
চণ্ডীকাব্য ৯১০, ৯৭৪ ১১০৭, ১১৩১	চন্দ্রবংশ ২৭৩, ২৮৫
চণ্ডীগড় ১০২৭	চন্দ্রবর্মা ২১২, ১১০৮
চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার ৯১১	চন্দ্রমুগবর্মা ১০৫৩
চণ্ডীদাস ৪২৭, ৫৫৬, ৬৭২, ৬৮৩, ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৯১, ৭৩৮, ৭৫৬, ৭৫৯, ৭৭০, ৭৭১, ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৮, ৭৮১, ৮৪৬, ৮৪৮, ৯১৪, ৯২৮, ৯৬৩, ৯৬৯, ৯৭২, ৯৮৮, ৯৮৯, ৮৯০, ৯৯৩, ৯৯২, ৯৯১	চন্দ্রশালা ৯২৫
চণ্ডীমঙ্গল ৮৬, ৯২২, ৯৭১, ৯৭৪, ৯৭৫, ৯৮৩, ৯৮৪, ৯৮৬	চন্দ্রশেখর ২৩৮, ৯৯৩
চণ্ডীর আশীর্ব্বাদী ৯৭৩	চন্দ্রশেখর দেব ১০৮১
চণ্ডেলী ৫৪৯	চন্দ্রসিংহ ১০৩৭
চণ্ডেশ্বর ৩৭	চন্দ্রসিংহ নারায়ণ ১০৩২
চতুর্বিজ্ঞাপনোনিধি ৯৪৭	চন্দ্রস্বর্ষ ১৬, ১৭
চন্দাই ৬, ৩৭, ১০৩০, ১০৮৮	চন্দ্রাবতী ৩৩, ৩৯৬, ৪৬৮, ৯১০, ৯১৩, ৯৬৯, ৯৮০, ৯৮৩
চন্দন ১০৭০	চন্ডিগড় ৮১২, ১১০৮, ১১২৬, ১১২৮, ১১২৯, ১১৩২, ১১৪০
চন্দন বাস ১৫০	চন্দ্রা ২৩, ৪৬৮
চন্দননগর ৮৩৮, ৮৬৮, ৮৭৫	চন্দ্রাই ৩৩৩
চন্দ্রভরি ২৭	চণ্ডীগ ১০২৫, ১০২৬, ১০৩৯, ১০৪৩
চন্দ্রেন ২৬১	চরক ৩৫৩
চন্দ্র ১০, ৩৯, ১০৪২	চরকা ৯৪০
চন্দ্রকান্ত সিংহ ১০৬৪	চরখানা ৯৩৬, ৯৪২
চন্দ্রকোষ ১০৯৭, ১০৯৮	চরপাড়া ৯৩৫
চন্দ্রকেতুর গড় ১১২৪, ১১২৮	চরাই খাড়া ১০৫৯
চন্দ্রগর্ভ ৩০৬	চলনবিলা ৬২৬
চন্দ্রগুপ্ত ১৩১, ১৪৩, ১৪৮, ১৫২, ১৯২, ২০৭, ২০৮, ২০৯	চন্দার ৯১৮
২১৬, ২৩৫, ২৪০, ৫৫৪, ৭৫৬, ১১০০	চাঁওপুলাই ১০৫৭
চন্দ্রগোমিন ৩৩৮, ৩৪৫	চাঁমিন ১১০১
	চাঁচড়া ৭৯৪, ৮৪৫, ১১৩৬
	চাঁদকবি ৫৩০
	চাঁদগালি ১১৩৩
	চাঁক বর্ধাই ৫৯১

১১৬০

বৃহৎ বঙ্গ

চাঁদ বিনোদ ৩৭২
চাঁদরায় ৩০৪, ৭৬০, ৭৬১, ৭৬২, ৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৬৭, ৭৬৮,
৭৬৯, ১০৩৩, ১০৪৩, ১০৪৮
চাঁদসঙ্গার ১৫, ৪৩৮, ২২৪, ২২৫
চাঁদেদি ৩৩
চাঁকলা ১৪
চাঁকমা ৪, ৪০
চাঁপকা ১৪২, ১৪৩ ১৪৮, ১৪২, ১৪১, ১৪৪, ৩৪১, ৩৭৩,
৭৪৬
চান্দনা ১১৩৪
চান্দোরার ছুর্গ ১১৩২
চান্দা ১৫৭
চাপঘাট ১০২৫
চাপলি ৮১২
চান্দারিয়া ১০৬৭
চান্দল ৩৪
চারণ ৬২৪
চারুপর্ণি ৩২৬, ৭৭২
চার্ফাক ৩৫৩, ৩৫৫
চালাঘাট ১০৮৩
চালুকা ১১০৩
চান্দানগরী ৩৪
চিংকং খদা ১০২৭
চিকনা ১০৬২, ১০৭০
চিহ্ন ২৩০
চিহ্নকল্প ১০৭৮
চিহ্নবিজ্ঞা ১০৫২
চিহ্নমতিকা ২৭১
চিহ্নলেখা ২৩৮
চিহ্নশিল্প ৪৪৪-৪৫২
চিহ্নসেনা ৩০
চিহ্না ৪৮
চিহ্নাসঙ্গ ১৩৭, ৪৬৫, ১০৫২
চিনি ২৪৩, ২৪৫
চিন্তা ২৭২
চিন্তাগাড়া ১১৩২
চিরন্তন সেন ৭৪২
চীন ১২, ১২, ৩০, ৩৮, ৭১, ৮৪, ২৩২, ২২৪, ৩১৭, ৩৩৭,

৩৩৮, ৪৮০, ৫২২, ২২৫, ২৩৩০, ২৩৪, ২৪৪, ২৭২,
২৮৭, ১০১৭, ১০৪৭, ১০৫৫, ১১০১
চীলরায় ১০৫২, ১০৬৭, ১০৭১, ১০৮১
চুঁচুড়া ২৪৮
চুকুলিয়া পরী ১১৩২
চুটিয়া ১০৫৬, ১০৫৭, ১০৫৮
চুনার ৬৩৩, ৬৩৭
চুড়াখাইড় ১০৮৫
চুড়াপতিগ্রহণ ২৮
চোকন্ ১১০১
চোহো ২২৫
চেন্নিঙ্গ বী ৩১৪
চৈতক ১৩২
চৈতি ১৪৭
চৈপি ৫, ১২, ২৫, ২৬, ৩২, ৩৫, ২৬১, ২৭২, ১০৭৭
চৈরাই রং (সামন্তকপতি) ১০২৭
চৈতন্য ১৫, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৩২৬, ৩৬০, ৩৬১, ৫১৫,
৫২২, ৫৫৬, ৬৩১, ৬৬৭, ৬৭৮, ৬৮১, ৬৮২, ৬৮৩, ৬৮৪,
৬৮৫, ৬৮৬, ৬৮৭, ৬৮৮, ৭০৬, ৭১১, ৭১৫, ৭১৭, ৭২০,
৭২১, ৭২২, ৭২৫, ৭৩০-৭৪৭, ৭৬৫, ৭৬৭, ৭৬৮, ৭৭০,
৭৭২, ৮৮২, ৮৮২, ২৫১, ২৬১, ২৭৩, ২৭৮, ২৮১, ২৮৪,
২৮৮, ২৮৯, ২৯৫, ১০৬৪, ১০৬৫, ১০৬৭, ১০৬৮,
১০৬৯, ১০৭৭, ১১০৩, ১১১৪, ১১৩৩, ১১৩৭
চৈতন্যচন্দ্রোদয় ৭৩৪, ২২৫
চৈতন্যচরিত ৬৮২
চৈতন্যচরিতামৃত ৩৬১, ৬৭২, ৬৮০, ৭০৮, ৭১৪, ৭১৬,
৭২৮, ৭৩২, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৪৩, ৭৪৭, ৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৬,
৭৬৭, ৭৬৮, ৭৬৯, ৭৭৩, ৭৭৮, ৭৮২, ২৬১, ১০৪২,
১০৮১, ১০৮৮, ১১৩১, ১১৩২
চৈতন্যদাস ১১১৫
চৈতন্যভাগবত ২২০, ৬৮০, ৬৮২, ৭০১, ৭০৫, ৭০৭, ৭১২,
৭১৪, ৭২১, ৭২৩, ২৬৬, ২৮৪, ২৮৬, ১০৮৮, ১১৩১
চৈতন্যমঙ্গল ৪৬৪, ৬৮২, ৬৮৭, ৭৪০, ২২৬, ১০৮৭, ১১৩১
চৈতন্যলীলা ৬৮২
চৈতন্যসিংহ ১১০২, ১১১৪, ১১১৭
চৈরাটায় ১০২৭
চোল ৫২
চৌকী ১০৮২

চৌড়গঙ্গ ৪৬৬
চৌধ ৮৫৬
চৌধুরীর লড়াই ১৪, ৮০৬, ১১২০, ১১২০
চৌরঙ্গী ২৭৬
চৌরাঙ্গিৎ ১০২৭, ১০২৮
চৌরীখর ৪৫২
চৌহান রাজা ১০২২
চ্যাংচু ৩০৮, ৩১২, ৩২২

ছ

ছবরিচা গড় ১০২৭
ছত্রনাঙ্গির ১১২১
ছত্রপতি ১০৭৫
ছত্রভোগ ১১৩১
ছত্রমাণিকা ৮৩৪, ১০১৬, ১০৩৬, ১০৩৭, ১০৪২, ১০৫০
ছত্রেশ্বরী-মন্দির ১১০৩
ছন্দক ২৫, ২৭, ২৮, ৬৮৬
ছত্রগড়ার জ্ঞান মিঞার ঘর ৫৫২
ছাত্র ঠাকুর ১০৪০
ছাত্রের নগর ১০১২, ১০৪০
ছিন্নমস্তা ২১২
ছুঁটি খাঁ ৬৫৬, ২৭৭, ২৭৮
ছোখোম্পা ১০৪৩, ১১১৭, ১১১২, ১১২০, ১১২১, ১০১৩
ছোফোহাগ ১০৮৬
ছোটনাগপুর ১২, ১৪

জ

জগৎমল ১১১৪
জগৎমাণিকা ১০৩৮
জগৎরাম ৮৩৮, ১০৩৭, ১০৩৮
জগৎশেষ্ট ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৬২, ৮৭১, ২৫৬, ২৫৭, ১০৩৮, ১১৩২
জগৎসিংহ ৭৮৩, ৭৮৪, ৮০৮
জগৎদানন্দ ৭৩৪, ৭৩৫, ১০৬৫
জগদানন্দ বাহুবলীল ১১৩৪
জগদীশ্বর ১১৩৫
জগদীশ ৩৪৫, ৩৪২

জগদীশ তর্কালঙ্কার ৪৫৬
জগদীশ্বর ৮৭, ৮২
জগদেব ১০৭৪
জগদল ১২, ৩০০, ৫৫৫
জগদ্রাথ ১১৩১
জগদ্রাথ চক্রবর্তী ৮৪৬
জগদ্রাথদেউ ৬৫৬
জগদ্রাথমঞ্জল ২৭২
জগদ্রাথ মঠ ১০৩৪
জগদ্রাথ মিত্র ৬২৭, ৬২৮, ৬২৯, ৭৩২, ৮৮৫, ১০৮১
জগদ্রাথপুর ১০২৫
জগদ্রাথ রায় ১১৩৬
জগদ্বন্ধু ভট্ট ৬২১, ৭৪৬, ৭৫৭
জগদমোহন ১০৩৬
জগদমোহন পণ্ডিত ১০২২
জগাই ৭২২, ৭৩০, ২৮০
জঙ্গলবাড়ী ১৩, ২৩২, ২২০, ৩৮৪, ৬৪৪, ৭৮৬, ৭৮৮, ৭২২, ৮০০, ৮০৫, ৮০৬, ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪, ৮৮২, ২৪০, ১০৫৪, ১০৫৬, ১০২৩
জাভিনগর ১০২৩
জটবিহার ১১১৩
জটীর বেউলা ১১২৪, ১১২২
জটীশ্বর ২, ২৪১
জতুগৃহ ১৫৮
জানমেজর ৪৬৩
জান ঝুয়াট মিল ২৪১
জানদীন কর্ণকার (কামার) ৮৪৭, ১০২৬
জফর খাঁ ৬৬০
জফরগড় ১০২৫
জবরদস্ত খাঁ ৮১২, ৮৩৮, ৮৩৯
জমির খাঁ গড় ১০২২, ১০২৭
জমুনদ্দিন (নবাব) ১১৩৩
জমুদীপ ৪৫৫
জমুদুর্ভি ২
জয়চল ৮৭৪
জয়দেব ২, ৩০, ৪১, ২২৬, ৩৩০, ৩৬১, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৭৫০, ৮৪৬, ৮৪৮, ৯০৮, ৯৮১, ১০৫০
জয়দেব রায় ১১৩৩

১১৬২

বৃহৎ বঙ্গ

অম্বদর ২২৩
 অম্বদর ১০৬০, ১০৬১
 অম্বদর ১১১৩, ১১২৪, ১১২৮
 অম্বদার ঘোষ ২৮২, ৮১৩, ৮১২
 অম্বদার মুখী ২৮২, ৮১৩, ৮১৭, ৮১৮, ১০৭৩, ১০৭৪,
 ১০৭৫
 অম্বদারিণ ২০১, ২৭১, ২৭৪, ২৮৩
 অম্বদারিণ রায় ১১৩৪
 অম্বদারিণ সেন ২১০
 অম্বদ ২২৫, ১০২১, ১০৩০, ১০৩২
 অম্বদচন্দ্র ১১২২
 অম্বদ্বিষ্ণু ১০৮৩
 অম্বদী পাহাড় ১০১২, ১০৮২
 অম্বদীয়ার ১০৬২, ১০৭২
 অম্বদগি ৩০৫
 অম্বদগল ৩৫৪, ৫২৪, ৫৪০
 অম্বদপুরি ৮২০
 অম্বদপুরী কলম ৪২১
 অম্বদঙ্গল ১০২৩
 অম্বদ ১১১৩
 অম্বদানিকা ১০১৬, ১০৩২, ১০৩৮, ১০৪৫
 অম্বদানিকা খণ্ড ১০১৬
 অম্বদান ৬৩
 অম্বদার খণ্ড ১১১৩
 অম্বদ ৫২১
 অম্বদিত্ত ৮২৮, ১০২৭, ১১০১
 অম্বদেন ২৮০, ২৮১, ২৮৪
 অম্বদেন বিধান ৫৪৭
 অম্বদোয়াল ২০৬
 অম্বদোয়ার ৫২০
 অম্বদোবী ১০৩২
 অম্বদ ৬৩
 অম্বদন ৬৬৪, ৬২৭, ৭৪০, ৭৪৫, ২২৬, ১০৮৭, ১১৩৭
 অম্বদন রায় চৌধুরী ১১৩৪
 অম্বদীড় ২২৪, ২২৫
 অম্বদজ ৬, ৭, ১২, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ৩২, ৪০, ৪১,
 ৫৩, ১০৩, ২০৬, ২২৭, ৩৫২, ৭৮৩, ১০৫১
 অম্বদী (গড়) ১১৩৪

অম্বদ্বিষ্ণু ৫৬৫, ৬৫৮
 অম্বদ্বিষ্ণু বোধি ১১৩৮
 অম্বদাইওড়ি ২৮, ৫২
 অম্বদ্বী ১০২৫
 অম্বদর সরকার ১১০৬
 অম্বদ ১১৪০
 অম্বদ ১০৭৪
 অম্বদ ১৪৫
 অম্বদ উদ্দিন ২৩০
 অম্বদগ্রাম ১১২৪, ১১২৮
 অম্বদগি ৫৪৬
 অম্বদগল ১১৪০
 অম্বদ ২১, ১২৫, ১২৭
 অম্বদগল ২২১
 অম্বদনাশ ৭৩৬
 অম্বদবন্দী ২৪৪
 অম্বদভেদ ৫২২
 অম্বদকীর্ষনী ১১০৭
 অম্বদকীনাথ ২৩১
 অম্বদকীনাথ (রাজা) ১১৩২
 অম্বদকী বিধান ৮৪৫
 অম্বদকীরাম ৮৫২, ৮৬০, ২৫৭
 অম্বদকী মিত্র ৬৬০
 অম্বদহম্বর (নবাব) ১০২১
 অম্বদমিত্র ৪৫৬
 অম্বদ ১২, ৭১, ৮৩, ২৩২, ৩৩৭, ২৮৭
 অম্বদ বী ৮৩২
 অম্বদ বীর মসজিদ ১১৪০
 অম্বদ ৫২, ৬৩
 অম্বদ ৭১, ৮২, ২২২, ২৩২, ২২৫
 অম্বদানি ২৩৬, ২৩৭, ২৪২
 অম্বদ বী ১০২৩
 অম্বদ বী পনি ১০৩২
 অম্বদ ৭৫১
 অম্বদ ৮৫২
 অম্বদ উদ্দিন ভববিজি ৪৫২, ৭৮৭, ৫১৩-৫২৩
 অম্বদ শাহ ৬৪০
 অম্বদ পাহাড় ১০২০

শব্দ-সূচী

১১৬৩

জালালুদ্দিন ৪২৪, ৪২৫, ৪০৪, ৪০৮, ৪১০, ৬১৫, ৬২৭
২২১

জালালুদ্দিন কতেমাহ ৬২৯

জাহাঙ্গীর ৬৭২, ৭২০, ৮০১, ৮০৪, ৮১০, ৮১১, ৮১৭,
৮১৮, ৮২০, ৮২১, ৮২৪, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮৮২,
৯৩৪, ১০০০, ১০০৬, ১০৭২, ১০২৪

জাহানকোবা (কামান) ৮৪৭, ১০২৬

জাহান খাঁ ১০২০, ১০২১

জাহান্নার শাহ ৮৪১

জাহ্নবী ১০৪২

জাহ্নবী সেবী ৪২৮

জিতারি ৩০৬, ৩৩০, ৩৩৯

জিনমিত্র ৩০১, ৩১৮

জিনশাহ ৮৪১

জিনারপুর ১০৩১

জিয়মপুকুর ১১৩৯

জীবক ৫২৩

জীবগোষ্ঠানী ৩৭১, ৩৭৩, ৩৭৫, ৭১৭, ৭২১, ৭৪৩, ৭৪৪
৭৪৬, ৭৪৮, ৭৫১, ৭৫৩, ৭৫৭, ৮৮২, ৮২১, ৯২৬,
১১১৪

জীবদা ১০৫৪

জীবশর্মা ৯২

জীরা ১০৬২, ১০৭০

জুগদিয়া ১০৪২

জুগীদিয়া ১১২১

জুনা খাঁ ৬৫৩

জুমুরনন্দী ৩৬৯

জেকবি ১২৯

জেনোফোন ৮১৫

জেনউল্লিঙ্গা ২৩৪, ২৩৬

জেমস্ ৮৩৭

জেরেমি বেঙ্কাম ৯৫০

জেলালুদ্দিন ৭৫১

জেহাজ খাঁ ৮১৬

জৈন ৬, ৭, ৯, ১০, ২০, ৪৫, ৪৭-৫৪, ৯২, ১২৫, ১২৮-
১৩৬, ২২৯, ৩৩৬, ৫৭৮, ৯৪৬, ১০৭১, ১১০০, ১১০২

জৈহুদ্দিন ১০৬০

জৈম্বাপাহাড় ১০২১

জৈমিনী ২৭৭

জোড়বাগলা মন্দির ১১১৭

জোয়ান-ডি-আর্ক ১০২০

জোয়ানপুর ৬৪২

জ্যোতির্বিজ্ঞান ২৫৩

জ্যোতিষশাস্ত্র ১০০০

জৌনপুর ৬৩২

জানচন্দ্র ৩০১

জানদাম ৬২১, ৭৫২, ৯২৩

জানশ্রী ৩৩৯

জানশ্রী মিত্র ৩৩০

জানানন্দ ১১৩৪

জালালুদ্বী ২৫৩

খ

খাজি ২৪৬

খাপনা ২৩০

খারিগণ ৪, ৭২০, ৭৫২, ১১০২

খালকড়ার বীথি ১১০৭

খালকাটি ৮৩৩

খালসা ৮৪০

খিনারদি ২৭২, ২৮৩

খুনো ২৩৬, ২৪২

খুমখুম খাঁ ৮৪৭

ট

টকিন ৪৪

টড ৩৩

টপোগ্রাফি ২৩৪, ২৩৬

টমাস ২৪৮

টলেমি ২০৬, ২০৭, ২০৮

টানা ২৩৯, ২৪১

টাবলা ১০৫৯

টার ১০৫৭, ১০৫৮

টিগন্ ১০৫৮

টপ্পা ১০৮০

টিগ্রাভা (তিগ্রাভা) ৩৭, ১০৪৯

টিবেটো-বর্ধন ১২৩

টিম্বট ২২৪

১১৬৪

বৃহৎ বঙ্গ

ত

টুইট বঙ্গ ২২৬

টোই ২৪২

টোইল ২৩৩

টোইলটা ৪৪

টোইলজেলি ২২৮

টোইলস ২২২

টোইলি ১১২২

টোইল ৩৪৬

টোইল সাহেব ২৩৪, ২৩৬

টোইলি ৩৩

টোইল ৩২২-৩৩৪, ৩৪৪-৩৪৬, ৪৭৩, ১০৮৭

টোইলনিয়ার ২২৮, ২৩৪, ২৪২

ড

ডালনকাটি ২৪০

ডালিডন ২৪২

ডালি ৪, ২৩৮, ২৪৬, ২১৪, ২১৭, ২১৮, ২২২, ২২৭, ২৬২, ২৬২

ডালির্বি ২৪২, ২৬৩

ডালির্বি ১০১৭, ১০২১, ১০২২, ১০৩১

ডালির্বি-৭৩ ১০১৮

ডালির্বি হারবার ১১২৩, ১১২৭, ১১২৮, ১১৩১

ডালির্বি-নিকোলাস ১৪৮

ডালির্বি ৭, ২৪

ডালির্বি ১০৬২

ডালির্বি ৭২৬

ডালির্বি ২৪০

ডালির্বি ৮৩৩, ২৩৪, ২৩৭

ডালির্বি ৮৬৮, ৮৭৪

ডালির্বি ২২৬

ডালির্বি ১০, ৪১৭, ৪৩২

ডালির্বি ১০, ৪১৭

ডালির্বি ৩০৬

ড

ডালি ১৬, ৩৪, ২০৭, ২২৪, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৪, ২৩৭, ২৪০, ২৪২, ১০৩৬, ১০৪২, ১০৪৪, ১০৪৬, ১০৪৮, ১০৪৯, ১০৫১, ১০৫৩, ১০৫৪

ডালির্বি ৭৩৩

ডালির্বি ৬২, ২০৪, ৩০০

ডালির্বি ১০২৭

ডালির্বি ৭৬, ৩৩৬

ডালির্বি ৩৩৩

ডালির্বি (৩৩) ৬৮

ডালির্বি ৪২

ডালির্বি ৪৭২-৪৮২

ডালির্বি ৩৮৮

ডালির্বি ১১৩৮

ডালির্বি ৪৭০

ডালির্বি ১২, ১৪, ১৬, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৬০, ৮১২, ১০২২, ১১০১, ১১০২, ১১০৩, ১১০৪

ডালির্বি ৬১৪, ৬৪২

ডালির্বি ২৭

ডালির্বি ২১৪, ২৩০

ডালির্বি ৭৭৬

ডালির্বি ১০৮৬, ১০৮১, ১০৮২

ডালির্বি ৩৩৪

ডালির্বি ৭৭৪

ডালির্বি লেন ১৬২, ৩২৬, ৬২৭, ৬২৮, ৮৩১

ডালির্বি ১১০১, ১১০২

ডালির্বি ১১০২

ডালির্বি ১১০১

ডালির্বি ৭১

ডালির্বি ১১০৬

ডালির্বি ৬৪৪

ডালির্বি ৪৪৪, ৪৪৭, ৮৮৭, ৮৮৮, ২৪০, ১০৪৩

ডালির্বি ১১৩৭

ডালির্বি ৮২২, ৮২৩

ডালির্বি ৬০৭

ডালির্বি ৪২

ডালির্বি ১২৩, ১২৪

ডালির্বি ১৬, ৬৪৭, ৬৪৮, ৮০৭, ৮০৮

ডালির্বি ২৩০

ডালির্বি ৮২২

ডালির্বি ৬১৪

ডালির্বি ২০৮

তানিষ আলি খাঁ (নবাব) ১০২১	তিগভাওেশ্বর ২৪১, ৪৬৭
তান্ত্রিক ১২৪	তিলোত্তমা ৭৭২
তান্ত্রিকতা ৩৮৮	তিয়রক্ষিতা ১৮০
তাল্লাসেবী ৪৪২	তিসুল ৮২
তামিল ৪৪, ৮৬, ১২৩, ২২৪, ২২৮, ২২৯, ২৪৩, ১১০০	তীর্থধর ৬, ৯, ২০, ৪১, ৩৩৪, ৬৭৪
তাম্বলি ১১০৪	তীর্থরাম ৭৩৩
তাম্রধ্বজ ১০৬২, ১০৭৮, ১০৭৯, ১১০০, ১১০৩	তুঙ্গেশ্বর ১০৮২, ১০৮৩
তাম্রপত্র (তাম্রপাণি, তাম্রপাণি) ৭৪, ৭৯, ৮২	তুড়কা ১০৭০
তাম্রলিপি ৩৭৩	তুন্দর ২৪৩
তাম্রলিপি (তাম্রলিপি) ৬, ১৬, ২০, ৩০, ৪৪, ৪৭, ২২৪	তুরবক ১০৪২
১১০০, ১১০১, ১১০২, ১১০৩	তুরঙ্গ ১১, ৪৩৮, ৮৮৬, ২২৪, ২৩৩, ২৩৬
তাম্রশালিন ৪৪২, ৪১২, ২৬৭, ১০১১, ১০১২, ১০৩১,	তুরাক ৩২
১১৪৪, ১০৪১, ১০৪৩, ১০৪৪, ১০৪৫, ১০৮৬, ১১০১,	তুর্কী ৫৭৭
১১০৪, ১১২৪	তুর্কীয়ান ১০০২
তারক ১০৪৩	তুলসীবাস ২১৮
তারকচন্দ্র রায় ৪৬৩	তুলারাম ২০৭৯
তারকনাথ রায় ১১৩৬	তুয়াফ ১৫, ২৩০, ৪৪৪
তারপাশা ২৮৬	তেওতা ১১৩৭
তারি ৮, ৯	তেজাশেখর ৬০২
তারানাথ ২৪৮, ২৪০, ২৪১, ২৭১, ২৮৮, ২৮৯	তেজপুর ১০৪৩, ১০৬২
তারাপতি ২২৭	তেলাইরঙ্গ ১০৪৩
তারাহন্দরী ৮৬৩	তেলিহাটি ৮৪৪, ৮৪৬, ১১২০
তাল ২৩৬	তেলেগু ৪৪, ২৪৩
তালতলা ১১৪০	তৈয়স ৪৮৪
তালধ্বজ ১১২২, ১১২৭	তৈমকিণ ১০১৯
তালিষ আলি খাঁ (নবাব) ১০২২	তৈমকিণধও ১০১৬
তালিশ ৮১২	তৈয়স নদী ১০১৬
তালুঙ্গ ১১০০	তৈলকম্প ২৬৭
তাহিরপুর ১১৩৭	তোড়লমর ৬৪৬, ৭৮৬, ৭৮৯, ৮০২, ৮০৭, ৮১১, ৮২২,
তিমিধ্যা ২২৩	১১০৬, ১১২১
তিতবন্ধী ২৩৪, ২৩৭	তোগান খাঁ ৩১৩, ৩১৪, ৪৪৯
তিতবাদি ২৪০	তোয়েল খাঁ ৬১৩
তিতপুর ২৩০	ত্রস ১২০
তিগত ১৯, ৩৪, ২৪১, ২৭০, ২৮৮, ৩০৭, ৩১৬, ৪০২,	ত্রিগামা ২২৪
৭৭৯	ত্রিপিটক ৩০৬
তিহ্মাল ৪৬, ১১০১	ত্রিপুর ৬, ৪২
তিহ্মকবস ২৭৯	ত্রিপুরধও ১০১৬
তিহ্মকচন্দ্র ২৬৬	ত্রিপুর-রাজবাংশ ১০৪৪

১১৬৬

বৃহৎ বঙ্গ

জিপুরা ৩, ৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ৩১, ৪৩,
২৭০, ৩৭০, ৪২২, ৭২১, ৭২৩, ৮৫১, ৮৫৩, ১০১১,
১০১২, ১০৫০, ১০৭০, ১০৭৮, ১০৮২, ১০৮৪, ১০৮৬,
১০৮৭ ১১০৮, ১১১৯, ১১২০, ১১২১, ১১৩৮

জিপুরার খাল ১০৩১

জিপুরার জামাল ১০৩১

জিপুরাশ্রমরী ৪৮২, ১০১৯, ১০৪৩

জিপুরেশ্বরী কালী ১০৪১, ১০৪৮

জিবাছুর ৭০০

জিবিজ্ঞান নারায়ণ ১০০০

জিবেগ ১০১৫, ১০১৮, ১০৪৩, ১০৪৫

জিবেলী ৩৫, ১১৪০

জিভবনপাল ২৫৫

জিলোচন ৪০, ১০১৮, ১০৭০, ১০৭৭

জিলোচনখণ্ড ১০১০, ১০৭৭

জিশকু ১২৩

জিহুত ১৮, ২২০, ৩১২, ৮১০

জৈলোক্যচন্দ্র ১১২৪

জৈলোক্যানাথ ধর ২০০

জৈলোক্যানাথ পাল ১১০৪, ১১০৭

জৈলোক্যানন্দরী ২৮৫

ধ

ধানল ৫০

ধানবিহার ৩১৩

ধানাংচি ১০২৩, ১০৪৩, ১০৪৫

ধানাংছি ১০২৫, ১০২৬, ১০৩৯

ধিতুঙ্গ ৫০

ধিসরঙ্গ সিঁড়িহান ৩১৭

ধোড়া ১৭

ধোরাপুটিক ২৪০

ধোলিন বিহার ৩১৩

দ

দক ৪১, ২৪১

দক্ষিণখণ্ড ১০১৬

দক্ষিণগোবিন্দপুর ১১২৪, ১১২৯

দণ্ডভুক্তি ১১০১

দণ্ডমহোৎসব ৭২৩, ৭৪৮

দণ্ডাচাণা ২২৪, ২২৮

দণ্ডকচন্দ্রিকা ১০২৪

দণ্ডাধেবী ১০৫৩

দণ্ডমর্দন ৬২৮

দণ্ডমাণব ১০২১

দণ্ডরায় ৬১৬

দনৌজ ৬২৩

দনৌজমাণব ৬০৫

দণ্ডভুক্তি ১৬, ৫৭

দবাক্ (ভবাক্) ১৬, ২১২

দময়ন্তী ৪০১, ২০২

দয়ারাম ২০৬

দয়ারাম রায় ১১৩৬

দয়িতবিলু ২৪৯, ২৫১, ২৫২

দরবেলী ৭৭১, ৮২২

দরাক খী ৩

দরিয়া ৮০৪, ৮০৫

দর্পনারায়ণ রায় ১১৩৪

দর্ভপাণি ২৫৭, ২৫৮, ৭৫৬

দর্শান ৩৫

দলমাণল (দলমর্দন) কামান ১১১৮

দশকাহানিয়া ৩৮৩, ১০৫৬

দশকুমারচরিত ২২৫

দশকুমা ২১২

দশনহাবিজা ২১৩

দশরথ ২০৪

দশাধমেধ ২০৮

দশম ২৩১

দাইলামন ৪৩৯

দাউদ খাঁ ৫৩, ৪৮২, ৪২৫, ৬৪৩, ৬৪৬, ৬৫১, ৭৬০, ৭৮৩

৭৮২, ৮৮১, ২৫৭, ১০৩১, ১০৭১, ১১০৬

দাউদ ১১০১

দাক্ষিণাত্য ৭২৯

দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস ২৫৪

দাতাকর্ণ ৭৮০

দাভারাম ২২৪
 দাধ খাঁ ৬৪৪
 দাধরা ১১২১
 দানকেনী কৌমুদী ৭৫২
 দানব ৪০, ৫২
 দানবী ৩১৮
 দান-সাগর ৪৮২, ৪২০
 দানেশ ককির ৮৭৮
 দামোদর ৭২৩, ৭২৪
 দামোদরপুর ২৪৬
 দামোদর সিংহ ১১১৭
 দায়ভাগ ২৫৩
 দারী ৮২৮
 দার্কিলি ১২, ২৮
 দাশরথী ১০১০
 দাগরা ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২২২, ১১৪০
 দাড়া ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৮৭, ২৭২
 দিওয়ান ৬২২
 দিকরায়ে নদী ১০৫২
 দিগধর ২, ১৩৩, ৩৩৬, ৪৫৭
 দিগ্ধর্শনী ৬৮২
 দিহ্মাগ ৩৫৪
 দিনাজপুর ২৮, ২২৮, ২৪৩, ২৪৭, ১১৩৩, ১১৩৮, ১১৩৯, ১১৪০
 দিনার ২৪৩, ৫২৬
 দিনারপুর ১০৮২
 দিলোক ৬৪, ২৬৪, ২৮৫, ৪৮৮
 দিবাংসিহ ১০২৪
 দিনাপুর ১০৭৬, ১০৭৮, ১০৮০
 দিলীপ ৭২২
 দিলীপ রায় ১২, ২২৭
 দিল্লী ৫২৫, ৭৮৬, ৭৮৭
 দিশাং ১০৫৬
 দিশাপুর ১১৩৯
 দীক্ষিত ২৮
 দীখাপাতিয়া ১১৩৬
 দীর্ঘিতি ৩৫৫
 দীনবন্ধু মিত্র ১১০১

দীনমণিচন্দ্রোদয় ১১১৫
 দীনরাজ ঘোষ ১১৩৬
 দীপকর ৮, ১১, ১৫, ১২, ২৪৪, ৩০৫-৩১৭, ৩৪৪, ৪৫৭, ৪১২, ৪২২, ৬০৪, ৭৭২, ৮২৪, ৯৭৫, ১১৪০
 দীর্ঘহরণ ২০৩
 দীলিপ সিংহের গড় ১১৩৯
 দুর্গা ৬৭৬, ২৭৩
 দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় ৩৫৩
 দুর্গাচরণ নাটকাল ১৩৭, ২৬২, ৮০২, ১১৩৬
 দুর্গাপুর ১০৫৬, ১১৩৮
 দুর্গাশ্রম কর ৭৭৬, ৭৭৭, ৭৭৮
 দুর্গামণি উজির ১০১৬
 দুর্গামোহন ভট্টাচার্য ২৪৭
 দুর্গেশনন্দিনী ২৬৬
 দুর্জয় সিংহ ১১১৫
 দুর্জয় ১০৫৪
 দুর্জয় দাস ২৮০, ২৮১
 দুর্জয় দেব ১০৩৭
 দুর্খোদন ২৩, ২৪, ২৬, ১৫৮, ২৩৪, ২৩৫, ১০৩৭
 দুর্মন্তনারায়ণ ১০৩০, ১১২০, ১১২১
 দুর্মন্তনারায়ণ হর ১৩
 দুর্মন্ত মলিক ২৭৪
 দুর্মন্তরাম ৮৬২, ৮৭১, ৮৭২, ২৫৬
 দুর্মন্ত রায় ১০৩৪
 দুর্মন্তেন্দ্র ৩৭, ১০১৬
 দুলাদ্রী বিবি ৬৪০, ৬৪২
 দুলাল ৮০৫, ৮০৬
 দুমন্ত ১০৫২
 দুর্গপতি ১০৭৭
 দুষ্টোদরী ৩১৩
 দেওড়াই ১০১৮, ১০৩৫
 দেওয়ানজী ১১৩৪
 দেওয়ান মদিনা ২৬২
 দেওয়ানী খান ৮১০, ২৪০
 দেবসং ১০৭৮
 দেবদেবী ২৫২
 দেবকোট ১১৩০
 দেবদত্ত ২২১, ২২২

১১৬৮

বৃহৎ বঙ্গ

সেবগিরি ১০৬৪
সেবগুপ্ত ২১৯
সেবদত্ত ২৪
সেবপাল ২৫১, ২৫৬-২৫৮, ২৫৬, ২৪৭, ১১২৪, ১১২৮
সেববতী ১০৫৩
সেবভোগ ৪৪৪, ৪৪৬
সেবমালিকা ১০২৯, ১০৩০
সেবরক্ষিত ১১০৩
সেবলগিরি ৩৫
সেবানন্দ ১১২১
সেবী ৮৯
সেবীকোট ১১৩৮
সেবীপুরাণ ২৩
সেবীবর ৬০৭
সেবীবরত শ্রীচন্দন পাল ১১০৫
সেবেল ৩১৩, ৩১৫
সেবেলনাথ হালদার ৫৬৩
সেবেলনারায়ণ ১০৭৫, ১০৭৬
সেবেল সিংহ ১০২৭, ১০২৮
সেবাং ৮৪
সেহারা ৩৩৩
সৈতথও ১০১৬
সৈতানারায়ণ ১০৩০
সৈবপুত্র ২১৩
সৈবা বিবি ১০৪০
সোরোপরপণার মাধব ১১০৭
সোলমক ২৫৬
সোহাল দীপি ১১৩৮
সৌজ গাধর ১০২৮
সৌলত কাজি ১৬, ১৭
সৌলতপুর ৫৪৪
সৌলতাধা ৬৬২
সৌলং গাজি ১১৩০
স্লামসেন ৪০১
স্লামনি ২৩৮
স্লামনী ২১০, ২১১
স্লামি ১২৩, ২৫৭
স্লাম ২৬

স্লাম ৩৬, ৩৭, ১০১৫, ১০১৭, ১০১৯, ১০২৩, ১০৭৭
স্লামচাঁদা ১৬০
স্লামদী ২৬৯
স্লামদী বুদ্ধ ২৭৯
স্লামশ বঙ্গ ১২, ১৩
স্লামশমণ্ডল স্বামী ১২
স্লামশ মাণ্ডলিক ১৩, ১৫
স্লামকা ৮৭, ১১১৫
স্লামকানাথ ২২৭
স্লামিকা ১০৩৭
স্লামেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী ১১৩০
স্লামেন্দ্রলাল রায় ১৯
স্লামবংশ ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৭২, ৮৩, ৮৭, ১৫৪
স্লামপাতি ১১২৩, ১১২৭
স্লামায়ন ২৫

ধ

ধনসেব ২৬১
ধনপং সিংহ ৮৮১
ধনপতি ১৫, ৪২৮, ২৭৪, ২৮৪, ১১০২
ধন সিংহ ৫৪
ধনমালিকা ১৪, ২২০, ২৭৬, ১০২৪, ১০২৫, ১০২৬,
১০২৭, ১০২৮, ১০২৯, ১০৩০, ১০৪৪, ১০৪৭, ১০৪৮,
১০৪৯
ধনমালিকাধও ১০১৬, ১০২৪
ধনস্ত্রী ৫২৮
ধনেন্দ্রনারায়ণ ৮১৯
ধর্ম ১০
ধর্মগুপ্ত ৩০৩
ধর্মদাস রায় ১১৪০
ধর্মপা ২৫৯
ধর্মপাল ১৫, ২৪, ৬০, ৬১, ২৫০, ২৫৩-২৫৫, ২৫৬,
২৫৭, ৩০১, ৩১৭, ২৬৬, ২৬৭, ২৭০, ২৭৩, ১০৫৩,
১০৫৫, ১০৬২, ১০৮৪, ১১০১, ১১২৭
ধর্মপালসেব ১১২৯
ধর্মপূজাপতি ৬৭৫, ২৬৭
ধর্মমঙ্গল ১৩, ৪৬৭, ২২২, ২৭০, ২৭১, ২৭৫, ২৮৩, ২৮৬,
১০৩৩, ১০৫০

শব্দ-সূচী

১১৬৯

- ধর্মমঙ্গল কাব্য ১১০১, ১১০৪
 ধর্মমহামায়া ১১০, ১১১
 ধর্মমাণিকা ১০১৬, ১০২৩, ১০৩৭, ১০৩৮, ১০৪৪, ১০৪৯,
 ১০৭২, ১০৭৭
 ধর্মরক্ষিত ৩০৬
 ধর্মশাস্ত্র ৩৩৫-৩৪০
 ধর্মসাগর ১০৪০
 ধলশ্রী ১০৮০
 ধলেশ্বরী ২৭৭, ২৮৩, ২০২, ২০৬
 ধান্যার ভূঞা ১১০৩
 ধাড়িমল ১১১৪, ১১১৫
 ধাতুমাল ২০৮
 ধাতুসেন ৮৩
 ধামরাই (ধামরান) ৬৮, ৪১২, ২৩৫, ১১৪০
 ধাররাজকন্ডা ২৫৮
 ধীবর ১১৪০
 ধীমন্তসেন ৩৪, ২৭৮, ২৮৩, ২০৭
 ধীমান ১১, ১৫, ১২, ৪০৭, ৪৪৪, ৬০৪, ১০১৭
 ধীরনারায়ণ ১০৫৬, ১০৬২
 ধূলিজুরার ১০২৫
 ধুমঘাট ৭২৬
 ধৃতরাষ্ট্র ১৬৩, ৫৫২
 ধেরপুর ৭৮৩
 ধৈর্যোত্তরনারায়ণ ৮১৬, ১০৭৬
 ধোপার পাঠ ২৬৮
 ধোপার পাখর ১০৪৩, ১০৪৫
 ধোয়ী ৩৬২, ৪২১, ৪২২, ৫০৬, ৫৫৬
 ধোয়া ২৫
 ধ্রুব ৮, ২৭০
 ধ্রুবপামিনী দেবী ২১৬
 ধ্রুবানন্দ ৬০৭
 ধ্রুকের উপাখ্যান ২৭৬
 ধ্বজঘাট ১০৪৭
 ধ্বজমাণিকা ১০২২
 নকুল ১৫৮
 নক্ষত্রসিংহ ১০৩৭
 নগেন্দ্রনাথ বহু ৪৭, ৭০, ১২২, ২০৬, ২৮৬, ৩০৮, ২০৯,
 ২৮১, ১০৫১, ১১৩১
 নগুগুণীপ ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৯, ৭৫, ৬৮১
 নটিকেন্দ্র ২২
 নছর আলি ১০৩৭
 নটেশ্বর ২২৩
 নড়াইল ১১৩৭
 নন্দকুমার ৮৮০, ১১২০
 নন্দন নাথী ২৩৭
 নন্দবংশ ৪৪, ১৩৬-১৪০, ১৪১-১৪৭, ৭৮৬
 নন্দরাম দাস ২৭২
 নন্দলাল দে ২৩, ৩৩, ৩৫, ৫৭
 নন্দি ২১২
 নবকিশোরী ৬২৫
 নবগীর্দান ১০৮৫
 নবঘোষ (নবীয়া) ১২, ৮৭, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৪৭৮, ৫৪১,
 ৬২৭, ৭০৬, ৭৩১, ৭৪২, ২২৮, ১০৮১, ১০৮৭, ১০৮০,
 ১১০৮
 নব-ব্রাহ্মণী ৪৭, ৫৪, ৩৮১
 নবরত্ন ২৫৬
 নবরত্ন মন্দির ১১০৭
 নবিগঞ্জ ২৩৫
 নবিশ মহম্মদ খাঁ ২৫৬
 নবীনচন্দ্র স্ত্র ৩৩
 নবীনচন্দ্র সেন ৫৬৪
 নবীন সিংহ ১০২৮
 নবাস্তায় ১৫, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৬
 নমুচি ১২১
 নয়ন দেবী ১০৫৩
 নয়ানটীকায় ৬৪০
 নরক ৬, ৭, ১২, ২২, ২৯, ৩০, ৪১, ৫৩, ১৫৬, ২০৬,
 ২২৭
 নরককুণ্ড ৮০২
 নরকবংশী ১০৫৪, ১০৬২
 নরক রাজা ১০৫০, ১০৭৭
 নরনারায়ণ ১০৫২, ১০৭০, ১০৭১, ১০৭২, ১০৭১
 নরনারায়ণ রায় ১১৩৪, ১১৩৫
 নরসিংহ ও কবর ২২৭

১১৭০

বৃহৎ বঙ্গ

নরপতিজি ১৭	নাগদত্ত ২১২
নরপাণ্ড ৩০৬, ৩১০, ৩৩০	নাগভট্ট ২৪৫
নরপাল ২৬৩, ৩০২, ৩০৬	নাগসেন ৩৩৭
নরপালা ১০৫৭	নাগাশেখ ১০৮২
নরসিংহ ৬২৪, ১০২৭, ১০২৮	নাগা পর্বত ১০৭৩
নরহরি ৭৪১, ৭৪৩, ৭৪৭	নাগা পাহাড় ১০২১
নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকর ১১০৮, ১১১৫	নাগার্জুন ৩০১
নরহরি সরকার ৭১১, ৭১২, ৯২৩, ৯২৬	নাজিমুদ্দিন ৬১৭
নরিচৌদ্দাম্পা ৩১৩	নাজির আহম্মদ ৮৪১, ৮৫২
নরিয়ারাজা ১০৬০	নাটোর ১১৩৫
নরেন্দ্রনারায়ণ ২৮৯, ১০৭৬	নাড়াজোল ১১৩৭
নরেন্দ্রমণিকা ১০৩৭	নাথ-গীতিকা ২৬৬
নরোত্তম ২০, ৩০৪, ৭৪২, ৭৪৭-৭৬৯, ১১২০	নাথবর্ষ ২৬৬
নরোত্তম ঠাকুর ১১০৩	নাসিরশাহ ৮৫৩
নরোত্তমবিলাস ২৭৩	নানক ৫২১, ৯৫১
নরোত্তমের জুর্গ ১১৩৯	নান্নার ২৭৫, ১১৪০
নল ২৫৫	নান্নুর ২২১
নলভাঙ্গা ১৪, ৭২৪, ১১৩৬	নাভাগরিষ্ঠ ১১৯
নলদি পরগণা ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬	নামসার ১০৫৯
নলিনীকান্ত ভট্টশালী ৭, ৯, ১৬, ৩৪, ২২২, ২২৩, ২৭৭	নামক ২৪৮
নলিনীমোহন মাছাল ৮৯১	নাচাগা ১০৫৬, ১০৬৪
নলিনীরতন সেন ২৮০	নাথিকাগ্রাম ২৫৮
নলুপকানন ২৬১, ৬০১	নারদ ২৪, ২৫, ১৬১, ২১৪, ২৩০, ৭৩৩, ৩৩৭, ২০৮
নশীপুর ১১৩৭	নারদ-পঞ্চভূজ-সংবাদ ৪৯
নসরত শাহ ৬৩৪, ৬৫০, ২৭৭	নারদীচপুরাণ ১০৭৯
নসর মাগুম ৮১১, ৮১৫, ৯২৭, ৯৬৮, ৯৬৯	নারায়ণ ১০২৭, ১০৬৬, ১০২৮
নসির ৬২৮, ৬২৯	নারায়ণগঞ্জ ৩৪, ৮৩৩,
নসিরউদ্দিন ৬৪৯	নারায়ণগড় ১১০৪, ১১০৫, ১১০৬
নসিরা শাহ ২৭৭	নারায়ণ জৈলোকানর্শী ১০৭২
নসু মাগুম ২২৬	নারায়ণ দাস ১০৬৬
নাইট এরাণ্ডি ৭৭২	নারায়ণ দেব ২৭৪, ২৮৩, ১০৮৫
নাকাধাক ২৫৪	নারায়ণ দেবঠাকুর ১০৬৭
নাকিবাড়ী ১০৪৩	নারায়ণ পাল ২৫৮, ২৫৯
নাকুট ২২৫	নারায়ণ বর্মা ১০৫৩
নাগ ২১২	নারায়ণবল্লভ শ্রীচন্দন পাল ১১০৪, ১১০৫
নাগকেশর ৩৪, ৩৫	নারায়ণী মুদ্রা ৮১৮, ১০৭১
নাগ-কো ৩১০, ৩১৩	নারোজি ১৫৭, ২৮০

- নারোজি দ্বন্দ্ব ৭৩৩
 নালন্দা ৮, ১১, ১২, ৮৭, ২৪৫, ২৪৬, ২২৪, ২২৫, ২২৬,
 ৩০০, ৩২২, ৪৪২, ৪৮০, ৪৮৬, ১১২৮
 নালিয়া ২৪১, ৮৪০, ৮৪৭, ৮৪৮, ১১৪০
 নালোগ্রাম ৩০০
 নাসির (নাসীর) ২৫৩, ৫৫৫
 নাসির উদ্দিন ৬১৩, ৬১৬, ৬৩৩
 নাসির মহম্মদ ১০৪০
 নাহার ১০৬৪
 নাহারপলী ২২৮
 নিউটন ২৪২
 নিখৌখখা ১০২৭
 নিকষ ৫২২
 নিগমবোধ ঘাট ১৩৬
 নিজামউদ্দৌলা ১১৩২
 নিজাম বাহাদুর ২০৪
 নিজামুলমূলক ৮৬৬
 নিতাই ঘোষ ৮২৩
 নিত্যানন্দ ২০, ৫২, ৩২৬, ৬৮১, ৭০৭, ৭১০, ৭১১, ৭২২,
 ৭৩০, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৪১, ৭৪২, ৭৫৭, ৭৬৫
 নিত্যানন্দ ঘোষ ২৭৮, ২৭৯, ২৮০
 নিত্যানন্দ দাস ২২৬
 নিষিপতি ৬০৪
 নিখুবাবু ২৫২, ১০১০
 নিবেদিতা (ভগিনী) ১০১১
 নিমতা ২৪৮
 নিমরায় ৭২৭
 নিমাই ৬২২, ৭০০, ৭০১, ৭০২, ৭০৫
 নিখাচাধা ৬৭৮
 নিয়ামত খাঁ ৮৩৮
 নিরঞ্জন ২৮
 নিরঞ্জনানন্দ ১১৩৪
 নিরঞ্জনের উদ্ভা ১০, ৩৩২
 নিগ্রা স্বজাতিপুত্র ১০৬, ১০৮, ১২২, ১৩০
 নিক্সাপ ২০১
 নির্ভর নারায়ণ ১০৩২
 নির্দ্বাই ১০৮৩
 নির্দ্বাই শিব ১০৮৩
 নিশকমল ৩৩, ৩৪, ৭০
 নিশানবাড়ী ৮১২
 নিশন্দ ২২
 নীতিবিজ্ঞান ২৫৩
 নীতিশাস্ত্র ৬২০
 নীলক্ষয় ৩০, ১০৫৬
 নীলমণি চক্রবর্তী ৫৫২
 নীলমাধব ১১০৭
 নীলাশ্বর ৬০৫, ৭৩২, ১০৫৬
 নীলাশ্বর চক্রবর্তী ১০৮১
 নীলাশ্বর রায় ১১৩৪
 নুরউল্লা ৮৩৮, ৮৪৫
 নুরুল্লাহ ২৬২
 নুরুদ্দিন (কাজি) ১০৮৮, ১০৮৯
 নুরুল্লা ১০৩৬
 নুরুল্লা খাঁ (নবাব) ১০২১
 নূরজাহান ৮২২, ৮২৪, ৮৮২, ২৩৪
 নৃত্যকলা ৪৫২-৪৫৭
 নৃপেন্দ্রনারায়ণ ১০৭৬
 নৃসিং দেব ১১১৩
 নৃসিংহ মূর্তি ১১২৪, ১১২৮
 নৃসিংহ রায় ৭৬৩, ৭৬৪
 নেগাপত্তম ৫২, ৬০
 নেড়ানেড়ী ৩২৪, ৭৩৬, ৭৬৫
 নেদামত ৬৬৪
 নেজামুদ্দিন (পীর) ১০২০
 নেত্রকোনা ১০৪৫
 নেপাল ১১, ১২, ২১২, ২৮৮, ৫২২, ৮৪৫,
 ২৩১
 নেপালী শব্দ ১৩৪৮
 নেমিনাথ ৩
 নৈতিক অধিপত্য ৫০৪-৫১২
 নৈমিষারণ্য ৬৮১
 নেটিন মদলি ৬৬০
 নোয়াখালি ১৪, ৮১২, ১১১২
 নোয়াখালি গেজেটিয়ার ১১১২
 নৌগায় ১০৫৩
 ন্যায়শাস্ত্র ৩৭২

১১৭২

বৃহৎ বঙ্গ

প

পদ্যাত্মক ২০৩

পরকীয়া ৭৫১, ৭৬২, ৭৭২, ৭৭৬, ২০২, ১০০১

পরবী-গ্রাম ৮২৪

পরম স্টারক ২৮৫

পরমহংস দেব ৭২৫, ১১৩৭

পরমানন্দ বাহুবলীল ১১৩৪

পরমানন্দ সেন ৭২৬

পরমেশ্বর ২৮৫

পরমেশ্বর (কবীন্দ্র) ২৭৭, ২৭৮

পরমেশ্বরী ১০৬০

পরশুরাম ২৩, ৪৪, ৪২, ১২৩, ১৪১, ১৪২, ১২৮

পরহিত ভদ্র ৩১৪

পরগল দী ৬৫৬, ২৭৭

পরশর ১০২

পরিগ্রাহ্য ১০৬৭

পরিগ্রাহ্য কেশব ২২৫, ২২৬, ৭৮৬

পরীক্ষিত ১০৬০, ১০৭২, ১১০৫, ১১০৬

পরী বাহু ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৪, ৮৩৫

পর্জন্ত দেব ৫১

পর্জন্ত দেব ৭২৩, ৭২৬, ৭২৭, ৮১১, ৮১২, ৮১৩, ৮১৪, ৮১৫, ৮২৭, ৮৪৩, ৮৪২, ২২৬

পলওয়ার নৌকা ১০২৫

পলশী ৮৫৭, ৮৬৩, ১০৪২

পল্লীশ্রীতিকা ২০২, ২০৮, ২০৯, ২৮৮, ১০৬২

পল্লপতি ৫০৪, ৫৫০

পাইকপাড়া ১১৩৭

পাঁচকড়ি ১০৩৮

পাঁচ ফকিরী ৩২৭, ৭৭১

পাখাবা ১০২৬, ১০২৭

পাগলনাথী ৩২৭, ৭৭১, ৮২৩

পাগলা কানাইয়া ৩২৭

পাকসত্তা ৪৩

পাকাল ২৫, ২০৩

পাঞ্জাব ৮২০

পাটনা ১০২২

পাটলিপুত্র ১৫০, ১৫১, ১৭৭, ২১৪, ২৫৮, ২২৭

পাটীকারা ১৬, ২২৩, ১০২৫, ১০৪২

পাটীখণ্ডিত ২০২

পঞ্চপদী ৭৬৩

পঞ্চদশমিশ্র ৩৬৩

পঞ্চপদ ১০৮৪

পঞ্চপদোৎসব ৭, ১২, ২১, ৩৩, ৪৬৭

পঞ্চদশ ১২৭

পঞ্চদশ ২৭২

পঞ্চদশ ২০৬

পঞ্চদশনা ১০৩১

পঞ্চদশাবল ২৪৬

পঞ্চানন ১১১০

পঞ্চাশ ৭৭

পঞ্চ ফকির ৮২২

পট্টচিত্র ২৫

পট্টা ৪২২

পট্টন ২০২, ২৪১, ২৪২

পট্টাতি ৪৬, ১২১, ১০৫১

পট্টালি ২১৭

পট্টাতিনৌ সতী ১১১৬

পট্টনা ২৮০, ২৮৭, ৪৬২, ৫২০, ২৪৬

পট্টকোষ ২৩৮

পট্টচিত্র ১৩৪

পট্টনাথ বিজ্ঞানিনোব ১০৮৪

পট্টনাথ ৩১৮

পট্টনাথ দাস ১১০৬

পট্টপুট ২৩৮

পট্টপুত্র ৬৪৪, ২২৭, ১১২৩, ১১২৪, ১১২৭

পট্টগ্রাম ৩১৩

পট্টনস্বর ৩১৮, ৩৩৮

পট্টা ১৬, ২৮, ২৩৪, ৭২৭, ২০২, ২০৭, ২০২, ২৩৫, ২৩৬, ১০২১

পট্টাশী ৫৪২

পট্টাবল ২৮২

পট্টাবলী ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪২৩, ২০৮

পট্টিনী ৪৭৪, ৪৮৮, ৫০১, ৫০৩, ৭০৪

পট্টাতি ১০৮২

পট্টগণ ১০

পাঠান ১৪, ১৫, ২০১, ৪৮০, ৬১০, ৬৪২, ৬৭৪, ৭৮০,
৭৮৪, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৮৯, ৭৯০, ৭৯১, ৭৯২, ৭৯৩, ৮০০, ৮০১,
৮১১, ৮১৫, ৮২১, ৮৩৮, ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৮১,
৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ১০২৫, ১০২৮, ১০৩০, ১০৩১, ১০৩১, ১০৩৩,
১০৪৮, ১০৪৯, ১০৫৫, ১০৭১, ১১০৬

পাড়াবাউশি ১০৬৭

পাণিনি ৩৬৭, ২৫২, ২৬০

পাণ্ডব ৮, ৪২

পাণ্ডিত্য ৩৩৫, ৩৪০, ৩৫০-৩৭৬

পাণ্ডু ৮০, ৮১, ৮২

পাণ্ডুকায় ৮২

পাণ্ডুরা ১৬, ২৮, ৬২৭, ৮০০, ১১৪০

পাতঞ্জল-ভাষ্য ৩৬৮

পাতনকাস ২০৩

পাত্ৰকেশরী শ্রীমতী ৩৩৬

পাত্ৰনায়েক ৩৬০

পাণ্ডুরিহাট ১১৩৭

পাণ্ডুরিয়া ছায়া ১১৩৮

পাণ্ডুরান ৩২৩, ৬০৫

পাণ্ডুরা ২৮, ৮৪৬, ২২৮

পাণ্ডুরেইবা ১০২৭

পারলিঙ্গ ৮১২

পারসী ২৪৩, ১০৪০, ১০৪২

পারস্ত ২০১, ৭৮৭, ৮৮৬, ২০৩, ১০০২

পারিভ্রাত ১২৫

পারিষাদ ২০৮

পারিষাদিক ১১

পারোপনিন্দই ১৫০

পার্মিটার ১০২, ২৮৭

পার্মিট ২০৩, ২০৪

পার্মিটচরণ কবিরাজ ৩২৩

পার্মিটচরণ কবিশেষ ৭৭২

পার্মিটচরণ রায় ২

পার্মিট ৬, ১৫, ২০, ৪৫, ১২৮, ১০১, ১০২

পাল ২০, ২৭২, ২৮৬, ২৮৮, ৩০৬, ৩০৪, ৫১৭, ৭৮৬
১০৬২

পালক ৪৭০

পালগাজি ১১৩৩

পালগাজি ৩০৫, ১১২৭

পালগাজি ১০৬২

পালগাজি ২৪৮-২৪৯

পালি ৪২, ৫৫, ২৫, ১২৭, ৩০০, ২৫২, ২৬০, ২৬১, ২৬২
২৮২

পালগাজি ৫৮৫

পিরালী ১২২

পিরালী ৩২৭

পিরোজ বী আশ্রি ১০৩২

পিতৃপিতৃ যজ্ঞ ৪৮৫

পিতৃপিতৃ ৬০৫, ১১৩৪

পিরমহম্মদ ১০৪০

পির মদাগর ২২৬

পুটিয়া ১১৩৪

পুণা ৮৫৮

পুণ্ডরীক ৩০৫

পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধি ৭২৬

পুণ্ডরীকাক ১০৭৮

পুণ্ড ৫, ৬, ২০, ২২

পুণ্ডনগর (পুণা) ৭২৭

পুণাবতী ১০৩০

পুতা ৬৮

পুত্রদাস ৮০৭

পুনর্লিঙ্গ ৪৮, ১০৬

পুনর্লিঙ্গ ২১৭

পুনর্লিঙ্গ ২৫

পুনর্লিঙ্গ বী ১১৩১

পুনর্লিঙ্গ পাল ১০৫৫

পুনর্লিঙ্গ লিহ ১০৬৪

পুণ্য ২১১, ২৬৮, ২৬৯, ১০১৪, ১০১৫

পুণ্য প্রজ্ঞানর্শন ৩৮০, ৭২৩, ৭০২, ৭০৪, ৭৪২, ৭৪৭
১১০৫, ১১১৩, ১১৩১

পুণ্ড ৫, ৩৭, ১৪৪, ১৪৫

পুণ্ডরাজ ৮২২

পুণ্ডরাজ ৭০৪, ১০৭২

পুণ্ডরাজ ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৬১, ৮৬৫, ৮৬৬, ৮৬৭, ৮৭০, ৮৭১,
৮৮০

পুণ্ডকেশী ২৪৩, ১১০৩

বৃহৎ বঙ্গ

১১৭৪

পুলিন্দ ৩৫, ৮১
 পুলো ২৪৩
 পূর্ববর্ধা ১০৫৩
 পুজা ৪৮, ১৬৬
 পুণ্যমিত্র ৪২, ১৪৭, ১৮৪, ২০৪, ২২৮, ২৪৬
 পুষ্পপুর ১৪২
 পুষ্পহার ২৩৮
 পূর্ণ ১১৬
 পূর্ণচন্দ্র সেন ২০৭
 পূর্ববর্ধা ৫৫৪
 পূর্ববী ১১৩৭
 পূর্ববঙ্গ-নীতিকা ২১০, ২২৭, ২৬০, ১০৩৩
 পূর্বরাগ ৩২৭
 পৃথিবী সেন ২১৬
 পৃথু ২১৪, ২৫৫
 পৃথ্বীমল ১১১৮
 পৃথ্বীরাজ ৫০০, ৫২৪, ৭২৫
 পেত্ত ৫২, ২২৩, ৩০৬, ১১০২
 পেটীরা ৮৩৩
 পেরিগ্লেসরন্ ৬১
 পেশোয়ার ২১৩
 পৈতা ৫৮২
 পৈশাচী ২২৭
 পোকা ২৪৩
 পোড়া রাজার বাড়ী ৫৫০
 পোড়াগুরী ১০২
 পৌত্ত ৫, ৬, ৭, ১২, ২২, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩১, ৪৫, ৬৪, ২২৭, ২৮৮, ৭৮৬
 পৌত্ত বর্জন ২৮, ১৫১, ২১৭, ২২৪, ৩০২, ১১২৫, ১১২৯
 প্যারিসাইস লট ২৬৪
 প্রকাশনন্দ সরস্বতী ৭২৬
 প্রজাকর ৩০৬, ৪৭১, ৫১৪
 প্রজাকরমতি ৩০০
 প্রজাপারমিতা ৩২৪
 প্রতাপগড় ১০৮৬, ১০৯২, ১০৯৫
 প্রতাপচন্দ্র ৬০২
 প্রতাপ নারায়ণ ১০৭৮
 প্রতাপমানিকা ১০২৪, ১০২৫, ১০৪৪

প্রতাপরত্ন ৩৭০, ৬৬৪, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৪০, ৭৪২, ৯২৫
 প্রতাপ সিংহ ১০৬
 প্রতাপানিতা ১৩, ১৪, ৫৪৩, ৫৪৫, ৭৮৬, ৭৮৯, ৭৯১, ৭৯৩, ৭৯৮, ৮০১, ৮১০, ৮১৪, ৮৪৮, ৮৮১, ৯০৬, ৯২৭, ১১০৩, ১১৪০
 প্রতিভা ৭
 প্রতীতধণ্ড ১০১৬
 প্রতীপ ১০১৯, ১০৪২
 প্রত্যাধিন ১০৪৭
 প্রহ্মা ৬০২
 প্রহ্মাপুর ১১১৩
 প্রহ্মাচন্দ্র ৫৫৫
 প্রবচন ২৬২
 প্রবর সেন ২০৭, ২০৯
 প্রবোধচন্দ্র সেন ১৪০
 প্রবোধচন্দ্রিকা ২৯৮, ৪০৩,
 প্রবোধচন্দ্রোদয় ৭০
 প্রব্রাহ্মিকা ৩২১
 প্রভাকর ৪৭১, ৫১৪
 প্রভাকর গুপ্ত ৩০৯
 প্রভাবতী ২০২, ৩০৫, ৩০৬, ১০০৮
 প্রমথনাথ রায় ১১৩৬
 প্রমথ সিংহ ১০৬০
 প্রমথনাথ রায় ১১৩৬
 প্রমথবর্তিকালকার ৩০৯
 প্রমথ ৮৪, ৪০৪, ৫৫৪, ৯০৮, ৯২৫, ৯৭০
 প্রমথ ৯২৫
 প্রশান্তমহাসাগর ২৭২
 প্রসন্নচন্দ্র তর্কালকার ৩৪৮
 প্রসন্ননাথ রায় ১১৩৬
 প্রসাদনারায়ণ রায় ১১২০
 প্রহ্লাদ ৮, ২৭৬
 প্রাকৃত ৪২৬, ৯৫২, ৯৬৪
 প্রাগ্জ্যোতিষপুর ৫, ৬, ১২, ১৬, ১৭, ১৯, ২২, ২৬, ২৯, ৩১, ১৩৮, ১৪৬, ১৭৬, ২৫৭, ২৮৩, ৪২৫, ১০১৮, ১০৪৫, ১০৪০, ১০৪৮, ১০৪৯, ১০৭৮, ১০৯৭
 প্রাটি ১৪০
 প্রাণকর ১১০৪

শব্দ-সূচী

১১৭৫

প্রাণনাথ রায় ১১৩৬
প্রাণনারায়ণ ১০৬০, ১০৭৩, ১০৭৪, ১০৮৭
প্রাপ্তি ২৬, ২৭, ৪০
প্রালম্ব ১০৫৪
প্রিয়ঙ্কর ৬০৫
প্রিয়দর্শী ৮, ৫১, ৭৭০, ৭৭১
প্রোতচতুর্দশী ১০২২
প্রেমবিলাস ৭০৭, ৭১১, ৭২৬, ১০৬৫, ১১১২
প্রকল্পীপ ১১২৩, ১১২৭
প্রাটিনাম ৩৮
প্রিনি ২৩৩
প্রুটো ২৪২

ফ

ফকর উদ্দিন ৬১২
ফকির ১০
ফকিরচাঁপ ৪০৫
ফকিররাম কবিত্বমণ ২০২
ফকীরদিন ৬১২
ফজল গাজি ১১৩৬
ফতুল্লা ৩৪
ফতে খাঁ ৭৮৭, ১০৩৩, ১০২১
ফতে জঙ্গ ১০৩৬
ফতেপুর ১০৭৪
ফতে সাহ ৬৩০
ফতে সিং ১৩
ফতেসিংহ ১০৪৩, ১১১৫
ফরদাহ খাঁ (নবাব) ১০৬০, ১০২১
ফরমান ৩৩৪
ফরাসী ২২৮, ৮১২, ৮৬৮, ৮৭০, ৮৭৮, ২৫৩, ২৫৭, ১১৩২
ফরিদপুর ২১০, ২১২, ১১০৮, ১১৪০
ফলতা ১১২২
ফাফার ১৭
ফারসী ২৫৩, ২৬৭, ২৮২, ২৮৭
ফারা ৮২৩
ফাফ্রসন ২৮
ফাহায়েন ২৭, ২৩৫, ২৪২, ৩০১, ৫৫৭, ১১০২, ১১১২
ফিটে ২৪৩

ফিজবি খাঁ ৮০৭
ফিদাই খাঁ ৮২৭, ৮৩৬
ফিনিসিগান ১২১
ফিরিসি ৮৪৫, ৮৪২, ৮২৩, ১০৩৪
ফিরিসিবার ৮১২
ফিরোজ খাঁ ১৪, ২৩২, ৪২৫, ৮০২, ৮০৩, ৮০৬, ৮০৫, ৮০৬, ১০৬১
ফিরোজ সাহ ৩৮৩, ৬১৮, ৬২৮, ৬৫০, ৬৫৫, ১০৮৮
ফিলিপ (লুই) ২৫১
ফিলিপাইন ২৭২
ফুসে ২৬১
ফুরজা ২৬৭
ফুরার ৩৩
ফুলকোয়ারি ছড়া ১০৩৪
ফুলবাড়ী পুকুর ১১৩২
ফুলবেড়িয়া ৭২৭
ফুলমতি ৬৫৩
ফুলনাঙ্গনের গড় ৩৪
ফুলিয়া ৬০৮
ফুলরা ২৮৫
ফেরকসেয়ার ৮৫১
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ৩৪৩, ২৫৪
ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ ৮৪০, ৮৬৮
ফোহি ২৪৪
ফোজদার ১৩
ফ্রেক সাহেব ১১৩২
ফ্রিট ২১৭

ব

বাণীদাস ২২৪, ২২৭, ২৭৪, ২৮০, ২২৩
বক ৩৮
বকদ্বীপ ৪৮৮
বক্তার খাঁ ৮৪৩, ৮৪৪
বকপুর ৭২৬
বক্রেখর ৭৪২
বখতিয়ার (বজ্জিয়ার) বিলজি ২০৩, ৩৩১, ৪৭৭, ৪২৬, ৫২৭, ৫৩৫, ৪৪০-৪৫৫, ৬১০, ৬৪২, ৮২১, ১০৫০, ১১৩০

১১৭৬

বৃহৎ বঙ্গ

বগড়ি ৩৮, ৫৭
 বগড়ী পরগনা ১১১৪
 বগড়ী ২, ২৮, ১১৩৮
 বঙ্গরাজ ৪৪৪
 বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৪০
 বঙ্গ ৪, ৫, ৬, ৭, ১২, ১৫, ১৬, ২০, ২২, ২৩, ৩১, ৫৬,
 ২৮৬, ৫২৮
 বঙ্গবীরস্বনা ১৪
 বঙ্গভাষা ৬৫৬, ১১২৯
 বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় ৭৮০
 বঙ্গের নামাজিক ইতিহাস ১১৩৬
 বঙ্গোপনগর ১১২৬
 বঙ্গরানিন ৬০
 বঙ্গী ৩০১
 বঙ্গতারা ৩২৪
 বঙ্গনারায়ণ ৮১৭, ৮১৮
 বঙ্গবর্ধন ২৮৫
 বঙ্গযোগিনী (বঙ্গযোগিনী) ৩০৫, ৬৫৩, ১১৩৪, ১১৪০
 বঙ্গ ৮
 বঙ্গাসন বিহার ৩০৫
 বটকে আউটি ৮২৮
 বটফলি ১০৬৪
 বটুকৈলরব ৫২
 বটুগা ২১২
 বটেবর ১০৮৫
 বড়গা ১০৫৩
 বড়গোহাইন ১০৫৭, ১০৫৮
 বড়কুকন ১০৩১
 বড়বড়গা ১০৬৪
 বড়রাজা ১০৬৩
 বড়িশা ৫৭
 বণিকচহিতা (কমলা) ২৬২
 বৎসরাজা ১১৩৪
 বজ্রিস সিংহাসন ২০২, ২১০
 বঙ্গনগর ১১১৫
 বঙ্গরিকাসম ৬৮১
 বঙ্গুয়া আতা ১০৬৭
 বঙ্গবর্ধ ৩১৮

বনবিষ্ণুপুর ১৪, ১৫৭, ৭৫৬, ৭৬৬, ৮৮১, ১১০৩, ১১০৮
 বনমাল ১০৮৪
 বনমালা ১০৪৪
 বনমালী ১০৪১
 বনমালী কর ১০৮৫
 বনমালী ঘটক ৭০০, ৭০১
 বনমালী মুখুটী ২৭২
 বণাট ২৪২, ২৫২
 বঙ্গকবি ৩১, ৩২, ১২১
 বঙ্গবাহিন ৪৬৫, ১০৭৭, ১০৮৬
 বরদাশীত ১০২৫, ১০৪২
 বরদোয়া ১০৫৬
 বরাবক শাহ ৬২২, ৬৪০, ৬৪২, ৬৪৩
 বরবঙ্গ নদী ১০১৮, ১০১৯, ১০২০
 বর-মনোনয়ন ৫২০
 বরাক নদী ১০৮২
 বরাহ ২১৬
 বরাহপুরাণ ২২
 বরাহমন্দিব ১১০৩
 বরাহমিহির ২৪৩, ২৪৪, ১১২৪, ১১২৮
 বরাহীমুর্তি ১১১২
 বরিশাল ৮১২, ৮৩০, ৮৪৬, ১১০৮
 বর্ষভীমার মন্দির ১১০৭
 বর্গী ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯, ৮৬০, ১১০৫, ১১১৭
 বর্জনা গোহাইন ১০৬৬, ১০৬৪
 বর্জন ৪৬৬
 বর্জনকোট ৬১০
 বর্জমান ১০, ১৪, ৫৭, ৭০, ১৩২, ২৮৬, ৭৫৬, ৮৫৬, ৮৫৭,
 ২৫৬, ২৫৮, ২৭২, ১০১০, ১১০৬, ১১২২, ১১৩২, ১১৪০,
 বর্ষবংশ ৬৪, ২৮৫
 বর্ষাগড়া ১১৩২
 বঙ্গদেব ৪৮৫, ৮০১
 বঙ্গদেব ভট্টাচার্য ৫১৫
 বঙ্গবর্ধী ২১২, ৪৬৬, ১০৫১, ১০৫৬, ১০৫৪
 বঙ্গভ্রম ৫০৪
 বঙ্গভ্রম দাস ১১০৬
 বঙ্গভি ৩০০
 বঙ্গরাম ২৭, ১১৩৪

- বঙ্গরাম দাস ২২৩
বঙ্গরাম শূর ১১২১, ১১২২
বঙ্গরাম স্বর ১৩
বঙ্গরামী ৩২৭, ৭৭১
বঙ্গশেভিক ৭৭৮
বঙ্গভা ৪৫২, ৫০২, ৫১১
বঙ্গভাচার্য্য ৬৭৮
বঙ্গভানিন্দ ৪৮৫, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৯০
বঙ্গভী মঙ্গলদায় ৬৭২
বঙ্গভিচরিত ২৮৪, ৪৬০, ৪৬৪, ৪৮৩, ৪৮৬, ৫৩৩
বঙ্গভিবাড়ী ১১৪০
বঙ্গভিনেন ৫৬, ২৮১, ২৮৬, ৪৬১, ৪৩৪, ৪৬৬, ৪৭৬, ৪৭৮, ৪৮৭, ৪৮৮, ৫২৪, ৫২৮, ৫৩২, ৫৫২, ৬০২, ৭২৫, ৭৭৬, ১০৫৫, ১০৮৭, ১১৪০
বঙ্গভী দারিত্র্য ৪৮৫, ৫৩৩
বঙ্গকা ৩৩০, ৩৩২
বঙ্গিষ্ঠ মুনি ১১২, ১০১৭, ১০৫১
বঙ্গিষ্ঠ-সংহিতা ১৬১
বঙ্গসুখুমার ১১৩৬
বঙ্গসুখ পাল ১৫
বঙ্গসুখ রায় ৭৮২, ৭৯১, ৭৯২, ৭৯৩, ৭৯৫, ৭৯৬, ৯০৬, ৯০৭
বঙ্গসুখ সেনা ৭৭২
বঙ্গাগমা যুবতী ১০২৭
বঙ্গিক ১০২৫
বঙ্গিরহাট ১১৩০
বঙ্গবন্ধু ২৪৩
বঙ্গভূতি ৩৩৫
বঙ্গোরা ২০, ২৩১, ২৬২
বঙ্গি ২০
বহর ৮১১
বহরধার ৮১১, ৯২৬
বহরম ঈশ্বরগির্জাঘর খা ১১৩০
বহরম খা ৬১২
বহরম খা (নবাব) ১০২২
বহরমপুর ৯৪৪, ১০৪২
বহারক ২৩৫
বহুবাহ ৫২২
বাইবেল ১৭৭, ২৩৩
বাইরাম শাহ ৩১৪
বাউল ১১৪, ৩২৬, ৩২৭, ৭৭২, ৭৮০
বাকুড়া ১১৩২, ১১৪০
বাঁশবেড়িয়া ৭২৫, ৮২৩, ১১৪০
বাকলা ৮১২, ১০৩৩, ১০৩৪, ১০৪৩, ১১২১
বাকতিক ২০৭, ২০৮, ২০৯
বাখরগঞ্জ ১১২৩
বাগছুর ১০৬২
বাগসারি ১০২৫
বাগেশ্বর কীর্ত্তি ৩৩০
বাঘার মসজিদ ৩৩০
বাঙ্গলা কলম ৮২১
বাঙ্গলা ঘর ৫৫২
বাঙ্গলা দেশে জ্ঞানের পৌরব ৩৪০-৩৪৪
বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ ২৫২
বাঙ্গলা মহর ৫৫৮
বাঙ্গাল রাগ ৪৬৮, ৯০২
বাঙ্গলা ১১, ১২, ১৫, ১৬, ৭১৬, ৮১৫, ৮৩৮, ৮৪০, ৮৪১, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬৭, ৯৫৩, ৯৬২, ১০৪০, ১০৪২
বাঙ্গালীর পটু ৪১৬
বাচস্পতি মিশ্র ৩৫৪, ৩৬০
বাজসিন ৩২৪, ৯৪৬, ৯৭৫, ১১৪০
বাজীরাও ৫২৫
বাণ ২১৪, ২৬১
বাণগড় ২২০, ১১৩২
বাণগান ১০৬৪
বাণভট্ট ১৬৪, ৩৬৮, ৪৬৫, ৪৯২
বাণরাজা ১০১৮, ১০৫০
বাণরাজার দুর্গ ১১৩২
বাণলিঙ্গ ৪০, ১০৫১
বাণিমা ৮১২, ৮১৪
বাণেশ্বর ৩৭, ১০১৬, ১০৭৪
বাণেশ্বর বাচস্পতি ১০৭২
বাণেশ্বর শিব ১০৮৩
বাত (ভাত) ৩৫
বাতাসের জাল ২৩৬
বাংসল্য ৬৮৫, ৬৮৭, ৯৭৭

১১৭৮

বৃহৎ বঙ্গ

বাংলাদেশ ২৩১
 বানান ৪৬
 বানিয়াচঙ্গ ২১৮, ২৩৯, ১০৩০, ১০২৪
 বাবর ৩১৭, ৬৩৪, ৬৩৬
 বাবা আউল ৮২৩, ৮২৪
 বাবা বী ৮০৭, ৮০৮
 বাবুলা মিশ্র ২১৭
 বামদেবী মহাপীঠ ১০৮২
 বামনাচাঁদ ১০৬৬
 বামুন (বাবুন) ৬৮
 বামুদারী ৬৪৮
 বারভূঞা (বারভূঞা) ১২, ১৩, ৭২৭, ৮০১, ৮০২, ৮৪৩
 বায়মুখী ১৫৭, ৭৩০
 বাবাণ্যাকার-নির্মাণ ৩৭, ২৮২
 বাজেন ৫২, ৪৩২
 বাউন্ড ২৩, ৫২২
 বাবুন ৬০
 বাপার্ডি শ ৩০০, ৩০১
 বালকলী ২৬৪
 বালাগা ১১৩২
 বালাপিত্তা ৩০১, ৩০২, ৩৪৫
 বালামী ২২৫, ২২৬
 বালামী নৌকা ২২৪, ২২৬
 বালি ৩৯, ২৩২, ২৭২, ১১০২
 বালি নারায়ণ ১০৬০
 বালিশিলা পরগণা ১০৮০
 বালী ৭১, ৮৪
 বালেশ্বর ৮১২, ৮২৮, ৮৪৬, ৮৪৭
 বাম্বীকি ৫, ২০৯, ৩৮৬, ৬৮৫, ৭২২, ৮৮৮, ৯৫২, ৯৮০
 বালাবিবাহ ৪৭২-৪৭৬
 বাউলী ২০৭
 বাসলী মন্দির ২২১
 বাহুসেব ৬, ৭, ১২, ২২, ২৫, ২৯, ৩২, ৮২, ২২৭, ৪৩৮, ৪৭৮, ৫৭১, ৬৩৪, ৭৩২, ৭৮৬, ৯০৭, ১০৮৪
 বাহুসেব ঘোষ ২২০
 বাহুসেব নারায়ণ ১০৭৪
 বাহুসেব নারায়ণ ৩৬০, ৩৬১, ৭১১, ৭২৬
 বাহাদুরপুর ৮২৮, ১০৮২

বাহাদুর সাহ ৮৮১
 বাহিরখণ্ড ২৭০
 বাহিরের সঙ্গে আশানগ্রহণ ২৪৩-২৪৭
 বিক্রমকেশরী ৫০০, ৫১৬
 বিক্রমখোলা ২২৯
 বিক্রমপুর ৮, ১০, ১৬, ১৭, ২০, ৩০০, ৬১১, ২৩২, ২৭৮, ২৭৯, ২৮৩, ১০০২, ১০৪২, ১১২৪, ১১৩৪, ১১৪০
 বিক্রমরাজ ২৬৪
 বিক্রমশীলা ৮, ১১, ২২৪, ২২৯, ৩০৪, ৩০৬, ৩০৭, ২৮৬
 বিক্রমসিতা ২০৮, ২০৯, ২৫৬, ৪২১, ৬৪৮, ৭২৩
 বিগাওঁট ৪৭০
 বিগাওঁপাল ২৫৮, ২৬১
 বিজয় ১৫, ৫৪, ৫৫, ৫৯, ৬২, ৬৩, ৭২, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৮, ২৩৮, ২৮৬, ৪৭০, ১০২৪
 বিজয়কুমার ১০২২
 বিজয়গড় ২২৮
 বিজয় গুপ্ত ৫৮২, ৫৯০, ৬৬৪, ৯২৪, ৯৭১, ৯৭৪, ৯৭৭, ৯৮০
 বিজয়চন্দ্র মজুমদার ২৬২
 বিজয় ঠাকুরতা ১১১২
 বিজয়নগর ১৬
 বিজয়নন্দিনী ১০৩১
 বিজয়পুর ১০৩১
 বিজয়বাহ ২৮৫
 বিজয়মণিকা ১৩, ১০৩০, ১০৩১, ১০৩২, ১০৩৯, ১০৪০, ১০৪৭, ১০৪৯, ১০৮৩, ১০৮৪
 বিজয়মণিকা গু ১০১৬
 বিজয় সেন ৪৭৬, ৪২২, ৪২৪, ৪৪৫, ৫৫৫, ৫৭০, ৯৭৩, ১০৫৫, ১১২২
 বিজলী বী ৮২২
 বিজিত ৭২
 বিজুজু ২২৪
 বিতপাল (বীতপাল) ১১, ১৫, ১৯, ৪০৭, ৫৭০, ৬০৪, ১০১৭
 বিতপা ৬২, ২৩০
 বিতপমদন ৭৫২, ৯৮১
 বিদিশা ৮২
 বিদ্যেশ্বর ৫

विज्ञा ४२१, २१०, २१८, १००८	विराम १२२, ८००
विज्ञाधर ११००	विरिकिनारायण १०००
विज्ञाधरदीधि ११००	विरुपाक्ष ७१८
विज्ञाधर राय ११००	विरोचन ७१८
विज्ञानगर १२०	विलासदेवी ४७७, ४१८
विज्ञानन्द बी १११२	विलासपुर ७०२
विज्ञापति ७०७, ७२१, ७२०, १२८, १००, १०७, १०२, २२८, २७१, २११, २२१, २२२, २२०	विशाल वस्तु १४८, १४२
विज्ञावागीश १०१२	विशाल ७८१
विज्ञाविरिकि ७७४	विशालगढ़ १०१२, १०२१, १०४०
विज्ञारणा ७७४	विश्व १०१०
विज्ञारण १०४२	विश्वकर्मा २००, २०१
विज्ञासागर १०१, १०२, २४१, ११०१	विश्वकोश ११०८
विज्ञाप्रस्ता ४२०, ४०४, ४२०, २०८	विश्वनाथ कविराज ७७२
विज्ञाप्रस्ता ४००	विश्वनाथ तर्ककानन ७१२
विज्ञाप्रस्ता २००, २०४	विश्वनाथ राय (महाराज) ११०४
विज्ञाप्रस्ता त्रिजिनी ११०, २००	विश्वनाथ सिंह ८१७, १०२८
विज्ञाप्रस्ता त्रिजिनी १४	विश्वपति चौधुरी ४०१
विज्ञाप्रस्ता शशी ७२१	विश्वर मित्र १०२
विज्ञाप्रस्ता त्रिजिनी १, ८	विश्वर शूर १११२, ११२१
विज्ञाप्रस्ता ७०२	विश्वरूप ७२८, ७२२, १००
विज्ञाप्रस्ता ४२२	विश्वरूप सेन २१७
विज्ञाप्रस्ता ४२०	विश्वसिंह १००१, १००२, १०१०
विज्ञाप्रस्ता १००, १००, १००, १००	विश्वामित्र २०
विज्ञा १२	विश्वेश्वर त्रिजिनी २१०
विज्ञाप्रस्ता चक्रवर्ती ११०१	विश्व उडि १०४२
विज्ञाप्रस्ता ४२७	विश्व १०, ११, २२७, २०८, ७१७, १०२१
विज्ञाप्रस्ता ७१०, १२०, २०१	विश्व आता १०७१
विज्ञाप्रस्ता ७२१	विश्वगुप्त २११
विज्ञाप्रस्ता १२७, १२१, ७८०	विश्व नारायण ८०७, १०१०
विज्ञाप्रस्ता ११०७	विश्वपुर ४०१
विज्ञाप्रस्ता वस्तु ११, २२२	विश्वपुराण ७७, २२, १४०, १४२, १२०, ११००
विज्ञाप्रस्ता ७१८	विश्वप्रिया १०२, १००, १०१, १०८
विज्ञाप्रस्ता ७००	विश्वप्रति-चक्रिका १०२४
विज्ञाप्रस्ता ७००	विश्वप्रगत १०२८
विज्ञाप्रस्ता २८, ११४, १२२, १४०, ७००	विश्वप्रामी ७१८
विज्ञाप्रस्ता ७८, १०११	विश्व १०, २०७, ८१०, ८००, ८४०, ८००, ८००, ८००, ८००
विज्ञाप्रस्ता ११०२	विश्व ८०१, ८०१
विज्ञाप्रस्ता ११४०	विश्वमण्डल १

১১৮০

বৃহৎ বঙ্গ

বিহারীলাল ৮৩৯
বীরগুণ ১১০১
বীরচন্দ্র ১০৭৮
বীরচন্দ্র মাণিক্য ১০৪৪
বীরকম্পনারায়ণ ১০৩৩
বীর দত্ত ১০৮৫
বীর নারায়ণ ১০৭২, ১০৭৩
বীর পাল ১০৫৬
বীরবর ১১২০, ১১২৭
বীরবল ৮০২
বীরবাহু ৪৬৬
(জি) বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর ৩৭, ১০১৭,
১০৪৪, ১০৪৬
বীরভদ্র ১০৬৫
বীরভূম ৮৫১, ৮৫৭
বীরশ্রী ২৮৫
বীরসিংহ ৭০, ১১১৫
বীরহাছির ৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৫৮, ৮৮১,
১০৪৮, ১১০৮, ১১০৯, ১১১২, ১১১৪, ১১১৫
বীরাচন্দ্র ৩১০, ৩১৪
বুঝারথ ১০১৬
বুড়া গোহাইন ১০৫৭, ১০৫৮
বুড়া ফুকন ১০৬১
বুড়িপদ্মা ২২৯, ১০৪৭
বুড়ল মিজ ৪২৪, ৪২৫
বুড়গুপ্ত ২১৭
বুদ্ধ ২, ১১, ১৫, ১৬, ৪১, ৫১, ২০-১১৮, ১২৫, ১২৫,
২০০, ২৪১, ৪০৬, ৬৭৫, ৬৮৫, ৭৭৮, ৭৮০, ৭৮৩,
৮১৫, ৯৫২, ৯৮১, ১০৬০
বুদ্ধ ধী ১০৬৬
বুদ্ধগুপ্ত ৩০১
বুদ্ধচরিত ৪৭০
বুদ্ধরক্ষিতা ৩২১
বুদ্ধিমত্তা ৫৫২, ৫৫৩
বুনাগিম ৫৩৯
বুন্দেলখণ্ড (বুন্দেলখন্ড) ৩৩, ৬০৯
বুরহান উদ্দিন ১০৮৮, ১০৮৯
বুঝি ১০১৫, ১০৫৭

বুলন্দমহর ৭১
বুলবন ৩১৫
বুলহাগেন ৫৩৯
বুলাচি ৩৪
বুলার ৩৩
বুলাল ৫৩৯
বুদ্ধগঙ্গা ৩৪
বুন্দাবন ৮৭, ৫৪৫, ৬৮১, ৭০৩, ৭০৯, ৭১৬, ৭৩৫, ৭৪১,
৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৮, ৭৪৯, ৭৫০, ৮০৯, ৮৪২,
৮৮১, ৮৮২, ৯৬১, ১০৩৬, ১১১৩, ১১১৪, ১১১৫
বুন্দাবন দাস ২২০, ৬৮১, ৬৮৮, ৭১২, ৭৪৩, ৯৭৩, ৯৮৬
বৃহৎ দীঘি ১১৩৮
বৃহৎসংহিতা ২১৭
বৃহৎসং ২৫, ১৮৮
বৃহৎলা ৪৭৪
বৃষ ৪৮, ২৪১
বৃহৎপতি (মতিলাল) ১১০৪
বেগমতী ৩১০
বেঙ্গবরুয়া ৫২৫
বেড়াচাঁপা ১১২৪, ১১২৮
বেতড় চতুরক (বেতড়চতুরক) ১১২৫, ১১২৯
বেথেলহাম ২০
বেথ ৭৭৫, ৭৭৬
বেদান্ত ৬৮২
বেদারবস্ত ৮৪০
বেনিগ্রাজুড়ম ২০৬, ২০৮
বেলট্টের ১১৪
বেলিন ৬১৬
বেলোল লোদি ৬৩২, ৬৪২, ৬৪৩
বেহালা ৫৭, ১১২৯
বেহলা ৪২৭, ৪৬৮
বেহলাকাবা ২০২
বৈকুণ্ঠ ৮৪১, ৮৪২, ৮৪২, ২৫৫
বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ২০৬
বৈকুণ্ঠপুর ১০১২, ১০৪২, ১০৭০
বৈকুণ্ঠবাস ১১৩০
বৈঠুর ১১৩১
বৈদিক ৫১, ১৬০, ৪৩২, ৯৬০, ১০৮১

যছনন্দন দাস ৪৪৩
 যছনাথ দাস ১০৮১
 যছবংশ ২৮৫
 যছরাম দাস ১০২৫
 যপসা গ্রাম ২১০
 যবদীপ ৮৩, ৮৪, ৩১৭
 যমুনা ২, ৮৭
 যযাতি ৩৬, ৪৬৩, ১০১৫, ১০১৭, ১০৭৭
 যশপুর ১০২৩, ১০২৭
 যশোদা ৫০৩
 যশোদেবী ৪৬৬
 যশোধরমণিকা ১০৩৬, ১০৩৮
 যশোধরমণিকা-খণ্ড ১০১৬, ১০৩৬
 যশোবন্ত রাও ২৫৬
 যশোবন্ত সিংহ ৮২২
 যশোবন্দী ২২১, ২৬১
 যশোরাজ খাঁ ৬৫৬
 যশোরেশ্বরী ৭২৩
 যশোহর ৭১৪, ৭৮৬, ৮১২, ৮১৩, ৮৩৮, ৮৪১, ৮৪৬, ১১০৮
 ১১২৬, ১১৩৯, ১১৪০
 যাজ্ঞবল্ক ১৬৬, ৪৭২
 যাজ্ঞবল্ক-সংহিতা ১৬১
 যাজ্ঞবল্ক্যকর ১০৪৪
 যামবানন্দ ২৮৪
 যাদুদাস ১০৩১
 যাবদি পাহাড় ১০৪১
 যাতা ৪৪, ৩০৬, ৩২৭, ১১০২
 যীশ ৬৮৫, ৭৭৮
 যুইচি ২০৪
 যুজারসিংহ ১০৩৫
 যুজিৎ সিংহ ১০৮০
 যুজিষ্টি ৮, ২৫, ১৫৮, ২০৫, ২২৭, ২৪৪, ১০১৮, ১০৪৭,
 যুরোপীয় ১১১০, ১১১২
 য়েহুট ৫৯
 যোগিনীতন্ত্র ২৮৩, ৮১৬
 যোগিনী মালিক ৩৭, ২৮৯
 যোগীন্দ্রনাথ ১১৩৯
 যোগীন্দ্রনাথ রায় ১১৩৫

যোগীন্দ্রনাথ ২৪৮, ২৬২, ২৭২, ২৯০, ৪২৯, ৭৭৬
 যোগীন্দ্রনাথ ২২৮
 যোগীন্দ্রনাথ রায় ১১৩৫
 যোগীন্দ্রনাথ সিংহ ১১১৮
 যোগীন্দ্রনাথ রায় ১১৩৪
 যোগীন্দ্রনাথ বহু ৫৭, ১১০৩, ১১০৪, ১১০৭
 যোগীন্দ্রনাথ রায় ১৪০
 যোগীন্দ্রপুর ৮৩৬
 যোগীন্দ্রপাল ২৬৬

র

রঘু ২২৭
 রঘুদী-কৌশল ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯
 রঘুনন্দন ৪৭০, ৭২৭, ৭৭২, ৭৮১, ১১৩৫
 রঘুনাথ ৬০৪, ৭২১-৭২৪, ৭৪১, ৭৪৩, ৭৪৫, ১১০৮,
 ১১০৯, ১১১৩
 রঘুনাথ চক্রবর্তী ১১১৫
 রঘুনাথ শিরোমণি ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫০, ৭২৩, ৭৮১, ১০৮১,
 ১০৮৭
 রঘুনাথ সিংহ ১১১৫, ১১১৭
 রঘুবংশ ১১১, ২৪২
 রঘুরাম ১১৩৩
 রঘুপুর ১২, ২৮, ৮১৯, ৯২৮, ৯৩৪, ৯৩৫, ৯৫১, ৯৬৬,
 ১০৬৯, ১০৮০
 রজনাল বন্দোপাধ্যায় ৭৩৪
 রজনাক ৫৩৯
 রজাধর ১০৩৩
 রজাবতী ২৭০
 রজা ৭২৫
 রণধির নারায়ণ ১০৩৩
 রণচন্দ্র নারায়ণ ১০৩২
 রণধীর সেন ৩৪
 রণধীর ১৪, ২৮৪
 রণধীর খাঁ ৭২৪
 রণধীর ১০৩৩
 রণধীর নারায়ণ ১০৩৩
 রণধীর নারায়ণ ১০৩৩
 রণধীর নারায়ণ ১০৩৩

১১৯০

বৃহৎ বঙ্গ

রণাগণ ১০২
 রণেন্দ্রনারায়ণ (কুমার) ১১৩৪
 রঙ্গসেবী ২৫৫, ২৫৬
 রতিকান্ত ৬৫৪
 রতিকান্ত রায় ১১৩৪
 রতিশর্মা ১০৭৬
 রত্নগর্ত আচাৰ্য ১০৮১
 রত্নপাল ১০৫৩, ১০৫৪
 রত্নপাল (২য়) ১০৫৫
 রত্নপুর ৩২, ১০২৩, ১০৫৬
 রত্নপ্রভা ৫১২
 রত্নকা ১০২১, ১০২৩
 রত্নবজ্র ৩৩০
 রত্নবতী ১০৫৩
 রত্নমণিকা ১০১৬, ১০২৩, ১০৩৭
 রত্নমণিকাখণ্ড ১০১৬, ১০৪৪
 রত্ননার ২৩৮
 রত্নাকর ১৫৭, ৩১১, ৩৩০
 রত্নাকরকন্দলী ১০৬৬
 রত্নাকরশাস্তি ৩৩৯
 রত্নিনী ৮৪১
 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৫, ১১৯, ১২৪, ২০২, ৩২৪, ৪৯৬, ৬৮৫, ৭৯৫, ৯১৩, ৯৫১, ৯৫৪
 রবীন্দ্রনাথের গীতি ১১৩৭
 রবীন্দ্রনারায়ণ (কুমার) ১১৩৪
 রমতী ১৬
 রমানাথ রায় ১১৩৬
 রমেন্দ্রনারায়ণ (কুমার) ১১৩৪
 রমেশচন্দ্র বসু ১১০৯
 রমুলাস ৮৪
 রমৌতি ২৭০
 রমচাঁন ৩১৮
 রমময় ঘাস ৯৮২
 রসায়ন-মর্দন ১০২৭
 রসায়ন-শাস্ত্র ৯৫০
 রহিম খাঁ ৮৫৮, ১১১৫
 রহিম সেখ ৮৩৮, ৮৩৯
 রাইস ৩২

রাইস ৫২
 রাষ্ট্রপতি বন্দোপাধ্যায় ১৯, ৭০, ২১৭, ২১৯, ২৬৩, ২৭০, ২৭৫, ১১৩০
 রাগচন্দ ৩১৫
 রাগচন্দ্র ৬৮৯, ৬৮৮, ১০৬৭
 রাঘ ১০৬৪
 রাঘবচন্দ্র রায় ১১৩৩
 রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ ৭৯৪
 রাজমাটি (রাজমাটি) ১৬, ২২৭, ১০১৯, ১০২২, ১০২৩, ১০২৭, ১০৪৫
 রাজগড় ৪৪১
 রাজগৃহ ১৬
 রাজকুমারী ২২৩, ২২৫, ২৩০, ২৪৩, ৪৩৭, ৫০০, ১০১৫
 রাজধর ১০৩৪, ১০৪৩, ১০৭৬
 রাজধর মণিকা ১০৩৫
 রাজধর সিংহ ১০৩৫
 রাজেন্দ্র ৯৫৬, ১০০২
 রাজনী ১০৫৭
 রাজপুতনা ৩৯, ১৩১, ৫০০, ৭২১, ৭৪২, ৮৩৬
 রাজপুত শিল্প ৮৯০
 রাজবরত ২৬১, ৮৬৮, ৮৭৪, ৯২৪, ৯৫৬, ১০০২, ১০০৩, ১১২১, ১১৩২
 রাজবাড়ী ৯০৭, ১১৪০
 রাজমহল ১৬, ৮৫৫, ৮৫৭, ৮৫৯
 রাজমালা ১৩, ২৮৯, ১০১৫, ১০১৬, ১০২০, ১০২২, ১০২৪, ১০২৫, ১০৩১, ১০৩৩, ১০৩৬, ১০৪৩, ১০৪৪, ১০৪৮, ১০৭৭, ১০৭৮, ১১১৯, ১১২০, ১১২১
 রাজমালিকা ২৮৯
 রাজরত্নাকর ৩৭
 রাজশ্রী ২৫৭
 রাজসাহী ১৪, ৮৬৩
 রাজসিংহ ৮৫১
 রাজসুয় ২৬, ৩২, ২০৫, ২৩৪, ২৩৫, ২৪০
 রাজস্থান ৯৬১
 রাজাফা ১০২১
 রাজীবলোচন ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৯, ৮৭৭
 রাজু ৬৪০

রাজেন্দ্র চৌল ৫৩, ৫২, ৫৫, ২৭৪, ২৭৫, ২৮৬, ৪৬২,
৬০২, ৯৬৬, ১১০১
রাজেন্দ্র দাস ২৭২
রাজেন্দ্রনাথ সেন ২৮০
রাজেন্দ্রনারায়ণ ১০৭৬, ১১২০, ১১৩৪
রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ১১৩৪
রাজেন্দ্রবহু দাস ১০২১
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১২৩, ১২৪, ৯৪০, ১০৮৪
রাজেশ্বর সিংহ ১০৬৩
রাজোপাধ্যায় ১০৭৪
রাজাধর ১৩, ৭৮৭, ৭৮৮
রাজাধরমণিক্যখণ্ড ১০১৬
রাজাপাল ২৫৮, ২৬০, ২৬৬, ২৭৬
রাজাবর্জিন ২১২, ২২০, ৭৮৭
রাজাশ্রী ২২০, ৭২২
রাজ ৬, ১৮, ২০, ৩০, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬২, ৬৫, ২৬১, ২৮৬
২৯২
রাতু (রাতা) ৬৮
রাতুল গ্রাম ৩৩২
রাধাকৃষ্ণ ১১১৫
রাধাকৃষ্ণ মন্ডী ১১৩৫
রাধাভূষণ ১৭২
রাধানাথ ১০২২
রাধানাথ রায় ১১৩৬
রাধামাধব-মন্দির ১১১৮
রাধারমণ ১০২৩
রাধারাম ১০২৩
রাধাগ্রাম-মন্দির ১১১৮
রাধাগ্রামানন্দ বাহুবলীল ১১৩৪
রাধিকা ৬৮১, ৬৮৫, ৭০৭, ৯১৪
রাফা ৮৪১
রাবণ ২৩, ৮৮৮
রামকান্ত ১১৩৫
রামকৃষ্ণ ১৫, ১১৪, ৩৭৬, ৯৪৭, ৯৪৯, ১১৩৩,
১১৩৫
রামকৈলী ৩২৪, ৮২২
রামগঙ্গা বিহারি ১০৪২
রামগোপাল ১১৩৩

রামচন্দ্র ২০, ১২৮, ২২৪, ৬৮০, ৬৯৮, ৮০১, ১০১৫,
১১০৩, ১১২২, ১১৩৩
রামচন্দ্র কবিরাজ ৭৬৮
রামচন্দ্র খাঁ ১১৩১
রামচন্দ্র রায় ১১৩৪
রামচরণ ঠাকুর ১০৬৭
রামচরণ তর্কবাগীশ ৩৬২
রামচরিত ২৮৮
রামচাঁদ ২৫৭
রামজীউর মন্দির ১১০৭
রামজীবন ১১৩৩, ১১৩৫
রামদাস কাপুরি ৭৪৩
রামদাস খাঁ ৮৪২
রামনাথ সেন ৫৮৩
রামনারায়ণ বিজয়ারত্ন ১০৪২
রামনারায়ণ (রাজা) ২৫৩
রামনিধি ভূষণ ১০১০
রামপাল ১৩, ১৫, ৫৭, ৮৪, ২৫০, ২৬৮, ২৮৮, ২৯০,
৩১২, ৫০৮, ৫১৫, ৬০৪, ৮৪৫, ৯৭৬, ১১০১, ১১০৪,
১১০৭
রামপাল-চরিত ১০১৫
রামপ্রসাদ ৭০, ৪৫০, ৫২১, ৬৯১, ১০০৪, ১০০৫
রামভদ্র ২৫৭
রামভদ্র কর্ণপুর ১১১৯
রামভূজ বড়চৌধুরী ৮২০
রামবল্লভী ৭৭১
রামমল ১১১৪
রাম মণিক্য ১০১৬, ১০৩৭
রামমোহন রায় ৫৩, ৩৭৫, ৬০৬, ৬৯১, ৭২৩, ৮২৬,
৯১৩, ৯৪৯, ৯৫০, ৯৫১, ৯৫৪, ৯৫৬, ৯৮১
রামমোহন সিংহ ১১২২
রামরতন ১১২০
রামরসায়ন ৯৭৯, ৯৮১
রামরাম বহু ৭২৩, ৯৪৮
রাম রায় ৬৮৫, ৭৪২, ৭৬৯
রামকর্ণ ঘোষ ৮৪৪, ৮৪৮
রামলীলা ২৮০
রামশরণ পাল ৮২০, ৮২৪

রামনাগর সৌধ ৮৪৭
 রাম সিংহ ১০০১, ১০০২
 রামধামী ২২০
 রামাই গতিত ৩০১, ৩০৩, ২০৭, ১১১৪
 রামানন্দ খাঁ ১১২৫
 রামানন্দ (পৌসাই) ১০৭৫
 রামানন্দ ঘোষ ১০, ২৮৫, ২৮০
 রামানন্দ ঠাকুর ১০৮৮
 রামানন্দ বহু ১১২৫
 রামানন্দ রায় ৭২৫
 রামাচন্দ্র ৩৭৭, ৩৭৮
 রামাচন্দ্র ১, ২, ৫, ৩৯, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১৪৬, ১৫০,
 ২০৪, ৭২৩, ৭২৬, ২০৭, ২০৮, ২৭২, ২৮০, ২২৮,
 ১০৫০, ১০৫১, ১০৭২, ১১২৩, ১১২৭
 রামী ৭৭৬, ২২১
 রামেশ্বর ১৮
 রামেশ্বর চক্রবর্তী ২৭১
 রামেশ্বর নন্দী ২৭২
 রায়কাম ১০২৭
 রায়গড় ২২৮
 রায়চাঁপ ১০২৭
 রায়লীখি ১১২৩
 রায়বাখিনী ১৪
 রায়বেশে নাচ ৮২৫
 রায়শেখর ২০১, ২২৪
 রায় ৫০
 রায়ফ্ ডিট ১০৭১
 রাষ্ট্রকূট ২৫৫, ২৫৭, ২৬৫
 রায়বিহারী ২৫৬
 রায়মণি ৭৮১
 রাহু ২০৫
 রাহুল ২০, ১১৫, ১১৬
 রাহুল গুপ্ত ৩০৬
 রিচ্ ডেভিড ৮৩
 রিভিরা ৩১৩
 রিথ হেন জাং পো ৩০৭
 রিমাস্ক ৮৪
 রকন খাঁ ১০২০

রুক্মিণিন ৩১২
 রুক্মিণিন কৈলাস ১১৩০
 রুক্মিণিন বরাক ১১২৫
 রুক্মিণিন বরাক ১১৩০
 রুক্মিণী ২০৬
 রুচিদত্ত ৩৫২
 রুদ্রাক ২৬৪
 রুদ্রসমন ১২০
 রুদ্রসাম ৫৫৪
 রুদ্র-বাস ১০২১
 রুদ্র বেব ২০৭, ২১২
 রুদ্র নারায়ণ ১০৭৫, ১১৩৩
 রুদ্র সার্বভৌম ৩৪২
 রুদ্রপতি ৭৩৩
 রুদ্রমণি ১০৩৮
 রুদ্রমান ২৮৫
 রুদ্রশিখর ২৬৭
 রুদ্রসম্ভবায় ৬৭৮
 রুদ্রসিংহ ১০৬২, ১০৬৩
 রূপ ২০, ২৪৬, ৩২৪, ৩৪২, ৭১৬-৭২১, ৭৩৭, ৭৪৩, ৭৪৪,
 ৭৪৫, ৭৪৮, ৮৫৭, ৭৬২, ৮২১, ২০১, ২৭২, ২৮১, ২২৫,
 ২২৬
 রূপকথা ২২৫
 রূপচাঁক ঢালী ৮৪৪
 রূপনাথ-গুহা ১০৮২
 রূপচন্দ্র ৩৭৩-৩৭৫
 রূপনারায়ণ ৩৭৩, ৩৭৫, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৫২, ৭৬৪, ৮১২,
 ১০৭৫, ১১০১
 রূপরাম ২৭০, ২৮৩
 রূপরাম বহু ৭২৩, ৭২৪
 রূপ সেন ৮২০
 রূপাভিনার ৬২১
 রূপেশ্বর ২০৮
 রূপম পত্রিকা ৮২১
 রেখা-গণিত ২০২
 রেঙ্গুন ১২, ২০২
 রেজা খাঁ ৮৪১
 রেড ইন্ডিয়ান ২৩১

রেনেটি ৬২১, ৭৩৭
 রেয়না ৭০২
 রেশম ২৪৩, ২৪৪
 রৈবতক ২৬, ৬৪২, ৭৮৭
 রৌলা ৪০০
 রোচমান ৩৪
 রোজবাড ৪০৪
 রোটাস্ হুর্গ ৬৩৭, ৬৩৮
 রোটাস্ নগর ২৭৩
 রোবেনষ্টাইন ৪৩১
 রোম ৬৮৮, ২৩৩, ২৪৪
 রোমথা ৪২২
 রোমান অক্ষর ২৮২
 রোয়াইল ৮২২, ১১৩৭
 রোহিলী ৪৮
 র্যাঙ্কিন ২৮৩, ২৮৪

ল

লক ক্যাটিন ১১৩৮
 লক লেমন ১১৩৮
 লক্ষবতী ২৭৪
 লক্ষাধীপ ২২৪
 লক্ষা ১০৩১
 লক্ষণ ৮, ১১৬
 লক্ষণাধিকার ২৮১
 লক্ষণমালিকা ৮০১, ১০৪০, ১০৪১, ১১২১, ১১২২
 লক্ষণমালিকা ২৮২
 লক্ষণ সেন ২৬৭, ৩৬৭, ৩৭৭, ৪৪৮, ৪৭১, ৪৭৬, ৪৮৫,
 ৪৯৩, ৪২৪, ৪৪৫, ৪৮২, ৬০২, ৮২১, ২০৮, ২৭৬,
 ১০২০, ১১২৫, ১১২৬
 লক্ষণ হাঙ্গরা ৭৮৮
 লক্ষণাবতী ১৬, ৪৪১
 লক্ষী ২০৬, ২৩০, ৭০১, ৭০২, ২১১, ২৭০, ১০৪৬
 লক্ষীকান্ত আতা ১০৬৭
 লক্ষীকান্ত মজুমদার ৭২৪, ৭২৫
 লক্ষীনারায়ণ ৬০২, ৮১৭, ৮১৮, ১০২২, ১০৩৬, ১০৭২
 লক্ষীনারায়ণ ভট্টাচার্য ৭৪৫

লক্ষীপুর ২৬৬
 লক্ষী সিংহ ১০৬৩
 লগ তাক্ হুর্গ ১০২৬, ১০২৭
 লঘিমা ৪৮০
 লহ সাহেব (পাঙ্গী) ৮১৫, ২০৪, ২০৫, ২১২
 লহা ২, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৮১, ২৩০, ৬৮০, ২২৫
 লহমনিয়া ৪৭৭, ৫৩২, ৫৪২
 লব সেন ২৮৬
 লক ২০৩
 লরা রাজা ১০৬১
 লক্ষা ২৪৮, ২৫২
 লগুন ২০৮, ২০৫
 ললিত ১১৩৭
 ললিতপুর ৩৩
 ললিতবিস্তার ২১, ২৬, ১২৫
 ললিতমাধব ২৮১
 ললিতা ৬৮১
 ললিতাবিতা ২২৪, ২২৫
 লক্ষরপুর ১০২৪
 ল'হই ওয়াংচাঙ্গ ৩১৫
 ল'হই ওয়াংপো ৩১৩
 লহচল ২২২
 লাইব্রেরি সেবরি ১০২৭
 লাউ গজা ১০৪৩
 লাউর ৩৮, ৭১০, ১০৫০
 লাউ সেন ২৮৬, ৬৫১, ৬৫২, ২৭০, ২২৭, ১১০১, ১১৩৪
 ১১৩২
 লাঙ্গলবক ৩৮
 লাউ ৫৩, ৬১, ৬২
 লাউ ৫৩, ৭০
 লাউকৃষ্ণ ২৫৭
 লামা ইয়েসি হোড ৩০৭
 লামা লাউসন হুপ ৩১৬
 লারকনা ২৪১
 লারিকা ৬১
 লাল ৭৩, ৭৫, ৭৬
 লালগোলা ১১৩৭
 লালজীর মন্দির ১১১৭

১১৯৪

বুহৎ বজ

লালবাই ১১১৫, ১১১৬

লালবাই ১১১৬

লাল রাট্টা ৭০

লালশশী ৩২৭, ৮২৪

লাল সাহেব ৮৭০, ৮৭৮

লালা বাবু ৬০৪

লালা ৩২৬

লাহোর ৮২৩

লিকা পাহাড় ১০৪৫

লিচ্ছবি ১২৮, ১৩৮, ২০৭, ২১৪, ২১৭

লীলাবতী ২১১

লুইন ৮৩৪

লুতক উম্মা খী বাহাদুর (নবাব) ১০২১

লুৎফুল্লাহ ৮৭৭

লুৎফুল খবির ৫২২

লুথার ৫২১

লুথিনী বন ১৯, ২০

লুসন পা (জাং) ৩১৪

লোগন পাহি সিরাব ৩০৭

লোখান ৩১৬

লো (রক্ত) ৬৮

লোকনাথ ২২৬

লোকনাথ গোখানী ৭১৬, ৭৪১

লোকনাথ মন্ডী ১১৩৫

লোচন দাস ৫৮২, ২২৬

লোচাকা ঙ্গধাং ৩১৪

লোডি খী ৬৪৬

লোডি খী ১০২০

লোদি মেলিকি ৩৩৭

লোচাং ১০২৭

লোহিত সাগর ১০৫১

লোহিতা নথ ১০৫১

ল্যাটিন ২৫০

ল্যাসেন ৩২

শকুনি ৭২৫, ৮৭৪

শকুন্তলা ২৪২, ৪০১, ২৬২, ২৭২, ১০৫২

শক্তি ১০২৭

শক্তিধর ৬০২

শঙ্ক ৭৬

শঙ্কর ২, ২০, ২৮০

শঙ্কর চন্দ্রবর্তী ৭২৫

শঙ্করদেব ১৫, ১০৫৬, ১০৬১, ১০৬২, ১০৬৪, ১০৬৫,

১০৬৬, ১০৬৮, ১০৭২

শঙ্করনারায়ণ ১০৬৭

শঙ্কর বাগীশ ৩৫১

শঙ্করবিজয় ২

শঙ্খচূড় ২২৪

শঙ্খমালা ২৬৮

শঙ্খশিলা ২২৮

শচী ৫২, ৬৮৩, ৬৮৭, ৬৮৮, ৬৮৯, ৭০১, ৭০২, ৭৩১, ৭৪১

শচীদেবী ১০৮১

শতপথ ৫

শত্ৰুঘ্নন নারায়ণ ১০৩০

শনির পাঁচালী ৮৭

শবর স্বামী ৩৩৫

শঙ্করজয়ম ৩৭

শব্দভেদী বাণ ১০৮৮

শঙ্করী ৮৩৭

শরৎকুমার ১১৩৬

শরৎকুমারী ৭২১, ৭২২

শরৎচন্দ্র দাস ৩১৮, ৩২৮, ৩৩২

শরৎচন্দ্র দেবী ১১৩৪

শরণ ৪২৩

শরণদেব ৩৬৭

শরণমা দীপি ১১০৫

শলা ১৬০

শলাক ৩৪২, ৭৮৭, ১১০৮

শলাক ৩১৯, ২২০

শলিকলা ৪২৪, ৫০৪, ৫২৩, ২০৮

শলিশেখর ২২৩

শক্তি ২০, ২১

শক্তি ২০

শক ১২০, ২০২, ২০৩, ২৩১, ১০৪৭

শকব্দ ৮৬১, ৮৬৫, ৮৬৭, ৮৬৮, ৮৭০, ৮৭৭

শব্দ-সূচী

১১২৫

- শাস্ত্র ৬৮৫, ৬৮৬, ২৭২
 শাস্ত্রনারায়ণ ৮১২, ১০৭৫
 শাস্ত্রপু ১০৫৬
 শাস্ত্ররক্ষিত ২০, ৩১৭, ৩১৮, ৩৫২, ২২৫
 শাস্ত্রা বাসী ৭৭৭
 শাস্ত্রি ৩০৬, ৩০৭
 শাস্ত্রিপুর ৭১০, ১০৮৭, ১১৩১, ১১৪০
 শারণ ৬১৭
 শাস্ত্র ২২, ৪৩
 শাস্ত্রীলকর্ণ ১২৩
 শাস্ত্রীলবিক্রীড়িত ২২৪
 শালবান্ ২৭৬
 শালয়ন ২৫
 শাল ২৫
 শানারাম ৬৩৭
 শিকার-সুগ ২২২
 শিকারাজ ১০১২
 শিখ ৮৪৫
 শিখতিচন্দ্র ১০৭৮
 শিব ২, ১০, ৪১, ৫৩, ১৩৬, ১২৫, ১২৬, ২০১, ৪৩৬, ৪৭২, ৬৭৬, ২২৮, ২৭১, ২৭২, ১০১৮, ১০৫০, ১০৫১, ১০৭০, ১০৮৩, ১০২৭
 শিবচন্দ্র ৩৮০
 শিবচন্দ্র রায় ১১৩৩
 শিবচন্দ্র সেন ২৮১
 শিবদাস ঘোষ ২৮০
 শিবনাথ রায় ১১৩৫
 শিবনাথ শাস্ত্রী ৩২০
 শিবনিবাস ১০১৩, ১১৩৩
 শিবপুরাণ ২২
 শিববাণীয়া ৮১৮
 শিবমন্দির ১১২৮
 শিবময় ১১১৪
 শিবরাজ ঘোষ ২৬৫
 শিবরাম ২০৩
 শিবলিঙ্গ ২০৭
 শিবসংগীত ১০০৬
 শিবসিংহ ১০৬৩
 শিবসিংহময় ১১১৪
 শিবাজী ৮৩৬, ৮৪৪
 শিবানন্দ সেন ৭২৬, ৭৪২
 শিবায়ন ২৭০, ২৭১
 শিয়ারশোল ১১৩৭
 শিলাদেবী ৫৪২, ৭২৮
 শিলালিপি ১১০১
 শিলিঙড়ি ৫২
 শিল্প-সাহিত্য ২২৭-২৪০, ৩০৫-৩৪০
 শিল্প ও স্থাপত্য ৫৫১-৫৬৮, ৬৫২-৬৬০
 শিল্প ১০৭০
 শিল্পনাগ ১৩৬, ১৪০, ১৪২, ১২১
 শিল্পপাল ১২, ২৩, ২৫, ২৬, ৩২, ৩৫, ১২৮, ২০৬, ১০৭৭, ১১৪০
 শিল্পবংশ ১০৭০
 শীকর ২৩৮
 শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী ২৭৬
 শীতলাকা ৮৩৩
 শীলভদ্র ২০, ৩০০, ৩০১, ৩৫২, ৪৫৬, ৬০৪
 শীলরক্ষিত ৩০৬
 শীলানন্দ ৬০, ৬১
 শুকুর উয়া খী (নবাব) ১০২১, ১০২২
 শুকুরের রায় ১১৩৬
 শুকুরজ ১০৭০
 শুকুনীতি ১৬১, ২৩৫, ২৩৭, ৬৮৭
 শুকুরিতা ৩০১
 শুকুরধর ২৮২, ১০১৬
 শুকুরজ ১০৬৮
 শুকুরিকা ১০৬৬
 শুটকি মাজ ২২৬
 শুভোদন ২০, ২৪, ২৬
 শুভকর দাস ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫
 শুভকরী ২০৩, ২১৫
 শুভ-নিশ্চয় ২
 শূদ্রাঙ্গ ৫০
 শূদ্রপুরাণ ২, ১০, ৩৩১, ৬৭৫, ২০২, ২৬৭, ২৭৩, ১০৫৭, ১১১৪
 শূদ্রবাহ ৩০৬

টুয়ার্ট ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯, ৮২৩, ৮৩৪, ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৩৯,
৮৪২, ৮৬১, ৮৬৯, ৮৭৫, ৮৮০

ট্রেটস্‌ম্যান ৪৫৫

ট্রেপলটন ২৭৮, ২৮০, ২৮১, ৪৫২

ট্রেলা জামরিশ ৪০০

স

সংগীত মিহ ৮৪০, ৮৮৯

সংবাদিনী ১০৮১

সংস্কৃত ৩৫৩-৩৭৬, ২৫৩, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪,
২৬৫, ২৭৭, ২৭৮, ২৮২, ২৮৩, ২৯৯, ১০৪৩, ১০৮৭,
১০৯৭

সংস্কৃত ব্যাকরণ ১০৭২

সংস্কৃত ২৫৬

সংস্কৃত ১৪২

সংস্কৃত ২৫

সংস্কৃত ২৩৯, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৬, ২১৩

সংস্কৃত ২০৯

সংস্কৃত ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৮৭, ২৭২

সংস্কৃত ৪

সংস্কৃত-মন্দির ১১১৮

সংস্কৃত ৮৯, ১৫৮, ১১০০

সংস্কৃত ১১০০

সংস্কৃত ২৭৮

সংস্কৃতবেলটুটিপুত্র ১০৫, ১০৮

সংস্কৃত বিজ্ঞান ১১২, ৩১৮

সংস্কৃত মিহ ৭২৩, ৭২৭, ৮১৩, ৮৪৬, ৮৪৮, ১১২৬

সংস্কৃত রায় ১১৩৩

সংস্কৃত ৮৬, ২৭৮

সংস্কৃত ৪০১

সংস্কৃত ১৩, ৭২৬, ৮০১, ৮১০, ৮৪৩, ৮৮১,
১০৬০

সংস্কৃত গ্রাম ৭৮২

সংস্কৃত বী

সংস্কৃত বাস ১১০৬

সংস্কৃত ৫৩০, ৫৩১, ৫৩৩

সংস্কৃত ৪৪, ৩০০

সংস্কৃত ২৮১, ৫৪৭

সংস্কৃত ৩২৯

সংস্কৃত ৬৭৮

সংস্কৃত ১০, ৩২৪, ৩২৯, ৬০৪, ৭১৬-৭২১, ৭২৭, ৭৩৫,
৭৩৭, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৮, ৭৫২, ৭৫৭,
৭৬৯, ৮৮৯, ৮৯১, ৮৯২, ৯২৫, ৯২৬

সংস্কৃত-মন্দির আশ্রয় ২৫৫

সংস্কৃত-মন্দির ১০৭৪

সংস্কৃত রায় ৮৮১

সংস্কৃত ৬৮১

সংস্কৃত ৭২৭, ৮১২, ৮১৩, ৮১৪, ১০৪২, ১১২৩

সংস্কৃত ৩৩

সংস্কৃত ২৪৮, ২৮৮, ১০১৫

সংস্কৃত ১২৫-১২৮

সংস্কৃত ৩৮৯

সংস্কৃত ৭২১, ৭২২, ৭৩৬, ৭৪৮, ৯১৩, ৯২৫

সংস্কৃত ৮২৪

সংস্কৃত ৫২৪, ৫২৫, ৫৩৮

সংস্কৃত ৮৭৫, ৮৭৬

সংস্কৃত ৭, ১২, ৬১, ২২২

সংস্কৃত ১০৩৩

সংস্কৃত ৪৭৭

সংস্কৃত ১০০০

সংস্কৃত ৮৫৮, ৮৫৯, ১০২২,

সংস্কৃত ২২১, ১০৪০, ১০৪১, ১০৪২, ১০৪৪

সংস্কৃত ৬৮

সংস্কৃত ১০৫৬

সংস্কৃত ১৫, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২৪৩, ৩০০, ৪৪২, ৯০৮,
১০২৯

সংস্কৃত ২২৪

সংস্কৃত ১০৫৩

সংস্কৃত ৪৭০

সংস্কৃত ৩০

সংস্কৃত ১২, ১৩১

সংস্কৃত ২২৯

সংস্কৃত ২১০, ২১১

সংস্কৃত ৩১৮

সংস্কৃত ৮৮৭

১২০০

বৃহৎ বঙ্গ

অনামগঞ্জ ১০২৫	অমিত (অমিত) ৭৫, ৮২
অনৌতিসুমার ৫১০	অমিতা ৮৩, ১১০২
অন্দ-উপাধ্যায় ১০১২	অমেরিয়ান ২৩০
অন্দর ৭০, ৪২৭, ২৭৫, ১০০০	অগাপুর ৩০৫, ২৭৫, ১১৩০, ১১৪০
অন্দর গোহাইন ১০৭১	অরচল ১০২৭, ১০২৮
অন্দরবন ১১, ১২, ৭২১, ৮১২, ৮৪৫, ৮৪৬, ১০৮০, ১১২৩	অরজিং সিংহ ১০৮০
১১৩২, ১১৪০	অরতরঙ্গিনী ৫
অন্দর সিংহ ২৫৬, ২৫৭	অরবর্ণ নারায়ণ ১০৭২
অরমিত ৮৮৭	অরবংশ ৪০২, ৪০৪, ৪০৬
অগাইকা রাজা ১০৫১	অরসেন ৮২০, ২৭৬
অগিলো ১০৫৮	অরানন্দ বী ১১১২, ১১২১
অপুর্বাবন্দর ৫৮	অরেন্দ্রমোহন বহু ১১৩৬
অমরিক ৬০, ৬১, ৬২, ৭৫, ৪৭০	অরেশ্বর ২০৬
অমরিক ৬২	অর্গাম্বৌ ৮৭
অমরতাপ নারায়ণ ১০০০	অর্গা ১০৩০, ১০৪৩, ১০৮৫
অফাকলা ১০৫৮	অলতানগঞ্জ ২৪৬
অফি কবি ৭৫১	অলিকলা ১০৬১
অবড়াই ১০১৮	অলেমান বী ১০৪৮
অবর্ণগ্রাম ২৮, ১০০১, ১০৪২, ১১৪০	অলেমান সাহ ১০৩২
অবর্ণদীপ ৩০৬	অলোচন রাজা ১০৪৭
অবর্ণবপিক ৪৮৫-৪৮৮, ২৭২	অলোচনা ১১২৩, ১১২৭
অবর্ণবিহার ৮, ১২, ৩০৬, ৩৩০	অলুয়া ৫৮৫
অবর্ণশ্রী ১০৫৬	অলেন ১১২৩, ১১২৭, ১১৩৪
অবল ৪৮৮	অলং ছর্গাপুর ৩৮৩
অবিনাশনারায়ণ ১০২১, ১০২২, ১০২৩	অলিনা ৫৫, ৫৬
অবিনাশরাম ১০২১	অলোফা ১০৬০
অবিনকা ১০৫৭	অলুল ২৫
অবুদ্ধি রায় ৬০২, ৬০৩	অলির বর্গা ১০৫০
অবতা ১০৫০	অলং মং ১০৫২
অভগা ৫৪২	অলং ১০৬১
অভজ্ঞাপি ১৫৫	অলেনকা ১০৫৮
অভাগসেনা ২০৩	অলৈ ৫০৪
অভায়া ১৬, ১০১৬, ১০৪৭	অল ৫, ৩০, ৪২
অমন ১৫৬	অরসেন ২৫
অমনকুট ৮১	অর্বা ১০, ৩২, ৫৭৬, ৫৭৭
অনন্ত ২৫	অর্বাচার ৭২৫
অনল ১৪১, ১৪২	অর্বাচাং সরকার ৭৩৬, ৭৩৭
অনাজা ৭১, ২৭২	অর্বাচাং ১১২৪, ১১২৮

সুপ্তিধর ৩৪৮	সোম ঘোষ ১১০১
সেক মহুহর ১০৪১	সোমতীর্থ ৭১
সেক শুভোদয়া ২৬০, ৪৪০, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪১২, ৪১৩-৪২৩, ৪৮৪	সোমবর ১৪২
সেকেন্দর সাহি ৩২০, ৩৩৩, ৩৪৩, ১০৩৪, ১০৮৮, ১০৮৯	সোমসেবী ৪৪০
সেকেন্দর নামা ১৬	সোমনাথ ২, ৪২০, ৪২৪, ৪২৭, ৪৪০
সেজপীয়ার ৩১, ১৪৯	সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ১১০৪
সেতুবজ ২০৯, ৪৪৪, ১০৩৩	সোমেশ বহু ২০৩
সেধনমন ১১৩২	সোলেমান খাঁ ৬৪৩, ৬৪২, ৭৮৭, ৭৮৯, ৮২৮, ৮৮১
সেন ২০, ৩৭, ৪৬৩, ১০৬৯	সোলেমান কররানী ৬৪৪, ১০৩০, ১০৭১
সেন-রাজহ ৪৪৮-৪৭১, ১১২৭, ১১২৯	সৌদীর ৩২
সেনহাটি ৪৪৩, ৪২৮	সৌরধর্ম ৪৭৩-৪৭৯
সেনামহি ১০২৭	সৌরাষ্ট্র ৬
সের আফগান ৮১১, ৮২১, ৮২২, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৫, ৮২৬	স্ট ৪১৯
সেরিফ খাঁ ৮০৮	স্টলিও ১৮
সেলিউকস ১৪০, ১৮১	স্বন্দত্ত ২১৪, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২২৭, ১১০১
সেলিবিস ৯৭২	স্বিনে ৪৪
সেলিম ৮২১, ৮২২, ৮২৩, ৮২৪	স্বীলোকের উচ্চশিক্ষা ৪২৭
সেলিমগড় ৮৩০	স্ববিরপুত্র ১৭৯
সৈক উদ্দিন ৬২২	স্বাপত্য ও শিল্প ৩০২, ৪০৬-৪৪২
সৈয়দ আলোয়াল ৯৮২, ৯৯৯, ১০০০, ১০০২	স্বিরবন্দী ১০৪৩
সৈয়দ ইব্রাহিম ১০৯১	স্বিরমতি ৩০১
সৈয়দ খান ৮২২	স্মেন ২২৮
সৈয়দ মর্জুনা ১০০২	স্পেলিরিসেস্ ১২০
সৈয়দ মহম্মদ ৮৪৪, ৮৪৬, ৮৬১, ৮৬৪	স্পেলোগডানাস্ ১২০
সৈয়দ মহম্মদ আলি খাঁ (নবাব) ১০৯১	স্বকীয়া ৭৪১
সৈয়দ হুসেন ৬৩১, ৬৩২	স্বয়ত্ব ৪০
সৈয়দ উদ্দৌলা ১১৩২	স্বয়ংচল ৩৮
সোণাই ৮৩২	স্বর্গ নারায়ণ ১০৪২, ১০৬৩
সোণাপাড়া ১১৩৯	স্বর্গগ্রাম ১০২৩
সোণামনি ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০০	স্বর্গময়ী ১১৩৪
সোণামুখী ১১১৪	স্বর্গ সিংহ ৪৪৪
সোণামোড়া ১০২৭	স্বাধ ২৪৯
সোণার গাঁ ১৬, ৯৩০, ৯৩৬, ৯৩৭	স্বাধীনচর্চকা ৮২১
সোণার বাজলা ৮২৪	স্বাত্তিক ২৩৮
সোলেনহোফার ৪০১	স্মিথ (বার্গার্ড) ৯০৩
	স্মিথ (জিসেস্ট) ১১৪, ১৩৬, ১৩৮, ১৪১, ১৪৩, ১৭৭, ২৪০, ২৪৩, ২৮৩
	স্মৃতি ৯৪৩, ১০৭৩

১২০২

বৃহৎ বঙ্গ

হ

হাস ২৫
হাসকল ১১০২
হাসেশ্বরীর মন্দির ১১৪০
হাসরত মহেশ্বর ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪৩২
হাসরতি ৩২৭, ৭৭১, ৮২২
হাসর বর্ষা ১০৪০, ১০৪৪
হাসর দেব ১০৮৫
হাউপাটক ১০৮৫
হাড়াহা ৪৭০
হাসমান ২০, ১২০, ১৪০, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬
হাফকিস ১৩০, ১৪১, ১৪০
হাফিগজ ১০২৫
হাফি বী ১০২৪
হাফি ২০০
হাফ্রীব ২২
হাগৌরী ১১১২
হাগৌরী-নবোদ ৩৭
হাগা ২২২, ২৩০, ২৪১, ৪১০
হাগ্রসাদ শাহী ৭, ১১, ৪৭, ১৮২, ২০০, ২৮৮, ৩০১,
২৪২, ২৮৬, ১০২২, ১১০০
হাগ্রসাদ-সম্বন্ধনা-লেখানাল ৮
হাগ্রসাদ ১০২০
হাগ্রসাদ ভূঞা ১১০২
হাগ্রসাদ ১০৭১
হাগ্রসাদ ১১
হাগ্রসাদ শাস ২২০
হাগ্রসাদ ২৪০
হাগ্রসাদ পত্রিকা ১২৪
হাগ্রসাদ ৪০৭, ৪০৮
হাগ্রসাদ সাধু ৪৪২, ৪৮১, ৭১০, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬, ৭৩০,
৮২২, ১১১২
হাগ্রসাদ নিম্নাভাগীশ ১৪০, ১৪১
হাগ্রসাদ ১২, ৭০৪, ২০৮
হাগ্রসাদ ঠাকুর ১০০২
হাগ্রসাদ নন্দী ১১০৪
হাগ্রসাদ ২৮০, ২৭০, ১১০১

হাগ্রসাদ ২৪১
হাগ্রসাদ ৪, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ২০৮, ৪২৪, ১০৪০,
১০৪১
হাগ্রসাদ ২৮০
হাগ্রসাদ ৭২০, ৭২৮, ৭৪২, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪
হাগ্রসাদ ৭৪২
হাগ্রসাদ ২১০
হাগ্রসাদ ২, ৩৪, ২৭৪, ২৭২, ২৮০, ২৮৭, ৭৭৫, ৮৪০,
২০৭, ২০৬, ১১০৪, ১১৪০
হাগ্রসাদ ১০৭০
হাগ্রসাদ ২৭০
হাগ্রসাদ ৩০৭
হাগ্রসাদ ৪৪০
হাগ্রসাদ ৪২০
হাগ্রসাদ ১০২২
হাগ্রসাদ ১১০০
হাগ্রসাদ ২৮২, ৮১৭, ১০৭০
হাগ্রসাদ ১০৮০
হাগ্রসাদ ১২০
হাগ্রসাদ ১০৪৫, ১০৬২
হাগ্রসাদ ২০০, ২০২, ২০৬, ৭২২
হাগ্রসাদ ৮৭৫, ১১১০, ১১১২
হাগ্রসাদ ৪৪৮, ৪৪২, ৪০০, ৪০৪, ৪৪৫, ৪০৩, ৪০২, ৪৮৮,
২৪৭
হাগ্রসাদ ৪১২
হাগ্রসাদ ২০৮
হাগ্রসাদ ৩০২
হাগ্রসাদ ২৪৮
হাগ্রসাদ ১৪৮
হাগ্রসাদ ৪০৮
হাগ্রসাদ ৩০০
হাগ্রসাদ ৩৮
হাগ্রসাদ ৪, ৪০
হাগ্রসাদ ১১০০
হাগ্রসাদ ৮৪০, ৮৪৪
হাগ্রসাদ ৮৪৪, ৮৪৬, ৮৪১, ৮৪৫
হাগ্রসাদ ১০০৮
হাগ্রসাদ ১০০২

- হাঙ্গো ১০৬২
 হাটকেদর ১০৮৩, ১০৮৪
 হাড়মাগরা ১১৪০
 হাড়ি সিদ্ধা ২৬৬
 হাতিয়া ৮১২, ১১২৩
 হাতিয়াঘর ১১৩২
 হাছিয়া ১১৩৮
 হানিফ ৮০৫
 হাফেজ ৬২২, ৭৫১
 হাক্কিজুলা ১১৩৬
 হাবিনো ৬৩২, ৬৫০
 হামতরফার শ্মশান ১০৪২
 হামিদ খাঁ ৮৩৯
 হায়েদরাবাদ ২০৪, ২২৮
 হারক ২০৩
 হারিয়া মেচ ১০৭০
 হারীত সাহিত্য ১৬১
 হারুদেবরকড়াবার ১০৫৩
 হার্মাদি (হারমাদ) ৪৭৩, ৮১১, ২২৬
 হায়া ২০৩
 হালহেড সাহেব ৮১৩
 হালাম ১০৪৭
 হালি (শালিধান) ৬৮
 হাসাই ৬০৭
 হাসানুদ্দিন খিলজি ৬১৩
 হিউগো, ভিক্টর ২৫২
 হিউন সাজ ৭, ৮৯, ৯০, ৯৭, ১২৬, ১২৭, ২০৯, ৩০১, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৪৪, ৪৫৯, ৭২২, ১১০০, ১১০২
 হিন্দু ৪৪৫, ৬০৫
 হিন্দুল নারায়ণ ১০৩৩
 হিজরি ১০২০
 হিজলি ৫৭, ৮৫৭, ১১০৬
 হিড়িখা ৪৬৫
 হিন্দী ২০২, ২৬২
 হিন্দু ২৬৮, ১১০২
 হিন্দুহানী ২৫৩
 হিন্দুহানী লিপি ৩৫
 হিন্দুধর্মের খলিফা ৮২০
 হিন্দু-মুসলমানের জীতি ৬৪৪
 হির ১৭৭
 হিমকর দাস ৮৪২
 হিমতি ১০১২
 হিমতির শ্মশান ১০৪২
 হিমালয় ৩০৮, ২০১, ২৪৪
 হিমু ৬৩৯
 হিম্মত সিংহ ৮৩৮
 হিরণ্য ৭২১, ৭২২
 হিনাম উদ্দিন ৬১৬
 হীন ২০৩
 হীনয়ান ২০৪, ৩০৬, ২৫৯
 হীরা ১০১৮, ১০৬৯, ১০৭০
 হীরাপুর ১০২৩, ১০২৯, ১০৩০
 হীরাবন্ত খাঁ ১০২০, ১০৪৩
 হইলুন ১১০১
 হুগলি ৩০, ৩৮, ৫৭, ৮১২, ৮১৩, ৮২৮, ৮৫৭, ১১৩২
 হুন ২৩১, ২৫৭, ৩০২, ১০৪৭
 হুমায়ুন ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৫২
 হুমায়ুনজা (নবাব) ১১৩৩
 হুরি উজি ৩১৮
 হুসেন আলি ১১৩৩
 হুসেন আলি খাঁ ৮৫০, ৮৫১
 হুসেন কুলি খাঁ ৬৪৮, ৮২২, ৮২৬, ৮৩০, ৮৩৩, ৮৭৪, ৮৭৮, ৮৭৯
 হুসেন খাঁ ১০২৮, ১০৫৯
 হুসেন সাহ ২১, ৬৩৩, ৬৫৪, ৬৫৪, ৬৫৭, ৭১১, ৭১৭, ৭৩৩, ৭৮৭, ৮৮১, ৮৯২, ৯৭৭, ৯৭৮, ১০২৬, ১০২৭, ১০৩৯, ১০৪৩, ১০৪৮, ১০৫৬, ১০৫৯, ১১৩১
 হেইনেস ৭২
 হেকিম ৫২৫
 হেতমপুর ১১৩৬
 হেপাকলাউ ১০২৯
 হেমচন্দ্র চৌধুরী ১৪০
 হেমকর ১০৭৮
 হেমন্তকুমারী ১১৩৫
 হেমন্ত সেন ৪৩৩, ৫২৪, ৯৭৬

১২০৪

বৃহৎ বঙ্গ

হেমপ্রভা দেবী ২৮১
হেমমালিকা ৫৪২
হেমেন্দ্রকুমার ১১৩৩
হেরথ ১০১৮, ১০২৫, ১০৭৬-১০৮০
হেলিওডোরাস ২০৪
হেলিগে ১১৩৪
হৈতেন ধী ১০২৭, ১০২৮
হোগলডাঙ্গা ৮৫৬

হোত (প্রোত) ৬৮
হোমের টিখা ১০৮৪
হোরস ধী ৬৩১
হামিটন ১৭৭, ৮৫১
হাভেল সাহেব ৮৮৬, ৮৮৭, ৮৮১
হারিসহাম ৭২
হালিডে ২১৩
হুখহরণ ২০৩

চিত্র-স্মৃতি

আমরা কতকগুলি ধাতব বুদ্ধমূর্তি চট্টগ্রামের দেয়াং পাহাড়ের নিকটে পাইয়াছি। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মেও সেইরূপ অনেকগুলি রক্ষিত আছে। গ্রন্থভাগে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সেগুলির সঙ্গে যাদা-বরোবদোরের কতকগুলি মূর্তির এরূপ আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য, যে মনে হয় যেন তাহারা একই কারিগরের হাতের নির্মিত। বাদলা হইতে যে এই চিত্র-ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যশিল্প স্বদূর ভারতীয় উপদ্বীপগুলিতে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ক্রমশঃ বহু প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমরা এই পুস্তকের ভূমিকার ২৥৮ পৃষ্ঠার লিখিত বিবরণের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সম্প্রতি গাইকোওয়ার ওরিয়েণ্টাল সিরিজের ডাঃ সিলভ্যান্ লেভি কৃত বলি-দ্বীপে প্রাপ্ত সংস্কৃত হস্তলিখিত পুথির তালিকার ভূমিকায় ঐ দ্বীপের একখানি শিল্প-সম্বন্ধে প্রাচীন পুস্তকের উল্লেখ আছে, তাহাতে লেখক বলিতেছেন যে তিনি “গৌড়-গুরুদেব” চিত্রাঙ্কনমিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শিল্পের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৪৩৬ (খ) সংখ্যক পৃষ্ঠার বুদ্ধমূর্তির নিয়ে বাদলার চিত্রশিল্প সম্বন্ধে পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলির উচ্চ ধারণার প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাজমহলের মত কোন মন্দির ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ বেক্রপ বহু স্থান ব্যাপিয়া পড়িয়া থাকে, বাদলার সেই অদ্ভুত শিল্প-নৈপুণ্যের নিদর্শন সেইরূপ এখনও দেশময় পড়িয়া আছে; এখনও তাহার প্রচুর অনুসন্ধান হয় নাই।

(**) চিত্রিত চিত্রগুলি সমস্তই আমার চিত্রশালার, উহাদের অধিকাংশই এখন ত্রিপুরেশ্বরের আগড়তলার রাজপ্রাসাদে রক্ষিত আছে। কেবল মাত্র যে সকল মূর্তি ও চিত্র আমার রূপেশ্বর দেবমন্দিরে পূজার ঘরে ছিল, তাহা সেইখানেই আছে।

				পৃষ্ঠা
১।	মকরের উপর গঙ্গাদেবী (দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগ)	১
২।	বিজয়ের বক্ষপরাজয় (অজস্তা)	৭৮
৩।	যুদ্ধান্তে প্রমোদোৎসব (অজস্তা)	৭৯
৪।	বিজয়ের অভিব্যেক	৮০
৫।	সিংহের সহিত মল্লবারের যুদ্ধ (কালী ঘাটের পটুয়া) **	৮৫
৬।	সিংহলী ধর্ম্ম-গুরু ধর্ম্মপাল	৮৬(ক)

				পৃষ্ঠা
৭।	ধর্মপাল (বৃদ্ধ বয়সে)	৮৬(ক)
৮।	বিমলানন্দ	৮৬(ক)
৯।	দেবপ্রিয় বলীসিংহ	৮৬(ক)
১০।	রেভারেণ্ড শীলানন্দ	৮৬(খ)
১১।	রেভারেণ্ড সিদ্ধার্থ	৮৬(খ)
১২।	পালোওয়ার নৌকা	৮৬(খ)
১৩।	বুদ্ধ-পুত্র রাহুল (প্রাচীন চিত্র হইতে)	৯৬
১৪।	সারিপুত্র (প্রাচীন চিত্র হইতে)	১০৩
১৫।	মৌদগল্যায়ন (প্রাচীন চিত্র হইতে)	১১৬
১৬।	পার্শ্বনাথের মূর্তি	১৩৫
১৭।	আলেকজেন্ডার (প্রাচীন মুদ্রা হইতে)	১৪৪
১৮।	পুরু ও আলেকজেন্ডার (প্রাচীন মুদ্রা হইতে)	১৪৫
১৯।	মহিবশৃঙ্গযুক্ত আলেকজেন্ডারের মুখ	১৪৭
২০।	আলেকজেন্ডারের মহিব-লাঞ্ছন শিরস্ত্রাণ (ত্রিবর্ণ)	১৪৭(ক)
২১।	অশোক	১৫৪
২২।	কনিক (প্রাচীন মুদ্রা হইতে)	২০৩
২৩।	হবিক (প্রাচীন মুদ্রা হইতে)	২০৩
২৪।	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমার দেবী (প্রাচীন মুদ্রা হইতে)	২০৭
২৫।	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত	২০৭
২৬।	সিংহ-শিকারী চন্দ্রগুপ্ত (২য়) (প্রাচীন মুদ্রা)	২১০
২৭।	শিকারোদ্ভূত চন্দ্রগুপ্ত (২য়) (প্রাচীন মুদ্রা হইতে)	২১১
২৮।	অম্বারোহী চন্দ্রগুপ্ত (২য়) (প্রাচীন মুদ্রা)	২১১
২৯।	বীণাবাদক চন্দ্রগুপ্ত (২য়) (প্রাচীন মুদ্রা)	২১৪
৩০।	কুমারগুপ্ত (১ম) (প্রাচীন মুদ্রা)	২১৫
৩১।	কুমার গুপ্ত (২য়) ঐ	২১৫
৩২।	স্বনগুপ্ত ও তাঁহার রাজ্ঞী, গরুড় স্তম্ভ	২১৫
৩৩।	দ্বিতীয় কুমার গুপ্ত (প্রাচীন মুদ্রা)	২১৮
৩৪।	শশাঙ্ক গুপ্ত (প্রাচীন মুদ্রা)	২১৯
৩৫।	মহেন্দ্রোদারের বাঁড়	২২৮(ক)
৩৬।	পাহাড়পুরের পুরুষ	২২৮(ক)
৩৭।	যমলার্জুন-ভঞ্জন	২২৮(ক)
৩৮।	মহেন্দ্রোদারের স্তম্ভ মনুষ্য-মূর্তি	২২৮(ক)

চিত্র-সূচি

২০৭

পৃষ্ঠা

৩৯।	দশম-একাদশ শতাব্দীর অশ্বরূপ মূর্তি	২২৮(ক)
৪০।	মহাপালদেবের সময়ের ছবি	২২৮(খ)
৪১।	নরপতি কবিচন্দ্রের ব্রহ্মবামল	২২৮(খ)
৪২।	ব্রহ্মবামলের ছবি	২২৯(ক)
৪৩।	ঐ	২২৯(ক)
৪৪।	পটুয়ার অঙ্কিত সিংহ	২২৯(খ)
৪৫।	ঐ সংকীর্ণন	২২৯(খ)
৪৬।	রমণীমূর্তি ত্রিঘণ (২৫০ বৎসরের প্রাচীন)	২৩৮(ক)
৪৭।	ব্রহ্মবামলের ছবি (ত্রিঘণ)	২৩৯(ক)
৪৮।	১০৪৭ সনের গোপীদের ছবি (ত্রিঘণ)	২৩৯(ক)
৪৯।	ঐ ঐ	২৩৯(ক)
৫০।	দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান	৩০৫
৫১।	নাগসেন	৩৩৬
৫২।	মিনাওয়ার	৩৩৭
৫৩।	কাভিকেশ (দশম একাদশ শতাব্দী)	৪০৬(ক)
৫৪।	হরগৌরী (দ্বাদশ শতাব্দী)	৪০৬(ক)
৫৫।	ঐ (নবম শতাব্দী)	৪০৬(ক)
৫৬।	স্বর্ঘ্যমূর্তি (দশম শতাব্দী)	৪০৬(ক)
৫৭।	বিষ্ণুমূর্তি (একাদশ শতাব্দী)	৪০৬(খ)
৫৮।	ঐ (দ্বাদশ শতাব্দী)	৪০৬(খ)
৫৯।	নবগ্রহ (দশম শতাব্দী)	৪০৬(খ)
৬০।	সাদা কুকুরমুখো ছবি	৪১৭(ক)
৬১।	উদ্ধামুখো ছবি	৪১৭(ক)
৬২।	বিশাখা কর্তৃক চিত্র প্রদর্শন	৪১৭(ক)
৬৩।	বৈষ্ণব	৪১৭(খ)
৬৪।	বৈষ্ণবী	৪১৭(খ)
৬৫।	ঘোড়া	৪১৭(খ)
৬৬।	অশোক-স্তম্ভের সিংহের মত সিংহ	৪১৮(ক)
৬৭।	অশোক-স্তম্ভের সিংহ	৪১৮(ক)
৬৮।	সিদ্ধানপুরের চিত্র (২২৮-২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)	৪১৮(ক)
৬৯।	সিদ্ধানপুরের চিত্র	৪১৮(ক)
৭০।	পোড়া ইটে হরিণ	৪১৮(খ)

৭১।	অজস্রার হরিণ	৪১৮(খ)
৭২।	সিদ্ধানপুরের হাড়ি	৪১৮(খ)
৭৩।	ঐ টিকটিকি	৪১৮(খ)
৭৪।	সিদ্ধানপুরের মানুষ (২২৮-২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)	৪১৮(খ)
৭৫।	ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ত্রিপুরার রথের মূর্তি **	৪১৯(ক)
৭৬।	জৈন সন্ন্যাসী **	৪১৯(ক)
৭৭।	খুলনার চতুর্দশ শতাব্দীর কাঠশিল্প **	৪১৯(ক)
৭৮।	ঐ **	৪১৯(ক)
৭৯।	ঐ **	৪১৯(ক)
৮০।	বাউলীর রথের মূর্তি **	৪১৯(খ)
৮১।	ঐ	৪১৯(খ)
৮২।	ঐ	৪১৯(খ)
৮৩।	বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, কাঠ-সিংহাসন (সপ্তদশ শতাব্দী)	৪১৯(গ)
৮৪।	আন্দুলের রথের মূর্তি (বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ সংগৃহীত)	৪১৯(গ)
৮৫।	নবাব হরেকৃষ্ণের কাঠ-সিংহাসন (১৭০৯ খৃঃ) **	৪১৯(গ)
৮৬।	আন্দুলের রথের চিত্র (সপ্তদশ শতাব্দী) বিপিনকৃষ্ণবাবুর সংগৃহীত	৪১৯(গ)
৮৭।	ঐ	৪১৯(গ)
৮৮।	খজুর-বাদিকা—কাঠ-শিল্প (সপ্তদশ শতাব্দী) **	৪১৯(ঘ)
৮৯।	খুলনার কাঠগৃহের স্ত্রীমূর্তি (সপ্তদশ শতাব্দী) **	৪১৯(ঘ)
৯০।	ঐ পুরুষ মূর্তি **	৪১৯(ঘ)
৯১।	ঢাকার কাঠ সিংহাসনের উৎকীর্ণ মূর্তি, (সপ্তদশ শতাব্দী) **	৪১৯(ঙ)
৯২।	ঐ **	৪১৯(ঙ)
৯৩।	ঐ **	৪১৯(ঙ)
৯৪।	ফরিদপুর মাতৃমূর্তি (কাঠের) **	৪১৯(চ)
৯৫।	ঢাকা কাঠ সিংহাসনের মূর্তি **	৪১৯(চ)
৯৬।	দশাবতার (সপ্তদশ শতাব্দী) **	৪১৯(চ)
৯৭।	রাজা সীতারাম রায়ের স্বহস্তনির্মিত কাঠের লক্ষ্মী **	৪১৯(চ)
৯৮।	নারীকুঞ্জর (ত্রিঘণ, মৎসংগৃহীত)	৪২১
৯৯।	রাধাকৃষ্ণ (ত্রিঘণ, মৎসংগৃহীত)	৪২১(ক)
১০০।	রাম-সীতা, জয়পুরী কলম	৪২১(খ)
১০১।	স্ত্রীলোকের অঙ্কিত নারী-পুরুষের চিত্র, ব্রীহত্ত (ত্রিঘণ) **	৪২২(ক)
১০২।	দুর্গামূর্তি (ত্রিঘণ, মৎসংগৃহীত)	৪২২(ক)

চিত্র-সূচি

১২০৯

পৃষ্ঠা

১০৩।	গণেশ জননী (ত্রিবর্ণ, মৎসংগৃহীত) ...	৪২২(খ)
১০৪।	বলরাম ঐ ...	৪২২(খ)
১০৫।	কাঁধা-শিল্প (ত্রিবর্ণ) ...	৪৩০(ক)
১০৬।	ঐ (ত্রিবর্ণ) ...	৪৩০(খ)
১০৭।	নৌ-সৈন্য (বিষ্ণুপুর, পোড়া ইটে, সপ্তদশ শতাব্দী) ...	৪৩৩(ক)
১০৮।	পদ্ম (পোড়া ইটে) ** ...	৪৩৩(ক)
১০৯।	ঐ ** ...	৪৩৩(ক)
১১০।	ঐ বরিশা, (সপ্তদশ শতাব্দী) ** ...	৪৩৩(ক)
১১১।	রথের অংশ (পোড়া ইটে, চতুর্দশ শতাব্দী, ফরিদপুর) ** ...	৪৩৩(ক)
১১২।	বানর যুদ্ধ (পোড়া ইটে, সপ্তদশ শতাব্দী, মেদিনীপুর) ** ...	৪৩৩(খ)
১১৩।	মেঘপালক (২৪শ পরগণা) ** ...	৪৩৩(খ)
১১৪।	বড়াই ও গোপীদের দধি-বিজয়ার্থ মথুরাযাত্রা ...	৪৩৩(খ)
১১৫।	শিকার-চিত্র (ফরিদপুর, চতুর্দশ শতাব্দী) ** ...	৪৩৩(খ)
১১৬।	মাটির গহেনা (ফরিদপুর) ** ...	৪৩৩(খ)
১১৭।	ঐ ** ...	৪৩৩(গ)
১১৮।	মাটির মাতৃমূর্তি (ফরিদপুর) ** ...	৪৩৩(গ)
১১৯।	আমসন্দের ছাঁচ (বরিশাল) * ...	৪৩৩(গ)
১২০।	আলপনা ...	৪৩৩(ঘ)
১২১।	ঐ ...	৪৩৩(ঘ)
১২২।	ঐ ...	৪৩৩(ঙ)
১২৩।	ঐ ...	৪৩৩(ঙ)
১২৪।	ঐ ...	৪৩৩(ঙ)
১২৫।	ঢাকার মসলিন ...	৪৩৩(চ)
১২৬।	ঐ ...	৪৩৩(চ)
১২৭।	মাছর (মেদিনীপুর) ভাল উৎসাহ নাই। ভিতরের যন্ত্র কৃৎসলি ছবিতে অদৃশ্য (ভূমিকা ৩১/০ পৃঃ) ...	৪৩৩(চ)
১২৮।	শঙ্খের উপর দশ অবতার (সপ্তদশ শতাব্দী, শ্রীহট্ট) ...	৪৩৩(চ)
১২৯।	অমুরাগহীন দাম্পত্য (হরপার্কসী, ৯ম শতাব্দী) ...	৪৩৫(ক)
১৩০।	সম্পূর্ণ দাম্পত্য (হরপার্কসী, ১১শ শতাব্দী) ...	৪৩৫(খ)
১৩১।	সম্পূর্ণ দাম্পত্য (হরপার্কসী, ১১শ শতাব্দী) ...	৪৩৫(খ)
১৩২।	ঐ (৯ম-১০ম শতাব্দী) ** ...	৪৩৫(গ)
১৩৩।	কালীঘাটের পটুয়ার অঙ্কিত হরপার্কসী, বাংলা ভাব ** ...	৪৩৫(গ)

				পৃষ্ঠা
১৩৪।	কালীঘাটের পটুয়ার অঙ্কিত হর-পার্বতী **	৪৩৫(ঘ)
১৩৫।	মহাদেব (পটুয়া অঙ্কিত) **	৪৩৫(ঙ)
১৩৬।	দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালে শিব-চিত্র	৪৩৫(চ)
১৩৭।	পটুয়া-অঙ্কিত শিবের সঙ্গে ভদ্রীর সাদৃশ্য **	৪৩৫(চ)
১৩৮।	অজাস্তার স্তম্ভ	৪৩৫(চ)
১৩৯।	অম্বরূপ কাঠের স্তম্ভ, খুলনা (১৪শ শতাব্দী) **	৪৩৫(চ)
১৪০।	সুলতানগঞ্জের বুদ্ধ	৪৩৬(ক)
১৪১।	সারনাথের বুদ্ধ	৪৩৬(ক)
১৪২।	চট্টগ্রামের ধাতব বুদ্ধ (৯ম শতাব্দী) **	৪৩৬(ক)
১৪৩।	ঐ (দ্বাদশ শতাব্দী) **	৪৩৬(ক)
১৪৪।	বরোবদোরের বুদ্ধ	৪৩৬(খ)
১৪৫।	ঐ	৪৩৬(খ)
১৪৬।	মথুরার বুদ্ধ	৪৩৬(খ)
১৪৭।	বরোবদোরের বুদ্ধ	৪৩৬(খ)
১৪৮।	বরোবদোরের বুদ্ধের অঙ্ককরণ, (এন, সি, পাল) **	৪৩৬(গ)
১৪৯।	ঐ	৪৩৬(গ)
১৫০।	প্রাচীনমের বুদ্ধ	৪৩৬(গ)
১৫১।	খেজুরাহের বুদ্ধ (১০ম-১১শ শতাব্দী) **	৪৩৬(ঘ)
১৫২।	বৌদ্ধ গণেশ (১০ম শতাব্দী, চট্টগ্রাম) **	৪৩৬(ঘ)
১৫৩।	বৌদ্ধ-জাতকের চিত্র (কাঠ ফলক) **	৪৩৬(ঘ)
১৫৪।	প্রসন্ন বুদ্ধ	৪৩৬(ঙ)
১৫৫।	ভূটিয়া বুদ্ধ **	৪৩৬(ঙ)
১৫৬।	রূপেশ্বর শিব **	৪৩৬(ঙ)
১৫৭।	ছন্দক ও বুদ্ধশিষ্য আনন্দ (প্রাচীন চিত্র হইতে)	৪৩৬(ঙ)
১৫৮।	জম্বল দেবতা	৪৩৬(চ)
১৫৯।	অশোক রেলিংএর মূর্তি	৪৩৬(চ)
১৬০।	ঐ	৪৩৬(চ)
১৬১।	কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা (মৎসংগৃহীত—ত্রিবার্ণ)	৪৩৮(ক)
১৬২।	পুথির মলাটে ফুল-লতার চিত্র **	৪৩৮(ক)
১৬৩।	মথুরায় কৃষ্ণ (মৎসংগৃহীত—ত্রিবার্ণ)	৪৩৮(খ)
১৬৪।	স্তম্ভ-নিপুণের বুদ্ধ **	৪৩৮(খ)
১৬৫।	মন্দিরীদের (পটীদারদের) চিত্র **	৪৩৯(ক)

চিত্র-সূচি

১২১১

পৃষ্ঠা

১৬৬।	মস্তুরীদের (পটীদারদের) চিত্র **	৪৩২(ক)
১৬৭।	ঐ **	৪৪০(ক)
১৬৮।	ঐ **	৪৪০(ক)
১৬৯।	বাণ গোপাল (ত্রিবর্ণ)	৪৪১(ক)
১৭০।	কুঞ্জবন (ত্রিবর্ণ) **	৪৪১(ক)
১৭১।	মিস বেলনসের অঙ্কিত বাঙ্গালীর ছবি—রক্ষণ শালা	৪৪৭(ক)
১৭২।	ঐ—চরক	৪৪৭(ক)
১৭৩।	শিশুর শব	৪৪৭(ক)
১৭৪।	গদায় অর্ঘ্যদান	৪৪৭(খ)
১৭৫।	বাঙ্গালী হিন্দু বাই	৪৪৭(খ)
১৭৬।	গৃহাভিমুখে	৪৪৭(খ)
১৭৭।	হিন্দু অস্তঃপুর	৪৪৭(গ)
১৭৮।	প্রসাধন	৪৪৭(গ)
১৭৯।	নিদ্রিতা **	৪৪৮(ক)
১৮০।	নর্তকী **	৪৪৮(খ)
১৮১।	স্বামী স্ত্রী **	৪৪৮(খ)
১৮২।	বৈষ্ণব **	৪৪৮(গ)
১৮৩।	নায়িকা **	৪৪৮(গ)
১৮৪।	ঐ **	৪৪৮(ঘ)
১৮৫।	ভেড়া বানানো **	৪৪৮(ঙ)
১৮৬।	বীণাবাদিকা **	৪৪৮(চ)
১৮৭।	নায়িকা	৪৪৮(ছ)
১৮৮।	নাটক-নায়িকা **	৪৪৮(জ)
১৮৯।	পরী **	৪৪৮(ঝ)
১৯০।	নাটক-নায়িকা **	৪৪৮(ঝ)
১৯১।	পরী **	৪৪৮(ঞ)
১৯২।	চুল আচরানো **	৪৪৮(ঞ)
১৯৩।	বেহালা-বাদিকা **	৪৪৮(ট)
১৯৪।	তাম্রকুট-সেবিকা **	৪৪৮(ট)
১৯৫।	ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা	৪৪৮(ঠ)
১৯৬।	পটল চেরা	৪৪৮(ঠ)
১৯৭।	দুল-পরী **	৪৪৮(ড)

১৯৮।	তবলা-বাদিকা **	৪৪৮(ড)
১৯৯।	গো-দোহনকারিণী	৫৪১(ক)
২০০।	ফরিদপুরের মাতৃমূর্তি	৫৪১(ক)
২০১।	আলেকজেন্দ্রিয়ার আইসিস মূর্তি	৫৪১(ক)
২০২।	চীনদেশীয় মাতৃমূর্তি	৫৪১(ক)
২০৩।	কালীঘাটের মাতৃমূর্তি	৫৪১(ক)
২০৪।	লক্ষণ সেন	৫৪২(ক)
২০৫।	বাবর	৫৪২(ক)
২০৬।	আকবর	৫৪২(ক)
২০৭।	মানসিংহ	৫৪২(খ)
২০৮।	হুমায়ুন	৫৪২(খ)
২০৯।	শেরশাহ	৫৪২(খ)
২১০।	হুজুহান **	৫৪২(খ)
২১১।	জাহাঙ্গীর	৫৪২(খ)
২১২।	শাহজাহান	৫৪২(খ)
২১৩।	আরঙ্গজেব	৫৪২(গ)
২১৪।	মুরসিদকুলি খাঁ	৫৪২(গ)
২১৫।	সরফরাজ খাঁ	৫৪২(গ)
২১৬।	আলিবর্দী খাঁ	৫৪২(গ)
২১৭।	সুজাউদ্দিন	৫৪২(গ)
২১৮।	সিরাজুদ্দলা	৫৪২(ঘ)
২১৯।	মীরজাফর ও মীরণ	৫৪২(ঘ)
২২০।	গোরক্ষনাথ	৫৪২(ঘ)
২২১।	মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র	৫৪২(ঘ)
২২২।	ক্লাইভ	৫৪২(ঘ)
২২৩।	মোহনলাল	৫৪২(ঙ)
২২৪।	কৃত্তদমন	৫৪২(ঙ)
২২৫।	রাজা নরসিংহ দেব	৫৪২(ঙ)
২২৬।	রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল	৫৪২(ঙ)
২২৭।	রামপ্রসাদ সেন • •	৫৪২(ঙ)
২২৮।	রামপ্রসাদের স্ত্রী যশোদা দেবী • •	৫৪২(ঙ)
২২৯।	রমণী-দেহের উত্তরার্দ্ধ নগ্ন, মধুরভঙ্গ	৫৪২(ক)

চিত্র-সূচি

১২১৩

পৃষ্ঠা

২৩০	রমণী-দেহের উত্তরার্দ্ধ নথ, বরোবন্দর ...	৫৫৯(ক)
২৩১	সারওয়ারজান মিত্রের ঘর ...	৫৫৯(খ)
২৩২	ঐ (ত্রিবার্ণ) ...	৫৫৯(গ)
২৩৩	কান্তিনগরের মন্দির ...	৬৬০(ক)
২৩৪	বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী-মন্দির ...	৬৬০(খ)
২৩৫	বাঁশবেড়িয়ার বিষ্ণুমন্দির ...	৬৬০(খ)
২৩৬	মহানাদের, রাধাকৃষ্ণ-মন্দির ...	৬৬০(খ)
২৩৭	মহানাদের দোতলা ঘরের সত মন্দির ...	৬৬০(খ)
২৩৮	বারিশদের, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ...	৬৬০ গ)
২৩৯	জটার দেউল ...	৬৬০(ঘ)
২৪০	সের সাহের সমাধি ...	৬৬০(ঘ)
২৪১	চৈতন্য-সংকীর্তন (সপ্তদশ-শতাব্দী—ত্রিবার্ণ) মৎসংগৃহীত ...	৬৭৪(ক)
২৪২	গোবর্দ্ধন-ধারণ (ত্রিবার্ণ) মৎসংগৃহীত ...	৬৭১(ক)
২৪৩	দশ্যাকর্ষক নারীধারণ (ত্রিবার্ণ) ** ...	৬৭৫(ক)
২৪৪	রাই মানিনী (ত্রিবার্ণ) ** ...	৬৭৫(ক)
২৪৫	কৃষ্ণের মথুরা-যাত্রা (ত্রিবার্ণ) ** ...	৬৭৫(ক)
২৪৬	রাধাকৃষ্ণ ও গোপীগণ (ত্রিবার্ণ) ...	৬৭৫(খ)
২৪৭	কৃষ্ণের মথুরা-যাত্রা (ত্রিবার্ণ) ...	৬৭৫(খ)
২৪৮	চারিটি গোপী (ত্রিবার্ণ) ...	৬৭৫(খ)
২৪৯	চৈতন্য (সপ্তদশ শতাব্দী) ** ...	৬৭৭(ক)
২৫০	চৈতন্য (২৫ বৎসর পূর্বের) ** ...	৬৭৭(খ)
২৫১	চৈতন্য (সমসাময়িক) ** ...	৬৭৭(খ)
২৫২	চৈতন্য (নবদ্বীপের প্রাচীন মূর্তি) ...	৬৭৭(খ)
২৫৩	চৈতন্য সংকীর্তন (১৮১৫ খৃঃ) ...	৬৭৭(খ)
২৫৪	কৃষ্ণের দধি-হরণ-লীলা (মকরীন্দ্রের চিত্র, ত্রিবার্ণ) ** ...	৬৭৭(গ)
২৫৫	ত্রিনিবাস মূর্ত্যপয়, রামচন্দ্র কবিরাজ এবং একজন বৈষ্ণব চিকিৎসক (সপ্তদশ শতাব্দী ত্রিবার্ণ) ** ...	৬৭৭(গ)
২৫৬	বীরহাদীর (বৈষ্ণব ভিক্ষুবশে) রাণী হৃদক্ষিণা এবং ত্রিনিবাস আচার্য (ত্রিবার্ণ) ** ...	৬৭৭(গ)
২৫৭	প্রতাপকজ ও চৈতন্যের প্রথম মিলন সপ্তদশ শতাব্দী (ত্রিবার্ণ) ...	৬৭৭(ঘ)
২৫৮	হরিদাস ও অষ্টমত (১২৫ বৎসর পূর্বের ত্রিবার্ণ, মৎসংগৃহীত) ...	৬৭৭(ঘ)
২৫৯	হরিদাস, (সপ্তদশ শতাব্দী ত্রিবার্ণ, মৎসংগৃহীত) ...	৬৭৭(ঘ)

২৬০।	বড়ভুজ চৈতন্য (১৮১৫ খৃঃ)	৬২৭(ঙ)
২৬১।	নিত্যানন্দ (২৫০ বৎসর পূর্বের) **	৬২৭(ঙ)
২৬২।	অষ্টমত (প্রোট বয়সের, সপ্তদশ শতাব্দী) **	৬২৭(ঙ)
২৬৩।	অষ্টমত (বারুকো) **	৬২৭(ঙ)
২৬৪।	হরিদাস (২৫০ বৎসর পূর্বের) **	৬২৭(ঙ)
২৬৫।	রূপ গোস্বামী	ঐ	**	...	৬২৭(চ)
২৬৬।	গদাধর	ঐ	**	...	৬২৭(চ)
২৬৭।	রায় রামানন্দ	ঐ	**	...	৬২৭(চ)
২৬৮।	শ্রীগোবিন্দ	ঐ	**	...	৬২৭(চ)
২৬৯।	সনাতন	ঐ	**	...	৬২৭(চ)
২৭০।	রাজা প্রতাপরুদ্র	ঐ	**	...	৬২৭(চ)
২৭১।	জীব গোস্বামী	ঐ	**	...	৬২৭(ছ)
২৭২।	গোপাল ভট্ট	ঐ	**	...	৬২৭(ছ)
২৭৩।	রঘুনাথ ভট্ট	ঐ	**	...	৬২৭(ছ)
২৭৪।	রঘুনাথ দাস	ঐ	**	...	৬২৭(ছ)
২৭৫।	স্বরূপ দামোদর	ঐ	**	...	৬২৭(ছ)
২৭৬।	শ্রীজগদানন্দ	ঐ	**	...	৬২৭(জ)
২৭৭।	গুরুদ্বার ব্রহ্মচারী (সপ্তদশ শতাব্দী) **	৬২৭(জ)
২৭৮।	উদ্ধরণ দত্ত (২১৩ শত বৎসর পূর্বের) **	৬২৭(জ)
২৭৯।	গদাধর পণ্ডিত (সপ্তদশ শতাব্দী) **	৬২৭(জ)
২৮০।	শ্রীবাস (২৫০ বৎসর পূর্বের) **	৬২৭(জ)
২৮১।	রামচন্দ্র কবিরাজ (সপ্তদশ শতাব্দী) **	৬২৭(ঝ)
২৮২।	মূর্ত্যাপন্ন শ্রীনিবাস আচার্য (সপ্তদশ শতাব্দী) **	৬২৭(ঝ)
২৮৩।	হেবজ (ভূমিকা ৩-৩/০ দ্রষ্টব্য)	৬২৭(ঝ)
২৮৪।	বীরহাধীর (২৫০ বৎসর পূর্বের) **	৬২৭(ঝ)
২৮৫।	হরিদাস-আশ্রমের বকুলতরু (মৎসংগৃহীত)	৬২৭(ঞ)
২৮৬।	চৈতন্য-সংকীর্ণন (সপ্তদশ শতাব্দী)	৬২৭(ঞ)
২৮৭।	বাসুদেব সার্কভৌম **	৬২৭(ট)
২৮৮।	মহারাজা প্রতাপরুদ্র (১৩৪ খৃঃ) **	৬২৭(ট)
২৮৯।	ধরন আচার্য (সপ্তদশ শতাব্দী) **	৬২৭(ট)
২৯০।	দক্ষিণে শ্রীনিবাস, মধ্য নরোত্তম, বামে শ্রামানন্দ (১৭৫৮ খৃঃ) মৎসংগৃহীত	৬২৭(ট)
২৯১।	রথের মিছিল	৬২৭(ঠ)

চিত্র-সূচি

১২১৫

পৃষ্ঠা

১২।	পঞ্চ-শ্রীযুক্ত ত্রিপুরেশ্বর বীরবিক্রমকিশোর মানিক্য কে, সি, এস, আই (ত্রিবার্ণ)	১০১৩
১৩।	মহারাজা বিজ্ঞানিকোয় নোবাতান	১০৩১(ক)
১৪।	ত্রি	১০৩১(খ)
১৫।	মহারাজা দুর্গামানিক্য	১০৪৫(ক)
১৬।	মহারাজা কৃষ্ণমানিক্য	১০৪৫(ক)
১৭।	মহারাজা দীপানমানিক্য	১০৪৫(ক)
১৮।	মহারাজা রামগঙ্গামানিক্য	১০৪৫(ক)
১৯।	মহারাজা ধনুমানিক্যের মন্দিরসমূহ	১০৪৫(খ)
২০।	মহারাজা বীরচন্দ্রমানিক্য (ত্রিবার্ণ)	১০৪৬(ক)
২১।	মহারাজা রাধাকিশোরমানিক্য (ত্রিবার্ণ)	১০৪৬(খ)
২২।	মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরমানিক্য (ত্রিবার্ণ)	১০৪৬(গ)
২৩।	"রিয়া" প্রস্তুতকারিনী রমণীগণ (ত্রিবার্ণ)	১০৪৭(ক)
২৪।	বয়ননিরতা রমণী (ত্রিবার্ণ)	১০৪৭(খ)